কেবলমাত্র

সূচীপত্র—শ্রাবণ, ১৩৭১

সূচীপত্র—শ্রাবণ, ১৩৭১

পরিচয় ধীরে ধীরে দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু প্রতিকারের সক্রিয় [illegible] কোনও আশাজনক লক্ষণ এখনও দেখা যাইতেছে না।

উদাহরণ স্বরূপে জনকল্যাণের দুইটি জরুরি কথা ধরা যাউক। সে দুইটি খাদ্য ও আশ্রয়। এই দুইটিই অত্যাবশ্যক ও জীবনধারণের অপরিহার্য উপকরণ এবং এই দুইটিই দেশের অর্থপিশাচ বণিক ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অতৃপ্ত লালসার প্রতিক্রিয়ায় জনসাধারণের ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। সারা দেশে খাদ্য-দ্রব্য লইয়া যাহা চলিতেছে তাহাকে প্রধানমন্ত্রী লাল-বাহাদুর শাস্ত্রী জনসাধারণের জীবন লইয়া জুয়াখেলা বলিয়াছেন। দেশের প্রধান কর্মস্থলগুলিতে জমি ও বাসস্থল লইয়া যে জুয়াখেলা চলিতেছে তাহার ফলে বহু অল্পপরিবার অতি নিকৃষ্ট বস্তিতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে। কলিকাতার অবস্থা ক্রমে এমন দাঁড়াইতেছে যে, কোনও ভদ্র গৃহস্থ বাঙালী আর অল্প দিন পরে কলিকাতায় ভদ্রস্থ থাকিতে পারিবে না—যদি না ভাগ্যক্রমে পিতৃপুরুষের বাস্তুভিটা ঐ অর্থপিশাচদের কবলে পড়িয়া থাকে বা যদি না পরিবারের কর্তা সরকারী কিংবা বিদেশী বণিক প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী থাকেন।

বিগত সাধারণ নির্বাচনে যিনি কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থীরূপে কলিকাতার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের এক সংসদীয় আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, তিনি ঐ সময়ে আমাদের বলেন যে আমরা ঐ অঞ্চলের বস্তিগুলিতে কি শ্রেণীর লোক থাকে সে বিষয়ে কিছু জানি কি না। তিনি বলেন যে, ঐ বস্তিগুলির মধ্যে যে সকল পরিবার থাকে তাহাদের মধ্যে শতকরা ১০।১৫ হইতে ৩০।৪০ পর্যন্ত বাঙালী মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থ শ্রেণীর এবং তাহাদের মধ্যে অনেকেই [illegible] লোক, যাঁহাদের ঊর্দ্ধতন চৌদ্দ-পুরুষের মধ্যে কেহই ঐরূপ পরিবেশে জীবনযাপন করেন নাই। ঐ প্রার্থী মহাশয়ের নির্দ্দেশে আমরা দুই-তিন বার [illegible] বস্তিতে যাইয়া ঐ শ্রেণীর লোকের সঙ্গে [illegible] বাক্যালাপ করি এবং সেই [illegible] [illegible] [illegible] এখনও মনে জাগিয়া আছে। [illegible]

কংগ্রেসী সরকারকে আক্রমণ করেন। এবং সেই আক্রমণের মধ্যে মার্কসবাদ বা কম্যুনিষ্ট মতবাদের [illegible] বিশেষ কিছু ছিল না। [illegible] কংগ্রেসী সরকারের [illegible] ও জনসাধারণের [illegible] কল্যাণচর্চায় নিদারুণ অবহেলার ফর্দ প্রদানের কথা এবং ঐ অবহেলা ও কর্তব্যজ্ঞানশূন্যতার কারণ সম্পর্কে (তাঁহাদের অনুমান স্বরূপে) বণিক সম্প্রদায় হইতে ব্যক্তিগত বা দলগত ঘুষ গ্রহণের কথা। তাঁহাদের বুঝাইতে আমরা পারি নাই, কেননা তাঁহারা নিজেরাই এই অবহেলার জলন্ত নিদর্শন ছিলেন। বলা বাহুল্য ঐ প্রার্থী মহাশয় অতিশয় কর্মঠ হওয়া সত্ত্বেও পরাজিত হইয়াছিলেন।

বাংলায় কংগ্রেসে একদল লোক আছেন যাঁহারা মনে করেন যে, তাঁহাদেরই বুদ্ধিমত্তার ফলে ও এঁদের প্রধান সংবাদপত্রগুলির কর্তৃপক্ষের সহায়তায় বাংলায় কংগ্রেস জয়যুক্ত হইয়াছে। এই বুদ্ধিমানদের হাতে কংগ্রেসের অবনতি যেরূপ হইয়াছে তাহাতে বাংলায় কংগ্রেসের প্রকৃত সহায়ক যাহারা, তাহাদের মনে হতাশার সঞ্চার হইতেছে, একথা এখন বলা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস জিতিয়াছিল, যেহেতু বিপক্ষে অধিকাংশ স্থলেই অযোগ্যতর প্রার্থী ছিল। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ অনেক। কিন্তু তার মধ্যে প্রধান কথা এই যে, কংগ্রেসের পার্টি তহবিল কালোবাজারী টাকায় ভর্তি এবং কালোবাজারীরা ও মুনাফাবাজেরা এই টাকা ও অন্য ব্যক্তিগত "ব্যবস্থা" নিজেদের রক্ষা করার জন্যই খরচ করিয়া থাকে এবং এই টাকার জোরেই তাহারা অবাধে দেশের লোকের রক্ত শোষণ করিতেছে। আমরা জানি যে কংগ্রেসী পাণ্ডারা এরূপ কথার [illegible] [illegible] করেন—অথচ ক্রমে দেশশুদ্ধ লোক এই অভিযোগ সত্য বলিয়াই মনে করিতেছে।

পশ্চিম বাংলায় পূর্ব পাকিস্তান হইতে আগত [illegible] গৃহহীন ও আশ্রয়হীন বহু লক্ষ লোক রহিয়াছে। [illegible] কংগ্রেসী সরকার ও তাঁহাদের [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীদের সাম্প্রতিক সম্মেলনে এইরূপ একটি কর্পোরেশন গঠনের প্রস্তাব করেন।

প্রকাশ, আগে মূল্য নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে উভয়েই একমত হন। (আনন্দবাজার)

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যে সমস্ত মন্ত্রীর হাতে অর্থনৈতিক মন্ত্রণালয়গুলির ভার আছে তাঁহাদের সকলকেই প্রধান-মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী এই অনুরোধ করিয়াছেন যে, তাঁহারা যেন সমস্ত দ্রব্যের মূল্য হ্রাস করিবার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন।

শ্রীশাস্ত্রী তাঁহাদের নিকট প্রেরিত এক নোটে এই কথা জানাইয়াছেন যে, গত ১৫ দিনের মধ্যে সমস্ত দ্রব্যের মূল্যই শতকরা ৪·৪ ভাগ বাড়িয়া গিয়াছে। শ্রীশাস্ত্রী আরও জানাইয়াছেন যে, শুধু খাদ্যসামগ্রীর দামই বাড়ে নাই, প্রায় সব রকম জিনিষপত্রের দামই বাড়িয়া গিয়াছে। দ্রব্যমূল্যের ঊর্দ্ধগতি কিভাবে রোধ করা যাইতে পারে সেই সম্বন্ধে পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্যও প্রধানমন্ত্রী তাঁহার সহকর্মিগণকে অনুরোধ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা মন্ত্রিসভার নিকট আলোচনার জন্য পেশ করিতে হইবে। অর্থমন্ত্রী শ্রী টি টি কৃষ্ণমাচারী লণ্ডন হইতে ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত সম্ভবত এই বিষয়টি মন্ত্রিসভার নিকট পেশ করা হইবে না। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহিত যে সমস্ত দ্রব্যের সম্পর্ক আছে সেই সমস্ত দ্রব্যের মূল্য হ্রাস করিবার জন্যও তিনি মন্ত্রণালয়-গুলিকে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধি রোধকল্পে যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে সেই সমস্ত ব্যবস্থা এবং দ্রব্যমূল্য হ্রাসের উদ্দেশ্যে রচিত বিভিন্ন পরিকল্পনা বিবেচনা করিয়া দেখিবার পর মন্ত্রিসভা একটি সুসংহত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবেন। (আনন্দবাজার)

সেই সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী খাদ্যনীতির কথাও আলোচিত হইয়াছে একথা অন্য সংবাদে দেখা যায়। যথা :

[illegible] পাওয়া যাইতেছে তাহাতে প্রস্তাবিত খাদ্যশস্য ব্যবসায় সংস্থাটি কেন্দ্রীয় উদ্যোগে পরিচালিত [illegible] হয়। তবে রাজ্য সরকারসমূহ উহার [illegible] পারেন। [illegible] প্রস্তাবিত সংস্থা [illegible] জাতীয় খাদ্য-নীতিরই একটি অংশ [illegible] এই সংস্থা পরিচালনার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের উপর অর্পিত হওয়া উচিত বলিয়া বিবেচনা করা হইতেছে। কেন্দ্রীয় খাদ্যসচিব এই বিষয়ে খুঁটিনাটি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতেছেন। ওয়াকিবহাল মহলের সংবাদে জানা যায় যে, প্রস্তাবিত খাদ্যশস্য ব্যবসায় সংস্থা গঠন সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহের কারণ নাই।

মুখ্যমন্ত্রীদের সাম্প্রতিক সম্মেলনে যে সকল প্রশ্নের উত্তর হয়, আজকের আলোচনায় সেইগুলিই প্রাধান্য লাভ করে। কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত খাদ্যশস্য ব্যবসায় সংস্থা গঠন এবং খাদ্যজাত দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ সংস্থা গঠনের যে প্রস্তাব করিয়াছেন, এই বৈঠকে তাহা বিশেষভাবে আলোচিত হয়।

কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য পরিস্থিতির উপর বিশেষ নজর রাখিতেছেন। পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে সরেজমিনে পর্য্যালোচনা এবং মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনের সহিত পরামর্শ করিয়া অবস্থার উন্নতির জন্য আর কি ব্যবস্থা দরকার সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে শ্রীসুব্রাহ্মণ্যম আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে কলিকাতা সফর করিবেন বলিয়া আশা করা যায়। (যুগান্তর)

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও ব্যাপকভাবে একদিকে দৃষ্টি দিবার জন্য তাঁহার দপ্তর ও অন্যান্য দপ্তরের সকলকে বলিতেছেন। তাঁহার প্রধান লক্ষ্য অবশ্য দুর্নীতি দমন এবং সেই পথে জনকল্যাণসাধন। সম্প্রতি এ বিষয়ে তাঁহার নানা প্রচেষ্টার কথা প্রকাশিত হইয়াছে। তার মধ্যে একটিতে বলা হইয়াছে যে :—

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সকল প্রকার দ্রব্যে ভেজাল [illegible] ও [illegible]-নিষেধের [illegible] হইতেছে যে সম্বন্ধে সোচ্চার হইবার জন্য দেশব্যাপী এক [illegible] ব্যবস্থা করিতেছেন। [illegible] স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীনন্দ [illegible] এই সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। [illegible] সাংবাদিকদের নিকট তিনি বলেন, [illegible] [illegible] ব্যবসায়ীদের [illegible] হইয়াছে। [illegible] [illegible] দেখা হইয়াছে [illegible] [illegible] উদ্দেশ্য [illegible]।

[illegible]

[illegible] জনসাধারণের ঘাড়েই চাপাইতে হইবে। এবং সেজন্য জনসাধারণের নিকট হইতে ইহার জন্য চালাইবার টাকা তুলিতে হইবে, হয় কোনও (cess) উপকর বা করের অংশ হিসাবে বা জনহিতকর ট্রাস্ট, দেবোত্তর ও ওয়াকফ সম্পত্তির আয়ের ক্ষুদ্র অংশ হিসাবে। খরচের টাকা যে পথেই আসুক তাহার আয়ের উপর ও ব্যয়ের উপর সমানে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। "অর্থই সকল অনর্থের মূল" এই প্রবাদ বাক্য যতটা সত্য, এ দেশের ইতিহাসে উহা ততটা সত্য ইহার পূর্বে কখনও ছিল না।

অপকর্মের সাফাই গান

বিগত ভুবনেশ্বর কংগ্রেস অধিবেশনের সময় উড়িষ্যার ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিজু পট্টনায়েক বলেন যে, দেশে ৩০০০ কোটির মত অসৎ উপায়ে প্রাপ্ত ও সংগৃহীত টাকা কয়েক শত পরিবারের হাতে রহিয়াছে। এবং এই চোরাকারবার, ট্যাক্স ফাঁকি ও কালোবাজার ইত্যাদি জাল-জুয়াচুরি জাতীয় কারবারে উৎপন্ন টাকার পুঁজিই দেশের সকল প্রগতি ও উন্নয়নে প্রবল বাধা দিয়া দেশের সর্বনাশ ও জাতির ধ্বংসই আগাইয়া আনিতেছে। এই কথাটা সর্বজনবিদিত এবং এখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনেকেই ইহা মূলতঃ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন— শুধু টাকার পরিমাণ সম্পর্কে শ্রী পট্টনায়েকের আনুমানিক উক্তি ছাড়া অন্য বিশেষ নজির নাই।

শ্রী পট্টনায়েকের মন্তব্য প্রকাশিত হইবার কিছুদিন পর সংবাদপত্রে চিঠি ও মন্তব্য আসিতে লাগিল, যাহার উদ্দেশ্য ছিল শ্রী পট্টনায়েকের উক্তিকে অন্যায় প্রমাণ করা। এই চিঠি ও মন্তব্যের প্রধান বক্তব্য ছিল যে, এ দেশে নোট চলিতেছে মাত্র ২৮০০ কোটি টাকার মত সুতরাং ৩০০০ কোটি টাকা আসিবে কোথা হইতে। আমাদের দেশের সংবাদপত্রে আজকাল এই প্রকার তথাকথিত [illegible] পত্র, বক্তব্য ইত্যাদি নির্বিচারে ও বিনা [illegible] মন্তব্যে ছাপা হইতেছে সুতরাং সাধারণ [illegible] উহা সত্য বলিয়া গ্রহণ [illegible]। [illegible] কোটি টাকার

ঐ জোরা টাকা [illegible] এবং উহার অধিকারীদিগের [illegible] ও ব্যাপক নয়। চোরাই টাকা যে মুদ্রার [illegible] নোটের আকারে বাঁধা থাকে না, এটা একটু বিচার করার [illegible] পাঠকদের শতকরা [illegible] করিবেন কি না সন্দেহ।

এই চোরাই টাকার পুঁজি ও তাহার ব্যবহার কি ভাবে হয় তাহার দুইটি উদাহরণ আমাদের সামনে আসে। সে দুইটি আমরা এখানে দিলাম। বলা বাহুল্য অন্য সাধারণ উদাহরণ শত শত দেওয়া যায় কিন্তু প্রয়োজন নাই ও স্থানও নাই বলিয়া আমরা দিলাম না।

প্রথমটি আমাদের সামনে আসে এক আফিমের বৃহৎ চোরাচালান ধরা পড়ার পর। চালানে একটি পাঞ্জাবী যাত্রীদলের সুটকেসে প্রায় ৩০ সের খাঁটি আফিম ছিল যাহা হাওড়া ষ্টেশনে ধরা পড়ে। ধরা পড়ার পর আবগারি ও পুলিস জোর তদন্ত চালায়। যাঁহারা তদন্ত করিতেছিলেন তাঁহাদের মধ্যে আমাদের পরিচিত এক উচ্চপদস্থ পুলিস কর্মচারী ছিলেন। তিনি বলেন, যেহেতু ঐ ৩০ সের আফিম চোরা চালানের হওয়া সত্ত্বেও উৎকৃষ্ট ধরণের, অতএব উহা বাহিরে চালান দিবার জন্য এখানে আনীত হয় এবং ঐ যাত্রীদলের এখানে আসিবার পূর্বের গতিবিধি সম্পর্কে ও এখানে উহাদের সঙ্গে যাহারা ষ্টেশনে সংযোগ করিতে গিয়াছিল তাহাদের সম্পর্কে ব্যাপক খোঁজ করার মত প্রমাণও পাওয়া যায়। পুলিস অফিসার যাহা বলেন তাহাতে বুঝিলাম যে, এক বিরাট আন্তর্জাতিক দল এই আফিমের চোরাই চালান মধ্য-প্রাচ্যে, সিঙ্গাপুরে ও হংকঙে পাঠাইতেছে এবং তাহার পরিবর্তে আনিতেছে সোনার চোরাই চালান। তাঁহার বিবৃতিতে আমরা বুঝিলাম যে, [illegible] হয় [illegible] বিভাগ যাবৎ [illegible] হয়। [illegible] টাকা [illegible] করে [illegible]।

[illegible]

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীকরুণাকুমার নন্দী

খাদ্যসঙ্কট ও মূল্য-সমস্যা

গত মাসের প্রবাসীতে খাদ্য-সমস্যা সমাধানকল্পে সম্প্রতি রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীদের নয়া দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার উল্লেখ করা হয়েছে। ভারতে খাদ্য-সমস্যা আজকের হঠাৎ গজিয়ে-ওঠা সমস্যা নয়। বস্তুতঃ, দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময় বাংলা দেশে কয়েকটি সম্পূর্ণ বিবেক ও মনুষ্যত্বহীন মুনাফাখোরের কারসাজিতে যে বিশ লক্ষাধিক হতভাগ্য ও সম্বলহীন দরিদ্রের খাদ্যাভাবে জীবনপাত ঘটেছিল তখন থেকেই আমরা এই সমস্যাটির সঙ্গে বসবাস করতে সুরু করেছি। ইংরেজ যখন এদেশের শাসনদণ্ড ভারতীয়দের হাতে তুলে দিয়ে চলে যায়, তখন খাদ্যশস্য সরবরাহক একটি নিতান্ত অক্ষম যন্ত্র কতকগুলি শহরাঞ্চলে চালু ছিল। তার ফলে উপযুক্ত মূল্যে দেশের সাধারণ লোকদের খাদ্য ত মিলেই নাই, বরং নানাবিধ অসৎ উপায়ে মুনাফাবাজী বাড়িয়াই চলিয়াছিল। দেশের শাসন-যন্ত্রে আজ যে ব্যাপক অনাচার ও অসদাচারণের কীট ইহাকে প্রায় বিকল করিয়া আনিয়াছে তাহারও প্রাথমিক উদ্ভব এই সরকারী খাদ্যবন্টন যন্ত্রের ভিতর দিয়াই সুরু হয়। স্বর্গগত রফি আহমদ কিদোয়াই যখন কেন্দ্রীয় খাদ্য-মন্ত্রণালয়ের ভার গ্রহণ করেন তখন তিনি খুব স্পষ্ট করিয়াই অবস্থাটি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, অসদাচরণের কীট এমন গভীর ভাবে শাসনযন্ত্রে অনুপ্রবেশ করিয়াছিল যে. খাদ্যশস্য বণ্টনের ব্যবস্থাটিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবমুক্ত করিতে না পারিলে ব্যাপক এবং অনির্দ্দিষ্টকালব্যাপী মন্বন্তর অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িবে। তাই ১৯৫৭ সনে তিনি খাদ্যপণ্য বণ্টন ব্যবস্থার উপর হইতে সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করিয়া লন। তাহার ফলে মোটামুটি সমস্যাটির জটিলতা খানিকটা কমিয়াছিল, বাড়ে নাই।

ইতিমধ্যে অংশতঃ প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেশ খানিকটা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং অংশতঃ আমেরিকার সহিত চুক্তির ফলে খাদ্যশস্য নিয়মিত আমদানী হইতে থাকিবার ফলে মূল্য ও সরবরাহ উভয় দিক দিয়াই খাদ্যপণ্যের সমস্যাটি কিছু দিনের জন্য খানিকটা সহজ হইয়া আসিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ও উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই সময়ে দেশের সাধারণ উৎপাদন গতি কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই বেশ খানিকটা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে উন্নয়ন উদ্দেশ্যে যে প্রভূত পরিমাণ অতিরিক্ত অর্থ নিয়োগ করা হইয়াছিল তাহা মূল্যমানের উপর তেমন একটা অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করিতে পারে নাই। তবু দ্বিতীয় পরিকল্পনার মধ্যভাগ হইতেই যে ধীরে ধীরে মূল্যমানের উপরে একটা ক্রমবর্দ্ধমান চাপ সৃষ্টি হইতে সুরু করিয়াছিল সে কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তদানীন্তন পরিকল্পনা মন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টির একটি বৈঠকে এই বিষয়টির উল্লেখ করিয়া বলেন যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার উন্নয়নের পথে এই মূল্যবৃদ্ধি প্রভূত বাধা সৃষ্টি করিয়াছিল এবং এই বিষয়ে কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন ও প্রয়োগ করিতে না পারিলে তৃতীয় পরিকল্পনার উন্নয়ন সার্থকতা যে আরও অধিকতর পরিমাণে ও অনিবার্য্য ভাবে ব্যাহত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীনন্দের আশঙ্কা যে অমূলক ছিল না, তাহা আজ পর্য্যন্ত তৃতীয় পরিকল্পনার চারি বৎসরে সম্পূর্ণভাবে প্রমাণ হইয়াছে।

ইতিমধ্যে দেশের আর্থিক সংস্থানের উপরে আরও একটি নূতন চাপ আসিয়া পড়িল। ১৯৬২ সনের শেষ ভাগে দেশের উত্তর-পূর্ব্ব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে চীনা হামলার ফলে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক সম্প্রসারণ ও তজ্জনিত বিরাট্ পরিমাণ অতিরিক্ত অর্থ বিনিয়োগ একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িল। এই প্রসঙ্গে আমরা তখন বলিয়াছিলাম যে, এই কারণে বিনা বিলম্বে তখনই অতিরিক্ত রাজস্ব-বাজেট রচনার দ্বারা দেশে অতিরিক্ত

চালু অর্থ জব্দ করিয়া ফেলা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, তাহা না হইলে প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে যে অতিরিক্ত সরকারী ব্যয়-বরাদ্দ করিতেই হইবে, তাহার ফলে মূল্যমানের উপর অতিরিক্ত চাপ অনিবার্য্য ভাবে বাড়িয়া চলিবে এবং বিশেষ করিয়া খাদ্যপণ্য ও অন্যান্য অবশ্যভোগ্য পণ্যাদির উপরে এই চাপ আরও বেশী করিয়া বর্ত্তাইবে। ব্যবসায়ী-গোষ্ঠী তখন কেন্দ্রীয় সরকারকে এই আশ্বাস দেন যে, তাঁহারা কিছুতেই অবশ্যভোগ্য খাদ্যপণ্যাদির আরও মূল্যবৃদ্ধি ঘটিতে দিবেন না, কিন্তু তাঁহাদের এই আশ্বাসবাণী যে একান্তই ভুয়া তাহা অচিরেই প্রমাণিত হইয়াছে। আমাদের অবিলম্বে অতিরিক্ত বাজেট দ্বারা অধিকতর রাজস্বের আয়োজনের অভিমত দেশের অন্যান্য বিশিষ্ট অর্থ-বিশেষজ্ঞরা ও সমর্থন করিয়াছিলেন, কিন্তু মাত্র চার-পাঁচ মাস পরেই সাধারণ বাজেট পেশ করিবার সময় ইহার আয়োজন করিলেই চলিবে, এই অজুহাতে তদানীন্তন কেন্দ্রীয় অর্থ-মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই তাহা করিতে রাজী হন নাই। তাই ১৯৬২ সনের নভেম্বর মাসে পার্লামেন্টের অধিবেশনে প্রতিরক্ষা খাতে অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দ পাশ করাইয়া লইলেও অতিরিক্ত রাজস্বের দ্বারা এই প্রয়োজনটি পূরণ করিবার ব্যবস্থা করেন নাই।

১৯৬৩ সনের সাধারণ বাজেটের সঙ্গে তিনি যে অতিরিক্ত রাজস্বের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহাকে যে কোন বৎসরে অতিরিক্ত রাজস্ব ব্যবস্থার দিক দিয়া অভূতপূর্ব্ব বলা হইয়াছে। আর একদিক দিয়াও এই বাজেটটি ছিল অভূতপূর্ব্ব। ১৯৫০-৫১ সন হইতেই, অর্থাৎ সরকারী পরিকল্পনানুসারী আর্থিক উন্নয়ন ব্যবস্থা সুরু হইবার প্রথম হইতেই কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব নীতিতে একটি নূতন ধারা প্রবর্ত্তিত হইতে সুরু করে, অর্থাৎ এই সময় হইতেই ক্রমে বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া কেন্দ্রীয় ট্যাক্স ব্যবস্থায় গৌণ ট্যাক্সের আনুপাতিক বাড়িতে সুরু করে। তবু যতদিন শ্রীচিন্তামন দেশমুখ কেন্দ্রীয় অর্থ-মন্ত্রণালয়ের প্রধানের পদ অধিকার করিয়া ছিলেন, ততদিন এই ধারাটি একটি নির্দ্দিষ্ট পরিধির মধ্যে সীমিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। ইহার ফলে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র সাধারণের উপরে ট্যাক্সের চাপ অনুপাতে বেশী করিয়া পড়িলেও, ইহার ফল এই গণ্ডি অতিক্রম করিয়া মূল্যমানের উপরে বিশেষ অসম চাপ সৃষ্টি করিতে পারে নাই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণমাচারী যখন প্রথম বারের মত কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রণালয়ের ভার গ্রহণ করেন তখন হইতে কেন্দ্রীয় রাজস্ব-নীতিতে একটি নূতন ধারা প্রবর্ত্তনের আভাস পাওয়া যায়। তিনি আবগারী শুল্কের মাধ্যমে রাজস্বের প্রয়োজনে অবশ্যভোগ্য খাদ্য-পণ্যাদির উপরে প্রথম হাত দিতে সুরু করেন। এইবার যে রাজস্ব-নীতি চালু হইতে সুরু করিল তাহার ফলে সরকারী দাবির চতুর্গুণ মূল্য ভোক্তাকে তাহার অবশ্য-ভোগ্য পণ্যের জন্য দিতে সুরু করিতে হইল। শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের হাতে এই নীতি আরও ব্যাপক ভাবে প্রয়োগ করা হইতে সুরু করিল এবং ১৯৬৩ সনের শ্রীমোরারজীর শেষ বাজেটে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেশের মোট রাজস্বের শতকরা ৭৪%-এরও বেশী গৌণ রাজস্বের মাধ্যমে আদায় করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণমাচারীর অর্থ-মন্ত্রিত্বের দ্বিতীয় পর্য্যায়ে বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম বাজেট বক্তৃতায় এই নীতির কুফল প্রকারান্তরে স্বীকৃতিলাভ করিলেও ইহা সংশোধনের কোন আয়োজনের লক্ষণ আজি পর্য্যন্ত লক্ষিত হয় নাই। দেশের বর্ত্তমান মূল্য পরিস্থিতি এবং খাদ্য ও অবশ্যভোগ্য পণ্যাদির উপরে তাহার প্রচণ্ড প্রতিফলনের গোড়ায় যে-সকল বিষয় ক্রিয়া করিতেছে তাহার মধ্যে আমাদের বর্ত্তমান সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক এবং অসম রাজস্বনীতি যে অন্যতম, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

দ্বিতীয়তঃ, অন্য একটি বিষয় যে প্রচণ্ড ভাবে ইহাতে ক্রিয়া করিতেছে তাহা বর্ত্তমানে দেশের সর্ব্বজনস্বীকৃত, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সকল প্রকার নিয়ন্ত্রণ-প্রভাবরহিত পুঁজির বিরাট্ কালোবাজার। এই কালোবাজারের সৃষ্টি গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতেই সুরু হইয়াছিল। ১৯৪৩ সনের মন্বন্তর যে এই কালোবাজারীরাই ঘটাইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হইয়াছে এবং এই মন্বন্তর হইতেই এই বিরাট্ কালোবাজারী পুঁজির বৃহত্তম অংশ কিঞ্চিদধিক বিশ লক্ষ মানুষকে হত্যা করিয়া সংগৃহীত হইয়াছিল তাহাতেও সন্দেহ নাই। সরকারী রাজস্ব-নীতিতে স্বাধীনতার পর হইতে, বিশেষ করিয়া চিন্তামন

দেশযুদ্ধের পরত্যাগের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত যে এই দুর্বিষহ সম্পূর্ণ অমানুষ কালোবাজারীর দল তাঁহাদের পুঞ্জায়িত পুঁজির পরিমাণ ক্রমাগতই অতিরিক্ত বৃদ্ধি করিয়া লইবার সুযোগ করিয়া লইয়াছেন ও লইতেছেন, তাহাতেও সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। দেশের খাদ্য-পরিস্থিতিতে গত বৎসর হইতে সুরু করিয়া বর্ত্তমানে যে সঙ্কটজনক পরিণতি উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে এই কালোবাজারীদের কারসাজি যে অন্যতম প্রধান কারণ, তাহা কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রীও স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এবং বিশেষ আশঙ্কারও বিষয় এই যে, আজ পর্য্যন্ত ইহাদের নিবৃত্ত করিবার উপায় কেন্দ্রীয় সরকার আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন নাই; আমরা নিঃসন্দেহ যে, এই দিকে কোন কার্য্যকরী প্রচেষ্টাও আজ পর্য্যন্ত কখনও প্রযুক্ত হয় নাই, কিংবা ইহা করিবার কোন চিন্তাও কখনও কেহ করেন নাই। এই প্রসঙ্গে এ কথাও অস্বীকার করা চলে না যে, সরকারী শাসনযন্ত্রের সহিত, কেন্দ্রে এবং রাজ্য সরকারে, ইহাদের কোন-না-কোন কার্য্যকরী কেন্দ্রে সংযোগ না থাকিলে ইহারা এভাবে দেশের জনসাধারণের জীবনে, সরকারী উন্নয়ন পরিকল্পনার ধারায়, এমনকি রাষ্ট্রের নিরাপত্তায়ও এ ভাবে অবাধে বিঘ্ন ও বিপদ সৃষ্টি করিতে পারিত না। শ্রীনন্দর নব-প্রতিষ্ঠিত সদাচার সমিতি যদি আর সকল কাজ ছাড়িয়া দিয়া শুধু এই দিকেই তাঁহাদের সকল মন ও শক্তি সার্থক ভাবে নিয়োগ করিতে পারিতেন তবে দেশের মহত্তম উপকারী বন্ধু বলিয়া তাঁহারা চিরকালের জন্ম স্বীকৃত হইয়া থাকিতেন।

আর একটি দিক দিয়াও এই মূল্য তথা খাদ্য-সঙ্কট ঘটিবার পথে সরকারী দায়িত্ব অতি স্পষ্ট ও অনস্বীকার্য্য। উন্নয়নের অজুহাতে যে বিরাট্ পুঁজি লগ্নী হইতেছে তাহার অনুপাতে রূপায়ণের গতিতে যে সার্থকতার স্বল্পতা অতি স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে তাহার ফলে অনিবার্য্যভাবে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিতেছে এবং তাহাও মূল্যবৃদ্ধির সহায়ক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পরিকল্পনার পরিধি অপেক্ষাকৃত সঙ্কুচিত করিলে স্বয়ংক্রিয় উন্নয়নের (self-generating growth) তীরে পৌঁছিতে আনুপাতিক বিলম্ব ঘটিবার কথা। কিন্তু ক্রততর গতিতে এই অবস্থায় পৌঁছিবার তাগিদে যদি কেবলমাত্র বিরাটতর পুঁজি লগ্নী করিয়া অনুপাতে ফল পাইতে বিঘ্ন ঘটে বা বিলম্ব হয়, তাহা হইলেও স্বয়ংক্রিয় অবস্থায় পৌঁছিতে বিলম্ব ঘটিবেই। কিন্তু দেশের সমগ্র এবং বিশেষ করিয়া মূল (basic) অর্থব্যবস্থায় এমন একটা সঙ্কট উপস্থিত হইতে বাধ্য, যাহার ফলে উন্নয়নের সমগ্র কাঠামোটাই সম্পূর্ণ ভাঙিয়া পড়িবার আশঙ্কা। এই রকম একটা আশঙ্কাজনক অবস্থা যে প্রায় ঘটিয়া আসিয়াছে তাহা প্রায় স্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে—বর্ত্তমান খাদ্য-সঙ্কট তাহারই একটা প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণমাচারী আর "ঘাটতি অর্থের" (deficit financing) পরিমাণ বাড়াইবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। বস্তুতঃ এই "ঘাটতি অর্থ" মানে আর কিছুই নহে, ভবিষ্যৎ সম্পদ্ বন্ধক রাখিয়া তাহা সৃষ্টি করিবার প্রয়োজনে বর্ত্তমানে লগ্নীর জন্ম ঋণ গ্রহণ (advance draft on futuredevelopment) করা। কিন্তু ইহা না করিয়াও যদি পুঁজি লগ্নীর পরিমাণ আনুপাতিক সম্পদ্-সৃষ্টিতে নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে সার্থকতা লাভ না করে তাহা হইলে অর্থ সরবরাহ ও উৎপাদনের মধ্যে যে ফাঁকটুকু থাকিয়া যায়, তাহা অনিবার্য্যভাবে মুদ্রাস্ফীতি ও তজ্জনিত মূল্যবৃদ্ধি ঘটাইতে বাধ্য। তৃতীয় পরিকল্পনায় লগ্নীর তুলনায় সম্পদ্-সৃষ্টির সম্ভাবনায় শেষ পর্য্যন্ত যে অন্ততঃ এক-সপ্তমাংশ ঘাটতি ঘটিবে তাহা সরকারীভাবেও স্বীকৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান সঙ্কটে ইহার প্রভাবও কম নহে। অতএব পরিকল্পনার লগ্নী-নীতিতে যে অধিকতর সংযমের প্রয়োজন একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, তাহা অতি স্পষ্ট। কিন্তু সরকারী চিন্তা বা আয়োজনে ইহার কোন স্বীকৃতি দেখা যাইতেছে না। (বারান্তরে এই বিষয়ে আরও কিছু আলোচনা করা যাইবে)

সঙ্গীতের আসরে

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

মুস্তারি বাঈয়ের রবীন্দ্রসঙ্গীত

রবীন্দ্রনাথের রাগসঙ্গীত-প্রীতির এবং এক হিন্দুস্থানী শিল্পীর রবীন্দ্রসঙ্গীত-গীতির এক স্মরণীয় কাহিনী। ঘটনাস্থল কলকাতা। আজ থেকে প্রায় ৩৫ বছর আগেকার কথা।

শিল্পীর নাম হ'ল মুস্তারি বাঈ, আগ্রা অঞ্চলের গায়িকা। আগ্রা শহর থেকে তিন মাইল দূরে ফতিয়াপুর নামে একটি আধা-গ্রাম আধা-শহরের বাসিন্দা ছিলেন। পেশা—সঙ্গীত-চর্চা। সেখানে নিজের কোঠিতে ব'সে রইস ব্যক্তিদের গান শুনিয়ে রোজ তিনি রোজগার করতেন ৫০।৬০ টাকা, ৩৫।৪০ বছর আগে। কিন্তু তা আসল কথা নয়। বড় কথা হ'ল, তিনি ছিলেন এক দুর্লভ সঙ্গীতশিল্পী, যদিও তাঁর নাম সঙ্গীতজগতে প্রখ্যাত হবার সুযোগ পায় নি। তার কারণ, তাঁর অকালমৃত্যু। সে সব কথা পরে প্রকাশ্য।

মুস্তারি বাঈ প্রধানতঃ খেয়াল-গায়িকা এবং তাঁর ওস্তাদ ছিলেন কবীর বক্স। তিনিও একই অঞ্চলে বাস করতেন।

ওস্তাদ কবীর বক্স কিংবা তাঁর একমাত্র কলাবতী ছাত্রী মুস্তারি বাঈয়ের নাম সঙ্গীতজগতে আজ সুপরিচিত নয়। সঙ্গীতপ্রিয় সাধারণের অনেকেরই ওই দু'টি নাম জানাশোনা নেই।

কবীর বক্স কিন্তু গায়ক ছিলেন না। ছিলেন সারেঙ্গী। আসরে ব'সে তিনি মুস্তারির গানের সঙ্গে সারঙ্গ-যন্ত্রে সহযোগিতা করতেন, গায়করূপে তাঁর পরিচয় ছিল না। হয়ত সেই কারণে তিনি সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারেন নি। আর মুস্তারির যথাযোগ্য খ্যাতি না পাবার কারণ—৩১।৩২ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু, এবং তাও ৩০ বছরের অধিককাল আগে। সেই বিস্ময়কর প্রতিভার অগ্রগতিতে অপূর্ণতার ছেদ টেনে দেয় আকস্মিক মৃত্যু। যশ প্রচারের কোন প্রচলিত উপায় অবলম্বন করাও তাঁর ঘটনাচক্রে ঘটে ওঠে নি। গ্রামোফোন রেকর্ড বা রেডিও বা সর্বভারতীয় আনুষ্ঠানিক সম্মেলন—কোনটিতেই গুণপনা প্রদর্শনের সুযোগ আসে নি তাঁর জীবনে। তাই দেহপটের সঙ্গে নটীর গীতি-কণ্ঠও স্তব্ধ হয়ে গেছে কালের কবলে।

শুধু স্মৃতি আছে। স্মৃতি-শ্রুতিতে অনুরণিত হয়ে আছে সেই কণ্ঠমাধুর্য। সেই অনুপম সুরমাধুরী তাঁদের স্মৃতির পটে সোনার আল্পনায় আঁকা আছে, যাঁরা সেদিন মুস্তারি বাঈয়ের গান শুনেছিলেন। কলকাতায় তাঁর গানের সেই প্রথম আসর। কলকাতায় আসর বটে, কিন্তু এমন সর্ব-ভারতীয় গুণীদের সমাগম একটি আসরে সেকালে সচরাচর ঘটত না। এমন প্রথম শ্রেণীর শিল্পীসমন্বয় এখনকার অখিল ভারতীয় সঙ্গীত সম্মেলনেও কম দেখা যায়।

সেই আসরে অংশ নেবার জন্তে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের নাম উল্লেখ করলে সেকথা বোঝা যাবে। যথা, স্বনামধন্ত ফৈয়াজ খাঁ (আগ্রার রঙ্গিলা ঘরাণার ওস্তাদ গোলাম আব্বাসের দৌহিত্র), রামপুর ঘরাণার অপ্রতিদ্বন্দ্বী খেয়ালগুণী মুস্তাক হোসেন খাঁ, সরোদ নেওয়াজ হাফিজ আলী খাঁ, ইন্দোরের খ্যাতনামা বীণকার মজিদ্ খাঁ, জলন্ধরের (ভাস্কর রাওয়ের শিষ্য) হরিশচন্দ্র বালী, বোম্বাইয়ের খেয়াল-গায়ক বসির খাঁ প্রভৃতি। সেই সঙ্গে কলকাতার গুণী গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, কৃষ্ণচন্দ্র দে, সেতারী এনায়েৎ খাঁ প্রভৃতি শিল্পীরাও ছিলেন। এই গুণী সমাজের দ্বারা সেদিন মুস্তারি বাঈ অভিনন্দিত হয়েছিলেন। তাঁর অতুলনীয় কণ্ঠে রাগ রূপায়ণের জন্তে স্বেচ্ছায় স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন, তাঁরা।

একদিকে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের এই সব দিক্‌পাল। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ। তাঁরও অকুণ্ঠ প্রশংসায় ধন্য হয়েছিল মুস্তারি বাঈয়ের কণ্ঠমাধুর্য।

রবীন্দ্রনাথ সে আসরে উপস্থিত ছিলেন না। কিভাবে তিনি মুস্তারি বাঈয়ের গান সেদিন শুনেছিলেন এবং পুনরায় শোনবার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন তা যথাস্থানে বর্ণনা করা হবে। এখানে সেদিনকার আসরের প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলবার আছে।

সে-যুগের কলকাতার বিখ্যাত সঙ্গীতাসর 'লালচাঁদ উৎসব'-এ

গায়িকার সেদিন গান হয়েছিল। বিগত শতকের বাংলার ওজস্বী টপখেয়াল গায়ক লালচাঁদ বড়াল মহাশয়ের স্মৃতিবাসর রূপে তাঁর তিন সঙ্গীতজ্ঞ পুত্র কিষণচাঁদ, বিষণচাঁদ ও রাইচাঁদের উদ্‌যোগে অনুষ্ঠিত হ'ত বার্ষিক লালচাঁদ উৎসব। বর্তমান কলকাতার সঙ্গীত সম্মেলনগুলি তখনও আত্মপ্রকাশ করে নি। এই সব সম্মেলনের অগ্রদূতরূপে তখন সঙ্গীত-সমাজে (দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রবর্তিত ও পরিচালিত) মুরারি সম্মেলন, (নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, দীননাথ হাজরা প্রমুখ প্রতিষ্ঠিত ও সংগঠিত) শঙ্কর উৎসব, উক্ত লালচাঁদ উৎসব প্রভৃতি কলকাতার সঙ্গীতসমাজের রসপিপাসা চরিতার্থ করত।

প্রধানতঃ ওই সব সঙ্গীতাসর কলকাতার সঙ্গীত সম্মেলনের পথপ্রদর্শক হয়ে তখনকার শ্রোতাদের সুযোগ ক'রে দিত বহু গুণীর একত্র সঙ্গীত আস্বাদনের। যে তিনটি সঙ্গীতাসরের নাম করা হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে স্বল্পকালস্থায়ী এবং বয়োকনিষ্ঠ হ'ল—লালচাঁদ উৎসব। মাত্র ৪।৫ বার লালচাঁদ উৎসবের বার্ষিক অনুষ্ঠান হয়েছিল। কিন্তু তার প্রত্যেকটি অধিবেশনে এমন প্রথম শ্রেণীর ও সর্বভারতীয় গুণীর সমাবেশ উদ্‌যোক্তারা করতেন, যা তখনকার পক্ষে অভিনব ছিল এবং অন্য কোন আসরে দেখা যেত না। এই দিক্ থেকে লালচাঁদ উৎসবের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অনস্বীকার্য। সেজন্যে কলকাতার সঙ্গীতচর্চার ক্ষেত্রে লালচাঁদ উৎসবের নাম বিশেষ ক'রে স্মরণীয় থাকবে। কলকাতার সঙ্গীতাসরকে লালচাঁদ উৎসব নিখিল ভারতীয় রূপ দান করতে, সর্বভারতীয় দৃষ্টি লাভ করতে সহায়তা করেছে।

এই বার্ষিক সঙ্গীতানুষ্ঠানের উদ্‌যোক্তারা শুধু প্রাচীন ও প্রখ্যাত কলাবতদেরই আমন্ত্রণ জানাতেন না। উত্তর ভারতের নানা জায়গায় সন্ধান ক'রে নতুন ও অপরিচিত প্রতিভাকে আহ্বান ক'রে আনতেন এবং সঙ্গীতসমাজে তাঁদের সুপরিচিত করতেন। সেই শিল্পীরা সুযোগ পেতেন কলকাতার রসজ্ঞ শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে তাঁদের গুণপনা প্রদর্শন করবার। লালচাঁদ উৎসবের এমনি অনুসন্ধানের ফলেই মুস্তারি বাঈয়ের কলকাতায় আসা এবং গুণীসমাজে প্রতিভার পরিচয় দেওয়া ঘটে।

কলকাতায় লালচাঁদ উৎসবে যদি সে গায়িকা সেবার না উপস্থিত হতেন, তা হ'লে তাঁর সঙ্গীতপ্রতিভা বৃহত্তর সঙ্গীতসমাজে অপরিচিত ও অপ্রকাশিত থেকে যেত এবং তিনি সম্পূর্ণ অখ্যাত অবস্থায় পৃথিবী থেকে বিদায় নিতেন। ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর বাড়ী আগ্রায়, কিন্তু তিনিও তার আগে মুস্তারির গুণপনার কোন পরিচয় পান নি। ফৈয়াজ খাঁর মতন আরও কয়েকজন সর্বভারতীয় কলাবতের সামনে মুস্তারি বাঈকে প্রথম উপস্থাপিত করে লালচাঁদ উৎসব এবং সেই উপলক্ষ্যে তাঁকে আবিষ্কার ক'রে কলকাতায় এনেছিলেন বিষণচাঁদ বড়াল।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে এই গায়িকা প্রথম লালচাঁদ উৎসবে এসেছিলেন এবং সেবারের আসরে তাঁর গানের কথাই এখানে বর্ণনা করা হবে।

লালচাঁদ উৎসবের অনুষ্ঠান হ'ত দিন-রাতের অনেকখানি সময় ধ'রে। সকাল থেকে আরম্ভ ক'রে প্রায় দুপুর। আবার সন্ধ্যা থেকে প্রায় মধ্যরাত পর্যন্ত। তিন দিন ধ'রে উৎসব চলত। প্রথম দিন হ'ত শুধু ধ্রুপদ গানের অনুষ্ঠান। দ্বিতীয়-তৃতীয় দিনের অধিবেশনে খেয়াল ও ঠুংরি গান এবং বীণা, সেতার, সরোদ ইত্যাদি যন্ত্রসঙ্গীতের আয়োজন করা হ'ত। এখানে তিনটি দিনের অধিবেশনেই অনুষ্ঠিত সঙ্গীতের মান অতি উচ্চাঙ্গের ছিল, কারণ সর্বভারতীয় নিরিখে যাঁরা ছিলেন প্রথম শ্রেণীর শিল্পী, তাঁরাই শুধু আমন্ত্রিত হতেন লালচাঁদ উৎসবের আসরে।

এই উৎসবের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আরও একটি উল্লেখ্য সংবাদ আছে, যা সে-সময়কার অন্য কোন সঙ্গীত সম্মেলনের বিষয়ে বলা চলে না। তা হ'ল এখানকার অধিবেশনের সঙ্গীতাদি কলকাতার তখনকার বেতার প্রতিষ্ঠানের যোগে পুনঃ-সম্প্রচারিত (relay) হ'ত। কলকাতায় বেতার কেন্দ্র তখন সরকারী সম্পত্তি ছিল না। Indian Broadcasting Service নামে সে সময় তা ছিল একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। সেই বেসরকারী বেতারে ১৯২৬ খ্রীঃ থেকেই outside broadcast বা ষ্টুডিওর বাইরেকার নানা স্থানের অনুষ্ঠান relay করবার ব্যবস্থা দেখা যায়। সেই যুগের কলকাতা বেতার কেন্দ্রের ষ্টেশন-পরিচালক ছিলেন মিঃ জে. আর. স্টেপল্টন। ভারতীয় অনুষ্ঠানাদির প্রধান পরিচালক ছিলেন সুপরিচিত ক্ল্যারিওনেট-বাদক নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার এবং পিয়ানো ও তবলাবাদক রাইচাঁদ বড়াল

তাঁর সহকারী। লালচাঁদ উৎসবের বেতার relay-র ব্যবস্থাও রাইচাঁদ করেন।

মুস্তারি বাঈ যখন ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে লালচাঁদ উৎসবে গিয়েছিলেন, তাঁর গানও বেতারে relay হয়েছিল।

তিনি ছিলেন খেয়াল-গায়িকা। তাই উৎসবের দ্বিতীয় দিনে তাঁর গানের ব্যবস্থা হয় এবং তিনি প্রথম গান গেয়েছিলেন সকালবেলার অধিবেশনে। সেই অনুষ্ঠানে বেশিক্ষণ তাঁর গান হয় নি। সন্ধ্যার আসরেই তাঁর জন্যে পর্যাপ্ত সময় ধার্য করা ছিল।

কিন্তু সেই সকালের অল্প সময়ের গানেই শ্রোতাদের মধ্যে একটি অসাধারণ সাড়া জাগালেন গায়িকা। বলতে গেলে, সেই প্রথম অনুষ্ঠানেই তিনি যেন সঙ্গীত-গগনে এক নতুন ধূমকেতুর মতন উদয় হলেন। শ্রোতৃমণ্ডলীর একটি অপূর্ব অভিজ্ঞতা লাভ হ'ল—এমন তাঁর কণ্ঠমাধুর্য। অতিশয় হৃদয়স্পর্শী সেই সঙ্গীতের আবেদন।

এমন গান ত সচরাচর শোনা যায় না! কি নাম এই নতুন গায়িকার? কৌতূহলী শ্রোতারা প্রায় কেউই এ নাম আগে শোনেন নি। সেই প্রথম এ নামের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হ'ল। এই নতুন গায়িকার কণ্ঠে এ কি অপরূপ সুরের লীলা!

সে আসরে উপস্থিত ছিলেন—বহুমুখী সঙ্গীত-প্রতিভা কৃষ্ণচন্দ্র দে এবং কবি, সুরকার ও গীতরচয়িতা কাজী নজরুল ইসলাম। আরও অনেক গুণীই উপস্থিত ছিলেন এবং গায়িকার গানে মুগ্ধ হয়েছিলেন সকলেই। কিন্তু বিশেষ ক'রে কৃষ্ণচন্দ্র এবং কাজী সাহেবের নাম উল্লেখ করবার কারণ—তাঁরা গানের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন সবচেয়ে বেশি। দিনের আসর শেষ হয়ে গেলেও তাঁরা দু'জন আর বাড়ী ফিরে গেলেন না। বড়াল-বাড়ীতেই রইলেন সারা দিন। দুপুরের বিশ্রামাদির পর বিকালে ঘরোয়াভাবে, অর্থাৎ আসরের বাইরে শুনতে লাগলেন মুস্তারি বাঈয়ের গান। দোতলার একটি ঘরে বসে রাগের পর রাগ ফরমায়েস ক'রে তাঁরা তাঁর গান শুনতে লাগলেন এবং গায়িকাও অক্লান্তভাবে তাঁদের অনুরোধে একটি একটি ক'রে গান শুনিয়ে গেলেন। তেমনি হৃদয়স্পর্শী, তেমনি আকর্ষক কণ্ঠে দরদী শ্রোতৃদ্বয়কে তিনি গান শোনালেন। কাজী নজরুল এবং কৃষ্ণচন্দ্র বার বার জানালেন, এমন কণ্ঠমাধুর্য সত্যই দুর্লভ। এমন সঙ্গীতের অভিজ্ঞতা কদাচিৎ লাভ হয়ে থাকে।

সকালবেলার লালচাঁদ উৎসবে গায়িকার সেই গান বেতার-যোগে 'রীলে' করা হয়েছিল যথারীতি।

তারপর তাঁর গানের অনুষ্ঠান আবার আরম্ভ হ'ল সেই রাতে, উৎসব-প্রাঙ্গণে। সেখানে উপস্থিত গুণীদের মধ্যে ফৈয়াজ খাঁ, মুস্তাক হোসেন খাঁ, তাঁর ভ্রাতা আসফাক হোসেন, মজিদ খাঁ, হরিশচন্দ্র বালী, বসির খাঁ, গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, এনায়েৎ খাঁ, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী প্রভৃতির নাম উল্লেখনীয়। কাজী সাহেব এবং কৃষ্ণচন্দ্রের উপস্থিতির কথা বলাই বাহুল্য।

মুস্তারি বাঈ বিশিষ্ট শ্রোতাদের দিকে সেলাম ক'রে আসরে আসীন হলেন। কৃশ এবং প্রায় শীর্ণ শরীর, আদৌ সুরূপা নন গায়িকা। আকৃতিতে ব্যক্তিত্বের কোন চিহ্ন নেই। তাঁর সেই সকালের আসরের পর গুণীমহলে খ্যাতি রটনা হ'তে কিছু বাকি ছিল না। তাই এ আসরের শ্রোতারা সাগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন তাঁর গানের। শান্ত, ধীর কণ্ঠে তখন তিনি গান আরম্ভ করলেন।

গানের সুরের মধ্যে দিয়ে তাঁর সাঙ্গীতিক প্রভাব অনুভূত হ'ল আসরে, শ্রোতাদের মনে। সে এক আশ্চর্য সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর। প্রথম গানটি তিনি ধরলেন পটদীপ রাগে। শ্রোতাদের মন আপ্লুত হয়ে উঠল সেই কণ্ঠমাধুর্যে। সুমিষ্ট সুরের গুঞ্জরণে রাগরূপ তার মনোহর দলগুলি মেলতে লাগল। ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে উঠল সঙ্গীতের শতদল। আসর সুরে ভরে গেল।

কিন্তু রাগের রূপায়ণ বা তাল-লয়ের প্রয়োগ যথাযথ হ'ল কি না সেদিকে শ্রোতাদের মন আকৃষ্ট হ'ল না। যদিও সে-সব বিষয়ে গায়িকার স্বচ্ছন্দ নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছিল। গানের গঠনশৈলীর কথা কারও মন অধিকার করতে পারল না। সকলে অনুভব করতে লাগলেন এক অপার্থিব সুরবিহার। গায়িকার কণ্ঠের পাখায় ভর ক'রে এক অনির্বচনীয় আনন্দলোকের আবির্ভাব হ'ল। গানের কারুকৃতির চেয়ে গায়িকার কণ্ঠের অপূর্ব দরদ, তাঁর গভীর অনুভব বড় হয়ে দেখা দিল শ্রোতাদের মনে। সেই মাধুর্যময় কণ্ঠে সুরের সুষমা 'শিক্ষিত' ও 'অশিক্ষিত' সর্বস্তরের শ্রোতাদের পক্ষেই মনোমুগ্ধকর। সেই সঙ্গে সঙ্গীত

পরিবেশনের যথার্থ শিল্পীজনোচিত রীতি। সৌকুমার্যে-ভরা সুরবিহারের সঙ্গে তদ্গত-চিত্ত গায়িকার অন্তর মথিত করে সুরের নির্ঝরিণী প্রবাহিত হ'ল। সুরের এক-একটি মনোরম মোচড়ে যে ব্যঞ্জনা ফুটে উঠতে লাগল তা' ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। সুরশিল্পীর প্রাণের আবেগ তাঁর গানের মধ্যে মূর্ত হয়ে শ্রোতাদের মনে সঞ্চারিত হ'ল। তরঙ্গের পর তরঙ্গধ্বনি যেমন প্রতিধ্বনি তোলে তটপ্রান্তে।

নিজেরই রচিত সুরের আবেদনে, স্পন্দিত হৃদয়ের আবেগে শিল্পীর চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। সঙ্গীতের মায়াস্পর্শে এমন তন্ময় শিল্পী বেশি আসরে দেখা যায় না।

পটদীপের গানখানি শেষ হ'ল উচ্ছ্বসিত প্রশংসার মধ্যে। তারপর গায়িকা একটি মালগুঞ্জি ধরলেন। তেমনি অনন্য-দৃষ্টি, তেমনি আত্মনিমগ্ন হয়ে গাইতে লাগলেন তিনি।

পটদীপের পর মালগুঞ্জি আরম্ভ হ'তে বিশিষ্ট শ্রোতৃবর্গ নড়ে-চড়ে বসলেন। মালগুঞ্জির প্রথম সুর বিচ্ছুরণের সঙ্গেই সাড়া পড়ে গেল আসরে। এই জমাটি সুর শ্রোতাদের মন অধিকার না করেই পারে না। আবার সকলে গায়িকার সুরের ধারায় অবগাহন করতে লাগলেন। সমস্ত আসর যেন সুরের স্নিগ্ধ ঝর্ণাতলায় বসে মালগুঞ্জির কোমলকান্ত রস আস্বাদন করতে লাগল মুস্তারি বাঈয়ের মধুকণ্ঠে। গায়িকার গীতিকণ্ঠের এই বৈশিষ্ট্য সমঝদারেরা লক্ষ্য করলেন যে, তা গভীর হৃদয়াবেগে পূর্ণ, অতিশয় সুরেলা ও সুমিষ্ট এবং তাঁর গীতিরীতি অনিন্দ্য শিল্প-সুন্দর (artistic)।

সে গান এক সুসমঞ্জস সৌন্দর্য-সৃষ্টি। পূর্ণবিকশিত শিল্পী-প্রাণের অবদান। সুরশিল্পীর সঙ্গীত-মানস যে সুর-সুন্দরের সাধনায় পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, তা-ই অনুবাদিত হয়েছে তাঁর এই সঙ্গীতে। তাই এমন ভাবের ব্যঞ্জনা দেখা দিয়েছে। গান তাই এমন প্রাণ পেয়েছে। শ্রোতাদের মনোবীণায় ঝঙ্কৃত হয়েছে এমন অনুরণন।

এইভাবে প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে তাঁর গান হ'ল। গান শেষ হ'তে ঘড়ি দেখে বোঝা গেল, এতখানি সময় তিনি গাইলেন। কিন্তু যতক্ষণ গান চলেছিল, সেকথা জানা যায় নি। আচ্ছন্ন, একমুখী হয়ে শুনেছিলেন সবাই, সময়-জ্ঞান কারও ছিল না।

মালগুঞ্জি গেয়েই মুস্তারি বাঈ তাঁর অনুষ্ঠান শেষ করলেন। এবং তারপরই ধারণা করা গেল, তাঁর গানের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া কেমন হয়েছে। শুধু সাধারণ শ্রোতাদের ওপর নয়, সেখানে উপস্থিত বিখ্যাত কলাবন্তদের ওপরেও।

কারণ তখন এক সমস্যা হ'ল—এই গানের পর কার গান হবে? শ্রোতাদের মনপ্রাণ এমন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে আছে, আসর এমন মাৎ হয়ে আছে মালগুঞ্জির সুরনিক্বণে—তা অতিক্রম ক'রে কে সেখানে গান ধরবেন? এই জলে-যাওয়া আসরকে আবার নতুন করে মাতাবেন কে? এই প্রশ্ন উদ্যোক্তাদের ভাবিত করলে।

শেষে কয়েকজন গুণীর সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির হ'ল যে, ফৈয়াজ খাঁ সাহেব তাঁর অনুষ্ঠান এখন আরম্ভ করলেই বোধ হয় সবচেয়ে ভাল হয়। ফৈয়াজ খাঁকে সেই মর্মে যথারীতি অনুরোধও জানানো হ'ল গাইবার জন্যে।

ফৈয়াজের তখন মধ্য বয়স এবং সঙ্গীত-প্রতিভার মধ্য-গগনে তিনি তখন সগৌরবে দেদীপ্যমান। 'আফ্‌তাব-এ মুসিকী'—হিন্দুস্থানের সূর্য তিনি সঙ্গীতক্ষেত্রে। তাঁর জোয়ারিদার উদাত্ত কণ্ঠ একাধারে বীর্য ও মাধুর্যমণ্ডিত। এই আসরে সুরের আসন যদি তখন কেউ আবার পাততে পারেন, তবে তা তিনিই। এই আশায় তাঁকে গাইতে অনুরোধ করা হ'ল।

ফৈয়াজ খাঁ যত বড় গায়ক, তত বড় সমঝদারও। একজন প্রকৃত সঙ্গীতশিল্পী, সঙ্গীতসাধক তিনি। তাঁর মনে মুস্তারি বাঈয়ের গানের প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল, তা' উদ্যোক্তারা ধারণা করতে পারেন নি। তিনি স্বয়ং তা প্রকাশ করলেন গায়িকাকে অভিনন্দিত ক'রে।

তাঁকে আসরে গাইতে বলার উত্তরস্বরূপ তিনি মুস্তারি বাঈয়ের গান সম্পর্কে বললেন, আমাকে আজ আপনারা গাইতে বলবেন না। এ গানের পর আমার আর গানের মেজাজ নেই। এ গানের পর আজ আর কোন গান দরকারই নেই। আমি অন্ততঃ এ আসরে এখন গাইতে পারব না। আর কারও যদি সে হিম্মৎ থাকে, তা হ'লে সে যুবক এসে আসরে।

উদ্যোক্তারা খাঁ সাহেবের কথায় অপ্রস্তুত হলেন। এর পর আর কি কথা তাঁকে বলা যেতে পারে? কলাবন্তের পক্ষে তিনি চূড়ান্ত কথা ব'লে দিয়েছেন। আর তাঁকে অনুরোধ করা যায় না।

অন্য ওস্তাদেরা প্রথমে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। তারপর স্পষ্টই জানালেন যে, এ বিষয়ে তাঁরা ফৈয়াজ খাঁর সঙ্গে একমত। এ গানের পরে তাঁদের কারও আর গান গাইবার ইচ্ছা নেই। কারণ, আজ আর তাঁরা গান জমাতে পারবেন না এ আসরে।

এই সব কথার মধ্যে মুস্তারি বাঈ উঠে এসেছেন ফৈয়াজ খাঁ'র কাছে। খাঁ সাহেবের পায়ে হাত রেখে তিনি সবিনয়ে বললেন, এ কি কথা বলছেন, খাঁ সাহেব? আমার গানের জন্যে গান গাইবেন না আপনি? আমি বড় দুঃখ পাব আপনি না গাইলে। আপনার কাছে আমি কি? আপনার তুল্য গুণী পথ দেখিয়েছেন, তাই আপনাদের আশীর্বাদে আমরা ক'রে খাই। আপনি এমন ক'রে বলবেন না।

খাঁ সাহেব বললেন, সে যা হোক, কিন্তু আমার হাল ত দেখছ! তোমার গান শুনে চোখের জল আমি আটকাতে পারি নি। এতক্ষণ শুধু কেঁদেছি। আমার গলা ব'সে গেছে কেঁদে কেঁদে। আমি 'বেচাই' হয়ে গেছি। গান গাইব কি? তা ছাড়া, এ শুধু গানেরই কথা নয়। এখানে যন্ত্রী যাঁরা রয়েছেন, তাঁরাও কি এর পর বাজাতে পারবেন যন্ত্র ধ'রে? আমার ত মনে হয় না। ওঁদের জিজ্ঞেস ক'রে দেখা হোক।

এ কথার পর ফৈয়াজ খাঁকে আর মুস্তারি বাঈ বা উদ্‌যোক্তাদের আর কেউ গাইতে অনুরোধ করলেন না। তবে তাঁর কথায় বীণ্‌কার মজিদ খাঁ এবং সেতারী এনায়েৎ খাঁকে অনুরোধ করা হ'ল বাজাবার জন্যে। কিন্তু তাঁরাও সম্মত হলেন না। সুর-সৃষ্টির চূড়ান্ত হয়ে গেছে আজ। এ আসরে আর কোন গুণীর বাজাতে বা গাইতে মেজাজ বসতে পারে না।

মুস্তারি বাঈয়ের গানের পর আসরে যখন এইসব কথাবার্তা চলেছে, তখন আর একটি ঘটনা ঘটেছে তাঁর গান উপলক্ষ্যে।

তাঁর সেই রাত্রের গানও কলকাতা বেতারকেন্দ্র মারফৎ 'রীলে' করা হয়েছিল এবং সেই সূত্রে মুস্তারির গান বেতার-শ্রোতাদের কর্ণগোচর হয়।

রবীন্দ্রনাথ তখন কলকাতায় অবস্থান করছিলেন এবং বেতারে তিনিও শোনেন গায়িকার সেই গান। আসরে [illegible]

টেলিফোন বেজে উঠল। কোন ঘরতে, তার অপর প্রান্ত থেকে শোনা গেল,—রবীন্দ্রনাথ এখানে একবার কথা বলতে চান রাইচাঁদবাবুর সঙ্গে। তাঁকে একবার ডেকে দিন।

রাইচাঁদ এসে রিসিভার নিয়ে পরিচয় দিলেন, ও-প্রান্ত থেকে যিনি যোগাযোগ করেছিলেন, তিনি এবার ফোন দিলেন রবীন্দ্রনাথকে।

বিশ্ববন্দিত কণ্ঠস্বর যন্ত্রে ভেসে এল,—কে এই দেবী, যিনি এখন তোমাদের ওখানে গান গাইলেন?

তাঁকে জানান হ'ল, গায়িকার নাম-ধাম পরিচয়-কথা।

শুনে রবীন্দ্রনাথ বললেন,—এ ত অপূর্ব কণ্ঠ। এমন গান বিশেষ শোনা যায় না। আমি অভিভূত হয়েছি এঁর গান শুনে। আর একদিন আমি ভাল ক'রে শুনতে চাই; সামনে ব'সে। কিভাবে তা হ'তে পারে, একটু ব্যবস্থা কর।

—সেজন্যে কোন অসুবিধা হবে না। গায়িকাকে একদিন আপনার ওখানে নিয়ে গিয়ে আপনাকে গান শোনান যেতে পারে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। শীগ্‌গীরই এ ব্যবস্থা করা হবে।

কয়েকদিন পরে রবীন্দ্রনাথকে গান শোনাবার জন্যে মুস্তারি বাঈকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবার কথা হ'ল।...

রবীন্দ্রনাথকে গান শোনাবার কথা স্থির হবার পর রাইচাঁদবাবুদের মনে এল আর একটি কথা। কবির যখন এই গায়িকার হিন্দুস্থানী গান এত ভাল লেগেছে আর তিনি যখন এঁর গান আর একদিন সামনে বসে শুনবেন, তখন কবির নিজের গানও তাঁকে সেই সঙ্গে শোনাবার ব্যবস্থা করলে কেমন হয়? মুস্তারি বাঈ যদি রবীন্দ্র-সঙ্গীত গান করেন, কবি নিশ্চয় আনন্দ পাবেন।

তখন স্থির হ'ল, গায়িকা রবীন্দ্রনাথকে তাঁরই দু'খানি গান শোনাবেন। বলা বাহুল্য, আগ্রা অঞ্চলের বাসিন্দা এবং হিন্দুস্থানী পেশাদার গায়িকা আগে রবীন্দ্রনাথের বা অন্য কোন বাংলা গান গান নি কখনও। বাংলা ভাষাও তাঁর একরকম অজানা। এবং বাংলা দেশে, কলকাতায় এই তাঁর প্রথম আসা। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের গান তাঁকে নতুন ক'রে শিখতে হবে। শুধু তাই নয়, সে গান যেমন-তেমন গাইলে চলবে না, কারণ শুনবেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। নিখুঁত-ভাবে আয়ত্ত না ক'রে তাঁর গান তাঁকে শোনান চলবে না।

[illegible]

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের একটি বিশিষ্ট রীতি ও প্রকৃতি আছে। সেই বিশেষভাবে না গাইলে তার রূপ সঠিক থাকে না। রবীন্দ্রনাথ নিজেও পছন্দ করেন না তাঁর সুর বা গীতিরীতি বিচ্যুত করলে। রবীন্দ্র-সঙ্গীত কবিকে শুনিয়ে সন্তুষ্ট করা তাই সহজ কাজ নয়। একাধিক লব্ধপ্রতিষ্ঠ গায়ক রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশনে ব্যর্থ হয়েছেন, বলা যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের গান শুনে আনন্দ পান নি, বরং মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছেন তাঁর গানের ক্ষুণ্ণতা দেখে। বলেছেন,—"কেমন যেন ধাক্কা দিয়ে দিয়ে গাইলে।"···কিংবা—"আমার গানের ওপর দিয়ে অমন ক'রে 'ষ্টীম রোলার' চালিও না।"···

মুস্তারী বাঈকে সেজন্যে রবীন্দ্রনাথের গান বিশেষভাবে শেখাবার ব্যবস্থা রাইচাঁদবাবু করলেন হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগিতায়। হরিপদবাবু ছিলেন তখনকার একজন সুকণ্ঠ গায়ক এবং বিশেষ ক'রে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের নিষ্ঠাবান্ শিল্পী। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের শুধু স্বরলিপি অনুসরণ নয়, তার গায়কী যথাযথ রূপায়িত করতেন যাঁরা, শ্রীচট্টোপাধ্যায় ছিলেন তাঁদের অন্যতম। বড় প্রাণস্পর্শী ছিল তাঁর গান।

মুস্তারি বাঈয়ের কণ্ঠে দু'খানি রবীন্দ্রনাথের গান তুলতে সহায়তা করলেন তাঁরা দু'জন—হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ও রাইচাঁদ বড়াল, যিনি শুধু ওস্তাদ মসিদ খাঁ'র কাছে তবলা শিক্ষাপ্রাপ্ত উদীয়মান তবলা-বাদক তখন নন, রাগ-সঙ্গীতে অভিজ্ঞ এবং সুরকারও। তাঁরা দু'জনে গায়িকাকে যথাক্রমে শেখালেন—আজ দখিন দুয়ার খোলা এবং মন্দিরে মম কে (আড়ানা), এই গান দু'খানি।

উত্তর প্রদেশের সেই গায়িকার পক্ষে রবীন্দ্রনাথের দু'টি গান আয়ত্ত করা সহজ ছিল না। এ খেয়াল গান নয় যে হৃদয়োৎসারিত বিচিত্র তানকর্তবে পূর্ণ স্বরসৃষ্টির ধারায় সঙ্গীতের চরমোৎকর্ষ দেখাবেন। ভিন্ন প্রদেশের ভাষায় রচিত এই কাব্যসঙ্গীতের অর্থ ও তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা চাই। তার মর্মের সন্ধান ও পরিচয় লাভ করা প্রয়োজন। এ কাব্য-সঙ্গীতে কথা ও সুরের মোহন-মিলন ঘটেছে। দুয়েরই সমান অধিকার, কোন একটির গুরুত্ব কম নয়। কোন একটিকে উপেক্ষা করবার নেই। সুর ও ভাব, সঙ্গীত ও কাব্য এখানে বর-বধূর মতন একাত্ম, গ্রন্থিযুক্ত। পরস্পরের সহযোগিতাতেই তারা সঙ্গীতকে সার্থক ও রসসিদ্ধ করবে। কেউ কারও অধীন নয়, কিন্তু অপরের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করেও স্বাধীন নয় কেউ। সুসঙ্গত পরিমিতি-বোধ এবং সুসমঞ্জস সৌন্দর্যসৃষ্টি কথা ও সুরের সানন্দ সম্মেলনে। বাংলার মহান্ কবি-সুরকারের এই সঙ্গীতধারার সঙ্গে হিন্দুস্থানী গায়িকার আগে কোন পরিচয় ছিল না। গানের ভাবের আবেদনকে সুরের ব্যঞ্জনায় ফোটাতে হ'লে সে ভাষায় অভিজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন এবং সেখানেই তাঁর প্রধান বাধা।

কিন্তু মুস্তারি বাঈ সত্যকার সঙ্গীতশিল্পী এবং জাত-শিল্পী। ললিতকলার স্বভাববোধ থেকে তিনি সেই বাধা অতিক্রম করলেন। গান দু'টি শেখবার সময় প্রশ্ন ক'রে ক'রে প্রত্যেকটি কথার অর্থ ও মর্ম জেনে নিলেন। তারপর সমগ্র গানের বক্তব্য বুঝে নিয়ে অনুভব করলেন তার অন্তর্নিহিত ভাবটি। গান দু'টির সুর আয়ত্ত করা অবশ্য কঠিন হ'ল না তাঁর পক্ষে। দ্বিতীয় গানটি ত খেয়াল অঙ্গেরই।

এমনিভাবে তিনি 'আজি দখিন দুয়ার খোলা' এবং 'মন্দিরে মম কে আসিল হে' গান দু'খানি কণ্ঠে প্রস্তুত করলেন কবিকে শোনাবার জন্যে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আর সে গান শোনা হ'ল না। মুস্তারি বাঈ আর সুযোগ পেলেন না তাঁকে শোনাবার। রবীন্দ্রনাথকে গান শোনাবার দিন ও সময় ধার্য করতে গিয়ে শোনা গেল যে, তিনি হঠাৎ জরুরী প্রয়োজনে শান্তি-নিকেতনে চ'লে গেছেন। তখন শান্তিনিকেতনে গিয়ে তাঁকে গান শোনান আর সম্ভব হ'ল না গায়িকার পক্ষে। এ প্রসঙ্গের অকস্মাৎ এইভাবেই ছেদ পড়ল।

এত যত্নে ও আগ্রহে গান দু'টির অনুশীলন করবার পর কবিকে তা শোনাবার সুযোগ না পেয়ে গায়িকা হতাশ বোধ করলেন। এবং যাঁরা গান শিখিয়েছিলেন তাঁরাও।

তারপরে স্থির হ'ল যে, রবীন্দ্রনাথকে তাঁর গান শোনান না যাক, কলকাতায় সাধারণের জন্যে একটি সঙ্গীতাসরে মুস্তারি বাঈয়ের একদিন অনুষ্ঠান হোক। কলকাতার বৃহত্তর সঙ্গীতপ্রিয় সমাজ-মহল গায়িকার গুণপনার পরিচয় লাভ করবে। সেই উদ্দেশ্যে বিশেষ ক'রে তাঁর গানের জন্যে একটি জলসার আয়োজন করা হ'ল স্টার থিয়েটারে।

স্টার মঞ্চের আসরে তাঁর গান শোনবার জন্যে অনেক সঙ্গীতশিল্পী ও সঙ্গীতজ্ঞকে আমন্ত্রণ ক'রে আনা হ'ল। আর বিশেষ ক'রে এলেন কলকাতার ওওয়ায়েক সম্প্রদায়। তাঁদের

সকলের নাম করবার প্রয়োজন নেই এবং নাম করা সমীচীনও নয়। কারণ, এই নবাগতার গান শোনবার পরে তাঁরা প্রায় কেউই তাঁকে সুনজরে দেখেন নি। গহর জান্ তখন সঙ্গীতের আসর থেকে অবসর নিয়েছিলেন, তিনি উপস্থিত হন নি এখানে। তা ছাড়া কলকাতার খ্যাতনাম্নী তাওয়ায়েফরা মুস্তারি বাঈয়ের সেদিনের গানের আসরে প্রায় সকলেই কৌতূহলী হয়ে এসেছিলেন। কয়েকদিন আগেই লালচাঁদ উৎসবে তাঁর অসাধারণ সাফল্যমণ্ডিত সেই আসরের কথা মুখে মুখে তাঁদের অনেকেরই কানে পৌঁছেছিল।

স্টার থিয়েটারে সেদিনকার সমবেত শ্রোতাদের মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র দে, কাজী নজরুল প্রভৃতিও ছিলেন। কলকাতার সঙ্গীত-রসিক সমাজে ইতোমধ্যে গায়িকার লালচাঁদ উৎসবে সাফল্যের কথা আলবাবেই প্রচারিত হয়ে গেছে, কারণ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন সে আসরে। সুতরাং বিশেষ ক'রে সেই গায়িকার জন্যেই স্টারে যে সঙ্গীতানুষ্ঠান, সেখানে শ্রোতৃবর্গের বিপুল সমাগম হ'ল।

সেই পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে মুস্তারি বাঈ গান আরম্ভ করলেন। প্রথমে ধরলেন খেয়াল। তেমনি দরদী কণ্ঠে সুরের আলাপনায় রাগরূপ বিকশিত করতে লাগলেন। তদ্গত চিত্তে গাওয়া তাঁর সেই মাধুর্যময় স্বরে গান অন্তর স্পর্শ করল শ্রোতৃমণ্ডলীর। লালচাঁদ উৎসবে যেমন সার্থক হয়েছিল তাঁর সঙ্গীত, এখানেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটল। এখানেও তেমনি মন্ত্রমুগ্ধ করলেন শ্রোতাদের।

বরং এক হিসাবে তার চেয়েও বেশি। কারণ, খেয়াল শেষ ক'রে তিনি আসরে আরম্ভ করলেন রবীন্দ্র-সঙ্গীত। অপ্রত্যাশিত আনন্দে শ্রোতা-সাধারণের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে গেল। কলকাতার আসরে নবাগতা এবং প্রায় অপরিচিতা এই হিন্দুস্থানী শিল্পীর কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গান হঠাৎ শুনে বিস্ময়ের সীমা রইল না সকলের। এ কি আশ্চর্য ঘটনা।

কাজী সাহেব এবং কৃষ্ণচন্দ্র উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন গায়িকাকে রবীন্দ্রনাথের গান আরম্ভ করতে শুনে। বিস্মিত পুলকে তাঁরা শুনতে লাগলেন অবাঙালী খেয়াল-গায়িকার কণ্ঠে 'আজি দখিন দুয়ার খোলা' এবং 'মন্দিরে মম কে আসিল হে।' আর তাও এমন মর্মগ্রাহী রূপে। অবশ্য বাংলা উচ্চারণে কিছু ত্রুটি আছে। 'অ-কার' জাতীয় উচ্চারণে কিছু পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। কিন্তু কলকাতার আসরে এবং তাঁর জীবনে প্রথম বাংলা গান পরিবেশনরতা হিন্দুস্থানী গায়িকার পক্ষে সে ত্রুটি নিশ্চয় মার্জনীয়ও। এবং যে অনায়াস-নৈপুণ্যে গাইছেন, তাতে গানের কোন হানি ঘটে নি, বরং তার সৌন্দর্য অতিশয় উপভোগ্য হয়েছে। প্রকৃত শিল্পীর উপযুক্ত এই উপস্থাপনা। কারণ, রবীন্দ্রনাথের গান শুধু নির্ভুলভাবে গাওয়া নয়, তার সঙ্গে মিলেছে গায়িকার নিজস্ব অনুভব। সেই গান দু'টি সেজন্যে তার কাব্যের সুষমা ও সুরের কমনীয়তায় (বিশেষ 'আজি দখিন দুয়ার খোলা' গানটি) রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মর্মগ্রাহী শ্রোতাদের পরিতৃপ্ত করলে।

সে প্রায় ৩৫ বছর আগেকার কথা। রবীন্দ্রনাথের গানের এত ব্যাপক প্রচলন ও জনপ্রিয়তা তখন কলকাতায় হয় নি। তাই একজন হিন্দুস্থানী খেয়াল-গায়িকার কণ্ঠে কবির দু'খানি গান এমন সুচারুভাবে গীত হতে শুনে সেদিন অনেক শ্রোতাই অপরিসীম বিস্ময় বোধ করেছিলেন।

আর সেই তওয়ায়েফদের মধ্যে সেদিন প্রতিক্রিয়া হয়েছিল আর একরকম। এ গায়িকার গান তাঁদের ভাল লেগেছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু সে ভাল লাগার ফলে তাঁদের মনে অবিমিশ্র আনন্দ জাগে নি। সমব্যবসায়িনী সেই নারীদের অনেকের মধ্যে কিঞ্চিৎ অসূয়ার উদ্রেক হয়েছিল, শোনা যায়। তাঁদের নাকি ভাবনা হয় যে, আগ্রা থেকে এই গায়িকা যদি কলকাতায় এসে অধিষ্ঠান করেন, তা হ'লে তাঁদের প্রতিষ্ঠার পক্ষে হানিকর হবে।—এমন কথা। উপরন্তু বাংলা গান পর্যন্ত শিক্ষা হয়েছে এরই মধ্যে।

সেবার আর মুস্তারি বাঈ কলকাতায় বেশিদিন না থেকেই আগ্রায় ফিরে গিয়েছিলেন। তার দু' বছর পরে আবার তাঁকে কলকাতায় আনবার ব্যবস্থা করেন লালচাঁদ উৎসবের উদ্যোক্তারা। এবার তাঁর গান গ্রামোফোনে রেকর্ড করবারও আয়োজন হয়।

উৎসবের সঙ্গীতাসরে যোগ দেবার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়ে যথাসময়ে লিপি যায় তাঁর কাছে। কিন্তু উত্তরে তাঁর সেই কোঠি থেকে টেলিগ্রাম আসে—মুস্তারি বাঈয়ের অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটেছে।

বিগত-যুগের ওস্তাদরা, অর্থাৎ সঙ্গীত-ব্যবসায়ীরা, এই বিদ্যা দান করতে অনেক সময় কাতর হতেন। যক্ষের ধনের মতন তাঁরা সঙ্গোপনে রাখতেন তাঁদের সঙ্গীত-সম্পদ্। সাধারণ্যে সে বিদ্যা প্রচার করা অবশ্য সেকালের সামাজিক পরিবেশে প্রায় অসম্ভব ছিল। কিন্তু বাইরে থেকে কেউ তাঁদের কাছে শিষ্য হয়েও তা সচরাচর লাভ করতে পারত না।

কারণ নিজের বংশের অতিরিক্ত কোন শিক্ষার্থীকে তাঁরা দান করতে ইচ্ছুক ছিলেন না তাঁদের ঘরাণা সম্পদ্। জমিদার, রাজা-মহারাজা বা নবাব-বাদশার দরবারে তাঁরা নিযুক্ত থাকতেন। সেখান থেকেই হ'ত জীবিকার সংস্থান। সেজন্যে অর্থের প্রয়োজনে ছাত্রদের শিক্ষা দিতে তাঁদের হ'ত না। যে আশ্রয়ে থাকতেন, সাংসারিক অভাব মিটে যেত সেখান থেকেই। সুতরাং সঙ্গীত-শিক্ষা দিতেন নিজের পুত্রকে, কিংবা খুব বেশি ত— জামাতাকে, যদি অবশ্য তাদের গ্রহণ করবার শক্তি থাকে।

এ কথাও অবশ্য সাধারণভাবে ওস্তাদশ্রেণীর সম্বন্ধে স্বীকার করতে হবে যে, অর্থের চেয়ে তাঁরা মূল্যবান্ মনে করতেন সঙ্গীত-বিদ্যাকে। নচেৎ অর্থের বিনিময়ে এ বিদ্যার বেসাতি তাঁরা করতেন। একালের অনেক ওস্তাদদের মতন এমন অর্থলোলুপ ছিলেন না তাঁরা। বিদ্যা দান করতে তাঁদের কার্পণ্য দেখা যেত বটে, কিন্তু অর্থকে পরমার্থ জ্ঞান করবার এমন সর্বাত্মক দৃষ্টান্ত হয়ত ছিল না। দোষে-গুণে সেটা ছিল মধ্যযুগের অবশেষ। তার স্বতন্ত্র ধারা। ধ্যান-ধারণা তখনকার অনেকখানিই ছিল অন্যরকম।

সে যা হোক্, ঘরাণা বিদ্যা সেকালের পেশাদার কলাবতেরা অন্যত্র যেতে দিতেন না। বংশের অতিরিক্ত কোন শিষ্যকে মন খুলে বা অকাতরে শিক্ষা দিয়েছেন কদাচিৎ। এই নীতির ব্যতিক্রম বা অঘটন ঘটেছে ওস্তাদ অবিবাহিত বা অপুত্রক বা অস্বাভাবিক উদারচেতা হ'লে। নিঃসন্তান হ'লেও তাঁরা বাইরেকার শিক্ষার্থীদের ঘরাণা সম্পদ্ ছেড়ে দিতেন না, দিতেন আত্মীয়দের। নিয়মের ব্যতিক্রম ছিলেন মুষ্টিমেয় কয়েকজন।

সে যুগের পেশাদার সঙ্গীতজ্ঞদের (প্রধানতই তাঁরা অবাঙালী) মনের কথা ছিল—পুত্র বা জামাতাকে ভিন্ন এ বিদ্যা আর কাউকে দেওয়া চলে না।

সঙ্গীতচর্চা যত আধুনিক বা গণতান্ত্রিক কালের দিকে এগিয়ে এসেছে, ততই পরিবর্তিত হয়েছে এই মনোভাব। কারণ, সেকালের মনোভাবের বাস্তব ভিত্তি টলে গেছে। পূর্বযুগের বনিয়াদী পৃষ্ঠপোষকদের জীবনের রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নেবার ফলে আগেকার ধ্যান-ধারণা বদলেছে—অবস্থা-গতিকে, কালের যাত্রায়। দীর্ঘকালের সঞ্চিত প্রায়-গুপ্ত বিদ্যা এখন ওস্তাদদেরই বাস্তব প্রয়োজনে সাধারণের দরবারে ব্যক্ত করতে হচ্ছে।

তবে সেকালের ওস্তাদদের স্বপক্ষে আর একটি কথাও বলা যায়। সঙ্গীতবিদ্যার প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাপূর্ণ নিষ্ঠাও অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষাদানে কার্পণ্যের জন্যে দায়ী ছিল। অব্যবসায়ীর অর্থাৎ অনধিকারীর হাতে যেন সঙ্গীতের মান নমিত না হয়, মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না হয়, এই ভয়েও কোন কোন ওস্তাদ যত্র-তত্র শিক্ষা দিতেন না। অপাত্রে বিদ্যা ন্যস্ত হ'লে তার যথাযোগ্য চর্চা ও সমাদর না হ'তে পারে, এই আশঙ্কা তাঁদের রীতিমত ছিল। সঙ্গীত-সাধনায় তাঁরা এখনকার অনেকের তুলনায় অতিশয় serious ছিলেন, একথা অস্বীকার করা যায় না। অর্থের লালসায় বিদ্যাকে হাটে হাটে ফিরি করবার কথা তাঁদের কল্পনায়ও স্থান পেত না। তাকে লালন ক'রে সঞ্জীবিত করতেন পরম নিষ্ঠায়। সঙ্গীতের যে ধারা তাঁরা যোগ্য উত্তরাধিকারীর সাধন-লব্ধ ক'রে রেখে যেতে পারতেন, তা-ই রক্ষিত হ'ত। যাঁরা তা না পারতেন, তাঁদের দেহপটের সঙ্গে লুপ্ত হয়ে যেত অমূল্য সেই সঙ্গীত-সম্পদও। এমন অনেক কলাবতের দৃষ্টান্ত আছে। তাঁদের মধ্যে একজনের কথা এখানে বলা হবে।

এই ওস্তাদের নাম আসগর আলী খাঁ। একটি মহাকৃতী সঙ্গীত পরিবারের অন্যতম গুণী। এখনকার কালের বিখ্যাত সরোদী হাফিজ আলী খাঁ'র জ্যেষ্ঠতাত ছিলেন হোসেন খাঁ, গোলাম মহম্মদের সাগীরদ্। হোসেন খাঁ'র দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুরাদ আলী এবং নান্নে খাঁও (হাফিজ আলীর পিতা) গুণী ছিলেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠ হোসেন নাকি ছিলেন তিন ভ্রাতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আবার উক্ত হোসেন খাঁ'র একমাত্র পুত্র আসগর আলী সমগ্র পরিবারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণী ছিলেন ব'লে কথিত আছে।

আসগর আলী তালিম পেয়েছিলেন (রামপুর ঘরাণার অন্যতম প্রবর্তক আমীর খাঁ'র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) রহিম খাঁ বীণ্‌কারের কাছে। আসগর আলী বাজাতেন সরোদ, বীণা এবং সুরচয়ন নামে একটি যন্ত্র। শেষেরটিকে তিনি ঘরাণা-যন্ত্র বলতেন। এটি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় যন্ত্র ছিল, সুরবীণ্ নামেও কখনও কখনও অভিহিত করতেন এটিকে। প্রধানত আলাপচারীর এই যন্ত্রটি তিনি সরোদের চেয়ে বেশি বাজাতেন। তাঁর সুরবীণ্ বা সুরচয়ন যন্ত্রটি ছিল সেতার ও সরোদের সমন্বয়ে গঠিত। সেতারের দণ্ড এবং সরোদের তব্‌লি, তবে তা কাঠের—চর্ম কিংবা তম্বুরার নয়। দণ্ডের ওপর সেতারের মতন সচল ঠাটের পর্দা, কিন্তু সুতোয় বা তাঁতে বাঁধা নয়, সুরবাহারের মতন পেতলের ওপর পর্দার সারি বসানো। সরোদের মতন কোলে রেখেও এ যন্ত্র বাজানো যেত। তবে বুকে ঠেকিয়ে অনেকটা বীণার ধরণে রেখে বাজাতেন আসগর আলী। বুকে রেখে বাজিয়ে বাজিয়ে বুকে তাঁর চাপরাশের আকারে কড়া পড়ে যায়। সেতারের মেজ্‌রাব্ বা সরোদের জবা দুইয়ের যে-কোনটি দিয়ে বাজানো যেত সুরচয়ন।

উত্তরজীবনে আসগর আলী ছিলেন দারভঙ্গ মহারাজের দরবারে নিযুক্ত বাদক। এই দরবারেই তাঁর সঙ্গীতজীবনের অধিকাংশ অতিবাহিত হয়। মহারাজা লক্ষ্মীশ্বর সিংহের আমলেই তিনি বেশিদিন সেখানে ছিলেন, তারপর শেষ ক' বছর মহারাজা রামেশ্বর সিংহের দরবারে। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে আসগর আলীর দারভঙ্গেই মৃত্যু হয় এবং এই কাহিনী তারও কয়েক বছর আগেকার কথা।

দারভঙ্গের নতুন বাজার-অঞ্চলে রাজার যে বৃহৎ 'ব্যারাক' বাড়ীটিতে তাঁর নানা শ্রেণীর কর্মচারীদের বাস ছিল, তারই একদিকে ছিল ওস্তাদজীর বাসা। সেখানে তিনি তাঁর একমাত্র কন্যা এবং জামাতাকে নিয়ে বহুদিন থাকেন। জামাতার নাম আবদুল আজিজ, তিনি সরোদ-বাদক। তবে জামাতার যুক্ত প্রসঙ্গ আরম্ভ করবার আগে আসগর আলীর সঙ্গীতজীবনের আরও কিছু পরিচয় দেওয়া দরকার।

আসগর আলী একজন সাধক-স্বভাবের সুরশিল্পী ছিলেন। কিন্তু বড়ই অদ্ভুত-প্রকৃতির সঙ্গীতসাধক। রাজ-দরবারে বাজাবার জন্যে যখন উপস্থিত হতেন, সে সময় ছাড়া বাইরে আর কোথাও তাঁকে বিশেষ দেখা যেত না। মহারাজা তাঁকে বাজনা শোনাবার জন্যে তলব করতেন সাধারণতঃ বিকালে। কখনও কখনও সন্ধ্যায়। আর ওস্তাদজী'র নিজের বাজাবার বা সাধনার সময় ছিল গভীর রাত্রে, ব্যারাকবাড়ী আর সমগ্র দারভঙ্গ শহর যখন ঘুমে অচেতন হয়ে থাকত।

রাত ন'টা সাড়ে ন'টার সময় রাত্রের খাওয়া শেষ করবার কিছুক্ষণ পরে তিনি যন্ত্র নিয়ে বসতেন। ঘরের দরজা বন্ধ। চারদিক্ ক্রমে নীরব, নিস্তব্ধ হয়ে আসত। তখন তাঁর হাতে ধীরে ধীরে মুখর হয়ে উঠত সুরযন্ত্র। তিনি দরবার, সংসার, বিশ্বজগৎ ভুলে গিয়ে বাজনায় তন্ময় হয়ে যেতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চ'লে যেত রাগের ধ্যানে, সুরের আবাহনে। এ সঙ্গীত-সৃষ্টি কাউকে শোনাবার জন্যে নয়, নিজের অন্তরের তাগিদেই এর জন্ম। বলতে গেলে, তাঁর অন্তরাত্মাই এর শ্রোতা। আর যদি সুরের কোন দেবতা থাকেন, তা হ'লে তিনি। তিনি এই স্তবকে স্তবকে সুরের অঞ্জলি গ্রহণ করেন। যে গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে একাদিক্রমে প্রায় সারা রাত শিল্পী বাজিয়ে চলেন, নিজে পরম পরিতৃপ্তি লাভ না করলে তা সম্ভব নয়।

সেই ত্রিযামা রাত্রিই ছিল তাঁর সঙ্গীতসাধনার প্রকৃষ্ট সময়। দিনের কোন সময়ে আর তাঁকে যন্ত্র নিয়ে বসতে বড় একটা দেখা যেত না। আর তাঁর প্রতিভা বেশি স্ফূর্তিলাভ করত রাগালাপে। আলাপচারিতেই তিনি সঙ্গীত-জগতের শ্রুতি-স্মৃতিতে অমর হয়ে আছেন।

ওই যে রাত তিনটা সাড়ে-তিনটা পর্যন্ত বাজাতেন, তারপর থেকে সকালবেলার অনেকটা সময় নিদ্রা যেতেন। দরবারে যাওয়া ছাড়া দিনের অন্য সময়ে সাধারণতঃ বাড়ীর বার হতেন না। দুপুরে বা দিনের অন্য সময়ে হয়ত বিশ্রাম করতেন, কিংবা অন্য কিছু, তা জানা যায় না। আর লোকের সঙ্গে মেলামেশা তিনি এত কম করতেন যে, রীতিমত অসামাজিক মানুষ বলা যেত তাঁকে।

অতি মিষ্টি হাতের বাজনা এবং সেই সঙ্গে রাগবিদ্যায় অসাধারণ অধিকার—এই জন্যে আসগর আলীর নাম।

তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পরে এপ্রাজী শীতল মুখোপাধ্যায় একবার দারভঙ্গে উপস্থিত হ'লে সেখানকার দরবারী সরোদ-বাদক আজিজ খাঁ তাঁকে বলেছিলেন, আর দু'বছর আগে

এত্রে আপনি আসগর আলীর বাজনা শুনতে পেতেন। তাঁর সরোদে বাঁশী বাজত।

সরোদ 'আঘাত' করে বাজাবার যন্ত্র, কিন্তু মীড়ের কাজ ইত্যাদিতে এমন সুরেলা বাজাতেন যে বাঁশীর মতন আওয়াজ শোনাত—এত সুমিষ্ট হাত ছিল আসগর আলীর। আজিজ বক্সের উক্ত মন্তব্য থেকে একথাই বোঝা যায়।

যেমন গুণী শিল্পী ছিলেন আসগর, তেমনি বিপুল ছিল তাঁর রাগবিদ্যার সঞ্চয়। কিন্তু তাঁর সেই সম্পদ কোন্ উত্তরসাধককে তিনি দান ক'রে গিয়েছিলেন? বলতে গেলে কাউকেই না।

তাঁর জ্ঞাতিভ্রাতা হাফিজ আলীর তরুণ বয়সে আসগরের মৃত্যু হয়েছিল। হাফিজ আলী তার আগে আসগরের তালিম পেয়েছিলেন অল্পকালের জন্যে। সে শিক্ষা তাঁর সম্পূর্ণ হ'তে পারে নি এবং সেই তালিমে হাফিজ আলীর সঙ্গীত-জীবন এমন গঠিত হয় নি যে, বলা যেতে পারে আসগরের তিনি উত্তরাধিকারী। হাফিজ আলী পরে আলাপচারিতে রীতিমত তালিম পেয়েছিলেন রামপুর ঘরাণার উজীর খাঁ'র কাছে এবং গৎ তোড়া ইত্যাদি শিখেছিলেন পিতা নান্নে খাঁ'র অধীনে। তাই উত্তরজীবনে হাফিজ আলীর 'বাজ'-এ আসগরের বাজনার ছায়া পাওয়া যেত না। কখনও কখনও হাফিজ আলী ঘরোয়াভাবে বাজিয়ে দেখাতেন, আসগরের তালিমী আলাপচারির কি রীতি ছিল। কিন্তু প্রকাশ্য আসরের বাজনায় হাফিজ আলী সে পদ্ধতিতে বাজান নি।

আসগরের একজন 'শিষ্যে'র অপূর্ব সঙ্গীত 'শিক্ষা'র কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। তাঁর নাম জ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন আসলে চিত্রশিল্পী এবং নিসর্গচিত্র রচনায় নিপুণ। অনেক অনুরোধ-উপরোধেও তাঁর দ্বারবঙ্গে বাসের সময় ওস্তাদজী তাঁকে শেখাতে সম্মত হন নি। কিন্তু নাছোড়বন্দ শিক্ষার্থীকে শেষ পর্যন্ত অনুগ্রহ ক'রে এই অনুমতি দিয়েছিলেন যে, তাঁর বাজনা 'ছাত্র' কখনও কখনও শুনতে পাবেন এবং সে সময় স্বরলিপি করতে পারবেন। এই প্রস্তাব অবশ্য জ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ই করেছিলেন, কারণ তাঁর এই নৈপুণ্য ছিল যে, গান বা বাজনার সময়ে তা শুনে সঙ্গে সঙ্গে স্বরলিপি ক'রে নিতে পারতেন।

অবশ্য এই প্রক্রিয়ায় রাগ-সঙ্গীত কেউ পূর্ণভাবে শিখতে পারে না এবং বন্দ্যোপাধ্যায়ও তা জানতেন। তবু তিনি এই উপায় স্থির করেছিলেন উপায়ান্তর না দেখে। জেনেছিলেন, একটা কাঠামো কোনক্রমে ত পাওয়া যাবে। তারপর ওস্তাদজীকে শুনিয়ে তার ভুলভ্রান্তি সংশোধন ক'রে নিলে হয়ত কিছু লাভ হবে। এই ভাবে স্বরলিপি ক'রে পরে নিজে তা যন্ত্রে বাজিয়ে ওস্তাদকে শুনিয়ে তাঁর নির্দেশ চাইতেন তিনি। কিন্তু এটুকু শিক্ষাদান করতেও কিভাবে আসগর গররাজি ছিলেন তা জ্যোতির্ময়বাবুর এই বিবৃতি থেকে বোঝা যায়—'আমি স্বরলিপি থেকে তুলে যখন যন্ত্রে বাজাতাম, ওস্তাদজী শুম্ হয়ে ব'সে শুনতেন। যখন ঠিক ঠিক বাজিয়ে যেতাম, তিনি কোন মন্তব্য বা প্রশংসা কিছুই করতেন না। কোন কথাই বলতেন না তখন। কিন্তু যখনই বাজনায় কোন ভুল হ'ত, তখনই এমন ভাবে সাবাস দিতেন কিংবা তারিফ করতেন যেন আমি সঠিক এবং খুব ভাল বাজিয়েছি।'

অর্থাৎ, সোজা কথায়, 'ছাত্র'কে বিপথগামী করতে চাইতেন।

এমন কি, পুত্রহীন আসগর আলী নিজের একমাত্র জামাতাকেও তালিম দিতে অসম্মত ছিলেন, জামাতা বাদক হওয়া সত্বেও। না-শেখাবার একটি যুক্তি জানাতেন—ও এসব জিনিষ ঠিক মতন হাতে তুলতে পারবে না। সুর সব নষ্ট ক'রে দেবে।

এ কথায় হয়ত কিছু সত্য থাকতে পারে। তিনি যে উচ্চমানের সঙ্গীতসাধনা করতেন, সুরের যে অতি সূক্ষ্ম কারুকর্ম তাঁর হাতে ফুটত, জামাতা হয়ত তা যথারীতি ধারণ করতে পারবেন না—এই ধারণা হয়ত একেবারে মিথ্যা নয়। কিংবা একটা অজুহাতও হ'তে পারে, জোর ক'রে কিছু বলা যায় না।

জামাতা আবদুল আজিজ কিন্তু শ্বশুরের সঙ্গীত-কৃতিতে, তাঁর বাদন-পদ্ধতিতে মুগ্ধ ছিলেন এবং সেই রীতি অনুসরণ ক'রে বাজাবার আগ্রহ কিছুতেই তিনি দমন করতে পারেন নি। অথচ সাক্ষাৎ ভাবে তাঁর কাছে শিক্ষা করা সম্ভব নয়। কারণ, তিনি বহু অনুনয়-বিনয়েও শিক্ষা না দিতে অটল। এমন কি পাছে শুনে নকল ক'রে নেন, সেজন্যে নিজের রেয়াজের সময়ে তাঁর সামনে কখনও বাজাতেন না এবং গভীর রাতে

চর্চা করতেন বাজনা বন্ধ রেখে। তাঁর বাজনার সময়ে একমাত্র তাঁর কন্যার সে ঘরে প্রবেশাধিকার ছিল।

আবদুল আজিজ এক অভিনব উপায়ে শ্বশুরের সঙ্গীত-সম্পদ্ আহরণ করবার চেষ্টা করলেন। আসগর আলী যখন বাজাতেন, তাঁর কন্যা নিবিষ্টচিত্তে তা শুনে যতদূর সাধ্য মনে রাখতেন এবং পরে পিতার অনুপস্থিতিতে তা স্বামীর কাছে কণ্ঠে প্রদর্শন করতেন, অর্থাৎ গান গেয়ে সেই সব সুর শোনাতেন। তখন তা যন্ত্রে তুলে নিতেন তাঁর স্বামী। এমনিভাবে যতদূর সম্ভব শ্বশুরের বিদ্যা আয়ত্ত করতেন আবদুল আজিজ। আসগর আলী অনেকদিন কন্যা-জামাতার এই বিচিত্র সঙ্গীত-শিক্ষা পদ্ধতির সন্ধান পান নি। কন্যার এই ধরণের নৈপুণ্যের বিষয়ে আগে কখনও সন্দেহ জাগে নি তাঁর।

কিন্তু এই গুপ্ত উপায় একদিন ব্যক্ত হয়ে পড়ল। কন্যা-জামাতার এই অপূর্ব সঙ্গীত-চর্চার এক অসতর্ক অবস্থায় আসগর আলী সন্ধান পেলেন ব্যাপারটির। কন্যার ওপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং ভবিষ্যতে যেন চৌর্যবৃত্তি আর কখনও না ঘটে সে বিষয়ে কঠিন ভাবে নিষেধ ক'রে দিলেন। তারপর থেকে কন্যার সামনেও আর বাজাতেন না কোনদিন।

এই প্রায়-অবিশ্বাস্য বৃত্তান্ত আবদুল আজিজ স্বয়ং জানিয়েছিলেন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন-কে, যাঁর প্রথম জীবন অতিবাহিত হয় দ্বারবঙ্গে। উত্তরকালে যতীন্দ্রকুমার কলকাতায় বসবাস করেন এবং একজন খ্যাতনামা চিত্রশিল্পীরূপে সুপরিচিত হন। রস-সাহিত্যস্রষ্টা রাজশেখর বসুর (পরশুরাম) গড্ডলিকা, কজ্জলী, হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদি সাহিত্য-কীর্তির সার্থক চিত্রকররূপেই প্রধানতঃ যতীন্দ্রকুমারের খ্যাতি। রাজশেখরের পিতার মতন যতীন্দ্রকুমারের পিতাও দ্বারবঙ্গ রাজ্যে কর্মসূত্রে বাস করায় তাঁরা প্রথম জীবনে সেখানে বাস করেছিলেন এবং কিশোর বয়স থেকেই তাঁদের পরস্পরের আলাপ-পরিচয়। দ্বারবঙ্গরাজের নতুন বাজারে যে বৃহৎ বাড়ীর একাংশে ওস্তাদ আসগর আলী স-কন্যা-জামাতা থাকতেন, তারই অন্য একদিকে যতীন্দ্রকুমারও তখন ছিলেন। সেজন্যে আসগর আলী এবং তাঁর জামাতাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানবার সুযোগ ঘটে। ওস্তাদজীর সঙ্গে তাঁর বিশেষ আলাপ-পরিচয়ের আর একটি কারণ—যতীন্দ্রকুমারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসক এবং আসগর আলী তাঁকে দিয়ে মাঝে মাঝে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতেন। তাছাড়া সঙ্গীতের দিকে ওস্তাদজীর অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। সেই সুবাদে যতীন্দ্রকুমার তাঁর বাজনা শোনার সুযোগ পেয়েছেন অনেকবার, যা বাইরের কোন লোকের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল, শোনা যায়।

এই লেখার শিরোনামাটি যে ঘটনার ইঙ্গিত দেয়, তার বিবরণ দিয়েছিলেন শিল্পী যতীন্দ্রকুমার। এবার সেই বৃত্তান্ত সেন মহাশয়ের জবানীতেই এখানে বিবৃত করা হ'ল।

সে এখন থেকে প্রায় ৬০ বছর আগেকার কথা। আমার বয়স তখন বোধ হয় ২০।২১ বছর হবে। সে সময় আমি কলকাতায় বাস আরম্ভ করেছি বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে দ্বারভাঙ্গায় যাই। সেখানে গেলে খাঁ সাহেবের বাজনা এক-একদিন তাঁর ঘরে গিয়ে শুনি। তাঁর তখন বয়স বোধ হয় ৬৫।৬৬-র কম হবে না। আমার তাঁকে খুব কাছে থেকে দেখবার সুযোগ হয়েছিল, একই বাড়ীর দু'দিকে থাকবার জন্যে শুধু নয়, আমার দাদাকে (ডাক্তার) তিনি প্রায়ই কান দেখাতে আসতেন। না হ'লে তাঁর দেখা পাওয়া শক্ত ছিল। প্রায় সারা রাত তিনি তাঁর ঘরে আপন মনে বাজাতেন, সেখানে কোন শ্রোতা তাঁর থাকত না। আমি তাঁর ঘরে বাজনা শুনেছি অল্প সময়ে। সারাদিনের মধ্যে প্রায় তিনি বাড়ী থেকে বেরুতেন না, দরবারে যাওয়া ছাড়া। বাড়ীর মধ্যেই বেশীর ভাগ থাকতেন।

একদিন সকালবেলা বেড়াতে বেড়াতে তাঁর ঘরের সামনে এসে পড়েছি। দেখি, খাঁ সাহেব বাইরে বেরিয়েছেন। ফিরে এসে দাদাকে বললাম, 'খাঁ সাহেবকে তাঁর ঘর থেকে বেরুতে দেখলাম।' দাদা শুনে বললেন, 'তা হ'লে বোধ হয় কান দেখাতে আসবেন আজ।' আমি তখন আবার জামাতার কাছে গিয়ে বললাম, 'ওস্তাদজী, একটু বাজনা শোনাতে হবে।' ব'লে তিনি কিছু বলবার আগেই, তাঁর সুরচয়ন যন্ত্রটি তাঁর ঘর থেকে নিয়ে এলাম। আমার সঙ্গে তখন যোগ দিয়েছিলেন সামনের বাড়ীর উকিল জ্ঞানবাবু, তিনিও ছিলেন আমার মতন খাঁ সাহেবের বাজনার ভক্ত। আমরা দু'জনে খাঁ সাহেব এবং তাঁর যন্ত্রকে সঙ্গে নিয়ে দাদার কাছে এলাম। ওস্তাদজী তখন দাদাকে বললেন, 'দেখুন ত, আপনার ভাই আমার যন্ত্র

নিয়েই চলে এসেছে। বলছে, বাজনা শোনাতে হবে।' দাদা হাসতে হাসতে বললেন, 'তা বেশ ত, শুনিয়ে দিন না বাজনা।' ব'লে, ওস্তাদজীর কান পরীক্ষা করতে চাইলেন এবং তিনিও কান দেখালেন যথারীতি। তারপর আমাদের অনুরোধে আমাদের ঘরে বসে সুরচয়ন হাতে তুলে নিলেন। ঘরের মধ্যে শ্রোতা শুধু আমরা তিনজন। তিনি সুর বেঁধে নিয়ে বাজাতে আরম্ভ করলেন—খাম্বাজ। সে মিষ্টি হাতের বাজনার কথা আমি আর কি বলব। তিনি তন্ময় হয়ে বাজাচ্ছেন, আমরাও একমনে শুনছি। খানিকক্ষণ খাম্বাজের আলাপ ক'রে ওস্তাদজী গৎ ধরলেন, যদিও সঙ্গত করবার কেউ ছিল না সেখানে, আর সঙ্গত হয়ও নি। তিনি আপন মনে খাম্বাজের একটি গৎ বাজাতে লাগলেন। যন্ত্রের পর্দায় পর্দায় তাঁর দক্ষ অঙ্গুলি চালনা দেখছি আর শুনছি কি আশ্চর্য সুরের কাজ ফুটে উঠছে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধ'রে তাঁর হাতে খাম্বাজ শুনলাম। তারপর হঠাৎ তিনি যন্ত্রের কান (ক'টা তা লক্ষ্য করি নি) মুচড়ে দিলেন বাঁ-হাতে। ডান-হাত আগের মতই চলছিল। কিন্তু কান মোচড়াবার সঙ্গে সঙ্গে খাম্বাজ বন্ধ হয়ে গিয়ে হঠাৎ শোনা গেল ভৈরবী। ভৈরবীতে কখন তিনি আলাপ আরম্ভ ক'রে দিলেন, প্রথমটা ধরতেই পারি নি। প্রায় চোখের পলকের মধ্যেই রাগ বদল হয়ে গিয়েছিল। খাম্বাজের বদলে ভৈরবী বাজতে লাগল। ব্যাপারটা বেশ আশ্চর্যের। কারণ খাম্বাজ শেষ ক'রে তিনি যন্ত্রের কোন পর্দা সরালেন না। রে কিংবা ধা পর্দা সরিয়ে কোমল করলেন না, দেখলাম। খাম্বাজ বাজাবার সময় ঠাট যেমন ছিল, এখনও তেমনি রইল। অথচ খাম্বাজ থেকে হ'ল ভৈরবী। কান মুচড়ে চট্‌ ক'রে সুর পাল্‌টে দেবার জন্যেই ভৈরবী বাজানো সম্ভব হয়েছিল। না হ'লে আর কি ক'রে যে, বুঝতে পারি না। Scale change-এর মতন কিছু একটা ব্যাপার খুব কায়দা ক'রে তাড়াতাড়ি ক'রে নিয়েছেন। ব্যাপারটা জানবার জন্যে বড় কৌতূহল হ'ল। কিন্তু বাজনা চলবার সময়ে ত আর জিজ্ঞেস করতে পারি ? আর সে কি চমৎকার ভৈরবীই বাজাতে লাগলেন। সেই সুরের মধ্যে বাধা দিয়ে কোন কথাই বলা চলে না। আমরা ভৈরবী শুনলাম বেশ খানিকক্ষণ ধরে।

তারপর ভৈরবী শেষ ক'রে তিনি আর কিছু বাজালেন না। বেলা তখন অনেকখানি গড়িয়ে গেছে। বাজনা থামিয়ে তিনি যখন যন্ত্রটি বুক থেকে নামিয়ে রাখলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ওস্তাদজী, পর্দা সরালেন না অথচ কি ক'রে খাম্বাজ থেকে ভৈরবী হ'ল ?'

খাঁ সাহেব কিন্তু ব্যাখ্যা ক'রে দিলেন না। কাঁধ-ঝাঁকুনি দিয়ে শুধু সংক্ষেপে বললেন, 'হো গিয়া।'

বন্ধু বীণা

বারাণসীর সঙ্গীতসাধক, বীণ্‌কার ও রবাবী, সাদিক আলী খাঁ। সঙ্গীত-জগতের মহান্ পুরুষ তানসেনের একজন দিক্‌পাল বংশধর। পুরুষানুক্রমে রক্ষিত তাঁদের ঘরাণা-বিদ্যার এক সুযোগ্য উত্তরাধিকারী।

স্বনামধন্য তানসেন একটি বিরাট্ সঙ্গীত-গুণী পরিবারের জনক। তাঁর সঙ্গীত-সম্পদের ধারক ও বাহক তাঁর কন্যা ও পুত্রদের বংশধারা অবলম্বনে সেই পরিবার বিস্তৃত হয়েছিল। তানতরঙ্গ খাঁ, সুরতসেন, বিলাস খাঁ প্রভৃতি পুত্রদের এবং একমাত্র কন্যা সরস্বতীর বংশধারা। সাদিক আলী খাঁ তানসেনের পুত্রবংশীয় ছিলেন ব'লে কথিত আছে।

তানসেনের এই সাক্ষাৎ বংশধরদের আর কালক্রমে তাঁদের কাছে শিক্ষা পাওয়া-শিষ্যদের নিয়ে গঠিত হয় বৃহত্তর সেনী ঘরাণা। বৃহত্তর এই জন্যে যে, এই মূল সেনী ঘরাণা থেকে নানা শাখা ঘরাণার সৃষ্টি হয়েছে—তানসেনের উত্তরাধিকারীদের নানা অঞ্চলে অবস্থান, শিষ্য গঠন এবং (কোন কোন ক্ষেত্রে) সঙ্গীতকেন্দ্র স্থাপনের ফলে।

তানসেন পরিণত বয়সে তাঁর পৃষ্ঠপোষক রেবা-রাজ্যের মহারাজা রামচাঁদের আশ্রয় থেকে বাদশা আকবরের দরবারে যোগ দেন। গোয়ালিয়র সঙ্গীতকেন্দ্রের গায়করূপে প্রসিদ্ধ তানসেন সেই থেকে সপরিবারে মোগল রাজধানীর অধিবাসী হলেন। তারপর পুরুষানুক্রমে তাঁর বংশধরদেরও বাস ছিল সেখানে। সঙ্গীত-চর্চাই ছিল তাঁদের জীবনের বৃত্তি, তাই পুরুষানুক্রমে মোগল দরবারে নিযুক্ত সঙ্গীতজ্ঞ থাকেন। একের পর এক মোগল বাদশা দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন এবং যথাকালে বিদায় নেন পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ থেকে। কিন্তু প্রায় সব বাদশার দরবারেই কোন-না-কোন সেনী-বংশীয় সঙ্গীত-গুণীকে পাওয়া যায়। আওরঙ্গজেবের

[illegible] হয়ে যায়।

আকবরের থেকে আরম্ভ করে মহম্মদ শা'র রাজত্ব পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় দু'শ বছর, তানসেনের বংশধরেরা রাজধানীতে বাস করেছিলেন। মহম্মদ শা'র আমলে দিল্লীর দরবারে তানসেনের কন্যা-বংশের গুণী নিয়ামৎ খাঁ (সদারঙ্গ) এবং পুত্রবংশীয় সোনাব খাঁ অবস্থান করেন ব'লে প্রকাশ। মহম্মদ শা'র পরে দিল্লী দরবার কার্যতঃ ভেঙে যাওয়ায় সেনী উত্তরাধিকারীরা রাজধানী ত্যাগ করে উত্তর ও পূর্ব ভারতের নানা আঞ্চলিক রাজ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকেন। রাজস্থানের জয়পুর প্রভৃতি রাজ্যে, পাঞ্জাবের কয়েকটি ক্ষেত্রে, লক্ষ্ণৌ নবাব দরবারে, রেবা রামপুর বেতিয়া ইত্যাদির রাজসভায় সম্মানের আসন লাভ করেন তাঁরা। সেই সব রাজ্যে তাঁদের অনেকে স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন।

এই ভাবে তানসেনের কোন কোন বংশধর আস্তানা স্থাপন করেন কাশীরাজ্যে। কাশীতে সেনীদের বাস নাকি এই প্রথম নয়। জনশ্রুতি এই যে, স্বয়ং তানসেন প্রথম জীবনে বারাণসী-নিবাসী ছিলেন এবং তাঁর পৈত্রিক বাসও নাকি ছিল সেখানেই। কাশী থেকে তিনি পরে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে গিয়েছিলেন। গোয়ালিয়র, বৃন্দাবন, রেবা ইত্যাদি নানা স্থানে সঙ্গীতশিক্ষা ও সঙ্গীত-চর্চার পর আকবরের আগ্রহে বাস করতে আসেন রাজধানীতে। তারপর তাঁর সাত-আট পুরুষ পরে কয়েকজন বংশধর আবার কাশীতে বসবাস আরম্ভ করলেন। কাশী-নরেশ হলেন তাঁদের পৃষ্ঠপোষক। এবং তাঁদের এখানে নতুন আবাস হ'ল কবীর চৌরা মহল্লায়।

কাশীতে তানসেনের পুত্রবংশের একটি ধারার বাস আরম্ভ হ'ল। সেই সঙ্গে কন্যাবংশের গুণী নির্মল শা'রও এখানে অবস্থানের কথা শোনা যায়। কিন্তু তাঁর বাস বারাণসীতে বংশানুক্রমে হয় নি, যেমন হয়েছিল (তান-সেনের) পুত্রবংশের একটি ধারার। যতদূর জানা যায়, ছজ্জু খাঁ ও তাঁর তিন পুত্রের সময় থেকে এই ধারার কাশীতে বাসের পত্তন হয়। এবং এই শাখা তানসেনের কনিষ্ঠ পুত্র বিলাস খাঁ'র অধস্তন পুরুষ এই প্রসিদ্ধি আছে।

ছজ্জু খাঁ হলেন বাদশা মহম্মদ শা'র দরবারে নিযুক্ত গায়ক গোলাব খাঁর পৌত্র। তানসেনের [illegible]

[illegible] উভয় সঙ্গীতেই ছিল তাঁদের দখল। [illegible] ধ্রুপদ-রচয়িতা এবং গীতকার [illegible] সঙ্গীত-চর্চায় [illegible] অবলম্বন। অথবা তাঁর বংশধরদের রচিত বহু [illegible] সঙ্গীতের আসরে প্রচলিত আছে।

তানসেনের পুত্রবংশে রবাবের, কন্যার ধারায় শ্রেষ্ঠ বীণার সাধনা। সঙ্গীত-চর্চায় ভিত্তিস্বরূপ ধ্রুপদ অবশ্য দুই ক্ষেত্রেই বরাবর আছে; কন্যাবংশে বীণার প্রচলন [illegible] তানসেনের জামাতা নৌবাৎ খাঁ'র সময় থেকে। তানসেনের এই দৌহিত্র বংশে অনেক মহাগুণী বীণকারের আবির্ভাব ঘটে যুগে যুগে। যথা: সদারঙ্গ, প্যার খাঁ (আঞ্জীকট), নির্মল শা, ওমরাও খাঁ, আমীর খাঁ, উজীর খাঁ প্রভৃতি। তেমনি পুত্রবংশীয় রবাবীদের মধ্যে স্মরণীয় নাম হ'ল—ছজ্জু খাঁ, জাফর খাঁ, বাসৎ খাঁ, সাদিক আলী খাঁ, মহম্মদ আলী খাঁ, কাসিম আলী খাঁ প্রভৃতি।

এই কাহিনীর নায়ক হলেন উক্ত সাদিক আলী খাঁ, রবাবী ছজ্জু খাঁ'র পৌত্র এবং জাফর খাঁ'র দ্বিতীয় পুত্র।

ছজ্জু খাঁর তিন পুত্র জাফর খাঁ, প্যার খাঁ এবং বাসৎ খাঁ ছিলেন সঙ্গীত-জগতের তিন দিক্‌পাল। জাফর খাঁর দৌহিত্র এবং সাদিক আলীর ভাগিনেয় ছিলেন বাংলার হোসেন খা সেন, রামপুর ঘরাণার অন্যতম প্রবর্তক (আমীর খাঁর সহযোগে)। কয়েক পুরুষে এই পরিবার থেকে এতজন প্রথম শ্রেণীর গুণী সঙ্গীতক্ষেত্রে দেখা দিয়েছেন যে পরিবারটি বিশেষ স্মরণীয় হয়ে আছে।

সাদিক আলীর পিতা জাফর খাঁ হলেন সুরশৃঙ্গার যন্ত্রের প্রচলনকর্তা। কাশীরাজ উদিতনারায়ণের দরবারে তাঁর পরিকল্পিত এই সুরশৃঙ্গার যন্ত্রটি তিনি প্রথম বাজিয়েছিলেন ব'লে প্রকাশ। তারপর থেকে সেনীদের অনেক গুণী ও তাঁদের শিষ্য-প্রশিষ্যের ধারায় এই সুমিষ্ট আলাপচারির যন্ত্রটি বাদিত হয়ে এসেছে এবং এখনও পর্যন্ত এই যন্ত্রের প্রচলন আছে গুণী-মহলে।

সাদিক আলী খাঁ সুরশৃঙ্গার বাজাতেন না। তিনি ছিলেন প্রধানত বীণ রবাব ও রবাববাদক। তবে তাঁর কোন কোন শিষ্য সুরশৃঙ্গারবাদক ছিলেন।

সাদিক আলী [illegible] হ'লেও

তাঁর প্রসিদ্ধি সমধিক ছিল বীণ্‌কাররূপে এবং বীণায় তাঁর একাধিক কৃতী শিষ্য গঠিত হন। পরে তাঁদের কথা উল্লেখ করা হবে।

সাদিক আলী শুধু ক্রিয়াসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ ও শিল্পী ছিলেন না। সঙ্গীত-তত্ত্বে পরম প্রাজ্ঞ এবং সুপণ্ডিতরূপে খ্যাতি ছিল তাঁর। তাঁদের স্থায়ীভাবে কাশীতে বসবাস তাঁর পিতার সময় থেকে আরম্ভ হয়েছিল এবং তাঁর নিজের সঙ্গীত-জীবনও প্রধানতঃ এখানে অতিবাহিত হয়। সঙ্গীতজ্ঞরূপে প্রথম জীবনে তিনি বেতিয়া-রাজার দরবারে কয়েক বছর অবস্থান করেন, অবশিষ্ট জীবন নিযুক্ত থাকেন কাশী-নরেশের সঙ্গীত-সভায়। তিনি অত্যন্ত দীর্ঘজীবী পুরুষ ছিলেন, মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ১০৫ বছর।

তাঁর সঙ্গীতসাধনার ফলে বারাণসীর সঙ্গীতক্ষেত্র তখন বিশেষ সমৃদ্ধ হয়েছিল। কারণ তাঁর প্রধান শিষ্যমণ্ডলী গঠিত হয় এখানেই এবং তাঁদের মধ্যে একমাত্র কাসিম আলী খাঁ ভিন্ন অন্য সকলেই তাঁদের সঙ্গীত-জীবন যাপন করে-ছিলেন কাশীতে।

সাদিক আলীর শিক্ষাদানের বিষয়ে একটি উল্লেখনীয় কথা হ'ল, তিনি আপন পরিবারের বাইরে এবং হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে যোগ্য শিষ্যকে মূল্যবান্‌ ঘরাণা সম্পদ্‌ বিতরণ করেন—যা সে যুগের ওস্তাদদের মধ্যে নিতান্তই দুর্লভ। তিনি যে অকৃতদার ছিলেন, তা-ই বোধ হয় এই অসাধারণ ঘটনার একমাত্র কারণ নয়। কেননা, আপন সন্তান না থাকলেও সেকালের সঙ্গীত-ব্যবসায়ীরা অন্ততঃ আত্মীয়দের সে বিদ্যা দান করতেন, অনাত্মীয় ও বিধর্মীকে শেখাতেন কদাচিৎ। সাদিক আলী তেমন হ'লে শুধু কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিসার আলী কিংবা জ্যেষ্ঠ কাজাম আলীর যথাযথ পুত্র কাসিম আলীকে তালিম দিয়েই শেষ করতেন। কিন্তু তেমন সঙ্কীর্ণমনা ছিলেন না তিনি। আপনার উদার সঙ্গীত-স্বভাবের প্রেরণাতেই তিনি বহু অনাত্মীয় উপযুক্ত আধারে দান ক'রে গেছেন তাঁর কষ্টার্জিত সঙ্গীত-সম্পদ্‌।

সঙ্গীত-জগতে তাঁর আসন কোথায় ছিল, তা ধারণা করা যায় তাঁর গঠিত শিষ্যমণ্ডলীর কথা মনে করলে। তাঁর শিষ্যরা সকলেই ছিলেন যন্ত্রকার। সুরশৃঙ্গার, বীণা, রবাব, সেতার ইত্যাদি পৃথক্‌ যন্ত্রে তাঁরা এক-একজন তালিম পান। কেউ বা একাধিক যন্ত্রে—যেমন কাসিম আলী খাঁ।

রবাব যন্ত্রে তাঁর দুই শিষ্য—দু'জনেই তাঁর আত্ম-জন—কনিষ্ঠ নিসার আলী খাঁ ও ভ্রাতুষ্পুত্র কাসিম আলী খাঁ। তবে নিসার আলী সুরশৃঙ্গার বাজাতেন। তাঁর সঙ্গীত-জীবনও কাশীতে অতিবাহিত হয় এবং তিনি সাদিক আলীর মৃত্যুর পর হয়েছিলেন কাশী-রাজের সঙ্গীতসভার আচার্য। তাঁর প্রধান দুই শিষ্যও ছিলেন কাশী-নিবাসী। একজন হলেন পান্নালাল জৈন, ইনি সুরশৃঙ্গারে নিসার আলীর তালিম পান এবং আর একজন অর্জুন বৈদ্য, সেতারী। দুজনেই গুণী বাদক ব'লে সুপরিচিত হয়েছিলেন। পরবর্তী কালের নেতৃস্থানীয় বীণ্‌কার ও সুরশৃঙ্গার-যন্ত্রী উজীর খাঁ—নিসার আলীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাজাম আলীর দৌহিত্র—কিশোর বয়সে নিসার আলীর তালিম পেয়ে-ছিলেন। বারাণসীর বীণ্‌কার মহেশচন্দ্র সরকারও নিসার আলীর শিক্ষা কিছু লাভ করেন।

সাদিক আলীর সর্বশ্রেষ্ঠ ঘরাণা-শিষ্য হলেন কাসিম আলী খাঁ। রবাব ও বীণা দুই যন্ত্রেই তিনি মহাগুণী ছিলেন। সাদিক আলীর শিক্ষা সমাপ্ত ক'রে তিনি বেশি দিন থাকেন নি কাশীতে। উত্তর-জীবনে বাংলা দেশের নানা সঙ্গীত-দরবারে অবস্থান করবার পর তাঁর মৃত্যুও হয় এই প্রদেশেই। প্রথমে তিনি এসেছিলেন লক্ষ্ণৌর নির্বাসিত নবাব ওয়াজিদ আলী শা'র মেটেবুরুজ দরবারে বীণ্‌কার নিযুক্ত হয়ে। তারপর বাংলার নানা আঞ্চলিক রাজসভায় সসম্মানে যুক্ত থাকেন। যথা: পঞ্চকোটে কাশীপুরের সঙ্গীতসভায়, ত্রিপুরার রাজ-দরবারে, ভাওয়াল-রাজের সভায়, ইত্যাদি। ত্রিপুরার প্রতিষ্ঠিত যদু ভট্ট গুপ্ত-ভাবে তাঁর সঙ্গীত-সম্পদ্‌ আহরণ করবার চেষ্টা করায় তিনি বিরক্ত হয়ে ত্রিপুরা ত্যাগ ক'রে ভাওয়াল-রাজার সঙ্গীতসভায় চ'লে যান। ভাওয়ালেই তাঁর মৃত্যু ঘটে এবং তাঁর হাতের রবাব যন্ত্র সেখানেই রক্ষিত হয়েছিল। ত্রিপুরায় অবস্থানের সময় আলাউদ্দিন খাঁর পিতা সদু খাঁ (ত্রিপুরার শিবপুর নামে গ্রামের অধিবাসী) সেতার শিখেছিলেন কাসিম আলী খাঁর কাছে। কাসিম আলীর তুল্য যন্ত্রকার বাংলা দেশে খুব কমই এসেছিলেন—সঙ্গীতজগতের স্মৃতি-স্মৃতিতে এমন কথা প্রচলিত আছে।

সাদিক আলীর অন্যান্য শিষ্যদের মধ্যে বহু-বিখ্যাত ছিলেন—সেতারী গণেশ বাজপেয়ী, বীণ্‌কার মিঠাইলাল এবং বীণ্‌কার মহেশচন্দ্র সরকার। তিনজনই কাশীনিবাসী এবং প্রথম শ্রেণীর সঙ্গীতজ্ঞ। গণেশ বাজপেয়ীর কাছে বিখ্যাত সেতারী রামেশ্বর পাঠক কিছু তালিম পেয়েছিলেন এবং মহেশচন্দ্র সরকারের প্রথম সঙ্গীতগুরুও তিনি (বাজপেয়ীজী)। মহেশচন্দ্র মিসার আলীর শিক্ষা কিছু লাভ করবার পর সাদিক আলীর তালিম পান এবং গুণী বীণ্‌কাররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস বৃন্দাবন যাবার পথে বারাণসীতে মহেশচন্দ্রের বীণাবাদন শুনে ভাব-সমাধিস্থ হয়েছিলেন, একথা সুবিদিত। সাদিক আলীর অপর শিষ্য মিঠাইলাল একজন শ্রেষ্ঠ বীণ্‌কাররূপে স্বীকৃত হয়েছিলেন এবং বীণাযন্ত্রে তাঁর কৃতী শিষ্য হলেন বারাণসীর শিবেন্দ্রনাথ বসু। বড় ও ছোট রামদাস কণ্ঠসঙ্গীতে মিঠাইলালের দুই খ্যাতনামা শিষ্য। তা ছাড়া, ধ্রুপদী গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও মিঠাইলালের তালিম পেয়েছিলেন।

এই সব সুপ্রসিদ্ধ শিষ্য ভিন্ন চিন্তামণি বাপুলি নামে সাদিক আলীর একজন বাঙালী শিষ্য ছিলেন। তিনি বাংলার এক সৌখীন সঙ্গীতজ্ঞ, কাশীপ্রবাসী হবার পর সাদিক আলীর শিষ্য হন এবং সুরশৃঙ্গার বাজাতেন।

এই প্রতিষ্ঠাবান্ শিষ্যগোষ্ঠীর গুরু সাদিক আলী খাঁর সঙ্গীতজগতে কি মর্যাদার আসন ছিল, তা সহজেই অনুমেয়। সেই সঙ্গে স্মরণীয় যে, বেতিয়ারাজার দরবার ত্যাগ করবার পর তিনি কাশী-নরেশের সঙ্গীতগুরুরূপে তাঁর সঙ্গীতসভায় বিপুল গৌরবে অবস্থান করেছিলেন। তা ছাড়া, সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল এবং বারাণসীর সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমহলে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল তাঁর।

রবাব ও বীণা এই দুই যন্ত্রেই তিনি গুণপনা প্রদর্শন করতেন এবং শোনা যায়, 'লড়ী জোড়' এবং 'লড় গুথাও'-বিভাগে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

তিনি শতায়ু ছিলেন, একথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। আঠারো শতক থেকে আরম্ভ ক'রে তাঁর জীবন এসে পৌঁছেছিল উনিশ শতকের প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত।

তিনি একজন যথার্থ সঙ্গীত-সাধক ছিলেন। চিরকুমার তিনি আজীবন সঙ্গীতচর্চায় আত্মনিময় রাখেন নিজেকে। ভারতীয় সঙ্গীতের বিপুল ও গভীর রাগসম্পদ্ আস্বাদন করেন অনন্যচিত্তে।

সঙ্গীত-সাধনায় তিনি কি একনিষ্ঠ ভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তার উদাহরণ হিসেবে তাঁর একটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করা হবে। তিনি তখন পরিণত বয়সে অবস্থান করছিলেন বারাণসীতে। পরবর্তী কালের সুবিখ্যাত রবাবী-ধ্রুপদী মহম্মদ আলী খাঁর সে সময় অল্প বয়স। পিতা বাসৎ খাঁর সঙ্গে তিনি তখন কাশীতে এসেছিলেন এবং কিছুদিন ছিলেন সাদিক আলী খাঁর সঙ্গে। বাসৎ খাঁ হলেন সাদিক আলীর পিতৃব্য এবং জাফর খাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

সাদিক আলীর সঙ্গে কথা-প্রসঙ্গে একদিন মহম্মদ আলী খাঁ তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন,—বিদ্যা কি?

অর্থাৎ তিনি জানতে চেয়েছিলেন, রাগবিদ্যার স্বরূপ কি। কেমন ক'রে এই বিদ্যা লাভ করা যায়, কি রকম এ বিদ্যার বিস্তার, ইত্যাদি।

সাদিক আলী এইভাবে উত্তর দিয়েছিলেন,—বিদ্যা ছড়ান আছে, সকলে যেমন জানে। কিন্তু এ যেন অপার। সীমা-পরিসীমা নেই। এর শেষও দেখতে পাই না। যত দিন যাচ্ছে, ততই নতুন নতুন রাস্তা বেরুচ্ছে। রাগের বিস্তারের যেন আর শেষ নেই। অন্য সব রাগের কথা কি বলব? আমি ত তিনটি নিয়ে পড়ে আছি। শুদ্ধ (শুদ্ধ) কল্যাণ, ইমন কল্যাণ আর দরবারী কানাড়া। কিন্তু তা-ই আমি শেষ করতে পারছি না। দিন দিন এদের নতুন নতুন দিক্ খুলে যাচ্ছে।...

শুদ্ধ কল্যাণ, ইমন কল্যাণ ও দরবারী কানাড়া। এই তিনটি রাগ ছিল সাদিক আলীর সবচেয়ে প্রিয় এবং এই তিনে তিনি সিদ্ধ ছিলেন। অন্য বহু রাগেও যে তিনি পারঙ্গম ছিলেন, তা বলা বাহুল্য। ওটি তাঁর বিনয়ের কথা। তাঁর সঙ্গীত-ভাণ্ডার বিপুলভাবে সঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি মাত্র ওই তিনটির নাম করেছিলেন, কারণ ওই তিনটি ছিল তাঁর প্রিয় সাধনের রাগ। তাই তিনটির সীমার মধ্যেই তিনি অসীমের, অনন্তের আভাস পেয়েছিলেন। কল্যাণ, ইমন কল্যাণ আর দরবারী কানাড়ার অগাধ বিস্তারের মধ্যে আত্মসমাহিত হয়েছিলেন তিনি।

এখন খাঁ সাহেবের আর একটি প্রসঙ্গ বর্ণনা ক'রে তাঁর

কথা শেষ করা হবে। এটি এক কৌতুককর ঘটনা। তাঁর সুরসিক-মনের একটি দৃষ্টান্ত এবং এই নিবন্ধের শিরোনামার প্রসঙ্গ।

সাদিক আলীর এক বন্ধু ছিলেন, তিনি সঙ্গীতজ্ঞ নন। বাইরে বাইরে থাকতেন আর কাশীতে এলে দেখা করতেন খাঁ সাহেবের সঙ্গে। সঙ্গীত-জগতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক না থাকায় খাঁ সাহেবের অন্তর্জীবনের সংবাদ তিনি কিছু জানতেন না। সাদিক আলী যে কত বড় গুণী, তাঁর জীবনে সঙ্গীতের স্থান কোথায় এসব কথা সেই বন্ধুর ধারণা ছিল না। কি সব বাজনা বাজান, এইটুকুই জানা ছিল তাঁর।

সেবার তিনি কাশীতে এসেছেন অনেক দিন পরে। সাদিক আলীর সঙ্গে সেদিন তিনি দেখা করেছেন এবং দু'জনে গল্প হচ্ছে।

কি একটা কথায় তিনি খাঁ সাহেবকে হেসে বললেন,—সে সব আর তুমি কি বুঝবে, বল। সংসার ত আর করলে না। বিয়ে-শাদী হ'ল না—এ আর তুমি কি জানবে? সারাটা জীবন শুধু গান-বাজনা নিয়ে কাটিয়ে দিলে।

সাদিক আলী খাঁ মুখে বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়ে বললেন,—বিয়ে করি নি কিরকম? তুমি কি ভেবেছ আমার শাদী হয় নি?

বন্ধু আরও আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন,—সে কি? তুমি বিয়ে করেছ? কবে, কই আমায় ত কিছু জানাও নি! সত্যি বিয়ে করেছ?

—নিশ্চয়। আর সে কি আজকের কথা। বহুকাল আগে বিয়ে করেছি। বৌ ত পুরনো হয়ে গেছে হে।

বন্ধুর তখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটে নি। তিনি কথাটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছেন না। কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে। সাদিক আলী গান-বাজনা নিয়ে পাগল হয়ে থাকেন, তিনি আবার কবে বিয়ে করলেন, কারুর কাছে ত শোনা যায় নি। এ কেমন কথা?

তখন সাদিক আলী বন্ধুর মুখের দিকে চেয়ে বললেন,—বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? আচ্ছা, এস আমার সঙ্গে বাড়ীর মধ্যে। আমার বৌ দেখবে এস।

ব'লে, বাইরের ঘর থেকে বন্ধুর হাত ধ'রে বাড়ীর ভেতরের একটি ঘরে নিয়ে এলেন। ঘরের একদিকে রাখা একটি খাটের দিকে আঙুল তুলে বললেন,—ওই দেখ, আমার বৌ এখন শুয়ে আছে।

বন্ধু তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে দেখেন, খাটের ওপর লাল রেশমী কাপড়ে সর্বাঙ্গ ঢেকে—ওই কি সাদিকের পত্নী?

খাঁ সাহেব বন্ধুর সন্দেহ নিরসন করবার জন্যে সেদিকে এগিয়ে গেলেন অপ্রতিভ বন্ধুকে নিয়ে। খাটের ধারে দাঁড়িয়ে, নীচু হয়ে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করবার মতন ক'রে তাকে কিঞ্চিৎ নিরাবরণ করলেন।

বন্ধু সবিস্ময়ে দেখলেন—উজ্জ্বলকান্তি চিক্কণ-তন্ত্র একটি বীণাযন্ত্র!

এই বধূর পাদপদ্মে সাদিক আলী তাঁর মন-প্রাণ সাধ-সাধনা সব সমর্পণ করেছেন!

হাসতে হাসতে বন্ধুর দিকে ফিরে সাদিক আলী বললেন, আমার বৌ দেখলে ত?

তারপর দু'জনেই হাসতে লাগলেন।

বন্ধু বিদায় নেবার পর সাদিক আলী এসে বসলেন খাটের ওপর। বধূ বীণার লজ্জা অপসারণ ক'রে তাকে সাদরে বক্ষ সংলগ্ন করলেন। তারপর তন্ত্রে সুর সংযোগের পর তাঁর প্রকম্পিত তনুলতা ঝঙ্কৃত ক'রে তুললেন প্রেমিকের আত্মহারা আবেশে।

বিশ্বামিত্র

শ্রীচাণক্য সেন

আট

মাধব দেশপাণ্ডেকে নিজের খাস কামরায় নিয়ে সযত্নে সাদরে সসম্মানে বসালেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

বড় একটা তাকিয়া এগিয়ে দিলেন।

"বসুন, মাধবভাই, বসুন। আরাম ক'রে বসুন। রাজনীতি আর রাজকার্য ক'রে আরাম ত ভুলেই গেছেন। ভবিষ্যৎ আপনার সুস্থ আছে ত? নিজের দেহের দিকে নজর রাখবেন। বসুন, আরাম ক'রে বসুন।"

বেয়ারাকে ডাকলেন: "বাদামের সরবৎ নিয়ে এস দেশপাণ্ডেজির জন্যে।"

মাধব দেশপাণ্ডে তাকিয়া টেনে বসলেন। কিন্তু স্বস্তিবোধ করলেন না। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কাছে ব'সে কদাপি তিনি স্বাভাবিক হ'তে পারেন না। মনে হয়, এ লোকটা যেন আমার মনের সব কথা বুঝে নিচ্ছে। আমার আদ্যোপান্ত দেখছে। আমি কঙ্কাল হয়ে এর সামনে বসে আছি।

হ'লও ঠিক তাই। মাধব দেশপাণ্ডের মনে সঙ্কোচ-সংশয়ের যা আসল কারণ তাই বাইরে টেনে আনলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

"আপনি অস্বস্তি বোধ করছেন, মাধবভাই। ভাবছেন, আমার বিপক্ষে দাঁড়িয়ে আপনি আমাকে দারুণ চটিয়েছেন। ভাবছেন, সুদর্শন ছুবেকে সমর্থন ক'রে আপনি আমাকে চির-শত্রু করেছেন।"

মাধব দেশপাণ্ডের মুখ পাণ্ডুবর্ণ হ'ল।

"তা নয়, মাধবভাই। রাজনীতিকে অমন ভয়ঙ্কর গম্ভীরভাবে গ্রহণ করতে নেই। এও এক খেলা। আমি চিরদিন বিশ্বাস ক'রে এসেছি রাজনীতিতে শত্রু-মিত্র নেই। আজ যে বিপক্ষ, কাল সে স্বপক্ষ। আজ সে আমার দলে, কাল সে অন্য দলে। রাজনীতি যদি আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের আস্বাদ নষ্ট ক'রে দেয় তা হ'লে ত সর্বনাশ।"

মাধব দেশপাণ্ডের মুখে এখনও ভাষা এল না।

"আমি অনেক ভেবেছি, মাধবভাই, আপনার কথা। বুঝতে চেষ্টা করেছি কেন আপনি আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। নিশ্চয় আমার বিরুদ্ধে আপনার অনেক নালিশ আছে। [illegible] খোলাখুলি আলোচনা ক'রে আমায় তা জানান নি। আমারা [illegible] আপনার কথা নয়। বস্তুত পক্ষে, আমি সাধ্যের বেশি, উচিতের বেশি, আপনাকে আগলে এসেছি। টিউবওয়েল নিয়ে ব্যাপারটা আরও বহুদূর গড়াত, মাধবভাই, যদি আমি আপনাকে না আগলে রাখতাম।"

এতক্ষণে মাধব দেশপাণ্ডে কথা বললেন।

"আমাকে আগলেছেন তা জানি। কিন্তু সে আমার জন্যে নয়, আপনার জন্যেই।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হেসে ফেললেন।

"ওটা আপনার কথা নয়, মাধবভাই। ওটা সুদর্শন ছুবের কথা। সে আপনাকে অমন বুঝিয়েছে।"

মাধব দেশপাণ্ডে প্রতিবাদ করলেন, "সুদর্শন ছুবেজি যা বলেছেন আমি তার সঙ্গে একমত হয়েছি।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়।" কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মেনে নিলেন। "একমত না হ'লে আপনি কেন তার মতে সায় দেবেন? কারও কথায় ওঠ-বোস করার মানুষ যে আপনি নন, তা কি আমি জানি নে?"

মাধব দেশপাণ্ডের কান জ্বালা করে উঠল। ঠিক বুঝতে পারলেন না কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যঙ্গ করছেন, না মনের কথা বলছেন।

"অথচ আপনি জানেন না, সুদর্শন ছুবেই সবচেয়ে বড় গলায় দাবি করেছিল টিউবওয়েল ব্যাপারে পাব্লিক জুডিশিয়েল এনকোয়ারীর।"

"আমি বিশ্বাস করি না!" মাধব দেশপাণ্ডে সোজা হয়ে বসলেন।

"বিশ্বাস করা সহজ নয়," মৃদু হেসে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন। "কিন্তু, মাধবভাই, এতদিনে আপনার জানা উচিত ছিল, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোনও মিথ্যা বলে না।"

মাধব দেশপাণ্ডে চুপ ক'রে রইলেন।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বাঁ-দিকে সুরক্ষিত টেবিলের ড্রয়ার খুলে একখণ্ড কাগজ বার করলেন।

"প'ড়ে দেখুন।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে লেখা সুদর্শন ছুবের পত্র।

প'ড়ে মাধব দেশপাণ্ডে [illegible] হয়ে গেলেন।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন [illegible]

এবার বাঁকা হাসিতে তাঁর ধনুকের মত ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত হ'ল।

"বিশ্বাস হ'ল, মাধবভাই ?"

একটু পরে : "যাক্ গে, এসব কথা থাক। আমি আপনার মন সুদর্শনের বিরুদ্ধে বিষাক্ত করতে চাই নে। যদি আপনি তাঁকে প্রশ্ন করেন কেন সে এ-চিঠি আমায় লিখেছিল, নিশ্চয় একটা মানানসই ব্যাখ্যা সে আপনাকে দিতে পারবে। হয়ত বলবে, তার লক্ষ্য ছিলাম আমি, আপনি নন।"

মিনিট খানেক পরে : "খোঁজ করলে জানতে পারবেন, যে বিভাগের দায়িত্ব বর্তমানে আপনার, সে বিভাগের পূর্ণ মন্ত্রিত্ব সুদর্শন প্রজাপতি শেউড়েকে দেবার অঙ্গীকার করেছে।"

এ কথায় মাধব দেশপাণ্ডে বিচলিত হলেন না।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "জানি, আপনাকে সে আরও অনেক বড় অঙ্গীকার করেছে। হয় মুখ্যমন্ত্রিত্ব, নয় অর্থ-মন্ত্রিত্ব।"

এবার মাধব দেশপাণ্ডে কিঞ্চিৎ অস্থিরতা দেখালেন।

"খোঁজ নিয়ে দেখুন, ঐ একই লোভ সে আরও তিন-জনকে দেখিয়েছে।"

বেয়ারা শ্বেত-পাথরের গ্লাসে সরবৎ নিয়ে এল। রাখল মাধব দেশপাণ্ডের সামনে। মাধব তা স্পর্শ করতে পারলেন না।

টেলিফোন বাজল।

রিসিভার তুলে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন : "বলছি। নমস্তে। বেশ ত, খুব আনন্দের কথা। তিনটের সময় আসুন। জি, হ্যাঁ, তিনটে।"

টেলিফোন নামিয়ে রেখে তাকিয়ায় দেহ এলিয়ে দিলেন।

বললেন : "আমার আর এসব ভাল লাগছে না, মাধব-ভাই। দেশ স্বাধীন হ'ল, শাসনভার বিদেশীদের কাছ থেকে হঠাৎ চলে এল আমাদের কাছে। নতুন দায়িত্ব, নতুন কর্তব্য মাথায় ক'রে নেওয়ার মধ্যে দুঃসাহস ছিল, আনন্দও ছিল। যোগ্যতা, অযোগ্যতা সব কিছু নিয়ে সে দায়িত্ব এতদিন গ্রহণ করেছিলাম। সাধ্যমত তা পালন করবার চেষ্টার ত্রুটি হয় নি। তখন ভাবি নি এ নতুন দায়িত্বের পেছনে এত বড় আত্মকলহ লুকিয়ে রয়েছে। ভাবি নি, স্বাধীনতার পর এত শীঘ্র আমরা ক্ষমতার জন্যে এমন কুৎসিত আত্মসংগ্রামে লিপ্ত হব। আমার সব সাধ পূর্ণ হয়েছে মাধবভাই। এবার অন্তরে বনানীর আহ্বান শুনছি, এ দায়িত্ব আমার নয়। দুর্গাভাইকে রাজী করাতে পারলে এ দায়িত্ব তাঁকেই দিয়ে দেব ; তিনি রাজী না হ'লে সুদর্শন দুবেকেই। মুখ্যমন্ত্রী হবার বড় সখ তার, একবার হয়ে দেখুক। কণ্টকশয্যা কাকে বলে জানতে পারবে।"

মাধব দেশপাণ্ডে অতিশয় শঙ্কিত হলেন।

দুর্গাভাই মুখ্যমন্ত্রী হ'লে মন্ত্রীসভায় যে তাঁর স্থান হবে না, তা তিনি নিশ্চিত জানতেন। সুদর্শন দুবের দলে ভিড়েছিলেন কতকটা ভয়ে, কিছুটা লোভে, কিছুটা রাজ-নৈতিক কূটবুদ্ধিতে। ভয় পেয়েছিলেন এজন্যে যে, সুদর্শন দুবে খোলাখুলি শাসিয়েছিলেন যে অন্যথা টিউবওয়েল কেলেঙ্কারীর হাঁড়ি তিনি হাটে না ভেঙে ছাড়বেন না। লোভ হয়েছিল সুদর্শন দুবের কাছে অর্থমন্ত্রিত্ব এমন কি মুখ্যমন্ত্রিত্বের আশা পেয়ে।

আর কূটনৈতিক বুদ্ধি যেটুকু, তা মাধব দেশপাণ্ডের একেবারে নিজস্ব। একথা তিনি জানতেন যে, যে-কোনও কারণেই হোক্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন টিউবওয়েল কেলেঙ্কারীটা চেপে যাবেন। আরও জানতেন যে, কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে যতই না কেন তিনি না-বুঝুন, যতটাই অস্বস্তি লাগুক তাঁর সান্নিধ্যে, মানুষ হিসেবে সুদর্শন দুবের সঙ্গে তাঁর তুলনা হয় না। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন শক্ত মানুষ, তাঁর কথাবার্তা, কাজকর্মে শক্তির ছাপ আছে। ভীরু মানুষের গোপন বিশ্বাসঘাতকতা তাঁর দ্বারা সম্ভব নয়। রাজনৈতিক কারবার তাঁর সঙ্গে করা যতটা সহজ, সুদর্শন দুবের সঙ্গে ঠিক ততটা কঠিন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সর্বদা মাধব দেশপাণ্ডের মত লোকেদের ছোট ক'রে দূরে সরিয়ে রাখেন : সমকক্ষের সম্মান দেন না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাছ থেকে সর্বদা এক ধরণের নিশ্চিন্ত সংরক্ষণ পাওয়া যায়। অনেকটা বিরাট্ বটগাছের নীচে ব'সে থাকার মত। বটগাছ ক্লান্ত পথিককে নিজের চেয়ে অনেক ছোট ভাবে, কিন্তু ছায়া থেকে বঞ্চিত করে না ; দু'চারটে পাতা বা ছোট্ট ডাল ছিঁড়লে রাগেও না।

সুদর্শন দুবের কোনও বটচ্ছায়া নেই। তাঁর সঙ্গে থাকা মানে পচা দীঘির শ্যাওলা-পেছল ঘাটে দাঁড়ান। কখন পা পিছলে বোবা জলে পড়তে হবে তার ঠিক নেই।

মাধব দেশপাণ্ডে ভেবেছিলেন, সুদর্শন দুবের সঙ্গে তাল ঠুকে ঠিক শেষ মুহূর্তে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সঙ্গে একটা সুবিবেচিত বোঝাপড়া ক'রে নেবেন। আশা করেছিলেন, সঙ্কট থেকে ত্রাণ পাওয়ার জন্যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কিছু বেশি মূল্য দিতে রাজী হবেন মাধব দেশপাণ্ডের সমর্থনের।

কিন্তু এ সবই বানচাল হয়ে যাবে যদি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিনা যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার ক'রে নেন।

মাধব দেশপাণ্ডে ব'লে উঠলেন, "তা হয় না, কোশলজি। উদয়াচলের ভবিষ্যৎটা একবার ভেবে দেখবেন।"

"আমি সাড়ে পাঁচ বছর ভেবেছি মাধবভাই", ক্লান্ত সুরে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "এবার আপনারা সবাই ভাবুন। আপনারাও ভেবেছেন, এবার আরও বেশি ক'রে ভাববেন।"

"কোশলজি, আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।"

"বলুন।"

"আপনি ভেবে বসবেন না যে আমি অনিবার্যরূপে আপনার বিপক্ষে।"

"তা ত আমি কদাচ ভাবি নি, মাধবভাই! আজ মুখ্যমন্ত্রীরূপে আমাকে যদি আপনি না-ও চান, আপনি আমার একেবারে বিপক্ষে, এমন ত কোনও কারণ নেই! মাধবভাই, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলের একমাত্র পরিচয় উদয়াচলের মুখ্যমন্ত্রী নয়। তার আরও কিছু পরিচয় আছে। আমি জানি, আপনি আমার কবিতা পড়তে ভালবাসেন। 'কৃষ্ণলীলাকহানী'র আপনি উৎসাহী পাঠক। কবি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সঙ্গে আপনার কোনও বিরোধিতা নেই, তা কি আমি জানি নে?"

মাধব দেশপাণ্ডে হেসে উঠলেন। এঁর সঙ্গে কথা বলাও শ্রমসাধ্য।

"কবি হিসেবে আপনি অজাতশত্রু, কোশলজি। কিন্তু দলের নেতা হিসেবেও আপনি ভাববেন না আমি অনিবার্যরূপে আপনার বিপক্ষে। আপনি জানেন, নতুন দলপতি নির্বাচনে আমি আপনার প্রস্তাব সমর্থন করেছিলাম।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হঠাৎ এমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন, এমন চিন্তাকুল হ'ল তাঁর মুখচ্ছবি যে, তিনি যেন মাধব দেশপাণ্ডের কথাগুলি শুনতে পেলেন না।

কিছুক্ষণ অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা ঘরখানা জুড়ে রইল।

হঠাৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব'লে উঠলেন, "আপনার জন্যে আমার বড় দুশ্চিন্তা হচ্ছে, মাধবভাই।"

মাধব দেশপাণ্ডে চমকে গেলেন।

"দুশ্চিন্তা? আমার জন্যে? আপনার? কেন?"

"আজ আপনি বড়ই সুদর্শন দুবের সঙ্গে হাত মেলান না কেন, একথা আপনি ঠিক জানেন যে, আপনার সুনাম ও স্বার্থ বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টায় আমি ত্রুটি করি নি। আমার প্রটেক্শন না পেলে আপনার মন্ত্রিত্ব কেন, রাজনৈতিক নেতৃত্বও বহুদিন আগেই নষ্ট হয়ে যেত।"

মাধব দেশপাণ্ডে কিছু বলতে পারলেন না।

"কিন্তু আর বুঝি আপনাকে আমি রক্ষা করতে পারলাম না।"

"আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না, কোশলজি।"

মাধব দেশপাণ্ডের কণ্ঠস্বরে এবার প্রচ্ছন্ন শঙ্কা।

"দলপতি নির্বাচিত হই আর না হই, সহকর্মীদের প্রতি দলনেতার দায়িত্ব শেষদিন পর্যন্ত পালন ক'রে যাব ভেবে খানিকটা তৃপ্তি পাচ্ছিলাম। কিন্তু বিধাতা সে তৃপ্তি থেকে আমায় বঞ্চিত করছেন।"

মাধব দেশপাণ্ডে অস্থির হয়ে উঠলেন।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "আজ, একটু পরে, ক্যাবিনেট মিটিং-এ গোবর্ধন বাঁধের ব্রীজ দুটোর ব্যাপার আলোচিত হচ্ছে।"

"জানি।"

"হরিশংকর ত্রিপাঠী হনুমান নেশন বিল্ডিং কোম্পানীকে ব্রীজের কন্ট্রাক্ট দিতে আপত্তি তুলেছেন।"

"তাতে আমি অবাক হচ্ছি নে।"

"দুর্গাভাইও বিরুদ্ধে।"

"হওয়াই স্বাভাবিক।"

"মন্ত্রীসভার বর্তমান অবস্থায় হনুমানকে কন্ট্রাক্ট দেবার প্রস্তাব আমি সমর্থন করতে চাই নে।"

"বেশ ত। ওটা বর্তমানে স্থগিত রাখাই সমীচীন হবে।"

"এদিকে একটা গুরুতর ঘটনা ঘটে গেছে!"

মাধব দেশপাণ্ডেকে অস্থির প্রতীক্ষায় রেখে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দু'মিনিট গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন।

তার পর বললেন, "একটু খুলে বলি ব্যাপারটা আপনাকে। উদয়াচলের মুখ্যমন্ত্রী আমি; প্রদেশের সর্বত্র কি হচ্ছে না হচ্ছে আমার জানা দরকার। প্রায় সবাই জানে, আমার একটা নিজস্ব খবর বিভাগ আছে। অফিসাররা কে কোথায় কবে কি করছে, সব খবর আমি পাই। ধরুন, আমি জানি, রত্নগড়ের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ীতে গতকাল জেলা কংগ্রেসের সভাপতি জীওনলাল গুপ্ত উপস্থিত হয়েছিলেন একটা গোপন সংবাদের জন্যে; ম্যাজিস্ট্রেট সে সংবাদ তাঁকে দিয়েছে। জীওনলাল, আপনি জানেন, সুদর্শন দুবের লোক। আমি জানি রাধানগরের পুলিশ-সুপার পরশু দিন দু' হাজার টাকা ঘুষ নিয়েছে এক মদের ব্যবসায়ীর কাছ থেকে; ব্যবসায়ীর নামও আমি জানি।"

মাধব দেশপাণ্ডের চোখে পলক পড়ল না।

"সব সময় এ সব সংবাদ আমি ব্যবহার করি নে।

দরকার হ'লে করি। আমার মন্ত্রীসভার সহকর্মীদের সম্বন্ধেও অনেক খবর আমি জানি। সত্যি কথা বলতে কি, তাঁদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে আমার এক-একটি গোপন ফাইল আছে।"

"বলেন কি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার ফাইলটা গতকাল চুরি হয়ে গেছে!"

মাধব দেশপাণ্ডে আঁৎকে উঠলেন।

"অ্যাঁ! সর্বনাশ!"

"সর্বনাশই বটে, মাধবভাই। ওতে অনেক কিছু ছিল। কেবল টিউবওয়েল ব্যাপারের নথিপত্র নয়, গোবর্ধন বাঁধেরও অনেক কাগজপত্র। আপনার নিজের হাতে লেখা চারখানা চিঠিও। যে-চিঠিখানা আপনি বোম্বাই-এর ব্যবসায়ী এস. আর. সোমানীকে লিখেছিলেন, সেটাও।"

"কোশলজি—"

"শুধু চুরি যায় নি। গত রাত্রে জানতে পেরেছি সে ফাইলটা সুদর্শন দুবের কাছে পৌঁছেছে। কে চুরি করেছে তাও আমার অজানা নেই।"

"কোশলজি—"

মাধব দেশপাণ্ডের আর্তস্বরকে বিদ্রূপ ক'রে টেলিফোন বাজল।

"কোশল।"

"সব ব্যবস্থা ঠিক আছে ত?"

"কে?"

"এসে গেছেন? আচ্ছা, আমি নীচে নামছি।"

মাধব দেশপাণ্ডের পিঠে হাত রেখে কৃষ্ণবৈপায়ন বললেন, "ক্যাবিনেট মিটিং-এর সময় হয়েছে। আপনি ক্যাবিনেট-রুমে গিয়ে বসুন। দুর্গাভাই এসে গেছেন। আমি নীচে যাচ্ছি।"

নয়

চার ভাই-এ একত্র হয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল। স্থান— অম্বিকাপ্রসাদের বসবার ঘর। আসবাবপত্র বিশেষ নেই। বড় একটা সেগুনকাঠের টেবিল, আধ-ময়লা কাপড়ে ঢাকা; টেবিলে খানকয়েক আইনের বই, দোয়াত-কলম, দু'খানা অভিধান। খান চারেক চেয়ার। দুটো পুরাতন আলমারি; আইনের বই-এ ভর্তি। একপাশে একখানা পালঙ্ক। নীল রং-এর ডোরা-কাটা বেড-কভারে ঢাকা।

অম্বিকাপ্রসাদ খাটের ওপর বসেছিল। কৃশাঙ্গ, রোগাটে চেহারা। মাথায় বড় বড় চুল। রং ফর্সা না হলেও কালো নয়। বড় একজোড়া গোঁফ অম্বিকাপ্রসাদের তাজ-মানুষ মুখখানায় কেমন একটা নির্বোধের বিশেষণ যোগ করেছে। অম্বিকাপ্রসাদ এমনিতেই কথা বলে কম; সর্বদা যেন এক বিড়ম্বিত ভাব।

টেবিলের সঙ্গে যে চেয়ার তাতে বসেছে সূর্যপ্রসাদ। সেও দীর্ঘাকৃতি, চওড়া কপাল, রং বেশ ফর্সা, দেহে কিঞ্চিৎ মাংসের প্রাচুর্য। সূর্যপ্রসাদ এম. এল. এ; অতএব, নিজের মর্যাদা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন। মুখ্যমন্ত্রী পিতার, বলতে গেলে, সে-ই রাজনৈতিক বংশধর। বি. এ. পর্যন্ত পড়েছিল; ছাত্রকালেই রাজনীতিতে হাতেখড়ি। ছাত্র-কংগ্রেসের নেতা হিসেবে স্বাধীনতার আগে একবার বছরখানেক জেল খেটে স্নাতঃকোত্তর।

জানলার পাশে চেয়ারে বসেছে শ্যামাপ্রসাদ। বেঁটে-খাটো মোটা-সোটা, রং শ্যামবর্ণ। ম্যাট্রিক পাস ক'রে আর কলেজে যায় নি। চিরদিন ব্যবসায়ে ঝোঁক। প্রথম কয়েক মাস কনট্রাক্টারী করার পর বেঙ্গল পেপার মিলস্-এর উদয়াচলের সোল এজেন্সী পেয়েছিল। বছরখানেক পরে সেটা হাতছাড়া হয়ে যায়। তখন থেকে কাপড়ের ব্যবসা। এ ব্যবসায় সে সার্থকতা অর্জন করেছে। বিলাসপুরে তার পাইকারী ব্যবসা; কুম্ভাণপুরেও। রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ নেই। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর পুত্র, রাজনীতি সম্পূর্ণ এড়াতে পারে না। ব্যবসায়ী-মহলে এ জন্যে তার প্রতিপত্তি কম নয়।

দরজার কাছে চেয়ারে পা রেখে কপাটে দেহ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে চন্দ্রপ্রসাদ।

সূর্যপ্রসাদ রাজনৈতিক পরিস্থিতির শেষতম অবস্থার ব্যাখ্যা শোনাচ্ছিল তিন ভাইকে।

"পিতাজি বড় বেশি আশাবাদী হয়ে রয়েছেন," বলছিল সূর্যপ্রসাদ। "অবস্থা যে কতটা সঙ্গীন হয় তিনি জানেন না, নয় জেনেও মানতে চান না।"

"তুমি তাঁর সঙ্গে ক'বার কতক্ষণ আলোচনা করেছ?"— প্রশ্ন করল চন্দ্রপ্রসাদ।

"আমি তোমার মত মুর্খ নই। আলোচনার দরকার হয় না। আমি জানি ব'লেই বলছি।"

চন্দ্রপ্রসাদ বলল, "তুমি কি ক'রে জান পিতাজি অকারণ আশাবাদী হয়ে রয়েছেন?"

সূর্যপ্রসাদ বিরক্ত হয়ে জবাব দিল, "আমি জানি।"

অম্বিকাপ্রসাদ বলল, "রাজনৈতিক নেতৃত্ব নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে এ ধরণের লড়াই অত্যন্ত ক্ষতিকর। যেই জিতুন, কংগ্রেস দুর্বল হয়ে পড়বে।"

চন্দ্রপ্রসাদ বলল, "লড়াই ছাড়া পথ কোথায়, বল?"

অম্বিকাপ্রসাদ বলল, "কেন? সবাই মিলে আপোস ক'রে নিলেই ত সব চুকে যায়! এতদিন আপোস চলল, আর এখন চলবে না?"

সূর্যপ্রসাদ বলল, "কে. ডি. কোশল কখনও আপোস করেন না অন্যায়ের সঙ্গে, বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গে।"

চন্দ্রপ্রসাদ বলল, "ঠিক বলেছ। ঠিক এম. এল. এ-র মত বলেছ।"

সূর্যপ্রসাদ ধমক দিয়ে বলল, "তুমি চুপ কর।"

"আমি চুপ করলে কি হবে? এদিকে তোমার অবস্থা ভেবে দেখেছ?"

"আমার আবার কি অবস্থা?"

"পিতাজি হেরে গেলে তোমার কি হবে?"

"কেন? আমি কি পিতাজির ওপর নির্ভর ক'রে আছি। আমি নিজের নেতৃত্বে বিধান সভায় ঢুকেছি।"

"শুনতে ভাল লাগছে। বছর না ঘুরতে নির্বাচন, জান ত?"

"তোমার চেয়ে বেশি জানি।"

"তা নিশ্চয় জান। শুধু জান না, তোমার আর বিন্দুমাত্র চান্স নেই। পিতাজি হারলে, তুমিও ডুববে।"

শ্যামাপ্রসাদ বললে, "এসব ইয়ার্কি থাক। পিতাজি হারলে আমাদের সবারই ভয়ানক ক্ষতি হবে। সূর্যপ্রসাদ, অবস্থা তুমি ভাল দেখছ না, এই ত?"

"না।"

"কেন বলতে পার?"

"সব কিছু নির্ভর করছে দুর্গাভাইজির ওপর। তিনি যদি দুবেজির সঙ্গে দাঁড়ান, পিতাজির পরাজয় নিশ্চিত।"

"দাঁড়াবেন মনে হচ্ছে?"

"দুর্গাভাইজির ওপর নানারকম চাপ পড়ছে। সবচেয়ে বড় চাপ তাঁর গৃহেই।"

অম্বিকাপ্রসাদ বলল, "গৃহে মানে?"

সূর্যপ্রসাদ জবাব দিলে, "তুমি যেমন দিনরাত চাপ খাচ্ছ, তেমনি।"

শ্যামাপ্রসাদ বলল, "ব্যবসায়ী-মহল কিন্তু পিতাজিকেই চায়।"

চন্দ্রপ্রসাদ যোগ দিল, "সেটা তেমন জোর গলায় বলার মত নয়।"

শ্যামাপ্রসাদ বলল, "নয় কেন? নির্বাচনের টাকা পাবে কোথায় কংগ্রেস?"

চন্দ্রপ্রসাদ উত্তর দিল, "জনম পর্দার আড়ালে।"

"তা হোক," শ্যামাপ্রসাদ বলল, "হাই কমাণ্ড এত নির্বোধ নয় যে, যে-গরু দুধ দেয় তাকেই জবাই করবে। হাই কমাণ্ডকে ভাবতেই হবে উদয়াচলের স্থিতিশীল অগ্রগতির কথা। পিতাজির নেতৃত্বে প্রদেশে আজ পর্যন্ত কোনও বড় রকমের গোলমাল হয় নি। ব্যবসা-বাণিজ্য বেশ ভালই চলেছে। আর্থিক উন্নতিও মন্দ হয় নি। গভর্ণমেণ্ট সবল ও স্থিতিশীল, এ বিশ্বাস ব্যবসায়ী-মহলে উন্নতির অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে। এসব কথা হাই কমাণ্ড নিশ্চয় ভাববেন।"

চন্দ্রপ্রসাদ বলল, "তুমি চেম্বার অব কমার্স থেকে আগামী নির্বাচনে প্রার্থী হও না কেন?"

সূর্যপ্রসাদ বলল, "পরিহারজি দিল্লী থেকে কি খবর দিয়েছে জান?"

অম্বিকাপ্রসাদ প্রশ্ন করল, "কি?"

"হাই কমাণ্ড দোটানায় পড়েছেন। টিউবওয়েল এবং গোবর্ধন বাঁধের ব্যাপারে পিতাজির সুনাম অনেকখানি নষ্ট হয়েছে। তথাপি হাই কমাণ্ডের ইচ্ছে, পিতাজিই দলের নেতৃত্ব করুন। কিন্তু দুর্গাভাইজি যদি নেতৃত্ব করতে রাজী হন, তা হ'লে হাই কমাণ্ড তাঁর হাতে খুশী হয়ে নতুন মন্ত্রীসভার ভার দেবেন। হাই কমাণ্ড চান না দুবেজি কিংবা ত্রিপাঠিজি দলের নেতা হোন।"

চন্দ্রপ্রসাদ প্রশ্ন করল, "এত বড় মৌলিক খবরটা তুমি পেলে কোথায়?"

"যেখানেই পেয়ে থাকি, তাতে তোমার কি?"

"তুমি কি পিতাজির ওপর গোয়েন্দাগিরি কর?"

"চন্দ্রপ্রসাদ, তোমার বড় বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।"

"রাগছ কেন? তুমিও জান, আমিও জানি, পরিহারজির রিপোর্ট জানেন একটিমাত্র লোক, তাঁর নাম কে. ডি. কোশল। হয় তুমি টেলিফোনে কথাবার্তা 'ট্যাপ' করেছ, নয়ত টেলিগ্রাম চুরি ক'রে পড়েছ।"

"মোটেই না।"

"এবার তুমি সত্যি বলছ। আমিও জানি তুমি টেলিফোনও 'ট্যাপ' কর নি, টেলিগ্রামও চুরি ক'রে পড় নি।"

অম্বিকাপ্রসাদ জিজ্ঞেস করল, "তা হ'লে ও জানল কি ক'রে?"

"বড়েভাই, ওটা সূর্যপ্রসাদের অনুমান মাত্র। খুব সহজ অনুমান। ও আমিও বলতে পারতাম।"

সূর্যপ্রসাদ চটে গেল।

"তোমার সঙ্গে কথা বলাই বোকামি। সারাদিন টো

টো ক'রে ঘুরে বেড়াও আর বাপের পয়সায় ষ্টাইল কর। কোনও কর্মের নও তুমি।"

"একথ' স্বীকার মানি। কিন্তু তুমি তোমার কাজটি করেছ ?"

"কি কাজ ?"

"পিতাজির সেই 'মিসিং থার্ড ম্যান্' ? তাঁর খোঁজ পেয়েছ ?"

সূর্যপ্রসাদ চুপ ক'রে গেল।

"অর্থাৎ পিতাজির এই সঙ্কটে একটি মাত্র কাজ তিনি তোমায় করতে বলেছিলেন। তুমি করতে পার নি।"

"আর তুমি ?"

"আমার কাজ আমি ঠিক ক'রে যাচ্ছি।"

"যথা ?"

"টো টো ক'রে ঘোরা আর বাপের পয়সায় ষ্টাইল করা।"

অম্বিকাপ্রসাদ বললেন, "এ ব্যাপারে সরোজিনী সহায়ের স্থান কোথায় আমি বুঝতে পারছি না।"

সূর্যপ্রসাদ বলল, "আপনি তাকে দেখেছেন ?"

"না।"

"বহুৎ খুবসুরৎ।"

"তার আগমন হ'ল কোথেকে ?"

"যে নাটক উদয়াচলের রঙ্গমঞ্চে আজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তার একমাত্র নায়িকা সরোজিনী সহায়।"

শ্যামাপ্রসাদ বলল, "পিতাজি অনেক আগেই এ বিষবৃক্ষ উপড়ে দিতে পারতেন। কেন যে করেন নি বুঝতে পারি নে।"

সূর্যপ্রসাদ বলল, "সরোজিনী সহায়কে উপড়ে দেওয়া সহজ নয়। দেখবেন, সে এক বছর পরে অন্ততঃ উপমন্ত্রী হবে।"

"অসম্ভব। পিতাজি মুখ্যমন্ত্রী থাকতে নয়।"

"দেখবেন আপনি।"

অম্বিকাপ্রসাদ প্রশ্ন করল, "তুমি বলছ পিতাজি সরোজিনী সহায়কে মন্ত্রীসভায় নেবেন।"

"আমার ত তাই ধারণা।"

"হ'তেই পারে না", বলল শ্যামাপ্রসাদ।

সূর্যপ্রসাদ বিজ্ঞের মত মন্তব্য করল, "রাজনীতিতে সব হয়।"

আপিস-বাড়ীতে ক্যাবিনেট মিটিং শেষ হয়েছে। মন্ত্রীরা একে একে বিদায় নিচ্ছেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সহকর্মীদের এগিয়ে দিতে নীচে নেমে এসেছেন।

বেশির ভাগ মন্ত্রীদেরই মুখ গম্ভীর। কেউ কেউ পরস্পরের সঙ্গে হেসে কথা বলছেন। কিন্তু সে হাসি নিষ্প্রাণ।

এর মধ্যে রসিকতা যা একটু করছেন সে কেবল কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

দুর্গাভাইকে বলছেন, "দুর্গাভাইজি, রাত্রে সুনিদ্রা হচ্ছে ত ? মৃত মন্ত্রীসভার ভূত দেখে ভয় পাচ্ছেন না ত ?"

হরিশংকর ত্রিপাঠীকে : "ত্রিপাঠীজি, আগামী রবিবারে তাস খেলতে আসুন। আমার ত চাকরি থাকবে না! বেকার সময় নিয়ে কি করব ভেবে পাচ্ছি না।"

মহেন্দ্র বাজপাঈকে : "মহেন্দ্রভাই-এর মুখে একটা জ্যোতি দেখতে পাচ্ছি। এই বয়সে আবার প্রেমে পড়ছেন নাকি ?"

মাধব দেশপাণ্ডেকে : "রাত্রে এক গ্লাস সিদ্ধি পান করুন। সুনিদ্রা হবে।"

একতলায় সাংবাদিকগণ সমবেত হয়েছিলেন। তাঁদের কাছে উপনীত হ'তেই তাঁরা এসে ঘিরে দাঁড়ালেন।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হেসে বললেন, "তদা নাশংসে বিজয়ায়, সঞ্জয়।"

প্রশ্ন হ'ল : "আপনারা আজ কি কি সিদ্ধান্ত করলেন আমাদের বলবেন কি ?"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "ভদ্রমহোদয়গণ, ক্যাবিনেট ঠিক করেছেন যে, আগামী শুক্রবার বিধান সভায় কংগ্রেসী দল নতুন নেতা নির্বাচন করবেন। এ প্রস্তাব দলের কার্যকরী সমিতির অনুমোদন-সাপেক্ষ।"

"কার্যকরী সমিতির সভা কবে হবে ?"

"কাল সকালে।"

"নেতৃপদের প্রার্থী কে কে ?"

"এ প্রশ্নের জবাব আমি একা দিতে পারব না।"

"আপনি নিশ্চয় পুনর্নির্বাচন চাইবেন ?"

"সাত দিনে অনেক কিছু হ'তে পারে। এ প্রশ্নের জবাব আজ দেওয়া সম্ভব নয়।"

"প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে কি ?"

"একাধিক প্রার্থী থাকলে, হওয়াই সম্ভব।"

"একাধিক প্রার্থী থাকাটাই সম্ভব কি ?"

"এ প্রশ্নের জবাব এখন দেওয়া সম্ভব নয়।"

সাংবাদিকদের সবাইকে উদ্দেশ ক'রে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আরও বললেন, "দলপতি যেই কোন না কেন, কংগ্রেসের ঐক্য, শক্তি ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে। কংগ্রেস একই ভাবে, পূর্ণ সংহতি ও আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে, দেশ-গঠনের দায়িত্ব পালন করবে, দেশের সেবা করবে। একথা

আমাদের মধ্যে একজনও মুহূর্তের তরে ভুলে যান নি যে, ব্যক্তির চেয়ে কংগ্রেস বড়, কংগ্রেসের চেয়ে দেশ বড়।"

চার ভাই নীচে নেমে এসে মন্ত্রীদের প্রস্থান দেখছিল। মন্ত্রীরা বিদায় নিলে তারাও যে-যার কাজে বার হ'ল। অম্বিকাপ্রসাদ গায়ে খদ্দরের কুর্তা চাপিয়ে মুখে পান গুঁজে পথে নিষ্ক্রান্ত হ'ল। ফাটকের কাছে ড্রাইভার নানক সিং প্রশ্ন করল, "গাড়ি চাই হুজুর?"

অম্বিকাপ্রসাদ বলল, "না, চাই নে।"

কিছু দূরে গিয়ে সে সাইকেল রিক্শা থামিয়ে চেপে বসল।

শ্যামাপ্রসাদের নিজস্ব গাড়ি আছে। গাড়িতে বসবার আগে একবার সে তিওয়ারীর খোঁজ করল। শুনল, সে কোথায় কোন্ জরুরী কাজে গেছে, কখন ফিরবে ঠিক নেই। অন্দরে গিয়ে তিওয়ারীর নামে এক চিরকুট লিখে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের খাস বেয়ারার হাতে দিল।

"বড় জরুরী। তিওয়ারীজি এলেই তাঁর হাতে দেবে।"

"বহুৎ আচ্ছা, হুজুর।"

"পিতাজি এখন আহারে বসবেন?"

"খাস মহলে খেতে যাবেন, হুজুর।"

"এখানে ব'সে খাবেন না, ঘরে গিয়ে খাবেন?"

"জি, হুজুর।"

শ্যামাপ্রসাদ অবাক্ হ'ল।

গাড়িতে ষ্টার্ট দেবার সময় নজর পড়ল চন্দ্রপ্রসাদের দিকে। সে সিঁড়ি বেয়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের খাস দপ্তরে যাচ্ছে।

মুচ্‌কি হেসে আপন মনে শ্যামাপ্রসাদ বলল, "কোলের ছেলে।"

সূর্যপ্রসাদ এমন স্থান বেছে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, ফাটকে মন্ত্রীদের বিদায় দিয়ে ফিরবার সময় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাকে দেখতে পান।

এই সঙ্কটে বাপের আস্থাভাজন, নিকট-বন্ধু হবার বড় ইচ্ছে তার। সে চায় পিতার জন্তে কিছু করতে, সংগ্রামে অন্ততঃ ছোট সেনাপতির ভূমিকা পেতে।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাকে দেখলেন। চিন্তিত মুখের একটি রেখাও বদলাল না। মন্থর পদক্ষেপে তিনি দপ্তর-বাড়ীর দিকে এগিয়ে চললেন।

সূর্যপ্রসাদ তাঁকে ডাকতে গেল। গলায় স্বর বেরুল না। তাঁর দিকে এগোতে গেল। পা সরল না।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দপ্তর-ঘরে পৌঁছলে সূর্যপ্রসাদ হাঁকল: "নানক সিং!"

নানক সিং কাছে এসে দাঁড়াতে:

"আমাকে একটু পৌঁছে দিতে পারবে?"

"নিশ্চয়, হুজুর।"

"পিতাজির গাড়ি দরকার আছে?"

"এখন দরকার নেই, হুজুর।"

"তবে চল।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নিজের ঘরে ঢোকবার সময় দেখলেন, দরজায় দাঁড়িয়ে চন্দ্রপ্রসাদ।

মুখে হাসি খেলল।

"কি রাজকুমার? খবর কি?"

"আপনাকে একটু দেখতে এলাম, পিতাজি।"

"দেখতে এলে? এস। বস।"

"জয়ের কতটুকু বাকী, পিতাজি?"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হেসে বললেন, "অনেক।"

"বিশ্বাস হয় না, পিতাজি।"

"তোমার ধারণা, আমি জিতে গেছি?"

"আমি আপনাকে একটু চিনি, পিতাজি।"

"চন্দ্রপ্রসাদ, তোমার বাজারে দেনা কত?"

"এক পয়সাও নয়।"

"দোকানদাররা কত পাবে তোমার কাছে?"

"এক পয়সাও নয়, পিতাজি। আমার সব কিছু আপনার নামে।"

আবার হেসে ফেললেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

"একটা কাজ করবে।"

"বলুন।"

"দোকানদারদের সব টাকা আজই শোধ দিয়ে দেবে।"

"নিশ্চয়।"

"কত চাই?"

"শ'খানেক হ'লেই যথেষ্ট। হাতে কিছু থাকবে।"

"তিওয়ারীকে ব'লো টাকার কথা।"

"বলব।"

"তারপর, তুমি কিছু করবে? না, এমনি করেই কাটবে?"

"একটা প্রকল্প মাথায় এসেছে, পিতাজি।"

"কিসের প্রকল্প?"

"মন্ত্রীদের পুত্রদের নিয়ে একটা জোটাজুটি করব।

দেব, টাইগার্স ক্লাব। মুখ্যমন্ত্রীর পুত্র হিসেবে আমি হব তার সভাপতি।"

"টাইগার্স ক্লাব? কেন? মন্ত্রী-পুত্রদের দিয়ে দেশের কি কোনও কাজ হবে?"

"পিতাজি, দেশের কাজ ছাড়া কি আর কোনও কাজ নেই? আমি জীবনে দেশের কাজ করব না। যদি কখনও কিছু করি, নিজের কাজ করব। ভাল থাকব, খাব, পরব, আনন্দ করব।"

"মন্ত্রীপুত্রদের একজোট হবার কারণটা ত বললে না।"

"পিতাজি, আমাদের মত অত্যাচারিত, উৎপীড়িত আর কেউ নেই। দেখুন না কেন আমাদের অবস্থাটা একটু ভেবে? মন্ত্রীপুত্র হবার অপরাধ আমাদের নয়, মন্ত্রীদের। মন্ত্রী হবার আগে কোনও পিতা পুত্রদের মতামত চেয়েছেন, আজ পর্যন্ত শোনা যায় নি। মন্ত্রীপুত্র ব'লে আমাদের যে স্বকীয় কোনও মান-মর্যাদা আছে, যোগ্যতা আছে তা কেউ স্বীকার করে না। আমাদের যা-কিছু সব পিতার গৌরবের ম্লান ছায়া মাত্র। দুর্গাভাইজির পুত্র সবটুকু যোগ্যতা সত্ত্বেও উদয়াচলে চাকরি করতে ভয় পায়, কারণ তার বাপ ভাবেন মন্ত্রীপুত্র ব'লে সবাই তাকে 'ফেভর' করবে। আমাদের স্বতন্ত্রভাবে কিছু করবার উপায় নেই, পিতাজি। আমরা কারুর কাছে 'ফেভর' না চাইলেও পেয়ে থাকি, তাতে আমাদের মনুষ্যত্বের অপমান হয়। 'ফেভর' না করলেও লোকে ধরে নেয় আমরা পেয়েছি, পাওয়াটাই রীতি, নিয়ম। অতএব, ভেবে দেখুন, আমাদের কি দুরবস্থা! মন্ত্রীপুত্রদের একটা ট্রেড-ইউনিয়ন না হ'লে আর উপায় নেই।"

চন্দ্রপ্রসাদের কথা কৌতুকভরে শুনছিলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। দিনের পর দিন বিস্বাদ রাজনীতির বিবর্ণ মাদকতায় অন্তর কেমন যেন নিজের অজ্ঞাতে হাঁপিয়ে উঠেছিল।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "শীঘ্রই নিজের যোগ্যতায় ক'রে খাবার দিন তোমার আসবে, চন্দ্রপ্রসাদ।"

"মনে হয় না, পিতাজি। প্রথমতঃ, আপনি হারবেন না। মুখ্যমন্ত্রিত্বের বন্ধন থেকে আপনার মুক্তি নেই।"

"কথাটা যেন দুঃখের সঙ্গে বলছ!"

"দুঃখ? চন্দ্রপ্রসাদ ত অমানুষ, পিতাজি! তার আবার দুঃখ কিসের। দুঃখ তারও নেই, তার পিতা কৃষ্ণদ্বৈপায়নেরও নেই।"

একখণ্ড কালো মেঘের ছায়া পড়ল কৃষ্ণদ্বৈপায়নের গৌরবর্ণ মুখে।

একটু থেমে চন্দ্রপ্রসাদ বলল, "আর, যদি-বা আপনি হারেন, পিতাজি, তথাপি শৃঙ্খল আপনার কাটবে না।"

"অর্থাৎ—"

"আপনি মুখ্যমন্ত্রী না হয়ে রাজ্যপাল হবেন। কিংবা কেন্দ্রে আপনার মন্ত্রিত্বের তলব আসবে। কিংবা আর কিছু হবেন।"

"অর্থাৎ বনবাস আমার জীবনে নেই।"

"না, পিতাজি; সে সৌভাগ্য আপনার হবে ব'লে মনে করি না।"

"হ'লে তুমি খুশী হও?"

"আমার কথা ছেড়ে দিন, পিতাজি। তবে একজন নিশ্চয় খুব খুশী হন।"

দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন।

চন্দ্রপ্রসাদ আবার বলল, "একটা কথা বুঝতে পারি নে পিতাজি। আমাদের দেশে মন্ত্রীরা অবসর নেন না কেন?"

"নতুন স্বাধীনতার দায়িত্ব যত বেশী, কর্তব্য যত বেশী, তত যোগ্য লোক নেই ব'লে।"

"নিশ্চয় তাই। কিন্তু মন মানতে চায় না।"

"কেন?"

"আপনি অবসর নিলে উদয়াচলের ক্ষতি হবে, জানি। কিন্তু তার কারণ এই নয় যে, নতুন নেতার অভাব। তার কারণ, আপনার স্থান অধিকার করবে দুবেজি বা ত্রিপাঠীজির মত অযোগ্য লোক।"

"তাঁরা ত নতুন নেতা-ই হবেন।"

"কিন্তু তাঁরা ত নতুন নন, পিতাজি। তাঁরা পুরাতনের মধ্যে নিকৃষ্ট। নতুন মানুষ, নতুন নেতা আপনারা তৈরী করতে পারছেন না, অথবা ইচ্ছে ক'রে তৈরী হ'তে দিচ্ছেন না।"

"নতুন নেতা মানে ত তোমার ভাই সূর্যপ্রসাদ।"

"সূর্যপ্রসাদ খুব খারাপ মাল নয়, পিতাজি।"

"নতুন আদর্শবান্ কর্মক্ষম শিক্ষিত যুবক কংগ্রেসে আসছে কোথায় বল?"

"হয়ত সেও আপনাদের ব্যর্থতা। বাণীর চেয়ে দৃষ্টান্ত বড় পিতাজি।"

"তুমি এসব কথা ভাব নাকি, চন্দ্রপ্রসাদ?"

"অপরাধ নেবেন না, পিতাজি। আমাদের পাঁচ ভাই-এর মধ্যে একমাত্র একজনকে আপনি মানুষ ব'লে মনে করতেন। তাকে আপনি ত্যাগ করেছেন।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়নের দুই চোখের কোটরে ব্যথা জমে উঠল।

"বাকী কাউকে আপনি মানুষের মর্যাদা দেন নি, পিতাজি। তাঁদের জীবনে দাঁড় করিয়ে দিতে চেয়েছেন, কিন্তু সে পিতার কর্তব্যে, পুত্রের প্রতি অনতিক্রমণীয় স্নেহে, মানুষের সম্মানে নয়।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কপালে বিস্ময়ের কুঞ্চন দেখা গেল।

"ভাবছেন, পিতাজি, আমার মত অপদার্থ এত সব জানল কি ক'রে? আপনি আপনার সন্তানদের যতটা জানেন, আমি আপনাকে তার বেশী জানি।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ওষ্ঠাধরে বাঁকা হাসি খেলে গেল।

"বড়ে ভাইয়াকে আপনি ল' কলেজের লেক্‌চারার ক'রে দিয়েছেন। যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও। অথচ একবারও ভেবে দেখেন নি. কি ভয়ানক আত্ম-অবমাননার মধ্য দিয়ে বছরের পর বছর তিনি কাটাচ্ছেন। ক্লাসের ছাত্ররা তাঁর লেক্‌চার শোনে না, তাঁকে শুনিয়েই বলে 'মুখ্যমন্ত্রীর ছেলে হ'লেই অধ্যাপনা করা যায় না।' কলেজের অধ্যাপকরা তাঁকে তাচ্ছিল্যের চোখে দেখে; সামনা-সামনি যে অতিরিক্ত খাতির দেখায় তার মধ্যেও অসম্মানের জ্বালা। হাইকোর্টে প্র্যাক্‌টিস্ করা তাঁর ইচ্ছে ছিল না, আপনিই তাঁকে জোর ক'রে অ্যাডভোকেট করেছেন। কেস যা সে পায় তাও আপনার খাতিরে, নিজের যোগ্যতায় নয়। যারা ভয়ে আপনাকে উপঢৌকন দিতে পারে না, তারা পয়সা দেয় অম্বিকাপ্রসাদ কোশলকে. বেশী লাভের ব্যবস্থা ক'রে দেয় শ্যামাপ্রসাদ কোশলের। নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রতি শ্রদ্ধা যদি আপনার থাকত, পিতাজি, জীবনের পদে পদে এত অসম্মান তাঁকে আপনি কুড়োতে দিতেন না।"

বিস্ময়ে স্তব্ধ হলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। খানিক পরে প্রশ্ন করলেন, "এ অনুভূতি তোমার, না তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার?"

"আমার। কিন্তু পিতাজি, এটুকু আমি জানি, বড়ে ভাইয়া সুখী নন, মনে তাঁর শান্তি নেই।"

"আর শ্যামাপ্রসাদ?"

"আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান্। আপনি তাঁকে ব্যবসায়ে সরাসরি সাহায্য করেন না, কিন্তু আপনার নাম ও মর্যাদার পূর্ণ সদ্ব্যবহার সে করেছে। করেছে, যতদিন পারে করবে। ব্যবসায়ী মহলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে সে আপনাকে বেশ একটু সাহায্যও করে। কিন্তু পিতাজি, কোশল বংশের সন্তান হয়ে শ্যামাপ্রসাদ যে ব্যবসা করছে, কোনমতে ধনী হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ক'রে নিয়েছে, এ জন্যে আপনি তাকে শ্রদ্ধা করেন না, মনে মনে তাচ্ছিল্য করেন।"

"তুমি একথা বুঝলে কেমন ক'রে?"

"আমি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সন্তান, পিতাজি।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আস্তে বললেন, "তাই ত দেখছি।"

"সূর্যপ্রসাদের কথা ত জিজ্ঞেস করলেন না, পিতাজি?"

"করি নি বুঝি?"

"সূর্যপ্রসাদ আপনার রাজনৈতিক বংশধর।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নাসিকায় কুঞ্চন দেখা দিল।

"সত্যিই তাই, পিতাজি। দুর্গাপ্রসাদ আপনার রাজনৈতিক শত্রু। বড়ে ভাই ও শ্যামাপ্রসাদ রাজনীতির বাইরে। আমি ত কিছুই না। একমাত্র সূর্যপ্রসাদই কংগ্রেসের অন্যতম তরুণ নেতা। তাকে আপনি বিধান সভার সদস্য বানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর ছেলে এবং কংগ্রেসী এম. এল. এ. হিসেবে উদয়াচলে সে একজন উল্লেখযোগ্য মানুষ।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে বললেন, "তা বটে।"

"তার হয়ে একটা প্রার্থনা আছে, পিতাজি।"

"প্রার্থনা?"

"তাকে একটু কাছে ডাকবেন। এ সঙ্কটে সে আপনার কাছে আসতে চায়। আপনার জন্যে কিছু একটু করতে চায়। সে চায় আপনার আস্থা, আপনার বিশ্বাস।"

"তার কোনও যোগ্যতা নেই।"

"তবু—"

"তুমি জান, সে কি করেছে?"

"জানি।"

"তবে?"

"অমন কঠিন বিচার করবেন না, পিতাজি। সূর্যপ্রসাদ কৃষ্ণদ্বৈপায়নের পুত্র হ'লেও সে-ই তার একমাত্র পরিচয়-পত্র নয়। আপনি হারলেও তাকে বাঁচতে হবে। বছর পরে নির্বাচন। সে যদি টিকেট না পায় তবে তার ভবিষ্যৎ কি বলুন?"

"তাই ব'লে সে আমার বিরুদ্ধে, আমাকে গোপন ক'রে, দুর্গাভাই-এর সঙ্গে সম্পর্ক গ'ড়ে তুলছে!"

"উপায় কি বলুন, পিতাজি? আপনি এই সংগ্রামে তাকে কাছে ডেকে আপনার পার্শ্বচর ক'রে নেন নি। আপনার কাছে সে পুত্রের প্রাপ্য দাক্ষিণ্য পেয়েছে, সহকর্মীর মর্যাদা পায় নি। আপনার সামনে দাঁড়িয়ে কোনও দিন নিজেকে মানুষ ব'লে ভাবতে তার সাহস হয় নি। সে জানে, যদি আপনি হারেন, সুদর্শন দুবে তার ওপরেও প্রচণ্ড প্রতিশোধ নেবেন। যদি আপনি জেতেন, তথাপি তার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত নয়। সম্ভব হ'লে আপনি তাকে টিকেট পাইয়ে দেবেন; প্রয়োজন হ'লে আপনি তাকে বিসর্জন দেবেন। সুতরাং তার পক্ষে অন্য পথের সন্ধান করা ত অমার্জনীয় অপরাধ নয়, পিতাজি। তা ছাড়া, সূর্যপ্রসাদ দুবেজি কিংবা ত্রিপাঠীজির কাছে যায় নি; গেছে দুর্গাভাইজির কাছে।"

"হুঁম্। তোমাকে সে এ সব কথা কবে বলল ?"

"দুর্গাপ্রসাদ আমাকে কিছু বলে না, পিতাজি। তার ধারণা, আমার মাথায় আর যা থাক, বুদ্ধি নেই।"

"সে যে দুর্গাভাইর কাছে যায় তুমি জানলে কি ক'রে ?"

একটু ইতস্ততঃ ক'রে চন্দ্রপ্রসাদ বলল, "বসন্ত বলেছে।"

কৌতুক-হাস্যে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মুখ নরম হ'ল।

"বসন্ত! বসন্ত কেমন আছে ? বহুদিন দেখি নি তাকে।"

"ভালই আছে, পিতাজি।"

"বি. এ. পাশ করেছে ?"

"এ বছর করবে।"

"তোমার সঙ্গে ভাব-সাব কেমন আজকাল ?"

"মন্দ নয়, পিতাজি।"

"হুঁম্। তোমার ত চালও নেই, চুলোও নেই। বি. এ.-টা পর্যন্ত পাশ করলে না।"

"বসন্তও তাই বলে, পিতাজি।"

"তা হ'লে ?"

"তা ত হ'ল না, পিতাজি।"

দু'জনেই হেসে উঠলেন।

চন্দ্রপ্রসাদ বলল, "একটা খবর আছে, পিতাজি।"

"ব'লে ফেল।"

"বসন্ত'র মা, অর্থাৎ দুর্গাভাইজির ধর্মপত্নী—"

"তাঁর মেয়ের সঙ্গে তোমার বিবাহ দিতে চান না!"

"সে ত পুরাণো খবর পিতাজি। এটা নতুন।"

"বল।"

"তিনি চান দুর্গাভাই মুখ্যমন্ত্রী হোন।"

"এ আকাঙ্ক্ষা আজকার নয়। প্রাচীন।"

"কিন্তু বর্তমানে অত্যন্ত প্রবল।"

"তাই নাকি ?"

"এ নিয়ে প্রায় প্রতিদিন গৃহযুদ্ধ চলছে।

"ও।"

"শুধু তাই নয়। এবার বসন্ত-জননী প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নেমেছেন।"

"তার মানে ?"

"তিনি দুবেজির সঙ্গে দু'তিন বার কথাবার্তা করেছেন। আর—"

"আর ?"

"সরোজিনী সহায়ের সঙ্গে দুর্গাভাইজির যোগাযোগও তাই জন্যে।"

"তুমি ঠিক জান ?"

"ঠিক জানি, পিতাজি।"

"তোমার সংবাদ-সূত্র ?"

"সেটা একান্ত গোপনীয়, পিতাজি।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন চিন্তামগ্ন হলেন। চন্দ্রপ্রসাদ দেখল, তাঁর কোটরগত চোখে আগুনের ঝিলিক্। প্রশস্ত কপালে চিন্তার গাঢ় কুঞ্চন। নাসিকায় প্রচ্ছন্ন জিঘাংসা। ধনুকের মত ওষ্ঠাধরে পাথর-কঠিন সংগ্রাম-আহ্বান।

ধীরে ধীরে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের চোখ কোমল হ'ল, ললাটের কুঞ্চন মিলিয়ে গেল, নাসিকা শান্ত গম্ভীর ভাব ধারণ করল।

অধরোষ্ঠে হাসি ফুটল।

"বসন্ত মেয়েটি বেশ, কি বল ?"

চন্দ্রপ্রসাদ চুপ ক'রে রইল।

"তোমার তিন ভাই-এর কথা ত বললে। তোমার নিজের কথা ত বললে না ?"

চন্দ্রপ্রসাদ হাসল।

বলল, "আমার কথা ? আপনি থাকতে আমার কোনও কথা নেই, পিতাজি। লোকে জানে, আমি আপনার নষ্ট-পুত্র, স্পয়েল্ট চাইল্ড। আমি তাতেই খুশী।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কিছু বললেন না।

চন্দ্রপ্রসাদ আবার বলল, "আপনার অনুগ্রহ এড়িয়ে উদয়াচলে বাস করা চলে না, পিতাজি। তাই মনে মনে একটা ব্যবস্থা করেছি। অনুমতি করেন ত বলতে পারি।"

"বল।"

"এয়ার ফোর্সে ভর্তি হব। শুনেছি ওখানে মুখ্যমন্ত্রীর দাপট পৌঁছয় না।"

"পৌঁছতে পারে।

"দরকার হবে না, পিতাজি। ফ্লাইং ক্লাবে ভর্তি হয়ে বিমান চালনা আমি শিখে নিয়েছি। এয়ার ফোর্সে কমিশনের জন্যে দরখাস্ত করেছিলাম। আপনার পরিচয় না দিয়ে। বিলাসপুরের ঠিকানা না দিয়ে কানপুরে এক বন্ধুর বাড়ীর ঠিকানা দিয়েছিলাম। ওখানেই ইন্টারভিউ এবং মেডিক্যাল একজামিনেশন হয়ে গেছে।"

"ও! এজন্যেই গত মাসে কানপুর গিয়েছিলে ?"

"হাঁ, পিতাজি। আমার সিলেকশনও হয়ে গেছে।"

"হয়ে গেছে ?"

"পরশু চিঠি পেয়েছি, পিতাজি। দশদিন পরে আমাকে যোগ দিতে হবে।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন গম্ভীর হয়ে গেলেন। বুকের কোথায় একটা ব্যথা ক'রে উঠল।

কিন্তু অল্প সময়ের জন্তে।

তারপর খুশিতে মুখ উজ্জ্বল হয়ে গেল।

"বেশ করেছ। আমার সাহায্য না নিয়েই জীবনে দাঁড়াতে পারবে তুমি।"

"শুনেছি পিতাজি, আপনি কারুর সাহায্য না নিয়েই জীবনে দাঁড়িয়েছেন।"

"আমার বাবা দেওয়ান ছিলেন। কিছু সাহায্য তিনি করেছেন বৈ কি?"

"আমার বাবা মুখ্যমন্ত্রী, পিতাজি। তাঁর কাছে আমি অনেক কিছু পেয়েছি।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ন'ড়ে বলতে গিয়ে "উঃ" ক'রে উঠলেন।

চন্দ্রপ্রসাদ বলল "আপনার পিঠের ব্যথাটা বেড়েছে, পিতাজি। একটু টিপে দেব?"

গাঢ় স্বরে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "দেবে? আচ্ছা, দাও।"

চন্দ্রপ্রসাদ আস্তে আস্তে পিঠ টিপতে লাগল। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের বড় ইচ্ছে হ'ল, তাকে কাছে টেনে, বুকের মধ্যে চেপে ধরেন। বুকটা যেন একেবারে খালি মনে হ'ল।

চন্দ্রপ্রসাদের চোখ জ্বলছিল। পিঠে মৃদু চাপ দিতে দিতে ভাবল, এত বড় একটা মানুষ, সারা দেশে যাঁর এত নাম, এমন যাঁর তীব্র ব্যক্তিত্ব, প্রচণ্ড শক্তি, অসীম দুঃসাহস, অনন্ত আত্মবিশ্বাস, এত বড় যাঁর প্রতাপ, নাম, মর্যাদা, যশ, খ্যাতি, বুদ্ধি; তিনি কত সাধারণ, কত নরম, কত নির্জন, কি ভয়ংকর একা!

নীরবতা ভঙ্গ ক'রে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "তোমার এই এয়ার ফোর্সে যাবার ব্যাপারটা আর কেউ জানে?"

"একজন প্রথম থেকেই সব কিছু জানেন, পিতাজি।"

একটু চুপ থেকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রশ্ন করলেন, "তাঁর মত পেয়েছ?"

"তিনি আপনার মতই খুশী হয়েছেন।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এবার চন্দ্রপ্রসাদের মাথায় হাত রাখলেন। বললেন, "চল। ঘরে যেতে হবে খাওয়ার জন্যে। তোমার মা'র হুকুম।"

ক্রমশঃ

— • ✱ • —

প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা

আমাদের দেশের সাধারণ লোকেরা মধ্যবিত্ত লোকদের চেয়ে জ্ঞানে ও মার্জ্জিত বুদ্ধিতে হীন হইলেও, ভক্তি ও হৃদয়ের শক্তি তাহাদেরই বেশী বলিয়া মনে হয়। তাহারা ভাবের বশে আমাদের চেয়ে বেশী সাহসের, কষ্টসহিষ্ণুতার, স্বার্থত্যাগের কাজ একা একা ও দলবদ্ধভাবে করিতে পারে। সকল প্রকার ভাব ও প্রবৃত্তির মূল্য সমান নয়। সৎভাব ও সৎপ্রবৃত্তির উন্মেষ ও বিকাশ যাহাতে হয়, যাহাতে তৎসমুদয় শক্তিশালী হয়, সেরূপ চেষ্টা করা শিক্ষার একটি উদ্দেশ্য। প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষাতেও, বালক বালিকাদের শিক্ষার ন্যায়, এই উদ্দেশ্য মনে রাখা একান্ত আবশ্যক।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রবাসী চৈত্র ১৩...

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

শ্রীঅশোককুমার দত্ত

ডাঃ গঙ্গাপ্রসাদের পুত্র সার আশুতোষের শতবার্ষিকীর অর্ঘ্য রচনা। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং আশুতোষ মুখোপাধ্যায় একই সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন—১৮৬৪ সাল; দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এবং সার আশুতোষ একই সালে দেহত্যাগ করেছিলেন—১৯২৫ সাল। সমস্ত উনবিংশ শতাব্দীটাই ছিল বাংলা ও বাঙালী জাতির পক্ষে সূর্যোদয়ের কাল। ইতিহাসের এই বিশেষ সময়টিতে অনেক দিক্‌পাল মনীষী সাহিত্য শিল্প বিজ্ঞানের নানা শাখায় সারা দেশের গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন। নাম বলতে গেলে অনেক নামই বলতে হয়, আপাততঃ তার প্রয়োজন নেই। সার আশুতোষের কথা আমরা এখানে উল্লেখ করছি তাঁর শতবার্ষিকী স্মরণে। বলা বাহুল্য, আশুতোষের ঐ বড় নামটি শুধু বছরে একবার বা বিশেষ উপলক্ষ্যে একবার মাত্র মনে করার জন্য নয়, বরং শিক্ষার বিভিন্ন প্রসঙ্গে প্রতিদিনকার কর্মধারায় তা ধ্যানের যোগ্য। সার আশুতোষের হাতে-গড়া এই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সমুদ্র-দ্বীপের লাইট হাউসের মত সেই পরাধীন অবস্থাতেও দেশের শত সহস্র ছাত্রছাত্রীকে জ্ঞানের পথ দেখিয়েছিল। শিক্ষা বিস্তার—শিক্ষার চিন্তায় তাঁর যা অবদান তা একটা পূর্ণাঙ্গ বইয়ের আলোচনার বিষয়। আমরা এখানে একটা বিষয় মাত্র উল্লেখ করছি—মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের প্রসঙ্গ। আশুতোষের বিভিন্ন লেখা থেকেই তা তুলে দিলাম। গঙ্গা জলে এই গঙ্গা পূজা।

শিক্ষায় মাতৃভাষার স্বপক্ষে তাঁর বক্তব্য—

"জ্ঞানের জন্যই হউক, আর উদরের জন্যই হউক, অথবা আর কিছু করিবার নাই বলিয়াই হউক, সকলেই অল্পবিস্তর ইংরেজী লেখাপড়া শিখিয়া থাকে। এরূপক্ষেত্রে আবার নূতন করিয়া এই ভারতীয় ভাষার প্রচলনের প্রয়াস কেন। যে কার্যসাধনের জন্য এই প্রয়াস, সেই কার্য বা সেই উদ্দেশ্য ত অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে ইংরেজীতেই হইতে পারে, তবে এ শিরোবেষ্টনপূর্বক নাসিকা স্পর্শ কেন?...

"প্রথম কথা—জাতীয় ভাব বজায় রাখিতে হইলে জাতীয় ভাষার সেবা আবশ্যক। বিজাতীয় ভাষার সাহায্যে জাতীয় সাহিত্য গঠনের চেষ্টা করা বাতুলতার কার্য।

"দ্বিতীয় কথা—ইংরেজী ভাষা অর্থকরী হইলেও ভারতের অধিকাংশ লোক—ইতর সাধারণ—তাহা জানে না বা এখনও জানিবার জন্য তাহাদের প্রাণে তেমন আকাঙ্ক্ষা দেখা যায় নাই। সুতরাং ইংরেজীর সাহায্যে তাহাদিগকে বুঝাইতে প্রয়াস করা বৃথা। তাই আমার মনে হয়, জাতীয় ভাব ফুটাইতে হইলে—সকলকে এক, অদ্বিতীয় জাতীয়তার সূত্রে গাঁথিতে হইলে, জাতীয় সাহিত্যে একতাবন্ধনের চেষ্টা করিতে হইবে। বিভিন্ন জাতির ভাবের আদান-প্রদানের সুব্যবস্থা স্ব স্ব জাতীয় সাহিত্যের মধ্য দিয়া করিতে হইবে। উচ্চ-শিক্ষিত হইতে নিরক্ষর কৃষককুল পর্যন্ত এক ঊর্ণনাভের জালে বেড়িয়া ফেলিতে হইবে, অন্যথায় একীকরণ অসম্ভব।..." (জাতীয় সাহিত্য)

এ প্রসঙ্গে বর্তমানের রাজনীতি তথা শিক্ষানীতির একটা বড় সমস্যা হিন্দী ভাষা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য—

"যে কারণে ইংরেজী ভাষা আমাদের জাতীয় ভাষা হইতে পারে না, সেই কারণেই হিন্দী বা অন্য কোন একটা নির্দিষ্ট ভাষাও ভারতের একমাত্র সার্বজনীন ভাষা হইতে পারে না। ইংরেজী ভাষা ভারতের জাতীয় ভাষা রূপে গৃহীত হইলে যেমন প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ ক্রমে তাহার নিজের বৈশিষ্ট্য হারাইয়া অশ্বত্থ পাদপজাত

উপবৃক্ষের মত হইয়া পড়িবে, সেইরূপ হিন্দীকে সমগ্র ভারতের ভাষা করিতে গেলেও ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশসমূহ তাহাদের নিজের নিজের বৈশিষ্ট্য বা ব্যক্তিত্ব হারাইয়া ফেলিবে।…" (জাতীয় সাহিত্য)

ভাষা-প্রসঙ্গে সার আশুতোষের সুচিন্তিত অভিমত—

"আমার মতে, যে প্রদেশের যে ভাষা চিরদিন প্রচলিত, তথায় তাহা সেইরূপই থাকুক—সেই ভাষায় সেই প্রদেশের জাতীয় সাহিত্য ক্রমে বর্ধিত হউক—শ্রীসম্পন্ন হউক। সে পক্ষে কোন বাধার প্রয়োজন নাই। কেননা যে জাতির জাতীয় সাহিত্য নাই, তাহারা বড়ই দুর্ভাগ্য।…" (জাতীয় সাহিত্য)

এই একই প্রসঙ্গে অন্যত্র তিনি বলেছেন—

"পাশ্চাত্য ভাষায় অনিপুণ থাকিয়াও যাহাতে বঙ্গের ইতর সাধারণ পাশ্চাত্য প্রদেশের যাহা কিছু উত্তম, যাহা উদার এবং নির্মল, তাহা শিখিতে পারে এবং শিখিয়া আত্মজীবনের ও আত্মসমাজের কল্যাণসাধন করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।…

"ইউরোপীয় সাহিত্যের গ্রহণযোগ্য অংশগুলি যদি আমরা গ্রহণ করিতে পারি তবেই ক্রমে আমাদের বঙ্গ-ভাষা আশাতীতভাবে পরিপুষ্টি লাভ করিবে। ইউরোপীয় ভাষায় অনভিজ্ঞ বা অনভিজ্ঞ থাকিয়াও এদেশবাসীরা ইউরোপের শিক্ষাদীক্ষার উত্তম ফলে বঞ্চিত থাকিবে না।…প্রাচীন জাপান এই উপায়েই অধুনাতম নবীন জাপানে উন্নীত হইতে পারিয়াছে।"

(জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি)

ভাষা-প্রসঙ্গে সার আশুতোষের এ সমস্ত বক্তব্য কোনটাই নূতন বা অভিনব কিছু নয়। জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধগুলির মতই তা সহজ এবং সাধারণ ধারণা। সার আশুতোষের শতবার্ষিকী অর্ঘ্য নিবেদন করতে গিয়ে আমরা এই সহজ এবং মৌলিক বিষয়টিরই শুধু উল্লেখ করলাম। শিক্ষা ও রাজনীতির এই ডামাডোলের বাজারে খবর কাগজের পাতায় উপেক্ষিত এ সমস্ত বিষয়-গুলিই আজ মানুষের মনের সামনে বার বার হাজির করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। "শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ, জগতে এই সর্বজনস্বীকৃত নিরতিশয় সহজ কথাটা বহুকাল পূর্বে একদিন বলেছিলেম; আজও তার পুনরাবৃত্তি করব। সেদিন যা ইংরেজী শিক্ষায় মন্ত্রমুগ্ধ কর্ণকুহরে অশ্রাব্য হয়েছিল আজও যদি তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, তবে আশা করি পুনরাবৃত্তি করবার মানুষ বারে বারে পাওয়া যাবে।"

সার আশুতোষের জন্মশতবার্ষিক বছরে আমরা এই কথাটারই পুনরাবৃত্তি করলাম মাত্র।

—•—

জুনিয়াস্ মল্টবি

জন ষ্টাইনবেক্

অনুবাদ—শ্রীপ্রমোদরঞ্জন পাল

জুনিয়াস মল্টবি খর্বকায় তরুণ যুবক। কৃষ্টিসম্পন্ন পরিবারে তার জন্ম, নিজেও শিক্ষিত। তার পিতা যখন দেনার দায়ে দেউলিয়া হয়ে মারা গেলেন, তখন জুনিয়াস কেরাণীগিরির জটিল জালে বাঁধা পড়েছে। দশ বছর ধ'রে দুর্বল হাতে এই বাঁধন খুলবার চেষ্টা করেও সে অকৃতকার্য হয়েছে।

দিনের কাজ শেষ হ'লে সে তার ঘরে ফিরে আসে। তার মরিস চেয়ারের কুশনটা ঠিক করে নিয়ে পড়তে বসে। বিকেলটা এমনি কাটে। ষ্টিভেনসনের প্রবন্ধ তার কাছে খুব ভাল লাগে। ওঁর লেখা ট্রাভেল উইথ এ ডাঙ্কি বইখানা সে বার বার করে পড়ে।

এই সেদিন ওর জন্মোৎসব হ'ল, ৩৫ বছরে পড়েছে সে। এরই কয়েকদিন পরে একদিন সন্ধ্যায় সে তার বোর্ডিং হাউসের সিঁড়ির ওপর হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। কতক্ষণ এ ভাবে যে সে পড়ে ছিল তা ওর ধারণা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু জ্ঞান যখন ফিরল তখন তার মনে হ'ল নিঃশ্বাস নিতে যেন কষ্ট হচ্ছে।

একজন অমায়িক প্রকৃতির ডাক্তার তার চিকিৎসার ভার নিলেন—ভরসা দিয়ে বললেন, "এখানে যা কুয়াশা, এখানে থাকলে অসুখ আর সারবে না। সান ফ্রান-সিস্কোর বাইরে, কোনও শুকনো-গরম দেশে হাওয়া বদলাতে চলে যান।"

জুনিয়াস কিন্তু এই দৈহিক দুর্বিপাকের জন্য খুশীই হ'ল। পাকানো জটটা আপনা থেকেই এবার আলগা হয়ে গেল বলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কিন্তু টাকার দিক্ থেকে যেটুকু ভরসা, তার পরিমাণ মাত্র পাঁচশত ডলার। তাও এ টাকা ক'টি কি সে জমিয়েছে? খরচ করতে ভুলে গেছে বলেই জমেছে। হয়ত এই টাকাই ওকে বাঁচাবে, নতুন জীবন আরম্ভ করতে সাহায্য করবে। আর যদি মরেই যায় ত সব ল্যাঠা চুকেই গেল একেবারে।

অফিসের একজন তাকে একটি স্বাস্থ্যকর স্থানের খবর দিল। সেটি পাহাড়ে ঘেরা একটি উষ্ণ উপত্যকা। খবর পেয়েই মল্টবি সেখানে চলে গেল হাওয়া বদলাতে। স্বর্গচারণিকা নাম। নামটি তার বেশ ভাল লাগল। স্বর্গ? মর্ত্যের পাট কি তা হ'লে তুলতে হবে? সে ভাবতে লাগল তা না হ'লে তাকে হয়ত বা কাটাতে হবে মৃত্যুরই মত নিষ্ক্রিয় জীবন। স্বর্গচারণিকা নামটির ভেতর খুঁজে পেল সে মৃত্যুরই প্রতীকগত বিকল্প অর্থ। যেন ওর ব্যক্তিসত্তায় খানিকটা রয়েছে এই নামটিতে। গত দশ বছরের মধ্যে ব্যক্তিগত বলে সে কিছু ভাবতে পারে নি—তার নিজের বলে কিছুই ছিল না। এবার যেন ও সন্ধান পেয়েছে নিজের জিনিসের। তাই মন ওর ভরে উঠল খুশিতে।

স্বর্গচারণিকায় কয়েকটি মাত্র পরিবার বাস করে। ওরা বোর্ডার রাখে। জুনিয়াস বাড়ী ক'টি দেখল। তার যে বাড়ীটি পছন্দ হ'ল, সেটি মিসেস্ কোয়েকারের গোলাবাড়ী। তিনি বিধবা। তার থাকার ব্যবস্থা হ'ল গোলাঘরের পাশেই আলাদা একটি চালাঘরে। মিসেস্ কোয়েকারের দু'টি ছোট ছেলে। একটি ভাড়া-করা মুনিষ চাষের কাজ দেখে। সেও ওদের সঙ্গে থাকে।

উপত্যকার উষ্ণ বাতাস জুনিয়াসের ওপর বুলিয়ে দিতে লাগল স্বাস্থ্যের কোমল প্রলেপ। বৎসর যেতে না যেতেই জুনিয়াসের গায়ে স্বাস্থ্যের রং ফুটে উঠল। ওজন বাড়ল। গোলাবাড়ীর নিরালায় সে দিন কাটাতে লাগল নিশ্চিন্তে। আর দশ বছরের কেরাণীর জীবনকে যে সে ছুঁড়ে ফেলতে পেরেছে একথা ভেবেই তার মন তৃপ্তিতে ভরে উঠল। কিন্তু একটানা এই বিশ্রাম তাকে অকর্মণ্য করে তুলল। জুনিয়াসের ব্রাশু চুলে (কর্দা) এখন আর চিরুণী পড়ে না। চোখ তার এখন অনেক সতেজ হয়ে উঠেছে—তাই সে এখন তার চৌকো নাকের ডগার উপর চশমা নামিয়ে পরে—প্রয়োজন নেই, তবুও অভ্যাসবশেই পরে। আর একটি কুঅভ্যাস এরই মধ্যে সে রপ্ত করেছে। প্রায়ই দেখা যায় খড়ের টুকরো ওর দাঁতে ঝুলছে। ব্যাপারটা কিছুই নয়। চিন্তা-বাই-গ্রস্তদের অন্তমনস্কতার এটা একটা দুর্লক্ষণ মাত্র।

জুনিয়াসের রোগমুক্তির পর স্বাস্থ্যের ক্রমোন্নতির এই কাহিনীটা ১৯১০ সালের ঘটনা।

১৯১১ সালে মিসেস্ কোয়েকারের খেয়াল হ'ল, লোকে যেন কি সব বলাবলি করছে। এ নিয়ে যে এমন জটিল অবস্থার সৃষ্টি হ'তে পারে তা তিনি আগে ভাবতে পারেন নি। এতে বিচলিত হলেন তিনি। জুলিয়াস্ এখন সম্পূর্ণ সেরে উঠেছে। আশঙ্কার কোনও কারণ নেই আর। মিসেস্ কোয়েকারের অস্বস্তির কথা জানতে পেরে ও মন ঠিক করে ফেলল। এক কথায় সে ওঁকে বিয়ে করতে রাজী হয়ে গেল খুশী মনেই। শুভকাজটি নিষ্পন্ন হ'তেও দেরি হ'ল না। জুলিয়াসের এবার বাড়ী হ'ল। সোনালী ভবিষ্যৎ এখন ওর সামনে। পাহাড়ের গায়ে তার স্ত্রীর ২০০ একর ঘাসের জমি আর ৫ একর ফুল ও ফলের বাগান রয়েছে। জুলিয়াস এবার তার মরিস চেয়ার, পড়ার বই, আর ভেলাকীর কার্ডিনাল ছবিখানা আনিয়ে নিল। এখন ভবিষ্যৎটা তার কাছে যেন একটি রৌদ্রোজ্জ্বল সায়াহ্ন, বিশ্রাম ও আরামের আমেজে পূরন্ত।

মিসেস মণ্টবি কিন্তু এবার ভাড়া-করা মুনিষটিকে ছাড়িয়ে দিতে একটুও দেরি করলেন না। ইচ্ছা, স্বামীই এখন থেকে কাজকর্ম দেখেন। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হ'ল না। স্বামী কাজ করতে নারাজ। এতে মিসেস মণ্টবি দিশেহারা হয়ে পড়লেন। তেমন জোর খাটাতেও তিনি পারেন না। জোর খাটাবেন কার ওপর? লোকটি যা নরম মেজাজের—তার ওপর জবরদস্তি চলে না। কঠিন বস্তু হ'লে আঘাত করা চলত, দাবানো চলত। কিন্তু ও যে অন্ত প্রকৃতির।

রোগমুক্তির পর বিশ্রামই মণ্টবির কাল হয়েছিল—তখন থেকেই ওর কুঁড়েমির সূত্রপাত। উপত্যকা, খামার-ক্ষেত্র সে ভালবাসে—ভালবাসে ঐ পর্য্যন্তই। যেমনটি আছে তেমনটিই। জমির অপ্রয়োজনীয় জঞ্জাল সাফ করে কোনও ভাল ফসল লাগাতে তার ইচ্ছা হয় না। একদিন মিসেস মণ্টবি ওর হাতে কোদালখানা তুলে দিয়ে সব্জী বাগানে কাজ করতে বললেন। ঘণ্টাখানেক পরে দেখা গেল মাঠের ভেতর দিয়ে যে নদী গেছে তার জলে পা ডুবিয়ে, জুলিয়াস 'কিডন্যাপ্‌ড'-এর পকেট সংস্করণ পড়ছে। কাজ ফেলে কখন যে পড়তে বসেছে তা সে নিজেই জানে না। ওর মত সরল মানুষের কথা অবিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই।

কুঁড়েমি আর অগোছাল বেশ-ভূষার জন্ত জুলিয়াসকে প্রথম প্রথম কত কটু কথাই না শুনতে হয়েছে। কথা শুনে শুনে গেছে তার বহুদিন। এতে ফল হ'ল এই—ওর একটা অদ্ভুত মনোবৃত্তি গড়ে উঠল। সে আর মিসেস মণ্টবির কথা কানেই তোলে না এখন। ওর ধারণা স্ত্রীর এই অভব্য আচরণের প্রতি মন দিলে, অভদ্রতাই প্রকাশ পাবে। বিকলাঙ্গ লোকের প্রতি তাকিয়ে দেখায় যেমন অসভ্যতা আছে, দুর্বিনীত ব্যবহারের প্রতি নজর দেওয়াতে তেমনি অভদ্রতা আছে—এই তার ধারণা। ওর স্বভাবের কুয়াশার আস্তরণের ওপর কিছুদিন আঘাত চালিয়ে মিসেস মণ্টবি কিছু ফল হ'ল না দেখে শেষে হাল ছেড়ে দিলেন। কিন্তু এর ফলও ভাল হ'ল না। মিসেস মণ্টবির স্বভাবেরও পরিবর্ত্তন হ'ল। তাকে ছিচ্‌কাঁদুনীতে পেয়ে বসল। এখন তিনি না করেন শরীরের যত্ন, না চুলের।

১৯১১ থেকে ১৯১৭ সালের মধ্যে ওদের আর্থিক অবস্থা হয়ে উঠল সঙ্গীন। খামারের যত্ন নেওয়ার দিকে জুলিয়াসের মন নেই। কয়েক একর জমি বিক্রী করে ফেলতে হ'ল খাওয়া-পরার অভাব মেটাতে। কিন্তু এতেও কি অভাব দূর হ'ল? দারিদ্র্য যেন গোলা-বাড়ীতে গেড়ে বসেছে। ছিন্ন বস্ত্র, অর্দ্ধাশন এখন সার। তাতে কি আসে-যায়? জুলিয়াস কিন্তু স্টেভেন্সনের নিবন্ধ-গুচ্ছের সন্ধান পেয়ে গেছে। সে এই নিয়েই এখন ব্যস্ত। মেঠো নদীর ধারে, সাইকামোর গাছের সারির নীচে ওভারঅল পরে বসে বসে সে শুধু এখন বই পড়ে। কখন কখন স্ত্রী, আর ছেলেদের 'এ্যাড্‌ভেঞ্চারস্ ইন কন্টেন্টমেন্ট' (সন্তুষ্টির পথে অভিযান) পড়ে শোনায়।

১৯১৭ সালের গোড়ার দিকে মিসেস মণ্টবি সন্তান-সম্ভবা হলেন। বছরের শেষের দিকে যুদ্ধকালীন ইনফ্লুয়েঞ্জার হিড়িক পড়ল। নিষ্ঠুর ভয়াবহতা নিয়ে রোগটি দেখা দিল মণ্টবি-পরিবারে। প্রথমেই ছেলে দু'টি অসুখে পড়ল। দু'জনই একসঙ্গে। পুষ্টির অভাবই হয়ত এর অন্যতম কারণ। তিন দিন ধরে চলল সংগ্রাম। জ্বরে আরক্তিম শিশু দু'টি তাদের কম্পিত আঙুলে বিছানার চাদর আঁকড়ে ধরল, প্রাণটাকে যেন আটকে রাখতে চাইল চাদরের সুতো ধরে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। চতুর্থ দিনে ওরা মারা গেল। ওদের মা তখন আঁতুড়-ঘরে। কিছুই জানেন না। প্রতিবেশীদেরও ওঁকে এই নিদারুণ সংবাদ দিতে মানা হ'ল। মিসেস মণ্টবি তখন ব্ল্যাক ফিভারে ভুগছেন। নবজাতকের মুখের দিকে চেয়ে দেখার অবসরও তিনি পেলেন না—বিদায় নিতে হ'ল জ্ঞান ফিরে পাওয়ার আগেই।

প্রতিবেশিনী যারা এসেছিল আঁতুড়ে সাহায্য করতে,

তারা রটাল, স্ত্রী ও ছেলেরা যখন মরতে বসেছে, জুনিয়াস তখন নদীর ধারে বই পড়তে ব্যস্ত। গুজবটা কিন্তু পুরোপুরি সত্যি নয়। ছেলেদের যে অসুখ সে খবর সে প্রথমে জানতে পারে নি। প্রথম দিন ওরা যখন অসুখে পড়ল তখন সে অবশ্য নদীর জলে পা ডুবিয়ে পড়াতে মগ্ন ছিল এ কথা অস্বীকার করা যায় না। পরে জানতে পেয়ে দিশেহারার মত ওদের কাছে সে ছুটে গিয়েছিল। বাড়ী গিয়ে একবার এর কাছে আবার ওর কাছে ছুটোছুটি লাগিয়ে দিয়েছিল। আর আবোল-তাবোল যত সব বাজে কথা বকে যাচ্ছিল ওদের কাছে। ওর বাজে কথা সব, কিন্তু জ্ঞানের কথা। বড়টিকে শোনাল হীরের জন্ম-কথা। ছোটকে বোঝাবার চেষ্টা করল স্বস্তিকার ভাবগত অর্থ আর তার প্রাচীনতার কথা। সেদিন যখন সে 'ট্রেজার আইল্যাণ্ড'-এর দ্বিতীয় অধ্যায়টি পড়ে শোনাচ্ছিল, সে সময় একটির জীবন-দীপ নিবে গেল। কিন্তু ও তা জানতে পায় নি—পড়াতে এতই মগ্ন ছিল সে। অধ্যায়টি শেষ করে সে যখন চোখ তুলে দেখল, তখন যা ঘটবার ঘটে গেছে। ওদের অসুখের কয়েক দিন ও দিশেহারার মত কাটিয়েছে। তার একমাত্র যা দেওয়ার ছিল, তা সে ওদের দিয়েছে। কিন্তু সে 'দেওয়ার' মৃত্যুকে রোধ করার শক্তি ছিল না। আর এ কথাটা সে জানত বলেই, ওদের মৃত্যু ওকে আরও মর্মান্তিক আঘাত দিয়েছিল।

মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার পর জুনিয়াস নদীর ধারে গিয়ে আবার বসেছিল 'ট্র্যাভেল্‌স উইথ এ ডাঙ্কি' বইখানা নিয়ে। মোডেষ্টাইনের একগুঁয়েমি দেখে ওর হাসি পেল—বোকা হাসি। গাধার নাম মোডেষ্টাইন! এমন নাম যে একটি গাধার হ'তে পারে এমন অসম্ভব কথা কেই বা ভাবতে পারে ষ্টিভেনসন্‌ ছাড়া—কি সৃষ্টিছাড়া লোক!

সেদিন কিন্তু একজন প্রতিবেশিনী ডেকে নিয়ে গিয়ে বেশ দু'কথা শুনিয়ে দিয়েছিল ওকে। জুনিয়াস্‌ এতে ব্যথিত হয়েছিল। এমন ব্যবহার মোটেই ভাল লাগে নি ওর। তাই সে কানই দিল না প্রতিবেশিনীর কথায়। মেয়েটি অলন্ত দৃষ্টিতে ওর দিকে একবার তাকাল, তার পর নবজাত শিশুটিকে ওর কোলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যেতে যেতে গেটের কাছ থেকে মেয়েটি পেছন ফিরে দেখল, শিশুটি প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে। আর ও ঠায় দাঁড়িয়ে আছে শিশুটিকে কোলে করে। কোথায় ওকে রাখবে যেন বুঝে উঠতে পারছে না।

জুনিয়াস সম্বন্ধে অনেক গাল-গল্পই শোনা যায় ওখানকার লোকের মুখে। ওর কুঁড়েমি দেখে ব্যস্ত লোকেরা ওকে ঘৃণা করে, মনে মনে আবার হিংসায়ও মরে। তবে লোকটি যে সকলের কাছে কৃপার পাত্র, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু ওর অন্তরের খোঁজ ত ওরা রাখে না, ওরা জানে না যে ও মনেপ্রাণে সুখী।

ওর সম্বন্ধে এমন গল্পও শোনা যায় যে ডাক্তারের পরামর্শে খোকার দুধের জন্য জুনিয়াস ছাগল কিনতে গিয়ে ছাগল ব্যাপারিকে বলল "আমার একটি ছাগল চাই।" পাঁঠা না পাঁঠী চাই, সে কথা উল্লেখই করল না। বিক্রেতা ছাগল নিয়ে এলে, জীবটার নীচের দিকে একবার দৃষ্টি চালিয়ে গম্ভীর ভাবে ও প্রশ্ন করল—"ছাগলটা স্বাভাবিক ত?"

"নিশ্চয়ই।" ছাগলের মালিক উত্তর দিল।

"কিন্তু ওটার নীচের থলে কোথায়, দেখতে পাচ্ছি না ত? মানে দুধ থাকে যাতে।"

ওখানকার লোকেরা ওর কথা শুনে হেসে লুটোপুটি খেয়েছিল সেদিন। তার পর দুধ-দেওয়া পাঁঠী এল পাঁঠার বদলে। কিন্তু এই পাঁঠী এবার হয়রাণ ক'রে ছাড়ল জুনিয়াসকে। বেচারা দু'দিন ধ'রে চেষ্টা করল দুধ দোয়াতে। কিন্তু এক ফোঁটা দুধও বার করতে পারল না বাঁট থেকে। তার পর ছাগলটা নিয়ে গেল মালিকের কাছে ফেরৎ দিতে, ভাল নয় বলে। মালিক ওকে দোয়াবার কায়দাটা তখন শিখিয়ে দিল।

গুজব রটাতে অনেকে আবার আর এককাঠি ওপরে যায়। তারা বলে, জুনিয়াস ছেলেকে নাকি ছাগলের নীচে বসিয়ে দিত, আর ছেলে বাঁটে মুখ লাগিয়ে দুধ খেত। ও সব বানানো কথা। আসল কথা ছেলেকে কি করে যে ও মানুষ করছিল তা কেউ জানে না।

জুনিয়াস একদিন মোণ্টারে থেকে একটি লোক ভাড়া করে নিয়ে এল, খামারের কাজে সাহায্য করার জন্যে। কাজে বহাল হওয়ার দিন সেই যে ও ৫ ডলার পেয়েছিল, সেই তার প্রথম আর সেই শেষ। পরে তাকে আর কিছু দেওয়া জুনিয়াসের পক্ষে সম্ভব হয় নি। প্রথম প্রথম লোকটি বেশ কাজ করছিল। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই তাকেও কুঁড়েমিতে পেয়ে বসল। আর কুঁড়েমিতে সে মালিকের চেয়ে কম গেল না। এখন ওদের কাজ হ'ল বসে বসে খালি গল্প করা। অদ্ভুত সব ওদের আলোচনার বিষয়। ওদের জানবার আগ্রহ অনেক। অনেক কিছু দেখেই ওদের বিস্ময়

লাগে—মন ব্যগ্র হয় জানবার জন্যে। ফুলে রংএর ছোপ লাগে কি করে—প্রকৃতির মধ্যে প্রতীক বা রূপকের কোনও স্থান আছে কি না—এ্যাটলাণ্টিস্ কোথায়—ইনকা জাতি মৃতদেহ গোর দেয় কি ক'রে, এ সব হ'ল তাদের আলোচনার বিষয়।

বসন্ত প্রায় শেষ হয়েছে—আলুর চাষের সময় চলে গেছে। তখন ওদের মনে হ'ল আলু লাগাবার কথা। কিন্তু তাতেও আবার নানা গাফিলতি। আলু যদি বা লাগান হ'ল, অসময়ে, পোকার হাত থেকে ফসল রক্ষা করার জন্যে যে চারাগাছের গোড়া ছাই দিয়ে ঢেকে দেওয়া দরকার সে কথা আর তাদের মনে রইল না। সিম, মটর, ভুট্টা জমিতে লাগান হ'ল ত ভুলে গেল ওগুলোর যত্ন নেওয়ার কথা। পরগাছাতে ঢেকে ফেলল জমির ফসল। পরে হয়ত একদিন দেখা গেল জুনিয়াস ঝোপ-ঝাড় ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে, হাতে একটি রংমরা ফ্যাকাশে লাউ। এই ত ওর চিরাচরিত অভ্যাস। সে খালি পায়েই চলে আজকাল, হয়ত জুতো নেই বলে, না হয় খালি পায়ের নীচে মাটির স্পর্শে আরাম পায় বলে।

রোজ বিকেলে সে জ্যাকব ষ্টুজের সঙ্গে গল্পে মেতে ওঠে। একদিন কথা-প্রসঙ্গে সে বলে, "ছেলেরা মারা গেলে আমাকে কেমন একটা আতঙ্কের ভাব পেয়ে বসেছিল। ক্রমে ভয় চলে গেল, কিন্তু দুঃখ কাটিয়ে উঠতে পারলাম না। আশ্চর্য্যের কথা, স্ত্রী ও ছেলেদের আমার মনে হ'ত অপরিচিত। তারা এত কাছে তবুও মনে হ'ত ওদের যেন আমি চিনি না। অনেক খুঁটিনাটি আছে যা ভাল করে পর্য্যবেক্ষণ না করলে অজানা থেকে যায়। অনেকের মনের দৃষ্টি বহু দূরে প্রসারিত থাকে, কারও দৃষ্টি থাকে সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ। আমার নিজের দৃষ্টি সুদূর-বিলম্বী। কাছের জিনিষকে আমি দেখতে পাই না। পার্থেনন সম্বন্ধে আমি অনেক কিছু জানি, কিন্তু জানি না আমার কাছের ঐ নিজের বাড়ীটাকে তেমন করে।" জুনিয়াসের মুখ হঠাৎ আবেগে চঞ্চল হয়ে উঠল। চোখে ওর উৎসাহের দীপ্তি। বলল, "জ্যাকব, পার্থেননের (এথেন্সের মিনার্ভাদেবীর মন্দির) থামের উপরকার কোনও ছবি তুমি দেখেছ কখনও?"

"দেখেছি, সে ত খুব চমৎকার।" জ্যাকব উত্তর দিল।

জুনিয়াস, জ্যাকবের হাঁটুর উপর হাত রেখে আবেগ ভরে বলল, "মনে পড়ছে, সেই যে ঘোড়াগুলি এক স্বর্গীয় চারণভূমির দিকে এগিয়ে চলেছে আর সেই যে সব যুবক, যাদের মুখে আগ্রহ, চেহারায় আভিজাত্য—ওরা সব উৎসবে যোগ দিতে যাচ্ছে। কার্নিশের চারপাশে অদ্ভুত সেই উৎকীর্ণ দৃশ্য। আমি ভেবে পাই না জ্যাকব, লোকে পশুর মনের খুশির ভাবটা কি ক'রে বুঝতে পারে। তেমনটি অনুভব করার শক্তি নিশ্চয়ই সেই ভাস্করটির ছিল, না হলে ঘোড়ার সেই আনন্দের ভাবটা কি এমন সার্থকভাবে প্রাণ পেত ভাস্কর্য্যে, ঐ কঠিন শিলা-গাত্রে?"

এমনি সব চলত কথাবার্ত্তা। এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে কেবলই মোড় ঘুরে চলত নানা প্রসঙ্গ। একই বিষয় নিয়ে জুনিয়াস বেশীক্ষণ আলোচনা চালাত না। কথার নেশায় খাবার চিন্তা ভুলে যেত তারা। খাবার জোগাড় নেই। হঠাৎ খেয়াল হ'ল যখন, বন-বাদাড় ঘাসের ভেতর খুঁজে-পেতে হাঁসের ডিম যদি পাওয়া গেল এক-আধটা তবে খাওয়া হ'ল সেদিন, না হ'লে উপবাস।

জুনিয়াসের ছেলেটির নাম রাখা হয়েছিল রবার্ট লুই। জুনিয়াস এই নামেই ওকে ডাকতে আরম্ভ করেছিল, কিন্তু জ্যাকব সাহিত্যিক গন্ধওয়ালা এই নামটি শুনলেই চটে যেত। সে বলত, "ছোটদের নাম কুকুরের নামের মত ছোট্ট হবে, সহজে যাতে ডাকা চলে। এক শব্দের নাম। শুধু রবার্ট নামটিও বড্ড জাঁকালো। রব্ নামটি কিন্তু মন্দ নয়।" জ্যাকবের যুক্তিটা জুনিয়াসকে মানতে হ'ল।

জুনিয়াস বলল, "বেশ, তোমার কথা না-হয় মানলাম। ওকে রোবি বলেই ডাকব তা হ'লে। রোবি নামটাও ত বেশ ছোট্ট, তাই না?"

জ্যাকবের কাছে জুনিয়াসকে প্রায়ই হার মানতে হ'ত। ভাব আর কথার ঊর্ণনাভের জাল যখন তাকে জড়িয়ে ধরতে চাইত জ্যাকব অনবরতই তা প্রতিহত করে চলত। রাগ হ'ত ওর। ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার করে ফেলত সব কথার জঞ্জাল। তবে ওর ক্রোধটা কখনও অশোভন ভাবে প্রকাশ পেত না।

এমনি একটা গাম্ভীর্য্যপূর্ণ পরিবেশের ভেতর রোবি বেড়ে উঠছিল। সে বড়দের সঙ্গে ঘুরে বেড়াত, আলাপ আলোচনা শুনত। জুনিয়াসও ওর সঙ্গে বড়দের মত ব্যবহার করত। ছোট আর বড়দের মধ্যে ব্যবহারের তফাৎটা সে জানতই না। রোবি যদি কখনও কোনও

মন্তব্য করত ওদের কথার মাঝখানে, ওরা ওর অভিমত মনোযোগ দিয়েই শুনত। ছেলের অভিমত নিয়েই তখন চলত আলোচনা। তা না হ'লেও ওর কথার গুরুত্ব মেনে নিয়ে, তথ্য-সন্ধানের একটি পরীক্ষামূলক সূত্র হিসাবে গ্রহণ করা হ'ত ওর মন্তব্যকে। বিশেষ করে বিকেল বেলাটা স্রেফ আলোচনাতেই ওদের কাটত—আর কতবার করে যে জুনিয়াসকে তথ্য-সন্ধানের জন্য অভিযান চালাতে হ'ত এনসাইক্লোপিডিয়ার পাতায় তার ঠিক নেই।

ওদের বাড়ীর কাছে মাঠের মধ্যে প্রকাণ্ড একটি সাইকামোর গাছ ছিল। গাছটির একটা অংশ সমান্তরালভাবে নদীর জলের ওপর ঝুঁকে পড়েছিল। সেই গাছটির নুয়ে-পড়া অংশটি হ'ল ওদের নিত্যকার বসবার জায়গা। ওরা গাছের ওপর বসে নদীর জলে পা ডুবিয়ে পাথরের নুড়ি পায়ের আঙুল দিয়ে নাড়াচাড়া করত। রোবিও বড়দের অনুকরণ করার চেষ্টা করত। রোবি মনে করত, পা দিয়ে জল ছুঁতে পারাটা বড়ত্বের একটা প্রমাণ। ওদের খালি পা, কাজেই জল ঘাঁটতে বাধা নেই। জ্যাকবও অনেকদিন হ'ল জুতো পরা ছেড়ে দিয়েছে—আর রোবি ত কখনও জুতোই পরে নি।

ওখানে যত সব পণ্ডিতী ধরণের আলোচনা হ'ত। রোবিরও ছেলে-মানুষি কথা আসতই না—ওরকম কথা জীবনে সে কখনও শোনেই নি তা বলবে কি? ওদের ত কথা নয়—ওদের কথা হ'ল কতকগুলো চিন্তার বীজ। ও বীজগুলো আপনা থেকেই বিকশিত হ'ত। দেখে ওদের নিজেরই অবাক্ লাগত—বীজ থেকে অঙ্কুর, তার পর গাছ, তার পর ডালপালা কি অদ্ভুতভাবে বিস্তার লাভ করছে আরও অবাক্ লাগত ওদের যখন দেখত, ওদের আলোচনার গাছে অজানা ফল ফলেছে। চিন্তাকে ওরা কোনও নির্দিষ্ট পথে চালাতে চেষ্টা করত না। সাহায্য করত না তাকে জাফ্রি বেয়ে লতিয়ে উঠতে, ছাঁট-কাট করে সুন্দর করে তোলাও ছিল ওদের কাছে অপ্রয়োজন।

গাছের সেই বাড়তি কাণ্ডের ওপর তিনজনের বৈঠক। পরণে ছেঁড়া পোশাক। বড় বড় চুলগুলো কান ছেঁদিয়ে ছোট করা হয়েছে, চোখের ওপর যাতে ঝুলে না থাকে। বড় দু'জনের আছাঁটা দাড়ি। ওরা জলে বসে দেখে 'ওয়াটার-স্কেটার' মাছ জলের নীচে ...র ভেতর ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঐ যে জলের নীচে নুড়িটা—ওদেরই অলস পায়ের খেলার ছলে তৈরী হয়েছে সেটা। মাথার ওপরে বড় গাছটা দমকা হাওয়ায় নড়ছে, কখনও দু'একটা পাতা খসে পড়ছে—যেন বাদামী রংএর রুমাল উড়ছে। রোবির বয়স এখন পাঁচ বছর মাত্র। ওর কোলের ওপর একটি পাতা পড়তেই ও বলে উঠল, "সাইকামোর খুব ভাল, তাই না?" জ্যাকব পাতাটি তুলে নিয়ে শিরা ছাড়াতে ছাড়াতে বলল, "হ্যাঁ, সাইকামোর খুব ভাল। এ গাছ জলের ধারে জন্মায়, সরস জিনিষ জল পছন্দ করে। আর রুক্ষ জিনিষের জলের সঙ্গে সম্বন্ধ কম। নিরস জিনিষ ভাল নয়।"

জুনিয়াস ওদের কথায় যোগ দিয়ে বলল, "সাইকামোর যেমন ভাল, দেখতেও তেমনি খুব বড়। উপকারী জিনিষ বড় হ'লেই ভাল। ভাল জিনিষ ছোট হ'লে তার বেঁচে থাকাই দায়। বিষাক্ত ছোট জিনিষ, উপকারী ছোট জিনিষকে নষ্ট করে ফেলে। তাই মানুষের চিন্তায় মঙ্গলের প্রতীক হ'ল বিশালত্ব, তেমনি অকল্যাণের প্রতীকগত রূপ হ'ল ক্ষুদ্রত্বের। আমার কথা বুঝতে পেরেছ রোবি?"

"হ্যাঁ, তাই ত হাতী ভাল।" রোবি উত্তর দেয়।

"হাতী অবশ্য কখনও কখনও অনিষ্টকারীও হয়। কিন্তু আমরা যখন হাতীর কথা ভাবি—তার মঙ্গলময় শান্তরূপই কল্পনায় আসে।"

"কিন্তু জল?" জ্যাকব ওদের কথায় যোগ দিয়ে বলে, "জলের কথা ভেবেছ কখনও?"

"না, জলের কথা ত ভেবে দেখি নি।" জুনিয়াস বলল।

তার পর আবার বলল, "ও, বুঝতে পেরেছি তুমি কি বলতে চাও। জল হ'ল জীবনের বীজ। প্রকৃতির তিনটি মূল উপাদানের মধ্যে জল হ'ল বীজ, মাটি আধার বা গর্ভাশয়। আর রৌদ্র, দেহকে গড়ে তোলার ছাঁচ।"

এমনি যত সব বাজে কথা রোবিকে শেখান হ'ত।

স্ত্রী আর ছেলে দু'টির মৃত্যুর পর, লোকেরা জুনিয়াসের আর খবর রাখে না। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার হিড়িকের সময় তার নির্লিপ্ততার গুজব গুঞ্জনে এত ভারী হয়ে উঠেছিল যে কালক্রমে নিজেরই গুরুভারের চাপে ওটা ভেঙে পড়েছিল। সে-সব কথা লোকেরা এখন প্রায় ভুলেই গেছে। মরণোন্মুখ ছেলের শিয়রে বসে বই পড়ে শোনানর কথা ওরা ভুলে গেছে বটে, কিন্তু জুনিয়াস যে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে ক্রমে, সে কথা ভুলতে পারছে না। এমন একটি উর্বর জমির মালিক সে,

তবুও কি না সে রয়ে গেছে তেমনি গরীব? এই উপত্যকার অনেক পরিবারই ত বেশ দু'পয়সা করে নিয়েছে। কারও বাড়ীতে বিদ্যুৎ, কারও রেডিও, গাড়ীও ত রয়েছে দেখা যায়। ওরা না-হোক-করেও সপ্তাহে দু'বার ত মোন্টেরিতে বা সালিনাসে সিনেমা দেখতে যায়। আর জুনিয়াস? নেমেছে অন্ধকারের চরমে। ন্যাকড়া-সার জংলীতে পরিণত হয়েছে সে। পাহাড়ের ঢালুতে জুনিয়াসের চমৎকার জমির কথা মনে হ'লে কার না রাগ হয়? জঙ্গলে আগাছায় ভরে গেছে ওর জমি। ফলগাছের ডাল ছেঁটে দেওয়া হয় নি। চারধারের বেড়া ভেঙ্গে পড়েছে। ওর উঠানে নোংরার স্তূপ। ওর শ্রীহীন ঘরের কথা মনে হ'লেই ত মেয়েরা ঘেন্নায় মরে। ও মেয়ে-পুরুষ সকলেরই ঘৃণার পাত্র। ও নিরভিমানী, অলস বলে ওদের গাত্রদাহ যেন আরও বেশী। কখনও-সখনও প্রতিবেশীরা যেত ওর কাছে। তাদের পরিচ্ছন্নতা দেখে যদি ওর জবুথবু ভাবটা কাটে এই আশা নিয়ে। ওরা গেলে সমপর্য্যায়ের লোক ভেবেই সে ওদের সমাদর করত। ছিন্ন বস্ত্র আর দারিদ্র্যের মধ্যে লজ্জার কিছু আছে তা সে ভাবতেই পারত না। তার কোনও পরিবর্ত্তন হ'ল না দেখে সবাই শেষ পর্য্যন্ত ওকে পরিত্যাগ করল। তার বাড়ীর পথে কেউ আর পা বাড়ায় না। ভদ্র-সমাজ ওকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। ওরা ঠিক করেছে জুনিয়াস যদি যেচেও আসে ওদের বাড়ীতে, অভ্যর্থনা জানাবে না ওকে।

প্রতিবেশীরা যে ওর প্রতি এতখানি বিরূপ, তা ওর ধারণাই ছিল না একেবারে। কিন্তু তাতে তার যায়-আসে না। সে যে পরিপূর্ণ ভাবে সুখী, এটাই চরম সত্য ওর কাছে। জীবনটা তার অসার চিন্তারই মত অবাস্তব, কিন্তু রসাপ্লিষ্ট। রোদে বসে, জলে পা ডুবিয়েই সে পরিতৃপ্ত, নাই বা রইল ভদ্রপোশাক। আর ভদ্র পরিবেশে যাওয়ার জন্য ত ভদ্রপোশাক? তেমন জায়গাই বা কোথায় তার যাওয়ার?

জুনিয়াসকে লোকে ঘৃণা করলেও, তাদের দুঃখ হয় রোবির জন্যে। নোংরা পরিবেশে মানুষ হচ্ছে ছেলেটা। এর পরিণতি কি যে মারাত্মক হবে, এই নিয়ে আলোচনা চলত মেয়েদের মধ্যে। কিন্তু আসলে ওরা ভদ্র, তাই জুনিয়াসের ব্যক্তিগত ব্যাপারে মাথা গলাতে চাইত না।

একদিন মিসেস্ ব্যাঙ্কসের বৈঠকখানায় বসেছে মেয়েদের মজলিস। নানা কথার ভেতর রোবির কথা উঠল। মিসেস ব্যাঙ্কস্ বললেন, "আমাদের ইচ্ছা থাকলেও আমরা এর কি প্রতিকার করতে পারি বলুন? ছেলে ছোট দায় এখন জুনিয়াসের। ওর কোন দায়িত্ব আমাদের নেই। ছ'বছরে পড়লে ও যখন স্কুলে যেতে আরম্ভ করবে তখন ওর ওপর সাধারণের দায়িত্বও কিছুটা অর্শাবে, তখন দেখা যাবে।"

মিসেস এ্যালেন মাথা দুলিয়ে উক্তিটা সমর্থন করলেন। তাঁর চোখে আন্তরিকতার ছায়া। বললেন, "ছেলেটা যে ম্যামি কোয়েকারের তা ভাবতেই কষ্ট হয়। স্কুল যেতে আরম্ভ ত করুক তখন যা হোক সাহায্য করলেই চলবে।"

অন্য একটি মেয়ে বলল, "ছেলেটার জামা-কাপড়ের কোনও অসুবিধা না হয় তখন অন্ততঃ সেটা ত দেখতে হবে নিশ্চয়ই।"

তার পর ব্যাপার দাঁড়াল এমন—আগ্রহ কারও বাধা মানতে চাইল না, ওরা যেন ওৎ পেতে রইল রোবির স্কুল যাওয়া দিনটির জন্য।

এদিকে রোবি ছ'বছরে পড়ল। স্কুলের সিজনও আরম্ভ হ'ল, কিন্তু তবুও রোবি স্কুলের পথ মাড়াল না। তখন স্কুল-পরিষদের করণিক জন্ হোয়াইটসাইড, জুনিয়াস মন্টবিকে এ প্রসঙ্গে চিঠি লিখে পাঠালেন।

চিঠি পেয়ে জুনিয়াস রোবিকে বলল, "কথাটা আমার মনেই পড়ে নি ত। তোমাকে এবার স্কুলে যেতে হবে রোবি।"

"না, আমি যাব না।" রোবি উত্তর দিল।

"তুমি যে যেতে চাও না, তা আমি জানি। তোমাকে জোর করে পাঠাবার ইচ্ছাও আমার নেই। তবে এটা দেশের আইনের ব্যাপার। আইনের নিজস্ব রকমফের রয়েছে, দণ্ড তার হাতে। বেলাগৎ সে আদায় করবেই। আইন ভাঙ্গার আনন্দ আছে ঠিক। কিন্তু শাস্তির বাটখারা দিয়ে আইন সে আনন্দের বাড়তি ঝুঁকিটা টেনে রাখে। এ আইন তবুও ভাল। কার্থেজিনিয়ানদের ভেতর এমন আইনও ছিল যে দুর্ভাগ্যের জন্য শাস্তি পেতে হ'ত। সেনাপতি যদি ভাগ্যবিপর্য্যয়ে পরাজিত হতেন তা হ'লে তাঁর ভাগ্যে আইন মঞ্জুর করত মৃত্যুদণ্ড। ওদেরই বা দোষ দিচ্ছি কেন? দৈবাৎ অনিয়ন্ত্রিত সন্তান যদি জন্মে কারও তা হ'লে আমাদের আইন রেহাই দেয় না তাকে। তফাৎ কোথায় ওদের সঙ্গে আমাদের তা হ'লে।"

কথার তোড়ে চিঠি ভুলিয়ে দিয়েছিল দেখিস? কি

জন্ হোয়াইটসাইড দমবার পাত্র নন। আবার খুব কড়া করে লিখে পাঠালেন জুনিয়াসের কাছে।

চিঠি পেয়ে জুনিয়াস বলল, "দেখ রোবি, তোমাকে যেতে হবে বলেই মনে হচ্ছে। স্কুলে গেলে দেখবে অনেক কাজের কথা শিখতে পাবে।"

"তুমি নিজেই শেখাও না কেন তা হ'লে?" রোবি অনুনয় করে বলে।

"না রে, আমি ওসব ভুলেই গেছি।"

"না, যাব না, আমার শিখে কাজ নেই।"

"কিন্তু কি করি বল্, উপায় ত দেখছি নে।"

শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও রোবিকে স্কুলে যেতে হ'ল। পরণে ওভারঅল, হাঁটুর কাছে ও পেছনটাতে ছেঁড়া। গায়ে কলার-খসা পুরণো একটি নীল কোর্ত্তা। ব্যস্, স্কুলের বেশভূষা ঐ পর্য্যন্ত। জংলী ঘোড়ার মাথার ঝুঁটির মত তার লম্বা চুলের গোছা ক'টা চোখের ওপর ঝুলে পড়েছে।

স্কুল-প্রাঙ্গণে নির্ব্বাক্ ছেলের দল চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। জুনিয়াসের কুঁড়েমি আর দুঃস্থ অবস্থার কথা ছেলেদেরও অজানা নেই। ওরা দিন গুনছিল রোবি এলেই ওর পেছনে লাগবে বলে। কিন্তু ওকে কাছে পেয়ে ওদের মুখে আর রা' ফুটল না। শুধু তাকিয়েই দেখতে লাগল তারা। অনেক কথা বলবে বলে ওরা ভেবে রেখেছিল আগেভাগে—

"অমন অদ্ভুত পোশাক তুমি কোথায় পেলে বল দেখি।"

"দেখ, দেখ, ওর চুলের ছিরি দেখ।"

রোবিকে নির্য্যাতন করতে না পেরে ওরা কেমন যেন মন-মরা হয়ে গেল।

রোবিও ওদের দেখছিল বেশ একটু গম্ভীর চালে। এত ছেলে দেখে ও কিন্তু ভয় পায় নি একটুও।

"তোমরা খেল না? বাবা বলছিল, তোমরা খেলবে আমার সঙ্গে।" রোবি হঠাৎ ওদের জিজ্ঞেস করল।

ওর কথা শুনে ছেলের দল এবার চীৎকারে ভেঙ্গে পড়ল।

"ও বাবা, ও দেখছি খেলতে জানে না।"

"পিউরি খেলাটি ওকে শেখালে মন্দ হয় না", "না, নিগার বেবী'', "আরে না, না, প্রিজনার্স-বেস প্রথম'', "আরে রাম, ও কোনও খেলাই জানে না দেখছি।" ইত্যাদি সব মন্তব্য করতে লাগল ওরা।

কিন্তু একথাটাই ওদের মনে বার বার ঘুরপাক খাচ্ছিল, খেলতে না জানাটা তা হ'লে নিশ্চয়ই চমৎকার জিনিষ। কেন এমন কথা ওদের মনে হচ্ছিল তা ওরা নিজেরাই জানে না। রোবিকে দেখে মনে হ'ল ও যেন কি ভাবছে। সে শুধু এক মুহুর্ত্তের চিন্তা, মন ঠিক করে নিয়ে সে বলল, "পিউরি খেলাটিই পয়লা খেলা যাক্।'' রোবির কাছে খেলাটা নতুন। খেলতে গিয়ে রোবির আনাড়িপনা ধরা পড়ল। খুদে শিক্ষকের দল ওকে ক্ষেপাবার সুযোগ পেয়েও, ক্ষেপাতে চাইল না। বরং পিউরি ঠিক্ কি করে ধরতে হয় তা শেখাবার অধিকারের গৌরব কে নেবে এই নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল ওদের ভেতর। পিউরি খেলার রকমারি কায়দা। রোবিকেই অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত নিজের পছন্দমত একজন উপদেষ্টাকে বেছে নিতে হ'ল।

কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল, রোবি স্কুলের ছেলেদের ওপর অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করেছে। বড় ছেলেরা ওর আওতার বাইরে রইল বটে, কিন্তু ছোটরা সর্ব্বতোভাবে ওর অনুকরণ করতে আরম্ভ করল। এমন কি অনেকেই রোবির মত করে ওভার অলের হাঁটুর কাছটা ছিঁড়ে ফেলল। লাঞ্চের সময় হ'লে ওরা স্কুলের দেয়ালের দিকে পেছন ফিরে রোদে বসত। তারপর চলত গল্প। রোবি ওদের কাছে ওর বাবার গল্প বলত, সাইকামোর গাছের কথা বলত। গল্প শুনে ওরা ভাবত, ওদের বাবাও যদি এমনি কুড়ে হ'ত আর ওদের যদি বকা-ঝকা না করত, তা হ'লে কি ভালই না হ'ত।

এমনও কখন হয়েছে যে বাবার নিষেধ না মেনেই ওরা লুকিয়ে মন্টবি বাড়ীতে গেছে দেখতে।

সাইকামোর গাছের প্রতি জুনিয়াসের আকর্ষণ চিরদিনের। ছেলেরা যেতেই জুনিয়াস ওদের নিয়ে গিয়ে বসেছিল সাইকামোরের ওপর। ওদের দুপাশে বসিয়ে, আরম্ভ করে দিয়েছিল গল্প—যুদ্ধের গল্প, ট্রাফলগারের যুদ্ধ, 'গল্'দের সঙ্গে যুদ্ধ। কোনও দিন বা 'ট্রেজার আইল্যাণ্ড' পড়ে শোনাত ওদের।

কালক্রমে রোবি হয়ে দাঁড়াল স্কুল প্রাঙ্গণের প্রধান পাণ্ডা। যত সব ঝগড়া-ঝাঁটি, রোবিই তার মীমাংসা করে দিত। ছেলেরা সব যার-যা-খুশি আদুরে নামে ওকে ডাকতে আরম্ভ করল। ওদের মধ্যে সমকক্ষ কেউ নেই যে নেতৃত্ব নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। নিজের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে রোবিও ক্রমে সচেতন হয়ে উঠেছিল। ওর যেমন ছিল আত্মপ্রত্যয় তেমনি পরিণত বুদ্ধি, সেজন্য ছোটরা নেতা বলে ওকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল।

কোন্‌ খেলা খেলতে হবে রোবিই বলে দিত। বেস্‌বল খেলায় তাকেই আম্পায়ার হ'তে হ'ত। কারণ রোবি ছাড়া অন্য কারও রুলিং ছেলেরা বিনা আপত্তিতে মানতে রাজী নয়। এমনও বহুবার হয়েছে যে, অন্য কোনও আম্পায়ার রুলিং দিয়েছেন কিন্তু তা নিয়েই দু'দলে খণ্ড যুদ্ধ হয়ে গেছে। রোবি নিজে ভাল খেলতে জানে না, ভুল-ভ্রান্তিও করে, অথচ খেলার নিয়ম-নীতি কি হওয়া উচিত বা উচিত নয় তা নির্ধারণের ভার তারই ওপর আবার পড়ে।

জুনিয়াস আর জ্যাকবের সঙ্গে আলোচনা করে রোবি একদিন দু'টি নতুন খেলা তৈরি করে ফেলল। ছেলেদের কাছে খেলা দু'টি খুব প্রিয় হয়ে উঠল। একটি খেলার নাম হ'ল 'স্নিকিং কোয়েটি'—স্থানীয় 'খরগোস আর কুকুর' খেলারই রূপান্তর। অন্যটির নাম 'ব্রোকেন লেগ,' পা-ভাঙ্গা খেলা। এটি 'ছোটা আর ছোঁওয়া' খেলারই উন্নত সংস্করণ আর কি।

স্কুল-প্রাঙ্গণে এই ছেলেটি যেমন সকলের আগ্রহ জাগিয়েছিল, ক্লাসেও রোবি তেমনি শিক্ষিকা মিস্‌ মোরগানের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সে রিডিং পড়ত চমৎকার। কথা-বার্ত্তায় বড়দের মতই শব্দ ব্যবহার করত। কিন্তু লিখতে পারত না। সংখ্যাজ্ঞানও তার ভালই ছিল। যত বড় সংখ্যাই হোক না কেন, চিনতে অসুবিধা হত না। কিন্তু অঙ্ক নিয়েই তার যত মুস্কিল। অঙ্ক তার ভাল লাগত না। লেখা শিখতেও তাকে কম বেগ পেতে হয় নি। লিখতে গিয়ে ওর হাত কেঁপে যেত—বেঁকে যেত সব লেখা কিস্তুতকিমাকার ভাবে। ব্যাপার দেখে মিস্‌ মোরগান বললেন, "একটি কথাই বার বার লিখতে থাক। ভাল করে আয়ত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত চলবে এমনি মক্স করা। প্রত্যেকটি হরফই খুব যত্ন করে লিখবে।"

বহুক্ষণ স্মৃতি মন্থন করে রোবি তার মনের মত একটি কথা খুঁজে পেল। লিখল,—'ওটা যতই ভয়ঙ্কর হোক, বিশ্বাস আমাদের করতেই হবে'। এই ভয়ঙ্কর শব্দটি তার খুব প্রিয়। শব্দটি ভীষণের ভীষণত্ব প্রকাশে একটি বলিষ্ঠ আঙ্গিক। যদি কোনও শব্দের এমন ক্ষমতা থাকে যে তার ধ্বনিগত হুঙ্কারে লুক্কায়িত কোনও দৈত্যকে পাতাল থেকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আসার, তবে রোবির মতে সেই শব্দটি হ'ল 'ভয়ঙ্কর'। বার বার সে এই একটি কথাই লিখল। বিশেষ করে 'ভয়ঙ্কর' কথাটা লিখল খুব যত্ন করে।

ঘণ্টার শেষে মিস্‌ মোরগান এলেন ছাত্র তার লেখায় কতখানি পোক্ত হয়েছে দেখতে। লেখা দেখে অবাক্‌ হয়ে তিনি বললেন, "এ কি রবার্ট, এমন অদ্ভুত কথা তুমি পেলে কোথায়?"

"কেন, ষ্টিভেনসনের লেখা থেকে। আমার বাবার ত এসব মুখস্থ।"

মিস্‌ মোরগান জুনিয়াসের অনেক নিন্দাই শুনেছেন এতদিন ধরে। এবার রবার্টের কথায় ওঁর ধারণা একটু অন্য রকম হ'ল। এবং জুনিয়াসকে দেখার প্রবল আগ্রহ মনে দেখা দিল।

এদিকে স্কুল-প্রাঙ্গণে খেলার হুল্লোড়টাও ক্রমে নেতিয়ে এল। পুরনো হয়ে গেছে খেলা সব। এক-দিন স্কুলে যাওয়ার আগে রোবি এই আফশোষের কথাটা তার বাবাকে জানাল। জুনিয়াস কিছু সময় চিন্তা করে বলল, "স্পাই খেলাটা ভাল। ছোট বেলায় এ খেলাটা আমার বেশ ভাল লাগত।"

"গোয়েন্দাগিরি? কিন্তু কার ওপর করব বলে দাও"

"যার ওপর তোমাদের খুশি। আমরা সে সময় ইটালিয়ানদের ওপর করতাম।"

আনন্দে নাচতে নাচতে রোবি চলল এবার স্কুলে। সেদিনই গুপ্তচর সমিতির গোড়াপত্তন হয়ে গেল। সারা বিকেলটা অভিধান খুঁজে খুঁজে সমিতিটির মস্ত এক নাম-করণ করল রোবি। বি, এ, এস, এস, এফ, ই, এ, জে, —মানে বয়েজ অক্সিলিয়ারি সিক্রেট সার্ভিস ফর এস্‌-পিওনেজ এগেনস্ট জাপান (জাপানের বিরুদ্ধে গুপ্তবার্ত্তা সংগ্রহকারী সহকারী বাল-সমিতি) নামের যা বহর! নামটা যদি শুধু বাক্‌সর্ব্বস্বই হয়, তা হ'লেও এই নামের ভেতর যে মহৎ অর্থ রয়েছে তার শক্তিটা যে প্রচণ্ড, সে কথা অস্বীকার করা চলে না।

স্কুল-প্রাঙ্গণের শেষ প্রান্তে যেখানে উইলো গাছের স্নিগ্ধ সবুজ ছায়া পড়েছে, সেখানে রোবি গিয়ে বসল। তারপর ডেকে পাঠাল সমিতির সভ্যদের এক-একজন করে। গোপনে তাদের শপথ নিতে হ'ল। এমনই সাঙ্ঘাতিক সে প্রতিজ্ঞা যে, সত্যিকারের যে কোনও গুপ্তচর সমিতি যে এমন প্রতিজ্ঞায় গৌরব বোধ করত, এতে সন্দেহ নেই। প্রথম পর্ব্ব শেষ হ'লে সকলে আবার এক সঙ্গে জড়ো হ'ল; রোবি বলতে লাগল ওদের উদ্দেশ করে:

"আমার কাছ থেকে জেনে রাখ, জাপানীদের সঙ্গে

আমাদের একদিন যুদ্ধ বাধবেই। সেদিনের জন্ত আমাদের এখন থেকেই তৈরী হ'তে হবে। আমাদের যোগ্য হ'তে হবে। জাপানীদের ঘৃণ্য কার্য্যকলাপের খোঁজ রাখতে হবে। যুদ্ধ বাধলে আমাদের সংগৃহীত তথ্য অনেক কাজে লাগবে, একথা আমি তোমাদের জানিয়ে রাখছি।"

সমিতির সভ্যরা রোবির এই গুরুগম্ভীর ভাষণের দাপটে ঘায়েল হ'ল। এমন গুরুতর ব্যাপারে ভাষা যে গম্ভীর হবে এতে আর আশ্চর্য্য কি? তার পর থেকেই চরবৃত্তির কাজ খুব জোর চলল। ছোট্ট টাকাশী ক্যাটো তৃতীয় পর্য্যায়ে পড়ে। ও বেচারাই মুশ্‌কিলে পড়ল। পেছনে লাগল চরের দল। টাকাশী যদি দৈবাৎ ছুটো আঙ্গুল তুলেছে কোন কারণে ত অমনি দেখা যাবে যে, রোবি তাকাচ্ছে তার সমিতির সভ্য কোনও একজনের দিকে—চোখে তার ইশারা। আর সঙ্গে সঙ্গে সভ্যটি তার গোটা হাতটাই শূন্যে ছুঁড়ে আস্ফালন সুরু করে দিয়েছে, পাল্টা আক্রমণের ভঙ্গিতে। টাকাশী যখন বাড়ী ফেরে, তখন কম্‌সে কম পাঁচটি ফেউ চলে রাস্তার পাশে ঝোপের আড়ালে আড়ালে ওর ওপর নজর রেখে। একদিন এমন হ'ল, টাকাশীর বাবা দেখলেন, একটি সাদা মুখ জানলা দিয়ে উঁকি দিচ্ছে। তখন রাত হয়েছে। অমনি তিনি তাঁর গাদা-বন্দুকের গুলী ছুঁড়লেন অন্ধকারে। এ ঘটনার পরই একদিন গুপ্ত সমিতির অধিবেশন হ'ল। রোবি জানাল সন্ধ্যার পর আর চরবৃত্তি করা চলবে না। কারণ সন্ধ্যার পর সত্যিকারের কোনও কাজই হয় না। আসল কথাটা কিন্তু সে গোপন করল।

টাকাশীকে অবশ্য খুব বেশী দিন ভুগতে হ'ল না। প্রমোদ-ভ্রমণে সমিতির সভ্যরা মাঝে মাঝে যেত। মুশ্‌কিল হ'ত তখন। জাপানী টাকাশীর নজর-বন্দীর ভার নিতে কেউ রাজী হ'ত না সেদিন। টাকাশীকে সঙ্গে নেওয়া হ'ত না, কাজেই পাহারাদার গোয়েন্দাকেও ওর জন্যে থেকে যেতে হ'ত। আনন্দের সুযোগ কেই বা ছেড়ে দিতে রাজী হবে।

কিন্তু সমিতির সভ্যদের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল একদিন। টাকাশী গুপ্ত-সমিতির সভ্য হওয়ার জন্ত বায়না ধরেছে। গুপ্ত-সমিতির গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে গেল শেষে?

রোবি ওকে বোঝাতে লাগল, "তা কেমন করে হয় বল টাকাশী? তুমি যে জাপানী। আর জাপানীদের আমরা ঘেন্না করি, তা ত জান?"

টাকাশীর চোখ ছল ছল ক'রে উঠল, বলল—"আমি জাপানী হ'তে যাব কেন? আমি এখানে জন্মেছি—এই আমেরিকাতে—আমি ত আমেরিকান।"

রোবি চিন্তায় পড়ে গেল। টাকাশীর উপর শক্ত হ'তে পারল না। মায়া হ'ল। কপাল তার কুঁচকে উঠল চিন্তায়। একটু পরেই কপালের রেখা মিলিয়ে গেল—সমস্যার সমাধান হয়েছে। বলল, "আচ্ছা, তুমি জাপানী ভাষা বলতে পার ত?"

"বেশ ভাল পারি।"

"তা হ'লে ঠিক আছে। তোমাকে দিয়ে দোভাষীর কাজ হবে। যে-সব গোপন খবর পাওয়া যাবে তার অর্থ তোমাকে বলে দিতে হবে।"

টাকাশী খুশিতে ঝলমল করে উঠল। "নিশ্চয়ই। তোমরা যদি বল ত বাবির ওপর গোয়েন্দাগিরি করতেও রাজী আছি আমি।"

কিন্তু ওর কথায় কেউ সায় দিল না। কে আবার মিঃ ক্যাটোর গাদাবন্দুকের পাল্লায় যেতে রাজী হয়?

এদিকে হলোউইনের উৎসব রজনী চলে গেছে। ধন্তবাদ দেওয়ার পালাও শেষ, এরই মধ্যে রোবির প্রভাব ছেলেদের ওপর আরও প্রবল হয়েছে। ওদের কথাবার্ত্তার ধরণ বদলেছে, আর ভাষায় প্রচুর নতুন শব্দের আমদানী হয়েছে। তারপর জুতো বা যে কোনও ভাল পোশাকের প্রতি ওদের বিজাতীয় ঘৃণা ওর প্রভাবের আর একটা বড় প্রমাণ। যদিও অভিনব কিছু নয়, রোবি একটা নতুন ষ্টাইল সৃষ্টি করে ফেলেছে। এ কথাটা রোবির নিজের কাছে অজানা থাকলেও সে যে ষ্টাইলের স্রষ্টা, কথাটা সত্যি। ছেলেদের ধারণা যে ভাল পোশাকে পৌরুষের অভাব প্রকাশ পায়। তার চেয়ে বড় কথা, হয়ত ওদের মনের কথা, এতে রোবির প্রতি অশ্রদ্ধা দেখান হয়।

সেদিন শুক্রবার। রোবি বিকেলে পর পর ১৪ খানা চিঠি লিখে ফেলল। চিঠিগুলির কথা ও ভাষা এক। ১৪ জন সমিতি-সভ্যের ভেতর বিলি করা হ'ল সেগুলো অত্যন্ত গোপনে। চিঠিতে জানান হ'ল—"কাল বেলা দশটায় রেড ইণ্ডিয়ানরা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে খুঁটিতে বেঁধে পুড়িয়ে মারার মতলব এঁটেছে। ঘটনাটা আমাদের বাড়ীর কাছে ঘটবার সম্ভাবনা। সন্ধানে থাকবে। আমাদের বাড়ীর নীচের মাঠে অপেক্ষা করবে। সময় হ'লেই সকলে হাঁক ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠবে,

তখন আমি তোমাদের এগিয়ে নিয়ে যাব। তারপর বেচারা প্রেসিডেন্টকে উদ্ধার করব আমরা।"

অনেক দিন ধরেই মিস্ মোরগান, জুনিয়াস মন্টবির সঙ্গে দেখা করবেন বলে মনে মনে ভাবছিলেন। জুনিয়াস সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত কথাই তিনি আগে শুনেছেন, বিশেষ করে এবার রোবির সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর আগ্রহ তাঁর আরও বেড়েছে। তারপর ছেলেরা আবার মাঝে মাঝে এমন সব চমকপ্রদ খবর দিত, তাতে বিস্মিত না হয়ে পারতেন না তিনি। একদিন ক্লাসের এক বোকা ছেলে জানাল যে হেন্‌জেষ্ট আর হোরসা নাকি ব্রিটেন আক্রমণ করেছে। এ খবর সে কোথায় পেয়েছে জিজ্ঞেস করা হ'লে ও বলল, এই গোপনীয় খবরটা জুনিয়াস মন্টবির কাছে পাওয়া গেছে। মন্টবির ছাগলের গল্পটাও এই মহিলা ভুলতে পারেন নি এখনও। গল্পটা তাঁর এতই ভাল লেগেছিল যে, তিনি গল্পটি লিখে কয়েকটি পত্রিকায় ছাপতে পাঠিয়েছিলেন, যদিও কোনও পত্রিকাই গল্পটি ছাপে নি।

ডিসেম্বর মাসের শনিবার। ঘুম থেকে জেগে উঠেই মিস্ মোরগান দেখেন, আকাশ রোদে ঝল্‌মল্ করছে। বাতাসে তুষার কণিকা। প্রাতরাশ সেরে গায়ে কার্ডারি স্কার্ট চাপালেন তিনি। তারপর হাইকিং বুট পরে বেরিয়ে পড়লেন ঘর থেকে। গোষ্ঠ রাখাল কুকুর ক'টা শুয়ে ছিল বাড়ীর উঠোনে। সঙ্গে নেওয়ার চেষ্টা করলেন একটিকে। ওরা লেজ নেড়ে আদর জানাল বটে—কিন্তু রোদে শুয়ে থাকার আরামটুকু ছেড়ে যেতে চাইল না কেউ।

দুই পাহাড়ের মাঝখানে ছোট-উৎরাইটির নাম প্যাটো এমারিলো। এখান থেকে প্রায় দুই মাইল দূরে। মন্টবির বাড়ী সেখানে। রাস্তার ধার দিয়ে নদী চলেছে। এ্যালডার গাছের নীচে সোর্ড-ফার্ণের ঝোপ তেজী হয়ে উঠেছে। সূর্য এখনও পাহাড়ের মাথা নাগাল পায় নি। তাই উৎরাইয়ের ভেতরটাতে রোদ না পড়ায় এখনও খুব ঠাণ্ডা। যেতে যেতে মিস্ মোরগানের মনে হ'ল, কারা যেন সামনে চলেছে—কাদের কথা আর পায়ের শব্দ যেন শোনা যাচ্ছে। পা চালিয়ে গেলেন তিনি। কিন্তু মোড় ঘুরে কাউকে দেখতে পেলেন না। পথের ধারে ঝোপঝাড়ে শুধু মাঝে মাঝে কুটকাট শব্দ হচ্ছে।

মিস্ মোরগান আগে কোন দিন এদিকে আসেন নি। কিন্তু একটি ক্ষেতের ধারে আসতেই তিনি বুঝতে পারলেন, এটা মন্টবির জমি। গুল্ম-লতার প্রচণ্ড চাপে জমির প্রান্ত বেড়া মাটিতে গা এলিয়ে দিয়েছে। আগাছায় ভরা জঙ্গলের ভেতর থেকে ফলগাছের ফলহীন শাখা দিগন্তে বিস্তৃত হয়ে আছে। জংলী ব্ল্যাক বেরির লতা আপেল গাছের ওপর লতিয়ে উঠেছে। কখনও মিস্ মোরগানের পায়ের কাছে খরগোস আর কাঠবিড়ালী এসে ছিটকে পড়ছে। কোমলকণ্ঠী ঘুঘু তার পাখায় শিস্ তুলে কখনও উড়ে যাচ্ছে। ওদিকে একটি বন্ধ পিয়ার গাছের উপর একদল ব্লু জে পাখী তর্কের কলতান তুলেছে। ঐ যে বরফ থেবড়ানো এল্‌ম্ গাছের জোব্বা কোটের ওপর ভোরের আলো ঝলমল করছে, তারই ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে মন্টবি-বাড়ীর শেওলা-ঢাকা থাক-কাটা কাঠের ছাদ। নিস্তব্ধ প্রশান্তি চারিদিকে। মনে হয় যেন শতাব্দী ধরে এই স্থানটি জনশূন্য হয়ে এমনি পড়ে আছে। কেমন যেন এলিয়ে-পড়া অগোছাল মালিন্য—কিন্তু কি অদ্ভুত সুন্দর খাপছাড়া এই শিথিল ব্যতিক্রম। গেটের খামের গায়ে লোহার পাতের ওপর কবাটটি আলগা হয়ে ঝুলে আছে। মিস্ মোরগান গেট পার হয়ে উঠোনে ঢুকলেন। গোলাবাড়ীর ঘরগুলি বহুদিনের রৌদ্রে-ঝড়ে বিবর্ণ হয়ে পড়েছে। ঘরের আড়াল কাটিয়ে মোড় ঘুরতেই মিস্ মোরগান থমকে দাঁড়ালেন। বিস্ময়ে তাঁর মুখ বিস্ফারিত হ'ল। শিরদাঁড়ায় জাগল হিম-কণ্টক অনুভূতি। উঠোনের মাঝখানে খুঁটিতে দড়ি দিয়ে কষে বাঁধা একটি লোক। লোকটি বৃদ্ধ। পোশাক জীর্ণ। আর একটি রোগা ধরণের অপেক্ষাকৃত কম বয়েসের লোক ওর পায়ের কাছে শুকনো খড়কুটো জড়ো করছে। এর পোশাক আবার ততোধিক জীর্ণ। মিস্ মোরগান ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কোন রকমে ঘরের আড়ালে ফিরে গেলেন। অসম্ভব, এ হ'তেই পারে না। একেবারে অবিশ্বাস্য, স্বপ্ন। দাঁড়িয়ে এমনি যখন তিনি ভাবছেন, শুনতে পেলেন লোক দু'টি কথা বলছে। কিন্তু ওদের কথা-বার্তার ধরণ ধারণ-বেশ নম্র বলেই তাঁর মনে হ'ল।

"দশটা ত প্রায় বাজতে চলল।" উৎপীড়নকারী লোকটি বলল।

"তা হবে।" বন্দী উত্তর দিল, "তোমাকে কিন্তু খুব সাবধান হ'তে হবে। যখন দেখবে ওরা কাছে এসে পড়েছে, তখনই আগুন দেবে, এর আগে নয়।"

মিস্ মোরগান স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। দুর্বল পায়ে তিনি এগিয়ে গেলেন ওদের দিকে।

উৎপীড়নকারী ওঁকে দেখতে পেয়ে অবাক্ হয়ে চেয়ে রইল স্থিরদৃষ্টিতে। কিন্তু মুহূর্ত্তের ভেতরই সামলে নিয়ে মিস্ মোরগানকে মাথা নুইয়ে অভিবাদন করল। জট-পাকানো দাড়ি তায় আবার ছেঁড়া পোশাক, এমন একটি লোকের অভিবাদন পেয়ে তিনি কৌতুকবোধ করলেন। কৌতুককর হ'লেও এর ভেতরে যে মাধুর্য্য আছে এবং তাও যে কম আকর্ষক নয়, একথা মনে মনে স্বীকার করলেন মিস্ মোরগান।

"আমি এখানকার স্কুলের শিক্ষিকা, এদিক্ দিয়েই বেড়াতে যাচ্ছিলাম। আপনাদের এই ব্যাপারটা হঠাৎ দেখে খুব গুরুতর মনে হয়েছিল কিন্তু প্রথমে।" এক নিঃশ্বাসে বক্তব্য শেষ করলেন মিস্ মোরগান।

কৃশতর লোকটি হেসে বলল, "গুরুতর মানে? খুবই গুরুতর। আমি ভেবেছিলাম আপনি মুক্তি-ফৌজের একজন। ওদের দশটায় আসার কথা ছিল কি না?"

এমন সময় হুক্কা হুয়া রব উঠল বাড়ীর নীচে উইলো গাছের আড়াল থেকে।

"ঐ যে রক্ষীদল এসে গেছে।" উত্তর দিল সেই লোকটি আবার, "মাপ করবেন আমায়, মিস্ মোরগান। আমার নাম জুনিয়াস মন্টবি। আর ঐ যে ভদ্রলোক, নাম জ্যাকব ষ্ট্রজ। আজ কিন্তু তিনি ইউনাইটেড ষ্টেটসের প্রেসিডেন্ট। রেড ইণ্ডিয়ানরা ওঁকে পুড়িয়ে মারবে বলে বেঁধে রেখেছে। প্রথমে ভেবেছিলাম ওঁকে গুনেভিয়ার সাজলেই ভাল মানাবে। কিন্তু এখন দেখছি চেহারা জাঁদরেল না হ'লেও প্রেসিডেন্টই ভাল মানিয়েছে ওঁকে। ঠিক বলছি না? তা ছাড়া স্কার্ট পরতে রাজী হ'ল না ও।"

"যত সব বাজে বোকামি।" প্রেসিডেন্ট আত্ম-তৃপ্তিতে গুলজার হয়ে বললেন।

ওর কথা শুনে মিস্ মোরগান হেসে উঠে বললেন, "উদ্ধারকার্যটা তা হ'লে দেখতে পারি কি মিঃ মন্টবি?"

"আমি মিষ্টার মন্টবি নই। আমি রেড ইণ্ডিয়ান। তাও একজন নই—তিনশ' জন।"

শেয়ালের চীৎকার আবার শোনা গেল।

"সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যান।" তিনশ' রেড্ ইণ্ডিয়ান হাঁক ছেড়ে বলল। "ওখানেই আপনি নিরাপদ্ থাকবেন। এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে আপনাকে রেড ইণ্ডিয়ান মনে করে মেরে ফেলতে পারে।"

ডালগুলো ভয়ানক নড়ছে। সে ট্রাউজারে ঘসে একটি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালল, তারপর প্রেসিডেন্টের পায়ের কাছে জড়োকরা জঞ্জালে আগুন ধরিয়ে দিল। আগুন যখন লাফিয়ে উঠতে সুরু করেছে—দেখা গেল উইলো গাছগুলো খান্ খান্ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। গাছের ছড়িয়ে পড়া অংশগুলি আর কিছু নয়, এক-একটি ছেলে। চীৎকার করতে করতে ওরা ছুটে আসছে। যুদ্ধ-সাজে সজ্জিত সব, তবে একটু অবিন্যস্ত—কিন্তু আক্রমণ সুতীব্র, যেন ফরাসীরা বাস্টিল আক্রমণ করেছে প্রচণ্ড বিক্রমে। আগুন যখন প্রেসিডেন্টকে প্রায় ঘিরে ফেলেছে, ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ে, পা দিয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে আগুন নিবিয়ে দিল। তারপর প্রেসিডেন্টের বন্ধন মুক্ত করা হ'ল। পরের অনুসঙ্গ ঘটনাও বড় কম চমকপ্রদ নয়। প্রেসিডেন্টকে অভিবাদন করতে ছেলেরা সব সার-বেঁধে দাঁড়াল। প্রেসিডেন্ট প্রত্যেকের ওভারঅলের বুকে একটি করে সীসার শামুক এঁটে দিলেন—তাতে খোদাই করা রয়েছে 'বীর', এই একটি কথা।

এবার রোবি ঘোষণা করল, "যারা এই জঘন্য ষড়যন্ত্রের জন্য দায়ী, সামনের শনিবারে তাদের ফাঁসি দেওয়া হবে।"

সৈন্যেরা চীৎকার করে বলল, "না, তা হবে না। ওদের আমরা এখনই ফাঁসি দেব।"

"তা হয় না ভাই।" রোবি ওদের বুঝিয়ে বলল, "ফাঁসির মঞ্চ তৈরির কাজ ত রয়ে গেছে। ওটা আগে ত হবে, তারপর।" রোবি তার বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার মনে হয়, তোমাদের দু'জনকেই ফাঁসি দেওয়া উচিত।" বলেই মিস্ মোরগানের দিকে একবার চোখ তুলে দেখল। ওর দৃষ্টিতে আগ্রহ। কিন্তু কি ভেবে মিস্ মোরগানকে শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই ও অব্যাহতি দিল।

সেদিন বিকেলটাও মিস্ মোরগানের বেশ ভালই কাটল। সসম্মানে ওঁকে সাইকামোর গাছের ওপর বসানো হয়েছিল। ছেলেরাও সেদিন তাঁকে শিক্ষিকা বলে ভয় পাচ্ছিল না একটুও।

রোবি ওঁকে বলেছিল, "পায়ের জুতো খুলে বসুন, ভাল লাগবে।" ওর কথায় মিস্ মোরগান জুতো খুলে নদীর জলে পা ডুবিয়ে বসতেই সত্যি ওঁর খুব ভাল লাগছিল।

জুনিয়াস সেদিন ওদের কাছে নরখাদক এন্থ্যুনিয়ান ইণ্ডিয়ানদের গল্প বলেছিল। তারপর ন্যাসুডিয়োনিয়ানদের কথা বলতে গিয়ে থার্মোপলির যুদ্ধের গল্প ওদের শোনাল।

যখন ওরা কেশ-বিন্যাসে ব্যস্ত এমন সময় ওরা আক্রান্ত হয়ে প্রাণ দিয়েছিল। আরও সব অদ্ভুত কাহিনী ওদের শুনিয়েছিল সেদিন। ম্যাকারুনীর জন্ম-কথা। তামা আবিষ্কার। তামা আবিষ্কারের বর্ণনা এমন ফলাও করে দিল যে, গল্প শুনে মনে হ'ল ও নিজেই যেন আবিষ্কারকদের একজন। এর পরই ইডেন গার্ডেন থেকে মানব-যুগলের বিতাড়ন-পর্ব নিয়ে ওর সঙ্গে জ্যাকবের মতান্তর হ'তেই ছেলেরা বাড়ী যাওয়ার জন্য উঠে পড়ল। মিস্ মোরগানও ওদের সঙ্গে চললেন বাড়ীর পথে। তিনি পেছনে রইলেন, ওদের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে। কারণ একান্তে এই অদ্ভুত লোকটির কথা ভাবতে তাঁর ইচ্ছা হচ্ছিল।

স্কুল কমিটির সদস্যেরা স্কুল পরিদর্শনে আসবেন। যেমন ছাত্রেরা তেমনি শিক্ষাদাত্রীও সশঙ্কিত থাকেন সেদিন। উদ্যোগ-পর্বে মানসিক উদ্বেগ ত আছেই—পড়া মুখস্থ করার ব্যাকুল ব্যস্ততা। সেদিন বানান ভুল করা ত একটি মহা অপরাধ। কিন্তু মজা এই, এমনি দিনেই ছেলেরা করে যত সব মারাত্মক ভুল, যা এমনিতে করে না। কাজেই শিক্ষিকার অবস্থাটা হয়ে ওঠে ওদের সঙ্গে ততোধিক করুণ।

১৫ই ডিসেম্বরের পড়তি বেলায় স্বর্ণচারণিকার স্কুল সদস্যেরা এলেন স্কুল পরিদর্শনে। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর এলেন পরিদর্শকরা—গম্ভীর যেন শব-যাত্রীর দল। সকলের প্রথম জন হোয়াইটসাইড, করণিক, শ্বেতকেশ বৃদ্ধ। শিক্ষা-বিষয়ে উদারপন্থী। সেজন্য বিরুদ্ধ সমালোচনাও তাকে শুনতে হয় অনেক। তারপর প্যাট্ হামবার্ট। নিরিবিলি মানুষ। লোকের সঙ্গে মিশতে জানেন না। কিন্তু সাধারণের সঙ্গে যোগাযোগের কোন সুযোগ উপস্থিত হ'লে তা ছাড়েন না। তাই সদস্য নিযুক্ত হওয়ার সুবর্ণ সুযোগটি তিনি ছাড়তে পারেন নি। পোশাকে তাঁর ওয়াশিংটনের ব্রোঞ্জ মূর্তির পোশাকের কাঠিন্য—একটা খাপছাড়া অসঙ্গতি।

পরবর্তী জন টি. বি. এ্যালেন। সবে ধন নীলমণি, তিনিই একমাত্র ব্যবসায়ী সেখানকার। সেই দাবিতেই সদস্যপদ পেয়েছেন তিনি। তাঁর পেছনে রেমণ্ড ব্যাঙ্কস, দীর্ঘদেহী, বেশ হাসিখুশী। মুখে রক্তিম আভা। সকলের শেষে রয়েছেন বার্ট মনরো—এবারই প্রথম তিনি নির্বাচিত হয়েছেন। নতুন বলে চলার ভঙ্গিতে জড়িমা। সকলে ঘরের সামনের দিক্‌টাতে গিয়ে বসলে, এলেন ওঁদের সহ-ধর্মিণীরা। এঁদের বসার স্থান হয়েছে পেছনের দিক্‌টাতে, মাঝখানে পড়ুয়ার দল। সামনে-পেছনে প্রহরী, মনে ওদের আতঙ্ক উপস্থিত হ'ল। পালানোর পথটুকুও যেন আগেভাগে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ভয়ে ভয়ে ওরা মহিলাদের দিকে তাকায়—ওঁদের ঠোঁটে হাসি, যেন একটু করুণা-মিশ্রিত। মিসেস মনরোর কোলে প্রকাণ্ড একটা কাগজের বাণ্ডিল দেখে ওরা অবাক্ হয়ে ভাবল, ওতে আবার কি রয়েছে কে জানে।

স্কুল বসল। ঠোঁটে শুকনো হাসি টেনে মিস্ মোরগান বলতে লাগলেন, "এখন ছেলেদের পড়া নেওয়া হবে, রোজকার মত। আমার ধারণা এতে আপনারা আনন্দ পাবেন।" কিন্তু কিছুক্ষণ ক্লাস চালানোর পর—ওঁর মনে হ'ল, নিজে যেচে এঁদের সামনে পাঠনের দায়িত্বটা না নিলেই ভাল হ'ত। ছেলেগুলো যেন কি? এমন হাঁদা সব। এমন দুর্ভোগেও পড়ে মানুষ? একেবারে বেকুব ব'নে গেছেন তিনি। কিছু জিজ্ঞেস করলে মুখই খুলতে চায় না ওরা। আর যদি বা কখনও খোলে ত এমন সব ভুল উত্তর দেয়, যার চারা হয় না। যেমন কদর্য বানান, তেমনি অদ্ভুত রিডিং পড়া—যেন পাগল বিড় বিড় করে প্রলাপ বকছে। সদস্যেরা গম্ভীর হ'তে চেষ্টা করছেন—কিন্তু ছেলেদের তালগোল পাকানো দেখে আর হাসি চেপে রাখতে পারছেন না। মিস্ মোরগান ত ঘেমে অস্থির। এবার নির্ঘাত চাকুরি যাবে, ওঁর মনের কোণে অস্বস্তি। তারপর গণিতশাস্ত্র চটকিয়ে যখন হাস্যরসের পিণ্ডি তৈরি করা হ'ল তখন জন হোয়াইটসাইড মিস্ মোরগানকে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, "এবার আমি ছেলেদের দু'একটা কথা বলব। তারপর ছুটি।"

মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে মিস্ মোরগান বললেন, "ভয়ে ভয়ে ওরা আজকের পড়া ভণ্ডুল করেছে। অন্যদিন ওরা অত ভুল করে না।"

জন হোয়াইটসাইড হাসলেন। অভিজ্ঞ লোক তিনি। স্কুল পরিদর্শনের দিনে শিক্ষকরা যে ভড়কে যান, একথাটা তাঁর জানা আছে। বললেন, "ছেলেরা পারে না বলেই ত স্কুলের ব্যবস্থা, তা না হ'লে ত স্কুলের দরকারই হ'ত না।" ছেলেদের উপদেশ দিলেন—ওরা যেন ভাল করে পড়াশোনা করে আর দিদিমণিকে ভালবাসে। পাঁচ মিনিটের সংক্ষিপ্ত ভাষণ। কথাগুলি কলেটেপা মেশিনের মত অনর্গল বলে গেলেন—বছর বছর একই কথা বলে বলে মুখস্থ হয়ে গেছে তাঁর। বড় ছেলেরা ত আরও অনেক বার শুনেছে তাঁর এ ভাষণ। ভাষণ শেষে ছেলেদের ছুটি দেওয়া হ'ল।

এক-একজন করে বেরিয়ে পড়ল ওরা মুক্ত প্রাঙ্গণে। ওদের আনন্দ আর বাঁধ মানল না এবার। চীৎকার আর ছুটোছুটি, কে কার মাথা ভাঙে, নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে বের করে তার ঠিক নেই।

জন হোয়াইটসাইড মিস্ মোরগানের করমর্দন করে বললেন, "স্কুলের শৃঙ্খলা রক্ষায় আপনার বাহাদুরি আছে। এর আগেও ত দেখেছি, কিন্তু এমনটি আর দেখি নি। কিন্তু ছেলেরাও আপনাকে কি যে ভালবাসে মিস্ মোরগান তা ত আপনি জানেন না।"

প্রশংসায় সঙ্কুচিত হয়ে মিস্ মোরগান বললেন, "ওরা নিজেরাই যে খুব ভাল তাই আমাকে ভালবাসে। ওরা খুব চমৎকার।"

"তা হবেও বা। ভাল কথা, মণ্টবির ছেলেটি কেমন করছে স্কুলে?"

"ছেলেটি খুব বুদ্ধিমান্। শেখায় ইচ্ছা খুব। মনটাও ওর বেশ তাজা।"

"ছেলেটির কথাই হচ্ছিল, আজ বোর্ডের মিটিং-এ। ওঁর বাড়ীর কথা ত জানেন আপনি। ওর বাড়ীর পরিবেশ যেমনটি হওয়া দরকার তেমনটি নয়। আজ ছেলেটিকে লক্ষ্য করছিলাম—বেচারার পোশাক-আশাক বলতে কিছু নেই বললেই চলে।"

জন হোয়াইটসাইডের কথাগুলো মিস মোরগানের কিন্তু ভাল লাগল না। তিনি জুনিয়াসকে এই বিরূপ সমালোচনার হাত থেকে রক্ষা করতে চাইলেন। বললেন, "ওর ঘরবাড়ী অন্যদের মত অত ভাল নয়, তবে খুব যে খারাপ তাও বলা চলে না।"

"আমাকে ভুল বুঝলেন হয়ত। অনধিকার চর্চায় আমাদের মোটেই আগ্রহ নেই। ছেলেটিকে সাহায্য করাই আমাদের উদ্দেশ্য। ওর বাবা গরীব বলেই একথা ওঠাতে হচ্ছে।"

"মিঃ মণ্টবি যে গরীব সে কথা আমি জানি।" মিস্ মোরগান নম্রভাবে উত্তর দিলেন।

"মিসেস্ মন্‌রো ওর জন্য কিছু জামা-কাপড় এনেছেন। ওকে একবার ডেকে দিলে, ওগুলো ওকে তিনি দিতে পারেন।"

"আমার মনে হয় তা উচিত হবে না।"

"কেন বলুন ত? এতে আপত্তি কিসের? ওভার-অল, জুতো, শার্ট এই ত মোটে।"

"আপনি বুঝতে পারছেন না, মিঃ হোয়াইটসাইড, ছেলেটি বড় অভিমানী। ওতে সে লজ্জা পাবে।"

"কি যে বলেন, ভাল পোশাক পরতে লজ্জার কি আছে? ভাল পোশাক না থাকাটাই ত বেশী লজ্জার। তা ছাড়া বছরের এই সময়টাতে যা শীত। ওর জুতো নেই। রোজ ভোরেই ত মাটিতে বরফ জমে—খালি পায়ে যাই যে কষ্ট।"

যুক্তির কথা বটে, কিন্তু এতেও মিস্ মোরগান উৎসাহ বোধ করলেন না।

"তা হোক্। ওকে কিছু না দেওয়াই ভাল হবে।" শিক্ষিকা উত্তর দিলেন।

"এ নিয়ে আপনি কিন্তু একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলছেন মিস্ মোরগান। মিসেস্ মন্‌রো এত কষ্ট করে এগুলো কিনে এনেছেন, আর দেওয়া হবে না, সে কেমন কথা? দয়া করে ওকে ডেকে আনুন।"

একটু পরে রোবি এসে সামনে দাঁড়াল। অগোছাল চুল মুখের ওপর ঝুলে পড়েছে। চোখ জ্বলজ্বল্ করছে খেলার উত্তেজনায়। স্কুল বোর্ডের সদস্যেরা ওকে মনোযোগ দিয়ে একান্ত আগ্রহে দেখতে লাগলেন। অমনি করে তাকালে ছেলেটি লজ্জা পেতে পারে, তাই ওঁরা অবশ্য একটু সাবধান হয়েই তাকাচ্ছিলেন। তা হলেও রোবি অস্বস্তি বোধ করছিল। ও তাকিয়ে রইল অন্যদিকে।

মিস্ মোরগান বললেন, "ওঁরা তোমাকে কিছু দিতে চান রবার্ট।"

মিসেস্ মন্‌রো এগিয়ে এসে ওর হাতে একটি পোঁটলা দিয়ে বললেন, "কি সুন্দর ছেলেটি।"

রোবি পোঁটলাটি মাটিতে নামিয়ে রেখে, হাত দুটো পেছনে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

টি. বি. এ্যালেন তখন একটু কড়া মেজাজেই বললেন, "ওটা খুলেই দেখ না রবার্ট। এ কি ব্যবহার তোমার?"

রোবি একবার জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ভদ্রলোকের দিকে তাকাল। তারপর বলল, "এই যে খুলছি স্যার।" মোড়কটি খুলতেই নতুন শার্ট আর ওভারঅল বেরিয়ে পড়ল। বোকার মত তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ ওগুলোর দিকে—যেন বুঝতে পারছিল না ওগুলো কি? বুঝতে পারল যখন তখন তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে—চোখের চাহনিতে জালে-পড়া জন্তুর অসহায় ভাব। বিদ্যুৎগতিতে ছিটকে বেরিয়ে গেল সে দরজা দিয়ে। পড়ে রইল কাপড়ের পোঁটলা। ওর দ্রুত পলায়নের শব্দ বারান্দায় শোনা গেল—রোবি উধাও হয়ে গেছে।

মিসেস্ মন্‌রো মিস্ মোরগানের দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে বললেন, "হ'ল কি ওর?"

"ও ঘাবড়ে গিয়েই এমন করেছে।"

"কেন, আমরা কিছু খারাপ ব্যবহার ত করি নি ওর সঙ্গে?"

মিস্ মোরগানের এবার রাগ হ'ল ওঁর কথায়। কিন্তু বোঝাবার চেষ্টা করে বললেন, "ও যে গরীব সে ধারণাটাই

ওর ছিল না। তাই ত আমি আপনাদের বারণ করেছিলাম।"

জন হোয়াইটসাইড ক্ষমা চেয়ে বললেন, "আমারই ভুল হয়েছিল মিস্ মোরগান, সেজন্য খুব দুঃখিত।"

"এখন আমাদের কি করণীয়, তাই বলুন।" বার্ট মনরো জিজ্ঞেস করলেন।

"আমি আর কি বলব বলুন।" মিস্ মোরগান উত্তর দিলেন।

মিসেস্ মনরো তাঁর স্বামীর দিকে চেয়ে বললেন, "মিঃ মন্টবির সঙ্গে দেখা করে ওঁকে বললে হয় না? তবে বলতে হবে এমন ভাবে যাতে তিনি আবার মনে কিছু না করেন। মিঃ মন্টবি ছেলেকে বুঝিয়ে বললে, ছেলে পোশাক নিতে রাজী হ'তে পারে। ঠিক বলছি না মিঃ হোয়াইটসাইড?"

"আমার কিন্তু মনে হয় জিনিষটা মোটেই ভাল হবে না। ভাল করতে গিয়ে ছেলেটার ওপর একটু জুলুম করাই হয়েছে। তবে মিঃ মন্টবিকে জানান যদি উচিত মনে করেন আপনারা সকলে, তবে আমার বলার কিছু নেই।"

মিসেস্ মনরো একটু জোর দিয়েই বললেন, "ওর কি ভাল লাগবে না-লাগবে অত কথা ভাবলে চলে না। ওর স্বাস্থ্যের কথাই ভাবা দরকার আগে।"

২০শে ডিসেম্বর বড়দিনের ছুটি আরম্ভ হ'ল। মিস্ মোরগান ছুটিটা লস এ্যাঞ্জেলিসে কাটাবেন বলে ঠিক করলেন। সালিনাসের বাসের অপেক্ষায় সেদিন তিনি রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলেন। দেখলেন স্বর্গচারণিকার রাস্তা ধরে একটি লোক এদিকেই আসছে, সঙ্গে একটি ছোট ছেলে। ওদের গায়ে সস্তা দামের পোশাক। ওরা চলছে ঠিকই, কিন্তু পা যেন চলতে চাইছে না। কাছে আসতেই তিনি চিনতে পারলেন, ছেলেটা রোবি। মুখখানা ভার-ভার।

আরও কাছে আসতেই তিনি বললেন, "রোবি যে, কোথায় যাচ্ছ?"

সঙ্গের লোকটি বলল, "সান্ ফ্রান্সিস্কোতে যাচ্ছি, মিস্ মোরগান।"

মিস্ মোরগান ওঁর দিকে দ্রুত তাকিয়েই এবার চিনতে পারলেন—জুনিয়াস। গোঁফ-দাড়ি বিলকুল সাফ্। একেবারে অন্য মূর্তি। ওঁকে অনেক বুড়ো দেখাচ্ছে। চোখে সে দীপ্তি নেই। দাড়ির বহরটাই ওঁর মুখটিকে এতদিন রোদের আড়াল করে রেখেছিল—তাই মুখের রং পাঁশুটে হয়ে গেছে। কিন্তু সব ছাপিয়ে ওর মুখে ফুটে উঠেছে একটা দিশেহারা ভাব।

মিস মোরগান বললেন, "ওখানে কি ছুটি কাটাতে যাচ্ছেন? আমিও শহরে যাচ্ছি। বড়দিনের সময় দোকানপাটগুলো দেখতে বেশ লাগে আমার। দেখে দেখে তৃপ্তি হয় না।"

জুনিয়াস মৃদুকণ্ঠে বললে, "আমরা কিন্তু এখানকার পাট তুলে দিয়েই যাচ্ছি। আমি এককালে একাউন্টেন্ট ছিলাম মিস্ মোরগান, প্রায় বিশ বছর আগে। আবার একটা কাজ খুঁজে নিতে হবে আমাকে।" ওর কণ্ঠে ব্যথা ঝরছিল।

"কিন্তু আপনার এখান থেকে চলে যাওয়ার এমন কি দরকার পড়ল বলুন ত?"

"আমি যাচ্ছি রোবির জন্য। ওর যে ক্ষতি হচ্ছে সেটা আমার খেয়ালই হয় নি। কিন্তু খেয়াল না হওয়াটাই ত অন্যায়। দারিদ্র্যের ভেতর ছেলেরা কি মানুষ হ'তে পারে? পাঁচজন ত এই নিয়েই কথা বলছে।" জুনিয়াস সরল-ভাবেই কথাগুলি বলল।

"কিন্তু আপনার খামারটা ত ভাল ছিল। ওতেই ত আপনার ভালভাবে চলে যেতে পারত।"

"কিন্তু ওতে আমার কিছু সুবিধা হ'ল না মিস্ মোরগান। আমি চাষের কিছুই জানি না। জ্যাকবের ওপরই খামারের ভার দিয়ে গেলাম। কিন্তু জানেন ত, জ্যাকবও কুঁড়ে কম নয়। পরে কখনও সুযোগ মত বিক্রী করে দিলেই চলবে। টাকাটা রোবির কাজে লেগে যাবে।"

মিস্ মোরগানের রাগ হ'ল, কান্নাও পেল, বললেন, "বাজে লোকদের কথায় কেন কান দিচ্ছেন মিঃ মন্টবি? ওদের কথা মোটেই বিশ্বাস করবেন না।"

জুনিয়াস বিস্মিত হয়ে মিস্ মোরগানের দিকে তাকাল। বলল, "না, ওদের কথা আমি বিশ্বাস করি না। তবে কি জানেন? বাড়ন্ত ছেলে, বুনো অন্তুর মত বেড়ে ওঠে, সেটাও ত ঠিক নয়। কি? ঠিক বলছি না?"

বড় রাস্তা দিয়ে বাস ওদের দিকেই এগিয়ে আসছিল। জুনিয়াস রোবিকে দেখিয়ে বলল, "ও ত মোটেই যেতে চাইছিল না। পালিয়ে গিয়ে পাহাড়ে লুকিয়ে ছিল। খুঁজে বের করতে হয়রানির একশেষ। বয়স হচ্ছে, কিন্তু জংলীই রয়ে গেছে এখনও। সান ফ্রান্সিস্কোতে একবার যাক্ না, তখন ভুলেই যাবে এখানকার কথা।"

বাসটি খঁচ করে এসে কাছে থামল। জুনিয়াস রোবিকে নিয়ে পেছনের সিটে গিয়ে বসল। মিস্ মোরগান ওদের পাশে বসতে গিয়ে আবার কি মনে করে ড্রাইভারের পাশের সিটে গিয়ে বসলেন। ভাবলেন, ওদের এখন বিরক্ত করা ঠিক হবে না হয়ত।

বিদেশের কথা

শ্রীযোগনাথ মুখোপাধ্যায়

লিবিয়া

পৃথিবীর স্বাধীন দেশগুলির মধ্যে লিবিয়া সবচেয়ে জনবিরল, প্রতি বর্গমাইলে এখনও গড়ে দু'জন লোক বাস করে না সেখানে। উত্তর আফ্রিকায় ভূমধ্যসাগরের উপকূলে ৬ লক্ষ ৭৯ হাজার ৩৫৮ বর্গমাইল আয়তনের এই দেশটির বর্তমান লোকসংখ্যা ১১ লক্ষ ৯৫ হাজার। অর্থাৎ আকৃতিতে ভারতের অর্ধেকের বেশী হ'লেও লিবিয়ার লোকসংখ্যা কলকাতার এক-তৃতীয়াংশ মাত্র। তবু এই শতকের প্রথমার্ধের শেষ পর্যন্ত ঐ দেশটির ভাগ্যকে ঈর্ষা করার মত দৈন্যদশা পৃথিবীর কোন দেশের ছিল না।

বিশাল মহাসাগরের বুকে বিচ্ছিন্ন দু'টি দ্বীপের মত লিবিয়ার উত্তর সীমান্তে প্রায় দু'শ মাইল ব্যবধানে গড়ে উঠেছে দু'টি জনপদ, ত্রিপলিতানিয়া ও সাইরেনাইকা। আর সুদূর দক্ষিণে আছে ফেজান—দ্বীপপুঞ্জের মত কয়েকটি মরূদ্যান। ত্রিপলিতানিয়ার লোকসংখ্যা আট লক্ষ, সাইরেনাইকার তিন লক্ষ ও ফেজ্জানের প্রায় এক লক্ষ কয়েক শত মাইলের ব্যবধানে গড়ে-ওঠা একটি জনপদের বাইরে লিবিয়া শুধু প্রাণস্পন্দহীন মরুভূমি মাত্র। উত্তর উপকূল বরাবর ত্রিপলিতানিয়া ও সাইরেনাইকার মধ্যে পথের সংযোগ থাকলেও ফেজান এখনও দুর্গম, সেখানে যেতে হয় উটের পিঠে চড়ে, জলশূন্য দীর্ঘ মরুপথ অতিক্রম করে।

মনের দিক্ থেকেও তিনটি জনপদের বহু ব্যবধান। ত্রিপলিতানিয়া লিবিয়ার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী, ইউরোপের অনেক কাছে। সেখানে বাসও করে প্রায় এক লক্ষ ইউরোপীয়। এসব কারণে ত্রিপলিতানিয়ার উপর পশ্চিমের প্রভাব বেশী। আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ ও জমি অপেক্ষাকৃত উর্বরা বলে তার সমৃদ্ধিও অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া জাতিগোষ্ঠীর বিচারেও কিছুটা স্বাতন্ত্র্য আছে ত্রিপলিতানিয়ার। তার অধিকাংশ অধিবাসী বার্বার, আরবদের সঙ্গে যাদের অনেক পার্থক্য। অপর পক্ষে সাইরেনাইকা মিশর ও সুদানের সমীপবর্তী বলে তার উপর প্রভাব বেশী পশ্চিম এশিয়ার আরব সংস্কৃতির। প্রধানতঃ এই পার্থক্যের জন্য আজও ত্রিপলিতানিয়া ও সাইরেনাইকার মধ্যে একাত্মবোধ গড়ে ওঠে নি। ত্রিপলিতানিয়ার অধিবাসীদের আছে পশ্চিমী উদারনৈতিকতা, সাইরেনাইকার প্রাণশক্তি আরব জাতীয়তাবোধ। আজও সাইরেনাইকার অভিযোগ যে, ত্রিপলিতানিয়ার অতিরিক্ত পশ্চিমপ্রীতির জন্যই লিবিয়া স্বাধীনতা হারিয়েছিল। আর ত্রিপলিতানিয়া মনে করে, সাইরেনাইকা অত্যুগ্র, একগুঁয়ে, সঙ্কীর্ণ ও অসুন্দর।

আবার ফেজ্জানের মরূদ্যানগুলিতে যারা বাস করে, ত্রিপলিতানিয়া বা সাইরেনাইকা কেউ তাদের আত্মীয় বলে ভাবে না। আরবের চেয়ে সাহারার নিগ্রো জাতিগুলির সঙ্গে তাদের রক্তের সম্পর্ক নিকট। ঐ যাযাবর প্রকৃতির মানুষগুলির সঙ্গে এখনও মাটির স্থায়ী বন্ধন গড়ে ওঠে নি। তারা সম্পদের বিচার করে ঘোড়া, উট ও ভেড়ার সংখ্যা দিয়ে, আর সব পার্থিব সম্পদ সঙ্গে নিয়ে গোষ্ঠী-নেতা শেখের নেতৃত্বে ঘুরে বেড়ায় এক মরূদ্যান থেকে আর এক মরূদ্যানে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সিদ্ধান্তক্রমে ১৯৫১ সালের ২৪শে ডিসেম্বর লিবিয়া যখন স্বাধীন হয় তখন এই সম্পর্ক ও অবস্থানের দূরত্ব অস্বীকার করা সম্ভব ছিল না। এ কারণে ১৯৬৩ সালের এপ্রিল মাসে নতুন সংবিধান বলবৎ হওয়ার পূর্বে পর্যন্ত লিবিয়া ছিল একটি দুর্বল যুক্তরাষ্ট্র। ত্রিপলিতানিয়া, সাইরেনাইকা ও ফেজ্জান ছিল তার তিনটি গবর্ণর-শাসিত রাজ্য এবং প্রত্যেকের ছিল আলাদা আইন-সভা ও মন্ত্রিপরিষদ। তার রাজধানীও ছিল দু'টি। ত্রিপলিতানিয়ার ত্রিপলি শীতকালের ও সাইরেনাইকার বেনগাজী গ্রীষ্মকালের রাজধানী। প্রধান দু'টি রাজ্যকে সন্তুষ্ট রাখার জন্যই ছিল এই ব্যবস্থা।

এর পর ১৯৫৯ সালে লিবিয়া সরকার লিবিয়ার প্রধান পুণ্যক্ষেত্র বেইদায় প্রায় আট কোটি টাকা ব্যয় করে একটি নতুন রাজধানী গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন। দুই রাজধানীর অসুবিধা দূর করতে ও আঞ্চলিক চিন্তাধারার বিচ্ছিন্ন লিবিয়াবাসীদের ধর্মের বন্ধনে নিকটতর করতে লিবিয়া সরকার ঐ সিদ্ধান্ত নেন। লিবিয়ার অধিকাংশ মুসলিম সেনুসি সম্প্রদায়ভুক্ত এবং ঐ

সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু বেইদায় নিবাসবৃত্তি লাভ করেন। নতুন রাজধানী গড়ার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এবং বহু সরকারী অফিস ইতিমধ্যে বেইদায় স্থানান্তরিত হয়েছে। কিন্তু সরকার এ বিষয়ে এখনও নিঃসন্দেহ হতে পারেন নি যে, ত্রিপলি ও বেনগাজীকে সম্পূর্ণ বর্জন করে বেইদাকে একমাত্র রাজধানী করা ঠিক হবে কি না। ফলে, কার্যতঃ লিবিয়ার এখন তিনটি রাজধানী।

লিবিয়ার জাতীয় চেতনা জাগ্রত হওয়ার পথে বাধা অনেক থাকলেও তার মিলন-সূত্রগুলি নগণ্য নয়। যেমন লিবিয়ার সকল মানুষের ধর্ম ইসলাম ও ভাষা আরব। রাজা ইদ্রিসের প্রতিও লিবিয়ার সকল মানুষের গভীর শ্রদ্ধা ও আস্থা। এ ছাড়া লিবিয়ার গণজীবনে আর যা সর্বজনীন তা হ'ল দারিদ্র্য ও অশিক্ষা। লিবিয়ার বারো লক্ষ লোকের মধ্যে দশ লক্ষ নিরক্ষর, আর তরল স্বর্ণ-স্রোত পেট্রোলিয়মের সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত তার পণ্য বলতে ছিল শুধু এসপার্টো রাম্ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে লিবিয়ার বিস্তৃত মরুপ্রান্তরে ফেলে যাওয়া ভাঙা এরোপ্লেন ও অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র। অতবড় দেশে উর্বরা জমির পরিমাণ মাত্র দুই শতাংশ। সারা দেশে একটিও নদী নেই, আর বছরভোর জল পাওয়া যায় এমন ক্ষীণ স্রোতস্বতী আছে মাত্র দুই-তিনটি। খাদ্য, চিনি, কফি, চা, গৃহনির্মাণের যাবতীয় সরঞ্জামও প্রায় সব রকমের ভোগ্যপণ্য তাকে বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানী করতে হয়। উত্তর উপকূলের দৈর্ঘ্য ১৪০০ মাইল হলেও সেখানে তব্রুক ছাড়া একটিও স্বাভাবিক বন্দর নেই, আর সেখানেও আছে তীব্র জলাভাব। এ কারণে লিবিয়া যখন স্বাধীন হয় তখন সকলেরই আশঙ্কা হয়েছিল যে, বৈদেশিক সাহায্য ছাড়া লিবিয়া কোনদিন চলতে পারবে না।

অবশ্য দারিদ্র্য লিবিয়ার অনাদ্যন্তকালের ইতিহাস নয়। সম্প্রতি সাইরেনাইকার সাইরিন, তোলমেতা ও এপলোতানিয়ায়, ত্রিপলির নিকটবর্তী লেপটিস মাগনায় ও ফেজানের দক্ষিণ পশ্চিমে তাসালি এন আজ্জের উপত্যকায় যেসব ধ্বংসাবশেষ ও গুহাচিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ হয় যে, খ্রীষ্ট-জন্মের তিন-চার হাজার বছর আগেও লিবিয়ার ঐসব স্থান শস্যশ্যামল ও জনাকীর্ণ ছিল। পাঁচ শত খ্রীষ্টপূর্বাব্দের লিবিয়ারও ঐশ্বর্যের উল্লেখ পাওয়া যায় গ্রীক ঐতিহাসিক হেরডটাসের লেখায়। লেপটিস মাগনা ও সাব্রাথার বালি-সমুদ্রের অতলগর্ভ থেকে প্রত্নতাত্ত্বিকরা যেসব কীর্তি উদ্ধার ও তত্ত্ব উদ্ধার করেছেন সেগুলির বয়স তিন হাজার বছরের কম নয়। ত্রিপলির কাস্তেলো বাদুঘরে রক্ষিত ঐসব পুরাকীর্তিগুলি পর্যটক ও ঐতিহাসিকদের এক বিরাট আকর্ষণ। জুলিয়াস সিজার একবার লেপটিস-বাসীদের উপর পিটুনি কর ধার্য করে হুকুম দিয়েছিলেন, প্রতি বছর তাদের ত্রিশ লক্ষ পাউণ্ড অলিভ তেল সরবরাহ করতে হবে। ত্রিশ লক্ষ পাউণ্ড তেলের জন্য অন্তত দশ লক্ষ অলিভ গাছ দরকার। এতে অন্ততঃ এইটুকু প্রমাণ হয় যে, দু'হাজার বছর আগেও সাহারা মরুর শুষ্ক রসনা লিবিয়ার প্রাণরস নিঃশেষ করতে পারে নি।

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর লিবিয়ার ইতিহাস অন্ধকারময়। বার্বার ও ভেণ্ডালদের আক্রমণে ধ্বংস হয় তার নগরসভ্যতা। সপ্তম শতাব্দীতে আরবরা যখন লিবিয়ায় যায় তখন সে দেশ নিঃস্ব, মরুগ্রস্ত। তাই সেদিন তারা ফিরে যায়, তার পর আবার আসে একাদশ শতাব্দীতে। কিন্তু এবার যে আরবরা আসে তারা ছিল যাযাবর, লিবিয়ার বৈষয়িক উন্নয়নের দিকে তাদের কোন দৃষ্টি ছিল না। তাদের অবস্থান কালেই লিবিয়াতে একে একে স্পেন, মাল্টা ও তুরস্ক হানা দেয়। পরে করমালি বংশের রাজত্বকালে ১৭১১ থেকে ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত লিবিয়ার উত্তর উপকূল হয়ে ওঠে বার্বার জল-দস্যুদের আস্তানা। তাদের লুণ্ঠনের ফলে ভূমধ্যসাগর দিয়ে ইউরোপ ও আমেরিকার জাহাজ চলাচল প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর তৎপরতায় ঐ অবাঞ্ছিত অবস্থার প্রতিকার হয়। তার পর উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তুর্কীরা আবার লিবিয়া দখল করলে সেখানকার প্রশাসনিক ব্যবস্থায় কিছুটা স্থিতি আসে।

তুর্কীদের হাত থেকে ইতালী লিবিয়াকে ছিনিয়ে নেয় ১৯১২ সালে। ঐ বছর অক্টোবর মাসে অউচি সন্ধি অনুসারে লিবিয়ার উপর ইতালীর সার্বভৌম অধিকার কায়েম হয়। ১৯৩৯ সালে ইতালী লিবিয়াকে তার অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে ঘোষণা করে এবং লিবিয়ার নাম হয় লিবিয়া ইতালীয়ানা। কিন্তু লিবিয়ার উপর ইতালীর অধিকার মাত্র ত্রিশ বছর স্থায়ী হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজ ও ফরাসী বাহিনী ইতালীর কাছ থেকে লিবিয়া ছিনিয়ে নেয় ও সাময়িক ভাবে ত্রিপলিতানিয়া ও সাইরে-নাইকায় ব্রিটেনের ও ফেজানে ফ্রান্সের কর্তৃত্ব কায়েম হয়। যুদ্ধের শেষে লিবিয়া রাষ্ট্রসংঘের [illegible]

এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে ১৯৪৯ সালের ২১শে নভেম্বর তারিখে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৫১ সালের ২৪শে ডিসেম্বর পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। লিবিয়াই রাষ্ট্রসঙ্ঘের রক্ষণাধীন প্রথম স্বাধীন দেশ।

ইতালীয়দের শাসনকালে লিবিয়ায় সরকারী উদ্যোগে অনেক শিল্প গড়ে ওঠে। রাস্তাঘাট তৈরী হয় ও জমি উদ্ধার করা হয় প্রায় ছয় লক্ষ একর। কিন্তু সেগুলি ইতালীয়রা নিজেদের ভোগের জন্যই করে এবং লিবিয়ার আদিম অধিবাসীদের উৎখাত ক'রে তারা দক্ষিণ দিকে ঠেলে দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ওলট-পালট যদি না হ'ত তবে লিবিয়ার সমগ্র উত্তর উপকূলই ইতালীয় উপনিবেশীদের দখলে চলে যেত, আর লিবিয়ার লোকদের নিঃস্ব যাযাবর অবস্থায় বাস করতে হ'ত দক্ষিণের মরুস্থানগুলিতে।

লুণ্ঠিত, নিঃস্ব লিবিয়া যখন স্বাধীন হয় তখন রাষ্ট্রসঙ্ঘ এবং ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র লিবিয়াকে নতুন করে গড়ে তোলার দায়িত্ব নেয়। ১৯৫০ থেকে '৬২ সালের মধ্যে বিভিন্ন সাহায্য-খাতে রাষ্ট্রসঙ্ঘ লিবিয়াকে প্রায় ৭৫ লক্ষ ডলার সাহায্য দেয় এবং যুক্তরাষ্ট্র বৈষয়িক সাহায্য ও ঋণ বাবদ দেয় ১৯ কোটি ১৭ লক্ষ ডলার ও সামরিক প্রয়োজনে ৪৫ লক্ষ ডলার। বলা বাহুল্য, যুক্তরাষ্ট্রের এই সাহায্য নিঃস্বার্থ বা নিঃসর্ত ছিল না। বৈষয়িক সাহায্যের বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্র ত্রিপলির কাছে হুইলাস বিমানক্ষেত্রে বিরাট বিমান ঘাঁটি স্থাপনের সুযোগ পায়। যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে এতবড় মার্কিন বিমানঘাঁটি আর নেই। '৬১ সালে সেখানে কর্মরত মার্কিনের সংখ্যা ছিল বারো হাজার।

১৯৫৯ সাল লিবিয়ার রাষ্ট্রজীবনে এক যুগসন্ধিক্ষণ। নিঃস্ব মরুকল্প লিবিয়া ঐ বছর আশাতীতভাবে অন্তহীন ঐশ্বর্যের ফল্গুস্রোত তেলের সন্ধান পায়। ঐ তেলের জন্য পাগলের মত বালির পাহাড় সরিয়েছেন মুসোলিনী, কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে নিরাশ হয়েছে অগণিত ছোট বড় বিদেশী কোম্পানী। কিন্তু ১৯৫৯ সালের জুলাই মাসে এক মার্কিন কোম্পানীর পাতালফোঁড়া শাবলের কঠিন আঘাতে মরুর বুক চিরে হঠাৎ ছিটকে বেরিয়ে এল তেলের ফোয়ারা। জেলটেন তৈলক্ষেত্রে উদিত হ'ল লিবিয়ার নতুন ভাগ্যসূর্য।

তিন বছরের মধ্যে লিবিয়া তৈল রপ্তানিকারী দেশে পরিণত হয়েছে। ১৯৬২ সালের জুন মাসে লিবিয়া বিশ্বের বৃহত্তম তৈল রপ্তানিকারী সংস্থা 'অর্গানিজেশন অফ পেট্রোলিয়ম এক্সপোর্টিং কান্ট্রিজ'-এর সভ্যপদ লাভ করেছে। ঐ বছরেই সেপ্টেম্বর মাসে লিবিয়ার প্রধানমন্ত্রী সবিনয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘের কর্মকর্তাদের জানিয়ে দেন যে, আর বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন নেই লিবিয়ার। মার্কিন, ব্রিটিশ, ফরাসী, ডাচ ও ইতালীয়, মোট একুশটি কোম্পানী এখন লিবিয়ায় তৈল উত্তোলনের কাজে নিযুক্ত। প্রতিদিন সেখানে তেল উঠছে তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার ব্যারেল এবং '৬৭ সালে এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে হবে দশ লক্ষ ব্যারেল। ১৯৬২ সালে লিবিয়া সরকার বিভিন্ন পেট্রোলিয়ম কোম্পানীর কাছ থেকে সেলামী-বাবদ পেয়েছেন ৪ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার অর্থাৎ প্রায় ২২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। লিবিয়ার বারো লক্ষ লোকের পক্ষে এ টাকা নিশ্চয়ই সামান্য নয়। তার ওপরেও লিবিয়ার কর্মপ্রার্থী যুবকদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে বিরাট ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা।

১৯৬১ সালে বিশ্বব্যাঙ্ক লিবিয়ার অর্থনীতি পর্য্যালোচনাকালে বলেন, লিবিয়ার এখন সবচেয়ে বেশী জোর দেওয়া দরকার কৃষির উন্নয়নের উপরে। দু'হাজার বছর আগে লিবিয়ার জনসংখ্যা বর্তমানের তুলনায় চারগুণ হওয়া সত্ত্বেও সেদিন লিবিয়া খাদ্য রপ্তানি করত। আর আজ তাকে প্রায় সব প্রয়োজনীয় সামগ্রীই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। সুতরাং লিবিয়াকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হ'তে হ'লে কৃষির উন্নতির জন্যই তাকে সবচেয়ে বেশী যত্নশীল হতে হবে। এর জন্য লিবিয়ার অশান্ত বালুরাশি সংযত করা দরকার। অনেক সময় এমন ঝড় ওঠে লিবিয়ার মরু অঞ্চলে যে একটা মরূদ্যান পর্যন্ত চাপা পড়ে যায়। নতুন জমি উদ্ধারের জন্য তাই অপরিশুদ্ধ তেল দিয়ে লিবিয়ার কয়েকটি মরু-অঞ্চল বশে আনার চেষ্টা হচ্ছে।

ফেজান অঞ্চলে সম্প্রতি লোহার সন্ধান মেলায় সে-দিক্ থেকেও লিবিয়ার শিল্প সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, এ ছাড়া সিমেন্ট কারখানা প্রভৃতি স্থাপনেরও উদ্যোগ শুরু হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে গ্রীক ও রোমান সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হওয়ায় পর্যটকদের কাছেও লিবিয়ার আকর্ষণ বেড়েছে। এ কারণে পর্যটন ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য বিবিধ ব্যবস্থা হচ্ছে সেখানে।

ঐশ্বর্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লিবিয়ার কেন্দ্রীকরণের কাজ এগিয়ে চলেছে। ১৯৬৩ সালের এপ্রিল পর্যন্ত লিবিয়া ছিল যুক্তরাষ্ট্র। আর তিনটি গভর্ণর শাসিত প্রদেশ সাইরেনাইকা, ত্রিপলিতানিকা ও ফেজানে ছিল আলাদা

আইনসভা ও মন্ত্রিপরিষদ। কেন্দ্রীয় শাসনের ক্ষমতা ছিল সীমিত। কিন্তু এখন লিবিয়ার শাসন এককেন্দ্রিক, তিনটি গভর্ণর শাসিত প্রদেশের বদলে লিবিয়ায় এখন আছে দশটি কমিশনার শাসিত জেলা।

রাজা ইদ্রিস লিবিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান। তিনি সাইরেনাইকার আমির ও সেনুসি মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু। মহম্মদ ইদ্রিস এল মাহ্‌দি এল সেনুসি ১৯২২ সালে ইতালী সরকারের নির্দেশে নির্বাসিত হন ও লিবিয়া স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত নির্বাসনেই দিন কাটে তাঁর। এই দণ্ডভোগই রাজা ইদ্রিসের জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ। সংবিধানের বিধি অনুসারে রাজা নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হলেও তিনিই লিবিয়ার প্রকৃত শাসক। লিবিয়ার সংসদ দ্বিকক্ষ-বিশিষ্ট; উর্ধ্বকক্ষ সিনেটের সদস্য ২৪ জন—অর্ধেক রাজ-মনোনীত। নিম্ন কক্ষ 'হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস'-এর সদস্য সংখ্যা ৫৫। সকলেই নির্বাচিত; তার মধ্যে পঁয়ত্রিশ জন ত্রিপলিতানিয়ার, পনের জন সাইরেনাইকার ও পাঁচজন ফেজানের প্রতিনিধি। কুড়ি হাজার অধিবাসী পিছু একজন সদস্য চার বছরের জন্য নির্বাচিত হন। শুধুমাত্র অর্থবিলের উপর নিম্নকক্ষের একক অধিকার, এ ছাড়া যে কোন বিলের প্রস্তাব রাজা স্বয়ং, বা সিনেট বা 'হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস' করতে পারেন। লিবিয়ার মুদ্রা পাউণ্ড, যার মূল্যমান ব্রিটেনের পাউণ্ডের সমান। পাউণ্ড বিভক্ত হয়েছে একশ' পিয়াস্ত্রে ও হাজার মিলিয়েম-এ।

আরব ঐক্যের আন্দোলন লিবিয়ায় আগে বিশেষ শক্তিশালী না থাকলেও তার ঐশ্বর্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শক্তিশালী হয়ে উঠছে। এখন লিবিয়ায় বা'থ-সোশ্যালিষ্ট ও নাসের পন্থীরা যথেষ্ট শক্তিশালী। কিন্তু রাজা ইদ্রিসের প্রভাব খুব বেশী থাকায় রাজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের পক্ষে এখনও পর্যন্ত কিছু করা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু এ অবস্থা খুব বেশী দিন থাকবে না, কারণ রাজা ইদ্রিস বৃদ্ধ, আর সারা আরব দুনিয়ায় যে রাজতন্ত্রবিরোধী ঝড় উঠেছে তা থেকে লিবিয়া খুব বেশীদিন আত্মরক্ষা করতে পারবে না। লিবিয়ার অন্তহীন তেল সম্পদ্ মাত্র কয়েক লক্ষ লোকের সম্পদ্ হয়ে থাকবে এটা জনসমস্যাপীড়িত প্রতিবেশী রাজ্যগুলির পক্ষে খুব বেশীদিন মেনে নেওয়া সম্ভব হবে না। অথচ বৃহত্তর আন্দোলন থেকে আত্মরক্ষা করে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে যে জনশক্তি থাকা দরকার তা লিবিয়ার নেই।

সুতরাং লিবিয়ার সদ্য আবিষ্কৃত অজের প্রাকৃতিক সম্পদ্ ও জনসংখ্যার স্বল্পতা যদি কোনদিন তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিপন্ন করে তবে 'বিশ্বের কূটনৈতিক মহলের কাছে সেটা খুব বিস্ময়কর বলে মনে হবে না।

—•—

অতীত ও ভবিষ্যৎ

অতীতটা ভবিষ্যতের মাপকাঠি নহে। অতীত পরিমিত, সীমাবদ্ধ; ভবিষ্যৎ অপরিমিত, অসীম; আমরা অতীতে যাহা পারি নাই, করি নাই, এমন অনেক কাজ বর্ত্তমান সময়ে করিতেছি, ভবিষ্যতে আরও করিতে পারিব।

—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩২৮।

রায়বাড়ী

শ্রীগিরিবালা দেবী

কামিনীর মা ডালায় করিয়া কতকগুলি সুপারি কাটিতে বসিয়াছিল। রায়বাড়ীর পানের ভার তাহার উপরে। সকলকে মুখে মুখে পান যোগাইতে হয়।

ঠাকুমা তাহার কাছে বসিয়া কহিলেন, "সুপারি নিয়ে বসেছিস্ রাজেশ্বরী? কয় কুড়ি পান বানাইবি কয় কুড়ি সুপারি কেটে?"

রাজেশ্বরী বলে, "গুনিগাঁথি করি না মাঠান, ভাগে ভাগে পান বানায়ে বিড়িদানিতে রাখি দেই। যার যখন খাওনের ইচ্ছা যায়। গুয়াও গুনি কাটি না। কাটিকুটি কৌটা ভরি থুয়ে দেই।"

পান-সুপারির উল্লেখ ঠাকুমার গৌরচন্দ্রিকা। আসল কথায় আসিলেন এবার। "শোন্ লো রাজেশ্বরী, নতুন গুড়ের তিলের নাড়ুর তিল ত মাজলি না নবান্নের জন্যে? তিলের নাড়ুর আবার নানান ল্যাঠা। শনি-মঙ্গলবারে রবিবারে বৃহস্পতিবারে তিল মাজতে, নাড়ু করতে হয় না।"

কামিনীর মা কচ্‌কচ্ করিয়া সুপারি কুচাইতে কুচাইতে জবাব দেয়, "তিল মাজন, তিল ধোওন ত হইয়া গিইচে মাঠান। কাল বুধবারে নাড়ু পাকান হইবে।"

ঠাকুমা ক্ষুব্ধ হইলেন। তাঁহার অগোচরে কোন্‌দিন এত বড় কাজ সমাধা করা হইয়াছে? তখন তিনি কোথায় ছিলেন? যাহা হইবার হইয়াছে, যাহা বাকী আছে তাহাই লইয়া তাঁহার গবেষণা সুরু হইল—"নবান্ন যে এসে গেল রাজেশ্বরী, নারকেল ছাড়াতে দিচ্ছে না কেনে? নবান্নেও পাঁচটা দেব্য করে দেব-দেবী, পূর্ব্ব-পুরুষকে দিতে হয়। সে কম নয়, দেবপক্ষ দেবীপক্ষ পিতৃকুল মাতৃকুল গুরুকুল সকলকার নামে নামে নিবেদন। নামে নামে ভোজ্য। আমার মহেশ নতুন চাল নতুন গুড় মুখে দেবে। ধোপা, নাপিত কামার কুমোর ছুতোর ভূমিমালী গাঁয়ের বামুন বোষ্টম কারোকে কি বাদ দিতে পারে? তা নারকেলের তক্তি-নাড়ু ঢের লাগবে। কয় কুড়ি নারকেল ছাড়িয়ে দিতে হুকুম দিচে কর্ত্রীরা শুনেছিস্?"

"না, কয় কুড়ি ছুলিবে শুনি নাই। যারা ছুলিতে কইচে তাগরে বরাদ্দ রইচে মাঠান। তোমাগো বাড়ীতে মিত্যি পরব, 'কত ধানে কত চাল' ওয়াগরে জানা হইয়া গিইচে।"

"হ'লেই ভাল, তা হ'লে আমার আর গলা ফাটাতে হয় না। চালের গুঁড়োর কি হবে রাজেশ্বরী? তোদের এদিকেও না চাল কুটতে হবে?"

"আমাগরে অল্পসল্প, কুটে থোব একদিন। আপুনিগরে ওইদিকেই ত আসল ব্যাভার। নারাণ ঠাকুরের ভোগরাগ, আপুনিগরে তিন বিধবার খাওন-দাওন। পিঠা-পরমান্ন ত ওইদিকে হইয়া থাকে। কাঁচা বয়সের ম্যায়ার ওই দশা হইচে, মা'র পরাণে সয় না। যা ভাল দেব্য, মা আপন হাতে ভোগের ঘরেই বানায়ে দেয়। মণিরাম ঠাকুররাই দুই ভাই খাওন-দাওনের পরে গুঁড়া করি ছাঁকি দিবি কইছে। কর্ত্তার ধনে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা মারিচে 'মুখ দেখি কি'? 'যেমতি দেওন তেমতি করণ' না করিলে চলিবে ক্যানে?"

সরস্বতী বারান্দায় বাহির হইয়া তীব্র দৃষ্টিতে ঠাকুমার দিকে তাকাইল। দাস-দাসীর সহিত ঠাকুমার আলাপ-আলোচনা তাহার অসহ্য। অথচ ঠাকুমার তাহাতে বিরতি নাই।

নাতনীর সহিত চোখোচোখি হওয়ামাত্র ঠাকুমা উঠিলেন। বলিতে বলিতে চলিতে লাগিলেন "পোড়া কপাল পুড়ে গেছে, ফুলের মালি মরে গেছে।"

ভরদুপুর, ভোগ রান্না প্রায় হইয়াছে। রন্ধনশালায় সমস্ত প্রস্তুত। হারাণী খাবার জায়গা করিতেছে। রায়বাড়ীর বিরাট্ রান্নাঘর। মাঝখানে "জলপিঁড়ি" গাঁথিয়া রান্নার স্থান ভাগ করা। "জলপিঁড়ি" মানে অর্দ্ধহাত চওড়া একটা দেয়াল গাঁথা। উপরে সারি সারি

পাঁচটা জলের কলসী বসে। দুই দিকে অনেকগুলি কুলুঙ্গি। রান্নার দিকে রান্নার তেল-মশলা সরঞ্জাম থাকে। খাবার দিকে নুন ঘি আচার ইত্যাদি। খাবার পূর্ব্বে ঘর মুছিয়া পাতা হয় বড় বড় সেগুন কাঠের পিঁড়ি। পিঁড়ির বাঁদিকে মস্ত মস্ত কাঁসার ঝকঝকে ঘটিতে মাটির কলসীতে রাখা কর্পূর সুবাসিত জল ভরিয়া কাঁসার গেলাসে ঢাকিয়া রাখা হয়। উহার নাম 'খাবার ঠাঁই করা'।

বিনু তাহার গৃহে পূবের দরজায় ছোট্ট মাদুরে খাতা খুলিয়া লিখিতে বসিয়াছে। তাহার পিছনে একফালি রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছে। এ সময় রৌদ্র গায়ে লাগিলে বড় মিঠা বোধ হয়। সুদূর দেশ হইতে শীত এখনও আসিয়া জমিতে পারে নাই, কিন্তু শীতল বাতাস তাহার আসন্ন আগমন-বার্ত্তা বহিয়া আনিতেছে।

নিয়মের কাজ আজ বিশেষ কিছু ছিল না। কাল হইতে আরম্ভ হইবে নবান্নের সমারোহ।

সকলে ভোজনে বসিবার পূর্ব্বে বিনু পালাইয়া আসিয়াছে। বিধবারা আহারে বসিলে বিনুকে সেখানে উপস্থিত থাকিতে হইবে। খাবার জায়গা করিয়া লবণ ঘৃত দই দুধের বাটি সমস্ত পাতার গোড়ায় আগাইয়া দিতে হইবে। খাওয়া হইলে বাসন আঙ্গিনায় নামাইয়া দিয়া গোবরজলে ঘর ধুইয়া দিতে হইবে।

বাড়ীর নূতন বধূর এটা অবশ্যকরণীয়। কামিনীর মা শিখাইয়া দিয়াছে। পাথরকুচি গ্রামের গৌরব ও ব্রজেশ্বরীর শিক্ষার গৌরব কামিনীর মা নষ্ট করিতে পারে না, তাই তাহার এত প্রয়াস।

বিনু হাতের লেখা লিখিতে তেমন ব্যস্ত নহে। প্রণবের চিঠি আজই হয়ত আসিবে। রাতেই তাহার উত্তর লিখিয়া রাখিতে হইবে। সে ১, ২ নম্বর দিয়া অনেকগুলি খাতা দিয়া গিয়াছে বিনুকে। তাহার চিঠি মানে, কয় নম্বরের খাতায় কত পাতা লেখা হইয়াছে তাহার বিশদ বিবরণ জানাইতে হইবে। নহিলে বিনুর দায় পড়িয়াছে খাতার পাতা ভরাইতে।

বিনু প্রণবকে মিছে কথা লিখিতে পারে না।

বিবাহের পূর্ব্বে সে কাছারের ওইখানেই 'নন্দরাজ' যাত্রা গান শুনিয়াছিল, পতিনিন্দা শুনিয়া সতীর দেহত্যাগ আজও সে ভুলিতে পারে নাই। মনে হইলে দুই চোখ জলে ভরিয়া যায়। 'পতি পরম গুরু', তাঁহার সহিত ছলনা প্রতারণা করিতে নাই। কিন্তু স্বামীর প্রতি রাগ করিতে দোষ কি? উনি যেন জানেন না রান্নাবাড়ীর হালচাল! ইহাদের আচার-বিচার কর্ম্মপদ্ধতি কাঁকশূন্য, ছিদ্রশূন্য। কর্ম্মের গুহায় প্রবেশ করিলে বাহির হইবার পথ থাকে না। এখান হইতেই বুড়ো মন্দ হইয়া ভুলিয়া বসিয়াছেন। "যাঁর জন্তে রামের মা, তাঁকে উনি চেনেন না।"

বণ্ডমানে ক্ষিতির সহযোগিতায় বিনু দুই-একখানা বই পাইতেছে। সেকালে পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের অন্য পুস্তক-পাঠ নিষিদ্ধ ছিল।

পিতার গ্রন্থাগার হইতে ক্ষিতি গোপনে আনিয়া দিয়াছে 'ভারতী' মাসিক পত্রিকা। 'হিতবাদী', 'বঙ্গবাসী' কত কি পত্র-পত্রিকা আসে বাহির মহলে, অন্তঃপুরে সেসব প্রবেশ করিতে পারে না।

ভারতী খুলিয়া বিনু তাড়াতাড়ি টুকিয়া লইতেছিল খাতায়—

"আজি, শরত তপনে প্রভাতী স্বপনে
কি জানি পরাণ কি যে চায়,
ওই, শেফালির শাখে কি বলিয়া ডাকে,
বিহগ-বিহগী কি যে গায়।"

"বৌমা, ওনারা যে খাইতে বসিবে এখন, যাও যাও ভোগের ঘরে। কি নয়া বসি রইচ? ভুলে খুরে যাও।"

কামিনী মায়ের তাড়নায় বিনুকে তখনই উঠিতে হইল। শরত তপন খাতায় পাতায় শেষ হইতে পারিল না। মনের মধ্যে ভ্রমরের মত গুঞ্জন করিতে লাগিল—

"কোন ফুলবাসে সুনীল আকাশে
কিসের আবেশে পরাণ যায়।"

আকাশে 'কোদালে' মেঘ দেখা দিয়াছে, গত সন্ধ্যায় রক্ত-সন্ধ্যা হইয়াছিল। সূর্য্যদেব অস্তগামী হইলেও আকাশ যদি লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়া থাকে, তাহাকে রক্তসন্ধ্যা বলা হয়। ঘোলাটে আকাশে ছেঁড়া-ছেঁড়া সাদা মেঘকে পল্লীবাসীরা কোদালে মেঘ বলে। ওই রক্তসন্ধ্যা কোদালে মেঘ বৃষ্টির পূর্ব্বাভাস।

ধানের আঁটি ঝাড়ানো শেষ হইয়াছে। এখন বাকী

রৌদ্রে দিয়া মরাইতে তুলিয়া রাখা। মণ্ডপের আঙিনা, কাছারির আঙিনা, গোলাবারান্দার আঙিনায় ধান রোদে দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে অকুলান হওয়াতে অন্দরের উঠানে মেলিয়া দেওয়া হইয়াছে রাশি রাশি ধান।

ঢেঁকিশালার সামনে স্তূপ করিয়া রাখা হইয়াছে চিটা ধান। চিটা গরীব-দুঃখীদের বিলাইয়া দেওয়া হইবে।

গোয়ালের পাশে গাদা গাদা খড়। যাহাদের গাভী আছে তাহারা বাড়তি খড় চাহিয়া লইয়া যাইতেছে।

ধানের আধিক্যে ঠাকুমা পুলকিত। তাহার মহেশকে মা লক্ষ্মী কৃপা করিয়াছেন। ঘাটে মাঠে বাটে আসন পাতিয়া বসিয়াছেন। এখন কোদালে মেঘে বর্ষণের আগে ধান সুরক্ষিত হইলে তিনি আরামের নিঃশ্বাস মোচন করিতে পারেন।

মালী-বৌ দুই পায়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠানের ধান উল্টাইয়া দিতেছিল। ঠাকুমা একদৃষ্টে ধান নাড়া দেখিতেছিলেন। তাঁহার পাশে আসিয়া বসিল তরু ও মেনী। মেনী তরুর বয়সী, দিব্য ফুটফুটে মেয়েটি।

তরু ভাঁড়ার হইতে কয়েকটা কমলালেবু আপন হাতে লইয়া আসিয়াছে। সকলের অগোচরে। নিজের হাতে ফল মিষ্টি সংগ্রহ না করিলে তরুর খাদ্য মধুর হয় না।

তরু মেনীকে দু'টি কমলালেবু অর্পণ করিয়া নিজে আর দু'টির সদ্ব্যবহার করিতেছিল।

মেনী লেবুর কোয়া মুখে পুরিয়া আব্দার করে—"ঠাকুমা, একটা শাস্তর বল না? কতদিন তোমার শাস্তর শুনি নি।"

ঠাকুমা আনন্দে ডগমগ। কে আবার তাঁহার গা ঘেঁষিয়া চাঁদমুখে শাস্তর শুনিতে চায়?

ঠাকুমা হাসিয়া বলেন, "দিনের বেলা কইলে শাস্তর থাকে না তার বত্তর। দেখ্ লো মেয়, না কইতে কইতে শাস্তর আমি ভুলে গেছি। তজিয়া যখন ছোট ছিল ডালিমকুমার, কাঠের ঘোড়া, বেঙ্গমা-বেঙ্গমির কত শাস্তর কইছি। এখন মনে নাই।"

তরু বলিল, "ছড়া ত খুব মনে আছে? দিনরাত শুনিয়ে শুনিয়ে সকলের কান ঝালাপালা করে দিলে। বুড়ো বয়েসে তোমার মত ছড়া-পাঁচালি কেউ বলে না।"

ঠাকুমা হাসিয়া জবাব দিলেন—

"কারবাড়ীতে বাস করি আমি এক বড়াই বুড়ী"
আপন মনে হাসি কাঁদি, কাজের সময় ঝাড়ি তুড়ি।"

তরুরা দুই সখী খিলখিল করিয়া হাসিতে লাগিল। ঠাকুমা নাতনীদের হাসিতে যোগ না দিয়া গম্ভীর হইয়া শুরু করিলেন—

"আইলে দেশালি (বিদেশী) বঁধু কতেক দিবস পরে,
তোমার সোনার ধানে আঙিনা গিয়াছে ভরে।
নগরে নাগর হয়ে কাটালে এতেক কাল
সাপটে (ঝড়ে) উড়িয়া গেছে ঘরের দু'খানা চাল।
শাওনে দেয়ার ডাকে তরাসে মরিয়া যাই,
শরম ঢাকিতে বঁধু, দোসরা (দুই) বসন নাই।
সকলি হইবে মোর, তুমি যে আসিছ ফিরে,
যাইতে দিব না আর, দিলাম মাথার কিরে।
বিছানো ধানের পরে আঁচল পাতিয়া দেই,
আমার চামর কেশে পদধুলা মুছে নেই।
ভাল করে বোস বঁধু, বহিছে পবন মিঠা,
পরাণ ভরিয়া খাও খাজুর রসের পিঠা।"

তরু কহিল, "ঠাকুমা, তুমি যে চাষা-বৌএর কথা বললে? ও, আমাদের বৌকে ত কমলা'লেবু দেওয়া হ'ল না?"

মেনী বলে, "বৌদি যে নারকেল কুরতে বসেছে?"

"হ্যাঁ, নবান্নের ঘটা লেগে গেছে। তুই যা না মেনি, বল্‌গে, 'তরুর পায়ে কাঁটা ফুটেছে, তোমাকে ডাকছে বৌদি।' আমি ডাকলে ওকে বেরোতে দেবে না, তুই ফাঁকি দিয়ে ডেকে আন্।" বলিয়া তরু উঠিয়া বিনুর ঘরে গেল।

ঠাকুমাও চলিয়া গেলেন বাহিরের ধানের তদারকে।

তরুর পায়ে কাঁটা ফুটিয়াছে।

মনোরমা বলিলেন, "দিন-রাত বনবাদাড় একাকার করে দস্যি মেয়ে। বৌমা যাও, ওর পায়ের কাঁটাটা তুলে দিয়ে এস গে। সূচ-সুতোর কৌটায় সূচ আছে। দেশলাইয়ের কাঠি জেলে সূচ পুড়িয়ে নিয়ে তবে কাঁটা তুলে দিও।"

বিনু নারকেল কোরানো ফেলিয়া মেনীর পিছনে চলিল তরুর পায়ের কাঁটা তুলিতে।

তরুর কাছে উপনীত হইয়া বিনুর চক্ষুস্থির। তরু

নিভৃতে বসিয়া মনের সুখে কমলালেবু খাইতেছে। দুইটা লেবু বিনুর দিকে ছুঁড়িয়া তরু হাসিতে হাসিতে বলিল, "কেমন জব্দ হ'ল ওরা বৌদি, আমার পায়ে কাঁটা না ছাই ফুটেছে। কাঁটা ফুটলে আমি তুলতে জানি। নাও, নেবু দুটো চট্ করে খেয়ে ফেল।"

বিস্মিতা বিনু কুণ্ঠায় এতটুকু হইয়া গেল। সবেগে ঘাড় দুলাইল, "না তরু, আমি খাব না, তোমরা খাও। মা আমাকে দেবেন। ওঁরা টের পেলে—"

তরু ধমক দিল, "কাল বেড়ার হাট থেকে ঝাঁকা-ভরে নেবু এনেছে। গোণা-গাঁথা কিছু নেই। টের পাবে কে? ওঁদের যখন ফুরসৎ হবে তখন দেবেন হাতে হাতে। আমি খাবার জিনিষের প্রত্যাশায় বসে থাকতে পারি না। তুমি এত ভয়কাতুরে কেন বৌদি? ভয়ে সারা হয়ে থাক। এত ভয় ভাল নয়, ভীত-স্বভাব হয়ে যায়। নাও, ছাড়িয়ে খেয়ে ফেল। আমরা অনেকগুলো খেয়েছি।"

মেনী বলে "খাও না কেন বৌদি? আমার বৌদি খুব ভাল, আমি যা বলি তাই শোনে।"

ইহাদের নিকটে ভাল হইবার প্রলোভনে বিনু আর আপত্তি করিতে পারিল না।

লেবু নিঃশেষ হইলে মেনী তাহার লাল শালুর থলিটা খুলিল। মেনী কড়ি খেলিতে খুব ভালবাসে। কতকগুলি ছোট-বড় কড়ি ও ছক-কাটার একখণ্ড খড়িমাটি তাহার সঙ্গে সঙ্গেই থাকে।

ক্ষিপ্র হস্তে খড়ি দিয়া ছক আঁকিয়া মেনী ছক্কা-পাঞ্জার গুটি সাজায়।

তরু বলে, "এক পাট্টি খেলে যাও বৌদি।"

"খেলতে বস্‌লে দেরি হবে তরু, অনেক কাজ রয়েছে ওখানে। সবগুলো নারকেল এখনও কোরানো হয় নি।"

"রেখে দাও তোমার নারকেল, যারা রয়েছে ঘর সেঁতে তারাই করুক গে।" বলিয়া তরু বড় বড় পাঁচটা কড়ি লইয়া দান ফেলিল। "ছক্কা, জোড়া ছক্কা, এইবার পাঞ্জা।" পাঞ্জার পরে পোয়া।

তরুর এক দানেই দুই গুটি বাহির হইয়া একটা পাকিয়া ঘরে উঠিল। তরুর পরে মেনী, তাহার পরে বিনু।

দুই পাকা কড়ি-খেলুনির নিকটে বিনু হারিয়া গেল। কোন্ কালে কবেই বা জিতিতে পারিয়াছে। তাহার হার পদে পদে।

নূতন গুড়-সংযোগে তিলের নাড়ুর সুগন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল। বিনু ব্যস্ত হইয়া কহিল, "আমি যাই, নাড়ু পাকাতে হবে।"

মেনী তাহার হাত চাপিয়া ধরে, "আর একদান খেলে যাও বৌদি। না, তোমার দেরি হবে না। দেরি হবে বলেই না দশ-পঁচিশের কোট আঁকি নি। ছক্কা-পাঞ্জা খেলা এক ফুঁয়ে শেষ।"

এক ফুঁয়ে শেষ হইবার পূর্ব্বেই কামিনীর মা উপস্থিত। "একি বোমা? তিলের নাড়ুর চার নামিছে। তোমাগো খুঁজি হয়রান, তুমি বসি গেইচ—এই নয়া বৌমানুষের একি কাণ্ড? ছিঃ ছিঃ, লজ্জা লজ্জা।"

কড়ির কোটে কড়ি বসিয়া রহিল, বিনু ছুটিল কর্ম্মশালায়।

পাথরের তেলমাখা প্রকাণ্ড থালায় তিলের স্তূপ নামিয়াছে। ছোট ঠাকুমা, সরস্বতী, মনোরমা নাড়ু পাকাইতেছেন।

বিনু এক ঘটি জল হাতে-পায়ে ঢালিয়া ঘরে ঢুকিতেই মনোরমা কহিলেন, "এতক্ষণ কোথায় ছিলে? পায়ের কাঁটা তুলতেই কি এত সময় লাগে? ঘরে যে গিয়েছিলে, বিছানা ছুঁয়ে ত আস নি?"

সরস্বতী রুক্ষস্বরে বলিল, "বিছানা ছোঁয়া; কড়ির খট্ খট্ শব্দ শোন নি? হাত বাজিয়ে আসা হ'ল নিয়মের কাজে। হাত ছুঁলে নাইতে হয়।"

ছোট ঠাকুমা কহিলেন, "কাপড় ছেড়ে আসুক, এদিকে যে শক্ত হয়ে যাচ্ছে। নাড়ু পাকানর হাত চাই।"

মনোরমা গম্ভীর হইয়া আদেশ করিলেন, "খাবারের আধার গরম রয়েছে, তাড়াতাড়ি ওসব ছেড়ে নেইয়ে পরে এস। একটু গঙ্গাজল মাথায় ছিটিয়ে দিচ্ছি।"

নাড়ু পাকাইতে পাকাইতে বিনু ভাবে, [illegible] তিনগুণি [illegible] দুই হাতে ঠেলিয়া [illegible] খাইতে চাহে না। [illegible]

তাহার পরের দিন। দিন যায়, বিহুর নিকটে দিন দীর্ঘ হইলেও অগ্রহায়ণের স্বল্পায়ু দিবা দেখিতে দেখিতে বিলীন হয়।

নবান্নের পূর্ব্ব দিন শিশির-সিক্ত প্রভাতে রায়বাড়ী সচকিত হইল। গত রাত্রে খড়ের গাদার ফাঁক হইতে কালজীর দুইটি ছানা শেয়ালে লইয়া গিয়াছে। 'বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।' যে কুকুরদের প্রচণ্ড প্রতাপে কাকপক্ষী রায়বাড়ীতে 'নাক গলাইতে' সাহস পায় না, তাহাদের সন্তান অপহরণ!

সকলে অনুমান করিতে লাগিল, সুচতুর শৃগালরা দল বাঁধিয়া আসিয়াছিল। একদল পুকুরপাড়ে হুক্কা-হুয়া জিগির তোলায় লালজী গিয়াছিল সেই দিকে শেয়াল তাড়াইতে। আর একদল মণ্ডপের কাছে শব্দ করায় কালজী সন্তান ফেলিয়া কর্ত্তব্য-কাজে রত হইয়াছিল, সেই সুযোগে শেয়াল দুই বাচ্চাকে মুখে করিয়া বাঁশবনে ভোজের আয়োজন করিয়াছিল। আরও কয়েকবার কুকুর-শাবকদের এইরূপ পরিণতি হইয়াছে। যাহারা পরের কাজে ব্যস্ত, তাহাদের এই দুর্দ্দশা হইয়া থাকে। পশু আর কাহাকে বলে? বুদ্ধির দোষে পশু, বুদ্ধির গুণে মানুষ।

নবীন চাকর ভিতরে বিছানা রৌদ্রে দিতে আসিয়াছিল। ঠাকুমা তাহাকে লইয়া পড়িলেন, "দেখ্ নবনে, তোরে একটা কথা কই, তুই ছাওয়াল বয়েসে এবাড়ী এইছিলি, এখন তোর যুবা বয়েস হইচে। তোর মতন আর কারোর এত টান নাই, কেউ এমন করে রায়-বাড়ীর হিত কামনা করে না। লালজী-কালজীর বয়েস হয়ে যাচ্ছে। একটা বাচ্চাও থাকছে না, এর পরে রায়বাড়ী চৌকি দেবে কে?"

নবীন বলে, "দিবে, আরও কত কুকুর আসবে।"

"তা হয় না, তৈরি করে নিতে হয়। তুই থাকতেই শেয়াল খেলো দুই-দুইটা বাচ্চা।"

"আমি তার কি করব মাঠান? ভেতর বাড়ীত থেকেও বিলাই-ছানা গেল। যেমন পালে পালে হয়, তেমনি যায়।"

"বেড়ালের ছানা বেড়াল খায়, তার কথা ধরি না নবনে। কুকুর হ'ল প্রভুভক্ত জীব, তাকে রক্ষে করতে হয়, যত্ন করতে হয়। শেয়ালের লোভ হয়েছে, 'লোভ হয়েছে ছাগল খেয়ে, নিত্যি আসে কানছি বেয়ে।' যে দুটো আছে আজকেই শেষ করে দেবে।"

"তার আমি কি করব মাঠান?" বলিয়া নবীন সরিয়া যাইবার উপক্রম করিল।

ঠাকুমার কণ্ঠে মিনতি ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, "তুই কি করবি, তাই জিজ্ঞেস করছিস্? এতক্ষণ ভরে আমি কি অরণ্যে রোদন করলাম সাধে? তোর ঘরের চৌকির তলায় বিচালি পেতে বাচ্চা দুটোকে রেখে দেগে। কেষ্টর জীবকে যত্ন করলে ভগবান্ তুষ্ট হন। ভাগবতে কয়েছে, যদি কেষ্ট চাও, সর্ব্বজীবে দয়া করে গোলকধামে যাও।"

"আপুনি য্যান কইলেন মাঠান, কিন্তু কুত্তার বাচ্চা নিয়া শোয়া কি সোজা কথা! গাছের পাতা পড়লেই বাইরে বেরোবে। তথুনি আবার ফিগ্যা আসি কপাটে থাবা দিয়া ভেউ ভেউ করে কাঁদবে। কে খুলবে কপাট, কে করবে বন্ধ?"

"তুই করিস বাবা সোনা, তোরে আমি আশীর্ব্বাদ করব। ক'টা দিনই বা কষ্ট করবি। হাঁটা-খাওয়া শিখলে ভেতরে এনে রাখিস। সারাদিন ঘুর ঘুর করে বেড়াবে। এরা যখন থাকবে না, ওরাই হবে চৌকিদার।"

ব্রাহ্মণ-কন্যার অনুরোধ-উপরোধ নবীন এড়াইতে পারিল না। কহিল, "তাই রাখি দিব মাঠান, আমার চৌকির তলায়।"

ঠাকুমা খুশী হইয়া নবীনকে ঝুড়ি ঝুড়ি আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। বর্ত্তমান লইয়া থাকিলে কি তাঁহার চলে? এ বাড়ীর ভূত ভবিষ্যৎ তিনি না ভাবিলে ভাবিবে কে?

নবান্নের দিন আসিল। রাত্রি হইতেই আয়োজন করিয়া রাখা হইয়াছে। বিরাট্ পাথরের থাদায় মনোরমা ঠাকুমা-বর্ণিত সমস্ত উপকরণ সংযোগে নবান্ন প্রস্তুত করিলেন।

স্নানান্তে গরদের জোড় পরিধান করিয়া মহেশবাবু আসনে বসিলেন। পুরোহিত মন্ত্র পড়াইতে লাগিলেন। ছোট ছোট কলার পাতায় পাতায় থরে থরে সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে কলা, মূল, বাতু, তক্তি, নবান্নের নূতন

চাল মাথা। দেবপক্ষ দেবীপক্ষ গুরুপক্ষ মাতৃপক্ষ পিতৃপক্ষ। পক্ষের আর শেষ নাই। যত পক্ষ, যত পক্ষকে উৎসর্গ করা হইবে তত পক্ষের নামে ভোজ্য নিবেদন হইতেছিল।

ছোট ঠাকুমা ভোগের ঘরে নূতন চালের পায়েস চড়াইয়া দিয়াছেন। নূতন গুড়ের গন্ধে সারা বাড়ী আমোদিত। সরস্বতী পিঠা প্রস্তুত করিতে বসিয়াছিল। চালের গুঁড়োর সিদ্ধ পিঠাতে বিনুর হস্তার্পণ করিবার উপায় নাই। ক্ষীরের ও ছানার জিনিষ পাকের পর্য্যায়ে পড়ে না। তাহাকে কাঁচা বলিয়া ধরা হয়। চালের গুঁড়া সেদ্ধ হইলেই সে হয় পাকা, অন্নের সমতুল্য। বিধবারা বিনুর রান্না গ্রহণ করেন না। অতটুকু মেয়ে, যার আচার-বিচার বোধ নাই, পূজা-অর্চ্চনা নাই, কুলগুরুর নিকট হইতে ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ করিয়া দেহকে শুদ্ধ করা হয় নাই, বিধবারা তাহার ছোঁয়া রন্ধন-সামগ্রী খাইয়া পরলোকের পথ রুদ্ধ করিয়া দিতে পারেন না।

নবান্ন শেষ হইলে মনোরমাকে এদিকে আসিতে হইবে পিঠেপুলির সমারোহে।

বিনু আছে শাশুড়ীর সঙ্গে ফাই-ফরমাইস খাটিতে। ক্ষিতি সুমন্ত তরু রহিয়াছে পূজার কাছে। ঠাকুমা দূরে থাকিয়া মন্ত্র পাঠ শুনিতেছেন। তাঁহার ভয় আছে বিলক্ষণ, কি জানি ভুলবশতঃ যদি পূর্ব্বপুরুষদের কাহারও নাম বাদ পড়িয়া যায়।

না, একটা নামও বাদ পড়িল না। রায়বাড়ীর নবান্ন সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইয়া গেল।

পুরোহিত জলযোগ করিতে বসিলে মহেশবাবু পাতায় করিয়া নবান্ন লইয়া প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলেন কাকদের ভোজন করাইতে। কাকরা না খাইলে নবান্ন সিদ্ধ হয় না।

নবান্ন প্রস্তুতে অনাচার স্পর্শ করিলে কাকরা নাকি সে দ্রব্য আস্বাদ করে না। নবান্ন অসিদ্ধ হইলে পুনরায় করিতে হয়। সৌভাগ্যক্রমে নবান্ন সুসিদ্ধ হইল। এক ঝাঁক কাক পরমানন্দে উড়িয়া আসিয়া খাইতে লাগিল।

কাকদের খাওয়াইয়া গরু-বাছুরদের খাইতে দিয়া কর্ত্তা প্রসাদ মুখে তুলিয়া নবান্ন সমাধা করিলেন।

ছেলেমেয়েরা প্রসাদের পাতা লইয়া বসিয়া গেল। দাসদাসী কুকুর-বেড়াল কেহ বাদ গেল না।

সকলকে নবান্ন করাইয়া গৃহিণী ঢুকিলেন ভোগশালায়, সেখানে বিপুল আয়োজন।

বিনু ঠাকুমার সামনে নবান্নের থালি রাখিতেই ঠাকুমা জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "তোর নবান্ন হ'ল মণিমালা? ছোট বৌ সরি যে ভোগ নিয়ে মত্ত। নবান্ন খেয়ে কাজ করুক। তিথি ছেড়ে গেলে তখন আবার নবান্ন কিসের? শিবের মাথায় নতুন চাল না দিলে খেতে নেই। কাল বুঝি ওরা সকলে শিবের মাথায় নতুন চাল দিয়েছিল? তোকে মাটির শিবঠাকুর গড়তে দেখেছিলাম?"

বিনু প্রকাশ্যে ঠাকুমার সহিত বাক্যালাপ করে না। সে চকিত দৃষ্টি চারিদিকে নিক্ষেপ করিয়া চুপে চুপে উত্তর দিল, "হ্যাঁ, কাল সকলে শিব পূজো করে নতুন চাল শিবের মাথায় দিয়েছেন। এখন মা প্রসাদ নিয়ে গিয়েছেন ভোগের ঘরে। ওঁরা তিনজনা নবান্ন করবেন। আমাকেও দিয়ে গেছেন। আপনি খান ঠাকুমা, আপনার ত শিবের মাথায় দেওয়া নেই?"

"কে তোকে কয়েছে আমার শিবপূজো নেই? আঁচলে বেঁধে দুটো নতুন চাল নিয়ে শুয়েছিলাম কাল রাতে। প্রাতঃস্নান করি, গোটাকতক ডুব দিয়ে চাল-জল নিবেদন করি দিলাম জলে।"

"কাকে নিবেদন করলেন ঠাকুমা?"

"কাকে আবার, শিবকে। ও, বুঝতে পারলি নে? তবে শোন্ মণিমালা, তোকে গোপনে কই; কারোকে কোস্ নে যেন। আমি চাল ধুয়ে নিয়ে দিলাম তোর দাদাশ্বশুরকে। চাল দিয়ে অঞ্জলি ভরে জল দিয়ে কইলাম—'এই নাও, চাল-জল গেরণ করো। আজ তোমার মহেশ কত দেব্য দেবে তোমাকে। তার আগে আমি তোমাকে পেবেছিলাম, তুমিই আমার দেব্‌তা, শিব। তোমার নামে জল দিলেই আমার পূজো-আচ্চা হয়। আমার বুদ্ধি নাই, মন্তর তন্তর জানি না, তা তুমি ত জানই'।"

বিনু তরলমতি, তাহার ভিতরে গভীরতা নাই। সে হাসিয়া কহিল, "আপনি বুঝি রোজ নেয়ে-ধুয়ে দাদুকে জল দেন? আর কিছু দাদুর উদ্দেশে দেন না?"

"সেই ত আমার ! যা খাই, আগে মনে মনে তাঁরে দিয়ে তবে মুখে দেই। নেয়ে তিন গণ্ডুষ জল দেই নিত্যি —যখন গঙ্গা-জলে দাঁড়িয়ে জল দেই চোখ বুঁজে, তখন মনের মধ্যে দেখতে পাই তিনি আমার কাছে গঙ্গাজলে এসে দুই হাত পেতে জল নিয়ে হাসতে হাসতে মুখে দেয়। আমার ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব পুজো হয়ে যায়।" বলিয়া ঠাকুমা নবান্নের মাথা চাল তুলিয়া কপালে ঠেকাইয়া মুখে দিলেন।

বিষ্ণু ফিরিয়া চলিল যথাস্থানে।

মধ্যাহ্ন হইতে না হইতে বাড়ী ভরিয়া গেল নিমন্ত্রিত জনসমাগমে।

ঘরে বারান্দায় উঠোনে পংক্তি-ভোজনে বসিয়া গেল সকলে। ভোজের পরে প্রসাদ বিতরণ, পায়েস পিঠে-পুলির মহোৎসব।

ক্রমশঃ

—॰—

বাঙ্গালী মাত্রেই ভীরু কি না

এমন কোনো জাতি নাই যাহার প্রত্যেক মানুষই সাহসী বীরপুরুষ। কোন জাতিকে ভীরু বলাও মূর্খতা। এখনও কিন্তু এমন বাঙ্গালী আছে যাহারা নিজের জাতভাইকে ভীরু বলিতে লজ্জাবোধ করে না। তাহার একটা দৃষ্টান্ত সেদিন পাওয়া গিয়াছে। বাগ্‌নাপাড়া দাঙ্গার মোকদ্দমা কালনার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ইউ এন্ বসুর নিকট হইতে কোন ইউরোপীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচারার্থ প্রেরণের জন্য বর্দ্ধমানের ম্যাজিষ্ট্রেট ডাগলাস সাহেবের নিকট দরখাস্ত পড়ে। দরখাস্ত নামঞ্জুর করিবার সময় ডাগলাস সাহেব যে রায় দেন, তাহার মধ্যে আছে, "দরখাস্তকারীর (বাঙ্গালী) কৌসিলি বলেন, তাঁহার স্বদেশবাসীরা স্বভাবতই কাপুরুষ। আমি তাঁহাকে ইহা জানান দরকার মনে করি নাই, যে, আমি গত মহাযুদ্ধে বাঙ্গালী পল্টনের এক দলের নেতা ছিলাম, এবং সেইজন্য তাঁর চেয়ে আমার ইহা বলিবার বেশী অধিকার আছে, যে, বাঙ্গালীদের মধ্যে সাহসী লোকের অভাব নাই। তাঁহার যুক্তিটা আমার কাছে হাস্যকর মনে হইতেছে।"

মেকলে এবং অন্য অনেক ইংরেজ নিন্দুকের কথায় বাঙ্গালীরা মন্ত্রমুগ্ধবৎ মানিয়া লইয়াছিল, যে, তাহারা ভীরু। সেই কুসংস্কার এখনও অনেকের আছে। দেশভ্রমণ করিলে, বাঙ্গালীরা যত সাহসের পরিচয় দিয়াছে তাহা স্মরণ করিলে এবং মেকলের প্রতিবাদ যে-সব ইংরেজ করিয়াছেন তাঁহাদের কথা জানিলে ঐ কুসংস্কারাবিষ্ট লোকদের ধারণা বদলাইবে। যেমন ধরুন, ভূতপূর্ব্ব সিভিলিয়ান ক্রাইন সাহেব তাঁহার "ভারতের আশা" (India's Hope) নামক পুস্তকের ৪৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :

"Considerations of space forbid me to discuss all the allegations made (by Macaulay) in the 'Essay on Warren Hastings', but I must refer, briefly, to the charge of cowardice. No quality is so widely diffused as physical courage, and healthy Bengalis possess it in a marked degree......"

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬।

ছায়াপথ

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

॥ উনিশ ॥

অবশেষে একদিন রামকিঙ্করের বি. এ. পরীক্ষা শেষ হ'ল।

ফিরে এসে শ্রান্তদেহে তক্তপোশে শুয়ে পড়ল। শ্রান্তির কারণ ছিল না। এবারে খুব কঠোর পরিশ্রমের সুযোগ সে পায় নি। যদিচ দোকানের হট্টগোলে পাছে তার পড়াশুনার বিঘ্ন হয় সেই জন্যেই গিন্নীমা তাকে এখানে এনেছিলেন, এখানে এসে কিন্তু কিছুটা মানসিক দুর্বলতা, নানা বিঘ্নের মধ্যে সে জড়িয়ে পড়েছিল। তার ফলে তার পড়াশুনার বেশ খানিকটা ক্ষতি হয়েছে।

তথাপি পরীক্ষার নামটাই শ্রান্তিকর। যে ছেলে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছে আর যে করে নি, পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে সকলেরই স্নায়ুগুলো ঢিলে হয়ে যায়। রামকিঙ্করেরও তাই হয়েছিল।

বিছানায় শুয়ে তার প্রথম মনে এল রবীন্দ্রনাথের সেই লাইনটি: 'বন্ধনের কাল হ'ল শেষ।' জমিদার-বাড়ীর আমলা-মহলের নিরিবিলি ঘরে বাস এবার চুকল। হয়ত কালই, কি আর দু'-একদিন পরে আবার ফিরে যেতে হবে তেলের দোকানের কাজে, সেই বিশ্রী আবহাওয়া এবং বিশ্রী খাওয়া-দাওয়ার মধ্যে। আবার হরেকৃষ্ণের সেই কদর্য্য ব্যবহার তার মনে পড়ল।

হরেকৃষ্ণকে সে যেন ভুলেই গিয়েছিল। এই ক'মাসের মধ্যে, এখানকার নিশ্চিন্ত পরিবেশে হরেকৃষ্ণকে তার একবারও মনে পড়ে নি। হরেকৃষ্ণ এই ক'মাস তার জীবনের কক্ষপথ থেকে যেন দূরে সরে গিয়েছিল। তার কর্মজীবনের সঙ্গে যেন ওর আর কোন সংযোগই ছিল না। অনেকদিন পরে আজ প্রথম হরেকৃষ্ণ তার জীবনে ফিরে এল।

গিন্নীমার সঙ্গে গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তার দেখা হয় নি। তিনিও ডাকেন নি, রামকিঙ্করও নিজের থেকে যেতে সাহস করে নি। কিছুদিন থেকে গিন্নীমার সম্বন্ধে তার একটা ভয় জেগেছে। ভয় একেবারে অহেতুক নয়। বৌরাণী কাইজ়রমারে খাটায় এবং সারদার সঙ্গে মেলামেশা যে তিনি পছন্দ করেন না, সহজ কথার কথাও নয়, [illegible] রামকিঙ্কর বুঝতে পারে। [illegible] মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, এ সবের মধ্যে সে থাকবে না। সে গরীবের ছেলে, এসেছে পরীক্ষার পড়া তৈরী করবার জন্যে। বড়-মানুষীর ব্যাপারের মধ্যে তার থাকবার দরকারই বা কি?

কিন্তু ঐ সারদা। সে এলেই বৌরাণীর জন্যে করুণায় এবং সমবেদনায় রামকিঙ্করের মন ভরে ওঠে। সে দুর্বল হয়ে পড়ে। তার প্রতিজ্ঞাও ভেসে যায়।

তার আশঙ্কা গিন্নীমা এটা পছন্দ করেন না। এ বাড়ীতে গিন্নীমাই সর্বময়ী কর্ত্রী। তাঁর অনুগ্রহেই সে এখানে এসেছে। তাঁর জন্যেই হরেকৃষ্ণ কিছু পরিমাণ সংযত থাকে। তিনিও অপ্রসন্ন হ'লে, কি দোকানে, কি এখানে কোথাও তার শান্তিতে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠবে।

পরীক্ষা শেষ হবার পরে এই প্রশ্নই তার মনে বড় হয়ে দেখা দিল।

অবস্থাটা ঠিক কোথায় দাঁড়িয়েছে, তা সে জানে না। সন্ধ্যার পরে গিন্নীমা পূজায় বসেন। এবং অনেক রাত্রি পর্যন্ত পূজা করেন। সন্ধ্যার পরে তিনি কারও সঙ্গে দেখা করেন না। সুতরাং আজ রাত্রে আর নয়, কাল সকালে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে। তাঁর মনের ভাব মুখ দেখে অনুমান করা কঠিন। তবু যতটুকু অনুমান করা সম্ভব, ততটুকু করবার চেষ্টা করবে। তাছাড়া আর উপায় কি!

সারদা কয়েকদিন আসে নি। কেন আসে নি কে জানে! হয়ত সে পরীক্ষার পড়া নিয়ে ব্যস্ত, সেই জন্যেই আসে নি। কিংবা হয়ত অন্দরের রাজনীতি ঘোরালো হয়ে উঠেছে, সেই জন্যেই আসতে পারে নি।

কিন্তু এখন আর সারদা নয়, বৌরাণীও নয়। কাল সকালে সর্বাগ্রে গিন্নীমার সঙ্গে দেখা করতে হবে।

রামকিঙ্কর স্নান করে বেড়াতে বেরুল। অল্পদূর যেতেই সারদার সঙ্গে দেখা।

—পার্কে যাচ্ছেন?—সারদা সহাস্যে জিজ্ঞেস করল।

—পার্কে আর কি করতে যাব? তুমি ত আর সেখানে যাও না।—রামকিঙ্করও হেসে উত্তর দিলে।

—যাই না? আপনি গিয়ে দেখেছেন?

—না গিয়েও দেখা যায়।

—কি ক'রে ?

রামকিঙ্কর হেসে বললে, তোমাকে যদি চব্বিশ ঘণ্টা বৌরাণীর অন্দরে দেখা যায়, তা হ'লে বুঝতে হবে, তুমি পার্কে যাও না।

ওদের দুজনেরই পা অন্যমনস্কভাবে কখন পার্কের পথ নিয়ে ফেলেছে।

সারদা হেসে বললে, আমি চব্বিশ ঘণ্টা বৌরাণীর অন্দরে কখনই থাকি না। এর মধ্যে কয়েকদিনই আমি পার্কে ঘুরে গেছি। মোটে একদিন আপনাকে দেখতে পেয়েছিলাম। আপনি লক্ষ্য করেন নি। ক'টি বাবুর সঙ্গে জোরে জোরে কি যেন আলোচনা করছিলেন।

—হ্যাঁ। পরীক্ষা দিয়ে ফেরবার পথে একদিন এসে বসেছিলাম। কিন্তু পার্কে কেন, আমার ঘরেও ত একদিন আসতে পারতে।

ওরা পার্কে এসে পড়েছে। দু'জনে গিয়ে তাদের সেই নির্দিষ্ট কোণটিতে ঘাসের ওপর গিয়ে বসল।

সারদা সভয়ে একবার চারিদিকে চেয়ে বললে, বৌরাণী একদিন আমাদের এইখানে দেখে ফেলেছিলেন। জানেন ?

রামকিঙ্কর ভয়ে শিউরে উঠল: কি সর্বনাশ! কিছু বকাবকি করেছিলেন নাকি ?

সারদা বললে, বকাবকি ঠিক না করলেও কথার মধ্যে খোঁচা ছিল। সেই ভয়েই আমি আর আপনার সঙ্গে দেখা করি নি।

দু'জনে নিঃশব্দে বসে রইল।

হঠাৎ একসময় রামকিঙ্কর বললে, কাল বোধহয় আমি চ'লে যাচ্ছি।

সারদা চম্‌কে উঠল—কোথায় ?

—দোকানে। যেখান থেকে এসেছিলাম।

—এবাড়ী আর আসবেন না ?

—মনিব বাড়ী আসতেই হবে। তবে কালে-ভদ্রে।

আবার দু'জনে চুপ করে বসে রইল।

একটু পরে সারদা বলল—আপনাদের দোকান আমি চিনি।

—চেন ? দরকার হ'লে যেতে পারবে ?

ম্লানকণ্ঠে সারদা বললে, কি দরকার আর হবে, বলুন। দোকানে ত আর বৌরাণীর কোন ফরমাশ থাকবে না ?

মনে মনে রামকিঙ্কর তা স্বীকার করলে। মুখে বললে, বলা ত যায় না সারদা, বৌরাণীর আমাকে দরকার হ'তেও পারে। দোকানটা চেনা থাকলে তোমার পক্ষে খবর দেওয়া সুবিধা।

সারদা অন্যমনস্কভাবে কি যেন ভাবছিল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রামকিঙ্কর বললে, এখানে বেশ ছিলাম, না সারদা ? আবার ফিরে যেতে হবে সেই তপ্ততেলের কড়াইয়ে। ভাবতেও মনটা দমে যাচ্ছে।

সারদা চম্‌কে উঠল: তপ্ততেলের কড়াই বলছেন কেন ? সেখানে কি খুব কষ্ট ?

—কি কষ্ট, সে তুমি কল্পনাও করতে পার না। শুনেছি, নরকে পাপী লোকদের তপ্ততেলের কড়াইয়ে ফেলে দেওয়া হয়। আমাদের দোকানটিও তেমনি একটা নরক।

—গিন্নীমা জানেন না ?

—তিনি না জানেন কি ? দু'একবার আমাকে রক্ষেও করেছেন। কিন্তু আর করবেন কি না সন্দেহ।

—কেন ?

—ঠিক জানি না, কাল সকালে কথা ব'লে বুঝতে পারব। কিন্তু আমার সন্দেহ, আমার ওপর আর তিনি খুশী নন।

—কেন ? বৌরাণীর ব্যাপার নিয়ে ?

—তাই।

সে সন্দেহ সারদার মনেও রয়েছে। বৌরাণীর মনেও। কিন্তু কেউ নিশ্চয় করে কিছু জানে না।

সারদা বললে, পড়াশুনার ব্যাপার নিয়ে আপনাকে হয়ত বৌরাণীর দরকার হবে। একদিন তিনি সেই রকম বলছিলেন। কিন্তু আপনি যদি এখান থেকে চলে যান, তা হ'লে কি ক'রে কি হবে, সে একটা ভাবনার কথা।

সারদা এখন থেকেই বোধহয় ভাবতে বসল।

রামকিঙ্কর জিজ্ঞেস করলে, বৌরাণী কি সত্যি সত্যি পরীক্ষা দেবেন ?

—হ্যাঁ। পড়াশুনা আরম্ভ করে দিয়েছেন। তবে মনের অবস্থা ত ভাল নয়।

রামকিঙ্কর সভয়ে জিজ্ঞেস করলে, বাবুর অত্যাচার কি এখনও চলছে ?

—প্রত্যহ। এখন চাবুক ধরেছেন। বৌরাণীর পিঠে শুধু চাবুকের দাগ।

—কান্না ত শুনতে পাই না।

—না। বৌরাণীর ত অভ্যেস হয়ে গেছে। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খান। একটা 'উঃ' শব্দ পর্যন্ত

করেন না। সেই জন্যেই কেউ ঢুকতে পারে না। সব সময়ের গায়ে ব্লাউজ থাকে। সুতরাং কেউ দেখতে পায় না। শুধু আমি জানি আর জানেন ভগবান্।

দু'জনেই দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

রাত হয়ে আসছিল।

সারদা বললে, উঁহুম, আর নয়। বৌরাণী আমাকে হয়ত খুঁজছেন।

দু'জনে উঠে পড়ল।

সকালে গিন্নীমা যথারীতি স্নান করে, খোলা চুলে একটা গেরো দিয়ে, একখানি মটকার শাড়ি পরে ঠাকুর-দালানে পূজার যোগাড় করছিলেন।

রামকিঙ্কর প্রণাম করে দাঁড়াল।

গিন্নীমা সহাস্যে জিজ্ঞেস করলেন, পরীক্ষা শেষ হ'ল?

রামকিঙ্কর বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ। কাল শেষ হয়েছে।

—কেমন হ'ল?

—হ'ল এক রকম।

—'এক রকম' কেন? ভাল হয় নি?

কাঁচুমাচু করে রামকিঙ্কর উত্তর দিল, খুব ভাল হয় নি।

গিন্নীমা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করলেন, দোকানে যাচ্ছ কবে?

—আপনি যেদিন আদেশ করবেন।

গিন্নীমা বললেন, এখানে ত আর কিছু কাজ নেই।

—আজ্ঞে না।

—তা হ'লে আজ বিকেলেই চলে যাবে।

—তা হ'লে আপনি দোকানে একটা হুকুম পাঠিয়ে দেবেন।

হুকুম আগেই চ'লে গেছে। কিন্তু গিন্নীমা সেকথা চেপে গেলেন। শুধু বললেন, আচ্ছা।

রামকিঙ্কর নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। যদি আরও কিছু হুকুম থাকে। তিনি না বললে যেতেও পারে না।

গিন্নীমা রামকিঙ্করকে যেতেও বললেন না। নিঃশব্দে নিজের কাজ করে চললেন। অনেকক্ষণ পরে বললেন, নিরিবিলি একমনে পড়ার সুবিধা হবে ব'লে তোমাকে এখানে এনেছিলাম। কিন্তু তা হয় নি। বাজে কাজে অনেক সময় নষ্ট করেছ। দোকানে গিয়ে মন দিয়ে কাজ করবে। কারও সঙ্গে বকাবকি করবে না।

রামকিঙ্কর নিঃশব্দে শুনে যেতে লাগল। প্রতিবাদ করলে না। বললে না, সে মন দিয়েই কাজ করে, কারও সঙ্গে বকাবকি করা তার স্বভাব নয়।

গিন্নীমা জিজ্ঞেস করলেন, ফল বেরুতে কত দেরি হবে?

—দু'তিন মাসের মধ্যেই বেরুবে।

—পাশ করলে খবরটা দিও।

রামকিঙ্কর তাড়াতাড়ি বললে, সে ত নিশ্চয়। আমি যে কোনদিন লেখাপড়া শিখতে পারব, স্বপ্নেও ভাবি নি। এই যে বি-এ পরীক্ষা দিলাম, সে আপনার দয়াতেই সম্ভব হ'ল। আপনি আমার কলেজের মাইনে যুগিয়েছেন, বই কিনে দিয়েছেন, দোকানের কাজের পরে যাতে নিয়মিত কলেজ যেতে পারি, তার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আপনার দয়া ভোলবার নয়।

বলতে বলতে শেষের দিকে রামকিঙ্করের গলা ভারী হয়ে এল, চোখ ছলছল করে উঠল।

গিন্নীমা যে তা বুঝতে পারলেন না, তা নয়। কিন্তু মুখ তুলেও ওর দিকে চাইলেন না। বললেন, কিন্তু কাজটা ভাল হ'ল কি না, ঠিক বুঝতে পারছি না।

কি সাংঘাতিক কথা! রামকিঙ্কর কাঠের পুতুলের মত আড়ষ্ট হয়ে গেল। তার ওপর অনুগ্রহ প্রকাশের জন্যে গিন্নীমা কি এখন অনুতপ্ত? কেন? এ আশঙ্কা রামকিঙ্করের মনে ছিল। বৌরাণীর সংস্পর্শে আসা গিন্নীমা পছন্দ করেন না। কাছারি বাড়ীতে আরও অনেকে ত আছে—দীর্ঘকাল থেকেই আছে। তারা ত বৌরাণীর সংস্পর্শে আসে নি। সে এল কেন? বৌরাণী কোন প্রয়োজনে অন্যদের ডাকেন নি। তাকেই বা ডাকলেন কেন?

রামকিঙ্কর অনেকদিন ভেবেও এর কারণ আবিষ্কার করতে পারলে না। কিন্তু এ কথা নিশ্চিত যে, গিন্নীমার অনুগ্রহের জন্যেই সে হরেকৃষ্ণর অকথ্য নির্য্যাতন সহ্য করতে পেরেছে। দোকানে আরও অনেক কর্মচারী আছে। গিন্নীমা তাদের কাউকেই চেনেন না, বড় জোর নামটা জানেন। তাদের ওপর গিন্নীমা প্রসন্নও নন, অপ্রসন্নও নন। এবারে তাকে দোকানে ঢুকতে হবে, গিন্নীমার অপ্রসন্নতা মাথায় নিয়ে। ব্যাপারটা হরেকৃষ্ণ যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে, তা হ'লে তার অত্যাচার যে কি রূপ নেবে, ভাবতেও রামকিঙ্কর শিউরে উঠল। তার মনে সান্ত্বনা এইটুকু যে, বি. এ. পাশ করতে পারলে, এই দুর্দিনে, যা-হোক একটা চাকরি জোগাড় করা অসম্ভব নয়।

তবু তার মনটা খারাপ হয়ে গেল। গিন্নীমাকে সে মনে-প্রাণে শ্রদ্ধা করে। অযাচিতভাবে তাঁর কাছ থেকে বহু উপকার সে পেয়েছে। চাকরির অদৃষ্টে যাই হোক, গিন্নীমার মনে আঘাত দেওয়ার জন্যে সে মনের মধ্যে একটা যন্ত্রণা অনুভব করতে লাগল।

বৌরাণী। রামকিঙ্করের বয়সে অমনি একটি দুঃখিনী, সুন্দরী তরুণীর জন্যে সমবেদনা অনুভব করা স্বাভাবিক। এখানে থাকলে বৌরাণীর জন্যে আরও অনেককিছু করতে হয় ত সে বাধ্য হ'ত। কিন্তু আজই সে চলে যাচ্ছে। হয়ত আর কখনও বৌরাণীর সঙ্গে তার দেখাই হবে না। তার আর কোন কাজে আসবার হয়ত সুযোগও ঘটবে না। তখন গিন্নীমা হয়ত তার অপরাধ ক্ষমা করতে পারবেন। হয়ত আবার সে গিন্নীমার প্রসন্নতা অর্জন করতে পারবে।

গিন্নীমাকে ভক্তিভরে প্রণাম ক'রে সে নিজের ঘরে চলে এল।

নিজের ঘরে ফিরে রামকিঙ্কর দেখলে, সারদা তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

জিজ্ঞেস করলে, কি খবর, সারদা?

সারদা স্বভাবসিদ্ধ চটুল হাস্যে বললে, বৌরাণী এক্ষুনি একবার আপনাকে ডাকছেন। দেরি করবেন না। এক্ষুনি আসুন।

আবার বৌরাণী!

রামকিঙ্কর শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে, কি ব্যাপার, সারদা?

—তার আমি কি জানি? এলেই জানতে পারবেন। ব'লে শাড়ির আঁচলে একটা দোলা দিয়ে চলে গেল।

যেতেই হবে, এবং যাওয়ার রাস্তাটা ঠাকুর-দালানের সামনে দিয়েই, যেখানে গিন্নীমা ব'সে ঠাকুরসেবার যোগাড় করছেন। হয়ত না যেতে হ'লেই ভাল হ'ত। কিন্তু যেতেই হবে। কেন জানে না, না গিয়ে তার উপায় নেই। কিন্তু যাওয়াটা সহজ নয়। যে পথের ধারে বাঘ বসে আছে, সেই পথ দিয়ে যাওয়ার মত।

রামকিঙ্কর বেরুল। গিন্নীমার দিকে না চেয়ে মাথা নীচু করে সটান অন্দরে ঢুকল।

বৌরাণী তার শোবার ঘরে বসে ছিল। রামকিঙ্কর আসতে হাসিমুখে বললে, আপনাকে একটু দরকারে ডেকে পাঠিয়েছিলাম।

বৌরাণীর হাসি করুণ, অথচ সুন্দর। দেখামাত্র রামকিঙ্করের মন হাল্কা হয়ে গেল।

নিঃশঙ্ক দৃঢ়চিত্তে বললে, আদেশ করুন।

বৌরাণী বললে, আপনার পরীক্ষা কেমন হ'ল? আপনি ত শুনেছি ভাল ছেলে। নিশ্চয় পাশ করে যাবেন।

—কিছুই বলা যায় না।

বৌরাণী সহাস্যে বললে, না, নিশ্চয় পাশ করে যাবেন। এবার আমার একটা ব্যবস্থা করতে হবে যে।

—কি ব্যবস্থা, বলুন।

—সামনের বার প্রাইভেটে বি. এ. পরীক্ষা দেব ভাবছি। আপনার ত হিষ্ট্রি-ফিলজফি ছিল। আমারও তাই। বই আমার আছে। আপনার কলেজের নোট-গুলো যদি আমাকে দিয়ে যান।

—সে আর বেশি কথা কি?

—আপনি ত আজকেই চ'লে যাচ্ছেন?

—হ্যাঁ। যাওয়ার আগে আমি সারদাকে দিয়ে নোটগুলো পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বৌরাণী হেসে বললে, যাওয়ার পরেও মাঝে মাঝে আসবেন। একেবারে ডুব দেবেন না। আপনাকে আমার মাঝে মাঝে দরকার হ'তে পারে।

এর উত্তরে কি বলা যায়, রামকিঙ্কর ভাবছিল। সারদা পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। চট করে বললে, আপনি ত মাঝে মাঝে আসতে বলছেন। বেচারার চাকরিটা খোওয়া যেতে পারে, সে কথা ভেবেছেন?

বৌরাণী চমকে উঠল: চাকরি খোওয়া যাবে কেন?

সারদা বললে, আপনার এখানে আসা গিন্নীমা পছন্দ করেন না, জানেন না?

বৌরাণী চুপ করে রইল। মুখভাব কঠিন। কম্পিত ওষ্ঠযুগল দেখে স্পষ্ট বোঝা গেল যে, একটা আবেগকে সে প্রাণপণে দমন করার চেষ্টা করছে। বৌরাণীর অমন মুখ রামকিঙ্কর কখনও দেখে নি। বোধ হয় সারদাও না। দু'জনে বিস্মিত নেত্রে তার মুখের দিকে চেয়ে।

আবেগটা শান্ত হ'লে বৌরাণী ধীরে ধীরে বললে, তাতে ভয়ের কি আছে? গিন্নীমা ত অমর নন।

তার মানেটা কি?

বৌরাণী বলে চলল, আমি আজ বৌরাণী, কাল গিন্নীমা হ'তে পারি। কর্তার যা অবস্থা, তাতে আমাকেও হয়ত গিন্নীমার মত সমস্ত দেখাশোনা করতে হবে। ক'টা দিন হয়ত আপনার একটু কষ্ট হবে, রামবাবু, কিন্তু

তাতেই ভয় পাবেন না। আপনি নিঃসঙ্কোচে মাঝে মাঝে আসবেন।

বড়বাড়ীর ব্যাপারে মোড়ে মোড়ে বিস্ময়। কিন্তু যে কথা এইমাত্র সে শুনলে, এত বড় বিস্ময়ের জন্যে রামকিঙ্কর প্রস্তুত ছিল না। ফেরবার পথে সেই কথাগুলো তার কানে বারবার ধ্বনিত হ'তে লাগল: আমি আজ বৌরাণী, কাল গিন্নীমা হ'তে পারি।

নিশ্চয় পারে। অবশ্য স্বামীর বেত্রাঘাত সহ্য করে, যদি ততদিন বেঁচে থাকে। বৌরাণীর কঠিন মুখভাব দেখে মনে হ'ল, বেঁচে থাকতে সে বদ্ধপরিকর। আসছে বার সে বি. এ. পরীক্ষা দিচ্ছে বটে, স্বাবলম্বী হওয়ার ইচ্ছাও আছে, কিন্তু সে একটা বিকল্প ব্যবস্থা হাতে রাখা মাত্র। আসলে এই বাড়ীতে সে থাকতে চায়, এককালে এই বাড়ীরই সর্বময়ী কর্ত্রী হিসাবে। গিন্নীমার মত। কে জানে, সেইজন্যেই হয়ত বেত্রাঘাত সে নিঃশব্দে সহ্য করে। আর কাঁদে না, চিৎকারও করে না।

ক্রমশঃ

আমাদের লক্ষ্য

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বর্ত্তমানে যে ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাতে অদূর, বা কল্পনা করা যায় এরূপ কোনও সুদূর ভবিষ্যৎ কালেও ভারতবর্ষের ডোমিনিয়ন হইবার সম্ভাবনা নাই, একথা বারবার আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়া বিলাতের রক্ষণশীল রাজনীতিবিদ্‌গণ আমাদের উপকারই করিতেছেন এবং এই সত্যটা ভুলিয়া গিয়া ডোমিনিয়নত্বে আমাদের আস্থা আছে এই কথা প্রচার করিয়া ভারতবর্ষের লীবারেল দল কেবলমাত্র আত্মপ্রবঞ্চনা ও মত-বিরোধের প্রশ্রয় দিতেছেন। পৃথিবীতে আন্তর্জ্জাতিক মনোভাবের প্রসারের ফলে ভবিষ্যতে যদি কখনও এমন দিন আসে যখন জাতিগত, ভাষাগত, সংস্কৃতিগত ও ধর্ম্মগত বৈষম্য সত্ত্বেও ভারতবর্ষের পক্ষে সাম্যের অধিকার বজায় রাখিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকা চলিতে পারে, তখন আর আমাদের পক্ষে বিশেষ করিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকিবার কোনও প্রয়োজন থাকিবে না। তখন পৃথিবীর সমস্ত জাতি ও সমস্ত সভ্যতা সঙ্ঘীভূত হইয়া যাইবে, লীগ অফ নেশ্যন্‌স্ সত্যে পরিণত হইবে। সে-অবস্থায় শুধু গ্রেট ব্রিটেন কেন, রুষিয়া, ফ্রান্স, জার্ম্মেনী, আমেরিকা সকলেই আমাদের সমান আত্মীয় ও সমান বন্ধু হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু আজ আমাদের সম্মুখে শুধু এক লক্ষ্য, সে লক্ষ্য পূর্ণ-স্বরাজ, আর সকলই আলেয়ার পিছনে ছুটা।......আমরা যদি আজ নিঃসংশয়ে জানি, যে, পূর্ণ-স্বরাজই আমাদের লক্ষ্য, তাহা হইলেই আমরা এই লক্ষ্যে পৌঁছিবার পথে যে-সকল বাধা আছে তাহা অতিক্রম করিবার জন্য অনন্যমনে ও একনিষ্ঠ ভাবে নিজেদের নিয়োজিত করিতে পারিব।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৩৬।

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর স্মরণে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

বিজ্ঞানাচার্য গিইকী বিজ্ঞান-লেখকদের সম্বন্ধে এই অভিযোগ করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা বিজ্ঞান-বিষয়ে লিখিতেছেন বলিয়া তাঁহাদের রচনাতে ভাষা, ব্যাকরণ ও রচনা-শৈলী প্রভৃতি বিষয়ে আদৌ মনোযোগ দেন না, সে-কারণ রচনাগুলি যথেষ্ট হৃদয়গ্রাহী হয় না। তিনি যদি আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের রচনাগুলি পড়িতেন তাহা হইলে সেরূপ অভিযোগ করিতে পারিতেন না। রামেন্দ্রসুন্দর একাধারে সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক, সেজন্য তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলিও উন্নততর সাহিত্যের মতই চিত্তাকর্ষক। বিশেষতঃ তাঁহার নিজস্ব একটা রচনা-শৈলী ছিল তাহাও মনোহারী। তাঁহার 'প্রকৃতি', 'জিজ্ঞাসা' প্রভৃতি পুস্তকে যে প্রবন্ধগুলি আছে তাহা একদিকে যেমন জ্ঞানসমৃদ্ধ, অন্যদিকে তেমনই হৃদয়গ্রাহী।

শুধু তাহাই নহে, তিনি সে-যুগেও প্রমাণ করিয়া দিয়া গিয়াছেন যে, ইংরেজী বৈজ্ঞানিক শব্দগুলির বাংলা পরিভাষা স্বচ্ছন্দে সৃষ্টি করা যায়। তাঁহার উত্তর-সূরী বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুও বর্তমান যুগে সেই অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন।

বেদ উপনিষদ্ সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান ভাষাতত্ত্ব ব্যাকরণ প্রভৃতির বিবিধ জ্ঞানস্রোত একত্র মিশিয়া তাঁহার মধ্যে একটি জ্ঞান-সমুদ্রের সৃষ্টি করিয়াছিল। অথচ, মানুষটি একেবারে নিরহঙ্কার ও সদা-হাস্যময়। যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন তাঁহারাই তাঁহার সরলতায় ও মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি মানুষের গুণ উপলব্ধি করিতে পারিতেন এবং গুণী ব্যক্তি হইলেই তাঁহার প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিতেন। তিনি স্বাধীনতার পূজারী ছিলেন এবং দেশপ্রেম তাঁহার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই কারণে তিনি পি. আর. এস. হইয়াও সরকারী চাকুরির দিকে পা বাড়ান নাই এবং রিপন কলেজের অধ্যক্ষরূপে জীবন কাটাইয়া দেন। [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাধীন চিত্তবৃত্তি, দেশপ্রেম, ইংরেজীতে অসামান্য ব্যুৎপত্তি, বাগ্মিতা ও বিলাসবর্জিত সরল জীবনযাত্রা প্রভৃতি দেখিয়া তাঁহাকে নিজের কলেজে অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অধ্যাপক অশ্বিনীকুমার ঘোষও (এক্ষণে অ্যাড্‌ভোকেট) নানাবিধ গুণের জন্য শ্রদ্ধেয় রামানন্দ-বাবুর মত তাঁহারও স্নেহের পাত্র ছিলেন।

তিনি নিরভিমান ও অনাড়ম্বর ছিলেন বটে কিন্তু তাই বলিয়া চাটুকার ছিলেন না। প্রকৃত গুণী ব্যক্তিগণ কোনও প্রলোভনে চাটুকার হন না। বস্তুতঃ তাঁহার মনের তেজ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরূপ ছিল। কথিত আছে, স্যার আশুতোষের সহিত তাঁহার মতবিরোধ হওয়ায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বার তাঁহার জন্য চিরদিন অবরুদ্ধ ছিল। কিন্তু সেজন্য তিনি দুঃখিত হন নাই।

প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ হাস্যরসিক হইয়া থাকেন। এই পৃথিবী তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পৃথিবী কিন্তু তাঁহাদের মন আর একটি কল্পনাময় পৃথিবীতে বিচরণ করিতে থাকে, তাঁহারা এই দুইটি পৃথিবীর মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে অক্ষম। এরূপ মনের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি—হাস্য। রামেন্দ্রসুন্দরের পক্ষেও তাহাই। কিন্তু তাঁহার হাস্য ব্যক্তিবিশেষের প্রতি অথবা পৃথিবীর প্রতি বিদ্রূপ নয়, উহা সহানুভূতিসম্পন্ন, মধুর, নির্মল ও নির্দোষ হাস্য, ইংরেজীতে যাহাকে humour বলে। তাঁহার রচনাবলী এইরূপ হাস্যরসে সিক্ত বলিয়া উহা আরও হৃদয়গ্রাহী। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্র-সুন্দর!" আমরা তাঁহার মধুর হাস্যের একটা উদাহরণ দিব।

অসুস্থতাবশতঃ তিনি শেষের দিকে নিজ হস্তে প্রবন্ধ লিখিতে পারিতেন না, একটা কাগজে তাঁহার চিন্তার বিষয়গুলি নোট করিয়া রাখিতেন এবং কোনও ব্যক্তিকে

ডাকিয়া সেই নোট হইতে ডিকটেশন দিতেন। একদিন তিনি অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডাকিয়া বলিলেন, "হাঁ জিতেন, আমার বাংলা ডিকটেশন ব'য়ে লিখতে পারবে এমন একটি ছাত্র যদি তোমার মেসে থাকে তবে তাকে আমার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিও ত!" ছাত্রটি পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীটে তাঁহার বাড়ীতে নির্দিষ্ট দিনে আসিল। আচার্যদেব তাঁহার নোট হইতে কিছুক্ষণ ডিকটেশন দিতে দিতে হঠাৎ থামিয়া গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরে নিজেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া ছাত্রটিকে বলিতে লাগিলেন, "দেখলে ত! রবি ঠাকুরের কেউ চুলটি, কেউ পোশাকটি, কেউ হাতের লেখাটি নকল করে আর আমার নিজের হাতের লেখা আমি নিজেই পড়তে পারি না, তার আর অন্য লোকে নকল করবে কি? তুমি আজ যাও, আর একদিন ডেকে পাঠাব।'

প্রতিভা প্রতিভাকেই আকর্ষণ করে, সেজন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অন্তরের অপেক্ষাও অন্তরতর ছিলেন। ১৯১৯ সালে তিনি যখন মৃত্যুশয্যায় তখন রবীন্দ্রনাথ নাইট উপাধি ত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে চাহিলেন। রবীন্দ্রনাথ না আসিয়া থাকিতে পারিলেন না। আচার্যদেব তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। ইহার কয়েকদিন পরেই তাঁহার জীবনদীপ নির্বাপিত হইল। তখন শিয়রে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বসিয়া ছিলেন, তিনি হাহাকার করিয়া উঠিলেন—"আমাদের চোখের সামনে বিস্তার একটা বড় জাহাজডুবি হয়ে গেল।"

বাঙ্গলা দেশের প্রতিভা যেমনটা যায় সে রকমটা আর হয় না। রামেন্দ্রসুন্দরের পক্ষেও তাহাই। তিনি সাহিত্যাচার্য, তিনি বিজ্ঞানাচার্য। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার স্থান আর পূরণ হইবে না। তাঁহার পাণ্ডিত্য, নীতিজ্ঞান, সাধুতা, চরিত্রমাধুর্য, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, দেশপ্রেম প্রভৃতি চিরদিন বাঙ্গালী জাতিকে অনুপ্রাণিত করিবে। তাঁহার জন্মশতবার্ষিকীতে আমরা আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিতেছি।

"স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে যে, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা"

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁহার প্রসিদ্ধ গানে যে-জন্মভূমিকে সকল দেশের সেরা বলিয়াছেন, সেটি কোন্ দেশ? বর্তমান ভারতবর্ষ নিশ্চয়ই সে দেশ নহে। কেননা, ইহার দুর্গতি ও হীন অবস্থা দেখিলে ইহাকে কেহ সকল দেশের সেরা বলিতে পারেন না। অতীত-গৌরবমণ্ডিত ভারতবর্ষকেও সকল দেশের সেরা বলা যায় না, কারণ, অতীতের যে-যুগই লওয়া যাউক, প্রত্যেক যুগেই শ্লাঘ্য অনেক কিছুর সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ নিন্দনীয়ও কিছু-না-কিছু ছিল; এবং তাহা অতীতের ভারত, বর্তমানের নহে—এখন বিদ্যমান নাই।

কবি সেই ভবিষ্যৎ ভারতকে সকল দেশের সেরা বলিয়াছেন যাহাতে অতীতের গৌরবোজ্জ্বল অংশের এবং দেশভক্ত মনীষীদিগের "স্বপ্ন"-দৃষ্ট আদর্শের অপূর্ব সংমিশ্রণ হইতে থাকিবে।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৪৭।

ইতিহাস কথা কয়

শ্রীঅজিত চট্টোপাধ্যায়

ফতেপুর সিক্রী দেখে Finch বলেছিলেন :

'Ruin all ; lying like a waste desert and very dangerous to pass through in the night'

কিন্তু Finch-এর উক্তি সম্ভবত অতিশয়োক্তিতে ভরা। কারণ ফতেপুর সিক্রীর সুরম্য সৌধশ্রেণী আজও দর্শকের কাছে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের এক নতুন দিগন্তের নির্দেশ দেয়। সত্য বলতে ফতেপুর সিক্রীর প্রধান প্রধান সৌধগুলি আজও বিনষ্ট হয় নি। দীর্ঘ চার শত বৎসর পরেও তাদের গঠন এবং কারুকার্য সময়ের চাপকে সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যেতে সমর্থ হয়েছে।

ফতেপুর সিক্রী সম্বন্ধে খুব সুন্দর একটি উক্তি আছে আমাদের নেহরুজীর। তাঁর Glimpses of World History গ্রন্থে জওহরলাল লিখেছেন :

'Fattehpur Sikri still stands with its beautiful mosque and great Buland Darwaza and many other fine buildings. It is a deserted city and there is no life in it ; but through its streets and wide courts, the ghosts of a dead empire still seem to pass.'

ফতেপুর সিক্রীতে গিয়ে দাঁড়ালে দু' চোখে স্বপ্ন নামবে। অতীতের স্বপ্ন,......এক বিরাট্ সাম্রাজ্যের ইতিহাস মনের আনাচে-কানাচে উঁকিঝুঁকি দেবে।

আগ্রা শহর থেকে ফতেপুর সিক্রী দক্ষিণ-পশ্চিমে, প্রায় তেইশ মাইল পথ। রাজধানী স্থাপনের আগে, ছোট্ট একটি গাঁ ছিল সিক্রী। এক ছোট জংলী গ্রাম। এর শান্ত নির্জন কোণে উপাসনা করতেন এক মুসলমান ফকির। তাঁর নাম সেখ সেলিম চিস্তি। বিরাট্ রাজত্বের সূচনা করেও আকবরের মনে কোন শান্তি ছিল না। সন্তান জন্মেও অকালে ঝ'রে পড়ত। আটাশ বৎসর বয়স পর্যন্ত বাদশাহের কোন সন্তানসন্ততি পৃথিবীর আলোবাতাসে টি'কে রইল না। স্বভাবতই আকবরের মন দরবেশ ও ফকিরদের দোয়ার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছিল। এমন সময় সেখ সেলিমের কাছে বাদশাহ যাতায়াত সুরু করলেন। একদিন কথা প্রসঙ্গে আকবর প্রশ্ন করলেন—'আমার ক'টি ছেলে বেঁচে থাকবে দরবেশ ?"

ফকির স্নিগ্ধ হেসে উত্তর দিলেন—'খোদা, যিনি দানে মুক্তহস্ত, তাঁর দোয়ায় তোমার তিন পুত্রসন্তান হবে বাদশাহ।'

আনন্দে অধীর হয়ে আকবর প্রতিশ্রুতি দিলেন—'আমার প্রথম সন্তানকে তোমার কোলে তুলে দেব, ফকির, যাতে তুমিই তার রক্ষক ও অভিভাবক হও।'

আকবরের হিন্দুপত্নী মরিয়ম্-উজ-জমানী তখন গর্ভবতী। বাদশাহ তাকে পাঠালেন ফকিরের আশ্রয়ে। সেখানেই জন্ম হ'ল জাহাঙ্গীরের।

ফকিরের নামেই নাম হ'ল পুত্রের মহম্মদ সেলিম বা সুলতান সেলিম। কিন্তু আত্মচরিতে জাহাঙ্গীর লিখেছেন—'বাবা আমাকে কোনদিন ঐসব নামে ডাকেন নি। আদর করে আমায় তিনি বরাবর ডেকেছেন, সেখু বাবা।'

ছোট্ট সিক্রী গ্রামটি ভাল লেগেছিল বাদশাহের। আর ভাল লেগেছিল গ্রামের দরবেশ সেলিম চিস্তিকে। এখানেই রাজধানী স্থাপন করতে মনোযোগী হলেন আকবর। সম্ভবত ১৫৭১ সালে ফতেপুর সিক্রীর কাজ সুরু হয় কিংবা হয়ত তার দু'-এক বৎসর আগে। চৌদ্দ-পনের বৎসরের মধ্যে এক সুন্দর সমৃদ্ধিশালী জনপদ গ'ড়ে উঠল। উপত্যকার বন-জঙ্গল, হিংস্রপ্রাণী-অধ্যুষিত অরণ্য সরে গিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াল এক আশ্চর্য নগরী। কারও কারও মতে বৈভবে, অট্টালিকায় এবং জন-বহুলতায় ফতেপুর সিক্রী তখনকার লণ্ডন শহর থেকেও বড় ছিল।

১৫৭৩ সালে গুজরাটে মির্জা হোসেন বিদ্রোহী হলেন। আকবর তখন ফতেপুর সিক্রীতে। রাজধানী গড়ে

উঠছে। সুরম্য সৌধশ্রেণী নিপুণ স্থপতির হাতে এক আশ্চর্য সৌন্দর্যের স্বাক্ষর বহন করে রূপায়িত হচ্ছে। কিন্তু বাদশাহকে ছুটতে হ'ল গুজরাটের পথে। সাড়ে চার শত মাইলের বন্ধুর পথ। তাঁর সুনিপুণ সৈন্য-বাহিনীর সহায়তায় মাত্র নয়দিনে সে পথ অতিক্রম করলেন আকবর। গুজরাটের বিদ্রোহ প্রশমিত হ'ল। তেতাল্লিশ দিন পরে আবার ফতেপুর সিক্রীতে ফিরলেন বাদশাহ। সেদিন সোমবার, ৬ই অক্টোবর, ১৫৭৩ খ্রীঃ। ফতেপুর সিক্রীর উপত্যকা অঞ্চলে শীত নামতে আর দেরি নেই। এরই মধ্যে হাওয়ায় কাঁপন লেগেছে। সন্ধ্যে না হ'তেই মানুষজন ঘরমুখো হ'তে চায়। কিন্তু সেদিন বাদশাহকে অভ্যর্থনা জানাতে সমস্ত ফতেপুর জেগে উঠল। বিজয়ী আকবর ফিরে আসছেন তাঁর ধূসর রঙের প্রিয় যুদ্ধঅশ্বে আরোহণ করে। আমীর ওমরাহের দল, প্রজা-পরিজন এসে অপেক্ষা করছেন পাহাড়ের পাদদেশে। বাদশাহকে তাদের অভ্যর্থনা জানাতে সকলেই ব্যাকুল।

সিক্রীতে ফিরে এসে এই জনপদের নতুন নাম দিলেন আকবর—ফতেহাবাদ। কিন্তু লোকে সে নাম গ্রহণ করল না। মুখে মুখে ফতেপুর সিক্রী নামটাই ছড়িয়ে পড়ল। কাজেই আকবরকেও মেনে নিতে হ'ল সেই নাম। জনপদের নাম হ'ল ফতেপুর সিক্রী।

বর্তমানকালে ফতেপুর সিক্রীর খ্যাতি শুধু সেই বিস্মৃত অধ্যায়ের স্মৃতি হিসেবেই নয়, অনেকগুলি আশ্চর্য সুন্দর অট্টালিকা, তাদের কারুকার্যময় গঠন-শৈলী, শিল্পীর হাতের নিপুণ আঁকিবুকি ইত্যাদির জন্যই তার প্রসিদ্ধি। ফতেপুর সিক্রীর সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা গ'ড়ে তুলতে যে মালমশলা ব্যবহৃত হয়েছে তা আজও লোকের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। ইঞ্জিনিয়ার, রসায়নবিদ্ এবং আরও অনেকে এই সুরম্য সৌধশ্রেণীর মূল উপাদান-গুলির বিশ্লেষণ করে বিস্মিত না হয়ে পারেন নি।

ফতেপুর সিক্রী চার শত বৎসর আগের এক প্রাণোচ্ছল স্মৃতিমাত্র। ভূগর্ভস্থ পম্পেই নগরীর মত বিস্তীর্ণ স্থান জুড়ে অবহেলিত ফতেপুর সিক্রী পড়ে আছে। তবে মাটির অন্তরে নয়, মাটির উপরেই।

প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। একপাশে একটি কৃত্রিম হ্রদ ছিল। বহুদিন তা শুকিয়ে গেছে। ফতেপুর সিক্রীর প্রধান অট্টালিকাগুলি ওখানকার উঁচুনীচু মাটির উপরের দিকে অবস্থিত।

ফতেপুর সিক্রী সাধারণত পূর্বদিক হ'তে দেখতে শুরু করা হয়। দর্শক ঢোকেন আগ্রা গেট হয়ে। এর দু'পাশে ঘরবাড়ী জীর্ণ ও অসংস্কৃত হয়ে পড়ে আছে বহুদিন। হয়ত সেদিন দোকান-পসারী বসত পথের দু'পাশে। আজকের জীর্ণ ও অব্যবহার্য ঘরগুলি ক্রেতা-বিক্রেতার কলরোলে ভরে উঠত। একটু ভিতরে গেলেই নহবতখানার ভগ্নাবশেষ চোখে পড়বে। এই নহবতখানা থেকেই সঙ্গীতের সুর ভেসে যেত। সম্রাটের আগমনের প্রথম ঘোষণা নহবতের বাজনার সুরে মুখরিত হয়ে উঠত।

নহবতখানা থেকে ডানদিকে একটি বড় অট্টালিকা চোখে পড়বে। অনুমান করা হয়, এটি ছিল বাদশাহের টাঁকশাল। এই অট্টালিকার গম্বুজের কাজ প্রশংসার দাবি রাখে। টাঁকশালের বামদিকে একটি প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। এটি আচ্ছাদনযুক্ত এবং বেলেপাথরের স্তম্ভের দ্বারা বেষ্টিত। বাদশাহ এইখানে সাধারণ প্রজা-পরিজনের দুঃখকষ্ট, সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কথা শুনতেন। ফতেপুর সিক্রীর এটি দেওয়ান-ই-আম।

দেওয়ান-ই-আম পেরিয়ে এসে দর্শক পৌঁছবেন দপ্তরখানা বা বাদশাহের রেকর্ড-অফিসে। এই সুন্দর অট্টালিকা লাল গ্রানাইট্ পাথরে নির্মিত। বর্তমানে ভ্রমণকারীদের বিশ্রামাগারে পরিণত হয়েছে।

দপ্তরখানা থেকে আর একটু দূরেই বাদশাহের খাসমহল। ঢুকবার বামদিকের দোতলা গৃহটি আকবরের নিজস্ব আবাস ছিল। একতলার ঘরগুলি নানাবিধ দ্রব্যাদি রাখবার জন্য ব্যবহার করতেন বাদশাহ। বই, দলিলপত্র এবং মূল্যবান্ সামগ্রীও নীচতলার ঘর-গুলিতে রাখা হ'ত। দেওয়ালগাত্রে কিছু কিছু অঙ্কন-চিত্র আংশিক ভাবে এখনও দৃষ্ট হয়। এগুলি টিউলিপ, পপি ইত্যাদি পুষ্পের হস্ত-চিত্রণ।

বাদশাহের নিদ্রাগৃহ বা Kwabgah ছাদের উপরের

[illegible] দেওয়ালগুলি সুন্দর ফ্রেসকো চিত্রে পূর্ণ ছিল। বর্তমানে সেই সৌন্দর্য অনেকাংশে নষ্ট হয়েছে। এগুলি সংরক্ষণের জন্য যে রং বা বার্ণিশ ব্যবহৃত হয়েছে তা এর সৌন্দর্যকে যথেষ্ট পরিমাণে বজায় রাখতে পারে নি। এই অঙ্কনকার্য সমস্তই ইরাণের রীতিতে। মূলত তা পারসীক শিল্পকলারই ধারা।

এখানেই ডানাযুক্ত স্ত্রীমূর্তি একটি পাথরের গুহার সামনে চিত্রিত। মেয়েটির হাতে একটি নবজাত শিশু। অনেকে মনে করেন, এই মূর্তি বাইবেলের কোন গল্পের ছায়াযুক্ত। কিন্তু সম্ভবত সে ধারণা ঠিক নয়। নবজাত শিশু, আকবরের প্রিয় সন্তান সেলিমের জন্মের ইঙ্গিত দিচ্ছে। দেবদূত বা ডানাযুক্ত কোন স্বর্গবাসী ভারতীয় কিংবা পারসীক কল্পনায় নিতান্তই অপরিচিত নয়।

আকবরের সভায় চিত্রকর বা পটুয়াদের যথেষ্ট সমাদর ছিল। নিজে বাদশাহ ছিলেন চিত্রবিদ্যার এক উদ্যমী সমর্থক। তিনি যা বলেছেন তার ইংরেজী :—

'Bigoted followers of the law are hostile to the art of painting, but their eyes now see the truth. There are many that hate painting but such men I dislike.'

বাদশাহের নিজস্ব আবাসের ঠিক বিপরীত দিকে একটি বর্গাকৃতি পুষ্করিণী আছে। এর মাঝখানে বেদী-মত স্থান। চারটি পাথরের নির্মিত রাস্তা পুষ্করিণীতে এসে পড়েছে। এই জলাশয়ের জল সুকৌশলে সর্বদাই টাটকা রাখা হ'ত।

ফতেপুর সিক্রীর একটি অবশ্য-দ্রষ্টব্য অট্টালিকা—তুর্কী সুলতানার কুঠি। খাসমহলের উত্তর-পূর্ব কোণে এটি অবস্থিত। সম্ভবত বাদশাহের তুর্কী-পত্নী ইস্তাম্বুলী বেগম বাস করতেন এখানে। এই প্রাসাদের দেওয়াল-গাত্রে প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক জগতের নানা ছবি আশ্চর্য দক্ষতায় খোদিত হয়েছে। বৃক্ষ, ফুল এবং পশু-পক্ষীর ছবি অপূর্ব সুষমা ও কারুকার্যে 'dado panel'-এ মূর্ত করে তোলা হয়েছে। দেখা যাবে বনের দৃশ্যাবলী, পাহাড় অঞ্চলের পাখীর ছবি, জঙ্গলের পশু, এমনকি চীনে ড্রাগনও দুষ্প্রাপ্য নয়। আফ্রিকার তালজাতীয় বৃক্ষ, ভারতের আঙুরক্ষেত, এবং পুষ্পসজ্জায় ও আঙুরের [illegible] ফ্রেইমের আকারে দরজার দু'পাশে শোভিত। পরবর্তীকালে আওরংজেবের ধর্মান্ধ অনুচরেরা এই সুন্দর কারুকার্য অনেকাংশে নষ্ট করে দিয়েছে।

প্রাসাদের দক্ষিণদিকের বারান্দা থেকে একটি সিঁড়ি নেমে গেছে স্নানাগারের দিকে। সম্ভবত ইস্তাম্বুলী বেগম ব্যবহার করতেন এটি। এই হামামটিও সুন্দর কিন্তু হাকিম স্নানাগারের মত অত সৌন্দর্যমণ্ডিত নয়। হামামের নাম 'হাকিম' শব্দটির সঙ্গে যুক্ত এই কারণে যে, স্নানাগারটির কাছেই হাকিম বা ডাক্তারদের আবাসগৃহ। ধারণা করা হয় যে, হাকিম স্নানাগার বাদশাহ নিজে ব্যবহার করতেন। এর গাত্রের পালিশ-করা প্লাষ্টারের কাজ এটিকে সৌন্দর্য ও শ্রীমণ্ডিত করে তুলেছে।

ফতেপুর সিক্রীতে এলে স্বর্ণমঞ্জিল ঠিক দেখবেন। গাইড বলবে মরিয়মের কুঠি। মরিয়ম-উজ্-জমানী, যিনি জাহাঙ্গীরের জননী। স্বর্ণমঞ্জিলে আজ স্বর্ণ অলংকরণ খুঁজে পাওয়া যাবে না। সোনার জলের যে কাজগুলি প্রাসাদের বুকে একদা শোভা পেত, তা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়েছে। সোনা নেই, আজ আছে শুধু সোনা দিনের স্মৃতি। জাহাঙ্গীরের মা ছিলেন হিন্দুকন্যা। সম্ভবত সে কারণেই প্রাসাদের বুকে হিন্দুধর্মের দু'-একটি ছবি পাওয়া যায়। বারান্দার খোদিত ব্র্যাকেটে ভগবান্ বিষ্ণুর রাম অবতার মূর্তি চিত্রিত। দেওয়ালের গায়ে অপূর্ব ফ্রেসকো চিত্রণ। এতে ফিরদৌসীর শাহনামার বিভিন্ন চিত্র সযত্নে অঙ্কিত হয়েছে। কিন্তু নিদ্রাগৃহ বা Kwabgah-র দেওয়ালের চিত্রাঙ্কনের মতই সংরক্ষণের অভাবে এগুলি প্রায় নষ্ট হ'তে চলেছে।

মোগল রাজপ্রাসাদে একটি পচিশী বোর্ড অবশ্যই প্রস্তুত করা হ'ত। রাজকার্যে ক্লান্ত শ্রান্ত বাদশাহ পচিশী বোর্ডে খেলতে বসতেন প্রাসাদের বেগম সাহেবাদের নিয়ে। ক্রীতদাসীরা ছিল হারজিতের লেনদেনের সামগ্রী। গুটি ফেলা হ'ত পচিশী বোর্ডের মাঝখানের ছোট স্থানটিতে। প্রাসাদ-সংলগ্ন প্রাঙ্গণের উত্তর দিকে পচিশী বোর্ডটি নির্মিত হয়েছিল।

ফতেপুর সিক্রীতে দেওয়ান-ই-খাস রচনা করেছিলেন আকবর। দেওয়ান-ই-খাস মোগল দরবারের একটি অবশ্য-প্রয়োজনীয় স্থান। এখানেই আমীর-ওমরাহ ও

সভার রাজপুরুষদের সঙ্গে মিলিত হ'তেন বাদশাহ। মন্ত্রিদের কুঠির উত্তরে এবং দেওয়ান-ই-আমের পশ্চিমে এই কারুকার্যমণ্ডিত অট্টালিকাটি রয়েছে। বাইরে থেকে মনে হয় যে, এটি একটি দ্বিতল গৃহ। কিন্তু ভিতরে এলেই বোঝা যাবে যে, ধারণাটি ঠিক নয়। এই শ্রীমণ্ডিত অট্টালিকা একটি কক্ষের অনুরূপ এবং এর অর্ধ উচ্চে চারিপাশ গ্যালারি দ্বারা বেষ্টিত। দেওয়ান-ই-আমের ঠিক মধ্যস্থানে একটি সুন্দর স্তম্ভ রয়েছে। স্তম্ভের গাত্রের খোদাইয়ের কাজ সৌন্দর্য ও শিল্পের এক সর্বোচ্চ প্রকাশ। এই স্তম্ভের শীর্ষদেশ থেকে চারটি বারান্দামত পথ গ্যালারিতে গিয়ে পড়েছে। সম্ভবত বাদশাহের আসন ছিল স্তম্ভটির ঠিক উপরে এবং গ্যালারির চারকোণে প্রধান চারজন মন্ত্রী বাদশাহের আদেশের অপেক্ষায় রইতেন। এঁরা যথাক্রমে—খান-ই-খানান, বীরবল, ফৈজী ও আবুল ফজল।

দেওয়ান-ই-খাস ছাড়ালেই আঁখ-মিচৌলী। পশ্চিম দিকের এই অট্টালিকাটি দেখিয়ে গাইড আপনাকে পুরাণো দিনের গল্প বলবে। কর্মক্লান্ত বাদশাহ অবসর যাপনের সময় বেগম সাহেবাদের নিয়ে আসতেন আঁখ-মিচৌলীতে। সুরু হ'ত লুকোচুরি খেলা। নারীকণ্ঠের মিষ্টি হাসি প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরত আঁখ-মিচৌলীর দেওয়ালে দেওয়ালে।

কিন্তু হয়ত লুকোচুরি খেলার জন্যই এ অট্টালিকার সৃষ্টি হয় নি। অনুমান করা হয় রাজসম্পদ, হীরে-জহরত ইত্যাদি এই নির্ভরযোগ্য অট্টালিকাতে সঞ্চিত রাখা হ'ত। কাছাকাছি দৃষ্টি ফেললেই বৈরাগীর বেদী নজরে পড়বে। একটি গম্বুজাকৃতি আচ্ছাদনযুক্ত এই বেদীটি চারটি গ্রানাইট পাথরের স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে। এর গাত্রে খোদাই ও চিত্রণের কাজ রয়েছে। এই বেদীটিতে একজন হিন্দু উপাসক দিনযাপন করতেন। আকবর ছিলেন সর্বধর্মের সমর্থক। রাজপ্রাসাদের এককোণে হিন্দু বৈরাগীর স্থান পাওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব ছিল না।

দেওয়ান-ই-আমের বিপরীতে একটি পাঁচতলা অট্টালিকা সকলের দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করে। এটি পঞ্চমহল নামে অভিহিত। খাসমহল থেকে একটি সিঁড়ি পঞ্চমহলে গিয়ে পড়েছে। পিরামিডের আকৃতি [illegible] এই অট্টালিকাটি ভারতবর্ষেই বোধ হয় প্রথম। সারি সারি [illegible] গ্যালারিগুলি একতলা থেকে পাঁচতলা পর্যন্ত রয়েছে। প্রতিটি তলা সুন্দর খোদাই-করা স্তম্ভের উপর ভার ন্যস্ত করে দাঁড়িয়ে আছে। সর্বনিম্ন তলায় স্তম্ভের সংখ্যা প্রায় চুরাশি—এর গায়ে নানাবিধ কারুকার্য। খোদাই-করা হাতীশুঁড় এবং অপরের শুঁড় জড়িয়ে আদর জানাচ্ছে, গাছ থেকে ফল আহরণ করছে লোকে, ইত্যাদি নানা কাজ আর আঁকিবুকি। দ্বিতলে

পঞ্চমহল

স্তম্ভের সংখ্যা পঁয়ত্রিশটি, ত্রিতলে পনেরটি, চারতলায় আটটি এবং সর্বোচ্চ তলাটি মাত্র চারটি স্তম্ভের উপর সমস্ত ভার ছড়িয়ে দিয়েছে।

পঞ্চমহলের সৃষ্টি হয়েছিল কেন তা নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা রয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, স্থানটি প্রার্থনার জন্য নির্দিষ্ট করার ইচ্ছে ছিল বাদশাহের। অন্যদের মতে এর সর্বোচ্চ স্থানে একটি বড় ঘণ্টা ঝুলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন আকবর। এই পেটা ঘণ্টার নিনাদের দ্বারা রাজকীয় দায়িত্বের কার্য শুরু এবং সারা হওয়ার ঘোষণা করা সম্ভব হ'ত। আর এক দলের অভিমত যে, পঞ্চমহলের শীর্ষতলে দাঁড়িয়ে বাদশাহ সমস্ত ফতেপুর সিক্রীকে অবলোকন করতে চেয়েছিলেন। যুক্তিতর্কের বিচারে শেষের মতটিই বেশী গ্রাহ্য। অবসর-বিনোদনের জন্য এই পঞ্চমহলের শীর্ষতলা নিঃসন্দেহে আদর্শ ছিল। জ্যোৎস্নারাতে ফতেপুর সিক্রী যখন স্তব্ধ, কর্মক্লান্ত বাদশাহ উঠে আসতেন পঞ্চমহলের সর্বোচ্চ কক্ষে। সঙ্গে কয়েক- [illegible]

মাথার মিষ্টি প্রলেপ দিয়ে আকবরের মনের কাছাকাছি আসতে পেরেছিলেন। ফুরফুরে হাওয়া বইছে। পৃথিবী শান্ত স্নিগ্ধ···হানাহানি রেষারেষি কিছুক্ষণের জন্যও স্তব্ধ। বাদশাহ্ বসতেন সর্বোচ্চ আসনে, তাঁকে ঘিরে বেগম সাহেবার দল। এ দৃশ্য নিছক কল্পনা। পঞ্চমহলের সেই জ্যোৎস্নাভরা হাসিতরল রাতগুলি আজ গাইডের মুখে শোনা স্বর্ণস্মৃতিমাত্র।

যোধবাঈ-এর প্রাসাদ জাহাঙ্গীরমহল নামেও অভিহিত। জাহাঙ্গীর-জননী মরিয়ম হিন্দুকন্যা ছিলেন। ফতেপুর সিক্রীতে বস্তুত সব বেগম সাহেবাদের আগেই তাঁর আগমন। অনেকের মতে মরিয়মের কুঠি প্রকৃতপক্ষে জাহাঙ্গীর-মাতার আবাস ছিল না। হয়ত মরিয়মের কুঠিতে আকবরের প্রথম দুই পত্নীর মধ্যে কেউ বাস করতেন। পারস্য দেশের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ বেশী ছিল। হয়ত সুলতানা রাকিয়া বেগমই মরিয়ম কুঠির অধীশ্বরী ছিলেন।

জাহাঙ্গীরের জন্মের পর যুবরাজ-জননীর জন্য একটি সুন্দর প্রাসাদ রচনা করতে চেয়েছিলেন বাদশাহ। যোধবাঈ মহল সেই ইচ্ছার প্রসূত ফল। এই প্রাসাদের গঠন এবং অলংকরণ অনেকাংশে হিন্দুরীতি-সদৃশ। এমন কি প্রাসাদের মধ্যে একটি হিন্দু মন্দিরও বাদশাহ রচনা করেছিলেন। যোধবাঈ মহলের বিশিষ্টতা এর হাওয়া-মহল। উত্তর দিকে আচ্ছাদনযুক্ত এই মণ্ডপটি মেয়েদের বসবার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। জাফরীকাটা পাথরের পর্দা-জাতীয় একটি বেষ্টনী এর চারপাশ ঘিরে আছে। এখানে বসে মোগলসুন্দরীরা দূরের দিগন্তলীন বনরেখা, বহুদূরের পর্বতশ্রেণী, এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতেন। বৈকালের মৃদুমন্দ মলয়ানিল তাঁদের মন দিত ভরে। প্রসাধনের সুরভিতে হাওয়ামহলের বাতাস মিষ্টি ও মধুর হয়ে উঠত।

ফতেপুর সিক্রীতে এসে শেখ সেলিম চিস্তির সমাধি-স্থান না দেখলে সিক্রী দেখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। রাজ-আবাসের দক্ষিণ-পশ্চিমে এই সুন্দর সমাধিসৌধটি শিল্প-কলার এক আশ্চর্য নিদর্শন। উচ্চ পালিশসম্পন্ন মার্বেল পাথরে নির্মিত এই সমাধিসৌধটির গায়ে খোদাইয়ের নানা [illegible]

ভূমি। এর আচ্ছাদনটি অম্বুজ-জাতীয় ফলের আকৃতি-বিশিষ্ট গোল ছাদের মত। প্রস্তরীভূত শবাধারটির চার-পাশে মার্বেল পাথরের জাফরী বা চাঁচাবেড়া-জাতীয় বেষ্টনী। দূর থেকে লেসের কাজ বলে ভ্রম হয়। ১৮৭৬ সালে তখনকার প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ দেখতে এসেছিলেন এটি। এর স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের তিনি উচ্চ প্রশংসা করে গিয়েছেন। ভিতরের কক্ষের দেওয়াল-গাত্রে কর্ণেলিয়াম, জেসপার ইত্যাদি পাথরের আশ্চর্য অলংকরণ দেখা যাবে। মেঝেতেও পাথরের সাহায্যে নানাবিধ পুষ্পের

সেলিম চিস্তির সমাধি

সুন্দর অলংকরণ। প্রস্তরনির্মিত শবাধারটি মার্বেলের সৃষ্টি। কথিত যে, সমাধিসৌধটির সমস্ত কারুকার্যই আকবরের সময়ের রচনা নয়। জাহাঙ্গীরও এটিকে নানাবিধ উপায়ে শ্রীমণ্ডিত করতে যথেষ্ট সচেষ্ট ছিলেন।

বিশ্বাস যুক্তিতর্কের অনেক উপরে। এক সময় বন্ধ্যা নারীরা শবাধারটির চারপাশের জাফরীকাটা পাথরের বেষ্টনীর গায়ে ফিতে বা কাপড়ের ফালি গিঁট বেঁধে ঝুলিয়ে দিতেন। প্রতিজ্ঞা থাকত মনে যে, সন্তানের জননী হ'লে মিষ্টি বা অন্য কিছু ফকিরের সমাধির কাছে দিয়ে যাবেন। ফিতে বা কাপড়ের ফালির গিঁটটিও ঐদিন খোলা হ'ত।

কাছাকাছি আরও অনেকগুলি সমাধি চোখে পড়বে। এর মধ্যে সেলিম চিস্তির পৌত্র এবং পরবর্তীকালে বাংলা দেশের শাসনকর্তা ইসলাম খানের সমাধি উল্লেখযোগ্য। আরও রয়েছে শেখের পৌত্রী বিবি জেনাব এবং বাজো [illegible]

চোখ

শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

মাঠের পশ্চিম দিকে লাল হয়ে সূর্য্য অস্ত গেল। অস্তগামী সূর্য্যের আবির রং, মাঠের ওপর, ধান-ক্ষেতের ওপর ছড়িয়ে পড়ল। অন্ধকার তখনও ঘোর হয়ে নেমে আসে নি।

কেশব লাঙল থামিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। এতক্ষণ একনাগাড়ে লাঙল ঠেলে পেট-কোমর টন্‌ টন্‌ করছে।

আউশ ধান কাটা হয়ে গেছে। আমন ধান বোনা এখনও শেষ হয় নি। ছোট মাঠটুকু বুকভরা বর্ষার জল। কাদা-করা শেষ হ'লে, দু'দিন ঘাসগুলো পচতে সময় লাগবে। তার পর দিতে হবে আবার লাঙল। একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বিড়ি ধরাল কেশব। মুখ ভরে বিড়ির ধোঁয়া টেনে, খক্‌ খক্‌ করে কাশতে লাগল। কাশি থামতে চায় না—সজোরে বুক চেপে ধরে হাঁপাতে সুরু করল। কাল-ব্যাধিতে ধরেছে কেশবকে। কাশতে কাশতে থুথু ফেলল কেশব। সেই লাল রক্তের ছিটে থুথুর সঙ্গে। আপন মনেই বিড়বিড় করে বলল কেশব, নাঃ, কবরেজের ওষুধে কোন কাজই হ'ল না। মিছিমিছি টাকাগুলো জলে দিলাম। 'বরদা কবরেজ রোগ সারাবে বলে সময় নিয়েছে তিন মাস। ফুরোন হয়েছে এক শ টাকা। সব টাকা দিতে পারে নি কেশব। এই চাষের সময় কোথায় পাবে অতগুলো টাকা এক সঙ্গে? মাত্র দশটি টাকা দিয়েছে কবরেজকে। বলেছে, চাষ শেষ হ'লেই আউশ ধান বিক্রী করে আরও কিছু দেবে। সব একসঙ্গে দিতে পারবে না। এই আউশ ধান ধানক'টা সব বিক্রী করে দিলে তাদের চলবে কি করে? চালের দর চৌত্রিশ টাকা—এখন এই ক'টা আউশ ধানের ওপরই সব ভরসা। ক্ষণেক ভাবল কেশব। বিড়িটা ফেলে দিয়ে জোরে নিঃশ্বাস ছাড়ল।

বিকেলের ঠাণ্ডা হাওয়া, সূর্য্যের আবির রং, পাখীদের অকারণে নাচানাচি কিচিরমিচির শব্দ, এ সব দেখবার সময় নেই কেশবের। শ্রান্তিতে ভেঙে যাচ্ছে সমস্ত দেহ। জল-ভেজা কাপড় আর কাদায় সমস্ত শরীর ভরে গেছে। এই অবেলায় আবার ডুব না দিলে এ কাদা উঠবে না। কিন্তু অবেলায় স্নান করলে হয়ত রাতে আসবে জ্বর। বউ, বড় ছেলে বার বার বারণ করেছে—খবরদার, অবেলায় যেন চান করে এস না। অবেলায় ডুব দিলেই জ্বর হবে।

কিন্তু এই কাদা-মাখা অবস্থায় কি করে থাকে। সন্ধ্যে হয়ে আসছে, আবছা অন্ধকারে সারা মাঠ ছেয়ে যাচ্ছে। দূরের জিনিষ আর নজরে পড়ে না। বলদ দুটোর পিঠে আস্তে আস্তে ঠেলা দিয়ে কেশব বলে, চল্‌ বাবা, চল্‌। তোরাও সেই সকাল থেকে জলে কাদায় ভূতের মত খাটছিস্‌। চাষটা উঠিয়ে দে, তার পর দু'দিন রেহাই দিস্‌।

কেশব বলে ওঠে, কে যায় গো। অদূরে আলের ওপর দিয়ে একটা লোক খুব সন্তর্পণে হাঁটছিল। সেই সাড়া দিল, আমি গো—আমি নবু।

—ওঃ। আজ বুঝি তাতুড়ের হাট ছিল। বলি ও নবু, আজ চালের দর কি গেল?

নবু দু'হাত দিয়ে মাথার ঝুড়িটা একটু উঁচু করে বলল, চালের দর? সে কথা আর ব'লো না কেশব দা। চাল এখন সোনার মত মাগ্‌গি। আমাদের মত গরীব-গুরবো না খেয়ে খেয়ে রোগা দড়ি হয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে মরছে। এ যে কত মরছে তার হিসেব কে নেয়। গাঁয়ের চৌকিদাররা জানে একটাই কথা। যে যখন মরে তখন গিয়ে লেখায় জ্বর-বিকার। না খেয়ে খেয়ে কতজনা যে মরছে, সে কথা আর বলে না। কেশবদা, ছেলেপুলে ভাত শুকিয়ে মরবে। আজ ছত্রিশ টাকা চালের মণ, বুঝলে, ছত্রিশ টাকা। বলি, কোন্‌ জিনিষ সস্তা কেশবদা? ভাল রাজ্যিতে বাস করছি আমরা। নবু বোঝাটা মাথায় নিয়ে হাঁটতে সুরু করল। কেউ আর কোন কথা বলল না।

সকলেরই এক চিন্তা—কি করে সংসার চলবে? কি উপায়ে ছেলে-মেয়েদের মুখে দু' মুঠো ভাত দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবে। এমন অদ্ভুত অবস্থা আগে কেউ কখনও দেখে নি। দর-দামের ঠিক-ঠিকানা নেই। সকাল-বেলায় যে জিনিষের দাম পাঁচসিকে, আবার বিকেলেই তার দর উঠেছে দেড় টাকা বেশি। দোকানী আর ব্যবসায়ীরা দু' হাতে টাকা লুটছে। যে দাম হাঁকছে, লোকে বহু কষ্টে তাই দিচ্ছে। প্রতিবাদে কোনও ফল হয় না। ইচ্ছে হয় নাও—না হয় নিও না। একেবারে সোজা কথা। ক্রেতার ক্ষমতা না থাকলে শুধু হাতে ফিরে যায়। যার ক্ষমতা আছে, সে দু-একবার প্রতিবাদ করে সেই দাম দিয়েই সেই জিনিষ কেনে। কিন্তু মনে মনে অসন্তোষ জমা হয়। সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মত

সেই অবরুদ্ধ ক্রোধ মনের অন্তস্থলে ধূমায়িত হ'তে থাকে। বাইরে তার কোনও প্রকাশ নেই, কোন উত্তাপ নেই, আগুন নেই। হয়ত একদিন সেই রুদ্ধ আগ্নেয়গিরির পুঞ্জ ক্রোধ, কি ভয়াবহরূপে—না জানি, কি নিষ্ঠুর ভয়ালরূপে আত্মপ্রকাশ করবে। ক্রোধের ফুটন্ত অগ্নি-স্রোতে, হয়ত সৃষ্টির বহুকিছু ধ্বংস হবে, বুঝিবা তবেই পুঞ্জীভূত ক্রোধের শান্তি হবে। আজ গ্রামে গ্রামে হাহাকার দেখা দিয়েছে। চাল, ডাল, নিত্য-ব্যবহার্য্য সমস্ত বস্তুই চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে। কিন্তু মানুষের আয় নেই—আয় বাড়ে নি। চাষী, কামার, তাঁতী, মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক আজ সকলেরই এই অবস্থা। লোকের পরনে কাপড় নেই, পেটে ভাত নেই, রোগে একটু ওষুধ পায় না। আবার সবচেয়ে অদ্ভুত পরিস্থিতি হয়েছে এই যে, আর মহাজনদের কাছে টাকা ধার পাওয়ার উপায় নেই। আগে যদি কেউ কেউ দু'-এক-খানা গহনা বন্ধক রেখে টাকা আনত এখন সে পথও বন্ধ। এখন আর বন্ধক রেখেও টাকা পাওয়া যায় না। দেশ থেকে নাকি সোনা উঠে যাচ্ছে। গহনার দোকান বন্ধ হ'ল। কেউ কেউ গহনার দোকান উঠিয়ে দিয়ে মুদীখানার দোকান খুলে বসল। কতজন ত শেষ পর্য্যন্ত বিষ খেয়েই মারা গেল। গৃহস্থ ঘরে এই যৎসামান্য গহনা ছিল বিপদ্-আপদের সময় একমাত্র ভরসাস্থল। চাষের সময় টাকা দেয় কে? তখন ঐ গহনা বন্ধক রেখেই ত চাষের কাজ চলে। কিন্তু আজ আর সে সুবিধে নেই। আকাশের দিকে তাকিয়ে চাষী চাষ করে। দেবতার যদি করুণা হয় তবে বৃষ্টি হয়। চাষী গতরে খেটে, ঘরের পয়সা খরচ করে মাঠে ছড়িয়ে দেয়। যদি বৃষ্টি হয় তবেই সব পরিশ্রম সার্থক। নতুবা সবই লোকসান।

এবার হ'ল তাই। জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি বেশ বৃষ্টি হয়ে গেল, আষাঢ় মাসেও ভালই বৃষ্টি হ'ল। লোকে আনন্দে, শত কাজ ফেলে দিন-রাত পরিশ্রম করে ধান রুয়েছে। কিন্তু মজা সুরু হ'ল দু'দিন পর। সেই যে মেঘ ধরে গেল, আর বৃষ্টির দেখা নেই। ভাদ্রের রোদে যেন কাঠ ফাটছে—রোদ যেন গায়ে এসে লাগে বিষের মত। জল শুকিয়ে গেল, মাঠ ফাটতে সুরু করল। কোথা থেকে দেখা দিল কাল কাল পোকা। সারা মাঠে ভিড় করেছে সেই কাল কাল পোকা। কচি-কচি ধানের চারাগুলো কেটে কেটে শেষ করল। লোকে পাগল হয়ে গেল। প্রতিকারের আশায় ছুটে গেল স্থানীয় ব্লক অফিসে। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। বড় বড় মোটা মাইনের কৃষি-বিশেষজ্ঞরা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ফতোয়া দিলেন, ও কিছু না, বৃষ্টি হ'লেই চলে যাবে। চাষীরা আকাশের দিকে তাকিয়ে দিন গুণতে লাগল, কিন্তু বৃষ্টি হয় না, মাঠের জল শুকিয়ে গেল, পোকার অত্যাচারও চরমে উঠল।

অত্যন্ত অসুস্থ শরীরেও কেশব কোন মতে এল নিজের জমিতে। এ কি অবস্থা হয়েছে তার জমির। কোথায় সেই কচি কচি ধানের চারা? কোথায় সেই মাঠভরা জল, এ যে সব শুকনো, সারা মাঠে যে ফাট দেখা দিয়েছে। নিজের কপালে চটাৎ চটাৎ করে চাপড় মেরে কেশব আলের ওপর বসে পড়ল। এক সময় ডুকরে কেঁদে উঠল, এ হ'ল কি, হা ভগবান্, শেষে এই হ'ল। বলি, ও কেদার, এ হ'ল কি, অ্যাঁ।

কেদার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল নিজের জমির অবস্থা। একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, কেশবদা, আর দেখছ কি? মা লক্ষ্মী এবার আর আমাদের ঘরে আসবেন না। একে নেই জল, সব ত শুকিয়ে খড় হয়ে উঠল, তার ওপর এই পোকার অত্যাচার—

খক্ খক্ করে কাশতে কাশতে কেশব বলল, এ কালশত্তুর মরে কিসে? বলি, তোরা যা না ঐ ব্লক আপিসে। বাবুদের গিয়ে সব বল্।

হেসে কেদার বলল, সে কি আর আমরা যাই নি? ওনারা বলেন, বৃষ্টি হ'লেই সব চলে যাবে। কি যেন বলল, একটা ইংরেজী নাম, আহাঃ মনে আসছে না।

অসহিষ্ণু হয়ে কেশব বলল, পোকার নাম শুনে কি আমার চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার হয়ে যাবে নাকি? বলি, ওষুধ বিষুদের কথা কি কিছু বলল?

—না। বাবুরা বলে কথাই বলে না। সিগারেট ফোঁকে আর গপ্প মারে। অনেকক্ষণ পর বলল, ও কিছু না। বৃষ্টি হ'লেই সব চলে যাবে।

বিড় বিড় করে আপন মনেই গালাগাল করতে থাকে কেশব।

মাঠ হ'তে মাতালের মত টলতে টলতে কেশব বাড়ী ফিরে আসে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শয্যা নেয় কেশব। ভাবনা-চিন্তায় কাশি বেড়ে যায়। অনেক রাতে আবোল-তাবোল বকতে থাকে। এক সময় বড় ছেলেকে ডেকে কেশব বলে, সনা—ও সনা। সনাতনের ঘুম ভেঙে যায়। ধড়মড় করে উঠে বসে। নিবু নিবু প্রদীপকে উসকে দেয়। কেশবের অবস্থা দেখে ওর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে।

ভোর হয়। কবরেজ এসে বলে, এ বাপু অসাধ্যি রোগ। এ হ'ল গিয়ে রাজ-ব্যাধি। পার ত কলকাতায় নিয়ে বড় ডাক্তার দেখাও।

বড় বড় চোখ করে বোকার মত তাকিয়ে থাকে সনাতন। কলকাতায় যেতে হবে?—বড় ডাক্তার দেখাতে হবে।

সনাতনের মা কেঁদে ওঠে।—তবে কি হবে কবরেজ মশাই। আকাশে বৃষ্টি নেই। এক মুঠো ধান হবে না। আউশ যা হয়েছিল, কিছু বিক্রি ক'রে, চিকিচ্ছের জন্য টাকা দিয়েছি। আর অল্পই ধান আছে, এখন ঐ আমাদের সম্বল। কোথায় টাকা পাব? মহাজন আর ধার দেবে না। মাঠে নেই ধান। মণ-দুই পাট যা হ'ত —তাও জল অভাবে পচানোই হবে না। এখন কেউই টাকা দেবে না।

গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে কবরেজ মশাই বললেন, তবে কি লোকটা মরবে? এখানে কিছু হবে না বাপু। কলকাতায় নিয়ে গিয়ে সেখানে হাসপাতালে রেখে যদি বাঁচাতে পার, নইলে বাঁচানো কঠিন। অবিশ্যি শুধু হাতে গেলে ফল হবে না। এ অনেক টাকার ধাক্কা। কিন্তু বাড়ীতে থাকলে, এ রোগ সারবে না।

অবশেষে সেই একমাত্র পথই দেখতে হ'ল এদের। আট শ' টাকায় চ'লে গেল এক বিঘে ভাল ধানী-জমি। প্রথমে কেশব কোনমতেই রাজী হয় নি। সনাতনের হাত ধরে কেঁদে ফেলল কেশব।

—ও রে, অমন জমি বিক্রি করিস্ নে বাপ। আ রে, আমি ত মরবই, কিন্তু তোরা এরপর খাবি কি? জমিতে যে সোনা ফলে বাবা। এবার না হয় বৃষ্টি নেই। কিন্তু বৃষ্টি হ'লে, ওতে যে মা-লক্ষ্মী হেসে ওঠেন। কিন্তু কেশবের কথায় কেউ কান দিল না। আগে প্রাণটা বাঁচুক তারপর জমি। যদি তুমি বাঁচ তবে আবার জমি হবে।

গাঁয়ের সুরেন সরকার লেখাপড়া-জানা লোক। গাঁয়ের প্রাইমারী স্কুলের মাষ্টার। সনাতন তাকে ধরল। হাউমাউ ক'রে কেঁদে ফেলল সনাতন।

—আমায় এই বিপদ্ থেকে উদ্ধার করুন, মাষ্টারবাবু।

সুরেন বলল, কি হয়েছে? ব্যাপারখানা কি আগে তাই বল—

—আর মাষ্টারবাবু, আমার বাবার অবস্থা বড় খারাপ। এখন কলকাতায় নিয়ে দেখাতে হবে, হাসপাতালে ভর্ত্তি করতে হবে। আমি ত ওসব ব্যাপার জানি নে, রাস্তাঘাটও চিনি নে। আপনি যদি দয়া করে কলকাতায় নিয়ে যান তবে এ যাত্রা রক্ষা হয়।

—নিয়ে ত যাব, কিন্তু বাপু টাকার কি ব্যবস্থা করেছ? আজকাল যা অবস্থা হয়েছে, তাতে টাকা খরচ না করলে কিছু হবার উপায় নেই। যেখানেই যাও, টাকা না ছাড়লে কোন কাজই হবে না। টাকার কি ব্যবস্থা করেছ আগে তাই বল।

সনাতন কেঁদে ওঠে। কি আর বলব মাষ্টারমশাই, এক বিঘা জমি বিক্রি করেছি। সেই আট শ' টাকাই এখন সম্বল।

কলকাতাতেই এল কেশব। সুরেন মাষ্টারই সঙ্গে করে এনেছে। সুরেন মাষ্টারের এক বন্ধুর সঙ্গে বেশ জানাশোনা ছিল এক ভাল ডাক্তারের। তিনি এই সব রোগের একজন বিশেষজ্ঞ। ডাক্তারবাবু রোগী পরীক্ষা ক'রে ঘাড় নেড়ে বললেন, এ ত দেখছি বেশ পাকাপাকি রকমের। হাজার টাকার ধাক্কা। হাসপাতাল ছাড়া এ রোগের চিকিৎসা হবে না।

তাই সই। আট শ' টাকা যখন সংগ্রহ হয়েছে তখন যে-করেই হোক বাকি টাকা সংগ্রহ করতেই হবে। হাসপাতালেই ভর্ত্তি করা হ'ল কেশবকে। ছেলের হাত দুটো ধরে কেশবের কি কান্না।

—ওরে সনা, আমি ধনে-প্রাণে মলাম। তোদের জন্যে কি রেখে যাব বাবা? জমিটুকুও যে গেল।

সনাতন আর সুরেন মাষ্টার অনেক অভয় দিয়ে বলল, ভয় নেই, ভাল হয়ে যাবে। আগে প্রাণ, তারপর জমি। আগে ভাল হও—তারপর অন্য কথা—

হাসপাতালে কেশবকে রেখে ওরা ফিরে এল। ছেলের মন মানতে চায় না। সপ্তাহে একদিন ক'রে হাসপাতালে ছুটতে লাগল সনাতন। এদিকে ক্ষেতে নেই ফসল। এক ফোঁটা বৃষ্টি হয় নি। সারা মাঠের জমি খাঁ খাঁ করছে। রোদের কড়া তাতে মাঠ ফুটি-ফাটা। চাষীরা মাথায় হাত দিয়ে বসেছে। চালের দাম উঠেছে এক সের এক টাকা। লোকের উনুনে হাঁড়ি চড়ে না। অভাব, অনশন, হাহাকার, চলেছে ঘরে ঘরে।

কেশব বলে, হাঁ রে, গাঁয়ের খবর কি? তোরা আছিস্ কেমন? ছেলের গায়ে হাত বুলিয়ে বলে, খুব শুকিয়ে গিয়েছিস বাবা। তোর এ কি হাল হয়েছে রে? বুঝি বাপের জন্যে খুব ভাবিস্? না—না, না, ভাবিস নে। এ বুড়ো হাড় খুব টন্‌কো। উঁহুঃ—শীগ্‌গির মরব না। দেখিস্, ঠিক ভাল হব। কিন্তু এ কি চেহারা হয়েছে

[illegible] এখানে টাকা [illegible] অভাব হয় না। কেশব হাসতে [illegible]।

সনাতন কিছু ভাবে না। তাদের দিন যে কি ভাবে যাচ্ছে সে কথা আর কেশবকে জানায় না। কি হবে তা জানিয়ে?

কেশব ত জানছে না, এই কয় মাসে তাদের গাঁয়ে—আর আশে-পাশের গাঁয়ে কত কি হয়ে গিয়েছে। খিদের জ্বালায় কত লোক পাগল হয়েছে—কেউ গলায় দড়ি দিয়েছে, কতজন কত অকাজ-কুকাজ করেছে। দিনের পর দিন যায়। মাসের পর মাস। এমনি ক'রে চ'লে গেল এক বছর।

এক বছর পরে কেশব গাঁয়ে ফিরে এল। কেশব এখন ভাল হয়েছে। ঘুরে ঘুরে, নূতন করে দেখে তার দেশকে, তার ক্ষুদ্র জন্মভূমিকে। অনেক মানুষ নেই, কোথায় সব হারিয়ে গেছে। সেই সব পুরাণো মুখগুলো আর দেখা যাবে না। সনাতন আরও রোগা হয়ে গিয়েছে, আগের মতন আর খাটতে পারে না। নিজের স্ত্রীর অবস্থা আরও খারাপ, দেখলে আর চেনা যায় না। কেশব লাঠি ধরে গুটি গুটি চলে যায় মাঠে। তার হারানো জমির আলে গিয়ে দাঁড়ায়, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে সে। ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাসে ধানগাছগুলো হেলছে-দুলছে। যেন তাকে দেখে হেসে উঠেছে সারা মাঠ, যেন দু'হাতে ওরা ডাকছে কেশবকে। কেশব চোখের জল আর ধরে রাখতে পারে না। আবার ফিরে এসেছে বর্ষা, আউশ ধানের অবস্থা এবার খুব ভাল। আউশ, পাট উঠে যাবার পর, ওরা আবার রোবে আমন ধান। সোনার ধান ঘরে আসবে; খামারে খামারে মা-লক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদে স্তূপীকৃত হয়ে জমা হবে ফসল। ঢেঁকিশালে আবার ঢেঁকির শব্দ হবে, নূতন ধানের গন্ধে, খুশিতে আবার ওরা গান গেয়ে উঠবে। লোকে দিনরাত ভগবান্‌কে ডাকে, হে ভগবান্, সুবৃষ্টি যেমন দিচ্ছ দিয়ে যাও, বড় কষ্ট গিয়েছে ঈশ্বর। তুমি মুখ তুলে চাও। হ্যাঁ, এবার দেবতা করুণা করেছেন, মুখ তুলে চেয়েছেন। সারা মাঠ, আউশ ধানে ভরে গেছে, জল থৈ থৈ করছে।

কিন্তু কেশবের কি হ'ল? কেশব শুধু কাঁদে। তার হারানো জমির আলে বসে বসে শুধু কাঁদে। এ জমিটুকু ছিল তার স্নেহময়ী মায়ের মত। কেশব ভাবে, ওঃ, কি ধানই না হ'ত, এবারও হবে। কিন্তু এবার ঐ জমির খড়, ধান আর তার খামারে উঠবে না। সমস্ত চলে যাবে মহাজনের ঘরে। কেশবের চোখ দিয়ে জল পড়ে। অবশ্য আজকাল কেশবের চোখ দিয়ে দিনরাত জল গড়াচ্ছে। সেই ভারী অসুখের পর, হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর, এই এক নূতন ব্যাধিতে তাকে ধরেছে। চোখে ভাল করে দেখতে পায় না। সমস্ত যেন ঝাপ্‌সা-ঝাপ্‌সা—

সনাতনকে এক সময় কেশব বলে, বাবা সনা। শেষে কি অন্ধ হয়ে থাকব নাকি রে? চোখে যে কিছু ঠাহর হচ্ছে না। শেষে কি অন্ধ হয়ে বেঁচে থাকতে হবে?

এতদিন টোটকা-টুটকো ওষুধই চলছিল, কিন্তু আর চলে না। সনাতন নিয়ে গেল কেশবকে প্রফুল্ল ডাক্তারের কাছে।

প্রফুল্ল ডাক্তার চোখ দেখে বলল, নাঃ, এখানে কিছু হবে না। যেতে হবে কলকাতায়—

কলকাতা? আবার সেই কলকাতা—

—হ্যাঁ, তা ছাড়া উপায় নেই। আমার মনে হয়, আজকালের মধ্যেই চলে যাওয়া ভাল। নইলে হয় ত, শেষে দুটো চোখই চলে যাবে—

কেশবের দুই চোখে, অন্ধকার গাঢ় হয়ে ঘনিয়ে আসে। সেবার গিয়েছে এক বিঘের ওপর জমি। কিন্তু এবার? এবার কি দেবে সে, দেবার ত আর কিছুই নেই। কেশব ডুকরে কেঁদে ওঠে—না, না, আর কলকাতায় যাব না। আমার অমন ভাল জমি চলে গিয়েছে, ওতে যে সোনা ফলত ডাক্তার। এবার দেখগে মা-লক্ষ্মী কেমন হাসছেন। আমার ছেলেরা যে না খেয়ে মরবে। এর চেয়ে যে আমার মরণ ছিল ভাল। যায় যাক্ আমার চোখ। আর না, আর যাব না কলকাতায়। ডাক্তার, ওখানকার ওরা সব মানুষ নয়। ঐ সহর রাক্ষুসে সহর। দিনরাত হাঁ করে আছে। মানুষকে গিলে খাচ্ছে, দয়া নেই, মায়া নেই, মুখের কথায় মিষ্টি নেই গো। কড়ি না ফেললে কিছু হবার উপায় নেই। আমার যায় যাক্ চোখ। পরের ঘরে আমার মা-লক্ষ্মী চলে গেছেন, আর তাঁকে যেন এই দুই চোখে দেখতে না হয়। সেই ভাল। পরের হাতে চষা—পরের ঘরে চলে যাওয়া ধান, খড়, এ যেন আমার দুই চোখে দেখতে না হয়। ডাক্তার, এতেই আমার নিষ্কৃতি, এই আমার ভাল। হু হু করে কেঁদে ওঠে কেশব, চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে। বুঝি বা ঈশ্বরই দয়া করে এ দুই চোখ নিয়ে এক মহা দুঃখ থেকে নিষ্কৃতি দিচ্ছেন কেশবকে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের ইংরেজী অনুবাদের তালিকা

শ্রীসুধাময়ী মুখোপাধ্যায়

(১৮৯৪) বিদায় অভিশাপ—র র ৪

বিদায় অভিশাপ—Tr. by the poet in Fugitive, No. 20
—Kacha O Debajani—Tr. by K. Kripalani in V.B.Q Vol. II Part IV 193
—'Curse at Farewell'—Tr. by Edward Thompson
—Another Translation in the 'Orient'—May-June 1924

(১৮৯৬) চিত্রা—র র ৪

চিত্রা—জগতের মাঝে কত বিচিত্ররূপিণী —Fugitive II—1—Endlessly varied art thou (416)
প্রেমের অভিষেক—তুমি মোরে করেছ সম্রাট —Fugitive II—11—You have made me great (419)
সুখ—আজি মেঘমুক্ত দিন—Lover's Gift 51—The early autumn day is cloudless
স্নেহস্মৃতি—সেই চাঁপা সেই বেল ফুল—Crescent Moon—The first jasmines—Ah, these jasmines (82)
সাধনা—দেবী, অনেক ভক্ত এসেছে —Fugitive II 20—Lovers come to you, my queen
পূর্ণিমা—পড়িতেছিলাম গ্রন্থ বসিয়া—Lover's Gift 56—The evening was lovely for me (265)
আবেদন—জয় হোক মহারাণী—Gardener I—Have mercy upon your servant (89)
উর্বশী—নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ —Fugitive I—11—Neither mother nor daughter (409
—Sheaves—Urvasi—Nor mother, nor maid, nor bride art thou
—Echoes from East and West—'Urbasi'—By Roby Datta
—Presidency College Magazine, Sept. 1935—Tr. by Lalit Mohan Chatterji

স্বর্গ হইতে বিদায়—
ম্লান হয়ে এল কণ্ঠে মন্দার-মালিকা —Golden Boat—The garland of celestial flowers
দিনশেষ—দিন শেষ হয়ে এল, আঁধারিল —Fugitive I—3—It was growing dark (406)
সান্ত্বনা—কোথা হতে দুই চক্ষে ভরে নিয়ে —Fugitive II—13—Whence do you bring this (420)
শেষ উপহার— যাহা কিছু ছিল— —Lover's Gift 27—I filled my tray with
গৃহশত্রু—আমি একাকিনী যবে চলি— —Gardener 9—When I go alone (96)
উৎসব—মোর অঙ্গে অঙ্গে যেন আজি —Fruit Gathering 73—The spring with its leaves (212)
প্রস্তর মূর্তি—হে নির্বাক অচঞ্চল —Gardener 60—Amidst the rush and roar (128)
নারীর দান—একদা প্রাতে—Gardener 58—One morning, in the flower garden (128)
জীবনদেবতা—ওহে অন্তরতম, মিটেছে কি—Poems II—Lord of my Being
রাত্রে ও প্রভাতে—কালি মধু যামিনীতে—Lover's Gift 13—Last night, in the garden (256)
১৪০০ সাল—আজি হতে শতবর্ষ পরে—Gardener 85—Who are you, reader (147)

দুরাকাঙ্ক্ষা—কেন নিভে গেল বাতি—Gardener 52—Why did the lamp go out (123)
—V.B.Q., Vol. 18 No. 2. 1952—Translation by Lila Roy
প্রৌঢ়—যৌবন নদীর স্রোতে—Lover's Gift 38—The current in which I drifted

(১৮৯৬-১৯১২) চৈতালি—র র ৫

উৎসর্গ—আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে——Lover's Gift 3—The fruits came in crowds
স্বপ্ন—কাল রাতে দেখিনু স্বপন—Lover's Gift 28—I dreamt that she sat (259)
আশার সীমা—সকল আকাশ সকল বাতাস—Lover's Gift 5—I would ask for still more (255)
পুণ্যের হিসাব—সাধু যবে স্বর্গে গেল—Sheaves—The Acoount—When the pious man went to heaven
মধ্যাহ্ন—বেলা দ্বিপ্রহর। ক্ষুদ্র জীর্ণ —Fugitive III—14—The kingfisher sits still (432)
সামান্য লোক—সন্ধ্যাবেলা লাঠি কাঁধে—Fugitive III—17—If the ragged villager (435)
বৈরাগ্য কহিল গভীর রাত্রে সংসার বিরাগী—Gardener 75—At midnight, the would-be ascetic announced (140
পল্লীগ্রামে—হেথায় তাহারে পাই কাছে—Lover's Gift 4—She is near to my heart (255)
খেয়া—খেয়া নৌকা পারাপার করে—Fugitive III—3—The Ferry-boat plies between the two villages (430)

ঋতু সংহার—হে কবীন্দ্র কালিদাস / মেঘদূত—নিমেষে টুটিয়া গেল —Poems No. 12—At youth's coronation, Kalidas
—V.B.Q. Aug-Oct. 1935—Reprinted in Poems No. 12
Modern Review, June 1932—Tr. by Nagendranath Gupta

তপোবন—মনশ্চক্ষে হেরি যবে —Sheaves—The Forest Hermitage—When I behold, the ancient Ind in the mind's eye

দিদি—নদীতীরে মাটি কাটে সাজাইতে পাঁজা / পরিচয়—একদিন দেখিলাম উলঙ্গ সে ছেলে —Gardener 77—The workman and his wife (142)
পুঁটু—চৈত্রের মধ্যাহ্ন বেলা কাটিতে না চাহে—Gardener 78—It was in May. The sultry (142)
দুই বন্ধু—মূঢ় পশু ভাষাহীন নির্বাক্ হৃদয়—Gardener 79—I often wonder where lie hidden (143)
সঙ্গী—অনেক দিনের কথা পড়ি গেল মনে—Fugitive III—15—I remember the scene (435)
মেহদৃশ্য—বয়স বিংশতি হবে, শীর্ণ তনু তার—Fugitive II—16—He is tall and lean
করুণা—অপরাহ্নে ধূলিচ্ছন্ন নগরীর পথে—Fugitive III—14—The evening stood bewildered (434)
দুর্লভ জনম—একদিন এই দেখা হয়ে যাবে শেষ—Gitanjali 92—I know that the day will come (43)
ধরাতল—ছোট কথা ছোট গীত—Poems 13—Little songs and little things
তত্ত্ব ও সৌন্দর্য—শুনিয়াছি নিম্নে তব—Poems 14—Thou ocean of things, they say
মানসী—শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি—Gardener 59—O woman, you are not merely the handiwork of God (128)
ঐশ্বর্য—ক্ষুদ্র এই তৃণদল ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে—Gardener 74—In the world's audience hall (140)

মৌন—যাহা কিছু বলি আজ / অসময়—বৃথা চেষ্টা রাখি দাও —Fugitive II—12—Like a child that frets......(419)

গান—তুমি পড়িতেছ হেসে —Sheaves—In Any Moods—Laughing, you fall like a wave
—Fugitive II—5—You give yourself to me by the flower

(১৯০৭) কথা ও কাহিনী—র-র ৭

কথা কও, কথা কও—Sheaves—The Past—Speak, Oh speak, O past, that never had a beginning
—V.B.Q. Vol. I Part I, April 1923—Tumultous years brings their voice (abridged Tr.)

শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা—প্রভু বুদ্ধ লাগি—Golden Boat—The Strange Beggar

প্রতিনিধি—বসিয়া প্রভাতকালে—Hind. Std. Annual 1952—The Proxy—Tr. by Somnath Moitra

ব্রাহ্মণ—অন্ধকার বনচ্ছায়ে—Fruit Gathering 64—The sun had set (209)

মস্তক বিক্রয়—কোশল নৃপতি তুলনা নাই—Golden Boat—Price of a head

পূজারিণী—নৃপতি বিম্বিসার, নমিয়া বুদ্ধে—Fruit Gathering 43—Over the relic of Lord Buddha (194)

পরিশোধ—রাজকোষ হতে চুরি—Golden Boat 1955—Retribution
—Hind. Std. Annual 1950—Retribution—by K. Ray
Reprinted from V.B.Q. May, 1939

অভিসার—সন্ন্যাসী উপগুপ্ত,—Fruit Gathering 37—Upagupta, the disciple of Buddha (194)

মূল্যপ্রাপ্তি—অঘ্রাণে শীতের রাতে—Fruit Gathering 19—Sudas, the gardener (184)

নগর লক্ষ্মী—দুর্ভিক্ষ শ্রাবস্তীপুরে—Fruit Gathering 31—Who among you, will take up (189)

অপমান বর—ভক্ত কবীর সিদ্ধ পুরুষ—Fugitive III—24—They said that Kabir, the weaver (442)
—Hind. Std. Annual, 1958—Boon of Disgrace—by Somnath Moitra

নিষ্ফল উপহার—নিম্নে আবর্তিয়া—Fruit Gathering 12—Far below flows the Jumna (181)

দীনদান—নিবেদিল রাজ ভৃত্য—Fruit Gathering 34—'Sire', commenced the servant (190)

স্বামীলাভ—একদা তুলসীদাস জাহ্নবীতীরে—Fruit Gathering 55—Tulsidas, the poet was wandering (204)

স্পর্শমণি—নদীতীরে বৃন্দাবনে সনাতন—Fruit Gathering 27—Sanatan was telling his beads (187)

বন্দীবীর—পঞ্চনদীর তীরে বেণী পাকাইয়া শিরে—Hind. Std. Annual 1946—'The Lion in Chains' —by S. C. Dutt

রাজ-বিচার—বিপ্র কহে রমণী মোর আছিল—Sheaves—The King's Justice—Into the presence of the King

গুরু গোবিন্দ—বন্ধু তোমরা ফিরে যাও ঘরে—Hind. Std. Annual 1945—Tr. by Indira Debi Choudhurani

শেষ শিক্ষা—একদিন শিখগুরু গোবিন্দ নির্জনে—Golden Boat—'Guru Gobind'
—Hind. Std. Annual 1948—Sesh Shiksha—by Amiya Chakravarty

নকল গড়—জলস্পর্শ করব না আর—Modern Review, June, 1931—'The Toy Citadel'—by Nagendranath Gupta
—Hind. Std. 30|3|52—'The Imitation Fort'—by S. Moitra

হোরিখেলা—পত্র দিল পাঠান কেসর খাঁরে—Hind. Std. 1-3-53—The Hory Play—by S. Moitra

বিবাহ—প্রহর খানেক রাত হয়েছে শুধু—Golden Boat—The Wedding
—Hind. std. 30-3-54—The Wedding—by S. Moitra

দুই বিঘা জমি—শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই—Hind. Std. Annual 1956—Two Bighas of Land—by Lila Majumdar

পণরক্ষা—মারাঠা দস্যু আসিছে রে ঐ —Hind. Std. Annual 1953—The Keeping of the Vow—by S. Moitra

পুরাতন ভৃত্য—ভূতের মতন চেহারা যেমন—Hind Std. Annual 1956—The Old Servant—by Lila Majumdar

গান ভঙ্গ—গাহিছে কাশীনাথ নবীন যুবা —Fruit Gathering III—30—The crowd listens in wonder (447)

(১৯০০) কাহিনী—র র ৫

গান্ধারীর আবেদন—Fugitive II 32—The Mother's Prayer
পতিতা—ধন্য তোমারে—Lover's Gift 60—Take back your coins
নরকবাস—Fugitive III 25—Somak and Ritvik
সতী—Fugitive II 29—Ama and Binayak
লক্ষ্মীর পরীক্ষা—Modern Review, July 1920
কর্ণকুন্তী সংবাদ—Fugitive III 29—Karna and Kunti
—Modern Review, April 1920—Foundling Hero—Tr. By Sturge Moore

(১৯০০) কল্পনা—রবীন্দ্র রচনাবলী ৭

দুঃসময়—যদিও সন্ধ্যা আসিছে—Gardener 67—Though the evening comes (133)
—'Kavita'—International Number, January 1960—'Hard Times' Tr. by Buddhadeb Bose
—Presidency Coll. Magazine, Nov. 1918—'Evil Times' Tr. by Hiran Kumar Sanyal

স্বপ্ন—দূরে বহু দূরে স্বপ্নলোকে—Gardener 62—In the dusky path (129)
মদন ভস্মের পর—পঞ্চশরে দগ্ধ করে—Sheaves—After the Burning of Cupid—What have you done, O Sanyasin!
পিয়াসী—আমি ত চাহিনি কিছু—Gardener 13—I asked nothing, only stood (100)
মার্জনা—ওগো প্রিয়তম আমি—Gardener 33—I love you beloved (112)
স্পর্ধা—সে আসি কহিল, প্রিয়ে—Gardener 36—He whispered, my Love (114)
পসারিণী—ওগো পসারিণী দেখি আয়—Lover's Gift 9—Woman, your basket is heavy
ভ্রষ্টলগ্ন—শয়নশিয়রে প্রদীপ নিভেছে—Gardener 8—When the lamp went out (95)
প্রণয় প্রশ্ন—এ কি তবে সবি সত্য—Gardener 32—Tell me if this be all true (112)
• শরৎ—আজি কি তোমার মধুর মূরতি—Hind. Std. Annual 1946—'Autumn'—By Indira Debi Choudhurani
• লীলা—কেন বাজাও কাঁকন কনকন—Gardener 23—Why do you sit there and jingle your bracelets (107)
• মানস প্রতিমা—তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত—Gardener 30—You are the evening cloud (111)
• সকরুণা—সখী প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায়—Gardener 20—Day after day, he comes and goes away (106)
প্রকাশ—হাজার হাজার বছর কেটেছে—Lover's Gift 17—While ages passed and the bees
• সঙ্কোচ—যদি বারণ কর তবে গাহিব না—Gardener 47—If you would have it so (122)

অশেষ—আবার আহ্বান ? যত কিছু ছিল কাজ —Gardener 65—Is that your call again (181)
বিদায়—ক্ষমা করো ধৈর্য ধরো —Gardener 61—Peace, my heart (128)
বর্ষশেষ—ঈশানের পুঞ্জ মেঘ —V.B.Q. Vol. XV Part IV 1950—'The Year End'—by Latika Ghosh
Coll. poems and plays—The new year (455)
বসন্ত—অযুত বৎসর আগে হেমন্ত —Lover's Gift 12—Ages ago, when you opened the south
রাত্রি—মোরে কর সভাপতি —Fruit Gathering 20—Make me thy poet (185)
ভগ্নমন্দির—ভাঙা দেউলের দেবতা —Gitanjali 88—Deity of the ruined temple (41)
• পূর্ণকাম—(আমি) সংসারে মন দিয়েছিনু —Crossing 49—In the world's dusty road
—Poems 19—I threw away my heart in the world
ভারতলক্ষ্মী—অয়ি ভুবন মনমোহিনী —Echoes from East and West—A song of Ind.
—Cultural Forum, Tagore Number 1961—Well-beloved of the whole world—by K. Ray
—Anthology of 100 songs—Sangeet Natak Akademi Vol. I No. 32

(১৯০০) ক্ষণিকা—র র ৭

উদ্বোধন—শুধু অকারণ পুলকে—Gardener 45—To the guests, that must go (abridged) (120)
—Lover's Gift 6—In the light of this
মাতাল—ও রে মাতাল, দুয়ার ভেঙে—Gardener 42—O mad, superbly drunk (118)
যুগল—ঠাকুর তব পায়ে নমো নম—Gardener 44—Reverend Sir, forgive this pair (120)
শাস্ত্র—পঞ্চাশোর্ধে বনে যাবে—Lover's Gift 19—It is written in the book that (258)
অনবসর—ছেড়ে গেলে হে চঞ্চলা—Gardener 46—You left me (121)
যথাস্থান—কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস—Lover's Gift 20—Where is the market for you
অচেনা—কেউ যে কারে চিনি নাকো—Fugitive I 10—Be not concerned about her heart (408)
উৎসৃষ্ট—মিথ্যে তুমি গাঁথলে মালা—Gardener 37—Would you put your wreath (114)
অপটু—যতবার আজ গাঁথনু মালা—Gardener 39—I try to weave a wreath (115)
ভীরুতা—গভীর সুরে গভীর কথা—Gardener 41—I long to speak (117)
সেকাল—আমি যদি জন্ম নিতেম—Fugitive I 9—If I were living (407)
পথে—গাঁয়ের পথে চলেছিলাম—Gardener 14—I was walking by the road (101)
ক্ষতিপূরণ—তোমার তরে সবাই মোরে—Gardener 38 (abridged)—My love, once upon a time (115)
জোড়াতুড়ি—হৃদয়পানে হৃদয়টানে—Gardener 16—Hands cling to hands and eyes (102)
কবির বয়স—ওরে কবি সন্ধ্যা হয়ে এল—Gardener 2—Ah poet, the evening draws (90)
এক গাঁয়ে—আমরা দুজনা একটি গাঁয়ে—Gardener 17—The yellow bird sings in their tree (103)
অতিথি—ঐ শোনো গো অতিথি বুঝি—Gardener 10—Let your work be, Listen the guest is come (99)
পরামর্শ—সূর্য্য গেল অস্তপারে—Lover's Gift 37—You had your rudder broken
নষ্ট স্বপ্ন—কালকে রাতে মেঘের গরজনে—Lover's Gift 35—Last night clouds were threatening
অসাবধান—আমায় যদি মনটি দেবে—Lover's Gift 18—Your days will be full of cares (257)

দুই তীরে—আমি ভালোবাসি আমার নদীর —Lover's Gift 23—I loved the sandy bank
—Sheaves—On Two Shores—I love the sand beach of my river

যাত্রী—আছে আছে স্থান —Lover's Gift 8—There is room for you (256)
অবশেষ—অধিক কিছু নেই গো —Lover's Gift 7—It is little that remains
কূলে —আমাদের এই নদীর কূলে —Fugitive I 19—On the side of the water (412)
জন্মান্তর—আমি ছেড়েই দিতে রাজি —Lover's Gift 22—I shall gladly suffer the pride (258)
ক্ষণেক দেখা—চলেছিলে পাড়ার পথে —Gardener 19—You walked by the river side (105)
দুই বোন্—দুই বোন্ তারা হেসে যায় কেন —Gardener 18—When the two sisters go to fetch (104)
বিরহ—তুমি যখন চলে গেলে —Gardener 55—It was mid-day when you went away (125)
অকালে—ভাঙা হাটে কে ছুটেছিস্ —Gardener 54—Where do you hurry (125)
প্রতিজ্ঞা—আমি হব না তাপস হব না —Gardener 43—No my friends, I shall never be (119)
বিদায় রীতি—হায় গো রাণী বিদায়বাণী —Gardener 40—An unbelieving smile flits on your eyes (116)

স্থায়ী অস্থায়ী—তুলেছিলেম কুসুম তোমার —Gardener 57—I plucked your flower (127)
শেষ—থাকব না ভাই, থাকবে না কেউ —Gardener 68—None lives for ever (134)
খেলা—মনে পড়ে সেই আষাঢ়ে —Gardener 70—I remember a day (136)
চিরায়মানা—যেমন আছ তেমনি এসো —Gardener 11—Come as you are, do not loiter (98)
সমাপ্তি—পথে যতদিন ছিনু ততদিন —Crossing 50—I was with the crowd
* অবিনয়—হে নিরুপমা, চপলতা আজি যদি ঘটে —Lover's Gift 14—If I am impatient to-day
* কৃষ্ণকলি—কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি —Lover's Gift 15—Her neighbours call her dark I call her my Krishna flower (256)

ভর্ৎসনা—মিথ্যে আমায় কেন শরম দিলে —Gardener 53—Why did you put me to shame (124)
দুর্দিন—এতদিন পরে প্রভাতে এসেছো —Fugitive 15—Of all days, you have chosen
* আষাঢ়—নীল নব ঘন আষাঢ়গগনে —Crescent Moon—The Rainy Day—Sullen clouds are gathering (66)

* নববর্ষা—হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে —Poem No. 20—My heart like a peacock on a rainy day, spreads its plumes

সুখ দুঃখ—বসেছে আজ রথের তলায় —Gardener 76—The fair was on before the temple
কৃতার্থ—এখনো ভাঙেনি ভাঙেনি মেলা —Gardener 71—The day is not yet done (137)
বিদায়—তোমরা নিশি যাপন করো —V.B.Q. XXIV No. 2 (1958)—Tr. by the poet
বিলম্বিত—অনেক হ'ল দেরী —V.B.Q. XXIV No. 3 (1958-59)—Tr. by the poet
আবির্ভাব—বহুদিন হল কোন্ ফাল্গুনে —Sheaves—Manifestation—In some long ago month of May

অন্তরতম—আমি যে তোমায় জানি, সেতো কেউ জানে না —Fruit Gathering 85—When the world sleeps, I come to your door (217)

ক্রমশঃ

—•—

হরতন

শ্রীবিমল মিত্র

২৩

আজ এতদিন পরে কেষ্টগঞ্জের কথা মনে করতে গিয়ে শুধু বঙ্কু নয়, অঞ্জনাও কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। কোথায় স ছিল 'শ্রীমানী অপেরা'র রূপকুমারী। রাণী রূপকুমারী। রাণীই বটে। যাত্রাদলের মেকি রাণী থেকে একেবারে সত্যিকারের কেষ্টগঞ্জের রাজরাণী। যখন আবার জোড়হাট, গৌহাটি, শিবসাগর, ডিব্রুগড়ের দিকে বঙ্কু যাত্রা করতে যায় নতুন দল নিয়ে, তখন ষ্টেশনের প্লাটফরমে লোকের ভিড় জমে যায়। আগে যেমন 'শ্রীমানী অপেরা'র সময় হ'ত, এও ঠিক তেমনি। বলে—শ্রীদাম অপেরা আসছে যাত্রা করতে গো, ডাকসাইটে দল—

বঙ্কু নিজের নামেই যাত্রা-দল করেছে। বঙ্কু বিহারী দাম। দামের আগে শ্রী কথাটা বসিয়ে 'শ্রীদাম অপেরা' নাম দিয়েছে। 'শ্রীদাম অপেরা'কে এখন এক মাস আগে থেকে 'বুক' না-করলে আর ধরা যায় না। বড্ড নাম-ডাক।

অথচ সেদিন সেই কেষ্টগঞ্জের কর্ত্তামশাই-এর মৃত্যুর রাতটাতেও এ-কথা কল্পনা করতে পারত না বঙ্কু। তুমি আমি এবং আরও পাঁচজন ভদ্রলোক যারা প্রতিদিন কেষ্টগঞ্জের সুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত দেখে এসেছি, তারা দুলাল সা'কেও দেখেছি, কর্ত্তামশাইকেও দেখেছি। আমাদের এই পায়ের তলায় পৃথিবী কেমন করে সুরু হয়েছিল তা দেখি নি বটে, কিন্তু না-দেখলেও কেষ্টগঞ্জকে দেখেই সেটা কল্পনা করে নিতে পারি। এই পৃথিবীটাও একটা বড়-সড় কেষ্টগঞ্জ। প্রতিদিন রাস্তার ঘাটে আমরা দুলাল সা'দের দেখছি, কর্ত্তামশাইদের দেখছি। এখানে কেউ জেতে, কেউ বা হারে, কেউ মাটি মাড়িয়ে হাঁটে, কেউ মাটি কাঁপিয়ে হাঁটে। দুদিনের কেউই চিরকাল এখানে বাঁচতে আসে নি। কিন্তু তবু যতদিন তারা বেঁচে থাকে ততদিন একজনের উন্নতি হ'লে আর একজনের বুক ফাটে। একজনের বাড়ী থেকে লুচি-ভাজার গন্ধ এলে আর একজনের কষ্ট হয়। একজনের সর্ব্বনাশ হ'লে আর একজন তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে। এই-ই চলে আসছে অনাদি অনন্ত কাল ধরে।

এখনও যদি কেউ কেষ্টগঞ্জে যায় ত কর্ত্তামশাই-এর বাড়ীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালে চমকে যাবে। দুলাল সা'র বাড়ী থেকে কর্ত্তামশাই-এর বাড়ীতে যেতে গেলে আগে কাদা মাড়িয়ে ঘুর-পথ দিয়ে যেতে হ'ত। এখন আর তা নেই। এখন ও-অঞ্চলটা একাকার হয়ে গেছে। একেবারে লম্বা পাঁচিল পড়ে গেছে এ-দিগর থেকে ও-দিগর পর্য্যন্ত। সমস্ত জমিটাই হরিসভার নামে ব্রহ্মোত্তর করে দেওয়া হয়ে গেছে। দুলাল সা'ও নেই, কর্ত্তামশাইও নেই। বড় গিন্নীও নেই, নিবারণ সরকারও নেই। কিন্তু তবু কেষ্টগঞ্জ আছে, আর আছে কেষ্টগঞ্জের হরিসভা।

এই সেদিন পর্য্যন্ত নিতাই বসাকই শুধু ছিল। সারা-জীবন গৌপুলবেড়ের বাঁওড় থেকে সুরু করে যে-লোকটা সুকান্ত রায়ের প্রমোশনটা নিয়ে যে কাণ্ড করে গেল, তার এতটুকু চিহ্ন পর্য্যন্ত কোথাও রইল না। কেউ জানতে পারল না, কেমন করে কেষ্টগঞ্জের 'দি ইণ্ডিয়া সুগার মিল লিমিটেড' হ'ল, কেমন করে পাটের এক্সপোর্ট-ইম্পোর্ট পারমিট পেল, কেষ্টগঞ্জের উন্নতির মূলে কার হাত-সাফাই ছিল। শেষের দিকে লাঠি হাতে নিয়ে বিকেলবেলার দিকে একটু হেঁটে বেড়াত। কখনও বা একটা গাড়িতে চড়ে সমস্ত অঞ্চলটা দেখতে বেরুত। ড্রাইভার গাড়িটা নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাত ইছামতীর শান-বাঁধানো ঘাটটার কাছে। দুলাল সা একদিন বেঁচে ছিল নিজের হাতে এই ঘাট বাঁধা দিয়ে গেছে। মনে পড়ে যেত প্রথম যৌবনের সেই সব দিনগুলোর কথা,

যখন দুলাল সা আর সে হরিসভার জন্তে মাঝি-মাল্লা ব্যাপারীদের কাছ থেকে মাথা-পিছু চার পয়সা করে চাঁদা তুলেছে। শুধু মনেই পড়ত তার, সে-সব বলবার মত, শোনবার মত লোকও তখন কেউ ছিল না কেষ্টগঞ্জে। তখন পাকিস্তান থেকে নতুন নতুন লোক এসে কেষ্টগঞ্জে বসতি করেছে। যারা গঞ্জের দিকে জমি পায় নি বসবাস করতে, তারা মালো-পাড়ার দিকে গিয়ে ঘর বেঁধেছে। একেবারে ভিড়ে ভিড় হয়ে গেছে কেষ্টগঞ্জ। নতুন নতুন রিফিউজীদের কাপড়ের দোকান, হাঁড়ি-কলসীর দোকান। তারা গঞ্জ, বাজার, রাস্তা ছেয়ে ফেলেছে। তাদের জন্তে রাস্তায় মোটর চালানোও বিপদ্। সাইকেলটা নিয়ে এক-একবার ঘাড়ের ওপরেই হয়ত লাফিয়ে পড়ল।

তারপর একদিন নিতাই বসাকও হঠাৎ মারা গেল।

খবরের কাগজে যখন নিতাই বসাকের মৃত্যুর খবরটা বেরিয়েছিল তখন খবরটার সঙ্গে তার ছবিও বেরিয়েছিল। ছবির নিচের শোক-সংবাদে নিতাই বসাকের অনেক গুণাবলীর কথাও লেখা ছিল। লেখা ছিল—"তিনি কৃষ্ণগঞ্জের প্রাতঃস্মরণীয় সন্তান। তাঁর উদ্যোগেই কৃষ্ণগঞ্জে বিভিন্ন সেবা-প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। তিনি একাধারে কর্মী ও সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া নিরাসক্ত চিত্তে আমৃত্যু কর্ম করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে রাম-মোহন, রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দের দেশ আর একজন কর্মবীর হারাইল। আমরা তাঁহার পারলৌকিক আত্মার সদ্গতি কামনা করি এবং তাঁহার অগণিত গুণগ্রাহী ও ভক্তদের শোকে আন্তরিক সহানুভূতি জানাই।"

যারা এ-যুগের ছেলে, তারা খবরের কাগজটা পড়ে "আহা" বলে উঠেছিল। সত্যিই দেশের একজন মহা-পুরুষ চলে গেলেন। কিন্তু সত্যিই যেদিন কেষ্টগঞ্জে নিতাই বসাকের জন্তে শোকসভা হয়েছিল সেদিন একজন শুধু অবাক্ হয়ে গিয়েছিল সব দেখে-শুনে। সে সুকান্ত। এ কেমন করে হয়! এ কেমন করে সম্ভব! সুকান্তর কাছে কতদিন কত টাকা নিয়ে গেছে কত লোককে দেবার জন্তে। কিন্তু কোনও টাকাই আইটাম বিল্ডিং-এ কারও হাতে পৌঁছয় নি। সুকান্তরও প্রমোশন হয় নি, বদলিও হয় নি। সে তখন সেই কেষ্টগঞ্জের মালোপাড়ায় ব্লক-ডেভেলপ্মেন্ট অফিসার হয়ে রয়েছে।

শুধু রয়েছে নয়, কর্তামশাই আর দুলাল সা'র যে ঝগড়া গোড়ার দিক্টা থেকে দেখে এসেছিল, তার পরিণতিটাও দেখেছে।

পরিণতিটা যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি অভিনব।

আশ্চর্য্য, এমন করেই মানুষের জীবনের পরিণতি ঘটে। বঙ্কুবিহারী যেদিন হরতনকে নিয়ে কর্তামশাই-এর বাড়ী ছেড়ে গেল, সেদিন সুকান্তও সশরীরে সেখানে হাজির ছিল। শুধু সে কেন, সবাই। সবাই-ই হাজির ছিল সেদিন।

সমস্ত কেষ্টগঞ্জটাই যেন তোলপাড় হয়ে গিয়েছিল তখন। মালোপাড়া, উত্তরপাড়া, দক্ষিণপাড়া, গঞ্জ, সব জায়গা থেকে লোক জড়ো হয়ে গিয়েছিল সেই কর্তামশাই-এর বাড়ীতে।

যে শোনে সেই বলে, কি হয়েছে গো? কোথায় যাচ্ছ?

এ ওর মুখ থেকে শুনেছে, সে তার মুখ থেকে শুনেছে। কেউ দেখে নি তখনও আসল ঘটনাটা। সকলেরই শোনা কথা। মুখের কথায় বিশ্বাস নেই, তাই দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছে দেখতে। এমন তাজ্জব ঘটনা না দেখে থাকতে পারা যায় নাকি?

—সত্যি বলছ?

—হ্যাঁ গো, সত্যি না ত কি কাজ-কর্ম ফেলে মিছি মিছি যাচ্ছি!

দেখে নি কেউ বটে, কিন্তু ব্যাপারটা সবাই-ই শুনেছে। শুনেছে, এতদিন পরে নাকি কর্তামশাইয়ের আসল মাতৃনীকে পাওয়া গেছে।

—তা হ'লে এতদিন যে ছিল বাড়ীতে, সে কে?

—সে কে তা গেলেই বোঝা যাবে। আমরা কি সব দেখেছি? আমরা ত শুধু শোনা-কথা বলছি।

সেদিন কেষ্টগঞ্জে সেই শোনা কথাই সবাই যাচাই করে দেখে নিতে এসেছিল। কিন্তু এসে যা দেখেছিল তাতে হতবাক্ হ'তে তাদের বাকি থাকে নি। তারাও বলেছিল—আশ্চর্য্য! এমন করেও মানুষের জীবনের

পরিণতি ঘটে। কর্তাবাবুরাই সেইসঙ্গে গেলেন, কিন্তু এ সব রেখে গেলেন কি এমন ক্ষতিটা তাঁর হ'ত? তিনি ত জানতেও পারলেন না কিছু। তিনি ত তাঁর ভাগ্যের দেবতাকে ডেকে একটা ক্ষীণতম অভিযোগ করে যেতেও পারলেন না। ব'লে যেতে পারলেন না যে, আমি যা চেয়েছিলাম সবই তুমি দিলে প্রভু, কিন্তু এমন মর্মান্তিক ভাবে তা না দিলে কি চলত না? তা দিলে কি তোমার মহাসৃষ্টির কাজে বড্ডই ক্ষতি হ'ত?

নতুন-বৌ তখনও পুরো সামলাতে পারে নি।

দুলাল সা'ও যেন এ দু'দিনে একেবারে চুপ্‌সে বেঁটে হয়ে গেছে। দোলগোবিন্দ ঘটককে নিয়ে পুলিশের দল যখন আবার ফিরে এল, তখন যেন সমস্ত কেষ্টগঞ্জের চেহারাটাই চোখের সামনে থেকে বদ্‌লে গেছে।

পুলিশের দারোগা দোলগোবিন্দকে জিজ্ঞেস করেছিল —তা তুমি এমন সর্বনাশ করলে কেন?

পাগল মানুষের মনেও বুঝি পাপবোধটা ছিল তখন।

বললে—আমার মতিচ্ছন্ন হয়েছিল হুজুর তখন, আমি তখন পনেরো ভরি সোনার লোভ ছাড়তে পারি নি—

—তা বলে তুমি একবারও ভাবলে না যে, দুলাল বাবুর মত একজন ধার্মিক লোকের সর্বনাশ হয়ে যাবে?

—তা কি আর ভাবি নি হুজুর?

—তা হ'লে এমন কাজ করলে কেন?

—ওই যে বললাম হুজুর, পনেরো ভরি সোনার লোভে। সে সোনাও পেলাম না, আমারও সব্বোনাশ হয়ে গেল।

তারপর গ্রামের কয়েকজন লোক এসে দাঁড়াল। নতুন-বৌয়ের এক দিদিমা ছিল, সেও আর নেই। মৃত্যুর পর সে সম্পত্তিও নতুন-বৌয়ের হাতে এসে পড়েছে। নিতাই বসাক আর দুলাল সা মিলে সে-সম্পত্তি বিক্রি ক'রে টাকা তুলেও নিয়েছে। সুতরাং এতদিন পরে গাঁয়ের লোকেরা কেউ আশাও করে নি যে, আবার সেই নাত্‌নী এদেশে আসবে।

—তা তুমি কি করে জানলে যে ইনি জেলের মেয়ে?

—আজ্ঞে, বিয়ের আগে ওনার দিদিমার কাছেই শুনেছিলাম। সেই জন্যেই ত বিয়ে হচ্ছিল না।

নতুন-বৌ হঠাৎ বলে উঠল—মিথ্যে কথা, তা হ'লে আমি জানতে পারতাম। তুমি মিথ্যে কথা বলছ।

—না মা, আগে অনেক মিথ্যে কথা বলেছি, আগে অনেক পাপ করেছি, সেই পাপের ফলও পাচ্ছি হাড়ে-হাড়ে! আমার নিজের মেয়েরাও মরে গেছে সব সেই পাপে! যাদের ভালর জন্যে আমি সনাতনের কথায় ভুলে মিথ্যে কথা বলেছিলাম, সা'-মশাই-এর সর্বনাশ করেছিলাম, তারাই আর নেই মা এখন! এখন কাদের জন্যে মিথ্যে কথা বলতে যাব? কে আছে আমার?

—তা হ'লে কেন বলছ আমি জেলের মেয়ে? আমার দিদিমা আমার আপন দিদিমা নয়?

দোলগোবিন্দ বললে, না মা, না—

—প্রমাণ দিতে পার তুমি?

—সেই প্রমাণ দেব বলেই ত এসেছি মা এখানে!

—দাও, তা হ'লে প্রমাণ দাও।

দোলগোবিন্দ বললে, একটু দাঁড়ান আপনারা—

ব'লে কোথায় চলে গেল। তারপর একজন বুড়ো লোককে ডেকে নিয়ে এল। প্রায় নব্বই বছর বয়েস লোকটার। লোকটা এসে সবাইকে প্রণাম করলে। কুঁজো হয়ে গেছে বয়সের ভারে। ভাল করে চোখে দেখতেও পায় না।

—এই একেই জিজ্ঞেস করুন আপনারা!

দারোগা জিজ্ঞেস করলে, কি নাম তোমার?

—হুজুর, কালীচরণ মাইতি!

—কোথায় থাক তুমি?

—হুজুর, কোথায় আর থাকব, এই গেরামেই থাকি।

—তুমি এই দোলগোবিন্দ ঘটককে চেন?

—খুব চিনি হুজুর।

—তুমি এই মহিলাকে চেন?

—চিনি হুজুর। আমার মা-জননী! আমি কত কোলে-পিঠে করেছি ওনাকে। আমি ত ওঁাদেরই মুনিষ-মাস ছিলাম, আজ্ঞে। উনি এখন আমাকে চিনে

হয়ত চিনতে পারবেন না, উনি এখন কত বড় লোকের ঘরণী হয়েছেন।

নতুন বৌ-এর দিকে চেয়ে দারোগা সাহেব জিজ্ঞেস করলে—আপনি চিনতে পারেন একে?

নতুন-বৌ বললে, না—

—ঠিক ভাল করে চিনতে চেষ্টা করুন!

কালীচরণ মাইতি বললে, আচ্ছা মা, তোমার মনে পড়ে, এখানে একটা ঘট-পেয়ারার গাছ ছিল, তুমি পেয়ারা খেতে চাইতে, আমি পেড়ে দিতাম—

নতুন-বৌ বললে, আমার কিছুই মনে পড়ছে না—

কালীচরণ বললে—তুমি তখন খুব ছোট মা, তোমার কি করে মনে থাকবে? তোমার বিয়ের সময় আমি এসেছিলাম নেমন্তন্ন খেতে, গোঁসাইমা আমাকে আসতে খবর দিয়েছিলেন। আমি ওনার দিদিমাকে গোঁসাইমা বলে ডাকতাম।

—তা তুমি কি এবাড়ী ছেড়ে তখন অন্য জায়গায় চাকরি করতে?

—না, আমাকে গোঁসাইমা ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—কালীচরণ, তোর বয়েস হয়েছে, তুই চাটুজ্জেদের সঙ্গে কাশী চলে যা, তোকে আমি খরচ দেব। মা-জননী একটু বড় হতেই আমাকে কাশী পাঠাবার নাম করে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। গাঁয়ের চাটুজ্জেরা তখন কাশীধামে যাচ্ছিল কি না?

—তারপর?

—তারপর চাটুজ্জেরা চলে এলেন সব্বাই, আমি সেখানেই রয়ে গেলাম, গোঁসাইমা আমাকে কাশীধামে থাকতেই চিঠি লিখেছিলেন। আমিও ভাবলাম, বাবা বিশ্বনাথের চরণে পড়ে থাকব চিরকাল—

—তা এখন আবার কাশী থেকে চলে এলে কেন?

—গোঁসাইমা মারা যাবার পর আমাকে আর টাকা কে পাঠাবে, তাই যাত্রীদের সঙ্গে আবার গাঁয়ে চলে এলাম—

দারোগাবাবু বললে—তা গোঁসাইমা তোমাকে কাশীতে পাঠাতে গেলেনই বা কেন?

কালীচরণ বললে—ওই যে আমি সব জানতাম হুজুর—

—কি জানতে তুমি?

—সেই কথা বলতেই ত আমাকে ঘোলগোবিন্দ এখেনে ডেকে এনেছে হুজুর। গোঁসাই-মা'র ত কেউ ছিল না হুজুর। ছেলে মারা গেল, নাতি মারা গেল, বাড়ী একেবারে খাঁ খাঁ করত। থাকবার মধ্যে কেবল ছিলাম আমি আর গোঁসাই-মা। আমি বাড়ীর কাজ-কম্ম করি, খাটি-খুটি, আর গোঁসাই-মা'র সেবা করি। এমন সময় একদিন সকালে গোঁসাই-মা বললে, ওরে কালীচরণ, আজকে একটা ভারি ভাল স্বপ্ন দেখেছি রে—

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি স্বপ্ন গোঁসাই-মা?

গোঁসাই-মা বললেন, ওরে কালীচরণ, দেখলাম মা-লক্ষ্মী করলেন কি, ওই পেয়ারা গাছতলাটা দিয়ে আমার বাড়ীর দিকে আসছেন। রূপে একেবারে আলো হয়ে গেছে চারদিক্‌টা। আমি প্রথমটায় চিনতে পারি নি। জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কে মা? মা-লক্ষ্মী বললেন, আমি কমলা—আমি তোমার ঘর আলো করতে এলাম মা।—আমাকে তুমি রাখতে পারবে?

আমি বললাম, কেন রাখতে পারব না মা, তুমি যদি আমার ঘরে অচলা হয়ে থাক ত রাখব—

আমি জিজ্ঞেস করলাম—তারপর? তারপর কি হ'ল গোঁসাই-মা?

গোঁসাই মা বললেন, তারপর মা-লক্ষ্মী আমার কাছে আসতেই আমি কোলে তুলে নিয়ে চুমু খেলাম। কি ফুটফুটে মেয়ে যে কালীচরণ, কি বলব—তারপর মা-লক্ষ্মীকে যেই আবার চুমু খেতে যাব, হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল—দেখি অন্ধকার ঘরে আমি একা শুয়ে আছি—বুঝলাম স্বপ্ন—

কালীচরণ মাইতি একটু দম নিয়ে বলতে লাগল, তারপর হুজুর, মা-লক্ষ্মীর কি লীলা, আগের দিন ঝড়-বিষ্টি হয়ে গেছে, হঠাৎ পুব-পাড়ার দিক থেকে কে যেন আসছে দেখতে পেলাম—প্রথমে মনে হ'ল তারিণী কলুর বউ নাতনীকে কোলে নিয়ে আমাদের বাড়ীর দিকে আসছে। কিন্তু তা নয় হুজুর, কাছে আসতেই দেখলাম অন্য মেয়েলোক—

গোঁসাই-মা জিজ্ঞেস করলে—কে গা?

মেয়েলোকটা কাছে এসে কেঁদে পড়ল। বললে, আমি পরাণে মালোর বউ, ঝড়-বিষ্টিতে আমার ঘর ভেসে গেছে নদীর জলে, আমাকে থাকতে দাও মা তোমার ঘরে—

তখন আমিও চেয়ে আছি পরাণে মালোর বউটার কোলের মেয়েটার দিকে। গোঁসাই-মাও চেয়ে আছে। গোঁসাই-মা একবার আমার দিকে চাইলে। পরাণে মালোকে আমরা চিনতাম হুজুর। গোঁসাই-মা ত মাছ খেত না, কিন্তু মাছ ধ'রে গেরস্ত-বাড়ীতে বেচে আসত পরাণে মালো, তাইতেই চিনত সবাই তাকে। তা আমি ভাবলাম, এত বাড়ী থাকতে গোঁসাই-মা'র বাড়ীতেই বা এল কেন?

গোঁসাই-মা জিজ্ঞেস করলেন, এ কোলের মেয়েটা কে রে?

পরাণে মালোর বউ বললে, এ মেয়েটাকে কুড়িয়ে পেইছি গোঁসাই-মা—

—কুড়িয়ে পেয়েছিস্?

গোঁসাই-মা'র তখন স্বপ্নের কথাটা হয়ত মনে পড়ে গেল।

পরাণে মালোর বউ-এর কোলের মেয়েটা তখন গোঁসাই-মা'র কোলে আসবার জন্যে হাত বাড়াচ্ছে। ছট্‌ফট্ করছে। গোঁসাই-মা'র মনে হ'ল, স্বপ্নে যেন মা-লক্ষ্মী ওই রকম করেই তাঁর দিকে চেয়েছিল।

গোঁসাই-মা মেয়েটিকে কোলে তুলে নিলেন। চুমু খেলেন।

তারপর বললেন, মেয়েটাকে আমার কাছে রেখে যা বউ, বড় লক্ষ্মী মেয়ে রে—

মালো-বউ বললে, তা আমাকেও থাকতে দাও না গোঁসাই-মা তোমার বাড়ীতে, আমার ত ঘর-সংসার সব গেছে—আমিও থাকি তোমার কাছে—

—কিন্তু এ-মেয়েটা কাদের? খোঁজ নিস্ নি তুই?

—না গোঁসাই-মা, কেউ খোঁজ করে নি, আমিও খোঁজ নিই নি। আমাদের পাড়ার ক্ষেতের ধারে ভোর রাত্তিরে গেছি বেগুন তুলতে, সেখেনেই পেইছি গোঁসাই-মা, কাউকে যেন ব'লো না গোঁসাই-মা তুমি। তারপর যখন কেউ-ই আর এতদিনে খোঁজ নিলে না, তখন থেকে আমার কাছেই রয়েছে—

তা সেই থেকে আমি আর কারোর কাছে কিছু বলি নি গোঁসাই-মা।

—তোদের পাড়ার সবাই জানে?

—আমি বলিছি আমার বোন-ঝি, আমার কাছে আমার বোন মেয়েকে রেখে গেছে!

তা পরাণে মালোর কাছ থেকে গোঁসাই-মা মেয়েটিকে নিলেন সেদিন। সেদিন থেকেই সেই মা-লক্ষ্মী রয়ে গেল গোঁসাই-মা'র কাছে। তারপর যতদিন পরাণে মালো আর তার বউ বেঁচে ছিল, ততদিন গোঁসাই-মা তাদের চাল-ডাল-কাপড় দিতেন। তারপর যত দিন যেতে লাগল ততই গোঁসাই-মা'র অবস্থা ফিরতে লাগল। আরও জমি-জমা হ'ল, আরও টাকা আসতে লাগল হাতে, কোঠা-দালান হ'ল। আমি মা-লক্ষ্মীকে নিয়ে থাকতাম, গোঁসাই-মাও তখন এই মা-লক্ষ্মীকে নিয়ে দিনরাত ব্যস্ত থাকতেন—

তারপর যখন মা-লক্ষ্মীর বয়েস হ'ল তখন এই দোল-গোবিন্দ ঘটক একদিন এল গাঁয়ে। বললে, এক পাত্তর আছে, যদি বিয়ে দেন—

আমি বললাম, কিন্তু মা-লক্ষ্মী ত গোঁসাই-মা'র নিজের নাত্‌নী নয়—

দোলগোবিন্দ বললে, তবে কার?

আমি সব ব্যাপার খুলে বললাম। দোলগোবিন্দ বললে, তা হ'লে জেলের মেয়ে?

গোঁসাই-মা আমার কথা শুনে রেগে গেলেন। বললেন, তুই কেন এসব কথার মধ্যে থাকিস্? তুই কেন বলতে গেলি আমার নিজের নাত্‌নী নয়? আমি ত ওর গোত্তর বদলে নিয়েছি, আমি ত ওকে পুরুত ডেকে আমার পুষ্যি করে নিয়েছি, এখন ত আমাদেরই স্বজাত ও—

তবু আমি কিছুতেই মত দিতে পারলাম না।

তখন গোঁসাই-মা রেগে গিয়ে চাটুজ্জেদের সঙ্গে কাশীধামে পাঠিয়ে দিলেন। আমিও কাশী চলে গেলাম। চাটুজ্জেরা এক মাস পরে কাশী থেকে ফিরে এলেন।

কিন্তু আমি রয়ে গেলাম সেখানে। গোঁসাই-মা আমাকে সেখানে টাকা পাঠাতে লাগলেন।

শেষকালে মা-লক্ষ্মীর বিয়ের সময় আমি চলে এলাম এখানে।

গোঁসাই-মা আমাকে দেখে বললেন, কালীচরণ, তুই কাউকে কিছু বলিস্ নে, আমার নাত্নীর বিয়ের সময় তুই আসতে চেয়েছিলি তাই তোকে খরচ-পত্তর দিয়ে এনেছি, বিয়ের পর তোকে আবার কাশীধামে পাঠিয়ে দেব—

তা দেবে ত দেবে! তা আমারই বা অত কথায় থাকবার দরকারটা কি! আমি মা-লক্ষ্মীর বিয়েতে পেট ভরে লুচি-মোণ্ডা খেলাম, প্রাণভরে আশীর্ব্বাদ করলাম—

এতক্ষণ সকলে হাঁ করে কালীচরণ মাইতির গল্প শুনছিল। দোলগোবিন্দ ঘটক, দারোগা-পুলিস, ছুলাল সা, নিতাই বসাক, নতুন-বৌ, সবাই।

কালীচরণ মাইতি কথা বলতে বলতে থেমে গেল। আশী বছর বয়েসের বুড়ো মানুষ। চোখেও ভাল দেখতে পায় না, কথাও ভাল ক'রে বলতে পারে না। মুখের সব দাঁত পড়ে গেছে। গায়ের চামড়া ঝুলে থল্ থল্ করছে।

দারোগাবাবু জিজ্ঞেস করলে—তারপর?

ক্রমশঃ

—•—

দুই সমুদ্র

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

সাঁতরে ত পার হয়ে এলে,
আবার সাঁতার দিতে এই ভয় কেন ?
জীবনের সৈকতে দাঁড়িয়ে,
যে-সমুদ্র পাড়ি দিলে সেদিকে তাকাও,
সমুখের সমুদ্রের ভয় ভুলে যাবে।

পিছনের যে-সমুদ্র কুয়াসায় ঢাকা,
চ'লে ত এসেছ পথ ক'রে
তার মধ্যে দিয়ে ?
যাওনি ত অবলুপ্ত হয়ে ?
আবার কুয়াসা-ঢাকা যে-সমুদ্র সম্মুখে তোমার
চ'লে যাবে পথ ক'রে তারও মধ্যে দিয়ে
সমান সহজে,
ডুবে ভেসে,
দুপায়ের নীচে মাটি খুঁজে,
কখনো সে মাটি পায়ে ঠেলে
উত্তাল তরঙ্গ-আলিঙ্গনে
ধরা দিতে।
পিছনের তারারাই
আবার দেখবে মুখ সমুখেরও সমুদ্রের জলে
ঝড়ের মেঘের ফাঁকে ফাঁকে।

তোমার দেহের রক্ত যে-সমুদ্র লবণাক্ত করে,
হয়ত বা তার কথা সে-রক্তকণারা কিছু জানে।
হয়ত তেমনি জানে
তোমার চেতনাকণাগুলি
আর এক সমুদ্রের কথা,
যে-সমুদ্র হতে
একদিন উঠে এলে জীবনের সোনালী সৈকতে।
আছে সেই সমুদ্রের পরিচয়ে
সমুখের সমুদ্রের পরিচয়।

একই ত সমুদ্র দুইদিকে ?
দুইদিকে একই ত কুয়াশা ?

দেখনি কি, গাঙচিলগুলি
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে উড়ে যায়
একটি কুয়াসা থেকে আর-একটি কুয়াসার দিকে
কি অকুতোভয়ে ?

পিছনের কুয়াসাটা কেটে যেতে পারে।
ওটা যেন থরথরে পুরণো অনেক স্বপ্ন দিয়ে,
অনেক মেঘের স্বপ্ন,
অনেক তারার স্বপ্ন,
যে-স্বপ্ন পড়ে না মনে কিছুতেই ;—
মনে আনতে পারি না যেমন
সারারাত ধ'রে দেখা বহু স্বপ্ন ভোরে জেগে উঠে।
মনে আনতে পারি না, তবুও
মনে মনে জানি,
দেখেছি অনেক স্বপ্ন,
দুঃস্বপ্ন দেখিনি।

যেন সে-স্বপ্নের সুর
গাঙচিলদের ডানা-ঝাপ্‌টানো সুরের মতন
এই দু'টি সমুদ্রকে এক ক'রে বাঁধে।
এই দুটি সমুদ্রের কোন্‌টির থেকে
জানি না আবেগ এসে
ঢেউ হয়ে ভাঙে এই জীবন-সৈকতে,
অকারণে হাসায় কাঁদায়।
সে-সুরে আনন্দ আছে,
আছে রোগ-শোক-মৃত্যু,
অনেক বেসাতি আছে,
ভরাডুবি তাও আছে,
তারা আছে, মেঘ আছে,
ভীষণ ঝড়ের মেঘ,
আছে ভয়।

তবু যেন
ভয়ের মতন ভয় কিছু নেই
তাই ভয় নেই।
হয়ত বা তারারাও নেই,
মেঘও নেই…

সমুখে পিছনে কিছু নেই,
একটা আশ্চর্য্য স্বপ্ন আছে শুধু,
যেই স্বপ্নটাকে
মনে আনতে পারছি না কিছুতে,
ভুলে গেছি, ভুলে আছি।

আকাশ-নান্দনা

শ্রীকৃতান্তনাথ বাগচী

তুমি এক চিরন্তনী কান্নার কবিতা
মৃত্তিকার মর্মমাঝে সহসা বন্দিনী,
হৃদয়ে হৃদয়ে জ্বলে অনির্বাণ চিতা,
ছায়ার গুণ্ঠন কাঁপে, আকাশ-নন্দিনী !

তাই ত শিশির-বিন্দু মুকুট পরায়
শ্যামল কুমার তৃণে, ধূলির আসনে,
ফুলের বুকের সুধা আনন্দে ছড়ায়
বিবাগী বাতাস, মানি' স্নেহের শাসনে।

সুন্দরের দূত আসে মায়াবী ডানায়,
সুরের পাগলঝোরা পাখীর গলায়,
হৃদয়-শোণিতে শেষে প্রণাম জানায়
প্রথম পলাশে শীত বনের তলায়।

জীবনের রামায়ণে শুভ্রজ্যোতিঃ সীতা,
নিভৃত পাতালে লীনা, শূন্যে অপহৃতা।

উত্তর-বসন্ত

হেনা হালদার

নির্বাক্ উত্তুরে আলো, দক্ষিণের সদালাপী হাওয়া
এই ঘরে অসঙ্কোচে পাওয়া
যাবে না সহজে একদিন···
জানালায় নেমে এসে এঞ্জেলিয়া হবে না রঙীন।
বিনিদ্র রাত্রির বোবা অন্ধকারে বাঁধবে না সেতু
স্বাতী-চিত্রা-বিশাখারা তখন। যেহেতু :
একে একে খুলে নেবে বিষয়ী সংসার
প্রেম-প্রীতি সংরাগের সব অলঙ্কার
মৃত্যুর ঝাঁপিতে। ক্ষীয়মাণ নিরুত্তাপ
হৃদয়ের সুখ-দুঃখ-লোভ-পুণ্য-পাপ
করবে না শান্তিকে কাঙাল···
স্থবিরতা ঠিক জানে কত ধানে কতটুকু চাল।

পূবের রঙিন ছাট, পশ্চিমের পরাস্ত সূর্যের
চোরা চাহনির মায়া ফের
ভোলাবে না। সাড়া দিয়ে কোনমতে সাড়া
অকারণ পুলকের পাবে না। তা ছাড়া
কোনো পাখী, কোনো ফুল কিংবা কোনো মূঢ়
প্রজাপতি
নিত্য কর্মপদ্ধতির অতর্কিতে ঘটাবে না ক্ষতি।

যৌবনের সিঁড়িগুলি একে একে ক'রে অতিক্রম
ভাললাগা মনে হবে : শুধু স্বপ্ন-মায়া-মতিভ্রম।

আলোচনা

"আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পটভূমিকা"-র পটোত্তোলন

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

বৈশাখ সংখ্যা "প্রবাসী" পত্রিকায় শ্রীশ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়-রচিত "আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক পটভূমিকা" নামক পরস্পরবিরোধী-উক্তি-সমন্বিত ও ঐতিহাসিক সত্যের বিকৃত অপব্যাখ্যা-পূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে দেখিয়া তাজ্জব বনিয়াছি। ইংরেজী শাসনের সমর্থক এই লেখকটির "ইংরেজের সঙ্গে অকালে রাজনৈতিক সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হওয়া বাঙ্গালীর পক্ষে গুরুতর ক্ষতির কারণ" বোধ হওয়াতে তাহা প্রতিপাদনই প্রবন্ধটির মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া প্রতিভাত হইল। বাংলা সাহিত্য এ প্রবন্ধে গৌণ ও ইতিহাস বহুক্ষেত্রে মনগড়া ও বিকৃত। এই প্রবন্ধ মারফৎ "বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমানের সহিত বুঝাপড়া করার আগেই ইংরেজের বিরুদ্ধে বিপ্লবে ব্রতী হয়ে যে গুরুতর প্রমাদ ঘটিয়ে বসল" তার ফলে যে ক্ষতি লেখকের ধারণায় ঘটিয়াছে এবং "তথাকথিত দেশপ্রেমাত্মক আন্দোলনগুলিতে কোনও সৎকাজ হয় নি" এই বিশ্বাসে আচ্ছন্ন হইয়া যে-সমস্ত কু-তর্কের অবতারণা করিয়াছেন, তাহার তুলনা কদাচিৎ মিলে। বাস্তবিক দৃষ্টিভঙ্গি কি আমাদের এই শিক্ষাই প্রদান করে না যে, ইংরেজ থাকাকালে, কিংবা কোনও কালেই ধর্মোন্মাদ মুসলিমগণের সহিত কোনও বুঝাপড়া সম্ভব ছিল না? মধ্যযুগীয় সাধকগণের, বিশেষত নানক, কবীর, দাদু প্রভৃতি সাধকগণের ঐকান্তিক চেষ্টা কি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় নাই? লেখক নিজেই অন্যত্র "পরমত-অসহিষ্ণু" ইসলামী আদর্শের ও সর্বাস্তিকবাদী হিন্দুদের সমন্বয়-সাধনে রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টার ব্যর্থতার জন্য রামমোহনের নিন্দা করিয়াছেন। অথচ তাহার তার উদ্ধার সাধন পূর্ণ না করিয়া ইংরেজ শাসনের অবসানকে ক্ষতিকর বলিয়াছেন। যে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য, ইংরেজ শাসন অব্যাহত থাকিলে তাহা কি প্রকারে সম্ভব হইত? ইংরেজ শাসকগণ এই বুঝাপড়ার সহায়ক না হইয়া বরাবরই যে আপন রাজনৈতিক ও বৈষয়িক স্বার্থে হিন্দু-মুসলমানের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির এই প্রভেদকে শুধু জীয়াইয়া রাখিয়াই নহে, মুসলমান-মনে হিন্দু-বিদ্বেষে ইন্ধন যোগাইয়া নিজেদের কায়েম রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, আলিগড়ে বেক সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া স্বদেশী আন্দোলনের যুগ পর্যন্ত ইংরেজের এই নীতি অব্যাহত ধারায় প্রবাহিত থাকিয়া তার [illegible] হইতে আরম্ভ করিয়া ঢাকার নবাব সলিমুল্লাকে এই বিরোধে সক্রিয় হইয়া উঠিতে কি ইংরেজদের সক্রিয় সমর্থন ছিল না? এই সমর্থনের ফলেই কি মোস্লেম লীগের জন্ম ও ভারত ত্যাগের প্রাক্কালে ইংরেজদের শেষ অবদান 'পাকিস্তান' সৃষ্টি সম্ভব হয় নাই? লেখক সমন্বয়-সাধনের বৃথা চেষ্টায় [illegible] সংগ্রাম স্থগিত রাখিলে কি চিরকালই ইংরেজ শাসন কায়েম থাকিত না? লেখক তাঁহার এই অবান্তর উক্তির সমর্থনে বঙ্কিম-চন্দ্রের [illegible] কথা উল্লেখ করিয়া যেই [illegible] হইতে মুক্তি যে জাতির পক্ষে ক্ষতিকারক হইয়াছে তাহাই বলিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি করিয়া মতের পোষকতা করিবার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হইয়াছেন যে, "ইংরেজ রাজা না হইলে সনাতন ধর্মের পুনরুদ্ধার সম্ভাবনা নাই। সনাতন ধর্মের পুনরুদ্ধার করিতে হইলে আগে বহির্বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার আবশ্যক। ইংরেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোক-শিক্ষায় সুপটু। যতদিন না হিন্দু আবার জ্ঞানবান্, গুণবান্ আর বলবান্ হয় ততদিন ইংরেজ রাজত্ব অক্ষয় থাকিবে। ইংরেজ রাজ্যে প্রজার সুখ হইবে। নিষ্কণ্টক ধর্মাচরণ করিবে। অতএব হে বুদ্ধিমান্! ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া আমার অনুসরণ কর।"

বঙ্কিমের এই উক্তি যে সনাতন সমাজের রক্ষাকল্পে উক্ত, তাহা কি হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয়-সঞ্জাত ধর্ম? তাহা না হইলে এই উক্তি লেখকের প্রতিপাদ্যের সহায়ক হয় কি করিয়া? আর বঙ্কিমের এই উক্তি কখনই সার্থকতালাভ করে নাই।

হিন্দু "জ্ঞানবান্, গুণবান্, আর বলবান্" হইয়া উঠিবার পূর্বেই ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটিয়াছে, অক্ষয় হইয়া থাকে নাই। প্রজা সুখী থাকিলে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর গণ আন্দোলন সার্থকতা অর্জন করিল কিরূপে? কোন্ সনাতন ধর্মের পুনরুদ্ধার বঙ্কিমের প্রার্থিত ছিল? ইসলামের সহিত সমন্বয়-সাধনের নিশ্চয়ই নহে, তাহা সনাতন হইবে কি প্রকারে?

এখানে এই মত-প্রচার ইংরেজের চাকুরিয়া বঙ্কিমের দাসত্বসুলভ মনোভাবেরই পরিচায়ক। হেমচন্দ্রের "বাজ রে শিঙ্গা" গান রচনার খেসারৎ হিসাবে বৃদ্ধ বয়সে পেন্সন বন্ধের মত দুর্দশা হইতে নিজেকে মুক্ত রাখার ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা হিসাবে বঙ্কিমের এই ইংরেজ শাসনের প্রশস্তি। ইংরেজের বহির্বিষয়ক জ্ঞান যতই থাকুক না কেন, সেই জ্ঞান ভারতবাসীদের মধ্যে বিতরণের বিন্দুমাত্র আগ্রহ ইংরেজের ছিল না। ইংরাজত্বের প্রারম্ভকালেই ছিয়াত্তরের ভয়াবহ মন্বন্তর এবং তাহার পর ইংরেজ শোষণের ফলে ক্রমাগত দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে, কাজে কাজেই ইংরেজ আমলে প্রজা সুখী ছিল না। গঙ্গাগোবিন্দ সিং, দেবী সিং যে অত্যাচার চালাইয়াছিলেন তাহাতে ইংরেজ শাসনের আমলে প্রজা এতদূর অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে যে, এই কুশাসনের অবসানকল্পে প্রজা-সাধারণ সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ প্রভৃতির মধ্য দিয়া ইংরেজ শাসনের প্রতি বিতৃষ্ণার ভাব প্রকাশ করে। সংবাদপত্র-গুলি ইংরেজ শাসনের সঠিক সমালোচনায় লিপ্ত হইলে কি লর্ড লিটনের আমলে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ প্রচেষ্টা হয় নাই? এই সমস্ত সত্ত্বেও "ইংরেজের রাজত্বে প্রজা সুখী হইবে" এই অবশ্য উক্তি কেন? ইংরেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে সুপটু বলিয়া তাহারা আমাদের কল্যাণার্থে সেই জ্ঞান বিতরণ করিবে এই ভ্রান্ত আশা বঙ্কিম হইতে এই প্রবন্ধ-লেখকের মনে সঞ্চারিত হইয়াছে। তাই তিনি লিখিয়াছেন যে, "ইংরেজী ভাষার কল্যাণে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও শিল্পকলার দ্বার উন্মুক্ত হইল। ইংরেজী ভাষার কাছে ত বটেই, ইংরেজ শাসনের কাছেও আমাদের যে ঋণ তাহা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করা উচিত।" লেখকের এই মন্তব্য অবাস্তব ও ঐতিহাসিক সত্যের বিপরীত। ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে

যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তার তাহা ঐতিহাসিক accident মাত্র। ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত না হইলে ফরাসীগণের এদেশে রাজত্ব কায়েম হইত ও ফরাসী ভাষার মাধ্যমে উহা আমাদের মধ্যে বিস্তার লাভ করিতে পারিত।

ইংরেজ শিক্ষার ফলে আমরা সমুন্নত হই নাই; হইয়াছি আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থার (modern education) ফলে। এই আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলনে কোনও দিনই ইংরেজ সরকারের প্রবৃত্তি ছিল না। রাজা রামমোহন রায়ের দূরদৃষ্টিই উহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া লর্ড আমহার্স্টকে শিক্ষা-বিষয়ে যে প্রসিদ্ধ পত্র প্রেরণ করেন, তাহাতেই উহার যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়া উহা প্রবর্তনের দাবি জানান। উহার প্রত্যুত্তরে সরকারের মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হইতে মিষ্টার হ্যারিংটন যে পত্র প্রেরণ করেন তাহাতে স্পষ্ট সরকারী মনোভাব ব্যক্ত করিয়া বলা হইয়াছে: "It cannot be given a respectful consideration." ইংরেজী শিক্ষা অথবা আধুনিক শিক্ষার পরিবর্তে লর্ড মিণ্টো, লর্ড ময়রার প্রভৃতির আমল হইতে এদেশে টোল ও মক্তব প্রদত্ত শিক্ষাকেই সরকার কায়েম করিয়া দেশবাসীকে অন্ধকার তিমিরাবৃত রাখিতেই প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য বহন করে। কিন্তু রামমোহন যাহা দেশের পক্ষে কল্যাণকর বিবেচনা করিতেন তাহা হইতে নিরস্ত হইবার পাত্র ছিলেন না। তাই সরকারকে সঙ্গত দাবি গ্রহণ করিতে অসমর্থ হওয়াতে নিজস্ব প্রচেষ্টায় ও অর্থব্যয়ে Anglo-Hindu School স্থাপন করিয়া আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতির প্রচলন করেন। এই সময়ে ডেভিড হেয়ার, ডিরোজিও প্রভৃতিও এই কাজে অগ্রসর হওয়াতে ইংরেজ উহার প্লাবন রোধ করিতে পারিবে না বুঝিয়া উহার এক নকল সংস্করণ এদেশে উচ্চতর আধুনিক শিক্ষার নামে প্রচলন করেন, যাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের শাসনকার্য অল্পব্যয়ে পরিচালনার্থে দেশী কেরাণী ও নিম্নপদস্থ সরকারী কর্মচারী তৈয়ার করা। পাছে ইংরেজী সাহিত্যের মাধ্যমে স্বাধীনতার স্পৃহা জাগ্রত হয় সেজন্য এদেশের প্রাচীন ইতিহাস বিকৃত করিয়া ও অন্যান্য পাঠ্যপুস্তকের মধ্য দিয়া এদেশীয় মনে হীনমন্যতা ও শ্বেতকায় জাতির শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে বোধ জাগাইবার অপচেষ্টা চলে। উন্নততর বিজ্ঞান-সাধনায় বিংশ শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত সরকারী প্রচেষ্টা কত অন্তরায় সৃষ্টি করিত তাহার পরিচয় আচার্য জগদীশচন্দ্র ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র পদে পদে অনুভব করেন এবং ইংরেজের বিশ্ববিদ্যালয় আইনের আসল উদ্দেশ্য নাকচ করিয়া এদিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত করেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। আমরা যে বিশ্বের দরবারে আদৃত হইতে পারিয়াছি তাহা ইংরেজের সহায়তায় নহে, বরঞ্চ ইংরেজদের বিরোধিতা সত্ত্বেও জাতীয় প্রাণশক্তির বলে আমাদের উত্তরণ সম্ভব হইয়াছে। সেজন্য ইংরেজ সরকারের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবার কোনও কারণ দেখি না। যদি কৃতজ্ঞ থাকিতে হয়, সেই কৃতজ্ঞতা প্রাপ্য রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া আশুতোষ পর্যন্ত। কাজে কাজেই লেখকের এই মতবাদ যে "ইংরেজের যতই দোষ থাক, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা তার দ্বারাই বাহিত হইয়াছিল", ইহা ঐতিহাসিক সত্য নহে। মেজর বামনদাস বসু তাহার বহু প্রমাণ দিয়াছেন। ইংরেজ আমলে আমাদের অর্থনৈতিক যে দুর্দশা ঘটিয়াছিল তাহা রমেশচন্দ্র দত্ত, দাদাভাই নৌরজী, মিষ্টার কেইন প্রভৃতি তথ্য ও প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

নারীশিক্ষা বিস্তারে বেথুন সাহেবের দান অনস্বীকার্য: কিন্তু তাহা যে অতি নিম্নস্তরের প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ের ছিল, তাহা সরকারী শিক্ষা-দপ্তরের বার্ষিক রিপোর্টে বার বার স্বীকৃত হইয়াছে। নারীজাতির পক্ষে উচ্চশিক্ষার প্রচলন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার উন্মোচন সম্ভব হয় ইংরেজের প্রচেষ্টায় নহে, দুর্গামোহন দাস, মনোমোহন ঘোষ, আনন্দমোহন বসু ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে। তাঁহাদের দেশ-জোড়া আপত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামী প্রচেষ্টা ভিন্ন আজও ভারত-ললনা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিতেন। তাঁহারা এই ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন যে:

"না জাগিলে সবে ভারত-ললনা,
এ ভারত বুঝি জাগে না জাগে না।"

এই প্রবন্ধ-লেখকের আর একটি প্রতিপাদ্য এই যে, ইংরেজ শাসন অব্যাহত না থাকায় আমাদের জাতীয় অধঃপতন দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে এবং তাহার কারণরূপে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন নিজেই অনুরূপ কারণ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও অন্যদেশের উন্নতির ধারা ব্যাহত না হইয়া যে আরও দ্রুততর গতিতে অগ্রসর হইতে পারিয়াছে, তাহা স্বীকার পাইয়াছেন। তিনি নিজেই স্বীকার পাইয়াছেন যে, ইংরেজ-শাসনমুক্ত হওয়ার পর মার্কিণ মুলুক ও আয়ারল্যাণ্ড দ্রুততর গতিতে উন্নত মার্গে আরোহণ করিয়াছে এবং নিত্য-ব্যবহার্য ভোগ্যপণ্য ও আহার্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে ও সুলভতর হইয়াছে। উহা যদি মার্কিণ দেশ ও আয়ারল্যাণ্ডে সম্ভব হয় তাহা হইলে ভারতের পক্ষে সম্ভব-পর হইবে না কোন্ যুক্তিবলে? স্বাধীনোত্তর ভারত যদি অধঃপতনমুখী সত্যই হইয়া থাকে তবে তাহার কারণ ইংরেজ-শাসনমুক্তির পরিবর্তে অন্যত্র খুঁজিতে হইবে। এই অধঃপতনের বীজ যে আমাদের দেশে প্রগতিমুখীন মনোভাব পরিত্যাগ করিয়া প্রতিক্রিয়া-পন্থী মনোভাবের প্রতি ঝোঁক ঘটার ফলে ঘটিয়েছে, লেখকের এই মতের মধ্যে কিঞ্চিৎ সত্য নিহিত আছে। কিন্তু এই মনোভাবের উদ্ভব ও প্রসার ভারত স্বাধীন হইবার পূর্বেই ইংরেজ শাসনের আমলেই মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা লেখকই অনবধানতাবশত স্বীকার করিয়া ফেলিয়া উহার শক্তিশালী আকার ধারণ যে ১৯০৫ সাল হইতে আরম্ভ হয় তাহা স্বীকার করিয়াছেন। ইংরেজ শাসনকালে যে ক্ষতিকর শক্তি প্রতিহত হয় নাই বরং ইংরেজদের সক্রিয় সমর্থনে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা ইংরেজ শাসন কায়েম থাকিলে ঘটিত না, উহা বলা যায় কি প্রকারে? লেখক কি অবগত নহেন যে, ব্রাহ্ম আন্দোলন, প্রার্থনা সমাজ আন্দোলন, আর্যসমাজ আন্দোলন এদেশে চিন্তার স্বাধীনতা জাগাইয়া জাতিকে বৈপ্লবিক প্রগতিমুখীন করিয়া তুলিতেছিল, তাহাতে ভীত হইয়া ইংরেজ শাসকবর্গ "থিয়সফিষ্ট" আন্দোলন, রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি প্রতিক্রিয়া-পন্থী আন্দোলনের প্রসারে সহায়ক হইয়াছিল? একথা কি সত্য নহে যে, এদেশে দিকে দিকে "নকুড় ঠাকুর"দের উদ্ভব এবং এদেশের শিক্ষিতজন মধ্যে অতিপ্রাকৃত ব্যাপারে অন্ধবিশ্বাসী, যুক্তিবাদে বীতশ্রদ্ধ, সাধুবাবাদের অবতার-জ্ঞানে পূজা করিতে তৎপর ব্যক্তিদের প্রভাব ইংরেজ আমলেই পড়িয়া উঠিয়াছে? লেখক নিজেই স্বীকার পাইয়াছেন যে, "এদেশের অলিতে-গলিতে নকুড় ঠাকুর ও বিরিঞ্চি-বাবাদের পূজার সুব্যবস্থা বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে আরও বেড়েছে।" তিনি যদি আর একটু গভীরভাবে এ সম্পর্কে চিন্তা করিতেন তাহা হইলে উহার জন্য ইংরেজ শাসনের অকালে (?) অবসানকে কারণ রূপে না দেখিয়া যে বঙ্কিমচন্দ্রকে জাতীয় হিরোরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, সেই বঙ্কিমচন্দ্রাদিকেই এই প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের উদ্ভব ও

বিকাশের জন্য দায়ী করিবেন। শশধর তর্কচূড়ামণির "টিকি মাহাত্ম্য" প্রচার যখন আচার্য নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষুরধার যুক্তি খণ্ড-বিখণ্ড করিয়াছিল ও শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের প্রতিক্রিয়া-পন্থী আন্দোলনেও দেশের সায় মিলিতেছিল না, ঠিক সেই সময়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনার মুখোসে আবৃত হইয়া বাহির হইল বঙ্কিমচন্দ্রের "কৃষ্ণচরিত্র"। ফরাসী-চিন্তাবিদ্ রেণার খ্রীষ্ট জীবনীর (Ecce Homo) ধাঁচে এই কৃষ্ণচরিত্রে বঙ্কিমচন্দ্র পৌরাণিক কৃষ্ণচরিত্রের কলঙ্কমুক্ত এক মহামানবরূপ প্রচার করিয়া পৌরাণিক হিন্দুধর্মের সমর্থন আরম্ভ করার পর হিন্দুধর্মের সমর্থনে ইংরেজী প্রবন্ধাবলী প্রকাশ, অনুশীলন, বিবিধ প্রবন্ধ প্রভৃতিতে ও আনন্দমঠ প্রভৃতির মাধ্যমে হিন্দু-মনে যে সমস্ত প্রতীক বিশ্বজননীর স্মারক হিসাবে মনে বাসা বাঁধিয়াছিল, সেগুলিকে দেশমাতৃকার প্রতীক হিসাবে খাড়া করিয়া কি এই প্রতিক্রিয়া-মুখীনতায় বঙ্কিম পতি-সকার করেন নাই? আমাদের হিন্দুত্বের অহমিকা বঙ্কিমকে ঋষি আখ্যায় ভূষিত করিয়াছে এবং তাঁহার ইংরেজ রাজত্বের স্তাবকতাপূর্ণ আনন্দমঠকে জাতীয় মন্ত্রের সার্থক প্রকাশ বলিয়া বরণ করিয়া ও অখণ্ড ভারতের পরিবর্তে শুধু বাংলা মায়ের যশোগান-মুখর পৌরাণিক দেবী-প্রতীককে দেশমাতৃকার প্রতীকরূপে রূপায়িত, "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীতকে রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য জাতীয় সঙ্গীত "জনগণমন অধিনায়ক"-এর সমপর্যায়ে এবং মত-বিশেষে আরও উচ্চ পর্যায়ে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে আসন দিতেও আমরা কুণ্ঠিত নহি। তাই "হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে বাঙ্গালী ছিল বঙ্কিমের সাধনার ধন" বলিতেও লেখকের বাধে নাই। "দুর্গা দশ-প্রহরণধারিণী" "বাণী বিদ্যাদায়িনী" ও "কমলা কমলদল-বিহারিণী" কি মুসলিম চৈতন্যের উপযোগী প্রতীক? আনন্দমঠে "নেড়ে-স্কাড়া-মণ্ডিকে মার" প্রভৃতি কি মুসলিমকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণের প্রকাশ? যাঁহারা "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীতকে "জনগণমন"'র সহিত সমান আসন দিতে চাহেন, তাঁহারা আর যাহাই হউন না কেন, যুক্তিনিষ্ঠ নহেন।

লেখকের মতে "বঙ্কিমচন্দ্র ধর্ম সম্পর্কে যাবতীয় গোঁড়ামি থেকে রামমোহন হইতে বেশি মুক্ত ছিলেন।" রামমোহন কোনও একটি বিশেষ পুস্তকে বিশেষ আস্থার অবতারণা করিয়া কাঁকিমদ্দি সেখকে দিয়া দুর্গাপূজা করাইবার অথবা মুরগী বলিদানের মত উদ্ভট ব্যবস্থা করিয়া তথাকথিত সংস্কার-মুক্তির পথে অগ্রসর না হইলেও আজীবন প্রতিমা পূজার বিরোধিতা করিয়া মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াও অকুতোভয়ে ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদের সমর্থন, বিশ্বে সর্বপ্রথম তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অনুশীলন দ্বারা সকল ধর্মের মূলগত ঐক্য প্রতিপাদন, বর্তমান কালের রাষ্ট্রসংঘের আদর্শ অন্য কাহারও মনে জাগিবার পূর্বে বিশ্বমানবের ঐক্য ও সমপর্যায়ে শক্তিতে আস্থাবান্ হইয়া বিশ্বমৈত্রীর প্রথম উদ্গাতা রামমোহন, যিনি সতীদাহ প্রথা, বহুবিবাহ প্রথা, গঙ্গাবক্ষে সন্তান বিসর্জন প্রভৃতি দেশ-প্রচলিত কুপ্রথার বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করিলেন এবং সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয়-স্বরূপ জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে বজ্রসূচি প্রকাশ, আত্মীয় সভায় বিধবা বিবাহ সমর্থন, সংবাদপত্রে বিধবাগণের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য বিদেশী অ্যান্যুইটি ফণ্ডের ন্যায় এদেশে অ্যান্যুইটি ফণ্ড স্থাপনের প্রস্তাব পেশ করিলেন, তাঁহা অপেক্ষা সংস্কারমুক্ত মন কি দুর্গাপূজা মুসলমানকে দিয়া করাইবার মত অবাস্তব প্রস্তাবে প্রকট হয়? মুরগী বলির এই প্রস্তাব ব্যতীত সংস্কারমুক্ত মন বা কার্যের অন্য কোনও পরিচয় বঙ্কিমের আছে কি? বঙ্কিমচন্দ্রকে রোমান্টিক এবং তজ্জন্য বিপ্লবী বলিতে কি বুঝেন, তাহা কোথাও স্পষ্ট নাই। যে বঙ্কিমচন্দ্র দেশাচারের [illegible] রোহিণীর [illegible] করিয়াছেন, গোবিন্দলালের রূপজ মোহের জন্য গোবিন্দলালের মুখ হইতে রোহিণীকেই দায়ী করিয়া নিন্দা করিয়াছেন, চন্দ্রশেখরকে দিয়া যোগবলে শৈবলিনীর পাপ সম্পর্কে জ্ঞান সঞ্চার করিয়া সতীত্বের মহিমা-কীর্তন করিয়াছেন, কোনও রচনায় সমাজ-প্রচলিত কদাচারের বিরুদ্ধে লেখনী সঞ্চালন করেন নাই, তাঁহার মন রামমোহন অপেক্ষা মুক্ত হইল কোন্ যুক্তিবলে? প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক শ্রীসুবোধকুমার সেনগুপ্ত বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে আলোচনাকালে বঙ্কিমের সঠিক স্বরূপটি প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে:

"Bankim Chandra may be said to be the champion of Hinduism. As the years passed on Bankim Chandra became more and more millitant in his zeal for the resuscitation of Hindu culture.

তিনি আরও বলিয়াছেন:—

"Bankim Chandra did not look upon the moral sense as the product of envirormental socio-economic conditions, rather he regarded it as something devine. From that point of view, he may be called a traditionalist, a purveyor of outmoded ideas."

"In almost all the novels we feel that human life is related to super-human powers, who, though unseen, reveal themselves in dreams or in the calculations of hermits and sages."

লেখক শ্রীশ্যামল চট্টোপাধ্যায় বলিতেছেন যে, "স্বাধীনতালাভের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা রোমান্টিক মনের একটি স্বাভাবিক ও প্রধান প্রবণতা।" ইহা স্বীকার করিয়াও তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে রোমান্টিক অভিহিত করেন কিরূপে? বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৮৫৫ সালে এবং তাঁহার সাহিত্য-জীবন শেষ হয় হিন্দুত্ব প্রচারকল্পে "প্রচার" পত্রিকার সহযোগিতায় ১৮৮৯ সাল পর্যন্ত। এই যুগে ভারতীয় চিন্তা-ধারার গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে অল্প কথায় সুন্দর চিত্র দিয়াছেন লর্ড আরউইন তাঁহার "Evolution of Political Life in India" প্রবন্ধে। তিনি লিখিয়াছেন যে:

• "One of the most interesting bypaths in the history of British India is the study of the evolution of the press, and particularly that portion of which is Indian owned. From 1860 downwards there is a steadily growing interest in politics. During late 1870's this development flared up suddenly into an anti-governmental propaganda of strangely modern type…this in itself marked the end of the period when the Indian acquiesced with-

out question into the doings of their hitherto omnipotent rulers"

ঠিক এই সময়েই বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনের কাল এবং দেখা যায় যে, ব্রিটিশ শাসনকে বিধাতার দান হিসাবে তাহার সকল কার্য বিনা বিচারে অকুণ্ঠ চিত্তে সমর্থনের যুগ শেষ হইয়া তাহার দোষগুণের বিচার আধুনিক ধারায় হইতে আরম্ভ করিয়াছে, আর বঙ্কিম সেই ধারাকে বাধা দিয়া পুরাতন খাতেই তাহাকে পরিচালনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা পাইতেছেন। তাই আনন্দমঠের শিক্ষা "হে বুদ্ধিমান্! ইংরেজের সহিত যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া আমার অনুসরণ কর।" চন্দ্রশেখরেও ইংরেজ-রাজের প্রশস্তিতে ভরা। তবে আমাদের ভাগ্য ভাল যে, বঙ্কিমের প্রগতি-গতিরোধের চেষ্টা সফল হয় নাই।

লেখক অবশ্য বর্তমান রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সারদামণির মূর্তিপূজা বুদ্ধির ভরাডুবি বলিতে সাহসী হইয়াছেন কিন্তু এই রুচিবিকার ও উন্মত্ত তাণ্ডব, বিবেকানন্দের শিক্ষার প্রকৃত মর্ম গ্রহণের পরিবর্তে কর্তাভজা মনোভাবের প্রাধান্য ঘটায় হইয়াছে বলিয়াছেন. তাহা কি নিছক সত্যে প্রতিষ্ঠিত? ইহা কি সত্য নহে যে, প্রথম জীবনে স্বামী বিবেকানন্দ বলিষ্ঠ মনের পরিচয় প্রদান করিতে থাকিলেও পরবর্তীকালে সন্ন্যাস গ্রহণের পর রামকৃষ্ণ-অনুগত ভক্তদের প্রভাবে নিজেই রামকৃষ্ণকে প্রায় অবতাররূপে প্রচার করেন? তাঁহার পত্রাবলীতে রামকৃষ্ণ সম্পর্কে ঐরূপ উক্তির ভূরি ভূরি উদাহরণ লেখক কেন যে দেখিতে পান নাই, তাহাই বিচিত্র। লেখকের উক্তির মধ্যে কয়েকটি অতি অন্যায় আক্রমণ রহিয়াছে—যাহা সত্য নহে. যেমন তিনি বলিয়াছেন যে, রামমোহন যেমন "একদিকে সতীদাহ প্রথার বিরোধিতার মত প্রগত মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন অন্যদিকে ব্যক্তিগত জীবনে একাধিক বিবাহ এককালে অনুষ্ঠিত রেখেছেন।" রামমোহনের তিন পত্নী ছিল, ইহা সত্য, কিন্তু তাহার জন্য তিনি দায়ী নহেন। অতি বাল্যকালে তাঁহার পিতাই যে তাঁহার ওই তিন বিবাহ প্রদান করেন, অকারণে তাহাদের কাহাকেও ত্যাগ করা মনুষ্যোচিত হইত না বলিয়া ত্যাগ না করা কি অনুচিত রাখার পরিচয়? একথা কি লেখকের জানা নাই যে, রামমোহন বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং উইলে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহার পুত্রদের মধ্যে এক পত্নী বর্তমানে যদি কেহ দারান্তর গ্রহণ করেন তাহা হইলে তিনি বিষয় হইতে বঞ্চিত হইবেন? রামমোহন সম্পর্কে তাঁহার আর একটি অমার্জনীয় উক্তি হইল, "ব্যক্তিগত জীবনযাপনের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য তিনি তাঁহার নিজের দেশে ও সমাজে প্রায় বিস্মৃত ও পরিত্যক্ত;" ইহার ন্যায় মিথ্যা কলঙ্ক আর কি হইতে পারে? দেশে তাঁহার সম্পর্কে যে বিরূপতা, তাহা তাঁহার মূর্তিপূজার বিরোধিতা ও সতীদাহ প্রথার অবসান প্রার্থনার জন্যই ঘটিয়াছিল এবং তাহার নেতৃত্বে সমাসীন ছিলেন রামমোহনেরই মাতৃদেবী। অবশ্য ইহা সত্য যে কতকগুলি হীনচেতা লোক বিদ্বেষবশতঃ যবনীগমন, অপরের সম্পত্তি লুণ্ঠন, উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি কয়েকটি দোষ রামমোহনের প্রতি বেনামা অভিযোগ তুলিয়াছিলেন, যাহাতে সে সময় কেহ তেমন আস্থা স্থাপন করে নাই এবং পরবর্তীকালে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন নানা কুযুক্তির সাহায্যে সেই দোষ সত্য বলিয়া প্রমাণের চেষ্টা করিলেও তথ্য-প্রমাণাদির সাহায্যে সেগুলি খণ্ডিত হইয়া রামমোহনের চরিত্র কলঙ্কশূন্য রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তবুও ওই মিথ্যাকে সত্য-বিচ্যুতি রূপে ধরিয়া লইয়া লেখক বলিয়াছেন যে, বিদ্যাসাগরের চরিত্রে সেরূপ বিচ্যুতি ছিল না, যার জন্য মানুষ হিসাবে তিনি বেশি শ্রদ্ধার্হ।

তিনি কি জানেন না যে, বিধবা বিবাহ সমর্থনের জন্য উগ্র সনাতনপন্থীগণও বিদ্যাসাগরের নামে বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহিত তঞ্চকতার মিথ্যা অভিযোগ করিয়াছিল এবং বিধবাদের সহিত অসৎ জীবন-যাপনেরও কলঙ্ক আরোপ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই? প্রচলিত অন্যায় সামাজিক আচরণের বিরুদ্ধতা করিতে যিনি সাহসী হন তাঁহারই ভাগ্যে এরূপ কলঙ্ক-তিলক পরাইয়া দেওয়ার ঘটনা এদেশে বিরল নহে। রামমোহন-চরিত্রে নিন্দুক নিজ নাম গোপন করিয়া কলঙ্ক আরোপে চেষ্টা পাইয়াছিল বলিয়াই "বিদ্যাসাগরের মহৎ জীবন-যাপন পদ্ধতির মধ্যে ওই ধরণের ত্রুটি ছিল না, যার জন্য মানুষ হিসাবে তিনি অনেক বেশি শ্রদ্ধার্হ", একথা বলার সমীচীনতা কোথায়? বিদ্যাসাগর রামমোহনের ভাবধারার নিশ্চয়ই একজন সার্থক উত্তরসাধক। কিন্তু মহত্তর উত্তরসাধক গণ্য হইবেন কোন্ যুক্তিবলে? রামমোহনের মানব-প্রীতি দেশের সীমা অতিক্রম করিয়া বিশ্বের সকল মানুষকে প্রীতি-সিক্ত করিয়াছিল। বিদ্যাসাগরে সে ব্যাপকতা ও কর্মপ্রবাহের সে প্রাচুর্য কোথায়? বিদ্যাসাগর অবশ্যই আমাদের দেশে উনবিংশ শতকে অগ্রগামী নেতাদের মধ্যে খুবই শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু রাম-মোহনের আকাশচুম্বী মহত্ত্বের তুলনায় তিনি কোথায়?

রবীন্দ্রনাথের আক্ষেপ, ত্রুটি-বিচ্যুতিকে প্রাধান্য দিয়া রামমোহন রায়ের মহত্ত্বকে দেশ স্বীকৃতি না দেওয়ার জন্য কখনই নহে, কেননা রামমোহনের এইরূপ কোনও ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্ভব এ ধারণা মুহূর্তের জন্য রবীন্দ্রনাথের মনে উদিত হয় নাই। তাঁহার আক্ষেপ কেন. তাহা তিনি স্পষ্ট ভাষাতেই ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, "একদা যেদিন বাংলা দেশে প্রগাঢ় অন্ধতা, কৃত্রিমতা, সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার মধ্যে রামমোহন রায়ের আগমন হ'ল সেদিন এই বিমুখ দেশে তিনিই একেলা ভারতের নিত্য পরিচয় বহন করে এসেছেন। তাঁর সর্বতোমুখী বুদ্ধি ও সর্বত-প্রসারিত হৃদয় সেদিনকার এই বাংলা দেশের অখ্যাত কোণে দাঁড়িয়ে সকল মানুষের জন্যে আসন পেতে দিয়েছিলেন। একথা মুক্তকণ্ঠে বলবার দিন এসেছে যে, আতিথ্যভ্রষ্ট আসন কৃপণ ঘরের রুদ্ধ কোণের জন্য সে আসন নয়, যে আসনে সর্বজন অবাধে স্থান পেতে পারে, সেই উদার আসনই চিরন্তন ভারতবর্ষের আসন। লক্ষ লক্ষ আচারবাদী যদি তাকে সঙ্কুচিত করে, খণ্ড খণ্ড করে সমস্ত পৃথিবীর কাছে স্বদেশকে বিকৃত করে, ভারত সত্যতার প্রতিবাদ করে, তবু বলব, একথা সত্য। মানুষের ঐক্যের বার্তা রামমোহন রায় একদিন ভারতের বাণীতেই ঘোষণা করেছিলেন এবং তাঁর দেশবাসী তাঁকে তিরস্কৃত করেছিল—তিনি সে-সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমন্ত্রণ করেছিলেন মুসলমানকে, খ্রীষ্টানকে, ভারতের সর্বজনকে হিন্দুর একপংক্তিতে ভারতের মহা অতিথিশালায়।

"তাঁর মৃত্যুর পর আজ একশত বৎসর অতীত হ'ল। সেদিনের অনেক কিছুই আজ পুরাতন হয়ে গেছে কিন্তু রামমোহন পুরাতনের অস্পষ্টতায় আবৃত হয়ে যান নি, তিনি চিরকালের মতই আধুনিক।...... রামমোহন যে-কালে বিরাজ করেন সেকালে অতীতে অনাগতকে পরি-ব্যাপ্ত। আমরা তাঁর সেই কালকে আজও অতিক্রম করিতে পারি নি।" রামমোহনের এই সত্য পরিচয় স্বীকৃত হয় নাই, সেজন্যই রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভ। তিনি স্পষ্ট করেই সেকথা বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, "[illegible]

দেশের বহুজনে সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্র অহমিকায় যদি অবজ্ঞা করে, আপন মনে স্বীকার না করে, তবুও চিরকালের ভারতবর্ষ তাঁকে গভীর অন্তরে নিশ্চিতভাবে স্বীকার করেছে।"

তিনি রামমোহনের এই সত্যকার পরিচয়-স্বীকারে আমাদের কার্পণ্যে ব্যথিত হইয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের হৃদয় যে ছিল ভারতবর্ষের হৃদয়ের প্রতীক, তিনি যে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ নিয়ে বিচরণ করিয়াছিলেন আমরা আজও তাঁহাকে সমগ্র হৃদয় দিয়া গ্রহণ করিতে যে পারি নাই তার জন্যই রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভ, রামমোহন রায়ের ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও তিনি দেশে সমাজে স্বীকৃত হন নাই বলিয়া নহে। তথাপি লেখক রবীন্দ্রনাথের আক্ষেপকে বিকৃতরূপে প্রকাশ করিয়া রবীন্দ্রনাথের অসম্মানই করিয়াছেন।

বস্তুতঃ সমগ্র প্রবন্ধে এত বেশি অপব্যাখ্যা ও বিকৃত তথ্য ও প্রশ্নের সমাবেশ যে, তাহার সকলগুলির আলোচনা করিতে হইলে কোনও সাময়িক পত্রিকায় সম্ভব নহে, এক মহাভারতের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। মূল প্রতিপাদ্য এবং কয়েকটি অমার্জনীয় উক্তির প্রতিবাদ করিয়াই ক্ষান্ত রহিলাম।

—০—

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

বিশ্বভারতীর প্রতি বিরূপ কেন?

কিছুদিন ধরিয়া দেখা যাইতেছে কোন কোন সাপ্তাহিক পত্রিকা বিশ্বভারতীর—বিশেষ করিয়া বিশ্বভারতীর বর্ত্তমান উপাচার্য্যের—কুৎসা-প্রচারে অতীব তৎপরতা প্রদর্শন করিতেছেন। উক্ত পত্রিকাগুলির এই বিরূপতার কারণ বলা শক্ত, তবে "যাকে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা"—এমনও হইতে পারে। অবশ্য এ-বিষয়ে সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলিকে দোষ দিয়া লাভ নাই। ইহার পশ্চাতে রহিয়াছেন এমন বিশেষ কয়েকজন, যাঁহারা মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বেও বিশ্বভারতীতে কর্ম্মনিযুক্ত ছিলেন। বয়ঃসীমা পার হইলে পর ইঁহাদের বিশ্বভারতীর কর্ম্ম হইতে অবসর দান করা হয় সম্মানের সঙ্গে এবং সর্ব্ব দেনা-পাওনা পুরাপুরি মিটাইয়া।

বয়স হইলে এমন একটা সময় মানুষের জীবনে আসে যখন তাহাকে কর্ম্ম হইতে অবশ্যই অবসর গ্রহণ করিতে হয়, এবং এমন ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন প্রশ্নই থাকে না। ইচ্ছা না থাকিলেও কর্ম্মীকে তাঁহার ২০।২৫ বা তাহা অপেক্ষাও বেশী দিনের কর্ম্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া বয়সে কম এবং যোগ্যতর কর্ম্মীকে স্থান ছাড়িয়া দিতে হয়—ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। অবশ্য ব্যক্তিগত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কিংবা পৈতৃক জমিদারীতে এ-নিয়ম প্রযোজ্য নহে।

বহুদিনের পুরাতন কর্ম্মী যাঁহারা যোগ্যতার সহিত কাজ করিয়া অবশেষে বিশ্বভারতী হইতে বিদায় লইয়াছেন—দুঃখের কথা, তাঁহাদেরই মধ্যে কেহ কেহ আজ বিশ্বভারতীর সম্পর্কে নানা প্রকার অপপ্রচারে অন্তরাল হইতে উস্কানি দিতেছেন। ইঁহাদের বিশেষ [illegible] উপাচার্য্য মহাশয়। তাঁহার একমাত্র অপরাধ এই যে—তিনি প্রতিষ্ঠানের নিয়মকানুন সম্পর্কে সদা অতি-সজাগ, কোথাও কোন ব্যতিক্রম এ বিষয়ে তিনি সাধ্যমত ঘটিতে দেন না। এমন কথা কেহ, আশা করি, বলিতে পারেন না যে, উপাচার্য্য মহাশয় বিশ্বভারতীকে "কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান" করিয়া তুলিয়াছেন। স্বজন-পোষণের অভিযোগও তাঁহার উপর কেহ আরোপ করিতে পারিবেন না। আমরা ভারতের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতির জন্য ওকালতি করিতেছি—এমন যেন কেহ মনে করিবেন না। তাঁহার পক্ষে ওকালতি করার কোন প্রয়োজন নাই, ইহাও অতি সত্য কথা।

উপাচার্য্যের উপর ব্যক্তিগত রাগের কারণ হয়ত কাহারও কাহারও থাকিতে পারে—এবং এই প্রকার রাগের একমাত্র কারণ, ভূতপূর্ব্ব (বিশ্বভারতীর) কর্ম্মীদের ক্ষুদ্র স্বার্থে আঘাত। কিন্তু ব্যক্তিগত রাগের কারণ যাহাই হউক, এই সকল ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মী বিশ্বভারতী এবং শান্তিনিকেতনকে আঘাত করিতে কেন অপপ্রয়াস করিতেছেন, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

বিশ্বভারতীকে লোকচক্ষে হেয় প্রতীয়মান করার অপচেষ্টা ব্যক্তিবিশেষকে হয়ত খানিকটা আত্মপ্রসাদ এবং তৃপ্তি দান করিতে পারে, কিন্তু কার্য্যত তাহা উক্ত প্রতিষ্ঠানটির কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। লোকে জানে বিশ্বভারতী কি এবং তাহার মর্য্যাদা কতখানি। যে বিশেষ দু-একজন নেহরু-ভক্ত আজ বিশ্বভারতীকে খাটো করিবার গোপন প্রয়াস পাইতেছেন—সেই তাঁহাদেরকে বিশ্বভারতী সম্পর্কে স্বর্গত মহামানব নেহরুর মত কি ছিল তাহা স্মরণ করাইয়া দিব। নেহরুজী বলেন—

"There are many Universitities in India. The biggest of all, Calcutta, is not far from here. But Visva-Bharati obviously is unlike other universities in India, and although it has been recognised as a university under a special Act, it is still different .... The whole object of Visva-Bharati functioning as it is, is because of its special character, because it attempts to give something special to its students, which moulds a person, his thinking, his habits, his total personality, so that one who has been to Visva-Bharati or Santiniketan should carry the stamp of this institution wherever he or she goes."

বলা বাহুল্য বিশ্বভারতীর বর্ত্তমান উপাচার্য্য নেহরু-কথিত এই 'Stamp of the Institution"-এর একটি উজ্জ্বল ধারক ও বাহক। বিশ্বভারতীর বিরুদ্ধে কল্পিত অ-গুণ আজ যাঁহারা গোপনে এবং প্রকাশ্যে গাহিতেছেন, বলা বাহুল্য, বিশ্বভারতী এবং শান্তিনিকেতনের ছাপ বা স্ট্যাম্প তাঁহারা বহন করিবার অধিকারী হয়েন নাই নিজেদের অযোগ্যতার কারণেই।

দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প ক্ষেত্রে বাঙলা কোথায় ?

সংবাদপত্রের রিপোর্টাদি হইতে জানা যায় যে:—ভারতবর্ষের শিল্প ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের যে অগ্রণী স্থান ছিল সেখান হইতে এই রাজ্য ক্রমে পিছাইয়া আসিতেছে। ১৯৫৭-৫৮ সালে সারা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই সবচেয়ে অধিক সংখ্যক নূতন কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছিল। ঐ বৎসর এই রাজ্যে মোট ৩৬৯টি কোম্পানী রেজিষ্টার্ড হইয়াছিল। পাঁচ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯৬২-৬৩ সালে পশ্চিমবঙ্গে কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশনের সংখ্যা হ্রাস পাইয়া ৩২৭-এ দাঁড়াইল। অথচ এই সময়ের মধ্যে বোম্বাইয়ে নূতন কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশনের সংখ্যা বাড়িয়া ১৯১-এর স্থলে ২৯৯-এ আসিয়া দাঁড়াইল। একই সময়ে মাদ্রাজে নূতন কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশনের সংখ্যা তিন গুণের বেশী বাড়িয়া গিয়াছিল। যদি রেজিষ্টার্ড ফ্যাক্টরির হিসাব ধরা যায় তাহা হইলেও দেখা যাইবে যে, ১৯৫৬ হইতে ১৯৬১ সালের মধ্যে বোম্বাইয়ে কারখানার সংখ্যা ১৫৪৯-এর স্থলে ২৬৮৬-এ আসিয়া দাঁড়াইতেছে অর্থাৎ বৃদ্ধির হার শতকরা ৭০ ভাগের বেশী। একই সময়ে পশ্চিমবঙ্গে রেজিষ্টার্ড কারখানার সংখ্যা আদৌ বাড়ে নাই, বরং হ্রাস পাইয়াছে। শিল্পের প্রসারে এই পশ্চাদ্গামিতা পশ্চিমবঙ্গের বেকার সমস্যাকে তীব্রতর করিয়া তুলিতেছে। রেজিষ্টার্ড কারখানাগুলিতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা বোম্বাইয়ে পাঁচ বৎসরের মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে, আর পশ্চিমবঙ্গে বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা মাত্র ১৩ ভাগ।

প্রকৃত অবস্থা এই, কিন্তু দিল্লী-মহলে এবং কেন্দ্রীয় দরবারে সার্থকভাবে প্রচার করা হইয়াছে যে, পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের বর্ত্তমান এ ন ভীষণ উন্নতি হইয়াছে যে—এই প্রদেশে আর নূতন কোন শিল্প-প্রসারের অবকাশ এবং প্রয়োজন নাই। দিল্লীর দরবারের প্রধানগণও ইহাই বিশ্বাস করিয়া সেই মত পশ্চিমবঙ্গকে প্রায় বাদ দিয়া ভারতের তথাকথিত "অনগ্রসর" রাজ্যগুলিতে নূতন নূতন নানা শিল্পের ক্ষেত্র বহুভাবে বহুদিকে বিস্তৃত করিতে ব্যস্ত হইয়াছেন।

অথচ পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচিতে হইলে—এখানে আরও বহুভাবে শিল্পের ক্ষেত্র প্রসারিত করিতেই হইবে। উদ্বাস্তু এবং হাজার হাজার শিক্ষিত-অশিক্ষিত বেকারী-পীড়িত এই রাজ্যের নিপীড়িত মানুষদের রুজিরোজগার এবং বাঁচিবার অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা আরও কলকারখানা এবং অন্যান্য ব্যবসায় স্থাপন ছাড়া উপায় নাই।

"পশ্চিমবঙ্গে শিল্প-প্রসারের সমস্যাগুলি বিবেচনা করিয়া রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দিবার জন্য যে পরিষদ গঠিত হইয়াছে তাহাতে এই কথাটা স্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধরা হইয়াছে। ইহা সুখের বিষয়। ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেণ্ট শ্রীচিরঞ্জীলাল বাজোরিয়া পর্য্যন্ত এই পরিষদকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের কলকারখানাগুলিতে রাজ্যের অধিবাসীদের কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দিতে হইবে।

... এই পরামর্শদাতা পরিষদ গঠন করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগ একটি উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছেন। মনে হয় পশ্চিমবঙ্গে শিল্প-প্রসারের বিরুদ্ধে দিল্লীতে যে বিরূপতা জন্মিয়াছে তা কাটাইয়া উঠিতে পরিষদটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সাহায্য করিতে পারেন। কারণ, এই পরিষদে শিল্প ও ব্যবসায়ী মহল যেমন সরকারী পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত হইতেছেন, তেমনি জনমতের মুখপাত্ররূপে শ্রীঅশোক সরকারের ন্যায় লোকও থাকিতেছেন, যাঁরা বেকারী পীড়িত বাঙ্গালীর সমস্যাকে বিশেষভাবে তুলিয়া ধরিতে সক্ষম হইবেন।"

বিগত কিছুকাল হইতে শ্রীঅশোক সরকার (আনন্দ-বাজার পত্রিকা-সম্পাদক) বাঙ্গলা এবং বাঙ্গালীর পক্ষ লইয়া যেভাবে নানা দিকে নানা সমস্যার প্রতি সরকারী এবং বেসরকারী দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে প্রয়াস পাইতেছেন—তাহা সত্যই আমাদের আশার কথা। শ্রীসরকার দিল্লীর বড়কর্ত্তাদের প্রসন্নদৃষ্টি এবং কৃপাপ্রার্থী হইয়া কোন প্রকার প্রয়াস যে করিতেছেন না, বলা বাহুল্য। শ্রীযুক্ত সরকারের চেষ্টা সামান্য ফলবতী হইলেও বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কিছু উপকার অবশ্যই হইবে—এ আশা পোষণ করি। বাঙ্গলার হইয়া স্পষ্টকথা বলিবার, দিল্লীকে শুনাইবার, লোকের সংখ্যা খুবই কম—কাজেই আজ শ্রীসরকারের উপর আমরা ভরসা করিতেছি।

"যে ধরণের বিরূপতার সহিত পরিষদকে লড়াই করিতে হইবে তার একটি উদাহরণ—বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতি। যে-সকল কারণে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের প্রসার ব্যাহত হইতেছে তাদের মধ্যে একটি প্রধান কারণ হইল, এখানে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ-শক্তির অভাব। কেন্দ্রীয় সরকারের ঔদাসীন্যেই এই ঘাটতি সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁরা বরাবরই এই রাজ্যে বিদ্যুতের চাহিদা কম করিয়া ধরিয়াছেন। এমন কি ১৯৬২ সালে ভারত সরকারের উদ্যোগে যে কমিটি গঠিত হইয়াছিল তাঁরাও এই দিক্ দিয়া পশ্চিমবঙ্গের উপর ঘোরতর অবিচার করিয়াছেন। এই কমিটি পশ্চিমঘাট এলাকায় বিদ্যুতের উৎপাদন দশ বৎসরের মধ্যে বাড়াইয়া পাঁচগুণ করিবার সুপারিশ করিয়াছেন। অথচ এই দশ বৎসরের মধ্যে পূর্ব্ব হিমালয় এলাকায় বিদ্যুতের চাহিদা তিনগুণের বেশী বাড়িবে না বলিয়া কমিটি অনুমান করিয়াছেন। এই ঔদাসীন্য পশ্চিমবঙ্গে শিল্প-প্রসারের সম্ভাবনাকে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা করার সামিল। কেননা, বিদ্যুৎশক্তি ছাড়া নিশ্চয়ই কোন আধুনিক শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে না। এই কথাটা দিল্লীর কর্ত্তাদের কানে ভাল করিয়া ঢুকাইয়া দিতে হইবে। গত দুই পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের উপর যে অবিচার হইয়াছে তার প্রতিকার করিতে হইবে। তবেই পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোন্নয়ন ও অর্থ নৈতিক অগ্রগতি সম্ভব হইবে।"

স্বর্গতঃ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এ বিষয় পূর্ণ অবহিত ছিলেন এবং সেই কারণে কেন্দ্রের কৃপার উপর নির্ভর না করিয়া এ রাজ্যের বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের জন্য কয়েকটি পরিকল্পনা মত কার্য্যও আরম্ভ করেন। তাঁহার হঠাৎ মৃত্যু না হইলে হয়ত আজ সেই প্রচেষ্টার ফল ফলিত। কিন্তু বিলম্ব হইলেও এ আশা করিতে পারি যে, রাজ্য-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন বাঙ্গলা এবং বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তাঁহার কর্ত্তব্য-পালনে কোন প্রকার কার্পণ্য করিবেন না।

অন্যান্য রাজ্যের কলকারখানাগুলিতে স্থানীয় লোক-দের নিযুক্তি সম্পর্কে অন্যান্য রাজ্য সরকার যে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নির্দ্দেশ পাকাপোক্তভাবে প্রয়োগ করিতেছেন, পশ্চিম বাঙ্গলা সরকার রাজ্যের বেকারী দূরীকরণে সম-প্রকার ব্যবস্থা এখনও কেন গ্রহণ করিতে পারেন নাই তাহা বুঝা শক্ত। এই বিষয়েও কি কেন্দ্রীয় সরকারের কোন গোপন নির্দ্দেশ আছে?

ধানের বদলে পাট চাষ—বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশ!

পশ্চিমবঙ্গে বিষম খাদ্যাভাবের রাজত্ব চলিতেছে বিগত কিছুকাল হইতে। বাঙ্গলার এই জীবনমরণ সমস্যা-সঙ্কটের কালে বেশ ভাল করিয়াই হাড়ে হাড়ে বুঝা গেল যে, এ রাজ্যের বিষম বিপদ্ ভারতের অন্যান্য রাজ্যে তেমন কোন সমবেদনার ভাব জাগাইতে পারে নাই।—

"পক্ষান্তরে ভারতের বহু রাজ্যই পশ্চিমবঙ্গের এই জটিল খাদ্য পরিস্থিতির কথা তেমন সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করেন না। সম্প্রতি উড়িষ্যার ক্ষেত্রে তাহাই দেখা গিয়াছে। সম্প্রতি দিল্লীতে খাদ্য সম্পর্কে যে

সর্ব্বভারতীয় মুখ্যমন্ত্রী ও খাদ্যমন্ত্রীদের সম্মেলন হইয়া গেল তাহাতে, নাকি গুজরাটের খাদ্যমন্ত্রী সর্ব্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে খাদ্য-বিষয়ক সমস্যাটি সকলকে উপলব্ধি করার জন্য অনুরোধ জানান। প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক স্বার্থ না দেখিয়া বৃহত্তর ভারতের স্বার্থের কথাই নাকি তিনি চিন্তা করিতে বলেন।

"প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনও ঐ সম্মেলনে অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করেন। এই সম্পর্কে তিনি নাকি এই মনোভাব প্রকাশ করেন যে, খাদ্যের দিক্ দিয়া চিরন্তন ঘাটতি পশ্চিমবঙ্গ যদি পাট চাষের পরিমাণ বহুলাংশে হ্রাস করে এবং ঐ জমিতে ধান চাষ করে, তাহা হইলে খাদ্যের জন্য তাহাকে পরনির্ভরশীল হইতে হয় না। কিন্তু ইহা করা হইলে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটা সঙ্কট দেখা দিতে পারে। কারণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জনের ক্ষেত্রে পাট একটা প্রধান সহায়।

"তিনি নাকি বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গ ভারতের বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করিয়াই এখনও পর্য্যন্ত পাট চাষের পরিমাণ হ্রাসের কথা চিন্তা করে নাই। পশ্চিমবঙ্গের এই বিশেষ সমস্যা যাহাতে সর্ব্বভারতীয় রাজ্যগুলি উপলব্ধি করেন এই জন্য তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে সহানুভূতিসূচক বিবেচনা করিবার অনুরোধ জানান।"

এ অনুরোধ দিল্লী-মহলে কতখানি রক্ষিত হইবে বলা শক্ত। তবে কেন্দ্রীয় কর্ত্তারা যদি মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনে কোন সাড়া না দেন, পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য-সমস্যার বাস্তব সুরাহা কিছু না করেন, তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বৎসর যে ১২ হইতে ১৩ লক্ষ একর জমিতে পাটের চাষ হয়, তাহাতে ধান চাষ করিয়া এই রাজ্যের চিরন্তন খাদ্য-সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। অবশ্য দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথা বিবেচনা করিয়া রাজ্য সরকার পাট চাষের পরিবর্ত্তে ধান চাষে উৎসাহ দিতেছেন না। (দিবার শক্তি আছে কি?) কারণ, পাট দ্বারা ভারতের প্রভূত পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জিত হয়। এদিকে বৃহত্তর ভারতের স্বার্থরক্ষা করিতে গিয়া রাজ্য সরকার প্রতি বৎসর কেন্দ্রের মাধ্যমে খাদ্যের জন্য অন্যান্য রাজ্যের মুখাপেক্ষী হন। অনেক ক্ষেত্রে ঐ সব রাজ্যের দয়া-করুণার উপর পশ্চিমবঙ্গকে প্রতীক্ষা থাকিতে হয়।

পাটের দৌলতে লাট হইবে অন্য রাজ্যের মহাজন এবং কেন্দ্রীয় কর্ত্তারা সেই লাটদের স্বার্থই যে সর্ব্বাগ্রে দেখিবেন—ইহা জানা কথা। কিন্তু কেন্দ্রের মুদ্রা অর্জ্জন এবং অবাঙ্গালী (পাট-ব্যবসায়ে কচ্ছে ছাড়া বাঙ্গালী নাই বলিলেই হয়) পাট-ব্যবসায়ীদের ধন-দৌলত বৃদ্ধির কারণে খেসারত দিতে হইবে বাঙ্গলাকে। পাটকলগুলিতে বাঙ্গালী শ্রমিকও বোধ হয় শতকরা ২০।২২-এর বেশী নাই—এখানেও সেই চিরস্থায়ী 'বাঙ্গালী-মার' প্রথা বিরাজ করিতেছে।

কলিকাতায় আশুতোষ জন্মশতবার্ষিকী

এই অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণ ভারতীয় বিজ্ঞানী-দের বিদেশ হইতে ভারতে ফিরাইয়া আনার কথা বলিয়াছেন। তাঁহার ভাষণে প্রকাশ:

"বিজ্ঞানে স্নাতক ৪৬০০ ভারতীয় আমেরিকা এবং ইউরোপের নানা দেশে বসবাস করিতেছেন। ইঁহারা ভারতে ফিরিতে অনিচ্ছুক। তাহার কারণ অবশ্য ইহা নয় যে, তাঁহারা স্বদেশের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ। .... যদি গবেষণা এবং অন্যান্য বিষয়ে সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে এই ৪৬০০ ভারতীয় বিজ্ঞানীর পক্ষে দেশে ফিরিয়া আসা সম্ভব হয়। গবেষণার যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা এবং উপযুক্ত পরিমাণে পারিশ্রমিক দানের ব্যবস্থা করা অবশ্য অবিলম্বে সহজসাধ্য নয়। চেষ্টা নিশ্চয়ই করিতে হইবে, তবে সমস্যাটি আন্তর্জ্জাতিক নিরিখে বিচার-বিবেচনা না করিয়া উপায় নাই।"

বহু কৃতী ভারতীয় বিজ্ঞানী, যাঁহাদের মধ্যে বাঙ্গালীদের একটি বৃহৎ সংখ্যা আছে, বিদেশে তাঁহাদের নিজ নিজ বিষয়ে গবেষণাদি কাজকর্ম্মে নিযুক্ত রহিয়াছেন। উপযুক্ত অবকাশ পাইলে ইঁহাদের অনেকেই দেশে অবশ্যই প্রত্যাবর্ত্তন যে করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারত সরকার এই বিষয়ে গত কয়েক বৎসর যাবৎ চিন্তা এবং চেষ্টা কিছু করিয়াছেন, সত্য

কথা, কিন্তু বিশেষ কিছু ফল এখনও পাওয়া যায় নাই।

গ্রেট ব্রিটেনের সমস্যা হইয়াছে খানিকটা ভারতের মতই।

"'ব্রেন-ড্রেন' তথা মেধাক্ষয় কথাটা ইদানীং ব্রিটেনেও উদ্বিগ্ন আলোচনার বিষয়! কারণ সেখানেও বহু কৃতী বিজ্ঞানী দেশ ছাড়িতেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, কানাডায় পাড়ি দিতেছেন। ব্রিটিশ বিজ্ঞানীদের কোন কোন মহল এজন্য দায়ী করিতেছেন ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের অর্থ-কার্পণ্যকে। আমাদের দেশের তুলনায় যন্ত্রশিল্পে ও বিজ্ঞানে ব্রিটেন অনেক বেশী উন্নত, সে-কারণে অনেক বেশী তাহার অর্থসাচ্ছল্য এবং উপকরণপ্রাচুর্য। কিন্তু এ ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ব্রিটেনও পরাজিত। সম্প্রতি একজন প্রখ্যাত ব্রিটিশ বিজ্ঞানী কাজে ইস্তফা দিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলিয়া গিয়াছেন; তাঁহার কথা, তিনি যে-বিষয়ে গবেষণায় নিযুক্ত সে-বিষয়ে গবেষণার সুযোগ-সুবিধা, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনেক, অনেক বেশী। তার পর আছে বেতন বা পারিশ্রমিকের বিপুল পার্থক্য। কৃতী বিজ্ঞানী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে-পরিমাণ পারিশ্রমিক পাইবেন, ব্রিটেনে পাইতে পারেন তাহার অর্দ্ধেক কিংবা বড়জোর ⅔ ভাগ। ভারতের সাধ্য তাহার চেয়েও কম। বেশী পারিশ্রমিকের আকর্ষণ ছাড়া বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম চালাইবার মত উন্নত স্বচ্ছন্দ পরিবেশ ও প্রচুর আধুনিক সাজসরঞ্জামের আকর্ষণ কম নয়। সে-কারণে কৃতী ব্রিটিশ বিজ্ঞানীর নজর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে, কৃতী ভারতীয় বিজ্ঞানী, অনেকের বাসনা 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনখানে'।"

কেবল মাত্র অর্থ বরাদ্দ করিলেই এ-সমস্যার সমাধান হইবে না। ভারতীয় বিজ্ঞানী যাঁহারা বিদেশে কাজকর্ম এবং গবেষণা করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন, দেশের জন্য, জাতির ভবিষ্যতের কারণে তাঁহাদেরও কিছু ত্যাগস্বীকার অবশ্যই করা দরকার।

এ বিষয়ে আমরা আনন্দবাজার সম্পাদকের সহিত একমত। তিনি বলিতেছেন—ভারতীয় বিজ্ঞানীরা "কিছু ত্যাগস্বীকার না করিলে, ভারতের শিল্পবিজ্ঞানে উন্নতি সম্পর্কে কিছু দরদ বোধ না করিলে গবর্ণমেন্টের কোন চেষ্টাই তাঁহাদের আকৃষ্ট করিতে পারিবে কি না সন্দেহ। ইউরোপ-আমেরিকার বৃহদায়তন শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করে। হয়েল-নারলিকার মহাকর্ষণতত্ত্বের অন্যতম উদ্ভাবক অধ্যাপক হয়েল শুধু কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণাকার্য্যে নিযুক্ত নন, বছরের কয়েকটি মাস তিনি আমেরিকার একটি বিখ্যাত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের গবেষণাগারে কাজ করিয়া থাকেন। আমাদের দেশেও কয়েকটি বিখ্যাত শিল্প-প্রতিষ্ঠান বৈজ্ঞানিক গবেষণাকার্য্য পরিচালনায় যথেষ্ট উৎসাহী। কিন্তু দেশের সর্ব্বত্র বৃহৎ যন্ত্রশিল্প উদ্যোগের বিবিধ বিভাগে সর্ব্বস্তরে গবেষণা-কার্য্যের জন্য কৃতী বিজ্ঞানী নিয়োগের আধুনিক ঐতিহ্য এখনও গড়িয়া উঠে নাই।"

দরিদ্র দেশের বৈজ্ঞানিকদের মনে রাখা দরকার যে,—

"বিদেশে অনেক বেশী সুযোগ-সুবিধা, পারিশ্রমিক এবং উন্নতির সম্ভাবনা বলিয়া হা-হুতাশ করাও বৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিচয় নয়। আমেরিকায়, ব্রিটেনে, পশ্চিম-জার্ম্মানীতে, রাশিয়ায়, জাপানে বিজ্ঞানীরা যে সমস্ত সুযোগ পাইতেছেন তাহা রাতারাতি গড়িয়া উঠে নাই। ওই সব দেশে বৈজ্ঞানিক সমৃদ্ধির পিছনে আছে কমপক্ষে অর্দ্ধশতাব্দীর অক্লান্ত অধ্যবসায় ও সাধনা। ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও কাজকর্ম্মের সুযোগ সীমাবদ্ধ অপ্রচুর বলিয়া হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে কিংবা বিদেশে পাড়ি দিতে হইবে, ইহা মোটেই বাস্তবযুক্তিসঙ্গত কথা নয়। উন্নত দেশগুলির ঐতিহাসিক অগ্রগতি যেভাবে হইয়াছে ভারতেও তাহা যাহাতে হইতে পারে সেজন্য বিজ্ঞানীরা, শিল্পপতিরা এবং গবর্ণমেণ্ট অকুণ্ঠ সহযোগিতা করিতেছেন, ইহাই দেখিতে চাই।"

কিন্তু আমরা ভারতের বৈজ্ঞানিক উন্নয়নে সকলের অকুণ্ঠ সহযোগিতা কামনা করিলেও—তাহা কবে এবং কি ভাবে সংগঠিত হইবে—তাহা বলা কঠিন। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্ত্তব্যও যে আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

বাঙালী বৈজ্ঞানিক ও রাজ্য সরকার

বহু বাঙালী বৈজ্ঞানিক আজ বিলাতে, আমেরিকায়, পশ্চিম জার্মানিতে নানা কর্মে নিযুক্ত রহিয়াছেন। এই সব বৈজ্ঞানিককে স্বদেশে ফিরাইয়া আনিবার জন্ম কতদূর কি করা হইয়াছে—তাহা আমাদের জানা নাই। মুখে দেশের প্রতি দরদ এবং কর্ত্তব্যবোধের কথা বলিয়া লাভ কি? মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ড হইতে কয়েকজন বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক দেশে আসিয়া উপযুক্ত কর্ম্মের সন্ধান করেন, কিন্তু সরকার কিংবা কোন বৃহৎ শিল্প-সংস্থা হইতে তাঁহাদের উপযুক্ত বেতনে এবং উপযুক্ত কর্ম্মে নিয়োগের বিষয় কোন প্রকার আন্তরিক চেষ্টা করা হয় নাই। এই সব যুবক বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক শেষ পর্য্যন্ত হতাশ হইয়া বিলাতে ফিরিয়া গিয়াছেন এবং ঐ দেশেই চিরবসবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার (কেন্দ্রের অনুকরণে) বিগত কিছু কাল হইতে অতিবৃহৎ বহুতল-বিশিষ্ট বাড়ী নির্ম্মাণে পরম উৎসাহে অপরিমিত অর্থ ব্যয় করিতেছেন। সিনেট হাউস গিয়াছে, এইবার শুনিতেছি যে পুরাতন সুবৃহৎ রাইটার্স বিল্ডিংসও নাকি যাইবে। এই সরকারী মহা-করণ ভাঙ্গিয়া তাহার স্থানে বারো-চৌদ্দতলা এক অতি বিরাট্ ভবন নির্ম্মাণের পরিকল্পনা হইয়াছে। ইহাতে কত কোটি টাকা ব্যয় হইবে, কত কন্ট্রাক্টার, কি সংখ্যক সরকারী-বেসরকারী কর্ম্মচারী এবং অন্যান্য কতজন কত লক্ষ টাকা উপার্জ্জনের অবকাশ পাইবেন বলা শক্ত এবং এই হিসাব কখনও প্রকাশিত হইবে না। গৌরী সেনের টাকা বলিয়াই কি তাহার অপ-শ্রাদ্ধ এমনি করিয়াই করিতে হইবে? সরকারী শাসনযন্ত্রে এবং ব্যবস্থায় দুর্নীতি এবং গলদ যতই বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার সঙ্গে সমতালে ততই অসংখ্য নূতন নূতন সরকারী প্রাসাদ নির্ম্মাণ বাড়িয়া যাইতেছে। বর্ত্তমান রাইটার্স বিল্ডিংসে স্থানের অভাব নাই এবং একদা বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা-আসামের সকল প্রশাসনিক কর্ম্ম এই ভবন হইতেই নিয়ন্ত্রিত এবং সুপরিচালিত হইত। কখনও স্থানের অভাবের কথা শুনা যায় নাই। কিন্তু আজ খণ্ডিত মাত্র এক তৃতীয়াংশে বাঙ্গলার শাসনকার্য্য চালাইতে—স্বদেশী সরকার বিষম ভাবে 'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছেন। হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে চৌদ্দতল দ্বিতীয় মহাকরণ নির্ম্মিত হইয়াছে—তাহাতেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্থানাভাব মিটিল না—এ-ক্ষুধা কখনও মিটিবে কি না জানি না। বর্ত্তমানে এই সব অযথা কাজে অযথা কোটি কোটি টাকা অপব্যয় না করিয়া—ওই অর্থ বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের এবং শিক্ষার খাতে ব্যয় করিলে দেশের এবং জাতির বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ কল্যাণ হইত। বৈজ্ঞানিক-দের বিদেশ হইতে ফিরাইয়া আনিয়া তাঁহাদের উপযুক্ত পরিবেশে এবং উপযুক্ত বেতনে পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ী করা এমন কঠিন কার্য্য বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই।

পেন্‌শনপ্রাপ্ত বৃদ্ধদের পুনরায় কর্ম্মে নিয়োগ না করিয়া—যুবক বৈজ্ঞানিকদের উপযুক্ত স্থলে উপযুক্ত কর্ম্মে নিয়োগ করার কথাটা সরকার কেন চিন্তা করেন না? এমন বেশ কিছু সংখ্যক পেনশনপ্রাপ্ত সরকারী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী আছেন, যাঁহারা এখন পর্য্যন্ত সরকারী বিবিধ কর্ম্মে "বার বার—আবার-পুনরায়" নিযুক্ত হইতেছেন—কেন? সরকারের এ-ক্রণিক বদ্‌রোগ দূর করা অত্যাবশ্যক। বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে আমাদের জ্ঞান সীমিত—তাই কথাগুলি সাধারণভাবে বলিতেছি।

সহস্রভাবে সহস্র প্রকার অপব্যয় বন্ধ করিলে এই পশ্চিমবঙ্গেই দু-চার হাজার পরবাসী বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিককে এ-দেশেই কাজে নিয়োগ করা সম্ভব হইতে পারে। অমাত্যগুষ্টির বেতন এবং ভাতা বৃদ্ধির সঙ্গে গরীব দেশে "রাজকীয় চালে" তাঁহাদের বসবাসের ব্যবস্থা একটু সীমিত করিলে যে অর্থ বাঁচিবে, তাহাতেও বেশ কয়েক শত বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক দেশে ফিরিয়া সানন্দচিত্তে দেশের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিতে সক্ষম হইবেন।

এই প্রসঙ্গে রাজ্য সরকারের বিরাট্ মোটর বাহিনীর কথা বলা যায়। একমাত্র কলিকাতা শহরেই রাজ্য-সরকারের বেশ কয়েক হাজার মোটরকার, জিপ, ষ্টেশন-ভ্যান, বাস, লরি এবং অন্যান্য ধরণের মোটর যান আছে। এক-একটি পুলিস থানাতেও গাড়ির সংখ্যা কম নহে—এবং এই জিপ্‌গুলি থানার ছোট-বড় সকল অফিসারের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অবাধে ব্যবহার

হইতেছে। সরকারী অজস্র গাড়িগুলির ব্যবহার যে কেবল মাত্র সরকারী কাজেই হইয়া থাকে, তাহা বলা যায় না। কর্ত্তাদের ব্যক্তিগত কাজে সরকারী গাড়ির ব্যবহার বিশেষ ভাবেই হয়। সরকারী এবং আধা-সরকারী মোটর যানগুলির পেট্রল খরচার পরিমাণ আকাশ-প্রমাণ এবং এ অর্থ যোগাইতেছে এ রাজ্যের দরিদ্র, অর্দ্ধাহারী, অনাহারী করদাতারাই।

এই ভাবে সহস্র সহস্র অ- এবং কু-কাজে সরকারী অর্থাৎ জনগণের অর্থের শ্রাদ্ধ হইতেছে—শাসকদের খুশি-খেয়ালমত। অন্যদিকে: বিদ্যালয় আছে—শিক্ষক নাই, গবেষণাগার আছে- উপযুক্ত সংখ্যক বিজ্ঞানী নাই। যে কয়জন শিক্ষক আছেন, বহু ক্ষেত্রে তাঁহারা নিয়মিত বেতন পাইতেছেন না, বেতনের পরিমাণও বর্ত্তমান অবস্থায় অত্যন্ত কম—নামমাত্র। এমন অবস্থায় কেবল মাত্র বৈজ্ঞানিক এবং শিক্ষকদের ত্যাগের মন্ত্রদানে ফল কি হইবে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। শাসকগুষ্টি, তথা অন্যান্য কর্ত্তারা, নিজেদের জীবনে এবং আচরণে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া অন্যকে, অভাবগ্রস্তকে ত্যাগের বাণী দান করিলেই তবে সাক্ষাৎ ফললাভ হইবে।

সেই চিরকেলে প্রতিবাদ!

সংবাদ: জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ থানা এলাকা হইতে পূর্ব্ব পাকিস্থান রাইফেল বাহিনীর লোকেরা বেআইনীভাবে একজন ভারতীয় কনেষ্টবল, একজন ভারতীয় ঠিকাদার ও সাতজন শ্রমিককে অপহরণ করার বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পূর্ব্ব পাকিস্তান সরকারের নিকট প্রতিবাদলিপি প্রেরণ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

এই প্রকার ঘটনা বার বার ঘটিতেছে এবং প্রতিবারই আমাদের সরকার পাক্-সরকারের নিকট জোর প্রতিবাদ জানাইতেছেন পরম তৎপরতার সঙ্গে। কিন্তু এই সকল ব্যাপারের পরিসমাপ্তি প্রতিবাদ প্রেরণেই হইতেছে। যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে এই সকল পাক্-ক্রিয়াকে এক দিনেই ঠাণ্ডা করা যায়, রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার সে-পথ দিয়া যাইবেন না স্থির করিয়াছেন। পাকিস্তান গত দু-এক মাস হইতে শান্তির বুলি আওড়াইতেছে—ভারতের সহিত শান্তিতে সহ-অবস্থানের পবিত্র ইচ্ছাও বার বার প্রকাশ করিতেছে—কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যেন মনে করিবেন না, পাকিস্তান তাহার স্বাভাবিক 'ধর্মকর্ম' পরিত্যাগ করিবে। গো-মহিষ হইতে মানুষ চুরি দেখা যাইতেছে পাকিস্তানীদের নিত্যকর্ম্ম এবং এই অবশ্যকরণীয় নিত্যকর্ম্মে পাক্-সরকার মৌন সহযোগিতাই দিতেছে।

আমরা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকারের পাকিস্তানের নিকট এই 'প্রতিবাদ' প্রেরণ-রূপ পরিহাসের বিরুদ্ধে বিনম্র প্রতিবাদ মাত্র করিতে পারি।

দেখিয়া অবাক্ হই—পাকিস্তান তাহার মর্জ্জিমত ভারতের যে-কোন সীমান্ত অঞ্চলে গুলী চালাইয়া, কেবল নিরীহ ভারতবাসী মানুষই নহে, পুলিস এবং সৈন্যও হত্যা করিতেছে। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম এবং কাশ্মীর সীমান্তে ইহা প্রায় প্রত্যহই ঘটিতেছে। পাক্-সৈন্যবাহিনীর এই প্রকার বেপরোয়া গুলীচালনা এবং নরহত্যার পশ্চাতে পাক্-সরকারের হাত বা সম্মতি নাই—ইহা কেহই বিশ্বাস করিবে না। পাকিস্তানী সৈন্য এবং নাগরিক যে স্থলে এমন বেপরোয়া হইয়া ভারত এবং ভারতীয়দের উপর হামলা চালাইতে ভরসা পায়, সেই স্থলে পাকিস্তানী 'গুলীর' বিরুদ্ধে ভারতের প্রতিবাদ কেবল 'বুলি'। বেফায়দা—নিরর্থক।

গত কয়েকদিনে পাকিস্তানী হামলার আরও সংবাদ প্রকাশ পাইয়াছে, সব কয়টি ক্ষেত্রেই আমাদের তরফ হইতে 'অতি তীব্র প্রতিবাদ' প্রেরণ করা হইয়াছে। গত ১৭ বৎসরে, এই ভাবে প্রেরিত প্রতিবাদের সংখ্যা কত হইবে? আমরা আন্দাজে বলিতে পারি যে এই প্রতিবাদের সংখ্যা কমপক্ষে ৯৯৯৭৯৯'! এই সব প্রতিবাদ-পত্রগুলির শেষ গতি হইয়াছে—পাকিস্তানের সরকারী ওয়েষ্ট-পেপার বাস্‌কেটে! প্রতিবাদ পাইয়া পাইয়া পাক্-কর্ত্তাদের এখন এমনই অভ্যাস হইয়াছে যে—ভারতের প্রতিবাদপত্রগুলি তাঁহারা আর খুলিয়া দেখিবারও প্রয়োজন বোধ করেন না—জবাব দেওয়ার কথাই ত উঠে না।

লজ্জা এবং কিঞ্চিৎ পৌরুষ থাকিলে ভারতীয় কর্তারা 'প্রতিবাদ' প্রেরণকে এমন এক লজ্জাজনক ব্যাপারে পরিণত করিতেন না। এখন চিন্তা করা দরকার—পাক্-রোগের চিকিৎসার মোক্ষম ঔষধের কথা।

"আকাশবাণী" ও শ্রীমতী গান্ধী

মন্ত্রিত্বের শপথ গ্রহণ করিবার পর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী—দিল্লীতে আকাশবাণীর ভবনে পদার্পণ করিয়াই যে-উক্তি করিয়াছেন, তাহাতে আমরা খুশী হইয়াছি, আকাশবাণী সম্পর্কে কিছু আশাও করিতেছি। তথ্য ও বেতার মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াই শ্রীমতী গান্ধী আকাশবাণী সম্পর্কে এই তিক্ত মন্তব্য করিতে দ্বিধা করেন নাই যে: আকাশবাণীর শ্রুতিকটু এবং প্রাণহীন অনুষ্ঠানের সঙ্গে তাঁহার যথেষ্ট পরিচয় আছে এবং এই পরিচয় আছে বলিয়াই তিনি ইতিমধ্যেই চিন্তা করিয়াছেন, কি উপায়ে এই সর্ব্বভারতীয় বিরাট্ প্রচার-যন্ত্রের গলদ দূর করিয়া এখানে সুস্থ আবহাওয়া প্রবর্ত্তিত করা যায়।

আকাশবাণী—বিশেষ করিয়া কলিকাতার আকাশ-বাণী—সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্ব্বে বহু কথা বলিয়াছি এবং বহু মন্তব্যও করিয়াছি, কিন্তু সবই হইয়াছে বৃথা। আমরা আকাশবাণীর সহিত জড়িত কোন ব্যক্তি-বিশেষ (বা বিশেষদের) সম্পর্কে কিছু বলি নাই, বলিয়াছি শ্রোতাদের শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ের প্রতি মায়া-পরবশ হইয়া, কারণ আমরা, যাহারা রেডিও-শ্রোতা, তাহারা কেহই রেডিও-কর্তৃপক্ষ এবং প্রচারক প্রভৃতির মত লম্ব-কর্ণের অধিকারী নহি এবং সেই কারণে আমাদের অর্থাৎ শ্রোতাদের ক্ষুদ্র কর্ণে রেডিওর প্রাত্যহিক অত্যাচার অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। আজ আমাদের মন্তব্যের সঙ্গে প্রায় একসুরে একটি বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা (যুগান্তর) মন্তব্য করিতেছেন:

"কিন্তু আকাশবাণীর আসল ব্যাধি কি? এই বিশাল ভারতবর্ষের ১২ লক্ষ বর্গমাইল ভূমির উপরে যে আকাশ ও ঈথার-তরঙ্গ অল ইণ্ডিয়া রেডিওর শব্দ ও ধ্বনি বর্ষণের দ্বারা রাত্রি-দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোড়িত হইতেছে, সেই আকাশে নিশ্চয়ই আলো ও প্রসন্নতার কোনও অভাব নাই; সেখানে নিশ্চয়ই মেঘ ও বজ্রবিদ্যুতের দ্বারা অভাবনীয় নাটক সংঘটিত হইতেছে এবং রৌদ্র ও ছায়ার খেলায় প্রকৃতির আশ্চর্য্য কবিতাও রচিত হইতেছে। কিন্তু ঈশ্বর, কিংবা ভারতীয় ব্যুরোক্রাসি অল ইণ্ডিয়া রেডিওকে সেই আকাশের প্রসারতা কিংবা উজ্জ্বলতা কোনটাই দিতে পারে নাই। অবোধ ব্যুরোক্রাসির চাপে আকাশবাণী এত কুণ্ঠিত এবং এমন নীরস বস্তুতে পরিণত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষের আকাশে সিলোন্ রেডিওর আধিপত্য এখন প্রশ্নাতীত। শ্রোতাদের রুচিবোধের প্রতি ঘৃণা-মিশ্রিত অনুকম্পা দেখাইয়া কর্তারা বলিতে পারেন যে, সিলোন্ রেডিওর আধিপত্যের একমাত্র কারণ তার চটুল গীতি-সম্ভার। কিন্তু তা নয়, আসল কারণ, আকাশবাণীর প্রোপাগ্যাণ্ডা-ভার—মন্ত্রীদের আপ্তবাক্য ও উপদেশ, সরকারী বুলেটিনের অবিরাম প্রগল্‌ভতা এবং দুঃসহ ও স্থূল প্রচার আকাশবাণীকে শ্রোতার যন্ত্রণায় পর্য্যবসিত করিয়াছে। (নিশ্চয়ই ঘণ্টা হিসাব করিয়া দেখানো যায় যে, আকাশবাণীর প্রতিদিনের কতটা সময় এই প্রচারপর্ব্বের দ্বারা ধ্বংস করা হইতেছে।) কিন্তু মুশ্‌কিল এই যে, আমরা যাকে শুষ্ক প্রচার বলিয়া মনে করি, দিল্লীর আকাশবাণীর বড়বাবুরা তাকে মনে করেন গণসংযোগ এবং লোকশিক্ষা!

"কিন্তু তা ছাড়াও শ্রীমতী গান্ধী নিশ্চয়ই অবহিত আছেন যে, অল ইণ্ডিয়া রেডিওর ঊর্দ্ধতন পরিচালক-মণ্ডলীর মধ্যে শুধু বুদ্ধিহীনতা নয়, দুর্ব্বুদ্ধিরও বাসা তৈরি হইয়াছে। নতুবা, গত বৎসর আকাশবাণীর জন্য মার্কিন ইজারার বন্দোবস্ত এত দূর গড়াইত না, ভয়েস অব আমেরিকার সঙ্গে মারাত্মক চুক্তি বন্ধনের জন্য কোন কোন আমলারা সন্তর্পণে অগ্রসর হইবার সাহস পাইতেন না এবং এখনও অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কিছু সময় ভয়েস অব আমেরিকাকে বিক্রী করার বন্দোবস্ত চালু থাকিত না। অর্থাৎ জনসংযোগের মাধ্যম সম্বন্ধে যে পবিত্রতা-বোধ, যে স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার কথা আমরা সংবাদপত্র-জগতে বিশ্বাস করি, অল ইণ্ডিয়া রেডিও তার প্রতি কোন সম্মান দেখাইতে পারেন নাই। কারণ, ইহা ব্যুরোক্রাট-শাসিত। অথচ সরকারী আমলা বা এই ব্যুরোক্রাটদের মধ্যে যে নিয়মানুবর্তিতা এবং নির্দ্দলীয় মনোভাব আশা করা যায়, অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে তারও কোন চিহ্ন নাই। প্রোগ্রামের ভুল এবং ভাষার দোষ হয়ত পরিশ্রমের দ্বারা সংশোধন করা যায়, কিন্তু এই আদর্শহীনতার প্রতিকার কি?

শ্রীমতী গান্ধী এই বৃহৎ এবং শক্তিমান্ গণমুখপত্রের ভার লইয়াছেন এবং অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় ইহার চ্যালেঞ্জগুলিও স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আকাশবাণীর উন্নতি যদি তিনি চান, তা হইলে তাঁকে আমূল সংস্কারের দিকে যাইতে হইবে, অবোধ আমলাদের (এবং বাস্তুঘুঘু কর্মীদের) বাধা ছিন্ন করিতে হইবে এবং আকাশবাণীর মধ্যে বিবেক ও আত্মার প্রতিষ্ঠা ঘটাইতে হইবে। বিবেকহীন এবং প্রাণহীন কোন যন্ত্র গণমুখপত্র হইতে পারে না। তথ্য ও বেতার মন্ত্রীরূপে তথ্য দপ্তরেও বহু উন্নতি ঘটানোর সুযোগ তিনি পাইবেন, কারণ নিঃসন্দেহে প্রেস ইনফরমেশান ব্যুরোগুলিকে ঢালিয়া সাজানোর এবং আধুনিক 'মাস্ মিডিয়ার' সহযোগী করিয়া তোলার আহ্বান তাঁর সম্মুখে রহিয়াছে। সংবাদপত্রে আমরা নূতন তথ্য, পুরাতন রেফারেন্স, চিত্র ও পরিসংখ্যানের জন্ত প্রেস ইনফরমেশান ব্যুরোর দিকে তাকাইয়া থাকি; আমরা ভিন্ন ভিন্ন ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের উল্লেখযোগ্য মন্তব্যের তর্জ্জমা চাই; এবং আকাশবাণীর নির্ব্বোধ ও কর্কশ (এবং নীতি বিদ্যালয়ের ঢং-এর) প্রোগ্রামের অবসানও চাই। আমরা আশা করি, এই বৃহৎ সংস্কারের জন্তই শ্রীমতী গান্ধী প্রস্তুত হইতেছেন।

শ্রীমতী গান্ধীকে অনুরোধ করিব, তিনি যেন দয়া করিয়া একবার এই অধম কলিকাতার বেতার ষ্টেশনটিতে পদার্পণ করিয়া এখানের বিচিত্র ক্রিয়া-কর্ম দেখিয়া যান। তিনি বাঙ্গলা জানেন এবং বুঝেন।

কতগুলি বাস্তু-ঘুঘু কি ভাবে এখানে পাকা বাসা বাঁধিয়া শ্রোতাদের কর্ণমর্দ্দন করিবার সঙ্গে সঙ্গে বেশ দু'পয়সা অর্জ্জন করিতেছে—তাহা দেখিয়া শ্রীমতী গান্ধী বিস্মিত হইবেন। কলিকাতার বেতার কেন্দ্রটিকে বেলুড় মঠের এবং বাবাজী মহারাজদের প্রচার-ঘাঁটিরূপে কেমন ব্যবহার করা হইতেছে তাহাও দেখিবার বিষয়। পল্লীর মঙ্গলের নামে—কি ভাবে প্রত্যহ নীতি-বিদ্যালয়ের পচা এবং অচল বাণী বিতরণ করা হইতেছে, বিশেষ ব্যক্তির রচিত অচল এবং চতুর্থ শ্রেণীরও নয় এমন সব নাটক বার বার বিশেষ এক আসরে প্রচার করা হয়—এই সব দেখিয়া শ্রীমতী গান্ধী পরম আনন্দ লাভ করিবেন।

এখানে একজন আশ্রিত ও অনুগৃহীত ব্যক্তির একটা পাকা ভিৎ হইয়াছে—কোন সরকারী কিংবা অন্য প্রতিষ্ঠানে যাহার স্থান হওয়া কখনও উচিত নহে। কলিকাতা বেতারে আজ গুণীর আদর নাই, বরং অ-গুণীদেরই কদর বেশী।

কলিকাতা বেতার-আশ্রমে বিশেষ কতকগুলি 'আসর' আছে। এই আসরগুলি, মনে হয়, এক-একজন অতি-অনুগৃহীত ব্যক্তিকে চিরকালের জন্ত ইজারা বা পত্তনি দেওয়া হইয়াছে এবং সেই জোরেই বোধ হয় ইজারা-প্রাপ্ত-ব্যক্তিরা এই সকল আসরে নিজেদের খেয়াল খুশিমত যাহা ইচ্ছা তাহাই প্রচার করিয়া থাকেন। আসর সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় বিরুদ্ধ মন্তব্য প্রকাশ পাইলে 'আসরপতি' তাহা দমন করিবার পদ্ধতি জানেন। মন্তব্যকারীর সন্ধান লইয়া তাঁহাকে (বা তাঁহাদের)—আসরে প্রোগ্রামের মাধ্যমে কিছু দর্শনীর (সরকারী পয়সার) সুযোগ দান করিয়া ভবিষ্যৎ 'মুখ-বন্ধের' উপায় সহজেই হয়। অনেক সাংবাদিক আসরপতিদের এই ফাঁদে পড়িতে দ্বিধা করেন না। (কারণ, পেটে খাইলে পিঠে সয়!)

শ্রোতাদের পত্রাদির জবাব দিবার ব্যবস্থা কলিকাতা বেতারে আছে। কিন্তু পত্রের জবাব যে-ভাবে এবং ভাষায় দেওয়া হইয়া থাকে—তাহাকে প্রকারান্তরে মূর্খ শ্রোতাদের বেশ ভাল করিয়াই কর্ণমর্দ্দন বলা চলে। সবিনয় নিবেদনে সবই আছে—কেবল 'বিনয়' বস্তুটিরই একান্ত অভাব। এই অনুষ্ঠানটিও একজন অতি-অনুগৃহীত মহাশয় ব্যক্তিকে লীজ দেওয়া হইয়াছে—যে লীজ কখনও শেষ হইবে না।

শ্রীমতী গান্ধীকে কাতর নিবেদন জানাই—তিনি বিশেষভাবে কলিকাতা বেতারের প্রোগ্রাম এবং অন্যান্য প্রচারগুলি—রবি হইতে শনিবার পর্য্যন্ত দয়া এবং কষ্ট করিয়া একবার শ্রবণ করুন, সব কিছু হাড়ে হাড়ে অনুভব করিবেন। এই কাজটি করিলে, অন্ত কাহাকেও কষ্ট করিয়া তাঁহাকে কলিকাতা বেতারের বে-তার তথা বে-তাল কি ভাবে চলিতেছে তাহা বুঝাইতে হইবে না।

আমরা সাগ্রহ প্রতীক্ষায় রহিলাম, বেতারের ব্যাধি-দূরীকরণে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কি ফলপ্রদ ঔষধ প্রয়োগ করেন, অচিরে তাহা দেখিয়া তাঁহাকে সাধুবাদ জানাইবার অবকাশের জন্ত।

ইংলিশ চ্যানেলের তলায় সুড়ঙ্গ

অবশেষে লণ্ডন এবং প্যারিস, অর্থাৎ ব্রিটিশ এবং ফরাসী সরকার একমত হয়ে দু'দেশের মধ্যে ট্রেণ চলাচলের জন্যে ইংলিশ চ্যানেলের নীচে সুড়ঙ্গ কেটে রেলপথ তৈরি করতে মনস্থ করেছেন। এই জলতলের রেলপথ নির্মাণের কাজ ১৯৭৫ সালে শুরু হবে এবং শেষ হ'তে পাঁচ-ছ' বৎসর লাগবে। জলের নীচেকার মাটিতে ট্রেঞ্চের মত কেটে তার মধ্যে কংক্রিটের বড় বড় টিউব বসিয়ে এই রেলপথ তৈরি করার কল্পনা হচ্ছে। আমেরিকার চিজ্যাপিক উপসাগরের নীচেকার সুড়ঙ্গ এই প্রণালীতে তৈরি।

পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু ১১০ তলার একজোড়া বাড়ী

বাড়ী দু'টি তৈরি হয় নি এখনও,—তৈরি হ'তে যাচ্ছে। নিউ ইয়র্কের বিশ্ব-বাণিজ্য-কেন্দ্রে (World Trade Centre) এই বাড়ী দু'টির নির্মাণের কাজ যখন শেষ হবে, তখন এরা উচ্চতায় হবে ১৩৫০ ফুট, অর্থাৎ সিকি মাইলেরও কিছু বেশি। এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংএর উচ্চতার চেয়েও ১০০ ফুট ছাড়িয়ে যাবে এরা।

এই বাড়ী দু'টি তৈরি করতে খরচ পড়বে, বেশি কিছু নয়, ১৭৫ কোটি টাকা।
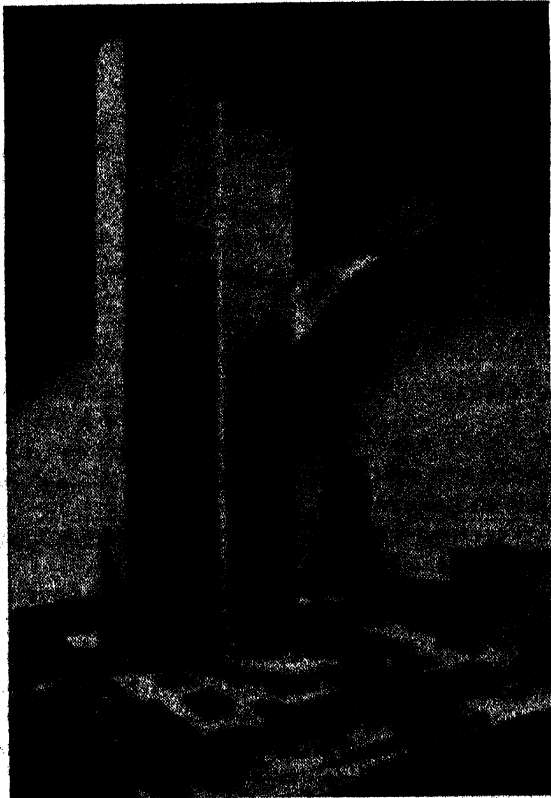
চিতাবাঘ

মাংসাশী জন্তুমাত্রেই সাহসী হয় না

প্রমাণস্বরূপ একটি সত্য ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। দার-এস-সালামের এক শস্যক্ষেত্রের পাশে একটি ঝোপের ছায়ায় তার ঘুমন্ত শিশু-সন্তানটিকে শুইয়ে রেখে একটি কৃষকবধূ ক্ষেতে নিড়েনি দিচ্ছিল। কাজের মধ্যেও সে চোখ রেখে চলছিল তার শিশুটির দিকে। হঠাৎ সে দেখতে পেল একটা চিতাবাঘ কোথা থেকে গুঁড়ি মেরে মেরে এসে তার সেই শিশুটিকে মুখে ক'রে নিয়ে পালাচ্ছে। ভয়ে এবং রাগে পাগলের মত হয়ে বধূটি প্রাণপণ শক্তিতে চীৎকার ক'রে উঠল। হয়ত তার আশা ছিল, বাঘটা ভড়কে গিয়ে তার শিশুটিকে ফেলে দিয়ে পালাবে। কিন্তু ফলটা হ'ল আশাতীত, বাঘটা প'ড়ে ম'রে গেল। শিশুটির গায়ে কামড়ের একটু দাগও যে লাগে নি, সেটা না বললে গল্পটা ঠিক শেষ হয় না। কিন্তু গল্প কথা নয়, ঘটনাটা সত্যি।

ডি ডি টি ও কার্বামেট

কীটনাশক ডি ডি টি প্রয়োগ ক'রে পৃথিবীর অনেক দেশ থেকে ম্যালেরিয়া উৎখাত করার কাজ বেশ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছিল। কিন্তু সম্প্রতি কিছুকাল ধরে ডি ডি টি এদিকে আর বিশেষ কাজে লাগছিল না, কারণ দেখা যাচ্ছিল যে, মশারা ডি ডি টির বিষ হজম করবার শক্তি অর্জন ক'রে ফেলেছে। কীট-কীটাণু-জীবাণু-জগতে এরকমটা প্রায়ই হয়। এদের বিষপ্রতিরোধ ক্ষমতা ক্রমশঃ বেড়ে যাওয়াতে বিষের ক্রিয়া নিস্তেজ হয়ে আসে।

ইতিমধ্যেই ম্যালেরিয়ার রোগ-জীবাণুবাহী এনোফিলিস- জাতীয় ৮৫ রকমের মশার ৩২টি জাতের মশার উপর ডি ডি টি ও ডিএল্‌ড্রিণ আর কাজ করছে না।

ক্যালিফোর্ণিয়া ইউনিভার্সিটির গবেষকরা কার্বামেট নামীয় কীট-নাশক একটি নূতন যৌগিক পদার্থ আবিষ্কার করেছেন। যে-সব [illegible] ডি টি ও ডিএল্‌ড্রিণ হজম করে ফেলতে পারে, কার্বামেটের [illegible] এই যে

কার্বামেটের বিষ হজম করবার ক্ষমতা যেসব মশাদের জন্মায়, ডি ডি টি ও ডিএল্‌ড্রিণের বিষ তাদের কাবু করতে পারে।

বৈদ্যুতিক দাঁতন

বৈদ্যুতিক ক্ষুরে দাড়ি কামানোর রেওয়াজ চালু হয়ে গিয়েছে। এবারে বৈদ্যুতিক টুথব্রাশ দিয়ে আপনি দাঁত মাজতে পারবেন। আপনার হাতের কাজ কমবে, আর দাঁত অনেক বেশি ভাল করে মাজা হবে। আপনার দন্তরুচির ওপর এই বৈদ্যুতিক টুথব্রাশ মিনিটে ১১, ২০০ বার ডাইনে-বাঁয়ে, উপরে-নীচে চলাচল করবে। হাতের জোরে ক'বার সেটা করতে পারেন, দেখুন।

হাতীর দাঁত

হাতীদের কি দাঁত প'ড়ে যায়? না। কোন দুর্ঘটনায় ভেঙে না গেলে, হাতীদের দাঁত, তারা যতদিন বেঁচে থাকে, সমানেই বাড়তে থাকে।

অনেকের যে ধারণা আছে, হাতীর দাঁত প'ড়ে গেলে আবার জন্মায়, এটা ভুল। যে দাঁত কোন কারণে ভেঙে প'ড়ে যায়, বা যে দাঁত তুলে ফেলতে হয়, সেটা কস্মিন্‌ কালেও আর জন্মায় না।

চৌবাচ্চায় মুক্তার চাষ

বিগত শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত মানুষকে সমুদ্রতল থেকে ঝিনুক আহরণ ক'রে বহু আয়াসে তাদের মধ্যে মুক্তার সন্ধান করতে হ'ত। যে-কারণে ঝিনুকের মধ্যে মুক্তা জন্মায়, সেটা দৈবাৎ ঘটে, কাজেই মুক্তার সন্ধানও দৈবগতিকে মিলত। প্রায়শই ডুবুরিদের বহু পরিশ্রম ব্যর্থ হ'ত।

যে-কারণটা দৈবাৎ ঘটত, সেটাকে ইচ্ছামতন ঘটিয়ে "পোষা" ঝিনুকদের দিয়ে মুক্তা উৎপাদনের কায়দা জাপানীদের আবিষ্কার। সমুদ্রের কতগুলি নির্দিষ্ট জায়গায় এই উদ্দেশ্যে ঝিনুক "পোষা" হয়, এবং সময়মত সেগুলিকে তুলে নিয়ে যে মুক্তা আহরণ করা হয়, ইংরেজীতে তাকে বলা হয় **Cultured Pearl** বা চাষ করা মুক্তা।

বুদ্বুদ সাবমেরিণ

সম্প্রতি জাপানের "জাতীয় মুক্তা গবেষণা পরীক্ষাগারে" ওয়াই কুওআটালি এবং তাঁর সহকারীরা চৌবাচ্চায় ঝিনুক পুষে তাদের দিয়েও অনুরূপ উপায়ে মুক্তা উৎপাদনে সমর্থ হয়েছেন। ব্যাপক ভাবে এই প্রথার প্রচলন হবার মত অবস্থা এলে মুক্তা-উৎপাদকদের আর সমুদ্রের মেজাজের উপর নির্ভর ক'রে থাকতে হবে না, ঝড়-তুফান, জোয়ারের জোয়ার্হ্রাস ইত্যাদির ভাবনা থেকে তাঁরা মুক্ত হ'তে পারবেন। সমুদ্র-তলে পোষা ঝিনুকদের খুঁজে বেড়াবার পরিশ্রম থেকেও তাঁরা অব্যাহতি পাবেন।

প্রথাটা এখনই খুব ব্যাপকভাবে প্রচলিত হ'তে পারছে না এইজন্যে যে, ঝিনুকরা কি খেয়ে বাঁচে সেটা কারুর জানা নেই। তবে সে-বিষয়ের পরীক্ষাও অনেকটাই সফলতার দিকে এগিয়েছে।

সবচেয়ে বেশি চাহিদার ওষুধ

১৯৬৩ সালে পৃথিবীতে যত ওষুধ বিক্রি হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি টাকার বিক্রি হয়েছে এনোবিদ (Enovid) নামক একটি ওষুধ। এটি স্ত্রীলোকদের সেব্য জন্মনিয়ন্ত্রণের একটি বটিকা। ঐ বৎসর জন্ম-নিয়ন্ত্রণ বটিকার বিক্রির পরিমাণ প্রায় তেরো কোটি টাকা।

বুদ্বুদ সাবমেরিণ

ব্রিটেনে তৈরি এই ক্ষুদ্রকার সাবমেরিণটিতে দু'জন লোক পিঠো-পিঠি বসতে পারে। এর দেহের প্রায় সমস্তটাই স্বচ্ছ প্লাস্টিকের ব'লে এর বুদ্বুদ সাবমেরিণ নামকরণ সার্থক। সমুদ্রতল পর্যবেক্ষণের পক্ষে এর উপযোগিতা যে কত বেশি তা বোঝা কিছুই শক্ত নয়। এই সাবমেরিণটিতে যন্ত্রপাতির বাহুল্যও কিছু নেই। চালকের দু'দিকে দু'টি ব্যাটারী-চালিত মোটরের সাহায্যেই একে উপরে নীচে, ডাইনে বাঁয়ে, সমুখে পিছনে স্বচ্ছন্দে চালিয়ে নেওয়া যায়। ডানদিকে ঘুরতে চান, সেদিককার মোটরটিকে বন্ধ ক'রে দিন। চট্ ক'রে ঘুরতে যদি চান ত মোটরটিকে উল্টো ক'রে চালান।

বদলে বসানো শারীরযন্ত্র

মানুষের কোন কোন শারীরযন্ত্র, বিশেষ করে বুক বা কিড্‌নী এক দেহ থেকে অন্য দেহে আরোপিত করবার চেষ্টায় যেসব সার্থক অস্ত্রোপচার বিগত কয়েক বৎসরে করা হয়েছে তার সংখ্যা বেশ কয়েক শ' হবে। কিন্তু যাদের উপর এই অস্ত্রোপচার করা হয়েছে তারা বাঁচেন কি।

অধিকাংশ রোগীই অস্ত্রোপচারের পর এক বৎসর অতিক্রান্ত হবার আগেই মারা গেছেন। তবু চেষ্টার বিরাম নেই, এই জাতীয় অস্ত্রোপচার হয়েই চলেছে। সদ্যমৃত ব্যক্তির দেহ থেকে অবিকৃত হৃদ্‌যন্ত্র নিয়ে কর্কট-রোগগ্রস্ত ব্যক্তির দেহে বদলে বসাবার চেষ্টা অতি শীঘ্রই করা হবে। কৃত্রিম শারীরযন্ত্র নির্মাণের কল্পনাও বেশীদিন কল্পনার পর্যায়ে থাকবে ব'লে মনে হচ্ছে না।

স. চ.

দোতলা রাস্তা

দোতলা বাসের মত দোতলা রাস্তার কথাও আজ উঠেছে। শুধু কথা নয়, কাজেও তা হচ্ছে, এবং হয়েছে। আমেরিকার লস্‌ এঞ্জেলিস্‌-এ তার নিদর্শন। রাস্তার উপরে এই আরেক রাস্তা পরিবহনের এক নূতন দিক্‌ খুলে দিয়েছে। ইতিপূর্বে আমরা পঞ্চশস্য বিভাগে চাই—কলকাতার লোকদের তা ব্যাখ্যা করার অপেক্ষা রাখে না। রাস্তার উপরে বসালে এই মনোরেলে পরিবহনের সমস্যা একটা নূতন দিক্‌ খুঁজে পায়। এই সমস্যা আরও সহজ হয় যদি গোটা রাস্তাটাই দোতলা হিসাবে গ'ড়ে তোলা যায়। দেখা যাচ্ছে তাও আর আর অসম্ভব নয়, লস্‌ এঞ্জেলিস্‌-এ তা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এ সমস্ত অভিনব রাস্তা তৈরির সমস্যা অনেক সময় অন্য দিক্‌ থেকেও আসতে পারে। সম্প্রতি লণ্ডন থেকে ওয়েল্‌স্‌-এ যে দোতলা রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে তার কথাটাই ধরা যাক না। জনবহুল অঞ্চল, পুরাণো যে রাস্তাটা রয়েছে তা অল্প কয়েকদিনের জন্য বন্ধ রাখারও উপায় নেই—লোকের দৈনন্দিন জীবন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে; রাস্তার যান ও জনপ্রবাহ কোনরকম ব্যাহত না করেই কাজে অগ্রসর হ'তে হবে। কাজের অসুবিধাগুলি সহজেই অনুমেয়। কিন্তু স্ট্রাক্‌চারাল ইঞ্জিনিয়ারিং (তথাকথিত সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং) অনেক দূর এগিয়ে গেছে। কংক্রীটের কাজ-কর্ম আজ আসল জায়গা থেকে অনেক দূরে ফ্যাক্টরীতে সম্ভব হয়ে উঠেছে। প্রি-কাষ্ট কংক্রীট (Pre-cast concrete) একটা

দোতলা রাস্তা

[মনোরেলের কথা আলোচনা করেছিলাম। মনোরেল একটি মাত্র রেল সাধারণ রেলের মত জোড়া রেল নয়। এ ধরণের রেল যদি রাস্তার উপরে বসান যায়, সুবিধাগুলি সহজেই অনুমেয়। গাড়ি-ঘোড়া থাকলেই তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় না, রাস্তা যত চওড়াই থাক তা পরিষ্কার থাকা

অনন্য-সাধারণ পদ্ধতি। যেখানে বাড়ী নেই, ফাঁকা মাঠ, সেখানেও আজ "রাতারাতি" বাড়ী তৈরি সম্ভব হচ্ছে। বাড়ীর বিভিন্ন অংশগুলি অন্য জায়গায় কংক্রীটে জমিয়ে তুলে পরে একত্র করে জোড়া। গল্পে আলাদীনের দৈত্য বোধহয় এভাবেই প্রি-কাষ্ট কংক্রীটের রাজপ্রাসাদ

তৈরি করেছিল। পরের কথা থাক, তোমরা যাতায় এই মিনিকার্ট পদ্ধতিই কাজে লাগান হচ্ছে।

এর একদিন বাজারে নেমে এসেছে।

মানুষ : নূতন কয়েকটি পরিসংখ্যান

পপুলেশন একস্‌প্লোশন (Population explotion) বা "জনসংখ্যার বিস্ফোরণ" নামে একটা কথা সম্প্রতি বড় চালু হয়েছে। বিস্ফোরণ মানে অল্প সময়ে অধিক শক্তির প্রকাশ। শক্তির বিস্ফোরণের মত পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যাও আজ হু হু করে বেড়ে উঠছে—বিস্ফোরণের মতই তা দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে। "জনসংখ্যার বিস্ফোরণ" পরমাণুর বিস্ফোরণের মতই গুরুতর সমস্যা। পৃথিবীর জরিপ-চিহ্নিত মাটিতে মানুষের চাপ ক্রমশ বাড়ছে। আমাদের অর্থনীতি, সমাজনীতি, দৈনন্দিন জীবন, সমস্তই এতে প্রভাবিত হচ্ছে। পৃথিবীতে নূতন আগন্তুক মানুষ মোটেই অনভিনন্দিত নয়—নবজাতকের আবির্ভাবে মঙ্গল-শাঁখই বাজে, কিন্তু সমস্যার পরিধিটাও সে-সঙ্গে বুঝে নেওয়া চাই, সে অনুযায়ী প্রস্তুত হওয়া চাই—নূতন মনোভঙ্গি, নূতন পদ্ধতি আয়ত্ত করে পৃথিবীর সম্পদ্ বাড়িয়ে তুলতে হবে। পৃথিবীকে আমরা যতখানি বড় বলে জানি আসলে তা থেকে অনেক, অনেক বড়। মানুষের উদ্যোগ আজ গ্রহের সীমানা ছাড়িয়ে মহাকাশের দিকে প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু এখানেই পৃথিবীর বুকে আজও অনন্ত রহস্য বাঁধা পড়ে আছে। অনেক শক্তি ও সম্পদের উৎস মানুষের কাছে অজ্ঞাত রয়েছে। লোকের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সীমানাটাও তখন বাড়িয়ে তুলতে হবে।

মানুষের সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য জোগাড় করা এই ভবিষ্যৎ প্রস্তুতিরই একটা অংশ। জাতিসংঘ (United Nations) তার প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এ বিষয়ে তৎপর হয়েছেন। প্রতি বছর তাঁরা একটি পরিসংখ্যান বর্ষলিপি (Statistical Yearbook) প্রকাশ করে আসছেন। মানুষ-সংক্রান্ত একটা পুরোপুরি বিবরণ—তার অর্থনীতি, সমাজনীতি এবং অন্যান্য রীতিনীতি তথ্যবিস্তার এই বর্ষলিপিগুলিতে সংগ্রহ করা হয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত সংখ্যাটি থেকে (পঞ্চদশ সংস্করণ) কিছু কিছু তথ্য এখানে তুলে ধরা হ'ল।

জনসংখ্যা। ১৯৬২ সালের মাঝামাঝি সময়ে পৃথিবীর লোকসংখ্যা ৩১৩'৫ কোটি। ১৯৫০ সাল থেকে মাত্র ১৮ বছরে পৃথিবীর লোকসংখ্যা ২৫ শতমিক (বা শতকরা ২৫ ভাগ) বৃদ্ধি পেয়েছে। বলা বাহুল্য, "জনসংখ্যার বিস্ফোরণ" কথাটার ব্যবহার খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই বিস্ফোরণ এশিয়া মহাদেশেই বিশেষভাবে অনুভূত। পৃথিবীর ৫৩ শতমিক লোকই এই মহাদেশে বাস করছে।

বছরে গড়ে ২ শতমিক করে লোকের সংখ্যা বাড়ছে।

(রাশিয়া বাদে) ইউরোপই হ'ল পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল। লোকসংখ্যা প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে ৮৮ জন। সবচেয়ে কম বসতি হ'ল ওসেনিয়ায় (২ জন মাত্র প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে)। পৃথিবীতে লোক-বসতির গড় হ'ল প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে ২৩ জন।

কয়লা ও পেট্রোলিয়াম। সভ্যতার এই দুই ধারক ও বাহক। কয়লার উৎপাদন ১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৬২ সালের মধ্যে ৩৫ শতমিক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ১৯৬১ সাল থেকে তা বেড়েছে ২ শতমিক। কয়লা উৎপাদনে চারটি অগ্রণী রাষ্ট্র—আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, এবং জেকোস্লোভাকিয়া।

ক্রুড (Crude) পেট্রোলিয়াম ১৯৬১ সালের তুলনায় ৮ শতমিক বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং ১৯৫৯ সাল থেকে তা বেড়েছে ৮২ শতাধিক। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া পৃথিবীর প্রধান দু'টি তেল-উৎপাদনকারী দেশ।

লৌহ আকরিক। ১৯৬২ সালে পৃথিবীর ইস্পাত (Crude Steel) উৎপাদন ৩৩'১ কোটি মেট্রিক টন, ১৯৬১ সালের তুলনায় তা ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন বা ৩ শতমিক বেশি। ১৯৬১ থেকে এক বছরের মধ্যে রাশিয়ার ইস্পাতের উৎপাদন ৫০'৫ লক্ষ মেট্রিক টন বৃদ্ধি পায়।

তন্তুজ জিনিষ। ১৯৬১ সালের তুলনায় ১৯৬২ সালে তুলা ও উল-জাত জিনিষের ব্যবহার অনেক কমে গেছে। কাপড় তৈরি ছাড়াও তুলার একটা শিল্পগত (Industrial) ব্যবহার আছে। ১৯৫৯/৬০ সালের তুলনায় তুলার এই ব্যবহারটিও কমের দিকে। প্রকৃতিজাত তন্তুজ কাপড়ের পরিবর্তে সেলুলোজ এবং অ-সেলুলোজ (Non-cellulosic) উৎসজাত নানা ধরণের কাপড়ের ব্যবহার এখন আশ্চর্য হারে বেড়ে উঠছে। এ ধরণের জিনিষগুলির মধ্যে রেয়ন ও নানা শ্রেণীর অ্যাসিটেট ফিলামেন্ট (Acetate Filament—continuous and discontinuous) নাইলন, ওরলন ইত্যাদি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রেয়ন এবং অ্যাসিটেট তন্তুগুলি সেলুলোজ-জাত, ১৯৪৮ সালের বার্ষিক উৎপাদন ১১'৫ লক্ষ মেট্রিক টনের জায়গায় ১৯৬২ সালে ২৮'৬ লক্ষ মেট্রিক টন বার্ষিক উৎপাদন—১৫ বছরে আড়াইগুণ উৎপাদন বৃদ্ধি। নাইলন, ওরলন ইত্যাদি অ-সেলুলোজ তন্তু, ১৯৪৮ সালে ৩৪ হাজার মেট্রিক টনের জায়গায় ১৯৬২ সালে ১১ লক্ষ মেট্রিক টন বার্ষিক উৎপাদন—প্রায় ৩২ গুণ উৎপাদন বৃদ্ধি।

শক্তি। জাতিসংঘের বর্ষলিপিতে শক্তির উৎপাদন ব্যবহার এবং উৎপাদনের বিভিন্ন উৎস সম্বন্ধে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। শক্তি উৎপাদনের উৎস প্রধানত এই কটি—কয়লা এবং লিগনাইট (Lignite), ক্রুড পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং জল-বিদ্যুৎ (Hydro-electricity)। কয়লাজাত শক্তির সঙ্গে তুলনায় পরিসংখ্যানের হিসাব তৈরি করা হয়েছে—অর্থাৎ নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি-উৎপাদনের জন্য কতখানি কয়লার প্রয়োজন, সে হিসাবটাই মেট্রিক টনের মাপে দেওয়া হয়েছে (শক্তির মাপ অন্য রকম, কয়লার মাপে তার মাপ হয় না, শুধু কয়লার সঙ্গে তুলনা করে বিভিন্ন উপায় জাত শক্তি সম্বন্ধে ধারণা দেওয়ার জন্য কয়লার সঙ্গে তুলনা করে হিসাব রাখা হয়েছে)। ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৬২ সালের মধ্যে গত ৮ বছরে শক্তির উৎপাদন দেড় গুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫৪ সালে মোট যা শক্তির উৎপাদন হয়েছে, শুধু কয়লা থেকে তা সম্ভব হ'লে ৩০২'৫ কোটি মেট্রিক টন কয়লার প্রয়োজন হ'ত। ১৯৬২ সালের পক্ষে এই সংখ্যা ৪৪৩'৬ কোটি মেট্রিক টন।

পরিবহন। মানুষের কর্মচাঞ্চল্য ও সমৃদ্ধির লক্ষণ। রেল, মোটর গাড়ি, বাণিজ্য-জাহাজ এবং অসামরিক বিমান-বহর—পরিবহনের এ চারটি প্রধান উপায়। রেলপথে মাল পরিবহন ১৯৪৮ সালের তুলনায় ১৯৬২ সালে প্রায় ১'৯ গুণ বেড়ে গেছে। ১৯৬২ সালের মোট মাল পরিবহন—৩৩১৯'৮ হাজার কোটি টন-কিলোমিটার (টন-কিলোমিটার নূতন একটি পরিমাপ-বোধক একক, জিনিষের ওজন এবং উহাকে পরি-

বহন দূরত্ব এত কিলোমিটার দিয়ে গুণ করলে যা হয় তা হ'ল টন-কিলোমিটার, উদাহরণ—২ টন ওজনের একটা জিনিষ শিয়ালদহ থেকে যাদবপুর ৭ কিলোমিটার পথ গেল, এখানে টন-কিলোমিটার—২×৭=১৪)।

মোটর গাড়ির সংখ্যাও ক্রমশ বাড়তির মুখে। যাত্রীবাহী বাসের সংখ্যা ১৯৬১ সালের তুলনায় ১৯৬২ সালে ৬ শতমিক বেশি, এবং মালবাহী গাড়ির পক্ষে এই বৃদ্ধি ১'৫ শতমিক।

বাণিজ্য-পোত—ষ্টীমশিপ এবং মোটরশিপেও মাল পরিবহন অনেক বেড়ে গেছে। ১৯৬৩ সালে মোট মাল পরিবহন ১৪'৬ কোটি টন, ১৯৬২ সালের তুলনায় তা ৪ শতমিক বৃদ্ধি এবং ১৯৫৮ সালের তুলনায় ২৪ শতমিক বেশি।

বিমান পরিবহনও বৃদ্ধির মুখে। ১৯৬২ সালে পৃথিবীর সমস্ত অসামরিক বিমান মিলে ৩২৪ কোটি কিলোমিটার পথ আকাশে উড়েছে। ১৯৬১ সালের তুলনায় তা ৪ শতমিক বেশি, এবং ১৯৫৬ সালের তুলনায় ২৮ শতমিক। ১৯৬১ সালে বিমানে যাত্রী পরিবহন ১১৭০০ যাত্রী-কিলোমিটার (যাত্রীর সংখ্যা × কিলোমিটার হিসাবে দূরত্ব), ১৯৬২ সালে তা ১৩০০০। (রাশিয়া এবং মূল ভূখণ্ড চীন এ হিসাব থেকে বাদ পড়েছে)। বিমানে চিঠির আদান-প্রদানও ক্রমশ বাড়ছে। ১৯৬২ সালে তার পরিমাণ ৮০০ টন-কিলোমিটার। ১৯৫৩ সালের তুলনায় তা ১১ গুণ।

মানুষের সম্পদ, কর্মচাঞ্চল্য এবং উন্নতির নিদর্শনগুলি যখন পরিসংখ্যানের হিসাবে বাঁধা পড়ে তখন তা নিরস হ'তে বাধ্য। তবে এ সমস্ত হিসাবের মধ্যেই আমরা আমাদের ক্ষমতা ও সম্ভাবনার উৎসগুলি আর একবার যাচাই করে নিতে পারি। তখন এ বিশ্বাসই আমাদের ফিরে আসে, মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধিতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, পৃথিবীতে জমিন সে অনুপাতে প্রস্তুত করে তুলতে হবে। তবে সেই সঙ্গে "জন-সংখ্যার বিস্ফোরণ"-কেও সংযত করতে হবে।

এ. কে. ডি.

শ্রীচিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও পরিকল্পনার সাফল্য

কিছুদিন পূর্বে আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উদ্যোগে দেশ থেকে দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করবার চেষ্টা সুরু হয়েছে। এই সূত্রে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বেতার-ভাষণের কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি (বেতার জগৎ, ২২ মে, ১৯৬৪)

"একটা কথা ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে যে, জাতীয় জীবনের বহু ক্ষেত্রেই আজ আবহাওয়া কলুষিত হয়ে পড়েছে। নাগরিকদের সঙ্গে প্রশাসনিক আচরণের ক্ষেত্রে একটা সাধারণ অভিযোগ শোনা যায় যে, 'বেআইনীভাবে খুশী করা' অথবা অসঙ্গত প্রভাব বিস্তার করা ছাড়া, কোথাও কোন কাজ প্রায় অসম্ভব।···

দুর্নীতির ব্যাপক প্রসারকে একটা অপ্রতিরোধ্য বাস্তব বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। অথচ শাসনযন্ত্রে এবং বাণিজ্যজগতে এই দুর্নীতি যে ক্রমেই একটা ভাঙন ধরাচ্ছে এবং জাতির সামাজিক, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক হানি ঘটাচ্ছে এ ব্যাপারে সবাই সচেতন, গভীর উদ্বেগবোধেরও অভাব নেই। এই সমস্ত বিবৃতি থেকে মুক্তি পাওয়া জাতীয় সংহতির মান বজায় রাখার ব্যাপারে চূড়ান্ত ব্যর্থতার ফলে, লোকের মনোবল ভেঙে পড়ছে। জনজীবনের মেরুদণ্ড শিথিল হয়ে পড়ছে।···

সবচেয়ে শোচনীয় পরিস্থিতি হয়েছে এই যে—লোকে কোনরকম উন্নতির আশা, অথবা দেশ থেকে দুর্নীতি দূর হবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে নৈরাশ্যজনক ভাবে উদাসীন হয়ে পড়ছে। এটা একটা প্রকৃত দুশ্চিন্তার বিষয়। এর সঙ্গে জাতীয় জীবনের ভিত্তিগত প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে।······জনজীবনে একটা ব্যাপক অনাস্থাবোধের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। জীবনের বহুক্ষেত্রেই দুর্নীতি-বিষ ঢুকেছে, এটা একটা প্রচলিত বিশ্বাস। কে. শান্তনম্-এর নেতৃত্বে গঠিত দুর্নীতি-নিরোধ কমিটির রিপোর্টে উদ্বেগজনক পরিস্থিতির বিবরণ পাওয়া যায়। জনসাধারণের অর্থ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার যে ছবি এতে পাওয়া গেছে, সেটা জাতির অর্থনৈতিক প্রগতির পক্ষে অন্তরায়, জনস্বার্থের পরিপন্থী।···

···শাসন-যন্ত্রের সম্পূর্ণ শোধন এবং নৈতিক পরিবর্তনের জন্য দুর্নীতি-বিরোধী সংগ্রামকে সার্থক করে তুলতে হবে।"

স্বাধীনতা লাভের পর ১৭ বছর এবং পরিকল্পনা-পর্বের ১৩ বছর অতিবাহিত হবার পর, প্রশাসনিক শৈথিল্য ও দুর্নীতি যখন চরম পর্যায় পৌঁছেছে এবং দেশবাসীর মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, নাগরিক জীবনের সামান্যতম অধিকারটুকু বজায় রাখতে হ'লে কোন-না-কোন প্রকারে দুর্নীতি বা 'প্রভাব বিস্তার'-এর আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় নেই, তখন স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই উক্তি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ তিন-চার বছরের মধ্যেই দুর্নীতির প্রভাব দেশের প্রতিটি রন্ধ্রে প্রবল ভাবে প্রবেশ করে, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর অভাব এবং সেই সঙ্গে নোট ছেপে সরকারের কাজ নিষ্পন্ন করার অত্যাবশ্যক তাগাদা, এর অনিবার্য ফল দেখা দেয় সমাজের সর্বস্তরে। এ কথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না যে, দেশের একদল লোক প্রায় ভিখারীর পর্যায়ে পরিণত হয়; চাল-চিনি সংগ্রহ থেকে আরম্ভ করে ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করা, রোগীকে ডাক্তার দেখান বা হাসপাতালে ভর্তি করা, রেলের টিকিট সংগ্রহ করা, সব ক্ষেত্রেই তারা একদল 'প্রভাবশালী' লোকের কাছ থেকে অনুগ্রহ পাবার আশায় থাকতে শিখল নিতান্ত প্রাণ-ধারণের দায়ে। আরেক দল শিখল যে, হাতে টাকা থাকলে আর কোন ভাবনা নেই; ন্যায়-অন্যায়-এর সীমারেখা মিলিয়ে গেল টাকার সর্বগ্রাসী প্রভাবে।

ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে সর্বসাধারণের স্বার্থ বিসর্জন দেবার প্রবৃত্তি যুদ্ধপূর্বকালেও অজানা ছিল না, এবং এই প্রবৃত্তি সব দেশের মানুষের মধ্যেই অল্পবিস্তর ছিল। পরাধীন ভারতবর্ষে অনেকেরই এই ধারণা ছিল "কোম্পানীর টাকা দরিয়া"য় ঢেলে দেওয়াতে কোন অন্যায় নেই, কারোর কোন স্বার্থহানিও হয় না। যুদ্ধের কয় বছরে যে বিষ দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল তার অনিবার্য প্রভাব এসে পড়ল যুদ্ধোত্তর পর্বের পুনর্গঠনের যুগে এবং দেশের নূতন মানুষদের ওপর,— আজ যারা স্কুল-কলেজে পড়ছে বা সবেমাত্র কাজে প্রবেশ করছে। কনিষ্ঠদের একশ্রেণীর মধ্যে দুর্বিনীত ব্যবহার নিয়ে আজ বয়োবৃদ্ধদের দুশ্চিন্তার অভাব নেই কিন্তু এই সব ছেলেমেয়েরা তাদের জন্মের পর থেকে যে আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হয়েছে তার সম্মিলিত ও একক দায়িত্ব যে সমাজের বয়স্ক লোকদের সকলের ওপরেই এসে পড়ে, সে কথা বোধ হয় আমরা ভেবে দেখতে চাই না।

স্বাধীনতার পর থেকে দেশ পুনর্গঠনের জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে নানান খাতে; টাকা আজ সহজলভ্য একদল লোকের কাছে। টাকার ক্রমহ্রাসমান মূল্য, নিত্য-প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহের জন্য সময় ও শ্রমের অপচয় এবং তারই সঙ্গে প্রায় সব সময় নিত্য-ব্যবহার্য পণ্যের গুণগত অবনতি, এই সব কিছুর প্রভাবে আজ বেশির ভাগ লোক ক্লান্ত এবং উদ্‌ভ্রান্ত। অভাবের সঙ্গে স্বভাব নষ্ট হবার যাবতীয় লক্ষণ সমাজে লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

Material progress-এর আগ্রহে আমরা একটি জিনিষকে এ যাবৎ অবহেলা করে এসেছি, সেটি হচ্ছে human material! আজ যে Code of Conduct-এর কথা শান্তনম্ কমিটি বলেছেন সেই Code-এর কথা এতকাল কেউ ভাববার সময় পান নি, সকলেই ভেবেছেন, দেশ গঠনের বিরাট্ কাজে কিছু স্খলন-পতন অনিবার্য, বড় কাজের খাতিরে ছোট কথা নিয়ে ভাবতে গেলে চলে না। ব্রীজ তৈরি শেষ হ'লে কাগজে বেরোয়, কাজ ahead of schedule সমাপ্ত হ'ল; কয়মাস বাদে যখন সেই ব্রীজ ভেঙে পড়ছে (এ রকম দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে বিরল নয় বরং কিছু বেশিই) বলে যখন সংবাদ পাওয়া যায় তখন সেটি কার দোষে হ'ল তাই নিয়ে কারোর মাথা ব্যথা দেখা যায় না, দোষীকে দণ্ড দেবার প্রস্তাব ত দূরের কথা। উর্ধ্বতর পঙক্তিতে দেখা গেছে যে, কোন গণ্যমান্য ব্যক্তি যখন এই ধরণের কোন অভিযোগের সম্মুখীন হয়েছেন, তিনি আশ্রয় পেয়েছেন তাঁর মুরুব্বীর কাছে; নিরপেক্ষ তদন্তের সব দাবি অগ্রাহ্য করা হয়েছে "Efficiency"র দোহাই দিয়ে।

যাঁরা আজ সরকারের তরফে বাড়ী-ঘর বা ব্রীজ বা রাস্তা নির্মাণের কাজে লিপ্ত আছেন তাঁরা জানেন বিল করতে হবে মোটা অঙ্কের, তার বেশ বড় এক অংশ দপ্তরেই রেখে আসতে হবে; সিমেণ্ট, লোহা, কিছু "বাজারে" বিক্রি করতে হবে, তা না হ'লে "পড়তা" থাকে না। এই রকম চলেছে সর্বস্তরে। চালের ব্যবসায়ী কাঁকর মিশিয়ে ওজন বাড়াচ্ছে, গোয়ালা দুধে জল মেশাচ্ছে, ভাড়াটে বাড়ীয়ালাকে 'সেলামি' দিচ্ছে, জমির ক্রেতা যে দামে লিখিত চুক্তি করছে তার থেকে বেশি টাকা দিচ্ছে অলিখিত চুক্তিতে; পারমিট্ জোগাড়ের জন্য অদৃশ্য লেনদেন চলেছে নির্বিবাদে, অফিস থেকে সময়মত বিলের টাকা পাবার জন্য খরচ করতে হচ্ছে—আর এই সব বাড়তি খরচ উশুল হচ্ছে আখেরে ক্রেতার কাছ থেকে। দেশের মূল্যমানের ওপর এই "black money"র প্রতিক্রিয়া কতদূর বিস্তৃত সেই তদন্ত কি কোনদিন হয়েছে?

মূল্যবৃদ্ধি এবং পণ্যের গুণগত অবনতি দুইই চলেছে সমান ভাবে। খাদ্যে বা ওষুধে ভেজাল "প্রমাণিত" হ'লে তার শাস্তি কয়েক শ' টাকা মাত্র! সেই জরিমানা দিয়ে তার বহুগুণ টাকা জনসাধারণের কাছ থেকে তুলে নেবার জন্য একদল ব্যবসায়ী উদ্‌গ্রীব। মাঝে মাঝে আমরা কাগজে দেখি, আটায় পাথরগুঁড়ো মিশিয়ে দেবার দায়ে কোন ব্যবসায়ী 'গ্রেপ্তার' হয়েছেন; পরবর্তী খবরটা আমরা পাই না, আজকাল জানবার আগ্রহও হয় না। শিশি-বোতলগুলি আমাদেরই ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে অবাঞ্ছিত হাতে আর সেখান থেকে ভেজাল ওষুধ ইত্যাদি বাজারে আসছে বিনা বাধায়, দু-চার জন ধরা পড়ছে কিন্তু ছাপ দেওয়া শিশি-বোতল যাতে উৎপাদকেরই হাতে পৌঁছয় তার জন্য স্বয়ং উৎপাদকও কোন ব্যবস্থা করতে অনিচ্ছুক। সরকারও কোন ব্যবস্থা করতে পারছেন না।

যাঁরা আজ শাসনের গুরুভার বহন করছেন তাঁরা নির্বাচনের সময়ে ন্যায়-অন্যায়-এর সীমারেখা যেভাবে লঙ্ঘন করেন, সে কথা আজ সর্বজনবিদিত। দেশের লোককে যেখানে "Emergency"র জন্য বলা হচ্ছে—

"রক্ত চাই, অন্ন চাই, টাকা চাই, সোনা চাই"—সেখানে দেশশাসকরা চেষ্টায় আছেন কি ভাবে দৈনিক ভাতা বাড়ানো যায়; এর জন্য সরকার কেবলমাত্র দল বেঁধে হাত তোলা। বিনা ভাড়ায় বাড়ী পাওয়া যায় ব'লে মন্ত্রীর বাড়ীতে Electricity-র মাসিক বিল হয় ২০০০ টাকা। টেলিফোন বিনা পয়সায় পাওয়া যায় ব'লে বিল হয় ৬০০০ টাকা। এককালে নিয়ম ছিল, কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান কোন রাজনৈতিক দলকে টাকা দিতে পারবেন না; ১৯৫৬-র Indian Companies Act-এ দেওয়ার নিয়মটি চালু হ'ল; কংগ্রেসের "চার আনা"র সদস্য সংগ্রহের চেষ্টা গেল মিলিয়ে; এর বিরুদ্ধে যখন দেশবাসী প্রতিবাদ করলেন তখন অনায়াসে সেই প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করা হ'ল; এর বিষময় প্রতিক্রিয়া কতদূর যেতে পারে আজ সেকথা সরকার সবেমাত্র ভাবতে সুরু করেছেন। এই টাকার জোরে তিন দিনের বাৎসরিক "তামাসা"র (হাতীর পিঠে চড়ে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট সভায় আসেন) জন্য কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় হচ্ছে অকাতরে, আর সেই তামাসায় প্রস্তাব পাশ হচ্ছে যে, সমাজতান্ত্রিক দেশ (আজকাল শুধু সমাজতান্ত্রিক বা গণতান্ত্রিক বললেও হবে না, বলতে হবে "গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদ" বা "সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রবাদ") গঠন করতে হবে!! যে দেশে প্রতি তিন টাকার মধ্যে এক টাকা হচ্ছে PL 480 Deposits-এর টাকা (মাত্র কয় বছর আগে অবস্থা ছিল বিপরীত, ষ্টার্লিং ব্যালেন্স-এর মোটা অঙ্ক নিয়ে আমরা যখন দেশ পুনর্গঠনের কাজে লাগলাম), সে দেশে এক-একটি সরকারী বাড়ীর জন্য যে বিপুল ব্যয় করা হয় তার সমস্তটাই বাড়ীর আয়ু দীর্ঘ-তর করার জন্যই কি না সে প্রশ্ন মনে আসা স্বাভাবিক।

"জনসংযোগ"-এর খাতিরে মন্ত্রীদের অন্যতম কাজ হ'ল "দ্বারোদ্ঘাটন" করা বা "ভিত্তিপ্রস্তর" স্থাপন করা; সমাজের যাঁরা মুরুব্বী তাঁরাও জানেন যে যথেষ্ট "Publicity" দিতে হ'লে একজন মন্ত্রীকে আনা একান্তই প্রয়োজন। এই রকমের এক-একটি সভায় যে পরিমাণ টাকা অকারণে ব্যয় হয় তার হিসাব করা হয় না এই ভেবে যে, ঐ টাকা দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে অতি সামান্য। দেশের কাজে মন্ত্রীদের ভ্রমণ করতে হয় অনেক, তার জন্য আকাশচারী হ'তে হয়, নয় ত "এয়ারকণ্ডিশন্" রেলগাড়ি, নয় ত "স্পেশাল" ট্রেন। এর জন্য যে অর্থব্যয় হয় তা Incidental

হয়; মন্ত্রীদের সময়ের মূল্যও অনেক, আর "জনসংযোগ" করতে হ'লে আরামে ভ্রমণ না করলে ত সেটা সম্ভব হয় না।

কিছুদিন পূর্বে দিল্লীর সেক্রেটারিয়েট সম্বন্ধে আলোচনা-সূত্রে এক সাংবাদিক একটি কথা ব্যবহার করেছিলেন,—"Light-hearted Bureaucracy।" —দেশ গঠনের বিরাট্ দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে যেসব কর্মক্লান্ত Top Executives-রা কাজ করছেন তাঁরা রাস্তার লোকদের থেকে কিছু বেশিরকম সুযোগ-সুবিধা পাবার অধিকারী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু—গান্ধীজীর দেশে—সেই সুযোগ-সুবিধা এবং তারই সঙ্গে তাঁদের কাজের মোট ফলাফল-এর সামঞ্জস্য কতখানি থাকছে তাই নিয়ে কারোরই ভাববার অবকাশ নেই। বিদেশে ভারতীয় দূতাবাসগুলির অপচয় এবং নিষ্ক্রিয়তার বিবরণ প্রায়ই বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ কাগজে প্রকাশিত হয়েছে, কোন প্রতিবিধান হয় নি।

অপর দিকে সরকারী কাজে যাঁরা নিচের দিকে আছেন তাঁদের কাছ থেকে সরকার বা দেশশাসকরা কি আশা করেন?

"লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক" মাইনে পাবেন ১৩০৲ বা ১৫০৲ টাকা; বহুকাল "ডিয়ারনেস অ্যালাউয়েন্স" দিয়ে যুদ্ধপূর্ব মূল্যমানের সঙ্গে একটা ক্ষীণ যোগসূত্র রাখবার চেষ্টা করবার পর "Basic Pay" বাড়ানো হয়েছে; Dearness Allowance রদ করা হয়েছে। এই শ্রেণীর ক্ষুদ্র কর্মচারীর কাছ থেকে আমরা আশা করছি Ideal Code of Conduct এবং দেশের জন্য আত্মোৎসর্গীকৃত কাজের নিষ্ঠা। যুদ্ধোত্তর পর্বে সরকারী দপ্তরে কাজের মান যে ভাবে নেমে গেছে তার মূলে, একদিকে যদি থাকে আমাদের সহজাত কর্মবিমুখতা, আরেক দিকে আছে এই সব নিম্ন-আয় কর্মচারীদের নিছক জীবন-

কারণের জন্য সংগ্রাম ও তারই ফলে কাজে মনঃসংযোগের অভাব।

এই সব "কেরাণী"রা বছরের যে-কোন সময়ে যে কোন স্থানে বদলী হ'তে পারেন—বাসস্থানের জন্য সরকার ভাবতে বাধ্য নন। এই শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীকে বাসস্থানের জন্য "Private Sector"-এর প্রভাবশালী ব্যক্তির দ্বারস্থ হ'তেই হচ্ছে; তবু আমরা আশা করব, সেই প্রভাবশালী লোক যখন সরকারী দপ্তর থেকে কোন কাজ করিয়ে নিতে চাইবেন, তখন দেড় শ' টাকার কেরাণী 'ন্যায়পরায়ণতা'র পরাকাষ্ঠা দেখাবেন। যাঁরা বদলির চাকরিতে আছেন, তাঁরা স্কুলগুলিতে অসময়ে ছেলে ভর্তি করাতে পারেন এই মর্মে এক নিয়ম আছে। সেই সংখ্যা সীমাবদ্ধ এবং যতদূর শুনেছি ঐ সুযোগ বড়দরের চাকুরেদের জন্যই বাঁধা থাকে।

এ সত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে যে, এখনও সরকারী দপ্তরের সর্বস্তরেই কর্মোৎসাহী, দক্ষ এবং সৎ লোকের অভাব নেই। জনসাধারণকে সাহায্য করার জন্য তাঁরা সর্বদাই প্রস্তুত এবং যথাসাধ্য সাহায্য করেও থাকেন। অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ, অকারণ বদলি ইত্যাদি নানারকম সমস্যার জন্যে বহু কর্মীই তাঁদের সদিচ্ছা বিসর্জন দিতে বাধ্য হন এবং নির্ঝঞ্ঝাট ভাবে থাকবার জন্য যতটুকু করণীয় ততটুকুই মাত্র করেন। উচ্চপদস্থ বহু কর্মচারী অনেক সময় আপ্রাণ চেষ্টা করেন দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রতিনিধিদের হস্তক্ষেপ থেকে নিজেদের এবং তাঁদের দপ্তরকে মুক্ত রেখে নিষ্ঠার সঙ্গে কর্তব্য সম্পাদন করে যেতে। আজও যে ইংরেজের তৈরী steel frame সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে নি তার মূলে আছেন উচ্চনীচ সর্বস্তরে এই শ্রেণীর কর্তব্যজ্ঞানসম্পন্ন ও দেশভক্ত কর্মীবৃন্দ। গত কয়েক বছরে তাঁদের মনোবল ভাঙবার জন্য অনেক কিছুই হচ্ছে এবং এই জন্য আজ স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকেও উদ্বিগ্ন হ'তে হয়েছে।

গত ১৭ বছরে আমরা এগিয়েছি অনেক, অন্ততঃ বস্তুতান্ত্রিক দিক্ দিয়ে। শিক্ষার বিস্তারও কিছু হয়েছে। ভবিষ্যৎ দেশবাসীর সুযোগ-সুবিধাও অনেক বেড়েছে। কিন্তু যে বৈষম্য, শৈথিল্য আজ প্রশাসনিক কাঠামোতে ঢুকেছে, 'প্রভাব বিস্তার'-এর যে অসংখ্য কৌশল দেশবাসী শিখেছে, তার সমাধান কি ভাবে হবে? পথ দেখাবেন কারা?—

দেশশাসকরা আশা করে এসেছেন "জনসাধারণ" বলতে যা বোঝায় তাঁরাই "austerity" অভ্যাস করবেন, "ত্যাগ" স্বীকার করবেন। এ কথা তাঁরা ভুলে গিয়েছেন যে, তাঁরা যা করছেন, বলছেন সবই দেশবাসী সকলে মিলে দেখছেন এবং তাঁদের দেখে শিখছেন। দেশশাসকদের কার্যকলাপ তরঙ্গ তুলছে সারা দেশে; নগণ্য লোকের কাজ যতই খারাপ হোক না কেন, তার প্রতিক্রিয়ার গণ্ডি অতি সীমাবদ্ধ। ন্যায়পরায়ণতার দৃষ্টান্ত শুধু কথায় নয়, কাজে দেখাতে না পারলে দেশশাসকেরা সাধারণ লোককে দুর্নীতিমুক্ত হ'তে বলতেও পারবেন না, বাধ্য করতেও পারবেন না। দুর্নীতি থেকে মুক্তির পথ দেখাতে হবে তাঁদের যাঁরা দিল্লীতে ও প্রাদেশিক রাজধানীতে ব'সে দেশের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করছেন।

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৭৭।২।১ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

প্রবাসী
৭৭।২।১ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের জন্য :—

ভারত ও পাকিস্তানে সডাক বার্ষিক মূল্য ১২৲, ঐ ষাণ্মাসিক ৬৲, ঐ প্রতি সংখ্যা ১৲ টাকা। বিদেশে সডাক বার্ষিক মূল্য ১৮৲ টাকা, ঐ ষাণ্মাসিক ১০৲ টাকা, ঐ প্রতি সংখ্যা ১'৫০ টাকা : অগ্রিম দেয়। বৎসর বৈশাখ হইতে আরম্ভ হয়। তবে গ্রাহকের সুবিধামত অন্য যে-কোন মাস হইতেও করা যায়। টাকা মণিঅর্ডারে অগ্রিম পাঠানোই ভাল। প্রবাসী বাংলা মাসের ১লা তারিখে প্রকাশিত হয়। যথাসময়ে প্রবাসী না পৌছিলে ১৫ তারিখের ভিতর স্থানীয় ডাকঘরের রিপোর্ট ও নির্দিষ্ট গ্রাহক নম্বরসহ পত্র লিখিতে হইবে। পুরাতন গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ তাঁহাদের চাঁদা যে সংখ্যার সহিত নিঃশেষ হইবে, সেই সংখ্যা পাইবার পর ২০ দিনের ভিতর পুনর্ব্বার চাঁদা বা প্রবাসী লইতে অনিচ্ছাজ্ঞাপক পত্র না পাঠাইলে, তাঁহারা পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিঃতে লইয়া চাঁদা দিতে ইচ্ছুক এই বিশ্বাসে ভিঃ পিঃ প্রেরণ করা হয়। চিঠিপত্র বা টাকা পাঠাইবার সময় গ্রাহক নম্বর-উল্লেখ না করিলে অসুবিধা অবশ্যম্ভাবী।

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ	
সাধারণ—১ পৃঃ	১০০৲ টাকা
„ ½ বা ১ কলম	৬০৲ „
„ ¼ পৃঃ বা ½ কলম	৩৫৲ „
„ ⅛ „	২০৲ „
সূচীর পরে ১ পৃঃ	১২৫৲ „
„ নীচে ½ „	৭৫৲ „
„ „ ¼ „	৪৫৲ „
„ „ ⅛ „	৩০৲ „

বিশেষ পৃষ্ঠা

বিজ্ঞাপনের প্রথম পৃঃ	১৫০৲ টাকা
„ শেষ „	১৪০৲ „

অন্যান্য বিশেষ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনের হার জানিতে হইলে—পত্র লিখুন।

রিডিং ম্যাটারের মধ্যে

১ পৃঃ	১৮০ টাকা
½ „	৯৫৲ „
¼ „	৫০৲ „
¼ কলম	৩০৲ „

(পত্রিকার শেষের দুই ফর্ম্মার মধ্যে যায়)

কভার পেজের বিজ্ঞাপন-হার

১ম কভার (নীচে) (১″×৬″)		১০০৲ টাকা
২য় „		২০০৲ „
৩য় „		১৭৫৲ „
৪র্থ „	এক রঙে	২২৫৲ „
„ „	দুই রঙে	২৭৫৲ „
„ „	তিন রঙে	৩৫০৲ „

সাপ্লিমেন্ট

(বিজ্ঞাপনদাতা কর্ত্তৃক সরবরাহ করিতে হইবে)

৮ পৃঃ (৪ স্লিপ)	৪০০৲ টাকা
৪ „ (২ „)	২৫০৲ „
২ „ (১ „)	১৫০৲ „

এজেন্সি এবং চুক্তিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের রেটের জন্য এবং
অন্যান্য বিষয় ও বিশদ ভাবে বিজ্ঞাপন সম্পর্কে কিছু জানিতে হইলে দয়া করিয়া পত্র লিখুন।

সূচীপত্র—ভাদ্র, ১৩৭১

সূচীপত্র—ভাদ্র, ১৩৭১

সূচীপত্র—ভাদ্র, ১৩৭১

স্বাধীনতা বিপন্ন
সর্ব্বশক্তি দিয়ে তা রক্ষা করুন
—জওহরলাল নেহরু
সঞ্চয় করুন!
নিতান্ত প্রয়োজন হ'লে কিনুন
যদি না কিনেও চলে তাহলে একেবারেই কিনবেন না। এতে ক'রে যে টাকা বাঁচবে তা সরকারের প্রতিরক্ষা সঞ্চয় পত্রগুলিতে লগ্নী করুন। এতে যে আপনি শুধু দ্রব্যমূল্যের ঊর্দ্ধগতি রোধ করতে সাহায্য করবেন তাই নয়, প্রতিরক্ষার প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে অনেক জিনিস পেতেও সাহায্য করবেন।
আপনার সঞ্চয় প্রতিরক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনতে সাহায্য করে
DA 64/F 2

স্বাধীনতা বিপন্ন
সর্ব্বশক্তি দিয়ে তা রক্ষা করুন
—জওহরলাল নেহরু
ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করুন, ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগিয়ে চলুন
ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করা, ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগিয়ে চলা এবং নিয়মানুবর্ত্তিতার ওপরেই একটা জাতির শক্তি নির্ভর করে। আমাদের স্বাধীনতা যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছে, একমাত্র একতা ও সম্মিলিত প্রচেষ্টাই সেই বিপদ দূর করতে পারে। ঐক্যবদ্ধ হয়ে সর্ব্বশক্তি দিয়ে কাজ করুন।
ভারতের প্রতিরক্ষা শক্তিশালী ক'রে তুলুন

THE MODERN REVIEW

—Advertisement Rates—

ORDINARY POSITION

	Rs. P.
Full Page	150.00
Half-page or one column	80.00
Quarter page or half-column	50.00
One-eighth page	30.00
One-eighth column	20.00
Page next to and or opposite contents	180.00
Ditto half-page	100.00
Ditto quarter-page	60.00
Ditto one-eighth page	40.00
Ditto one-eighth cloumn	30.00

SPECIAL POSITIONS

Full Page facing second page of the cover	200.00
„ Page facing third page of the cover	190.00
„ Page facing last page of the reading matter	195.00
„ Page facing back of the Frontispiece	210.00
Ditto half-page	110.00

POSITION WITHIN READING MATTER

Full Page	220.00
Half-page	120.00
Quarter page	70.00
„ col.	50.00

Space within reading matter available only at the end pages of the Magazine

COVER PAGES

Second page of the cover	220.00
Third page of the cover	200.00
Fourth page of the (*One-colour*)	250.00
(*Bi-colour*)	300.00
(*Tri-colour*)	350.00

SUPPLEMENT size $8\frac{1}{2}'' \times 6''$ (to be printed and supplied by the advertiser)

8 pages (or 4 slips) ..	450.00
4 pages (or 2 slips) ..	300.00
2 pages (or 1 slip) ..	225.00

MECHANICAL DETAILS, Etc..

Type area of a full page	$8'' \times 6''$
„ „ „ half page	$4'' \times 6''$
Number of columns to a page	2
Length of a column	8″
Breadth of a column	3″
Type area of half-column	$4'' \times 3''$
„ „ „ quarter-column	$2'' \times 3''$

Only Mounted Stereos & coarse screen blocks (65 screen) are accepted.

Prabasi Press Private Ltd.
77/2/1, DHARAMTALA STREET,
CALCUTTA-13.

প্রহরী
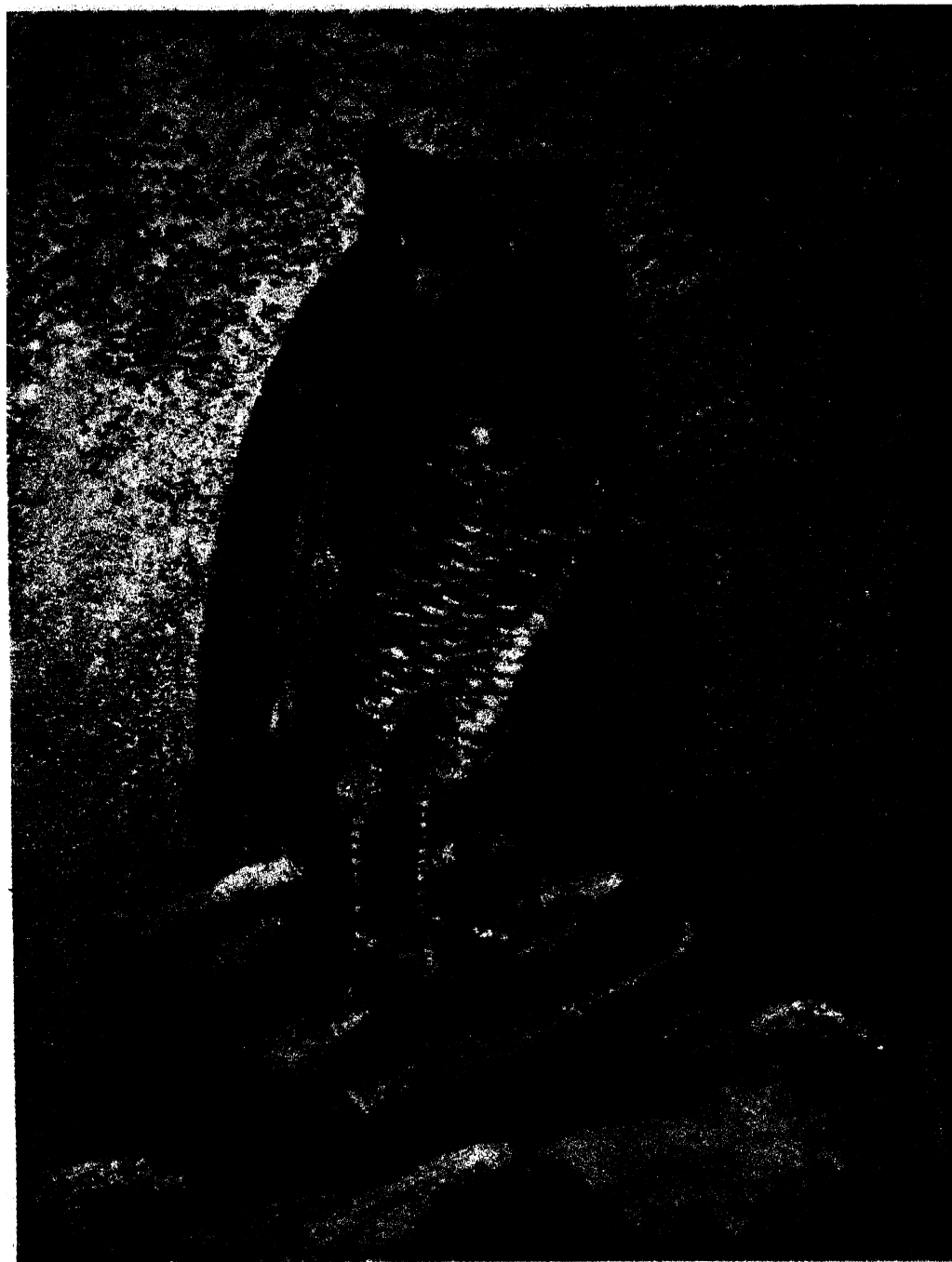
"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৪শ ভাগ
১ম খণ্ড

পঞ্চম সংখ্যা
ভাদ্র, ১৩৭১

স্বাধীনতা দিবস

সতের বৎসর পূর্ব্বে, ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ সনে, ভারতে ইংরেজ-রাজের অবসান হয়। কি উৎসাহ, কি আনন্দের উচ্ছ্বাস সেদিন সারা ভারতে দেখা গিয়াছিল, কি অনাবিল সুখ, শান্তি, স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্য্যের স্বপ্নই না দেখিয়াছিল এ দেশের আবালবৃদ্ধ-বনিতা ও কিবা অনুপম বর্ণ-শোভাযুক্ত আকাশ-কুসুমের নন্দনকানন রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন আমাদের কর্ণধারবর্গ ঐ দিনে!

তার পর? সতের বৎসরের সুখ-দুঃখ-বিভীষিকাময় কালচক্রের কঠোর ঘর্ষণের পর? কোথায় গেল সে স্বপ্নময় কল্পনার রাজ্য, কোথায়ই বা মিলাইল সেই নন্দন-কাননে আকাশকুসুম চয়নের স্বপ্ন? মহাকালের ফুৎকারে সে-সবই বিলীন হইয়া গিয়াছে ধূম-ধূলিজালপূর্ণ অতীতের অন্তরালে, ভবিষ্যতের পথও সন্দেহ-সমস্যা ও আশঙ্কার কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন আজ এই অভাব-অনটন, বিপদ্-আপদ্ সমাকীর্ণ, কঠোর বাস্তবময় স্বাধীনতা দিবসে নিতান্তই প্রয়োজন দাঁড়াইয়াছে কারণ নির্ণয়ের ও হিসাব-নিকাশের। যে-ভাবে দেশ চলিতেছে তাহাকে অধোগতি ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না, যদিও বিজ্ঞের বচনে ও অজ্ঞের লিখনে আমাদের দেখান হইতেছে যে, দেশ চলিতেছে প্রগতির পথে, বৈষয়িক উন্নতির পথে।

কারণ নির্ণয় ও হিসাব-নিকাশের আরম্ভেই বলা প্রয়োজন যে, কাহার দোষে দেশের এই অবস্থা হই... কথার উত্তর অতি সহজ এবং সত্য। দোষ দেশের জনসাধারণের, অর্থাৎ আমার, আমাদের, আপনার ও আপনাদের। আমাদের ও আমাদেরই অর্পিত অধিকারে যাহারা দেশে উচ্চ অধিকারী হইয়াছেন তাঁহাদের ভুল ভ্রান্তি ও কর্ত্তব্যে অবহেলার ফলেই দেশের এই অধোগতি হইতেছে। সুতরাং এখন দোষ কাহার বা কাহাদের সে বিষয়ে সমীক্ষণের প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন আছে সেই ভুল-ভ্রান্তি ইত্যাদির কারণ নির্ণয়ের, নহিলে এই স্বাধীনতা বিফলে নষ্ট হইতে বাধ্য। স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য আমাদের আছে, নাই শুধু এই জ্ঞান যে, স্বাধীনতার মূল্য অনন্তকালীন অপলক ও অক্লান্ত রক্ষণাবেক্ষণ। এবং এ কথাও জানা প্রয়োজন যে, প্রহরী নির্ব্বাচন আমাদেরই কাজ এবং সেই নির্ব্বাচনে ভুলভ্রান্তি যাহা আছে তাহারও শোধন অচিরে প্রয়োজন।

প্রথমে দেখা যাউক এই স্বাধীনতা, যাহা আমাদের আছে, তাহার রূপ কি। স্বাধীনতা আমাদের আছে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। যাঁহারা বলেন, "ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়" তাঁহাদের আজাদী, স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে ধারণাই ঝুটা। স্বাধীনতা বা আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার অবহেলায় খর্ব্ব ও ব্যাহত হয় এবং অপব্যবহারে অজ্ঞের স্বাধীনতায় হাত পড়ে এবং উহা দুষিত হয়। বর্ত্তমানে

জনসাধারণ যাহার দরুণ নানা দুঃখ-কষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন হইয়াছি তাহা ঐ অবহেলা ও অপব্যবহারের কারণে আসিয়াছে।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর আমাদের মনোনীত নেতৃবর্গ স্থির করেন যে, দেশ পরিচালন-ব্যবস্থা ও শাসন-তন্ত্রের শোধন ও গঠন প্রয়োজন। সেইজন্য বিশেষজ্ঞ-দিগের এক সমিতি গঠিত হয় এবং নূতন সংবিধান তাঁহারাই রচনা করেন। এই সংবিধান রচিত হওয়ার পর দীর্ঘদিন কেন্দ্রীয় বিধান মণ্ডলে তাহার বিচার ও আলোচনা চলে এবং তার পর নূতন সংবিধান গৃহীত হইলে এই দেশ সমাজতন্ত্র অনুযায়িক সার্ব্বভৌম সাধারণতন্ত্র বলিয়া ঘোষিত হয় ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৫০ সনে। ঐ ২৬শে জানুয়ারী এখন "সাধারণতন্ত্র দিবস" বলিয়া পালিত হইয়া থাকে এবং ঐদিন হইতে এই দেশ নূতন সংবিধান অনুযায়ী পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। অবশ্য যতই দিন যাইতেছে ততই দেখা যাইতেছে, যে সংবিধানে বহু ফাঁক রহিয়া গিয়াছে এবং বেশ কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতিও রহিয়া গিয়াছে। সেই সকলের পূরণ ও শোধনের কাজ অতি দীর্ঘকালব্যাপী ক্রিয়া-প্রকরণসাপেক্ষ এবং ত্রুটি-বিচ্যুতিরও শোধন অতি দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু সেই কাজ এখন কিছু হইয়াছে সকল বাধা সত্বেও, যদিও অনেক কিছুই এখনও বাকী রহিয়া গিয়াছে। এবং এই সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ফাঁক থাকার কারণে একদিকে শাসনতন্ত্রে দুর্নীতি দুষ্কৃতি ও কর্ত্তব্যে অবহেলা ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে, অন্যদিকে ফাঁকিবাজি, কালোবাজারী, মুনাফাবাজি ও ভেজাল চালান, যে সকল সমাজদ্রোহী দুষ্কৃতকারীদের অর্থাগমের মূল সূত্র, অভাগা ভারত তাহাদের অবাধ বিচরণের ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সংবিধানে দুর্নীতিপরায়ণ ও দুষ্কৃতিকারীদের পলায়নের সহস্র ছিদ্রপথ রহিয়া গিয়াছে। নিপুণ ব্যবহারজীবিকে নিযুক্ত করার সামর্থ্য থাকিলে এই সকল সমাজবিরোধী কাজের প্রধান উদ্যোক্তাদিগকে দোষী প্রমাণ করার কাজ প্রায় জুয়াখেলারই মত অনিশ্চিত দাঁড়াইয়াছে। অন্যদিকে দোষী সাব্যস্ত হইলেও অপরাধের অনুপাতে দণ্ডদান ও আইনকানুনের ধরা-বাঁধা কাঠামো-ফিরিস্তির কৃপায়, অসম্ভব ব্যাপার হইয়া আছে। অন্যদিকে দেশ-পরিচালন যন্ত্র ও জনসাধারণের প্রতি অভাব ও রূঢ় ব্যবহার এত ব্যাপক হইয়াছে যে, বিশেষ প্রভাব-প্রতিপত্তি না থাকিলে অনেক ক্ষেত্রেই কার্য্যোদ্ধারের জন্য "সেলামী" বা "নজরানা" দেওয়া প্রয়োজন হয়।

আজ দেশে অভাব-অনটন ও মূল্যবৃদ্ধি চরমে উঠিয়া সমস্ত জাতি সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে বলিয়া কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রীমণ্ডল সবিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। সেইজন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দুর্নীতিদমনে সক্রিয় ভাব দেখাইতেছেন ও চার-পাঁচটি প্রাদেশিক সরকারও সদাচার সমিতি গঠন ইত্যাদিতে আগ্রহ দেখাইতেছেন, যদিও এখন পর্য্যন্তও অধিকাংশ রাজ্যে—যথা পশ্চিমবঙ্গে—এরূপ কোনও দুর্নীতি দমনের প্রকাশ্য ব্যবস্থা হয় নাই। কিন্তু মাত্র অল্পদিন পূর্ব্বে ভূতপূর্ব্ব কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী চিন্তামন দেশমুখ যখন ঠিক এই জাতীয় সমিতি বা সংগঠনের কথা তুলিয়াছিলেন, তখন সরকারী মহলের উচ্চতম অধিকারী হইতে প্রায় নিম্নতম পদাতিক পর্য্যন্ত সকলেই সেই প্রস্তাবের বিরোধে মুখর হইয়া উঠেন। অবশ্য তাঁহাকে অপরাধ ও অপরাধীর নাম করিতে বলা হয় এবং তিনি কিছু অভিযোগ উপস্থিত করিলে তাহার তদন্তে একটা প্রহসনেরও অভিনয় করা হয়। সেই সময় একজন বিশেষ আইনজ্ঞ ব্যক্তি এ কথাও বলিয়াছিলেন যে, সরকারী দুর্নীতির অনুসন্ধান ও দমন করার ব্যবস্থার জন্য কোনও সংগঠন করা সংবিধান-বিরোধী কাজ হইবে!

আজ বাজার হইতে গম, চাল, ইত্যাদি অদৃশ্য হইয়াছে, খাঁটি সরিষার তেল বলিয়া স্বাস্থ্যনাশক বিষ-বিক্রয় খোলাখুলি ভাবে চলিতেছে। দেশের জনসাধারণকে অন্নে-বস্ত্রে বঞ্চিত করিয়া তাহাকে অর্থসামর্থ্যশূন্য ও নিরাশ্রয় করার ষড়যন্ত্র চরমে উঠিয়াছে। এখনও সরকারী মহল একদিকে শাসনের ও শাস্তির ভয় দেখাইতেছেন এবং অন্যদিকে এ সকলই "হিসাব-বহির্ভূত অর্থের" (unaccounted money) খেলা বলিয়া তাঁহাদের ব্যর্থতার অজুহাত দেখাইতেছেন অথচ এই "হিসাব বহির্ভূত টাকা" যাহাদের কাছে বিপুল পরিমাণে আছে, তাহাদের প্রধানদের ত প্রায় সকলেই ধরা পড়িয়াছিল ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি বরদাচারী গঠিত ও চালিত ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার তদন্তে ও বিচারে। সেই যে অসৎ উপায়ে অর্জ্জিত কোটি কোটি টাকার অধিকারীগণ তাহাদের কি শাস্তি কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকা

দিয়াছিলেন ? তাহাদের নাম ত প্রকাশ পর্য্যন্ত করা হয় নাই। তাহাদের ও তাহাদের নিযুক্ত কর্মচারীদের এইরূপ দুষ্কর্ম হইতে বিরত করার মত শাস্তি দেওয়া ত দূরের কথা, সেই ফাঁকির টাকা ১০।১৫ বা ২০ বৎসরে কিস্তিবন্দিভাবে (ট্যাক্সের টাকা) দেওয়ার সুযোগই দেওয়া হইয়াছিল, উপরন্তু তাহাদের ধরিয়া শিখাইয়া দেওয়াও হইয়াছিল যে, ধরা পড়ার ভয় কোথায় এবং তাহা এড়াইবার পথই বা কি। এবং সেই পথে, অর্থাৎ লুণ্ঠন, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা ইত্যাদি দুর্নীতির পথে সহায়ক দাঁড়াইয়াছে আমাদের শাসনতন্ত্র এবং শাসনতন্ত্রের সমর্থক দাঁড়াইয়াছে আমাদের সংবিধান!

এই সংবিধানে মানুষের অধিকার সম্বন্ধে "ফলাও" করিয়া বিবৃতি ও বিধান দেওয়া আছে। অথচ সেই অধিকারের সীমা নির্দ্দেশ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই করা হয় নাই। প্রত্যেকটি অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে যে দায়িত্বের প্রশ্ন আছে সে-কথা সুস্পষ্টভাবে লিখিত কোথায়ও হয় নাই, না সংবিধানে, না আইনকানুনে, না নিয়মাবলীতে, না অধিকারীবর্গের কার্য্য-প্রকরণে। সুতরাং দেশের জনসাধারণ সকলেই, উচ্চতম অধিকারী হইতে নিম্নতম পকেটমার পর্য্যন্ত সকলেই নিজ নিজ অধিকার সম্পর্কে সজাগ এবং দায়িত্ব বা কর্ত্তব্যজ্ঞান সম্পর্কে সমান উদাসীন বা অচেতন। এহেন অবস্থায় এদেশ প্রবঞ্চক ও প্রতারকের লীলাভূমি হইবে না ত হইবে কোথায় ?

যাঁহারা এই সংবিধান রচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল—বিচার-পদ্ধতি, এদেশে প্রচলিত দণ্ড-নীতি, অধিকার ও অধিকারী ভেদ, শাসনতন্ত্রের ব্যবস্থা প্রকরণ, সংবিধান-বিধি ইত্যাদি বিষয়ে। ছিল না বিন্দুমাত্র জ্ঞান সমাজ কল্যাণ বিষয়ে এবং ছিল না লেশমাত্র অভিজ্ঞতা সমাজবিরোধী কার্য্যকলাপ নিরোধ বিষয়ে বা সমাজবিরোধী দুষ্কৃতকারীর দণ্ডদান বা দমন বিষয়ে। সেই খসড়া সংবিধান যাঁহারা আলোচনা ও "বাচাই" করিয়াছিলেন সেই কেন্দ্রীয় "সংবিধান সভার" অর্থাৎ রূপান্তরিত কেন্দ্রীয় "বিধান মণ্ডলের" সভ্য ও সভ্যাদের ঐ বিষয়ে জ্ঞানবুদ্ধি-বিবেচনা যে কিছুমাত্র ছিল তাহারও কোন নির্দ্দেশ আমরা পাই নাই ঐ সময়ে। দেশের শাসনতন্ত্র ও পরিচালন-যন্ত্র ইত্যাদি হস্তান্তরিত হইবার পর যাঁহারা আমাদের কর্ণধাররূপে দেশ ও জাতির শাসন দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাঁহাদেরও ছিল নিদারু(ণ) অনভিজ্ঞতা ও কার্য্যকারণ বিচার-সম্পর্কিত জ্ঞানেরও নিতান্ত অভাব। কিন্তু এই অভাগা দেশের এমনই কপাল যে, ঐ তিন দলের প্রায় সকলেই নিজেদের সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ব বিদ্যাবিশারদ মনে করিয়া এই বহুধা-অসম্পূর্ণ সংবিধান ও তদনুসারী শাসনতন্ত্র, বিচারবিধি ও দণ্ডনীতির রচনা ও গঠনকার্য্য মহোল্লাসে সমাপন করিয়া দেশের জনসাধারণের দুর্গতির ও দেশের যত কুচক্রী, দুর্নীতিপরায়ণ, প্রতারক এবং প্রবঞ্চকের অর্থাগমের পথ সরল করিয়া দিয়াছিলেন। এবং সেই সঙ্গেও তখন হইতেই এদেশের ও জাতির স্বাধীনতার যথার্থ বিকাশও ব্যাহত হইতে থাকে।

অথচ এমনও নয় যে ইঁহাদের সমাজ-কল্যাণ বিষয়ে বা সমাজদ্রোহী ঠগ ও জুয়াচোর সম্পর্কে এবং তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধ ষড়যন্ত্রের আকার-প্রকার ও বিষময় ফল বিষয়ে সতর্ক বা অবহিত হওয়ার কোনও কারণ বা অভিজ্ঞতার প্রতিঘাত ছিল না। ঐ সংবিধান ইত্যাদির রচনা ও আলোচনার মাত্র অল্প কয় বৎসর পূর্ব্বে, ১৯৪৩ সনে, পঞ্চাশের মন্বন্তর ঘটে। সেই সময়ে একদিকে ভয়ত্রস্ত ব্রিটিশ সরকারের "পরিগ্রহ নিরোধ" নীতির (denial policy) ফলে ও নৌকা ইত্যাদি নষ্ট হওয়ায় চর-আবাদ ও দ্বীপের জমির ফসল সংগ্রহের অভাবে নষ্ট হয়। অন্যদিকে জমিদার, জোতদার, আড়তদার এবং "হিসাব-বহির্ভূত টাকার" মালিক পুঁজিপতির দল বাজারের সমস্ত খাদ্যশস্য আটক করিয়া শস্যের ঘাটতিকে আকাশ দাঁড় করাইয়া ছাড়িল। খাদ্যশস্য দুর্মূল্য যখন হইতে আরম্ভ হয় তখন চতুর্দ্দিকে ক্ষুধাতুর জনসাধারণের দল ফিরিতে লাগিল এবং সেই সময়েই সরকারী মহল স্থানীয় সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগকে ডাকাইয়া প্রাথমিক অর্থবিজ্ঞানের কয়েকটি বুকনি আওড়াইয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, চাহিদা বেশী ও মজুত সরবরাহ যদি কম হয় এবং তদুপরি মুদ্রাস্ফীতি যদি ঘটে—যাহা যুদ্ধকালীন অবস্থায় ঘটিতে বাধ্য, তবে মূল্যবৃদ্ধি হইবেই এবং চাহিদা ও সরবরাহের অনুপাত ঐ মূল্যবৃদ্ধির দরুণ সমভাব ধারণ করিলেই মূল্যমান সমভাব ধারণ করিতে বাধ্য ও দ্রব্যমূল্য স্ফীতিও থামিতে বাধ্য।

এই মহাপণ্ডিতগণ ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, প্রাথমিক অর্থবিজ্ঞানের ঐ সকল সূত্র নির্ভর করে বাজারে ক্রেতা-

বিক্রেতার ব্যাপারিক সম্বন্ধ স্বাভাবিকভাবে চলার উপর। যেখানে কয়েকদল শক্তিশালী ও অমানুষ অর্থপিশাচ সঙ্ঘবদ্ধভাবে ক্রেতা-বিক্রেতা সম্বন্ধের মধ্যে কৃত্রিম ও কঠোর বাধার সৃষ্টি করে, সেখানে, প্রজা-পালন ও সমাজ-কল্যাণের নীতি অনুসারে, ঐ অর্থপিশাচদিগকে সবলে শাসনতন্ত্রের আয়ত্তে না আনিতে পারিলে এবং যাহারা শাসন না মানে তাহাদিগকে উৎখাত করিতে না পারিলে সমূহ বিপদের আশঙ্কা আছে। প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধে প্রাথমিক অর্থ-বিজ্ঞানের ঐ সকল নীতি যে কতদূর ভঙ্গুর ও অবাস্তব দাঁড়াইতে পারে তাহা প্রমাণ হইয়া যাওয়ায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে যুদ্ধরত স্বাধীন দেশগুলি অর্থনীতি-অর্থবিজ্ঞান ইত্যাদি সরাইয়া রাখিয়া একদিকে মূল্যনিয়ন্ত্রণ ও অন্যদিকে কঠোর নিয়ম-শাসন চালিত করিয়া দেশের খাদ্যসঙ্কট আয়ত্তের মধ্যে আনে। পরাধীন ভারতে সেই অকেজো অর্থনীতির সূত্রাবলী শুনান হয় এবং ষাট লক্ষ অসহায় নরনারী-শিশু খাদ্যাভাবে মরিবার পর এদেশের বিদেশী শাসকদের জ্ঞানচক্ষু খোলে। ততদিনে ঐ নরপিশাচগুলির পুঁজি শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়া গিয়াছিল।

দুর্নীতি ও দুষ্কৃতির পথে কি অসীম অর্থোপার্জ্জন সম্ভব এবং সেই অসৎ উপায়ে লব্ধ টাকার জোরে দেশের পরিচালন-যন্ত্রের ও শাসনতন্ত্রের উচ্চতম অধিকারীবর্গের মধ্যেও কিভাবে পাপ প্রবেশ করে তার জাজ্জ্বল্যমান উদাহরণ এদেশ পাইয়াছিল প্রথম মহাযুদ্ধের পরে যখন এক কোটিপতি "মিউনিশন" অর্থাৎ যুদ্ধকালীন সরবরাহে অসৎ উপায়ে অর্থাগম করার জন্য অভিযুক্ত হয়। তাহার পক্ষে যে ব্যবহারজীবী সেই বিচারে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তিনি প্রকাশ্য আদালতে ঘোষণা করেন যে, তাঁহার মক্কেল দোষী। কিন্তু তাহাকে দণ্ডদানের জন্য যদি ঐ বিচার চালিত হয় তবে তিনি এদেশের উচ্চতম অধিকারীদের ঐ আসামীর কাঠ-গড়ায় দাঁড় করাইয়া ছাড়িবেন!

তাঁহার এই প্রবল ভয় প্রদর্শনের ফলে ঐ ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে সরকারী বিচার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং সে রেহাই পায়।

এইরূপ উদাহরণ চতুর্দ্দিকে থাকা সত্ত্বেও আমাদের শাসনতন্ত্রে এ-জাতীয় দুর্নীতি-দুষ্কৃতি রোধের কোনও ব্যবস্থাই নাই। বরং সংবিধানে ঐ জাতীয় মহাপাতক সংক্রামণের প্রধান উদ্যোক্তা ও যোজকদের অবাধ শোষণ-লুণ্ঠন ও দুর্নীতির পথ আরও নিরাপদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমাদের উচ্চতম অধিকারীদিগের ছিল একদিকে অভিজ্ঞতার—বিশেষ শাসনতন্ত্রের পরিচালনার অভিজ্ঞতার নিদারুণ অভাব। উপরন্তু আমাদের শাসনত[ন্ত্র] নখদন্তহীন ও বিধিনিষেধের আগড়ে আড়ষ্টভাবে বাঁধা এব[ং] এদেশের বিচার চলে "তাদের দেশের" নিয়ম অনুযায়ী ফলে এদেশের সাধু-সজ্জনের জীবনপথ কণ্টকাকীর্ণ দুষ্কৃতের পরিত্রাণের পথ উন্মুক্ত ও প্রশস্ত। নহিলে আজ আমাদের প্রধানমন্ত্রী সদুপদেশ শুনাইতেছেন ও স্বভা[ব] শোধনের জন্য সময় দিতেছেন সেই নরপিশাচদেরই উত্তরাধি[কারী]কারীদিগকে, যাহারা অর্থের লোভে ষাট লক্ষ অসহা[য়] নরনারীকে মৃত্যুমুখে ঠেলিয়া দিয়াছিল।

প্রবাদে বলে, "কেউ দেখে শেখে কেউ ঠেকে শেখে" আমাদের কর্ণধারবর্গের সম্মুখে ও অভিজ্ঞতায় দুইই আছে তবুও তাঁহারা শিখিতে অক্ষম, এ যেন ভাগ্যের পরিহাস আর আমাদের সরকার-বিরোধী পক্ষ—তাঁহাদের এক ঢো[ল] এক কাঁসী, বিক্ষোভ ও হরতাল। যেন শাসনতন্ত্র অচ[ল] করিলেই সব কিছু সহজ সরল ও সুশৃঙ্খল হইয়া যাইবে!

দোষ আমাদেরই। স্বাধীনতা যে কি বস্তু তাহা যদি আমরা বুঝিতাম তবে শুধু তাহার রক্ষণাবেক্ষণ নহে, তাহা[র] পূর্ণ বিকাশ কি ভাবে হয় এ বিষয়ে যাঁহারা সচেতন এতদিনে সেরূপ কিছু লোক আমাদের মুখপাত্ররূপে সংসদে বিধান মণ্ডলে ও মন্ত্রিসভায় আমরা পাঠাইতাম।

স্বাধীনতার এক-চতুর্বর্গরূপ বর্ণন আমরা পাইয়াছিলা[ম] মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের ১৯৪১ সনের ৬ই জানুয়ারী প্রদত্ত বাণীতে। তাহাতে স্বাধীনতার রূপ বর্ণনে ছিল:

সর্ব্বপ্রথমে বাক্যের স্বাধীনতা ও মনোভা[ব] প্রকাশের স্বাধীনতা ও সর্ব্বজনীন অধিকার।

দ্বিতীয়, প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের মত ও বিশ্বাস অনুযায়ী ঈশ্বর ভজনের স্বাধীনতা ও অধিকার।

তৃতীয়, অভাব-অনটন হইতে মুক্ত থাকিবার স্বাধীনতা ও অধিকার।

চতুর্থ, ভয়মুক্ত থাকিবার স্বাধীনতা ও অধিকার—অর্থাৎ শত্রুভয় হইতে মুক্তির অধিকার।

আমাদের দেশে আমরা প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার স্বাধীনতা ও অধিকার পাইয়াছি। তৃতীয় ও চতুর্থ বিষয়ে আমাদের ও আমাদের কর্তৃপক্ষের জ্ঞানবুদ্ধি-বিবেচনার পরীক্ষা এখন চলিতেছে। চতুর্থ বিষয়ে সেই পরীক্ষা অগ্নিপরীক্ষায় দাঁড়ায়—আমাদের ও আমাদের কর্ণধারবর্গের চেতনা, ও জ্ঞানবুদ্ধি-বিবেচনার অভাবে—বিশ্বাসঘাতক চীনের আক্রমণে। তৃতীয় বিষয়ের পরীক্ষা এখন চলিতেছে দারুণ সংশয়ে আচ্ছন্ন ও অসংলগ্ন কার্য্যক্রমের মধ্য দিয়া।

আজ স্বাধীনতা দিবসে আমাদের স্বাধীনতার এই যথার্থ রূপ-বর্ণন।

পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাব

বিগত সোমবার, ১০ই আগষ্ট পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিরোধীদলের আনীত অনাস্থা প্রস্তাবের দুই দিনব্যাপী বিতর্কের সূচনা হয়। প্রথম দিনের বিতর্কেই বুঝা যায় যে, এই অনাস্থা প্রস্তাব উহার অল্প কয়দিন পূর্ব্বের দুই দিন-ব্যাপী খাদ্য বিতর্কেরই পুনরভিনয় মাত্র। কোনও নূতন তথ্যের নির্দ্দেশ ইহাতে বিরোধী পক্ষ দিতে পারেন নাই। খাদ্য বিতর্কেও তাঁহাদের তর্কে যুক্তি বা তথ্য বিশেষ কিছু ছিল না। সেই তর্কে ছিল জিগীর ও অভিযোগ, এই দিনের তর্কেও ছিল তাই, উপরন্তু ছিল শ্লেষ, বিদ্রূপ ও অর্থহীন শাসানি। 'যুগান্তর' হইতে গৃহীত নিম্নস্থ নমুনা কয়টিতে তাহার নিদর্শন পাওয়া যাইবে। অন্য যে কয়জন এই বিতর্কে বিরোধী পক্ষ হইতে অংশ গ্রহণ করেন তাঁহাদের বক্তব্য ছিল আরও ফাঁকা, আরও অসার। একমাত্র নির্দ্দলীয় শ্রীবিজয় ব্যানার্জ্জির মন্তব্যে যে অভিযোগ ছিল "বাংলার সম্পদ্ ও সম্পত্তি অবাঙ্গালীর কুক্ষিগত হইতেছে এই সরকারের জন্যই" তাহা একেবারে অসার বলিয়া ফেলিবার নহে। বিরোধী পক্ষের বিতর্কের নমুনা এইরূপ :

"অনাস্থা প্রস্তাবের বিতর্কের সূচনা করিয়া বিরোধী দলের নেতা শ্রীজ্যোতি বসু পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভাকে 'বিশ্বাস-ভঙ্গ দুর্নীতি এবং সীমাহীন ব্যর্থতার' অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। শ্রীবসু বলেন যে, মানুষের দুর্গতি ও দুর্দশার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর নিকট হইতে সুস্পষ্ট ব্যবস্থার কথা পাওয়া যায় নাই। ভবিষ্যতের আশ্বাস শুধু দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীবসু বলেন যে, খাদ্যাভাব কৃত্রিম সৃষ্টি। এই মনুষ্য-সৃষ্ট অভাবের ফলে সাধারণ মানুষ অনাহার-অর্দ্ধাহারে থাকিতেছেন। এই সরকার ইহার জন্য দায়ী। তিনি অভিযোগ করেন যে, যাহারা খাদ্যে ভেজাল দেয়, যাহারা খাদ্য লইয়া চোরাকারবার করে, তাহাদের বিরুদ্ধে পুলিশ লাগান হয় না। কারণ, এই সমাজবিরোধীদের সহিত সরকারের গাঁটছড়া বাঁধা রহিয়াছে।

"কারবারীদের কথা শুনিয়া সরকার তেলের দর বাড়াইয়া দিলেন। অথচ ঐ সময়ে বিধানসভার অধিবেশন চলিতেছে। ইহা বিধানসভার প্রতি অবমাননা। হয়ত আগামী কয়েক-দিনের মধ্যে মাছের দরও সরকার আবার বৃদ্ধি করিবেন।

"মুখ্যমন্ত্রী আরও 'আলু খাও' বলিয়া পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু আলুর ব্যাপারে ফাটকাবাজি চলিতেছে ; ঠাণ্ডা-ঘরের মালিকরাও বেশ লাভের অঙ্ক বৃদ্ধি করিতেছে। এই অবস্থায় ঠাণ্ডা-ঘরগুলি সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনা দরকার।

"শ্রীবসু 'জীবনযাত্রার ব্যয়সূচী' তৈয়ারীর ব্যাপারে 'কারচুপি' হয় বলিয়া অভিযোগ করিয়া বলেন যে, এই 'জোচ্চুরির' ফলে আজ শ্রমিক সাধারণ, চটকল ও বস্ত্রকলের শ্রমিকদের মাগ্‌গী ভাতা কমিয়া গিয়াছে। যেখানে সমস্ত জিনিষের দর বৃদ্ধি পাইতেছে সেখানে জীবনযাত্রার ব্যয়সূচী কি করিয়া কমিয়া যাইতেছে তাহা তদন্ত করিয়া দেখা দরকার। কারণ এই পরিসংখ্যানের উপর শ্রমিকদের ভাতার হার নির্ভর করিতেছে।

"বিরোধী দলের নেতা শ্রীজ্যোতি বসুর বক্তৃতায় লাহিড়ী মশাই-এর মত শ্লেষ-বিদ্রূপের সূক্ষ্ম ধার না থাকিলেও, তাহাতে সরকারের উদ্দেশে শাসানি কিছু কম ছিল না। সরকারী যে পরিসংখ্যানে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ব্যয়ের সূচক সম্প্রতি হ্রাস পাইয়াছে, শ্রীবসু তাহার উল্লেখক্রমে বলিয়াছেন, ঐ পরিসংখ্যানের কারচুপিতে চটকল-কর্ম্মীদের মাগ্‌গী ভাতা কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। শ্রীবসু ঐ প্রসঙ্গে বলেন, 'আমার যদি আজ শক্তি থাকত, স্পীকার মহাশয়, তবে আড়াই লক্ষ চটকল-কর্ম্মীকে আমি বলতাম, কাল থেকে তোমরা ধর্ম্মঘট কর। আমরা সেই পথেই যাব। সেই পথ ছাড়া এখন আর অন্য গতি নেই।'

"শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী (কম্যুনিষ্ট) পশ্চিমবঙ্গের জন-গণের দুর্দ্দশার চিত্রটি তুলিয়া ধরিয়া বলেন যে, এই সরকার স্বর্ণশিল্পী ও মৎস্যজীবী খুচরা ব্যবসায়ীদের ধ্বংসের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভেড়িগুলিকে মৎস্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ হইতে কেন বাদ দেওয়া হইয়াছে, কেন চাল, তেল পাওয়া যাইতেছে না তাহার রহস্য সন্ধানে গেলে দেখা যাইবে যে, সর্ব্বত্র প্রাপ্তিযোগের রহস্য রহিয়াছে। শ্রীলাহিড়ী বিবিধ তথ্য ও পরিসংখ্যান উল্লেখ করিয়া দেখান যে, পরিকল্পনায় কৃষির উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ বরাদ্দ ছিল সরকার তাহার বেশীর ভাগই ব্যয় করিতে পারেন নাই। তিনি বলেন যে, সরকার তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক আচরণ করিয়াছেন ; কিন্তু ভারতরক্ষা আইনে চোরাকারবারী ধরা পড়ে না ; মালিকদের বিরুদ্ধে এই আইন প্রযুক্ত হয় না। শ্রীলাহিড়ী অভিযোগ করেন যে, চীনা আক্রমণের প্রথমে খড়্গপুরে একটি জনসভায় শ্রমমন্ত্রী উস্কানিমূলক ভাষণ দেন এবং সেই সভা হইতেই লোক বাহির হইয়া গিয়া স্থানীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির অফিসে হানা দেয়।

"লাহিড়ীমশাই তাঁহার বক্তৃতার শেষে বলিয়াছেন : 'এই মন্ত্রিসভার রাজ্যে শুধু 'নাই' 'নাই' রব। চাল নাই, তেল নাই, মাছ নাই, আলু নাই। আরও কত কি আছে। কিন্তু স্পীকার স্যার, আমি কিন্তু একটি সরকারী তথ্যে

১৯৫৩ সনে কলকাতায় ড্রেন থেকে যখন ২০-৮ ... ঘনফুট পাঁক, কাদা উঠেছে, তখন ১৯৬২ সনে তার ... [illegible] থেকে দাঁড়িয়েছে ৪৬-০৪ লক্ষ ঘনফুট। এই ... [illegible] রাজত্বে খালি থেড়ে চলেছে ড্রেনের পাঁক। সেই ... [illegible] মন্ত্রিসভার মুখে মাখানো। তাই মন্ত্রিসভা চেষ্টা ... [illegible]ছেন, সারা দেশের মুখে তা মাখিয়ে দিতে। কিন্তু ... [illegible] বলি, দেশকে এই পাঁক থেকে মুক্তি পেতে হ'লে ... [illegible]মন্ত্রিসভাকে অপসারণ করা ছাড়া অন্য গতি নেই।"

বিরোধী পক্ষের এই অভিযোগ, শাসানি ও কর্দম-[illegible]ক্ষেপের জবাবে কংগ্রেসী দলের সাধারণ সভ্যেরাও প্রায় [illegible]সমান ফাঁকা তর্কবিতর্কের অবতারণা করেন। মন্ত্রিসভা হইতে উত্তর প্রথম দিনে দিয়াছিলেন শ্রীবিজয় সিং নাহার ও শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায়।

"শ্রমমন্ত্রী শ্রীবিজয় সিং নাহার তাঁহার ভাষণে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ব্যয়সূচী তৈয়ারীর ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের শ্রম-বিভাগের দায়িত্ব নাই বলিয়া জানান এবং বলেন যে, ১৯৬৩ সন হইতে কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ব্যুরো ইহা করিয়া থাকে। বস্ত্র ও চটকলের শ্রমিকরা যে ভিত্তিতে মাগ্‌গী ভাতা পান তাহার সঙ্গে এই ব্যয়সূচীর হার বৃদ্ধি ও হ্রাসের প্রশ্ন জড়িত আছে এবং ইহা রিভিউরও ব্যবস্থা আছে। এই ব্যয়সূচী তৈয়ারীর ব্যাপারে শ্রম সম্মেলনের যে ত্রিপক্ষীয় সিদ্ধান্ত আছে তাহাও তিনি উল্লেখ করেন।

বিরোধী পক্ষের আন্দোলনের 'হুম্‌কি' উল্লেখ করিয়া শ্রীনাহার বলেন যে, শ্রমিকের কল্যাণ নয়, দেশের মঙ্গল নয়, চীনা শত্রুর সুযোগ করিয়া দেওয়ার জন্যই এই হরতাল, গোলমাল সৃষ্টির হুম্‌কি বলিয়া তিনি মনে করেন। কিন্তু ভারতের মানুষ এই সুযোগ তাঁহাদের দিবে না।

"শ্রীনাহার শ্রীসোমনাথ লাহিড়ীর অভিযোগ অস্বীকার করিয়া বলেন যে, শ্রীলাহিড়ী অন্যায় উক্তি করিয়াছেন।

"স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায় বলেন, প্রধানমন্ত্রী নেহরুর পরলোকগমনের পর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহ রাষ্ট্রশক্তিকে করায়ত্ত করিবার অপপ্রয়াস করে। পুঁজিপতি, মুনাফাখোর ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইলেও বর্তমানে তাহারা সরকারের বিরুদ্ধে শেষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছে। সুখের বিষয়, জনসাধারণ এই ব্যাপারে সরকারকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করিয়া মুনাফাখোর মজুতদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে জোরদার করিয়াছে। শ্রীমতী মুখো-পাধ্যায় বিরোধী দলের নেতা শ্রীজ্যোতি বসুর প্রারম্ভিক ... [illegible] করিয়া বলেন, অপরদিকে জ্যোতিবাবুর ... মজুতদার ও ... সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

"তৈল ও অন্যান্য খাদ্যে ভেজালদানকারীদের বিরুদ্ধে সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন না বলিয়া বিরোধী সদস্যরা যে অভিযোগ আনেন, তাহাকে অস্বীকার করিয়া স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, সংশ্লিষ্ট আইনকে আরও কঠোর-ভাবে প্রয়োগের জন্য কেন্দ্রের অনুমোদন চাওয়া হইয়াছে। কেন্দ্রের অনুমোদন আসিতে বিলম্ব হইলে সরকার জরুরী ব্যবস্থা হিসাবে অত্যাবশ্যক পণ্য আইন অনুযায়ী তৈল ভেজালের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। প্রয়োজন হইলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেবলমাত্র 'আগ মার্কা' তৈল পশ্চিমবঙ্গে আমদানী হইতে দিবেন। শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়, বাঁকুড়া জেলায় ধৃত মজুতদারদের এক তালিকা পেশ করেন।"

শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের বিবৃতিতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ভেজাল-নিরোধ বিষয়ে বর্তমানে কোন আইন নাই, যাহাতে ভেজালকারীদিগকে ঐ দুষ্কৃতি হইতে নিবৃত্ত করিবার মত কঠোর দণ্ড দেওয়া যায় (Deterrent Sentence)। সূক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যাইবে যে, সমাজ-বিরোধী অপরাধ বিষয়ে আমাদের বর্তমান শাসনতন্ত্রের ও দণ্ডনীতির সর্ব্বত্রই এইরূপ ঔদাসীন্য ও অবহেলার নিদর্শন জাজ্বল্যমান। এবং ইহারই কারণে দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রা এই ভাবে ক্রমেই আরও দুর্ব্বিষহ হইতেছে। বাস্তবপক্ষে "সমাজ-কল্যাণ" বা "কল্যাণমুখী রাষ্ট্র" এই শব্দগুলি উচ্চারণ করাই যেন এই অভাগা দেশের দুর্গত জনসাধারণের প্রতি পরিহাস করার মতই দাঁড়াইয়াছে, কেননা ঐ দুই শব্দই এদেশে অলীক ও অর্থহীন। ইহার পূর্ণ দায়িত্ব প্রত্যক্ষভাবে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সংসদ ও বিধান মণ্ডলে আমাদেরই মনোনীত ও নির্ব্বাচিত সদস্যবর্গের এবং পরোক্ষভাবে আমাদের নিজেদেরই। প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর আমাদের বুদ্ধিলোপ হয় বলিয়াই আমরা এইরূপ ব্যক্তিদের নির্ব্বাচিত করি, কাহারও পৃষ্ঠের কংগ্রেসী ছাপ দেখিয়া আবার অজ্ঞে... কাহাকেও বা বিরোধী পক্ষের সদস্য হিসাবে। দুই ক্ষেত্রে একই পাকের বস্তু আমাদের ভাগ্যে জোটে!

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এখানের সরকারী বিভাগে... সহায়তায়, এই কৃত্রিম কারণ-জনিত খাদ্য সঙ্কটের সমাধা... কোনও বাস্তবমুখী কার্য্যপন্থার উল্লেখ এযাবৎ বিধানসভ... কোনও সদস্য করেন নাই, না খাদ্যাভাব সম্পর্কিত বিত... না অনাস্থা-প্রস্তাবের বিতর্কে। মুনাফাবাজী, মজুতদারী... [illegible] এই সকল অপরাধের জন্য দুষ্ট ব্যক্তিদের ... [illegible] যে কঠোর দণ্ডাদেশ হওয়া উচিত এবং ... [illegible]

ও [illegible]
উচিত না একথা ত কেহই প্রস্তাবেও উল্লেখ করেন নাই। জরিমানাও যাহা হইতেছে তাহা যে ছেলেখেলা সে কথাও ত কেহ বলেন নাই। যুদ্ধের মধ্যে এখানে এক পাঞ্জাবী ম্যাজিস্ট্রেট বে-আইনী মুনাফাবাজির বিচারে ৫০,০০০—৬০,০০০ এই পরিমাণে জরিমানা করিতে আরম্ভ করেন এবং তাহাতে এখানের ব্যবসায়ী মহলে হুলুস্থুল পড়ে।

এই সূত্রে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সম্প্রতি কলিকাতা পৌরসভার এক অধিবেশনে "ভেজাল দেওয়ার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড পর্য্যন্ত দেওয়া উচিত" এই প্রস্তাব সর্ব্ববাদী-সম্মত ভাবে গৃহীত হইয়াছে। পৌরসভার দণ্ডনীতি বা দণ্ডবিধি সম্পর্কিত কোন কিছু আইন-কানুন প্রণয়নের কোনও অধিকার নাই ইহা সত্য। কিন্তু পৌরপিতাগণ যে এই ক্ষেত্রে কলিকাতার সাধারণজনের মানসিক প্রতিক্রিয়ার যথার্থ পরিচয় এইভাবে দিয়া নিজেদের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন তাহা বলিতেই হইবে। এখানের বিধান মণ্ডলের বিরোধী পক্ষেরও ঐরূপ আইন প্রণয়নের অধিকার নাই, কিন্তু তাঁহারা যদি এই সকল সমাজবিরোধী অপরাধের জন্য খুন-জখম বা ডাকাতির ন্যায় কঠোর দণ্ডবিধানের দাবি জানাইতেন এবং প্রবঞ্চক ও প্রতারক ব্যবসায়ীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার মত দণ্ডাদেশের প্রস্তাব আনিতেন তবে কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু চেতনা আসিত। এবং সেই সঙ্গে আমাদের নির্ব্বাচিত কেন্দ্রীয় সংসদের সদস্যবর্গও বুঝিতেন যে নয়াদিল্লীর বৈঠকে বসিয়া নিজস্বার্থপূর্ত্তি চিন্তা ও দিল্লীকা লাড্ডু ভক্ষণে অবসর বিনোদন ছাড়াও তাঁহাদের নিজ নিজ নির্ব্বাচকবৃন্দের সম্পর্কিত অন্য কর্ত্তব্যও আছে। বিরোধী পক্ষ সে-সবের দিকে অগ্রসর হইলেন না কেন তাহা তাঁহারাই জানেন।

দ্বিতীয় দিনের বিতর্কে উল্লেখযোগ্য কোন কথাই উত্থাপিত হয় নাই। যাহা হইয়াছিল তাহাকে কর্দ্দম নিক্ষেপ ও কর্দ্দম প্রক্ষালন বলিলেই যথেষ্ট—অবশ্য সেই সঙ্গে যে "মেছোহাটা" সৃষ্টি হয় তাহা বলা বাহুল্য। তবে এই [illegible] বিষয়ে দ্বিতীয় পক্ষ শ্রীবিনয়কুমা[illegible] [illegible] বক্তৃতা উল্লেখযোগ্য, কেননা তাঁহার [illegible] যুক্তি-[illegible] [illegible] নিরানন্দতা [illegible] মাত্রায় "[illegible]" হয়। [illegible] এখানে ৭৪-১৪৯ ভোটে অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

পরলোকে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত

গত ২১শে জুলাই আকাদমি পুরস্কার প্রাপ্ত [illegible] সাহিত্যিক ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৫৩ বৎসর হইয়াছিল। প্রায় বৎসরখানেক ধরিয়া তিনি [illegible] ক্যান্সাররোগে ভুগিতেছিলেন।

ডঃ শশিভূষণ ১৯১২ সনে বরিশালের চন্দ্রহার গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৫ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাংলা সাহিত্যে এম. এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া, ঐ বছরেই রামতনু লাহিড়ী গবেষক নিযুক্ত হন এবং তিন বৎসর পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। ১৯৫৫ সনে তিনি বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রধান—রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ১৯৬১ সনে তিনি ইউনেস্কো আয়োজিত বিশ্বধর্ম-সম্মেলনে যোগ দেন। তিনি ছিলেন হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধি।

ডঃ দাশগুপ্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. এইচ. ডি ও পি. আর. এস। তিনি ১৯৬২ সনে বাংলা-সাহিত্যে আকাদামি পুরস্কার লাভ করেন। পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থটির নাম—'ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত-সাহিত্য।' তিনি বহু গ্রন্থ—প্রবন্ধ, উপন্যাস, কবিতা এবং শিশু-সাহিত্য লিখিয়া গিয়াছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অমায়িক, বন্ধুবৎসল ও সরল প্রকৃতির। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে বাংলা দেশ একজন যথার্থ মনস্বীকে হারাইল।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীকরুণাকুমার নন্দী

খাদ্য ও মূল্য সঙ্কট

গত কয়েক মাস ধরে আমরা বারে বারেই দেশের বর্ত্তমান খাদ্য ও মূল্য সঙ্কটের বিষয় আলোচনা করে আসছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সরকারী চিন্তাধারায় বা সমাধানের তথাকথিত নানাবিধ প্রয়োগের মধ্যে এ সকল আলোচনার কোনও সার্থক প্রতিফলন এ পর্য্যন্ত লক্ষিত হয় নাই। বস্তুতঃ সমস্যাটির গোড়ার কথাটি যে কি, মনে হয় সেটি তাঁহারা এখন পর্য্যন্ত সম্যক্‌ উপলব্ধি করতে পারেন নাই। কিংবা তা যদি তাঁরা পেরে থাকেন তবে যে-পথে অগ্রসর হ'লে সমাধান সহজ না হলেও সম্ভব হ'তে পারত, ইচ্ছা করেই তাঁরা সে পথে এগুতে চাইছেন না বা ভরসা পাচ্ছেন না।

পূর্ব্বের আলোচনায় আমরা তথ্যাদির দ্বারা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছি যে, দেশে বর্ত্তমানে যে খাদ্য ও মূল্য সঙ্কট ভয়াবহ রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং যার প্রকোপ সমাধান-সূচক সরকারী সকল প্রকার প্রয়োগ সত্ত্বেও দিন দিন উত্তরোত্তর প্রবলাকার ধারণ করে চলেছে, সেটি মূলতঃ খাদ্যশস্য উৎপাদনে এবং সরবরাহে কোন একটা বিশেষ পরিমাণ ঘাটতির দরুণ দেখা দেয় নাই। বাংলা দেশের মূল চাহিদার পরিমাণ, বর্ত্তমান বৎসরের ফসলের পরিমাণ ও কেন্দ্রীয় সরকার এবং অন্যান্য রাজ্য থেকে প্রাপ্ত ও প্রতিশ্রুত আমদানীর পরিমাণ তুলনা করে দেখলে বর্ত্তমান বৎসরে বাংলা দেশেই অন্ততঃ ৬ লক্ষ টন পরিমাণ খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত হওয়া উচিত বলে দেখা যাবে। কিন্তু বাস্তব পক্ষে বাজারে খাদ্যশস্যের আমদানী গত দুই মাসের উপর ধরে একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু চাল, গম, ইত্যাদি খাদ্যশস্যের বেলায়ই মাত্র যে তা ঘটেছে তা নয়, ডাল, তেল, মাছ, ইত্যাদি অন্যান্য খাদ্য-পণ্যের বেলায়ও অনুরূপ অবস্থা দেখা যাচ্ছে। সমগ্র দেশেই আজ খাদ্য সঙ্কট আশঙ্কাজনক অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। সে ক্ষেত্রেও সেই একই অবস্থা দেখা যাবে। সরকারী হিসাব মত বর্ত্তমান বৎসরে খাদ্যশস্যের উৎপাদনের পরিমাণ ৭৯,০০০,০০০ টন। কেন্দ্রীয় সরকারের সম্প্রতি প্রচারিত হিসাব মত আমাদের খাদ্যের চাহিদার ন্যূনতম পরিমাণ ৯০,০০০,০০০ টন, অতএব ঘাটতির পরিমাণ ১১,০০০,০০০ টন। এই হিসাব কিন্তু বাস্তবতানুসারী নয়। বার্ষিক শতকরা ২½% হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দেশের বর্ত্তমান জনসংখ্যার অঙ্ক হয় ৩৭৪,০০০,০০০। এর মধ্যে ০—১৪ বৎসর বয়স্কদের এবং ৬৫ ও তদূর্দ্ধ বয়স্কদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৩৯%। ১৫-৬৪ বৎসর বয়স্কদের জন্য দৈনিক ১৬ আউন্স ও অন্যান্যদের জন্যে দৈনিক ৮ আউন্স বরাদ্দ ধরে নিলে আমাদের সমগ্র দেশের মোট খাদ্যশস্যের চাহিদার পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৩,০০০,০০০ টনের কম। বর্ত্তমানে আংশিক বণ্টন নিয়ন্ত্রণের সরকারী নীতি অনুযায়ী প্রতি প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য সাপ্তাহিক ৩ কিলোগ্রাম খাদ্যশস্যের বরাদ্দ ধরা হয়েছে; এর দৈনিক পরিমাণ দাঁড়ায় ৭·৭ আউন্স মাত্র। অতএব আমাদের বর্ত্তমান বৎসরের উৎপাদিত খাদ্যশস্য থেকেই ন্যূনাধিক ১৬,০০০,০০০ টন উদ্বৃত্ত থাকা উচিৎ। কিন্তু সরকারী আয়োজনে যে ৪,০০০,০০০ টন গম বিদেশ থেকে আমদানী করা হয়েছে, তা থেকেও ইতিমধ্যে ৩,৮০০,০০০ টন বাজারে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ সমগ্র দেশেই বাজারে খাদ্যশস্যের আমদানী একরকম বন্ধ হয়ে গেছে বললেই হয়।

কেন এমনটা হ'ল এবং কি করেই বা তা সম্ভব হ'ল, সেই প্রশ্নের জবাব মিললেই তবে এই দুরূহ সঙ্কট থেকে মুক্তি লাভ করবার পথ খুঁজে পাওয়া যাবে। গড়পড়তা হিসাবে দেখা যাবে যে, গত ফসলের ৬ মাসের মধ্যে দেশের খাদ্যশস্যের খাদ্য হিসাবে খরচের পরিমাণ মোট ৩২,০০০,০০০ টনের বেশী হওয়া উচিৎ নয়। এর মধ্যে ৩,৮০০,০০০ টন সরকারী গুদাম থেকে বেরিয়েছে। তা হ'লে আমাদের বর্ত্তমান বৎসরের উৎপাদন থেকে অন্ততঃ ৫০,০০০,০০০ টন চোখে দেখা না গেলেও এখনও দেশে মজুদ থাকা উচিৎ। এর মধ্যে চাষীরা যদি নিজেদের খোরাকির জন্য অর্দ্ধেক পরিমাণ মজুদ করে থাকেন—যদিও তার সম্ভাবনা খুবই কম—তা হ'লেও অন্ততঃ ২৫,০০০,০০০ টন পরিমাণ খাদ্যশস্য বাজার থেকে লুকিয়ে ফেলা হয়েছে ব'লে মানতে হবে। এটা

করতে হ'লে আর ২,০০০ কোটি টাকার সংস্থান প্রয়োজন।

চাষী বা জোতদারদের পক্ষে সেটা যে একান্তই অসম্ভব, সেটা বলাই বাহুল্য। দেশের সমগ্র চাষী-গোষ্ঠীর মধ্যে মাত্র শতকরা ১০ জন নিজেদের খোরাকির অতিরিক্ত উৎপাদন করে থাকেন, শতকরা ৩০ জন তাঁদের বৎসরের খোরাকির জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ উৎপাদন করে থাকেন। বাকী শতকরা ৬০ জন তাঁদের তিন মাস থেকে নয় মাসের খোরাকির পরিমাণ মাত্র উৎপাদন করে থাকেন। দেশের চাষী সমাজ এখনও প্রচণ্ড পরিমাণ ঋণের বোঝা বহন করছেন। অতএব লক্ষ লক্ষ টন খাদ্যশস্য গোপনে মজুদ করে রাখবার সামর্থ্য বা সংস্থান যে এঁদের নাই, এটা অতি স্পষ্ট। অন্য পক্ষে খাদ্যশস্যের কারবারীরা সাধারণতঃ তাঁদের কারবার, মাল আমানতের দ্বারা মোটামুটি ৬০% অর্থ সাহায্য ব্যাঙ্ক ইত্যাদি থেকে নিয়ে, তাঁদের ব্যবসা চালিয়ে থাকেন। অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য হাজার কোটি টাকার মাল মজুদ করে প্রচণ্ড মুনাফা করবার সামর্থ্য বা সাহস এঁদের নিজেদের সংস্থানের জোরে সংগ্রহ করা একটা অচিন্তনীয় ব্যাপার। অতএব এই ব্যাপারটার পিছনে যে বৃহৎ পুঁজিপতিদের কারসাজি ও অর্থাগ্কূল্য অবশ্যই আছে, সেটা অন্ততঃ খুবই স্পষ্ট। এই কারবারে "হিসাব-বহির্ভূত" (Unaccounted) অর্থ ক্রিয়া করছে ব'লে কোন কোন বিশিষ্ট সরকারী মুখপাত্র বলেছেন। এই হিসাব-বহির্ভূত পুঁজির দখলীকার কারা, সেটা সন্ধান করবার কোন প্রয়াস আজ পর্য্যন্ত দেখতে পাওয়া যায় নি। আশঙ্কা হয়, যে-সকল বেসরকারী ব্যক্তিদের সরকারী অন্দর মহলে অবাধ গতিবিধি আছে তাঁরাই এই হিসাব-বহির্ভূত পুঁজির মালিক, না হ'লে এর কুক্রিয়া বন্ধ করবার কোন সার্থক প্রয়োগ আজও কেন রচিত হয় না? বরং বর্ত্তমান অবসরে সেটা অপেক্ষাকৃত সহজেই করা সম্ভব হওয়া উচিৎ ছিল। নিতান্ত বাতুলেও একথা বিশ্বাস করবে না যে, সরকার পক্ষ থেকে দেশে লুকিয়ে রাখা খাদ্যশস্যের মজুদ সত্যিই খুঁজে বের করবার ইচ্ছা থাকলে, সেটা করতে পারা এমন কিছু একটা কঠিন ব্যাপার নয়। লক্ষ লক্ষ টন, এমন কি দু'-চার-দশ টন খাদ্যশস্যও লুকিয়ে রাখা সহজ ব্যাপার নয়। সরকারের সক্রিয় সমর্থনে পুলিশ যদি এটুকুও করতে সমর্থ না হয় তবে পুলিশের সব কর্ত্তাদের এখুনি অযোগ্যতার জন্য বরখাস্ত করা উচিৎ। এবং এই [illegible]

করতে [illegible] হিসাব-বহির্ভূত অর্থের কুক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেত।

কিন্তু এ ত গেল জরুরী অবস্থায় জরুরী ব্যবস্থা। কিন্তু মূল্য সঙ্কটের আসল গোড়াটি অন্য খানে, এগুলি তার লক্ষণ ও অনিবার্য্য প্রতিক্রিয়া মাত্র। উন্নয়নের অজুহাতে—এবং তার সঙ্গে এখন প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে যুক্ত হয়েছে—যে প্রভূত পরিমাণ পুঁজি বাজারে ছাড়া হয়েছে তার সবটাই সার্থক ভাবে যে উৎপাদন-সংস্থার পরিবর্ত্তনে রূপায়িত হয় নি তার প্রমাণের অভাব নেই। সার্থক উন্নয়নের আনুষঙ্গিক খানিকটা পরিমাণ মুদ্রাস্ফীতি অনিবার্য্য একথা মেনে নিলেও তার পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকা একান্ত প্রয়োজন, না হ'লে উন্নয়ন সার্থকতা আনুপাতিক পরিমাণে যেমন বিঘ্নিত হ'তে বাধ্য, অন্যদিকে তেমনি আর্থিক কেন্দ্রিকরণ ঘটতে বাধ্য। এই অবস্থা থেকেই হিসাব-বহির্ভূত পুঁজি সঞ্চয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। অতএব উন্নয়নের আয়োজনে আমূল সংস্কার ও সংশোধন যে একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে সে কথা একমাত্র শ্রীঅশোক মেহতা ব্যতীত আর সকলেই স্বীকার করছেন। মুদ্রা লগ্নী ও উৎপাদনে সামঞ্জস্য রক্ষা না হ'লে মুদ্রাস্ফীতি নির্দ্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমিত রাখা সম্ভব নয় এবং তা না হ'লেই অবশ্যভোগ্য পণ্যাদির ক্ষেত্রে উচ্চতর হারে মূল্যবৃদ্ধি এবং অবশেষে সরবরাহে সঙ্কট বারে বারে অনিবার্য্য হয়ে পড়বে।

শুধু খাদ্যশস্য ও অন্যান্য খাদ্য-পণ্যে মাত্র নয়, অন্যান্য অবশ্যভোগ্য পণ্যের বেলায়ও এটি ঘটতে সুরু করেছে। সরকারী হিসাব মত দেশের দরিদ্রতর শ্রেণীর ভোগ্য-আয়ের ৭০% একমাত্র খাদ্যশস্যে ব্যয় হয়ে থাকে। খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রকোপ এই শ্রেণীর উপরে স্বভাবতই সমধিক। এবার ডাল, সরিষার তেল, মাছ, সকল প্রকার সব্জীর, সবকিছু খাদ্য-পণ্যের উপরেই এই চাপ সমধিক হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর এর চাপটাও সমান হয়ে উঠল। কাপড়ের ব্যাপারেও নূতন মূল্যবৃদ্ধির মহড়া চলতে সুরু করেছে। ব্যবসায়ী মহলে সন্ধানে জানতে পারা গেল যে, পুরাণো চুক্তি সংশোধন করতে সরকার রাজী না হ'লে সব কাপড়-মিলওয়ালারাই নিজেদের ইচ্ছামত মূল্যবৃদ্ধি করতে বাধ্য হবেন এমন হুমকী দেখিয়েছেন। অন্য পক্ষে তাঁত বস্ত্রের উপরে যে রিবেট দেওয়া হ'ত, সেটা কমান যায় কি না, সে প্রশ্নও নাকি বর্ত্তমানে বিচারাধীন। এবার পূজার উৎসব বাঙ্গালী [illegible]

যুদ্ধাবের সঙ্গেই অর্দ্ধাহারে, ছিন্নবস্ত্রে উদ্‌যাপন করতে বাধ্য হবে দেখিতে পাইতেছি!

সরকারী শিল্পায়নে বিদেশী বেসরকারী পুঁজি লগ্নী

পঞ্চবার্ষিকী আর্থিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিদেশী পুঁজি লগ্নী বিষয়ে ভারত সরকারের এতাবৎ যে নির্দ্দিষ্ট নীতি অনুসৃত হয়ে আসছিল, তার ধারায় একটা আমূল পরিবর্তনের আভাস সম্প্রতি পাওয়া যেতে সুরু করেছে। সরকারী মালিকানা ও পরিচালনায় নির্দ্দিষ্ট শিল্পএলাকায় বিদেশী পুঁজি এ পর্য্যন্ত ঋণ হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে। এই ঋণ সাহায্যকারী বিভিন্ন সরকার ও নানাবিধ আন্তর্জ্জাতিক উন্নয়ন-সহায়ক প্রতিষ্ঠান থেকেই বেশীর ভাগ সংগ্রহ করা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিদেশী পুঁজিও লগ্নী করা হয়েছে বটে, যেমন দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠায়, কিন্তু এ সকলই ঋণ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

ব্যক্তিগত মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত কতকগুলি শিল্পের ক্ষেত্রে বিদেশী ব্যক্তিগত পুঁজি, লগ্নী (investment) হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে, কিন্তু সরকারী মালিকানার ক্ষেত্রে না স্বদেশীয় না বিদেশী কোন প্রকার ব্যক্তিগত পুঁজি লগ্নী করা এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট সরকারী নীতির দ্বারা অনুমোদিত হয় নি। বোকারো ইস্পাত কারখানার পরিকল্পনায় এই বিষয়ে মতভেদের কারণেই মার্কিনী সাহায্যের প্রাথমিক প্রস্তাব বাতিল হয়ে গিয়েছিল, স্মরণ থাকতে পারে। যে মার্কিনী বিশেষজ্ঞের দলের উপরে বোকারো পরিকল্পনার সম্ভাব্যতা ও অর্থকারিতা (feasibility) বিচার করবার ভার দেওয়া হয়েছিল, তাঁরা সুপারিশ করেন যে, এই প্রস্তাবিত ইস্পাত কারখানাটির পরিচালনার ভার কোন ব্যক্তিগত সংস্থার উপরে অন্ততঃ একটা নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য হলেও যদি না দেওয়া হয়, তা হ'লে ইহার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনকল্পে ব্যক্তিগত ক্ষেত্র থেকে আহরণ করা মার্কিনী পুঁজি এতে লগ্নী করা সমীচীন হবে না। এই কারণেই এই সম্পর্কে প্রথম মার্কিনী অর্থ সাহায্যের প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। বর্ত্তমানে একটি মার্কিনী ও ব্রিটিশ যুক্ত সংস্থা (Consortuim) এই ইস্পাত কারখানাটির প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রয়োজনীয় ঋণ (Credits) দিবার ব্যবস্থা করবেন বলে আশা আছে বলে শোনা যায়।

কিন্তু গত বাজেট বক্তৃতা প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী কৃষ্ণমাচারী এ সম্পর্কে এতাবৎ অনুসৃত সরকারী নীতির পরিবর্ত্তনের একটা স্পষ্ট আভাস দেন। তিনি বলেন যে, সরকারী শিল্পক্ষেত্রে বিদেশী ব্যক্তিগত পুঁজি লগ্নীর সুযোগ করে দেবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করবার আয়োজন করা হবে। সম্প্রতি কোচিনে যে তৈল শোধনাগার প্রতিষ্ঠা করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে তাতে একটি বিদেশী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে মোট পুঁজির ২৫% লগ্নী করবার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্তে কৃষ্ণমাচারী-বর্ণিত সরকারী নীতির পরিবর্ত্তনের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে একটা বিশেষ ব্যাপার প্রণিধানযোগ্য। সরকারী শিল্পে বিদেশী বেসরকারী পুঁজি লগ্নীর যে পথ উন্মুক্ত করে দেবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'ল, সেই রকম অনুরূপ সুযোগ ভারতীয় বেসরকারী পুঁজির বেলায় ঘটবে না। এই ভেদনীতি নিয়ে ইতিমধ্যে কিছুটা সমালোচনাও হয়েছে, কিন্তু এ বিষয়ে সরকারী পরিবর্ত্তিত নীতির অতিরিক্ত পরিবর্ত্তনের কোন আশা এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নি। এই ভেদনীতি অনুসরণ করবার স্বপক্ষে দুইটি কারণ থাকা সম্ভব। প্রথমত, উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়ণের প্রয়োজনে যে বিরাট বৈদেশিক ঋণ এ পর্য্যন্ত গ্রহণ করা হয়েছে তা শোধ করবার সময় অদূর ভবিষ্যতেই সুরু হবে। কিন্তু আমাদের রপ্তানী বাণিজ্যের অবস্থা এখনও যে স্থানে পড়ে আছে, তাতে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই সব ঋণের কিস্তি শোধ করবার মত উপযুক্ত পরিমাণ উদ্বৃত্ত বৈদেশীক মুদ্রা আমরা অর্জ্জন করতে পারব কি না সে-বিষয়ে গভীর সন্দেহের অবকাশ আছে। আমদানী কড়া হাতে প্রভূত পরিমাণে সঙ্কুচিত করে দিয়ে এবং রপ্তানীর পরিমাণ কিছুটা পরিমাণে বৃদ্ধি করে এই বিষয়ে খানিকটা উন্নতি গত দুই বৎসরে সাধিত হয়েছে, একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই উন্নতি সাধনের মোট পরিমাণ এখনও প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। যতটুকু উন্নতি এ পর্য্যন্ত এদিকে সাধিত হয়েছে তার দ্বারা আমাদের ঋণের কিস্তি শোধ করবার মত

পর্য্যন্ত উপার্জন হবার আশা এখনও সুদূরপরাহত। তা ছাড়া এই উন্নতি সাধনকল্পে যে পরিমাণে বৈদেশিক আমদানীর সঙ্কোচন করা হয়েছে তার দ্বিবিধ কুফল আমরা ইতিমধ্যেই ভোগ করতে সুরু করেছি। প্রথমতঃ, নিতান্ত প্রয়োজনীয় শিল্পসহায়ক কাঁচা মালের (industrial raw materials) এবং শিল্পে চালু যন্ত্রাদির অংশাদির (spare parts) আমদানী অনেক পরিমাণে সঙ্কোচন করা হয়েছে। এর ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে উৎপাদনে বিশেষ বিঘ্ন যে ঘটেছে সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। যে যে কারণে দেশে প্রতিষ্ঠিত শিল্পশক্তির (established capacity) একটা বিশেষ অংশ অলস থাকতে বাধ্য হচ্ছে তার মধ্যে এটিও অন্যতম। অন্যদিকে আমদানী সঙ্কোচনের ফলে যে সকল প্রকার ভোগ্য পণ্যের আমদানী একেবারেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, তার ফলে মূল্যমানের উপরেও আনুপাতিক অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হয়েছে। দেশে যে মূল্যসমস্যা গত তিন বৎসরে দ্রুতগতিতে আজ একটা আশঙ্কাজনক অবস্থায় এসে পৌঁছেছে তার অন্যান্য কারণের মধ্যে এটিও যে একটি বিশেষ কারণ তাও অস্বীকার করবার উপায় নেই।

অথচ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনানুযায়ী যদি দেশে শিল্পায়নের গতি অব্যাহত রাখতে হয়, তবে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন আরও বেশ কিছুকালের জন্য যে বাড়তেই থাকবে তাতেও কোন সন্দেহ নেই। দেশের মধ্যে কতকগুলি শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি প্রস্তুত করবার কিছুটা আয়োজন ইতিমধ্যেই অবশ্য সম্পূর্ণ হয়েছে এবং আশা করা যায় যে, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য বিদেশী যন্ত্রাদি আমদানী করবার প্রয়োজন ধীরে ধীরে ভবিষ্যতে কমে আসবে। কিন্তু কতকগুলি মূল শিল্পের ক্ষেত্রে উন্নয়নের ক্ষেত্র এখনও অনেকটা পরিমাণেই অপূর্ণ রয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে ইস্পাত শিল্পের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। চতুর্থ পরিকল্পনা পর্য্যন্ত দেশে উন্নয়নকল্পে যে পরিমাণ ইস্পাতের ন্যূনতম প্রয়োজন হবে বলে হিসাব করা হয়েছে সেটা বার্ষিক ১৮০ লক্ষ টনে নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। এটা ছিল প্রাথমিক হিসাব মাত্র। ইতিমধ্যে চতুর্থ পরিকল্পনার যে সম্ভাব্য রূপ ও আয়তনের আভাস সরকারী মুখপাত্রদের কাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছে তাতে মনে হয়, ইস্পাতের ন্যূনতম প্রয়োজনের অঙ্ক অন্ততঃ বার্ষিক ২০০ লক্ষ টনে দাঁড়াবে। বর্ত্তমানে আমাদের ইস্পাত উৎপাদনের সংস্থানের পরিমাণ: টাটা ২০ লক্ষ টন; বার্নপুর ১০ লক্ষ টন; দুর্গাপুর ১০ লক্ষ টন; রাউরকেলা ১০ লক্ষ টন; ভিলাই ১০ লক্ষ টন এবং ভদ্রাবতী ২ লক্ষ টন; মোট ৬২ লক্ষ টন। ইতিমধ্যে দুর্গাপুরে ৬ লক্ষ টন; রাউরকেলায় ৬ লক্ষ টন এবং ভিলাইয়ে ১০ লক্ষ টন অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা সংযোজনের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সম্ভবতঃ চতুর্থ পরিকল্পনার শেষ পর্য্যন্ত এ সকল সম্প্রসারণের কাজ সম্পূর্ণ হবে। শোনা যাচ্ছে বার্নপুরেও আরও অতিরিক্ত ৬ লক্ষ টন উৎপাদন ক্ষমতা সংযোজনের সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে গৃহীত হয়েছে; অবশ্য এ বিষয়ে এখন পর্য্যন্ত কোন পাকা খবর পাওয়া যায় নি। এ ছাড়া বোখারোতে প্রস্তাবিত ৪০ লক্ষ টন উৎপাদন ক্ষমতা-সম্বলিত কারখানা প্রতিষ্ঠা করবার সিদ্ধান্ত হয়েছে। নানা কারণে বোকারোর রূপায়ণের কাজ সুরু হ'তে অনেক বিলম্ব হয়ে গিয়েছে এবং শীঘ্রই যদি এর নির্ম্মাণের কাজ সুরু করা যায় তবে সম্ভবতঃ চতুর্থ পরিকল্পনার শেষ পর্য্যন্ত বোকারোর উৎপাদন পরিধি ১০ লক্ষ টন পর্য্যন্ত পৌঁছাতে পারে। এ ছাড়া মাদ্রাজ প্রদেশে লিগ্‌নাইট ভিত্তিক একটি ১০ লক্ষ টন কারখানা স্থাপনের প্রস্তাবও ছিল। সম্প্রতি গোয়াতেও একটি ১০ লক্ষ টন কারখানা প্রতিষ্ঠা করবার কথা শোনা গিয়েছে। এ সকলই যদি চতুর্থ পরিকল্পনার অন্ত পর্য্যন্ত উৎপাদন করবার অবস্থায় এসে পৌঁছায়, তা হ'লে চতুর্থ পরিকল্পনার শেষ পর্য্যন্ত আমাদের ইস্পাত উৎপাদনের মোট সংস্থানের পরিমাণ দাঁড়াবে ১২০ লক্ষ টন। আমাদের চতুর্থ পরিকল্পনার জন্য ইস্পাতের চাহিদার প্রয়োজন যদি বার্ষিক ১৮০ লক্ষ টনে ধার্য্য হয় তা হ'লেও এখানে একটা মস্ত ফাঁক থেকে যাবে। ইতিমধ্যে এ সকল কারখানা প্রতিষ্ঠা ও পরিবর্দ্ধনের জন্য প্রভূত পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হবে এবং প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদনে যদি বার্ষিক ৬০ লক্ষ টন ঘাটতি হয় এবং এই ঘাটতি যদি আমদানীর

মেটাতে হয়, তবে সে জন্ত আরও অতিরিক্ত বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হবে। তা ছাড়া বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো এবং অন্তান্ত আরও অনেকগুলি মূল শিল্পের প্রয়োজনেও বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন খুবই বিরাট্ আকারের হবে, সন্দেহ নেই।

এই প্রয়োজন যদি ঋণের দ্বারা পূরণ করতে হয়, তবে এক কালে বৈদেশিক মুদ্রাতেই সেই ঋণ এবং তৎসংলগ্ন সুদ পরিশোধ করবার দায়িত্বও সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। কিন্তু যদি বিদেশী পুঁজিপতিদের আমাদের সরকারী মূল শিল্পগুলির শেয়ারে তাঁদের পুঁজি লগ্নী করবার কাজে আকৃষ্ট করা যায়, তবে এ ভাবে শিল্পায়নের কাজে আমাদের বিদেশী মুদ্রার প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হয় অথচ বিদেশী মুদ্রায় শেয়ারের মুনাফা ব্যতীত অন্ত কোন দায় বর্ত্তায় না। সম্ভবতঃ এই কারণেই এ বিষয়ে সরকারী নীতির পরিবর্ত্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। দেশী বেসরকারী পুঁজি লগ্নীর দ্বারা সরকারী শিল্পায়নের এই বিশেষ সমস্যাটি সমাধানের কোন পথ প্রস্তুত হ'ত না। তা ছাড়া পরিকল্পনায় বেসরকারী শিল্পায়নের আয়তন ও পরিধিও অকিঞ্চিৎকর নয়। দেশে শিল্পে লগ্নীযোগ্য বেসরকারী পুঁজির পরিমাণও এমন কিছু বৃহৎ নয় যে, সরকারী শিল্পে এই পুঁজি লগ্নীর সুযোগ সরাসরি পেলে বেসরকারী শিল্পের জন্ত অবশিষ্ট বেশী বাকী কিছু থাকবে। ইতিমধ্যে গৌণ ভাবে, ইউনিট ট্রাষ্ট ও অন্তান্ত নূতন পরিকল্পিত সংস্থানের মারফৎ কিছুটা পরিমাণ বেসরকারী পুঁজি অবশ্যই আনুপাতিক পরিমাণে সরকারী শিল্পে নিয়োগ করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অন্তদিক দিয়েও এ পরিবর্তিত নীতি দেশের আর্থিক উন্নয়নের অধিকতর সহায়ক হবে বলে মনে হয়। বিদেশী ঋণের সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ অতিরিক্ত বোঝা যে দেশকে বহন করতে হচ্ছিল, বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রথমতঃ, যাকে বলা হয় নির্দ্দিষ্ট শিল্পের জন্ত ঋণ (Project based assistance) সেটা পাবার বেশীর ভাগ সময়েই এই চুক্তি ছিল যে, ঋণদানকারী দেশ হ'তেই নির্দ্দিষ্ট শিল্পের জন্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি ও বিশেষজ্ঞ সহায়তা (Capital goods and technical know-how) আমদানী করতে হবে। আমরা এ পর্য্যন্ত যত বৈদেশিক ঋণ আমাদের শিল্পায়নের কাজে পেয়েছি তার প্রভূততম অংশ এসেছে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র থেকে। ঐ দেশে বিশ্বমানের তুলনায় যন্ত্রাদির মূল্য মোটামুটি ৩৭% উচ্চতর এবং এই ঋণের সুদ ব্যতীত এই উচ্চতর মূল্যও আমাদের দিতে হয়েছে। তা ছাড়া তথাকথিত মার্কিনী বিশেষজ্ঞের মূল্য মোটামুটি বিশ্বমানের তুলনায় গড়পড়তা ২৫০-৩০০% বেশী, অর্থাৎ একটি মাসিক ৫০০০৲ টাকা মূল্যের ব্রিটিশ কুশলীর একজন সমকক্ষ মার্কিনী বিশেষজ্ঞের মূল্য মোটামুটি মাসিক ১০,০০ ৲ টাকা থেকে ১৫,০০০ টাকা। ভারত সরকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ একটি বিরাট্ মার্কিনী প্রতিষ্ঠানের এই রকম একটি বিশেষজ্ঞের জন্ত ট্যাক্স-ফ্রী বার্ষিক ১৮০,০০০ ডলার, অর্থাৎ ৯০০,০০০ টাকা অর্থাৎ মাসিক ৭৫,০০০৲ টাকা দিতে হয়েছে বলে শোনা যায়। এই অতিরিক্ত প্রচণ্ড বোঝা বৈদেশিক ঋণের অনিবার্য্য আনুষঙ্গিক। আশা করা যায় ভারতের সরকারী শিল্পায়নে বিদেশী বেসরকারী পুঁজি লগ্নী সম্ভব করতে পারলে এই প্রচণ্ড বোঝারও ভার খানিকটা হাল্কা করা সম্ভব হবে।

অবশ্য সবটাই নির্ভর করবে এ সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান-গুলির পরিচালন-নীতি রচনা এবং পরিচালনায় লগ্নীকারী বিদেশী পুঁজিপতিদের কতটা প্রভাব ও অধিকার দেওয়া হবে তার ওপরে। সঙ্গে সঙ্গে এ সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান-গুলি যাতে তথাকথিত বিদেশী বিশেষজ্ঞের কুক্ষিগত না হয়ে পড়ে সে দিকেও যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন হবে। এ পর্য্যন্ত ভারতীয় শিল্পায়নের ক্ষেত্রটি মোটামুটি বিদেশী বেকারের মোটা বেতনের চাকুরির স্থানে পরিণত হয়েছে। এতে যে কেবলমাত্র দেশের প্রচণ্ড আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে তা নয়, আমাদের দেশের নতুন বিশেষজ্ঞ শিক্ষাপ্রাপ্ত কুশলীদের নিজ দেশে উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্রের অভাবে অনেকেই এ সকল প্রায় নিরক্ষর এবং অধিকাংশ স্থলে নিতান্তই অকর্ম্মণ্য বিদেশীদের তাঁবে কাজ করতে রাজী না হয়ে বিদেশে কর্ম্মসংস্থানের জন্ত প্রস্থান করেছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এঁদের মধ্যে অনেকেই যে-সকল দেশ থেকে আমরা প্রভূত ব্যয়ে তথাকথিত বিশেষজ্ঞ আমদানী করছি, সে-সকল দেশের বৃহৎ বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে দায়িত্ব ও সম্মানের পদ অধিকার করতে পেরেছেন। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে মার্কিন দেশের বৃহত্তম (সমগ্র জগতেরও বটে) ইউনাইটেড ষ্টীলের গবেষণাগারের প্রধানাধ্যক্ষ বর্ত্তমানে একটি বিশিষ্ট ভারতীয়। ঐ দেশে ইহার এখন অসাধারণ প্রতিষ্ঠা, কিন্তু নিজের দেশে তিনি সামান্ততম স্বীকৃতিও পান নি।

সঙ্গীতের আসরে

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

'কলকাতা আজব শহর'

রাগের রূপ ও তাদের ব্যাকরণ সঠিক রেখে সঙ্গীত পরিবেশন করতে অনেকে পারেন। কারণ তা শিক্ষা-নির্ভর। কিন্তু সঙ্গীতে—অন্য সব আর্টেরই মতন—আসল কথা হ'ল রসসৃষ্টি, যা সত্যকার শিল্পী ভিন্ন আর কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। এ কৃতিত্ব শুধু শিক্ষার ফলে অর্জন করা যায় না। আর কণ্ঠ-সঙ্গীতে সেই রসসৃজনে সবচেয়ে সাহায্য করে—কণ্ঠমাধুর্য। তাই কণ্ঠ-সঙ্গীতে তার আদর ও আবেদন এত।

কণ্ঠ-সঙ্গীতের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ত প্রত্যক্ষ। গায়কের পক্ষে শ্রোতার অন্তর-তন্ত্রী স্পর্শ করা সহজতর হয় তিনি মধুকণ্ঠ হ'লে। শ্রোতার মর্মে তাঁর সুরের আবেদন অনুরূপ ভাবের সঞ্চার করে। শিল্পী অমরত্ব লাভ করেন কণ্ঠ-মাধুর্যের প্রসাদে।

তেমন কণ্ঠসম্পদের অধিকারী অবশ্য কোন দেশেই সুলভ নন। বাংলায়ও তাঁদের সংখ্যা অল্প। এমন কয়েকজনের নাম সঙ্গীত-জগতের শ্রুতি-স্মৃতিতে বেঁচে আছে। তাঁরা ছিলেন বিভিন্ন যুগের, বিভিন্ন রীতির গায়ক। কেউ ধ্রুপদ, কেউ বা টপ্পা, কেউ বা খেয়াল অঙ্গের শিল্পী। যথা—বিষ্ণুপুরের ধ্রুপদী যদু ভট্ট; কৃষ্ণনগরের দেওয়ান, খেয়াল-গায়ক কার্তিকেয়চন্দ্র রায়; ধ্রুপদ টপ্পা ও ভজন-গায়ক অঘোর-নাথ চক্রবর্তী; টপ্পা-গায়ক মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়; রাণা-ঘাটের নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য; পাথুরিয়াঘাটার ধ্রুপদী পিতা-পুত্র মহীন্দ্রনাথ ও ললিতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়; ভাগলপুরের ধ্রুপদ-খেয়াল গায়ক সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার; এণ্টালীর ধ্রুপদী হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; তেলিনীপাড়ার টপ্পাশিল্পী জিতেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (কালোবাবু); ধ্রুপদী ভূতনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়; শিবপুরের টপ্পা-গুণী ফণীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়; খেয়াল-গায়ক ও ধ্রুপদী জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী; রাণাঘাটের টপ্পা-গায়ক নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (পদ্মবাবু) প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন কৃষ্ণনগরের কার্তিকেয়চন্দ্র রায়। তাঁর আগেকার যুগে কণ্ঠ-মাধুর্যের জন্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেন—নিধুবাবুর প্রিয় শিষ্য, হাফ্-আখড়াই গানের প্রবর্তক, বাগবাজারের মোহনচাঁদ বসু। তাঁরও আগে—বাংলার আদিযুগের টপ্পাশিল্পী নিধুবাবু স্বয়ং। পশ্চিমাঞ্চলের সুর-রাজ্য থেকে যাঁরা বাংলায় এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কণ্ঠ-মাধুর্যের জন্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন—খেয়াল-গায়ক কালে খাঁ, ঠুংরি-গায়ক মৌজুদ্দিন, টপ্পা-গায়ক রমজান খাঁ, খেয়াল-গায়িকা মুস্তারি বাঈ, প্রভৃতি।

এখন ওস্তাদ রমজান খাঁর প্রসঙ্গ। অসামান্য সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের জন্যে তাঁর নাম সঙ্গীতক্ষেত্রে সঞ্জীবিত আছে। তাঁর কণ্ঠের যে হৃদয়গ্রাহী মাধুর্য আসরের পর আসর মাৎ করত, শ্রোতাদের পুলকে উদ্বেল ও বিষাদে বিধুর করে তুলত, তার কোন চিহ্ন আর কোথাও কিছু পাওয়া যাবে না। সেকালের গায়কদের এই এক ট্র্যাজেডি। তাঁদের দেহের সঙ্গে সুরেরও সমাধি ঘটে যেত। রমজান খাঁর কণ্ঠস্বরও লুপ্ত হয়ে গেছে, যদিও তাঁর জীবনের মধ্যপর্বে আরম্ভ হয়েছিল গ্রামোফোনের যুগ।

খাঁ সাহেবের গান রেকর্ড করবার অবশ্য একবার সব বন্দোবস্ত হয়েছিল। কিন্তু একটা অদ্ভুত রকমের বাধা পড়ে ব্যর্থ হয়ে যায় সে প্রচেষ্টা। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর সে বিষয়ে কথাবার্তা সব পাকা হয়। গান দু'খানিও তৈরি। নির্দিষ্ট দিনে নির্ধারিত সময়ে তিনি এলেন রেকর্ড করতে, রেকর্ডিং ঘরে গাইতে। সেখানকার সব আয়োজনও প্রস্তুত।

সে আদিকালের রেকর্ড করবার পদ্ধতি ছিল অন্য রকম। লম্বা চোঙার ফনোগ্রাফের সামনে বসে গাইতে হ'ত। আজকালকার মাইক্রোফোনের মতন স্বরকে গ্রহণ করবার শক্তি তার ছিল না। গায়কের গলার চড়া ও খাদের সব রকম কার্য নাকি করা যেত না ফনোগ্রাফ থেকে একই দূরত্বে মুখ রেখে। উদারা গ্রামের নীচের দিকে, অর্থাৎ স্বর যখন অনেক নেমে যেত, তখন চোঙার দিকে গায়কের মুখ দিতে হ'ত একটুখানি এগিয়ে। তেমনি তারা গ্রামে স্বর চড়ার

উঠে গেলে, গায়ক মুখ একটু পিছিয়ে নিতেন। মাঝামাঝি স্বরে গাইবার সময় গায়ককে এমন দূরত্বের তারতম্য করতে হত না। স্বরের পার্থক্য যখন দ্রুত ঘটাবার দরকার; তখনই নাকি গায়কের কণ্ঠ ওইভাবে সমতা রক্ষা করত।

রমজান খাঁর এত কাণ্ড-কারখানা জানা ছিল না। তিনি ভাবে-ভোলা সঙ্গীত-শিল্পী। গান গাইতেন প্রাণের আবেগে, আত্মবিস্মৃত হয়ে। কর্তৃপক্ষ তাঁকে এত যন্ত্র-কৌশলের বিষয়ে অবহিত করা প্রয়োজন মনে করেন নি। তাঁর গলা যে তারা গ্রামের এত উঁচু পর্দায় কাজ করবে, তা হয়ত ভাবেন নি তাঁরা।

ওস্তাদজী চোঙার সামনে বসে গান আরম্ভ করেছেন। তাঁর ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে শুনছেন কর্তৃপক্ষের এক সাহেব, এই যন্ত্রের বিশেষজ্ঞ। সাহেব হঠাৎ দেখলেন, গায়ক খুব high pitch-এ (চড়া সুরে) গলা তুলেছেন। তিনি অমনি খাঁ সাহেবের মাথাটি ধরে একটু টেনে নিলেন পিছন দিকে। যন্ত্রের প্রয়োজনে।

আচমকা এভাবে মাথা টেনে নেওয়াতে রমজান খাঁ হতভম্ব হয়ে গান বন্ধ করে দিলেন। সে রেকর্ড নষ্ট হ'ল। সাহেব তখন তাঁকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে ব'লে অনুরোধ করলেন, গানটি আবার নতুন ক'রে গাইতে।

কিন্তু তখন রমজানের মেজাজ একেবারে বিগ্‌ড়ে গেছে, আর তা ধাতস্থ হ'ল না। 'আরে দূর করো' ব'লে সেই যে সেখান থেকে উঠে এলেন, আর ওমুখো হন নি কখনও। রেকর্ড করবার মেজাজ আর তাঁর কোনদিন ফিরে আসে নি।

রমজান খাঁর গলা কেমন মিষ্টি ছিল, সে বিষয়ে একটি চমৎকার কথা আছে। কথা না ব'লে কথা কাটাকাটি বললেই ঠিক হয়। সে একটি গানের আসরের ঘটনা। সেখানে বিশ্বনাথ রাওয়ের সঙ্গে একটি 'মনোজ্ঞ বচসা' হয়ে যায় রমজান খাঁর। সে কথা বলবার আগে বিশ্বনাথ রাওয়ের একটু পরিচয় দেওয়া ভাল।

ওস্তাদ বিশ্বনাথ রাও তখনকার কলকাতার আর একজন প্রতিষ্ঠাবান গায়ক। জাতিতে মারাঠী ব্রাহ্মণ, সঙ্গীতজ্ঞ পরিবারের সন্তান। সঙ্গীত-শিক্ষা হয় প্রধানতঃ পিতা সদাশিব রাওয়ের অধীনে, কাশীতে। পরে বাংলা দেশে চলে আসেন এবং প্রায় সমগ্র সঙ্গীত-জীবনই কলকাতায় কাটে। বাংলার সঙ্গীতাসরে ধামার গানে তিনি এক সুনাম অর্জন করেন, ধামার তাঁর দ্বারা এমন প্রচলিত হয় বাংলা দেশে যে তাঁর নামই হয়ে যায় বিশ্বনাথ ধামারী। তিনি ধ্রুপদ ও তেলেনাও অতি দক্ষতার সঙ্গে গাইতেন। সার্গম আর বাঁটের কাজে এমন পারদর্শী কলাবত খুবই কম ছিলেন তখনকার কালে। অনেক আসরেই তিনি প্রথমে ধ্রুপদ গেয়ে অতি পরিপাটি ভাবে ও মুন্সিয়ানার সঙ্গে ধামার গাইতেন। বাঁটের সুনিপুণ কারুকর্মে-ভরা আর সার্গমের চমৎকারিত্বে তাঁর ধামার এক অভিনব উপভোগের বস্তু হয় বাঙালী শ্রোতাদের পক্ষে। শ্রোতাদের মাতিয়ে দিয়ে বিশ্বনাথ রাও ধামারের এখানে প্রচার করলেন।

বাংলা দেশে বছরের পর বছর বাস ক'রে তিনি এ দেশেরই একজন হয়ে যান। বাঙালীদের সঙ্গেই তাঁর মেলামেশা ছিল বেশী, যদিও থাকতেন বড়বাজার অঞ্চলে, বাঁশতলায়। বাংলায় বেশ ভালই কথাবার্তা বলতে পারতেন। বাঙালীদের সঙ্গে অনেক সময় বাংলাতে কথা বলতেন, উচ্চারণে একটু পশ্চিমী টান দিয়ে; বাংলা গানও তিনি কিছু কিছু গাইতেন। তাঁর যে গানের রেকর্ড হয়েছিল, তা সবই বাংলা গান। তাঁর গানের রেকর্ডের এক সময় বাংলায় বেশ চলন ছিল। সেই—'হর হর হর, বম্ বম্ বামে শোভে গৌরী' (প্রভাতী) ও 'এমন দিন কি হবে তারা' (কাফি সিন্ধু)। এই গান দু'টির রেকর্ড নং—পি, ৮৬১। তাঁর আর একখানি গানের রেকর্ড ছিল—'তারা তারা তারা ব'লে কবে আমার প্রাণ যাবে' (ছায়ানট)। তা ছাড়া, 'রাধ রাধ মিনতি মম আজিকে গো রাই' (খাম্বাজ), 'জাল ফেলে যম রয়েছে বসে' (বেহাগ), 'মুই অধমের অধম' (আশাবরী, তেতালা)।

বাংলার সঙ্গীতক্ষেত্রে ধামারের প্রচলন ভিন্ন বিশ্বনাথ রাওয়ের আর কি দান ও সম্মানের আসন ছিল, তা তাঁর শিষ্যদের কথা স্মরণ করতে বোঝা যায়। বিখ্যাত গায়ক লালচাঁদ বড়াল তাঁর একজন শিষ্য। লালচাঁদের অবশ্য অন্য গুরুও ছিলেন। রাওজীর কাছে বিশেষ করে তিনি শেখেন ধামার ও সার্গম। প্রসিদ্ধ পাখোয়াজী ও ধ্রুপদী সতীশচন্দ্র দত্ত (দানীবাবু) বিশ্বনাথ রাওয়ের কাছে ধ্রুপদ ও ধামার শিক্ষা করেন। ধ্রুপদী অমরনাথ ভট্টাচার্য ও মাটোরের যোগীন্দ্রনাথ রায়ের অন্যতম সঙ্গীত-গুরু বিশ্বনাথ রাও

'সঙ্গীত সঙ্ঘ'-সম্পাদক ও গুণী কণ্ঠে বন্দেমাতরম্ গানের জন্যে বিখ্যাত গায়ক ব্রজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও তাঁর শিষ্য। তা ছাড়া, ধ্রুপদী বিনোদবিহারী মল্লিক (পাখোয়াজী গোপাল মল্লিকের কনিষ্ঠ পুত্র), প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ (অধ্যাপক ঈশানচন্দ্র ঘোষের পুত্র), শ্রীরামপুরের সতীশচন্দ্র ঘোষ, মেদিনীপুরের প্রবোধচন্দ্র দত্ত, লালচাঁদের জ্যেষ্ঠ পুত্র কিষণ-চাঁদ বড়াল, ২৪ পরগণার রাজপুরের আশুতোষ চক্রবর্তী প্রভৃতি অনেকেই বিশ্বনাথের শিষ্য।

স্যর আশুতোষ চৌধুরী ও প্রতিভা দেবী পরিচালিত 'সঙ্গীত সঙ্ঘ'র তিনি কণ্ঠ-সঙ্গীতের অধ্যাপক ছিলেন। 'সঙ্গীত সঙ্ঘ' যে কত উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীত-শিক্ষাকেন্দ্র ছিল তা আজকের দিনে স্মরণযোগ্য। ওস্তাদ কৌকভ ও করামতুল্লা খাঁ ভ্রাতৃদ্বয়, তবলাগুণী দর্শন সিং, সেতার-সুরবাহার বাদক ইমদাদ খাঁ, ওস্তাদ লছমীপ্রসাদ মিশ্র, গঙ্গা গিন্নি প্রভৃতির মতন ব্যক্তিরা বিভিন্ন সময়ে এখানে শিক্ষাদান ক'রে গেছেন। সে-সব কথা একটি পৃথক নিবন্ধের বিষয়।

শিষ্যদের শেখাবার বিষয়ে বিশ্বনাথ বিশেষ উদার ছিলেন। উপযুক্ত পাত্রে সঙ্গীতবিদ্যা দান করতে তিনি কখনও কার্পণ্য করতেন না, সে যুগের অনেক পেশাদার ওস্তাদের যে গুণের অভাব ছিল। তাঁর অবিবাহিত-অপত্যহীন হওয়াই তার কারণ নয়। এ সম্বন্ধে তাঁর স্বভাবের মধ্যেই একটি প্রসন্ন ঔদার্য ছিল—এই তাঁর কয়েকজন শিষ্যের অভিমত।

নাটোর মহারাজার সঙ্গীতসভায় তিনি অন্যতম সম্মানিত কলাবত ছিলেন। এবং তাঁর শিষ্য যোগীন্দ্রনাথের পিতা, মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় মাঝে মাঝে পাখোয়াজ সঙ্গত করতেন তাঁর গানের সঙ্গে।

কিন্তু বিশ্বনাথজীর গানের বিষয়ে একথা থেকেই যায় যে, তাঁর কণ্ঠে মিষ্টত্ব কিংবা মাধুর্য ছিল না। আর তাই নিয়েই রমজানের সঙ্গে তাঁর সেই আসরের প্রসঙ্গ। সে আসরে তাঁদের মধ্যে যে তর্কাতর্কির ইঙ্গিত করা হয়েছে তা রাগের রূপ বা বিস্তার নিয়ে কিছু নয়—যা নিয়ে সেকালের আসরে শ্রোতাদের সামনেই গায়ক-বাদকের মধ্যে লুটোপুটি বেধে যেত। এ ঘটনাটি তেমন কিছু নয়। অন্তত বিশ্বনাথ তাও তেমন কিছু হ'তে দেন নি। রমজান খাঁর কথার মোড় ঘুরিয়ে দেন অন্যদিকে। সুরের আসরে অসুরের আবির্ভাব ঘটে নি। সেটি ছিল এক ঘরোয়া আসর।

তখন আসরে গানের পালা সবে সাঙ্গ হয়েছে। সকলে কথাবার্তা বলছেন। রমজানের সঙ্গে বিশ্বনাথের আগে কি কথা হয়েছিল, জানা যায় নি।

হঠাৎ শোনা গেল, বিশ্বনাথজীকে খাঁ সাহেব বলছেন, 'কেয়া হায় হায় হায় হায় করতা। গলেমে ত সুরসতী ঝাড়ু মার দিয়া।'

অর্থাৎ, হায় হায় করে কি সুরের কাজ দেখাচ্ছ? গলায় ত সরস্বতী সম্মার্জনী প্রয়োগ করেছেন—মিষ্টত্বকে একেবারে ঝাঁটা দিয়ে বিদায় দিয়েছেন!

বিশ্বনাথের গলা একটু কড়া ছিল, একথা ঠিক—অঘোরনাথ চক্রবর্তী ত তাঁর সম্পর্কে বলতেন, 'পাহারাওলার গলা।' কিন্তু তাই বলে একজন সমব্যবসায়ীর পক্ষে অমন ভাষায় দশজনের সামনে তা বলাও শোভন নয়। কণ্ঠে মিষ্টত্ব থাকা না থাকায় গায়কের হাত কিছু নেই। জীবনব্যাপী সাধনা করলেও কোন গায়ক মধুকণ্ঠ হ'তে পারেন না। কণ্ঠ-মাধুর্য স্বভাবজ। সাধনার ফলে তা মার্জিত, পরিশীলিত হ'তে পারে মাত্র। রূপ-লাবণ্যবতী তরুণীর সৌন্দর্যে যেমন তার নিজের কৃতিত্ব কিছু নেই। তবে সুরমুগ্ধ শ্রোতা বা রূপমুগ্ধ দর্শক এ দার্শনিক তত্ত্বে ভুলবে কেন? সে বিচার করবে তার প্রাপ্তি দিয়ে, তৃপ্তি দিয়ে। মধুকণ্ঠের, তনু-সৌন্দর্যের আকর্ষণ কোন যুক্তিতে রোধ করা যায় না। তেমনি সৌন্দর্যময়ী তার রূপের জন্যে গরবিণী থাকে, কিন্নর-কণ্ঠ গায়কও গৌরব বোধ করে কণ্ঠের জন্যে।

সে যা হোক, শ্রোতাদের সামনে তাঁর কণ্ঠ নিয়ে এই নিষ্ঠুর বিদ্রূপেও বিশ্বনাথজী বিচলিত হলেন না। হ'লে একটা হাতাহাতি হয়ে যেত সেদিন। বরং রমজানের বক্তব্য এক রকম স্বীকার ক'রে নিলেন। আর প্রকারান্তরে এই দার্শনিক তত্ত্বটি আশ্রয় করলেন—মনোরম-কণ্ঠ না হওয়া তাঁর নিজের দোষে নয়, যেমন নিজের গুণে নয় রমজানের মধুকণ্ঠ হওয়া!

খাঁ সাহেবের কটু ভাষণের উত্তরে তিনি সপ্রতিভ ভাবে বললেন, তুমহারা কেয়া? নারায়ণ কণ্ঠ দিয়া, তনু [illegible]

অর্থাৎ, তোমার আর কি? মারারব অপর খবা দিয়ে-ছেন, তাই কটর কটর কটর করতে পারছ!

রমজানের কণ্ঠের কত বড় প্রশংসাই করলেন তিনি। ব্যাপারটির ওইখানেই সমাপ্তি ঘটেছিল।

তবে সেদিন বিশ্বনাথজীকে অমনভাবে শোনালেও, নিজের গলা নিয়ে রমজান বড় একটা অহঙ্কার করতেন না। বরং বিনয়ী ছিলেন এ বিষয়ে। বিনয় প্রকাশ করতেনও বেশ অভিনব কায়দায়। বলতেন, 'কল্‌কাত্তা আজব শহর। হাম্‌সে গানা সুন্‌তা হায়!'

অর্থাৎ—কলকাতা একটা অদ্ভুত জায়গা। তাই এখানে লোকে আমার মুখে গান শোনে। আমার আর কি এমন আছে গাইয়ে হিসেবে? আমি আবার গাইয়ে নাকি? আমি ত আসলে সারেঙ্গীয়া।

প্রথম জীবনে রম্‌জান সারেঙ্গীই ছিলেন। সারঙ্গ সঙ্গে করেই তিনি জোয়ান বয়সে কলকাতায় আসেন, জীবিকা অর্জন করতে। কলকাতায় তাঁর সারেঙ্গী বলেই সুনাম হয়। সারঙ্গ বাজাতেন নাকি চমৎকার। হাতও খুব মিষ্টি ছিল। এখানকার অনেকের গানের সঙ্গেই তখন সারঙ্গে সঙ্গত করেছেন আসরে। অঘোরনাথ চক্রবর্তী তাঁর অনেক গানের আসরে তাঁকে নিয়ে গেছেন নিজের গানের সঙ্গে বাজাবার জন্যে। তাঁর সারঙ্গ সহযোগিতা অঘোরবাবু গাইবার সময় খুব পছন্দ করতেন। সারঙ্গ বাজাবার জন্যে ১৫ টাকা মুজরো নিতেন রম্‌জান।

তিনি কাশীর লোক। মায়ের মৃত্যুর পর কলকাতায় আসেন সারঙ্গওয়ালা হয়ে। তবে তারও আগে তিনি গাইয়েই ছিলেন। তালিমও পান গলায়। আর নিজের 'ঘরে' ই সে শিক্ষা। গান দিয়ে আরম্ভ ক'রে পরে ধরেন সারঙ্গ। কারণটা ঠিক জানা যায় না। পেশার প্রয়োজনেও হ'তে পারে। সারঙ্গ-সঙ্গতে হয়ত নগদ-প্রাপ্তির সুযোগ পেয়ে যান বেশী। মিষ্টি হাতের ওস্তাদী সঙ্গতের জন্যে বোধ হয় মাইফেল্‌ ভালই হ'তে থাকে। তাঁর গানের কথা তখন চাপা পড়ে যায় আসরে। আত্মভোলা শিল্পী নিজেও সে কথা উত্থাপন করেন না। অথচ আপনার 'ঘরে', মায়ের কাছেই রীতিমত তালিম পেয়েছিলেন গানে। বারাণসীর বিখ্যাত টপ্পা-গায়িকা ইমাম বাঁদী রম্‌জানের জননী। কাশী নরেশের সঙ্গীতসভায় নিযুক্ত গায়িকা ইমাম বাঁদী। তাঁর কাছে খুব কম বয়স থেকেই রম্‌জান গান শিখেছিলেন।

টপ্পা গানে খুব নাম ছিল রম্‌জান-জননীর। বরাবর টপ্পা-গায়িকা হিসেবে তিনি সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। রম্‌জান ভিন্ন তাঁর আর একজন শিষ্যের কথা জানা যায়, যিনি বাংলার এক শ্রেষ্ঠ টপ্পা-শিল্পী বলে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি হলেন—রামবাগানের মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—নগেন্দ্রনাথ দত্ত, নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (পঙ্কবাবু) প্রভৃতির সঙ্গীতগুরু। গুরুভাই রম্‌জান যাঁর সঙ্গে ভট্টাচার্য মশায়ের সঙ্গীতক্ষেত্রে বরাবর একটি প্রীতির সম্পর্ক ছিল।...

কাশীতে মায়ের কাছে রম্‌জানের গান-শিক্ষা। তারপর মায়ের মৃত্যুতে তাঁর কলকাতায় বসতি। তার আগেও নাকি একবার রম্‌জান কলকাতায় এসেছিলেন। কিন্তু তা কিছু দিনের জন্যে। সে সময় তিনি কলকাতায় দু'এক জায়গায় গানও গেয়েছিলেন। কিন্তু তখন তাঁর সে গানের কথা কেউ মনে রাখে নি।

পরে তিনি কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে এলেন পেশাদার সারঙ্গী হয়ে। কলকাতার সঙ্গীতের আসরে তাঁর সারঙ্গওয়ালা বলেই ক্রমে নাম-ডাক হয়ে গেল। এখানকার সঙ্গীত-সমাজে তাঁকে পরিচিত করতে অনেকখানি সাহায্য করেছিলেন—পাখোয়াজী কেশবচন্দ্র মিত্র। অঘোরবাবু সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতেন বলেও রম্‌জান অনেক মাইফেল পেতেন।

সারঙ্গ-বাজিয়ে রম্‌জান গাইয়ে রম্‌জান বলে পরিচিত হন ঘটনাচক্রে। বৌবাজারের একটি সঙ্গীতাসর তাঁর এই রূপান্তরের উপলক্ষ্য হয়েছিল। সেদিনের আসরে তাঁর হঠাৎ গানের খেয়াল যদি না হ'ত, আরও কতকাল তিনি বাংলা দেশে সারঙ্গওয়ালা থেকে যেতেন, কে জানে।

সেদিনকার আসরের গল্প তিনি নিজেই বলতেন পরবর্তীকালে। গল্প নয়, সত্যি ঘটনা। তিনি শিষ্যদের কাছে নিজে না বললে, সে-সব কথা আর জানা যেত না।

রম্‌জান সেদিন হাঁটতে হাঁটতে চলেছিলেন বৌবাজারের একটি গলি দিয়ে। হিদারাম ব্যানার্জী লেন।

এই গলির মধ্যে যেটি দেওয়ান-বাড়ী ব'লে পরিচিত সেটি সেকালে সঙ্গীতের আসরের জন্যে প্রসিদ্ধ ছিল। অনেক বড় বড় জলসা এখানে হয়ে গেছে। বহু বিখ্যাত

ওস্তাদ এখানকার আসরে তাঁদের গুণপনার পরিচয় দিয়েছেন। এই আসরের কথা তখন সকলেরই জানা ছিল কলকাতার সঙ্গীত-সমাজে। এ বাড়ীর কর্তারা সঙ্গীত ও সঙ্গীতজ্ঞদের পৃষ্ঠপোষক ব'লে সুপরিচিত ছিলেন।

রমজান তখনও সারঙ্গ-বাদক। আর সেই সূত্রে এখানকার আসরে কয়েকবার যোগ দিয়েছেন। সারঙ্গ বাজিয়ে এখানে সুনাম ও গৃহকর্তার স্বীকৃতি পেয়েছেন। এ আসর রমজানের বিশেষ জানাশোনা।

বাড়ীর সামনে দিয়ে যাবার সময় তিনি বুঝতে পারলেন —দোতলার সেই ঘরে আসর বসেছে।

তখন সন্ধ্যে পার হয়ে গেছে। রাস্তায় বেশী শব্দ নেই। সে-যুগের কলকাতায় এত যান্ত্রিক আর নানা রকমের আওয়াজ শোনা যেত না। তাই তিনি রাস্তা থেকেই দোতলার আসরের গান স্পষ্ট শুনতে পেলেন। আর দাঁড়িয়ে একটু শুনেই তাঁর বড় ভাল লাগল।

তিনি সে আসরে তখন যাবার জন্যে এ পথে আসেন নি। অন্য জায়গায় যাচ্ছিলেন। কিন্তু সেই গান এত ভাল লাগল যে, থমকে দাঁড়িয়ে শুনলেন খানিকক্ষণ। গান তখনও চলেছে। গানের টানে তিনি উঠে এলেন দোতলায়। গৃহকর্তা তাঁকে দেখতে পেয়ে আসরে সামনের দিকে খাতির ক'রে বসালেন। আর রমজান তন্ময় হয়ে শুনতে লাগলেন গান।

খানিকক্ষণ পরে গান শেষ হ'তে, কর্তা কথায় কথায় রমজানকে বললেন, খাঁ সাহেব, যদি যন্তরটা আনতেন তা হ'লে বেশ এখন শোনা যেত।

রমজান জবাব দিলেন—আমাকে ত আর আপনি মাইফেলে নেমন্তন্ন করেন নি! আমি তাই শোনাবার জন্যে তৈরি হয়ে আসি নি।

মুখে একথা তিনি বললেন বটে, কিন্তু মনে তখন তাঁর সুর জেগেছে। ওই গায়কের গান তাঁর প্রাণে সাড়া তুলে ঘুম ভাঙিয়েছে তাঁর গানের। ওই গান শুনে তিনি নিজের মধ্যে গানের প্রেরণা অনুভব করেছেন।

তাই তাঁর কথায় যখন গৃহকর্তা বললেন, নেমন্তন্ন আপনাকে আমি এখনই করতে পারি। কিন্তু আপনার যন্তর কোথায়?

তিনি তৎক্ষণাৎ ব'লে উঠলেন, যন্তর আমার সঙ্গেই আছে।

ব'লে আঙুল তুলে নিজের গলার দিকে ইঙ্গিত করলেন।

—আপনি কি গান গাইবেন? তা হ'লে বেশ ত, আরম্ভ করুন।

তারপর যথারীতি রমজান অনুরুদ্ধ হলেন গান গাইতে। এবং গান আরম্ভ করলেন।

সে আসর বেশ বড় আর উঁচুদরের। আরও কয়েকজন গুণী গায়ক-বাদক রয়েছেন। আগেকার গানের ফলে শ্রোতায় পরিপূর্ণ সে আসর তখন জমজমাট। এমন আসরে রমজানের এই প্রথম গান। কলকাতায় শ্রোতা এমন প্রকাশ্যে সারঙ্গ-বাদক রমজান খাঁর গান শোনেন নি।

সেখানকার শ্রোতারা মুগ্ধ-বিস্ময়ে পরিচয় পেলেন তাঁর এই নতুন গুণের। গান তাঁর খুবই ভাল হ'ল, বলা যায় আসর মাৎ। এমন মধুর কণ্ঠ তাঁরা কমই শুনেছেন।

সেই আসর থেকেই মুখে মুখে তাঁর গানের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। অনেক আসর থেকে তাঁর ডাক আসতে লাগল গানের জন্যে। তাঁর গান কোন আসরে একবার হ'লে, আবার সেখান থেকে বায়না পেতেন।

এমনি ক'রে তাঁর কলকাতায় গায়ক-জীবন আরম্ভ হ'ল। সারঙ্গ বাজনাও তাঁর তখনও চলত। অনেক আসরে সারঙ্গও তিনি বাজাতেন মুজরো পেলে।

কিছুদিন ধ'রে গান আর সারঙ্গ দুই চলতে লাগল তাঁর। পরে সারঙ্গের মাইফেল্ ক্রমেই কমে এল। আর বাড়তে লাগল তাঁর গানের আসরের সংখ্যা। শেষ পর্যন্ত তিনি পুরোপুরি গায়কই হয়ে গেলেন। আসরে তাঁর গানেরই জয়-জয়কার প'ড়ে গেল।

বাংলা দেশ। তাই বাঙালী শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে রইলেন তাঁর মধুকণ্ঠের গুণে। অবশ্য শুধুই কণ্ঠ-মাধুর্য তাঁর সম্বল ছিল না। গানের জন্যে যা যা দরকার সবই ছিল রমজানের। যেমন তৈরি গলা, তেমনি সুরের কাজ, তেমনি গানের বন্দেশ, আর রাগের রূপবন্ধ। টপ্পা অঙ্গ।

কলকাতা সত্যিই কিছু আজব শহর নয় যে, নির্গুণকে মাথায় তুলেছে। গুণগ্রাহী কলকাতা গুণের কদরই করেছে। রমজান খাঁর জন্ম দিয়েছে কাশী। গায়ক রমজানের খ্যাতি ও

লালন পালন করেছে কলকাতা। কলকাতার পক্ষে এ কম গৌরবের কথা নয়।

কে জানে, বাংলায় না এলে রম্‌জান হয়ত সারঙ্গওয়ালাই থেকে যেতেন। এদেশে এসে তিনি হলেন অমৃতকণ্ঠ টপ্পা-গায়ক। আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে—টপ্‌-খেয়াল গায়ক।

জন্মস্থান কাশীতে তাঁর সংস্থান হয় নি। জীবিকার সন্ধানে তিনি চ'লে আসেন বাংলা দেশে। এসে ভালই করেছিলেন। বাংলা তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। শুধু প্রাণে নয়, সঙ্গীত-শিল্পী রূপেও।

তাঁর অনুপম কণ্ঠে অভিনব টপ্‌-খেয়াল পদ্ধতির গান বাঙ্গালী মুজ্‌রো দিয়ে শোনে। মাসের পর মাস। বছরের পর বছর। রম্‌জান ত এদেশে কম দিন থাকেন নি। পঞ্চাশ বছরেরও বেশী বাংলায় বাস করেছিলেন তিনি।

অতি অল্পে তুষ্ট থাকতেন রম্‌জান। মুজ্‌রোর ব্যাপারেও। ১০ টাকা মুজ্‌রো দিয়ে তাঁকে আসরে নিয়ে আসা তেমন শক্ত ছিল না। ১৫ টাকা হ'লে ত কথাই নেই। এমন কি, শিষ্য বা তেমন কোন আলাপী লোক হ'লে ৫ টাকাতেও রম্‌জান রাজি।

কলকাতার বহু আসরে তাঁর গান হয়েছে। তা ছাড়া, কলকাতা থেকে অনেক দূরে দূরেও লোকে তাঁকে মাইফেল করতে নিয়ে গেছে। মফঃস্বলের কত আসরে তাঁর গান হয়েছে। কলকাতায় ত কথাই নেই। মুজ্‌রো দিয়ে গান শুনেও কখনও কখনও শেষ হয় নি। কোন কোন সঙ্গীত-প্রেমী তাঁকে নিয়মিত বেতন দিয়ে মাসের পর মাস নিজের সঙ্গীতাসরে যুক্ত রেখেছেন। যেমন, মজিলপুরের হেমচন্দ্র দত্ত। তাঁর আসরে মাসিক ৮০ টাকায় এক সময়ে রম্‌জান থেকে এসেছেন।

শুধু আসরে গান শোনাই কি সব? এই গীতি-রীতি, এই সঙ্গীত-সম্পদ্ আহরণ ক'রে নিতে হবে। নিজেদের মধ্যে আত্মস্থ ক'রে নিয়ে গাইতে হবে এমনি ধরণে। নচেৎ এই সুচারু সুর-সঞ্চয় ওস্তাদের সঙ্গেই মাটিতে মিশিয়ে যাবে।

অতএব এমন জিনিষ শিখে নাও যে যত পার। যার ক্ষমতা আছে সে শেখ মন-প্রাণ দিয়ে। আর ওস্তাদের যখন এমন দিলদরিয়া মেজাজ! এত অল্পে তিনি যখন সন্তুষ্ট! মাসে কিছু ক'রে টাকা তাঁকে দাও, নিষ্ঠা আর গান তুলে নেবার ক্ষমতা দেখাও—তিনি ঢেলে দিতে শেখাতে কসুর করবেন না।

রম্‌জান খাঁর কাছে যাঁরা এখানে গান শিখলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই বিখ্যাত হলেন। যাঁরা বিখ্যাত হলেন না, নানা কারণে, তাঁরাও পেলেন অনেক কিছু, যা তাঁরা আবার তাঁদের শিষ্যদের মধ্যে দান করতে পারলেন।

বাংলা দেশ তাঁর কাছে কি পেয়েছে, এদেশে পশ্চিমা টপ্পা ও টপ্‌খেয়ালের ধারায় তাঁর দান কতখানি, তা তাঁর শিষ্যদের তালিকা থেকে অনেকটা বোঝা যায়। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ব্যক্তি তাঁর কাছে সঙ্গীতশিক্ষা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের কথা উল্লেখযোগ্য।

প্রসিদ্ধ গায়ক লালচাঁদ বড়াল তাঁর অন্যতম শিষ্য। লালচাঁদের যদিও আরও একাধিক ওস্তাদ ছিলেন, কিন্তু রম্‌জানের রীতিই তিনি তাঁর গানে বেশী অনুসরণ করতেন। গায়কীতে লালচাঁদের স্বকীয়তা ছিল বটে, কিন্তু তিনি প্রধানতঃ টপ্‌খেয়াল-পদ্ধতির গায়ক। সে গানের রীতি-নীতি এবং তান-লহরাতে রম্‌জানের প্রভাব সর্বাধিক।

তেলিনীপাড়ার জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রম্‌জানের একজন যথার্থ শিষ্য। সঙ্গীত-জগতে কালোবাবু নামে সুপরিচিত এই গুণী গায়ক কণ্ঠ-মাধুর্যের জন্যে বরণীয় ছিলেন। রম্‌জানের গানের কারুকৃতি কালোবাবুর কণ্ঠে চমৎকার ফুটে উঠত এবং তিনি গণ্য হতেন বাংলার এক শ্রেষ্ঠ টপ্পা-গায়ক ব'লে।

শিবপুরের বিখ্যাত অন্ধ-গায়ক নিকুঞ্জবিহারী দত্তও রম্‌জানের কাছে তালিম নিয়েছিলেন। নিকুঞ্জ দত্ত অঘোর-বাবুর শিষ্য ছিলেন ধ্রুপদ ও ভজনে আর রম্‌জানের কাছে টপ্‌খেয়াল ও টপ্পা-অঙ্গের শিক্ষা পান।

শিবপুরে রম্‌জান খাঁর একজন প্রকৃত শিষ্য ছিলেন ফণীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়। মধুকণ্ঠ ফণীশঙ্কর টপ্পা-রীতি অতি নিপুণভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। রম্‌জানের অতি প্রিয় শিষ্য ফণীশঙ্করের অকালমৃত্যু না ঘটলে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ গায়ক ব'লে খ্যাতিমান্ হতেন সুমিষ্ট কণ্ঠ ও মনোরম গায়কীর জন্যে।

যে সুকণ্ঠ গায়ক গগনচন্দ্র দাসের "বিদ্যাসুন্দর" যাত্রা

এক সময়ে বাংলা দেশে সুবিখ্যাত হয়েছিল তাঁর "সুন্দর"-এর জন্যে, তিনিও রমজানের কাছে সঙ্গীত-শিক্ষা করেছিলেন।

গিরিবালা নাম্নী এক পেশাদার গায়িকারও ওস্তাদ ছিলেন রমজান। আর খাঁ সাহেব বলতেন যে, তাঁর কাছে যাঁরা গান শেখেন তাঁদের সকলের মধ্যে গিরিবালার গলা ভাল আর গান গাওয়া ভাল। এই গায়িকার গান রেকর্ড হয়েও এককালে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করে।

খ্যাতিমতী গায়িকা আখ্‌তারি বাঈ, যাঁর ৫৪ খানি গানের রেকর্ড আছে মেগাফোন কোম্পানীতে, রমজানের কাছে গান শিখেছিলেন।

সানাইবাদক ফর্জন আলী ও সুরবাহারী মানোয়ার সুলতান (প্রসিদ্ধ নবাব টিপু সুলতানের পৌত্র) রমজানের কাছে রাগ শিক্ষা করেন।

শেষোক্ত তিনজন অবাঙ্গালী হ'লেও বসবাস করেছিলেন বাংলায়।

মহম্মদ খাঁর শিষ্য এবং বাংলার গুণী সুরবাহার-বাদক জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ও রমজানের কাছে রাগবিস্তার পাঠ নিয়েছিলেন।

এণ্টালী অঞ্চলের সুগায়ক এবং কয়েকটি সঙ্গীত-গ্রন্থ-প্রণেতা হৃষিকেশ বিশ্বাস রমজান-খাঁর আর একজন শিষ্য। তিনি দীর্ঘ ২০ বছর ওস্তাদের সঙ্গ করেছিলেন।

কৌকভ ও করামতুল্লা খাঁ ভ্রাতৃদ্বয়ের শিষ্য সেতার-বাদক গুনী মতিলাল রমজানের শিক্ষাও কিছু পেয়েছিলেন।

সঙ্গীতক্ষেত্রে বাংলার এক সর্বতোমুখী গুণী, বিশেষ হ'য়ে ধ্রুপদী ছিলেন মোহিনীমোহন মিশ্র। তিনি একজন উৎকৃষ্ট টপ্পা-গায়কও। তাঁকে কেউ কোন ওস্তাদের কাছে গানের তালিম নিতে শোনে নি—রমজানের কাছেও না। কিন্তু সত্যের খাতিরে বলতে হয় তিনিও রমজানের এক শিষ্য। তবে বিচিত্র রকমে। রমজান যখন ফণীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়কে তাঁর শিবপুরের বাড়ীতে তালিম দিতে যেতেন, তখন মোহিনীমোহন ছিলেন ফণীশঙ্করের প্রতিবেশী এবং শেষোক্তের কাছে তবলাবাদক হ'লে পরিচিত। মোহিনীবাবু নিয়মিত ফণীশঙ্করের বাড়ী এসে তাঁর গানের সঙ্গে তবলা সঙ্গত করতেন। ফণীবাবুর রেওয়াজের সময় শুধু নয়, রমজান খাঁ যখন তাঁকে তালিম দিতেন, তখনও। রমজান ফণীশঙ্করকে সপ্তাহে দিন-দুয়েক তালিম দিতে আসতেন। আর সেই সময়েও তাঁদের গানের সঙ্গে সঙ্গত করতেন মোহিনীমোহন। রমজান ফণীশঙ্করকে তালিম দিতেন। কিন্তু তাঁদের দু'জনের কেউই জানতেন না যে সেই সব গান আর তান মনে মনে তুলে নিচ্ছেন সেই তবলচি। মোহিনীবাবুর টপ্পা-'শিক্ষা' ও সঙ্গের সূত্র এইখানে। তাই তাঁকে রমজানের শিষ্যশ্রেণীর একজন বললে বোধ হয় ভুল হবে না।

বাংলার সুপরিচিত ও প্রবীণ টপ্পা-গায়ক কালীপদ পাঠকও রমজান খাঁর কাছে কিছুদিন শিখেছিলেন। পাঠক মশায় আগে শিবপুরে থাকতেন। রমজান সেখানে যখন যেতেন, সে সময় কিছু কিছু শেখবার সুযোগ পান কালীপদবাবু। পাঠক মশায় ফণীশঙ্কর ও নিকুঞ্জবিহারী দত্ত দু'জনের কাছেই যাতায়াত করতেন। তাঁর সঙ্গীতশিক্ষা প্রধানতঃ নিকুঞ্জবাবুর কাছেই ঘটে। রমজানকেও তিনি সেখানেই বেশী পেতেন।

রমজানের আর একজন ভাল শিষ্য ছিলেন খিদিরপুরের শরৎচন্দ্র দাস। শরৎবাবুর খ্যাতি বৃহত্তর সঙ্গীতসমাজে ছড়াবার সুযোগ হয় নি। ব্যবসায়িক কাজকর্মের অবসরে নিয়মিত বাড়ীর বৈঠকখানায় গানের আসর বসাতেন। প্রথম জীবনে তিনি কৌকভ খাঁর কাছে সরোদ শিখেছিলেন কিছুদিন। কিন্তু পরে যন্ত্রে তৃপ্তি না পেয়ে রমজানের কাছে অনেক বছর টপ্‌খেয়াল শেখেন। নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি গান শিখেছিলেন, আর নিষ্ঠার সঙ্গে গাইতেনও। কণ্ঠে তাঁর মাধুর্য ছিল, দরদ ছিল, তাল-লয়ে নিপুণ তানকর্তব পরিপাটি ভাবে তিনি করতেন—এসব লেখকের স্বকর্ণে শোনা। তা ছাড়া, মোহিনী মিশ্র মশায় লেখককে বলেন যে, শরৎবাবু রমজানের কাছে যেমনটি শিখেছিলেন সেই চালেই গাইতেন।

এতক্ষণ যাঁদের কথা বলা হ'ল তাঁরা ভিন্ন রমজানের অন্য শিষ্যও থাকতে পারেন।

বিশ্বনাথ রাওয়ের মতন বাংলা দেশে শেষ পর্যন্ত বসবাস করে রমজানও যেন এদেশের একজন হয়ে গিয়েছিলেন। বিশ্বনাথজীর চেয়ে তিনি আরও অনেক বেশীদিন ছিলেন এখানে। কারণ, তিনি আরও দীর্ঘজীবী। তাঁরা ভাঙা বাংলা বলতে পারতেন। বুঝতেন আরও বেশী। গুটিকয়েক

বাংলা গানও তিনি শিখেছিলেন। তেমন তেমন আসরে অনুরুদ্ধ হ'লে সেই বাংলা টপ্পা তিনি বেশ দরদের সঙ্গে গাইতেন, তাঁর ঈষৎ বাঁকা পশ্চিমী উচ্চারণে।

তাঁর যে-সব বাংলা গান পছন্দ ছিল, তাদের মধ্যে এই কখানির নাম করা যায়। প্রথমেই বলতে হয়, বাংলা টপ্পা-গানের রাজা নিধুবাবুর সেই মনোরম গানটি—'কি যাতনা যতনে মনে।'

তারপর, 'কি দেখে এলাম সই যমুনারি কূলে' (ভৈরবী)। আর একখানি ভৈরবীর (তেতালা) গান—'হায় হায় একি হায় কেন নিশি পোহাইল।'

এই শেষের গানটি তাঁর একটি আসরে গাইবার একটি হৃদয়গ্রাহী বিবরণ পাওয়া যায়। রমজান সে আসরে প্রথমে পাঞ্জাবী টপ্পা গেয়েছিলেন। শেষে গান ওই বাংলা টপ্পাটি।

এই গানের আসর হয়েছিল এণ্টালীতে। জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ নামে সেখানকার এক গায়কের বাড়ীতে।

এটি এক ঘরোয়া আসর। দুর্গাপূজার নবমীর রাত্রে এই গানের আসরটি হয়েছিল। আসর বড় না হ'লেও অনেক গুণীজন সেখানে ছিলেন। এন্টালীর মধুর কণ্ঠ ধ্রুপদী (অঘোরবাবুর শিষ্য) হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমজান খাঁ প্রভৃতি আরও কয়েকজন গান করেন সেদিন।

তখন মাঝ রাত। ওস্তাদ রমজান তাঁর ঘরাণা টপ্পা ধরেছেন। অন্যান্য গায়কের গান হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁরা সবাই ব'সে রয়েছেন রমজানের গান শোনবার জন্যে। শুনছেন তদ্গত চিত্তে। গৃহকর্তা, জিতেন্দ্রনাথের পিতা, হুঁকো হাতে দরজায় দাঁড়িয়ে। সেখান থেকেই সকলকে অভ্যর্থনা করেছেন, তামাকু সেবনের সঙ্গে সঙ্গে গানও শুনেছেন। তখনও শুনছেন।

অপূর্ব মনে হ'ল তাঁর রমজানের গান। খাঁ সাহেব গান শেষ করতে, তিনি মুখ থেকে হুঁকোটি নামিয়ে তাঁকে বললেন, অনেকের গান এই ঘরে আগে হয়ে গেছে। কিন্তু এমন গান আমি এখানে শুনি নি। তা শুনেছি, খাঁ সাহেব বাংলা গানও জানেন। আজ এই পুজোর রাত্তিরে যদি একখানি বাংলা গান শোনান, বড় ভাল হয়।

রাত আর তখন বিশেষ বাকি নেই। ভোর হ'তে আর অল্পক্ষণ আছে। রমজান রাজি হয়ে ভৈরবীতে ধরলেন—

হায় হায় একি হায়

কেন নিশি পোহাইল।

চরণে চন্দন জবা

মঙ্গলঘট শুকাইল ॥

লম্বোদর নিয়ে কোলে,

ভাসিতেছে নয়ন জলে,

কৈলাসেতে যাবে চলে,

এ কি প্রমাদ ঘটিল ॥

গান হবার সঙ্গে ওদিকে ভোরও হয়েছে। নবমী উৎসব, রাত্রি শেষ হয়ে বিজয়া-দশমীর প্রত্যূষ। বিসর্জনে শান্ত-করুণ সকাল। গানের সঙ্গে সমস্ত পরিবেশের [illegible] অপরূপ মিলনই ঘটল। গানের ভাব, ভাষা আর সুরে সঙ্গে বিজয়ার ঊষাকাল একাকারে মিলে গেল। দুর্গাপূজ[illegible] বিসর্জনের আভাস যেন ফুটে উঠেছে দশমীর ভোরে আকাশে। পিতার রাজসদন ছেড়ে পুত্র-কোলে উমা দরি[illegible] স্বামীর গৃহে চ'লে যাবেন, কৈলাসেতে। বাতাসে যেন [illegible] পৌরাণিক বিদায়ের হাহাকার বাস্তব হয়ে মিলে গেছে রমজানের দরদ-ভরা কণ্ঠের মাধুর্য—উদাসী ভৈরবীর উদা[illegible] করা রূপ আর উমার দুঃখ একাকারে মিশিয়ে দিয়েছে।

রমজানের চোখ দিয়ে ভাবাবেগে জল পড়ছে। ভাব[illegible] বেশে হরিবাবুর মতন ধ্রুপদীর চোখও তখন অশ্রুসজল সমস্ত শ্রোতার মনে ঝঙ্কার দিয়ে উঠছে উমা আর ভৈরবী বেদনা একাত্ম হয়ে—

কেন নিশি পোহাইল।

চরণে চন্দন জবা

মঙ্গলঘট শুকাইল।...

রমজান খাঁ এমনি গান গাইতেন। একদিকে যেম[illegible] ভাবের ভাবুক, অন্যদিকে তেমনি সিদ্ধ ওস্তাদ। ইচ্ছে হ'[illegible] ওস্তাদী ফলাতেন। নানারকম কায়দা-কানুন মুন্সিয়া[illegible] দেখিয়ে দিতেন।

আসরে তিনি গাইতেন টপ্পা আর টপ্‌খেয়াল। কি[illegible] ধ্রুপদ গান যে জানতেন না, বা গাইতে পারতেন না, [illegible] নয়। আগেকার প্রায় সমস্ত ওস্তাদই, আসরে যে-রীতি গান করুন না কেন, ধ্রুপদ অল্প-বিস্তর চর্চা ক'রে রাখতেন কারণ, রাগসঙ্গীতের ভিত্তিমূলে যে ধ্রুপদ, এ বাস্তব জ্ঞা[illegible] তাঁদের ছিল। তাই তাঁরা অনেকেই ধ্রুপদ শিখতেন

[illegible] সঙ্গীত-শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। এই ছিল সিদ্ধান্ত সঙ্গীতজ্ঞদের—কি গায়ক, কি যন্ত্রী—সবার। খেয়াল-গায়ক কালে খাঁ, সুরবাহার-সেতার-বাদক ইমদাদ খাঁ, ঠুংরির রাজা গণপৎ রাও, বীণ্‌কার বন্দে আলী খাঁ—কত আর নাম করা যাবে এখানে, এমন কি গহরজান, মালকাজান প্রভৃতি বাঈজীরা পর্যন্ত, তানসেনের পুত্র ও কন্যার ধারার প্রত্যেক রবাবী, বীণ্‌কার, সুরশৃঙ্গার-বাদক কিংবা সেতারী ধ্রুপদে প্রাজ্ঞ ছিলেন।

রম্‌জানও ধ্রুপদ জানতেন। তবলার গানকে ধ্রুপদ ক'রে গাইতেন, ইচ্ছে হ'লে। বিভিন্ন গীতিরীতির ওপর, রাগ-তাল আর লয়ের ওপর তাঁর এমন দখল ছিল।

গানের আগে আলাপ করা পছন্দ করতেন না রম্‌জান খাঁ। তিনি এই রকম বলতেন—আলাপচারী করবে নবীশেরা। রাগ বিস্তারের বাঁধা ধাপে ধাপে ভর দিয়ে তারা এগিয়ে যাবে। কিন্তু যারা ওস্তাদ, তাদের আলাপের আলগ দরকার কি? আলাপের সব জিনিষ তারা গানের মধ্যে দরকার মতন বিস্তার ক'রে দেখাবে।

এখানে ব'লে রাখা যায়, ধ্রুপদী অঘোরবাবুরও মত অনেকটা এই ধরণের ছিল। তিনি গানের আগে আলাপচারী করতেন না।

রম্‌জান আলাপচারী রীতিমত করতে পারতেন না ব'লে যে এ ধরণের কথা বলতেন, তা নয়। আলাপের সম্বন্ধে ওই ছিল তাঁর আন্তরিক ধারণা। ইচ্ছে করলে তিনি আলাপচারী দস্তুরমতন করতে পারতেন। যেমন একদিন করেছিলেন তালতলার একটি বাড়ীর আসরে।

সেদিন তিনি ইমনের আলাপ শুনিয়েছিলেন। শুনিয়ে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ করে দিয়েছিলেন আসরের শ্রোতাদের। ইমনের আলাপচারী যে এমন বিস্তারিত হ'তে পারে তা তাঁর অনেক শ্রোতারই অভাবিত ছিল।

যথারীতি তিনি উদারা গ্রাম থেকে রাগালাপ আরম্ভ করলেন। তারপর মুদারায় উঠে সুরবিহার করতে লাগলেন আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে। শ্রোতারা অবাক্ হয়ে শুনছেন—খাঁ সাহেব কতক্ষণ ধ'রে ইমনের কি চিত্তাকর্ষক সৌন্দর্য সৃষ্টি ক'রে চলেছেন। কিন্তু কই, খড়জ ত স্পর্শ করছেন না একেবারে। কড়ি, মধ্যম, পঞ্চম আর গান্ধারের কি লীলা-বিলাসই দেখাচ্ছেন। আবার খাদের নিখাদে নেমে কি [illegible] উঠে যাচ্ছেন যেখানে গান্ধার দিয়ে। [illegible] বিচিত্র পথে [illegible] খুলে দিয়ে [illegible] এই বুঝি [illegible] ফিরি করেও ফিরে ফিরলেন না। [illegible] আবার আঁকাবাঁকা কোথায় উঠে গেলেন। [illegible] সাগ্রহ আশা পূর্ণ হবার পূর্ব মুহূর্তেই যাত্রা করলেন [illegible] পথে। শ্রোতাদের উৎকর্ণ রাখলেন, [illegible] তুললেন নতুন সম্ভাবনায়। শ্রোতারা বিরক্তি বা [illegible] বোধ করা দূরে থাক, অনাস্বাদিত আনন্দ অনুভব করলেন।

এমনিভাবে ঘণ্টাখানেক ধ'রে ইমনের বিস্তার দেখাতে লাগলেন সুরকে একেবারে না ছুঁয়ে। তারপর এমন অতর্কিত চমক সৃষ্টি ক'রে খড়জে এসে দাঁড়ালেন যে শ্রোতারা এক রমণীয় আরাম বোধ করে হাল্কা হলেন। শ্রোতাদের এমনই উত্তেজনায় উৎকণ্ঠ রেখেছিলেন এতক্ষণ ধ'রে।

তারপর আরও খানিকক্ষণ আলাপচারী চলল। শেষে তিনি গান ধরলেন।

শ্রোতারা আসরের শেষে রম্‌জানের সম্বন্ধে একটি নতুন ধারণা নিয়ে গেলেন। গায়ক রম্‌জানের একটি অনাবিষ্কৃত পরিচয় তাঁরা লাভ করলেন সেদিন।

শ্রোতাদের সম্মোহিত করবার মতন কণ্ঠ যে তাঁর ছিল, একথা তাঁর সমসাময়িক গায়করাও সকলে জানতেন, এবং মানতেন। বিশ্বনাথজীর কথা আগেই বলা হয়েছে। অঘোরবাবুরও একটি গল্প আছে, বলবার মতন।

অঘোরবাবুর কণ্ঠ-লালিত্যের পরিচয় নতুন করে দেবার দরকার নেই। তাঁর মতন গায়কও রম্‌জানের কণ্ঠকে কতখানি পরোয়া করতেন, এই ঘটনাটি থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায়।…

রম্‌জান তখনও আসরে সারঙ্গ বাজাতেন, মুজ্‌রো হ'লে। আবার গাইয়ে ব'লে নামও করেছেন। সকলে তাঁর মধু-কণ্ঠের পরিচয় পেয়েছেন। অঘোরবাবু রম্‌জানের সারঙ্গের সঙ্গত নিজের গানের সঙ্গে খুবই পছন্দ করতেন। তাই তাঁকে সারঙ্গওয়ালা ক'রে নিয়ে যেতেন নিজের গানের আসরে।

এমনই এক সময়ের কথা।

অঘোরবাবুর গানের সঙ্গে সারঙ্গ বাজাবার জন্যে রমজান এসেছেন। অঘোরবাবুও আসরে উপস্থিত। গান আরম্ভ করবার আগে গল্পসল্প হচ্ছে। কথায় কথায় রমজান কি বেফাঁস ব'লে ফেললেন।

এখন, খাঁ সাহেবের সুরের নেশার সঙ্গে আকারান্ত ওই একটু ব্যাপার ছিল। তিনি জলপথে ভ্রমণ করতে বড় ভালবাসতেন। তবে গভীর জলে নয়। সারাদিন ধ'রে একটু একটু, আর কি। যদু ভট্ট, মুরাদ আলী প্রভৃতির তুলনায় এককালীন মাত্রা অনেক কম।

সে যা হোক, আসরের মধ্যে রমজানকে বেফাঁস ব'লে ফেলতে দেখে অঘোরবাবুর ভাল লাগল না। তিনি ঈষৎ বিরক্তির সঙ্গে বললেন, আঃ, কি 'ইয়ে'মি হচ্ছে ?

এই তিরস্কার শুনে খাঁ সাহেবের মনে ভারি দুঃখ হ'ল। বড় অভিমান হ'ল।

—কেয়া ? 'ওঘোর' হামকো 'ইয়ে' বোলা ?

এ আসরে আজ তিনি বাজাবেন না। আর থাকবেন না এখানে।

বিনা বাক্যব্যয়ে যন্ত্রটি তুলে নিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তারপর গুটি গুটি ক'রে বেরিয়ে এলেন আসর থেকে।

অঘোরবাবু এতটা ভাবেন নি। তিনি, গৃহকর্তা আর আসরের কেউ কেউ রমজানকে উঠে পড়তে দেখে তাঁকে ডাকাডাকি করতে লাগলেন।

—এ কি খাঁ সাহেব, কোথায় যাচ্ছেন ? বসুন, বসুন। শুনছেন ?

না। খাঁ সাহেব আর কোন কথা শুনবেন না। কিছুতেই থাকবেন না এখানে। তাঁর মনে বড় লেগেছে। এত লোকের সামনে 'ইয়ে' বলেছেন 'ওঘোর'বাবু !

কারও কথায় কর্ণপাত না ক'রে দোতলা থেকে নীচে নেমে এলেন, একেবারে বাড়ীর বাইরে। কিন্তু চ'লে গেলেন না। রাস্তার ধারে, বাড়ীর চওড়া রোয়াকের ওপর বসলেন, পাশে সারঙ্গটি রেখে। তখন মনে তাঁর দুষ্ট সরস্বতীর উদয় হয়েছে।

তিনি ঠিক করলেন, সেইখানেই বসে গাইবেন। সেই রোয়াকের ওপরকার দোতলায় অঘোরবাবুর আসর হবার কথা, যেখান থেকে তিনি চলে এলেন।

এখন সেই দোতলায় আসরের ঠিক নীচে, রাস্তার ধারের রোয়াকে তোড়জোড় ক'রে বসলেন গান গাইবার জন্যে। নিজের সামনে চাদর না কাগজ কি একটা বিছিয়ে দিলেন, যাতে লোকে পেলা দেয়। তারপর একেবারে গলা ছেড়ে গান আরম্ভ করলেন।

ওদিকে গৃহকর্তা যখন দেখলেন যে, রমজান আর ফিরে আসবেন না, তখন অঘোরবাবুকে বিনা সারঙ্গেই গান গাইতে অনুরোধ করলেন।

তখন আসরে খবর এল যে, রমজান নীচে রোয়াকে ব'সে গান আরম্ভ করেছেন। অঘোরবাবু তা শুনে রমজানের উদ্দেশে একটা অম্ল-মধুর মন্তব্য ক'রে বললেন, এই রেঃ, আজ দেখছি গাইতে দেবে না।

কিন্তু আসরের সকলের কথায় তিনি গান আরম্ভ করলেন। তাঁর নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও।

নীচে রমজানের গান তখন বেশ জমে উঠেছে। রাস্তায় ভিড় জমে গেছে। এমন মধুকণ্ঠের গান এত কাছে হচ্ছে শুনে অনেক শ্রোতা দাঁড়িয়ে পড়েছে রাস্তায়। পেলাও পড়তে সুরু করেছে। দু' পয়সা, চার পয়সা, দু' আনা।

একে রমজানের গলা। তার ওপর আবার তিনি ক্ষুব্ধ মনে জেদের সঙ্গে গাইছেন। তাঁর সুর ভেসে আসতে লাগল ওপরের আসরে। আসরের শ্রোতাদের মন সেই সুর যেন কেড়ে নিতে লাগল। শ্রোতারা অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। অঘোরবাবুর চিত্তও বিক্ষিপ্ত হ'ল। তাঁর গান ছাপিয়ে উঠল রমজানের গান। তাঁর সুরকে যেন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ক'রে দিলে রমজানের সুর। ভারে নয়, ধারে।

অঘোরবাবু গান বন্ধ করলেন। এখানে কি ক'রে গান হবে ? বরং এক কাজ করলে ভাল হয়। রমজানকে এই আসরে নিয়ে এলে গানবাজনা হ'তে পারে। অঘোরবাবু বললেন রমজানকে ধরে নিয়ে আসতে।

আসরের সকলেরই সেইরকম ইচ্ছে।

তখন আসরের পক্ষ থেকে আবার রমজানকে ওপরে আসবার জন্যে বলতে যাওয়া হ'ল।

—চলুন খাঁ সাহেব। গাইছেনই যখন, এখানে কেন ? আসরে গিয়ে গাইবেন চলুন।

সামনের রাস্তা তখন উদ্গ্রীব শ্রোতায় ভ'রে রয়েছে।

রমজান গান থামিয়ে পেলার পয়সা গুণতে লাগলেন।

অনেক জমেছে—পয়সা, আনি, সিকি, দু'আনি। হিসেব ক'রে দেখলেন, পনেরো টাকার কিছু বেশিই হয়েছে।

এখানকার আসরে তাঁর পনেরো টাকা মুজ্‌রোর কথা ছিল। তাই রম্‌জান পেলা উঠিয়ে পকেটে পুরলেন। সেলাম করলেন রাস্তার শ্রোতাদের। সেলাম ঠুকলেন আসরের পক্ষ থেকে যাঁরা বলতে এসেছিলেন, তাঁদেরও। তবে আজ আর তিনি গান করবেন না। রোজগার হয়ে গেছে।

সারঙ্গটি বগলদাবা ক'রে রম্‌জান রাস্তায় নেমে পড়লেন। ওপরে গাইতে গেলেন না কিছুতেই।

অঘোরবাবুর আসর সেদিনকার মতন পণ্ড!

জীবনের শেষ পর্যন্ত রম্‌জানের কণ্ঠ সতেজ ও সুরসাধ্য ছিল। শরীর ছিল সুস্থ, সুপটু। কলকাতার একদিক থেকে আর একদিক তিনি অক্লেশে পায়ে হেঁটে যাতায়াত করতেন।

শ্যামবর্ণ গায়ের রঙ, মাঝারি গড়ন, উচ্চতাও মাঝামাঝি। মুখে-চোখে একটি আত্মসমাহিত ভাব। পরনে আধ-ময়লা পাজামা জামা। শিষ্যবাড়ী কি অন্য কোথাও যাতায়াত করতে মাইলের পর মাইল হাঁটতেন। সর্বদাই বেশ একটা সুখী তুষ্ট ভাব, খুশি মেজাজ। রাস্তায় চলতেন আপনার ভাবে আপনি মগ্ন হয়ে। আর তেমন তেমন দোকান দেখলে একবার টুক্‌ ক'রে ঢুকে পড়তেন।

মৃত্যুর একদিন আগেও অনেকটা পথ প্রদক্ষিণ ক'রে এসেছেন। অসুখ বলতে কিছু ছিল না, বোঝবার মতন। তখন তাঁর বয়স কত হয়েছিল, তা সঠিক জানা যায় না। খাঁ সাহেবের নিজেরও বয়সের হিসেব কিছু ছিল না। জিজ্ঞেস করলে বলতেন, কেয়া মালুম!

তাঁর এক শিষ্য হৃষীকেশ বিশ্বাস বলেন যে, খাঁ সাহেবের বয়স ৯০ বছর হয়েছিল। লেখকের মনে হয়, তার চেয়ে অনেক বছর কম হ'তে পারে। রম্‌জানের এই ফটোটি তোলা হয় তাঁর মৃত্যুর দু'বছর আগে, হৃষীবাবুর ২০, হাজরা বাগান লেনের (এন্টালী) বাড়ীতে। ছবি দেখে ৮৮ বছর-বয়সী মনে হয় না।

সে যাই হোক, রম্‌জান সে-বছর একদিন হৃষীবাবুকে বললেন যে, তাঁর মিঠাই খেতে ইচ্ছে হয়েছে।

শিষ্য তাঁকে মিঠাই খাইয়েছিলেন। কিন্তু তখনই তাঁর মনে একটা খটকা লাগল—হঠাৎ মিষ্টি খেতে চাইলেন! কিন্তু 'হিন্দু' লোকের পক্ষে এটা ত বড় অস্বাভাবিক! ভাবতে ভাবতে নিজের বাড়ী ফিরে এলেন।

তার একদিন পরে আবার ওস্তাদের বাড়ী গেলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে।

রম্‌জান, জীবনের শেষ ক'বছর, চাঁদনী অঞ্চলের একটি মাঠকোঠায় থাকতেন। ৫, নীলমণি হালদার লেন। সেখানে রম্‌জান বাস করতেন নিজের সংসারে। পত্নী বিগত, কন্যারা ছিলেন। হৃষীবাবু সেখানে বিকালে যেতে খাঁ সাহেবের বড় মেয়ের সঙ্গে দেখা হ'ল। আর তাঁর মুখে শুনলেন স্তম্ভিত হয়ে—রম্‌জান আর নেই! গতকাল রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন! আজ দুপুরে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়ে গেছে; আর কিছু বাকি নেই। সব শেষ!

এ কি আশ্চর্য! পরশু দিনও যে মানুষের কোন অসুখ জানা যায় নি, যিনি হেঁটে বেড়িয়েছেন, মিষ্টি চেয়ে খেয়েছেন—তার পরের দিনই তাঁর সমস্ত শেষ?

তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর মতন আরও এক বিস্ময়ের ব্যাপার—কেমন ক'রে মৃত্যু এল! সঙ্গীতশিল্পীর পক্ষে তার চেয়ে মহনীয় মৃত্যু আর কি হ'তে পারে?

রম্‌জানের পরলোকগমনের বিবরণ তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা এইভাবে হৃষীবাবুকে দিয়েছিলেন:

"বাপ্‌জান তাঁর বিছানায় শুয়েছিলেন। আমরা ভেবেছিলাম, তিনি ঘুমোচ্ছেন। রাত তখন এগারটা কি বারোটা হবে, জানি না। হঠাৎ বাপ্‌জান আমায় বললেন, 'আমাকে বসিয়ে দে'। শুনে আমার একটু আশ্চর্য লাগল। কোনদিন ত এমন বলেন না। যা হোক, তাঁর কথা মতন হাত ধ'রে তাঁকে বিছানাতেই বসিয়ে দিলাম, দু'দিকে দু'টি বালিশ দিয়ে। তিনি তারপর বললেন, 'একতারাটা এনে দে।' দেয়ালে একটা একতারা টাঙানো থাকত। কখনও বিশেষ তা বাজাতেন না। সেটি সেখান থেকে পেড়ে এনে বাপ্‌জানের হাতে দিলাম। তিনি একতারার সুরটা একটু ঠিক ক'রে নিয়ে, গান গাইতে লাগলেন। সঙ্গে ওই একতারার তারে সুরের রেশ তুলে। সে কি গান, আপনাকে

আর কি বর্ণনা দেব। আপনারা ত বাপ্‌জানের অনেকদিন অনেক গান শুনেছেন। কিন্তু আমার মনে হয়—তেমন গান বোধ হয় আপনারাও শোনেন নি,—কাল যা বাপ্‌জান গাইলেন। সে কি তন্ময় হয়ে, কি দরদের সঙ্গেই যে গাইতে লাগলেন। টপ্‌ টপ্‌ ক'রে জল ঝরতে লাগল চোখ দিয়ে। তিনি যেন আত্মহারা হয়ে গেয়ে গেলেন। খানিক পরে গান শেষ ক'রে একতারাটি কোল থেকে পাশে নামিয়ে রাখলেন। তারপর আস্তে আস্তে শুয়ে পড়লেন, বালিশে মাথা দিয়ে। শুয়ে, ঘুমিয়ে পড়লেন। সে ঘুম আর ভাঙল না। আমরা তখনই বুঝতে পারি নি কিছু। একটু পরে আমরা তাঁকে ডাকতে লাগলাম—"বাপ্‌জান, বাপ্‌জান!" কিন্তু আর তাঁর কোন সাড়া পাওয়া গেল না।"

গ্রাহক মহোদয়দের প্রতি নিবেদন

আমাদের ঠিকানা পরিবর্ত্তন এবং নূতন বাড়ীতে প্রেস বদল করিবার কারণে গত তিন-চারিমাস, প্রবাসী নিয়মিত সময়ে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই বলিয়া দুঃখিত এবং আপনাদের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। আশা করি শীঘ্রই আমরা নিয়মমত যথা সময়ে প্রবাসী প্রকাশ করিতে সক্ষম হইব।

ঠিকানা বদলের জন্য আমাদের চিঠিপত্র পাইতে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিয়াছে এবং এখনও ঠিক মত চিঠিপত্রাদি পাইতেছি না।

ইতিমধ্যে বৈশাখ হইতে ভাদ্র (১৩৭১) পর্য্যন্ত আপনাদের নামে এবং ঠিকানায় প্রবাসী প্রেরণ করা হইয়াছে। সংখ্যা-বিশেষ পত্রিকা এখন পর্য্যন্ত না পাইয়া থাকিলে আপনাদের পোঃ আপিসে সন্ধান লইয়া দয়া করিয়া আমাদেরও জানাইবেন।

বিনীত
ম্যানেজার, প্রবাসী

৭৭।২।১ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

কামিনী মায়া

শ্রীঅজিত চট্টোপাধ্যায়

ভেজা আকাশের দিকে চেয়ে ছিল অবনীমোহন। কাল থেকেই টিপটিপ বৃষ্টি। দুপুরের দিকে সামান্য কিছুক্ষণ ক্ষান্ত ছিল। আবার ঘড়ির কাঁটা চারটে না ...র হ'তেই বর্ষণ শুরু। হয়ত সারা রাতই চলবে। আকাশ দেখে থামবে ব'লে মনে হয় না।

আষাঢ়ান্ত বেলা। এখনও আলো নিভে নি। ছ'টা ...ংবা সাড়ে ছ'টা হ'তে পারে। অবনীমোহন বাইরের আলো, আকাশের রং, ঘরের আলো-আঁধারি সবকিছু ...র করে সময়টা আঁচ করবার চেষ্টা করল। সান্ত্বনার ...তে এখনও অনেক দেরি। আটটার আগে ফিরবে ...ল মনে হয় না। পিঠবালিশের ওপর হেলান দিয়ে ...ম নিশ্চিন্ততায় আর একবার চোখ বুজল অবনী, যেন ... একটা আলস্য সমস্ত দেহে-মনে। এখন এই আষাঢ়ের ...্যায় সান্ত্বনাকে কাছে পেলে ভাল লাগত। এক কাপ ...ায়িত চা নিয়ে সান্ত্বনা কাছে এসে দাঁড়াত। অবনীর ...া লম্বা চুলে ওর কোমল কলির মত আঙুলগুলি দিয়ে আদর করত।

আজ তিন বছর এমনি শুয়ে-বসে কাটাচ্ছে অবনী-মোহন। হ্যাঁ, তিন বছর প্রায় হ'ল। এই বর্ষা পেরুলেই ... পুজোর হাওয়া বইবে। তারপরই কার্তিকের শিশির ...র হিম। তখন রং বদলাবে আকাশটা। গাঢ় নীল ...য়ে উঠবে। সান্ত্বনার ফুলবাগানে মরশুমী ফুল ফুটবে ...রাশ—পিটুনিয়া, ক্যালেণ্ডুলা আর বড়জাতের গাঁদা-...ল।

তিন বছর আগের সেই ভয়ংকর দিনটির কথা শুয়ে-বসে অনেকবার ভেবেছে অবনী, অনেকবার নয়, অসংখ্য-বার। ভাবতে ভাবতে এখন অদ্ভুত একটা অবসাদ আচ্ছন্ন করে অবনীকে। সেই দিনটাকে স্মৃতি থেকে মুছে ফেলতে চায়। চিন্তা করতে চায় না। একবারও স্মরণ করবে না। কিন্তু অদ্ভুতভাবে সমস্ত ঘটনাটা চোখের সামনে ভাসে। ঠিক ছায়াছবির মত, রূপোলী পর্দার বুকে যেন ছবি ভেসে উঠছে।···

এ্যাকসিডেন্ট—দুর্ঘটনা বই কি। পান কিনতে কিনতে গলির মোড়ে অবনী এসেছিল। দরজায় সান্ত্বনা দাঁড়িয়ে। যতক্ষণ অবনীকে দেখা যায়, সান্ত্বনা ঠিক থাকবে। অবনী পিছন ফিরে হেসেছে, তারপর আর একটু এগুলেই চোখের আড়াল, রোজ দিনের মতই বাদুড়-ঝোলা। বাসটা ডালহৌসীর কাছাকাছি। ষ্টপে বাসগুলো দাঁড়াতেই চায় না। দু'-একটা অল্প সময় থামে। ঠিক থামে না, একটু গড়িয়ে গড়িয়ে চলে। সেই মুহূর্তে কোনমতে উঠে পড়া, অবশ্য উঠে পড়া না ব'লে ঝুলে পড়া বলাই ভাল। সেণ্ট্রাল এভেনিউ পেরুবার আগেই কি যেন হ'ল অবনীর। মাথাটা কেমন ঝিম্ ঝিম্ করে উঠল। ঘাড়ের কাছটা টন্‌টন্ করছে বুঝতে পারল, তারপরই আর মনে নেই। কখন হাতল ফসকে গেছে হাতের মুঠো থেকে, অবনী ছিটকে পড়েছে বাইরে।

জ্ঞান হ'ল হাসপাতালে। মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে সান্ত্বনা। সমস্ত বুকে-পিঠে অদ্ভুত যন্ত্রণা।···

—'কেমন আছ?' ম্লানমুখে সে জিজ্ঞাসা করল।

আশ্চর্য! সেই মুহূর্তে সব বুঝতে পারল অবনী, চলন্ত বাস, একরাশ লোক, হাতের মুঠোয় ধরা হাতলটা মিছিলের মুখের মত সার সার ভেসে এল মনে।

প্রায় একমাস পরে উঠে বসল অবনী, উঠে দাঁড়াতেও পারিবে। তবে চলাফেরা কম, না করলেই যেন ভাল। পাঁজরের কোথায় যেন ভেঙেচুরে গেছে, সে ভাঙা হাড় আর জোড়া লাগবে না। কলেজ ষ্ট্রীটের দোকান থেকে চামড়ার বেল্টজাতীয় কি একটা জিনিষ এল, সেটা প'রে সামান্য একটু চলাফেরা করতে পারবে। কিন্তু ঐ অদ্ভুতদর্শন জিনিষটার ওপর অবনীর এক বিজাতীয় ঘৃণা। পারতপক্ষে ওটা সে বুকে-পিঠে আঁটতে চায় না।

সান্ত্বনা বলে, 'এ কি করছ?' ডাক্তারবাবু বলেছেন

—‘কি নাটক করছেন এখন? রোজই ত দেখি ব্যস্ত হয়ে বেরোচ্ছেন।’

—‘ব্যস্ত হব না? নাটক কি একটা, চার-পাঁচটা ত লেগেই থাকে।’

—‘বলছি ত আপনায়। একদিন চলুন—ফিল্ম লাইনে আমার এক বন্ধু আছে। আলাপ করিয়ে দেব। —সিনেমায় চান্স পেলে।’

—‘কোথায় বন্ধু আপনার? একদিন বাড়ীতেও আনলে পারেন—তা নয়, খালি চলুন আর চলুন’—একটা বিলোল কটাক্ষ করল সান্ত্বনা।

—‘বাড়ীতে কি কথা বলা যায়? এসব ব্যাপার কোন হোটেল-রেস্তঁরায় ভাল, চলুন না পার্ক ষ্ট্রীটের ওদিকে—আপনার স্বামীটি আবার আমার দিকে জুলজুল করে তাকান—’

খিল্‌খিল্ করে হাসল সান্ত্বনা, ‘স্বামীটিকে তা হ’লে ভয় করেন?’ সে বলল।

—‘ভয়? হ্যাঁ, তা বলতে পারেন।…’

ঘড়ির কাঁটা ন’টা পার হয়েছে। সান্ত্বনা উঠল। আর দেরি করলে অবনী রাগারাগি করবে। মানুষটা যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। হাসিখুশী নেই, আনন্দ-উজ্জ্বলতা কম। কেবল ভার হয়ে ব’সে থাকে।

রাতে সান্ত্বনা বলল—‘তোমাকে একজন স্পেশ্যালিষ্ট দেখাব ভাবছি।’

—‘স্পেশ্যালিষ্ট? কাকে ঠিক করেছ?’ অবনীকে উৎসাহিত মনে হ’ল।

—‘ঠিক করি নি। ডাক্তার মজুমদারকে কাল ডেকেছি। উনি এলে বলব।’

চিকিৎসার কথা শুনে অবনীকে-তাজা বোধ হ’ল। ঘুমোবার আগে অনেকক্ষণ গল্প করল সান্ত্বনার সঙ্গে। খানিকটা আদর করল, সোহাগ জানাল।

সান্ত্বনা বলল, ‘আমার অভিনয় দেখতে কিন্তু কোন দিন গেলে না তুমি।’ কথায় অভিমান ঝরল।

অবনীর মনটা বেশ ভাল ছিল। বলল, ‘বেশ ত কাছেপিঠে কোথাও হ’লে আমাকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করো’—

—‘সত্যি যাবে? এই রবিবারে চল। নওজোয়ান ক্লাবের বার্ষিকী। একটা ছোট নাটক হবে।’

—‘বেশ, রাজী আছি,’ অবনী হেসে বলল।

সকাল দশটা নাগাদ মজুমদার এসে হাজির। দরজা থেকেই নাম ধরে ডাকাডাকি—‘কই, অবনীবাবু কোথায়?’

সান্ত্বনার নাম ধরে কখনও ডাকাডাকি করে না মজুমদার। অন্ততঃ অবনীর বাড়ীতে, তার সামনে।

যথারীতি পরীক্ষা শেষ হ’তেই সান্ত্বনা বলল, ‘কোন স্পেশ্যালিষ্টকে দেখাব ঠিক করেছি। শীতের প্রথমেই কাশিটা বাড়ে। বড় জব্দ করে ফেলে।’

এক ভদ্রলোকের নাম করল মজুমদার। সান্ত্বনা শোনে নি নামটা, অবনীরও মনে পড়ে না, হবে নিশ্চয়ই কেউ। কোন উপাধিধারী বিশেষজ্ঞ।

—‘তা হ’লে আজ বিকেলেই যাওয়া যাক। আমি একটু ফ্রি আছি।’ মজুমদার এক রকম ঘোষণা করল।

সান্ত্বনা চা করে আনল। টিন থেকে বিস্কুট দিল দু’খান, ভাল বিস্কুট। মজুমদার লোকটা বড় সৌখীন। শুধু ওর জন্যই একটা সুন্দর ফুল-আঁকা কাপডিস কিনে রেখেছে সান্ত্বনা, ডাক্তার এলে সেটি বের করে, ধুয়ে-মুছে আবার তুলে রাখে।

চা খেয়ে ডাক্তার উঠল। দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে এল সান্ত্বনা।

—‘কি ঠিক করলেন?’

—‘কিসের?’

—‘বা রে, এরই মধ্যে ভুলে গেছেন’—

সান্ত্বনা মনে করবার চেষ্টা করল।

মজুমদার বলল, ‘আমার সেই বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করার কথা। একটা এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করি’—

—‘কোথায়?’

পার্ক ষ্ট্রীট অঞ্চলের একটা হোটেলের নাম করল মজুমদার। বলল, ‘সন্ধ্যের দিকে’

—‘পরে বলব আপনায়। তাড়া কিসের?’ সান্ত্বনা মনোহর একটি হাসি ঠোঁটে ফুটিয়ে তুলল।

ডাক্তার দেখিয়ে ফেরার পর অবনী প্রথম কথা বলল, ‘মজুমদারবাবু কেমন লোক—’

—'কেমন মানে ?'

—'আমরা পিছনের সীটে যখন, ও সামনে বসলেই পারত। তোমাকে মাঝখানে বসিয়ে তোমার পাশে বসাটা—'

অনেকদিন বাইরে বেরোয় নি। সান্ত্বনা জানে। কতদূর এগিয়ে গেছে সান্ত্বনা, অবনী গলিতে বসে খোঁজ রাখে না, পৃথিবীটা বদলেছে, রুচি বদলেছে। তবু—

—'এই সামান্য ব্যাপারে তুমি ভাবছ। হয়ত কিছু মনে না করেই বসেছে।'

—'ঠিক তা নয়। ভদ্রলোক যেন কেমন তোমার গা ঘেঁষে—'

খিলখিল করে সান্ত্বনা হাসল।

—'বাব্বাঃ, এতও তোমার চোখে পড়ে। আসলে মজুমদারটা বোকা। নইলে সত্যি কি অমনি করে বসতে আছে ?'

রবিবার দিন থিয়েটার। চারটে না বাজতেই সান্ত্বনা বেরিয়ে গেছে। ওর মেকআপ, ড্রেসিং শেষ করতে সময় লাগবে। কথা আছে, সাড়ে পাঁচটা নাগাদ এক ভদ্রলোক আসবেন। রমেনবাবু। রমেন শিকদার। সান্ত্বনার জানাশোনা। গাড়ি করে তিনিই নিয়ে যাবেন।

প্রথম সারিতেই অবনীর আসন। লোকজন, ঝলমলে আলো, সুবেশ তরুণ-তরুণীর দল, অবনী চেয়ে চেয়ে দেখছিল। দু'একজন আলাপ করে গেল। সান্ত্বনা দেবীর স্বামী বলে পরিচিত হ'ল অবনী। প্রথমত দু' হাত তুলে নমস্কার জানাল।

বই দেখতে দেখতে গর্ব হচ্ছিল অবনীর। এত সুন্দর অভিনয় করছে সান্ত্বনা। হাসি-কান্না, ব্যঙ্গ বা পরিহাস যে কোন রূপই যেন সহজ আয়ত্ত। সান্ত্বনার দক্ষতা আছে। অবনী স্বীকার করে। ট্রেনিং পেলে হয়ত আরও কত ভাল করত। অসুস্থ স্বামীর বুকে মাথা লুকিয়ে কেমন ঝরঝর করে কাঁদল। আবার সহজভাবে পরের দৃশ্যেই কেমন হাসছে। সমস্ত দর্শকের সঙ্গে অবনী চিত্রার্পিতের মত চেয়ে দেখল।...

ফেরবার সময় ট্যাক্সিতে সবাই মিলে তুলে দিয়ে গেল। সেই রমেন শিকদার, কৌকড়া চুলের এক ভদ্রলোক, আরও অনেক। অভিনয়ের জন্য সান্ত্বনাকে হাত ধ'রে সকলের কি কনগ্র্যাচুলেশনস। কেউ কেউ হাত দুটো যেন ছাড়তেই চায় না। নতুন বইতে আবার আসতে হবে, অবিশ্যি, অবিশ্যি।

সান্ত্বনাও বেশ মিষ্টি মিষ্টি উত্তর দিল। কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা ইত্যাদির জন্য ধন্যবাদ। সে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে মাত্র। নইলে তার আর এমন কি ক্ষমতা—

গাড়ি ছাড়লে অবনী বললে, 'লোকগুলো কেমন যেন! ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে, এত কি হাত ধরাধরি করে ? আজকাল কি যে সব—'

সান্ত্বনা ওর কাছ ঘেঁষে বসল। শান্তকণ্ঠে বলল, 'রাগ ক'রো না। হাঁদারামের দল সব কি বলতে হয় কি করতে হয়, কিছু জানে না, একটু ছোঁয়াছুঁয়ির কাঙাল।

রাতে বাড়ী ফিরে স্নান করল সান্ত্বনা। জামাকাপড় পরে সামান্য প্রসাধন সেরে নিয়ে শুতে এল।

—'তুমি ঘুমোও নি এখনও ?'—

অবনী একটু হাসল।

—'বুঝেছি। গায়ে-মাথায় হাত না বুলিয়ে, দিলে বাবুর ঘুম আসবে না। যা অভ্যেস তোমার।'

সান্ত্বনা এক চিলতে হাসল।

মশারির মধ্যে ঢুকে হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করে শুল সান্ত্বনা।

—'কেমন দেখলে থিয়েটার ?'

—'ভাল।'

—'আমার অভিনয় ?'

—'খুব সুন্দর। আমি ভাবতে পারি নি তুমি এত ভাল করবে।''

অবনীর গায়ে, মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল সান্ত্বনা, নিত্যকার মত। আদর করে মিষ্টি হেসে চাইছিল স্বামীর মুখে। অন্যদিন অবনীও উজ্জ্বল হয়ে উঠত। স্ত্রীর সান্নিধ্যে, দেহের উত্তাপে চোখ দুটো আবেশে বুজে আসত। আজ কিন্তু ওর ভাবান্তর হ'ল। সমস্ত শরীরটা শক্ত ও কঠিন করে টানটান হয়ে শুয়ে রইল

অবনী, একটা পাথরের বুকে যেন হাত বুলোচ্ছে সান্ত্বনা, অচেতন একটি অবয়বকে স্পর্শ করে আছে।

—'জানো, মজুমদার কি বলেছে। স্পেশ্যালিষ্ট নাকি আশা দিয়েছেন। ওই ওষুধটা খেলে আর ইনজেকশনগুলো নিয়মিত নিলে তোমার আর কষ্ট থাকবে না। আবার আগের মত বেরুবে। তখন কিন্তু আমায় নিয়ে একবার' —

সান্ত্বনা থামল। তার পর অবনীর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'পুরী যাব। দু'জনে, বুঝলে? ঠিক আগের মত –'

অন্ধকারে অবনী একটা শ্বাস ফেলল। একটু চাপা আর বিলম্বিত। অবনী পারলেও সান্ত্বনা কি আর আগের মত হ'তে পারবে? সান্ত্বনার অভিনয়-দক্ষতার কথা ভাবছিল অবনী। সুন্দর শিখেছে সান্ত্বনা। ষ্টেজে উঠে কোন জড়তা নেই। সহজ, সাবলীল···

কিন্তু শুধুই কি মঞ্চে?

রঙ্গমঞ্চের বাইরেও আশ্চর্য অভিনয়-পটিয়সী সান্ত্বনা, আরও অনেককে ত মুগ্ধ করেছে। মজুমদার, রমেন শিকদার কোঁকড়া চুলের সেই ভদ্রলোক, আরও কতজন। এমন কি অবনীকেও—

হঠাৎ সান্ত্বনার নরম কোমল হাতটা বুকের ওপর কেমন শক্ত আর ভারী মনে হল অবনীর।

—*—

কলিকাতার গবর্ণর-হাউসে চুঁচুড়া কুঠির ওলন্দাজ ডিরেক্টারের সংবর্দ্ধনা (১৭৭০)

জুলফিকার

চুঁচুড়ার তখন ওলন্দাজ কুঠিয়ালদের পূর্ণ আধিপত্য। পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের নানাস্থানে,—জাভা সুমাত্রা, বোর্ণিওতে তাদের কলাও কারবার। শুধু ব্যবসাই চালাচ্ছে তা নয়, পুরোদমে জমিদারিও চালাচ্ছে।

চুঁচুড়ার কুঠিটা ছিল ব্যাটাভিয়ার ডাচ সরকারের অধীন। কুঠির কাজে কোন লোক নিয়োগ করতে হ'লে, ব্যাটাভিয়ান কর্ত্তৃপক্ষের অনুমোদন দরকার হ'ত। কুঠির যিনি অধ্যক্ষ, তাঁকে বলা হ'ত "ডিরেক্টার"—গাল-ভরা নাম—"The Honourable Director of the Company's important, trade in the Kingdoms of Bengal, Bahar (?) and Orixa."

চুঁচুড়া ছাড়া এদেশে আরও পাঁচ-ছয় জায়গায় ওলন্দাজদের ফ্যাক্টরী বা মাল কেনা-বেচার আড়ত ছিল,—কাশিমবাজার, ফলতা, কালিকাপুর, ঢাকা, বালেশ্বর ও পাটনায়। কোম্পানী বলতে অবিশ্যি তখন সাধারণতঃ ইংরেজদের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকেই বোঝাত। ডাচদের কোম্পানীর নাম ছিল, Ostindiche Vereenigde Companie (United East India Company), সংক্ষেপে বলা হ'ত O. V. C.।*

ডিরেক্টারের কাজ-কর্ম্মে পরামর্শ দেবার জন্য ছিল একটা কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি বা কাউন্সিল। এর সভ্য ছিলেন, সাতজন। তার মধ্যে পাঁচজনের ভোট-দানের অধিকার ছিল, বাকী দু'জনের কোন ভোট ছিল না।

ডিরেক্টার সাহেবের খুব জাঁক-জমক ছিল। রাস্তায় বেরোলে, আগে আগে চলত চোবদারের দল, হাতে রূপোর আশা-শোটা নিয়ে। তাঁর যাত্রা ঘোষণা হ'ত—তুরী, ভেরী, রশুনচৌকি বাজিয়ে। (কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্যদেরও চোবদার থাকত বটে, তবে তাদের হাতের লাঠি-শোটার অর্দ্ধেকটা মাত্র রূপা বাঁধানো থাকত।) মাথার উপর ধরা হ'ত রেশমী কাপড়ের বিরাট্‌ ছাতা, পাশে মুক্তোর ঝালর লাগানো (এ সব ঠাট শিখেছিলেন ওঁরা মোগলদের দেখাদেখি)। চুঁচুড়ার কোর্টে তখন অনেক সৈন্য রাখা হ'ত। মিলিটারী ও স্থাভাল এষ্টাব্লিশমেণ্ট বেশ বড়ই ছিল। ডিরেক্টার ছিলেন সর্ব্বময় কর্ত্তা। বেতন ছাড়াও আমদানী মাল-বিক্রির ওপর তিনি বেশ মোটা কমিশনই পেতেন। বছরে তাঁর জন্য খরচের বরাদ্দ ছিল ৩৬০০০৲। আগে আরও অনেক বেশী টাকা ব্যয় হ'ত।......

ডাচ সেটেলমেণ্টের মধ্যে এক ডিরেক্টার ছাড়া আর কারও পাল্কী (বা সিডান চেয়ার) চাপবার অধিকার ছিল না। ডিরেক্টারের ঠিক পরেই যাঁর মর্য্যাদা—কাউন্সিলের সেই সদস্যটি ছিলেন, কাশিমবাজার কুঠির অধ্যক্ষ। কাউন্সিলের তিন নম্বর সভ্য ছিলেন, এ্যাড-মিনিষ্ট্রেটর এবং তার নীচেই ছিলেন, বস্ত্র-বিভাগের তদারককারী Superintendent of Cloth House সেযুগে এই পদটি খুবই লাভের ছিল। ফিসক্যাল (Fiscal) বা মেয়র এবং গুদামরক্ষক (Warehouse-Keeper) এঁরাও দু'জনে ছিলেন কাউন্সিলের মেম্বর। সৈন্য দলের যিনি অধিনায়ক, তিনিও ছিলেন সদস্যদের একজন, তবে, তাঁর কোন ভোটাধিকার ছিল না। আর একজন ভোট-বিহীন সভ্য ছিলেন, Controller of Equipment (এঁর কাজটা আজকাল কালেক্টারীর নাজিরের মত,—

* ডাচদের দুর্গ Fort Gustavus-এর প্রবেশ-দ্বারে একখানা প্রস্তর-ফলক ছিল। তার গায়ে খোদাই ছিল কোম্পানীর প্রতীক বা মনোগ্রাম: দু'পাশে 16|87 লেখা—অর্থাৎ, 1687 খ্রীষ্টাব্দে এই দুর্গটা নির্ম্মিত হয়েছিল, সেইটেরই নির্দ্দেশক ছিল পাথরখানা। এখন এখানা বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনারের কুঠির সামনের বৈঠকখানার কামরার দোরের উপর দেওয়ালে গাঁথা হয়ে আছে। এই বাড়ীটাও ডাচ আমলে তৈরী।

তাঁবু, সাজ-সরঞ্জাম প্রভৃতি এঁরই হেফাজতে থাকত)। ফিসক্যালের পদটি ছিল বেশ মর্য্যাদার এবং আর্থিক দিক থেকেও লোভনীয়। এঁর হাতে ছিল বিচারের ভার। স্থানীয় ধনী বেণেদের ধ'রে এনে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ইনি কখনও চাবুক মারবার হুকুম দিতেন, কখন বা বিশ, ত্রিশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত জরিমানাও করে বসতেন,—অপরাধ কোম্পানীর অবাধ্যতা অথবা ব্যবসার কোন গোপন খবর ফাঁস করে দেওয়া।......স্থানীয় শাসনে পুরোমাত্রায় স্বৈরতন্ত্র চলত। ব্যাটাভিয়ান কর্তৃপক্ষ এ সব ব্যাপার নিয়ে আদৌ মাথা ঘামাতেন না। বেসরকারী কারবারের (Private trades) মুনাফার ওপর শতকরা ৫% ছিল ফিসক্যালের প্রাপ্য। এ ছাড়া শুল্ক ফাঁকি দেওয়া বেআইনী মাল বাজেয়াপ্ত হ'লে, তার অর্দ্ধেক পেতেন ফিস্‌ক্যাল সাহেব। দিশি লোকেরা ফিসক্যালকে (তাঁকে ওরা ডাকত 'জমাদার' বলে) খোদ ডিরেক্টারের চেয়ে অনেক বেশী খাতির ও ভয় করত (আগের দিনে দারোগাকে যেমন গেয়োঁ লোকেরা জজ্, ম্যাজিষ্ট্রেটের চেয়েও ভয় ও মান্য করত)।......ডিরেক্টার ও ফিসক্যালের মোটা আয় হ'ত এদেশ থেকে ব্যাটাভিয়ায় আফিং-চালানী কারবারে। পাটনা থেকে আফিং রপ্তানী হ'ত জাভায়, সেখান থেকে মালয় দ্বীপপুঞ্জ সিয়াম, চীন প্রভৃতি নানাস্থানে তা বৈধ বা অবৈধ ভাবে বিক্রী হ'ত। এক এক পেটির ওজন ছিল ১২৫ পাউণ্ড, অর্থাৎ প্রায় দেড় মণ। ক্রয় মূল্য, পাঠানোর খরচ, ইনস্যুরেন্স, দালালী সব নিয়ে পেটি-পিছু লাগত ৭০০|৮০০ টাকার মতন, অথচ, ব্যাটাভিয়ায় সেগুলো বিক্রী হ'ত ১২৫০৲ টাকায়। আফিং চালানীতে বছরে অন্তত: কম্‌সে-কম ৪ লক্ষ টাকা মুনাফা হ'ত।...ডাচদের বাণিজ্য এসব দেশে খুব ভালই চলত। প্রচুর লাভ হ'ত। ১৭৭০ সাল থেকে ১৭৮০ সাল এই দশ বছরে বাংলায় ওলন্দাজদের ব্যবসা উন্নতির চরমে উঠেছিল। কিন্তু ক্যাক্টরীর কর্তাব্যক্তিরা মুনাফার অনেকখানি আপন আপন পকেটজাত করতেন। সে-যুগের ক্যাক্টরদের অসাধু আচরণের বিরুদ্ধে ব্যাটাভিয়ান সরকারের কাছে অভিযোগ জানিয়ে একখানা পত্রে লেখা হয়েছিল :

"For a series of years, a succession of directors in Bengal have been guilty of the greatest enormities and foulest dishonesty; they have looked upon the company's effects confided to them, as a booty thrown open to their depredations; they have most shamefully and arbitarily falsified the invoice prices, they have violated in the most disgraceful manner, all our orders and regulations with regard to purchase of goods, without paying the least attention to their oaths and duty."

শুধু ডাচদের মধ্যে নয়, সে আমলে ইংরেজ কুঠিয়ালদের মধ্যেও চুরি, জুয়াচুরি, প্রভৃতি দুর্নীতি ব্যাপক ও জঘন্য ভাবে দেখা দিয়েছিল। সে-দিনের ইতিহাস পড়লে অনেক ইংরেজই স্বজাতির ঘৃণ্য চরিত্রের কথা স্মরণ করে লজ্জায় অধোবদন হবেন।

তখনও খবরের কাগজের চল হয় নি এদেশে।

১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের কথা। জি. ভার্নেট তখন চুঁচুড়ার ডাচ-কুঠির ডিরেক্টার। কলকাতায় ইংরেজ গভর্ণর (প্রেসিডেণ্ট) হচ্ছেন মি: কার্টিয়ার, সবে চার্জ নিয়েছেন। সেই সময় ডিরেক্টার ভার্নেট কলকাতায় গভর্ণর কার্টিয়ারের সঙ্গে দেখা করতে যান। ডাচ ডিরেক্টারকে গভর্ণর-হাউসে কি ভাবে সংবর্দ্ধিত ও আপ্যায়িত করা হয়, তারই বর্ণনা করেছেন একজন ডাচ এ্যাডমিরাল,—Admiral Stavorinus। ষ্টাভোরিনাস বাংলা ভ্রমণে আসেন ১৭৬৯ সালে, এবং বছর-খানেকেরও ও বেশী এদেশে কাটিয়ে যান। তিনি তার ভ্রমণ কাহিনী লিখে গেছেন; তৎকালীন ডাচদের অনেক খবর জানা যায় এঁর লেখা থেকে (অবিশ্যি ভদ্রলোক অনেক বাজে কথাও লিখে গেছেন। যেমন মূল বেদ না কি ফারসীতে লেখা, পাটনা থেকে চুঁচুড়ার দূরত্ব নব্বই মাইল, ইত্যাদি)। ষ্টাভোরিনাস ডিরেক্টারের সহযাত্রী হিসাবে কলকাতায় গভর্ণর-হাউসে গিয়েছিলেন। তাঁর বর্ণিত ইংরেজদের কর্তৃক ডাচ গভর্ণরের সংবর্দ্ধনার

খবরটায় খুব বেশী অতিরঞ্জন বা মিথ্যাভাষণ আছে বলে মনে হয় না।

বেলা চারটের সময় গঙ্গার ঘাটে নৌকায় চাপলেন ডিরেক্টার সাহেব, সঙ্গে আরও আটজন (এঁদের মধ্যে এ্যাডমিরাল ষ্টাভোরিনাস একজন)। দুর্গের সৈন্যরা এসে ঘাটের দু'পাশে সারবন্দী হয়ে দাঁড়াল, ডিরেক্টারকে সম্মান জানানোর জন্য। বডিগার্ড হিসাবে তাঁর সঙ্গী হ'ল একজন অফিসার ও চব্বিশ জন প্রাইভেট। ডিরেক্টার ভার্নেট উঠলেন OVC কোম্পানীর বড় বজরাটায়। (বজরার যেটা বড় কামরা,—সেখানে এক টেবিলে, একসঙ্গে ছত্রিশ জন খানা খেতে বসতে পারে)। সঙ্গে যাঁরা যাচ্ছেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই নিজের নিজের পৃথক্ বজরা ছিল। এছাড়া একখানা বোটে ছিল রান্নাশালা, আর অন্য একটায় ভাঁড়ার। বডিগার্ডেরা চড়েছিল আলাদা নৌকায়।

বজরা ছাড়বার আগে একুশটা তোপ-ধ্বনি করা হ'ল। সবশুদ্ধ তেত্রিশখানার নৌ-বাহিনী রাতে খাবার-দাবার পর, চলল ভেসে, ভাঁটার টানে, কলকাতার দিকে।

সকাল সাতটায় নৌকোগুলো চিৎপুরের ঘাটে এসে লাগল। ডাচ-অতিথিদের অভ্যর্থনা করবার জন্য ঘাটে উপস্থিত ছিলেন, ইংরেজদের প্রতিনিধি মিঃ রাসেল (গভর্ণর বা প্রেসিডেন্টের পরেই ছিল ওঁর স্থান) এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আরও জনকত হোমরা-চোমরা কর্মচারী। ডাচ-ভদ্রলোকেরা কূলে নামলে, তোপধ্বনি দ্বারা তাঁদের সংবর্দ্ধিত করা হ'ল। তারপর রাসেল সাহেব অতিথিদের নিয়ে গেলেন, গঙ্গার ধারে তাঁর নিজের বাগান-বাড়ীতে। সেখানে প্রাতরাশ শেষ করে, গভর্ণরের প্রেরিত পাঁচখানা ঘুড়িগাড়ি চেপে, তাঁরা বেলা ন'টায় তাঁদের নির্দ্দিষ্ট বাসায় এসে উপস্থিত হলেন। বাড়ীটা ছিল পুরাণো গভর্ণর-হাউসের লাগোয়া। মহম্মদ রেজা খাঁ, এক লক্ষ বিশ হাজার টাকায়, কিছুদিন পূর্ব্বে কিনেছিলেন বাড়ীখানা। অনেকগুলো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘর। দামাস্ক সিল্কের পর্দ্দায় এবং ইউরোপীয় কায়দায় আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো সব ঘর। সদর অঙ্গনে আশীজন সেপাই ও একজন ইংরেজ ক্যাপ্টেন মোতায়েন ছিল ডিরেক্টারকে গার্ড অব অনার দেবার জন্য। ওঁদের আসার খবর পেয়ে গভর্ণর কার্টিয়ার তাঁর কাউন্সিলের সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন।

ডিরেক্টার ভার্নেট সাহেব জানালেন যে, 'The object of his visit was to congratulate the Governor on his appointment and as a particular compliment he hoped that Mr. Cartier would so well manage matters as to be able to return to Europe in a few years.'

কার্টিয়ার ডিরেক্টার সাহেবের কথায় ঈষৎ হাস্য করলেন। বোঝা গেল রসিকতাটা তিনি উপভোগ করেছেন।......

সৌজন্য বিনিময়ের পালা চলল ঘণ্টাখানেক ধরে। তারপর গভর্ণর ও তাঁর কাউন্সিলের মেম্বরেরা বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। এরই আধঘণ্টা বাদ, ডাচ-ডিরেক্টার ভার্নেট দলবল নিয়ে গভর্ণরের কুঠিতে পাল্টা সাক্ষাৎ করতে এলেন, এবং সেখানে প্রায় মিনিট পঁয়তাল্লিশ কাটিয়ে নিজেদের আস্তানায় ফিরে এলেন।

দুপুর সাড়ে বারোটার পর সবাই গভর্ণর-হাউসে ডিনারের নেমন্তন্ন রক্ষা করতে চললেন। আলো-হাওয়া-যুক্ত বিরাট্ একটা বৈঠকখানা ঘরে (Saloon), প্রকাণ্ড টেবিল পেতে ভোজের আয়োজন করা হয়েছে। অভ্যাগতের সংখ্যা সবশুদ্ধ ষাট-সত্তর জন হবে।...রুটি পোলাও, মাছ-মাংসের বহুবিধ ব্যঞ্জন, আস্ত ভেড়া ও বাচ্চা শূকরের রোস্ট, কাছিমের সুপ, চিংড়ি, কাঁকড়া, পমফ্রেট প্রভৃতি সামুদ্রিক মৎস্য (শূয়োর, কচ্ছপ ও কাঁকড়া মুসলমান বাবুর্চ্চির অস্পৃশ্য। এগুলো রান্না করেছিল গোয়ানীজ ফিরিঙ্গি কুক। ফরাসী হেড কুক বা সেফও ছিল তখন গভর্ণর-হাউসে)। হরেক রকম ফলও ছিল টেবিলে—কলা, আনারস, আম, বাতাবীলেবু (যাকে ইংরেজরা বলে গ্রেপ ফ্রুট), খরমুজা, বাদাম (নাট্স), খেজুর, ন্যাসপাতি, আঙুর আখরোট প্রভৃতি। এ ছাড়া ছিল নানা জাতীয় সুরা, আরক (কড়া মদ, জঙ্গী সাহেবদের অনেকেই এর পক্ষপাতী ছিলেন) ও মধু ফরাসী মদিরা। ভোজ আরম্ভ হবার আগে একচোট খাওয়ার কাঁকে কাঁকে অবাধ মদ্যপান চলছিল। নিমন্ত্রিতদের অর্দ্ধেকই ছিলেন আর্মি অফিসার সেজন্যেই

হাউস, ওঁদের জন্য রোজই খোলা থাকত, এখানে এসে ওঁরা ইচ্ছামত পান-ভোজন করতে পারতেন। যে সময়ের কথা বলছি, সেটা হচ্ছে পলাশী যুদ্ধের ছোট্ট বছর পরে। বাংলায় তখন ভীষণ দুর্ভিক্ষ চলছে—ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। দুর্ভিক্ষে অবশ্য ইংরেজদের খুব বেশী কষ্ট পেতে হয় নি, কেননা, তাঁরা আগে থেকেই অনেক খাদ্য মজুত করে রেখেছিলেন। তাছাড়া সে-যুগের বড় বড় হোর্ডার রেজা খাঁ ছিলেন ইংরেজদের একান্ত অনুগত)। খাওয়ার পাট চুকলে, টেবিলের কাপড় তুলে নিয়ে, প্রত্যেকের সামনে এক-একটা আলবোলা দেওয়া হ'ল। (হুকা টানাটা সে-যুগের ইউরোপীয়দের একটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল)। আটঘণ্টা ধ'রে চলল ধূমপান ও খোসগল্প। তারপর যে-যার বাড়ী রওনা দিলেন।……

সন্ধ্যা ছ'টায় গভর্ণর কার্টিয়ার এসে, সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন ভার্নেট সাহেবকে তাঁর পল্লীভবন, বেলভেডিয়ারে—গভর্ণর-হাউস থেকে যার দূরত্ব দু'মাইলের কিছু বেশী। এখানে ওলন্দাজ ডিরেক্টার ও তাঁর সঙ্গীদের চমৎকার কনসার্ট বাদ্য শুনিয়ে আপ্যায়িত করা হ'ল। নৈশ-ভোজনের ব্যবস্থাও হয়েছিল সেখানে। খাওয়া-দাওয়া ভালই হ'ল (elegant supper)। খাওয়া সেরে অনেক রাতে ওঁরা কলকাতার বাসায় ফিরে এলেন।

পরদিন সকাল নটায় কার্টিয়ার আবার এলেন ভার্নেটকে নিমন্ত্রণ জানাতে সান্ধ্য বল-নাচের আসরে (grand ball), তাঁরই সম্মানে এই নাচের আয়োজন করা হয়েছিল কোর্ট হাউসে। মিসেস কার্টিয়ার ও ডিরেক্টার ভার্নেট জুটি হয়ে, বল ওপ্‌ন (open) করলেন। নিমন্ত্রিতের সংখ্যা নেহাৎ কম ছিল না। সবারই পরিধানে মূল্যবান্ সুদৃশ্য পরিচ্ছদ। মহিলারা এসেছিলেন নানা-দিব্য-রত্নালঙ্কার-ভূষিতা হয়ে। পাশের কামরায় হাল্‌কা জলযোগের (collation) ব্যবস্থা ছিল। রাত-ভর চলল নাচ, বাজনা, আমোদ-প্রমোদ, হৈ-হল্লোড়। আসর ভাঙল ভোরের দিক। পরদিন বৈকালে ওলন্দাজ-কুঠির কর্তা ইংরেজ গভর্ণরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দলবল সহ, গভর্ণর বাহাদুরের গাড়ি হাঁকিয়ে, চিৎপুর ঘাটে এসে উপস্থিত হলেন। ওঁদের বিদায়-সম্বর্দ্ধনা জানাতে এলেন তাঁরাই, যাঁরা একদিন ওঁদের অভ্যর্থনা করতে এসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ছিল গভর্ণর বাহাদুরের ছজন দেহরক্ষী সৈন্য। ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ থেকে বিদায়ী অতিথিদের সম্মানার্থে ১৭টি তোপধ্বনি করা হ'ল। ডিরেক্টার বাহাদুরের আগমনীও ঘোষিত হয়েছিল অনুরূপ উনিশটি তোপধ্বনিতে।

কলকাতার গভর্ণমেণ্ট হাউসের চাকর-বাকরদের বকশিস দিতে গিয়ে, ডিরেক্টার সাহেবের মোট হাজার সিক্কা টাকা ব্যয় হ'ল (সে-যুগের হাজার টাকা বর্ত্তমান মুদ্রা-মানে প্রায় ত্রিশ হাজার)।……

জোয়ার এলে নৌকো ছাড়া হ'ল। ডিরেক্টার সাহেবের নৌবহর পরদিন ভোরে গেরেটির (গৌরহাটি) ঘাটে এসে পৌঁছল। গেরেটি ছিল ফরাসীদের। ফরাসী গভর্ণর মঁসিয়ে শিভালিয়ার ওদের ছোট হাজরী না খাইয়ে ছাড়লেন না। বেলা তখন প্রায় ন'টা। At nine O' clock the breakfast in those days of formality and etiquette seems to have been rather early…গেরেটি থেকে তাঁরা গাড়ি চড়ে এলেন চন্দননগর বা ফরাসডাঙ্গায়। সেখানে আনুষ্ঠানিক ভাবে সকলের সঙ্গে দেখা-শোনা শেষ করে, পুনরায় নৌকোয় চেপে, যখন চুঁচুড়ার ঘাটে এসে পৌঁছুলেন, তখন ঘাটে কাউন্সিলের সদস্যেরা সবাই এসে সমবেত হয়েছেন, তাঁদের প্রধানকে অভ্যর্থনা জানাতে। ফোর্ট গাস্টাভাস থেকে ডিরেক্টারের নামবার আগে তাঁর সম্মানে একুশবার তোপ ছোড়া হ'ল।……

১৮২৪ সালে ১৭ই মার্চ তারিখে, লণ্ডনে স্বাক্ষরিত ইংরেজ ও ডাচদের সন্ধিপত্র অনুযায়ী, চুঁচুড়া কালিকাপুর, পাটনা, ঢাকা ও বালেশ্বরের ওলন্দাজ কুঠিগুলো ইংরেজদের অর্পণ করা হ'ল। ডাচেরা ভারতবর্ষ ত্যাগ করে চলে গেলেন। বিনিময়ে তাঁরা ইংরেজদের কাছ থেকে পেলেন—কোর্ট মারলবোরো ও সুমাত্রা দ্বীপের অধিকার। সন্ধির সর্ত্তানুসারে ডাচদের বেঙ্কুলেনে থাকায় ইংরেজদের যে আপত্তি ছিল এবং সিঙ্গাপুর ইংরেজ আধিপত্য সম্বন্ধে ডাচদের যে আপত্তি—পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে সেই আপত্তি তুলে নিলেন।

রায়বাড়ী

শ্রীগিরিবালা দেবী

৪

বেলা একটার ভিতরে বিন্নুকে শুভলগ্নে যাত্রা করিতে হইবে। তাহার পরে বারবেলা, যাত্রা নাস্তি।

তরু একটা বাক্সে বিন্নুর জামাকাপড় গোছাইয়া দিল। চুল বাঁধিয়া দিল। মনোরমা গহনা পরাইতে আসিলে তরু জানাইল গহনা পরিতে বিন্নুর আপত্তি, "বৌদি যে আর গয়না পরতে চাইছে না মা। বলে, "গয়না আমার ভাল লাগে না। শরীর ভারী লাগে। বিয়েবাড়ীতে ত যাচ্ছি না, গয়নার কি দরকার'।"

তবু বাছা বাছা কয়েকটা গহনা মনোরমা বিন্নুকে পরাইয়া দিলেন। রায়বাড়ীর বৌ ন্যাড়া হইয়া যাইবে নাকি বাপের বাড়ী, লোকে বলিবে কি?

সকলকে প্রণাম করিয়া বিন্নু যাইয়া নিজেদের গো-যানে চড়িল। জুড়ান চাকর সর্ব্বাপেক্ষা গো-শকট পরিচালনায় দক্ষতা লাভ করিয়াছে। সে-ই হইল গাড়োয়ান, বিন্নুর সঙ্গে চলিল কামিনীর মা ও নবীন চাকর।

রায়বাড়ীর সদরে সিংহদরজার নীচে গলিপথ। পথে নামিবার সারি সারি সোপান।

সদর দিয়া যাত্রা প্রশস্ত। সিংহদরজায় বিন্নুর শ্বশুর-শাশুড়ী, দুই ঠাকুমা, তরু দাসীর দল উপস্থিত হইল বধূকে বিদায় দিতে। শুধু সরস্বতী আসিল না। ক্ষিতি স্কুলে গিয়াছিল। হঠাৎ সুমন্ত তারস্বরে কান্না জুড়িয়া দিল "আমি বইদি যাব, বইদি যাব।"

তাহাকে ভুলাইতে হরি চাকর লইয়া গেল পচা পুকুরের বুড়ো কচ্ছপ দেখাইতে।

ছইওয়ালা গাড়ির দুই দিকে পর্দা ঝুলানো। সম্মুখে বসিয়াছে কামিনীর মা, ভিতরে বিন্নু।

গলিপথে এখন বর্ষার জলকাদার কোন চিহ্ন নাই। শুখ্না মাটি খটু খটু করিতেছে, ধুলা উড়িতেছে। তরু-শ্রেণী ক্রমে পত্রবিরল হইয়া আসিতেছে। গলির দুই পাড়ে বৃক্ষের আড়ালে ঘন বসতি।

গাড়ি চলিতেছিল চাকায় কাঁচ কাঁচ শব্দ করিতে করিতে। সুমন্তর কান্নায় বিন্নুর অসীম আনন্দে একটুখানি যেন সীমার রেখাপাত হইল। কর্ণকুহরে কচি কণ্ঠস্বর বাজিতে লাগিল, "বইদি যাব, বইদি যাব।" বিন্নু ভাবে এ আবার কি, "শাঁখের করাত দুই দিকেই কাটে।"

ঠাকুমা যে বলিয়াছিলেন "মণিমালা, আহ্লাদে আটখানা হয়ে চললি, দেখিস্ এদের জন্নে মন খারাপ লাগবে। শ্বশুরবাড়ীর মায়া কি কম লো, আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি—'খাঁচার পাখী উড়তে চাই, ডানায় আমার বল নাই'।" ঠাকুমার কথা মিছে নয়। বল মানে বুঝি মায়া?

"টু টু"! গলির পাশে ডাক্তার বাড়ী, সামনে রাস্তায় হেলিয়া পড়িয়াছে বিরাট জাম গাছ। সেই ছায়াময় জামতলা হইতে কচি কোমল স্বর হইতেছিল, "টু টু"।

কামিনীর মা সামনে হইতে বলিল, ওই ভাখ বৌমা, তোমাগো ছোট ননদ পুকুরের চালা ঘুর্‌য়া আসিছে। বাওন কালে পিছে ডাকিতে নাই। তাই টু দিইচে।"

বিন্নু পর্দার ফাঁক দিয়া মুখ বাহির করিয়া হাত নাড়িয়া হাসিতে লাগিল। তাহারও সাধ হইতেছিল তরুর ধ্বনির প্রতিধ্বনি তুলিতে, 'তরু টু, তরু টু'। কিন্তু সে যে এই গ্রামের বৌ, সঙ্গে লাজ-লাজ রহিয়াছে। হাসিয়া হাত নাড়া ছাড়া তাহার 'টু' দেওয়া হইল না।

গাড়ি বাঁক লইল, তরু মিলাইয়া গেল জামতলায়। কিন্তু বিন্নুর হৃদয় হইতে মিলাইতে পারিল না।

হরিণহাটি গ্রামখানা বৃহৎ। অন্নপূর্ণার মন্দির জমা রায়ের মন্দির। খেলার মাঠ বাজার বালিকা বিদ্যালয় বালকদের প্রাথমিক শিক্ষার স্কুল। পল্লীবিরল গ্রাম, স্থানে স্থানে অসংখ্য পুষ্করিণী দীঘি গ্রামের কোণে কোণে

বিল হীরাসাগরের সহিত সংযুক্ত। তবু কাণা গ্রাম লোকে বলে। 'নদী শূন্য গাঁ, হাল শূন্য না', অনেকে পছন্দ করে না। গ্রাম নদীশূন্য হইলেও সমৃদ্ধিশালী। আঁকিয়া-বাঁকিয়া গলিপথগুলি গোলকধাঁধার মতন।

গলিপথ অতিক্রম করিয়া গাড়ি দিগন্ত প্রসারিত মাঠে আসিয়া উপস্থিত হইল বিরাট্ মাঠ, মাঝখানে সড়ক সোজা চলিয়া গিয়াছে হীরাসাগর নদী অবধি। সড়কের দুইপাশে বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র। ধান কাটিবার পরে ধানক্ষেতগুলিতে চাষীরা পুনরায় লাঙ্গল চষিতেছে। শস্যক্ষেত্রে সোনার সরিষা ফুলে ভরিয়া গিয়াছে। কড়াই ক্ষেত বেগুনি ফুলে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে।

এই মাঠের পরেই বিনুদের গ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। দুই গ্রামের সীমানা এক বৃহৎ প্রাচীন বটগাছ। ও গাছ যে কত যুগের দুই গ্রামবাসীরা তাহার সঠিক খবর দিতে পারে না। কিংবদন্তী, বটগাছটি ভূতপ্রেতের আদি নিবাস। রাত্রে কেহ একাকী বটগাছের নিকট দিয়া যাইতে সাহসী হয় না।

বিনু বিস্ফারিত নেত্রে চাহিতেছে ক্ষণেক ডাইনে, ক্ষণেক বামে। পূজার সময় সে প্রসাদের সহিত গিয়াছিল জলপথে। কতকাল পরে এই মেঠোপথের অপরূপ শোভা সম্পদে তাহার জীবন যেন জুড়াইয়া গেল। সড়কের দুইদিকে জল-নিকাশের পগার। পগারের গায়ে শ্রেণীবদ্ধ বাবলা ও খেজুর গাছ। শ্যাওড়ার বন, ছাতিম কদম ও পিটালি বৃক্ষের ছায়ানিবিড় ঝোপ। কৃষকরা ক্ষেতের কাজ করিতে করিতে রৌদ্রতাপে দগ্ধ হইয়া ওই সব ঘন ঝোপে আসিয়া বিশ্রাম করে। কৃষাণীরা স্বামী-পুত্রের নিমিত্ত মধ্যাহ্নে ভাত-জল বহিয়া আনে গাছের ছায়ায়। পগারের গভীর গহ্বরে জায়গায় জায়গায় বর্ষার জল জমিয়া থাকে। গাভীরা পশুপক্ষীরা সেই জল পান করে।

বেলা গড়াইয়া গিয়াছে। অপরাহ্ণ আগতপ্রায়, শস্যক্ষেত্র কড়াইফুলের সৌরভ গায়ে মাখিয়া বাতাস উতলা হইয়াছে। ঘন শাখায় লুকাইয়া পাখী ডাকিতেছে 'বৌ কথা কও, বৌ কথা কও।' বৌ কথা না কহিলেও পাকুড় গাছের ভিতর হইতে আর এক পাখী ডাকিতেছে [illegible]

বেড়াইতেছিল। কতক ক্লান্ত হইয়া তরুশাখে বসিয়া উদাসস্বরে বনভূমি মুখরিত করিতেছিল।

কতকাল পরে আজ যেন বিনুর নূতন এক জগতের সহিত পরিচয় হইল। শ্রবণ মন প্রাণ উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। কি রাখিয়া কি সে আস্বাদন করিবে? স্বপ্নের ঘোরে সে যেন বিভোর, বিহ্বল।

অকস্মাৎ তাহার স্বপ্নের আবেশ ভাঙ্গিয়া গেল পথিপার্শ্বের কুকুরের উচ্চ কোলাহলে।

কামিনীর মা বলে, "ঢাখ নব্‌নে, কি কাণ্ড, কুত্তা দুডা যে আইচে পিছে পিছে তা পরখ করি নাই এতক্ষণ।"

বিনু সবিস্ময়ে তাকাইল গাড়ির পশ্চাতে, সত্যই লালজী, কালজী আসিয়াছে গাড়ির সঙ্গে। শুধু আসা নয়—সামনে সমগোত্রের যাকে দেখিতেছে, তাহারই সহিত তুমুলবেগে কলহ করিতেছে।

নবীনের দিদির নাম রাজেশ্বরী, সেই সুবাদে নবীন তাহাকে দিদি বলিয়া ডাকে। নবীন বলে, "আর কও কেনে দিদি, জ্বালায়ে মারিল পচা কুত্তা দুডা। বাড়ীর লোকেরা পথে পা বাড়াইলে ওরা সাথে যাইবে। রায়বাড়ীর ম্যায়াগরে কিন্তুক পিছ লয় না। সেয়ান ঘুঘু, বজ্জাতের নাজীর।"

"মা যে আইল, ছাওগুলানের কি দশা হইবে নব্‌নে? সেগুলা যাদ গলা শুকায়ে মরি যায়? তুই খেদায়ে দে কুত্তা দুডারে বাড়ীর পথে।"

নবীন গাছের একটি ডাল ভাঙ্গিয়া কুকুরকে তাড়া করিল। লালজী, কালজী পগার পার হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল গাড়ি লক্ষ্য করিয়া। গাড়ি আসিল দুই গ্রামের সীমানার বটের ছায়ায়। ছুডোন গাড়োয়ান উচ্চারণ করিল, "আল্লা রসুল,"। কামিনীর মা "রাম রাম।"

নবীন হাসে হিঃ হিঃ করিয়া, "দিন দুপুরে বটের তলে আসি ভয় পাল নাকি ছুডোন?"

"না বাই, ভয় পাওনের কি হইচে? খোদা তালার নাম করন কি মন্দ? ভয় পাইচে তোর দিদি।"

দিদি বনেদের কুলের মেয়ে, তারা মচকায় তবু ভাঙ্গে না। দিদি ঝাঁঝিয়া উঠিল, "কি কইলি ছুডোন, [illegible] ভয়? [illegible] কামিনীর [illegible] হইচে না?

তোরে নাম লইতে শুনি আমাগো নাম লইতে ইচ্ছা হইছিল। তোর আল্লা রসুল রইচে য্যামন, আমাগো রাম-লক্ষ্মণ ত্যামন।"

নবীন ঝগড়ার সূত্রপাত করিয়াছিল, সেই কের সঙ্গ ডাকিয়া আনিল, "ছাখ দিদি, বটগাছটার কি ত্যাজ, এই যে ঝড় ঝাপটা যায়, কোন দিন একখানা ডাল ভাঙন দেখি না। ও জুম্মান, তোর গরু যে পগারে যাইচে—খেদাইয়া নে।"

"না বাই—পগারে যাইবে ক্যান? ওই নকপকে ঘাসের চাপড়াডা মুকে নয়া এই ত ফিরি আইল সড়কে। হ, গাছডার বড় ত্যাজ—দিনমান মাঠের রদ্দুর পায়—পগারের পানি শুষি নয়া বড় ত্যাজ হইচে।"

কামিনীর মা বলে, "তোরা ছাওয়াল-পায়াল মানুষ—জানিস না, গাছের ওপর ভর করি বেঁই রইচে—তেনাই দিইচে গাছেরে ত্যাজ। রাম নক্ষণ, রাম নক্ষণ।"

বটগাছ ছাড়াইয়া গাড়ি চলিয়াছে পাথরকুচি গ্রামের সড়ক দিয়া। কানন কুন্তলা বনশ্রী আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, কৃষকের ছোট ছোট খড়ের কুটির, নদী রহিয়াছে বনের শেষ প্রান্তে।

বিনু পর্দার ফাঁক দিয়া অনিমেষে চাহিয়া রহিল। তাহার চঞ্চলচিত্তে অনুক্ষণ যাহারা জাগ্রত থাকিয়া আকর্ষণ করে—ওই ত তাহাদের সেই আকাশস্পর্শী নারিকেল বৃক্ষের চূড়া, দেবদারুর সুউচ্চ শির, সরল বংশের ছত্র। আর দেরি নাই, বিনু আসিয়া গিয়াছে।

বিশালকায় সারিবদ্ধ শিরীষ গাছের নীচে গাড়ি থামিল। সামনেই পেটকাটা বাংলো প্যাটানের প্রকাণ্ড গৃহ। দুই পাশে দুইটি মনোরম ফুলের বাগান। নানা বর্ণের গাঁদা ফুলে বাগান আলো করিয়া রাখিয়াছে।

এখানকার সকলে উদ্গ্রীব হইয়াছিল বিনুর আগমন আশায়।

গাড়ি আসামাত্র সকলে ছুটিয়া আসিল, তাহাদের অগ্রগামী ঠাকুরদা। তিনি সস্নেহে আহ্বান করিলেন, "দুলালি, এলি,—আয়।" ঠাকুমা রাজনীকে বাহু বারণ করিয়া গাড়ি হইতে নামাইয়া বুকে চাপিয়া ধরিলেন। মা বৌমানুষ, আধ ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়াছিলেন। তাঁহার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত। ভাসুরদারাও একে একে কাছে আসিয়া কুশল প্রশ্ন করিতে লাগিল। স্বাগত সম্ভাষণ করিল।

নকর্তা প্রবাসে, তাই সঙ্গীতের অভ্যর্থনা হইল না।

গাড়ির সামনে বিনুদের ভুলু ও কালো কুকুরের সহিত লালজী-কালজীর হঠাৎ বাধিয়া গেল গোলমাল, গোঁ গোঁ ভেউ ভেউ শব্দে পাড়া সচকিত হইতে লাগিল।

ভগীরথ চাকর লাঠি হস্তে অগ্রসর হইয়া দুইপক্ষকে থামাইবার চেষ্টা করিতেই ঠাকুরদা পত্নীর প্রতি চোখ তুলিয়া সহাস্যে কহিলেন, "দুলালীর সাথে পাইক-পেয়াদা এসেছে, ওদের ভেতরে ডেকে নিয়ে কিছু খেতে দাও গে, প্রকাণ্ড সুন্দর কুকুর দুটো বাঘের মতন।"

নবীন কর্তার পদধূলি লইয়া বলিল, "যা কইলেন করতা বাবু, ওরা দেখিতে যেমতি, গায়ের বলও তেমনি। ওয়াদের তরাসে রায়বাড়ীতে কাকপক্ষী ঢুকিতে পারে না, যে যেখানে পা নাড়িবে ওয়াগরে যাওন চলিবে সাথে সাথে।"

ঠাকুরদা হাসিতে লাগিলেন। সকলকে সমাদর করিয়া সঙ্গে করিয়া ঠাকুমা অন্দরমহলে প্রবেশ করিলেন।

কুটুম্ব বাড়ীর সকলকে আদর করিতে হয়। সে মানুষ, জীব জন্তু যাই হোক্ না কেন।

গাড়ির বলদ দুটিকে খুলিয়া জাব খাইতে দেওয়া হইল। লালজী-কালজীকে আর দেখা গেল না। গন্তব্য স্থান চিনিয়া তাহারা শাবকের টানে প্রস্থান করিয়াছে।

কতকাল পরে ব্রজেশ্বরীর সহিত রাজেশ্বরী মিলিত হইল। পরস্পর পরস্পরের গলা জড়াইয়া অঝোরে কাঁদিতে বসিল।

বিনুর মা বলিল, "কান্না কেন? মাঠের এক পারে এক বোন অন্য পারে আর এক বোন থাক। যখন খুশী মাঝে-মাঝে আসা-যাওয়া করলেই পার তোমরা। তোমাদের গাড়ি-ঘোড়া লাগবে না। পায়ে হেঁটেই মেয়ে লোকরা দিনরাত আসা-যাওয়া করে।"

ব্রজেশ্বরী চোখ মুছিয়া বলে, "তুমি কি জান না বৌঠান, 'গাঙে গাঙে দেখা হয় তবু বুনে বুনে দেখা হয় না।' ললাটে না থাকলে বোনের সঙ্গে বোন দেখা করতে পারে না। কতকাল পরে দেখা, তাই চোখে জল এসে গেল।"

কেন দেখা হয় না, কোথায় বাধা, তাহার বিশদ বিবরণ শুনিবার হেমাঙ্গিনীর সময় ছিল না।

নবীন তাগিদ দিতেছে এখনই তাহাদের রওনা হইতে হইবে। সম্মুখে কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, গলিপথ। ডাগার পথারের অভাব নাই, ইত্যাদি।

কুটুম বাড়ীর লোকদের সম্বন্ধে জলযোগ করাইতে হইবে। শাশুড়ী বধূ তাহাই লইয়া ব্যস্ত।

বিনুর ব্যবস্থা পরে হইবে। সে প্রতিবেশিনী পরিবেষ্টিত হইয়া সকলের আদর সোহাগ কাড়িয়া লইতেছে।

এ বাড়ীর নবান্নও গতকাল হইয়া গিয়াছে। সুতরাং গৃহে খাদ্যাদির অভাব ছিল না। বন্দর হইতে লালমোহন ও ক্ষীরমোহন মিষ্টান্ন আনা হইয়াছিল।

ঠাকুমা দুর্গাসুন্দরী সকলকে সমাদর করিয়া পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া বিদায় দিলেন।

এতক্ষণে বিনু মাথার কাপড় ফেলিয়া হাল্‌কা হইল।

ঠাকুদা খড়ম ঠকাস ঠকাস্‌ করিতে করিতে অন্তঃপুরে দেখা দিলেন। সাধারণতঃ ভোজনের ও শয়ন সময় ভিন্ন তিনি বিশেষ ভিতরে আসেন না। ভিতরের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী গৃহিণী।

নাতনীর খবরে কর্তা আসিয়াছিলেন। স্ত্রীকে কহিলেন, "দুলালী কই? কাপড়ের পুঁটলি হয়ে ত গাড়ি থেকে নামল। ওকে ভাল করে দেখাই হয় নি।"

বিনু আগাইয়া আসে। ঠাকুরদার অসীম স্নেহ উপভোগ করিতে তার ভাল লাগে, কিন্তু ভাল লাগে না তাঁহার দুলালী সম্বোধন। ছোট বেলায় আদর করিয়া যা বলিয়াছেন, বড় হ'লেও কি তাহাই বলিতে হইবে? এই দুলালী শব্দটা সেখানকার ঠাকুমার কানে গেলে তিনি কি ছাড়িয়া কথা কহিবেন? ছুলি-বুলি ফুলি কত কি বিকৃত শব্দের অবতারণা করিবেন।

ঠাকুরদা সস্নেহে নাত্‌নীর ললাটের এক গুচ্ছ অবাধ্য চুল সরাইয়া দিয়া প্রশ্ন করলেন "জল খেয়েছিস্‌ দুলালি? মুখটা শুখনো দেখাচ্ছে।"

বিনু বলে, "এখুনি খাব ঠাকুরদা। পাড়ার সকলে এসেছিলেন তাই দেরি হ'ল। আপনি আজ সন্ধ্যায় বন্দরে যাবেন না?"

"হ্যাঁ, একটু পরেই যেতে হবে বৈ কি। আজ বেশি দেরি করব না, যাব আর আসব।"

ঠাকুমা কাছেই ছিলেন, ঠেস দিলেন, "একবার নাও ভাসালে তোমার কি আর ফেরার কথা মনে থাকে? সেখানে গেলেই ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশে যাও।"

"তুমি ভুলে যাও কেন বড়বৌ, সেইটেই আমার আদি নিবাস। আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব সবাই সেখানে। তা ছাড়া কয়েকটা রোগীও রয়েছে—"

ঠাকুমা বাধা দেন, "যত রোগের আড্ডা হয়েছে তোমার নাকাসিয়ার বন্দরে। রোগী দেখা একটা ওজর।"

কলহের পূর্ব্বাভাষ টের পাইয়া ঠাকুরদা আস্তে আস্তে সরিয়া গেলেন।

কতকাল পরে বিনু মা'র কাছে শয়ন করিল রাত্রে। বাল্যকাল হইতে সে ছিল ঠাকুমার শয্যাসঙ্গিনী।

ঠাকুমা আজ আদেশ করিলেন, "বিনু, তুই আজ মা'র কাছে শো। ও একলা খাটে থাকে—বুকের ভেতরে ওর ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ করে।"

করিবে না—আহা, মা'র যে বুকজোড়া ধন বিনুর ছোট ভাইটি কেদার ফুলের মত মার বুক হইতে ঝরিয়া গিয়াছে চিরতরে।

ঠাকুমা-ঠাকুরদার শয়ন-গৃহ খুব বড় দক্ষিণ-দ্বারী। দুই দিকে চওড়া বারান্দা। মাঝখানে দরজাযুক্ত দেয়াল, দুই ভাগ করা। এক ভাগে থাকেন কর্ত্তা, তাঁহার বয়স হইয়াছে। শরীরও তেমন ভাল নয়। ঠাকুমা স্বামীকে সারারাত নজরে রাখেন।

ছেলেরা বিদেশে, বধূই বা পৃথক্‌ গৃহে কাহাকে লইয়া থাকিবে? সেই কারণে ঠাকুমা থাকেন বিনুর মাকে লইয়া এদিকের অংশে।

দুই পাশে দুইখানা খাট পাতা। মাঝখানে অনেকটা জায়গা পড়িয়া থাকে। ঠাকুমা তাঁহার শুচিতার বজায় রাখিয়া শয়ন করেন।

সরস্বতীর মতন দুর্গাসুন্দরী বা ঈশানচন্দ্রের ঈশানীর একচোখো শুচিতা না থাকিলেও আচার-নিষ্ঠায় তিনি কেনুমা যান না।

বাহিরে রজনীর গভীরতা ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছে। সন্ধ্যা হইতে রাত দশটা পর্য্যন্ত চন্দ্রদেব আলোক বিতরণে বিরত থাকিয়া এখন প্রফুল্ল জ্যোৎস্নায় চারিদিক প্রফুল্ল করিয়া তুলিয়াছে।

বিনু মাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "আমি আসব শুনে বাবা ত এলেন না মা? কাকাও এলেন না।"

মা বিনুর চুলে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে ফিস্ ফিস্ করিয়া জবাব দিলেন, "এখন আসবেন কি রে? এই ত কালীপুজোর পরে গেলেন। তোর কাকারও কলেজ খুলে গেছে। এর পরে আবার যখন তুই আসবি আগে থেকেই ওঁকে জানিয়ে আসতে লিখে দেব।"

বিনুর বাবা কলিকাতায় অধ্যাপনা করেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি আছে। বাবার নিকটে বিনু বিশেষ থাকিতে পারে না। কারণ এদিকের সমস্ত ছাড়িয়া ঠাকুরদা-ঠাকুমা শহরে গিয়া থাকিতে পারেন না। যান আবার দিন কতক পরে ফিরিয়া আসেন। বাবাও স্ত্রী-কন্যাকে নিজের কাছে রাখিতে পারেন না। বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে সেবাযত্ন করিবার জন্য হেমাঙ্গিনী দেবীর নিরন্তর থাকা হয় না স্বামীর নিকটে। বাবা অবশ্য সুযোগ-সুবিধা পাইলে দেশে আসেন। ছোট ছেলে রতীশও চলিয়া গিয়াছে ডাক্তারী পড়িতে।

মায়ের কোলে শয়ন করিয়া আজ যেন বিনুর বেশি করিয়া মনে পড়িতেছে জ্ঞানে প্রদীপ্ত স্নেহে সারল্যে সমুজ্জ্বল পিতার অপূর্ব্ব মুখচ্ছবি বিনুর হৃদয়ের পটভূমিকায় উদয় হইতেছিল। বিনু চুপ করিয়া বাবাকে ভাবিতে লাগিল। মা কহিলেন, "ঘুমোলি বিনু? তুই তাকে চিঠি-পত্র লিখিস্ ত?"

"লিখি মা, বেশি লিখতে পারি না। এখানে আসবার আগে বাবার চিঠি পেয়েছিলাম। তার উত্তর দেওয়া হয় নাই।"

"কাল লিখিস্। প্রসাদের চিঠির ঠিক ঠিক উত্তর দিস? না ভুলে যাস?"

"ভুলে যেতে কি দেয় মা। চিঠিতে হুকুম চালায় বিকেলে চিঠি পেয়ে রাতে উত্তর লিখে রাখতে হবে। ক' পাতা হাতের লেখা হ'ল তার খবর দিতে হবে। কোন্ অবধি বই-পড়া হ'ল তা জানাতে হবে। আমি আর পারি না মা, আমার ভাল লাগে না। এখন আমার মনে হয়, বাবার কাছে গিয়ে আমি পালিয়ে থাকি।"

মা সকৌতুকে হাসিতে লাগিলেন "লেখা-পড়ার ভয়ে তুই যে পালিয়ে যাবি তোর বাপের কাছে, সেখানেও যে প্রসাদ প্রায় দিন আসে। সে তোকে কক্ষণো মূর্খ হয়ে থাকতে দেবে না।"

"না দেয় না দেবে, আমি যাব না বাবার কাছে। যেমন আছি এমনি থাকব। আমি এখন ঘুমোই মা, আমার ঘুম পেয়েছে।" বিনু চোখ বুজিল।

বিনুর সেই গভীর নিদ্রা ভাঙিয়া গেল জগাইদাদার ডাক-হাঁকে। জগাইগাছি খেজুর গাছের জিরেনকাটা রস বিনুকে দিতে হাজির হইয়াছে।

রসের মাটির হাঁড়ি হাতে তারস্বরে ডাকিতেছিল জগাই, "বিনুদি, এখনও ঘোম ভাঙিল না, বাবাস্ ঘোম, বলিহারি যাই। আইস, তোমাগো লেগে খাজুরের জিরেন কাটা রস আনিছি। মুকে-চোকে জল দিইয়া খাইয়া লও চক চক করি।"

বিনু ত্রস্তে বিছানা ছাড়িয়া বাহির হইয়া কহিল, "জগাইদা, রস এনেছ? আমি যে এসেছি তুমি জানলে কি করে?"

"শোন কথা, আমি যে তহন পগারের পারে খাজুর গাছ কামাইতেছিলাম। রায়বাড়ীর গাড়ির সাথে সাজ-পাজ দেখি হদিশ পাইলাম বিনুদি আসিছে। নেও বিনুদি, মুকে জল দিয়া আগে ক্যানে সবেত রস খাইয়া নও। ক্যানা যদি গেইলে খাজুরের রসের সোয়াদ নষ্ট হইয়া যাও। দেও একটা পাত্তর, ঢালি দিয়া যাই।"

ব্রজ দাঁড়াইয়াছিল আঙিনায়। সে তাড়াতাড়ি একটা মাজা পিতলের বড় ঘটি আনিয়া উপস্থিত করিল।

জগাই মাটির ভাঁড়ের রস ঘটিতে ঢালিয়া দিতে দিতে ব্রজেশ্বরীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি এহনি রস খাইবা বেজদিদি, একডা, খোরা দয়, ভাঁড়ে আরও রস রইচে।"

ব্রজ রাগিয়া অস্থির। "কি কইছিস জগাই, আমাগো নাওন-ধোওন হয় নাই, তুলসীতলায় জল দেওন হয় নাই। বিহানে উঠি [illegible] [illegible] [illegible] আমি

বলে চুমুক দিব নাকি? দিদির পরে যদি এত দরদ থাকে তা হইলে রসের ভিয়ান হইলে দিয়া যাইব এক সরা পাটারি গুড়।"

পেমো ও তাহার মা কাজে আসিয়াছিল। তাহারা ছুটিয়া গিয়া ঢেঁকিশালা হইতে লইয়া আসিল পিতলের বাটি-ঘটি।

বাকী রসটা সেই ঘটি-বাটিতে ঢালিয়া দিয়া জগাই-গাছি বিনুকে প্রশ্ন করিল, "হ বিনুদি, তুমি হাজারি না সরার পাটারি গুড় ভালবাস? আছ ত পুষ মাস নাগাত? পুষ মাসের গুড় জমে ভাল।"

বিনু বলে, "না জগাইদা, এই মাসেই আমাকে যেতে হবে। আমি হাজারিও ভালবাসি, সরাও ভালবাসি। তোমার বাড়ীর সকলে ভাল আছে ত, ছেলে-বৌরা?"

"আছেন বিনুদি, আমাগো সময় নাই। এহনও বেবাক খাজুর গাছের রসের হাঁড়ি নামাইতে পারি নাই। বৌ খাজুরতলায় কলসী লয়া খাড়াইয়া রইচে।"

ঠাকুমা অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "বিকেলে একবার বৌকে পাঠিয়ে দিস জগাই, ভোগের প্রসাদ নিতে।"

জগাইগাছির সারাটা মুখ প্রসন্ন হাসিতে ভরিয়া গেল। সে মাথার বাবরী চুল ঝাঁকাইয়া কহিল, "বৌ আইবে মাঠান, সে খাড়াইয়া রইচে খাজুরতলায়।"

বলা শেষ হওয়া মাত্র জগাইগাছি দৌড়াইল। তাহার বেবাক গাছের রসের ভাণ্ড নামান হয় নাই। বৌ খাজুরতলায় অপেক্ষা করিতেছে।

বিনু মুখ ধুইতে চলিয়া গেল। কাল সে ভালরূপে কিছু পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারে নাই। তাহার শ্বশুরালয়ের লোকজনদের ভূরিভোজন করাইয়া বিদায় দিতেই দিনের আলো নিবিয়া গিয়াছিল। তাহার পরে প্রতিবেশিনী-দের মেলা বসিয়াছিল। এক-এক জনার হাজার-প্রশ্ন, "বিনু শ্বশুরবাড়ীতে কখন শোস, কখন ঘুম থেকে ওঠে, খাস কখন? কি দিয়ে খাস? তোদের বাড়ীতে চাকর ক'জনা? ঝি ক'টা? তারা তোকে তেল-হলুদ মাখিয়ে ইঁদারার পাড়ে ঘটি ঘটি জল দিয়ে নাইয়ে দেয় না কি? না নিজেই পুকুরে ডুব দিয়ে আসিস?"

বিনু দুই-একবার 'হাঁ' 'না' উত্তর দিয়া চুপ করিয়াই ... লইয়া প্রত্যেকের কথার জবাব দিয়াছিলেন। সকলে বিনুকে ভালবাসে, ছুটিয়া আসিয়াছে। তাহাদের কথার উত্তর না দিলে কি চলে?

সকলে চলিয়া গেলে রাত্রি হইয়া গেল। তখন সাঁজালের ধোঁয়া লইয়া গরু-বাছুর গোয়ালে উঠিয়াছে। শীতের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত গোশালার সামনে খড়ের আগুন জ্বালাইয়া গাভীদের গায়ে ধোঁয়া লাগান হয়। ধোঁয়ার ধোঁয়ায় তাহাদের গায়ে মশা বসিতে পারে না। বিনুর সহিত গরু-বাছুরের সাক্ষাৎ হয় নাই। পায়রার খোপেও শ্যাম চাকর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। কাকার কত আদরের পায়রা, তিনি পড়িতে যাইবার সময় বিনুকে সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। বিনু দিয়া গিয়াছে পেমোর ভাই এ বাড়ীর গরুর রাখাল বালক শ্যামচরণকে। দধিমুখী বেড়াল ও ভুলু বাঘা কুকুর সে না শোয়া অবধি পায়ে পায়ে ঘুরিয়াছে।

মুখ ধোওয়া হইলে বিনু প্রথমেই আসিয়া উপনীত হইল পায়রার খোপের পাশে। "গিগ্‌গির-কর্ম্মা" শ্যাম ইহারই মধ্যে খোপের দরজা খুলিয়া দিয়াছে। পায়রারা চরিতে গিয়াছে ধানের ক্ষেতে। সকল ক্ষেতের ধানকাটা এখনও শেষ হয় নাই। সোনার বরণ পাকা ধান এখনও অনেক ক্ষেতে ঝম্‌ঝম্ করিতেছে। বিনুদের বাহিরের আঙিনা ও মণ্ডপের আঙিনায় কাটা ধান স্তূপ হইয়া রহিয়াছে, মাড়ান হয় নাই।

বিনু গাভীদের সন্ধানে পা বাড়াইতেই ঠাকুমা ধরিয়া ফেলিলেন। "বিনু মুখ ধুলি, কিন্তু বাসি কাপড়টা ত ছাড়লি না? বিছানার কাপড়ে থাকতে নেই, অলক্ষ্মী লাগে। চট্ ক'রে কাপড় ছেড়ে আয়, রস খা। রসের কেনা মরে গেলে তেমন স্বাদ থাকে না।"

"না থাকুক, খেজুরের কাঁচা রস আমি ভালবাসি না। আমার গন্ধ লাগে।"

"লাগুক গন্ধ, কেউ ভালবেসে কিছু খেতে দিলে ভাল না লাগলেও মুখে দিতে হয়। আমি ভোগের ঘরে রেখেছি রসের ঘটি। ঠাকুরের ভাগ ঢেলে রেখে তোকে দিচ্ছি। তুই কাপড় ছেড়ে ধোয়া কাপড় পরে আয়।"

বিনু পড়িয়াছিল শক্তের পাল্লায়। তখনই তাহাকে কাপড় ছাড়িয়া ছোট পায়রের বাটির এক বাটি র...

খাইতে হইল। মা রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া তাড়া দিলেন, "তোর ক্যানা-ভাত চড়িয়েছি বিনু, কোথায় যাচ্ছিস্ ঘুরে এসে খেতে বোস্।"

বিনু মহা বিরক্ত। "তোমাদের খালি খাওয়া খাওয়া মা, এক্ষুণি এক বাটি রস খেয়ে ওঠলাম। রাতে নবান্নের কাঁড়ি কাঁড়ি খাবার আমাকে খাইয়ে রেখেছ। আমার ক্ষিধে নেই, আমি ক্যানা-ভাত খাব না।"

মায়ের মুখের ওপরে জবাব দিয়া বিনু চলিল পুকুর-পাড়ে। পুকুরের জল অনেকটা নীচে নামিয়া গিয়াছে। দুই পাড়ের গায়ে মাষকলাই ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। এক দিকে মটরশাক লক্ লক্ করিতেছে। নীল নীল ফুল ফুটিয়াছে। মাষকলাই গাছেও সাদা সাদা ফুল ছাইয়া ফেলিয়াছে। মাষকলাই গাভীদের জন্ত, মটর-শাক গৃহস্থের।

প্রভাতে গরু-বাছুরগুলিকে বাঁধিয়া দেওয়া হয় পুকুরের সংলগ্ন মাঠে কাঁচা ঘাস খাইতে।

বিনুর সাড়া পাইয়া লালমণি ধলিমণি আদরিণী সোহাগিনী উচ্চকিত হইয়া অগ্রসর হইয়া আসিল। একটা লাল রংএর নালকে বাছুর লেজ ঊর্দ্ধে তুলিয়া উহাদের মধ্য দিয়া কেবল ছুটিতেছে, আবার ছুটিতেছে।

বিনু সবিস্ময়ে নব-প্রসূত বৎসটির প্রতি চাহিয়া ভাবে, এ আবার আসিল কোথা হইতে? উহাকে ত সে দেখিয়া যায় নাই।

বালিকা ঝি পেমো কোমরে শাড়ী জড়াইয়া মা'র সহিত ঘাটে বাসন মাজিতে বসিয়াছিল। বিনুর আগমনে তাহার আর বাসন মাজা হইল না। সে হাত ধুইয়া বিনুর কাছে আসিয়া কহিল, "বাছুর ভাখিচ ঠাকুজ্জি, ওইডা তোমাগো লালমণি গাই-এর বাছুর।"

বিনু জিজ্ঞাসা করে "কবে, হয়েছে রে? আমি যাবার পরে বুঝি? লালমণির বাছুর ঠিক লালমণির মতন হয়েছে, কি সুন্দর।"

"হ, ঠাকুজ্জি, যেমত্তি গোরুর মা, তেমতি বাছুর। আজ ওডার বয়ক্রম একুশ দিন হইল। কাল হইবে গোরুক থার। দুধ শুদ্ধ হইলে ঠাকুর ভোগে লাগিবে।"

বিনু পেমোর কথায় জবাব না দিয়া প্রত্যেকটি গাভীর গলা জড়াইয়া পিঠে মাথা রাখিয়া আদর করিতে লাগিল। বিনু বিলক্ষণরূপে জানিত নূতন দুধ একুশ দিন বাদ দিয়া ভোগে দিতে হয়। গোক্ষুর দেবতাও তাহার অজানা নয়।

গাভীরা বিনুকে পাইয়া বিনুর আদরে অভিভূত হইয়া কেহ তাহার হাত চাটে, কেহ মুখ চাটে, লেজের চামর বুলাইয়া দেয় সর্ব্বাঙ্গে।

গাভীদের আদর শেষ হইলে বিনু ধরিতে গেল বাছুরটিকে কিন্তু বাছুর ধরা দেয় না। তড়াক তড়াক করিয়া কেবলই দৌড়ায় এদিক হইতে সেদিকে। লালমণি তাহাকে চোখের অন্তরাল করিতে পারে না। কোঁস্ কোঁস্ শব্দ করিয়া কাছে ডাকে। বিনুর সাধ হইতেছিল বাছুরের কোমলমসৃণ অঙ্গে হাত বুলাইয়া সোহাগ করে। কিন্তু বাছুর ধরা দেয় না।

পেমো এখানকার যাহা কিছু তথ্য বিনুকে জানাইতে উৎসুক। নূতন খবরের আছেই বা কি, পল্লীবাসীদের গতানুগতিক জীবনযাত্রা, তাহার মধ্যে বৈচিত্র্য নূতনত্বের কি বা থাকিবে। থাকার ভিতর জীবন মৃত্যু বিবাহ তিনটি প্রধান ঘটনা। জেলেপাড়ায়, সাহা-পাড়ায় এবং কুম্ভকার-পাড়ায় বিবাহের সংবাদ বিনু গত রাতেই পাইয়াছে। এখন নূতন খবর দিতে লাগিল পেমো, কলাবাগানে একটা নন্দন পাখী কোথা হইতে আসিয়া-ছিল। পাকা কলার গন্ধে কয়েকদিন আগে। লেজ তাহার এক হাত, মাথার ঝুঁটি চূড়ার মতন। লাল টুকটুকে ঠোঁট, দুধের বরণ। বিনুকে পেমোর পিছনে তখনই ছুটিতে হইল কলা বাগানে নন্দন পাখীর সন্ধানে। কোথায় নন্দন পাখী। নবান্নের পূর্ব্বে কাঁদি কাঁদি পাকা কলা কাটিয়া লওয়া হইয়াছে। কলার কাণ্ড গিয়াছে মানুষের পেটে। পড়িয়া আছে খোলা ও ডাঁটা।

বিনু ক্যানাভাত খাইতে বসিয়াছে। লাল বরণের চালের ভাত, ঘরের সরবাঁটা ঘি, বড়ি, বেগুন, রাঙা আলু ও কাঁঠালের বীচি ভাতে। বিনুর আর একটি প্রিয় খাদ্য মা সংগ্রহ করিয়াছেন। কুচো চিংড়ি মাছ লাউয়ের পাতায় জড়াইয়া ভাতে সিদ্ধ।

বিনু খাইতেছে রন্ধনশালার বারান্দায়, তাহার

অদূরে নারিকেল-তলায় ক্যানাভাত খাইতেছে পেঁয়ো। সে নমঃশূদ্রের মেয়ে, রান্না ভোগ মণ্ডপের বারান্দাতেও তাহাদের বসিবার অধিকার নাই। বিনুর সামনে কাঁসার থালা-গেলাস। পেঁয়োর পিতলের থালা-ঘটি।

মেয়ে শ্বশুরালয়ে চলিয়া যাইবার পরে এখানে আর ক্যানাভাতের চলন ছিল না। কে খাইবে ক্যানাভাত, বাড়ীতে বালক-বালিকার অভাব। প্রভাতে ঝি-চাকররা কড়কড়ে ভাত ও সরাপরা বেন্নে প্রাতঃকালীন প্রাতঃরাশ সমাধা করিত। শীতকাল সেও কিছু মন্দ খাদ্য নয়। সরিষা তেল কাঁচা লঙ্কা কাঁচা মুলা সংযোগে ইহারা কড়কড়ে ভাতকে মুখরোচক করিয়া লয়।

আজ 'বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছিঁড়িয়াছে, তাই পেঁয়োও বসিয়াছে ক্যানাভাত লইয়া।

বিনু কাঁঠালের বীচি চিবাইতে চিবাইতে বলে, "মা তোমাদের কাঁঠালের বীচি এখনও ফুরিয়ে যায় নি? ওখানে কত খাবার ঘটা। ওরা কিন্তু লাউডগা দিয়ে কুচো চিংড়ি ভাতে খায় না। ইলিশ মাছ ভাতে খায়। এত সকালে মাছ তুমি কোথায় পেলে মা?"

মা ভাত মেখে দিতে দিতে উত্তর দেন, "নদীতে কাশের বনের গোড়ায় শ্যাম তোর জন্যে 'ঘোয়ার' পেতে রেখেছিল কাল বিকেলে, ভোরে তুলে এনেছে। তুই ভালবাসিস ব'লে কুঁচো চিংড়ি ছাড়িয়ে তেল-নুন-হলুদ দিয়ে একটু সরষে-লঙ্কা বেঁটে ভাতে দিয়েছিলাম। আমাদের বীচিও ফুরিয়ে গেছে। তোর জন্যে বালির হাঁড়িতে ক'টা সরিয়ে রেখেছিলাম। হ্যাঁরে বিনু, ওখানে তোরা ক্যানাভাত খাস্ নে?"

"খাই কখনো-সখনো, যেদিন তরু সখ করে রান্না করে। ক্ষিতি স্কুলে যায় তার জন্যে তাড়াতাড়ি রান্না চড়ায় ঠাকুর, আমরা তখন ভাত খেয়ে নিই।"

"তরু তোর চেয়ে বয়সে ছোট, সে কেন রাঁধবে? তরুর যেদিন ক্যানাভাত খাবার ইচ্ছে হয় তুই রান্না করে দিস। কুচো চিংড়ি লাউপাতায় জড়িয়ে ভাত নামাবার আগে ভাতে গুঁজে দিস। ওরা খেয়ে কত ভালবাসবে। ক্যানাভাত রান্না করতে করতে কত রান্না শিখে যাবি। মেয়েদের সবচেয়ে বড় গুণ রান্না শেখা। সকলকে খাওয়ানো, যত্ন করা।"

'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী'। তাড়া মাথার ছলে মায়ের হিতোপদেশ বিনুর ভাল লাগিল না। সে সে-প্রসঙ্গ এড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কখন নদীতে নাইতে যাবে মা? আমি আজ তোমার সাথে নাইব। এখনও আমি হীরে সাগরকে দেখি নি। জল পাড়ের তলায় নেমে গেছে না?"

বিনুর খাওয়া হইয়াছিল, মা তাহার মুখে জলের গেলাস ধরিয়া জবাব দিলেন, "হ্যাঁ, জল নেমে গেছে অনেকটা, আজ তুই ঠাকুমার সঙ্গে নদীতে নাইতে যাস। আমার এদিকে তাড়া আছে। আমি পুকুরে স্নান সেরে নেব। কাল তোকে নিয়ে যাব নদীতে।"

"আজ তোমার কিসের তাড়া মা?"

"স্নান করে মণ্ডপে পুজোর সাজ, নৈবিদ্য করে নিজের পুজো সেরে আসতে হবে ভোগের যোগাড়ে। জগাই অত খেজুরের রস দিয়ে গেছে, জ্বাল দিয়ে ঘন করে না রাখলে মা বুড়ো মানুষ তাঁর ঘাড়েই পড়বে। এমনি নিত্যি তিরিশ দিন তাঁকে ভোগ রান্না করতে হয়। আমাকে থাকতে হয় মাছ নিয়ে।"

"রস জ্বাল দিয়ে আজ তোমাদের কি হবে মা, পায়েস না পিঠে? আমার পিঠে-পায়েস খেতে খেতে অরুচি হয়ে গেছে। ওদের বাড়ীর সবাই খাবার কুমীর—খালি খাওয়া, খালি খাবার জিনিস তৈরি।"

মা হাসলেন, "সেই জন্যে আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকি। খাবার কুমীরদের পাশে আমার চুনোপুঁটি ভাগ পায়। তবু অভ্যাস যায় না—তোমাদের বাড়ীতে কার্ত্তিক মাস বৈশাখ মাস ভোর পায়েস দিয়ে শ্রীধরকে ভোগ দিতে হয়। নিত্য একজনা করে ব্রাহ্মণ ভোজন করেন। পায়েসের কড়া চেঁচে চাঁচি-হাতে আমি তোকে দিতে যাই। তুই যে চাঁচি ভালবাসিস। শেষকালে সেটা ভাগ করে দিই শ্যাম ও পেঁয়োর হাতে।" মা'র চোখ অশ্রুসজল হয়। মেয়ে কিন্তু মহাখুসী, "তাই দিও মা, ওরা বড় দুঃখী, তোমরা না দিলে ওরা পাবে কোথায়?" ব'লে বিনু যায় পুকুরে মুখ ধুইতে।

লালমণির বাছুর হইয়াছে মঙ্গলবারে, ঠাকুমা তাহার নাম রাখিয়াছেন মঙ্গলা। মঙ্গলা পেট পুরিয়া মায়ের দুধ পান করিয়াছে। এখন রৌদ্রে শুইয়া নিদ্রাক

অচৈতন্য। কি নবরকান্তি তাহার দেহ, কাঁচা লাবণ্য যেন উছলিয়া পড়িতেছে। বিনু তাহাকে স্পর্শ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। কিন্তু মঙ্গলার নিকটে বিনু যাইতে পারিল না, লালমণি শিং বাগাইয়া কোঁস্ কোঁস্ শব্দে ছুটিয়া আসিল।

বিনু সাত হাত দূরে পিছাইয়া অকৃতজ্ঞ গাভীর পানে অনিমেষে তাকাইয়া রহিল।

মা পুকুরে স্নানে আসিয়া কহিলেন, "বিনু, তোর ঠাকুরকাকা সাজি ভরে রোজ ফুল রাখে, কিন্তু পুরুষ মানুষ ভাল দূর্বো তুলতে পারে না। নিত্যি আমাকে দূর্বো তুলে নিতে হয়, আজ আমার সময় নেই। তুই যা ত মা, চারটি দূর্বো তুলে নিয়ে আয়। গোয়ালের পেছনে থকুথকে দূর্বো হয়েছে।"

বিনু মাতৃ আদেশ পালন করিতে চলিল।

এ বাড়ী ঢুকিতেই দুই পাশে দুইটি ফুলের বাগান। একটা বাহিরে, অন্যটা গোশালার পিছনে অন্দরের সহিত সংযুক্ত। সামনেই ঈশানচন্দ্রের বিরাট্ ঔষধের ভাণ্ডার বা "আরোগ্য নিকেতন"। চওড়া বারান্দায় এক সারি কাঠের চেয়ার, অন্য পাশে লম্বা বেঞ্চি সংরক্ষিত। বিনু দূর্বা তুলিতে আড়চোখে তাকাইয়া দেখিল এক সুসজ্জিত প্রৌঢ় ভদ্রলোক চেয়ারে বসিয়া ঠাকুরদার সহিত কথা কহিতেছে। ঠাকুরদার স্বর উত্তেজিত, "ম্যানেজার বাবু, আমি আমার ধনী বিধবা রোগিণীকে অসম্মান করলাম কোথায়? যে রোগের যে বিধান তাই ত আমাকে দিতে হবে। তিন দিন ওষুধ খেয়ে ব্রাহ্মণ-কন্যা ঝিম সামলে নিয়েছেন। এক মাসে আমি তাঁকে স্বাভাবিক করে দিতে পারব। আমার ওষুধের সঙ্গে পথ্য দিতে হবে, তাজা কই-মাগুর মাছের ঝোল, দাদখানি চালের ভাত। দুই বেলাই ওই পথ্য। আপনার আপত্তি, ব্রাহ্মণের বিধবাকে মাছের ব্যবস্থা দিচ্ছি কেন? কিন্তু আপনার মনিব বিধবা নন, তাঁর হাত্ত বিধবা। বিধবার গর্ভপাত-জনিত সূতিকা রোগ হয় না, হয় হাত্ত বিধবার।"

বিনু ঠাকুরদার মন্তব্য ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। সে আজ একটা নূতন কথা শুনিল 'হাত্ত বিধবা'। ওকথার মানে কি বিনুর জানিতে হইবে।

দূর্বা লইয়া মণ্ডপে উপনীত হইয়া বিনু নিরীক্ষণ করিল পাথরের বাণেশ্বর শিব টাটে বসাইয়া মা ধ্যানস্থ। বিনু সেইখানে হাতের দূর্বা নামাইয়া ঠাকুমার উদ্দেশে ছুটিল। বিনুর ঠাকুমা গ্রাম্য সাধারণ স্ত্রীলোক নন। বাংলা ভাষায় তাঁহার রীতিমত দখল আছে। সংস্কৃত অল্পস্বল্প জানিলেও শাস্ত্রজ্ঞান টনটনে। রামায়ণ মহাভারত ভাগবত গীতা চণ্ডী তাঁহার কণ্ঠস্থ। প্রজারা তাঁহার নাম দিয়াছে 'বিদ্যাবতী ঠাকুমা'।

বিদ্যাবতী ভোগশালার বারান্দায় ঝাঁকাখানেক তরকারি লইয়া কুটিতে বসিয়াছেন। পূজার সময়কার 'রাবণের গোষ্ঠী' পূজান্তে লঙ্কায় ফিরিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যাহারা অবস্থান করিতেছে তাহারাও সংখ্যায় কম নহে। কর্তার সাত-আটটি আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন-রত দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তান, এখানেই প্রতিপালিত হইয়া থাকে। তাহার উপরে দাসদাসী। দাসী-পুত্র, দাসী-কন্যা। শ্রীধরের পূজারী, অতিথ অভ্যাগত।

বিনু ঠাকুমার কাছে বসিয়া প্রশ্ন করিল, "ঠাকুমা, হাত্ত বিধবা কাকে বলে?"

ঠাকুমা বঁটি হইতে চোখ তুলিলেন, "তুই একথা কোথায় শুনলি?"

—"ঠাকুর্দা এক ভদ্রলোককে বলছিলেন।"

"ও, বুঝেছি, কদিন আগে এক জমিদারণী রোগী দেখে এসেছেন, তার কথাই বলছিলেন হাত্ত বিধবা। যে বিধবার আচার-নিষ্ঠা পালন করে না অথচ লোক-দেখানো হাতে গয়না পরে না, তারই নাম হাত্ত বিধবা। এখন প্রসাদ হয়েছে তোর শিক্ষাগুরু, তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে তোকে বুঝিয়ে দেবে। হ্যাঁ, তোর কাছ থেকে যে শোনা হয় নি, তোর লেখাপড়া শেখা কতদূর হ'ল?"

"অনেকদূর হয়েছে ঠাকুমা, আমি ইংরাজিতে নাম লেখা শিখেছি, নাম পড়তে পারি। বাংলা পড়া তেমন এগোয় নি। কেউ দেখিয়ে না দিলে কি কারোর লেখা পড়া হয়?"

"এতকাল পরে যে সে বোধ হয়েছে তোর এই আনন্দের। কিন্তু তুই যে ইংরাজ বনে গেলি বিনু! নিজের দেশের ভাষায় জ্ঞান হ'ল না, সংস্কৃত জাতি ভাষায় অক্ষর চিনলি নে। ইংরাজিতে নাম লেখা শিখে 'অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী' হ'ল।"

বিহু প্রসাদের ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিল, "ইংরাজি না জানলে ভদ্র সমাজে মেশা যায় না, সভ্য হওয়া যায় না।"

ঠাকুমা মুচকি হাসি হাসিলেন, "বেশ ত, মন দিয়ে সব ভাষাই শেখ বিহু, বিদ্যার কি শেষ আছে, 'যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।' পরের ভাষা শেখার আগে নিজেদের দেশের ভাষা শিখতে হয়। ইংরাজরা বাংলা ভাষা জানে না বলে ত লজ্জা বোধ করে না? তোর বাবা সংস্কৃত ভাষায় অত বড় পণ্ডিত, তুই সংস্কৃত অক্ষরই চিনলি নে, তাতে তোর লজ্জা হয় না?"

বিহু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলে, "আজকেই আমি বাবাকে চিঠি লিখে দেব সংস্কৃত প্রথম ভাগ পাঠাতে। আচ্ছা, ঠাকুমা, তুমি যে বাবাকে পণ্ডিত বল, আমার ঠাকুরদা কি কম পণ্ডিত? আমার সকল ঠাকুরদাই পণ্ডিত, আমাদের পণ্ডিতের বাড়ী।"

"হ্যাঁ, পণ্ডিতের বাড়ী ব'লেই মেয়ে হয়েছে 'বিশ্বকর্মার পুত্র চামচিকে।' তোর ঠাকুরদার পাণ্ডিত্য ছাপিয়ে চিকিৎসায় নাড়ী-জ্ঞানের খ্যাতিই বেশি। কিন্তু হ'লে হবে কি, স্পষ্ট কথার জন্যেই ভয়ে কেউ এগোতে চায় না। সাক্ষাৎ দুর্ব্বাসা মুনি।"

বিহু সহসা আবদার করে, "বল না ঠাকুমা, ঠাকুরদা সাহাবাবুদের বাড়ীতে রোগী দেখতে গিয়ে কি করেছিলেন?"

"সাহাবাবুরা এ অঞ্চলের বিরাট ধনী। 'টাকার গরমে ধরাকে সরা দেখে।' তোর ঠাকুরদাকে তারা নিয়ে গিয়েছিল তাদের মা'র চিকিৎসা করাতে। কবিরাজের নাড়ীজ্ঞান কতখানি তাই পরীক্ষা করতে বলে, 'আমাদের মা খুব পর্দানসিন, তিনি আপনাকে হাত দেখাবেন না। তাঁর হাতে আমরা সুতো বেঁধে দিচ্ছি, আপনি পর্দার আড়াল থেকে সুতো ধ'রে নাড়ী পরীক্ষা করুন।'

তোর ঠাকুদা মনে মনে চটে গেলেও দমলেন না। বললেন, 'আচ্ছা, তাই হবে, তবে একটা মোটা সুতো রোগীর বাঁ-হাতের ধমনীতে শক্ত করে বেঁধে দেবেন।'

পর্দার আড়ালে মেঝেয় বসলেন উনি, সুতো এনে দিল ওরা। হাতে সুতো নিয়ে চোখ বুজে বসে রইলেন ধ্যানস্থ হয়ে। কতক্ষণ পরে বিনামেঘে বজ্রপাত হ'ল। কর্ত্তা চিৎকার করে উঠলেন, 'কি, এত বড় আস্পর্দ্ধা, আমার সঙ্গে প্রতারণা—কুকুরের পায়ে সুতো বেঁধে আমাকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। আমি চললাম প্রতারকের বাড়ী থেকে।'

সকলে এসে হাতজোড় করে পায়ে লুটিয়ে পড়ল, "কবরাজ মশাই, মাপ করুন। আপনার মতন এমন নাড়ীজ্ঞান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নেই, এখন চলুন মাকে দেখবেন।'

কর্ত্তা ফেটে পড়লেন, 'না, প্রতারকদের মা'র চিকিৎসার ভার আমি নিতে পারব না। অসৎদের সংসর্গে মুহূর্ত্তকালও থাকতে পারব না। আমি চললাম।'

কর্ত্তার সঙ্গেই ঘাটে পানসী-নৌকা বাঁধা ছিল। নৌকায় উঠে মাঝি-মাল্লাদের হুকুম দিলেন নৌকা ছেড়ে দিতে। সাহাবাবুরা কত মিনতি করতে লাগল, প্রলোভন দেখাতে লাগল, পাঁচ হাজারের থেকে দশ হাজার, দশ হাজারের থেকে বিশ হাজার। উনি অটল-অচল হয়ে বললেন, "আমি গরীব ব্রাহ্মণ, চিরকাল গরীব হয়েই থাকব। প্রতারকের টাকা স্পর্শ করে ধনী হ'তে চাই না।" দুর্ব্বাসা নৌকা ভাসালেন।

ঠাকুমার আষাঢ়ে গল্প শুনিয়া বিহু সকৌতুকে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিল।

ক্রমশঃ

বৈষ্ণবপদাবলীতে অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব

শ্রীযোগীলাল হালদার

'রামচরিত' অবলম্বন করে রামায়ণ রচনা করতে উপদেশ দিয়ে ব্রহ্মা মহর্ষি বাল্মীকিকে বলেছিলেন,—

যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবদ্ রামায়ণ কথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি॥
যাবদ্ রামস্য চ কথা ত্বৎকৃতা প্রচরিষ্যতি।
তাবদূর্দ্ধমধশ্চ ত্বং মল্লোকেষু নিবৎস্যসি।

বালকাণ্ড, ২য় সর্গ, ৩৬-৩৭ শ্লোক।

যতকাল ভূতলে গিরি-নদীসকল অবস্থান করিবে ততকাল রামায়ণ-কথা লোকসমাজে প্রচারিত থাকিবে। যতকাল তোমার রচিত রামের আখ্যান প্রচারিত থাকিবে ততকাল তুমিও আমার জগতের ঊর্দ্ধে ও অধোলোকে বাস করিবে অর্থাৎ তোমার কীর্তি জগতের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

ব্রহ্মার এই উক্তিটি যে কতবড় সত্য, সেকথা আজ আর কাকেও বুঝিয়ে দিতে হবে না। বাল্মীকির কাব্যকথা ভারতের সীমা ছাড়িয়ে পৃথিবীর তাবৎ শিক্ষিত-সমাজে প্রচারিত হয়ে সকলের শ্রদ্ধালাভে সমর্থ হয়েছে। আর রামায়ণ হয়েছে বহু কবির কাব্য ও কবিতার, বহু নাট্যকারের নাটকের উৎস। রামায়ণের প্রভাব বহুভাবে আমাদের সমাজ ও সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে।

বীরভূমের কেন্দুবিল্বের কবি জয়দেব ও তাঁর শ্রীগীতগোবিন্দ অনুরূপভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে বৈষ্ণবসমাজ ও সামগ্রিক ভাবে বৈষ্ণবসাহিত্যের ওপর। বৈষ্ণবসাহিত্য আলোচনা করতে গেলেই এসে যায় শ্রীজয়দেব ও তাঁর শ্রীগীতগোবিন্দের কথা। গৌরচন্দ্রিকা গান ক'রে কীর্তনীয়াগণ যেমন করে কীর্তন আরম্ভ করেন, ঠিক তেমনই শ্রীজয়দেবের প্রশস্তি গান ক'রে, তাঁর শ্রীগীতগোবিন্দ স্মরণ-বন্দন করে তবে পদাবলীর বিষয় আলোচনা সমীচীন। প্রকৃতপক্ষে জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দই বৈষ্ণবপদাবলীর উৎস। বিষয়বস্তু ত বটেই—তা ছাড়াও তার মধ্যে লিরিক বা গীতি-কবিতার যে সুমধুর ধ্বনিটি আছে—তারও মূলে আছে শ্রী শ্রীগীতগোবিন্দের প্রভাব।

জয়দেবের আবির্ভাবের পূর্বে বৈষ্ণবী সাধনার ক্ষেত্রে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাব এসেছিল; কিন্তু মধুর ভাবের পূর্ণ পরিণতি আসে নি। জয়দেবের সাধনায় এসেছিল মধুর ভাবের পূর্ণ পরিণতি। আর এই মধুর ভাবের পরিপূর্ণ রূপ দিয়েছেন জয়দেব তাঁর শ্রীগীতগোবিন্দে। জয়দেবের সাধনা দিয়েছে বৈষ্ণব-সাধককে পথের নিশানা, আর তাঁর শ্রীগীতগোবিন্দ সঞ্চারিত করেছে বৈষ্ণব-মহাজনদের অন্তরে অমৃত-রসধারা। তার ফলে বৈষ্ণব গীতি-কবিতার ক্ষেত্র হয়েছে উর্বর। কিন্তু স্বল্পকালের জন্য নয়, নিত্যকালের উপযোগী। জয়দেবের সাধনার মূল তত্ত্ব হ'ল রাগানুগা বা পরকীয়া (Spontaneous or Dynamic) তত্ত্ব। ইহাই অতীন্দ্রিয়ানুভূতির চরমকথা।

বৈষ্ণবদর্শনের মূল তত্ত্ব হ'ল—পরমাত্মা নিত্য; জীবাত্মা নিত্য—আর এই উভয়ের যে সম্বন্ধ অর্থাৎ প্রেম, তাও নিত্য। প্রেম পরমাত্মার মত অসীম। তাই পরমাত্মা অর্থাৎ ভগবান্ প্রেমময়। এই প্রেমসাধনার দ্বারাই জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়। বৈষ্ণবের ধর্ম তাই প্রেমধর্ম। এই প্রেমধর্ম জয়দেবের সাধনায় পূর্ণপরিণতি লাভ করেছে। আর সেই পরিণতিই হ'ল—রাগানুগা বা পরকীয়া সাধনা। এই পরকীয়া সাধনার আলোচনায় আমরা অন্যত্র বলেছি—"রাধাকৃষ্ণ লৌকিক নারী পুরুষ নন। ভক্তমাত্রেই রাধা এবং শ্রীভগবানই একমাত্র পুরুষ। জীবাত্মা রাধা এবং পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ। এই পরমাত্মা থেকে জীবাত্মার সৃষ্টি, তাই পরমাত্মার জন্য জীবাত্মার এত আকুতি। সূর্য থেকে যেমন সূর্যপ্রকর বেরিয়ে আসে; আবার সেই

…কর সূর্যই সংহত করে নেয়—ঠিক তেমনই পরমাত্মা …জীবাত্মার অবস্থা।"

(অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব, সুবর্ণবণিক সমাচার, চৈত্র সংখ্যা, …৬৯ সাল।)

জয়দেবের শ্রীকৃষ্ণ চক্রধারী ষড়ৈশ্বর্যশালী নারায়ণ …ন, তিনি বংশীধারী মাধুর্যময় সচ্চিদানন্দ পুরুষ কিশোর কৃষ্ণ। তাঁর হ্লাদিনী শক্তিই রাধা। আবার হ্লাদিনী শক্তিরূপিণী রাধাই হ'ল জীবাত্মা, আর বংশীধারী মাধুর্যময় সচ্চিদানন্দ পুরুষ কিশোর কৃষ্ণই পরমাত্মা। এই জীবাত্মা-পরমাত্মার লীলা অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের লীলার প্রেমসাধনাই জয়দেবের পরকীয়া সাধনা; জয়দেবের অতীন্দ্রিয়ানুভূতি। জয়দেবের এই প্রেমসাধনা বা অতীন্দ্রিয়ানুভূতির মূল অন্বেষণ করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, তার মূলে আছে—মাটির মানুষের প্রেম। জয়দেব মাটির মানুষের প্রেমকে অবলম্বন করে তাকে স্বর্গীয় সুষমা দান করেছেন। মানুষের প্রেম অপূর্ব সুষমামণ্ডিত হয়ে মর্ত থেকে স্বর্গে উপনীত হয়েছে, মানুষের প্রেম অপূর্ব স্বর্গীয় প্রেমে নিষ্কাম প্রেমে পরিণত হয়ে সাধকের অতীন্দ্রিয়লোকে …দি বৃন্দাবনে অতীন্দ্রিয় আনন্দরূপে বিরাজিত হয়েছে। জয়দেবের এই অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের পূর্বরূপ দেখা গিয়েছে রাগানুগা বা পরকীয়া সাধনার মধ্যে। এই পরকীয়া সাধনাই বৈষ্ণবী সাধনার পরম এবং চরম বিকাশ।

বৈষ্ণবের কৃষ্ণ বৃন্দাবনের বংশীধারী কিশোর কৃষ্ণ। জয়দেবের পূর্ববর্তী বৈষ্ণবসাধকেরা দেবকী-বাসুদেবের পুত্র কৃষ্ণের রূপ পাল্টিয়ে তাঁকে চক্রধারী কৃষ্ণের পরিবর্তে বংশীধারী কৃষ্ণে পরিবর্তিত করেছেন, দ্বারকা থেকে তাঁকে এনেছেন গোকুল বা বৃন্দাবনে। কৃষ্ণ এখানে নন্দ-যশোমতীর সন্তান; আর গোপ-বালক-…দের সখা; মানবসন্তান, আবার মানুষের কান্ত। একটু অনুধাবন করলেই এখানে দেখতে পাওয়া যাবে—বৈষ্ণবের প্রেমসাধনার মূলে মানবের প্রেম। মানুষের পরিচয় হ'ল মানুষীভাবে। মানুষীভাবের সার্থক পরিণতি হ'ল—মনুষ্যত্বে। মনুষ্যত্ব ও দেবত্বে কোন প্রভেদ নেই। প্রকৃতপক্ষে পূর্ণ মনুষ্যত্বেই দেবত্বের বিকাশ। তাই মানুষের প্রেমই ভগবৎ-প্রেমে পরিণত হয়। বৈষ্ণবসাধকেরা মানুষের প্রেমকেই ভগবৎ-প্রেমে রূপ দিয়েছেন। এই সাধনাই তাই প্রেমসাধনা বা অতীন্দ্রিয় সাধনারূপে বৈষ্ণব-সাধনতত্ত্বের পরিণতি দিয়েছে।

মানুষের প্রেম কি ভাবে বৈষ্ণবের প্রেমসাধনায় রূপান্তরিত হ'ল—এখানে তার আলোচনা প্রয়োজন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে দেখি, প্রভু ভৃত্যকে ভালবাসেন; আবার ভৃত্যও প্রভুকে ভালবাসে, বন্ধু বন্ধুকে ভালবাসে, পিতা পুত্রকে ভালবাসেন, আবার পুত্র পিতাকে ভালবাসে, মাতা সন্তানকে ভালবাসেন, আবার সন্তান মাতাকে ভালবাসে, স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসে, আবার স্ত্রীও স্বামীকে ভালবাসে। এই ভালবাসাও আবার ভিন্ন নামে অভিহিত হয়েছে। তাই পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, প্রভুভক্ত, পুত্রস্নেহ, বন্ধুপ্রীতি, দেশপ্রেম, পত্নীপ্রেম প্রভৃতি সম্বন্ধসূচক শব্দ (Term) আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। বৈষ্ণবসাধকেরা মানুষের এই প্রেম-প্রীতির সূত্র ধ'রে তার ভগবন্মুখী ভাবকে গ্রহণ করে মর্ত থেকে স্বর্গে উত্তরণ করেছেন। এই ভাবের সাধনাকেই বলা হয় সহজ সাধনা। এই সাধনার পূর্ণ পরিণত রূপ অতীন্দ্রিয় সাধনা। সুতরাং প্রেমসাধনা বা সহজ সাধনার পরিণত রূপই অতীন্দ্রিয় সাধনা। বৈষ্ণবের এই সাধনাকেই উদ্দেশ্য করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

"সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহ তাপিত। হেরি কাহার নয়ন
রাধিকার অশ্রু আঁখি পড়েছিল মনে।

দেবতারে যাহা দিতে পারি দিই তাই
প্রিয়জনে, প্রিয়জনে যাহা দিতে চাই
তাই দিই—দেবতারে; আর পাব কোথা।
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।
বৈষ্ণব কবির গাঁথা প্রেমউপহার
চলিয়াছে নিশিদিন কত ভারে ভার
বৈকুণ্ঠের পথে। মধ্যপথে নরনারী

অঞ্জলে যে সুধারাশি করি কাড়াকাড়ি
লইতেছে আপনার প্রিয় গৃহতরে
যথাসাধ্য যে যাহার—

(বৈষ্ণব কবিতা, সোনার তরী)

বিশেষকে আশ্রয় করে নির্বিশেষে যাওয়া অর্থাৎ নৈর্ব্যক্তিক ভাবের আশ্রয় গ্রহণ করাই ত অতীন্দ্রিয় ভাবের সাধনা। সহজ সাধনাই হোক্, আর রাগানুগা বা পরকীয়া সাধনাই হোক্—একে যে নাম দেওয়া যাক্ না কেন, এর সর্বশেষ নাম অতীন্দ্রিয় সাধনা। অতীন্দ্রিয়-বাদ বা অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব বৈষ্ণবদর্শনের তথা আত্মদর্শনের সারতত্ত্ব। রাধাকৃষ্ণের অপার্থিব লীলা গীত হয় ব'লে যে-কীর্তন আমাদের ভাল লাগে তা নয়, এই অখিল বিশ্বের মূলে যে নিত্য আনন্দ, সেই নিত্য আনন্দের এক খণ্ডাংশের উপলব্ধি হয় পার্থিব প্রেমে; মানব-প্রেমের মধ্যে আছে সেই নিত্য বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত লীলা। পার্থিব প্রেমকে অবলম্বন করে কীর্তন গানের মাধ্যমে আমরা হৃদয়ে অপার্থিব আনন্দ লাভ করি, সবিশেষকে আশ্রয় করে নির্বিশেষকে লাভ করি। কীর্তন তাই আমাদের এত প্রিয়। সেজন্যই ত কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন—

"কৃষ্ণের যতেক লীলা সর্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাঁহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর
নরলীলার হয় অনুরূপ॥
কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন।
যে রূপের এক কণ, ডুবায় সর্বভুবন,
সর্বপ্রাণী করে আকর্ষণ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ২১ পরিচ্ছেদ, ১৭ শ্লোক)।

রবীন্দ্রনাথই এর চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাঁর 'পঞ্চভূত' গ্রন্থের মনুষ্য প্রবন্ধে। তিনি লিখেছেন, 'যাহাকে আমরা ভালবাসি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। এমনকি, জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অন্য নাম ভালবাসা। প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্য সম্ভোগ। সমস্ত বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে এই গভীর তত্ত্বটি নিহিত রহিয়াছে। বৈষ্ণবধর্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেম-সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে, মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না, সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ মানবাঙ্কুরটিকে সমস্ত বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না, তখন আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে, প্রভুর জন্য দাস আপনার প্রাণ দেয়, বন্ধুর জন্য বন্ধু আপনার স্বার্থ বিসর্জন করে, প্রিয়তম ও প্রিয়তমা পরস্পরের নিকট আপনার সমস্ত আত্মাকে সমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ওঠে, তখন এই সমস্ত প্রেম-সম্পর্কের মধ্যে একটা সীমাতীত লোকাতীত ঐশ্বর্য অনুভব করিয়াছে।"

এই অতীন্দ্রিয় সাধনার বিশেষ পরিচয় আছে বাঙালীর গীতি-সাহিত্যের মধ্যে। বাঙালীর কবি-মানসের আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, গীতি-সাহিত্যের দিকেই তার প্রবণতা অধিক। চর্যাপদ থেকেই বাঙালীর এই স্বাভাবিক গীতি-প্রবণতার পরিচয় মেলে। বাঙালী-বৈষ্ণবের সাধনা আর বাংলার প্রকৃতিই দিয়েছে বাঙালীর এই বিশিষ্ট গীতি-প্রবণতার প্রেরণা। বাংলার গীতি-সাহিত্য তাই বাংলা-সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ্। অবশ্য সার্থক গীতি-কবিতার জন্ম হয়েছে জয়দেবের সাধনায়, আর তার রূপায়ণ দেখতে পাওয়া যায় তাঁর লেখনীতে। বস্তুতঃ জয়দেবই বাংলা দেশের প্রথম সার্থক গীতি-কবিতাকার। জয়দেব থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বহু কবি গীতি-কবিতার পথ ধরে আমাদের মনের মণিকোঠার শ্রদ্ধার আসন পেতেছেন। বাঙালী যে যে ভাবে বিশিষ্টতা লাভ করেছে বৈষ্ণব-পদাবলীতে অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের পূর্ণ পরিণতি দান তার মধ্যে অন্যতম। বৈষ্ণবের সাধন-রীতির কাব্য প্রকাশ ঘটেছে বৈষ্ণবপদাবলীর মধ্যে। বৈষ্ণবপদাবলী গীতি-কবিতা হ'লেও ইহা বৈষ্ণব দর্শন ছাড়া আর কিছু নয়। বৈষ্ণবপদাবলীর মধ্যে রাধাকৃষ্ণলীলা, গৌরাঙ্গলীলা, প্রার্থনাবিষয়ক পদ থাকলেও রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদই এর প্রধান উপজীব্য। শ্রীরাধার প্রেম বিদেহী, একান্ত কামগন্ধহীন। কামগন্ধহীন প্রেমই বাঙালী-বৈষ্ণব কবিমানসকে রাঙিয়ে দিয়েছে। বাঙালীর মধুর অনুভূতি

এবং ভাবময়তা জীবন-রসে সিক্ত হ'য়ে এক অপরূপ সুষমামণ্ডিত হয়েছে। বাঙালী তার হৃদয়ের মধু উজাড় করে ঢেলে দিয়েছে এই পদাবলীর মধ্যে। বাঙালী সাধক-কবি দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাব মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বৈচিত্র্যে রসরূপ দিয়েছে। বৈষ্ণব-কবিরা ভগবান্‌কে অনন্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী করে জগতের পরপারে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেন নি, তাঁরা পৃথিবী ও স্বর্গ একবারে মিশিয়ে দিয়েছেন।

বৈষ্ণবপদাবলীর প্রথম কবি শ্রীজয়দেব। তাঁর শ্রীগীতগোবিন্দ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হ'লেও—বাংলা পদাবলী সাহিত্যে ইহাই অগ্রদূত। তাই জয়দেব বৈষ্ণব কবিদের গুরু ব'লে অভিহিত হয়ে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে আরম্ভ করে সমগ্র বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যের ওপর শ্রীগীতগোবিন্দের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান আছে। এমনকি মৈথিল কবিরাও শ্রীগীত-গোবিন্দের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। বৈষ্ণব-পদাবলীর যুগকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রাক্ চৈতন্য যুগ এবং চৈতন্যোত্তর যুগ। প্রাক্-চৈতন্য যুগের প্রথম কবি জয়দেব। তাঁর শ্রীগীতগোবিন্দ সংস্কৃত ভাষায় রচিত ব'লে তার বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। শুধু গুরুর প্রভাবের কথা উল্লেখ করেই আমরা এখানে নিরস্ত রইলাম। জয়দেবের পর বড়ু চণ্ডীদাস। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের' ওপর 'শ্রীগীতগোবিন্দের প্রভাব' এই পর্যায়ে আমরা পৃথক্ পর্যায়ে আলোচনা করব। তবু এখানে একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন।

ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বাংলা ভাষার প্রাচীনত্ব বিচার করে স্থির করেছেন যে, চর্যাপদের পরবর্তী বাংলা কাব্যগ্রন্থ হ'ল—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। চর্যাপদের পর এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পূর্বে আর কোন বাংলা কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়েছিল কি না জানা যায় নি। জয়দেবের পর এবং মহাপ্রভুর পূর্বে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি বড়ু চণ্ডীদাস আবির্ভূত হন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভণিতা থেকে তাঁর নাম বড়ু চণ্ডীদাস এবং অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস বলে জানা যায়। পদাবলী সাহিত্যে পদকর্তা হিসাবে চণ্ডীদাস সুপ্রসিদ্ধ। চণ্ডীদাসের পদ বাংলার আবাল-বৃদ্ধ বনিতার প্রাণে আনন্দের ধারা বর্ষণ করে। কিন্তু এই চণ্ডীদাসকে নিয়ে পণ্ডিত-সমাজে যে সমস্তার সৃষ্টি হয়েছে আজিও তার নিরসন হয় নি। একসময় বীরভূম ও বাঁকুড়ার মধ্যে চণ্ডীদাসকে নিয়ে বিবাদের সৃষ্টি হবার উপক্রম হয়েছিল। বীরভূমের নান্নুর ও বাঁকুড়ার ছাত্না গ্রামে বাশুলীদেবীর মন্দির আছে। উভয় স্থানের বাশুলী মন্দির এই বিবাদের ইন্ধন দিয়েছিল। রাধাকৃষ্ণলীলা অবলম্বন করে চণ্ডীদাস ভণিতায় যে পদাবলী পাওয়া যায়, তার কবি দু'জন। একজন দ্বিজ চণ্ডীদাস, অপর জন দীন চণ্ডীদাস। দীন চণ্ডীদাস মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের (খ্রী: ১৪৮৫-১৫৩৩) পরবর্তী কবি। তার কারণ—

> চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
> কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
> স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
> গায় শুনে পরম আনন্দ ॥
>
> (চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যলীলা, ২য় পরিচ্ছেদ।)

এই শ্লোক হ'তে বেশ বুঝতে পারা যায়, মহাপ্রভু চণ্ডীদাসের কবিতাগান করে আনন্দ উপভোগ করতেন সুতরাং এই চণ্ডীদাস যে মহাপ্রভুর পূর্ববর্তী—এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। আমাদের মতে ইনিই দ্বিজ চণ্ডীদাস। অপর পক্ষে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অধিক প্রচলন ছিল না। একখানি মাত্র পুঁথি বাঁকুড়ার এক গৃহস্থের বাড়ী হ'তে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় উদ্ধার করেন এবং উহাই তাঁর সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে বঙ্গাব্দ ১৩২৩ সনের মহাবিষুব সংক্রান্তিতে প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন তেরটি খণ্ডে বিভক্ত—জন্মখণ্ড, তাম্বুলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকা খণ্ড, ভারখণ্ড, ভারখণ্ডান্তর্গত ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবন খণ্ড, যমুনা-খণ্ডান্তর্গত কালিয় দমন খণ্ড, যমুনা খণ্ড, যমুনা খণ্ডান্তর্গত হারখণ্ড, বাণখণ্ড বংশীখণ্ড, রাধাবিরহ—তেরটি পালায় বিভক্ত। এই গ্রন্থটি স্বরূপ আলোচনা করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ইহা একখানি পাঁচালী জাতীয় কাব্য। গ্রন্থখানিতে যে ভাবে রাধাকৃষ্ণের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, তাতে এই রাধাকৃষ্ণ মাটির সাধারণ মানুষের উর্ধ্বে নহেন। যদিও এই গ্রন্থে

ভাগবত ও শ্রীগীতগোবিন্দের প্রভাব আছে, তথাপি ইহার রচনা-কৌশল স্বতন্ত্র। প্রবৃত্তির রচনা-কৌশল আলোচনা করলে বেশ বুঝতে পারা যায় যে, ইহা ঝুমুর-জাতীয় গান। নাটকের সংলাপের মত শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা ও বড়ায়ি—এই তিনজনের সংলাপে রচিত। যে প্রসাদগুণে ও অতীন্দ্রিয়ভাবে শ্রীগীতগোবিন্দ স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তার নিতান্ত অভাব। তার পরিবর্তে এর মধ্যে যে রোমান্টিক ভাবের সমাবেশ হয়েছে—তাতে এর রাধা-কৃষ্ণ নাটকের নায়ক-নায়িকার রূপলাভ করে মর্তপ্রেমের অভিনয়ে যেন মেতে উঠেছে। এর অশ্লীল পালা যে মহাপ্রভু গান করতেন আর তার ভাবে যে বিভোর হয়ে থাকবেন, এমনও মনে হয় না।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গীতিসাহিত্যের অন্তর্গত না হ'লেও, বৈষ্ণবপদাবলীর ভাবময়তা এবং অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের পূর্বাভাষ এর মধ্যে প্রথম দেখা গেছে। বংশীখণ্ডের দ্বিতীয় কবিতায় রাধার উক্তির মাধ্যমে কবি লিখেছেন,*—

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি (২) এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন॥ ১॥
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি যেনা কোনজনা।
দাসী হ আঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা॥
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
তার পাএ বড়ায়ি মো কৈলোঁ কোন দোষে॥
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পানী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী॥ ২॥
আকুল করিতেঁ কিবা আহ্মার মন।
বাজাএ সুসর বাঁশী নান্দের নন্দন॥
পাখী নহোঁ তার ঠাই উড়ী পড়ি জাঁও।
মেদিনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ॥ ৩॥
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী॥
আন্তর সুখা-এ-মোর কাহ্ন অভিলাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

উপরি-উক্ত পদটি বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে যে অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব নিহিত আছে সেটি অনায়াসে ধরা পড়ে। বৈষ্ণবপদাবলী ও পরবর্তী গীতি-সাহিত্যের মধ্যে যে অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের সমাবেশ হয়েছে, এই পদটি যেন তারই ইঙ্গিত বহন করে এনেছে। সূর্যোদয়ের পূর্বে পূর্বদিক্-চক্রবাল যেমন উষার স্বর্ণাভরে রাঙিয়ে ওঠে এবং অরুণ সূর্যের উদয় ঘোষণা করে, এই পদটিও তেমনি অলক্ষ্য মুহূর্তে বড়ুর লেখনীমুখ-নিঃসৃত হয়ে বাংলা গীতি-সাহিত্যে অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের আভাস জানিয়ে দিল। বড়ু চণ্ডীদাসের উক্ত কবিতা আমাদিগকে শুনাচ্ছে,—ভগবানের বাঁশী প্রতিনিয়ত বাজছে। আকাশে বাতাসে, নদীর কলতানে, পাতার মর্মর-ধ্বনিতে, পাখীর কলগীতে, মানবহৃদয়ের অতি নিভৃত অন্তঃস্থলে তা' ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। কেউ শুনতে পায়, কেউ শুনতে পায় না। যে শুনতে পায় সে তা প্রকাশ করতে পারে না; কারণ, তা প্রকাশ করা যায় না। তা শুধু অনুভবযোগ্য, অনুভূতিবেদ্য। এজন্য এ তাবই অতীন্দ্রিয় ভাব। এই আনন্দই অতীন্দ্রিয় আনন্দ। এই তত্ত্বই অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব। এই আনন্দ কেমন? এর স্বরূপ হ'ল—বাঁশীর সুর কানের মধ্য দিয়ে অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করলে প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে, সব কাজ ভুলে যেতে হয়; সেই কাজ-ভোলা মনের অবস্থা প্রকাশের অতীত। সংসারের সমস্ত বন্ধন তখন শিথিল হয়ে যায়, মনে হয়, সব ছেড়ে দিয়ে তার পায়ে নিজেকে বিকিয়ে দিই দাসীর মত। 'ঠিক যেন পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার আত্মসমর্পণ।' আনন্দময় ত মহানন্দে বেণু বাঁশী বাজিয়ে চলেছেন, কিন্তু মানব ত সব ছেড়ে দিয়ে তাঁর পায়ে আত্মসমর্পণ করতে পারে না। মায়াবদ্ধ জীব কোন প্রকারে ত মায়াপাশ ছিন্ন করতে পারে না। ছাড়ি ছাড়ি, কিন্তু ছাড়তে পারে না। আর পারে না ব'লে সংসারের মায়াজালে সর্বদা বন্দীভূত হয়। শুধু

---

* কেদার রাগঃ॥ রূপকং॥
নিশীয় বংশনিনদং রাধা কংসভয়াতুরা।
বেদিতুং বাদকস্তস্য জগাদ জরতীং মিদং॥ (১)

(১) কংসভয়াতুরা রাধা বংশীনিনাদ শুনে কে বাজাচ্ছে—তা' জানবার জন্য বড়ায়িকে এ কথা বললেন।

(২) সুন্দা গোষ্ঠী—রাধাকৃষ্ণের মিলনে সহায়।

জ্বালা আর জ্বালা। সে জ্বালার নিবৃত্তি নেই, প্রতিকারও নেই। মায়াবদ্ধ জীবের পরিণাম ত এই-ই।

জয়দেব আরাধনার দ্বারা যে রাধাভাব-এ সিদ্ধি-লাভ করেছিলেন, বৈষ্ণব-সাধককে অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব শিক্ষা দিয়েছিলেন, বড়ু চণ্ডীদাস জয়দেবের দ্বারা প্রভাবিত হয়েও কাব্যক্ষেত্রে সেই অতীন্দ্রিয়ানুভূতির পরিচয় দিতে পারেন নি। শুধু উক্ত কবিতার মধ্যে তার বীজ রেখে গেছেন। পরবর্তীকালে এই বীজ পত্রপুষ্প-সমন্বিত বিরাট্ মহীরুহে পরিণত হয়ে তার শীতল ছায়াতে বহু পথিককে শান্তি দিয়েছে। বড়ু চণ্ডীদাসের পর জয়দেব-গোষ্ঠীর আর যে-সব বৈষ্ণব-পদকর্তা বৈষ্ণব গীতি-সাহিত্যে অতীন্দ্রিয় ভাবের সমাবেশ করেছেন তাঁদের মধ্যে মহাপ্রভুর পূর্বে আমরা আর দু'জনের নাম জানি। এঁরা হলেন—বিদ্যাপতি ও দ্বিজ চণ্ডীদাস। বিদ্যাপতি মিথিলাবাসী হ'লেও বাঙালীরা তাঁকে আপনজন করে নিয়েছে। তিনি বাঙালী নহেন এ কথা আর বাঙালীরা মানতে চায় না। বাংলার গীতি-সাহিত্যে বিদ্যাপতির অবদান অতুলনীয়। সাহিত্যের ইতিহাসে বিদ্যাপতির নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। বিদ্যাপতি চতুর্দশ শতকে জন্মগ্রহণ করেন এবং পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধেও তিনি জীবিত ছিলেন। মিথিলার দ্বারভাঙ্গা বা দ্বারবঙ্গে তাঁর বাড়ী ছিল। দ্বারবঙ্গ বঙ্গের দ্বারস্বরূপ ছিল—এই অর্থে বিদ্যাপতি বাঙালী। বাঙালীই বিদ্যাপতির কবি-প্রতিভার কথা সর্বপ্রথম সুধীসমাজে প্রচার করেছে। বিদ্যাপতিকে বাঁচাতে বাঙালীই এগিয়েছিল। তাই বিদ্যাপতি বাঙালীর কবি—অন্ততঃ বাঙালীর অতি প্রিয় কবি। সংস্কৃত এবং অপভ্রংশ ভাষায় তিনি বহু গ্রন্থ লিখেছিলেন অথচ তাঁর রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদগুলি তিনি মৈথিল ভাষায় লিখেছেন। বিদ্যাপতি মিথিলার রাজা শিবসিংহের সভাকবি ছিলেন। রাজা শিবসিংহ এবং তাঁর রাণী লছিমা দেবীর অনুগ্রহ লাভ করে তিনি রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক বহু পদ লিখেছেন। তাঁর কবিতায় পাণ্ডিত্যের লক্ষণ সুপরিস্ফুট, কিন্তু লৌকিক রসে পূর্ণ; অবশ্য পরবর্তীকালে অতীন্দ্রিয় ভাবও স্ফুরিত হয়েছে। মহাপ্রভু তাই তাঁর কবিতার রস আস্বাদন করতেন।

প্রাক্-চৈতন্যযুগে আর একজন বাঙালী কবি পদাবলীতে অতীন্দ্রিয় ভাব সমাবেশ করে তার সৌন্দর্য চরম সীমায় পৌঁছে দিয়েছেন। ইনি 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' বা শুধু 'চণ্ডীদাস'। বড়ু চণ্ডীদাস ও দীন চণ্ডীদাস হ'তে ইনি পৃথক্ ব্যক্তি। বড়ু চণ্ডীদাস মহাপ্রভুর পরবর্তী কবি—এ কথার উল্লেখ আগেই করেছি। দীন চণ্ডীদাস মহাপ্রভুর পরবর্তী কবি। মহাপ্রভু দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করতেন—এ কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। দ্বিজ চণ্ডীদাস মহাপ্রভুর সমসাময়িক কালের কবিও হ'তে পারেন। এই দ্বিজ চণ্ডীদাসের বাড়ী বীরভূমের নান্নুর গ্রামে অথবা বাঁকুড়ার ছাতনা। দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভাষা সরল ও মাধুর্যমণ্ডিত। অতীন্দ্রিয় ভাবের গভীরতায় তাঁর পদগুলি অতুলনীয়, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অতীত। তাঁর পদ যতই আস্বাদন করা যায়, ততই আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায়। তিনি বিদ্যাপতির মত সুখের কবি নন; তিনি দুঃখের কবি। কিন্তু এই দুঃখই তাঁর সুখ। দুঃখের মধ্যেই তিনি সুখের সন্ধান পেয়েছেন। দ্বিজ চণ্ডীদাসের দুঃখ তাই মাধুর্যে ভরা। বিদ্যাপতির রাধা হাস্যে, লাস্যে ভরপুর, কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধা যৌবনে যোগিনী; অথচ তাঁর সেই বৈরাগ্যের মধ্যে মিলনের আনন্দানুভূতি বিদ্যমান।

প্রাক্-চৈতন্যযুগের বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলীতে অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের আলোচনার পূর্বে আমরা চৈতন্যোত্তর যুগের কয়জন পদকর্তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেব। এঁদের মধ্যে অনেকেই রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদ ছাড়াও গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ লিখেছেন; তা ছাড়া সকলেই গৌরাঙ্গের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন; চৈতন্যদেব-প্রচারিত মতবাদে এঁদের পদাবলী পুষ্ট হয়েছে। গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদেও অতীন্দ্রিয় ভাবের সমাবেশ হয়েছে—ঠিক যেভাবে রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদে হ'য়েছে। চৈতন্যোত্তর যুগের প্রধান দু'জন কবি হলেন—জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস। অন্য সকল কবি হ'তে এঁদের প্রাধান্য বিশেষ ভাবে স্বীকৃত ব'লে আমরা সংক্ষেপে এঁদের পরিচয় দেব। অবশ্য পদাবলীতে অতীন্দ্রিয় ভাবের সমাবেশ-প্রসঙ্গে কয়েকজনের কতকগুলি পদ আলোচনার আশাও আছে।

চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব-কবিদের মধ্যে জ্ঞানদাসের নাম প্রথমেই মনে আসে। জ্ঞানদাস ছিলেন দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য। পদলালিত্যে এবং ভাবব্যঞ্জনায় জ্ঞানদাসের পদগুলি চণ্ডীদাসের পদের অনুরূপ। বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কাঁদড়া গ্রামে এক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণবংশে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে (১৫৩০ খৃঃ অব্দে) জ্ঞানদাস জন্মগ্রহণ করেন। গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির উত্তরসাধক কবি। ব্রজবুলিতে রচিত গোবিন্দদাসের পদগুলি ধ্বনিমাধুর্যে, ছন্দোবৈচিত্র্যে এবং অলংকার পরিপাট্যে বাংলা গীতি-সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। জীব গোস্বামী তাঁর কবিতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'কবিরাজ' উপাধি দান করেছিলেন। অবশ্য উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি স্বাভাবিক কবি-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁহার মাতামহ কবি ছিলেন, বড় ভাই কবি ছিলেন; আর তাঁর পুত্র ও পৌত্র কবি-খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর পৌত্র ঘনশ্যামদাস তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে অনেক পদ লিখেছিলেন। গোবিন্দদাস কবিরাজ শ্রীনিবাস ভট্টাচার্যের শিষ্য ছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে (১৫৩৭ খৃঃ অব্দে) তিনি বর্ধমান জেলার অন্তর্গত শ্রীখণ্ড গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা চিরঞ্জীব সেন মহাপ্রভুর একজন পার্ষদ ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর গোবিন্দ ও তাঁর বড় ভাই রামচন্দ্র পৈতৃক বাসভূমি কুমারনগরে গমন করেন এবং সেখান থেকে তেলিয়া-বুধরিতে (মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলার নিকট) বাসস্থাপন করেন। গোবিন্দের মাতামহের নাম দামোদর সেন। মাতার নাম সুনন্দা। রামচন্দ্র শ্রীনিবাস আচার্যের প্রভাবে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন।

ক্রমশঃ

স্বাধীন

পুষ্পদেবী

এ গল্প কিন্তু স্বাধীনতার নয়। একটি ছেলের নাম স্বাধীন। দিল্লী থেকে পিসীমা চিঠি লিখেছেন। সলিলের বিয়ের সম্বন্ধ হ'চ্ছে। আমাদের এই পাড়ার মেয়ে, কাজেই আমি যেন মেয়ে দেখে তাঁকে একবার জানাই। কি ক'রে তাঁদেরকাছে খবর পাঠাব ভাবছিলাম, এমন সময় তিনিই এলেন আমাদের বাড়ী। মুখচেনা ভদ্রলোক—রোজই লুঙ্গি প'রে দুহাতে দু'টো চটের থলি হাতে বাজার যান। আজ অবশ্য গিলে করা পাঞ্জাবী ধুতি পরনে। ভদ্রলোক নামে হ'লেও মানুষটি হাবেভাবে ভদ্রতার একান্তই অভাব। বললেন, দেখুন না পটলডাঙ্গা থেকে সেজকাকা খবর পাঠিয়েছেন তাঁর শ্যালীর মেয়েকে নিয়ে তিনি আমাদের বাড়ীতে আসবেন. আপনারা নাকি মেয়ে দেখতে যাবেন আমাদের বাড়ী। কখন যাবেন তাই জানতে এলাম। শুধু শুধু আমার একি ঝঞ্ঝাটে ফেলা বলুন দেখি? এখন আপনাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা ব'লে আবার ফলমূল কিনতে যেতে হবে। মা বলেছে তরমুজ নিয়ে যেতে, সত্যি কি আর আপনারা চা না খেয়ে তরমুজ খাবেন? তবু সাজান মানান করে দিতে হবে ত? আবার সেজ কাকীর জন্যে মিঠে পান কিনতে হবে নানান্ ঝঞ্ঝাট। আমার আবার সন্ধ্যেয় দাবা খেলার ঝোঁক, তখন আপনি গেলেও চিনতে পারবেন না। সেই যে গল্প আছে না এক দাবাড়ে দাবা খেলছে আর তার বাড়ী থেকে খবর এসেছে যে তার ছেলেকে সাপে কামড়েছে। সে বললে, কাদের সাঁপ? আমারও হয়েছে তাই। যাই হোক দাদা, চারটের আগে যাবেন, সাড়ে চারটের সব সারা। আমি ব্যস্ত হয়ে বলি, না না পনের মিনিটে দেখা হয়ে যাবে, ওসব চা টার হাঙ্গাম আর করবেন না। তাতে পানের ছোপ ধরা দাঁত বের ক'রে ভদ্রলোক হেসে বললেন, খেতেই ত আপনার আধঘণ্টা লাগবে মশাই, যা সব জোগাড়যন্তর হ'চ্ছে। যাক্ আপনার স্ত্রীকেও নিয়ে যাবেন মশাই, ওসব বারে বারে দেখান আমার পোষাবে না। কথাগুলো আমায় আর বলতে হ'ল না, পর্দার পাশেই তিনি ছিলেন।

যাই হোক ভদ্রলোকের কথা স্মরণ ক'রে সাড়ে তিনটের আগেই গিয়ে হাজির হই দুজনে। বাড়ীর রোয়াকে বেগুনে রং-এর ছাপা সাড়ী লুঙ্গির মত ক'রে পরে সেই কর্ত্তা বিড়ি খাচ্ছিলেন। আমাদের দেখে বললেন, একি মশাই, আপনারা এসে গেছেন? একটু ড্রেস চেঞ্জেরও সময় দিলেন না? অপ্রতিভ হয়ে আমি বলি, আপনার ড্রেস চেঞ্জে আর কি হবে বলুন? দেখুন, মেয়ের ড্রেস চেঞ্জ হয়েছে কিনা?

ভদ্রলোক বাড়ীর ভেতর ঢুকে গেলেন। আমরা দাঁড়িয়েই আছি, দাঁড়িয়েই আছি। প্রায় আধঘণ্টা হয়ে গেল, শেষে আর থাকতে না পেরে কড়া নাড়ি। এবারে এক বিধবা গিন্নি এসে আমাদের বাড়ীর ভেতর যেতে ইঙ্গিত করেন। সত্যিই ইঙ্গিত, ঘোমটার ভেতর থেকে হাতের ইসারা। ঘরে ঢুকে দেখি মস্ত বড় খাটে রাজ্যের লেপ, তোষক, বালিশ, পাড়ের একটা ঢাকনা দিয়ে ঢাকা। পাহাড়ের মত হয়ে আছে, তাতে আর যাই থাক্ বসবার জায়গা নেই। মাটিতে একটা সতরঞ্চি পাতা, আর কোন বসার জায়গা না থাকায় আমরা তাতেই ব'সে পড়ি। দেয়ালে প্রকাণ্ড এনলার্জমেণ্ট। ওমা এ যে ওই ভদ্রলোকেরই ছবি—যিনি বেগুনে ছাপা সাড়ী লুঙ্গির মত ক'রে প'রে বিড়ি টানছিলেন। ছবিতে তাঁরই পরনে রাজার পোষাক কোমরে তরোয়াল, মাথায় উষ্ণীষ কিছুই বাকি নেই। পাশে একটি নববধূ এক গা গয়না পরে মুকুট পরে বসে আছে। বুঝলাম ওঁরই বিয়ের ছবি। তার পাশে প্রকাণ্ড কাকাতুয়া উলের তৈরী—তলায় লেখা আশারাণী। আশারাণী কাকাতুয়ার বা কাকাতুয়া নির্ম্মাতার নাম বোঝা যায় না অবশ্য। তারই পাশে মাছের আঁশ দিয়ে তৈরী ফুলের সাজি।

খাবারঘরে আপনাদের চা সরবৎ এনেছি শুনে দেখি

একটি ঝি-এর হাতে বঙ্গ পেডলের পরাত—তাতে রুম পেটে ঝি বউ লেখা প্রকাণ্ড ফুলকাটা কাপে চা—কালো পাথর-বাটিতে বেলের পান:—কাচের গেলাসে লাল রং-এর সরবৎ। পরস্পরের মুখের দিকে চাই। এবার দেখা দেন সেই কর্ত্তা—পরনে যথারীতি জালি গেঞ্জি, কাঁচি ধুতি, পায়ে লপেটা। বলি যাক্, আপনার ড্রেস ত চেঞ্জ হ'ল, এবার দেখুন মেয়ের আসার কতদূর।

আপ্যায়িত হেসে ভদ্রলোক বলেন, মেয়ে? সে ত আসবেই মানে এসে গেছেই—দেখেছেন আমার ছবিটা? তখন কি চেহারাই ছিল। এখন একটু খেলেও সয় হয় না। অমন নাদুশ-নুদুস চেহারা দেখে কথাটির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়।

ভদ্রলোক আবার ভেতরে যান। দেখি এদের কতদূর হ'ল, যা সব কাণ্ড বলতে বলতে অন্তর্দ্ধান। এমন সময় বছর বারো একটি ছেলে ঘরে ঢুকলো। বেশ বেপরোয়া ভাব। ঘরে ঢুকেই বলে, এটা আবার মাটিতে কে পাতলো? আমাদের কারুকে ধর্ত্তব্যের মধ্যে না এনে পায়ে ক'রে সতরঞ্চিটা জড়ো ক'রে দিল। দিয়ে খাটের ওপরের ঢাকাটা তুলে ফেলল মাটিতে। খাটের ওপরে ত স্তূপাকার বিছানা, ছেঁড়া কাঁথা, লেপ, কম্বল ত বটেই। খাটের তলায় সবচেয়ে অপরূপ দৃশ্য। ঝুড়ি ক'রে কয়লা তোলা, উনুন-ভাঙা, বালতি, ক্যাম্বিসের জুতো, তুলোর পুঁটলি, মরচে ধরা টিন, বেড়ালের ছানা—দালদার টিন—ভাঙা ষ্টোভ—ছেঁড়া চটি—টিনের টুকরো—নেই হেন জিনিষ নেই। সব টেনে টেনে বের ক'রল সেই ছেলে। আমরা ত অবাক—শেষে বলি, তোমার নাম কি খোকা?

সে বলল, খোকা নই, আমার নাম স্বাধীন। স্বাধীনতার দিনে হয়েছিলাম কিনা।

মনে মনে এই সার্থকনামা ছেলেটিকে দেখে অবাক না হয়ে পারি না।

স্বাধীন বলে, বোঝা গভার সময় ওবাড়ীর বোমা, আর বাজার লম্বুরে হওয়ায় পিসীর ছেলের নাম দে... দাদা হয়েছে।

এই আবর্জ্জনার স্তূপের মধ্যে অন্দর থেকে রমণী সং... করে এসে দাঁড়ালো, সঙ্গে এক বর্ষিয়সী মহিলা... চারিদিকে অসহায় দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে ভদ্রমহিলা বলেন— এই দেখুন আমার হাতে যা যা রয়েছে সব ওর সেলাই... এই মেয়েটার—

স্বাধীন এতক্ষণ একটা লাটাই বের ক'রে পেছন ফিরে বসেছিল, এখন হঠাৎ ফিরে বলল, যাঃ ওটা ত ছুর্... —আমায় বুনে দিয়েছিল।

ভদ্রমহিলা তার কথায় কর্ণপাত না ক'রে বলেন... আর এই স্কার্ফ বুনেছে ও তখন কতটুকু। অমনি... তরে স্বাধীন বলে, সব মিথ্যে কথা বলছো ঠাকুমা—... ত নতুন দিদির। সকালে আমিই ত চেয়ে এনেছি... নতুন দিদির কাছ থেকে। নতুন দিদির মা বলল, দেখ... যাবা যেন ছেঁড়েটেড়ে না। আমরা তখন পালাতে পারলে বাঁচি।

স্বাধীন আবার বলতে সুরু করল, একি তুমি আমার... মার কাপড় পরেছ কেন নতুপিসী, দাও, খুলে রাখ... শিগ্‌গির। ব'লেই কনের খোঁপা ধ'রে এক টান।

এবার সত্যিই একটা আরও লজ্জাজনক ঘটনা ঘটলো। খোঁপার ভেতর থেকে বেরুল একজোড়া ছেঁড়া কালো মোজা। কনের সঙ্গে আমাদের অবস্থাও ন যযৌ ন তস্থৌ। এবার স্বাধীন সত্যিই স্বাধীনভাবে প্রস্থান করল। আমরাও মামুলি শিষ্টাচার সেরে উঠে পড়লাম। যতদূর মনে পড়ে তারপর সলিলের বিয়ের আর কোন খবর আমরা পাই নি। তবে ছাতে দাঁড়ালেই দেখি সেই ভদ্রলোক ছেঁড়া সাড়ী পাট ক'রে প'রে দু'হাতে দু'টো চটের থলি নিয়ে বাজারে যাচ্ছেন। আর তখুনি মনে ভেসে ওঠে স্বাধীনের সেই বেপরোয়া স্বাধীন স্বরূপটি।

সত্ত্বেও এত বিরাট ব্যক্তিত্ব এ-দেশে কম দেখা গেছে। বিদ্যাসাগর
মত-পরিবর্তনের কোন কারণ দেখা যাচ্ছে না। তাঁর চরিত্রবল
আজও অনতিক্রান্ত।

পূর্ব প্রবন্ধের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা সম্বন্ধে সামান্য আলোচনায় প্রমাণিত
হবে যে, প্রতিবাদীরা ইতিহাসের ব্যাখ্যা ও তথ্য—দু'টি ক্ষেত্রেই ভ্রান্ত।
বিখ্যাত ঐতিহাসিক হরিদাস মুখোপাধ্যায় বলেছেন :—

"ইতিহাস যখন প্রত্নতত্ত্ব নয়, প্রত্নতাত্ত্বিক মালমশলাগুলিকে জীবন-
দর্শন বা জীবনব্যাখ্যার দ্বারা আলোকিত ক'রেই যখন রচিত হয়
ইতিহাস, তখন একেবারে ষোল-আনা বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস কারো কাছ
থেকে আশা করা দুরাশা মাত্র। দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যবশত ঐতিহাসিকেরা
একই ঘটনা সম্বন্ধে রকমারি মতামত ব্যক্ত ক'রে থাকেন, আর সেটাই
স্বাভাবিক।" (১৮৫৭ সনের মহাবিদ্রোহ।)

বড় সুন্দর এই কথাগুলির অনুরূপ সিদ্ধান্ত শুনি পরলোকগত আচার্য
বিনয়কুমারের কথায় :—

"In order to be lifted up to history, archaeology must have to be impregnated with a bias, an interpretation, a standpoint, a philosophy, a criticism of life". (The Futurism of Young Asia.)

এই জন্যে ইতিহাসের মার্ক্সবাদী ব্যাখ্যাই একমাত্র ব্যাখ্যা নয়,
মাইন কাম্প্ফ্ (Main Kampf) গ্রন্থে প্রদত্ত হিটলারি ব্যাখ্যাও
বাস্তব তথ্য ও প্রমাণসঙ্গত হ'লে অবশ্যগ্রাহ্য। ইতিহাসবোধের শোচনীয়
অভাবে বাগবাজারের রাস্তায় মুক্তকচ্ছ হয়ে বেসামাল অবস্থায় ছুটোছুটি
না ক'রে একটু ভাবলেই সুধীন্দ্রলালের মত লোকেরা বুঝতে পারবেন যে,
স্বাধীনতার সংগ্রাম আর বিপ্লব যাঁদের দ্বারা সাফল্যমণ্ডিত হয় তাঁদের নেতা
বা অবলম্বনরূপে বর্ণনা করা যথাযথ। স্বাধীনতার জন্যে একটা যুদ্ধ বা
একটা বিপ্লব কোনমতে বেধে-যাওয়া বড় কথা নয়, তার সফলতালাভই
আসল কথা। মার্কিন স্বাধীনতা-যুদ্ধ ওয়াশিংটন ব্যতীত সাফল্যলাভ
করত না, নাপোলেঅন বাদে ফরাসী বিপ্লব-উদ্ভূত চিন্তাধারা কার্যকরী
হ'ত না। এ-কথা সবাই জানে যে, নেতা আর আন্দোলন অনেকাংশে
পরস্পরের পরিপূরক। আন্দোলন নেতার জন্ম দেয় এবং তার নেতৃত্বে
পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলে। ভারতে যুব-আন্দোলন সুভাষচন্দ্রকে
অবলম্বন ক'রে প্রকাশিত হয়, সুভাষচন্দ্র তাকে আশ্রয় ক'রে প্রকাশ
পান নি; প্রমাণ, সুভাষচন্দ্রের অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে যুব-আন্দোলনের
অবসান। ইতালীতে ফাশিস্ত্ আন্দোলন মুস্সোলিনির নেতৃত্বে গ'ড়ে
উঠে, তিনি ফাশিস্ত্ আন্দোলনকে অবলম্বন ক'রে প্রকাশ পান নি;
প্রমাণ, ইল্ দুচে-র তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে ফাশিস্তির অবসান। নাৎসী
আন্দোলন জর্মানিতে হিটলারের ব্যক্তিত্বকে অবলম্বন ক'রে প্রকাশিত
হয়, হিটলারের প্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গে ঐ আন্দোলনের প্রায় বিলুপ্তি।
ইতিহাসে এই সব আন্দোলন, বিপ্লব, যুদ্ধ নেতৃবিহীন অবস্থায় চলে না।
বার বার দেখা গেছে, অতি প্রবল শক্তিশালী আন্দোলনও মাত্র একটি
লোকের নেতৃত্বে প্রচণ্ড বেগে এগিয়ে যেতে যেতে শুধু তার অভাবে
একেবারে ভেঙে পড়েছে, নিজের জোরে নতুন নেতার জন্ম দিতে পারে
নি। আবার অনুরূপ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আবির্ভূত না হ'লে সে-যুগের
আন্দোলন শক্তি সংগ্রহ করতে পারে না। ওয়াশিংটনের নেতৃত্ব না

সুতরাং ওয়াশিংটনকে অবলম্বন ক'রে মার্কিণ স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও তার
পশ্চাদ্বর্তী যে নবশক্তির কথা বলা, তার আত্মপ্রকাশ সাফল্যমণ্ডিত হয়,
এ-কথা নির্ভুল। এ-সম্বন্ধে ফিশারের মত ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের ভক্ত
ঐতিহাসিক মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন :—

"It was Washington, and he alone, brought back a severely shaken and ill-provisioned army to a sense of disciplined efficiency and once more made of it an instrument of victory. So little was the revolution the work of a convinced and united people that at no time in the war did the army of Washington exceed twenty thousand men."

নাপোলেঅন বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ে উদ্ভূত আতিশয্য ও বিশৃঙ্খলাকে
বিনাশ করেন, বিপ্লবকে বিনাশ করলে "বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ফরাসী জীবনে
সুপ্রতিষ্ঠিত ও ইউরোপের চেতনায় নিহিত" করা যায় না। বিপ্লবকে বিনাশ
না ক'রে তিনিই তার বিগ্রহস্বরূপ হয়ে ওঠেন। তাঁর সাহায্য ভিন্ন
বিপ্লব কার্যকর না হয়ে বড় রকমের দাঙ্গায় পর্যবসিত হ'ত। তিনি
ইউরোপের চেতনায় ফরাসী বিপ্লবকে নিহিত করেন ব'লেই প্রথম
মহাযুদ্ধের পর বিভিন্ন ইউরোপীয় রাষ্ট্রের উইলসনীয় সীমারেখা নির্দেশের
সময় বৈপ্লবিক চিন্তাধারা মহত্তর সাফল্য লাভ করে। ফিশারের বই না
প'ড়ে সত্যের অপলাপ করা গুরুতর ত্রুটি। ফিশর তাঁর বইএ
Teaties of Peace পরিচ্ছেদের "for the Peace Treatics bear ......satisfactory" অনুচ্ছেদে তুর্কি-অধিকার সম্বন্ধে একটি কথাও না
ব'লে নবগঠিত স্বাধীন ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সীমানার কথাই বলেছেন।
যে ৩% জনসংখ্যার কথা বলা হয়েছে, তা ইউরোপীয় তুরস্কে বাস করতে
পারত না, কারণ, তার পরিমাণ দেড় কোটির মত। সাধারণ ভৌগোলিক
জ্ঞানের এত অভাব নিয়ে কোন আলোচনায় প্রবৃত্ত না হলেই সুধীন্দ্রলাল
ভাল করতেন। ফিশারের বইএর উদ্ধৃত অংশ তিনি কখনও পড়েন নি।
ঐ দেড় কোটি লোক নিজ রাষ্ট্রসীমাবহির্ভূত ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী রাষ্ট্রের
পরাধীন অধিবাসী।

পূর্ব প্রবন্ধে যে বিরাট আন্দোলন ও নবশক্তির কথা বলা হয়েছিল,
ফরাসী বিপ্লব ও মার্কিণ স্বাধীনতা-সংগ্রাম তার দুমুখী বিকেন্দ্রিক প্রকাশ
বলা হয়, মাত্র ফরাসী বিপ্লবকে সমগ্র আন্দোলন মনে করা ঠিক নয়।
পূর্ব প্রবন্ধের যুক্তি-পরম্পরা স্মরণ না রাখার জন্যে অনৈতিহাসিক অযুক্তি-
বাদের দুর্বোধ্যতার অভিযোগ এসেছে। যথেষ্ট অধ্যয়নের অভাবে যাঁরা
ফরাসী বিপ্লব ও রোমান্টিক আদর্শবাদের সম্বন্ধ বুঝতে পারেন না, এই
ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁদের অজ্ঞতা দূর করা অসম্ভব। পূর্ব প্রবন্ধে কিছু দৃষ্টান্ত
দেওয়া আছে। ফরাসী বিপ্লবের পরবর্তী ইউরোপের ইতিহাসের পথে
পথে রোমান্টিক আদর্শবাদ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কি প্রভাব বিস্তার করে
তার নমুনা ছড়ানো আছে। সমগ্র বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে রামমোহন
বাইরণ থেকে দি ভ্যালেরা ও সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত সকলেই রোমান্টিক রাজ-
নৈতিক কর্মপ্রচেষ্টার চমৎকার দৃষ্টান্ত।

[illegible]

মোটেই স্বাধীনতাকামী ছিল না। ওয়াশিংটন আর সিমন বলিভারের নেতৃত্বে তারা শুধু আর্থিক ও রাজনৈতিক কারণে নয়, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার প্রতি রোমান্টিক আদর্শবাদের আকর্ষণেও কি ভাবে স্বাধীনতা অর্জন করে, তার বিবরণ ইংরেজী ও স্পেনীয় সাহিত্যের ছত্রে ছত্রে অনন্ত ভাষায় দেওয়া আছে। প্রথমে ঔপনিবেশিকেরা Nathaniel Howthorne-এর Old Esther Dudley-র মত রাজভক্ত ছিল, সুধীন্দ্রলাল হিন্দি সাম্রাজ্যবাদের ক্ষেত্রে আজও যা রয়েছেন।

বাংলা ও অন্যান্য সাহিত্যের ইতিহাসের মনোযোগী পাঠকমাত্রে জানেন যে, কোন সাহিত্যের ইতিহাস বুঝতে হ'লে সমকালীন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও অন্য প্রত্যেকটি সাংস্কৃতিক বড় আন্দোলনের স্বরূপ বিশ্লেষণ ক'রে সাহিত্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা, তুলনামূলকভাবে আলোচনা করা অপরিহার্য প্রয়োজন। সাহিত্যের ঐতিহাসিক পটভূমিকার রহস্য উপলব্ধির জন্যে কেশব-রামকৃষ্ণ ধর্মালোচনা, সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস, অরবিন্দ-চিত্তরঞ্জন-সুভাষ প্রসঙ্গ কিছুই "ফেলিতব্য চিজ্" নয়। হরিদাসবাবুর বইটি পড়লে জানা যায়, বাংলা সাহিত্যের ওপর সিপাহী বিদ্রোহের প্রভাব পড়েছিল। ভোজপুরি, পূরবিয়া ও পশ্চিমা হিন্দিভাষীদের তুলনায় বাঙালী শিক্ষিত-জন ও অশিক্ষিত জনতার কোন ভূমিকাই ঐ বিদ্রোহে ছিল না। বাঙালী অসামরিক জনতা ছাড়া বাঙালি সামরিক লোক যে ছিল না, সে-সত্য সুকুমারবাবুর সাহিত্যের ইতিহাসেই আছে, দৃষ্টিহীনতার জন্যে সুধীন্দ্রলালেরা তা দেখতে পান না। শ্রদ্ধেয়া উমা মুখোপাধ্যায় হরিদাসবাবুর বইএর পরিশিষ্টে সংশয়াতীত ভাবে দেখিয়েছেন যে, কিছু অসৎ হিন্দিভাষী লোক ঐ বিদ্রোহে অংশ নিলেও অসামরিক জনতা ইংরেজকেই বেশি পছন্দ করত।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিদ্যাসাগরীয় যুগ মধু-বঙ্কিমের যুগের পূর্ববর্তী, সাল-তারিখ দিয়ে তা স্বতঃসিদ্ধের মত প্রমাণিত এবং সর্বজন-স্বীকৃত। বঙ্কিমের ভাষা ও মানসিকতায় বিদ্যাসাগরের প্রবল প্রভাব বর্তমান ছিল। মধুসূদনের জীবন ও কর্মপ্রচেষ্টাতেও তাঁর দান উপলব্ধ। বিদ্যাসাগর বঙ্কিমের চেয়ে ১৮ বছরের বড় ছিলেন, সাহিত্যক্ষেত্রে ১৮ বছর আগে আসেন ও ২৪ বছর আগে যান। মধুসূদন বিদ্যাসাগরের চেয়ে বয়সে ৪ বছরের ছোট হ'লেও সাহিত্যক্ষেত্রে ১২ বছর পরে আসেন। ছন্দের ব্যাপারে ও চিন্তাধারায় তিনি বিদ্যাসাগরের চেয়ে অন্তত এক পুরুষ এগিয়ে ছিলেন। বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যক্ষেত্রে সমসাময়িক বলা প্রলাপোক্তি মাত্র। ব্যাপকভাবে আধুনিক যুগ রামমোহন থেকে সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত ধরলে অবশ্য রামমোহন আর সুধীন্দ্রলাল সমসাময়িক হয়ে পড়েন।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের রচনাবলীতে মেটার্নিকের সঙ্গে তাঁর চরিত্রগত সাদৃশ্য ধরা পড়ে। যে-অর্থে মেটার্নিক প্রতিক্রিয়াশীল, সে-অর্থে ভূদেবও।

কেশবচন্দ্রের সঙ্গে মহর্ষির অনুগামীদের সংঘর্ষের কথা ঐতিহাসিকেরা জানেন। এককালে বাংলা সাহিত্যে তা ঢেউ তুলেছিল। কেশবচন্দ্রের প্রথমা কন্যার বিবাহের ঘটনায় তাঁর পশ্চাদগতি ও সততার অভাব ধরা পড়ে। তাঁর বাগ্মিতার সম্বন্ধে কোন মন্তব্য অবান্তর, তাঁর বিরাট্ মনীষার পরিচয় অপ্রমাণিত। তাঁর রচনায় ভাষা সহজ ও মর্মস্পর্শী, বিষয়বস্তু বাস্তুচ্যুতি। তাঁর রামকৃষ্ণ-প্রীতি তাঁর মনীষার অভাব ও প্রতিক্রিয়াশীলতার নিদর্শন।

বঙ্কিম অবশ্যই স্বাধীন বঙ্গের স্বপ্ন দেখেছেন। অব্যাহতভাবে শরদিন্দু-প্রমথনাথ-বুদ্ধদেবের নাম কেন টানা হয়েছে, বোঝা যায় না। প্রমথনাথ বিশি হিন্দির চেয়ে ইংরেজীর বেশি ভক্ত। প্রমথনাথ চৌধুরী বাংলার অনুরাগী ছিলেন, ভাষা ও স্বাধীন রাষ্ট্র দুই হিসেবে। বুদ্ধদেব বসু-র মন্তব্য তুলে দেওয়া হল :—

"আধুনিক জগতে নেশন নামে যে-ধারণা প্রচলিত আছে তার ভিত্তি কোথায়, খুঁজতে গেলে ভাষা ছাড়া আর উত্তর পাওয়া যায় না। যে-প্রজা-সমূহ এক ভাষায় কথা বলে, তারাই একটা দেশ বা রাষ্ট্রের অধিবাসী। রাষ্ট্র ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে, কিন্তু ভাষা ছাড়া পারে না। বাংলা দেশে বাংলা ভাষা যদি প্রাধান্য না পায়, তা হ'লে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা একেবারেই অর্থহীন হয়ে পড়ে। তথাকথিত প্রাদেশিকতা ভুলে গিয়ে নিজেকে ভারতীয় ব'লে অনুভব করার উপদেশ আজকাল শোনা যাচ্ছে। কিন্তু নিজেকে বাঙালী বা মারাঠী ব'লে ভাবা যদি প্রাদেশিকতা হয়, নিজেকে ভারতীয় বা ইংরেজ বা চৈনিক ব'লে ভাবাও কি তাই নয়? আমাদের প্রথম পরিচয় হবে বাঙালী ব'লে, সেটা প্রকৃতিরই বিধান।"

হিন্দিকে বাঙালীরা পর-ভাষা ভাবলেও দাদাজির গুরুগিরি অব্যাহত থাকবে। জার্মান জাতির মত বাঙালী গুণের জোরে প্রাপ্য সম্মান অবশ্য পাবে, বৃহৎ রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত থাক বা না থাক। ভারতের সঙ্গে যুক্ত থেকেও বাঙালীর উদর পূরণের বিশেষ সুবিধে হচ্ছে ব'লে মনে হয় না।

তাঁর প্রতিবাদের শেষাংশে সুধীন্দ্রলাল অসংলগ্ন কথাবার্তা ব'লে কটূক্তি প্রয়োগ করেছেন। Murray T. Titus-এর বই পড়লে তাঁর মুসলিম ধর্মপ্রসারসম্পর্কিত ভুল ধারণাগুলি দূর হবে। জাতিভেদ প্রথা এখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকদের প্রশংসাস্থল। তা হিন্দুধর্মের রক্ষাকবচস্বরূপ।

হিন্দি ভাষার কাছে বাংলার কোন ঋণ নেই। বাংলার কাছে হিন্দির ঋণ কোন দিন শোধ হবে না। সুরদাস নিজেই বাঙালী বৈষ্ণব গুরু ও কবিদের কাছে ঋণী। পাঁচকড়িবাবুর গ্রন্থাবলী পড়লে পরভাষী অধম জাতির বাঙালীবিদ্বেষ ভয়ানকভাবে প্রতিভাত হয়। রবীন্দ্রনাথ যে হিন্দিকে ভারতের রাষ্ট্রভাষারূপে চান নি, তার প্রমাণের অভাব নেই। তাঁর ভানুসিংহের পদাবলী ব্রজবুলিতে লিখিত, হিন্দিতে নয়। ব্রজবুলির সঙ্গে হিন্দির সম্পর্ক যৎসামান্য।

সহস্র বৎসর বাংলা দেশে বাস করলে নেমকহারাম ব্যতীত যে কোন হিন্দিভাষীর বাঙালী হয়ে যাওয়া উচিত। হাজার বছর আগের বাস-স্থানের জন্যে শোকাকুল হবার কারণ নেই।

বঙ্কিমচন্দ্র মুসলিম ধর্মবিশ্বাসীদের সঙ্গে বোঝাপড়া বলতে ধর্মযুদ্ধ বোঝেন নি, পূর্ব প্রবন্ধে আমার বক্তব্যও তা ছিল না। সুতরাং প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মশাইএর সঙ্গে আমার বোঝাপড়াটা সহজসাধ্য হয়ে গেল। তিনি আদ্যোপান্ত হাওয়ার সঙ্গে লড়াই করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে তিনি যা বলেছেন সেগুলির দফাওয়ারি জবাব মোহিতলাল দিয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য আমি ভুল ব্যাখ্যা করি নি, রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য সম্বন্ধে আমার বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা প্রভাতবাবু করেছেন।

রামমোহনের সঙ্গে নাপোলেঅঁর তুলনা চলে সামরিকতার দিক দিয়ে নয়, সংস্কারের দিক দিয়ে। আমি সেই তুলনা করেছি। বিনষ্টাত্মিকা শক্তির প্রবল প্রকাশরূপে তাঁকে বর্ণনা ক'রে রামমোহনের গৌরব ঘোষণা করা হয়েছে, তাঁকে খর্ব করা হয় নি।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী-র মত মনীষী যাঁর জীবনী সগৌরবে রচনা করেছেন, সেই খনামধন্য ঐতিহাসিক পণ্ডিতপ্রবর উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের রচনাংশ তুলে দিয়ে আলোচনার উত্তরদান শেষ করা হ'ল :—

"মহাত্মা রামমোহন রায়কে বাড়াইতে গিয়া তাঁহার জীবনচরিত লেখক নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একজন নিরপরাধী মৃত ব্যক্তির নামে কলঙ্ক দিয়াছেন। উক্ত জীবনচরিতের দ্বিতীয় সংস্করণের ৩৩ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে :—

"কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত রামনগর গ্রামে রামজয় বটব্যাল নামক এক ব্যক্তি রামমোহন রায় পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ ও ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করেন বলিয়া তাঁহাকে নানা প্রকার কষ্ট দিতে আরম্ভ করিয়াছিল।"

উল্লিখিত চিত্রটি কল্পনামূলক। রামমোহন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হইয়াছিলেন বলিয়া দলাদলির সূত্রপাত হয় নাই। রামমোহন ও রামজয়ের মধ্যে কে কাহার প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলেন, হুগলীর বিচারালয়সমূহের নথি অনুসন্ধান করিলে আজিও পাওয়া যাইবে। একটি কল্পনার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :—

২৪১ নং। ৪১ কানুন। জেলা হুগলির জজ, শ্রীযুক্ত ওকিলি সাহেব। ১৮১৮। ১৫ এপ্রেল। বাদী রামজয় বটব্যাল। প্রতিবাদী রামমোহন রায়। বাদীর আরজি এই যে, প্রতিবাদী রামমোহন রায় ১২২১ সালে লাটমজকুর পত্তনি তালুক খরিদ করিয়া ১২২২ সালের ২০শে অগ্রহায়ণ তারিখে তালুকদার রামমোহন রায় ও উঁহার নায়েব জগন্নাথ মজুমদার এক শতের অধিক লাঠিয়াল লোক লইয়া দলাদলির আবেশে দাঙ্গা হাঙ্গামা দ্বারায় রামনগর গ্রামের ৭৯/২।০ বিঘার মধ্যে ৫১৮১০ জমির ধান্য ফসল ও মৌজে বিরক গ্রামে ১০/১ ও দাইনায় গ্রামে ৮।।৫ বাগানের আম্র ইত্যাদি ১১৫টা গাছ কাটিয়া ৭০।।০ বিঘা জমি হইতে বেদখল ও আবাদি ধান্য ফসল লুটতরাজ করে। এ-কারণ ২০৯২৲ টাকার দাবিতে নালিশ।

এই মকদ্দমায় জজ আদালতে ও সদর দেওয়ানি আদালতে বাদী ডিক্রি পাইয়াছিলেন। ইহার উপর টীকা-টিপ্পনি করা আমরা অনাবশ্যক বোধ করি। কেন-না, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়কে খর্ব করা আমার অভিপ্রায় নহে।"

অত্র ইদম্ প্রমাণিতম্।।

ইহার পর আর কোন বাদ-প্রতিবাদই প্রকাশ করা সম্ভব হইবে না।

সম্পাদক, প্রবাসী

কিন্তু ফতেপুর সিক্রীর বুলান্দ দরওয়াজা স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল। প্রায় ১৭৬ ফিট উঁচু এই বিরাট্ গেটওয়ের উপর থেকে পঁচিশ মাইল দূরের তাজমহল এবং ভরতপুর দুর্গ চোখে আসে। সাকুল্যে একশত কুড়িটি সিঁড়ি অতিক্রম করে উপরে ওঠা যায়। বুলান্দ দরওয়াজার সৃষ্টি হয় এক বিশেষ বিজয় উৎসবকে স্মরণীয় করে তুলতে। খান্দেশের যুদ্ধজয়ের পর এই বিশাল গেটওয়ের রচনা সুরু হয়।

বুলান্দ দরওয়াজার দেওয়ালে অনেক বাণী উৎকীর্ণ করা আছে। তার মধ্যে ভগবানের পুত্র যীশুখ্রীষ্টের একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য :

. . . . 'So said Jesus, on whom be peace! The world is a bridge; pass over it but build no house on it. . . .'

যীশুর এই বাণী কোথা থেকে গৃহীত হয়েছে তা জানা শক্ত। কিন্তু এই প্রসঙ্গে Sleeman সাহেবের উক্তি বাদশাহের ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সহিষ্ণুতার সাক্ষ্য বহন করে। Sleeman লিখেছেন :

. . . . 'Where this saying of Christ is to be found, I know not; nor has any Mahomedan yet been able to tell me; but the quoting of such a passage in such a place is a proof of the absence of all bigotry on the part of Akbar'—

বুলান্দ দরওয়াজার দ্বারগুলি আপীত বর্ণ গ্রানাইট পাথরে নির্মিত। সুদক্ষ শিল্পীর হাতের খোদাই-করা রূপসজ্জার তার উপর এক বিচিত্র সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটেন করেছে।

ফতেপুর সিক্রীর মসজিদ বা Cathedral mosque দেখে ফার্গুসন বলেছিলেন 'Grandest mosque' আকবরের সৃষ্টি ফতেপুর সিক্রীর নানা সৌধ এবং অট্টালিকার মধ্যে এটি একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। চৌকো এবং উঁচু উঁচু অনেকগুলি থাম বা স্তম্ভের গায়ে নানা রকম খোদাইয়ের কাজ। এর
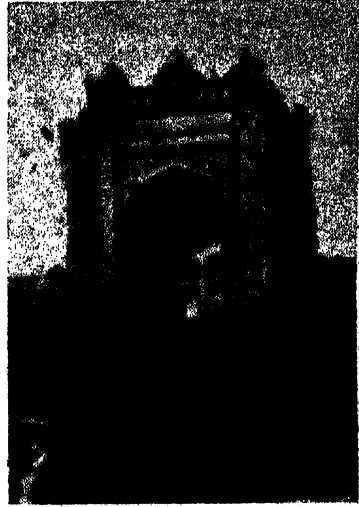
বুলান্দ দরওয়াজা

বাইরের খানিকটা অংশ লাল বেলেপাথরের এবং অন্যগুলি মার্বেল পাথরে বাঁধানো। দেওয়ালগাত্রে রঙের কাজ এবং জ্যামিতিক ধাঁচের নানা চিত্রে পরিপূর্ণ।

এই মসজিদে বসে নানা ধর্মমূলক আলোচনা করতেন বাদশাহ। জানা যায় একটি ঐতিহাসিক দলিলের সৃষ্টি এই মসজিদে বসেই সম্পন্ন হয়। এই দলিলে মোল্লারা সই করে জালালুদ্দীন মহম্মদ আকবর, বাদশাহ-ই-গাজীকে ধর্মের অধিনায়ক বলে ঘোষণা করেন।

ফতেপুর সিক্রীর এই মসজিদটি সেখ সেলিম চিস্তির সম্মানেই বাদশাহ রচনা করেন।

ক্যাথেড্রল মসজিদের পিছনে একটি ছোট্ট সমাধি বেষ্টনীর মধ্যে রয়েছে। এর সঙ্গে একটি অলৌকিক কাহিনী জড়িয়ে আছে। সেখ সেলিম চিস্তির ছয়মাস বয়স্ক একটি পুত্র পিতার সঙ্গে এক অজানা উপায়ে কথা বলে এবং নিজের জীবন বাদশাহের জন্য উৎসর্গ করতে চায়। খোদা যেন শিশুর জীবনের বদলে আর একটি শিশু পাঠিয়ে দেন বাদশাহের কাছে। নতুন জীবন যেন দীর্ঘজীবি ও প্রবর্ধমান সাফল্যে অনুপুর হয়ে ওঠে।

সেই ছোট্ট শিশুটির মৃত্যুর নয়মাস পরেই মরিয়ম-উজ্-জমানীর কোলে জাহাঙ্গীর জগতের আলো দেখলেন। অদ্যাবধি সেই ছয়মাস-বয়স্ক শিশুটির বলেই গাইড নির্দেশ করে।

ফতেপুর সিক্রীতে আরও রয়েছে আবুল ফজল, ফৈজী ও বীরবলের জন্য নির্দিষ্ট প্রাসাদ। রাজা বীরবল—হাস্যরসিক এবং উপস্থিত বুদ্ধিমত্তার অধিকারী হিসাবে ইতিহাসে যিনি সুপ্রসিদ্ধ। বীরবলের প্রাসাদ একটি দ্বিতল গৃহ। নীচের তলায় চারটি ঘর এবং উপরের তলায় ঘরের সংখ্যাও ঠিক চারটিই। মাথার উপর গম্বুজাকৃতি ছাদ। বীরবলের প্রাসাদ আকৃতিতে ক্ষুদ্র হ'লেও নৈপুণ্য ও শিল্প-রূপায়ণে সার্থক অভিব্যক্তি। Keene সাহেব মুগ্ধ হয়ে এর সম্বন্ধে লিখেছেন—

'It seems as if a Chinese ivory worker had been employed upon a Cyclopean monument.'

সমস্ত সৌধটি পাথরের, এক টুকরো কাঠের সাহায্য কোথাও নেওয়া হয় নি। ভিক্তর হিউগো এর সম্বন্ধে সুন্দর একটি উক্তি করে গেছেন—

. . . .'If it was not the most diminutive of palaces it was the most gigantic of Jewel cases.'

বীরবলের এই প্রাসাদটি সত্যিই রাজা বীরবলের জন্য নির্দিষ্ট ছিল কি না এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে। এই প্রাসাদটি বাদশাহের হারেমের বেষ্টনীর মধ্যে সুরুতে অবস্থিত ছিল। আবুল ফজলের মতে আকবর রাজা বীরবলের জন্য একটি গৃহ রচনার আদেশ দেন এবং ১৫৮২ খ্রীঃ এটি সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু স্মিথ সাহেব এই সৌধটির এক অংশ হ'তে আবিষ্কৃত একটি inscription বা লিপি থেকে দেখিয়েছেন যে, বীরবলের প্রাসাদ নামে পরিচিত এই অট্টালিকাটি ১৫৭২ খ্রীঃ রচিত হয়।

রাজা বীরবল বাদশাহের প্রিয়পাত্র ছিলেন। কিন্তু তাই ব'লে হারেমের কাছাকাছি তার প্রাসাদ নির্দিষ্ট হবে এটা ভাবাও ঠিক নয়। দ্বিতীয়ত আবুল ফজল ও ফৈজীর প্রাসাদের কাছে বীরবলের প্রাসাদ কোন তুলনায় আসে না, বীরবলের প্রাসাদ অনেক সুন্দর, কারুকার্য, গঠনে এবং রূপায়ণে একক ও অনন্য।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে মনে হয় যে, বীরবলের প্রাসাদ আকবরের কোন বেগম সাহেবার আবাস ছিল। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে রাজা বীরবলের কন্যা আকবরের বেগম হয়েছিলেন, কিন্তু এই অভিমত নানা কারণে গ্রহণযোগ্য নয়।

ফতেপুর সিক্রীর হিরণ মিনার অবশ্যই উল্লেখের দাবি রাখে। কিংবদন্তী বলে যে, বাদশাহ তাঁর একটি প্রিয় হস্তীর স্মৃতিতে এই মিনার সৃষ্টির আদেশ দেন। প্রায় ৭২ ফুট উঁচু (কারও কারও মতে ৮০ ফুট) এই মিনার বা মিনারিকার (minaret) সমস্ত গাত্রে নকল হাতীর (পাথরের নির্মিত) দাঁত প্রোথিত রয়েছে। পেরেকের মত পোঁতা এই হাতীর দাঁতগুলি মিনারিকাটিকে এক অদ্ভুত সাজে সজ্জিত করেছে। শীর্ষদেশে Cupola-র মত একটি আচ্ছাদন। সম্ভবত এখান থেকে বাদশাহ শিকার করতেন। কাছাকাছি একটি হ্রদ এবং এর সংলগ্ন জমি চতুষ্পদদের বিচরণভূমি ছিল।

ফতেপুর সিক্রী দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল। এর হাতীপোল বা Elephant gate, Sangin Burj, সরাইখানা, হৌজ, অনুবাতালাও, Baoli বা পুষ্করিণী এবং হ্রদ সবকিছুই দর্শকের চোখে নয়নমুগ্ধকর ব'লে মনে হ'তে পারে।

আজকের ফতেপুর সিক্রী চার শত বৎসর আগেকার একটি সুন্দর স্বপ্নের প্রেতচ্ছায়া। মাত্র সতের বৎসর সেখানে ছিলেন আকবর। জঙ্গল এবং হিংস্র প্রাণী নির্মূল করে ফতেপুর সিক্রীতে বাদশাহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এক চঞ্চল, মুখর, জীবনময় নগরী। কিন্তু সবই অল্প সময়ের জন্য। আকবরের পর আর কোন মোগল বাদশাহ ফিরে যান নি ফতেপুর সিক্রীতে পুনরায় রাজধানীর সম্মান দিতে। তাই পড়ে রইল ফতেপুর সিক্রী…তার বুলন্দ দরওয়াজা, দেওয়ান-ই-খাস, স্বর্ণমহল ও আরও সৌধ-শ্রেণী নিয়ে। তার ভাঙা অট্টালিকার কোণে কোণে পড়ে রইল বেগম সাহেবা, বাদশাজাদী, শাহজাদা এবং অজস্র পরিজনের পদচিহ্ন…তার প্রাসাদের নানা কক্ষে লুকিয়ে রইল হাসিভরা পরিহাস, কানাকানি, নর্তকী,

দাসী, চতুরিকা নিপুণিকার দলের চটুল চাহনি···তার মাটিতে আকাশে বাতাসে মিশে রইল অকালমৃত্যুর বেদনা।

অকালমৃত্যু বই কি! একটা সাধারণ মানুষের জীবনের চেয়েও কম সময়ে ফতেপুর সিক্রীর গৌরব বিনষ্ট হয়েছিল। তাজা পুষ্পের মত চারিপাশ আমোদিত করে যে নগরী দিনে দিনে বড় হয়ে উঠছিল, অকস্মাৎ এক কঠোর আঘাতে তা যেন হয়ে উঠল বোবা ও নিঃস্পন্দ।

ফার্গুসন ঠিক বলেছেন—

'Taking it altogether, this palace of Fattehpur Sikri is a romance in stone such as few, very few are to be found anywhere; and it is a reflex of the mind of the great man who built it more distinct than can easily be obtained from any other source.'

(৬)

ঘুম ভাঙল খুব ভোরে। দরজায় কে যেন কড়া নাড়ছে।

চোখ মেলেই বুঝতে পারলাম কার ডাক। নিশ্চয় বেড-টি নিয়ে বয় এসে দাঁড়িয়েছে। দরজা খুলেই কিন্তু ভুল ভাঙল, বেড-টি হাতে বয় নয়—সাজি হাতে এক গার্ল এসে দাঁড়িয়ে।

প্রভাতে উঠে যে মুখ দেখলাম তা পাঞ্জাবিনীর। মেয়েটির বয়স বেশী নয়। পঁচিশ-ছাব্বিশের কাছাকাছি। হাতের সাজিতে লেসের নানা কাজ। গৃহিণীর সঙ্গে সে একবার দেখা করবে।

বাইরে এসে বুঝলাম, বেলা হয়েছে। খুব ভোর নেই। তবু সাতসকালে হোটেলের ঘরে পসারিণী তার জিনিষপত্র নিয়ে হাজির হবে কিছুতেই আশা করি নি।

বাথরুম থেকে ফিরে দেখি পসারিণী হাওয়া। গৃহিণীকে ভালমানুষ পেয়ে একগাদা লেসের কাজ গছিয়ে গেছে।

আবার দরজায় টোকা, না, এবার ভুল নয়। প্রথমে বেড-টি হাতে বয়, পরে টাকাওলার মুখটি দরজার বাইরে দেখলাম। খুব সকালে বেরিয়ে পড়া ঠিক করেছিলাম সেকেন্দ্রার পথে।

সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধি। গ্রামের নাম সিকান্দর লোদীর নামের থেকে সুরু হয়েছে। আগ্রা শহর থেকে সেকেন্দ্রা মাইল পাঁচ-ছয় পথ, লাহোর ও কাশ্মীর যাওয়ার যে পথ আগ্রা হ'তে উত্তর-পশ্চিম অভিমুখে গিয়েছে সেকেন্দ্রা তারই একপাশে। পথের দু'পাশে অনেক প্রাচীন ঐতিহাসিক সাক্ষী। নানা সৌধ, অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ। কিছু জানা, কিছু অপরিচয়ের অন্ধকারে লুপ্ত। যেতে যেতে চোখে পড়বে লাল বেলে পাথরে নির্মিত প্রাচীন দিল্লী গেট। ডিষ্ট্রিক্ট জেলের উঁচু দেওয়াল এবং মানসিক রোগগ্রস্ত লোকদের হাসপাতাল ছাড়িয়ে পথ আরও দূর এগিয়ে যাবে। হঠাৎ নজরে পড়তে পারে লাল বেলেপাথরে নির্মিত একটি অশ্বের মূর্তি। লোকেদের মতে প্রতিপত্তিশালী কোন জায়গীরদারের প্রিয় অশ্ব এখানে মারা যায়। সেই অশ্বের স্মৃতিতেই এই মূর্তি নির্মিত হয়েছে। অশ্বের সহিসও একই সময়ে মারা যায়। তার সমাধিও কাছাকাছি রয়েছে।

আকবরের সমাধি বিরাট একটি বাগানের মধ্যে। কিন্তু এই সমাধিসৌধের কাছে পৌঁছবার বহু পূর্বেই এর দীর্ঘ, শুভ্র গম্বুজবিশিষ্ট মিনারিকা (Minaret)গুলি আপনার দৃষ্টিতে পড়বে। উদ্যানটি 'Garden of Bahistabad' নামেই অভিহিত। উদ্যানের চারপাশ উঁচু বেলেপাথরের দেওয়াল দ্বারা বেষ্টিত। প্রত্যেকটি দেওয়ালের মধ্যখানে একটি বিশাল গেটওয়ে বিরাজমান। যে গেটওয়ে দিয়ে আমরা প্রবেশ করলাম সেটিই দর্শনার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট। এটি পশ্চিমদিকে অবস্থিত এবং প্রায় সত্তর ফুট উঁচু। এর গায়ে উৎকীর্ণ এক লিপি থেকে জানা গিয়েছে যে, এই সমাধিসৌধটি ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের সময়ে সম্পূর্ণ হয়।

সেকেন্দ্রার রচনা আকবরের সময়েই সুরু হয়। নিজের শেষ শয়ন কোথায় হবে বাদশাহ তা আগেই করে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সমস্ত শেষ করে যেতে

পারেন নি। আত্মচরিতে জাহাঙ্গীর সেই কথাই লিখে গেছেন। স্থপতি এবং কারিগরের দলকে তিনি নিযুক্ত করেছিলেন। সম্ভবত প্রধান সৌধটির কিছু কিছু; সমস্ত উদ্যানটি এবং চারিপাশের দেওয়াল ও গেটওয়েটি তারই আদেশে নির্মিত হয়। জাহাঙ্গীরের কথায় প্রায় পনের লক্ষ টাকা এই সৌধটির পিছনে ব্যয়িত হয়।

পশ্চিম দিকের গেটওয়ে বা প্রবেশ-পথটির চার কোণে চারটি মিনারিকা ছিল। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে সুরাজমল জাঠের আক্রমণে সেগুলি বিনষ্ট হয়।

সমাধিসৌধটি অনেকটা পঞ্চমহলের ধাঁচের (ফতেপুর সিক্রী)। মোগল-স্থাপত্যের সঙ্গে মিল কম। আচ্ছাদন-বিশিষ্ট বহুতল এই সৌধটি হিন্দু রীতি-সদৃশ কিংবা বৌদ্ধ বিহারের সম্মেলন হলরূপে ব্যবহৃত অট্টালিকার মত। বর্গাকৃতি একটি বেদীর ওপর লাল বেলেপাথরের নির্মিত এই সৌধটি দর্শকের কাছে আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ এবং খুব একটা কারুকার্যমণ্ডিত মনে না হ'তে পারে। কিন্তু এর স্তব্ধ গম্ভীর রূপ এবং বিশালতা সহজেই মনে রেখাপাত করবে। প্ল্যাটফর্ম বা বেদীটি শ্বেতমার্বেলের এবং সৌধটি এর ওপর অনেকটা পিরামিডের আকারে দণ্ডায়মান। নিম্ন তলটির চারপাশেই চওড়া ও বড় বড় খিলান। প্রত্যেক দিকেই সংখ্যায় দশটি। প্রতি কোণেই ছাদের ওপর কাপের আকৃতি-বিশিষ্ট (cupola) গোলাকার শীর্ষ বা গম্বুজ। মধ্যখানের প্রবেশ-পথ দিয়ে প্রস্তরময় শবাধারটি যে কক্ষে আছে সেটিতে ঢুকতে হয়। দেওয়ালের কাজ প্রায় বিনষ্ট। কক্ষের মধ্যে মৃদু আলোকে শ্রেষ্ঠ মোগল সম্রাটের প্রস্তরময় শবাধারটি চোখে পড়বে। শবাধারটি শ্বেতপাথরের এবং এর অবস্থানটি এরূপ যে, মৃতের (বাদশাহের) মস্তকটি পশ্চিমদিকে রাখা হয়েছিল। ফলে, বাদশাহের মুখ পূর্বদিকের প্রতি শেষবারের মত নিবদ্ধ ছিল।

একদা শবাধারটির পাশে বাদশাহের নিত্য-ব্যবহার্য জিনিষপত্রগুলি রাখা হ'ত। তার বই, খাতাপত্র, বসন ও বর্ম কিছুই বাদ ছিল না। হয়ত এগুলি প্রদর্শনীর জন্যই রাখা ছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে সুরাজমল

আকবরের সমাধিসৌধ (সেকেন্দ্রা)

জাঠ সেগুলি রেখে যান নি। তার অবরোধের পরই এগুলি আর পাওয়া যায় নি।

নিম্নতলটির উপর দ্বিতল,…ত্রিতল,…এবং সর্বোপরি পাঁচতলাটি। প্রতিটি তলই বুরুজ, খিলান এবং স্তম্ভ দ্বারা সজ্জিত। উপরের তলাগুলি নিম্নতলার চেয়ে আকৃতিতে ক্ষুদ্র এবং সম্পূর্ণ সৌধটি প্রায় একশত ফুটের মত উঁচু। সর্বোচ্চ তলাটি আচ্ছাদনহীন। এর চার-পাশে মার্বেল পাথরের জাফরী বা চাঁচাবেড়া জাতীয় দেওয়াল, নানা জ্যামিতিক কাজ-সমৃদ্ধ এই সুন্দর বেষ্টনীর প্রশংসা বহু গুণী ব্যক্তিই করে গেছেন।

এই শুভ্র মার্বেল পাথরের বহির্বেষ্টনটির ঠিক মধ্যখানে দ্বিতীয় শবাধারটি। অবস্থিতি হিসাবে এটি নিম্নতলের শবাধারটির ঠিক উপরে। এটিকে 'নকল সমাধিও বলা যেতে পারে। এই প্রস্তরময় দ্বিতীয় শবাধারটি একটি একক মার্বেল পাথর হ'তে রচিত। এর গায়ে সুন্দর খোদাইয়ের কাজ—পুষ্পসম্ভার এবং লিপি নিপুণ শিল্পীর হাতে উৎকীর্ণ হয়েছে। একটি উঁচু বেদীর উপর শবাধারটি রাখা আছে।

এই আচ্ছাদনহীন প্রস্তরময় শবাধারটির উপর শীতের রাতে হিমশীতল বাতাস বয়ে যায়। বর্ষায় মেঘ জল ঢালে, শরতে শিশির পড়ে। বসন্তে পাখী এসে গান গায়। গ্রীষ্মে কালবৈশাখীর মেঘ বিদ্যুতের আলো খেলে। হেমন্তদিনে পাকা ফসলের গন্ধ মৃদুমন্দ বাতাসে ছড়ায়। তখন মনে হয় এই মহান্ সম্রাটের সমাধির ওপর মানুষের হাতে নির্মিত কোন আচ্ছাদনই যোগ্য নয়। ঋতুতে ঋতুতে যে আচ্ছাদনের রং বদল হয়, সেই নীলাকাশই শবাধারটির উপযুক্ত ছাদ, বা শীর্ষবেষ্টনী।

সেকেন্দ্রায় আরও অনেকের অন্তিম শয়ান রচিত হয়েছে। আকবরের দুই কন্যা, ও সম্রাট শাহ আলমের এক পুত্রের সমাধি অন্তকক্ষে রয়েছে।

শীর্ষতলের চারকোণে চারটি গোলাকার গম্বুজ। এগুলি শ্বেতপাথরের নির্মিত এবং শীর্ষদেশটি এনামেল-করা চীনা টালিতে আবৃত। বহুদূর হতে গম্বুজগুলি ভ্রমণকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

যে-কোন দর্শকের কাছেই সেকেন্দ্রা বড় শান্ত, বড় নির্জন বলে মনে হবে। বিরাট উদ্যানটিতে কিছু কিছু পুরাতন গাছও রয়েছে। তাজমহলের মত ভিড় এখানে নেই। ঘুরতে ঘুরতে মনে হবে চারশত বৎসর আগেকার সেই পুরাতন দিনগুলিতে আবার আপনি ফিরে গিয়েছেন, যখন মোগল সৈন্যবাহিনীর পদভারে উত্তর ভারত কম্পিত হ'ত। সামনে থেকে বাদশাহ নিজে সৈন্য পরিচালনা করতেন, সেই সব দিনগুলির কথা প্রায়ই আপনার মনে উঁকি দেবে। আপনাকে সারাক্ষণ নিমগ্ন করে রাখবে।

বিশালতা এবং গাম্ভীর্যে সেকেন্দ্রার সমাধিসৌধ সকলের উপরে। এই শান্ত নির্জন পরিবেশ, এই বিষাদ-মন্থর অপরাহ্ন, হেলে পড়া বেলায় এই গম্ভীর মহিমময় রূপ দেখে সদাই মনে হবে যে, সেকেন্দ্রা নিঃসন্দেহে মোগলসম্রাট আকবরের উপযুক্ত সমাধিক্ষেত্র। টমাস হারবার্ট তাঁর Travels in India, Africa etc গ্রন্থে লিখেছেন—

'Such a monument
The sun through all the world sees none more great.'

শুধু সমাধিসৌধ নয়। সেই মানুষটিও ছিলেন মহান। তাই Sleeman লিখতে পেরেছেন,—

'Akbar has always appeared to me among Soverigus as Shakespear was among poets and feeling as a citizen of the world I revered the marble slate that covers his bones more perhaps than I should that one of any other Soverigus with whose history I am acquainted.'

মহান্ মানুষটির উপযুক্ত সমাধিসৌধ। সেকেন্দ্রা নিঃসন্দেহে গৌরব, গাম্ভীর্য, বিশালতা ও মহিমায় এরূপ ও অনন্য।

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

কন্‌ট্রোল-কণ্টক

বিগত মহাযুদ্ধের সময় আমাদের প্রথম পরিচয় ঘটে 'কন্‌ট্রোল' অপদেবতার সঙ্গে। তৎকালীন ইংরেজ সরকার চাউল, আটা, চিনির মাথাপিছু বরাদ্দ স্থির করিয়া রেশনিং-এর দোকান হইতে ঐসব সামগ্রী বিক্রয়ের সরকারী ব্যবস্থা ও নির্দ্দেশ চালু করিল। অনতিবিলম্বে রেশনিং-এর আওতায় ধুতি শাড়ী এবং অন্যান্য সর্ব্ববিধ অবশ্য-প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদিও পড়িল। সরকারী রেশনের দোকান হইতে বিক্রয়ের ব্যবস্থা না করিয়া—কেরোসিন ও কয়লার দরও সরকার হইতে বাঁধিয়া দেওয়া হং। প্রথমে এইভাবে 'কন্‌ট্রোল' ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত হইল। এবং এইভাবে অত্যাবশ্যক খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য সামগ্রীর দর বাঁধিয়া দিয়া এবং রেশনের সরকারী দোকান হইতে বিক্রয়ের ব্যবস্থা দ্বারা তৎকালীন সরকার হয়ত দ্রব্যমূল্য প্রতিরোধ করিয়া জনসাধারণের প্রতি সরকারী কর্ত্তব্য কিছু পরিমাণে প্রতিপালন করিতে চাহিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা যাইতে পারে যে, বিগত যুদ্ধকালীন সঙ্কটে সরকারকে নিজের স্বার্থেই এ-কাজে ব্রতী হইতে হয় একান্ত বাধ্য হইয়াই। দ্রব্য-মূল্যের বিষম চাপ হইতে সেই সময় যদি অন্তত কিছু পরিমাণ স্বস্তি জনগণকে দিতে না পারা যাইত, তাহা হইলে অনাহারী প্রজাকুল দেশ জুড়িয়া এমন এক অশান্তি এবং বিক্ষোভের আগুন জ্বালাইত, যে-আগুন হয়ত ভারতে ব্রিটিশ-রাজকে ছারখার করিয়া দিত। এই ভয়াবহ সম্ভাবনার কারণে ব্রিটিশ সরকারকে নেহাত চাপে পড়িয়াই প্রজাহিতের প্রতি অবহিত হইতে হয়—মানুষের, ভারতীয়-মানুষের প্রতি নিছক করুণার জন্য নহে।

কিন্তু প্রবলপ্রতাপ ব্রিটিশ সরকার এত করিয়াও 'কন্‌ট্রোল' প্রথাকে সার্থক করিতে পারেন নাই—কিছু কালের মধ্যেই এই কন্‌ট্রোল অর্জ্জন করিল শোচনীয় ব্যর্থতা এবং এই ব্যর্থতার সঙ্গে দেখা দিল 'কালোবাজার' নামক একটি অভিশাপ—যে অভিশাপ আজ স্বাধীন ভারতে এক বিরাট্‌ দানবীয় আকার পরিগ্রহ করিয়াছে। প্রথম পর্য্যায়ে কন্‌ট্রোল জনগণের হয়ত কিছু সুবিধা, কিছু উপকার করিয়াছিল, কিন্তু অনতি-বিলম্বে দেখা গেল যে 'কন্‌ট্রোল' দেশের এবং মানুষের অপকার করিল তাহার হাজারগুণ। প্রমাণিত হইল: অসার্থক মূল্য ও দ্রব্য নিয়ন্ত্রণই—কালোবাজার এবং কালোবাজারীর জন্মদাতা, স্রষ্টা।

অসৎ এবং নীতিভ্রষ্ট ব্যবসায়ীরা এই 'নিয়ন্ত্রণ ও কন্‌ট্রোল'-এর কল্যাণে আবিষ্কার করিল অতিলাভের, মুনাফা শিকারের একটা গোপন সিংহদ্বার! সরকারী নির্দ্দেশে ব্যবসায়ীরা বাঁধা-দরে পণ্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হইল সত্য কথা—কিন্তু এই নির্দ্দেশের ফলে ক্রেতা-সাধারণ তাহাদের পছন্দ ও প্রয়োজন মত সামগ্রী ক্রয় করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল। রেশনের এবং 'ফেয়ার-প্রাইস্‌' দোকানে যে সামগ্রী যতটুকু পাওয়া যাইত, গুণাগুণের বিচার না করিয়া, ক্রেতাকে তাহাই লইতে, ক্রয় করিতে বাধ্য হইতে হইত। এই সব দোকানে—দ্রব্যমূল্য খানিকটা কম হইত সত্য কথা, কিন্তু ক্রেতার পছন্দ-অপছন্দের কোন অবকাশ ছিল না। এবং এই কারণেই: যে মিহি কাপড় চাহিত তাহার ভাগে জুটিত মোটা কাপড়; আর যে মোটা কাপড় চাহিত তাহাকে মিহি কাপড় লইয়া কাজ চালাইতে হইত। যে আতপ চাল চায় তাহার ভাগ্যে হয়ত জুটিত সিদ্ধ চাল আর যে সিদ্ধ চালের প্রত্যাশী মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও ও সে এক কণাও সেই চাল পাইত না। শুধু তাহাই নয়, চাল যা-ও বা পাওয়া যাইত তাহাতে থাকিত প্রচুর ক্ষুদ, বিস্তর তুষ ও ধান এবং অপর্য্যাপ্ত কাঁকর। কাপড় ত পছন্দসই হইতই না, তাহার উপর ছেঁড়া কাটা দাগী নানা দোষ থাকিত, বদল-ফেরতের কোনও ব্যবস্থা ছিল না।

এ অবস্থায় যাহা হইবার তাহা হইল। ধূর্ত্ত ব্যবসায়ী গোপনে ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন

পণ্য সরবরাহ করিবার দায়িত্ব লইল, কিন্তু দাম হাঁকিল চতুর্গুণ। প্রকাণ্ড বাজারের অন্তরালে একটা বিরাট্ কালো-বাজারের সৃষ্টি হইল। সেখানে নিয়ন্ত্রিত পণ্য যে-কোনও পরিমাণে পাওয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু অত্যন্ত চড়া দামে। নিরুপায় হইয়া লোকে সেই চোরা-বাজারের কবলেই আত্মসমর্পণ করিল। জিনিষের দাম কমাইবার যে অভিলাষ সরকারের ছিল সেইটাই পণ্ড হইয়া গেল। নথিপত্র অবশ্য ঠিক রহিল কিন্তু তাহাতে যে দাম লেখা হইল সেটা একান্তই অবাস্তব। কাজেই ক্রেতা না পাইল হ্রাসমূল্যের সুবিধা, না পাইল ইচ্ছামত সওদা করিবার সুযোগ। কনট্রোল ও রেশনিং-এর রন্ধ্রপথে সমাজজীবনে শনি প্রবেশ করিল। অসাধু ব্যবসায়ীরাই শুধু যে দুই হাতে টাকা লুটিল তাই নয়, দুর্নীতির বিষে জর্জ্জরিত হইল প্রশাসনিক যন্ত্রও। নিয়ন্ত্রণের নববিধান আমলাতন্ত্রের হাতে অবাধ ক্ষমতা তুলিয়া দিয়াছিল—তাহার অপব্যবহারও হইল প্রচুর। অতএব দেখা যাইতেছে কনট্রোলের ইতিহাস কলঙ্কের কাহিনী, দুর্নীতির লজ্জাকর ইতিবৃত্ত।

কেহ যেন মনে করিবেন না পরাধীন ভারতে কন্‌ট্রোলের যে বিকৃতি-ব্যভিচার জনসাধারণের জীবনকে পীড়িত করার সঙ্গে সঙ্গে কন্‌ট্রোলের সহিত জড়িত সরকারী উচ্চ-নীচ কর্ম্মচারীদের দুর্নীতিপরায়ণ করিয়াছিল, স্বাধীন ভারতে আজ তাহা লোপ পাইয়াছে। এখনও দেখা যাইতেছে কন্‌ট্রোল এবং সরকারী-সামগ্রী-বণ্টন-ব্যবস্থা একটা প্রচণ্ড দুর্নীতি এবং কালোবাজারীর পরম বন্ধুরূপেই বিরাজমান রহিয়াছে। শুনা যাইতেছে, আবার হয়ত এই 'কন্‌ট্রোল-মকরধ্বজ' পীড়িত জনগণের কল্যাণে অচিরে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে। আমাদের এখনও বেশ ভাল করিয়াই মনে আছে যে, পরম বিক্রমশালী ব্রিটিশ সিংহও ভারতে, বিশেষ করিয়া এই পোড়া বাঙ্গলা দেশে, আপৎকালে কালোবাজারী-ছুঁচোদের, বধ করা দূরের কথা, দমন করিতেও ব্যর্থ হন। কালোবাজার এবং কালোবাজারের গোপন ব্যাপারীদের শায়েস্তা করা বিশুদ্ধ কংগ্রেসী গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শুদ্ধ উপদেশাবলী এবং নীতিবাণী প্রচারে সম্ভব নহে।

সরকারের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা আছে—কিন্তু সরকার কিংবা উচ্চতম স্তরের শাসকগণ এই প্রভূত ক্ষমতার কথা হয় জানেন না, আর না হয় এই ক্ষমতা বাস্তবে কার্য্যকালে প্রয়োগ করিবার শক্তি তাঁহারা ধরেন না, কিংবা ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে ভয় পাইতেছেন। শ্রীনন্দা অভিজ্ঞ এবং দক্ষ ব্যক্তি—কন্‌ট্রোল-বিষয়ে আর নূতন তথ্য আবিষ্কারের চেষ্টা না করিয়া, যদি কালোবাজার এবং কালোবাজারীদের দমন করিতে সরকারী অস্ত্রাগারের ভীষণতম অস্ত্র প্রয়োগ করেন কোন প্রকার দুর্ব্বলতা এবং ব্যক্তি-বিচার না করিয়া, একমাত্র তাহা হইলেই হয়ত দরিদ্র অসহায় দেশবাসী খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ পাইবে।

কালোবাজারে ছুঁচা কাহারা—সরকারী মহলের তাহা মোটামুটি অজানা নহে। সরকারের অধীন পুলিসরূপী শিকারী-বিড়াল বাহিনীও বর্ত্তমান। এই বিড়াল-বাহিনী কি 'কালো' ছুঁচাকুল উৎখাত করিতে পারে না? বাধাটা কোথায় অনুমান করা যায়। 'বিড়াল' কেন ছুঁচা মারে না, তাহা বহুজনের বেশ ভাল করিয়াই জানা আছে। ছুঁচাও বিড়ালকে পোষ মানাইবার মন্ত্র এবং যন্ত্র দুইই জানে।

কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রীর 'যুদ্ধ-ঘোষণা'!

সংবাদে দেখা গেল—কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় ব্যবসায়ীদের চরিত্র সংশোধন করিয়া সৎ হইবার জন্য দয়া করিয়া তিনমাস সময় দান করিয়াছেন! অর্থাৎ আগামী অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি যদি দেখা যায়, ব্যবসায়ীরা তাহাদের চরিত্র সংশোধন করিয়া ভদ্রলোক সাজিতে পারে নাই, তাহা হইলে কেন্দ্রীয় খাদ্য-মন্ত্রী মহাশয় তাহাদের অবশ্যই 'খতম' করিবেন। আর যদি তাহা না পারেন, তাঁহা হইলে তিনি নিজেই 'খতম' হইবেন! কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই যুদ্ধ-ঘোষণাতে ব্যবসায়ীরা ঘাবড়াইয়া যাইবে—এমন সম্ভাবনা নাই। কারণ ইতিপূর্ব্বে অন্যান্য কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রীরা এই প্রকার ফাঁকা আওয়াজ করেন—কিন্তু ঘোষণামত কার্য্য করিবার পূর্ব্বেই নিজেরাই 'খতম' হইয়া যান।

দুষ্ট নীতিহীন ব্যবসায়ীদের তিন মাস সময় দানের মর্ম্ম আমাদের মত মূর্খ লোকেদের পক্ষে বুঝা অসম্ভব। দুষ্ট ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে মন্ত্রী মহোদয় যদি নিঃসন্দেহ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে কালবিলম্ব না করিয়া তাহাদের দমন করিতে কি কোন প্রকার প্রশাসনিক বাধা আছে? দেখিয়া মনে হইতেছে খাদ্যশস্য, বস্ত্রাদি, তৈল এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীদের মন্ত্রী মহাশয় কিংবা মহাশয়গণ আগামী তিনমাসকাল একটা মওকা দান করিলেন—প্রকারান্তরে যেন তাহাদের বলা হইল—"হে অসৎ ব্যবসায়িগণ! আগামী তিনমাসের মধ্যে যে

যাহা পার লুটিয়া লও, ইচ্ছামত কালোবাজারের পরিধি বিস্তার করিয়া মুনাফা শিকারের ক্ষেত্র বিস্তৃত কর। কিন্তু সাবধান!—তিনমাস পরে তোমরা অবশ্যই ভদ্র, সৎ এবং নীতিপরায়ণ ব্যবসায়ীরূপে বাজারে বিচরণ করিবে।"

আমরা এই প্রকার আপোষমূলক সরকারী নীতির মর্ম বুঝিতে পারি না। বারবার এই প্রকার ক্লীব এবং আপোষ-করা নীতি যেন সরকারের পেশা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্তমান বিষম সঙ্কটকালেও সরকারের এই নীতি আবার প্রকট দেখা যাইতেছে। এ-বিষয়ে 'যুগান্তরের' মন্তব্য উদ্ধৃত করা কর্তব্য বলিয়া মনে করি:—

"অতিমুনাফার ব্যাপারে আপোষমূলক এই নীতি অবশ্য নূতন নয়। গত মাসের শেষে সর্বভারতীয় খাদ্যশস্য ব্যবসায়ী সম্মেলনে গরম-গরম বক্তৃতার পরই তিনি ভরসা দিয়াছিলেন যে, চরিত্র সংশোধনের জন্য আর একটি সুযোগ দেওয়া হইবে। আগামী বৎসর আমন ফসল উঠিবার পূর্ব পর্যন্ত সরকার হাত গুটাইয়া থাকিলে সোনায় সোহাগার সমাবেশ ঘটে। কারণ, তার আগেই তাহারা আখেরের সুরাহা করিয়া লইতে পারে। মাত্র খাদ্যশস্য নয়, কাপড় ও সূতা সম্পর্কেও কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর কিছুটা দর চড়াইতে দেওয়ার এবং তিন মাস নিষ্ক্রিয় থাকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইতিমধ্যে ভারতের সর্বত্র দুর্গাপূজা, গণেশপূজা, দশহরা, দেওয়ালী প্রভৃতি বড় বড় উৎসব সম্পর্কে কাপড়ের বিরাট মরশুম পার হইয়া যাইবে—মহাজনরাও এ সময়টা পুরাণো কৌশলের চরম কৃতিত্ব দেখাইতে পারিবে। তারপরেও যে মেপালের পালে বাঘ পড়িবে—সে কথাটুই বা কে বলিতে পারে? অন্ততঃ সুযোগসন্ধানীদের অতীত অভিজ্ঞতা ইহার প্রতিকূল।"

কিন্তু এই 'তিন মাস'-কাল জনসাধারণ কি করিবে, কি ভাবে সংসারের প্রাত্যহিক দায় ঠেকাইবে—সরকার বাহাদুর সে-বিষয়ে আমাদের কোন হিতবাণী বলেন নাই। আমরা কি এই তিন মাস পেটে খিল দিয়া, ছিন্নবসন পরিধান করিয়া তিন-মাস-পরের আগামী সুখের দিনের জন্য উপবাসে তপস্যা-মগ্ন থাকিব? চোর, জুয়া-চোর এবং হত্যাকারীদের এইভাবে তিন মাস সময় দান যেন একটা বিরাট নির্দয়-নির্মম সরকারী পরিহাস বলিয়া মনে হইতেছে। দ্রব্যমূল্য আকাশ-সমান বৃদ্ধি পাওয়াতে সাধারণ মানুষের প্রকৃত অবস্থা কি, সুখাসীন এবং রেশন-ভাবনা-চিন্তামুক্ত মন্ত্রী মহাশয়দের বুঝিবার কথা নহে। কাজেই তাঁহাদের পক্ষে কদাচারীদের সদাচারী হইবার জন্য তিন মাস কেন, তিরিশ বৎসর সময় দানও যথোচিত এক মানবিক মহৎ ধর্ম বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতে অবশ্যই বাধ্য। জঠর-প্রদাহ কি এবং তাহার জ্বালা কতখানি—তাহা হৃদয়ঙ্গম করা পূর্ণ-জঠরীদের পক্ষে কদাচ সম্ভব নহে।

ভারতবাসী আমরা এক-জাতি-এক প্রাণ—কিন্তু:

পশ্চিমবঙ্গে সরিষার তৈল, মাছ এবং চাউল এই তিনটি অবশ্য এবং নিত্য প্রয়োজনীয় (অবাঙ্গালী ভারতীয়দের মতে বোধ হয় বিলাস-সামগ্রী) বস্তুর অভাবের কারণে আজ এ রাজ্যের জনগণকে (বাঙ্গালী) প্রচণ্ডতম দুর্দশায় পড়িতে হইয়াছে, কিন্তু ভারতের অন্যান্য রাজ্য হইতে এই সব সামগ্রী বাঙ্গলায় আমদানির ব্যাপার লইয়া অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে বিষম এক দর কষাকষির উদ্ভব হইয়াছে। অন্যান্য রাজ্য (এবং রাজ্য সরকারও কতকটা) পশ্চিম বাঙ্গলার এই পরম দুঃখ-অভাবের কথা জানিয়াও ন্যায্য দরে চাউল, মাছ এবং সরিষার তৈল (কিংবা সরিষা) পশ্চিমবঙ্গে পাঠাইতে (রপ্তানি?) গররাজি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার উক্ত কয়টি বস্তুর যে মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন—সে মূল্য নাকি রপ্তানিকারক রাজ্যগুলির পক্ষে যথেষ্ট নহে, অর্থাৎ তাহাদের মনোমত মুনাফা তাহারা লুটিতে পারিবে না। এই মনোভাব অন্যান্য রাজ্য সরকার এবং ব্যাপারীদের পক্ষে যে অতি যুক্তিযুক্ত তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই—কারণ অন্যান্য রাজ্য যখন স্পষ্টই দেখিতেছে যে, কালোবাজারী এবং মুনাফা-হাজর পশ্চিম বাঙ্গলার বাঙ্গালী জনসাধারণকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিয়া তাহাদের কালো-অর্থের গোপন ভাণ্ডার প্রকাশ্যভাবে স্ফীত করিতে কোন বাধা পাইতেছে না, সেই সময় অন্য রাজ্যগুলি এবং সেই সব রাজ্যের ব্যাপারীরা লুটের এমন সুবর্ণ সুযোগ কেন, কোন্ কারণে ছাড়িয়া দিবে? পশ্চিমবঙ্গে কিছু কাল হইতে যে অতি এবং অন্যায় লাভের মওকা সর্বশ্রেণীর প্রায় সকল খাদ্যসামগ্রীর ব্যাপারীরা পাইয়াছে, সে মওকা হইতে অন্যান্য রাজ্যের ব্যাপারীদের এবং ক্ষেত্র-বিশেষে অন্যান্য রাজ্য সরকারকে বঞ্চিত করিবার কোন যুক্তি বা দাবি আমাদের নাই এবং তাহা থাকাও অন্যায়!

সরিষা এবং সরিষার তৈলের ব্যাপারে বিহার এবং উত্তর প্রদেশ; মৎস্যের ক্ষেত্রে উত্তর-প্রদেশ, অন্ধ্র, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্যগুলি বেসুরা গাহিতেছে। মৎস্যের ব্যাপার—আরও চমৎকার! উক্ত রাজ্যগুলি কেবল অন্যায্য মূল্য দাবিতেই ক্ষান্ত নয়, তাহারা কলিকাতা এবং অন্যান্য শহরে পাইকার হিসাবে ব্যবসায় চালাইবার দাবিও পেশ করিয়াছে। সোনায় সোহাগা হইয়াছে কেন্দ্রীয় সরকার ও-জি-এল মারফৎ পূর্ব্ববঙ্গ হইতে মৎস্য আমদানি বন্ধ করিবার প্রস্তাব করাতে। এই প্রস্তাব কার্য্যকর হইলে—মনেপ্রাণে-এক এই আমাদের মহাভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলি তাহাদের মূল্য দাবির, পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করিবার, পশ্চিমবঙ্গবাসী বাঙ্গালীদের জীবন আরও দুর্ব্বিষহ করিবার—সুবর্ণ নহে—'হীরক'-সুযোগ পাইবেই।

পৃথিবীর অন্য কোন বড় রাষ্ট্রে এমন বিচিত্র ব্যাপার কেহ দেখিতে পাইবেন না, যেখানে একটি রাজ্য বা প্রদেশ অন্য প্রদেশের বিরুদ্ধে এমন নিষ্ঠুর এবং অমানুষিক ব্যবস্থার দাবি করিতে সাহস করে। কেন্দ্রীয় সরকার, প্রায়ই দেখা যায়, এই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের শাসন-পরিচালন ব্যাপারে অযথা এবং সংবিধান-বিরুদ্ধ হস্তক্ষেপ করিতে সঙ্কোচ-লজ্জা-দ্বিধা বোধ করেন না, কিন্তু যে-ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের সমূহ সর্ব্বনাশ হইবে—সেই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় মহারাজেরা অন্যান্য রাজ্য সরকারকে চাপ দিয়া আমাদের প্রতি সামান্য করুণাবারি সিঞ্চনে এত কার্পণ্য করিতেছেন কেন?

হিন্দী-প্রচার

মহীশূর হিন্দী প্রচার পরিষদে সমাবর্ত্তন-ভাষণে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মিঃ চাগলা বলেন যে, দক্ষিণ ভারত ও বাঙ্গলা যদি স্বেচ্ছায় সম্মতি না দেয় তাহা হইলে হিন্দী প্রচার-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবে। কোন প্রকার জোর-জবরদস্তি হিন্দীর পক্ষে ক্ষতিকর হইবে। কথাগুলি খুবই যুক্তিযুক্ত হইলেও ইহা উগ্র হিন্দীওয়ালাদের মনোমত অবশ্যই হয় নাই। এদিকে কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার হিন্দী চালাইবার এবং অহিন্দীভাষীদের ঘাড়ে চাপাইবার এক প্রকার জোর জবরদস্তি করিতেছেন। যেমন ধরুন—পয়সা, পাঁচ-পয়সা, দশ-পয়সা প্রভৃতিতে কেবল ইংরেজী এবং হিন্দীতেই উপরি-উক্ত 'কয়েন'-গুলির মূল্য খচিত হইতেছে। পোষ্টকার্ড, ইন্‌ল্যাণ্ড লেটার পেপার, মনি-অর্ডার ফরম প্রভৃতি ইংরেজী এবং হিন্দীতে ছাপা হইতেছে। ভারতীর অন্য কোন ভাষা এই সব সরকারী কাগজপত্রে কোন প্রকার মর্য্যাদা পাইতেছে না। রেলের ইঞ্জিনগুলিতেও দেখিতেছি হিন্দী অক্ষরে 'পূঃ রে' (পূর্ব্ব রেলওয়ে) লেখা হইতেছে। অহিন্দী-ভাষী অঞ্চলের রেল ষ্টেশন, পোষ্ট আপিস প্রভৃতির সাইনবোর্ডগুলিতে ইংরেজীর সঙ্গে হিন্দী লেখার বিরাম নাই। বিহারের বাঙ্গলাভাষী অঞ্চলে সব রকম সরকারী-বেসরকারী কাজকর্ম শুধুমাত্র হিন্দীর মাধ্যমেই চলিতেছে—এখানে অহিন্দী-ভাষীদের (সংখ্যাগুরু হইলেও) সুবিধা-অসুবিধার কথা হিন্দীভাষী রাজ্য সরকার কর্ত্তৃপক্ষ—কাতর নিবেদন সত্ত্বেও—বিবেচনা করা কর্ত্তব্য মনে করেন নাই। ইহাকে জবরদস্তি ছাড়া আর কি বলা যায়? বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার মাধ্যম এবার হিন্দী হইয়াছে—হাজার হাজার বাঙ্গালী ছাত্রছাত্রীকে একান্ত বাধ্য হইয়াই এবার হিন্দী-জাঁতাকলে পড়িতে হইবে—ইহাকে বোধ হয় কর্ত্তৃপক্ষ জবরদস্তি মনে না করিয়া হিন্দীর স্নেহাঞ্চল বিস্তারই বলিবেন।

১৯৬৫ সাল হইতে কেন্দ্রে হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হিসাবে সিংহাসনে অভিষিক্ত হইবে—ইংরেজীকে আরও কিছুকাল কেবলমাত্র সহযোগী ভাষা হিসাবে একান্ত দয়া করিয়াই চালু রাখা হইতেছে।

আগামী বৎসর হইতে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা ইংরেজী এবং হিন্দীর মাধ্যমেই হইবে, এ যাবত এ পরীক্ষা একমাত্র ইংরেজীর মাধ্যমেই হইতেছিল। ইহার ফলে হিন্দীভাষী ছাত্রছাত্রীদের সবিশেষ সুবিধা হইবে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। অবশ্য কর্ত্তারা বলিয়াছেন যে, অহিন্দীভাষী পরীক্ষার্থীদের যাহাতে অসুবিধা না হয়, সে ব্যবস্থাও তাঁহারা করিবেন। শুনা যাইতেছে, হিন্দীতে যে-সকল ছাত্রছাত্রী প্রশ্নপত্রের জবাব দিবেন—তাঁহাদের প্রাপ্ত নম্বর হইতে শতকরা ৫।১০ নম্বর কম করিয়া ধরা হইবে, কিন্তু এই ব্যবস্থা, মনে হয়, সাময়িক বাধা অতিক্রম করিবার মানসেই হইতেছে—এবং বছর দুই-তিন পরে এই 'moderation' তুলিয়া দিবার পক্ষে কোন বাধা থাকিবে না। থাকিলেও তাহা অগ্রাহ্য হইবে। এ কথা স্বীকার্য্য যে, যাহারা Union Public Service Commission-এ ইংরেজীতে পরীক্ষা দিবে, তাহারা বিদ্যাবুদ্ধির দিক্‌ হইতে (intellectual abilities) শ্রেষ্ঠতর হইলেও, হিন্দী পরীক্ষার্থীদের নিকট 'হারিয়া' যাইবে। কারণ, হিন্দী পরীক্ষার্থীরা পাইবে পলিটিক্যাল সাপোর্ট

অধিকতর—ফলে কি ঘটিবে, তাহা বলার প্রয়োজন নাই। এইটুকু মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সর্ব্ব-ভারতীয় সরকারী চাকুরির ক্ষেত্রে (আই-এ-এস, আই-পি-এস্ প্রভৃতি, দুইটি বিশেষ শ্রেণী বা গোষ্ঠীর সৃষ্টি হইবে। হিন্দীতে পরীক্ষা উত্তীর্ণ চাকুরেরা বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা মর্য্যাদা পাইবে, আর অহিন্দী-ভাষী চাকুরেরা বর্ণেতর জাতি বা শ্রেণী বলিয়া গৃহীত হইবে! এবং ইহার ফলে সে-সকল বিষম সমস্যা, বিশেষ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে বিশেষ "জাতি-বিদ্বেষ" দেখা দিবে—তাহা ঠেকাইবার শক্তি বর্ত্তমান কর্ত্তারা কোথা হইতে পাইবেন?

প্রসঙ্গক্রমে একটি পুরাতন কথার উল্লেখ করা যায়। স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী নেহরু, ১৯৬৫ সাল হইতে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করিবার আলোচনাকালে (বোধ হয় ১৯৬২-৬৩ সালে) ইংরেজীকেও হিন্দীর সমান মর্য্যাদা দিবার জন্য জোর সুপারিশ করিয়া—ইংরেজিকে হিন্দীর সহযোগী রাষ্ট্রভাষা হিসাবে রাখিবার জন্য 'MAY' কথাটির বদল করিয়া "SHALL' করিতে প্রস্তাব করেন, কিন্তু বর্ত্তমান প্রধানমন্ত্রী (তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) লালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রবল আপত্তি তুলিয়া নেহরুর প্রস্তাব নাকচ করেন। ফলে হইল—হিন্দীই ভারতের এক এবং অদ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা এবং কিছুকাল, অর্থাৎ সরকারী মালিকদের মর্জ্জিমত সহযোগী রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ইংরেজী 'মে কন্‌টিনিউ' (English may continue)! পাঠকবর্গকে আশা করি 'মে' এবং 'স্থাল' এই দুই কথার অর্থ তারতম্য বুঝাইতে হইবে না!

১৯৬৫ হইতে সরকারী নথীপত্র, হুকুম-নির্দ্দেশ এবং পত্র ব্যবহার প্রধানত হিন্দীতেই হইবে এবং ইহার কারণে হিন্দী-না-জানা অহিন্দী-ভাষী সরকারী কর্ম্মচারী, এমন কি সচিবদেরও প্রচণ্ড বেকায়দায় ফেলা অতীব সহজ হইবে এবং ইহার ফলে আবার অহিন্দী-ভাষী কর্ম্মী, কর্ম্মচারী এবং সচিবদের পদোন্নতি ব্যাহত হইবে অতি সাংঘাতিক ভাবে।

কিছুকাল পূর্ব্বে হস্তিনাপুরে মুখ্যমন্ত্রীদের হিন্দী সম্পর্কে আলোচনা সভায়—ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রিগণ হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করিবার সপক্ষে মত দেন এবং নিজ নিজ রাজ্যে তাঁহারা কাঁচা বয়সের ছাত্রদের হিন্দী শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা অবিলম্বে চালু করিবার প্রতি-শ্রুতিও না কি দেন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ত হস্তিনাপুর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই প্রতিশ্রুতি কার্য্যকর করেন। টপনি-টিঙ্ক আলোচনা সভার মধ্যমণিগণ (বিশদ করিয়া অহিন্দী-ভাষী মন্ত্রীরা) হিন্দীর সপক্ষে যে মত দেন তাহা সানন্দচিত্তে, না, পার্টির চাপে, পার্টির সংহতি রক্ষার কারণে? মুখ্যমন্ত্রীদের নিকট দেশের স্বার্থ এবং সংহতি অপেক্ষা—পার্টিই কি বড় হইল? এখনও বিলম্ব হয় নাই—হিন্দীর ষ্টীম-রোলার চালাইয়া ভারতকে খণ্ড-বিখণ্ড করিবার অপ-প্রয়াস পরিত্যাগ করিবার সময় এখনও আছে। কথায় কথায় কর্ত্তারা সংবিধান অ্যামেণ্ড করিতেছেন—মাত্র-এক-ভোটের-আধিক্যে গৃহীত হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করার সংবিধানের বিধান বাতিল করা কি এমনই অসম্ভব ব্যাপার? হিন্দীওয়ালারা যদি ভাবিয়া থাকেন—অর্দ্ধপক্ক বিস্বাদ হিন্দী ভাষার লগুড়াঘাতে তাঁহারা রাজত্ব করিবেন, সর্ব্বভারতে তাঁহারাই প্রধান থাকিবেন চিরকাল, তাহা হইলে তাঁহাদের এই দিবা-স্বপ্ন অচিরে ভঙ্গ হইবে!

শ্রীনেহরুর আদর্শ রূপায়ণ!

গত ১৫ই জুলাই বেলা এগারটার সময় পশ্চিমবঙ্গের সকল বিদ্যালয়ে স্বর্গত প্রধানমন্ত্রীর স্মৃতির উদ্দেশে দুই মিনিট নীরবতা পালন করা হইয়াছে এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সচিবের নির্দ্দেশমত পর্ষদের অধীন সকল স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীরা দণ্ডায়মান হইয়া এই শপথ গ্রহণ করেন:

"আমাদের প্রিয় নেতা পরলোকগত জওহরলাল নেহরুর স্মৃতির উদ্দেশে এবং তাঁহার পুণ্য-স্মৃতির স্মারকস্বরূপ আমরা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা শপথ গ্রহণ করিতেছি যে, আমরা সর্ব্বদা তাঁহার মহান্ আদর্শের অনুসরণ করিব, সর্ব্বান্তঃকরণে আমাদের দেশকে ভালবাসিব, সর্ব্বতোপায়ে মাতৃভূমির সেবা করিব, জাতিধর্মনির্ব্বিশেষে আমাদের স্বদেশবাসীর জীবন-ধারাকে উন্নত করার জন্য আত্মনিয়োগ করিব, শান্তি সংহতি সদিচ্ছা সত্যনিষ্ঠা ও সততার মনোভাব সৃষ্টি করিব, অর্থাৎ আমাদের মহান নেতার কাছে যাহা কিছু প্রিয় ছিল তাহার সবই সম্পন্ন করিব।"

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকা এই শপথবাক্য পাঠ করেন।

নেহরুজীর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি এবং তাঁহার মহাপ্রয়াণে আমাদের ব্যথা-বেদনা কাহারও অপেক্ষা কম নহে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও—স্বর্গত রাষ্ট্রনেতা এবং মহামানবের প্রতি লোকদেখান শোকের এই বাহ্য ভক্তি-প্রকাশ আমরা ঘৃণা করি।

নেহরুজীর জীবনী-পাঠ, তাঁহার সম্পর্কে—সহজকথায় সহজ ভাবে, 'বালক বালিকাদের সহজে বোধগম্য হয়, এমন ভাবে কিছু বলার মধ্যে কাহারও আপত্তিকর কিছু থাকিতে পারে না। কিন্তু ঘটা করিয়া যে গুরুগম্ভীর শপথ বালক-বালিকাদের পাঠ করান হইল, তাহার বাস্তব সার্থকতা কি? যে শপথের অন্তর্নিহিত—অর্থ, বয়সে এবং বিদ্যা বুদ্ধিতে পাকা, তথাকথিত শিক্ষক-শিক্ষিকারাও বুঝেন কি না সন্দেহ, বুঝিলেও তাহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া সেই মত কার্য্য করা যাঁহাদের পক্ষে অসাধ্য, বালক-বালিকাদের ঘাড়ে সেই না-বোঝা-শপথের বোঝা চাপান পরিহাস ছাড়া আর কিছুই নয়!

নেহরুর মৃত্যুর পর দেশে এখন প্রচণ্ড নেহরু-ভক্তির শোক-প্রবাহ বহিতেছে, যাহা দেখিয়া মনে হয়—ভারতবর্ষে নাম করিবার মত, পূর্ব্বকালে এবং বর্ত্তমানে—আর কোন মানুষ আবির্ভূত হন নাই। অর্থাৎ নেহরুই প্রথম এবং নেহরুই শেষ! নেহরুজী বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহাকে লইয়া এমন কাণ্ড ঘটিতে দেখিলে তিনি হয় আত্মহত্যা করিতেন কিংবা যে-সব ব্যক্তি তাঁহাকে লইয়া এমন পরিহাস চালাইতেছে, সেই তাহাদের কৃষ্ণ-প্রাপ্তি ঘটাইতেন!

নেহরু যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন মহাত্মা গান্ধীর নাম এবং তাঁহার আদর্শের কথা ও বাণী আমরা অহরহ শুনিতে পাইতাম, কিন্তু নেহরুর পরলোক প্রয়াণের পর আজ সেই মহাত্মাও প্রায় বিস্মৃত, তাঁহার স্থানে আজ বসান হইয়াছে—স্বর্গত নেহরুকে। নেহরুর আদর্শ, তাঁহার বাণী এবং তাঁহার দেশ, জাতি ও মানবসেবার কথাই আজ নেতাদের প্রধান অবলম্বন হইয়াছে। রামধুনের পরিবর্ত্তে আজ দেশে উচ্চরবে নেহরু-ধ্যান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে! অন্য রাজ্যের লোকদের কথা জানি না, কিন্তু আমাদের একদা-শস্য-শ্যামলা এবং বর্ত্তমানে পোড়া-বাঙলায় কি দেখিতেছি? বাঙালী নেহরুকে অবশ্যই স্মরণ করিবে, তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাইবে কিন্তু নেহরুর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা-প্রকাশের বাহ্য আতিশয্যে কি বাঙালী—রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, রামানন্দ, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি মহামানবদের কথা মন হইতে মুছিয়া ফেলিবে? বাঙলা দেশের তথা সমগ্র ভারতের জন্য এই সকল পরলোকগত নেতা তাঁহাদের মনপ্রাণ অর্পণ করেন। বাঙলা দেশের বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কেন এই সব অমরকীর্ত্তি মহাজনদের বাণী এবং জীবনাদর্শ প্রচার করার কথা কেহ মনে স্থান দেন না? বাঙলা এবং বাঙালী জাতির জন্য বিস্মৃতপ্রায় বাঙালী মহামানব এবং নেতারা যাহা করিয়াছেন, জাতিকে বাঁচিবার, মানুষের মত বাঁচিবার, এবং জাতিকে দেহ-মনে সুস্থ-সবল করিয়া গঠন করিবার জন্য যে মন্ত্র দিয়াছেন, নিজেদের জীবনে যে আদর্শকে পূর্ণ প্রতিফলিত করিয়াছিলেন—অসঙ্কোচে বলিতে পারি, স্বর্গত নেহরু—তাঁহাদের সমকক্ষ নহেন, কিন্তু এই কথা বলার জন্য কেহ যেন মনে করিবেন না আমরা নেহরুকে খাটো করিবার প্রয়াস করিতেছি—এতখানি ক্ষুদ্রতা আমাদের নাই। বিশ্বরাষ্ট্রে নেহরুর মত বিশাল ব্যক্তিত্বশালী রাষ্ট্রনেতা এবং রাষ্ট্রনীতিতে সত্য এবং শুদ্ধতার আদর্শ প্রচারকারী অন্য কোন রাষ্ট্রনেতার নাম আমরা জানি না। নেহরুর প্রাপ্য শ্রদ্ধা-সম্মান অবশ্যই দিতে হইবে—কিন্তু তাঁহাকে সর্ব্বকালের এক এবং অদ্বিতীয় ভারতীয় আদর্শবাদী নেতা বলিয়া প্রচার-প্রয়াস, তাঁহাকে কেবল অসম্মান করাই নহে, বিশ্ববাসীর চোখে হেয় করা হইবে।

একান্ত বাধ্য হইয়াই আজ আমাদের এত কথা বলিতে হইল। আমরা যেন নয়া-চীনের আদর্শে ভারতে 'মাও'-পূজার প্রবর্ত্তন না করি। বিধাতা বাঙালীকে বহু অপমান-ভূষিত করিয়াছেন—আর নূতন করিয়া কোন অপমানের প্রয়োজন নাই!

কাল-বৈশাখীর সঙ্কেত

দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, অন্নহীন ক্ষুধার্ত্ত মানুষের ছোট-বড় জনতা জঠর-জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া—গম-চাউল-চিনি প্রভৃতির দোকানের তালা ভাঙ্গিয়া মাল বাহির করিয়া নিজেদের মধ্যে সরকার-নির্দ্ধারিত মূল্যে বণ্টন করিয়া লইতেছে। বলা বাহুল্য—এই 'বে-আইনী' কর্ম্মকে সাধারণ লুঠতরাজের পর্য্যায়ে ফেলা যায় না। এই সব কর্ম্মে যাহারা আজ প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহারা আমাদেরই মত সাধারণ মধ্য এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের লোক এবং ইহারা সাধারণত নিজেদের কোন প্রকার অযথা হাঙ্গামায় জড়িত করে না—করিতে চাহেও না। কিন্তু মানুষের জীবন-মরণ লইয়া যাহারা মুনাফাবাজী করিতেছে—মুনাফার অতি-লোভে যাহারা মানুষকে ক্ষুধার অন্ন হইতে বঞ্চিত করিয়া স্থির মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিতে কোন প্রকার লজ্জা-ঘৃণা অনুভব করে

না—সরকার যখন তাহাদের দমনের, শায়েস্তা করিবার জন্ত মৌখিক বাক্য ছাড়া আর কিছু করিতে পারেন না, করিবার ক্ষমতাও হয়ত নাই, সেই অবস্থায় বেপরোয়া মানুষ নিজেদের হাতে আইন না লইয়া আর কি করিতে পারে? সরকার যে-ক্ষেত্রে ফতোয়া জারি ছাড়া বাস্তবে আর কিছু করিবেন না, সে-ক্ষেত্রে জনগণ অনাহার-দুর্বল-ক্ষীণ-দেহে ধুকধুক-প্রাণপক্ষীটিকে ধরিয়া রাখিবার জন্ত শেষ প্রয়াস অবশ্যই করিবে—এবং যদি করে তবে তাহাদের অপরাধী বলার অধিকার কাহারও নাই, থাকিতেও পারে না।

এই ব্যাপারে কলিকাতার বিখ্যাত দৈনিক 'যুগান্তর' বলিতেছেন:

"সংবাদগুলির গতি দেখিয়া বোঝা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে একটা বিক্ষোভের ঢেউ রীতিমত আগেভাগে জানান দিয়া ছুটিয়া আসার পথ খুঁজিতেছে। বাস্তবিকপক্ষে এই বিক্ষোভ কিছুকাল যাবতই দানা বাঁধিতেছিল। বৎসরের গোড়ার দিকে উত্তর ভারতের খাদ্যশস্তের বাজারগুলিতে কয়েকটি লুঠপাটের ঘটনাও ঘটিয়া গিয়াছে। তথাপি এখন পর্য্যন্ত যদি বড় রকমের কোন দুর্বিপাক ঘটিয়া না থাকে, তার কারণ এই নয় যে, ইতিমধ্যে অবস্থার উন্নতি হইয়াছে। বরং সাধারণভাবে বলিতে গেলে সারা ভারতবর্ষে অবস্থা আরও খারাপ হইয়াছে। সরকারী হিসাবেই দেখা যাইতেছে, প্রতি সপ্তাহে দর চড়িতেছে। নয়া-দিল্লীর হিসাবে গত বৎসরের তুলনায় এই বৎসর জুন মাসের গোড়ার দিকে চালের দাম শতকরা ৯ হইতে ৩৪ ভাগ পর্য্যন্ত এবং গমের দাম শতকরা ১৮ হইতে ১২০ ভাগ পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে। সরকারী পরিসংখ্যানে একথাও স্বীকার করা হইতেছে যে, দাম শুধু চড়িতেছে না, যে-হারে চড়িতেছে তাহাও অভূতপূর্ব্ব। যথা, গত বৎসর যে মাসে সারা ভারতে পাইকারী মূল্যমান বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ১·৪ ভাগ, আর এই বৎসর এই বৃদ্ধির হার দাঁড়াইয়াছে শতকরা ২ ভাগ।"

একথা স্বীকার করিব যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিপীড়িত মানুষের মনে হালে কিছুটা আশার সঞ্চার করিয়াছেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনের নির্দ্দেশে রাজ্য সরকার অবস্থার প্রতিরোধ সক্রিয় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। রাজ্য-এন্‌ফোর্স-মেন্ট বিভাগ ব্যাপকভাবে মজুতদারদের গ্রেপ্তারের সঙ্গে তাহাদের গোপন ভাণ্ডারও আবিষ্কার করিতেছেন—কিন্তু কতটুকু?

"...বিস্ময়জনক ঘটনাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে একথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার যে, (একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ বাদ দিলে) সরকার এখনও প্রত্যক্ষভাবে মজুতদারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। শুধু কতকগুলি ঘোষণা ছাড়া বাজার-দর নামাইয়া আনার আর বিশেষ কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা এখনও লওয়া হয় নাই। শ্রীসুব্রাহ্মণ্যমের নিজেরই ভাষায় বলিতে গেলে, তাঁরা অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে এখনও শুধু "ফোঁস ফোঁসই" করিতেছেন, কামড়াইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। যাহা খাদ্য ও অর্থ দপ্তরের সমস্যা তাহা অনিবার্য্য ভাবেই স্বরাষ্ট্র-দপ্তরে শ্রীগুলজারীলাল নন্দের ঘাড়ে আসিয়া চাপিতেছে। কাজেই "বাজার দরের সমস্যা আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার সমস্যায় পরিণত হইতে চলিয়াছে" বলিয়া নন্দজী আর্ত্তস্বর তুলিয়াছেন। অথচ, বিস্ময়ের এই যে, নন্দজীর চেতাবনীও দিল্লীর যোজনা ভবন পার হইয়া আর কারও কাছে গিয়া পৌঁছিতেছে না। কেননা, বাজারে আগুন লাগিলে জলের বালতি লইয়া ছুটিয়া যাওয়ার দায়টা কার, তা লইয়া নন্দজী ও পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান শ্রীঅশোক মেহ্‌তার মধ্যে চিঠি চালাচালি হইতেছে।"

পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাও যে অতি আশাজনক তাহা কেহই বলিবেন না। গত দুই-তিন মাসে বহু তথাকথিত মধ্য, নিম্ন-মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত মানুষের অবস্থা আরো খারাপের দিকেই গিয়াছে। এ রাজ্যে উপরতলাবাসী নগণ্য কিছু সংখ্যক লোককে বাদ দিলে দেখা যাইবে যে, আজ শতকরা ৯৫ জন লোকই পরিবারের লোকদের একবেলাও আধপেটা আহার দিতে প্রায় অপারগ হইয়াছে। বাজার দর—বিশেষ করিয়া চাউল-ডাইল-তৈল, মাছ, মাংস, ডিম এমন কি তুচ্ছ শাকপাতার দামও আজ প্রায় নব-মহাকরণের চৌদ্দতলায় উঠিয়া মানুষের নাগালের বাহিরে! অন্যত্র যে-সব ঘটনা খাদ্য লইয়া ঘটিতেছে, এ-রাজ্যেও তাহা যে ঘটিবে না এমন মনে করা ভুল।

"...সারা ভারতবর্ষের বাজারে যখন আগুন জ্বলিতেছে তখন দিল্লীতে আমরা শুধু দেখিতেছি, 'আন্ রে', 'চাল্ রে' বলিয়া একে অপরকে ডাকিয়া সোরগোল তুলিতেছেন। শুধু সোরগোলে যদি আগুন নিভিত তা হইলে বাজার-দর এতদিনে নিশ্চয়ই ঠাণ্ডা জল হইয়া যাইত। সমস্যাটা যদি আইন ও শৃঙ্খলারক্ষার সমস্যায় পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াই থাকে তা হইলে

[illegible] অপেক্ষা করিতেছি কি জন্য ? বাজারচোরাও-রীদের উপর প্রয়োগ করার জন্য লাঠি-বন্দুক না নাইয়া, মানুষের খাদ্যাপহারী মজুতদার ও মুনাফা-জদের বিরুদ্ধে আইনের চরম অস্ত্র সাহসের সঙ্গে বহার করা হইতেছে না কেন ?"

একথা সকলেরই জানা উচিত যে, 'হাজার কজেজ-্যাজার' এবং এই 'অ্যাজারই' জমিতে জমিতে ডিনা-ইটের মত ফাটিয়া সব কিছুই অজার করিয়া দিতে রে। সে সম্ভাবনা অদূর দৃশ্যমান।

প্রাসাদ-নগরী কলিকাতা ?

"দুই ঘণ্টা বারিপাতের পর যে শহরের এক প্রান্ত তে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত যানবাহন শুদ্ধ হইয়া যায় ং ডালহৌসি স্কোয়ারের মত বাণিজ্য ও শাসন কেন্দ্র ্যন্ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা অচল হইয়া থাকে, সে কোন্ শের শহর ? এবং এই শহরের ভবিষ্যৎ কি ? অবশ্য ই প্রশ্ন শোনা-মাত্র করপোরেশনের বাবুরা কাঁদুনি হিতে সুরু করিবেন যে, ইদানীং কোন বৎসরই এক গাড়ে প্রায় দুই ঘণ্টা এমন প্রবল বারি বর্ষণের আর ান রেকর্ড নাই। এবং 'এই নগরীতে ঘণ্টায় সিকি ঞ্চর বেশী বর্ষণ হইলে পয়ঃপ্রণালীগুলি তা টানিতে রে না। সুতরাং আমরা কি করিব বলুন ?' অর্থাৎ লকাতার লোক নরকের জলেই ডুবুক, আর চোখের লই ডুবুক করপোরেশনের বাবুরা কিছু করিতে রিবেন না।"

নগর-(উপ-) পিতারা ঘটা করিয়া মিটিং করিতে থাকিবেন এবং আরও টাকা-আরও টাকা দাও য়া রাজ্য সরকারকে জ্বালাইতে থাকিবেন। সোজা য় কলিকাতা করপোরেশনকে তাঁহারা পৈতৃক ্যাধী মনে করিয়া নবাবী করিবেন। এ-এক কারবারে পরিণত হইয়াছে! অনেকের পক্ষে রপোরেশন বিরাট এক অর্থ উপার্জ্জনের ক্ষেত্র!

"......পৌরসভায় যাঁরা আজীবন বড় চাকরি বা মাতব্বরী করিয়াছেন, নগরীর মধ্যে তাঁদের কের প্রাসাদোপম অট্টালিকা তৈরী হয় এবং য়ার করার সময় এক-একজন কুবেরের সম্পত্তি ্যা যান, সে দৃষ্টান্তও আছে। একদিকে এই সব ্বৎকর্ম্মা লোকের অভাব নাই। অন্যদিকে, জল বেশী লে করপোরেশন অপারগ, জলাভাবের সময় কলেরা দিলে তাঁরা অপারগ, আইনের পর আইন ভাঙ্গা রাস্তা পড়িয়া থাকিলে তাঁরা অপারগ এবং পৌরসভার স্কুলগুলি যদি জাহান্নামে যায় তা হইলেও তাঁরা অপারগ। অথচ মজা এই যে, এই প্রকার ব্যর্থতা ও বহু কলঙ্ক সত্ত্বেও তাঁরা প্রত্যেকেই কাউন্সিলার হওয়ার জন্য কাড়াকাড়ি ও মারামারি করিতেছেন এবং এঁদের দয়ায় পৌরসভার মিটিংগুলি অসভ্যতা শিখিবার ট্রেনিং ক্লাসে পরিণত হইয়াছে।"

'অপারগ' শুধু পৌরপিতারাই নহেন—পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারও 'অপারগ' এই করপোরেশনকে বাতিল করিতে। এমন কি 'সদাচার' সমিতি বা সংঘ-সমূহ প্রবল পরাক্রান্ত শ্রীঅতুল্য ঘোষও কলিকাতা করপোরেশনের ভাগ্য-বিধাতা হইলেও—তিনিও 'অপারগ'!

ছোট ছোট প্রায় ২০।২৫টি মিউনিসিপ্যালিটি রাজ্য সরকার বাতিল করিতে এক মিনিট সময় নষ্ট করেন নাই—কিন্তু মহানগরী কলিকাতার প্রতি তাঁহারা এত সদয় কেন ? কলিকাতা করপোরেশনের 'গুণের কথা অকথ্য কথন'—এই কারণেই কি ?

কিন্তু হে ভদ্র কাউন্সিলরগণ! আপনারা যদি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি যে-কোন ব্যাপারেই এমন অসহায় হন তা হইলে আপনারা পদত্যাগ করেন না কেন ? ঐটুকু সৎসাহস কেন আপনাদের নাই যে, আপনারা ব্যর্থতা কবুল করার সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃত্বের আসনও ছাড়িয়া আসিবেন ? স্বাধীনতার পরবর্তী পাঁচ-ছয় বৎসর যখন এই নগরীতে ক্রমাগত হরতাল বা শ্রমিক ধর্ম্মঘট চলিত, তখন প্রত্যেক কর্তাব্যক্তি ক্রমাগত আমাদের শুনাইয়াছেন যে, এই অবস্থা চলিতে থাকিলে শিল্পকেন্দ্র হিসাবে কলিকাতার সর্ব্বনাশ হইবে, সমস্ত বাণিজ্য ও শিল্প এখান হইতে সরিয়া পড়িবে। ঐ সমস্ত শ্রমিক ও রাজনৈতিক দলগুলিকে তখন দেশদ্রোহী এবং অন্তর্ঘাতক পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে। আর আজ সেই আপনারাই এই নগরীকে দুর্ব্বহ, অসহনীয় এবং অচল করিয়া আনিয়াছেন, আপনারা ইহাকে ভারতবর্ষের সবচেয়ে নোংরা, সবচেয়ে অকেজো এবং সবচেয়ে অচল নগরীতে পরিণত করিতেছেন এবং শিল্প-বাণিজ্য এখান হইতে উৎখাত করার বন্দোবস্ত করিতেছেন, আপনারা কি কম অন্তর্ঘাতক ? আপনারা নিজেরা অক্ষম, আপনাদের একটা আবেদন পর্য্যন্ত নিরুপদ্রবে ভদ্রভাবে ঘটিতে পারে না। অথচ

আপনারা সি-এম-পি-ও'কে ক্ষমতা ছাড়িবেন না, গবর্ণমেণ্টকে এক পা অগ্রসর হইতে দেখিলে হাঁ হাঁ করিয়া উঠিবেন এবং এই নগরীর আবর্জ্জনা ও নরকের জল ঘাঁটিয়া নিজেদের কর্ত্তৃত্বের গোড়ায় সার ও জলসিঞ্চন করিবেন। আপনাদের কি লজ্জা নাই?"

এ-প্রশ্ন কাহাদের করিতেছি? স্বয়ং লজ্জা দেবী যাঁহাদের দেখিয়া লজ্জা পাইয়া 'সদাচার'-কমিটি হইতেও হাজার যোজন দূরে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছেন—তাঁহাদের লজ্জা আছে, এমন কেহ ভাবিতেও লজ্জা বোধ করিবেন! করপোরেশনের কাউন্সিলার মোড়লদের এখন একমাত্র মন্ত্র হইয়াছে—"লজ্জা-মান-ভয়"—এই তিনটি তুচ্ছ বস্তুকে 'সদাচার' কমিটির নিকট শ্রীঅতুল্য ঘোষের হেফাজতে 'ফিক্সড্ ডিপজিট' এ রাখা!"

পৌরপিতা সাজিয়া যাঁহারা নগরী চালাইবার দায়িত্ব লইয়াছেন—তাঁহাদের কাজ যদি কেবল প্রতিপত্তি এবং অর্থ উপার্জ্জনই হয় তাহা হইলে এ-ব্যবস্থা আর চলিতে দেওয়া কাহারও পক্ষে উচিত হইবে না। কলিকাতা করপোরেশনের (সাধারণ চলতি নাম 'চোর-পোরেশন) কর্ত্তব্য যদি মেয়র এবং পৌর-পিতারা যথাযথ না করিতে পারেন, তাহা হইলে শেষ পর্য্যন্ত ট্যাক্স বন্ধ করা ছাড়া আর কি উপায় হইতে পারে?

দ্রব্যমূল্য আরও বাড়িবে!

জব্বলপুরে এক ভাষণে শ্রীঅতুল্য ঘোষের শ্রীমুখ হইতে পরম আশার বাণী নির্গত হইয়াছে—"সব রকম সম্পদের সদ্ব্যবহার করিয়া ভারত বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণে ব্যস্ত বলিয়া দ্রব্যমূল্য আরও বাড়িবে।......এখন দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্য যে-ভাবে একেবারে মাথায় গিয়া চড়িয়াছে" (হে জনগণ! তোমরা চিন্তা করিও না)—"আগামী পাঁচ-ছয় বৎসরের মধ্যে তাহা শেষ পর্য্যন্ত নামিয়া আসিবে!"

অর্থাৎ আগামী পাঁচ-ছয় বৎসর মানুষ যদি অর্দ্ধাহারে অনাহারে, সপ্তাহে বা মাসে একবার আহারে কোনক্রমে এই সামান্ত কাল অভাব-অনাহারের ধোলাই সহ্য করিতে পারে, তাহা হইলেই আবার সুদিন দেখিতে পাইবে। বর্ত্তমানে আগামী সেই সুদিনের স্বপ্ন দেখিয়াই আমাদের বাঁচা, ছাড়া আর কিছুই নাই। অতুল্য-কথিত সুসমাচার বর্ত্তমানে অভাবের-দক্রভরা-জনদেহে দক্র-মলমের কার্য্য করিতে বাধ্য! শেষ পর্য্যন্ত শ্রীঅতুল্য ঘোষও—একজন পাকা ইকনমিষ্টও বটেন—দেখা গেল!

শ্রীঘোষ আরও বলেন যে, "......দেশ এখন কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়া চলিতেছে। আমাদেরও এখন কষ্ট স্বীকার করিয়া লক্ষ্যে পৌঁছাইতে হইবে।"—শ্রীঘোষের ভাষণে আরও জানা যায় যে, "পুঁজিপতিরা কংগ্রেস দখল করিয়াছে বলিয়া যে-অভিযোগ করা হয় তাহার মূলে কোন সত্য নাই—" যথার্থ কথা, পুঁজিপতিদের কংগ্রেস দখল করিতে দেওয়া হয় নাই, কারণ: হয় পুঁজিপতিরা কংগ্রেসী হইয়া গিয়াছে আর না হয়—কংগ্রেসীদের এক বৃহৎ অংশ আজ রাষ্ট্রশাসন-ব্যবস্থার দৌলতে নয়া পুঁজিপতিতে পরিণত হইয়াছেন।

শ্রীঅতুল্য ঘোষ এতই জানেন! তাঁহার ভারত-প্রসারী দৃষ্টি প্রদীপের নিচের অন্ধকারটা কি তাঁহার চোখে পড়ে? তাঁহার কথামত, (অকংগ্রেসীদের) আরও কষ্ট অবশ্যই স্বীকার (ভোগ?) করিতে হইবে। কিন্তু এই 'আরও-কষ্টের' পরিমাণটা কি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে শ্রীঘোষকে তাঁহার গুরুদেহ-কিন্তু-হাল্কামন লইয়া, চোখের কাল চশমা খুলিয়া—সদলে রেশনের থলি লইয়া চাউল-তৈল-মাছের দোকানের (মাত্র দু'একদিন) কিউ-এ দাঁড়াইতে বলিব। কিউ-এ দণ্ডায়মান মানুষের সোজা দেহ কেমন করিয়া উল্টা-ইউ-এ পরিণত হইতেছে শ্রীঘোষ তাহা একবার উপলব্ধি করুন। সমগ্র বাঙালী জাতির দেহ অবিলম্বে বাঁকিয়া 'ইউ' হইয়া যাইবে এই কংগ্রেসী সুশাসনের কল্যাণে! মানুষের এই বিষম অবস্থায় শ্রীঅতুল্য তাঁহার পরিহাস-বাণী বিতরণ না করিলে সুখী হইতাম। তিনি হয়ত জানেন না যে মানুষ এখন আর কংগ্রেসী ধাপ্পা, যোঁকাবাজিতে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করে না!

হরতন

শ্রীবিমল মিত্র

॥ ২৪ ॥

কালীচরণ মাইতি বললে, মালো-বৌ প্রথমে কিছু বলে নি আজ্ঞে, আমরাও কিছু জিজ্ঞেস করি নি। জিজ্ঞেস করতে যাবই বা কেন বলুন? মালো-বৌ গোঁসাই-মা'র কাছে থাকত আর সংসারের কাজ-কর্ম্ম করত। সত্যিই সে-বছরে মালো-পাড়ায় খুব ঝড়-বৃষ্টি হয়েছিল কর্ত্তা। আর নদীটারও যে কি হ'ল, সেই থেকে এ-দিক্‌কার পাড় ভাঙতে লাগল আর মামারাকপুরের দিকে ক্ষেত গজিয়ে উঠল। মালো-পাড়াটাই উঠে গেল গাঁ থেকে—

নতুন-বৌ হঠাৎ বললে, তা আমি যে জেলের মেয়ে তার প্রমাণ ত দিতে পারলে না তুমি!

কালীচরণ বললে, আজ্ঞে সেই কথাই ত বলছি মা-জননী! গোঁসাই-মা'র অবস্থা ত তুমি আসার পর থেকেই ভাল হ'তে লাগল কি না, তাই গোঁসাই-মা তোমাকে মা লক্ষ্মীর মত সেবা করতে লাগল। গোঁসাই-মা বলত, এ মেয়ে আমার মা-লক্ষ্মী রে কালীচরণ, একে কিছু বলিস্ নে তুই। তুমি যে তখন কি দুষ্টুই ছিলে মা-জননী। আমাকে কত আঁচড়ে দিয়েছ, কত খামচে দিয়েছ তার ঠিক নেই। আমি তোমাকে মা-লক্ষ্মী মনে ক'রে বুকে তুলে নিয়েছি। গোঁসাই-মা'র জন্যে কিছু বলতে পারি নি, বকতে পারি নি।

দারোগাবাবু বললেন, ও-সব কথা থাক, আসল কথাটা বল—কিসে জানতে পারলে ইনি জেলের মেয়ে—

—বলি, দারোগাবাবু। বুড়ো মানুষ ত, তাই সব কথা গুছিয়ে বলতে পারি নে। একটু ক্ষেমা-ঘেন্না ক'রে নেবেন: সেই মালো-বৌ-এর একদিন অসুখ হ'ল তারপর। অসুখ অমন গাঁয়ে কতই করে, কিন্তু মালো-বৌ-এর সে-অসুখ আর সারল না আজ্ঞে।

—সারল না?

—না আজ্ঞে, সারল না। একদিন মারা গেল আজ্ঞে! আহা, সে-সব দিনের কথা যেন চোখের সামনে ভাসছে আজ্ঞে। মালো-বৌ মারা যাবার আগের দিন আমাকে ডাকলে। বললে, কালীচরণ, আমি ত চললাম, যাবার আগে দুটো কথা বলে যেতাম তোমাকে, না-বললে আর প্রাণটা বেরোচ্ছে না।

আমি সামনে ঝুঁকে পড়ে বললাম, কি মালো-বৌ?

মালো-বৌ বললে, গোঁসাই-মা'কে একবার ডাকো কালীচরণ।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন? কি জন্যে ডাকছ তাঁকে? তিনি ত এখন ঘুমোচ্ছেন।

মালো-বৌ বললে, গোঁসাই-মা'কে না বলে যে আমি যেতে পারছি নে কালীচরণ! আমার পাপের বোঝা যে আর লাঘব হচ্ছে না।

তা কি আর করব। গোঁসাই-মা'কে ডেকে নিয়ে এলাম সেই অত রাত্তিরে।

গোঁসাই-মা সারাদিন খেটে-খুটে ঘুমোচ্ছে তখন অঘোরে।

আমার ডাকাডাকিতে উঠে বললে, কি রে? ডাকছিস্ কেন?

বললাম, মালো-বৌ মর-মর, তোমাকে একবার ডাকছে।

গোঁসাই-মা এল মালো-বৌ-এর কাছে। মালো-বৌ-এর মুখের কাছে মুখ আনতেই মালো-বৌ কি যেন বললে গোঁসাই-মা'কে।

গোঁসাই-মা আমার দিকে চেয়ে বললে, কালীচরণ, যা ত, হারাধন কবিরাজ মশাইকে একবার গিয়ে ডেকে আন ত, বলবি গোঁসাই-মা ডাকতে পাঠিয়েছে, একেবারে মকরধ্বজ সঙ্গে করে নিয়ে আসতে বলবি।

গোঁসাই-মা'র কথা শুনে আমি ত দৌড়ে হারাধন কবিরাজ মশাইকে ডাকতে গেলাম আজ্ঞে, কিন্তু কবিরাজ মশাই যখন এলেন তখন সব শেষ হয়ে গেছে। মালো-বৌ তখন এ-পারের মায়া কাটিয়ে চলে গিয়েছে। তারপর আর কি! সব শেষ!

কিন্তু তখনও আমি আজ্ঞে মালো-বৌ যা বলেছে তাই-ই সত্যি।

আমি একদিন গোঁসাই-মা'কে জিজ্ঞেস করেছিলাম—মালো-বৌ কি কথা বলে গেল তোমাকে গোঁসাই-মা? মরবার আগে কি কথা বলতে তোমায় ডেকেছিল?

অনেক পীড়াপীড়ির পর গোঁসাই-মা বলেছিল, মালো-বৌ বলেছিল এই মা-জননী জল কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে নয়, ওর জাতি জেলেদের বলত মালো, সেই জাতের মালোর ছেলে

সত্য মালোর নিজের মেয়ে এ। পাছে জেলের মেয়ে বললে আমরা ঘরে ঠাঁই না দিই তাই মালো-বৌ বলেছিল কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে—

আমি গোঁসাই-মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তা সত্য মালো নিজের মেয়েকে মালো-বৌ-এর কাছে ফেলে দিয়ে গেলই বা কেন ?

গোঁসাই-মা বললে, সত্য মালোর বৌ মারা গিয়েছিল এই মেয়েটাকে সদ্য বিইয়ে, তাকে দেখবার তখন তার কেউই নেই, সত্য মালো তখন ওদিকে আবার চাকরিও পেয়েছে হাওড়ার পাট কলে, কোথায় রাখে মা-মরা মেয়েকে ? তাই মালো-বৌ-এর কাছে রেখে গিয়েছিল—

সবই আজ্ঞে ভাগ্যের লিখন বাবুমশাই। আমি চাকর-বনিষ্যি, আমাকে যা বললে গোঁসাই-মা, আমি তাই-ই বিশ্বাস করলাম।

তারপর একদিন এই দোলগোবিন্দ ঘটক মশাই সম্বন্ধ আনলে বিয়ের। বিয়ে হয়ে গেল চুপি-চুপি। কেউ কিছু জানতে পারল না। আমি আগেই কাশীধামে চলে গিয়েছিলাম হুজুর। বিয়ের সময় দু'দিনের জন্যে এসে আবার চলে গেলাম। তারপর আজ্ঞে এই আপনারা এসেছেন। এতদিন পরে আপনারা এলেন বলে আমার মা-জননীকে তবু একবার চোখের দেখা দেখতে পেলাম।

ব'লে কালীচরণ থামল।

দারোগাবাবু যা লেখবার লিখে নিলেন।

দুলাল সা, নিতাই বসাক, নতুন-বৌ, দোলগোবিন্দ, সবাই আবার কেষ্টগঞ্জের দিকে ফিরল।

দোলগোবিন্দ ঘটক আসবার সময় কেঁদে ফেললে হাউ-হাউ করে।

বললে, আমিই এই সব্বোনাশ করেছি সা'মশাই, ভগবানও তার জন্যে আমায় শাস্তি দিয়েছেন, এবার আপনারা আমায় শাস্তি দিন হুজুর—আমি সব শাস্তি মাথা পেতে নিচ্ছি—

ব'লে সত্যি-সত্যিই দোলগোবিন্দ সেইখানে সেই রাস্তার মধ্যেই মাথা পেতে দিলে।

আজও কেষ্টগঞ্জে গেলে দেখতে পাবে 'দি ইণ্ডিয়া সুগার মিল' লিমিটেডের অফিসের সামনে তিনটে বড় বড় স্ট্যাচু দাঁড়িয়ে আছে। তিনটেই পাথরের। শ্বেত পাথর। মধ্যেখানে কর্তামশাই-এর। কীর্তীশ্বর ভট্টাচার্য্যের। দু'পাশে আর দু'জন। একপাশে দুলাল সা'র, আর একপাশে নিতাই বসাকের।

তিনটেই নতুন-বৌ-এর তৈরি করানো। তিনটি মূর্তির নীচেই তাঁদের নাম-ধাম-পরিচয় লেখা আছে কালো অক্ষরে।

কেষ্টগঞ্জের সে চেহারাও আর নেই। এখন রাস্তা-ঘাট-ইলেকট্রিক লাইট সব কিছু মিলে এ একেবারে অন্য জায়গা।

বড়চাতরা থেকে এসে সেদিন দুলাল সা'র বাড়ীতে সে এক থম্‌-থমে ভাব ছিল ক'দিন ধরে। দুলাল সা, নিতাই বসাক, নতুন-বৌ যেন সবাই অন্য রকম হয়ে গিয়েছিল তখন। এমন হবে যেন ভাবতে পারা যায় নি।

নতুন-বৌ সেই দিনই চলে যেতে চেয়েছিল বাড়ী থেকে।

বলেছিল, আমি আর এ-বাড়ীতে জল-স্পর্শ করব না বাবা, আমাকে আপনি মুক্তি দিন—

নিতাই বসাক বলেছিল, তা কি ক'রে হয় ? তুমি যাবে কোথায় নতুন-বৌ ?

নতুন-বৌ বলেছিল, যেখানেই যাই, এ-বাড়ীতে থাকবার অধিকার আমার আর নেই—

বিজয় অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল।

বললে, তুমি এ-বাড়ী ছেড়ে চলে গেলে আমাকেও তোমার সঙ্গে চলে যেতে হয়—

—তুমি যাবে কেন ? যেতে হ'লে একলা আমিই চলে যাব। তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে না—

দুলাল সা কিছুই বলে নি। শুধু হরিনামের মালাটা নিয়ে ঘন ঘন জপ করতে সুরু করেছিল।

বলেছিল, সংসারে সবই মিথ্যে গো, একমাত্র হরিনামই সত্যি—পাপী-তাপীদের তরতে হরিই একমাত্র ভরসা—

কিন্তু আশ্চর্য্য, হরিই শেষ পর্য্যন্ত যে একমাত্র তারও প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। দু'দিন পরেই দারোগা-পুলিস সবাই আবার এসে হাজির হয়েছিল কেষ্টগঞ্জের বাড়ীতে।

এসেই দারোগাবাবু বললেন, সব সমস্যার সমাধান হয়েছে সা'মশাই—

দুলাল সা মালা জপতে জপতেই মুখে বললে, কি রকম ?

দারোগাবাবু বললেন, এই কাকে এনেছি দেখুন—

—এ কে ?

—এই হচ্ছে সত্য মালো, হাওড়ার জুট মিলে কাজ করত—এ সব জানে !

—কি জানে ?

দারোগাবাবু বললে, সবই বলবে, তার আগে সবাইকে ডাকুন এখানে, আপনার নতুন-বৌমাকেও ডাকুন, নিতাই-বাবুকেও ডাকুন, আপনার ছেলে বিজয়বাবুকেও ডাকুন—

দুলাল সা কান্তকে বললে, ডাক ত সবাইকে কান্ত—

শ্রীদাম অপেরা যেখানেই যায় সেখানেই 'রাণী-রূপকুমারী' দেখতে রাজ্যের লোক সে-যাত্রা দেখতে ভেঙে পড়ে। চণ্ডীবাবুর 'শ্রীমাণী অপেরা' নাম আর কেউ করে না। সে দল-ভেঙে গেছে। সে চণ্ডীবাবুও মারা গেছে। তার জায়গায় 'শ্রীদাম অপেরা' এখন বাজার গরম করছে। 'রাণী রূপকুমারী' আরাকান রাজের মেয়ে। আরাকান-রাজ রাজ্য হারিয়ে বনে বনে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাজ্যের ভেতর বিদ্রোহ চলছে। সঙ্গে রাণী রূপকুমারী আর মেয়ে বহ্নিবালা। কুমারী মেয়ে। পথ হারিয়ে তারা তিনজনে তিন দিকে চলে গেছে। খুব জমাটি নাটক। অঞ্জনা এখন আবার আরও জমিয়ে দিয়েছে। একবার শুনতে আরম্ভ করলে শেষ দেখে উঠতে হবে। দর্শকদের নট্‌-নড়ন-চড়ন অবস্থা। অঞ্জনার পার্ট দেখতে লোকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আসরে।

চণ্ডীবাবুর কাছে গিয়ে বঙ্কুবিহারী সেদিন খুবই তম্বি করেছিল।

সব লোক চীৎকার শুনে হৈ-হৈ করে এসে ঢুকে পড়েছিল সেই শ্রীমাণী অপেরার চিৎপুরের অফিসে।

বঙ্কুরও তখন মাথা-গরমের অবস্থা। মাথা গরমের অবস্থা না হয়ে উপায়ই বা কি!

—তা ওকে মারলে কেন তুমি?

—মারব না? অধিকারী মশাই মিথ্যে কথা বললে কেন?

—মিথ্যে কথা? মিথ্যে কথা আবার কখন বলতে গেল?

—ও কেন বলতে গেল অঞ্জনা হ'ল আসলে হরতন? অঞ্জনা ত হরতন নয়।

—সে কি?

চণ্ডীবাবু তখন খানিকটা সামলে নিয়েছে বোধ হয়। চোখ-নাক ফুলে গেছে বঙ্কুর ঘুঁষির মারে।

বললে, আমি কি আর সাধ করে মিছে কথা বলতে গেছি। দেখলাম ভদ্রলোক নাতনী-নাতনী করে পাগল হয়ে হন্তে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর ওদিকে আমার অঞ্জনারও তখন রাজরোগ হয়েছে। আমার দলেরও ক্ষতি হচ্ছে, ভাল মত চিকিৎসে করতে পারছি নে। দামী দামী ওষুধ-পথ্যি কে খাওয়াবে, কার অত পয়সা আছে? আমি ভাবলাম কর্তামশাই-এর কি আর এমন লোকসান হবে, অথচ মশাই মেয়েটার লাভ! মিছে কথা বললে যদি মেয়েটার চিকিৎসা হয় ত হোক না—! তা কি এমন অন্যায়টা করেছি আমি শুনি!

—তা ব'লে একজন ব্রাহ্মণের মনে কষ্ট দেবেন? অতগুলো টাকা দেনা করিয়ে দেবেন? বুড়োমানুষের কি মনে শান্তি ছিল এতদিন? তিনি যে দেনা করে করে ওই অঞ্জনাকে সারিয়ে তুললেন, এতে অঞ্জনার না-হয় উপকার হ'ল, কিন্তু তিনি যে এতগুলো টাকার দেনা বিধবা স্ত্রীর ওপর রেখে মারা গেলেন, এ শোধ করবে কে? এ শোধ হবে ক'বছরে?

তা এ-সব যুক্তি তখন শুনবেই বা কে আর বুঝবেই বা কে। তখন বঙ্কুর অত সময়ই নেই, চণ্ডীবাবুরও সে-সব শুনতে ভাল লাগছে না।

কিন্তু কেষ্টগঞ্জে আসতেই আর এক কাণ্ড ঘটল।

কর্তামশাই-এর বাড়ীর সামনে তখন বেশ ভিড় জমে গেছে। দুলাল সা এসেছে, নিতাই বসাক এসেছে, সুকোমল রায় এসেছে, বিজয় এসেছে, নতুন-বৌও এসেছে। আর এসেছে পুলিসের দারোগা। আর সঙ্গে আর একজন লোক।

—ও লোকটা কে?

—ওরই নাম ত সত্য মালো।

দারোগাবাবু বললে, এই হচ্ছে সত্য মালো, এর কাছে আপনি সব শুনতে পাবেন মা, এই-ই আপনার নাতনী হরতনকে পেয়েছিল—

সামনে বসে ছিল বড় গিন্নী। তাঁর চোখের জল তখনও শুকোয় নি। চিরকালই কম কথার লোক, কিন্তু সেদিন যেন বোবা হয়ে গিয়েছিল চিরকালের মত।

—বল সত্য, বল তুমি। বড় গিন্নীকে বল সব কথা।

সেদিন সত্য মালো যা বলেছিল তার অভাবনীয়তাটা যেন নাটকের মত শোনাবে! তবু সমস্তই সত্যি। গড়-গড় করে সে সব ব'লে গেল। যারা শুনেছিল তারাও হকচকিয়ে গিয়েছিল। এমনও হয় নাকি এ-যুগে!

সত্য মালো বলেছিল, সবই আমার দোষ মা, আমিই সব কিছুর জন্যে দায়ী—সেদিন শ্মশানে আমিই একা ছিলাম মা, আর সবাই ঝড়-বৃষ্টিতে বাড়ীতে চলে গিয়েছিল। ক'দিন আগে আমার বউ-এর একটা মেয়ে মারা যায়। সেই মেয়ে মারা যাবার পর থেকেই আমার বউ-এর পাগলের মত অবস্থা চলছিল। আমিও হরতনকে সেই অবস্থায় শ্মশানে ফেলে রেখে একবার বাড়ীতে চলে গিয়েছিলাম। বউটাকে দেখে আবার শ্মশানে এসেছি তখন ঝড়-বৃষ্টি থেমে গেছে একটু। কাছে গিয়ে দেখি অবাক্ কাণ্ড। দেখি হরতন যেন একটু নড়ছে। কেমন চমকে উঠলাম। বেঁচে উঠল নাকি তবে? বুকে হাত দিয়ে দেখলাম ধুক-ধুক করছে।

আমি তাড়াতাড়ি করলাম কি একটা মতলব ঠাওরালাম। মেয়েটাকে কোলে নিয়ে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলাম। আগুনের সেঁক দিলাম। যদি বাঁচে মেয়েটা। বউও দেখলাম খুব সেবা করতে লাগল।

আমার বউ জিজ্ঞেস করলে, এ কে গো?

বললাম, কর্তামশাই-এর নাত্‌নী—

তারপর দু'-তিন দিন কেটে গেল যা সেই ভাবেই। মেয়েটাও সুস্থ হয়ে উঠল, বউও যেন একটু ভালর দিকে গেল। মেয়েটাকে পেয়ে আর কোল থেকে নামাতেই চায় না।

—তারপর?

সবাই হাঁ করে শুনছিল সত্য মালোর গল্প।

বললে, তারপর কি করলে?

—তারপর, আজ্ঞে সব বলছি। সবই বলব আপনাদের। আমাদের পাড়ার তখনও কেউ টের পায় নি ত, কেউ-ই জানত না। শেষকালে জানাজানি হয়ে গেলে ত কর্তামশাই তার নাত্‌নীকে নিয়ে যাবে, আমার বউও আবার পাগল হয়ে যাবে হয়ত, তাই বউকে আর কর্তামশাই-এর নাত্‌নীকে নিয়ে একদিন রাতারাতি কেষ্টগঞ্জ ছেড়ে মোহনপুরে চলে গেলাম। সবাইকে বললাম, এ আমার নিজের মেয়ে—

কিন্তু ভগমানের মার কে খণ্ডাবে বলুন!

সে বউও আমার একদিন মারা গেল গিন্নীমা। যার জন্যে পরের নাতনীকে নিজের মেয়ে বলে চালিয়ে দিলাম, সেই বউও রইল না।

শেষে কোথায় রাখি হয়তনকে? আমার এক জ্ঞাতি-বোন ছিল বর্দ্ধমান জেলায় বড়চাতরাতে। তার বাড়ীতেই গিয়ে রেখে দিয়ে এলাম তাকে। ব'লে এলাম, কাউকে যেন না বলে দেয়। নইলে সর্বনাশ হয়ে যাবে!

আর তারপর হাওড়ার জুট-মিলে চাকরি করতে গেলাম। সেখানে গিয়ে আবার একটা বিয়ে করলাম নতুন করে। আবার আমার ছেলে হ'ল—নিকুঞ্জই সেই ছেলে। এখন আমার বয়েস হয়েছে, সব পাপ আপনার কাছে বলে গেলাম গিন্নীমা। এখন দারোগাবাবু আমার কাছে গিয়ে যখন সব কথা জিজ্ঞেস করলেন তখন আর কিছু গোপন রাখতে পারলাম না। এখন আমাকে যা দণ্ড দেবেন দিন—আমি মাথা পেতে নেব।

কেষ্টগঞ্জ আর কেষ্টগঞ্জ নেই, সে ত আগেই বলেছি এখন দুলাল সা'র বাড়ী থেকে কর্তামশাই এর বাড়ী পুরো এলাকাটা একটা পাঁচিল দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে। সমস্তটা একটা বিরাট্ বাড়ী হয়ে গেছে।

সেখানে একদিন যাত্রাও করে গেছে 'শ্রীদাম অপেরা' বঙ্কু এসেছিল, অঞ্জনাও এসেছিল। সেই কর্তামশাই-এর বাড়ীর সামনের উঠোনেই অঞ্জনা রাণী-রূপকুমারীর পার্ট করেছিল। আসরে গিয়ে বলেছিল—

কোথা যাবো, কোথা যাবো অবলা রমণী
কে আছে আমার!
কার কাছে মাগিব আশ্রয় বল অন্তর্যামী!

লোকে সে অভিনয় দেখে চোখের জল আটকাতে পারে নি। আর তার পরেই সখীর দল এসে গান গেয়ে আসর মাৎ করে দিয়েছিল—

পবনের পাল্‌কী চড়ে স্বর্গে যাব
ও হো হো হোঃ—

কিন্তু জীবন যেমন কারও সুখ-দুঃখের পরোয়া করে চলে না, ইতিহাসও তেমনি কারও ভাল-মন্দের দিকে চেয়ে নিজের গতি নির্দ্ধারণ করে না। সে নির্মম নিষ্ঠুর নির্বিকার। আজকের কেষ্টগঞ্জের মানুষ যখন সুগার মিলে কাজ করতে যায়, যখন দুলাল সা'র বাড়ীর সামনে দিয়ে হেঁটে যায়, তখন জানতেও পারে না এই কেষ্টগঞ্জের বাইরের বৈভবের পেছনে আরও অনেকের হাসি-কান্না-দুঃখ-আনন্দ জড়িয়ে আছে। এমনি করেই চিরকাল জড়িয়ে থাকবে। কিন্তু ইতিহাসের পাতা-বদলের মত একটার পর একটা প্রলেপ পড়ে পড়ে একদিন সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সেদিন আবার যারা আসবে তাদেরও হাসি-কান্না-দুঃখ-আনন্দ দিয়ে আবার অন্য উপন্যাস লেখা হবে। এই যাওয়া-আসা নিয়ে হয়ত মহাকাল তার নিজের বিচিত্র খেয়াল পরিতৃপ্ত করবে। কেন করবে কে কেউ জানে না। আমি আপনি কেউই জানি না। শুধু যা দেখব তা নিয়ে কাব্য উপন্যাস লিখে জলের দাগ কেটে যাব কাগজের পাতায়। আর কিছু নয়। আমাদের জীবনও ত জলেরই দাগ।

সমাপ্ত

রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের ইংরেজী অনুবাদের তালিকা

শ্রীসুধাময়ী মুখোপাধ্যায়

(১৯০১) নৈবেদ্য—র র ৮

* প্রতিদিন আমি হে জীবন স্বামী—Gitanjali 76—Day after day, O Lord of my life (36)

যারা কাছে আছে, তারা কাছে থাক—Poems 22—They, who are near to me, do not know that you are [illegible]

* তোমার অসীমে প্রাণ মন লয়ে—Poems 23—Far as I gaze at the depth of Thy immensity

আঁধার আসিতে রজনীর দীপ—Crossing 20—The day is dim with rain (273)

পাঠাইলে আজ মৃত্যুর দূত আমার—Gitanjali 86—Death, thy servant is at my door (40)

মাঝে মাঝে কতবার ভাবি কর্ম্মহীন—Gitanjali 81—On many an idle day have I (38)

এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়—Gitanjali 69—The same stream of life that runs (33)

ক্রমে ম্লান হয়ে আসে—Fruit Gathering 44—The day that stands between you and me, makes her last [illegible]

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়—Gitanjali 73—Deliverance is not for me (34)

তখন করি নি নাথ কোন আয়োজন—Gitanjali 43—The day was when I did not (20)

হে রাজেন্দ্র, তব হাতে কাল—Gitanjali 82—Time is endless in thy hands (38)

নির্জ্জন শয়ন মাঝে কালি রাত্রিবেলা—Gitanjali 58—I was musing last night

কারে দূরে নাহি কর। যত করি দান—Gitanjali 59—None need be thrust aside

কালি হাস্যে পরিহাসে গানে—Gitanjali 57—When from the house of feast (279)

প্রভাতে যখন শঙ্খ উঠেছিল বাজি—Gitanjali 62—When bells sounded in your temple

মহারাজ ক্ষণেক দর্শন দিতে হবে—Poems 24—I ask for an audience

তোমার ইঙ্গিতখানি দেখি নি যখন—Fruit Gathering 5—A handful of dust could hide (178)

তব পূজা না আনিলে দণ্ড দিবে
সেই তো প্রেমের গর্ব ভক্তির } —Crossing 56—You hide yourself in your own (278)

মর্ত্যবাসীদের তুমি যা দিয়েছ—Gitanjali 75—Thy gift to us, mortals (35)

যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে—Fruit Gathering 63—Not for me is the love that knows (208)

আমরা কোথায় আছি কোথায়—Poems No. 25—Light thy signal, Father, for us

তব চরণের আশা ওগো—Poems No. 26—Yet I can never believe that you are lost to us

শতাব্দীর সূর্য—
স্বার্থের সমাপ্তি—
এই পশ্চিমের কোণে—
সে উদার— } —Modern Review, June 1917
—Nationalism —The Sun set of the century
করোনা করোনা লজ্জা

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য —Gitanjali 35—Where the mind is without fear (16)
V.B.Q. May-July, 1935
Hind. Std. Annual 1941—Reproduced in Facsimile

আমার সকল অঙ্গে তোমার পরশ —Gitanjali 4—Life of my life, I shall ever (4)

একাধারে তুমিই আকাশ তুমিই নীড়—Gitanjali 67—Thou art the sky and thou art (32)

দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি, অতি দীর্ঘকাল —Gitanjali 40—The rain has held back (18)

জীবনের সিংহদ্বারে পশিনু
মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর } —Gitanjali 95—I was not aware of the moment (44)

কোরোনা কোরোনা লজ্জা —Poems 27—Be not ashamed
—Sheaves—To the sons of India—Before the glance
of the West, do not, O sons of Bharat feel ashamed

হে ভারত নৃপতিরে—Sheaves—India—India thou hast taught Kings to lay down
—Modern Review, Dec. 1917—Tr. W. W. Pearson & E. E. Speight
—India (Periodical) Dec. 1934—Tr. by M. Chatterjee

দুর্দিন ঘনায়ে এল ঘন অন্ধকারে —Crossing 20—The day is dim with rain (273)

মাঝে মাঝে কভু যবে অবসাদ —Gitanjali 25—In the night of weariness (12)

তব কাছে এই মোর শেষ নিবেদন —Gitanjali 36—This is my prayer to thee (17)

(১৯০৩) স্মরণ—র র ৮

আজি প্রভাতেও শ্রান্ত নয়নে রয়েছে —Fruit Gathering 45—My night has passed (200)

স যখন বেঁচেছিল গো তখন যা দিয়েছে —Fruit Gathering 46—The time is past when I would (201)

মৃত্যুর নেপথ্য হতে আরবার এলে —Fugitive II 26—You have taken a bath in the dark sea

আপনার মাঝে আমি করিনু অনুভব —Lover's Gift 44—When in your death

তুমি মোর জীবনের মাঝে মিশায়েছ—Lover's Gift 43—Dying, you have left behind (262)
—Poems 31—Love, thou hast

দেখিলাম খানকয় পুরাতন চিঠি—Fruit Gathering 47—I found a few old letters (201)

মর আয়ু এ জীবনে যে কয়টি —Fugitive II-25—I feel that your brief days (425)

সংসার সাজায়ে তুমি আছিলে রমণী
আপন বসন্তদিন কতবার } Fruit Gathering 48—Bring beauty and order
Lover's Gift 45—Bring beauty and order (201)
Lover's Gift 32—Many a time when the spring day knocked

যে ভাবে রমণীরূপে আপন মাধুরী —Fruit Gathering 56—You came for a moment

আবৃত্তি নিঃশব্দে আজি—Poems 32—As the tender twilight covers in its fold

জগৎ পারাবারের তীরে —Crescent Moon / —Gitanjali 60 } —On the sea-shore (51)

জন্মকথা—খোকা মাকে শুধায় ডেকে—Crescent Moon—The Beginning (57)
—Modern Review, March 1911—Tr. by Ajit Chakravarty & A. K. Coomaraswami

* খেলা—তোমার কটিতটের ধটি—Crescent Moon—The Unheeded Pageant (54)

খোকা—খোকার চোখে যে ঘুম আসে { —Crescent Moon—The Source (52) / —Gitanjali 61

ঘুমচোরা—কে নিল খোকার ঘুম হরিয়া—Crescent Moon—Sleep-stealer (55)

অপযশ—বাছা রে তোর চোখে কেন জল—Crescent Moon—Defamation (59)

বিচার—আমার খোকার কত যে—Crescent Moon—The Judge (59)

চাতুরী—আমার খোকা করে গো যদি—Crescent Moon—Baby's Way (53)

নির্লিপ্ত—বাছা রে মোর বাছা—Crescent Moon—Play Things (60)

কেন মধুর—রঙীন খেলনা দিলে { —Crescent Moon—When and Why (58) / —Gitanjali 62

প্রশ্ন—মাগো আমায় ছুটি দিতে বল—Crescent Moon—Twelve O'clock (76)

খোকার রাজ্য—খোকার মনের ঠিক—Crescent Moon—Baby's World (58)

সমব্যথী—যদি খোকা না হয়ে—Crescent Moon—Sympathy (72)

বিচিত্র সাধ—আমি যখন পাঠশালাতে যাই—Crescent Moon—Vocation (72)

বিজ্ঞ—খুকি তোমার কিচ্ছু বোঝে না—Crescent Moon—Superior (74)

ব্যাকুল—অমন করে আছিস্ কেন—Crescent Moon—The Wicked Postman (77)

ছোটো বড়ো—এখনো ত বড় হই নি আমি—Crescent Moon—The Little Bigman (74)

সমালোচক—বাবা নাকি বই লেখে সব নিজে—Crescent Moon—Authorship (76)

বীরপুরুষ—মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে—Crescent Moon—The Hero (78)

রাজার বাড়ী—আমার রাজার বাড়ী—Crescent Moon—Fairy Land (63)

মাঝি—আমার যেতে ইচ্ছা করে—Crescent Moon—The Farther Bank (69)

নৌকাযাত্রা—মধু মাঝির ঐ যে নৌকা—Crescent Moon—The Sailor (68)

ছুটির দিনে—ঐ দেখো মা আকাশ ছেয়ে—Crescent Moon—The Land of the Exile (64)

জ্যোতিষশাস্ত্র—আমি শুধু বলেছিলেম—Crescent Moon—The Astronomer (61)

[illegible]—যেমনি মাগো গুরু গুরু—Crescent Moon—The Flower School (70)

মাতৃবৎসল—মেঘের মধ্যে মাগো যারা থাকে—Crescent Moon—Clouds and Waves (61)

লুকোচুরি—আমি যদি দুষ্টুমি করে চাঁপা গাছে—Crescent Moon—The Champa Flower (62)

সওদাগর/ব্যবসায়ী—মনে করো তুমি থাকবে ঘরে—Crescent Moon—The Merchant (71)

বিদায়—তবে আমি যাই গো যাই —Crescent Moon—The End (80)
—Modern Review, April 1911—Tr. by the Author & A. K. Coomarswami

উপহার—স্নেহ উপহার এনে দিতে চাই—Crescent Moon—The Gift (abridged)

পাখীর পালক—খেলাধুলা সব রহিল পড়িয়া—Golden Boat—Bird's Feather—The Child comes running

কাগজের নৌকা—ছুটি হ'লে রোজ ভাসাই জলে—Crescent Moon—Paper Boats (67)

পুরাণো বট—লুটিয়ে পড়ে জটিল জটা—Crescent Moon—The Banyan Tree (82)

আশীর্বাদ—ইহাদের করো আশীর্বাদ—Crescent Moon—Benediction (83)

আকুল আহ্বান [১] সন্ধ্যে হ'ল গৃহ অন্ধকার
মায়ের আশা [১] কূলের দিনে সে যে চলে গেল —Crescent Moon—The Recall (81)

(১৯০৩-১৯১৪) উৎসর্গ—র র ১০

ভোরের পাখী ডাকে কোথায় —Fruit Gathering 25—The bird of the morning sings (186)
—V.B.Q. XXV No. I Sumer 1959—The Bird of the morning
This is an earlier and fuller draft of the translation appearing in F.G.

কেবল তব মুখের পানে চাহিয়া—Crossing 76—I felt, I saw your face

মোর কিছু ধন আছে সংসারে—Crossing 31—Only a portion of my gift

তোমারে পাছে সহজে বুঝি—Gardener 35—Lest I should know (113)

তোমার চিনি বলে আমি করেছি গরব—Gitanjali 102—I boasted among men (47)

পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি—Gardener 15—I run as a musk deer (102)

আমি চঞ্চল হে আমি সুদূরের পিয়াসী —Gardener 5—I am restless, I am a thirst (93)
—Modern Review, Feb. 1912—The Far Off—Tr. by S. V. Mukherjee

১। কাব্যগ্রন্থ ১ম ভাগ—বিশ্বভারতী পুনর্মুদ্রণ কার্ত্তিক ১৩০৮-এ 'কড়ি ও কোমলে' আছে মায়ের আশা' কবিতাটি। এটি কড়ি ও কোমল থেকে বাদ দিয়ে 'শিশু'তে নেওয়া হবে—একথা বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী ২য় খণ্ডে—গ্রন্থ-পরিচয় অংশে বলা হয়েছে। 'শিশু' কাব্যগ্রন্থে আছে 'আকুল আহ্বান' কবিতাটি। 'মায়ের আশা' ও 'আকুল আহ্বান' কবিতা দু'টি একত্রে অনুবাদ করেছেন কবি Crescent Moon-এ। এ তথ্য আমরা পেয়েছি শ্রীকানাই সামন্ত মহাশয়ের কাছ থেকে; তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি তাঁকে। 'কড়ি ও কোমলে'র পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

১। কবি এই কবিতার প্রকৃত মর্ম্ম যে ক'টি পংক্তিতে; সে ক'টি বেছে নিয়ে অনুবাদ করেছেন। অনুবাদের প্রথম লাইন হচ্ছে বাংলা কবিতার তৃতীয় স্তবকের শেষ দু'টি পংক্তির অনুবাদ। তারপরের চারটি লাইন চতুর্থ স্তবকের অনুবাদ। এমনি ভাবে তিনি বেছে নিয়েছেন। দ্রষ্টব্য—Poems-এর শিশুর দিক থেকে কবিতার নোট।

কুঁড়ির ভিতর কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে—Fruit Gathering 60—The odour cries in the bud (207)

আমার মাঝারে যে আছে কে গো সে—Fruit Gathering 57—Who is she who dwells in my heart (205)

না জানি কারে দেখিয়াছি, দেখেছি কার মুখ—Fruit Gathering 4—I woke up and found his letter (177)

হায় গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা—Fruit Gathering 62—What is there but the sky (208)

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে১—Poems 21—The dumb earth looks into my face

আকাশ সিন্ধু মাঝে—Fugitive II 28—Our life sails on the uncrossed sea (426)

তোমার বীণায় কত তার আছে—Crossing 68—There are numerous strings (280)

হে রাজন্ তুমি আমারে বাঁশি বাজাবার--Crossing 66—My king, thou hast called me

দুয়ারে তোমার ভিড় করে যারা আছে—Poems 36—Thou didst well to turn me back

—V.B.Q. July 1926—Take my lute, master

শূন্য ছিল মন, নানা কোলাহলে ঢাকা—Fugitive III 8—My mind still buzzed

ক্লান্ত করিয়াছ তুমি আপনারে
আজি হেরিতেছি আমি, হে হিমাদ্রি } —Fugitive III 31—In the youth of the world (449)

ভারতের কোন্ বৃদ্ধ ঋষির তরুণ মূর্তি তুমি—V.B.Q. XXIV No. 4 (Spring 1959)—To Jagadish Chandra Bose—Tr. by Manmohan Ghosh ;—Pubished earlier in Feb. 1916 in Presidency Coll. Magazine and—Reprinted in the Bengali Book of English Verse (in 1928)—Edited by Theodore Douglas Dumn

আজিকে গহন কালিমা লেগেছে—Poems 29—Dark clouds have blotted

—V.B.Q. Apr. 1926—The Message (abridged Tr.)

—Hind. Std. Anu. 1940—'The Untrammelled Bird'

—By Sukumar Chatterji

—V.B.Q. Nov. 41—Jan. 42—'We Birds in the Cage'

—By Apurva K. Chanda

যদি ইচ্ছা কর তবে কটাক্ষে হে নারী—Gardener 80—With a glance of your eyes (143)

আমি যারে ভালোবাসি—Lover's Gift 16—She dwelt here by the pool (257)

অকাল এ কি লীলা ওগো—Fruit Gathering 52—What music is that (203)

—V.B.Q. July 1924—This is thy Play—abridged Tr. by Ajit Chakravarty

সেদিন কি তুমি এসেছিলে ওগো—Crossing 19—You came to me

[...] সে যে পূত—Lover's Gift 34—When our farewell moment came

ওরে আমার কর্মহারা, ওরে আমার সৃষ্টিছাড়া—Poems 37—I have felt your muffled steps (only a portion of the original has been translated)

সাঙ্গ হয়েছে রণ—Poems No. 50—The Battle is over

পাহাড়ের এই পল্লীখানি—Gardener 83—She dwelt on the hill side (145)

আজ চুপি চুপি কেন কথা কও —Gardener 81—Why do you whisper (144)
—Sheaves—The Sweetness of Death—Softly—says my soul, 'O Sweet De

সংযোজন ১। হে পথিক কোনখানে চলেছ কাহার পানে—Crossing 77—Traveller, where do you go (28

(১৯০৬) খেয়া র র ১০.

* শেষ খেয়া—দিনের শেষে ঘুমের দেশে —Fugitive I—18—The evening beckons and I would fain follow the travell

ঘাটের পথ—ওরা চলেছে দীঘির ধারে—Lover's Gift 41—The girls are out to fetch water

শুভক্ষণ—ওগো মা রাজার দুলাল যাবে—Gardener 7—O mother, the young prince is to pass (94)

আগমন—তখন রাত্রি আঁধার হ'ল —Gitanjali 51—The night darkened (24)

* দুঃখমূর্তি—দুখের বেশে এসেছ বলে—Crossing 24—Have you come to me as my sorrow

মুক্তিপাশ—ওগো নিশীথে কখন এসেছিলে—Crossing 39—No guest had come to my house (276)

দান—ভেবেছিলাম চেয়ে নেবো —Gardener 52—I thought I should ask of thee (25)

বালিকা বধূ—ওগো বর, ওগো বধূ —Fruit Gathering 61—She is still a child, my Lord (207)

অনাহত—দাঁড়িয়ে আছ আধেক খোলা —Lover's Gift 24—Your window half-opened and veil half-raisec

বাঁশি—ঐ তোমার ঐ বাঁশিখানি —Fruit Gathering 22—This autumn morning is tired
—Presidency College Magazine Vol. XIII No. 1 (1927)
—'The Flute'—Tr. by Khagen Das Gupt

অনাবশ্যক—কাশের বনে শূন্য নদীর ধারে —Gitanjali 64—On the slope of the desolate river (30)

অবারিত—ওগো তোরা বলতো এরে ঘর বলি কোন্ মতে —Gardener 4—Ah me, why did they build my hou (92)

দানা—আমি শরৎ শেষের মেঘের —Gitanjali 80—I am like a remnant of a cloud (38)

সমুদ্র—তখন আকাশ তলে ঢেউ তুলেছে—Gitanjali 48—The morning sea of silence (22)

কৃপণ—আমি ভিক্ষে করে ফিরতেছিলেম —Gitanjali 50—I had gone on begging (24)

কূলের ধারে—তোমার কাছে চাইনে কিছু —Gitanjali 54—I asked nothing from thee (27)

বন্দী—বন্দী তোরে কে বেঁধেছে —Gitanjali 31—Prisoner, tell me who was it (15)

পথিক—পথিক, ওগো পথিক, যাবে তুমি —Gardener 63—Traveller, must you go ? (130)

বিচ্ছেদ—তোমার বীণার সাথে আমি —Crossing 69 —Poems 46 } —Let my song be simple as the waking in the morning (280)

ফুল ফোটানো—তোরা কেউ পারবি নে গো —Fruit Gathering 18—No it is not yours to open buds (183)

হার—মোদের হারের দলে বসিয়ে —Fruit Gathering 29—You have set me among those (188)

গোধূলি লগ্ন—আমার গোধূলি লগন —Crossing 13—The wedding hour is in the twilight

সব—আমি আজ হারিয়ে ফেলে —Lover's Gift 46—The sky gazes on its own endless blue

বিদায়—বিদায় দেহ ক্ষম আমায় ভাই—Fugitive I—2—We came hither together, friend.

দিনশেষ—ভাঙা অতিথিশালা—Gardener 64—I spent my day on the scorching hot dust of the road (131)

অনশোনা—আমার এ গান শুনবে তুমি—Lover's Gift 26—If by chance, you think of me

জাগরণ—কৃষ্ণপক্ষে আধখানা চাঁদ উঠলো—Gitanjali 47—The night is nearly spent

দুস্তর—কোথা ছায়ার কোণে দাঁড়িয়ে—Gitanjali 41—Where dost thou stand (19)

—V.B.Q. Vol. III No. 3, October 1925—'Come my lover'—(Translated from the middle 'Tumi Hatat')

সব পেয়েছির দেশ—সব পেয়েছির দেশে কারো—Lover's Gift—They do not build high towers

সার্থক নৈরাশ্য—তখন ছিল যে গভীর রাত্রি—Fruit Gathering 18—The beggar in me lifted his lean hand (186)

খেয়া—তুমি এপার-ওপার কর কে গো—Crossing 2—When the market is over

আরাধন—বিধি যেদিন ক্ষান্ত দিলেন—Gitanjali 78—When the creation was new (36)

দিনসন্ধ্যা—আমায় অমনি খুশি করে রাখো—Poems 45—For a mere nothing

উৎসর্গ—বন্ধু, এ যে আমার লজ্জাবতী লতা—Hind. Std. 30|11|58—Dedication

(১৯১০) গীতাঞ্জলি—র র ১১

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার—Sheaves—Submission—Hold down my head

আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই—Gitanjali 14—My desires are many (8)

কত অজানারে জানাইলে তুমি—Gitanjali 63—Thou hast made me known (30)

বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা—Fruit Gathering 19—Let me not pray to be sheltered (215)

অন্তর মম বিকশিত কর অন্তরতর হে—Sangeet Natak Akademi 100 songs Vol. I No. 5

আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায়—Gardener 84—Over the green and yellow rice fields (147)

তোমার সোনার থালায় সাজাবো—Gitanjali 83—Mother, I shall weave (39)

আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ—Sheaves—The Goddess of Autumn—We have tied a bunch

—Sangeet Natak Akatlemi 100 songs Vol. I No. 18

মেঘের পরে মেঘ জমেছে—Gitanjali 18—Clouds heap upon clouds. (10)

কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো—Gitanjali 27—Light, oh, where is the light (13)

আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে—Gitanjali 22—In the deep shadows of the rainy July (11)

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার—Gitanjali 23—Art thou abroad on the stormy night (12)

তুমি কেমন করে গান কর যে গুণী—Gitanjali 3—I know not how thou singest (4)

যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু—Gitanjali 79—If it is not my portion to meet (37)

হেরি অহরহ তোমারি বিরহ—Gitanjali 84—It is the pang of separation (39)

* আর নাই রে বেলা নামল ছায়া —Gitanjali 74—The day is no more (35)

* প্রভু তোমা লাগি আঁখি জাগে —Crossing 11—My eyes have lost their sleep

* এই তো তোমার প্রেম ওগো —Gitanjali 59—Yes, I know, this is nothing but (29)

* আমি হেথায় থাকি শুধু গাইতে —Gitanjali 15—I am here to sing thee songs (9)

* আমার মিলন লাগি তুমি আসছ —Gitanjali 46—I know not from what distant time (21)

* এসো হে এসো সজলঘন বাদল বরিষণে —Crossing 28—Come to me like summer cloud

* পারবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দে —Gitanjali 70—Is it beyond thee to be glad (33)

* নিশার স্বপন ছুটল রে ঐ —Crossing 44—Rejoice ! For night's fetters have broken

* শরতে আজ কোন্ অতিথি এল —Crossing 46—My guest has come to my door

* হেথা যে গান গাইতে আসা আমার —Gitanjali 13—The song that I came to sing (8)

* জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ—Gitanjali 16—I have had my invitation (9)

* আসনতলে মাটির পরে লুটিয়ে রব —Poems 47—Let me Lie down upon the ground
—Sangeet Natak Akademi 100 songs Vol. I No. 8

* রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি —Gitanjali 100—I dive down into the depth (46)

* কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ —Sangeet Natak Akademi 100 songs Vol. I No. 50

* আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে —Sangeet Natak Akademi 100 songs Vol. I No. 23

* তব সিংহাসনের আসন হতে —Gitanjali 49—You came down from the throne (23)

* তুমি এবার আমায় লহ হে নাথ লহ —Crossing 4—Accept me, my Lord (271)

* জীবন যখন শুকায়ে যায় —Gitanjali 39—When the heart is hard (18)
—Sangeet Natak Akademi 100 songs Vol. I No. 7

* এবার নীরব করে দাও হে তোমার —Sheaves—The Master Piper—Strike dumb thy babbling poet

* বিশ্ব যখন নিদ্রামগন গগন অন্ধকার —Sheaves—The Unseen Musician—When the world is plunged in slumb

* সে যে পাশে এসে বসেছিল —Gitanjali 26—He came and sat by my side (13)

* তোরা শুনিস্ নি কি শুনিস্ নি তার —Gitanjali 45—Have you not heard his silent steps (21)

* আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে —Gitanjali 97—When my play was with thee (45)

ওগো মৌন, না যদি কও নাই কহিলে —Gitanjali 19—If thou speakest not (10)

তুমি যখন গান গাহিতে বল —Gitanjali 2—When thou commandest me (3)

তারা দিনের বেলায় এসেছিল —Gitanjali 33—When it was day, they came (15)

কথা ছিল এক তরীতে কেবল তুমি আমি —Gitanjali 42—Early in the day it was whispered (20)

ছিন্ন করে লও হে মোরে —Gitanjali 6—Pluck this little flower (5)

চাই গো আমি তোমারে চাই —Gitanjali 38—That I want thee, only thee (17)

* এই করেছো ভাল, নিঠুর হে—Crossing 6—Thou has done well
ফুলের মত আপনি ফুটাও গান—Crossing 65—My songs are the same as
* আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে—Poems 48—The darkly-veiled June has come once again
* হে মোর দেবতা ভরিয়া এ দেহ প্রাণ—Gitanjali 65—What divine drink wouldst thou have (31)
* একলা আমি বাহির হলেম—Gitanjali 30—I came alone on my way (14)
আর আমায় আমি নিজের শিরে—Gitanjali 9—O Fool, to try to carry thyself (6)
* যেথায় থাকে সবার অধম—Gitanjali 10—Here is they foot stool and there (6)
* হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে জাগোরে ধীরে—Modern Review, Apr. 1922—'Pilgrim'
—A Flight of Swans No. 46
—V.B.Q. January 1939—Tr. by Indira Debi
—Indian Literature Apr.-Sept. 1958—Tr. by K. Kripalani
—Sangeet Natak Akademi 100 songs Vol. I No. 30
হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান—Harijan 5|8|1933—The Great Equality—By Basanta Kumar Ray
মরণ যেদিন দিনের শেষে আসবে—Gitanjali 90—On the day when death will knock (42)
ওগো আমার এই জীবনের—Gitanjali 91—O Thou, the last fulfilment of life (42)
ভজন পূজন সাধন আরাধনা—Gitanjali—11—Leave this chanting and singing (6)
* সীমার মাঝে অসীম তুমি—Sheaves—Forms of the Formless—Boundless in the midst of bounds
* তাই তোমার আনন্দ আমার পর—Gitanjali 56—Thus it is thy joy in me (28)
প্রভু গৃহ হতে আসিলে যেদিন—Gitanjali 85—When the warriors came (40)
ভেবেছিনু মনে যা হবার তারি শেষে—Gitanjali 37—I thought that my voyage (17)
আমার এ গান ছেড়েছে তার—Gitanjali 7—My song has put off (5)
যেন শেষ গানে মোর সব—Gitanjali 58—Let all the strains of joy (29)
রাজার মত বেশে তুমি সাজাও—Gitanjali 8—The child who is decked with (5)
গান দিয়ে যে তোমায় খুঁজি—Gitanjali 101—Ever in my life have I sought (47)
তোমায় আমার প্রভু করে রাখি—Gitanjali 34—Let only that little be left of me (16)
যাবার দিনে এই কথাটি বলে যেন যাই—Gitanjali 96—When I go from hence, let this (44)
আমার নামটা দিয়ে ঢেকে—Gitanjali 29—He whom I can close with my name (14)
* জড়ায়ে আছে বাধা ছাড়ায়ে যেতে চাই—Gitanjali 28—Obstinate are the trammels (13)
* জীবনে যত পূজা হ'ল না সারা—Crossing 18—I know that this life (273)
* একটি নমস্কারে প্রভু—Gitanjali 103—In one salutation to thee (47)
জীবনে যা চিরদিন রয়ে গেছে আভাসে—Gitanjali 66—She who ever had remained (31)
—Presidency College Magazine Apr. 1935—Tr. by Kalidas Ghosh
প্রেমের হাতে ধরা দেব, তাই রয়েছি—Gitanjali 17—I am only waiting for love (9)
সংসারেতে আর যাহারা আমায়—Gitanjali 32—By all means, they try to hold (15)
দিবস যদি সাঙ্গ হ'ল, না যদি—Gitanjali 24—If the day is done, if birds sing no more (12)

শৃংখল

শ্রীনারায়ণ চক্রবর্তী

এমনি বিষণ্ণ সন্ধ্যায়—আকাশ যখন মোটা মেঘের লেপে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে শুয়ে শুয়ে নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে থাকে, আর মাঝে মাঝে শ্রাবণ সন্ধ্যার তরল অন্ধকারকে ফালা ফালা করে চিরে ফেলে তার চোখের বিদ্যুৎ, তখন কেন যেন শ্যামলের মনে পড়ে তার বেদানা বৌদির কথা—তার বেদনার কথা।

এখানটায় বাঁধের পাড়, হঠাৎ-যুদ্ধে উন্মত্ত ষাঁড়ের মত মাথা নীচু করে নদীর গর্ভে ঢুকে গেছে, ফেনোচ্ছল ঢেউগুলি অবিরাম ছলাৎ ছলাৎ শব্দে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে, মাটি ধুয়ে ধুয়ে নিয়ে গিয়ে শুধু কাঁকরের রাশি ফেলে রেখে গেছে। অল্প দূরেই মেঘনার গৈরিক জলের তীব্র স্রোত দিন-শেষের ম্লান আলোতে অজানার ভ্রূকুটি নিয়ে আসে। অনেক দূরের ষ্টীমার থেকে তীব্র সার্চ-লাইট শ্যামলের মুখে এসে পড়ে, পলকের জন্ম তার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে স'রে যায়।

সজল এলোমেলো বাতাসে ফুরফুর করে ওড়ে শ্যামলের রুক্ষ চুল। দিগন্ত-লীন মেঘনার কূলে বসে থাকতে থাকতে শীতে শির শির করে ওঠে তার শরীর। আকাশের বিপুল মেঘের ভার বৃষ্টির ফোঁটা হয়ে নেমে আসতে এখনও দেরি আছে, তাই উঠি উঠি করেও ওঠে না শ্যামল, বরং আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবে কখন মেঘ-কজ্জল আকাশ থেকে ঝিমঝিম ঝিরঝির শব্দে নেমে আসবে বৃষ্টিধারা আর তখন চুপ করে বসে ভিজতে ভিজতে শ্যামল ফিরে পাবে বেদানা বৌদির স্পর্শের স্মৃতি।

দু'বছর আগে এমনি এক দিনে খবরটা এই চাঁদপুরে থাকতে থাকতেই পেয়েছিল শ্যামল। ঢাকায় তাদের ঠাঠারি বাজারের দোতলা বাড়ীতে নতুন ভাড়াটে এসেছে। আর দশটা খবরের ভীড়ে দাদার লেখা পোষ্টকার্ডের শেষের দু'লাইনে পাতার আড়ালে ফুলের মত লুকিয়ে ছিল এই খবরটি।

শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না বেশ কিছুদিন ধরেই কোরটিস্থ আর্মির দখলে চাঁদপুরের বোমা-পড়া আতঃ অসহ্য হয়ে উঠেছিল, অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজের লাভেঃ গুড় মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসের লোকেরাই খেয়ে দিচ্ছিল, এ ছাড়া ছিল কর্ণেল হপ্‌কিন্সের জন্ম নধর নারীদেহ সংগ্রহের জন্ম অবিরাম তাগিদ, তাই হঠাৎ একদিন ছোট স্যুটকেসটি নিয়ে ডাউন চাটগাঁ এক্সপ্রেসে চেপে বসে শ্যামল। ভৈরব ব্রিজ পার হবার সময়ে ঠাণ্ডা বাতাসে কাঁপন ধরে গিয়েছিল তার শরীরে।

অল্প অল্প জ্বর-গায়ে ঢাকা ষ্টেশনের পরিচিত প্ল্যাটফর্মে পা দিয়েছিল শ্যামল। অনেক দিন পরে ঢাকার মাটিতে পা দিয়ে তৃপ্তিতে তার বুক ভরে যায়। সেদিনও কচি মেঘে ঢাকার আকাশ ঢেকে গিয়েছিল, দু'দিনের মুষলধার বৃষ্টির পর যেন ক্ষণ বিশ্রামসুখ উপভোগ করছিল কাজল-কালো মেঘের দল। ভিজে বাতাসে শিরশির করছিল শ্যামলের জ্বরতপ্ত শরীর।

ঠাঠারি বাজারের প্রকাণ্ড বটগাছটা বাঁয়ে রেখে রেল-লাইনের কাছাকাছি ওদের দোতলা বাড়ীটার সুমুখে এসে দাঁড়াল শ্যামল। সদর দরজা বন্ধ দেখে একটু অবাক হয় সে। বেলা দুটো, এ সময়ে ত তাদের বাড়ীর দরজা বন্ধ থাকবার কথা নয়।

পা দুটো যেন শরীরের ভার বইতে পারছিল না. মাথার ভেতর কেমন যেন ভোঁতা যন্ত্রণা, গলা পর্যন্ত মুখের ভেতরটা শুকিয়ে যেন কাঠ হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ ধ'রে খটখট খটাখট্ শব্দে কড়া নাড়ার অধৈর্য হয়ে পড়ে শ্যামল, মা কিংবা সীতা, গীতা, মীতা এরা সব গেছে নাকি। এত দেরি করছে দরজা খুলতে।

দরজার ওপাশে পায়ের মৃদু শব্দ শোনা যায়, একটু

...রে কটি মোজারেম দরজার ভেতর থেকে সতর্ক প্রশ্ন ভেসে আসে—কে?

অধীর শ্যামল বলে ওঠে—আমি—শ্যামল—

ঘটাং শব্দে খিল খুলে যায়, অবাক্ হয়ে শ্যামল দেখে একটি অপরিচিতা তরুণী দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। বাঁকা চাঁদের মত ছোট্ট কপালের মাঝখানে উজ্জ্বল রক্তিম সিন্দুর বিন্দু উদয়-আকাশে প্রভাত সূর্যের মত জ্বলছে। কালো চুলের ঘন অরণ্যের মাঝখানে সরু সিঁথি আগুন-রাঙা।

এত রং কি সত্যিই ছিল? না কি ওসব ছিল তার জ্বর-রক্ত চোখের বিভ্রম? পরে অনেকবার এ কথাটা মনের ভেতর নাড়াচাড়া করেও কোন সুমীমাংসায় আসতে পারে নি শ্যামল।

তার বয়সীই হবে—মনে মনে আন্দাজ করেছিল শ্যামল, মুগ্ধ দু'চোখ মেলে দেখেছিল যে অপরিচিতা যুবতীর দেহ জুড়ে রুদ্ধ-স্রোত তটিনীর মত অবরুদ্ধ যৌবন-ক্রীড়া বিভঙ্গে আবর্তিত হয়ে চলেছে।

মেয়েটির মাথা ডিঙিয়ে বাড়ীর ভেতর তাকায় শ্যামল, মা, ভাই কিংবা বোনদের কোন সাড়া-শব্দ না পেয়ে মনে মনে আশ্চর্য হয়। মাথার ভেতর কে যেন ক্রমাগত হাতুড়ি পিটে চলেছে, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেও বেশ কষ্ট হচ্ছে। ভিজে জুতোর গোড়ালি বেয়ে জ্বর যেন প্রবলতর আক্রমণের জন্য উঠে আসছে ওপরে।

উৎকণ্ঠিত স্বরে শ্যামল বলে—সীতা, গীতা ওরা সব কোথায়?

শ্যামলের চোখে চোখ রাখে মেয়েটি, মিহি সুরেলা গলায় বলে—কেন, আপনি কি কিছুই জানেন না? আপনাদের বাড়ীর সবাই ব্রাহ্মণ গাঁ চলে গেছেন—আপনার জ্যেঠিমার অসুখ—

সে কি! অসহায়, হতাশ সুরে বলে ওঠে শ্যামল। ডান-হাতের আঙুলে ঝুলে-থাকা স্যুটকেশটা তার অবশ হাত থেকে খসে পড়ে মাটিতে—কবে?

শ্যামলের শুকনো মুখ দেখে তার অবস্থা অনুমান করে কোমল স্বরে মেয়েটি বলে—দিন তিনেক হ'ল। কিন্তু তাতে কি হয়েছে, আমরা ত আছি। আসুন, আমার সঙ্গে।

ঘুরে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায় মেয়েটি।

মাথার আঁচলটা খুলে রঙিন পুষ্পগুচ্ছের মত ঘাড়ের কাছে খোপ হয়ে পড়েছে। আধা শুকনো খোলা চুল কালো ঝরণার মত কোমরের কাছে নেমে গেছে।

আর কথা না বলে স্যুটকেশটি তুলে নিয়ে সম্মোহিতের মত মেয়েটির পিছু পিছু এগিয়ে গিয়েছিল শ্যামল।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে প্রথমেই যে ঘরটি পড়ে তার বাঁ-দিকে শ্যামলদের মহল—তালা বন্ধ। ডান-দিকে ভাড়াটে মহল।

নিজেদের শোবার ঘরে এসে তক্তপোষের ওপর ওল্টানো বিছানাটা ক্ষিপ্রহস্তে পেতে দেয় মেয়েটি, চাদরের কোন দুটো ধরে টান টান করে দেয়। তারপর চুপ করে দাঁড়িয়ে-থাকা শ্যামলের হাত থেকে স্যুটকেশটা নিয়ে নামিয়ে রাখে। শ্যামলের জ্বরতপ্ত আঙুলের ছোঁয়া পেয়ে চম্‌কে উঠে বলে—ইস্, গা যেন পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে। শীগগির শুয়ে পড়ুন। ভাববেন না, আমি আপনাদের ভাড়াটে—বেদানা—

শ্যামল আর দাঁড়াতে পারছিল না, ধুঁকতে ধুঁকতে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে।

তন্দ্রায় জাগরণে কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল ছিল না। বিছানাটা যেন কলার মোচার মত বৃহৎ তরঙ্গ-ভঙ্গে ক্রমাগত আবর্তিত হচ্ছিল।

—শুনুন।

চোখ মেলে তাকাল শ্যামল। দু'চোখ ভরা মমতা আর ডান হাতে এক বাটি বার্লি নিয়ে তার বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে মেয়েটি।

—এই বার্লিটুকু খেয়ে ফেলুন ত।

কয়েক মুহূর্ত শূন্য চোখে তাকিয়ে থেকে তাড়াতাড়ি উঠে বসে শ্যামল। সাগ্রহে বার্লির বাটি নিজের হাতে টেনে নিয়ে তৃষিত ওষ্ঠের কাছে নিয়ে যায়।

নীচের তলা থেকে কড়া নাড়ার শব্দ ভেসে আসে। কে যেন চীৎকার করে বলে ওঠে—বেদানা, দোর খোল।

যেন একখণ্ড মেঘ সূর্যের আলো ঢেকে দেয়, নিমেষে ম্লান হয়ে যায় বেদানার মুখ, কি এক আশঙ্কায় ছটফট করে ওঠে। তারপর তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে ...

যায়, বাবার মধ্যে তার দু'চোখের ভয়ার্ত-করুণ দৃষ্টি বিস্মিত শ্যামলের বুকে বিঁধে যায়।

এক চুমুকে বার্লিটুকু শেষ করে খালি বাটিটা তক্তপোষের পায়ার কাছে রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে শ্যামল। একটু পরেই সিঁড়িতে ভারি জুতোর মস্ মস্ শব্দ শুনতে পায়। জ্বররক্ত চোখ মেলে ঘাড় ফিরিয়ে সেদিকে তাকায় সে।

বেদানার পেছনে পেছনে যে লোকটি উঠে আসে তাকে দেখেই চোখ ফিরিয়ে নেয় শ্যামল। বেঁটে, ভয়ানক মোটা, ঘাড়ে-গর্দানে দশাসই চেহারার লোক। কালো কুচকুচে গায়ের রং। ভারী ঘাড়ের ওপর চেপে বসানো মুখটায় একটা নির্বাক নিষ্ঠুরতা লিপ্ত হয়ে আছে। মোটা পুরু ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে সুমুখের তিনটি দাঁত সারাক্ষণের জন্য বাইরে উঁকি দিয়ে আছে।

শোবার ঘরে শয্যাশায়ী শ্যামলকে দেখে চৌকাঠের ওপর থমকে দাঁড়ায় লোকটি, সন্দেহ-কুটিল চোখে কিছুক্ষণ তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে মুখ ফিরিয়ে বেদানার মুখে তাকিয়ে বলে—এ আবার কে?

তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বার্লির খালি বাটিটা আড়াল করে দাঁড়িয়ে বেদানা বলে—কাকাবাবুর বড় ছেলে শ্যামল—চাঁদপুর থেকে জ্বর-গায়ে এখানে এসে পৌঁছেচে একটু আগে, এদিকে কাকীমারা কেউ নেই, তাই—

ভীরু চোখ দু'টি স্বামীর মুখে তুলে ধরে বেদানা।

হুম্—ব'লে বিরক্তি-কুঞ্চিত মুখে ডানদিকের ঘরে অদৃশ্য হয়ে যায় লোকটি।

সঙ্গে সঙ্গে পা দিয়ে বার্লির বাটিটা তক্তপোষের নীচে অন্ধকার কোণে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে শ্যামলের দিকে একবারও না তাকিয়ে তাড়াতাড়ি স্বামীর পেছনে পেছনে চ'লে যায় বেদানা।

বেদানার ভীত সন্ত্রস্ত এই রূপের সঙ্গে কিছুক্ষণ আগের মমতাময়ী কল্যাণী রূপের সাদৃশ্যহীনতা লক্ষ্য করে দমে যায় শ্যামল।

একটু পরেই পাশের ঘর থেকে বেদানার স্বামীর ক্রুদ্ধ গর্জন আর সেই সঙ্গে বেদানার মিনমিনে গলার মিনতির রেশ ভেসে আসতে থাকে :

—ওর জন্য ত আমাদের কি? কেন তুমি ওকে—

—আঃ, আস্তে, শুনতে পাবে যে—

—শুনুক, তুমি ত জানো যে আমি এসব আদপেই পছন্দ করি না।

—ছিঃ, কি বলছ তুমি! কাকামারা ফিরে এলে কি ভাববেন বল ত!

—ভাবুক, ঢাকা শহরে ভাড়া বাড়ীর অভাব নেই।

—আঃ, আস্তে কথা বল না, একটা অসুস্থ মানুষ,—তোমার শরীরে কি দয়ামায়াও নেই।

—ওসব ছেঁদো কথায় আমি ভুলি না, আমার চোখের সামনে তুমি এ সব করে বেড়াবে এ আমি সহ্য করব না। আঠারো বার বাড়ী বদল করেছি, না-হয় আরও দু'-চার বার করব।

—ছি ছি ছি, তোমার মনটা কি একটা আস্তাকুঁড়? দুনিয়ার ভাল দিকটা কি তোমার চোখেই পড়ে না? তোমার জন্য কি আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে? দেখো, একদিন ঠিক তাই করব।

—আহা রাগ করছ কেন? আচ্ছা বেশ। অর ছেড়ে গেলে কিন্তু ওর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে পারবে না, বলে দিলাম।

—আহা, কথার ছিরি দেখ। বয়ে গেছে আমার ওর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে। যাও, এখন খাবে চল। এ ঘরেই তোমার বিছানা করে দিচ্ছি।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়। কিন্তু এ ঘরে আর কারুর দেখা পায় না শ্যামল। জ্বরের ঘোরে শরীরের যন্ত্রণায় ক্রমাগত বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে। মাথার ভেতর যেন আগুন জ্বলছে, একটুখানি স্নিগ্ধ স্পর্শের জন্য সমস্ত অন্তর উন্মুখ ব্যাকুলতায় ছট্‌ফট্ করে।

ঘড়ির কাঁটা ঘুরে চলে, অস্তাচলগামী সূর্য শেষবারের মত তার আলোক আঙুল দিয়ে পৃথিবীকে আদর করে নেয়। স্নান, আহার আর দিবানিদ্রার অবসানে বেরিয়ে যায় বেদানার স্বামী।

নীচের সদর দরজা বন্ধ করে ছুটতে ছুটতে ওপরে এসে শ্যামলের কপালে হাল্কা হাত রাখে বেদানা। জ্বরতাপন আনত মুখে মেঘের মত স্নিগ্ধতা ভাসে। চোখ মেলে তাকায় শ্যামল। স্বামীসঙ্গ-মুক্ত বেদানার মুখ,

পানের রসে রাঙা ঠোঁট দেখে। হঠাৎ অকারণ অভিমান ঘনিয়ে আসে তার মনে, দু' চোখের কোণে অশ্রু জমে, তবু মাথা নেড়ে কপাল থেকে বেদানার সেবা-সৌম্য হাতখানা নামিয়ে দেয় না।

স্নিগ্ধ স্বরে বেদানা বলে—লক্ষ্মী ভাইটি, কিছু মনে ক'রো না. উনি একটু··· বলতে বলতে কি ভেবে থেমে যায়। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে।

বেদানার নরম আঙুলের আলতো ছোঁয়া সমস্ত শরীর দিয়ে উপভোগ করে শ্যামল। চাঁদপুরের সেবাহীন দিনগুলির কঠোর তপস্যাই বুঝি আজ তাকে এই মাধুর্যের মধ্যে এনে দিয়েছে।

একটু পরে বেদানা বলে,—দাঁড়াও, তোমার মাথা ধুইয়ে দি আগে।

তক্তপোষ থেকে নেমে জল, গামছা, ঘটির সন্ধানে নীচে চলে যায় বেদানা।

মাথা ধুইয়ে, চুল আঁচড়ে দিয়ে বেদানা বলে—তুমি এবার চুপটি করে শুয়ে থাক, আমি রান্না-বান্নার যোগাড় করি, কেমন?

হঠাৎ ব্যাকুল স্বরে শ্যামল বলে ওঠে,—না না, আপনি যাবেন না, একটু বসুন, প্লীজ।

কথা ক'টি বলেই শ্যামল বুঝতে পারে যে অনাত্মীয়া মহিলাকে এ সব কথা বলা শোভন হ'ল না।

স্নিগ্ধ হাসিতে ভরে ওঠে বেদানার মুখ, বলে—তুমিও বুঝি আমার মত মানুষের সঙ্গ ছাড়া থাকতে ভালবাস না? আচ্ছা, এই আমি বসলাম কিন্তু বেশি-ক্ষণ না. আধঘণ্টা, কেমন?

দেখতে দেখতে নানা গল্পে মশগুল হয়ে যায় দু'জন। শ্যামলের মুখের ভেতরের তেতো ভাবটা কেটে যায়। বেদানার মুখ মাথা নেড়ে কথা বলা, তার চোখের তারার অবিরাম নাচ, তার ঠোঁটের কোনের চাপা হাসি—সব যেন কোন্ অমৃত লোকের বার্তা নিয়ে আসে শ্যামলের মনে।

দু'দিনেই দু' জনের অন্তরঙ্গতায় সৃষ্টি হয়। নীরব পরিচর্যার ভেতর দিয়ে বেদানার কোমল অথচ বেদনা-পীড়িত অন্তরটি স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয় শ্যামলের কাছে। স্বামীকে লুকিয়ে শ্যামলের সেবা করার মধ্যে বেদানা যেন নিষিদ্ধ ফল আস্বাদ করবার নিগূঢ় আনন্দ পায়।

বেদানার চিঠি পেয়ে ব্রাহ্মণ গাঁ থেকে ফিরে আসে শ্যামলের মা বাবা ভাইবোনেরা।

ঘর বদল হয়। সীতা গীতা আর রীতা শ্যামলের সেবার ভার নেয়, মা এসে গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। শ্যামলের কিছুই ভাল লাগে না। ফাঁক পেয়ে তাকে যখন বেদানা দেখতে আসে শুধু তখনই তার অন্ধকার মন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

সাত দিনে জ্বর ছাড়ে কিন্তু দুর্বলতা ছাড়ে না।

অন্নপথ্য করে দোতলার রাস্তামুখী বারান্দায় মেঘ-ভাঙা রোদে পিঠ দিয়ে চুপ করে বসে থাকে শ্যামল। কাছেই পাটি পেতে শ্যামলের মা গীতা রীতা সীতা আর বেদানা বৌদি বসে মৃদুকণ্ঠে গল্প করে। বেদানার স্বামী দেবতাটি দুপুরের খাওয়া সেরে কোথায় কোন্ কাজে যেন বেরিয়েছে।

এই ক'দিনেই যেন কত আপনার করে নিয়ে তাকে ঠাকুরপোর আসনে বসিয়েছে বেদানা। স্বামী বেরিয়ে গেলেই রাহুমুক্ত চাঁদের মত ছুটে এসেছে তার রোগ-শয্যার পাশে। কাছে বসে কত কথাই না বলেছে, বাপের বাড়ীর নানা গল্প করেছে, আর সেই সব গল্প শুনতে শুনতে নিজের অসুখের কথা ভুলে যেত শ্যামল, ভুলে যেত যে এই বেদানার সঙ্গে মাত্র ক'দিন হ'ল আলাপ হয়েছে—এক রকম অপরিচিতাই সে তার কাছে, তার মেজাজ বা প্রকৃতি সম্বন্ধে বলতে গেলে কিছুই জানে না সে, তবু কেন যেন শ্যামলের মনে হ'ত যে কয়েক দিনেই অপরিচয়ের মেঘ কেটে গিয়ে অন্তরঙ্গতার নির্মল নীল আকাশ বেরিয়ে আসার, উদ্ধত উজ্জ্বল দীপ্তির আলো নয়, স্নিগ্ধ, মেদুর প্রসন্নতার ছায়া ছড়াবে।

বড় রাস্তার ওপারে নিমগাছের ছায়ায় বসে মাখন বিক্রী করছে মাখন-ওয়ালা। আর তার পাশে বসে "চাই মাঠা-মাকখন, চাই মাঠা-মাকখন" ব'লে চীৎকার করে চলেছে ঘোলওয়ালা। দৈনন্দিন কর্মপ্রবাহে শ্রান্ত দিন সন্ধ্যার কূলে আশ্রয় নিতে চলেছে।

সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে শুভময়তা বেদানা

দিকে তাকায় শ্যামল। এক মাথা ভিজে ছড়ানো চুলে অপরাহ্ণের রোদ সোনা ছড়িয়েছে। ফর্সা হাতে চার-গাছি করে সোনার চুড়ি, তাতে রোদ লেগে ঠিক্‌রে পড়েছে—পাশের সাদা দেওয়ালে সোনালি জাফরি-কাটা চঞ্চল ছায়া ফেলেছে।

শুধু চেয়ে থাকা। তার ভেতরেও যে এমন অনাস্বাদিত পুলকের সঞ্চয় থাকতে পারে তার সন্ধান এর আগে আর কোনদিন পায় নি শ্যামল। তার রোগ ক্লান্ত মনের ধূ-ধূ-করা আকাশে প্রথম নারী-চেতনার রক্তছবিটি আস্তে আস্তে ফুটে উঠতে থাকে। আবেগে, আশায় আর আনন্দে দুলে দুলে ওঠে তার মন। তবু মাঝে মাঝে ভয় পায় শ্যামল। তার মনের অতল অন্ধকার থেকে উঠে আসছে এই যে অজানা এক আশ্চর্য অনুভূতি-কি এর নাম? বেদানার কাছে ত কোন প্রত্যাশার স্নিগ্ধতা নেই, তবে হঠাৎ-জাগা বিশ্বব্যাপী ক্ষুধার মত এ কোন্ অনুভূতি তার সমস্ত সত্তাকে গ্রাস করবার জন্ম এগিয়ে আসছে!

মা-র কি একটা কথায় হঠাৎ খিল্‌ খিল্‌ করে হেসে ওঠে বেদানা, চকিতে শ্যামলের মুখে একবার তাকায়। শিউরে ওঠে শ্যামল।

এলোমেলো সব গল্প, টুকরো টুকরো সব কথা, কিছু কানে আসে কিছু আসে না, শ্যামলের দু'কাম ভরে বাজে শুধু হাল্কা গানের সুরের মত বেদানার লঘু-চপল কণ্ঠস্বর, চঞ্চল হাতের কঙ্কন-কিঙ্কিণী। মুখ মাথা নেড়ে তার কথা বলবার মনোরম ভঙ্গি—আর তার বিদ্যুৎগর্ভ দু'চোখের চকিত দৃষ্টি যেন দু'চোখ দিয়ে পান করে শ্যামল।

এমন সময়ে নীচে সদর দরজায় কড়া বেজে ওঠে, রুক্ষ কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়—বেদানা, দোর খোল।

ব্যাধভীতা ত্রস্তা হরিণীর মত ছুটে চলে যায় বেদানা। রৌদ্র-পক শস্যক্ষেত্রের ওপর হাল্কা মেঘের ছায়ার মত একটা বিধুর শঙ্কা পলকের জন্ম দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায় তার মুখ থেকে।

ঘরের আলোটুকুও যেন শুষে নিয়ে চলে গেছে বেদানা—একটা নিশ্বাস ফেলে আবার রাস্তার দিকে চোখ ফেরায় শ্যামল।

আপন মনেই শ্যামলের মা বলেন—আহা, বড় ভাল মেয়েটা। কি ব'লে যে ঐ অমানুষটার সঙ্গে জুটলো!

ওপাশ থেকে সীতা বলে ওঠে—মা-র যেমন কথা, বেদানা বৌদি ত ভালবেসেই বিয়ে করেছে অনাথ দা'-কে

মেয়ের দিকে তাকিয়ে শ্যামলের মা বলেন- সে যাই হোক, বড় সন্দেহবাতু অনাথের। এমন লক্ষ্মী বৌ, কারুর সাতে-পাঁচে থাকে না, তবু তাকে কি হেনস্তাই না করে অনাথ, কি অশান্তি বল ত? মোটে ত দেড় বছর হ'ল বিয়ে হয়েছে ওদের, এর মধ্যে কত বার বাসা বদল করল বল দেখি? কেউ যদি একবার চোখ তুলে বেদানার দিকে তাকালো, কি বেদানাই কারুর সঙ্গে একটা কথা বলল ত আর রক্ষে নেই।

শ্যামলের কৌতূহল উদ্দাম হয়ে ওঠে, বলে—অনাথবাবুর মত এমন একটা বদখৎ লোককে কি করে ভাল বাসল বেদানা বৌদির মত অমন সুন্দরী মেয়ে?

গলা খাটো করে সীতা বলে—বেদানা বৌদিকে গান শেখাত অনাথ দা, সেই সূত্রে ঘনিষ্ঠতা, তারপর অসবর্ণ বিয়েতে বাপ-মা রাজী হবে না ভেবে ওরা দু'জন পালিয়ে যায় বাড়ী থেকে। তারপর রেজিষ্ট্রি করে বিয়ে করে ঢাকায় আসে।

অবাক্ হয়ে শ্যামল বলে—বলিস্ কি সীতা! শুধু গানের সুরে মুগ্ধ হয়ে এত কাণ্ড করেছে বেদানা বৌদি! অনাথবাবুর এই বিশ্রী স্বভাব, তার এই মর্কট-কান্তি চেহারা—এসব কি চোখেই পড়ে নি?

মা বলেন—তা চেহারা-চরিত্র যাই হোক না কেন, অনাথ গান গায় খুব চমৎকার। সেদিন আমাকে শ্যামাসঙ্গীত শোনাল, চোখে জল এসে গিয়েছিল। অত ভাল গান জানে বলেই না অত সহজে ঢাকা রেডিওতে ওর চাকরিটা হয়ে গেল।

সীতা বলে ওঠে—শুধু শ্যামা সঙ্গীতের কথা কেন বলছ মা, কি সুন্দর রবীন্দ্রসঙ্গীত গায় অনাথ দা, কোন্‌কোন কোম্পানীর রেকর্ড আছে ওঁর।

কান খাড়া হয়ে ওঠে শ্যামলের—বেদানা-মহল থেকে বেদানার চাপা কণ্ঠস্বর ভেসে আসে—আঃ, দিনের বেলা এসব কি করছ, ছাড়।

জড়িত কণ্ঠে অনাথ কি বলে তাল শোনা যায় না।
সীতা গীতা রীতা হাসি গোপন করে সেখান থেকে
ঠ যায়।

মা একটা নিশ্বাস ফেলে বলেন—বৌটাকে এত
লও বাসে ছোঁড়া, আবার অত্যাচারও কম করে না।
ন মেয়ে, কিন্তু কি দুর্গতি ওর।

সহানুভূতির লঘু কুয়াশায় ছেয়ে যায় শ্যামলের মন,
রই ভেতর দিয়ে প্রথম দিনে দেখা বেদানার টকটকে
ল সিন্দুর টিপ কেমন অস্পষ্ট দেখায়।

আরও কিছু দিন কেটে যায়।

দিনে দিনে বেদানার সঙ্গে শ্যামলের সম্পর্কটা
রও সহজ হয়ে আসে। ঠাকুরপো সুবাদে ছোট-
টো ঠাট্টা-ইয়ার্কি করে শ্যামল। আর তাই শুনে হেসে
টাপুটি যায় বেদানা, বলে—এত সব রঙ্গ কোথায়
খলে তুমি ঠাকুরপো?

গম্ভীর হয়ে শ্যামল বলে—ইয়ার্কি শিখেছি
াঙ্কিদের কাছে।

হাসি থামিয়ে বেদানা বলে—ইয়া কি?

ইয়াঙ্কি-ইয়াঙ্কি—মানে আমেরিকান। ওরা বর্মা
কে জাপানী যুযুৎসুর প্যাঁচে পড়ে পালিয়ে এসেছে।
ন গোটা ফোরটিন্থ আর্মি থানা পেতেছে কুমিল্লাতে,
কি কোন লজ্জা আছে ওদের। দিব্যি আমোদ
করে দিন কাটাচ্ছে, আর্মি কোরের কচকে নার্স-
কে নিয়ে কি কাণ্ডই না করছে। এখন আবার
দেশের মেয়েতে অরুচি ধরেছে বলে এদেশী
খোঁজে হন্যে হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে—মেয়েদের পথে
ওয়াই দায়।

স্ময়ে চোখ তুলে বেদানা বলে—বল কি ঠাকুরপো,
নাচার।

হেসে শ্যামল বলে—এ আর এমন কি, তবে
দিনের কথা বলছি শোন—থমথমে নিস্তব্ধ নিষ্প্রদীপ
—

কিন্তু সে কথা আর শোনা হয় না, শ্যামলের কথা
হবার আগেই হঠাৎ চঞ্চল হয়ে বেদানা বলে—এখন
থাক, পরে শুনব। ওঁর আসবার সময় হ'ল, তোমার সঙ্গে
গল্প করছি দেখলে আমাকে আর আস্ত রাখবে না
আজ।

দ্রুত পায়ে নিজের ঘরে চলে যায় বেদানা। আশ্রয়-
চ্যুত তার চুলের গন্ধ, অঙ্গ-সৌরভ বাতাসে ভেসে
বেড়ায়। নিশ্বাসে নিশ্বাসে তা বুকের ভেতর টেনে নেয়
শ্যামল।

দিনগুলি যেন অমৃত পাথারে ডুব দিয়ে আসে, যাবার
সময়ে শ্যামলের মনে রেখে যায় অনাস্বাদিত পুলকের
স্বাদ। রাতগুলি যেন লক্ষ ফুলের গন্ধ-রেণু মাখা।

অনেক বিনিদ্র বিছানায় শুয়ে বেদানার কথা ভেবেছে
শ্যামল। ভেবেছে অনাথের কথা, তার বিচিত্র ব্যবহারের
কথা। একটু একটু করে যেন অনাথকে বুঝতে পেরেছে
শ্যামল।

বেদানার প্রথম যৌবনের অপরিণামদর্শিতার সুযোগ
নিয়েছিল অনাথ। হয়ত বেদানা সেদিন অনাথের
বাইরের রূপের চেয়ে তার শিল্পের ঐশ্বর্যকেই বড় করে
দেখেছিল, ভালবেসেছিল শিল্পী অনাথকে, আর তাই
নিশির ডাকে সাড়া-দেওয়া মানুষের মত তার হাত ধরে
চলে এসেছিল বিশাল বিশ্বের অগণ্য জনতার মাঝখানে।
মা বাবা ভাইবোনের কথা একবারও ভাবে নি। সে
আকর্ষণ আজ কমে এসেছে, সে নেশা ফিকে হয়ে
এসেছে, তাই বেদানা আজ নতুন করে তার বাপ মা
ভাইবোনকে খুঁজছে, অনাত্মীয়ের মাঝে। নিজের কুরূ-
পতা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন অনাথ, সে জানে যে একদিন
বেদানার মন তার বাইরের কুশ্রীতা দেখে হয়ত ঘৃণায়
ভরে উঠবে, সেদিন কি দিয়ে বেদানার মনকে বেঁধে
রাখবে সে। তাই অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে বেদানাকে
কথা বলতে দেখলেই ঈর্ষার আগুন জ্বলে ওঠে তার মনে,
ক্ষিপ্ত হয়ে যায় সে বেদানাকে হারাবার আতঙ্কে।

তাই শ্যামল আসার পর অনাথের খবরদারিটা
আরও বহুগুণ বেড়েছে, তাই শ্যামল-বেদানার মধ্যে
দেখা হয়, কথা হয় লুকিয়ে-চুরিয়ে, কখনো হাতের
আড়ালের আড়ালে, কখনও বা সন্ধ্যার তরল অন্ধকারে

দীপ-নেভা বারান্দার স্তব্ধ নির্জনতায়। অকিঞ্চিৎকর কথা সব বেদানার, তবু ভাল লাগে শ্যামলের। জীবনের প্রথম আঠারটি বছর যেখানে যাদের সঙ্গে কাটিয়েছে বেদানা তারই সব গল্প। অনাথের অত্যাচারে বর্তমান তার কাছে শূন্য, ভবিষ্যৎ অন্ধকার, তাই মনের দেউলে স্মৃতির বিগ্রহ স্থাপন করেছে বেদানা, কথার স্তবে তারই নিত্য পূজা করে সে, আর তন্ময় হয়ে তাই শোনে শ্যামল।

বুঝলে ঠাকুরপো, আমাদের বাড়ীর পেছনে একটা ছোট্ট ডোবা ছিল। দাদা একবার দুটো হাঁস কিনে আনলেন। সারাদিন হাঁস দুটো ডোবার জলে সাঁতার কাটত, শুধু দুপুরে খাবার সময় হ'লে প্যাঁক্ প্যাঁক্ করতে করতে হেলে-দুলে ধীরে ধীরে ঠিক এসে হাজির হ'ত আমাদের উঠানে।

—আমি নিজের হাতে তাদের খাওয়াতাম।

শ্যামল লক্ষ্য করত যে বেদানা তার মুখে তাকিয়ে থাকলেও তাকে দেখছে না, তার মন চলে গেছে কোন্ এক সুদূর দিনের আনন্দময় মুহূর্তগুলিতে অবগাহন করতে।

গীতা একদিন সকালে চুপি চুপি শ্যামলকে বলে—তুমি আর বেদানা বৌদির সঙ্গে মিশো না দাদা।

—কেন রে?

—তোমার সঙ্গে কথা বলে ব'লে বেদানা বৌদিকে কাল রাতে খুব মেরেছে অনাথ দা। বলেছে, ফের তোমার সঙ্গে মিশলে হাড় গুঁড়ো করে দেবে।

আহত স্বরে শ্যামল বলে—সে কি রে! তুই জানলি কি ক'রে?

—কাল রাতে আমাদের খাওয়া-দাওয়া সারতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। হেঁসেল পরিষ্কার করে, নীচের রান্নাঘর ধুয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছি এমন সময়ে ওদের ঘর থেকে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ শুনলাম। মা নিজের ঘরে চলে গেল, আমি ওদের ঘরের দরজায় কান পাতলাম।

দাঁতে দাঁত চেপে অস্পষ্ট স্বরে শ্যামল বলে—বীস্ট, [illegible]।

দু'দিন আর বেদানার ছায়াও দেখতে পায় না শ্যামল। তার নিজের শরীর সম্পূর্ণ সেরে গেছে, এবার তার চাঁদপুরে ফিরে যাওয়া দরকার। কিন্তু যাই-যাই করেও যেতে পারে না সে। বেদানার সঙ্গ যেন একটা নেশা, ফিকে হয় না কখনও, নারী-সঙ্গের অনির্বচনীয় আনন্দের স্বাদ তার মনকে পুলকে ভরে রাখে। বেদানার ভেজা চুলের অন্ধকার থেকে ভেসে-আসা ঘুম ঘুম গন্ধ, তার কণ্ঠস্বরের মায়াবী যাদু আর কচিৎ-কখনও হঠাৎ-লাগা স্পর্শের বিদ্যুৎ-প্রবাহ শ্যামলের মনকে এক বিচিত্র অনুভূতির জগতে নিয়ে যায়। শরীরের রক্তস্রোত খর বেগে বইতে থাকে, বেদানার মত সহজ হয়ে সহজ ভাবে কথা বলতে পারে না সে তখন। বুকের ভেতর জেগে-ওঠা সপ্তসিন্ধুর কল্লোল-ধ্বনি চাপা দিতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। নিজেকে কেমন অপরাধী ব'লে মনে হয়।

সেদিন সকাল থেকেই ভাদ্রের আকাশ-প্রাঙ্গণে শ্রাবণের কালো মেঘ অনাহূত অতিথির মত এসে জুটেছিল। সারাদিনে বৃষ্টি-ধারার আর বিরাম রইল না।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে আসে। পড়ার ঘরে স্কুল-কলেজের পড়া নিয়ে মেতে থাকে গীতা রীতা সীতা আর বাদল। মা রান্নাঘরে আর বাবা নীচের তলায় তাঁর মক্কেল-মহলে।

কথা-প্রসঙ্গে কবে একদিন ঢাকাই পরোটার প্রশংসা করেছিল বেদানা, শ্যামল আজ তাই বৃষ্টিতে ভিজে চকবাজারের কালাচাঁদের দোকান থেকে চারটে ঢাকাই পরোটা কিনে এনেছে, তাই হাতে নিয়ে পা টিপে টিপে বেদানার ঘরের দিকে এগিয়ে যায় সে। একটু আগেই অনাথ চলে গেছে রেডিও স্টেশনে, সিঁড়িতে তার বিলীয়মান পদশব্দ শুনেছে শ্যামল।

দরজা খোলাই ছিল, ঘর অন্ধকার। শুধু একফালি

[illegible]ন্ধকার মত অদূরের রাস্তায় বিদ্যুতের আলো [illegible]নালা দিয়ে ঘরের মেঝেতে লুটিয়ে পড়েছে।

ঘরে ঢুকে এদিক্‌-ওদিক্‌ তাকায় শ্যামল, লক্ষ্য করে [illegible], খোলা জানলার শিক ধরে রাস্তার দিকে মুখ করে [illegible]প করে দাঁড়িয়ে আছে বেদানা।

বেদানার খুব কাছে গিয়ে দাঁড়ায় শ্যামল, বেদানার [illegible]ল ও শরীর থেকে একটা মাতাল-করা গন্ধ তার নাকে [illegible]সে লাগে।

ঘাড়ের ওপর উষ্ণ নিঃশ্বাস পড়তেই চমকে ঘুরে [illegible]াড়ায় বেদানা, দুই চোখের কোলে এতক্ষণ ধরে জমে-[illegible]াকা অশ্রুবিন্দু ঝরে পড়ে তার গালে, যেখানে পাঁচটি [illegible]াঙুলের যন্ত্রণার দাগ রক্তিম রেখায় ফুটে উঠেছে।

যেন পাগল হয়ে শ্যামল, ঢাকাই পরোটার কথা [illegible]ুলে কোঁচার খুঁট তুলে সযত্নে বেদানার চোখ দুটো [illegible]ুছিয়ে দেয়, বলে—কেঁদো না, কেঁদো না বেদানা, [illegible]ীবনে দুঃখ ত আছেই, কিন্তু তাতে ভেঙে না পড়ে [illegible]াকে জয় করাটাই বড় কথা।

—উঃ আমি আর পারি না, আর সইতে পারি না [illegible]ামল ঠাকুরপো—হতাশায় ভেঙে-পড়া সুরে বেদানা [illegible]লে—ওর সন্দেহের বিষে আমার সর্বাঙ্গ জলে [illegible]ল, এর কি বিরাম হবে না কোন দিন? একটু জুড়োবার [illegible]ন্য তোমাদের কাছে ছুটে যাই, দুটো কথা বলি, কিন্তু [illegible]ার জন্য কি শাস্তিটাই না ও দিচ্ছে আমায়। তাঁতি [illegible]াজার না শাঁখারি পট্টিতে কোথায় যেন নতুন বাড়ী [illegible]েখে এসেছে, সেই অন্ধকূপে আমি যেতে চাই না বলে —বলতে বলতে বেদানার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে।

শ্যামলের সমস্ত অবরুদ্ধ পৌরুষ ক্রোধে গর্জে ওঠে, [illegible]বদ্ধ হাত দুটো যেন কাকে আঘাত করতে ওপরে [illegible]ঠে যায়, দীপ্তকণ্ঠে বলে ওঠে—এই নরক থেকে তুমি [illegible]রিয়ে পড় বৌদি, পৃথিবীটা ত এই ঘরটার মধ্যেই [illegible]মিত হয়ে নেই, সে যে বিপুল, সে যে বিরাট্‌। [illegible]োমাকে এই চিরন্তন অপমান থেকে উদ্ধার করব আমি, [illegible]াবে আমার সঙ্গে?

—কোথায়?—যেন আঁধার একটা সতেজ লতা [illegible]েখতে পেয়ে তাকে আঁকড়ে ধরতে চায় বেদানা—[illegible]িলফিস্‌ করে বলে—কোথায় ঠাকুরপো?

আবেগ থরোথরো স্বরে শ্যামল বলে—চাঁদপুরে, কূলহারা মেঘনার ওপারে আমরা একটা শান্তি-নিবিড় গৃহনীড় রচনা করব। দূর-দূরান্ত থেকে দুরন্ত বাতাস এসে তোমাকে উড়িয়ে নিতে চাইবে, ভুলিয়ে দেবে তোমার এই অন্ধকার অতীতকে। যাবে, যাবে তুমি? তোমার ওপর এই অত্যাচার আর আমি সইতে পারি না বেদানা।

বলতে বলতে ঘন হয়ে দাঁড়ায় শ্যামল, ওর নাক দিয়ে ঝড়ের বেগে নিঃশ্বাস বইতে থাকে।

পিছিয়ে সরে যায় বেদানা। অন্ধকারে শ্যামলের চকচকে চোখ দুটো দেখতে না পেলেও, তার উষ্ণ নিঃশ্বাসের ভেতর দুরন্ত কামনার ঝড় অনুভব করে সে। শ্যামলের জলন্ত শরীর থেকে একটা আগ্নেয় বিকিরণ তাকে সাবধান করে দেয়। আশাহত সুরে বেদানা বলে—তুমি এ কি বলছ শ্যামল ঠাকুরপো। আমি কি শেষ পর্যন্ত ওঁর সন্দেহই যে সত্য, তাই প্রমাণ করে যাব?

শ্যামল বলে—হোক না সত্যি, তাতে কার কি ক্ষতি?

মাথা নেড়ে বেদানা বলে—না, তা হয় না।

অধীর স্বরে শ্যামল বলে—কিন্তু কেন হয় না, তুমি কি আমাকে ভাল—

হাত দিয়ে শ্যামলের মুখ চাপা দিয়ে বেদানা বলে—না না, ও কথা উচ্চারণ ক'রো না শ্যামল, তোমাকে যে আমি ঠিক আমার ভাই-এর মতই দেখি।

ভাই! চমকে ওঠে শ্যামল, যেন বুকের ওপর একটা ধাক্কা খায়। ঐ একটি শব্দ যেন শুষে নেয় তার মনের যত আবেগ, যত উত্তাপ।

উদ্ভাসিত মুখে বলতে থাকে বেদানা—হ্যাঁ, সে ছিল অনেকটা তোমার মতই দেখতে, তাই ত বার বার ছুটে যাই তোমার কাছে, তাই ত তোমার সঙ্গে এত ভাল লাগে আমার। আমার চেয়ে মাত্র দেড় বছরের ছোট ছিল সে। সারাদিন ধরে সে কি ঝগড়া, মারামারি চলত আমাদের দু'জনের মধ্যে। মা মাঝে মাঝে রেগে গিয়ে বলতেন—"তোরা দুটি যেন সাপ আর নেউল, শুধু দেখা হবার অপেক্ষা।

শ্যামলের মনের অনেক আশার ভুবনটি যেন ভূমিকম্পে গুঁড়িয়ে যাবার পূর্বক্ষণে কাঁপতে থাকে, কাঁপতে থাকে তার সারা শরীর।

কিন্তু—কি বলতে গিয়ে কথার খেই হারিয়ে ফেলে স্তব্ধ হয়ে থাকে শ্যামল।

ধরা গলায় বেদানা বলতে থাকে—তার পর মা মারা গেলেন, বাবা আবার বিয়ে করলেন। আমাদের দু'জনার কলকাকলি গেল থেমে, আড়ষ্ট হয়ে গেল আমাদের যত চঞ্চলতা। নতুন মা দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না আমাদের তাই দুঃখের দিনে আমরা পরস্পরের সান্ত্বনার সাথী হয়ে রইলাম। একদিন নতুন মা-র কি একটা কথায় সেই যে অভিমান করে ঘর ছেড়ে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল কেউ আর তার খোঁজ পেল না।

ছলছল করে ওঠে বেদানার দু'চোখ, একটু সামলে নিয়ে দু'হাতে শ্যামলের চিবুকটি উঁচু করে তুলে ধরে বলে—তার পরেই আমি ঐ অভিশপ্ত বাড়ী ছেড়ে ওঁর হাত ধরে অজানার উদ্দেশে ভেসে পড়ি, এখানে এসে তোমার ভেতর দেখেছি সেই পলাতকের ছায়া।

শ্যামলের মন থেকে যত কলুষ কালিমা নিঃশেষে ধুয়ে-মুছে বেরিয়ে যায় অনুতাপবিদ্ধ কয়েক ফোঁটা চোখের জলে। বেদানার স্নেহস্পর্শ পবিত্রতার দীপ জ্বেলে দেয় তার মনে।

অনেকক্ষণ চুপ করে পরস্পরের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকে দু'জনে। নারী যে শুধু প্রিয়া বা প্রেয়সীই নয় এই উপলব্ধি শ্যামলের সহানুভূতিশীল মনে ভিন্ন রসের সঞ্চার করে।

বাইরে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন থেকে ঘনতর হয়ে ওঠে।

—বাঃ বাঃ, চমৎকার! বজ্র গর্জনে ফেটে পড়ে অনাথ। কখন যে চুপিসাড়ে ঘরের ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে তা টেরও পায় নি বেদানা-শ্যামল। চমকে ওঠে ওরা।

—এটা কি লয়লা-মজনুর একটি নির্বাচিত দৃশ্য, না রোমিও-জুলিয়েটের—অ্যাঁ? কি মশাই, বাক্যহারা হয়ে গেলেন যে— অনাথের ঈর্ষায় রক্ত-আলাভ চোখের দৃষ্টি যেন পোড়াতে থাকে ওদের। শ্যামল মাথা নীচু করে, কিন্তু মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে বেদানা।

শ্যামলের মুখের কাছে হাত দুটো নেড়ে বিকৃত স্বরে অনাথ বলে—পরের বৌ-এর সঙ্গে প্রেম করতে খুব মজা, না?—বেরোও, বেরিয়ে যাও এ ঘর থেকে রাস্কেল, ভিখচ্—তার পর ওকে দেখছি আমি।

সমস্ত ব্যাপারটার কুশ্রীতা শ্যামলের শরীরকে সাপের মত পাকিয়ে পাকিয়ে ধরে, মুখ তুলে সে বলে—আপনি ভুল করছেন অনাথবাবু—আপনি যা ভাবছেন আসল ব্যাপার মোটেই তা নয়, অনর্থক আপনি এই মেয়েটির জীবনটা মিথ্যে সন্দেহের বিষে বিষিয়ে তুলছেন।

—বটে! বিকৃত স্বরে অশ্রাব্য গাল দিয়ে অনাথ বলে—ব্যভিচারীর কাছে হিতোপদেশ শুনতে হবে আমায়। নিজের চোখে যা দেখেছি তা অবিশ্বাস করতে হবে। বলি, তুমি এ ঘর থেকে বেরুবে, না চেঁচিয়ে বাড়ীর সব লোকজন জড়ো করব আমি তোমাদের কীর্তি দেখাতে?

শ্যামল আর কথা বলতে পারে নি সেদিন, তার মনের ভেতর এতদিন ধরে পুষে-রাখা পাপ তার কণ্ঠরোধ করে রেখেছিল। মাথা নীচু করে পালিয়ে এসেছিল সে।

দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে বেদানার দিকে এগিয়ে গিয়েছিল ঈর্ষায় অন্ধ অনাথ।

নিজের বিছানায় শুয়ে অনেক রাত পর্যন্ত বেদানার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না শুনতে পেয়েছিল শ্যামল। অনাথের উপর প্রতিশোধ নেবার অদম্য বাসনায় উৎকট স্বপ্ন বুনেছিল তার বিনিদ্র মন।

পরদিন সকালেই গরুর গাড়ি ডেকে গম্ভীর ভাবে তার ওপর সমস্ত লটবহর চাপিয়ে দিয়েছিল অনাথ, সর্বক্ষণ চোখে চোখে রেখেছিল বেদানাকে। যাবার আগে কাকীমাকে একবার প্রণাম করে যাবার সুযোগটুকুও পায় নি সে।

ঢাকায় আর মন টেকে নি শ্যামলের। ও-পাশের খালি ঘর দুটির দিকে চোখ পড়লেই তার মন হু হু করে উঠত, বেদানার অজস্র স্মৃতি সারাক্ষণ কাঁটা বেঁধাত তার মনে। তাই একদিন তল্পিতল্পা নিয়ে কর্মস্থান চাঁদপুরে এসে হাজির হয়েছিল সে।

দিনের পর দিন কেটে গেছে। ফেলে-আসা দিনগুলির স্মৃতি তাদের রং হারাতে থাকে, কিন্তু বেদানার স্মৃতির রং ফিকে হয় না। এ যেন কোন এক বৃহৎ শিল্পীর অবিস্মরণীয় তেল রংএর ছবি, ম্লান হবে না কখনও। তাই জীবিকার্জনের কঠোর সংগ্রামের ফাটল দিয়ে বেদানার স্নিগ্ধ মুখের ছবি শ্যামলের মনে উঁকি দেয়, বাস্তবের রূঢ় কঠোরতা ঢেকে রাখে হাল্কা মেঘের ছায়া দিয়ে।

আজ বিস্তীর্ণ মেঘনার কূলে ব'সে অতীতের এ-সব কথাগুলিই বার বার মনে পড়ছে শ্যামলের। পকেট থেকে বহুবার পড়া, প্রায়-মুখস্থ চিঠিখানা বার ক'রে অন্ধকারে অন্ধচোখে বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে থাকে।

ছোট্ট চিঠি, কিন্তু কি সর্বনাশা সংবাদই না বহন করে এনেছে।

মা লিখেছেন… …"আমাদের আগের ভাড়াটে বেদানার কথা মনে আছে কি তোর? আহা, বড্ড ভালবাসত তোকে, ওর ত বাইরে বেরুবার উপায় রাখে নি অনাথ, আমিই মাঝে-মধ্যে দেখতে যেতাম। কি রূপই না ছিল মেয়েটার কিন্তু অনাথের সন্দেহের আগুন তাকে যেন ঝলসে দিয়েছে। শাঁখারি পাড়ার অন্ধ গলির ভেতর ওদের বাসাটায় চন্দ্র-সূর্যের আলো পৌঁছুত না, তবু অনাথ তাকে ঘরে পুরে তালা বন্ধ করে তবে বাইরে বার হ'ত। মানুষের শরীর আর কত সইবে? তাই শেষটায় পাড়ার একটি ছেলের সঙ্গে ভাব করে গতকাল তার সঙ্গে বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে গেছে বেদানা। অনেক খোঁজাখুঁজি, থানা পুলিশ করেও আর তার সন্ধান পায় নি অনাথ। পাগলের মত হয়ে গেছে সে …।"

একটা নিশ্বাস ফেলে খরস্রোতা মেঘনার আবর্তসঙ্কুল জলের দিকে তাকিয়ে থাকে শ্যামল। চোখ দুটো ঝাপসা করে ওঠে তার।

মহৎ প্রকৃতির লক্ষণ

পৃথিবীর যে-কোন দেশের যে-কোন যুগের মানুষদের বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, তাহাদের অধিকাংশ সাধারণতঃ দৈহিক ও সাংসারিক প্রয়োজনের তাড়নায় কাজ করিয়াছে, এবং অনেক সময় অনেকে নীচ প্রবৃত্তির ও কুপ্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া কাজ করিয়াছে। মানুষ একাই জীবনযাত্রা নির্বাহ করুক, কিম্বা আত্মীয়স্বজন পরিবৃত হইয়া জীবনযাপন করুক, তাহার শরীর রক্ষার জন্ত কতকগুলি কাজ করা, কতকগুলি জিনিষ সংগ্রহ করা দরকার। অনেক মানুষ নৈতিক-নিয়ম লঙ্ঘন না করিয়া ইহা করিয়া থাকে, অনেকে নৈতিক-নিয়ম লঙ্ঘনও করে। শরীর রক্ষা ছাড়া, আরামের জন্ত, বিলাসের জন্ত, নানাপ্রকার দৈহিক সুখের জন্ত, মানুষ নানা চেষ্টা করিয়া থাকে। নৈতিক-নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ও না-করিয়া, উভয় প্রকারে এই চেষ্টা হইয়া থাকে। কতকগুলা আমোদ-প্রমোদ ব্যসন এরূপ আছে, যে, তাহা নৈতিক-নিয়ম-বিরুদ্ধ ; সেগুলাতে যাহারা আসক্ত তাহারা দুর্বৃত্ত।

নৈতিক-নিয়ম ভঙ্গ না করিয়াও যাহা করা যায়, এরূপ কাজ বা ব্যবহার মাত্রকেই মানুষ মহৎ বলে না। কেহ যদি নিজের পরিশ্রম দ্বারা সৎ উপায়ে টাকা রোজগার করিয়া তাহা নিজের শরীর রক্ষা, পরিবারবর্গের শরীর রক্ষা ও অন্যান্য সাংসারিক প্রয়োজনে ব্যয় করে, তাহা হইলে তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু তাহাকে মহৎ এবং সাধু ব্যক্তিও বলা যায় না। যদি কেহ অন্তের দুঃখ নিবারণ করিবার জন্য, অন্যের হিত করিবার জন্য, নিজের স্বার্থ ও সুখ ত্যাগ করেন, নিজে দুঃখ ভোগ করেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার প্রকৃতিতে মহত্বের লক্ষণ দেখিতে পাই।

পৃথিবীর আদিকাল হইতে দেখা যাইতেছে, যে, ত্যাগের আত্মোৎসর্গের সাধুতার সাত্বিকতার পথে চলে কম লোক সাংসারিকতার পথে চলে বেশী লোক ; কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে অনেক লোক ; লোকহিতের জন্য সর্বস্বপণ প্রাণপ করেন অতি কম লোক। সাংসারিক বুদ্ধির লোক যাহারা তাহারা নিজের কার্য্যসিদ্ধির জন্য মানুষের প্রকৃতির নিকৃ প্রবৃত্তসমূহকেই উত্তেজিত করে। ইতিহাসে দেখা যায়, দিগ্বিজয়ী অনেকে লুটের লোভ, বন্দিনীর লোভ, খ্যাতির লোভ অবাধে মারকাট করিবার লোভ, প্রভুত্বের লোভ, রাজত্বের লোভ, দেখাইয়া সৈনিক ও সেনাপতি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল

এই সব কথা ভাবিয়া দেখিলে দুর্বলচিত্তের পক্ষে মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে নিকৃষ্ট ধারণা হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে এইজন্য, অবস্থা বিশেষে কোন মানুষ, কোন সম্প্রদায়, শ্রেণী বা জাতি কিরূপ ব্যবহার করিবে, তাহা অনুমান করিবার সম আমরা স্বভাবতই মনে করি যে, মানব প্রকৃতির যেটা নিকৃষ্ট অংশ, যেটা মানুষকে স্বার্থপর সুখপ্রিয় ইহসর্বস্ব দেহসর্ব করিতে উন্মুখ করে, তাহারই জিৎ হইবে ; ধর্মবুদ্ধির জয় হইবে ইহা আমরা কল্পনা করি না।

অথচ অতি প্রাচীনকাল হইতে দেখা যাইতেছে, পৃথিবীর সাধু ধর্মোপদেষ্টা ঋষি যাঁহারা তাঁহারা এই আশা ও বিশ করিতেছেন যে মানুষ ধর্মবুদ্ধির অধীন হইবে ; মানুষ প্রেয় অপেক্ষা শ্রেয়কেই উচ্চস্থান দিবে, সহজ সাংসারিকতা ও সুখে পথ ছাড়িয়া মানুষ কঠিন ধর্মের পথের পথিক হইবে, এবং তাহার জন্ত ধন মান, প্রভুত্ব, আত্মীয়স্বজন, আরাম, এমন প্রাণ পর্য্যন্তও ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইবে। এই আশা ও বিশ্বাস ব্যর্থ ও ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। কঠিন ধ পথের পথিক অনেকে হইয়াছে, অনেকে সর্বস্ব বলিদান আত্ম বলিদান করিয়াছে। যাহারা তাহা করিতে পারে ন

করিতেছে, যে, তাহাদের আচরণ যাহাই হউক, ধর্ম্মোপদেষ্টারা ঠিক কথা বলিয়া গিয়াছেন। কোনও সম্রাট্, সেনাপতি, রাজনীতিজ্ঞ বা ধনীর পায়ে জগৎ আত্মবিক্রীত নহে, ধর্ম্মোপদেষ্টারাই অধিকাংশ মানুষের প্রণম্য হইয়া রহিয়াছেন।

মহৎ প্রকৃতির লক্ষণ এই, যে, মহৎ মানুষ নিজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাহা তাহাকেই চিরন্তন ও স্থায়ী মনে করেন, এবং তাহারই অনুসরণ করেন ; শুধু তাই নয়, মহৎ মানুষ বিশ্বাস করেন, যে, অন্য মানুষদের মধ্যেও এই শ্রেষ্ঠ জিনিষ আছে, এবং তাহাদের আত্মাকে জাগাইয়া দিতে পারিলে এই শ্রেয়ের প্রেরণাই তাহাদের জীবনের নিয়ামক হইবে। বাস্তবিক মানুষকে সুখ স্বার্থ ও আরামের সোজা পথে চলিতে বলিয়া কখনও তাহার নিকট হইতে ততটা বাধ্যতা এবং তত বড় ও তত বেশী কাজ পাওয়া যায় নাই, যতটা বাধ্যতা এবং যত বড় ও বেশী কাজ পাওয়া গিয়াছে তাহাকে ধর্ম্মের কঠিন পথে চলিতে আহ্বান করিয়া। মোহনদাস কর্ম্মচাঁদ গান্ধীকে মহৎ লোক অনেকেই বলিতেছেন, কেহ কেহ তাঁহাকে জগতের জীবিত মহৎ লোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিতেছেন। কিন্তু কেন তাঁহাকে এই উচ্চ স্থান দেওয়া হইতেছে তাহা সকলে ভাবিয়া দেখেন নাই। ভাবিয়া দেখিলে এই কারণ বুঝা যায় যে, তিনি, জগতের অন্য সাধুদের মত, আপনাকে মানব-প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ প্রেরণার বশবর্ত্তী করিয়াছেন, এবং অন্য মানুষদেরও যে তাহা করা উচিত ও সম্ভবপর ইহা বিশ্বাস করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার একটু বিশিষ্টত্বও আছে। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা এ পর্য্যন্ত সাধারণতঃ সেই সব উপায় দ্বারা লব্ধ হইয়াছে যে-সব উপায়ে বিদেশ ও বিজাতি পরাজিত ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া থাকে। এক জাতি অন্য জাতিকে নিজের অধীন করে, নিজেদের হিংসা ও লোভকে উত্তেজিত করিয়া এবং তাহার বশে অন্য জাতির বহু লোকের প্রাণ বধ করিয়াও তাহাদের ধন আত্মসাৎ করিয়া। ইহা যুদ্ধের পথ, এবং যুদ্ধ মানে সকলপ্রকার অপরাধের ও পাপের সমষ্টি। স্বাধীনতা লাভের পথও এ পর্য্যন্ত সাধারণতঃ এই হিংসাদ্বেষাদি-কলঙ্কিত যুদ্ধই হইয়া আসিয়াছে ; দুই এক ক্ষেত্রে যুদ্ধ করিবার ভয় প্রদর্শন ইহার স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে। গান্ধীর বিশেষত্ব এই. যে, তিনি হৃদয়ে ও মনে হিংসাকে স্থান না দিয়া, কর্ম্মে হিংসাকে স্থান না দিয়া, স্বজাতিকে লোভআদি অন্য রিপুরও বশবর্ত্তী হইতে না বলিয়া, কেবল সাত্ত্বিক আত্মিক উপায়ে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা-লাভ সম্ভব মনে করেন। ইহার জন্য তিনি ভারতীয় প্রত্যেক মানুষকে শুদ্ধচেতা সত্যাচারী ও কায়মনোবাক্যে হিংসাহীন হইতে বলিতেছেন, সমুদয় জাতিকে এই আদর্শের অনুবর্ত্তী হইতে বলিতেছেন। অন্যদিকে ইহাও বলিতেছেন, যে, অন্যায় যাহা, অসত্য যাহা, অপরে যদি আমাদিগকে তাহা করিতে বলে, তাহা আমরা করিব না, এবং না-করার দুঃখ সহ্য করিব ; যাহাতে ব্যক্তিগতভাবে আমাদের মনুষ্যত্বের অবমাননা হয় তাহা করিব না, সেরূপ কোন ব্যবহারে সায় দিব না, এবং যাহাতে জাতিগতভাবে আমাদের মনুষ্যত্বের অবমাননা, তাহা করিব না, সেরূপ কোন অবস্থায় সায় দিব না। তিনি মনে করেন, প্রত্যেক ব্যক্তি এবং সমগ্র ভারতীয় জাতি এই উপায়ে স্বাধীন হইতে পারিবে। বাস্তবিক, মানুষের পরাধীনতা আসে প্রধানতঃ যে যে কারণে সেই কারণগুলি নির্মূল করিবার উপায় একমাত্র ধর্ম্ম। ভয়, লোভ, সুখপ্রিয়তা, নিকৃষ্ট বৃত্তির অধীনতা, প্রভৃতি মানুষকে পরাধীন রাখে। যদি আমরা ধর্ম্মপথে চলিয়া সাত্ত্বিক প্রকৃতি লাভ করিয়া অভয় হই, লোভ হিংসাদিকে জয় করিতে পারি, তাহা হইলে ইহলোক পরলোক কোথাও কোন আশঙ্কা আমাদিগকে শঙ্কিত করিতে পারে না, কোন কামনার দাসত্ব আমাদিগকে করিতে হয় না। আমাদের অধিকাংশের আচরণ যদি এই আদর্শের অনুযায়ী হয়, তাহা হইলে জাতীয় স্বাধীনতাও আমাদের করতলগত। অবশ্য ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে ভয় দেখাইতে পারে, নানা লোভ দেখাইতে পারে, প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত নানা দণ্ড দিতে পারে ; কিন্তু যদি আমরা কোনপ্রকার লোভে বা ভয়ে উহার ইচ্ছার অনুবর্ত্তী না হইয়া নিজ নিজ স্ব-ইচ্ছার ও জাতীয় স্ব-ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হই, তাহা হইলেই ত আমরা ব্যক্তিগতভাবে স্ব-অধীন এবং জাতিগতভাবেও স্ব-অধীন হইলাম। গান্ধী স্বয়ং এই কঠিন পথের পথিক হইয়াছেন, এবং সমুদয় জাতিকে ইহা অবলম্বন করিতে বলিতেছেন। ইহা অবলম্বন করা প্রত্যেক ভারতীয়ের পক্ষে সহজ ও সুসাধ্য, এই বিশ্বাস তাঁহার থাকার মূলে রহিয়াছে যে, তিনি নিজের জাতিকে [illegible] মহৎ মনে করেন।

কিন্তু ইহা বলিলেই তাঁহার মানব প্রকৃতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে ধারণার মহত্বের সম্যক্ পরিচয় দেওয়া হইল না। তিনি কেবল নিজের জাতিকেই মহৎ মনে করিতেছেন না, মহত্ব কেবল ভারতীয়ের পক্ষেই সম্ভব মনে করিতেছেন না। তাঁহার বিশ্বাসের ও চেষ্টার সঙ্গে আর একটি বিশ্বাস জড়িত রহিয়াছে। তিনি বিশ্বাস করিতেছেন, যে, ইংরেজ জাতির মধ্যে এই মহত্ব সুপ্ত আছে, এবং আমাদের সাত্ত্বিক বীরত্ব ও সবল সহিষ্ণুতার দ্বারা আমরা তাঁহাদের সুপ্ত সত্যাচারিতা, ন্যায়নিষ্ঠা ও সাত্ত্বিকতাকে জাগাইতে পারিব। তখন তাহারা আমাদের প্রকৃত বন্ধু হইবে, অর্থাৎ অনুগ্রাহক প্রভু, দয়ালু মুরুব্বি না থাকিয়া বিশ্বজনহিত-সাধনক্ষেত্রে সমাবস্থাপন্ন সহকর্মী হইবে। অদূর ভবিষ্যতে মানব-প্রকৃতির এই মহৎ বিকাশ ও বাহ্য আচরণে তদনুযায়ী মহৎ আত্মপ্রকাশ, এই উভয়ে দৃঢ়-বিশ্বাসী হইয়া, এবং তদনুসারে কার্য্য করিয়া, গান্ধী মহাশয় জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষদের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছেন। কেহ কেহ যে তাঁহাকে জীবিত সকল মানুষদের মধ্যে মহত্তম বলিতেছেন, ইহাই তাহার কারণ। সাধারণ লোকদের মধ্যে তাঁহার নানা অলৌকিক শক্তি ও কার্য্যের গল্প প্রচারিত হওয়ায় তাঁহার প্রকৃত মহত্ব চাপা পড়িতেছে। এরূপ শক্তির দাবী ত তিনি কখনও করেন নাই, এরূপ গল্পের প্রতিবাদ করিয়া উহার অলীকত্ব ঘোষণা করিয়াছেন। এবং একজন তাঁহাকে পত্র লেখায় তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন, যে, তিনি ঈশ্বর দূত (messenger of God) নহেন এবং ঈশ্বরের নিকট হইতে বিশেষ প্রত্যাদেশ বা বাণী (special revelation) প্রাপ্ত হন নাই।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী, আষাঢ় ১৩২৮

ঋষি লিও টলস্টয়ের প্রথম জীবন

শ্রীকমলা দাশগুপ্ত

টলস্টয়-বংশ কয়েক পুরুষ ধ'রে রাশিয়ার রাজবংশের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। লিও টলস্টয়ের পিতামহ কাউন্ট ইলিয়া টলস্টয়ও বিবাহ করেন রাজকুমারী গর্চাকভকে। ইলিয়া টলস্টয় কাজান রাজ্যের গভর্ণর নিযুক্ত হন। সাধুস্বভাব ইলিয়াকে রাজকর্মচারীদের শত্রুতায় ঐ উচ্চপদ থেকে পদচ্যুত হ'তে হয়। এতে তিনি এত বড় আঘাত পান যে, মাসখানেকের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর পুত্র নিকোলাস টলস্টয় ছিলেন লিও টলস্টয়ের পিতা।

মস্কোর দক্ষিণে তুলা প্রদেশের যশনায়া পোলিয়ানা নামক স্থানে ১৮২৮ সালের ২৮শে আগষ্ট লিও টলস্টয় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা নিকোলাস টলস্টয় ধনী রাজকুমারী ম্যারিয়া ভলকনস্কিকে বিবাহ করেন। বহু ক্রীতদাসের সঙ্গে যশনায়া পোলিয়ানা প্রদেশও তিনি যৌতুক-স্বরূপ লাভ করেন। নিজের স্মৃতিকথায় লিও টলস্টয় লিখেছেন—'মাকে আমার মনে পড়ে না। প্রায় বছর দেড়েক বয়সের সময় মাকে আমি হারিয়েছিলাম। ঘটনাচক্রে—মায়ের কোন ছবিও রাখা হয় নি যাতে আমি তাঁর মূর্তি আমার মানসপটে এঁকে রাখব। ভালই হয়েছে। আমি শুনেছি মা খুব সুন্দরী ছিলেন। আমি কল্পনায় তাঁর সুন্দর পবিত্র মূর্তি দেখতে পাই। তাঁর সম্বন্ধে যাঁরাই আমাকে বলেছেন তাঁরাই সুখ্যাতি করেছেন।' টলস্টয় বলেন, তাঁর মা সুশিক্ষিতা ছিলেন। পাঁচটি ভাষা জানতেন। লোকে বলে তিনি এত চমৎকার গল্প বলতে পারতেন যে, তাঁর মেয়ে-বন্ধুরা তাদের বল নাচ অসমাপ্ত রেখে একটা অন্ধকার ঘরে চলে যেতেন তাঁর গল্প শুনবার জন্য। মা লাজুক-প্রকৃতির ছিলেন ব'লে যেখানে তাঁকে দেখা যাবে না এমন একটা জায়গায় বসে গল্প বলতে ভালবাসতেন। সংযম তাঁর স্বভাবের বৈশিষ্ট্য ছিল।' তিনি রেগে গেলে লাল হয়ে যেতেন। কেঁদেও ফেলতেন কিন্তু কখনও রূঢ়ভাষা ব্যবহার করতেন না বা নিন্দা করতেন না।

তাঁর সত্য ভাষণ ও সরলতা পুত্র টলস্টয়কে আকৃষ্ট করেছিল। মায়ের স্থান তাঁর কাছে এত উচ্চে ছিল, যে বড় হয়ে টলস্টয় অসংখ্য প্রলোভনে পড়ে যখন অত্যন্ত বিপন্ন-বিচ্ছিন্ন হতেন তখন তিনি কিছু একটা অবলম্বন করবার আশায় মায়ের কাছে প্রার্থনা করতে থাকতেন। এবং তাতে অনেকখানি শান্তিও লাভ করতেন।

ভগ্নী জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচমাস পরে মাতা ম্যারিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন ১৮৩০ সালে।

টাটিয়ানা ছিলেন টলস্টয়দের দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়া। পিতৃমাতৃহীন বালিকা টাটিয়ানা শিশুকাল থেকেই টলস্টয়-পরিবারে মানুষ হয়ে ওঠেন। টলস্টয়ের পিতামহী আপন সন্তানদের সঙ্গে সমানভাবেই তাঁকে লালন-পালন করেন। টাটিয়ানার সঙ্গে এই পরিবারের একটা মধুর ও প্রীতির সম্পর্ক ছিল। ম্যারিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর সন্তানদের টাটিয়ানা আপন সন্তানের ন্যায় প্রতিপালন করেন। তিনি নিজে কিন্তু বিবাহ করেন নাই।

মমতাময়ী ও মহীয়সী এই নারীর যত্নে লিও টলস্টয় মানুষ হ'তে থাকেন। লিওর জীবনের দু'টি মূল নীতি তিনি এই নারীর জীবনধারা থেকে অজানিতে গ্রহণ করেছিলেন। সেই নীতির প্রথমটি হচ্ছে : শারীরিক দণ্ডের প্রতি ঘৃণা, অপরটি পরিপূর্ণ পবিত্রতা (Complete Chastity)। টলস্টয় নিজের জীবনীতে বলেছেন, একদিন আমরা আমাদের শিক্ষকের সঙ্গে বেড়িয়ে বাড়ী ফিরছিলাম, খামারের কাছে এসে দেখি আমাদের কর্মচারী মোটা এনড্রু আগে আগে চলেছে, তার পিছনে পিছনে বিষণ্ণ মুখে চলেছে সহকারী কোচম্যান কুজমা। কুজমা ছিল বিবাহিত এবং বয়স্ক। এনড্রুকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল, সে খামারে যাচ্ছে কুজমাকে উত্তম-মধ্যম শাস্তি দিতে। একথা শোনামাত্রই ভালমানুষ কুজমার নিস্তেজ মুখখানা আমাকে যে কি ভীষণভাবে পীড়া দিতে লাগল বর্ণনা করতে পারি না। সন্ধ্যাবেলায় বাড়ী গিয়ে আমি আন্টি টাটিয়ানাকে এই কথা বললাম। আন্টি টাটিয়ানা আমাদের প্রতি অথবা কোন প্রাণীর প্রতি মারপিট করাকে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। আমার কথা শুনে তিনি খুব বিচলিত হয়ে আমাকে বকতে লাগলেন। তুমি কেন তাকে বাধা দিলে না? আমার আরও দুঃখ হ'ল। এসব বিষয়ে আমরা যে কিছু করতে পারি সেকথা আমার মনেই হয় নি। তবু মনে হ'ল, হয়ত আমরা কিছু করতে পারতাম। কিন্তু আর সময় ছিল না। সেই ভয়ঙ্কর শাস্তি দেবার কাজ তখন সমাধা হয়ে গেছে।

আন্টি টাটিয়ানা দৃঢ়সংকল্প এবং ত্যাগী স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তাঁর কর্মতৎপর দুটি হাত, কোঁকড়ানো কালো চুল, কালো দুটি [illegible]

এক সময় তাঁর মনে হ'ল তাঁর মৃত্যু যে-কোন সময়, যে-কোন মুহূর্তে আসতে পারে। লোকেরা কেন যে একথা বোঝে না তা ভেবে তাঁর আশ্চর্য লাগত। তাঁর মনে হ'ত মানুষ কেবল বর্তমানের সুখই অনুভব করতে পারে, ভবিষ্যতের কথা ভাবে না। এই কথা ভেবে টলস্টয় তিন দিন পড়া বন্ধ করে কেবল বিছানায় শুয়ে রইলেন। তখন শুধু একখানি উপন্যাস পড়েছিলেন। খেতেন একটু জিঞ্জার ব্রেড এবং মধু।

১৮৪১ থেকে ১৮৪৭ সাল পর্যন্ত টলস্টয়-ভাইরা কাজানে ছিলেন। তাঁরা কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। লিও টলস্টয় ১৮৪৪ সালে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৮৪৫ সালে তিনি আইন পড়তে থাকেন, কিন্তু ১৮৪৭ সালে তিনি অসুস্থতার এবং পারিবারিক প্রয়োজনের কারণ দেখিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নাম কাটিয়ে দেন। এই সময় তাঁদের সম্পত্তি ভাগ হয়ে যায় এবং ভাইরা আলাদা হয়ে যান। যশনায়া পলিয়ানা লিও টলস্টয়ের ভাগেই পড়েছিল।

লিও টলস্টয় ডায়েরী রাখতেন। তাঁর ডায়েরীর প্রথম খণ্ড যা পাওয়া যায় তার আরম্ভের তারিখ হচ্ছে ১৮৪৭ সালের ১৭ই মার্চ। তার প্রথম পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছিলেন তিনি সম্পূর্ণ একা। যে মানুষ সমাজে বাস করে তার পক্ষে নির্জনতা ততখানিই ভাল লাগে যতখানি সমাজে যে বাস করে না, তার ভাল লাগে সামাজিক আদান-প্রদান। একটি উপদেশকেও নিজের জীবনে কাজে পরিণত করার চেয়ে দশ খণ্ড দর্শনশাস্ত্রের বই লেখা বেশী সহজ।

এক মাস পরে তিনি লিখলেন, এই প্রশ্ন আমার মনে জাগছে, 'মানুষের জীবনের লক্ষ্য কি? আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, আমাদের মানব-জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে, জগতে যা-কিছু আছে সব কিছুর সম্পূর্ণ বিকাশের জন্য সর্বাধিক সাহায্য করা।'

কয়েকটা নীতি এই সময় নিজের জন্য তিনি লিখেছিলেন। তাঁর ডায়েরী-ভর্তি এরূপ বহু নিয়ম ও নীতি লেখা আছে। এই সব নিয়মে চলতে তিনি বার বার ব্যর্থ হয়েছেন এবং বার বারই তিনি বিশুদ্ধ হয়ে কেটেছেন।

পনের বছর বয়স থেকে তিনি দার্শনিক গ্রন্থ পড়তে থাকেন। ষোল বছর বয়সে তিনি চার্চে যাওয়া বন্ধ করলেন। শিশুকালে তাঁকে যা শেখানো হয়েছিল তা তিনি আর বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু কিছু একটা আছে তা বিশ্বাস করতেন। ভগবানে তিনি বিশ্বাস করতেন, কিন্তু কি ধরণের ভগবান্ তা তিনি বলতে পারতেন না। যীশু এবং তাঁর শিক্ষাকেও তিনি অস্বীকার করতেন না, কিন্তু তাঁর শিক্ষায় কি ছিল তা তিনি ব'লে উঠতে পারতেন না।

সে-সময়ে তিনি একটা বিষয়ে বিশ্বাস রাখতেন যে, তাঁর নিজেকে সর্বগুণসম্পন্ন, নিষ্কলুষ একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত করতে হবে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ বলতে কি বোঝায়, তার উদ্দেশ্য কি, তা বলতে পারতেন না। যা-কিছু সামনে পেয়েছেন তাই পড়েছেন, জীবনের নীতি লিখে তা পালন করতে চেষ্টা করেছেন, আত্মনির্যাতন দ্বারা সহ্যশক্তি ও ধৈর্য অবলম্বন করতে অভ্যাস করেছেন, ব্যয়াম দ্বারা শরীরের বলিষ্ঠতা এনেছেন।

১৮৪৭ সালে টলস্টয় আণ্টি টাটিয়ানার কাছে যশনায়া পলিয়ানাতে ছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল ভাল করে পড়াশুনা করা, জমিদারী দেখা এবং ক্রীতদাসদের অবস্থার উন্নতি করা। শেষের কাজটা অনেক চেষ্টা করেও তিনি তেমন সুবিধা করতে পারেন নাই। ১৮৪৮ সালে তিনি পিটার্সবার্গে গিয়ে ইউনিভার্সিটির পরীক্ষার জন্য তৈরী হ'তে থাকেন। তিনি আইনের দুটো পরীক্ষায় পাস করেন কিন্তু শেষ পরীক্ষাগুলি না দিয়েই ডিগ্রী না নিয়েই তিনি যশনায়া ফিরে যান। এবার গানের চর্চায় বিভোর হয়ে গেলেন।

১৮৫১ সালে তিনি মস্কো যান। সাহিত্যের সাধনা এখানে সুরু হয়। কয়েকটা গল্প লিখে ব্যর্থ হলেন। তারপর নিজের শৈশবের কথা নানা প্রকারে লিখতে থাকেন। কয়েকবার সংশোধনের পরে তাঁর এই কাহিনীই শৈশব (Childhood) নাম দিয়ে প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

এই সময়ে তিনি জুয়াখেলা, অতিরিক্ত বাজে খরচ ইত্যাদির জন্য ঋণজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। ঋণের জটিল আবর্ত থেকে তাঁর মুক্তি পাওয়া একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। শুধু তাই নয়, রাশিয়ার জিপ্‌সী মেয়েদের বিখ্যাত গানের মোহময় আকর্ষণ থেকেও তিনি মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন। এই সব নানা কারণে ১৮৫১ সালের এপ্রিল মাসে লিও টলস্টয় বড়ভাই নিকোলাস-এর সঙ্গে ককেশাস চ'লে যান।

শ্রীচিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরবর্তী অধ্যায়

[কি]ছুদিন পূর্বে প্ল্যানিং কমিশন তৃতীয় পরিকল্পনার [প]রবর্তীকালীন বিশ্লেষণ প্রকাশ করেছেন; তাতে [এ] যাবৎ কোন্ কোন্ দিকে আশানুরূপ সাফল্যলাভ [হ]য় নি, আরও কতটা করলে বাকি দুই বছরে পরিকল্পনা [অ]নুযায়ী কাজ সম্পন্ন হবে, তারই বিশদ আলোচনা [হ]য়েছে।

ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং [স]ামাজিকক্ষেত্রে যেসব দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে এবং ঘটছে [ত]ারই পরিপ্রেক্ষিতে সরকারকে পরবর্তী কর্মপদ্ধতি নতুন [ক]'রে ভাবতে হচ্ছে। মহলানবীশ কমিটির রিপোর্টটি [প্র]কাশিত হবার পর দেশে একপ্রস্থ আলোড়ন উপস্থিত [হ]য়; তার পর সান্থনম কমিটির রিপোর্টে দেশব্যাপী [দুর্ন]ীতির বিভিন্ন দিক্ সম্বন্ধে আলোচনা প্রকাশিত হবার [ফ]লে আরেকপ্রস্থ চিন্তার সূচনা দেখা দিয়েছে। জওহরলাল [নেহ]রুর মৃত্যুর পর দেশের নতুন পরিচালকগোষ্ঠীর [সাম]নে বিবিধ সমস্যা উগ্র আকারে দেখা দিয়েছে। [অভ]্যন্তরীণ সমস্যাগুলির মধ্যে যে দু'টি সমস্যা সর্বাপেক্ষা [উগ্র] আকারে দেখা দিয়েছে, সে দু'টি হচ্ছে: (১) দ্রব্য-[মূল্যে]র অত্যধিক বৃদ্ধি (এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন দ্রব্যের [মানের] অবনতি); (২) দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, [শিথি]লতা এবং অপচয়ের দুষ্টচক্রের প্রভাবে দেশবাসীর [ব্যাপক]ভাবে মনোভঙ্গ এবং স্ব স্ব গণ্ডীতে দেশনেতাদের [ক্ষমতা] অধিকরণের প্রচেষ্টা। অন্যান্য বা আনুষঙ্গিক সমস্যা-[গুলি]র মধ্যে প্রধান হচ্ছে (৩) রপ্তানী-বাণিজ্যের সঙ্গে [আম]দানীর ক্রমবর্ধমান বৈষম্য ও তার ফলে বিদেশী মুদ্রার [ঘাট]তি। এবং তারই জন্য উত্তরোত্তর বিদেশী ঋণের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি। অপরটি হচ্ছে, (৪) জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় কর্মসংস্থানে ঘাটতি।

পরিকল্পনার কাঠামো সম্বন্ধে বিভিন্ন মহলে মতের পার্থক্য থাকলেও মোটামুটি সকলেই প্রায় একমত যে, প্রশাসনিক সততা ও দৃঢ়তার সঙ্গে, গৃহীত-নীতির স্বচ্ছতা ও দূরদর্শিতা থাকলে বর্তমান প্ল্যানের কাঠামোটিকে আরও ভালভাবে রূপদান করা সম্ভব হ'ত। একথা খুবই সত্যি যে, ঘরে ও বাইরে এত বিচিত্র সমস্যা আমা-দের বিব্রত করছে যে, তার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে পরিকল্পনার কাঠামোতে রূপদান করা সম্ভব নয়। বিদেশী আক্রমণের ভয়ে আমাদের অস্ত্রশস্ত্রের জন্য অনেক বেশি ব্যয় করতে হচ্ছে এবং দেশের মধ্যেও, বিভিন্ন দলগত স্বার্থ মাথা তুলছে ব'লে অনেক শুভ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে। কিন্তু সেই যুক্তিতেই সমস্ত দোষত্রুটি স্খালন করা যায় না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে অন্যান্য যেসব 'অনুন্নত' দেশ পুনর্গঠনের কাজে লিপ্ত হয়েছে, তাদের দৃষ্টান্ত ত আমরা নিত্যই দেখতে পাচ্ছি; ইসরাইল বা মিশর অথবা যুদ্ধ-বিধ্বস্ত জাপান ইত্যাদি দেশে সমস্যার গুরুত্ব আমাদের দেশের তুলনায় নিতান্ত সামান্য নয়।

মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাব্য কারণ কি হ'তে পারে তাই নিয়ে বিভিন্ন মহলে বহু আলোচনা হয়েছে এবং হচ্ছে। মুদ্রানীতি, রাজস্বনীতি, শিল্পপণ্যের উৎপাদন ব্যবস্থা, মুনাফাকারীর কারসাজি, খাদ্যশস্যের উৎপাদনে অনিশ্চয়তা ইত্যাদি বিবিধ কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। [ক]য় মাস পূর্বে আমরা এই বিষয়ে কিছু তথ্য উপস্থিত করে-ছিলাম। তৃতীয় পরিকল্পনার পরবর্তী [illegible]

(Mid-term Appraisal) দেখা যাচ্ছে যে, অত্যধিক টাকার প্রচলনের কথা স্বীকৃত হয়েছে—যদিও 'ডেফিসিট ফাইনান্স'-এর প্রস্তাব যখন গৃহীত হয় তখন একরকম ধরেই নেওয়া হয়েছিল যে, উৎপাদন বৃদ্ধির হার এবং অতিরিক্ত ক্রয়ক্ষমতা সৃষ্টি, এই দুইয়ের মধ্যে গোড়ার দিকে অনিবার্যভাবে কিছু ব্যবধান থাকবে এবং ফলে মূল্যবৃদ্ধি হবে, কিন্তু বর্তমান হারে মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা হিসাব করা হয় নি নিশ্চয়ই। মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির যে দাবি করা হয়, তার অনেকাংশই ধুয়ে যাচ্ছে মূল্যবৃদ্ধির ফলে; আর, যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতির কুফল যে-দেশের কাঠামোর মধ্যে রয়ে গেছে—সেদেশে মূল্য বৃদ্ধির গতি একবার শুরু হ'লে কমতে চায় না। উপরন্তু দ্রব্যের গুণগত অবনতি এবং সংগ্রহের সমস্যা উভয়ই পূর্বের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সমস্যাটি তা হ'লে 'ডেফিসিট ফাইনান্স' নীতির মধ্যেই রয়ে গেছে, না তারই সঙ্গে অন্যান্য কারণ মিলিত হয়েছে? মুদ্রা বৃদ্ধির পরিমাণ এবং সময় নির্ধারণ উভয় ক্ষেত্রেই গলদ থাকা অসম্ভব নয়। একথা কিছু পরিমাণে স্বীকৃত হয়েছে। পূর্বের প্রবন্ধে আমরা দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ পর্যন্ত মাথাপিছু 'নেট' ও 'গ্রস' টাকার পরিমাণ অন্যান্য আনুষঙ্গিক তথ্যের সঙ্গে দেখিয়েছি। Mid-term Appraisal-এ উল্লেখ করা হয়েছে—

"there was an increase of Rs. 441 crores or about 15 per cent in money supply with the public in the period April 1,1961to end of March 1963" —"Since the expansion in money supply more than kept pace with the trend in aggragate output, it is possible that it had some price effect . . . ." (পৃ. ১২, ১৩)। ঐ বই-এর পৃ. ৩০-৩১এ যে তথ্য পরিবেশন করা হচ্ছে, তার সারাংশ উদ্ধৃত করছি—

	পরিকল্পনা পর্ব 1961-1966	১৯৬১-৬২	১৯৬২-৬৩	১৯৬৩-৬৪
প্ল্যানবাবদ মোট টাকা (কোটি)	৭৫০০ (১০০)	১১০০ (১০০)	১৪১৪ (১০০)	১৬৫৪ (১০০)
তার মধ্যে :				
বৈদেশিক সাহায্য („)	২২০০ (২৯.৩)	[illegible]	[illegible]	[illegible]

রিপোর্টের ৩৯ পৃষ্ঠায় দেখা যাচ্ছে সংশোধিত হিসা অনুযায়ী 'ডেফিসিট ফাইনান্স' প্রথম দুই বছরে মো ৩৩৯ কোটি টাকা, অর্থাৎ সামগ্রিক অঙ্কের ১৩.০ শতাংশ পাঁচ বছরের গড় যে টাকা 'ডেফিসিট ফাইনান্স' বাব ধরা ছিল (৭.৩ শতাংশ), সে তুলনায় প্রথম দুই বছরে অঙ্কের হার অনেক বেশি। অপর দিকে মূল্যবৃদ্ধির সূ ঐ রিপোর্ট-এ দেখছি—

"Since the end of March 30, 1963 the inde has risen by over 8 per cent—from 126.8 o March 30, 1963 to 137.3 on September 14, 1963 Once again the bulk of the increase has been in the category of food articles, especially rice, sugar and gur" (পৃ: ১০) ; গত এক বছরে মূল্যবৃদ্ধি যে হারে হয়েছে তাতে অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যাবার উপক্রম হয়েছে।

কৃষি উৎপাদনে উত্থান-পতন পূর্বের তুলনায় কমে এসেছে (Mid-term Appraisal, পৃঃ ৮), উপরন্তু আমরা পূর্বের প্রবন্ধে দেখেছি মাথাপিছু খাদ্যশস্য সরবরাহের সঙ্গে (net per capita availab,lity) খাদ্যশস্যের মূল্যের কোন সংগতি খুঁজে পাওয়া যায় না।

খাদ্যশস্যের মূল্য রোধ করার অন্যতম পন্থা হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক Selective Credit Control চালু করেছিলেন, কিন্তু অতিরিক্ত মুনাফার জন্য যাঁরা ব্যবসায় করছেন তাঁরা ধান, গম, চিনি মজুত করে মূল্যবৃদ্ধির জন্য ব্যাঙ্কের দ্বারস্থ হন না; ট্যাক্স-হিসাবের বহির্ভূত বহু কোটি টাকা আজ দেশের মধ্যে হাত-বদল হচ্ছে এবং সেই টাকার সামান্য এক অংশই খাদ্যশস্য "Cornering"-এর পক্ষে যথেষ্ট।

দেখা যাচ্ছে সরকারের মুদ্রা ও রাজস্বনীতির অদূরদর্শিতা এবং 'Price mechanism-'এর দ্বারাই

টানুষিকভাবে দেশের জনিতা অরবরাহ বিচ্ছিন্ন হবে।
নীতি অন্ধভাবে অনুকরণ করার ফলে উৎপাদক
ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর হাতে মূল্যমানের ওপর প্রভাব
ভারের উপায়, এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে ব্যবসায়ী-
ষ্ঠীর অসাধু মনোবৃত্তি। যদি ধরে নেওয়া হয় যে,
যাবৎ দীর্ঘমেয়াদী কাজে যে টাকা ব্যয় হয়েছে তার
ধ্য কোন অংশই অপব্যয় হয় নি বা পরিকল্পিত ব্যয়ের
টাই আখেরে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যই ব্যয়
য়েছে, তা হ'লে পূর্ব অনুমান অনুযায়ী আমাদের 'প্রস্তুতি
'র পর মূল্যমান স্থির থাকবে; কিন্তু এ প্রশ্ন স্বতঃই
ন আসে যে, কবে নাগাদ এবং কোন্ স্তরে মূল্যমান
র হবে, এ-বিষয়ে সরকার কোন সঠিক মতামত দিতে
রেন কি না — বর্তমান যুগে প্রবল প্রতিযোগিতা এবং
র বাধার মধ্যে স্বল্প সময়ে জাতীয় আয় বৃদ্ধি করতে হ'লে
সব অসুবিধা অনিবার্যভাবে ভোগ করতে হবে, সে
ন্ধে কারোরই মনে কোন সংশয় বা অভিযোগ থাকতে
রে না। কিন্তু এ যাবৎ দেশ যেদিকে চলেছে তাতে
খের সম্বন্ধে লোকের মনে সংশয় দেখা দেওয়া বিচিত্র
। Mid-term Appraisal-এ স্বীকার করা হয়েছে—

"—in a number of projects, estimates of cost
l estimates of time required have tended to be
timistic"—

এই "optimism-"এর হিসাব টাকার অঙ্কে যদি আনা
য়, তাহলে যাবে দেশবাসীর হতাশ এবং শঙ্কিত হবার
ত কারণ আছে। বৃহৎ কর্মে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি
বার্য। কিন্তু কর্জ করা টাকা নির্বিচারে ব্যয় করার
"Optimism" দেখা যাচ্ছে তার সম্মিলিত ফল আজ
ফলিত হচ্ছে মূল্যমানের ওপর। নতুন সৃষ্ট অনেক
গুলির কার্যকারিতা সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ
যাচ্ছে (দুর্গাপুর খাল তার একটি মাত্র উদাহরণ)।
র্ম-সংস্থান এবং বিদেশী মুদ্রা অর্জন উভয় বিষয়েই
া যাচ্ছে, অদূরদর্শিতা এবং চমক-লাগানো কল
ানোর আকাঙ্ক্ষা প্রাধান্য লাভ করেছে।

কর্ম-সংস্থান এবং উৎপাদন বৃদ্ধির মধ্যে যে বিরোধ
হয়ে আছে তার সমাধান কোন দেশই করতে পারে
[illegible]

না। কোন্ ধরনের শিল্পে মূলধন [illegible] প্রয়োজনীয়
এবং কোন্ শিল্পে লোক নিয়োগ করেই কাজ পাওয়া
যায়, সেই প্রশ্ন নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে; প্ল্যানকে
"Employment Oriented" করবার কথাও সম্প্রতি
উচ্চারিত হয়েছে বারবার। কিন্তু একদিকে যেমন
বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্পগুলিকে "Modernise"
করবার প্রশ্নে আমরা ইতস্তত করেছি এবং তার ফলে
পাট চা ইত্যাদি শিল্পের ক্ষতি করেছি, অপরদিকে তেমনি
চাল তৈরীর জন্য বিদেশী মুদ্রা ব্যয় করে যন্ত্রপাতি এনে
কারখানা খোলবার প্রস্তাবেও চরম অদূরদর্শিতার পরিচয়
দিচ্ছি। দেশের সমস্যা আজ ধান; যা অভাব খাদ্যশস্যের
উৎপাদন বৃদ্ধির এবং এর সমাধান হবে কৃষিক্ষেত্রে;
বর্তমান মূল্যবৃদ্ধির সময়ে হঠাৎ কর্তৃপক্ষের ধারণা
হয়েছে দেশের যত চাল-কল আছে সেগুলির উৎপাদন
ক্ষমতা যথেষ্ট নয় অথবা তারা সরকারের সঙ্গে সহ-
যোগিতা করতে-অনিচ্ছুক, অতএব দু'হাজার নতুন চাল-
কল খোলা দরকার! দুই যুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালে চাল-কল
আসাতে দেশের ঢেঁকি প্রায় অদৃশ্য হয়েছিল, দ্বিতীয়
মহাযুদ্ধের পর 'হাস্কিং মিল' আসাতে ঢেঁকি নিশ্চিহ্ন
হ'তে চলেছে, সেই সঙ্গে বেকার সংখ্যা নতুন করে সৃষ্টি
হচ্ছে। ঢেঁকির প্রচলনে অনেক বাধা আছে অবশ্যই,
কিন্তু কর্মসংস্থান বৃদ্ধি যেখানে কঠিন সমস্যা হিসাবে
আমাদের সামনে আছে, সেখানে এই শ্রেণীর কুটির
শিল্পকে বাঁচাবার চেষ্টা করার সার্থকতা আছে বৈকি।
এই বিষয়েই সরকারের বর্তমান কর্মপন্থা এবং ঘোষিত
নীতির বৈষম্য বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

বিদেশি মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে,
সে-বিষয়ে পূর্বে এক প্রবন্ধে আলোচনা করেছি। বিভিন্ন
দেশ থেকে নানান রকমের ঋণ গ্রহণ করে চলেছি
আমরা; এর সবটাই যদি মিতব্যয়িতার সঙ্গে [illegible]
পথে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ব্যয়িত হ'ত তা হলে [illegible]
দেশের মঙ্গল হ'ত। কিন্তু মোট যত টাকা বিদেশী [illegible]
নিয়েছি (এবং যতখানি পূর্ব-সঞ্চিত বিদেশী মুদ্রা [illegible]
করে ফেলেছি) তার মধ্যে [illegible]
[illegible]

এবং কতখানি বেহিসেবীভাবে খরচ হয়েছে তার হিসাব কোনদিন হবে কি না সন্দেহ। খাদ্যসঙ্কট হ'লে PL 480 খাতে গম আমদানী করা অবশ্যই প্রয়োজনীয়, কিন্তু খাদ্যসমস্যা সমাধানের অন্যতম উপায় হিসাবে বিদেশী সাহায্য গ্রহণ বিবিধ কারণে দেশের অমঙ্গল সাধন করছে। সামান্যতম কারণে Dry Dole দেবার যে রেওয়াজ চালু হয়েছে (আগে Test Relief-এ, লোকে পরিশ্রমের বিনিময়ে খাদ্য পেত) তার মূলে কতটা দেশের অন্নসঙ্কট আর কতটা রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা আছে, সেকথা ভেবে দেখা দরকার। এক সময়ে ইংলণ্ডে Poor Law-র সাহায্যে দুঃস্থদের সাহায্য করা হ'ত (অপরদিকে ধনী চাষীর জন্য গমের উচ্চমূল্য বাঁধা থাকত, Minimum Wage বাড়ানোর কথাও ভাবা হ'ত না); দেশের সেই দুঃস্থ লোকেরা একদিকে যেমন নৈতিক অধঃপতনের সীমায় গিয়ে পৌঁছেছিল তেমনি আরেকদিকে অপ্রত্যাশিত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির নিমিত্ত হয়েছিল। আমাদের দেশে কি তারই পুনরাবৃত্তি হবে?—আজ আমেরিকার উদ্বৃত্ত শস্যের দৌলতে আমাদের খাদ্য-সমস্যা মেটাবার গরজ কমে যাচ্ছে। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে খাল খননের পরও দেশের অনেক অঞ্চলে জমি অনেক মাস পতিত থাকে; কারণ রবিশস্যের জন্য জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয় নি। একশ' বছর আগেও প্রত্যেক গ্রামে (বিশেষতঃ বাংলা দেশে) জলসেচের প্রধান উপায় ছিল পুকুর; সেই পুকুরগুলি উদ্ধার করে শীতকালীন ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করা হ'ল না। শোনা যায় পুকুরের মালিকানার প্রশ্নই নাকি প্রধান প্রতিবন্ধক; এত আইন পাশ হচ্ছে আর পুকুরের মালিকানা রাষ্ট্রায়ত্ত করা সম্ভব হচ্ছে না, একথা ভাবতে আশ্চর্য লাগে। বর্ষাকালে যে উদ্বৃত্ত জল খাল দিয়ে বয়ে যাচ্ছে তার একাংশও যদি পুকুরগুলি সংস্কারের পর সেখানে সঞ্চয় করে রাখার কোন ব্যবস্থা থাকত তা হলে চাষীর আত্মনির্ভরশীলতা এবং শীতকালীন ফসল উৎপাদন উভয়ই বৃদ্ধি পেত।

জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার খুবই বেশি সন্দেহ নেই; ভবিষ্যতে খাদ্যসঙ্কট আরও উগ্র হ'তে পারে এই বাবদেই; কিন্তু এখনকার খাদ্যসঙ্কট সম্পূর্ণভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুণ নয়।—এই সঙ্কটের মূলে আমাদের এযাবৎ অনুসৃত মুদ্রানীতি, রাজস্বনীতি যেমন আছে তেমনি আছে ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর অসীম লোভ। খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে হবে সন্দেহ নেই, তারজন্য অন্যান্য সমস্ত ব্যবস্থার সঙ্গেই প্রয়োজন হচ্ছে মূল্যমানের স্থিতিশীলতা এবং কৃষিপণ্য ও শিল্পপণ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য। বর্তমানে যে সঙ্কট খাদ্যের বাজারে দেখা গেছে তার সমাধান করতে হ'লে আরও দৃঢ়তা ও সততা দেখানো দরকার, তার উপযোগী আইন সরকারের হাতে আছে কিন্তু ব্যবহার করা যাচ্ছে না। বর্তমানের এই সঙ্কট সমাধানের সঙ্গেই ভাবতে হবে দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা সমাধানের কথা।

পরিকল্পনার সাফল্য দেশবাসী মাত্রেই চাইছে, এ বিষয়ে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না, কিন্তু দীর্ঘকাল কষ্ট সহ্য করার পর দেশবাসী দেখছে সমস্যা জটিলতর হয়ে চলেছে। আমাদের নতুন শাসকগোষ্ঠী যাবতীয় সমস্যা যথাযথভাবে বিচার করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্য যদি ঘটাতে চান তা হ'লে এ যাবৎ অনুসৃত পদ্ধতির অনেকাংশে পরিবর্তন ঘটাতে হবে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

জীবনে মরণে বাড়ায়েছ তুমি মহাভারতের মান।—
সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী ও মহালক্ষ্মীর দান।
চিত্তাভস্মের কণা হবে—শত পদ্মরাগের খনি,
স্থল জল বায়ু অন্তরীক্ষ করিবে তাহারা ধনী,
জাতিকে করিবে শুদ্ধ, স্বাধীন, মুক্ত উদার প্রাণ।

২

বাড়ায়েছ তুমি মানব জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা কত!
পরাধীনে তুমি করেছ স্বাধীন—অবনতে উন্নত।
বিশ্বে তোমার পর নাহি কেহ সকলেই আপনার,—
ভুবন তোমার ভবন, বিশাল শুচি এক পরিবার।
দুর্ব্বলের যে ধ্বজপট তুমি করেছ জয়োদ্ধত।

৩

রেখে যাও তুমি গাণ্ডীব তূণ যে রথ কপিধ্বজ,—
জন-গণ-মনে ধ্যানের ভারত খোঁজো।
যুগে যুগে তুমি ভূমণ্ডলকে কর উর্জ্জ্বল
অনাগতে বরো, আহ্বানি আনো মহামানবের দল।
মধুময় তুমি করে দিয়ে যাও পুনঃ পার্থিব রজঃ।

নদী-যৌবনা

শ্রীকৃষ্ণধন দে

খরস্রোতা নদী যেন তোমার যৌবন
তন্বি, তুমি জান না তা?—শুধু তব মন
প্রতীক্ষার সিন্ধুতটে যায় ছুটিবারে,
শ্যামবর্ষ নেমে আসে স্রোতের কিনার
কভু ছুটে যেতে যেতে স্তব্ধ হয়ে রও,
নিশীথরাত্রির তন্দ্রা ভেঙে কথা কও,
ঘূর্ণিতে ঘূর্ণিতে কত ছল্ ছল্ ভাষে
কুড়াও বনের ফুল যারা উড়ে আসে
তন্বি, তুমি জেগে থাক অজন শয়নে
বিস্তীর্ণ বালুর তটে, যেথা কলস্বনে
কাহারে ডেকেছ পাশে? চঞ্চল যৌবন
অর্ঘ্য দিতে চাও কারে? তটে যৌ
কি তৃষ্ণা মিটাতে যাবে? [illegible]
কখনো তোমার [illegible] জীবনে [illegible]

বিশ্বামিত্র

শ্রীচাণক্য সেন

॥ দশ ॥

হরিশংকর ত্রিপাঠি ও সুদর্শন দুবেকে ...খোমুখি দাঁড়ালে ...গপৎ বেমানান বিসদৃশ এবং সমতুল দেখায়। হরিশংকরের ...শাল বপু, যেমন দৈর্ঘ্য, তেমন ব্যাপ্তি। লম্বায় ছ'ফুটের ...বশি, ওজনে আড়াই মণ। মেদবহুল প্রকাণ্ড দেহকাণ্ডের ...পর প্রচণ্ড মাথা; বাবড়ি চুল, সাদা-কালোয় বিসম ...ংমিশ্রণ। চওড়া কপালে প্রতিদিন সকালে রক্ততিলক ...রণ করেন; হরিশংকর কালীর সাধক, এককালে তান্ত্রিক ...প্রভাবে পড়েছিলেন। রক্ততিলক কেটে যায় ললাটের ...ভীর রেখায়। বিশাল চোখ সর্বদা রক্তিম। মোটা ...ডাকসাইটে নাক; নাসারন্ধ্রে অনায়াসে ইঁদুর যাতায়াত করতে পারে (হরিশংকর রসিকতা ক'রে বলেন, তিনি ...গুপ্ত সিংহ, ইঁদুরও তাঁকে ভয় মানে না।) গভীর কৃষ্ণবর্ণ জোড়া ভ্রূ; ভয়ংকর একজোড়া গোঁফের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করেছে। সর্বদা পান-দোক্তা খাবার জন্যে দাঁতগুলো কৃষ্ণবর্ণ। প্রকাণ্ড মাংসল গালের দু'পাশে বড় বড় কান। দেহের কোনও কিছুই হরিশংকর ত্রিপাঠির নগণ্য নয়। হাতের আঙুল, চিবুক আর কানের চুল থেকে ভুঁড়ি, বাহু, জংঘা; সবকিছু বিধাতা তাঁকে অকৃপণ ঔদার্যে বড় বেশি ক'রে দিয়েছেন।

সুদর্শন দুবেরও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে একটা অতিরিক্ত ভাব আছে। আয়তনে সুদর্শন ছোট, মাথা-ভরতি টাক; তবু কপালের ওপর অপলক একগুচ্ছ নাচে চুল। তবু তাঁর কপাল একটু বেশি চওড়া, চোখ দুটি একটু বেশি বড়, নাক খানিক বেশি মোটা, গায় একটু বেশি জ্বলা-জ্বলা। সুদর্শনকে দেখে সবচেয়ে যা সহজে মনে হয় তা হচ্ছে তাঁর অসাধারণ তৎপরতা। তিনি যেন চোখে-মুখে কানে-অনুভূতিতে সব কিছু চট্‌-পট্‌ জেনে ফেলছেন, বুঝে নিচ্ছেন। হরিশংকর ত্রিপাঠি, অপর পক্ষে, সবটা যেন অর্ধ-সুপ্ত; স্বয়ং মহাদেবের এ-কাল সংস্করণ। সুদর্শন দুবে কথ্যবার্তায় যেমন চৌখুস, হরিশংকর তেমন নিরেট। সহজে কথা বলেন না, বললেও যত কম সম্ভব, এবং ধীরে ধীরে। সেভাবে তিনি সজাগ হ'তে ... তাঁর সতর্কতাও ... অথচ, যাঁরা জানেন, লুকিয়ে রয়েছে এক অত্যন্ত চালাক, ধূর্ত, ক্ষিপ্র তীক্ষ্ণ মানুষ। সুদর্শন দুবের তৎপরতা বাহ্যিক; তাঁ... বুদ্ধি, বিচার ও কর্মপন্থায় গভীরতা নেই। হরিশংক... বাইরে শ্লথ, কিন্তু ভেতরে ভয়ানক ক্ষিপ্র। বাইরে মৌন প্রায়; ভেতরে তাঁর মন সর্বদা কর্মব্যস্ত।

হরিশংকর ত্রিপাঠির রাজনৈতিক ইতিহাস বিচিত্র। উত্তরাচলের যে সীমান্ত রাজস্থানের সঙ্গে, সেখানে আজমগড় নামে ছোট শহরে তাঁর জন্ম। রাজস্থানের অন্যতম দেশীয় রাজ্যে পিতা সামান্য বেতনের রাজকর্মচারী ছিল। ঠিক কি ধরণের কাজ সে করত কেউ জানত না, তবে মাঝে মাঝে তাকে রাজার তৃতীয় পুত্রের সঙ্গে গ্রামে সফরে যেতে হ'ত। সুতরাং লোকে তাকে তৃতীয় রাজকুমারের ব্যক্তিগত লোক বলত। হরিশংকর যখন বালক, তখন এই নিয়ে তাঁ... প্রথম বিদ্রোহ। স্কুলে সহপাঠিরা তাঁকে চাকরের ছে... ব'লে ব্যাত করায় তিনি অপমানিত হয়ে রাজদরবারে... এক প্রভাবশালী ব্যক্তির পুত্রের মাথায় দারুণ আঘা... করেছিলেন। তার ফলে বাপ হরিশংকরকে আজমগ... কাকার কাছে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হ'ল। আজমগ... হরিশংকর স্কুলে যত না বিকশিত হলেন তার চেয়ে অ... বেশি স্কুলের বাইরে। আজমগড়ে অভ্রখনি ... অনেকগুলি; স্কুলের অনতিদূরে ছিল খানর কর্মচ... মজদুরদের বস্তি। হরিশংকর সে বস্তির অন্তরঙ্গ ... উঠলেন। তখন তাঁর চেহারা ছিল আকর্ষণীয়। ... দীর্ঘ, তেমন মজবুত। স্কুল থেকে পাস ক'রে হরিশ... যখন আজমগড় ছাড়লেন তখন দেখা গেল বস্তির ... সুন্দরী কন্যাও নিখোঁজ।

এই কন্যাটি সুন্দরী হ'লেও অব্রাহ্মণ ছিল। হরি... তাকে নিয়ে আহমেদাবাদ চলে গেলেন। এক কা... করে মজদুর-সর্দারের কাজ জুটে গেল। হরিশং... কর্মজীবন আরম্ভ হ'ল। কাপড় ও সুতাকলের যা... হাল-চাল তিনি বুঝে নিলেন। বছর-তিনেক পরে পত্নী অথবা সহচরী আত্মহত্যা করল।

হরিশংকরের জীবনে প্রথম রাজনীতির সুযোগ ... আমেদা...

সময় কাপড়ের কলে বিক্ষোভ দেখা গেল। মজদুর-সর্দার হরিশংকর ত্রিপাঠি মজদুর-নেতা হয়ে উঠলেন। যে কলের তিনি কর্মচারী সেখানে এক দিন হরতাল লেগে গেল। গান্ধীটুপি ও খদ্দরে সুশোভিত হয়ে হরিশংকর মজদুরদের নেতৃত্ব করলেন। সে-নেতৃত্বে তাঁর কৃতিত্ব সহজে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। হরিশংকর ত্রিপাঠি কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত শ্রমিক-নেতা হিসেবে স্বীকৃতি পেলেন।

সেই থেকে আজ পর্যন্ত হরিশংকর ত্রিপাঠি শ্রমিক-নেতা। তিনি মালিকদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন বার বার, কিন্তু তাঁদের শত্রু হয়ে নয়, প্রকৃত মিত্র হয়ে। শ্রমিক ও মালিকের স্বার্থ যে পরস্পরবিরোধী, এ মতবাদে হরিশংকর ত্রিপাঠি কদাচ বিশ্বাস করেন নি। মালিক না হ'লে শিল্প গড়বে না—শ্রমিক না হ'লে শিল্প চলবে না; সুতরাং মালিক ও শ্রমিককে একত্র, পারস্পরিক সহযোগিতায়, আদর্শ পরিস্থিতিতে শিল্পায়ন সম্ভব করতে হবে। মালিক হবে আদর্শ মালিক, শ্রমিক আদর্শ শ্রমিক। মালিক লভ্যাংশের যতটা সম্ভব শ্রমিকের কল্যাণে বিনিয়োগ করবে; শ্রমিক মালিককে দেবে স্নেহের দাম, অন্তরের আনুগত্য, মস্তিষ্কের বুদ্ধি। এই হ'ল হরিশংকর ত্রিপাঠির শ্রমিক-দর্শন। শ্রমিক-নেতা হিসেবে তিনি আজীবন বিবাদ-কলহ আপোসে মেটাবার চেষ্টা ক'রে এসেছেন। হরতাল হ'লেও তিনি কৌশল করেছেন, মালিকের স্বার্থ যথাসম্ভব রক্ষা করে, শ্রমিকের দাবি যতটুকু সম্ভব মিটিয়ে, আপোস করবার। বহুক্ষেত্রে এ প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। যেখানে হয় নি, হরিশংকর ত্রিপাঠি দোষ দিয়েছেন সে-সব তথাকথিত বামপন্থী নেতাদের, যাঁদের উদ্দেশ্য কেবল সমাজ ধ্বংস করা, গ'ড়ে তোলা নয়; যাঁরা বিপ্লবের সস্তা হুজুগ বাধিয়ে দিয়ে আসলে শ্রমিকের সর্বনাশের রাস্তা তৈরীতে ব্যস্ত।

উদয়াচলে শিল্প-প্রসার অবিস্তর হ'লেও হরিশংকর ত্রিপাঠি সেখানকার প্রধানতম শ্রমিক-নেতা। উনিশ শ' সাঁইত্রিশ সালে তিনি বিলাসপুরে স্থায়ী নিবাস তৈরী করেন। তার পেছনে খানিক ইতিহাস আছে। যে-অব্রাহ্মণ কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে তরুণ হরিশংকর একদা আজমগড় থেকে আহমেদাবাদ পালিয়েছিলেন, শাস্ত্রমতে তাঁকে তিনি বিবাহ করেন নি। সে-কন্যার মৃত্যুর পর হরিশংকর সম্ভোগী হয়ে উঠেছিলেন। মজদুরদের সর্দারী করতে গিয়ে স্ত্রীলোকের কোনদিন অভাব হয় নি। পরে যখন মজদুর-সর্দার থেকে তিনি মজদুর-নেতা হ'লেন, তখন [illegible] স্বাধীনতা সংগ্রামে ভূমিকা গ্রহণ ক'রে তাঁর বল, [illegible] প্রতিপত্তি বাড়ল, তখন সমাজের যে-শ্রেণীতে তাঁর [illegible] অধিকার সেখানে স্থির হবার প্রয়োজন হ'ল। আহমেদাবাদে তাঁর যে-পরিচয় তাতে এ ধরণের স্থিতি অর্জন করা সহজ হ'ল না। কিন্তু সুযোগ এল বিলাসপুরে। উদয়াচলের অন্যতম ধনী মারোয়াড়ি অযোধ্যাপ্রসাদ মিশ্রের সঙ্গে হরিশংকর ত্রিপাঠির পরিচয় ছিল। অযোধ্যাপ্রসাদ কেবল জমিদার ছিলেন না, দু'টি অভ্রখনির মালিকও ছিলেন। বহুদিনের অযত্নে অভ্রখনি দুটোর অবস্থা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, অযোধ্যাপ্রসাদ চাইলেন তাদের উন্নতি সাধন করতে। হরিশংকর ত্রিপাঠির এ-বিষয়ে খানিকটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। আহমেদাবাদে একদিন দু'জনের এ নিয়ে কথাবার্তা হ'ল। হরিশংকর চাইলেন অভ্রখনি দুটোকে আধুনিককালের মাপকাঠিতে নতুন ক'রে গড়ে তুলতে। অযোধ্যাপ্রসাদ রাজী হলেন। তাঁর অভ্রখনির ম্যানেজার হয়ে হরিশংকর এলেন বিলাসপুরে। তাঁর ব্যবস্থাপনায় খনির কাজ দ্রুত অগ্রসর হ'তে লাগল। অযোধ্যাপ্রসাদের সঙ্গে হরিশংকরের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। বিলাসপুরে এসে হরিশংকর কাপড়ের কলের মজদুর সভার সভাপতি হলেন। অভ্রখনির ম্যানেজারীর সঙ্গে তাঁর এই নতুন দায়িত্বের সংঘর্ষ বাধল না। অভ্রখনির ম্যানেজারী করতে গিয়ে হরিশংকর মজদুরদের সুখ-সুবিধার দিকে নজর রেখেছিলেন; তাতে মজদুর-মহলে তাঁর সুনাম হয়েছিল। কাপড়ের কলের কর্তৃপক্ষও তাঁকে মজদুর সভার সভাপতি পেয়ে খুশীই হয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক মজদুর সভার এক বাৎসরিক অধিবেশনে অন্যতম ভারতীয় সদস্য হিসেবে হরিশংকর ত্রিপাঠি যখন প্রথম সুযোগ পেলেন [illegible] বিদেশ ভ্রমণ সার্থক করবার জন্যে মিলের কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করা স্বার্থবিরোধী মনে করেন নি।

অযোধ্যাপ্রসাদের তৃতীয়া কন্যা কমলা দেবীর সঙ্গে হরিশংকর ত্রিপাঠির বিবাহ হয়েছিল। কমলা দেবীর [illegible] শিক্ষায়, ব্যক্তিত্বে উল্লেখযোগ্য ছিল না কিছুই। রং কালো, মোটা, একটি চোখ ভয়ানক টেরা। সামনের তিনটি দাঁত নীচের ঠোঁট চেপে বেরিয়ে এসেছে। [illegible] পোষবে সে ঘটে নি, ওজনের দরকারও ছিল না। [illegible] বিবাহ করতে হরিশংকরের [illegible] হয় নি। [illegible]

ছিল না। অজিবার অযোধ্যাপ্রসাদের জামাতা হরিশংকর ত্রিপাঠি ভূমিবার অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্গত।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে হরিশংকর ত্রিপাঠির চেহারার ভয়ঙ্কর পরিবর্তন হয়েছিল। বিপুল মেদাধিক্য তার প্রধান কারণ। চিরদিন তিনি স্বল্পভাষী, রাজনীতিতে ঢোকবার পরেও একান্ত প্রয়োজন না হ'লে বক্তৃতা করতেন না। বিশ্বস্ত পার্শ্বচরদের কয়েকজন সুবক্তা ছিলেন, তাঁরাই হরিশংকরের মতামতের চৌখুশ মুখপাত্র। হরিশংকরের মেধা ছিল নেপথ্যে দর-কষাকষিতে, ইংরেজীতে যাকে বলে নেগোশিয়েসন। অপর পক্ষের কলাকৌশল বুঝে নেবার আশ্চর্য ক্ষমতায় তিনি সহজে নিজের কর্মপন্থাকে সফল ক'রে তুলতে পারতেন। কোন্ সময় কি কারণে মজদুর আন্দোলন সুরু করা উচিত, কি ভাবে হরতাল সংগঠন করলে না-জিতলেও না-হারার বিপদ এড়ানো যায়, হরতাল কি ভাবে সঙ্কটের সম্মুখীন হয় এবং সে সঙ্কট-ত্রাণের উপায় কি, কি উপায়ে হরতালের সর্বোচ্চ উত্তেজনার মধ্যেও মালিকদের সঙ্গে সংগোপনে কথাবার্তা চালাতে হয়, মজদুর-হরতালে অন্য রাজনৈতিক দলের অনুপ্রবেশ কেমন ক'রে রুখতে হয়, হরতাল বেসামাল হ'লে কি ভাবে অবস্থা সামলে নেওয়া যায়—এ সব সূক্ষ্ম, কঠিন, ক্ষুরধার পথে হরিশংকরের মেধা বিদ্যুতের মত অনায়াস ক্ষিপ্রতায় কাজ ক'রে যেত। অথচ তাঁর মেদভারজর্জিত থমথমে মুখের পানে তাকিয়ে মনে হ'ত না এমন তীক্ষ্ণ কৌশলজ্ঞানের তিনি অধিকারী।

মজদুর-নেতা হিসেবে উদয়াচলে, এমন কি ভারতবর্ষে, হরিশংকরের কিছুটা বৈশিষ্ট্য ছিল। অন্তত তিনি তাই মনে করতেন। যে-সব শিক্ষিত "ভদ্রলোকেরা" কংগ্রেসের নেতৃত্ব করতেন, তাঁদের হরিশংকর দেখতেন খানিকটা ঈর্ষা, কিছুটা অপরিচয়ের ভয় এবং অনেকখানি অহংকৃত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে। কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন-অর্জিত জ্ঞান-বিদ্যা তাঁর ছিল না, তাই অতি-শিক্ষিত নেতাদের তিনি মনে মনে ঈর্ষা করতেন। কিন্তু সংক্ষেত্রে স্বোপার্জিত নেতৃত্ব তাঁকে কঠিন আত্মবিশ্বাস দিয়েছিল; তিনি জানতেন "ভদ্রলোক" নেতাদের যা নেই, তাঁর আছে; শ্রমিক-সংযোগ, শ্রমিক-সমর্থন। আসল নেতা ত আমি, আমরা—হরিশংকর ভাবতেন, বিশ্বাস করতেন, কখনও-সখনও বলেও বসতেন। "ভদ্রলোকেরা" ভদ্র রাজনীতি অভদ্র ভাবে করে থাকে, অভদ্র রাজনীতিকে ভদ্রতার সম্মান দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের। কংগ্রেস আপাতজনসাধারণের প্রতিনিধি হ'লেও আসলে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেদের সংগঠন; তার পেছনে বিপুল মজদুর ও চাষীর জীবনে প্রসারিত, যে কেবল আমাদের জন্যে। কংগ্রেস যখন রাজত্ব করবে তখন আমাদের বাদ দিয়ে তার একদিন চলবে না।

এ আত্মবিশ্বাস ছিল ব'লে হরিশংকর ত্রিপাঠি কংগ্রেসের দলীয় রাজনীতিতে কখনও খুব একটা জেঁকে বসবার চেষ্টা করেন নি। নাদুস-নুদুস উকিল-অধ্যাপক-পত্রকারদের রাজনীতি তাঁর কাছে কেমন জলীয় মনে হ'ত। উদয়াচল কংগ্রেসের এক্‌জিকিউটিভ কমিটির মেম্বার তিনি ছিলেন; তার চেয়ে বড় ভূমিকার প্রয়োজন বোধ করেন নি। আন্দোলনের সময়ও তিনি মজদুরদের নিয়ে আলাদা আয়োজন করেছেন। যেমন, গান্ধীজির "এক-ব্যক্তি সত্যাগ্রহের" সময় তিনি তিনশত মজদুরকে একদিনে পর পর একে একে কারাবরণ করিয়েছিলেন; উদয়াচলের কংগ্রেস দপ্তর সর্বসাকুল্যে পঞ্চাশজনের বেশি একক সত্যাগ্রহী জোগাড় করতে পারেন নি। যে-তিনবার হরিশংকর ত্রিপাঠি নিজে জেলে গেছেন, তাও কংগ্রেসী নেতা হিসেবে ঠিক নয়, কংগ্রেসী মজদুর-নেতা হিসেবে।

স্বাধীনতার পর উদয়াচলে যখন কংগ্রেসী রাজত্বের সূচনা হ'ল, তার উদ্যোগ-পর্বে হরিশংকর ত্রিপাঠির খুব বড় ভূমিকা ছিল না। আগষ্ট আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। উদয়াচলে এ আন্দোলন যতটুকু দানা বেঁধেছিল তার বেশির ভাগ কৃতিত্ব হরিশংকর ত্রিপাঠির। বিলাসপুরের দু'টি কাপড়ের কলেই হরতাল হয়েছিল; মালিকরা নিজেরাই কল এক মাস বন্ধ রেখেছিলেন। হরিশংকর নিজে সাবেকী কংগ্রেসী কায়দায় কারাবরণ করলেও তাঁর পাঁচজন অনুচর 'আণ্ডার-গ্রাউণ্ড' হয়েছিল; তাদের নেতৃত্বে তিনশ' লেটার বক্স, চুয়াত্তরটি টেলিগ্রাফ পোল, তিন মাইল লম্বা টেলিগ্রাফ তার বিনষ্ট হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ইংরেজ যখন ক্ষমতা হস্তান্তরের বাসনা সুস্পষ্ট ঘোষণা করল, তখন হরিশংকর মিল-মালিকদের রাজী করালেন আগষ্ট আন্দোলনের সময় এক মাস লক-আউটের পুরো বেতন মজদুরদের দিয়ে দেবার। এ নিয়ে একটি মর্মস্পর্শী অনুষ্ঠান হয়েছিল বিলাসপুরে, যার প্রধান নায়করূপে জনৈক দেশনেতা আমন্ত্রিত হ'লেও আসল গৌরব ছিল হরিশংকরের। ভারতবর্ষের ইতিহাস তখন নতুন পথে পা বাড়াবার জন্যে তৈরী। ইংরেজ-বিদায় আসন্ন। সে অনুষ্ঠানে হরিশংকর একটি বিরল ভাষণ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "দেশের মুক্তি আসন্ন। মুক্তির চেহারা দেখে আমরা অনেকেই আতংকিত। হয়ত দেশ বিভক্ত হবে। এমন অনেক কিছু ঘটবে যা আমরা চাই নি, চাই নে। তবু বিদেশী শাসক বিদায় নেবে, ভারত স্বাধীন হবে। এবার সুরু হবে নতুন ভারত গড়বার অভিনব

উদ্যোগ। এ উদ্যোগের নেতৃত্ব করবে কংগ্রেস। এ তার বহু বছরের ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার। নেতারা আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। ভারতবর্ষের শ্রমিক খাঁটি দেশপ্রেমিক। তার দেশপ্রেমে ভেজাল নেই। নেতাদের আমরা একটি কথা নিবেদন করতে চাই। শ্রমিকদের বাদ দিয়ে স্বাধীন ভারত গড়া সম্ভব নয়। কংগ্রেসের যে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ তা কার্যকরী করতে পারে কেবল শ্রমিকরা। আমাদের বিনীত নিবেদন, আমরা শ্রমিকরা স্বাধীন ভারত তৈরীর মহান প্রচেষ্টার পূর্ণ অংশীদার হ'তে চাই। হ'তে পারার মত ক্ষমতা আমাদের আছে। উৎপাদনের পুরোহিত ত আমরাই। কিন্তু, গান্ধীজির ভারতবর্ষে, আমরা শ্রেণী-সংঘাতের পথ স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে ত্যাগ করেছি। আমরা চাই শ্রেণী-সহযোগিতার পথ। সে সহযোগিতা আসবে যদি আমাদের পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হয়।" মন্ত্রীসভা গঠন পর্বের প্রারম্ভে হরিশংকর ত্রিপাঠি তাঁর ভাষণ নতুন ক'রে ছাপিয়ে দেশের সর্বত্র প্রচার করেছিলেন।

তাঁর লক্ষ্য ব্যর্থ হয় নি। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলের মন্ত্রীসভায় হরিশংকর ত্রিপাঠি স্থান পেয়েছিলেন। এজন্যে কোনও তদ্বির করতে হয় নি। চাইতে হয় নি। স্থান তাঁর জন্যে যেন নির্দিষ্টই ছিল। হরিশংকর ত্রিপাঠি জানতেন, দুর্গাভাই তাঁকে মন্ত্রিত্ব দিতে যতই না আপত্তি করুন, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাঁর জন্যে আসন রাখবেনই।

মন্ত্রীসভায় আসন পাওয়া তখন হরিশংকর ত্রিপাঠির দরকার ছিল। একটা বিশ্রী ব্যাপারে যে-কারবার জড়িয়ে পড়েছিলেন। মন্ত্রিত্বই তাঁকে সহজে তা থেকে উদ্ধার করতে পারত। রাজা না হ'লে রাজরোষ থেকে সহজে রেহাই পাওয়া যায় না।

ক্রমশঃ

—•—

পাঞ্চশস্য

হয়েল নারলিকার প্রসঙ্গ

অনেক বাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১৬ ॥ বিশ্বরূপ-
দর্শন যোগ।
—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

গত ১১ই জুন তারিখে কেমব্রিজের অধ্যাপক ফ্রেড হয়েল রয়েল সোসাইটির আঙিনা'য় যে বক্তৃতা দেন তার বিষয়বস্তু নিয়ে সমস্ত কমন-ওয়েলথ এবং কমনওয়েলথের বাইরেও নানা দেশে আলোড়ন উঠেছে। এই আলোড়ন আমাদের দেশে আবার কিছু অধিক। এমনিতে আমাদের দেশ বিজ্ঞান আলোচনায় 'অনভ্যস্ত', বিজ্ঞানের বিষয়গুলি সম্বন্ধে প্রায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধভাবে নিরাসক্ত। কিন্তু হয়েল সাহেবের বক্তৃতা নিয়ে দেখি এখানকার খবর-কাগজেও জল্পনা-কল্পনার অবধি নেই। কারণ অবশ্য সহজেই বোধগম্য। রয়েল সোসাইটির সেই সভায় সৃষ্টিতত্ত্ব ও মাধ্যাকর্ষণ (অভিকর্ষ বলুন) সম্বন্ধে যে নূতন মত প্রকাশ করা হ'ল তারই অন্যতর প্রবক্তা হিসাবে রয়েছেন যিনি, তিনি আমাদেরই এই দীন-দুঃখী ভারতমাতার সন্তান। শুধু ভারতীয় বলে নয়, বরং আইনস্টাইনের নাম যেখানে জড়িত, সেখানে কি না [জয়ন্ত] নারলিকারের ছাত্রজীবন এখনও শেষ হয় নি। বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, ২৩ বৎসর বয়সের এই ভারতীয় কেমব্রিজের ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করে এখন পোস্ট-ডক্টরেট শিক্ষা-গবেষণায় নিরত। এত অল্প বয়সে অধ্যাপকের সহযোগিতায় সমস্ত সৃষ্টির রহস্য সন্ধানী কি, সেই তত্ত্ব তিনি নিরূপণ করলেন যা দুনিয়ার সেরা সেরা বিজ্ঞানীরা মাথা না ঘামিয়ে পারছেন না। কেউ বলছেন—"অসামান্য", "অভিনব", "এবং আইনস্টাইনের নামের পাশে লিখে রাখার যোগ্য।" আবার বিপরীত মতও রয়েছে। বিজ্ঞানী মার্টিন রাইল হয়েল-নারলিকারের তত্ত্বের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। ওপেনহাইমার বলেছেন, এঁদের যা মত তার অনেকই বিজ্ঞানের প্রচলিত ধারণা ও যুক্তির বিরোধী। কলকাতা ম্যাথমেটিক্যাল সোসাইটির সঙ্গে জড়িত একজন অধ্যাপকের মতে, ব্যাপারটা নাকি প্রায় রাজনৈতিক, জাতাভিমানের প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে। [illegible] ব্রিটেনের নাম আমেরিকার মত উজ্জ্বল করে তোলার জন্য [illegible] চেষ্টা চলছে। হয়েলের বিবৃতিও নাকি সে [illegible]। আমাদের দেশের আর একজন বিজ্ঞানী—বিশ্ববিখ্যাত [illegible] [illegible] বলছি [illegible]। এ ধরণের পরস্পর-বিরোধী [illegible] বিজ্ঞানজগৎ।

নারলিকারের প্রসঙ্গে মতামত যতটা সহজলভ্য দেখছি, আসল বিষয়টি অর্থাৎ ওঁদের বক্তব্যটি ঠিক সমপরিমাণে দুর্লভ। বস্তুত, হয়েল-নারলিকারের নূতন বিশ্ব-ধারণা সম্বন্ধে পুরোপুরি বিবরণ আমরা এখনও সংগ্রহ করতে পারি নি। বিজ্ঞানের এই উন্নতির যুগে মানুষের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার কত উন্নতি হয়েছে, মহাসমুদ্রের দু'পাড়ের দেশগুলিতে নিমেষের মধ্যে লক্ষ লক্ষ শব্দ সংবাদ বহন করে চলেছে, অথচ কি আশ্চর্য দেখুন—যে তত্ত্ব সমস্ত বিশ্ব-সৃষ্টি সম্বন্ধেই নূতন কথা বলতে যায় তার সম্বন্ধে খবর এখনও পর্যন্ত অবিশ্বাস্য রকমে অসম্পূর্ণ। বিজ্ঞানের কাজ করার ক্ষমতা একটু বেহিসাবী অপরিকল্পিত ভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হ'লেও হয়েল-নারলিকার প্রসঙ্গে এই সত্যটি আর একবার উপলব্ধি করা গেল। কিন্তু যে কথা আমরা বলতে বসেছি। হয়েল-নারলিকারের তত্ত্ব সৃষ্টি কৌশল ও অভিকর্ষের ব্যাপার সর্বাধুনিক তত্ত্ব। সেই আদিকাল থেকে মানুষ যে-সমস্ত জাগতিক ব্যাপারগুলির ব্যাখ্যা খুঁজছে, হয়েল-নারলিকারের তত্ত্ব সেই একই সূত্রে বাঁধা রয়েছে। গ্যালিলিও আমল থেকে, নিউটনের সময় থেকে মানুষের এ সম্বন্ধে যা ধারণা তাও এ প্রসঙ্গে এসে পড়ছে। মূল বিষয়ে যাওয়ার আগে আমাদের সেই পুরানো কথাগুলিই আবার নূতন করে আলোচনা করে নিতে হবে, খুব সংক্ষেপে।

যে-কোন জিনিষের গুণ বা লক্ষণ হ'ল, সে তার অবস্থা পরিবর্তন করতে চায় না। এই অবস্থা পরিবর্তনের জন্য যা চাই তার নাম হ'ল শক্তি। জিনিষের সম্বন্ধে আর একটা কথা এই যে, তারা পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণের পরিমাণ জিনিষগুলির "বড়ত্ব" এবং দূরত্বের উপর নির্ভর করে। জিনিষগুলি কোথায় রয়েছে—জলে, না বাতাসে, না শূন্যে, তার সঙ্গে আকর্ষণ-শক্তির কোন সম্পর্ক নেই। মূল এই নিয়মটির ওপর ভিত্তি করে গ্যালিলিও ও নিউটন সূর্যাদি গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিধির ব্যাখ্যা করেছেন। একটা জিনিষ অন্য জিনিষের ওপর এভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে (দূরত্বকে অতিক্রম করে)। কোথায় তা রয়েছে—অর্থাৎ স্পেস (SPACE), তার কোন হাত এ ব্যাপারে নেই। অন্য ভাবে বলতে গেলে, স্পেস যেন নিছক নিষ্ক্রিয় কিন্তু চুম্বক-শক্তির বেলায় দেখা গেল স্পেস মোটেই নিষ্ক্রিয় থাকছে না, তার বা পারিপার্শ্বিক চুম্বকের চারপাশে [illegible] তা লক্ষণীয়। আলোর ব্যাপারেও এ ধরণের একটা পরিবর্তন আছে। [illegible] আলোর উৎসটির [illegible] আশ-পাশের স্পেসে [illegible] আলোড়ন ঘটে না, আমাদের চোখের [illegible] অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। আসল কথা—স্পেস পরিবর্তিত হচ্ছে। [illegible] চুম্বক বা আলোর [illegible]

বিদেশের কথা

শ্রীযোগনাথ মুখোপাধ্যায়

গোল্ডওয়াটার ঃ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি চার বছর অন্তর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাক্কালে দু'টি প্রধান রাজনৈতিক দল খুব ঘটা করে তাঁদের প্রার্থী নির্বাচন করেন। প্রতিপক্ষকে সন্ত্রস্ত করা ও অনুগতদের উৎসাহ দেওয়াই ঐ আড়ম্বরের প্রকৃত উদ্দেশ্য। এইবারও যুক্তরাষ্ট্রের এই চিরাচরিত প্রথার কোন ব্যতিক্রম হয় নি। জুলাই মাসের গোড়ার দিকে সানফ্রান্সিস্কোর রিপাবলিকান দলের প্রতিনিধিরা এরিজোনার সেনেটর ব্যারী গোল্ডওয়াটারকে বিপুল সমর্থন জানিয়ে তাঁদের প্রার্থী মনোনীত করেছেন। শাসকদল ডিমক্রাটিক পার্টির প্রার্থী মনোনীত হবেন ২৪শে আগষ্ট, আটলান্টিক সিটিতে ঐ দলের প্রতিনিধি-সম্মেলনে। তবে ঐ মনোনয়ন সম্বন্ধে রাজনৈতিক মহলে কোন ঔৎসুক্য নেই, কারণ এটা এক রকম স্থির হয়েই আছে যে, বর্তমান প্রেসিডেন্ট জনসনই ডিমক্রাটিক পার্টির মনোনয়ন লাভ করবেন।

ডিমক্রাটিক ও রিপাবলিকান দলের প্রার্থীরা ছাড়াও আরও কয়েকজন প্রার্থী প্রতিবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কিন্তু তাঁদের কথা কেউ ধর্তব্যের মধ্যে আনেন না, বা তাঁদের নামটুকু পর্যন্ত অনেক সময় বিদেশী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় না। তাঁদের কেউ ব্যক্তিত্ববাদী, কেউ নিরামিষ ভোজনের সমর্থক, কেউ বা মদ্য-মত্ততার বিরোধী। কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থন তাঁদের পিছনে থাকে না, তাঁরাও তার প্রত্যাশা করেন না। সবচেয়ে বড় কথা, প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হ'তে হ'লে যে টাকার জোর থাকার দরকার তা তাঁদের একেবারেই নেই। প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দল অবশ্য [illegible] জাতীয় নির্বাচনব্যয় [illegible] বহন করে থাকে এবং [illegible] ১৯৬০ সালের নির্বাচনে দলের ব্যয় হয় আটত্রিশ লক্ষ বিশ হাজার ডলার। কিন্তু দলের মনোনয়নলাভের আশায় একজন প্রার্থীকে নিজের পকেট থেকে যা ব্যয় করতে হয় তা প্রায় অবিশ্বাস্য। ১৯৬০ সালে ডিমক্রাটিক দলের প্রার্থী মনোনীত হওয়ার আগে প্রেসিডেন্ট কেনেডি প্রচারকার্যে ব্যয় করেন নয় লক্ষ ডলার, অর্থাৎ প্রায় তেতাল্লিশ লক্ষ টাকা, আর বর্তমান প্রেসিডেন্ট জনসন আড়াই লক্ষ ডলার ব্যয় করেও মনোনয়ন পান না। রিপাবলিকান দলের মনোনয়ন পাওয়ার আগে নিক্সন ব্যয় করেছিলেন পাঁচ লক্ষ ডলার।

প্রেসিডেন্ট কেনেডি গত নির্বাচনে খুব অল্পভোটের ব্যবধানে নিক্সনকে পরাজিত করে শাসন-ক্ষমতা অধিকার করেছিলেন। পরে অবশ্য তাঁর দূরদৃষ্টি, দুর্জয় সাহস ও কর্মদক্ষতা তাঁর ও ডিমক্রাটিক দলের জনপ্রিয়তা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল, এবং যে নিক্সন ১৯৬০ সালে সামান্য ভোটের জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হ'তে পারেন না, ১৯৬৩ সালে এক রাজ্যের গবর্ণরপদের নির্বাচনে শোচনীয় পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে সেই নিক্সনকে রাজনীতি থেকে বিদায় নিতে হয়। সুতরাং আজ যদি প্রেসিডেন্ট কেনেডি জীবিত থাকতেন ও পুনর্নির্বাচনপ্রার্থী হতেন তবে তাঁর বিরুদ্ধে রিপাবলিকান দলের প্রার্থী খুঁজে পাওয়াই কঠিন হ'ত। প্রেসিডেন্ট জনসন অবশ্য প্রেসিডেন্ট কেনেডির নীতিই অনুসরণ করে চলেছেন এবং প্রেসিডেন্ট কেনেডির আদর্শ অনুসরণের আহ্বানই হবে তাঁর নির্বাচনী অভিযানের প্রধান ধ্বনি। তবু একথা অস্বীকার্য যে, প্রেসিডেন্ট কেনেডির [illegible] ক্ষতি ডিমক্রাটিক দলের পক্ষে অপূরণীয়। তার উপর ডিমক্রাটিক দলের [illegible]। কারণ [illegible] [illegible] প্রযুক্ত

[illegible] মার্কিন [illegible] ভিয়েৎনাম সরকার কম্যুনিষ্ট গেরিলাদের (ভিয়েৎকঙ) কোনভাবে পরাস্ত করতে পারবেন না। পরন্তু দিনের পর দিন তারা উত্তরোত্তর শক্তিশালী হয়ে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সরকারের স্বাভাবিক অস্তিত্ব অসম্ভব করে তুলছে। আজ যদি মার্কিন বাহিনী দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ত্যাগ করে বা মার্কিন সাহায্য বন্ধ হয় তবে সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের কম্যুনিষ্ট-বিরোধী সরকারের অস্তিত্ব অসম্ভব হয়ে পড়বে। আবার শূন্যহাতে যদি প্রেসিডেন্ট জনসন মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহার করে আনেন তবে হয়ত শুধু ঐ ব্যর্থতার জন্যই আসন্ন নির্বাচনে ডিমক্রাটিক দলের পরাজয় হবে। সুতরাং নভেম্বর মাসে নির্বাচন হওয়ার আগেই মার্কিন সরকার হয়ত দক্ষিণ ভিয়েৎনামে একটা বড় রকমের কিছু তৎপরতা দেখাবেন। কিন্তু ঐ তৎপরতার ফল সুদূরপ্রসারী হ'তে পারে। কম্যুনিষ্ট চীন বা উত্তর ভিয়েৎনাম কখনও যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক তৎপরতা মুখ বুঁজে মেনে নেবে না। সুতরাং অনতিবিলম্বে দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় একটা বড় রকমের অশান্তি দেখা দিতে পারে।

রুমানিয়া :

রুমানিয়ার সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের সম্পর্ক ক্রমেই তিক্ত হয়ে উঠছে। চীন-সোভিয়েট বিরোধের সুযোগ নিয়ে রুমানিয়া সম্পূর্ণরূপে সোভিয়েট-নির্ভরতা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চায় বলে মনে হয়। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে রুমানিয়ার প্রধানমন্ত্রী [illegible] সোভিয়েট নেতাদের সঙ্গে আলোচনার উদ্দেশ্যে [illegible] যান সেই সময়েই চীনের সঙ্গে রুমানিয়ার বৈজ্ঞানিক [illegible] কারিগরি সহযোগিতা বিনিময়ের এক চুক্তি সম্পাদিত হয়। সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে যা বিনিময় [illegible] জার্মানী, চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, যুগোস্লাভিয়া প্রভৃতি কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলি চীনের সঙ্গে ক্রমে ক্রমে সম্পর্ক গুটিয়ে আনলেও রুমানিয়ার সঙ্গে চীনের আদান-প্রদান ক্রমেই বাড়ছে। রুমানিয়ার তৈল সম্পদের প্রতি চীনের আকর্ষণ স্বাভাবিক এবং রুমানিয়াও এই সুযোগে চীনে তার শিল্পজাত পণ্যের বাজার-বিস্তৃত করতে চায়। শুধু তাই নয়, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি [illegible] রুমানিয়ার আলাপ-আলোচনা শুরু হয়েছে, [illegible] সোভিয়েট ইউনিয়নকে উপেক্ষা করেই রুমানিয়া [illegible] দেশগুলির সঙ্গে স্বতন্ত্র সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায়।

রুমানিয়ার মনোভাব ও কার্যকলাপ দেখে [illegible] যে, সে এ বিষয়ে সুনিশ্চিত যে, ১৯৫৬ সালের হাঙ্গেরীর [illegible] আর পুনরাবৃত্তি হবে না। সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে তার সম্পর্ক যতই খারাপ হোক না কেন, হাঙ্গেরীর উপর সেদিন সোভিয়েট বাহিনী যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, রুমানিয়াকে সেভাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন দমন করতে পারবে না। সোভিয়েট নেতা ক্রুশ্চেভের সেদিনের মত ও পথের সঙ্গে আজকের চিন্তাধারার অনেক পার্থক্য, বিশ্বরাজনীতির গতি-প্রকৃতিও এখন সম্পূর্ণ ভিন্ন।

সংবাদে প্রকাশ, রুমানিয়া হয়ত অনতিবিলম্বে বেসারাবিয়া প্রত্যর্পণের দাবি জানাতে পারে। [illegible] যুদ্ধের পূর্বে ১৭,১৪৬ বর্গ মাইল আয়তনের ঐ অঞ্চল রুমানিয়ারই ছিল এবং তার অধিবাসী [illegible] জাতেই রুমানিয়ান। ১৯৪৫ সালে রেড আর্মী [illegible] অধিকার থেকে রুমানিয়াকে মুক্ত করার সময় ঐ [illegible] এলাকাটি সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত করে নেয়।

রক্তের অক্ষরে—শ্রীমতী কমলা দাশগুপ্ত, নাভানা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলিকাতা। মূল্য ৩৷৷০ টাকা। পৃষ্ঠা ২০০।

লেখিকা বহু নির্য্যাতন ও কষ্ট স্বীকার করে রাজবন্দীর অভিজ্ঞতা নিয়ে এই বইখানি লিখেছেন। বইখানির অর্দ্ধেক ছাপা হয়েছে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শিক্ষা ও সঙ্গীদের নিয়ে; বিখ্যাত বীণা দাস (ভৌমিক), কল্যাণী গুপ্ত ও শান্তি দাস প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর গভীর পরিচয়। অনেককে সেসব দিনের কথা—লাট সাহেবকে 'কনভোকেসন হল'-এ গুলী করার কথাও ভাবাবে। তারপর লেখিকা বাকি একশ' পাতায় জেলে বন্দিনীদের অবস্থা গভীর সহানুভূতি দিয়ে চিত্রিত করেছেন। পড়ে ও তাঁর পরামর্শাদি শুনে বিশেষ উপকৃত হয়েছি প্রবীণ ঐতিহাসিক ডাঃ ভূপেন দত্ত (বিবেকানন্দ অনুজ) এই বইখানির ভূমিকা লিখে তাঁর উপযুক্ত কাজই করেছেন। এ বই প্রত্যেক নরনারীর পড়া উচিত। বিপ্লবযুগের ইতিহাস না হ'লেও, তার মর্মকথা ও দেশবাসীর কর্তব্য সম্বন্ধে কমলা দেবী যা কিছু বলেছেন তা সবাই অনুমোদন করবেন। আনন্দমঠের শান্তি ও দেবীচৌধুরাণীর যুগ থেকে বঙ্কিমচন্দ্র নারীর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ও শক্তি বিকাশের কথা বলে এসেছেন। এক্ষেত্রে তাঁকে সত্যি 'ঋষি' বঙ্কিম বলতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্র ও সেকালের ডেপুটি হয়েও বঙ্কিমচন্দ্র কেমন করে উপন্যাসে এসব কথা লিখেছেন, ভাবলেও বিস্ময় ও শ্রদ্ধা জাগে। পরের যুগের নারী—স্কুল-কলেজের ছাত্রীরাও স্বাধীনতার আকর্ষণে এগিয়ে আসবেন যেন সেই আশা নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র লিখে গেছেন। এইসব বীর-নারীরা—মাইকেলের বীরাঙ্গনা না হ'লেও, বীরত্বের যথার্থ পরিচয় দিয়েছেন, সেটি স্বীকার করবেন যাঁরা কমলা দাশগুপ্তের 'রক্তের অক্ষরে' বইখানি পড়বেন। তাঁর মা ও বাবা স্বর্গ থেকে কন্যাকে আশীর্বাদ করছেন এবং আমরাও আন্তরিক শ্রদ্ধা জানালাম।

বইখানির ছাপা ও বাঁধান সুন্দর। তাই আশা করি 'প্রাইজ বুক' রূপে এই বইখানি সাদরে গৃহীত হবে। "যেসব বাবা-মাকে পরাধীন ভারতের বিপ্লবী ছেলে-মেয়েরা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের আগুনে ঝলসে দিয়েছিলেন তাঁদের সকলকে স্মরণ ক'রে" এই বইখানি উৎসর্গ করেছেন। লেখিকার উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে। তাঁর সাধুবাদ করি।

শ্রীকালিদাস নাগ

শাশ্বত ভারত : দেবতার কথা—শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী প্রণীত; এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২; পৃঃ ১০+১৫০; মূল্য পাঁচ টাকা।

গ্রন্থকার ভারতবর্ষের তীর্থকাহিনী ও তৎপ্রসঙ্গে এ দেশের সাংস্কৃতিক লোকশ্রুতির বিবরণ বাংলা ভাষায় আলোচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। বর্তমান গ্রন্থে তিনি সর্বসমেত আঠাশটি অধ্যায়ে বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রধান দেবতাদিগের উপাখ্যান পরিবেশন করিয়াছেন। আবহমান কাল প্রতিটি নিষ্ঠাবান হিন্দু এই সকল দেবতার অর্চনা করিয়া আসিতেছেন ইঁহাদিগের কাহিনী ও কিংবদন্তী হিন্দুর কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। প্রাচীন ভারতবর্ষের দর্শনে সাহিত্যে শিল্পকলায় হিন্দুর সেই দেবনিষ্ঠ মানসিকতার ছাপ সুস্পষ্ট। এই সকল বিবেচনা করিয়া বলিতে হয় গ্রন্থখানির 'শাশ্বত ভারত' নামকরণ অনুপযুক্ত হয় নাই। গ্রন্থকারের আলোচনা নীরস তত্ত্বব্যাখ্যা-মাত্র নহে। হরিদ্বারের নিকট গঙ্গাতীরে অবস্থিত এক আশ্রমে আশ্রমগুরুর মুখে তিনি দেবতত্ত্বের যে ধারাবাহিক বিবরণ শুনিয়াছিলেন, গ্রন্থমধ্যে নিজস্ব ভাষায় তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার রচনাশৈলী প্রাঞ্জল ও সুখপাঠ্য। ফলে এই গ্রন্থপাঠে ব্রহ্মা, দশাবতার সমেত বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, ইন্দ্র, সূর্য, অগ্নি, চন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদিগের প্রকৃতি ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে পাঠকের মনে প্রাথমিক ধারণা জন্মিবে। গ্রন্থকারের লেখনী-নৈপুণ্যে আশ্রমের আভ্যন্তরীণ চিত্র ও বিভিন্ন আশ্রমবাসীর চরিত্রও ভালই ফুটিয়াছে, তবে খুশি-চেনেলু প্রসঙ্গটি লইয়া এতটা বাড়াবাড়ি আধ্যাত্মিক
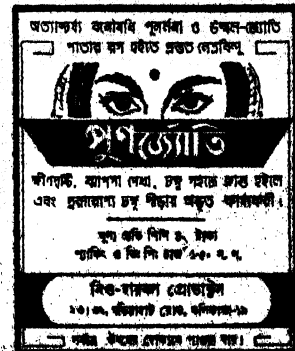
[ম]ল্লিকেশের মতো সামঞ্জস্যহীন মনে হইল। গ্রন্থকার ১৩৭ পৃষ্ঠায় [ল]িখিয়াছেন—যমের কীটাক্রান্ত পদক্ষত আরোগ্যহেতু তাঁহার পিতা সূর্য [ত]াহাকে একটি 'কুকুর' দিয়াছিলেন। আমরা কোনও কোনও পুরাণে [প]ড়িয়াছি সূর্য এই উপলক্ষে যমকে যাহা দিয়াছিলেন তাহা একটি [ক]ৃকবাকু' বা 'কুক্কুট'। গ্রন্থকার মূল গ্রন্থের উল্লেখ করিলে ভাল [ক]রিতেন। গ্রন্থের ছাপা বাঁধাই ভাল। তথাপি মূল্য পাঁচ টাকা [ক]িঞ্চিৎ বেশী মনে হইল। চিত্র ও নক্সাগুলি সুমুদ্রিত।

দিলীপকুমার বিশ্বাস

ভক্তকবি মধুসূদন রাও ও উৎকলে নবযুগ :—
শ্রীঅবন্তী দেবী। শ্রীঅমরনাথ ভট্টাচার্য প্রকাশিত এবং 'জিজ্ঞাসা', [১]৩ রাসবিহারী অ্যাভেনিউ, কলিকাতা-২৯ কর্তৃক পরিবেশিত। [মূ]ল্য ছয় টাকা।

এই জীবনী-গ্রন্থের ভূমিকায় প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় [ব]লিয়াছেন—"মধুসূদন বলতে বাংলা দেশে যেমন একজনকেই বোঝায় [উ]ড়িষ্যায় তেমনি দু'জনকে। তাঁদের কেউ কারো চেয়ে কম প্রসিদ্ধ নন। [দু]'জনেই অমর। যিনি রাজনীতিক্ষেত্রে অমর, তাঁকে বাংলা দেশের লোক চেনে। মধুসূদন দাস ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষক। আর সাহিত্যে অমর যিনি (মধুসূদন রাও) তাঁর 'কবিপ্রাণে দেবাবতরণ' এককালে অনূদিত হয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'সাধনার' কবিকণ্ঠের মালা পেয়েছিল।"—কিন্তু এ-সব কথা বর্তমানে বাঙলা দেশে কয়জন জানেন বলিতে পারি না। কিন্তু তাঁহার রাজ্যের (উড়িষ্যা) লোক তাঁহাকে ভক্তকবি মধুসূদন বলিয়া নিত্য স্মরণ করিতেছে।

মধুসূদনের দ্বিতীয় কন্যা এবং পুণ্যশ্লোক আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী-মহাশয়ের পুত্রবধূ পরম শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা অবন্তী দেবী ভক্তকবির পুত জীবন-কথা অপরিমেয় শ্রদ্ধা এবং অসম্ভব কষ্ট স্বীকার করিয়া, তাঁহার ৮২ বৎসর বয়সে, পিতার প্রতি, উড়িষ্যা এবং বাঙলা দেশের প্রতি—কর্তব্য পালন করিয়াছেন। উৎকল সমাজের সঙ্গে লেখিকার পরিচয় গভীর এবং এই কারণেই মধুসূদনের আমলে উৎকল সমাজের একটি জ্ঞাতব্য এবং সুখপাঠ্য চিত্র এই গ্রন্থে পরিস্ফুট হইয়াছে।

উড়িষ্যার ইতিহাস খুব বেশি সংখ্যক বাঙালীর নিকট সুবিদিত নহে, যদিও আমরা প্রতিবেশি। অধ্যাপক শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে উড়িষ্যার ঐতিহাসিক পটভূমিকা লিখিয়াছেন। এই

[illegible] উপাদেয় এবং বাঙ্গালী পাঠককে উড়িষ্যার সম্পর্কে একটি [illegible]পূর্ণ পরিচিতি দিবে বলিয়া মনে করি।

এই ছোট্ট পুস্তকটি পাঠ করিয়া কেহ হতাশ হইবেন না বিশেষ করিয়া, যাঁহারা সেইসব মানুষের জীবন কথা পাঠ করিতে আগ্রহী, যাঁহারা মৃত্যুর পরেও নিজেদের কীর্তিতে জীবিত থাকেন। বহু সাধনার দ্বারা অর্জিত কীর্তির মাধ্যমে তাঁহারা অমরত্ব অর্জন করেন। পুস্তকটির বিশেষ-বিশেষত্ব এই যে—ইহাতে মধুসূদনের সমকালীন বহুজ্ঞাত মহৎ ব্যক্তির সম্পর্কে বহু তথ্য এবং সাধারণ্যে অজ্ঞাত কথা পরিবেশিত হইয়াছে ভক্তি এবং নিষ্ঠার সঙ্গে।

পুস্তকখানির মুদ্রণ, বাঁধাই এবং অন্যান্য সব কিছুই খুবই সুন্দর।

হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

মোহিতলালের কাব্য পরিক্রমা—দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য চার টাকা।

রবীন্দ্র-প্রভাব মুক্ত কবিদের মধ্যে মোহিতলালের নাম অগ্রগণ্য। তাঁর সমগ্র কাব্য-গ্রন্থের বিশ্লেষণ করিয়া গ্রন্থকার মোহিতলালকেই—চিনাইয়া দিয়াছেন। তাঁর চরিত্রের একটা দিক খুবই বলিষ্ঠ—তিনি স্বতন্ত্র-ধর্মী। রবীন্দ্রানুকরণের ব্যাপক প্রয়াস বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও ছিল। মোহিতলালের মধ্যেও ছিল, কিন্তু তাকে কাটিয়ে উঠতে তাঁর বেশি সময় লাগে নাই। 'কল্লোল'-এর যুগেই তাঁর এ পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়াছে। 'কাব্যবস্তু যেখানে কবির স্বতন্ত্র অনুভূতি-স্পর্শহীন, কবিতার কলাবিধি যেখানে ধার করা সেখানে প্রথম শ্রেণীর কবিতা প্রত্যাশা করা যায় না।'

গ্রন্থকারের এই কয়টি কথা হইতেই মোহিত-চরিত্রের বলিষ্ঠতা লক্ষ্য করা যায়। মোহিতলাল কবি হইয়াও খুব বেশি কাব্য রচনা করেন নাই। তাঁর কয়খানি কাব্য সংগ্রহ আমরা দেখিতে পাই। স্বপন পসারী, বিস্মরণী, স্মর-গরল, হেমন্ত-গোধূলি, ছন্দ-চতুর্দ্দশী ও দেবেন্দ্র মঙ্গল।

গ্রন্থকার বলিয়াছেন—"মোহিতলালের কবি-মনের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল গ্রহিষ্ণুতা ও গতিশীলতা। প্রথম জীবনে দেবেন্দ্রনাথের কাব্যের তন্ময় সৌন্দর্য্যপ্রীতি, রবীন্দ্রকাব্যের স্বপ্ন ভাবমণ্ডল এবং সত্যেন্দ্রের কাব্যের কলাবিধি তাঁর কবি-কল্পনাকে আক্রান্ত করে। কিছুকাল পরে নজরুল-কাব্যের শব্দচয়নের ইন্দ্রজাল, দুর্দম আবেগ এবং দুঃসাহসিক প্রীতি তাঁর কবিচিত্তকে উত্তেজিত করে। এ বিদ্রোহী কবির মানস-সান্নিধ্যে এসে মোহিতলাল কিয়ৎ পরিমাণে বিদ্রোহী হয়েছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু মোহিতলালের বিদ্রোহ-চেতনা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। নজরুলের কবি-মন মুখ্যতঃ আবেগপ্রধান আর মোহিতলালের কবি-মন আবেগ ও মনন মিশ্রিত। মানবতার শত্রু, স্বাধীনতার শত্রু—মানুষের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে যে শক্তিই খর্ব করতে উদ্যত—সে শক্তির বিরুদ্ধেই নজরুলের বিদ্রোহ। এমন কি সর্বশক্তিমান যে ভগবান মানুষের ওপর মানুষের এ দুর্বিষহ অবিচার নীরবে সহ্য করেন—সে ভগবানের বিরুদ্ধেও নজরুল বিদ্রোহী। নজরুল যুগ-সচেতন কবি; প্রথম যুদ্ধোত্তর ভাব বিক্ষুব্ধ যুগে বাস করলেও সে যুগ-চেতনার স্পর্শ মোহিতলালের মনকে তেমন জাগ্রত করে নি।"

তবে কিছুটা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, আমরা এই কবিতাতেই দেখিতে পাই—

"কোথায় পিনাক ডমরু কোথায়? কোথায় চক্রসুদর্শন?
মানুষের কাছে বরাভয় মাগে মন্দিরবাসী অমরগণ!

নাই ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছ যবন, নাই ভগবান—ভক্ত নাই
যুগে যুগে শুধু মানুষ আছে রে মানুষের বুকে রক্ত চাই!"

কিন্তু মোহিতলালের কাব্য-প্রতিভার পূর্ণ জাগরণ দেখিতে পাই তাঁহার 'বিস্মরণী' কাব্যে।

"নিঃসঙ্গ হিমাদ্রি চূড়ে জ্বলিয়াছে হর-কোপানল
মদন হয়েছে ভস্ম রতি কাঁদে গুমরি গুমরি!
উমা সে গিয়েছে ফিরে, অশ্রু চোখে ম্লান ছল-ছল—
ফুলগুলো ফেলে গেছে ঈশানের আসন উপরি;
আঁখিতে আঁকিয়া গেছে অধরোষ্ঠ পক্ক বিম্বফল!
শ্মশানে পলায় যোগী তারি ভয়ে ধ্যান পরিহরি—
বধূর দুকূলে তবু বাঘছাল বাঁধা প'ল—আহা মরি' মরি!
চমৎকার কল্পনা।

কাব্যক্ষেত্রে মোহিতলালের যেমন স্তরভেদ লক্ষ্য করা যায়, তাঁহার জীবনেও সেই স্তর পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রথম যুগের কবি মধ্যযুগে আসিয়া একটা আবেগময় গতিলাভ করিলেন, কিন্তু পরবর্তী যুগে তা অনেকটা স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে। ইহার কারণও আছে, পরবর্তীকালে তিনি তখন সমালোচক হইয়া পড়িয়াছেন। সমালোচক মন কবির আনন্দলোককে ব্যাহত করে। তাই ক্রমিক মোহিতলালের সৃষ্টি এইখান হইতেই থামিয়া যায়।

তথাপি মোহিতলাল মোহিতলাল। অসাধারণ তাঁহার সংযম, অসামান্য তাঁর ভাবানুভব। এই সংযমই তাঁর জীবনকে বিভ্রান্ত হইতে দেয় নাই—যখনই প্রয়োজন হইয়াছে, তিনি রাশ টানিয়াছেন। 'মোহিতলালের কাব্য পরিক্রমা' তাই মনে হয় মোহিতলালেরই জীবন-আলেখ্য। এই সুন্দর বইখানির সমাদর হইলে দেখিলে সুখী হইব।

শ্রীগৌতম সেন

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—[illegible], প্রবাসী প্রেস [illegible]
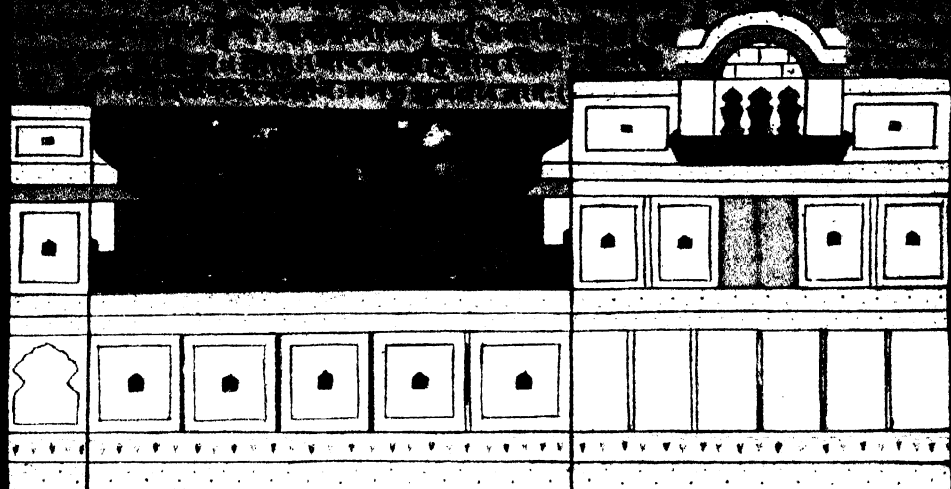
"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৪শ ভাগ
১ম খণ্ড

ষষ্ঠ সংখ্যা
আশ্বিন, ১৩৭১

াদ্যসঙ্কট ও অনাস্থাপ্রস্তাব

দেশব্যাপী খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির ঢেউ চলিয়াছে এবং সেইসঙ্গে দেশের সকল অঞ্চলের রাষ্ট্রনৈতিক মহলে একটা চাঞ্চল্য
থা দিয়াছে। ইতিমধ্যে ঐ চাঞ্চল্যের বাহিঃপ্রকাশরূপে কয়টি রাজ্যে রাজ্য মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপিত
বিতর্কের পর প্রস্তাবের ফলাফল ভোটে নিরূপিত হইয়া গিয়াছে। লিখিবার সময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায়, খাদ্যসঙ্কট
তর্কের পর, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার উপর অনাস্থা প্রস্তাবের আলোচনা চলিতেছে। এবং অন্যদিকে কেরল ভিন্ন অন্য সকল
জ্যে অনাস্থা প্রস্তাব বিফল হয়। কেরলে কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে ১৫ জন বিরোধীপক্ষে যোগ দেওয়ায় অনাস্থা প্রস্তাব
১ বনাম ৫০ ভোটে গৃহীত ও মন্ত্রীসভার পতন হইয়াছে। বলা বাহুল্য ঐ ১৫ জন কংগ্রেস হইতে (ছয় বৎসরের জন্য)
তাড়িত হইয়াছেন।

কেরল অবশ্য ভারতের মধ্যে একটি অপরূপ প্রদেশ। অনেক বিষয়েই অন্য সকল প্রদেশ হইতে ইহার প্রভেদ
াছে। স্বাধীনতা লাভের পর এই বোধ হয় ৭ম মন্ত্রীসভার পরিবর্তন বা পতন ঘটিল। ইহার মধ্যে দুইবার এই রাজ্যের
সনতন্ত্র প্রেসিডেণ্ট স্বহস্তে লইয়াছিলেন। এইবার তৃতীয় দফায় প্রেসিডেণ্টের শাসন ঐখানে প্রবর্তিত হইবে। কেননা
রোধী পক্ষের কেহই বিকল্প মন্ত্রীসভা গঠনের সামর্থ্য বা ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই। পূর্বের মন্ত্রীসভাগুলির মধ্যে একটি

ছিল কম্যুনিষ্ট ও তথাকথিত নির্দলীয় সদস্য লইয়া সংযুক্তভাবে গঠিত। ঐ মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী "সংগ্রাম" অভিযান চলে ও সারা দেশে অরাজক অবস্থার উৎপত্তি হওয়ায় রাজ্যপাল জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিয়া মন্ত্রীসভাকে আসনচ্যুত ও বিধানসভা ভঙ্গ করিয়া নূতন নির্ব্বাচনের আদেশ দেন। নূতন নির্ব্বাচনের পর কংগ্রেস প্রথমবার সংখ্যা-গরিষ্ঠ হওয়ার কাছাকাছি যায় ও নির্দলীয় সদস্যদের সমর্থনে শাসনতন্ত্র গ্রহণ করে। কিন্তু কংগ্রেসীদলের ভিতরেও উপদল ছিল এবং সেইরূপ এক উপদলের নেতা শ্রীচাকো মন্ত্রীসভা হইতে অপসৃত হওয়ার ফলে তাঁহার দলের ১৫ জন বিরোধী পক্ষে যোগদান করেন। ইহাও এখানে বলা প্রয়োজন যে, এই ১৭ বৎসরের স্বাধীন মন্ত্রীত্বের মধ্যে কোনও দল কোনও বারের নির্ব্বাচনে বিধানসভায় একাধিপত্য—অর্থাৎ নিশ্চিন্তরূপে সংখ্যাগরিষ্ঠতার আসন-লাভ করিতে পারে নাই, সুতরাং প্রত্যেক বারেই প্রত্যেক মন্ত্রীসভাকেই অন্যদলের বা নির্দলীয় সদস্যদের সমর্থনের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। কংগ্রেসী দলের মধ্যে ঐ ১৫ জন বিদ্রোহীকে বহিষ্কার করার ফলে কেরলের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে এই উদ্ভট অবস্থা আরও বৃদ্ধি পাইবে। রাজনৈতিক দলাদলি ছাড়াও কেরলের অন্য বৈশিষ্ট্য আছে। যে কয়টি প্রধান রাজ্য এই দেশে আছে তার মধ্যে মনুষ্যবসতি কেরলে সর্ব্বাপেক্ষা ঘন, যথা প্রতি বর্গমাইলে ১১২৭ জন। পুরুষের অনুপাতে এখানে স্ত্রীলোকের সংখ্যাও সর্ব্বাধিক, যথা ১০০০ পুরুষে ১০২২ স্ত্রীলোক। অবশ্য ক্ষুদ্র উপরাজ্যগুলিতে, যথা পণ্ডিচেরী এবং গোয়া, দমন, দিউতে ও মণিপুরে ইহার কাছাকাছি স্ত্রী-পুরুষ অনুপাত আছে। লেখাপড়া জানা—অর্থাৎ লিটারেট লোকও এই রাজ্যে সর্ব্বাধিক—শতকরা ৪৬·২। এই রাজ্যের লোকজনের মধ্যে প্রাচীনকালে প্রতিষ্ঠিত খ্রীষ্টান-সমাজ আছে যাহার অস্তিত্বের আরম্ভ পশ্চিম ইউরোপের খ্রীষ্টান-সমাজের পূর্ব্বেই হয়। এবং ভারতের মধ্যে এই রাজ্যেই খ্রীষ্টান-সমাজ রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে প্রভাবশালী। এই রাজ্যে পুরাণো, আরব-নাবিক প্রতিষ্ঠিত, মুসলমান সমাজও আছে। এহেন দেশে মন্ত্রীত্বের স্থায়িত্ব অনিশ্চিত হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু তবুও এইবারে কংগ্রেসী দলের ঐ ১৫ জনে এইপ্রকার অন্তর্ঘাতী কাজ করিয়া যে-দৃষ্টান্ত রাখিয়া গেল তাহা কেরলের পক্ষেও আশ্চর্য্য বলিতে হয়। এবং এই কেরলের মন্ত্রীসভার উপর অনাস্থা প্রস্তাবের মূলে খাদ্যসঙ্কট বা খাদ্যসমস্যা সম্পর্কে ঐ মন্ত্রীসভার কর্ত্তব্যে ত্রুটি বিচ্যুতিজনিত অবিশ্বাস যে কার্য্যকরী হইয়াছিল তাহার কোনও প্রমাণ ঐ প্রস্তাবের বিতর্কের মধ্যে পাওয়া যায় নাই। যাহা পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় তাহাতে বুঝা গিয়াছিল যে, কেরলে কংগ্রেসী দলে এরূপ লোকও ছিল, যাহারা প্রতিহিংসার জন্য সমস্ত দলের সর্ব্বনাশ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করে নাই।

সত্য সত্যই এই যে দেশব্যাপী খাদ্যসঙ্কট লইয়া প্রাদেশিক বিধানমণ্ডলীগুলিতে বিতর্ক চলিতেছে এবং সেই সঙ্গে মন্ত্রীসভাগুলির উপরও অনাস্থা প্রস্তাব আসিতেছে, ইহাতে যদি কোনও কিছু সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে তবে তাহা এই যে, এদেশের বিধানমণ্ডলীর বা সংসদের বিরোধী-পক্ষগুলিতে এরূপ কেহ নাই যিনি বা যাঁহারা খাদ্যসমস্যা বা মূল্যবৃদ্ধি সমস্যা সমাধান বিষয়ে কোনও সুচিন্তিত কার্য্যপন্থা নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ বা জনসাধারণের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই নিদারুণ অবস্থাকে আয়ত্তে আনার কোনও উপায় উদ্ভাবনে সক্ষম। তর্কের ধারা সমীক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, দলগত, গোষ্ঠীগত বা নিজস্ব ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্যই ইঁহারা আগ্রহান্বিত এবং সেই স্বার্থের গণ্ডির বাহিরে ইঁহারা চিন্তা করিতেও অক্ষম।

কংগ্রেসী দলগুলির মধ্যেও চিন্তাশীল লোকের, এমন কি জনস্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন লোকেরও নিতান্তই অভাব দেখা যায়। অবশ্য বিগত দুইটি নির্ব্বাচনে কংগ্রেসী দলপতিগণ তাঁহাদের দলের মধ্যে যাহাতে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বা স্বাধীন চিন্তায় সক্ষম লোক ঢুকিতে না পায় সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য অবশ্য ছিল যে দলপতির আসনে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি যাহাতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী থাকিতে পারেন, এবং সেই কারণে দুই-চারিজন আজ্ঞাবহ বাক্যবাগীশ ও দুই-একটি শোভাবর্দ্ধক সজ্জন ভিন্ন বাকী যাঁহারা দলপতিদের মনোনয়ন পাইয়া নির্ব্বাচনে সফলকাম হইয়াছেন তাঁহারা শুধুমাত্র দলের পদাতিক—এবং "ঘাস-বিচালি" শ্রেণীর পদাতিক। সুতরাং এই দেশব্যাপী খাদ্যসমস্যাজনিত বিতর্কে ইঁহাদেরও শ্রীমুখ-নিসৃত বাণীর মধ্যে কোনও "পদার্থ" আমরা খুঁজিয়া পাই নাই, যদিও খাদ্য বিতর্কে প্রত্যেক সদস্যকেই বোধ হয় স্বাধীন মত প্রকাশের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। ফলে বিতর্কের মধ্যে দুইদিকের সাধারণ সদস্যদের কথাবার্ত্তা সবাকচিত্রের "নেপথ্য সঙ্গীত"-জাতীয় "পশ্চাদ্‌ভূমিগত শব্দের" পর্য্যায়েই পড়ে। শুধুমাত্র মন্ত্রীগণের ভাষণ, মন্তব্য ইত্যাদিই সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়। উদাহরণ স্বরূপে সম্প্রতি লোকসভায় যে খাদ্য বিতর্ক হয় তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

লোকসভায় খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে যে চারদিন ব্যাপী বিতর্ক চলে তাহার আরম্ভে খাদ্যমন্ত্রী কোনও ভাষণ দেন নাই। তিনি খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে সরকারী পর্য্যালোচনা ও তাহার উন্নতিকল্পে প্রস্তাবিত ব্যবস্থা ও কার্য্যপন্থা ইত্যাদির

বিবরণযুক্ত এক নোট সদস্যদের মধ্যে প্রচারিত করেন। বিতর্ক ঐ নোটকে ভিত্তি করিয়াই আরম্ভ হয়। সুতরাং বিতর্কের বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ না হইলেও বিশদ পরিচয় সকল সদস্যেরই জানা ছিল। ইহা ছাড়া এই খাদ্য পরিস্থিতি দেশব্যাপী উদ্বেগ ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে, সুতরাং দেশবাসীর মুখপাত্ররূপে যাঁহারা সংসদে বিরাজ করিতেছেন তাঁহাদের এ বিষয়ে সূক্ষ্ম ভাবে বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ দ্বারা চিন্তা করার কারণও যথেষ্ট রহিয়াছে, সে মুখপাত্র যে কোনও দলের বা মতের সমর্থকই হউন না কেন। কার্য্যতঃ সেই সমীক্ষা বা চিন্তার কি পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হইল।

বিতর্কের সূচনা করেন কম্যুনিষ্ট নেতা অধ্যাপক হীরেন মুখার্জি। ইনি বলেন যে, সরকার মজুতদার ও মুনাফাবাজদের আয়ত্তে আনার বিষয়ে "দুর্বলতা" দেখাইয়াছেন এবং প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীর বিনম্র ও বিবেচনাপূর্ণ মনোভাবের পূর্ণ সুযোগও ঐ মজুতদার ও মুনাফাবাজেরা লইয়াছে। উহাদের জন্য দৃঢ় হস্তের ব্যবস্থা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে তিনি খাদ্যশস্য ব্যবসায়কে অবিলম্বে ও বিনা অজুহাতে সরকারের হস্তগত করার কথাও বলেন। তিনি আরও বলেন যে, সরকারের খাদ্য-সমস্যা সমাধানে অক্ষমতা প্রকাশের দরুন জনসাধারণের ক্রোধ বাড়িয়াই চলিতেছে। এই ভাবে ক্রমে এমন একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে পারে যাহা আমাদের কাহারও কাম্য নয়, যদি না অচিরে সরকার এই সমস্যার নিরসন করেন। অধ্যাপক মুখার্জ্জী বলেন যে, এই বর্ত্তমান অবস্থা সম্পর্কে যে সরকার এতদিনেও ওয়াকিবহাল হইয়াছেন তাহা প্রচারিত সরকারী নোটে বুঝা যায় না। এখন মার্কিনী পাব্লিক-ল ৪৮০ অনুযায়ী খাদ্যশস্য আমদানী ছাড়া আর পথ নাই, কিন্তু বিদেশী শস্য আমদানীর উপর এরূপ অসহায় ভাবে নির্ভরশীল হওয়ার জন্য তিনি সরকারী কার্য্য-প্রকরণকে দোষ দিয়া বলেন যে, ঐ পি-এল ৪৮০ অনুযায়ী আমদানী বিষয়ে একটি শ'ক্তশালী আলোচনা প্রয়োজন। তিনি সরকারী পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে, এ বৎসর গত বৎসর অপেক্ষা ৪০ লক্ষ টন অধিক শস্যের ফলন হইয়াছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অভাব দেখা দিয়াছে। এই কৃত্রিম অভাব মজুতদারদিগের কারসাজিতেই হইয়াছে।

অধ্যাপক মুখার্জ্জীর মন্তব্যগুলি তীব্র ও তাঁহার দোষারোপও কঠোর ভাবেই করা হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতপক্ষে বিচার করিয়া দেখিলে তাঁহার ভাষণের মধ্যে এমন কিছু পাওয়া যায় না যাহাতে এই সমস্যা সমাধানের কোনও নির্দেশ আছে। মজুতদার ও মুনাফাবাজদিগের বিরুদ্ধে তীব্র দোষারোপ ইতিপূর্ব্বেই সরকারী পক্ষ হইতে—বিশেষে খাদ্যমন্ত্রী সুব্রহ্মণ্যমের মুখে বহুবার শোনা গিয়াছে। ঐ দুষ্কৃতিকারীদের কি ভাবে দমন করা প্রয়োজন ও তাহার জন্য দণ্ডনীতির কি সংশোধন প্রয়োজন, সে বিষয়ে তিনি একটি কথাও খুলিয়া বলেন নাই, যদিও তিনি ব্যবহারজীব। খাদ্যসমস্যা ও মূল্যবৃদ্ধি এই দুই বিষয়ে সরকারী প্রয়াস কেন নিষ্ফল হইতেছে ও তাহার প্রতিকার কোন্ পথে তাহার কোনও নির্দেশ এই বক্তৃতায় ছিল না। শুধু তাই নয়, ইঁহার পার্টি জনমত বিষয়ে কতটা অচেতন তাহাও তাঁহার ভাষণে বুঝা গিয়াছিল। মুনাফাবাজদিগের ও মজুতদারদিগের বিরুদ্ধে কোনও সম্যক্ ও প্রত্যক্ষ ভাবে পরিচালিত অভিযানের কথাও যদি তিনি বলিতেন তবে বুঝা যাইত যে এই জনবিক্ষোভের কথার পিছনে সত্য সত্যই জনস্বার্থের প্রেরণা আছে।

আবার স্বতন্ত্র দলের প্রধান মুখপাত্র শ্রীমাসানি বিপরীত দিক হইতে সরকারী খাদ্যনীতি ও খাদ্যসমস্যা সম্পর্কে সরকারী ব্যবস্থার উপর আক্রমণ চালাইয়াছিলেন। তাঁহার মতে বর্ত্তমান খাদ্য-পরিস্থিতির জন্য সরকারী মুদ্রাস্ফীতি বর্দ্ধকনীতিই প্রধানতঃ দায়ী। ব্যবসায়ী ও চাষীদের সম্পর্কে তিনি সাফাই গাহিয়া বলেন যে, অযথা তাহাদের বলির পাঁঠার অবস্থায় ফেলা হইতেছে। মুনাফাবাজী ও মজুতদারী ইঁহার মতে রোগের লক্ষণ-মাত্র, উহা আসল রোগ নহে। খাদ্যশস্য ব্যবসায়ে সরকারের প্রবেশে তাঁহার আপত্তি নাই, কিন্তু খাদ্যশস্য ব্যবসায়ে সরকারের একচেটিয়া অধিকারের তীব্র বিরোধিতা তাঁহার ভাষণে প্রকাশ পায়। অধ্যাপক মুখার্জ্জী ও শ্রীমাসানির দৃষ্টিকোণ যে শুধু বিপরীতই নয়, উপরন্তু পরস্পর বিরোধী তাহা এই খাদ্য বিতর্কে স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পায়। তবে শ্রীমাসানির ভাষণে সমস্যার মূল কারণ ধামাচাপা দেওয়ার যে অপরূপ চেষ্টা ছিল, তাহার অনুরূপ কিছু শ্রীমুখার্জ্জীর ভাষণে ছিল না। খাদ্যসমস্যা সমাধানের কোনও নির্দেশ দু'জনের বক্তৃতাতেই নাই।

দ্বিতীয় দিনের বিতর্কের বিষয়ে দুইটি মাত্র সংবাদ অনুধাবনযোগ্য ছিল। তার মধ্যে আশ্চর্য্যজনক সংবাদ এই যে, **"বিতর্কের অধিকাংশ সময়ে উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যা অল্প ছিল।"** দেশের জনসাধারণের প্রতিনিধিরূপে যাঁহারা দিল্লী কি লাড্ডু ভক্ষণে উদরপূর্ত্তি করিতেছেন তাঁহাদের অনেকেরই দেশসেবার ইহাই প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আমাদেরই দোষ, নাহলে এরূপ মুখপাত্র আমাদের জোটে কেন। দ্বিতীয় সংবাদ, প্রবীণ কংগ্রেস সদস্য শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ কংগ্রেস-সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, তাঁহারা মজুতদার ও মুনাফাবাজদিগের বিরুদ্ধে নরম মনোভাব অবলম্বন করিয়াছেন। তিনিও সরকারী খাদ্যনীতি নির্ম্মমভাবে প্রয়োগের জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু কি

করিলে ঐ নীতি কঠোর ও কার্যকরী হয় সে বিষয়ে তিনি কোনও নির্দেশ দেন নাই। অন্যান্য বক্তাদের মন্তব্য ইত্যাদিতে কোনও পদার্থ ছিল না।

তৃতীয় দিনের বিতর্কে জোর গলায় কটু মন্তব্য ও ফাঁকা আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই লক্ষণীয় ছিল না। শুধু একজন কংগ্রেস সদস্য পাঁচ লক্ষ বা ততোধিক লোকের বসতি যে-সব শহরে সেখানে অবিলম্বে বিধিবদ্ধ রেশনিং ব্যবস্থা করার প্রস্তাব করেন।

চতুর্থ দিনের বিতর্কের শেষে, কম্যুনিষ্ট সদস্যগণের ভোট গ্রহণে বাধা সৃষ্টির চেষ্টা ব্যর্থ ও তাঁহারা সভাকক্ষ ত্যাগ করার পর ২০১-৩৪ ভোটে সরকারী খাদ্যনীতি লোকসভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়। বিতর্কের উত্তরে খাদ্যমন্ত্রী শ্রী সি. সুব্রহ্মণ্যম্ বলেন যে, যেরূপ লাভজনক মূল্য পাইলে খাদ্যশস্য উৎপাদনে কৃষকগণ উৎসাহিত হইতে পারে, তাহারই ভিত্তিতে সরকারের কৃষিনীতি রচিত হইবে।

খাদ্যমন্ত্রী তাঁহার বক্তৃতায় প্রধানত সরকারের খাদ্যনীতি বুঝাইয়া বলেন। সরকার কর্তৃক খাদ্যশস্য ব্যবসায় কর্পোরেশন গঠন, কৃষকদের জন্য লাভজনক মূল্য ধার্য্য করা ও খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থার বিষয় তিনি বর্ণনা করেন। দেশে "কৃষি বিপ্লব" ঘটাইবার জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে বলিয়াও তিনি ঘোষণা করেন।

শ্রীসুব্রহ্মণ্যম্ বলেন যে, দেশে খাদ্য পরিস্থিতি "সহজ হইয়া আসিতে আরম্ভ করিতেছে।" কতকগুলি স্থানে প্রবল বন্যা সত্ত্বেও খারিফ ফসলের সম্ভাবনা খুবই ভাল এবং এই কারণে "পরিস্থিতির উন্নতি দেখা দিয়াছে।"

প্রধানত কম্যুনিষ্ট সদস্যদের বাধাদানের মধ্যে খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী জনগণের মধ্যে "আস্থাহীনতার ভাব" সৃষ্টি করিয়া দেশে খাদ্য-পরিস্থিতিকে দুরূহ করিয়া তোলার জন্য বিরোধী পক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন।

কম্যুনিষ্ট সদস্যদের আরও প্রতিবাদের মধ্যে শ্রীসুব্রহ্মণ্যম বলেন: "পরিস্থিতি যাহাতে কখনও স্বাভাবিক আকার ধারণ না করে, তাহাই যেন বিরোধী পক্ষের অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়।" "দুঃখের বিষয়" সরকার কম্যুনিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারেন না।

শ্রীসুব্রহ্মণ্যম্ বলেন, বিরোধী পক্ষ ইচ্ছায়ই হউক বা অনিচ্ছায়ই হউক, খাদ্যশস্যের মজুতদার ও ব্যবসায়ীদের "সহযোগী" হইয়াছেন। ব্যবসায়িগণ বড় বড় উৎপাদককে তাঁহাদের জন্য মজুত খাদ্যশস্য ধরিয়া রাখিতে সাহায্য করিয়াছেন এবং মজুত মালের বাজারে আসার ব্যাপারে বাধা দিয়া সঙ্কটজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়াছেন।

তিনি বলেন, যাঁহারা বলিয়াছেন যে, খাদ্যশস্য মজুত করা হয় নাই এবং সমস্ত খাদ্যশস্যই খোলা বাজারে আসিয়াছে, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা ও অন্ধ্র প্রদেশের পরিসংখ্যানগত তথ্য তাঁহাদের সে যুক্তি খণ্ডন করিবে।

তিনি বলেন: "যদি আমরা আমাদের নীতিতে এ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হইয়া থাকি, তাহার কারণ এই যে, আমরা সস্তা খাদ্যশস্যের নীতি গ্রহণ করিয়াছি, সে নীতির ফলে শহর ও শিল্প এলাকার লোকেদের যতই সুবিধা হউক না কেন, আমরা যতদিন এই নীতি আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিব ততদিন পর্য্যন্ত আমাদিগকে চিরাচরিত কৃষিপদ্ধতি চালাইয়া যাইতে হইবে এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার কোন পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হইবে না।"

তারপর, শুক্রবার ১১ই সেপ্টেম্বর, লোকসভায় কেন্দ্রীয় ভারত সরকারের বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাবের আলোচনা সুরু হয়। এই অনাস্থা প্রস্তাবকে অগ্রাধিকার দেওয়ার চেষ্টা খাদ্যসমস্যা সম্পর্কিত বিতর্কের পূর্ব্বেই করা হইয়াছিল এবং ঐ খাদ্য পরিস্থিতি বিতর্কের শেষে কম্যুনিষ্ট দলের সদস্যেরা ও একজন নির্দ্দলীয় সদস্য ঐ খাদ্যসমস্যাকে এই অনাস্থা প্রস্তাবের সঙ্গে জড়াইবার বৃথা চেষ্টা করেন।

অনাস্থা প্রস্তাবের উদ্বোধন করেন নির্দ্দলীয় সদস্য শ্রী এন. সি. চ্যাটার্জ্জি। তিনি তাঁহার ৩০ মিনিটকাল ব্যাপী বক্তৃতায় সরকারী কার্যনীতির তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁহার মতে সরকার বিভিন্নক্ষেত্রে অতি নিন্দনীয়ভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছেন। এই ব্যর্থতার তালিকা তাঁহার মতে এইরূপ:

(১) বিদেশী বেসরকারী মূলধনের উপর ক্রমবর্দ্ধমান নির্ভরতার জন্য সরকার জাতির অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্যরক্ষায় ব্যর্থ হইয়াছেন।

(২) বিদেশ হইতে আমদানী দ্রব্যের উপর সরকারের একান্তভাবে নির্ভরতা।

(৩) বেসরকারী মূলধন ও কালোবাজারীদের নিকট সরকারের আত্মসমর্পণ এবং ব্যাঙ্ক কর্তৃক খাদ্যশস্যের জন্য অগ্রিম দেওয়া বন্ধ করিতে না পারা।

(৪) দ্রব্যমূল্য স্থির রাখিতে ব্যর্থতা।

(৫) নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা রক্ষায় ব্যর্থতা।

(৬) নির্ব্বাচন ব্যাপারে পবিত্রতা রক্ষায় ব্যর্থতা।

(৭) আঞ্চলিক সংহতি রক্ষায় ব্যর্থতা।

ইহা ভিন্ন তিনি বলেন যে, সরকারী দুর্নীতি বিরোধী অভিযানের লক্ষ্য দাঁড়াইয়াছে কেরাণী ও পিয়ন শ্রেণীর লোক। বড়দের রেহাই দেওয়া হইতেছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অভিযান দুর্ব্বল হইয়াছে মনে হয়। কংগ্রেস সভাপতি এবং সরকার তাঁহার সদাচার সমিতিকে অস্বীকার করিয়াছেন। সরকার এই বিষয়ে কতটা গুরুত্ব দিতেছেন তাহা ইহা হইতেই বুঝা যায়। প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণ মন্ত্রী পরিষদের সততার উপর আস্থা হারাইয়াছে।

তিনি কাশ্মীর সম্পর্কে অত্যন্ত আবেগপূর্ণ বক্তৃতা দিয়াছেন। সেখানের দুর্নীতিপরায়ণ মন্ত্রীসভাকে কোটি কোটি টাকা অপচয় করিতে দেওয়া হইয়াছে। এবং কাশ্মীর সম্পর্কে সরকারের দ্বিধাগ্রস্ত নীতিকে নিন্দাবাদ করিয়া তিনি প্রধান মন্ত্রীকে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিতে বলেন কাশ্মীর কোন মতেই ত্যাগ করা হইবে না। ইহা ভিন্ন তিনি উদ্বাস্তু ব্যবস্থা, এবং চীনা আক্রমণের পরে জনসাধারণ নিজেদের অধিকার হ্রাস করিয়া সরকারকে যে ক্ষমতা দিয়াছিল তাহার সরকারী অপব্যবহারের তীব্র সমালোচনা করেন। বস্তুতঃপক্ষে শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চ্যাটার্জ্জির বক্তৃতায় সরকারী নীতি ও ব্যবস্থার যে ব্যর্থতা প্রদর্শিত হয় তাহাতে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে তাঁহার অভিযোগ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম দিনে কংগ্রেস সদস্য শ্রী কে, হনুমন্তিয়া অতি আংশিক ভাবে তাহা খণ্ডন করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় দিনের বিতর্কে লোকসভায় কাশ্মীর বিষয়ে শেখ আবদুল্লা এবং শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের মতামত প্রচার সম্পর্কে যাঁহারা সন্দিহান তাঁহাদের ও সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের তীব্র সমালোচনা করেন শ্রীফ্রাঙ্ক এণ্টনী। তিনি যদিও সরকারের কোন নীতিরই সমর্থন করেন না বলেন, তবুও তিনি এই অনাস্থা প্রস্তাবকে "রাজনৈতিক চালবাজী" বলিয়া নিন্দা করেন ও বলেন যে দেশের রাজনৈতিক স্থায়িত্ব দৃঢ় রাখার জন্য কংগ্রেসের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা প্রয়োজন।

আচার্য কৃপালনীর বক্তৃতায় ফাঁকা আওয়াজই ছিল বেশী। তাঁহার "সম্মুখ আক্রমণ" ব্যাপক ছিল কিন্তু তার মধ্যে কোনও অভিযোগই তথ্য সমন্বিত ও সমর্থিত ছিল না। বিগত বৎসরের লোকসভায় আনীত অনাস্থা প্রস্তাবে তাঁহার উদ্বোধনী বক্তৃতা ঠিক এই মতই ধারবিহীন ও ভারশূন্য ছিল। অথচ তাঁহার নিক্ষিপ্ত অভিযোগগুলির প্রায় সবকটিই গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত ছিল। তাঁহার চিন্তাধারাও অনেক স্থলে অসংলগ্ন ও বিক্ষিপ্ত ছিল মনে হয়। তিনি সরকারের উপর "মনের ঝাল" ঝাড়িয়া শেষ পর্য্যন্ত বলেন যে, তিনি এই অনাস্থা প্রস্তাবের সঙ্গে যুক্ত থাকিবেন না। যুক্ত না থাকায় কারণও তিনি অদ্ভুত ভাবে দর্শাইয়াছিলেন।

তৃতীয় দিনে সরকারী পক্ষ হইতে প্রথম ব্যাপক ও তীব্র জবাব দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ। তাঁহার জবাবে ছিল সুস্পষ্ট ঘোষণা যে দুর্নীতি দূরীকরণে সরকার ও কংগ্রেস দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, নেহরুর সাধনা ও নীতিতে অবিচলিত থাকিতে সরকার দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ এবং ছিল এই তথ্য যে মন্ত্রীদের সম্পত্তির তালিকা দাখিল করার বাধ্যতামূলক বিধি-নির্দ্দেশ রহিয়াছে সম্প্রতি রচিত মন্ত্রীদের আচরণ-বিধির অঙ্গস্বরূপে। তিনি আরও বলেন যে আজিকার দুর্নীতি দমন ও নিরোধের সর্ব্বাত্মক অভিযানের কৃতিত্ব প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর গঠিত সদাচার সমিতি সেই অভিযানেরই শাখামাত্র। বিরোধী দলের অনেক গুলি অভিযোগ তিনি খণ্ডন করেন—আবার তাহার কিছু অংশ যে একেবারে ভিত্তিহীন নহে এ কথাও তিনি স্বীকার করেন। তবে তাঁহারা যে সেই সকল অব্যবস্থা ও অনাচারের প্রতিকারে সক্রিয়ভাবে চেষ্টিত এ কথাও তিনি জোরের সঙ্গে বলেন।

চতুর্থ দিনের বিতর্কে—অর্থাৎ অনাস্থা প্রস্তাবের আলোচনায় পঞ্চম দিবসে—অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী সরকারের অর্থনৈতিক নীতি, বিশেষভাবে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন ব্যবস্থা এবং সেই সঙ্গে প্রতিরক্ষার কাজ, সমানে ও অপরিবর্ত্তিতভাবে চালাইবার দৃঢ় সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়া সেই সঙ্গে বলেন যে কৃষির উন্নতি জন্য স্থির লক্ষ্যে অগ্রসর হইতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ মেনন তারপর সরকারী পররাষ্ট্র নীতির সমর্থন করেন। বিরোধী দল হইতে, পূর্ব্বদিনেরই মত, এদিনেও বিশেষ কোনও তথ্য বা যুক্তিমূলক বা অসঙ্গতি নির্দ্দেশক আলোচনা শোনা যায় নাই।

শেষদিনে প্রধানমন্ত্রী এক-দুই ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতায় বিরোধী দল উত্থাপিত সকল প্রশ্ন, সমস্যা ও অভিযোগের উত্তর দেন। কাশ্মীর ও চীন সম্বন্ধে কোনও নীতি পরিবর্ত্তিত হয় নি ও হইবে না এই আশ্বাস, দুর্নীতি দমন অভিযানে তাঁহার সক্রিয় সহযোগ এবং বর্ত্তমান খাদ্য পরিস্থিতির দুইমাস পরে উপশম এ বিষয়ে তাঁহার ভাষণ সুস্পষ্ট ছিল।

অনাস্থা প্রস্তাব আরম্ভকারী শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চ্যাটার্জ্জি এই ভাষণের উত্তরে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কোনও যুক্তি বা মন্তব্য করেন নাই।

অনাস্থা প্রস্তাব শেষ পর্য্যন্ত ৩০৭-৫০ ভোটে অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

শান্তিকামী ভারত

ভারতের পররাষ্ট্রনীতি যে-কয়টি মূলসূত্রের উপর স্থাপিত তাহার মধ্যে বিশ্বশান্তিকামনা ও শক্তিজোট নিরপেক্ষতা এই দুই লক্ষ্যের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ রহিয়াছে। পণ্ডিত নেহরু এই দুইটি নীতিকে সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রথম হইতেই চেষ্টিত ছিলেন ও শেষদিন পর্য্যন্ত যাহাতে আমাদের আন্তর্জ্জাগতিক সম্পর্কের মধ্যে ওই দুই নীতির ব্যতিক্রম কোথায়ও না হয় সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী দিল্লীর সাপ্তাহিক "লিঙ্ক" প্রেরিত প্রশ্নের উত্তরে যাহা বলিয়াছেন তাহাতেও ওই দুই মূলনীতির উপর মহত্ত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

এই নীতি অনুসারেই আমরা সকল প্রতিবেশী বা অল্পবিস্তর দূরস্থিত রাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনে সদাই ইচ্ছুক এবং সেই কারণেই আমাদের দেশের উচ্চ অধিকারী বা প্রতিনিধিবর্গ নানা দেশে যাইয়া থাকেন এবং তাহারই প্রতিদানে নানা দেশ হইতে আমাদের দেশে প্রীতিস্থাপনাকামী প্রতিনিধি দল বা উচ্চ অধিকারীগণ আসেন। এই কারণেই অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের উপরাষ্ট্রপতি জাকির হোসেন উত্তর আফ্রিকা সফর করিয়া সেখানে আরব রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে যোগাযোগ ও বন্ধুত্ব সম্পর্ক দৃঢ়তর করিতে গিয়াছিলেন। এই কারণেই আমাদের নূতন পররাষ্ট্র দপ্তরের অধিকারী মন্ত্রী স্বরণ সিং আফগানিস্থান, নেপাল ও ব্রহ্মদেশ ঘুরিয়া সম্প্রতি সিংহল হইয়া আসিয়াছেন। এবং এই কারণেই রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণ সম্প্রতি সোভিয়েট রুশ দেশে গিয়াছেন ও তাহার পর আয়ারল্যাণ্ডে যাইবেন।

এই দুই নীতি অনুসরণের ফলে ভারত অনেক বিষয়ে লাভবান হইয়াছে। আমাদের দৃষ্টিকোণ ও আমাদের অবস্থান এই দুইকেই প্রথম দিকে অনেকে বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন—এবং এখনও দুইটি রাষ্ট্র, চীন ও পাকিস্তান সমানে করিতেছে। কিন্তু পরে জগতের বহু জাতি উহার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়ায় আমাদের রাষ্ট্রের স্থিতি প্রকৃতি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়াছে এবং সেই রাষ্ট্র সকলের সঙ্গেই আমাদের মৈত্রী সম্পর্ক ও আদান-প্রদান সম্বন্ধ দৃঢ়তর হইয়াছে সন্দেহ নাই এবং তাহাতে আমরা লাভবান হইয়াছি, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই।

কিন্তু সকল নীতি ও নীতিগত কার্য্যক্রমের একটা ধারা ও সীমা আছে। এবং পররাষ্ট্রনীতির বিশেষত্ব এই যে, উহার গতি বা লক্ষ্য যতই মহান্ হউক না কেন উহা নিরন্তর একতরফা চলিতে পারে না। আমাদের দিক হইতে, প্রথম, মুখে বন্ধুত্ব বা মৈত্রী স্থাপনের প্রস্তাব উপস্থাপিত হইতে পারে। এবং কোন ভুল ধারণা বা মৈত্রী স্থাপনে বাধা থাকিলে সে-সম্বন্ধে বুঝা-পড়া করার প্রস্তাবও আমাদের দিক হইতে যাইতে পারে। এবং সেইরূপ চেষ্টা প্রতিহত হইলেও যদি দেখা যায় অন্য পথে, ভুলভ্রান্তি সংশোধন দ্বারা, ঐ মৈত্রী ও শান্তি স্থাপনের পথ সুগম হইতে পারে তবে একাধিক বারে ঐ প্রস্তাব উপস্থাপিত করা যায় ও বিভিন্ন পথে সেই মৈত্রী স্থাপনের প্রয়াস একাধিকবার চালিত হইতে পারে—যদি দেখা যায় যে, অন্য দিক হইতে কোনও আশাপ্রদ সদিচ্ছার নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু যদি দেখা যায় যে, আমাদের এই সকল প্রয়াসের প্রতিদানে অন্যপক্ষ কেবল তাহার লোভ, হিংসা ও লালসা চরিতার্থ করারই চেষ্টা করিতেছে এবং কুটিল পথে বা প্রকাশ্য ভাবে তাহার শত্রুতা ও হিংসা-বৃত্তি বাড়াইয়াই চলিতেছে তখন এদিকের উচিত সতর্ক ভাব অবলম্বন করিয়া অন্যদিকের অপচেষ্টার প্রতিরোধ করা এবং অন্যদিক হইতে সরলপথে চলিবার ও বুঝাপড়ার দ্বারা মৈত্রীর অন্তরায় যাহা তাহার মীমাংসা করার প্রস্তাব সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ ভাবে না আসা পর্য্যন্ত এইরূপ বিফল প্রয়াস বন্ধ রাখা। নহিলে আমাদের শুধু বিপদের আশঙ্কাই বাড়িবে না উপরন্তু জগতে আমরা দুর্ব্বল ও বিভ্রান্তচিত্ত বলিয়া কুখ্যাতি অর্জ্জন করিব। চীনের সঙ্গে এক তরফা ঐ ভাবে "ধর্ম্মের কাহিনী" শুনাইয়া তাহার শত্রুতাচরণ বন্ধ করার বৃথা চেষ্টার কি বিষময় ফল আমরা ভোগ করিতেছি তাহা আমরা না বুঝিলেও জগৎ জানে। সম্প্রতি কাশ্মীর ও পাকিস্তান লইয়া ঐরূপ বিভ্রান্তিপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টির আশঙ্কা অনেকের মনে আসিয়াছে।

লোকসভায় কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপনে শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চ্যাটার্জ্জী এই আশঙ্কারই উল্লেখ করেন। তিনি সরকারী দ্বিধাগ্রস্ত নীতির নিন্দা করেন এবং প্রধানমন্ত্রীকে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিতে বলেন যে, কাশ্মীর কোন ক্রমেই ত্যাগ করা হইবে না। তিনি শেখ আব্দুল্লা ও জয়প্রকাশের চক্রান্ত এবং পাশ্চাত্ত্য শক্তিসমূহের ষড়যন্ত্র সকলকে স্মরণ করাইয়া দেন।

আমরা অবশ্য শ্রীজয়প্রকাশনারায়ণের কার্য্যক্রমকে "চক্রান্ত" আখ্যা দিতে কোন মতেই প্রস্তুত নহি। কিন্তু তাঁহার

এই যে-সরকারী সৌজন্য যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। এবং পাকিস্তানের মত কুটিল পথে ভাগ্যান্বেষী রাষ্ট্রের পক্ষে ঐ বিভ্রান্তির সুযোগে নিজ কার্য্যসিদ্ধির চেষ্টা একেবারেই আশ্চর্য্য নয়—বরঞ্চ স্বাভাবিক।

শেখ আবদুল্লা মুক্তি পাওয়ার পর নানা প্রকার বিপরীত অর্থের কথাবার্তা বলিয়া শেষে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে স্থায়ী শান্তি ও মৈত্রী স্থাপনের চেষ্টায় পাকিস্তান গিয়াছিলেন। পণ্ডিত নেহরুর মৃত্যুকালে তিনি সেখানেই ছিলেন। তার পর তিন মাসের অধিক অতিবাহিত হইয়াছে। দেখা যাউক এই তিন মাসে ঐ শান্তি প্রচেষ্টার ও বর্ত্তমানে শ্রীজয়প্রকাশের প্রচেষ্টার প্রতিদানে পাকিস্তান কি করিয়াছে। নীচে উদ্ধৃত সংবাদে তাহা সুস্পষ্টভাবে বিবৃত হইয়াছে।

নয়াদিল্লী, ৭ই সেপ্টেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী কাশ্মীরে যুদ্ধবিরতি রেখা অঞ্চলের ঘটনাবলী সম্পর্কে আজ লোকসভায় কয়েকটি কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের সারমর্ম—(১) যুদ্ধবিরতি রেখা অঞ্চলের ঘটনাবলী নূতন কিছু নয়। (২) এই সব ঘটনার সঙ্গে প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের হালের "গঠনমূলক মনোভাব" মিলাইয়া দেখা ঠিক হইবে না। (৩) ভারত দৃঢ়তা তথা সাফল্যের সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবিলা করিতেছে। (৪) এ বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে আলোচনা কাম্য।

এদিকে প্রতিরক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীটমাস জানান: ১লা জুন হইতে ২৯শে আগষ্টের মধ্যে পাকিস্তান ৪২৬ বার যুদ্ধবিরতি রেখা লঙ্ঘন করিয়াছে। উহার ফলে ২২জন ভারতীয় নিহত ও ৩২ জন আহত হইয়াছে। তিনি আরও জানান, হালে এই ধরনের ঘটনা বাড়িয়াছে।

প্রধানমন্ত্রী প্রশ্নোত্তরকালে অতিরিক্ত প্রশ্নের উত্তরে এ বিষয়ে তাঁহার বক্তব্য পেশ করেন।

মূল প্রশ্নটি তুলিয়াছিলেন শ্রীনাথ পাই। জম্মু-কাশ্মীর যুদ্ধবিরতি রেখা অঞ্চলে পাক্ হামলাবাজি বৃদ্ধির সঙ্গে আয়ুবের 'গঠনমূলক মনোভাবে'র (প্রধানমন্ত্রীর ভাষায়) মিল কি ভাবে থাকিতে পারে, ইহাই ছিল শ্রীপাই-এর প্রশ্ন।

শাস্ত্রীজী গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তাঁহার বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বলেন যে, ভারত সাফল্যের সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবিলা করিতেছে। ইদানীং আরও বেশী সাফল্যের সঙ্গে।

ঐ রেখা অঞ্চলে হাঙ্গামা নূতন কিছু নয়। উহার সহিত তিনি আয়ুব খাঁর হালের মনোভাব মিলাইয়া না দেখার জন্য সদস্যদের প্রতি আবেদন জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, প্রেসিডেণ্ট আয়ুবও বলিয়াছেন যে, ভারত-পাক্ সঙ্ঘর্ষ বন্ধ হওয়া দরকার। উহাই গঠনমূলক মনোভাব।

এজন্য তিনিও (প্রধানমন্ত্রী) চাহেন যে, আলোচনায় বসিয়া দুই দেশের বর্ত্তমান সমস্যাগুলি সমাধানের চেষ্টা করা উচিত।

বলা বাহুল্য শ্রীযুক্ত লালবাহাদুর শাস্ত্রীর ব্যক্তিগত ধর্ম্মনীতি অনুসারে তাঁহার মত, অর্থাৎ কাশ্মীরের যুদ্ধবিরতি রেখা অঞ্চলে হাঙ্গামার সহিত পাকিস্তানী প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁর "হালের মনোভাব" মিলাইয়া না দেখার জন্য আবেদন সঙ্গত ও যথাযথ হইতে পারে। কিন্তু আমরা বলিতে বাধ্য যে, প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীর পক্ষে এই আবেদন পররাষ্ট্রনীতির সকল মূলসূত্রের পরিপন্থী এবং ঐ বিভ্রান্তির বশে যদি আমরা চলি তবে আমাদের বিপদ ও সমূহ ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। বিশেষে যদি কথা ও কাজের অসঙ্গতি আমরা চক্ষু বুজিয়া না দেখি এবং সেই না দেখার আনন্দে মশগুল হইয়া শান্তির স্বপ্ন দেখি।

আয়ুব খাঁ পাকিস্তানের শুধু প্রেসিডেণ্ট নহেন। তিনি সেখানে নিজের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া সর্ব্বাত্মক অধিকার নিজহস্তে লইয়াছেন। এই সম্প্রতি, মাস দুই পূর্ব্বে, "আজাদ কাশ্মীর" বলিয়া যে একটি লোক-দেখান বা বাকা-বোঝান রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল, তিনি তাহা ভাঙ্গিয়া ঐ অঞ্চল নিজ হস্তে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। অথচ কি আমাদের বুঝিতে হইবে যে এই অবিশ্রাম যে, খুন জখম হাঙ্গামা চলিতেছে তাহা তাঁহার অভিপ্রেত নয়?

অবশ্য ইংরাজী প্রবাদবাক্যে* যাহা বলে সেই মত যদি একদিকে সুখময় ভবিষ্যতের জন্য আশার বার্ত্তা উচ্চারণ ও অন্যদিকে কঠোর বাস্তববাদ অনুযায়ী বিপদ প্রতিহত করার প্রস্তুতি এক সঙ্গেই চলে তবে মৌখিক সৌজন্যের খাতিরে ঐরূপ কথা বলা চলে। কিন্তু আমাদের এই অভাগা দেশে এতাবৎ আমরা দেখিয়াছি যে দেশের কর্ণধারবর্গ যখনই মুখে ঐরূপ বাস্তব-বিরোধী আশাবাদের কথা উচ্চারণ করেন তখন কাজেও—বিশেষে প্রতিরক্ষার কাজে—এরূপ মারাত্মক ঢিলা-অবহেলার প্রবর্ত্তন করেন যে, আপৎকাল আসিলে তখন পরের দ্বারস্থ হইয়া চীৎকার করা ভিন্ন অন্য উপায় থাকে না।

*"Hope for the best but prepare for the worst."

শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশনারায়ণ ও তাঁহার সঙ্গীবর্গ প্রেসিডেন্ট আয়ুব এবং তাঁহার পররাষ্ট্রসচিব মিঃ ভুট্টোর সহিত যে আলোচনা চালাইয়াছিলেন তাহার সবিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হয় নাই। তবে আমরা দেখিতেছি পাকিস্তানী রেডিওর ঢাকা কেন্দ্র হইতে ভারত-বিরোধী অপপ্রচার সমানে চলিতেছে এবং স্বয়ং আয়ুব খাঁ ভারতের বিরুদ্ধে নির্লজ্জ মিথ্যা অভিযোগও পূর্ব্বের মতই চালাইতেছেন। সুতরাং মনে হয় যে, পাকিস্তান তাহার শিক্ষাগুরু ব্রিটেনের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া ছল-চাতুরির পথে কার্য্যসিদ্ধির চেষ্টা চালাইতেছে এই সকল কথাবার্ত্তায় এবং অন্যদিকে কাশ্মীর, আসাম ও ত্রিপুরা সীমান্তে যুদ্ধাত্মক প্রস্তুতি ও খণ্ডযুদ্ধের সক্রিয় অভিযান চালাইয়া ভারতকে শ্রান্ত ক্লান্ত ও বিষম ভাবে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া চলিতেছে।

শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশনারায়ণ ফিরিয়া আসিয়া কি সংবাদ প্রধানমন্ত্রীকে নিবেদন করিয়াছেন জানি না। প্রকাশ্যে তিনি সাংবাদিকদের বলিয়াছেন যে, কাশ্মীর সম্বন্ধে পাকিস্তানের মনোভাব একেবারে অনমনীয় নহে। জয়প্রকাশবাবু বোধহয় পাকিস্তানকে সামান্য ভুল বুঝিয়াছেন। কাশ্মীর সম্পর্কে পাকিস্তানী মনোভাব নমনীয় নয়, উহা স্থিতিস্থাপক মাত্র। চাপ পড়িলে বা প্রবল প্রতিরোধ পাইলে উহা নামিয়া বা বসিয়া যায়। চাপ সরিলে বা বাধা হটিয়া যাইলেই উহা পুনরায় অসম্ভব ভাবে প্রসারিত হয়।

পরলোকে যামিনীকান্ত সোম

গত ২৩শে আগষ্ট প্রবীণ শিশু-সাহিত্যিক যামিনীকান্ত সোম দীর্ঘকাল রোগভোগের পর পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮২ বৎসর হইয়াছিল।

যামিনীকান্ত ১৮৮২ সালের ২৫শে নবেম্বর মেদিনীপুর জেলার তিউলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শিশু-সাহিত্যিকদের মধ্যে যামিনীকান্ত বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ,' 'নীলপাখী,' 'খেলাঘর,' 'শ্রীনেহরু,' 'বেদপুরাণের গল্প' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রবাসীতেও অনেক লেখা লিখিয়াছেন। বিশেষ করিয়া তিনি স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ছাত্র বলিয়া, প্রবাসীর সহিত তাঁহার আত্মিক সম্পর্ক ছিল। গত ১৯৬২ সালে তাঁহার সাহিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ বঙ্গীয় শিশু-সাহিত্য পরিষদ তাঁহাকে ভুবনেশ্বরী পদক দান করে। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতাও তিনি ছিলেন। আমরা তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

পরলোকে সলিসিটর জেনারেল হেম সান্যাল

গত ৮ই সেপ্টেম্বর মধ্যরাত্রিতে সলিসিটর জেনারেল হেম সান্যাল মহাশয় দিল্লীতে সরকারী ভবনে দুর্বৃত্তগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬২ বৎসর হইয়াছিল। এই হত্যা সম্পর্কে পুলিস এখনও তদন্ত করিতেছে।

হেম সান্যাল ১৯০২ সনে রংপুর জেলার নীলফামারীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা জানকীনাথ সান্যাল ঐ অঞ্চলের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। রংপুর জেলার কোন একটি স্কুল হইতে ম্যাট্রিক পাস করিয়া হেমবাবু প্রেসিডেন্সীতে ভর্ত্তি হন। সেখান হইতে অর্থশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে অনার্স লইয়া বি-এ পাস করেন। পরে লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে অর্থনীতিতে পি-এইচ-ডি উপাধি লাভ করেন। এবং ব্যারিষ্টারী পাস করিয়া কলিকাতায় হাইকোর্টে প্র্যাকটিস সুরু করেন। ১৯৫৬-৫৭ সনে তাঁহাকে 'ট্যাগোর ল' লেকচারার পদে নিযুক্ত করা হয়। ১৯৫৭ সনের সেপ্টেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁহাকে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল পদে নিযুক্ত করেন। তাঁহার মেধা ছিল অসাধারণ। শুধু আইন নয়—স্থাপত্য শিল্পেও তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। সান্যাল রবীন্দ্র ভারতী সোসাইটির একজন ট্রাষ্টি এবং তিনি ইহার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্য ছিলেন।

হত্যার কারণ এখনও জানা যায় নাই। কিন্তু তাঁহার এই মর্ম্মান্তিক মৃত্যু সকলকেই স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছে।

মনোরঞ্জন গুপ্ত

গত ৮ই সেপ্টেম্বর বিজ্ঞান বিষয়ক বিশিষ্ট লেখক, প্রসিদ্ধ জীবনীকার মনোরঞ্জন গুপ্ত পরলোকগমন করিয়াছেন।

ইনি ময়মনসিংহের বিখ্যাত ঐতিহাসিক রামপ্রাণ গুপ্তের কনিষ্ঠ পুত্র। রামপ্রাণ গুপ্ত ছিলেন প্রবাসীর একনিষ্ঠ সেবক ও লেখক। মনোরঞ্জনবাবুও প্রবাসীর নিয়মিত লেখক ছিলেন। তাঁহার আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, আচার্য্য জগদীশ-চন্দ্র বসু, আচার্য্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি জীবনী গ্রন্থগুলি বিশেষ ভাবে সমাদৃত হইয়াছে। ব্যক্তি হিসাবে তিনি অমায়িক ও বন্ধুবৎসল ছিলেন। তাঁহার আকস্মিক মৃত্যু আমাদের ব্যথিত করিয়াছে। তাঁহার ৯৩ বৎসরের বৃদ্ধা মা এখনও জীবিতা—ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয়।

পৃথিবীর ইতিহাসের একটি আশ্চর্য ও বিচিত্র যুগের মধ্যে আমরা বাস করিতেছি। কারণ, আমরা একটি বিরাট্ ঐতিহাসিক পরিবর্তনের যুগে আসিয়া পৌছিয়াছি। চারি শত বছর আগে যে ইউরোপীয় নৌ-অভিযান 'সাত সমুদ্র তের নদী' পার হইয়া বাণিজ্য ও সাম্রাজ্যের সন্ধানে বাহির হইয়াছিল এবং যার ফলে কার্যতঃ সারা পৃথিবীব্যাপী ইউরোপীয় প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, আজ তার অবসান ঘটিয়াছে। এশিয়ায়, আমেরিকায় ও আফ্রিকায় আজ কোন বৈদেশিক সাম্রাজ্য নাই—যদিও আফ্রিকাতে এখনও কয়েকটি উপনিবেশ, বৈদেশিক 'পকেট' কিংবা বিভিন্ন সমুদ্রে ছিটু মহলের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ ও বন্দরের উপর ইউরোপীয় আধিপত্য আছে, তথাপি পশ্চিম বা পূর্ব্ব গোলার্দ্ধের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিচারে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ ও প্রভুত্বের যে মৃত্যু ঘটিয়াছে, তা'তে কোন সন্দেহ নাই। ইউরোপীয় কিংবা ব্যাপক অর্থে পশ্চিমী (অর্থাৎ ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা এবং তাদের সঙ্গে রক্ত ও বর্ণের সম্বন্ধে আবদ্ধ আত্মীয় বা সমর্থক গোষ্ঠী) শক্তির যে পতন ঘটিয়াছে, তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, কিউবার মত একটি দেড় ইঞ্চি পরিমাণ দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত প্রবল পরাক্রান্ত শক্তির হস্তের কাছে মাথা নত না করিয়া সগর্বে স্বীয় স্বাধীনতার ও মতাদর্শের স্পর্দ্ধা দেখাইতেছে! পঞ্চাশ বছর আগেও ইহা অসম্ভব ছিল। অথচ ভাস্কো ডি গামার আমল হইতে কিংবা ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে সুরু হইতে বিংশ শতকের প্রায় মধ্যভাগ পর্য্যন্ত চারি শত বছরের অধিক কাল ধরিয়া আমরা পৃথিবীর ইতিহাসে পশ্চিমী আধিপত্যের যুগ

দেখিয়াছি। কিন্তু সেই যুগ আজ অতীতের ইতিবৃত্তে পরিণত হইতে চলিয়াছে। আজ পৃথিবীতে নতুন সম্ভাবনা ও নতুন জীবনের দ্বার খুলিয়া যাইতেছে। কেননা, পৃথিবীর বৃহত্তম সংখ্যক মানুষ আজ রাজনৈতিক স্বাধীনতা কিংবা নিজেদের ভাগ্য নিজেদের হাতে রচনা করার অধিকার পাইয়াছে, যে-অধিকার আগে ছিল সঙ্কুচিত ও সীমাবদ্ধ। আজ একমাত্র রাষ্ট্রসংঘের বা ইউনাইটেড্ নেশন্সের সদস্য পদেই রহিয়াছে ১১২টি স্বাধীন জাতি—জার্মানী ও চীন ইত্যাদি ছাড়া। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পরেও লীগ অব্ নেশন্সে বা তদানীন্তন রাষ্ট্রসংঘে সম্ভবতঃ ৫০টির বেশী স্বাধীন জাতির সদস্যপদ ছিল না এবং তার মধ্যেও কয়েকটির গোঁজামিল ছিল, যেমন ভারতবর্ষের (বৃটেনের অধীনতা সত্ত্বেও) সদস্যপদ। কিন্তু এই আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রসভার চেহারা কি ভাবে পাল্টাইয়া গিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করার মত। আজ একমাত্র পশ্চিমী শক্তিবর্গই মেজরিটি নহে, একমাত্র শ্বেতবর্ণের আভিজাত্যই আজ আর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিতেছে না। অর্থাৎ অ-শ্বেতকায় জাতিসমূহ আজ নতুন সম্মান ও নতুন অধিকার লাভ করিতেছে।

কিন্তু পৃথিবীতে এই ইউরোপীয় আধিপত্যের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য কি ছিল?—বাণিজ্যিক অভিযান হইতে যার আরম্ভ, দিগন্তব্যাপী সাম্রাজ্যিক প্রতিষ্ঠা, তার পরিণতি। অর্থাৎ 'বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে' পরিণত হইল। কিংবা রাজনীতির ভাষায় ইউরোপীয় আধিপত্যের বৈশিষ্ট্য ছিল সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ এবং ধনতন্ত্রবাদের মধ্যে। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ যেমন পৃথিবীব্যাপ্ত ছিল, তেমনি তার ধনতন্ত্রবাদও এই পৃথিবীকে গ্রাস করিয়াছিল। যে ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা ইউরোপীয় আধিপত্যকে পৃথিবীতে শীর্ষস্থানীয় করিয়া তুলিয়াছিল, সেই ব্যবস্থা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। অথবা লেনিনের ভাষায় 'Imperialism is the highest stage of Capitalism'. অর্থাৎ ধনতন্ত্রবাদের চরম বিকাশ হইতেছে সাম্রাজ্যবাদ। সুতরাং পৃথিবীব্যাপী যখন ইউরোপীয় আধিপত্যের ও সাম্রাজ্যবাদের পতন ঘটিতেছে, তখন এই পৃথিবীব্যাপ্ত ধনতন্ত্রবাদ বা 'World Capitalism'-এরও পতন ঘটিতে বাধ্য। কথাটা শুনিতে খুব চমকপ্রদ, কিন্তু যুক্তিহীন নহে। কারণ, ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত আমরা সাম্রাজ্যবাদের যেমন দিগ্বিজয় যাত্রা দেখিয়াছি, তেমনি ধনতন্ত্রবাদেরও চরম বিকাশ ঘটিয়াছিল প্রথম মহাযুদ্ধ পর্য্যন্ত। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধ যেমন একদিকে সাম্রাজ্য ও উপনিবেশবাদী শক্তিগুলির পরস্পরের মধ্যে সংঘাত ও রক্তারক্তি ডাকিয়া আনে, তেমনি ধনতান্ত্রিক আধিপত্যের মধ্যেও প্রবল ফাটল সৃষ্টি করিতে থাকে। ইউরোপে তিনটি প্রধান রাজবংশ ও সাম্রাজ্যের পতন ঘটিল—হোহেনজোথার্ণ (বা জার্মানীর কাইজার), হ্যাপসবুর্গ (অষ্ট্রো-হাঙ্গেরীয়ান সাম্রাজ্য) এবং র‍্যামোনোভ বা রাশিয়ার জার সাম্রাজ্যের পতন ঘটিল। এই পতনের মধ্য হইতে কমিউনিজম বা বলশেভিক বিপ্লব মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। অর্থাৎ ধনতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে প্রথম সক্রিয় এবং বাস্তব চ্যালেঞ্জ জানাইল। আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বা ১৯৩৯-৪৫ সালের পর প্রায় সারা পৃথিবী হইতে সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটিয়াছে এবং তারই গতিপথে সমগ্র পূর্ব্ব ইউরোপ, সমগ্র চীন (ফরমোজা বাদে) এবং উত্তর ভিয়েৎনাম ও উত্তর কোরিয়া কমিউনিষ্ট দখলে চলিয়া গিয়াছে। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ আজ কমিউনিজমের কবলে এবং বাকী দুই-তৃতীয়াংশের মধ্যেও সোসিয়েলিজম বা সমাজতন্ত্রের আবেদন অত্যন্ত প্রবল। এমন কি, ব্রিটেন ও আমেরিকাও আজ সমাজতন্ত্রকে উপেক্ষা করিতে পারিতেছে না এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও ভারতীয় পার্লামেন্ট ত সরকারী ভাবেই ঘোষণা করিয়াছেন যে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ প্রতিষ্ঠাই বর্ত্তমান ভারতের লক্ষ্য। ব্রহ্মদেশ, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি দেশ হইতেও অনুরূপ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

সুতরাং এখানে একটি কৌতূহলজনক, কিন্তু ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ প্রশ্ন দেখা দিয়াছে :

> পৃথিবীব্যাপী পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের মৃত্যু এবং ধনতন্ত্রবাদের পতনের পর উহার শূন্য স্থান কি ভাবে পূর্ণ হইবে? অর্থাৎ ধনতন্ত্রবাদের স্থলে কোন্ অর্থনৈতিক ও সামাজিক মতবাদ তার স্থান গ্রহণ করিবে?

আগামী দিনের পৃথিবীকে এই ঐতিহাসিক প্রশ্নের জবাব দিতে হইবে। বর্তমান ক্যাপিটালিজমের মৃত্যুর পর আবার কি ক্যাপিটালিজমের পুনর্জন্ম সম্ভব?—কিংবা উহারই রকমফের কোন নয়া অর্থনৈতিক ও সামাজিক মতবাদ আত্মপ্রকাশ করিবে? অথবা সোসিয়েলিজম্-কমিউনিজমই নানা দেশে জাতীয় চরিত্র, ঐতিহ্য ও অবস্থানুযায়ী নানা মূর্তি লইয়া দেখা দিবে? মানুষের ভবিষ্যতের পক্ষে এই প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বব্যঞ্জক।

পৃথিবীব্যাপী সমগ্র মনুষ্য সমাজের ভবিষ্যৎ রূপান্তর সম্পর্কে এই মুহূর্তে কোন নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভব নয়। তবে, একথা সত্য যে, সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের মৃত্যুর পর ধনতন্ত্রবাদ তার আগের চেহারা, শক্তি ও সম্বল নিয়া টিঁকিয়া থাকিতে পারে না। কারণ, সাম্রাজ্যবাদ যেমন সামন্ত যুগকে হঠাইয়া দিয়াছে, তেমনি 'মডার্ণ ইজম্'কেও ডাকিয়া আনিয়াছে এবং এই মডার্ণ ইজম প্রধানতঃ বিজ্ঞান ও শ্রমশিল্পের আশ্রিত। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের অধীন বিভিন্ন পরাধীন দেশে এগুলির বিকাশ লাভ সম্ভব হয় নাই কৃষি ও কাঁচা মালের উপর অত্যধিক জোর দেওয়ার জন্য—যদিও প্রারম্ভিক সূত্রপাত হইয়াছিল অধিকাংশ দেশে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের পতনের পর স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞতা, অশিক্ষা, দারিদ্র্য, বেকারিত্ব ও পশ্চাৎবর্তিতার বিরুদ্ধে প্রত্যেকটি নয়া গবর্ণমেণ্টকেই সংগ্রাম ঘোষণা করিতে হইয়াছে এবং এই সংগ্রামের সবচেয়ে বড় রণনীতি হইতেছে প্ল্যানিং বা পরিকল্পিত অর্থনীতি। এই পরিকল্পিত অর্থনীতি প্রায় সমস্ত দেশেই সমাজতন্ত্রের মৌলিক চিন্তার উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্ততঃ পরিকল্পিত অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত পুঁজিবাদকে এবং একচেটিয়া মালিকানা ও শোষণকে অনেকখানি অস্বীকার করা হইয়াছে—অবশ্য এখনও পুরাপুরি নয়। কারণ, এখনও কায়েমী স্বার্থের শক্তিগুলি অত্যন্ত প্রবল এবং এখনও অধিকাংশ দেশের শাসকবর্গ মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে উদ্ভূত। সুতরাং এখনও তাঁরা নতুন যুগকে খোলা মন লইয়া প্রসন্নচিত্তে বরণ করিতে সাহস পাইতেছেন না। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও সত্য যে, প্রচলিত ধনতান্ত্রিক কায়দায় কিংবা পুরাণো জমিদারি প্রথায় কোন নতুন স্বাধীন দেশেরই সমস্যা সমাধানের আর কোন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং শাসক শ্রেণীকেও বাধ্য হইয়াই নতুন সমাজতান্ত্রিক যুগের দিকে হাত বাড়াইতে হইতেছে। ভারতবর্ষ ইহার সবচেয়ে বড় প্রমাণ, যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দ্বারা এশিয়া মহাদেশে ইউরোপীয় প্রভুত্ব ও সাম্রাজ্যবাদের সমাধি রচনা করা হইয়াছে। সুবিখ্যাত ইতিহাসবিদ্ ও মনীষী সর্দার পানিক্করের মতে এশিয়া মহাদেশ হইতে সাড়ে চারি শত বছরের ইউরোপীয় আধিপত্যের (ভাস্কো ডি গামার কালিকট বন্দরে অবতরণের পর হইতে) অবসান হইয়াছে। এই আধিপত্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধনতান্ত্রিক আধিপত্যও ম্রিয়মান হইতে বাধ্য। কেবল ভারতবর্ষে কিংবা দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নহে, পশ্চিম এশিয়ার আরব রাষ্ট্রগুলিতে এবং উত্তর আফ্রিকায় মিসরীয় বিপ্লবের বা 'নাসের বিপ্লবের' যে তরঙ্গ উঠিয়াছে, সেটাও কিন্তু গতানুগতিক ক্যাপিটালিজমকে অস্বীকার করিয়া এক ধরণের সোসিয়েলিজমকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। ১৯৬০ সাল হইতে আফ্রিকার নতুন বন্ধন মুক্তি সুরু হইয়াছে এবং বর্তমানে এই 'অন্ধকার মহাদেশে'র অধিকাংশ রাজ্যই স্বাধীন। কিন্তু এশিয়ার স্বাধীনতা যেমন নতুন 'এশীয় বিপ্লবের' মুখে পড়িয়াছে, তেমনি অনগ্রসর আফ্রিকাও নতুন বৈপ্লবিক আবর্তে পড়িয়াছে। কারণ, তার অতীত ইতিহাস, তার গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ, তার সমষ্টিগত জীবনধারণের রূপ প্রচলিত ক্যাপিটালিজমের

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, প্রতিদ্বন্দ্বিতার উগ্রতা এবং শোষণমূলক শাসনকে গ্রহণ করিতে পারে না। বরং আফ্রিকার সমাজের কতকগুলি আদিম বৈশিষ্ট্যের জন্য উহা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিকেই ঝুঁকিতে বাধ্য। অবশ্য এই সমাজতন্ত্র তার নিজস্ব প্রকৃতি ও ঐতিহ্য এবং প্রাচীন সমাজজীবনের প্রয়োজন অনুযায়ী গড়িয়া উঠিবে। দক্ষিণ বা লাতিন আমেরিকা সম্পর্কেও এ কথাই প্রযোজ্য। সেই দেশগুলিতেও কিউবান্ বিপ্লবের ছায়া পড়িয়াছে এবং সেখানকার জনগণ ক্রমশঃ অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির জন্য আন্দোলন করিতেছে।

মোট কথা এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকা, এই তিনটি মহাদেশের উপর গত কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ইউরোপীয় বা পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের যে আধিপত্য ছিল, তাহা ভাঙিয়া পড়িয়াছে এবং আমরা ইতিহাসের এক বিস্ময়কর যুগসন্ধিক্ষণে পৌঁছিয়াছি। বিজ্ঞানের দিক্ হইতে আমরা কেবল অত্যাশ্চর্য্য ও কল্পনাতীত আবিষ্কারগুলিই ঘটাই নাই, আমরা অবিশ্বাস্য শক্তির (পারমাণবিক) অধিকারী হইয়াছি এবং পৃথিবী গ্রহকে ছাড়াইয়া ও মাধ্যাকর্ষণকে অতিক্রম করিয়া আমরা অজ্ঞাত নক্ষত্রলোকের দিকেও যাত্রা করিয়াছি। আজ মহাকাশ জয় করিয়া একটি 'সামান্য মেয়ে' পর্যন্ত এই পৃথিবী গ্রহকে বার বার পরিক্রমা করিয়াছে এবং ১৯৭০ সালে চন্দ্রলোকে পৌঁছিবার জন্য সোভিয়েট রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতা শুরু হইয়াছে। সুতরাং আমরা কি সত্য সত্যই একটি অদ্ভুত যুগে বাস করিতেছি না?—যে-যুগ পশ্চিমী আধিপত্য, সাম্রাজ্যবাদ ও ক্যাপিটালিজমের মৃত্যুই ডাকিয়া আনিতেছে না, জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যেও নতুন সম্ভাবনা ডাকিয়া আনিয়াছে। বর্ণ-বৈষম্য, সামাজিক-বৈষম্য ও শ্রেণী-বৈষম্যের বিরুদ্ধে এই যুগ নতুন বিপ্লবের বাণী আনিয়াছে। এক দেশের মানুষকে বাকী পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে মিলিত হইবার সুযোগ আনিয়া দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি করিয়া বলা যাইতে পারে যে, আমরা ভৌগোলিক স্বাধীনতা এবং ন্যাশন্যালইজমের জন্মীবাদ হইতে আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্বমানবতার যুগের দিকে অগ্রসর হইতেছি। সুতরাং আগামী যুগের ইতিহাস হইবে 'World Revolution'-এর ইতিহাস। অর্থাৎ পৃথিবীব্যাপী এমন এক বিপ্লব আসিতেছে, যাহা সমগ্র মনুষ্য জাতিকে স্পর্শ করিবে এবং সমগ্র মনুষ্য সমাজের রূপান্তর ঘটাইবে। কিন্তু এই বিপ্লব ইউরোপীয় সভ্যতার বিরুদ্ধে নয়, যদিও ইউরোপীয় ধনতান্ত্রিক ও ঔপনিবেশিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে। ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে আত্মিক ও মানবিক সম্পদ, তার গৌরব চিরদিনের। কিন্তু নতুন যে বিশ্ব-ইতিহাস (World History) রচিত হইবে, তার ভিত্তিমূলে রহিয়াছে বিশ্ব-বিপ্লব বা World Revolution এবং এই নতুন বিশ্ব-বিপ্লবের মধ্যে সমগ্র মনুষ্য জাতির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির স্বীকৃতি থাকিবে। পশ্চিমী প্রভুত্বের অবসানে পৃথিবীতে এই নতুন যুগ আসিতেছে।

—

বনজ বটবৃক্ষ। একবার মনে হ'ল তাকে বাড়ীর লোকদের, রাতটার জন্য একটু আশ্রয়-ভিক্ষা চায়। বেশ একটু দ্বিধায় পড়ে গেছে। হয় মিছে কিছু একটা বানিয়ে বলতে হয়, না-হয় প্রকৃত অবস্থাটা হয় জানাতে। প্রথমটা অপরাধ, বিবেকে বাধে, শিক্ষকের বিবেকই ত; দ্বিতীয়টাতে নিদারুণ লজ্জা। মানুষের ঘরে সিঁধ কাটা গেলে প্রকাশ করতে লজ্জা করে না। পকেট কাটা গেলেই ক্ষতির চেয়ে লজ্জার পাল্লাটাই যায় একেবারে ঝুঁকে, মনে হয় যেন মাথা কাটা গেল। কেন হয় এমনটা? ও-ও মূর্খতা, না-হয় অনবধানতাই বলা গেল, এও তাই। তবে ওটা বোধ হয় পাঁচজনের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যায়, আর এটা নিতান্তই ব্যক্তিগত বলেই মনের প্রতিক্রিয়াতে এই প্রভেদ।

পিঠের দিকে একটা দেওয়াল, তাইতে ঠেস্ দিয়ে···ভাবছে বটকৃষ্ণ

রাস্তার গায়েই এক চিলতে রক, হাত-চারেক লম্বা। চওড়া হাত-আড়াইয়ের। পাশেই একটা ঘর। দুটো জানলাও রয়েছে। দুটোই বন্ধ; আশ্বিন গিয়ে কার্তিক পড়েছে, একটু হিমেল ভাব এসে গেছে। পিঠের দিকে একটা দেওয়াল, তাইতে ঠেস দিয়ে র‍্যাপারটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে ভাবছে বটকৃষ্ণ।—পকেট কাটা গেলেই লজ্জার যেন মাথা কাটা গেল···

এলোমেলো ভাবনা, একটার গায়ে একটা এসে পড়ছে। ···আজ রাতটা পথের ওপর নিরম্বু উপোসে কাটল! ···গোড়ার কথা, নিঃসম্বল, পকেট কাটা গেছে। ···না, একেবারে গোড়ার কথাই বা কি করে বলা যায়? একেবারে গোড়ায় রয়েছে সাধু-সন্ন্যাসীতে ভক্তি; অবুঝ ভক্তি?···তারও গোড়ায় কিছু আছে?···হ্যাঁ, আছে বৈকি। মনস্তত্ত্বের শিক্ষক নিজের দুরবস্থার গবেষণায় খোরাক পেয়ে এক ধরণের আনন্দই পাচ্ছে।···না, গোড়ারও গোড়া আছে বৈকি। লোভ। নীচ লোভই। নিজে মেহনৎ ক'রে উপার্জন নয়, একজনের অনুকম্পা, একটু খোসামোদ করলে যদি মুফতে হাতে এসে যায় কিছু।

তাই নয় ?

মজাই লাগছে। একটা সিগারেট ধরাতে পারলে বেশ হ'ত। না, চলবে না। গন্ধ যাবে পাশের ঘরে। জানলা খুলে—"কে মশাই আপনি ?…আজ্ঞে না, খুবই দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, সম্মতি দিতে পারি না, আপনি দয়া করে অন্য জায়গা দেখুন।"

—কেউ সাহস করে না আজকাল অচেনা-অজানা লোককে রাত্রে আশ্রয় দিতে। দিনকাল খুবই খারাপ-যে। আচ্ছা, ঐ চান্সটাই নেওয়া যাক না ? উল্টোও ত হ'তে পারে। জানলা খুলে গেল।—"বাইরে ব'সে কে ?"

'আজ্ঞে আমি…এই রকম অবস্থায় পড়ে—রাতটুকু এখানে কাটিয়ে—সকালেই চলে যাব…"

"সে কি ! ভদ্রলোক বাইরে পড়ে থাকবেন ! আসুন, ভেতরে আসুন ; এতক্ষণ বলতে হয়। ছ্যাখো ত কাণ্ড !…"

দরজা খুলে গেল ; তারপর আতিথ্যের ধূম। এ সম্ভাবনাও রয়েছে। মানুষ ত একেবারে অমানুষ হয়ে যায় নি।

বের করল সিগারেট বটকৃষ্ণ। জ্বালতে পারল না কিন্তু।…পকেট কাটা গেছে। কচি খোকা নয়, বত্রিশ-বছরের একজন যুবা। শিক্ষক ; ছেলেদের মনস্তত্ত্ব পড়ায়।…দেশলাই-সিগারেট আবার পকেটে রেখে দিল। চান্সের ওপরই ছেড়ে দেওয়া যাক বরং। যদি কোন কারণে ওয়াই নিজে হ'তে জানলা একটা খোলে ভেতর থেকে। তখন আর উপায় থাকবে না। আর, তখন ভিক্ষার লজ্জাটাও থাকবে না।

খিদে পেয়েছে বেশ।…কি একটা রান্নার গন্ধ ভেসে আসছে দিব্যি। এ যোগাযোগগুলো যে কেন ঘটে ! দৈবের পরিহাস ?

হাত-ঘড়িটা দেখল বটকৃষ্ণ। রেডিয়াম ডায়াল। সাড়ে দশটা হয়ে গেছে। ছোট জায়গা, আর সর্বত্রই নিশ্চয় আহারাদি শেষ করে—সবাই শয্যার কথা ভাবছে, শুধু এই বাড়ীতে আজকে এখনও আহার শেষ হবে না। এক প্রবঞ্চিত, বুভুক্ষু হতভাগ্য আজ এই বাড়ীর বারান্দায় রাত কাটাতে আসবে, জঠরাগ্নিতে নিষ্ফল গন্ধের ইন্ধন যুগিয়ে তার মর্ম-পীড়াটা বাড়াতে হবে।

চান্স, কোয়েন্সিডেন্স, যোগাযোগ। নিতান্ত অহেতুক, অন্ধ, না, এর পেছনে কেউ আছে ? আমাদের দিকের কথাটা "দৈব"। অর্থাৎ কেউ আছে। বেশ, সামান্য হ'লেও এটুকু তার বিশ্ববিধানের অবই ... একটা।

বৈজ্ঞানিকের মন, সন্দেহের দোলাতেই সর্বক্ষণ দুলছে, তবু মনের আক্রোশেই সেই বিশ্ব-বিধাতাকে আজ বিদ্রূপ করছে বটকৃষ্ণ। আক্রোশ মেটাবার জন্য অন্তত পাওয়া যাচ্ছে একজনকে। কি এমন মহাপ্রলয় ঘটত তার বিশ্ব-বিধানে, বটকৃষ্ণর গাড়িতেই সেই ভণ্ড-সন্ন্যাসীকে না এনে বসালে ?

কিন্তু সে ত ছিল দূরেই, দরজার কাছে দাঁড়িয়েই ছিল ভেতরে জায়গা না পেয়ে। বটকৃষ্ণর কি-এমন মাথাব্যথা পড়েছিল তাকে ও-ভাবে ডেকে এনে পাশটিতে বসাবার জন্য ; ভিড়ের মধ্যে নিজের অত অসুবিধা ক'রে ? ঐ সুকৃতে কিছু প্রাপ্তি, বাবা যদি দয়া পরবশ হয়ে ঝুলি থেকে কিছু দিয়ে যান।

গেছেন দিয়ে বৈকি না চাইতেই।

ছোট রেশনের ব্যাগ থেকে দৈব-জন্তু (হ্যাঁ, দৈব আছেন বৈকি, সন্ন্যাসীরা তাঁরই দূত নয় ?) জিনিষ ক'টা আর একবার বের করল বটকৃষ্ণ। দু'টি ছোট-বড় তুলসীর মালা। একটি ঘাড় পর্যন্ত জটার পরচুলা, বেশ চাপ-জটা। একটি গেরুয়া-রঙের ন্যাকড়া, হাত-দুয়েক লম্বা। একটি গেরুয়ায় ছোবানো সিল্কের লুঙ্গি, প্রায় এক মুঠোর মধ্যে এসে যায়। একটা শিশিতে খানিকটা কিসের গুঁড়ো, একটু আটা-আটা ; নিশ্চয় তিলক করবার জন্য। আজ বাবাজীর পরণে ছিল রক্তাম্বর, মাথার জটা পিঠ পর্যন্ত নেমে গেছে, কপালে মোটা গোলা সিঁদুরের টিপ। বিখ্যাত তান্ত্রিক পীঠস্থান বামাক্ষ্যাপার তারাপীঠের মেলায় যাচ্ছেন। নদীয়া বা কালনায় গেলে আবার এই র‍্যাশন ব্যাগের ভেক বেরুত। বষ্টুমী।

প্রায় সমস্ত ভিড়টাই তারাপীঠ রোডে, সাড়ি খালি করে নেমে গেলে এইটে পেল বটকৃষ্ণ, তার পায়ের কাছেই পড়ে ছিল। ভিড়ের চাপে হাত ফিরিয়ে ... সন্ন্যাসীর। টের পেলেও আর ... ...

... বা কি? তুচ্ছ ব্যাগম ব্যাগের পরিবর্তে-... যেন স্ফীতোদর মনি-ব্যাগ একখানি।

...হাসি পায় বটকৃষ্ণর; তা এটা এমন করে ঘরে ...চ্ছে কেন? যথা লাভ? আক্রোশ? জমা দেবে পুলিসে? গোড়ায় তাই ভেবেছিল, আক্রোশেই! গাড়ি থেকে নেমে জমা দিয়ে দেবে। একটা ক্লু (Clue); খুঁজে বের করবার সূত্র পুলিসের। ভাগ্যিস্ এর ওপর আর ও দুর্বুদ্ধিটুকু হয় নি! তা হ'লেই একেবারে চারপো। না, বেশ আছে। এবার নিজের ওপর আক্রোশেই নিজেকে শুনিয়ে বলল বটকৃষ্ণ—"না, খবরদার নয়! ইস্, সামান্য? আর্থিক মূল্যই একান্ন টাকা চল্লিশ নয়া পয়সা, তার ওপর একরাত্রির তপস্যা আছে অনশনে অনিদ্রায়। এমন দৈবলব্ধ বস্তু কথনও···।'

—ধড়াস্ ধড়াস্ করে উঠল বুকটা হঠাৎ। খাওয়া-দাওয়া সেরে এঘরে এসেছে ক'জন গল্প-গুজব করতে করতে। খুললেই হ'ল জানলা একটা। এদিকেরটা আবার প্রায় সামনা-সামনিই পড়ে। যতটা পারল গুটিয়ে-সুটিয়ে কোণ ঘেঁষে বসল বটকৃষ্ণ, নিঃশ্বাসও একরকম বন্ধ করেই।

বোঝা গেল এত বিলম্বের কারণটাও। এ-বাড়ীর সবাই আজ তারাপীঠের মেলায় গিয়েছিল। সন্ধ্যার পর ফিরে রান্নাবান্না ক'রে খাওয়া-দাওয়া সারতে তাই এত দেরি হয়ে গেছে। কণ্ঠস্বরের বৈচিত্র্যে মনে হ'ল পরিবারটি বড়ই। তারাপীঠের আলোচনাই চলছে। কে কি দেখল, কিভাবে দেখল। ছোটদের মুখে রং-তামাসার বর্ণনা। বড়দের ...নে তীর্থযাত্রার প্রভাব। মাঝে মাঝে অলৌকিকত্বের দিকেও চলে যাচ্ছে।—

"মা'র দয়া আর কাকে বলে দিদিমা? বীরুর যা অবস্থা, কোন আশা ছিল যে আসতে পারব? অথচ ...ন ভয়ানক টানছে। শেষকালে নিজে হ'তেই মনে হ'ল, ...কে কেউ বলেই দিলে—মাথা ত গুলিয়ে রয়েছে তখন—...লে দিলে—'কেন, মায়ের কাছে যাবি ত' মায়েরই মানত ...র না'···"আজ মাংসটা-খাসা রেঁধেছিল বিন্দু।"···মেটা ...ছেলের গলা, যেন পেটে হাত-বুলাতেই একটা ঢেঁকুর তুলে ...বললে—'তেতেপুড়ে এসে যে এমন চমৎকার···ঢে-উ-উ।···'

"আমি রেঁধেছি! মায়ের মহাপ্রসাদ ও আপনিই হ'য়ে ...য়।"···"ঐ, ঐখানটায় তোদের সঙ্গে একমত হতে পারলাম না এখনও। ছেলের অসুখ সেরে গেল ডাক্তার-বদ্যি ছেড়ে মা'র ক্রেডিট। আমরাই ত দিয়েছি কেন বাবা? ছাগশিশুটির মুণ্ডপাত করবার জন্তে?··· মাংস উৎরে গেল, সেখানেও মায়ের কল। যেন তিনি এসে তোর ঘাড়ে ভর হয়ে রেঁধে দিয়ে গেছেন।"··· "আমার অত ভাগ্যি হবে?"···"তাও করেন। ভয়ও না নিজে এসে বেড়া বেঁধে দিয়ে যান।"···"কেন, তুমি নিজে ত অবিশ্বাস কর না অনাদি। এ তোমাদের আধুনিক আধুনিকাদের একটা ষ্টাইল—বিশ্বাস কর বলেই সেটাকে বাধা দিতে যাও। বরং বলব যে নাকি যত বিশ্বাস করে তার তত বেশি বহ্বাস্ফোট। বিশ্বাস কর না ত গিয়েছিলে কেন সঙ্গে?"···"হ্যাঁ, এবার দাও উত্তর।"···"বাঃ, মেসোমশাইয়ের যেমন কথা—গিয়েছিলাম, সুতরাং করতেই হবে বিশ্বাস! তামাসা দেখতে যায় না লোকে?"··· "তোমায় প্রণাম করতেও দেখেছি। আমি লক্ষ্য রাখছিলাম।" একটু থতমত খেয়ে গিয়ে—"ওটা—ওটা মাস মেন্টালিটি (mass mentality), ভিড়ের মধ্যে, সবাই যা করে আপনি হয়ে যায় সেরকম—নিখরচার একটা প্রণাম রেখে দেওয়া।"···"একটা চার আনি না আটআনি লুকিয়ে ছুঁড়ে দিলে।"···"ওটা-ওটা···"

হাসির মধ্যে চাপা পড়ে গেল কথাটা, তারপর একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে অনাদির দাপট আরও বেড়ে গেল। —"বাঃ, পয়সা দিয়েছি কতকগুলা লোক দেখাশোনা করছে, তাদের পাওনা। এর জন্তেই বিশ্বাস করতে হবে—আপনাদের মেয়েকে কে যেন ডেকে বললে ইত্যাদি, কিংবা মা কালী এসে রামপ্রসাদের বেড়া বেঁধে দিলেন? ওসব নিজের মনের রিফ্লেক্স (Reflex)—যেটা চিন্তা করছি সেইটে ঐভাবে একটা ধোঁকার সৃষ্টি করে। ধোঁকাই, পিওর এণ্ড সিম্পল্ (Pure and Simple)"···"ওদের মেয়েই শুধু?"—এটা বীরুর মায়ের গলা, বক্তার স্ত্রী বলেই মনে হচ্ছে। বলছে, "তুমিও ত বললে, দু'দিন থেকে স্বপ্ন দেখছ কে যেন এক সন্ন্যাসী এসে···"···"সেও ঐ রিফ্লেক্স—তীর্থ, সন্ন্যাসী, সমস্ত বাহুল্য নিয়ে তুমি এমন একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করে দিয়েছিলে বাড়ীতে যে···"

মেসোমশাই অর্থাৎ মাসুবক্তাই পূরণ করে দিলেন—"যে, আমার মতন অবিশ্বাসীকেও স্বপ্ন দেখিয়ে, মাথা ঢুকিয়ে

…বেহাল করে ছাড়লে। নাও, ঢের
…য়েছে, এবার ঘুমোওগে, সব ক্লান্ত
…য়ে রয়েছ।…জানলা একটা খুলে
…ই না? কেমন যেন ভেপ্‌সে
…য়েছে ঘরটা।”

শরীরটা আলগা হয়ে গিয়েছিল …টকৃষ্ণের, একটু এগিয়েও এসেছিল, …াবার তাড়াতাড়ি সিঁটকে-মিটকে …কোণ-ঘেঁষে বসল। ওঁর কথাতেই আবার সামলে গেল—“নাঃ, থাক, কাচ্চাবাচ্চাগুলো রয়েছে, নতুন ঠাণ্ডা।…চল, শুয়ে পড়ি গে আমরা।”

বেশ অন্যমনস্ক ছিল খানিকটা, আবার নিজের চিন্তায় ফিরে এল …টকৃষ্ণ—নূতন খানিকটা খোরাকও …পল ত মনটা। বেশ চলছে সংসারটা …শ্বাস-অবিশ্বাসের জোট পাকিয়ে— …টে যেন আরও মজার লাগে, …সোমশাই যেমন বললেন, যার যত …শ্বাস তার আবার তত বেশী …বিশ্বাসের ভড়ং। কিন্তু ওটা কি …শ্বাস?—বিশ্লেষণ করে দেখবার …ষ্টা করছে বটকৃষ্ণ—না, ভীরুতারই …মান্তর—অবিশ্বাসের চেয়েও নীচের …রের?…আচ্ছা, একটা ধাক্কা দিলে …মন হয় এই সময়।

—মাথায় যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল, …ঠে বসল সোজা হয়ে বটকৃষ্ণ। …মৎকার আইডিয়া—এক সঙ্গে আহার, …াত্রিবাস!…ও দুটো এখন উপস্থি- …ওনা; এখন সবচেয়ে বুদ্ধ করছে …মাতা-বাবাজীকে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা। …আর কিছু না হোক, চমৎকার …টি অভিনয়। উত্তেজনায় শরীরটা

দরজায় ঘা দিয়ে ডাক দিল—কুমুদ কি নিদ্রিত?

কেঁপে উঠছে, কোনমতেই লোভ সামলাতে পারছে না বটকৃষ্ণ।

আর দেরি নয় তা হ'লে।

সিল্কের লুঙ্গিটা পরে, গলায়, ডান হাতে তুলসীমালা জড়িয়ে, মাথায় জটার পরচুলাটা ভাল ক'রে এঁটে দিল। চমৎকার ফিট করেছেও। ন্যাকড়াটাও কপালের ওপর জড়িয়ে নিল, ওটা নিশ্চয় পরচুলাটা টাইট রাখবার জন্যেই জুগিয়ে রাখা। গুঁড়ো হরিচন্দনের টীকা তুলে দিল কপালে, নাকে একটা রসকলিও, বেশ কায়দে বসেছে মনে হ'ল। একটু দ্বিধা আসেই। কাটিয়ে নিল সহজেই। না, আমরা ত জীবন-নাট্যের অভিনেতাই সব। কে চালায়—কখনও সুবুদ্ধি দিয়ে—সরস্বতী; কখনও দুর্বুদ্ধি, দুষ্টু সরস্বতী। আজ দুষ্টু সরস্বতী হয়ে ভর করেছে—সন্ন্যাসীকে পাশে ডাকিয়ে আনিয়ে এই সমস্যার সৃষ্টি করেছে, এখন সেইরূপেই সে যদি সমস্যা-মোচন করতে চায় ত মন্দ কি? তার ওপর ছেড়ে দিল বটকৃষ্ণ।...একটি বেশ কৌতুকপ্রিয় ছোট্ট মেয়ে কাঁদিয়ে-হাসিয়ে বেড়াচ্ছে... কেমন জুগিয়েও রেখেছে সরঞ্জাম সব!

এই রকেরই শেষে বাড়ীর সদর দরজা। কাপড় আর পাঞ্জাবি রেশন-ব্যাগে পুরে, বাদামি-রঙের র‍্যাপারটা আলগা ভাবে জড়িয়ে নেমে পড়ল বটকৃষ্ণ। দরজায় ঘা দিয়ে ডাক দিল—"গৃহস্থ কি নিদ্রিত?"

আরও গোটা দুই ঘা দিতে হ'ল, তারপর—"কে?"

আশ্চর্য যোগাযোগ, জামাই অনাদিরই গলা।

বটকৃষ্ণ বলল, "একবার বাইরে আসবেন কি?"

এগিয়ে আসার শব্দ হ'ল, তারপর দোরের কাছে দাঁড়িয়ে পড়ে আবার—"কে?"

এ ঘর থেকেও নারীকণ্ঠে প্রশ্ন হ'ল—"কে?"

ওদিককার ঘর থেকে মেসোমশাইয়েরও।

বটকৃষ্ণ উত্তর করল, "একটু আশ্রয় ভিক্ষা করছি রাতটুকুর জন্যে।"

ডান হাতে সিগারেট অনাদির। গুরুস্থানীয়েরা ঘরে যেতে উঠানে নিশ্চিন্ত হয়ে টানছিল, বাঁ-হাতে অর্গলটা টেনে একটা পাল্লা খুলেই অবাক্ হয়ে চেয়ে রইল। একটু হুঁশ হ'তেই সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রশ্ন করল, "সন্ন্যাসী!"

বলে বলে ঘুরে উঠানে এসে ডাক দিল—"মেসোমশাই, দিদিমা, মাসিমা দেখুন এসে কে এসেছেন।...তুমিও এসো গো! "বিন্দু আয়।"

গলাটা কেঁপে কেঁপে যাচ্ছে।

ততক্ষণে বেরিয়ে পড়েছে সবাই; বটকৃষ্ণও অনাদির পেছনে পেছনে উঠানে এসে দাঁড়িয়েছে। বিস্ময়ে, সম্ভ্রমে সবার গলা গেছে চেপে—"সন্ন্যাসী-ঠাকুর!...বাবাজী!!"...

অমায়িক হাসি বটকৃষ্ণের মুখে—"সে-কথা কি জোর করে বলতে পারি বাবা-মায়েরা? তবে ওপরের ভেকটা তাই বৈ কি।...রাত হয়ে গেছে, ভাবলাম সৎগৃহস্থের বাড়ীতে যদি আশ্রয় পাই একটু—রক্, উঠোন,—যেখানেই হোক..."

বিস্ময় কাটিয়ে সম্বিৎ হতে একটু দেরিই হ'ল, তারপর মেসোমশাই-ই বললেন, "সে কি! মাথায় তুলে রাখবার ধন! আসুন-আসুন!"

একটু বাধা পড়ল। পায়ের ধূলা নেওয়ার ধুম পড়ে গেছে। আরম্ভ করেছে অনাদিই, বেশ চেঁচে পায়ের ধূলা, মাসশ্বশুর দেখছেন কি না-দেখছেন খেয়াল নেই। তবে একটা গণ্ডি টেনে দিল বটকৃষ্ণ। মেসোমশাই এগুতে এক পা পেছিয়ে বলল, "গুরুর বারণ, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রণাম নেওয়ার অধিকার এখনও হয় নি বাবা।"

কর্তার বড় ঘরটাতেই নিয়ে যাওয়া হ'ল। একটা সোফায় বসিয়ে নিচে ঘেরেঘুরে বসল সবাই। ফিস্‌ফিসানি চলছেই। শুধু অনাদির মুখেই কোন কথা নেই। অভিভূত হয়ে বসে আছে। কম বেশী ক'রে সবারই অবস্থা অবশ্য তাই, আলোচনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সন্ন্যাসী একেবারে সশরীরে উপস্থিত! অলৌকিক কাণ্ডই ত!

গিন্নী, বিন্দু আরও কয়েকজন মেয়ে হেঁসেলের দিকে চলে গেছেন। প্রাথমিক প্রশ্নাদি মেসোমশাই করছেন, কোথা থেকে আসা হচ্ছে, কোথায় যেতে হবে, এত রাত হ'ল কেন? উত্তর তৈরীই ছিল, ব'লে যাচ্ছে বটকৃষ্ণ। তার মধ্যে বিন্দু এসে প্রশ্ন করল, "জিজ্ঞেস করলেন, খাওয়ার বিষয় কোন বাছবিচার আছে?"

"কিছু নয় মা। তোমরা আবার হাঙ্গাম করতে গেলে নাকি? কিছু দরকার নেই। ফল-কন্দ কিছু নেই? তাইতেই হয়ে যাবে। না-হয় না-ই হ'ল কিছু, একটা রাত..."

"তা কি হয়!"—মেসোমশাই শিউরেই উঠলেন,

বললেন, "সবাই মিলে তোমরা···আজকের রান্নারও কিছু যদি থাকে···"

"মহাপ্রসাদ আর পায়েস আছে। লুচির ময়দা মাখা হয়ে গেছে।"

"ঐ মাংস···ইয়ে মহাপ্রসাদ আর লুচি, পায়েস···"

অনাদি উদ্দীপ্ত হয়েই বলেছে, মেসোমশাই প্রশ্নের দৃষ্টিতে বটকৃষ্ণের দিকে চাইলেন। সেকেণ্ড দু'য়েকের দ্বিধা। এই মাংসের গন্ধই তখন ক্ষুধাটাকে অমন করে চাগিয়ে তুলেছিল। সেকেণ্ড দু'য়েকের মধ্যেই কিন্তু হাসি টেনে নিয়ে এসে বলল, "তা কি পারি বাবা? বৈষ্ণব-শাক্ত ভেদাভেদ অবশ্য মনের অবিদ্যাই একটা, তবু কণ্ঠী ধারণ ক'রে মাংস···"

"না, না, তোমরা তাড়াতাড়ি যা পার, টাটকা তোয়ের ক'রে দাও। রাত ক'রো না।"

"দুটো উনুন ধরিয়েছি, স্টোভটাও জ্বেলে নিচ্ছি।"—হন্ হন্ ক'রে চলে গেল বিন্দু।

আবার আরম্ভ হ'ল গল্প। সবার সঙ্গে নীচেই ব'সেছিল অনাদি। আপনিই হোক, আর ইচ্ছা করেই হোক, হাত দুটি কোলের ওপর যুক্ত হয়ে রয়েছে, মেসোমশাই লক্ষ্য করছেন কি না হুঁশ নেই। এক সময় মনের সবচেয়ে বড় প্রশ্নটা আর চেপে রাখতে না পেরে বলল, "একটা কথা, যদি আদেশ দেন।"

"কি বল,। এমন ভাবে হাসলবটকৃষ্ণ যেন প্রশ্নটা হবে জানাই।

অনাদি বলল, "আমি দু'দিন স্বপ্ন দেখলাম যেন এক সন্ন্যাসী···।"

"আমিই কি? ভাল করে দেখ ত।" হাসিটুকু ঠোঁটে রেখে মুখের পানে চেয়ে রইল।

"আজ্ঞে, স্বপ্নে দেখা, ঠিক ঠাহর করতে পারছি না।"

"তুমি অনাদি ত?" একটু জোরেই হেসে উঠল এবার একটা ওর অবস্থা দেখে, কতকটা নিজের অভিনয়-দক্ষতাতেই। তবে বেশ থামিয়েই গেল।"

প্রশ্ন করল—"বীরু আছে কেমন?"

একেবারে নির্বাক্ হয়ে গেছে সবাই। মেসোমশাই বললেন, "আপনিই ত ভাল ক'রে দিলেন বাবা।"

"এই ত হয়! কার মানত ক'রে তার হ'ল, কে পেল যশ।"

আবার বেশ জোরেই উঠল হেসে। ভাগ্যিস্ এক একটা পেয়ে যাচ্ছে, নইলে যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে, হাসি আসাটাই দায়ই হয়ে উঠেছে।

একটা সুবিধা, কেউ বেশি প্রশ্ন করতে সাহসই করছে না, কিংবা এত প্রশ্ন যে কোন্‌টা আগে করবে বুঝে উঠতেই পারছে না। সুযোগও দিচ্ছে না বটকৃষ্ণ, ধর্মতত্ত্ব নিয়ে বাঁধা গৎ এখানে-ওখানে যা শোনা আছে, তাই নিয়েই চালিয়ে যাচ্ছে সময়টুকু ভরে দেওয়ার জন্য। যোগবলে জানার মধ্যে ত তিনটি নাম—অনাদি, বিন্দু আর বীরু; আর বীরুর অসুখ। প্রশ্ন বাড়াতে আর সাহস হচ্ছে না। তারপর হাত দেখা এসে পড়বে, তারপর কত কি।

আহার সারতে রাত প্রায় একটা হয়ে গেল ···আহারের সময় কথা কয় না, গুরুর নিষেধ, এখনও অধিকার পায় নি।

ব্রাহ্মমুহূর্তে, অন্ধকার থাকতেই বেরিয়ে যেতে হবে, তারপরে এখনও ছাতের, কিংবা কোন রকম আচ্ছাদনের নীচে থাকা মানা গুরুর। এখনও অধিকার পায় নি।

তাই গেলও। আর-সব না-হয় চলতে পারে, কিন্তু পরচুলার ওপর কতটুকু ভরসা?

হচ্ছে বৈ কি একটু অনুতাপ। ভেবেছিল ফিরে সব কথা লিখে পাঠাবে। যোগী না হোক, সত্য-মিথ্যায় গ'ড়ে-ওঠা মানুষই, তবু তার একটা বিবেক আছে ত। লিখল না শুধু ঐ অনাদির বদ্ধাঞ্জলির জন্য। বিশ্বাসী ভালই, অবিশ্বাসীও এক রকম বরদাস্ত হয়; বরদাস্ত হয় না শুধু তাদের, যারা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দু' নৌকায় পা দিয়ে গলাবাজি ক'রে বেড়ায়; বটকৃষ্ণ নিজেও অনেকটা ঐ দলেরই হ'লেও।

লিখল না। ভাবছে, থাক না ব্যাপারটা ঐ ছুঁড়ী মেয়েটিরই হাতে।

মিসেস হাটন বাস থেকে নেমেই দাঁড়িয়ে পড়লেন।

সারাটা রাস্তা জুড়ে একটা থমথমে ভাব। অন্যদিন এই সময়ে দলে দলে মেয়ে-পুরুষে রাস্তা ছেয়ে থাকে। ভিড় ঠেলে ঠেলে বাচ্চাদের নিয়ে মায়েরা কেনাকাটা করতে বেরোয়। আজ রাস্তা ফাঁকা। কচিৎ দু'একটা লোককে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু তারাও খুব স্বচ্ছন্দ নয়। এদিক্-ওদিক্ চেয়ে বিদ্যুৎগতিতে রাস্তা পার হয়ে নিজেদের ডেরায় গিয়ে ঢুকছে। মোটর যা দু'-একটা যাচ্ছে, শম্বুকগতি নয়, সন্ত্রস্ত গতি। কোনরকমে এলাকাটা পার হ'তে পারলে যেন বাঁচে। যদিও নির্দেশ রয়েছে মোটর ধীরে চালাবার, কারণ মোড়েই একটা ছোটদের স্কুল।

এই থমথমে আবহাওয়ার কারণ মিসেস হাটনের অজানা নয়। কাল বিকালের কাগজেই কিছু বার্তা ছিল। আজ বিকেলেও, যে কাগজটা মিসেস হাটনের হাতে রয়েছে, তাতেই কিছু কিছু খবর রয়েছে।

এদিক্-ওদিক্ চেয়ে মিসেস হাটন এগোতে আরম্ভ করলেন।

ইচ্ছা ছিল, অফিসের পর একবার চুল কোঁকড়াবার সেলুনে যাবেন, সেখান থেকে মেয়েদের ক্লাবে। তবু সন্ধ্যাটা কেটে যেত! কিন্তু এই অনিশ্চিত আবহাওয়ার জন্ম সাহস করলেন না। পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে আছে, যে-কোন মুহূর্তে বিশৃঙ্খলা সুরু হ'তে পারে। তা হ'লেই মিসেস হাটন আটকে পড়ে যাবেন। বাড়ী ফিরতে পারবেন না।

সন্ধ্যার অন্ধকারে ঐ দানবগুলোকে বিশ্বাসও করা যায় না। শয়তানের অনুচর। ওদের অসাধ্য কাজ নেই।

দাঁতে দাঁত চেপে মিসেস হাটন কঠিন একটা শপথ উচ্চারণ করলেন। এই অদ্ভুত জীবগুলো সৃষ্টিকর্তা কি বিচিত্র খেয়ালে যে তৈরি করেছেন, তিনিই জানেন।

পারতপক্ষে মিসেস হাটন এদের ধারে-কাছে ঘেঁষেন না। ক্যাবের প্রয়োজন হ'লে ড্রাইভার দেখে তবে গাড়িতে ওঠেন। তাঁর বাড়ীতে ঝি-চাকর রাখার পাঠ নেই। একজন মানুষ। রান্নাবান্না, সংসারের অন্যান্য কাজ নিজের হাতেই করেন।

এদিক্-ওদিক্ দেখতে দেখতে মিসেস হাটন রাস্তাটা পার হয়ে নিলেন।

এ পাড়াটা মোটেই সুবিধার নয়। রাস্তার ওপারে একপাল কালো শয়তানের বাস। শুধু যে তারা এদেশের লোকের পরিচ্ছদই গ্রহণ করেছে এমন নয়, তালে তালে পা ফেলে সব বিষয়ে তারা শ্বেতাঙ্গদের সমান হ'তে চায়। আকাশচুম্বী স্পর্ধার কথা ভাবলেই মিসেস হাটনের মাথায় রক্ত চ'ড়ে যায়।

এক গির্জায় তারা যাবে, এক স্কুল-কলেজে পড়বে, এক বার-রেস্তঁরায় পাশাপাশি বসবে, কোনদিন হয়ত বলবে, এক কবরখানায় কবরও দেওয়া হোক্ তাদের। একেবারে সামাজিক সমাধি।

স্টুপিড! মিসেস হাটন ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে রুমালটা বার ক'রে মুখটা মুছে নিলেন। সমস্ত শরীর উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে শিরার জাল ছিঁড়ে শোণিত যেন শত ধারায় চারদিকে ছিটকে পড়বে।

এর জন্ম শ্বেতাঙ্গরাও কম দায়ী নয়। মাঝে মাঝে এক-একজন মহাপুরুষের মুখোস পরে আবির্ভূত হন। দরাজ কণ্ঠস্বরে সাম্যবাদের বুকুনি প্রচার করেন, আর সাম্যবাদের সেই পিল শয়তানগুলো নির্বিচারে অনুকরণ ক'রে তাদের তারা শ্বেতাঙ্গদের সমপর্যায়ের।

এই নিয়েই সুরু।

দিন ছয়-সাত আগে 'ব্লু ঈগল' রেস্তঁরায় গোলমাল আরম্ভ। বিকেলে জমজমাট আসর। নাচ গান হৈ-হল্লা। তার মধ্যে মূর্তিমান রসভঙ্গের মতন স্যামসন গিয়ে হাজির।

স্যামসনকে এ তল্লাটে সবাই চেনে। কারখানার মিস্ত্রী। শালপ্রাংশু চেহারা। নিরেট গড়ন। তবে ঠাণ্ডা ভদ্রলোক। কারও সাতে-পাঁচে থাকে না।

এতদিন অবশ্য মিসেস হাটনের সেই ধারণাই ছিল, কিন্তু লোকটার পেটে পেটে এত শয়তানি তা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি।

সোজা রেস্তঁরায় ঢুকে একেবারে উইলিয়ামসনের পাশে গিয়ে বসল। গায়ে গা ঠেকিয়ে।

আশ্চর্য কাণ্ড! বাইরে সাইনবোর্ডের পাশে স্পষ্ট অক্ষরে লেখা আছে, এ রেস্তঁরায় কৃষ্ণকায় লোকদের প্রবেশ নিষেধ। স্যামসন অনেকদিন এ পাড়ায় আছে। এ নিষেধাজ্ঞা তার নজর এড়াবার কথা নয়।

তা ছাড়া কৃষ্ণাঙ্গদের জন্ম আলাদা একটা রেস্তঁরা রয়েছে গলির শেষে। প্রিন্স। দল বেঁধে ওরা সবাই ওখানেই যায়। সারা রাত মাঝে মাঝে হুল্লোড় করে। এদিকে কোনদিন আসে না।

মিসেস হাটনের বুঝতে একটুও অসুবিধা হ'ল না, ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত।

মাসখানেক আগে থেকেই সংবাদপত্রে উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতার আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। পার্কে, সভায়, বাড়ীর বৈঠকখানায় কথার স্ফুলিঙ্গ। এক দেশের অধিবাসী, এক পরম পিতার সন্তান হয়েও কেন তারা এভাবে মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে? শুধু চামড়ার রংয়ের একটু ইতর-বিশেষ আছে, নয়ত দু'জনেরই রক্তের রং লাল। এ ভেদনীতি তারা মানবে না।

তারা যে মানবে না, স্যামসনের 'ব্লু ঈগল'-এর ভিতরে ঢোকা তারই একটা অঙ্গ। গায়ের জোরে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা।

কিন্তু স্যামসন সফল হয় নি।

সফল যে হয় নি এ কথাটা ভাবতেও মিসেস হাটনের

খুব ভাল লাগল। এক স্যামসনকে আস্কারা দিলে, হাজার স্যামসন এগিয়ে আসত। শ্বেতাঙ্গদের মর্যাদা, সম্মান কিছুই অবশিষ্ট থাকত না।

'ব্লু ঈগল'-এ সমাগত সবাই দাঁড়িয়ে উঠেছিল। চিৎকার ক'রে ডেকেছিল ম্যানেজারকে।

এ নিগারকে এখনই বাইরে বের ক'রে দিতে হবে। এ এখানে ঢুকল কি করে?

ম্যানেজার রিচার্ডসন রান্নাঘরে তদারক করছিলেন, হল্লা শুনে ছুটে এলেন।

একেবারে স্যামসনের ঘাড়ে হাত দিলেন।

স্যামসনের তুলনায় রিচার্ডসনের শরীরের কাঠামো একটা খেলার পুতুলের মতন। ইচ্ছা করলে স্যামসন এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত ক'রে নিতে পারত, কিন্তু তা করে নি।

সবাই আশা করেছিল হাতাহাতি একটা আরম্ভ হবে, তাই অনেকেই হাতের কাছে যা পেয়েছিল তাই নিয়েই রুখে দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু স্যামসন শান্ত, নিরুত্তেজ কণ্ঠে শুধু বলেছিল, কেন এ রেস্তঁরায় আমার, আমাদের ঢোকবার অধিকার নেই, তাই শুধু আমাকে বুঝিয়ে দিন। আমার গায়ের চামড়া আপনাদের চামড়া থেকে কম উজ্জল, এই যদি একমাত্র কারণ হয়, তা হ'লে বুঝব, এখনও আপনারা মধ্যযুগে বাস করছেন। মানুষের মূল্য তার চামড়ার ঔজ্জ্বল্যে নয়, তার মনুষ্যত্বে, ঔদার্যে, প্রেমে, ত্যাগে, ক্ষমায়। নিগ্রোজাতি কোন অংশে আপনাদের চেয়ে হীন নয়, এ কথাটাই আপনাদের বোঝাতে চাই।

একেবারে আচমকা। স্যামসনের কথাগুলো শেষ হবার আগেই সবাই মিলে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কলার ধরে তাকে মেঝের ওপর শুইয়ে ফেলে অন্তহীন কিল, ঘুষি বৃষ্টি। দু'একজন পর্দা খুলে লোহার ডাণ্ডাও ব্যবহার করেছিল।

অচেতন স্যামসনের দেহটা পা দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে রেস্তঁরার দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল।

মিষ্টার হার্বার্টের কাছে ঘটনাটা শুনতে শুনতে মিসেস হার্টন আনন্দে করতালি দিয়ে উঠেছিলেন। যাক্, আমেরিকানদের মধ্যে এখনও শৌর্য-বীর্যের অভাব ঘটে নি।

সাম্যবাদের ধুম্রজালে তাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয় নি এখনও নিগারদের গায়ে গা ঠেকিয়ে বসাকে এখনও তারা যথেষ্ট অপমানজনক মনে করে।

তার পর থেকেই একটু একটু ক'রে গণ্ডগোল সুরু হ'ল।

সেন্ট মেরীস্ হোম। এ অঞ্চলের নামকরা স্কুল। এক দিন সকালে ছাত্রী, শিক্ষিকা সবাইকে চমকে দিয়ে ক্যাথারিন তার মেয়েকে নিয়ে সেখানে হাজির হ'ল।

কি ব্যাপার? হাই পাওয়ারের চশমার অন্তরালে মিসেস পাওয়েলের দুটো চোখ জ্বলে উঠেছিল।

মেয়েটাকে ভর্তি করার জন্য নিয়ে এলাম। ক্যাথারিনের নির্লজ্জ হাসি অম্লান।

কিন্তু এখানে কেন? এ স্কুলে কেন? তোমাদের জন্য ত আলাদা শিক্ষালয় রয়েছে?

রাগে, উত্তেজনায় মিসেস পাওয়েলের কথা আটকে গেল। চেয়ারের হাতল আঁকড়ে ধ'রে কোনরকমে তিনি নিজেকে সামলালেন।

আলাদা শিক্ষালয়ের কি দরকার? আমার মেয়েও ত এ দেশের নাগরিক। এ দেশের সব স্কুলে পড়ার অধিকার তার আছে।

মুখস্থ-করা সংলাপের মতন ক্যাথারিন আউড়ে গিয়েছিল।

এবারে মিসেস পাওয়েল দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন। সমস্ত ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন। এরা দল বেঁধে আক্রমণ করতে চায়। পুরণো সংস্কার, পুরণো সমাজব্যবস্থা পালটে দেবার জন্য এরা বদ্ধপরিকর। এরা সব এক মতলব নিয়ে কাজ সুরু করেছে।

হাত বাড়িয়ে টেলিফোনটা তুলে নিয়ে মিসেস পাওয়েল পুলিসে খবর দিয়েছিলেন।

আশ্চর্য, ক্যাথারিন একটু ভীত হয় নি। সামান্য বিচলিতও নয়। মেয়ের হাতটা আঁকড়ে ধরে ঠিক এক জায়গায় দাঁড়িয়েছিল।

দু'-একবার শুধু বলেছিল, আপনাদের সঙ্গে আমাদের তফাৎটা কোথায় বলতে পারেন? সব জায়গায় এই রকম ভিন্ন ব্যবস্থা কেন আমরা মানব?

পুলিস এসে একটুও সময় নষ্ট করে নি। ক্যাথারিনের

াঁধে একটা হাত রেখে ইশারায় তাকে বাইরে বেরিয়ে যেতে
লেছিল।

ক্যাথারিন শোনে নি। বরং মেয়ের একটা হাত আরও
মুঠিতে ধ'রে বলেছিল, ঠেলে হয়ত আমাদের সরিয়ে
বে তোমরা। যুগ যুগ ধরে তাই দিয়েছ, কিন্তু মনে রেখ,
কা ঘুরছে। আমাদের ধাক্কা দিতে গিয়ে তোমরাই ধাক্কা
চ্ছ বেশী। অবশ্য বিবেক বলে তোমাদের যদি কিছু
াকে।

পুলিস এত কথা শোনে নি। বোঝেও নি। দু'দিক
কে ক্যাথারিনের দুটো হাত ধরে তাকে টানতে টানতে
াইরে নিয়ে গিয়েছিল। মেয়েটা মুখ থুবড়ে মেঝের ওপর
ড়ে গিয়েছিল। ঠোঁট কেটে রক্ত ঝরতে সুরু হয়েছিল।
স্ত কেউ এগিয়ে আসে নি। বরঞ্চ মিসেস পাওয়েল
ক্ষকণ্ঠে বলেছিলেন, এই শয়তানের ছা'কেও সরিয়ে নিয়ে
এ কেউ।

স্কুলের একজন পরিচারক মেয়েটাকে ঠেলতে ঠেলতে
কাঠের বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

এ কাহিনী মিসেস হাটন তাঁর এক প্রতিবেশিনীর কাছে
শুনেছিলেন। শুনে অবাক হয়েছিলেন। মনে মনে মিসেস
পাওয়েলের তারিফ করেছেন। শ্বেতাঙ্গদের পবিত্রতা রক্ষার
ব্যাপারে তিনি যে এত সজাগ ভাবতেও আনন্দ হয়েছিল।
এমন শিক্ষিকার সংখ্যা এদেশে যত বাড়ে, ততই দেশের
পক্ষে মঙ্গল।

হঠাৎ রাস্তার ওদিকে একটা গণ্ডগোল শুরু হ'ল।
অনেকগুলো লোকের সম্মিলিত চীৎকার।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সশব্দে দোকানপাট বন্ধ হ'তে
আরম্ভ হ'ল। ফলওয়ালা তার ফলের ঝুড়ি সরাল, ফুল-
ওয়ালী তার ফুলের স্তবক দোকানের মধ্যে নিয়ে গেল।
সব্জিওয়ালা আনাজের পসরা প্রাণপণ চেষ্টায় ফুটপাথ থেকে
উঠিয়ে নিল।

সব পরিষ্কার। এমন কি ওপরের ঘরের দরজা-জানলা
পর্যন্ত পলকের মধ্যে বন্ধ হয়ে গেল।

কোথাও কেউ নেই। শুধু গলির বাঁকে গোলমালটা
বেড়েই চলল।

একটু দ্রুতই চলছিলেন মিসেস হাটন, এবার দৌড়তে
আরম্ভ করলেন। ব্যাপারটা খুবই কষ্টসাধ্য। বয়সের সঙ্গে

মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে মেদ জমেছে শরীরে। জোরে চললেই হাঁপিয়ে ওঠেন।

তবু নিরুপায়। শয়তানদের বিশ্বাস নেই। ওদের অসাধ্য কাজ দুনিয়ায় নেই। দুর্বৃত্তদের নাগালের বাইরে যাবার জন্য মিসেস হাটন ছুটতে লাগলেন।

বাড়ীর কাছাকাছি আসতেই ব্যাপারটা ঘটল।

গোটা তিন-চার নিগ্রো। তাদের পিছনে প্রায় চল্লিশ জন শ্বেতাঙ্গ। ছুটতে ছুটতেই মিসেস হাটন দেখলেন দু'-একটা নিগ্রোর কপাল বেয়ে রক্তের ধারা ঝরছে। পিছন থেকে আর্তকণ্ঠে চীৎকার। একদল নিগ্রো রমণী ইনিয়ে-বিনিয়ে অভব্যভাবে কাঁদছে।

বাড়ীর দরজায় পৌছতে পৌছতেই একটা নিগ্রো ছিট্‌কে এসে মিসেস হাটনের সামনে দাঁড়াল। বোধ হয় মতলব ছিল দরজা খুললেই বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়বে। কিংবা হয়ত দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়েই এদিকে ছুটে এসেছিল।

মিসেস হাটন এক অসম সাহসিক কাজ করে বসলেন। নিগ্রোটা নাগালের মধ্যে আসতেই হাতের বেঁটে ছাতাটা তুলে সজোরে খোঁচা দিলেন তার পাঁজরে। দৈত্যসুলভ ওই দেহে সামান্য একটা খোঁচা হয়ত কিছুই নয়। বিশেষ ক'রে এলোপাথাড়ি মার খাবার পর। নিগ্রোটা টেরও পেল না। কিন্তু মিসেস হাটন প্রচুর আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন। জীবনে এই প্রথম শয়তানের অনুচরের দেহে তিনি আঘাত করতে পেরেছেন। সে আঘাত যত সামান্যই হোক।

নিগ্রোটা আবার রাস্তা পার হয়ে অন্য দিকে ছুটতে লাগল।

মিসেস হাটন ল্যাচ কী দিয়ে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলেন।

উত্তেজনায় হাত-পা তখনও থর থর করে কাঁপছে। কপালের পাশের শিরা দুটো দপ্ দপ্ করছে। নিজেকে বেতের আরাম-চেয়ারের ওপর ছেড়ে দিলেন।

এমন কোন আইন করা যায় না, যার বলে এই নর-পশুদের অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের কোন দ্বীপে চালান দেওয়া যায়। সকাল-বিকাল এদের মুখ দেখতে হয় না, কোন কাজে সাহায্য নিতে হয় না এদের। শ্বেতাঙ্গদের নিষ্কণ্টক জীবনে এদের ছায়াও পড়ে না।

এবারেও পাশের বাড়ীর লোকটিই খবর দিলেন।

মিসেস হাটন অফিস বের হয়ে যাবার পরই হাঙ্গামা শু হয়েছে। শুধু হাঙ্গামা নয়, দাঙ্গাও। তবে অবশ্য কথ দাঙ্গাটা একতরফা। নিগ্রোরা বিশেষ সুবিধা করতে পার না।

ওদের সমস্ত ব্যাপারটা একটাই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। ও যে শ্বেতাঙ্গদের সমপর্যায়ের সেটা দেখাবার জন্য অতিমাত্র উৎসাহী।

এটা অবশ্য ক'দিন আগে থেকেই অফিস যাওয়া-আসা পথে মিসেস হাটন লক্ষ্য করেছিলেন। রাস্তায় দু' পা গাছে গাছে, দীপদণ্ডে ওরা নোটিশ ঝুলিয়েছে। রক্তে রং-এ বড় বড় অক্ষরে।

সাদা আর কালো দুটো জীবই ঈশ্বরের সৃষ্টি। ঈশ্বরে সৃষ্ট পৃথিবীতেও তাই তাদের সমান অধিকার। এ অধিকা একদিন প্রতিষ্ঠিত হবেই।

নিগার। মিসেস হাটন ভ্রূ কুঁচকে অন্তরের সমস্ত বিরক্তি মিশিয়ে উচ্চারণ করেছিলেন।

শুতে যাবার আগে পর্যন্ত মাঝে মাঝে রাস্তায় হল্লা উঠল। নিগ্রো পুরুষদের চীৎকার। নিগ্রো রমণীদের আর্তনাদ। মিসেস হাটন বিশেষ আমল দিলেন না। কেবল দরজাটা ভাল করে বন্ধ করে দিলেন।

বিছানায় ওঠবার আগে ঘুরে ঘুরে নিজের সংসার তদারক করলেন। আজকে চিমনি পরিষ্কার করার কথা। লোক এসে যথারীতি চিমনি পরিষ্কার করে গেছে। পর্দার কাপড়গুলো ময়লা হয়ে গেছে। কাউকে দিয়ে লণ্ড্রিতে পাঠিয়ে দিতে হবে।

একজনের সংসার। ঘুরে ঘুরে তদারক করারই বা কি আছে।

মিসেস হাটন নিঃশ্বাস ফেললেন। নিটোল সবু একটা ছবি বাস্তবের নিকষণ আঁচড়ে নিশ্চিহ্ন। সামনে ধূ ধূ রুক্ষতা। শান্তি পাবার মতন, চোখ জুড়োবার মত কোন আশ্রয় নেই।

সেই জন্যই কাজের দুরন্ত ঘূর্ণিপাকে মিসেস হাটন নিজে জীবনটা বেঁধেছেন।

দিনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল এক মিলেনার লবিতে বাইরে অপ্রান্ত [illegible]। [illegible] হাড় পর্য

পিয়ে যেত। তখন অবশ্য মিসেস হাটন নয়, মিস নেরো। সবে কলেজ-ছাড়া উনিশ বছরের উর্বশী। জীবন-ত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন। বাপের তুলোর চাষ ফরের পর একর জুড়ে। তাতে সবই নিগ্রো কর্মী। কাজে াফিলতি হ'লে মিষ্টার মানরো চাবুক দিয়ে সব শায়েস্তা রতেন। কেউ একটু শব্দ পর্যন্ত করত না। জন্তুর মতন ার্তনাদ করত, কিন্তু একটু প্রতিবাদ নয়।

নিগ্রোদের এই ছবিই মিস মানরো দেখে এসেছেন। তারা যে একদিন মেরুদণ্ড সোজা করে সমান অধিকার দাবি রবে, করতে পারে, এ কথা ভাবতেও পারেন নি।

আপনি কোন্ দিকে যাবেন ?

কানের পাশে গম্ভীর গলার শব্দ শুনে মিস মানরো মকে উঠেছিলেন। পিছন ফিরতেই দেখলেন, দীর্ঘ চহারার একটি সুপুরুষ। মুখে সুমিষ্ট হাসি।

কোন্ দিকে যাবেন মিস মানরো বলেছিলেন। ভদ্র-লাক হেসে বলেছিলেন, আসুন আমার গাড়িতে। আমিও ই দিকেই যাব।

সেই সুরু। তারপর থেকে প্রায়ই দেখা হ'তে লাগল। না ছুতোয়। তারপর সেই মধুর লগ্ন এল। প্রত্যেক নারী জীবনের প্রত্যাশিত পরম মুহূর্ত। কোন দিক থেকে ান বাধা এল না। মিস মানরো রূপান্তরিত হলেন সেস হাটনে।

তার পরের বছরগুলো লঘুপক্ষ বিহঙ্গের মতন উড়ে লে গিয়েছিল। কোথাও কোন ছায়া ফেলে নি। কোন ালিমা নেই। নিস্তরঙ্গ, ক্লান্তিহীন জীবন।

কিন্তু সুখ চিরস্থায়ী নয়। আলোর পর ছায়া, আনন্দের বেদনা, রৌদ্রের পর তুষার, এই পৃথিবীর রীতি।

সেই সর্বনাশা রাতের কথা মিসেস হাটন জীবনে াবেন না।

অফিসের কাজেই বিলকে বাইরে যেতে হয়েছিল। শহর থেকে আড়াই শ' মাইল দূরে। তার কিছুদিন াগেই বিল রোগশয্যা থেকে উঠেছে, তাই মিসেস টনই বলেছিলেন, তোমার ড্রাইভিং ধ'রে দরকার নেই, ং টমকে ভার। সেই চালাবে।

বিল আপত্তি করে নি। টমই ড্রাইভিং ধরেছিল।

বিল যখন ফিরে এসেছিল তখন আর তাকে চেনার উপায় ছিল না। ছিন্ন-ভিন্ন দেহটা সাদা কাপড়ে আবৃত।

টম সম্পূর্ণ অক্ষত। মোটর পিছলে খাদে পড়বার আগের মুহূর্তে টম দরজা খুলে বাইরে লাফিয়ে পড়েছিল।

মিসেস হাটন খিলের দিকে বেশীক্ষণ দেখেন নি, তিনি রোষকষায়িত নেত্রে টমের দিকে চেয়ে ছিলেন। ঈশ্বরের এ কি অদ্ভুত বিচার। একটা মূল্যহীন নগণ্য প্রাণকে বাঁচিয়ে মহামূল্য একটা জীবনকে অপচয় করার কি অর্থ হ'তে পারে ?

মূর্তিমান্ এই শনির দিকে দেখতে দেখতে মিসেস হাটনের শরীর উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। জনকে জড়িয়ে ধরে তিনি আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে চ'লে গিয়েছিলেন।

জন তখন বছর-তিনেকের শিশু। বিল আর তাঁর মধ্যে এই প্রীতি আর প্রেমের সেতুকে বুকে বেঁধে তিনি বাঁচতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু করুণাময় ঈশ্বর তাও দেন নি।

কিছুক্ষণ বিছানায় ছটফট্ করে মিসেস হাটন চোখ বুজলেন। যন্ত্রণাদায়ক অতীত চিন্তা থেকে সাময়িক মুক্তি। তাঁর অবকাশ মুহূর্তগুলো এই এক ক্লান্তিকর ভাবনায় আচ্ছন্ন ভরাট থাকে সর্বক্ষণ।

মাঝরাতে বেশ একটু ঠাণ্ডা। বরফ পড়ার সময় এ নয়, কিন্তু এ দেশে বৃষ্টির কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। আর বৃষ্টি পড়লেই কন্‌কনে শীত।

হাত বাড়িয়ে আধতন্দ্রাঘোরে কম্বলটা টানতে গিয়েই মিসেস হাটন থেমে গেলেন।

তা কি সম্ভব। চেতনালোকের অন্য পার থেকে বঞ্চিত মাতৃহৃদয়ের তৃষ্ণা মেটাতে কেউ কি আসতে পারে!

কিন্তু এ কি কাণ্ড! মিসেস হাটন হাত বাড়াতেই নরম মাংসপিণ্ডটি একেবারে তার কাছে গড়িয়ে এল। বুকের তপ্ত সান্নিধ্যে।

মিসেস হাটন চোখ খুললেন না। চোখ খুললেই এমন মধুর স্বপ্ন নিঃশেষে মিলিয়ে যাবে। এমন স্বপ্ন মানুষের জীবনে বুঝি বার বার আসে না। মিসেস হাটনের জীবনেও এর আগে আর আসেই নি।

মিসেস হাটন উষ্ণ মাংসের আস্বাদে আবিষ্টের

[illegible] নিয়ে আসতেই কচি একটি বাহুর বাঁধনে তিনিও [illegible]।

আঃ, কি তৃপ্তি। ঊষর মাটির বুকে বৃষ্টির জলধারার মত অতৃপ্ত মাতৃহৃদয় স্নান করে উঠল। এ নিদ্রা যেন না ভাঙে, এ স্বপ্ন যেন না টুটে যায়। অন্তহীন সময় পর্যন্ত এমনি দু'জনে বাঁধা থাক হৃদয়ে হৃদয়ে।

অনেক চেষ্টা করেও মিসেস হাটন জনকে বাঁচাতে পারেন নি।

জন চলে যাবার পর তিন দিন তিন রাত তিনি বিছানা ছেড়ে ওঠেন নি। জলস্পর্শ করেন নি। তাকে মাটির তলায় ঘুম পাড়িয়ে রেখে আসার পর সারা পৃথিবী নিঃসঙ্গ মনে হয়েছিল।

জন। গভীর আবেগে মিসেস হাটন উচ্চারণ করলেন। বুকের এতদিনের শূন্যতা যেন পূর্ণ হ'ল। পৃথিবী রঙে-রসে সঞ্জীবিত মনে হ'ল।

অস্পষ্ট একটা শব্দ ক'রে নরম কচি দেহটা বুকের আরও কাছে স'রে এল। কেমন সন্দেহ হ'ল মিসেস হাটনের।

ফর্সা হয়েছে। কাঁচের শার্শির মধ্য দিয়ে আলোর টুকরো এসে পড়েছে বিছানায়। কম্বলটা সরিয়ে উঠে বসার চেষ্টা করলেন। তারপরই পাশের দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখে কঠিন কণ্ঠে বললেন, কে, কে তুই?

নিষ্পাপ শিশু চোখ খুলল না। একই আবেগে সে ঘুমে বিভোর। শুধু হাত দিয়ে মিসেস হাটনের কণ্ঠটি আরও জোরে আঁকড়ে ধরে বলল, মা, মা।

সর্বনাশ! নিগ্রোর বাচ্চাটা গোলমালের মধ্যে কখন বাড়ীর মধ্যে এসে ঢুকেছে। হয়ত বাইরের তাড়া খেয়ে তারপর শীতের প্রকোপ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জৈবিক প্রয়োজনে একেবারে মিসেস হাটনের পাশে, এক কম্বলের তলায় আশ্রয় নিয়েছে।

কিন্তু ভোরের আলোছায়ায় অস্পষ্ট রহস্যে শিশুকে খুব কালো ব'লে মনে হচ্ছে না। জনের কণ্ঠ, তার নবনীকোমল দেহ, তার কাছে টানবার দুর্জয় শক্তি চুরি করে এনে নিগ্রো শিশু মিসেস হাটনের সব কাঠিন্য, ঘৃণা, বিদ্বেষ দ্রবীভূত করেছে। তিনি বুঝতে পারলেন অনেক দিনের সযত্নে গড়ে-তোলা দুর্লঙ্ঘ্য একটা বাধা অপসারিত হচ্ছে।

কণ্ঠলগ্ন এই শিশুকে দূরে সরিয়ে দেবার ক্ষমতা মিসেস হাটনের নেই।

—•—

[illegible]। রেল স্টেশন দূরে।

মহকুমা শহরটিও ষোল-সতের মাইল দূরে। কাছাকাছি কোন সরকারী বড় সড়কও নেই, বলতে গেলে, বিংশ শতাব্দীর জমকালো-সভ্যতা থেকে গ্রামখানি বিচ্ছিন্ন। চারিদিকে কাছে-দূরে আরও কয়েকখানি গ্রাম আছে বটে, সেও এই শ্রেণীর ছোট গ্রাম।

যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে, আজ থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে, গ্রামখানি আরও ছোট ছিল। মাত্র তিরিশ চল্লিশ ঘর অশিক্ষিত দরিদ্র লোকের বাস। স্কুল-কলেজের ঝামেলা ছিল না, জামা-জুতার বালাই ছিল না, ক্ষেত-খামার নিয়ে বেশ শান্তিতেই লোকগুলি বাস করত।

অধিকাংশ বাড়ী মাটির দেওয়াল, খাপড়ার চাল। সামনে ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন উঠান। দেওয়াল ঘেঁষে কোথাও বা একটা মহুয়া গাছ। গ্রামে একখানি মাত্র দালান বাড়ী ছিল, বাড়ীখানা বড়, জানলা অপ্রাচুর্যহেতু বাড়ীখানিকে আটসাঁট দুর্গের মত দেখাত।

দয়ারামকে নামালে—এবং ধরাধরি করে ওপরে তাঁর শয়নঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলে।

দয়ারামের জ্ঞান আছে, কিন্তু কিছুটা জ্বরের জন্তে, কিছুটা এতখানি পথ ঘোড়ার পিঠে আসার জন্তে শরীরটা অবসন্ন। গলা দিয়ে স্বর বেরুচ্ছে না। অমন দরাজ কণ্ঠস্বরও যেন জ্বরের ধমকে কাহিল হয়ে গেছে।

বিছানায় শুয়ে তিনি ইশারায় শুধু একগ্লাস জল চাইলেন।

দিন-দুই কেটে গেল, জ্বর বেড়েই চলেছে।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, এই দু'দিনেই দয়ারাম যেন বদলে গেলেন। তাঁর উদ্ধত রুক্ষ দৃষ্টি ম্লান হয়ে গেছে। মুখে কেমন অসহায় ভাব। যে লোক সর্বদা সকলকে শাসন করতেন আর হুকুম করতেন, তিনি এখন সামান্ত কিছুর জন্তে অনুরোধ করেন—ছেলেকে, বৌদের, এমন কি ঝি-চাকরকে পর্যন্ত।

বেশীর ভাগ সময় চোখ বন্ধ ক'রে নির্জীবভাবে পড়ে থাকেন। মাঝে মাঝে চোখ মেলে ঘরের চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখেন, সব ঠিক আছে কি না। তাঁর এই দীর্ঘ জীবনের সদাসৎ উপায়ের সঞ্চয় এই ঘরটির মধ্যেই আবদ্ধ। তার পরিমাণ সামান্ত নয়। চেয়ে চেয়ে দেখেন, তার কিছু এদিক্-ওদিক্ হ'ল কি না।

জ্বর কমে না।

অন্ত ছেলেদের খবর দেওয়া হয়েছে। দু'একদিনের মধ্যে তারা সবাই এসে পৌছাবে, আশা করা যায়। তারা আসবার আগেই ছোট ছেলে না কিছু সরিয়ে ফেলে, রোগসন্তাপগ্র বৃদ্ধকে সেদিকে খরদৃষ্টি রাখতে হচ্ছে। রোগ যন্ত্রণার চেয়েও এই দুশ্চিন্তা দয়ারামকে আরও কাতর করেছে।

এক সপ্তাহ কেটে গেল, তথাপি রোগের উপশমের কোন লক্ষণ নেই।

পল্লীসমাজ তখন জীবিত। এবং কঠোর তার শাসন। গ্রাম্য পঞ্চায়েতের মাতব্বরেরা কনিষ্ঠ পুত্রকে হুকুম দিলেন, ডাক্তার বোলাও।

বুড়ামানুষের অসুখ, সাতদিন কেটে গেল, আর ডাক্তার না ডাকলে ভাল দেখায় না।

দয়ারাম পুত্রকে কাছে ডেকে ডাক্তার ডাকতে নিষেধ করলেন—মিথ্যে ডাক্তার ডাকা, দয়ারাম বেশ বুঝলেন এ যাত্রায় রক্ষা নেই—এই কঠিন মামলাটি শেষ হওয়া পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারলেই তিনি সুখী হতেন। কিন্তু যমের উপর ত কারও হাত নেই।

কথাগুলো বলতে গিয়ে দয়ারামের চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

বৃদ্ধের বাঁচবার ইচ্ছা অপরিসীম।

কিন্তু পঞ্চায়েতের শাসন বড় কঠিন। কনিষ্ঠ পুত্রকে ডাক্তারের কাছে লোক পাঠাতেই হবে।

সেও সামান্ত ব্যাপার নয়। এ অঞ্চলে একটিমাত্র ডাক্তার—থাকেন মহকুমা শহরে, কিন্ত নেবেন অনেক। তথাপি ধনীর পিতার অসুখে ডাক্তার না ডাকলে ভাল দেখায় না। সমাজে নিন্দা হবে। রাত্রির অন্ধকার থাকতেই টাট্টু ঘোড়াটিকে নিয়ে একটি লোক ছুটল মহকুমা শহরে ডাক্তারের কাছে।

লোকটি ডাক্তার নিয়ে যখন ফিরল, তখন বিকেল বেলা।

এতখানি পথ আসতে ডাক্তার খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। আসায় এত হাঙ্গামা সত্ত্বেও শুধু মোটা ফিসের লোভে তিনি এসেছেন—ছোকরা ডাক্তার। কয়েক বছর হ'ল প্র্যাকটিসে বসেছেন—আসতে রাজী হওয়ার সেও একটা কারণ।

এক গ্লাস ঘোলের সরবৎ খেয়ে সুস্থ হ'তে ডাক্তারবাবুর আধঘণ্টা তিন কোয়ার্টার গেল। তারপর তিনি উঠলেন রোগী দেখতে।

দয়ারাম ঝিমুচ্ছিলেন। ডাক্তারকে দেখে তিনি কিছু বললেন না বটে, কিন্তু মুখে বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠল।

ডাক্তারবাবু অনেকক্ষণ ধ'রে দয়ারামের বুক, পেট, পিঠ পরীক্ষা করলেন। জিভ এবং চোখ দেখলেন—সঙ্গে থার্মোমিটার এনেছিলেন, জ্বরের উত্তাপও নিলেন। তারপর নিচে নেমে এলেন এবং কনিষ্ঠ পুত্র ও বাড়ীর অন্যান্য লোকজনকে অসুখের সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন।

অন্যমনস্কভাবে সেগুলির উত্তর দিয়ে কনিষ্ঠ পুত্র

প্রথম যে প্রশ্নটি করলে, সেটি হচ্ছে, ডাগদর বাবু, উও বাঁচে গা?

ডাক্তারবাবু সোৎসাহে উত্তর দিলেন, জরুর বাঁচ যায়েগা। চিকিৎসা করলে রোগী বাঁচবে না? তবে ডাক্তার আছে কেন?

এত বড় আশ্বাসেও কনিষ্ঠ পুত্রকে খুব উৎফুল্ল অথবা উৎসাহিত বোধ হ'ল না।

জিজ্ঞাসা করলে, কত খরচ পড়বে?

ডাক্তারবাবু বয়সে নবীন হ'লেও এই অঞ্চলে বৎসর কয়েক প্র্যাকটিস করছেন। রোগীর বাড়ী-ঘর দেখে একটা আন্দাজ করলেন, কি পরিমাণ টাকা এখান থেকে পাওয়া যেতে পারে।

বললেন, কত আর হবে? শ' আড়াই-এর বেশী হবে না।

ছেলেও মনে মনে কি যেন হিসেব করলে। ডাক্তারবাবুকে প্রাপ্য ফি মিটিয়ে দিয়ে বললে, আচ্ছা, কাল খবর দোব।

একটা প্রেসক্রিপসান ক'রে দিয়ে ডাক্তারবাবু বিদায় নিলেন।

সন্ধ্যার আগেই অন্যান্য ছেলেরা একে একে ফিরল। সন্ধ্যার পরে গ্রাম্য পঞ্চায়েতের মাতব্বরেরাও এসে উপস্থিত হ'ল।

সভা বসল।

মাতব্বরেরা প্রশ্ন করলেন, ডাক্তারবাবু কি বললেন?

কনিষ্ঠ পুত্র জানালে, ডাক্তারবাবু বললেন, রোগী বেঁচে যেতে পারে।

—কত খরচ পড়বে?

—বললেন, আড়াই শো।

—আড়াই শো! একটা বুড়া মানুষকে বাঁচাবার জন্যে আড়াই শো! তাঁদের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল।

একজন জিজ্ঞাসা করলেন, বাবার শ্রাদ্ধে কত খরচ হ'তে পারে?

হিসাব হ'ল—প্রথমে নিমন্ত্রিতের সংখ্যা। সে তো সকলেরই জানা। তারপরে খাদ্যের ফর্দ—দহি, বুরা, চুড়া এবং মিঠাই।

অঙ্ক কষে দেখা গেল, শ্রাদ্ধের যাবতীয় খরচ দেড়শোর মধ্যে হয়ে যাবে।

মাতব্বরেরা সকলেই প্রবীণ। সমস্বরে ব'লে উঠলেন—তবু?

অর্থাৎ বুড়া মানুষ, ডাক্তার যতই বলুক, তাঁর বাঁচাবাঁচির ভরসা কোথায়? এ যাত্রায় যদিও বা কোনক্রমে বাঁচে, পরের বার মৃত্যু সুনিশ্চিত। কয়েক দিনের আগুপিছুর কথা। তার জন্যে অনর্থক অতগুলো টাকা খরচ করা মূঢ়তা। বিশেষ যেখানে শ্রাদ্ধের খরচ চিকিৎসার খরচের অর্ধেক বললেই চলে—সেখানে চিকিৎসার খরচের প্রশ্নই ওঠে না।

পঞ্চায়েৎ অপরিবর্তনীয় রায় দিয়ে চলে গেলেন।

আরও কিছুদিন ভুগে একদিন বাবাও চলে গেলেন। দুরূহ মামলাটির শেষ পর্যন্ত দেখে যাওয়া হ'ল না। অনিশ্চিত চিকিৎসার খরচ যেখানে সুনিশ্চিত শ্রাদ্ধের খরচের চেয়ে বেশী, সেখানে এছাড়া উপায়ই বা কি?

জীবনশিল্পী সেক্সপীয়র

শ্রীরণজিৎ কুমার সেন

সেক্সপীয়র সম্পর্কে এক সময় ল্যাণ্ডার বলেছিলেন—

'Shakespeare is not our poet, but the world's, therefore on him no speach,'

অর্থাৎ—'সেক্সপীয়র শুধু আমাদেরই কবি নন, তিনি সমগ্র পৃথিবীর, অতএব তাঁর সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া বাহুল্য।' পৃথিবীর যে-কোন শ্রেষ্ঠ শিল্পী সম্পর্কে এই একই কথা। তাঁরা কোন বিশেষ দেশের বা বিশেষ কালের নন, তাঁরা সর্ব কালের সমগ্র পৃথিবীর।

শ্রেষ্ঠ শিল্পী যিনি, তিনি আসেন দুঃখ-সাগরে জীবন-তরী বেয়ে, জীবনের অভিজ্ঞতা কুড়িয়ে কুড়িয়ে রচনা করেন তিনি আনন্দের গান, আর সেই গান শুনিয়ে চমকিত করে দিয়ে যান বিশ্ববাসীকে। শ্রেষ্ঠ শিল্পী-দেরকেই আমরা তাই বলে থাকি সাধক। তাঁর সাধনা সকলের সঙ্গে সমন্বিত হবার সাধনা, তাঁর ধ্যান মানব-প্রকৃতির বিচিত্র রহস্য উদ্ভাবনের ধ্যান, তাঁর কর্ম কাল থেকে কালান্তরের পথে প্রবাহিত। প্রচলিত জীবন-যাত্রার মধ্যে তিনি আসেন মূর্তিমান বিদ্রোহীর বেশে। তাঁর চালচলন আচরণ দেখে লোকে যতক্ষণ তাঁকে উন্মাদ বলে আখ্যায়িত করে, তিনি ততক্ষণে আপন ভাবে উন্মনা হয়ে রচনা করেন বিশ্বচিত্র; তার মধ্যে হয়ত বিশেষ ভাবে প্রতিফলিত হয় তারাই—যারা তাঁকে তাদের জীবন থেকে, জ্ঞান ও বুদ্ধি থেকে বাতিল করে নিশ্চিন্ত হ'তে চায়। প্রচলিত স্রোতের, প্রত্যক্ষ ব্যতিক্রম বলেই সমকালে প্রায়শঃ নিন্দিত হয়ে মহাকালে অভিনন্দিত হন তিনি দেশে দেশে। তিনি কবি, তিনি শিল্পী, তিনি স্রষ্টা, তিনি মহাজীবনের বাণীপ্রবক্তা, 'ক্ষুদ্র আমি'র বন্ধন ছিন্ন করে 'বৃহৎ আমি'র বিরাট পরিবেশ তাঁর। মুক্তিমন্ত্রে তিনি আসেন মানুষকে মুক্তি দিতে, অথচ যা-কিছু তিনি পরিবেশন করেন, তা জীবনের অভিজ্ঞতারই পরম সঞ্চয়, তা বেদনার রসে সিক্ত, কিন্তু বেদনায় রস-সঞ্চারি।

সেক্সপীয়র সম্পর্কে বিশেষভাবে এই কথাগুলিই প্রযোজ্য। তিনি ছিলেন মহাপ্রেমিক, অথচ মহা-বিদ্রোহী। জীবনকে নিংড়ে নিংড়ে তিনি যে সুধা আর গরল আহরণ করলেন, তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তুলবার জন্য তা ছিল অপরিমিত।

দান্তে ও সেক্সপীয়র সম্পর্কে তুলনামূলক বিচার করতে গিয়ে কার্লাইল এক সময় বলেছিলেন—

'Dante and Shakespeare are a peculiar two. They dwell apart, in a kind of royal salitude; none equal, none second to them; in the general feeling of the world, a certain transcendentalism, a glory as of complete perfection, invests these two . . . . we will look a little at these two, the poet Dante and the poet Shakespeare: what little it is permitted us to say here of the Hero as Poet will most fitly arrange itself in that fashion.'

সেক্সপীয়রের কোন সমালোচকই বোধ করি কার্লাইলের মত এমন বীরের সঙ্গে কবিকে তুলনা করে পৃথক ভাষায় তাঁকে মহত্তর আসন দেন নি। তাঁকে

বিচার করেছেন তিনি তাঁদের অলৌকিক প্রতিভার ভিত্তিতে। এখানে যে বিশেষ সত্তায় তাঁকে কার্লাইল এঁকেছেন, তা তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহ নেই। শ্রেষ্ঠ শিল্পী-মাত্রকেই আমরা বলে থাকি বীর ও সাধক। তাঁরা যে চিত্র আঁকেন, তার মধ্যে তাঁদের মানসিক বীরত্বের পরিচয়ই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সমকালে কখনও কখনও তা সমাজের বিরুদ্ধে গিয়েও তা হয় সমাজ ও জীবনেরই সার্থক আলেখ্য।

তাঁর জীবন-সায়াহ্নে কনিষ্ঠা কন্যা জুডিথ প্রশ্ন করল, 'তুমি এই যে এত নাটক, এত বই লিখেছ বাবা, তা কি সবই তোমার অভিজ্ঞতা থেকে?'

শেক্সপীয়র বললেন, 'সবই কি কল্পনা করা যায়, জীবন থেকেই যে বিশেষ করে সব গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন মা?'

জুডিথ বলল, 'তোমার শীতের গল্প পড়লে মনে হয়, তুমি নিজেই যেন রাজা লেয়ন্টিস, আর মা হার্মিওন, আর ম্যামিলিয়াস ঠিক যেন আমাদের মৃত ভাইটি।'

এ কথার কি জবাব দেবেন শেক্সপীয়র? জীবন-সত্যকে যেখানে তিনি নাট্যসত্য বা কাব্যসত্য করে তুলেছেন, সেখানে সমস্ত জবাবই যে সব প্রশ্নের অতীত।

এ শুধু এ কাহিনী বলে নয়, প্রায় প্রত্যেকটি নাটকের পিছনেই রয়েছে শেক্সপীয়রের ব্যক্তিজীবনের সম্পর্ক বা অভিজ্ঞতা। প্রথম জীবনে ভাগ্যান্বেষণে যখন তিনি স্ট্রাটফোর্ড ছেড়ে লণ্ডনে এসে 'রোজ থিয়েটারে'র মালিক ফিলিপ হেন্সলোর কাছে সাহায্যের প্রার্থী হয়ে দাঁড়ালেন, তখন 'রোজ থিয়েটার' কীড, মার্লো ও গ্রীনের ট্র্যাজিক নাটকে প্লাবিত। এখানে সামান্য একজন প্রম্পটারের চাকরি থেকে ক্রমে অভিনেতা ও পরে নাট্যকারের ভূমিকার সুযোগ পেয়ে গেলেন শেক্সপীয়র। ট্র্যাজিক নাটক তখন দর্শকদের কাছে প্রায় একঘেয়ে হয়ে উঠেছে। হেন্সলোর অনুরোধে কমেডি রচনায় প্রথম কলম ধরলেন শেক্সপীয়র। কিন্তু তিনি মনে মনে এটাও স্পষ্ট বুঝলেন যে, ট্র্যাজেডিকে যদি নতুন আঙ্গিকে পরিবেশন করা যায়, তবে দর্শকেরা সে নাটক না দেখে থাকতে পারবে না। এই ভাবের অবশ্যম্ভাবী দু'টি নাটক 'টাইটাস এ্যান্ড্রনিকাস' এবং 'প্যাশন লেবার লস্ট'। সঙ্গে সঙ্গে যেমন ভাগ্য ফিরে গেল রোজ থিয়েটারের, তেমনি শেক্সপীয়রেরও। তাঁর 'তৃতীয় রিচার্ড'ও হেন্সলোর অনুরোধেই লেখা। ক্রমে সাদাম্প্টনের জমিদার হেনরী রিয়টেস্লীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। রূপেরের ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান রিয়টেস্লী। অন্তরে তার কামনার অগ্নিশিখা। তার শিকারী মেয়েকে খুশী করবার জন্য সে চাইল শেক্সপীয়রের অন্তরনিংড়ানো ভাষা। তার প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাছ থেকে গল্প শুনে শুনে ইতিমধ্যেই তিনি রচনা করেছিলেন 'ভেরোনার ভদ্রযুগল।' এবারে রিয়টেস্লীর প্রণয়িনীর অনিন্দ্য রূপলাবণ্যে তিনি নিজেই মুগ্ধ হ'য়ে ভাবলেন—তাঁর স্ত্রী এ্যান তাঁকে একটি দিনও যে-তৃপ্তি দিতে পারে নি, এই নায়িকার মধ্যে হয়ত সেই তৃপ্তি লুকিয়ে আছে। এই নায়িকাকেই নাটকে মুখ্য চরিত্রে রূপায়িত করে লিখলেন তিনি 'রোমিও জুলিয়েট।' জুলিয়েট ছাড়া তাকে যেন আর কোন ভাবেই রূপ দেওয়া যেত না। লণ্ডন শহর ভেঙে পড়েছিল সেদিন রাত্রির পর রাত্রি এই নাটক দেখতে। কিন্তু এ নাটক দেখে সেই নায়িকা নিজেই যখন একদিন ছুটে এল শেক্সপীয়রের কাছে, তখন তিনি দেখলেন—সেই নায়িকা তাঁর সম্ভোগের পাত্রী নয়, ক্ষণিকের প্রভাদানে নতুন আঁধার সৃষ্টি ক'রে সে চায় দূরে সরে যেতে।

এ ঘটনার অব্যবহিত কালের মধ্যে শেক্সপীয়রের একমাত্র পুত্রের মৃত্যু তাঁকে যেভাবে মর্মাহত করে, তা বর্ণনার অতীত। এ সময়ে অনেককালের মধ্যে তিনি আর নাটক রচনায় কলম ধরতে পারেন নি। এমনি করে কিছুকাল কেটে যাবার পর অকস্মাৎ এক মুহূর্তে রচনা করলেন তিনি 'চতুর্থ হেনরী'। এ নাটকের 'ফলস্টাফ' চরিত্র একটি বিশেষ কৌতুক রসাশ্রয়ী। এ সময়ে শেক্সপীয়র কবি ও নাট্যকার হিসেবে যে খ্যাতি অর্জন করেন, তা রাণী এলিজাবেথের মনকে গিয়ে অবধি গভীরভাবে নাড়া দেয়। নাটকের মত তাঁর সনেটও এক অপূর্ব সৃষ্টি। ইংলণ্ডের মানবিক প্রতিভাকে শেক্সপীয়র পৃথিবীর চোখে নতুন ভাবে তুলে দিয়েছেন, এ গৌরব যে রাণীরই। তাই তাঁর [illegible] সম্মানিত অতিথি

হলেন তিনি। কিন্তু রাণীর সহচরী মেরী ফিটনের রূপে আকৃষ্ট হয়ে আবার তিনি আত্মহারা হলেন। কিন্তু ভুল করলেন সেখানেই। মেরী ফিটন যেন চিরকালের নন্দনবাসিনী উর্বশী। সে জানে শুধু তার কামনা চরিতার্থতার জন্ম পুরুষের সাহচর্যকে, তার অধিক নয়। নানা বিরুদ্ধ-স্বভাবের সমাবেশে গর্বিতা মেরী ফিটন। সেই স্বভাব তীব্র আঘাত দিল সেক্সপীয়রকে। এ সময়ে তাঁর একটি নাটক পড়া ছিল, নাম হচ্ছে 'ডেনমার্কের যুবরাজ হ্যামলেটের প্রতিশোধ।' এই নাটক ও মেরী ফিটনের চরিত্রকে জুড়ে এবারে তিনি রচনা করলেন তাঁর 'হ্যামলেট।' মানুষের জীবন-দর্শনের পূর্ণ আলেখ্যের জীবন্ত রূপ যেন ফুটে উঠল এই নাটকের মধ্য দিয়ে।

অলক্ষ্যে রাণী এলিজাবেথের জীবনদীপ ধীরে ধীরে এক সময় নিভে এল। অশ্রুভারাক্রান্ত চিত্তে সেক্সপীয়র গিয়ে তাঁর হাতে মৃদু চুম্বন করে শেষ বিদায় নিয়ে এলেন রাণীর কাছ থেকে। এর পর কত নাটকই ত লিখলেন তিনি, লিখলেন কত কবিতা, কিন্তু রাণীর প্রশংসা বাণী এসে আর তাতে যুক্ত হ'ল না। একটা বিরাট বিপুল স্বর্ণময় রেনেসাঁ যুগের অবসান ঘটে গেল ইংলণ্ডে। রাণী মেরীর ছেলে তখন ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের সিংহাসন অধিকার করে বসলেন প্রথম জেম্‌স নামে। কিন্তু এলিজাবেথান যুগের সমাপ্তির সঙ্গে সেক্সপীয়রের কলম কিন্তু বন্ধ হয়ে গেল না। রচনা করলেন তিনি ম্যাকবেথ, টেম্পেষ্ট, তারপর আরও, আরও, আরও অনেক। টেম্পেষ্টের প্রসপারো আর মিরাণ্ডা—এ ত তিনি নিজে আর তাঁর জীবনসঙ্গিনী। যে বড় ব্যথা পেতে সহ্য করে করে তিনি সারাজীবন কাটালেন, তাকে ফুটিয়ে তোলার মত আর কি আধার হ'তে পারে তিনি নিজে ভিন্ন। এই হোক্ তাঁর অটোবায়োগ্রাফী। কিন্তু তা কি তাঁর সারাজীবনের সমস্ত রচনার মধ্যেই ছড়িয়ে নেই? শিল্পী-জীবনের বৃহত্তর বেদনাই যে রূপ নেয় তাঁর মহৎ শিল্পে! সেক্সপীয়রের জীবনে আমরা তার পরম প্রকাশ দেখে কখনও অভিভূত, কখনও বিস্মিত, আবার কখনও বা ব্যথাহত হয়েছি। বোধ হয় এই ব্যথা রূপই হচ্ছে মহৎ শিল্প, আর তার রূপকারই হচ্ছেন জীবনশিল্পী।

আসলে সেক্সপীয়র নিজেই ছিলেন নিজের জীবনীকার। এ কথার স্বপক্ষে এমার্সনের উক্তিটি উল্লেখনীয়। এমার্সন বলেছেন:

'Shakespeare is the only biographer of Shakespeare ; and even he can tell nothing, except to the Shakespeare in us ; that is, to our most apprehensive and sympathetic hour.'

তাঁর লিখন বৃত্তির সূত্রে একথাটা তিনি অত্যন্ত বেশী করেই জানতেন যে, উদ্ভাবনীয় কোন কাহিনীর চাইতে দেশজ ট্রাডিশনের মধ্যে কাহিনীর চমৎকারিত্ব অনেক বেশী। বিশেষ করে যে-যুগে সেক্সপীয়রের আবির্ভাব, সে যুগ রেনেসাঁ আনলেও জনসাধারণের মেধা ও শিক্ষা এত বেশী ছিল না, যে, কোন মহৎ শিল্পকে তারা অনুধাবন করতে পারে। সেই যুগে সেক্সপীয়র তাঁর অসাধারণ কাব্য ও নাট্য প্রতিভায় জনসাধারণকে প্রভাবিত করে শিল্পকে মহত্তর করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন; এটা সহজ কথা নয়। এমার্সনের ভাষায়:

'Shakespeare knew that tradition supplies a better fable than any invention can. If he lost any credit of design, he augmented his resources ; and, at that day, our petulant demand for originality was not somuch pressed. There was no literature for the million. The universal reading the cheap press, were unknown. A great Poet who appears in illiterate times, absorbs into his sphere all the light which is anywhere radiating. Every intellectual jewel, every flower of sentiment, it is his fine office to bring to his people ; and he comes to value his memory equally with his invention. He is therefore little solicitous whence his thoughts have been derived ; whether through translation, whether through tradition, whether by traval in distant countries, whether by inspiration ; from whatever source, they are equally welcome to his uncritical audience.'

উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে বার্নার্ড শ' প্রমুখ যুক্তিবাদীদের এ রকম মত প্রকাশ করতে শোনা যায় যে, সেক্সপীয়রের নাটকে নাকি খুব বড় রকমের দর্শন বলে কিছু নেই। কথাটা কতখানি সত্য, তা প্রমাণ-নির্ভর। তবে এ কথা সত্য যে, একালের অতি বড় ক্ষয়িষ্ণু যুগ যখন অর্থনৈতিক বনিয়াদের ভগ্নস্তূপে ভাবজগতের খুব বড় রকমের সঙ্কট পরিদৃশ্যমান, তখন নানা চিন্তানায়ককে এই সঙ্কট ঢেকে রাখবার জন্ম নানা ফর্মুলা আবিষ্কার করে বিব্রত হয়ে উঠতে হচ্ছে। সেক্সপীয়রের যুগকে বলা যায় ঠিক এর বিপরীত। সে যুগে মোটামুটি সর্বদিকে একটা ভারসাম্য বজায় থাকার ফলে ইদানীন্তনকালের মত জীবন এত জটিল ও ভারাক্রান্ত হয় নি। ফলে ট্রাডিশনের দিক্ থেকে যে প্রাপ্ত-সত্যকে প্রকাশ করা সেক্সপীয়রের পক্ষে অত্যন্তই সহজ ছিল, একালের যুক্তিবাদীদের তা চিন্তাবহির্ভূত। ফলে সে-যুগের দর্শন একালে অস্বীকৃত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু দর্শন নেই—এ কথা সেক্সপীয়রের কোন রচনা সাক্ষ্য দেবে না। বরং দেখা যায়—তাঁর ফল্‌ষ্টাফের মত চরিত্র একালের যুক্তিবাদীদের দ্বারা অনেকাংশেই সমর্থিত ও অভিনন্দিত। কিন্তু ব্যক্তি-দর্শনের দ্বারা সেক্সপীয়র নিজেই শেষ পর্যন্ত ফল্‌ষ্টাফকে বিদায় দিয়ে নতুন সুর এনেছিলেন 'এ্যাজ ইউ লাইক ইট', 'টুয়েল্‌ফ্‌থ্‌ নাইট' প্রভৃতি নাটকে।

'সেক্সপীয়রিয়ান ট্রাজেডি'তে যেমন আমরা ঘটনাবলীকে দ্রুত অগ্রসর হ'তে দেখি চরম সঙ্কটের দিকে, এবং জীবনের অপচয় দেখে আমরা অভিভূত হই, তেমনি তার কমেডিতে স্পষ্টই লক্ষ্য করি—পৃথিবীর নীতিবোধের সঙ্গে কি অদ্ভুত ভাবে ঘটনাবলীর সামঞ্জস্য ঘটেছে। এখানে জীবনবীণার তন্ত্রীগুলি ও নীতিবোধের ঝঙ্কার বেসুরো বেজে উঠলেও পরিণামে দুটোর মধ্যে যথাযোগ্য নিষ্পত্তি ঘটতেও দেরি হয় নি। এই দার্শনিক ভিত্তিতে ইদানীন্তন কালের যুক্তিবাদীদের মতে সেক্সপীয়রের অনেক চরিত্র অংশতঃ দুর্বল হ'লেও তারা রক্তে-মাংসে এই পৃথিবীরই মানুষ হয়ে উঠেছে, সন্দেহ নেই।

অন্ত দিকে তাঁর নাট্যবিষয়বস্তু গভীর হয়েও এত স্বাভাবিক ছিল যে, এমার্সন-কথিত তৎকালীন Mass এর পক্ষেও সেক্সপীয়রকে গ্রহণ করতে কষ্ট হয় নি—যদিও তাঁর গভীরতা মাঝে মাঝে আমাদেরও চিন্তার অগম্য হয়ে ওঠে। এ কথারই ইঙ্গিত করতে গিয়ে চার্লস ল্যাম্ব বলেছেন—

'It is common for people to talk of Shakespeares' plays being so natural ; that every body can understand him. They are natural indeed, they are grounded deep in nature, so deep that the depth of them lies out of the reach of most of us.'

—•—

গহন গভীর অরণ্য। ঘোর অন্ধকার [illegible]। কি করে আর কেন যে এখানে এসে পড়েছি তা জানি না। পথও খুঁজে পাচ্ছি না।

সহসা দেখতে পেলাম সামনে একটি মন্দির।

যেন সেই আনন্দমঠের মন্দির।

মন্দির ত। ভরসা হ'ল। ভেতরে ঢুকে পড়লাম।

কেউ কোথাও নেই, সন্তানরা—সাধুরা সব গেলেন কোথায়? বিশ্রাম করছেন বুঝি?

সামনে মায়ের ভীমা করালী কঙ্কাল কপালমালিনী কালিকা মূর্তি।

মনে পড়ে গেল 'মা যা হইয়াছেন' এ সেই মূর্তি। রাজরাজেশ্বরী অন্নপূর্ণা মূর্তি কোন্ দিকে তাঁরা? দেখতে পেলাম না।

ব'সে পড়লাম চুপ ক'রে। একটি মৃদু প্রদীপ জ্বলছে একধারে।

সহসা কে ডাকলেন, 'কল্যাণী এসেছ? তা তুমি মন্দিরটা একটু পরিষ্কার করে ফেল। এখনি সন্তানরা ভোগ আনবেন।'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'আমি ত কল্যাণী নয়। আমি উমা।'

তিনি বললেন, 'তুমি অসুখ করে ভুলে গেছ আমি মহেন্দ্র তুমি কল্যাণী। নাও, হাত চালিয়ে মন্দিরের বাসন নির্মাল্য সব পরিষ্কার করে রাখ। অনেক লোক আসবেন। মানসিক পূজা আসবে অনেক লোকের।'

অবাক্ হয়ে গেছি। আমি ত উমাই মনে হচ্ছে।

তবু তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করছি ঘর। জমা-করা বেলপাতা ফুল চন্দনলিপ্ত বাসন কোশাকুশি ধুয়ে রাখলাম একপাশে।

ভোগ আসবে—সন্তানরা—ধীরানন্দ, জীবানন্দ, সত্যানন্দ, ভবানন্দরা আসবেন। দেখতে পাব।

অকস্মাৎ অনেক পায়ের শব্দ অন্ধকার প্রাঙ্গণে শোনা গেল।

আমি মায়ের নৈবেদ্যর ঘরে ঢুকে প'ড়ে লুকিয়ে পড়লাম ঘোমটা টেনে। আমরা ত সেকেলে মানুষ—পুরুষদের সামনে বেরোনো প্রথা নয়।

... ...

অনেক লোক এসে বসলেন। নানা দেশের মানুষ। সন্তানরা কি না বুঝতে পারলাম না।

রকম রকম সাজ-পোশাক। ধুতি জামা পাগড়ি পরা, টুপী পরাও কেউ কেউ। কেউ ধুতি চাদর পরা কপালে মস্ত মেটে সিঁদুরের (রোলী) ফোঁটা পরা—কেউ আবার চোস্ত পাজামা লম্বা জামা পরাও রয়েছেন। ধুতি চাদর পরাও আছেন অনেক।

সকলেই নানা আসনে বীরাসন, পদ্মাসনে ব'সে—মা'র ধ্যান করতে লাগলেন।

রাত্রি গভীর হ'তে লাগল, তাঁদের ধ্যান আর ভাঙে না।

ডাকছেন "মা, মা, মা, দয়া করো, কৃপা করো মা। কতদিন আর এভাবে থাকব।"

কেউ স্তব পাঠ করতে লাগলেন—কপালমালিনী ভীমা কালিকা দেবীর।

অকস্মাৎ দেবীমূর্তি যেন নড়ে উঠলেন, হেসে উঠলেন

মা বললেন, 'তোমরা কে? কি জন্য ধ্যান করছ—স্তব করছ?'

মার আশাতীত জাগরণে তাঁরা চমকে উঠলেন।

সকলে মিলে এক সঙ্গে বলতে চেষ্টা করল, 'মা, দয়া কর, মা আমাদের রাজ্য দাও, স্বাধীনতা দাও, বিদেশী হাত থেকে দেশ উদ্ধার করে দাও।'

দেবী গভীর হুঙ্কারে বললেন, 'একে একে কথা বল কে কি চাইছ—কোন্ দেশের লোক—পরিচয় দিয়ে বল।'

সৌরাষ্ট্র প্রয়াগ মগধ অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ প্রাগজ্যোতিষ দ্রাবিড় মহারাষ্ট্র পঞ্চনদ রাজস্থান বিদর্ভ মধ্যপ্রদেশ আদি নানা জাতি নানা প্রদেশীয় তাঁরা।

ক্ষীণ খর্বদেহ সৌরাষ্ট্র করজোড়ে বললেন, 'মা, আর পরাধীনতা সহ্য হচ্ছে না, কৃপা কর।'

বঙ্গ বললেন, 'মা, স্বাধীনতা দাও—বড় ছোট হয়ে আছি কত দিন ধরে।'

প্রয়াগ বললেন, 'আমাদের রাজত্ব আমাদের হাতে তুলে দাও মা।'

মগধও বললেন, 'আমরাও রাজ্য চাই মা।'

মা চারদিকে চাইলেন, বললেন—'তোমরা অন্যরা কেউ কিছু বলছ না?'

তাঁরা বললেন, 'আমাদের সকলেরই এক প্রার্থনা মা।'

দেবী বললেন, 'বেশ, ভেবে দেখি।'

মন্দির নীরব হয়ে গেল। বাইরে ঘোর অন্ধকার। শেয়াল ডাকতে লাগল। রাত্রি দ্বিপ্রহর, দেবীর শিবা ভোগের সময় হয়েছে বোধহয়।

ভক্তদের কারুর নিঃশ্বাস ফেলার শব্দও যেন শোনা যায় না। উৎসুক মুখ নির্বাক্ হয়ে মায়ের প্রসাদ-বাণীর অপেক্ষা করছেন, কি আদেশ হয় কে জানে।

সহসা ত্রিনয়নীর ললাটের নেত্র যেন দীপ্ত হয়ে উঠল। তারই আলোয় দেখলাম, মা'র অধরে কি কৌতুকের হাসির মৃদু আভাস ফুটে উঠেছে। আমি নৈবেদ্যের ঘরেই দরজার পাশে রয়েছি।

মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'স্বাধীনতা পেলে তোমরা কি করবে?'

ভক্তেরা উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। [illegible]

ভক্ত বললেন, 'অনেক কাজ করব মা। দেশকে সুসভ্য স্বাধীন দেশের মত গ'ড়ে তুলব। কলকারখানা—নদীর জলে বাঁধ—আকাশছোঁয়া ইমারত, প্রাসাদ, অট্টালিকাতে দেশকে এমন সাজিয়ে তুলব, বিদেশীরা এসে অবাক্ হয়ে যাবে···জীবনযাত্রার ষ্ট্যাণ্ডার্ড (মান) বাড়াব। কেউ আর দরিদ্র বলতে পারবে না।'

মা কি হাসলেন?

বৃদ্ধ প্রধান ভক্ত বললেন, 'মা, দেশের লোকের অন্ন, বস্ত্র, সুলভে পাওয়ার চেষ্টা করব। এরা বড় দীন হয়ে গেছে মা। অর্ধাশনে অনশনে বুড়িয়ে অর্দ্ধনগ্নভাবে পাতার কুটীরে পড়ে থাকে মা। শিক্ষা স্বাস্থ্য কিছুই পায় না।'

মা গম্ভীর। বললেন, 'কি তোমাদের ত্যাগ—তার জন্ম কি তপস্যা করেছ? জান ত, দেবাসুর সংগ্রামে স্বয়ং ইন্দ্রও পরাজিত হয়ে কঠোর তপস্যা করে রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।'

প্রধান প্রধান ভক্তরা উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।

'মা বহুদিন কারাবাস করেছি—কত বৎসর ধরে।

দেবী। 'কি কৃচ্ছ্রসাধন করেছ সেখানে? প্রাণ দিয়েছ? প্রাণ পণ ক'রে কি কষ্ট করেছ?'

'না মা, প্রাণ কেউ কেউ দিয়েছে—বঙ্গ মহারাষ্ট্র। আমরা কারাগারে শুধু বন্দী ছিলাম মাত্র।'

অনেকক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে মা বললেন, 'পেতে পার তোমরা স্বাধীনতা। পাবে—কিন্তু একটা কথা, পারবে কি তা?'

সৌরাষ্ট্র প্রয়াগ মগধ মন্ত্র অভিভূত, আশ্চর্য।

এত সহজে মাতা প্রসন্না হলেন—দেশ স্বাধীনতা লাভ করবে? বঙ্গ কলিঙ্গাদি দেশও অবাক্।

কিন্তু মা'র ঐ কথাটি কি?

মন্দির নিস্তব্ধ।

··· ··· ···

দেখতে পাচ্ছি—এবার আর মা'র মুখে প্রসন্ন হাসির আভাস নেই।

কঠিন গম্ভীর মুখে বললেন, 'আমার বলি চাই, দিতে পারবে?'

ভক্তজন মুখরিত। তখন কয়ে উঠলেন, 'বলি? বলি মা? কত বলি?'

মন্দিরের মাঝে বলির জন্ত আখ কুমড়া শশা ব সন্দেশ ভরা রয়েছে। কত চাই? সবই ত রাখা রয়ে

'আদেশ কর মা। এখনি বলি দিয়ে দিচ্ছি।'

মায়ের হাতে চোখ-ঢাকা সিঁদুর-মাখা খাঁড়াও রয়েছে। ছাগবলি পশুবলির জন্ত। মাটিতেও রয়েছে।

একজন ভক্ত বললেন, 'কি বলি চাও মা?'

দেবী শান্তমুখে বললেন, 'নরবলি।'

'নরবলি?' ভক্তরা স্তব্ধ।

খানিকক্ষণ পরে বিমূঢ় ভাবে একজন ভক্ত বলে 'নরবলি ত কলিযুগে নেই মা। তুমি ত এখন নর নাও না মা।'

দেবী বললেন, 'দরকার হ'লে লোকে দেয় ব নরবলি। সবই কালাকালের প্রয়োজনে হয়। চিতে পদ্মিনী ভীম সিংহের সময়ে 'ম'য় ভুখা হুঁ' বলে নর চেয়েছিলাম। তারা এগারজন রাজকুমারকে বলি আরও কত যে প্রাণ দিল সে কি জান না? নারীরাও জহরব্রত করে প্রাণ দিল।'

প্রবীণ প্রধান ভক্ত বললেন, 'আমার ধর্ম ত অহিংসাবাদ। নরবলি ত দূরের কথা—আমি কো জীবেরই হিংসা করি না মা। তুমি অন্য তপস্যা বল

অন্য ভক্তরা এবারে সমস্বরে বললেন, 'উনি আমা নেতা আর পিতার সমান, ওঁর অভিমত আমা শিরোধার্য।'

আবার নীরবতা।

মা'ও নীরব।

প্রধান ভক্ত আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'তা হ'লে কৃপা হবে না মা? কত বলি চাও মা? আমি আ প্রাণ তোমার চরণে বলি দেব মা, অনশন ব্রত নিয়ে।'

দেবী অট্টহাস্য করলেন, জীর্ণ মন্দির যেন কেঁপে উ বললেন, 'কোটি নরবলি চাই বৎস, তা না হ'লে দীর্ঘদিন তপস্যা কর সকলে। নিষ্ঠা তপস্যাও কল হয়।'

এঁরা ভাবেন—কোটি? কোটি নরবলি? তপস্যা কতদিন? কি তপস্যা?

ভক্তরা বিমূঢ়। অহিংসবাদীরা বিমনা।

কোটি নরবলি? কোথায় এত মানুষ। কি ভাবে [illegible] নেবেন দেবী? যুদ্ধ করে? কার সঙ্গে? কোথায় করবেন? কারা করবে?

হিংসাবাদী বিপ্লববাদীরাও স্তব্ধ। দু'দশ জন তারা [illegible] দিয়েছে, দিতে পারেও আর। কিন্তু কোটি মানুষ [illegible]!

এবার মৃদুস্বরে ভক্তরা বলাবলি করলেন, 'আর ত [illegible]স্যা করতে পারছি না, একটা উপায় করতে হবে।'

প্রবীণ প্রধান মুখ তুললেন, 'কি উপায়? আমার ত [illegible]বাসীকে বলি হ'তে বলা চলবে না রাজ্যলাভের [illegible]াসে।'

সকলে বঙ্গের দিকে তাকালেন।

'তোমার কি মত?'

বঙ্গ অবাক্। 'আমার কি মত? আমি কি বলতে [illegible]রি?'

বিশিষ্ট ভক্ত। 'তুমি ত কত প্রাণ দিয়েছ—আর [illegible]য়েছও ত মাঝে মাঝে।'

বঙ্গ আশ্চর্য! 'হ্যাঁ—তা এখন তাতে কি করতে [illegible]রি?'

বিমূঢ় বঙ্গকে মাঝখানে বসিয়ে সকলে মৃদুস্বরে পরামর্শ [illegible]তে লাগলেন।

সহসা সৌরাষ্ট্র বললেন, 'আমার এতে সম্মতি নেই, [illegible] সকলে মিলে তপস্যা করি, কর্মযোগ করি।'

মগ্ন—মগধ—প্রয়াগ বললেন, 'আপনি বৃদ্ধ হয়েছেন, [illegible] আমরাও আর তপস্যা করতে পারছি না। বঙ্গকেই [illegible] সংগ্রহ করতে আদেশ করুন।'

প্রধান পুরুষ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। বললেন, 'বলি [illegible] হ'লে অহিংস থাকব না ত, তার চেয়ে স্বাধীনতা-[illegible] মৃত্যুও আমার ভাল।'

[illegible] বললেন, 'না, না, ঠিক তা নয়। বলি নয়—আমরা অহিংসই থাকব। বঙ্গ বুঝতে পেরেছ ত? একটি দান উৎসর্গ হবে।'

কি দান? কি উৎসর্গ?

বঙ্গ বিমূঢ়। সকলেই নীরব। বঙ্গ কি বুঝেছিল?

রাজ্য লাভের প্রবল বাসনা সকলের মনে। মানুষের ভাবনা নয়। রাজ্য বাসনা।

এবারে দেবী যেন একটি বিকট্ শব্দে হেসে উঠলেন? না, ভেঙে পড়লেন?

দেখলাম—দেবীর প্রতিমা দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে। সে কিন্তু প্রতিমা ত নয়—কি তবে?

সমস্ত দিক্‌বিদিক্ অন্ধকার হয়ে গেছে ধূলায়—, মলিনতায়।

... ...

ভয়ে চমকে ঘুম ভেঙে গেল। হ্যাঁ, দেবী ভেঙে গেছে। সে ত ষোলো বছর হ'ল ভেঙে ভাগ হয়ে গেছে।

চেয়ে দেখলাম—এখানে মন্দির কোথায়? দেশের বাড়ীও নয়। গাড়ি। ট্রেন। ঘ্যাঁচ ক'রে কি রকম ধাক্কা দিয়ে থেমে গেছে। সেই শব্দতে ঘুম ভেঙে গেছে।

উনি পাশে দাঁড়িয়ে বলছেন, 'ওঠো ওঠো উমা—শেয়ালদা' এসে গেছে।'

আমার কোলের কাছে ঘুমন্ত একটি শিশু-নাতি এলিয়ে ঘুমোচ্ছে। পাশে আমার ছোট ছেলে। ওর কোলে রয়েছে আর এক নাতি।

মনে পড়ল মেয়েকে—বৌমাকে।

না, তাদের আনতে পারি নি।

আমরা কোথায় রেখে এলাম তাদের? কোথায় ফেলে এসেছি? কোথায় রইল তারা? ছেলেকে জামাইকে কি বলব?

আমার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

উনি হাত ধরলেন। স্টেশনে নামলাম।
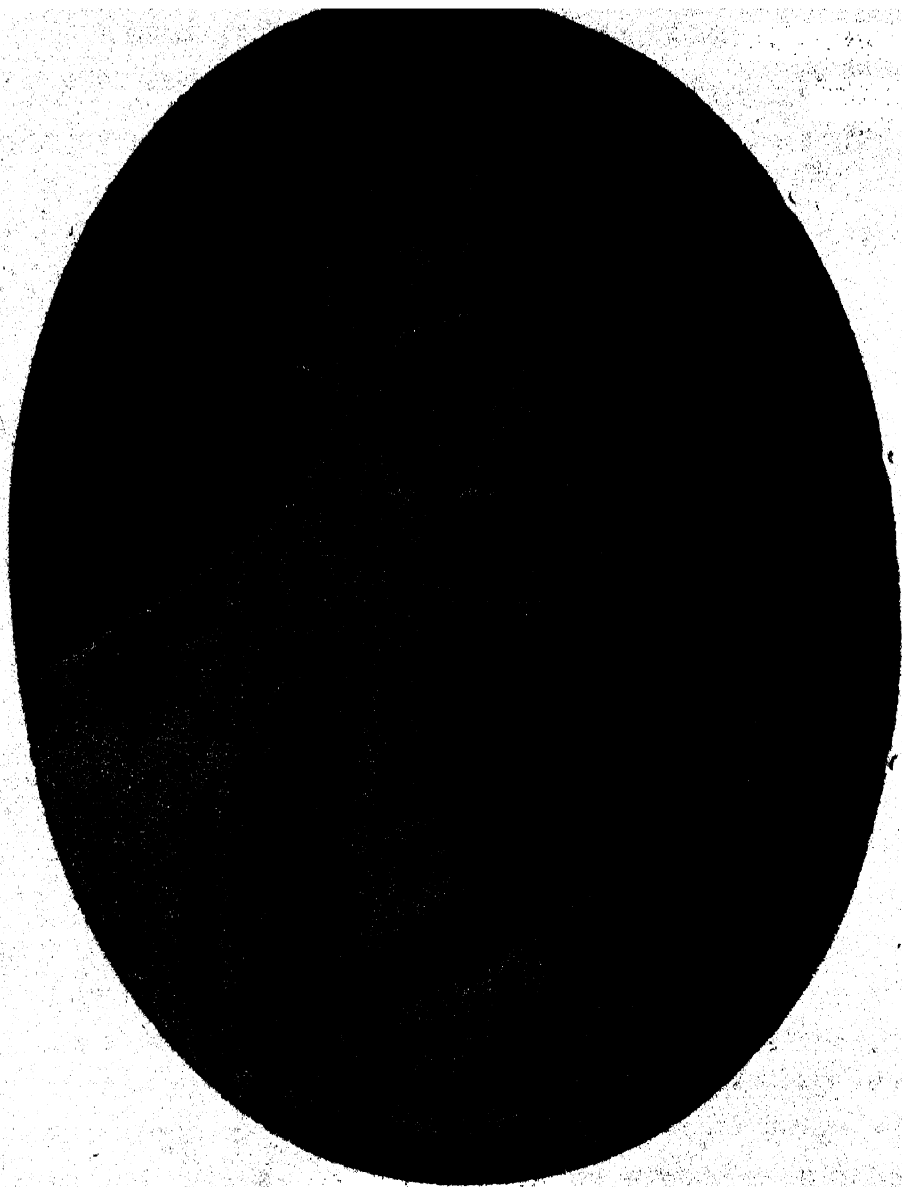
ঋষি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

রামানন্দবাবুকে যেমনটি দেখেছি

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

খন আমরা ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসের ছাত্র। ১৯১৭
ষ্টাব্দে। 'প্রবাসী' ছিল প্রিয় মাসিক পত্রিকা। বিবিধ
সঙ্গ পড়বার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতাম। 'প্রবাসী'
তে এলেই খুঁটিয়ে পড়তাম জাতীয়-জীবনের, সমাজ-
বনের অথবা সমসাময়িক আন্তর্জাতিক ইতিহাসের
বিধ সমস্যা সম্পর্কে সম্পাদকীয় টিপ্পনীগুলি। অন্তরের
ভীরে দেশাত্মবোধের উন্মেষ প্রধানতঃ প্রবাসী-
ম্পাদকের লেখনী-প্রসূত সেই বিবিধ প্রসঙ্গের কল্যাণে।
ঙ্কমের আনন্দমঠ, নবীন সেনের পলাশীর যুদ্ধ, হেমচন্দ্রের
বিতা, দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক রক্তে দোলা দিয়েছিল
কই। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বিবিধ প্রসঙ্গের
াবেদন ছিল প্রধানতঃ পাঠক-পাঠিকাদের পরিচ্ছন্ন
দ্ধির কাছে। আমাদের প্রথম যৌবনের চিন্তাধারার
পরে তখনকার দিনের প্রবাসীর ছাপ আজও উজ্জ্বল
য়ে আছে। সেই গৌরবর্ণ সৌম্যদর্শন ঋষিপ্রতিম
ক্তিটি সম্পাদকীয় টেবিলে বসে যা লিখতেন তার দ্বারা
ব্য বাংলার দৃষ্টিভঙ্গিমা বৈপ্লবিক হয়েছে, তার রক্তে
াধীনতার জন্যে ব্যাকুলতা জেগেছে, তার মর্মের মন্দিরে
াদর্শবাদের দীপশিখা নিঃসন্দেহে জ্বলে উঠেছে। অথচ
ত শান্ত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তিনি। তাঁর টেবিলের
মনে কত বার গিয়ে বসেছি। কত জায়গায় তাঁর সঙ্গী
য়ে গিয়েছি। হৃদয়াবেগের প্রাবল্যে তাঁর ধৈর্যচ্যুতি
টেছে। কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক মৃদুতা ও মাধুর্য হারিয়ে
ফেলেছে—সেই সংযমী পুরুষের জীবনে এমন ঘটনার কথা
ামি ভাবতেই পারিনে। তাঁর কথাবার্তার মধ্যে সব
য়ে লক্ষ্য করতাম grace আর judgement.

কিন্তু সেই মিতভাষী প্রশান্ত মানুষটি আসলে ছিলেন একটি পুরুষ-সিংহ। প্রবলের ঔদ্ধত্যের সামনে নীরব নম্রতাকে তিনি চরিত্রের দুর্বলতা বলেই মনে করতেন। সাম্রাজ্যবাদের উলঙ্গ বর্বরতার সম্মুখে রামানন্দের কণ্ঠ কখনও 'শান্তির ললিতবাণী' পরিবেশন করে নি। বজ্র-সুকঠিন রাজশক্তি তাঁর লেখাকে তাই রীতিমত ভয় করত, দারুণ সংশয়ের চক্ষে দেখত তাঁর বিপ্লবী মনের চিন্তাধারাকে। বার্ট্রাণ্ড রাসেল্ ঠিকই বলেছেন :—Men fear thought as they fear nothing else on earth—more than ruin, more even than death.

আসলে রামানন্দ ছিলেন সক্রেটিসের সগোত্র। সক্রেটিস যেমন এথেন্সের যুবকবৃন্দকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন নির্মম যুক্তির দ্বারা সত্যকে যাচাই করে নিতে, রামানন্দের লেখাও তেমনি তরুণ বাংলার চিত্তকে প্রেরণা দিয়েছে যুক্তির সাহায্যে সব কিছুকে বাজিয়ে নিতে। আমরা যে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সত্যকে সমগ্র ভাবে বিবেচনা না করে সহসা একটা সিদ্ধান্ত করে বসি, এই "jumping to conclusion"-এর মূলে ত আমাদের একদেশদর্শিতা এবং হঠকারিতা। তথ্যগুলিকে আমাদের পছন্দমত বেছে না নিয়ে সমস্ত তথ্যকে যদি data হিসাবে আমরা ব্যবহার করি, শব্দের প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে যদি সম্যক্ সচেতন থাকি তবেই সিদ্ধান্ত নির্ভুল হবে, এমনটি আমরা আশা করতে পারি। কিন্তু প্রমাদ ঘটায় আমাদের আসক্তি, আমাদের বাসনা। আমাদের চেতন বা অবচেতন মনের স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্ন কামনাগুলি যুক্তির সুযোগ

প'রে আমাদিগকে সত্যের পথে চলতে দেয় না। একটা সিদ্ধান্ত শুধু আমাদের হৃদয়গ্রাহী হ'লেই যে তা যুক্তিসহ হবে, এমন ত কোন কথা নেই। কোন সিদ্ধান্ত আমাদের পছন্দসই হ'লেই স্বার্থপুষ্ট কামনার বশে তাকে আমরা অনেক সময়ে সত্যের মূল্য দিয়ে বসি। জ্ঞাতব্য তথ্যগুলিকে গণনার মধ্যে এনে নিরাসক্তচিত্ত নিয়ে বিচার করলে যা বর্জনীয় ব'লে নিসংশয়ে বিবেচিত হ'ত তাকে সত্য বলে গ্রহণ করতে তখন কুণ্ঠা হয় না। নিষ্ফল আশা, প্রত্যাখ্যাত প্রেম, ব্যর্থ স্বপ্ন, তিক্ত দাম্পত্য সম্পর্ক, অবদমিত ভয়, প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষ—কত কিছুই না আমাদের মনের নেপথ্যে আত্মগোপন করে থাকে এবং আমাদের অজ্ঞাতসারে ভুল সিদ্ধান্তে আমাদিগকে পৌঁছে দেয়।

যখন কাউকে দেখি গাণ্ডীবধন্বার মতই অকাট্য যুক্তির শরজাল বর্ষণ করে মিথ্যার এবং কপটতার স্পর্ধাকে ধুলায় লুটিয়ে দিতে—যৌবনের শির আপনা থেকেই লুটিয়ে পড়ে তাঁর চরণে। গ্রীসের তরুণ প্লেটোর দল সক্রেটিসের দ্বারা এতটা যে প্রভাবিত হয়েছিল তার কারণ, যৌবনের স্বাভাবিক আনন্দ হচ্ছে মানস অভিযানে অন্ধকার থেকে আলোর পানে। স্বাধীন ভাবে চিন্তা করবার শক্তির মধ্যেই মানুষের পরম গৌরব; জ্ঞান নিঃসন্দেহে জগতের জ্যোতি; পরিচ্ছন্ন বুদ্ধি মানুষের গড়া বিধি-নিষেধের কোন তোয়াক্কা রাখে না, কাঞ্চন-কৌলীন্যের পরোয়া করে না, নরকের ভয়কে আমল দেয় না, প্রবীণ এবং পাকাদের পরামর্শকে উপেক্ষা করতে কুণ্ঠিত হয় না। রামানন্দ চাটুজ্জের সম্পাদকীয় লেখার মধ্যে আমাদের তরুণচিত্ত খুঁজে পেত জ্ঞানের রাজ্যে বৌদ্ধিক অভিযানের অনির্বচনীয় আনন্দ। আজ আমাদের মধ্যে কত প্রয়োজন ছিল রামানন্দবাবুর মত সম্পাদকের, যিনি হৃদয়াবেগের প্লাবনে বুদ্ধির আভিজাত্যকে ভাসিয়ে দিতে দৃঢ়তার সঙ্গে অস্বীকার করবেন, যুক্তিকে যিনি দেবেন সাম্রাজ্ঞীর স্বর্ণমুকুট, জ্ঞানের শুভ্রজ্যোতিকে যিনি কিছুতেই আচ্ছন্ন হ'তে দেবেন না ব্যক্তিগত ভাললাগার অথবা না-লাগার কুজ্ঝটিকায়। সমস্ত সংস্কারকে বাতায়ন-পথে বাহিরে নিক্ষেপ করে সত্যের জন্যে মরিয়া হবার সাহস তিনি রাখতেন। জনসাধারণের সহজ প্রবৃত্তির অনলে ইন্ধন জুগিয়ে তাদের উত্তেজিত করবার জন্যে যাদের সম্পাদকীয় লেখনী ব্যবহৃত হয় তাদের ভূ[মিকা] থেকে কত স্বতন্ত্র ছিল রামানন্দবাবুর সম্পাদকীয় ভূ[মিকা] —তাঁর ভূমিকা ছিল এক মহান্ প্রহরীর ভূমি[কা]। যেখানে গোঁড়ামি, যেখানে ভেদবুদ্ধির প্রগল্‌ভ আস্ফা[লন], যেখানে অত্যাচারীর ভ্রূকুটি সেখানে তিনি অকুতো[ভয়ে] তূর্যধ্বনি করেছেন। তাঁর ভূমিকা ছিল একনিষ্ঠ [...] ব্রতীর ভূমিকা। আমরা যাতে যুক্তির কষ্টিপাথরে [সব] কিছু যাচাই করতে শিখি, স্বাধীন মন নিয়ে চিন্তা ক[রতে] প্রবৃত্ত হই, কতকগুলি সিদ্ধান্তকে বিনা বি[চারে] গ্রহণ না করি—সেদিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল শ্যেনদৃষ্টি। কলেজের কক্ষে 'বারবারা', 'সিলারেণ্ট', 'ডেরি[ও]' 'ফেরিও' মুখস্থ করে পরীক্ষার হলে অধীত বিদ্যা উগ[রে] দিয়ে আমরা কতজনই না লজিকের সঙ্গে আম[াদের] কারবার জন্মের মত চুকিয়ে ফেলি। জীবনের প্রাঙ্গণে এসে ন্যায়শাস্ত্রের নিয়মগুলিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্র[দর্শন] করি, আমাদের মন যে-সিদ্ধান্তকে পছন্দ করে তা[কেই] সত্যের মর্যাদা দিই, কোন সংজ্ঞার প্রকৃত অর্থ জ[ানার] দিকে খেয়াল থাকে না, আশু প্রয়োজনের তাগিদে [তথ্য]গুলির সত্যাসত্যের দিকে দৃষ্টি না রেখে অথবা আ[ংশিক] তথ্যগুলির উপরে নির্ভর করে একটা সিদ্ধান্তে ঝাঁপ [দিয়ে] পড়ি। রামানন্দবাবু লেখনী ধারণ করেছিলেন [যাতে] আমাদের মনের বাতায়নগুলি সত্যের দিকে সর্বদা [খোলা] থাকে, স্লোগানে আর ছেঁদো বুলিতে বিভ্রান্ত হয়ে [সত্য]পথকে বর্জন না করি।

কিন্তু এর থেকে যেন ধারণা করে না বসি যে, বুদ্ধির অতিরিক্ত অনুশীলনে তিনি একজন শুষ্ক [...] ছিলেন। তিনি জ্ঞানী ছিলেন ঠিকই, কিন্তু কেব[ল] জ্ঞানী ছিলেন না, তাঁর হৃদয়ের গভীরে ছিল [...] একটি অফুরন্ত উৎস। বস্তুতঃ জ্ঞানের এবং ভক্তির কাঞ্চন যোগ ঘটেছিল তাঁর মহৎ জীবনে। ভক্ত [রামা]নন্দকে আমি প্রথম আবিষ্কার করি শান্তিপুরের [...] মন্দিরে। তিনি সেখানে গিয়েছিলেন সাহিত্য সম্মে[লনের] এক অধিবেশনে সভাপতি হয়ে। অভিভি[...] হয়ে[...] সাহিত্যিক শ্রীনলিনীমোহন সান্ন্যাল মহাশয়ের [...] আমিও সম্মেলনে নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। সেদিন স[...] আচার্যের আসনে বসে উপাসনা করছিলেন। [...]

ছিল অশ্রুগদগদ আর তাঁর গণ্ড বেয়ে দরদর ধারায় ঝর-ঝর করে পড়ছিল নয়নের জল। সম্পাদকের গুরুত্বপূর্ণ কাজের শত ঝামেলার মধ্যে তাঁর মন যে কোথায় লগ্ন থাকত, কার করুণাধারায় অভিষিক্ত হয়ে তিনি যে এমন্ শান্তসমাহিত যোগীর জীবনযাপন করতেন—সে রহস্যের দ্বার সহসা উদ্ঘাটিত হ'ল শান্তিপুরের সেই ব্রাহ্মমন্দিরে এক সূর্যালোকিত প্রভাতে।

পণ্ডিত মানুষ যেমন ছিলেন, রসিক মানুষও তেমনি ছিলেন। যারা তাঁর সান্নিধ্যে থাকৃত তারা জানত 'প্রবাসী'র এবং 'মডার্ণ রিভিউ'-এর খ্যাতনামা সুগম্ভীর সম্পাদকটির কথাবার্তায় পরিহাসপ্রবণতা উছলে পড়ত। সেবার কৃষ্ণনগরে যাচ্ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলালের জয়ন্তী সভায় পৌরোহিত্য করতে। আমিও ঐ ট্রেণে ছিলাম তাঁর পাণ্ডার ভূমিকায়। রাণাঘাট ষ্টেশনে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা থেকে নেমে এসে থার্ড ক্লাসে বসলেন আমাদের পাশে। আমার সঙ্গে স্ত্রী ও শিশুকন্যা। রাণাঘাটনিবাসী একবন্ধু খাবারের ঠোঙা দিলেন কন্যার হাতে। সে এক হাতে সেটা নিয়ে আর একটা লুব্ধ হাত বাড়িয়ে দিল দ্বিতীয় ঠোঙার প্রত্যাশায়। দু'হাতই তার পূর্ণ থাকা চাই। মিষ্টান্নলোলুপ শিশুর আচরণ লক্ষ্য করে রামানন্দবাবু মন্তব্য করলেন, "বিজয়, তোমার কন্যাটি দ্বিভুজা না হয়ে যদি দশভুজা হ'ত তবে কেমন হ'ত?' দশভুজা কন্যার লোভাতুর দশহস্তে দশপ্রহরণের পরিবর্তে দশটি খাবারের ঠোঙা বিরাজ করছে—এ ছবি কল্পনা করে আমরা হেসে উঠলাম। আহার্য তখনকার দিনে এমন দুর্মূল্য না হ'লেও কন্যার দশহাত কচুরি-সিঙাড়া-সন্দেশে ভরিয়ে তুলতে আমি কি রকম বিব্রত হ'ব—এই ইঙ্গিতও কি পরিহাসের মধ্যে ছিল?

সেবার কৃত্তিবাস উৎসবে আমরা শান্তিপুরের নিকটবর্তী ফুলিয়ায় চলেছি। আমরা থার্ড ক্লাসের যাত্রী। রামানন্দবাবুও আমাদের সহযাত্রী হলেন। থার্ড ক্লাসের ভিড়ে তাঁর কষ্ট হবে—এই কথা শুনে তিনি যে জবাব দিলেন তা ইহজীবনে ভুলব না। বললেন, "তীর্থে যেতে হ'লে কষ্ট করতে হয়।" যাঁরা নিজেরা মহৎ জীবনের অধিকারী, তাঁরাই গুণীর যথার্থ সমাদর করতে পারেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছে। ট্রেণে ওঠা-নামা করা তাঁর পক্ষে রীতিমত কষ্টকর ব্যাপার।

সেবার দিল্লীতে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে গিয়েছিলাম আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিনিধি হয়ে। রামানন্দবাবু ছিলেন সম্মেলনের মূল সভাপতি। কলিকাতায় ফেরার পথে এলাহাবাদ ও দিল্লীর মাঝখানে কোন্ স্টেশনে তিনি আমাকে ডেকে নিলেন নিজের কামরায়। তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিলেন, আমি ইণ্টার ক্লাসে। গাড়িতে তিনি একাই ছিলেন। কত গল্প করলেন। আমি তাঁকে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা-গুলিকে আত্মজীবনীতে লিপিবদ্ধ করতে সেদিন তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম। তিনি বক্তা। আমার ছিল উৎকর্ণ শ্রোতার ভূমিকা। সেই রসালো গল্পটি তাঁর মুখে সেদিন কত সুন্দরই লেগেছিল। ভিয়েনাতে তখন তিনি একই বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। কাণের পীড়ায় খুব কষ্ট পাচ্ছেন। ইউরোপের বিখ্যাত এক চিকিৎসকের সঙ্গে দিনক্ষণ স্থির হয়ে গেল। যথাসময়ে রামানন্দবাবু চিকিৎসকের চেম্বারে উপস্থিত হলেন। ডাক্তার সাহেব তাঁকে চেয়ারে বসালেন; তারপর মুখটি হাঁ করতে বললেন চোখ দু'টি বুঁজে। ইউরোপের অতবড় ডাক্তার! মহাদেশ জুড়ে বিকীর্ণ তাঁর যশঃসৌরভ! রামানন্দবাবু ডাক্তারের কথামত নিমীলিতচক্ষু হয়ে মুখব্যাদান করলেন, তারপর যে কাণ্ডটি ঘটল সেটি তাঁর দীর্ঘজীবনে নিঃসন্দেহে একটি অভূতপূর্ব ঘটনা! প্রবীণ প্রবাসী-সম্পাদকের মুখের মধ্যে একটি লজেন্স নিক্ষেপ করে ডাক্তার তাঁকে চক্ষু উন্মীলিত করতে বললেন। অতঃপর খুব যত্নের সঙ্গে ডাক্তার কান পরীক্ষা করে ব্যবস্থাপত্র লিখে দিয়ে রোগীকে বিদায় দিলেন। বোধ করি ডাক্তারের নিক্ষিপ্ত ছেলেভুলানো চোষ্য পদার্থটি নিঃশব্দে উদরস্থ করলেও ব্যাপারটি বিশ্ববিখ্যাত সম্পাদকের মনে ছোট্ট একটি কাঁটার মত খচ্ খচ্ করছিল। তিনি বাসায় ফিরে কাউকে কিছু বললেন না। অনাস্বাদিতপূর্ব অভিজ্ঞতা স্রেফ চেপে গেলেন। এর পর রবীন্দ্রনাথকেও চিকিৎসার ব্যাপারে ঐ একই ডাক্তারের কাছে যেতে হ'ল। ডাক্তার যথারীতি বিশ্বকবির মুখের মধ্যেও একটি লজেন্স ফেলে দিলেন। লজেন্সটি নিঃশব্দে গলাধঃকরণ

করে চিকিৎসার ব্যাপারে কি করণীয় সে সম্পর্কে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে নোবেল-পুরস্কারজয়ী জগদ্বিখ্যাত কবি বাসায় ফিরে এলেন। লজেন্সের ব্যাপারটা তিনিও চেপে গেলেন। ইতিমধ্যে ঘরোয়া বৈঠকে কথায় কথায় কবি রামানন্দবাবুকে একদিন জিজ্ঞাসা করে বসলেন, "মশাই, ডাক্তার আপনাকে লজেন্স খেতে দিয়েছিল?" মোক্ষম প্রশ্ন। পালাবার আর পথ নেই। রামানন্দবাবুকে অকপটে ঘটনার সত্য স্বীকার করতে হ'ল। সম্পাদকের স্বীকারোক্তিতে ভরসা পেয়ে কবি তখন বললেন, "আমাকেও দিয়েছিল।" রামানন্দবাবুর মনের গোপন কাঁটাটির খচ্‌খচানি এইবার গেল।

সেই কাহিনীটিও কি রসালো! রামানন্দবাবু তখন ইউরোপে। একজন জানতে চাইল, ইউরোপের রান্নার আস্বাদ সম্পাদকের মুখে লাগে কেমন? প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সঙ্গে রামানন্দবাবু জবাব দিলেন, ভালই ত। তবে বেশী খাওয়া যায় না।" কৃষ্ণনগর কলেজে গিল্‌ক্রাইস্ট সাহেব আমাদের পড়াতেন Rhetoric and Prosody, তার মধ্যে ছিল Euphemism-এর অনেক দৃষ্টান্ত। রামানন্দবাবুর জবাব ছিল ইংরেজী অলঙ্কার শাস্ত্রের Euphemism-এর একটি সেরা উদাহরণ। কর্কশ সত্যকে এমন মোলায়েম ভাষায় বলবার মত সৌজন্য এবং রসবোধ রামানন্দের কথাবার্তার মধ্যে লক্ষ্য করে কতবার মুগ্ধ হয়েছি।

দিগন্তপ্রসারী প্রান্তরের মধ্য দিয়ে হু হু করে ট্রেণ ছুটে চলেছে, কামরার মধ্যে বক্তা তিনি এবং নীরব শ্রোতা আমি। কোথা দিয়ে সময় চলে গেল। তাঁকে প্রণাম করে আমি মোগলসরাই-এ নেমে গেলাম। তিনি কলকাতা চলে গেলেন।

বিপ্লবীর ধাতুতে গড়া তিনি ছিলেন একান্তভাবে সত্যের। আরামের মধ্যে পুরাতনের জাবর কাটবার মানুষ তিনি একেবারেই ছিলেন না। এমার্সন তাঁর বিখ্যাত Intellect প্রবন্ধে ঠিকই বলেছেন—আরামপ্রিয়তার (love of repose) দিকে যাদের ঝোঁক তারা হাতের মাথায় প্রথম যে-মত, যে-জীবন-দর্শন, যে-রাজনৈতিক দলটিকে পায় তাকেই গ্রহণ করে—খুব সম্ভবতঃ সেই মত, সেই জীবন বেদ, সেই দল তার পিতার। সে বিশ্রাম পায়, সুখ-সুবিধা পায়, এবং খ্যাতিও পায়; কিন্তু সত্যের দরজা সে বন্ধ করে দেয়। যার ঝোঁক সত্যের দিকে সে আপনাকে মুক্ত রাখবে বন্দরের সমস্ত বন্ধন-রজ্জু থেকে; সে পোষণ করবে না কোন গোঁড়ামিকে। সে আপনার স্বভাব এবং স্বধর্মকেই সর্বোচ্চ মর্যাদা দেবে।

রামানন্দবাবুর মধ্যে কোন গোঁড়ামির বালাই দেখি নি। কঠিন-নির্মল সত্যের তিনি ছিলেন পূজারী। এ জন্যে তাঁকে দুঃখ পেতে হয়েছে বিস্তর, ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে প্রচুর, এই ক্ষতি আর দুঃখ নিয়ে তাঁকে ক্ষুব্ধ হ'তে দেখি নি। সেই গম্ভীর-সুন্দর গৌরবর্ণ পককেশ সুদুর্লভ মানুষটি! ছোট্ট টেবিলটিতে কাগজপত্র ছড়ানো, জোরালো লেখনী হাতে তিনি সম্পাদকের ভূমিকায়—আমি মুগ্ধনেত্রে তাঁকে দেখেছি। তপোবনের যেন কোন আর্য ঋষি! গান্ধী গোখেল সম্পর্কে যা লিখেছিলেন, রামানন্দ তাই ছিলেন—স্ফটিকের মত নির্মল, মেষশাবকের মত মৃদু, সিংহের মত সাহসী।

—

চরিত্র

মিঃ তরফদার—সাহিত্যিক।

মিসেস তরফদার।

মল্লিক-বাবু—সভাপতি।

নন্দী মশাই—কার্য্যকরী সমিতির সদস্য।

অভ্যর্থক।

অনিল, অসিত, কেষ্ট, হরিপদ প্রভৃতি বিভিন্ন সমিতির ছেলে। সংখ্যায় ১৫।১৬ জন।

কয়েকটি কিশোর-কিশোরী।

ডঃ তরফদারের বাইরের ঘর। চারিদিকে রবীন্দ্র-রচনাবলী ছড়ানো। ডঃ তরফদার রচনাবলীর খণ্ডগুলি উল্টে-পাল্টে দেখছেন। মিসেস তরফদার প্রবেশ করলেন।

মিসেস তরফদার। কি ব্যাপার—সকাল থেকেই যে বই মুখে দিয়ে বসেছ! এদিকে অনু কি বলে পাঠিয়েছে জান?

ডঃ তরফদার। একটু পরে শুনলেও ক্ষতি হবে না। ওকে বরঞ্চ বেশ বড় দেখে একখানা নভেল পাঠিয়ে দাও—যা সাত দিন ধরে পড়েও শেষ করতে পারবে না।

মিসেস তরফদার। আহা, সেই ভাবনায় আমার ত ঘুম হচ্ছে না! বাচ্চুটার ভারি অসুখ, ও এইমাত্তর ফোন করছিল, আজ বিকেলে তোমাকে একবার যেতে বলছিল।

ডঃ তরফদার। আজ বিকেলে? অসম্ভব। দেখছ সকাল থেকে একটু অবসর পাচ্ছি? এই ছাব্বিশ খণ্ড মহাভারত প্লাস দু'খণ্ড অচলিত সংগ্রহ—হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি। আজ কাল পরশু মিলিয়ে অন্তত গোটা দশেক ভাষণ আমাকে তৈরি করতেই হবে।

মিসেস তরফদার। আষাঢ় মাস শেষ হয় হয়, এখনও তোমাদের রবীন্দ্র-জয়ন্তী শেষ হ'ল না?

ডঃ তরফদার। ও কি শেষ হবার জিনিস—ও যে চিরকালের উৎসব। ভার্সাটাইল জিনিয়াস, এত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লিখেছেন! সারা জীবন ধরে শুধু লিখেই গেছেন, লিখেই গেছেন—

মিসেস তরফদার। কিন্তু একবারও ভাবেন নি, কাদের জন্য লিখছেন।

ডঃ তরফদার। কাদের জন্য! হাসালে ইন্দু। উনি লিখেছেন আমাদের সকলের জন্য—সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য।

মিসেস তরফদার। মোটেই নয়। সকলের কথা চিন্তা করলে এমন কাণ্ড কখনই করতে পারতেন না। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই সংসারে বাস করে। নানান রায় ঝঞ্ঝাট কাজ-কর্ম আমোদ-আহ্লাদ মিটিয়ে ক'টা মানুষ এমন সর্বনাশা লেখা নিয়ে থাকতে চায় বলবে কি! এমন লেখা যা সারাজীবন ধরে পড়লেও শেষ হবে না!

ডঃ তরফদার। সেই জন্যই ত এই সব জয়ন্তী অনুষ্ঠান। সাধারণ মানুষরা বুঝতে পারে না—বুঝতে চায় না বলেই ত বড় বড় পণ্ডিতরা, সাহিত্যিকরা তাঁর সাহিত্য-কর্মের ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

মিসেস তরফদার। বুঝিয়ে দিলেই সবাই বুঝছেন! ফুল মালা গলায় ঝুলিয়ে চোঙ মুখে দিয়ে তোমরা স জাঁকিয়ে বস, কিন্তু কতটুকুই বা বলতে পার!

ডঃ তরফদার। (চিন্তিত ভাবে) তা বটে, আরও সাংস্কৃতিক পর্ব থাকাতে ভাষণটা সংক্ষিপ্ত হয়। এবার আর সে ক্ষোভ রাখছি না। আমরা ক কয়েক মিলে স্থির করেছি অন কণ্ডিশান—সভাপ বা প্রধান অতিথির পদ গ্রহণ করব—যদি আমাদে ভাষণে কমপক্ষে এক ঘন্টা সময় রাখা হয়।

মিসেস তরফদার। তোমাদের কথা এক ঘন্টা ধরে শুন নাকি শ্রোতারা? শুকনো কথা!

ডঃ তরফদার। নিশ্চয় শুনবে। কবির প্রতি যাদের শ্র আছে, যাদের সাংস্কৃতিক চেতনা আছে, রসবো আছে—

মিসেস তরফদার। রসবোধ সাধারণ শ্রোতাদেরও আছে সেই জন্য নাচ গান নাটকের প্রতি তাদের আকর্ষ কম নয়।

ডঃ তরফদার। ওগুলো রসের তরল দিক।

মিসেস তরফদার। মোটেই নয়। বরং বলা যায় মনে স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে ওই সব লঘুপাক খাদ্যই রুচিক —এবং অতিশয় বলকারক। নাচ-গান নাটক না থাকলে জয়ন্তী উৎসব এমন জাঁকিয়ে হ'ত নাকি

ডঃ তরফদার। থাক ওসব তর্কের কথা—আমাকে একটু নিরিবিলি থাকতে দাও।

মিসেস তরফদার। তা যাই কর, খোকা বাড়ী নেই, তোমাকেই যেতে হবে অনুর ওখানে। দুপুর বেলায় যাবে।

ডঃ তরফদার। আচ্ছা, আচ্ছা তাই হবে।

মিসেস তরফদার। আর—

ডঃ তরফদার। আবারও—না, না, আর এক মিনিটও নয়—

(মিসেস তরফদারের প্রস্থান—নেপথ্যে কড়ানাড়ার শব্দ)

কে—কে?

নেপথ্যে। ডঃ তরফদার আছেন?

ডঃ তরফদার। হাঁ, চলে আসুন—দুয়োর খোলাই আছে।

(কয়েকজন তরুণের প্রবেশ)

সকলে। নমস্কার। আমরা স্যার—

ডঃ তরফদার। বুঝেছি, রবীন্দ্র-জয়ন্তী ত?

সকলে। আজ্ঞে—

ডঃ তরফদার। কবে? কখন?

১ম ছেলে। আজ্ঞে আসছে শনিবার—সন্ধ্যাবেলা।

ডঃ তরফদার। দাঁড়াও, ডায়েরিখানা দেখি। হুঁ। তা শুধু সন্ধ্যাবেলা বললে ত হবে না—ঠিক সময়টি চাই। সভা আরম্ভ হওয়া চাই পাংচুয়ালি। শুধু তোমাদের সভাটি ত নয়—এই দেখ শনিবার ২০শে জুলাই সন্ধ্যা ৬টায়, রাত্রি সাড়ে সাতটায় দু' জায়গায় আছে। তোমাদেরটা ন'টায় আরম্ভ করলে যদি হয়—

২য় ছেলে। আজ্ঞে ন'টায় বড্ড দেরী হবে না? দয়া করে যদি আটটায়—

ডঃ তরফদার। উঁহু, সে হবে না। খানিকটা মার্জিন রেখেই টাইম ফিক্স করছি। ধর সভার আরম্ভে একটা গান—মানে প্রারম্ভ সঙ্গীত—তারপর তোমাদের সমিতির সম্পাদকীয় অপভাষণ—দুই মিলিয়ে মিনিট পঁচিশ, বাকি এক ঘণ্টা আমার ভাষণ—

১ম ছেলে। স্যার, আপনি অতক্ষণ কষ্ট করে কেন বলবেন —দু' পাঁচ দশ মিনিট—

ডঃ তরফদার। না বাপু, কবিকে তোমরা যত খেলো করেই দেখতে চাও না কেন, আমরা তা পারি না। আমরা ওঁকে অন্তর দিয়ে শ্রদ্ধা করি। ওঁর সম্বন্ধে ভাল করে কিছু বলতে হলে দু' ঘণ্টাতেও কুলিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। তবে সাধারণের মুখ চেয়ে আমরা ঠিক করেছি—

২য় ছেলে। আচ্ছা স্যার, তাই হবে, আপনি এক ঘণ্টাই বলবেন। আবার প্রধান অতিথি মশায় কিছু বলবেন—

ডঃ তরফদার। নিশ্চয় বলবেন। ওঁর জন্যও এক ঘণ্টা—

১ম ছেলে। (বিপন্ন স্বরে) তা হলে স্যার সভা ম্যানেজ করা যাবে না!

ডঃ তরফদার। (রাগতভাবে) কি—কি বললে—

২য় ছেলে। (তাড়াতাড়ি) ও বলছে, তা হলে আর যাঁরা আর্টিষ্ট আসবেন তাঁরা হয়ত রাগ করবেন—চলে যাবেন।

ডঃ তরফদার। কবির প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলে অবশ্যই চলে যাবেন।

১ম ছেলে। আজ্ঞে স্যার, তা হলে অডিয়েন্স—মানে শ্রোতারা—

ডঃ তরফদার। (ক্রুদ্ধকণ্ঠে) থাকবেন না?

২য় ছেলে। আজ্ঞে স্যার, থাকবেন না নয়—নিশ্চয় থাকবেন। তবে হয়ত ঠিক চুপ করে থাকবেন না।

ডঃ তরফদার। (ক্রুদ্ধকণ্ঠে) মানে? তোমরা রয়েছ কি করতে—কন্ট্রোল করতে পারবে না?

১ম ছেলে। আজ্ঞে আপনেরাই ত—সব আরকণ্টে্রালেবল।

ডঃ তরফদার। দেখ একটা কথা বলি, এটা ঠাট্টা ইয়ার্কির ব্যাপার নয়। জয়ন্তী-উৎসব করছ, নিশ্চয় সেই ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য। যাতে কোন গোলমাল না হয় সে দায়িত্ব তোমাদেরই। তবে তাঁর কথা যদি শুনতে রুচি না থাকে তোমাদের—

১ম ছেলে। আজ্ঞে আমাদের নয়—অডিয়েন্সের—

ডঃ তরফদার। (সগর্জ্জনে) জাহান্নমে যাক অডিয়েন্স। প্রধান অতিথি যদি তাঁর ভাষণ সংক্ষেপ করতে চান করবেন। আমার কিন্তু এক কথা, এক ঘণ্টার এক মিনিট কম বলব না।

১ম ছেলে। (হতাশকণ্ঠে) তাই বলবেন। তবে স্যার একটা অনুমতি নিয়ে রাখছি, প্রধান অতিথিকে নিয়ে সভা আরম্ভ করতে পারব ত? আর আপনি না আসা পর্য্যন্ত আর আর আইটেমগুলো—

ডঃ তরফদার। অবশ্যই পারবে। তবে আমি পৌঁছানো মাত্র মিনিট পাঁচেক পরেই আমার ভাষণ আরম্ভ হবে। কারণ তারও পরে আরও দু' একটা সভায় হয়ত—

১ম ছেলে। বলেন কি স্যার, ওই অত রাত পর্য্যন্ত সভায় সভায় ঘুরবেন! ভারি কষ্ট হবে যে!

ডঃ তরফদার। (হেসে) কষ্ট! কবি যে অমূল্য সম্পদ দিয়ে গেছেন আমাদের, তা প্রচার করার জন্য এই সামান্য কষ্টটুকু স্বীকার করতে যদি না পারলাম তা হলে বৃথাই আমাদের রবীন্দ্র-সাহিত্য চর্চ্চা! বুঝলে ছোকরা—আমরা তাঁকে মানে তাঁর সাহিত্য-কর্ম্মকে মন প্রাণ দিয়ে শ্রদ্ধা করতে শিখেছি, হুজুগে মেতে গলা ফাটাতে বসি নি।

২য় ছেলে। আজ্ঞে, তা বটে, তা বটে—আপনারাই ধন্য।

১ম ছেলে। তা হলে স্যার ওই কথা রইল, পৌনে ন'টায় সময়—

ডঃ তরফদার। কোথায় আসবে? এখানে নয়। সেই সভায় যেটা তোমাদের আগে হবে, সেইখানে গাড়ী নিয়ে যাবে।

২য় ছেলে। যে আজ্ঞে। তা হলে আসি স্যার—নমস্কার, নমস্কার।

(সকলে চলে গেল।)

ডঃ তরফদার। এই কিশোর ছেলেদের মত করে একটা ভাষণ তৈরি করতে হবে। কিছু রবিঠাকুর আগে, প্রবন্ধের দু'চার লাইন, কবিতার দু' একটি কলি—

(কড়ানাড়ার শব্দ)

কে ?

নেপথ্যে কয়েকটি যুব কণ্ঠ। আজ্ঞে, আমরা সানডে ক্লাব থেকে আসছি।

ডঃ তরফদার। ভিতরে চলে আসুন। (সকলে হুড়মুড় করে ঢুকল) কি ব্যাপার ? জয়ন্তী ?

সকলে এক সঙ্গে। আজ্ঞে, আমরা এসেছি আপনাকে প্রধান অতিথি—

ডঃ তরফদার। এক সঙ্গে নয়, একে একে কথা বলুন। কবি ছেলেবেলায় ইস্কুল পালিয়ে প্রচলিত প্রথা ভেঙে-ছিলেন বটে, তবু আজীবন একটি নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে বাস করে গেছেন। বোধ হয় পড়েছেন— কবির একটি অভ্যাস ছিল, প্রতিদিন সূর্য্য ওঠার আগে শয্যাত্যাগ করার অভ্যাস। কবির এই শৃঙ্খলাবোধকে নিশ্চয় শ্রদ্ধা করেন আপনারা।

প্রথম জন। আজ্ঞে হাঁ, তা করি বই কি। তাই ত—

ডঃ তরফদার। আচ্ছা বলুন ত, কবি কোন্ বইয়ে এই কথাটা লিখেছেন ?

প্রথম জন। আজ্ঞে—আজ্ঞে (মাথা চুলকানো)

ডঃ তরফদার। মাথা চুলকোবেন না—বুঝতে পারছি ওটা পড়েন নি, কারও মুখে শুনেছেন।

প্রথম জন। আজ্ঞে ঠিক বলেছেন, শুনেছি।

ডঃ তরফদার। কার মুখে শুনেছেন ?

২য় জন। আজ্ঞে, আপনার মুখে।

ডঃ তরফদার। (হেসে) তোমাদের ক্লাবে বুঝি রবীন্দ্র-সাহিত্য চর্চ্চা হয় না ? কি হয় তবে ?

১ম জন। আজ্ঞে, আমাদের সময় খুব কম, মাত্তর রবিবার দিনটি আমরা একত্তর হতে পারি।

ডঃ তরফদার। তা একত্র হয়ে কর কি ?

১ম জন। আজ্ঞে, এই গানবাজনা, খানিকটা তাসখেলা কেউ ক্যারাম নিয়ে বসে, কেউ বা—

ডঃ তরফদার। তা তোমাদের এই খেয়াল হ'ল কেন ?

১ম জন। আজ্ঞে উনি ত—মানে রবিবাবু সকলের জন্তেই ত কিছু-না-কিছু করেছেন। শুনেছি হাজারের ওপর গান লিখেছেন, সেই সব গানে সুর দিয়েছেন— নিজে গেয়েছেন—

ডঃ তরফদার।, তা একজন ভাল গানের ওস্তাদকে নিয়ে গিয়ে প্রধান অতিথি করলেই ত সব ল্যাঠা চুকে যেত।

২য় জন। আজ্ঞে, তিনি ত সভাপতি আছেনই। গান ছাড়া আরও অবদান আছে ত রবিবাবুর—আ আপনার মুখ থেকে সেই সব শুনব।

ডঃ তরফদার। (খুশি হয়ে) বেশ বেশ। ভাষণে ক সময় রেখেছেন ?

১ম জন। যা আপনার খুশি, দশ পনেরো বিশ।

ডঃ তরফদার। (গম্ভীর হয়ে) আমার একটা সর্ত্ত আছে এক ঘণ্টার কম বলব না।

সকলে এক সঙ্গে। এ—ক—ঘ—ণ্টা ! !

ডঃ তরফদার। হাঁ পুরোপুরি এক ঘণ্টা, এক মিনিট কম নয়ই, দু' পাঁচ মিনিট বেশিও হতে পারে। কি সব চুপচাপ যে !

২য় জন। আজ্ঞে ধরুন সন্ধ্যে থেকে—

ডঃ তরফদার। সন্ধ্যে থেকে নয়, রাত সাড়ে দশটা থেকে

সকলে একসঙ্গে। সাড়ে দশটা থেকে ! সে কি করে স্যার !

ডঃ তরফদার। হবে, কারণ তার আগে আমাকে তি সভা সারতে হবে। কেমন—রাজী ?

১ম জন। আজ্ঞে, অতক্ষণ কি কোন লোক থাকবে সভ বিশেষ করে দেখেছেন ত, সভাপতির ভাষণ দে সময় আদ্ধেক চেয়ার খালি।

ডঃ তরফদার। আচ্ছা, ধর যদি সভাপতির ভাষণের ব কোন নামজাদা গায়ক কিম্বা বিখ্যাত কৌ অভিনেতার প্রোগ্রাম থাকে ওই অতখানি রাত্রি তা হলে শ্রোতারা থাকবেন ?

সকলে একসঙ্গে। নিশ্চয় থাকবে স্যার।

ডঃ তরফদার। তা হলে ঘোষণা করে দিও, ওই সময়ে বিখ্যাত কৌতুক-অভিনেতা—

১ম জন। কিন্তু কমিক ক্যারিকেচার ত প্রোগ্রামে নে

ডঃ তরফদার। আমি এমন ভাষণ দেব, কবির কৌতুব প্রসঙ্গে যাতে সবাই খুসি হবেন।

২য় জন। (বিপন্ন স্বরে) স্যার, অডিয়েন্স যদি (এসব চালাকি, তা হলে মেরে তক্তা বানিয়ে ছাড় আর আপনাকেই কি বাঁচাতে পারব স্যার ? বড় বড় আধলা ইট ছুঁড়ে প্যাণ্ডেল শুদ্ধ আপনা

ডঃ তরফদার। তা হলে মাপ কর ভাই, তোমাদের ও যেতে পারব না। প্রাণের ভয় আমারও আছে।

সকলে একসঙ্গে। (কাঁদ কাঁদ কণ্ঠে) আমরা যে বড় (নিয়ে এসেছিলাম স্যার। নিরাশ করবেন দয়া করে আপনার ভাষণটা মিনিট দশেকে নিতে পারবেন না ?

ডঃ তরফদার। না—কারণ আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি।

(নেপথ্যে কড়ানাড়ার শব্দ)

নেপথ্যে। আসতে পারি স্যার ?

ডঃ তরফদার। আসুন। (দলটি প্রবেশ করল)

নবাগত। নমস্কার। আপনার কাছে এলাম স্যার।

ডঃ তরফদার। সে ত দেখছিই। ক্লাবের নাম ?

১ম নবাগত। আজ্ঞে টেনিস কর্ণার।

ডঃ তরফদার। টেনিস কর্ণার! তা দেখ বাপু—আমি এই বইয়ের পাহাড় খুঁজে কোথাও ত পেলাম না—কবি টেনিস নিয়ে কোন কবিতা প্রবন্ধ কিংবা গল্প লিখেছেন।

১ম নবাগত। আজ্ঞে ওসব লেখাটেখা নিয়ে আমরাও বিশেষ মাথা ঘামাই নে। যে হেতু কবি আমাদের গৌরবের বস্তু—

ডঃ তরফদার। সেইহেতু পুজোটা বকলমে চালিয়ে যাচ্ছ! তা এ যে ক্রমেই সরস্বতী পুজোকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে বাপু। তোমাদের অভিভাবকরা খুসি মনে চাঁদার টাকাকড়ি দিচ্ছেন ত ?

২য় নবাগত। আজ্ঞে জানেনই ত সব—খুসি মনে কে কবে চাঁদার টাকা দিয়েছেন! কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটি ফাংশানে সকলকেই খুসি করার আপ্রাণ চেষ্টা করি।

ডঃ তরফদার। যথা ?

২য় নবাগত। এই ধরুন না—কৃষ্টির জগতে যত রকম বৈচিত্র্য আছে সবগুলিকে এক করে নিয়ে আমাদের বিচিত্রানুষ্ঠান। যায় যাদুবিদ্যা পর্য্যন্ত।

ডঃ তরফদার। বল কি ? তোমরা ত খুব বাহাদুর ছেলে!

২য় নবাগত। (হাস্য) একবার—গল্পটা শুনবেন স্যার ?

ডঃ তরফদার। এখন থাক—বরং একটা সাজেশান দিচ্ছি··· নিয়ে যাও—তা হলে তোমাদের অনুষ্ঠান আরও বিচিত্রতর হবে।

২য় নবাগত। বলুন স্যার।

ডঃ তরফদার। তোমরা নিশ্চয় গল্প শুনেছ—রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে স্বদেশী নেশায় মেতেছিলেন। সেই দলের চেষ্টায় দেশলাই তৈরি—কাপড়ের কল তৈরি—জাহাজ চালানো প্রভৃতি অনেক কিছু·· ব্যাপার ঘটেছিল। দেশলাইয়ের দিন্যুট পরদায় জেলে কোন কবিতা কিংবা কথিকা যদি গানের সুরের সঙ্গে একজিবিট করাতে পার—

২য় নবাগত। দি আইডিয়া! বলুন বলুন—নোট করে নিই।

ডঃ তরফদার। পরে বলব। প্রথম তারিখ আর সময়টা স্থির করে ফেল।

পূর্ব্বাগত দল। আমরা স্যার অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে আছি।

ডঃ তরফদার। বললাম ত লাইফ রিস্ক করে বক্তৃতার দায়িত্ব নিতে পারব না—আর দশ বিশ মিনিটে ফুল-বেলপাতা গোছ পুজোও সারতে পারব না।

পূর্ব্বাগত সকলে এক সঙ্গে। (সকাতরে) আচ্ছা স্যার—এক ঘণ্টাই বলবেন। অতিরিক্ত না থাকে—চেয়ার বেঞ্চিগুলো থাকবে ত।

ডঃ তরফদার। আর জীবনের দায়িত্ব ?

পূর্ব্বাগত দলের একজন। আমরা পুলিশের ব্যবস্থা করব—নিজেরা গার্ড দেব। স্যার হয়ত মনে করছেন—আপনার জীবন থাকে থাক যায় যাক ওদের কি ক্ষতি। কিন্তু সে যে কি ভীষণ ক্ষতি আপনি ধারণা করতে পারবেন না। শুধু মানুষকে খোঁচা দিলে হয়ত ক্ষতি তেমন হয় না, কিন্তু চেয়ার বেঞ্চি ভাঙলে ? প্যাণ্ডেল নষ্ট করলে ? আমরা স্যার বাগদী পাড়া থেকে সমাজ-বিরোধী ছেলেদের আনিয়ে রাখব।

ডঃ তরফদার। না বাপু—ওসব মারপিট দাঙ্গাহাঙ্গামার মধ্যে যেতে পারব না। তোমরা বরং আর কাউকে নিয়ো—যিনি নৈবিদ্যির চুড়োর মণ্ডার মত শোভা-বর্দ্ধন করবেন—আর খুব সংক্ষেপে পুজো সারবেন।

পূর্ব্বাগত দল। না স্যার আমরা আপনাকেই চাই। না হয় পরের দিন—

নবাগত দল। আব্দার! আমরা বলে পরের দিন বুক করব বলে—

পূর্ব্বাগত দল। ওসব মাঠঘাটে আর কোথাও চালাবেন। ফার্স্ট কাম, ফার্স্ট সার্ভ।

নবাগত দল। ঢের দেখেছি রকবাজী।

ডঃ তরফদার। এটা কিন্তু মাঠও নয়, রকও না—ভদ্র লোকের বৈঠকখানা।

পূর্ব্বাগত দল। ক্ষমা করবেন স্যার। দেখি আবার, যাক গে। 'এভ্রি ডে ইজ্ ফ্রাইডে—'

নবাগত দল। সত্যিই অপরাধ হয়েছে। ইয়েস—এভ্রি ডে

ডঃ তরফদার। সাধে কি কবি বলেছেন—বহু মনীষীও বলেছেন, বৈচিত্র্যের মধ্যে ভারতের ঐক্য। আর ঐক্য কথাটা তোমরা মনে রাখবে। শোন টেনিস কর্ণার, তোমরা পরে এসো—একটা দিন

নাও। দিন একই থাকবে—সময়টা আগে পিছে। সময়টা পিছিয়ে নিলে একটা লাভ হবে তোমাদের—আমি খুব অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথা শোনাতে পারব।

নবাগত দল। কিন্তু স্যার অনুষ্ঠান সূচীতে অনেকগুলি পদ আছে—

ডঃ তরফদার। জানি থাকবেই—বহুপদী না হলে জয়ন্তীর জলুস কি? তবে প্রথম মুখে আমার ভাষণ থাকলে, অনুষ্ঠান-সূচীর অপর অংশটি অর্থাৎ নাচন-কোঁদন-গাওনের পথটা খোলসা হয়ে যাবে। সেটা কি ভাল হবে না?

নবাগত দল। ভালমন্দ আমরা কি বুঝি স্যার, যা করেন আপনি।

ডঃ তরফদার। এখন আমার আর একটি প্রস্তাব শোন। আমার জন্য আলাদা একখানা গাড়ীর বন্দোবস্ত করবে—প্রধান অতিথি-টতিথির ঝামেলা ওর সঙ্গে রাখবে না। কারণ অমূল্য এই গ্রন্থরাজি থাকবে আমার সঙ্গে। এগুলিতে পেন্সমার্ক দেওয়া থাকবে, ভাষণ দানের সময়ে উদ্ধৃতিগুলি সহজেই বা'র করতে পারব। অবশ্য এগুলি এখান থেকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার কোন দরকার ছিল না, যদি তোমাদের ক্লাবে ছোট মত একটা পাঠাগার থাকত।

নবাগত দলের একজন। স্যার অত বই সব নিয়ে যাবেন?

ডঃ তরফদার। ভাল বক্তৃতার অঙ্গই হ'ল কোটেশান—যা অতিশয় ইম্‌প্রেসিভ। ভয় নেই সবটা পড়ে শোনাব না শ্রোতাদের—এর থেকে বিন্দু বিন্দু নিয়ে।

নবাগত ২য়। জানি স্যার, বিন্দু বিন্দু জল জমেই সমুদ্দুর হয়।

ডঃ তরফদার। (হেসে) তবে ভয় নেই—এই সমুদ্রে তুফান তুলব না। মাত্র কয়েকটি ছত্র—যা অমৃততুল্য মনে হবে—

নবাগত ২য়। সেই ভাল স্যার—সমুদ্দরের জল নোনা—ঢেউগুলো দুরন্ত—তাই ভয় লাগছিল···

ডঃ তরফদার। (উচ্চহাস্য) ক্লাবটা তোমাদের যাই হোক—সভ্যদের রসবোধ চমৎকার। তা হলে এখন তোমরা এস। হাঁ—দেখ কাষ্ট ক্যাম্পের দল, তোমরা পুলিশ মোতায়েন কর ক্ষতি নাই, কিন্তু ভিন্ পাড়া থেকে ওই সমাজবিরোধী ছেলেগুলিকে আমদানি করো না যেন!

পূর্বাগত দল। যে আজ্ঞে। তা হ'লে আসি স্যার—নমস্কার।

নবাগত দল। নমস্কার স্যার—

(ক্রমাগত ধ্বনি উঠছে—নমস্কার—নমস্কার)

দ্বিতীয় দৃশ্য

সভা প্রাঙ্গণ

একটি বড় মাঠের এক ধারে মঞ্চ বাঁধা হয়েছে—এখন মঞ্চ-সজ্জা সম্পূর্ণ হয় নি। খুটখাট শব্দে পেরেক পো[illegible] হচ্ছে। মঞ্চের তক্তার উপর বহু লোকের যাতায়াত এব[illegible] ভারি যন্ত্রপাতি ঘর্ষণের শব্দও শোনা যাচ্ছে। মঞ্চের পিছন দিকে আলো-আঁধারী মাঠে কয়েকখানি চেয়ার পাতা। একখানি চেয়ারে এক আধবৃদ্ধ ভদ্রলোক চোখ চেয়ে কি চোখ বুজে বসে আছেন বোঝা যাচ্ছে না। বাকি চেয়ারগুলো খালি। ডঃ তরফদারকে নিয়ে দুটি ছেলে সেইখানে উপস্থিত হ'ল।

১ম ছেলে। বসুন স্যার এই চেয়ারটায়। এই যে—ইনি আমাদের সভাপতি মশায় মল্লিক-দাহু (ডঃ তরফদ[illegible] হাত উঠিয়ে নমস্কার করলেও ওদিক থেকে কো[illegible] সাড়া এল না)

ডঃ তরফদার। তোমাদের ত দেখছি এখনও মাচা ব[illegible] শেষ হয় নি—ঠুক্‌ঠাক্ শব্দ চলছে। বলি পাংচুয়া[illegible] আরম্ভ হবে ত?

১ম ছেলে। আজ্ঞে নিশ্চয়।

ডঃ তরফদার। কিন্তু শ্রোতারা কেউ এসেছেন বলে মনে হচ্ছে না!

২য় ছেলে। আজ্ঞে এসেছেন বই কি। আসছেন[illegible] মাইকটা ফিট হয়ে গেলেই, যেমন ঘোষণা হবে দেখবেন মাঠ ভরে গেছে। আচ্ছা স্যার—ব[illegible] নমস্কার। (প্রস্থা[illegible]

ডঃ তরফদার। এ ত দেখছি লোকালয় ছাড়া এক বি[illegible] মাঠ! এটা কি উদ্বাস্তু কলোনী? শুনছেন মশা[illegible] (ততক্ষণ অল্প অল্প নাসিকা ধ্বনি হচ্ছিল) এ কি ইনি কি ঘুমোচ্ছেন? (ঈষৎ জোরে) শুনা[illegible] মশাই—

মল্লিক-দাছ। (চমকে উঠলেন) অ্যাঁ—কে? তো[illegible] হল? (হাই তুলতে তুলতে) ধর বাবা—হাতখ[illegible] ধর। কাল থেকে আবার হাতের ব্যথ[illegible] চাগিয়েছে। উহু—ধর বাবা—

ঃ তরফদার। ছেলেরা নয়—আমি। মানে প্রধান অতিথি।

ল্লিক-দাদু। ও—নমস্কার। মাপ করবেন। সারাদিন দোকানের টাটে বসে বসে ঘাড় পিঠ মাজায় যা টাটানি—চেয়ারে বসতেই—মাঠে দিব্যি ফুরফুরে হাওয়া ত—একটু আলিস্যি মত—

ঃ তরফদার। আপনি কতক্ষণ এসেছেন?

ল্লিক-দাদু। তা অনেকক্ষণই ত। তখনও যেন আলো-আলো ভাব ছিল—ওরা গিয়ে বলল, দাদু, এইবেলা চলুন। আপনি গিয়ে বসলেই—

ঃ তরফদার। উঃ এরা দেখছি মানুষ খুন করতে পারে। সেই গোধূলি কাল থেকে ঠায় বসিয়ে রেখেছে আপনাকে। আর আপনিও—

ল্লিক-দাদু। (হেসে) ওদের অপরাধ নেই। জানে দাদু একবার যদি পাশার ছক পেতে বসে ত ব্রহ্মা বিষ্টু মহেশ্বর এলেও নড়াতে পারবে না। কেলেভার আছে ছোঁড়াগুলো।

ঃ তরফদার। তা আপনাকে সভাপতি করার মানে কি? মানে বুড়ো মানুষ—শরীরও সুবিধার নয়—শুধু শুধু কষ্ট দেওয়া—

ল্লিক-দাদু। সে কথা আমিও বলেছিলাম—শুনল কই! বলেছিলাম, আমাকে আর টানাটানি কেন—যার নামে সভা করছিস—তার নামটা এই প্রথম শুনলাম তোদের মুখে। তার সম্বন্ধে কি জানি যে বলব? বলল—আপনাকে কিচ্ছু বলতে হবে না—আপনি শুধু মালা গলায় দিয়ে চেয়ারে বসে থাকবেন, যা বলবার আমাদের প্রধান অথিথি মশায় বলবেন। আপনার ভরসাতেই বুঝলেন না…তা ছোঁড়াগুলো ভালবাসে। চাঁদাটা বেশিই দিই কি না—তাই খাতিরটা বেশ করতে চায়। বুঝি মশাই—সব বুঝি। আমি ত মশায়—গোলা পায়রা—আপনাদের মত রাজহাঁসের মধ্যিখানে বলতে পারি! বলবার যুগ্যি?

ঃ তরফদার। এদিকে কারও পাত্তা নাই যে!

ল্লিক-দাদু। নাই থাকুক—বসে বসে দেখুন না রগড়টা।

ঃ তরফদার। রগড় দেখলে চলবে না—আমার আরও দু'জায়গায়—

ল্লিক-দাদু। জায়গা আছে? তা থাকুক না—ঘাবড়াচ্ছেন কেন? আমাদের নিতু চক্রবর্তীর মতই না হয় করবেন। এক রাত্তিরে পাঁচখানা কালীপুজো। বলেছিলাম একবার—কি করে হয় ভটচার্যি মশায়? বলেছিল—কেন হবে না—জায়গা জানলে আরও পাঁচখানা সারা যায়। যদি পুজোই না হয় আলাদা আলাদা জায়গায়—মা—ও আর আলাদা নয়। এক মন্তর, এক তন্তর, এক বিধান। এক জায়গায় ভাল করে পুজো করে—অন্য জায়গায় মন্তর না বলে শুধু ফুল জল দিলে মায়ের পায়ে পৌঁছে না হবে না? বুঝুন কত বড় তত্ত্বজ্ঞানের কথা! আপনিও না হয়—

ডঃ তরফদার। (হেসে) এ পুজোর নিয়মটা আলাদা। যদিও ঠাকুর এক—মন্ত্রগুলিও মোটামুটি একই সুরে বাঁধা—তবু এক এক জায়গায় এক এক রকম ব্যবস্থা। এরা কিন্তু বড্ড জ্বালাচ্ছে! এখনও ঠুক-ঠাক শেষ হ'ল না? মাচাটা কি বেলাবেলি বেঁধে রাখা যেত না?

মল্লিক-দাদু। আর বলেন কেন—বাবুদের যে ভুড়ও চাই টামাকও চাই। ফুটবল খেলা দেখার নেশা আছে যে। আজ আবার নাকি মোহনবাগানের খেলা ছিল।

ডঃ তরফদার। যাদের এত খেলার ঝোঁক—তাদের এসব কেন?

মল্লিক-দাদু। বুঝছেন না—সখ। যে বয়েসের যা। বলে—দাদু, সবাই করছে—দেশ জুড়ে হচ্ছে এই পুজো, আমরাও করব। না করলে সবাই ছি ছি করবে—বলবে—মুখ্যু পাড়া—

ডঃ তরফদার। বুঝেছি। (অধৈর্য্য হয়ে) আমি কিন্তু আর অপেক্ষা করতে পারছি না। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে যদি সভা আরম্ভ করতে পারে ভাল, না হলে—

মল্লিক-দাদু। চলে যাবেন? কি করে যাবেন? এ দিগড়ে গাড়ী ঘোড়ার নামগন্ধ নেই—মাইল খানিক হাঁটলে তবে—

ডঃ তরফদার। (বিরক্ত হয়ে) তা এই তেপান্তরের মাঠে কে ওদের সভা করতে বলেছিল। এখানে যে মানুষজন নেই—

মল্লিক-দাদু। আছে বই কি মানুষজন। দেখুন না—বাজনার আওয়াজ কানে ঢুকলে দেখে মদ্দ জোয়ান বুড়ো—আণ্ডাবাচ্চা সব পিল পিল করে ছুটে আসবে।

ডঃ তরফদার। (অধৈর্য্য হয়ে) নাঃ এ অসহ্য। আমি উঠলাম।

নাও। দিন একই থাকবে—সময়টা আগে পিছে। সময়টা পিছিয়ে নিলে একটা লাভ হবে তোমাদের—আমি খুব অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথা শোনাতে পারব।

নবাগত দল। কিন্তু স্যার অনুষ্ঠান সূচীতে অনেকগুলি পদ আছে—

ডঃ তরফদার। জানি থাকবেই—বহুপদী না হলে জয়ন্তীর জলুস কি? তবে প্রথম মুখে আমার ভাষণ থাকলে, অনুষ্ঠান-সূচীর অপর অংশটি অর্থাৎ নাচন-কোঁদন-গাওনের পথটা খোলসা হয়ে যাবে। সেটা কি ভাল হবে না?

নবাগত দল। ভালমন্দ আমরা কি বুঝি স্যার, যা করেন আপনি।

ডঃ তরফদার। এখন আমার আর একটি প্রস্তাব শোন। আমার জন্য আলাদা একখানা গাড়ীর বন্দোবস্ত করবে—প্রধান অতিথি-টাতিথির ঝামেলা ওর সঙ্গে রাখবে না। কারণ অমূল্য এই গ্রন্থরাজি থাকবে আমার সঙ্গে। এগুলিতে পেজমার্ক দেওয়া থাকবে, ভাষণ দানের সময়ে উদ্ধৃতিগুলি সহজেই বা'র করতে পারব। অবশ্য এগুলি এখান থেকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার কোন দরকার ছিল না, যদি তোমাদের ক্লাবে ছোট মত একটা পাঠাগার থাকত।

নবাগত দলের একজন। স্যার অত বই সব নিয়ে যাবেন?

ডঃ তরফদার। ভাল বক্তৃতার অঙ্গই হ'ল কোটেশান—যা অতিশয় ইম্প্রেসিভ। ভয় নেই সবটা পড়ে শোনাব না শ্রোতাদের—এর থেকে বিন্দু বিন্দু নিয়ে।

নবাগত ২য়। জানি স্যার, বিন্দু বিন্দু জল জমেই সমুদ্দুর হয়।

ডঃ তরফদার। (হেসে) তবে ভয় নেই—এই সমুদ্রে তুফান তুলব না। মাত্র কয়েকটি ছত্র—যা অমৃততুল্য মনে হবে—

নবাগত ২য়। সেই ভাল স্যার—সমুদ্দরের জল নোনা—ঢেউগুলো দুরন্ত—তাই ভয় লাগছিল···

ডঃ তরফদার। (উচ্চহাস্য) ক্লাবটা তোমাদের যাই হোক—সভ্যদের রসবোধ চমৎকার। তা হলে এখন তোমরা এস। হাঁ—দেখ ফার্ষ্ট কাসের দল, তোমরা পুলিশ মোতায়েন কর ক্ষতি নাই, কিন্তু ভিন্ পাড়া থেকে ওই সমাজবিরোধী ছেলেগুলিকে আমদানি করো না যেন!

পূর্ব্বাগত দল। যে আজ্ঞে। তা হ'লে আসি স্যার—নমস্কার।

নবাগত দল। নমস্কার স্যার—

(ক্রমাগত ধ্বনি উঠছে—নমস্কার—নমস্কার)

দ্বিতীয় দৃশ্য

সভা প্রাঙ্গণ

একটি বড় মাঠের এক ধারে মঞ্চ বাঁধা হয়েছে—এখনও মঞ্চ-সজ্জা সম্পূর্ণ হয় নি। খুটখাট শব্দে পেরেক পোঁতা হচ্ছে। মঞ্চের তক্তার উপর বহু লোকের যাতায়াত এবং ভারি যন্ত্রপাতি ঘর্ষণের শব্দও শোনা যাচ্ছে। মঞ্চের পিছন দিকে আলো-আঁধারী মাঠে কয়েকখানি চেয়ার পাতা। একখানি চেয়ারে এক আধবৃদ্ধ ভদ্রলোক চোখ চেয়ে কি চোখ বুজে বসে আছেন বোঝা যাচ্ছে না। বাকি চেয়ারগুলো খালি। ডঃ তরফদারকে নিয়ে দুটি ছেলে সেইখানে উপস্থিত হ'ল।

১ম ছেলে। বসুন স্যার এই চেয়ারটায়। এই যে—ইনিই আমাদের সভাপতি মশায় মল্লিক-দাদু (ডঃ তরফদার হাত উঠিয়ে নমস্কার করলেও ওদিক থেকে কোন সাড়া এল না)

ডঃ তরফদার। তোমাদের ত দেখছি এখনও মাচা বাঁধা শেষ হয় নি—ঠুক্‌ঠাক্ শব্দ চলছে। বাকি পাংচুয়াল আরম্ভ হবে ত?

১ম ছেলে। আজ্ঞে নিশ্চয়।

ডঃ তরফদার। কিন্তু শ্রোতারা কেউ এসেছেন বলে ত মনে হচ্ছে না!

২য় ছেলে। আজ্ঞে এসেছেন বই কি। আসছেনও। মাইকটা ফিট হয়ে গেলেই, যেমন ঘোষণা হবে—দেখবেন মাঠ ভরে গেছে। আচ্ছা স্যার—বসুন, নমস্কার। (প্রস্থান)

ডঃ তরফদার। এ ত দেখছি লোকালয় ছাড়া এক বিজন মাঠ! এটা কি উদ্বাস্তু কলোনী? শুনছেন মশাই? (ততক্ষণ অল্প অল্প নাসিকা ধ্বনি হচ্ছিল) এ কি—ইনি কি ঘুমোচ্ছেন? (ঈষৎ জোরে) শুনছেন মশাই—

মল্লিক-দাদু। (চমকে উঠলেন) অ্যাঁ—কে? তোদের হল? (হাই তুলতে তুলতে) ধর বাবা—হাতখানা ধর। কাল থেকে আবার হাতের ব্যথাটা চাগিয়েছে। উহুহু—ধর বাবা—

ডঃ তরফদার। ছেলেরা নয়—আমি। মানে প্রধান অতিথি।

মল্লিক-দাদু। ও—নমস্কার। মাপ করবেন। সারাদিন দোকানের টাটে বসে বসে ঘাড় পিঠ মাজার যা টাটানি—চেয়ারে বসতেই—মাঠে দিব্যি ফুরফুরে হাওয়া ত—একটু আলিস্যি মত—

ডঃ তরফদার। আপনি কতক্ষণ এসেছেন?

মল্লিক-দাদু। তা অনেকক্ষণই ত। তখনও যেন আলো-আলো ভাব ছিল—ওরা গিয়ে বলল, দাদু, এইবেলা চলুন। আপনি গিয়ে বসলেই—

ডঃ তরফদার। উঃ এরা দেখছি মানুষ খুন করতে পারে। সেই গোধূলি কাল থেকে ঠায় বসিয়ে রেখেছে আপনাকে। আর আপনিও—

মল্লিক-দাদু। (হেসে) ওদের অপরাধ নেই। জানে দাদু একবার যদি পাশার ছক পেতে বসে ত ব্রহ্মা বিষ্টু মহেশ্বর এলেও নড়াতে পারবে না। কেলেভার আছে ছোঁড়াগুলো।

ডঃ তরফদার। তা আপনাকে সভাপতি করার মানে কি? মানে বুড়ো মানুষ—শরীরও সুবিধার নয়—শুধু শুধু কষ্ট দেওয়া—

মল্লিক-দাদু। সে কথা আমিও বলেছিলাম—শুনল কই! বলেছিলাম, আমাকে আর টানাটানি কেন—যার নামে সভা করছিস—তার নামটা এই প্রথম শুনলাম তোদের মুখে। তার সম্বন্ধে কি জানি যে বলব? বলল—আপনাকে কিচ্ছু বলতে হবে না—আপনি শুধু মালা গলায় দিয়ে চেয়ারে বসে থাকবেন, যা বলবার আমাদের প্রধান অথিথি মশায় বলবেন। আপনার ভরসাতেই বুঝলেন না…তা ছোঁড়াগুলো ভালবাসে। চাঁদাটা বেশিই দিই কি না—তাই খাতিরটা বেশ করতে চায়। বুঝি মশাই—সব বুঝি। আমি ত মশায়—গোলা পায়রা—আপনাদের মত রাজহাঁসের মধ্যিখানে বসতে পারি! বসবার যুগ্যি?

ডঃ তরফদার। এদিকে কারও পাত্তা নাই যে!

মল্লিক-দাদু। নাই থাকুক—বসে বসে দেখুন না রগড়টা।

ডঃ তরফদার। রগড় দেখলে চলবে না—আমার আরও দু'জায়গায়—

মল্লিক-দাদু। বায়না আছে? তা থাকুক না—ঘাবড়াচ্ছেন কেন? আমাদের নিতু চক্কবাত্তির মতই না হয় করবেন। এক রাত্তিরে পাঁচখানা কালীপুজো। বলেছিলাম একবার—কি করে হয় ভস্‌চার্জমশায়? বলেছিল—কেন হবে না—কায়দা জানলে আরও পাঁচখানা সারা যায়। বলি পুজোই না হয় আলাদা আলাদা জায়গায়—মা—ত আর আলাদা নয়। এক মন্তর, এক তন্তর, এক বিধান। এক জায়গায় ভাল করে পুজো করে—অন্য জায়গায় মন্তর না বলে শুধু ফুল জল দিলে মায়ের পায়ে দেয়া হবে না? বুঝুন কত বড় তত্ত্বজ্ঞানের কথা! আপনিও না হয়—

ডঃ তরফদার। (হেসে) এ পুজোর নিয়মটা আলাদা। যদিও ঠাকুর এক—মন্ত্রগুলিও মোটামুটি একই সুরে বাঁধা—তবু এক এক জায়গায় এক এক রকম ব্যবস্থা। এরা কিন্তু বড্ড জ্বালাচ্ছে! এখনও ঠুক-ঠাক শেষ হ'ল না? মাচাটা কি বেলাবেলি বেঁধে রাখা যেত না?

মল্লিক-দাদু। আর বলেন কেন—বাবুদের যে ডুডুও চাই টামাকও চাই। ফুটবল খেলা দেখার নেশা আছে যে। আজ আবার নাকি মোহনবাগানের খেলা ছিল।

ডঃ তরফদার। যাদের এত খেলার ঝোঁক—তাদের এসব কেন?

মল্লিক-দাদু। বুঝছেন না—সখ। যে বয়েসের যা। বলে—দাদু, সবাই করছে—দেশ জুড়ে হচ্ছে এই পুজো, আমরাও করব। না করলে সবাই ছি ছি করবে—বলবে—মুখ্যু পাড়া—

ডঃ তরফদার। বুঝেছি। (অধৈর্য্য হয়ে) আমি কিন্তু আর অপেক্ষা করতে পারছি না। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে যদি সভা আরম্ভ করতে পারে ভাল, না হলে—

মল্লিক-দাদু। চলে যাবেন? কি করে যাবেন? এ দিগড়ে গাড়ী ঘোড়ার নামগন্ধ নেই—মাইল খানিক হাঁটলে তবে—

ডঃ তরফদার। (বিরক্ত হয়ে) তা এই তেপান্তরের মাঠের কে ওদের সভা করতে বলেছিল। এখানে যদি মানুষজন নেই—

মল্লিক-দাদু। আছে বই কি মানুষজন। দেখুন না—বাজনার আওয়াজ কানে ঢুকলে মেয়ে মদ্দ জোয়ান বুড়ো—আণ্ডাবাচ্ছা সব পিল পিল করে ছুটে আসবে।

ডঃ তরফদার। (অধৈর্য্য হয়ে) নাঃ এ অসহ্য। আমি উঠলাম।

মল্লিক-দাদু। (ওঁর হাত ধরে) আরে যান কোথায়? যান কোথায়? (উচ্চস্বরে) ওরে কেষ্টা—নফরা—ভূতো-কেলো—ওরে কে আছিস ছুটে আয়। ইনি মানে তোদের ইনি—মানে প্রধান অতিথি পালাচ্ছে

(ছেলেরা দুপ দাপ শব্দে ছুটে এল।)

ছেলেরা। স্যার—স্যার—ক্ষমা করুন—ক্ষমা করুন। আর পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন। মাইকটা ফিট হয়ে গেলেই···দেখুন না স্যার এখনও অডিয়েন্সরা কেউ আসে নি—মাঠ ফাঁকা—এই পাঁচ মিনিট স্যার—

ডঃ তরফদার। শ্রোতারা যদি নাই আসে—

ছেলেরা। আসবে বইকি স্যার—নিশ্চয় আসবে। মাইকটা ঠিক হোক, আওয়াজ উঠুক—দেখবেন বন্যের জলের মত—এই-ওই-ওই

(নেপথ্যে—মাইকের আওয়াজ ওয়ান-টু-থ্রী)

ছেলেরা। আপনার চারটি পায়ে পড়ি স্যার—বসুন।

ডঃ তরফদার। ভাল ফ্যাসাদ। তোমাদের জন্যে আমার পরবর্তী প্রোগ্রাম সব আপসেট হয়ে যাচ্ছে।

ছেলেরা। না স্যার সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনি না হয় একটু শর্টকাট করবেন—সময়টা ঠিক থাকবে।

(নেপথ্যে মাইকের ধ্বনি—ভদ্র মহোদয়গণ এইবার আমাদের কিশোর বন্ধু মিলনী ক্লাবের সভা আরম্ভ হচ্ছে—

আসুন স্যার—আসুন মল্লিক-দাদু—হাঁ এই দিকে, সাবধানে পা ফেলবেন—মাঠটা আবার উঁচুনীচু—

মল্লিক-দাদু। ওরে বাবা, হাতটা ধর। একে অন্ধকার—চোখেও ভাল দেখতে পাইনে—আবার বাতের ব্যাথাটা কাল থেকে এমন চাগাড় দিয়েছে—উ হু হু হু অত জোরে টানিস নে বাবা। আহা হা—কোমর শুদ্ধ—টনটনিয়ে উঠছে। উহু হু হু—আস্তে আস্তে বাবা। আরে আমাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেলেই কি তোমাদের সময় বাঁচবে? উহু-হু—

নেপথ্যে হঠাৎ তুমুল গোলযোগ উঠল। ছেলেদের হাততালি—মুখে সিটি দেওয়ার শব্দ, বিড়াল কুকুরের ডাক, ইনকিলাব জিন্দাবাদ ধ্বনি।

সভাপতি। কি হ'ল রে গোপলা? এরা সব শেয়াল-কুকুর ডাকছে কেন?

একটি ছেলে। আজ্ঞে কারেণ্ট ফেল করেছে।

ডঃ তরফদার। যাক—বাঁচা গেল।

তৃতীয় দৃশ্য

লাইব্রেরী হল

রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব আরম্ভ হয়ে গেছে। একটি মেয়ে নৃত্য করছে। নূপুরের রুণুঝুনু শব্দে নৃত্যটি রূপগ্রহণ করছে! ডঃ তরফদার প্রবেশ করতেই একজন সম্ভ্রান্ত বেশী বয়োবৃদ্ধ তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন।

বয়োবৃদ্ধ নন্দী মশাই। আসুন-আসুন। এই চেয়ারে বসুন। পাংচুয়াল হতে বলেছিলেন, দেখুন একেবারে ঘড়ি ধরে আরম্ভ করে দিয়েছি। (অমায়িক হেসে) আপনার কিন্তু তিন কোয়ার্টার লেট হয়েছে।

ডঃ তরফদার। সে এক কাণ্ড—যত সব অর্বাচীনের পাল্লায় পড়েছিলাম। ডায়াসে ওঠাই হয় নি—তা হলে এখানে আর আসাই হ'ত না।

নন্দী মশাই। ভালই হয়েছে—আমাদের সৌভাগ্য বলতে হবে।

ডঃ তরফদার। নাচটা কতক্ষণ থেকে চলছে?

নন্দী মশাই। তা অনেকক্ষণ হয়েছে—আধ ঘণ্টার কম নয়।

ডঃ তরফদার। এত দীর্ঘ নাচ···

নন্দী মশাই। হবে না—এ যে কবির সেই—'যবে বিবাহে চলিল বিলোচন' কবিতাংশ নিয়ে পরিকল্পনা। উমার তপস্যা—মদন ভস্ম—রতিবিলাপ—এক কথায়—

ডঃ তরফদার। এই নাচটা শেষ হয়ে গেলে আমার ভাষণ—

নন্দী মশাই। নিশ্চয়—আপনার ভাষণ হবে বই কি। নাচের পর মাত্র দু'টি আবৃত্তি আর দু'খান গান—তারপর আপনার—

ডঃ তরফদার। ভাষণটা নাচের পরই ঘোষণা করবেন। আমাকে আরও একটা সভায়, নটার সময়—

নন্দী মশাই। সে অনেক সময় আছে—এই ত সবে সাড়ে আটটা বাজে। প্রথম অংশের প্রমোদ সূচীটা শেষ হ'লেই—

ডঃ তরফদার। প্রথম অংশের প্রমোদ-সূচী শেষ হতে তিন কোয়ার্টার লাগবে মনে হচ্ছে।

নন্দী মশাই। (হেসে—ঘাড় নেড়ে) না—না—অত সময় লাগবে না। মেরে কেটে চল্লিশ মিনিট। ধরুন দুটো আবৃত্তি পনেরো থেকে আঠার মিনিট—
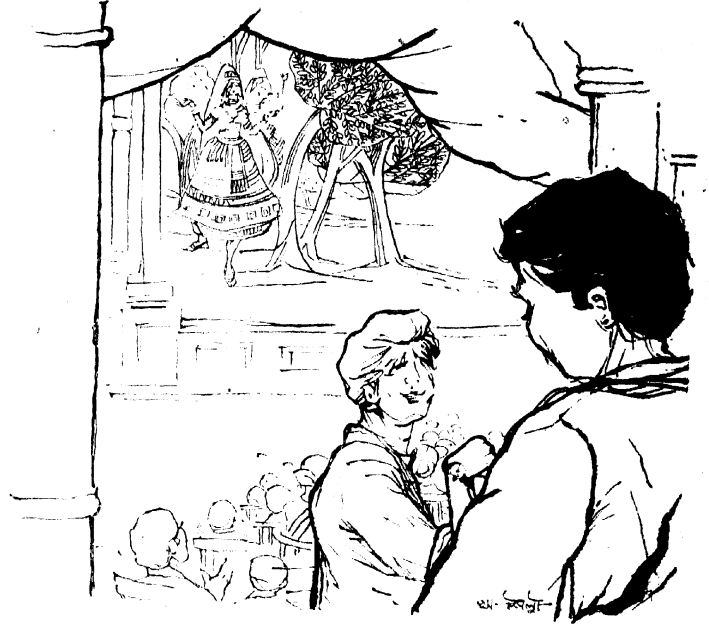
আস্থন আস্থন। পাংচুয়াল হতে বলেছিলেন, দেখুন একেবারে ঘড়ি ধরে আরম্ভ করে দিয়েছি

দু'খানা গানেও ওই সময়; আর নাচ ত ধরুন হয়েই এল।

ডঃ তরফদার। (ক্ষুণ্ণ স্বরে) তা হ'লে আমি কতটুকু সময় পাব?

নন্দী মশাই। আপনি? (সহাস্যে) তা দশ-পনর মিনিট ত নিশ্চয়।

ডঃ তরফদার। (ক্রুদ্ধ হয়ে) কি বলছেন যা তা! আমাকে কি বলে নিয়ে আসা হয়েছে—নিশ্চয় ভুলে যান নি?

নন্দী মশাই। (কাঁচুমাচু হয়ে) আজ্ঞে রাগ করবেন না—আমি এ-সবের কিছুই জানি না। আমরা ছিলাম কার্য্যকরী সমিতির সভ্য—ফাংশানে কোন্ কোন্ বিষয় থাকবে—সেই সব স্থির করে দিয়েই খালাস। ওরা, মানে কর্ম্মীরা, সেইগুলি একজিকিউট করছে। দাঁড়ান, ওদের কাউকে ডেকে—

ডঃ তরফদার। ডেকে আর কি করবেন। এই নাচটা শেষ হলে আমার ভাষণ হবে ঘোষণা করে দিন।

নন্দী মশাই। আজ্ঞে সত্যিই বলছি আমি এই সবের মধ্যে নেই! এ-সব প্রোগ্রাম ডিরেক্টারের মতেই হচ্ছে। এই ওরা···রাগ করবেন না, এই স্থনীল, অসিত—ওরে ও—শোন শোন। এই ইনি রাগ করছেন। মানে বলছেন, কি নাকি কথাবার্ত্তা হয়েছিল তোদের সঙ্গে—

অসিত। আমি ত কাকাবাবু—কার্য্যসূচী পরিচালনা করছি না—স্টেজ-ম্যানেজ করছি! স্থনীলদা আর্টিষ্টদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার ভার নিয়েছিলেন—

নন্দী মশাই। ডাক—ডাক স্থনীলকে ডাক। আপনি স্যার রাগ করবেন না—বস্থন ভাল হয়ে। স্থনীল এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ভারি হুঁসিয়ার ছেলে—

অসিত। কাকাবাবু, স্থনীলদা ত নেই এইমাত্র বেরিয়ে গেছেন গাড়ি নিয়ে। কোন্ কোন্ আর্টিষ্ট নাকি আসেন নি, তাঁদের আনতে গেছেন।

নন্দী মশাই। তা হ'লে এঁর—মানে এনার ভাষণের কি হবে? বস্থন বস্থন স্যার উতলা হবেন না। স্থনীল এলেই—

অসিত। হাঁ—একটুখানিক বস্থন—এই প্রোগ্রামটা শেষ হলেই···এর মধ্যে স্থনীলদা এসে পড়বেন।

ডঃ তরফদার। (সক্রোধে) তোমাদের স্থনীলদা এসে করবেন কি! ওই সব গান আবৃত্তি এখন রেখে দাও—ঘোষণা করে দাও এইবার প্রধান অতিথি ভাষণ দেবেন।

নন্দী মশাই। আপনি স্থির হয়ে বসুন স্যার, উতলা হবেন না।

ডঃ তরফদার। কি হে ছোকরা, যা বলছি শুনবে কি না?

অসিত। এই পর্য্যায়ের প্রোগ্রামটা—মানে নাচ গান আবৃত্তির কথা আগেই ঘোষণা করা হয়েছে। এখন যদি গান আবৃত্তির বদলে আপনাকে স্টেজে তোলা হয়—

ডঃ তরফদার। তাতে কি হবে? তোমাদের শূল ফাঁসি হবে?

অসিত। তা হলে পিঠের ছাল ছাড়িয়ে নেবে অডিয়েন্স। আপনি যদি স্যার দেরি করে না আসতেন—

নন্দী মশাই। বসুন, বসুন, স্যার রাগ করবেন না।

ডঃ তরফদার। (অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে) হাত ছাড়ুন—ন্যাকামি করবেন না।

নন্দী মশাই। ওরে অসিত—ধর না—পালায় যে—

কয়েকটি ছেলে। কে পালাচ্ছে কাকাবাবু? চোর-টোর নাকি!

নন্দী মশাই। না, রে, তোদের প্রধান অতিথি—

অসিত। আপনি স্থির হয়ে বসুন কাকাবাবু।

নন্দী মশাই। স্থির হয়ে বসব কি রে—প্রধান অতিথির ভাষণ—

অসিত। (দৃঢ় স্বরে) হবে না। এখনই ঘোষণা করে দিচ্ছি উনি এখনও এসে পৌছন নি।

নন্দী মশাই। আঃ—বাচাল বাবা, তোদের মাথায় এত খেলে! জলজ্যান্ত মানুষটাকে—অঁ্যা—

(তখনও নূপুর বেজে চলেছে)

চতুর্থ দৃশ্য

॥ সাধারণ রঙ্গমঞ্চ ॥

নেপথ্য সঙ্গীতের সঙ্গে একটি নাটকের মূক দৃশ্য অভিনীত হচ্ছে। ডঃ তরফদারের প্রবেশ

ভ্যর্থক। আসুন—আসুন। বসুন। (কাজ উল্টে) বেশ খানিকটা দোর করে ফেলেছেন।

তরফদার। (রাগটা তখনও পড়ে নি) হাঁ, দোষটা আমারই।

ভ্যর্থক। না—না, সেকি কথা। সব জায়গার ম্যানেজমেণ্ট ঠিকমত হয় না। এত সব চ্যাংড়া ছোঁড়া মিলে—

তরফদার। আশা করি আপনাদের এখানে কোন গোলযোগ হবে না?

ার্থক। গোলযোগ! দেখছেন না পিনড্রপ সাইলেন্স। তবু ত নাটকে কোন কথাবার্ত্তা নেই—মূক অভিনয় চলছে। নাটকটা বেশ জমেছে কি বলেন?

ডঃ তরফদার। নাটক সব শেষে হবার কথা ছিল না?

অভ্যর্থক। ছিলই ত। নিয়মও তাই। কিন্তু এ দিকের প্রোগ্রাম সব ফিনিস—আপনি আসছেন না, অডিয়েন্স কখনও চুপ করে থাকে! কুকুর শেয়ালের ডাকে অডিটোরিয়ামে কাণ পাতা দায় হয়ে উঠল। তখন নিতাই বুদ্ধি করে বলল, তা হ'লে নাটকটাই আরম্ভ করে দেওয়া যাক—ওঁর যখন আসতেই দেরি হচ্ছে। উনি ত বলেছেন, এক ঘণ্টা সময় নেবেন ভাষণে—এতে বরঞ্চ সুবিধাই হবে। কারণ নাটকের শেষে আর কোন আইটেম থাকছে না, ইচ্ছে করলে আরও এক ঘণ্টা—কিংবা যতক্ষণ খুশী বলতে পারবেন। ভাল মতলব নয় স্যার?

ডঃ তরফদার। (গম্ভীর ভাবে) মতলব ভাল। তবে একটা চলতি কথা আছে না—অপারেশান সাক্‌সেসফুল বাট দি পেসেণ্ট—

অভ্যর্থক। কেন, কেন স্যার এমন কথা বলছেন কেন?

ডঃ তরফদার। বুঝতে পারছেন না?

অভ্যর্থক। ও, ভাবছেন অডিয়েন্স থাকবে না?

ডঃ তরফদার। অনুমানটা কি অযৌক্তিক?

অভ্যর্থক। না—না মোটেই নয়। ভোজের ক্ষেত্রেও অবিকল তাই হয়, চাটনির পর কেউ শাক ভাজা, বেগুন ভাজা দিয়ে সুরু করে না। কিন্তু দই মিষ্টি চলে। শুধু চলে না—লোকে হা-পিত্যেশ করে বসে থাকে।

ডঃ তরফদার। ভাষণটা কি আমার দই মিষ্টির মত লাগবে মনে করেন?

অভ্যর্থক। বাঃ, লাগবে না? নিশ্চয় লাগবে। ওকাই ত বলছিল, ভাষণ যা দেবেন একখানা—অমৃত—অমৃত। তা যাই বলুন স্যার আমাদের রীতিটাই সবচেয়ে ভাল। সব শেষে মিষ্টি—মধুরেণ সমাপয়েৎ।

ডঃ তরফদার। অমৃতপানটা নির্ভর করে দর্শকের রুচির উপর, মর্জ্জির উপর। তবে একটু ভরসার রং দেখতে পাচ্ছি। এক শ্রেণীর দর্শক সভার আরম্ভ-কালে যারা সামনেটা জুড়ে বসে—যারা সকল রকম হৈ হৈ হট্টগোলের মূল, সেই বালখিল্যের দল এখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

অভ্যর্থক। হঁা স্যার, এট কম ভরসার কথা নয়।

ডঃ তরফদার। কিন্তু নির্ভরসার মেঘখানিও কম কালো

নয়, লক্ষ্য করেছেন ? লক্ষ্য করছেন কি কৌতুক-রঙ্গে সাঁতার কাটতে কাটতে অনেকে এলিয়ে পড়েছেন ? হাই তুলছেন ঘন ঘন ? এই সব লক্ষ্য করেও কি আশা করছেন, এই প্রমোদ-ক্লান্ত মন ও নিদ্রা-শ্রান্ত শরীর নিয়ে দর্শকবৃন্দ আরও এক ঘণ্টা বসে থাকবেন রবীন্দ্র-কীর্ত্তি সুধা পান করার নেশায় ? সে যদি সুধাই হয় স্থানকাল পাত্র-ভেদে সে কি সুধাই থাকবে ?

অভ্যর্থক। না—না. এ কি বলছেন। আমরা বলছি, নিশ্চয় করে বলছি সুধা যা তা সব সময়েই সুধা।

ডঃ তরফদার। বেশ এই আশা নিয়েই বসছি। কিন্তু নাটক কতক্ষণ চলবে ?

অভ্যর্থক। ওরা ত বলছিল ঘণ্টা দেড়েক লাগবে।

ডঃ তরফদার। এই নাটক কি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ?

অভ্যর্থক। আজ্ঞে না। ওঁর একটা গল্পকে না কবিতাকে আমাদের ক্লাবের একটি ছেলে নাট্যরূপ দিয়েছে।

ডঃ তরফদার। ছেলেটি দুঃসাহসী বটে !

অভ্যর্থক। কেন স্যার—এমন ত বহু জায়গাতেই হচ্ছে !

ডঃ তরফদার। হাঁ, এরা কবির নব-মল্লিনাথ। গল্পে কবিতায় উনি যা বলতে পারেন নি, নাট্যরূপে তাই বলিয়ে নিচ্ছে। যাক, আর কতক্ষণ চলবে নাটক ?

অভ্যর্থক। আধ ঘণ্টা ত হয়েই গেছে—আরও—

ডঃ তরফদার। এক ঘণ্টা ! অর্থাৎ এগারটা। তারপর ভাষণ। মাপ করুন—আমি উঠলাম।

অভ্যর্থক। অ্যাঁ—উঠছেন ! ওরে আনল—হরিপদ, এই ইনি উঠছেন। মানে ফাংশানের সভাপতি—

অনিল। সে কি স্যার, আপনি কিছু বলবেন না ?

ডঃ তরফদার। (গম্ভীর ভাবে) না। শুনবে কে ?

অনিল। আমরা সবাই শুনব স্যার। বসুন স্যার।

ডঃ তরফদার। না। শরীর খারাপ।

(ওরা ফিস্‌ফিস্ করে কি পরামর্শ করল)

অনিল। তা হ'লে স্যার জোর করব না। চলুন স্যার—একটু মিষ্টিমুখ করে—

ডঃ তরফদার। না। শরীর খারাপ।

অনিল। শরীর খারাপ ! তবে থাক স্যার। কিন্তু স্যার আর একটু বসেই যান। মানে বসতেই হবে—কারণ দু'খানা গাড়িই বাইরে আর্টিষ্টদের রাখতে গেছে।

ডঃ তরফদার। বল কি। একখানা গাড়িতে যে আমার রবীন্দ্র-রচনাবলী ছিল—(উত্তেজনা প্রকাশ) !

অনিল। ঘাবড়াবেন না—স্যার, ঘরের গাড়ি—

ডঃ তরফদার। লোকগুলি ত ঘরের নয়। দেখ দেখ (উত্তেজনা প্রকাশ) পাতায় পাতায় মূল্যবান মন্তব্য নোট করা আছে। হারালে আমার সর্ব্বনাশ হবে। সর্ব্বনাশ হবে। (অস্থিরতা প্রকাশ)

অনিল। ঘাবড়াবেন না স্যার—চুপ করে বসুন এই চেয়ারটায়। ওকি স্যার—অসুস্থ বোধ করছেন ? স্যার—স্যার—

অভ্যর্থক। কি হ'ল রে, ভদ্রলোক যে চেয়ারেই অজ্ঞান হয়ে পড়লেন ! ডাক্তার - ডাক্তার—

অনিল। আঃ চেঁচাবেন না প্লেটা মার্ডার করবেন না। আমি ব্যবস্থা করছি। হরিপদ, গোষ্টকে ডাক, বলাইকে ডাক—এই চেয়ারটা ধরাধরি করে ক্লাব-ঘরে নিয়ে চল দেখি। একজন ডাক্তারকে খবর দাও। আর দিব্যেন্দু শোন. তুই ত ষ্টেজ ম্যানেজ করছিস ? শোন, প্লেটা শেষ হলে একটা ঘোষণা দিবি—সুধীবৃন্দ, আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমাদের মাননীয় সভাপতি প্রখ্যাত সাহিত্যিক—কি নাম যেন ভদ্রলোকের মনে আসছে না। কি নাম, বল না রে ? যাচ্চলে—তোরও মনে নেই ! আচ্ছা, ঠিক আছে—প্রোগ্রাম দেখে ঠিক করে নিবি—কেমন ? হাঁ, প্রখ্যাত সাহিত্যক শ্রীযুক্ত অমুক হঠাৎ অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁর মূল্যবান ভাষণ দিতে পারবেন না। আশা করি আপনারা ইয়ে—ইয়ে—মানে শেষটা একটু গুছিয়ে বলে সবাইকে ধন্যবাদ জানাবি। প্রথমে সভাপতিকে—তারপর প্রধান অতিথিকে, আর্টিষ্টদের—অডিয়েন্সদের। তার পর সবাইকে নমস্কার জানাবি, সবশেষে সমাপ্তি সঙ্গীত : জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে, ভারত ভাগ্য বিধাতা।

পঞ্চম দৃশ্য

প্রথম দৃশ্যের অনুরূপ। রবীন্দ্রনাথের ছবিটি দেওয়াল থেকে নামিয়ে একখানা আলপনা দেওয়া জলচৌকির উপর রাখা হয়েছে। ফুলদানে রজনী গন্ধার গুচ্ছ —ধূপদানে ধূপ জলছে। মিসেস তরফদার দশ বারটি ছেলেমেয়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে গাইছেন : "জনগণ মন আধনায়ক জয় হে—"

মিসেস তরফদার। (গান শেষে) স্বপন, এইবার রচনাবলী থেকে পাঠ করে শোনাও।

স্বপন। "আমাদের জন্মভূমি তিনটি—তিনটিই একত্র জড়িত। প্রথম পৃথিবী, মানুষের বাসস্থান পৃথিবীর সর্ব্বত্র। মানুষের কাছে পৃথিবীর কোন অংশ দুর্গম নয়। পৃথিবী তার কাছে হৃদয় অবারিত করে দিয়েছে।

মানুষের দ্বিতীয় বাসস্থান স্মৃতি লোক। অতীত-কাল থেকে পূর্ব্ব-পুরুষদের কাহিনী নিয়ে কালের নীড় সে তৈরী করেছে। এই কালের নীড় স্মৃতির দ্বারা রচিত, গ্রথিত। এ শুধু একটা বিশেষ জাতির কথা নয়, সমস্ত মানুষ জাতির কথা। স্মৃতিলোকে সকল মানুষের মিলন। মানুষ জন্মগ্রহণ করে সমস্ত পৃথিবীতে, জন্মগ্রহণ করে নিখিল ইতিহাসে।

তার তৃতীয় বাসস্থান আত্মিক লোক। সেটাকে বলা যেতে পারে সর্ব্বমানব চিত্তের মহাদেশ। অন্তরে অন্তরে সকল মানুষের যোগের ক্ষেত্র এই চিত্তলোক। কারও চিত্ত হয়ত সঙ্কীর্ণ বেড়া দিয়ে ঘেরা, কারও বা বিকৃতির দ্বারা বিপরীত। কিন্তু একটি ব্যাপক চিত্ত আছে যা ব্যক্তিগত নয়, বিশ্বগত। সেটির পরিচয় অকস্মাৎ পাই। একদিন আহ্বান আসে। ···সাধারণ লোকের মধ্যেও দেখা যায়, যখন সে স্বার্থ ভোলে, যেখানে সে ভালবাসে, নিজের ক্ষতি করে ফেলে। তখন বুঝি, মনের মধ্যে একটা দিক আছে যেটা সর্ব্বমানবের চিত্তের দিক।"

মিসেস তরফদার। সুমিতা—এইবার কবিতা পাঠ করে শোনাও ত।

(একটি কিশোরী কবিতা পাঠ করতে উঠল। কবিতার এক ছত্র পড়া হতে না-হতে নেপথ্যে গোলমাল)

নেঃ এক সঙ্গে কয়েকটি কণ্ঠ। স্যার, আপনি যেতে পারবেন কি? আমরা না হয়—

নেঃ ডঃ তরফদার। না দরকার নেই। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছি—তোমরা যাও।

নেঃ সকলে এক সঙ্গে। আচ্ছা স্যার, নমস্কার—নমস্কার। রচনাবলীগুলো এই বারান্দায় রইল স্যার। নমস্কার।

মিসেস তরফদার। (চঞ্চল হয়ে) একটু অপেক্ষা কর—আমি আসছি।

(গমনোদ্যত—ডঃ তরফদারের প্রবেশ)

এ কি, তুমি কি অসুস্থ বোধ করছ?

ডঃ তরফদার। (হাসবার চেষ্টা করে) না—না, ঠিক আছি। বইগুলো বারান্দায় রেখে গেছে—রামধারী রামধারী—

মিসেস তরফদার। ব্যস্ত হয়ো না, ব্যবস্থা করছি। ব(…)
(দু'জন ছেলেকে ইসারা করতে ওরা উঠে গে(…) ওরা বই এনে রবীন্দ্রনাথের ছবির সামনে গুছি(…) রাখতে লাগল)

ডঃ তরফদার। এ কি এখানে কি হচ্ছে? বাতিদানে মোমবাতির আলো। ধূপদানে ধূপ জ্বলছে, ফুলদানে রজনীগন্ধার ডাঁটি···কবির জন্মোৎসব—

মিসেস তরফদার। (লজ্জিত কণ্ঠে) এ একটা ঘরোয়া ব্যাপার—এমন কিছু নয়। এরা সবাই ধরলে, কাকীমা, আমরা কবিপূজা করব তাই ওদের নিয়ে একটু ছেলেমানুষি করছি।

ডঃ তরফদার। তা কই, সভাপতিকে তো দেখছি না?

মিসেস তরফদার। (হেসে) দেখছ না? ওই ত উনি ফুলের মালা পরে বসে আছেন।

ডঃ তরফদার। ছবির রবীন্দ্রনাথ! বাঃ রে—ওঁকে ওখানে বসিয়ে এদের মন ভরবে! উনি ত ভাষণ দেবেন না?

মিসেস তরফদার। (হেসে) কে বললে ভাষণ দেবেন না! সারা জীবন ধরে আমাদের জন্য কত মহৎ চিন্তা করলেন, হাতে-কলমে কাজ করতে শেখালেন, বাণী সাধনার মন্ত্র দিলেন কানে কানে—কত অমূল্য উপদেশ···এতক্ষণ বসে বসে ওঁর কথাই ত শুনছিলাম।

ডঃ তরফদার। ওঁর কথা! নাচ, গান, নাটক এসব হয়ে গেছে?

মিসেস তরফদার। নাচ, গান, নাটক! কি যে বল! সামান্য মানুষের সামান্য আয়োজন উপকরণ—অত জাঁক-জমক করার শক্তি কোথায়! তুমি সব বড় বড় সভা জয় করে এলে, তোমার এসব ছেলেখেলা বোধ হচ্ছে—ভাল লাগছে না।

ডঃ তরফদার। ছেলেখেলা ভাল লাগছে না! না—না আমার ভাল-লাগা মন্দ-লাগার কথা থাক—নাচ-গান, রং-তামাসাহীন উৎসব এদের ভাল লাগছে?

কিশোর কিশোরীরা এক সঙ্গে। আমাদের খুব ভাল লাগছে কাকাবাবু।

ডঃ তরফদার। (বিস্ময়ে) বল কি! হাস্যকৌতুক নাচ গান না থাকলেও—

একজন কিশোর। খুব ভাল লাগছে। আমরা তাঁর কথা শুনছি—যা তিনি লিখে গেছেন।

একজন কিশোরী। কি সুন্দর করে বলেছেন উনি।

মিসেস তরফদার। আর একটু বসবে? এই কবিতা পাঠ হয়ে গেলেই আমাদের কবি প্রণাম শেষ হবে। তোমার কাছেও এরা কিছু শুনবে।

ডঃ তরফদার। আমার কাছে! (সত্রাসে) না—না—না। আমার কথা কেউ শুনবে না—

মিসেস তরফদার। আমরা শুনব। কবির এই লেখা—যেটা পড়া হ'ল, বেশ সহজ করে বুঝিয়ে দেবে তুমি। এদের খুব ভাল লাগবে। খুশী হবে এরা।

ডঃ তরফদার। না, না—আমি কিছু বলব না। এরা যা সহজে বুঝেছে তাই সবচেয়ে সোজা—যে আনন্দ আপনা থেকে পাচ্ছে সেইটাই খাঁটি—যে সত্য প্রাণ দিয়ে অনুভব করছে সেই ত কবির প্রাণের কথা। আমিও আজ শ্রোতা। পড় মা, কবির বাণী শোনাও। বনিয়াদ শক্ত হোক—চরিত্রের বনিয়াদ। সমস্ত মানুষকে ভালবাসার শক্তি অর্জ্জন কর, সংসারের ছোট বেড়া ভেঙ্গে দিয়ে বৃহৎ পৃথিবীর মাঝখানে এসে দাঁড়াবার সাহস হোক। কবি আজীবন এই কথাই বলে গেছেন। এই স্বপ্নকে সফল করার ভার দিয়ে গেছেন তোমাদের উপরে। পড় মা—পড়।

কিশোরী। (উঠে) যদি ভুল হয় শুধরে দেবেন কাকাবাবু।

ডঃ তরফদার। (হেসে) তার আগে আমার ভুলটা শুধরে নেব না। তুমি নির্ভয়ে আবৃত্তি কর মা—এমন পরিবেশে ভুল কখনও হয়—এখানে সবাই যে শ্রদ্ধাবান শ্রোতা।

কিশোরী। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনা।

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণ তলে দিবস শর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয় উঠে যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়—
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌরুষেরে করে নি শতধা—নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা—
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে কর জাগরিত।

যবনিকা

ধনী ও দরিদ্র

ধন ও ধনীর নিন্দা প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু বাস্তবিক ধন ও ধনী যেমন নিন্দার্হ নহে দরিদ্রতা ও দরিদ্রও তেমনি প্রশংসার্হ নহে। ধনের সদ্ব্যয় যে করে না, সে নিন্দার্হ; যে অপব্যয় করে সে নিন্দাভাজন, যে পাপকার্য্যে ব্যয় করে, সে অতি অধম। বড় বড় পুকুরে জল জমিয়া থাকিলে মানুষের তৃষ্ণা নিবারণ, স্নান, শস্যক্ষেত্রে জলসেচন, কত কাজ হয়। তদ্রূপ এক একজন মানুষের হাতে প্রভূত ধন সঞ্চিত থাকিলে দেশের খুব উপকার হইতে পারে। কোনও সৎকাজের জন্য ১০।২০ লক্ষ টাকার দরকার হইলে দু'-এক পয়সা করিয়া তাহা সংগ্রহ করিতে বিস্তর শ্রম ও সময় লাগে; দেশে দানশীল ধনী থাকিলে কাজটি সহজে হইয়া যায়। ক্ষেত্রে জল সেচন করিতে হইলে, খাল বা পুকুর হইতে জলসেচন, কূপ হইতে জলসেচন এবং গ্রামের প্রত্যেক গৃহ হইতে এক এক বাটী জল আনিয়া সেচন, ইহার মধ্যে কোন্ কোন্ উপায়ে কাজ সহজে হয়, তাহা সকলেই বুঝিতে পারে।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩২৩।

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

১৫ই আগষ্ট

এবারের স্বাধীনতা উৎসবে দেশের মালিকদের সেই পুরাণো কথা, সহস্রবার উচ্চারিত একই এবং বৈচিত্র্যহীন সেই ফাঁকা গালভরা বাণীপ্রবাহ—সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের অপূর্ব্ব কর্ম্মক্ষমতা এবং বিষম আত্মপ্রচার জয়ঢাকের নিনাদ আবার শ্রবণ করিয়া, আমরা অর্থাৎ গরীব প্রজাকুল কৃতার্থ, চরিতার্থ হইলাম! কংগ্রেসী সুশাসনে দেশের কত দিকে কত উন্নতি—বৈষয়িক এবং পরমার্থিক—উভয় ক্ষেত্রে হইয়াছে, সে-কথাও আবার দিল্লীর লাল-কেল্লা হইতে ভারতের বর্ত্তমান মালিকগুষ্টি সরবে এবং সবিস্তারে পরম-সুখী-গরীব প্রজাবৃন্দকে শ্রবণ করাইয়া তাহাদের প্রাণে পরম সুখের এবং তৃপ্তির বন্যা বহাইতেও কসুর করেন নাই। প্রতিবারের মত এবারেও—স্বাধীনতা-উৎসব, অযোগ্য স্বার্থপর এবং আত্মকেন্দ্রিক নেতা তথা শাসকগুষ্টির পক্ষে অতিশয় যোগ্যতার সহিত পালিত হইয়াছে—একথা যে হতভাগ্য-প্রজা স্বীকার না করিবে—তাহাকে আমরা কেবল ধিক্কারই দিব না, কর্ত্তাদের কাতর নিবেদন করিব তাহাকে 'ডি আই' জালে আবদ্ধ করিয়া তাহার কলুষিত-চিত্ত শুদ্ধির অবকাশ করিয়া দিবার জন্য। স্বাধীনতা লাভের পর আমরা সবই পাইয়াছি—আমাদের মত গরীব প্রজা অর্থাৎ করদাতাদের (এবং যে-করের টাকায় উপর-মহলের কর্ত্তাদের মর্য্যাদা রক্ষা মোগল বাদশাহী কায়দায় চলিতেছে!)—সুখের যেমন অন্ত নাই, দুঃখেরও তেমনি লেশমাত্র নাই! কি চরম সুখে এবং পরম নির্ভাবনায় আজ সাধারণ মানুষের দিন অতিবাহিত হইতেছে—তাহার পূর্ণ কাহিনী কথায় চিত্রিত করিতে হইলে অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত অপেক্ষাও বৃহত্তর মহাকাব্য লিখিতে হইবে—তাহাতেও হয়ত কুলাইবে না। তাই 'মহাকাব্য' লিখিবার দুঃসাহস না করিয়া—ট্যাবলেট আকারে আমাদের বর্ত্তমান 'সুখের আর অন্ত নাই'—পাঠকদের নিকট স্বাধীনতার শ্রদ্ধা উপহাররূপে নিবেদন করিলাম। বলা বাহুল্য সুখে-বেপরোয়া আমরা একদা-প্রখ্যাত কলিকাতা সম্পর্কেই এই চুটকি-চিত্র দিতেছি—যদিও সারা বাঙ্গলা দেশেই ইহা প্রযোজ্য:

"চাউল, গম, চিনি কিনিবার জন্য সপ্তাহে একদিন রেশনের দোকানে ছোট। বরাত ভাল থাকিলে দু-চার ঘণ্টা লাইনে দাঁড়াইবার পর জুটিতেও পারে, নয়ত দোকানে ঢুকিবার আগেই মজুত মাল নিঃশেষ হইয়া যায়—তারপর আর একদিন হয়রাণির পালা। সরিষার তৈল চাই? আর একবার লাইনে দাঁড়াও। নগদ পয়সা গণিয়া দিয়া সিকি কিলো আধ কিলো যাহাই জুটুক না কেন অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দাও। ট্রামে-বাসে উঠিবার জন্য লাইন লাগাও; পূর্ব্বজন্মের পুণ্য থাকিলে উঠিতেও পার। তারপর হয় ঝুলিতে ঝুলিতে নয়ত চারপাশে সহযাত্রীদের চাপে অর্ধমৃত অবস্থায় জায়গামত নামিয়া যাও। তবে মাঝরাস্তায় নামিতে হইলে শ্রীভগবানই ভরসা। নতুবা অক্ষত অবস্থায় পথে দাঁড়াইবার আশা কম। ডাকঘরে কোন দরকার আছে? আগের দিন অফিসে ছুটি লইয়া আসিও। কারণ, টিকেট, পোষ্ট কার্ডের জন্যই হউক—কিংবা মণিঅর্ডার রেজিষ্ট্রীর জন্যই হউক, কতক্ষণ লাইনে দাঁড়াইতে হইবে এবং তারপর অফিসে গিয়া হাজিরা দেওয়ার সময় থাকিবে কি না সন্দেহ। ট্রেণের টিকেট চাই? ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিতে

হইবে? দু-এক ঘণ্টা ধর্ণা না দিয়া কোন কাজ উদ্ধারের আশা মূর্খতা। ছাত্রজীবনে পড়িয়াছিলাম—"সময় অমূল্য।" তখন কথাটার সঠিক তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি নাই। প্রতি মুহূর্ত্তে ঠেকিয়া ও ঠকিয়া আজ হাড়ে-হাড়ে বুঝিতেছি যে, সময়ের আদৌ কোন মূল্য নাই সুতরাং আবর্জ্জনার মত যত্রতত্র ফেলিয়া দিতে বাধা কি? সত্যই আমাদের সুখের আর অন্ত নাই!"

'যুগান্তর' উপরি উক্ত মিনিয়েচার চিত্রটি প্রিণ্ট করিয়াছেন—এই চিত্রটি এন্‌লার্জ করিলে আরও বহুতর পরম বিস্ময়কর দৃশ্য মানুষের চোখে পড়িবে (সত্য কথা—অহরহই পড়িতেছে), যাহা এই বিশ্বের অন্য কোন সভ্য দেশে এমন বিকট প্রকটতা লাভ করিতে পারে নাই! এই প্রসঙ্গে এই সত্য স্বীকার করিব যে, নেতৃবাণীতে এ-দেশের মানুষের ক্ষুধা-তৃষ্ণা-অভাব-অভিযোগ দূর করিবার যে-প্রয়াস, অন্য কোন দেশে তাহারও একান্ত অভাব দেখি! নেতা তথা সরকারী মালিকদের—প্রাত্যহিক নীতিবাণী এবং পরমার্থিক উপদেশাবলীতে জনগণের পেট ফুলিয়া ঢাক হইয়া গিয়াছে এবং ঐ ঢাক-পেটে চাউল-ডাইল-গম-চিনি প্রভৃতির জন্য স্থান আর নাই—এবং স্থান যখন নাই, তখন উপরি উক্ত একান্ত অনাবশ্যক বাজে সামগ্রীগুলি এখন আর কোন প্রয়োজনও নাই বলিয়া মনে করি; অতএব আমাদের এই 'সুখের আর অন্ত নাই' জীবনে চাউল-ডাইল-তেল-চিনি-গমের একটা ভুয়া এবং অনাবশ্যক মানসিক অভাব সৃষ্টি করিয়া প্রজাকুল যেন অযথা নিজেদের এবং সেই সঙ্গে আমাদের সুখের জন্য অর্পিত দেহমন কংগ্রেসী শাসক এবং মহাশাসকদের উত্তপ্ত-উত্যক্ত না করেন। স্বাধীনতা দিবসের উৎসবের পর আমাদের এইমাত্র নিবেদন সকলের নিকট।

খাদ্য-সঙ্কটের ভয়াবহ রূপ—পরিণতি কি?

আজ পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতের সর্ব্বত্র খাদ্য-সঙ্কট যে এক অতি ভীষণ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে—তাহা সরকারী এবং বেসরকারী কোন মহলই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। অথচ খাদ্য-সঙ্কট, বিশেষ করিয়া পশ্চিম বঙ্গে চাউল-গম-চিনি-তৈল এবং মৎস্য প্রভৃতি অতি এবং নিত প্রয়োজনীয় খাদ্য-সামগ্রীর আকাল যে ঘটিবে সে বিষয়ে আমাদের দৈনিক মাসিক এবং অন্যান্য পত্রিকা ও সেই সঙ্গে ভবিষ্যৎ দৃষ্টিসম্পন্ন বহু ব্যক্তিই বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই এবিষয় সরকারকে অবহিত-সতর্ক করিতে 'ফ্যাক্ট্ এবং ফিগার' দিয়া সর্ব্বপ্রয়াস করেন। সরকারী মহল, বিশেষভাবে আমাদের পারসংখ্যানুবিদ্ মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় খাদ্যবিষয়ক সকল সতর্কবাণীকে 'সরকার-বিরোধী' প্রোপাগাণ্ডা বলিয়া উড়াইয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে জনগণকে মিথ্যা আশার বাণী এবং অন্যান্য নানা প্রকার স্তোকবাক্য দিয়া ইহাই বুঝাইতে প্রয়াস পান যে, পশ্চিমবঙ্গের এই খাদ্য-সঙ্কট নিতান্ত সাময়িক এবং নূতন ফসল উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই এ-রাজ্যে ধান-চালের সহিত অন্যান্য খাদ্য-সামগ্রীর বন্যা বহিয়া যাইবে! চাউলের সাময়িক ঘাটতি মিটাইবার বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন বিষম গমকের সহিত আমাদের অধিক পরিমাণে 'গমাহারী' হইবার হিতোপদেশও দান করেন, কিন্তু হায়! মুখ্যমন্ত্রীর গমকের প্রতিধ্বনি আকাশে মিলাইবার পুর্ব্বেই তাঁহার সেই গমও প্রায় গুম্ হইয়াছে!

আজ আমরা পশ্চিম-বঙ্গবাসী, ভেতো বাঙ্গালী বলিয়া পরিহসিত জনগণ, অসম্ভব অবস্থার মধ্যে ক্ষীণদেহ পিঞ্জরে প্রায়-বিলীন প্রাণ-পক্ষীটিকে আবদ্ধ রাখিয়াছি।

চাউল-চিনি-তৈলের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা রৌদ্র-বৃষ্টির মধ্যে কিউ-এ দাঁড়াইয়া ভিখারীর মত প্রতীক্ষা করিতেছি। গাঁটের পয়সা দিয়া মৎস্য ক্রয় করিতে গিয়া চোর-ছ্যাঁচড়ের মত ব্যবহার করিতে বাধ্য হইতেছি। সব কিছুর জন্যই আজ আমাদের দোকানীর কাছে হাত জোড় করিতে হইতেছে। সরকার-নির্দ্ধারিত মূল্যের উপর বেশ কিছু চাপাইয়া খাদ্য-অখাদ্য দোকানী খুশীমত যাহাই কৃপা করিয়া দিতেছে—হাসিমুখে আমাদের তা াই লইতে হইতেছে। এক কেজি সরিষার তৈল কিনিতে গিয়া দোকানীকে অন্তত দশ কেজি তৈল মর্দ্দন করিতে হইতেছে—তাও আবার ৪·৫০ হইতে ৫৲ কেজি-প্রতি এই দরে। সরকার ঘোষিত ৩·২৫

কেজি দরের তৈল নামে সরিষার হইলেও ভেজাল-মিশ্রিত বিষ ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহাতেই শেষ হইল না! বর্ত্তমান বাঙ্গালীর সাধারণজনের অবস্থা :—

"বাড়াভাড়া মেলে না, গাড়িতে মাথা গলানো যায় না, স্কুল-কলেজ হাসপাতালে ঠাঁই নাই। বিরাট সর্ব্বগ্রাসী এক 'নাই' আমাদের গিলিয়া রাখিয়াছে, আর এই সর্ব্বশূন্য আবহাওয়ায় বণিকরা বেপরোয়া মুনাফা লুঠিতেছেন, পলিটিসিয়ানরা বেপরোয়া বক্তৃতাবাজী আর কোঁদলে মাতিয়া আছেন। আর এই সর্ব্বাত্মক উপেক্ষার নীচে নিম্নবিত্ত গৃহস্থ সমাজ একটু একটু করিয়া তলাইয়া যাইতেছেন। দুর্নীতি অধঃপতন, অকালমৃত্যু হইয়াছে এই সম্প্রদায়ের নিত্য সহচর।—"

কেবল পশ্চিমবঙ্গ নহে—সারা ভারতে আজ যে ভীষণ ক্ষুধা এবং অসন্তোষের আগুন দেখা যাইতেছে—এই সর্ব্বদাহী আগুনকে, ভারতের ভবিষ্যৎ-সুখের কথা কিংবা গণতন্ত্রের গাল-ভরা-গুণগান শুনাইয়া নিভানো যাইবে না। বর্ত্তমানের কঠোর-নিষ্ঠুর বাস্তবকে না-দেখিয়া, না-বিবেচনা করিয়া, কিংবা অগ্রাহ্য করিয়া দেশের মানুষকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির সমাপ্তিতে ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের উজ্জ্বলতর চিত্র দেখাইয়াও ঠাণ্ডা করা যাইবে না। এখন অবিলম্বে জনগণকে জীবন-ধারণের পক্ষে যে-সব সামগ্রী চাই-ই—সেই সব বস্তু যেমন করিয়াই হউক দিতে হইবে। যেমন :

অন্ন, বস্ত্র, ঔষধ, বাসস্থান, শিক্ষা, তা সুলভে ও সহজ-প্রাপ্যরূপে সর্ব্বজনকে দিতে হইবে। তারপর তাহার কাছে ত্যাগ ও দুঃখ বরণ দাবি করা, কিংবা দেশপ্রেমের দোহাই পাড়া সমীচীন হইবে। জীবন-ধারণের ক্লেশে বেশির ভাগ মানুষের যেখানে নাভিশ্বাস উঠিয়াছে, সেখানে বাজে কথার বেসাতি যেমন অর্থহীন, অনাগত ভবিষ্যতের ভাঁওতা তেমনি নিরর্থক।

বাণীদান করিয়া, ভাঁওতা দিয়া অদ্যকার শাসন-কর্ত্তারা আত্মপ্রসাদ এবং তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন, কিন্তু অভাবপিষ্ট জনগণের নিকট ইহা আগুনে ঘি ঢালিবার মত হইবে (হইতেছে বলাই ঠিক)।

স্বীকার করিব যে, নূতন স্বাধীনতা-পাওয়া দেশকে যথাযথভাবে গড়িয়া তোলা সহজ বা এক-আধ দিনের কাজ নয়—এবং এই গঠন-কার্য্যে আমাদের বহু সুখ বিলাস হইতে বঞ্চিত থাকিয়া বহু দুঃখ-কষ্ট-অভাব অবশ্যই বরণ করিতে হইতে—(দেশবাসী এ-বিষয় কম করিতেছে না বলা বাহুল্য) কিন্তু দেশের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় দুঃখভোগ ও বঞ্চনা যদি সমান ভাবে এবং ভাগে—'হুজুর-মজুর, তেতলা ও বটতলা' ভোগ করেন, তবেই মঙ্গল। হুজুরদের জন্য ছাদনা-তলা আর মজুরদের জন্য কেওড়াতলা—এ-ব্যবস্থা অধিককাল চলিবে না।

জনকয়েক ভাগ্যবানের বোঝা যদি কেবলমাত্র অগণ্য অভাগার ঘাড়ে চাপে, তাহা হইলে তা অনিবার্য্যভাবেই দুর্ব্বিপাক ডাকিয়া আনে। ইহারই ভয়াবহ ইঙ্গিত পাইতেছি। পরম দুঃখজনক ও অনভিপ্রেত এই ইঙ্গিতের সঙ্কেত যেন আমরা অগ্রাহ্য-অবহেলা না করি।

মজুতদার ও ভেজালকারী দমন

সরিষার তৈলে এবং অন্যান্য নানা খাদ্য-সামগ্রীতে পশ্চিমবঙ্গে এখন ভেজালের রাজত্ব বেপরোয়া ভাবেই চলিতেছে। বলা বাহুল্য মানুষ মারিবার এই পুণ্য-কর্ম্মে মজুতদার এবং ভেজালদার হাতে হাত মিলাইয়াছে। বেশ কিছুকাল হইতেই ঔষধ এবং খাদ্যে ভেজাল-কারীদের 'কঠোর হস্তে দমন করিতে হইবে'—এবম্-প্রকার ভীম-ঘোষণা সরকারী মহল হইতে ঘন ঘন করা হইতেছে। কয়েকজন কেন্দ্রীয় কর্ত্তা মুনাফাশিকারী এবং ভেজালকারীদের শীঘ্রই শায়েস্তা করা হইবে বলিয়া যাত্রার দলের তুলা-ভরা গদাও ঘুরাইতেছেন—কিন্তু হায়! বাস্তবে দেখা যাইতেছে মজুতদার-মুনাফাশিকারীরা পরমানন্দে নির্ভয়চিত্তে তাহাদের মানুষমারা বিষম যন্ত্রে জনগণকে নিষ্পেষিত করিয়া তাহাদের রক্তমাখা অর্থ-ভাণ্ডার বৃহৎ হইতে বৃহত্তর করিতেছে—এবং আমাদের কর্ত্তব্যে-কঠোর প্রজাপালক মালিকগুষ্টি এই দৃশ্য ফ্যাল্‌ফ্যাল্ নেত্রে অবলোকন করা ছাড়া আর কিছুই করিতে পারিতেছেন না, হয়ত বা করিবার ইচ্ছা থাকিলেও কাজে নামিতে ভরসা পাইতেছেন না!

ভেজাল তৈলে পেঁয়াজি ভাজা বিক্রয়ের মহা অপরাধে সাত-পয়সার কারবারী দুখীরামকে গ্রেপ্তার করিতে জনপ্রাণ-রক্ষক সরকার পরম তৎপর, এবং তাহার শাস্তি-দান কার্য্যে তৎপরতর—কিন্তু ভেজাল তৈল যে-মিল হইতে বেচারা দুখীরাম ক্রয় করিতেছে, এবং যে-ভেজাল তৈল বাজারে প্রবাহিত হইতেছে, নাম-ঠিকানা জানা সত্ত্বেও সরকার এবং সরকারী-শিকারি-বিড়াল সেই সব তৈল-কলের মালিক রামভোরসা কিংবা রামভকৃতের অঙ্গ স্পর্শ করিতে বহুক্ষেত্রেই পিছপাও দেখা যাইতেছে—কেন? কেবল অঙ্গ স্পর্শই নহে—সংবাদপত্রে, এই সকল পুণ্যকীর্ত্তি ব্যক্তিদের নামপ্রকাশও কংগ্রেসী রাম-রাজ্যে নিষিদ্ধ!

আমরা ভাবিতেও পারি না, এক শ্রেণীর অতিলোভী এবং হাঙ্গরপ্রকৃতি ব্যবসায়ীর দুষ্ট ব্যবসায়ের প্রকোপে একটা সভ্য দেশে কোটি কোটি মানুষ কেন অকালে মৃত্যু-পথযাত্রার মিছিলে যোগ দিতে বাধ্য হইবে। ইহা কল্পনা করাও যায় না যে, যে-সময় অসহায়, অভাব-জর্জ্জরিত জনগণ 'হা অন্ন, হা অন্ন' করিয়া কাতরস্বরে গগনভেদী চিৎকার করিতেছে, সেই সময় রাষ্ট্র সরকার ব্যবসায়ে পবিত্র এবং ব্যবসায়ীদের অবশ্যপালনীয় কর্ত্তব্য প্রচার দ্বারাই মানুষের ক্ষুধা দূর করিতে প্রয়াস করিতে পারেন। দেশের এই প্রায়-দুর্ভিক্ষকালীন অবস্থায় সরকার কেমন করিয়া স্থিরচিত্তে অ-ক্রিয় থাকিতে পারেন? যে সব কংগ্রেসী নেতা তথা অধুনার সরকারী কর্ত্তারা, দেশের মানুষের চরম দুর্দ্দশার আজ প্রায়-নির্ব্বাক দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন—ইংরেজ আমলে ইঁহারাই দেশের খাদ্যাভাবের কালে বাক্যবাণে এবং সমাচলাচনার তোপে ইংরেজ সরকারকে প্রায় উড়াইয়া দিবার মত অবস্থার সৃষ্টি করেন। এই সকল মহাপ্রাণ এবং স্বার্থলেশহীন নেতাদের অদ্যকার ব্যবহারে আমরা কি ইহাই মনে করিব যে—"ভারতীয় মানুষদের অন্ন হইতে বঞ্চিত করিয়া হত্যা করিবার অধিকার কোন বিদেশী সরকারের থাকিতে পারে না। স্বদেশীয়দের এইভাবে নির্ব্বাণের পথে পাঠাইবার ভগবান্-প্রদত্ত স্বর্গীয় অধিকার থাকিতে পারে একমাত্র দেশীয় নেতা তথা শাসকদের" এবং যে-অধিকারের মালিক আজ কংগ্রেসী সরকার।

ঘটা করিয়া প্রচার করা হইয়াছে যে, খাদ্যাভাব মিটাইবার জন্য সরকার মার্কিণ গম (এবং হয়ত কিছু চাউলও) ওদেশ হইতে আমদানীর ব্যবস্থা পাকা করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে মানুষ কি খুব বেশী আশা বা ভরসা পাইবে? আমদানীকৃত গম এবং চাউল যে দেশের উৎপন্ন গম এবং চাউলের সবই চোরা গলিতে ঘুঘু কালোবাজারীদের খপ্পরে পড়িবে না এ-কথা জোর করিয়া বাহাদুর-সরকার ঘোষণা করিতে পারেন কি? (রেডক্রস এবং সরকারী গুদামের গুঁড়া দুধ এবং বিবিধ প্রকার শিশু-খাদ্যের—কিভাবে, কাহাদের কারসাজিতে কালোবাজারীদের গোপন ভাণ্ডারে চালান হয়—সে কথা স্মরণ করুন!)

কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার দেশের বিষম খাদ্য-সঙ্কট সমাধানে একেবারে নিশ্চেষ্ট—এমন কথা বলিব না। কিন্তু এ-সমাধান-প্রচেষ্টা যদি কেবলমাত্র পবিত্র প্রচেষ্টাতেই পর্য্যবসিত হয়—তাহা হইলে দেশের অনাহারী জনগণ শেষ পর্য্যন্ত, বিনা প্রতিবাদে হয়ত মৃত্যুবরণ করিতে নাও পারে। সরকারী মহল বার বার বলিতেছেন দেশে খাদ্যশস্যের অভাব নাই। সরিষার তৈলের ভাণ্ডারও কম নহে—কিন্তু এতই যদি জানেন, তবে কর্ত্তারা এসব সামগ্রী খোলা বাজারে সোজাপথে বিক্রয়ের ব্যবস্থা কেন করিতেছেন না? বার বার শুনিতেছি, কালোবাজারী এবং মজুতদারদের যথাযথ শাস্তি দিয়া তাহাদের দমন করিবার সংবিধান-সঙ্গত আইন নাকি নাই—একথা যদি সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে বলিব, গত দশ-পনেরো বৎসর কর্ত্তারা কি নাকে সরিষার তৈল প্রদান করিয়া সুখনিদ্রায় মগ্ন ছিলেন? জনগণ কর্ত্তাদের এই ক্লীব-অজুহাত কতদিন সহ্য করিবে জানি না, কিন্তু মাঝে মাঝে যে প্রকার বিপদের সঙ্কেত নানা অঞ্চল হইতে সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইতেছে, তাহাতে ভয় হয়—যে কোন মুহূর্ত্তে জনগণ বাধ্য হইয়া সংবিধান পরিবর্ত্তন এবং সংবিধানের গদিতে আসীন মহাশয়দের আসন বদল করিবার ব্যবস্থা করিতে পারে।

বর্ত্তমান অবস্থায় কর্ত্তাদের মুখে বড় বড় পাঁচ-সালা প্ল্যানের কথা শোভা পায় না। বর্ত্তমানকে হত্যা করিয়া ভবিষ্যতের সুখ-চিন্তা নির্ম্মাণের স্বপ্ন-বিলাস ভরতি-উদরদের পক্ষে মহাকর্ম্ম, দেশ-সেবা হইতে পারে, কিন্তু আজকের মানুষের বাঁচিবার সামান্যতম প্রয়োজন মিটাইতে যে-সরকার (এবং যে-পার্টি ঐ সরকারের পৃষ্ঠপোষক) অক্ষম, সেই সরকারের শাসন-যন্ত্র অধিকার করিয়া থাকিবার কোন অধিকার নাই। লজ্জা এবং বিন্দুমাত্র ভদ্রতা, শালীনতাবোধ থাকিলে—সরকার পদত্যাগ করিয়া পথে নামুন—জনগণের সঙ্গে সমানে তাঁহাদের দুঃখ-কষ্টের সমভাগী এবং ভোগী হউন। একথা শুনিয়া অনেকের, বিশেষ করিয়া বিত্তবান্ এবং এখনও সুখ-সমাসীন লোকেদের, হয়ত দেশে 'অ্যানার্কি'র সম্ভাবনায় আতঙ্ক হইবে, কিন্তু দেশের বর্ত্তমান অবস্থা যাহা, কোন অবস্থাতেই আর তাহা হীনতর হইতে পারে না। আশা করি, এবং এখন সামান্য বিশ্বাস আছে যে—শাসনযন্ত্রের চালক যাঁহারা, 'ফোরম্যানের' আসন দখল করিয়া যাঁহারা রহিয়াছেন, তাঁহারা শেষ এবং সর্ব্বাত্মক প্রয়াস করিয়া শাসন-রথকে খানায় পড়িয়া ধ্বংসের বিষম সম্ভাবনা হইতে বাঁচাইবার চেষ্টা করিবেন।

কালোবাজার, ভেজাল এবং মুনাফাশিকার দমনের জন্য বেশী কিছু করিবার দরকার হইবে না—মাত্র জন-কয়েক কালোবাজারী এবং খাদ্য-ঔষধে ভেজালদান-কারীকে প্রকাশ্য স্থানে দমদম বুলেট মারিয়া হত্যা করিবার সাহস যদি সরকার দেখাইতে পারেন—বন্দুকের আওয়াজ হাওয়াতে মিলাইবার সঙ্গে সঙ্গেই, বহু কঠিন সমস্যারও সহজ-সমাধান আপনা হইতেই হইয়া যাইবে। আশা করি, সরকার সমাজ-বিরোধীদের সর্ব্ববিধ সাং-বিধানিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার পক্ষে জরুরী নূতন আইন পেশ এবং পাস করিতে আর বিলম্ব করিবেন না ইহাতে কর্ত্তাদের 'আত্মমঙ্গল'ই হইবে।

দুর্নীত-দমনে এ-দেশ আর ও-দেশ

কিছুকাল পূর্ব্বে এ-পি-এ'র একটি সংবাদে প্রকাশিত হয়:

"মস্কো, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী—নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের অতিরিক্ত উৎপন্ন সুতীবস্ত্র বিক্রয় করিয়া তাহার লভ্যাংশ নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া লওয়া এবং অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণের দায়ে লাটভিয়ার দুইজন পদস্থ কর্ম্মচারীকে গুলী করিয়া হত্যা এবং তাহাদের তিনজন সাকরেদকে ১৫ বৎসর এবং একজনকে ১০ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। লাটভিয়ার সুপ্রীম কোর্ট এই নির্দ্দেশ দিয়াছেন।"

ইহার কিছুদিন পরেই আর একটি সংবাদে প্রকাশ পায় যে, সদ্য-স্বাধীন মরক্কোতে খাদ্য-তৈলের সহিত হোয়াইট অয়েল ভেজাল দেওয়ার 'লঘু' অপরাধে ওদেশে কয়েকজন ভেজালদার তৈল-ব্যবসায়ীকে প্রকাশ্য রাজপথের চৌমাথায় গুলী করিয়া হত্যা করা হয়—এবং তাহার পর হইতে মরক্কো'তে ভেজাল কারবার একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

সোভিয়েট রাশিয়া হইতে প্রায়ই সংবাদ প্রকাশ হয় যে, মুনাফাশিকারী, কালোবাজারী, খাদ্য-ঔষধে ভেজাল-দানকারীদের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ামাত্রই সরাসরি গুলী, কিংবা ১০।১৫।২০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড দান করা হয়। এই অতি-তৎপর বিচার-পদ্ধতি এবং ব্যবস্থা গ্রহণের পথে কোন প্রকার সাংবিধানিক, কিংবা দীর্ঘকাল-ব্যাপী মামলার কোন প্রশ্ন কেহই তোলেন না। সাধারণ মানুষের প্রাণ এবং সুখ-সুবিধার হানি যাহারা করে এবং যাহার ফলে রাষ্ট্রের সুনাম এবং ক্ষতি হইতে পারে, তাহাদের সাংবিধানিক, এমন কি সাধারণ নাগরিকের কোন অধিকার ভোগ করিবার কোন অধিকার থাকা উচিত নহে—এই শ্রেণীর সমাজ-বিরোধীদের, অভিযোগ উঠামাত্র 'আউট্‌ল' (outlaw) ঘোষণা করিয়া তাহাদের বিচার-ভার হয় সাধারণ নাগরিকদের উপর ছাড়িয়া দিতে হইবে, আর না হয় সরকারী নির্দ্দেশে প্রকাশ্য স্থানে—হাটেবাজারে তাহাদের গুলী করিয়া হত্যা করিতে হইবে।

রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন যে-সকল শাসক রাষ্ট্রের জনগণকে ক্রমাগত দুঃখ-অভাবের পথেই ঠেলিয়া দিতেছেন, তাঁহারা প্রাথমিক সাংবিধানিক কর্ত্তব্য

(জনগণকে ক্ষুধার অন্নদান) পালনে চরম ব্যর্থতাই অর্জ্জন করিতেছেন, দেশের দুর্নীতি দমনের বেলায় তাঁহাদের মুখে সংবিধানের বড় বড় গালভরা বুলি শোভা পায় না। নিজেদের ক্লৈব্য এবং চরম ব্যর্থতা ঢাকিতে যাঁহারা রাষ্ট্রের সংবিধানের আড়ালে আত্মগোপনের প্রয়াস পান, তাঁহাদের, আর যাহাই থাক—আত্মসম্মান এবং নিজের ও দেশের প্রতি প্রকৃত কর্ত্তব্য কি এবং তাহা কি ভাবে পালন করা দরকার, সে বিষয়ে সামান্য প্রাথমিক জ্ঞানও নাই। আজ এই সকল জ্ঞানহীন, বুদ্ধিহীন এবং দায়িত্ব-হীন রাষ্ট্র-নেতারাই দেশকে ডুবাইবার ব্যবস্থায় সিদ্ধহস্ত হইয়াছেন। অথচ ডি. আই. ইঁহাদের সম্পর্কে বেকার!

সাধারণ বাঙ্গালী বনাম কলিকাতায় বাড়ীভাড়া

বিগত কিছুকাল হইতে বাঙ্গলা এবং বাঙ্গালীর প্রাণকেন্দ্র কলিকাতা শহরে, বাঙ্গালীর পৈত্রিক ভিটা-গুলি ক্রমশঃ এবং ক্রমাগত হাত-বদল হইয়া অবাঙ্গালী মালিকানায় চলিয়া যাইতেছে, এবং ইহার ফলে সেই একদা-বাঙ্গালীর বাড়ীগুলিতে বাঙ্গালী ভাড়াটিয়ার প্রবেশ নিষিদ্ধ হইতেছে। একথাও সত্য যে, হঠাৎ যেসব বাঙ্গালী বাড়ীর মালিক হইতেছেন তাঁহারাও বাঙ্গালী অপেক্ষা অবাঙ্গালী ভাড়াটিয়া পছন্দ করেন—। সংবাদপত্রে প্রায়ই বাড়ী ভাড়ার বিজ্ঞাপনে দেখা যায় "অবাঙ্গালী ভাড়াটিয়া হইলে ভাল হয়" (Non-Bengalis preferred!)

কলিকাতার হঠাৎ নূতন বিত্তবান বাড়ীওয়ালারা অবাঙ্গালী ভাড়াটিয়া চাহেন এই কারণে যে, অবাঙ্গালী ভাড়াটিয়ারাও বিত্তবান—উচ্চ বেতনভোগী চাকুরে কিংবা ব্যবসায়ী। এই সঙ্গে ইহাও বলা যায়—কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে শতকরা প্রায় ৯৬টি অবাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানে, কল-কারখানা প্রভৃতিতে বাঙ্গালী দু'চারজন কপালে থাকিলে চাকুরি পায়, কিন্তু উচ্চপদে এবং বেতনে, বলিতে গেলে কোন বাঙ্গালীর এই সব প্রতিষ্ঠানে স্থান হইতে কদাচিৎ দেখা যায়। চাকুরির বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্ত্তামহলের দৃষ্টি বহুবার বহুভাবে আকৃষ্ট করা হয়, কিন্তু তাঁহারা নির্ব্বিকার—তাঁহাদের মোক্ষম অজুহাত বাঙ্গালীকে বাঙ্গলা দেশের বেসরকারী অবাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানে আইন করিয়া চাকরি দিবার ব্যবস্থা করাটাই নাকি বে-আইনী, সংবিধানবিরুদ্ধ হইবে! কিন্তু এ-কথা থাক্।

সাধারণভাবে দেখিতে গেলে—কলিকাতার—

বেসরকারী বাড়ীগুলির মধ্যে কয়েকপ্রকার বাড়ী আছে। ভাড়া দিবার জন্যই একই ধাঁচের একতলা ফ্ল্যাট বাড়ী: দুইখানা ঘর, রান্নাঘর, স্নানঘর ও শৌচাগার। কোনগুলি বহুতলাবিশিষ্ট ফ্ল্যাট বাড়ী, পৃথক্ বন্দোবস্ত। কতকগুলি বাড়ী আছে যেগুলি ভাড়া দিবার উদ্দেশ্যে তৈয়ারী হয় নাই, কাহারও বাসাবাড়ী ছিল, অবস্থা পড়িয়া যাওয়ায় অথবা উত্তরোত্তর ভাড়া বৃদ্ধিতে লুব্ধ হওয়ায় একতলা দু'তলা হইতে ক্রমান্বয়ে ভাড়া দিয়া গৃহকর্ত্তা উহারই এক প্রান্তে বাস করিতেছেন অথবা অন্যত্র ছোটমোট 'বাসা' করিয়া, এমন কি, ভাড়া বাড়ীতে বাস করিতেছেন। এমন অনেক বাড়ী আছে যে বাড়ীর একাংশে ভাড়াটিয়া, অপরাংশে গৃহকর্ত্তা থাকেন। অনেক বাড়ী আছে যাহাদের মালিক আদৌ কলিকাতায় থাকেন না, রাজ্যান্তরে কিংবা বিদেশে থাকেন। এই ধরণের বাড়ী বা ফ্ল্যাট বাড়ীতে ঝঞ্ঝাট অপেক্ষাকৃত কম; কিন্তু এগুলি দরোয়ান-নির্ভর অথবা ম্যানেজার-নির্ভর। কতকগুলি বাড়ী আছে কেন্দ্রীয় সরকারের, কতকগুলি রাজ্য সরকারের। কতকগুলি সরকারী ব্যয়ে নির্ম্মিত খাস সরকারের বাড়ী, কতকগুলি রিকুইজিসান-করা ভাড়া বাড়ী। এগুলি একান্তভাবে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের কর্ম্মচারীদের জন্য।

এখানে সাধারণের প্রবেশ নাই বটে, কিন্তু যেঁখানে সাধারণের প্রবেশ অনুমোদিত সেখানেও কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কর্ম্মিগণ প্রার্থী হইয়া থাকেন। তাহার কারণ, প্রয়োজন অনুপাতে কেন্দ্রীয় সরকার গৃহনির্ম্মাণ করেন না, প্রার্থীর সংখ্যা সর্ব্বদাই উদ্বৃত্ত থাকে। রাজ্য সরকার আরও কম করেন অথবা করেন না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কলিকাতা কর্পোরেশন রাজ্য সরকারের মতই এই বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন।

ফলে, কলিকাতার গৃহনির্ম্মাণের প্রধান দায়িত্বভার পড়িয়াছে বেসরকারী সংস্থা বা ব্যক্তিগত জমি-মালিকদের এবং কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের উপর। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার কর্ম্মীদের বাড়ী ভাড়া ভাতা দেন, কিন্তু বাড়ী জোগাড়ের দায়িত্ব লন না; এ-দায়িত্ব বা মাথাব্যথা সরকারী কর্ম্মীদেরই।

প্রায় ১৯৪৭ সাল পর্য্যন্ত দেখা যাইত, কলিকাতার প্রায় সর্ব্ব অঞ্চলে "বাড়ীভাড়া (To-let)" বোর্ড ঝুলিত। সাধারণ গৃহস্থ ৩০।৪০।৫০ টাকাতেই পছন্দমত বাড়ী পাইতেন কিন্তু হায়! সেই "টু-লেটের" খোলাবাজার আজ নাই—অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সঙ্গে সঙ্গে 'বাড়ী-ভাড়া' নামক বস্তুটিও কালোবাজারে প্রবেশ করিয়া সাধারণ বাঙ্গালীর নাগালের বাহিরে গিয়াছে। "আজ কোথাও 'টু-লেট' বা 'বাড়ী ভাড়ার' বিজ্ঞাপন ঝুলিতে দেখা যায় না। দুই-তিন শ' টাকার নীচে ছোট বাড়ী পাওয়া কঠিন। সেকালে যে অন্ধকার খুপরিগুলি কয়লা রাখারও উপযুক্ত বলিয়া গণ্য হইত না, সেগুলিতে এখন একটি গোটা পরিবার মাথা গুঁজিয়া মাসে ৫০৲ টাকা ভাড়া গুণিয়া দিতেছে। রান্নাঘর বলিয়া কিছু নাই; রাস্তায় তোলা উনুনে আগুন ধরাইয়া কোন একটি কোণায় রান্নার কাজটা সারিয়া লইতে হয়, খাওয়ার পর্ব্বটা ঘরেই। জলকল, পায়খানা 'কমন', অর্থাৎ, আরও দু'-এক ভাড়াটিয়ার সঙ্গে। কোন কোন ক্ষেত্রে বাড়ীওয়ালা পয়েণ্ট পিছু আলোর দাম ধরিয়া দেন, পুড়ুক না পুড়ুক ঐ খরচটা দিতে হয়। ঘর-মেরা তির বালাই নাই, চুণকাম ইত্যাদি ত নাই-ই। কিছু বলিলে, সাফ জবাব—উঠিয়া যান।"

ভাড়াটিয়ার ভাগ্যে বর্ত্তমানে আরও হাজারো রকমের দুর্ভোগ দেখা যাইতেছে। সেলামি (আক্কেল?)—, মাস কয়েক এমন কি দু তিন বছরের আগাম ভাড়া আদায় বহু ক্ষেত্রেই চলিতেছে। এবং যে-সকল হতভাগ্য বাঙ্গালী ভাড়াটিয়া এই সব দাবি মিটাইতে অক্ষম—তাহার পক্ষে কলিকাতায় বাস নিষেধ! কিন্তু কলিকাতায় যাহাকে চাকুরি করিয়া খাইতে হয়—সে যাইবে কোথায়? কলিকাতার কাছাকাছি অঞ্চলে, যেমন—দমদম, বিরাটি, মধ্যমগ্রাম, নব-বারাকপুর, ঢাকুরিয়া, যাদবপুর, গড়িয়া, সোনারপুর, বারুইপুর প্রভৃতি স্থানের বাড়ী ভাড়া এবং জমির দাম প্রায় কলিকাতার মতই হইয়াছে। যাদবপুরে, যেখানে ২৫।৩০ টাকায় ৩-ঘর ফ্ল্যাট একদা সহজলভ্য ছিল—আজ সেই ২৫।৩০ টাকা কমপক্ষে ১৫০।২০০৲ হইয়াছে!

পুরাতন ভাড়াটিয়ার অবস্থা কি?

যে-সব ভাড়াটিয়া একই বাড়ীতে—আজ ৩৫।৪০ বছর নিয়মিত ভাড়া দিয়া বাস করিতেছে, তাহাদের পক্ষে বাড়ী ভাড়া ২০।২৫ মাত্র বৃদ্ধি পাইলেও, বাড়ীওয়ালার নীরব অত্যাচার বাড়িয়াছে হাজার গুণ। অধম লেখক আজ প্রায় ৩৬ বৎসর একই বাড়ীতে বাস করিতেছে এবং আজ পর্য্যন্ত কখনও কোন দিন এক পয়সা বাড়ী ভাড়া বাকি রাখে নাই—মাসের ১০ তারিখের মধ্যে প্রতি মাসের ভাড়া দিয়া আসিতেছে। এই বাড়ী এবং ইহার সংলগ্ন আরও তিনখানি বাড়ী বা ব্লকের কোন প্রকার মেরামতি কার্য্য বাড়ীওয়ালার তরফ হইতে গত প্রায় ১৮ বৎসর হয় নাই—ফলে বাড়ীর অবস্থা জীর্ণ হইতে জীর্ণতর হইতেছে—এমন কি হঠাৎ ইহার ছাদ বা দেওয়াল ধ্বসিয়া যাইতেও পারে। বর্ত্তমান বাড়ীওয়ালা—অমায়িক প্রকৃতির লোক, কোন-কিছুতে কখনও না বলেন না—কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। বাস্তবে ভাড়াটিয়াদের দুঃখ এবং অভাব-অভিযোগ নিবারণের কোন প্রয়াস তিনি আজ পর্য্যন্ত করেন নাই। ব্যাপার দেখিয়া মনে হয়, এই ভদ্রলোক বহু বৎসরের ভাড়াটিয়াদের কোন প্রকারে উৎখাত করিতে পারিলেই যেন বাঁচেন! এই দুঃখ আজ প্রায় সকল পুরাতন ভাড়াটিয়ার কপালেই ঘটিতেছে। এক ভাড়াটিয়া তুলিয়া বেশী ভাড়ায় নূতন ভাড়াটিয়া আমদানী করিতে বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী সকল বাড়ীওয়ালাই একপ্রাণ, একমত, একগোত্র। সরকার পক্ষ হইতেও নিপীড়িত ভাড়াটিয়াদের দুঃখ দূরীকরণে কিছু হইবার আশা দুরাশা মাত্র!

ভবিষ্যতে কি ঘটিবে?

একটি ভয়াবহ ব্যাপারের বিষয় বহু পূর্ব্বে একবার আলোচনা করা হয়। আজ কলিকাতার প্রায়সর্ব্বত্র

ছোট-মাঝারি-বড়—প্রায় সকলরকম বাড়ী অবাঙ্গালীদের হাতে চলিয়া যাইতেছে এবং সেই সব পুরাণো বাঙ্গালী বাড়ী ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া কিংবা রি-মডেল করিয়া নূতন এবং হঠাৎ-বড়লোক অবাঙ্গালী মালিকের বড় বড় বাড়ী নির্ম্মিত হইতেছে। বিশেষ কয়েকটি অঞ্চলে নূতন অবাঙ্গালী মালিকের যে-সব দুই-তিন-চারিতল বাড়ী উঠিয়াছে এবং উঠিতেছে, সেগুলি অবশ্যই ভাড়া বাড়ী নয়।

"নব-নির্ম্মিত বাড়ীর একতলায় বিরাট্ লোহা-লক্কড়ের গুদাম—উপরতলায় মালিকগণ তাঁর বাসস্থান। এই ব্যবসায়ীদের একটা বিরাট্ 'পুল' আছে; সেই 'পুলের' সাহায্যে তাঁহারা দরিদ্র বাঙ্গালী গৃহস্থের কাছে লোভনীয় অপ্রত্যাশিত দর হাঁকিয়া বাড়ী ক্রয় করেন। এইভাবে তাঁহারা আজ বাঙ্গালী অধ্যুষিত এক বিরাট্ এলাকায় ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। বর্ত্তমানে বড়বাজারের বিপুল চাপ ছাড়াও গঙ্গাতীর হইতে মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট ও বিবেকানন্দ রোড বরাবর বাগমারী অবাধ বহু গৃহ বাঙ্গালী অধিবাসীর হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে এইসব এলাকায় বাঙ্গালী ভাড়াটিয়ার পক্ষে ভাড়াবাড়ী পাওয়াও কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

এক কথায়, গৃহাভাব, সেলামি, অগ্রিম ভাড়া, নিরাপত্তা ও স্থায়িত্বের অনিশ্চয়তায় সাধারণভাবে ভাড়াটিয়ার, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী গৃহস্থের নাভিশ্বাস উঠিয়াছে। অনেকে বাধ্য হইয়া, যেসব আবাস এককালে তথাকথিত নিম্নস্তরের লোকেদের ছিল, সেইসব আবাসে আশ্রয় লইতেছে। বস্তিগুলি এখন আর কোন বিশেষ স্তরের লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাই।"

এই প্রসঙ্গে জমির দাম সম্পর্কেও কিছু বলা অবান্তর হইবে না। কলিকাতায় কোন জমি ক্রয় করার কল্পনা বা সাধ্য এখন আর মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর আয়ত্তে নাই এবং এই কারণে খালি জমি এখনও যাহা শহরে বিদ্যমান এবং এককালে যে-সব জমির মূল্য কাঠাপ্রতি ছিল ২ হইতে ৪।৫ হাজার—আজ সেই সব জমির মূল্য দাঁড়াইয়াছে—১০।১২ হইতে ২৫।৩০ হাজার টাকা কাঠাপ্রতি।

আর একটি ব্যাপারও লক্ষ্য করিবার মত। যে কোন কারণেই হউক—কলিকাতায় যদি কাহারও এক হইতে দেড়-দুই কাঠা ফাঁকা জমি থাকে—তাহা হইলে ঐ জমিতে যে-সব বাড়ী নির্ম্মিত হইতেছে এবং হইবে, তাহার অর্থ কে বা কাহারা এবং কোথা হইতে যোগায় তাহা কেহই বলিতে পারে না। শুনিতে পাই, বাড়ীর প্ল্যান বা নক্সা হইবা মাত্র ঐ-সব বাড়ী ভাড়া হইয়া যায়—বলা বাহুল্য, মোটা আগাম টাকাতে বাড়ী নির্ম্মিত হয়! এখানেও কালোবাজারের কালো টাকার খেলা!

সদাচার ?

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীনন্দ-ঘোষিত 'সদাচার সমিতি' গঠনের প্রস্তাব কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আপাতত বন্ধ রাখিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন—সংবাদে এই প্রকার প্রকাশ। এই সদাচার সমিতি গঠন-বিষয়ে আমাদের প্রখ্যাত নেতা এবং বর্ত্তমান কংগ্রেসের বিশিষ্ট স্তম্ভ—শ্রীঅতুল্য ঘোষই ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে প্রথম আপত্তি উত্থাপন করেন বলিয়া প্রকাশ। অতুল্যবাবু জানিতে চাহেন—দেশে দুর্নীতি দমনের উদ্দেশে প্রস্তাবিত 'সদাচার সমিতি' কংগ্রেস হাই কমাণ্ড কিংবা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা কর্ত্তৃক অনুমোদিত কি না। শ্রীনন্দ কমিটিতে বলেন যে, সদাচার সমিতি সংগঠন বিষয়ে তিনি কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজের অনুমোদন লইয়াছেন।

সদাচার সমিতি গঠন বিষয়ে প্রায় দুই-তিন মাস যাবত বহু আলোচনা এবং সংবাদপত্রে বহু সংবাদ প্রকাশ হইয়াছে। কাজেই কথাটা কর্ত্তাদের গোচরে ছিল না, এ-কথা বিশ্বাস করা শক্ত। যতদূর জানি শ্রীনন্দ বাজে কথার লোক নহেন—এবং মিথ্যা ভাষণ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব মনে করি। সদাচার সমিতি বাস্তবে কার্য্যকরী হইবার মুখেই শ্রীকামরাজ (এবং কিয়ৎ পরিমাণে শ্রীলালবাহাদুরও) শ্রীনন্দকে এমনভাবে ল্যাং মারিয়া বি-পাকে ফেলিবেন, ইহা আমরা ভাবিতেও পারি নাই। 'সদাচারে'র অবস্থা অবশেষে এই পরিণতি লাভ করিবে—সাধারণ লোকও ভাবিতে পারে নাই। বিশেষ করিয়া পরম সদাচারী শ্রীঅতুল্য ঘোষ যে শ্রীনন্দকে

এমন ভাবে প্যাঁচে ফেলিবেন, তাহাও আমরা কল্পনা করিতে পারি নাই। তবে শ্রীঘোষ কংগ্রেসকে বাঁচাইয়াছেন, ইহা স্বীকার করিব। কারণ 'সদাচার সমিতি' গঠিত হইয়া যদি সক্রিয় হয়, তাহা হইলে কংগ্রেস-গাঁ উজাড় হইয়া যাইবে। লোম বাছিতে গেলে কংগ্রেস-কম্বলের কোন অস্তিত্বই থাকিবে না, কাজেই কংগ্রেস-কর্তারা 'সদাচার সমিতি'কে শিকায় তুলিবার ব্যবস্থা করিয়া বুদ্ধির কাজই করিয়াছেন অবশ্যস্বীকার্য্য।

এখন শ্রীনন্দ কি করিবেন? সর্ব্বশ্রী অতুল্য, সঞ্জীব রেড্ডি কামরাজ, লালবাহাদুর প্রভৃতি কংগ্রেসী 'হাই আপস্' নন্দজীকে যে-ভাবে অপমানিত এবং প্রকারান্তরে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করিলেন, তাহার পর (আমাদের মতে) তাঁহার মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগই সম্মানজনক হইবে। বলা বাহুল্য সরকারী মহলে দুর্নীতি দূর করিবার যে প্রচেষ্টা নন্দজী করিতেছিলেন—তাহাতে কেহই সুখী হয়েন নাই। শ্রীনন্দের প্রয়াস সফল হইলে 'পার্টি' ভাঙ্গিয়া যাইবে, কংগ্রেসের পক্ষে আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনে জয়লাভ অনিশ্চিত হইবে! কি ভয়ানক সম্ভাবনার কথা! কাজেই কংগ্রেস পার্টি জিন্দাবাদ! 'সদাচার সমিতি' মুর্দ্দাবাদ!!

আমাদের বিনীত প্রার্থনা—আগামী কংগ্রেস অধিবেশনে শ্রীঅতুল্য ঘোষকে কংগ্রেসকে অপমৃত্যু হইতে রক্ষা করার জন্য একটি অভিনন্দপত্রের সহিত একটি সোনার (১৪ ক্যারেট) পদক দিবার ব্যবস্থা করা হউক। এই অভিনন্দনপত্রসহ পদক প্রদান শ্রীনন্দের হাত দিয়া করা হইলে যথাযথ হইবে।

শেষ পর্য্যন্ত চলেই এল মালশ্রী। ছোট্ট স্টেশন, মিনিটখানেক থামে ট্রেণ। নামতে-না-নামতেই ছেড়ে দিল। কুলির চিহ্ন নেই, নিজেই স্যুটকেশ আর বিছানাটা টেনে নামিয়ে নিল। লাইনের ওপারে আগাছার জঙ্গল, মহুয়া আর শালবনের সারি। ভীড় নেই একেবারে, লাল সুরকি বিছানো প্ল্যাটফর্ম্ম। এক কোণে একটা ছোট্ট চায়ের দোকান, টিনের চাল, দরমার বেড়া। একটি ছোট ছেলে টুলের ওপর বসে বসে ঢুলছে। বিব্রত হয়ে এদিক্‌-ওদিক্‌ তাকাল মালশ্রী।

শালবনের ধার দিয়ে একজনকে আসতে দেখা গেল। মনে হ'ল, এদিকেই আসছে। কাছাকাছি আসার পর ভাল ক'রে চোখ পড়ল তার দিকে। আধময়লা পাঞ্জাবি

গায়ে, খালি পা, কাঁধে একটা খদ্দরের ঝোলা। দু'হাত তুলে নমস্কার করল তাকে। বলল, "আপনিই মালশ্রী দেবী? শোভনাদি আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। আমার নাম দীপক মুখোপাধ্যায়।"

মালশ্রী প্রতি-নমস্কার করল।

"চলুন, এগোনো যাক। এই মাইল দেড়েকের রাস্তা, হাঁটতে পারবেন ত?"

মালশ্রী ঘাড় নাড়ল।

জিনিষগুলোর দিকে তাকিয়ে দীপক হাসল একটু। বলল, "কুলি পাওয়ার আশা নেই, আমাকে দিন।"

মালশ্রী ব্যস্ত হয়ে উঠল, "সে কি, আপনি—"

ওর কথা শেষ হবার আগেই বিছানাটা কাঁধে তুলে নিয়েছে দীপক। স্যুটকেশটা হাতে। ছোট অ্যাটাচিটা মালশ্রীই তুলে নিল অগত্যা।

যেতে যেতেই বলল দীপক, "শোভনাদি রিকৃশ পাঠাতে চেয়েছিলেন, আমিই বারণ করলাম। প্রথম ইম্প্রেশনটা রিকৃশ-ঘটিত হ'লে হয়ত দু'দিনেই পালিয়ে যেতেন।" জোরে হেসে উঠল সে।

"কেন?"

"এত ঝাঁকাত যে গায়ের ব্যথায় দু'দিন উঠতে পারতেন না।"

প্ল্যাটফর্ম পার হয়ে সামনের কাঁচা রাস্তায় পড়ল ওরা। এখানকার মাটির রং লাল, দু'পাশে ঘন শালবন, দিগ্‌দিগন্ত শালমঞ্জরীর সৌরভে আচ্ছন্ন। অতি অপরিচিত পরিবেশ।

একটা গানের কলি মনে পড়ল, মালশ্রীর, "মনে হয় যেন পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ—।" কাল রাতে ছোড়দা অনেক ক'রে গাইতে বলেছিল তাকে। এখন যেন গানটা বর্ণে বর্ণে সত্যি হয়ে গেল। একটু দূরেই একটা নাম-না-জানা গাছ, তার সর্ব্বাঙ্গে শুভ্রতার প্রাচুর্য্য, একটিও পাতা নেই। মনে হচ্ছে শ্বেতা সরস্বতীর মত।

"ওটা কি গাছ?" মালশ্রী প্রশ্ন করল।

"কুচ্চি।"

খানিকক্ষণ দু'জনেই চুপ। তার পর আবার প্রশ্ন করে মালশ্রী, "কতদিন আছেন এখানে?"

"বছর চারেক হবে। শোভনাদি আমার মাসতুতো দিদি হন সম্পর্কে। আপনি ত আগে কখনও আসেন নি এসব জায়গায়।"

"না, কলকাতা থেকে বাইরে গেছি খুব কম। গেলেও বড় শহরে। অবিনাশপুরে ট্রেনিং-এর বছর মাঝে মাঝে গ্রামে গেছি, কিন্তু সে-সব গ্রাম ঠিক এরকম নয়।"

"হ্যাঁ, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর—এরা একেবারে আলাদা। এদের সঙ্গে বাংলা দেশের অন্য জেলাগুলো তুলনা হয় না।"

কথা বলতে বলতে অনেকটা পথ পার হয়ে এসেছে ওরা। দু'পাশের ঘন বন হাল্কা হয়ে গেছে, সামনে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কয়েকটি মহুয়া গাছ, নীচে ঝরা পাতার স্তূপ। দু'একটা কৃষ্ণকায় উলঙ্গ বালক গাছের তলায় লুব্ধ আগ্রহে কি খুঁজে বেড়াচ্ছে। অদূরে কয়েকটি ঘর দেখা গেল। চারপাশে বেশ খানিকটা জমি, বাঁশের বেড়ার সীমানা, নড়বড়ে আধভাঙা গেট, স্বর্ণলতা বিদ্যালয়ের সাইনবোর্ডটা মাধবীলতার ঝাড়ের পাশে অদৃশ্যপ্রায়, অক্ষরগুলো অস্পষ্ট হয়ে এসেছে।

"এই যে, এসে গেছি আমরা।"

গেট খুলে প্রথমে দীপক ঢুকল, পরে মালশ্রী। সারি সারি খড়ের ঘর, সামনে ছোট্ট মাটির দাওয়া, নিকোনো তকতকে। দাওয়ার কোলে বেলফুলের ঝাড়। সদ্য-ফোটা ফুলের গন্ধ আসছে। বেড়ার ধারে একটি কুয়ো। তার চারপাশে সব্জি-বাগান। কয়েকটি ছোট ছেলে-মেয়ে গাছে জল দিচ্ছে। একজন মহিলাও তাদের সঙ্গে কাজে ব্যস্ত। ওদের দেখে এগিয়ে এলেন তিনি।

"ও, তুমি এসে গেছ দীপক।" মালশ্রীর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। বললেন, "এস ভাই, সরমার কাছে তোমার কথা অনেক শুনেছি।"

সারি সারি ঘরের মধ্যে একখানাতে মালশ্রীর জিনিষপত্র নামিয়ে রাখল দীপক। সন্ধ্যার আঁধার তখনও গাঢ় হয় নি। ঘরের কোণে একটি লণ্ঠনের আলো কমিয়ে রাখা হয়েছে, একখানা সাদাসিধে তক্তপোশ, জানলার পাশে ছোট একটি পুরাণো টেবিল আর একখানা হাতলবিহীন চেয়ার—জায়গায় জায়গায়

চটা উঠে গেছে। ঘরে ঢুকতেই খড়ের গন্ধ এল নাকে। খোলা জানলা দিয়ে অন্তহীন আকাশের সীমারেখা চোখে পড়ে। কাঠের কড়ি-বরগায় জায়গায় জায়গায় ঘুণ ধরেছে, জানলার পাশে কুমোর পোকার বাসা। ঘরের মেঝে গোবর-মাটিতে নিকোনো।

শোভনাদি ওর পিঠে হাত রাখলেন, "আমি লক্ষ্মীকে ডেকে দিচ্ছি, ও তোমাকে স্নানের ঘরটর দেখিয়ে দেবে।"

ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি। দীপকও গেল তাঁর সঙ্গে। খানিক বাদে একটি পনের-ষোল বছরের মেয়ে দরজার পাশে এসে দাঁড়াল। ডুরে শাড়ীর আঁচল কোমরে জড়ানো, চোখে ঈষৎ কৌতূহলের দৃষ্টি। মালশ্রী হেসে বলল, "তুমিই লক্ষ্মী?"

ঘাড় নাড়ল মেয়েটি, কোঁকড়া চুলে ঘেরা মাথাটি দুলে উঠল, লণ্ঠনের আলোর ঝলক কানের গোল মাকড়িতে। ঘরের পেছনে চটের পর্দা-টাঙানো

একটি পনের ষোল বছরের মেয়ে দরজার পাশে এসে দাঁড়াল

বাঁধানো জায়গা—পাশেই বাঁশঝাড়, লণ্ঠনের মিটমিটে আলো, চারদিকে নিবিড় অন্ধকার নেমেছে ততক্ষণে। দু'বালতি জল তুলে রেখেছে কে যেন—হয়ত ওরাই কেউ। স্নানের জায়গায় ওকে পৌঁছে দিয়ে লক্ষ্মী চ'লে গেল। চারদিকে কেমন ভুতুড়ে আবহাওয়া। গা'টা ছমছম করে উঠল। বাঁশঝাড়ের মধ্যে কি যেন চলে গেল সড়সড় ক'রে। সাপ নয় ত! কোন মতে হাত-মুখটা ধুয়ে বেরিয়ে এল মালশ্রী। মনে পড়ল কলকাতায় একবার স্নানের ঘরে ঢুকলে সহজে বেরোতে চাইত না। সাবানের সুরভিত ফেনায় আর কলের অবিরল জলধারায় যেন কল্পসাগরে ডুব দিত মালশ্রী। গানের সুরে তন্ময় হয়ে যেত। ঘরে ঢুকে দেখে শোভনাদি ওর অপেক্ষায় বসে।

"তোমার নিশ্চয়ই চা খাওয়ার অভ্যেস আছে। আমিও ওটা ছাড়তে পারি নি। চল আমার ঘরে, সব তৈরী।"

হাসলেন শোভনাদি। হাসিটি ভারী সুন্দর। ওঁর খুড়তুতো বোন সরমার সঙ্গে বেসিক ট্রেনিং কলেজে পড়েছে মালশ্রী। সেই সূত্রেই আলাপ, এখানে আসার চনাও তারই থেকে। চাক্ষুষ পরিচয় অবশ্য আজই প্রথম হ'ল। শোভনাদির ঘরখানা একটু আলাদা। পিছন দিকে অবারিত ধানক্ষেত। জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে দেখালেন শোভনাদি, বললেন, "এই ক্ষেতের কিছুটা স্কুলেরই সম্পত্তি, আমরাও চাষ করি, দেখবে তার সময়।"

মেঝেতে মাদুর পেতে চায়ের সরঞ্জাম সাজাচ্ছিল একটি মেয়ে, পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়স হবে—সরু কালোপাড় ধুতি পরণে, দেখে মনে হয় বিধবা।

"এই যে সরস্বতী, এ হ'ল মালশ্রী, আমাদের নতুন দি। আর এ সরস্বতী, বহুদিনের পুরাণো কর্মী। মেয়েদের রান্না, সেলাই, সব শেখানোর দায়িত্ব ওর পর।"

সরস্বতী হাতের পেয়ালাটা নামিয়ে রাখল, চোখ তুলে তাকাল মালশ্রীর দিকে। সাজসজ্জার বালাই নেই মেয়েটির, শুধু দীর্ঘায়ত চোখ দু'টিতে কাজলের রেখা। দরজা ঠেলে হুড়মুড় করে কে একজন এসে ঘরে ঢুকল।

"শোভনাদি, দীপকদা কিছুতেই দিচ্ছেন না।"

"বার-বার চাচ্ছিসই বা কেন? দেবে ঠিক। আয়, শান্ত হয়ে বোস্।"

মালশ্রীর দিকে উগ্র কৌতূহলের দৃষ্টিতে তাকাল মেয়েটি। গায়ের কাপড় প্রায় খ'সে পড়েছে, লম্বা বিনুনিটা পিঠের ওপর দুলছে। ঘন ঘন স্পন্দিত হচ্ছে বুক। খাটের একধারে ব'সে পড়ল সে।

"উষাদি আর দীপকদা এলেন না?" সরস্বতী মৃদুস্বরে প্রশ্ন করল।

"ওঁরা আসছেন একটু পরে।"

বলতে বলতেই দরজার বাইরে গম্ভীর গলার আওয়াজ শোনা গেল। "আসছি শোভনাদি।"

"এস ভাই।"

দীপক ঘরে ঢুকল। মাদুরের ওপর ব'সে একখণ্ড গীত-বিতান রাখল সামনে, শোভনাদিকে উদ্দেশ করে বলল, "দেখুন ত কি অন্যায়। আমি কত কষ্টে অর্ডার দিয়ে আনিয়েছি। আর রমা বলছে আমাকে দিন। আরে, একি আমার সম্পত্তি নাকি? সবারই ত, তা না আমার নিজস্ব চাই—আশ্চর্য্য, এখানে থেকেও মনোভাব বদলাল না। তোমার আর কোন আশা নেই রমা।" তার মুখের হতাশাসূচক ভঙ্গিতে সকলেই হেসে উঠল। মালশ্রীর একটু অপ্রস্তুত লাগছিল, এই অন্তরঙ্গ মণ্ডলীতে সেই যেন একটু খাপছাড়া, বেমানান।

সরস্বতী ওর দিকে চায়ের পেয়ালাটা এগিয়ে দিল, সঙ্গে বাটিতে মুড়ি। চা-টা বিস্বাদ ঠেকল, মুড়িটা ততোধিক। তবু চক্ষুলজ্জার খাতিরে খেতেই হ'ল সবটা। শোভনাদি চায়ের গেলাসে চুমুক দিয়ে বললেন, "জানো দীপক, মালশ্রী খুব ভাল গান গায়। ওকে মেয়েদের গান শেখানোর ভার দাও।"

"হ্যাঁ, সে খুব ভাল হবে", দীপকের সোৎসাহ কণ্ঠস্বর। মালশ্রীর ক্ষীণ প্রতিবাদে কেউ কান দিল না। চা খেতে খেতে একসময় পেছনের দেয়ালের দিকে চোখ পড়ল মালশ্রীর, আলোছায়ার বিচিত্র ছায়াছবি।

ধীর পায়ে ঘরে ঢুকলেন একজন, ঈষৎ স্থূলাঙ্গিনী, হাতে শাঁখা আর মোটা সোনার বালা। সিঁথিতে

গাঢ় সিঁদুরের রেখা। চওড়া সবুজ পাড় শাড়ী পরণে, "কি শোভনাদি? চা বুঝি ফুরিয়ে গেল?"

"না না, উষাদি, বসুন—সরস্বতী আবার জল চাপিয়েছে। এক্ষুণি করে দিচ্ছে।"

মালশ্রীর দিকে বেশ ভাল করে তাকালেন উষাদি। খাটের ওপর আরাম করে বসলেন, বললেন, "ও, ইনিই বুঝি আজ এলেন?"

শোভনাদি জবাব দিলেন, "হ্যাঁ, ওরই নাম মালশ্রী।"

"তা কলকাতা ছেড়ে এই অজ পাড়াগাঁয়ে?" সোজাসুজিই মালশ্রীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা ক'রে বসলেন উষাদি।

এ কথার কি জবাব দেবে ভেবে পেল না মালশ্রী। যে কথা নিজের কাছেও গোপন করতে চাইছে এতক্ষণ ধ'রে তার প্রতিধ্বনি শুনতে চাইল না অন্যের কণ্ঠে। বিব্রতভাবে হাসল একটু। শোভনাদির দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি তা হ'লে উঠি, সব জিনিষপত্র ছড়িয়ে আছে।"

"নিশ্চয়ই। তুমি যাও, পরে সব কথাবার্ত্তা হবে।"

অজস্র কৌতুহলী দৃষ্টির সামনে থেকে সরে এসে হাঁফ ছাড়ল মালশ্রী। ঘরের দরজা খুলতেই একটা মিষ্টি গন্ধ এল নাকে। তক্তপোশের ওপর টানটান করে বিছানা পাতা, কে যেন একরাশ বেলফুল রেখে গেছে বালিশের পাশে। হয়ত সেই মেয়েটি, যার নাম লক্ষ্মী। শুয়ে পড়ল মালশ্রী। জানলা দিয়ে তারায়-ভরা আকাশটা চোখে পড়ে—বালিশে মুখ গুঁজে দিল, সমস্ত চেতনায় ছড়িয়ে গেল স্নিগ্ধ-মধুর সৌরভ। একে একে বাড়ীর কথা মনে পড়ল তার। বাবার নিশ্চয়ই এতক্ষণে খাওয়া হয়ে গেছে, তিনি তাঁর ছোট্ট ঘরখানাতে ব'সে একমনে লেখাপড়া করছেন। দাদারা সকলে হয়ত ফেরেই নি এখনও। মা নিশ্চয়ই রান্নাঘরে, ঠাকুরকে দিয়ে বিশেষ কিছু রাঁধাচ্ছেন অর্থাৎ নিজেই রাঁধছেন আর ঠাকুর চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। মধুশ্রী সেতারে আলাপ করছে, তার সুর এখানকার এই নির্জ্জন অরণ্য পার হয়ে মালশ্রীর কানে আসছে কি? না, নতুন যাত্রাপথের সুরুতে গত জীবনের স্মৃতি সুর হয়ে বাজছে।

ঘণ্টা পড়ল ঢং ঢং ঢং—

দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল লক্ষ্মী। বলল, "দিদি, খাবেন চলুন। ঘণ্টা পড়েছে।"

খাবার ব্যবস্থা রান্নাঘরের বারান্দায়, এরই মধ্যে দু'চারটে কুকুর এসে ভিড় করেছে উঠোনে—যে যার থালা-গেলাস নিয়ে বসে গেছে। বালতিতে ভাত আর গামলায় ডাল-তরকারি নিয়ে দু'টি ছেলে দাঁড়িয়ে। খদ্দরের শার্ট আর প্যাণ্ট পরেছে। তের-চোদ্দ বছর বয়স হবে, রোগাটে চেহারা। ওরাই পরিবেশন করছে। মালশ্রীকে ডেকে নিলেন শোভনাদি। থালা-গেলাস কিছুই আনে নি ও। একটি মেয়েকে ডেকে বললেন, "বেলা, আমার ঘর থেকে একটা কাঁচের প্লেট আর গেলাস নিয়ে আয় ত।"

রমা, সরস্বতীও বসেছে ওদের সঙ্গে। খাবার উপকরণ সামান্য, ভাত, ডাল আর আলু-কুমড়োর একটা তরকারি। সবাই তাই পরম পরিতৃপ্তিতে খাচ্ছে, মালশ্রী এ ধরণের খাবারে ঠিক অভ্যস্ত নয়। এত কম তেলের রান্না কোনদিন খায় নি সে। কোন মতে খেল খানিকটা। খাবার পর যে যার বাসন নিয়ে চলল। মেয়েরা অবশ্য নিতে দিল না, কাড়াকাড়ি করে নিয়ে নিল শোভনাদি আর মালশ্রীর হাত থেকে।

শোভনাদি কপট রাগের সুরে বললেন, "তোরা বাপু নাছোড়বান্দা। এত গালাগাল খাস, তবু…"

মেয়েরা হাসল। মালশ্রী দেখল, শোভনাদি মুখে যতই বকুনি দিন, গলার স্বরে তাঁর এতটুকু রূঢ়তা নেই, চোখ দু'টিও হাসছে।

তাঁর দিকে এগিয়ে গেল মালশ্রী। "আপনার কাছে কি এখন যাব? কালকে কি করতে হবে বলে দেবেন।"

"সে কালই জেনে নিও। আজ ঘুমিয়ে পড়। খুব ক্লান্ত লাগছে নিশ্চয়ই।"

মালশ্রী একটু হাসল—শোভনাদি নিজের ঘরের দিকে চ'লে গেলেন। মালশ্রীও তার ঘরের দিকে এগোল, ঘাসের ওপর সাবধানে পা ফেলল, টর্চ্চ দিয়ে দেখে নিল আশপাশ—দু' একটা ঘর পার হয়ে নিজের ঘরের কাছে পৌঁছল সে। যেতে যেতে একটা ঘরের বন্ধ দরজার ভেতর থেকে সেতারের সুর কানে এল।

"কে বাজাচ্ছে এখানে?" মনে মনেই প্রশ্ন করল সে।

ঘরে এসে লণ্ঠনটা টেবিলের ওপর রাখল, হাতঘড়িতে দেখল, মাত্র সাড়ে আটটা বেজেছে। কলকাতায় ত এখন সবে সন্ধ্যে। আর এখানে মনে হচ্ছে রাত দুটো বেজে গেছে। অন্ধকারের অতলান্ত সাগর যেন তার চারদিকে। আজ বোধহয় অমাবস্যা। কয়েকটি তারা ওই অন্তহীন সমুদ্রে আলোর বিন্দুর মত মিটু মিটু করছে। শালফুলের গন্ধ, ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক—সব মিলিয়ে কেবলই উন্মনা হচ্ছিল মন। অ্যাটাচি কেস থেকে চিঠির কাগজের প্যাড আর কলমটা বার করল, চিঠি লিখতে বসল। বাড়ীর কথা ভিড় করে এল মনে, শত তুচ্ছ ঘটনার ছায়া বিচিত্র চলচ্ছবির আকারে দেখা দিল।

আসার আগে মা ভাল করে কথা বলেন নি, দাদাদের মুখও গম্ভীর ছিল, শুধু বাবা এসেছিলেন স্টেশন পর্যন্ত। ট্রেণ ছেড়ে দেবার পরও জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে পাচ্ছিল মালশ্রী শুকতারার মত স্নিগ্ধোজ্জ্বল তাঁর চোখ দু'টি। স্নেহের হাসিতে উদ্ভাসিত। মা, বাবা দুজনকেই লিখল "আমার জন্য ভেবো না তোমরা। বেশ ভাল লাগছে এখানে।"

মনে পড়ল আগের দিন রাত্রে মা'র তৈরী চিংড়ি মাছের কাটলেট আর ফ্রুট স্যালাডটা সম্পূর্ণ খেতে পারে নি দেখে একটু বিরস হয়েছিলেন মা, বিশেষ কিছু বলেন নি। তাঁর মুখ দেখেই বুঝেছিল মালশ্রী, মনে মনে তিনি একটুও খুশী হন নি। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে এতটুকু অনিয়ম করলে তাঁর সহ্য হয় না। সবাইকে খাইয়েই তাঁর পরম তৃপ্ত। এতে কেউ বাধা দিলে তিনি অপ্রসন্ন হন, রুষ্টতাও প্রকাশ পায়। এই ত কালকেই—বড় দাদার মেয়ে ঝুমা চেটেপুটে খাচ্ছিল, বউদি এক ধমক লাগালেন, "ওরকম লোভীর মত খেও না ঝুমা, শেষকালে অসুখ করবে।"

মা তখন ঘরে ছিলেন না, ছোড়দা ওদিক থেকে চেঁচিয়ে উঠল, "দোহাই বউ'দ, খাওয়া নিয়ে আর পেছনে লেগ না। এখন থেকেই স্লিমিং-এর ট্রেনিং দিচ্ছ নাকি?"

সেই মুহূর্তে ঘরে ঢুকেছিলেন মা, কথা ক'টি তাঁরও কানে গিয়েছিল। মুখের রেখা কঠিনতর হয়েছিল তাঁর।

জানলার কাছে এসে দাঁড়াল মালশ্রী। অন্ধকার যেন তাকে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধরছে, এই পৃথিবীতে কি আলো আসে? সুদূরতম তারার আলো? জানলায় বেশীক্ষণ দাঁড়াল না। এই স্তব্ধতা ঠিক ভাল লাগছিল না। কলকোলাহলের লেশমাত্র নেই কোথাও। সবাই এরই মধ্যে শুয়ে পড়েছে। বড় একা লাগল, বুকের কাছটা কেমন শিরশির করে উঠল। শুয়ে পড়ল বিছানায়, শুতে-না-শুতেই ঘুম নেমে এল চোখে।···

আজকে ভারী ক্লান্ত লাগছে দীপকের, সারা সকাল ধরে ঘুরেছে—স্টেশনে গেছে বিকেলে, তার আগে ও একবার গিয়েছিল শহরে। রাত্রে ভাল করে খেতেও ইচ্ছে করল না। লণ্ঠনটা কমিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল দীপক। শুতে গেলেই আজকাল মায়ের মুখটা চোখে ভাসে। মনে হয়, তাঁর কোমল মমতাময় হাতের স্পর্শটা পাচ্ছে কপালের ওপর, সেরকম একটা আকাঙ্ক্ষাও জাগে··· মনে হয়··· নিজের মনটাকে রাশ টেনে ধরল, মনে পড়ল তের-চোদ্দ বছর আগে শ্যামবাজারের ছোট্ট গলির মধ্যে সেই বাড়ীটা। দেয়ালে টাঙানো ক্যালেণ্ডারে দার্জ্জিলিংএর পার্ব্বত্য প্রকৃতি আর কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্যটা একটা স্বপ্নের জগৎ বলে মনে হ'ত। যেখানে কোনদিন পৌঁছনো যাবে না। কাকা ছিলেন সাংবাদিক, মনে-প্রাণে বিপ্লবী ছিলেন তিনি। একটা পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন. চা বাগানে সাহেবদের অত্যাচার ও অবিচার সম্বন্ধে লিখতেন তাতে, এজন্য ইংরেজদের অপ্রীতিভাজন হয়েছিলেন। কিন্তু বিদ্রোহ ছিল তাঁর রক্তে। সেই বিদ্রোহের বীজ, বিপ্লবের ধারা দীপকের মনে প্রচণ্ড তাণ্ডব তুলেছিল। কাকা ছিলেন তার কাছে আদর্শ পুরুষ—ভাঙা তক্তপোশে বসে ছারপোকার কামড় খেতে খেতে ইংরেজদের অশেষ উপকারের কথা কণ্ঠস্থ করতে করতে চোখের সামনে ক্ষণেকের জন্য দীপ্ত হয়ে উঠত একটি অগ্নিময় মূর্ত্তি। আজীবন সংগ্রামেও যার আলো এতটুকু নেভে নি। সেই দীপ্ত চোখের ইঙ্গিতে পথ দেখত দীপক। বেয়াল্লিশের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল, বুনো ঘোড়ার মত বন্য আবেগ তখন রক্তে। সংসারের দায়িত্ব, পিতার দারিদ্র্য, কোনটাই ধরে রাখতে পারে নি তাকে। সব ফেলে চলে গিয়েছিল। জেলে বসে পড়াশুনা করল অনেক, কিন্তু ডিগ্রী এ টলো না। জেলে

যাবার আগে ম্যাট্রিকটা পাস করেছিল। জেল থেকে বেরিয়ে আবার সেই দরিদ্র পিতার আশ্রয়ে ফিরে গিয়েছিল। সেখানেও সেই বন্ধ্যা পৃথিবীর আর্ত্তনাদ, কোথাও কোন আলোর রেখা নেই, নেই সম্ভাবনার চিহ্ন। এমন একটা স্তরে নেমে গেল জীবনটা, যার কোন গোত্র নেই, পঙ্গু অসহায়। মা মারা গেলেন প্রায় বিনা চিকিৎসায়। রইলেন বাবা, রইল ছোট ভাই আর সে। জেলে বসে দীনেশদার কাছে সেতার শিখেছিল, তার সুরে সব ভুলত দীপক। মনে হ'ত আকাশের তারার ছায়া পড়েছে ওর জীবনের জোয়ার জলে। সেখানে এই পঙ্গু, বন্ধ্যা পৃথিবীর মালিন্য নেই, শ্বেতপদ্মের শুভ্রতায় আচ্ছন্ন চারিদিক। স্বপ্ন প্রতি মুহূর্ত্তে ভাঙত, সুধাপাত্র তীব্র বিষে ভরে উঠত। তবু সেই সুর-লক্ষ্মীর আরাধনায় শান্তি পেত দীপক। যতক্ষণ তার অবস্থান ততক্ষণ সব বেদনার নির্ব্বাণ। পনের বছরের ছোট্ট বোনটার টাইফয়েড হয়েছিল, দারিদ্র্য তাকেও গ্রাস করল। ফুটফুটে মেয়েটার গভীর কালো চোখে অনেক স্বপ্ন-মুকুল দল মেলছিল, কিন্তু নিমতলার চিতায় সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এমনি করে বেদনার অন্ধকার, অভাবের অন্ধকার কতবার ঘিরেছে তাকে। তবু বুকের ভেতরটাকে কালো করে দিতে পারে নি একেবারে। কি করে যেন একটুকরো ঝলমলে আকাশের ছায়া মনের মধ্যে ধরে রেখেছে সারা জীবন ধরে—একটি একটি করে টিফিনের পয়সা জমিয়ে বই কিনেছে, তারপর এখানে আসার পর সঞ্চয়ের অঙ্কটা সামান্য বেড়েছে। দীনেশদার দেওয়া পুরাণো সেতারটা বিক্রী করে একটা ভাল নতুন সেতার কিনেছে, সফল হয়েছে বহুদিনের অপূর্ণ সাধ।

জেল থেকে বেরোবার কয়েক বছরের মধ্যেই শোভনাদি ডেকে পাঠিয়েছিলেন তাকে, ডিগ্রীর নয়, বিদ্যার দাম পেল সে। শোভনাদি সহস্র দুঃখে, অজস্র ত্যাগে কিছু একটা গড়ে তুলছিলেন, দীপকও এল সেখানে। প্রথমেই টাকা যে পেল তাও নয়। পেটভরে অন্নও জুটল না। তবু একটা-কিছু করার আনন্দে দিগ্‌বিজয়ের সুখ অনুভব করল সে। তারপর আস্তে আস্তে কোন রকমে দাঁড়াল প্রতিষ্ঠানটা। সামান্য টাকার ব্যবস্থাও হ'ল। দীপকের জীবনে রোশনাই না জ্বলুক প্রদীপের আলো জ্বলল, বেশ আছে সে। ভাই ম্যাট্রিক পাস করে একটা কাজে ঢুকেছে। এখন বেশ উন্নতি করেছে। দমদমে একটা ঘরও তুলেছে, সম্প্রতি বিয়েও করেছে সে। শান্তিতেই আছে সকলে। ভাইয়ের বউটি বাবাকে যত্ন করে, শেষ বয়সে একটু তৃপ্তির মুখ দেখছেন তিনি। জীবন-জোড়া সংগ্রামের পুরস্কার বোধহয়। দীপক মাঝে মাঝে যায়, দেখে আসে, একটুকরো স্বপ্ন কেমন করে সফল হয়েছে একজনের জীবনে। ধূসর মরুভূমির একপাশে সোনালী ধানের দু'একটি শীষ মাথা তুলছে। রণক্লান্ত ঘোড়ার মত মাঝে মাঝে শ্রান্তিতে অবসন্ন হয়ে আসে দেহ-মন। ঝেড়ে ফেলতে চায়, কিন্তু তবু···যে স্বপ্ন কোন দিন সাহস করে দেখে নি, অগ্নিতাপ দিয়ে ঢাকা দিতে চেয়েছিল স্বপ্নের আলোকে, যৌবনের প্রখরতা ক্ষয় করে দিতে চেয়েছিল অসীম উদ্দামতায়, ক্লান্তিহীন ব্যস্ততায়—সেই ক্ষয়িত ক্লান্ত জীবনে এখন আবার এক গোপন আকাঙ্ক্ষার অঙ্কুর দেখা দিচ্ছে। পাথরেও কি চিড় ধরে? নিজেকে একটা পাথরের মত কঠিন করেই সৃষ্টি করতে চেয়েছিল একদিন। দারিদ্র্য লোভ আর বঞ্চনার আঘাত যেন সে-পাথরে প্রতিহত হয়ে যায় এই ইচ্ছাই ছিল। তবু রোমাঞ্চ জেগেছে মাঝে মাঝে। দক্ষিণ বাতাসের স্পর্শে বিহ্বল হয়েছে মন, মেয়েদের সম্বন্ধে একেবারে নিরুৎসুক ছিল, একথাও বলা চলে না। কিন্তু তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ আসে নি বিশেষ। কাছাকাছি যাদের দেখেছে, মনকে তেমন করে নাড়া দিতে পারে নি কেউ।

শোভনাদি মাঝে মাঝে বলেন, "বিয়ে করে সংসারী হও দীপক। আর কতদিন অপেক্ষা করবে? এই ত আমার ছাত্রীদের মধ্যেই বেশ ভাল মেয়ে আছে। রাণী, ছন্দা, এরা ত খুব লক্ষ্মী মেয়ে।"

রাণী, ছন্দা, এখানকার প্রাক্তন ছাত্রী। বছর দু'য়েক হ'ল গ্রামসেবিকার কাজ করছে দু'জনেই।

শোভনাদির কথার কোন জবাব দেয় নি দীপক। কথাটার স্পষ্ট জবাব শোভনাদিকে দেওয়া সম্ভব নয় তার পক্ষে। রাণী, ছন্দা, লক্ষ্মী মেয়ে, কাজের মেয়ে, এ ত দীপকও জানে। কিন্তু ওর কল্পনার জগতে যে মূর্ত্তির

ছায়া মাঝে মাঝে দেখা দেয়, তার সঙ্গে কি এদের কোন মিল আছে? সেই কল্প-মূর্ত্তির সন্ধান কি দীপক পাবে কোন দিন? মাঝে মাঝে মনে হয়, তার স্বপ্ন-বিলাসী মন একটা অবাস্তব কল্পনায় মিছিমিছি সময় নষ্ট করছে। যা কখনও হবার নয়, তারই সন্ধানে ঘুরছে সে। বেশ সুগৃহিণী সুশ্রী কোন ঘরণীর সঙ্গে ঘর বাঁধা, দু'চারটি স্বাস্থ্যবান্ সন্তানের পিতৃত্ব লাভ—এ হ'লেই ত যথেষ্ট হ'ত তার পক্ষে।

ভোর পাঁচটায় ঘণ্টার আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল মালশ্রীর। এখনও ভোরের দিকে চাদরটা টেনে নিতে ইচ্ছে করে গায়ে। ঠিক সেই সময় বিছানা ছেড়ে উঠতে চাইল না মন। মনের মধ্যে জাগতে লাগল অতীতের ছোট ছোট ছবি। ঘুম থেকে কোনদিন সাতটার আগে উঠতে পারত না। সেজদা এসে এক টান লাগাত বেণীতে। মা গায়ে ঠেলা দিতেন। তবু ঘুম ভাঙতে চাইত না মালশ্রীর। উঠতে উঠতে সাতটা বাজত। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলটা ঠিক করে নিত। গালে পাউডারের পাফটা বুলিয়ে শাড়ীটা বদলে নিত মালশ্রী। চায়ের টেবিলে একটু সেজেগুজে না গেলে বড়দার ভ্রূকুনি অবধারিত। ততক্ষণে চাকর দশরথ আর ঝি শীলা চায়ের টেবিল পরিপাটি করে সাজিয়ে ফেলেছে। টোষ্টে মাখম মাখানো শেষ, হাফ-বয়েল ডিমের ওপর নুন-গোলমরিচের গুঁড়ো ছড়াচ্ছে ছোড়দা। বাবাকে কিন্তু তখনও দেখা যায় না এ আসরে, তিনি যথারীতি ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে পার্কে বেড়াতে বেরোন। সেখান থেকে ফিরে দই চিঁড়ে খান, তার পর লেখাপড়ায় মন দেন।

এখানে ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই জানলা দিয়ে বাইরের আকাশটা চোখে পড়ল। কোন মায়াবিনীর যাদুকাঠির ছোঁয়ায় অন্ধকারের সমুদ্রটা সরে গেছে। অরুণ-আলোর বন্যায় জ্যোতির্ম্ময় পূর্ব্ব দিগন্ত। একটা মাতাল-করা অপরিচিত গন্ধ ছড়িয়ে গেল চারদিকে। উঠে বসল বিছানার ওপর, চোখ বুজে রইল খানিকক্ষণ। বাবার কথা মনে পড়ল।

বাইরে থেকে কে ডাকল, "উঠেছেন নাকি প্রার্থনায় যাবেন না?"

বেরিয়ে দেখে সরস্বতী। তার হাতে একটা কাঁচা নিমের ডাল, দাঁতন করতে করতে এসেছে। 'বিনাকা'র টিউব আর ব্রাশটা বার করা হ'ল না, সরস্বতীর কাছ থেকে একটা নিমের ডালই চেয়ে নিল সে। ওরা গিয়ে যখন বসল, প্রার্থনার মন্ত্রোচ্চারণ সুরু হয়ে গেছে 'অসতো মা সদ্‌গময়'। মন্ত্র পাঠের পর গান। সকলে মিলেই গাইল "আজিকার এই সকালবেলাতে।" কি যেন ছিল এই ভোরের স্নিগ্ধ হাওয়ায়, কচি গলার সুরে। মনটা ভরে উঠল মালশ্রীর। অচেনা জীবনের স্বাদ। সমারোহ নেই, তবু স্নিগ্ধতায় মধুর। আশ্রয় চেয়েছিল সে, কোমল মমতার আবেষ্টন। আজ ভোরের সুরে কি তারই প্রতিধ্বনি শুনল। প্রার্থনার পর দিনের কাজের সুরু। ঘর থেকে বেরিয়ে সামনের ভিজে ঘাসের ওপর পা দিল মালশ্রী। এই বসন্তের সুরুতেও শিশির ঝরছে।

"মালশ্রীদি।" কালকের সেই রমা তাকে ডাকছে, এরই মধ্যে অন্তরঙ্গ সুর ফুটেছে গলায়।

"চলুন, বাগানে যাই। সকলেই আছেন সেখানে।"

ছেলেমেয়েরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেছে। একজন কুয়ো থেকে জল তুলে বালতি ভরছে, অপরা হাতে হাতে চালান করে দিচ্ছে বালতি। এইভাবে গাছে জল দেওয়া চলেছে। শোভনাদিও ওদের সঙ্গে আছেন। একটু দূরে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে, তাঁর মাথাজোড়া টাক, চোখে চশমা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছেলেমেয়েদের কাজ দেখছেন, মুখের ভাব অত্যন্ত অপ্রসন্ন। মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে, উঠছেন, "এই সময়, রমেশ, হাসাহাসি হচ্ছে বুঝি? দুটো বাঁদর একসঙ্গে জুটেছে। স...সরে দাঁড়া ওখান থেকে।" রেগে গেলে একটু তোত্‌লা হয়ে যান ভদ্রলোক। রমা হাসি গোপন ক'রে মালশ্রীর কানে কানে বলল, "উনি হলেন সুখদাবাবু, সবাই ওঁকে দাদামশাই বলে। বড্ড কড়া। ছেলেমেয়েদের ইতিহাস পড়ান আর হিসেব-পত্তর দেখেন।"

দীপক খালি গায়ে কোদাল চালাচ্ছে। বেগুন-ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে একটা জল যাবার নালা তৈরী

করছে সবাই মিলে। রমা পিছন থেকে টিপ্পনী কাটল, "খুব যে কাজে ব্যস্ত দেখছি। আজ কিন্তু সেতার শোনাতে হবে।" দীপক পিছন ফিরে তাকাল, এত সকালেও ঘাম জমেছে কপালে। রমার কথার কি একটা জবাব দিতে গিয়েও থেমে গেল সে। বোধহয় মালশ্রীকে দেখেই একটু সংকোচ বোধ করল।

"আপনিই বুঝি বাজাচ্ছিলেন? কাল শুনতে পেয়েছি আমার ঘর থেকে।"

সলজ্জ হাসি দেখা দিল দীপকের মুখে, "ওকে কি আর বাজানো বলে? ওই একটু টুং টাং করি।"

"দীপকদা, অত বিনয় ভাল নয়। সব তা হ'লে ফাঁস করে দেব।" রমা চেঁচিয়ে উঠল।

"আচ্ছা, তাই দিও। সেদিনের পুঁচকে মেয়ের অত কথা কি?"

দীপকের কণ্ঠে কপট বকুনির সুর। কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল রমা। তার ফর্সা গোলমুখে একটু ছায়া ঘনালো। মালশ্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, "চলুন মালশ্রীদি, আমরাও কোদাল চেয়ে নিইগে।"

কোদাল এনে ওর হাতে দিল রমা। ট্রেনিংএর সময় এসব কাজের অভ্যাস ছিল কিছুটা। তারপর ত একেবারেই গেছে সে অভ্যাস। আজ রীতিমত হাঁফ ধরল। মাটির ওপরই বসে পড়ল ক্লান্ত হয়ে। রোদের তাপ ক্রমশ: বাড়ছে, মালশ্রীর ফর্সা কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমছে, রমা খুরপি দিয়ে কুমড়ো গাছের গোড়া খুঁড়ছে। তার চিবুকেও ঘাম জমেছে, ঈষৎ রক্তাভ মুখ। শোভনাদির দিকে চোখ পড়ল মালশ্রীর, রোদে লাল হয়ে উঠেছে তাঁর মুখ, এককালে বোধহয় গৌরবর্ণাই ছিলেন। এখন রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে রং। কোমরের কাপড়টা জড়িয়ে নিয়েছে আঁট করে। প্রাণপণে মাটি কোপাচ্ছেন, গুনগুন করে গানও গাইছেন। মুখে এতটুকু ক্লান্তির ছাপ নেই। বয়স বোধহয় চল্লিশের ওপরে। উষাদিকে দেখা গেল বেড়ার ধারে। তিনি মোটা মানুষ, একটু পরিশ্রমেই ক্লান্ত হয়ে পড়েন। ঘামে একেবারে নেয়ে উঠেছেন, অপ্রসন্ন মুখ। দু'-তিনটি মেয়েকে উদ্দেশ করে খুব চেঁচামেচি সুরু করেছেন, "এই মীনা, আবার কাজল পরেছিস্? তোদের সাজগোজের বাহার দেখে মরে যাই বাপু! তবু যদি·····।"

শোভনাদি কোদাল থামিয়ে কান পেতে শুনলেন। মুহূর্তের জন্য একটু গম্ভীর হ'ল মুখ, কোদালটা নামিয়ে রাখলেন। হাতে বাঁধা ঘড়িটার দিকে তাকালেন। একটি ছেলেকে ডেকে বললেন "রঞ্জন, জলখাবারের ঘণ্টা দিয়ে দে।"

ঢং ঢং ঢং। ঘণ্টা বাজল।

আজ মালশ্রীর ছুটি। সকাল বেলাটা পূর্ণ বিশ্রাম। বিকেলের দিকে শোভনাদির কাছে কাজ বুঝে নিতে হবে। আজ শুধু ঘুরে ঘুরে সব দেখে বেড়াবে সে। নিজের ঘরে ঢুকতে যাবে, রান্নাঘরের দিকে চোখ পড়ল, সরস্বতী পিঁড়িতে বসে বিরাট্ কড়ায় দুধ জ্বাল দিচ্ছে। গেট দিয়ে ঢোকার সময় গোশালাটা নজরে পড়েছিল। ঘরে আর ঢুকল না, রান্নাঘরের দরজার কাছে এসে দাড়াল। "কি হচ্ছে? দুধ জ্বাল?" চৌকাঠের ওপরই বসে পড়ল মালশ্রী।

সরস্বতী বলল, "হ্যাঁ, সকলের খাবার জোগাড় করছি। এই ত ঘণ্টা পড়ল। ওরাও এখুনি আসছে।"

বলতে বলতে ছেলেমেয়েরা যে যার বাটি নিয়ে দৌড়ে এল। একমুঠো করে ভিজে চিড়ে আর একহাতা দুধ। খাওয়া শেষ করে সবাই ছুটে চলে গেল। এবার ক্লাসে যাবার পালা। শুধু দু'টি মেয়ে রইল—ওদের মধ্যে লক্ষ্মীকে ত কালই দেখেছে, আরেকজন তারই সমবয়সী। নাম শুনল বাণী। ফর্সা, মোটা-সোটা মেয়েটি। এখানে সকলেই সব কাজ নিজেরা করে, চাকর-বাকরের বালাই নেই। দু'-একটা ভারী কাজ স্থানীয় লোধা মেয়েরা করে দেয়। এ ছাড়া সব কাজই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা করে। আজ এদের রান্নার পালা। তার সঙ্গে কুটনো কোটা, বাটনা বাটাও আছে। জলটা সৌরভি তুলে দেয়।

সৌরভি লোধাপাড়ার মোড়লের মেয়ে। মালশ্রীও ওদের সঙ্গে কুটনো কোটায় হাত লাগাল। এসব কাজ বেশ লাগে তার—বাবা ত সব সময় বলেন, "মেয়েরা

হ'ল ঘরের লক্ষ্মী, তারা কাজ না করলে সংসারের শ্রী চলে যায়।"

কিন্তু বাড়ীতে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ালেই মুশকিল। সেখানে মায়ের একচ্ছত্র সাম্রাজ্য। বউদিরাই এখনও প্রবেশাধিকার পায় নি, মালশ্রী আর মধুশ্রী ত কোন্ ছার।

কুটনো কুটতে কুটতে বাইরের দিকে চোখ পড়ল। সরস্বতী একটা বাটি হাতে করে উঠোনে এসে দাড়িয়েছে। একটি কালো রোগামত লোকের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে। সরস্বতীর গম্ভীর মুখ কিসের গোপন দীপ্তিতে উদ্ভাসিত, মনে হ'ল তার কাজল-পরা দীর্ঘায়ত চোখে অনেক ঐশ্বর্য্য লুকানো আছে। মালশ্রী চোখ সরিয়ে নিল। দেখল, বাণী আর লক্ষ্মী মুখ টিপে হাসছে। রান্নাঘরটা বড্ড গরম ঠেকল, জানলা নেই একটাও দেয়ালের ওপর জালের বেষ্টনী, ঝুল-কালিতে আচ্ছন্ন। উঠে পড়ল মালশ্রী। লক্ষ্মী পেছু পেছু এল খাবারের বাটি হাতে, ঘরে ঢুকে স্টোভে চায়ের জল চাপাল, এসব সরঞ্জাম সে সঙ্গেই এনেছে।

চায়ের সঙ্গে খাবার জন্য মা টিন-ভর্ত্তি করে কাজু বাদাম দিয়েছেন, কৌটো-ভর্ত্তি নারকেলের সন্দেশ। খেতে ইচ্ছে করল না কিছু। শুধু চা-ই খেল। চিঁড়ের বাটিটা ঠেলে রাখল খাটের তলায়। মাদ্রাজী সুগন্ধ সুপুরির কুচি ফেলল মুখে, বিছানায় আধশোয়া হয়ে গান্ধীজির "আত্মজীবনী"টা টেনে নিল টেবিলের ওপর থেকে। পড়ায় মন বসল না। বাইরের রৌদ্রতপ্ত প্রকৃতির দিকে চেয়ে রইল। একটা অদ্ভুত অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল মন। এখানে সে কেন এসেছে? অর্থের জন্য? ঠোঁটের কোণে হাসি দেখা দিতে-না-দিতেই মিলিয়ে গেল। ওদের সঙ্গে পড়ত সন্ধ্যা, প্রতিদিন দেরি করে আসত কলেজে। তার পায়ের ছেঁড়া চটিটার দৈন্য সর্ব্বদাই চোখে পড়ত। মোটা কর্কশ মিলের শাড়ীর রিপু-করা অংশটুকু আড়াল করতে পারত না। সকালে দুটো টিউশনি করত সে, বিকেলে একটা। আঠারো বছরের মেয়ের মুখে পঁয়তাল্লিশ বছরের প্রৌঢ়ত্বের ছাপ দেখতে পাওয়া যেত। আর মালশ্রী! এসব মেয়েদের কথা কি ভাল করে ভাবতে পারত তখন? জীবনে একটা নিরবচ্ছিন্ন সুখের তরঙ্গ বয়ে চলেছে, হীরের কুচি ছড়ানো চারদিকে। প্রতিদিন নতুন নতুন রোমাঞ্চ—বিচিত্র বর্ণের শাড়ী আর প্রসাধনের সুরভিতে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছন্ন। যৌবন-স্বপ্ন জগতের দ্বারটা তখন একটু একটু খুলছে, প্রকাশ করছে তার অসীম রহস্য। জীবনে কে কোথায় অতল অন্ধকারে হোঁচট খাচ্ছে, যৌবনের সব দীপ্তি বলি দিচ্ছে নির্ম্মম দারিদ্র্যের কাছে, সে-সব কথা কি কখনও জানতে চেয়েছে? সন্ধ্যা তার সহপাঠিনী ছিল, কিন্তু সঙ্গিনী ত নয়। সে-সময় বেদন-বিলাসের মুহূর্ত্তগুলো পরম রমণীয় হয়ে দেখা দিত, বিছানায় শুয়ে বালিশে মুখ রেখে গুনগুন করে গাইত, "আমার না বলা বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে……।" বাদলা হাওয়ায় জানলার মোটা নীল পর্দ্দাটা যখন একটু একটু করে উড়ত, তারুণ্যের উন্মাদনাময় স্বপ্ন সঞ্চারিত হ'ত রক্তের মধ্যে তখন কি জানত সুখের পাত্র এত ক্ষণস্থায়ী? রঙীন মদের মত উচ্ছ্বসিত যে সুধা, তা শুধুই ফেনা? দারিদ্র্য নয়, তীব্র গঞ্জনা নয়—শুধু হৃদয়ের দুঃসহ দুঃখই মানুষের সমস্ত জীবনটাকে একমুহূর্ত্তে চূর্ণমার করে দিতে পারে।

…শোভনাদিরও আজ দুপুরে পড়ায় মন বসছে না। বিনোবাজীর সর্ব্বোদয় আন্দোলন সম্বন্ধে একটা আলোচনা বেরিয়েছে ভূদান যজ্ঞে, সেটাই পড়ছিলেন। কিন্তু আজ কেবলই অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছেন। যৌবনের দীপ্ত বেদনা মধুর দিনগুলি বার বার ভিড় করে আসছে চোখের সামনে। তাঁকেও সুন্দরী বলত সবাই। মালশ্রীকে দেখে নিজের উৎসব-মুখর জীবনকে মনে পড়ছে। এমনিই ছিলেন তিনি, মাধুর্য্যে দীপ্তিতে এমনি মোহময়ী, পুরুষের ধ্যানভঙ্গকারিণী। তা না হ'লে সোমনাথের মত অমন বিদ্রোহী মানুষের তপস্যার আসন টলত কি করে? কিন্তু তাঁদের পথ ছিল আলাদা। শোভনা ছিলেন মহাত্মা গান্ধীর পরম ভক্ত, সোমনাথ বিপ্লবী দলের সভ্য। শোভনাদের বাড়ীর সকলেই গান্ধীজির ভক্ত। মনে মনে সোমনাথকে পছন্দ করতেন না তাঁরা, সোমনাথ ছিলেন তাঁর দাদার বন্ধু। প্রথম

প্রথম মোটেই ভাল লাগত না ওঁকে—ওর বৈপ্লবিক মতবাদ, উগ্র ভাবভঙ্গি, অস্বাভাবিক কাঠিন্য—একটুও পছন্দ হ'ত না। কিন্তু ওই সুকঠিন ব্যক্তিত্বের অন্তরালে এক সুধা-নির্ঝরের সন্ধান পেলেন তিনি একদিন। নিজেকে হারিয়ে ফেললেন। বহুজনের আরাধ্যা শোভনা সোমনাথের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। প্রেমের মুকুল সবেমাত্র দল মেলেছে, সোমনাথের মত একনিষ্ঠ দেশসেবীর মনেও সপ্তরঙের রামধনু ছায়া ফেলতে সুরু করেছে। বাড়ীর সবার চোখের অন্তরালে এক পরম অন্তরঙ্গ জগৎ গ'ড়ে তুলছিলেন তাঁরা, যে পৃথিবী শুধু তাঁদের দুজনের। কিন্তু সুখ-স্বপ্ন চূর্ণ হয়ে গেল। বোমার মামলায় ধরা পড়লেন সোমনাথ। সাত বছরের জেল হ'ল তাঁর। জেল-কর্তৃপক্ষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে অনশন করলেন। মারা গেলেন শেষ পর্য্যন্ত। জেলের বাইরে বসে শোভনাও শুনলেন সে সংবাদ। কিছুদিনের জন্য সব রং মুছে গেল তাঁর জীবন থেকে। তারপর ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে এসেছে বিপুল বেদনার ভার। স্বপ্ন পরিণত হয়েছে স্মৃতিতে। বাবার কাছ থেকে কিছু টাকা পেয়েছিলেন। পিতার একমাত্র কন্যা ছিলেন তিনি। সেই টাকায় গড়ে তুলেছেন প্রতিষ্ঠানটি, বাঁকুড়ার এই পল্লীগ্রামে। এখানেই নাকি তাঁদের আদি নিবাস ছিল। মনে মনে এ ইচ্ছা তাঁর অনেকদিনের। সোমনাথ বেঁচে থাকতে তাঁর সঙ্গে তর্ক হ'ত। "ওসব প্রতিষ্ঠান গড়ার ঠাণ্ডা বুলিতে মন ভরে না, শোভনা। আমি চাই আগুন—আগে ভাঙ, পু'ড়িয়ে দাও—তার পর ত গড়বে।"

সত্যিই অগ্নির দীপ্তি ছিল তাঁর সর্ব্বাঙ্গে। শুধু কি দেহ? মনও ছিল সেই অগ্নিশ্বরের প্রীতিতে অভিষিক্ত। সোমনাথ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন, বিপ্লবের পথে স্বাধীনতা আসবে। পুরাণো সমাজটাকে ভেঙ্গে চুরমার না করলে চলবে না। শোভনা এ কথা মানতে পারতেন না। তাঁর বিশ্বাস ছিল অহিংসায়, মানুষের হৃদয় পরিবর্ত্তনে। কিন্তু এ পথে আসার আগে স্বপ্নেও ভাবেন নি এত কণ্টকাঘাত এখানেও আছে—মানুষের হৃদয়ে অত সহজে দাগ পড়ে না। খুব কমক্ষেত্রেই চিরস্থায়ী পরিবর্তন হয়। শিবের সঙ্গে অশিবের দ্বন্দ্বে কত সময় জয়লাভ করছে অশিব। শুভবুদ্ধির স্থান হচ্ছে ধুলায়। তবু হার মানেন নি তিনি। পিতার অর্থের পরিমাণ সামান্যই ছিল, তাতে তাঁদের সব অভাব মেটে নি। সেই দুঃসহ দুঃখের দিনে গ্রামের লোকেদের কাছে কোন সহায়তাই পান নি। তারা প্রথম প্রথম তাঁকে অপমান করেছে, বাড়ীঘর পুড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছে ডাকাতিও হয়েছে একবার। অন্যান্য সমস্যাও দেখা দিয়েছে এর সঙ্গে। বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়ে পাঠাতে চায় নি কেউ। উঁচুজাতের ছেলেরা জেলে বাগ্‌দী, এমন কি লোধা সাঁওতালদের সঙ্গে পড়বে—এটা ভাবা অসম্ভব ছিল তাদের পক্ষে। তাই প্রথম প্রথম ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও খুবই কম ছিল। তবু তিনি আত্মবিশ্বাসে অটল ছিলেন—দু'টি ছেলে নিয়েও স্কুল চালিয়েছেন। সে সময় তাঁর পাশে ছিলেন সুখদাবাবু। এমন পরাজিতের ছাপ তখনও গাঢ় হয় নি তাঁর মুখে। দীপ্ত-যৌবনশ্রী। সুপুরুষ ছিলেন না—কিন্তু অটুট স্বাস্থ্য ছিল তাঁর। শোভনাদিকে অনেক সহায়তা করেছিলেন তিনি। কিন্তু শুধু আদর্শ নিয়ে তৃপ্ত হ'তে পারলেন না সুখদাবাবু। আরও সহস্র পুরুষের মত তাঁরও কৌমার্য্যের ধ্যান ভাঙল একদিন। শোভনাদির প্রতি আকৃষ্ট হলেন, নিজের করে পেতে চাইলেন তাঁকে। পারলে সব দিতেন শোভনা। সুখদাবাবুর কাছে তাঁর ঋণের বোঝা কিছু কম নয়। কিন্তু তাঁর হৃদয় তখন শূন্য। তাঁর সব সম্পদ্ দস্যুর মত লুটেপুটে নিয়ে গেছেন সোমনাথ। ফিরিয়ে দিতে হয়েছিল সুখদাবাবুকে। এর পর থেকেই বদলে গেলেন সুখদাচরণ। তিক্ত হ'লেন প্রতিপদে। কাজে ঘটল নানান অবহেলা—ছেলেমেয়েদের প্রতি অকারণেই রূঢ় হয়ে উঠলেন। তারপর এই সেদিন বিগত যৌবনে এক নারীকে ঘরে আনলেন। গ্রাম্য-অশিক্ষিতা তরুণী। সে তাঁকে না দিল সুখ, না দিল শান্তি শোভনা মনে মনে ভাবেন, এ হয়ত তাঁরই ওপর শোধ নেওয়া। যদি তাঁর আত্মদহনে শোভনার চৈতন্য হয়। তাঁকে ফিরিয়ে দেবার ভুলটা বুঝতে পারেন। কিন্তু সুখদাবাবুও বোঝেন নি কিছু। শোভনা'কে তিনিও বুঝতে চান নি। তাঁর অন্তরের সুগভীর শূন্যতা সুখদা-

বাবুর অজ্ঞাত। নিজের মর্ম্মবেদনা শেষ পর্য্যন্ত অন্ধ আক্রোশে পরিণত হয়েছে। শোভনার কানে এসেছে, তিনি গ্রামের লোকদেরও উত্তেজিত করেন শোভনার বিরুদ্ধে। মনে মনে হাসেন শোভনা। মনে পড়ে, একদিন এই সুখদাবাবুই তাঁর ঘরে লুকিয়ে বেলফুল রেখে যেতেন। লোকেদের সহস্র অপমানে আর উপহাসে মন যখন নিরাশায় ভরে উঠত, আশ্বাস দিতেন বার বার, অভয় দিতেন।

আজকাল মাঝে মাঝে বড় ক্লান্ত লাগে শোভনার। মনে হয়, তাঁর এত কষ্টে গড়া প্রতিষ্ঠান তাঁকে আর এতটুকু আনন্দ দিচ্ছে না। তিনি যেন বন্দিনী। শত সহস্র কর্ত্তব্যের বন্ধনে শৃঙ্খলিতা, এখান থেকে পালান চলবে না, তাই রয়েছেন এই সযত্নরচিত কারাগারে। তা না হ'লে এতটুকু মুক্তির আকাশও এখানে খোলা নেই তাঁর জন্য। শুধু দীপক আছে, তার একমাত্র সহচর। কিন্তু দীপক বয়সে অনেক ছোট তার চেয়ে। সেও তাঁরই পরামর্শের প্রত্যাশী। তাঁর অনুরোধ-উপরোধ সে সানন্দে পালন করে। কিন্তু পারে কি তাঁর অসীম ক্লান্তি মুছিয়ে দিতে? তাঁকে এই বন্দী জীবন থেকে মুক্ত করতে? যে পারত, সে নেই। সে থাকলে তাঁর সব বেদনা ঝরে পড়ত। আলোর বন্যায় ভেসে যেত সমস্ত জীবন। তাঁর অস্তিত্ব মুছে গেছে। তাই শুধু কাজ আর কাজ—কাজ দিয়েই ঠাসা সব। জীবন একটা হিসেবের খাতা হয়ে উঠেছে।

মালশ্রীকে দেখে চকিতের জন্য দোলা লাগল তাঁর মনে। মনে হ'ল ও কেন এসেছে? ও-ও কি হারিয়েছে কিছু? ওর জীবনেও কি কোন অধ্যায় রচিত হয়েছে? কি সে ইতিহাস?

ঢং ঢং ঢং······ক্লাস শেষ হয়ে গেল। এখুনি খাবার ঘণ্টা পড়বে। মালশ্রীর অনেকক্ষণ স্নান সারা হয়ে গেছে। আজকাল ও ভোরবেলা স্নান করে নেয়। সবুজ রঙের একখানা তাঁতের শাড়ী পরেছে, কপালে ছোট্ট কুমকুমের টিপ। সদ্যস্নাত, সুরভিত সর্ব্বাঙ্গ। সুখদাবাবু কুয়োপাড়ে দাঁড়িয়ে স্নান করছিলেন, মালশ্রী দরজা থেকে সরে এল। একটি সুন্দর সুকুমার মুখ দরজার পাশে উঁকি দিল।

"কে ওখানে?"—মালশ্রী প্রশ্ন করল।

"আমি অসিত, এই বাংলা কবিতাটা একটু বুঝিয়ে দেবেন?"

"ভেতরে এস।"

সঙ্কুচিত পায়ে ছেলেটি ঘরে ঢুকল। খাটের একপাশে বসল। মালশ্রী বই খুলে কবিতাটি দেখল, রবীন্দ্রনাথের 'নগর লক্ষ্মী'। ছেলেটির দিকে ভাল করে তাকাল। বয়স প্রায় আঠার-উনিশ হবে—ঠোঁটের ওপর সরু গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে। হাতে ক্লাস এইটের বই।

"কোন্ ক্লাসে পড়?"

"ক্লাস এইটে।" লজ্জায় আরক্ত হ'ল ছেলেটি।

"আচ্ছা, বিকেলে এস, বুঝিয়ে দেব। এক্ষুণি ত খাবার ঘণ্টা পড়বে।"

চ'লে গেল ছেলেটি। মায়া হ'ল ওর জন্য। বেচারী! ঠিক সময় লেখাপড়া শিখতে পারে নি, হয়ত অর্থাভাব কিংবা মা-বাবার ইচ্ছাকৃত অবহেলা। তাই এতখানি বয়সেও স্কুলের গণ্ডিটুকু পেরোতে পারে নি।

রমা ছুটতে ছুটতে এসে ঘরে ঢুকল, "চলুন, বড় হলঘরে, প্রার্থনা হবে।"

"এখন হঠাৎ?"

"আজ শোভনাদির জন্মদিন যে, খাবার আগে একটু প্রার্থনা হবে তাই।"

হলঘরে সকালে ক্লাস বসে। আসন নিয়ে ছেলে-মেয়েরা আসে, শিক্ষকও আসনে বসেন। এখন আর ঘরে আসন নেই। ব্ল্যাকবোর্ডটিও সরিয়ে রেখেছে ওরা, ঘরের মাঝখানে সুন্দর আলপনা। বাতাসে ধূপের সুরভি। মাটির ছোট কলসীতে একগোছা শ্বেতপদ্ম। পদ্ম এখানে দুর্লভ, পুকুর নেই কাছাকাছি। হয়ত গ্রামের ভেতর থেকে সংগ্রহ করে এনেছে কেউ। শোভনাদির গলায় কাঠচাঁপার মালা পরিয়ে দিল একটি মেয়ে, কপালে চন্দনের ফোঁটা আঁকল। ছেলেমেয়েরা সকলে তাঁকে ঘিরে বসেছে। অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরাও আছেন। দু'তিন-

না বড় বড় সতরঞ্চি বিছান হয়েছে—রমা আর মালশ্রী রই একপ্রান্তে বসল। দু'টি মেয়ে গান গাইল. "হে নূতন" আজ এদিনের গানে প্রথম সংস্কৃত-শিক্ষক ন্দ্রনাথ মন্ত্র পাঠ করল। সকলে প্রণাম করল শোভনাদিকে। দীপক এর মধ্যে সকলের অলক্ষ্যে কখন উঠে গিয়েছিল। খানিক বাদে একঝুড়ি ডিম নিয়ে ঢুকল। শোভনাদির পাশে রাখল। "আজ রাত্রে ডিমের ডালনা হবে। আপনার জন্ম দিন সেলিব্রেট করব। সারা সকাল গ্রামে গ্রামে ঘুরে জোগাড় করেছি। রাবণের সংসার ত! অল্পতে কুলোয় না।"

সকলেই হেসে উঠল দীপকের কথায়। মালশ্রী একটু অবাক্ হ'ল মনে মনে। জন্মদিনে ডিমের ডালনা। এর মধ্যে এমন কি বিশেষত্ব আছে ভেবে পেল না। সে জানত না এই অজস্র অভাবগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানের অলিখিত অধ্যায়। একদিন শুধু দু'টি ভাত জোটাতে প্রাণান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে। সোনালী ধানের হিল্লোলিত শোভার পেছনে কত সহস্র বিন্দু স্বেদ-কণার অবদান সে ত জানে না মালশ্রী। এই নিষ্ফলা মাটিতে তরকারি ফলাতে পরিশ্রম করতে হয় প্রচুর, এতদিনে কিছু কিছু সফল হয়েছেন এরা। কুমড়ো, চালকুমড়ো, লাউ, বেগুন প্রচুর ফল—আলু ছাড়া অন্য তরকারী কিনবার দরকার হয় না কিন্তু ডিম, মাছ, মাংসটা দুর্লভ এখনও। সপ্তাহে একদিন মাছ বরাদ্দ, মাসে একবার মাংস। ডিমটা হয়ই না। একসঙ্গে বেশি ডিম জোগাড় করা শক্ত। আজকে ডিমের ডালনা হবার খবরটা শুনে সকলের চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তাই। সহজলভ্যের আকাঙ্ক্ষায় মানুষ অধীর হয় না। প্রাচুর্য্যের মধ্যে থেকে তুচ্ছ খাদ্যবস্তুর মূল্য নিরূপণ সহজ নয়। কিন্তু এই তুচ্ছ জিনিষটা দুর্লভ হ'লে কতখানি কাম্য হয়ে ওঠে, সে অভিজ্ঞতা মালশ্রীর নেই। ছেলেমেয়েদের ডিম নিয়ে হৈ হৈ-টা একটু অতিরিক্তই মনে হ'ল তার।

খাওয়া-দাওয়ার পর খানিকক্ষণ বিশ্রাম। ঘরে বড্ড গরম। জানলাগুলো বন্ধ করে দিল মালশ্রী। দরজাটা খোলা রাখল শুধু। চৈত্রের তপ্ত বাতাসে পর্দাটা উড়ছে। মনে পড়ে, গ্রীষ্মের দুপুরে ন'টার মধ্যে সব দরজা-জানলা বন্ধ করে দিতেন মা। পূর্ণবেগে পাখাটা ঘুরত মাথার ওপর, মালশ্রী আর মধুশ্রী বন্ধ জানলায় কান পেতে থাকত ম্যাগনোলিয়ার হাঁক শোনার জন্য। কানাইকে ডেকে আইসক্রীম আনতে বলত। খাটের ওপর ব'সে পা দুলিয়ে দুলিয়ে খেত। আবার সেই অতীত স্মৃতিচারণ। নিজেকে জোর করেই সংযত করল মালশ্রী। বালিশের তলা থেকে দেশটা টেনে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখতে লাগল।

দীপক ডায়েরী লিখছে, এ তার প্রতিদিনের অভ্যাস। "চৈত্রের তপ্ত রোদ সমস্ত প্রকৃতিকে আচ্ছন্ন করেছে। এক তীব্রতর মদিরার পানপাত্র যেন। পূর্ণ হচ্ছে রৌদ্র-রসে, মহুয়া, শালমঞ্জরীর মাদকতায়। পাষাণের কাঠিন্য, এই উত্তপ্ত অবারিত প্রান্তরে। এর সম্ভাবনার উপচার মেলে প্রাণপাত করা পরিশ্রমের বিনিময়ে। বন্ধ্যা মাটি। বহু তপস্যায় ধরিত্রীর অঙ্গ বিদীর্ণ করে সৃষ্টির অঙ্কুর দেখা দেয়।" এই মাটিকে নিজের সঙ্গে একাত্ম করে ভাবে দীপক। কোথায় তার সম্ভাবনা? এই কি সেই দীপক না তার শবদেহ? ওর আত্মা কি মৃত? একদিন একটা সোনালী আকাশের টুকরোকে বুকের মধ্যে পুরে রেখেছিল। কিন্তু সেই সোনার স্বপ্ন তাকে কি দিল? শুধু স্মৃতি-বিলাস ছাড়া? যে বন্ধ্যা পৃথিবীর সান্নিধ্যে জীবনের সব আকাঙ্ক্ষা অসার হয়ে গেছে, সেই বন্ধ্যাত্ব তাকেও গ্রাস করল কি? কোন পরিণতিই নেই যেন তার। শুধু কর্ম্মব্যস্ততা দিয়ে নিজেকে ঢেকে রাখা। যে আগুনে দীপ্ত হয়ে উঠেছিল একদিন, নটরাজের মরণ-তাণ্ডব শুনেছিল কান পেতে, সে-আগুনের কণামাত্র আছে কি তার রক্তে? মত ও পথ ত বদলেইছে—এখন আর সে-সব নিয়ে ভাবেও না বিশেষ। অবসন্ন দেহ-মন। প্রগল্‌ভতা আর কৌতুক দিয়ে সেই ক্লান্তিকেই বারবার আড়াল করতে চায়। নিজেকে একটা সার্কাসের ক্লাউনের মত মনে হয় মাঝে মাঝে। অন্তরের শূন্যতাকে বারে বারে হাসি দিয়ে ঢাকতে হচ্ছে। সব উদ্যম ভোজবাজির মত মিলিয়ে গেছে, খোলস-সর্ব্বস্ব অস্তিত্বটুকু আছে শুধু। এদিকে যৌবন ত প্রায় বিদায় নিতে চলল। ছত্রিশ

বছর পূর্ণ হ'ল এই ফাল্গুনে। যে সম্ভাবনা তার মধ্যে ছিল সবই ত ভস্মসার। মাঝে মাঝে একটা দুর্বলতা জাগে, মনে হয়, কেউ যদি পাশে থাকত হয়ত সব ব্যর্থতার শান্ত মিলত। ক্লান্তি মুছে যেত কোন কল্যাণ হস্তের দাক্ষিণ্যে। যৌবনের কত ব্যর্থ ব্যথিত বসন্ত পার হয়ে গেল। একটা নিঃশ্বাস ফেলে জানলার কাছে এসে দাঁড়াল দীপক। ভাল করে খুলে দিল জানলাটা, সামনের রাস্তায় ধুলোর ঝড় উঠেছে, লাল ধুলো। শালবনটাও ধূসর হয়ে যাচ্ছে ধুলোর মেঘের আড়ালে। পিঙ্গল আকাশ, একক চিলের করুণ আর্তি মাঝে মাঝে শোনা যায়। এই প্রখর রোদেও একটি মানুষ চলেছে পথ দিয়ে, সঙ্গে দু'টি মহিষ; লোকটির পরণে ময়লা খাটো ধুতি, গায়ে পিরাণ। নির্মমভাবে মহিষের ল্যাজে মোচড় দিচ্ছে। চারিদিক নীরব, নিস্তব্ধ। চলে আসে শুধু হাওয়ার শব্দ, আর চারদিকে ভেসে বেড়ায় ধ্যান-মগ্ন মহাদেবের ধুনির উৎক্ষিপ্ত ভস্মরাশি। রাস্তার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল দীপক। ওর ঘরের পেছনেই কুয়োটা········আশেপাশে মাটির খাঁজে একটু-আধটু জল জমেছে। একটা তৃষ্ণার্ত কাক সেই জলে ঠোঁট ডুবোচ্ছে বার বার। বেড়ার ধারের পেয়ারা গাছ থেকে সাদা ফুলের পাঁপড়ি টুপ টুপ করে ঝরে পড়ছে। একটা টুনটুনি পাখী ডালে ডালে নেচে বেড়াচ্ছে। কুয়োর ধারে ঘন শাকের ক্ষেত। কলাগাছের ঝাড়। চালকুমড়ো গাছ মাচার গায়ে লতিয়ে উঠেছে। ধূসর মরুভূমিতে একটু মরূদ্যান। মধ্যাহ্ন সূর্য্যের দীপ্তি তত প্রখর নয় এখানে। এমনি একটু শ্যামলিমার দাক্ষিণ্য লতাবিতানের আশ্রয় মিলবে না কি তার জীবনে? সে কি সূর্য্যের মত নিঃসঙ্গ থাকবে চিরকাল?

এখানে আসার পর প্রায় মাসখানেক কাটল। মালশ্রী এর মধ্যে আর কলকাতায় যায় নি, মাঝে মাঝে বাড়ীর চিঠি পায়। বন্ধুরাও কেউ কেউ লেখে। মা'র চিঠি খুবই সংক্ষিপ্ত। বোঝা যায় তিনি মালশ্রীকে ক্ষমা করেন নি এখনও। মধুশ্রীর চিঠি অভিমানে অনুযোগে ভরা। দাদারা বিশেষ লেখেই না। তারাও বেশ বিরক্ত হয়েছে মনে হয়। একমাত্র বাবার চিঠিতেই আশ্বাস, স্নেহের সুধারসে অভিষিক্ত হয়ে আসে সে চিঠি। জুড়িয়ে যায় মালশ্রীর মন, প্রবাসের বেদনা কিছুক্ষণের জন্যও ভুলতে পারে সে। কিন্তু মায়ের বিরাগ, দাদাদের ঔদাসীন্য, মধুশ্রীর অভিমান মনটাকে হাল্কা হ'তে দেয় না। মাঝে মাঝে মনে হয় ফিরে যাবে নাকি? সকলের মুখে তা হ'লে হাসি ফুটবে। মেনে নেবে তাদের সব দাবি। নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা ব'লে কিছুই আর রাখবে না। তা হলেই ত সব সমস্যার সমাধান! সব বেদনার অবসান! কিন্তু বেদনার অবসান কি সত্যিই এমনি করে হ'তে পারে? তা হ'লে সব ছেড়ে এসেছিল কেন এখানে? কিন্তু সত্যি সত্যিই কি সব ছাড়া যায়? এখানকার প্রতিটি মুহূর্ত বাড়ীর স্মৃতিতে ভরে থাকে—এখানকার জীবনে অভ্যস্ত হয়েছে কিছুটা, যে জীবনে অভ্যস্ত ছিল তার প্রতি আকর্ষণ কিন্তু এক তিলও কমে নি।

এসব ভাবনায় মাঝে মাঝে ছেদ পড়ে—হয় রমা নয় ছেলেমেয়েরা কেউ দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। ডাকাডাকি করে। রমা প্রায়ই আসে। সহজে অন্তরঙ্গ হ'তে পারে সে। এসেই মালশ্রীর বিছানায় শুয়ে পড়ে—"মালাদি, তোমার বাড়ীর গল্প বল না।"

বাড়ী সম্বন্ধে রমার কোন অভিজ্ঞতা নেই, সাধারণ ঘর, কল্পনা, মা, বাবা ভাইবোন—এদের কথা শুনতে শুনতে চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার। রমা অনাথ আশ্রমে মানুষ। তাই বাড়ীর প্রতি মোহ তার অপরিসীম। রমার কাছে বাড়ীর কথা বলতে গিয়ে নিজেই তলিয়ে যায় ভাবনার মধ্যে। তাদের বাড়ীতে মা আর বাবা যেন দু'টি জগৎ—তাদের মাঝখানে মালশ্রী একটি সেতুর মত দাঁড়িয়ে আছে। মায়ের সংসারে, তাঁর প্রতিদিনকার খুঁটিনাটি, তাঁর ধনসম্পদের আকাঙ্ক্ষা এ সবকে একেবারে তুচ্ছ করতে পারে কই? নিজে এদের চায় কি না স্পষ্ট করে জানে না। কিন্তু মা'র কাছে সাহস করে জীবনের অন্য মূল্যবোধের কথা কি বলতে পেরেছে কোনদিন? দাদাদের কথায়-বার্তায় এটাই চিরকাল জেনেছে গভীরতার দায় অনেক, হাল্কা জীবনে সুখ বেশি, দায়িত্ব কম। দাদাদের সব কিছু পুরোপুরি মেনে নিতে না পারলেও তাদের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি তিলমাত্র কমে না। এই প্রবাসে তাদের প্রত্যেকের জন্যই মন ব্যাকুল হয়।

বাড়ীতে বাবা একটি ব্যতিক্রম। তিনি সংসারের খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না কখনও। লেখা-পড়ায় ডুবে থাকতে ভালবাসেন। ব্রহ্মসংগীত শোনেন তন্ময় হয়ে। ভোরবেলা উঠে শান্তিনিকেতন পড়েন প্রতিদিন। বাবাকে প্রাণমন দিয়ে শ্রদ্ধা করে মালশ্রী, ভালবাসে। তাঁর প্রিয় সব কিছুই মনকে ভরে দেয়। ডুবে যায় উপলব্ধির গভীরতায়। কিন্তু শুধু কি এতেই তুষ্ট হয় মন? উপভোগের সামগ্রীও কম কাম্য নয়। জন্মদিনে মা'র দেওয়া বাঙ্গালোর শাড়ী আর বাবার দেওয়া বই দুই-ই সমান আদরে গ্রহণ করে সে। দাদারা সকলেই মার দলে, মধুশ্রীও তাই। বাবাকে ওরা এড়িয়েই চলে, সহজে কাছে ঘেঁষে না। আসল কথা ওরা বাবাকে বোঝে না। বাড়ীর মধ্যে একমাত্র মালশ্রীই তাঁকে বুঝতে চায়, তার সান্নিধ্যে আনন্দ পায়। কিন্তু তবু বাবার হয়ে অন্যদের কিছু বলবার সাহস তারই কি আছে? সব কিছু মেনে নিয়ে, মানিয়ে নিয়ে চলতে জানে। কখনও কোন কিছুকে বাদ দিয়ে চলা সম্ভব হয় নি ওর পক্ষে। শুধু এই একটা ব্যাপারে বাড়ীর সকলকে অগ্রাহ্য করেছে। বাবার সানন্দ সম্মতি অবশ্য পেয়েছিল। কিন্তু শুধু কি বাবার আদর্শ প্রীতির অনুপ্রেরণা? তার জীবনের সেই বেদনার্ত অধ্যায় না থাকলে কি কখনও আসত এখানে? মা'র এতখানি আপত্তি অগ্রাহ্য করে? দাদাদের এত বিরক্তি সত্ত্বেও? শুধু নিজেকে লুকোবার জন্য কলকাতা থেকে পালিয়ে এসেছে সে· একথা তার নিজের কাছেও গোপন নেই। আর কোন কিছুর টানে নয়। বাবা অবশ্য চেয়েছিলেন মালশ্রী এখানে আসুক, চাকরি যদি করতেই চায় সাধারণ চাকরি যেন না করে। এ চাকরি ত অর্থের প্রত্যাশায় নয়। তাই চেয়েছিলেন কোন সেবা-প্রতিষ্ঠানে কাজ নিক মালশ্রী। তাতে মন তৃপ্ত হবে।

শোভনাদির প্রতিষ্ঠানটির কথা শুনেছেন অনেকবার। চিরকালই এ ধরণের কাজে আগ্রহ ওঁর অপরিসীম। খোঁজখবরও রাখেন। বিয়ের আগে একসময় সাইকেল চড়ে গ্রামে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াতেন, চাষীদের সুখ-দুঃখের খবর নিতেন। মালশ্রী এখানে আসাতে খুশী হয়েছিলেন তিনি। নিজের মনের একটি অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা কন্যার মধ্যে দিয়ে পূর্ণ হয়েছিল।

বেড়ার ধারে দাঁড়িয়েছিল মালশ্রী। একটু আগে ছুটির ঘণ্টা পড়েছে। ছেলেমেয়েরা বিকেলের জল-খাবার খাচ্ছে। এক্ষুণি বাগানের কাজ সুরু হবে। মালশ্রী তিনটের সময় চা খেয়ে নেয় রোজ। তার কোন তাড়া নেই এখন। সামনে উদার প্রান্তর, আর দু'একটা ছোটখাট কুঁড়েঘর। মাঠের শেষপ্রান্তে একটা নীলকুঠির ভগ্নাবশেষ দেখা যায়—বহু আগে এখানে নীলচাষ হ'ত। মাঠ ধরে একটু এগোলে লোধাপাড়া। সাঁওতালদের মত এরাও আদিবাসী, ভূমির কাঠিন্যে গড়া ওদের দেহ। দারিদ্র্যের নিপীড়নে স্বভাবে একটু কর্কশ। আবার মহুয়ার মদিরায় উচ্ছল, প্রাণবন্যায় চঞ্চল। এই এদের প্রকৃতি। মালশ্রী দেখল লোধা-পাড়ার মোড়লের মেয়ে সৌরভি কলসী কাঁখে গেট দিয়ে ঢুকল। কুয়ো থেকে জল তুলবে। বল্লভ নামে একজন থাকে এখানে, শোভনাদির একান্ত অনুগত। বল্লভ নাকি এককালে ডাকাতি করত, সেও জাতে লোধা। রং কুচকুচে কালো, চোখ দু'টি ঈষৎ রক্তাভ, সামনের সব ক'টি দাঁত ভাঙ্গা। শীর্ণ চেহারা, দেখলে মনে হয় বিনয়ের অবতার। সৌরভি জল নিতে এলেই বল্লভ কুয়োর কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। দু'জনে হাসাহাসি করে, কথা বলে। মালশ্রী একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, ও কে? তোমার স্বামী নাকি? ফিক্ করে হেসে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল মেয়েটি। সরস্বতীর কানে গিয়েছিল কথাটা। বলেছিল "আপনিও যেমন! ওদের আবার সোয়ামী। ও ত' ওর 'লাভার'। ওদের ওই ধরন··· যে যার সঙ্গে পারে।" সত্যিই এদের মধ্যে কোন বাঁধাবাঁধি নেই। পরস্ত্রীর সঙ্গে রাত্রিবাসে দ্বিধা নেই কোন। এর পরে সৌরভির স্বামীকেও দেখেছে'। বলিষ্ঠ চেহারা, বল্লভের চেয়ে অনেক অল্প বয়েস তার। অথচ তাকে ছেড়ে সৌরভি বল্লভের সঙ্গে····।' বিচিত্র মানুষের মন। আরেকজনের কথা এই সঙ্গে মনে পড়ে গেল। ওর সহপাঠিনী ইলা। তারও সুপুরুষ বিদ্বান্ স্বামী ছিল, ছিল দু'টি সন্তান। তবু সব ছেড়ে চলে

গেল একদিন, স্বামীর বন্ধু অমিতাভর সঙ্গে একই বাড়ীতে বাস করতে সুরু করল।......

ঘরে এসে ঢুকল মালশ্রী। বাগানের কাজ সুরু হয়ে গেছে, মালশ্রী দরজার পাশ থেকে বালতিটা হাতে নিল। বাগানে জল দিতে হবে। রোজ সকালে-বিকেলে সেও বাগানের কাজে যোগ দেয়। বাড়ীতে ছাদের ওপর টবে গোলাপ আর রজনীগন্ধা অনেক ফুটিয়েছে সে, বিচিত্র "ক্যাকটাস" লাগিয়েছে। এখানে বেগুন গাছে, শাকের ক্ষেতে রাশি রাশি জল ঢালতে হয়, দু' এক ঝারিতে মাটিই ভেজে না। মালশ্রী একটুতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তবু সকলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করার মধ্যেও বৈচিত্র্যের স্বাদ মেলে। আজ তার দেরি হয়ে গেছে —রমা কুয়ো থেকে বালতি বালতি জল টেনে তুলছে, তার পাশেই বিরস মুখে সরস্বতী দাঁড়িয়ে, শোভনাদি খুরপি দিয়ে গাছের গোড়া খুঁড়ছেন। দীপক ক্ষেতের মাঝখানে উবু হয়ে ব'সে কি যেন দেখছে। ওদিকে শালবনের প্রান্তে অস্ত যাচ্ছে সূর্য্য, এ আলোয় প্রখরতা নেই। নববধূর বেলাঞ্চলের কোমল আভাস জড়ানো গোধূলি। রমার হাত থেকে একটা বালতি টেনে নিল, জল দিতে দিতে সকলের মুখের দিকেই তাকাল কয়েকবার। দিনশেষের ক্লান্তি সবার মুখেই ছায়া ফেলেছে—কাজের উৎসাহ যেন অনেকটা কমে এসেছে।

রমার কাছে এখানকার কথা মাঝে মাঝে শুনেছে সে। বিদ্যালয়ের অলিখিত ইতিহাস। রমাকে বাঁকুড়ার এক অনাথ আশ্রম থেকে এনেছিলেন শোভনাদি। সে তখন ছ'বছরের মেয়ে। এই বিদ্যালয়ের পরিবেশেই বড় হয়েছে সে। শোভনাদির কাছে সেলাই শিখেছে, গান শিখেছে, লেখাপড়াও শিখেছে। এখন সেও শিক্ষয়িত্রী। এমনিতে' চঞ্চলা হাস্যময়ী মেয়েটি। কিন্তু মাঝে মাঝে তাকেও ভারী গম্ভীর মনে হয়। তার সদানন্দময়ী মূর্ত্তির ওপরেও অন্ধকারের ছায়া ঘনায়। নিজেই সে বলেছে মালশ্রীকে, শোভনাদি তাকে অনেক দিয়েছেন। কিন্তু সঙ্গ আর কতটুকু দিতে পারেন? মায়ের বুকের মমতার উত্তাপ কি দিতে পেরেছেন কোনদিন? অজস্র কর্ম্মব্যস্ততায় ডুবে আছেন তিনি, রমার প্রতি কর্ত্তব্যে কখনও ত্রুটি করেন নি। কিন্তু শুধু কর্ত্তব্যে মন ভরে না রমার, আর কিছু কামনা করে সে, সেটা দুর্লভ এখানে। রমা বিয়ের কথাও অনেকবার ভেবেছেন শোভনাদি, তা হ'লে মেয়েটা একটা আশ্রয় পায়—জীবনের অনেক বেদনা হয়ত ভুলতেও পারে। কিন্তু তার বিয়ের ব্যবস্থা করাও মুশকিল। রমা অনাথ আশ্রমের মেয়ে, ওর পিতৃ-পরিচয় কারও জানা নেই। বিয়ের কথাতে অনেকেই মুখ টিপে হাসে। এই বিদ্যালয়ই ওর চিরকালের আবাসস্থল হয়ে দাঁড়াবে শেষ পর্য্যন্ত। এখান থেকে আর কোথাও যাবার জায়গা নেই। মন মাঝে মাঝে টিঁকতে চায় না একঘেয়ে পরিবেশে। কিন্তু রমা নিরুপায়। এই বিদ্যালয় ছাড়া তার আর আশ্রয় কোথায়? সঙ্গী-সাথীও তেমন নেই, মালশ্রী আসার পর থেকে ওর সঙ্গেই যা-একটু মন খুলে কথা বলে। সরস্বতীর সঙ্গে একঘরে থাকে সে, কিন্তু তার কাছে মনের দুঃখ জানিয়েও কোন ফল হয় না। সে নিজের সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত। সরস্বতী বাল-বিধবা। অবৈধ প্রণয়ের দহনে জলছে সে। এখানকার সংস্কৃত শিক্ষক চন্দ্রনাথ মাইতির সঙ্গে তার নিবিড় সম্বন্ধ। চন্দ্রনাথ বিবাহিত, দেশে তার স্ত্রী আর দু'তিনটি সন্তান আছে। সব জেনেও সরস্বতী তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। এ বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করা অসম্ভব তার পক্ষে। শোভনাদি তাকে গোপনে ডেকেছেন, অনেক বুঝিয়েছেন, ফল হয় নি। সরস্বতীকে এখান থেকে বিদায় করাও চলে না, প্রতিষ্ঠানের অনেক কাজের ভার ওর ওপর দেওয়া আছে, তা ছাড়া যাবেই বা কোথায়? সংসারে চিরদিনের আশ্রয় বলতে কিছু নেই ওর। নিঃসহায় বিধবা। চ'লে যাবার কথা ওঠেই না তাই, অথচ দিন দিন চঞ্চল হয়ে উঠছে তার মন। অন্যদের উপহাস বিদ্রূপে সে কান দেয় না, অনেক সময় আবার ঝগড়াও করে। কিন্তু মনকে সে ফেরাতে পারছে না। পিপাসিত যৌবন তার। নিজের তৃষ্ণা নিয়েই সে অধীর। আর কারও দিকে ফিরে তাকাবার সময় নেই।......

বেগুন গাছের পাতাগুলো জল পড়ে চক্‌চক্ করছে।

আকাশের আলো প্রায় মিলিয়ে এল। এক্ষুনি প্রার্থনার ঘণ্টা বাজবে, মালশ্রী নিজের ঘরের দিকে চলল। উষাদি হন্‌হন্‌ করে কোথায় চলেছেন, অপ্রসন্ন মুখ, আপন মনেই গজ গজ করছেন। মালশ্রীর দিকে ভাল করে তাকালেনও না। এমনিই তাঁর প্রকৃতি। মাঝে মাঝে অতি অন্তরঙ্গতায় মানুষকে অস্থির করে তোলেন। আবার সময় সময় বিরক্তির আর অন্ত থাকে না, কথায় কথায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন, তারও বোধহয় মন টিঁকতে চায় না এখানে। অনেক সময় ত বলেই ফেলেছেন "আমার কি আর এখানে পড়ে থাকবার কথা? নেহাৎ-ই......" কথাটা আর শেষ করতে পারেন না। 'পড়ে থাকবার কারণটা কারও অবিদিত নেই। উষাদি স্বামী-পরিত্যক্তা। দু' তিনটি সন্তান তাঁর। সকলের দায়িত্ব তাঁকেই নিতে হয়েছে। চাকরি তাঁকে করতেই হবে। আজকালকার দিনে বিশেষ কোন ডিগ্রী না থাকলে কাজ পাওয়া কঠিন। এখানে বিনা ডিগ্রীতেও কাজ করার সুযোগ আছে। মাইনে যা পান, তাতেই চ'লে যায়। থাকবার জায়গায়ও পেয়েছেন, ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার ব্যবস্থাও হয়েছে। কিন্তু এতে সন্তুষ্ট নন উষাদি। অভিযোগের অন্ত নেই তাঁর। এক অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার দাহে তিনিও জ্বলছেন অহরহ। সংসার করার সাধ, স্বামী সোহাগের সুখ, সব ঘুচে গেছে তাঁর। সেই অতৃপ্ত কামনা তাঁকে দিবারাত্রি শান্ত দেয় না। সেই তৃষ্ণার পাক থেকে মুক্তি নেই তাঁরও।

মাঠের ওধার থেকে কে যেন গুনগুন স্বরে গান গাইতে গাইতে আসছে, তাকিয়ে দেখে দীপক। বলিষ্ঠ চেহারা, ঘামে ভিজে গেছে সারা শরীর। ভ্রূক্ষেপও নেই। দু'টি ছেলের হাত ধরে হাসতে হাসতে এগিয়ে এল। রমা একদিন বলেছিল, "দীপকদা আর শোভনাদি কিন্তু বেশ আছেন। ওদের শুধু কাজেই আনন্দ। মাঝে মাঝে মনে হয় ওঁদের কোন ইচ্ছে নেই, সাধ নেই।"

সত্যিই হয়ত তাই। এঁদের মধ্যে ক্ষোভ নেই কোন, দীপকের সদানন্দ মূর্ত্তির ওপরে কোনদিন অপ্রসন্নতার ছায়া ঘনাতে দেখে নি। শোভনাদিকেও দেখে নি অসন্তুষ্ট হ'তে। কিন্তু সত্যিই কি আর কোন আকাঙ্ক্ষা নেই দীপকের মনে? শুধু এই কাজের জগতের ভাবনা নিয়ে সে প্রসন্ন? আর কোন বাসনার উত্তাপে কি তপ্ত হয় না সে? পরক্ষণেই সচেতন হ'ল মালশ্রী, দীপক সম্বন্ধে এ ধরণের ভাবনা আসছে কেন মনে। সে কর্ত্তব্য-পরায়ণ, বুদ্ধিমান—এই প্রতিষ্ঠানকে সুন্দর ক'রে গ'ড়ে তোলার সাধনা তার। তার মন বিভ্রান্ত হবে কেন?

আর শোভনাদি? এ প্রতিষ্ঠান তাঁর প্রাণ। তাঁর সারা জীবন এরই জন্য সমর্পিত। তবু মাঝে মাঝে কেন মনে হয় শোভনাদির চোখের কোলে গভীর ক্লান্তির রেখা? মুখে ম্লানতার ছায়া। যদিও এ দৃশ্য কদাচিৎ চোখে পড়ে—তবু মনে হয়, শোভনাদিও শ্রান্ত হন। তাঁরও বোধহয় বিশ্রামের আকাঙ্ক্ষা জাগে।

পরদিন সকালে ক্লাস নিতে ঢুকেছে, দেয়ালে টাঙানো ক্যালেণ্ডারের দিকে চোখ পড়ল। আজ সাতই বৈশাখ। ওর জন্মদিন। সকাল থেকেই বাড়ীর কথা মনে পড়ছে বার বার। সঙ্গে সঙ্গে ভিড় করে আসছে কয়েকটি ঝলমলে সন্ধ্যা। সেজদার সঙ্গে রাত্রের শো'তে সিনেমায় যাওয়া, মেট্রোর সামনে আলোকোজ্জ্বল ফুটপাত। দোতলায় শোবার ঘরে নীল বাতিটা জ্বলছে। রেডিও-গ্রাম বাজছে। একটা বিলিতী সুর। সেজবউদি এক-গোছা বেলফুলের মালা নিয়ে ঘরে ঢুকল। 'এই মালু, খোঁপায় দে না, ভাল দেখাবে।' বড় আলোটা জ্বালিয়ে দিল সে। নীল বেনারসীর কল্কা আঁকা জরীর আঁচল ঝক্‌মকিয়ে উঠল, বড় আয়নায় নিজের ছায়া দেখেই মুগ্ধ হয়ে যেত মালশ্রী। চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে গেল। সনাতন জিজ্ঞেস করছে, 'দ্বিধা' মানে কি দিদি? আবার ফিরে এল বাস্তবে। বই খুলে শক্ত কথার অর্থ বলতে সুরু করল। কেমন নির্ব্বোধ নির্ব্বিকার লাগল সামনে-বসা ছেলেমেয়েদের মুখ। এতটুকু ঔজ্জ্বল্য নেই। কি নিস্তরঙ্গ জীবন এখানে। নিজেদের কলেজের দিনগুলির কথা মনে পড়ল। কি হৈ হৈ আর আনন্দ-কলরোলের মাঝখানেই না কেটেছে। সেই দুপুরবেলায় ক্লাস পালিয়ে রেস্তোঁরায় যাওয়া। লাজুক বংশের আড়ালে ফিল্ম-ফেয়ারে'র ছবি দেখা। ট্রামে বাড়ী ফেরার পথে ভিড়। কত সময় অশোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। সে আবার আর এক রোমাঞ্চ। ভিড়ের মধ্যে ওর কাছে ঘেঁষ

নিজেদের কলেজের দিনগুলির কথা মনে পড়ল

দাঁড়াত। শিহরণ জাগত বুকের মধ্যে। ভিড় ঠেলে নামতে পারত না কত সময় হাত ধরে নামিয়েছে অশোক। এখানকার দিনগুলো এত বিরস মনে হয় মাঝে মাঝে— সকাল থেকে ঘণ্টায় বাঁধা জীবন, এতটুকু অবকাশ নেই। নিজের ব্যক্তিগত সময় বলে কিছু নেই। সন্ধ্যা না হতেই রাত্রির নিস্তব্ধতা নামে। কলকাতার উজ্জ্বল সন্ধ্যাগুলো চোখের সামনে স্পষ্ট হ'তে থাকে, প্রতিদিন একটা পায়ের শব্দের জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকত। সে হঠাৎ পেছন থেকে এসে মুখে গুঁজে দিত ক্যাডবেরীর চকোলেট, কিংবা হাতে দিত কাজু বাদামের প্যাকেট। তারপর পড়ার টেবিলের পাশেই মোড়া টেনে বসত। বাড়ীর কারও তাতে আপত্তি ছিল না। অশোককে সকলেই পছন্দ করত, ওর অপরূপ চেহারায় মুগ্ধ ছিল বাড়ীর সবাই। সেই ষোল বছর বয়স থেকে পরিচয়, দিনে দিনে মুগ্ধতার আবেশ রঙ ধরিয়েছে মনে, তিলে তিলে আত্মসমর্পণ করেছে মালশ্রী। অথচ শেষকালে এমনটা কেন হ'ল? খাতা নিয়ে রাণী এসে সাম দাঁড়াল। 'রচনাটা লিখেছি।'

"দাও দেখি।"

খাতাটা নিয়ে দেখতে বসল মালা। অজস্র বানা ভুলে ভরা, কদর্য্য হাতের লেখা, এদের জ্ঞান কত কম ভারী বিরক্ত লাগে এক এক সময়। ওর ভাইঝি রি ডায়োসেশনে পড়ে। এরই মধ্যে কত কিছু শিখেছে, নির্ভুল উচ্চারণ তার। পরিষ্কার সুন্দর হাতের লেখা। আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেল মালশ্রী। শালফুলের গন্ধ, সূর্য্যোদয়ের রক্তাভা, তারাভরা আকাশ, সকাল-বিকেলে বাগানের কাজ, আর এই অতি সাধারণ স্তরের ছেলে-মেয়েদের পড়ান—শুধু এই নিয়েই কি দিন কাটে?

তবু কাটতে লাগল দিন। প্রভাত, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ। এই বৈচিত্র্যহীন পরিবেশ মাঝে মাঝে দুঃসহ হয়ে উঠে।

ফিরে যাবার ইচ্ছা যে একেবারে জাগে না তাও

য়, কিন্তু সেখানেও অনেক বাধা। সবটাই অবশ্য মনোগত। সে ফিরে গেলে বাড়ীর সকলে সবচাইতে খুসী হবেন— সে কথা ভাল করেই জানে, তবু মনে মনে বাড়ীর সবার উপর অভিমান হয়। কেউ ত তাকে ফিরে যেতে বলে নি একবারও। অপর পক্ষের ঔদাসীন্য যে অভিমানেরই নামান্তর, সে কথাটা বুঝেও বুঝতে চায় না। সবাই যদি মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারে, তা হ'লে সেও তাই থাকবে। তা ছাড়া ফিরে গেলেই ত সেই অতীত অধ্যায়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে সবাই। কেউ কি তাকে ভুলতে দেবে কিছু? এখানে এক এক সময় মন একেবারেই টি'কতে চায় না, সঙ্গী-সাথীও তেমন কেউ নেই, যার সঙ্গে কথা ব'লে সুখ পাওয়া যায়, আলোচনায় আনন্দ। উষাদি আর সরস্বতীর সঙ্গে কত আর গল্প করা যায়। সব তাতেই তাঁদের উগ্র কৌতূহল, বারবারই প্রশ্ন করেন, "তুমি কেন এসেছ ভাই? তোমার কিসের অভাব? এত সাদাসিধে থাক কেন?"

সব প্রশ্নের পেছনে সেই একই জিজ্ঞাসা—ওর অতীত সম্বন্ধে সন্দেহ-প্রকাশ। এক রমার সঙ্গেই যা একটু মেলে, সেও ত বয়সে অনেক ছোট। কথা বলবার মত মানুষ একেবারেই যে নেই, সে কথা অবশ্য বলা চলে না। দীপক আছে, শোভনাদি আছেন, কিন্তু তাঁরা বড় ব্যস্ত থাকেন সব সময়। প্রতিষ্ঠানের খুঁটিনাটি নিয়ে দিন কাটাতে হয় তাঁদের, ওঁদের নাগাল পাওয়া বড় শক্ত। তবু এরই মধ্যে সময় করে শোভনাদি অনেক সময় ডাকেন, কথাবার্ত্তা বলেন। বাড়ীর খবর জানতে চান,

বেড়াতে যাবার গণ্ডিটুকুও সীমাবদ্ধ তার কাছে, গ্রামের ভেতরে কালেভদ্রে যাওয়া হয়। সামনে ঐ শালবনের সীমানা, আর পেছনে ধানের ক্ষেত—এইটুকুই ত বিদ্যালয়ের বাইরের জগৎ, কত আর বেড়ান যায়। ঘরে বসে বই পড়ে, লাইব্রেরীটা নেহাতই ছোট। বইয়ের সংখ্যা নগণ্য, এরই মধ্যে বেছে বেছে খানকয়েক পড়ছে, আর কিছু ত করার নেই।...

সেদিন সকাল থেকেই কেমন মেঘ করেছে। ক্লাসে বসেও মালশ্রীর মনটা তেমন নিবিষ্ট হ'তে পারছিল না। কে একজন বলল, "দিদি, একটা গল্প বলুন।"

আর একজন ফিস্ ফিস্ করে বলে উঠল, "না, না, একটা গান।"

হেসে উঠল সকলে। মালশ্রী ওদের ধমক দিতে পারল না। এই প্রগল্‌ভতাকে একটু প্রশ্রয়ই দিল মনে মনে। এই অতিপরিচিত ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটু নূতনত্ব আবিষ্কার করল যেন, সত্যি সত্যিই গান গাইতে ইচ্ছে করছিল। ওদেরই বলল, "তোমরা গান গাও, আমি শুনি।"

চামেলী আর শ্যামলী যাচ্ছিল বারান্দা দিয়ে, ওরা দু'টি বোন এখানকার পুরণো ছাত্রী, মাঝে মাঝে শোভনাদির কাছে বেড়াতে আসে। বাঁকুড়ারই কোন গ্রামে অম্বর চরকা শেখায় ওরা। দু'দিনের ছুটিতে এখানে এসেছে, গান গাওয়ার কথা ওদেরও কানে গেছে, দাঁড়িয়ে পড়ল দরজার কাছে। এরপর ছেলেমেয়েদের আটকে রাখা শক্ত হ'ল—কেয়া একটু কাব্য করে কথা বলে। সে-ই বলে উঠল, "দিদি, কি সুন্দর মেঘ করেছে, চলুন না, শালবনে বেড়িয়ে আসি।"

অন্যরাও স্থান-কাল ভুলে সমস্বরে চেঁচাল, "হ্যাঁ দিদি, চলুন।"

মালশ্রী আপত্তি করতে পারল না। আজকের দিনে কড়া ডিসিপ্লিন পালনের আদর্শটা কাজে লাগাতেই ইচ্ছে করল না। সে নিজেই কেমন বিমনা হয়ে গেল, বলল, "বেশ ত চল, কেউ একজন শোভনাদিকে ব'লে এস।"

কেয়াই ছুটে চলে গেল, কোঁকড়া চুলের রাশ হাওয়ায় দুলিয়ে। চামেলী আর শ্যামলী এগিয়ে এল, "মালাদি, আমরাও যাব।"

"নিশ্চয়ই—চল"—মালশ্রী অকারণেই উল্লসিত হয়ে ওঠে, বেশ চপলগতিতে ঘাসের ওপর পা রাখে। ওপাশের ছোট্ট ঘরের জানলা থেকে সুখদাবাবু একবার বাইরের দিকে তাকালেন, চশমাটা নাকের উপর থেকে যথাস্থানে তুলে দিলেন। ছেলেমেয়েরা তখন মহোল্লাসে চেঁচাচ্ছে, ভুরু দুটো কুঁচকে এল সুখদাবাবুর। মালশ্রীর দিকে তাকালেন একবার—আবার হিসেবের খাতায় মন দিলেন। জানলার ধারেই কতকগুলি বনতুলসীর ঝোপ। ছেঁড়া কাগজের টুকরো এদিক্-ওদিক্ ছড়ান। তবু সেই বন্য অনাদৃত গাছের দিকেই মুগ্ধ হয়ে তাকাল মালশ্রী।

কোনদিন ত দেখে নি, কি বিচিত্র বর্ণের ফুল ফুটেছে, জংলী গাছটাকে রঙের মাধুরীতে স্নান করিয়ে দিয়েছে যেন। সুখদাবাবুর কলম দ্রুতবেগে চলছে। চোখ সরিয়ে নিল মালশ্রী। কেয়া ফিরে এসেছে, বিজয়িনীর ভঙ্গিতে বলল, "দিদির মত পেয়েছি।"

কথাটা শুনবার ধৈর্য্যও নেই অন্যদের। কেয়াকে দেখেই তারা গেট খুলে বাইরে বেরিয়ে গেছে। চামেলী ওদের সঙ্গে গেল। শ্যামলা আর মালশ্রী একটু তফাতে রইল। শ্যামলীকে বেশ ভাল লাগছে মালশ্রীর। মোটে দু'দিনের আলাপ, এরই মধ্যে খুব অন্তরঙ্গ হয়ে গেছে। মেয়েটি বুদ্ধিমতী, কথায় কথায় অকারণ কৌতূহল প্রকাশ করে না। বয়স বেশী নয়, কিন্তু বেশ পরিণতি এসেছে মনে।

ছেলেমেয়ের দল সুরে-বেসুরে মিলিয়ে গাইছে—"আমরা চাষ করি আনন্দে।"

শ্যামলী আস্তে আস্তে বলল, "আপনি একটা গান করুন না মালাদি। দিদি বলছিলেন, কলকাতায় গীত-বিতানে গান শিখতেন আপনি।"

মুহূর্তের মধ্যে মনটা পেছনের জগতে পাড়ি দিল। সেই গান শেখার ক'টি বছর। কাফি, পিলু, টোড়ী, বেহাগ, বসন্তবাহার। সুরের অসীম বৈচিত্র্য। আলোকোজ্জ্বল উৎসবমুখর কক্ষ···কত দর্শক। তন্ময় চিত্তে মালার গান শুনছে সবাই। গান গেয়ে বাইরে বেরিয়ে এল · কে একজন এসে একগুচ্ছ 'ব্ল্যাকপ্রিন্স' তুলে দিল তার হাতে। সেই মুখটা এখনও মনে পড়ে কি? সেই গান কি হারিয়ে ফেলেছে মালশ্রী?

শ্যামলী আবার বলল, "করুন না তাড়াতাড়ি, স্কুলে ফিরতে হবে আবার। ঐ দস্যিগুলো যে-রেটে চেঁচাচ্ছে, চামেলী হয়রান হয়ে পড়বে।"

মালশ্রীর অতীত ভ্রমণ শেষ হয়ে গেল। যে দরজাটা খুলে গিয়েছিল অকস্মাৎ, বন্ধ করে দিল তাকে।

"গান কি আর মনে আছে আমার?"

"খুব মনে আছে? গান কি কেউ ভোলে?"

"আচ্ছা নাছোড়বান্দা ত তুমি? চল, বসা যাক।"

একটা ঝাঁকড়া মহুয়া গাছের তলায় বসে পড়ল ওরা। দূর থেকে ছেলেমেয়েদের কল-কোলাহল ভেসে আসছে।

"কি গাইব?"

"যা আপনার খুশী। আমি ত কিছুই জানি না।"

মালশ্রী গাইল "মেঘছায়ে সজল বায়ে"। শেষ হবার পর শ্যামলী মুগ্ধকণ্ঠে বলল, "এত ভাল গান জানেন, তবু করতে চাইছিলেন না। এখানে কেউ গায়ই না বিশেষ। এক রমাদি ছাড়া, আর দীপকদাও মাঝে মাঝে গান।"

"দীপকবাবু গান জানেন বুঝি?"

"এখানে যখন পড়তাম, মাঝে মাঝে গাইতে শুনেছি, আজকাল গান কি না জানি না।"

"একদিন শুনতে হবে ত।" তারপর প্রসঙ্গান্তর করে বলে ওঠে, "আর দেরি নয় শ্যামলী, ওদের ডাকো, অনেক বেলা হ'ল।"

ছেলেমেয়েদের নিয়ে মালশ্রী আর শ্যামলী যখন বিদ্যালয়ে ফিরল, স্নানের ঘণ্টা বেজে গেছে। দীপক কাঁধে একটা লাল গামছা ফেলে এদিক্-ওদিক্ ঘোরাঘুরি করছে, তার হাতে সদ্য-ফোটা একটি বেল ফুল।

শ্যামলী চেঁচিয়ে উঠল, "এই যে দীপকদা, আজ একটা আবিষ্কার করেছি।"

"কি ব্যাপার?" দীপক এগিয়ে এল।

"মালাদি অপূর্ব্ব গান করেন।"

"সে আমরা অনেকদিন আগেই জানি।"

"শুনেছেন কখনও?"

"তা অবশ্য শুনি নি"—মালশ্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, "একদিন শোনাতে হবে কিন্তু—বাইরের লোকদের শোনাচ্ছেন, আমরাই বাদ পড়ে গেলাম।"

"হুস্, আমরা বাইরের লোক!" চামেলী চেঁচিয়ে উঠল। মালশ্রী একটু হেসে দীপকের হাতের ফুলটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "এটা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন যে।"

ফুলটা মালশ্রীর হাতেই দিয়ে দিল দীপক। বলল, "এটা রাখুন, মতিয়া, আমার গাছের প্রথম ফুল। কি বিরাট্ দেখেছেন—ঠিক গোলাপের মত।"

মালশ্রী গন্ধ শুঁকছিল, বলল, "গন্ধটা গোলাপের চেয়েও মিষ্টি।"

"অতটা বলবেন না। দীপকদার তা হ'লে অহঙ্কারে

মাটিতে পা পড়বে না, এমনিতেই ত বাগানের দেমাকে গেলেন।" শ্যামলী ব'লে উঠল।

দীপক জবাব দেবার আগেই ওদিক্ থেকে কে একটি ছেলে এসে ডাক দিল, "দীপকদা, নাইতে চলুন।"

সকলেই যে যার ঘরের দিকে চলল। মালশ্রী ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়ল বিছানায়, ফুলটা রাখল বালিশের পাশে। এখানকার তপ্ত বাতাসে এই গন্ধ ভেসে বেড়ায়, অতি পরিচিত সৌরভ। আর সব চেনা গন্ধ স্মৃতি হয়ে গেছে।

সেদিন সকাল থেকেই বৃষ্টি, বৈশাখের মেঘে শ্রাবণের ধারা নেমেছে। ক্লাস বন্ধ। নিজের ঘরে বসে আকাশের কান্না দেখছিল মালশ্রী। মাঝে মাঝে দু'একখানা বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিল। একটা ছোট খাতা খুলে পুরণো ছোটখাট লেখার ওপর চোখ বোলাল। আজ কোন কাজ নেই। ভালও লাগছিল না কিছু। আজ শোভনাদির কলকাতা থেকে ফিরবার কথা। সকালে এই ঝড়-জলের মধ্যেই দীপককে যেতে দেখেছে স্টেশনের দিকে, শুধু একটা ছাতা সম্বল করে। জানলা দিয়ে দেখল মালশ্রী, দীপকের মূর্ত্তিটা পথের বাঁকে মিলিয়ে গেল। কাল রাত্রের কথা কিছুতেই ভুলতে পারছে না। খাতার পাতা উল্টে গেল, চোখে পড়ল "আকাশের কান্নার সমুদ্র কি অনন্ত? বর্ষায় তার অশ্রুভরা বেদনার সঞ্চার, হেমন্তে শীতে শিশিরাশ্রু। বসন্তের সুরুতেও সেই কান্নার অধ্যায় বদল হ'তে সময় লাগছে। জীবনেও হয় ত তাই। সে কি শুধু অশ্রুরই লিপিকার? হাসির ঐশ্বর্য্য তার কতটুকু?" পড়তে পড়তে নিজেই অবাক্ হ'ল, যে মন নিয়ে কথা ক'টি লিখেছিল, সেই মন কোথায়? আবার কয়েকটা পাতা উল্টে গেল—দেখল কয়েকদিন আগেকার লেখা ক'টি লাইন "আকাশের বুক দীর্ণ করে বজ্রবাণ, কিন্তু সেই আকাশেই ত রামধনু ওঠে, তারা ফোটে, সূর্য্যের আলো দীপ্তি ছড়ায়, জ্যোৎস্নায় সুধা ঝরে। সবই ত সেই আকাশ।" সত্যিই তাই। নিজের অজ্ঞাতেই কখন খ'সে গেছে সব বেদনার ভার। জীবনটা শুধু কান্না দিয়ে ঘেরা, এ কথা এখন কিছুতেই স্বীকার করতে পারে না। বজ্রবাণের চিহ্নমাত্র নেই। অথচ একদিন কি দুঃসহ যন্ত্রণায়ই না বিদ্ধ হয়েছে সে। অশোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা নিবিড় হয়েছিল, কিন্তু তার সব ব্যাপারে সায় দিতে পারত না। সে ফ্লোর শো দেখতে ভালবাসে, মাঝে মাঝে মদও খায়। এসব সে নিজেই বলেছিল মালশ্রীকে। মনে মনে ব্যাপারটা পছন্দ না করলেও অশোককে কিছু বলতে পারে নি। ছোড়দা ত হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিল, "অত সিরিয়াস্ হোস্ কেন সব ব্যাপারে। তুই যে দেখছি একেবারে হেরম্ব মৈত্র হয়ে গেলি? একটু ব্রড মাইণ্ডেড হ'তে পারিস্ না? মদ খাওয়াটা আজকাল আবার কেউ ধর্তব্যের মধ্যে ফেলে নাকি?"

বড়দা গম্ভীর মানুষ, বেশী কথা বলেন না। তাঁকেও একদিন বলতে শুনেছে সে, "অশোকের মত ছেলে দুর্লভ আজকাল। ওর বাপের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স নাকি দু'লাখ টাকা, নিজেও এই বয়েসে যথেষ্ট উন্নতি করেছে। এখনই বারো শ' টাকা পায়। মালা অনেক ভাগ্যে এমন বর পাচ্ছে।"

মালশ্রী মেনে নিয়েছিল শেষ পর্য্যন্ত। মদ খাওয়া নিয়ে মাথা ঘামাত না, এসব সত্ত্বেও অশোকের প্রতি আকর্ষণের তীব্রতা ত বিন্দুমাত্র কমে নি। তার অপরূপ চেহারা, উজ্জ্বল চোখের আমন্ত্রণ দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষার ঢেউ জাগাত বুকে। শেষ পর্য্যন্ত আরও অনেক কিছু কানে এল তার। অশোকের প্রতিদিনের আসা—সপ্তাহে একদিনে ঠেকল, তারপর মাসে দু'দিন। একদিন মধুশ্রী কলেজ থেকে ফিরে ওর কানে কানে বলল, "অশোকদাকে মোটর নিয়ে যেতে দেখেছি, পাশে কে একজন বসে ছিল। দূর থেকে মনে হ'ল, বড় বউদির মামাতো বোন শীলা।"

সেদিনই সন্ধ্যায় অশোককে ফোন করেছিল মালশ্রী। অশোক এল, তার কাছ থেকে স্পষ্ট জবাব কিছুই পেল না, সব প্রশ্নের উত্তরে বিরক্ত হয়ে বলেছিল সে, "আজকাল বড্ড বেশী পিউরিটান হয়ে যাচ্ছ তুমি! তা হ'লে সারাজীবন চলবে কি করে আমার সঙ্গে, এর চেয়ে কোন সম্বন্ধ না রাখাই ভাল।"

দুঃসহ বেদনায় আত্মবিস্মৃতা মালশ্রী বলেছিল, "বেশ ত, রেখ না সম্বন্ধ।" অশ্রুতে রুদ্ধ হয়ে এসেছিল স্বর, ঘর থেকে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গিয়েছিল সে।

ঘরের সামনে দিয়ে কে যেন চলেছে, জলের ছপ্ ছপ্ আওয়াজ কানে আসছে। জানলা দিয়ে মুখ বাড়াল মালশ্রী। সৌরভি একটা চট দিয়ে ঢেকেছে সর্ব্বাঙ্গ। হেসে উঠে এল বারান্দায়। বলল, "মাগো, কি বিষ্টি, আকাশে যেন বান ডেকেছে, ঘর-দোর সব জলে ভেইসে গেছে।"

"তোর হাতে ওটা কি?" মালশ্রী প্রশ্ন করল।

"মাছ। জলের মধ্যে খল্বল্ করতেছিল, তুলে আনছু।" এক গাল হাসল সৌরভি, পানের রসে কালো দাঁত, ছেঁড়া শাড়ীর আঁচল থেকে টপ্‌টপ্ করে জল ঝরছে।

রান্নাঘরের দরজার গোড়া থেকে সরস্বতীর উচ্চস্বর শোনা যায়, "কে রে ওখানে, সৌরভি নাকি? তাড়াতাড়ি আয় বাবা, সকাল থেকে একা একাই খেটে মরছি, রান্নাঘর ত আর বন্ধ হবে না—সবার ছুটি হয়, আমিই কেবল—" গজ্ গজ্ করতে করতে ভিতরে চলে গেল সরস্বতী।

সৌরভি ব্যস্ত ভাবে সাড়া দিল, "যাচ্ছি দিদিমণি।"

মালশ্রী মনে মনে একটু লজ্জিত হ'ল। হয় ত তার যাওয়া উচিত ছিল, সরস্বতীকে একটু সাহায্য করতে পারত—কিন্তু আজ তার কোন কিছু করার শক্তি নেই। বড় ক্লান্ত লাগছে। একটু চা খেলে হয়। ষ্টোভ জ্বালিয়ে চায়ের জল চাপাল। বিস্কুটের কৌটটা খুলতে গিয়ে মনে পড়ল, শত বিরক্তি সত্ত্বেও তার সঙ্গে সব কিছু গুছিয়ে দিতে কিন্তু ভোলেন নি মা। সে নিজে ত কিছুই আনতে চায় নি, শুধু বাবার টেবিল থেকে দু'চারখানা বই এনে বাক্সে পুরেছিল। ঘরে এসে দেখেছিল মা গম্ভীর মুখে তার স্যুটকেশ গুছোচ্ছেন, ভরছেন ঘিয়ের শিশি, আচারের কৌটো, বিস্কুটের টিন, গোছা গোছা রঙীন শাড়ী সাজিয়ে রাখছেন ট্রাঙ্কে। আপত্তি করে নি মালশ্রী, করবার সাহসই ছি · না, তবু একটা কথা ভেবে খানিকটা সান্ত্বনা পেয়েছিল, মুখে যতই রাগ দেখান, তার সুখের জন্য আরামের জন্য ভাবনার অন্ত নেই মা'র। সেই সুখের কামনায়ই ত অশোককে চেয়েছিলেন—কিন্তু অশোক ত আর এল না। সেদিনের পর থেকে তার কাদিনের আসাটাও বন্ধ হয়ে গেল, চিঠিপত্র লেখাও ছেড়ে দিল, মালশ্রী দুরন্ত অভিমানে অনেকদিন চুপ করে ছিল। শেষ পর্য্যন্ত একদিন মা'র অনুরোধে চিঠি লিখতে হ'ল অশোককে, সে চিঠির কোন জবাব আসে নি।

সত্যিই সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছিল অশোক। মোহভঙ্গ হয়েছিল তার, রিক্ত হয়েছিল সুধার পাত্র। কিন্তু সেই স্মৃতি ভুলতে মালশ্রীর কত রজনী কেটেছে নিদ্রাহীন টুকরো টুকরো ছবিগুলি চেষ্টা করেও মুছতে পারত না, শেষ পর্য্যন্ত পালিয়ে এল এখানে। আজ হঠাৎ মনে হ'ল কখন নিজের অজ্ঞাতে ক্ষয় হয়ে গেছে বেদনার ভার, উগ্র স্মৃতির সুরভি ক্ষীণ হয়ে এসেছে। সেই অতি-প্রিয় মুখখানার ওপরেও বিস্মৃতির ছায়া পড়েছে, বিবর্ণ সে ছবি। অথচ যেদিন অশোক এমনি করে চলে গেল, আর এল না, মা বাবাকে কি ভীষণ বকেছিলেন, "তোমার জন্যেই ত এ রকম হ'ল, তুমিই ওকে তাড়ালে। মেয়েটার এখন কি হবে?"

সত্যিই বাবা অশোককে পছন্দ করতেন না। মা'কে কতদিন তীব্রকণ্ঠে ভর্ৎসনা করতে শুনেছে, "তোমার যত কথা, আমাকে সারাজীবন কষ্ট দিয়েছ, এখন মেয়েটাকে কষ্ট দিতে চাও।" বাবা মা'র কথার কোন জবাব দিতেন না, তাঁর নির্ব্বিকার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হ'ত তিনি মা'র একটি কথাও শোনেন নি, মা'র উত্তাপের কারণ বুঝত মালশ্রী, দারিদ্র্যের যন্ত্রণা প্রথম জীবনে যথেষ্ট পেয়েছিলেন তিনি। ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন —সুপ্রকাশকে। ধনী বাপের একমাত্র আদরিণী কন্যা। দেড়'শ টাকা মাইনের এক স্কুল মাষ্টারকে বিয়ে করেছিলেন বাড়ীর সব আপত্তি অগ্রাহ্য করে। কিন্তু দারিদ্র্যকে বরণ করার মত মন ছিল না তাঁর। তাই তিলে তিলে শুকিয়ে গেছে সেই প্রেমের প্রবাহ— দারিদ্র্যকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করেন মালশ্রীর মা সুজাতা দেবী। সেই সঙ্গে স্বামীর উপর শ্রদ্ধাও হারিয়েছেন।

আধুনিক সামাজিক কৌলিন্য অশোকের যথেষ্ট ছিল। সে নিজে চার্টার্ড অ্যাকাউন্‌টেণ্ট, তার বাপের অগাধ টাকা। অশোকই তাঁর একমাত্র সন্তান। মেয়ে তাঁর এতখানি ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হবে, সে কথা ভেবেই সুখী হয়েছিলেন সুজাতা দেবী, অন্য কোন কথা ভাবেন নি। অন্য সম্পদ · সুপ্রকাশেরও যথেষ্ট ছিল, কিন্তু শুধু

তাতেই কি সুখ মিলেছিল তাঁর ? মেয়ের সৌভাগ্যের কল্পনায় নিজের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়ার স্বাদ পেতেন সুজাতা দেবী—সুখ-স্বপ্নে মগ্ন হয়ে যেতেন। সেই স্বপ্নের নেশা মালশ্রীর মনেও দোলা দিত—শুধু প্রণয়ের বিহ্বলতা নয়, এক অসীম সুখের আশাও জড়িয়ে থাকত তার সঙ্গে। ঐশ্বর্য্যের সুখ, সমারোহের সুখ, সামাজিক সম্মানের সুখ—আর তার সঙ্গে এক পরম-সুন্দর মানুষের প্রণয়িনী হবার সুখ। সব সুখ কেড়ে নিয়ে অশোক চলে গেল। বাড়ীর সবার স্বপ্ন ভাঙল। বাবার মুখ দেখে কিছু বোঝা গেল না, হয়ত তিনি খুসীই হয়েছিলেন। সেদিনের সেই দুঃসহ মুহূর্ত্তে বাবার ওপর প্রচণ্ড রাগ হয়েছিল, অভিমানের সমুদ্র উথলে উঠেছিল বুকে। মনে হয়েছিল, এই বিয়ে বাবা চান নি বলেই এমনি করে সব শেষ হয়ে গেল।

সেদিন অনেক রাত্রে বাবা এসেছিলেন তার ঘরে। তার কান্নাভেজা গালের ওপর হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন। চুলের ভেতর অনেকক্ষণ ধরে আঙুল চালাতে চালাতে বলেছিলেন, "কিছু ভাবিস্ না মালা, সব ঠিক হয়ে যাবে।" সেদিন মনে হয়েছিল কি অসম্ভব কথাই না বলছেন বাবা। অশোককে কি সারাজীবনেও ভুলতে পারবে ? কিন্তু সত্যিই ত আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে গেল। বিস্মরণের অতল সাগর গ্রাস করল তার বেদনার ইতিহাস—নতুন পটভূমিতে আবার নতুন সুখের রেখা দেখা দিচ্ছে যেন। 'নূতন সুখের' কথাটা ভাবতে গিয়ে চমকে উঠল মালশ্রী। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে কাল রাতের কথাটাই ভাবতে বসল আবার···

···সরলা—সেই লোধা মেয়েটি। তন্বী দীর্ঘাঙ্গী, নিকষ-কালো চেহারায় অপরূপ লালিত্য মাখান। সব সময় হাসত সে, সেই মেয়েটির করুণ আর্ত্তনাদ। নিজেকে বড় অসহায় লাগছিল। দীপকের দিকে তাকিয়ে দেখছিল, তার মুখে উদ্বেগের চিহ্নমাত্র নেই, নির্ব্বিকার ভাবে বলেছিল, "ডাক্তারবাবুকে একবার ডেকে আনি। কেসটা বোধহয় খুব সহজ হবে না। আপনি ততক্ষণ ওর কাছে বসুন।"

হাসপাতালের নার্স সুধাদিও অনুপস্থিত, তার জ্বর হয়েছে। দাইটা শুধু ছিল। মালশ্রী সরলার পাশে বসেছিল চুপচাপ। যন্ত্রণায় সরলার মুখ বিকৃত হচ্ছিল, কি বীভৎস দেখাচ্ছিল সেই ঢলঢলে মুখখানা।

এসব ব্যাপারে সে একেবারে অনভিজ্ঞ, অথচ দীপক তাকেই ডেকে পাঠিয়েছিল, শোভনাদি দু'দিনের জন্য কলকাতায় গেছেন। উষাদি ছেলেমেয়েদের ফেলে আসবেন না। তাছাড়া এসব ব্যাপারে তিনি আসতে চানও না। বড্ড ছোঁয়াছুঁয়ি বাই তাঁর। আশ্রমের অনেকখানি দায়িত্বই মালশ্রীর ওপর দিয়ে গিয়েছিলেন শোভনাদি—রমা ছেলেমানুষ, সরস্বতী বিশেষ কিছু বোঝে না—কলের মত খাটতেই পারে শুধু। সুখদাবাবুকে কিছু বলতে যাওয়া বৃথা, শোভনাদির কোন অনুরোধই তিনি রাখেন না, আর রাখলেও শেষ পর্য্যন্ত আর কারও ওপর দায়িত্ব দিয়ে চুপ করে বসে থাকেন। অগত্যা দীপক আর মালশ্রীকেই সব ভার নিতে হয়েছিল, আর শোভনাদির অনুপস্থিতিতেই এই ব্যাপার। হাসপাতালটা বিদ্যালয়েরই এলাকার ভেতরে—কে একজন কিছু টাকা দিয়েছিলেন—তাতেই তৈরী হয়েছে হাসপাতাল। কাছাকাছি ভাল কোন হাসপাতাল নেই, এটা থাকতে গ্রামের লোকদের অনেক ভাবনা ঘুচেছে।

কাল উপায়ন্তর না দেখে মালশ্রীকেই ডেকেছিল দীপক। মালশ্রী কিন্তু মনে মনে ভয়ে সারা হয়ে গিয়েছিল। তার অক্ষমতার সীমা নেই যেন। সরলাকে বেদনা থেকে মুক্তি দিতে পারছে না, শুধু তার দুঃসহ কষ্টটাই চোখ মেলে দেখছিল। অনেকক্ষণ বাদে দরজার কাছে খস্‌খস্ আওয়াজ শুনে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল, ভেবেছিল দীপক বোধহয় ফিরে এসেছে। বেরিয়ে দেখল একটা জংলী চেহারার লোক ভীতত্রস্ত মুখে দাঁড়িয়ে— "কে রে ?" মালশ্রী প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিল। ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছিল হাসপাতালের দাই লক্ষ্মীমণি—ওকে দেখে একগাল হেসে বলেছিল, "ও ত জংলা, সরলার মরদ। কি রে ভয় লাগছে বুঝি—ভয় করছিস্ কেনে। দেখিস্—ছেইলে লিয়ে সরলা ঠিক ঘর যাবে"

জংলা নিরুত্তরে চেয়ে ছিল। সেই অবোধ বন্য লোকটার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হয়েছিল তার। সেও ত মালশ্রীর মতই অক্ষম, অসহায় দৃষ্টিভরা চোখ, মনের বেদনা প্রকাশের ভাষা ছিল না। উদ্বেগ,

উৎকণ্ঠার ছায়া পড়েছিল সেই ক্ষীণ মুখের রেখায়। বারান্দার ওপর উবু হয়ে বসেছিল লোকটি। ভেতরে গিয়ে আবার সরলার পাশে বসেছিল মালশ্রী। তার পরের ঘটনাগুলো পর পর মনে পড়ে না। কি বীভৎস আর্তস্বর উঠল সরলার কণ্ঠ থেকে। ডাক্তারবাবুকে নিয়ে দীপক এসে পৌঁছল, পাশের ছোট ঘরটায় সব ব্যবস্থা করে মালশ্রীকে ডেকে পাঠালেন ডাক্তারবাবু—যন্ত্রচালিতের মত তাঁর সব আজ্ঞা পালন করেছিল মালশ্রী—হাত কাঁপছিল থরথর করে, সারা কাপড়ে রক্তের ছিটে। শুধু এইটুকু মনে আছে, সরলার প্রাণ বেঁচে ছিল, শিশুর জীবন বলি দিয়ে। সব শেষ হয়ে যাবার পর বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল মালশ্রী। তখনও ওর সমস্ত শরীর কাঁপছিল থরথর করে, আর একটু হ'লে টলে পড়ে যেত। এর মধ্যে ও দেখেছিল, দরজার পাশে তেমনি নিঃস্পন্দ ভাবে বসে আছে সরলার স্বামী জংলা।

দীপক এসে দাঁড়িয়ে ছিল বারান্দায়, এলোমেলো চুল, ঘামে ভেজা সার্ট। হঠাৎ কেমন অসহায় লেগেছিল নিজেকে, অসহ্য যন্ত্রণায় ব্যথা করছিল বুকটা, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল মালশ্রী। সেই মুহূর্ত্তে একটা বলিষ্ঠ হাতের স্পর্শ পেয়েছিল পিঠের কাছে, "ছিঃ, ছেলেমানুষী করবেন না, ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন, আপনাকে না ডাকলেই হ'ত। এত নার্ভ দুর্ব্বল নাকি আপনার?" জলভরা চোখ মেলে তাকিয়ে ছিল মালশ্রী। পিঠের ক্ষণিক স্পর্শটা তখন আর নেই। দীপকের কথার কোন জবাব দিতে পারে নি। দীপকই বলেছিল, "শুতে যান—রাত আর নেই, চারটে বাজে···"

আকাশের দিকে চেয়ে দেখেছিল, চাঁদ অস্ত গেছে, শুকতারার দীপ্তি তখনও মেলায় নি—নির্জ্জন, নিস্তব্ধ চার দিক—মোরগের ডাক শোনা যাচ্ছিল। আচ্ছন্নের মত ফিরে এসেছিল নিজের ঘরে। দীপকও সঙ্গে ছিল, ঘরে ঢোকার আগে বলেছিল, "ওষুধ কিছু খাবেন কি? আমার কাছে আছে।"

ঘাড় নেড়ে 'না' ব'লে ঘরে ঢুকে পড়েছিল মালশ্রী। বালিশে মুখ গুঁজে সারারাত ধ'রে কেঁদেছিল। শঙ্কা বেদনা, আর বুঝি একটু আবেগ জড়ানো ছিল সেই কান্নার সঙ্গে। আজ ত সকাল থেকে ক্লাস নেই। ক্লাস করবার শক্তিও ছিল না তার। সকাল থে[ke] ত শুয়ে বসেই কাটাচ্ছে, মনে মনে কেন জা[নি] উৎসুক হয়েছিল। কিসের প্রত্যাশায় তা [সে] নিজেও ভাল করে জানে না। জানলার ধারে এসে দাঁড়াল। চারদিকে যেন অকুল সমুদ্র, সীমারেখা নেই তার। গেট খোলার শব্দ হ'ল। শোভনাদি এসে গেছেন, সঙ্গে দীপক। ওর ঘরের সামনে দিয়েই চলে গেলেন ওঁরা। অকারণেই বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। জানলার শিকে মাথাটা রাখল।···

বিকেলের দিকে শোভনাদি ডেকে পাঠালেন তাকে, দশ-বারদিন বাদে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস। ছেলেমেয়েদের দিয়ে একটা কিছু করানো চাই। মালশ্রীকে শেখাবার ভার নিতে হবে। রাজী হয়ে গেল মালশ্রী। একটা কিছু করতে পেয়ে বেঁচে গেল সে।

ঠিক হ'ল রবীন্দ্রনাথের চণ্ডালিকা হবে। ছেলেমেয়েদের নিয়ে রোজ রিহার্সাল সুরু করল মালশ্রী। দীপক, রমাও যোগ দিল তার সঙ্গে। শেষ পর্য্যন্ত বেশ ভালই হ'ল অভিনয়, সকলেই খুশী হলেন, উচ্ছ্বসিত হলেন শোভনাদি। সদা অপ্রসন্ন উষাদি পর্য্যন্ত হাসিমুখে বললেন, "বেশ করেছে কিন্তু এরা" দীপক সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, "গেঁয়ো ভূতদেরও তাহলে কিছু গুণ আছে, আপনি পর্য্যন্ত মুগ্ধ!"

মিলিত হাস্যরোলে উষাদির প্রতিবাদ শোনা গেল না। অভিনয় শেষ হ'ল। কিন্তু তার রেশটুকু ছড়িয়ে রইল চারদিকে। এ ধরনের কিছু কখনও হয় নি এখানে, তাই সকলের মনেই মুগ্ধতার আবেশ জড়িয়ে রইল। বৈচিত্র্যহীন জগতে নতুনত্বের স্বাদ। কেউ ভুলতে চাইল না, আঁকড়ে ধরে রইল এই নতুনত্বকে। মালশ্রীরও অনেকদিন পর ভাল লাগছিল খুব, সফলতার আনন্দ অনুভব করছিল সে। যে ছেলেমেয়েদের নিতান্ত সাধারণ মনে হ'ত, তাদের মধ্যে যেন এক অসামান্য দীপ্তি দেখতে পেল সে। কেউ কম নয়, সকলের মধ্যেই সম্পদ আছে, তাকে খুঁজে নিতে হয়। ওদের জন্য কোমল মমতায় ভরে গেল মন।

দু'একদিন পরের কথা, রমা এসে ঢুকল ঘরে, "মালাদি, আজ যাবেন আমার সঙ্গে?"

"কোথায় ?"

"গ্রামের ভেতরে, উধাদিই যান—আজ তাঁর শরীরটা ভাল নেই, আপনি চলুন না—কোন দিন ত যান নি।"

প্রস্তাবটা মন্দ লাগল না, এও একটা নতুনত্ব, গণ্ডির বাইরে পা বাড়ানো, এমনিতে ত যাওয়া হয় না।

রাজী হয়ে গেল। গ্রামের নাম লক্ষ্মী-সাগর। প্রধানতঃ কামার, কুমোর আর গয়লাদের গ্রাম। কিন্তু আদিবাসীও আছে—লোধা, অবর। ক'ঘর ব্রাহ্মণও আছেন। ডোম, বাগদী, হাড়ীও কিছু কিছু দেখা যায়, গ্রামের শেষ প্রান্তে এদের বাস। সমাজ-কল্যাণ সংস্থার একটা কেন্দ্রও আছে—এখানে। সেখানকার গ্রাম-সেবিকা "স্বর্ণলতা" বিদ্যালয়ের পুরণো ছাত্রী।

রাস্তায় বেরিয়ে রমা বলল, "প্রথমে শোভার কাছে যাই চল, ওর কাছে একটা প্যাটার্ণ শিখতে যাব, ক'দিন ধরেই ভাবছি—যাওয়া আর হয় না।"

গ্রামসেবিকার নাম শোভা। মাঠের মধ্যে দিয়ে পথ, দু'পাশে অন্তহীন প্রান্তর, ধূ ধূ করছে, তাপদগ্ধা ধরিত্রী। মরুভূমির সঙ্গে কোথায় যেন সাদৃশ্য আছে। খানিকদূর যাবার পর গ্রামের সীমারেখা দেখা যায়, এখানে বেশ জন-বসতি। ছোট ছোট মাটির ঘর, ঘরের পেছনে বাঁশ-ঝাড়, কলাবাগান, আম-কাঁঠালের গাছ।

গ্রামের ভেতর সবে ঢুকেছে—রমা বলল, "এটা গয়লা পাড়া—"

এগিয়ে যাচ্ছে, বাঁশঝাড়ের পেছন থেকে কে একজন উঁকি মারল।

"ওমা, রমা দিদি যে, একটু দাঁড়াও—" বলতে বলতে বেরিয়ে এল একটি ষোল-সতের বছরের মেয়ে। মালশ্রীর দিকে তাকাল, কৌতূহল সম্বরণ করতে না পেরে বলেই ফেলল, "সঙ্গে সোন্দর মত উটি কে গো ?"

ওরা দু'জনেই হেসে ফেলল, রমা হাসতে হাসতেই জিজ্ঞেস করল, "কেমন আছিস্ গৌরী ?"

"ভালই, আপনাদের আশীর্ব্বাদে। একবারটি চলুন, আপনিও আসুন দিদি।" ওদের হাত ধরে টানাটানি সুরু করে দিল সে। যেতেই হ'ল অগত্যা। বাঁশঝাড়ের আড়ালে গয়লা-বৌ গৌরীর ঘর, সবটাই মাটির, কোথাও এতটুকু ধূলোর চিহ্ন নেই, গোবর-মাটি দিয়ে লেপা চারদিক। দাওয়ায় দু'খানা কম্বলের আসন এনে দিল গৌরী—ওরা বসল। মালশ্রী চেয়ে চেয়ে দেখছিল, মাচায় কুমড়ো ঝুলছে। একটি মোটাসোটা কালো ছেলে ধূলোয় শুয়ে খিল খিল করে হাসছে। নিকোনো দেয়ালে খড়িমাটি দিয়ে ছোটখাট লতা-পাতা ফুল-আঁকা ঘরের ভেতরটা প্রায়ান্ধকার, একটি জানলা, তাও অনেক উঁচুতে, আলো এসে ঘরে পৌঁছায় না। উঠোনের এক কোণে কুয়ো, কে একজন স্নান করছে। বউটি দাঁড়িয়েই রইল, বেশ হাসিখুসী চেহারা, এখনও কৈশোরের চপলতা জড়িয়ে আছে তার সর্ব্বাঙ্গে, কপালে একটা বড় সিঁদুরের টিপ, হাত-ভর্ত্তি নীল কাঁচের চুড়ি।

গুটিপাঁচেক উলঙ্গ ছেলেমেয়ে দাওয়ার কোল ঘেঁষে দাঁড়াল, চোখে উগ্র কৌতূহলের দৃষ্টি। রমা ওদের পরিচিত, ওরা দেখছিল মালশ্রীকে।

রমা বলল, "বোস্ গৌরী, সেদিন থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলি ?"

"হ্যাঁগো দিদি, খুব ভাল, আবার কবে হবে ?"

রমার গা ঘেঁষে ব'সে পড়ল গৌরী, থিয়েটারের উল্লেখে তার মুখ উৎসাহে দীপ্ত হয়ে উঠেছে, ঘোমটা খ'সে গেছে মাথা থেকে। ঘরের ভেতর থেকে একজন বর্ষীয়সী বিধবা বেরিয়ে এলেন, দু'খানা পেতলের রেকাবিতে গুটিচারেক নারকেল নাড়ু, বড় কাঁসারবাটি ভর্ত্তি মুড়ি। খাবারের পরিমাণ দেখেই প্রমাদ গণল ওরা, কিন্তু আপত্তি করেও কোন ফল হ'ল না। খেতেই হ'ল খানিকটা, বাকিটা ছেলেমেয়েদের হাতে ভাগ করে দিল মালশ্রী। খাওয়া সেরে বেরোতে বেরোতে অনেকটা দেরি হয়ে গেল।

ওদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে ক্ষণেকের জন্য উন্মনা হ'ল মন—ঘর, সংসার, স্নেহ-নিবিড় আশ্রয়…

রমা বলল, "শোভার কাছে আজ আর যাব না মালাদি, চলুন, ফিরে যাই।"

ফিরে আসছে, পথে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। রোগা, লম্বা চেহারা—ঘর্ম্মাক্ত কলেবর।

"এই যে, কোথায় যাওয়া হয়েছিল ? আপনাদের 'থেটার' দেখলাম, যেন একেবারে রামায়ণের পালা গান। আহাঃ আহাঃ, কি মধুর। বুঝলেন, আমিও

লিখি, ঐ যাত্রার পালাটাকা···বড় মনোরম হয়েছিল সেদিনের অনুষ্ঠান। ভোলা যায় না। আচ্ছা চলি, নমস্কার।"

ভদ্রলোক চলে যাবার পর মালশ্রী রমাকে প্রশ্ন করল, "উনি কে রমা?"

"এখানকার বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের মাষ্টার, রাধাকান্ত দত্ত। ভদ্রলোক কবিতা লেখেন।"

আবার সেই মাঠের মাঝখান দিয়ে পথ, দু'একটি লোধা মেয়ে চলেছে, কোলে স্তন্যপানরত শিশু। রমাকে দেখে পরিচিতির হাসি হাসল। পথে চলতে চলতে মনটা আশ্চর্য্য রকম হাল্কা হয়ে গেল মালশ্রীর। কি যেন পেয়েছে সে। সকলের প্রশংসায় মন ভরে উঠেছে, হয়ত সত্যিকারের রসগ্রাহী নয়, অল্পেই আনন্দ পায়। তবু ওদের দীপ্ত মুখচ্ছবি মালশ্রীকে এক পরম পরিতৃপ্তিতে ভরে দিল।

দীপক বেলফুল গাছের গোড়া খুঁড়ছিল, ঘরের সামনের এই গাছ ক'টি তার নিজের হাতে লাগান। বিকেলে ক্ষেতের পরেও কাজ তার ফুরোয় না। একটু পরেই প্রার্থনার ঘণ্টা পড়বে, তাড়াতাড়ি গোড়ার মাটি-গুলো নেড়েচেড়ে দিতে লাগল দীপক। সামনে দিয়ে কেয়াকে যেতে দেখা গেল, এ মাসের অনুষ্ঠান পরি-চালনার ভার ওর ওপর। এখানকার নিয়মানুসারে প্রত্যেক মাসেই এক একজনকে এ কাজের জন্য নির্ব্বাচিত করা হয়, ছাত্র-ছাত্রীরাই তাদের মধ্যে থেকে নির্ব্বাচন করে।

দীপক কেয়াকে ডাকল, "প্রার্থনায় আজ কার গান?"

"মালশ্রীদিকে বলেছি, উনিই করবেন।"

"ভাল করেছিস।"

চ'লে গেল কেয়া। ক'দিন আগের একটি ছোট্ট ঘটনা মনে পড়ল দীপকের, সারাদিন ব্যস্ত ছিল হিসেব-পত্র নিয়ে, আজকাল সুখদাবাবু একা পেরে ওঠেন না। ইচ্ছাকৃত অবহেলাও আছে, তাই শোভনাদি দীপককেও কিছু কিছু কাজের ভার দিয়েছেন। গোশালার সব ভারই এখন দীপকের···সেদিন গরুর জন্য খড় আনার দরকার। শোভনাদির ঘরে ঢুকেছে টাকা চাই হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মাটিতে মাদুরের ও শোভনাদি বসে আছেন, আর তাঁর সামনে দরজার দি পেছন করে মালশ্রী। কানে এল, মালশ্রী গাই "উদাসী হাওয়ার পথে পথে মুকুলগুলি ঝরে।"

হিসেবের খাতাটা পেছনে লুকিয়ে ফেলল, চ আসবে। শোভনাদি ডাকলেন, "এস দীপক, মালশ্রী গান শুনবে।"

দীপক আমতা আমতা করে বলল, "আমি যে···ইে খড়···"

"সে হবে'খন। তুমি বোস ত, আমি বল্লভকে বলছি, ও বেশ পারবে।"

দীপককে বসে পড়তে হ'ল, গান সে চিরকালই ভালবাসে, নেহাৎই চক্ষুলজ্জার খাতিরে কাজের কথাটা পেড়েছিল। একটু দ্বিধা হচ্ছিল বসতে, ধুতিটা উঁচু করে পরা, পা-ময় কাদা, ঘরে ফিরে মনে হ'ল—মালশ্রী না জানি কি ভাবল তাকে। পরক্ষণেই তীব্র কশাঘাতে নিজেকে সচেতন করল। কারও মনে করাতে কি আসে-যায় তার?

মালশ্রী আর পাঁচজনের মত এখানকারই একজন কর্মী। তার মনে করা নিয়ে অত ভাববারই বা কি আছে? আবার গানের কথাটা মনে পড়ে—তার নিজের কথাও ভাবল। এখানে আসার পর থেকে নানা ব্যস্ততায় দিন কাটে, ইদানীং গান-বাজনার পাট প্রায় তুলেই দিয়েছে। কালেভদ্রে সেতারটা নিয়ে বসে। ছেলেমেয়েরা কেউ কেউ ছুটে আসে, শুনতে চায়, এই পর্য্যন্ত। ক'দিন হ'ল সেটাও ভেঙে গেছে। সারাবার সময় করে উঠতে পারছে না। প্রথম প্রথম যখন এখানে এসেছিল, এত ব্যস্ততা ছিল না তখন সাধ করে নূতন সেতার কিনেছিল, রোজ সন্ধ্যায় অনেকক্ষণ ধরে বাজাত। আস্তে আস্তে প্রতিষ্ঠান বেড়েছে, বদল হয়েছে কর্ম্ম-সূচীর, কর্ম্মজগতের অন্তরালে হারিয়ে গেছে সঙ্গীত-লক্ষ্মীর সিংহাসন।

সেদিন মালশ্রীর গান শেষ হবার পর শোভনাদি তাকে বললেন, "এবার তোমার পালা—তুমি গাও একটা।"

দীপক হাসল, "আমি ওসবের মধ্যে নেই, কবে ছেড়ে য়েছি।"

"ওসব বাজে কথা শুনতে চাই না। তোমার গান আমি আগে অনেক শুনেছি।" শোভনাদি ধমকে উঠলেন।

"গান না।" মালশ্রীও অনুরোধ করল।

কারও অনুরোধই সেদিন রাখতে পারে নি, সঙ্কোচ হয়েছিল খুব। মনে মনে ঠিক করেছিল, এবার থেকে আর সুরকে এমনি করে অবহেলা করা চলবে না। সেতারটা সারিয়ে আনবে, রোজ সন্ধ্যায় বসতে হবে একবার।

আজকাল মাঝে মাঝে রাত করে ফেরে, 'বয়স্ক শিক্ষার' াস নেয় সন্ধ্যায়। ফিরতে দেরি হয় অনেক সময়। কদম-াটের পাশ দিয়ে পথ, ধানক্ষেতের আল, বাঁশঝাড়ের ন অন্ধকার। কতদিন টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ে···গলা ড়ে গান গায় দীপক। বেশ লাগে, মনে হয়, পাতাল-রীর দরজা খুলতে চলেছে সে। নাই রইল পক্ষীরাজ। কশোরের হারানো জগতটা আবার দেখা দেয় াখের সামনে···ভাবতে ভাবতে আকাশের দিকে াখ পড়ল, তারা ফুটছে, চারদিক অন্ধকার। ঘরে কে তাড়াতাড়ি লণ্ঠনটা জ্বালাল—কে একজন চলে গেল রের সামনে দিয়ে। শাড়ীর রঙটা আবছা চোখে াগল, বোধহয় মালশ্রী। হঠাৎ একটা কথা মনে হ'ল, মনিতে মালশ্রীকে এখানে বড় বেমানান লাগে, ও যে-গতের অধিবাসিনী তার সঙ্গে এখানকার কারও ামান্যতম পরিচয়ও নেই। তবু মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, র সঙ্গে যতটুকু কথাবার্তা হয়েছে তাতেও বুঝেছে, এ ায়গা সম্বন্ধে অবহেলা কিছু নেই ওর মধ্যে, করুণাও য়। নিজেকে একেবারে আলাদা করে ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে া ওর স্বভাব নয়, যতটুকু দূরত্ব রয়েছে, সে ব্যবধান ানদিনই ঘুচবে না। মালশ্রী যে-পৃথিবীতে মানুষ য়েছে, তার প্রকৃতি একেবারে আলাদা। এখানকার ঙ্গ নিজেকে মেলাতে চাইছে, কিন্তু সেটা যে চেষ্টাকৃত—াও বোঝা যায় প্রতিপদে। উৎসাহ আছে, সহজ খুশীর াপ্তিতে উজ্জ্বল হ'তে জানে, তবু ওরা সবাই বোঝে, এখানে কোন কিছুর প্রত্যাশায় আসে নি। এখানে াসার সঠিক কারণটা দীপক জানে না—অর্থের অভাবে নয় নিশ্চয়ই, আশ্রয়ের অভাবও নয়। তাই মাঝে মাঝে মনে হয় ও বেশীদিন থাকবে না এখানে। শোভনাদি একবার কথায় কথায় বলেছিলেন, "মালশ্রী আর ক'দিনই বা থাকবে এখানে? এরা কি থাকবার জন্য আসে? ঝোঁকের মাথায় এসেছে, আবার চলে যাবে।"

সত্যিই হয়ত তাই। মালশ্রী কর্ত্তব্যপরায়ণা, তার উৎসাহে কোন খাদ নেই, তার আনন্দ, হাসি, গান, সবই স্বতঃস্ফূর্ত্ত। তবু সে সুদূরতমা। এখানকার সঙ্গে তার কোন বন্ধন নেই। সে ভিন্ন গ্রহের অধিবাসিনী।

টেবিলের ওপর রাখা ঘড়িটার দিকে চোখ পড়ল। সাড়ে সাতটা বাজে। কখন প্রার্থনার ঘণ্টা পড়ে গেছে, এতক্ষণে শেষও হয়ে গেল। কি এত ভাবছিল? প্রার্থনায় যাওয়া হ'ল না, এপর্য্যন্ত যা কখনও হয় নি। নিজেকে কঠিন ভাবে তিরস্কার করল, লণ্ঠনটা টেনে নিল সামনে—একটা বই খুলে পড়ায় মন দিল। সময় নষ্ট করলে তার চলবে না।···

গ্রীষ্মের ছুটি হ'তে আর দেরি নেই; দিন চারেক বাকী। মালশ্রীর মাঝে মাঝে বেশ হাল্কা লাগছে। বাড়ী যাবার কথা ভাবলে খুসী হয়ে উঠছে মন, সেই পুরণো জগতটাকে আবার ফিরে পাবে, সেই হাসি, গান, আনন্দ। ছোড়দার সঙ্গে গল্প, মধুশ্রীর সঙ্গে খুনসুটি, মা'র হাতের কাটলেট খাওয়া, ঘরের জানলায় ব'সে আলোকোজ্জ্বল রাজপথের অজস্র দৃশ্য দেখা। ভাবতেই রোমাঞ্চ হচ্ছে তার। কিন্তু তবু কোথায় যেন কাঁটা বিঁধছে, মাঝে মাঝে এর-ওর মুখ মনে পড়ে যাচ্ছে, অবাক্ হচ্ছে নিজেই। তবু এ ব্যাপারটাকে ঠিক অস্বীকার করতে পারছে না। এখানে ফিরে আসার কথাও মনে হচ্ছে মাঝে মাঝে। সেই ফেরাটা খালি নিরানন্দ কর্ত্তব্যের টানে নয়, আরও কোথায় যেন টান পড়ছে।

বিকেলে একবার শালবনের দিকে বেড়াতে গেল, একাই ঘুরছিল। মাটিতে শালফুলের কোমল আস্তরণ, গাছের ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখা যায়, দেখল, এরই মধ্যে কখন ঘন মেঘে সারা আকাশ ছেয়ে গেছে, এক্ষুণি বোধ-হয় ঝড় উঠবে। ফেরার জন্য পা বাড়াল, পিছনে পায়ের শব্দ শুনে চমকে তাকাল। দেখে দীপক।

কি, বেড়াতে এসেছেন, একা একা ভয় করল না?

"কি, বেড়াতে এসেছেন, একা একা ভয় করল না?" হাসিভরা চোখে প্রশ্ন করল দীপক।

মালশ্রীর হঠাৎ কি যে হ'ল, কিছুতেই সহজ হ'তে পারল না, কি রকম বিবর্ণ হয়ে গেল তার মুখ, একটু হাসল কোনমতে। দীপকই তাড়া লাগাল, "চলুন তাড়াতাড়ি, ভীষণ ঝড় আসছে।" ওর হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টির সঙ্গে ক্ষণেকের জন্য মিলল মালশ্রীর দৃষ্টি, পরক্ষণেই নামিয়ে নিল চোখ। কালো হীরে কখনও দেখে নি সে, মা'র গডরেজের লকারে রাখা সাদা হীরের আঙটিটা অনেকবার দেখেছে।. কিন্তু তারা কি এর চেয়েও উজ্জ্বল। খানিক দূরে এগোতে না এগোতেই ঝড় উঠল —লাল ধুলোর ঝড়। অকাল-সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। বুকের মধ্যে দুরুদুরু করে কাঁপতে সুরু করল মালশ্রীর। ঝড়কে বড্ড ভয় তার, বাজ পড়াকে আরও। ছোটবেলায় বাজের শব্দে মাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরত, এই ত সেদিনও কলকাতায় বিদ্যুৎ চমকালেই এক ছুটে ছোড়দার ঘরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াত। ছোড়দা দুষ্টু হেসে প্রশ্ন করত, "কি রে মালা? ভয় করছে বুঝি?"

দীপকের কিন্তু কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। সে চেঁচিয়ে গান ধরল, 'ঝরে যায় উড়ে যায় গো।' মালশ্রী এক পা'ও এগোতে পারছিল না। ঝড়ে আঁচল উড়ে যাচ্ছে, চুল এলোমেলো। হাঁটতে গিয়ে পড়েই যাচ্ছিল সে, দীপক গান থামিয়ে বলল, "এই গাছটার তলায় দাঁড়ান একটু, ঝড় না থামলে যেতে পারবেন না।"

গাছতলায় খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল ওরা। দীপকই প্রশ্ন করল, "সোমবার কখন যাচ্ছেন?"

"সকালেই যাব ভাবছি, ওই ট্রেণটাতেই সুবিধা।"

"আমরাও সকালে যাব, এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে বেশ।"

"আপনি কি কলকাতায় থাকেন?"

"না, দমদমে। আপনি?"

"বালিগঞ্জ।"

"বালিগঞ্জ ছেড়ে একেবারে বাঁকুড়া, নেহাৎই রসিকের মত কাজ করেছেন।" হেসে উঠল দীপক।

মালশ্রীও হাসল।

"এখানে ভাল লাগে আপনার?"

"হ্যাঁ, ভালই লাগে, আপনার লাগে না?"

"আমার ত এখানেই সব—অনেকদিন আছি, হয় ত ারাজীবন থাকব, ভাললাগা না লাগলে ত াচবই না।"

কথা বলতে বলতেই অঝোর ধারায়বৃষ্টি নামল, জ্যৈষ্ঠের অপরাহ্ণেই ঘনালো শ্রাবণের সন্ধ্যা। গাছের তলায় দাঁড়িয়েও সর্বাঙ্গ ভিজে গেল, ভিজতে ভিজতেই 'ওনা দিল শেষ পর্য্যন্ত। পা বাড়াতেই বিদ্যুৎ চমকাল, ঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বজ্রপাতের শব্দ, ভয়ে কেঁপে উঠল লশ্রী, স্থান-কাল-পাত্র ভুলে সজোরে চেপে ধরল পকের হাত। পরক্ষণেই সচেতন হয়ে ছেড়ে দিল। পক কিন্তু নির্বিকার, তাকে বিশেষ বিচলিত মনে হ'ল । মালশ্রীর কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করছে, বুকের ভেতরটা পছে একটু একটু। ঘরের কাছাকাছি এসে দীপক বলল, ক ভীষণ ঠাণ্ডা লাগছে বাব্বা, শীগ্‌গির কাপড় ছেড়ে লুন, নিউমোনিয়া বাধাবেন শেষকালে, আমাদের নাম করবেন।"

চ'লে গেল সে। মালশ্রী অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল জায়। কাল রাত্রের স্বপ্নের দেখা মুখটা মনে পড়ল।

জানলা দিয়ে বাইরে চেয়েছিলেন শোভনাদি। কি ড় উঠেছে। বৃষ্টির ছাট এসে গায়ে লাগছে, তবু ভাল াগছে দেখতে, প্রকৃতির এই উদ্দাম তাণ্ডব। জানলাটা করতে ইচ্ছে করছে না। নটরাজের প্রলয় নৃত্যের রু বাজছে আকাশে বজ্রের শব্দে। 'অগ্নিতীক্ষ্ণ বজ্র-ণ দিগন্তের তূণ ভরি একান্তে করিয়া গেল দান'— ামনাথ প্রায়ই আবৃত্তি করতেন কবিতাটি। হঠাৎ দ্যুতের আলোয় চারদিক উদ্ভাসিত হ'ল, কড়কড় রে বাজ পড়ল একটা, মুহূর্ত্তের জন্য দেখতে পেলেন মনের রাস্তায় দুটি মূর্ত্তি, এদিকেই আসছে ওরা। চনেছেন তিনি, দীপক আর মালশ্রী। ক'দিন ধরেই ক্ষ্য করেছেন—মালশ্রীর উন্মনা ভাব, দীপককে দেখলে কটু দীপ্ত হয়ে উঠে তার মুখ। দীপকের মনের কথা অত সহজে বোঝা যায় না, সে বড় চাপা ছেলে, তার কৌতুকপরায়ণতার আড়ালে অনেক বেদনার ইতিহাস চাপা থাকে। তবু শোভনাদি তাকে অনেকদিন ধরে জানেন বলেই তার মনের কথাটাও ধরে ফেলেন অনেক-সময়। দীপকের চোখে ক'দিন ধরে একটা ঔৎসুক্যের ছায়া দেখছেন তিনি। দীপক চিরকালই নির্বিকার, কারও সম্বন্ধে বিশেষ করে উৎসুক হয় না সে। এখানে ত কতদিন আছে ও, কোনদিন কারও প্রতি ব্যবহারে এতটুকু আতিশয্য ঘটে নি। আজকাল মালশ্রীকে দেখলে ওর চোখের ঔজ্জ্বল্য, আর ঔৎসুক্য শোভনার চোখ এড়ায় নি। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-দিবসটি মনে পড়ছে, সকালবেলা সারা আশ্রম প্রদক্ষিণ করে গান হ'ল। 'আমার আনন্দ ঐ এল দ্বারে'—দীপক মালশ্রী দু'জনেই গাইছিল, সঙ্গে ছেলেমেয়েরাও ছিল। বেশ লাগছিল, দু'জনে পাশাপাশি গাইতে গাইতে যাচ্ছিল। অজ্ঞাতসারেই কখন চোখোচোখি হচ্ছিল দু'জনের— ভারী কোমল লাগছিল দীপকের চাহনি। সেদিন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠানের পর বারান্দার এককোণে দীপক দাঁড়িয়ে ছিল, হাতে একরাশ পদ্ম। পাশ দিয়ে যেতে যেতে মালশ্রী বলে উঠেছিল, "বাঃ, কি সুন্দর!"

"নেবেন?"

"আপনিই রাখুন না।"

"আমাদের কালো কেঠো হাতে কি পদ্ম মানায়?"

হেসেছিল দীপক। সেদিন এত তলিয়ে ভাবে নি। স্পষ্টতর হয় নি কিছুই—আজ মনে হচ্ছে দীপকের স্বভাবজাত কৌতুকের সুর সেদিন যেন ধ্বনিত হয় নি তার কণ্ঠে।

মনে হচ্ছে, দীপকের ঐ পাথরের মত মনে কোথায় চিড় ধরেছে। বুঝতে পারেন সব। ওরা নিশ্চয়ই তাঁর মত পাগলামি করবে না। জীবনের ঐশ্বর্য্যকে দূরে সরিয়ে দেবে না। তাঁর মত কি নিজেকে ক্ষয় করে কেউ, তিলে তিলে জমিয়ে তোলে অপরিসীম ক্লান্তির ভার? তিনি যদি আজ সুখদাবাবুকে ফিরিয়ে না দিতেন তা হ'লে হয়ত এমন শ্রান্তির ভারে···পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করেন শোভনা। ছিঃ, একি ভাবছেন তিনি? সত্যিই কি এত ম্লান হয়ে গেছে সোমনাথের

স্মৃতি? এমন কথাটা এতদিন পরে ভাবতে পারলেন তিনি? সুখদাবাবুর সঙ্গে সোমনাথের তুলনা হয়? এই পরিবেশে থেকে থেকে মনটা কেমন হয়ে গেছে। এ সবও ভাবতে পারছেন তিনি। তা না হ'লে এ চিন্তা কি সম্ভব ছিল কোন দিন? আর একটা কথাও ভাবলেন। মালশ্রী আর দীপক কি এক গোত্রের মানুষ? জাতের মিল আজকাল তুচ্ছ।

কৌলীন্যের মানদণ্ডের বদল হয়েছে। সেই কৌলীন্য কোথায় দীপকের? সরমার কাছে শুনেছেন, মালশ্রীর বাড়ীর লোকদের চালচলন রীতিমত বড়লোকের মত। তার দাদারা ভাল ভাল চাকরি করেন। মাও বড়-লোকের মেয়ে ছিলেন। মালশ্রী আর তার বোন ডায়োসেসনে পড়েছে, সরমাই বলেছে তাঁকে। মালশ্রীটা অবশ্য চিরকালই একটু ইমোশনাল। অশোক ওকে রিফিউস্ করাতেই এ সব হ'ল। বেসিক ট্রেণিং পড়ল। তারপর তোমাদের ওখানে চাকরি নিল, তা না হ'লে এ চাকরিতে ওর বাড়ীর কারও ত মত ছিল না, এক ওর বাবা ছাড়া।

তবে কেন জড়িয়ে পড়ছে মালশ্রী? হয় ত নিজের অজ্ঞাতেই জড়াচ্ছে। তবু সাবধান হওয়াই উচিত ছিল ওর। দু'জনেই হয় ত শেষ পর্য্যন্ত আঘাত পাবে, জীবনে আঘাত সম্বল করে লাভ কি? মালশ্রী কি তার জগতের দ্বার কোনদিন সম্পূর্ণ করে খুলে দিতে পারবে দীপকের কাছে? ওদের প্রাচীরের বেষ্টনী কি ভাঙবে কখনও? মনে মনে প্রশ্ন করেন শোভনাদি। ভাবেন—সকলেই বন্দী। কেউ বা কর্ত্তব্যের খাঁচায়, কেউ নিজেদের অতিপ্রিয় জগতের পরিচিত সুখের শৃঙ্খলে। মুক্তি চাইলেও মেলে না। নিজের কাছ থেকেই কি মুক্তি আছে? মালশ্রীই কি পারবে নিজেকে মুক্তি দিতে? এতদিনের পরিবেশ থেকে অল্প ক'দিনের জন্য বেরিয়ে এসে চাকরি নেওয়া যায়—দরকার হলেই আবার ফিরে যেতে পারবে সেখানে। যেখানে পরিচিত আরাম আছে, সুখ আছে—যার মধ্যে সে জন্মেছে, বড় হয়েছে। যাকে জীবনের সর্ব্বস্ব বলে জেনেছে চিরদিন তার বন্ধনকে তুচ্ছ করা কি এতই সহজ? চিরকালের জন্য সে জীবনকে ত্যাগ করতে পারবে মালশ্রী? সু তৃষ্ণা কি সর্ব্বগ্রাসী?

প্রেমের ঐশ্বর্য্য কি সর্ব্বোচ্চ নয়? এ প্রশ্নও জ

কাল থেকে ছুটি সুরু। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার শোভনাদির ঘরে একবার গেল মালশ্রী। দেখল, দ রমা সবাই আছে সেখানে।

শোভনাদি সাগ্রহে বললেন, "এসো মালশ্রী, কাল যাচ্ছ ত?"

"হ্যাঁ, কালই যাচ্ছি। আপনি?"

"আমি আর এবার যাব না—কোথাই বা যাব? ছাড়া এ সব ছেড়ে, বেশী দিন থাকাও হবে না কোথ এরা আমার গলার মালা।" হাসলেন, কিন্তু ক্লা সুর ফুটল শোভনাদির গলায়।

ঠোঁটের গোড়ায় এল, "কেন, আমাদের বাড়ী না"—কিন্তু বলতে পারল না কথাটা। তার বাড়ী কি শোভনাদিকে সত্যিই ডাকা চলে?

দীপক বলল, "আমাদের বাড়ী চলুন—বাবা খুব খু হবেন। আমিও ত পুরো ছুটি থাকছি না। দু'জ ফিরে আসব ক'দিন বাদে।"

"এবার থাক দীপক। পরে এক সময় দেখা যাবে ঘুরতে আর ভাল লাগছে না—এখানেই বেশ থাকব।"

এর পরে আর কথাবার্তা বেশ জমলো না। শোভনা-দিকে কেমন গম্ভীর অন্যমনস্ক দেখাল—দীপকের সহাস্য মুখেও কিসের ছায়া ঘনিয়েছে—রমাও চুপচাপ বসে ছিল। তারও কোথাও যাবার জায়গা নেই—ছুটির সময় সেও এখানেই থাকে। শোভনাদি যখন যান, অনেক সময় সঙ্গে নেন তাকে। এবারে সে আশাও নেই। মালশ্রী উঠল, শোভনাদির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাইরে এল।

আজ পূর্ণিমা। আকাশে মেঘ নেই, চারিদিক দিনের আলোর মত স্পষ্ট, শিরীষের গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে—ছেলেমেয়েরা যে-যার ঘরের সামনে বসে গান ধরেছে। লণ্ঠন নিবিয়ে দিয়েছে ওরা। মালশ্রী ঘরে ঢুকল না, কুয়োর কাছে এসে দাঁড়াল—সামনের বনস্থলী স্বপ্নাচ্ছন্ন। মনটা অকারণ বেদনায় ভরে উঠল। সেই কৈশোরের আনন্দ-বেদনা-মধুর দিনগুলি ভিড় করে

চোখের সামনে। যখন নিরাপদ নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের রালে স্বপ্ন-বিলাসে ডুবে ছিল শুধু, সেই স্বপ্নের হ আবার ঘিরে ধরল তাকে। পেছনে পায়ের শব্দ ল, দীপক আর রমাও এসে দাঁড়িয়েছে কাছে, ওদেরও জ্যোৎস্নার পেয়েছে বোধহয়।

"কি মালাদি? গান করছেন?" রমা ব'লে উঠল। হেসে ঘাড় নাড়ল মালশ্রী।

"আপনাদের বেশ মজা, কাল চলে যাবেন, আর আমি একা একা পড়ে থাকব।"

"তুমিও চল—তোমাকে বারণ করছে কে?" দীপক বলে উঠল।

"দূর—আমি চলে গেলে দিদিকে দেখবে কে? উনি ত আরও একা হয়ে যাবেন। ছেলেমেয়েরা থাকবে না—কাজও থাকবে না বিশেষ—কি নিয়ে থাকবেন উনি?"

সামনের গাছ থেকে হাত ভরে বেলফুল তুলছিল মালশ্রী। দীপক রুমাল পাতল। "আমাকে কয়েকটা দিন।' সব ফুলগুলিই দিয়ে দিল মালশ্রী।

তারপর প্রশ্ন করল, "কাল ত সোজা দমদম যাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ।"

"কলকাতায় কখনও আসেন না?"

"প্রায়ই আসি, বইয়ের দোকানে ঘুরে বেড়াই—ঐ ত আমার একমাত্র নেশা।"

"আমাদের বাড়ী যাবেন কিন্তু—নং হিন্দুস্থান পার্ক।"

"নিশ্চয়ই যাব।" দীপকের কণ্ঠে একটু আগ্রহের সুর।

কথাগুলি বলার আগের মুহূর্তেও ভাবে নি মালশ্রী, দীপককে তাদের বাড়ী যাবার জন্য অনুরোধ করবে। সব কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। আশ্চর্য্য জ্যোৎস্নার যাদু। মনের রংমহলের চাবিকাঠি তার হাতে—কোন অজ্ঞাত মুহূর্তে দ্বার খুলে যায়।

পরদিন শিয়ালদা পৌঁছতে বেলা দশটা। মালশ্রী জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়েই দেখল ছোড়দাকে। আশ্চর্য্য অনুভূতিতে মনটা ভরে গেল কতদিন বাদে দেখা। বাড়ীতে থাকলে এক মুহূর্ত ওর সঙ্গে খুনসুটি না করলে

দীপক রুমাল পাতল।...সব ফুলগুলিই দিয়ে দিল মালশ্রী

চলত না। সেই ছোড়দাকে এই ক'মাস একটা চিঠি পর্য্যন্ত লেখা হয় নি। আসার আগে কি রাগারাগিই না করেছিল। প্রথমে অভিমানে বুক ভরে গেল, চোখের জল সামলাবার আগেই ছোড়দা উঠে এল ট্রেণে—ধাঁই করে ও এক চড় মারল পিঠের ওপর। মালশ্রী ওর হাত চেপে ধরল সাগ্রহে। দীপক একটু দূরে বসেছিল। ওর হাতে একটা বই। বইয়ের আড়ালে মুখটা ভাল করে দেখা গেল না। মালশ্রী তাড়াতাড়ি নমস্কার করল একটা—তার পর দ্রুত পায়ে নেমে গেল ট্রেণ থেকে। কুলির জন্য হাঁকা-হাঁকি সুরু করল ছোড়দা। তারপর এগিয়ে গেল ট্যাক্সির সন্ধানে। সরস্বতীও ছিল গাড়িতে, কলকাতায় ওর পিসীর বাড়ী। দীপক ব্যাগ নিয়ে নামল এদিক্-ওদিক্ তাকাল। সরস্বতীর পিসতুতো দাদা বটুকচরণ একগাল হেসে এগিয়ে এলেন। সরস্বতীকে তার জিম্মায় দিয়ে প্লাটফর্ম্মের বাইরে পা বাড়াল দীপক। সামনে দিয়ে একটা ট্যাক্সি চলে গেল। জানলার কাঁচের আড়ালে আবছা দেখা গেল মালশ্রীর উজ্জ্বল মুখ।

দমদম পৌঁছতে বেলা হ'ল একটু। বাবা খুশী হলেন, ওকে দেখে। ভাইয়ের বউ শান্তি যত্ন করে রাঁধল—সকালবেলাই দিলীপ বাজার করে এনেছে। ইলিশ মাছ, কচুশাক, চালকুমড়ো। রান্নাঘরের দাওয়ায় পিঁড়ি পেতে খাবার জায়গা করল শান্তি। অনেকদিন পর তৃপ্তি করে খেল দীপক। শান্তি আধঘোমটা টেনে সামনে বসে ছিল, ঘোমটার আড়ালে দেখা যাচ্ছিল তার স্নিগ্ধ মুখখানা। লাজুক মুখে বারবার এটা-ওটা খেতে অনুরোধ করছিল। ভারী ভাল লাগছিল দীপকের। বাড়ীর সম্বন্ধে এ ধরনের অনুভূতি কখনও জাগত না তার। সে চিরকাল উদাসীন—খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে ভেবে দেখত না কখনও। প্রতিবারই শান্তি যত্ন করে খাওয়ায়। কিন্তু এ নিয়ে কখনও কোন অনুভূতিই জাগত না, আজকে কেমন একটা কোমলতায় ভরে গেল মন। মায়ের কথা মনে পড়ল।

পরদিন ভোরের ট্রেণে এল কলকাতায়। পথেই নামল বৃষ্টি। বৃষ্টিঝরা একটি সন্ধ্যা, একটি অন্ধকার রাত চেতনার অতল প্রদেশ থেকে উঠে এল—চোখের সামনে উজ্জ্বল হ'ল ছোট ছোট কয়েকটি ছবি। সেই হাসপাতালের ভয়াতুর রাত্রি, লণ্ঠনের আলোয় ও দেখা যাচ্ছে মালশ্রীর মুখ।

সেই বর্ষাচ্ছন্ন সন্ধ্যা,...মালশ্রীর চুল থেকে জল পড়ছে। সর্ব্বাঙ্গ ভিজে গেছে তার, একটা সিক্ত পদ্মে যেন ফুটে উঠছে চোখের সামনে—বাজের শব্দে কি না পেয়েছিল মালশ্রী, ওর হাত চেপে ধরেছিল। মুহূর্ত্তের স্পর্শ—কিন্তু—কি অদ্ভুত শিহরণ অনুভব করে সে—

শিয়ালদা এসে গেল, এবারে নামতে হবে। ক স্ট্রীটের একটা বইয়ের দোকানে যাবে—কয়েকটা কিনবার কথা ভাবছে। দুপুরে কোথাও খেয়ে নে 'লাইম লাইট'টা দেখার ইচ্ছা আছে। বইয়ের দোকা ঢুকল—খানকয়েক বই বেছে নিয়ে পাতা ওল্টাতে লাগল —মনে পড়ল মালশ্রী তাকে যেতে বলেছে, আজ একবা ঘুরে এলে হয় বিকেলের দিকে। কানের কাছে স্প শুনল তার গলার স্বর ...পরক্ষণেই দোকানদারের তীক্ষ্ণ গলার আওয়াজে চমকে উঠল, "বইটা নেবেন ত?"

এতক্ষণ বইটার একটা পাতায়ও চোখ রাখে নি—বইয়ের ওপর হাত রেখে কি সব ভাবছিল। বইটা কিনে বেরিয়ে এল—চাণক্য সেনের "সে নহি সে নহি"। খরচটা একটু বেহিসেবীই হয়ে গেল তার পক্ষে, তবু এ সব চিন্তা করতে ভাল লাগছিল না আজ।

বাইরে বেরিয়ে চারদিকে তাকাল—অনেকদিন পর শহরে এল। গ্রামে থাকতে থাকতে চোখটা অভ্যস্ত হয়ে যায়। এখানে এলে কেমন অদ্ভুত লাগে, নিজেকে বেমানান মনে হয়। অজস্র দোকানের সারি, কোথাও এতটুকু সবুজের চিহ্ন নেই—একপা এগোলেই ট্রাম লাইন, বাস যাচ্ছে ভীম বেগে। চারদিকে কেবল বাড়ী আর বাড়ী, পাষাণ প্রাচীরের বেষ্টনী। সেই সুদূর লক্ষ্মী-সাগরে, শালবনের অরণ্য-ছায়ায় মুক্তির স্বাদ তবু মেলে—সেখানকার কাজে-ঘেরা জীবন থেকে মুক্তি! এখানে তাও নেই—চারদিকে কেবলই প্রাচীর। এক অদৃশ্য লৌহ-কারাগার।

সামনে ল্যাম্পপোষ্টে একটা কিসের বিজ্ঞাপন—ছবিটা ভারী সুন্দর, একটি তন্বী তরুণী, হাতে এক আঁটি ধান।

বার স্পষ্ট হ'ল মালশ্রীর মুখ, আরও নিবিড় এ অনুভূতি এমন করে ভাবতে সাহসই পায় নি কখনও। এই য়টির সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেল মালশ্রীর মুখ-র।

একটা বাড়ী, খড়ের চাল—মাটির দেয়াল। সামনে জমি—তাতে ছোট্ট বাগান, বেলফুলের ঝাড়, রজনী-র সারি—সারাদিন প্রাণপাত-করা পরিশ্রমের পর ায় অবকাশ মেলে, বাগানে মোড়া পেতে বসে গান না, ফুলের গন্ধ ভেসে আসে হাওয়ায়। সেখানে সে া নয়, আর একজনও আছে তার পাশে। সে তার লক্ষ্মীর মূর্ত্তি, কিন্তু কল্পনার নয়—বাস্তবে রূপ পেয়েছে তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। দীপক বেলফুলের কুঁড়ি য়ে দিচ্ছে তার চুলে। মৃদু হাসছে সে—বড় সুন্দর মুখ, এ সৌন্দর্য্যকে ছুঁতেও দ্বিধা হচ্ছে দীপকের। ধরা দিল, দীপকের হাত ধরল—গা ঘেঁসে দাঁড়াল।

'কি রে তুই কোত্থেকে?"

মকে তাকাল দীপক। স্বপ্ন মিলিয়ে গেল, অবাক্ য়ে ভাবল—এতক্ষণ যাকে দেখছিল, সে ত আর কেউ য়—মালশ্রী।

সামনে কে একজন দাঁড়িয়ে।

"ও, তুই, সঞ্জয়?"

দীপকের স্কুলের বন্ধু। অনেকদিন পরে দেখা। াস্তায় দাঁড়িয়েই খানিক কথা হ'ল। সঞ্জয় কি কাজে াওড়া যাচ্ছে। শিয়ালদাতেই থাকে—একদিন যেতে লল তাকে…ঠিকানাও দিল। মিনার্ভাতে এসে ঢুকল ীপক। প্রচণ্ড ভিড়। এক টাকা চার আনার টিকিট পেল না। অগত্যা বেশী দামের টিকিটই কিনল, হলে ুকে বসল, চিনেবাদাম কিনল এক ঠোঙা। আরম্ভ হ'তে আর বেশী দেরি নেই—সব বাতিই নিভে গেছে তখন, ঠাৎ দরজার দিকে চোখ পড়ল। পরিচিত নারীকণ্ঠ কানে এল। দেখল সামনের দরজা দিয়ে ঢুকছে মালশ্রী, সঙ্গে আরও অনেকে। ওর সামনের লাইনেই বসল ওরা। ততক্ষণে ছবি শুরু হয়ে গেছে। অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না। কানে এল ওদের হাসি আর কথার আওয়াজ।

"ছোট ঠাকুরপো, তোমার 'লেটেষ্ট' গার্ল ফ্রেণ্ডটির নাম যেন কি? তিনি এলেন না?"

"ছোড়দা প্লিস, একটু 'ক্যাস্থই নাট' দাও না। বাব্বা, এত কিপ্টে তুই—মাত্র দুটো দিলি।"

আর একটা হাস্যোজ্জ্বল গলা শোনা গেল।

"এই মালা, গোমড়ামুখো হয়ে ব'সে আছিস্ কেন? তুই একেবারে সাতবুড়ীর একবুড়ী। তোদের আশ্রমে কি ধ্যান প্র্যাকটিস্ করতে হয় নাকি?"

এতক্ষণে মালশ্রীর গলা শোনা গেল—"কি যে বল ছোড়দা, থাম না একটু—ছবিটা দেখতে দাও।"…

ইনটার্ভেলের সময় দীপক সামনের দিকে ভাল করে তাকাল—মালশ্রী এর মধ্যে একবার পেছন ফিরে তাকায় নি। দীপকই দেখল, মালশ্রী একটা গাঢ় সবুজ রঙের কাশ্মিরী সিল্ক পরেছে। ব্লাউসের হাতটাও কাঁধ পর্য্যন্ত, অনাবৃত বাহু। ঠোঁটে রঙ আছে কি না বোঝা গেল না। গলার মুক্তোর মালাটা ঝকঝক করে উঠল, কানে পান্নাবসানো দুল, তার পাশেই আর একটি মেয়ে, রীতিমত রঙ মেখেছে সে, শাড়ীর আঁচল যথাস্থানে রাখাটাই দুঃসাধ্য তার পক্ষে। তার পাশে আর একজন, প্রসাধনে তারও আতিশয্য যথেষ্ট, সঙ্গে দু'জন ভদ্রলোক। নিভাঁজ স্যুট পরেছেন, ঠোঁটে দামী সিগারেট, মাঝে মাঝে পাশ ফিরে চুপি চুপি কি যেন বলছেন, পার্শ্ববর্ত্তিনীর কানে। সকলে হেসে গড়িয়ে পড়ছে। মালশ্রী এদের মধ্যে একটু চুপচাপ। তবু মনে হ'ল সেও সবার কথাতেই যোগ দিচ্ছে, হাসি ফুটছে তার ঠোঁটে।

মনে পড়ল, সবুজ তাঁতের শাড়ী পরা, কপালে কুমকুমের টিপ একটি নারীমূর্ত্তি। চাঁদের মত ছোট্ট কপালে জ্যোৎস্নার লাবণ্য জড়ানো। সে সুষমাময়ী ত তার নিজেরই স্বপ্নে গড়া, তাকে যে বেশে মানিয়েছিল, সে বেশই তার সবচেয়ে প্রিয়।

ছবি শেষ হয়ে গেল। আশ্চর্য্য হয়ে ভাবল দীপক। এত ভাল ছবিটা—দেখবার আগে বেশ খুসী খুসী লাগছিল, অথচ দেখার পরে মনে হ'ল—কি আর এমন? ভাল করে মনেই নেই কি দেখেছে, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে

একটু দূরেই মালশ্রীরা গাড়িতে উঠছে

এল বাইরে। ভিড়ের ঠেলায় ছিটকে পড়ল ফুটপাথের একধারে—একটু দূরেই মালশ্রীরা গাড়িতে উঠছে। কাঁচের জানলার ফাঁকে ক্ষণিকের জন্য স্পষ্ট দেখল মালশ্রীর মুখ, মনে হ'ল ওর চারধারে পাষাণের বেষ্টনী। বন্দিনী রাজকন্যা। কিন্তু তাকে উদ্ধারের মন্ত্র কি জানে দীপক? জানলেই কি প্রয়োগ করা সম্ভব? এ বাহংস'কে অস্বীকার করার শক্তি মালশ্রীরই কি আছে? রাস্তা পার হ'ল তাড়াতাড়ি, উঠে পড়ল ভিড়ভর্তি ট্রামে, দমদমের ট্রেণ ধরতে হবে তাকে, সময় বেশী নেই।

হল থেকে বেরিয়ে মালশ্রীও দেখেছিল দীপককে, মুহূর্তের জন্য থরথর করে কেঁপে উঠেছিল বুক, কানের ডগা দুটো গরম লাগছিল, ডাকতে পারল না তাকে—সামনে দিয়ে রাস্তা পার হয়ে চলে গেল দীপক—ত ডাকা হ'ল না। শুধু কি লজ্জা? সঙ্গে সঙ্গে কি দ্বিধা ছিল না অনেকখানি? দীপককে ঠিক এই পরিবে ডাকবার সাহস কি সত্যিই ছিল ওর? ট্যাক্সিতে উ জানলা দিয়ে মুখ বাড়াল মালশ্রী, জনস্রোতে দীপ কোথায় হারিয়ে গেছে, অথচ খানিক আগেই সে তা সামনেই ছিল, ইচ্ছে করলেই ডাকতে পারত—কথ বলতে পারত। কিন্তু পারে নি, সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝল তাদের হিন্দুস্থান পার্কের বাড়ীতে আর কোনদিনই যা না দীপক।

হেদুয়া পুকুরের উত্তরে, বীডন স্ট্রীটের ওপর সেই বাড়ীটি আজও দাঁড়িয়ে আছে। যেন অতীত ঐশ্বর্যের নীরব সাক্ষী।

অট্টালিকাটি যে একদা সমৃদ্ধ ছিল, তার দিকে দৃষ্টিপাত করলেই সেকথা বোঝা যায়। সেই সমৃদ্ধি নিছক আর্থিক হ'লে, উল্লেখ করবার প্রয়োজন হ'ত না। সঙ্গীত-চর্চার জন্যেই এই গৃহের কথার এখানে অবতারণা।

এখানে এত ভারত-বিখ্যাত গুণীর সমাগম ঘটেছে, এমন উচ্চাঙ্গের আসর বসেছে, এত স্বনামধন্য কলাবত অবস্থান করেছেন যে, এই ভবনকে সঙ্গীতজগতের এক তীর্থক্ষেত্র বলা যায়। বিশ শতকের প্রথম পাদেও সঙ্গীতচর্চার আদর্শ আবহ এখানে বিদ্যমান ছিল। বাড়ীতে তখন তারাপ্রসাদ ঘোষের আমল।

তারাপ্রসাদ শুধু সঙ্গীতপ্রেমী ছিলেন না। তাঁর তুল্য সঙ্গীতজ্ঞদের পৃষ্ঠপোষক আর সঙ্গীতসেবক অল্পই ছিলেন কলকাতায়। পশ্চিম থেকে যত বড় বড় ওস্তাদ শহরে এসেছেন, কিংবা এখানকার যাঁরা খ্যাতিমান্ হয়েছেন, তাঁদের প্রায় সকলেরই গান-বাজনার আসর ঘোষ মশায় বসিয়েছেন এই বাড়ীতে।

গুণী কলাবতেরা বাড়ীর আসরে সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন, তা-ই সব নয়। তারাপ্রসাদ অনেক বড় বড় গুণীদের এখানে আশ্রয় দিয়েছেন, ফলে পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গীতবিদ্যা বাংলা দেশে বিস্তারলাভের কিছু কিছু সুযোগ পেয়েছে। এখানকার সঙ্গীতচর্চাকে প্রকারান্তরে সাহায্য করেছে। কালে খাঁর তুল্য খেয়াল গায়ক, ইম্‌দাদ্ খাঁর মতন সেতার-সুরবাহার বাদক, দৌলৎ খাঁর মতন ধ্রুপদী প্রভৃতি এই বাড়ীতে অবস্থান ক'রে গেছেন তারাপ্রসাদের আমলে। কেউ কয়েক মাস, কেউ বছর খানেক, কেউ বছরের পর বছর।

এসব হ'ল পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেকার কথা। তারও আগে, তখন থেকে আরও পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে গেলে এ বাড়ীর আরও একটা গৌরবের যুগ পাওয়া যায়। বাংলা দেশে সাংস্কৃতিক কর্মচাঞ্চল্যের একটি পর্ব। সে হ'ল উনিশ শতকের প্রায় মাঝামাঝি সময়। তখন এখানকার ঘোষ-পরিবারের বিখ্যাত পুরুষ ছিলেন কাশীপ্রসাদ ঘোষ, তারাপ্রসাদের পিতামহ। কাশীপ্রসাদের জন্ম খিদিরপুর হ'লেও, কর্মক্ষেত্র আর বাসস্থান ছিল এই বীডন স্ট্রীটের ভবন।

উনিশ শতকের প্রসিদ্ধ ইংরেজী পত্রিকা Hindu Intelligencer-এর সম্পাদক কাশীপ্রসাদ ঘোষ। অনেক
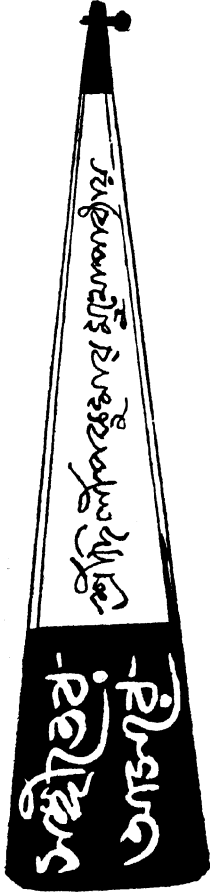
গুণের আধার কাশীপ্রসাদ তখনকার শিক্ষিত সমাজে একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। Hindu Intelligencer সম্পাদনে কৃতিত্বের পরিচয় ত দেনই। তা ছাড়া ইংরেজী রচনার জন্যেও তাঁর সুনাম ছিল। "সঙ্গীত-তরঙ্গ"-প্রণেতা রাধামোহন সেনের অনেক ভাল গান ইংরেজীতে অনুবাদ ক'রে প্রচার করেন তিনি। কাশীপ্রসাদ সঙ্গীতজ্ঞ এবং নিজেও একজন উৎকৃষ্ট গান-রচয়িতা ছিলেন। শুদ্ধ সুরে এবং টপ্পা অঙ্গে রচিত তাঁর বাংলা গানের জনপ্রিয়তা ছিল সেকালে এবং তাঁর মৃত্যুর পরেও। নিধুবাবুর জীবিত কালেই তাঁর প্রথম জীবন কাটে। সেজন্যে নিধুবাবুর যুগপ্রভাব অনিবার্যভাবে তাঁর রচনায় পড়েছিল। কিন্তু তা হলেও কাশীপ্রসাদের গানের আদর ছিল। ৩০০-র বশি গান তিনি রচনা করেন। এবং তাঁর মৃত্যুর প্রায় দশ বছর পরে প্রকাশিত কয়েকটি সঙ্গীত-সংকলন গ্রন্থে তাঁর ান স্থান পায়। যথা, "সঙ্গীতসার-সংগ্রহ" দ্বিতীয় পর্বে টি, "বাঙ্গালীর গান" পুস্তকে ২৫টি, ইত্যাদি। এ থেকেও াঝা যায়, কাশীপ্রসাদ গান-রচয়িতারূপে স্বীকৃতি ায়েছিলেন।

কাশীপ্রসাদের কথা সবিস্তারে বলবার দরকার নেই। ার সঙ্গীতজীবনের কথা বিশেষ জানাও যায় না। তিনি তি রূপবান পুরুষ ছিলেন—প্রতিকৃতিতে যার চিহ্ন আজও াছে—এ কথাটি উল্লেখ করে তাঁর প্রসঙ্গ শেষ করা হ'ল। র পৌত্র তারাপ্রসাদ এবং সে আমলের সঙ্গীতচর্চার ধাই আসলে আমাদের আলোচনার বিষয়।····

উত্তরাধিকারসূত্রে তারাপ্রসাদ সঙ্গীতপ্রীতি পেয়েছিলেন। ার বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত হয় সঙ্গীতের পীঠস্থান রাণসীতে। সেখানে অতি অল্প বয়স থেকেই গুণীদের ঙ্গ তাঁর সংস্রব ঘটে। আর সেই কিশোর বয়স থেকে র সঙ্গীতশিক্ষার সূত্রপাত কাশীতে। ধ্রুপদ দিয়েই তাঁর ীতের পাঠ আরম্ভ হয়। তবে ওস্তাদ হবার জন্যে তিমত কঠিন সাধনা ক'রে তিনি সঙ্গীতচর্চায় অগ্রসর নি। নচেৎ সিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ ব'লে দেশে সুপরিচিত তে পারতেন, সারা জীবন এমন গুণী সংসর্গ তিনি রছিলেন। আর সেই কৈশোর থেকে।

শখ করে শিখতেন যতখানি ভাল লাগে। শুনতে লবাসতেন তার চেয়ে অনেক বেশি। আর সঙ্গীতপ্রেমে াসরও করতেন কম নয়।

ছেলেবেলায় তারাপ্রসাদ কাশীতে থাকতেন দিদিমার ছে। সেখানেই তাঁর সঙ্গীতচর্চা ও সঙ্গীতজীবনের রম্ভ। ধ্রুপদাচার্য রামদাস গোস্বামীকে প্রথম গুরুরূপে পেলেন। গোস্বামী মশায় বাঙ্গালী এবং শ্রীরাম বিখ্যাত গোস্বামী-পরিবারের সন্তান। জীবনের প্রায় ২০ বছর কাশীবাস করেছিলেন এবং সেখানেই জীবনাবসান হয়। রামদাস গোস্বামী সেকালের এ শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদ-গায়ক ছিলেন। প্রসিদ্ধ ধ্রুপদী রসুল (অঘোর চক্রবর্তীর ওস্তাদ আলী বক্সের ভ্রাতা) কাছে দীর্ঘকাল ধ'রে নিষ্ঠার সঙ্গে ধ্রুপদ শিক্ষা করেছি রামদাস। এবং তিনিই ছিলেন রসুল বক্সের শিষ্য। রসুল বক্সের ঘরাণা ধ্রুপদের এমন সঞ্চয় রামদা ভিন্ন আর কারও ছিল না। গোস্বামী মশায়েরও কয়েকজ শিষ্য হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন—কাশী হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। রামদাস গোস্বামীর সঙ্গীত সম্পদ্ যোগ্য উত্তরাধিকারী হয়ে হরিনারায়ণই লাভ করে ছিলেন। তার পরিচয় পাওয়া যায় হরিনারায়ণের "ধ্রুপদ-সঙ্গীত স্বরলিপি" গ্রন্থমালায়। তারাপ্রসাদ ঘোষ তাঁর কৈশোরে সেই হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের গুরুভাই ছিলেন। দুজনেই কাশীতে তখন রামদাস গোস্বামীর শিষ্য।

হরিনারায়ণ একাদিক্রমে ১০ বছর ধ্রুপদ শিক্ষা করলেন রামদাসের কাছে। কিন্তু তারাপ্রসাদ কিছুদিন পরে আর এক গুণীর সঙ্গ লাভ করলেন। তাও কাশীতে। তারাপ্রসাদের এই দ্বিতীয় সঙ্গীতাচার্য হলেন আলী মহম্মদ খাঁ। তিনি তানসেনের পুত্র-বংশীয় বিখ্যাত গুণী বাসৎ খাঁর পুত্র এবং রবাবী মহম্মদ আলী খাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। আলী মহম্মদ সঙ্গীতজগতে বড়্কু মিয়াঁ নামে সুপরিচিত ছিলেন। রবাবী ও সুরশৃঙ্গারবাদক বড়্কু মিয়াঁ তাঁর কালে সমগ্র হিন্দুস্থানের এক শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ বলে সুপ্রসিদ্ধ হন। নেপাল রাজদরবারেও কাজী নরেশের সঙ্গীতসভায় তিনি সসম্মানে যুক্ত ছিলেন জীবনের অধিকাংশ সময়। অপুত্রক বড়্কু মিয়াঁর শিষ্য-গৌরবও কম ছিল না। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর বাদক ব'লে খ্যাতিমান হন। যেমন জলন্ধরের সৈয়দ মীর। তিনি বড়্কু মিয়াঁর কাছে সুরশৃঙ্গারে আলাপ-পদ্ধতি ও ঘরাণা ধ্রুপদ পেয়েছিলেন। বিখ্যাত খেয়াল-গায়ক রামসেবক মিশ্র (পশুপতি ও শিবসেবকের পিতা) সেতার শিক্ষা করেন বড়্কু মিয়াঁর কাছে। নামে খাঁ বীণ্‌কার ও সেতারী প্যারে নবাব খাঁও তাঁর (বড়কু মিয়াঁর) শিষ্য ছিলেন। কাশীর বিখ্যাত বীণাবাদক মিঠাইলাল সাদিক আলী খাঁর শিষ্য হ'লেও বড়্কু মিয়াঁর কাছে অনেকদিন শিক্ষা পান। কাশীর সুরশৃঙ্গার-বাদক পান্নালালও বড়্কু মিয়াঁর শিষ্যদের মধ্যে গণ্য।

তারাপ্রসাদ বড়কু মিয়াঁর কাছে যন্ত্রালাপ ও ধ্রুপদ শিক্ষার সুযোগ পান, মিয়াঁ সাহেবের শেষ জীবনে শীবাসের সময়। তখন তারাপ্রসাদ প্রায় প্রতিদিন ড়কু মিয়াঁর বাজনা শোনবার সৌভাগ্য লাভ করতেন। ব সম্ভব তারাপ্রসাদই তাঁর একমাত্র বাঙ্গালী শিষ্য। স্তাদজীর অন্য কোন বাঙ্গালী শিষ্যের কথা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মশায় (তাঁর হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের স্থান" পুস্তকে) লিখেছেন যে, রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর বড়কু মিয়াঁর অতি প্রিয় শিষ্য ছিলেন। ঠাকুর মহোদয়ও গুরুর ন্যায় বড়কু মিয়াঁকে তীব শ্রদ্ধা করতেন। কাশীধামে ও কলিকাতায় রাজা াহাদুর দীর্ঘকাল বড়কু মিয়াঁর নিকট সঙ্গীতবিদ্যা ও ন্ত্রবিদ্যা শিক্ষা ক'রে যথার্থভাবে আয়ত্ত করেছিলেন।"

বড়কু মিয়াঁর কাছে রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ই সঙ্গীতশিক্ষার কথা সঠিক নয়। শৌরীন্দ্রমোহন এবং বড়কু য়াঁর মধ্যে কোনদিন সাক্ষাৎ ঘটেছিল কি না সন্দেহ। য় চৌধুরী মহাশয় এ বিষয়ে ভুল সংবাদ পেয়েছেন। কারণ ৌরীন্দ্রমোহন কোনদিন কাশীতে যান নি। বড়কু মিয়াঁও খনও কলকাতায় আসেন নি। শৌরীন্দ্রমোহনের সঙ্গীত-রু ছিলেন ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্র এবং জ্জাদ মহম্মদ। বড়কু মিয়াঁর কাছে শৌরীন্দ্রমোহনের ক্ষার কথা অন্য কোন সূত্রেও জানা যায় না। বিষয়টির রুত্ব আছে, তাই উল্লেখ করা রইল।

তারাপ্রসাদ কাশীতে রামদাস গোস্বামী ও আলী মহম্মদ ভিন্ন অন্য অনেক ওস্তাদের গান-বাজনার সঙ্গেও পরিচিত য়েছিলেন। কারণ তখন বহু গুণীর সমাগম ও অবস্থান ছিল াশীতে। তবে গোস্বামী মশায় ও বড়কু মিয়াঁ ভিন্ন আর ারও সঙ্গ তারাপ্রসাদ শিষ্যরূপে করেন নি। এবং াদের দু'জনের, বিশেষ বড়কু মিয়াঁর সঙ্গীত অতি ঘনিষ্ঠ াবে শোনবার সুযোগ তাঁর হয়।

তার পর কাশীর পালা শেষ ক'রে এক সময়ে কলকাতায় লেন তারাপ্রসাদ। বীডন স্ট্রীটের এই বাড়ীতে বাস রতে লাগলেন। এখানে এসে প্রথম যৌবন থেকে রিণত বয়স পর্যন্ত কয়েকজন মহাগুণীর তিনি সঙ্গ করলেন খনও শিষ্যরূপে, কখনও পৃষ্ঠপোষকরূপে। তাঁদের মধ্যে থম জীবনে পেলেন স্বনামধন্য উজীর খাঁকে। তানসেনের ংশে আধুনিক কালের' সঙ্গীতরত্ন উজীর খাঁ।

উজীর খাঁকে অবলম্বন ক'রে তানসেন-বংশের সঙ্গীত-ধারার ত্রিবেণীসঙ্গম এ যুগে ঘটেছিল। কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের বভিন্ন ধারার সম্পদ্ তিনি লাভ করেন উত্তরাধিকারসূত্রে। একদিকে তিনি সদারঙ্গ-বংশে বীণ্‌কার ওমরাও খাঁর পৌত্র ও আমীর খাঁর পুত্র। আবার তাঁর মাতার বংশসূত্রে তিনি তানসেনের পুত্র-বংশের দৌহিত্র। উজীর খাঁর জননী ছিলেন (জাফর খাঁর পুত্র) কাজাম্ আলী খাঁর কন্যা এবং রবাব-সিদ্ধ কাসিম্ আলী খাঁর ভগিনী। এই দুই সূত্রে উজীর খাঁ তানসেনের পুত্র ও কন্যাবংশের কণ্ঠ ও যন্ত্রে বহু ঘরাণা বিদ্যা অর্জন করেন। সুরশৃঙ্গার, রবাব ও বীণ, আলাপ ও গীতাঙ্গ, ধ্রুপদ ও হোরিধামার ইত্যাদিতে ঘরাণা তালিম পান তিনি। পিতা আমীর খাঁ আর কাকা রহিম খাঁর কাছে বীণা ও কণ্ঠসঙ্গীত, মাতামহের ভাই নিসার আলী খাঁ ও তাঁর জ্ঞাতি-ভাই বাহাদুর সেনের কাছে রবাব সুরশৃঙ্গার শিক্ষা করেন উজীর খাঁ। বাল্যকাল থেকে এই সব শিক্ষালাভ আরম্ভ করে তিনি সাধনায় অগ্রসর হ'তে থাকেন ব্রতের নিষ্ঠায়। তার ফলে তিনি সেনী-সঙ্গীতের অমন বিরাট্ আধার হয়েছিলেন। সমগ্র হিন্দুস্থানে তিনি মহাগুণী ব'লে বন্দিত।

রামপুরে তাঁর জন্ম। প্রথম জীবনও সেখানে কাটে। রামপুর ঘরাণার দুই প্রবর্তক আমীর খাঁ ও বাহাদুর সেনের কাছে তাঁর প্রথম সঙ্গীতশিক্ষাও সেখানে। তাঁদের মৃত্যুর পর প্রথম যৌবনে তিনি বারাণসীতে নিশার আলী খাঁর তালিম পান। তার পর পরিণত প্রতিভা নিয়ে আসেন কলকাতায়। এখানে ক'বছর থাকবার পর রামপুর নবাব একরকম জোর করেই উজীর খাঁকে রামপুরে নিয়ে যান এবং সেখানেই তাঁর জীবনের অবশিষ্ট কাল সসম্মানে ও সগৌরবে অতিবাহিত হয়।

তিনি কলকাতায় অবস্থানের সময় কয়েকজন বাঙ্গালী তাঁর কাছে শিক্ষার দুর্লভ সুযোগ পান। তাঁরা হ'লেন—ভবানীপুরের প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সুরশৃঙ্গার-বাদক), পঞ্চেৎগড়ের যাদবেন্দ্রনন্দন মহাপাত্র (সুরবাহার-বাদক), সিমলার অমৃতলাল দত্ত (হাবু দত্ত নামে সুপরিচিত, স্বামী বিবেকানন্দের জ্ঞাতি-ভাই এবং ক্লারিওনেট ও এস্রাজ-বাদক), প্রভৃতি। তারাপ্রসাদ ঘোষও সে সময় উজীর খাঁর শিষ্য-স্থানীয় হয়ে তাঁর সঙ্গ লাভ করতেন। আলাউদ্দিন খাঁ তখনও কলকাতায় আসেন নি শিক্ষার্থী হয়ে। উজীর খাঁর তালিম তিনি পরে পেয়েছিলেন, রামপুরে। হাবু দত্ত পরেও রামপুরে খাঁ সাহেবের তালিম নিতে গিয়েছিলেন, এ কথা হাবু দত্তের এক শিষ্যের মুখে শোনা যায়।

তারাপ্রসাদ উজীর খাঁর উক্ত শিষ্যদের মতন নিয়মিত সঙ্গীত সাধনা করেন নি। তিনি খাঁ সাহেবের তৈরি শিষ্য ছিলেন না। তবে তাঁর সঙ্গীতের ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ

করেন শিষ্যতুল্য হয়ে। খাঁ সাহেব কলকাতায় থাকবার সময় তারাপ্রসাদ তাঁর সঙ্গীত শোনবার খুবই সুযোগ পেতেন।

উজীর খাঁ কলকাতা থেকে চ'লে যাবার পর তারাপ্রসাদ আর বড় একটা কোন ওস্তাদের শিষ্যরূপে সঙ্গ করতেন না। সঙ্গীতপ্রেম তাঁর কিছু কখনও কমে নি। বরং উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। ওস্তাদ সংসর্গও ভালভাবেই হ'তে থাকে তাঁর। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত-সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষা তাঁর আরও চরিতার্থ হয়। সঙ্গীত-সাধনার পথে না গিয়ে সঙ্গীতের সেবা আরম্ভ করেন অন্যভাবে। সঙ্গীতশিক্ষার্থী থেকে ক্রমে সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক হন। সঙ্গীতজ্ঞদের পৃষ্ঠ-পোষক বললেই সঠিক হয়। প্রচুর অর্থব্যয়ে গুণীদের এই বাড়ীতে আসর বসান, আশ্রয় দেন। এইভাবে তাঁর সঙ্গীতের সেবা চলে। বাড়ীতে সঙ্গীতের সদাব্রত।

অনেক জলসা এখানে তখন হয়ে গেছে। অনেক বড় বড় গাইয়ে-বাজিয়ে এ বাড়ীর আসর মাৎ করেছেন। মুজ্‌রো পেয়ে উপকৃত হয়েছেন। তাঁদের সঙ্গীতে তৃপ্তি পেয়েছেন শ্রোতারা। যে ওস্তাদদের তারাপ্রসাদ বাড়ীতে আশ্রয় দিতেন, তাঁরাও যেমন লাভবান হতেন, তেমনি আবার হতেন বাংলার শিক্ষার্থীরা। দৌলৎ খাঁর মতন ধ্রুপদ-গুণী এক সময়ে তারাপ্রসাদের আশ্রয় পেয়ে বাংলা দেশে বাস করেছিলেন। তার ফলে দৌলৎ খাঁর কাছে যাঁরা সঙ্গীত-বিষয়ে লাভবান হন, তাঁদের মধ্যে একজন হলেন অঘোরনাথ চক্রবর্তী। অঘোরবাবুর প্রধান ওস্তাদ অবশ্য আলী বক্স।

ইমদাদ্ খাঁকে তারাপ্রসাদ সপরিবারে এই বীডন স্ট্রীটের বাড়ীতে প্রায় দশ বছর রেখেছিলেন। ইমদাদ্ তাঁর সঙ্গীত সাধনার জন্যে এই বাড়ীর কাছে, তারাপ্রসাদের কাছে সবিশেষ ঋণী। তাঁর কৃতী পুত্র এনায়েৎ খাঁর সঙ্গীতশিক্ষার পর্ব অনেকাংশে এখানেই উদ্‌যাপিত হয়। আধুনিক কালের বাংলা দেশে সেতার বাদ্যের প্রচলনে এনায়েৎ খাঁর অবদান বিশেষ স্মরণীয়। তারাপ্রসাদের ইমদাদ্ খাঁকে সপরিবারে পৃষ্ঠপোষকতা তার কিছু পরিমাণও সহায়তা করেছিল।

বড়ে গোলাম আলীর প্রথম ওস্তাদ ও পিতৃব্য কালে খাঁ তারাপ্রসাদের আশ্রয়ে এক বছরেরও বেশি বাস করে-ছিলেন। আরও বহুদিন হয়ত তিনি থাকতেন, কিন্তু একটি দিনের ঘটনায় তিনি চলে যান এখান থেকে। সেই ঘটনাটিই এ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু এবং তা যথাসময়ে বলা হবে।

এই সব স্বনামধন্য ওস্তাদ এবং আরও অনেক গুণীকে নিয়ে তারাপ্রসাদের বাড়ীর আসর প্রায় নিয়মিত সুর-মুখরিত থাকত। সে আমলে বাড়ীর আসরও তৈরি হ'ত বিচিত্র উপায়ে। আসর সাজানর কথায় সে বাড়ীর সদর মহলের বর্ণনা একটু করবার আছে। বাড়ীর ফটক দু'টির পরে একটু খোলা জমি। তারপর মূল বাড়ী। বাড়ীর সদর দিয়ে প্রবেশ করলে দু'পাশে বেশ চওড়া উঁচু চাতাল, দালানের মতন পূব-পশ্চিমে বিস্তৃত। সেই দুই চাতালকে দু'দিকে ভাগ ক'রে মাঝখান দিয়ে পথ চ'লে গেছে, সদর থেকে অন্দরের দিকে। জলসার সময়ে, মাঝের এই নীচু পথটির ওপর, কাঠের মজবুত প্ল্যাটফর্ম তৈরি ক'রে দেওয়া হ'ত, দু'দিকের উঁচু চাতালের সমতল ক'রে। তারপর সমস্ত স্থানটি জুড়ে, কাঠের প্ল্যাটফর্ম ও দু'দিকের চাতাল নিয়ে, সতরঞ্চ চাদর ইত্যাদি বিছান হ'ত। এমনিভাবে গ'ড়ে উঠত এখানকার সঙ্গীতের আসর। জমকালো আর সুপরিসর।

এ আসরে ইমদাদ্ খাঁর বাজনা হয়েছে সবচেয়ে বেশি। কারণ তিনি সবচেয়ে দীর্ঘকাল এই বাড়ীতে বাস করেছিলেন।

দক্ষিণমুখী বাড়ীর সামনেকার দুই প্রান্তে, পূব ও পশ্চিমে, যে দু'টি মাঝারি আকারের ঘর দেখা যায়—সেখানেই এই দুই সঙ্গীত-সাধকের (কালে খাঁ ও ইমদাদ্ খাঁ) অধিষ্ঠান ছিল। পশ্চিম দিকের ঘরটিতে থাকতেন কালে খাঁ। আর পূবদিকে ইমদাদ্ খাঁ। সদর দেউড়ি দিয়ে বাড়ীতে ঢুকতে বাঁ-দিকের শেষে কালে খাঁর ঘর। ডানদিকের প্রান্তে ইমদাদের আস্তানা। বাড়ীর সদর মহলের দু'টি প্রান্ত। সদর দিয়ে এসে, বাঁ-দিকের ক'ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠে সেই চাতাল পার হয়ে কালে খাঁর ঘরে পৌছতে হয়। আর ডানদিকের ধাপ ক'টি উঠে ইমদাদ্ খাঁর ঘরে যেতে হয় চাতালের শেষে।

কালে খাঁর ঘরে যাবার ওই একটি পথ। কিন্তু ইমদাদ্ খাঁর ওই ঘরটিতে যাবার অন্য রাস্তাও আছে। তিনি বাইরের ঘরখানির সঙ্গে অন্য ঘরও পান। কারণ তাঁর বাস সপরিবারে। তবে পূব-প্রান্তের ওই ঘরেই তিনি রেওয়াজ করতেন।

আর কালে খাঁ একা। সঠিক জানা যায় না, তিনি অকৃতদার কিংবা বিপত্নীক। খুব সম্ভব, প্রথমটি। তাই তারাপ্রসাদ তাঁর থাকবার জন্যে ওই পশ্চিম-প্রান্তের ঘরটির ব্যবস্থা করেন। আর ইমদাদের জন্যে পূবদিকের অংশ, তার সামনেকার ঘরটি তাঁর রেওয়াজের। সে ঘরে যেতে হ'লে, বাড়ীর সদর দিয়ে না গেলেও চলে। সেখানে

যাতায়াতের অন্য পথও আছে। বিশেষ, কালে খাঁর ঘরের কাছে কখনই যেতে হয় না ইমদাদকে।

কিন্তু কালে খাঁর বেলা তা নয়। বাড়ীর পুব দিকের ফটকের সামনেই, বাড়ীর দক্ষিণ-পুব কোণে ইমদাদের রেওয়াজের ঘর। সেই ফটক দিয়ে বাড়ীতে যেতে গেলে ইমদাদের ঘর পার হয়ে যেতে হয়। তারপর সদর দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলে, ডান-দিকের অদূরে ইমদাদের ঘর। বাঁ-দিকে ক'ধাপ উঠে কালে খাঁ নিজের দিকে, বাড়ীর দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের ঘরে চলে যেতে পারেন, কিন্তু সেদিকে ইমদাদকে কখনও যেতে হয় না। কালে খাঁর ঘর থাকে ইমদাদের নাগালের একরকম বাইরে।

বাড়ীর ভৌগোলিক বৃত্তান্ত সবিস্তারে দেবার কারণ আছে। তাই এত কথা বলা হ'ল। পরে এই বিবরণ প্রয়োজনে আসবে।

ওস্তাদ কালে খাঁ ও ইমদাদ খাঁ এ অধ্যায়ের দুই নায়ক। তাঁদের সেই নাটকীয় ঘটনাটি বর্ণনা করবার আগে, দুজনের কিছু পরিচয় দেওয়া দরকার। শুধু ভূমিকা হিসেবে নয়, জানবার জন্যেও।

কালে খাঁর জীবন-কথা কিন্তু সবিশেষ জানা যায় না। তিনি যেমন খেয়ালী প্রকৃতির ছিলেন, তাঁর জীবনও তেমনি রহস্যে আচ্ছন্ন। সে রহস্য-জাল ছিন্ন ক'রে তাঁর পূর্ব বৃত্তান্ত অতি সামান্যই পাওয়া গেছে। মাত্র এই ক'টি তথ্য জানা যায় তাঁর বিষয়ে। তিনি ছিলেন পাঞ্জাবের বাসিন্দা। তাঁদের পরিবার পুরুষানুক্রমে সঙ্গীত-ব্যবসায়ী। তাঁর সঙ্গীত-শিক্ষাও হয় আপন বংশে। তাঁর 'ঘরকা তালিম', তা হ'ল, বিখ্যাত আলিয়াফত্তু ঘরাণা। কালে খাঁর নিজের সন্তান বলতে কেউ নেই। সম্ভবতঃ তিনি অবিবাহিত ছিলেন। তবে দেশে থাকতে তিনি তালিম দেন তাঁর প্রতিভাবান ভ্রাতুষ্পুত্রকে, যিনি আজ বড়ে গোলাম আলী খাঁ নামে সঙ্গীতজগতে সগৌরবে বর্তমান। তবে শোনা যায়, গোলাম আলী কালে খাঁর রীতি-পদ্ধতি ও চালে গান করেন না। কালে খাঁর কাছে যেমন তালিম তিনি পেয়েছিলেন, তার থেকে স্বতন্ত্র ও স্বকীয়ভাবে তিনি সাধারণতঃ আসরে গেয়ে থাকেন। কালে খাঁর চাল তাঁর দেহপটের সঙ্গেই চিরকালের জন্যে লুপ্ত হয়ে গেছে। তাঁর গানের কোন রেকর্ড না হওয়ায় তার সামান্য চিহ্নও আর নেই। অথচ রেকর্ডের যুগ বেশ কিছুদিন আরম্ভ হবার পরেও তিনি তাঁর পূর্ণ সঙ্গীত-প্রতিভা ও কণ্ঠসম্পদ্ নিয়ে বর্তমান ছিলেন। কলকাতাতেও তিনি বাস করেছিলেন কয়েক বছর এবং সে সময়ে গ্রামোফোন কোম্পানী ব্যবসায়ের দিক্ থেকে সুপ্রতিষ্ঠিত। কালে তাঁর সমসাময়িক অনেক গায়ক-গায়িকার —বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী গানের রেকর্ড এই কলকাতাতেই হয়েছিল। কিন্তু কালে খাঁর গান রেকর্ড করবার কথা কেউ চিন্তা করে নি। আর শিল্পী স্বয়ং ছিলেন অতিশয় অন্যমনস্ক ও খামখেয়ালী প্রকৃতির। তাঁর নিজের দিক্ থেকে এ বিষয়ে কোনপ্রকার উদ্‌যোগ বা তৎপরতা ছিল না। তাই ভাবীকাল এই সঙ্গীত সম্পদের উপভোগ থেকে চিরকালের জন্যে বঞ্চিত হয়ে রইল।

কালে খাঁ সে-যুগের সঙ্গীত-সমাজে প্রখ্যাত ছিলেন খেয়াল গানের গুণী ব'লে, যদিও সঙ্গীত বিষয়ে তাঁর অন্য কৃতিত্বও ছিল। সে কথা পরে আসবে।

খেয়াল-গায়করূপে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী তখন বেশি ছিলেন না। তাঁর গান খুব সুদূর অতীতের ব্যাপার নয়, সঙ্গীত-সমাজের শ্রুতিস্মৃতিতে এখনও তার রেশ একেবারে বিলীন হয়ে যায় নি। বছর পঞ্চাশেক আগে তিনি কলকাতায় বাস ক'রে গেছেন। তাঁর গান ভালভাবে শুনেছেন, এমন ব্যক্তির এখনও অভাব হয় নি।

কালে খাঁ কত বড় সঙ্গীত-শিল্পী ছিলেন, কি অপরূপ পদ্ধতিতে তিনি গাইতেন, তার অতি মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন, শ্রদ্ধেয় অমিয়নাথ সান্যাল। সঙ্গীত-প্রবীণ সান্যাল মশায় সঙ্গীত-বিষয়ে যেমন তত্ত্বজ্ঞ, তেমনি রসজ্ঞ। লেখনীও তাঁর উপযুক্ত শক্তিধর। নাটোর মহারাজার ভবানীপুর ভবনে কালে খাঁর গান শুনে তিনি যে আনন্দরসে আপ্লুত হয়েছেন, তার স্বাদও অনেকাংশে তাঁর পাঠকদের দিতে পেরেছেন। খেয়াল-গায়ক কালে খাঁর কিছু পরিচয় লাভের জন্যে সান্যাল মশায়ের বিবৃতির অংশ থেকে উদ্ধৃত করা হ'ল :

"আসরকে নতি জানিয়ে খাঁ সাহেব কণ্ঠের সুর ছাড়লেন তম্বুরা কোলে নিয়ে।

কোনও তোম্ তায় নোম্ বোল্ ব্যবহার না ক'রে, মাত্র স্বরবর্ণ উচ্চারণ করে খাঁ সাহেব সুরের নক্‌শা ফুটিয়ে তুললেন এক নিঃশ্বাসে।... ...

খাঁ সাহেব গান আরম্ভ করলেন "ডুথকে পাত সব ঝর্ গয়ে" দিয়ে আরম্ভ একটি পদ ; পরে বিশ্বনাথজীর মুখে শুনেছিলাম রাগের নাম "কৌশিকী কানাড়া"। উদার ও অসাধারণ এক রকমের আবেদনের মাহাত্ম্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মুদারার মধ্যম-স্বর।

......অল্পক্ষণ পরে খাঁ সাহেব হাতের তম্বুরাটি পাশে নগেন্দ্রবাবুকে দিলেন এবং ডান হাঁটু উঁচু করে কায়দা করে বসলেন ; তাঁর ডান হাত চলে গিয়েছে ডান কানের কাছে,

বাঁ হাতটি রেখেছেন বাঁ হাঁটুর উপর। মৌজুদ্দিনও এরকম আসনে বসে গান করেন, মনে পড়ে গেল।

এতক্ষণে যেন আবেগ-সঞ্চয়ের কারণেই তাঁর কণ্ঠস্বর উজ্জ্বলে মধুরে অপূর্ব হয়ে উঠেছে; চিকণ সুমার্জিত সেই কণ্ঠধ্বনির ঝলকে ঝলকে আভাস দেয় মীড়-মূর্ছনা দিয়ে তৈরি অলঙ্কারগুলি। গায়কীর শৃঙ্গারসজ্জায় সার্থক হয়েছে রাগের আবাহন। তখনও কানে "তথকে পাত সব" শব্দগুলি ধরতে পারছি। প্রতি আবর্তে নূতন তানের উপসংহার হয়ে যেন নূতন সাজে ফিরে ফিরে আসে ঐ শব্দগুলি।···

খাঁ সাহেবের কণ্ঠস্বরের বৈশিষ্ট্য অনুভব করলাম, যখন তিনি ছোট ছোটে পাল্লার "হরকত" (অর্থাৎ প্রত্যেক নূতন বিস্তারের মুখে মূর্ছনার মোলায়েম আল্‌পনা) দিয়ে বিস্তারের বিচিত্র তরণীগুলি ভাসিয়ে দিচ্ছিলেন সুরের তরঙ্গে। তখনকার তখন সেই কণ্ঠের তুলনা পাই নি। পরে, ইন্দোর-নিবাসী বীণ্‌কার মজিদ খাঁ সাহেবের হাতে বীণার হরকতগুলি শুনে মনে পড়ে গেল খাঁ সাহেবের কণ্ঠের স্নিগ্ধ গম্ভীর লীলায়িত চরিত্র, যার মধ্যে রুক্ষতার লেশমাত্র ছিল না। কত রকমের গতিবেগ দিয়ে কত রকমের অজস্র তান হ'তে থাকে, অথচ কণ্ঠের সেই কোমলতার বিচ্যুতি ঘটে নি। আমার কানে সুরের স্নেহ-লেপনই অনুভব করেছি, স্বর দিয়ে শ্রবণের বেধ বা আঘাত ঘটেছে বলে মনে পড়ে না। জরবদার (অর্থাৎ Staccato Style-এর) বোল্ বা তানের ছুঁই-ফোঁড় লক্ষণ সহজেই কানে ধরা পড়ে; সুরগুলি যেন তাদের বিশিষ্ট পরিচ্ছিন্ন আবির্ভাব স্পষ্ট আঘাত দিয়ে জানিয়ে দেয়। খাঁ সাহেবের কণ্ঠের চরিত্র ও কারুকার্য এরকম জরবদার তানকে যেন উপেক্ষা করেছে বলে মনে হ'ল; এমন কি, চৌদুনি তানের মধ্যেও জরবদার লক্ষণ ছিল না।

মজিদ খাঁ সাহেবের বীণায় গমক-যোড় শুনে মনে পড়ে গিয়েছিল কালে খাঁ সাহেবের কণ্ঠের মোলায়েম গমকের কাজগুলি। তম্বুরার গুঞ্জনের সহযোগে কণ্ঠের সেই আন্দোলনগুলি বীণাযন্ত্রে গমকেরই অনুরূপ ছিল নিশ্চয়; তা না হ'লে মজিদ খাঁ সাহেবের হাতে গমক শুনে কালে খাঁ সাহেবের কণ্ঠের গমক মনে পড়ত না। কালে খাঁ সাহেবের গান শোনার আগে ইম্‌দাদ্ খাঁ সাহেবের সেতার সুরবাহারে গমক শুনেছি; পরে আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের কেরামতউল্লা খাঁ সাহেব ও ফিদা হুসেন খাঁ সাহেবের হাতে সরোদের গমকও শুনেছি। কিন্তু এসব ব্যাপার

······কালে খাঁ সাহেবের কণ্ঠ ছিল সারেঙ্গীর মত, তারা সপ্তকের সুরে কোন কৃত্রিম তীক্ষ্ণতা দেখা দেয় নি।···

গান শেষ হ'লে অল্পক্ষণ বিশ্রাম নিলেন খাঁ সাহেব।···

তম্বুরার সুরে কোনও পরিবর্তন না করে, কোনও উপক্রমণিকা না করে খাঁ সাহেব দ্বিতীয় গান আরম্ভ করলেন "যোবন আয়ে" ইত্যাদি একটি পদ।······

একটি ছোট্ট দোহারা গিট্‌কিরির চমক আর একটি হাল্‌কা মোলায়েম ফান্দা রচনা করেই খাঁ সাহেব যেন তলবারের চোট্ দিলেন সমের ওপর নিষাদ সুরে। "আয়ে" শব্দের "আ"-এর ওপরই ছিল সমের সন্ধান। তীব্র নিষাদের অমৃতমুখ একটি বাণ দিয়ে যেন গানের মর্মভেদ হল, আর পরম সুস্বাদু এক শ্রবণামৃতই যেন অনুস্যূত হয়ে চলল গানের প্রতি অঙ্গে, ছন্দ আর মাত্রার গ্রন্থিতে। নিষাদের সেই বেদনামধুর স্বরূপটি তৎক্ষণাৎ মিলিয়ে গেল যেন ধৈবতের মূর্ছনার মধ্যে, কিন্তু তার শিহরণ উছলে পড়ে দেখা দেয় যেন পঞ্চমের স্পর্শে; যেন আত্মসমর্পণের ক্রমিক লীলাপর্যায় দেখা দিয়ে যায় সুরের পথে শ্রুতিদের সাথে সাথে। প্রতিটি সুর আসে আপন অভিমানের স্পর্ধায় আপন আবেগ সঞ্চয় করে। পরমুহূর্তেই যেন বিমোহ আর বিস্ময়ের মধ্যে ঘটে আত্মবিস্মরণের চমৎকারী।······

মাত্র ঐ পাঁচটি অক্ষরকে ধরে খাঁ সাহেব রাগের বাঢ়ত (ক্রমশঃ অগ্রগামী সুরের ভাঁজ দিয়ে একরকম রাগ-বিস্তার) রচনা করে চলেছেন একটির পর একটি। প্রতিবারেই ফিরে আসে "যোবন আয়ে"-র মুখবন্ধনী নূতন তানের বেগ সংগ্রহ করে, সুর-কল্লোলের উদ্দাম তরঙ্গ-সম্ভার বহন করে। এ কি যৌবন-সমুদ্রের নিত্য-নব পরিচয়?······

······ঐ গানের "যোবন আয়ে"ই হয়ত রাগানুভূতির একটি সন্ধিক্ষণ; নিষাদ আর ধৈবতের ব্যঞ্জনাই হয় সেই সন্ধিক্ষণে নূপুরধ্বনির মত চমৎকৃতি আস্বাদন করিয়েছে অবশ্য কালে খাঁ সাহেবের প্রতিভা ও-রকমের উন্মেষণা আ সাক্ষাৎকারের চরম সৌন্দর্য আস্বাদ করিয়ে দিয়েছিল।····

···ঢিমা একতালার ছন্দোবন্ধনে খাঁ সাহেব রচনা ক চলেছেন গিটকারির কুসুমগুচ্ছ; বাণী ও সুরকে ছন্দে বাঁধনে জড়িয়ে অলঙ্কৃত করেন বোল তানের বিভূতি দিয়ে ···রাগের শরধি থেকে বাছাই-করা সুরের বাণ তুলে খাঁ সাহেব; কথার ডালি থেকে চয়ন করেন ব্যঞ্জ শ্লিষ্ট ধ্বনিগুলি; মাত্রা-ছন্দের সন্ধিক্ষণে কথার কুসুমা [illegible] সুরের বাণগুলি খাঁ সাহেবের কণ্ঠচ্যুত

ঢিমা খেয়ালের মন্থর গতিভঙ্গির অন্তরালে এতখানি চপলতা গোপন থাকতে পারে, গিটকারি ও বোলতানের ছন্দ সজ্জায় গানের রূপ এমন মহিময় মূর্ত হয়ে উঠতে পারে, এ কথা স্বপ্নেও ভাবি নি।······খেয়াল গানের এই স্বচ্ছন্দ স্বতন্ত্ররূপের চরম পরিচয় সর্বপ্রথম ঘটেছে কালে খাঁ সাহেবের মুখে বিলম্পত আস্থায়ী শুনে।······

······বিচিত্র ছন্দের বোল-তান শুনে আমরা উত্তেজিত হয়ে উঠেছি; ছন্দ বা মাত্রায় আমাদের দেহ দুলে ওঠে,··· খাঁ সাহেবের পাগড়িও থেকে থেকে দুলে উঠছে; তাঁর বাঁ-হাতখানি উর্ধে উঠে যায় তানের আগে, আর বোলতানের চক্রের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে নেমে আসে। সময়ে সময়ে আবেগের চরমে সেই হাতখানি বেগে নেমে এসে বাঁ-হাটুর ওপর ধাক্কা দিয়ে থেমে যায়; কখনও বা আসরের জাজিমের উপর একটা চাপড় দিয়ে উঠে যায়।······

······ক্রমে দেখা দেয় চৌদুনি তানের বিদ্যুৎ-বলয়; রাগের উপযুক্ত অলঙ্কারই এরা। কয়েকটি কথার ইঙ্গিতে ঝলকে ঝলকে সুরগুলি আরোহ-অবরোহের অলাতচক্র সৃষ্টি করতে করতে মিলিয়ে যায় "যোবন আয়ে"র মধ্যে; আখেরী তান এরা। অনুভবে বোধ হ'ল, সুরের প্রদীপের শেষ আরতি দিয়ে গানের পূজা সমাপন করেন খাঁ সাহেব। গান সমাপ্ত হ'ল। গানের সমগ্র মহিমার একটা রেশ যেন বিদায় নিতে চায় না আমাদের হৃদয় থেকে, তখনও।······

······খাঁ সাহেব তম্বুরার সুর অদল-বদল ক'রে নিয়েছেন, খরজের তার খরজে আর পঞ্চমের তার মধ্যমে। আসর গম্‌গম্‌ করতে থাকে যুগল তম্বুরার সুর—মধ্যমের মধুর সংবাদে। বিশ্বনাথজী বললেন, "আমাদের খাঁ সাহেব ত মালকোশে সিদ্ধ!"······সত্য সত্যই খাঁ সাহেব আরম্ভ করলেন মালকোশ রাগের একটি পদ "পগ্‌লাগন দে", মধ্য লয়ের তেতালায় আর ত্রিনা উপক্রমণিকায়। জীবনে এই গানটি প্রথম শুনলাম। পরেও শুনেছি কয়েকবার, কিন্তু প্রথম পরিচয়টি যেন শেষ পরিচয় হয়ে আছে, এ পর্যন্ত সময়ে।

আরম্ভেই মুদারার মধ্যমস্বরে দুই গমকের মাণিকজোড়। পরেই একটি সূত, যেন সুরশৃঙ্গারের ধ্বনির মত চিকণ উজ্জ্বল রেখা নীচে নেমে এসে উদারার কোমল নিষাদের চারিদিকে কুণ্ডলী পাকিয়ে নিষাদকে কয়েদ ক'রেই নিয়ে চলে যায় কোমল ধৈবতের অপ্রমেয় সীমান্তে। এর পরেই বাণী ও সুর একসঙ্গে সপ্রতিভ সঞ্চারে ফিরে এসে দাঁড়ায় ষড়্‌জে; সমের মন্দিরে রাগবিগ্রহের অধিষ্ঠান হয়ে যায়। ঐ জোড়-গমক আর সূতে সুচারু চরণক্ষেপ আর প্রকাশভঙ্গিমা ত ভুলতে পারি নি।······কালে খাঁ সাহেবের কণ্ঠের সূত-গমকের লহরী উছ্‌লে পড়ে স্মৃতির মধ্যে; ···"পগ্‌লাগন দে" দিয়ে আরম্ভ করে দিয়ে মুহরাটি কায়েম হ'তে না হ'তেই একটি সপাট তান হয়ে গেল তড়িৎ গতিতে। এর পরে গানের পূর্ণ স্থায়ী পদটি দেখা দিল যেন ঝড়ের আগে কাক-চিলের মত;···হঠাৎ এমনভাবে সুরের ঝড় উঠল যে, অন্য কথাগুলি তাদের রূপ বজায় রেখে পরিচয়ই দিতে পারল না। খাঁ সাহেবের হৃদয়ে সুর আর ছন্দের একটা অভিনব উত্তেজনা এসেছে, বুঝলাম তাঁর চোখ-মুখের উদগ্র উল্লসিত ভাব দেখে, তাঁর কণ্ঠধ্বনির আকুল আবেদন অনুভব করে। ···গানের আরম্ভেই ধ্বনি আর ছন্দের এই আশা-প্রত্যাশা-গুলি যেন তালগোল পাকিয়ে যায়। খাঁ সাহেব তাদের পিষে বেঁটে রগড়ে সুর আর ছন্দের নূতন সাজে সাজিয়ে রচনা করতে থাকেন রূপগুলি; আর বিদায় ক'রে দেন মুহূর্তের মধ্যে। আমাদের মনপ্রাণ ভ'রে গেল সুর ও ছন্দের মধুর উতরোলে।······

আরম্ভ হ'ল মোটা মোটা সুরের দানা দিয়ে হরকতের পর হরকত; তার মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে দেখা দেয় গমক-লাগান সুরের ফিরৎ আর ফিকরবন্দী চক্রগুলি; সুরের দলেরা হুড়মুড় ক'রে ঘুরে বেড়ায় মুহরার এপাশে-ওপাশে!······ সুরের অবিরল ধারা আমাদের শ্রবণকে প্লাবিত ক'রে রাখে, শ্রাবণের বর্ষণের মত।······

···সেই বিহ্বল অবস্থায় খাঁ সাহেবের দিকে চাইলাম। অদ্ভুত একরকম আবেদনের আগুন খেলছে তাঁর দৃষ্টিতে, তাঁর চোখ দু'টি জ্বল্ জ্বল্ ক'রে উঠছে, আর সেই মুরেঠা সমেত সর্বদেহটি দুলে দুলে কেঁপে কেঁপে উঠছে গমকের পর্বে পর্বে। বাইরের জগতের জ্ঞান যেন তাঁর নেই।···কালে খাঁ সাহেব মালকোশ রাগে সিদ্ধ, এমন কথা বললেন বিশ্বনাথজী। আমার ধারণা, খাঁ সাহেব সিদ্ধ মাত্র নন; তিনি রাগের অগ্নিতে বিদগ্ধ একটি সত্তা।······"

নাটোর ভবনে কালে খাঁর গানের আসরের এই রসোত্তীর্ণ বর্ণনা থেকে ধারণা করা যায়, খাঁ সাহেব কত বড় সুরস্রষ্টা ছিলেন। সান্যাল মশায়ের এই উৎকৃষ্ট সাহিত্য-কর্ম থেকে ভাবীকালের পাঠক-সমাজ জানবে, কি প্রতিভাধর গায়ক ছিলেন কালে খাঁ, কেমন ছিল তাঁর গানের রীতি-নীতি-প্রকৃতি। স্মৃতির অতল থেকে সঙ্গীত মুক্তার পাঁতি "স্মৃতির অতলে"র গ্রন্থকার সযত্নে আহরণ ক'রে রেখেছেন।

গায়ক কালে খাঁর সঙ্গে ব্যক্তি কালে খাঁর কথাও কিছু কিছু আছে বইখানিতে। সে বিষয়ে এখানে দু'একটি কথা

আলোচনা করা দরকার। কারণ খাঁ সাহেবের প্রকৃতির সম্বন্ধে এমন কোন কোন কথা শ্রদ্ধেয় সান্যাল মশায় বলেছেন যা তথ্য হিসেবে নির্ভুল নয়। সেজন্যে "স্মৃতির অতলে"র বিবরণ থেকে কালে খাঁ সাহেবের ব্যক্তিজীবন এবং সঙ্গীত-জীবন সম্পর্কেও কিছু ভুল ধারণা সৃষ্টি হ'তে পারে।

আত্মভোলা এবং অন্যমনস্ক স্বভাব কালে খাঁর পরিচয় দেবার প্রসঙ্গে গ্রন্থকার খাঁ সাহেবের বীণ্ না-বাজাবার কথা সকৌতুকে বর্ণনা করেছেন একাধিকবার। খাঁ সাহেব বীণ্ বাজাতেন না, অথচ আঙ্গুলে মেজরাব্ চড়িয়ে রাখতেন, তাঁর বীণ্ লেখক (অর্থাৎ সান্যাল মশায়) বা তাঁর পরিচিত অন্য কেউ কখনও শোনেন নি, অথচ কালে খাঁ নিজেকে মস্ত বড় বীণ্কার ভাবতেন এবং বলতেন। অন্য কোন বীণ্কার তাঁর চেয়ে ভাল বাজান; একথা স্বীকার করতে চাইতেন না—এইসব মন্তব্য গ্রন্থকার হাসি-তামাসার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। খাঁ সাহেবের আত্মা "নিজেকে সবচেয়ে বড় বীণ্কার মনে ক'রে নিরীহ রকমের আত্ম-প্রসাদে নিমগ্ন হ'ত মাঝে মাঝে।······তিনি মনে মনে মনোবীণা বাজাতেন; মেজরাব্ দু'টি বাঁ-হাতের আঙ্গুল ছেড়ে ডান হাতের আঙ্গুলে চড়ে বসত।"

কিন্তু এই বিবৃতি সঠিক নয়। খাঁ সাহেবের মেজ্রাব বাঁ-হাত ছেড়ে যথাসময়ে ডান হাতের আঙ্গুলে সত্যই চড়ে বসত এবং তিনি বীণার তারে স্বরের মায়াজাল সৃজন করতেন। তিনি একজন উচ্চশ্রেণীর বীণ্কার ছিলেন, যদিও বৃহত্তর সঙ্গীত জগতে সেকথা তেমন সুপরিচিত ছিল না, কারণ তিনি আসরে গানই গাইতেন এবং তাঁর প্রধান পরিচয় ছিল গায়করূপে। কিন্তু খাঁ সাহেবকে যাঁরা অন্তরঙ্গ-ভাবে জানতেন, তাঁদের কাছে তাঁর বীণাবাদনের কথা অজানা ছিল না। যেমন বীডন ষ্ট্রীটের ওই বাড়ীর বাসিন্দারা জানতেন তাঁর বীণ্ বাজাবার কথা। কালে খাঁ বীডন ষ্ট্রীটে এক বছরের বেশি বাস করেছিলেন এবং সে-সময়ে তাঁর নিজের বীণা যন্ত্রটি সেখানেই ছিল। বাড়ীর দক্ষিণ-পশ্চিমের যে ঘরে খাঁ সাহেব থাকতেন, সেখানে বসে বহুদিন তাঁকে অপূর্ব বীণালাপ করতে শুনেছেন সে-বাড়ীর অনেকে। তাঁদের মধ্যে যাঁরা এখনও বর্তমান আছেন তাঁরা কালে খাঁর বীণ বাজাবার বিবরণ দিয়ে থাকেন। সে বিবৃতি অবিশ্বাস করবার কোন সঙ্গত কারণ নেই।

কালে খাঁর বিষয়ে "স্মৃতির অতলে"র আর একটি বিবৃতিও সমালোচ্য। তা হ'ল বিখ্যাত বাঈজী গহরজান ও কালে খাঁর সম্পর্ক নিয়ে।

হ'লেও তিনি প্রায় আজীবন কলকাতাতেই বাস করে-ছিলেন। তাঁর সমকালে গায়িকা হিসেবে তাঁর তুল্য খ্যাতি খুব কম বাঈজীরই ছিল। রাগসঙ্গীতে পারদর্শিনী গহরজান বাংলা গানও গাইতেন প্রয়োজন হ'লে। কলকাতার অনেক বাঙ্গালী বাড়ীতে বিবাহ ইত্যাদি উপলক্ষ্যেও তিনি মুজ্রো নিয়ে গান করেছেন। আসরে তিনি সাধারণত খেয়াল, ঠুংরি, গজল-ই গাইতেন, কিন্তু ধ্রুপদেরও চর্চা করেছিলেন প্রথম জীবনে। গ্রামোফোন রেকর্ডে তাঁর বাংলা গানেরও কিছু নিদর্শন আছে। রবীন্দ্রনাথের 'কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না পথের শুকনো ধূলি যত' গানখানি কয়েক বাড়ীতে গেয়ে বিস্ময় জাগিয়েছিলেন গহরজান।

এই গহরজান ও কালে খাঁর যুক্ত প্রসঙ্গ "স্মৃতির অতলে"-তে বর্ণনা করা হয়েছে। সান্যাল মশায় জানিয়েছেন যে, গহরকে খাঁ সাহেব ডাইনী মনে ক'রে ভীষণ ভয় করতেন এবং এড়িয়ে চলতেন। শুধু তাই নয়, গহরজান নাকি অনেকবার কালে খাঁকে তাঁর বাড়ীতে অতিথি হিসেবে থাকবার জন্যে আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু খাঁ সাহেব তাঁর কোন অনুরোধে কর্ণপাত করেন নি। খাঁ সাহেব এমন ছেলেমানুষের মতন গহরকে ডাইনী ভেবে ভয় পেতেন! কালে খাঁ অবোধ ভয়ে গহরের সংস্পর্শ যদি এড়িয়ে না চলতেন, তা হ'লে খাঁ সাহেব নিশ্চিন্তে বসবাস করতে পারতেন কলকাতায়, দারিদ্র্যের কষ্ট তাঁকে পেতে হ'ত না; ইত্যাদি। "···কালে খাঁ সাহেব, যিনি গহরের নাম শুনলেই অতিমাত্রায় ত্রস্ত, উত্তেজিত হয়ে উঠতেন।"······"মিথ্যা প্রবঞ্চনার অতীত ছিল সেই আত্মা, যে গহর বাঈজীকে ডাইনী মনে ক'রে শিউরে উঠত,···।" "শ্যামলালজী বললেন—গহরের প্রতি খাঁ সাহেবের দৃষ্টি ছিল সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ আর কামনারহিত একটা প্রশংসার দৃষ্টি। গহরের গানের প্রতিভাই খাঁ সাহেবের হৃদয়কে আকুলিত করেছিল। কিছু কিছু বিচিত্র রকমের ভয় বা বর্জনের সংস্কারও ছিল খাঁ সাহেবের হৃদয়ে, যে কারণে তিনি গহরের অনুনয় ও সংস্রব এড়িয়ে গিয়েছেন। গহর কত বার তাঁর কাছে অনুরোধ পাঠিয়েছিল যে, তিনি কলকাতায় থাকবার কালে গহরের বাড়ীতে সম্মানিত অতিথি ও মুরশিদের মতই থাকুন। খাঁ সাহেব সে কথা কানে ধরেন নি। অথচ তিনি গহরের প্রস্তাবে সম্মত হ'লে তাঁর বসবাস আহারাদির জন্যে দুশ্চিন্তা করতে হ'ত না। এমন একটা বাঞ্ছিত সুযোগকে তিনি উপেক্ষা করতে বাধ্য হয়েছিলেন···।"

"স্মৃতির অতলে"-তে গহরজান ও কালে খাঁর পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে এই সমস্ত কথা আছে—লেখকের বিবৃতিতে

এবং তাঁর সঙ্গীত-গুরু শ্যামলাল ক্ষেত্রীর জবানিতে। কালে খাঁ গহরকে কিরকম ভীতির চোখে দেখতেন এবং তাঁর বাড়ীতে বাস করবার আহ্বানে সাড়া দিতেন না, ইত্যাদি কথা সান্যাল মশায় তাঁর গুরুজীর মুখে শুনেছিলেন মনে হয়।

কিন্তু এ বিষয়ে প্রায় উল্টো রকমের একটি কথা জানা যায়। তা হ'ল, কালে খাঁ গহরজানের বাড়ীতে বাস করেছিলেন বীডন ষ্ট্রীটের বাড়ীতে আসবার আগে। নাখোদা মসজিদ ও তারাচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীটের মাঝামাঝি, চিৎপুর রোডের পূর্বদিকে গহরজানের বারান্দাওয়ালা দোতলা বাড়ীতে খাঁ সাহেবের বাসের সময় একটি ঘটনা ঘটে। তা হ'ল—গহরজানকে কালে খাঁ বিবাহের প্রস্তাব করেন এবং গহর কর্তৃক তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান। তার পরই হতাশ-প্রণয়ী খাঁ সাহেব চিৎপুর রোডের সেই বাড়ী থেকে চ'লে আসেন বীডন ষ্ট্রীটের ঘোষ ভবনে। গহরের প্রতি কালে খাঁর প্রেম নিবেদন ও বিবাহের আবেদন এবং গহরজানের তা অগ্রাহ্য করার কথা তখনকার ঘোষ-পরিবারের অনেকের কাছে সুপরিচিত ঘটনা ছিল। এখনও সে পরিবারের প্রাচীন ব্যক্তির মুখে সেসব স্মৃতিকথা শোনা যায়। সেই সব বিবৃতি থেকে মনে হয় যে, কালে খাঁর মনে গহর সম্পর্কে "বিচিত্র রকমের ভয় বা বর্জনের সংস্কার ছিল" না, ছিল গ্রহণের প্রবল প্রেরণা। এবং সেই গ্রহণের সংস্কার প্রচণ্ড বাধা পাবার পর থেকে হয়ত খাঁ সাহেব গহরকে সামাজিকভাবে এড়িয়ে চলতেন। গহরের সংস্রব এড়াবার সেই কাহিনী বাইরের জল্পনায় পল্লবিত হয়ে কিছু অলীক কিংবদন্তীর সৃষ্টি করেছিল।......

এখন থাক এসব কথা। বীডন ষ্ট্রীটের ঘোষ-বাড়ীতে কালে খাঁ আর ইমদাদ খাঁর কথা এবার আরম্ভ করা যাক। কালে খাঁ এখানে তারাপ্রসাদ ঘোষের আমন্ত্রণে বাস করতে আসেন গহরজানের বাড়ী থেকে। অর্থাৎ গহরজানকে খাঁ সাহেবের বিয়ে করার প্রস্তাব নাকচ করার পর।

বীডন ষ্ট্রীটে যখন কালে খাঁ এলেন, তার আগে থেকেই সেখানে ইমদাদ খাঁ ছিলেন।

ইমদাদ হোসেন খাঁ সঙ্গীতজগতে সুপরিচিত ছিলেন সেতার-সুরবাহারের শিল্পীরূপে। জীবনের শেষ ক'বছর তিনি ইন্দোর দরবারের সভাবাদক নিযুক্ত থাকলেও, জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ তাঁর বাংলা দেশে কেটেছিল। বিশেষ কলকাতায়। ২০ বছরেরও বেশিদিন তিনি কলকাতায় বাস করেছিলেন। তার মধ্যে প্রায় অর্ধেককাল ছিলেন বীডন ষ্ট্রীটের এই বাড়ীতে।

ইমদাদ খাঁ বাঙ্গালী ছিলেন না। তাঁদের বংশে তিনি প্রথম বাংলায় আসেন পশ্চিম থেকে। ঘোষ-পরিবারে আশ্রয় পাবার আগে তিনি যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গীত-সভায় কিছুকাল ছিলেন।

মুসলমান বংশেও ইমদাদ খাঁর জন্ম হয় নি। তাঁর বাবা প্রথম ইসলাম ধর্ম নিয়েছিলেন আর তাও জীবনের প্রায় শেষ দিকে, বৃদ্ধ বয়সে। ইমদাদের বাবা প্রথম জীবনে ছিলেন রাজপুত হিন্দু—সাহেব সিং। হ'লেন সাহাবদাদ হোসেন খাঁ। তাঁর এই ধর্ম বদল করবার আসল কারণও ছিল—সঙ্গীত। মুসলমান ওস্তাদদের কাছে সঙ্গীতশিক্ষা করবার সময় দীর্ঘকাল ধরে তাঁর যে মুসলমান সংস্পর্শ ঘটতে থাকে, তার ফলে তিনি ক্রমে নিজের সমাজে একঘরে হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত রাজপুত সাহেব সিং ৬০ বছর বয়সে সপরিবারে ইসলামী শিবিরে চলে যান সাহাবদাদ হোসেন খাঁ নাম নিয়ে। তাঁর প্রথম ওস্তাদ ছিলেন গোয়ালিয়রের বিখ্যাত খেয়ালী হদ্দু খাঁর ভ্রাতা নত্থু খাঁ। তারপর তিনি মিঞা মৌজ নামে জনৈক কলাবত এবং তানসেনের কন্যাবংশীয় নির্মল শা'র (ওমরাও খাঁর কাকা) কাছে যন্ত্রসঙ্গীতের কিছু তালিম পেয়েছিলেন। সাহেব সিং প্রধানত ছিলেন গায়ক। বিশেষ করে সাধনা করেছিলেন কণ্ঠসঙ্গীত। আর সুরবাহার ছিল সখের বাজনা। কিন্তু পরে তাঁর বংশে যন্ত্রসঙ্গীত চর্চাই প্রথম স্থান নেয়।

তিনি সাহাবদাদ খাঁ হবার পর তাঁর দুই ছেলের নাম হয়—করিমদাদ হোসেন খাঁ ও ইমদাদ হোসেন খাঁ। করিমদাদ ও ইমদাদ দুজনেই সেতার-সুরবাহারের সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। করিমদাদের অল্পবয়সে অবিবাহিত অবস্থায় মৃত্যু হয়। তাঁদের দুজনেরই পিতার কাছে সঙ্গীত-শিক্ষা আরম্ভ হয় নাওগাঁও-তে। সেখানকার রাজদরবারে সাহাবদাদ খাঁ নিযুক্ত ছিলেন।

ইমদাদ খাঁ শেষ বয়সে ইন্দোর দরবারে অবস্থান করলেও মধ্য জীবনের প্রায় ২০ বছর থাকেন বাংলা দেশে। প্রথমে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গীত সভায়, কিছু মেটিয়াবুরুজে নবাব ওয়াজিদ আলীর দরবারে, ইত্যাদি। আর ১০ বছরের কিছু বেশি ছিলেন তারাপ্রসাদ ঘোষের ওই বীডন ষ্ট্রীটের বাড়ীতে।

সুরবাহার-বাদক ও সেতারীরূপে ইমদাদ খাঁ স্বনাম-প্রসিদ্ধ গুণী হয়েছিলেন এবং প্রথম যুগের গ্রামোফোন রেকর্ডে তাঁর সঙ্গীতকৃতির কিছু নিদর্শন বিধৃত আছে। তার মধ্যে বিশেষ করে জৌনপুরীর আলাপটি থেকে বোঝা

যায় যে একজন সত্যকার শিল্পী ছিলেন তিনি। যন্ত্র-সঙ্গীতে তাঁর এই কলাপৈপুণ্য তাঁর নিজস্ব সাধনার ফল। সঙ্গীতবিষয়ে তিনি প্রথম জীবনে পিতার কাছে যে শিক্ষা পান, তা কণ্ঠসঙ্গীতের। পরবর্তীকালে সেতার-সুরবাহারের চর্চা যে ঐকান্তিকভাবে করেছিলেন, সে-বিদ্যা অন্যান্য সূত্রে লাভ করা। তিনি কোন এক বা একাধিক কলাবতের বিশিষ্ট সঙ্গীতধারার শিক্ষা সেতার-সুরবাহারে রীতিমত পান নি, এই তথ্যটি লক্ষ্যণীয়। অর্থাৎ তিনি কোন ঘরাণা তালিম লাভ করেন নি। পশ্চিমের কোন কোন অঞ্চলে এবং বাংলা দেশে বাস করবার সময়ে তিনি নানা কলাবতের সঙ্গীত-সম্পদের কাছে ঋণী ছিলেন শিক্ষা বিষয়ে। বলা যায়, পাঁচ বাগিচার ফুলে তিনি তাঁর সুরের ডালি ভরিয়েছিলেন। আর সেই সঞ্চিত পুষ্প-সম্ভার থেকে নিজের গাঁথা মালা নিবেদন করেছিলেন সুর-সরস্বতীর পাদপদ্মে।

সেতার-সুরবাহার বাদনে তিনি যাঁদের কাছে উপকৃত, তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য ছিলেন—জয়পুরের (সেনীঘরের) রজব আলী খাঁ বীণ্‌কারের কাছে ইম্‌দাদ দেড় বছর শিখেছিলেন। রজব আলী ছিলেন বীণ্‌কার বন্দে আলী খাঁর আত্মীয়। গোয়ালিয়রের সভাবাদক বীণ্‌কার-সেতারী আমীর খাঁর বাজনা ঘনিষ্ঠভাবে অনেকদিন শোনেন ইম্‌দাদ। এই আমীর খাঁ ছিলেন বিখ্যাত সেতার-গুণী অমৃত সেনের (তানসেনের পুত্রবংশীয়) ভাগিনেয়। তা ছাড়া, অমৃত সেনের বাজনাও ইম্‌দাদ অনেক শুনেছিলেন। শুনে শিক্ষা তাঁর অনেকখানি হয়েছিল, কারণ তিনি ছিলেন নিপুণ শ্রুতিধর।

অবশ্য পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়ীতে নিযুক্ত স্বনামধন্য সাজ্জাদ মহম্মদের কাছে তাঁর ঋণ সবচেয়ে বেশি। তাই পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে স্বরচিত 'হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতি'তে (চতুর্থ খণ্ড) এই ধরনের মন্তব্য করেছেন যে, 'আধুনিক প্রসিদ্ধ ইম্‌দাদ খাঁও শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের চাকরি করেছেন। শুনা যায়, তিনি সাজ্জাদের বাজনা শুনে বাজাতে শিখেছিলেন। সাজ্জাদের বাজনা শুনতে না পেলে ইম্‌দাদ খাঁকে আজ কেউ চিনত না।''

সে যা হোক, সঙ্গীতচর্চার বিষয়ে ইম্‌দাদ খাঁ সাধক-স্বভাবের ছিলেন। প্রতিদিন সকাল থেকে তাঁর যে কয়েক ঘণ্টার করণীয় সঙ্গীত-সাধনা ছিল, কোন রকমের বাধা-বিপত্তিতেই তার অন্যথা হ'ত না। তারাপ্রসাদবাবুর এক কনিষ্ঠা কন্যার মৃত্যু ঘটে। কিন্তু তাতেও প্রাত্যহিক সঙ্গীতসাধনায় ছেদ পড়ে নি তাঁর। এবিষয়ে পরে ঘোষ-পরিবারের একজন খাঁ সাহেবকে প্রশ্ন করেছিলেন। তাতে তিনি বলেন, "বাবুজি, স্নেহ আমার নেই, তা কি হ'তে পারে? আমি কি মানুষ নই? কষ্ট আমার আর পাঁচজন মানুষের মতই হয়েছে। কিন্তু আমার ধর্ম হ'ল রেওয়াজ করা। তা' আমি বন্ধ করতে পারি না। সুরসাধক ইম্‌দাদের এই হ'ল শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

কালে খাঁ ছিলেন আলিয়া ফত্তুর ঘরাণাদার এবং নিজেদের ঘরেই রীতিমত তালিম পেয়েছিলেন। এখনকার বিখ্যাত খেয়াল ও ঠুংরি-শিল্পী গোলাম আলীর তিনি খুল্লতাত এবং তাঁর কাছে গোলাম আলী প্রথম জীবনে প্রায় ১০ বছর সঙ্গীতশিক্ষা করেছিলেন।

সঙ্গীতচর্চার বিষয়ে কালে খাঁর স্বভাব ছিল ইম্‌দাদ খাঁর প্রায় বিপরীত। তাঁর সঙ্গীত-সাধনায় কোন নিয়মিত বা নির্দিষ্ট সময় ব'লে কিছু ছিল না। অত্যন্ত খামখেয়ালী ও মেজাজী ছিলেন তিনি। কখনও কখনও দিনের পর দিন কেটে যেত তাঁর বিনা সঙ্গীতে, অলস নিক্রিয়তায়। আবার গানের মেজাজ যখন আসত, তখন অসময় বলে কিছু নেই। হয়ত বেলা বারোটায় স্নান করতে চলেছেন, কারুর সঙ্গে সুরের কথায় মেজাজ এসে গেল, বসে গেলেন ঘোষ-বাড়ীর সেই পূবদিকের ঘরে, সুরের জাল বুনতে বুনতে সময় কোথা দিয়ে চলে গেল তার সন্ধান নেই—পরিতৃপ্ত কালে খাঁ নিজের সঙ্গীত-সৃষ্টিতে নিজেই বিভোর হয়ে রইলেন। অবশ্য আসরে মাইফেলের কথা আলাদা। সেখানে সময় মত যেতেন, গাইতেনও যথারীতি। নিজের ঘরে বসে তাঁর সঙ্গীতচর্চা করবার কোন সময় বা দিনের ঠিক ঠিকানা ছিল না। এমনিতেই তিনি আত্মসমাহিত মানুষ ছিলেন, তার ওপর স্বেচ্ছায় যখন গান-বাজনা করতেন তখন যেন কোন সুদূর সুরলোকে অধিষ্ঠান হ'ত তাঁর।

ইম্‌দাদ খাঁ তারাপ্রসাদবাবুর বাড়ীতে থাকবার সময়ে ভালভাবেই বুঝেছিলেন যে, কালে খাঁ কত বড় গুণী। তাই তাঁর বিশেষ ইচ্ছা হয় যে পুত্র এনায়েৎ কালে খাঁর কিছু তালিম পান। পুত্রদের নানা গুণীর শিক্ষা লাভ করাতে ইম্‌দাদ বড়ই আগ্রহী ছিলেন এবং পরে এনায়েৎ ও ওয়াহিদ-কে অনেক ওস্তাদের কাছে সঞ্চয় করে নেবার সুযোগ দিয়েছিলেন, ভারতের নানা সঙ্গীতকেন্দ্র পর্যটনের সময়ে। যথা—কলকাতায় সাজ্জাদ মহম্মদের কাছে সেতারের কিছু ঘরাণা গৎ তোড়া, ধ্রুপদী ভ্রাতৃদ্বয় জাকরুদ্দিন ও

ওস্তাদ) আল্লাদিয়া খাঁর কাছে কিছু খেয়াল, ধ্রুপদী দৌলৎ খাঁর কাছে কিছু ধ্রুপদ, সাহারণপুরের বৈরাম খাঁর দৌহিত্র আব্বণ খাঁর কাছে ধ্রুপদ ও খেয়াল, ইত্যাদি শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন এনায়েৎ ও ওয়াহিদ খাঁ।

বৌডন ষ্ট্রীটের বাড়ীতে থাকবার সময়ে তাই ইমদাদ খাঁ কালে খাঁকে অনুরোধ করেন এনায়েৎকে কিছু খেয়ালের তালিম দিতে। এক বাড়ীতেই যখন রয়েছেন, তখন এনায়েৎকে শেখাবেন কালে খাঁ, এ আশা তিনি বিলক্ষণ করেছিলেন। কিন্তু কালে খাঁ সম্মত হন নি। একাধিকবার কথায় কথায় ইমদাদ্ কালে খাঁর কাছে তাঁর মনোবাঞ্ছা জানিয়েছিলেন। কিন্তু কালে খাঁ এড়িয়ে যান সে প্রস্তাব। এই নিয়ে দুজনের মধ্যে মনান্তরের সূত্রপাত। কালে খাঁর ওপর অসন্তুষ্ট হন ইমদাদ এবং তাঁর প্রতিও বিরূপতা জাগে কালে খাঁর। কিন্তু এক বাড়ীতে থাকার সূত্রে রোজই দেখা-সাক্ষাৎ ঘটে। ইমদাদের পশ্চিমের সেই ঘরখানির সামনে দিয়ে তাঁর পূবদিকের ঘরে যাতায়াত করতে দু' একটা কথাবার্তাও হয় কালে খাঁর। এনায়েৎকে শেখানো না-শেখানো নিয়ে অবশ্য দুজনেরই মনের মধ্যে বিরোধের একটা কাঁটা থেকেই যায়।

এমন সময় একদিন প্রকাশ্য সংঘর্ষ হয়ে গেল দু'জনের মধ্যে। তবে কোন সাধারণ আসরে নয়, ওই বাড়ীতেই তাঁদের এক প্রচণ্ড সাঙ্গীতিক বচসা হয়ে গেল। তারাপ্রসাদবাবু ভিন্ন আর বিশেষ কেউ উপস্থিত ছিলেন না সেখানে।

তাঁদের সে কলহ হ'ল কিন্তু যথার্থ গুণীরই যোগ্য, কোন সাধারণ লোকের তর্কাতর্কি বা ঝগড়া নয়। ইমদাদ খাঁর সেই পশ্চিমের ঘরের সামনে দিয়ে কালে খাঁ আসবার সময় সেদিন দেখা হয়েছিল দু'জনের। কি কথায় তারপর তাঁদের বচসা আরম্ভ হয়ে যায় তা সবটা জানা যায় নি। তবে নিজেদের সঙ্গীতচর্চার ধারা নিয়ে তর্ক বেধেছিল তাঁদের মধ্যে। তবে সুরশিল্পীর বিবাদ কথা-কাটাকাটিতে পর্যবসিত না হয়ে পরিণত হয়েছিল সাঙ্গীতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায়।

তারাপ্রসাদবাবু যখন সেই অকুস্থলে এসে পড়েন, তখন কালে খাঁ মওড়া নিচ্ছিলেন।

ইমদাদ খাঁকে তিনি আহ্বান জানিয়ে বলছিলেন, 'কি বাজনা আপনি বাজাবেন, বাজান। আমি গলায় সে সব কাজ দেখিয়ে দেব। কিন্তু আমার গলার জিনিষ আপনি হাতে দেখান দেখি। এই রকম ত আপনি বাজান—'

ব'লে; কালে খাঁ ইমদাদ খাঁর বাজনার ঢঙ্ তাঁকে গেয়ে শুনিয়ে দিতে লাগলেন। যেমন করে তিনি সুরবাহারে রাগের আলাপ কিংবা বিস্তার করেন, সেতারে গৎ বাজাবার সময় যেমন কায়দায় তান মারেন তার বেশ কিছু নমুনা কালে খাঁ দেখালেন গান গেয়ে। যে ক'টি কাজ তিনি দেখালেন, তা ইমদাদের বাজনার প্রায় হুবহু নকল, বলা চলে। তাঁর সেই মিড়, গমক, মূর্ছনা, আশ্ ইত্যাদি সূক্ষ্ম অলঙ্কার কালে খাঁ গলায় অবলীলাক্রমে দেখিয়ে দিলেন।

ইমদাদ খাঁ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন শুধু কালে খাঁর অদ্ভুৎ কণ্ঠনৈপুণ্যেই নয়, তিনি কি করে তাঁর হাতের বাজনার ঢঙ্ তাঁর রেওয়াজের সময়ে বাজানো জিনিষ কি করে এমন খুঁটিয়ে তুলে নিয়েছেন? কি করে শুনলেন সব? তাঁর ঘরের সামনে দিয়ে আসা-যাওয়া করবার সময় এসব এমন করে মনের পর্দায় উঠিয়েছেন? তা হ'লে ত এ ঘরে আর রেওয়াজ করাই চলবে না!

কালে খাঁ আবার তাঁকে চ্যালেঞ্জ করে বললেন, 'এখন যন্ত্রে ওঠান ত দেখি আমার এই সব গানের জিনিষ।'

এই ব'লে তাঁর আশ্চর্য কণ্ঠে কয়েকটি তানের নিদর্শন দেখালেন।

প্রত্যুত্তরে ইমদাদ খাঁ কি করতেন বলা যায় না, কারণ সেই বিসংবাদের ছেদ টেনে দিলেন গৃহস্বামী, দুই কলাবতের মধ্যস্থ হয়ে। কিন্তু তাঁর জের সেখানেই মিটল না।

কারণ ইমদাদ খা অতিশয় ক্ষুব্ধ হয়ে জানিয়ে দিলেন, 'এ বাড়ীতে কালে খাঁ থাকলে আমি চলে যাব।'

শান্তিপ্রিয় কালে খাঁ একথা শুনে নিজেই চলে যাবার কথা বললেন তারাপ্রসাদবাবুকে।

ঘোষমশায় তাঁদেরই অন্য এক জায়গায় খাঁ সাহেবকে থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

সেখানে কিছুদিন বাস করবার পর কালে খাঁ কলকাতা ছেড়ে চলে গেলেন।

—*—

ট্রেণ থেকে নেমেই এদিক্‌-ওদিক্‌ চাইলে নিশাকর। লোকজন নেই। নেহাৎই পাণ্ডব-বর্জ্জিত জায়গা, বিছানা আর স্যুটকেশটা এক পাশে রেখে ট্রেণটার দিকে চাইল। ইতিমধ্যে গাড়ি আবার সচল হয়েছে। গার্ড সাহেবের হুইসিল বেজেছে। নীল পতাকা উড়ছে। এখনই বেরিয়ে যাবে।

অল্প অল্প অন্ধকার। স্টেশনটার পিছনেই মাঠ আর রুক্ষ প্রান্তর। খুঁজে খুঁজে খেজুর গাছ ছাড়া আর কিছু নিশাকরের নজরে এল না। লাল কল্লাচ-বিছানো স্টেশনটার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সে হেঁটে গেল। একই অবস্থা। লোকজন নেই।

রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। পাখী ডাকছে। ভোর হয়ে এল। সময়টা ফাল্গুনের প্রথম। এসব অঞ্চলে শেষরাতে এখনও ঠাণ্ডা পরে। ভোরে হিমেল হাওয়া বয়, দিনে আবার গরম। মাটি-ফাটানো রোদ্দুর। তপনতাপে প্রাণ যাই-যাই করে।

স্টেশন ঘরটার কাছে এসে নিশাকর আশ্বস্ত হ'ল। লোকজন আছে। টেবিলের ওপর ঈষৎ মাথা ঝুঁকিয়ে কে একজন বসে। নিশ্চয়ই স্টেশন মাস্টার। মেঝেতে কাপড় মুড়ি দিয়ে দু'জন ঘুমোচ্ছে। একটা একচক্ষু আলো ঘরের এককোণে জ্বলছে। সম্ভবত তেল নেই বাতিটায়। আলোটা নিবু-নিবু হয়ে আসছে। প্রায় শেষ অবস্থা।

নিশাকর বাইরে থেকে বলল, 'মশায়ের সাহায্য পেতে পারি একটু।'

গলা শুনে চেয়ারে উপবিষ্ট ভদ্রলোকটি উঠে এলেন।

—'আপনি কি এই ট্রেণ থেকে নামলেন?'

নিশাকর এক নজরে দেখে নিল মানুষটিকে। পোশাকে, চেহারায়, রেলকোম্পানীর একজন বলে ধরে নিতে ভুল হয় না। বয়স পঞ্চাশের কম হবে না। বরং বেশী।

হেসে বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, জনসন সায়েবের স্কুলে যাব। কতদূর হবে বলতে পারেন?'

এবার যেন চিনতে পারল লোকটি। একগাল হেসে বলল, 'আপনিই নতুন হেডমাষ্টার? তাই বলুন। সায়েব ব'লে গেছলেন বটে। আমি আবার ভুলেই বসে আছি।'

স্টেশন ঘরে জাঁকিয়ে বসল নিশাকর। রীতিমত খাতির। জনসন সায়েবের স্কুলের হেডমাষ্টার। সেই মস্ত লোক ছুটো কখন উঠে বসেছে। ঘুমভাঙ্গা বড় বড় চোখে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ওর দিকে।

স্টেশন মাষ্টারের বাসা থেকে চা এল। গরম গরম হালুয়া খানিকটা।

নিশাকর বলল, 'কিন্তু মুখ-হাত যে ধুই নি মশায়। সব হাঙ্গামা কেন আবার?'

—'হাঙ্গামা কিসের? জল দিচ্ছে রামধনিয়া। মুখ-হাত ধুয়ে ফেলুন।'

শুধু জল নয়। কোথা থেকে একটা নিমের দাঁতনও এনে দিল রামধনিয়া। মুখে দিল নিশাকর। তেতো-তেতো। বেশীক্ষণ ঘষল না মুখে। জল দিয়ে ধুয়ে ফেলল।

চা খেতে খেতে স্টেশন মাষ্টার বললেন, 'রামধনিয়া যাবে আপনার সঙ্গে। বিছানা-বাক্স মাথায় নেবে। একটা টিকি-টিকি দিয়ে দেবেন হাতে। খুব খুশী হয়ে ফিরে আসবে।'

গরম গরম হালুয়া খেতে খেতে নিশাকর বলল, 'কতটা পথ?'

—'জামুরিয়া? মাইল তিন-চার হবে। কষ্ট হবে খুব। রোদ উঠবার আগেই বেরিয়ে পড়ুন। ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় পৌছে যাবেন।'

চা-টা খেয়ে আর অপেক্ষা করল না নিশাকর। রোদ উঠলেই খামকা কষ্ট। যাবার সময় প্রশ্ন করল, 'সায়েব লোক কেমন? টিঁকতে পারব ত মশায়?'

খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ি মুখে লোকটা চোখ দুটো কোঁচকাল একবার। তার পর ঈষৎ হাসি, নতুন হাঁসের সদ্য প্রসব-করা ডিমের গা থেকে বেরিয়ে-আসা লালচে আভার মত ছড়িয়ে পড়ল।

বলল, 'জনসন সায়েব পাগলা সায়েব। আর দশ-জনের সঙ্গে মিলবে না, তবে হ্যাঁ, একটা গুণ আছে লোকটার। কখনও মিথ্যে কথা বলবে না। মরে গেলেও না। কি রে রামধনিয়া?'

হিন্দুস্থানী লোকটা সম্ভবত হাতের তেলোয় খৈনি ডলছিল। ঢুলছিল একটু। তেমনি ঢুলে ঢুলেই ঘাড় নাড়ল।

স্টেশন মাষ্টার আবার বললে, 'আমরা ওকে আড়ালে কি বলি জানেন?'

নিশাকর অবাক্ হয়ে তাকাল।

বলি, 'সায়েব আমাদের যুধিষ্ঠির।' এবার হো হো হাসি। কানে প্রায় তালা লাগবার জোগাড়।

স্টেশন ছাড়িয়ে সরু পথ। ইতস্তত শালবন ছড়ানো-ছিটোনো। আবার মাঠ, রুক্ষ প্রান্তর ও অনাবাদী জমি দেখা যায়।···

নিশাকরের মন্দ লাগছে না। এখনও রোদ ওঠে নি। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভোরের হাওয়া গায়ে লাগছে। প্রথম বসন্তের সতেজ সমীরণ। পাখী ডাকছে অজানা ভাষায়। কি সব বুনো ফুল পথের দুধারে। রামধনিয়া বলল, 'কুঁরচি ফুল হয়।'

সাতটার আগেই জামুরিয়া পৌছে গেল নিশাকর। মর্ণিং স্কুল। ক্লাস সুরু হয়ে গেছে। মাষ্টাররা পড়াচ্ছেন ঘরে বসে। কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে ছাত্ররা ওকে দেখছে। কিন্তু অবাক্ হ'ল নিশাকর। জনসন সায়েবের স্কুলে ডিসিপ্লিন আছে সত্যি। ওকে দেখে মাষ্টাররা ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে এলেন না কেউ। ছেলের দল গোল হয়ে ভিড় করল না।

ছেলেদের বোর্ডিঙে বলা ছিল। চাকর এসে দরজা খুলে দিল তাড়াতাড়ি। খাটের ওপর বিছানা পাতল। বাক্সটা এককোণে সাজিয়ে রাখল। রামধনিয়াকে বিদায় করে বাইরে এসে দাঁড়াল নিশাকর। চারপাশে চেয়ে দেখল। জামুরিয়া ছোট গ্রাম। আসবার সময় খানিকটা চোখে পড়েছে। বাকিটা পরে বেড়িয়ে দেখে নেবে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে টানা ঘুমিয়েছে নিশাকর। সারা-রাতের জাগরণে শরীরটা তলে তলে শ্রান্ত হয়ে উঠেছে। ঠিক টের পায় নি। বিছানায় গড়াতেই ঘুম। গাঢ় নিদ্রা। এক ঘুমেই দুপুর কাবার। কখন বাইরে ছায়া নেমেছে। শালবনে পাখী ডাকছে অনর্গল। সূর্য্য অস্ত যাবে।

মুখ-হাত ধুয়ে বাইরে এসেই নিশাকর দেখল প্রায় ছ'ফুট দীর্ঘ এক সায়েব স্কুলের মাঠে পায়চারি করছেন। পরণে শাদা প্যাণ্ট। গায়ে ঢিলা-ঢালা জোব্বাজাতীয় জামা। এক-মাথা শাদা চুল, সিঁথি করে দু'পাশে পরিপাটি বিছানো, গলায় ঘাড়ে ঈষৎ লালচে ছোপ। এখানকার রোদে মুখটা তামাটে বর্ণ হয়ে গেছে। গলায় কালো সুতোয় বাঁধা ক্রশ ঝোলানো, এক নজরে দেখে মানুষটার প্রতি ভক্তি জন্মাল।

সায়েব বললেন, 'তোমাকে দেখে খুব খুশী হলাম। সকালেই এসেছ শুনেছি। আমি আবার ছিলাম না। আসানসোল যেতে হয়েছিল।'

—'আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন? আমাকে ডাকলেই হ'ত।'

—'নো, নো, মাই ফ্রেণ্ড। তুমি ঘুমোচ্ছিলে। ক্লান্ত হয়ে এসেছ। আমি ডিসটার্ব করব কেন?'

নিশাকর আশ্চর্য্য হ'ল। লোকটা সত্যি বিস্ময়। এসব সহৃদয়তা আজকালকার মানুষের নেই। স্টেশন মাষ্টার ঠিকই বলেছে। জামুরিয়ার জনসন সায়েব পাগলা সায়েব। আর দশজনের সঙ্গে মিলবে না।

জামা পরে সায়েবের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল নিশাকর। জামুরিয়া ছোট গ্রাম। ক্রীশ্চান বেশী, অন্য ধর্ম্মের লোকও আছে। আজ আঠার-উনিশ বছর এখানে এসেছেন জনসন। তার আগে নানা জায়গায় ঘুরেছেন। ছোট্ট জামুরিয়া ওর ভাল লেগেছে। তাই এখানেই থেকে গিয়েছেন।

গ্রাম ছাড়িয়ে প্রান্তর। মাটি কেমন কালো কালো, অঞ্চলটা কোলফিল্ড জোনের মধ্যে। দূরে দূরে কোলিয়ারী দেখা যায়। ধোঁয়া উড়ছে। প্রান্তরের মধ্যে বিরাট দৈত্যের মত কোলিয়ারীর চানিক মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। রোপওয়েতে বালিভর্তি বাকেট চলেছে ঝুলতে ঝুলতে। একপ্রান্তে—

জনসন সায়েব বললে,'ছোট স্কুল, ছাত্রও কম। তোমাকে অনেক খাটতে হবে, মাই ফ্রেণ্ড।'

—'নতুন স্কুলে খাটুনি একটু বেশীই হবে। তাতে কিছু নে করি না।'

—'ভেরী গুড।' সায়েব ওর পিঠ চাপড়ে দিলেন। ললে, 'তোমাকে দেখে আশা হচ্ছে হেডমাষ্টার। হয়ত লটা দাঁড়িয়ে যাবে। দেখা যাক্।' একটা দীর্ঘশ্বাস ড়ল তার।

ইতস্তত ঘুরে বেড়াল দু'জনে। উঁচুনীচু প্রান্তর। কাঁটা-ঝোপ। দূরে শালবন। কাছাকাছি জামবনী গ্রামের একজন বাড়ী ফিরছে। সায়েবকে দেখে মাথা ঝুঁকি নমস্কার করছে।

হঠাৎ জনসন সায়েব বললেন, 'একটা কথা তোমা বলা হয় নি হেডমাষ্টার।'

—'কি কথা?'

—'আমার স্কুলে ছাত্রদের একটা জিনিস ভাল শিক্ষা দেওয়া হয়।

নিশাকর বিস্ময়ের ভাব কাটিয়ে বলল, 'কি জিনিষ?

—'ট্রুথ ফুলনেস, মানে সত্যবাদিতা। সত্য সবাই বলবে। সত্যকে ভালবাসবে। সত্যের আ নেবে। মিথ্যেকে কখনও প্রশ্রয় দেবে না।'

নিশাকর বলল, 'তা ত ঠিক। অলওয়েজ স্পীক্ ট্রুথ।'

—'তুমি সত্য কথা বল ত মাষ্টার?'

কঠিন প্রশ্ন। নিশাকর এরকম বিপদের সম্মুখীন কখনও আশা করে নি। সে কি জবাব দেবে ঠিক বু পারল না। সায়েব গম্ভীর স্বরে বললেন, 'আই মাইণ্ড হেডমাষ্টার। তুমি আগে যা করেছ, যা ব তা অন্ধকারে চাপা থাক্। বাট ফ্রম নাউ, সদা সত্য ক বলিবে।'

তারপর মিষ্টি হেসে বললেন, 'তোমার হয়ত ভাল লা না এসব, কিন্তু আমার একটা নীতি আছে, প্রিন্সিপ আছে। সেটা ত ত্যাগ করতে পারি না।'

খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন জনসন সায়েব। তার গলায় ঝোলানো ক্রশটা হাতের আঙুলে নাড়াচাড়া কর করতে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলেন।

দিনকয়েক কাজ করেই অবস্থাটা বুঝতে পারল নিশাকর স্কুলটা জনসন সায়েবের চ্যারিটি স্কুল। ক্লাস নাইন পর্য্য আছে। ছাত্রসংখ্যা খুব কম। অর্দ্ধেকের উপর ফ্রি বাকী যারা আছে তারাও নিয়মিত মাইনে দেয় না। টাক জোগাড় করে আনেন জনসন সায়েব। আসানসোলে মিশন থেকে প্রতি মাসেই সাহায্য আসে। আর আছে কিছু কিছু ধনী, জনসন সায়েবের অনুরোধে তারা চাঁদ দেন। বাকী টাকা সায়েবের। তাঁর নিজের জমানো টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে আনেন।

চেষ্টা করলে সরকারী সাহায্য মেলে। জনসনের নাম ডাক আছে। জেলাশহরে সবাই চেনে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহে খাতির করে বাড়ী নিয়ে যান। এক কথায় সাহায্য বেরিয়ে

সে। নিশাকর সেই চেষ্টাই করতে গিয়েছিল। কিন্তু সন নিজেই বাদ সাধলেন।

অনড়, অটল। বরং এযুগে অচল। মিথ্যে ষ্টেটমেন্টে করতে পারবেন না তিনি। নিশাকর বুঝিয়েছিল, কারো আইনে লেখা আছে এসব। এত ফ্রি ষ্টুডেন্ট কলে গ্র্যান্ট দেবে না, ছাত্রসংখ্যা আরও একটু বেশী হওয়া ই। সেইরকমই সাজিয়ে-গুছিয়ে লিখিছি।

জনসন সায়েব হেসে বললেন, 'সত্যি কথা লিখলে ান্ট দেবে না বুঝি?'

—'মানে, ওদের রুল্‌স-এ যা আছে তার মধ্যে না ঢুকতে রলে—'

এবার গম্ভীর হয়ে সায়েব বললেন, 'ওদের রুল্‌স আছে নি। কিন্তু আমারও একটা প্রিন্সিপ্যাল আছে ডমাষ্টার।'

দিন পনের পরে কি একটা ব্যাপারে আবার যেতে হ'ল শাকরকে। জনসন সায়েবের বাংলো খুব পরিষ্কার-রিচ্ছন্ন। সামনে সুন্দর বাগান খানিকটা। বছরের সব য়ই নানা রঙের ফুল ফোটে। নিশাকর জানত সায়েবের াড়ীতে লোকজন নেই কেউ। শুধু এদেশী একটা লোক জ করে। রান্নাবান্না থেকে সবকিছু তারই হেপাজতে। াকটা সায়েবের কাছে অনেকদিন আছে। নাম বিলাস-া, নিশাকর গেলেই সায়েবকে খবর দেয়।

আজ কিন্তু বাগানে অচেনা একটি মেয়েকে দেখল শাকর। সুন্দর চেহারা। কুড়ি-বাইশের মত বয়স, ায়ের রং টক্‌টকে ফর্সা। চোখের মণি নীল। একমাথা নালী চুল বব ক'রে কাটা।

নিশাকর বলল, 'সায়েব আছেন বাড়ীতে?'

মেয়েটি ভিতরে গেল। বেরিয়ে এসে পরিষ্কার বাংলায় ল ওকে—'আপনি আসুন।'

নিশাকর চিন্তা করল একবার। মেয়েটি কে? সায়েবের য়?

ভেতরে ঢুকে নিশাকর অবাক্ হ'ল। টেবিলে বসে সন সায়েব ভাত খাচ্ছেন। ডাল তরিতরকারি সাজানো। াকটা বেগুনপোড়াও আছে। স্টেশন মাষ্টার বলেছিল, াব রক্তে খাঁটি ইংরেজ। নিশাকর ভাবল জীবনযাত্রায় কটা নিতান্তই বাঙালী।

সায়েব বললেন, 'কি খবর, হেডমাষ্টার?'

এখনই আসানসোলে বেরুব। তাই খাওয়া-দাওয়া র নিচ্ছি।-

—'আসানসোলে?'

—'হ্যাঁ, রবার্টস আসছে কানপুর থেকে। এই যে আমার মা-মণিও আগে এসে গেছে।'

নিশাকর বুঝতে না পেরে চেয়ে রইল।

—'ও হো, তুমি ত চেনই না একে। এ হ'ল ডরোথী। আমার মা কিংবা মেয়ে যা ইচ্ছে বলতে পার। আসানসোলে থাকে। এবার সিনিয়র কেম্ব্রিজ দিয়েছে। সি ইজ ভেরী ইনটেলিজেন্ট। বুঝলে হেডমাষ্টার?'

নিশাকর হাত তুলে মেয়েটিকে নমস্কার করল।

কাজকর্ম অল্প ছিল। নিশাকর সায়েবের সঙ্গেই বেরুল। যেতে যেতে সায়েব বললেন, 'এবার স্কুলের কিছু বইপত্র আনাতে হবে। ওয়েসলিয়ন মিশনকে ধরেছি। কিছু সাহায্য হয়ত পাওয়া যাবে। একটা লিষ্ট বরং তৈরি কর। টাকাটা হাতে এলে অর্ডার দেওয়া যাবে।'

—'আপনি আসানসোল থেকে কবে ফিরছেন?'

—'কেন? আজই বিকেলে। এইট ডাউন দুটো নাগাদ আসে। রবার্টসকে নিয়ে চারটের মধ্যেই পৌছে যাব এখানে।'

—'মিঃ রবার্টস কি আপনার কোন বন্ধু?'

জনসন উচ্চৈস্বরে হাসলেন। 'দূর, আমার বন্ধু কেন হ'তে যাবে? ডরোথীর বন্ধু, তোমার বয়সী হবে। এখন কানপুরে আছে। আর্মির ফার্ষ্ট লেফটেন্যান্ট।'

নিশাকর হেসে বলল, 'তাই বলুন।'

—'কেন আসছে জান ত? ডরোথীকে বিয়ে করতে চায়, সে আর ইন লাভ, অনেক দিন থেকে। রবার্টসের আসানসোলেই বাড়ী। ডরোথীর সঙ্গে তখনই আলাপ। আমার একটা ফর্ম্যাল পারমিশন চায় আর কি? তুমি সন্ধ্যেবেলায় এস না, আলাপ-সালাপ করবে।'

সায়েব রওনা হলেন।

নিশাকর একদৃষ্টে চেয়ে ছিল। অদ্ভুত মানুষ এই জনসন সায়েব। জামুরিয়া গ্রামের সবাই যুধিষ্ঠির সায়েব বলে। কেউ মিথ্যে কথা বললে সায়েবের বাংলোয় টেনে নিয়ে যায়। জনসন সায়েবের সামনে দাঁড় করিয়ে মজা দেখে। সায়েব কখনও রেগে ওঠেন, কখনও মিষ্টি করে বকেন। তারপর পাদ্রীদের মত ভঙ্গিতে হেসে বলেন, 'মাই সন, স্পীক দি ট্রুথ, সদা সত্য কথা বলিবে।'

সায়েব কিন্তু পাদ্রী নন, কোন মিশনের সঙ্গেও যুক্ত নন তেমন। সাহায্যের জন্য ওয়েসলিয়ন মিশনে যাতায়াত করেন মাত্র। তবে পোষাকটা পাদ্রীর মত। আর মাঝে মাঝে বাইবেল থেকে আওড়ান।

সন্ধ্যের পর নিশাকর বাংলোয় গেল সায়েবের সঙ্গে

দেখা করতে। জামুরিয়ায় রাতগুলি বড় দীর্ঘ মনে হয়। সন্ধ্যের পরই ফাঁকা-ফাঁকা, লোকজন নেই। বোর্ডিঙে ছেলে কম। তারা পড়াশুনো করে। হষ্টেল ঘরটার পশ্চিমে একটা পুকুরগোছের আছে। তার পিছনেই মাঠ। রাতে জোনাকী জ্বলে। শিয়াল ডাকে মাঠে। শন্‌শনে হাওয়া বইলে পুকুরপাড়ের বড় তেঁতুলগাছটার পাতায় কেমন ভূতুড়ে শব্দ হয়।

বাংলোয় যেতেই বিলাসরাম বলল, 'সায়েব বড় গম্ভীর গো বাবু। ফিরে তক্ কারও সাথে কথা বলে নি।'

নিশাকর বলল, 'রবার্টস সায়েব আসে নি ?

'তিনি ত বিকেলেই দিদিমণিকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। ফিরতে রাত হবে ওনাদের।'

আকাশে বোবা তারার দল। রাত্রি গম্ভীর, শীতল। কি ভেবে নিশাকর বলল, 'সায়েব কোথায় ?'

—'দেখুন গিয়ে। ঘরের মধ্যে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন।'

বিলাসরাম মিথ্যে বলে নি। ঝড়ে জলে নীড়হারা পাখী গাছের ডালে যেমন চুপ করে বসে থাকে, তেমনি বসে আছেন সায়েব। মুখে শব্দ নেই, শনের মত পাকা চুলগুলো অবিন্যস্ত।

নিশাকরকে দেখে বললেন, 'কাম ইন হেডমাষ্টার। তোমাকেই দরকার ছিল আমার।'

—'আমাকে ?'

—'হ্যাঁ, জান ত রবার্টস ডরোথীকে বিয়ে করতে চেয়েছে। আমার পারমিশন চায়।'

—'ভাল কথা, মত দিয়ে দিন, আমরা একদিন নেমন্তন্ন পাব।'

সায়েব কিন্তু কথা শুনে হাসলেন না। গম্ভীর হয়ে বললেন, 'রবার্টস আমাকে সমস্যায় ফেলেছে। সত্যমিথ্যার পরীক্ষা, কি যে করি'—

নিশাকর অবাক্ হয়ে তাকাল।

জনসন সায়েব বলে চললেন, 'ইয়ংম্যান, তোমাকে আমার ভাল লাগে। ভেরী গুড চ্যাপ। তোমার কাছে বলেই ফেলি। তুমি একটা গ্র্যাজুয়েট, একটা স্কুলের হেড-মাষ্টার। তোমার অনেষ্ট অপিনিয়নের দাম আছে আমার কাছে।'

নিশাকর নিরুত্তর। সায়েব যেন আরও গভীর কিছু বলবেন, অন্য কথা। যা এতদিন ধরে কাউকে বলেন নি।

—'কলকাতার প্রিন্সেপ ষ্ট্রীট চেন হেডমাষ্টার ? মহা-যুদ্ধের সময় ওখানে একটা ইউরোপীয়ান কোম্পানীর অফিস ছিল। উনিশ শ' একচল্লিশ সাল। যুদ্ধের দামামা বাজছে। আমি কলকাতায় এলাম, সঙ্গে আমার এমিলি।'

—'আপনার স্ত্রী ?'

—'হ্যাঁ, এমিলি জনসন। আদর করে আমি ডাকত এমিলিয়া। বিলেত থেকে এসে ইণ্ডিয়া আমাদের ভা লাগল। এক হিসেবে ইণ্ডিয়ায় আসাই আমাদের হনিমু ট্রিপ।'

কলকাতার অফিসের কাজ ভাল লেগেছিল জনসনের নানারকমের ব্যবসা আছে কোম্পানীর। ইউরোপীয়া অফিসারের মাইনে, এ্যালাউন্স সবই বেশী। সুন্দর ফ্ল্যা কোম্পানীর গাড়ি, বয় বাবুর্চি, কোন অভাব নেই।

এমিলি জনসন গুছিয়ে বসেছেন বেশ। মেম্বার হয়েছে ক্লাবের। সভাসমিতিতে যোগ দিচ্ছেন। সন্ধ্যেয় টেবি টেনিস খেলছেন। কোনদিন ড্রাইভ করে বেড়ি আসছেন ডায়মণ্ডহারবার থেকে।

বছর দুই কেটে গেল। এমিলি জনসনের কোন ছেলে পিলে হ'ল না। চিন্তার রেখা দেখা দিল দু'জনের মুখেই এমন কেন হচ্ছে ?

তবু স্বামী স্ত্রীকে বোঝালেন, 'চাইল্ড হওয়া একটা চা মাত্র। অত অস্থির হ'লে চলবে কেন ?'

আরও একটা বছর কাটল। এমিলি জনসন কেম যেন হয়ে যাচ্ছিলেন। ইদানিং বাইরে বেরুতেন না তেমন ঘরের মধ্যেই থাকতেন। মাঝে মাঝে শুধু সায়েবের স বেড়িয়ে আসতেন খানিকটা। কলকাতা ছাড়িয়ে অনে দূর যেতেন।

এমিলিকে পরীক্ষা করেছিলেন অনেকে। বড় ব ডাক্তার। নামের পিছনের বিদেশী খেতাবগুলো স আনে। কিন্তু কেউ কিছু করতে পারেন নি। জনস দম্পতীকে খুশী করতে একটি শিশু দেবদূতের হাসি দি ওদের সংসারকে মধুর করে তুলল না।

মরীয়া হয়ে এমিলি একদিন বললেন, 'চল, দুজনে পরীক্ষা করাই আর একবার। যাচাই করে দেখি ভাগ্যকে এই শেষবার। আর কিছু বলব না তোমায়।'

জনসনের আপত্তি ছিল না, দুর্ভাগ্যকে মেনে নেবা আগে শেষ চেষ্টা করতে দোষ কি ? কলকাতায় সবচে বড় ডাক্তারের কাছে গেলেন ওঁরা। বার বার ত নয় এই শেষবার।

দিন কয়েক পরে রিপোর্ট নিয়ে এলেন জনসন এমিলির কোন দোষ নেই। জনসনই অক্ষম। নিজে

ব্যর্থতার কথা সেদিনই প্রথম জানলেন, ভারী লজ্জা হ'ল তার। স্যুইট এমিলিয়া। তার সামনে দাঁড়াতে যে কোনদিন এত খারাপ লাগবে এ কথা স্বপ্নেও চিন্তা করেন নি।

এমিলিকে লুকোন নি জনসন। গভীর রাত্রে তাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে সব কথা বলেছিলেন। তার দিকে কেমন অদ্ভুত একটা দৃষ্টিতে চেয়েছিল এমিলি, জনসন সে দৃষ্টি কোনদিন ভুলবেন না। মানুষের চাউনি সময়-বিশেষে ঘৃণায় বিদ্বেষে কেমন বর্বর মনে হয়। এমিলির দৃষ্টি তেমনি মনে হয়েছিল। মাথা নীচু করে তিনি চলে গিয়েছিলেন। ঘর ছেড়ে বারান্দায়। বিছানায় শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল এমিলি। জনসন তার কাছে যেতে পারেন নি। চোরের মত দাঁড়িয়েছিলেন বাইরে। তার কেমন মনে হয়েছিল এমিলিকে সান্ত্বনা দেবার অধিকার তিনি আজই হারিয়েছেন।

এর পর এমিলি জনসন আশ্চর্য্যভাবে সামলে নিয়েছিলেন নিজেকে। আবার বেরুতে সুরু করলেন। ক্লাবে, বারে, ডিনার পার্টিতে, পিক্‌নিকে। সাজগোজ করতেন আগের চেয়ে দ্বিগুণ। মদ খেয়ে বল নাচ নাচতেন। একের পর অন্যের সঙ্গে! একদল স্তাবক সর্ব্বদাই ঘিরে থাকত তাকে। মৌমাছির মত গুনগুন করত তার কানের কাছে।

জনসনের দুঃখ হ'ত। কিন্তু ক্ষোভ প্রকাশ করেন নি। ভেবেছিলেন হয়ত এতেই সাময়িকভাবে দুঃখকে ভুলতে পারবে এমিলি।

মাত্র তিন মাস। তার পরই অঘটন ঘটল। একদিন এমিলি আর ফিরলেন না। জনসন ব্যস্ত হন নি। যেন এ-রকম একটা কিছুই আশঙ্কা করতেন। দিন দুই পরেই এমিলির চিঠি পেলেন জনসন। যা ভেবেছিলেন তাই। এমিলি স্বেচ্ছায় চলে গেছেন। জনসন যেন তাকে আর বিরক্ত না করেন।

কলকাতার সমাজে নানা গুজব উঠল। এক আমেরিকান মিলিটারী অফিসারের সঙ্গে নাকি পালিয়েছে এমিলি। এখন বম্বেতে। পরে ওয়াশিংটনে যাবে।

মাথার চুলগুলো ধবধবে শাদা। জনসন সায়েবকে আরও বুড়ো লাগছিল। বড় অসহায় আর একাকী, নিশাকরের মায়া জন্মাল। দুঃখে-বেদনায় মানুষটা জামুরিয়ায় এসে আশ্রয় নিয়েছে। নির্ভর করতে চাইছে। সত্য বলতে অনুরোধ জানাচ্ছে। আসলে এসব ছদ্মবেশ। মানুষটা ভিতরে ভিতরে বড় একা। বড় নিঃসঙ্গ।

সায়েব বললেন, 'ইয়ংম্যান, ইচ্ছে করলে এমিলিকে আমি মিথ্যে বলতে পারতাম। এমিলি জানতেও পারত না, কিন্তু—'

আর কিছু বললেন না, উদাস চোখে বাইরে চেয়ে রইলেন। নিশাকর প্রশ্ন করল, 'রবার্টস কি জানতে চায়?'

—'সে কানাঘুষো শুনেছে, ডরোথী আমার মেয়ে নয়। ওর পিতৃপরিচয় জানতে চায়।'

—'ডরোথীকে আপনি পেলেন কোথায়?'

—'আমার খুব বেশী জানাশুনো একজনের মেয়ে ডরোথী। মরবার সময় সে ওকে আমার হাতে দিয়ে যায়। ডরোথী জানে আমি ওর বাবা। ওর মা মারা গিয়েছেন।'

—'ডরোথীর সেই পরিচয় রবার্টসকে বলা যায় না?'

—'হয়ত যায়। হয়ত যায় না। সেই কথাই ভাবছি।'

—'রবার্টসকে কি বলবেন?'

—'জানি না হেডমাষ্টার। টু বি অর নট টু বি। কি বলব নিজেই জানি না। ডরোথীকে মানুষ করেছিলাম একটা আনন্দ মেটাতে। ছোট্ট একটা শিশুকে নাড়াচাড়া করবার বাসনা এমিলির মত আমারও ছিল, ইয়ংম্যান। অক্ষমতাটা অপরাধ নয়। এমিলি একটু বুঝল না।'

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে জনসন সায়েব উঠে গেলেন। নিশাকরের মনে হ'ল সায়েবের মনে বহুদিনকার সঞ্চিত অভিমান আর পুঞ্জীভূত বেদনা—সে বেদনার মেঘ আর কাটবে না।

পরদিন সকালে অনেক বেলা পর্য্যন্ত ঘুমোচ্ছিল নিশাকর। কি একটা ছুটি। স্কুল বন্ধ। সায়েবের চাকর বিলাসরাম এসে ঘুম ভাঙ্গাল ওর।

—'কি ব্যাপার, বিলাসরাম?' নিশাকর প্রশ্ন করল।'

—'সায়েব আসানসোলে গেছেন সকালেই, রবার্টস সায়েব, দিদিমণি দু'জনকেই নিয়ে। ওখানেই বিয়া হবে দিদিমণির। দিনকয়েক বাদেই ফিরবেন সায়েব। আপনাকে চিঠি দেছেন গো।'

সায়েব লিখেছেন,—

ইয়ংম্যান,

রবার্টসকে বলেছি কিছু। হয়ত সব বলা হয় নি। কিন্তু সে তাতেই সুখী, ডরোথীকে বিয়ে করছে।

এমিলির একটা ছবি ছিল আমার কাছে। ওদের দিয়েছি। রবার্টসকে বলেছি এমিলির বড় আদরের মেয়ে ডরোথী। তাকে যেন কখনও অনাদর না করে।

রবার্টস উদার ও দয়াবান। তবু এ রকম বলতে হ'ল। অল্প বয়সে নগ্ন সত্যকে সহ্য করা যায় না, তাই কম বয়সে

মানুষ সত্য ও মিথ্যেকে মিশিয়ে পেতে ভালবাসে। আমার মত পাকা চুল হলে সত্যকেই আঁকড়ে ধরবে। শত প্রলোভনেও মিথ্যের আশ্রয় নেবে না।

তোমাকে চিঠি লিখে বড় শান্তি পাচ্ছি। ওদের বিয়ে দিয়ে আসি। দু'জনে স্কুলটাকে নিয়ে মেতে উঠব। কেমন ?···

দিন সাত কেটে গেল। জনসন ফেরেন নি। বিলাসরাম বলেছে সায়েবের দেরি হবে। দিদিমণি আর রবার্টস সায়েবক ট্রেণে তুলে দিয়ে ফিরবেন। রবার্টস সাহেবের ছুটি কম, শীঘ্রি কানপুরে ফিরতে হবে।

নিশাকর ব্যস্ত হয়েছিল একটু। স্কুলের কয়েকটা কাগজপত্রে সায়েবের সই প্রয়োজন। আদায় উশুল কম। সায়েবকে একবার আর্থিক পরিস্থিতিটা বোঝান দরকার। নইলে সামনের মাসে মাষ্টারমশাইদের মাইনে দিতে বেশ একটু কষ্ট হবে। এ সময় জনসন সায়েব এতদিন ধরে আসানসোলে বসে রইলেন।

কিন্তু জনসন আর ফিরলেন না। কাঁদতে কাঁদতে বিলাসরামই একদিন এল। আসানসোলে মারা গেছেন সায়েব। গতকাল রাত্রে। খবর নিয়ে লোক এসেছে। পরশুদিন মেয়ে জামাইকে সী-অফ করে এসে আর বেরোন নি। দরজা বন্ধ করে ঘরে শুয়েছিলেন। এই ক'দিন কম দৌড়ঝাঁপ ত হয় নি! হঠাৎ রাত্রেই হার্ট এ্যাটাক। ডাক্তার বলেছে থ্রম্বসিস্।

বিকালের দিকে মৃতদেহ এল। গাড়ীতে করে আসানসোল থেকে। সায়েবের বাংলোর পেছনের বাগানের মাটির নীচে তাকে শুইয়ে দেওয়া হ'ল, লোকে লোকারণ্য, জনসন সায়েবকে শেষবারের মত দেখবার জন্য দশখানা গ্রামের লোক ভেঙ্গে পড়েছে। ছেলেরা ফুলের মালা পরাল। ফুল দিয়ে ঢেকে দিল সমস্ত শরীর। তারপর মাটির ওপর ফুল ছড়ানো শেষ হ'লে সকলে ফিরল। কেউ কেঁদেছে। চোখ লাল। কেউ গম্ভীর মুখে।···

সাতদিন পর।

স্টেশনটার এককোণে বসে নিশাকর ভাবছিল অনেক কিছু! পাশেই বিছানাপত্র আর স্যুটকেশটা। জামুরিয়া ছেড়ে চলে যাচ্ছে নিশাকর। জনসন সায়েব নেই। স্কুল আর চলবে না, কে আর টাকা জোগাবে? চাঁদা তুলে আনবে আসানসোল থেকে? মিশনের কাছে সাহায্যের জন্য দরবার করবে।

আর একজন কে যেন এই দিকেই আসছে না? হয়ত এই ট্রেণেই যাবে। কোন যাত্রী।

কাছে আসতেই নিশাকর চিনতে পারল। রামধনিয়া। ওকে ঠিক চিনেছে। জামুরিয়ার হেডমাষ্টার বাবুকে ভুল করবে কেন?

নিশাকর বলল, 'স্টেশন মাষ্টারবাবু কোথায়?'

—'দেশ গিয়া, ছুটিমে হায়। অভি নয়া মাষ্টারবাবু আয়া।'

—'তুই ভাল আছিস্?'

রামধনিয়া মাথা হেলাল। বলল, 'কাল আসিয়েছে। দেশ গিয়া থা। লেকিন জামুরিয়াকা যুধিষ্ঠির সাব—' কথাটা যেন শেষ করতে চাইল না রামধনিয়া। কথার মাঝখানেই থেমে গেল।

নিশাকর বলল, 'হ্যাঁ রে, উনি মারা গিয়েছেন। স্বর্গে গিয়েছেন—'

রামধনিয়া মাথা নাড়ছে। কথাটা সে জানে। যুধিষ্ঠিররা স্বর্গে যায়। জামুরিয়ার যুধিষ্ঠির সায়েবও যাবেন। আলবৎ। জরুর।

নিশাকর সায়েবের শেষ চিঠিটার কথা ভাবছিল। মৃত্যুর দু'দিন পরে পাওয়া। গোলযোগে দেরি। নিশাকর কাউকে জানায় নি। ডরোথী, রবার্টস, কাউকে না।

বেশীদিন বাঁচে নি এমিলি। দুঃখকষ্টে পড়েছিল বেচারী। সঙ্গী আমেরিকান অফিসার ওকে ফেলে পালায়। ছোট্ট মেয়েকে নিয়ে নাগপুরে ছিল এমিলি। হঠাৎ গুরুতর অসুখে পড়ে। হয়ত সায়েবকে ভোলে নি এমিলি। শেষ সময় খোঁজ করেছিল। চিঠি পেয়ে জনসন ছুটে গিয়েছিলেন। সেই দেখা। দীর্ঘ চিঠি সায়েবের। কত দুঃখ আর ব্যথা ছড়ানো।

ট্রেণ জামুরিয়া ছাড়ল। নিশাকরের মনে পড়ল। সায়েব একবার বলেছিলেন বটে। ডরোথী ঠিক এমিলির মত দেখতে। অবিকল। স্যুইট এমিলিয়া। সায়েব বিড় বিড় করতেন।

নিশাকর ঠিক বুঝতে পারে নি।

—※—
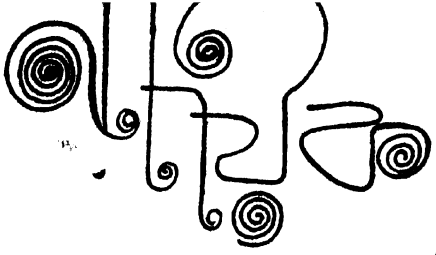
সর্বযুগেই শিল্প ও সাহিত্যের অন্যতম উপজীব্য নর-নারীর প্রেম। এর কারণ খুঁজলে দেখতে পাওয়া যাবে মানুষের জীবনে যে-রিপুর প্রভাব সর্বাধিক, তা হচ্ছে আদিম রিপু। পশুর থেকে মানুষের তফাৎ এইখানে, যে, মানুষ তাকে একটা মধুর ও সংস্কৃত রূপ দিয়েছে। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা মানুষের এই স্বাভাবিক বৃত্তিকে অস্বীকার করেন নি বরং পূর্ণাঙ্গ জীবনযাপনের জন্য তার অনুশীলন অবশ্য প্রয়োজনীয় ব'লে নির্দেশ করেছেন। আমাদের অলঙ্কারশাস্ত্রে যে নবধারসের উল্লেখ আছে তার মধ্যে প্রথম ও প্রধান স্থান দখল ক'রে আছে শৃঙ্গার রস। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে এই রসের কিঞ্চিৎ আধিক্য ঘটলেও কোথাও তা বিকৃতির পর্যায়ে পৌঁছয় নি,১ তার কারণ তখনকার নর-নারীর সম্পর্ক ছিল সুস্থ ও স্বাভাবিক। এখন মানুষের মানসিক ও বহির্জগতের মধ্যে ব্যবধান যত দুস্তর হচ্ছে, তার অবদমিত কামনা তত গোপন পথ খুঁজছে, সেজন্য আধুনিক সাহিত্য ও শিল্পে এত বিকৃতির ছড়াছড়ি।

পঞ্চশরে যে পুরুষ ও নারী দগ্ধ হয়েছে তারাই নায়ক ও নায়িকা। প্রাচীন সংস্কৃত নাটক ও কাব্যে এইসব নায়ক-নায়িকাদের রূপ, গুণ ও চরিত্র ভেদে বহুবিধ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। কবে যে এর সুরু হয়েছিল বলা কঠিন, তবে ভরতের নাট্যশাস্ত্রে এর সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। সংস্কৃত নাটক ও কাব্যে যে-সব নায়ক-নায়িকার দেখা পাওয়া যায় তাঁরা সবাই প্রায় উচ্চকুলোদ্ভব (বা কুলোদ্ভবা)। পরে সংস্কৃতের প্রভাব যখন দেশে আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে এল এবং তার স্থান দখল করল সাধারণের মুখের প্রাকৃত ভাষা, তখন নায়ক-নায়িকারাও সমাজের উঁচুস্তর ছেড়ে সাধারণের মধ্যে নেমে এলেন। প্রাকৃত ভাষা বহু লোকের বোধগম্য হওয়ায় নায়ক-নায়িকা ভেদকে অবলম্বন করে কাব্য রচনার উৎসাহ বেড়ে গেল এবং পরবর্তী কবি পূর্ববর্তী কবিকে টেক্কা দেওয়ার জন্য তাঁর কাব্যে নায়ক-নায়িকার সংখ্যা বাড়িয়ে দিলেন। এভাবে বাড়তে বাড়তে নায়ক-নায়িকার সংখ্যা এত হয়ে উঠল যে, তাদের মধ্যে সংযোগ রাখা কঠিন হয়ে উঠল। এ ছাড়া শুধু সংখ্যা বৃদ্ধির আগ্রহে কবিরা অনেক সময় কষ্টকল্পনার আশ্রয় নিতে লাগলেন অথবা নতুন পাত্রে পুরনো মদ পরিবেশন করতে লাগলেন। এই সংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় কবিরা কিভাবে মেতে উঠেছিলেন একটা উদাহরণ দিলেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। পঞ্চদশ

শতকের কবি ভানুদত্ত তাঁর 'রসমঞ্জরী' কাব্যে এক নায়িকা-দেরই ১১৫৫টি শ্রেণী বিভাগ করেন। ভানুদত্ত অবশ্য তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন সংস্কৃতে কিন্তু তাঁর কাব্য যে বিদগ্ধ মহলে বিশেষ সমাদৃত হয়েছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু ব্রজ ভাষায় নায়ক-নায়িকা ভেদকে অবলম্বন ক'রে কাব্যরচনা ক'রে যিনি সর্বাপেক্ষা যশস্বী হয়েছেন তিনি হলেন কেশবদাস। কেশবদাস তাঁর পূর্ববর্তী কবি ভানুদত্তের মত নায়িকাদের নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি না করলেও তাঁর কাব্যে ৩৬০ রকম নায়িকা বর্ণনা করেছেন। এই কেশবদাস সম্পর্কে আমরা কিছুটা বিশেষভাবে আগ্রহী তার কারণ তাঁর 'রসিকপ্রিয়া' কাব্য পরবর্তীকালের রাজপুত ও পাহাড়ী চিত্রকরদের চিত্ররচনার অতি প্রিয় বিষয় ছিল।[২] অবশ্য কেশবদাসের পরেও অনেকে[৩] ওই একই বিষয় অবলম্বন করে কাব্যরচনা করে খ্যাতিলাভ করেছিলেন এবং তাঁদের কবিতাও রাজপুত ও পাহাড়ী শিল্পীদের আকৃষ্ট করেছিল কিন্তু তাঁরা সবাই কম-বেশী কেশবদাসের শ্রেণী-বিভাগই গ্রহণ করেছিলেন। সেজন্য নায়ক-নায়িকা ভেদ আলোচনায় কেশবদাসের উল্লেখ অপরিহার্য।

এই কেশবদাস সম্বন্ধে মোটামুটি জানা যায় যে, তাঁর আদিনিবাস ছিল হিমালয়ের তেহরী অঞ্চলে, এখন যা গাঢ়োয়ালের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর পিতার নাম ছিল কাশীনাথ, বর্ণে তাঁরা ছিলেন ব্রাহ্মণ। পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে কেশবদাস পৈতৃক বাসভূমি ছেড়ে বুন্দেলখণ্ডের রাজা মধুকর শা'র আশ্রয়প্রার্থী হন এবং ওরছায় বসবাস সুরু করেন। পরবর্তী রাজা ইন্দ্রজিত শা তাঁকে ২১টি গ্রামের ভূমিস্বত্ব দান করেন। কেশবদাস প্রথম কাব্য রচনা করেন ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কিন্তু তাঁর সবচাইতে জনপ্রিয় কাব্য 'রসিকপ্রিয়া' সমাপ্ত হয় ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দে। কবি হিসাবে তিনি যে খুবই খ্যাতিলাভ করেছিলেন এবং রাজা ইন্দ্রজিৎ শা'র যথেষ্ট আস্থাভাজন হয়েছিলেন তার প্রমাণ মেলে একটি ঘটনায়। একবার কোন কারণে ইন্দ্রজিৎ শা'র উপর ক্রুদ্ধ হয়ে সম্রাট্ আকবর তাঁর এক কোটি টাকা জরিমানা ধার্য করেন। ইন্দ্রজিৎ শা উপায়ান্তর না দেখে কেশবদাসকে পাঠালেন আগ্রায় সম্রাটের রোষ প্রশমিত করার জন্য। কেশবদাস আগ্রায় গিয়ে প্রথম রাজা বীরবলের সঙ্গে দেখা করলেন এবং তাঁকে একটি স্বরচিত কবিতায় আপ্যায়িত করলেন। তাঁর কবিতা শুনে এতই প্রীত হলেন বীরবল যে নিজে মধ্যস্থ হয়ে সেবার ইন্দ্রজিৎ শা'র পরিত্রাণের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। এর পরেও কেশবদাস বেশ কিছুদিন সম্রাটের দরবারে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে যে তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন তার প্রমাণ মেলে মোগল কলমে আঁকা ছবিসমেত সমসাময়িক একটি 'রসিকপ্রিয়া'র সংস্করণে। কেউ কেউ এমন কথাও বলেন যে, বীরবল অথবা আকবরের প্রীত্যর্থেই 'রসিকপ্রিয়া' রচিত হয়েছিল। এ সম্বন্ধে সঠিক কিছু অবশ্য বলা মুশ্‌কিল। কেশবদাস কবে আগ্রা থেকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন তাও জানা যায় না। তাঁর মৃত্যুকালও অনিশ্চিত।

যে কোন নায়ক-নায়িকা ভেদমূলক কাব্যে নায়কের চাইতে নায়িকার সংখ্যাই বেশী এবং সেইটেই স্বাভাবিক, তার কারণ শ্রেণী-বিভাগ যাঁরা করেছেন তাঁরা সবাই পুরুষ। কেশবদাসও এর ব্যতিক্রম নন। আমরা আগেই দেখেছি কেশবদাসের বর্ণিত নায়িকার সংখ্যা ৩৬০। রূপ, গুণ, বয়স, প্রকৃতি ও সামাজিক অবস্থাভেদে এই বিস্তৃত নায়িকা-ভেদের সম্পূর্ণ পরিচয় এখানে দেওয়া সম্ভব নয়, আমরা শুধু একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম।

কেশবদাস প্রথমে প্রথাগত ধারা অনুসরণ করে গুণানুসারে[৪] নায়িকাদের তিনভাগে ভাগ করেছেন—উত্তম, মধ্যম ও অধম।

তারপর বয়সানুসারে তাদের চারভাগে ভাগ করেছেন—বালা (১৬ বছর অবধি), তরুণী (১৬ থেকে ৩০ বছর), প্রৌঢ়া (৩০ থেকে ৫৫) ও বৃদ্ধা (৫৫র উর্ধে)।

এরপর আকৃতি ও প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি তাদের তিন ভাগে ভাগ করেছেন—পদ্মিনী (যার কোন খুঁত নেই), চিত্রিণী (যার বহুবিধ রূপ গুণ থাকা সত্ত্বেও কিঞ্চিৎ ত্রুটি আছে), শঙ্খিনী (লজ্জাশীলা) ও হস্তিনী (স্থূল, বিসদৃশ)।

এ ছাড়া নায়িকাদের মানসিক প্রবণতা লক্ষ্য করে তিনি তাদের তিনভাগে ভাগ করেছেন—স্বকীয়া (যে শুধু নিজের পতিতেই আসক্ত), পরকীয়া (যে অন্য পুরুষের প্রতি আসক্ত) এবং সামান্যা (যে সর্বসাধারণের)।

স্বকীয়া আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—

১ এর ব্যতিক্রম যে-একেবারেই নেই তা নয়, কিন্তু যে-সব রচনায় তার সাক্ষাৎ মেলে সেগুলি হচ্ছে যুগ-সন্ধিকালের রচনা। যুগ-সন্ধিকালে সামাজিক বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নৈতিক বিপর্যয়ও ঘটে এবং তার প্রতিফলন ঘটে সাহিত্যে ও শিল্পে।

২ এক সময় বাশোলী অঞ্চলের শিল্পীদের মধ্যে ভানু দত্তের রসমঞ্জরীও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

৩ মতিরাম, কৃপারাম, রহিম, চিন্তামণি, দেব, সুরতি মিশ্র, রঘুনাথ প্রভৃতি।

মুগ্ধা—যার মধ্যে ভালবাসার সবে অঙ্কুরোদ্গম হচ্ছে।
মধ্যা—যে এ সব বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞানলাভ করেছে।
প্রৌঢ়া—যে এ সব বিষয়ে একেবারে পরিপক্ক।

মুগ্ধার আবার দু'টি বিভাগ—
অজ্ঞাত যৌবনা—যে তার যৌবন সম্বন্ধে সচেতন নয়।
জ্ঞাত যৌবনা—যে তার যৌবন সম্বন্ধে সচেতন।

জ্ঞাত যৌবনার আবার দু'টি বিভাগ—

নবোঢ়া—যে সদ্য বিবাহিত এবং বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা না থাকায় প্রথম স্বামী-মিলনের পূর্বে আশঙ্কিতচিত্ত।

বিপ্রলব্ধা নবোঢ়া—যে প্রথম মিলন-রাত্রি অতিবাহিত করেছে এবং স্বাভাবিক কারণেই যার মন থেকে অমূলক ভয়-ভাবনা তিরোহিত।

মধ্যা নায়িকা মনে মনে কল্পনার জাল বুনলেও স্বাভাবিক লজ্জা-সংকোচের বশে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করতে পারে না। কিন্তু প্রৌঢ়া নায়িকার সে-সব কোন বালাই নেই, সে নিজের কামনা অসংকোচে ব্যক্ত করে। প্রৌঢ়ার দু'টি বিভাগ—

রতিপ্রিয়া—যে মিলন-সুখ কামনা করে।

আনন্দ-সম্মোহিতা—যে সেই আনন্দ সব সময় মনের মধ্যে লালন করে।

যে-সব স্বকীয়া নায়িকাদের পতিরা অন্য নারীতে আসক্ত সেই সব নায়িকাদের প্রকৃতি অনুসারে কেশবদাস তাদের তিন ভাগ করেছেন—

ধীরা—যে মনের দুঃখ মনে গোপন করে রাখে।

অধীরা—যে মনের দুঃখ তীব্র ভর্ৎসনার মাধ্যমে প্রকাশ করে।

ধীরা-অধীরা—যে অন্তরে বিচলিত হ'লেও বাইরে তা ব্যক্ত করে না বরং মিষ্ট কথায় পতিকে বোঝাবার চেষ্টা করে। এই তিন শ্রেণীর নায়িকাদের কেশবদাস আবার ছ ভাগে ভাগ করেছেন—

মধ্য-ধীরা, মধ্য-অধীরা, মধ্য ধীরা-অধীরা
প্রৌঢ়-ধীরা, প্রৌঢ়-অধীরা, প্রৌঢ় ধীরা-অধীরা।

পরকীয়া নায়িকাদের কেশবদাস দু'-ভাগে ভাগ করেছেন—

গুপ্ত বিদগ্ধা—যে গুপ্ত প্রেমে পারদর্শিনী

কুলটা—যে অঙ্গ-ভঙ্গির দ্বারা এবং অশ্লীল ভাষা প্রয়োগে পথচারী নায়ককে আকর্ষণ করতে চেষ্টা করে।

বিদগ্ধা আবার দু-শ্রেণীর—

বাগ-বিদগ্ধা—যে কথার জাল বিস্তার করতে সক্ষম।

ক্রিয়া-বিদগ্ধা—যে ক্রিয়ায় বিশেষ পারদর্শিনী

অনুরূপ ভাবে কেশবদাস সামান্যা নায়িকাদেরও বহুবিধ ভাগে ভাগ করেছেন, যার উল্লেখ আমরা এ ক্ষেত্রে করলাম না।

এরপর কেশবদাস নায়কদের সঙ্গে নায়িকাদের সাক্ষাৎ সম্পর্ক বিচার করে তাদের আট ভাগে ভাগ করেছেন। কেশবদাসের আগেও অবশ্য অনুরূপ শ্রেণী-বিভাগ ছিল, কিন্তু কেশবদাসই সর্বপ্রথম সুললিত দোঁহার মাধ্যমে এই সব নায়িকাদের মনোভাব সর্ব-সাধারণের গোচর করলেন। উত্তরকালে পাহাড়ী শিল্পীদের মধ্যে এই অষ্ট-নায়িকাকে অবলম্বন করে চিত্ররচনা একটা বিলাস হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা কেশবদাসের নায়িকা-বর্ণনা এবং পাহাড়ী শিল্পীদের আঁকা সেই সব নায়িকাদের চাক্ষুষ চিত্র আলোচনা করব এবং আরও দেখব আমাদের বৈষ্ণব কবিরা ঐ সব নায়িকাদের যা বর্ণনা দিয়েছেন তার সঙ্গে কেশবদাসের বর্ণনার পার্থক্য অতি অল্পই।

কেশবদাসের বর্ণিত আটটি নায়িকা হ'ল :

১। স্বাধীন-পতিকা—যার পতি তার ইচ্ছার বশীভূত।

২। উৎকণ্ঠিতা—যে কোন পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে উৎকণ্ঠিত-চিত্তে প্রেমিকের জন্য অপেক্ষা করছে।

৩। বাসকশয্যা—যে গৃহে শয্যা পেতে প্রবাসগত পতির প্রত্যাবর্তনের আশায় অপেক্ষা করছে।

৪। কলহান্তরিতা—যে প্রেমিকের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে কলহ করে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

৫। খণ্ডিতা—যে প্রেমিকের প্রতি রুষ্ট।

৬। প্রোষিত পতিকা—যার পতি বিদেশে গেছে।

৭। বিপ্রলব্ধা—যে প্রেমিকের আগমনের আশায় সারাক্ষণ অপেক্ষা ক'রে থেকেও প্রেমিক এল না বলে ক্ষুব্ধ।

৮। অভিসারিকা—যে একাকী প্রেমিকের সঙ্গে মেলবার উদ্দেশ্যে কোন পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে গমন করছে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা ব'লে রাখা দরকার। পাহাড়ী শিল্পীদের আঁকা বেশীর ভাগ নায়ক-নায়িকার ছবিতেই দেখা যাবে নায়ক কৃষ্ণ, নায়িকা রাধা। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, তার কারণ ভারতীয় ঐতিহ্যে কৃষ্ণ ও রাধাই চিরন্তন নায়ক-নায়িকা।

১। স্বাধীন পতিকা—

স্বাধীন পতিকা সেই নায়িকা, যার পতি তার একান্ত অনুগত এবং সব সময় তার সঙ্গে সঙ্গে ফেরে।

[৪] গুণের আটটি অঙ্গ—যৌবন, রূপ, গুণ, শীল, প্রেম, কুল, বৈভব ভূষণ।

প্রচ্ছন্ন স্বাধীন পতিকা

নায়িকার সখী নায়িকাকে বলছে :

যে হরি ব্রজের জীবন, পিতা নন্দের কাছে যে জীবনেরও অধিক, যার জন্য দেবতা, মানুষ এমন কি কুমারীরা অবধি নিজেদের বিকিয়ে দেয়, যাকে লক্ষ্মী ও সূর্য ভালবাসে।

তাকে, তুই কি না গোয়ালার মেয়ে এমন ভালবাসায় বেঁধেছিস যে সে তোর পা ধুইয়ে দিচ্ছে।

আমি না হেসে এখান থেকে সরে যাচ্ছি বটে, কিন্তু লোকে দেখলে নিন্দে করবে।

স্বাধীন পতিকা

প্রকাশ স্বাধীন পতিকা

সেই সখীই বলছে :

আমার মত যে (নায়ক) সব সময় তোমার অঙ্গে লেগে রয়েছে। মুকুরের মধ্যে যেমন ছায়া পড়ে তেমনি তোমার মধ্যে সেই আনন্দচন্দ্র শোভা পাচ্ছে।

ভগীরথের রথের পিছু পিছু গঙ্গা যেমন অনুগমন করেছিলেন তেমনি আমাদের গোপালও তোমার মনোরসের পিছু পিছু ছুটে চলেছে।

বল দেখি রাণী, এমন কোন বিষয় আছে কি যাতে সে তোমার কথা বেদবাক্যের মত মেনে নেয় না ?

স্বাধীন পতিকার চিত্ররূপে দেখা যায়, নায়ক নায়িকার চুল বেঁধে দিচ্ছে, পায়ে আলতা পরিয়ে দিচ্ছে কিংবা কপালে টিপ পরিয়ে দিচ্ছে। অনুগত নায়কের এই আত্মনিবেদনটুকু নায়িকা বেশ খুশী মনেই গ্রহণ করছে।

এখানে যে ছবি ছাপা হ'ল তার সঙ্গে চন্দ্রশেখরের নিম্নোদ্ধৃত স্বাধীন পতিকা বর্ণনার আশ্চর্য মিল আছে :

কি করিলে মনসিজ মত্ত মহোদ্ধত
দেখহ নয়ন পসারি।
ক্ষত বিক্ষত ভেল মঝু কুচ-মণ্ডল
নখর নিশানে তুহারি॥
নিরলজ অরু হাম কি কহব তোয়।
আপন মন্দিরে কৈছনে যাওর
ননদিনি কি কহব মোয়॥
মৃগমদ-চন্দন কর অনুলেপন
মৈছন নখ-পদ ছাপে।
আপন ভালই চাহি বেণি বান্ধহ
চাঁচর চিকুর কলাপে॥
রঙ্গিম যাবক আপন করে করি
দেহ মঝু পদ-যুগ-ধারে।
চন্দ্রশেখর কহে কান্তুক করি বশ
কামিনি গরব বিথারে॥

যাবক—আলতা

২। উৎকণ্ঠিতা—

উৎকণ্ঠিতা সেই নায়িকা, যে প্রেমিকের আগমনের প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে রয়েছে। প্রেমিক সময়মত না আসায় তার মনে নানা অশুভ চিন্তার উদয় হচ্ছে।

প্রচ্ছন্ন উৎকণ্ঠিতা

নায়িকা ভাবছে—

বাড়ীতে কি কোন কাজ ছিল? নাকি বন্ধুবান্ধবরা ছাড়ে নি? অথবা আজ কোন ব্রতোপবাসের দিন?

কারুর কাছে হয়ত টাকাকড়ি ধার নিয়েছিল সময়ে শোধ দিতে পারে নি, কিংবা কারুর সঙ্গে বিবাদ করেছে, নয়ত অন্তরে হঠাৎ বোধোদয় হয়েছে।

শরীর খারাপ হয় নি ত? আমাকে সত্যি সত্যি ভালবাসে ত? নাকি মাঝ রাতে ঝড়-বৃষ্টি দেখে ভয় পেয়েছে?

কিংবা হয়ত আমার ভালবাসা পরীক্ষা করার জন্য আজ আমার কাছে এল না, কেশব রায়। নইলে আর কি কে ভুলিয়ে রাখতে পারে?

প্রকাশ উৎকণ্ঠিতা

নায়িকা ভাবছে—

ভুলে যায় নি ত? কোন কিছু তাকে ভুলিয়ে রাখে নি? নাকি পথ ভুলে অন্য কোথাও চলে গেল, এখন আর খুঁজে পাচ্ছে না?

ভয় পেয়ে যায় নি ত, কেশব? নাকি পথে আসতে ...র সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে? কিংবা কোন প্রেমিকা ...নীর পাল্লায় পড়েছে?

সে কি এখনও আসছে? হয়ত এসে গেছে এতক্ষণে। ...মি যখন এত করে আশা করছি তখন আমার প্রিয় ...সবেই।

কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন নন্দকুমার এল না তখন সে ভাবতে ...ল তার না আসার কারণ কি?

উৎকণ্ঠিতা নায়িকার ছবিতে দেখা যায়, নায়িকা এক ...র্জন স্থানে অপেক্ষা করছে নায়কের জন্য। গাছের পাতা ...ড়িয়ে সে শয্যা পেতেছে এবং তার উপর বসে বা দাঁড়িয়ে ...তীক্ষা করছে নায়কের আগমনের। বনভূমি নিস্তব্ধ, ...টুকু শব্দেই সে সচকিত হয়ে ওঠে। তার বিরহব্যথাকে ...রও প্রকট করে তুলেছে জোড়ায় জোড়ায় পশু ও পাখী, ...া নায়িকার দুঃখে সহানুভূতি জানাতে এসেছে। শিল্পী ...াতে চেয়েছেন, এ জগতে পশু, পাখী সবারই ভালবাসার ...া আছে শুধু নায়িকারই নেই। নির্জন বনভূমিতে একা ...প্রহর গুণছে।

বৈষ্ণব কবি কানুরাম দাস এই উৎকণ্ঠিতা নায়িকার মনের ...াকে ব্যক্ত করেছেন অতি সুন্দরভাবে—

মন্দির তেহি কানন মাহা পৈঠলুঁ
কানু মিলন প্রতি আশে।
আভরণ বসনে অঙ্গে সব সাজলুঁ
তাম্বুল কর্পূর বাসে॥
সজনী সো মুঝে বিপরীত ভেল।
কানু রহল দূরে মনমথ আগি ফুরে
সো নাহি দরশন দেল॥
ফুলশরে জর জর সকল কলেবর
কাতরে মহি গড়ি যাই।
কোকিল বোলে তোলে ঘনজীবন
উঠি বসি রজনি গোঙাই॥
শীতল ভবন গরল সমান ভেল
হিমাচল বায়ু হুতাশ।
লোচনে নীর থীর নাহি বান্ধয়ে
কান্দয়ে কানুরাম দাস॥

মাহা—মধ্যে; পৈঠলুঁ—প্রবেশ করলাম; মহি গড়ি যাই—মাটিতে গড়াই।

৩। বাসকশয্যা—

বাসকশয্যা সেই নায়িকা, যে গৃহে শয্যা পেতে অপেক্ষা করছে প্রিয়-প্রত্যাগমনের আশায়।

প্রচ্ছন্ন বাসকশয্যা

একজন সখী কবিকে সম্বোধন করে বলছে:

কেশবদাস, ওই যে কচি পাতা ও কুঁড়িতে ভরা কোমল-বপু চন্দনগাছ দেখছ, যার চারধারে লবঙ্গলতা জড়িয়েছে—সেইখানে আমার সখী ছুটে ছুটে যাচ্ছে দীপশিখার মত; তার নীল বসন তার অঙ্গের দ্যুতিকে চাপা দিচ্ছে। যেদিক থেকে একটু বাতাস, শুকনো পাতা অথবা পশু-পাখীর পায়ের আওয়াজ আসছে সেদিকেই সে চমকে চমকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে, প্রতি মুহূর্তেই আশা করছে এই বুঝি প্রিয় এল।[৫]

কুঞ্জজালের মধ্যে নন্দলালের জন্য প্রতীক্ষারতা বালাকে দেখাচ্ছে যেন ঠিক খাঁচায় পোষা পাখীর মত।

প্রকাশ বাসকশয্যা

একজন সখী আর একজন সখাকে বলছে:

---

৫ তুলনীয়— অপরূপ রাইক চরীত।
নিভৃত-নিকুঞ্জ মাঝে ধনি সাজয়ে
পুন পুন উঠয়ে চকীত॥
(জ্ঞান দাস)

দেখ সখী, মিষ্টি কথার ভেতর দিয়ে সে তার উল্লসিত হৃদয়ের কামনা কেমন ব্যক্ত করছে।৬

কোমল-হাসিনী, নয়ন-বিলাসিনী ও অঙ্গ-সুভাসিনী সখী আমাদের তুলসীবনে তুলসীর মত অথবা মূর্তিমতী রতির মত মনোহারিণী রূপ ধারণ করেছে।

কুঞ্জবনে গোপবালা কুঞ্জকুটিরে সীতার মত বিরাজ করছে।

বাসকশয্যা (আগত পতিকা)

বাসকশয্যা নায়িকার ছবিতে দেখা যায়, নায়কের প্রত্যাগমনের সংবাদ পেয়ে (আগম পতিকা) নায়িকার সখীরা ঘরের মধ্যে শয্যারচনার কাজে ব্যস্ত, ওদিকে নায়িকা ঘরের দরজা ধরে দাঁড়িয়ে (কখনও কখনও বারান্দায় বসে) বাহিরের দিকে চেয়ে আছে। নায়িকার ঘরের পাশ দিয়েই হয়ত বয়ে গেছে এক নদী। একটি নৌকোকে আগে থাকতেই পাঠানো হয়েছে নায়ককে এগিয়ে আনতে; নৌকোটি ওপারে গিয়ে নোঙর ফেলেছে। কখনও কখনও দেখা যায়, ঘরের চালে এসে বসেছে একটি কাক। নায়ক যে আসছে সেই খবর বয়ে এনেছে। নায়িকা তাকে অনুরোধ করছে তুমি আর একটি বার যাও, দেখ সে কতদূর এল। যদি তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে পার তা হ'লে তোমাকে গলার এই হারছড়াটা দেব আর বাটি ভরে পায়েস দেব।৭ গলার হারছড়ার জন্য না হোক পায়েসের লোভে কাক আবার যাত্রা করে, কখনও কখনও দেখা যায় মুখে করে একটা চিঠি নিয়ে যাচ্ছে—নায়িকা লিখেছে নায়ককে। প্রাসাদের ভিতরের দৃশ্যে দেখা যায় উঠোনে, ফোয়ারার ধারে অথবা কার্নিশে হাঁস, সারস অথবা পায়রা দম্পতি পরস্পর পরস্পরকে প্রেম নিবেদন করছে। এরা সব আসন্ন মিলনের ইঙ্গিত।

আমাদের বৈষ্ণব কবিরা বাসকশয্যা নায়িকার যে বর্ণনা দিয়েছেন তার থেকে এ ছবির খুব একটা তফাৎ নেই। নীচে বলরাম দাসের বাসকশয্যা নায়িকার বর্ণনা তুলে দিলাম:

অনুপম মন অভিলাষ।
সঙ্কেত কুঞ্জহিঁ শেজ বিছায়ই
কানু মিলব প্রতি আশ॥
মৃগমদ চন্দন গন্ধ সুলেপন
বিকসিত চম্পকদাম।
কপূর তাম্বুল সম্পুটে রাখয়ে
পূরব মনোরথ কাম॥
মঙ্গল কলস পর দেই নব পল্লব
রম্ভা শোভে তছু ধাম।
রতন প্রদীপ সমীপহিঁ জারল
চামরবিজন অনুপাম॥
কত উপহার কুঞ্জমাহা করলহি
কানু মিলব প্রতি আশ।
ঘর বাহির কত আয়ত যায়ত
কি কহব বলরাম দাস॥

সম্পুটে—ডিবায়; জারল—জ্বালাল।

৪। কলহান্তরিতা বা অভিসন্ধিতা—

কলহান্তরিতা সেই নায়িকা, যে অনুতপ্ত প্রেমিকের

---

৬ তুলনীয়— উজর দীপ উজারই পুন পুন
কহত ভরমময় ভাব।
হৃদয় উলাস হাসি দরশাওই
কহ ঘনশ্যামর দাস।।
(ঘনশ্যাম দাস)

উজর—উজ্জ্বল: ভরমময়—সসভ্রম

৭ এসব ছবির পিছনে কবিতার আকারে লেখা থাকে।

অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও মান ত্যাগ করে নি কিন্তু তারপর প্রেমিক যখন ক্ষুণ্ণ মনে বিদায় নিচ্ছে তখন অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছে।

প্রচ্ছন্ন কলহান্তরিতা

নায়িকা নিজেই নিজেকে তিরস্কার করছে—

সে যখন বার বার অনুনয় করছিল তখন ছেলেমানুষী করে তার কথার উত্তর দিস্ নি—এখন কথা বলার জন্য শিশুর মত কাঁদলে কি হবে?

সে যখন তোর পায়ে ধরে সাধছিল তখন তুই পাষাণের চাইতেও কঠিন হয়েছিলি—এখন মাখনের মত গলে গেলে কি হবে?

কেশবদাস বলে, অহঙ্কারে (মত্ত হয়ে) তার কোন কথাই না শুনে তাকে একেবারে দূরে ঠেলে দিলে—এখন জীবনের জীবন থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে কোথা?

তুমি এমনই প্রেয়সী যে প্রিয়র অত সাধ্য-সাধনা উপেক্ষা করলে—এখন বড় দেরিতে অনুশোচনা করছ।

প্রকাশ কলহান্তরিতা

নায়িকা সখীর কাছে আক্ষেপ করছে—

হায় কেশব, আমার প্রিয় যখন পায়ে ধরে সাধছিল তখন কেন আমি তার দিকে একবার চোখ তুলে তাকাই নি!

সখী, তোর পরামর্শ না শুনে আমি শেষে কি না ক্রোধের বশবর্তী হলাম?

চন্দন, চাঁদের আলো, স্নিগ্ধ বাতাস, পদ্ম ফুল সবার স্পর্শ ই আমার শরীরে এখন জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে। সখী, আমার দেহ আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমার মনে সুখ নেই।

মানিনী

কলহান্তরিতা

আমি বিপরীত আচরণ করেছি বলে আমার কপালে সব কিছুই বিপরীত ঘটছে।

এবার শুনুন বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাসের কলহান্তরিতা নায়িকা বর্ণনা—

সাকর চরণ নখর রুচি হেরইতে
মুরছিত কত কোটি কাম।
সো মঝু পদতলে ধ্বনি লোটায়ল
পালটি না হেরলুঁ হাম॥
সজনি কি পুছসি হামারি অভাগি।
ব্রজকুল নন্দন চান্দ উপেখলুঁ
দারুণ মানকি লাগি॥
কাতর দীঠে মীঠ বচনামৃতে
কতরূপে সাধল নাহ।

সো হমে শ্রবণ সীম নাহি আনলুঁ
অব হিয়ে তুষদহ দাহ॥
সো হেন রসিক পিয়া কাঁহা রহু কাঁহা করু
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর।
গোবিন্দদাস কহে শুন বর নাগরি
সো পহুঁ তোহারি অদুর॥

উপেখলুঁ—উপেক্ষা করলাম ; সোঙরি—স্মরণ করে

কলহান্তরিতা নায়িকার ছবিতে দেখা যায় অভিমানিনী নায়িকা মুখ ঘুরিয়ে বসে রয়েছে আর নায়ক ক্ষুণ্ণ মনে চলে যাচ্ছে।

৫। খণ্ডিতা—

খণ্ডিতা সেই নায়িকা, যার প্রেমিক রাত্রিবেলা অন্য কুঞ্জেতে নিশিযাপন করে পরের দিন সকালবেলা এসে হাজির হয়েছে, তখন ক্রুদ্ধ নায়িকা তাকে তীব্র ভর্ৎসনা করছে।

খণ্ডিতা

প্রচ্ছন্ন খণ্ডিতা

নায়িকা বলছে নায়ককে—

লোক-সমাজে তোমার নামে যা রটছে তা আর কানে শোনা যায় না।

নিজের বংশ-পরিচয় বিস্মৃত হয়ে তুমি কাকের মত শুধু উচ্ছিষ্টের সন্ধানে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছ। অকর্মা লোকের মত শুধু অপকর্মের সন্ধানে আছ।

যতবার তোমাকে দূর করে দিচ্ছি ততবারই তুমি দৌড়ে এসে পায়ে পড়ছ। তুমি জান না কুসংসর্গে পড়ে তোমার জীবন কি ভাবে নষ্ট হচ্ছে।

কার ঘরে (সারারাত) পেঁচার মত বসে থেকে তার সর্বনাশ করে এলে ঘনশ্যাম—এখন সকালবেলা চুপি চুপি আমার ঘরে ঢুকছ ?

প্রকাশ খণ্ডিতা

নায়িকা বলে যাচ্ছে নায়ককে—

হরি, কোন্ কারণে তোমার আঁখি আজ রক্তবর্ণ হয়েছে। মনে হচ্ছে কে যেন রঙ করে দিয়েছে।

আমার বিশ্বাস তারা তোমাকে সারা রাত কামনা অথবা ক্রোধের তাড়নায় জাগিয়ে রেখেছিল।

মোহন, তোমার ওই রক্তবর্ণ আঁখি দু'টি এখনও আমার উপর মোহ বিস্তার করছে, তারা আমাকে আকর্ষণ করছে তোমার দিকে।

কেশব, বল ত ওই আঁখি দু'টি যে লাল হয়েছে সে কি

মার বিরহ জ্বালায়, না অপর কারও প্রেমাস্পদকে নুসরণের ক্লান্তিতে ?

খণ্ডিতা নায়িকার এই বর্ণনার সঙ্গে বৈষ্ণব কবিদের ণ্ডিতা নায়িকা বর্ণনার যথেষ্ট মিল আছে। নীচে গোবিন্দ সের খণ্ডিতা বর্ণনা দেওয়া হ'ল—

শুন মাধব কোন কলাবতি সোই।
প্রেম হেম গহি আপন রঙ দেই
এ হেন সবজায়লি তোই॥
নয়নক অঞ্জন অধরে ভেল রঞ্জিত
নয়নহি তাম্বুল দাগ।
সিন্দুর বিন্দু চন্দন ইন্দু ঝাঁপল
উর পর সাবক রাগ॥
মদন সোনার ভোরি রূপ-লালসে
তাহে দেয়ল নখরেহ।
কোন গোঙারি তোহে অব পরশব
হেরি তুয়া ঝামর দেহ॥
অবরস লালস কিয়ে দরশায়সি
নীলজ দেহ মৈলান।
গোবিন্দদাস কহ আপন পরশ দেহ
কানু করু মুকুত সিনান॥

গহি—গ্রহণ করে; ঝাঁপল—ঢেকে দিল; উর—বুক; ারি—ভুলে গেল; গোঙারি—মূর্খ; ঝামর দেহ—মলিন হ; নীলজ—নির্লজ্জ; মৈলান—ম্লান।

খণ্ডিতা নায়িকার ছবিতে দেখা যায় ক্রুদ্ধা নায়িকা র্জনী তুলে নায়ককে তিরস্কার করছে এবং নায়ক অপরাধীর ত দাঁড়িয়ে রয়েছে।

৬। প্রোষিত পতিকা—

প্রোষিত পতিকার স্বামী বিদেশে গেছে কোন র্যোপলক্ষ্যে। দীর্ঘ বিচ্ছেদে নায়িকা ক্লিষ্টা।

প্রচ্ছন্ন প্রোষিত পতিকা

নায়িকার বিরহাবস্থা লক্ষ্য ক'রে একজন সখী ভাবছে—

হে কেশব, কোন পূর্বকৃত পুণ্যের ফলে তোমার কাজ এত দিনে) সমাধা হয়েছে এবং তোমার অভিলাষ পূরণের দিন (অর্থাৎ প্রত্যাগমনের দিন) সমীপবর্তী।

তারপর নায়িকাকে সম্বোধন করে—সখী শুনছ, সে যে ক'দিন বাইরে থাকবে বলেছিল তার অর্ধেকেরও বেশী দিন কেটে গেছে।

তা সত্ত্বেও তুমি কেন হাসছ না বা কথা বলছ না; অথচ

প্রোষিত পতিকা

সে যাবার সময় আমার পায়ে ধরে বলে গিয়েছিল (অর্থাৎ সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিল তোমাকে দেখতে)।

কাঠের চাইতেও কঠিন তোমার দেহের কাঠিন্য—তোমার বিরহানলেও তা দগ্ধ হচ্ছে না।

প্রকাশ প্রোষিত পতিকা

সখী বলছে—

ফেরবার দিন ঠিক করে সে বলে গিয়েছিল। আ তাদের সঙ্গে ভোজনাদি শেষ করেই (অর্থাৎ কাজ-ক মিটিয়েই) চলে আসব।

তারপর কতদিন হয়ে গেল, এ দিকে অপেক্ষা ক থেকে থেকে (আমাদের সখী) ক্রমশঃ প্রস্তরীভূত হ যাচ্ছে। সে কি জানে না আমাদের সখীর চোখ দিয়ে স সময়েই অশ্রু গড়াচ্ছে—সে ফিরবে না এই ভেবে সে কেঁ আকুল হচ্ছে ?

প্রোষিত পতিকা নায়িকার চিত্ররূপে দেখা দায় বিরহি নায়িকাকে সখীরা নানা ভাবে বোঝাবার চেষ্টা করছে।

প্রোষিত পতিকা নায়িকার সঙ্গে বিরহিনী শ্রীরাধার যথেষ্ট সাদৃশ্য। বিরহিনী রাধিকার বর্ণনা বৈষ্ণব কবি, ভূপতিনাথ করেছেন এইভাবে—

মাধব দুবরী পেখলুঁ তাই।
চৌদশি চাঁদ জনু অনুখণ খীয়ত
ঐছন জীবয়ে রাই॥
নিয়ড়ে সখীগণ বচন যো পুছত
উতর না দেয়ই রাধা।
হা হরি হা হরি কহতহি অনুখন
তুয়া মুখ হেরইতে সাধা॥
সরসহি মলয়জ পঙ্কহি পঙ্কজ
পরশে মানয়ে জনু আগি।
কবহি ধরণি শয়নে তনু চমকিত
হৃদি যাহা মনমথ জাগি॥
মন্দ-মলয়ানিল বিষ সম মানই
মুরছই পিককুল রবে।
মালতি মাল পরশে তনু কম্পিত
ভূপতি কহ ইহ ভাবে॥

দুবরী—দুর্বলা; চৌদশি চাঁদ……খীয়ত—চতুর্দশীর চাঁদ যেমন ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে যায়।

নিয়ড়ে—নিকটে; জনু আগি—যেন আগুন

৭। বিপ্রলব্ধা—

বিপ্রলব্ধা সেই নায়িকা, যে দূতী মারফৎ নায়ককে খবর পাঠিয়েছিল এক নিভৃত স্থানে সাক্ষাৎ করার জন্য। নায়ক কথা দিয়েছিল আসবে এবং নায়িকা সেই মত সেখানে গিয়ে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু রাত্রি প্রভাত হয়ে গেল, নায়ক এল না।

প্রচ্ছন্ন বিপ্রলব্ধা

একজন সখী নায়িকার অবস্থা বর্ণনা করছে—

ফুল এখন শূলের মত (বেদনাদায়ক), সুগন্ধ দুর্গন্ধ বোধ হচ্ছে, স্নিগ্ধ কুঞ্জবনকে মনে হচ্ছে যেন অগ্নিকুণ্ড, হে কেশব, পুষ্পোদ্যান তার কাছে মনে হচ্ছে যেন অরণ্য, চাঁদের আলোও তার শরীরে এখন জ্বরের দাহ সৃষ্টি করছে। বাঘিনীর মত (ক্ষুধার্ত) তার ভালবাসা, নিশার প্রহর গোণায় তার আর কোন আনন্দ নেই।

সুমিষ্ট স্বরও তার কানে কর্কশ ঠেকছে, পান তার মুখে বিষের মত লাগছে, অঙ্গের আভরণ তাকে আগুনের মত দগ্ধ করছে।

প্রকাশ বিপ্রলব্ধা

একজন সখী আর একজন সখীকে বলছে—

জলের কিনারায় চলতে চলতে সে যখন নীচের দিকে তাকিয়ে নিজের প্রতিবিম্ব দেখছে তখন মনে হচ্ছে চাঁপা পাতার গায়ে কে যেন কি লিখে দিয়েছে।

নিজের গলার সুগন্ধী মালা সে রাগে টুকরো টুকরো করে দূতীকে ছুঁড়ে মারছে।

থেকে থেকে (সে শুধু) দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছে কেশব দাস (কবি), সব বিলাস ত্যাগ করে সে আকুল উদাস হয়ে পড়েছে। কানুর (আগমনের) কোন সঙ্কেত না পেয়ে সে আমার সঙ্গেও কথা বলছে না, শুধু হাতে হাত রেখে অন্তরে দ্বিগুণ দুঃখ অনুভব করছে।

বৈষ্ণব কবি চন্দ্রশেখর এই বিপ্রলব্ধা নায়িকার মনোভাব আরও হৃদয়গ্রাহী করে বর্ণনা করেছেন—

কুসুমিত শেজহিঁ ভেজহ আগুনি
অরু কিয়ে দেখহ চাই।
মালতিমাল সুবাসিত তাম্বুল
এ দুহুঁ দেহ জ্বলাই॥
সখি হে পূরল পীরীতিক সাধ।
নিশি চলি যায়ত পিক-কুল বোলত
থন ঘন কুলীশ নাদ॥
মৃগমদ চন্দন করহ সমর্পণ
যম-বহিনী জল মাঝে।
কর্পূর-বাসিত বারি সুশীতল
দূরে কর কিয়ে অব কাজে॥
আপন হত-মন বশ নহে আপন
অব পুন করতহি আশ।
চন্দ্রশেখর কহে চল নিজ মন্দিরে
দশ দিশ ভেল পরকাশ॥

শেজহিঁ—শয্যা; ভেজহ আগুনি—আগুনের মত তাপ সৃষ্টি করছে; অরু—আরও; কুলীশ—বজ্র; যম-বহিনী—যমের বোন, যমুনা; দশ দিশ ভেল পরকাশ—দশ দিক প্রকাশ হয়ে গেল (সূর্যের আলোয়)।

বিপ্রলব্ধা নায়িকার ছবিতে দেখা যায় নিশাবসানে সূর্যোদয় হয়েছে। নায়িকা সারারাত্রি নির্জন স্থানে বৃথাই অপেক্ষা করল। ক্রোধে, ক্ষোভে সে এখন অঙ্গের আভরণ খুলে মাটিতে আছড়ে ফেলছে।

৮। অভিসারিকা—

যে নায়িকা প্রিয়র সঙ্গে মেলবার উদ্দেশ্যে একাই রওনা হচ্ছে তাকে অভিসারিকা বলে।

বিপ্রলব্ধা

অভিসারিকা তিন রকমের—

প্রেমাভিসারিকা—যে শুধু প্রেমের তাগিদে প্রিয়র সঙ্গে মিলতে যাচ্ছে।

গর্বাভিসারিকা—যে নিজের অহঙ্কার জাহির করবার জন্য প্রিয়র সঙ্গে মিলতে যাচ্ছে।

কামাভিসারিকা—সে শুধু কামনা চরিতার্থ করার জন্য প্রিয়র সঙ্গে মিলতে যাচ্ছে।

এ ছাড়াও অভিসারিকার শ্রেণীবিভাগ আছে, যেমন দিবাভিসারিকা, নৈশাভিসারিকা, সান্ধ্যাভিসারিকা, মধ্যাহ্নাভিসারিকা, জ্যোৎস্নাভিসারিকা, কৃষ্ণাভিসারিকা ইত্যাদি।

প্রেমাভিসারিকা—

প্রচ্ছন্ন প্রেমাভিসারিকা

নায়ক ও নায়িকার মধ্যে কথোপকথন

নায়ক—না বলতেই যে তুমি এসেছ এতে আমি তোমার কেনা গোলাম হয়ে রইলাম ; তোমার ভালবাসা আমি বুঝতে পারি।

নায়িকা—ঘনশ্যাম, ঘনমালাই (ঘন মেঘ, পক্ষান্তরে কৃষ্ণ) আমাকে এখানে ডেকে এনেছে।

নায়ক—অন্ধকারে আমি তোমাকে ভাল করে দেখতে পাচ্ছি না—এই অন্ধকারে তুমি এলে কি করে ?

নায়িকা—কেশব, বিদ্যুৎ আমাকে পথ দেখিয়ে এনেছে।

নায়ক—উঁচু, নীচু, খানা ডোবা এসব পেরিয়ে আসতে তোমার পায়ে আঘাত লাগে নি ত ?

নায়িকা—হস্তীর মত সাহসে ভর করে আমি সুখেই এসেছি।

নায়ক—এই ভয়ঙ্করী রাত্রিতে তুমি একলা এলে ?

নায়িকা—না প্রিয়, সঙ্গে তোমার প্রেম সহায় ছিল।

প্রকাশ প্রেমাভিসারিকা

নায়িকাকে পথে আসতে দেখে তার এক সখী নায়ককে গিয়ে খবর দিচ্ছে—

বিদ্যুতের চমকও তার নয়নের চঞ্চলতা, কথার চাতুর্য ও দেহের দ্যুতির কাছে হার মানে।

তার চরিত্র বড় বিচিত্র, চিত্রিণী রমণীর মতই এই গোপবালা। চাঁদের মত সে সুশ্রী, তোমার মৃগ-নয়নকে পাল্কা করে সে খুশীমত এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে (অর্থাৎ তোমার নয়নে তার প্রতিবিম্ব পড়ছে এবং তুমি অনবরতই এদিক-ওদিক তাকাচ্ছ ; সেই সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবিম্বও ঘুরে বেড়াচ্ছে)।

এই দুধটুকু খাও আর পানটা মুখে দাও প্রাণপ্রিয়, অযথা দুর্ভাবনা কর না। গতকাল যে গোপবালাকে দেখেছিলে সেই আসছে।

গর্বাভিসারিকা—

প্রচ্ছন্ন গর্বাভিসারিকা

নায়িকা নায়ককে না দেখতে পেয়ে ভাবছে—

কোথায় গেলে লালা, কোথায় লুকোলে, আমাদের নীল গাইয়ের বাছুর সে আজ কিছুতেই দুধ খাচ্ছে না, তার মা কাউকে কাছে যেতে দিচ্ছে না। আমি আকুল হয়ে ছুটে এসেছি তোমার কাছে যে গোকুলে এতদিন ধেনু চড়িয়েছ সেই গোকুলকে ভুলো না গোবিন্দ।

প্রকাশ গর্বাভিসারিকা

একজন সখী বলছে নায়িকাকে লক্ষ্য করে—

চন্দনে চর্চিত হয়ে, সুন্দর পোশাকে সজ্জিত হয়ে, বক্ষে মালা দুলিয়ে তাকে দেখাচ্ছে যেন সব আনন্দের উৎস। তাকে পাবার জন্য কোটি রতিপতি (এখন) নিজেদের বিকিয়ে দিতে পারে। বীণাবাদনরতা, মরাল-হরিণ পরিবৃতা তাকে দেখাচ্ছে যেন সাক্ষাৎ সরস্বতী।

রাত্রির অন্ধকার অথবা বিয়োগব্যথা বিস্মৃত হয়ে তার চকোর-চক্ষু দু'টি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। চাঁদের মত সুন্দর এই চক্ষু দু'টি যখন মাঝে মাঝে চমকে চমকে উঠছে তখন তাদের প্রভায় তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের রূপ ম্লান হয়ে যাচ্ছে, তাদের অবস্থা হচ্ছে ঠিক যেন সূর্যোদয়ে পদ্মফুলের মত।

কামাভিসারিকা—

প্রচ্ছন্ন কামাভিসারিকা

গোড়ালির চারধারে সরিসৃপ জড়িয়ে ধরছে, পায়ের নীচে সাপ চাপা পড়ছে, চারদিকে নানা নিশাচরেরা (ভূত প্রেত) ঘুরে বেড়াচ্ছে, মাথার উপর মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে, মেঘ গর্জনের সঙ্গে উঠছে ঝিল্লীদের নির্ঘোষ—সে সবে তার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই।

অঙ্গ থেকে ভূষণ খুলে পড়ছে, বসন ছিঁড়ে যাচ্ছে, দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে—সেদিকেও কোন লক্ষ্য নেই। প্রেতিনীরা বলছে, কোথা থেকে তুমি এমন যোগ শিখলে রমণী? হে অভিসারিকে, তোমার অভিসারই শ্রেষ্ঠ।

প্রকাশ কামাভিসারিকা

নায়িকার সখী নায়িকাকে অভিসারে যেতে প্রতিনিবৃত্ত করে বলছে—

নির্বোধ সখী, তুমি বুঝছ না বাইরে অনেক বয়স্ক গোপ জমা হয়েছে এবং আরও অনেকে আসছে। রাস্তায় ছেলেরা খেলা করছে, তারা তোমার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখবে।

এ ছাড়া বহু মেয়ে বউ যাতায়াত করছে যারা ঘোমটার ভেতর থেকেও তোমাকে চিনে ফেলবে।

এই াঁদের মত-মুখ নিয়ে তুমি তাড়াতাড়ি কোথায় যাচ্ছ? তোমার কি এতটুকু বুদ্ধি নেই?

পাহাড়ী শিল্পীরা যদিও সব অভিসারিকাই চিত্রিত করেছেন তবুও তার মধ্যে কামাভিসারিকাই বেশী। কামাভিসারিকার ছবিতে দেখা যায়, নায়িকা ত্রস্তপদে অন্ধকার ভেদ করে এগিয়ে চলেছে। তার পায়ে সাপ জড়িয়ে ধরছে, মাথার উপর বৃষ্টি পড়ছে, প্রেতিনীরা ভয় দেখাচ্ছে কিন্তু নায়িকার কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

বৈষ্ণব কবি গোবিন্দ দাস এই কামাভিসারিকা নায়িকার রূপ বর্ণনা করেছেন অতি সুন্দর ভাবে—

মাধব কি কহব দৈব বিপাক।
পথ আগমন কথা কত না কহিব হে
যদি হয় মুখ লাখে লাখ।
মন্দির তেজি সব পদ চারি আওলুঁ
নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ।
তিমির দুরন্ত পথ হেরই না পারিয়ে
পদযুগে বেড়ল ভুজঙ্গ॥
একে কুলকামিনি তাহে কুহু যামিনি
ঘোর গহন অতি দূর।
আর তাহে জলধর বরিষায় ঝর ঝর
হাম যাওব কোন পুর॥
একে পদ পঙ্কিল পন্থহি বুরল
তাহে শত কণ্টক শেল।
তুয়া দরশন আশে কছু নাহি জানলুঁ
চির দুখ অব দূরে গেল॥
তোহারি মুরলি সব শ্রবণে প্রবেশল
ছোড়লুঁ গৃহ সুখ আশা
পন্থক দুখ তৃণহুঁ করি না গমলুঁ
কহতহি গোবিন্দদাসা॥

কুহু যামিনি—অমাবস্যার রাত

এই প্রবন্ধ রচনায় সব চাইতে বেশী সাহায্য পেয়েছি কুমারস্বা[illegible] Eight Nayikas থেকে। কেশবদাসের কবিতাগুলি তৎকৃত ইংর[illegible] অনুবাদের ভাষান্তর। দু'এক জায়গায় কুমারস্বামীর অনুবাদের উ[illegible] নির্ভর না করে অন্য অনুবাদের সাহায্য নিয়েছি। যেখানে যেথ[illegible] সম্ভব মূলের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছি।

এই সঙ্গে মালিনী নায়িকার যে ছবিটি ছাপা হ'ল তার ব[illegible] পাওয়া যাবে নীচের কবিতাটিতে—

রাইক হৃদয় ভাব বুঝি মাধব
পদতলে ধরণি লোটাই।
দুই করে দুই পদ ধরি রহু মাধব
তবহুঁ বিমুখি ভেল রাই॥
পুনহি মিনতি করু কান।
হাম তুয়া অনুগত তুহুঁ ভালে জানত
কাহে দগধ মঝু প্রাণ॥
তুহুঁ যদি সুন্দরি মঝু মুখ না হেরবি
হাম যায়ব কোন ধাম।
তুয়া বিনু জীবন কোন কাজে রাখব
তেজব আপন পরাণ॥
এতহুঁ মিনতি কানু যব করলহিঁ
তব নাহি হেরল বয়ান।
পামরি গোবিন্দ মিছই আশোয়াসল
রোই রোই চলু কান॥

পল্লী-কিশোরী

শ্রীকালিদাস রায়

ঐ যে মেয়েটি নয়ন করিয়া নত
গায় গুন গুন, বল' দেখি কবি বয়স উহার কত?
সন্ধ্যাবেলায় চাঁদপানে চেয়ে থাকে,
চমকায় কেন পাপিয়া-পিকের ডাকে?
বন্ধ হয়েছে মুখের উচ্ছভাষ
মাঝে মাঝে পড়ে নীরবে দীর্ঘশ্বাস।
ব্যথার সাথে সে অজানা সুখের কোন্ অনুভূতি পায়?
শিহরিয়া উঠে অঙ্গ কেন বা ঝির-ঝিরে মলয়ায়?

চীনা-করবীর বোঁটা কেনই বা চোষে?
চুরি ক'রে কেন পান খাওয়া শিখিলো সে?
কেয়ার পরাগ কেন সে জমায় কি কাজ হবে তা দিয়ে?
মালা গাঁথে কেন বকুল তলায় গিয়ে।
ছোট ভাইটিরে কোলে তুলে চুমে
ছুটে যদি কাছে আসে,
ছোট বোনটির খেলা-পাতি দেখি
কেন মৃদু মৃদু হাসে?

পোষা হাঁসটির পালখে বুলায় গাল,
শব্দ পেয়েও পুকুরের ধারে কুড়াতে যায় না তাল।
মাধবী লতারে জড়াইয়া দেয় গন্ধরাজের ডালে,
সকাল-বিকাল চারা গাছে জল ঢালে,
গাভীর অঙ্গে হাত বুলাইয়া শিহরণ দেখে তার,
খসে-খসে-পড়া বসনাঞ্চলে বুক ঢাকে বার বার।
নয়নে উহার করে আশ্রয় লাভ
ভয়ে বিস্ময়ে দ্বিধা সঙ্কোচে 'কিল কিঞ্চিত' ভাব
হে তরুণ কবি, কবিতা হইতে ইহারে দিয়াছ বাদ,
সন্ধান রাখ—পেয়েছে মেয়েটি কিসের নতুন স্বাদ?

কৃপার কথা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

হে ভগবান, তোমায় পেতে
হয় না কোথাও যেতে।
গৃহী তাহার গৃহেতে পায়,
চাষী তাহার ক্ষেতে।
শিল্পী তাহার শিল্পশালে,
ভাবুক ভাবের অন্তরালে
সতী তাহার রঙমহলে
আপন অন্দরেতে।

২

পাহাড়ি তার পাহাড়ে পায়
ডুবারি তার জলে,
পথিক তাহার পথেতে পায়
কিম্বা তরুতলে।
যে যা করে নিজের পেশা।
আমার সাথেই মেলামেশা!
দিনে তোমায় সূর্য্য যে পায়
চন্দ্র যে পায় রেতে।

৩

এসো 'দীনবন্ধু দাদা'
কভু বিজন পথে,
মহারথীর সাথে কভু
সারথি জয়-রথে।
দম্ভ নাশে, দম্ভে কভু,
এসো স্ফটিক স্তম্ভে প্রভু,
এসো নরসিংহ—ধরা
কাঁপে হুঙ্কারেতে।

৪

রাজসূয় ও অশ্বমেধ যে,
পায় না যোগেশ্বরে,
এ যে দয়াল, বিদুর-দেওয়া—
ক্ষুদের আদর করে।
গুণী, জ্ঞানীর সঙ্গেতে বেশ
থাকেন—ব্যাকুল হন মধুবেশ,
রাখাল বালক যখন ডাকে
গুঞ্জা-মালা গেঁথে।

৫

বিপদবারণ হে নারায়ণ
বলবো তোমায় কি?
ভেবে আমি পাইনে তোমার
কৃপার পরিধি।
অর্জ্জুনেরে বক্ষ দিয়া,
নিজেই রাখ আগুলিয়া,
ব্যর্থ যে ব্রহ্মাস্ত্র ফেরে
মুহূর্ত্ত সঙ্কেতে।

কবি-বল্লভা

শ্রীকৃষ্ণধন দে

কোথায় চলেছ তুমি অভিসারিণি,
চির কবি-বল্লভা মায়া-চারিণি ?
তুফানে-উতলা বহে বিপুলা নদী,
সে আঁধার-কূলে এসে দাঁড়াও যদি—
আকাশ গরজে, ধরা শিহরে ত্রাসে,
পাগল ঝড়ের বুকে প্রলয় আসে !
আলুথালু ঝাউ বন ছেঁড়ে এলোচুল,
খসে দেবদারু পাতা, ঝরে কুঁচ ফুল,
শাঁখ-চিল ভয়ে ডাকে কাঁপায়ে ডানা,
চাঁদতারা কোথা গেছে নাই ঠিকানা,
মেঘে মেঘে বাজে শুধু বিষাণ ভয়াল,
এক সাথে মিশে গেছে আকাশ পাতাল !

কোথায় চলেছ তুমি অভিসারিণি,
চির কবি-বল্লভা মায়া-চারিণি ?
প্রবালদ্বীপের কোলে ঝিকিমিকি ঢেউ,
হীরক গুঁড়ায়ে বুঝি সাজায়েছে কেউ,
বন-টীয়া পাখীদের জমাট আসর
ভেঙ্গে দিতে আসে ছুটে ভয়াল হাঙর,
ছড়ায়ে রঙিন্ ফুল সাগর-বেলায়
রূপসী মেয়েরা মাতে ঢেউয়ের খেলায়,
কোথা থেকে আসে ভেসে গীটারের সুর,
দুঃসহ যৌবন কাঁপে তৃষাতুর !
শুক্তি ঝিনুক আর উড়ে-চলা মাছ,—
সাগর-হাওয়ায় দোলে নারিকেল গাছ।

কোথায় চলেছ তুমি অভিসারিণি,
চির কবি-বল্লভা মায়া-চারিণি ?
যেখানে ফোটে না ফুল মরুর বুকে,
ধুম্র আকাশ রয় পাংশু মুখে,
যেথা নেই ছায়াতরু, ঝরণার জল,
অট্ট হাসিছে মরু-ঝঞ্ঝা কেবল,
বালুর পর্দা ঢাকে নিদাঘের দিন,
পোড়ানো তামার মত সূর্য মলিন,
ছড়ানো রয়েছে যেথা লাখো কঙ্কাল,
ক্যাক্টাস্-সারি হানে ভ্রূকুটি করাল,
মরীচিকা কাছে আনে মরুদ্বীপ-বন,
চকিতে মিলায়ে যায় মায়াবী স্বপন !

কোথায় চলেছ তুমি অভিসারিণি,
চির কবি-বল্লভা মায়া-চারিণি ?
যেখানে সাগর ঢেউ কঠিন কায়ে
দিকে দিকে সীমাহীন গেছে ছড়ায়ে,
তুষারের ফ্রেমে-আঁটা সাগরের নীল,
পেঙ্গুইন পাখীদের যেথায় মিছিল,
দল বেঁধে শিলমাছ জটলা করে,
সাদা ভাল্লুক নামে শিকার তরে,
দিনের আকাশে হাসে কুহেলি-রবি,
রাতের আকাশে কাঁপে রঙের ছবি,
তুষারের ঝড় বয়, আঁধার নামে,
মহাকাল বুঝি সেথা সভয়ে থামে !

সুতনুকা

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

শিল্পী চলে যায়—তার মৃত্যুজয়ী শিল্পকীর্তি রহে ;
সে চিরবসন্ত-বায়ু কালের প্রান্তরে সদা বহে
যুগযুগান্তর ধরি নিত্য নব কুসুম ফুটায়ে,
মলিন মর্তের মাঝে নন্দনের সৌরভ ছুটায়ে।
সুদূর অতীতে শুনি তেমনি সে শিল্পী একজন
এসেছিল অনবদ্য নৈবেদ্য করিতে নিবেদন
আপন জীবনশিল্পে ভবিষ্যমানবে—শুভক্ষণে
পিতৃসত্য পালিবারে রামচন্দ্র গিয়েছিল বনে।
সে যাওয়ার শিল্পরূপে মুগ্ধ আজও এ ভারত ভূমি ;
সে যাওয়ার যাত্রাপথে যুগে যুগে উঠেছে কুসুমি'
কত না মন্দির মূর্তি—কত তীর্থ—কত না নগর !
বিন্ধ্যগিরিমালা বক্ষে তারই এক সাক্ষী রামগড়
মেঘচুম্বী মহাচল। মহামানবের স্মৃতিপূত
সে পর্বতে কালে কালে আসিয়াছে কত রবাহূত
সন্ন্যাসী গৃহস্থ রাজা, কেহ শান্তি—কেহ পুণ্যলোভে ;
গিরিগাত্রে স্থানে স্থানে তাদেরি ভক্তির অর্ঘ্য শোভে
তোরণে সোপানে কুণ্ডে—শৈলশীর্ষে শ্রীরামমন্দিরে ;
জাগিয়াছে জনপদ অরণ্যের নির্জন গভীরে।
সার্ধ দ্বিসহস্র বর্ষ পূর্বে সেই শিলসাহুদেশে
দেশদেশান্তর হ'তে রূপদক্ষ শিল্পিদলে এসে
একদা রচিয়াছিল নৈসর্গিক কন্দরেরে কাটি'
গুটিকত গুহাকক্ষ তারি মধ্যে ছিল পরিপাটি
ক্ষুদ্র এক রঙ্গমঞ্চ ভিত্তিচিত্রে শোভিত সুন্দর।
যেদিন ভক্তের দানে উৎসৃষ্ট হ'ল সে নাট্যঘর
আবাল বনিতাবৃদ্ধ সবা লাগি'—সেদিনের কথা
ইতিহাস গেছে ভুলি'। তারপর বর্ষে বর্ষে তথা
সে গিরিকন্দর বক্ষে হ'য়ে গেছে কত অভিনয়,
কত বরবর্ণিনীর নৃত্যলীলা হাস্যলাস্যময়।
মিলেছে দর্শকদল সে দৃশ্য দেখিতে মুগ্ধ চোখে,
ক্ষণিক পেয়েছে ছুটি দেহাতীত কোন্ রূপলোকে
ভুলিয়া সংসারচিন্তা। এইরূপ কত না বৎসর
ছিল সে মর্তের স্বর্গ নৃত্যে গীতে আনন্দমুখর।
তারপর একদিন কি কারণে কেমনে না জানি
ঘনাইল দুঃসময়, লুপ্ত হ'ল রাজ্য রাজধানী
অদূরের জনপদে, স্তব্ধ হ'ল শাস্ত্র আলোচনা ;
রামগড় গিরিদুর্গে প্রাকারের চিহ্ন রহিল না।
শস্ত্র-অস্ত্র ঝঞ্ঝনায় থেমে গেল মঞ্জীরশিঞ্জন
গিরিগাত্রে গুহাকক্ষে। দিনে দিনে নিঃশব্দ নির্জন
পরিত্যক্ত সে পুরীর ধ্বংসশেষ মাতৃস্নেহ ভরে
বনানী ঢাকিয়া নিল আপনার পল্লবমর্মরে,—
মধুপগুঞ্জনে। ব্যস্ত বর্তমান গেল তারে ভুলে ;
শতাব্দী শতাব্দী ধরি' উপেক্ষিত শৈলপাদমূলে
সে রহিল। কালে কালে এল গেল কত যোদ্ধদল,-
মগধ, কলিঙ্গ, বঙ্গ, প্রতীহার, পাঠান, মোগল—
সেই পথে দিগ্বিজয়ে,—গেল বর্গী, আসিল ইংরাজ।
সহস্র বৎসর পরে তা'দেরি শিক্ষার গুণে আজ
বিদগ্ধ ভারতবাসী রামগড়ে করেছে স্মরণ।
রামপদধূলিপূত পুণ্য তীর্থে করি' বিচরণ
প্রত্নতাত্ত্বিকের দল যোগী যারা গুহাগর্ভে তার
নাট্যশালা-ভিত্তিগাত্রে সহসা করেছে আবিষ্কার
একটি আশ্চর্যলিপি, অতি দূর কোন্ অতীতের
অজ্ঞাত প্রণয়কথা, মর্মবাণী কোন্ ব্যথিতের
দু'টি ছত্র শিলালেখে, "সুতনুকা নামে দেবদাসী,
কামনা করিল তারে দেবদীন বারাণসীবাসী
রূপদক্ষ।" একদিন সার্ধ দ্বিসহস্র বর্ষ আগে
রূপমুগ্ধ কোন্ শিল্পী লিখেছিল অন্ধ অনুরাগে
কোন সুন্দরীরে স্মরি' শিলা কাটি' এ প্রলাপবাণী
কি আনন্দবেদনায়—আজ মোরা কেহ নাহি জানি
এ কি তার দুঃসাহস বাঞ্ছিতার লভিয়া প্রশ্রয় ?
নৈষ্ফল্যের হাহাকার প্রত্যাখ্যানে একি বীতভয় ?
কে সে ছিল সুতনুকা ? যৌবনপুষ্পিত তনু তার
কি ঐশ্বর্যে ভরেছিল সেদিন অতনু দেবতার
অন্তহীন অনুগ্রহে ! কি কুহক ছিল কালো চোখে !
বঙ্কিম অপাঙ্গ ভঙ্গে কি অদৃশ্য শাণিত শায়কে
বিঁধিত অবোধ জনে ক্ষণেক্ষণে ! প্রবাল-অধরে
কি হাসি খেলিত যবে দাঁড়াত সে আসি যুক্ত-করে
সৌন্দর্যের স্বপ্নসম পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহতলে।
কি অনিন্দ্য নৃত্যছন্দ বিকশি' তুলিত লীলাছলে
কি অপূর্ব সুষমায় ! সুনিপুণা চৌষট্টি কলায়
শিঞ্জিত মঞ্জীরে আর আন্দোলিত স্বর্ণমেখলায়
তরল কাঞ্চনকান্তি অঙ্গে অঙ্গে কি তরঙ্গ তুলি'
নাচিত সে দেবদাসী ! দর্শকেরা স্বর্গমর্ত ভুলি'
চাহিয়া রহিত শুধু। দীপালোকে ঝলিত চঞ্চল
কেয়ূরকঙ্কণ তার,—বিচ্ছুরিত কিরীট কুণ্ডল ;
পীনোন্নত বক্ষতলে সঘনে দুলিত পুষ্পমালা ;
নিঃশব্দে তুলিত জ্বালি কামনার দীপ্ত বহ্নিজ্বালা

অশান্ত পুরুষচিত্তে ! কি কৌশলে সে লাস্যভঙ্গিমা
মুহূর্তে ছড়ায়ে দিত উচ্ছলিয়া তনুদেহসীমা
যৌবন মাধুরী তার—দিকে দিকে রচি ইন্দ্রজাল,—
বিস্মিত স্তম্ভিত করি' সমস্ত দর্শকে ক্ষণকাল।
তারপর নৃত্যশেষে ক্ষণকাল ক্লান্ত অবসাদে
বসিত সে অবিচল জনতার উচ্চ সাধুবাদে—
নমি' সবে নতনেত্রে ; নৃত্যসঙ্গিনীরা ঈর্ষাভরে
নীরবে রহিত যবে বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠস্বরে
সে পুন ধরিত ধীরে দেবতার বন্দনার গান ;
ভক্তজন সে সঙ্গীতে আনন্দে করিয়া মুক্তিস্নান
জুড়াত সংসারজ্বালা, কামিচিত্ত ক্ষণেকের তরে
শান্ত হ'ত,—স্নিগ্ধ হ'ত ডুবি সে সঙ্গীতসরোবরে।
সেই গুহারঙ্গকক্ষে দিনে দিনে এমনি করিয়া
কত দর্শকের হিয়া দেবদাসী নিয়েছে হরিয়া—
কভু ভক্তিরসে কভু কামরসে হেলায় জর্জরি !
সে কুহকবন্যাজলে লজ্জা ভয় সব পরিহরি'
ডুবেছিল দেবদীন। আসি দূর বারাণসী হ'তে
অর্থ-উপার্জন-লোভে মূঢ় শিল্পী সে লাবণ্য স্রোতে
গিয়েছিল ভাসি। কেহ নাহি জানে কিসের আশায়
কঠিন পাষাণ কাটি লিখেছিল অকুণ্ঠ ভাষায়
আপনার মর্মবাণী : সাক্ষী তার কয়টি অক্ষর
আছে জাগি গিরিগাত্রে সার্ধ দুই সহস্র বৎসর।
তারপর কি যে হ'ল জানিবার নাহিকো উপায়।
যশ অর্থ কায়মন সমর্পণ করি রাঙা পায়
দেবদীন একদিন বাঞ্ছিতারে পেয়েছিল শেষে ?
সৌন্দর্যের সুধাপাত্র করেছিল পান কি নিঃশেষে
কান্তার কোমল দেহে ? স্বপ্নলোকচারিণী অপ্সরা
ঘরের ঘরণী হয়ে বাহুপাশে দিয়েছিল ধরা ?
জনতার জয়ধ্বনি তুচ্ছ করি' গিয়েছিল ফিরে,
বেঁধেছিল পর্ণগেহ পল্লীপ্রান্তে দূর নদীতীরে ?
শিল্পীযশঃপ্রার্থী নর,—বহুজনমনোলোভা নারী—
হয়েছিল সুখী দোঁহে পরিচিত জীবনেরে ছাড়ি ?
দেশে দেশে বনে বনে ফিরে নি তো সভয়ে লুকায়ে ?
অবশেষে পড়ি' ধরা দেবদাসী হরণের দায়ে
রাজদ্বারে বন্দী হ'য়ে দেবদীন দেয় নি তো প্রাণ ?
অথবা সুদূর কোন রাজগৃহে পেয়েছে সম্মান ?
প্রিয়ার আদর্শে রচি' অপরূপ পাষাণবিগ্রহ,
মন্দিরের ভিত্তিচিত্র, লভিয়াছে রাজ-অনুগ্রহ,
ধনে মানে লোকযশে জীবন সার্থক করিয়াছে ?
সেদিন ঐশ্বর্যবক্ষে প্রেয়সী নারীরে পেয়ে কাছে
দেবতার শাপভয়ে ব্যর্থ ত করে নি রাত্রিদিবা ?
বহুজন-বল্লভার কে জানিত মনে ছিল কিবা ?
মূঢ় রূপদক্ষে বরি পাদপীঠ উঠেনি ত গিয়া
রাজবক্ষে সে রূপসী ? রূপমুগ্ধ ভক্তদলে নিয়া
স্বগৃহে রহেনি মত্ত ? স্বামী তার নিঃসঙ্গ শয্যাতে
একাকী রহে নি জাগি' রুদ্ধরোষে নিদ্রাহীন রাতে ?
কিংবা রহি অন্তঃপুরে সুনিশ্চিন্ত সুখের সংসারে
কর্মহীন দীর্ঘদিন ঘৃতদুগ্ধমৎস্যমাংসাহারে
জন্মে নি ত মাংসস্তূপ বর অঙ্গে ? গুরুমেদস্থূল
লম্বোদরী ঘটোর্ধ্বীর বাহুবন্ধে মুক্তিচিন্তাকুল
কাঁদে নি ত প্রিয় তার ? অথবা দুর্ভাগা দেবদীন
মৃন্ময় পুত্তলি গড়ি' কায়ক্লেশে যাপিয়াছে দিন
কোথাও অজ্ঞাতবাসে ; সেথায় কঠিন পরিশ্রমে
তরুণীর দিব্যদেহ কঙ্কালেতে পরিণত ক্রমে
হইতে দেখেছে চোখে ? অর্থলোভে মেতেছে পাশায়
আয়ের অর্ধাংশ দেছে শৌণ্ডিকেরে শান্তিলাভাশায় !
নৃত্যহীনা গীতহীনা দীনবাসা অলকাবাসিনী
অর্ধাহারে অনাহারে রুক্ষমূর্তি কর্কশভাষিণী
সঁপিয়াছে উগ্রচণ্ডা,—আপনার সন্তান স্বামীর
মৃত্যু মাগিয়াছে নিত্য ? স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে কামীর
দারিদ্র্যে কলহে : শেষে সে নারীর বাক্যবিষে জ্বলি'
হয়েছে কি আত্মঘাতী দেবদীন ? গিয়াছে কি চলি'
গৃহত্যজি নিরুদ্দেশে ? সহনের সীমা হ'লে পার
করেছে কি নারীহত্যা ? উপায় নাহিকো জানিবার
কি যে হয়েছিল তার তীব্র আকাঙ্ক্ষার পরিণতি।
হয় ত বা সুতনুকা ফিরিয়া চাহে নি তার প্রতি,
সুদীর্ঘ জীবন গেছে কাটায়ে সে মাতি নৃত্যগীতে ;
ভগ্নচিত্তে দেবদীন গেছে ফিরি' আপন পুরীতে,
স্বঘরে বিবাহ করি' সুখে দুঃখে গেছে দিন তার ;
সুতনুকা কিছু দিন সঙ্গী রহি নিভৃত চিন্তার
মিলায়েছে স্মৃতিপটে। লঘুচিত্ত কামনার দাস—
ক্ষণিকের রূপমোহে রমণীর করি সর্বনাশ
হয় ত গিয়েছে শিল্পী দেশান্তরে অন্য মৃগয়ায় ;
প্রবঞ্চিতা সুতনুকা রোষে ক্ষোভে মৃত্যুর দয়ায়
জুড়ায়েছে সর্ব জ্বালা। অনুমান, সবই অনুমান।
জাগিছে পর্বতগাত্রে যে বিরহ পর্বতসমান—
ব্যথা তার বক্ষে ধরি ইতিহাস আছে নিরুত্তর।
সার্ধ দ্বিসহস্র বর্ষ গেছে চলি সেদিনের পর ;
মানুষ এসেছে গেছে প্রতি বর্ষে প্রতি দণ্ডে তার ;
কত বিরহের অশ্রু—কত প্রণয়ের উপচার
ছড়ায়ে গিয়েছে তারা গ্রামে শৈলে অরণ্যে নগরে
কে তার সন্ধান রাখে ? অতীতের সেদিনের পরে
কত রাজ্য সাম্রাজ্যের ধরায় ঘটেছে আনাগোনা ;
তারি মাঝে শিলাগাত্রে কালজয়ী যৌবনবেদনা—
জাগিতেছে দু'টি কথা, "সুতনুকা নামে দেবদাসী
কামনা করিল তারে দেবদীন বারাণসীবাসী।"

বঙ্গ বন্দনা

শ্রীঅবনীনাথ চট্টোপাধ্যায়

সোনার বাংলা তোমায় নমি
আমরা সকলে
মানবতার মিলন গাথা
তুমিই গাহিলে।
যত যে মত ততই যে পথ
ভেদ নাই যে দেব দেউলে
শ্রীরামকৃষ্ণের পরম বাণী
তুমিই শোনালে।
বিবেক-আনন্দ-জয়
সত্যের নাহি রে ভয়
সেবা ধর্ম জ্ঞান কর্ম
তুমিই দেখালে
তোমার অভয় বাণী
জগতে ঘোষিলে।
রাজা রামমোহন মুখে
তোমার বাণী উঠ্‌লো ফুটে
রাষ্ট্রীয় মুক্তির পথ
তুমিই দেখালে
বন্দেমাতরম্ মন্ত্রে
ভারত জাগালে
সুরেন্দ্রনাথ বিপিন পালে
তুমিই মাতালে!
অরবিন্দ উঠলো ফুটে
তোমার স্মরণে
শ্রীজগদীশ প্রফুল্ল রায়
সাজায় যতনে

আশুতোষের পূজার ডালি
তোমার চরণে!
মুক্ত ধারায় জ্ঞানের আলো
তুমিই ছড়ালে
সোনার বাংলা তোমায় নমি
আমরা সকলে।
রবীন্দ্রনাথ তোমার কোলে
মানুষ হ'লেন তোমার বোলে
রবির আলো ছড়িয়ে দিয়ে
তিমির নাশিলে
বিশ্বসভায় ভারতবাসী
তুমিই বসালে!
অগ্নি যুগের দাবানলে
ছেলে মেয়ে দলে দলে
বাঁচা মরার নাইরে ভয়
ঝাঁপিয়ে পড়ে কর্‌লে জয়
নেতাজীরে নেতা ক'রে
তুমিই পাঠালে
দেশবন্ধুর প্রাণের পূজা
পালন করালে!
অকাতরে দিলে তুমি
স্বাধীন হ'ল ভারতভূমি
জনগণ মন জয়
তুমিই গাহিলে
সোনার বাংলা, তোমায় নমি
আমরা সকলে!

"উড়ে পড়া শুকনো পাতা ঢেউ-ভাঙ্গা সাগর জলে"

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

শুকনো পাতা এক উড়ে পড়ে সাগর জলে।
ঢেউএ ঢেউএ সে নেচে চলে……
দূর সাগর পাড়ি দেবে বলে।
উড়ে-পড়া শুকনো পাতা ঢেউ-ভাঙ্গা সাগর জলে।
নোঙর ছাড়ে কত জাহাজ ··
কত রং কত ঢং কত যে সাজ···
ডেকে ডেকে কত আলো কত মন কত গান,
কত না গোপন রাত্রি···জোয়ারের নিত্য কলতান।
দূর সাগর···দূর জাহাজ···
দূর সাগর···দূর জাহাজ···
স্তিমিত ডেকের আলো···তখনও জাহাজ চলে।
উড়ে-পড়া শুকনো পাতা ঢেউ-ভাঙ্গা সাগর জলে।
সহসা সাগর ফোঁসে···
ক্ষুব্ধ রোষে···
শুকনো পাতা হাসে···শঙ্কাহীন অনন্ত আশ্বাসে···
ফ্যাকাসে জাহাজ মৃত্যুর প্রহর গোনে নিরুদ্ধ নিশ্বাসে।
মানুষের কত কান্না···ভরে দেয়···আকাশ-তরঙ্গে দশদিক্
তবু ডুবে যায় কত 'টিটানিক'।
এই জাহাজের তুমি যতই রাখ মন-ভোলানো নাম···
ঐ...দূর...দুরন্ত সাগরে...আছে কি তার শুকনো পাতারও দাম?
তবু সে সাগর পাড়ি দেয়,
মানুষের দম্ভের সেলাম নেয়।
কোথায় কিনারা কোথায় নোঙর তবুও জাহাজ চলে,
উড়ে-পড়া শুকনো পাতা ঢেউ-ভাঙ্গা সাগর জলে।

স্বর্গাদপি গরিয়সী

শ্রীদিলীপ দাশগুপ্ত

অমৃতের বার্তা শুনে অমর্ত্যবাসিনী হ'লে
পুণ্যময়ী-স্নেহপ্রাণা জননী আমার—
আনন্দলোকের আলো নয়নে লেগেছে ভালো
রুদ্ধ হয়ে গেল তাই তিমিরের দ্বার।
আমাদের সর্বগ্লানি, দোষত্রুটি, শোকতাপ,
অবহেলা, অনাদর, কামনা-কলুষ পাপ,
নিয়ে তুমি নীলকণ্ঠ : বিলায়েছ সব সুধা,
পূর্ণ করে রেখে গেছ আপন সংসার।
অপরাধ কাকে বলে আজ তাই শিখে গেছি
চিনেছি নাগিনীরূপী কার নাম পাপ,—
ভূমিময়ী হয়ে যেন তোমারই পুণ্যের বলে
লাগে নাই দেহেমনে কোনও অভিশাপ।
উদাস দৃষ্টির মাঝে রুদ্ধবাক, শক্তিহীনা
তবুও কুশলমন্ত্রে বাজায়েছ প্রীতি-বীণা,
কুসুমে ও বর তনু যতই সাজাতে গেছি'
ততই বেড়েছে মনে বিচ্ছেদের তাপ।
যে আগুনে সবই শেষ, শুভারম্ভ সেখানেই,
সূর্যমণ্ডলের মাঝে দেখা দাও এসে,
কঠোর তপস্যা দিয়ে আবার কি পেতে পারি?
আবার কি কাছে টেনে নেবে ভালবেসে?
সর্ব পূর্ণতার বুকে তবু শূন্যতার স্মৃতি
সর্ব শোক তুচ্ছ করে তোমার বিচ্ছেদ-গীতি
মরলোক পার হয়ে অসীম নভের কোলে
করুণা-কিরণ নিয়ে তাই যেন মেশে।

সমুদ্রতীর কোণারক

শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী

পাথর কি কথা বলে, কথা বলে হাজার বছর?
স্তব্ধ অতীতের হাড়ে লাগে কি প্রাণের সূর্য্যালোক?
সারে সারে শোভাযাত্রা, দল বাঁধে রেখাবদ্ধ তনু
দেহের ছন্দের নাচে অনন্তের জাগে কি আভাস?
কথা বলে ঝাউ বন? মৃত্যুনীর নিষিক্ত বাতাস
ছুঁইয়ে বালুকামনে চাপা দিয়ে রেখেছিল যাকে
সে আজ সঙ্গীতে উচ্চারিত। বাজে শোন, হৃদয় নিক্কণে
দেহের সুরেলা-দিলরুবা। প্রাণের অর্চনা করে
প্রাণহীন পাথরেরা। কার কণ্ঠস্বর চারিদিকে?
ম্লান ইতিবৃত্ত নয় সময়ের ধূলিস্পর্শ ছিঁড়ে
এ'কোন্ জীবন অনুভব? বিপুল সমুদ্রে দ্বীপ—
কথা বলে প্রবাল শোন কি? তপ্ত আকাঙ্ক্ষার শিখা
পূর্ণতার মূর্তি আলে; দেহ হয় ইমনের সুর
সে সুর অনন্তকালে ঢেউ তোলে প্রাণোন্মত্ততায়।

কাছে দাখিল করে পেনশনার দামোদরবাবু বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন ; অন্য মাসের তুলনায় এবার যেন একটু সকাল সকালই এসে পড়েছেন—মোট বাইশজন পেনশনারের মধ্যে এখন পর্যন্ত এসেছেন মোটে চারজন।

বাতে পঙ্গু মৃগাঙ্কবাবু ঐ আসছেন—আসছেন বললে ঠিক হয় না—অষ্টবক্রীয় নিজস্ব-বিশেষ এক ভঙ্গিতে যেন ধাওয়া করছেন ট্রেজারীর দিকে। গোটা রাত্রি আটকে-রাখা একটা রুগ্ন অনাহারী বাছুর যেন আজ দড়ি খোলা পেয়ে দিগ্বিদিকশূন্য হয়ে ছুটেছেন দুগ্ধামৃতের সন্ধানে! পদদ্বয়ের পঙ্গুতা, হাঁপানির টান কিংবা ছানিকাটা-চোখের অস্বচ্ছ দৃষ্টিশক্তি এসব প্রতিবন্ধকতা বাহাত্তর বছরের মৃগাঙ্কবাবুর কাছে কিছুই নয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণ যে তিন টান এক না হ'লে মোক্ষলাভ করা যায় না বলেছেন, সেই ত্রিবিধ টানের চুম্বককেন্দ্র আজ আর কেউ নয় মহকুমা ট্রেজারীর অ্যাকাউনটেণ্টবাবু।

ট্রেজারীর উঁচু উঁচু সিঁড়ির নিচে এসে একবার দাঁড়ালেন মৃগাঙ্কবাবু—জীর্ণ ছাতাটা বন্ধ করলেন, তারপর ছাতা দিয়েই কপালের ঘামটা মুছে নিয়ে পা পা করে সন্তর্পণে সিঁড়ি ভেঙে অদৃশ্য হয়ে গেলেন অ্যাকাউনটেণ্ট-ঘরের ভিতরে।

দামোদরবাবুর ইচ্ছা হয়েছিল একবার কুশল প্রশ্ন করেন মৃগাঙ্কবাবুকে কিন্তু আর করলেন না; বাহাত্তর বছরের পেনশনারদের যে দিনটা যায় সেই দিনটায় ত' চরম কুশলের দিন—জিজ্ঞাসা করার আর কি আছে?

এস. ডি. ও সাহেবের ঘরের বড় ঘড়িটায় ঠং ঠং করে এগারটা বাজল—কাছারি-ট্রেজারী গিস্‌গিস্ করে উঠল নানা রকম লোকে। মোটে এগারটা! সেই বিকেল চারটায় ট্রেজারী অফিসারের সাম্নে ডাকের সঙ্গে সঙ্গে হাজির হ'তে হবে পেনশনারদের—দৈহিক উপস্থিতি দিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে, ওঁরা আজও বেঁচে আছেন। আর সবাইকে মরে যাওয়ার প্রমাণই প্রয়োজন বোধে দিতে হয়, বেঁচে থাকার নয়।

ওঁরা বসবেন কোথায়? বারান্দায় একদিকে একটা বেঞ্চ অবশ্য পাতা আছে কিন্তু ছোট হাকিম সাহেবের আর্দালিমশাই যেরকম মুখ বেজার করে ওটার ওপর পা ছড়িয়ে অধিষ্ঠান করে আছেন তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, বেঞ্চিখানার স্বত্ব-স্বামিত্ব সম্পূর্ণভাবে একা আর্দালি মশায়েরই আর কারও নয়।

বারান্দার দেওয়ালে পাবলিসিটির বড় বড় ছবি পোস্টার আর কেউ পড়ুন না পড়ুন পেনশনার বাবুরা ওগুলো ছানি-কাটা চোখে বিশেষ মন দিয়েই দেখেন আর পড়েন, তারপর ক্লান্ত হয়ে নিজের নিজের ছাতা নিয়ে বারান্দার ছায়াময় স্থানটা মুছে নিয়ে থপ্ করে বসে পড়েন দল বেঁধে।

মাসান্তে একবার ওঁরা একসঙ্গে এসে জোটেন এই শ্রীক্ষেত্রে। অতীতের পদমর্যাদা এদের গায়ে আর মনে মোটেই লেপ্টে থাকে না। লাভই বা কি? তিনশো আর তিরিশে? সবই ত' ফেলে যেতে হবে ক'দিন পরে? সরকার উত্তর বেতন দেবার চুক্তি করেছেন সত্যি কিন্তু ওদের স্বাচ্ছন্দ বিধানের চুক্তি ত' করেন নি, কাজেই কোঁচা কিম্বা ছাতা দিয়ে ট্রেজারীর বারান্দার ধূলো ঝেড়ে বসে পড়া ছাড়া ওদের আর গত্যন্তর কি? তেষ্টার জল? স্বর্গীয় কোন এক মৃগনয়নী দেবীর ভাগ্যিস ভজহরির মত এক সার্থক পুত্ররত্ন ছিল, আবার সেই পুত্ররত্ন ভাগ্যিস মাতৃভক্ত ছিলেন বলেই ত' তিনি কাছারী প্রাঙ্গণে মায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে যে খয়রাতী টিউওয়েল দিয়েছেন, তার জল আঁজলা-ভরে খেয়ে পরম কৃতার্থ হন পেনশনারবাবুরা—এতটুকু ক্ষোভ নেই কারও মনে!

দল বেঁধে বসে আছেন পেনশনর বাবুরা—বাড়ী থেকে ট্রেজারী হাঁটার ক্লান্তি এতক্ষণে দূর হয়েছে। বাসুদেববাবু ধূমপানের জন্য উসখুস করছেন—কার কাছে বিড়ি-দেশলাই আজ চাইবেন? ধূমপানের বাতিক আছে, কিন্তু বিড়ি-দেশলাই নিজে কেনেন না কোনদিন। মাসান্তে একবার করে অন্য পেনশনারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়—খুব জোড় তাদের বছরে তিনটে করে বিড়ি দিতে হয় বাসুদেববাবুকে। কাজেই এই সামান্য বাৎসরিক খয়রাতির জন্য ওদের মনে করবার কিছু নেই অথচ বাসুদেববাবুর নেশার সাধ মিটে যায়—

একজনের দেওয়া দেশলাই, অন্যজনের বিড়ি মুখে নিয়ে বাসুদেববাবু দেশলাইটা বার তিনেক জ্বাললেন কিন্তু বাতগ্রস্ত হাতের তেমন ঠাহর নেই। যে মাসের গরম ঝ'ড়ো বাতাসের ঝাপ্টা এড়োবার জন্য যে আঁজলা বাঁকা বাঁকা আঙুল দিয়ে বারংবার বেঁধেছিলেন, সেটা ছিদ্রহীন না হওয়ায় নিভে গেল তিন বারই।

"দূর—ছাই! রামবাবু, নিন মশাই আপনার দেশলাই—কই? শিববাবু—? আপনার দেশলাইটা দেখি—" দোষ যেন দেশলাইয়েরই! কাঠির আর বেশি বাজে খরচ থেকে রেহাই পেয়ে রামবাবু অনুগৃহীত হলেন, না শিববাবুর দেশলাইয়ের প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব দেখানতে শিববাবু অনুগৃহীত হলেন বেশি—মোটেই বোঝা গেল না!

নিতান্ত অনিচ্ছা'র সঙ্গে শিববাবু দেশলাইয়ের জন্য হাত বাড়ালেন ফতুয়ার পকেটের দিকে। মাসান্তে ৫১৲ টাকা পেনশন পান। মোট তিনটি বিড়ি আর একটা খালি দেশলাইয়ের খোলের মধ্যে গুণে যে তিনটি কাঠি নিয়ে আসেন এইটাই ত ওর বাবুগিরির চরম! ৫১৲ টাকার পেনশন থেকে কেনা দেশলাইয়ের তিনটি কাঠিরও যে মূল্য আছে সে কথা মহাগাণনিকও স্বীকার করবেন এবং এই চুলচেরা হিসাব চিরদিন রেখে এসেছেন বলেই লোকে বলে "হিসেবী!" তা বলুকগে! মাসান্তে মোট ১২০৲ টাকা বেতন পেতেন—ঐ থেকেই টেনেটুনে এদিক্-সেদিক্ করে আজ শিববাবু জমি জায়গা পুকুর-বাগানের মালিক হ'তে পেরেছেন। যে লোকের প্রতিটি সিকি আর প্রতিটি পয়সার ওপর মূল্যায়নের সমান মমত্ববোধ আছে, তারই—

"কই, দিন না মশাই—দেশলাইটা—" বাসুদেববাবু তাগিদ করলেন।

নাঃ, দেশলাইটা না দিলে আর ভাল দেখায় না; গতমাসে বাসুদেববাবু শিববাবুকে একটা বিড়ি যোগাড় করে দিয়েছিলেন, ঋণী হয়ে আছেন শিববাবু। কিন্তু দুর্ভাগ্য, ইস্ত্রি-করা ফতুয়ার পকেটটা এমনভাবে লেপ্টে আছে জামার গায়ে যে শিববাবুর কম্পমান হাতটা কিছুতেই দেশলাইয়ের নাগাল পেল না। যাক উদ্ধার করলেন

দামোদরবাবু—রিটায়ার্ড সাবডেপুটি। নিজের দেশলাইটা জেলে ধরলেন বাসুদেববাবুর মুখের কাছে।

বাসুদেববাবু বিড়িটা ধরিয়ে বিশেষ বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, "দাদা, সব খবর ভাল? মানে—বৌদি কেমন আছেন বলুন—"

দামোদরবাবুর জরাগ্রস্ত মুখটা প্রসন্নতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল বাসুদেববাবুর প্রশ্নের আগ্রহে। বেচারী বাসুদেব বাবু! ওঁর স্ত্রী আজ বহুদিন হ'ল গত হয়েছেন কিন্তু দমেন নি উনি, কি অফুরন্ত উৎসাহ। মেঘে মেঘে যে বেলা অনেক হয়েছে একথা কিন্তু ওঁর কর্মঠ ঋজু দেহ আর বাঙ্‌ময় জিহ্বা মোটেই স্বীকার করে না। এই দেখবেন গলিহাতে মাছের বাজারে, পরক্ষণে অধ্যাপকদের সান্নিধ্যে অনর্গল কাব্য-সংলাপে—এই ছাতামাথায় ধানের মাঠে, পরক্ষণে শ্যামডাক্তারের চেয়ারে। এখানে নিকুচি করছেন শিক্ষানীতির, ওখানে প্রশংসায় পঞ্চমুখ শিক্ষকদের ঐকান্তিকতার। সে যাই হোক আচ্ছা স্মরণশক্তি বাসুদেববাবুর—এই গত পেনশনের আগের দিন দামোদর-বাবুর গিন্নীর যাই-যাই অবস্থা—বাতের উৎকট ব্যথার সঙ্গে জ্বর, হাঁটু-ফোলা। ভারী ভাবনায় পড়েছিলেন দামোদর-বাবু। কই, বাসুদেববাবু ছাড়া আর কারও ত মনে নেই সেকথা। সত্যি মুষড়ে পড়েছিলেন দামোদরবাবু। কম নয়, আজ ৫৩ বছর ধরে ঘর করছেন কিরণশশীর সঙ্গে অথচ এখনও দিব্যি শুনতে পান তিপ্পান্ন বছরের পুরোন সানাই-এর রঙদার সুর—মনে হয় এই ত সেদিন!

গিন্নীর কথা উঠতেই বৃদ্ধ আর অতিবৃদ্ধ পেনশনাররা অনেকেই নড়ে-সরে বসলেন দামোদরবাবুকে ঘিরে—"হ্যাঁ—হ্যাঁ, কেমন আছেন আপনার 'বাড়ী—?' 'বাড়ীর ওনা'র খবর ভাল?"

নিজের দেশের খাদ্য-পরিস্থিতি থেকে সুরু করে পরের দেশের বর্ণ-বৈষম্য কোন প্রসঙ্গই বাদ যায় না এদের পেনশন নেবার দিনে। কিন্তু যে-প্রসঙ্গের প্রতি ওদের অনেকে বেশি আকৃষ্ট হন সেটা হ'ল গৃহিনী-প্রসঙ্গ, কারণ হয়ত এই যে, বাইশজন পেনশনারের মধ্যে ষোলজনই বিপত্নীক এবং যে ছয়জন সৌভাগ্যবান সপত্নীক আছেন তাঁদের কারও স্ত্রীর মাথা ধরলে বাদবাকী ওঁদের মাথায় যেন ভেঙ্গে পড়ে আকাশ—তাই ত ভাবনার কথা!

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভালই আছেন 'উনি'—বড়ছেলে, বউমা 'ওনাকে' পাটনায় নিয়ে যেতে চাইলেন চেঞ্জের জন্য, কিন্তু আমিই বাধা—" নাতি-নাতনীর ঠাকুরদা দামোদরবাবুর মুখটা কিন্তু সহসা লাল হয়ে উঠল লজ্জায়, কথাটা আর শেষ করতে পারলেন না।

"না—না, লজ্জার কি আছে দাদা, ঠিকই করেছেন! ঠিকই করেছেন! ছেলেই বলুন আর মেয়েই বলুন, আপনি স্ত্রীকে যতটা যত্ন-আত্তি করবেন ততটা আর কেউই নয়! বুঝলেন দাদা—ওসব আমার দেখা আছে। তা ছাড়া এই শেষ বয়সে আমাদেরই বা কে অতটা তাকিয়ে দেখে বলুন ত? কেউ না—কেউ না! আরে দাদা, মশারিটা সযত্নে খাটিয়ে দেবারও ত একটা লোক চাই, লোক চায় চানের পর শুকনো কাপড়টা নিশ্চিতভাবে এগিয়ে দেবার—না কি, বলুন?" সাতকড়িবাবু মন্তব্য করলেন।

ওঁর কথার সবটা না হোক, ওঁর সারবস্তুটা সমর্থন করতে যাচ্ছিলেন দামোদরবাবু, কিন্তু রিটায়ার্ড হেডমাষ্টার রাধাকান্ত-বাবু তীব্র প্রতিবাদ তুললেন—"রাখুন মশাই! একটা-আধটা নয় বর্তমানেরটা ধরে আমি তিন তিনটে গিন্নী নিয়ে সংসার করে দেখলুম—ওরা করবে যত্ন? আপনাকে সত্যিকার যত্ন—যদি কেউ করে ত আপনার ঐ পেনশনের বইটা। ওটাকে যত্ন ক'রে বালিশের তলায় রেখে শোবেন দেখবেন ঘুম হবে খাসা। এই আজকের ব্যপারটাই ধরুন না"—আঃ আহঃ—আঃ—যন্ত্রণায় কাতরে উঠলেন রাধাকান্ত বাবু।

জষ্ঠিমাসের প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও রাধাকান্তবাবু গালে-মাথায় জড়িয়ে এসেছেন কম্বলের মোটা কম্ফর্টার—দাঁতের ব্যথা! দাঁত প্রায়ই নির্মূল হয়ে এসেছে কিন্তু যে তিন-চারটে এখনও নড়বড়ে অবস্থায় টিঁকে আছে, ওর ব্যথায় মাসে দু'তিনবার করে ওকে জড়াতে হয় কম্ফর্টার।

রাধাকান্তবাবুর আজ সেই কম্ফর্টার জড়াবার দিন। গালে হাত দিয়ে চোখ বুজে ফেললেন। নড়বড় করে বকে উঠেছেন তৃতীয়পক্ষ গিন্নীর বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত রাগ প্রকাশ করতে—উত্তেজিত জিভের অসতর্ক ধাক্কায় ঠিক ব্যথার দাঁতটায় আবার টনটন্ করে উঠেছে ভীষণ। চোখমুখ সিঁটকে কাতরাতে লাগলেন—অঁঃ—অঁঃ—উঃ—

পেনশনাররা নিঃসহায়ের মত তাকিয়ে থাকলেন অসহায় রাধাকান্তবাবুর দিকে—শরীরের আর মনের নানা ব্যথার সমষ্টিকেই এককথায় বার্দ্ধক্য বলা হয়।

বৈদ্যজনোচিত নানা উপদেশ বর্ষণ শেষ হ'তে-না-হ'তেই রাধাকান্তবাবু আবার আরম্ভ করলেন—"আপনাদের মধ্যে যাঁরা আজ বিপত্নীক তাঁদের মধ্যে কেউ হয়ত স্বর্গগত গিন্নীর জন্য বলবেন দাঁত থাকতে তখন দাঁতের মর্ম বুঝিনি মশাই! দাঁত অবশ্য বটেন, কিন্তু মশা—ই স্রেফ দংষ্ট্রা! তেত্রিশ বছর হেডমাষ্টারী করে কত গরু মানুষ করেছি! কিন্তু কি বলব মশাই—ওঁরা পক্ষান্তরে সেই মানুষকেও গরু

বানাতে পারেন। এ অভিজ্ঞতা শুধু রাধাকান্ত শর্মার একার নয়, ঐ দেখুন না—উনিও!" রাধাকান্তবাবু বাল্যবন্ধু—পেনশনার দারোগাবাবুর দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন—"ও বেচারীও তাই! দারোগাবাবুর কি প্রবল প্রতাপ! পোশাকের অছিলায় চামড়ার মোটা মোটা বেল্ট আর ক্রসবেল্ট দিয়ে সরকার যাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছেন বে-এক্তিয়ার না হন বলে, যাদের দেখে বড় বড় চোর-ডাকাতের পিলে চমকে উঠত সেই দারোগা বন্ধু বাড়ীতে একদম কুঁচে—! আমি কিন্তু মশাই কুঁচেটুচে নই। সাফ সাফ বলে দিয়েছি—তুমভি মিলিটারী হামভি মিলিটারী—! যাক গে! দাঁতের ব্যথায় কার না খিঁচুড়ি খেতে ইচ্ছে করে? খিঁচুড়ির বরাতটা না হয় রান্না-বান্না শেষ হ'তেই দিয়েছিলাম, তাই বলে কি খেঁকিয়ে উঠবেন '—দায় পড়েনি চিরদিন ফরমাশি পিণ্ডি রাঁধতে!' দেখুন ত কথার ছিরি! না খেয়েই চলে এলাম। যে স্ত্রী স্বামীর জীবদ্দশাতেই তার পিণ্ডির ব্যবস্থা করতে পারে, প্রাণ থাকতে তার হাতে জলস্পর্শ করতে আর ইচ্ছে হয় মশাই? যদি একটা যোগ্য ছেলে আর বউমা থাকত তা হলে—আঃ—আঃ—" ব্যথায় চোখদুটো চকচক্ করে উঠল রাধাকান্ত বাবুর।

"ছেলে-বউমা? রাম—রাম—রাম!" ভীষণ প্রতিবাদ করে উঠলেন দারোগাবাবু—"বড্ড ভুল করেছি ভাই, রাধাকান্ত, বড্ড ভুল করেছি! জামাই হ'লে মেয়ে, বিয়ে দিলে ছেলে আর বৃদ্ধ হলে গিন্নি পর হবেই। এর আর ব্যতিক্রম নেই! এখন ত' আমরা নাতি-নাতনীর খেলার ঘোড়া! সেবার বড় ছেলের কাছে রাণাঘাটে ছিলাম একমাস। বউমা সকালের রান্না চড়িয়ে বলতেন—'খোকনকে একটু ধরুন ত বাবা!' দুপুরে বৌমার ঘুমের ব্যাঘাত হলেই দামাল নাতনীকে থুয়ে যেতেন—'বড্ড বিরক্ত করছে, একটু আটকান ত!' সন্ধ্যায় কারও বাড়ী ছেলের সঙ্গে বেড়াতে বেরুলেই একটিকে নিগ্ঘাত রেখে যেতেন আমার কাছে—'একটু দেখবেন ত অন্ধকারে না নামে!' এর মানে কি ভাই? মানে খুবই সরল আর স্পষ্ট—বুড়ো বয়সে রাঁধাভাত খেতে হ'লে, ভাই, কারও না কারও—বিশেষ করে বউমার মন যুগিয়ে চলতেই হবে। 'পিতা ধর্ম পিতা স্বর্গ...' এসব বাপ-ভোলান কথা বাপের শ্রাদ্ধে উপসংহার মন্ত্রেই খাটে ভাল, বেঁচে থাকতে নয় ভাই!" সখেদে চুমকারি দিলেন দারোগাবাবু—"ব্যস্! ফিরে এলাম ভাই নিজের ভিটেই। বামুনের ছেলে, তিন ফুঁ দিতে জানি—কানে, শাঁখে আর উনোনে! এখন মশাই নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ—স্বপাকে রাঁধি-খাই আর মায়ের নাম করি—তারা-তারা—!"

অন্য সব পেনশনার বাবুরা বেশ মন দিয়েই শুনলেন—এর আর প্রতিবাদের কি আছে? যার জ্বালা সেই জানে ভাল! ছেলেদের আর দোষ কি? এইটুকু বয়েস থেকে ওদের মানুষ করেছেন; আজও পেনশনারবাবুরা বলে দিতে পারেন ওদের ছেলেবেলার বিশেষ বিশেষ বায়নাক্কার কথা, আব্দারের কথা! আজও মনে পড়ে নিজের পাত থেকে নিজেকে বঞ্চিত-করা মাছের মুড়োটা ওদের পাতে তুলে দিয়ে নিজেরা তুলেছেন পরম পরিতৃপ্তির ঢেকুর! ওদের ভাল ভাল পরিয়ে পরম আত্মগর্বে কে না পরেছেন ওদের বাতিল-করা পরিধেয় বস্ত্র! বাপ জানে না ছেলের মনের কথা, ওদের স্ফটিক-স্বচ্ছ মতির কথা? বাপ চেনে না নিজের ছেলে? কিন্তু আজ জীবন-সায়াহ্নে এসে সেই ছেলেদের ক'জনকে যায় চেনা? কেন এমন হয়? ছেলের স্ফটিক-স্বচ্ছ মানস সরোবর কে দিল ঘুলিয়ে? বলে দিতে হবে কে? কে আবার, ঐ পরের মেয়ে—বৌমা!

"সত্যি ভাই—" কে একজন সমর্থন করলেন কিন্তু, কিন্তু সমর্থন করলেন না রিটায়ার্ড সাবরেজিষ্ট্রার হরিভূষণ বাবু—

হরিভূষণবাবু একটা চোখের ছানি সম্প্রতি কাটিয়েছেন—ঘষা কাঁচে চোখের দৃষ্টি আটকান। সাত-আট বছরের একটা নাতিকে নিয়ে আজকাল পেনশন নিতে আসেন—বাঁহাতে ধরেন নাতির হাত, ডানহাতে বেতের মোটা লাঠি। শীত-গ্রীষ্মের ঝাপ্টা-খাওয়া শির-বহুল পতনোন্মুখ একটা হলদে পাতার গায়ে যেন লেগে আছে একটা সতেজ মখমল-সবুজ নবকিশলয়—অতীত আর বর্তমানের সংযোগ-প্রয়াগ। দাদুর পিঠে ঠেস দিয়ে নাতিটা পা ছড়িয়ে বসে আছে—দাদুর চশমার খাপটা নিয়ে খুলছে আর বন্ধ করছে মহা তন্ময়তার সঙ্গে—কি যান্ত্রিক তত্ত্ব নিহিত আছে খাপটা খোলার চাইতে বন্ধ করার সহজত্বে?

"প্রদীপ?" হরিভূষণবাবু নাতিটির খোঁজ নিলেন।

"উঁ—"

"ঘুমিও না ভাই!" তারপর দারোগাবাবুকে বললেন, "না—না দারোগাবাবু, আপনি একটু ভুল করছেন। জানেন ত ভাই, মাইনের চাইতে টি. এ. আর আসলের চাইতে সুদ বেশি মিষ্টি। নাতির চাইতে ওপারে যাবার মিষ্টি টি, এ, আর কি আছে আমাদের। পাপপুণ্যের পৌটলা নিয়ে ঘাটে এসে বসেছি, টি, এ-ও পেয়েছি—পারের তরি এলেই হয়! ওরা ছাড়া আর কি আছে

অবলম্বনের ? কি পাচ্ছি, কি পাচ্ছি না, এসব আক্ষেপের ভারি পোঁটলা যাবার সময় বেশি বাড়িয়ে লাভ কি ?"

"দাদু ? কই দিলে না ?" প্রদীপ দাদুর দিকে হাত বাড়াল।

"ওহো—ঠিক ত'! ভুলেই গিয়েছিলাম ভাই !"

বারোটা নয়া পয়সা দিয়ে দিলেন নাতিটার হাতে—ওকে সঙ্গে আনার দক্ষিণা! প্রদীপ ছুটে নেমে গেল বারান্দা হ'তে—মিষ্টির দোকানের দিকে।

পেনশনারদের চোখে ভারি সুন্দর লাগল হরিভূষণবাবুর নাতিটিকে—প্রাণসম্পদে ভরা একটা মৃগশিশু! নিজেদের স্থবিরত্বের কালো মেঘের কোলে যেন একটা বিদ্যুৎ ঝলক—ভবিষ্যতের তেজোময় সম্ভাবনা।

কে বলল পেনশনারবাবুরা বৃদ্ধ ? বৃদ্ধত্ব ওঁদের আসল-রূপ মোটেই নয়—এক নিমিষে কোন্ সুদূরে ফেলে-আসা ওঁদের বাল্যের অতীত নতুন করে জেগে উঠল চোখের সম্মুখে—মনে হ'ল এই সেদিন! ওঁরাও ছিলেন এমনি দুরন্ত! পাড়ার পদিপিসির ঊর্দ্ধতন সাতপুরুষ উদ্ধার করা গালাগালির বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা পেয়ারা গাছটির দুর্লঙ্ঘ্য হাতছানি আজও যেন ওঁদের ডাকছে! পাঁচুপণ্ডিতের নির্মম বেতের ব্যথা আজও যেন লেগে আছে সর্বাঙ্গে। অলগাবান চানের দাপে উত্যক্ত চন্দ বামনীর শাপশাপান্ত আজও যেন কানে বাজছে থন্ থন্ করে—এই ত সেদিন—ষাট-পঁয়ষট্টি বছর আগে!

মিষ্টির দোকান থেকে প্রদীপ ফিরে এল। দাদুর কোঁচায় ভিজে হাত আর মুখটা স্বচ্ছন্দে মুছে নিয়ে আবার বসল দাদুর পিঠের দিকে—লুকিয়ে বের করল চানাচুরের ঠোঙা, কুটকুট করে চিবিয়ে চলল নিজের মনে। রসগোল্লাটা খেতে হয়েছে দাদুর মন রাখতে, চানাচুরটা চুরি করে খাচ্ছে নিজের তৃপ্তির তাগিদে! আশ্চর্য মানুষ ঐ দাদু—ঘটে যদি একটু বুদ্ধি থাকে—ভুলেও যদি মুখে দেয় চানাচুর! বেশ চানাচুরে না হয় পয়সা লাগবে কিন্তু প্রতিবেশি পদিপিসিদের বাড়ীর পুরোণ পেয়ারাগাছটাতে দাড় হাতের লাঠির এক ঘা দিতে পারে—অন্ততঃ সাত-আটটা ত পড়বে, কিন্তু তাও না! দাদুর দোষ নেই—প্রদীপের মত ছোট ত কোনদিন ছিল না—ও কি বুঝবে ডাঁসা পেয়ারার স্বাদ!

কি যেন খেয়াল হ'ল প্রদীপের, চর্বণক্রিয়াটা হঠাৎ বন্ধ করে ভক্তি মুখে জিজ্ঞাসা করল—"দাদু? তুমি কি করছ ?"

দাদু পরম স্নেহে নিজের গালটা রাখলেন নাতির মাথায়, তারপর হাসতে হাসতে বললেন—"কি করছি ? আমরাও তোমার মত জাবরই কাটছি ভাই—তবে বিনা চানাচুরে। —এই যা তফাৎ !"

—০—

আপনাকে বিশ্বাস ও পরকে বিশ্বাস

শুধু বড় ব্যবসা বাণিজ্য নয়, অন্য রকমেরও বড় কাজ আমাদের দেশে হওয়ার একটা প্রধান বাধা ও অন্তরায়, পরস্পরকে বিশ্বাসের অভাব। কেহ বিশ্বাসের যোগ্য না হইলে তাহাকে বিশ্বাস করা যায় না বটে, কিন্তু বিশ্বাস না করিলেও আবার মানুষ বিশ্বাসভাজন হয় না। যাহার বিরুদ্ধে কিছু জানি না, তাহাকে একটু বিশ্বাস করিলে ক্রমশঃ বুঝা যায় যে সে আরও বিশ্বাসের যোগ্য কিনা। পৃথিবীর অনেক মহৎ লোক বিশ্বাস করিয়া কোন কোন স্থলে ঠকিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা যদি বিশ্বাসপ্রবণ না হইতেন, তাহা হইলে মোটের উপর তাঁহাদের দ্বারা জগতের এত কল্যাণ হইত না। আত্মনির্ভর ও পরনির্ভরের মূল একই—মানব-প্রকৃতির উপর আস্থা। সেই জন্য দেখা যায়, যে জাতির মধ্যে আত্মনির্ভরের ভাব প্রবল, তাহারা পরস্পরকে বিশ্বাসও তত করে, এবং সেই জন্য তাহাদের মধ্যে নেতৃত্ব, দল বাঁধিবার শক্তি, নেতার আজ্ঞানুবর্তিতা, দলের স্বার্থের জন্য নিজের স্বার্থত্যাগের শক্তি, সহযোগী প্রীতি, অনুচরবাৎসল্য প্রভৃতি সদ্‌গুণ লক্ষিত হয়।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২৩।

নষ্টনীড়, সত্যজিৎ রায় ও চারুলতা

শ্রীমিহির সিংহ

রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' অবলম্বনে রচিত চারুলতা নামক চলচ্চিত্রটি দর্শক ও সমালোচক মহলে প্রচুর কৌতূহল ও বিতর্কের সূচনা করেছে, বস্তুতপক্ষে সত্যজিৎ রায় যখন চিত্রনাট্যটি লিখতে সুরু করেছেন তখন থেকেই সে উদ্‌গ্রীব আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে। শেষমুহূর্ত্তে ছবিটির নাম পাল্‌টিয়ে চারুলতা করা পর্য্যন্ত তা শুধু অব্যাহতই থাকে নি —উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে প্রকৃত বিতর্ক সুরু হয়েছে সমালোচকদের জন্যে আয়োজিত বিশেষ প্রদর্শনীর দিন থেকে। এত বিতর্ক হয়েছে যে জনৈক সমালোচক বলেছেন, এটি যে সত্যজিৎ রায়ের একটি মহৎ সৃষ্টি, বিতর্কের তীব্রতাই তার নিশ্চিত প্রমাণ। বলা বাহুল্য কথাটি মানতে পারা গেল না। পৃথিবীতে এমন অনেক কাজ আছে যা করলে বিতর্ক অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু বিতর্ক মানেই মহত্ত্বের চিহ্ন নয়। বিতর্ক বেশী হয়েছে ছবির শেষ অংশটুকুকে নিয়ে। তা ছাড়া ভূপতির আচরণ স্বাভাবিক হয়েছে কি না, চিত্রনাট্যে রবীন্দ্রনাথের মূল গল্প থেকে তফাতে সরে যাওয়ার যৌক্তিকতা, ইত্যাদি নিয়েও আলোচনা অনেক হয়েছে। তবে সাধারণ ভাবে বলতে গেলে বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকায় নিয়মিত সমালোচকদের কাছ থেকে আমরা যা পেয়েছি তা প্রায় নিছক স্তুতিবাদ ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু বিশ্বের চলচ্চিত্র ইতিহাসের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীর গভীর অনুভূতি ও অসাধারণ দক্ষতার সাহায্যে সে জিনিষটি তৈরী করেছেন তার সম্বন্ধে শুধু উচ্ছ্বাস ও ভাবাবেগ প্রকাশ করেই ক্ষান্ত থাকলে বোধ হয় তার সম্বন্ধে পুরো মর্য্যাদা দেখানো হয় না। ভাল লাগাটা ভাল, খারাপ লাগাটা যুক্তিযুক্ত হ'তে পারে, কিন্তু কেন ভাল লেগেছে বা কেন খারাপ লেগেছে তার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। পর্ব্বত কি সমুদ্রের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখে শুধু মুগ্ধ বিস্ময় প্রকাশ করা ছাড়া উপায় না থাকতে পারে, কিন্তু সামগ্রিক পরিকল্পনা ও সজ্ঞান প্রয়াসের মধ্যে দিয়ে যার সৃষ্টি, তাকে অনুরূপ ভাবে না দেখা কি উচিত হবে? শাশ্বত মূল্য আছে কি না তার চরম বিচার ইতিহাসের হাতে। আর আপাতবিচার করতে গেলেও অনুসন্ধান হওয়া উচিত একাধিক স্তরে: technique বা শিল্পকুশলতা; কাহিনী বা বক্তব্যের [illegible] অথবা দুই-ই; এবং শিল্পের ও শিল্পীর ক্রমঃবিকাশের ইতিহাসে তার স্থান। এর একটি যে অপরটির থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্ তা মোটেই নয়, তবে মূল্য নিরূপণ করতে হ'লে এই ভাবে পৃথকীকরণ করে নিলে আমাদেরই সুবিধা।

উপমা বা তুলনা অনেক অনর্থের কারণ হয়, তবুও এটা বলা হয়ত অন্যায় হবে না যে, অন্যান্য শিল্পকর্ম্মের মধ্যে ঐকতান বাদকের সঙ্গে চলচ্চিত্রের মিল আছে। যন্ত্রীরা ব্যক্তিগত ভাবে যথেষ্ট নিপুণতার অধিকারী হ'লেও তাঁদের একক প্রকাশের চাইতে ঐকতান বা Orch stra-র সমবেত প্রকাশই বড়। একটি সার্থক চলচ্চিত্র অনেকের সম্মিলিত প্রয়াসের ফল—অভিনেতা, আলোকচিত্র শিল্পী ও সঙ্গীত-পরিচালক থেকে সুরু করে দৃশ্যশিল্পী ও সজ্জাশিল্পী পর্য্যন্ত। ঐকতান যেমন সামগ্রিক ভাবে সঞ্চালকের সৃষ্টি, চলচ্চিত্রও তেমনি একান্ত ভাবে পরিচালকেরই সৃষ্টি। তবে ঐকতান সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যেমন সঞ্চালকের সঙ্গে একটি বিশেষ সম্পর্ক আছে মূল সুরকারের. চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও তেমনি একটি বিশেষ স্থান আছে মূল কাহিনীর রচয়িতার। আমরা যেমন Tchaikovski-কেও শুনতে চাই আবার Thomas Beechum-কেও শুনতে যাই, তেমনি 'চারুলতা' দেখতে গেলে সত্যজিৎ রায়ের সৃষ্টি হিসেবেও তাকে দেখতে যাই আবার রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়'কেও দেখতে চাই। একটা কথা বলে রাখা ভা'ল যে, 'চারুলতা'র আলোচনা করতে গিয়ে এই সূত্রগুলির অবতারণা করছি কোন প্রামাণ্য মাপকাঠি হিসেবে নয়, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়ে দেবার জন্যে মাত্র।

প্রথমে শিল্পকুশলতার কথা। এ বিষয়ে সত্যজিৎ রায় তাঁর প্রথম ছবি 'পথের পাঁচালী' থেকেই যে-নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা আমাদের দেশে ত দূরের কথা, সমস্ত পৃথিবীতেই মেলা ভার। সবাক্-চিত্র রচনার নৈপুণ্য বিভিন্ন দিক্ থেকে বিচার করা যায়: আলাদা আলাদা করে এক-একটি চিত্রের (frame) নিজস্ব সৌন্দর্য্য ও গভীরতা, চিত্রগুলির পরম্পরা অনুযায়ী বিন্যাস (montage), গতি, শব্দের ব্যবহার ইত্যাদি। চিত্ররচনা ও ক্রমবিন্যাসে সত্যজিৎ রায় যে দক্ষতা বরাবর দেখিয়ে এসেছেন তার ব্যতিক্রম হয় নি। এবং তাঁর কাছ থেকে এই ধরণের জিনিষ পেতে

আমরা এত অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে, সেটা যেন আর আলাদা ক'রে চোখেই পড়ে না। তবে যেটা চোখে পড়ে সেটা হ'ল চিত্রগ্রহণ ও প্রতীকধর্ম্মী উপকরণের ব্যবহারে নূতনত্ব। ছোট্ট দূরবীক্ষণটির সাহায্যে জীবনের কর্ম্মব্যস্ততার থেকে চারুলতার অসহ অনতিক্রম্য দূরত্ব যেভাবে ফোটানো হয়েছে সেটা খুব ভাল লেগেছে। ভূপতি যখন তাকে লক্ষ্য না করে আত্ম-বিভোর ভাবে চলে যাচ্ছে তখন ক্যামেরাকে সহসা পিছনে সরিয়ে নিয়ে এসে চারুলতার ধাক্কা খেয়ে ভূপতির কাছ থেকে আরও সরে যাওয়া যেভাবে প্রকাশ করা হয়েছে তা সত্যিই অপূর্ব্ব। অমল চলে যাওয়ার পরে চারুলতার মন ভেঙে গিয়েছে। আদর্শবাদী ভূপতির জীবনে নিষ্ঠুর আঘাত এসেছে উমাপতির বিশ্বাসঘাতকতায়। ভেঙে-যাওয়া দাম্পত্য-জীবনকে জোড়া লাগানোর চেষ্টায় তারা দুঃখময় স্মৃতি-জড়িত বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়েছে পুরীর সমুদ্রে। সেখানে মুক্ত পরিবেশে তারা আশা খুঁজে পেয়েছে নতুন একটা কাগজের জন্যে যুগ্ম প্রচেষ্টার কথায়, ফিরে এসেছে কলকাতার বাড়ীতে। কিন্তু এখানকার পুরাণো স্মৃতি-বিজড়িত অচলায়তনে এসে ঢুকতেই তাদের নতুন আশা শক্তিহীন হয়ে পড়ছে। ক্যামেরাকে পুরণো পুরণো আসবাবপত্রের ভারি ভারি পায়ার পিছনে নামিয়ে নিয়ে এসে এই অচলায়তনের চেহারা সত্যজিৎ রায় কতটা সজ্ঞানে করেছেন তা জানি না, কিন্তু আমাদের মনে তা ধাক্কা না দিয়ে পারে না। অথচ যেখানে তিনি বেশী সচেতন সেইখানেই আমাদের কাছে পীড়াদায়ক কয়েকটি জিনিষের অবতারণা হয়েছে ব'লে মনে হয়। ঝড়ের মধ্যে অমলের আবির্ভাব ভালই লেগেছে, কিন্তু পাখীর খাঁচাটাকে দুলিয়ে না দিলে কিংবা শেষকালে স্বামী-স্ত্রীর চরমবিচ্ছেদের মুহূর্ত্তে অমলের অদৃশ্য উপস্থিতি ফোটানোর জন্যে আবার সেই ঝড়কে টেনে না আনলে কি নীড় যে সত্যিই নষ্ট হয়েছে, তা প্রমাণ করা যেত না?

পরিচালকের শিল্পকুশলতার একটি সবচেয়ে বড় প্রমাণ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যথাযথ ব্যবহার। চারুলতা চরিত্রে মাধবী মুখোপাধ্যায় প্রয়োজনীয় গভীরতা বা তীব্রতা আনতে পারেন নি। যেখানে চারুলতা শান্ত বা শুধুই নিঃসঙ্গ সেখানে তাঁকে বেশ ভাল মানিয়েছে। কিন্তু যেখানে চারুলতার মনে দ্বন্দ্ব আসছে, কিংবা অস্বীকৃত কি স্বীকৃত ভালবাসা আসছে অমলকে উপলক্ষ্য করে সেখানে তিনি ব্যর্থই হয়েছেন। সম্পূর্ণ নূতন কোন শিল্পীকে দিয়ে হয়ত এত জটিল একটি চরিত্র ফোটানো সম্ভব হ'ত না, আবার অভিজ্ঞ কোন শিল্পীর পক্ষে হয়ত আত্মসচেতনতা বা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বিসর্জ্জন দিয়ে চারুলতাকে রূপ দেওয়া অসম্ভব। কিন্তু তবুও বলব যে ঠিক মনের মতন না হ'লে সত্যজিৎ রায়ের মতন নিষ্ঠাবান্ পরিচালকের চেষ্টাই করা উচিত নয়, চারুলতাকে দর্শকের সামনে আনবার। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের 'অমল' মোটের পরে বেশ ভালই ফুটেছে। তবে অভিনয়ের কথা যদি বলতে হয় শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের 'ভূপতি' আর গীতালি রায়ের 'মন্দা' সত্যিই সুন্দর ও সম্পূর্ণ। কাগজ-বিক্রেতা হিসেবে বঙ্কিম ঘোষ ও উমাপতি হিসেবে শ্যামল ঘোষালও খুবই ভাল। ব্রিটেনের সাধারণ নির্ব্বাচনে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের জয়লাভ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত উৎসব সভায় প্রত্যেকটি চরিত্র একেবারে জীবন্ত। ভৃত্য এবং দাসী ছাড়া আর কোন চরিত্র বোধ হয় চিত্রটিতে নেই।

আলোকচিত্র, শব্দ, সঙ্গীত, শিল্পনির্দ্দেশনা ও রূপসজ্জা ইত্যাদি নিখুঁত না হ'লেও বেশ ভাল। মোটের পরে ভাল ব'লেই এবং সত্যজিৎ রায়ের কাছ থেকে আমাদের আশা অনেক বেশী ব'লে এক-একটি ত্রুটি অবশ্য বড় বেশী ক'রে চোখে পড়ে। যথা, দোলনায় দোলবার সময় মাধবী মুখো-পাধ্যায়কে যখন খুব কাছে থেকে দেখানো হয়েছে তখন চলচ্চিত্রোপযোগী রূপসজ্জার অমসৃণ কঠিনতা অত্যন্ত স্পষ্ট ও অসুন্দরভাবে ধরা দিয়েছে। উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই, তবে খুঁটিনাটি বিষয়ে এত মনযোগী-পরিচালকের কাছ থেকে এই ধরণের ত্রুটি আমরা সত্যিই আশা করি না। শিল্পী হিসেবে তাঁর ক্রমপরিণতির ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্প-নির্দ্দেশনা ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের আরও কিছু বক্তব্য আছে, তবে তার আগে মূল কাহিনী ও চিত্ররূপের আপেক্ষিক আলোচনাটুকু করে নেওয়া যাক।

রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' রচনাকালের বিচারে ত বটেই, সর্ব্বকালের বিচারে একটি সুন্দর সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের ভূপতি ভালয়মন্দয় মেশানো একটি চরিত্র। উনবিংশ শতাব্দীর Young Bengal দলের একটি typical মানুষ হিসেবে তার আদর্শবাদ ঠিক কর্ম্মঠ লোকের আদর্শবাদের মতন নয়। ইংলণ্ডের Liberal ভাবধারাপুষ্ট, ইংরাজী ভাষায় নাতি-গভীর ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন আন্তরিক অথচ খানিকটা absurd একটি চেহারা আমাদের মাথায় আসে ভূপতির কথা পড়লে। তার স্ত্রী বিদুষী না হয়েও স্বাভাবিক প্রতিভাসম্পন্না, কিন্তু Young Bengal-এর অন্তঃপুরবাসিনীর জরুরী সমস্যা হ'ল নিঃসঙ্গ যৌবন। অমল শিক্ষার ছাপও পেয়েছে, আবার সাহিত্যেও রুচি আছে, কিন্তু স্বাভাবিক মিষ্টতা ও আন্তরিকতা সত্ত্বেও খুব পরিণত মানুষ নয়। বৌঠানের

সান্নিধ্যে তার মধ্যে সুপ্ত সাহিত্য-প্রতিভার উন্মেষ ও স্বীকৃতি,আবার প্রধানতঃ তার এই স্বীকৃতি লাভের প্রতি-ক্রিয়ায় অপ্রত্যাশিতভাবে চারুলতার সাহিত্য-প্রতিভার বিকাশ—গল্পের এগুলিই সব চাইতে উল্লেখযোগ্য উপাদান। দূর-সম্পর্কের দেবর ও ভ্রাতৃবধূর মধ্যে যে সম্পর্ক সেটা সাধারণ সব বাঙ্গালী পরিবারের মতনই খানিকটা প্রেম, খানিকটা স্নেহ ও প্রীতি, খানিকটা নিছক বন্ধুত্ব—তার বেশী কিছু নয়। অর্থাৎ দেহজ আকর্ষণ প্রচ্ছন্নভাবে উপস্থিত থাকলেও তার প্রকাশ্য স্বীকৃতি ত দূরের কথা, অমল বা চারুলতার মনেও স্পষ্ট কোন সময় হচ্ছে না। বরং অমল চলে যাবার পরে চারুলতা নিজের মনেই বুঝবার চেষ্টা করছে এত বেদনার কারণ কি। প্রবন্ধের গোড়াতেই বলেছি যে আখ্যানভাগের নিজস্ব আবেদন ছাড়াও একটা সামাজিক আবেদন থাকতে পারে। 'নষ্টনীড়' গল্পের মধ্যে যেটুকু সামাজিক মূল্য আছে তা হ'ল তখনকার দিনের ইংরাজী-শিক্ষিত উদার-মতাবলম্বী একটি মানুষের দ্বন্দ্ব। আদর্শগত হিসেবে সে ইংরাজী Liberal-দের সমগোত্রীয় হ'লেও পারিবারিক ব্যাপারে গতানুগতিকতা পূরো অস্বীকার করতে পারে নি। ঘরণীকে জীবনসঙ্গিনীর মর্য্যাদা দিতেও যেমন সে পারে নি, অমলের প্রতি স্ত্রীর মানসিক আকর্ষণের পরিচয় পেয়ে নিছক ঈর্ষ্যা প্রকাশের দুর্ব্বলতাকেও জয় করতে পারে নি। শ্যালক উমাপতির কাছে প্রতারিত হওয়ার ট্র্যাজিডির চাইতেও, এমন কি নিজের স্ত্রীর প্রীতিলাভে অমলের কাছে হেরে যাওয়ার চাইতেও, স্বাভাবিক ঔদার্য্য হারিয়ে ফেলার এই ব্যক্তিগত ট্র্যাজিডিটাই ভূপতির জীবনে সব চাইতে বড় ট্র্যাজিডি ব'লে মনে হয়।

সত্যজিৎ রায়ের 'চারুলতা'তে মহৎ কথাশিল্পীর এই সূক্ষ্ম রেখাগুলি বাদ দিয়ে ফুটে উঠেছে মোটা তুলিতে চড়া রং-এ আঁকা একটি গতানুগতিক ত্রিভুজ প্রেম-কাহিনী। অমলের সাহিত্য-প্রতিভার উন্মেষ অধ্যায়টি 'চারুলতা' ছবিটিতে মোটের 'পরে গৌণ হয়ে পড়েছে। মুখ্য স্থান অধিকার করেছে আত্মভোলা স্বামীর স্ত্রী চারুলতার জীবনে প্রেমের আবির্ভাব তরুণ অমলকে আশ্রয় করে। তাও যেন এক তরফাভাবে; রবীন্দ্রনাথের অমল চারুলতার মনে প্রথম আসন পাততে পেরেছিল বৌঠানের কাছে এটা-ওটা-সেটা দাবি করার মধ্যে দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের চারুলতা দিতে চাইছিল, এবং দেবার পাত্র তার স্বামীর মধ্যে পাচ্ছিল না। সত্যজিৎ রায়ের চারুলতা যেন নিতেই চাইছে, তাই তার প্রায় অশোভন আত্ম-উন্মোচন ঘটেছে। এতে অমল বা চারুলতা কোন চরিত্রই মূল গল্পের চেয়ে গভীরতর হয়েছে বলে মনে হ'ল না। অন্যদিকে সত্যজিৎ রায়ের ভূপতি সমস্ত absurdity এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব হারিয়ে নিছক 'ভাল লোক' হ'তে পেরেছে বটে, তবে সেই সঙ্গে ভালয়-মন্দয় মেশানো সজীব একটি চরিত্রের থেকে নিছক ভাল একটি দ্বিমাত্রিক চিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। ফলে সেও আমাদের কাছে যেন কেমন unconvincing।…………সেই একই সঙ্গে অবশ্য বলতে হয় যে উমাপতি ও মন্দার চরিত্রে সত্যজিৎ রায় মূল গল্পের চাইতে অনেক বেশী প্রাণ সঞ্চার করতে পেরেছেন, বিশেষ করে মন্দার চরিত্রে। তবে এই অনাবশ্যক ও ক্ষতিকর পরিবর্ত্তনগুলির চাইতেও মর্ম্মান্তিক হয়েছে চিত্র-কাহিনীর শেষ অংশটি। যে শিল্পচাতুর্য্যের সাহায্যে সত্যজিৎ রায় ছবিটি শেষ করেছেন তা স্বভাবতঃই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অভিনব কিছু করলে তা স্বভাবতঃই একদল লোকের ভাল লাগে ও একদল লোকের খারাপ লাগে—উভয়ক্ষেত্রেই কারণ এক, নিছক নূতন ব'লে। কিন্তু ক্যামেরা থামিয়ে দিয়ে স্বামী ও স্ত্রীর বাড়িয়ে-দেওয়া হাত দু'টিকে মিলতে না দেওয়া এবং তাদের দু'জনের মধ্যে অনুপস্থিত অমলের স্মৃতিরূপ ব্যবধানটিকে স্পষ্ট করার মধ্যে আমরা কি পেলাম? উত্তর সত্যজিৎ রায়ই দিয়ে দিয়েছেন: অত্যন্ত দৃষ্টিকটুভাবে 'নষ্টনীড়' কথাটিকে দৃশ্যপটের গায়ে প্রতিফলিত করে। ভূপতি এবং চারুলতা ছিল এবং এখনও আছে, অমল অতীতে ছিল না, তারপরে এসেছিল এবং এখন চলে গিয়েছে। সমীকরণের মাঝখানের জিনিষটুকু নেই বলে ভূপতি ও চারুলতার নষ্টনীড়টি একটি স্থাবর অবস্থায় থমকে দাঁড়িয়ে রইল—এইটেই কি সত্যজিৎ রায় বোঝাতে চেয়েছেন? রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তা বলেন নি। তাঁর গল্পের শেষে সংসারের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দাঁড়িয়ে ভূপতি ও চারুলতার যে Staccato কথোপকথন, তার থেকে আমরা অনেক বেশী বাস্তবানুগ একটি চিত্র পাই। ঝড়ের মতন যে ছেলেটির আবির্ভাব হয়েছিল, ঝড়ের মতনই সে চলে গেছে, যাওয়ার সময় ভাঙনও সে ঘটিয়ে গেছে, কিন্তু জীবনের এক অধ্যায়ে যতই না ভাঙাচোরা হোক জীবনটা কখনও এক জায়গায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না। পরিচালক হিসাবে সত্যজিৎ রায় মূল কাহিনীর পরিবর্ত্তন করুন, কিন্তু শিল্পী হিসাবে রবীন্দ্রনাথের এই শেষ হয়েও শেষ না হওয়ার ইঙ্গিতটুকুকে বিসর্জ্জন দিয়ে এত স্থূল চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে-দেওয়া চিত্র ফোটাতে গেলেন কেন?

রবীন্দ্রনাথের গল্প যাঁদের ভাল লেগেছে তাঁদের অনেকের কাছে সত্যজিৎ রায়ের 'চারুলতা' ভাল লাগবে না। তবু একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ চিত্র হিসাবে 'চারুলতা' যে খুব সুন্দর

একটি সৃষ্টি তাতে সন্দেহ নেই। তবে চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সব চাইতে প্রতিভাশালী একটি মানুষের নবতম অবদান হিসাবে 'চারুলতা'র আলোচনা করতে গেলে তাঁর নিজের ব্যক্তিগত বিবর্তন ও চলচ্চিত্র শিল্পের সামগ্রিক বিবর্তনের ইতিহাসে এর স্থানটুকুকেও নির্দিষ্ট করতে হয়। এবং সেই দিক্ থেকেই বোধ হয় আমরা সবচেয়ে বেশী মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছি। উচ্চমানের ছবি পর পর করে গিয়ে যদি সত্যজিৎ রায় সন্তুষ্ট থাকেন তা হ'লে আমাদের কিছু বলবার নেই। তা ছাড়া তার প্রয়োজনও আছে, দর্শকদের সামনে ক্রমাগত ভাল ছবি না এলে রুচিই বা ভাল হবে কি করে? তবে কোন শিল্পের যাঁরা নেতৃত্ব করেন তাঁদের কাছ থেকে আমরা শুধু তাই পেলে সন্তুষ্ট থাকতে পারি না, আমরা চাই নতুন পথ দেখানো, ক্রমাগত উচ্চতর মানের ছবি। আমরা চাই এমন ছবি যা দেখে মুগ্ধ হয়ে বলতে পারব যে, আগের ছবির চাইতেও এটা ভাল, এবং তরুণ পরিচালকেরা বলতে পারবেন আমরাও এইভাবে ক্রমান্বয়ে উচ্চতর মানের ছবি করতে থাকব। অসাধারণ একটি গল্পকে অনাবশ্যকভাবে পরিবর্তিত করার যে বিপজ্জনক দৃষ্টান্ত সত্যজিৎ রায় স্থাপন করেছেন তাও যদি বা ব্যক্তিগত রুচির কথা ভেবে ভুলতে পারি অন্য অন্য দিকে এমন কিছু আমরা পাই নি যাতে বলতে পারি যে সত্যজিৎ রায় তাঁর ব্যক্তিগত, তথা শিল্পগত উন্নতির ধারা অব্যাহত রাখতে পেরেছেন। নিছক খণ্ডচিত্র রচনায় দক্ষতা এর চাইতে অনেক বেশী দেখিয়েছিলেন 'দেবী'তে, কথোপকথন এবং ঘটনার বিন্যাস 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'য় অনেক বেশী সুন্দর, 'অপরাজিত' দর্শকের মনকে অনেক বেশী স্পর্শ করতে পেরেছিল। কিন্তু এ-সব তুলনামূলক বিচারের কথা ছাড়াও যেটা আমাদের সবচেয়ে বেশী শঙ্কিত করেছে, সেটা হ'ল আবহাওয়া তৈরী করতে গিয়ে বা নিছক Period piece রচনা করতে গিয়ে খুঁটিনাটির দিকে তিনি এত বেশী নজর দিতে সুরু করেছেন যে, অভিনয় বা ঘটনার থেকে দর্শকের মন বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে। আসবাবপত্র বা অন্যান্য উপকরণের পীড়াদায়ক আতিশয্যে দৃশ্যগুলি ভারাক্রান্ত ত হচ্ছে, দু'টি-একটি ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা থাকলেই সেগুলি বড্ড বেশী প্রকট হয়ে উঠছে। খুঁটিনাটির দিকে তিনি এত বেশী নজর না দিলে আমাদেরও নজরে আসত না যে অত বড় বিত্তবান্ ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের বধূর পাশে তখনকার দিনে অপরিহার্য্য দাসীটি নেই কিংবা পুরীর সমুদ্রতটে তাঁর মাথায় কাপড় নেই, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য যে 'নষ্টনীড়'-এর লেখক রবীন্দ্রনাথ যখন আবির্ভূত হন তখনও যেমন তাঁর Peir বা পাশে দাঁড়ানোর মতন কেউ থাকে না যার সঙ্গে তুলনা করে আপেক্ষিক বিচার করা যায়, আবার চারুলতার স্রষ্টা সত্যজিৎ রায় যখন আসেন এমন কোন চিত্র-পরিচালককে পাই না যিনি সহজে দাঁড়াতে পারেন তাঁর পাশে আপেক্ষিক মাপকাঠি হিসাবে। কিন্তু সেইজন্যে কি সত্যজিৎ রায়ের মতন শিল্পী তাঁর নিজের প্রগতি বন্ধ ক'রে দেবেন?

—*—

শ্রীচিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও মূল্যমান

বর্তমান মূল্যবৃদ্ধির যথার্থ কারণ নির্ণয় করার সূত্রে অর্থনীতিবিদদের অনেকে প্রস্তাব করছেন অতঃপর ব্যয়ের অঙ্ক হ্রাস করা প্রয়োজন, নয়ত মুদ্রাস্ফীতি নাগালের বাইরে চলে যাবে। অপর একদল বলছেন, বর্তমান মূল্যবৃদ্ধির মূল কারণ যথাযথভাবে বিশ্লেষণ না ক'রে যদি এখন ব্যয়-সঙ্কোচন করে ভবিষ্যতে মূলধন গঠনের কাজ মন্থর করা হয়, তা হ'লে যে-হারে আমরা জাতীয় আয়বৃদ্ধির কল্পনা করছি তা ব্যাহত হবে। বর্তমান মূল্যবৃদ্ধির বিবিধ কারণ থাকতে পারে, কিন্তু তারই দরুণ দেশের বিরাট্ প্রাকৃতিক সম্পদ্ এবং লোকবল ব্যবহার করার যে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা আমরা করেছি সেই পরিকল্পনা হ্রাস করা যুক্তিযুক্ত হবে না।

এঁদের মতে সম্মিলিত চাহিদার তুলনায় সম্মিলিত সরবরাহতে সাময়িক ঘাটতি পড়ছে এবং তারই জন্য বর্তমান অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে; এর প্রতিবিধান করতে হ'লে সরবরাহ বৃদ্ধিই প্রকৃষ্ট উপায় এবং তার জন্য দেশে মূলধন গঠনের দরুন নির্ধারিত হারে টাকা ব্যয় করতে হবে; হঠাৎ চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে ব'লে ব্যয়-সঙ্কোচন ক'রে চাহিদার হার খর্ব করা ভবিষ্যতের পক্ষে ক্ষতিকর হবে।

পরিকল্পনার দরুন বিভিন্ন খাতে যে টাকা বরাদ্দ করা আছে, তার একাংশ আসছে 'ডেফিসিট ফাইনান্স' থেকে। অদূরদর্শিতার ফলে এর মাত্রাধিক্য ঘটে থাকতে পারে; অথব ভবিষ্যতে উৎপাদন বৃদ্ধি হবে ব'লে যে টাকা খরচ করবার কথা সে টাকা অকাজে ব্যয় করলে মোট সরবরাহতে ঘাটতি পড়তে পারে, এ কথা স্বতঃসিদ্ধ; (যুদ্ধের সময় যত বাড়তি টাকা ছাপা হয় তার সবটাই প্রায় যায় কামান গোলাবারুদ তৈরীর কাজে, যার অনিবার্য প্রতিক্রিয়া দেখা যায় দেশের মূল্যমানে; কিন্তু বর্তমানে অতিরিক্ত মুদ্রা বাজারে ছেড়ে যে-সব কাজ করান হচ্ছে, তা বিচক্ষণতা ও মিতব্যয়িতার সঙ্গে ব্যয় করলে অনুরূপ পরিস্থিতি স্থায়ীভাবে ঘটা সম্ভব নয়।) প্রশাসনিক দুর্বলতা বা শৈথিল্যের জন্য অথবা মুদ্রানীতিতে বিচক্ষণতার অভাব ঘটলেও মূল্যবৃদ্ধি ঘটতে পারে। বর্তমানে যে পরিস্থিতির সম্মুখীন আমরা হয়েছি তার মূলে এই সবরকম কারণেরই সমন্বয় ঘটা সম্ভব; এ বিষয়ে পূর্বের কয়েকটি সংখ্যাতে আমরা কিছু আলোচনা করেছি।

কিন্তু এর থেকে ভবিষ্যতের পরিকল্পনার কাঠামো ছাঁটাই করা সম্বন্ধে যে প্রশ্ন উঠছে, সেটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রশ্ন। যদি আমরা এক পূর্বনির্ধারিত হারে জাতীয় আয়বৃদ্ধির কথা ভাবি, তা হ'লে তার উপযোগী মূলধন গঠন করতেই হবে এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় টাকার সংস্থানও করতে হবে। এইখানেই যে প্রশ্নটি অনিবার্যভাবে আসে, সেটি হচ্ছে যে, কোন্ খাতে কত টাকা বরাদ্দ করা উচিত এবং সেই টাকা কতখানি বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্যয় করা হচ্ছে। একদল বিশেষজ্ঞের মতে physical assets তৈরীর জন্যও যেমন ব্যয়বরাদ্দ যথেষ্ট পরিমাণে রাখতে হবে তেমনি human assets তৈরীর জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি খাতে যথেষ্ট টাকা ধরতে হবে। যুদ্ধোত্তরকালীন জাপান ও জার্মানীর দ্রুত পুনরুত্থানের মূলে আছে সে-দেশের লোকেদের পূর্ব-অর্জিত কর্মকুশলতা, তাই তারা সমস্ত physical assets নষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষের তুলনায় তাড়াতাড়ি অগ্রসর হ'তে পেরেছে।

সমস্যা-জর্জরিত ভারতবর্ষে এই প্রশ্নটিই আজ সর্বাপেক্ষা জটিল; কৃষির উন্নতির জন্য কত বরাদ্দ করা হবে, ইস্পাত তৈরী বা রেলগাড়ি বা এরোপ্লেন তৈরীর বাবদেই বা কত বরাদ্দ করা হবে; দেশরক্ষার দরুণ কত টাকা বরাদ্দ ধরতেই হবে; বর্তমান জনসাধারণের দৈনিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সামগ্রী উৎপাদনের জন্যই বা দেশের কতখানি সম্পদ্ ব্যবহৃত হবে আর ভবিষ্যৎ জনসাধারণকে উপযুক্ত শিক্ষাদানের জন্যই বা কত টাকা ব্যয়বরাদ্দ করা হবে। আভ্যন্তরীণ টাকার উৎস অতি সীমাবদ্ধ; বিদেশী সাহায্য অফুরন্ত নয় এবং যদি-বা অযাচিত ভাবে সেই সাহায্য আসে তার অন্যান্য অসুবিধা ভবিষ্যৎ দেশবাসীকে ভোগ করতে হ'তে পারে; অপরদিকে, এক হাতে ঋণ গ্রহণ, আরেক হাতে রপ্তানী দ্রব্যে ক্রমশঃ কম হারে মূল্যপ্রাপ্তি, এ সমস্যাও বর্তমান আন্তর্জাতিক

পরিস্থিতিতে প্রায় অনিবার্য। 'ডেফিসিট ফাইনান্স'-এর সাহায্যে নির্ধারিত ব্যয় এবং সংগৃহীত আয়ের ব্যবধান পূরণ করার পন্থা যে সবসময়ে বাঞ্ছনীয় নয়, সে-কথা ক্রমেই বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যাচ্ছে। তা হ'লে কোন্ পন্থা আমাদের সামনে রইল? এক হচ্ছে, অগ্রগতি যে-হারে চাইছি সে-হারে না চেয়ে উন্নয়নমূলক কাজের গতি মন্থর করা; অপরটি হচ্ছে প্রশাসনিক দৃঢ়তা ও সুষ্ঠুতার দ্বারা অপচয় ও অপ্রয়োজনীয় ব্যয় বাদ দিয়েও, ভবিষ্য- দেশবাসীর জন্য বর্তমানকালের দেশবাসীকে যে পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করতেই হবে তার জন্য প্রস্তুত হওয়া। পূর্বের নানান প্রবন্ধে আমরা এই কথা আলোচনা করেছি যে, আন্তর্জাতিক এবং আভ্যন্তরীণ যে-সব বিচিত্র সমস্যার সম্মুখীন হয়ে, স্বল্পতর সময়ের মধ্যে আমাদের এগিয়ে চলবার সঙ্কল্প গ্রহণ করতে হয়েছে, সেই সঙ্কল্প পূর্ণ করতে হ'লে আরও বহুকাল নিজেদের বর্তমান সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কিছু পরিমাণে ত্যাগ করতে হবে। (অবশ্য সেই কৃচ্ছ্র সাধনের পর্বে একদিকে অপচয়*, বিলাসিতা, আরেকদিকে অত্যাবশ্যক পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ও গুণগত অবনতি এবং প্রশাসনিক শৈথিল্য, এই সব চলতে পারে না; যদি চলতে থাকে তা হ'লে পরিকল্পনার সামগ্রিক সাফল্য ঘটা সম্ভব নয়।)

চতুর্থ পরিকল্পনা-পর্বে ১৮ হাজার কোটি টাকা বা ২২ হাজার কোটি টাকা, যতই ব্যয় হোক না কেন, সে টাকা ফলপ্রসূ কাজে বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্যয় হোক এইটিই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কথা। সর্বজনগৃহীত অর্থনৈতিক নিয়মে যদি ধীরে ধীরে মূল্যবৃদ্ধি অনিবার্য ধরে নিতেই হয়, সেই বৃদ্ধি জনসাধারণ সহ্য করতে পারবে যদি ধনবৈষম্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি না পায় এবং অস্বাভাবিক অভাব সৃষ্টির ষড়যন্ত্র সাফল্য লাভ না করে।

মুদ্রাস্ফীতি কতদূর পর্যন্ত হ'লে দেশের ক্ষতি হবে না, এই প্রশ্নে বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন মত পোষণ করেন। গত দেড়-দুই বছরে যে ধরণের এবং যে হারে মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে তা অবশ্যই স্বাভাবিক নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। এই মূল্যবৃদ্ধির অনেকখানিই যে-সব বিভিন্ন কারনের সমন্বয়ে ঘটেছে তা রোধ করার জন্য একাধারে রাজস্বনীতি ও মুদ্রানীতির সংস্কার এবং প্রশাসনিক দৃঢ়তা প্রয়োজন; এই বিষয়ে আমরা পূর্বে কিছু তথ্য পরিবেশন করেছি। এখানে আমরা ১৯৬০-৬১ থেকে ১৯৬৩-৬৪র মধ্যে টাকার প্রচলন ও মূল্যবৃদ্ধির সংক্রান্ত কয়টি তথ্য উপস্থিত করছি।

	১৯৬০-৬১	১৯৬১-৬২	১৯৬২-৬৩	১৯৬৩-৬৪
জনসাধারণের হাতে টাকা (কোটি টাকা)	১৯৪১·৫৭	২০২৭·১৩	২১৯৮·৭৯	২৪১০·৮৩
(Notes in circulation with public)	(১০০)	(১০৪·৪)	(১১৩·২৫)	(১২৪·১৭)
ব্যাঙ্কে সঞ্চিত চলতি আমানত (কোটি টাকা)	৭৫৭·১০	৮২৭·৪৩	৯০৭·৯৮	১১১৪·৬৫
	(১০০)	(১০৯·২৮)	(১১৯·৯২)	(১৪৭·২২)
চেক লেনদেন (Cheque clearances) (")	১২৫৫০·৬৬	১৩৬০২·৩৪	১৪৯৮৯·৩৫	১৬৮০৮·৫৪
	(১০০)	(১০৮·৩৮)	(১১১·৪৬)	(১৩৩·৯০)
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইস্যু ডিপার্টমেণ্টে সরকারী ঋণপত্র (")	১৬৩২·২০	১৭৪৭·১৪	১৯১১·৪২	২১৩৪·৪৭
	(১০০)	(১০৭·০৪)	(১১৭·১১)	(১৩০·৭০)
জনসংখ্যা (কোটি)	৪৩·৯০	৪৪·২৭	৪৫·৩১	৪৬·৩০
	(১০০)	(১০০·৮৪)	(১০৫·২১)	(১০৫·৪২)

* বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ সি. এন. ভকিল এই সূত্রে এক স্থানে (Hindusthan Standard, 25. 6. 64.) লিখছেন—

"So far as inflation is Concerned I would like to refer to the proposal to increase the size of the Fourth Plan to more than Rs. 20000 crores. I have no objection to any figure, if the planners can find the resources and are able to *spend them wisely*. If deficit financing is to be resorted to, to that extent there will be further inflation ....Besides, the greater the amount of money available for spending, the greater the *danger* of *reckless spending* and therefore of inflation due to non-fructifying of plan expenditure."

	১৯৬০-৬১	১৯৬১-৬২	১৯৬২-৬৩	১৯৬৩-৬৪
কৃষিপণ্য উৎপাদন হার (১৯৫০—১০০)	১৩৯·৭	১৪১·৪	১৩৬·৮	—*
	(১০০)	(১০১·২২)	(৯৭·৮০)	...
	১৯৬০-৬১	১৯৬১-৬২	১৯৬২-৬৩	১৯৬৩-৬৪
নীট খাদ্যশস্য (Cereal) উৎপাদন (মিলিয়ন টন)	৫৫·৮৭	৫৮·৮৪	৫৯·৭৭	৫৭·৭৮
	(১০০)	(১০৫·৩১)	(১০৬·৯৮)	(১০৩·৪২)
* শিল্পপণ্য উৎপাদন হার (১৯৫৬=১০০)	১২৯·৯	১৩৮·৫	১৪৯·৬	১৬৩·৩
	(১০০)	(১০৬·৬২)	(১১৫·১৬)	(১২৫·৭১)
শ্রমিক শ্রেণীর ব্যবহৃত দ্রব্যের মূল্যমান (১৯৪৯—১০০)	১২৪	১২৭	১৩১	১৩৭
	(১০০)	(১০২·৪২)	(১০৫·৬৪)	(১১০·৫)
পাইকারী দ্রব্যের মূল্যমান (১৯৫২-৫৩=১০০)				
—গড়	১২৭·৫	১২২·৯	১২৭·৪	১৩৯·৩
	(১০০)	(৯৬·৩৯)	(৯৯·৯)	(১০৯·২৫)
—খাদ্যদ্রব্যাদি (৫০·৪)	১১৮·১	১১৮·৪	১২৩·৫	১৪১·৫
	(১০০)	(১০০·২০)	(১১৩·০৪)	(১১৯·৩১)
—শিল্পের কাঁচামাল (১৫·৫)	১৫৮·৫	১৩৪·৭	১৩৫·৩	১৪৬·১
	(১০০)	(৮৪·৯৮)	(৮৫·৩৬)	(৯২·১৭)
—শিল্পপণ্যাদি (২৯·০)	১২৮·৮	১২৬·৩	১২৯·৫	১৩৩·০
	(১০০)	(৯৮·০৬)	(১০০·৫৪)	(১০৩·২৬)
—চাল	১০৮	১০৫	১১১	১২৫
	(১০০)	(৯৭·২২)	(১০২·৮১)	(১১৫·৭৪)
দুধ	১১৮	১১৭	১২৩	১৩৩
	(১০০)	(৯৯·১৫)	(১০৪·২৩)	(১১২·৭১)
চিনি	১২৭	১২৫	১৩১	১৩৯
	(১০০)	(৯৮·৪২)	(১০৩·১৫)	(১০৯·৪৫)
কয়লা	১৪১	১৪২	১৫১	১৬১
	(১০০)	(১০০·৭১)	(১০৭·০৯)	(১১৪·১৮)
—সিল্ক ও রেয়ন বস্ত্রাদি	১০৪	১২০	১৩২	১৪০
—লোহা/ইস্পাত দ্রব্যাদি	১৪৭	১৪৮	১৬০	১৬৩
—যন্ত্রপাতি	১১৬	১২০	১২৪	১৩১
—খাদ্যশস্য (Cereals)	১০০	১০২	১০৩	১২৩
চলতি মূল্যে মাথাপিছু গড় আয় (টাকা)	৩২৬·২	৩২৯·৭	—	—
আমদানীসহ মোট খাদ্যশস্যর সরবরাহ (মিলিয়ন টন)	৫৯·৫৪	৬২·৪৪	৬৩·৭০	৬২·১৯
	(১০০)	(১০৪·৮৭)	(১০৬·৯০)	(১০৪·৪৫)

* "Crop prospects during 1963-64 are however bright" (**Mid-term Appraisal.** পৃ ৭)

* ১৯৬০-এর অঙ্ক ১৯৬০-৬১তে নেওয়া হয়েছে। (দ্রঃ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বুলেটিন, জুলাই)

সরকারী আয়-ব্যয় (কোটি টাকা)

—চলতি আয় (Revenue a/c)	৮৭৭·৪৬	১০৩৬·৭৯	১৪২৭·৫৩	১৭৫৩·২৮
	(১০০)	(১১৮·১৫)	(১৬২·৬৮)	(১৯৯·৮১)
—চলতি ব্যয় (Revenue Exp)	২৪৬·২১	৯১১·৯৪	১৩১৪·১৪	১৬৬৪·০
	(১০০)	(১১০·৩৭)	(১৫৯·০৫)	(২০১·৫২)
—'ক্যাপিট্যাল' আয়	১১২৭·০০	৯৫৭·৩৪	১২০৪·২৫	১৫৭৯·৫০
	(১০০)	(৮৪·৯৪)	(১০৬·৮৫)	(১৪০·১৫)
—'ক্যাপিট্যাল' ব্যয়	১০০০·৫৩	১১৭১·৬১	১৪৫৪·৩৮	১৮২৬·০
	(১০০)	(১১৭·০৯)	(১৪৫·৩৬)	(১৮২·৫০)
মোট উদ্‌বৃত্ত (+) বা ঘাটতি (−)	+ ১১৬·৮৫	− ১১৪·৫০	− ১৫৬·১০	-- ১৫২·৬২
চলতি খাতে 'দেশরক্ষা' বাবদ	২৪৭·৬	২৮৯·৬	৪২৫·৩০	৬৯২·৬
মোট ক্যাপিট্যাল ব্যয়ের মধ্যে—				
—Capital outlay	৪০৫·৫০	৪৩৬·০	৬১২	৮৩০
—Developmental outlay	...	৩৫১·০	৫০২	৬১৪

উপরোক্ত তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে, জনসাধারণের হাতে টাকা চার বছরে শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে ; তৃতীয় বর্ষের তুলনায় চতুর্থ বৎসরে বৃদ্ধি বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। ব্যাঙ্কে চলতি আমানতের পরিমাণও চতুর্থ বৎসরে ১১৯·৯২ থেকে ১৪৭·২২ অংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে (চতুর্থ বৎসরে ৫·৪২%) খাদ্যশস্য উৎপাদন (৩·৪২%) এবং আমদানীসহ মোট খাদ্যশস্য (Cereals) সরবরাহ (net availability) বৃদ্ধির পরিমাণ (চতুর্থ বৎসরে ৪·৪৫%) তুলনা করিলে 'Cereals'-এর মূল্যবৃদ্ধি (চতুর্থ বৎসরে ২৩%) অত্যন্ত অস্বাভাবিক মনে হয়। পাইকারী দ্রব্যের গড় মূল্য বৃদ্ধি (৯·২৫%)-র সঙ্গে মোট খাদ্যদ্রব্যের (Food articles) মূল্যবৃদ্ধি (১৯·৮১%) এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির তুলনা করলে দেখা যাচ্ছে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। চাল, দুধ, চিনি, কয়লা এবং অন্যান্য দ্রব্যের প্রতি বৎসরের মূল্যের গতি তুলনা করলে দেখা যাচ্ছে, অকৃষি (Non-agricultural) ক্ষেত্রের অতি প্রয়োজনীয় পণ্যগুলির মূল্যবৃদ্ধিই অন্যান্য কৃষিজ পণ্যের তুলনায় আগে সুরু হয়েছে। সরকারী আয়-ব্যয়ের হিসাব থেকে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় বৎসর থেকেই 'রেভিনিউ' ও 'ক্যাপিট্যাল'-এর সম্মিলিত ব্যয় আয়ের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে ; অপর দিকে Developmental খাতে যে টাকা প্রতি বৎসরে ব্যয় হয়েছে, সেই অঙ্কের সঙ্গে "ক্যাপিট্যাল" মোট ব্যয়ের পার্থক্য অনেক। দেশরক্ষা, ঋণ শোধ ইত্যাদি বাবদে উত্তরোত্তর বেশি টাকা ধার্য করতে হয়েছে।—Non-Developmental খাতে ব্যয়বৃদ্ধি সম্ভবতঃ অনিবার্য ; কিন্তু আসল সমস্যাটি এখানেই। মোট যত টাকা ব্যয় হচ্ছে প্রতি বৎসর তার কত অংশ resproductive assets তৈরীর কাজে লাগছে, সেই প্রশ্নেই আমাদের ভবিষ্যৎ মুদ্রাস্ফীতি রোধের সম্ভাবনা অথবা ব্যর্থতার বিষয়টি জড়িত আছে।

প্রায়ই বলা হচ্ছে, কৃষিপণ্য উৎপাদন ব্যাহত হওয়াতে মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছেঃ কিন্তু সরকারী তথ্য যদি গ্রহণীয় হয়, তা হ'লে দেখা যাচ্ছে, খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে উৎপাদন ঘাটতির প্রত্যক্ষ কোন যোগ খুঁজে পাওয়া যায় না।

ফাল্গুন, চৈত্র সংখ্যাতে যে তথ্য সন্নিবিষ্ট হয়েছে, তারই, সঙ্গে বর্তমান তথ্যাদি একত্র বিশ্লেষণ করে দেখলে অনুমান হচ্ছে একাধারে টাকার প্রচলন বৃদ্ধি (Paper money) এবং ব্যাঙ্ক আমানতসহ), অতিরিক্ত টাকা কর বা ঋণপত্রে যথেষ্ট পরিমাণে আদায় না হবার দরুন বাড়তি ক্রয়-ক্ষমতার বৃদ্ধি এবং সরকারের Non-Developmental খাতে অত্যধিক খরচ। এই সবগুলি কারণই মূল্যবৃদ্ধি ঘটাচ্ছে, এছাড়া যুদ্ধোত্তর বা যুদ্ধকালীন: পর্বের "গুপ্তধন" বা Hidden money-র প্রতিক্রিয়া ত আছেই।

ভবিষ্যৎ 'প্লান-এর আকার হ্রাস করার কোন প্রশ্নই ওঠা উচিত নয়, কেননা তা হ'লে জাতীয় আয়বৃদ্ধির গতি আথেরে ব্যাহত হবে। কিন্তু এককালীন অদূরদর্শিতা বা অক্ষমতা বা অন্য কোন কারণের সমন্বয়ে যখন মুদ্রাস্ফীতির যাবতীয় লক্ষণ দেখা

দিয়েছে, সেটি সর্বাগ্রে রোধ করার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ১৯৬২-৬৩-র তুলনায় ১৯৬৩-৬৪-তে আকস্মিকভাবে প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে অঙ্ক বৃদ্ধি পেয়েছে—টাকার সরবরাহ, ব্যাঙ্ক আমানত, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইস্যু ডিপার্টমেণ্টে সরকারী ঋণপত্র, 'রেভিনিউ বা ক্যাপিট্যাল' থাতে সরকারী ব্যয় এবং সেই সঙ্গে মূল্যমান। 'ডেফিসিট ফাইনান্স' কিছু পরিমাণে করতেই হবে; সরকারী আয়-ব্যয় প্রতি বছর সমান রাখা সম্ভব নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয় বর্তমান ক্ষেত্রে; কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও বলতে হয় যে, মূল্যবৃদ্ধির যে বিষ-ক্রিয়া দেখা দিয়েছে সেটি ভবিষ্যৎ প্রগতির নামে একেবারে অগ্রাহ্য করা চলে না।—চতুর্থ পরিকল্পনার কাজ সুরু করার পূর্বে রাজস্বনীতি, মুদ্রানীতি এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার দ্বারা এই সমস্যার সমাধান করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। অন্যান্য দেশে এর থেকেও বেশি মুদ্রাস্ফীতি পূর্বে হয়েছে বা এখনও হচ্ছে এই যুক্তিতেই আমাদের দেশের বর্তমান মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা অগ্রাহ্য করলে আখেরে চতুর্থ "প্ল্যান"-এর কাজ ব্যাহত হবে।

এই সূত্রে অন্যান্য কয়েকটি দেশের টাকার সরবরাহ শিল্পোৎপাদন এবং পাইকারী মূল্যের তথ্য উপস্থিত করছি। কয়েকটি 'অনুন্নত' দেশে দেখা যায় মুদ্রাস্ফীতি প্রবল আকার ধারণ করেছে। সে তুলনায় এখনও আমাদের দেশে মুদ্রাস্ফীতি তত ভয়াবহ নয়! অপরদিকে অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, টাকার সরবরাহ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও মূল্যমান সে পরিমাণে বৃদ্ধি পায় নি। বিভিন্ন দেশের পরিস্থিতি স্বতন্ত্র, তবে এর থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, আমাদের দেশে যখন মুদ্রাস্ফীতির যাবতীয় লক্ষণ বিরাজমান, তখন অন্যান্য দেশে গৃহীত ব্যবস্থা থেকে আমাদের কিছু দৃষ্টান্ত গ্রহণ করবার আছে।

লাটিন আমেরিকার দেশ দু'টিতে মুদ্রাস্ফীতির প্রাবল্য দেখা যাচ্ছে; অন্যান্য 'উন্নত' দেশগুলির তুলনায় ভারত বর্ষের মূল্যমান খুব বেশি বৃদ্ধি না পেলেও অপেক্ষাকৃত বেশি। পশ্চিম জার্মানীতে টাকার সরবরাহ যেখানে ১৯৬৩তে ১৫৭তে এসেছে, মূল্যমান সেখানে ১০৪-এর বেশি নয়; অপরদিকে ফ্রান্সের সঙ্গে তুলনা করে দেখা যাচ্ছে, ভারতের শিল্পোৎপাদন হার বেশি, মূল্যমানের পার্থক্য বেশি নয়।

ইউরোপ বা উত্তর আমেরিকার দেশগুলির স[...] আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোর যত সাদৃশ্য তার তুলন[...] লাটিন আমেরিকার দেশগুলির সঙ্গে অধিকতর সাদৃশ্য থাক[...] সম্ভাবনা। ঐ দেশগুলিতে যে মুদ্রাস্ফীতি লক্ষিত হ[...] তার পুনরাবৃত্তি আমাদের দেশে অবশ্যই ঘটবে না[...] আমাদের সরকার এ-বিষয়ে অপেক্ষাকৃত সজাগ আছে[...] এবং আমাদের রাষ্ট্রপরিচালন ব্যবস্থাও ঐ হারে মুদ্রাস্ফী[...] রোধ করার উপযুক্ত আইন-কানুন সম্বন্ধে অবহিত। ত[...] সত্ত্বেও বর্তমানে বিভিন্ন কারণের সমন্বয়ে (এর মধ্যে অসা[...] ব্যবসায়ীর দুরভিসন্ধি, রাজনৈতিক স্বার্থ থাকার দরু[...] একদল লোকের এই অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা এসবই[...] থাকা স্বাভাবিক) মূল্যবৃদ্ধির যে গতি লক্ষিত হচ্ছে[...] তার থেকে মনে হয় যে, ভবিষ্যৎ অগ্রগতি অব্যাহত[...] রাখবার উদ্দেশ্যেই মূল্যবৃদ্ধি রোধ করার জন্য যাবতীয়[...] ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার।—অগ্রগতির পরিবর্তে[...] শুধুমাত্র স্থির মূল্যমান রক্ষা করা খুব সম্ভব বাঞ্ছনীয় নয়। এবং যেখানে আমাদের অতি স্বল্প সময়ে একসঙ্গে বহুবি[...] কাজ সুরু করতে হচ্ছে সে-ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণ মূল্যবৃদ্ধি অনিবার্য। সেই সঙ্গে একথাও বলতে হয় বর্তমান মুদ্রাস্ফীতির লক্ষণকে অগ্রাহ্য করাও বাঞ্ছনীয় নয়।

চতুর্থ পরিকল্পনা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা সুরু হয়েছে, এখন বিশেষজ্ঞরা স্থির করছেন প্ল্যান ছাঁটাই করা ভাল হবে, না বর্ধিত হারেই প্ল্যান তৈরী করা হবে। বর্তমান মূল্য-বৃদ্ধির দরুনই ভবিষ্যতের অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় Capital outlay সংক্ষিপ্ত করা অবশ্যই বাঞ্ছনীয় হবে না। যেটি প্রয়োজন, তা হচ্ছে বর্তমান মূল্যবৃদ্ধির কারণগুলি নির্ণয় ক'রে সেইগুলি অপসারণ করা, এবং বিভিন্ন খাতে 'প্ল্যান'-এ যে টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে সেই টাকা কিছু পরিমাণে পুনর্বিন্যাস করে, যথোচিত দূরদৃষ্টি-সহকারে ব্যয় করা। আমাদের ভবিষ্যৎ অগ্রগতি রোধ করার জন্য একদল প্ল্যানকে বাতিল বা খর্ব করতে চাইছেন; সেই পথ অবলম্বন করলে আখেরে দেশের আয়বৃদ্ধির পথ সঙ্কীর্ণ হবে।

[১৯৫৮=১০০]	১৯৫৯	১৯৬০	১৯৬১	১৯৬২	১৯৬৩
আর্জেন্টিনা—					
(ক) টাকা সরবরাহ	১৪৩	১৮৪	২০৫	২১১	২৭১
(খ) শিল্পপণ্য উৎপাদন	৮৯	৯৩	১০২	৯৫	৮৮
(গ) পাইকারী মূল্যমান	২৩৩	২৭০	২৯২	৩৮১	৪৮৯

অঞ্চল		আযক				খণ্ডে
লজিয়াম	(ক)	১০৩	১০৫	১১৩	১২১	১৩৩
	(খ)	১০৪	১১০	১১৪	১২১	১২৯
	(গ)	১০০	১০১	১০০	১০১	১০৪
াজিল	(ক)	—	১৯২	২৯৫	৪৮২	৮০৪
	(খ)	—	—	—	—	—
	(গ)	—	১৮০	২৪৯	৩৮৩	৬৪৯
ান্স	(ক)	১১১	১২৬	১৪৬	১৭৩	১৯৮
	(খ)	১০৪	১১০	১১৬	১২৩	১৩০
	(গ)	১০৫	১০৭	১১০	১১৩	১১৬
চম জার্মানী	(ক)	১১২	১১৯	১৩৭	১৪৬	১৫৭
	(খ)	১০৭	১১৯	১২৬	১৩২	১৩৬
	(গ)	৯৯	১০০	১০২	১০৩	১০৪
াতবর্ষ	(ক)	১০৭	১১৪	১১৯	১৩১	১৪৯
	(খ)	১০৯	১২০	১২০	১৪০	১৫০
	(গ)	১০৪	১১১	১১৩	১১৫	১১৯
ল্যাণ্ড	(ক)	১০৫	১০৫	১০৮	১১১	১১৬
	(খ)	১০৫	১১২	১১৪	১১৫	১১৮
	(গ)	১০০	১০২	১০৪	১০৭	১০৯
মেরিকা	(ক)	১০০	১০০	১০৪	১০৫	১০৬
	(খ)	১১৩	১১৬	১১৭	১২৬	১২৮
	(গ)	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০

——

সুব্রতর চোখের সম্মুখ দিয়ে চ'লে গেলেও তার পরিচিত, এমন কি বন্ধুবান্ধবকেও সহজে সে দেখতে পায় না। এ নিয়ে যদি কেউ প্রশ্ন করে, গম্ভীর ভাবে সে জবাব দেয়, কানের সাড়া না পেলে চোখ আর দেখে না।

ঠিক এমনি এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল চারুব্রতকে মাসখানেক আগে। ও বাইরে বাইরেই কাটায়। বহুকাল পরে বাল্যবন্ধুর সাক্ষাৎ পেয়ে উৎসাহ ভরে ডাক দিয়েই বিপদে পড়ল।

চারুব্রতর বিব্রত ভাব লক্ষ্য করে সুব্রত বলল, মাথায় ঢুকল না বুঝি। আর কিছুদিন যাক্ আপনি বুঝবে। দেশী কোম্পানীতে স্বদেশী সাহেবের অধীনে চাকরি কর না চারু? কি বললে? তাঁরা পুরোপুরি সাহেব নন? সেইখানেই ত বিপদ্ বেশী। সাহেব সব সময় সাহেব, কিন্তু দেশী সাহেব, না-সাহেব না স্বদেশী। চিনতে পারবে না। ভুল করবার সম্ভাবনা থেকে যাবে। হেসো না চারু। এ আমার অভিজ্ঞতার কথা। অনেক ঠেকে, অনেক ঠকে তবে শিখতে হয়েছে।

চারুব্রত ব'লে বসল, কি আবোল-তাবোল বকছ।

সঙ্গে সঙ্গেই সুব্রত হুঙ্কার দিয়ে ওঠে। দু' চোখে আগুন। আবোল-তাবোল! ভেবেছ কি আমাকে? পাগল আমি?

চারুব্রত অপ্রস্তুত। বলল, ঐ দেখ কে আবার তোমাকে পাগল বললে!

অনেকেই বলে। পাগল হয়ে যাবারই কথা। বুঝলে চারু? সুব্রত বলতে থাকে, আমার মাথার চুলগুলি সব প্রায় সাদা হয়ে গেছে দেখছ ত। তোমার মাথাটা এখনও বেশ কালই আছে কিন্তু।

তা আছে—

অথচ বয়েসে আমি তোমার চেয়ে এক বছরের ছোটই হব। কিন্তু দেহে আর মনে বুড়িয়ে গেছি। এমনি যাই নি। দিশী সাহেবের দাপটে। সুব্রত টেনে টেনে হাসতে থাকে।

চারুব্রত বলে, তোমার কথা ঠিক জানি নে সুব্রত, কিন্তু আমার সাহেবরা নামেই সাহেব। ব্যবহারে একই পরিবারের লোক। তারা কেউ দাদা, কেউ কাকা।

রাখ তোমার দাদা আর কাকা। সুব্রত চীৎকার করে ওঠে, ও-সব কাজ আদায়ের ফন্দি। অনেক দেখেছি, আমাকে আর শিখিও না।

চারুব্রত একটু হেসে বলল, কি দিয়ে দেখেছ? কান দিয়ে নাকি?

সে ভেবেছিল এ কথার পরে সুব্রত হয় তাকে রেহাই দিয়ে সরে পড়বে, নয় সে হাত ব্যবহার করবে। কিন্তু কার্যতঃ কিছুই সে করল না। এমন কি তার স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরও খাদে নেমে এল। সখেদে বলল, তখনও তৃতীয় নয়নের সন্ধান পাই নি চারুব্রত। কপালের নীচের চোখ দুটোর ওপরই পুরোপুরি ভরসা করতাম।

চারুব্রত বলল, সকলেই তাই করে সুব্রত, কিন্তু এসব আলোচনা এখন থাক। আমাকে এখুনি যেতে হবে। আর একদিন বরং···

সুব্রত একটু যেন দুঃখিত হয়েই বলল, তোমার দরকার থাকলে নিশ্চয় যাবে চারু। ইদানিং দেখি, দরকার না থাকলেও সবাই পাশ কাটিয়ে যেতে চায়।

সে ত তুমিও চাও—

বাধ্য হয়ে। ওদের সুযোগ না দেবার জন্য। সময়টা আমার বড় খারাপ যাচ্ছে কি না···

এর পরে এত সহজে চারুব্রত চ'লে যেতে পারে না।

সুব্রত বলে, কই, গেলে না চারু?

যেতে আর পারলাম কোথায় সুব্রত। চারুব্রত জবাব দিল।

সুব্রত হঠাৎ হাত বাড়িয়ে বলে, দাও ত ভাই তোমার একটা সিগারেট। পকেটে আমারও আছে। তবে চারমিনার। একটু মুখ বদলে নিতে চাই।

চারুব্রত পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট সুব্রতর দিকে এগিয়ে দিলে। একটি সিগারেট বার করে নিয়ে তাতে অগ্নিসংযোগ ক'রে গোটাকয়েক টান দিয়ে সে বলল, গোল্ড ফ্লেক খাও তুমি! ভাল রোজগার কর তা হ'লে···কর কি আজকাল চারুব্রত?

চারুব্রত বলে, চাকরি।

চাকরি ক'রে গোল্ড ফ্লেক খাও···সাহেব কোম্পানীতে ঢুকেছ বুঝি?

না, আমি আগের জায়গায়ই আছি।

বল কি চারু! দেশী কোম্পানীতে চাকরি ক'রে··· পারচেজিং-এ আছ বুঝি? সুব্রত জিজ্ঞেস করে।

চারুব্রতর মুখ থমথমে হয়ে উঠল। গম্ভীর গলায় বলল, না।

তুমি বুঝি রাগ করলে?

চারুব্রত বলল, রাগ···কিন্তু সিগারেটটা মিছিমিছি জ্বলে যাচ্ছে সুব্রত। আগে ওটার সদ্ব্যবহার কর।

আমি খেলেও ওটা জ্বলেই যাবে—ওদিকে তাকিও না চারুব্রত। বলল, চল, কোথাও গিয়ে একটু বসা যাক। যেতে যখন পারলেই না···কি বল, বসবে একটু? দুটো সুখ-দুঃখের কথা শুনবে—

বসতে চাও? কিন্তু কোথায়?

একটু হেসে সুব্রত বলে, কোন একটা বাড়ীর রোয়াকেও বসতে পার।

রোয়াকে! চারুব্রতর কণ্ঠে বিস্ময়।

সুব্রত বলে, ইচ্ছে করলে চায়ের দোকানেও বসতে পার। কিন্তু এখনও তোমার দেওয়া দামী সিগারেট খাচ্ছি, চায়ের কথা আর বলি কোন্ মুখে।

চারুব্রত হেসে বলে, লজ্জা পাবার কিছু নেই। এক কাপ চা খাওয়াবার মত পয়সা আমার পকেটে আছে।

হাতের জ্বলন্ত সিগারেটে গোটাদুই জোরে জোরে টান দিয়ে সুব্রত পুনরায় বলে, পকেট তোমার সব সময় ভরা থাক চারু, আমরা মাঝে মাঝে এক-আধ কাপ চা পেলেই খুশী।

কথাটা সুব্রত আজই নতুন বলল না। ছাত্র-জীবনের অভ্যাসটা আজ হয়ত স্বভাবে দাঁড়িয়েছে। চাওয়ার অভ্যাস ওর অতীতেও ছিল, আজও দেখা গেল আছে। অরুণ কটু কটু করে কথা শোনাত। সত্যব্রত, নিশাকান্ত আর মনোজ তাকে থামিয়ে দিত। চারুব্রত আর তারক কান আর

দৃষ্টিকে সজাগ রেখে উপভোগ করত। কথা বলত না। অনেক দিনের কথা, প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর হবে। মনে থাকবার নয়। অথচ একের পর এক বহু বিস্মৃতপ্রায় ঘটনা মনের পর্দায় স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে, উপলক্ষ্য একটি সিগারেট আর এক পিয়ালা চা।

কি ভাবছ চারু? ওর অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করে সুব্রত প্রশ্ন করে।

কিছু না—চারুব্রত মুহূর্ত্তে বর্ত্তমানে ফিরে আসে। বলে, কোথায় তোমার চায়ের দোকান?

সুব্রত হাত তুলে অল্প দূরে একটি চায়ের দোকান দেখিয়ে দিয়ে সেই দিকে অগ্রসর হ'তে থাকে। চারুব্রত তাকে অনুসরণ করে।

দু' পা এগিয়েই আবার ফিরে দাঁড়াল সুব্রত।

ফিরলে কেন? প্রশ্ন করে সুব্রত।

স্কুলের দশম শ্রেণীতে যখন পড়ি—সুব্রত বললে, আমরা কয়েক জন লেখক হবার স্বপ্ন দেখতাম। মনোজ গুপ্ত, শরদিন্দু সেন, তুমি, অরুণ আর আমি। মনোজ আর শরদিন্দু বড়-চাকুরে হয়েছে, কিন্তু লেখা ছেড়েছে। অথচ ওদের সত্যিকার শক্তি ছিল। ভাল ভাল কাগজে স্বীকৃতিও পেয়েছিল। অরুণ শুনেছি স্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক কিছু হারিয়েছে। নিশা মারাই গেল, আমি আজও পণ্ডশ্রম ক'রে চলেছি। একমাত্র তুমিই দেখছি কিছুটা করতে পেরেছ। প্রায়ই চোখে পড়ে।

চারুব্রত বলল, নামেই করতে পেরেছি। আধুনিক প্রগতি সাহিত্যের সঙ্গে পাল্লা দিতে মন সায় দেয় না সুব্রত। নেহাৎ পুরনো নেশা, তাই ছাড়তে পারছি না। কিন্তু এ-সব কথা থাক। তোমার চায়ের দোকানে চল।

সুব্রত বলে, নেশা না থাকলে এগোবে কিসের জোরে।

চারুব্রত কোন জবাব দেয় না।

সুব্রত বলতে থাকে, মানুষের জীবন নিয়েই কাব্য—

চারুব্রত বাধা দিল, হঠাৎ চায়ের দোকান ভুলে এ প্রসঙ্গ তুললে কেন সুব্রত?

সুব্রত বলল, ভুলব কেন—চায়ের দোকানে ব'সে তোমাকে একটা কড়া পাকের প্লট দেব।

প্লট! চারুব্রতের কণ্ঠে বিস্ময়।

সুব্রত বলল, একেবারে নির্ভেজাল বাস্তব সত্য। নিজেই চেষ্টা করেছিলাম। জমল না।

কথা বলতে বলতে ওরা চায়ের দোকানে এসে উপস্থিত হ'ল। দোকান একেবারে ফাঁকা। সুব্রত বলল, যা চাইছিলাম ঠিক তাই পেয়েছি। একটিও লোক নেই।

চারুব্রত একটুখানি হাসল। কথা বলল না।

দোকানের শেষ প্রান্তে গিয়ে দু'জনে মুখোমুখি হয়ে বসল। চায়ের কথা সুব্রতই ব'লে দিল। চারুব্রত সেই সঙ্গে টোষ্টের কথা বলল।

এল চা—দিয়ে গেল টোষ্ট। সুব্রতর চোখে মুখে খুশীর আমেজ। চারুব্রতর তা দৃষ্টি এড়াল না। বলল, খাও সুব্রত।

একখানা টোষ্ট তুলে তাতে কামড় বসিয়েই হুঙ্কার দিয়ে উঠল সুব্রত, করেছ কি হে ছোকরা, চিনি আর গোলমরিচ দুই-ই চালিয়েছ যে। ঝাল আর মিষ্টিমুখ একসঙ্গে করিয়ে দিলে সুব্রত?

একটু থেমে সে উৎসাহ ভরে পুনরায় সুরু করল, তারপরে শোন ভাই, যার জন্যে তোমাকে ডেকে এনেছি।

চারুব্রত নিঃশব্দে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিল।

সুব্রত বলতে লাগল, কলেজ থেকে বেরিয়ে যে-যার ছিট্‌কে গেলাম নিজের নিজের ভাগ্য অন্বেষণে। আমাকে বাবা টেনে নিলেন তাঁর ব্যবসায়। ভালই চলছিল, কিন্তু বাবা চোখ বোজার সঙ্গে সঙ্গে সব ভাল ভোল পাল্‌টাল। ঠিক বুঝলাম না, কেমন ক'রে এটা সম্ভব হ'ল। তার ওপর বাবা মারা যাবার আগেই আমার বিয়ে হ'ল। একবার নয়, দু'বার—এক স্ত্রী জীবিত থাকতেই।

বল কি!

সুব্রত আস্তে আস্তে বলল, হ্যাঁ, প্রথম স্ত্রী আমাকে নিয়ে ঘর করলেন না। রাগে দুঃখে আর অপমানে আমি ক্ষেপে গেলাম। বাবা যোগালেন ইন্ধন। এ অপমান শুধু আমারই নয়; তাঁরও। তিনি শোধ নিলেন।

আশ্চর্য্য—

এক-এক সময় আমারও তাই মনে হয়। তবে তার জন্য দুঃখ করি না। পৃথিবীতে এমন বহু আশ্চর্য্য ঘটনাই ঘটে থাকে চারুব্রত। আমার জীবনেও না হয় ঘটেছে। কিন্তু যে কাহিনী শোনাবার জন্যে তোমাকে ডেকে এনেছি তা আমার স্ত্রীকে নিয়ে নয়। যে স্ত্রী পরিত্যাগ ক'রে গেছেন তাঁকে নিয়েও নয়, যিনি আজও বিশ্বস্ত ভাবে টি'কে আছেন তাঁকে নিয়েও নয় ভাই। বক্তব্য আমার কর্ম্মকর্ত্তা আর কর্ম্মস্থলকে নিয়ে।

সুব্রত হঠাৎ কথা বন্ধ ক'রে অর্দ্ধভুক্ত টোষ্টখানি তুলে নিল।

চারুব্রত ওর কর্ম্মকর্ত্তা আর কর্ম্মস্থলকে বাদ দিয়ে সুব্রতর বিবাহিত জীবন নিয়েই আগ্রহান্বিত হয়ে উঠল। বলল,

বাংলা দেশের মেয়েদের মধ্যে এটা খুব স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না কিন্তু।

তা জানি না চারু। সুব্রত জবাবে বলতে থাকে, আমার জীবনে যা ঘটেছে তাই তোমাকে জানিয়েছি। আজও তার চলে যাবার কোন যুক্তি আমি খুঁজে পাই নি। ফেরাবার চেষ্টাও করেছিলাম। আমি নিজে উপযাচক হয়ে গিয়েছিলাম—দেখা করে নি। চাকরের হাতে চিরকুট লিখে জানিয়ে দিয়েছে যে, যা হবার নয় তা নিয়ে যেন মিথ্যে আর চেষ্টা না করা হয়।

হবার নয় কেন?

আমার প্রকৃতির মধ্যে নাকি রয়েছে একটা বন্য আর হিংস্র পশু—তার নখ-দন্তের আক্রমণের ভয়েই তাকে চ'লে যেতে হয়েছে। সুব্রতর চোখদুটো ধ্বক্ ধ্বক্ ক'রে জ্বলতে থাকে।

চারুব্রত নীরব।

সুব্রত পুনরায় বলতে সুরু করে, পরে অবশ্য অন্য কথা শুনেছি। আসলে সে মেয়েই নয়, তাই একটা লজ্জাজনক পরিস্থিতির হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যেই বাধ্য হয়ে তাকে এ কাজ করতে হয়েছে।

তা হ'লে বিয়েতে রাজী হয়েছিল কেন? এমন তাজ্জব ব্যাপার ত কখনও শুনি নি!

সেইটেই আমার কাছেও দুর্বোধ্য। সুব্রত বলে, আজও এ প্রশ্নের মীমাংসা আমার কাছে হয় নি; কিন্তু দোহাই চারু, আমার জীবনের যে-দিকটা অন্ধকারে আছে, তা অন্ধকারেই থাক। ও নিয়ে আজ আমার আর কোন আগ্রহ নেই। তার চেয়ে তুমি আমার পরবর্তী জীবনের কথাগুলো একটু ধৈর্য্য ধ'রে শোন।

চারুব্রত লজ্জিত হ'ল। যদিও প্রসঙ্গটা সুব্রতই তুলেছিল তবুও তার দিক থেকে এই সামান্যতম আগ্রহ প্রকাশ করাও শোভন হয় নি।

সুব্রত পুনরায় বলতে লাগল, আবার বিয়ে দিয়ে বাবা আমাকে সংসারে পুনঃপ্রতিষ্ঠ ক'রে আর বেশীদিন বাঁচেন নি। কিন্তু আমি পড়লাম অথৈ জলে। বাবার রেখে-যাওয়া ঘুণ-ধরা ব্যবসার যেখানেই হাত দিতে গেছি, সেখানটাই খসে পড়েছে। গোড়া ধরে নাড়া দিতে একেবারে আমার মাথার উপর ধ্বসে পড়ল। আমার বিবাহিত জীবনের সবটুকু সবুজ রং বিবর্ণ হয়ে গেল।

সুব্রত থামল। অন্যমনস্ক ভাবে খালি চায়ের পেয়ালাটা মুখের কাছে তুলে নিয়ে আবার তা নামিয়ে রাখল।

চারুব্রত পুনরায় চায়ের হুকুম করল।

সুব্রত একটু লজ্জা পেয়ে বলল, আবার চা কেন চারু? তা হোক—

পুনরায় চা এল। সুব্রত বারকয়েক গলা ভিজিয়ে নিয়ে আবার সুরু করল, আমার চোখের সামনের সব ক'টা আলো নিভে গেল। অনেক দোরে মাথা ঠুকে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্য্যন্ত এক বড়লোক বন্ধুর শরণাপন্ন হলাম। মস্ত বড় ব্যবসা তাদের। বন্ধুবর তার পরিচালক। পরম সহিষ্ণুতার সঙ্গে আমার দুঃখের কথা শুনে সে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাল, তোমাকে ত আর যেখানে-সেখানে যেমন-তেমন ভাবে বসান যায় না ভাই···তাই ভাবছি···তুমি বরং অন্য কোথাও চেষ্টা ক'রে দেখ।

একান্ত আকস্মিক ভাবেই পাঠ্যজীবনের অনেকগুলি ঘটনা চোখের সম্মুখে ফুটে উঠল। নরম স্বভাবের জন্য ওকে আমরা "মেয়ে" আখ্যা দিয়েছিলাম। সেদিনের অমলেন্দুর স্বভাবের কতখানি পরিবর্ত্তন হয়েছে তা একবার পরখ ক'রে দেখবার জন্য একটা চান্স নিলাম। ওর দুটো হাত ধ'রে একেবারে ভেঙ্গে পড়লাম, না খেয়ে মরতে বসেছি ভাই। অন্ততঃ দু-চার মাসের জন্যও আমাকে একটু আশ্রয় দাও। তার পরে যেখানে হোক একটা খুঁজেপেতে নেব।

অব্যর্থ ফল হাতে হাতে পেলাম। উপবাসের হাত থেকে অমল আমাকে বাঁচাল।

শেষ পর্য্যন্ত ওখানেই তুমি স্থায়ীভাবে রয়ে গেলে ত?

সুব্রত বলল, ও কথা বলতে পার। মোদ্দা আমিও আর কোনদিন যাবার নাম করি নি আর অমলেন্দুও চ'লে যাবার কথাটা মুখ ফুটে বলতে পারে নি। বরং ধীরে ধীরে মাইনে-পত্র বাড়িয়ে দিয়ে একটা দায়িত্বপূর্ণ বিভাগের ভার আমার ওপর দেওয়া হ'ল।

শুধু অফিস কেন আস্তে আস্তে ওদের ব্যক্তিগত বহু কাজের দায়িত্বও আমার কাঁধে চাপান হ'তে লাগল। তোমাকে মিথ্যে বলব না চারু—আমি খুশী মনে পরম উৎসাহ আর একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গেই তা ক'রে যেতে লাগলাম। কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারলাম না। এখন মনে হচ্ছে গোড়ায় গলদ রয়ে গেছে। বন্ধু ততদিনই বন্ধু, যতদিন উভয়ের মধ্যে অর্থের সম্বন্ধ গ'ড়ে না ওঠে।

চারুব্রত বাধা দিল, তোমার উক্তিগুলি পরস্পরবিরোধী হয়ে যাচ্ছে না কি সুব্রত?

মাথা নেড়ে সুব্রত বলে; না চারু, তোমাকে সত্যি বলছি, আমি দুটোর একটাকেও বাঁচিয়ে রাখতে পারি নি।

আমার ত মনে হয় এখনও তুমি দুটোকেই বাঁচিয়ে রেখেছ···

সুব্রত জবাব দেয়, না, পারি নি চারু। এতদিন ধ'রে অনবরত জোড়াতাপ্পি দিয়েই মনকে বুঝিয়েছি। আজ তাই আর আসলকে খুঁজে পাচ্ছি না। তাপ্পিগুলোই আসলকে ঢেকে ফেলেছে।

চারুব্রত বলে, বুঝলাম না।

সুব্রত একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রে বলে, পেটের দায়ে চাকরিতে ইস্তফা দিতে পারি নি বটে, কিন্তু খুইয়েছি অনেক। মান-সম্ভ্রম···হয়ত তার চেয়েও ঢের ঢের বেশী। আমি ত মরে বেঁচে আছি ভাই।

তবে যে শুনতে পাই তুমি মস্ত বড় বাড়ী করেছ?

সুব্রত হোঁচট খেল। কিন্তু মুহূর্তেই সামলে নিয়ে সপ্রতিভ হেসে বলল, তা করেছি। মস্ত বড় না হ'লেও মাথা গোঁজার একটা আস্তানা হয়েছে, এ কথা ঠিক। কিন্তু কেমন ক'রে সম্ভব হয়েছে সে আর এক ইতিহাস। ও শুনে তোমার কাজ নেই।

চারুব্রতও কোন আগ্রহ দেখাল না।

সুব্রত ব'লে চলল, যতদিন শুধু কাজ নিয়ে ছিলাম ভালই ছিলাম। অনেক আশা করতে গিয়ে আসলকে খুইয়েছি। যা দেখেছি, যা শুনেছি তাই ধ্রুব সত্য ব'লে জেনেছি। আসলে আমার শোনা আর দেখার মধ্যে ছিল একটা বিরাট্ ফাঁক। সেইটেই আমার দৃষ্টিতে এড়িয়ে গেছে।

চারুব্রত একবার মণিবন্ধের ঘড়ির পানে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলল, তুমি কিন্তু ধান ভানতে শিবের গীত সুরু ক'রে দিয়েছ সুব্রত।

সুব্রত বলল, একটু এলোমেলো বকছি। এর থেকেই তোমাকে সংগ্রহ ক'রে নিতে হবে ভাই।

বল—

ভাল লেগেছিল কথাটা! সুব্রত বলল, মালিক-পক্ষ যদি কর্ম্মচারীদের একই পরিবারের লোক বলে তা হ'লে ভাল লাগারই কথা। আমার কিন্তু শুধু ভালই লাগে নি, আমি উক্তিটিকে বিশ্বাস করেছিলাম আর সেই জন্যেই আজ নিজের হাত নিজে কামড়াচ্ছি। অতি বিশ্বাসই আমার পতনকে ডেকে এনেছে।

বড্ড টুইষ্ট করছ সুব্রত। ও কাজটা আমাকেই করতে দিও। বরং তোমার যা বলবার তা সংক্ষেপে সহজ ক'রে বল।

সুব্রত বলল, তোমার অনেকখানি সময় নষ্ট করেছি। কথা বলতে আরম্ভ করলে হুঁস্ থাকে না।

[illegible] চারুব্রত হেসে বলল, তবে সময়

যদি আমার নষ্ট হয়ে থাকে তা তোমার জন্যে হয় নি, হয়ে[illegible] আমার নিজের জন্যে।

বাঁচালে। তারপর শোন—বুক আমার ভরে উঠ[illegible] মিথ্যে বলব না। তাদের কথায় আর কাজে বি[illegible] প্রভেদ খুঁজে পেলাম না। আমি ডাক এলেই এগিয়ে যেত[illegible] ছোট-বড় প্রত্যেকটি কাজে। আমার চলাফেরা, অত্যা[illegible] মাথামাথি, সহকর্ম্মীরা ভাল চোখে দেখল না। তারা মু[illegible] বাহবা দিলেও ভিতরে ভিতরে সঙ্ঘবদ্ধ হ'ল আমার বিরু[illegible]

তোমার অপরাধ?

অপরাধ একটু ছিল বৈকি। অনেক পরে এসেও অ[illegible] এগিয়ে যাওয়াটাই ত একটা অপরাধ। তা ছাড়া কর্তা[illegible] যখন-তখন ডেকে পাঠান। কারণে-অকারণে ভাল-মন্দ নি[illegible] পরামর্শ করেন এই ত যথেষ্ট। তোমাকে মিথ্যে বলব[illegible] ওদের এই অন্তর্জ্বালা দেখে আমি ভেতরে ভেতরে প্র[illegible] আনন্দ পেতাম।

অর্থাৎ জেনে শুনে এই সঙ্ঘবদ্ধ অভিযানকে তুমি রী[illegible] মত অবজ্ঞা করেছ, এই ত?

মুখের কথা লুফে নিয়ে সুব্রত বলল, ঠিক তাই। অ[illegible] সেই জন্যেই আজ আমি সকল ক্ষমতা হারিয়ে ঠুঁটো জগন্না[illegible] হয়ে একটা চেয়ার আর টেবিল আগলে বসে আছি। যা[illegible] একসময় হুকুম করেছি তাদেরই করুণার ওপর আজ আ[illegible] নির্ভরশীল। এর চেয়ে দুঃসহ অবস্থা আর কি হ'তে পা[illegible] চারু?

এর জন্যে দায়ী কে সুব্রত?

আমি নিজে।

তা হ'লে আর খেদ করছ কেন?

সেইখানেই ত আমার গল্পের মর্ম্মকথা। সুব্রত বল[illegible] আমার দুঃখ, অকারণে এতবড় অসম্মানের সম্মুখীন হ[illegible] হ'ল ব'লে। যাদের জন্য চুরি করলাম তারাও আজ চো[illegible] বলে। কিছু দেখল না তলিয়ে। ভাবল না। কা[illegible] দেখাটাকেই—

কি বলছ সুব্রত? কানের দেখা মানে—

ওটা হ'ল গিয়ে তৃতীয় নয়ন। ঐটেই যে ওদের [illegible] সময় খোলা থাকে, আর দুটো ঘুমে আচ্ছন্ন। নইলে আম[illegible] এত শ্রম এভাবে ব্যর্থ হ'তে পারে না। সুব্রত ককি[illegible] উঠল। অথচ এদের কোন্ কাজে আমাকে এগিয়ে যে[illegible] হয় নি? বাড়ী হ'ল, পুকুর হ'ল, তাতে মাছের ব্যবস্থা হ[illegible] সব ব্যাপারেই সুব্রত। বিয়ে-পৈতে সেখানেও সুব্রত।

চারুব্রত বললে, ভারী আশ্চর্য্য কথা শোনাচ্ছ ভা[illegible]

একেবারে খাস কামরা থেকে পুকুরে ছুঁড়ে ফেলে দিল তোমাকে?

সুব্রত বলল, তার চেয়েও বেশী।

চারুব্রত বলল, তা ভাই এক জায়গায় দেহটাকে ভাসিয়ে না রেখে একটু হাত-পা নেড়ে কূলে ওঠবার চেষ্টা করলে না কেন?

সুব্রত বলল, পুকুরের চতুর্দ্দিকে যে সঙ্ঘবদ্ধ পাহারা। নড়লেও ইট-পাটকেল।

কিন্তু মালিক-পক্ষ?

সুব্রত আবার ককিয়ে উঠল, আমার প্রশ্নও সেইটে—

কারণ ছাড়া কোন কাজ হয় বলে আমি বিশ্বাস করি না সুব্রত।

কারণ? হ্যাঁ, কারণ একটা দেখান হয়েছে বৈকি। সুব্রত গর্জ্জন ক'রে উঠল, ওদের বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে আমি দশ হাতে লুটে নিয়েছি—আমার বাড়ী হয়েছে কিন্তু আর কারুর এক ছটাক জমিও হয় নি।

তাদেরও কিছু কিছু দিলেই হ'ত?

চারুব্রত···আর্ত্তনাদ ক'রে উঠল সুব্রত, পেলে ত দেব···

অর্থাৎ তুমি নাও নি দেবে কোত্থেকে। কিন্তু তোমার বন্ধুকে ত আমিও চিনি সুব্রত। প্রচুর বুদ্ধি ধরেন—হৃদয়বানও বটে। একটু "মুডি"···আর তারই সুযোগ অনেকে নেয়।

সুব্রত বলল, সবই স্বীকার করি। কিন্তু কর্ম্মেন্দ্রিয় সবার চেয়ে প্রবল। এটি ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়, এরই সাহায্যে···

আচমকা সুব্রতর কণ্ঠ বুজে গেল।

থামলে কেন সুব্রত? চারুব্রত প্রশ্ন করে।

আমার উপস্থিতিতে। পাশে এসে দাঁড়াল নির্ম্মল।

চারুব্রত খুশী হয়ে বলে, একেবারে মণিকাঞ্চন যোগ দেখছি।

নির্ম্মল মাথা নেড়ে একটু বাঁকা জবাব দিল, আমি বলি, বারুদ আর আগুন যোগ, কি বল ভাই, সুব্রত?

সুব্রত গর্জ্জন ক'রে উঠল।

নির্ম্মল হাসতে হাসতে বলল, দেখলে ত ভাই চারু—কেমন অক্ষরে অক্ষরে কথাটা ফলে গেল। এতক্ষণ ধ'রে সুব্রতর গল্পটা শুনছিলাম। পিছন ফিরে বসেছিলাম ব'লে দেখতে পাও নি। গল্পটা জমবে ভাল, তবে খুব সাবধানে গল্পকে শেষ করতে হবে। গোটা দুই সূক্ষ্ম আঁচড়ে তোমাকে দেখিয়ে দিতে হবে যে আগাগোড়াই একটা সাসপেন্সের মধ্যে রেখে তোমার পাঠকদের ধোঁকা দিয়েছ। আরে সুব্রত, তুমি অমন ক'রে পালাচ্ছ কেন? ভয় নেই, সব কথা আমি বলব না, শুধু আসল সত্যটি ছাড়া।

চ'লে যেতে গিয়েও ফিরে দাঁড়াল সুব্রত। তার দু'চোখে ক্রোধের আগুন ধ্বক্ ধ্বক্ ক'রে জ্বলছে।

সুব্রতর জ্বলন্ত চোখের ওপর চোখ রেখে নির্ম্মল বরফের মত ঠাণ্ডা গলায় বলল, তবে হ্যাঁ, একটা কথা তুমি বড় খাঁটি বলেছ ভাই। কান হ'ল কর্ত্তাদের তৃতীয় নয়ন—মস্ত বড় হাতিয়ার। সজাগ প্রহরী। তাই অত বড় প্রতিষ্ঠানের মান-সম্মানকে তুমি ধুলায় লুটিয়ে দিতে পার নি। ক্ষমতা হাতে পাওয়া এক কথা, আর তার সদ্ব্যবহার করতে পারা অন্য কথা। এটা তুমি ভুলে গিয়েছিলে। আর তুমি ভুলে গিয়েছিলে ব'লেই তোমার এই দশা। তোমার বন্ধুর মনটা সত্যই খুব নরম, তাই হাত কেটে ঠুঁটো জগন্নাথ ক'রে রাখলেও তোমার নিত্য তিরিশ দিনের ভোগের ব্যবস্থা ক'রে যাচ্ছে। নইলে···

একটু থেমে সে পুনরায় বলল, আর নয়। সুব্রতকে কথা দিয়েছি সব কথা ভাঙ্গব না। পরেরটুকু তুমি অনায়াসেই যোগ ক'রে নিতে পারবে। নইলে আর গল্প-কার কি? নির্ম্মল হেসে উঠল। আর সুব্রত মাথা নীচু ক'রে চায়ের দোকান থেকে টলতে টলতে বার হয়ে গেল।

—o—

শ্রীকরুণাকুমার নন্দী

মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধি

গত কয়েক মাস ধরে আমরা প্রবাসীর প্রতিটি সংখ্যাতেই বর্তমান দেশজোড়া খাদ্যসঙ্কট ও মূল্য-পরিস্থিতির গতি-প্রকৃতি, কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ এবং এই উভয়বিধ সমস্যার সম্ভাব্য কার্য্যকরী প্রতিবিধানের উপায় সম্বন্ধে বিস্তৃত ও বিশদ বিশ্লেষণ করে এসেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় কি সরকারী বা কি বেসরকারী চিন্তা-ধারায় এ সকল আলোচনার কোনও কার্য্যকরী প্রতিফলন এখনও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

খাদ্যশস্য আমদানী

বর্তমান সঙ্কট মোচনের উদ্দেশ্যে যে-সকল সরকারী প্রয়োগ এ পর্য্যন্ত অবলম্বন করা হয়েছে, সেটুকু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, একমাত্র আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র থেকে অধিকতর পরিমাণে খাদ্যশস্য আমদানী করবার আয়োজন করা ছাড়া বাকী সব কিছুই শূন্যগর্ভ বক্তৃতা ছাড়া আর কিছুই নয়। বিদেশী খাদ্যশস্য আমদানী বৃদ্ধি করা হয়ত মূল নীতির দিক্ দিয়ে খুব একটা প্রশংসনীয় ব্যাপার নয় স্বীকার করলেও, একথাও না মেনে উপায় নেই যে, বর্তমান সঙ্কটে এই প্রয়োগটুকু অনিবার্য্য হয়ে পড়েছিল। অতএব ভাল-মন্দ যাই হোক খাদ্যশস্য আমদানীর পরিমাণ বাড়ান একান্তই দরকার ছিল এবং এইটুকুর ব্যবস্থাও যে কেন্দ্রীয় সরকার খানিকটা তৎপরতার সঙ্গে গ্রহণ করতে পেরেছেন সেটা আনন্দের কথা। প্রসঙ্গতঃ আমেরিকা যে এই বিষয়ে আমাদের অতি তৎপরতার সঙ্গে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন তার জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতেই হবে।

কালোবাজারী মজুদ

শুধু এইটুকু ছাড়া আর যে-সকল সরকারী প্রয়োগের কথা এপর্য্যন্ত বলা হয়েছে সে সবই অদূর ভবিষ্যতে চালু হবে বলে ভরসা দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে যে প্রয়োগটুকু সার্থক ভাবে চালিয়ে যেতে পারলে সঙ্কটের গভীরতা খানিকটা পরিমাণে অন্ততঃ নিরসন হ'তে পারত সেই দিকে সকল প্রয়াস খানিকটা প্রাথমিক তৎপরতার পর থেকে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আমরা খাদ্যশস্যের লুকিয়ে-ফেলা মজুতের কথা বলছি। কেন্দ্রীয় এবং কোন কোন রাজ্য সরকারের উচ্চতম মুখপাত্রেরা একাধিকবার বলেছেন যে, অবশ্যভোগ্য পণ্যাদির এবং বিশেষ করে খাদ্যপণ্যের এ বৎসর অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধির প্রধান কারণ কালোবাজারী পুঁজিপতিদের (unaccounted money) অত্যধিক মুনাফাবাজীর প্রয়াস। পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন গত মাসে বলেন যে, এই রাজ্যে তাঁহার আন্দাজ-মত অন্ততঃ ২০ লক্ষ টন চাউল লুকোন মজুদে সরিয়ে ফেলা হয়েছে এবং এর জন্য তাঁর নিজেরই হিসাবমত অন্ততঃ ৯০ কোটি টাকা পুঁজি লগ্নী করা প্রয়োজন হয়েছে। এই লুকিয়ে ফেলা মজুদ আবিষ্কার ও জব্দ করে ফেলবার একটা ক্ষীণ প্রাথমিক প্রয়াসের পর—এবং এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, নয়াদিল্লী ও অন্যান্য কয়েকটি বৃহৎ শহরাঞ্চলে এই প্রয়াস খানিকটা পরিমাণে সফলতাও লাভ করেছিল—এ-বিষয়ে তৎপরতা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীই স্বয়ং এই ব্যাপারের জন্য বিশেষ ভাবে দায়ী বলে মনে হয়। দিল্লীতে যখন পুলিশ-বিভাগ সাধারণের সহযোগিতার ফলে কয়েকটা বৃহৎ মজুদ আবিষ্কার ও জব্দ করতে সমর্থ হন তখন হঠাৎ এঁদের প্রয়াস বন্ধ করে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী এক সরকারী বিজ্ঞপ্তির মারফৎ প্রচার করেন যে, তিনি এ সকল কালোবাজারী মুনাফাবাজদের দুই সপ্তাহের অবকাশ দিচ্ছেন; এই সময়ের মধ্যে যদি তাঁরা তাঁদের লুকিয়ে মজুদ করা খাদ্যশস্য বের করে না দেন তবে তাঁদের উপরে কঠিন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তিনি আরও বলেন যে যাঁরা এই সময়ের মধ্যে তাঁদের মজুদ বের করে দেবেন তাঁদের ফাঁকি-দেওয়া ট্যাক্স থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে এবং কি ভাবে তাঁরা এ সকল মজুদের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করেছেন সে-বিষয়ে কোন প্রশ্ন করা হবে না। বলা বাহুল্য কোন মজুতদার প্রধানমন্ত্রীর একাধারে আশ্বাসবাণী ও হুমকি সত্ত্বেও আজ পর্য্যন্ত তাঁদের এককণা মজুদও বের করে দেন নি এবং এঁদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক প্রয়োগের কথাটাও আপাততঃ মুলতুবী রয়েছে বলে স্পষ্ট হ

উঠেছে। আশঙ্কা হয় যে, যে-কারণে শ্রীগুলজারীলাল নন্দ মহাশয়ের সদাচার সমিতিকে অতুল্য ঘোষ প্রমুখ কংগ্রেস ধুরন্ধরদের চেষ্টায় বানচাল করে দেওয়া হয়েছে ঠিক সেই কারণেই সংশ্লিষ্ট মহলের চাপে খাদ্য মজুদ াবিকার ও জব্দ করবার প্রয়াসটিকেও বানচাল করে দওয়া হয়েছে। কেননা এ কথা কারও অজানা নেই য-কালোবাজারী পুঁজিপতিদের উচ্চতম মুখপাত্রের লের কংগ্রেসের উচ্চতম দরবারের অন্দরমহলে অবাধ াতিবিধি রয়েছে এবং দেশের মঙ্গলের জন্য এঁদের অন্যায় ার্থে আঘাত করবার শক্তি কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ এবং কংগ্রেস অধ্যুষিত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির নেই।

খাদ্যশস্য রাষ্ট্রীকরণ এবং বণ্টন নিয়ন্ত্রণ

আর যে-সকল প্রয়োগের পরিকল্পনা করা হয়েছে বলে বলা হয়েছে, সে সবই মোটামুটি আগামী বৎসর থেকে করা হবে বলে বলা হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা খাদ্যশস্যের ব্যবসার রাষ্ট্রীকরণ। কিন্তু এই রাষ্ট্রীকরণের পরিধি কেবলমাত্র আংশিকভাবে খাদ্য-শস্যের ব্যবসায়ের উপর অধিকার স্থাপন করবে—সম্পূর্ণ ভাবে নয়। কেননা, কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মণ্যম্ স্পষ্টভাবেই স্বীকার করেছেন—দেশের সমগ্র খাদ্যশস্যের ব্যবসায়টিকে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত করতে হ'লে যে সংস্থান ও আয়োজন প্রয়োজন হবে (resources), তা সরকারের সামর্থ্যের অতীত। যে কারণ তিনি এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে দর্শিয়েছেন তার সম্যক্ তাৎপর্য্য আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম। প্রয়োজন হলে সরকার সম্পূর্ণ ভাবে খাদ্যশস্যের ব্যবসায়টিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করতে সামর্থ্য-হীন—এই স্বীকৃতি সরকারী নীতি ও প্রয়োগবিধির গভীরতম বিফলতার স্বীকৃতি। দ্বিতীয়তঃ, এক আমদানী শস্য ব্যতীত দেশের মধ্যে উৎপন্ন শস্যের কতটুকু অংশ রাষ্ট্রায়ত্ত করা হবে তারও কোন স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না। এর ফলে সরকারী সংগ্রাহক-ব্যবস্থা এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণের অতীত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ব্যবসায়ীগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধটি কি ভাবে নিয়মিত হ'তে পারে তা ভেবে পাওয়া যায় না। ফলে আশঙ্কা হয় যে, এমন একটা জটিল অবস্থার সৃষ্টি হ'তে পারে যাতে বর্ত্তমান সঙ্কট আরও অনেক গুণ গভীরতর এবং দেশজোড়া মন্বন্তর অনিবার্য্য হয়ে পড়বে।

সরকারী প্রচার অনুযায়ী যদি আগামী বৎসর থেকে দেশের সকল শহর ও শিল্পাঞ্চলে বণ্টন-নিয়ন্ত্রণ (rationing) চালু করা হয় তা হ'লে এই বণ্টন ব্যবস্থা সত্যিকার কল্যাণসূচক করতে হ'লে সরবরাহের উপর দখল সার্বভৌম না হ'লে এ কখনই চলতে পারে না। সরবরাহের উপরে সার্বভৌম সরকারী দখল প্রতিষ্ঠা করতে হ'লে খাদ্যশস্যের ব্যবসায়টি সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। অতএব কেন্দ্রীয় সরকার ও কংগ্রেস কর্ত্তৃক প্রচারিত সরকারী খাদ্যসঙ্কট-মোচক প্রয়োগগুলি যে প্রধানতঃ কেবল প্রচারধর্মী (Propagandist), এগুলি সার্থকভাবে কার্য্যকরী (realistic and effective) হবার আশা যে খুবই কম সেটুকু অনুমান করা কঠিন হওয়া উচিত নয়। সরকারী প্রয়োগের সার্থকতা কতটুকু বাস্তব, সেটি একটি বিষয়ের উল্লেখ করলেই স্পষ্ট বোঝা যাবে। গত সপ্তাহে এ-আই-সি-সির খাদ্যবিতর্ক উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী মন্তব্য করেন যে, সরকারী সার্থক প্রয়োগের ফলে খাদ্যসঙ্কটটি এখন আয়ত্তাধীন হয়ে এসেছে এবং খাদ্যমূল্য এখন কম্‌তির দিকে চলেছে। বোম্বাই শহরে প্রকাশিত ইংরাজী দৈনিক 'ইকনমিক টাইম্‌স্' পত্রিকায় যে মূল্য-পরিসংখ্যান নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে তা থেকে দেখতে পাওয়া যাবে যে, গত ২২শে আগষ্ট তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হয়েছে সেই সময়ে পাইকারী খাদ্যমূল্য-পরিসংখ্যানের অঙ্ক ছিল ১৫৬.৯; এক সপ্তাহ পূর্বে এর মান ছিল ১৫৪.৬; এক মাস পূর্বে ছিল ১৪৮.৩; তিন মাস পূর্বে ১৩৬.২ এবং ঠিক এক বৎসর পূর্বে ঐ দিনে ছিল ১১৯। অর্থাৎ ১৯৬৩ সনের আগষ্ট মাসে যে পাইকারী খাদ্যমূল্যের মান ছিল, তার তুলনায় ১৯৬৪ সনের মে মাসে ছিল ১৪.৪% বেশী, জুলাই মাসে ছিল ২৪.৬% বেশী, ১৫ই আগষ্ট ২৯.৯% বেশী এবং গত ২২শে আগষ্ট ৩১.৮% বেশী। অথবা গত বৎসর অগষ্ট মাসের তুলনায় এ বৎসর মে মাসে পাইকারী খাদ্যমূল্য ১৪.৪% বৃদ্ধি পায়, এ বৎসর মে মাসের তুলনায় এই মূল্যমান জুলাই মাসে আরও ৮.৯% বৃদ্ধি পায়; জুলাই মাসের তুলনায় ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত মূল্যবৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ৪.৩% এবং ১৫ই আগষ্ট থেকে ২২শে আগষ্ট এক সপ্তাহ আরও ১.৫% মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে।

কার্য্যকারণ সম্বন্ধ

সম্প্রতি লোকসভায় খাদ্য বিতর্ক উপলক্ষ্যে বিরোধী পক্ষের সমালোচনার মূল বক্তব্য ছিল যে বর্ত্তমান খাদ্য-সঙ্কট ও মূল্যপরিস্থিতির আসল জনক উন্নয়নের অজুহাতে অসম্ভব পরিমাণে মুদ্রাস্ফীতি। সেই কারণেই অনবরত

মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে এবং স্বভাবতঃই খাদ্যপণ্যের এবং অন্যান্য অবশ্যভোগ্য পণ্যাদির উপর এর চাপ বেশী করে বর্তাচ্ছে। একটি বিশিষ্ট বিরোধী নেতা বিশেষ করে এই প্রসঙ্গে অত্যধিক পরিমাণে ঘাটতি মুদ্রার (deficit financing) ব্যবহারকেই দায়ী করেছেন। তাঁর মতে লুকান মজুদ শস্যের পরিমাণ এমন কিছু বেশী হওয়া সম্ভব নয় যার ফলে বর্তমান অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে। আসলে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় কৃষি উৎপাদনে প্রগতির অভাবে এমনিতেই খাদ্যশস্যে ঘাটতি রয়েছে, তার উপরে মুদ্রাস্ফীতির (inflation) ফলে যে আনুপাতিক সাধারণ মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে তার চাপ অনিবার্য ভাবে খাদ্য-পণ্য ও অবশ্য ভোগ্যাদির উপর বেশী করে বর্তাচ্ছে। এঁর মতে খাদ্যশস্যের ব্যবসায়ের রাষ্ট্রীকরণের দ্বারা সমস্যার সমাধান হবে না। একমাত্র মুদ্রাস্ফীতি বন্ধ করতে পারলেই তবে এর সার্থক সমাধান সম্ভব হবে।

অভিযোগটি আংশিকভাবে সত্য হলেও সম্পূর্ণ সত্য নয় তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। খাদ্যশস্যের যে মূল্য পরিসংখ্যান উপরে উদ্ধৃত করা হয়েছে তা থেকে দেখা যাবে যে ১৯৬০-৬১ সনের তুলনায় ১৯৬৩ সনের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত ১৯% মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছিল। ১৯৬৩ সনের এপ্রিল মাস থেকে ঘাটতি মুদ্রা সৃষ্টির গতি (the rate of deficit financing) অনেকটা কমিয়ে দেওয়া হয় অথচ ১৯৬৩ সনের মে মাস থেকে ১৯৬৪ সনের আগষ্ট মাসের শেষ পর্য্যন্ত ৩১·৮% পরিমাণ মূল্য বৃদ্ধি ঘটে-ছিল। কালোবাজারী পুঁজিদারদের দ্বারা অনুষ্ঠিত আটক মজুদের (hoarding) ফলেই যে অন্ততঃ এই মূল্যবৃদ্ধির বৃহত্তম অংশ দায়ী তা'তে সন্দেহের কোন কারণ নেই। কংগ্রেসের কোন কোন বিশিষ্ট উচ্চাধিকারী নেতাও যে অনুরূপ বক্তব্য করেন নি তা নয়। এঁরাও বলেছেন উন্নয়নের অনিবার্য্য সহযোগী খানিকটা পরিমাণ মুদ্রাস্ফীতি এবং সঙ্গে সঙ্গে সমপরিমাণ মূল্যবৃদ্ধি। এই সকল নেতারা তাঁদের ধনবিজ্ঞানের পাঠ কোথায় নিয়েছিলেন জানি না তবে মনে হয় যে এই বিজ্ঞানের একটি মূল সূত্র, অত্যধিক পরিমাণ মুদ্রাস্ফীতি সঙ্কুচিত করে রাখতে না পারলে যে তার ফলেই উন্নয়নের গতি অনিবার্য্যভাবে ব্যাহত হতে বাধ্য সেটি এঁদের জানা নেই। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্য এ, সি, পিগুর মতে উন্নয়নকালীন মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ যদি ২%য়ের মধ্যে সীমিত করে রাখা না হয় তবে কেবল নয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে সমাজে আর্থিক বৈষম্যের পরিমাণও অনিবার্য্য ভাবে বেড়ে চলে। আমাদের দেশেও যে তাই ঘটছে তার প্রমাণের অভাব নেই।

যুদ্ধকালীন বৃটিশ ধনব্যবস্থা

তবে মুদ্রাস্ফীতি ঘট্‌লেই যে খাদ্যসঙ্কট উপস্থিত হতেই হবে এমন কোন কথা নেই। গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ইংলণ্ডে যে পরিমাণ মুদ্রাস্ফীতি অনিবার্য্য হয়ে পড়েছিল এমনটি একমাত্র ফ্রান্স ব্যতীত বোধহয় আর কোথাও ঘটে নি। বৃটিশ শাসন যন্ত্রের অধিকর্তারা জান্‌তেন যে এমনটা ঘটবেই এবং তার জন্য পূর্ব থেকেই উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। যুদ্ধকালীন অবস্থায় ইংলণ্ডের খাদ্যসরবরাহের পরিমাণ অনিবার্য্যভাবেই বিশেষ পরিমাণে সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছিল; অন্যান্য ভোগ্য পণ্যের সরবরাহেও প্রভূত ঘাটতি সৃষ্টি হয়েছিল। তা সত্ত্বেও এ সকল পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির পরিমাণ সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে সীমিত করে রাখা সম্ভব হয়েছিল। তার কারণ বিশেষ করে খাদ্য ও অন্যান্য অবশ্য ভোগ্য পণ্যাদির বণ্টন অত্যন্ত কঠিন নিয়ম ও তার সার্থক, সৎ ও সার্বভৌম প্রয়োগের দ্বারা নিয়ন্ত্রণাধীন করে রাখা হয়েছিল। ইচ্ছাভোগ্য, বিশেষ করে আরামসূচক (luxury) পণ্যাদির মূল্য বেশ খানিকটা স্ফীতি লাভ করেছিল সন্দেহ নেই কিন্তু একটি সুপরিকল্পিত এবং সার্থকভাবে প্রয়োগ করা খরিদ শুল্কের প্রবর্তনের দ্বারা এর পরিধিও একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আটকে রাখা সম্ভব হয়েছিল। অন্যপক্ষে প্রচণ্ড ট্যাক্স বৃদ্ধি ও সরকারী ঋণের দ্বারা মুদ্রা-স্ফীতির একটা মোটা অংশ ভোগ থেকে সরিয়ে ফেলা সম্ভব হয়েছিল। এর ফলে যুদ্ধকালে ইংলণ্ডের মুদ্রাস্ফীতি কেবলমাত্র যে মূল্যমানে আনুপাতিক পরিমাণে প্রতিফলিত হয় নি শুধু তাই নয়, সমগ্র ভাবে ইংরাজ জাতির সঞ্চয়ও অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পেয়েছিল। যুদ্ধপূর্ব কালে ইংরাজ জাতির মোট আয়ের ১৯% সরকারী ট্যাক্সে এবং প্রায় ৭৫% ভোগে ব্যয় হ'ত এবং ৬% সঞ্চয় হ'ত। যুদ্ধকালে ট্যাক্সের পরিমাণ এই মোট আয়ের ২৯% অধিকার করে এবং খানিকটা পরিমাণ মূল্যস্ফীতি সত্ত্বেও ভোগব্যয় ৫৩%য়ে সীমিত হয়ে যায়। ফলে ইংরাজ জাতি ঐ সময়ে তার আয়ের ১৮% সঞ্চয় করতে পেরেছিলেন। এই সঞ্চয় যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের কাজে এবং জাতীয় জীবন মান উন্নয়নে খুবই সহায়তা করেছিল। আমাদের দেশেও অনুরূপ ফলপ্রসূ প্রয়ো

সম্ভব ছিল না কিন্তু তাহার আয়োজন ও প্রয়োগের মতা যে বর্তমান সরকারের একেবারেই নাই তাহা তি স্পষ্ট। আসল কথা কালোবাজারী পুঁজিপতিদের নাফাবাজী বন্ধ করবার শক্তি বা সাহস কোনটাই যে দের নেই সম্প্রতি তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে।

পশ্চিমবঙ্গের উদাহরণ

অথচ একটু দৃঢ়তার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ চালু করতে পারলে তটা সুফল পাওয়া যেতে পারে পশ্চিমবঙ্গেই গত মাসে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। কলিকাতা ও শ্লিষ্ট শিল্পাঞ্চলে এখন আংশিক বণ্টন নিয়ন্ত্রন ব্যাপক বে চালু হওয়ায় সাধারণের এখন চাউল-গম-চিনির াব যে অনেকটা মিটেছে সেটা সত্য। অবশ্য খোলা জারে চাউল-মাছ-তেল কোনটাই নির্দ্ধারিত মূল্যে বা উপযুক্ত পরিমাণে কোথাও পাওয়া যায় না। তবু যেটুকু সম্ভব হয়েছে তাতে অনেকটা যে সুরাহা হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিস্তৃততর ক্ষেত্রে এই একই নীতি যদি প্রয়োগ করা যেত তবে যে দেশের লোকের জীবনযাত্রা অনেকটা বিঘ্নহীন ও নিরাপদ হতে পারত তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেবলমাত্র খাদ্যই নিম্নবিত্ত জনসাধারণের একমাত্র বা এমনকি একমাত্র প্রধান সমস্যাও নয়। বস্ত্র, বাসস্থান, ইত্যাদি আরও নানাবিধ সমস্যা তার জীবনযাত্রার ধারাকে জর্জ্জরিত করে রেখেছে। এসব ক্ষেত্রেও—বিশেষ করে বাসস্থানের ক্ষেত্রে—মুনাফালোভী কালোবাজারীদের ধ্বংসকারী হাতের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নিম্ন ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ভদ্রতা বজায় রেখে জীবনযাত্রা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে আগামী সংখ্যায় বিশদ আলোচনা করবার প্রয়াস করা হবে।

—০—

উপদেষ্টা ও উপদিষ্ট

অনেকে মনে করেন, উৎকৃষ্ট উপদেশ, উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রভৃতি ঘরে বসিয়া লোককে আকর্ষণ করিবে। তাহাকে লোকের দ্বারে লইয়া গিয়া উপস্থিত করিবার আবশ্যক কি? ধর্ম্মপিপাসু যে, জ্ঞানার্থী যে, সে অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াও সদ্‌গুরুর কাছে যায় সত্য। কিন্তু ধর্ম্ম-পিপাসা এবং জ্ঞানলিপ্সা জন্মাইয়া দেওয়াও কি উপদেষ্টার কর্ত্তব্য নহে? অনেক ছেলেমেয়ে আপনা হইতে পড়িতে চায় না। তথাপি বাপ মা তাহাদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করেন। শিক্ষাকে ইচ্ছাধীন রাখিয়া, আইনের দ্বারা উহাকে অবশ্যকর্ত্তব্য না করিয়া, কোনও দেশের নিরক্ষরতা এ পর্য্যন্ত দূর হয় নাই। সুতরাং, কেহ উপদেষ্টার নিকট আসিলে তবে তিনি উপদেশ দিবেন, এইরূপ ব্যবস্থায় আংশিক ফললাভেরই সম্ভাবনা। হিন্দীতে একটি এই মর্ম্মের দোঁহা আছে যে, দুধকে গলি গলি ফেরী করিতে হয়, আর মদের বিক্রী দোকানে বসিয়াই হয়। মানুষের প্রবৃত্তির অনুকূল যাহা, মানুষ তাহার পানে, অগ্নিশিখার প্রতি পতঙ্গের মত, ধাবিত হয়। শ্রেয়ের প্রতি তেমন উধাও হইয়া দৌড়ে খুব কম লোকে। কিন্তু যিনি নিজেই উদ্যোগী হইয়া উপদেশ দিতে যান, তাঁহার বিপদ আছে। তিনি যদি মনে করেন যে, আমি উচ্চ স্থানে পৌঁছিয়াছি, অন্যের উপকার করিতে যাইতেছি, তবেই ত তাঁহার পতন আরম্ভ হইল। কিন্তু কবি যে-ভাবে নিজের আনন্দের ভাগ আর সকলকে দিতে যান, উপদেষ্টা যদি সেই ভাবে ধর্ম্মরসের আস্বাদন সকলকে দিতে ভালবাসেন, তাহা হইলে তাঁহার কোন অমঙ্গল হয় না। পাত্রাপাত্র নির্ব্বিশেষে যথাতথা ধর্ম্মের কথা বলিবে, এরূপ ব্যবস্থাও কিন্তু দেওয়া যায় না। "বেনা বনে মুক্তা ছড়াইও না" এই নিষেধ সম্পূর্ণ নিরর্থক নহে। ধর্ম্মপিপাসু ও জ্ঞানার্থী কতদুর অগ্রসর হইয়া যাইবেন, সৎশিক্ষকই বা শিক্ষার্থীর দিকে কতটা অগ্রসর হইবেন, তাহার সীমা নির্দ্দেশ করা কঠিন।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বৈশাখ, ১৩২১।

বিদেশের কথা

শ্রীযোগনাথ মুখোপাধ্যায়

জনসন-হামফ্রে ঃ

আটলাণ্টিক সিটিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসকদল ডিমক্রাটিক পার্টির প্রতিনিধি সম্মেলনে বর্তমান প্রেসিডেণ্ট জনসন আসন্ন প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনে দলের প্রার্থী মনোনীত হয়েছেন এবং প্রেসিডেণ্ট জনসন তাঁর সহকারী ভাইস-প্রেসিডেণ্টরূপে মনোনীত করেছেন মিনসোটা রাজ্যের সেনেটর ও বর্তমান সিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হুইপ হুবার্ট হামফ্রেকে। রিপাবলিকান দলের প্রার্থী মনোনয়নকালে যে রাজনৈতিক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল, ডিমক্রাটিক দলের ক্ষেত্রে তা একেবারেই হয় নি। কারণ প্রেসিডেণ্ট জনসনই যে ডিমক্রাটিক দলের প্রার্থী মনোনীত হবেন তা বহু পূর্বেই ঠিক হয়েছিল। শুধু প্রেসিডেণ্ট জনসন কাকে ভাইস-প্রেসিডেণ্টরূপে পেতে চাইবেন, সেই নিয়ে যা কিছুটা জল্পনাকল্পনা হয়েছিল। সেনেটর হামফ্রে ঐ মনোনয়ন লাভ করায় সে ঔৎসুক্যেরও অবসান হয়েছে এবং ডিমক্রাটিক দলের সমর্থকরা সকলেই তাতে সন্তুষ্ট হয়েছেন। পরলোকগত প্রেসিডেণ্ট কেনেডির ভাই ও বর্তমান মার্কিন সরকারের এটর্নী-জেনারেল রবার্ট কেনেডিকে ডিমক্রাটিক দলের একটি বড় অংশ ভাইস-প্রেসিডেণ্টরূপে পেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি নিজেই সে প্রস্তাবে সম্মত হন না।

রিপাবলিকান দলের প্রার্থী গোল্ডওয়াটার অত্যন্ত রক্ষণশীল ও সঙ্কীর্ণ বলে ইতিমধ্যে যথেষ্ট কুখ্যাতি কুড়িয়েছেন। রিপাবলিকান দলেরই অনেকে বলতে আরম্ভ করেছেন যে, সেনেটর গোল্ডওয়াটার দলের দীর্ঘদিনের সুনাম ও গৌরবময় ঐতিহ্য ক্ষুণ্ণ করার উপক্রম করেছেন। তারপর ভাইস-প্রেসিডেণ্ট পদে যাঁকে মনোনীত করেছেন গোল্ডওয়াটার, নিউইয়র্ক থেকে নির্বাচিত কংগ্রেসম্যান উইলিয়ম মিলারও তত পরিচিত ব্যক্তি নন।

উভয়েই মার্কিন রাজনীতিতে সুপরিচিত। ছাপ্পান্ন বৎস[র] বয়স্ক রাজনীতিজ্ঞ প্রেসিডেণ্ট জনসন বত্রিশ বছরকা[ল] রাজনীতিতে আছেন। তিনি ভাইস-প্রেসিডেণ্টের দায়ি[ত্ব] পালন করেছেন তিন বছর, প্রেসিডেণ্টও হয়েছেন ন[য়] মাস। যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে এখন তাঁর মত অভি[জ্ঞ] ব্যক্তি একজনও নেই। তাঁর মনোনীত সহকারী হুবা[র্ট] হামফ্রেও দশ বছর ধরে সেনেটের সদস্য। সম্প্রতি মার্কি[ন] কংগ্রেসে যে নাগরিক অধিকার বিল গৃহীত হয় তাতে সেনেটর হামফ্রের ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উদারদৃষ্টিসম্পন্ন দক্ষ রাজনীতিজ্ঞরূপে মার্কিন রাজনৈতি[ক] মহলে তিনি বিশেষ সুপরিচিত। সেনেটর হামফ্রে সিনেটের পররাষ্ট্রবিষয়ক কমিটির সদস্য এবং ১৯৫৮ সালে সোভিয়েট-নায়ক ক্রুশ্চেভের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করে তিনি যথেষ্ট কূটনৈতিক দক্ষতার পরিচয় দেন।

হামফ্রের নাম প্রস্তাবকালে প্রেসিডেণ্ট জনসন বলেন, তিনি এমন একজনকে সহকারীরূপে পেতে চান, যিনি প্রেসিডেণ্টের সকল কাজের সহায়ক হ'তে পারবেন এবং দরকার হ'লে প্রেসিডেণ্টও হ'তে পারবেন। দুর্ভাগ্যবশত ডিমক্রাটিক দলকে ভাইস-প্রেসিডেণ্ট মনোনয়নকালে এখন একথাও বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে চিন্তা করতে হচ্ছে। কারণ তাঁদের দুইজন শ্রেষ্ঠ প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও কেনেডি প্রেসিডেণ্ট থাকাকালেই পরলোকগমন করেছেন এবং ভাইস-প্রেসিডেণ্টদের এগিয়ে আসতে হয়েছে তাঁদের শূন্য আসনে। সুতরাং ভাইস-প্রেসিডেণ্ট এমন একজনেরই হওয়া দরকার, যিনি প্রেসিডেণ্টের মতই যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ঃ

দিয়েম ভ্রাতাদের পতনের পর দক্ষিণ ভিয়েৎনামের রাজনীতিতে যে সঙ্কট সৃষ্টি হয়, দিনে দিনে তা বেড়ে চলে

যাচ্ছে। দক্ষিণ ভিয়েৎনামে প্রায় পনের হাজার মার্কিন সৈন্য আছে এবং মার্কিন সরকার সেখানে প্রতিদিন অর্ধ কোটি টাকারও বেশী ব্যয় করেন। মার্কিন সামরিক ও আর্থিক সাহায্য দক্ষিণ ভিয়েৎনামের রাজনীতি, শাসনযন্ত্র ও সৈন্যবাহিনীর উপর এমনই প্রভাব বিস্তার করেছে যে, মার্কিন-সমর্থিত নন এমন ব্যক্তির পক্ষে ঐ দেশের শাসন-ক্ষমতা বেশীদিন করায়ত্ত রাখা কিছুতেই সম্ভব নয়। দিয়েম-বিরোধী অভ্যুত্থানের নায়ক মেজর জেনারেল দুয়ং ভানমিনের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার মাত্র তিনমাস পরে কোণঠাসা হওয়ার সেইটিই প্রধান কারণ বলে মনে হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের এ পর্যন্ত পাঁচ শত কোটি ডলারেরও বেশী ব্যয় হয়েছে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে, বহু মার্কিন সৈনিকও প্রাণ হারিয়েছে কম্যুনিষ্ট গেরিলা ভিয়েৎকঙদের আক্রমণে। অথচ দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে কম্যুনিষ্ট উপদ্রব-মুক্ত করার ব্যাপারে কোন উল্লেখযোগ্য সাফল্যই এ পর্যন্ত অর্জিত হয় নি। যুক্তরাষ্ট্রের ডিমক্রাটিক শাসনকে এজন্য রিপাবলিকানদের তীব্র সমালোচনারও সম্মুখীন হ'তে হয়েছে। প্রেসিডেন্ট জনসন তাই বোধহয় আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগেই দক্ষিণ ভিয়েৎনামে কিছু একটা উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখাতে চান। কিন্তু তাঁর আকাঙ্ক্ষিত তৎপরতার সঙ্গে জেনারেল দুয়ং হয়ত পা ফেলে চলতে রাজী নন। সেই কারণেই ভিয়েৎনামের রাজনীতিতে আবির্ভাব হয় মার্কিন সমর্থনপুষ্ট জেনারেল ঙ্গুয়েন খানের। সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ওলট্‌পালট্ ঘটিয়ে প্রায় তড়িৎগতিতেই জেনারেল খান ক্ষমতার পুরোভাগে আসেন এবং এক সময় তাঁর হাতে জেনারেল দুয়ংকে বন্দী পর্যন্ত হ'তে হয়। কিন্তু প্রেসিডেন্ট দিয়েমের নিষ্ঠুর শাসনের বিরুদ্ধে সাহসের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ও জনগণের অভ্যুত্থানের সকল পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে জেনারেল দুয়ং যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন, তা বোধহয় জেনারেল ঙ্গুয়েন খানের পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব হয় না। আবার একটা বড় রকমের গণবিক্ষোভের আশঙ্কা করে জেনারেল ঙ্গুয়েন অনতিবিলম্বে জেনারেল দুয়ং-এর সঙ্গে একটা আপোষ করে নেন। নতুন ব্যবস্থায় জেনারেল দুয়ং হন দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রেসিডেন্ট ও জেনারেল ঙ্গুয়েন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু ঐ ব্যবস্থা ছিল নিছক লোকদেখানো আপোষ, তলায় তলায় ষড়যন্ত্র ও ক্ষমতার লড়াই আগের মতই চলতে থাকে।

পুরাণো সংবিধান বাতিল করে গত ১৫ই আগষ্ট দক্ষিণ ভিয়েৎনামে নতুন সংবিধান চালু করা হয় এবং মাত্র বাহান্নজন সামরিক অফিসারের "নির্বাচনে" জেনারেল ঙ্গুয়েন খান দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রেসিডেন্ট হন। তার পরেই সাংবাদিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বর্তমান পরিস্থিতিতে চালু করা সম্ভব নয়। এ কারণে সামরিক ব্যক্তিদের সাহায্যেই দক্ষিণ ভিয়েৎনামের শাসন-কার্য চালানো হবে এবং শীঘ্রই তিনি তাঁর সমরকালীন মন্ত্রিসভা গঠন করবেন। ঐ ঘটনার কয়েকদিন আগে মার্কিন সমর অধিনায়ক জেঃ ম্যাক্সওয়েল টেলর সায়গনে মার্কিন রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন। জেনারেল ঙ্গুয়েনের পূর্ণ ক্ষমতালাভ, জেনারেল দুয়ং-এর অপসারণ ও ম্যাক্সওয়েল টেলরের উপস্থিতিতে সকলেই প্রায় ধরে নেন যে, দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সৈন্যবাহিনী ও শাসনব্যবস্থার উপর পূর্ণ মার্কিন কর্তৃত্ব কায়েম হয়েছে এবং অবিলম্বে উত্তর ভিয়েৎ-নাম ও ভিয়েৎকঙ গেরিলাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান সুরু হবে।

কিন্তু জেনারেল ঙ্গুয়েন খানের নয়াশাসন দশদিনের বেশী কায়েম থাকে না। আবার বৌদ্ধ ও ছাত্রদের বিক্ষোভ প্রবল হয়ে ওঠে এবং জেনারেল ঙ্গুয়েন অতি সহজেই সেই বিক্ষোভের কাছে নতি স্বীকার করেন। দিয়েম ভ্রাতাদের শোচনীয় পরিণতির কথা চিন্তা করেই বোধহয় জেনারেল ঙ্গুয়েন আগুন নিয়ে খেলা করার সাহস পান নি। স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ঐ বিক্ষোভ ছিল জেনারেল দুয়ং-এর সমর্থনপুষ্ট। নতুন সংবিধান অনুসারে গঠিত সামরিক বিপ্লবী পরিষদ ভেঙ্গে দেওয়া হয় এবং মেজর জেনারল দুয়ং ভানমিন আবার ফিরে আসেন ক্ষমতায়। তাঁর সঙ্গে জেনারেল ঙ্গুয়েন খান ও প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী লেঃ জেঃ খিয়েমকে নিয়ে গঠিত হয় দক্ষিণ ভিয়েৎনামের নতুন ত্রয়ী শাসকজোট। কিন্তু এ ব্যবস্থাতেও শান্তি আসে নি, কারণ বৌদ্ধ সমর্থনপুষ্ট জেনারেল দুয়ং ও ক্যাথলিক ও মার্কিন সমর্থনপুষ্ট

জেনারেল হ্যুয়েনের মধ্যে আপোষ হওয়া খুবই কঠিন। তাছাড়া মার্কিন রাজনীতির প্রয়োজনে যুদ্ধক্লান্ত দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে এখনই একটা বড় রকমের যুদ্ধ ও অশান্তির মধ্যে ঠেলে দিতে জেনারেল হুয়ং রাজী নন। আর জেনারেল হুয়ং যে জেনারেল হ্যুয়েনের তুলনায় অনেক বেশী জনপ্রিয় তা বোঝা যাচ্ছে জেনারেল হ্যুয়েনের "অসুস্থতার" জন্য রাজনীতি থেকে সাময়িক অবসর গ্রহণে। সুতরাং জেনারেল হুয়ং যদি তাঁর নীতিতে অবিচল থাকেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিয়েৎনাম নীতিতেও কোন পরিবর্তন না হয়, তবে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের শাসন-সঙ্কটের সমাধান খুব সহজে হবে না।

সাইপ্রাসের সঙ্কট ঃ

প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির স্বার্থ-সংঘাত, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও আন্তর্জাতিক ঠাণ্ডা লড়াইয়ের প্রভাব ক্ষুদ্রদ্বীপ রাষ্ট্র সাইপ্রাসের জনজীবন প্রায় অসহনীয় করে তুলেছে।

সাইপ্রাসের আয়তন ৩,৫৭২ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা ৫ লক্ষ ৭৪ হাজার। তার মধ্যে গ্রীক খ্রীশ্চানের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৪২ হাজার ও তুর্কী মুস্লিম ১ লক্ষ ৫ হাজার। অবশিষ্ট সাতাশ হাজার অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। প্রাকৃতিক সম্পদে দীন, একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ সাইপ্রাস স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্র-রূপে কোন দিনই সমৃদ্ধ হ'তে পারবে না। এ কারণে ব্রিটিশ শাসনাধীনে থাকাকালেই সাইপ্রাসের গ্রীক্ অধিবাসীরা গ্রীসের সঙ্গে সাইপ্রাসকে সংযুক্ত করার জন্য আন্দোলন সুরু করে, যে আন্দোলন 'ইনোসিস' আন্দোলন নামে পরিচিত। কিন্তু সাইপ্রাসের সংখ্যালঘু তুর্কীরা তাতে আপত্তি জানায় এবং তাদের দাবির সমর্থনে তুরস্ক এগিয়ে আসে। তুরস্কের পক্ষ থেকে বলা হয়, ১৫৭১ থেকে ১৮৭৮ সাল, অর্থাৎ তিনশ' বছরেরও বেশী সাইপ্রাস তুরস্কের অধিকারে ছিল এবং ঐ দ্বীপটি তুরস্ক থেকে, মাত্র চল্লিশ মাইল দূর। অপরপক্ষে গ্রীস থেকে তার দূরত্ব সাতশ' মাইল। কিন্তু সাইপ্রাসের শতকরা আশিজন গ্রীক্ অধিবাসীর দাবি উপেক্ষা করা ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই শেষ পর্যন্ত সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার নামে কতকগুলি গোঁজামিল-দেওয়া এক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে ব্রিটিশ সরকার ১৯৬০ সালে সাইপ্রাসকে একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু তাতে সাইপ্রাস সমস্যার কোন সমাধান হয় না, বরঞ্চ গ্রীক্-তুর্কী বিরোধ দিনে দিনে বাড়তে থাকে।

ঐ বিরোধেরই চরম প্রকাশ ঘটে গত ৯ই আগষ্ট। হঠাৎ তুর্কী সংখ্যালঘুদের রক্ষার অজুহাতে ঐদিন তুর্কী বিমানবহর সাইপ্রাসের উপর হানা দেয় ও দুইদিনে বোমাবর্ষণ করে ছত্রিশজন গ্রীক্ সিপ্রিয়টকে নিহত ও প্রায় আড়াই শ' জনকে আহত করে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের স্বস্তি পরিষদের নির্দেশে সাইপ্রাস সংযত থাকে, কিন্তু তুরস্ক আপনজনদের রক্ষার অজুহাতে আরও কয়েকদিন আক্রমণ চালিয়ে যায়। সোভিয়েট ইউনিয়ন ও আরব দেশগুলি যদি ইতিমধ্যে সাইপ্রাসের পক্ষে কঠোর মনোভাব না নিত তবে তুরস্কের নির্লজ্জ জঘন্য আক্রমণ হয়ত খুব সহজে বন্ধ হ'ত না। তুরস্কের এই বেপরোয়া মনোভাবের কারণ খুবই স্পষ্ট। তুরস্ক 'নাটোর' সদস্য পশ্চিমী শক্তিজোটের মিত্র। সুতরাং তার দৌরাত্মের বিরুদ্ধে হঠাৎ কেউ অস্ত্রধারণ করবে না এটা সে ভালভাবেই জানে। আমেরিকা বা ব্রিটেন এ ব্যাপারে তুরস্ককে সংযত হওয়ার উপদেশ দেওয়া ছাড়া কার্যত আর কিছুই করে নি। তুরস্কের এই অন্যায় ও বেপরোয়া আচরণ এবং এ সম্বন্ধে ব্রিটিশ ও আমেরিকার নিষ্ক্রিয় মনোভাবে ভারতের যথেষ্ট শঙ্কিত হওয়ার কারণ আছে। কারণ ভারতের প্রতিবেশী পাকিস্তানও তুরস্কের মতই পশ্চিমী প্রশ্রয়পুষ্ট। সুতরাং তুরস্কের মত পাকিস্তানও যদি হঠাৎ একদিন তার ভারতস্থ "স্বজনদের" রক্ষার জন্য ভারতের ওপর হামলা করে সেদিনও পশ্চিমী শক্তিজোট হয়ত এমনি নিষ্ক্রিয় থেকে যাবে। ৩০শে আগষ্ট তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ, যুক্তরাষ্ট্রস্থ পাক্-রাষ্ট্রদূত এক মার্কিন সেনেটরকে পত্রযোগে জানিয়েছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া আশি কোটি ডলার মূল্যের সমরাস্ত্র ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পাকিস্তান প্রস্তুত আছে, কিন্তু এ প্রসঙ্গ থাক্ এখন।

সম্প্রতি পশ্চিমী শক্তিবর্গ সাইপ্রাসের উপর এক নতুন

চাপ দিয়েছে। সাইপ্রাসের কাছে প্রস্তাব করা হয়েছে যে, তাকে গ্রীসের সঙ্গে সংযুক্ত হ'তে হবে এবং সাইপ্রাসের তুর্কী-অধ্যুষিত অঞ্চলে তুরস্ককে একটি সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের সুযোগ দিতে হবে। গ্রীস ও তুরস্ক উভয়েই নাটোর সদস্য, সুতরাং সাইপ্রাস যদি এভাবে গ্রীসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় ও সেখানে তুরস্ক সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের সুযোগ পায় তবে সেটা পশ্চিমী শক্তি-জোটের পক্ষে একটা বিরাট্ লাভ হবে। কারণ, প্রথমত, সাইপ্রাস ভূমধ্যসাগরে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত, দ্বিতীয়ত, সাইপ্রাসের সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের যে নিকট সম্পর্ক গড়ে উঠছে সেটা পশ্চিমী শক্তিজোটের কাম্য নয়।

এই প্রস্তাব দশ বছর আগে করা হ'লে সাইপ্রাস আনন্দের সঙ্গেই তাতে সম্মত হ'ত। কিন্তু এখন যে-উদ্দেশ্যে প্রস্তাবটি সাইপ্রাসের কাছে পেশ করা হয়েছে তা সাইপ্রাসবাসীদের কাছে সুস্পষ্ট। গত কয়েক বছরে সাইপ্রাসের একটা স্বাধীন রাজনৈতিক চরিত্র গড়ে উঠেছে, তারা আর তাই সহজে পশ্চিমী সামরিক জোটের অংশীদার হ'তে চাইবে না। তারপর তুরস্কের আক্রমণের বিরুদ্ধে সাইপ্রাস গ্রীসের কাছে প্রত্যাশিত সাহায্য পায় নি। এ.কারণে গ্রীক্ সিপ্রিয়ট-দের সঙ্গে গ্রীসের একাত্মবোধ ইতিমধ্যে যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। তাই যে-গ্রীক্ সিপ্রিয়টরা একদিন 'ইনোসিস' আন্দোলন করে সারা সাইপ্রাস মুখর করে তোলে তারাই আজ গ্রীসের সঙ্গে সংযুক্তির প্রস্তাবে বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করছে।

কিন্তু সোভিয়েট প্রভাবে সাইপ্রাস ক্রমে ভূমধ্য-সাগরের কিউবা হয়ে উঠুক এটা পশ্চিমী শক্তিজোট কিছুতেই চাইবে না। এ কারণ কূটনৈতিক মহলে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে যে, 'ইনোসিসে'র অজুহাতে অবিলম্বে হয়ত একটা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে প্রেসিডেণ্ট আর্চবিশপ মাকারিওসকে অপসারিত করা হবে। ইনোসিসের প্রবল সমর্থক গ্রিভাস এখন সাইপ্রাসে, এবং এ ব্যাপারে তাঁর মনোভাব খুব স্পষ্ট নয়।

লেবানন ঃ

ক্ষুদ্র আরব রাজ্য লেবাননের শাসন-ব্যবস্থা ও রাজ-নৈতিক বুঝাপড়া সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-পীড়িত দেশগুলির আদর্শ হওয়া উচিত।

লেবাননের জনপ্রিয় প্রেসিডেণ্ট জেনারেল চেহাব লেবাননবাসীদের একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও দ্বিতীয়বার প্রেসিডেণ্ট পদ গ্রহণে সম্মত না হওয়ায় সেখানে কিছুকাল ধরে একটা রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার ভাব দেখা দেয়। লেবাননের সংবিধানে অবশ্য একজনের দুইবার প্রেসিডেণ্ট হওয়ার অনুমতি নেই। কিন্তু জেনারেল চেহাবকে পুনরায় প্রেসিডেণ্ট পদে অধিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে লেবানন পার্লামেণ্টের ৯৯ জন সদস্যের মধ্যে ... জন সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব করেন। কিন্তু জেনারেল চেহাব তাঁর সিদ্ধান্তে অবিচল থাকায় বাধ্য হয়েই লেবাননবাসীদের অন্য প্রেসিডেণ্টের সন্ধান করতে হয়। অত্যন্ত আশা ও আনন্দের কথা যে, লেবাননবাসীরা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করেই জেনারেল চেহাবের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন এবং চার্লস হেলু হন লেবাননের নতুন প্রেসিডেণ্ট।

সাইপ্রাসের সংবিধানে লিখিত-পড়িত ভাবে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে ব্রিটিশ সরকার যে অন... ঘটিয়েছেন, লেবাননবাসীরা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে তা স্থির করেছেন বলে সেখানকার কোন সংখ্যালঘুরই স্বার্থ উপেক্ষিত হয় না এবং বহু ধরণের ভুল বোঝাবুঝি ও প্ররোচনার মধ্যেও লেবাননবাসীরা নিজেদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্য সন্তোষজনক ভাবে বজায় রাখতে পেরেছেন। লেবাননের প্রায় পনের লক্ষ লোকের মধ্যে অর্ধেক মেরনাইট নামধারী ক্যাথলিক, বাকি অর্দ্ধেক মুস্লিম। মুস্লিমরা আবার শিয়া ও সুন্নী সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এই কারণে লেবাননের বিভিন্ন সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে স্থির করেছেন, লেবাননের প্রেসিডেণ্ট হবেন মেরনাইট, প্রধানমন্ত্রী হবেন সুন্নী মুস্লিম ও পার্লামেণ্টের অধ্যক্ষ শিয়া। গ্রীক আর্থোডক্স ক্রীশ্চান ও দ্রুজ সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্যও তাদের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা আছে।

লেবাননে কোন রাজনৈতিক দলেরও উল্লেখযোগ্য প্রভাব নেই। তার পার্লামেণ্টের ৯৯ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ছয়জন রাজনৈতিক দলের সদস্য। এইসব ব্যবস্থার জন্যই বোধহয় আরব রাজ্য হওয়া সত্ত্বেও লেবাননে এখনও গণতন্ত্র টিঁকে আছে। একজন নির্বাচিত প্রেসিডেণ্টের শূন্যস্থান আর একজন নির্বাচিত প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক পূরণ আজকের আরব রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম।

দ্রোণাচার্যের ছেলে অশ্বত্থমা পিটুলিগোলা জলই দুধ ভেবে খেয়ে হাত তুলে নেচে বেড়াত। এ হ'ল মহাভারতের কথা। ভারতের অবস্থা এখন যা দাঁড়াচ্ছে, তা এ থেকে মোটেই সুবিধার নয়—পিটুলীগোলা জল খেয়ে খেয়ে শিশু অশ্বত্থমারা আজ দুধের স্বপ্নও আর দেখে না। শুধু ভারত নয়, পৃথিবী-জোড়া এই খাদ্য-সংকটের মধ্যে দুধের অভাবটাও এক মস্ত সমস্যা। পুষ্টিবিজ্ঞানীদের মতে দুধ একটা "সম্পূর্ণ খাদ্য।" তদুপরি তা শিশুদের খাদ্য। জনসংখ্যা আজ "বিস্ফোরণের" হারে বেড়ে যাচ্ছে, ফলে মানুষের সমাজে যারা নূতন আগন্তুক সেই শিশুরা জন্মমাত্রেই পৃথিবীর সমস্যার সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে। বস্তুত, খুব অল্প-সংখ্যক শিশুই আজ শুধুমাত্র দুধ বা দুগ্ধজাত জিনিষের উপর নির্ভর করে আত্মীয়-পরিজনের মুখ চিনে নিতে শেখে। ডেনমার্কের ডঃ হান্স পেডারসেন (আন্তর্জাতিক খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ডায়েরী বিভাগের প্রধান) এ সম্বন্ধে যা লিখছেন তা থেকে দুধের চাহিদা ও জোগানের মধ্যে যে বিরাট্ ফারাক, তা সহজেই ধারণা করা যায়। ডঃ পেডারসেনের মতে দুধের চলতি চাহিদার কথা বাদ দিলেও প্রতি দিন পৃথিবীতে মোট যত মানুষশিশুর জন্ম হচ্ছে, তাদের জন্যই প্রতি চৌদ্দ দিনে এক লক্ষ লিটার (এক লিটার=(প্রায়) সিকি গ্যালন) ক'রে বাড়তি দুধের প্রয়োজন। সমস্যার পরিধির কথা এবার চিন্তা করুন। "দুধ সমুদ্রের" কথা মনে আসছে। কিন্তু তা রূপকথার অলীক গল্প।

বাস্তব উপায়, উন্নততর গোপালন পদ্ধতি। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাটিন আমেরিকায় (ভারতের উদাহরণ ত আমাদের চোখের সামনে) এ সম্বন্ধে শিক্ষা খুবই শোচনীয়। ডঃ পেডারসেন যেভাবে চিন্তা করেছেন—সমাধানে তিন দিক্ থেকে অগ্রসর হ'তে হবে। এক, উপযুক্ত লোকদের ডায়েরী শিল্পে আকর্ষণ করা। দুই, তারা যাতে অল্প সময়ের মধ্যে ডায়েরীর কাজে শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে সে ব্যবস্থা করা। এবং তৃতীয়ত, তারা যাতে শেষ পর্যন্ত ডায়েরী শিল্পেই আত্মনিয়োগ করে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা।

কথায় বলে—দুধের স্বাদ ঘোলে মেটে না। যদিও বা মেটে (ধরা যাক মেটে), সেই ঘোলও দুধ থেকেই আসছে। দুধ এবং দুগ্ধজাত খাদ্য মানুষের জন্ম-মৃত্যু আর রোগের সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। অজানা ভবিষ্যতের কালো পর্দায় দুধের রঙে এ কথাটাই লেখা রয়েছে।

পরমাণু ঃ নোনা থেকে মিষ্টি

চোখের যে নোনা জল তার মধ্য দিয়ে আমরা পরমাণুর প্রথম পরিচয় পেয়েছি। কিন্তু সে হ'ল অন্য কথা। আমরা বলছিলাম নোনা জল অর্থাৎ সমুদ্রের যে-জল অন্তহীন অথচ লবণাক্ত তার কথা। জলের অভাবে পৃথিবীর বিস্তৃত অঞ্চল শুষ্ক মরুভূমি। এমন যে বিস্তৃত সাহারা আরব মরুভূমি তাদের পাশেও রয়েছে লোহিত ভূমধ্য আরব সাগর। এই অপার জলধি, তাকে যদি লবণ মুক্ত করে মিষ্টি সুপেয় ক'রে তোলা যায়, তা হ'লে পৃথিবীর মানচিত্রই আজ বদলে যায়। ভূগোল নূতন ভাবে লিখে নিতে হয়। আকাশে সৌধ নির্মাণ স্বপ্নবৎই থাক, কিন্তু মরুভূমির বুকে শস্যক্ষেত তখন আর অবাস্তব কল্পনা নয়। পরমাণুর দৌলতে তাও আজ সম্ভব হ'তে বসেছে। সম্প্রতি এমন এক যন্ত্র তৈরি হয়েছে যা বিদ্যুৎ উৎপাদনের সঙ্গে সাগরের নোনা জলকেও সুপেয় করে তুলবে। আরও যা বড় কথা, তা সাধারণ ব্যয়ের সীমার মধ্যেই এসে-যাচ্ছে। অর্থাৎ পৃথিবীর চেহারা অদলবদল হ'তে বেশি দেরি নেই আর।

পরমাণু সভা

পরমাণু নিয়ে আবার সভা বসছে। রাজনৈতিক বা নিরস্ত্রীকরণ নয়—পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক সভা। সভার উদ্দেশ্য অবশ্য "শান্তির উদ্দেশ্যে পরমাণু।" পরমাণুর যে অগাধ শক্তি, শান্তির কাজে তাকে কি করে নিয়োগ করা যায়। নিয়োগ করা যায়, আরও ভাল ভাবে, আরও সার্থক উপায়ে। একটা গোটা মহাদেশ—যথা আমেরিকা আবিষ্কারের মতই একটা বড় ঘটনা—একটা নূতন শক্তি, যা নিয়ে কাজ করা যায়। মানুষ বর্তমান শতকে তেমনি একটা শক্তি পেল। অথচ মানুষের কি দুর্ভাগ্য, মানুষ এই শক্তি নিয়ে প্রথমেই বোমা তৈরি করল। নূতন শক্তির ক্ষমতা অনেক যাচাই হয়েছে—মানুষের মনটাও অনেক থিতিয়ে এসেছে। কাজের দিনগুলি এখন বিবেচনা করে দেখা যাক। বিচার-বিবেচনা অবশ্য অনেক হয়েছে, কাজও যে একেবারে আরম্ভ হয় নি তা নয়—পরমাণু আজ নানা বিচিত্র কাজে অংশ গ্রহণ করছে, যা আগে কোনদিনই সম্ভব হ'ত না—পরমাণুর জন্যই আজ তা সহজ হচ্ছে। বোমা তৈরির মত এটাও পরমাণু-শক্তির আর এক দিক। তবে পরমাণু আমাদের কাছে এখনও নূতন—তার অনেক সম্ভাবনা এখনও পুরোপুরি যাচাই করা হয় নি। আর সম্ভাবনার কথা জানা গেলেও তাকে কাজে নামানোর উপায়গুলি রপ্ত করা হয় নি। একটা নূতন মহাদেশ আবিষ্কারের মতই আমাদের সামনে পরমাণু-শক্তির অনন্ত সম্ভাবনা। তাকে নিয়ে বার বার আলোচনা-সভা ডাকার উপলক্ষ্য তাই রয়ে গেছে, নানা আন্তর্জাতিক সমাবেশ তাই আয়োজন করা হচ্ছে। সম্প্রতি বিশ্বসংস্থা এমনই একটা বৃহৎ সভার আহ্বান করেছেন। আগামী ৩১শে আগষ্ট থেকে ৯ই সেপ্টেম্বর—দশদিন ব্যাপী একটা আন্তর্জাতিক সমাবেশ বসছে শান্তির কাজে, পরমাণুর বিভিন্ন দিকগুলি নিয়ে আলাপ-আলোচনার জন্য! এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পাঁচটি আন্তর্জাতিক সংস্থাসহ পৃথিবীর ৩৭টি

দেশ অংশ গ্রহণ করেছেন। সভার কাজ পরিচালনার জন্য ভারতের পরমাণু-বিজ্ঞানী ডঃ হোমি জে, ভাবা সহ সাত জন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিককে নিয়ে একটা পরামর্শদাতা কমিটি গঠন করা হয়েছে। স্থির হয়েছে, সভায় বিজ্ঞান প্রবন্ধ পাঠ হবে মোট ৭৬১টি। তার মধ্য ভারত থেকেই ২১টি। প্রতিটি প্রবন্ধের উপর আলোচনার পর তা ইংরেজী ও ফরাসীভাষায় বইয়ের আকারে প্রকাশ করা হবে।

শক্তির উদ্দেশ্যে পরমাণু-শক্তি ব্যবহারের বিভিন্ন দিক্ নিয়ে এ ধরনের সর্ব্বাঙ্গীণ বৈজ্ঞানিক আলোচনা সত্যই অভিনব। তবে রাষ্ট্র-সংঘের পরিচালনায় এর আগে আরও দু'টি অনুরূপ আলোচনা-সভার আয়োজন হয়েছিল যথাক্রমে ১৯৫৫ ও ১৯৫৭ সালে। এটি তৃতীয়।

অথ মৎস্য পরিবহন

মাছ। মাছ।

মাছের বাজারের নানা কথায় খবরের কাগজ আজ ভরে উঠেছে। মাছের জন্মমৃত্যু সংখ্যা অবস্থান এবং বিকার (বিকার—কথাটির তাৎপর্য্য বিশেষ অনুধাবনযোগ্য, যদিও বাজারে বাজারে তার বরফবিগলিত রূপ চোখ খুললেই চোখে পড়ে) এ সমস্ত গুরুতর বিষয় নিয়ে সাধারণ থেকে বিশেষজ্ঞ কারোই মাথাব্যথার অন্ত নেই। আমরা অবশ্য মস্তিষ্কের পক্ষে অহিতকর এ সব নিয়ে মাথা ঘামাতে যাচ্ছি না। আমাদের প্রসঙ্গ শুধুমাত্র পরিবহন—মৎস্য-পরিবহন। আমাদের না ব'লে বিশেষজ্ঞদের বললেই আরও ভাল হ'ত। কারণ এ সমস্ত বিশেষজ্ঞরা জার্মানীর হুসুম (HUSUM) নামক জায়গায় মিলিত হয়ে (হুসুম—ভূগোলের মতে এটি কি মৎস্য সংখ্যাগুরু অঞ্চল!) এ গুরুতর প্রসঙ্গটি নিয়ে বিচার-বিবেচনা করবেন। শুনলাম, মাছের পরিবহন সম্বন্ধে অন্তত ১০০টি পদ্ধতির তাঁরা খোঁজ পেয়েছেন, এতগুলো বিভিন্ন উপায়ে নাকি মাছ এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় চালান দেওয়া হয়ে থাকে। কিছুটা দ্বিধার সঙ্গে আমরা ১০১ নম্বর পদ্ধতিটা সম্বন্ধে তাঁদের ওয়াকিবহাল করতে চাই। (বিশেষজ্ঞদের জানাতে দ্বিধাই সঙ্গত, তবে দুরাশা এজন্য যে, বিশেষজ্ঞরা অনেক সময়ই সর্ব্বজ্ঞ থাকেন শুধু নিজের বিষয়টি বাদে;) বিশেষজ্ঞদের কথা এখন থাক, আমাদের যা বক্তব্য: আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন "জীয়ল" মাছ, কৈ মাছ চালানের নূতন কৌশল—ইলিশ মাছের মত বরফবন্দী অবস্থায়। একশ'য়ের পর এটিই বোধহয় একশ' এক নম্বর কৌশল। কোন উৎসাহী পাঠক যদি বিশেষজ্ঞ মহলে কথাটার "টোপ" ফেলে আসতে পারেন, চাই কি, সারাজীবনের তরে মৎস্য ভোগ নিশ্চিত।

'বৃহৎ বঙ্গ'

এই বঙ্গ আজ ভঙ্গ খণ্ডিত দ্বিধাবিভক্ত। তবু আর এক দিক্ থেকে তা প্রসারিত। পরিব্যাপ্ত। বাঙালী শুধু যে বঙ্গের বাইরেই রয়েছে তা নয়, পদমর্য্যাদার আসনেও আজ প্রতিষ্ঠিত। মহাদেশের অখণ্ড ভূমি ছাড়িয়েও যেমন দ্বীপময় ভূমি—ছোট-বড়ো নানা দ্বীপ, এই ভঙ্গ খণ্ডিত বাংলাও তেমনি বৃহৎ হতে বৃহত্তর হয়ে পৃথিবীর নানা দেশে আজ ছড়িয়ে পড়েছে। এই "বৃহৎ বঙ্গে"রই এক কৃতী সন্তান শ্রীউপেন্দ্রলাল গোস্বামী। সম্প্রতি (১লা জুলাই, ১৯৬৪ থেকে) তিনি আন্তর্জাতিক পরমাণুশক্তি সংস্থার (International Atomic Energy Agency) ডেপুটি ডাইরেক্টার জেনারেল রূপে নিযুক্ত হয়েছেন।

শ্রীযুক্ত গোস্বামী ভারত সরকারের একজন আই-সি-এস। ১৯ সালে বর্ম্মাদেশের রেঙ্গুনে তাঁর জন্ম। ১৯৩৬ সাল থেকে তিনি ভা সরকারের অধীনে বিভিন্ন পদমর্য্যাদায় যোগ্যতার সঙ্গে কাজ ক আসছেন। বর্ত্তমান কর্ম্মভার গ্রহণের আগে গত তিন বছর তিনি পরমাণু সংস্থার অর্থনীতি ও কারিগরি সাহায্য বিভাগের ডাইরেক্টা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নূতন পদে তাঁর কর্ত্তব্য হ'ল পরমাণু

শ্রীউপেন্দ্রলাল গোস্বামী

বিষয়ে গবেষণা-যন্ত্র ও বিশেষজ্ঞদের আদান-প্রদান, উপযুক্ত ি ব্যবস্থা ইত্যাদির পরিচালনা করা।

শ্রীযুক্ত গোস্বামীর মত কৃতী সন্তানদের সেবাতেই "বৃহৎ ব ভূমি প্রসারিত—আরও প্রসারিত হবে।

আশী দিনে ভূপ্রদক্ষিণ : পুনর্ভ্রমণ

স্বপ্নচারী জুল ভার্নে স্বদেশভূমি ফ্রান্সের সীমানা ছেড়ে বেশিদূর নি। কিন্তু মনে মনে তিনি পৃথিবী প্রদক্ষিণের কল্পনা করেছিে সেই কল্পনার কিছু কিছু বিবরণ তাঁর "আশী দিনে ভূ-প্রদক্ষিণ" একটা বইয়ে তোলা রয়েছে। ১৮৭৩ সালে ছাপা সেই বই। থেকে প্রায় একশ' বছর আগেকার কল্পনায় পৃথিবী ভ্রমণের নিয়েছিল আশীটি দিন—জল এবং স্থলপথে। প্রায় একশ' বছর বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যায়ে জুল ভার্নের পরিকল্পিত ভ্রমণ-পথে কতটা লাগতে পারে তার হিসাব আমাদের কাছে বেশ কৌতূহ বিষয় হবে। মোটামুটি একটা হিসাব আমরা সংগ্রহ করতে পে তুলনামূলক সেই তালিকা এখানে পেশ করা গেল।

ভ্রমণ-পথ	১৮৭৩ সালের হিসাবে সময়	বর্তমানের হিসাবে সময়
(ক) লণ্ডন থেকে সুয়েজ খাল ব্রিণ্ডিসি (Brindisi) হয়ে (রেল ও সমুদ্রপথে)	৭ দিন	১৫ দিন
(খ) সুয়েজ থেকে বোম্বাই	১৩ দিন	
(গ) বোম্বাই থেকে কলকাতা	৩ দিন	৩ দিন
(ঘ) কলকাতা থেকে হংকং	১৩ দিন	১২ দিন
(ঙ) হংকং থেকে য়ুকোহামা	৬ দিন	১৮ দিন
(চ) য়ুকোহামা থেকে সান-ফ্রান্সিসকো	২২ দিন	
(ছ) সানফ্রান্সিসকো থেকে ন্যু ইয়র্ক	৭ দিন	৫ দিন
(জ) ন্যু ইয়র্ক থেকে লণ্ডন, পুনরায়	৯ দিন	৫ দিন
	মোট—৮০ দিন	৫৮ দিন

মোট ২২ দিনের তফাৎ। লক্ষ্যণীয়, রেলপথে সময়ের হিসাব বেশ ফাঁকাছি রয়েছে। দ্রুততর হয়েছে ষ্টীমারের গতি। আকাশ-পথে প্লেনের গতি আজ আরও উদ্দাম। শব্দের গতিকেও তা ছাড়িয়ে । কিন্তু এ সমস্ত যান্ত্রিক গতি যতই উঁচুতে উঠুক না, গল্পকার ভার্নের কল্পনার গতি কিছুতেই স্তব্ধ হ'ত না। উপযুক্ত যন্ত্র বা নের অভাবে তা অভিনব সমস্ত উপায় কল্পনা করে নিত! ৫৮ ন পৃথিবী ভ্রমণের বদলে আজও অনেকে তাই তাঁর ৮০ দিনে প্রদক্ষিণকেই সাগ্রহে মেনে নিচ্ছে। কল্পনার কাছে বাস্তব এভাবে রাভব স্বীকার করে নিচ্ছে। স্বীকার করছে বাস্তবেরই কারণে। না এক অর্থে ভবিষ্যতের বাস্তব। জুল ভার্নের বৈজ্ঞানিক কল্পনার য় এ কথা বার বার সত্য বলে প্রমাণ পেয়েছে।

রলোকে লিও সিলার্ড

সিলার্ড মারা গেলেন। অধ্যাপক লিও সিলার্ড—আর একজন মাণু-বিজ্ঞানী। আর্থার কমটন তাঁর "এটমিক কোয়েষ্ট" বইয়ের মকায় লিখছেন (রমণ এফেক্ট-এর রমন সিরেনকভ এফেক্ট-এর সবিশেষ খ্যাত), পরমাণুর শক্তি উদ্বোধনের সঙ্গে যারা ব্যক্তিগত বে জড়িত ছিলেন, এই পরমাণুর যুগ—পরমাণুর যজ্ঞের যাঁরা হোতা রা কালের বিনাশী-শক্তির কবলে একে একে গত হচ্ছেন, সেই বিগত দের স্মরণীয় ঘটনাগুলি ধরে রাখার জন্য তাই তিনি পুঁথি লিখছেন। যুদ্ধের সর্বাত্মক আতঙ্ক আর উন্মাদনার মধ্যে তিল তিল সঞ্চয়ে মাণুর শক্তি সঞ্চয়ের সেই বিস্ময়কর কাহিনী। ভাবীকালের জন্য ই বিবরণ গচ্ছিত রইল। "এটমিক কোয়েষ্টের" কমটন আর দের মধ্যে নেই, পরমাণুর অন্বেষণ করতে করতে বছর দুই আগে নি অনির্দিষ্ট মহাকালের পথে অন্তিম প্রস্থান করলেন। তারও গে গেলেন নীলস্ বোর, গেলেন এনরিকো ফের্মি। সেই একই পথে প্রতি সিলার্ড, অধ্যাপক লিও সিলার্ড। পরমাণুর যুগ এখনও চলছে। ন্তু এঁদের তিরোধানে একটা যুগের শেষ হ'তে চলল। পরমাণু গর এঁরা প্রথম নায়ক।

১৯৩৯ সালের ২রা আগষ্ট আইনষ্টাইন আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে একটা চিঠি লেখেন, এই চিঠিতে সিলার্ডের কথা উল্লেখ ছিল। চিঠির প্রথম দুটো স্তবক আমরা এখানে তুলে ধরছি।

"ই. ফের্মি এবং এল. সিলার্ডের যে সমস্ত-কাজ আমি সম্প্রতি দেখেছি তা থেকে আমার আশা জাগছে যে, খুব শীঘ্রই য়ুরেনিয়াম পরমাণু নূতন একটা শক্তির উৎসরূপে দেখা দেবে। অবস্থা যে পর্যায়ে এসে দাঁড়াচ্ছে, তা বিশদ পর্যবেক্ষণের অপেক্ষা রাখে, এবং এতে সরকারী হস্তক্ষেপেরও প্রয়োজন হ'তে পারে।...

"গত চার মাসের মধ্যে ফ্রান্সে জোলিও এবং আমেরিকায় সিলার্ডের গবেষণার ফলে অধিক পরিমাণ য়ুরেনিয়ামে পর্যায়বদ্ধ প্রতিক্রিয়া (Chain vaction) এবং তা থেকে প্রচুর শক্তি ও রেডিয়ামের মত মৌলিক জিনিষ পাওয়া খুবই সম্ভব বলে মনে হচ্ছে।..."

অধ্যাপক লিউ সিলার্ড

এই চিঠিতেই আইনষ্টাইন পরমাণুর শক্তিকে জাগ্রত করে অভিনব বোমা তৈরির কথা উল্লেখ করেছিলেন। ক্রমে সে সম্ভাবনাই সত্য হ'ল। নানা রকম কষ্টসাধ্য গবেষণা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের মধ্যে ১৯৪৫ সালে অ্যালামাগরডো-র মরুভূমিতে দুনিয়ার প্রথম এটমিক বোমা বিস্ফোরণ হ'ল। শান্তিকামী আইনষ্টাইন সত্যসন্ধানী আইনষ্টাইন এজন্য বহু মানুষের যুক্তি-বিবেচনার কাছে আর একবার যাচাই হয়েছেন। সিলার্ডকেও অনেকে একই দিক থেকে দেখেছেন। পরমাণু-বিজ্ঞানীদের পরমাণু গবেষণার বিচার হয়েছে খুবই আংশিক

দৃষ্টিকোণ থেকে। শান্তিকামী সৈনিকদের মত পরমাণু-বিজ্ঞানীরাও যে পরমাণু অস্ত্রের বিরোধী হ'তে পারেন, এ যেন প্রায় অবিশ্বাস্য। অথচ অধিকাংশ প্রধান বিজ্ঞানীদের কাছে এ কথাই বড় সত্য। আইনষ্টাইন সিলার্ডের পক্ষেও তা সত্য।

পরমাণু অস্ত্রের বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে বিজ্ঞানী সিলার্ড তাঁর ছোট-বেলায় পড়া একটা বইয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। হাঙ্গেরীর ভাষায় লেখা এই বইটার যা মূলকথা (সিলার্ড আমেরিকাবাসী হ'লেও মূলত হাঙ্গেরীয়)—শয়তান আদি মানুষ আদামের চোখের সামনে মানুষ জাতির ইতিহাস তুলে ধরছে। সূর্য্য নিস্তেজ হয়ে ক্রমশঃ মৃত্যুমুখে। একমাত্র অ্যাস্কোমোরাই টি'কে রইল। কিন্তু দারুণ খাদ্যাভাব। অ্যাস্কোমোরা অনেক, অথচ শীলমাছ মাত্র কয়েকটি। বইয়ের মূল ভাবনাটুকু হ'ল এই যে, ভবিষ্যতের বিষয় চিন্তা করতে গেলে আশা করার মত বিশেষ কিছু থাকে না। সিলার্ড বলছেন, "এটম বোমার ব্যাপারেও অবস্থা সেই একই রকম। কিন্তু এই অল্প পরিমাণ আশার উপরই আমাদের জোর রাখতে হবে।"

সিলার্ড ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র হিসাবে তাঁর কলেজ-জীবন শুরু করেছিলেন। পরে তত্ত্বগত পদার্থ বিদ্যাই তাঁর পাঠ্যবিষয় হ'ল। এর পরেও কয়েকবার তাঁর বিষয়ান্তর হয়। জীবপদার্থবিদ্যা ছেড়ে কালে তিনি একজন পরমাণু-বিজ্ঞানী হলেন। স্বদেশ হাঙ্গেরীর মায়া ছেড়ে নানা দেশ ঘুরে শেষ পর্য্যন্ত আমেরিকা তাঁর আশ্রয় হ'ল। পরমাণু তাঁর বিজ্ঞান-সাধনা হ'ল। কালে এই পরমাণু পরমাণু-বোমা হ'ল। যে বিস্ফোরণ তাঁকে স্থান থেকে স্থান, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে সারাজীবন অস্থির ঘূর্ণীপাকে ছুটিয়ে রেখেছিল তা-ই যেন কালে তাঁর জীবনের ইন্ধন পেয়ে পরমাণুর মধ্যে অগ্নিময় হয়ে উঠেছিল। আজ তার সমস্তই ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

অধ্যাপক লিও সিলার্ড পরলোক গমন করেছেন।

জগজিৎ সিং : কলিঙ্গ পুরস্কার প্রসঙ্গ

আন্তর্জ্জাতিক কলিঙ্গ পুরস্কার সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে দু'বার আলোচনা করেছিলাম। তথাকথিত 'পপুলার সায়েন্স' (Popular Science) অর্থাৎ সাধারণের মত করে বিজ্ঞান আলোচনার লেখকদের সম্মান জানানোর উদ্দেশ্যে ১৯৫১ সালে আন্তর্জ্জাতিক শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (UNESCO) এই পুরস্কারটির প্রবর্ত্তন করেন উড়িষ্যার (কলিঙ্গদেশের) শ্রীবিজয়ানন্দ পট্টনায়কের আর্থিক সহায়তায়। পর্য্যন্ত ১১ বার পুরস্কার-প্রাপকদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। ফ্রান্স থেকে, জার্ম্মানী থেকে, ইংলণ্ড, আমেরিকা, ভেনজুয়েলা থেকে পুরস্কার পেয়েছেন জ্ঞানী গুণী মনীষীরা। বারট্রাণ্ড রাসেল, জুলিয়ান হাক্সে, ডী ব্রগ্‌লি। জর্জ্জ গামো তাঁদেরই কয়েকজন। এঁদেরই পাশাপাশি নাম শ্রীজগজিৎ সিংহ। ১৯৬৩ সালের কলিঙ্গ পুরস্কার ভারতের জগজিৎ সিংহ পাচ্ছেন। ভারতে এই প্রথম। এশিয়ায় এই প্রথম।

জগজিৎ সিং ভারতীয় রেলওয়ে বোর্ডের ট্রাফিক (ট্রান্সপোর্টেশন) ডিরেক্টর আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা ও সময়-দেশ সন্ততি (Space-time Continuum) সম্বন্ধে দুরূহ ভাবনাগুলি তিনি সাধারণের ভাষায়

শ্রীজগজিৎ সিং

সাধ্যমত ব্যাখ্যা করেছেন। "Great Ideas & theories of Modern Cosmology" এবং "Mathematical Ideas, Their Nature & Daily Use" তাঁর দু'টি বিখ্যাত পুস্তক।

শ্রীযুক্ত সিং ইংরাজীতে লেখেন। ইংরাজীতে লিখেই তিনি আন্তর্জ্জাতিক পুরস্কার পেলেন। ইংরেজী একটা "আন্তর্জ্জাতিক ভাষা। ইংরেজীতে তিনি যদি না লিখতেন তবে আন্তর্জ্জাতিক স্বীকৃতি জুটত কি না ভাবনার কথা। চীন জাপান এবং অন্যান্য অনেক ভাষার লেখকেরাও এ প্রশ্ন তুলতে পারেন। তোলেনও।

জগজিৎ সিং-এর এই সম্মান লাভে আমরা সবাই আনন্দিত।

য়ুইগনার, জেনসেন, মেয়ার

১৯৩৩ সালে ইউজিন পল য়ুইগনার এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন 'আজকের আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে পরমাণুর গঠন নির্ণয়ই আসল সমস্যা নয়। সব থেকে গুরুতর প্রশ্নটি হ'ল নিউক্লিয়নস্ পরমাণুর কেন্দ্রবস্তু নিউক্লিয়াসের উপাদান কণা সমষ্টি। বার্লিনের বিখ্যাত TECHNISCHE HOCHSCHULE-এর কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর স্নাতক (পরে ১৯২৫ সালে এই একই বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রীধারী) ডঃ য়ুইগনার পরমাণুর ভিতরকার এই ছোট্ট জগতের অনন্ত সমস্যাগুলি খুব ভালভাবে চিনেছেন। বার্লিন থেকে প্রিন্সটন পর্য্যন্ত তাঁর চল্লিশ বছরের কর্ম্মজীবনে (অধ্যাপক য়ুইগনারের বর্ত্তমান বয়স ৬২, ১৯০২ সালে হাঙ্গেরীর বুডাপেষ্টে তাঁর জন্ম) তিনি এ সমস্ত জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে ফিরছেন। য়ুইগনার প্রিন্সটনে গাণিতিক পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। গণিতের অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হয়ে তিনি পরমাণুর রহস্য মোচনের পথে অগ্রসর হয়েছেন। য়ুইগনারই সর্ব্বপ্রথম এটমিক স্পেক্ট্রা (Atomic Spetra) সংক্রান্ত কোয়ান্টাম ম্যাকানিক্স-এ সমষ্টি তত্ত্ব' (Gronp Theory) প্রয়োগ করেন। প্যারিটি

জেমাসন

য়ুইগনার

শ্রীমতী মেয়ার

(Parity)-র ধারণাও তাঁরই সৃষ্টি। পরমাণুর ভিতরকার বিভিন্ন মৌলিক কণিকা ও শক্তির প্রতিক্রিয়া এবং বিচ্ছুরণের প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা ম্যাট্রিক্স গণিতের (Scattering Matrix)-এর অভিনব তত্ত্ব দাঁড় করান। ১৯৪২ সালের ২রা ডিসেম্বর যখন প্রথম এটম বোমা তৈরির সম্ভাবনা বিজ্ঞানীদের কাছে যাচাই হয়ে গেল, অধ্যাপক য়ুইগনার তখন সাদা কথায় মন্তব্য জানালেন, "পরমাণুর যুগ এসে গেছে।" এই যুগকে টেনে আনার জন্য ১৯৩৯ সাল থেকেই আমেরিকার সরকারী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যুঝে আসছেন। অবশ্য পরমাণু বোমা প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি খুবই সংযত থাকার পক্ষপাতী। ১৯৬০ সালে অধ্যাপক য়ুইগনার "শান্তির জন্য পরমাণু" (Atom for Peace) পুরস্কার পেলেন।

অধ্যাপক জে, হান্স ডি, জেনসেন জার্ম্মান দেশের বৈজ্ঞানিক। ১৯০৭ সালে হামবুর্গে তাঁর জন্ম; অধ্যাপক মেরিয়া জিওপার্ট মেয়ার জার্ম্মাণ মহিলা হ'লেও বর্ত্তমানে আমেরিকার ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। তাঁর স্বামী জোসেফ মেয়ার একজন কিজিক্যাল ক্যামিষ্ট। অধ্যাপক মেয়ার এবং জনসন নিউক্লিয়ার শেল-মডেলের যুগ্ম প্রণেতা (Nuclear—shell model)। হেনাভারের TCCHNISCHE HOCHSHULE থেকে জেনসেন এবং কালিফোর্ণিয়ার La JOLLA থেকে মেয়ার একই সময় স্বতন্ত্রভাবে (১৯৪৯ সালে) এই তত্ত্বের প্রস্তাব করেন। এর পর থেকে তাঁদের এই অভিনব তত্ত্ব অনেক ডালপালায় প্রসারিত হয়ে পরমাণু বিজ্ঞানের অনেক জটিল সমস্যার মীমাংসা করতে সফল হয়েছে।

য়ুইগনার, জেনসেন এবং মেয়ার চলতি বছরে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেলেন। ৫১ হাজার ডলারের অর্থমূল্যের অর্দ্ধাংশ অধ্যাপক য়ুইগনারের সম্মান মূল্য, বাকি অর্দ্ধেক অধ্যাপক জেনসেন এবং মেয়ার। উল্লেখযোগ্য যে, ১৯০৩ সালে ম্যাডাম কুরীর দ্বিতীয়বার নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর (অধ্যাপিকা কুরী দু'বার এই মহার্ঘ পুরস্কার পেয়েছিলেন) শ্রীমতী মেয়ারই হচ্ছেন দ্বিতীয় মহিলা, যিনি নোবেল প্রাইজ পেলেন।

এ. কে. ডি.

—*—

অভ্যাস ত্যাগ

কোনো একটা কাজ বারবার করিতে করিতে তাহা সম্পন্ন করিবার যে একটা বিশেষ ধরণ আয়ত্ত হইয়া যায় এবং যাহা সুপ্তচেতন অবস্থাতেও সহজে করিয়া যাওয়া যায় তাহাকে অভ্যাস বলে। যে অভ্যাস অপর লোকের খারাপ ঠেকে তাহা বদ অভ্যাস, যাহা লোকের মনোযোগ আকৃষ্ট করে না তাহাই সুঅভ্যাস। লোকের সামনে বসিয়া পা নাচানো, আঙুল মটকানো, লিখিবার সময় মুখভঙ্গি করা, গান গাহিবার সময় মাথা নাড়া প্রভৃতি মুদ্রাদোষ বদঅভ্যাস; নেশার দ্রব্যে আসক্ত হওয়াও বদঅভ্যাস। কিন্তু লেখা, পড়া, চলা, কথা বলা সমস্তই অভ্যাসের ফল—তাহা সকল লোকের মধ্যে একই রকমে সম্পন্ন হইলে লোকের চোখে বিসদৃশ লাগে না।

নিউইয়র্কের মেডিক্যাল রেকর্ড পত্রিকায় একজন শরীর ও মনের তত্ত্বজ্ঞ ডাক্তার বলিতেছেন যে সকল-পদার্থেরই অভ্যাস আছে। কল চলিতে চলিতে তাহার চলার একটি ধরণ হয়, তাহাই তাহার অভ্যাস। জুতো জামা পরিতে পরিতে গায়ের সঙ্গে তাহাদের যে মিল হয় তাহাই তাহাদের অভ্যাস। পাহাড়ের গা বহিয়া বৃষ্টির ধারা ঝরিতে ঝরিতে যখন অভ্যাস হইয়া দাঁড়ায় তখন তাহাকে আমরা ঝরণা বা নদী বলি। অভ্যাস ছাড়া বস্তু বা জীব নাই, অভ্যাস প্রকৃতিগত। সুতরাং অভ্যাস বদ হইলেও তাহা ছাড়াইবার জন্য কাহাকেও তিরস্কার বা শাস্তি দেওয়া উচিত নয়। তাহাকে ঐ অভ্যাসের কদর্য্যতা অপকারিতা বুঝাইয়া তাহার নিজের সচেতন ইচ্ছাযুক্ত চেষ্টায় উহা ছাড়িয়া দিতে সাহায্য করা উচিত। অভ্যাস মানে কতকটা মস্তিষ্কক্রিয়া ও পেশীক্রিয়া দেহ ও মনের প্রত্যেক অংশে বদ্ধমূল হইয়া উঠা; সুতরাং তাহা ত্যাগ করিতে হইলে প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও সুস্থস্নায়ু শিরা লাভ করিবার অনুকূল অবস্থা পাওয়া দরকার। তাহার জন্য খোলা জায়গায় ব্যায়াম ও প্রচুর নিদ্রা আবশ্যক। অনেক সময় স্থান ও অবস্থানের পরিবর্ত্তনে বদঅভ্যাস ছাড়িয়া যায়। অভ্যাস প্রতিকারের চেয়ে অভ্যাস হওয়া প্রতিরোধ করা ঢের সহজ ও বুদ্ধিমানের কার্য্য।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩২৩।

যিনি যে স্থানটিকে পবিত্র মনে করেন, বা যেখানে ভগবানের পূজা করেন, সেই স্থানটিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সুসজ্জিত রাখিতে চেষ্টা করেন। হিন্দুর দেবমন্দির ও তপোবন, বৌদ্ধের চৈত্য ও বিহার, খ্রীষ্টিয়ানের গির্জ্জা ও সমাধিস্থান, মুসলমানের মসজিদ ও কবর প্রভৃতি স্থান পরিষ্কার রাখা হয়। অধিকন্তু জগতের সুন্দরতম নিকেতন-সমূহের মধ্যে অনেকগুলি এই জাতীয়।

আমরা আপনাদিগকে দেশভক্ত বলিয়া মনে করি। কিন্তু বঙ্গের খানা, ডোবা, রাস্তাঘাট, পচা পুকুর, পূতিগন্ধময় নর্দ্দমা, আগাছা ও জঙ্গলপূর্ণ পতিত-ভূমি দেখিলে কি মনে হয় যে আমরা দেশকে পবিত্র স্থান মনে করি? অরণ্যের গম্ভীরতা ও সৌন্দর্য্য বিধান করিবার জন্য মানুষকে কোন চেষ্টা করিতে হয় না। পর্ব্বতের ভীমকাণ্ড শোভা মানুষের চেষ্টার কোনও অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু মানুষের বাস ও মানুষের হাত যেখানে আছে, সেখানকার চেহারা দেখিলেই বুঝা যায় যে, মানুষ নিজের জীবনকে ভগবানের লীলাক্ষেত্র মনে করিতেছে কি না।

দেশকে আমরা যে ভক্তি করি, পবিত্র মনে করি, তাহা এই জন্য যে, উহার ভিতর দিয়া ভগবানের স্নেহ-দয়া আমাদিগকে পুষ্ট করে; উহার প্রত্যেক অণু-পরমাণুতে তিনি বিরাজিত। তবে উহাকে এমন হতশ্রী করিয়া কেন রাখি?

ফুল বাগানটির মতন সুন্দর সাজান পল্লী, নগর, দেশ যে পৃথিবীতে নাই, তাহা ত নয়।

দারিদ্র্যে অনেক লোককে অপরিষ্কার অশুচি থাকিতে এবং নিজগৃহ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহকে ঐরূপ অবস্থায় রাখিতে বাধ্য করে, দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি। কিন্তু অনেকের সচ্ছল অবস্থা সত্ত্বেও ঐরূপ দশা দেখা যায়, আবার অনেক দরিদ্র ব্যক্তিও অপরিচ্ছন্নতা ও অশুচিতা সহ্য করিতে পারে না। ইহা কিন্তু সত্য যে, দরিদ্র অপেক্ষা ধনীর পক্ষে নিজ দেহের ও বাসভূমির পরিচ্ছন্নতা সাধন সহজসাধ্য।

আমরা গরীব কেন? ভারতবর্ষ বিদেশীর অতুল ঐশ্বর্য্যের কারণ, অথচ ভারতবাসী গরীব। ইহা কাহার দোষ?

আমরা দেশকে "জনক-জননী-জননী," "দেশমাতা" প্রভৃতি নামে অভিহিত করি; "বন্দেমাতরম" গান গাই। দেশবাসীকে ভাই বলিয়া রাখীবন্ধন করি, "ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই ভেদ নাই," প্রভৃতি মন্ত্র উচ্চারণ করি। তাহা হইলে কার্য্যতঃ দেখান কর্ত্তব্য যে যাহারা চিরজীবন অর্দ্ধাশনে কাটায়, যাহারা অর্দ্ধনগ্ন ও চীর-পরিহিত, যাহাদের চালে খড় নাই, যাহাদের কুঁড়েঘরও নাই, যাহারা নিরক্ষর, যাহারা পাইক গোমস্তা পিয়াদা কনষ্টেবল হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চপদস্থ নানা জনের উৎপীড়ন সহ্য করে, যাহারা পীড়িত হইলে বিনা চিকিৎসায় বিনা যত্নে মারা পড়ে, যাহারা দুর্নীতিগ্রস্ত হইয়া পশুর অধম জীবন যাপন করে, তাহারাও আমাদেরই দেশমাতার সন্তান।

কিন্তু সে ভাই কেমন ভাই যে কেবল আপনার সুখ লইয়াই ব্যস্ত, মাতার অন্য সন্তানদের কোন খবর রাখে না। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বৈশাখ, ১৩২১।

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু : মনোরঞ্জন গুপ্ত, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য ২·৫০ নঃ পঃ।

ইতিপূর্ব্বে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, প্রমথনাথ বসু প্রভৃতির জীবন-কথার মাধ্যমে গ্রন্থকার আমাদের অনেক তথ্যই পরিবেশন করিয়াছেন। যাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণার তত্ত্ব আমরা প্রায় কেহই জানি না—শুধুমাত্র জানি একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলিয়া, যাঁর গবেষণার বিষয় বসু-আইনষ্টাইন নামে জগৎ-খ্যাত, সেই সত্যেন্দ্রনাথকে বিশেষ করিয়া জানিবার কৌতূহল কাহার না হয়? তিনি নিজের কথা কোনদিনই বলেন নাই বা বলার কোন পথও রাখেন নাই; সেই অসাধারণ বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথের অতি দুর্লভ জীবন-কথা শুনাইয়া গ্রন্থকার আমাদের বিস্মিত করিয়া দিয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথের ছোটবেলার কাহিনী যাহা তাঁহার পিতার মুখ হইতে শোনা, যাহা কোনদিনই জানিবার উপায় ছিল না, সেইগুলি সংগ্রহ করায় এই পুস্তকখানি আরও মূল্যবান হইয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথের বাল্য-জীবন, ছাত্র-জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলি এমন করিয়া আর কে শুনাইতে পারিতেন?

তাঁর অসাধারণ প্রতিভার কথা বলিতে গিয়া, তাঁহার ছাত্রসুলভ অনুসন্ধিৎসার দিকগুলি দেখাইয়া গ্রন্থকার বিজ্ঞানীকে আরও ভাল করিয়া আমাদের দেখাইয়া দিলেন। সবচেয়ে বড় কথা, পৃথিবীর সমাদর পাইয়াও তাঁর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই। এমনই উদাসীন। এই আত্মভোলা লোকটির কথা মনোরঞ্জনবাবু তাঁর গ্রন্থে বিশেষ করিয়া ফুটাইয়াছেন। চরিত্রের এই দিকটি দেখাইতে তাঁহাকে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ই লিখিতে হইয়াছে।

তাঁহার জীবনের আর একটি বড় অধ্যায়—মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-শিক্ষা। এই চেষ্টা তিনি আজও করিতেছেন। তিনি বলেন, "মাতৃভাষায় শিক্ষা দিতে হবে, তাতে বিজ্ঞানও শিক্ষা দেওয়া যায় এবং এই পথেই দ্রুত নিরক্ষরতা দূর হবে।"

এই ক্ষুদ্র বইখানিতে গ্রন্থকার সত্যেন্দ্রনাথের বিভিন্ন দিক্ আমাদের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন। যেমন অত বড় বৈজ্ঞানিক হইয়াও তিনি সাহিত্যিক এবং শিল্পী, বিশেষ করিয়া, তাঁহার এস্রাজের হাত খুব মিঠা। অবসরকালে আজও তিনি তাহা বাজান। একদা তিনি অনুশীলন সমিতিরও সভ্য ছিলেন।

আকারে ক্ষুদ্র হইলেও, গ্রন্থটি নানা তথ্যে ভরপুর। সত্যেন্দ্রনাথকে জানিতে হইলে, এ গ্রন্থ অবশ্যপাঠ্য। মনোরঞ্জনবাবুর শ্রম সার্থক হইয়াছে।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্, ২৪৩।১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোড, কলিকাতা—৬।

এখানি সাহিত্য-সাধক চরিতমালার অন্তর্গত শততম গ্রন্থ। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় বাঙ্গালী জাতির নিকট একটি পরম বিস্ময়। তিনি পণ করিয়াছিলেন, ফিরিঙ্গীর জেলে যাইবেন না, আর এই পণ রক্ষা করিয়াই তিনি মৃত্যুকে বরণ করেন। প্রাক্-স্বদেশী ও স্বদেশীযুগের নব-ভাবনার উদ্গাতা অরবিন্দ নিবেদিতা রবীন্দ্রনাথের সমগোত্রীয় ছিলেন ব্রহ্মবান্ধব। ভারতবর্ষের স্বাধীনতাই ছিল তাঁহার জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য। ঐ সময়ের নব-ভাবনার আদর্শ প্রচারে তিনি সাহিত্যকেই বাহন করিয়াছিলেন। তাই একাধারে তিনি স্বাধীনতা-সৈনিক এবং সাহিত্য-সাধক। বঙ্গদর্শন নব পর্য্যায়ের সারগর্ভ প্রবন্ধাবলী 'সন্ধ্যা' ও স্বরাজের জাতীয় ভাবোদ্দীপক এবং বীরবত্তার উন্মেষক রচনাসমূহ তাঁহাকে একজন উচ্চস্তরের সাহিত্য-সাধকে পরিণত করিয়াছে। লেখক যোগেশচন্দ্র গ্রন্থখানিতে উপাধ্যায়-জীবনের এই দিকটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছেন।

গ্রন্থশেষে প্রদত্ত রচনার নিদর্শনগুলি ব্রহ্মবান্ধবের একনিষ্ঠ সাহিত্য-কৃতীর সঙ্গে পাঠককে স্বতঃই পরিচয় করাইয়া দিবে। কেশবচন্দ্র-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রভাবের কথা তাঁহার লেখায় বিধৃত হইয়াছে। ঐ সময়কার শুধু বাংলা সাহিত্যের নহে, আমাদের জাতীয় সাহিত্যেরও বিস্তর উপাদান এই বইখানির মধ্যে মিলিবে।

বাঙলা পাঠকের নিকট ইহা আদৃত হইবে সন্দেহ নাই।

শ্রীগৌতম সেন

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড নয় — ৭৭।২।১ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

অসুর তৃণাবর্ত্ত দমন
(প্রাচীন চিত্রের প্রতিলিপি)

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৪শ ভাগ
২য় খণ্ড

প্রথম সংখ্যা
কার্ত্তিক, ১৩৭১

বিবিধ প্রসঙ্গ

প্রধানমন্ত্রী—ঘরের বাইরে ও ঘরে ফিরে

কাইরোতে জোট-নিরপেক্ষ জাতিবর্গের ৪৭টি জাতির সদস্য ও রাষ্ট্রপ্রধানদিগের সম্মেলন শেষ হইবার পর প্রধান-মন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এই সম্মেলনে ৫৮টি আফ্রিকীয় এশিয়াবাসী. ইউরোপীয় ও আমেরিকা মহাদেশস্থ জাতি সম্মিলিত ভাবে বিশ্বজগতের রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জ্জাতিক অবস্থার পর্য্যালোচনা করিয়া নিজ নিজ ও সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে ভবিষ্যৎ-দিনের কর্ত্তব্য ও কার্য্যপন্থা নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভারতের দিক্ হইতে দুইজন প্রধান, যথাক্রমে আমাদের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরণ সিং আলোচনা-ভাষণ ইত্যাদি দ্বারা সক্রিয়ভাবে সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন। একমাত্র কঙ্গো সাধারণতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী চম্বেকে এই সম্মেলনে যোগ দিতে দেওয়া হয় নাই, নহিলে অন্য সকল শক্তিজোট বহির্ভূত জাতিকেই আমন্ত্রণ দেওয়া হইয়াছিল এবং প্রত্যেকের প্রতিনিধিই কার্য্যক্রমে ইচ্ছামত অংশগ্রহণ করেন। ইহাদের মধ্যে আরব যুক্তরাষ্ট্রের (মিশর) প্রেসিডেণ্ট নাসের, যুগোশ্লাভিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান মার্শাল টিটো, ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেণ্ট সুকর্ণ, ঘানার রাষ্ট্রপ্রধান আংক্রুমা, সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়েক, ইথিও-পিয়ার সম্রাট হাইলে সেলাসী, কাম্বোদিয়ার রাজপুত্র নোরোদম্ সিহানুক প্রমুখ কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা-গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই সম্মেলনে ফলাফল কি হইল এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রীই বা কোন্ কাজে সাফল্যলাভ করিয়া আসিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন দেশের মুখপাত্রগণ বিভিন্ন ভাবে দিয়াছেন—অধিকারী-স্বার্থ হিসাবে এবং শক্তিজোটদ্বয়ের সঙ্গে সম্পর্ক বা নিরপেক্ষতার পরিমাণ-ভেদ হিসাবে। আমাদের দেশের প্রধান সংবাদপত্রগুলিতে যে-সকল "নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত" সংবাদ ও মন্তব্য ছাপা হইয়াছে তাহাতে প্রধানতঃ দেখা যায় দুইটি বস্তু। প্রথমতঃ, ঐ সকল সংবাদ-দাতার দৃষ্টিকোণের বিরাট পার্থক্য এবং দ্বিতীয়তঃ, ইঁহাদের সকলেরই এই জাতীয় সম্মেলনের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিরূপণে ও ফলাফল সম্পর্কে সময়সাপেক্ষতার বিচারে অক্ষমতা।

বস্তুতঃ এ জাতীয় সম্মেলনের ফলাফল বুঝা যায় অনেক পরে এবং তাহাও কখনও সকল সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রে একপ্রকার হয় না। লীগ অব নেশন্স বা বর্ত্তমান কালের জাতিসঙ্ঘের কার্য্যাবলী পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, আজ যেখানে সম্পূর্ণ সাফল্য, কালের গতিতে ও কূটনীতির পাকে-চক্রে সেখানে বিপরীত ব্যাপারই ঘটিয়াছে। সুতরাং আমাদের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে ঐ সম্মেলন "সন্তোষজনক" মনে করা কিছু অসমীচীন নয়।

দেশে ফিরিবার পথে প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রী করাচীতে পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁর সহিত সাক্ষাৎকার ও ৯০ মিনিটকাল আলোচনা করিয়াছেন। এই সাক্ষাৎকারের একমাত্র ফল হিসাবে বলা হইয়াছে যে, ভারত ও পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীদ্বয়ের সাক্ষাৎ আলোচনার সময়

অনেকটা আগাইয়া আসিয়াছে। তবে সেই আলোচনার ফলে কি লাভ-লোকসান হইতে পারে সে-সম্পর্কে কিছু বলা হয় নাই।

প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জ্জাতিক বিষয়ে, বিশেষতঃ জগতের সকল বিরোধ-বিপত্তির প্রধান আকরগুলি সম্পর্কে যে-প্রকার দ্বিধাহীন ভাষায় সুস্পষ্ট ভাষণ দিয়াছেন তাহা বিদেশী নিন্দুকদেরও প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে। আণবিক বিস্ফোরণ-শক্তির ব্যবহার বিষয়ে তাঁহার মন্তব্য, জগতে শান্তি ও মৈত্রী সম্পর্কিত আলোচনায় তাঁহার পঞ্চনীতির প্রস্তাবনা, এ সকলই ঐ সম্মেলনের আবহাওয়াকে সংযত ও শুদ্ধ করে।

এখন তাঁহার সকল বুদ্ধি-বিচার নিয়োগ করা প্রয়োজন দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থার সংশোধনে। সমস্ত দেশ ও সর্ব্বস্তরের সাধারণ জন এক শঙ্কাজনক পরিস্থিতিতে আসিয়া পৌছিয়াছে দেশের ব্যবসায়ী ও ব্যাপারিদিগের শতকরা ৯৯ জনের সমাজবিরোধী কার্য্যকলাপের ফলে। ইহাদের পিছনে রহিয়াছে একদল চোরাই টাকার মালিক, যাহারা সকল ন্যায়নীতিধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া উদ্দাম অর্থলালসা তৃপ্তির জন্য সমাজবিরোধী কার্য্যপন্থা চালাইয়া সারা দেশকে বিপন্ন করিয়াছে। ইহাদের কঠোর হস্তে দমন ভিন্ন দেশকে রক্ষা করার অন্য উপায় নাই। আমরা চাই দেশে ফিরিয়া প্রধান-মন্ত্রী সর্ব্বপ্রথমে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করুন ইহাদের উচ্ছেদ-সাধনের অভিযান। একদিকে জগৎকে জানানো হইবে যে, ভারত নিজে কল্যাণরাষ্ট্র ও সেই কারণে সে চায় বিশ্ব-মানবের কল্যাণ, অন্যদিকে সমস্ত দেশের জনগণকে এই ঘৃণ্য, হিংস্র নারকীয় ফেরুপালের সম্মুখে অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া দেওয়া হইবে, ইহা কি প্রকার রাষ্ট্রনীতি?

দেশ সমাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, সাধারণতন্ত্র বা "গণতন্ত্র", যে আদর্শেই পরিচালিত হউক, দেশের শাসনতন্ত্র যদি সাধারণজনের নিরাপত্তা ও তাহার জীবনপথ বিপদমুক্ত না করিতে পারে তবে সে-দেশের শাসনতন্ত্রের উচ্চতম অধিকারী অক্ষমতা ও অযোগ্যতার দোষে দোষী হইতে বাধ্য। শাস্ত্রীজি বিশ্বমানবের পরিত্রাণে পঞ্চনীতি উচ্চারণ করিয়াছেন, এখন দেশের জনমনুষ্যের পরিত্রাণ-নীতি ঘোষণা করুন।

কৃষি ও শিক্ষায় গলদ

এদেশে শস্যের ফলন ক্রমেই হ্রাস পাইতেছিল—কয়েক বৎসর আগে পর্য্যন্ত। কারণ অনুসন্ধান অনেক দিন পূর্ব্বেই আরম্ভ হয় এবং সেই সব গবেষণামূলক খোঁজ-খবরের ফলাফলও দীর্ঘদিন যাবৎ সরকারী পুঁথিপত্রে সঞ্চিত হইয়া চাপা পড়িয়া আছে। নানারূপ তথ্য—যার মধ্যে অনেক কিছুই অবান্তর বা পরস্পরবিরোধী যুক্তি, উপপত্তি বা সিদ্ধান্তযুক্ত মনে হয়—নানা শস্য সম্বন্ধে আহরিত হইয়া পড়িয়া আছে। বিভিন্ন প্রদেশে বহু লোক সরকারী চাকুরিয়া বা সরকারী ক্ষেত-খামার ইত্যাদির কর্ম্মী হিসাবে, এই কাজের জন্য ও অনুরূপ কাজের জন্য, সরকারী কৃষিবিভাগে নিযুক্ত হইয়া, দিনগত পাপক্ষয় মাত্র করিয়া জীবন কাটাইয়াছেন। সরকারী কৃষি বিভাগের কার্য্যক্রমের মধ্যে লাভের বা সুফল-প্রাপ্তির খাতে এই কর্ম্মচারী ও কর্ম্মীদের যে অর্থাগম হইয়াছে তাহা এবং যে দুই-চার দশ জন অবস্থাপন্ন ও উদ্যমশীল কৃষকদের উৎসাহী সজ্জন এই সকল গবেষণার ফলাফল সম্বন্ধে খোঁজ-খবর লইয়া ও সেই সকলের মধ্যে অসঙ্গতি নিরূপণ করিয়া, তাহার সারমর্ম্ম গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহাদের কয়জনের কৃষিকর্ম্মের উন্নতি, এইমাত্র ধরা যাইতে পারে।

অন্যদিকে, অর্থাৎ লোকসানের দিকে, অনেক কিছুই ছিল এতদিন। এবং সম্প্রতি দেশের অবস্থা অত্যন্ত উৎকণ্ঠা-জনক হওয়ার কারণে সরকারী উচ্চ অধিকারিবর্গ সজাগ হওয়ার দরুন বিভাগীয় কর্ম্মচারিগণ কিছুমাত্রায় কর্ম্মতৎপর হওয়ায় দেশের কৃষির এরূপ নৈরাশ্যজনক অবস্থার মূল কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা এতদিনের পর যথাযথ ভাবে করা হইতেছে। এবং দেখা যাইতেছে যে, কৃষির দুরবস্থার মূল কারণ দেশের জমি নয় ও আবহাওয়াও ততটা নয়, যতটা দেশের চাষী-সাধারণের অবস্থা। সার-সেচ ইত্যাদিতে জমি উর্ব্বর হয় ও শস্যের ফলন বাড়ে, একথা জানে না এরূপ মহামূর্খ চাষী এদেশে থাকিলেও তাহাদের সংখ্যা অতি নগণ্য। কিন্তু যথাসময়ে সার ও সেচ পাওয়া এবং রোগশূন্য বীজশস্যের যোগাড়, ইহার কোনটাই এদেশের চাষীসাধারণের মধ্যে, হাজার-করা দুই-তিন জন ছাড়া, কাহারও নিজ আয়ত্তাধীন নয়। সরকারী "ব্যবস্থা"ও এতদিন যে ভাবে চলিয়াছে, বর্ত্তমান তদারকের ফলে দেখা যাইতেছে যে, তাহাকে "অব্যবস্থা" বলাই শ্রেয়। অথচ কৃষি এদেশের জনসাধারণের অন্যতম প্রাণবস্তু-বিশেষ।

সরকারী মুখপাত্রের বক্তৃতায় শোনা যায় এবং সরকার-পোষিত পরিসংখ্যান বিভাগের খতিয়ানে দেখা যায় যে,

শস্যের মোট ফলন অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবে শস্য উৎপাদন অনুপাতে সন্তান উৎপাদন আরও অধিকতর হওয়ায় এই খাদ্যশস্যের ঘাটতি চলিতেছে। ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, দুই তথ্যই ঠিক এবং তাহা ঠিক হইলেও দুইটির কোনটিই—শস্য উৎপাদন বা সন্তানের জন্মদান—তৎসংক্রান্ত সরকারী বিভাগদ্বয়ের পক্ষে আত্মতুষ্টি বা সন্তোষজনক নয়। বরঞ্চ সমীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, কৃষিবিভাগে কর্ম্ম-তৎপর লোক যথাযথ ভাবে উৎসাহ পায় নাই এবং কাজে ফাঁকি বা নামে-মাত্র কাজ করিয়া বিভাগীয় অধিকারীবর্গের তোষামোদ ও তাঁহাদের স্বজন পোষণে সহায়তা যাহারা করিয়াছে তাহাদেরই দ্রুততর পদোন্নতি হইয়াছে। ফলে বিভাগীয় কাজ গতানুগতিক শ্লথ ও খাপছাড়া ভাবেই চলিয়াছে। যেটুকু ফলন বাড়িয়াছে তাহা কাগজে-কলমে, সরকারী বিবরণ বৃত্তান্তে যতটা পাওয়া যায় তাহার অনুরূপ মোটেই নয়—অন্ততঃ পক্ষে যে-অনুপাতে বৃদ্ধি পাওয়া উচিত ছিল তাহা হয় নাই। অবশ্য পরিবার-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সফল হইলে দেশের খাদ্যসমস্যার কতকটা সমাধান হয়ত হইত। সে বিভাগেও উৎসাহী ও সক্ষম কর্ম্মীর অভাব খুবই অধিক। বিশেষতঃ আত্মনিবেদনকারী ভদ্র মহিলা ও পুরুষের নিতান্তই অভাব জনসংযোগ ও প্রচার বিভাগে।

এই জনসংযোগের অভাবই সকল সরকারী ব্যবস্থার ব্যর্থতার মূল কারণ। চাষীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন না করিলে অভাব বা অক্ষমতা কোথায়, সে কথা বুঝা অসম্ভব, একথা এতদিনে প্রধানমন্ত্রী অতি স্পষ্ট ভাষায় বলার পর কেন্দ্রীয় কৃষিদপ্তরে ক্ষণিকের চাঞ্চল্য মাত্র দেখা দিয়াছিল শোনা যায়। তার পর ধীরে ধীরে সেই পূর্ব্বেকার মত তাচ্ছিল্য, অবহেলা ও কাজে ফাঁকি পুনর্ব্বার চলিবে বোধ হয়। কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রী ত খাদ্যবস্তুতে মুনাফাবাজী ও মজুতদারীর সমস্যাপূরণে হিমসিম খাইতেছেন, নিজের দপ্তরে—বিশেষ করিয়া কৃষিবিভাগে যে সকল "কাঠের ঘোড়া" ঘর জুড়িয়া বিরাজ করিতেছেন তাঁহাদের সচল করিবার জন্য চাবুক চালাইবার সুযোগ-সুবিধা বা অবসর তাঁহার কোথায়?

তার পর ফাঁকি দেওয়ার আরও সুবিধা হইয়াছে কেন্দ্রীয় সরকারের ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে অপরূপ "ফাইল চালনা"র ব্যবস্থায়। যদি কেন্দ্রীয় দপ্তরের মন্ত্রী লোকমতের ঠেলায় বিব্রত হইয়া বিভাগীয় অধিকর্ত্তার উপর চাপ দিয়া বসেন কোন কাজে অবহিত হইয়া তাহা দ্রুতভাবে চালিত করার জন্য তবে আরম্ভ হয় বিভাগের এক ঘর হইতে অন্য ঘরে "ফাইল চালন"। এবং তাহা দ্রুত হইলে—অর্থাৎ ফাইল এক ঘর হইতে "দুই পা ফেলিয়া" অন্য ঘরে যাইতে যদি ২৭ দিনের বদলে ১৮ দিন মাত্র লাগে—যদি সমস্ত বিভাগ বিব্রত ও বেচাল হইয়া পড়ে, তবে কোনও এক ছুতা ধরিয়া সেই অনর্থকারী ফাইলে কোনও রাজ্য সরকারের সম্পর্কিত কিছু জড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা হয়। সে চেষ্টা সফল হইলে কেন্দ্রীয় বিভাগ নিশ্চিন্ত—অন্ততঃ ছয় মাসের মত। এই ত অবস্থা কৃষি বিভাগের!

জলের মত টাকার স্রোত বহিয়া গিয়াছে বাঁধ নির্ম্মাণে ও খাল খননে, কিন্তু অতি সৌভাগ্যবান ভিন্ন চাষী-সাধারণের ক্ষেতে সময়মত জলসেচ হয় না, আবার অনেক ক্ষেত্রে—অর্থাৎ বহু লক্ষ একরে আদৌ জলসেচের ব্যবস্থাই হয় নাই। রাসায়নিক সার প্রস্তুত করিবার জন্য বিরাট অঙ্কের টাকা খরচ হইয়াছে ও সার প্রস্তুত হইতেছেও বেশ কিছু এবং সে জন্য প্রতি বৎসর বিভিন্ন অধিকারী, সময়ে-অসময়ে, বক্তৃতা করিয়া ও পরস্পরে পৃষ্ঠ কণ্ডুয়ন করিয়া আত্মতুষ্টি জাহির করেন। শুধুমাত্র চাষীর পোড়াকপালের গুণে ও অকর্ম্মণ্য ও অলস—এবং কিছু দুর্নীতিপরায়ণ—বিভাগীয় কর্ম্মচারীর গাফিলতির কারণে বহুক্ষেত্রেই সার পৌছায় সার দেওয়ার সময় উত্তীর্ণ হইবার পরে!

যাহা হউক এতদিনে কর্ত্তৃপক্ষের টনক নড়িয়াছে কেন্দ্র-স্থলে, এবং আমাদের আশা আছে পশ্চিমবঙ্গ ও অন্য রাজ্য সরকারেরও চেতনা সংক্রামিত হইবে যথাসময়ে—অর্থাৎ দুই-চারি বৎসরের মধ্যে!

এতক্ষণ বলিলাম কৃষকের দগ্ধ অদৃষ্টের কথা। এখন বলি শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর অদৃষ্ট বিড়ম্বনার কথা। অবশ্য আমরা এখানে বলিব প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকের কথা। এই ভাবে একই সূত্রে কৃষি ও শিক্ষার প্রসঙ্গ তুলিবার প্রথম কারণ এই যে, আধুনিক জগতে কৃষি ও শিক্ষার মধ্যে গভীর ও প্রগাঢ় সম্পর্ক। দ্বিতীয় কারণ, কৃষকের মত শিক্ষকেরাও চাষী, তবে তাঁহাদের কৃষিক্ষেত্র ছাত্রছাত্রীদের মানসস্থলে। এবং তৃতীয় কারণ, এই দুই শ্রেণীর কর্ষকের ভাগ্য এতদিন দৈবের ও দেবতার কৃপার উপর নির্ভরশীল ছিল—সরকারের উচ্চতম অধিকারীবর্গের বিভ্রান্তির ফলে। এবং এখন আশার সঞ্চার হইতেছে যে, চাষীর মত শিক্ষকেরও কপাল ফিরিয়াছে।

অন্যদিকে আমাদের একথাও বলা প্রয়োজন যে, চাষী ও শিক্ষককে একই প্রসঙ্গে আনিয়া আমরা কাহারও মানহানি করিতে চাহি নাই। অন্য প্রদেশে একথা বলা প্রয়োজন হইত না, কেননা অন্ততঃ দুইটি প্রদেশে আমরা দেখিয়াছি অতি উচ্চশিক্ষিত ব্রাহ্মণ সন্তান মনের আনন্দে লাঙ্গল চালাইয়া নিজের চাষকে ফলবতী করিতেছেন। এবং আমরা জানি না বাংলার বাহিরে জমি চাষের কাজকে হেয়জ্ঞান আর কোথাও করে কি না। অন্য বহু প্রদেশের লোকে করে না, ইহা আমরা শুনিয়াছি। শুধু বাঙালীর অন্য অনেক কুসংস্কার এবং চিত্তবিভ্রান্তির মত এই চাষকে ও চাষীকে হেয়জ্ঞান তাহার ভবিষ্যতকে আচ্ছন্ন ও নৈরাশ্য-পূর্ণ করিয়াছে। অবশ্য শিক্ষার ক্ষেত্র শুধু সুদূরপ্রসারিত নয়, উহা মানব-সমাজের প্রত্যেক স্তরের উন্নতি ও প্রগতির আকর বলিয়া সভ্য জগতে শিক্ষা ও বিদ্যার্জনকে উচ্চতর স্থান সর্ব্বত্রই দেওয়া হয়। এবং তাহা দেওয়া সমীচীন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

জগতের প্রত্যেকটি সভ্য ও প্রগতিশীল দেশে শিক্ষক ও অধ্যাপকের স্থান সমাজের উচ্চতম স্তরে রক্ষিত আছে দেখা যায়। শিক্ষাগুরুর প্রতি সম্মানদান সকল সভ্য দেশেই অবশ্যকর্তব্য বলিয়া স্বীকৃত। আমাদের দেশের ও জাতির সভ্য জগতে আসন দাবির মূলে যে-সকল যুক্তি আছে তাহাও শিক্ষাগুরু ও আচার্য্যদিগের অবদানের উপর নির্ভর করে। বাংলা দেশ এককালে সারা ভারতের গুণী সমাজের শীর্ষ স্থান পাইয়াছিল যাঁহাদের চেষ্টায় তাঁহাদেরও সকল শক্তির সকল গরিমার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল সেদিনের শিক্ষকের হস্ত-প্রসাদে। তখনকার দিনেও শিক্ষক ধনী ছিলেন না, যদিচ তাঁহার মান ছিল সকল ধনী ও আঢ্যের ঊর্দ্ধে। এবং ভদ্রজন-মধ্যে তাঁহার আসন ছিল অগ্রভাগে।

রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাইবার অল্প কিছুদিন পরে তাঁহার কৈশোর কালের এক শিক্ষক শুনিতে পান যে, তিনি কলিকাতায় আসিয়াছেন এবং মাঝে মাঝে 'বিচিত্রা' ভবনের বৈঠকে আলাপ-আলোচনা করেন। শিক্ষকমহাশয় তখন বৃদ্ধ ও অবসরপ্রাপ্ত। এই জগদ্বিখ্যাত কীর্তিমান ছাত্রকে দর্শন করিবার ইচ্ছা প্রবল হওয়ায় একদিন তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্রকে সঙ্গে করিয়া তিনি বিচিত্রার বৈঠকে যান। সেখানে লোকের মধ্যে এক পার্শ্বে ও অনেক পিছনে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও নিজের স্থান করিয়া বসেন এবং রবীন্দ্রনাথের আলাপ-আলোচনা শুনিতে থাকেন। সম্মুখে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের পংক্তিতে ঠেলিয়া বসার বা রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎভাবে কথা বলার চেষ্টা শিক্ষক মহাশয় করেন নাই এবং উহা যে সম্ভব হইতে পারে ইহা তিনি ভাবিতেও পারেন নাই, কেননা দীর্ঘদিন শিক্ষাদান করিয়া থাকিলেও তিনি সাধারণ শিক্ষক মাত্র এবং রবীন্দ্রনাথ তখন সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে উচ্চতম স্থানে প্রতিষ্ঠিত।

রবীন্দ্রনাথ যখন আলাপ-আলোচনার মধ্যে নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন তখন শিক্ষক মহাশয় একটি প্রশ্নের উত্তরের আরও বিশদ ব্যাখ্যা শুনিতে চাহেন এবং কেন চাহেন তাহাও অল্প কথায় বলেন। সভার লোকে আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল যে, রবীন্দ্রনাথ ঘাড় ফিরাইয়া যে-দিক হইতে প্রশ্ন আসিতেছিল সেদিকে তাকাইয়া বলিলেন, "গলার স্বর ত চেনা মনে হচ্ছে—কে প্রশ্ন করছেন?"

শিক্ষক মহাশয় কুণ্ঠিত হইয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিয়া নিজের নাম বলিবা-মাত্রই রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে চিনিলেন এবং "মাষ্টার মহাশয়! আপনি অত পিছনে কেন? সামনে এসে বসুন" বলিলেন। সভার লোকে সসম্ভ্রমে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষককে সম্মুখে বসিবার স্থান করিয়া দেয়। সেই ভ্রাতুষ্পুত্র আজও জীবিত এবং তাঁহার কাছে শুনিয়াছি যে, শিক্ষক মহাশয় সভা হইতে ফিরিবার সময় তাঁহাকে প্রথম কথাতেই বলেন, "দেখ্, এত বড়, এ রকম উঁচু মন বলেই আজ বিশ্বজগৎ ওর গুণে মুগ্ধ"—

এ ত সুদূর অতীতের কথা নয়, পঞ্চাশ বৎসর, পূর্ব্বের কথা মাত্র। তারও পরের দিনের কথা, পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা ও দৃষ্টান্ত অনেক দেওয়া যায়, যদিও এ দেশের সমাজের ও সংস্কৃতি জ্ঞানের বিকার আরম্ভ হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেই। এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সেই বিকার প্রবল রূপ ধারণ করিয়াছে এই দেশে। বিশেষে বাংলা দেশে এই বিকার বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতিকে শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন করিয়াছে এবং ধ্বংসের পথে লইয়া চলিয়াছে। ইহার অন্যতম প্রধান কারণ শিক্ষকের দৈন্য ও দারিদ্র্যের চরম অবস্থা, যাহার ফলে শিক্ষকের মানসিক বিভ্রান্তি চরমে উঠিতেছে এবং শিক্ষার মান সারা ভারতে পড়িয়া গিয়াছে।

সেই মানসিক বিভ্রান্তির সুযোগ অবশ্য নানা স্থানের

রাষ্ট্রনৈতিক দল লইতেছে। কিন্তু সেই বিভ্রান্তির যে কঠোর নির্মম সত্য তাহা কোনও চিন্তাশীল ব্যক্তি স্বীকার করিতে পারেন না। এবং সেই সত্য হইল দারিদ্র্য, অভাব ও অনটনের জ্বালা, যাহার দহনে সমস্ত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ জ্বলিয়া-পুড়িয়া ছারখার হইতেছে—বিশেষতঃ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীগণ যাঁহাদের পক্ষে আজিকার দিনে, এই বণিক ব্যবসায়ীদিগের নির্দয় ও নির্লজ্জ লুণ্ঠন ও শোষণের মধ্যে, নিজেদের ও নিজের সন্তান-সন্ততির জীবনের মান রক্ষা করা তো নিতান্তই অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। ব্যক্তিগত ভাবে, নিজেকে বঞ্চিত করিয়াও যেখানে ভদ্রস্থ রাখা সম্ভব হয় না, সন্তান-সন্ততিকে শত চেষ্টা সত্ত্বেও যেখানে শিক্ষাদান, ভরণ-পোষণ সম্ভব হয় না, সেই নৈরাশ্যময় পরিস্থিতিতে বিভ্রান্ত হওয়া আশ্চর্য্য কি অথবা অপরাধই বা কোথায় এবং পবিত্র শিক্ষাব্রতে তাঁহাদের আদর্শচ্যুত হওয়াই বা বিস্ময়কর কেন?

অথচ এই বিভ্রান্তি, এই আদর্শচ্যুতির বিষময় ফল ভোগ করিতেছে সমগ্র জাতির সন্তানগণ। এবং যদি ইহার মূলে অনর্থকারী অপশক্তিযুক্ত কারণগুলি রহিয়াছে তাহা দূর না করিলে সমস্ত দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যাইবে। কেননা নিরক্ষরতা ও অজ্ঞানতা এই দুই মহা-পাতক হইতে উদ্ধার না হইলে ভারতের কোনও স্থায়ী উন্নতি প্রগতি সম্ভব নয়—যত টাকাই যতগুলি পরিকল্পনায় ব্যয় হউক না কেন। এই সহজ কথাটা আমাদের পরিকল্পনা কমিশনের ও মন্ত্রীসভার বিদগ্ধচূড়ামণিগণ বুঝেন না কেন এটা আমরা বুঝিতে অক্ষম।

রুশ জাতির পুনর্গঠন তখনই সম্ভব হয়, যখন সোভিয়েটের পরিকল্পনাকারিগণ বুঝিলেন জাতিগঠনের প্রথম সূত্র হইল নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও জাতির সমস্ত শিশু ও কিশোরদের শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা। জারদিগের রাজত্ব-কালে ইউরোপীয় রুশদেশে নিরক্ষরতা আমাদের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে তুলনীয় ছিল। অন্যদিকে সেখানে নূতন পন্থা আরম্ভ হইবার মুখে, ১৯৩০ সালে, রবীন্দ্রনাথ যাহা দেখেন তাহার বিবরণে (রাশিয়ার চিঠি) বুঝা যায় যে, এই শিশু ও কিশোরদের শিক্ষার উপর সোভিয়েট কতটা গুরুত্ব আরোপ প্রথম হইতেই করিয়াছিল। এবং সেই শিক্ষার প্রগতি এখন জগতের যে-কোন জাতির সমান।

কামাল আতাতুর্ক তুর্কী সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর দাঁড়াইয়া যখন ঐরূপ বীর, ধৈর্য্যশীল ও কঠোর নিয়মানুগ জাতির এইভাবে পতনের কারণ সম্পর্কে চিন্তা করিয়া জাতির পুনর্গঠনের দুইটি সূত্র স্থির করেন, তখন তুর্কী জাতির নিরক্ষরতা ছিল সমকালীন ভারত অপেক্ষাও অধিক এবং জাতি তখন মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় স্বদেশপ্রেম ও দেশের মাটির টান সম্পূর্ণ ভুলিয়াছে। তিনি বুঝিয়াছিলেন জাতি উৎখাত হওয়ার বা করার শ্রেষ্ঠ উপায় তাহাকে স্বদেশপ্রেম ও দেশের মাটির টান হইতে বিচ্যুত করা—যে-কথা বুঝিয়াছিল মস্কোর স্টালিন এবং বুঝে পিকিং-এর মাও-সে-তুং ও চু-এন-লাই, এবং সেই কারণে ভারতীয় জাতিকে উৎখাত করার জন্য তাহাদের পঞ্চমবাহিনী ঐ উদ্দেশ্যেই কাজ করিয়াছিল ও এখনও করিতেছে। কামাল আতাতুর্ক ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে-দেশের নিরক্ষরতা দূর না হইলে কোনরূপ প্রগতি অসম্ভব। সেই কারণে প্রথম সূত্র অনুযায়ী তিনি জাতির কেন্দ্র ইস্তাম্বুল হইতে সরাইয়া আঙ্কারায় লইয়া তাহার শিকড় মাতৃভূমিতে প্রোথিত করেন এবং তাঁহার আত্মনিবেদিত বীর সেনার যুবজনকে দ্রুত শিক্ষণ কাজে অভ্যস্ত করিয়া সারা দেশে ছড়াইয়া দিয়া যুদ্ধযাত্রার পরিকল্পনায় নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান করেন। তাঁহাকে আতাতুর্ক বা তুর্কজাতির পিতা বলা হয় এই কারণেই এবং ঐ নাম সার্থক হয় ঐ দুই সূত্রের আবিষ্কারে।

চীনের নবজাগরণের মুখে সুন্-ইয়াট-সেন্ও ঐ শিক্ষার উপর ঝোঁক সমানেই দিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে পন্থার বদল হইলেও শিক্ষার উপর ঝোঁক উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইয়াছে।

আমাদের জাতির পিতা তাঁহার সময়ে জাতির তৎকালীন সাধ্য অনুযায়ী দ্রুত ও ব্যাপক শিক্ষার পথ খুঁজিয়াছিলেন এবং বুনিয়াদি শিক্ষার আরম্ভ হয় সে কারণে। এখন জাতির সাধ্য-ক্ষমতা অনেক অধিক কিন্তু কাজ চলিয়াছে পুরাণো পথে, ঢিমে তেতালায়, এবং এখন যতটা উন্নতি হইয়াছে তাহাও নষ্ট হইতে চলিয়াছে কর্তৃপক্ষের অবহেলা ও কার্য্যক্রমে দোষত্রুটির কারণে।

দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষণ-ব্যবস্থার সমস্ত কাঠামোয় ঘুণ ধরিয়া যাইবে যদি ঐ স্তরের শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যে বিভ্রম ও চিত্তবিকার ব্যাপকভাবে ছড়ায়। শিক্ষাব্রতীগণ ব্রতভ্রষ্ট হইলে ছাত্র-ছাত্রীদের কি হয় তাহা ত সারা ভারতে দেখা যাইতেছে। অথচ এই

বিষয়ে দেশের কর্ণধারগণের কোনও চেতনার উন্মেষ আমরা দেখি না এখনও। অন্যদিকে এদেশে যাঁহারা অন্তর্বিচ্ছেদ ও শ্রেণী কলহের পথে জাতিকে পথভ্রষ্ট ও আদর্শচ্যুত করিতে ব্যস্ত, তাঁহারা মরশুম অনুকূল বুঝিয়া বিভ্রান্তির বীজ সযত্নে ছড়াইতেছেন এই অভাগাদের মধ্যে!

কলিকাতায় সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে ত্রিশজন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী সপ্তাহব্যাপী অনশন করেন, তাহাতে দেশের লোক ব্যথিত ও দুঃখিত হইয়াছে। এই "অনশন সত্যাগ্রহে"র পিছনে রাষ্ট্রনৈতিক কূটচাল থাকিতে পারে কিন্তু মূল কারণ যাহা, সে-সম্বন্ধে কোনও বিচার বা তর্কের অবকাশ নাই। এবং এ-বিষয়ে—অর্থাৎ ঐ কারণ বা সমস্যার বিষয়ে—সরকারী পক্ষ বা কংগ্রেসী মহল যে কোনও চিন্তা বা যুক্তি-পরামর্শ করিতেছেন বা করিয়াছেন তাহার কোনও নির্দেশ আমরা পাই নাই। অনশন আরম্ভ হইবার পর সংবাদপত্রে দুই-একটি চিত্র ও অন্য সংক্ষিপ্ত বিবরণ ছাড়া যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা নীচে উদ্ধৃত হইল।

যুগান্তর দিয়াছিলেন—

কলিকাতা, ৪ঠা অক্টোবর—মাধ্যমিক শিক্ষকদের অনশনের পাঁচ দিন নির্বিঘ্নে শেষ হইয়াছে।

নিঃ বঃ শিক্ষক সমিতির পক্ষে জানান হইয়াছে। নিখিল ভারত মধ্যশিক্ষক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীরাম-প্রকাশ গুপ্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ও পরিকল্পনা কমিশনের সহিত সংযোগ স্থাপনের পর এ বি টি এ-কে জানাইয়াছেন যে, রাজ্য সরকার অনুরোধ জানাইলে বর্দ্ধিত মহার্ঘ্য ভাতার জন্য পরিকল্পনা লক্ষ্যের ঊর্দ্ধে যে অর্থ লাগিবে তাহার অর্দ্ধেক বহন করিবেন। কাশীতে ফেডারেশনের একটি জরুরী সভা ডাকা হইয়াছে। ৬ই অক্টোবর রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে। ঐ দিন রাজ্যের মধ্য-শিক্ষায়তনের কর্মচারীরা একদিনের অনশন উদ্‌যাপন করিবেন।

৪ঠা অক্টোবর—পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অর্দ্ধেক ভার কেন্দ্রীয় সরকার বহনে প্রস্তুত।

গতকাল সংসদ সদস্যা শ্রীমতী রেণু চক্রবর্ত্তী শিক্ষামন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মাধ্যমিক শিক্ষকদের বক্তব্য শিক্ষা-

বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে গত ৪ দিন ধরিয়া অনশন করিতেছেন। শ্রীচাগলা সহানুভূতির সহিত পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দাবিগুলি শোনেন এবং পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অবস্থা উন্নতিবিধান করিতে যে অর্থ ব্যয় হইবে কেন্দ্রীয় সরকার তাহার অর্দ্ধেক ভার বহন করিবেন, শ্রীচাগলা এই মর্মে শ্রীমতী চক্রবর্ত্তীকে আশ্বাস দিয়াছেন বলিয়া জানা যায়।

আগামী ৯ই অক্টোবর হইতে ১২ই অক্টোবর পর্যন্ত কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের যে বৈঠক হইবে তাহাতে মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং চৌদ্দ ও তদূর্দ্ধ বয়সের যে-সকল ছাত্রছাত্রী সাধারণ শিক্ষার অনুপযুক্ত হইবে তাহাদের বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা হইবে। উপদেষ্টা বোর্ড সরকারী ও সরকারী অর্থ-সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি সম্পর্কে আলোচনা করিবেন।

আনন্দবাজার পত্রিকা দিয়াছিলেন:

মহার্ঘ্য ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে মাধ্যমিক শিক্ষকদের অনশনের প্রসঙ্গে মঙ্গলবার রাজ্য বিধান পরিষদে অভূতপূর্ব উত্তেজনার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। উভয় পক্ষের কয়েকটি উক্তিকে কেন্দ্র করিয়া অবস্থা চরমে উঠে। জনৈক বিরোধী সদস্য প্রচণ্ড ক্রোধে দুই হাতের আস্তিন গুটাইয়া ট্রেজারী বেঞ্চের দিকে ধাইয়া যান।

দুই পক্ষের কয়েকজন প্রবীণ সদস্যের চেষ্টায় তাঁহাকে নিরস্ত করা সম্ভব হয়। কিন্তু ইহার পরও সভাকক্ষে উত্তেজনার ভাব না কমিলে ডেপুটি চেয়ারম্যান আধঘণ্টার জন্য সভা মুলতুবী রাখেন।

সভার কাজ আবার সুরু হইলে বিরোধী পক্ষের শিক্ষক সদস্যগণ,—শিক্ষকদের দেয় অতিরিক্ত মহার্ঘ্য ভাতা বিদ্যালয়ের করণিক ও অন্যান্য কর্মচারীদের মধ্যে সমহারে বণ্টন করা হইবে, শিক্ষামন্ত্রীর নিকট এইরূপ নীতিগত প্রতিশ্রুতি আদায়ের জন্য বারবার পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহ বলেন, নিঃ বঃ শিক্ষক সমিতির নিকট হইতে অনুরূপ দাবি লিখিত ভাবে পেশ করা হইলে তিনি উহা 'বিবেচনা করিতে পারেন।' ইহার বেশী একটি কথাও তিনি ঐ দিন বলিতে

নতার পরিচয়' এই অভিযোগ করিয়া উহার প্রতিবাদে ত সকল বিরোধী সদস্যই ঐ দিনের মত সভাকক্ষ করিয়া যান।

বশ্য সভাকক্ষ ত্যাগের ঘটনার আগেই সংশ্লিষ্ট বিরোধী এবং সরকার পক্ষে পরিষদের নেতা শিক্ষামন্ত্রী উহার দুইপক্ষ হইতে উচ্চারিত কটুক্তির জন্য আন্তরিক দুঃখ শ করেন। বিরোধী সদস্য তাঁহার উক্তি প্রত্যাহার া লন।

গালমালের সূত্রপাত এইভাবে: বিরোধী সদস্য প্রায় ভট্টাচার্য্য (সি) মাধ্যমিক শিক্ষকদের বর্তমান ন সত্যাগ্রহ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন—বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ক ও অন্যান্য কর্ম্মীদের সমহারে মাসিক ৫ টাকা হারে ভাতা দিতে হইলে সরকারের মাত্র সাড়ে নয় লক্ষ ব্যয় হইবে। সরকার কি এতই দেউলিয়া হইয়া ছেন যে, এই সামান্য টাকাও দিতে পারেন না? শ্রী গর্য্য উত্তেজিত ভাবে শিক্ষামন্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া কয়েকটি বিশেষণ নিক্ষেপ করেন।

মঙ্গলবার বিকালে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে ত্রিশজন ক-শিক্ষিকা সাত দিনের অনশন ভঙ্গ করেন। পরে লবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সভাপতি শ্রীসত্যপ্রিয় রায়ের াহিত্যে সেখানে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন নতিক সংগঠন ও ছাত্র প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে কয়েক-বক্তা শিক্ষকদের দাবির সমর্থনে বক্তৃতা করেন। —শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের সমস্ত কর্ম্মচারীদের অন্তর্বর্ত্তী হিসাবে সমহারে মহার্ঘ্যভাতা প্রদান—আপাতত দশ ।

শিক্ষক ও ছাত্রদের তরফে অনশন-ব্রতীদের অভিনন্দনও ন হয়।

থম রিপোর্টে দেখা যাইবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সমস্যাটি সরকারের এলাকায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া খানিকটা দায়মুক্ত ছন। রাজ্য সরকার যাহা রাজ্য বিধান পরিষদে ছেন তাহাতে ত জল আরও ঘোলাই হইয়াছে। বেই চলিতেছে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা!

শের ও জাতির দেহমনের প্রাণবস্তু কৃষি ও শিক্ষা। ই দুই বিষয়েই চলিতেছে যত ত্রুটি-বিচ্যুতি, যত র কারবার। দোষ আমাদেরই, নহিলে দেশের এইরূপ আলগা ও খাপছাড়া ভাবে কাজ চালাইতে তন কি?

কলিকাতা মহানগর ধ্বংসের পরিকল্পনা

মহানগর বলিতে বুঝায় প্রধানতঃ কর্ম্মকেন্দ্র এবং মনুষ্য-সমাজের প্রয়োজনীয় সকল সামগ্রীর উৎপাদন, আমদানী-রপ্তানী ও সরবরাহ ব্যবস্থার স্নায়ুকেন্দ্র। কোন কোনও মহানগর সেই সঙ্গে শিল্পকেন্দ্রও হইয়া থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রে ঐরূপ মহানগর শাসনতন্ত্রের কেন্দ্র বা উপকেন্দ্রও হয়। এই প্রত্যেক ধরনের কেন্দ্র প্রাণবন্ত, সরল ও সমৃদ্ধ হয়, যদি সেই সকল কেন্দ্র চালিত করিবার জন্য কর্ম্মীদের খাদ্য বস্ত্র, বাসস্থল এবং যানবাহন ব্যবস্থা সুষ্ঠু ও যথাযথ হয়। উপরন্তু যদি সেই মহানগর শিল্পকেন্দ্র বা বিরাট্ শিল্পাঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ ও সরবরাহ কেন্দ্র হয় তবে সেই শিল্প-সামগ্রীর উপাদান এবং উৎপাদিত শিল্প-সামগ্রীর সরবরাহ আমদানী-রপ্তানী ব্যবস্থাও নিখুঁত হওয়া—অর্থাৎ পরিবহন ব্যবস্থা সহজ ও যথেষ্ট সামর্থ্যযুক্ত হওয়া—নিতান্তই প্রয়োজন। যদি কর্ম্মীদের বাসস্থল কর্ম্মকেন্দ্র হইতে দূরে হয়, তবে কর্ম্মীদের যাতায়াতের যানবাহন ব্যবস্থা এবং কাজে-প্রয়োজনে নগরের এক প্রান্ত হইতে যাতায়াত ব্যবস্থাও পর্য্যাপ্ত হওয়া প্রয়োজন। এক কথায় দেহে রক্ত চলাচল ব্যবস্থার মত মহানগরের যানবাহন চলাচল ব্যবস্থা এবং শিল্প-বাণিজ্য সামগ্রীর পরিবহন ব্যবস্থা বাধামুক্ত ও পূর্ণরূপে সক্রিয় হওয়া নিতান্তই আবশ্যক। রক্ত চলাচলের বাধা-বিঘ্ন দ্রুত উপশম না হইলে মানুষ যেমন মরে, মহানগরের পরিবহন ও যান-বাহন ব্যবস্থা অচল বা অক্ষম হইলে মহানগরও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, যদি-না প্রতিকার দ্রুত এবং যথাযথ হয়।

কলিকাতা মহানগর একাধারে বিরাট্ কর্ম্মকেন্দ্র, শিল্প-বাণিজ্য কেন্দ্র ও ভারতের বৃহত্তম শিল্পাঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র এবং প্রাদেশিক শাসনকেন্দ্র। কলিকাতা বন্দর হইতে আজও বিদেশী মুদ্রা অর্জ্জনের জন্য বৃহত্তম পরিমাণে ভারতীয় পণ্য রপ্তানী হয়। উপরন্তু উত্তর প্রদেশ, বিহার, আসাম, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের এক অংশ বহু বিষয়ে কলিকাতা হইতে বিরাট্ পরিমাণে প্রেরিত অতি-প্রয়োজনীয় বস্তুর উপরে একান্তই নির্ভরশীল। আবার ঐ সকল অঞ্চলের পণ্যবস্তুর বহির্জগতে নিষ্ক্রমণের একমাত্র পথ এই কলিকাতা।

অথচ এই কলিকাতা মহানগরকে ধ্বংস করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যেন বদ্ধপরিকর। কলিকাতাবাসীদের—বিশেষে কলিকাতাবাসী বাঙালীদের লুণ্ঠনে ও প্রতারণে যেমন অবাঙালী ব্যবসায়ী ও তাহাদের ঘৃণ্য অনুচর-স্থানীয়

বাঙালী-পুঙ্গবদের উৎসাহ, তেমনি কলিকাতা বন্দর ও কলিকাতার পরিবহন ব্যবস্থা ধ্বংসের পথে ঠেলিয়া কলিকাতা মহানগরকে মহাশ্মশানে পরিণত করার আগ্রহ আমরা দেখি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-উপমন্ত্রী ও তাঁহাদের "নোকরশাহী" অধিকারী-বর্গের। আমরা বাঙালীরা আজ নির্জীব ও নিষ্প্রাণ হইয়া গিয়াছি তাই এইরূপ প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন শত্রুতা এবং অপকার চেষ্টার প্রতিকারে কোনও সক্রিয় ও সক্ষম প্রতিকার চেষ্টা আমাদের দ্বারা হয় না। আমাদের—বিশেষ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালী সমাজের সন্তানদের—এখন ছিন্নমস্তার অবস্থা!

কলিকাতা বন্দর এবং শিল্পাঞ্চল ও এই মহানগরের জল-সরবরাহ ব্যবস্থা দিনে দিনে দ্রুত অবনতি ঘটিতেছে, একথা সারা জগত জানে, এমন কি নয়া দিল্লীর প্রভুরাও জানেন, এবং অচিরে ইহার প্রতিকার না করিলে কলিকাতা মহানগর ধ্বংস হইয়া যাইবে ইহাও সর্বজনবিদিত। প্রতিকারের শ্রেষ্ঠ উপায় যে ফরাক্কায় বাঁধ দিয়া গঙ্গার বিশাল প্রবাহের এক অংশ এদিকে ফিরাইয়া আনা, একথা নয়া দিল্লীকে জানানো হয় ১৯৪৯-৫০ সনে। তারপর প্রথমে বিদেশী বিশেষজ্ঞদিগের মত সংগ্রহ এবং তাঁহাদের মত ফরাক্কা বাঁধের অনুকূল হওয়ায় স্বদেশী অজ্ঞ-বিজ্ঞ, গণ্য-মান্য-জঘন্য ইত্যাদির নানা ওজর-আপত্তি চালাইয়া, নানা টালবাহানার শেষে নয়া দিল্লী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পকে মঞ্জুরী দিলেন, উহা প্রস্তাবিত হওয়ার বারো বৎসর পরে। তবে যে ভাবে দিলেন তাহাতে ১৯৭০ সনের পূর্ব্বে উহা যাহাতে চালু না হয় তাহার ব্যবস্থাও করিলেন। ভাবিয়া দেখুন ২০ বৎসর লাগিবে একটা প্রকল্পে, যাহা ভাক্রা-নাঙ্গালের সঙ্গে তুলনীয়ই নয়, অথচ সে-সব প্রস্তাবিত, মঞ্জুরীপ্রাপ্ত ও সমাপ্ত হইয়া গেল ১০ বৎসরের মধ্যে। এবং এ কথাও বলা প্রয়োজন যে, এখনও এখানে "না আঁচাইলে বিশ্বাস নাই"।

তারপর আসে কলিকাতার আভ্যন্তরীণ ও উপকণ্ঠের পরিবহন সমস্যার কথা। নানা বিদেশী বিশেষজ্ঞ আসিল-গেল এবং নানাপ্রকার গবেষণা, সমীক্ষণ ইত্যাদিও হইল। দেখা গেল সার্কুলার রেল বর্ত্তমান কালের ও অবস্থার পক্ষে শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা। ডাক্তার রায় সক্রিয় ভাবে চেষ্টা করিয়া উহা নয়া দিল্লীর প্রভুদের বিবেচনার জন্য রাখিলেন, প্রায় পাঁচ-ছয় বৎসর পূর্ব্বে। নিম্নস্থ সংবাদ পড়িলে পাঠক বুঝিবেন [illegible] অবস্থা। সংবাদ বিবরণ 'আনন্দবাজার'—

"রেলমন্ত্রী শ্রী এস কে পাতিল মঙ্গলবার ৬ই অক্টোবর কলিকাতায় এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে জানান যে, কলিকাতার জন্য প্রস্তাবিত সার্কুলার রেল প্রকল্পটি তাঁহার মন্ত্রণালয়ে বিবেচনাধীন আছে।

কলিকাতা মহানগর পরিকল্পনা সংস্থা (সি এম পি ও) কলিকাতার যানবাহন সমস্যা এবং ব্যয়-অনুপাতে উপকারের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পটি সম্পর্কে একটি রিপোর্ট তৈয়ার করিতেছেন। রিপোর্টটি পাওয়া গেলে বিষয়টির প্রতি আরও মনোযোগ দেওয়া হইবে বলিয়া শ্রীপাতিল জানান।

শ্রীপাতিল স্বীকার করেন যে, আগের দিন ভারত বণিক সভায় তিনি বলিয়াছিলেন: প্রকল্পটি সম্পর্কে উদ্যোগের দায়িত্ব কলিকাতা পৌর সংস্থা এবং রাজ্য সরকারের লওয়া উচিত। তবে এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, প্রকল্পটি রূপায়ণের ব্যাপারে রেল-মন্ত্রণালয় সহায়তা দিতে পারেন।

রাজ্য পরিবহণ মন্ত্রী শ্রীশৈল মুখোপাধ্যায় মঙ্গলবার রেল-মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। তিনি প্রকল্পটির খুঁটিনাটি বিষয়গুলি সম্পর্কে শ্রীপাতিলকে অবহিত করেন এবং বলেন যে, এটি চতুর্থ যোজনার অন্তর্ভুক্ত হওয়া জরুরী দরকার।

শ্রীমুখোপাধ্যায় বলেন যে, এ মাসের শেষ দিকে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের বৈঠকে যোগ দিতে তিনি যখন দিল্লী যাইবেন তখন বিষয়টি লইয়া রেলমন্ত্রীর সঙ্গে আরও কথাবার্ত্তা বলিবেন।

প্রসঙ্গত স্মরণীয়, গত ১৯শে সেপ্টেম্বর রাইটার্স বিল্ডিংস-এ একটি বৈঠক ডাকা হইয়াছিল। উহাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, রেল ও কলিকাতা পোর্ট কমিশনার্স-এর প্রতিনিধিরা যোগ দেন। শেষোক্ত দুই সংস্থা প্রকল্পটি সম্পর্কে যেসব আপত্তি তুলিয়াছেন সেগুলি বিবেচনার জন্যই ঐ বৈঠক ডাকা হয়।

বৈঠকে ঠিক হয়, কারিগরি-বিশেষজ্ঞদের দ্বারা রেলের পক্ষ হইতে প্রকল্পটির ইঞ্জিনীয়ারিং সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এবং চিৎপুর ইয়ার্ড এড়াইয়া বিকল্প ব্যবস্থা দেওয়ার জন্য রেল-মন্ত্রণালয়কে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা দিতে বলা হইবে।

প্রকল্পটি সম্পর্কে 'সি এম-পি-ও'-কে একটি রিপোর্ট তৈয়ারী ও পেশের নির্দ্দেশও ঐ সম্মেলনেই দেওয়া হয়।"

কলিকাতা মহানগরে অর্জ্জিত বিদেশী মুদ্রা ও কলিকাতার আদায়ীকৃত শুল্ক-ট্যাক্স ইত্যাদিতে সারা ভারতের রুধির প্রবাহ বহিতেছে। অথচ এইরূপ কাজ করা উচিত "কলিকাতা পৌর সংস্থার ও রাজ্য সরকারের"। একদিকে অবিবেচনা ও অদূরদর্শিতা, অন্যদিকে প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষ!

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রকলা

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

স্বগ্য শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ও তাঁর অঙ্কিত ছবির সহিত কদিন ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হবার সৌভাগ্য হয়েছিল। ই কারণে অনেক পুরাণো কথা মনে পড়ছে। পুরাণো লেও তাদের আত্মসাৎ করার উপায় নেই, কারণ গোপন ণ্ডারে অনেক জাতীয় সম্পদের খবর আছে।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী আগের কথা, তখন গুরু অবনীন্দ্রথের যুগ, কৃষ্টি সাধনের নবচেতনায় মার্জিত মহলে ছবি াঝার হুজুগ পড়ে গিয়েছে এবং না-বোঝার তাড়ায় ছবি কনাও ঢাক-ঢোল বাজিয়ে সুরু হয়েছে। সস্তায় বাবুগিরির ত ক্রেতার দল, প্রদর্শনীর তালিকায় কমদামী ছবির নম্বর জেছেন, আমার মত আনাড়ির আঁকা ছবিও হুজুগের ট্টগোলে বিকিয়ে যাচ্ছে। বিকিকিনির বাজারে দৈবাৎ দীয়মান শিল্পীর সহিত ক্রেতার সাক্ষাৎ পরিচয় হয়ে গেলে, শিল্পীর পিঠে বেধড়ক চাপড় মেরে জানিয়ে দিচ্ছেন, 'আমার মত একজন ক্রেতা পেলে ; তোমার ভাগ্যি ভাল! আমার নামটা মনে রেখ, ভবিষ্যতে সার্টিফিকেট-দাতা হিসাবে কাজে আসবে।' এই জাতীয় কৃপা এখন আমরা ভোগ করছি। কৃপার বিনিময়ে কৃতজ্ঞতার বোঝা বহনেও অভ্যস্ত 'তে হয়েছে, অন্যথায় ক্ষুধার তাড়না ডাষ্টবিনের দিকে ছোটায়। উচ্ছিষ্ট অন্নের ডাক, বুভুক্ষু কুকুর-বেড়াল ও মানুষকে এক পংক্তিতে বসিয়ে ছাড়ে। আশ্চর্যের ব্যাপার ই যে, পূতিগন্ধের মাঝেও রুচির আভিজাত্য সজাগ। তাকে নিয়েই ভালমন্দের বিচার চলে।

শিল্পীর অদৃষ্ট মেনে নিয়েই আমার বক্তব্যে নামি। গুরু অবনীন্দ্রনাথের সমসাময়িক বা তাঁর প্রভাবে যাঁরা যাসল গুণগ্রাহীর কাছে শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছিলেন, তাঁদের াম ও কাজের দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হ'লে গগনেন্দ্রনাথের নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

প্রভাবের কথা উল্লেখ করতে হ'ল কারণ মৌলিকতার াঠিবাজি, intellectual দাঙ্গার অধুনা এমনই ব্রহ্মাস্ত্র য়ে দাঁড়িয়েছে যে, খাঁটি নকলও original ব'লে চ'লে াচ্ছে। নির্বিচারে originalityর ওপর দাবি সঙ্গত ব'লে মনে করি না, কারণ পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর প্রতিক্রিয়া, অনুকরণশীল মানুষের চিন্তাধারা, রুচি, এমন কি ব্যক্তিগত চরিত্র গঠনের উপরও ছাপ দিয়ে যায়। অসাধারণ বা genius ব্যতীত এই প্রত্যাশার ব্যতিক্রম নেই। প্রভাবের প্রতিপত্তি কড়া পাহারায় নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও যাঁরা আপন বৈশিষ্ট্যের সত্বাকে স্বীকৃতি দিতে পেরেছেন, মোহান্ধের মত অনুসরণ বা অনুকরণের আকর্ষণ থেকে আত্মরক্ষা করেছেন, তাঁদের মধ্যে গগনেন্দ্রনাথ একজন বিশিষ্ট কর্ণধার। সংক্ষেপে গুরু অবনীন্দ্রনাথের অঙ্কন-পদ্ধতি বা রূপ-কল্পনার আদর্শের সহিত গগনেন্দ্রনাথের আঁকা ছবির কোন মিল ছিল না, যদিও দুই ভাই একই জায়গায় ব'সে ছবি আঁকতেন, এক সঙ্গে একই পরিবারে মানুষ হয়েছিলেন। সুতরাং বিরাট শিল্পী গগনেন্দ্রনাথের অবদানকে স্বতন্ত্র স্থান দেওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করি।

গোড়ার দিকে গগনেন্দ্রনাথের আঁকা জল রংএর ছবিতে প্রাকৃতিক দৃশ্যই প্রাধান্য পেয়েছিল। পরে, Cubism তাঁকে পেয়ে বসল। তখনকার আবহাওয়ায় তিনি হলেন Modern। যে দেশ থেকে নতুন ধারার আমদানী, সেখানে এই জাতীয় ism মার্কা ছবির পরিকল্পনা ছিল জ্যামিতিক ফরমায় আবদ্ধ, যা abstraction-এর ছোঁয়া লাগায় আমার মত অনেকের কাছে আজও অবোধ্য হয়ে আছে।

গোলক-ধাঁধার প্যাঁচ জড়ান ছবির, শূন্যগামী উদ্দেশ্যকে, সুস্থ মনে বোঝা দুঃসাধ্য কর্ম বলেই প্রশ্ন ওঠে, ছবিতে শিল্পীর ভাব-অভিব্যক্তি যেখানে রূপহীন, সেখানে যা নেই তারই অস্তিত্ব ঘোষণা এবং শূন্যের জবরদস্তি গুণ ব্যাখ্যার জন্য কলমের ডগায় বন্দুকের সঙ্গীন চড়ালে মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ থাকে না কি? ছবিতে সুন্দরের আদর্শ সম্বন্ধে নানা মতবাদ থাকা স্বাভাবিক। মানুষ এগিয়ে চলেছে নূতনকে জানার জন্য, এই চলার প্রেরণা আসে ধীর চিন্তার বিধান থেকে, বিশেষ বক্তব্য ও উদ্দেশ্যকে সার্থক করার জন্য। কিন্তু Abstract-পন্থীর মতবাদে

ছবিকে উদ্দেশ্যের সর্তে বাঁধা নিয়ম নয়, ছবির রূপ ও বাস্তবের সহিত সাদৃশ্য খোঁজে না—বক্তব্যের নথিতেও যা থাকে তা নিজের কথা। নিজে শোনারই রেকর্ড। সুতরাং স্বীকার করতে হয় এই প্রথায় ছবি আঁকার চেষ্টায় রেখার জড়াজড়ি ও রং-এর তাল পাকিয়ে একটা হট্টগোল বাধাতে পারলেই শিল্পী আত্মতুষ্টির বিশেষ সুযোগ পায়। অবোধ্য তালগোল পাকানো রূপকেই originalityর বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। রেখার জড়াজড়িতে দৈবাৎ বাস্তবের সাদৃশ্য এসে গেলে, ছবির একটা নামকরণও হয়ে থাকে—কিন্তু নামের মালিক কোথায়, তা শিল্পী জানে না। রেখার দ্বারা ধর-পাকড়ের কারণ খুঁজলে শিল্পী পরম নির্লিপ্তের মত বলে—কারণ আবার কি? আমি ছবি আঁকি সেটা আমার ইচ্ছে, ছবিতে যা-খুসী তাই করাটাও আমার ইচ্ছে, দর্শকের দল না বুঝলে ক্ষতি তাদেরই। ছবিতে যা আছে তা আমি নিজেই বুঝি না। নিজের প্রতি এইরূপ শ্রদ্ধা একমাত্র বাতুলের পক্ষেই সম্ভব। তার বাঁচার ধারায় সবকিছুই নিষ্কাম ও উদ্দেশ্যহীন। সে পথে পথে ঘোরে, কিন্তু চলার উদ্দেশ্য বা গন্তব্যস্থান জানে না, সে কথা বলে কিন্তু কাউকেও শোনাবার প্রয়োজন হয় না, নিজের কথা স্বকর্ণে শুনলেও অর্থকরণ তার পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ কথার ধ্বনি কানের মধ্যে গেলেও মস্তিষ্কে পৌঁছবার উপায় নেই।

আধুনিক প্রগতিশীলতার সমর্থনে এই প্রথায় রূপ-সৃষ্টি যদি আর্টের চরম কাম্য হয়, দলভারীর দাপটে ভিন্ন মতের রুচি ও প্রকাশভঙ্গিকে সম্পূর্ণভাবে সংস্কারিক রীতির আদর্শ থেকে বিচ্যুত না করলে চলে না, তা হ'লে বুঝতে হয়, দল-বন্ধের প্রকোপে শাসনই বিচারের চরম বিধান হয়ে দাঁড়িয়েছে, নির্দোষেরও দণ্ড থেকে পরিত্রাণ নেই।

গগনেন্দ্রনাথের কথায় ফিরে আসি। তিনি প্যাঁচের ঘূর্ণীপাককেই সুন্দর ও সহজবোধ্য করার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। ছবির রূপ পরিকল্পনায় বাস্তবের অভিজ্ঞতা যোগ দেওয়ায় রস নিবেদনে হৃদয়ের সাড়া পেতে লাগলাম। জটিলকে সায়েস্তা করার প্রথায় ঐন্দ্রজালিকের কৌশল ছিল। বিস্ময়মুগ্ধ দর্শক ছবির বাহ্যরূপকেই সহজ ব'লে মেনে নিল, কিন্তু যাঁরা ভিতরের খবর রাখেন তাঁরা স্বীকার করবেন যে, সুন্দরের রূপ ধরার কৌশল আয়ত্ত করা সহজসাধ্য নয়, কারণ ইংরাজী ভাষায় তথাকথিত simplicityর আড়ালে যা থাকে, তা আসলে diffi solution of intriguing problems। এ সমস্যা সমাধান করতে হ'লে অক্লান্ত পরিশ্রম, দৃঢ় সংকল্প ও অটুট আত্মবিশ্বাস একান্ত প্রয়োজন। সব কয়টির প্রো মিলিতভাবে শিল্পীর উচ্ছ্বাসকে রূপায়িত করার জন্য সহ না হ'লে রূপ-সৃষ্টির উদ্দেশ্য সার্থক হওয়া সম্ভব না। গগনেন্দ্রনাথ জটিলকে জেনেই দুর্গম পথ-চলার পা সংগ্রহ করেছিলেন এবং যাবতীয় বিঘ্ন এড়িয়ে চলার দাবি প্রতিষ্ঠিত করাতেই আজ তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য দেবার আয়োজন হয়েছে। দ্রুত পরিবর্তনশীল, নিত্য নব-রুচির আমদানী সংঘর্ষণের জয়পতাকা উড়িয়েও সত্যের ভিত্তি বা সুন্দরের স্থায়িত্বকে বিধ্বস্ত করতে পারে নি।

এই প্রসঙ্গে সুন্দর ও সত্যের আদর্শ সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, কারণ আদর্শের প্রতিষ্ঠা আসে ব্যক্তিগত বিচার অথবা সংস্কারবদ্ধ চলতি মতের অনুগমন থেকে। ব্যক্তিগত বিচার যতই স্বাধীন চিন্তার দাবি করুক তাতে বাইরের কিছুটা প্রভাব থেকে যায় কিন্তু এই জাতীয় প্রভাবকে সব সময় বশ্যতার অধীনে আত্মোৎসর্গ বলা চলে না, কারণ বাইরে থেকে আমদানী মতের সঙ্গে ব্যক্তিগত মতেরও যোগ থাকে, বাইরের প্রভাবকে যাচাই করেই শক্তিশালী ব্যক্তি নিজের সুবিধা অনুসারে গ্রহণ করে। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন দলবৃদ্ধির প্রয়োজন যখন আপোষবিরোধী আদর্শকে উগ্ররূপী করে তোলে তখন ব্যক্তিগত মত অচল হয়ে যায়, সত্যের স্তম্ভকেও টলায়মান ক'রে ছাড়ে।

গগনেন্দ্রনাথ ছিলেন আত্মভোলা সাধক-শিল্পী, বাইরের আলোড়ন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, ভিড়ের মাঝেও সম্পূর্ণ একলা। সত্য ও সুন্দরের উপলব্ধি আসত অন্তর থেকে, রূপ-সৃষ্টির প্রেরণায় থাকত আনন্দের সন্ধান। আনন্দই ছিল তাঁর কাছে পরম সত্য। উৎসবের ভিড়ে দক্ষিণার অনুপাতে পুরোহিত মারফৎ পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতেন না। কারণ তিনি জানতেন, কেবল সাংস্কারিক অনুষ্ঠান মেনে নির্ভুল মন্ত্রপাঠ দ্বারা একের হয়ে অপরের ভক্তি নিবেদন করানো চলে না। ভক্তি আসে ব্যক্তি বিশেষের অন্তর থেকে, নিরালাতেই তার আদান-প্রদান। একান্তচিত্ততার জন্য যে পরিবেশের প্রয়োজন হয়, তা ভিড়ের হট্টগোলে যোগদান নয়।

...ই প্রসঙ্গে উৎসবের ভিড়, দক্ষিণার অনুপাতে পুরোহিত ...ং পুণ্য সঞ্চয়ের উল্লেখ করতে হ'ল, কারণ সব কয়টির ...ত প্রদর্শনীর জটলা, ফ্যাসানমত্ত সমালোচক ও নতুন ...গর বিশেষ সাদৃশ্য আছে। ক্ষেত্রবিশেষে পুরোহিতের ...ধ্য ব্যতীত যেমন পুণ্যের পুঁজি বাড়ে না, সেই রূপ সৃষ্টির ...নায় ছাড়পত্র পেতে হ'লে সমালোচক-বন্দনা অপরিহার্য। ...ীর অস্তিত্ব, ওঠা-নামা সবই নির্ভর করে স্তুতির ...ক্ত প্রয়োগের ওপর, অন্যথায় পুরোহিতের মুখস্থ-করা ...াঠের মতই বাঁধি বোলের ব্যবহারে সমালোচক বিরূপ হয়ে বসেন। ছাপার অক্ষরে ছবির বিবরণ প্রচার না হ'লে শিল্পীর ভাগ্যে ক্রেতা জোটে না।

মহাশিল্পী গগনেন্দ্রনাথের রূপ-সৃষ্টির আদর্শ এবং টেকনিক (Technique) অর্থাৎ প্রকাশভঙ্গির সূত্র-বিশ্লেষণ এই প্রসঙ্গে অবান্তর নয়, কিন্তু বিশ্লেষণ মানেই বিচার এবং নিরপেক্ষ বিচার। বিচারে বসতে হ'লে বিচারককে উর্দ্ধস্তরের মানুষ হ'তে হয়। উপস্থিত ক্ষেত্রে এইরূপ ধারণা পোষণ করাও আমার পক্ষে ধৃষ্টতা, সুতরাং নমস্য শিল্পীকে পুনরায় নমস্কার জানিয়ে আমার বক্তব্য এখনকার মত শেষ করি।

—*—

রূপ ও গুণ

রূপের চেয়ে যে গুণ বড়, তাহা লোককে স্বীকার করান শক্ত নয়। কিন্তু রূপটা যদি নিতান্তই নগণ্য হইত, তাহা হইলে জগতে শোভা ও সৌন্দর্য্যের এত প্রাচুর্য্য কেন হইল? "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি জাতানি" সমুদয় সৃষ্টি আনন্দ হইতেই জন্মিয়াছে, তাই সৃষ্টি সুন্দর। বিধাতা সুন্দর; সৌন্দর্য্য তাঁহারই ঘনীভূত আনন্দ। রূপও দেখিতে জানিতে হয়। স্বাস্থ্য রূপ বাড়ায়, আত্মার সৌন্দর্য্য মুখের মধ্যে ফুটিয়া বাহির হয়। কে সুন্দর কে কুৎসিত সে বিষয়ে মানুষে মানুষে খুব মতভেদ দেখিয়াছি। যে নিজেকে কুৎসিত মনে করে এবং অনেকে যাহাকে রূপহীন মনে করে, সেও যে দেখিতে বেশ, এমন কথা একাধিক ব্যক্তির সম্বন্ধে শুনিয়াছি। রূপটা যদি শুধু শরীরের ও বাহিরের জিনিষ হইত, তাহা হইলে একই মানুষের যৌবনের রূপ প্রৌঢ়ত্ব ও বর্দ্ধক্যের রূপের অপেক্ষা অধিক হইত। কিন্তু যৌবনাপগমে রূপ বাড়িয়াছে, এমন প্রসিদ্ধ কোন কোন মানুষের নাম করা খুব সহজ। স্থূলদর্শীর কাছে রূপগুণের বিরোধ আছে, সূক্ষ্মদর্শীর চক্ষে বিরোধ নাই। রূপ দেখিতে হইলে দ্রষ্টার সাত্ত্বিকতা চাই।, মহাকবি স্পেন্সর যে বলিয়াছেন, "Soul is form and doth the body make." "আত্মাই রূপ, আত্মা শরীরকে গঠন করে," ইহাতে গভীর সত্য আছে। আমরাই কি দেখি নাই, সুগঠিত মুখ পাপ ও দুষ্প্রবৃত্তির বশে কেমন শ্রীহীন হইয়া যায়, আবার সতত উচ্চচিন্তা ও সাধু-জীবনের প্রভাবে সৌষ্ঠববিহীন মুখেও কেমন অশরীরী সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে?

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বৈশাখ, ১৩২১।

বিশ্বামিত্র

চাণক্য সেন

একটা গোলমেলে ব্যাপারে জড়িয়ে গিয়েছিলেন হরিশংকর ত্রিপাঠি। এ ব্যাপারে জড়িত ছিল একটি রূপসী মুসলমান যুবতী। ব্যাপারটা আদালত পর্যন্ত পৌঁচেছিল। অস্তাচল-গামী ইংরেজ শাসনের গোধূলি অধ্যায়েও বিলাসপুরে এমন একজন উচ্চপদস্থ মুসলমান রাজকর্মচারী ছিলেন, যাঁর হাত থেকে হরিশংকর ত্রিপাঠি রেহাই পান নি। অবশ্য তিনি জানতেন যে, আদালতে তাঁর দোষ বা অপরাধ প্রমাণিত হবে না। তথাপি আদালতে এসব ব্যাপার আসা মানে অসম্মান। রাজনৈতিক প্রতিপত্তির মূলে কুঠারাঘাত। ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলন উৎসবের সপ্তাহ খানেক আগে হরিশংকর ত্রিপাঠি সংকল্প করলেন মন্ত্রীসভায় ঢুকতে হবে। ভারতের পরাধীনতার সঙ্গে তাঁর জীবনের কলঙ্কও তা হ'লে যাবে অতীতের অন্ধকারে। স্বাধীনতার অরুণোদয়ে নতুন জীবনে আলোকিত ভারতবর্ষে হরিশংকর ত্রিপাঠি মজদুর ভাইদের অগ্রগতি ও কল্যাণের মহান্ আদর্শে নব উদ্দীপনায়, পূর্ণ উদ্যমে, অপরাজেয় উৎসর্গে আত্মনিয়োগ করতে পারবেন।

হরিশংকর ত্রিপাঠি জানতেন হাই কমাণ্ডের নির্দেশ মন্ত্রীসভায় যতদূর সম্ভব মজদুর, কৃষাণ ও তপশিলী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস নেতাদের স্থান দিতে হবে। উদয়াচলের কংগ্রেসে মজদুর নেতাদের অগ্রণী হরিশংকর। তাঁকে মন্ত্রীসভায় স্থান দিতে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যে আগ্রহ দেখাবেন এ বিষয়ে তিনি ছিলেন নিঃসন্দেহ।

সন্দেহের সত্যি কোনও কারণ ছিল না। দুর্গাভাই একবার নিস্তেজ আপত্তি করেছিলেন।

"হরিশংকর ত্রিপাঠি আসলে লেবর লীডর নন," বলেছিলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে। "তাঁর হাত পরিষ্কার নয়।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হেসেছিলেন: "ত্রিপাঠিজিকে আমি বিলক্ষণ জানি। আপনি যা বলছেন, সত্যি। তবু তাঁকে মন্ত্রীসভায় নিতে হবে।"

"কেন?"

"উদয়াচল কংগ্রেসে একমাত্র হরিশংকর ত্রিপাঠিই মজদুর নেতা ব'লে পরিচিত। তিনি জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অন্যতম নেতা। আন্তর্জাতিক লেবর কনফারেন্সে একবার ভারতের অন্যতম প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন।"

"তিনি কি মন্ত্রীত্ব চান?"

"হরিশংকর অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক। মন্ত্রীত্বের প্রক উমিদার তিনি নন। হালে তিনবার তাঁর সঙ্গে আম দেখা হয়েছে। মন্ত্রীসভা গঠন নিয়ে একটি প্র করেন নি।"

"তা হ'লে বোধ হয় তিনি চান না।"

"ওটা তাঁর কর্মকৌশল, ষ্ট্র্যাটজি। তিনি নিমন্ত্রণে অপেক্ষায় রয়েছেন। জানেন, তাঁকে আমি ডাকবই।"

"ডাকতেই হবে?"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দুর্গাভাইকে একখানি পত্র দেখালেন দিন চারেক আগে দিল্লী থেকে এসেছে।

এই কথোপকথনের পরের দিন কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সাদ আহ্বানে হরিশংকর ত্রিপাঠি তাঁর বাসভবনে উপস্থি হলেন।

আধ ঘণ্টা দু'জনে কথাবার্তা হ'ল।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলের প্রথম মন্ত্রীসভায় হরিশংক ত্রিপাঠি নাম দিতে রাজী হলেন। দপ্তর নিয়ে প্রথম থেকেই মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলেছিলেন, "আপনি উদয়াচলের প্রধান শ্রমিক নেতা। শ্রম-মন্ত্রীত্ব আপনাকে দেব।"

হরিশংকর ত্রিপাঠি বলেছিলেন, "তাতে আমার বিশে কিছু শ্রম হবে না। উদয়াচলে শিল্প বলতে যা আছে তা সামান্য। শ্রম-মন্ত্রীর করণীয় কিছু থাকবে না।"

"শিল্প বাড়বে। শ্রমিকের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাবে।"

"আপনি আমার কর্মক্ষমতা বেশ ভালই জানেন। আজ প্রায় পঁচিশ বছর আমি শিল্পের সঙ্গে জড়িত। আহমদাবাদে এমন কোনো কারখানা নেই যা আমি সম্যক জানি নে। উদয়াচলেও খনিজ শিল্পের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আপনার অজানা নয়। আমার ক্ষুদ্র ক্ষমতা নিয়ে এ প্রদেশের বিরাট্ অব্যবহৃত খনিজ সম্পদ সম্বন্ধে বেশ কিছু কাজকর্ম আমি করেছি। যদি আমাকে আপনি শিল্প ও খনিজ সম্পদের দায়িত্ব দেন, উদয়াচলের আর্থিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তনে আমি সবটুকু শক্তি বিনিয়োগ করব।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "হরিশংকরের কর্মক্ষমতায় অথবা [illegible] তাঁর

মাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু ত্রিপাঠিজি, মন্ত্রীসভা গঠন,
তে পাচ্ছি, বড় এক ইমারত তৈরির চেয়ে অনেক
ন। ধরুন, আপনি একটি মহল তৈরি করছেন।
নার লক্ষ্য দু'টি: ব্যবহারিক উপযোগিতা এবং
শিল্পের সৌন্দর্য। আপনি দুয়ের সুঠাম সামঞ্জস্য
য়ে প্ল্যান তৈরি করলেন; সে-প্ল্যান কর্তৃপক্ষের
মোদন পেলে, আপনি তাতে ইঁট-সিমেণ্ট-লোহা-রংএর
য়ব দিতে লেগে গেলেন। মন্ত্রীসভা নির্মাণে
ত লাগাবার আগে আমারও তেমনি বাসনা ছিল।
পাঠিজি, আপনি জানেন, আমার এক-আধটু সাহিত্য-
ণতা আছে। না, না, বড় কবি আমি নই, আমি
সীদাস নই, টাগোর নই, কালিদাস ত নই-ই; তবু,
বিনয় মাপ করবেন, আমার কিছুটা কবি-যশ আছে।
ীসভা গঠনের কাজ আমি রাজনৈতিক মনের সঙ্গে
নিকটা শিল্পীমন নিয়েও শুরু করেছিলাম। ভেবেছিলাম,
য়াচলের মত অনগ্রসর প্রদেশের ভাগ্য-নির্মাণ যখন
ধাতার রহস্যময় খেয়ালে আমার মত অযোগ্যের হাতে
সে পড়ল, তখন, আমার সবটুকু সুবুদ্ধি নিয়োগ ক'রে,
পনাদের মত সুদক্ষ নেতাদের সাহায্যে এমন এক মন্ত্রীসভা
ন করব যা এ প্রদেশের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও অগ্রগতি
ধন করতে পারবে। ভেবেছিলাম দল-উপদল গোষ্ঠি-উপ-
াষ্ঠি মানব না, যেখানে যোগ্যতম ব্যক্তি আছেন, হাতে-
য়ে ধরে বেঁধে আনব; মন্ত্রীসভায় এমন কেউ থাকবেন না
নি উদয়াচলে স্বক্ষেত্রে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত নন।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব'লে চললেন, "কিন্তু
জনীতি এমন কঠিন ব্যাপার, ত্রিপাঠিজি, যে আমার স্বপ্ন
ঝ আর সার্থক হ'ল না। রামায়ণের একটি শ্লোক মনে
ছে, সেই কুম্ভকর্ণের সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের যুদ্ধের বর্ণনা।
সকল শরে রামচন্দ্র সপ্তশালভেদ এবং বালিবধ করে-
লেন, কুম্ভকর্ণ তা বেমালুম হজম ক'রে বসলেন। যুদ্ধের
সময় কুম্ভকর্ণ ছিন্নবাহু, ছিন্নপদ হয়ে রামচন্দ্রের দিকে
বার ন্যায় মুখব্যাদন ক'রে ধাবমান হলেন। বাল্মিকী
র বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন, "রাহুর্যথা
মিয়ান্তরীক্ষে"—রাহু যেমন আকাশে চন্দ্রের দিকে
ত হয় সেইরূপ। রাজনীতির রাহু আমার
-চন্দ্রমাকেও তেমনি গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে—
মি ত শ্রীরামচন্দ্র নই, তাকে আটকাবার সাধ্য আমার
। সুতরাং শেষ পর্যন্ত মন্ত্রীসভা যা দাঁড়াবে তা
নকখানি রাজনৈতিক বাস্তব, সামান্য স্বপ্ন। এ ছাড়া
র কোনও উপায় নেই। দর-কষাকষির যেন আর শেষ
। আপনাকে বলতে কি—আপনি ত আমাদের মত
দলীয় নেতা-উপনেতা নন, শ্রমিক-আন্দোলনে আপনার
নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত—একমাত্র দুর্গাভাই ছাড়া এমন একজন
নেতাও উদয়াচলে নেই, যিনি মন্ত্রীসভায় বিনাসর্তে, বিনা
দরাদরিতে যোগ দিতে এগিয়ে এসেছেন।"

হরিশংকর ত্রিপাঠি বললেন, "আপনি ভাববেন না
আমি দরাদরি করছি।"

"ভাবলে আপনাকে এমন মন খুলে সব বলতাম না,
ত্রিপাঠিজি। আমি জানি, আপনি উদয়াচলের কল্যাণ ও
উন্নতি ছাড়া আর কিছু কামনা করেন না। শিল্প-দপ্তরের
দায়িত্ব আপনাকে দেবার কথা, খোলাখুলি বলছি, আমি
ভাবি নি। কিন্তু খনিজ সম্পদের ভার আপনাকে দেব,
এ ইচ্ছে আমার ছিল, এখনও আছে। পেরে উঠব কি না
জানি নে, খুব একটা ভরসাও রাখি নে এখন। তবু,
এটুকু আমার তৃপ্তি যে, শ্রম-দপ্তরের দায়িত্ব এমন হাতে দিতে
পারব যা অজ্ঞানতা, অনভিজ্ঞতার ভারে পঙ্গু হয়ে থাকবে
না। তা ছাড়া, ত্রিপাঠিজি, কংগ্রেসে আমাদের মত
ভদ্রলোকদের স্থান আর কতদিন? দেশের অগণিত
জনসাধারণ, যারা মেহনত করে মাঠে, কারখানায়, বন্দরে—
তারা অদূর ভবিষ্যতে দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করবে, সে
দায়িত্ব তাদের হয়ে বহন করবেন আপনাদের মত আসল
জননেতারা।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কথায় সেদিন হরিশংকর ত্রিপাঠির মন
ভিজে গিয়েছিল। এ লোকটির ক্ষমতাই শুধু নেই, বিনয়
আছে, রসবোধ আছে, দূরদৃষ্টি আছে—তিনি স্বীকার করতে
বাধ্য হয়েছিলেন। দলীয়-উপদলীয় নেতাদের দর-
কষাকষির এমন করুণ ছবি ইনি এঁকেছিলেন যে হরিশংকর
দপ্তর-দাবিতে জোর দিতে পারেন নি। মন্ত্রীসভার
তালিকা প্রচারিত হবার আগের দিন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল
তাঁকে একটি সুন্দর পত্র পাঠিয়েছিলেন। তাতে ছিল
মন্ত্রীত্ব গ্রহণে সম্মতি দেবার জন্যে বিনীত ধন্যবাদ,
হরিশংকরের নেতৃত্বে উদয়াচলের শ্রমিকদের সর্বাঙ্গীণ
উন্নতি সাধনে গভীর আস্থা, এবং শ্রম-দপ্তরের অতিরিক্ত
কোনও দায়িত্ব তাঁকে দিতে না পারার জন্যে দুঃখপ্রকাশ।
সেই সঙ্গে আশ্বাস যে, ক্যাবিনেটের কয়েকটি সাব-কমিটি
গঠন ক'রে বিভিন্ন সরকারী কাজকর্ম ঠিকভাবে পরিচালনার
প্রকল্পে ত্রিপাঠিজির সর্বজনস্বীকৃত কর্মক্ষমতা ও অভিজ্ঞতার
পূর্ণ সুযোগ নিতে মুখ্যমন্ত্রী দ্বিধা করবেন না।

সে আজ অনেক বছর আগের কথা। মন্ত্রীসভার
সদস্য হয়ে হরিশংকর ত্রিপাঠি বুঝতে পেরেছিলেন শ্রম-
মন্ত্রীর করণীয় বড় কিছু নেই, বিশেষত উদয়াচলের মত শিল্পে
অনগ্রসর প্রদেশে।

তথাপি শ্রমিকদের জন্যে কিছু কিছু কাজ তিনি করতে পেরেছিলেন। শ্রমিক-মালিকে বিবাদ তিনি বড় একটা ঘটতে দেন নি। শ্রমিকদের দেন নি এমন কিছু দাবি করতে যা মালিকরা মেটাতে পারবেন না, বা চাইবেন না। ছোট-খাট দাবি মালিকদের দিয়ে তিনি গ্রহণ করাতে পেরেছেন। শ্রমিকদের জন্যে রাজকীয় বীমা, কর্মের সময় বেঁধে দেওয়া, ওভার-টাইম—সবেতন ছুটি, চিকিৎসার প্রাথমিক ব্যবস্থা ইত্যাদি কিছু কিছু শ্রমিক-কল্যাণ তিনি সাধন করেছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা, উদয়াচলে সংঘবদ্ধ শ্রমিকসমাজে বামপন্থী দলগুলিকে তিনি আধিপত্য করতে দেন নি। য়ুনিয়নগুলি সবই জাতীয় ট্রেড য়ুনিয়ন কংগ্রেসের কর্তৃত্বাধীন রেখেছেন। বামপন্থী য়ুনিয়ন একটিও মালিকদের স্বীকৃতি পায় নি। শ্রমিক-য়ুনিয়ন থেকে বেছে বেছে একটি একান্ত ব্যক্তিগত অনুচর-দল হরিশংকর ত্রিপাঠি তৈরী করেছিলেন। দুষ্ট লোকেরা তাই তাঁকে উদয়াচলের গুণ্ডা-রাজ বলত। এ অনুচররা হরিশংকর ত্রিপাঠির জন্যে না করতে পারত এমন কিছু নেই। অন্য দলের মিটিং ভেঙ্গে দেওয়া, য়ুনিয়ন নির্বাচনের সময় ভোট সংগ্রহ, বিপক্ষ দলকে সব রকমে নাস্তানাবুদ ইত্যাদি শ্রমিক-সমাজ অন্তর্গত কাজই শুধু নয়, হরিশংকরের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক উচ্চাশার উপযোগী পথ তৈরী করায় যাবতীয় সাহায্যও।

দুর্গাভাই একাধিকবার কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কাছে এ নিয়ে নালিশ জানিয়েছে।

"কোশলজি, আপনার শ্রম-মন্ত্রী কিন্তু বেশ একটি প্রাইভেট আর্মি তৈরি করে নিচ্ছেন।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলেছেন, "তাই ত শুনছি।"

"এর বিপদটা ভেবে দেখেছেন ?"

"বর্তমানে কোনও বিপদ দেখছি না, তবে ভবিষ্যতে দেখা দিতে পারে।"

"আমি আপনার মত নিরুদ্বেগ নই। হরিশংকর যত রাজ্যের গুণ্ডাকে এনে কংগ্রেসের সভ্য বানাচ্ছেন।"

"গুণ্ডারা সভ্য হ'লে ত ভালই।"

"এটা পরিহাসের ব্যাপার নয়, কোশলজি। এতে একদিন কংগ্রেসের এমন বিপদ হবে, এমন বদনাম হবে যে, আপনি ভাবতেও পারছেন না।"

"দুর্গাভাইজি, কংগ্রেস সংবিধানে এমন কিছু নিয়ম-কানুন নেই যাতে আপনি যাদের গুণ্ডা বলছেন তাদের সভ্য হওয়া বন্ধ করা যায়। তা ছাড়া, এ ব্যাপারটা প্রাদেশিক কংগ্রেসের লক্ষণীয়, সরকারের নয়। হরিশংকরের অনুচররা কোনও বেআইনী কাজ করছে ব'লে "আজ করছে না। একদিন করবে।"

"সেদিন আমরাও ঘুমিয়ে থাকব না।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন একেবারেই ঘুমিয়ে থাকেন নি। হরিশংকর ত্রিপাঠির যাবতীয় কাজকর্মের খবর তিনি রাখতেন। জানতেন, হরিশংকরের "প্রাইভেট আর্মি"তে প্রায় তিনশত সন্দেহজনক চরিত্র স্থান পেয়েছে। এরা যা করত তা ন্যায়-নীতির দিক্ থেকে আপত্তিজনক হ'লেও আইনের সীমানার বাইরে যেত না। হরিশংকর শ্রমিকদের মধ্যে বিপজ্জনক রাজনীতি বা ভাবধারা দুর্ভাবনীয় ধারায় প্রবেশ করতে দেন নি, তাতে উদয়াচলের মঙ্গলই সাধিত হয়েছে। মালিকরা সরকারের সঙ্গে প্রায় সব বিষয়ের সহযোগিতা ক'রে এসেছে; কোনও বড় হাঙ্গামায় উদয়াচলেও শিল্প-শান্তি ব্যাহত হয় নি। মোট কথা হরিশংকরের সঙ্গে বিবাদের কোনও কারণ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেশ ক'বছর খুঁজে পান নি। যে-সব নৈতিক প্রশ্ন দুর্গাভাইএর কাছে বড় মনে হ'ত, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাদের খুব একটা দাম দিতেন না। দুর্গাভাই শ্রদ্ধেয়; কিন্তু তাঁর আদর্শবাদ বাস্তব-রাজনীতির বাজারে পুরাতন টাকার মত খাঁটি রূপা হ'লেও অচল।

মন্ত্রীসভার তৃতীয় বছরে এক দুর্ঘটনা ঘটল যার ফলে হরিশংকর ত্রিপাঠির সঙ্গে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলের প্রথম রাজনৈতিক ক্ষমতার মুখোমুখি পরিমাপ হ'ল।

পাকিস্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায় ভারতবর্ষের অনেক স্থানে অশান্তির আগুন জ্বলে উঠল। উদয়াচলেও আগুন লাগল।

আগুন লাগল প্রথম কাপড়ের কলে শ্রমিক বস্তিতে। ছড়িয়ে পড়ল বেশ কয়েকটি শহরে। দেখা গেল, এ আগুনের পেছনে রয়েছে হরিশংকর ত্রিপাঠির 'প্রাইভেট আর্মি।' হরিশংকর কয়েকদিনের মধ্যে উদয়াচলের বিপন্ন হিন্দুদের সবচেয়ে সক্রিয় রক্ষকের গৌরবে অভিনন্দিত হলেন।

দুর্গাভাই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন।

মুখ্যমন্ত্রীকে বললেন, "হরিশংকর ত্রিপাঠি গুণ্ডাদের দিয়ে মুসলমানদের বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছেন। হঠাৎ তিনি হিন্দু-নেতা হয়ে উঠেছেন।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন উষ্ণ হয়ে বললেন, "এসব দুষ্ট লোকের প্রচার। মুসলমান নেতারা দাঙ্গা বাধিয়েছে, প্রথম আক্রমণ হয়েছে হিন্দুদের ওপর। হিন্দুরা যদি নিজেদের রক্ষা করতে চায়, তাদের দোষ দিতে হবে ?"

"এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হরিশংকর ত্রিপাঠির ভূমিকা আপনি ভাল ক'রে জানেন ?"

"তা হ'লে আমার কিছু বলার নেই। আইন ও শৃঙ্খলা রাখবার দায়িত্ব আপনার।"

হরিশংকর ত্রিপাঠির ভূমিকা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ভালই জানতেন।

তিনি শ্রম-মন্ত্রীকে পরামর্শের জন্যে আহ্বান করলেন।

"ত্রিপাঠিজি, আপনার কার্যের প্রশংসা আমি করতে পারি না, নিন্দা করতে চাই নে! এখন, আমাদের প্রধান কর্তব্য হ'ল সাম্প্রদায়িক আগুন নেবানো। যা ঘটেছে তা নিয়ে হৈ-চৈ করা বৃথা।"

"মজদুররা ক্ষেপে গিয়েছে। তারা রক্তের বদলে রক্ত চায়। প্রাণের বদলে প্রাণ।"

"আপনি তাদের শান্ত করুন।"

"আমার অন্যায় দাবি তারা মানবে কেন?"

"ত্রিপাঠিজি, এখন গোলগাল বাৎচিতের সময় নেই। অবস্থা গুরুতর। যদি দাঙ্গা দু'দিনে বন্ধ না হয়, আমাকে সৈন্যবাহিনীর সাহায্য চাইতে হবে। তাতে বিপদ অনেক। সৈন্যরা গুলী চালাবে, লোক মরবে। পুলিসের গুলীতে দশ জনের মৃত্যু হয়েছে, একশ' বারো জন আহত হয়েছে।"

"এতে আমি কি করতে পারি?"

"আপনি এ হাঙ্গামা বন্ধ করতে পারেন।"

"কি ক'রে?"

"আপনার অনুচরদের দিয়ে।"

"তারা ভয়ংকর উত্তেজিত। আমরা সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে মুসলমানদের ভয়ানক প্রশ্রয় দিই। প্রশ্রয় দিয়েছি ব'লেই ভারত আজ দ্বিখণ্ডিত। পাকিস্থান ইচ্ছেমত আমাদের আভ্যন্তরীণ শান্তি ভেঙে দিতে পারে। এ দাঙ্গা তারা বাধিয়েছে আপনার জানা আছে। প্রায় সপ্তাহকাল আপনি তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত কঠোর ব্যবস্থা করেন নি। আর্মড পুলিসের হাতে শান্তিরক্ষার ভার দিতে এত সময় আপনার কেন লাগল আমার বুদ্ধির বাইরে। আপনি দুর্গাভাইজির পরামর্শে অহিংসা দিয়ে হিংসার আগুন নেবাতে চেয়েছিলেন। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব আপনার। উদয়াচলের লোকেরা আপনাকে 'লোহার মানুষ' ব'লে থাকে। অথচ এ সংকটে আপনি যে দুর্বলতা দেখিয়েছেন তাতে আমরা শুধু দুঃখ পাই নি, অবাক হয়েছি।"

"আপনি আর কে কে?"

"তাঁদের কথা তাঁরা বলবেন। আমি নিজের কথা বলছি।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "ত্রিপাঠিজি, লোকে আমাকে শক্ত মানুষ বলে ঠিকই। তারা আমার কতটুকুই বা জানে। আমি ব্রাহ্মণ সন্তান, আপনিও। চৌদ্দ পুরুষ আমরা অহিংস—অন্ততঃ মানুষের রক্ত আমরা পাত করি নি। আমি স্বীকার করছি, পুলিসকে গুলী চালাবার হুকুম দিতে আমার মন ওঠে না। এক কালে পুলিসের গুলী দেশের লোক বুক পেতে নিয়েছে, সে ক্ষত এখনও পুরো শুকোয় নি। মুখ্যমন্ত্রী হবার পর ক্ষমতা নামক বস্তুটিকে আমার বড় রহস্যময় মনে হ'ত। ভাবতাম, আমরা স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করেছি, অথচ দেশ স্বাধীন হবার পরে যে বিরাট্ দায়িত্ব আমাদের কাঁধে চাপবে তার জন্যে তৈরি হই নি। আজ আমার মত এক অতি সাধারণ মানুষের হাতে বিধাতা এ কি অসাধারণ ক্ষমতা দিয়েছেন? এ ক্ষমতা বহন করবার যোগ্যতা আমার কতটুকু? সৃষ্টি ও বিনাশের ক্ষমতা দিয়ে ঈশ্বর আমাকে এক ছোটখাট বিধাতা বানিয়েছেন! মনে পড়ছে, ত্রিপাঠিজি, প্রথম যেবার আই. জি. এসে প্রয়োজনমত গুলী চালাবার অনুমতি চাইলেন, সেদিনকার কথা। ধাঙড়দের নিয়ে একটা গোলমাল চলছিল। লালা মুনসীরামের ধাঙড় বস্তি—আপনার মনে পড়বে। বস্তি সাফ ক'রে মুনসীরাম ভাড়া দেবার জন্যে ফ্ল্যাট-বাড়ী তৈরি করবে, ধাঙড়রা বস্তি ছাড়বে না। গোলমাল শেষে দাঙ্গায় পরিণত হ'ল। আমাদের মন্ত্রীসভায় যিনি তপশিলী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, তাঁকে ধাঙড়রা হাঁকিয়ে দিল। দুষ্ট লোকেরা হঠাৎ একদিন কিছু দোকানপাট লুট ক'রে বসল—কেউ কেউ আমায় বলল, তারা আপনারই লোক, যদিও আমি তাদের কথায় কান দিই নি। বিলাসপুরে সেদিন নতুন এক স্কুল উদ্বোধন ছিল, আমায় বক্তৃতা দিতে হ'ল। বেশ জোর দিয়েই বললাম, 'আমরা হিংসা, রক্তপাত, হত্যা চাই নে, আমাদের হাত গান্ধীজীর মন্ত্রে দীক্ষিত। কিন্তু শাসনভার যখন জনগণ আমাদের এ হাতে ন্যস্ত করেছেন, শান্তি ও শৃঙ্খলা আমাকে রক্ষা করতেই হবে। দরকার হ'লে যে-হাতে আমরা চরকা কেটেছি, সে হাতে বন্দুক ধরব। যারা অশান্তি, হিংসা, বিদ্বেষ বাধিয়ে দেশের অগ্রগতি ব্যাহত করতে বদ্ধপরিকর তাদের আমি সতর্ক করছি। দেশের স্বার্থের জন্যে রক্তপাত দরকার হ'লে, আমাদের হাত টলবে না।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মৃদু হেসে ব'লে চললেন, "বাইরের দৃষ্টিতে দেখলে ঘটনাটা কিঞ্চিৎ হাস্যকর। জীবনে আমি কোনওদিন বন্দুক ধরি নি। অথচ এক বিরাট্ বন্দুকধারী পুলিসবাহিনী আমার আজ্ঞাধীন। কোন্টা কোন্ জাতের রাইফেল আমি জানি নে। অথচ আমি 'সেনাপতি'। সেদিন সন্ধ্যাবেলা আই. জি. এসে বলল, স্যর, বন্দুক ছাড়া

অবস্থা আয়ত্তে আনা যাবে না। আপনি আজ যা বলেছেন তা অতি সত্যি কথা। আদেশ দিন, দরকার মত আমরা বন্দুক চালাব। আদেশ না দিয়ে উপায় ছিল না। দাঙ্গাকারীদের হাতে ডজন কয়েক পুলিস জোর জখম হয়েছিল, একজন এস. আই. মাথা ফেটে হাসপাতালে। আদেশ দিতে হ'ল। কিন্তু সে কি ভীষণ অশান্তি! সারারাত ঘুম হ'ল না। পরের দিন আই. জি.-কে বললাম, গুলী না চালিয়ে পারলে হুকুম দেবেন না। প্রথম প্রথম ফাঁকা আওয়াজ করবেন। গুলী করলেও, দেখবেন, কেউ যেন প্রাণে না মরে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনায় তা হ'ল না। ধাঙড়রা পুলিসদের আক্রমণ করল, পুলিস গুলী চালাল, চারটে ধাঙড়ের মৃত্যু হ'ল। নেপথ্যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলের অবস্থাটা লোকের অগোচরেই রয়ে গেল।"

হরিশংকর ত্রিপাঠি বললেন, "স্বাধীন ভারতে পুলিসের গুলী কম চলছে না, কোশলজি।"

"চলছে। চলবার দরকার হচ্ছে। কিন্তু আমি উদয়াচলে পুলিস ও সৈন্যের রাজত্ব একদিনের জন্যেও চালাতে চাই নে। ভারতবর্ষে উদয়াচলের মান-সম্মান তা হ'লে আর থাকবে না। আমাদের গর্ব করবার বিশেষ কিছু নেই। শিল্পে, শিক্ষায়, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে গর্ব করবার আমাদের কিছু নেই। আমাদের গর্ব শুধু শান্তি ও সম্প্রীতিতে। এ বছর দিল্লীতে রাজ্যপালদের বাৎসরিক সভায় উদয়াচলকে দেশে সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ প্রদেশ ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে। পাকিস্থানে ও ভারতে কতবার ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হ'ল, কিন্তু উদয়াচলে এর আগে এ-আগুন লাগে নি। ত্রিপাঠিজি যদি এ আগুনের পেছনে আপনার অনুচরদের উস্কানি থাকে, আপনি আমার বুকে বড় আঘাত করেছেন, আমার মাথা হেঁট ক'রে দিয়েছেন।"

"এ মিথ্যা প্রচার আপনি বিশ্বাস করেন?"

"না, করি না। তবে জানি, এ দাঙ্গা আপনি বন্ধ করতে পারেন। এবং সে অনুরোধই আপনাকে করছি।"

হরিশংকর ত্রিপাঠি দাঙ্গা বন্ধ করেছিলেন।

তিন মাস পরে মন্ত্রীসভার বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য শ্রীরাম চৌহানের মৃত্যু হ'ল। নতুন মন্ত্রী নিয়োগ ও দপ্তর পুনর্বণ্টনের সুযোগে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হরিশংকর ত্রিপাঠিকে শিল্প-মন্ত্রী করলেন।

দুর্গাভাইকে তিনি বোঝালেন, "শ্রমিকদের ওপর হরিশংকর ত্রিপাঠির প্রভাব কমাতে হবে। তাঁর 'প্রাইভেট আর্মি' ভেঙ্গে দেওয়া দরকার হ'য়ে পড়েছে।"

হরিশংকর যা চেয়েছিলেন, পেলেন। কিন্তু যে-ভাবে চেয়েছিলেন, সে-ভাবে পেলেন না।

ক্রমশঃ

—•—

কর্ত্তব্য ও আনন্দের মিলন

কর্ত্তব্যপরায়ণতা ভাল, আমোদের লালসা ভাল নয়। কিন্তু আমোদ ও আনন্দ এক জিনিষ নহে। আনন্দ ব্যতীত কোন কাজ সুন্দররূপে করা যায় না। যে কেবল নিয়মের অনুরোধে অনুশাসনের আনুগত্যে কর্ত্তব্য করে, সে বেশী দিন কর্ত্তব্যপরায়ণ থাকে না। কর্ত্তব্যের মধ্যে যে রস পাইয়াছে, সেই প্রকৃত রূপে কর্ত্তব্য পালন করিতে পারে।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বৈশাখ, ১৩২১

ডাক্তার নীলরতন সরকার

শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

১৮৬১ সন ভারতের একটি স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসরে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, শিক্ষাব্রতী মদনমোহন মালব্য, সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী ও দেশনায়ক মতিলাল নেহরু এবং শতায়ু ভারতরত্ন বিশ্বেশ্বরায়া জন্মগ্রহণ করায় বিশ্বসভায় ভারতবর্ষ একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছে।

স্বনামধন্য ডাক্তার নীলরতন সরকারও এই বৎসর কলিকাতার দক্ষিণে ন্যাতরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামটি ডায়মণ্ডহারবারের নিকট, ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্ভুক্ত। সরকার-বংশ সম্পদে ও সম্মানে একদিন বাংলা দেশে সুপরিচিত ছিল। কলিকাতা শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর এবং খুলনার আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের পরিবারবর্গের সহিত ইঁহাদের কৌলিক সম্বন্ধ ছিল।

১৮৬৪ সনে ভীষণ ঝটিকায় ন্যাতরা গ্রাম বিধ্বস্ত হইয়া যায়। ইহার সঙ্গে বন্যায় কৃষিক্ষেত্রগুলি লবণ-জলে ডুবিয়া গিয়া চাষের অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে। গ্রাম হইতে প্রায় সকলকেই পলাইতে হয়। সরকার-পরিবারও তখন ন্যাতরার কিছু উত্তরে নীলরতনের মাতুলালয় জয়নগরে আসিয়া বাস করিতে বাধ্য হন। ঝড় ও বন্যায় যে আর্থিক ক্ষতি হইল, সে ক্ষতি আর তাঁহারা পূরণ করিতে পারিলেন না। দারিদ্র্যের চরম সীমায় উপনীত হইলেন। শুনা যায় ছোটবেলায় নীলরতনদের গায়ে দেবার জামা ছিল না। একখানি মাত্র চাদর ছিল, প্রয়োজনমত তাঁহারা কয় ভাই সেই চাদরখানি গায়ে দিয়া বাড়ীর বাহির হইতেন।

নীলরতনের পিতা নন্দদুলাল সরকার মহাশয়ের পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা। তিনি আপনভোলা মানুষ ছিলেন। সংসারের আর্থিক কষ্ট নিবারণের সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। নীলরতনের মাতা থাকমণি বিশেষ বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি নিজেকে সকল সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়া অশেষ কৃচ্ছ্রসাধনে এই বৃহৎ পরিবার-পালনের সকল ভার মাথা পাতিয়া লইলেন। অভাব-অনটনের সকল জ্বালা সহ্য করিয়া অল্প দিনেই তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিছুদিন রোগ-ভোগ করিয়া ১৮৭৫ সনে [illegible]

নীলরতনের বয়স তখন চৌদ্দ বৎসর মাত্র। কোমলহৃদয়া মাতা নীলরতনকে প্রাণাধিক ভালবাসিতেন। এইরূপ অসহায় অবস্থায় ও বিনা চিকিৎসায় মায়ের অকাল-মৃত্যুতে তাঁহার কিশোর মনে নিদারুণ আঘাত লাগে। চিকিৎসা-বিদ্যা শিখিয়া দেশের সেবা করিবার শুভ সংকল্প সেই সময়েই নীলরতনের মনে উদিত হয়।

বাল্যকাল হইতেই নীলরতনের যন্ত্রবিদ্যার প্রতি বিশেষ আসক্তি ছিল। ছোটখাট জিনিষ সামান্য যন্ত্রপাতির সাহায্যে তিনি বাড়ীতেই প্রস্তুত করিতেন। আত্মীয়-স্বজনেরা ভাবিত নীলরতন বড় হইয়া একজন দক্ষ "ইঞ্জিনীয়ার" হইবে। তাঁহার নিজেরও সেইরূপ ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বিধাতার বিধি অন্যরূপ। চিকিৎসার অভাবে স্নেহময়ী মাতার অকালমৃত্যু তাঁহাকে অন্য পথে লইয়া গেল। মানুষের হাতে-গড়া কল-কারখানার ডাক্তার না হইয়া শ্রীভগবানের সৃষ্ট দেহ-যন্ত্রের চিকিৎসক হইলেন। যন্ত্রবিশারদ না হইয়া, হইলেন ভিষকরত্ন। কলকারখানার প্রতি আসক্তি তাঁহার কোন দিনই কিন্তু দূর হয় নাই। তিনি নানাবিধ শিল্প-প্রচেষ্টা আজীবন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই মনোভাব লক্ষ্য করিয়া অনেক ঠগ বহুবার নূতন শিল্প-প্রযোজনার অছিলায় তাঁহার নিকট হইতে প্রভূত অর্থ লইয়াছে। নীলরতন কিন্তু উহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আনিতেন না। তাঁহার টাকায় শিল্পোন্নতির পথ পরিষ্কার হইল এই ভাবিয়াই তিনি আনন্দ বোধ করিতেন।

জয়নগর হাই স্কুলেই তাঁহার লেখাপড়া প্রথম আরম্ভ হয়। তিনি যখন এই স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে (Second class বর্ত্তমান Class IX) পড়েন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পাইবার আশায় তখনই তাঁহাকে দিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ান হয়। ১৮৭৬ সনে সেই পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। তাঁহাদের স্কুলও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে। এই বৎসরেই তিনি ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে ভর্ত্তি হন। বাড়ীর সকলেই তখন জয়নগর হইতে কলিকাতায় চলিয়া আসিয়াছেন। নিজের লেখাপড়ার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য এবং বৃহৎ পরিবার-পোষণের সাহায্যার্থ

তাঁহাকে কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে হইত। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকেও পড়াশুনা ছাড়িয়া স্কুলে শিক্ষকতার চাকুরি গ্রহণ করিতে হইল। জ্যেষ্ঠের এই মহত্ব তিনি কোনদিন ভুলেন নাই। উপার্জ্জনক্ষম হইবামাত্র তিনি দাদাকে সংসারের ভার হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি দেন।

১৮৭৯ সনে নীলরতন ডাক্তারী ডিপ্লোমা পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। পড়াশুনায় তাঁহার আকুল আগ্রহ ও পরীক্ষায় নিয়মিত ভাল ফল দেখিয়া মেডিক্যাল স্কুলের অধ্যক্ষ ডাঃ এস, সি, ম্যাকেঞ্জি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন, এবং তাঁহাকে নানাভাবে সাহায্য করিতে ও উৎসাহ দিতে থাকেন।

নীলরতনের উচ্চাভিলাষের সীমা ছিল না এবং তাঁহার জ্ঞানস্পৃহাও ছিল অপরিমেয়। তদুপরি ডাঃ ম্যাকেঞ্জির উৎসাহ পাইয়া তিনি কেবল ডাক্তারী ডিপ্লোমা পাইয়া ও 'সাব্-এসিসট্যাণ্ট সার্জ্জেন"-এর পদ লাভ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই। তখন তিনি এল.এ. বর্ত্তমান (I.A. বা I.Sc.) পড়িবার জন্য জেনারেল এসেমব্লি ইন্‌ষ্টিটিউশনে (বর্ত্তমান স্কটিশ চার্চ্চেস কলেজ) ভর্ত্তি হইলেন। এই সময় নরেন্দ্রনাথ, পরবর্ত্তীকালের বিশ্ববিশ্রুত স্বামী বিবেকানন্দ, তাঁহার সতীর্থ ছিলেন। এল. এ. পাশ করিয়া তিনি মেট্রোপলিটন ইন্‌ষ্টিটিউশনে (বর্ত্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) ভর্ত্তি হইয়া বি.এ. পড়িতে আরম্ভ করেন। এইরূপ অসীম উন্নতি তাঁহার লাভের আকাঙ্ক্ষা।

১৮৮৪ সনে তৎকালীন মেধাবী ইংরেজী শিক্ষিত যুবকদিগের সংস্পর্শে আসিয়া এবং প্রচলিত আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম-কর্ম্মে আস্থা হারাইয়া তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ১৮৮৪ সনে বি. এ. পাশ করিয়া কিছুদিন চাতরা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে কার্য্য করেন। পরে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর পিতা ডাঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত কলিকাতার গ্রে ষ্ট্রীটে একটি স্কুলে তিনি কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। স্বামী বিবেকানন্দ এই বিদ্যালয়ে তাঁহার সহকর্ম্মী ছিলেন।

কিছুকাল শিক্ষকতা করিবার পর ১৮৮৫ সনে নীলরতন কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। ডাক্তার এস. সি. ম্যাকেঞ্জি এ বিষয়েও তাঁহাকে যথেষ্ট উৎসাহ দেন ও বিশেষ সাহায্য করেন। অসাধারণ মেধা, অব্যভিচারিণী নিষ্ঠা ও অদম্য অধ্যবসায়ের ফলে তিনি ১৮৮৮ সনে এম. বি. পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। [illegible] তিনি এই সময় 'গুডিভ বৃত্তি' লাভ করেন। এবং ধাত্রীবিদ্যা (Midwifery) ও চিকিৎসাবিষয়ক আইনে (Jurisprudence) "অনার" প্রাপ্ত হন। সুবিখ্যাত শল্য-চিকিৎসক ডাক্তার সুরেশচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী এই সময় তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। চাঁদনী ও মেয়ো হাসপাতালে তাঁহার চিকিৎসক-জীবন আরম্ভ হয়।

নীলরতনের জ্ঞানপিপাসার কোন দিনই নিবৃত্তি হয় নাই। ১৮৮৮ এবং ১৮৮৯ সনে তিনি যথাক্রমে এম.এ. ও এম.ডি. পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। নীলরতনের উত্তুঙ্গ অভিলাষ ফলবান হইবার মূলে ছিল তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অবিনাশচন্দ্রের স্নেহসিক্ত ত্যাগ ও নিঃস্বার্থ কৃচ্ছ্রসাধনা। তিনি গ্রাম্য স্কুলের সামান্য একজন শিক্ষক ছিলেন। নিজে সকল প্রকার দুঃখ বরণ করিয়া নীলরতনের লেখাপড়ার ব্যয় নির্ব্বাহে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। নীলরতনও তাঁহাকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন ও ভালবাসিতেন। নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে মানুষ করিয়া দিয়াছিলেন।

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে বরিশাল একটি সমৃদ্ধিশালী ও সংস্কৃতিপূর্ণ দেশ ছিল। সেখানে স্বনামধন্য অশ্বিনীকুমার দত্ত, ঋষিপ্রতিম জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষীগণ জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। এখন উহা পূর্ব্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত। ১৮৮৯ সনে সেই স্থানের ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক পূত-চরিত্র গিরীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী নির্ম্মলা দেবীর সহিত নীলরতনের বিবাহ হয়।

শুধু চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ত্ত করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। আজীবন নানা বিষয়ে জ্ঞানার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, গণিত, দর্শন, ব্যবসায়-বাণিজ্য বা অর্থনীতি—যে-কোন বিষয়ের পুস্তক তাঁহার হাতে পড়িত, তিনি তাহা বিশেষ মনোযোগের সহিত পড়িতেন। বৃত্তি হিসেবে চিকিৎসকের ব্যবসা গ্রহণ করিলেও ব্যবসায়-বাণিজ্য, কৃষি, খনিবিদ্যা, কাব্য, সাহিত্য, দর্শন ও শিল্প সম্বন্ধে প্রয়োজন হইলে বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিতে পারিতেন। কোন কোন হাতের কাজেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ছুতারের কাজ ভালই জানিতেন। নানা জিনিষের সুন্দর সুন্দর নক্সা (designs) করিতে পারিতেন। রন্ধন-কার্য্যেও তিনি বিশেষ পটু ছিলেন। রোগী-শুশ্রূষাতেও ছিলেন তিনি সুদক্ষ।

১৮৯০ সনে সরকারী চাকুরি ত্যাগ করিয়া তিনি স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। প্রথম

হইতেই ইউরোপীয় চিকিৎসকদিগের স্থায় তিনি ষোল টাকা দর্শনী দাবি করিতে থাকেন এবং তাহাই লইতে আরম্ভ করেন তখন সাহেব ডাক্তারদের একটু বেশী মর্য্যাদা ছিল এবং তাঁহারাই কেবল ষোল টাকা দর্শনী গ্রহণ করিতেন। এইরূপ উচ্চ হারে দর্শনী দাবি করার মধ্যে নীলরতনের কোনরূপ অহমিকা ছিল না। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিতেন বিদেশী চিকিৎসকদিগের তুলনায় তিনি কোন অংশে নিকৃষ্ট নহেন। তিনি ভাবিতেন সাহেব ডাক্তারদের সমপর্য্যায় দর্শনী না লইলে নিজেকে ছোট করা হইবে, জাতিরও অপমান ঘটিবে। ঈদৃশ ছিল তাঁহার আত্মসম্মানজ্ঞান ও জাত্যাভিমান। এইরূপ উচ্চ দর্শনী লওয়াতে দেশী ও বিদেশী সমাজে কিছু কঠোর সমালোচনা আরম্ভ হইল বটে, কিন্তু কাজের খাতিরে ও চিকিৎসার নিপুণতায় সকল গোলমাল অচিরেই মিটিয়া গেল।

তড়িৎ গতিতে নীলরতন বাঙ্গালী সমাজের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, স্বনামধন্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, স্যার রাসবিহারী ঘোষ এবং স্যার তারকনাথ পালিত প্রভৃতি দেশবরেণ্যদিগের সমকক্ষ হইয়া উঠিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার সম্পর্ক বিশেষ ঘনিষ্ঠ ও মধুর হইয়া দাঁড়াইল। বাংলার বাহিরেও তাঁহার চিকিৎসার নৈপুণ্য স্বীকৃতি লাভ করিল। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ হইতেই রোগী দেখিবার জন্য তাঁহার ডাক আসিতে লাগিল। চিকিৎসা ব্যবসায়ের বিপুল আয় হইতে প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকা তিনি সঞ্চয় করিতে পারিলেন। তাঁহার এই উন্নতির মূলে ছিল সততা, রোগীদিগের প্রতি সহানুভূতি ও সমপ্রাণতা, রোগী চিকিৎসাকালে খুঁটিনাটি সকল বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, পথ্যাপথ্য নির্দ্ধারণ করা এবং প্রয়োজন হইলে রোগীর আত্মীয়-স্বজনকে পথ্য প্রস্তুত করিতে শিখান এবং সে পথ্য ঠিক ভাবে খাওয়ান হইতেছে কি না সে বিষয়ে সংবাদ লওয়া। যে রোগীর চিকিৎসার ভার তিনি লইতেন, তাহার সেবা-শুশ্রূষা নিয়মিত হইতেছে কি না, সে বিষয়েও সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। তদনুযায়ী তাহার আত্মীয়বন্ধুকে উপদেশ দিতেন। রোগীর কোনরূপ অযত্ন বা রোগীর প্রতি অল্প অবহেলাও তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না।

অচিরকালে শিক্ষিত সমাজে তাঁহার এরূপ সুনাম প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং দেশের শিক্ষা বিস্তারে তাঁহার ঈদৃশ আগ্রহ দেখা যায় যে, ১৮৯৩ সনে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য (Fellow) নির্ব্বাচিত হন।

এদেশের চিকিৎসকদিগের যাহাতে সম্মান বৃদ্ধি হয়, তাঁহাদের বিদ্যাবর্ত্তার আরও উন্নতি ঘটে এবং সংহত শক্তিতে তাঁহারা যাহাতে নিজ নিজ বৃত্তির উন্নতি সাধন ও তৎসঙ্গে দেশের কল্যাণ সম্পাদন করিতে পারেন সে বিষয়েও নীলরতনের প্রথম হইতেই প্রখর দৃষ্টি ছিল। সেই উদ্দেশ্যে ১৯০১ সনে ৬১ নং হ্যারিসন রোডে (বর্ত্তমান মহাত্মা গান্ধী রোড) নিজ বাড়ীতে "কলিকাতা মেডিক্যাল ক্লাব" তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ সকল চিকিৎসকই তাঁহার এই মহৎ কার্য্যে আন্তরিক সহযোগিতা করিয়াছিলেন।

১৯০৫ সনে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশে তদানীন্তন লর্ড কার্জ্জন বাঙ্গলা দেশ দ্বিধা বিভক্ত করেন। সেই উপলক্ষ্যে বাঙ্গলা দেশে তথা সমগ্র ভারতে যে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, সেই স্বদেশী আন্দোলনেও নীলরতন নিবিড়ভাবে যোগ না দিয়া থাকিতে পারেন নাই। জাতির মেরুদণ্ড শিক্ষা। সেই শিক্ষা-সংস্কারের জন্য যখন "জাতীয় শিক্ষা পরিষদ" প্রতিষ্ঠিত হইল, নীলরতনই তাহার প্রথম কর্ম্মসচিব নিযুক্ত হইলেন। সেই জাতীয় পরিষদের প্রচেষ্টায় এ দেশের ছেলেমেয়েদের হাতের কাজ শিখাইবার জন্য যে "বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট" স্থাপিত হয়, তাহারও কর্ম্মসচিব নির্ব্বাচিত হন নীলরতন সরকার। দেশের লোক তাঁহার কর্ম্ম-নৈপুণ্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছিল। এই "বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট"ই ক্রমোন্নতির পথে উঠিয়া আজ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। দেশসেবার সুযোগ উপস্থিত হইলে কোনদিনই তিনি সে সুযোগ প্রত্যাখ্যান করেন নাই। ১৯১২ সনে নীলরতন বাঙ্গলার আইন সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন এবং পূর্ণ পাঁচ বৎসর এই পদে থাকিয়া দেশের ও দশের প্রভূত কল্যাণসাধন করেন।

১৮৮৮ বা ১৮৮৯ সনে পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসাশাস্ত্র ছাত্রদিগকে বাংলা ভাষায় শিক্ষা দিবার ও বাংলা ভাষায় চিকিৎসা পুস্তক এবং সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করিবার চেষ্টা চলিতে থাকে। তাহার ফলে এখন যেখানে মেছুয়াবাজার ট্রাম ডিপো, সেইখানে "ক্যালকাটা মেডিক্যাল স্কুল" নামে এমন একটি স্কুল স্থাপিত হয়, যেখানে বাংলা ভাষায় চিকিৎসা-বিজ্ঞান শিখান আরম্ভ হইল। ইহার কিছুদিন পরেই যেখানে এখন "ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়" গৃহ, সেইখানে "কলেজ অফ্ ফিজিসিয়ানস্ এণ্ড সার্জ্জেনস অফ্ বেঙ্গল" নামে উহারই

একটি শাখা খোলা হয়। সেখানে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে পড়ান চলিল। এই শাখা বিদ্যালয়ের অন্যতম উৎসাহী প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্যার নীলরতন সরকার।

মাতৃভাষায় চিকিৎসা-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞান-বিষয়ক গবেষণাপূর্ণ পুস্তকাদি বাংলা ভাষায় প্রণয়ন ও প্রকাশ করা যে নীলরতনের আন্তরিক অভিপ্রায় ছিল তাহা তাঁহার নিজের লেখাতেই প্রমাণিত হয়। ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্য্যের "ভারতীয় ব্যাধি ও আধুনিক চিকিৎসা" নামক পুস্তকের প্রথম খণ্ডে নীলরতন যে মুখপত্র লিখিয়াছেন তাহাতে আছে —"আমার বিশেষ আশা এবং দৃঢ় বিশ্বাস যে, ছাত্র কিংবা শিক্ষক কিংবা ভিষক—চিকিৎসা-জগতের সকল পাঠকই গ্রন্থকারের এই অক্লান্ত পরিশ্রমের সুফল ভোগ করিবেন। আশা করি ভবিষ্যতে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথে আমাদের দেশীয় বহু কৃতী ও শ্রমশীল সুপণ্ডিত ভিষকগণের গবেষণা ও বিচারপূর্ণ গ্রন্থ আমাদের প্রিয় মাতৃভাষাকে অলঙ্কৃত করিবে, এবং বিদেশীয় সুধীগণ অস্মদ্দেশীয় ব্যাধিগুলির সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানোপার্জ্জনের উপায়স্বরূপ ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন।"

নীলরতন মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিতেন ভারতীয় ছাত্রেরা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় শিক্ষকদিগের নিকট চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে পারিলে বিশেষ উপকৃত হইবে এবং তাহাদের দাস মনোবৃত্তি (Inferior Complexity) ধীরে ধীরে অপনোদিত হইবে। এই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়াই ১৯:১ সনে তিনি "কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুল" এবং "কলেজ অফ্ ফিজিসিয়ানস্ এণ্ড সার্জ্জেনস অফ্ বেঙ্গল" সম্মিলিত করার প্রয়াস পান। তাঁহার এই সাধু প্রচেষ্টায় ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর যে অপূর্ব্ব ত্যাগ ও উদ্যম প্রদর্শন করেন তাহা এদেশে, বিশেষত এ যুগে অতীব বিরল।

১৯০৩ সনে ডাক্তার রাধাগোবিন্দ করের "ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুল" বেলগেছিয়ায় উঠিয়া আসে এবং "এল্‌বার্ট ভিক্টর হসপিট্যাল" নামে একটি হাসপাতালও উহার সহিত সংলগ্ন হয়। তখন উহা "আর জি কর মেডিক্যাল স্কুল" নামে পরিচিতি লাভ করে। সুবিখ্যাত শল্য-চিকিৎসক সুরেশচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী ও সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং আরও অনেক খ্যাতনামা বিজ্ঞ চিকিৎসক স্বেচ্ছায় এই প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনার কার্য্য গ্রহণ করেন। স্যার নীলরতনের আন্তরিক চেষ্টায় এবং ডাক্তার রাধাগোবিন্দ করের অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগে ১৯১৫-১৬ সনে এই সম্মিলিত চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানটি তদানীন্তন বড়লাটের নামানুসারে 'কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ ও হসপিট্যাল" নাম গ্রহণ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে। এই অনুমোদন লাভের মূলেও ছিলেন স্যার নীলরতন। বেসরকারী মেডিক্যাল স্কুলের প্রথম স্থাপয়িতা, বাঙ্গলা ভাষায় পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা দিবার এবং চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষায় প্রণয়ন ও প্রকাশ করিবার পুরোধা ডাক্তার রাধাগোবিন্দ করের নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য এই প্রতিষ্ঠানটির নূতন নামকরণ হইয়াছে—"আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ এণ্ড হসপিট্যাল।"

নিজের কর্ম্মকুশলতায় নীলরতন শুধু স্বদেশবাসীরই প্রিয় হন নাই, সরকারেরও প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। ১৯১৮ সনে যেমন তিনি 'নিখিল ভারত চিকিৎসক সম্মেলন'-এ সভাপতির আসনে বৃত হন, তেমনই ভারত সরকারের নিকট হইতে প্রভূত সম্মানসূচক "স্যার" উপাধি পাইয়াছিলেন।

শিক্ষা-বিস্তারকল্পেও স্যার নীলরতন আজীবন কঠোর পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। ১৯১৯ সন হইতে ১৯২১ সন পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য বা ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন। তাঁহারই কার্য্যকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক নূতন বিধি প্রণীত হয় এবং অনেক প্রাচীন পদ্ধতিরও সংস্কার সাধন করা হয়। এই সময় হইতেই সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি অ-বিজ্ঞান বিষয়সমূহ, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, শারীর ও জীববিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিষয় সকল স্বতন্ত্রভাবে পড়ান হইতে থাকে এবং উহাদের পরীক্ষাও স্বতন্ত্রভাবে গৃহীত হয়।

স্যর্ তারকনাথ পালিতের সহিত চিকিৎসক হিসাবেই নীলরতনের প্রথম পরিচয় ঘটে। সেই পরিচয় ক্রমে এমনই ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে যে, প্রধানত তাঁহার অনুরোধে এবং স্যর্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আপ্রাণ চেষ্টায় পালিত মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক লক্ষ টাকা দান করেন। সেই অর্থ এবং স্যর্ রাসবিহারী ঘোষের অনুরূপ অর্থ সাহায্যেই কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজ স্থাপিত হয়।

১৯২০ সনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির যে সম্মেলন সংঘটিত হয়, স্যর্ নীলরতন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিস্বরূপ সেই সম্মেলনে যোগদান করেন। সেই বৎসরেই তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের "অনারারী ডি. সি. এল." এবং এডিনবারা বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের "অনারারী এল. এল. ডি." উপাধিপ্রাপ্ত হন। ১৯২৪ হইতে ১৯২৭ সন পর্যন্ত তিন বৎসর কলা বিভাগের স্নাতকোত্তর উপদেশ সভা (Post Graduate Council of Arts) এবং ১৯২৮ হইতে ১৯৪২ সন পর্য্যন্ত আট বৎসর বিজ্ঞান বিভাগের স্নাতকোত্তর উপদেশ সভা (Post Graduate Council of Science)-এর সভাপতির পদে থাকিয়া এবং ১৯৩৩ হইতে ১৯৩৯ পর্য্যন্ত কয় বৎসর "ডীন অব্ ফ্যাকালটি অব সায়েন্স"-এর কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করেন।

সংগঠন কার্য্যে নীলরতন যে বিশেষ নিপুণ ছিলেন তাহা তাঁহার কর্ম্মজীবনে অনেকবারই প্রমাণিত হইয়াছে। ১৯২৮ সনে কলিকাতায় নিখিল ভারত চিকিৎসক সম্মেলন আহূত হইলে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন এবং সেই সময় তাঁহারই আন্তরিক চেষ্টায় "ভারতীয় চিকিৎসক সভা" (Indian Medical Association) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩২ সনে ভারতীয় চিকিৎসক সভা যে নিখিল ভারত চিকিৎসক সম্মেলন আহ্বান করেন সর্ নীলরতন তাহার মূল সভাপতি নির্ব্বাচিত হন এবং সেই সম্মেলনে যে অভিভাষণ তিনি পাঠ করেন তাহা যেরূপ জ্ঞানগর্ভ, সেইরূপ শিক্ষাপ্রদ হইয়াছিল। ভারতীয় চিকিৎসকদিগের বিদ্যা, বুদ্ধি ও সম্মানের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন এবং তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হইবার আকুল আহ্বান ইতিপূর্ব্বে আর কেহই করেন নাই।

রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ মনীষীগণ ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্ত্তক। ইংরাজ সরকার প্রথমে এদেশে ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার করিতে বিশেষ ইচ্ছুক ছিলেন না। জনসাধারণের চাহিদা মিটাইতে তাঁহারা যে শিক্ষার প্রচলন করেন তাহাতে তাঁহাদের শাসনব্যবস্থার অনেক সুবিধা হইল বটে, কিন্তু সে শিক্ষার সহিত দেশের নাড়ীর কোন যোগ রহিল না। টবেসাজান গাছের মত কিছু শিক্ষিত লোক উৎপন্ন হইল, তাহাতে দেশের অভাব মিটিল না, সাধারণ দেশবাসীর সহিত শিক্ষিত সমাজের কোন সংযোগ স্থাপিত হইল না। এমন একটা খাপছাড়া শিক্ষিত সমাজ গড়িয়া উঠিল, যাহার সহিত দেশের সংস্কৃতি ও "ট্র্যাডিশনের" কোন সম্পর্কই রহিল না। অনেক বক্তৃতা ও প্রবন্ধের মাধ্যমে এবং শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করিয়া রবীন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথম এই দিকে দেশের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সর্ নীলরতনেরও এদিকে প্রখর দৃষ্টি ছিল। শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিতে তিনি অনেক স্থলে অনেকবারই বলিয়াছেন। ১৯৩৯ সনে তিনি বিশ্বভারতীর প্রধান আচার্য্য পদে বৃত হন, এবং উহার একজন "ট্রাষ্টী"ও নিযুক্ত হন। এই সময়েই তিনি আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত "বোস ইনষ্টিটিউট"-এর পরিচালক সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৯৪০-৪১ সনে সর্ নীলরতন ভারতীয় যাদুঘরের একজন 'ট্রাষ্টী' ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডীন অব ফ্যাকালটি অব মেডিসিন' নিযুক্ত হন। এই সকল পদ লাভ করিয়া তিনি তাঁহার চিরাভিলষিত জাতীয় ধারায় শিক্ষা সম্প্রসারণের যথাসাধ্য চেষ্টা করেন এবং তাঁহার সে আন্তরিক চেষ্টা কিছু ফলবতী হয়। ১৯৩৯ সনে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে নীলরতন যে অভিভাষণ (Convocation address) প্রদান করেন তাহাতে তিনি ছাত্র-ছাত্রীদিগকে ভারতের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইতে উপদেশ দেন। ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার এইরূপই অন্তরের টান ছিল।

১৯৩৯ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি "অনারারী ডি.এস-সি" উপাধিপ্রাপ্ত হন। এই বৎসরই তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ ঘটে, এবং তাঁহার স্বাস্থ্যও ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে। ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়াই ১৯৪১ সনে তিনি রবীন্দ্রনাথের রোগশয্যার পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সুকুমার দেহ এবং ততোধিক সুকুমার তাঁহার মনের সহিত নীলরতন এরূপ সুপরিচিত ছিলেন যে, যখনই রবীন্দ্রনাথের দেহে অস্ত্রোপচারের কথা উঠিল তখনই তিনি সাবধানবাণী উচ্চারণ করিলেন—"কবির দেহে তোমরা অস্ত্রোপচার করিতে যাইতেছ, একথা যেন তোমাদের মনে থাকে।" শরীরটাকে কাটা-ছেঁড়া করার ইচ্ছা কবিরও আদৌ ছিল না। তিনি প্রায়ই বলিতেন—"শ্রীভগবানের হাত থেকে শরীরটাকে যে অবস্থায় পাওয়া গেছে, ঠিক সেই অবস্থায়ই তাঁর হাতে ফিরিয়ে দেওয়া ভাল। সেটাকে ছিন্নভিন্ন ক'রে লাভ কি?" কেহই ইঁহাদের কথা শুনিল না। সেই অস্ত্রোপচারই কাল হইল।

১৯৪৩ সনে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য নীলরতন গিরিডি যান। সে স্থান হইতে আর ফিরিয়া আসেন নাই। ঐ বৎসরেই ১৮ই মে ইহধাম ত্যাগ করিয়া তিনি অভীষ্ট লোকে চলিয়া যান। তাঁহার নশ্বর দেহ জ্যোৎস্নাধবলিত উশ্রী নদীর তীরে ভস্মীভূত হইল।

চিকিৎসক হিসাবে নীলরতনের তুলনা ছিল না। শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইলেই রোগী আশা করিত সে অচিরেই আরোগ্যলাভ করিবে। এমনই আন্তরিক সহানুভূতির স্বরে তিনি রোগীকে প্রশ্ন করিতেন। রোগের কারণ অনুসন্ধানে পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রশ্ন করিয়া রোগী ও তাহার আত্মীয়-বন্ধুদিগের নিকট হইতে সকল বিষয় জানিয়া লইতেন, সকলেই বিশেষ সন্তুষ্ট ও আশ্বস্ত হইত। যতক্ষণ-না রোগ-নির্ণয়ে স্থিরনিশ্চয় হইতেন ততক্ষণ তিনি রোগীর কাছে বসিয়া সাহস ও উৎসাহ দিতেন এবং রোগ নির্ণয় হইলে উহার ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা এরূপ সুনিপুণ ভাবে করিয়া আসিতেন যে, রোগী নিশ্চিন্ত মনে তাঁহার উপর নির্ভর করিত। সেই নির্ভরতায় রোগীর অর্দ্ধেক রোগ সারিয়া যাইত।

চিকিৎসা-ব্যাপারে তাঁহার কোন গোঁড়ামি ছিল। আয়ুর্ব্বেদ, হোমিওপ্যাথি বা ইউনানী—কোন কিৎসা পদ্ধতিকেই তিনি অবজ্ঞা করিতেন না। তিনি ল সময়েই বলিতেন—"যে-কোন পদ্ধতি অবলম্বনে কৎসা করা হউক না কেন, চিকিৎসককে সকল ন্নাতেই চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইতে হইবে। ীর-সংস্থান, দেহের যন্ত্রগুলির স্বাভাবিক ক্রিয়াপ্রণালী রোগের নিদান প্রভৃতি আনুষঙ্গিক বিষয়গুলিও াকে সম্যক্‌রূপে আয়ত্ত করিতে হইবে।" মেডিক্যাল জগুলিতে বিভিন্ন চিকিৎসা-প্রণালীতে অভিজ্ঞ ভিন্ন চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া ছাত্রীদিগকে তাহাদের মত চিকিৎসা-পদ্ধতি শিখিতে সুযোগ দিবার ব্যবস্থা তেও তিনি চাহিয়াছিলেন। তাঁহার সে চেষ্টা আজও পরিণত হয় নাই। অদূর ভবিষ্যতে হইবার বনাও নাই। কারণ, সংস্কারমুক্ত চিকিৎসক অতি ।

াকুল প্রার্থনায় যে দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মানুষ লাভ করিতে পারে সে-বিষয়েও তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলেই এ বিশ্বাস তাঁহার াছিল। রোগ-নিরাময় ব্যাপারে প্রকৃতিদেবীর যথেষ্ট হাত আছে, সে-বিষয়েও তিনি সুনিশ্চিত ন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—"১৮৯২ সনে কাতায় যখন কলেরার মহামারি উপস্থিত হয়, তখন হাসপাতালে এক রাত্রে যে-রোগীর বাঁচিবার কোন নাই বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত হইল, পরদিন সকালে রোগীকে তাহার নির্দ্দিষ্ট শয্যায় না দেখিয়া সকলে ল, নিশ্চয়ই তাহার মৃত্যু হইয়াছে, এবং মৃতদেহটি লইয়া যাওয়া হইয়াছে। কিন্তু বেলা হইলে সেই রোগীকে জলনিকাশের নর্দ্দমার ধারে সুস্থ শরীরে নিদ্রিত অবস্থায় দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। অনুসন্ধানে জানা গেল জল পিপাসায় কাতর হইয়া রাত্রে কোনরূপে নর্দ্দমার ধারে গিয়া, সেই নর্দ্দমার জলই আকণ্ঠ পান করিয়া সে সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতি দেবীই তাহাকে রোগমুক্ত করিলেন।

চিকিৎসাকে বৃত্তিহিসাবে গ্রহণ করিলেও সব্ নীলরতন দেশের শিল্প-বাণিজ্য বিস্তারে বিশেষ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। দেশকে শিল্পপ্রধান করিয়া তোলা এবং সেই সকল শিল্পের সাহায্যে বেকার সমস্যার সমাধান করা ছিল তাঁহার জীবনের স্বপ্ন। চামড়া পরিষ্কার করা (Tanning), সাবান প্রস্তুত করা, রং-এর কাজ করা (Dyeing); মাটির খেলনা ও তৈজসপত্রাদি নির্ম্মাণ করা, কাপড় ধোলাই করা (Bleaching), রাসায়নিক শিল্পসামগ্রী প্রস্তুত করা (Industrial Chemistry), লোহার পাত প্রভৃতি প্রস্তুত করা, চায়ের আবাদ (Tea Planting)- কয়লাখনির কাজ প্রভৃতি নানা শিল্পকর্ম্মে তিনি ছিলেন পথিকৃৎ।

এ-সকল বিষয়ের কলকারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়াই তিনি শান্ত হন নাই, দেশের লোক যাহাতে শিল্পানু-রাগী হয় এবং শিল্প-বাণিজ্যের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে মডার্ন রিভিউ (Modern Review) পত্রিকায় নানাবিধ সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিতেন, এবং ঐ বিখ্যাত পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সেই সকল প্রবন্ধ সাদরে প্রকাশ করিয়া নীলরতনের দেশসেবায় যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। এই সকল কাজে নীলরতন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অকুণ্ঠ সহানুভূতি ও সাহায্য পাইয়াছিলেন। তৎসত্ত্বেও নিজে সকল কাজ দেখাশুনা করার সময়ের অভাবে এবং শিল্পসংশ্লিষ্ট লোক-দিগের অসৎ প্রবৃত্তির জন্য তাঁহাকে আর্থিক ক্ষতিও অনেক সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহার পূর্ব্ব-সঞ্চিত চল্লিশ লক্ষ টাকা এই সকল শিল্পপ্রসার প্রচেষ্টায় নষ্ট ত হইয়াই ছিল, অধিকন্তু ইহার জন্যই তিনি আকণ্ঠ ঋণে মগ্ন হইয়াছিলেন। ইচ্ছা করিলে আইনের সাহায্যে দেউলিয়া হইয়া তিনি এই বিপুল ঋণের দায় হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার সহজ ধর্ম্ম-বুদ্ধিই একাজে তাঁহাকে বাধা দিল। চোখে তাঁহার তখন ছানি পড়িতেছিল, কাজকর্ম্মেরও বিশেষ অসুবিধা হইতে লাগিল। বন্ধুবর কর্ণেল কিরওয়ানিকে দিয়া অসময়ে সেই ছানি কাটাইয়া তিনি নূতন উদ্যমে আবার

চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে সেই ঋণ পরিশোধ করিয়া ফেলিলেন। দরিদ্রের গৃহে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, দারিদ্র্য বরণ করিয়াই তিনি ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

সর্ নীলরতনের সংগঠনশক্তির মূলে ছিল দেশবাসীর প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা, দীনদুঃখীর প্রতি উদার সমবেদনা এবং নিজের নিঃস্বার্থ সেবার প্রবৃত্তি। যে প্রতিষ্ঠানই যখন তিনি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন—তাহার মধ্যে ছিল না তাঁহার নাম-কিনিবার বাসনা, ছিল না নিজেকে জাহির করিবার প্রচেষ্টা, ছিল না সহজ নেতৃত্বের সখ, ছিল কেবল দেশপ্রেম ও লোকহিতৈষণা। দেশ-বাসীর কিসে কল্যাণ হয়, সমব্যবসায়ীদিগের কিসে মঙ্গল ঘটে, সকল সময় সেই দিকেই তাঁহার দৃষ্টি ছিল। রোগশয্যায় পড়িয়াও তিনি সকলের ভাবনা ভাবিয়া গিয়াছেন।

জড়বিজ্ঞানের উন্নতিসাধনে ও দেশের শিল্পবাণিজ্যের প্রসারকল্পে নীলরতন যথেষ্ট পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতেন বলিয়া তিনি জড়বাদী ছিলেন না। মানুষের আধ্যাত্মিক চেতনার দিকেও তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। তিনি ঈশ্বর-বিশ্বাসী ছিলেন, এবং জীবনের সকল কাজে ঈশ্বরানুভূতি ফুটাইয়া তুলিতে প্রয়াস পাইতেন। দর্শনশাস্ত্র তিনি উত্তমরূপেই পড়িয়াছিলেন এবং সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। কয়েকটি ধর্ম্মসভার (Theistic Conferences) তিনি সভাপতির আসনে বসিয়া উদাত্ত স্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন—"কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানেরই আজ আর কোন মূল্য নাই যদি সে অনুষ্ঠান দুর্গতদিগকে সাহায্য করিতে না পারে, পদদলিতকে সমাজে স্থান দিতে না চায়, মানুষের সেবায় আত্মবলি দিতে না শেখায়।" সর্ নীলরতন নিজ জীবনে এই আদর্শ ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় মানবদরদী জগতে বিরল। তাঁহার জীবনবর্ত্তিকা যে আলোক বিচ্ছুরিত করিয়া গিয়াছে, সেই আলোকে দেশ উদ্ভাসিত হউক, তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণে দেশের যুবকেরা মানুষ হইয়া উঠুক, তাহা হইলেই তাঁহার সম্যক্ স্মৃতিরক্ষা হইবে। দুই-একটি প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার নাম জড়িত করিয়া রাখিলে এমন কি আর বেশী লাভ হইবে?

—•—

স্বার্থ ও পরার্থের বিরোধ

স্বার্থ ও পরার্থের বিরোধের কথা সর্ব্বজনবিদিত। নিজের শাশ্বত মঙ্গলও কি এই প্রচলিত অর্থে স্বার্থের অন্তর্গত? তাহা হইলে, যে ব্যক্তি নিজের মঙ্গল করিল না, নিজে ভাল হইল না, তাহা দ্বারা অপরের উপকার কেমন করিয়া সম্ভবে? আমোদ, অর্থ, যশ, সাংসারিক পদমর্য্যাদা, স্থলবিশেষে ও সময়বিশেষে মানুষ এই সকল স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারে। কিন্তু নিজের শ্রেয়-রূপ যে স্বার্থ, তাহার প্রতি দৃষ্টি না রাখিলে মনুষ্যত্বলাভ কেমন করিয়া হইবে? এই দিক্ দিয়া দেখিলে স্বার্থে ও পরার্থে কোন বিরোধ নাই।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বৈশাখ, ১৩২১।

পারিবারিক

শ্রীমিহির আচার্য

১

আমরা পাঁচ ভাইবোন। দাদা, আমি, নন্দিতা, স্বপ্না আর ছোট ভাই নীলু। নন্দিতার একদিন বিয়ে হয়ে গেল। সে আজ বছর দশেক হ'ল। ওর কোল আলো ক'রে এসেছে ফুটফুটে দু'টি মেয়ে। তনু আর শানু। ওর স্বামী ব্রজরাজ থাকে রায়গঞ্জে। ওদের সেখানে বিরাট্ স্টেশনারি আর ওষুধের দোকান আছে। দাদা চাকরি নিয়ে আছে জলপাইগুড়ি। গত বছর নবদ্বীপের মেয়ে এল বউ হয়ে। বউদিদিকে আমরা বেশিদিন পাই নি। দাদা বাড়ী পাওয়া মাত্র তিনি চালান হ'লেন জলপাইগুড়ি।

২

আমাদের বাবা-মা দু'জনেই ছিলেন। শুনেছি বাবার একটা ছোটখাটো জমিদারি ছিল বালুরঘাট অঞ্চলে। বাবা কোনদিন যান নি। একজন কর্মচারী ছিল, সে-ই মাঝে মাঝে টাকা পাঠাত। বাবা সৌখিন ওকালতি করতেন। এইসব আমার ছোটবেলার স্মৃতি। তার ধ্বংসাবশেষ ক্ষয় হ'তে হ'তে এখন আর কিছু নেই। এমন কি বাবা সাহেবের কাছ থেকে যে গ্রামোফোন কিনেছিলেন, সেটা অদৃশ্য হয়েছে। গ্রামোফোনের টেবিলটা এখনও আছে। যদিও আমার বোন স্বপ্না ওতে তার প্রসাধনের টুকিটাকি রাখে আমরা এখনও তাকে গ্রামোফোনের টেবিল ব'লে উল্লেখ করি। আর-একটা আছে আমাদের গর্ব করার মতন সুদৃশ্য দেয়ালে-টাঙানো জাপানী ঘড়ি।

৩

পঞ্চাশ সালের দুর্ভিক্ষের পরই আমরা সাংঘাতিক রকমের গরিব হয়ে গেলাম। আমাদের জমানো টাকা ছিল না। বাবার পসার ছিল না। আমরা বাড়ীতে ব'সেই দেখেছি বাড়ীওলার তাগাদা, মুদি-গয়লার গালাগালি। [illegible] টাকা খরচেরও অভিযোগ ছিল। আমরা আঘাত পেতাম, পিতৃত্বের গৌরবের প্রতি সন্তানের স্বাভাবিক গর্ববোধ আমাদের ছিল। অথচ, আশ্চর্য হয়ে দেখতাম সবকিছু বাবা হাঁসের পালকে জলের মতন গায়ে লাগতে দিতেন না। টাকার প্রতি বাবার লোভ ছিল না, কৃপণতা ত নয়ই। বাবার অন্তর ছিল ধনী, কোন ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা ছিল না তাঁর চরিত্রে। দারিদ্র্যকে স্বীকার করবার ঔদার্য ছিল বাবার। আমার মনে হ'ত, বাবা যেন একটা মহৎ আইডিয়া, যার বস্তুগত শরীর নেই। অনেকটা রোমান্টিক যুগের কবিদের মতন।

৪

মা'র সঙ্গে বাবার ঝগড়া হ'ত। আবার মিল হ'তেও দেরি হ'ত না। এই বয়সে বাবা-মা'র পারস্পরিক আসক্তি আমাদের কৌতুক জোগালেও ভাল লাগত। বাবা-মা'র এক ধরনের সুখের চেহারা ছিল। তাই বোধ করি এই বয়সেও ওঁদের কারুর স্বাস্থ্য ভাঙে নি। বলতে বাধা নেই—ওঁদের হৃদয়ে কোন বাৎসল্য ছিল না। এটা এক ধরনের ঔদাসীন্য কিন্তু উপেক্ষা হয় ত নয়। এই সংসারে বিচিত্র ধরনের মানুষ আছে, সকলের কাছে সবকিছু আশা করা যায় না। রক্তের সম্বন্ধে ওঁরা আমাদের জনক-জননী হ'লেও ওঁদের স্বভাবে বাবা-মা-বোধ কোনদিন জাগে নি। ফলে আমরা মাথার ওপরে কোন অভিভাবকত্বের চন্দ্রাতপের স্পর্শ পেতাম না। আমাদের আকাশটা ছিল খোলামেলা, আর অজস্র হাওয়ায় আমরা যথেচ্ছ নড়াচড়া করতে পেরেছি। আমরা ছেলেবেলা থেকেই আরও দশজন ছেলেমেয়েদের মতন স্বাভাবিক সরল হ'তে পারি নি। আমাদের মনের ওপরে চাপ ছিল। দারিদ্র্য আমাদের অপরিচ্ছন্ন এবং সন্দিগ্ধ ক'রে রাখত। ঐ বয়সেই আমরা অলৌকিক বিষয়ের কথা ভাবতাম, কিন্তু ঈশ্বরকে চিন্তা করতাম না। তার কারণ আমাদের প্রত্যহের বেঁচে-থাকা বিষয়টা ছিল [illegible]

পাব কি না সেইটে যেন অনিশ্চিত, সন্ধ্যেবেলা বাড়ী ফিরে পেটে কিছু পড়বে কি না সেইটেও অনিশ্চিত। আবার, কোনদিন সন্ধ্যায় বাইরের কেউ এলে অবাক্ হয়ে যেতে পারত আমরা ময়রার দোকানের লুচি-তরকারি খাচ্ছি। ঐ ময়রার দোকানের ছেলেটা ছিল দাদার ক্লাস-ফ্রেণ্ড, মাঝে মাঝে বাকি রাখতে তার আপত্তি হ'ত না। দাদা এলে ঋণ পরিশোধ হ'ত। আমরা কতদিন শুধু জল খেয়ে ঘুমিয়েছি। বিরাট্ তক্তপোশ আর প্রকাণ্ড মশারির তলায় এক ঘরে আমরা ভাইবোন শুতাম। সে দিনগুলিতে আলো জলত না। আমরা অন্ধকারে থাকতে ভালবাসতাম।

৫

অল্প বয়স থেকেই আমার সাহিত্যের রোগ ছিল। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে অজস্র ভাব জমে উঠত, বুকের দরজায় আথালিপাথালি করত, আর যেন বলত—'আমায় মুক্ত করে দে, আমায় মুক্ত করে দে।' ভাঙা ভাষায় প্রকাণ্ড ভাবগুলিকে আমি বাঁধবার চেষ্টা করতাম, প্রথম ধুতি পরবার মতন সেগুলি আমাকে নাজেহাল করত।

বাবার ভাঙা ট্রাঙ্ক থেকে বাঁধানো খাতা আবিষ্কার করার কৃতিত্ব আমারই। বাবার অর্ধ-সমাপ্ত উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি ছিল তার ভেতরে। নন্দরাণী ব'লে একটি যৌবনকুণ্ঠিত মেয়ের দুঃখ।

৬

স্কুলের উঁচু ক্লাসে থাকতেই মফস্বল সহরে আমার সাহিত্যিক-খ্যাতি জুটেছিল। স্কুল ম্যাগাজিনে আমার প্রথম গল্প বেরুল। হাসির গল্প। আমাদের বাঙলা পড়াতেন সেকেণ্ড পণ্ডিত, তিনি আমাকে ক্লাস এইটে পরীক্ষায় একবার বাঙলায় ফেল করিয়ে দিয়েছিলেন। কলকাতার দু'-একটি কাগজেও আমার লেখা বেরুল। অবশ্য লেখা ফিরে এসেছে বিস্তর 'আপনার সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ' জানিয়ে। আমার যে কোন প্রতিভা ছিল, আমি বিশ্বাস করি নে। তবে বাবা আমাকে প্রশংসা করতেন। মা'র কাছে হেসে বলতে শুনেছি—'ব্যাটা আমার গুণ পেয়েছে।'

৭

ভেবে দেখতে গেলে আমার সামনে সাহিত্য ছাড়া অন্য পথ খোলা ছিল না। কঠোর বাস্তবের হাত থেকে বাঁচবার এই একটু রাস্তা ছিল। আমি যেন নিজের একটি জগৎ গ'ড়ে তুলেছিলাম, অন্য-আকাশ, অন্য-রোদ, অন্য-পরিচয়। আমি সাহিত্যের বাস্তবে নিজেকে বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ ক'রে সরিয়ে এনেছিলাম। আমার ভেতরে একটা দূরত্ববোধ জাগছিল। এই মানসিক তৃষ্ণা ব্যবহারিক সংসারটা সম্বন্ধে আমাকে কৌতূহলহীন নিরাসক্ত ক'রে তুলছিল। কিংবা হয়ত সংসারটা এত অমানুষিক কঠিন ঠেকছিল যে, মনের বিলাসিতার রাজ্যে আমি পলাতক হ'তে চেয়েছিলাম। ক্ষুধা আমাকে আর তেমন যন্ত্রণা দিতে পারত না, কারণ আমার সৃষ্টিশালার যন্ত্রণা ছিল আরও তীব্র এবং আকর্ষণীয়। রাত্রে বাড়ী ফিরে যখন দেখেছি ভুতুড়ে অন্ধকার, নিশ্বাস ফেলে বুঝেছি সেদিন আহার নেই। চুপিসাড়ে ঘরে ঢুকে জামাকাপড় ছেড়ে জানলার ধারে ভাঙা টেবিলে ক্ষয়-পাওয়া মোম জ্বালিয়ে গল্প লিখে গেছি। আমাকে কেউ বাধা দেয় নি। ভাইবোনেরা জেগে থাকলেও কোন কথা বলে নি। ওরা আমাকে ঈর্ষা করেছে কি না জানি নে। তখন আমার নিজেকে মনে হ'ত সম্রাট্।

৮

আমি একটা কথা বুঝেছিলাম, ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ বেদনার কথা কেউ মনে রাখে না এবং বৃহত্তর মানুষের কাছে তার কোন মূল্যও নেই। এটা একটা নিছক ঘটনা, ইতিহাস তাকে ধ'রে রাখে না। ইতিহাস শুধু কৃতিত্বকে ধ'রে রাখে। আমার সাহিত্য-সৃষ্টির পেছনে নিশ্চয়ই এই সামাজিক-মন কাজ করছিল। আমার সংসার আমাকে খণ্ড খণ্ড ক'রে রাখতে পারত না। আমার মা বাবা ভাই বোন ক্রমশঃ আমার চোখে অস্পষ্ট হয়ে আসছিল। আমি ঘষা কাঁচের ভেতর দিয়ে ওদের দেখতাম। হয়ত এটা এক ধরনের স্বার্থপরতা। আমি বিশ্বাস করতাম সৃষ্টির ধর্মই স্বার্থপরতা। জগৎ-স্রষ্টা ঈশ্বরও ত একেশ্বর!

৯

পুরণো ঘরবাড়ী, খোয়া বের-করা রাস্তা, রঙ-চটা বিবর্ণ মানুষ, সস্তা সিনেমা হল, এই মফস্বল শহরটা পরম প্রশান্তিতে আমার ভেতরে লীন হয়ে গিয়েছিল। মাছি-

মশা-ফাইলেরিয়া-যক্ষ্মা-ঘেরা সহরকে আমি ভালবেসে ফেলেছিলাম। আমার সঙ্গীসাথী ছিল না, কারণ বন্ধুত্ব পেতে হ'লে কিছু ছাড়তে হয়। আমি কিছুই ছাড়তে রাজি ছিলাম না। একা-একা ঘুরে বেড়াতাম মহানন্দার তীরে, বাঁধ রোড ধ'রে। আর একটা বিমূর্ত ভাব জড়িয়ে ধরত আমার কল্পনাকে। দিগন্তের আকাশের দিকে চেয়ে আমি আধ্যাত্মিক বেদনা বোধ করতাম।

১০

আমার বিনা চেষ্টাতে বি. এ. পাস করলাম। এম. এ. ক্লাশ থাকলে ভর্তি হয়ে যেতে বাধা থাকত না। কলকাতায় গিয়ে পড়া চলত, কিন্তু টাকা নেই। বাবাই একটা চাকরির খবর ঠোঁটে ক'রে নিয়ে এলেন। নিচু-তলার কেরানীর পদ। চাকরিটা নিলাম। না নিলে যে বাবা রাগ করতেন তা নয়। আমি রাজি হ'লে বাবা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলেন। একশো তিরিশ টাকায় সংসারের পরম উপকার করলাম, এ রকম ভাব আমার জন্মায় নি। প্রথম মাসের মাইনে বাবার হাতে তুলে দিতে গেলে বাবা বললেন, 'তোমার মাকে দাও।'

১১

বস্তুত সাহিত্যের জন্যে একটি কল্পিত তৃতীয় ভুবন আমি আকাঙ্ক্ষা করতাম না। সাহিত্যিকের বিশিষ্ট হয়ে বিশেষ সুবিধা ভোগ করবার অধিকার নেই। নাই কোন নির্দিষ্ট অবসর। আমি কখনও ক্লান্তি বোধ করতাম না। অনেক রাত্রে টেবিলে মোমের মৃদু আলোকে আমার সাহিত্য-চর্চা অব্যাহত চলত।

১২

ইতিমধ্যে আমার বোন স্বপ্না কখন যে বড় হয়ে গেছে আমার খেয়াল ছিল না। ঈষৎ দীর্ঘ ও রোগা শরীরে কখন যে বাইরের পবন ওর যৌবনের কৌতূহল বাসনা লজ্জা ভয় আকাঙ্ক্ষাকে আঙুল ছুঁইয়ে গেছে, এটা আমার অজানা থাকত। ভাঙা ঘরেও বসন্ত আসে।

১৩

সেদিন বাড়ীতে পা দিতে মা আমাকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে গিয়ে স্বপ্না সম্বন্ধে গুরুতর সমস্যায় পীড়িত ক'রে তুললেন। আমি কিছু না-ব'লে ঘরে এসে ঢুকলাম। বিছানায় উপুড় হয়ে শোকের ঢেউ তুলে স্বপ্না ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। আমার পায়ের শব্দে সে যে জেগে অ[illegible] সেটাই আমাকে জানাল।

আমি ডাকলাম—'স্বপ্না!'

স্বপ্না একরাশ চুলের বোঝা থেকে ওর মুখ তুলে [illegible] চোখে বললে, 'জানি কি বলবে। জানতাম মা তোমা[illegible] সব বলবে। মেজদা আর তোমাদের বোঝা হব [illegible] আমি চ'লে যাব।'

আমি চমকে উঠলাম। আমার সাহিত্যিক-অ[illegible] মনস্কতা যেন এক নিমিষে চিড় খেল। আমি বুঝ[illegible] পারলাম ওর প্রতিটি মুখের শব্দ আমি না চাইলে[illegible] আমার হৃদয়ে একটা কোলাহল তুলল।

'স্বপ্না তুই কি বলছিস?' নিজের ভেতরে একটা কাঁপুনি বোধ করলাম, যেমন একটা অপরাধ অনুভূতি। আমার মনে হ'ল আমরা ভাইবোনেরা কেউ কাউকে বিশ্বাস করি নে। সন্দেহ-সংশয় আর অপরিচয়ের একটা বোবা পাথর আমাদের নিয়ত পিষে মারছে।

স্বপ্না নির্ভীক গলায় বললে, 'মা ত একটা চিঠি পেয়েছে। অশোকদার এক ডজন চিঠি আমার স্যুটকেসে জমা আছে।'

আমি বললাম—'তুই ভুল করছিস, আমি দারোগা নই, তোর অপরাধ কবুল করতে আসি নি।'

স্বপ্না বললে, 'আমি অশোকদার কাছে গান শিখি। অশোকদা আমাকে ভালবাসে, আমরা বিয়ে করব।'

আমি ফ্যাল ফ্যাল ক'রে ওর দিকে চেয়ে রইলাম, ওকে যেন আমি চিনতে পারছি নে। রোগা অপুষ্ট চেহারার মেয়েটা সদ্য যৌবনের শক্তি লাভ ক'রে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। ওর স্থূল বর্বর আবেগে আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। আমার কাহিনীর নায়িকারা কেউ ওর মতন নয়, নির্বোধ আর অনভিজ্ঞ।

১৪

সে-রাত্রে আমার লেখা হ'ল না। আমি স্বপ্নার কথা ভাবছিলাম। স্বপ্না অনেক রাত্রে শান্ত হ'লে হেসে আমাকে বলছিল, 'দাদা, আমাকে নিয়ে গল্প লিখবে? আমার মতন সাধারণ মেয়ের গল্প, যারা স্বপ্ন ভাখে, স্বপ্নে হরিণ হয়…' ওর কথাগুলো নরম মলমের মতন আমাকে আরাম দিচ্ছিল, ও যেন সে-রাত্রে আর ছোট ছিল না।

আমার বন্ধু হয়ে গিয়েছিল। আমি লিখি ব'লেই বোধ হয় আমার কাছে ওর মনকে মুক্ত ক'রে দিতে সংকোচ ছিল না। সে ওর ভালবাসার ভীরু মিষ্টি ক্লান্ত অভিজ্ঞতা বলছিল। ওকে তখন অনেক বড় দেখাচ্ছিল, আমার কল্পনার ফ্রেমের ভেতরে সে আটকা থাকছিল না। আমি প্রাণপণে ওকে বুঝতে চাইছিলাম, ওর আবেগ ওর আনন্দ ওর উদ্বেগ। ওর চিন্তায় অনেক ফাঁক ছিল যা সে কিছুতেই ভরাতে না পেরে শীতের পলাতক রোদের মতন পাতায় পাতায় লাফিয়ে লাফিয়ে দ্রুত ছুটছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম না ঐ ফাঁকগুলি সে পূর্ণ করবে কি করে!

১৫

স্বপ্না একদিন বাড়ী থেকে উধাও হয়ে গেল। লিখে গেল—'আমার খোঁজ ক'রো না।'

মা বললেন—'রাক্ষুসীকে পেটে ধরেছিলাম, এর চেয়ে ও মরল না কেন?'

বাবা গুম হয়ে রইলেন।

আমি ক্লান্ত হয়ে অন্ধকার থইথই ঘরে পা দিলাম। একটা কিছু করা উচিত, আমি ভাবছিলাম। কিন্তু আমার মনের পাত্র অনেক সময়ই ভাবনার অর্গল ভেঙে কর্মের প্রবাহে নেমে আসতে পারে না। স্থূল বাস্তবের আকৃতি কোনকালেই আমার সত্য ব'লে মনে হ'ত না। আমার কাছে বাস্তবতার সংজ্ঞা ভিন্ন রকম ছিল।

স্বপ্না সংসার নামক স্থূল সীমা থেকে বেরিয়ে গিয়ে আমার দূরত্ববোধের মধ্যে ভাসতে লাগল। আর, সেখানে সে আমার শুধু বোন নয়, একটা চরিত্র। অস্থির, দুর্বল এবং স্বপ্নবিলাসী। আমি ওর বেদনাকে বোঝবার চেষ্টা করলাম। আর, বোধ হ'ল ও একটা অন্ধ যন্ত্র কোন মহৎ সৃষ্টির।

গানের মাস্টার অশোকের কথাও আমার মনে হ'ল। লম্বা চুল, কালো এবং খর্ব। গানের জলসায় ওর গানও শুনেছি ব'লে মনে হয়। সে আর্টিস্ট, অপার্থিব আনন্দলোকের অমৃতের আস্বাদ সে পায় নি। তার লোভ কামনা প্রবৃত্তি……। এই মুহূর্তে ওর কোন প্রতিভা রয়েছে আমি স্বীকার করিনে। সে হিসেবী, ঘরোয়া, সংসারী মানুষ। সংগীত সাধনার থেকে তার কাছে বড় হ'ল একটি সাধারণ মেয়ে। ও একজন সাধারণ কেরাণী হ'লে আমার কিছু বলবার ছিল না।

১৬

বাবা বললেন: 'কে যায়?'

বললাম: 'আমি।'

বাবা চুপ ক'রে গেলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম: 'কিছু বলবেন?'

বাবা বললেন, 'না।'

অশোকের মা বললেন, 'ও ত নেই বাবা। কিছু কাজ ছিল?'

বললাম: 'কোথায় গেছে?'

'বললে ত কৃষ্ণনগরে যাচ্ছি। কবে আসবে কিছুই ব'লে যায় নি।'

১৭

আমি বিরক্ত হচ্ছিলাম নিজের 'পরে। আমি কিছু লিখতে পারছিলাম না। সংসারের সমস্ত মানুষ যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি কি করি দেখবে। আমার সাহিত্যিক-মানসিকতার সঙ্গে সংসারের একটা দ্বন্দ্ব বোধ করছিলাম এবং এক সময় আমার যেন নতুন জ্ঞানোদয় হ'ল প্রতিটি মানুষ সমাজের কাছে অঙ্গীকৃত এবং সমাজমনের কারুকার শিল্পীর অঙ্গীকার ত আরও বেশি। সামাজিক নৈতিকতার দায়িত্ব শিল্পীর ওপর সমধিক।

বস্তুত বাধা না থাকলে স্বাধীনতার অর্থই হাস্যকর। আমার শিল্পী-চৈতন্যের স্বাধীনতা উদ্ধার করতেই সামাজিক বাধাগুলি অপসারিত করার দরকার। আমার যদি কোন দায় না থাকে তা হলে মুক্তির আস্বাদ পাব কি করে!

আমার মা বাবা ভাইবোন এবং ক্লান্তিকর এই দারিদ্র্য না-থাকলে আমি লেখক হ'তে পারতাম না। ওদের মূক অস্তিত্বই আমাকে মুখর করেছে।

১৮

স্বপ্না তিনদিন পর ফিরে এল। একা নয়, অশোক সঙ্গে। স্বপ্নার সিঁথিভরতি সিঁদুর, হাতে বালা, কানে দুল। লাল বেনারসী গায়ে জড়ানো। ওরা দু'জনে বাবাকে প্রণাম করল। মা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

আমাকে যখন প্রণাম করতে এল আমি অস্ফুটে কি বললাম মনে নেই।

১৯

স্বপ্না বাড়ীতে রয়ে গেল। আমি যা ভেবেছিলাম কিছুই হ'ল না। মা-বাবা আশ্চর্য শান্ত হয়ে গেলেন। স্বপ্নাকে মা'র সঙ্গে ভাগাভাগি ক'রে রান্না করতে, কলতলায় কাপড় কাচতে-কাচতে গল্প করতে দেখলাম। বেশির ভাগ গল্প অশোককে কেন্দ্র করে। অশোক যে খুব সৎ ও উদার যুবক, আজকালকার ফাজিল ছেলেদের তন নয়, মা অকারণেই আমাকে বোঝাতে চেষ্টা রলেন। অশোক দু'বেলা বাড়ীতে আসা-যাওয়া াতে স্বরু করল। কোনদিন বাজার থেকে মাছ ন, মিষ্টি এনে, সে ঘরের ছেলে হয়ে গেল। মা লেন: 'সোনার টুকরো ছেলে।'

২০

অশোক কোনদিন বিনা প্রয়োজনে আমার সঙ্গে বলেছে, মনে পড়ে না। অনেকদিন তাড়াতাড়ি ফিরে দেখেছি অশোক আমার সাধনার টেবিলে লে দিয়ে স্বপ্নার সঙ্গে গল্প করছে। ও পা নামিয়েছে কিন্তু ওর বা আরও কারুর চেয়ার ছেড়ে দেবার াজন বোধ হয় নি। এমন কি স্বপ্নাও যে তার র প্রতি বিন্দুমাত্র মনোযোগ দেখাল, মনে হয় নি। বিরক্ত হচ্ছিলাম, কিন্তু কিছু বলতে পারি নি। । আমি দাদা এবং বয়োজ্যেষ্ঠ, স্বপ্না যদি বলে, আমাদের সহ্য করতে পারে না'. এসব ভেবে আমি যাচ্ছিলাম।

২১

ামি বুঝতে পারছিলাম এ সংসারের কেউ নই। একটা তক্তপোশ ছাড়া আমার আর কিছু দরকার আমি কোনদিনই এ বাড়ীর কিছু ছিলাম না, । নেই। আমি কিছু করি নি যার জন্যে আমার ওদের সকৌতূহল মনোযোগ আকৃষ্ট হ'তে পারে। া কিছু করেছে। আর, বাড়ীর ছেলের মতন ় ক্রমশ হাটবাজারের অধিকার নিজের হাতে নেছে। পেটের ছেলেও এমন করে না! সেদিন ছোট ভাইকে জুতো কিনে দিল।

২২

বাবা অন্ধকার বারান্দায় পায়চারি করছিে আমি যে অন্ধকারে ব'সে আছি বাবা দেখেন নি।

বললেন: 'কে রে?'

বললাম: 'আমি।'

'ঘুম আসছে না?' বাবা অন্ধকারে আমার হাত রাখলেন, বাবার আঙুলগুলি কি কাঁপছি বাবা কথা ব'তে পারছিলেন না। এই অন্ধক আমাদের রক্ষা করছিল। বাবা অনেকক্ষণ পর চা গলায় বললেন: 'কলকাতায় যাবি? আমার এব বন্ধু আছে অ্যাডভোকেট, একটা কিছু ব্যবস্থা ক'রে দেবে।'

আশ্চর্য হয়ে বললাম: 'কলকাতায় কেন?'

বাবা আর কথা বললেন না।

বাবা চ'লে গেলে আমি অনেকক্ষণ অন্ধকার বারান্দায় বসে ছিলাম। সে-রাত্রে বাবাকে যেন নতুন ক'রে আবিষ্কার করলাম। বাবা কি করে আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছিলেন। তবে কি বাবার মনের গোপনে কোথাও এমন দুঃখ ছিল, ছিল বৈরাগীর উদাস-করা একতারা!

২৩

আমি মা'র কথাও কোনদিন ভাবতাম। শুনেছি মা'র মনের গড়ন খুব সৌখিন ধরনের। মা এককালে চুলে তেল দিতেন না, রোজ সাবান ঘষতেন। গায়ের রঙ ফরসা, আত্মীয় জনের মধ্যে তাঁর মেমসাহেব নাম প্রচলিত ছিল। মা সেই যুগে হাত-কাটা পেছনে-বোতাম জামা পরতেন। শীতকালে মোজা পরতেন। মা'র এই আদবকায়দা আমরা দেখি নি। শোনা কথার ওপর তর্ক চলে না। হয়ত এর অনেকটাই নিছক প্রচার।

কিন্তু আজকাল মাকে দেখে মনে হয় এই অস্বাভাবিক দারিদ্র্যের ভেতরেও তিনি তাঁর মনের স্বভাব অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। এককালে জমিদারি থেকে পাঠানো টাকায় তিনি স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রেখেছেন। এ টাকার পেছনে পরিশ্রম ছিল না, যেন এটা মা'র সুখভোগের জন্যেই উৎসর্গীকৃত। মা'র সুখ-সুবিধাগুলিই রত্ন করল

টাকা যেখান থেকেই আস্নক না কেন। মা'র এই অগোছালো বেহিসেবী স্বার্থমগ্নতাই আমাদের পারিবারিক দুঃখের অন্যতম কারণ ব'লে সন্দেহ হয়।

ইদানীং অশোকের মারফৎ যে অনায়াস সুবিধাগুলি তিনি পাচ্ছেন, সেটা তাঁর দাবি ব'লেই মনে করেছেন। অশোকও যেন বিষয়টা বুঝেছে, মাকে জয় করবার জন্যে তার চেষ্টার ত্রুটি নেই। অশোককে আমার ভাল না-লাগলেও ওর দিক্ থেকে ব্যাপারটা যে আমি বুঝতে চেষ্টা করি নি, তা নয়। ওর নিজের বাড়ী আছে, বিধবা মা আছে, সে-কর্তব্য কি সে সুচারুরূপে পালন করতে পারে? আমার মাকে সে চেনে না। মা'র চাওয়া আর ওর দেওয়া কোনদিন একবিন্দুতে মিলবে না।

২৪

স্বপ্না হাসতে হাসতে বললে, 'ছাখ ত এই ধুতি তোমার পছন্দ কি না।'

ধুতি পরখ করে বললাম: 'বেশ হয়েছে।'

'জানি তোমার পছন্দ হবে। এইটে তোমার জন্যেই কেনা হয়েছে।' স্বপ্না বললে।

'মানে?'

'সকলের জন্যেই কেনা হয়েছে। তোমার জন্যেও হয়েছে।'

'কে কিনেছে, অশোক?'

'হ্যাঁ। আর কে কিনবে?' স্বপ্না স্বামী-গৌরবের হাসি হাসল।

আমি মেজাজ রাখতে পারলাম না। বিশ্রী চিৎকার ক'রে বললাম: 'ছাখ্ স্বপ্না, ইয়ার্কির একটা সীমা আছে। অশোককে ব'লে দিস্, ভবিষ্যতে······'

স্বপ্না নাক ফুলিয়ে চোখ লাল ক'রে বললে, 'দাদা, তুমি ভীষণ ছোট হয়ে গেছ। কোনদিন ত হাত খুলে কাউকে কিছু দাও নি—'

আমি উঠে গিয়ে স্বপ্নার গালে চড় মারলাম। 'বেরিয়ে যা আমার সামনে থেকে।'

২৫

আপিস-ফেরত বাড়ীতে পা দিতেই দেখলাম মা'র ঘরে জরুরী সভা বসেছে। অশোক, স্বপ্না, মা। সম্ভবত মা-ই সভানেত্রী। বাবার অনুপস্থিতিতে বোঝা গেল তিনি খারিজ-সভ্য।

আমার পদশব্দে সভা নিস্তব্ধ হ'ল। আমি নিঃশব্দে পাশের ঘরে সেঁধোলাম। মাথা ব্যথা করছে, চোখ জ্বালা। আমার কি জ্বর হয়েছে? গা-জোড়া ক্লান্তি।

জানলার বাইরে পশ্চিম আকাশের সূর্যাস্ত-রঙিন ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। করুণ বিয়োগ-ব্যথার মতন। আমি যেন শৈশবকালের নিঃসঙ্গ দুঃখে পতিত হয়েছি।

একটু পরে মাকে আমার ঘরে পায়ে-পায়ে আসতে দেখলাম।

'সুমন—'

'মা।' আমি কতদিন মা'র মুখের দিকে চেয়ে দেখি নি। মা'র মুখ আমি ভুলে গেছি। মা'র মুখ অনেকদিন পরে দেখলাম। আশ্চর্য, মা'র মুখে এত ভাঙনের চিহ্নগুলি কবে ফুটে উঠল। মা'র সামনের দু-একটি চুলে রূপোলী ঝিলিক। মা'র কটা চোখের মণি কেমন ঘোলাটে হয়ে গেছে। আমি কি মাকে ভালবাসি। 'মা—'

'অশোক তোর সঙ্গে কথা বলতে চায়। তুই কি···'

'না। মা।'

'আচ্ছা।' মা ধীরপায়ে চ'লে গেলেন।

মা চলে যেতে আমি দুঃখ পেলাম। আর, আমার পুনরায় মনে হ'ল মাকে আমি ভালবাসি। মাকে না-ভালবেসে পারা যায় না।

২৬

রাত্রি নামছিল। জানলার বাইরে ঝাঁকড়া গাছটা চিত্রার্পিত। আকাশে মেঘ ছিল। আমি মূঢ়ের মতন ব'সে ছিলাম। যেন যুগ যুগ ধ'রে আমি ওইভাবে ব'সে রয়েছি। আমার চেতনা প্রস্তরীভূত হয়ে আসছিল। আর একবার দুর্মর একাকিত্ব বোঝার মতন আমাকে আবৃত করে ফেলল।

দূরে থানার ঘড়ি থেকে রাত নটার আওয়াজ ভেসে এল। আমি কোনদিন থানায় যাই নি, মনে হ'ল।

আমি কিছু ভাবতে চেষ্টা করছিলাম। ভাবনাগুলো মাথার ভেতরে ভারি পাথরের মতন নিরেট হয়ে রয়েছে।

দরজায় কার ছায়া পড়ল।

আমি চমকে উঠলাম। অতর্কিত আক্রমণে মানুষ যেমন চমকে ওঠে।

কুঁজো হয়ে বাবা ঘরে ঢুকলেন। বিষণ্ণ, উদ্‌ভ্রান্ত। আর, দীর্ণ।

বাবা বললেন, 'উঠে এস।'

আমি জামা গায়ে দিয়ে বাবার সঙ্গে বেরিয়ে এলাম।

দরজার সামনে রিকশ দাঁড়িয়ে। বাবা আমাকে টেনে তুললেন। রাত্রির বাতাসে রিকশ নির্জন রাস্তায় উড়ে চলল।

ষ্টেশন।

আমরা প্ল্যাটফরমে এসে দাঁড়ালাম।

ট্রেণ এল।

বাবা জামার পকেট থেকে ট্রেণের টিকিট আমার হাতে দিলেন। অন্য পকেট থেকে দশটাকার চারখানা নোট।

'এই চিঠিটা রাখ। সদাশিবকে দিও। সে নিশ্চয় তোমার একটা ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারবে।' বাবা বললেন।

আমি অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

বাবা আমাকে গাড়িতে তুলে দিলেন।

যতক্ষণ ট্রেণ দাঁড়িয়ে ছিল বাবা দাঁড়িয়ে রইলেন।

আমি দেখলাম বাবা জামার হাতায় একবার তাঁর চোখ মুছলেন।

রবীন্দ্রনাথের ভগ্নহৃদয় গ্রন্থ ও বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব

ডক্টর দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পদাবলীর রসমাধুর্য রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করে কিশোর বয়স থেকেই। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, বলরামদাস প্রভৃতি পদকর্তাদের প্রত্যক্ষ প্রভাব রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনায় দেখতে পাওয়া যায়। ব্রজবুলির ভাব, ভাষা ও ছন্দ কবিকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। কবির বয়স যখন ১৬ বৎসর, তখন তিনি 'ভারতী'তে সাতটি পদ প্রকাশ করেন; পরে কয়েক বছরের মধ্যে তিনি আরও তেরটি পদ লেখেন। এইভাবে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীরচনা সম্পূর্ণ হয় কবির পঞ্চবিংশতি বয়ঃক্রমকালে।

রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণব কবিতার প্রতি অনুরাগের আর একটি নিদর্শন হচ্ছে তাঁর সম্পাদিত 'পদরত্নাবলী' নামে পদসঙ্কলন গ্রন্থ। পদরত্নাবলী প্রকাশিত হয় ১২৯২ সালে। এক বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১২৯১ সালের ৮ই বৈশাখ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু হয়। রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা সামান্য কয়েক বছরের বড় এই বধূটি দেবরকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসতেন। কবিগুরুর জননী সারদাদেবীর মৃত্যুর পর কাদম্বরী দেবী একাধারে শিশুদের মাতৃস্থান ও বন্ধুস্থান পূরণ করে রেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জীবনের বিকাশের সহায়তা যেমন এসেছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অকুণ্ঠ প্রেরণায়, তেমনি কাদম্বরী দেবী রবীন্দ্রনাথের সুকুমার চিত্তবৃত্তির সূক্ষ্ম অনুভাবগুলি উদ্বোধিত করেছিলেন অফুরন্ত স্নেহ বিলিয়ে। ইনি ছিলেন তরুণ কবির সাহিত্য-রসমাধুর্যের যেমন উপভোক্তা, তেমনই সমালোচক। নব নব প্রেরণায় ইনি কবিচিত্তকে নূতন ভাবরসে প্রাণবন্ত ক'রে তুলতেন। কাব্যসৃষ্টি প্রেরণার এই অধিষ্ঠাত্রী দেবীর অকাল-মৃত্যুতে কবির চিত্তে আসে দারুণ আঘাত। শোকাচ্ছন্ন মনকে শান্তিরসে সিঞ্চিত করবার জন্যই রবীন্দ্রনাথ নিজেকে পদাবলীরস-সমুদ্রে নিমজ্জিত রাখেন ব'লে মনে হয়। এ অনুমান সত্য হ'লে নিশ্চয়ই মনে করা যেতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথ শুধু কাব্যরস-আস্বাদনের জন্যই পদাবলীরস-সায়রে নিমগ্ন হন নি; পার্থিব বস্তুর বাইরে যে রহস্য আছে তাও অনুসন্ধানের জন্য পদাবলী-অধ্যয়নে নিরত হন। সেই সত্যদর্শনে তাঁর শোকক্লিষ্ট চিত্ত শান্তি লাভ করবে, এই ছিল কবির উদ্দেশ্য। পদাবলীর রসাস্বাদনকালে হয়ত তাঁর মনে হয়েছিল যে, বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রেষ্ঠ রত্নগুলি তিনি চয়ন করে একত্র করবেন এবং সেইগুলির দর্শন ও অনুভাবনে শোকতপ্ত মনকে শীতল করতে পারবেন। পদগুলি সংকলন করে কবিগুরু যথার্থ ই তাদের রত্নের কোঠায় ফেলেছিলেন ব'লে নাম দিয়েছেন 'পদরত্নাবলী।'

বৈষ্ণব কবিতা যে রবীন্দ্রনাথকে কতখানি মুগ্ধ করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর লিখিত এক চিঠিতে। ১৩১৭ সালের ২০শে আষাঢ়ের এক পত্রে তিনি লিখেছিলেন, 'আমার বয়স যখন তের-চোদ্দ তখন থেকে আমি অত্যন্ত আনন্দ ও আগ্রহের সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলী পাঠ করেছি; তার ছন্দ, রস, ভাষা সমস্তই আমাকে মুগ্ধ করত। যদিও আমার বয়স অল্প ছিল তবু অস্পষ্ট অস্ফুট রকমের বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের মধ্যে আমি প্রবেশলাভ করেছিলাম।' (দ্রষ্টব্য: রবীন্দ্র-জীবনী, পৃষ্ঠা ৬১, পরিবর্ধিত সংস্করণ)। বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের সত্য দর্শন ক'রে নানা রচনার মধ্যে তিনি তা প্রকাশ করে গেছেন। 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থের (রচনাকাল ১৩১৩) 'শুভক্ষণ' ও 'ত্যাগ' কবিতাদ্বয় এর অন্যতম নিদর্শন। 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থের 'শুভক্ষণ' কবিতায় পাওয়া যায়—

ওগো মা,

রাজার দুলাল যাবে আজি মোর
ঘরের সমুখপথে,
আজি এ প্রভাতে গৃহকাজ লয়ে
রহিব বলো কি মতে।
বলে দে আমায় কি করিব সাজ,
কি ছাঁদে কবরী বেঁধে লব আজ,
পরিব অঙ্গে কেমন ভঙ্গে
কোন্ বরণের বাস।

মাগো কি হ'ল তোমার, অবাক নয়নে
মুখপানে কেন চাস।

আমি দাঁড়াব যেথায় বাতায়ন কোণে
সে চাবে না সেথা জানি তাহা মনে,
ফেলিতে নিমেষ দেখা হবে শেষ,
যাবে সে সুদূর পুরে,

শুধু সঙ্গের বাঁশি কোন্ মাঠ হতে
বাজিবে ব্যাকুল সুরে।

তবু রাজার দুলাল যাবে আজি মোর
ঘরের সমুখ পথে,

শুধু সে নিমেষ লাগি না করিয়া বেশ
রহিব বলো কি মতে।

উদ্ধৃত কবিতাটিতে বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। বহু সাধনার পর চির-আকাঙ্ক্ষিত দয়িত যখন গৃহসম্মুখে আসেন, তখন বস্তুজগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও দেবময় হয়ে সেই চির-সুন্দরকেই ত দেখতে হয়!

উক্ত কাব্যগ্রন্থের 'ত্যাগ' কবিতায় কবিগুরু আবার বলেছেন,—

ওগো মা,
রাজার দুলাল চলি গেল মোর
ঘরের সমুখপথে,
প্রভাতের আলো ঝলিল তাহার
স্বর্ণশিখর রথে।
ঘোমটা খসায়ে বাতায়ন থেকে
নিমেষের লাগি নিয়েছি মা দেখে,
ছিঁড়ি মণিহার ফেলেছি তাহার
পথের ধূলার পরে।
মাগো কি হ'ল তোমার, অবাক নয়নে
চাহিস কিসের তরে!
মোর হার-ছেঁড়া মণি নেয় নি কুড়ায়ে
রথের চাকায় গেছে সে গুঁড়ায়ে
চাকার চিহ্ন ঘরের সমুখে
পড়ে আছে শুধু আঁকা।
আমি কি দিলেম কারে জানে না সে কেউ—
ধূলায় রহিল ঢাকা।
তবু রাজার দুলাল চলি গেল মোর
ঘরের সমুখপথে—
মোর বক্ষের মণি না ফেলিয়া দিয়া
রহিব বলো কি মতে।

যে প্রেমরাজ্যের রাজপুত্রকে এতদিন ধরে কন্যা মানসপূজা ক'রে আসছিল, তারই আগমনে এবং তারই উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত হৃদয়-মণিহার তুচ্ছ পার্থিব বস্তুমাত্র নয়। এর মধ্যে বিশিষ্ট প্রেমভক্তিদীপের প্রোজ্জ্বল শিখাই দেদীপ্যমান।

খেয়া কাব্যগ্রন্থের উক্ত কবিতাদ্বয়ে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট পরকীয়া প্রেমের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তার নিদর্শন রয়েছে কবির রচিত 'ভগ্নহৃদয়' নামে গীতিকাব্যে। ভগ্নহৃদয় প্রকাশিত হয় ১৮০৩ শকাব্দে (১৮৮১ খ্রীঃ)। তখন কবির বয়স ২০ বৎসর। এত অল্প বয়সেও পদাবলী-নিহিত মূল তত্ত্বকথার আভাস রয়েছে এই গ্রন্থটিতে। গ্রন্থে পাত্রপাত্রীর উল্লেখ আছে; কিন্তু নাটক বলা হয় নি। এর কারণস্বরূপ [illegible] ('এই কাব্যটিকে কেউ যেন নাটক মনে না করেন। নাটক ফুলের গাছ। তাহাতে ফুল ফুটে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র, এমন কি কাঁটাটি পর্যন্ত থাকা চাই। বর্তমান কাব্যটি ফুলের মালা, ইহাতে কেবল ফুলগুলি মাত্র সংগ্রহ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, যে দৃষ্টান্ত স্বরূপেই ফুলের উল্লেখ করা হইল।' গীতি-কাব্যের প্রধান নায়ক কবি, আর নায়িকা কবির বাল্যসখী মুরলা। নলিনী এক চপল-স্বভাবা কুমারী সকলের হৃদয় নিয়ে খেলা করে; কবিও তার বিলাসবিভ্রমে চঞ্চল। মুরলা কবিকে অন্তর দিয়ে ভালবাসে; কিন্তু কবি তা জানতে পারেন নি। ললিতা নামে সরলা বালিকাকে ভালবেসে গ্রহণ করেছে মুরলার ভাই অনিল; কিন্তু ললিতার প্রেম আবেগময় বা উচ্ছ্বাসপূর্ণ নয়। এই প্রেম অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত, অথচ সুগভীর এবং অব্যক্ত। অনিল এই বিশুদ্ধ প্রেমের নাগাল না পেয়ে দূরে স'রে যায় এবং নলিনীর চটকে ভোলে। শেষে মুরলা ও ললিতা উভয়েই অন্তর্দাহে মরণের পথে পা দেয়। মুরলাকে যখন কবি বুঝতে পারলেন তখন সে মৃত্যুপথযাত্রী; সেই যাত্রায় তাদের মালা বদল হ'ল, আর মৃতকল্প ললিতার কাছে এসে ধরা দিল অনিল।

ভগ্নহৃদয়-এ উল্লিখিত প্রেম বৈষ্ণবোক্ত পরকীয়া প্রেম থেকে স্বরূপতঃ ভিন্ন; কারণ উভয়তঃ এই প্রেম বরাবর অব্যক্ত। নারী তার দয়িতকে মনে-প্রাণে ভালবাসলেও সে এ ভালবাসা মুখে কখনও প্রকাশ করে নি। গীতিকাব্যের নারীচরিত্র মুরলা ও ললিতার মধ্যে তা সুপ্রকট। মুরলা অন্তর দিয়ে কবিকে ভালবাসে কিন্তু এ-ভালবাসা সে কারোর কাছে প্রকাশ করতে পারে না। নির্জনে আপনহারা হয়ে মুরলা ব'সে থাকে। যেখানে জনপ্রাণী নাই, যে-স্থান অতি নির্জন সেখানে ছুটে যায় মুরলা। সখী চপলা মুরলাকে খুঁজে খুঁজে সারা হয়ে শেষে তাকে দেখতে পায় অন্ধকার বনানীতে। এই নির্জন স্থানে সখীকে একলা ব'সে থাকতে দেখে চপলা জিজ্ঞাসা করে—

সখি, তুই হলি কি আপনা-হারা?
এ ভীষণ বনে পশি একেলা আছিস বসি
খুঁজে খুঁজে হোয়েছি যে সারা!
এমন আঁধার ঠাঁই জনপ্রাণী কেহ নাই,
জটিল মস্তক বট চারিদিকে ঝুঁকি।
অন্ধকার, চারিদিক হতে, মুখপানে
এমন তাকায়ে রয় বুকে বড় লাগে ভয়,
কি সাহসে রয়েছিস বসিয়া এখানে?

রাধিকারও এই দশা দেখতে পাই পদাবলীতে। নব-অনুরাগিণী রাধা কৃষ্ণপ্রেমে আপনহারা হয়ে বিরলে ব'সে থাকেন। তিনি এমনই তন্ময় যে কারোর কথা পর্যন্ত তাঁর

কানে পৌঁছায় না। আহার-বিহারে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নাই। কৃষ্ণরূপ-দর্শনের আশায় তিনি মেঘের দিকে তাকিয়ে থাকেন, কখনও বা ময়ূর-ময়ূরীর কণ্ঠদেশ নিরীক্ষণ করছেন। কবি চণ্ডীদাসের পদে রাধিকার পূর্বরাগের এই চিত্রটি সমুজ্জ্বল—

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা॥

ভগ্নহৃদয়-এর নায়িকা মুরলাও সখীর প্রশ্নে অনুরূপ উত্তর দিয়েছে—

বুকের ভিতরে গিয়া কি যে উঠে উথলিয়া
বুঝায়ে বলিতে তাহা পারি না সজনি!
যা সখি, একটু মোরে রেখে দে একেলা।

রাধিকা ও মুরলা উভয়েরই দশা এক।

মুরলার এই অবস্থা দেখে সখী চপলার বড় কষ্ট হয়; সে সখীকে বনমাঝে একলা রেখে যেতে চায় না। সখীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, যদি সে পুরুষ হ'ত তবে—

সারাদিন তোরে রাখিতাম ধরে
বেঁধে রাখিতাম হিয়ে
একটুকু হাসি কিনিতাম তোর
শতেক চুম্বন দিয়ে।

শুধু সখীর মুখে হাসি ফুটিয়েই চপলা ক্ষান্ত হ'ত না; সে অমিয়া-মাখানো মুরলার মুখখানি বুকের মধ্যে রেখে অনিমেষ লোচনে চেয়ে থাকত সারাক্ষণ। এই ভাবে দুঃখ ক'রে শেষে চপলা সখীর হাত দু'টি ধ'রে জিজ্ঞাসা করল—

সখি, কার তুমি ভালবাসা-তরে
ভাবিছ অমন দিনরাত ধরে,
পায়ে পড়ি তব খুলে বল তাহা
কি হবে রাখিয়া ঢাকি?

সখীর এই প্রশ্নে মুরলা হৃদয়াবেগ আর ধারণ করতে না পেরে বলে ওঠে—

ক্ষমা কর মোরে সখী, শুধায়ো না আর
মরমে লুকানো থাক মরমের ভার।
যে গোপনকথা সখি সতত লুকায়ে রাখি
ইষ্টদেব মন্ত্রসম পূজি অনিবার
তাহা মানুষের কানে ঢালিতে যে লাগে প্রাণে
লুকানো থাক তা সখি, হৃদয়ে আমার!
ভালবাসি, শুধায়ো না কারে ভালবাসি।
সে নাম কেমনে সখি, কহিব প্রকাশি!
আমি তুচ্ছ হ'তে তুচ্ছ সে নাম যে অতি উচ্চ
সে নাম যে নহে যোগ্য এই রসনার!
ক্ষুদ্র ঐ কুসুমটি পৃথিবী কাননে
আকাশের তারকারে পূজে মনে মনে
দিন দিন পূজা করি শুকায়ে পড়ে সে ঝরি
আজন্ম নীরব প্রেমে যায় প্রাণ তার
তেমতি পূজিয়া তারে এ প্রাণ যাইবে হারে
তবুও লুকানো রবে একথা আমার!

মুরলার এই কথায় সখীর মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে অজানা আশঙ্কায়; সেই প্রণয়াস্পদের নামটি শুধু চপলা জানতে চায় সখীর মঙ্গলের জন্য; সেই নাম রসনার সাধের খেলনার মত। উলটে-পালটে সেই নাম নিয়ে রসনা কতই না খেলা করতে চায়। তাই চপলা সখীকে মিনতি করে বলে—

নাম যদি তার বলিস, তা হ'লে
তোরে আমি অবিরাম
শুনাব তাহারি নাম—
গানের মাঝারে সে নাম গাঁথিয়া
সদা গাব সেই গান!
রজনী হইলে সেই গান গেয়ে
ঘুম পাড়াইব তোরে,
প্রভাত হইলে সেই গান তুই
শুনিবি ঘুমের ঘোরে!
ফুলের মালায় কুসুম-আখরে
লিখি দিব সেই নাম
গলায় পরিবি, মাথায় পরিবি
তাহারি বলয় কাঁকন করিবি
হৃদয়-উপরে যতনে ধরিবি
নামের কুসুমদাম!

চপলার মুখনিঃসৃত এই নাম-মাহাত্ম্য বর্ণনা সম্পূর্ণ বৈষ্ণব-প্রভাব-জাত। পদকর্তা দ্বিজ চণ্ডীদাসের অনুরূপ একটি বিখ্যাত পদ রয়েছে এই নাম-মাহাত্ম্য বিষয়ে। রাধিকার কৃষ্ণদর্শন তখনও হয় নি, শুধু নাম শুনেছেন তিনি এবং তাতেই তিনি উন্মাদিনী প্রায়। সখীকে উদ্দেশ করে রাধিকা বলেছেন—

সখি কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে॥

'ভগ্নহৃদয়'-এ চপলার উক্তিতে যে নাম-মাহাত্ম্যের বর্ণনা আছে, তার উপর যথেষ্ট প্রভাব পড়েছে দ্বিজ চণ্ডীদাসের এই পদটির।

মুরলা ও চপলার কথাবার্তার সময় হঠাৎ সেই বনে মুরলার প্রেমাস্পদ কবির আবির্ভাব হ'ল। তিনি ভাবনা-বিহ্বলা মুরলাকে দেখতে পেলেন বনদেবীর মত। কবি জানতে চাইলেন, মুরলা কি প্রকৃতির কাছে উদার ভাষা শিখছে বা তটিনীর কলধ্বনিতে কোন ছন্দের আভাস পেয়েছে! পরে কবি চপলাকে বললেন, সখি, মুরলাকে বনদেবীর মত সাজিয়ে দাও; তার এলোমেলো কেশপাশ সপুষ্প লতা দিয়ে বেঁধে দাও; তার বস্ত্রাঞ্চল গেঁথে দাও বন্য পুষ্প দিয়ে; হরিণ-শিশু নির্ভয়ে সখীর পদতল আশ্রয় ক'রে পরম নিশ্চিন্ত হোক, আর সবিস্ময়ে সুকুমার গ্রীবাটি বাঁকিয়ে অবাক্ নয়নে তার দিকে চেয়ে থাক; আর—

আমি হয়ে ভাবে ভোর দেখিব মুখানি তোর
কল্পনার ঘুম ঘোর পশিবে পরাণে।
ভাবিব, সত্যই হবে বনদেবী আসি তবে
অধিষ্ঠান হইলেন কবির নয়ানে!

কবি ও মুরলার পরস্পরের প্রতি এই অনুরাগ বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবধারা থেকে গৃহীত। পরকীয়া প্রেমের যে কি জ্বালা তা যেমন রাধিকায় প্রকাশ, তেমনি ভগ্নহৃদয়ের নায়িকা মুরলাও সে দহন বুঝতে পেরেছে কবিকে ভালবেসে। পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের পরস্পর ভালবাসা উভয়ের নিকট বিদিত কিন্তু ভগ্নহৃদয়-এ কবি ও মুরলার প্রেম সুগভীর হলেও [প]রস্পরের নিকট অব্যক্ত। সুতরাং এদের প্রেম অধিকতর [জ্ব]ালাময়। তাই কবি যখন জিজ্ঞাসা করলেন মুরলাকে—

প্রণয়বারির তরে তৃষায় আকুল
ম্রিয়মাণ হয়ে বুঝি পড়েছে সে ফুল?
পেয়েছ কি যুবা কোন মনের মতন?

[নি]জের প্রণয়াস্পদের মুখে এই কথা শুনে মুরলার হৃদয় [হাহ]াকার ক'রে বলে—

বুঝিলে না বুঝিলে না কবি গো এখনো
বুঝিলে না এ প্রাণের কথা
দেবতা গো বল দাও এ হৃদয়ে বল দাও
পারি যেন লুকাতে এ ব্যথা।

[কবি]র যে মুরলার প্রেম বুঝতে পারেন না, তার কারণস্বরূপ [মুরল]া মনে করে যে, কবি তাকে এতটুকুও ভালবাসে না। অভিমানে মুরলাও তার হৃদয় বেদনা প্রকাশ না ক'রে [বলে]—

তবে থাক, থাক সব, বুকে থাক গাঁথা
বুক যদি ফেটে যায়—ভেঙে যায়—চুরে যায়
তবু রবে লুকানো এ কথা।
দেবতা গো বল দাও—এ হৃদয়ে বল দাও

বৈষ্ণবোক্ত পরকীয়া প্রেম রবীন্দ্রনাথ দূর থেকে অবলোকন করেছেন; অথচ প্রেমের গভীরতা যে বাধার মধ্য দিয়েই সুপ্রকট তা তাঁর অগোচর নয়। তাই তিনি পরকীয় প্রেমের বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য সেই প্রেম নায়ক-নায়িকার মধ্যে অব্যক্ত রেখেছেন। এতে প্রেমের বিশুদ্ধিতাও রক্ষিত হয়েছে, আবার তা গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে পরম উৎকর্ষ লাভ করেছে। পরস্পরের ভালবাসা জানতে পেরে কবি ও মুরলা যদি পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধ হ'ত, তবে সে প্রেমের গাম্ভীর্য হ'ত লুপ্ত। বাধার মধ্যেই যে প্রকৃত সুখোদয় তা তাতে হ'ত না। কবি নলিনীকে ভালবাসেন—এ কথা কবির মুখ থেকে শুনেও কবির প্রতি মুরলার প্রেম বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি। বরং মুরলা কবির উদ্দেশে বলেছে—

অন্তর্যামী দেবতা গো, শুন একবার,
যদি আমি ভালবাসি কবিরে আমার
কবি যেন সুখী হয়, নলিনী সে সুখে রয়—
সখারে আমার আমি ভালবাসি যত
নলিনীবালাও যেন ভালবাসে তত!
নলিনীবালার যত আছে দুখজ্বালা
সব যেন মোর হয়, সুখে থাক বালা!
তবে চলিলাম কবি, আমি চলিলাম—
মুরলা করিছে এই বিদায় প্রণাম!

মুরলার এই মনোবেদনার প্রায় অনুরূপ ভাব পাওয়া যায় মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবি কবিশেখরের 'গোপাল বিজয়ে।' কৃষ্ণবিরহখিন্না রাধিকা কৃষ্ণের উদ্দেশে বলছেন—

মোর নামে কভু জবে মেলে আর নারী।
তারে হেন নিঠুর না হইহ মুরারি॥
লাখ দোষে কভু তারে না হইবে বাম।
সময়েহো সোঙরিবে হের পরিণাম॥
তাহার যতেক দুখ যত গ্লানিচয়।
সব যেন মোর হয় দূরে যায় ভয়॥

মুরলা প্রান্তর দিয়ে চলেছে সন্ন্যাসিনী বেশে। পূর্ব স্মৃতি তার ভেসে ওঠে মনে, আর মন অতিশয় ব্যাকুল হ'লে নিজেই মনকে সান্ত্বনা দেয় এই ব'লে—

যার কেহ নাই তার সব আছে,
সমস্ত জগৎ মুক্ত তার কাছে—
তারি তরে উঠে রবি শশী তারা
তারি তরে ফুটে কুসুম গাছে।
একটি যাহার নাইক আলয়
সমস্ত জগৎ তাহারি ঘর
একটি যাহার নাই সখা সখী

হৃদয়ের সর্বস্ব ধন অন্যকে দিয়ে মুরলা এখন রিক্ত অথচ মুক্ত। জনহীন প্রান্তর এখন তার কাছে নূতন ভাবে দেখা দিয়েছে। এখানে কেউ কাউকে আদর করে না, কেউ কারোর কাছে ভালবাসা পায় না; এখানে সুখ-দুঃখের বালাই নেই। দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন চ'লে যাচ্ছে নীরব চরণে। পূর্বে যে-জগতে মুরলা বাস করত, সেখানে ছিল কারও দুঃখ, আবার কারোর বা সুখরাশি কিন্তু এখন যে জগতে সে আছে, সেখানে—

সকলেই চায় সকলের মুখে,
শুধায় না কেহো কথা—
নাইক আলয়, চলেছে সকলে
মন যার যায় যেথা।

মুরলার শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে আসে; মৃত্যুর ছায়া সে দেখতে পায় অদূরে। এমন সময় তার মনে পড়ে কবির কথা, সখী চপলার কথা; আবার হাহাকার করতে থাকে তার মন। কবি হয়ত এতক্ষণ এসেছেন; কিন্তু তাঁর জন্য বাতায়নে ত কেউ অপেক্ষা করছে না। তাঁর পদ-শব্দ শুনে কেউ ত দ্রুত দ্বার খুলে দিচ্ছে না! তাঁর জন্য কেউ ত মালা গাঁথছে না। হয়ত কবি ম্রিয়মাণ হয়ে ব'সে আছেন, কথা বলার কেউ নাই। হয়ত অভাগা মুরলার জন্য তাঁর হৃদয় ব্যথিত হয়ে উঠেছে। এই সব ভাবনা মুরলাকে আকুল ক'রে তোলে। সে নিজেকে ব'লে ওঠে—

'হা নিষ্ঠুর মুরলা রে, কেন ছেড়ে এলি তাঁরে
নিতান্ত একেলা ফেলি কবিরে আমার—
হয়ত রে তোর তরে প্রাণ কাঁদে তার!
বড় স্বার্থপর তুই, নয় দুঃখে তোর
কাঁদিয়া কাটিয়া হত এ জীবন ভোর!

কিন্তু হঠাৎ সন্ন্যাসিনী মুরলার সম্বিৎ ফিরে আসে। এ-সমস্ত চিন্তা তার কাছে আবার স্বপ্নময় মনে হয়। সে নিজেকে প্রবোধ দিয়ে বলে—

কোথা কবি? কোন্ কবি? কে গো সে তোমার?
মাঝে মাঝে দেখিস রে একি স্বপ্ন মিছে!
স্বপনের অশ্রুজল ত্বরা ফেল মুছে!

মুরলা বুঝতে পারে তার জীবনের দিন ফুরিয়ে এসেছে; মৃত্যু তার ক্রোড়দেশ প্রসারিত ক'রে আছে মুরলার জন্য। মুরলা স্পষ্ট অনুভব করে—

এ সংসারে কেহ যদি তোরে ভালবাসে
সে কেবল ঐ মৃত্যু—ঐ রে আকাশে!
গুরুভার রক্তহীন হিমহস্তে তার
আলিঙ্গন করেছে সে হৃদয় তোমার!
হে মরণ! প্রিয়তম—স্বামী গো, জীবন মম
কবে আমাদের সেই সম্মিলন হবে?
জীবনের মৃত্যুশয্যা তেয়াগিব কবে?

ভাগ্য টেনে নিয়ে আসে কবিকে মুরলার কাছে জীবন-সায়াহ্নে। মৃত্যুপথযাত্রী মুরলাকে দেখে কবির মন হাহাকার ক'রে ওঠে; এই সময় কবি আর সহ্য করতে না পেরে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন—

কি করেছি এত তুই হলি যে কঠোর?
প্রাণ মোর, মন মোর, হৃদয়ের ধন মোর,
সমস্ত হৃদয় মোর, জগৎ আমার—
একবার বল্ বালা, বল্ একবার
ছাড়িয়ে যাবিনে মোরে ফেলি এ সংসার-ঘোরে
নিতান্ত এ হৃদয়েরে রাখি অসহায়।
আয় সখি, বুকে থাক্, এই হেথা মাথা রাখ,
হৃদয়ের রক্ত ফেটে বাহিরিতে চায়।
মুরলা, এ বুক তুই ত্যজিস না আর—
চিরদিন থাক্, সখি, হৃদয়ে আমার!

মুরলার মরু মন শীতল হয়ে যায় কবির প্রেমবারি-বর্ষণে। মুরলা বলে, সে অতি স্বার্থপর অতি নিষ্ঠুর, নইলে তার কবিকে সে ত্যাগ করে এসেছে! এমন স্নেহময় কবির হৃদয়কেও সে আঘাত করতে পারে! একবার ত সে কবির হৃদয়ের কথা ভাবে নি। সে কেবল নিজের ভাবনা নিয়েই ব্যস্ত ছিল। মুরলা আর থাকতে না পেরে কবিকে বলে—

মার্জনা করিও এই অপরাধ তার,
কবি মোর, শেষ ভিক্ষা এই মুরলার!
এমন দুর্বল হৃদি, এত নীচ, হীন,
এমন পাষাণে গড়া, এতই সে দীন,
এ যে চিরকাল ধরে ছিল তব কাছে
এ অপরাধের, কবি, মার্জনা কি আছে?
সখা, অপরাধ সারা অস্তিত্ব তাহার
মরণে করিবে আজি প্রায়শ্চিত্ত তার!......
ছি ছি সখা, কেঁদো নাকো মুরলার কথা রাখো
ও মুখে দেখিতে নারি অশ্রু বারিধার।

কবিও তাঁর হৃদয় খুলে দিলেন। যে প্রেমবারি এতদিন সংগোপনে ছিল তা আজ সহস্রধারায় প্রবাহিত হ'ল; কবি বাষ্পারুদ্ধকণ্ঠে ব'লে উঠলেন—

এত দিন এত কাছে ছিনু এক ঠাঁই,
মিলনের অবসর মোরা পাই নাই।
কে জানিত ভাগ্যে, সখি, ঘটিবে এমন
মরণের উপকূলে হইবে মিলন!

কবির এই কথায় মুরলার সুখের পরিসীমা রইল না;

সে আর মরতে চায় না; এই মরণের দিন যদি ফুরিয়ে না যায়, যদি মরতে মরতেও বেঁচে থাকা যায়, সেই প্রার্থনাই এখন মুরলার। প্রিয়তম কবিকে মুরলা তখন বলে যে সে এখন পরম সুখে শ্রান্ত হয়ে পড়েছে; কবি যেন তার মুখে একটু জল দেন। কবি বললেন, সখি, আজ সত্যই আমাদের বিবাহ—

দারুণ বিরহ ঐ আসিবার আগে, সই
অনন্ত মিলন হোক এই দুজনের!
আকাশেতে শত তারা চাহিয়া নিমেষহারা,
উহারা অনন্ত সাক্ষী রবে বিবাহের!
আজি এই দু'টি প্রাণ হইল অভেদ,
মরণে সে জীবনের হবে না বিচ্ছেদ
হোক তবে, হোক সখি, বিবাহ সুখের—
চিতায় বাসরশয্যা হোক আমাদের!

মুরলা ফুল তুলে আনতে বলল; সেই ফুলরাশিতে চিতাশয্যা আকুল হয়ে উঠবে; বিশেষ ক'রে রজনীগন্ধার মালার প্রয়োজন জানিয়ে মুরলা বলল—

রজনীগন্ধার মালা গাঁথ গো ত্বরায়,
সে মালা বদল করি দিও এ গলায়—
সেই মালা পরে আমি তোমার সম্মুখে, স্বামি,
করিব শয়ন সুখে সুখের চিতায়
সেই মালা পরে যেন দগ্ধ হয় কায়!

মুরলার সুখের তুলনা নেই; সে আশাও করে নি যে শেষ সময়ে কবিকে স্বামী ব'লে চিরবিদায় নিতে পারবে। শেষ দিনে বিধাতা যে তার কপালে এত সুখ লিখেছেন তা তার কাছে স্বপ্নাতীত। তাই মুরলা কবিকে বলল—

আরও কাছে এস কবি, আরও কাছে মোর—
রাখ হাত দু'খানি হাতের উপর।
কবি গো, স্বপ্নেও আমি ভাবি নাই কভু
শেষ দিনে এত সুখ হবে মোর প্রভু!
এখনো এল না ফুল! সখা গো আমার,
বড় যে হতেছি শ্রান্ত, পারি নে যে আর!

মুরলার শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে; এমন সময় ফুল ও রজনীগন্ধার মালা পাওয়া গেলে মুরলা কবিকে বলল—

ঐ যে এসেছে মালা—কবি গো, ত্বরায়
পরায়ে দাও গো তাহা এ মোর গলায়।
এই লও হাত মোর রাখ তব হাতে—
ছেলেবেলা হ'তে মোরে কত দয়া স্নেহ করে
রেখেছ এ হাত ধরি তব সাথে সাথে
আবার মোদের যবে হইবে মিলন
যেথা যাবে সেথা রব, দুই জনে এক হব,
অনন্ত বাঁধনে রবে অনন্ত জীবন!

কবি মুরলার গলায় মালা পরিয়ে এবং তাকে ফুলসাজে সাজিয়ে বললেন—

বিবাহ মোদের আজ হ'ল এই তবে,
ফুল যেথা না শুকায় সদা ফুটে শোভা পায়
সেথায় আরেক দিন ফুলশয্যা হবে!

মৃত্যুর ঘোর কপাল ছায়া নেমে এল মুরলার চোখে; কবিকে অতি নিবিড়ভাবে কাছে নিয়ে মুরলা শেষ প্রার্থনা জানাল—

আজ তবে বিদায়, বিদায়!
স্বামি, প্রভু, কবি, সখা, আবার হইবে দেখা
আজ তবে বিদায় বিদায়!

গীতিকাব্যের প্রধান নারীচরিত্র মুরলা ব্যতীত ললিতা নামে অন্যতম নারীচরিত্রের কথা পূর্বে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা হয়েছে। ললিতার বিষয় একটু স্বতন্ত্র। সে অনিল নামে এক যুবককে বিবাহ করেছে কিন্তু ভালবাসা রেখেছে অব্যক্ত। এইখানে মুরলার সঙ্গে তার ঐক্য। মুরলা ও ললিতা উভয়ই তাদের দয়িতকে ভালবাসে কিন্তু কবি বা অনিল তা বুঝতে পারে নি। ফলে, গীতিকাব্যের নলিনী নামে অপর এক চঞ্চলা নারীর রূপমোহে প'ড়ে কবি ও অনিল উভয়ই বিভ্রান্ত। নলিনীর স্বভাব হ'ল অন্যের হৃদয় নিয়ে খেলা। শেষে তাকেও অনুতপ্ত হ'তে হয়; অর্থাৎ যারা তাকে ভালবাসত, তারা ধীরে ধীরে দূরে স'রে যায়। শেষে নলিনী আক্ষেপ ক'রে বলেছে—

হা অদৃষ্ট! কাল মোরে হেরিয়া যে জন
নলিনী নলিনী ব'লে হত অচেতন,
নিমেষ ভুলিত আঁখি, পুরিত না আশ—
আমার সৌন্দর্যরাশি করিত যে গ্রাস,
মোর রাঙ্গা চরণের ধূলি হইবার
হৃদয়ের একমাত্র সাধ ছিল যার,
ধূলিতে যে পদচিহ্ন করিত চুম্বন,
মুখ ফিরাইয়া আজ গেল সেই জন!

এই ভাবটি বিখ্যাত পদকর্তা গোবিন্দদাসের নিম্নোক্ত পদে পাওয়া যায়—

একলা যাইতে যমুনাঘাটে
পদচিহ্ন মোর দেখিয়া বাটে
প্রতি পদচিহ্ন চুম্বয়ে কান,
তা দেখি আকুল বিফল প্রাণ।
লোকে দেখিলে কি বলিবে মোরে।

হাসি হাসি পিয়া মিলল পাশ
তা দেখি কাঁপয়ে গোবিন্দদাস।

উপরি-উক্ত আলোচনায় দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের 'ভগ্নহৃদয়' গীতিকাব্যখানির উপর বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব বিদ্যমান। বৈষ্ণব পদাবলীতে পরকীয়া প্রেমের মাহাত্ম্য কীর্তিত হ'লেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতিকাব্যে পরকীয়া প্রেমের যে চিত্র অঙ্কিত করেছেন, তা বৈষ্ণবোক্ত পরকীয়া প্রেমের অনুরূপ হ'লেও স্বতন্ত্রতাবিশিষ্ট। রাধাকৃষ্ণ উভয়ে উভয়কে ভালবাসে। এই ভালবাসার মধ্যে পূর্বরাগ, অনুরাগ, মিলন ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়; পক্ষান্তরে 'ভগ্নহৃদয়'-এ এ-সমস্ত রস-পর্যায় থাকলেও প্রধান চরিত্র কবি ও মুরলার মধ্যে কার্যতঃ মিলন সংঘটিত হয় নি; কিন্তু অপ্রধান চরিত্র অনিল ও ললিতার পরিশেষে মিলন হয়েছে দীর্ঘ বিরহ-শেষে রাধাকৃষ্ণের মিলনের অনুরূপেই। রাধার প্রণয়-লাভান্তে কৃষ্ণ মথুরায় চ'লে গিয়ে এবং অন্যাসক্ত হয়ে দীর্ঘকাল রাধাকে ভুলে থাকলে রাধা প্রাণ বিসর্জনে কৃতসংকল্পা হন; দূতী তার এই অবস্থার কথা মথুরায় গিয়ে কৃষ্ণকে জানালেই কৃষ্ণ বৃন্দাবনে ফিরে আসেন এবং রাধাকৃষ্ণের পুনর্মিলন হয়। (দ্রষ্টব্য: বিশ্বভারতী-প্রকাশিত 'গোপাল-বিজয়')। অনিল ও ললিতার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। ললিতার অকৃত্রিম নীরব প্রেম বুঝতে না পেরে অনিল নলিনীর রূপমোহে পড়ে; কিন্তু শেষে নিজের ভুল বুঝতে পেরে সে ললিতারই পাশে এসে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ দুই জনের যে মিলন দেখিয়েছেন তার কারণ আছে। অনিল ও ললিতা বিবাহিত; মুহূর্তের ভ্রমবশতঃ তাদের মধ্যে সাময়িক বিচ্ছেদ হয়েছিল; কিন্তু ভুল সংশোধনের পর তাদের মধ্যে মিলনের আর বাধা রইল না এবং সমাজনীতিও এখানে লঙ্ঘিত হয় নি। পক্ষান্তরে কবি ও মুরলার মিলন ঘটান নি রবীন্দ্রনাথ বিশেষ কারণবশতঃ। পরকীয়া প্রেমের মাহাত্ম্য অস্বীকার না করলেও রবীন্দ্রনাথ সমাজের রীতি ও আদর্শকে কখনও ত্যাগ করেন নি। রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মধ্যে বিশুদ্ধিতা থাকলেও সমাজনীতি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ তার প্রশ্রয় দেন নি, মনে হয়। সুতরাং সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন ক'রে কবি ও মুরলার মিলন-ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ চিন্তা করেছেন। অসংযম কামনা ও রূপে যে-মোহ আনে তা কল্যাণকে সৃষ্টি করে না। শকুন্তলার প্রতি দুর্বাশার অভিশাপ এবং কুমারসম্ভবের মদনভস্ম এই সত্যকে প্রমাণিত করে। তবে মৃত্যুশয্যায় যে কবি ও মুরলার মিলন দেখা যায়, তা নিতান্তই পারত্রিক; মরজগতে এ-ব্যবস্থার অবকাশ রবীন্দ্রনাথ রাখেন নি। এ-ক্ষেত্রে যেমন অকৃত্রিম বিশুদ্ধ প্রেম রক্ষিত হয়েছে, তেমনই সমাজনীতিও আদর্শচ্যুত হয় নি। এই কারণেই বলা হয়েছে, 'ভগ্নহৃদয়' গ্রন্থে যে-প্রেমের অভিব্যক্তি আছে, তা বিশিষ্ট পরকীয়া প্রেম। পদাবলীর উপজীব্য এই পরকীয়া প্রেমের মর্মকথা মুরলার সখী চপলার মুখেই উক্ত হয়েছে—'বাধা না পাইলে সখি সুখেতে কি সুখ আছে।' সমাজের কঠোর শাসন, মিলনের অনিশ্চয়তা, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইত্যাদি সমস্ত তুচ্ছ বস্তুকে অগ্রাহ্য ক'রে যে প্রেমের জন্য আকূতি, সেই পরকীয়া প্রেমের মহিমা যে কি গভীরতর, তা রবীন্দ্রনাথ উনিশ বৎসর বয়সেই বুঝতে পেরেছিলেন এবং তারই সাক্ষ্য বহন করছে 'ভগ্নহৃদয়' গ্রন্থটি।

হারানো ছবি

শ্রীকিরণচন্দ্র ঘোষাল

ছুটির দিনে নতুন ছোট ষ্টাণ্ডার্ড গাড়ীখানা নিয়ে সুজিত বেরিয়ে পড়েছে। পাশে স্ত্রী, নীলিমা। কালো মসৃণ পীচের রাস্তা অজগরের মত পড়ে আছে—কখনও সোজা, কখনও বাঁকা। রাস্তার দু'পাশে আমগাছের সারি। কলকাতা থেকে প্রায় বিশ মাইল তারা চ'লে এসেছে।

সবেমাত্র আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। পাখীরা গাছে ব'সেই গান সুরু করেছে। আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ আহার-অন্বেষণে বেরিয়ে গিয়েছে। দূরে সবুজ ধানের ক্ষেতের উপর দিয়ে পূবদিকের আকাশটাকে রাঙিয়ে দিয়ে প্রভাত সূর্য উঁকি মারছে।

গাড়িটায় ব্রেক কষে সুজিত ডাকল নীলিমাকে, দেখ, খোলা মাঠে সূর্যোদয়ের কি অপূর্ব দৃশ্য! ব'লে সুজিত পিছনের 'সিট'-এর উপর খাবারের ঝুড়িটার দিকে এবং চায়ের ফ্লাস্কটার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। নীলিমা বুঝল। চা ঢেলে, বিস্কুটের টিন খুলতেই, সুজিত চীৎকার করে উঠল—ও কি! রাস্তার ধারে নালায় জল, তার মধ্যে একখানা মোটর সাইকেল উল্টে আছে। সুজিত ও নীলিমা ছুটে গেল।

আরোহী প'ড়ে আছে কাৎ হয়ে, খানিকটা জলে, খানিকটা কচুরি-পানার উপরে। মাথাটা পড়েছে এমন জায়গায়—যেখানে একটা প্রকাণ্ড আমগাছের শিকড় নেমে গিয়েছে। মাথায় রক্তের চাপ—হুঁস নেই।

কখন পড়েছে, কি ভাবে পড়েছে কেউ জানে না।

দেখতে দেখতে ভিড় জমে গেল। একখানা বাসও এসে পড়ল। বাসখানা যাচ্ছিল কাঁচড়াপাড়ার দিকে। যাত্রীদের মধ্যে ছিল আমডাঙ্গা থানার একজন এ, এস, আই ও একজন সিপাই।

এ, এস, আই-এর জিম্মায় মোটর-সাইকেলখানা রেখে সুজিত আর নীলিমা মুমূর্ষু লোকটাকে নিয়ে সোজা আর, জি, কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ছুটল। সেখানে ওর বড়দা আর-এম-ও।

লোকটাকে পিছনের সিটে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। জ্ঞান হয় নি—হবে কি না কে জানে! নীলিমা তার বুক-পকেট থেকে ছোট একটা ডায়রী বের করলে—তাতে নাম লেখা আছে সুনীল রায় এম. বি. বি. এস. ঠিকানা কল্যাণী। বয়স মনে হয় তিরিশের মধ্যে।

সুজিত এসেই তার বড়দাকে পেয়ে গেল ইমারজেন্সি ওয়ার্ডে নেওয়া হয়েছে। তাঁরা পরীক্ষা করে বললেন, ভয়ের কারণ নেই, মাথায় চোট্ লেগেছে একটা এক্স-রে করা হবে।

এক্স-রে ক'রে ধরা পড়ল, বুকের দু'খানা পাঁজর ভেঙ্গে গিয়েছে।

চিকিৎসা চলল। এক সপ্তাহ কেটে গেলে রুগী অনেকটা সুস্থও হ'ল। সুজিত আর নীলিমা রোজই আসে। সুনীল সবই শুনল। শুনে সুজিত আর নীলিমার প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার মনে ভ'রে উঠল।

ডাক্তার বলেছে, সম্পূর্ণ সুস্থ হ'তে তিনমাস লাগবে। রুগী এখনও দুর্বল। সুজিতকে তার খুব ভাল লেগেছে—বিশেষ করে তাঁর মুখের 'ভাই' সম্বোধনটি। সুনীল হাসে। বলে, ভাগ্যিস্ দুর্ঘটনাটা হ'ল, তাই ত নতুন দাদা-বৌদি পেলাম।

সেদিন বৌদির সঙ্গে এসেছে একটি নতুন মেয়ে। বৌদির মুখেই শুনল, তার নাম চিত্রলেখা—সুজিতের বোন। লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজের হোষ্টেলে থাকে, তিন বছরের বি. এ. ডিগ্রী কোর্সের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী—দর্শন শাস্ত্রে অনার্স নিয়েছে।

কিন্তু মেয়েটি বড় গম্ভীর। দর্শনের ছাত্রী ব'লেই বোধহয় নির্লিপ্ত। সুনীল শুয়ে আছে অর্দ্ধ-নিমীলিত চোখে। নীলিমা ডাকল, ঠাকুরপো!

হাসিমুখে উঠতে চেষ্টা করল সুনীল। বৌদি ধমকে উঠতে আবার শুয়ে পড়ল একটু হেসে।

কেবিনের দরজার পাশে দাদার কাছে দাঁড়িয়েছিল চিত্রলেখা। পশ্চিমের জানলা দিয়ে পড়ন্ত সূর্যের কিরণ এসে পড়েছে চিত্রলেখার মুখে। সুনীল তাকিয়ে আছে সেইদিকে। চোখের পলক আর পড়ে না। বৌদির চোখ পড়তে লজ্জা পেল সুনীল। বৌদি হেসে ডাকলেন, ছবি, শুনে যা।

—ছবি!

—হাঁ, ওকে আমরা ছবি ব'লেই ডাকি।

ছবি কাছে এল। সুনীল পরিপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে চাইল।

নামিয়ে নেয়। সুনীলও নামায়, ছবিও নামায়। এমন হয়?

আমরা হাজার হাজার লোক দেখি, সুন্দর লোকও কুৎসিত লোকও দেখি,—ভাল লোকও দেখি, লোকও দেখি—কত লোকই ত দেখি। তবু কেন হয়—হঠাৎ-দেখা একজনের চিত্র যেন লেখা হয়ে মনে, সে সুন্দর হ'তে পারে, নাও পারে। আর চিত্রলেখা? চিত্রকরের হাতে-আঁকা চিত্র নয়। খুঁত বের করা যায় অনায়াসে। নাক তিলফুলের মত নয়, চোখ পটল-চেরা নয়, রং দুধে-আলতা নয়। তবু ওর শ্যামলা মুখে সুনীল যেন কি দেখল—যার জন্যে সুনীলের মনে চিত্রলেখা দাগ কাটল।

ওরা চ'লে গেল ৬টার ঘণ্টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে। রাত দশটা। হাসপাতালে তখন নিশীথ-রাত্রি।

বড় ঘড়িটার কাঁটা ঘুরছে—বারান্দায় আলো জ্বলছে—কেবিনের আলো নিবিয়ে দিলেও, খোলা দরজা দিয়ে খানিকটা আলো এসে পড়ছে বিছানার উপরে। পাখা ঘুরছে।

প্রথম দিকে দু-তিন দিন ঘুমের ওষুধ দিয়ে যেত নার্স। সুনীল ঘুমিয়ে পড়ত। আজ ক'দিন থেকে ঘুমের ওষুধের আর দরকার হয় না।

কিন্তু সেদিন যেন কেন সুনীলের চোখে ঘুম এল না। মনে জাগছে অজানা মেয়ের সলজ্জ হাসি, আর অমন সকৌতুকে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া। আর মনে জাগছে চোখের নীচে সেই তিলটি। যেন ইচ্ছে ক'রে বসান হয়েছে—যেন ও নইলে তাকে মানায় না।

নার্স একবার দু'বার ক'রে কয়েকবার ঘুরে গেল। রাত তখন সাড়ে এগারটা। সুনীলকে ঘুমুতে না দেখে, নার্স একটা বড়ি খাইয়ে দিয়ে চ'লে গেল।

চোখ বুজে আসছে। সুনীলের চোখের পাতায় জড়িয়ে আছে—চিত্রলেখার আকাশী রঙের শাড়ী...... তার ঘন-কালো চুলের বেণী...... তার মুখ...... তার হাসি...আর তার নাছোড়বান্দা চোখের নীচে সেই বড় তিলটি। তারপর কখন সে ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোরে নার্স ঢুকতেই জেগে ওঠে সুনীল। তাকাতেই ভেসে ওঠে আবার একজোড়া সলজ্জ চোখ আর চোখের নীচের তিলটি।

নার্স জিজ্ঞাসা করে, ঘুম হ'ল?

সুনীলের সংক্ষিপ্ত উত্তর, হ্যাঁ।

সুনীলের বাবা নেই। মা থাকেন জলপাইগুড়িতে তাঁর বড় ছেলে অনিলের কাছে। অনিল সেখানকার কলেজের অধ্যাপক। সুনীলের খবর তাঁদেরকে জানানো হয়েছে।

আর কিছুদিন পরের কথা। সুনীলকে নিয়ে এসেছে সুজিত তার নিজের বাড়ীতে। দোতলায় সুজিতদের চারখানা ঘর। দক্ষিণ-পূর্বের খোলা ঘরখানা দেওয়া হয়েছে সুনীলকে। তারই পাশের ঘরে থাকে সুজিত ও নীলিমা। একখানা বসবার ঘর। আর একখানা আছে চিত্রলেখার জন্যে যখন সে বাড়ী আসে।

সুনীলের চোখ এসে অবধি যেন কাকে খুঁজছে—মুখে কিছু বলতেও পারে না। সর্বদাই অন্যমনস্ক। চা খেতে অনেকটা সময় লাগে। টোষ্ট ও দুধের গ্লাস প'ড়ে আছে। বৌদি পরদা সরিয়ে ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞাসা করল, কাকে খুঁজছ? খাবারে মাছি পড়বে যে? দেয়ালে ছবি নেই। তোমার দাদা ইঞ্জিনীয়ার—সাহেব মানুষ, ছবি রাখেন না।

শনিবারে ছবি হোষ্টেল থেকে এল। দেখা হ'ল, কিন্তু তেমনি নির্লিপ্তভাব।

ইতিমধ্যে সুনীলের মা ও দাদা এসে পড়েছেন। পুজোর ছুটির সঙ্গে আরও দু'সপ্তাহের ছুটি বাড়িয়ে নিয়েছে অনিল।

মা ছবিকে দেখে চম্‌কে উঠলেন। বললেন, এটি কে?

সুনীল জানায়, সুজিতদা'র বোন।

ছবি এক গ্লাস সরবৎ নিয়ে ঘরে ঢুকল:—মাসীমা, আপনার সরবৎ এনেছি। ব'লে, সুনীলের মাকে সে প্রণাম করল।

মাসীমা চিবুক ধ'রে তাকে আদর করলেন। বললেন, তোমার নাম কি মা?

—ছবি।

ছবি! মা'র চোখ ঝাপসা হয়ে এল। সতের বছর আগের আর-এক ছবিকে মনে পড়ল তাঁর। তার নামও ছিল ছবি। সুনীলের বয়স তখন এগার। তিন বছরের ছবি খেলতে বেরিয়ে গেল, আর ফিরল না। তার হাতে ছিল সোনার বালা, গলায় সরু হার। পরণে ছিল সবুজ ফ্রক। আজ সে বেঁচে থাকলে এই ছবির মতই হ'ত। মাও চেয়ে থাকেন ছবির দিকে—চোখ ফেরাতে পারেন না।

ছুটি শেষ হয়ে গেল। সুনীলের মা ও দাদা জলপাইগুড়ি ফিরে গেলেন। আর সুনীল কল্যাণী থেকে বদলী হয়ে এল বারাসতে নতুন সরকারী হাসপাতালে।

বারাসত কলকাতা থেকে বেশী দূরে নয়। নীলিমারা কয়েকবারই সুনীলের বাসায় এসেছে। দর্শনের ছাত্রীরও দর্শন পেয়েছে সুনীল, কিন্তু সেই নির্লিপ্ত—ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

কিন্তু ঘটনা ঘটনাকে তৈরী করে। মেয়েটির জীবনেও ঘটল এক প্রমাদ। সেদিন হাসপাতালের ডিউটি সেরে সুনীল বাড়ী আসবে, ফোন এল বৌদির কাছ থেকে—ছবি য়্যাক্সিডেণ্ট হয়ে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।

মেডিক্যাল কলেজের ইমারজেন্সি ওয়ার্ডে ছবি। পথে বাস য়্যাক্সিডেণ্ট হয়ে মাথায় চোট লেগেছে—মাথা ফেটে ও হাতের একটি শিরা কেটে গিয়ে প্রচুর রক্তপাত হয়েছে। এখন রক্ত দেওয়ার প্রয়োজন।

সুনীলকে বাঁচিয়েছে সুজিত। এ সময় তারও ত একটা কর্ত্তব্য আছে। বললে, আমি রক্ত দেব।

সুনীলের রক্ত পরীক্ষা করে, ডাঃ চ্যাটার্জি জিজ্ঞাসা করলেন, রোগী আপনার কে? Blood যে same group-এর।

যাই হোক, রক্ত দেওয়ার দু'সপ্তাহ পরে ডাক্তারের মুখে হাসি ফুটল। বললেন, She is now out of danger।

'আউট অফ্ ডেঞ্জার, আউট অফ্ ডেঞ্জার।' সুনীল যেন হাতে স্বর্গ পেল। ছবি কিন্তু আজ আর তার দিকে চেয়ে চোখ ফেরায় নি। বরং ঠোঁটে লেগে ছিল মিষ্টি একটা হাসি।

ছবি শুনেছে সুনীল তাকে রক্ত দিয়ে বাঁচিয়েছে। সুনীলও জানে, আজকের ছবি—সম্পূর্ণ তারই।

সেদিন নীলিমা এসেও দু'জনের চোখের পরিবর্তন দেখে গেল।

সুজিত শুনে বলে, ভালই ত—দু'টিতে মানাবে বেশ।

ছবি ক্রমেই সুস্থ হয়ে উঠছে। বসতে অবশ্য এখনও পারে নি। সুনীল আসে-যায়। এই আসা-যাওয়ার মধ্যের ফাঁকটুকুকে ছবি আজকাল আর সহ্য করতে পারছে না! মনে হয়, এটুকু না থাকলেই ভাল ছিল।

খবর পেয়ে মা চ'লে এলেন কলকাতায়। দিনকতক পরে ছবিকে ও মাকে নিয়ে সুনীল বারাসতে চ'লে এল। নীলিমা আসে মাঝে মাঝে। নীলিমার মুখে মাও শুনলেন ওদের দু'জনের মনের অবস্থা।

ছবি সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে উঠেছে। মা ব'সে ব'সে ছবির চুলের জট ছাড়াচ্ছেন। সামনের চুল সরাতেই তিনি চীৎকার করে উঠলেন: ওরে, এই ত আমার হারানো ছবি! এই যে মাথার সেই কাটা দাগ! চোখের নীচে কালো তিল দেখে তখনই চিনেছিলাম।—এ কি ভুলবার! মা ছবিকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

সুনীল পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে। শুধু মনে পড়ছে ডাক্তারের সেই কথা—Blood যে same group-এর।

সুজিত স্বীকার করেছে—ছবিকে সে কুড়িয়ে পেয়েছিল।

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

রাজা রামমোহন রায়

ভারত সরকার রামমোহনের কথা হঠাৎ মনে করিয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য একটি স্মারক ডাক টিকিট অবশেষে বাহির করিলেন। বলা বাহুল্য ইহার পূর্ব্বে বহু খ্যাত-অখ্যাত, এমন কি টম-ডিক-হ্যারির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য ভারত সরকার ডাক টিকিট প্রকাশ করিয়াছেন। বিলম্ব হইলেও বাঙ্গালী রামমোহনের কথা যে ভারত সরকারের মনে পড়িয়াছে ইহার জন্য পশ্চিমবঙ্গ-নামক কলোনীর বাঙ্গালী-নামক প্রায়-অবলুপ্ত একটা জাতি একটু গৌরব বোধ করিতে চেষ্টা করিবে। ভারত সরকারকে ধন্যবাদ!

প্রসঙ্গক্রমে আর একটি কথা এখানে বলা যাইতে পারে। বোধ হয় ১৯৫১ সনে বিলাতে ব্রিষ্টল নামক শহরে রামমোহন মেমোরিয়ালে রামমোহনের একটি বৃহৎ তৈলচিত্র রক্ষিত আছে। মেমোরিয়ালের সম্পাদক ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে ঐ বিশেষ তৈল-চিত্রটি দিল্লীতে ভারতের প্রখ্যাত ব্যক্তিদের চিত্র-গ্যালারিতে স্থান দিবার জন্য পত্রে অনুরোধ জানান। বারবার তাগিদ দেওয়ার পর বোধ হয় ১৯৫৮ সালে নেহরু পত্রলেখককে জবাব দেন যে দিল্লীর ঐ চিত্র-গ্যালারিতে একান্ত স্থানাভাব—কারণ রামমোহন অপেক্ষা বহুগুণে এবং সর্ব্ববিষয়ে মহত্তর ভারতীয় মহাজনদের চিত্রে গ্যালারী পূর্ণ—কাজেই রামমোহনের চিত্রের 'পুনর্ব্বাসন' এদেশে সম্ভব হয় নাই। মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক একদা বর্ণিত পিগ্‌মী (pigmy) রামমোহনের চিত্রটি বিদেশেই পাড়য়া রহিল!

কিন্তু রামমোহনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধায় যখন ডাক টিকিট প্রকাশিত হইবে ঠিক সেই সময় সংবাদে প্রকাশ যে—পশ্চিমবঙ্গে এই যুগমানবের অমর স্মৃতিগুলি সরকার এবং সেইসঙ্গে সর্ব্বসাধারণের আনুকূল্য ও পৃষ্ঠ-পোষকতার অভাবে অবহেলিত অবস্থায় অবলুপ্তির পথে চলিয়াছে। এমন কি উনিশ শতকে বাঙ্গালীর জীবন-প্রভাতে বহু ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী এবং পীঠস্থান আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের পবিত্র বাসভবনটিও মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বে অবাঙ্গালীর নিকট হস্তান্তরিত হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালীর তথা ভারতীয় মাত্রেরই তীর্থস্থান-স্বরূপ এই পবিত্র বাসভবনটি রক্ষা করিবার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা নাই—মাথাব্যথার কথা ত দূরের কথা। এই বিষয়ে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত "সুনন্দ"র জর্নালে যে মন্তব্য করা হইয়াছে তাহার কিছু অংশ উদ্ধৃত করিলাম। তাহার পূর্ব্বে একটি কথা বলার প্রয়োজন আছে। রাজ্য সরকার (ডাঃ বিধান রায়ের আমলে) লালগোলা, বেলেঘাটা, রাজাবাজার প্রভৃতি অঞ্চলে স্থিত কতকগুলি রাজবাটি ক্রয় করিতে, অর্থাৎ ঐ সকল জমিদারীর মালিকদের আর্থিক সহায়তা দানের জন্য, লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে কোন প্রকার কার্পণ্য এবং আলস্য দেখান নাই। কিন্তু রামমোহন (বিদ্যাসাগরও কিঞ্চিৎ পরিমাণে) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃপা-দৃষ্টি হইতে কেন বঞ্চিত হইলেন বলিতে পারি না। বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীটে অবস্থিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসভবনটিও আজ একজন (বোধ হয়) অবাঙ্গালীর দখলে।

এইবার দেখুন 'সুনন্দ' তাঁহার জর্নালে কি বলিয়াছেন :

"আমি অনুমান করি, বাঙালী মাত্রেই রামমোহন রায় নামে একটি ব্যক্তির কথা অবগত আছেন। এঁকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'ভারত-পথিক'—বলেছেন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রেরণাই হলেন রামমোহন। দেশ-বিদেশের মনীষী এবং পণ্ডিতবৃন্দ এই রামমোহন রায়কেই 'নব-ভারতের স্রষ্টা' ব'লে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ইউরোপেও এক সময় তাঁর মনস্বিতা এবং কর্ম্মশক্তির প্রভূত খ্যাতি ছিল বলে জানা যায়।

"উত্তর কলকাতাকে যাঁরা কিঞ্চিৎ চেনেন, তাঁরা জানেন, উক্ত ভদ্র-সন্তানের নামাঙ্কিত দু'টি ভদ্রাসন

এখনও এই অঞ্চলে বিদ্যমান। একটি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে—সেখানে এখন আঞ্চলিক আরক্ষার একটি প্রধান ঘাঁটি। এক দিক থেকে তা ভালই, রামমোহনের স্মৃতি পুলিশের পাহারায় সংরক্ষিত রয়েছে—এর চেয়ে আনন্দ-সংবাদ আর কি হ'তে পারে? অথবা এই মহামানবের দ্বারা আরক্ষা-বাহিনী প্রতিদিন অনুপ্রাণিত হচ্ছেন, এমন অনুমানেও আমরা নিশ্চয়ই পুলকিত বোধ করব।

"কিন্তু আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের বাড়ীটি সম্পর্কে।

"শেষ পর্য্যন্ত এই বাড়ীতেই রামমোহন রায় বসবাস করতেন, এইখানেই বারবার কলকাতার এবং ভারতের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের পদধূলি পড়েছে। এই বাড়ীতে থেকেই তিনি 'সতী বিল' পাশ করিয়েছিলেন—এখান থেকেই জীবনযজ্ঞে পূর্ণাহুতি দেবার জন্যে ইউরোপের পথে তাঁর অন্তিম যাত্রা। সন্দেহ নেই, যাঁরা আজও রামমোহন রায়কে শ্রদ্ধা করেন (মোট ক'জন করেন আমার সঠিক জানা নেই), তাঁদের পক্ষে বাড়ীটি জাতীয় জীবনের মহাতীর্থ।

"তবু যে দু'-একজন শ্রদ্ধান্বিতের খবর পাই, তাঁরা কেউ কেউ এই বাড়ীতে প্রবেশাধিকার চেয়েছিলেন কিছুক্ষণের জন্যে। অসৎ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে নয়—মহামানবের কিছু স্মরণ চিহ্ন দেখে তাঁরা চরিতার্থ হবেন। কিন্তু যতদূর শুনেছি—নিষিদ্ধ দুর্গের মত এই বাড়ীতে প্রায় কাউকেই সে অনুমতি দেওয়া হয় নি। গৃহস্বামী সাক্ষাতে বিমুখ, কোন আলাপ-আলোচনায় বীতরাগ। এই বিশাল প্রাসাদ তার সুউচ্চ প্রাচীরগুলো নিয়ে রবীন্দ্রনাথের যক্ষপুরীর মত অবরুদ্ধ, শ্মশানের মত নিঃশব্দ। শুধু দিনের পর দিন তার গায়ে কালের ছাপ পড়ছে।

"সম্প্রতি আর একটি সংবাদ এল, এক খবরের কাগজের নোটিশ মারফৎ। কিছু অ-বাঙ্গালী পুরুষ-মহিলা যৌথভাবে এই বাড়ীটি কিনে নিয়েছেন। রামমোহনের বংশধর, বর্ত্তমান প্রাচীন উত্তরাধিকারী যতদিন বেঁচে থাকবেন, ততদিন এই বাড়ীর দখল তাঁরা পাবেন না, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে ক্রেতারা সম্পূর্ণভাবে বাড়ীটির মালিক হবেন - তখন আর কারোরই এর ওপর কোন স্বত্ব-স্বামিত্ব থাকবে না।

"বলবার কিছুই নেই, আইনের জোরেই সম্পত্তি হস্তান্তরিত হবে; যে-ঘরে বসে রামমোহন রায়—ডেভিড করেছেন, সেই ঘরে ভাগ্যবান্ ব্যবসায়ী গদি বিছিয়ে লাভ-লোকসানের হিসেব করবেন; বাগানের যে বেদীতে বসে ধ্যানমগ্ন রামমোহন অন্তরে সত্যের জ্যোতি উপলব্ধি করেছেন, সেটি ভেঙে ফেলে সেখানে হয়ত বা লোহা-লক্কড়ের গুদাম তৈরি করা হবে।

"না—আইনত বলবার কিছুই নেই।

"আমার স্বর্গত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মশাইকে মনে পড়ছে। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীকে নতুন অর্থবানদের গ্রাস থেকে রক্ষা করবার নেতৃত্ব তিনিই নিয়েছিলেন। কিন্তু আজ আর তিনি বেঁচে নেই। সুতরাং 'নব-ভারতের স্রষ্টা'র অসামান্য ঐতিহাসিক গৌরবজড়িত তীর্থপ্রতিম এই বাড়ীটি আইনঘটিত পরিণামই লাভ করবে। আর এই সময় বাঙ্গালী পুলকিত চিত্তে সাহিত্য সম্মেলন ডাকবে, সাংস্কৃতিক উৎসব পালন করবে, রবীন্দ্র জন্মোৎসবের জন্যে চাঁদা আদায় করবে, মনীষী-স্মরণের আয়োজন করবে, ট্রামে-বাসে যে-কোন বাংলা উপন্যাস পড়তে পড়তে তন্দ্রামগ্ন হবে এবং সংস্কৃতিপরায়ণতার আত্মস্তবে পরমোল্লাসে ময়ূরের মত পেখম মেলবে!

"আসেম্বলিতে দেশের নেতারা অগ্নিময় ভাষণ দিতে থাকবেন—তাতে কখনও কখনও রামমোহনের নজির তোলা হবে; অধ্যাপকেরা সাহিত্য ও সমাজ সাধনায় রামমোহনের অবদান নিয়ে মোটা মোটা বই লিখবেন—কেউ কেউ ডক্টরেটও লাভ করবেন। রবীন্দ্রপুরস্কার এবং অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডের পক্ষপাতিত্ব আলোচনা করে বাঙ্গালী সাহিত্যিকেরা চিত্তবিকারে দগ্ধ হবেন। আর 'দারুভূতো মুরারি' পশ্চিমবঙ্গ সরকার দার্শনিক ঔদাসীন্যে অবলীন হয়ে বসে থাকবে; কারণ, আইনত সম্পত্তি হস্তান্তরিত হ'লে কারোই কিছু বলবার থাকে না।

"পৃথিবীর অন্য দেশ হ'লে কি হ'ত, সে প্রসঙ্গ অবান্তর। আমার শুধু মনে হচ্ছে, সাংস্কৃতিসেবক বাঙ্গালী জাতির গঙ্গাযাত্রার আর বিলম্ব কত?"

সংবাদপত্র হইতে জানা গেল যে অতি সম্প্রতি এই ঐতিহাসিক বাড়ীটি হস্তান্তরিত হইয়াছে। এ সম্পর্কে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী এই বাড়ী শ্রীশচীন্দ্রমোহন রায়ের নিকট হইতে কয়েকজন অবাঙ্গালী ক্রয় করিয়াছেন এবং গত ১৭ই জুন দলিল রেজেষ্ট্রি হইয়াছে। সর্ত্ত অনুসারে শ্রীশচীন্দ্রমোহন রায়ের পিতা কুমার ধরণীমোহন রায় এই বাড়ীটিতে জীবনস্বত্বের অধিকারী হইয়া থাকিবেন। অর্থাৎ তিনি যতদিন বাঁচিয়া থাকিবেন

পারিবেন। কিন্তু তাঁহার অবর্ত্তমানে এই ক্রেতারা রামমোহনের ঐতিহাসিক বাসভবনটির মালিক হইবেন।

রাজা রামমোহন ১৭৩৬ শকে অর্থাৎ ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় আসিয়া বসবাস সুরু করেন। এ সম্পর্কে ১৭৮৭ শকের অগ্রহায়ণের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে জনৈক লেখক মন্তব্য করেন—"রামমোহন রায় যে-সময়ে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সমুদয় বঙ্গভূমি অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল।"

রামমোহন কলিকাতায় প্রথম যে বাড়ীটিতে বাস করেন, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোডের সেই বাড়ীটিতে আজ উত্তর কলিকাতার উপ-নগরপালের কার্য্যালয়। দেওয়ালে একটিমাত্র ট্যাবলেট ছাড়া এই বাড়ীটিকেও চিনিবার আজ আর কোন উপায় নাই।

এ-দেশ হইতে বিগতকালের প্রকৃত মহামানবদের, স্বর্গত যে-সব বাঙ্গালী মহাপুরুষদের জন্য বাঙ্গালী গৌরব বোধ করিতে পারে, সেই সকল মানুষদের স্মৃতি যত শীঘ্র দেশের লোক বিস্মৃত হইবে, বর্ত্তমান রাষ্ট্র এবং জননেতাদের পক্ষে ততই মঙ্গল। আদর্শ, নীতিভ্রষ্ট দেশে আদর্শ-মহামানবদের স্মৃতি অবশ্যই অপ্রয়োজনীয়!

ভারতপথিক রামমোহন

বাংলায় যে নবযুগের সূচনা হয় উনবিংশ শতাব্দীতে, তাহার অগ্রনায়ক রাজা রামমোহন রায়। কিন্তু কেবলমাত্র বাঙ্গলা দেশ এবং বাঙ্গালী জাতিই নহে, সমগ্র ভারত এবং ভারতবাসী মাত্রেই রামমোহনের নিকট ঋণী। সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা, লোককল্যাণ, হিন্দু-ধর্ম্মকে তাহার প্রকৃত স্থান পুনঃস্থাপন প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই রামমোহনের দান তথা কীর্ত্তি—অনন্যসাধারণ, অতুলনীয়। দেশের সেই গভীর তমসাবৃত যুগে তিনি উদার এবং মুক্ত-বুদ্ধি ও যুক্তির প্রদীপ জ্বালাইয়া দেশ ও জাতিকে নূতন পথের সহিত নূতন জীবনের সন্ধান দান করেন। কিন্তু পরম আশ্চর্য্যের বিষয়ঃ

......"এই যে, দেশের পক্ষ হইতে সেই মহাপুরুষের স্মৃতিরক্ষার কোনও যোগ্য ব্যবস্থা আজও করা হয় নাই। তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য অবশ্য স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করা হইতেছে; কিন্তু, বলাই বাহুল্য, রামমোহনের স্মৃতিরক্ষার ব্যাপারে এই ধরনের একটা মামুলী ব্যবস্থা করিয়াই জাতির কর্ত্তব্য ফুরাইয়া যাইতে পারে না। রাজা রামমোহনের কীর্ত্তিই অবশ্য তাঁহার শ্রেষ্ঠ স্মারক; কিন্তু দেশ তাই বলিয়া নিজের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইবে কেন? খুবই শোভন হইত, সরকার যদি আমহার্ষ্ট স্ট্রীটে রাজা রামমোহনের বাসভবনটিকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতেন। এই ভবনটি অতীত দিনের বহু ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী; এটিকে কেন্দ্র করিয়া রামমোহনের জীবনসাধনা ও আদর্শ সম্পর্কে চর্চ্চা ও গবেষণার একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া কিছু কঠিন ছিল না। কিংবা, বাড়ীটিকে রক্ষা করিয়া, লোকহিতকর অন্য কোনও কাজেও এটিকে ব্যবহার করা চলিত। কিন্তু সেই ন্যূনতম কর্ত্তব্যেও গাফিলতি হইয়াছে, এবং বাড়ীটি ইতিমধ্যে হস্তান্তরিত হইয়াছে। দেশ জাতি ও সরকারের পক্ষে ইহা গভীর লজ্জার বিষয়। মনে হয়, সরকার যদি উদ্যোগী হন, তবে বাড়ীটিকে এখনও রক্ষা করা যাইতে পারে। সে-ব্যবস্থা অবিলম্বে করা দরকার। খানাকুলের রাধানগরে রাজা রামমোহনের পৈতৃক বাসস্থানে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার যে প্রস্তাব সরকারের তরফ হইতে করা হইয়াছিল, তাহাও নাকি ধামাচাপা পড়িয়া আছে। ইহার চাইতে গভীর পরিতাপের কথা আর কি হইতে পারে! জাতি যে আত্মবিস্মৃত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। নহিলে যাঁহাদের কাছে জাতির ঋণ অপরিশোধ্য, এবং দুই হাত দিয়া জাতি একদিন যে-সব মহাপুরুষের দান গ্রহণ করিয়াছে, তাঁহাদের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থায় এত বড় ঔদাসীন্য কিছুতেই দেখা দিতে পারিত না।"

বলিতে পারি না আনন্দবাজার পত্রিকার উপরি-উক্ত আবেদনে দেশের এবং দেশ-নায়কদের চিত্তে কোন রেখাপাত করিবে কি না। আমাদের এ-বিষয় সন্দেহ গভীর। বিশেষ করিয়া যখন দেখি—অদ্যকার ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ভার যাঁহাদের হাতে, তাঁহারা মহাত্মা গান্ধী এবং জবাহরলাল নেহরু ছাড়া ভারতের অন্য কাহাকেও আজ আর দেখিতে পাইতেছেন না। বলা বাহুল্য আমরা মহাত্মাজী এবং নেহরুকে খাটো করিবার জন্য একথা বলিতেছি না—তাঁহাদের অবদান অতুলনীয়। কিন্তু এই দুই জনই ভারতের একমাত্র মূলধন এবং ইঁহাদের নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে পারিলে দেশ এবং জাতি সর্ব্ববিষয়ে উন্নতির চরমে উঠিবে—এ-কথাও স্বীকার কিংবা বিশ্বাস করি না। ভারতের বিশেষ এক সন্ধিকালে গান্ধীর আবির্ভাব ঘটে এবং সেই কালের প্রয়োজনে তিনি তাঁহার জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিশ্বাসমত সাধন করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে তাঁহার নির্দ্দেশিত দেশও জাতি-গঠন-মূলক সব পন্থাগুলি অনুসরণের সার্থকতা আছে কি না বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, গান্ধী ছিলেন বহু

বিষয়ে অতীব গোঁড়া এবং পুরাতন পন্থী ও যে-আদর্শ এবং নীতি নিজ জীবনে সার্থক করেন, তাহার সমগ্র দেশ এবং জাতির পক্ষে পালন করা অসম্ভব এবং তাহার সার্থকতাও আছে বলিয়া মনে করি না। বিশেষ করিয়া গান্ধীজীর অর্থনৈতিক মতবাদ এ-যুগে আদর্শ হিসাবে মূল্যবান্ হইলেও বাস্তবে কার্য্যকর হইতে পারে না। আর নেহরু ছিলেন রাজনৈতিক নেতা, কিন্তু বহু বিষয়ে গান্ধীজী অপেক্ষা উদার, বাস্তব এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি এবং এই জন্যই তিনি গান্ধীর বহু নির্দ্দেশ-উপদেশ অশ্রদ্ধা না করিয়া, অগ্রাহ্য করেন এবং ভারতকে যুগের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার আধুনিক এবং যান্ত্রিক শিল্পে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পান। জাতি-গঠনে নেহরুর অবদান কি—সে বিচার যথাকালে হইবে। এইটুকু মাত্র বলিতে পারা যায়—জাতিকে যে-ভাবে গঠন করিতে তিনি চাহিয়াছিলেন, তাহা পারেন নাই। তাহার প্রমাণ স্বাধীনতা লাভের ১৮ বৎসর পরেও বর্ত্তমান ভারতের পরম দুর্দ্দশার চিত্র।

ভারতে 'জাতির-জনক' যদি কাহাকেও বলিতে হয়—তবে ইহা রাজা রামমোহন রায় ছাড়া আর কাহাকেও নহে। কিন্তু আত্মবিস্মৃত জাতিকে এ-কথা বলার কোন সার্থকতা নাই। যে-দেশে হিন্দী রাজভাষার সম্মান স্বীকৃতি পায়, সে-দেশে রাজা রামমোহন রায়ের মত মহাপুরুষের স্মৃতির অবলুপ্তি অতীব যুক্তিযুক্ত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী কি এতই নীচে নামিয়াছে যে, অতল হইতে রামমোহনের মত যুগ-মানবের প্রতি দৃষ্টিদান করা তাহার পক্ষে অসাধ্য? আমাদের রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেনের প্রতি আমাদের বিশ্বাস আছে, দেশের বর্ত্তমান নৈতিক দুর্দ্দশার দিনে তাঁহার বিশেষ কতকগুলি গুণের জন্য তাঁহার প্রতি ব্যক্তিগত ভাবে শ্রদ্ধাও আমাদের কম নহে, তাই আশা করি তিনি অন্তত 'সঙ্গদোষ' সত্ত্বেও রামমোহনের প্রতি বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর যে সামান্য কর্ত্তব্য আছে, তাহা অবিলম্বে পালন করিবেন। ইহাতে রামমোহন অনুগৃহীত হইবেন না, হইব আমরা, বাঙ্গালী জাতি।

'সর্ব্বত্র নাই-রাজ্য'!

জলপাইগুড়ির 'জনমতে' প্রকাশ:

জলপাইগুড়ি বাজার হইতে সরিষার তৈল উধাও

"সরিষার তেলের দাম বাড়িতে বাড়িতে বাজার হইতে একদম উধাও। কিছু কিছু ব্যবসায়ী বলিয়াছেন—তাঁহারা ৪ টাকা মূল্যে সরিষার তেল বিক্রয় করিতে পারিবেন না। অধিকাংশ দোকানদার বলিতেছে ৪৲ টাকায় তাঁহারা বিক্রয় করিবেন। তেল নাই একথা ঠিক নয়, তেল আছে এবং প্রচুর আছে। বেশী দাম দিলে বেশী পাওয়া যাইবে। আমরা খবর পাইলাম বেলাকোবা এবং রায়গঞ্জ এলাকায় পাটের গুদাম-গুলিতে প্রচুর পরিমাণে চাউল ও সরিষার তেল মজুত রহিয়াছে। জেলা-সমাহর্ত্তা এবং আরক্ষা বিভাগের কাছে অনুরোধ, তাঁহারা সংবাদটি সত্য কি না একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখুন। বর্ত্তমানে সরকার এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে লড়াই সুরু হইয়াছে। কাজেই সরকারকে তৎপর হইতে হইবে। তাহা না হইলে আমরা সংবাদ পাইয়াছি কয়েকদিনের ভিতর জলপাইগুড়ির জনসাধারণ নিজেরাই ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবেন এবং তাহার জন্য যদি অবাঞ্ছিত অবস্থার সৃষ্টি হয় তবে সরকার দায়ী হইবেন।—"

বাঙ্গলার সর্ব্বত্রই এই অবস্থা, কিন্তু রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় কর্ত্তাদের কেবল মৌখিক হুমকিতে কোন কাজ হইবে কি? কালোবাজারের কর্ত্তারা হুমকির দৌড় কতদূর তাহা ভাল করিয়াই জানে।

বারাসাতের বাজারের আরও অবনতি: চাল তেলের দাম আরও বাড়িল: মাছ নাই, ডিম প্রতিটি পঁচিশ পয়সা: শাক-সবজির দাম অবিশ্বাস্য!

'বারাসাত বার্ত্তা' বলেন:

গত পক্ষকালের মধ্যে বারাসাতের বাজারের আরও অবনতি ঘটিয়াছে। চাউলের দাম এক টাকা কিলো ছিল, উহা বাড়িয়া এক টাকা পঁচিশ পয়সা হইয়াছে। সরিষার তৈলের দাম চার টাকা ছিল, উহার দাম বাড়িয়া চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। মাছের বাজার প্রায় মরুভূমির মত ফাঁকা। সামান্য যেটুকু মাছ আসে উহার দাম চার হইতে ছয় টাকা কিলো। ডিমের দাম বাড়িয়া জোড়া পঞ্চাশ পয়সায় উঠিয়াছে। শাক-সবজির দাম পূর্ব্বের তুলনায় বাড়িয়া গিয়াছে। চারিদিকে হতাশার গুঞ্জরন শোনা যাইতেছে। পেট ভর্ত্তি ভাত কাহারও অদৃষ্টে জুটিতেছে না। সমাজ জীবনে মানসিক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হইয়াছে। কলিকাতা হইতে বহু লোক প্রত্যহ বারাসাত হইতে চাউল ও বাজার সংগ্রহ করিতে আসেন। কলিকাতার ক্রেতাদের আগমনের কারণে বারাসাত বাজারের জিনিষপত্রের দাম বাড়িতেছে বলিয়া কোন কোন মহল অনুমান করেন।"

'দামোদর' বলিতেছেন :

'আর যে ঠাকুর সইতে নারি'

"হ্যাঁ, এবার ষোল-কলা পূর্ণ হইয়াছে। বর্ধমান শহরে আর আটাও পাওয়া যাইতেছে না। ন্যায্য মূল্যের দোকানগুলি হইতে সপ্তাহে প্রতি পরিবারের কার্ড-পিছু মাত্র দুই কেজি হিসাবে চালানী আটা দেওয়া হইয়াছিল, এ সপ্তাহের সংবাদ, তাহাও সব কার্ডধারী পান নাই। যাহা হউক এক দিক্ দিয়া কয়েক মুহূর্তের জন্য বর্ধমানে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অর্থাৎ খোলা ও কালোবাজারেও যখন আটা মিলিতেছে না, তখন, ছোট-বড় সকল আয়ের পরিবারকে এক লাইনে দাঁড় করিতে বাধ্য করিয়া কংগ্রেসী শাসকগণ দুধের সাধ ঘোলে মিটাইয়া লইলেন। ইহা কে বিশ্বাস করিবে? চাউল গেল, আলু গেল, আটাও যাইতে বসিয়াছে। বাঙ্গালীকে খাদ্যের অভ্যাস পালটাইতে হইবে, ইহাই প্রভুপাদ মুখ্যমন্ত্রীর শ্রীমুখ-নিসৃত বাণী। এবার বোধহয় বলা হইবে আহারের ঐ বদ অভ্যাসটাই ত্যাগ কর। হে চক্রধারী, সেদিন তোমার জন্মাষ্টমী পালন করিলাম—ইহাদের শিরে কি বজ্রপাত হইবে না? এখনও কি তুমি চক্র ধারণ করিবে না ঠাকুর?"

ছিঃ ছিঃ একথা ভাবাও পাপ!

সদাচার মহিমা!

বৰ্দ্ধমানের 'দৃষ্টি'তে কংগ্রেসের সদাচার যে-ভাবে পড়িয়াছে তাহা বহুজনের মনের কথাই, 'দৃষ্টি'বলিতেছেন :

"কংগ্রেসে ভুয়া সদস্যের, বিশেষ করিয়া ভুয়া প্রাথমিক সদস্যের অভিযোগ সুপ্রাচীন। নেতৃবৃন্দ মধ্যে মধ্যে এই সমস্যা সম্পর্কে অতিমাত্রায় সজাগ হইয়া প্রতিকার প্রয়াসী হইতেন। এইরূপ প্রচেষ্টায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস নেতৃবর্গের এক সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলেন। সম্মেলনে নেতাগণ স্ব স্ব প্রদেশের ভুয়া সদস্যের আনুমানিক সংখ্যা দিতেছিলেন। বাংলার পক্ষে উপস্থিত ছিলেন পরলোক-গত কিরণশঙ্কর রায়। বাংলার পক্ষ হইতে কপট গাম্ভীর্য্যের সহিত তিনি বলেন, বাংলায় ভুয়া সদস্য নাই বলিলেই চলে। বিস্ফারিত নেত্রে বিস্ময় প্রকাশপূর্ব্বক পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু প্রশ্ন করেন—'কিরণ, তুমি কি কথা বলিলে?'

"ভুয়া সদস্য বন্ধ করার প্রয়াস হয়। প্রাথমিক সদস্য থাকেন কেবল ভোট দেওয়ার মালিক, প্রার্থী হওয়ার ভোট লওয়ার অধিকার হইতে বঞ্চিত হন তিনি। সৃষ্টি হয় সক্রিয় সদস্যপদের।

"ভুয়া সদস্য যায় নাই বরং ক্ষমতার ডাকে বাড়িয়াই গিয়াছে।

"কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্য কংগ্রেসে কুলীন। তাঁহারাই কংগ্রেসের সর্ব্বপ্রকার নির্ব্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অধিকারী। কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সক্রিয় সদস্যকে ব্যক্তিগত জীবনে কয়েকটি আচরণ-বিধি পালন করিয়া চলিতে হয়, যথা: তিনি খাদি পরিধান করিবেন, পানদোষ-মুক্ত হইবেন, সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি থাকিবে না, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করিবেন ইত্যাদি। কিন্তু কমিশন বসাইয়া কংগ্রেস নির্দ্ধারিত আচরণের মানদণ্ড দ্বারা সক্রিয় সদস্যগণের ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা প্রণালী মাপিলেই দেখা যাইবে অধিকাংশ স্থলেই কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্য ভ্রষ্টাচারদুষ্ট। তাঁহারাই কংগ্রেসের ভিতরে ও বাহিরে পদ অধিকার ও অলঙ্কৃত করিয়া বসিয়া আছেন।

"কংগ্রেসের যে নিজস্ব নির্ব্বাচন হয়, তাহার একটি বৈশিষ্ট্য আছে। দপ্তর যাঁহার হাতে, নির্ব্বাচন হইবে তাঁহারই মনোমত; তিনি যে লোককে চাহেন না, তিনি জিতিয়াও দেখেন হারিয়া গিয়াছেন। আপীল আছে, ট্রাইবুন্যাল আছে, কিন্তু কর্ত্তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ন্যায় বিচার নাই।

"নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অতি সাম্প্রতিক দিল্লী অধিবেশনে পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে পণ্ডিতজীকে মূর্ত্ত কংগ্রেস, মূর্ত্ত ভারত বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে; আবার এই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এই দিল্লী অধিবেশনেই কামরাজ পরিকল্পনা আলোচনা প্রসঙ্গে এই বরেণ্য নেতার উদ্দেশ্যে কটু-কাটব্য (?) করিতেও সদস্যদের শালীনতাবোধে বাধে নাই।

"সদাচার আর কাহাকে বলে?

"কামরাজ পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া কংগ্রেস মানিয়া লইয়াছেন দেশ ও প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত করিতেই হইবে। শ্রীনন্দ স্বরাষ্ট্র দপ্তরে আসিলেন, শান্তনম্ কমিটি বসিল, সদাচার সমিতি গঠিত হইল। কংগ্রেস-নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ জানাইয়া দিলেন সদাচার সমিতি কংগ্রেসেরও নয়, সরকারেরও নয়। সদাচারের জন্য সদাচার সমিতির যাঁহাদের নিকট মূল্য ছিল না, ছিল কংগ্রেসী ও সরকারী সংস্থা বলিয়া, তাঁহাদের নিকট ইহা হাল্কা হইয়া গেল।

"সদাচার সমিতির কর্তৃপক্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ অগ্রণী হইয়া শ্রীনন্দ ও শ্রীঘোষের মধ্যে বুঝা-পড়ার ব্যবস্থা করিতেছেন।

কংগ্রেসে সবই সম্ভব।"

'দৃষ্টি'র মন্তব্যের পর আমাদের একমাত্র মন্তব্য—বর্তমান কংগ্রেস এবং শতকরা অন্তত ৯৮ জন কংগ্রেসীর পক্ষে অসম্ভব অকরণীয় কোন কার্য্যই নাই। সম্প্রতি কংগ্রেস-কম্বলের লোম বাছা খুব ঘটার সহিত প্রচার করা হইতেছে—কিন্তু ইহার প্রধান কারণ বোধ হয় কংগ্রেসী 'হ্যাভ্' এবং 'হ্যাভ-নট্স্'দের ব্যক্তিগত বিদ্বেষ, হিংসা এবং দাঁও মারিবার প্রয়াস। আমাদের এই উক্তি মিথ্যা হইলে আমরা সুখী হইব। হঠাৎ যে-ভাবে কংগ্রেসী মন্ত্রী এবং অন্যান্য উপরওয়ালাদের 'ময়লা-বস্ত্র' প্রকাশ্যে ধোওয়া সুরু হইয়াছে, তাহাতে সর্ব্বভারতীয় একটি নূতন 'ধাপা' সৃষ্টি হইতে পারে।

মৎস্যাভাব দূর করার সহজ পথ

তারকেশ্বরের 'পঞ্চায়েত'-এর মতে :

"বাংলায় মাছের অভাব লজ্জার কথা। আরও লজ্জার কথা, আমাদের শহরের "শিক্ষিত"রা অধিকাংশই বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞ না হ'লেও উদাসীন বটেই। তাঁদের জারিজুরি কেতাবের সীমায় আবদ্ধ। প্রচারের বাহন খবরের কাগজের কর্ম্মকর্ত্তারা বা সাংবাদিকরাও মূলতঃ শহুরে। তাই হৈচৈ যতই করুন, তাঁরা গোড়া ধরতে পারেন না। আর, সেই জন্যেই সহজ হইলেও সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। অর্থের অপচয় হচ্ছে, সমস্যা বেড়েই চলেছে।

"সরকার বড় জোর শহরের হৈ-হল্লাকে, তথা কাগজের হৈ-চৈকেই কিছুটা আমল দেন। অভিজ্ঞ গ্রামের লোকদের সরকার আমলই দেন না। তাঁরা অপদার্থ, দুর্নীতিপরায়ণ ও সেবাবোধহীন ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের হাতের মুঠোয়—কর্ম্মচারীরা যেমন নাচান তেমনই নাচেন।

"কাজেই, সমাধান হবে কি করে! মাছেই কি শুধু! সব ক্ষেত্রেই ঐ একই কারণে ব্যর্থতা আর সমস্যা! তা আজ সারা দেশে দানবীয় আকার ধারণ করেছে।

"বাংলায় পুকুর, দীঘি, দহ, বিল, জলা আদির অভাব নেই। অসংখ্য পুকুর, দীঘি, দহ, বিল, জলা আদি হেজে-মজে গেছে। কংগ্রেসের হালী-বন্ধু জমিদারদের বা তাঁদের কর্ম্মচারীদের জালিয়াতিতে সাধারণের ব্যবহার্য্য এবং সেচযোগ্য বহু বিল, দহ, জলা, পুকুর আদি বেআইনী বিলি করা হয়ে গেছে। সরকার তা বেআইনী জেনেও বন্ধুকীর্ত্তি ব'লে তা উপেক্ষা করে চলেছেন। সেগুলির অধিকাংশই এখন জমিতে পরিবর্ত্তিত। এই সবগুলির পরিমাপ কয়েক লক্ষ একর হবে।

"মাছ ধরার নামে সরকার গভীর জলে ডুবে ডুবে অনেক জলই খেয়েছেন। (গৌরী সেনের?) টাকার আদ্যশ্রাদ্ধ হয়েছে। সমস্যার একতিলও সমাধান হয় নি।

"আমরা ইতিপূর্ব্বে বলেছি, এখনও বলছি এই সব পুকুর, দীঘি, বিল, দহ, জলাগুলির পুনরুদ্ধার করলে মাছের সমস্যার বহুলাংশেই সমাধান হবে তদুপরি গ্রামের স্বাস্থ্য ও শ্রী ফিরবে এবং গ্রামে অর্থাগমের একটা বড় পথ খুলে যাবে। শুধু তাই নয় কৃষি-বেকারী সমস্যারও উল্লেখযোগ্য সমাধান হবে।"

এই প্রকার গেঁও-প্রকল্পে সরকারী কর্ত্তারা কখনও রাজী হইতে পারেন না। ইহাতে না আছে ঢাকের বাদ্য না-আছে করদাতাদের অর্থের প্রচণ্ড অপশ্রাদ্ধের অবকাশ! এ কাজ বে-ফায়দাও বটে।

পঞ্চায়েতে আর এক সংবাদে আনন্দ পাইলাম—

"তৈল মর্দ্দনের স্থানে" এবার মৎস্যদান"

"স্থান-বিশেষে তৈল মর্দ্দনের ব্যবস্থাই আবহমান কাল ধরে চলে আসছিল। খাঁটি সরষের তেলই চলত। এখন পরিবর্ত্তনের যুগে তেলের স্থান মাছ নিয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। একে তেল দুষ্প্রাপ্য তার উপর ভেজাল। তাতে আর যা-ই হোক তৈল মর্দ্দন চলে না। শহরে মাছ দুর্লভ হয়েছে, তার দরটাও গলাকাটা। আর যাঁদের তৈল মর্দ্দন করতে হয় তাঁরা অধিকাংশই শহরবাসী। তাই বিজ্ঞজনেরা তৈল মর্দ্দন ছেড়ে মৎস্যোপঢৌকনের পথ ধরেছেন। শোনা যাচ্ছে 'সায়েব' বা 'বড়বাবু'দের দেবার জন্য আজকাল মাছ যাচ্ছে খুবই গ্রাম থেকে। তার ফলে গ্রামের ৩৩০ টাকার মাছ উঠেছে ৪।৪॥৹ টাকায়, স্থানে স্থানে তারও ওপরে। তেলের চেয়ে মাছে সুবিধেও হয়েছে। তেলটা কর্ত্তার পায়ে মর্দ্দন করতেই লাগত। তাতে ঝঞ্ঝাট কম ছিল না! মাছ অন্দরমহলে চালান করে দেওয়া যায় স্বচ্ছন্দে। তাতে গৃহিণী বা মেম-সায়েব থেকে ছেলে-বুড়ো সবাই খুসী হন। তবে একটা বিপদ্। মেম-সায়েবরা না তেল চেয়ে বসেন আবার।"

আমরা কলিকাতাবাসীরাও পরম সুখে আছি—তবে আমাদের একটা সুবিধা এই যে, এখানে মাছও নাই, তেলও নাই—যে-দরে ঐ বস্তু দু'টি পাওয়া যাইতে

তাহা আমাদের মত সর্ব্বভাবে নিষ্পেষিত গৃহস্থদের নাগালের বাহিরে।

সকল দুঃখের মধ্যে একমাত্র সান্ত্বনা এই যে—

কলিকাতা বেতারের পল্লীমঙ্গল আসরে বঙ্গবাসীদের প্রয়োজনীয় সব কিছুই সুলভ!! দেশে কোন প্রকার অভাব-অনটন নাই—এই আসরের পরম বিজ্ঞ মোড়লের মতে।

অগ্নকার দুঃখ-অভাবের জ্বালা যদি ভুলিতে চান—একটি লোকাল রেডিও সেট অবিলম্বে ক্রয় করিয়া প্রত্যহ পল্লীমঙ্গল আসরের পাঁচালি শ্রবণ করুন!

স্বাধীনতার আশীর্ব্বাদ

'বারাসত বার্ত্তা' বলিতেছেন :—

"প্রকৃতপক্ষে বাংলার গ্রাম-জীবন যে দুর্দ্দিনের ভিতর দিয়া চলিয়াছে স্বাধীনতার সতের বৎসরের মধ্যে এত বড় দুর্দ্দিন আর দেখা যায় নাই। বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলের ছোট মাঝারি বড় শহরগুলি কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছে। শহর বাজারের নিত্য খাদ্যবস্তু সংগ্রহ প্রায় দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। চাউলের বাজার একরূপ অনিশ্চিত। কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চল ব্যতীত সরকার গ্রামাঞ্চলে পূর্ণমাত্রার রেশন ব্যবস্থা করেন নাই—আংশিক রেশন ব্যবস্থার মধ্যে শহরের অধিবাসীদের খোলা বাজারের উপর নির্ভর করিতে হয়। অথচ খোলা বাজারের চাউলের দাম এবং আমদানী দুই অনিশ্চিত। খোলা বাজারে মাছ পাওয়া যাইতেছে না, তরি-তরকারি আনাজের দাম বহু বাড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং দুই বেলার কেন এক বেলার আহার্য্য-সামগ্রী শহরবাসীদের পক্ষে সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

* * * *

"সর্ব্বত্র শোনা যাইতেছে অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এবং গত বৎসর হইতে কাপড় পোষাক পরিচ্ছদের দাম অনেক বাড়িবে এবং বাড়িয়া গিয়াছেও। এই সংবাদ সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের পক্ষে মারাত্মক কথা। যেখানে পেটের ভাত সংগ্রহ করা যাইতেছে না সেখানে যদি পরনের কাপড়ের দাম আরও বাড়িয়া যায় তবে কি করিয়া চলিবে।" সে ভাবনা আপনার আমার যাহাদের রেশনের থালি হাতে করিয়া—দাম দিয়া খাদ্য বস্তু কিনিবার জন্য ভিখারীর মত দোকানীর দ্বারে জোর করে দাঁড়াইতে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

* * * *

"রবীন্দ্রনাথের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হইতে মহাত্মা গান্ধীজীর ভারত ছাড় আন্দোলন পর্য্যন্ত গ্রামাঞ্চলের শহরগুলির যে সামাজিক ও নৈতিক মান ছিল, উহা আর নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। (এই দুইটির বস্তুরই মূল্য কমিয়াছে—এই মূল্যবৃদ্ধি যুগে!) উনবিংশ শতাব্দী হইতে বিংশ শতাব্দীর মধ্য পর্য্যন্ত শহরগুলির সামাজিক পরিবেশের মধ্যে আদর্শবাদ ছিল, জাতীয় জাগরণের প্রেরণা ছিল—উহা ধীরে ধীরে উড়িয়া যাইতেছে। সেদিন পরাধীন ভারতের অভাব-দারিদ্র্য সমাজকে মহান করিয়াছিল, স্বাধীন ভারতের অভাব-দারিদ্র্য সমাজকে পতনের অতল গহ্বরে ঠেলিয়া নামাইতেছে। আজিকার এই যে সাধারণ মানুষের খাওয়া-পরার অভাব ইহাকে যেন কেবল এক অর্থনীতির দ্বারা বিচার করা না হয়, সমাজতত্ত্বের দিক হইতে এক কঠিন পরীক্ষা বিচারের পটভূমিকা এই অভাব-দারিদ্র্যের মধ্যে গড়িয়া উঠিতেছে তাহা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই —"

কেবল বাঙ্গলার গ্রাম্য-জীবনই নহে—শহর-জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে যে-চিত্র আমাদের চোখে পড়িবে, তাহাতে বাঙ্গলা দেশের এবং বাঙ্গালী জাতির পরমায়ু আর কতদিন সে-বিষয়ে সন্দেহ জাগে। বিশেষ করিয়া বালক-বালিকা এবং যুব-সমাজের যে ভীষণ চিত্র অহরহ দেখা যাইতেছে তাহাতে চিন্তাশীল ব্যক্তি-মাত্রেই আতঙ্কিত হইবেন। অথচ এই পরম আতঙ্কময় এবং আশাহীন চিত্রের জন্য যুব-সমাজকে নিন্দা বা গালি দিবার কোন অধিকার আমাদের আছে বলিয়া মনে হয় না। সমাজের এবং রাষ্ট্রের কর্ত্তা-ব্যক্তিদের আচার-ব্যবহার এবং নৈতিক চালচলন দেখিয়া তাহারাই অনুকরণ করিতেছে আজ এই বাঙ্গলার যুব-সমাজ।

শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক-যুবতীদের জীবনে আজ ভবিষ্যৎ বলিয়া কিছু নাই—সকল বিষয়ে তাহারা বিফল—বেকার। রাজ্যের কলকারখানা এবং অবাঙ্গালী শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং উদ্যোগে কয়জন বাঙ্গালী প্রবেশাধিকার পায় তাহা সকলেরই জানা আছে। রাষ্ট্রকর্ত্তারা কেবল বাক্যেই দায় সারিতেছেন—কিন্তু দেশের অনাচার বন্ধ করিতে যে কঠোরতা প্রয়োজন, তাহার একান্ত অভাব দেখা যাইতেছে।

কেবলমাত্র ক্রন্দন করিয়া কি হইবে?

নিজ বাসভূমে—দুর্গাপুর—

মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বে একটি সংবাদে প্রকাশ পাইয়াছে যে, দুর্গাপুর ইস্পাত নির্ম্মাণ কারখানায় গত বৎসরখানেক যাবৎ বিবিধ কৌশল ও অজুহাতে বাঙ্গালী অফিসার এবং কর্ম্মচারীদের বিতাড়ন করা হইতেছে। যে-ক্ষেত্রে বিতাড়ন করা সম্ভব হইতেছে না, সেক্ষেত্রে উহাদের অন্যত্র বদলী করা হইতেছে।

কারখানার প্ল্যাণ্ট ষ্টোরস্ বিভাগে ঐ মাৎস্যন্যায় আরও বেশী বলিয়া অভিযোগ উঠিয়াছে। সেখানে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বাঙ্গালী অফিসারদের সরাইয়া দিয়া অনভিজ্ঞ গ্র্যাজুয়েট অবাঙ্গালী অ্যাপ্রেনটিসদের ঐ পদগুলিতে বসানো হইতেছে। ইহার প্রতিবাদে গত ৬ মাসের মধ্যে ৩ জন বাঙ্গালী অফিসার চাকুরি ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন।

সম্প্রতি এই বিভাগের ২ জন বাঙ্গালী অফিসারকে তাঁহাদের প্রমোশন হইতে বঞ্চিত করিয়া রাউরকেলা হইতে অবাঙ্গালী জুনিয়ার অফিসার আনাইয়া তাঁহাদের মাথার উপর বসানো হইতেছে। ডেপুটি কণ্ট্রোলার অব পারচেজ অ্যাণ্ড ষ্টোরস ঐভাবে কয়েকজন বাঙ্গালী অফিসারকে ডিঙ্গাইয়া এই পদটি দখল করিয়াছেন। ইহা ছাড়া রোলিং মিলস্, হুইল অ্যাণ্ড অ্যাকসেল, প্ল্যাণ্ট অপারেটার গ্যারেজ প্রভৃতি বিভাগেও ঐ একইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে

কিছুকাল পূর্ব্বে দুর্গাপুরে বাঙ্গালীদের প্রতি এই অপরূপ পক্ষপাতিত্বের বিষয় আমরা আলোচনা করিয়াছিলাম। এখন দেখা যাইতেছে যে—এই বিষম পক্ষপাতিত্বের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধির মুখেই চলিয়াছে। বাঙ্গলার বাহিরে সরকারী কল-কারখানাগুলিতে, দৈবাৎ ভাগ্যে থাকিলে, বাঙ্গালীর স্থান হয়, কিন্তু ঐ সব স্থানে স্থানীয় বা 'লোকাল' যোগ্য-অযোগ্য ব্যক্তিদের রুজিরোজগারের অবকাশ করিয়া দেওয়া হয় সর্ব্বপ্রথম—তাহার পর অন্য রাজ্যের লোকদের কথা। কিন্তু খাস বাঙ্গলা দেশেও কি বাঙ্গালী ক্রমে ক্রমে পরবাসীর মত বসবাস করিতে বাধ্য হইবে?

আমরা এমন কথনও বলি না—দাবি করা ত দূরের কথা—যে, অযোগ্য হইলেও বাঙ্গালীকে কাজকর্ম্ম বা চাকরি দিতে হইবে। কিন্তু বাঙ্গলা দেশে হাজার হাজার যোগ্য শিক্ষিত এবং সামান্য-শিক্ষিত লক্ষ লক্ষ বেকার লোক থাকিতেও তাহাদের কর্ম্মে নিয়োগের অবকাশ সর্ব্বপ্রথম কেন দেওয়া হইবে না? পশ্চিম বাঙ্গলায় কল-কারখানা এবং ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের অবাঙ্গালী মালিক-গুষ্টি কি এখানে বসিয়া যাহাদের শিল-নোড়া তাহাদেরই দাঁতের গোড়া ভাঙ্গিবার পূর্ণ স্বাধীন বিশেষ অধিকার-স্বরূপ লাভ করিয়াছেন?

কেবল অবাঙ্গালী মালিকদের নিন্দা করিয়া লাভ নাই। এ-রাজ্যে এমন কিছু বাঙ্গালী মালিকও আছেন যাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গের যে শহর বা জেলা হইতে এখানে আসিয়া কারবার ফাঁদিয়াছেন, তাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গের সেই শহর এবং জেলার লোকদের কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে অগ্রাধিকার দিয়াছেন এবং এখনও দিতেছেন। ইঁহারা এখন সর্ব্বতোভাবে পশ্চিমবঙ্গবাসী হইয়াছেন, কিন্তু মানসিক দিক হইতে সেই পূর্ব্ববঙ্গীয়ই রহিয়া গিয়াছেন। এই শ্রেণীর বিশেষ কয়েকজন এমন মালিকও আছেন যাঁহাদের কাজে-কারবারে পশ্চিমবঙ্গবাসী বাঙ্গালীর প্রবেশ কার্য্যতঃ প্রায় নিষিদ্ধ! ইতরজন-কথিত 'ঘটি ও বাঙ্গাল' ঐতিহ্য এই শ্রেণীর ওপার-আগত এক শ্রেণীর মালিক সযত্নে—কেবল রক্ষা নহে—লালন করিতেছেন। সে-কথা যাক—বর্ত্তমান অবস্থায় রাজ্য সরকারই বা কি করিতেছেন?

শুনিয়াছিলাম স্বর্গত ডঃ বিধান রায়, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী যুবকদের কর্ম্মসংস্থান উদ্দেশ্যেই দুর্গাপুর পরিকল্পনা কার্য্যকর করেন। তিনি আজ বাঁচিয়া থাকিলে হয়ত এই শিল্পনগরীতে বাঙ্গালীর প্রতি সুবিচার হইত কিন্তু বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য—তাঁহার মৃত্যুর পর রাজ্যশাসন ভার এমন ব্যক্তিদের উপর বর্ত্তাইয়াছে, যাঁহাদের সাহস ও ব্যক্তিত্বের এমনই অভাব রহিয়াছে, যাহার কারণে তাঁহারা কেন্দ্রীয় কর্ত্তা কিংবা এ-রাজ্যের অবাঙ্গালী এবং ক্ষেত্র বিশেষে বাঙ্গালী মালিকদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারেন না। এমন অবস্থায় কর্ত্তব্য কি—তাহা বাঙ্গালী বেকার যুবকদেরই স্থির করা ছাড়া পথ নাই। পশ্চিম-বঙ্গে নেতৃত্ব বলিতে কিছু নাই—কি দক্ষিণ, কি বাম, সকল নেতাই বাক্য দ্বারাই বাঘ মারিতে উৎসাহী এবং বেকার বাঙ্গালী যুবকদের প্রতি সকলেই বাম! সকলেই এই কথা বলিয়া দায় এড়াইতে চাহেন "বাঙ্গালী যুবক কর্ম্মবিমুখ।"—কর্ম্মের অবকাশ দিয়া, বেকারদের কর্ম্ম-সংস্থান করিয়া, তাহার পর যদি এই দায়-এড়ান কথা বলিতেন—মানাইত ভাল! সদাচারী শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয় বাঙ্গালী যুবকদের ত একেবারে অকেজো বলিয়াই কর্ত্তব্য সমাপন করিয়া—অন্য রাজ্যের গুরুতর সমস্যা মিটাইতে গুরুদেহ এবং হাল্কা মন নিয়োগ করিয়াছেন! এখন একমাত্র শ্রীপ্রফুল্ল সেন—ইচ্ছা করিলে

হয়ত বাঙ্গালীর বেকারত্ব দূরীকরণে বাস্তব কিছু করিতে পারেন, বিশেষ করিয়া দুর্গাপুরের ব্যাপারে।

একটি আবেদন

সবিনয় নিবেদন,

আপনারা সকলে অবগত আছেন যে, আগামী ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে মে অর্থাৎ ১৩৭২ বঙ্গাব্দের ১৬ই জ্যৈষ্ঠ বিশ্ব-বিখ্যাত সাংবাদিক ও বাঁকুড়ার সুসন্তান ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম-শতবর্ষ পূর্ত্তি হইতেছে। এই ব্যাপারে বাঁকুড়াবাসীর বিশেষ দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য রহিয়াছে।

সাংবাদিক শিরোমণি রামানন্দের জন্ম-শতবর্ষ যাহাতে এই জেলায় যথাযোগ্য ভাবে প্রতিপালিত হয় তাহার জন্য আপামর জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা করিতেছি।

রামানন্দ জন্ম-শতবার্ষিকী সমিতি গঠনকল্পে আগামী ৬ই সেপ্টেম্বর রবিবার বৈকাল ৪ টায় বাঁকুড়া সহরের বঙ্গ বিদ্যালয়ের হলঘরে এক সভার আয়োজন করা হইয়াছে। আপনারা এই সভায় যোগদান করিয়া বাঁকুড়া জেলা রামানন্দ জন্ম-শতবার্ষিকী সমিতি গঠন করিতে সহায়তা করুন—এই প্রার্থনা করি।

নিবেদক—

১-৯-৬৪ ॥

শ্রীরামনলিনী চক্রবর্ত্তী

শ্রীকানাইলাল দে

শ্রীরাখহরি চট্টোপাধ্যায়

শ্রীরবি দত্ত

আহ্বায়কবৃন্দ

কিছুকাল পূর্ব্বে বাঁকুড়ার 'মল্লভূম' পত্রিকায় উপরি-উক্ত আবেদনটি প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা অবশ্যই এই আশা পোষণ করি যে, বাঁকুড়াবাসী মাত্রেই এ আবেদনে সাড়া দিয়া এবং সাধ্যমত সর্ব্ব সহযোগিতা দান করিয়া বাঁকুড়া তথা সমগ্র ভারতের স্বর্গত সুসন্তানের প্রতি তাঁহাদের ন্যূনতম কর্ত্তব্য পালন করিবেন।

খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ও তাহার প্রতিকার

এ বিষয়ে অন্যান্য কথার মধ্যে—জলপাইগুড়ির 'জনমত' বলিতেছেন:

"...সরকার যদি দেশের আর্থিক বাজারের উপরে কর্তৃত্ব করিতে না পারেন তবে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। এর জন্য চাই দীর্ঘ-মেয়াদী ব্যবস্থা।

"প্রথমতঃ আমাদের দেশের খণ্ড খণ্ড জমি চাষের প্রথাকে বিলোপ করিয়া সমষ্টিগতভাবে ঢালাও জমি চাষের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এতে উৎপাদনের খরচ কম পড়িবে এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ করিয়া অধিক ফসল ফলানো যাইবে। একথা সমস্ত দেশের কৃষি-বিজ্ঞানীরাই স্বীকার করিয়াছেন। এছাড়া পথ নাই। দেশের জমি কৃষকদের মধ্যে বিলি করিতে হইবে। এবং কৃষক জমির মালিক হইবে বটে কিন্তু সেই জমি সমবায়ের মাধ্যমে চাষ হইবে এবং কৃষক প্রতিদিন পারিশ্রমিক পাইবে এবং সমবায় প্রতিষ্ঠানে তার অংশ থাকিবে যেহেতু সে জমির মালিক। সরকার এই সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। এই সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি ধান ক্রয় করিবে এবং এই সমবায় প্রতিষ্ঠান মিল হইতে ধান ভাঙ্গাইয়া ক্রেতা সমবায়ের মাধ্যমে বিক্রয় করিবে। তবে সুষ্ঠু বণ্টন সম্ভব এবং এতে কালোবাজারী টাকার চলাচল বন্ধ করিয়া অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এই ব্যাপারে সমবায়গুলিকে ব্যাঙ্ক হইতে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য দিতে হইবে। এবং লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহারা বিভিন্ন ভাবে এই সমবায়কে কর্ম্মের দ্বারা সাহায্য করছে তাহারা ছাড়া কেহ যাহাতে সমবায়ে অংশীদার হইতে না পারে। অর্থাৎ ব্যক্তিগত মালিকানার কালো ছায়া যাহাতে ইহাকে গ্রাস না করে। এই সমবায়ী মনোভাব গড়িয়া উঠিলে দেশপ্রেম জাগিবে। কলেক্‌টিভ ফার্ম্মিং ছাড়া কোন পথ নেই। সরকার বর্ত্তমানে যে খাদ্য-শস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কথা চিন্তা করিতেছেন তাহাতে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। কারণ একই সঙ্গে একই বাজারে সরকারী ব্যবস্থা ও ব্যক্তিগত মালিকানায় খাদ্য শস্যের ব্যবসা চালু থাকিতে পারে না। বরং চালু থাকিলে সরকার বিশেষ সুবিধা করিতে পারিবেন না।"

আজ সারা দেশে খাদ্য সঙ্কট ভয়াবহ হইয়াছে। আমাদের রাষ্ট্রপতি হইতে সকলেই শঙ্কিত। স্বাধীনতার সতের বৎসর পরেও দেশের মানুষ খাদ্য সংগ্রহের জন্য লাইন দিতেছে। বহুজন খাদ্য সংগ্রহ করিতে না পারিয়া অর্দ্ধাহারে-অনাহারে রহিয়াছে। দ্রব্যমূল্য এত অসম্ভব বাড়িয়াছে যে, সরকার কোন ক্রমেই ইহা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিতেছেন না। কৃষ্ণমাচারী এবং অন্যান্য কর্ত্তারা বলিতেছেন যে, খাদ্য সঙ্কটের মূল কারণ অতি-মুনাফার লোভে মজুতদারী ও কালোবাজারী টাকা'। কিন্তু বাঙলার শ্রীঅতুল্য ঘোষ ছাড়া আর সকলেই মজুতদারী কালোবাজারী টাকার বিরুদ্ধে বলিলেও ইহা রোধ

করিতে তাঁহারা অক্ষম! মজুতদারদের চ্যালেঞ্জে সরকার পরাস্ত! এই জন্যই কি সদাচার সমিতি নামক আদর্শ শিশুটিকে ভ্রূণেই নষ্ট করার ষড়যন্ত্র এত প্রকট? আমাদের ভয় হয়। জনসাধারণ এই ব্যবস্থা আর বেশী দিন সহ্য করিবে না। প্রমাণ?—বোম্বাই বন্ধ, গুজরাট বন্ধ, ইন্দোর বন্ধ, এলাহাবাদ-এ ধর্ম্মঘট। বর্ত্তমানে সারা ভারত একটা বিরাট্ বিপর্য্যয়ের মুখে।

সর্ব্বশেষ সংবাদে জানা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গে সদাচার সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং এই সমিতির সর্ব্বাধ্যক্ষ—সদাচারী শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয়!

দেখা যাক—!

দুর্নীতির খতিয়ান

ভারতবর্ষে দুর্নীতির ময়না তদন্ত বারবার হইয়াছে। ১৯৪৯ সালে টেকচাঁদ কমিটি, ১৯৫৩ সালে আচার্য্য কৃপালনীর সভাপতিত্বে গঠিত রেলওয়ে দুর্নীতি অনুসন্ধান কমিটি, ভিভিয়ান বসু কমিশন, চাগলা কমিশন, দাশ কমিশন, সান্তনম্ কমিটি প্রভৃতি বিভিন্ন স্তরে দুর্নীতির প্রসার, দুর্নীতি নিবারণের সমস্যা সম্পর্কে যেসব তথ্য রাখিয়া গিয়াছেন সেগুলি একত্র করিলে নূতন মহাভারত হইবে।

ধনবান ও ক্ষমতাবানের মধ্যে কিভাবে যোগসাজস গড়িয়া উঠিয়াছে এবং তাহার ডালপালা কিভাবে সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছে তাহার বিবরণ এ-সব কমিটি-কমিশনের পাতায় পাতায় চিত্রিত হইয়াছে।

এইসব রিপোর্ট প্রমাণ করে যে, বিলম্ব, অকর্ম্মণ্যতা ও স্বেচ্ছাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা—এ তিনের সমন্বয় হইল দুর্নীতি প্রচলনের আদর্শ ঘাঁটি। প্রশাসনিক ব্যবস্থায় যেখানেই অর্থ বিনিময়ের সংযোগ রহিয়াছে, যেখানেই টেণ্ডার, লাইসেন্স, কণ্ট্রাক্ট, গ্রাণ্ট, ট্যাক্স, সরবরাহ এবং কেনাবেচার খাতিরে সাধারণের সঙ্গে প্রশাসনিক ব্যবস্থার যোগাযোগের সুযোগ আছে; যেখানেই উচ্চ-পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীর স্বেচ্ছাধীন সিদ্ধান্তের দ্বারা স্বচ্ছন্দে বিশেষ ব্যক্তির আর্থিক স্বার্থকে কায়েম করিয়া দিবার সুযোগ থাকে সেখানেই দুর্নীতির জাল বিস্তৃত হয় এবং এ দুর্নীতি রূপ গ্রহণ করে কখনও সোজাসুজি আর্থিক বিনিময়ে, কখনও পরোক্ষভাবে নানা ধরনের উপহার আদান-প্রদানের মাধ্যমে। অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছে সরবরাহ দপ্তর, খাদ্য দপ্তর, কারিগরি উন্নয়ন দপ্তর, কেন্দ্রীয় পূর্ত্ত বিভাগ, পুনর্ব্বাসন দপ্তর, আমদানী রপ্তানী বিভাগ, কর সংগ্রহ বিভাগ, বিভাগ, পুলিশ প্রভৃতি প্রশাসনিক শাখা-প্রশাখ দুর্নীতির প্রভাব বেশী।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পাঁচ বছরে (১৯৫ ৬২) প্রায় চল্লিশ হাজারের বেশী সরকারী কর্ম্মচা দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হইয়া নানা ভাবে শা পাইয়াছে। দুর্নীতির দায়ে চাকুরি গিয়াছে অথ পদাবনতি হইয়াছে ১৫৪ জন উচ্চপদস্থ অফিসার এ ৫৪৩১ জন নন-গেজেটেড সরকারী কর্ম্মচারীর।

শতকরা নব্বুইটি অভিযোগে দুর্নীতি ধরা পড়িয়াছে এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ৫ বছরে পূর্ব্ববর্তী সময়ের তুলনায় দুর্নীতি তিনগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে শুধু আমদানী-রপ্তানীর ব্যাপারে দিল্লী পুলিশ এষ্টাব্লিশমেণ্টের অনুসন্ধানে দুর্নীতি ধরা পড়িয়াছে:

সাল	দুর্নীতির প্রভাবে মোট কত লাইসেন্স বাহির হইয়াছে	অভিযুক্ত লাইসেন্স কত টাকার	কতগুলি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এ অপরাধে সংশ্লিষ্ট
১৯৫৮	১৯৬	৭৬,৬৬,২৩৭	৯০
১৯৫৯	১৩৯	৪৯,৮৩,১২৮	১২৯
১৯৬০	৮২	৩৭,১৩,০৮২	৭৪
১৯৬১	১৩৭	৪৭,৯২,০৫৪	১৫৬
১৯৬২	১০৬	২৬,৬৯,৬৪১	৭৩
	৬৬০	২,৩৮,২৪,১৪২	৪৫১

অর্থাৎ পাঁচ বছরে প্রায় আড়াই কোটি টাকার লাইসেন্স -বে-আইনীভাবে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি দুর্নীতির আশ্রয় লইয়া দপ্তর হইতে আদায় করিয়াছে এবং ইহা জানা কথা যে, এই লাইসেন্সগুলির কেনাবেচা হইতে অন্ততঃ পাঁচ গুণ টাকা অর্থাৎ ১০।১১ কোটি টাকার লেনদেন হইয়াছে। ওয়ার্কস, হাউসিং এবং সরবরাহ দপ্তরে ধরা পড়িয়াছে অনুরূপ হিসাবে ১৫৯৩টি কেস্ যাহাতে প্রায় চুয়াল্লিশ লক্ষ টাকা দুর্নীতির দক্ষিণা হিসাবে জড়িত। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উন্নয়ন ও কেনার খাতে ২৮০০ কোটি টাকা নিয়োজিত হইয়াছে এবং উপরোক্ত অঙ্ক হইতেই ধরা পড়ে যে, শতকরা ১০।১১ ভাগ টাকা উৎকোচের খাতে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি লেনদেন করিয়াছে। শান্তনম্ কমিশন আন্দাজ করিয়াছেন যে, যদি শতকরা পাঁচ ভাগ টাকাও দুর্নীতির শুল্ক হিসাবে ধরা যায়, তবে অন্ততঃ ১৪০ কোটি টাকা দুর্নীতির খাতে অপব্যয়িত

ইয়াছে। আয়কর দপ্তরের ক্ষেত্রে এ পাঁচ বছরে অনুরূপ হিসাবে দুর্নীতির আশ্রয় লইয়া উচ্চবিত্ত সম্প্রদায় অন্ততঃ ৩০ কোটি টাকা আয়কর ফাঁকি দিয়াছেন।

ভ্রান্ত ধারণা

দুর্নীতির বাহক হিসাবে উচ্চপদস্থ (গেজেটেড্) প্রশাসনিক কর্ম্মচারীরা কি পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করে তা বুঝা যাইবে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পরিসংখ্যান হইতে। '৫৮ হইতে '৬২ সালের মধ্যে অনুসন্ধানের হিসাব অনেকটা দাঁড়ায়:

আণ্ডারসেক্রেটারী ও তদূর্দ্ধ কর্ম্মচারী—	২০
কেন্দ্রীয় দপ্তরের আণ্ডার সেক্রেটারীর অনূর্দ্ধ কর্ম্মচারী—	১৬
এক্সিকিউটিভ্ ইঞ্জিনীয়ার ও তদূর্দ্ধতন	১২০
এক্সিকিউটিভ্ ইঞ্জিনীয়ারের নিম্নতন	২১৯
রেলওয়ে অফিসার	৪৭
মিলিটারী কমিশনড্ অফিসার	১০৬
ডিরেক্টর, ডেপুটি ডিরেক্টর, এসিস্ট্যাণ্ট ডিরেক্টর ইত্যাদি—	৩৯
ইম্পোর্ট, এক্সপোর্ট এবং ষ্টীল কণ্ট্রোলার	৩২
আয়কর বিভাগীয় অফিসার	৪১
এক্সাইজ ও কাস্টমস্	৫১
কর্পোরেশন ও স্ট্যাটুটরি দপ্তরের উচ্চপদস্থ অফিসার—	৪৭
ক্লাস ওয়ান অফিসার—	১৩০
ক্লাস টু	১৫৯

উপরোক্ত তালিকায় উদ্ধৃত কর্ম্মচারীদের প্রত্যেকে স্বচ্ছাধীন সিদ্ধান্ত দেবার অধিকারী এবং ব্যক্তিগতভাবে সরকারী বেতনভুক্ সম্প্রদায়ের সর্ব্বোচ্চে প্রতিষ্ঠিত। ভারতবর্ষের সাধারণ কেন, উচ্চমধ্যবিত্ত নাগরিকের রাজগারী আয়ের তুলনায় ইঁহাদের আয়ের পরিমাণ কোন অংশে কম নয়। তাহা সত্ত্বেও উঁচুমহলের দুর্নীতি যেভাবে প্রসারিত তাহাতে প্রমাণিত হয় যে, সরকারী কাজে কম বেতন দুর্নীতি সম্প্রসারিত হইবার অন্যতম কারণ—এ ধারণা অনেকাংশে ভ্রান্ত।

নিম্নে বর্ণিত কয়েকটি দপ্তরের খতিয়ান হইতে আরও পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় দুর্নীতির বীজ কি ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত। শান্তনম্ কমিশনের রিপোর্টে দেখা যায়, প্রমাণিত অপরাধের জন্য প্রায় চল্লিশ হাজার সরকারী কর্ম্মচারী অভিযুক্ত হইয়াছে গত পাঁচ-ছয় বছরে। তাহার মধ্যে গেজেটেড্ এবং নন-গেজেটেড্ মিলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছে:

শিল্প ও বাণিজ্য সংস্থায়	১৩৫ জন
ডিফেন্স দপ্তর	৬৩৬ "
পররাষ্ট্র বিভাগ	৪৯ "
অর্থ দপ্তর (ফিনান্স)	১৬৯৭ "
খাদ্য ও কৃষি দপ্তর	৩২৪ " / ৬৪৪ "
স্বাস্থ্য দপ্তর	১৩১ "
স্বরাষ্ট্র দপ্তর	২৯৬ "
তথ্য ও বেতার দপ্তর	১৩৪ "
শ্রম ও নিয়োগ দপ্তর	১৭৯ "
রেল দপ্তর	৭৭২ "
বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি দপ্তর	২৫২ "
পরিবহন ও সংযোগ দপ্তর	৩৪৬৫ " / ২২৩ "
ডাক ও তার বিভাগ	৫৯০৯ "
পুনর্ব্বাসন বিভাগ	৩৯০ "
ওয়ার্কস্, হাউসিং ও সাপ্লাই	৪৩৭ "
ক্যাবিনেট্ সেক্রেটারিয়েট্	৯৮ "
ইউনিয়ন টেরিটরী	১০৪২ "
দিল্লী প্রশাসনিক সংস্থা	৯৪৫ "

৫০ হাজার নালিশ

কমিশনের তালিকা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় দপ্তরগুলির দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত কর্ম্মীর সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে গেজেটেড্—৮৪১ এবং নন্-গেজেটেড্—১৬,৮৪৬ ইহা শুধু দুর্নীতির দরুণ শাস্তিপ্রাপ্ত কর্ম্মীর সংখ্যা। অভিযোগ যাঁহারা এড়াইয়া গিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা কি বিপুল হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। খবরদারী কমিশনের খাতায় এ পাঁচ বছরে ২৫৭৯৯টি অভিযোগ লিখিত হইয়াছে। পুলিস এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলিতে ইহা ছাড়াও দুর্নীতির অভিযোগ আসিয়াছে প্রায় পঞ্চাশ হাজার। সুতরাং কি ব্যাপকভাবে দুর্নীতি প্রতিটি দপ্তর, প্রতিটি বিভাগে অনুপ্রবেশ করিয়াছে এবং এ সংক্রামক ব্যাধি হইতে প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে বাঁচান যে কি দুরূহ এমন কি অসম্ভব কার্য্য তাহা সহজেই বোঝা যায়।

সদাচার

তবে এইবার হয়ত দেশ হইতে দুর্নীতি বিতাড়িত

হইবে—কারণ কংগ্রেস-কর্ত্তারা বলিতেছেন, তাঁহাদের সকলকেই সদাচারী হইতে হইবে। কংগ্রেসী-মহলে তথা শাসকমহলে এবার অবশ্যই সদাচারের স্রোত বহাইতে হইবে—এবং যে-স্রোতের প্রবল বন্যায় সকল প্রকার অসদাচার ভাসিয়া যাইবে। কর্ত্তামহলে হঠাৎ সদাচারে এত উৎসাহ দেখিয়া দুষ্টলোকে যেন মনে করিবেন না যে, কংগ্রেসী এবং শাসকমহলে দুর্নীতি ব্যাপক হইয়াছিল, কারণ স্বর্গত প্রধানমন্ত্রীর আমলে আমরা বারবার দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি যে, যখনই কোন মন্ত্রী, উপমন্ত্রী কিংবা উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আসিত—তখনই স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী সর্ব্বপ্রথম তাহা বাতিল করিয়া দিবার প্রয়াস পাইতেন। কিন্তু তাঁহার প্রয়াস শেষ পর্য্যন্ত কোন কোন ক্ষেত্রে টিঁকিতে পারে নাই। কাহারও নাম করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ 'পাবলিক মেমারি শর্ট' হইলেও, যতখানি 'শর্ট' মনে করা হয় ততখানি নয়। মাত্র কিছুকাল পূর্ব্বে যে মুখ্যমন্ত্রী এবং কোন কোন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে গদি ছাড়িতে হইয়াছে তাহার কথা জনসাধারণ হয়ত এখনই ভুলিয়া যায় নাই। এই সব দৃষ্টান্ত হইতে আমরা ইহাই মনে করিব যে, বাস্তবিক পক্ষে কর্ত্তা তথা শাসকমহলে দুর্নীতি প্রায় নাই বলিলেই হয়, যে-দু'একটা ঘটনা হঠাৎ ঘটে, তাহাকে গুরুত্ব দিবার কোন অর্থ হয় না! তাহা ছাড়া ইংরেজিতে কথা আছে যে, 'একসেপ্‌সন্ প্রুভস্ দি রুল'—তাহা হইলেই প্রমাণিত হইল যে, সামান্য দু'-একটা দুর্নীতির দৃষ্টান্ত ইহাই বুঝাইতেছে যে, কংগ্রেসী তথা শাসকমহলে দুর্নীতি নাই।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে সদাচার

এ-রাজ্যেও সদাচার সমিতি শেষ পর্য্যন্ত সংগঠিত হইল। ইহা অতীব আনন্দের কথা। সদাচার ব্যাপারে শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয় যখন নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তখন আমরা ভরসা করিতে পারি যে, এ রাজ্যের সীমানার মধ্যে কোথাও আর দুর্নীতির বাসা থাকিবে না, বিশেষ করিয়া কলিকাতা কর্পোরেশন নামক প্রতিষ্ঠানে। লোকে মনে করে এই প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠানটি দুর্নীতির 'ব্রিডিং গ্রাউণ্ড'—কিন্তু এবার আর ভয় নাই। শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয় সদাচার-ঝাঁটার দ্বারা সব কিছু সাফ করিয়া দিবার ব্রত লইয়াছেন।

এখনই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে—সরকারী মহলে, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে, রেল ষ্টেশনে, ক্রীড়া-ক্ষেত্রে, এমন কি নটনটী মহলেও সদাচারের একটা বিষম ঢেউ উঠিয়াছে। এখন কেহ কোন কার্য্য উদ্ধারের চেষ্টায় ঘুষ দিতে গেলে ঘুষি খাইয়া ফিরিয়া আসিতে হইবে। সরকারী বহু আপিসে, থানায়, যেখানে ঘুষ ছাড়া কোন কাজই হইত না, এবার পূজার ছুটির পর দেখা যাইতেছে—বিনা ঘুষেই সরকারী কর্ম্মীরা সর্ব্বসাধারণের সকল কাজই হাসিমুখে করিয়া দিতেছে! কেহ ঘুষের প্রস্তাব করিলে তাহাকে পুলিসে দিবার ভয়ও দেখাইতেছে। সদাচারের প্রভাবে দেশে যেন সেই বহুকাল পূর্ব্বের সত্য-যুগের বিমল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে সদাচারের গুণেই এতদিনে দেখিতেছি 'রাম নাম সং হ্যায়' হইতেছে!

বাঙ্গলা ভাষা ও জাতীয় ঐক্য

গত ১১ই অক্টোবর নয়া দিল্লীতে নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রচার সমিতির সমাবর্ত্তন অনুষ্ঠানে আমাদের উপরাষ্ট্রপতি সভাপতির ভাষণে বলেন যে:

চারিটি বৈশিষ্ট্য—ছাপাখানা, ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্র পাশ্চাত্ত্যের বৈজ্ঞানিক ভাবধারার বিকাশ ও বৈপ্লবিক সমাজবাদ বাঙ্গলা সাহিত্যকে এক অপরূপ রূপ দিয়াছে এই সকলের প্রভাবে বাঙ্গলা সাহিত্য ভাবধারার গভীরতায় সমৃদ্ধ এবং বৈচিত্র্যে বিস্ময়কর। ডঃ জাকির হোসেন বলেন যে, দেশের অন্যান্য অংশের অধিবাসীরা বাংলা সাহিত্য পড়িয়া উপকৃত হইবে এবং ইহাতে ভাব ও প্রকাশ ভঙ্গির বিনিময় ঘটিয়া সংস্কৃতির মান উন্নীত হইবে।

উপরাষ্ট্রপতির মতে বাংলা সাহিত্যে সুন্দরতম সংস্কৃতি পরিবেশিত হইয়াছে। ইহা ভারতের অন্যান্য অংশে নূতন নূতন ভাবধারা প্রচারের মাধ্যমে পরিণত হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যই সর্ব্বপ্রথম জাতীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিয়া দেশবাসীকে স্বাধীনতা লাভে প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। আধুনিক সাহিত্যের ইতিহাস দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়া উপরাষ্ট্রপতি বলেন যে, তিনি সাহিত্য জগতের এক বিরাট্ পুরুষ। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া বাঙ্গলার সাহিত্যাকাশে তিনি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত দীপ্যমা

ছিলেন। তিনি আর কয়েকটি আঞ্চলিক সাহিত্যের উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

কিন্তু বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের হাজার গুণ এবং এত উৎকর্ষ থাকা সত্ত্বেও দিল্লীর রাজমহল এবার সরকারী ভাষা হিসাবে ১৯৬৫র ২৬শে জানুয়ারী হইতে একমাত্র হিন্দীকেই রাজ-সিংহাসনে পাকাপাকি অধিষ্ঠিত করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। আগামী ২৬শে জানুয়ারীর পর সকল প্রকার সরকারী ফর্ম্ম, প্রোফর্ম্ম এবং চিঠির কাগজপত্রে—হিন্দী ও ইংরেজী দুই ভাষাই থাকিবে, তবে হিন্দী ভাষা মুদ্রিত হইবে উপরে। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিসংখ্যান-বিষয়ক সমস্ত বিবরণ এক্ষণে ইংরেজীতে ছাপা হইলেও ইহার পর হইতে হিন্দীতেও প্রকাশ করা হইবে। কিছু কিছু ফর্ম ২৬শে জানুয়ারীর পূর্ব্বেই হিন্দীতে মুদ্রণ বাঞ্ছনীয় হইবে বলিয়া স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ইস্তাহারে বলা হয়।

২৬শে জানুয়ারীর পর হিন্দীর ব্যবহার ব্যপকতর করার জন্য কোন্ কোন্ ব্যবস্থা অবলম্বন করা চলিতে পারে, কেন্দ্রের বিভিন্ন দপ্তরের নিকট সেই সম্পর্কে বক্তব্য পেশের জন্যও স্বরাষ্ট্র দপ্তর অনুরোধ জানাইয়াছেন।

হিন্দীর জয়যাত্রা সুরু হইল এই ভাবে এবং আশা করা যায়, সহযাত্রী এই ইংরেজীকে হঠাৎ এক শুভমুহূর্ত্তে জমিচ্যুত করা এমন কিছু কঠিন কার্য্য হইবে না। সরকারী ফর্ম্ম, চিঠিপত্র এবং অন্যান্য হিন্দীতে হউক, কিন্তু অহিন্দী ভাষী রাজ্যের গরীবদের কথাটা কি কর্ত্তারা একবার চিন্তা করাও প্রয়োজন মনে করিলেন না। সরকারী আদেশ-নির্দ্দেশ প্রভৃতি জানিতে এবং মানিতে হইবেই—অতএব হিন্দী না শিখিলে চলিবে না। ইহাকে সোজা কথায় জবরদস্তি ছাড়া আর কি বলিব? কর্ত্তাদের মতে হিন্দী না কি ভারতের লোকদের মধ্যে ঐক্যের বাঁধন স্থায়ী করিবে। অবশ্যই সত্য—যেমন, দক্ষিণ ভারতে হিন্দীর প্রতি প্রেম ঐ অঞ্চলের লোকদের মনে বিচিত্র এক প্রচণ্ড উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছে!

ইহার পূর্ব্বে আমরা কর্ত্তাদের সতর্ক করিয়াছি যে গায়ের জোরে হিন্দীকে মানুষের ঘ'ড়ে চাপানোর ফল হইবে মারাত্মক—ভারতের ঐক্য ইহাতে দৃঢ় না হইয়া—ভাঙ্গনের মুখে চলিবে। কিন্তু এক ভোটে জয়ী (তাও সভাপতির কাষ্টিং-ভোটে!) হিন্দীকে এবার রাজভাষার সকল মর্য্যাদা দান করা হইতেছে। অদূর কালে ইহা যে বিষম বিপর্য্যয় ঘটাইবে—কর্ত্তারা তাও যেন বুঝিয়াও বুঝিতে চাহেন না। এই ভাবে দেশে নয়া 'রাজতন্ত্র' স্থাপন প্রচেষ্টা কখনও সার্থক হইবে না! 'সংহতি' দিবসের শপথ গ্রহণও বিফল হইবে!

—

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

প্রবীণ সাহিত্যিক ও আইনবিদ্ ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত গত ১৯শে সেপ্টেম্বর পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮১ বৎসর হইয়াছিল।

নরেশচন্দ্র ১৮৮২ সনের ১৭ই সেপ্টেম্বর বগুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন সেকালের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। ১৮৯৭ সনে এণ্ট্রান্স পাস করিয়া কলিকাতায় থাকিয়া এম. এ পাস করেন। পরে আইনের ডক্টরেট পান। তাঁর কর্ম্মজীবনের অনেকখানি জুড়িয়া ছিল অধ্যাপনা। ঢাকা আইন কলেজ, রিপণ কলেজ, সিটি কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। লেখা আরম্ভ করিয়াছিলেন নয়-দশ বৎসর বয়স হইতেই। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত "দাসী" পত্রিকায় তাঁহার প্রথম প্রবন্ধ বাহির হয়। তখন তাঁহার বয়স তেরো। তাহার পর বিবিধ পত্রিকায় তিনি লিখিতে সুরু করেন। যেমন, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, মানসী, মর্ম্মবাণী প্রভৃতি।

'বিচিত্রা'র বিচার-সভায় আধুনিকতার সপক্ষে নরেশচন্দ্রের সওয়াল ঐতিহাসিক মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। এ-কথা আজ অনস্বীকার্য্য যে, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং কল্লোল-কালের কথা-সাহিত্যের মধ্যে সেতু বন্ধন করিয়া গিয়াছেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। তিনি ছিলেন এক গৌরবময় যুগের জীবন্ত সাক্ষী। তাঁহার মৃত্যুতে সেই যুগের সহিত একালের একটি নিবিড় যোগ-সম্পর্ক যেন ছিন্ন হইয়া গেল।

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

'মহাস্থবির জাতক' রচয়িতা প্রথিতযশা সাহিত্যিক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী গত ১৩ই অক্টোবর পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৫ বৎসর হইয়াছিল। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে এক 'মহাস্থবির জাতক' লিখিয়াই তিনি প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন। সকলের কাছেই তিনি 'বুড়োদা' বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

এক কঠোর নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম পরিবারে জন্মিয়া প্রেমাঙ্কুরের শৈশব ও কৈশোরের কিছু সময় নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু কৈশোর শেষ হইবার আগেই তিনি সে বেড়াজাল ভাঙিতে সুরু করিয়াছিলেন। এই দুরন্ত এ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় দীপ্যমান ব্যক্তিটির পরিচয় তাঁহার 'মহাস্থবির জাতক'-এর প্রতিটি পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়া আছে। ১৮৯০ সনের ১লা জানুয়ারী তাঁহার জন্ম হয়। পিতা মহেশচন্দ্র আতর্থী উনিশ শতকের বাংলা দেশে ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রচারক ও দিক্‌পাল ছিলেন। তাঁহাদের আদি নিবাস ছিল পূর্ব্ববঙ্গে। প্রেমাঙ্কুরের কর্ম্মবহুল জীবনের ইতিহাস বড় বিচিত্র। তাঁহার প্রথম চাকরি চৌরঙ্গীর একটি খেলার সরঞ্জামের দোকানে। তিনি ব্যবসায়ের দিকেও ঝুঁকিয়াছিলেন। অবশ্য বলাবাহুল্য, ব্যবসায়ে শুধু লোকসানই গিয়াছিল। সাহিত্য-প্রীতি তাঁহার বরাবরই ছিল। কাজের ফাঁকে যখনই সময় পাইয়াছেন তখনই লিখিয়াছেন। জীবিকার জন্য তাঁহাকে অনেক কাজ করিতে হইয়াছে। সিনেমায় যাওয়ার পর আর্থিক স্বাচ্ছল্য তাঁহার কিছুটা আসে। পরিচালকরূপে তাঁহার প্রথম আত্মপ্রকাশ 'দেনা পাওনা' চিত্রে। এবং নিউ থিয়েটার্সের ইহাই প্রথম সবাক্ চিত্র। নিউ থিয়েটার্সে থাকাকালীন তিনি অনেক ছবি তুলিয়াছিলেন। বহুদর্শী, বহুশ্রুত, সুরসিক আতর্থীর জীবনে বারে বারে কর্ম্মক্ষেত্রের পট-পরিবর্ত্তন হইলেও মনে-প্রাণে তিনি এক জায়গায় স্থির ছিলেন। তাহা হইল সাহিত্য-সেবা। সাহিত্যিকই তাঁর পরিচয়। একথা তিনি নিজেও বলিতেন। তিনি বহু বই লিখিয়া গিয়াছেন। ছেলেদের বইও তাঁহার কম নাই। তবে 'মহাস্থবির জাতক' তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া স্বীকৃত। ইহা ছাড়াও সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদনায় ও সাংবাদিকতায় প্রেমাঙ্কুর তাঁহার মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। আকাশবাণীর 'বেতার জগৎ' পত্রিকার তিনি ছিলেন প্রথম সম্পাদক। তাঁহার মৃত্যুতে নবীন ও প্রবীণের আর একটি যোগ-সূত্র ছিন্ন হইয়া গেল।

অণিমা সেনগুপ্ত

আর একটি দুর্ঘটনার কথা আমাদের জানাইতে হইতেছে। গত ২রা অক্টোবর প্রচণ্ড তুষার-ধ্বসের কবলে পড়িয়া অণিমা সেনগুপ্ত মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তিনি নন্দকোট শিখরের মধ্যবর্ত্তী ট্রেইল্‌স গিরিবর্ত্ম অভিমুখী এক অভিযাত্রী দলে যোগ দিয়া হিমালয়ে গিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন কলিকাতার শশীমুখী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা। পর্ব্বতারোহণে ছিল তাঁহার অদম্য উৎসাহ। ইতিপূর্ব্বে তিনি কৈলাস ও মানস সরোবর, অমরনাথ, পিণ্ডারি এবং রূপকুণ্ড হইতে ঘুরিয়া আসিয়াছেন।

অণিমা সেনগুপ্তের আদি নিবাস ছিল বরিশাল জেলার গৈলায়। ব্রজমোহন কলেজ হইতে বি. এ. এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইতিহাসে এম. এ. পাস করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৪৪ বৎসর হইয়াছিল। তিনি অবিবাহিতা ছিলেন। তাঁহার পিতা মাতা এখনও বর্ত্তমান, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয়।

দূরের তারা

উমাদেবী

প্রথমে অনেক আলো—গান—হাসি—ব্যর্থ কোলাহল—
সময়ের রাজপথে ওরা মূঢ় মত্ত ও চঞ্চল,—
কান্ত তুমি তারই মধ্যে এনেছিলে নিশীথের তিমির প্রহর
আনন্দে গম্ভীর আর বেদনায় মন্থর—মন্থর।

প্রথমে তিমির শুধু—কিছু নাই আর
তারপর—হৃদয়ের তট ছুঁয়ে ধীরে ধীরে জেগে-ওঠা
সৌরভের অদৃশ্য জোয়ার—
কায়াহীন অনুভূতি
অলভ্যের সমস্ত আকুতি—
ক্রমে রূপ পরিগ্রহ করা এক সাকার পুষ্পের
নাসা—চোখ—ঠোঁট—মুখ—ঘন ভ্রূযুগের
রেখা-জেগে-ওঠা এক দেহের সন্নিধি—
একটি নির্জন দ্বীপ—পার হয়ে সময়ের অকূল জলধি।

তারো পরে বাসনার রক্তিম কীটের
বিষরস কেন জমে? কাটে প্রহরের
ক্লান্ত বেলা। সে নির্জন দ্বীপ হয় রাতের আকাশ
তোমার সৌরভটুকু মরে গিয়ে জন্ম নেয় অস্থির বাতাস—
আর সেই রেখাটুকু দূরে—দূরে চলে গিয়ে ক্রমে ক্রমে ধরে
দুর্লক্ষ্য তারার রূপ বিরহী প্রহরে।

আনন্দ

চিত্রভানু

মুষ্টিমেয় আয়ুর সন্তাপে মানুষ ক্ষুধায় দীন
কলঙ্কী দৈন্যের শোচনায়, একান্ত শ্রীহীন।
কিন্তু ওই নারিকেল তরু, সুন্দর সুঠাম সুকুমার,
সীমারে সহজে মেনে নিয়ে মেলে দিল আপনার।
সীমাহীন আশ্চর্য্য সুষমা, প্রাণের ঐশ্বর্য্যময়
রূপের সঙ্গীত মাঝে আপনার সত্য পরিচয়।
যা কিছু সঙ্কোচ তারে আনন্দে করিল উত্তরণ
গভীরের রসলোকে মুক্ত হ'ল স্থিতির বন্ধন।
মানুষ পারে নি যাহা পদে পদে আপন বিকারে
এই তরু সাধিল তা' অব্যাহত গ্রহণে স্বীকারে।
বন্ধন এবং মুক্তি এক সূত্রে হ'ল পরিণয়,
আনন্দ তাহার নাম, ক্ষয়হীন তার পরিচয়।

দেশের হিতসাধন

শত শত যুবক দেশের হিতসাধনের জন্য ব্যগ্র। দেশের জন্য স্বার্থত্যাগ করিতে, জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত। পথ কি, উপায় কি, তাঁহারা জানিতে চান।

পথ একটি নয়, উপায়ও একটি নয়। সোজা কথায় পরিষ্কার করিয়া পন্থা বুঝাইয়া দেওয়াও কঠিন।

একজন প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিত বলিয়াছিলেন, there is no royal road to geometry, জ্যামিতি শিখিবার সোজা কোন পথ নাই। অন্যান্য বিদ্যা শিখিবারও সোজা পথ নাই, পরিশ্রম করিতে হয়, বুদ্ধি খাটাইতে হয়। তথাপি বীজগণিত প্রভৃতি শিখাইবার জন্য Algebra Made Easy প্রভৃতি বহি লেখা হইয়াছে। তাহাতে নানা প্রকারের প্রশ্ন সমাধানের কৌশল বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু যতরকমের প্রশ্ন সমাধানের যতরকম ফিকিরই শিখাও না কেন, স্মরণশক্তির উপর যত বোঝাই চাপাও না কেন, বুদ্ধির উন্মেষে যে কাজ হয়, সে কাজটি শুধু স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া হইতে পারে না।

দেশকে শুদ্ধ, উন্নত, বড়, শক্তিশালী করিতে হইলে উপায় অবলম্বন করিতে হইবে বটে, একজন সুপন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিলে, হাজার হাজার লোককে সেই পথে চলিতে হইবে বটে, কিন্তু না বুঝিয়া কোন একটি পথে চলা অপেক্ষা বুঝিয়া চলা অধিক ফলপ্রদ। অপরের নির্দ্দিষ্ট উপায় অবলম্বন করিতে পারা অপেক্ষা উপায় আবিষ্কার করিবার শক্তির মূল্য ও প্রয়োজন অধিক।……

নির্দ্দিষ্ট উপায় অবলম্বন করিবার প্রয়োজন আছে, কিন্তু অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন করিতে পারিবার মত বুদ্ধি সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক। যাঁহারা দেশের মঙ্গল চান, তাঁহাদের হৃদয়ে দেশপ্রীতির প্রদীপ যেমন সর্ব্বদা জ্বলিতে থাকিবে, অবস্থানুযায়ী উপায় অবলম্বন করিবার জন্য বুদ্ধিও তেমনি সর্ব্বদা জাগরূক থাকিবে।

নেতার প্রয়োজন আছে; কিন্তু যদি নেতা না থাকেন, তাহা হইলে, এবং নেতা থাকিলেও, নিজের বুদ্ধি খাটাইয়া কাজ করিতে হইবে। যুদ্ধক্ষেত্রে যখন বড় বড় বা ছোট ছোট দলের নায়ক আহত বা হত হন, তখন যে-সব সিপাহী দিশাহারা না হইয়া বুদ্ধি খাটাইয়া কাজ করে, তাহারাই শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা।

ছোট ছোট বিষয়ে যেমন 'দেশের হিতসাধন আবশ্যক, পল্লী, গ্রাম, নগরাদি দেশের ছোট ছোট অংশের মঙ্গলসাধন যেমন আবশ্যক, সমগ্র দেশের মহত্তম হিতসাধনও তেমনি প্রয়োজনীয়। এরূপ হিতসাধনে সকল দেশবাসীর একযোগে কাজ করা চাই; অন্ততঃ খুব বেশী লোকের সহযোগিতা চাই। কিন্তু তার আগে চাই,- আমাদের দেশ বলিয়া যে একটা জিনিষ আছে, আমরা যে একটা জাতি, এই বোধ জন্মান।……

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩২৩

ছায়াপথ

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

কুড়ি

তপ্তকটাহই বটে।

হরেকৃষ্ণ চশমার ফাঁক দিয়ে রামকিঙ্করকে দেখে নিয়ে যেন লাফিয়ে উঠল: এস, এস, রামবাবু এস। তোমার অভাবে দোকান অন্ধকার হয়ে ছিল। ভাল ছিলে ত?

রামকিঙ্কর ব্যঙ্গটা যেন বুঝতেই পারলে না এমনি ভাবে উত্তর দিলে: আজ্ঞে হ্যাঁ, ভাল আছি।

—পড়ার জন্যে বড্ড খেটেছ মনে হচ্ছে যেন। শরীরটা ত খুব ভাল বোধ হচ্ছে না। এখনি কাজে যোগ না দিয়ে দেওবর কি পুরী কোথাও একটু হাওয়াবদল করে এলে পারতে।

রামকিঙ্কর একটু হাসলে।

হরেকৃষ্ণ বললে, এখানকার খাটুনি ত জান। আর খাওয়া-দাওয়াও, তোমার গিয়ে, বাবুদের বাড়ীর মতন ত নয়। কষ্ট হবে।

রামকিঙ্কর জবাব না দিয়ে তার বাক্স বিছানা নিয়ে ওপরে চলে গেল।

বসে বসে ভাবতে লাগল, হরেকৃষ্ণ এবারে তার ওপর কি নতুন নির্যাতনই না আরম্ভ করবে। প্রথম সম্ভাষণটা ত যুদ্ধ ঘোষণার মতই মনে হ'ল। আরও মনে হ'ল তার বুকে যেন বল বেড়েছে। গিন্নীমার কাছ থেকে কিছু কি ইঙ্গিত পেয়েছে? ওকি বুঝেছে যে, এবারে তার পিছনে গিন্নীমা নেই?

এমন সময় সুবল এল হাসতে হাসতে।

—কি খবর, সুবল? আছ কেমন?

—কেমন আছি দু'দিন পরেই বুঝতে পারবে।

—তার মানে?

—তার মানে, হরেকেষ্টর তেজ বেজায় বেড়েছে। সবাই ভয়ে তটস্থ।

রামকিঙ্কর ভয় পেয়ে গেল। বললে, তাই নাকি?

—হ্যাঁ। ও যেন সাপের পাঁচ পা দেখেছে। কি ব্যাপার তুমি কিছু জান?

অন্যমনস্কভাবে রামকিঙ্কর উত্তর দিলে, কিছুমাত্র না।

সুবল বললে, আমরা তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আছি।

—কেন?

—তোমার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করে দেখবার জন্যে।

রামকিঙ্কর হাসলে: কি রকম আর করবে! তোমাদের সঙ্গে যা করে, তার চতুর্গুণ করবে নিশ্চয়।

গম্ভীরভাবে সুবল বললে, তা পারবে না।

—কেন?

—তুমি গিন্নীমার পেয়ারের লোক। তোমাকে ঘাঁটাতে সাহস করবে না।

রামকিঙ্কর আবার হাসলে।

সুবল বললে, আর যদি করে, তোমার ত ভাবনা নেই।

—কেন? গিন্নীমার পেয়ারের লোক ব'লে?

—তা ত বটেই। তা ছাড়া, দু'দিন পরে তুমি গ্রাজুয়েট হবে। তখন তোমার নাগাল পায় কে? পরীক্ষা দিলে কেমন?

—হয়েছে একরকম।

—পাস করে যাবে ত?

—তা যেতে পারি।

সুবল গম্ভীর ভাবে বললে, আমার মনে হয়, হরেকেষ্টও চায় যে তুমি পাস করে যাও। তার কথা শুনে তাই মনে হয়।

গম্ভীর বিস্ময়ে রামকিঙ্কর বললে, বল কি!

সুবল বললে, ওর যত দুর্ভাবনা দোকানের ম্যানেজারি নিয়ে। পাছে তুমি ওর গদি দখল করে বস, সেই ওর ভয়। তোমার ওপরে ওর রাগের কারণও তাই।

রামকিঙ্কর বললে, আমি বি. এ. পাস করলে ওর কি সুবিধা হবে?

—ও ভাবে, আমরাও ভাবি, একটা ভাল চাকরি পেয়ে তুমি চলে যাবে।

রামকিঙ্কর হতাশভাবে মাথা নাড়লে: ভাল চাকরি কি এতই সহজ ভাব'হে!

—তোমার পক্ষে কিছুই কঠিন হবে না। তোমার ভাগ্য ভাল।

রামকিঙ্কর হাসলে: তাই নাকি?

সুবল জোরের সঙ্গে বললে, নিশ্চয়। একদিন আমাদের মত অবস্থাতেই তুমি এই দোকানে ঢুকেছিলে। তারপরে

গ্রহের কি যোগাযোগ ঘটল, তুমি একটা একটা করে পাস করে যেতে লাগলে। গিন্নীমা নিজে তোমার সহায় হলেন। ভাগ্য আর কাকে বলে?

এ কথা রামকিঙ্করের নিজেরও মাঝে মাঝে মনে হয়। বস্তুতঃ সে যেরকম করে ধাপে ধাপে উঠল, ভাগ্যের প্রসাদ ছাড়া তা সম্ভব নয়। সত্যই ত, এ দোকানে যেদিন সে ঢুকল, সেদিন ওতে আর সুবলে তফাৎ ছিল কোথায়?

কিন্তু এবারে তার মনটা কি রকম দমে গেছে। মনে আর জোর পাচ্ছে না। তার বিশ্বাস, এই উত্থানই শেষ। সে যেন একটা জটিল জালে জড়িয়ে পড়ছে। নিজের ইচ্ছায় নয়, বোধ হয় ভাগ্যের চক্রান্তে। তার আশঙ্কা, গিন্নীমার অনুগ্রহ সে হারিয়েছে। যদি বা কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাও ধীরে ধীরে গ্রহের চক্রান্তে হারাবে। অন্যমনস্ক-ভাবে সেই কথা ভাবতে লাগল।

এমন সময় একটি লোক এসে খবর দিলে, ম্যানেজার-বাবু ডাকছেন।

রামকিঙ্কর সুবলের দিকে চাইলে। সুবলও রাম-কিঙ্করের দিকে। এ সবের অর্থ কি, দু'জনেই জানে।

দু'জনেই নীচে এল।

হরেকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলে, তোমার হাত-মুখ ধোয়া হয়েছে, রাম?

রামকিঙ্কর বললে, না, এখনও হয় নি। এই ত এলাম। একটু বিশ্রাম করছি।

হরেকৃষ্ণ কুটিল হাস্যে বললে, হ্যাঁ, অনেক দূর থেকে এলে, একটু বিশ্রাম ত দরকারই। কিন্তু একটা জরুরী কাজ আছে। বকেয়া টাকা কিছু আদায় করতেই হবে। সন্ধ্যার পরে বাবু এসে নিয়ে যাবেন। এ কাজ তুমি ছাড়া আর কেউ পারবে না।

রামকিঙ্কর অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, বাবু?

বিরক্ত কণ্ঠে হরেকৃষ্ণ বললে, হ্যাঁ হে, বাবু। আমাদের একজন বাবু আছেন জান না, এই দোকানের যিনি মালিক?

রামকিঙ্কর জানে। কিন্তু সেই মালিক যে মাঝে মাঝে দোকান থেকে টাকা নিয়ে যাচ্ছেন এবং বাগানবাড়ীতে খরচ করছেন, তা জানে না। এটা নিশ্চয় সম্প্রতি আরম্ভ হয়েছে। এবং গিন্নীমাও জানেন কি না সন্দেহ।

তার চোখের সামনে বৌরাণীর ছবি। বাগান থেকে ফিরে এসে উন্মত্ত পশুটার অসহায়া স্ত্রীর ওপর বীরত্ব প্রকাশ। বৌরাণী আজকাল আর কাঁদেন না। তাঁর পিঠের ওপর চাবুকের পর চাবুক চলে, তিনি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে সহ্য করেন। এই দৃঢ়তার কারণ রামকিঙ্কর জানে না। অনুমানও করতে পারে না। শুধু তাঁর শেষ দিনের কথাটা তার মনে গাঁথা হয়ে গেছে: আমি আজ বৌরাণী, কাল গিন্নীমা হ'তে পারি।

রামকিঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় কোথায় যেতে হবে?

হরেকৃষ্ণ তার হাতে কতকগুলো বিল কভার দিয়ে বললে, যেখানে গেলে নিশ্চয় দু'হাজার টাকা পাওয়া যায়, এমন কতকগুলো জায়গায়। ওর মধ্যে থেকে বেছে নাও, কোথায় কোথায় যাবে। কিন্তু মনে রেখ, বাবু সন্ধ্যে সাতটার সময় আসবেন। যেখানেই যাও, তার আগে টাকা নিয়ে ফিরে আসতে হবে। স্নান ক'রে দুটো খেয়ে নিয়ে চটপট বেরিয়ে পড়।

বিশ্বনাথের সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয় নি। দু'জনেই পড়ায় ব্যস্ত ছিল। বিশ্বনাথ একদিন এসেছিল। কিন্তু অত বড় বাড়ী, দেউড়িতে তকমা-আঁটা বন্দুকধারী দারোয়ান, গলায় কার্তুজের মালা, এইসব দেখে-শুনে সে আর ভিতরে আসতে সাহস করে নি। রামকিঙ্কর একদিন ওর বাড়ী গিয়ে খবরটা শুনে খুব হেসেছিল।

বিশ্বনাথ কেমন পরীক্ষা দিলে খবরটা নেওয়া দরকার। দোকানের ছুটির পর একদিন সেখানে গেল। বিশ্বনাথ বাড়ী ছিল না। বসবার ঘরে সবিতা একটি ছোকরার কাছে পড়া করছিল। ওকে দেখে সে লাফিয়ে উঠল।

বললে, তুমি অনেকদিন পরে এলে, রামদা। পরীক্ষা কেমন হ'ল?

—হ'ল একরকম। দাদা কোথায়?

—দাদা বোধ হয় বাড়ী নেই। ভেতরে যাও, মা আছেন।

সুলোচনা রান্না করছিলেন। রামকিঙ্কর গিয়ে প্রণাম করতে প্রথমে চমকে উঠলেন। তারপর উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বললেন, রাম! অনেকদিন পরে এলি। পড়া নিয়ে ব্যস্ত ছিলি বোধ হয়। কেমন পরীক্ষা দিলি?

—হ'ল একরকম। রামকিঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, আপনাদের খবর সব ভাল? বিশু কোথায়?

সুলোচনা বললেন, ওঁর শরীরটা খুব ভাল যাচ্ছে না।

—কি হয়েছে?

—বয়স হ'লে যা হয়। রোগ একটা ত নয়।

রামকিঙ্কর আবার জিজ্ঞাসা করলে, বিশু নেই?

—সে কোথায় বেরুল। এখুনি ফিরবে। তুই ও-ঘরে বোস্। আমি হাতের রান্নাটা সেরেই যাচ্ছি। পালাস্ না যেন।

রামকিঙ্কর পাশের ঘরে গিয়ে বসল। তার পাশের র মাষ্টারমশাই সবিতাকে গ্রামার পড়াচ্ছিলেন।

সবিতাকে অনেকদিন পরে রামকিঙ্কর দেখলে। এই দিনে সে যেন অনেকখানি বড় হয়ে গেছে। তার খেরও যেন খানিকটা পরিবর্তন হয়েছে। সে আর সেই ছেলেমানুষটি নেই।

পৃথিবী রোজ রোজ কেমন করে বদলাচ্ছে! এই ত ন নিজে তার গ্রামের পথে-ঘাটে, গাছের ডালে ডালে খেলা রে বেড়াত। আর আজকে বি, এ পরীক্ষা দিলে। ার পরে আবার একদিন বুড়ো হবে। এবং হয়ত চন্দ্রনাথ-াবুর মত নানা রোগে ভুগবে। এ ত মানুষের কথা। ই পৃথিবীরই কি কম পরিবর্তন হচ্ছে! ছেলেবেলায় এর । চেহারা দেখেছিল, সে চেহারা কি আজ আছে? কত লে গেছে। তার গ্রাম? ছোটবেলায় যেমন দেখেছিল, খন তার থেকে কত বদলেছে। কলকাতা শহরেই ত ত্য নতুন নতুন রাস্তা হচ্ছে, নতুন নতুন বাড়ী, নতুন তুন ব্যবস্থা। অনেক জায়গা চিনতে পারা যায় না।

সবিতাও অনেক বদলেছে; রোজ দেখলে চোখে পড়ত না, অনেক দিন পরে দেখল বলেই চোখে পড়ল।

বই বগলে সবিতা এসে দাঁড়াল।

হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলে, মা'র সঙ্গে দেখা হয়েছে?

— হয়েছে। তোমার পড়া হয়ে গেল?

সবিতা হেসে বললে, হ্যাঁ, এবেলার মত। আবার ত্রে আছে। সকালে স্কুল। দুপুরে আবার পড়া। কি ঘেয়ে বল ত?

রামকিঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, তোমার বুঝি সকালে স্কুল?

—হ্যাঁ। একটাই স্কুল। সকালে আমরা পড়ি, দুপুরে লেরা। আমাদের ঐ মোড়ের মত অবস্থা! সকালে চটা তরকারিওয়ালা বসে, বিকেলে ফলওয়ালা।

সবিতা হাসতে লাগল।

রামকিঙ্কর অবাক্ হয়ে গেল। সবিতা চমৎকার কথা াতে শিখেছে ত!

বললে, এখনকার দুনিয়াতে কারও দু'মিনিট বিশ্রামের াসৎ নেই। তোমাদের স্কুলেরও না, ঐ মোড়টারও না।

সবিতা হেসে জিজ্ঞাসা করলে, এ কি ভাল?

রামকিঙ্করও হেসে জবাব দিলে, ভাল-মন্দর কথা নয়। ই এখনকার অবস্থা। অবকাশ ব'লে কোথাও আর কিছু কবে না—মানুষের জীবনেও না, মানুষের বাসভূমিতেও ! শহরের কথা ছেড়েই দাও, আমাদের গ্রামেও আগে খেছি, কত ফাঁকা জায়গা, এখন ক্রমেই কমে আসছে।

এমন সময় বিশ্বনাথ ফিরে এল: আরে, রামকিঙ্কর যে! কখন এলে? পরীক্ষা কেমন দিলে? কি আলোচনা হচ্ছিল তোমাদের?

সবিতার দিকে চেয়ে রামকিঙ্কর বললে, দেখলে ত? মানুষ নিজেও দম নেবে না, অন্যকেও দম নিতে দেবে না। তোমার দাদা এসেই কতগুলো প্রশ্ন করল, শুনলে ত?

অপ্রস্তুতভাবে বিশ্বনাথ বললে, কি হ'ল?

রামকিঙ্কর বললে, কিছুই নয়। কথা হচ্ছিল মানুষের জীবন নিয়ে এবং জীবনের চারিদিক ক্রমেই নীরেট হয়ে আসছে। একঘেয়ে। কোথাও অবকাশের চিহ্ন নেই।

বিশ্বনাথ বললে, সে ত পরের কথা হে। আমি ভাবছি পরীক্ষার ফলের কথা।

রামকিঙ্কর বললে, পরীক্ষা দিয়েই ফলের কথা ভাবতে আরম্ভ করেছ? তোমার মত ছেলেও ভাবে? আমি ত ও কথা ভাবছিই না। যা হবার হবে।

বিশ্বনাথ চিন্তিতমুখে বললে, অনার্সের জন্য একটু ভয় হচ্ছে হে। তোমার কি রকম হ'ল?

রামকিঙ্কর সহাস্যে বললে, আমাদের আর হওয়া-হওয়াই কি? আমাদের অনার্সও নেই, আমরা ভাল ছেলেও নই। কোন রকমে পাসকোর্সে ফেলা। পাস করলাম ভাল, না করলাম আর একবার দেখা যাবে।

বলেই বললে, আর একবার দেখা যাবে কি ক'রে তাও জানি না। গিন্নীমা প্রসন্ন ছিলেন বলেই এতদূর সম্ভব হ'ল, তা তিনিও চ'টে গেছেন।

বিশ্বনাথ চমকে উঠল, বল কি! তিনি চ'টে গেলেন কেন?

রামকিঙ্কর কপালে হাত ঠেকিয়ে বললে, অদৃষ্ট।

ব'লে হাসতে লাগল।

বিশ্বনাথ কিন্তু হাসল না। বললে, এটা ভাল খবর নয় হে। যে কারণেই তিনি চ'টে থাকুন, তাঁকে প্রসন্ন করার চেষ্টা কর।

রামকিঙ্কর হাসলেও এ নিয়ে ভেতরে ভেতরে তার একটা দুশ্চিন্তা রয়েছে। গিন্নীমার প্রসন্নতা অর্জন করার ইচ্ছেও আছে। কিন্তু তার ধারণা ব্যাপারটা তার হাতে নয়। ঘটনাস্রোত বয়ে চলেছে। এখনও খুব জোরে বয়ে না চললেও, বউরাণীর কথায় সন্দেহ হয়, অচিরেই হয়ত খর বেগে বইতে সুরু করবে। তখন সেই স্রোতে সে যে কোন্ পথে গিয়ে পৌছবে তা সে নিজেও জানে না।

বিশ্বনাথের কথার উত্তরে বললে, গিন্নীমা গভীর জলের মাছ। তাঁর প্রসন্নতা-অপ্রসন্নতা বাইরে থেকে টের পাওয়ার উপায় নেই। সুতরাং কি হবে জানি না। তবে বাঁচতে

গেলে তাঁর প্রসন্নতা হারালে আমার চলবে না, এ তুমি ঠিকই বলেছ। যাই হোক, বাবা এখন অফিস থেকে ফেরেন নি? তাঁর শরীর কেমন আছে?

বিশ্বনাথ বললে, বাবার শরীর কিছুদিন থেকেই ভাল যাচ্ছে না।

—কি হয়েছে?

—এ বয়েসে যা হয়, টুকিটাকি নানা রকম অসুখ। তার ওপর অফিসের খাটনি অত্যন্ত বেড়েছে। সাড়ে সাতটা-আটটার আগে কোন দিনই ফিরতে পারেন না। তুমি কি তাঁর সঙ্গে দেখা করে যাবে?

একটু চিন্তা করে রামকিঙ্কর বললে, অফিস থেকে খেটেখুটে ফিরবেন, এখন থাক। একটা ছুটির দিন সকালের দিকে বরং আসব। ইতিমধ্যে আমার চাকরির কথাটা একবার তাঁকে মনে করিয়ে দিও।

বিশ্বনাথ বললে, কেন, দোকানে কি তোমার সুবিধা হচ্ছে না?

— দোকানে একটা অসুবিধা ত বরাবর লেগেই আছে। গিন্নীমা খুসী ছিলেন ব'লে কোন রকমে কাজ করে যেতে পেরেছি। এখন ভয় হয়েছে। তাছাড়া কি জানো, দোকানে ভবিষ্যৎই বা কি? যদি কোন মতে বি.এ.-টা পাশ করতে পারি, বয়স থাকতে থাকতে একটা ভাল জায়গায় ঢুকে পড়া দরকার।

বিশ্বনাথ বললে, সে ত নিশ্চয়, বাবাকে আমি নিশ্চয় বলব। মাকেও একবার বলে রেখ।

রামকিঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, তুমি কি এম.এ. পড়বে? না চাকরি-বাকরির চেষ্টা করবে?

বিশ্বনাথ বললে, আমার ত এম.এ. পড়ার ইচ্ছে। কিন্তু বাবা-মা দু'জনেই সাহস পাচ্ছেন না। বাবার শরীরটা ভাল ন', তার ওপর তাঁর অবসর নেবার সময়ও ঘনিয়ে আসছে। তিনি বলছেন, তাঁর চাকরিটা থাকতে থাকতে আমাকে কোথাও একটা চাকরিতে ঢুকিয়ে দিতে পারলে তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন।

তা যদি হয়, রামকিঙ্কর মনে মনে বুঝলে, তা হ'লে তার চাকরি সম্বন্ধে চন্দ্রনাথবাবু নিশ্চয় চেষ্টা করতে পারবেন না।

বিশ্বনাথ ব'লে চলল, তার ওপর সবিতাও বড় হচ্ছে। মায়ের ইচ্ছা, বাবার প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকায় ওর বিয়েটা তিনি নিজে দিয়ে গেলেই ভাল হয়।

উপসংহারে বিশ্বনাথ হেসে বললে, দুনিয়া বড় গোলমেলে জায়গা হে। বয়েস যত বাড়ছে, মন থেকে আনন্দ তত ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছে।

রামকিঙ্কর বললে, মা ঠিকই বলেছেন, মেয়েদের বিয়েটা অল্প বয়সে দেওয়াই ভাল।

বিশ্বনাথ বললে, মা ত ঠিকই বলছেন, তুমিও ঠিকই বলছ। কিন্তু সবিতা ত বড় হচ্ছে। তার এখন বিয়েতে প্রবল আপত্তি।

—সবিতা কি বলছে?

—বলছে, বি. এ. পাস করার আগে আমার বিয়ে দেবার কেউ চেষ্টা করবে না।

—সবিতা নিজে বলছে?

— বলবে বৈকি ভাই। সেকালের ছোট মেয়ে ত নয়। ওর একটা ইচ্ছা-অনিচ্ছা থাকবে।

এ যুক্তি রামকিঙ্কর অস্বীকার করতে পারলে না। সে পাড়াগাঁয়ের ছেলে। বিয়ের কনে এ রকম কথা বলতে পারে তা তার কল্পনারও অতীত। সে-কথা ভাবতে ভাবতে সে দোকানে ফিরল।

দেশ থেকে কাকার একখানা চিঠি এসেছে। ওদের পাশের গ্রামে একটি মেয়ে আছে। মেয়েটি সুন্দরী এবং গৃহকর্মে নিপুণা, বয়সেও বেশ ডাগর। ওরা বলছে দশ-এগার বছরের সুতরাং বার ত নিশ্চয়ই হবে। বাপের একমাত্র সন্তান এবং বাপের অবস্থাও বেশ সম্পন্ন। জমি-জায়গা, গরু-বাছুর অনেকগুলি। সুতরাং পাত্রের অভাব নেই। কিন্তু মেয়ের বাপের ঝোঁক পড়েছে রামকিঙ্করের ওপর। কাকার ইচ্ছে রামকিঙ্করের বিবাহে সম্মত হওয়া।

বিয়ে ব্যাপারটা সাধারণতঃ খুব গোপনীয়। ভাংচি দেবার লোকের অভাব নেই। সুতরাং শিবকিঙ্কর চিঠিখানি বুদ্ধি করে খামেই দিয়েছে। খামের পিছনে ৭৪॥ দেওয়া, পাছে কেউ দেখে এবং পড়ে।

রামকিঙ্কর চিঠিখানি প'ড়ে শার্টের বুক-পকেটে রেখে দিলে।

কি আশ্চর্য পার্থক্য!

সবিতার বয়স ষোল-সতের হবে। বলছে, বি, এ, পাস না করে, অর্থাৎ কুড়ি-একুশের আগে বিয়ে করবে না। মায়ের বিয়ে দেবার যে ঝোঁক সেটা বয়সের জন্য নয়, কর্তা থাকতে থাকতে তার প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকায় স্বচ্ছল ভাবে বিয়ে দেবার জন্য। কর্তার শরীর ভাল নয়। তাঁর অবর্তমানে বিশ্বনাথের পক্ষে একটি সুপাত্র দেখে বোনের বিয়ে দেওয়া সম্ভব নাও হ'তে পারে। নইলে সবিতার বয়স ষোলই হোক আর ছাব্বিশই হোক কিছুই যায়-আসে না।

এই কলকাতার অবস্থা! আর গ্রামে দশ-এগার

বছরের মেয়ে ডাগর মেয়ে। বাপ-মা তার বিয়ের ভাবনায় আকুল।

রামকিঙ্কর হাসলে। সবিতার বিবাহে অনিচ্ছার জন্যও হাসলে, কাকার পত্রে বর্ণিত ডাগর মেয়েটির জন্যেও। গ্রাম থেকে সে স'রে এসেছে। কিন্তু শহরের হাওয়া এখনও ঠিক ধাতস্থ হয় নি। দুটোই তার বাড়াবাড়ি মনে হয়। সবিতা নিতান্ত কচি মেয়ে নয়। বিবাহে আপত্তি করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। পক্ষান্তরে গ্রামের মেয়েটি নিতান্ত কচি, তার এখন বিবাহ দেওয়ার কোন মানেই হয় না।

শুয়ে শুয়ে রামকিঙ্কর উসখুস করতে লাগল। কিছুতেই ঘুম আসে না।

সবিতার মুখখানা বারে বারে মুদ্রিত চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। ক'মাস পরে দেখলে তাকে? দু'-তিন মাসের বেশি হবে কি? কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই তার দেহের এবং ব্যবহারে কি প্রকাণ্ড পরিবর্তন হয়েছে! মুখখানি বেশ ভরন্ত হয়েছে, ঘন পল্লব ভারাতুর চোখ কি শান্ত এবং সঙ্কোচ-মাখা!

এক সময় ঘুম ভাঙতে সুবল বুঝতে পারলে রামকিঙ্কর ঘুমোয় নি।

জিজ্ঞাসা করলে, কি হে, ঘুম আসছে না?

রামকিঙ্কর বললে, না ভাই।

—তাই আসে কখনও। ক'টা দিন কোথায় শুয়ে কাটিয়েছ। আর আজ দোকানের এই ছোট কুঠুরিতে শুয়ে তেলের গন্ধে ঘুম আসে কখনও? তা কি করবে বল, এইটাই আমাদের পাকা আস্তানা। এইখানেই শুতেও হবে, ঘুমুতেও হবে। প্রথম দু'-এক দিন একটু কষ্ট হবে, ঘুম আসতে চাইবে না, তারপরেই ঠিক ঘুম এসে যাবে।

ব'লে একটা বিড়ি ধরালে।

রামকিঙ্কর অপ্রস্তুত ভাবে হেসে বললে, তা নয় হে। এই ঘরেই ত এত বছর কাটল, দু'দিন বাইরে থেকে ফিরে ঘুম আসবে না কেন?

সুবল জিজ্ঞাসা করলে, তবে ঘুম আসছে না কেন?

—বাড়ী থেকে একটা চিঠি এসেছে।

—কার?

—কাকার।

—তাতে কিছু খারাপ খবর আছে?

রামকিঙ্কর বললে, খারাপও বলতে পার, খারাপ নয়ও বলতে পার।

—সেটা কি রকম?

—কাকা একটি বিয়ের সম্বন্ধ করে পাঠিয়েছে।

উৎসাহে সুবল লাফিয়ে উঠল, বল কি হে! এত জবর সুখবর! মেয়েটি কোথাকার?

রামকিঙ্কর কাকার চিঠির বিবরণ মোটামুটি বললে।

শুনে সুবল বললে, এ ত ভাল পাত্রী। লাগিয়ে দাও, আমরা দু'দিন আনন্দ করে আসি।

রামকিঙ্কর বললে, ভাবছি।

—ভাবছ? এতে ভাববার কি আছে? এর চেয়ে ভাল মেয়ে তুমি পাবে কোথায়?

রামকিঙ্কর মনে মনে হাসলে, অন্ধকারে সে হাসি সুবল দেখতে পেলে না। কলকাতার বন্ধু-সমাজের কল্যাণে মেয়েদের সম্বন্ধে তার রুচির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু সে কথা সুবলকে বলা যায় না। সুবল কলকাতা সহরে থাকে বটে কিন্তু তার দিন-রাত্রি কাটে এই দোকান-ঘরে। তেলের পিপে গড়াচ্ছে আর তেল ঢালছে। সহরের সঙ্গে তার যথার্থ পরিচয় ঘটে নি।

সুবলের চোখে তখনও ঘুম ছিল। উপর্যুপরি ক'টা টানে বিড়িটা শেষ ক'রে বললে, আর ভেব না হে, লাগিয়ে দাও।

ব'লে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। [ক্রমশঃ

—

বিদ্যা আদায়

কবি শ্রীমধুসূদন তাঁর সঙ্গে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের পরিচয় করিয়ে দিলেন এই বলে,—ইনি আমাদের লাইনের লোক।

মাইকেল তখন বিলাত-প্রত্যাগত ব্যারিষ্টার, আইন-ব্যবসায় আরম্ভ করেছেন। দীনবন্ধু তাই নব-পরিচিতের সম্পর্কে মাইকেলকে জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কি Lawyer?

মধুসূদন বললেন, না হে, না। ইনি নাট্যশাস্ত্রবিদ্। আমাদেরই লাইন ত!···

'ইনি' এবং 'নাট্যশাস্ত্রবিদ' ব'লে তিনি যাঁর পরিচয় করালেন দীনবন্ধুর সঙ্গে, তিনি কিন্তু কোন নাট্য-প্রবীণ ব্যক্তি নন। এমন গুণীর মর্যাদা যাঁকে মাইকেল দিলেন, তিনি অতি তরুণ এবং মাত্র একটি ভূমিকা অভিনয় ক'রে কুশলী, সৌখীন অভিনেতা রূপে পরিচিত হয়েছেন। নাম—কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়। পরবর্তী কালের সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য, কিন্তু তখন তাঁর খ্যাতির কারণ—মাইকেল মধুসূদনের প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা'র 'নায়িকা'র ভূমিকায় অভিনয়।

সুকান্ত, সুকণ্ঠ, প্রতিভাদীপ্ত কৃষ্ণধন। পাদ-প্রদীপের সামনে প্রথম শর্মিষ্ঠা-রূপে দর্শকবৃন্দকে চমৎকৃত করেছিলেন। আর সে দর্শকদের মধ্যে ছিলেন কারা? ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মাইকেল মধুসূদন, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, গৌরদাস বসাক, প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি তৎকালীন কলকাতার মান্যগণ্য শিক্ষিত ও অভিজাত ব্যক্তিবর্গ। আর সে অভিনয় হয়েছিল কোথায়? সেকালের শ্রেষ্ঠ সৌখীন রঙ্গমঞ্চ বেলগাছিয়া থিয়েটারে। অভিনয়ে, গীতবাদ্যে, দৃশ্যপটে, সাজ-সজ্জায়, প্রয়োগ-নৈপুণ্যে যা বাংলার মঞ্চশিল্পে যুগান্তর এনেছিল। যার অধিকাংশ অভিনেতা ছিলেন ইংরেজী-শিক্ষিত, যাঁদের মধ্যমণি ছিলেন প্রতিভাধর কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। তা ছাড়া, আধুনিক ভারতের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আরও কত দিকে এই থিয়েটার স্মরণীয় অবদান রেখে যায়। এখানেই প্রথম ভারতীয় ঐকতান গঠন ক'রে শুনিয়েছিলেন আচার্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী। সেই বাদকদের জন্যে এখানে প্রথম স্বরলিপিও রচনা করেছিলেন তিনি। (যা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল দশ বছর পরে, ১৮৬৮ খ্রীঃ 'ঐকতানিক স্বরলিপি' নামে)। এই থিয়েটারেই নাট্যকার করেছিল কবি শ্রীমধুসূদনকে। এখানকার প্রথম নাটক (১৮৫৮ খ্রীঃ) 'রত্নাবলী'র তিনি ইংরেজী অনুবাদ ক'রে দেন। থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের অনুরোধে, উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজকর্মচারীদের অভিনয় অনুসরণ করবার সুবিধার জন্যে। এই নাটক অনুবাদ-কর্মের ফলেই মাইকেলের নাটক রচনার ভাব ও ইচ্ছা মনে জাগে। তারপর রচনা করেন এখানে অভিনয়ের জন্যেই 'শর্মিষ্ঠা' নাটক (১৮৫৯ খ্রীঃ)।

সেই 'শর্মিষ্ঠা'-র নাম-ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়। হিন্দু কলেজের মেধাবী ছাত্র, ১৩।১৪ বছর বয়সী, সুকুমার-কান্তি, সুললিত কণ্ঠের অধিকারী। অভিনয় তাঁর কেমন হ'ল সেকথা স্বয়ং নাট্যকার তাঁর সুহৃদ রাজনারায়ণ বসুকে চিঠি লিখে জানালেন—When Sharmistha was acted at Belgatchia the impression it created was simply indescribable. Even the least romantic spectator was charmed by the character Sharmistha and shed tears with her. As for my own feelings, they were "things to dream of, 'not to tell"···

অথচ সেই কিশোর কৃষ্ণধনের প্রথম অভিনয়। তার

আগে কোন থিয়েটারের সঙ্গে তাঁর কোন সংস্রব ছিল না। দেশে থিয়েটারই বা ক'টি! কৃষ্ণধনের থিয়েটারের সখের কথা তার আগেও কখনও জানা যায় নি। ঘটনাচক্রে তিনি হয়ে ওঠেন এই নাটকের অভিনেতা।

সখ ছিল তাঁর কুস্তী লড়বার। তাঁর হোগলকুড়িয়ার (উত্তর কলকাতার ভীম ঘোষ লেন) বাড়ীর কাছে তখন মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীটের বিখ্যাত গুহ পরিবারের কুস্তির আখড়া। গুহ বংশের সৌখীন পালোয়ান অম্বিকাচরণ (অম্বুবাবু) সেই আখড়ার পত্তন করেছিলেন তার কয়েক বছর আগে। সেখানে নিয়মিত কুস্তি লড়'তে গিয়ে কৃষ্ণধনের সঙ্গে গুহ পরিবারের তারাচরণ বাবুর পরিচয় ঘটে। তারাচরণ গুহ যেমন কুস্তিগীর, তেমনি ছিলেন সঙ্গীতপ্রেমী, অভিনয়-কুশলী এবং মজলিসী ব্যক্তি। ওই বেলগাছিয়া থিয়েটারের তিনিও একজন অভিনেতা এবং প্রতাপচন্দ্র-ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের বন্ধু। তিনি কুস্তির আখড়ায় বেলগাছিয়া থিয়েটারের মহলা, অভিনয়, যন্ত্রসঙ্গীত এই সব বিষয়ের নানা গল্প বলতেন কৃষ্ণধনের কাছে। তাঁর মুখে সে-সব কথা শুনতে শুনতে সেখানকার থিয়েটার দেখবার কৃষ্ণধনের প্রবল ইচ্ছা জাগে।

কিন্তু বেলগাছিয়া থিয়েটারের প্রবেশপত্র পাওয়া অতি কঠিন। বিশেষ খ্যাতিমান্ কিংবা অভিজাত ব্যক্তি ভিন্ন কারুর পক্ষে সে থিয়েটারে প্রবেশ করা সম্ভব হ'ত না। তাই দর্শকরূপে সেখানে উপস্থিত হ'তে অনেক বার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন কৃষ্ণধন। কারণ তিনি ছিলেন দরিদ্রের সন্তান।

শেষ পর্যন্ত তিনি স্থির করেন, সেখানকার নাট্য দলে যোগ দেবেন, তা হ'লে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। কিন্তু সে সংকল্প কাজে পরিণত করাও প্রায় অসম্ভব। তবে তিনি হাল ছাড়লেন না এবং তারাচরণ বাবুর মধ্যস্থতায় তাঁর চেষ্টাও বন্ধ রইল না।

কিছুদিন পরে একটি সুযোগ এল। তখন দ্বিতীয় নাটক শর্মিষ্ঠা মঞ্চস্থ করবার ব্যবস্থা হচ্ছে বেলগাছিয়া থিয়েটারে। নাটকের নাম-ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্যে একজন অল্প-বয়সী অভিনেতার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। (বলা বাহুল্য, তখনকার সমস্ত সৌখীন রঙ্গালয়েই স্ত্রীভূমিকা অভিনয় করতেন অভিনেতারা। পেশাদার অভিনেত্রীরা প্রথম স্ত্রীভূমিকায় অবতীর্ণ হন বেঙ্গল থিয়েটারে, মাইকেল মধুসূদনেরই পরামর্শে—সে থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী ছিলেন শরৎচন্দ্র ঘোষ, ধনকুবের রামদুলাল সরকারের দৌহিত্র)।

এবার কৃষ্ণধন বেলগাছিয়া থিয়েটারে প্রবেশ করতে সক্ষম হলেন নিজের প্রতিভায়, অভিনেতারূপে।

কিন্তু এহ বাহ্য। তাঁর অভিনেতার জীবন বেশি দিন স্থায়ী হয় নি। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের অকালমৃত্যুতে (১৮৬১ খ্রীঃ) বেলগাছিয়া থিয়েটারেরও আয়ু ফুরিয়ে যায়। তার ক'বছর পরে কৃষ্ণধন আর একবার পাদ-প্রদীপের সামনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়ীর থিয়েটারে। তখন তাঁর বয়স ১৯।২০ বছর। সেই শেষ অভিনয়। কারণ তাঁর প্রকৃত পরিচয় হ'ল তাঁর সঙ্গীত-জীবন, যার সূত্রপাতও হয়েছিল ওই বেলগাছিয়া থিয়েটারে। ওখানেই তিনি ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর সঙ্গে পরিচিত হন ও তাঁর কাছে প্রথম সঙ্গীত-শিক্ষা আরম্ভ করেন। গোস্বামী মহাশয়ের শিক্ষা কয়েক বছর পাবার পর তিনি অন্যান্য কলাবতের কাছেও শিখেছিলেন—যেমন পাথুরিয়াঘাটার ধ্রুপদী-বীণ্‌কার হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোয়ালিয়রের সেতারী আহম্মদ খাঁ প্রভৃতি। কণ্ঠসঙ্গীতের সঙ্গে সেতার, পিয়ানো ইত্যাদি যন্ত্রসঙ্গীতেরও তিনি চর্চা করেছিলেন। পিয়ানো শিক্ষা করেন জনৈক ইউরোপীয় শিক্ষকের কাছে। ইউরোপীয় সঙ্গীততত্ত্বে তাঁর অভিজ্ঞতার পরিচয় তাঁর গ্রন্থাবলীর রেখামাত্রার স্বরলিপি রচনায় বিধৃত আছে। তা ছাড়া, তাঁর সুনাম ছিল ভাল পিয়ানো-বাদক বলে।

ক্ষুরধার-বুদ্ধি কৃষ্ণধন তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন সঙ্গীতক্ষেত্রে। মাত্র ২১ বছর বয়সে নিজের লেখা স্বরলিপির বই 'বঙ্গৈকতান' (১৮৬৭ খ্রীঃ) প্রকাশ করেন। শুধু বাংলায় নয়, ভারতবর্ষের মধ্যে এইটিই প্রথম প্রকাশিত স্বরলিপি পুস্তক। (ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ১৮৫৮ খ্রীঃ বেলগাছিয়া থিয়েটারে ঐকতান বাদনের বাদকদের জন্যে যে-সব স্বরলিপি রচনা করেছিলেন, তা তখন পুস্তকাকারে প্রকাশ হয় নি, হয়েছিল কৃষ্ণধনের 'বঙ্গৈকতান' প্রকাশের এক বছর পরে)।

শুধু প্রথম স্বরলিপি পুস্তক নয়, ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে কৃষ্ণধন-রচিত এই স্বরলিপির পদ্ধতিও অভিনব। ইউরোপীয় সঙ্গীতের রেখামাত্রার স্বরলিপি প্রণালী কৃষ্ণধন ভারতীয়

সঙ্গীতে প্রথম প্রয়োগ করেছিলেন। রাগসঙ্গীতে প্রথম harmony রচনার কৃতিত্বও তাঁর।

কৃষ্ণধনের রেখামাত্রার স্বরলিপি প্রচলনের চেষ্টা এদেশে সফল হয় নি। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী যে অঙ্কমাত্রার স্বরলিপি প্রবর্তন করেন এবং শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর যার ব্যাপক প্রচার করেন সেই লিপি চলিত হয়। কিন্তু কৃষ্ণধনের পক্ষে তাতে অগৌরবের কথা কিছু নেই। তাঁর নতুন প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় তাঁর সঙ্গীত-প্রতিভা, তাঁর স্বাধীন সঙ্গীত-চিন্তা।

দারিদ্র্য এবং বিরুদ্ধ পরিবেশের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম ক'রে কৃষ্ণধনকে সঙ্গীতশিক্ষায় অগ্রসর হ'তে হয়েছিল। প্রতিভাধর তিনি সেই অবস্থার মধ্যে প্রবেশিকা পরীক্ষায় স্কলারশিপ লাভ ক'রে কলেজের শিক্ষা পান ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। তার পর সেকালের বাঙ্গালীর সেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পরম আকাঙ্ক্ষিত পদ সঙ্গীতচর্চায় আত্মনিয়োগ করবার জন্যে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করেন—তাঁর সে-সব বিস্তৃত জীবনকথা এখানে বলবার অবকাশ নেই। সঙ্গীততত্ত্ব বিষয়ে রচিত তাঁর বহুমূল্য গ্রন্থ 'গীতসূত্রসার'-এর নাম উল্লেখ ক'রে তার প্রথম জীবনের কথায় ফিরে আসা যাক। কারণ আলোচ্য ঘটনাটি তাঁর সঙ্গীতশিক্ষার প্রথম যুগের কথা।

সঙ্গীত শিক্ষার প্রথম থেকেই কৃষ্ণধনের শিক্ষা করবার অদম্য আগ্রহ দেখা যায়। যেমন তাঁর অধ্যবসায়, তেমনি অপরিসীম গ্রহণ করবার ক্ষমতা। তীক্ষ্ণবুদ্ধি কৃষ্ণধন সহজাত সঙ্গীত-প্রতিভায় অতি ত্বরিৎ শিক্ষণীয় বিষয় আয়ত্ত করে নিতেন। নচেৎ সঙ্গীত শিক্ষা একেবারেই সম্ভব হ'ত না তাঁর পক্ষে। কারণ গুরুর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রাণ-ঢালা শিক্ষা তিনি পান নি। তাঁর প্রথম সঙ্গীতগুরু ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর সঙ্গে পরে স্বরলিপি-প্রণালী ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কৃষ্ণধনের যে গুরুতর মতবিরোধ ও মনান্তর ঘটেছিল, হয়ত তার সূত্রপাত হয় তার অনেক পূর্বে, তাঁর কাছে সঙ্গীত-শিক্ষার সময় থেকেই। যে কোন কারণেই হোক, কৃষ্ণধন গুরুর তেমন প্রিয়পাত্র ছিলেন না। গোস্বামী মহাশয়ের অতি প্রিয় শিষ্য ছিলেন শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। শৌরীন্দ্রমোহনের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্বের সঙ্গে কুরুকুলের অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের অর্জুনের প্রতি মনোভাবের হয়ত উপমা দেওয়া যায়। সে যা হোক, শৌরীন্দ্রমোহনকে ক্ষেত্রমোহন নিজের অর্জিত বিদ্যা অকাতরে দান করতেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে শৌরীন্দ্রমোহনের তুল্য আর কেউ না হ'তে পারেন, এ ইচ্ছাও সম্ভবত ছিল গোস্বামী মহাশয়ের মনে।

সে জন্যে গুরু হয়ত কৃষ্ণধনকে শৌরীন্দ্রমোহনের সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী মনে ক'রে প্রথম জনের ওপর ঈষৎ বিরূপতার ভাব পোষণ করতেন। তার ওপর, কৃষ্ণধনের শিখে নেবার, মনে রাখবার ও আত্মসাৎ করবার অসাধারণ ক্ষমতাও লক্ষ্য করেছিলেন তিনি। অন্য কেউ শিক্ষা করবার সময়, কিংবা কেউ গাইবার বা বাজাবার সময় কৃষ্ণধন তা মনের পটে মুদ্রিত ক'রে নিতেন। তাই কোন কোন সময় ক্ষেত্রমোহন এড়াবার চেষ্টা করতেন তাঁকে। বিশেষ শৌরীন্দ্রমোহনকে শিক্ষা দেবার সময়ে। কৃষ্ণধন যেন সর্বদা বিদ্যা আদায় ক'রে নিতে না পারেন!

সেই সময়কার একদিনের ঘটনা। যখন শৌরীন্দ্রমোহন ও কৃষ্ণধন দুজনেই উদীয়মান সঙ্গীতপ্রতিভা এবং তাঁদের যুগপৎ গুরুরূপে বিরাজমান ক্ষেত্রমোহন।

স্থান—৬৫, পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট। শৌরীন্দ্রমোহনের পৈত্রিক প্রাসাদ, সঙ্গীতচর্চার এক স্মরণীয় পীঠস্থান। সেখানকার সঙ্গীতসভায় সমগ্র ভারতবর্ষের কত শ্রেষ্ঠ কলাবত তাঁদের গুণপনা দেখিয়ে ধন্য ক'রে গেছেন। ভারতবর্ষের প্রথম সর্বভারতীয় সঙ্গীত-সম্মেলন হয় যে ঐতিহাসিক ভবনে। শৌরীন্দ্রমোহনের সমগ্র সঙ্গীতজীবনের সাক্ষী এবং ভারতীয় সঙ্গীতের পুনরুদ্ধারে তাঁর চিরস্মরণীয় অবদানের সমস্ত কার্যাবলীর ঘটনাস্থল। সঙ্গীত-সরস্বতীর যে তীর্থস্থান এখন বণিকের তুলাদণ্ড মস্তকে ধারণ ক'রে কুশ্রী পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে—তার তখন সেই সমৃদ্ধ যুগ।

সেখানকার সদর মহলের দোতলার একটি কক্ষ। বাইরের কোন ওস্তাদের সে-সময় সেখানে আসর বসে নি। নিরিবিলি বিকালবেলা সঙ্গীতচর্চা করছিলেন শৌরীন্দ্রমোহন এবং গোস্বামী মহাশয়। প্রিয় শিষ্যকে তখন তিনি মূল্যবান্ কিছু শেখাচ্ছিলেন।

এমন সময় সেখানে হঠাৎ উপস্থিত হলেন কৃষ্ণধন। গুরুভাই শৌরীন্দ্রমোহনের কাছে এমন তিনি মাঝে মাঝে আসতেন, সঙ্গীতের আলাপ-আলোচনা কিংবা চর্চা ক'রে

খাতেন। কিন্তু তাঁর উপস্থিতিতে শৌরীন্দ্রমোহনকে শেখাতেন না ক্ষেত্রমোহন। কৃষ্ণধনও জেনেশুনে সে-সব সময় আসতেন না।

সেদিনও তিনি গুরুর শিক্ষাদানের কথা না জেনে উপস্থিত হয়ে পড়েন সেখানে। অবাঞ্ছিত অতিথি!

তাঁকে দেখবামাত্র ক্ষেত্রমোহন শৌরীন্দ্রমোহনকে ব'লে উঠলেন, সব বন্ধ কর। এখনই সব আদায় ক'রে নেবে!

গোস্বামী মহাশয় কথাটি যেভাবেই বলুন, কৃষ্ণধনের সঙ্গীত-বিদ্যা অর্জনের শক্তির এমন প্রশংসা আর কি হ'তে পারে?

এক দিনের, না এক মাসের, না এক বছরের ভৈরবী?

এই প্রশ্নটি করেছিলেন মহম্মদ খাঁ। গত শতকের বিখ্যাত সেতার-সুরবাহার গুণী মহম্মদ খাঁ। লক্ষ্ণৌ-এর গোলাম মহম্মদের ঘরের কৃতী শিষ্য তিনি, বাংলা দেশে অনেক বছর বাস ক'রে এখানকার সঙ্গীতসমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। তাঁর নাম রাখবার মতন শিষ্যও ছিলেন বাঙ্গালী। এবং তাঁর মৃত্যুও হয় এখানে, বিশ শতকের গোড়ার দিকে।

যে ঘরের তালিম মহম্মদ খাঁ পেয়েছিলেন, ভারতবর্ষে সেতার-সুরবাহারের সেটি এক বড় ঘরাণা ছিল। বহু শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত এই সঙ্গীত-পরিবার লক্ষ্ণৌ অঞ্চলে প্রথম গঠিত হ'লেও শেষে বিস্তার লাভ করে বেশি বাংলা দেশে। পশ্চিমে তার একটি ধারা অবশ্য থেকে যায়। কিন্তু বাংলায় একাধিক ধারা বিস্তৃত হয় বিচিত্রভাবে এবং মহম্মদ খাঁর পরের কয়েক পর্যায় ধরে তার অস্তিত্ব থাকে বিভিন্ন বাঙ্গালী গুণীর সাধনায়। এমন কি আজও বাংলা দেশে তার কোন কোন ধারা লুপ্ত হয় নি।

এই সঙ্গীত পরিবারের (ভাষান্তরে ঘরাণার) নানা সূত্র ধ'রে প্রথম প্রতিষ্ঠার যুগ অনুসন্ধান করতে গেলে উপস্থিত হ'তে হয় সওয়া শ' বছর আগে. লক্ষ্ণৌ নগরে। পরিবারটির গদিতে তখন মহাগুণী বীণ্‌কার ওমরাও খাঁকে সেখানে দেখা যায়। সে হ'ল লক্ষ্ণৌর শেষ নবাব ওয়াজিদ আলী শা'র পিতা আমজাদ আলী শা'র আমল। ওমরাও খাঁ ছিলেন আমজাদ আলী শা'র দরবারের সম্মানিত বীণ্‌কার।

ওমরাও খাঁ তানসেনের কন্যা-বংশের বীণ্‌কারদের মধ্যে একজন প্রখ্যাত পুরুষ। তিনি সেই বংশীয় ছোট নৌবাৎ খাঁর পুত্র এবং স্বনামখ্যাত নির্মল শা'র ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা। নির্মল শা'র পুত্র না থাকায় তাঁর সমগ্র সঙ্গীত-সম্পদ্ ভ্রাতুষ্পুত্র-জামাতা ওমরাও খাঁ লাভ করেছিলেন। তাঁর দুই সুযোগ্য পুত্র আমীর খাঁ (বাহাদুর সেনের সহযোগে রামপুর ঘরাণার প্রতিষ্ঠাতা) ও রাহম খাঁও ছিলেন কৃতী বীণ্‌কার। পিতার কাছেই তাঁরা বীণার শিক্ষা পেয়েছিলেন।

ওমরাও খাঁ কিন্তু সুরবাহার-সেতারে তালিম দেন অন্য দুই শিষ্যকে। ওমরাও খাঁর এই সুরবাহার সেতার শিক্ষাদান থেকেই আমাদের আলোচ্য পরিবারটির উৎপত্তি। সুরবাহার যন্ত্রে তাঁর প্রধান শিষ্য ছিলেন গোলাম মহম্মদ। সুরবাহারের অস্তিত্ব নাকি তার আগে ছিল না। সেতার-যন্ত্রের এই বৃহত্তর সংস্করণ তৈরি হয় ওমরাও খাঁর নির্দেশ, গোলাম মহম্মদের জন্যে। এই বৃহৎ আকারের সেতারের নামকরণ করা হয় সুরবাহার। এটি গৎ বাজাবার যন্ত্র নয়, শুধু আলাপচারির উপযুক্ত এবং ওমরাও খাঁ গোলাম মহম্মদকে সুরবাহারে আলাপ-পদ্ধতি শিক্ষা দেন।

গোলাম মহম্মদের আরও কথা জানাবার আগে ওমরাও খাঁর আর এক শিষ্যের কথা উল্লেখ করবার আছে। তাঁর নাম কুতুব-উদ্দৌল্লা। তানসেনের পুত্রবংশীয় গুণী প্যার খাঁ (ছজু খাঁর পুত্র এবং জাফর খাঁর দ্বিতীয় ভ্রাতা) ছিলেন কুতুব্‌উদ্দৌল্লার প্রধান ওস্তাদ। কিন্তু ওমরাও খাঁর শিক্ষাও কুতুব্ পেয়েছিলেন। তিনি অতি গুণী সেতারী রূপে সুপরিচিত হন এবং ওয়াজিদ আলী শা লক্ষ্ণৌতে নবাব থাকবার সময় তাঁর দরবারে নিযুক্ত থাকেন। নবাব ওয়াজিদ আলী তাঁর কাছে প্রথম জীবনে সেতার শিক্ষাও করেছিলেন এবং একজন সভাসদরূপে সম্মানিত করেন তাঁর এই সেতারের ওস্তাদকে। নবাব মেটিয়াবুরুজ নির্বাসিত জীবনযাপন করবার সময়ে কুতুব্‌উদ্দৌল্লার নাম আর বিশেষ পাওয়া যায় না। তিনি সম্ভবত পশ্চিমাঞ্চলেই থেকে যান, কলকাতায় আসেন নি।

তিনি যেমন সেতারে, ওমরাও খাঁর অন্য শিষ্য গোলাম মহম্মদ তেমনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন সুরবাহারে কুশলী কলাকাররূপে। গোলাম মহম্মদকে ওমরাও খাঁ তালিম

দেবার সময় যে সুরবাহার যন্ত্রের উৎপত্তি, পরে গোলাম মহম্মদের সুর-সাধনার ফলে তার প্রচলন হয়। তিনি সেতারও বিশেষ ভাল বাজাতেন (সে তালিমও তাঁর ওস্তাদ ওমরাও খাঁর কাছে পাওয়া), বীণাবাদনেও নিপুণ ছিলেন, কিন্তু সুরবাহারী বলেই তাঁর নাম ছিল সবচেয়ে বেশি।

লক্ষ্ণৌতে তিনি অনেক সময় বাস করলেও তাঁর বাড়ী ছিল বান্দায়। একনিষ্ঠ সঙ্গীত-চর্চার আগ্রহ আর গুরুকে একান্ত শ্রদ্ধা-ভক্তির জন্যে ওমরাও খাঁর তিনি বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়েছিলেন। শোনা যায়, গোলাম মহম্মদের নাম আসলে গোলাম ছিল না. ওই শব্দটি তিনি নামের সঙ্গে যোগ ক'রে নেন ওস্তাদের কাছে নিজেকে 'দাস' বলে নিবেদিত করবার জন্যে। তিনি ওস্তাদ ওমরাও খাঁর 'গোলাম' ব'লে নিজেকে পরিচিত করতেন গুরুর কাছে—তাই গোলাম মহম্মদ নাম নেন।

তঁদের সমসাময়িক একজন উর্দু লেখকের (লক্ষ্ণৌর হকিম মহম্মদ করম ইমাম—'মাদনুল মুসিকী' গ্রন্থপ্রণেতা) মতে, গোলাম মহম্মদ তাঁর বাজনায় যে ধরণের ঠোক' ব্যবহার করেন তা' তিনি (করম ইমাম) এক ওমরাও খাঁ ছাড়া আর কারুর বাজনায় শোনেন নি। ১৮০৭-এর কিছু আগে গোলাম মহম্মদের মৃত্যু হয় বলারামপুরে।

তিনি কোনদিন বাংলা দেশে আসেন নি। কিন্তু তাঁর [পু]ত্র ও শিষ্যধারার একাধিক ব্যক্তি বহু বছর বাংলায় বাস [ক]রেছিলেন এবং তাঁদের নিয়েই এই অধ্যায়। এই রকমের [এ]কটি শাখা-প্রশাখায় ওমরাও খাঁ তথা গোলাম মহম্মদের [সঙ্গী]তধারা বাংলা দেশে বিস্তার লাভ করে।

গোলাম মহম্মদের সঙ্গীত-সম্পদের শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী [ছি]লেন তাঁর পুত্র—স্বনামধন্য সাজ্জাদ মহম্মদ। তিনি ছাড়া [তাঁ]র পিতার (গোলাম মহম্মদের) আরও কয়েকজন [শিষ্]য ছিলেন—নবী বক্স, মহম্মদ খাঁর পিতা প্রভৃতি। [মহম্]মদ খাঁর পিতা (নাম জানা যায় নি) গোলাম মহম্মদের [উ]মেদ্গার থেকে পরে তাঁর শিষ্য হয়েছিলেন। তিনি [সাজ্]জাদ মহম্মদের প্রায় সমবয়সী। পুত্র মহম্মদ খাঁ তাঁর [কা]ছ যেমন তালিম পেয়েছিলেন, তেমনি সাজ্জাদ মহম্মদের [কা]ছও অনেক লাভ করেন, বিশেষ সাজ্জাদ মহম্মদের শেষ [বয়]স।

প্রথমে সাজ্জাদ মহম্মদের মাধ্যমে এই ধারা বাংলা দেশে এসে পৌঁছয়। তিনি পরিণত বয়সে বাংলায় বসবাস আর[ম্ভ] করেন এবং শেষ ক'বছরের সঙ্গীত-জীবন অতিবাহি[ত] করবার পর তাঁর মৃত্যুও হয় এখানে। বাংলার অন্য কয়েক[টি] সঙ্গীতাসরে তিনি মাঝে মাঝে যোগ দিলেও, একাদিক্রমে বহুদিন এবং জীবনের শেষ ক'বছর তিনি রাজ[া] শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গীত-দরবারে নিযুক্ত ছিলেন। শেষ জীবনে একমাত্র পুত্রের মৃত্যুশোকে অন্ধ হয়ে যা[ন] সাজ্জাদ মহম্মদ। তারও আগে থেকে এবং মৃত্যু পর্যন্ত মহম্মদ খাঁ তাঁর সঙ্গে থাকেন, সেবাযত্ন করেন, তালিম নেন।

তা ছাড়া, বাংলা দেশে আরও একাধিক শিষ্য তৈরি ছিলেন সাজ্জাদ মহম্মদের। শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রধানত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীরও পরে কিছুকাল বীণ্‌কার লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্রের শিষ্য হ'লেও সাজ্জাদ মহম্মদের কাছে সেতার শিক্ষা করেছিলেন। সাজ্জাদ মহম্মদ তাঁর আশ্রয়েই বাস করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বৃত্তি ভোগ করেন।

সাজ্জাদ মহম্মদের আর একজন বাঙ্গালী শিষ্যের নাম করা উচিত। তিনি সে-যুগের বাংলার এক বিচিত্র সঙ্গীত-প্রতিভ—বামাচরণ ভট্টাচার্য। বিচিত্রতর তাঁর শিক্ষার প্রসঙ্গ। তিনি ধনীর সন্তান ছিলেন না, কিন্তু সেকালের ভারতবর্ষের এমন ক'জন শ্রেষ্ঠ কলাবতের কাছে সঙ্গীত শিক্ষার সুযোগ ক'রে নেন, যাঁদের সামনে সাধারণ ঘরের কোন শিক্ষার্থীর উপস্থিত হওয়াই ছিল অসম্ভব ব্যাপার। যেমন, তানসেনের পুত্র-বংশীয় মহাগুণী বাসৎ খাঁ, বড়কু মিয়াঁ ও মহম্মদ আলী খাঁর পিতা এবং জাফর খাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। প্রথম জীবনে বাসৎ খাঁ লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি পশ্চিমাঞ্চলের দরবারে অবস্থান করবার পর নবাব ওয়াজেদ আলী শা'র মেটিয়াবুরুজ দরবারে সসম্মানে অধিষ্ঠিত থাকেন। নবাবের মৃত্যুর পরে ছিলেন রাণাঘাটের বিখ্যাত ধনী-পরিবার পাল-চৌধুরীদের সঙ্গীত-সভায়। তারপর টিকারির মহারাজার সম্মানিত অতিথিরূপে গয়ায় শেষ-জীবন অতিবাহিত করেন। সঙ্গীত-জগতের এমন একজন নায়কের কাছেও শিক্ষা করেছিলেন বামাচরণ, যা অন্য কোন বাঙ্গালীর পক্ষে সম্ভব হয় নি। সাজ্জাদ মহম্মদের তালিমও পেয়েছিলেন তিনি এবং মহম্মদ খাঁরও। তা ছাড়াও আরও কয়েকজন গুণীর কাছে অল্প-বিস্তর শিখেছিলেন বামাচরণ, সকলের নাম করা

হন। তাঁর এই দুর্লভ সৌভাগ্যের কারণ, বাংলার কয়েকটি সঙ্গীতপ্রেমী ধনী পরিবারের সহযোগিতা। রাণাঘাটের পালচৌধুরী, গোবরডাঙ্গার মুখোপাধ্যায়, মুড়াগাছার আচার্য চৌধুরী প্রভৃতি জমিদার-ভবনের সঙ্গীতসভায় তাঁর অবারিত গতিবিধি ছিল পরিবারের কর্তাদের অকুণ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতায়। তাঁদের অনুমোদনে বামাচরণ কয়েকজন শ্রেষ্ঠ গুণীর কাছে শিক্ষার দুর্লভ সুযোগ পান ও নিজের প্রতিভায় তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন। 'ধনবানে কেনে বই জ্ঞানবানে পড়ে' কিংবা ধনবানে আনে গুণী 'সুরবানে' শেখে। সে যা হোক, বামাচরণ এই ভাবে যে অমূল্য সঙ্গীত-বিদ্যা আহরণ ও ধারণ করেন, তার ফলে বাংলা দেশে রাগসঙ্গীতের চর্চার কিছু পরিমাণে শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। বাসৎ খাঁ, সাজ্জাদ মহম্মদ প্রভৃতির সঙ্গীতধারা, আংশিক ভাবে হ'লেও, বামাচরণের পুত্র-পৌত্রাদি (জিতেন্দ্রনাথ ও লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য) এবং তাঁদের শিষ্যবৃন্দের মধ্যে দিয়ে বাংলার সঙ্গীতের আসরে সঞ্জীবিত থাকে।

সাজ্জাদ মহম্মদের সেতার-সুরবাহার বাজনার জন্যে আর একজন এখানে দস্তুরমত উপকৃত হয়েছিলেন। তিনি বাঙ্গালী না হ'লেও বাংলা দেশে জীবনের প্রায় অর্ধাংশ অতিবাহিত করেন এবং তাঁর পুত্র আজীবন বাংলা নিবাসী। তিনি হলেন সেতারী এনায়েৎ খাঁর পিতা ইমদাদ খাঁ। সাজ্জাদ মহম্মদ পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর-বাড়ীতে থাকবার সময় ইমদাদ খাঁ তাঁর কাছে যে যন্ত্রসঙ্গীত বিষয়ে ঋণী হয়েছিলেন, সে-প্রসঙ্গ ইমদাদ খাঁর একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে উল্লেখ করা হবে।

এমনি ভাবে ওমরাও খাঁ, গোলাম মহম্মদ, সাজ্জাদ মহম্মদ, মহম্মদ খাঁর ক্রম-পর্যায়ে গঠিত সঙ্গীত-পরিবারের ধারা আংশিক ভাবে কয়েকটি শাখা-প্রশাখায় বাংলা দেশে বিস্তৃত হয়। সাজ্জাদ মহম্মদের পরে এই সম্পদের প্রধান ধারক-বাহক মহম্মদ খাঁর সূত্রে এই ধারা আর এক দফায় বিস্তার লাভ করে বাংলায়। কারণ মহম্মদ খাঁও তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল এদেশে বাস করেন, বাংলার বহু সঙ্গীতাসরে যোগ দেন নানা সঙ্গীত-সভায় যুক্ত থাকেন এবং কয়েকজন বাঙ্গালী শিক্ষার্থী তাঁর তালিম পান।

সাজ্জাদ মহম্মদের মূল্য অত বড় কলাবত না হ'লেও মহম্মদ খাঁ সেতার-সুরবাহার বাদকরূপে বিশেষ কম ছিলেন না। সাজ্জাদ মহম্মদের মৃত্যুর কিছু পরে তিনি নিযুক্ত হন গোবরডাঙ্গার মুখোপাধ্যায় পরিবারের সঙ্গীতসভায়। মহম্মদ খাঁর কাছে বামাচরণ ভট্টাচার্যের কিছু শিক্ষার কথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু খাঁ সাহেবের তালিম যিনি সবচেয়ে বেশিদিন এবং ভাল ভাবে পেয়েছিলেন, একান্ত ভাবে তাঁরই ধারায় সুর-সাধনা করেছিলেন, যাঁকে মহম্মদ খাঁর উত্তরাধিকারী বলা যায়, তিনি হলেন গোবরডাঙ্গার জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। মনুবাবু নামে সঙ্গীত-সমাজে সুপরিচিত এই মুখোপাধ্যায় পরিবারের সৌখীন সঙ্গীতজ্ঞ যেমন একনিষ্ঠ সাধনায় সঙ্গীতশিক্ষা করেন, তেমনি বাংলার এক শ্রেষ্ঠ গুণীরূপে পরিগণিত হন। সুরবাহার-শিল্পী জ্ঞানদাপ্রসন্নের আর এক সখ ও সাধন ছিল শিকার। নিপুণ শিকারী হিসেবেও তাঁর খুব নামডাক ছিল। শিকারের তীব্র নেশাও কিন্তু তাঁর সঙ্গীত-চর্চার আকর্ষণ কিছুমাত্র শিথিল করতে পারে নি। শিকার যাত্রার সঙ্গেও তাঁর সঙ্গে যেতেন ওস্তাদ মহম্মদ খাঁ, অন্যান্য গায়ক-বাদকেরা এবং সঙ্গীতামোদী সুহৃদবর্গ। সঙ্গীতের নানা সরঞ্জাম ওস্তাদের সঙ্গে তাঁবুতে রেখে তিনি শিকারে যেতেন। রাত্রে তাঁবুতে ফিরে এসে চলত গান বাজনা। শিকার ও সঙ্গীতে তাঁর অন্তরঙ্গ সহযাত্রী ছিলেন মুড়াগাছার আচার্য চৌধুরী, রাণাঘাটের পালচৌধুরী, নলডাঙ্গার রায় প্রভৃতি জমিদার পরিবারের বন্ধুরা। রাণাঘাটের বিখ্যাত টপ্পাগায়ক নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, সেতার-সুরবাহার বাদক বামাচরণ ভট্টাচার্য প্রভৃতিও এই সব শিকার-শিবিরের সঙ্গীতাসরে যোগ দিতেন। জ্ঞানদাপ্রসন্নের সুহৃদ জমিদারবর্গের অনেকের বাড়ীর আসর সেতার-সুরবাহার বাজিয়ে মাৎ করেছেন মহম্মদ খাঁ। কিন্তু জ্ঞানদাপ্রসন্ন ভিন্ন আর কেউ মহম্মদ খাঁর সঙ্গীত-বিদ্যা অনেকাংশে আয়ত্ত করতে পারেন নি।

মহম্মদ খাঁর আর একজন শিষ্য ছিলেন উমেশচন্দ্র চক্রবর্তী। তিনি বিক্রমপুরের বীজগাঁয়ের জমিদার এবং সঙ্গীত-শাস্ত্রবিদ্ ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর মাতুল। যে শিরোনামা দিয়ে এই অধ্যায়ের আরম্ভ, সেই কথাটি উমেশচন্দ্র চক্রবর্তীকে মহম্মদ খাঁ বলেছিলেন :—এখন সেই প্রসঙ্গ।

মহম্মদ খাঁ তখন উত্তর কলকাতার জ্ঞানদাপ্রসন্নের 'গোবরডাঙ্গা হাউস্'-এ (মাণিকতলার মোড়ের কাছে, বিবেকানন্দ রোডে। সে ভবন এখন হস্তান্তরিত) থাকেন। উমেশচন্দ্র

বিক্রমপুর থেকে মাঝে মাঝে কলকাতায় আসেন এবং অন্যান্য কাজের মধ্যে মহম্মদ খাঁর কাছে কিছু কিছু সেতারে তালিম নেন। সেবারেও এসে দেখা করেছেন মহম্মদ খাঁর সঙ্গে, গোবরডাঙ্গা হাউসের বৈঠকখানায়। সেখানে মন্নুবাবু ও আরও কয়েকজন ছিলেন মহম্মদ খাঁর কাছে, সঙ্গীত-চর্চা হচ্ছিল। উমেশচন্দ্রও এসেছেন খাঁ সাহেবের কাছে নতুন কিছু শিখতে।

মহম্মদ খাঁ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ কি দেব?'

অর্থাৎ কোন্ রাগ তিনি শিখতে চান খাঁ সাহেবের কাছে।

উমেশচন্দ্র বললেন, 'ভৈরবী'।

শুনে, মহম্মদ খাঁ একটু চুপ ক'রে থেকে রহস্য ভরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি রকম ভৈরবী শেখবার ইচ্ছে? এক-দিনের ভৈরবী, না এক মাসের ভৈরবী, না এক বছরের ভৈরবী?'

ভারতীয় রাগ-বিদ্যার যেমন গভীরতা, তেমনি ব্যাপকতাও। যেমন অসংখ্য রাগ, তেমনি বৈচিত্রময় তাদের রূপায়ণের পদ্ধতি। অতল ভাবগাঢ়তা ভারতীয় সঙ্গীতে। এক-একটি রাগ তাই বিপুল বিস্তৃতিতে প্রস্ফুটিত ও বিকশিত হ'তে পারে। তার আবেদন, তার আকর্ষণী শক্তি যথার্থ শিল্পীর হাতে কখনও নিঃশেষ কিংবা পুরণো হয় না। নব নব সুর-দিগন্তর উন্মেষে তার রূপ কখনও ক্লান্তিকর লাগে না। কমল মুকুলের দল উন্মোচনের মতন তা চিরনতুন। কারণ তা কখনও বৈচিত্রহীন পুনরাবৃত্তি মাত্র নয়, নতুন নতুন সৃজনের পথ তার মধ্যে উন্মুক্ত থাকে। নচেৎ এতকাল ধরে সুরসাধক তাঁদের প্রতিভা প্রকাশ করতে পারতেন না ভারতীয় সঙ্গীতে, এক-একজন সঙ্গীতসেবক কয়েকটি মাত্র রাগ নিয়ে আজীবন সাধনায় নিমগ্ন থাকতে অপারগ হতেন। আর রাগমালা তাদের প্রাণোচ্ছল সজীবতা হারিয়ে সবস্বান্ত হ'য়ে যেত বহুকাল আগেই। কিন্তু তা হয় নি হবেও না কোন দিন, যদি সাধক-শিল্পীর অনটন না ঘটে।

মহম্মদ খাঁ-ও একজন সাধক শিল্পী ছিলেন। তাই রাগের গভীরতার মর্মজ্ঞও। এক ভৈরবী নিয়ে একজন শিক্ষার্থী এক বছর চর্চা করতে পারে এবং এমন পদ্ধতি প্রদর্শন করতেও তিনি সক্ষম। আবার সে ভৈরবীকে সংক্ষিপ্ত করে চপলমতি সঙ্গীতজ্ঞের একদিনের শিক্ষার উপযোগী করে দেওয়াও সম্ভব।

মহম্মদ খাঁ রাগবিস্তারের এই রহস্যের প্রতি ইঙ্গিত করেই প্রশ্ন করেছিলেন।

উমেশচন্দ্র তার তাৎপর্য বুঝিয়ে সবিনয়ে জানিয়েছিলেন, 'আমি অ্যামেচার লোক। মাসখানেক পরে পরে কলকাতায় আসি। একমাসে শিখতে পারি এমন ভৈরবীই দেবেন।'

মঙ্গুবাঈ-এর কণ্ঠে জয়দেবের পদাবলী

কোথায় বারো শতকের রাঢ়ভূমিতে অজয় নদীর তীরে কেন্দুবিল্ব গ্রামের পদ-রচয়িতা জয়দেব, আর কোথায় বিশ শতকের প্রথম পাদে গোয়ালিয়রের ধ্রুপদ-গায়িকা মঙ্গুবাঈ! কত যুগ-যুগান্তের, কত দূরত্বের ব্যবধান! কিন্তু এই দুস্তর কালের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেছে, সঙ্গীত। জয়দেবের পদাবলী যে শুধু কাব্য রূপে নয়, সঙ্গীত স্বরূপেও তার আবেদন বিশ শতকে পর্যন্ত হারায় নি, তা মঙ্গুবাঈয়ের গানে আর একবার প্রমাণিত হ'ল।

আরও লক্ষ্যণীয়, মঙ্গুবাঈ যে জয়দেবের পদাবলী গাইলেন, তার গীতি-রীতি। বাংলা দেশে জয়দেবের কোমলকান্ত পদ সাধারণত কীর্তনগানের আকারেই শোনা যায়। বৈষ্ণবভাবের চির-মাধুর্যময় এই পদাবলী কীর্তনাঙ্গে বাঙ্গালীর কাছে অতিশয় হৃদয়স্পর্শী। বৈষ্ণব গায়ন-সমাজ জয়দেবকে ভক্ত কবিরূপে গ্রহণ ক'রে তার লীলামধুর পদাবলী তাঁদের নিজস্ব-গীতি এই কীর্তন-রীতিতে আস্বাদ করেছেন এবং গৌড়জনদের মনে আবেগবিধুর রসমাধুরীর অনুভব ঘটিয়েছেন!

কিন্তু মঙ্গুবাঈ জয়দেবের পদ গাইলেন পূর্ণাঙ্গ ধ্রুপদ পদ্ধতিতে। আসরটিও ছিল শুধু ধ্রুপদ গানের এবং বাংলার কয়েকজন সুপরিচিত ধ্রুপদী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বাংলা দেশের সেই এক বিশিষ্ট আসরে, গুণগ্রাহী বাঙ্গালী শ্রোতাদের সামনে গোয়ালিয়রের স্বনামধন্যা ধ্রুপদ-গায়িকা গেয়ে শোনালেন বাংলা তথা ভারতের এক শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতবিদ্ কবির পদাবলী। বাংলার সঙ্গীতাসর বক্ষেই পশ্চিম ভারতের এই গায়িকা বোধ হয় আগ্রহ ক'রে জয়দেবের পদ শোনালেন। কিন্তু কবির নিজের দেশে এমন ধ্রুপদাঙ্গে তাঁর

পদাবলী গান এক অভিনব বস্তু। এখানকার শ্রোতাদের এ এক অভাবিত অভিজ্ঞতা। উপস্থিত বাঙ্গালী ধ্রুপদীরাও চমৎকৃত হলেন।

সে আসরের বর্ণনা করবার আগে জয়দেবের পদাবলীর প্রসঙ্গে কিছু বলা প্রয়োজন।

গৌড়ের এবং ভারতবর্ষের শেষ স্বাধীন হিন্দু নৃপতি লক্ষ্মণ সেনের রাজসভার শ্রেষ্ঠ কবি জয়দেব। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, গায়ক এবং সঙ্গীততাত্ত্বিক। গীতকার এবং সুরকাররূপে জয়দেবের অমর সৃষ্টি "গীতগোবিন্দম্" গীতিগুচ্ছ। গীতগোবিন্দের পদাবলী তিনি স্বয়ং মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সভায় গেয়েছিলেন ব'লে কথিত আছে। তাঁর সঙ্গীতের সঙ্গে নৃত্য করতেন তাঁর জীবনসঙ্গিনী পদ্মাবতী, যাঁর তিনি "চরণ-চারণ চক্রবর্ত্তী"—এমন জনশ্রুতিও পাওয়া যায়।

গীতগোবিন্দের যশ ক্রমে লক্ষ্মণ সেনের রাজসভা পার হয়ে, গৌড় রাজ্যের সীমানা অতিক্রম ক'রে ভারতবর্ষের দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর সমস্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। জয়দেব এবং তাঁর পদাবলীর তুল্য এমন খ্যাত ও আলোচিত হওয়ার দৃষ্টান্ত বেশি দেখা যায় না। সমগ্র ভারতে, প্রদেশে প্রদেশে তাঁর গীতগোবিন্দের ৪০ খানের অধিক ভাষ্যগ্রন্থ রচিত হয়। গীতগোবিন্দের অনুকরণে অনেক কবি সংস্কৃতে কাব্য রচনা করেন, যদিও তাঁদের সকলের বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্ণের প্রেম-কাহিনী ছিল না। রাম-সীতা বা হর-গৌরীর লীলাও অনেকে তাঁদের কাব্যের বিষয় করেছিলেন।

জয়দেবের কালে উড়িষ্যাও ছিল লক্ষ্মণ সেনের গৌড়-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এবং পুরীর মন্দিরে জয়দেব-পদ্মাবতীর সঙ্গীত পরিবেশনের কিংবদন্তী আছে। সেই সূত্রে আবার ইদানীং কালের উড়িষ্যার কোন কোন পণ্ডিতব্যক্তি জয়দেবকে দাবি করেন উড়িষ্যার সন্তান ব'লে। শিক্ষিত উড়িষ্যাবাসীদের কাছে জয়দেব কতখানি প্রিয়, তা এই থেকে বোঝা যায়। অবশ্য তাঁদের এই দাবির মূলে যে কোন সত্য নেই, তা প্রমাণ ক'রে দিয়েছেন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিতেরা।

আধুনিক কালে ইউরোপ ভূখণ্ডে পর্যন্ত গীতগোবিন্দের জনপ্রিয়তা প্রসারিত হ'তে দেখা যায়। ইউরোপের বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতবর্গ কাব্যরূপে গীতগোবিন্দের প্রতি শুধু অনুরাগ প্রদর্শন করেন নি, তার রীতিমত অনুশীলন করেছেন, আপন আপন ভাষায় অনুবাদ পর্যন্ত করেছেন। গীতগোবিন্দের প্রথম মুদ্রণও হয়েছে ইউরোপে, জয়দেবের স্বদেশে নয়। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর বন্ শহরে লাসেন সম্পাদিত সংস্করণই গীতগোবিন্দের আদিতম মুদ্রণ। ইউরোপীয়দের মধ্যে গীতগোবিন্দের প্রথম অনুবাদ করেন স্যার উইলিয়ম জোন্স্। তাঁর সেই ইংরেজী অনুবাদ ১৮০৭ খ্রীঃ তাঁর Collected Works-এর মধ্যে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। তারপর Edwin Arnoldও একটি স্বাধীন ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন ১৮৭৫ খ্রীঃ The Indian Song of Songs নামে। এই দু'টি ইংরেজী অনুবাদের মধ্যবর্তী কালে গীতগোবিন্দের জার্মান ভাষায় অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন এফ. রিউকার্ট, ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে। তারপর ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীস থেকে ফরাসী অনুবাদ করেন জি. কোর্টিলয়ে। এমনি ভাবে বর্ত্তমান ইউরোপের পণ্ডিত সমাজেও গীতগোবিন্দ জয়যাত্রা করেছে।

নানা কারণে পাঠক ও শ্রোতাদের চিত্ত আকৃষ্ট ক'রে স্মরণীয় হয়ে আছে জয়দেবের এই পদাবলী। কোথাও ধর্ম-গ্রন্থ, কোথাও কাব্য, কোথাও সঙ্গীতরূপে। এমন প্রেমের আবেগে প্রতপ্ত পদগুলিকে বাংলার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনেকে তাঁদের বিশিষ্ট ধর্মতত্ত্ব ও রসশাস্ত্রের নিদর্শন হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু জয়দেব ধর্মীয় প্রেরণা থেকে গীত-গোবিন্দ রচনা করেছিলেন কি না তা গভীর সন্দেহের বিষয়। আর রূপ গোস্বামীর রসশাস্ত্র প্রণয়নের তিন শ' বছরেরও আগে ত রচিত হয়েছিল জয়দেবের পদাবলী।

মধ্যযুগের প্রিয় বিষয়বস্তু রূপে রাধাকৃষ্ণের অপার্থিব প্রেমকে তিনি বিষয়রূপে নিয়ে গীতগোবিন্দ রচনা করেন বটে, কিন্তু তাঁর পদাবলী সুগভীর হৃদয়াবেগে পূর্ণ হয়ে মানবিক আবেদনে মুখর হয়ে উঠেছে। এইখানেই তার বৈশিষ্ট্য এবং এইজন্যেই তার এত বেশি জনপ্রিয়তা। রাধা-কৃষ্ণের মিলন-প্রসঙ্গ মানবোচিত নিবিড় আন্তরিকতায় সকলের অন্তর-স্পর্শ করে। রাধাকৃষ্ণ-ঘটিত বিষয় অবলম্বনে সমগ্র ভারতবর্ষে কাব্য রচনার কখনও অভাব হয় নি, কিন্তু গীতগোবিন্দ এক অনন্য স্থান অধিকার ক'রে আছে সংস্কৃত কাব্য-জগতে। বিষয়বস্তু পুরণো হ'লেও তা জয়দেবের নিজস্ব অনুভবের অভিনব, অনুপম সৃষ্টি।

পণ্ডিত ব্যক্তিরা গীতগোবিন্দ কাব্যের বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন যে, জয়দেব সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে এক নতুন পথ অভিযান করেছেন। তাঁর পদ-রচনার প্রণালী ও শৈলী গতানুগতিক সংস্কৃত কাব্যকৃতির ধারা অনুসরণ না ক'রে স্বকীয় সৃষ্টিতে উজ্জ্বল। তাঁর দৃষ্টিকোণ ও মান সকতা অলৌকিকের সন্ধান না ক'রে লৌকিক বা মানবিক ভাব প্রকাশে বেশ উন্মুখ। আত্মিক মিলন গাথার চেয়ে দেহযমুনার তটে কামনার তরঙ্গধ্বনি বেশি শোনা যায় তাঁর কাব্যে। তার গঠন অনেকাংশে নাটকোচিত হ'লেও, অন্তর্গূঢ় প্রেরণা হ'ল 'গীতিকবিতা'! কাব্য হিসাবেও গীতগোবিন্দ সংস্কৃত ঐতিহ্য অনুকরণ না ক'রে অপভ্রংশের (বাংলা ভাষারূপের জননী) কারুকৃতি ও প্রাণস্পন্দন ঝঙ্কৃত করেছে। ছন্দ-প্রকরণেও সংস্কৃতের চেয়ে বাংলার সগোত্র অপভ্রংশের রীতিনীতি, ভঙ্গি বেশি প্রকট। বাক্য-গঠনও সংস্কৃত ব্যাকরণের পদ্ধতির চেয়ে দেশীয় ভাষার ধারার অধিকতর অনুসারী।

তবে এ সবই গীতগোবিন্দের বহিরঙ্গের কথা। তার ভূমিকাংশ ও বর্ণনাত্মক শ্লোকগুলি প্রাচীন কাব্যরীতির ছন্দ-বন্ধে গ্রথিত হ'লেও, সুরমাধুর্যে পূর্ণ পদাবলী সঙ্গীতরূপেই রচিত হয়েছিল এবং সেই সব অপূর্ব পদের জন্যেই গীত-গোবিন্দের সমাদর। সঙ্গীতরূপে গীতগোবিন্দ সমগ্র ভারতে গীত হয়েছে, তবে সর্বত্র একই পদ্ধতিতে নয়। যেমন আগেই বলা হয়েছে, বাংলা দেশে শ্রীচৈতন্যের অনুগামী কীর্তনীয়াগণ এবং ভক্তবৃন্দ জয়দেবের পদাবলী কীর্তনাঙ্গে রূপান্তরিত করেছেন। কীর্তন পদ্ধতিতে মন্দিরে, আখড়ায়, আসরে গীতগোবিন্দ গেয়েছেন। তাঁদের অনুসরণে বাংলার যাত্রার পালায় এবং থিয়েটারের প্রথম যুগ থেকেও জয়দেবের পদাবলী কীর্তন গানরূপে বহুল প্রচারিত হয়েছে। সেজন্যে বাংলায় গীতগোবিন্দ কীর্তনরূপেই সকলের কাছে সুপরিচিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রভাবে জয়দেবের পদাবলীর গীতিরীতি বাংলা দেশে যেমন কীর্তনাঙ্গে পরিণত হয়েছে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে কিন্তু এমন ঘটে নি।

কীর্তন পদ্ধতির জন্মের তিন শতাব্দীরও আগে রচিত ও গীত হয় জয়দেবের পদাবলী। তাঁর কালে গীতগোবিন্দের সঙ্গীত ছিল 'প্রবন্ধে'র পর্যায়ভুক্ত। জয়দেব নিজেও তাঁর পদাবলীকে প্রবন্ধ বলেছেন এবং গীতগুলির সঙ্গে গেয় রাগের ও তালের নাম উল্লেখ করেছেন।

প্রবন্ধ-সঙ্গীতের অন্তর্গত ধ্রুব নামক গীত থেকেই নাকি কালক্রমে ধ্রুবপদ বা ধ্রুপদ সঙ্গীত গঠিত ও রূপায়িত হয়েছে। গীতগোবিন্দের সেই সব প্রবন্ধ রচনা ও গঠিত করেন জয়দেব ধ্রুব প্রভৃতি গানের রীতিতে। সেজন্যে উত্তর কালে জয়দেবের এই পদাবলী ধ্রুবপদ বা ধ্রুপদ রূপে দেখা যায়। সেই ধ্রুপদ গানেরই একটি ধারা হয়ত এসে পৌঁছেছিল গোয়ালিয়রের মঙ্গুবাঈ পর্যন্ত, যার রূপ তিনি প্রদর্শন করে ছিলেন সেবারকার কলকাতার একটি ধ্রুপদের আসরে। তার সেই আসরের কথার আগে জয়দেবের পদাবলীর প্রসঙ্গ আরও একটু আছে।

জয়দেবের মৃত্যুর পর তাঁর সঙ্গীত-শৈলী ক্রমে লোপ পেয়ে যায়। প্রায় ২৫০ বছর পরে, ১৫ শতকের মধ্যভাগে মেবারের মহারাণা কুম্ভ যিনি ছিলেন একাধারে মহাযোদ্ধা নৃপতি এবং সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ ও বীণকার, গীতগোবিন্দের নব-রূপায়ণ করেন। মহারাণা কুম্ভর সেই শৈলী তখনকার কালে প্রচলিত প্রবন্ধ-সঙ্গীতের এক নিদর্শন।

তাঁর আরও কয়েক শতক পরে ভারতের অন্য এক অঞ্চলে প্রচলিত গীতগোবিন্দের সঙ্গীতরূপের আর এক পরিচয় ক্ষেত্র-মোহন গোস্বামী প্রণীত "গীতগোবিন্দের স্বরলিপি" (১৮৭২ খ্রীঃ প্রকাশিত) থেকে পাওয়া যায়। ক্ষেত্রমোহন ছিলেন বিষ্ণুপুর ঘরাণার প্রবর্তক রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের এক কৃতী শিষ্য এবং তিনি পুস্তকটির উপক্রমণিকায় বলেছেন যে, গীতগোবিন্দের গীতাবলী তিনি প্রথম জীবনে রামশঙ্করের শিক্ষাধীনে লাভ করেছিলেন। রামশঙ্কর ভট্টাচার্য আঠারো শতকের চতুর্থপাদে (১৭৮২-৮৩ খ্রীঃ) বিষ্ণুপুরে আগত আগ্রা-বৃন্দাবন অঞ্চলের অনেক বৈষ্ণব-সঙ্গীতাচার্যের শিক্ষায় সঙ্গীতচর্চা আরম্ভ করেন। ক্ষেত্রমোহনকে উনিশ শতকে তিনি যে গীতগোবিন্দ শিক্ষা দেন, তার গীতরূপ তিনি সম্ভবত লাভ করেছিলেন তাঁর পশ্চিমা, বৈষ্ণব সঙ্গীতাচার্যের কাছে। ক্ষেত্রমোহন তাঁর উক্ত গ্রন্থে গীতগোবিন্দের যে ২৫টি গানের স্বরলিপি প্রকাশ করেন, সেই ধরণের ধ্রুপদাঙ্গের গান তা হ'লে আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে বৃন্দাবন অঞ্চলে প্রচলিত ছিল—রামশঙ্করের সঙ্গীতগুরুর সঙ্গীতচর্চার দেশ-কালের নিরিখে একথা বোঝা যায়। তার

পর জয়দেবের পদাবলীর সেই গীতিরীতি প্রচলিত হয় বিষ্ণুপুর ঘরাণায়।

বৃন্দাবন অঞ্চলে গীতগোবিন্দ চর্চার এক শতাব্দ পরে ভারতের অন্য এক অঞ্চলের স্বনামধন্য সঙ্গীতকেন্দ্রে সেই পদাবলী গীতির আর এক রূপের প্রচলন ছিল জানা যায়, যার এক শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিলেন মঙ্গুবাঈ। গোয়ালিয়রের ধ্রুপদ-গায়িকা এবং সেখানকার সুপ্রসিদ্ধ খেয়ালগুণী ভ্রাতৃদ্বয় হদ্দ হস্‌সু খাঁর শিষ্যা মঙ্গুবাঈ। তিনি কি তা হ'লে গীতগোবিন্দের ধ্রুপদ-রীতির গান হদ্দ হস্‌সু খাঁর ঘরে পেয়েছিলেন? সে-কথা সঠিক জানা না গেলেও গোয়ালিয়রের সঙ্গীত-সমাজে যে তা মঙ্গুবাঈয়ের আগে থেকে প্রচলিত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হদ্দ খাঁ ও হস্‌সু খাঁর সঙ্গীত-জীবন। উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতজগতে তাঁদের অতি সম্মানের আসন ছিল গোয়ালিয়রী রীতির খেয়াল গানের জন্যে। সেই ভারি চালের খেয়াল ছিল ধ্রুপদ-ঘেঁষা এবং সেকালের অনেকের মতন তাঁরা খেয়াল অঙ্গে গাইলেও রীতিমত ধ্রুপদীও ছিলেন। সেজন্যে তাঁদের তালিমে মঙ্গুবাঈ হয়েছিলেন ধ্রুপদসাধিকা।

হদ্দ খাঁর সঙ্গে বাংলার সঙ্গীত-সমাজের এই সম্পর্ক ছিল যে, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সভাগায়ক গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী গোয়ালিয়রে অবস্থান ক'রে তাঁর কাছে খেয়াল অঙ্গের শিক্ষা পান। বাংলা দেশে মহিষাদল রাজবাড়ীর আসরে হদ্দ খাঁ একবার সঙ্গীতানুষ্ঠান করেছিলেন, একথাও জানা যায়।

হদ্দ হস্‌সু খাঁর কাছে মঙ্গুবাঈয়ের শিক্ষা হয় গোয়ালিয়রে এবং তাঁর সঙ্গীতপ্রতিভার প্রকাশও ঘটে প্রধানত গোয়ালিয়র রাজদরবারকে কেন্দ্র ক'রে। মঙ্গুবাঈ ছিলেন গোয়ালিয়র দরবারের বিশেষ সম্মানিত সভাগায়িকা। তিনি দরবারে তাঞ্জামে চ'ড়ে গান গাইতে যেতেন, এমন তাঁর সমাদর ছিল সেখানে।

এ হেন মঙ্গুবাঈ সেবার কলকাতায় একটি উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীত-সম্মেলনে ধ্রুপদাঙ্গে গীতগোবিন্দ শুনিয়ে আসর মাৎ করলেন। সে হ'ল ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের কথা এবং তিনি তখন অশীতিপর বৃদ্ধা। কিন্তু তাঁর গীতকণ্ঠ তখনও সতেজ, সাবলীল, স্বরসমৃদ্ধ। সুদীর্ঘকালের একনিষ্ঠ সাধনার ফলে তখনও তা শিল্পীর সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যেমন দেখা গেছে, খেয়ালীদের তুলনায় ধ্রুপদীরা বেশি বয়স পর্যন্ত সঙ্গীত-সক্ষম থাকেন—মঙ্গুবাঈও তেমনি।

কলকাতায় তিনি সেবার যোগদান করতে আসেন লালচাঁদ উৎসবের আসরে। লালচাঁদ উৎসবের পরিচয় এখানে দেবার দরকার নেই, মুস্তারি বাঈয়ের প্রসঙ্গে তা পাওয়া যাবে।

উৎসবের প্রথম দিনের অধিবেশনে যে ধ্রুপদের আসর হ'ত, সেখানেই সেদিন গাইলেন মঙ্গুবাঈ। বাংলার কয়েকজন সুপরিচিত ধ্রুপদীও সে আসরে ছিলেন। রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

বাংলা দেশের আসর ব'লেই বোধ হয় মঙ্গুবাঈ গীতগোবিন্দ গাইবেন স্থির করেছিলেন। ভালই হয়েছিল তাঁর এই নির্বাচন। নচেৎ জয়দেবের পদাবলীর ধ্রুপদ রূপের অভিজ্ঞতা থেকে উপস্থিত বাঙ্গালী ধ্রুপদী ও শ্রোতাদের বঞ্চিত হ'তে হ'ত। মঙ্গুবাঈ-এর এই গান শোনবার পর তাঁরা একবাক্যে বলেছিলেন যে, এ বাণীর ধ্রুপদ তাঁরা আগে শোনেন নি।

তাঁর গানের সঙ্গে সেদিন মৃদঙ্গে সঙ্গত করেন গোয়ালিয়রের গুণী মৃদঙ্গী পর্বত সিং।

মঙ্গুবাঈ সে আসরে এত বৃদ্ধ বয়সেও যে গুণপনা দেখালেন তাতে শ্রোতারা চমৎকৃত হয়ে যান। গীতগোবিন্দের পদাবলী সম্পূর্ণ ধ্রুপদাঙ্গে গানই যে শুধু অভিনব হয়েছিল, তা নয়। রাগের রূপায়ণ তাঁর যেমন অনিন্দ্য, তেমনি তাল-লয়ের কারুকর্মে আশ্চর্য মুন্সিয়ানা দেখান তিনি। সে যেন এক জাত-ধ্রুপদীর যোগ্য অনুষ্ঠান।

প্রথমে চৌতালে গাইলেন বেশ বিলম্বিত লয়ে। শেষে ধামার ধরলেন। কিন্তু দুর্লভ বিশেষত্ব এই দেখা গেল যে—চৌতালে গাইবার সময়ে যে বিলম্বিত লয়ে স্থিত হন সম বিসম অতীত অনাগত সমস্ত মোকাম ঘুরে এসে, সেই লয়েই ধামার ধরেন। অর্থাৎ ধামার আরম্ভ করবার সময়ে লয় একেবারেই বাড়ালেন না। সাধারণত ধ্রুপদীরা কিন্তু তা করেন না—লয় বাড়িয়ে নেন ধামার ধরবার সঙ্গেই। মঙ্গুবাঈ এইভাবে যে লয়কারী দেখালেন, তা যেমন কঠিন তেমনি উপভোগ্য হ'ল বোদ্ধা শ্রোতাদের। এমন বৃদ্ধ একটি শ্রোতা

যায় না। গানের বিষয়বস্তু এবং গানের রীতি দু'দিক্ থেকে আসরের মন অধিকার ক'রে নিলেন মঙ্গুবাঈ। এক দমে তিনি গেয়ে গেলেন।

তারপর যখন সেই অশীতিপর বৃদ্ধা গান বন্ধ করলেন, দেখা গেল, প্রায় দু' ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে গেছে তাঁর গানে।

'মেরি নাম জান্‌কী বাঈ ছপ্পন ছুরি'

আগেকার আমলের রেকর্ডে শিল্পীদের নিজ কণ্ঠে নাম ঘোষণা করবার একটা রেওয়াজ ছিল। রেকর্ডের গান বা বাজনা শেষ হয়ে যাবার পর হঠাৎ শোনা যেত শিল্পীর নাম, তাঁরই নিজের গলায়। রেকর্ড-সঙ্গীতের প্রথম যুগে যখন রেকর্ড করা হ'ত চোঙার সাহায্যে, তখন এইভাবে প্রতি রেকর্ডে শিল্পীর নাম চিহ্নিত করবার নাকি দরকার হ'ত। রেকর্ডগুলির labelling-এর সময় যেন কোন গোলমাল বা নামের ওলট-পালট না হয়ে যায় সে-জন্যেই ছিল এই সাবধানতা। সেই সঙ্গে শিল্পীদের নিজের কণ্ঠ বা নামকে চিরস্মরণীয় রাখবার আকাঙ্ক্ষাও হয়ত থাকতে পারে। তবে পরবর্তী কালে রেকর্ডিং-এর যান্ত্রিক উন্নতি ভালভাবে হওয়ার পর থেকে ওইভাবে নিজের নাম ঘোষণা করার প্রথাটি ক্রমে লোপ পেয়ে যায়। এমন কি, যে-সব পুরণো রেকর্ডে নাম ঘোষণা ছিল, তাদের নতুন মুদ্রণের সময়ে নামের অংশ বর্জন করা হয়। আর সে সব শোনা যাবে না কোন দিন। (উত্তরকালের রেকর্ডে স্বকণ্ঠে নাম ঘোষণা যে একেবারে রহিত হয়ে যায়, তা নয়। তবে তখন তা কদাচিৎ ঘট্‌ত।)

কিন্তু আগেকার সেই রেওয়াজটি মন্দ ছিল না। যিনি যন্ত্রবাদক তাঁর কণ্ঠস্বরের একটি অবিকল নিদর্শন ভবিষ্যৎ কালের আগ্রহী শ্রোতাদের জন্যে থেকে যেত। যাঁরা গান গেয়েছেন তাঁদের স্বকণ্ঠে নিজেদের নাম উচ্চারণ শুনতে অনেক সময় ভালই লাগত। এই স্থায়ী শ্রুতির মূল্য খুবই বেশি। তা ছাড়া, সঙ্গীতের শেষে শিল্পীর নিজের গলায় নামটি শুনলে বেশ একটি অন্তরঙ্গ পরিবেশ সৃষ্টি হ'ত। শ্রোতাদের তা উপরি পাওয়া লাভ।

সেতার-সুরবাহার-সাধক ইম্‌দাদ খাঁর মিষ্টি হাতের বাজনার রেকর্ড আছে—দরবারী কানাড়া, সোহিনী, জৌনপুরী তোড়ি ও পুরিয়া। সেই সব বাজনার শেষে জোর ... ... — ... ইম্‌দাদ খাঁ। ...

খ্যাতনামী খেয়াল-ঠুংরি-গায়িকা, বীন্‌কার বন্দে আলী খাঁর শিষ্যা, কিরাণা ঘরাণার জোহরা বাঈয়ের রেকর্ডে গানের পরে মর্দানা ঢং-এর গলায় ধ্বনিত হ'ত—'মেরি নাম জোহরা বাঈ আগ্রাওয়ালী।' কলকাতার সুপরিচিতা বাঈজী গহর্ জান্ বাংলা গানের রেকর্ডেও ইংরেজীতে নাম ঘোষণা করতেন ('যদি নিমিষের দেখা পাই তোমারি' কিংবা 'হরি বল মন রসনা'র পরে)—'My name is Gahar Jan'। তাঁদের পরের যুগে এনায়েৎ খাঁর সেই সুরবাহারে মনোহারী বাগেশ্রী আলাপের পর শোনা যেত—'প্রোফেসর এনায়েৎ হোসেন খাঁ সেতারিয়ে।'...এমনি আরও কত সঙ্গীত-শিল্পীর নাম সেই অতীত যুগের স্মৃতির বার্তা এনে দিত।

আর শোনা যেত নারী-কণ্ঠে এক অদ্ভুত নাম—জান্‌কী বাঈ ছপ্পন ছুরি। মল্লার রাগে একটি হিন্দুস্থানী গানের রেকর্ড, তাল সেতারখানি (১৬ মাত্রার আদ্ধা কাওয়ালীর অনুরূপ ত্রিতালী। এই রেকর্ডের শেষ দিকে গায়িকা এক অশ্রুতপূর্ব নাম ঘোষণা করেছেন—'মেরি নাম জান্‌কী বাঈ ছপ্পন ছুরি।'

কে সেই জান্‌কী বাঈ এবং কেনই বা তাঁর নামের সঙ্গে এই অদ্ভুত বিশেষণ?

পশ্চিমাঞ্চলের পেশাদার গায়িকা জান্‌কী বাঈ পঞ্চাশ বছর আগে সঙ্গীতের আসরে এবং রেকর্ড-সঙ্গীতের জগতে সুপরিচিতা ছিলেন। কলকাতার কোন কোন ঘরোয়া সঙ্গীতসভায় কিংবা বাগান-বাড়ীর আসরেও মহ্‌ফিল করেছেন তিনি। ১৯১৮ সালে কালুরাম পোদ্দারের বন হুগলীর বাগান-বাড়ীতে (এটি তাঁর আগে ছিল মসজিদ-বাড়ী ষ্ট্রীটের বিখ্যাত সঙ্গীতপ্রেমী গুহ-পরিবারের) জান্‌কী বাঈয়ের একটি বড় আসরের কথা জানা যায়। কালুরাম ছিলেন বিখ্যাত বণিক কেশোরাম পোদ্দারের (মেটিয়াবুরুজে যাঁর নামের কটন মিল এখন বিড়লা পরিবারের স্বত্বাধীন) ভ্রাতা। সেই সব সময়ে জান্‌কী বাঈয়ের ওই নামের তাৎপর্য সঙ্গীতসমাজের কেউ কেউ জানতেন।

তারও কয়েক বছর আগে তিনি বাস করেন দ্বারবঙ্গ রাজ্যে। যুক্তপ্রদেশের কোন জায়গা থেকে এসে তিনি দ্বারবঙ্গ রাজ লক্ষ্মীশ্বর সিংহের নতুন বাজারের সেই প্রকাণ্ড ...

গায়িকার সঙ্গে বছর দুয়েক ছিলেন। মহারাজা লক্ষ্মীশ্বরের আনুকূল্যে তখন তিনি ভালভাবে তালিমও পান সেখানে, ওস্তাদ মৌলা বখ্‌সের অধীনে। এই বখ্‌স বরোদার নন, যিনি কলকাতায় এসেছিলেন 'হিন্দুমেলা'র যুগে। এই মৌলা বখ্‌স্ দ্বারবঙ্গে অবস্থানের সময় জানকী বাঈয়ের সঙ্গে জোহ্‌রা বাঈকেও সঙ্গীত-শিক্ষা দেন।

সেখানে বাসের সময়ে জানকী বাঈয়ের তেমন নাম হয় নি গায়িকা হিসেবে। কিন্তু নতুন বাজারে সেই একতলা ব্যারাক বাড়ীতে থাকবার সময় তাঁর গান সেখানকার লোকেরা সহজেই শুনতে পেতেন এবং তাঁকে একজন উৎকৃষ্ট গায়িকা ব'লে সকলের ধারণা হয়। তিনি যে-ঘরে রেওয়াজ করতেন, সেটি ছিল বাড়ীর বাইরের দিকে। তা ছাড়া, বাড়ীটি একতলা এবং বাড়ীর সামনে মাঠ থাকায় যে-কেউ ইচ্ছা করলে বাড়ীর সামনে মাঠে ব'সে তাঁর গান শুনতে পেতেন। সন্ধ্যার পর তিনি প্রায় প্রতিদিন বাইরের ঘরে রেওয়াজ করতেন, মৌলা বখ্‌স্ তাঁকে শেখাতে আসতেনও সেই ঘরে।

ঘরের সামনে ফুটবল খেলার মাঠ, তার ধারে বসলে পরিষ্কার শোনা যেত জানকী বাঈ মিষ্টি গলায় গান ধরেছেন। ওস্তাদ শিখিয়ে গেছেন, সেইটিই হয়ত রেওয়াজ করছেন ব'সে। কোনদিন হয়ত সে ঘর থেকে ভেসে আসে বাগেশ্রীর করুণ, মায়াময় সুরের বিস্তার। তার প্রাণ-কাঁদানো, মর্ম-ছেঁড়া মোচড়গুলিও স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যায় জানকী বাঈয়ের গলার খোলা আওয়াজে।

তাঁর নামের যে অংশটি নিয়ে তাঁর প্রসঙ্গ আরম্ভ করা হয়েছে, তা তখনও তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত ছিল। অর্থাৎ দ্বারবঙ্গে আসবার আগেই ওই অনন্য নামটির জন্ম। এবং সেখানকার কোন কোন ব্যক্তি জানকী বাঈয়ের নাম-মাহাত্ম্য, আর তার খ্যাতি বা অখ্যাতির রহস্য জানতেন। যথা, ওস্তাদ আসঘর আলী থাঁর জামাতা স্বরদবাদক আবদুল আজিজ, যাঁদের কথা "খাম্বাজ থেকে ভৈরবী"তে বলা হয়েছে।

জানকী বাঈয়ের প্রথম জীবনের সেই ঘটনার কাহিনী এইভাবে জানান আবদুল আজিজ: রীতিমত সঙ্গীত-চর্চা আরম্ভ করবার আগে জানকী বাঈয়ের জীবনে এক সময় দু'জন প্রণয়ীর আবির্ভাব ঘটে। দু'জনের প্রতি সম-ব্যবহার বেশি দিন প্রদর্শন করতে পারে নি বাঈজী। এক-জনের ওপর পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ হয়ে যায়। তখন ব্যর্থ-প্রেমিক একদিন ভীষণ আক্রোশে ছুরি নিয়ে আক্রমণ করে—প্রতিদ্বন্দ্বীকে নয়—প্রণয়িনীকেই। তার ছুরির আঘাত নাকি ৫৬ বার জানকী বাঈয়ের শরীরে পড়ে। বাঈজী কোনরকমে প্রাণরক্ষা করে সেই পৌনঃপুনিক ছুরিকাঘাত থেকে। নাটকের পরিসমাপ্তি ওইখানেই ঘটে, তার জের আর চলে নি। কিন্তু তারপর থেকে তার নাম হয়ে যায়—জানকী বাঈ ছপ্পন ছুরি। অন্যেরা তার এই নাম প্রচার করে নি, সে নিজেই (সগৌরবে?) এই নামে নিজেকে চিহ্নিত করেছে। না হ'লে বাইরের লোকের একথা জানবার নয়।

ঘটনাটির সত্য-মিথ্যা জানবার উপায় নেই। ছাপ্পান্ন বার ছুরিকাহত হ'লে কোন মানুষ, বিশেষ নারী, কি প্রাণ রাখতে পারে? বারাঙ্গনার সহ্যশক্তি কি অমানুষিক? কে জানে! কিংবা হয়ত সেই ছুরি চালনা বাংলা সংবাদ-পত্রের পুলিসের মৃদু লাঠি চালনার মতন কিছু?

যাই হোক, সঙ্গীতজ্ঞ মহলে তিনি উত্তরজীবনে আত্ম-বিঘোষিত 'জানকী বাঈ ছপ্পন ছুরি' নামেই সুপরিচিত হয়েছিলেন। একাধিক জানকী বাঈ এই পেশার ক্ষেত্রে সেকালে থাকার জন্যে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে হয়ত নীলকণ্ঠের মতন এই বিশেষণটি নামাঙ্গে ধারণ করতে হয় তাঁকে!

তাই মল্লারে সেই মাধুর্যময় 'ঝুমে ঝুমে বরষে বাদরিয়া' গানখানির শেষে বায়ুমণ্ডলে কম্পন জাগায়—মেরি নাম জানকী বাঈ ছপ্পন ছুরি।

—

কামড়

শ্রীশৈবাল চক্রবর্ত্তী

ছেলেটা বড় দুরন্ত হয়েছে। স্বামীস্ত্রী দু'জনেই ওই এতটুকু ছেলের দুরন্তপনায় নাজেহাল হয়ে উঠেছে।

বাড়ীটা বড় হ'লে হয়ত এতটা বোঝা যেত না, খোলা জায়গায় মধ্যে খেলত, ছুটোছুটি করে বেড়াত, কিন্তু এই একফালি পায়রার খোপের মত ঘরের মধ্যে যেদিকেই ও যায় সেখানেই একটা অনর্থ ঘটে।

রাস্তার ধারের ঘর, চৌকাঠ পেরিয়ে দু' ধাপ সিঁড়ির পরে চওড়া পিচের রাস্তা। হু হু ক'রে সেখান দিয়ে এমন বড় বড় গাড়ি ছুটে যায় যে, দেখে অমলার বুক কাঁপে।

তার চেয়ে দরজা বন্ধ থাকুক, ঘরের মধ্যে যা ইচ্ছে করুক ও। কাঁচের বাসন পেয়ালা-পীরিচগুলো ওর নাগালের বাইরে রাখলেই চলবে। বিছানা-বালিশ একটু 'এদিক্-ওদিক্ হ'লে আর কি এসে-যাবে, কিন্তু দরজা খোলা পেয়ে ও যদি রাস্তায় নেমে যায় তা হলে জীবনভোর আপশোস করা ছাড়া উপায় থাকবে না।

সাত নয়, পাঁচ নয় একটি মাত্তর ছেলে। যাকে বলে সবেধন নীলমণি।

সেকথা ঠিক, কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা জ্বলুনির মধ্যে এক-এক সময় খোকন এমন বিরক্ত করে তোলে যে, ভবেশ মাথা ঠিক রাখতে পারে না। দুম্ দুম্ ক'রে পিঠে কিল বসিয়ে দেয়, কি রান্নাঘরের দিকে মুখ বাড়িয়ে বলে, কই,তোমার ছেলে নিয়ে যাও।

আর ওই মানুষটাকেও ঠিক দোষ দেওয়া যায় না। অফিসে উদয়াস্ত কলম পিষেও বরাদ্দ কাজ শেষ করতে পারে না, বকেয়া বোঝা বাড়ীতে বয়ে আনতে হয়। খাটের ওপর রাজ্যের ফাইল-পত্র, চালান, রসিদ ইত্যাদি ছড়িয়ে যোগ-বিয়োগ গুণভাগ করবার সময় খোকন যদি একটা কাগজ নিয়ে পালায়, কি ফরফর ক'রে ছিঁড়ে দেয় তা হ'লে রাগ না ক'রে মানুষ যায় কোথা?

অফিসের রবার-ষ্ট্যাম্প আর প্যাড্‌টার ওপর খোকনের একটু বিশেষ লোভ। ভবেশ যখন ওইগুলি দিয়ে কাগজের ওপর পটাপট ছাপ মারে তখন খোকন নিবিষ্টমনে ব'সে ব'সে তাই দেখে। অনেক দিন ধ'রেই সে ওই দু'টি জিনিষ হাতাবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারে নি। ভবেশ অত্যন্ত সাবধানে সেগুলিকে ব্যবহার ক[illegible] কেননা সে জানে একবার ও দু'টি হাতে পেলে খো[illegible] সর্বাঙ্গে কালি মেখে তার কাগজপত্রের শোচনীয় দ[illegible] করবে।

তা ছাড়া প্যাডের ওই কালি মুখে গেলে যে সর্বনা[illegible] ঘটতে পারে তাও তার অজানা নয়। ওই দু'টি জিনি[illegible] নিয়ে তাই তার সতর্কতার আর শেষ নেই।

উঁচু তাকটার ওপর ফাইল-বাঁধা কাগজ, ষ্ট্যাম্প ইত্যাদি রেখেও নিস্তার নেই, খোকনের দুষ্টুমি ওই তাকটাকেও ছাড়িয়ে যায়। চেয়ারটাকে টেনে-হিঁচড়ে তাকের কাছে এনে সে বাবার সম্পত্তি বেদখল করতে চায়। একদিন স্নান সেরে ঘরে ঢুকতে ভবেশের চোখে এই দৃশ্য পড়ল। খোকা তখন সবে প্যাডটা হাতে নিয়ে খুলে গভীর অভিনিবেশ সহকারে তার ভেতরে দৃষ্টিপাত করছে।

—ও কি খোকন!

ডাক শুনে সে থতমত খেয়ে গেছে, বাবার চোখে চোখ পড়তেই তার চোখ-মুখ ভয়ে কি রকম শুকিয়ে গেছে।

—তুমি ওতে হাত দিয়েছ! বেশ ভয়-মাখান গলায় অবাক্ হওয়ার ভঙ্গিতে ভবেশ বলেছে, ওতে হাত দিলে কি হয় জান না বুঝি?

এপাশে-ওপাশে মাথা নেড়েছে খোকন। জানে না সে। পৃথিবীর অধিকাংশ নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে সে এখনও অজ্ঞ।

—ওতে হাত দিলে কামড়ে দেবে। প্রতিটি কথা আস্তে উচ্চারণ করে বলেছে ভবেশ।

—কে বাবা? সরল সহজ প্রশ্ন শিশুর কণ্ঠে। এই সামান্য জিনিষটার মধ্যে যে এত জটিলতা তা সে জানত না।

—সে আছে একজন, তার নাম হ'ল বড় সাহেব।

—বড় সাহেব কে বাবা? যেন একটা গল্পের মধ্যে ঢুকে পড়েছে পাঁচ বছরের বাচ্চাটা।

—বড়সাহেব হ'ল যার অফিসে আমি কাজ করি, সে; এইসব কাগজ-পত্তর, কালি-কলম সব তার। তার

জিনিষ নিয়ে যদি তুমি খেল, নোংরা কর তা হ'লে সে তোমায় কামড়ে দেবে।

—আমায় কামড়ে দেবে বাবা? বাবার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছে খোকন।

—দেবে না? চুল আঁচড়ে চিরুণীটা গামছায় মুছে রেখে দিল ভবেশ। অমলা ভাত বেড়ে ডাকছে।

বেশ কষ্ট ক'রে নিজে থেকেই চেয়ার থেকে নামে খোকন, তার পরে রান্নাঘরের পাশে যে ফালি জায়গাটুকুতে ব'সে তার বাবা ভাত খায় সেইখানে গিয়ে হাজির হয়।

—সত্যি বাবা, কামড়ে দেবে? ভবেশের হাঁটুতে কনুইয়ের ভর দিয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করে। কমন ক'রে দেখবে যে আমিই জিনিষে হাত দিয়েছি?

—বড় সাহেবরা সব দেখ'তে পায়, ভবেশ বলে। ভয় পেয়ে যদি ছেলেটা তাকে আর না বিরক্ত করে তা হ'লেই এই গল্প ফাঁদা তার সার্থক হবে, ভাবে সে।

তাদের সব জায়গায় চোখ আছে, কে কখন কি দুষ্টুমি করল, সব তারা জানতে পারে।

—সত্যি?

—সত্যি না ত কি! মাকে জিজ্ঞেস করো।

খোকন সঙ্গে সঙ্গে মা'র মুখের দিকে তাকায়। নীরবে মাথা হেলিয়ে অমলা ভবেশের কথা সমর্থন করে।

ভবেশ একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করে। একটা সামান্য কথায় যে ছেলেটাকে ও এই রকমভাবে ভোলাতে পারবে তা ও বিশ্বাস করতে পারছে না। ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে তুলতে একবার স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে নেয়, অমলার মুখে মৃদু কৌতুক। স্বামীর কাহিনী-রচনায় সে খুশী হয়েছে। এমনিতে ভবেশ বেশ রসিক-প্রকৃতির; বিয়ের প্রথম ক'বছরের কথা ভাবলে অমলা এখন উদাস হয়ে যায়। সেই মানুষটা আজকে সাত বছরে তিনটে অফিসের চাকরি বদলে কেমনি গোমড়ামুখো হয়ে গেল কি করে! সঞ্চয় বলতে কাণাকড়িও নেই, সাধ-আহ্লাদ বলতে অমলা এখন ডাল-ভাত রাঁধা বোঝে। সারাটা দিন দিস্তে দিস্তে কাগজের সঙ্গে কলম নিয়ে লড়াই ক'রে সন্ধ্যেবেলা ভবেশ যখন বাড়ী ফেরে তখন তার মুখের দিকে তাকিয়ে অমলার কান্না পায়।

ছেলেটার মনে বড় সাহেবের কামড়ে দেবার কথাটা বেশ চেপে বসেছে। সন্ধ্যেবেলায় অফিস থেকে ফিরে হাত-পা ধুয়ে ভবেশ কিছুক্ষণ ওর সঙ্গে খেলা করে। আজ কিন্তু সে-খেলায় খোকনের উৎসাহ নেই। হাঁটু মুড়ে তার ওপর ছেলেকে শুইয়ে হাসতে হাসতে বাপ বলছে, 'বল্, সোনাকুঁড়ে পড়বি না এঁটোকুঁড়ে?'

দু'-একবার খুব হৈ হৈ ক'রে হাসি হ'ল। হঠাৎ তাকে-রাখা কাগজগুলোর ওপর চোখ পড়তে খোকন বললে, বাবা, সকালে যে তুমি বললে—

—কি বললাম?

—ওই যে বললে বড়সাহেব কামড়ে দেবে—সত্যি বাবা?

—সত্যি। ভবেশ চোখ-মুখ বেঁকিয়ে বললে। ভীষণ জোর কামড়ে দেবে, বকুনিও দেবে।

খোকন আর একবার কাগজগুলোর দিকে তাকাল। ওতে জাহাজের মাল খালাসের বিচিত্র হিসেব, কুলীদের মাইনের খতিয়ান, ঠিকাদারদের রসিদ তাড়া-বাঁধা রয়েছে।

—তোমাদের বড় সাহেবের বুঝি বড় বড় দাঁত বাবা?

হাত দু'টো ফাঁক ক'রে একটা মাপ দেখায় ভবেশ।

—এ্যাত্তো বড়! খোকনের মুখে কথা সরে না।

ওর ভয়ার্ত মুখটা দেখে ভবেশের মায়া হয়। কিন্তু একটু মজাও পায় সে।

—খুব মোটা?

—খুব।

—বড় বড় দাঁত আছে?

—বাঃ, তা নেই! তা না থাকলে আর কামড়াবে কি দিয়ে?

একটুখানি সময় চুপ ক'রে রইল খোকন, তার পর বলল, সে তোমাদের কি করে?

—সে আমাদের কাজ দেয়। আমরা তার কাজ করি। কাজে ভুল হলে ভীষণ রেগে সে তার মুলো-দাঁত নিয়ে তেড়ে আসে।

—তুমি তাকে রোজ দেখ বাবা?

—দেখি বই কি। রোজ আমরা অফিসে গিয়ে তাকে নমস্কার করি। যেদিন তার মেজাজ খুশী থাকে সেদিন সে একটু হাসে। যেদিন রাগ ক'রে থাকে সেদিন কষে বকুনি দেয়।

—কামড়ায় না?

—বকুনি দিলেই আমরা এত ভয় পেয়ে যাই যে, আর কামড়াতে হয় না।

খোকা বাবার মুখের দিকে তাকায়। আস্তে আস্তে বাবার হাঁটুর ওপর হাত তুলে দেয় সে। তার বাবা যে রোজ বড় সাহেবের কাছে গিয়ে অক্ষত শরীরে ফিরে

আসে এতে বাবার সম্বন্ধে তার ধারণা উঁচু হয়ে যায়। বাবাকে মস্ত এক বীরপুরুষ ব'লে মনে হয় তার।

—আচ্ছা বাবা, বড় সাহেব কি একটা রাক্ষস?

এবার ভবেশের হাসি পায়। কিন্তু হাসলে সমস্ত ব্যাপারটা হাল্‌কা হয়ে যাবে তাই হাসি চেপে সে বলে, হ্যাঁ রাক্ষসই ত। তবে জামা-কাপড়পরা চুল-আঁচড়ানো রাক্ষস।

খোকার একটা ছবির রামায়ণ বই ছিল। সেটা সে পড়তে না পারুক উল্টে-পাল্টে দেখতে ভালবাসত। একছুটে বইটা এনে একটা পাতা খুলে আঙ্গুল দিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'এই রকম রাক্ষস বাবা?

—হুঁ, প্রায় ওই রকম···ভবেশ এখন ফাইল-পত্র পেড়েছে, আস্তে আস্তে মনটা ডুব দিচ্ছে তারই ভেতরে। বাইরের জ্ঞান তার লোপ পাচ্ছে। খোকা সেটা বুঝলে, বাবা বড় সাহেবের কাগজপত্র নিয়ে কাজ করছে এখন বাবার কাছে না বসাই ভাল।

গুটি গুটি সে মা'র কাছে চ'লে এল। অমলা তাকে এক হাতে ধ'রে পাশে বসিয়ে অন্য হাতে খুন্তি নাড়ে, কড়ায় জল ঢালে। মা'র সঙ্গেও তার যা কথা হয় তাও বেশীর ভাগ ওই বড় সাহেব নামক ভয়ংকরকে কেন্দ্র ক'রে। দুটো-চারটে কথার পরই মা'র কোলে মাথা ঢ'লে পড়ে ছেলের। 'এই, ওঠ ওঠ', অমলা ডাকে কিন্তু সাড়া পায় না। ঘুমে নিথর হয়ে পড়ে আছে ছেলেটা। সারাদিনের দাপিপনার পর মায়ের কোল পেয়ে এখন যে সে ঘুমবে এতে ত য় আশ্চর্য কি!

কিন্তু অমলা বিরক্ত হয় ছেলের ওপর। এই এক মুশকিল হ'ল, এখন ওর ঘুম ভাঙিয়ে ওকে দুধ খাওয়াতে তাকে বেশ ভুগতে হবে। জেগে থেকে সারাদিন তাকে জ্বালাবে এখন ঘুমিয়েও শান্তি নেই।

রাত্তিরে খেতে ব'সে একথা-সেকথার পর ঘুমন্ত খোকনের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ভবেশের মনে প'ড়ে যায়, বলে, আচ্ছা ভুত চেপেছে ছোঁড়ার ঘাড়ে।

—কি, ওই বড় সাহেব ত? অমলা রুটি ছিঁড়তে ছিঁড়তে প্রশ্ন করে।

—তা ছাড়া আবার কি। উঃ, প্রশ্ন ক'রে ক'রে আমার মাথা খারাপ করে দিল।

—থাক না বাপু, ওই ভয় নিয়ে যদি ও ওই কাগজগুলোর হাত না দেয় আর তোমাকে নিশ্চিন্তে কাজ করতে দেয় তাতে লাভ বই ক্ষতি নেই।

— একবার ভাব ত ওই টালিশীট কি ক্লিয়ারেন্স গাটি কিকেটের কপি যদি ও ফর্দাফাঁই করে তা হ'লে কি অবস্থা হবে আমার! হাজার হাজার টাকার ট্রাকটারের বিল আটকে থাকে ওই কাগজগুলোর জ কপালে ভুরু তুলে ভবেশ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ব্যাপার গুরুত্ব বোঝায়। তার চাকরিটা টাকার অঙ্ক হ'লেও মর্যাদায় যে বেশ ভারী তা-ও এই সঙ্গে জা দেওয়া হয়।

—যাক বাপু, ওই ভয় নিয়ে ও যদি একটু দূরে থাকে আর ওতে হাত না দেয় তা হ'লে অনেক ঝ থেকে বাঁচোয়া।

খেতে ব'সে কথাটা নিয়ে আর একবার ভাবে আর তার পরের দিন অফিসে হঠাৎ গোবিন্দন নায়া দিকে তাকিয়ে ভাবে যে এই লোকটাকে নিয়ে বাড়ীতে এখন কত কথাই হচ্ছে। গোবিন্দন না অবশ্য খুব সুশ্রী নয়, গায়ের রং মাজা কালো, বড় দাঁতের দুটো ত ধার থেকে সব সময় বেরিয়ে থা কিন্তু তাই ব'লে একটা বদ্‌রাগী-রাক্ষস ব'লে তা চালানো হয়ত ঠিক হচ্ছে না ভাবে ভবেশ।

এই ছোট অফিসটার সর্বেসর্বা ওই লোকটা মালিক গোকুলদাসজী ন'মাসে-ছ'মাসে এখানে পায়ে ধুলো দেন। হঠাৎ যেদিন তাঁর মনে পড়ে যায় যে, তাঁর বহুবিস্তৃত কারবারের মধ্যে ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্ট ও শিপিং একটি, সেদিন বিরাট হাম্বার গাড়িটা নিঃশব্দে এসে ব্রাবোর্ণ রোডের এই বাড়ীটার সামনে দাঁড়ায়। সারা অফিসটায় একটা হৈচৈ পড়ে যায় সেদিন। ম্যানেজারের ঘরের সামনে টাঙ্গানো যার সহাস্যমুখ ছবি, সেই অন্নদাতা আজ মূর্তিমান এসে দাঁড়িয়েছেন। বেশীক্ষণ কিন্তু থাকেন না গোকুলদাস, এক্সপেন্স য়্যাকাউণ্টে একবার চোখ বুলিয়ে দু'-একজন হোমরা-চোমরার সঙ্গে দেখা করে তাঁর গাড়িতে গিয়ে ওঠেন। ইতিমধ্যে গোটা পাঁচ-সাত ট্রাঙ্ককল এসেছে তাঁর দিল্লী বোম্বে আমেদাবাদ থেকে।

আর যতক্ষণ থাকেন গোকুলদাস, গোবিন্দন নায়ার তাঁর সঙ্গে ছায়ার মত লেগে থাকে। সে সময় সে কি ক্ষিপ্র, চটপটে ভাব তার! এই ও-ফাইলটা নিয়ে আসছে, এই অমুক ফিগারটা মুখে মুখে হিসেব ক'রে ব'লে দিল'। প্রফিট এণ্ড লস, সেলস্ ট্যাক্স, ইন্‌কাম ট্যাক্স সব ফুলঝুরির মত ছড়িয়ে পড়ছে তার মুখ থেকে। এই কারবারের সব ইতিবৃত্ত তার নখদর্পণে, যা জানতে চান গোকুলদাস তার অতিরিক্ত তথ্য তাঁকে জানিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে তাঁর হৃদয় চুরি করে গোবিন্দন নায়ার।

তারপর অধস্তন কেরাণীকুলের কাছে এসে নিজের কৃতিত্ব বিবৃত করে এবং মালিক যে আরও ব্যয়সংক্ষেপ

অধিক উৎপাদনের কথা ব'লে গেছেন তাও জানিয়ে দেয়। ভবেশ, নবনী আর শুভস্ সেকসনের আরও ক'জনার মুখে একটা অস্বস্তিকর অন্ধকার ঘনিয়ে আসে গোবিন্দন নায়ার সেটা উপভোগ করে। ইনিয়ে-বিনিয়ে গোবিন্দন নায়ার এ-কথাও বলে যে, গোকুলদাসজীর এই ব্যবসায় একটা পয়সারও মুখ দেখতে পান নি। তবে তিনি এটা খাড়া করে রেখেছেন কেন? সেটা তাঁর মহানুভবতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আজ ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্ট দরজা বন্ধ করলে দু'শোটি মানুষ যে তাদের বাচ্চাবাচ্চা নিয়ে আকাশের তলায় এসে দাঁড়াবে, তা তিনি জানেন।

গোবিন্দন নায়ার যতই বক্তৃতা মারুক, ভবেশ-নবনীরাও কম খবর রাখে না। তারা জানে গোকুল, দাসের পাট, চিনি, তৈলবীজ, কেমিক্যালস প্রভৃতি হাজারো ব্যবসায়ের লক্ষ লক্ষ টাকা ট্যাক্স ফাঁকি দেবার এটি একটি ছিদ্রমাত্র। এতে হাজার লাভ হ'লেও হিসেবের কারচুপি ক'রে লোকসান দেখানো হয়। গোবিন্দন নায়ারের ব্যাপার অন্য, সে পারে না এমন কাজ নেই। করেসপণ্ডেন্স, কষ্টিং ম্যানেজমেণ্ট কণ্ট্রোল থেকে আরম্ভ করে মালিকের মনোরঞ্জন—সব বিদ্যায় সে পাকা ঘুঘু একটি। সে যে গোকুলদাসের শুধু এই অবহেলিত অফিসটুকুরই কর্ণধার তা নয়, আরও তিনটে অফিসের কাগজপত্র সে দেখাশুনা করে এবং তার জন্যে মাইনের ওপর ভাউচারে তাকে কিছু মোটা টাকা পাইয়ে দেওয়া হয়। এ সবই জানে এরা; নবনী গোবিন্দন নায়ারের সঙ্গে আগে ইণ্ডিয়ান কপার কোম্পানীতে একসঙ্গে কাজ করেছে। কোন্ মন্ত্রে সে যে আকাশের এত কাছাকাছি উঠে এসেছে তা ওর জানা। গভর্ণমেন্টের দপ্তরে ওর প্রভাব অসীম। কোথায় কাকে ধরলে পারমিট আগে বেরিয়ে আসবে, বিনা ঝামেলায় লাইসেন্স পেতে হ'লে কার কাছে দরবার করা শ্রেয়ঃ এসব বলার জন্যে গোবিন্দন নায়ারকে এখন আর তার ছোট ডায়েরীটাও খুলতে হয় না।

ভবেশ অবশ্য তার অভিজ্ঞতার জোরেই চাকরিটা পেয়েছে কিন্তু তিন বছরের বেশী যে চাকরি টেঁকে নি তার দামই বা কত? তা ছাড়া চাকরিটাও ছিল নিতান্ত মামুলী ধাঁচের। এখন চাকুরিদাতারা বড় চাকরের অভিজ্ঞতার দাম দেয়। যেমন, গোবিন্দন নায়ারকে ন্যাশনাল শিপিং, ইণ্ডিয়ান কপার থেকে ভাঙ্গিয়ে এনেছে তিনশো টাকা বেশী মাইনে দিয়ে; এ ছাড়া সে বাড়ী-ভাড়া বাবদ পৌণে চারশ ও এক'শ টাকা পাচ্ছে কার-এলাউন্স।

সে তুলনায় ভবেশ-নবনীদের কি হয়েছে? ভবেশ হিসেব করে দেখেছে যে, ষ্টীল কর্পোরেশনের মাইনের চেয়ে সাকুল্যে এখন সে এগার টাকা কয়েক আনা বেশী পাচ্ছে, তেমনি অফিসটা দূর হওয়ায় তার গাড়িভাড়া পড়ছে আগের চেয়ে বেশী।

সে শুনতে পায় এখনকার ব্যবসা-বাণিজ্যের ধারা নাকি ভাল নয়। লাভটা প্রায় ক্ষেত্রেই অনিশ্চিত থাকে, আর প্রতি পদেই নানারকম বেয়াড়া ঝুঁকি নিতে হয়। প্রথমতঃ, লগ্নী ক'তে হয় অনেকগুলো টাকা, তারপর অন্য কোম্পানীর সঙ্গে কাজ ক'রে হয় পিছু হটো আর নয় বিনা-লাভে ব্যবসা ক'রে ঘরের টাকা বেনাবনে ছড়াও। আর গভর্ণমেন্টের সঙ্গে কাজ-কারবারের ত সাত ঝামেলা। এই খুঁত, সেই খুঁত, দফায় দফায় ইন্স্পেকশন, তারপর কাজ সারা হলে বিল পাশ হয়ে হাতে টাকা আসতে আসতে বছর ঘুরে যায়।

এই সব কথা বলত গোবিন্দন নায়ার আর ওদের মনের জোর কতখানি তাই পরীক্ষা ক'রে দেখত বোধ হয়। এক এক সময় অবাক্ হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে ভবেশ। সত্যি, এই একটা লোক এতবড় একটা অফিস চালাচ্ছে। অতি সাধারণ পরিচ্ছদ, কিন্তু কাজে-কর্মে লোকটার কি অসীম দক্ষতা! কাজের সময় সে সবারই মত একজন কর্মী; ভবেশের সীটের পাশে দাঁড়িয়ে তার পিঠে একটা চাপড় মেরে 'এই ক্যাল-কুলেশনটা দেখ ত ভায়া' ব'লে কাজটা সারা না-হওয়া পর্যন্ত ঠায় সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে। ভবেশ অস্বস্তি বোধ করে। একটা জলজ্যান্ত আড়াই-হাজারী মানুষ—যার কলমের আঁচড়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ওলট-পালট হয়ে যেতে পারে, সেই লোকটা তার সীটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে আর সে নিশ্চিন্তে ব'সে ব'সে কাজ করে কেমন ক'রে? 'রায় কুইক' এক তাড়া কাগজ ওর টেবিলে ফেলে দিয়ে মিস্ বাগচীর কাছ থেকে ব্যালান্স-সীটটা নিয়ে চৌধুরীকে কতকগুলো ড্রাফ্‌ট টাইপ করার জন্যে যখন ছুঁড়ে দিত তখন মনে হ'ত এ অফিসে বুঝি পিয়ন-বেয়ারা নেই।

নিজে যেমন কাজ করে তেমনি একসঙ্গে একশ'টা লোককে খাটাতেও পারে।

আবার আর একটা চেহারাও ছিল ওর। জাহাজে বুক-করা মাল কোন কারণে ড্যামেজ হয়ে গেলে যখন পার্টির কাছ থেকে চিঠি আসত তখন গোবিন্দন নায়ারের মুখে মেঘ জমত। সেই মুখ আরও ভয়ংকর হয়ে উঠত

কারও কাজে কোন গুরুতর ভুল পেলে। হাতের বুড়ো আঙুলটা তখন দাঁত দিয়ে কামড়াত খালি খালি। সবাই বুঝত, এটা বিস্ফোরণের পূর্বাভাষ।

একবার নবনীর গাফিলতির জন্যে একটা জাহাজ একদিন পরে খালাস পায়। কোম্পানীকে সে জন্যে ক'হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। জাহাজী কোম্পানী থেকে ওই চিঠিটা গোকুলদাস কোম্পানীর চারতলায় এসে পৌঁছনোর পর অফিসের চেহারাটা দেখবার মত হ'ল।

ঠিক যেন ঝড় উঠবে এই রকম থমথমে ভাব সমস্ত ঘরগুলোয়। কোন গোলমাল নেই, ফিস্‌ফাস্ যে যার টেবিলে কাজ ক'রে যাচ্ছে! বাচাল এ্যাংলো মেয়ে মিস্ পিয়ারসনটা পর্যন্ত চুপ হয়ে গেছে। এরই মধ্যে একটা ঘণ্টির আওয়াজ হ'ল, এ্যাকাউণ্টেণ্টকে সবাই গোবিন্দন নায়ারের ঘরে যেতে দেখল। হিসেব সে নিজেই ক'রে রেখেছিল, কাগজটা এগিয়ে দিয়ে আসছে মাস থেকে অর্ডারটা চালু করতে ব'লে দিল শুধু।

দু'বছরের জন্যে নবনীর বোনাস ইনক্রিমেণ্ট বন্ধ হয়ে গেল আর মাসে মাসে ত্রিশ টাকা করে তার মাইনে থেকে কাটা হবে যতদিন না কোম্পানীর গুণোগার-দেওয়া ওই টাকাটা পুরো উশুল হয়ে যায়।

এই অর্ডারের ব্যাখ্যা শুনে অন্য সবার যে-রকম মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল, নবনীর কিন্তু ঠিক ততটা হ'ল না; বছর তিনেকের মত তার চাকরিটা এখানে পাকা থাকছে এই রকম একটা আশ্বাস পেয়ে সে চাঙ্গা বোধ করল।

এই হ'ল তার দু'নম্বর চেহারা। কোন কটু কথা নেই, নেই তর্জন-গর্জনের লেশমাত্র। চেয়ারে একটু কাৎ হয়ে ব'সে পেন্সিলটা দাঁত দিয়ে কামড়াতে কামড়াতে সে নির্মমতার নিষ্ঠুরতম আদেশটি দিতে পারে। মিষ্টি কথার ছুরি দিয়ে যখন সে কারও মাংস কাটে কচ্‌কচ্‌ ক'রে তখনও তার গালে সেই টোল-পড়া নিজস্ব হাসিটি ফুটে উঠতে ভুল হয় না।

এই অফিসের কাগজপত্র বাড়ীতে এনে ভবেশ যে এই রকম সন্ত্রস্ত হয় তাতে অবাক্ হবার কি আছে! তার কাজ হ'ল কনট্রাকটরদের বিল পাশ করার আগে তাদের কাজের পরিমাণ যোগ-বিয়োগ ক'রে দেখা। জাহাজে কত বস্তা মাল উঠল-নামল এবং তাদের ওজন কত, প্রতি এক কুইণ্টাল মাল খালাসের রেট এক টাকা ... আনা হ'লে, সাড়ে সাত হাজার টন মালের খালাসী বোঝাইয়ের দাম কতয় গিয়ে দাঁড়াবে। অল্প কথায় কাজগুলো বাড়ীতে ব'সে করলে তাতে ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে কম।

প্রথম প্রথম অমলা এই নিয়ে আপত্তি করত। এখন এ তার গা-সওয়া হয়ে গেছে, তা ছাড়া মনিবকে সন্তুষ্ট ক'রে চাকরিটা বজায় রাখা যে কত দরকার, ঠেকে তাও সে বুঝতে শিখেছে।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা কাগজপত্তর মেলে ভবেশ কাজ করতে বসেছে এমন সময় দেশলাইয়ের বাক্স রেলগাড়ি করতে করতে খোকন ডেকে উঠল, বাবা।

—বল, কৌটো থেকে সিগারেট বার করে তাতে অগ্নিসংযোগ করতে করতে ভবেশ বলল।

—আজকেও বড় সাহেবকে দেখেছ বাবা?

—হুঁ, রোজই ত দেখি—।

—বাবা, বড় সাহেব তোমায় মারে না?

ভবেশ হেসে ফেলে, বলে, আমি ভাল কাজ করি, আমায় কেন মারবে? ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, তুমি লক্ষ্মী হয়ে থাকলে আমি তোমায় বকি?

আজ অমলার রান্নার পাট দুপুরেই সারা, সে ঘরে মাদুর বিছিয়ে শুয়ে ছিল। খোকন তার দিকে তাকিয়ে বলল, বকে মা?

—কোথায় বকে! তুমি লক্ষ্মী হয়ে থাকলে ত তোমায় কত জিনিষ কিনে দেয়। সেদিন তুমি লাটাই চাইলে, এনে দিল।

মা'র কাছ থেকে বাবার প্রশংসাপত্র পেয়ে খোকন একবার বাবার মুখের দিকে তাকাল, তারপর আবার মা'র দিকে ফিরে বলল, 'বাবা ভাল, না মা?'

—সে তুমি দেখ বিচার করে। অমলা স্বামীর দিকে চোখ রেখে বলে, আমার ত খুব একটা ভাল ঠেকে না।

পরিতৃপ্ত ভবেশ হাসিমুখে তার কাজে মন দেয়। অমলা ছেলেকে বুকের ওপর চেপে আদর করতে থাকে। দমচাপা গুমোটের মধ্যে এক ঝলক ফুরফুরে হাওয়া এসে ঢোকে।

কিন্তু আশ্চর্য! ছেলেটার মনে বারবার ওই এক প্রশ্নের আনাগোনা। বড় সাহেব নামে জীবটি কামড়ায় কেন আর কেনই বা বাবা রোজ তার কাছে যায়? বোধ হয় এই রহস্যের উদ্ঘাটন করার জন্যেই সে সেদিন চেয়ারটা তাকের কাছে টেনে ফাইলের ভেতর থেকে একটা হলদে রংয়ের মস্ত বড় ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট টেনে বার করে। বেশ তন্ময় হয়ে সে দেখছিল কিন্তু ভবেশ ঘরে পা দিয়ে এই দৃশ্য দেখে হাঁ হাঁ করে উঠেছে, ও কি খোকন, আবার? তোমার জন্য নেই একটুও?

জি ছেলে, দাও, দাও শীগগির…। বাবার রুদ্রমূর্তি খ ভয়ে খোকনের প্রাণ উড়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে গজটা সে বাবার হাতে দিয়ে দিয়েছে।

কাগজটা যথাস্থানে রাখতে রাখতে হাঁকাতে কাতে ছেলের দিকে তাকিয়ে ভবেশ ভাবে বকুনিটা ধহয় একটু বেশীই হয়ে গিয়েছে। রাগের মাথায় তুলে মারতে গিয়েছিল সে। কাগজটা অক্ষত াতে পেরে সে অনেক নিশ্চিন্ত বোধ করছে। হাতে ওকে কোলে তুলে নিয়ে তার গালে নিজের খ ঠেকিয়ে বলল, তুমি ভুলে গেছ তোমায় কি লেছিলাম?

—সেই বড় সাহেব কামড়ে দেবার কথা?

—হ্যাঁ, এই ত মনে আছে।

একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে খোকন জিজ্ঞেস করল, সত্যি বাবা কামড়ে দেবে?

—দেবে না, বা!

—খুব লাগবে?

—খুব লাগবে; তুমি কাঁদবে।

সেদিন খোকন আর কোন কথা বলে নি। বলল পরের দিন।

পরের দিনটা কেমন গোলমেলে ঠেকল ভবেশের। কাল হ'ল, পাখি ডাকল, সে বাজার চান-খাওয়া সব গারল, তবু যেন কেমন বেয়াড়া বেখাপ্পা লাগছিল। অফিসে পা দিয়েই ভবেশ বুঝল, আজ একটা কিছু হয়েছে।

কিন্তু তখনও পর্যন্ত কিছুই হয় নি। হ'ল পরে।

গুজ্‌গুজ্ ফুস্‌ফুস্ অনেকক্ষণ ধ'রেই চলছিল। অ্যাকাউন্টেণ্ট ক্যাশিয়ার দু'জনেই ঘন ঘন ম্যানেজারের ঘরে ঢুকছিলেন আর বেরুচ্ছিলেন। হঠাৎ এক সময় লে আলো-জ্বলা ঘরটার ভেতর ডাক পড়ল ভবেশের।

খুব আপ্যায়ন ক'রে তাকে বসিয়ে মুখে চুক্ চুক্ শব্দ করতে করতে গোবিন্দন নায়ার ব'লে উঠল, ভেরি সরি রায়…সত্যি আমি অ-ফুলি সরি। তোমার মত একজন এফিশিয়েণ্ট ওয়ার্কারকে…কিন্তু উপায় নেই, কোম্পানী এ ব্যবসা গুটিয়ে নিচ্ছে। সাদা টাইপ-করা কাগজটা ভবেশের হাতে তুলে দিতে দিতে গোবিন্দন নায়ার বলে, একমাসের মাইনে আমরা তোমায় দিয়ে দিচ্ছি, সেটা মালিকেরই হুকুম, আর একটা সার্টিফিকেট… ভবিষ্যতে তোমার কাজে লাগবে।

ঘরটা ঠাণ্ডা; এত ঠাণ্ডা ভবেশ আগে কখনও বুঝতে পারে নি। তার বুকের ভেতরটাও সেই ঠাণ্ডায় হিম হয়ে এল।

হাতের কাগজটা উল্টেপাল্টে দেখল ভবেশ, কি সুন্দর কাগজ! সচরাচর অফিসের সাধারণ কাজে এই কাগজ ব্যবহার করা হয় না। নিউ ইয়র্ক কি ম্যাঞ্চেষ্টারে চিঠি লেখবার সময় আলমারি খুলে এই কাগজ বার করা হয়।

চারজনে তারা বেরিয়ে এল। একটা শুকনো কাগজ আর কতকগুলো নিরর্থক নোট পকেটে পুরে। কি করবে তারা এই টাকাগুলো নিয়ে? যা ইচ্ছে তাই ফুর্তি করবে? তা দিয়ে যে-খুশী পাওয়া যাবে তা কি তাদের সামনের বেকার নিরন্ন দিনগুলিতে পারবে তাদের জীইয়ে রাখতে?

আজ অফিসে এসে এতটুকু না খেটে তাজা শরীর নিয়ে সে বাড়ী ফিরছে।

রোজ রোজ দেরি ক'রে ফিরলে অমলা রাগ করে। ঠাট্টা ক'রে বলে চটকলের চাকরি।

আজ তার খুশী হওয়ার কথা।

—কি হ'ল গো? শরীর খারাপ? খুশী নয়, বেশ উদ্বেগ নিয়েই প্রশ্ন করেছে অমলা, এত আগে ফিরলে যে?

—কাজ ফুরিয়ে গেল, তাই ফিরলাম। আশ্চর্য! ওরই মধ্যে মুখে হাসি টানল।

—তোমার কাজও ফুরোয়? একটু চোরা চাউনি হেনে বলল অমলা।

—ফুরোয় গো, ফুরোয়। নাও, এক কাপ চা খাওয়াও দিকি নি।

না, ওকে বলা যাবে না। অমলা চলে যেতে ভবেশ মন স্থির করে ফেলে। ওকে কাঁদতে দেখলে তার মন ভেঙ্গে যাবে। তার চেয়ে নিজে দুঃখ সওয়া ভাল।

তাতে মনটা সবল থাকবে। ভেতরটা শক্ত হয়ে আসবে। নইলে ডালহৌসীর বাড়ী বাড়ী ঘুরে নতুন কাজ খোঁজার উদ্যম আসবে কোত্থেকে?

হঠাৎ খোকা পাশ ফিরতে গিয়ে চোখ মেলে তাকে দেখতে পায়। বাবাকে এইসময় বাড়ীতে দেখে একটু অবাক্ হয় সে।

—এস, বাপি এস, ভবেশ তাকে কাছে টেনে নেয়।

—বাবা তুমি অফিস থেকে চলে এলে!

—হ্যাঁ, এই ত এক্ষুণি এলাম।

——বাবা, আমাকে বেড়ু করতে নিয়ে যাবে আজকে?

—হ্যাঁ যাব, চা খেয়ে নিই।

—বাবা, আজকে তোমার অফিসে বড় সাহেব এসেছিল?

—হ্যা বাবা।

খোকন বাবার হাঁটুতে মাথা এলিয়ে দেয়। তার চোখে ঘুম। হঠাৎ সে মাথা তোলে, তারপর প্রবীণের মত বাবার মুখখানা বেশ ক'রে দেখে আস্তে বলে, বাবা—

—কি বাবা?

—আজ বড় সাহেব তোমায় কামড়ে দিয়ে বাবা?

——

সত্য, মিথ্যা ও কল্পনা

সত্যবাদীর সত্য কথা এবং মিথ্যাবাদীর মিথ্যা কথার মধ্যে যে বৈপরীত্য, বাস্তব বিষয় এবং কবিকল্পনার মধ্যে সেরূপ বৈপরীত্য নাই। কারণ কবিকল্পনার মানসী-সত্তা আছে। বাস্তব পদার্থ ও বিষয় যেমন ক্ষণস্থায়ী বা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, কবিকল্পিত বস্তুও তেমনি ক্ষণস্থায়ী বা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে। কবি নিরঙ্কুশ বলিয়া তাঁহার কল্পিত বস্তু কখন কখন বাস্তব অপেক্ষা সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ হইতে পারে। অনেকে কবিকল্পিত নাটক উপন্যাসাদি মাত্রেরই পাঠের সম্পূর্ণ বিরোধী। কিন্তু যদি প্রমাণ হইয়া যায় যে রাম বা ভীষ্ম বা যুধিষ্ঠির বলিয়া কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন না, তাহা হইলে বাল্মীকি ও ব্যাসের মানসী সৃষ্টিগুলি কি তৎক্ষণাৎ মূল্যহীন হইয়া পড়িবে? ভগবান কবিকে নিজের সহকারী করিয়াছেন। সেইজন্য কবিকল্পনা প্রকল্পিত বস্তুকে মানস অস্তিত্ব দিতে পারে। মিথ্যাবাদীর মিথ্যা কথার মত কবিকল্পনা অলীক নহে।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বৈশাখ, ১৩২১।

ইতিহাস কথা কয়

শ্রীঅজিত চট্টোপাধ্যায়

(৭)

গ্রা দেখা এখানেই শেষ। সময় থাকলে আরও ছুদিন ঘুরতাম। দেখা কি শেষ হয় এত অল্প নে? কত শতাব্দীর ইতিহাস বুকে নিয়ে আগ্রা নগরী ড় আছে। আজ যে-পথ দিয়ে আমাদের টাঙ্গা চ্ছে, ঘোড়ার খুরের শব্দে ধ্বনিত হচ্ছে গতি, একদা ই পথে কত অশ্বারোহী, পদাতিক, কত রথী-মহারথী গিয়েছেন। তাদের কথা সব লেখা হয় নি। দের বেদনা-ব্যথা সবটুকু জানা যায় নি। ইতিহাসের য় নেই সব কথা বলতে পারে।

কাল রাত্রে আগ্রার হোটেলে শুয়ে অনেক কিছু বেছি। শেষ ফেব্রুয়ারীর নরম-গরম রোদে পিঠ পেতে বেড়িয়ে এই কটা দিন কি তৃপ্তিই না পাচ্ছি। ার মনে হয় হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে ঠিক বেড়ান যায় ভ্রমণের সময়টা অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করতে । পুজোর সময় আমার এক বন্ধু-দম্পতী পুরী য়ছিলেন। ফিরে আসতেই সাগ্রহে বললাম, কেমন লে হে? নীল সমুদ্রের ঢেউ তোমাদের চোখে-মুখে াছি কই?

বন্ধুর মুখে বিরক্তি। ঢেউ কোথায়? মুখখানা পচা পানার দামে-ভরা ছোট্ট এক ডোবা।

ভরসা পেতে বন্ধুপত্নীকে আশ্রয় করি। কিন্তু ভরসা বেন কে? বড় বড় চোখে সমুদ্রের ঢেউ নেই। আছে স্থির নীর।

বুঝলাম একটু আগেই দু'জনের একচোট হয়ে ছে।

বিরক্তি প্রকাশ করে বন্ধু বলল,—রা তোমার য়। নীলার কথামত গিয়ে আমি শুধু সমুদ্রের ানি-চোবানি খেয়েছি।

নীলাদেবী মৃদু আপত্তি করলেন, বা রে, আমার দোষ? আচ্ছা, আপনিই বলুন—

সর্বনাশ, স্বামী-স্ত্রীর বিবাদে মধ্যস্থতা। এমন বোকা অপবাদ আমার স্ত্রীও দিতে পারবেন না।

পুজোর সময় পুরী গিয়ে ভীষণ বিপদে পড়েছিল দু'জনে। কোন হোটেলে জায়গা নেই। ধর্মশালা, পান্থশালা সর্বত্রই ঠাঁই নেই ঠাই নেই রব। অতি কষ্টে কাটিয়েছে তিনটে দিন। সমুদ্র দেখেছে।

পুরীর মন্দির-চত্বরে হেঁটে বেড়িয়েছে। সারা বিকেল আর সন্ধ্যে বীচে বসে থেকেছে।

কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ভীষণ ভীড়ে দু'জনের কারুরই ভাল লাগে নি। কলকাতায় ফিরে এসে দম ফেলে যেন বেঁচেছে।

বন্ধু বলল—কি ভীড় জানিস্? বীচ ত নয়, যেন মধ্য কলকাতার পার্ক রে।

আমাদের কিন্তু এতটুকু খারাপ লাগে নি। ট্রেণে এসেছি আরামে, অনায়াসে। সহযাত্রীরা সকলেই রীতিমত ভদ্র। মনটা সব সময়ই তাজা আর প্রফুল্ল। হঠাৎ যেন বড় হাল্কা হয়ে গেছি। সংসারের সেই জোয়ালটা আর কাঁধে নেই। মনটা কি লঘু সব ভাল লাগছে। সব কিছুতে আনন্দ পাচ্ছি। আনন্দটা কিসের? নিশ্চয়ই মুক্তির। মুক্তির আনন্দ বৈকি। এর একটা নতুন স্বাদ, যা এতদিন বুঝি নি, এতদিন অনুভব করি নি।

এই হোটেল ছেড়ে কালই চলে যাব। শুয়ে শুয়ে ভাবলাম, হোটেল ছেড়ে নয়—আগ্রা ছেড়ে। কালই ছুটব দিল্লীর পথে। দিল্লী আর দূর নয়। মাত্র এক দিনের ব্যবধান।

শুয়ে শুয়ে. হঠাৎ একটা লেখা চোখে পড়ল। দরজার এক কোণে। আশ্চর্য! এতদিন চোখে পড়ে নি। পরিষ্কার বাংলায় লেখা। সম্ভবত মেয়েলী হাতে। লেখা আছে দু'টি নাম। রমা সেন ও প্রলয় সেন। তার নীচে তারিখ ও সময়। পনেরই আগষ্ট, রাত দুটো।

আশ্চর্য! ১৫ই আগষ্ট রাত দুটোর সময় রমা সেন আর প্রলয় সেন এই ঘরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিল কিংবা কথা বলেছিল এলোমেলো কখন খেয়ালবশে রমা সেন উঠে গিয়ে দরজার পাল্লার এককোণে নিজেদের নাম লিখেছে। সময় তারিখ সব উল্লেখ করে গেছে। লেখা দুটো আজও মোছে নি। তারপর ত কত রাত কেটে গেল। আরও কত স্বামী-স্ত্রী বন্ধুবান্ধবী এ ঘরে রাত কাটিয়েছে তার হিসেব হোটেলের খাতায় লেখা আছে।

কখন এক সময় আমাদেরও রাত শেষ হ'ল। অত খেয়াল করি নি। যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন বাইরে প্রচুর রোদ। হোটেলের পিছনটায় নানা গাছপালা। দূরে-কাছে কোথাও ঘরবাড়ী নেই। একটু বেশী পয়সা লাগে বটে কিন্তু আমাদের এই হোটেলের ব্যবস্থা বা সার্ভিসে কোন ত্রুটি নেই। পরিবেশটাও বড় সুন্দর। সামনে থেকে তাজমহল দেখা যাবে। পিছনে উন্মুক্ত দিগন্ত।

সকালের দিকে সামান্য একটু ঘুরে এলাম। সেই টাঙ্গাওলা। এই ক'দিন ওর সঙ্গেই ঘুরছি। বুড়ো মানুষ। লোকটা ভাল।

বললাম,—আজ তুফানেই চলে যাচ্ছি। তুমি ষ্টেশনে পৌঁছে দিও।

গাড়ি চালাতে চালাতেই সে বলল—জরুর হুজুর।

আগ্রা শহরটায় আর একবার ঘুরে বেড়ালাম, যেখানে-সেখানে। তাজমহল থেকে যে-পথটা যমুনার ধার ঘেঁষে চলে গেছে পন্টুন ব্রীজের দিকে, সে-পথ ধরে [illegible]য়ে গেলাম। বাঁ-দিকে আগ্রা কোর্ট সকালের ঈষৎ [illegible] রোদে ঝিমোচ্ছে। এখনও যেন ঘুম ভাঙ্গে নি।

খাওয়া-দাওয়া সেরে সামান্য বিশ্রাম নিচ্ছি। দরজায় [illegible]কা পড়ল। বুড়ো টাঙ্গাওলা ঠিক এসেছে। [illegible]পত্তর চাপিয়ে হোটেল ছেড়ে চললাম। আগ্রা [illegible]ন্টনমেন্ট ষ্টেশনে যাব।

ছায়া-ছায়া পথ, নিমগাছের ডালে কাক ব'সে। [illegible]টেলের সামনে মরশুমী ফুল ফুটেছে কত। টাঙ্গা [illegible]ছ। হোটেলের ম্যানেজার দূর থেকে নমস্কার [illegible]চ্ছেন। আমরাও হাত নাড়ছি। মনে মনে

ক্যান্টনমেন্টের পথ সুন্দর। পীচ-ঢালা। [illegible] প্রশস্ত। ফুল ফুটেছে পথের ধারে। সাজানো গোছানো বাড়ী। এদিকটা ভাঙ্গাচোরা নয়। [illegible] গ'ড়ে উঠেছে শহরটা, অবশেষে পৌঁছলাম আ[illegible] ষ্টেশন। আগ্রা ক্যান্টনমেন্ট। যে-ষ্টেশনে নেমেছিল[illegible] তার চেয়ে এটা অনেক বড়।

আমাদের সেই পুরাণো গাড়ি, তুফান এক্সপ্রে[illegible] তবে এখন আর ভীড় নেই গাড়িতে। যেন শ্র[illegible] ক্লান্ত গাড়িটা অনেক পথ দৌড়ে দৌড়ে এসে হাঁফাচ্ছে[illegible] গাড়ি ছাড়ল। গার্ডসাহেবের হুইসিল সজোরে বে[illegible] উঠল। রেলকর্মচারীর হাতে সবুজ পতাকা দুলছে[illegible] আর নয়। এবার আগ্রা ছেড়ে চল।

চল দিল্লী। দিল্লীর পথে :—

রেলপথে দিল্লী বেশী দূর নয়। আগ্রা থেকে নব্ব[illegible] মাইলের মত। ঘণ্টা তিন-চার লাগে। ছোট ছো[illegible] ষ্টেশন—রাজা কি মাণ্ডী, আরও কি যেন সব নাম[illegible] বহুদূরে সেকেন্দ্রার শুভ্র মার্বেল-নির্মিত গোলাকা[illegible] গম্বুজগুলি আবার চোখে পড়ল।

পথের পাশে বড় একটা ষ্টেশন এল, মথুরা জংশন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মথুরা। কবে কতদিন আগে ওর ধূলি-ধূসরিত পথে শ্রীকৃষ্ণ হেঁটে গিয়েছেন। ভক্ত ও পুণ্যার্থীর দল আজও শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তাই স্মরণ করে।

মথুরা ছাড়িয়ে আরও পথ। দু'পাশে ক্ষেত[illegible] গমের কিংবা অড়হরের হ'তে পারে। উট নিয়ে চাষী চলেছে ঘরের দিকে। কোথাও উটের সাহায্যে জল উঠছে। বহুদূরে কি একটা জনপদ। শেষ বেলার সূর্যের হলদে হাসি ওর বুকে কি নয়নাভিরাম দৃশ্যের রচনা করেছে।

ফরিদাবাদ। নানা কলকারখানা। আমরা পাঞ্জাবে এসে গেছি। কামরার মধ্যে অনেক সর্দারজী উঠেছেন। দিল্লী আর এক ঘণ্টারও কম।

সন্ধ্যের আগেই নিউ দিল্লী ষ্টেশনে গাড়ি ঢুকল।

(৮)

দিল্লীতে এলে কালীবাড়ীতে উঠবেন।

বাঙ্গালীর কালীবাড়ী। কম খরচে সুবন্দোবস্ত এবং আরাম অনেকখানি। তেতলার ওপর একটা

তলার ক্যান্টিনে খাওয়া-দাওয়া করবেন। এত খরচে যে রাজধানীতে থাকা যায় কালীবাড়ীতে ালে বুঝবেন না।

দিল্লী মহাভারতের দেশ। কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে ভীষণ সমর জ্বলে উঠেছিল, তা দিল্লী থেকে দূর নয়। দা দিল্লীরই সন্নিকটে যমুনার তীরে মহারাজ ষ্টির ইন্দ্রপ্রস্থের রচনা সুরু করেন। খ্রীষ্টের জন্মের দেড় হাজার বৎসর আগে এবং আনুমানিক খ্রী: পূ: ০ অব্দে ইন্দ্রপ্রস্থ বা ইন্দ্রপত্ রচিত হয়। ভারতের কথা সকলেরই জানা। বাঙ্গালীর ঘরে কাশীরাম দাসের কথা পুণ্যবান্ এখনও শোনে। া দুষ্মন্তের পত্নী আশ্রম-পালিতা শকুন্তলার গর্ভে তের জন্ম। রাজা ভরত সমগ্র হিন্দুস্থান জয় করে নাম দেন ভারতবর্ষ। ভরতের পুত্র হস্তিন হস্তিনাপুর াদের স্রষ্টা। হস্তিনের পুত্র কুরু। কুরুর পর ন্তনু। শান্তনুর পুত্র ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা সকলেই নেন। শান্তনুর অন্যতমা পত্নী সত্যবতীর গর্ভে চিত্রবীর্যের জন্ম। কিন্তু ভাগ্যহীন বিচিত্রবীর্য। র কোন পুত্র-সন্তান জন্মায় নি। হস্তিনাপুরের জপ্রাসাদে উত্তরাধিকারী নেই। তখন রাজমাতা াসদেবকে স্মরণ করলেন। অবিলম্বে ব্যাসদেব এলেন স্তনাপুরে। রাজবংশ লুপ্ত হ'তে চলেছে। হস্তিনাপুরের ংহাসনে উত্তরাধিকারী নেই। কাজেই ব্যাসদেব রসা। বিচিত্রবীর্যের বিধবা পত্নীদের কারও পুত্রসন্তান হ'লে হস্তিনাপুরের রাজবংশ আর প্রবাহিত াকে না।

ব্যাসদেব সম্মত হলেন। রাজমাতার অনুরোধ ানি প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। কিন্তু ব্যাসদেবের হারা ছিল ভয়ংকর। বহুদিন তপস্যার ফলে দৃষ্টি ঠোর,······মুখের রেখায় কাঠিন্যের স্পষ্ট ছাপ। নেক রাতে প্রথমা রাণীর ঘরে যখন এলেন ব্যাসদেব, খন রাণী ভয়ে চোখ বুজে রইলেন। দ্বিতীয়া রাণী ার মূর্তি দেখে আতংকে পাণ্ডুর হয়ে যান। যাই হোক, স্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদে ব্যাসদেবের তিনপুত্র ন্মগ্রহণ করল। প্রথমা রাণীর গর্ভে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র, িতীয়া রাণীর সন্তান পাণ্ডু। আর এক দাসীর গর্ভে বদুর জন্ম নিলেন। মহাভারত বলে যে, ভীষণ-দর্শন ব্যাসদেবকে এড়াতে রাণীরাই প্রথম রাত্রে এক দাসীকে নিজেদের ঘরে ফেলে রেখে পালিয়ে যান।

পাণ্ডু রাজার দুই পত্নী—কুন্তী ও মাদ্রী। কুন্তীর পুত্র যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন। মাদ্রীর গর্ভে জন্মালেন নকুল ও সহদেব। পাণ্ডুপুত্ররা পরিচিত হলেন পাণ্ডব নামে। অবশ্য পাণ্ডবদের জন্ম-রহস্যের কথা নতুন করে উল্লেখের প্রয়োজন নেই।

পাণ্ডু মারা গেলেন। অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র এলেন সিংহাসনে। রাজরাণী গান্ধারীর গর্ভে একশত পুত্র জন্ম নিল। তাদের মধ্যে দুর্যোধন ও দুঃশাসনই বড় ছিলেন। এদের নাম হ'ল কৌরব বা কুরুর উত্তর-সূরী। কৌরব আর পাণ্ডবদের বাদবিসম্বাদের অন্ত ছিল না। প্রতিদিন নিয়ত বিবাদ। রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের পাঠালেন খাণ্ডবপ্রস্থে। সেখানে নতুন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করুক তারা। হস্তিনাপুরের ঝগড়া-বিরোধ প্রশমিত হোক।

যমুনার তীরে নতুন দেশে গেলেন যুধিষ্ঠির। সম্ভবত দিল্লীর খুব নিকটেই জনপদ প্রতিষ্ঠা করেন। নতুন রাজধানীর নাম হ'ল ইন্দ্রপ্রস্থ। ঐশ্বর্যে বৈভবে দেবরাজ ইন্দ্রের স্বর্গের রাজধানীর মতই ইন্দ্রপ্রস্থ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। হয়ত তাই নাম হ'ল ইন্দ্রপ্রস্থ। অন্যদের মতে রাজধানী ইন্দ্রের নামে উৎসর্গীকৃত হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন, রাজধানী গড়ে উঠেছিল এক সমভূমির ওপর। ইন্দ্রের সমভূমি বা 'ইন্দ্র-কা-খেরা'। তাই যুধিষ্ঠির নাম দিয়েছিলেন ইন্দ্রপ্রস্থ।

দীর্ঘ সাত শতাব্দী ধ'রে ইন্দ্রপ্রস্থ পাণ্ডব রাজাদের বংশধরদের কাছে রাজধানীর সম্মান পেয়েছে। জানা গিয়েছে যে, রাজা দাস্তানের সময় হস্তিনাপুর বন্যায় ভেসে যায় এবং নগরী জনশূন্য হয়ে পড়ে। নতুন রাজধানীর অন্বেষণে রাজা দাস্তান সুদূর দক্ষিণে গিয়ে হাজির হন। কিন্তু অবশেষে তিনি ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে আসেন এবং ইন্দ্রপ্রস্থকে আবার রাজধানী করে তোলেন। পুরাণ-মতে রাজা যুধিষ্ঠিরের পরবর্তী ষষ্ঠ রাজা নিচক্র কৌশাম্বীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

প্রায় ত্রিশ পুরুষ ধরে পাণ্ডুবংশ রাজত্ব করে ইন্দ্রপ্রস্থে। যুধিষ্ঠির থেকে রাজা ক্ষেমক পর্যন্ত। কিন্তু তারপর আরও বহুদিন ইন্দ্রপ্রস্থ রাজধানীর

সম্মান লাভ করেছে। বিশরবংশ, গৌতমবংশ এবং ময়ূরবংশের কাছেও ইন্দ্রপ্রস্থই রাজধানীর সম্মান পেয়েছে। কালক্রমে ইন্দ্রপ্রস্থ কুমায়ুনের রাজা শুকৃয়াস্তর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। বার বৎসর পরে শুকয়াস্ত উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের কাছে পরাজয় স্বীকার করেন। কিন্তু ইন্দ্রপ্রস্থ তারও বহুদিন পূর্ব হ'তেই সমস্ত গৌরব ও বৈভব হারাতে সুরু করেছিল। সম্ভবত কুমায়ুন সীমানাভুক্ত হওয়ার আগেই ইন্দ্রপ্রস্থের আর কোন প্রসিদ্ধি ছিল না।

ইতিহাসে ইন্দ্রপ্রস্থের নাম বড়ই অস্পষ্ট। গ্রীক্ ঐতিহাসিকদের বিবরণীতে ইন্দ্রপ্রস্থের তেমন উল্লেখ নেই। এ-বিষয়ে এরিয়ান, ফেবিয়ান সকলেই নীরব। অথচ মথুরার উল্লেখ রয়েছে। গ্রীক্ ঐতিহাসিকেরা মথুরাকে মথুরা নামেই অভিহিত করে গেছেন।

কিন্তু ইন্দ্রপ্রস্থ কোথায় গেল? দিল্লীর আশেপাশে কোন ভগ্নস্তূপকে দেখিয়েই গাইড আপনাকে ইন্দ্রপ্রস্থের নির্দেশ দেবে না। অথচ হুইলার সাহেব বিশ্বাস করতেন যে, ইন্দ্রপ্রস্থের ভগ্নস্তূপ হস্তিনাপুরের চেয়েও অনেক বেশীভাবে পরিস্ফুট এবং দর্শনযোগ্য। কুতুব টাওয়ার পথে বিরাট্ প্রান্তরে, উঁচুনীচু মাটির ওপর কিছু কিছু ধ্বংসস্তূপ আছে। ঢিপির মত স্থান। বহু রাজা, ঘরবাড়ী প্রাসাদ অট্টালিকা, একদা এ-পথের পাশে গড়ে উঠেছিল। হয়ত বা এরই কোন-একটি খ্রীঃ পূঃ দেড় হাজার বছর আগেকার ইন্দ্রপ্রস্থ। অন্যদের মত ভিন্ন। জনৈক ভারতীয় পণ্ডিতের মতে, ইন্দ্রপ্রস্থ খলার কাছাকাছি অবস্থিত ছিল। কারও মতে, য়া দিল্লীরই একাংশে যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থের প্রতিষ্ঠা করেন।

কত বড় ছিল ইন্দ্রপ্রস্থ? সাড়ে তিন হাজার বছর আগেকার সেই নগরী আয়তনে ও সম্পদে কেমন রূপ নিয়েছিল।......

ইন্দ্রপ্রস্থের সঠিক ইতিহাস নেই। কাহিনী আর রূপকথায় সেই পরিচ্ছেদ ঢাকা পড়েছে।

লম্বায় ১০ মাইল ছিল ইন্দ্রপ্রস্থ। প্রস্থে ২ মাইল। একটি বিরাট্ পরিখা বেষ্টন করে ছিল রাজধানীকে। এই নালাটি প্রায় বত্রিশ হাত গভীর ছিল। প্রায় সাড়ে

তুলেছিল। এবং চৌষট্টিটি গেট নগরীর শোভা করত।

ইন্দ্রপ্রস্থ আর হস্তিনাপুর 'কালের চাপে পিষ্ট হয়েছে। কোন চিহ্নই আর নেই। ভাঙ্গা পরিত্যক্ত অট্টালিকা, সাড়ে তিন হাজার বছর আগের কোন স্মৃতি শত চেষ্টা করেও খুঁজে পাওয়া যায় ইন্দ্রপ্রস্থের অবস্থিতির কোন প্রামাণ্য দলিল নে অনেকটাই মনুষ্য-কল্পনামাত্র।

ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয় যজ্ঞ। হস্তিনাপুরে অশ্বমে রাজ্য পরিচালনার আর ইচ্ছা ছিল না যুধিষ্ঠিরের সশরীরে স্বর্গে আরোহণের আগে সাম্রাজ্য তিনি দু'ভাগ ভাগ করে দিয়ে যান। হস্তিনাপুর দিয়ে গেলেন পাণ্ডব বংশধর পরীক্ষিৎকে। ইন্দ্রপ্রস্থ পেলেন কুরুবংশের সন্তান যুযুৎসু।

(৯)

দিল্লীর বহু পুরাতন ও অবশ্য-দ্রষ্টব্য বস্তুটির মধ্যে লৌহস্তম্ভ বা 'Loha-ki-lat' অন্যতম। হুইলার সাহেব এটিকে পাণ্ডবদের স্তম্ভ বলে অভিহিত করেছেন। সৈয়দ আমেদ খান অবশ্য আরও একটু আধুনিক। তার মতে খ্রীঃ পূঃ ৮৯৫ অব্দে পাণ্ডব-বংশধর রাজা মেধব (MEDHAVA) এটিকে নির্মাণ করান।

লৌহস্তম্ভটি কুতুবমিনারের কাছেই। প্রায় তেইশ ফুট উঁচু এই লৌহস্তম্ভটি ঢালাই লোহার দ্বারা নির্মিত। এটি আমেদ সাহেবের অভিমত। অন্যদের অনেকেরই মতে লৌহস্তম্ভটি কোন একটি বিশেষ ধাতুর নির্মিত নয়। অনেকগুলি ধাতুর মিশ্রণে এটি একটি এ্যালয় (alloy) জাতীয় বস্তু।

লৌহস্তম্ভটিকে কেন্দ্র করে বহু কিংবদন্তী ছড়িয়ে পড়েছে। গল্পের মত সুন্দর এই ছোট্ট ছোট্ট কিংবদন্তীগুলি এই স্তম্ভটির প্রসিদ্ধি বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে দিতে অনেকখানি সাহায্য করেছে। কিংবদন্তী বলে, এই লৌহস্তম্ভটি রাজা অনঙ্গ পাল নির্মাণ করেন। রাজা অনঙ্গ পাল বা বেলান দেও Ton-war বংশের প্রতিষ্ঠাতা। একদা এক পুণ্যবান ব্রাহ্মণ-সন্তান তার কাছে এসে বলেন যে, এই লৌহস্তম্ভটি যদি নাগরাজ শেষ নাগের মস্তকে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া যায় তবে অনঙ্গ

[স]ন্দেহ ঢুকল। সত্যিই কি নাগরাজের মাথায় স্তম্ভটি [স্প]র্শ করতে পেরেছে? সন্দেহগ্রস্ত রাজা আদেশ দিলেন [লৌ]হস্তম্ভটিকে তুলে আনা হোক। শ্রমিকের দল রাজ-[আ]দেশ পালন করল। কিন্তু সভয়ে রাজা দেখলেন লৌহস্তম্ভটির এক প্রান্ত রক্তে রাঙা। সম্ভবত শেষ-নাগের মাথায় সেই প্রান্তটি বিদ্ধ হয়েছিল। আবার নতুন করে চেষ্টা হ'ল লৌহস্তম্ভটি আগের মতই প্রোথিত করতে। কিন্তু সব বৃথা। সর্পরাজ শেষনাগ তখন অন্যত্র চলে গিয়েছেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি সুন্দর শ্লোক রচিত হয়েছে—

—কিল্লি তো ঢিল্লি ভৈ
তোমর ভ্যয়া মৎ হিন—

অর্থাৎ, স্তম্ভটি আলগা হয়ে রয়েছে। তোমাদের ইচ্ছা আর পূর্ণ হবে না।

এই একই গল্প বিভিন্ন ভাবে রূপায়িত হয়েছে। [ক]বি চান্দ তার 'কিল্লি ঢিল্লি কথা'য় এই উপাখ্যানকেই [বি]বৃত করেছেন। তবে তার মতে এটি ঘটেছিল [দ্বি]তীয় অনঙ্গ পালের সময়। সৈয়দ আমেদ খানের [ম]তে এটি দিল্লীর শেষ হিন্দুরাজা রায় পিথোরা [(]পৃথিরাজ) নির্মাণ করেন।

চান্দ বলেছেন যে, রাজা দ্বিতীয় অনঙ্গ পাল তার [পৌ]ত্রের জন্মোৎসব পালন করবার সময় মুনি ব্যাসদেবকে [ব]রণ করেন। মুনি বললেন, রাজা, সুসময় সমাগত। [তো]মার রাজবংশ পৃথিবীতে অক্ষয় ও অমর হয়ে থাকবে [এ]বং লৌহকিলকটি শেষনাগের মস্তকদেশে বিদ্ধ হয়ে [থা]কবে। কিন্তু রাজা মুনির কথায় হেসে উঠলেন। অপমানে মুনি মনে পেলেন ব্যথা। একটি লৌহ-কিলককে সজোরে প্রবেশ করিয়ে দিলেন মৃত্তিকার অভ্যন্তরে। তারপর লৌহকিলকটিকে বের করিয়ে এনে রাজাকে দেখালেন। কিলকটির গায়ে রক্ত। তারপর অনঙ্গ পালকে উদ্দেশ করে মুনি বললেন—কিলকটির মতই তোমর সাম্রাজ্যের ভিত্তি আলগা।' তোমরদের পরই চৌহান এবং তারপর তুর্করা আধিপত্য বিস্তার করল।

কিংবদন্তী আরও রয়েছে। আক্রমণকারী নাদির-শাহ চেয়েছিলেন এই লৌহস্তম্ভটিকে ভেঙ্গে দিতে এবং তার আদেশে শ্রমিকের দল এ-কাজে রত হয়েছিল। কিন্তু নাগরাজ শেষনাগ তার মস্তক হেলনের ফলে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয় এবং শ্রমিকের দল কার্য ত্যাগ করে পলায়ন করে। মারাঠারা চেয়েছিল কামানের গোলায় এটিকে উড়িয়ে দিতে। কিন্তু এর গায়ে গোলার দাগ সৃষ্টি ছাড়া আর কিছু করতে সক্ষম হয় নি।

লৌহস্তম্ভটির গায়ে কয়েকটি শ্লোক খোদিত করা আছে। লিপির ভাষা পুরাতন নাগরী হরফে। এর পাঠোদ্ধার করার জন্য বহু চেষ্টা হয়েছে। ক্যাপ্টেন আর্চার, উইলিয়ম এলিয়ট এবং সর্বশেষে জেমস প্রিন্সেপ এর একটি ভাষ্য করতে সমর্থ হয়েছেন। আবার ডক্টর ভাউ দাজী প্রিন্সেপ সাহেবের ব্যাখ্যার মধ্যে কয়েকটি ভুল এবং অসঙ্গতি দেখিয়ে শ্লোকগুলির একটি নতুন অর্থ নির্ণয় করেছেন।

এই লিপি কোন্ সুদূর অতীতে লেখা হয়েছিল তাই নিয়েও নানা মুনির নানা মত। কারও মতে এগুলি গুপ্তযুগে লিখিত হয়েছিল, কারও মতে এগুলি মৌখরী-বংশের সময়ে লৌহগাত্রে উৎকীর্ণ হয়েছিল।

কিন্তু লিপির সময় উদ্ধার করা সন্ধানী ঐতিহাসিকের কাজ। কিংবা ইতিহাসের কোন গবেষকের বিষয়বস্তু। যাই হোক এরূপ কল্পনা করাও নিতান্ত অসম্ভব নয় যে, সুরুতে লৌহস্তম্ভটি এর বর্তমান স্থানে প্রোথিত ছিল না। সম্ভবত কোন বিষ্ণুমন্দিরের চত্বরে এটিকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। কিন্তু সেই বিষ্ণুমন্দির বা বিষ্ণু-পাদ-গিরি আজ মনুষ্য কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। কুতুবউদ্দিন আইবক যখন মিনারের কাজ সুরু করেন তখন লৌহস্তম্ভটিকে তিনি বিনষ্ট করতে চান নি। হয়ত আলাউদ্দিন খিলজীও সেটুকু সহিষ্ণুতা দেখিয়েছিলেন।

তবে কুতুবউদ্দিন আইবক বা আলাউদ্দিন খিলজীর মিনারের গল্প এখন নয়
সে কাহিনী বারান্তরে। (ক্রমশঃ)

রায়বাড়ী

গিরিবালা দেবী

মা ভোগশালায় কাজে আবদ্ধ। ঠাকুমা বিনুকে তেল মাখাইয়া স্নান করিতে লইয়া চলিলেন নদীর ঘাটে। ভরা বর্ষায় যখন নদীনালা এক হইয়া যায় তখন ভিন্ন দুর্গাসুন্দরী আর পুকুরে স্নান করেন না। চলতি জলে যে গঙ্গা যমুনা গোদাবরী মিশিয়া রহিয়াছে। এইখ'নেই ডুব দিলে গঙ্গাস্নানের ফল পাওয়া যায়।

বিনু গোয়ালপাড়ার ভিতর দিয়া নদীতে যাইতে শুনিল যশোদা-বৌ পিত্রালয়ে গিয়াছে।

বিনু ক্ষুণ্ণ হইল, যশোদা-বৌ তাহাকে বড় ভালবাসে, দেখা হইবে না। যশোদা-বৌএর শাশুড়ী ননদিনী বাহির হইয়া বিনুকে কুশল প্রশ্ন করিল। আরও কতজনা পথে আসিয়া কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। বিনু যে গোটা গ্রামের স্নেহের দুলালী।

কতদিন পরে হীরাসাগর। জল নামিয়া গিয়াছে কাশের শ্রেণীর নিম্নে, উঁচু তটের কোলে বালি ঝক্ ঝক্ করিতেছে। পারে সেই হেলিয়া-পড়া প্রাচীন বটবৃক্ষ, যাহার শাখায় শাখায় অগণিত পাখীর বাসা। মাছ-রাঙ্গার আবাসস্থল। টিটি পক্ষী টিহি টিহি শব্দ করিয়া উড়িতেছে, সঙ্গে শঙ্খচিল।

বিনু তীরে দাঁড়াইয়া মুগ্ধনেত্রে তাকাইয়া রহিল [illegible]দীর তরঙ্গভঙ্গের দিকে। হীরাসাগর তাহার কাছে [illegible]রাতন হয় না। যতবার চোখ মেলে বিনু ততবার [illegible] নব রূপে উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে।

ঠাকুমা বিনুর গাত্র মার্জ্জনা করিয়া দিতে লাগিলেন [illegible]বানে নহে, সাজিমাটিতে।

ঘাটে একে একে দেখা দিতে লাগিলেন গৃহিণীর[illegible]। তাহাদের সহিত স্নানে নামিল পণ্ডিত বাড়ীর [illegible]শি। আকাশি বিনু অপেক্ষা বছর-দুইয়ের বড়। [illegible]র সাদামাঠা সরল স্বভাবের জন্যে বিনুর সহিত [illegible] আছে। প্রখর বুদ্ধিসম্পন্না মেয়েদের সহিত বিনু [illegible]ন মিশিতে পারে না, বাধ-বাধ লাগে। সেই কারণে [illegible] তাহার বন্ধুর সংখ্যা বিরল।

বিনু গলা-জলে দাঁড়াইয়া একের পরে এক ডুব [illegible]ছিল। শীতের প্রারম্ভ হইলেও রৌদ্রকিরণে [illegible]র শীতলতা নাই।

"বিনু, কশাড় বনের দিকে স'রে আয়, তোর সাথে আমার কথা আছে। তুই এসেছিস শুনে কাল সন্ধ্যাবেলা আমি তোর কাছে যেতে চেয়েছিলাম, মা যেতে দিলেন না।"

ঘাটের বর্ষিয়সী হাসলেন মুখ টিপিয়া। কেউ অনুচ্চস্বরে আর একজনাকে বলেন, "বিয়ে ঠিক হয়েছে, তাই আহ্লাদে আটখানা হয়ে বলবে ওকে। তর সইছে না দুলির।"

"যেই না আমার বিয়ে তার আবার চিতরি বাজনা" বলিয়া আর এক বর্ষিয়সী জলে ডুব দিতে থাকেন।"

ঠাকুমার স্নানের পরে গলাজলে দাঁড়াইয়া সূর্য্য প্রণাম, পূর্ব্বপুরুষদের নামে নামে জলগণ্ডুষ প্রদান, জপ পূজা কম থাকে না, এই অবকাশে বিনু উপস্থিত হয় আকাশির কাছে।

কশাড় বনের গাছে তেঁতুলগাছের গুঁড়িতে উভয়ে উপবেশন করে—আকাশি বলিতে আরম্ভ করে, "দেখ বিনু এতদিনে তোদের দুলির বিয়ের ফুল ফুটল রে! বোনেদের বিয়ের বাধা ঘুচে গেল। আমি সকলের রাস্তা জুড়ে আপদ-বালাই হয়েছিলাম। দুটো মন্তর পড়ে ফুল ছিটিয়ে দিয়ে আমাকে উদ্ধার করবার লোক ঠিক হয়েছে।"

বিনু নিরুত্তরে ভেজা চোখে আকাশির মুখের পানে তাকাইয়া থাকে। ভাগ্যবিড়ম্বিতা আকাশি।

আকাশির বাবা যাদব পণ্ডিত বন্দরের হাইস্কুলের হেড পণ্ডিত। তাঁহার চার কন্যা এক পুত্র। মেয়েরা বড়। আকাশি তাঁহাদের প্রথম সন্তান। বিকলাঙ্গ অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। তাহার ডান হাতখানা প্রায় বুকের সঙ্গে সংলগ্ন, শুষ্ক কাঠের মতন ডান পায়ের জোর কম হইলেও চলাফেরা করিতে অসুবিধা নাই। এই খুঁত ছাড়া আকাশির ন্যায় অপূর্ব্ব সুন্দরী মেয়ে সচরাচর কাহারও চোখে পড়ে না। আকাশির বিবাহ হয় না। যাহার দক্ষিণহস্ত অনড় তাহাকে কে বিবাহ করিবে? পরের বোনগুলি বিবাহের বয়সপ্রাপ্ত হইতেছে। শাস্ত্রানুযায়ী জ্যেষ্ঠার বিবাহ না হইলে সেগুলির গতি-মুক্তি করিতে কেহ অগ্রসর হইতে চাহে

ডুয়া হাবুডুবু খাইতেছিলেন। এমন সময় আকাশির ভাগ্যবিধাতা প্রসন্ন হইলেন।

আকাশির এত বড় সৌভাগ্যের খবরে বিনু চুপ করিয়া রহিল দেখিয়া আকাশি ঈষৎ আহত হইয়া বলিল, "তুই চুপ করে রয়েছিস কেন রে? এই মাসের তিরিশে তারিখে আমার বিয়ে, গয়নাও গড়ানো হয়েছে। দেখতে আসিস একদিন গয়নাগাঁটি।"

আকাশির যে কখনও বিবাহ হইতে পারে বিনু তাহা প্রত্যাশা করে নাই, তাই ক্ষণেকের জন্য বিমূঢ় হইয়াছিল। এখন সে উৎসাহভরে জিজ্ঞাসা করিল, "কার সাথে তোর বিয়ে রে? তার নাম কি? কোন গাঁয়ে থাকে? বিয়ে হলেই যে তোকে যেতে হ'বে শ্বশুর বাড়ীতে। একখানা হাত নিয়ে সেখানে তোর বড় কষ্ট হবে আকাশি।"

"না রে বিনু তারা কেন নুলো বউকে ঘরে নিতে যাবে? আমি যেমন আছি তেমন থাকব। সাগরপুরের কুলীন বামুন, এখন ত নাম নিতে দোষ নেই, সাতপাক ঘুরি নি। বরের নাম দয়াময় ভাদুড়ী। মা আছে, বাপ নাই, বড় গরীব, বাড়ীতে একখানার বেশি ঘর নেই। ওর বিয়ে ঠিক হয়ে আছে, পয়লা মাঘ বিয়ে হবে। তাই এর জন্যে একখানা ঘরের দরকার। বাবা তাকে ঘর তুলতে একশ' টাকা দেবেন, তাই সে সাতপাক ঘুরে মন্তর পড়তে রাজি হয়েছে। বিয়ের পরের দিনই টাকা নিয়ে চ'লে যাবে। তারপরে বাতাসী উদাসীর বিয়ে। এক ঘরের দুই ভাইয়ের সাথে ঠিক হ'য়ে রয়েছে। আমার না হ'লে ছোটদের হ'তে পারে না এই জন্যেই এতদিন দেরি হল। আমাদের বোনেরা সুন্দর ব'লে ওদেরকে আদর ক'রে নিতে চায়।"

বিনু বলে, "তোর মতন কেউ অত সুন্দর নয় আকাশি। সকলে বলে তুই পরী। তোর হাতটার জন্যেই যত জ্বালা। হ্যাঁরে, তোর কি গয়না হয়েছে? এক হাতে গয়না পরবি কি করে? সোজা হয় না?"

"নুলোরা যেমন গয়না পরতে পারে মা তেমনি গয়নাই গড়িয়েছেন। নারকেলফুল সুতোয় গাঁথা, বিছে মালা, কাণবালা আংটি নথ, পায়ে গুজরী। মা নিজের গয়না ভেঙ্গে আমাদের তিন বোনের একসমান করে গয়না গড়িয়ে রেখেছেন। সুহাসী এখনও ছোট, তার জন্যেও কাটা তাবিজ আর চিক রেখেছেন। মা'র গয়না ছিল তাই রক্ষে। এমনিইত কত জমি বাবার বেচতে হ'ল বিয়ের খরচের জন্যে।"

আকাশির সংসারীর কথা শুনতে বিনুর ভাল লাগছিল না। তাকে টানছিল হীরাসাগরের কল কল ছল ছল জলকল্লোল।

বিনু বলিল, "ঠাকুমার জপ-তপ হয়ে গেল বুঝি, এক্ষুনি তাড়া দেবেন। আমার একটুও সাঁতার কাটা হ'ল না।"

আকাশি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "কাকে নিয়ে সাঁতার দিবি রে, পাড়ার মেয়েরা এখনও নাইতে আসে নি। এসেছে নাকটেপা বুড়োর দল। আর একটা কথা তোকে বলে দেই—সাবধান, আমার বিয়ের কথা কাউকে বলিস নে। লোক জানাজানি করলে ভাংচি দেবে।"

"ভাংচি?"

"হ্যাঁ, ভাংচি। আমার মতন নুলোর বিয়ে, বাবার দায়মুক্ত, এই হিংসায় বরের কাছে গাঁয়ের লোকের লাগানি-ভাঙ্গানির নাম ভাংচি দেওয়া। সেই ভয়ে মা এখন আমাকে কারোর বাড়ীতে যেতে দিতে চান না।"

"না, আমি কাউকে বলব না।" বলিয়া বিনু জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তাহার পরে সুরু হইয়া গেল সাঁতার কাটা, জলের সহিত মাতন।

ক্ষণকাল পরে দুর্গাসুন্দরীর জপতপ শেষ হইলে তিনি হাঁক-ডাক আরম্ভ করিলেন, "এই বিনু, আর নয় খুব হয়েছে, এখন উঠে আয়। বেলা হয়েছে, আমার সৃষ্টি পড়ে রয়েছে।"

ঠাকুমার তাড়নায় বিনুকে অনিচ্ছার সহিত জল হইতে উঠিতে হইল। তখন আকাশি স্নানে নামিয়াছে। তাহার মাথাভরা কালো কুচকুচে চুল আলগা হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে চোখে-মুখে। বিনুর মনে হইল একটি প্রফুল্ল কমল যেমন প্রস্ফুটিত হইয়া ঘাট আলো করিতেছে।

দ্বিপ্রহরের আহারাদির পর বিনু বাবাকে চিঠি লিখিতে বসিল। ঠাকুমার হাতে পৈতার টেকো, মা'র হস্তে তুলা। ইঁহাদের দিবানিদ্রার অভ্যাস নাই। গোটা দুপুর কাটিয়া যায় শাশুড়ী-বধূর নানারূপ হালকা কাজে। দুর্গাসুন্দরীর মত পৈতা কাটিতে কেহ পারে না। হেমাঙ্গিনীর কাটা পৈতা অমন সমান সরু হয় না। বাড়ীতে অজস্র জটা কার্পাসের গাছ। হেমাঙ্গিনী সময় পাইলেই তুলা পিঁজিয়া বাঁশের চোঙার ভিতরে 'সাজ' করিয়া রাখিয়া দেয়। দুর্গাসুন্দরী সুতা কাটেন ঝুরুর ঝুরুর শব্দ করিয়া। ব্রাহ্মণের বাড়ীতে

বিশেষতঃ রাবণের গোষ্ঠীদের পৈতা অল্প লাগে না। দুর্গাসুন্দরীর হাতের মিহি পৈতার সমাদর সর্ব্বত্র। দেশ-দেশান্তরে পৈতা চালিত হয়। পালা-পার্ব্বণেও যজ্ঞসূত্রের প্রয়োজন হয়। ইহা ভিন্ন পশম ও ক্রুশকাঠি লইয়া অবকাশ সময় দুই শাশুড়ী-বধূ বসিয়া যান টুপি মোজা গলাবন্ধ বুনিতে। কখন বা ফুলপাতা নক্সার কাঁথা সেলাইতে অবকাশ অতিবাহিত হয়। আমের সময় সেলাই তোলা থাকে। আমদী হইতে আচার মোরব্বা আমসত্ত্বে আমকাল কাটিয়া যায়। ইহার মধ্যে ঘরে ঘরে বিবাহের পিঁড়ি আলপনা আছে। কড়ি সংযোগে পাটের শিকা বোনা আছে। পুরাণ পাঠ আছে।

বিনুর বাবাকে চিঠি লেখা শেষ হইল। সে চিঠিখানা আগাইয়া দিল মায়ের দিকে।

ঠাকুমা টেকোয় সুতা জড়াইতে জড়াইতে নাত্‌নীর পানে চোখ তুলিয়া কহিলেন, "তোর বিয়ের সময় মেজ-বৌ যে বাণ্ডিল ধরে পশম দিয়েছিল তোর বাক্সে, সেগুলো দিয়ে কিছু বুনেছিস কি? তুই ত দিব্যি বুনতে শিখেছিলি বিনু?"

বিনু সহসা ঝাঁজিয়া ওঠে, "বুনব কখন? সময় পেলে ত? একবার খাতা লিখতে হবে, বই মুখস্ত করতে হবে, আবার নিয়মের ঘরে ঢুকতে হবে, পত্তর পাওয়া মাত্তর উত্তর দিতে হবে। এত সবের ভেতরে উল বোনা।"

ঠাকুমা কামিনীর মা'র নিকট হইতে বিনুর কর্ম্ম-তালিকা শুনিয়া লইয়াছিলেন। হাসিয়া কহিলেন, "যাদের কাজের অত লোকজন সেখানে একটু হুটুর-পুটুর করেই কি গলে যাবি বিনু? দেখ ত তোর মা দিনরাত কত কাজ করে? কাজকে ভয় পেলে কাজ বোঝা হয়। হালকা ভাবলে গায়ে লাগে না। ছোট দেওর ননদরা রয়েছে, শীতের সময় তাদের কিছু বুনে দিস, ফিরে গিয়ে। তারা কত খুসী হবে।"

"তাদের খুসী করতে আমার বয়ে গেছে।" বলিয়া বিনু ঘরের বাহির হইল।

বিনুর অপেক্ষায় কয়েকটা ডাঁসা পেয়ারা সংগ্রহ করিয়া পেমো বসিয়াছিল ঢেঁকিশালায় ঢেঁকির উপরে।

প্রভাতে পায়রাগুলিকে ভালরূপে পর্য্যবেক্ষণ করা হয় নাই। পায়রার ঝাঁক মাঠে গিয়াছিল খাদ্যানুসন্ধানে। খোপে ছিল ডিমে তা-দেওয়া-রত কপোতীরা আর শক্তিহীন শাবক।

ভরা দুপুর, বাহিরে রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। বিশ্রাম করিতেছে। কোন কোনটা মৃদু মৃদু গুঞ্জ তুলিতেছে "বাক বাক কুঁ, বাক বাক কুঁ।"

বিনু খোপের সামনে উপনীত হইয়া ডাকিতে লাগিল "এই লোটন, ছোটন, তিলমণি, টগরফুটি আয়, আয় আয়।"

পায়রা বিশ্রাম-সুখ অবহেলা করিয়া বিনুর সস্নেহ আহ্বানে সাড়া দিল না। বাহিরে আসিল না।

অভিমানে বিনুর চোখ জলে ভরিয়া গেল। কি অকৃতজ্ঞ জগৎ! দুই দিনের অদর্শনে সকলে সকলকে ভুলিয়া যায়। নহিলে যে লালমণি বিনুর পদধ্বনিতে চকিত হইয়া ছুটিয়া আসিত, সেই কি না তাহার বাছুরের কাছে বিনুকে দেখিয়া শিং বাঁকাইয়া তাড়িয়া আসিয়াছিল।

বিনু গিয়া পেমোর অদূরে ঢেঁকিতে উপবেশন করিল। পেমো সাগ্রহে অঞ্চল হইতে বাহির করিয়া দিল চারটা পেয়ারা—তাহার অন্বেষণের ফল।

বিনু সানন্দে প্রশ্ন করিল, "এখনও কি আমাদের গাছে পেয়ারা আছে? কোথায় পেলি রে?"

"সগল গাছ খুঁজিপাতি পাইচি ঠাকুজ্জি। আরও একটু একটু কষা রইচে পাড়ার মধ্যি।"

"সেগুলো বড় হ'তে হ'তে আমাকে ওরা নিয়ে যাবে। তুই মজা করে খাস পেমো।"

পেমো ক্ষুণ্ণ হইয়া চুপ করিয়া রহিল। বিনু দুইটা পেয়ারা পেমোকে দিয়া একটা পেয়ারা আঁচলে মুছিয়া কাপড় দিতে লাগিল। পেয়ারা মুখে তুলিয়া মনে পড়িল তরুকে। সে কত দুর্লভ জিনিষ বিনুকে গোপনে খাইতে দিয়াছে। সে এখানে আসিবার সময় পথের পাশে দাঁড়াইয়া কেমন 'টু' দিয়াছিল। 'বইদি যাব' বলিয়া সুমন্ত কত কান্না কাঁদিয়াছিল। মানুষ মানুষকে যত ভালবাসিতে পারে তাহা কপোত-কপোতী, লালমণি গাভী কোথায় পাইবে? উহাদের অপেক্ষা হীরাসাগর নদী তাহাকে ভালবাসে। ঘন অরণ্যানী ভালবাসে। তাহারা কথা কহিতে না পারিলেও বিনু হৃদয় দিয়া অনুভব করিতে পারে তাহাদের অব্যক্ত ভাষা। হীরা-সাগরের জলে ডুব দিলেই বিনু শুনিতে পায় ছল ছল ফিস ফিস করিয়া হীরাসাগর ডাকে, "বিনু আয়, আয়, আমার গভীরে আয়।" অরণ্যও সস্নেহে আহ্বান করে, "আয় আয়, আমার গহনে আয়।"

বিনুকে বিমনা দেখিয়া পেমো প্রস্তাব করে,

াকুজ্জি। আমি ঘরডা নেপিপুঁছি টলটলে করি থুইগা। ল তুমি রাঁধন-বাড়ন থ্যালা করিবা?"

বিনু পেয়ারা চিবাইতে চিবাইতে পেমোকে ধমক দেয়, "ধ্যেৎ, এখন মাটির হাঁড়ি-কুড়ি নিয়ে খেলা করবে কে? আমি যে বড় হয়ে গেছি।"

পেমো চোরা কটাক্ষ বারেক বিনুর প্রতি নিক্ষেপ করিয়া ভয়ে ভয়ে ফের বলে, "তা হলি তোমাগো পুতলা গুলান বার করি আন গা, কতদিন পুতলা থ্যালন কর না। ভরা দুকুরে করিবা কি?"

"আমি কি তোর মত, আমার কি লেখাপড়া নেই? পুতুল খেলার বয়েস উঠছে? মূর্খ হয়ে থাকার চেয়ে দুঃখ আর জগতে নেই। লেখাপড়া শিখলে পৃথিবীর কত কি জানা যায়, কত আনন্দ পাওয়া যায়। এবার তোকেও আমি বই পড়তে শেখাব পেমো।"

বিনুর মুখে নূতন সুর শুনিয়া পেমো আশ্চর্য্য হইল। সে জানিত না বিনু তাহার স্বামীর বাক্যের প্রতিধ্বনি করিতেছে। বিনু যাহাই করুক না কেন, পেমো খেলা হইবে না জানিয়া দুঃখিত হইল। হায়, এত শিগ্‌গীর মানুষের খেলার নেশা ভাঙ্গিয়া যায়! বিনু বড় হইয়াছে, বড় হইলে দুমদাম শব্দ করিয়া হাঁটে কেন? খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসে কেন? একবার গরুর গলা জড়াইয়া ধরে, পাখীর বাসা খুঁজিয়া বেড়ায়। পেমো দাসী-কন্যা, জমিদার-বৌ তাহার সহিত আর খেলাধুলা করিবে না, এই হইল আসল ব্যাপার। বড় না বড় ছাইয়ের বড় হইয়াছে।

পেমো নীরবে পেয়ারা খাইতে লাগিল।

বিনু একটা শেষ করিয়া আর একটা কামড় দিয়া বলিল, "তোকে লেখাপড়া শেখাব শুনে চুপ করে রইলি কেন? আমার শেষ-করা প্রথম ভাগ রয়েছে। কাল থেকেই তোকে অ আ শেখাব।"

"চাঁড়ালের ম্যায়া ল্যাকাপড়া করিবে তা হ'লে বাসন মাজিবি কে? ধান ভানিবে কে?"

পেমোর কণ্ঠে হতাশের সুর। সেটা বিনুর হৃদয়ে স্পর্শ করিল। বিনু তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল, "চাঁড়াল কি মানুষ নয়? কাজ করলে কি পড়াশোনা হয় না, আমিও না কত কাজ করে পড়াশোনা করছি। ওদিকে ওটা কি পাখী ডাকছে রে? তোর সেই নন্দন পাখীটা ত আসে নি? চল দেখি গে।"

"ও ত কানাকুয়া পক্ষী ডাকিতে নাগিছে ঠাকুজ্জি। বাগিচায় কলা না পাকিলে নন্দন আসিবে কিসের গন্ধে।" বলিয়া পেমো অগ্রসর হইল। বিনু তাহার পেছনে।

এ বাড়ীতে মণ্ডবের পশ্চাৎভাগে একটা ডোবা আছে। ডোবার চারিপাশ দিয়া বৃক্ষের পরে বৃক্ষের সারি। কতক পুরাতন ফলবান গাছ, কতক আগাছা। আম-জাম। পাকিলে বাড়ীর কেহ বিনা প্রয়োজনে এদিকটায় আসে না। সেই নিবিড় বনখণ্ডে শিকড় বাহির করা এক বৃদ্ধ তেঁতুলগাছের ছায়ায় বিনু বসিল।

দেবীর পদতলে বরপ্রার্থিনী সেবিকারূপে আসন লইল পেমো। সামনেই শৈবালে আচ্ছন্ন ডোবা। বর্ষায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল, এখন প্রায় জলশূন্য। সাদা বকের সারি ডোবায় বিচরণ করিতেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাছের আশায়। ডোবার গায়ে ঘন জঙ্গলে ফুটিয়াছে দুপুরে চণ্ডীর লাল লাল ফুল, ভাঁটি ফুল, ঘাসের ফুল। বিনু অনিমেষে তাকায় সেই ফুলের দিকে। তেঁতুল-গাছের সুউচ্চ শাখায় কোকিল ডাকিতেছে। বিলাসী কোকিল শীতের সময় চলিয়া যায় ভিন্ন দেশে আবার ফিরিয়া আসে বসন্ত সমাগমে। গোবরা-শালিক মাটি ঠোকরাইয়া গোবরে পোকা খাইতেছে।

গাছের পাতা দুই-একটা করিয়া ঝরিতেছে টুপটুপ। এখনও ঝরাপাতার বিলাপ-তানে বনস্থল ভরিয়া যায় নাই।

বিনু মুগ্ধ বিস্ময়ে দিকে দিকে নেত্রপাত করিয়া এই রূপ রস স্পর্শ গন্ধ যেন হৃদয়ের মধ্যে শুষিয়া লইতে চায়। বিনুর গৌরবের পরিবর্ত্তে ভয় হইতেছিল সে যেন বড় হইয়া যাইতেছে। তাই পুতুলের বাক্স বাহির করিতে ইচ্ছা হইল না। খেলাঘরে ঘরকন্না সাজাইতে মন চাহিল না। বড় হওয়া মন যদি প্রকৃতির এ অনবদ্য রূপসাগরে নিমগ্ন হইতে না চায়, তাহার আঁখিপল্লব হইতে যদি মায়াকজ্জল মুছিয়া যায় তাহা হইলে বিনু বড় হইতে চাহে না। দূর দিগন্ত হইতে আসিতেছে বাসন্তীশ্রীতে বিভূষিত হইয়া মনোহর মন্ত্রমুখর নব যৌবন। কে তাহাকে সাদরে বরণ করিয়া লইবে, সে ভুলাইয়া দেয় বিনুর সোনার কিশোরের স্বপ্ন, তাহাকে দিয়া বিনুর প্রয়োজন নাই।

"হই ঠাকুজ্জি, ঠাকুজ্জি হ।"

পেমোর দাদা গরুর রাখাল শ্যামচরণ যেন হারানো গরু খুঁজিতে বাহির হইয়াছে।

বিনু চমকিত হইয়া সাড়া দেয়, "আমরা এখানে শ্যাম, কেন ডাকছিস?"

শ্যাম কাছে আসিয়া তড়বড় করে, "তোমাগো সারা বাড়ী তাল্লাস করি হয়রাণি হইচি ঠাকুজ্জি। কলা বাগিচায় গেইচি, আম বাগিচায় গিইচি, লেচু—"

বিনু বাধা দেয়, "কত বাগানে খুঁজেছিস তা দিয়ে কি দরকার? কেন ডাকছিস আমাকে?"

"জগাই গাছির বৌ তোমাগো নাগি পাটারি গুড় নয়া বসি রইচে। গোয়ালপাড়ার বিন্দি দিতি আইছে খেতর চাঁছি। মাঠান ডাকিছে।"

"চল যাই, দুপুর বেলা সকলে হাজির হয়েছে।"

পেমো এতক্ষণে মৌনব্রত ভঙ্গ করে, "দুকুর কনে ঠাকুজ্জি, বেলা যে পড়ি আইছে। তুমি চায়ে চায়ে গাছ-গাছালি দেখিছিলা। আমি গাছের গায়ে মাথা রাখি এক ঘোম দিয়া লইছি।"

"বেশ করেছিস, বসলেই ঘুম, শুলেই ঘুম, খালি ঘুম।" বলিতে বলিতে বিনু অনিচ্ছার সহিত বনভূমি পরিত্যাগ করিল।

রায় বাড়ীতে যেমন উঠোন ঝাঁট দেওয়া, লেপিয়া দেওয়ার ও ধানের 'জাত' করিবার মালীবৌ, এ বাড়ীতেও তেমনি কাজ করে বিধবা মালী-মেয়ে টগর।

প্রভাতে টগর গোবর গুলিয়া গোটা বাড়ীতে ছড়া দিতেছিল। দুর্গাসুন্দরী টগরকে ডাকিয়া কহিলেন, শোন টগর, আজ আমাদের লালমণির গোরক্ষ ধার শোধ, তুই বিকেলে এসে গোবর দিয়ে ভাল করে উঠোনটা নিকিয়ে দিয়ে যাস।"

টগর হাসিমুখে বলে, "ওমা, ইয়ার মধ্যিই নালমণির একুশ দিন হইয়া গেল। আমি সাঁজ বেলার আগে-ভাগেই উইঠান নেপি দবদবে করি দিব মাঠান। আমাগো গোক্ষুর নাড়ু দিবা না?"

"দেব না কেন লো, তোদের জন্যেই ত আজকের ক্ষীরের নাড়ু। কাল নারায়ণের ভোগে নাড়ু দিয়ে তবে না বাড়ীর সকলে প্রসাদ পাবে।"

দুর্গাসুন্দরী আদেশ করিয়া সরিয়া পড়িলেন। আজ তাঁহাদের অনেক কাজ। লালমণির সমস্ত দুধ দিয়া ক্ষীরের নাড়ু করিতে হইবে। মূলাষষ্ঠী আসিতেছে, তাহারও আয়োজন আছে।

কবীর জোলা আসিয়াছে লালমণির দুধ দুইতে। লালমণির কি সোজা বিক্রম! কবীর ভিন্ন আর কাহারও সাধ্য নাই তাহার বাঁটে হাত দেয়। কবীর লালমণিকে ডাকে 'লাল বিটি।' লাল বিটি যেন সাক্ষাৎ কপিলা। অফুরন্ত তাহার দুধের ভাণ্ডার লাল টুকটুকে মাটির দোনা (চ্যাপটা মাটির হাঁড়ি) আনা হইয়াছে লালমণির নবপ্রসূত বৎসের কল্যাণে।

কবীর বসিয়াছে দুধ-দোহনে, পাশে পিতলের বালতি লইয়া উপস্থিত রহিয়াছেন দুর্গাসুন্দরী। লালমণি যদি শান্ত হইয়া দুধ দেয়, তাহা হইলে দোনা ভরিয়া বালতিও ভরিয়া যায় তাহার দুগ্ধে।

হ্যাঁ, লালমণি আজ শান্ত হইয়াই দুধ দিয়াছে। গাভীরা যে দেবী ভগবতী অন্তর্যামিনী, গোক্ষুর ধারশোধে প্রচুর ক্ষীরের নাড়ু হইলে সকলে পরিতোষপূর্ব্বক ভক্ষণ করিবে বুঝিয়া লালমণি দুধ দিয়াছে দোনা ও বালতি ভরিয়া।

কবীর হাসিয়া বলে "মাঠান, দেখ বিটির কাণ্ড, টানি দোয়ালে আর এক বালতি তোমাগো ভরি যায়।"

গৃহিণী মাথা নাড়েন, "না শেখের ব্যাটা, আর দোয়াবেন না। থাক বাছুর মায়ের দুধ প্রাণ ভরে। এই দুধেই অনেক নাড়ু হবে। সন্ধে বেলা আপনি আসবেন ছেলেদের নিয়ে।"

কবীর সানন্দে মাথা হেলায়, "মাঠানের কওন লাগিবে ক্যানে, আমাগো বিটির পরব, আমি না আইলে কেডা করিবে গোক্ষুর ধারশোধ।"

কবীর শেখ সম্পন্ন গৃহস্থ, তাহার বড় ছেলে মৌলভী, আর দুই ছেলে বাপের তাঁতে-বোনা গামছা লুঙ্গি ধুতি ইত্যাদি লইয়া হাটে বেচাকেনা করে। জমির তদ্বির করে। মজুর খাটায়। কবীর লালমণিকে দোহন করে, অভাবে নয়, স্বভাবে। সে ইহার জন্য কর্ত্তার নিকটে পারিশ্রমিক লয় না। পূজায় সম্মানের ধুতি-চাদর পায়, শীতের কম্বল। পাল-পার্ব্বণে খায়-দায়, বাড়ীর লোকের মত আসা-যাওয়া করে। রোগে-ভোগে বিনামূল্যে ঔষধ খায় সমগ্র পরিবার।

বিনুর মা গতকাল মেয়েকে কথা দিয়াছিলেন তাহাকে লইয়া আজ নদীতে স্নান করিতে যাইবেন।

কথা রাখিতে মা অনবরত বিনুকে তাড়া দিতে লাগিলেন চুল খুলিয়া তেল মাখিতে। আজ ভোগ-শালায় রায়বাড়ীর পুনরাবৃত্তি হইবে। লালমণির সমস্ত দুধের নাড়ু তৈরি, একটুখানি কথা নয়। মেয়ে একবার জলে নামিলে সহজে উঠিতে চাহিবে না, কিন্তু মায়ের আজ বিলম্ব করিবার অবকাশ হইবে না।

বিনুর চুলে তেল মাখাইতে মাখাইতে মা মেয়েকে সাবধান করিতে লাগিলেন। বিনু গম্ভীর হইয়া মাকে আশ্বাস দিল, "আজ আমি নাইতে নেমে একটুও দেরি করব না মা, কাজ থাকলে কেউ কি দেরি করতে পারে?

আমি কি বুঝি না। এত সকালে কার দায় পড়েছে শীতকালে নাইতে আসার। ঘাটে লোক না থাকলে দেরি হবে কিসে? নেয়ে এসে আজ আমিও তোমাদের সঙ্গে ভোগের ঘরে কাজ করব। দেখ তুমি, কি সুন্দর করে আমি ক্ষীরের নাড়ু বানিয়ে দেব। আমি কত শিখেছি, এখন বড় হয়ে গেছি।"

আনন্দে মা'র চোখে জল আসিল। তাঁহার অশান্ত অবুঝ বিনুর সুবুদ্ধি হইতেছে, সে বড় হইতেছে।

সন্ধ্যাসমাগমে গোক্ষুরের ধারশোধের সূচনা হইল। লালমণিকে মঙ্গলা বাছুর সমেত বাঁধিয়া রাখা হইল আঙ্গিনার এককোণে। পাড়ার গরুর রাখাল-শ্রেণীর বালকরা উপস্থিত হইল। কবীর জোলা আসিল তাহার ছেলে রূপাকে লইয়া। লেপাপোঁছা উঠানে ধূপ দীপ জ্বালিয়া একখানা কলার মাইজ পাতা ধুইয়া পাতা হইল। পাতার উপরে মুড়ির মোয়ার আকৃতি রাখা হইল একটি ক্ষীরের প্রকাণ্ড নাড়ু। কাণা-উচু একখানা পিতলের কাঁসিবোঝাই করিয়া রাখা হইল নাড়ুর আকার বাকী নাড়ুগুলি।

লালমণির প্রকৃত রাখাল শ্যামচরণ। শ্যাম স্নান করিয়া ভিজা কাপড়ে শুষ্ক গামছা গায়ে জড়াইয়া বসিল সকলের মাঝখানে। গোক্ষুর ধারের মন্ত্র হইল গ্রাম্য-গান—মূল গাওক হইল কবীর, বাকী সকলে দোহার। কবীর মেঠো সুরে গান ধরিল—

"আপনার মা'র দুধে আপনি হইলাম চোর,
গলায় বান্দিয়া দিল পাট-সোলার ডোর
হাঁচ্চো হাঁচ্চো হাঁচ্চো।
খাইতে দেয় না দুধ দোনা ভরি দোয়ায়
ক্ষিদের তাড়নে মোর প্যাটটা শুকায়,
হাঁচ্চো হাঁচ্চো হাঁচ্চো।

জয় বাবা, গোক্ষুরনাথ, গোপালক গোরক্ষক।" সমস্বরে জিগীর দিয়া সকলে ভূমিতে লুটাইয়া প্রণাম করিল।

শ্যাম চিৎ হইয়া ঘাড় বঁকাইয়া ক্ষীরের ঢেলাটা মুখে তুলিয়া লইল। হইয়া গেল গোক্ষুর ধার শোধ করা।

দুর্গাসুন্দরী বিনুর উপরে ভার দিলেন কলার পাতায় করিয়া সকলকে চারিটা করিয়া নাড়ু বিতরণের। গরুর রাখাল গোক্ষুর নাড়ুটা খাইলেও তাহাকে আরও চারিটা নাড়ু দিতে হইল।

টগর ঢেঁকিশালার আড়াল হইতে কহিল, "মাঠান, আমি আইচি গোক্ষুর বাবার পরসাদ নইতে।"

মাঠান এক খাবা নাড়ু কলার পাতায় মুড়িয়া তাহার আঁচলে ফেলিয়া দিলেন। আর এক খাবা দিলেন কবীরকে।

এদিনের নাড়ু বাড়ীর কেহ না খাইলেও দুর্গাসুন্দরী অন্য গরুর দুগ্ধে আরও নাড়ু করিয়া রাখিয়াছিলেন। যদি কম পড়িয়া যায় ওইগুলি দিয়া চালাইয়া দিবেন। তা ছাড়া দাস-দাসীরা আছে। কর্ত্তার ছাত্রের সংখ্যাও কম নহে। সকলেই যে আশা করিয়া থাকে।

—

বৈষ্ণবপদাবলীতে অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব

শ্রীযোগীলাল হালদার

মহাভারতের মানবরূপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। কয়েকটি শ্লোক ছাড়া মহাপ্রভু কোন গ্রন্থ রচনা করেন নি; কিন্তু তাঁর জীবনই এক মহাকাব্য। তাঁর সেই জীবন কোটি কোটি গ্রন্থ হ'তে মূল্যবান্। সেই জীবনই পৃথিবীর মানবকে মহাপ্রেরণা দান করেছে। সেই প্রেরণার উৎসমুখ অনন্তকাল মানবজাতির প্রাণে রস সঞ্চার ক'রে চলেছে, তা শুকোবার নয় ব'লে কখনও শুকিয়ে যাবে না। মহাপ্রভুই ভারতের আবাল-বৃদ্ধ নরনারীর প্রাণে হরি-ভক্তি সঞ্চারিত করেছিলেন। সুতরাং নগর-কীর্তন, নামকীর্তন, রাধাকৃষ্ণের লীলা কীর্তনের প্রারম্ভে যে তাঁর মাহাত্ম্য কীর্তিত হবে এটি স্বাভাবিক। বৈষ্ণব মহাজনগণ এটিতে বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। এর ফলে গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদগুলি রচিত হয়েছিল এবং কীর্তনের প্রারম্ভে কীর্তনীয়াগণ পালাগান আরম্ভে, সেই পালার রসদ্যোতক গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদগুলি গান ক'রে সর্বপ্রথম ভক্তিরস সঞ্চারিত করেন এবং যুগপৎ হরিভক্তিদাতা শ্রীগৌরাঙ্গের পদে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করেন। ইহাই গৌরচন্দ্রিকা। বৈষ্ণব সমাজের ধারণা গৌরচন্দ্রিকা না গাইলে, না শুনলে চিত্তশুদ্ধি হয় না। আর রাধাকৃষ্ণলীলা গাইবার বা শোনবার অধিকারও জন্মে না। কোন কোন বৈষ্ণব-কবি তাঁর পদাবলীতে বহু 'ব্রজবুলি পদ' ব্যবহার করেছেন। 'ব্রজবুলি পদ' সম্বন্ধে নানাজনের নানামত আছে। অনেকের ধারণা, 'ব্রজবুলি পদ' ব্রজমণ্ডল বা বৃন্দাবনের ভাষা। তাঁদের ধারণা—রাধাকৃষ্ণ এই ব্রজবুলিতে কথাবার্তা বলতেন। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। 'ব্রজবুলির' সঙ্গে ব্রজভাষা অথবা মথুরা বৃন্দাবনের বর্তমান ভাষারও কোন সম্পর্ক নেই। একদা বৃহত্তর বঙ্গের দ্বারস্বরূপ ছিল দ্বারবঙ্গ অর্থাৎ বর্তমান বিহারের দ্বারভাঙ্গা জেলা। ঐ সময় মৈথিল ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার মিশ্রণ ঘটেছিল এই দ্বারবঙ্গে। এর ফলে বিদ্যাপতি মৈথিল ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার মিলন সাধন ক'রে অতি মধুর 'ব্রজবুলি'তে তাঁর পদাবলী লিখেছিলেন। বিদ্যাপতি পদাবলীতে 'ব্রজবুলি' প্র সমাবেশ ক'রে পদাবলীর সৌন্দর্য ও সম্পদ্ শতগুণে বর্দ্ধিত করেছেন।

পদাবলীতে অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব আলোচনার পূর্বে এখানে দু'টি বিষয়ের উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে। প্রথম-পদাবলীতে অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব আলোচনা-প্রসঙ্গে পদকর্তাদের পদগুলি তাঁদের পর্যায় বিভাগ উল্লেখ করে আলোচিত হবে; দ্বিতীয়—মহাপ্রভুর জীবনই এক মহাকাব্য। এই মহাকাব্যের আলোচনার জন্য স্বতন্ত্র অধ্যায় প্রয়োজন। তাই স্বতন্ত্র অধ্যায়ে তা আলোচিত হবে। সেই আলোচনায় গৃহীত হবে গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ এবং বৈষ্ণব সমাজ-স্বীকৃত বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত। ষড় গোস্বামী এবং গোস্বামী সম্প্রদায়ের সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থ-রাজির বিষয়সমূহ আলোচিত হবে না। যে-গ্রন্থ বৈষ্ণব সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত হয় নি, তাহাও আলোচনায় বহির্ভূত থাকবে।

অতীন্দ্রিয় সাধনার পাঁচটি স্তর। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। মধুর আবার দুই পর্যায়ে বিভক্ত। স্বকীয়া ও পরকীয়া। পরকীয়া বা রাগানুগা (Spontaneous বা Dynamic) অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের চরমভাব। এই পরকীয়াতত্ত্বই যে জয়দেবের রাধাতত্ত্ব বা অতীন্দ্রিয়-তত্ত্ব, এ সত্য আমরা 'জয়দেব ও অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব' প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। বৈষ্ণব-পদকর্তাদের উক্ত পঞ্চভাবাত্মক পদগুলি বাল্যলীলা, পূর্বরাগ, অভিসার, মান, আক্ষেপানুরাগ, আত্মসমর্পণ বা আত্ম-নিবেদন, মাথুর, ভাব সম্মেলন ও প্রার্থনা—এই পর্যায়ে বিভক্ত হয়েছে। এই পর্যায় বিভাগ অনুসারে আমরা উক্ত পঞ্চ স্তরের সাধনার আলোচনা করব।

বিবিধ কুসুম দিয়া সিংহাসন নিরমিয়া
কানাই বসিলা রাজাসনে।

রচিয়া ফুলের দাম ছত্র ধরে বলরাম
গদ গদ নেহারে বদনে।
অশোক-পল্লব-করে সুবল চামর করে
সুদামের করে শিখিপুচ্ছ।
ভদ্রসেন গাঁথি মালে পরায় কনাইয়ের গলে
শিরে দেয় গুঞ্জাফল-গুচ্ছ ॥
স্তোক কৃষ্ণ আনাগোনা ঠাঞি ঠাঞি বানায় থানা
আজ্ঞা বিনে আসিতে না পায়।
শ্রীদামাদি দূত হৈয়া কানাইয়ের দোহাই দিয়া
চারি পাশে ঘুরিয়া বেড়ায় ॥
করযুগ যুড়ি তথি অংশুমান্ করে স্তুতি
রাজ-আজ্ঞা-বচন চালায়।
বটু করে বেদধ্বনি পড়ে আশীর্বাদ-বাণী
দাম সুদাম নাচে গায় ॥
অতি মনোহর ঠাট নিরমিয়া রাজপাট
কতেক হইল রস কেলি।
এ দাস উদ্ধব কয় সখ্য-দাস্য-রসময়
সেবয়ে সকল সখা মেলি ॥

বৈষ্ণব-পদকর্তারা সকলেই ভক্তসাধক ছিলেন। ...র এই সময় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে শান্ত, দাস্য, সখ্য, ...ৎসল্য ও মধুর ভাবের উপাসনাও প্রচলিত ছিল। এর ...লে পদকর্তারা যখন যে ভাবে আবিষ্ট হয়ে পড়তেন ...ই পর্যায়ের পদ তাঁদের লেখনী-মুখে নিঃসৃত হ'ত। ...বষ্ণব পদকর্তা ভক্তসাধক উদ্ধব দাস এখানে যুগপৎ দাস্য ... সখ্য ভাবে আবিষ্ট হয়ে পদ লিখেছেন। তাই শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলায় উক্ত পদটিতে বৈষ্ণবভক্তের ...াস্য ও সখ্যভাবের সাধনার পরিচয় আছে। অখিল বিশ্বের আদি কারণ বিরাট্ পুরুষ আজ লীলার ছলে সামান্য রাখাল বেশে গোষ্ঠবিহার করছেন। তাঁর ভক্তগণ তাঁর গোষ্ঠলীলার সহচর। ভক্তগণ তাঁর দাস এবং সখা। এই অপূর্ব ভাবে আজ তাঁর লীলা চলছে। পদকর্তা তাঁর হৃদি-বৃন্দাবনে বিরাট্ পুরুষকে এনেছেন, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বৃন্দাবনলীলা চলছে। এই অপূর্ব ভাবকল্পনাই অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব।

বৈষ্ণবভক্ত এখানে দাস ও সখা ভাবে ভাবিত হয়েছেন। তাঁর হৃদি-বৃন্দাবনে বিরাট্ পুরুষ আজ সৃষ্টি, স্থিতি লয়ের বিশ্বরূপ ধারণ করে উপস্থিত হননি। আজ তিনি ভক্ত-হৃদয়ে রাখাল-রাজ বেশে উপস্থিত। ভক্ত-সাধক কবি নিজেও একজন রাখাল হয়ে তাঁর লীলা-সহচর। ভগবানকে ভক্ত আজ রাখাল-রাজ বেশ দিয়েছে। ফুলের সিংহাসনে তাঁকে বসিয়ে, তাঁর মাথায় রাজছত্র ধরে আছে, কেহ বা চামর-ব্যজনে ব্যস্ত। কেহ দূত হয়ে রাখাল রাজের শান্তির বাণী প্রচারে নিয়োজিত। কেহ যুক্ত-করে স্তোত্র পাঠে রত। কেহ রাজা বা রাজ্যের মঙ্গলের জন্য বেদ পাঠে নিযুক্ত। আবার কেহ কেহ নৃত্যগীতে সভায় আনন্দবর্ধনে ধন্য।

দধি-মন্থ-ধ্বনি শুনইতে নীলমণি
আওল সঙ্গে বলরাম।
যশোমতি হেরিমুখ পাওল মরমে সুখ
চুম্বয়ে চাঁদ বয়ান ॥
কহে শুন যাদুমণি তোরে দেব ক্ষীরননী
খাইয়া নাচহ মোর আগে।
নবনী-লোভিত হরি মায়ের বদন হেরি
কর পাতি নবনীত মাগে ॥
রাণী দিল পুরি কর খাইতে রঙ্গিমাধর
অতি সুশোভিত ভেল তায়।
খাইতে খাইতে নাচে কটিতে কিঙ্কিণী বাজে
হেরি হরষিত ভেল মায় ॥
নন্দদুলাল নাচে ভালি।
ছাড়িল মন্থন-দণ্ড উথলিল মহানন্দ
সঘনে দেই করতালি ॥
দেখ দেখ রোহিণী গদ গদ কহে রাণী
যাদুয়া নাচিছে দেখ মোর
ঘনরাম দাসে কয় রোহিনী আনন্দময়
দুহু ভেল প্রেমে বিভোর ॥

পদকর্তা ভক্তসাধক ঘনরাম দাস এখানে বাৎসল্য রসে আবিষ্ট হয়ে পদ লিখেছেন। তাই বাল্যলীলার এই পদটিতে বাৎসল্য ভাবের সাধনার পরিচয় আছে। পরমব্রহ্ম আজ নন্দদুলালের রূপে অবতীর্ণ। ভক্ত-সাধক এখানে মাতা যশোমতির রূপে উপস্থিত। ভক্তের মনোমন্দিরে যেভাবে পূজারতি চলছে, সেই ভাবটিতেই অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে। ভক্তরূপে এখানে

মাতা যশোমতী এবং ভগবান্ এখানে নন্দদুলাল। উপাসনাছলে চলেছে এখানে গার্হস্থ্য ধর্মের খেলা। দধিমন্থনের শব্দ শুনে গোপাল এসেছে মায়ের কাছে। তাঁর চাঁদ মুখ দেখে অমনি মায়ের প্রাণ, প্রাবৃটের কৃষ্ণ-মেঘ দেখলে ময়ূরের প্রাণ যেমন আনন্দে নেচে ওঠে; ঠিক তেমনই নেচে উঠল। মা তাঁর আদরের ছেলের চাঁদমুখে চুমু দিলেন আর ক্ষীর-ননীর প্রলোভন দেখালেন। কিন্তু নাচতে হবে এই চুক্তি। ছেলে তাতেই রাজি। ননী খেতে খেতে আনন্দে ছেলেও নাচতে আরম্ভ করল। কাজভোলা মা আপন সখীদের নিয়ে আনন্দে করতালি দিতে দিতে প্রেমে বিভোর হয়ে পড়লেন।

মহা

এই রূপই ত হয়। ভগবানের খেলা দেখতে পেলে ভবের হাটের খেলা শুরু হয়ে যায়। আনন্দময়ের আনন্দের বিন্দুমাত্র হৃদয়ে সঞ্চারিত হ'লে যে অতীন্দ্রিয়ানুভূতি লাভ হয়, তার কাছে সব কিছু তুচ্ছ হয়ে যায়। বৈষ্ণবসাধকের এই সাধনার তুলনা হয় না।

আমার শপতি লাগে না ধাইও ধেনুর আগে
পরাণের পরাণ নীলমণি
নিকটে রাখিও ধেনু পূরিও মোহন বেণু
ঘরে বসে আমি যেন শুনি॥
বলাই ধাইবে আগে আর শিশু বামভাগে
শ্রীদাম সুদাম সব পাছে।
তুমি তার মাঝে ধাইও সঙ্গছাড়া না হইও
মাঠে বড় রিপু ভয় আছে॥
ক্ষুধা পেলে চাঞা খাইও পথ পানে চাহি যাইও
অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে।
কারু বোলো বড় ধেনু ফিরাইতে না যাইও কানু
হাত তুলি দেহ মোর মাথে॥
থাকিহ তরুর ছায় মিনতি করিছে মায়
রবি যেন না লাগয়ে গায়।
যাদবেন্দ্রে সঙ্গে লইও বাধা পানই হাতে থুইও
বুঝিয়া যোগাবে রাঙ্গা পায়॥

এখানেও পদকর্তা যাদবেন্দ্র বাৎসল্য রসে আবিষ্ট হয়ে পদ লিখেছেন। বাল্যলীলার এই পদটিতে তাই বাৎসল্য ভাবের সাধনার পরিচয় আছে। সাধক-কবি ভগবানকে এখানে ব্রজের রাখাল বালক সাজিয়েছেন, আর নিজে সেজেছেন যেন মাতা যশোম রাখাল বালকরূপী শ্রীভগবান্ তাঁর অবোধ শিশু। আ এই অবোধ শিশুটিকে গোষ্ঠে পাঠাতে তাঁর কত ভাবনা। যিনি ত্রিজগতের ভাবনা ভাবতে বি হন না, আজ ভক্তরূপী 'মাতা যশোমতী' তাঁর চি অতীব বিব্রত। কখনও তিনি পুত্রকে শপথ করা বলেছেন, আবার তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে নিজের মাথা পুত্রের হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করতে বলেছেন। অতীন্দ্রি সাধনার এই অপূর্ব ভাবটি লীলাকীর্তনের অথবা কৃষ্ণ-যাত্রার মাধ্যমে চমৎকাররূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। অথবা বাংলা দেশের বৈরাগীর আখড়াতেও যে লোকায়াত ভাবটি আছে তার মধ্যেও এই অতীন্দ্রিয় সাধনার পরিচয় মিলে। সেখানেও গোপালের সেবার মধ্যে বৈরাগী সম্প্রদায়ের সাধক-সাধিকার মনোভাব মাতা যশোমতীর মনোভাবের সহিত তুলনীয়। ভগবান্ এখানে শিশুরূপে বর্ণিত হ'লেও ঐ শিশুর বাঁশীর সুরের সঙ্গে ভক্তরূপী 'মাতা'র সম্পূর্ণ পরিচয় আছে। কবি এখানে সে ভাবটিও প্রকাশ করতে ভোলেন নি। কারণ ভগবানের বাঁশীর সুর যে একবার শুনেছে, সে যে-ভাবে থাকুক না কেন, ঐ সুর সে ভুলতে পারে না। তাই কোন-না-কোন প্রকারে ঐ বাঁশীর সুরের কথা সে প্রকাশ করবেই। বাঁশীর ঐ সুর তাকে যে-কোন দিকে আকর্ষণ করে, সে সুরে আত্মহারা হয়। বাঁশীর আহ্বান-গীত তাঁর অন্তরে অভূতপূর্ব সাড়া জাগায়। তাই বিশ্বকবি বলেছেন :—

যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বান-গীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সঙ্কট আবর্ত মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন ;
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি ; মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সংগীতের মত। (এবার ফিরাও মোরে, চিত্রা)

ভক্তরূপী 'মাতা যশোমতী' এখানে ভগবানের এক অসহায় শিশু-মূর্তির কল্পনা করেছেন। আর তার জন্য (ভক্তের) চিন্তার অবধি নাই। মহাভারতের চক্রধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এর কোন সাদৃশ্যই

র্ষি ব্যাস-কল্পিত অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের সঙ্গে গৌড়ীয় প্রদায়ভুক্ত পদকর্তাদের অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের বিরাট্ বৈষ্ণব-কবি এখানে অসীমকে সীমার মধ্যে ন নি, একেবারে অসহায় শিশু করে

বিশ্বরূপ বর্ণনায় যেখানে অর্জুন বলেছেন :—

পশ্যামি দেবাং স্তব দেব দেহে
সর্ব্বাংস্তথা ভূতাবিশেষ সজ্ঞান্।
ব্রহ্মানমীশং কমলাসনস্থম্
ঋষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যাম্ ॥ ১৫ ॥ ১১ শ সঃ
॥ গীতা

অনেক বাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোহনন্ত রূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১৬ ॥ ঐ ॥ ঐ ॥

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ
তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষং সমন্তাদ্—
দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥ ১৭ ॥ ঐ ॥ ঐ ॥

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশত ধর্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥ ১৮ ॥ ঐ ॥ ঐ ॥

হে দেব, তোমার দেহে আমি সমস্ত দেবগণ, জঙ্গমাত্মক বিবিধ প্রাণিবগ, সৃষ্টিকর্তা কমলাসনস্থ নারদসনকাদি দিব্য ঋষিগণ এবং অনন্ত তক্ষকাদি কে দেখিতেছি। অসংখ্য বাহু, উদর, বদন ও বিশিষ্ট অনন্তরূপ তোমাকে সকলদিকেই আমি তেছি। কিন্তু হে বিশ্বেশ্বর, হে বিশ্বরূপ, আমি র আদি, অন্ত্য, মধ্য, কোথাও কিছু দেখিতে চছি না। কিরীট, গদা ও চক্রধারী, সর্বত্র দীপ্তি-তেজঃপুঞ্জ-স্বরূপ, প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় স্পন্ন দুর্নিরীক্ষ্য, অপরিচ্ছন্ন তোমার অদ্ভুত মূর্তি ক সর্বস্থানে আমি দেখিতেছি। তুমি অক্ষর পর-মিই একমাত্র জ্ঞাতব্য তত্ত্ব, তুমিই এই বিশ্বের পরম আশ্রয়, তুমিই সনাতন ধর্মের প্রতিপালক ; তুমি অব্যয় সনাতন পুরুষ, ইহাতে আমার সংশয় নাই।

মহাভারতের যুগ থেকে বৈষ্ণব পদাবলীর যুগ পর্যন্ত যে দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, তার মধ্যে বৈষ্ণব-সমাজের চিন্তাধারার মধ্যেও বিরাট্ পরিবর্তন এসেছিল। ঐ পরিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে ভারতীয় অতীন্দ্রিয়তত্ত্বেরও পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। সাধনার পরিবর্তনের ফলে চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণবের বাল-গোপালের মূর্তি ধারণ করে বৈষ্ণবী সাধনার নবরূপ দিয়েছেন। এই নবরূপায়ণের ফলেই ক্রমে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের সাধনার রীতি প্রচলিত হয়েছিল বৈষ্ণব সমাজে।

ভারতীয় অতীন্দ্রিয় সাধনার চরম বিকাশ ঘটেছিল পরকীয়া বা রাগানুগা (Spontaneous or Dynamic) তত্ত্বের মধ্যে। আর এই পরকীয়াতত্ত্বই যে শ্রীজয়দেব-প্রবর্তিত রাধাতত্ত্ব, একথা আমরা বহুভাবে আলোচনা করেছি। এই রাধাভাবের সাধনার বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া গেছে বৈষ্ণব পদাবলীর পূর্বরাগ, অভিসার, মান, আক্ষেপানুরাগ, আত্মসমর্পণ বা আত্ম নিবেদন, মাথুর ও ভাব-সম্মেলন পর্যায়ভুক্ত পদগুলির মধ্যে। শান্ত-ভাবের সাধনার বিশেষ পরিচয় আছে প্রার্থনা পর্যায়ভুক্ত পদগুলির মধ্যে।

সই কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে
নাম পরতাপে যার ঐছন করল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো
যুবতী ধরম কৈছে রয় ॥
পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়।

কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুলনাশে
আপনার যৌবন যাচায় ॥

সাধক-কবি চণ্ডীদাস এখানে পরকীয়া ভাবে আবিষ্ট হয়েছেন। পূর্বরাগের এই পদটি মধুর রসাশ্রিত। ভক্তকবি ভগবানকে এখানে গ্রহণ করেছেন প্রেমিক পুরুষরূপে। এই প্রেমিক পুরুষটি তাঁর প্রণয়ী। তিনি বৈধ পতি নন। কবি নিজে হয়েছেন তাঁর অর্থাৎ ঐ প্রেমিক পুরুষরূপী ভগবানের পরকীয়া পত্নী। অতি সঙ্গোপনে তাঁদের লীলা চলে। আড়ালে-আবডালে, লোকচক্ষুর অন্তরালে ভক্তের সঙ্গে ভগবানের এই যে লীলা এর তুলনা হয় না। ভগবানের বাঁশীর সুর ভক্তের কানের মধ্য দিয়ে মর্মে প্রবেশ করে ভক্তকে আকুল করেছে। অতি অস্পষ্টভাবে ভক্তের মুখে তার নাম গীত হচ্ছে। দেহ-মন প্রাণ-অবশ হয়ে যাচ্ছে। ধৈর্যের বাঁধ আর থাকছে না। যেখানে তাঁকে পাওয়া যাবে—উত্তুঙ্গ পর্বত শিখরে, গহনবনে অথবা অতল সমুদ্রে, বিশাল মরুভূমিতে বা কুমারী মেরুতে—সেখানেই যাবার জন্য ভক্তের আকুলতা বেড়েই চলেছে। ভক্ত তাঁকে ভুলতে পারছে না—ক্ষণিকের জন্যেও। তাঁকে পেলে যে কি করবে, কোথায় রাখবে, কিভাবে তার সন্তুষ্টি সাধন করবে কিছুই যেন ভেবে পাচ্ছে না। কিন্তু! কিন্তু পরমুহূর্তেই এই অনিত্য সংসার মনোমুকুরে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। নানা বাধা এই অনিত্য সংসারে। এখানে সংসার-বুদ্ধিরূপা জটিলা এবং আসক্তিরূপা কুটিলা প্রেমিক পুরুষরূপী ভগবানের কাছে যাবার পরম বাধা। প্রতিনিয়ত তাদের সজাগ দৃষ্টি পড়ে আছে ভক্তের ওপর। কোনমতেই তাদের চোখে ধুলি দিয়ে পালাবার পথ নেই ভক্তের। অথচ জড় সংসার-রূপ স্বামী আয়ান ঘোষ ভক্তকে চরম সুখ দিতে পারে না। তাই শ্যাম-সুন্দররূপ চিরসুন্দরকে লাভ করবার জন্য ভক্তের হৃদয়ে জাগে চরম আকুলতা। আর এই জন্য শুধু প্রতীক্ষা আর প্রতীক্ষা। শুধু ফাঁক খোঁজা। আর ওদের ফাঁকি দিয়ে অবশ মন নিয়ে কোন রকমে সংসারে থাকা। মন-প্রাণ সংসার ছেড়ে যেতে চায় কিন্তু উপায় নেই। এই টানা-পোড়েনের মধ্যে ভক্তের অন্তরের ভাবটি ভক্তকবির লেখনীতে অতি সুন্দরভাবে এখানে ফুটে উঠেছে। অতীন্দ্রিয় ভাবের চরম বিকাশ ত এইখানেই।

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা।
সদাই ধেয়ানে চাহে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ান তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে
যেমত যোগিনী-পারা ॥
এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি
দেখয়ে খসায়ে চুলি।
হসিত বয়ানে চাহে মেঘপানে
কি কহে দু'হাত তুলি ॥
এক দিঠ করি ময়ূর ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়
কালিয়া বঁধুর সনে ॥

ভগবানের রূপ-বর্ণনায় বলা হয়েছে তিনি কৃষ্ণ, তিনি কালো, কালোবরণ। তাঁর রূপের বর্ণনায় বলা হয়েছে—

দিবি সূর্য সহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা
যদি ভাঃসদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥
১২ ॥ ১১ সঃ ॥ গীতা

—যদি আকাশে যুগপৎ সহস্র সূর্যের প্রভা উত্থিত হয়, তাহা হইলে সেই সহস্র সূর্য্যের প্রভা সেই মহাত্মা বিশ্বরূপের প্রভার তুল্য হইতে পারে।

এখানে কিন্তু সাধক-কবি চণ্ডীদাস পরকীয়া ভাবে আবিষ্ট হয়ে মধুর রসাশ্রিত পূর্বরাগের এই পদটিতে ভগবানকে প্রেমিক পুরুষরূপে গ্রহণ করে তাকে অনন্ত রূপের পরিবর্তে সান্তরূপে নিয়ে অতীন্দ্রিয়বাদের চরম পরিণতি দিয়েছেন। অসীমকে সসীম, অনন্তকে সান্তে, Ideal-কে Real-এ এনে আনন্দরস আস্বাদন করেছেন। এইভাবে আনন্দরস আস্বাদনই বৈষ্ণব ভক্ত কবিদের বৈশিষ্ট্য। তাই মাধুর্য ভাবের পরকীয়াতত্ত্বে বৈষ্ণবী সাধনার অতীন্দ্রিয় ভাবের চরম বিকাশ লাভ করেছে। চণ্ডীদাসের এই কবিতায় ভক্তের ঘর-ছাড়া মনের পরিচয় মিলছে। ভক্তরূপী প্রেমিকা ভগবানরূপ প্রেমিক পুরুষের দর্শন লাভের জন্য ব্যাকুল। সংসার-বন্ধন ছিঃ

হয় নি; অথচ সংসারের আকর্ষণ আদৌ নেই। ভগবদ্দর্শন না পাওয়ার জন্য অন্তরে যে বেদনা ভোগ করছে তা প্রকাশ করে অন্তরের বেদনা লাঘব করবারও পথ পায় না। ভক্ত হৃদয়ের এই অবর্ণনীয় বেদনা এখানে অপরূপ রূপ লাভ করেছে। কোনদিকে মন নেই। আহারেও অনিচ্ছা। অন্তরে যে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়েছে তার বহিঃপ্রকাশ পেয়েছে তার বৈরাগীর পরিধেয়ে। কালোবরণকে দেখবার জন্য যেদিকে কালো সেদিকেই তার দৃষ্টি। কখনও কালো চুল খুলে তার মধ্যে কালোবরণ কৃষ্ণকে দেখছে। আবার পরমুহূর্তে কালো মেঘের মধ্যে প্রাণ-কৃষ্ণকে দেখে হাসি-হাসি মুখে দু'হাত তুলে মৃদু গুঞ্জনে কি বলছে। পরক্ষণেই ময়ূর-ময়ূরীর কণ্ঠে যে নীলাভ কৃষ্ণবর্ণ আছে অনিমেষ নয়নে সেইদিকে চেয়ে দেখে। এমনি করেই যেখানে কালো সেখানে দৃষ্টি দিয়ে কালোবরণকে দেখবার আকুল প্রয়াস। বৈষ্ণব-ভক্ত কবির এই অতীন্দ্রিয় ভাবের সাধনার তুলনা হয় না।

বৈষ্ণব-ভক্ত কবির কৃষ্ণরূপের কল্পনা বড় সুন্দর, বড় মধুর। যা অনন্ত, যা অগাধ, যা কল্পনাতীত, যা অব্যাখ্যেয়, যা দুর্নিরীক্ষ্য তাই কৃষ্ণ। অগাধ বারিধি কৃষ্ণ, অনন্ত আকাশব্যাপী কালো মেঘ কৃষ্ণ, সীমাহীন অন্ধকার কৃষ্ণ। যা আমরা বুঝতে পারি না, ক্ষুদ্র দৃষ্টির দ্বারা দেখতে পাই না অথচ সত্য—তাই কৃষ্ণ। এই বিরাট্ বিশ্বের গাঢ় কৃষ্ণ-শ্যাম বর্ণকেই কৃষ্ণরূপে, শ্যাম-সুন্দররূপে গ্রহণ করেছেন ভারতীয় বৈষ্ণব-সাধকেরা। বৈষ্ণব কবির লেখনী-মুখে নিঃসৃত হয়েছে সে অমৃত নির্ঝর। কৃষ্ণের রূপ ও শিখীপুচ্ছ চূড়া প্রসঙ্গে আচার্য্য দীনেশচন্দ্র লিখেছেন:—

* The Vaisnavas have tried to interpret the dark blue in a metaphysical way, as is the *wont* of the Hindus, disregarding the obvious historical facts. This, they say, is the prevading colour of the universe, or the azure, or the sea and generally speaking of the landscape. As the main colour of the universe this has been, they say, made the symbol of the Diety. There is a crown of peacock feathers on the head of Krishna which indicates a combination of other colours, that decorate the main dark blue of the world. Others seem to maintain that the dark colour symbolises the mystory which enshrouds the unseen and the unknowable. Hence it is sacred with the Vaisnavas.

—Vanga Sahitya Parichaya Part I, Introduction P. 47.

—•—

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীকরুণাকুমার নন্দী

মস্কো-পিকিং ও লণ্ডন

আমাদের বর্ত্তমান সংখ্যা প্রকাশ হবার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বহির্বিশ্বের বিশেষ সংবাদ জানা গেল। রাশিয়ান কমিউনিষ্ট পার্টির সম্পাদকের পদ ও যুগপৎ সোভিয়েৎ রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে নিকিতা ক্রুশ্চেভের অবসর গ্রহণ (অপসারণ?) এবং তাঁর স্থলে ষ্টালিনিষ্ট দলের মুখপাত্র সুশ্লভের প্রস্তাবক্রমে কোসিগিনের ঐ পদে অধিরোহণ; বৃটেনে হ্যারল্ড উইলসনের নেতৃত্বে সাধারণ নির্ব্বাচনে লেবার পার্টির জয়লাভ ও রাষ্ট্রের শাসনভার গ্রহণ; এবং কমিউনিষ্ট চীনের দ্বারা প্রথম আণবিক বোমা বিস্ফোরণ।

রুশ রাষ্ট্রের অধিনায়কত্ব থেকে ক্রুশ্চেভের অপসারণ এবং পিকিং সরকার কর্ত্তৃক একই সময়ে আণবিক বোমা বিস্ফোরণ, এই দুইটি বিশ্ব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার মধ্যে কোন পারস্পরিক সংযোগ আছে কিনা তা নিয়ে সমগ্র দুনিয়ায় আজ আলোচনা চলেছে। ক্রুশ্চেভের অধিনায়কত্বে রুশ রাষ্ট্র আণবিক বিস্ফোরণ স্থগিত রাখবার আন্তর্জ্জাতিক চুক্তি স্বীকার করে নিয়েছিলেন। সেই চুক্তি উপেক্ষা করে পিকিং সরকার এই বিস্ফোরণের আয়োজন চালিয়ে গেছেন। অন্য পক্ষে কিছুকাল ধরে পিকিং ও মস্কো সরকারের মধ্যে বিশ্ব কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রপুঞ্জের উপর নেতৃত্ব স্থাপনের যে প্রতিযোগিতা স্পষ্ট হয়ে উঠছিল এবং যার ফলে স্পষ্টতঃই পিকিং-মস্কো বিরোধ ক্রমে গভীর হয়ে উঠছিল, ক্রুশ্চেভের অপসারণের ফলে তার মীমাংসা এবং মস্কো-পিকিং জোট পুনর্গঠিত হয়ে উঠবে কিনা, এই প্রশ্ন আজ গভীর আন্তর্জ্জাতিক তাৎপর্য্যমণ্ডিত। এ পর্য্যন্ত যতটুকু প্রকাশ পেয়েছে তাতে সন্দেহ করবার কারণ রয়েছে যে, আবার মস্কো-পিকিং জোট বাঁধবার দিকে নজর দেওয়া হবে—নতুন রুশ রাষ্ট্রপতিদের কথাবার্ত্তায় এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আণবিক বিস্ফোরণটির পেছনে নিজ রাষ্ট্রের প্রতিরোধ শক্তি বৃদ্ধি করবার প্রয়াসমাত্র ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল একথা এঁরা স্বীকার করেন না। তা ছাড়া এই ঘটনাটির ফলে বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত আশঙ্কা ঘটতে পারে এমন আশঙ্কাও তাঁরা করেন না

কমিউনিষ্ট জোটের বাহিরে অন্যান্য রাষ্ট্রসমূ নিয়ে কিন্তু যথেষ্ট আশঙ্কা ও উত্তেজনার সৃষ্টি হ সাধারণতঃ এই আশঙ্কা অনেক আন্তর্জ্জাতিক রাষ্ট্রনায় মনে উদয় হয়েছে যে, এই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ঘ যুগপৎ উদ্ভবের পেছনে কমিউনিষ্ট জোটের অ বিশ্বের উপর অধিকার প্রসারিত করবার প্রয়াসই দে পাওয়া যাচ্ছে। এ আশঙ্কা যদি সত্য হয় তবে বিশ্ব অব্যাহত রাখা সম্ভবতঃ কঠিন হয়ে উঠবে। নি ক্রুশ্চেভ তাঁর রাজত্বকালে কমিউনিষ্ট (অবশ্য চীন তাঁর মোসাহেব রাষ্ট্রগুলি বাদ দিয়ে) ও ডিমোক্রে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একটা নূতন মৈত্রী এবং বেশ খানি পরিমাণে পারস্পরিক বিশ্বাস ও নির্ভরতার সম্বন্ধ তুলছিলেন। ক্রুশ্চেভের সহাবস্থান নীতির প্রতি আ এই সম্বন্ধটি গড়ে তুলতে সাহায্য করছিল। তবু শান্তির কাঠামোটি এ পর্য্যন্ত নিতান্তই কাঁচা বুনিয়া ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। বর্ত্তমান ঘটনাবলীর প্রতিক্রি ফলে এই বুনিয়াদটি ধ্বসে পড়তে পারে এমন আ অনেকেই করেন।

আমরা এদেশে বর্ত্তমান ঘটনার ফলে ক্রমবর্দ্ধমান ভা রুশ মৈত্রী ও সহযোগিতায় সম্বন্ধটি কি ভাবে প্রভাবিত সেই চিন্তাটুকু নিয়েই বিশেষ ব্যস্ত। নূতন রুশ রাষ্ট্রনায় আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন যে ভারত-রুশ মৈত্রী সহযোগীতার কোন বদল বা বাধা তাদের তরফ উপস্থিত হবে না। ভরসার কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু ম পিকিং সম্বন্ধের যে নূতন স্বরূপ বর্ত্তমানে গড়ে উঠবার শোনা যাচ্ছে তার প্রভাব ভারত-রুশ সম্বন্ধকে প্রভা করবে কি না এমন আশঙ্কা থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ সমস্তটাই অবশ্য নির্ভর করবে নূতন মস্কো-পি পারস্পর্য্যের স্বরূপটির উপরে। এটি যদি সর্ব্বক্ষেত্রে বিশেষ করে পিকিং সরকারের স্পষ্ট করেই ব্যক্ত

নেতৃত্বের ক্ষেত্রে খুব বেশী করে দানা বেঁধে ওঠে হলে ভারত-রুশ সম্বন্ধ নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে করা বা অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে কিনা সেটা গভীর তার বিষয়।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, বর্ত্তমান ভারত-চীন সম্বন্ধটি াসরি শত্রুতার পর্য্যায়ে এসে ঠেকে রয়েছে। এই ক্রতা যে সহজে এবং ভারতের স্বাতন্ত্রের স্বীকৃতির ভিত্তিতে মিটতে পারে এমন কোন আভাস আজ ান্ত পাওয়া যায় নি। চীন স্পষ্টতঃই তার সামরিক ক্তির হুমকি দেখিয়ে ভারতকে দাবিয়ে রাখবার চেষ্টা রছে। এই হুমকী ইতিমধ্যেই ভারতের একটি বিস্তৃত মান্ত এলাকা চীনের অধিকারে সামরিক প্রয়োগের দ্বারা ন্তর্ভুক্ত করে রেখেছে। কূটনৈতিক আদান-প্রদান বা রাঞ্চলের অন্যান্য নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মধ্যস্থতা কোন ছুতেই চীনকে এই অন্যায় অধিকার পরিত্যাগ করতে াজী করাতে পারে নি। বর্ত্তমানে এই আণবিক ফোরণের ফলে চীনের প্রচণ্ড সামরিক শক্তি আরো রদার করে তোলা হয়েছে এটাই বিশ্বের সকলে আশঙ্কা রেন। আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী াশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, এই নবতম শক্তির প্রকাশের রা চীন সমগ্র দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে আশঙ্কার সৃষ্টি করে তার াধিকার প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াস করছে। এরূপ আশঙ্কার রণ যে রয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। এই পরিস্থিতিতে শী-চীন জোট যদি আবার ঘনীভূত হয়ে ওঠে তার ফলে রত-রুশ মৈত্রী ও সহযোগিতা রুশ রাষ্ট্রের নূতন নায়কদের াশ্বাসবাণী সত্ত্বেও অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে কিনা সেটা ভীর অনুশীলনের বিষয়। এর ফলে ভারতের প্রতিবেশী প্রতিকূল রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্বন্ধের ভারকেন্দ্র কতটা পরিমাণে বৈয়হীন থাকবে সেটা চিন্তার বিষয়।

বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ভারতের প্রতিরক্ষা শক্তি বিলম্বে প্রভূত পরিমাণে ও প্রতিরক্ষা আয়োজনের সকল ভাগেই সমান্তরালভাবে জোরদার করে তোলাই যে াত্মরক্ষার একমাত্র উপায় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আশা রা যায় যে আমাদের রাষ্ট্রনায়কেরা এ বিষয়ে অবিলম্বে বহিত হবেন এবং উপযুক্ত আয়োজন গঠনে তৎপর বেন। বিশ্বশান্তির কল্যাণে আন্তর্জ্জাতিক সামরিক আয়োজন সীমিত করে রাখতে পারাই যে সুবুদ্ধির কাজ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রবল শত্রু পরিবেষ্টিত অবস্থায় দেশের স্বাধীন স্বাতন্ত্র বিঘ্নহীন করবার জন্য যে অতিরিক্ত সামরিক শক্তি একান্ত প্রয়োজন হয়ে উঠেছে তার দাবী অস্বীকার করে চললে যে বিশ্বশান্তি রক্ষার কাজও এগুবে না, নিজেদের অস্তিত্বও বিপন্ন হয়ে পড়বে এটুকুও স্পষ্ট করে বুঝতে হবে। আন্তর্জ্জাতিক মৈত্রী আমরা রক্ষা করে চলব কিন্তু আত্মরক্ষার আয়োজনেও আমরা অবহেলা করব না,—এটি না হলে কোনদিনই রক্ষা পাবে না।

লণ্ডনে রক্ষণশীলকে দলকে পরাজিত করে যে লেবার পার্টি পুনরায় অনেকদিন পরে বৃটিশ রাষ্ট্রের শাসনভার অধিকার করতে পেরেছেন সেটা অনেক পরিমাণে আগে থেকেই আশা করতে পারা গিয়েছিল। আশানুরূপভাবেই লেবার পার্টির পার্লামেণ্টে সংখ্যাধিক্য অতি সামান্যই হয়েছে। এই সংখ্যাধিক্যের ফলে লেবার পার্টি শাসনভার প্রাপ্ত হয়েছেন বটে তবে এই ক্ষীণ সংখ্যাধিক্য তাঁরা কতদিন বজায় রেখে চলতে পারবেন সেটাই প্রশ্ন। দুই চারিটি অন্তর্বর্ত্তী নির্ব্বাচনের ফলেই এঁদের শাসনের মেয়াদ ফুরিয়ে যাবার আশঙ্কা নিতান্ত কাল্পনিক নয়। ফলে হ্যারল্ড উইলসনের কঠিন বিদ্রূপের পাত্র মুষ্টিমেয় সংখ্যক উদার-নৈতিক দলের সদস্যেরা যে বেশ একটা জোরের স্থান অধিকার করে থাকবে তাই মনে হয়। এ পর্য্যন্ত উদারনৈতিক দলের নেতা গ্রিমড যা বলেছেন তাতে মনে হয় যে নূতন শাসনকর্ত্তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবার ব্যাপারে এঁরা এখনও অন্তিম সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারেন নি। তবে মনে হয় ভারপ্রাপ্ত দলই মোটামুটি এই সহযোগিতা পেতে থাকবে। তার কারণ মনে হয় দুটি। প্রথমতঃ এই দলটি বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে পারা সত্ত্বেও নিজেদের শক্তির উপরে নির্ভর করে এঁদের কোন কিছুই করবার ক্ষমতা নেই। অন্যপক্ষে রক্ষণশীল দলের সঙ্গে একজোট হয়েও আপাততঃ লেবার পার্টিকে ক্ষমতাচ্যুত করবার আশা নেই। তা ছাড়া হ্যারল্ড উইলসনের বিদ্রূপবাণ সত্ত্বেও নীতির দিক দিয়ে উদার দল রক্ষণশীল দল থেকে অনেক বেশী তফাতে। সবার উপরে বৃটিশ জাতির চরিত্রে স্বভাবতঃই রাজনৈতিক স্থিরতার (stability) প্রতি আনুগত্য আন্তরিক। অতএব শাসনভারপ্রাপ্ত দলের সঙ্গে সহযোগিতা করে এই স্থিরতা রক্ষা করতে এঁরা সাহায্য করবেন

সেটাই বেশী সম্ভব বলে মনে হয়। অবশ্য এ সমস্তই নির্ভর করবে নূতন মন্ত্রীদল দেশের আভ্যন্তরীণ শাসন বিষয়ে যদি বিশেষ বৈপ্লবিক ধরণের রদবদল করবার চেষ্টা না করেন। ইংরেজ জাতি যে তার চিরাচরিত সমাজ-ব্যবস্থা বা জীবনধারার খুব একটা আলোড়ন পছন্দ করেন না তার অনেক প্রমাণ ইতিহাসের সাক্ষাৎ থেকে পাওয়া যাবে।

বৃটেনের নির্ব্বাচনের ফল ভারতে আমাদের উপরে কোন নূতন প্রতিক্রিয়া বা পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে কি না এ প্রশ্ন অবান্তর। রক্ষণশীল দলের শাসনেও ইঙ্গ-ভারত সম্বন্ধ মৈত্রীর ও পারস্পরিক সাহচর্য্যের দ্বারা বিধৃত ছিল, এখনও তাই থাকবে। কেবল একটিমাত্র ক্ষেত্রে পূর্ব্ব সম্বন্ধ খানিকটা পরিমাণে বদল হলেও হ'তে পারে। সেটি কমনওয়েলথের ক্ষেত্রে। বর্ত্তমানে কমনওয়েলথ সম্বন্ধটি নানা কারণে দানা বেঁধে উঠতে পারছে না। এর অনেকটাই ইংরেজের পুরণো সাম্রাজ্যবাদের ঐতিহাসিক ভগ্নাবশিষ্টের প্রতি ঔপনিবেশিক ইংরেজদের আকর্ষণ। রক্ষণশীল ইংরেজ শাসনকর্ত্তারা এই বিষয়ে সম্পূর্ণ রকমে নিরপেক্ষ ও জাতি বিচারহীন কোনকালেই হতে পারেন নি। এঁদেরই প্রশ্রয়ের ফলে দক্ষিণ আফ্রিকা, রোডেশিয়া এবং কমনওয়েলথভুক্ত আফ্রিকা মহাদেশের অন্যান্য উপনিবেশগুলিতে জাতি ও বর্ণবৈষম্য এখনও প্রবল হয়ে রয়েছে। বৃটেনের নীতি যদি এই প্রশ্রয়মুক্ত হতে পারে তাহলে হয়তো কালে এই বৈষম্য সম্পূর্ণ দূরীভূত হতে পারবে এবং তার ফলে কমনওয়েলথ জোটটি আরো গভীর পারস্পর্য্যের দ্বারা বিধৃত হয়ে উঠবে। এই দিক দিয়ে নূতন লেবার গবর্ণমেণ্টের কাছে কমনওয়েলথ সম্ভবতঃ একটা বড় রকমের অগ্রগতি আশা করতে পারে। [illegible]র্ব্বারা ক্যাসলকে ক্যাবিনেট ভুক্ত করাও এই রকম [illegible]কটা সূচনারই আভাস পাওয়া যায় বলে মনে হয়। [illegible]র্ব্বাচনের পরাজয় সত্ত্বেও প্যাট্রিক গর্ডন ওয়াকারকে [illegible]দেশিক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিযুক্ত করায় এই আশা [illegible]রো জোরদার হয়েছে।

খাদ্য সমস্যা ও মূল্য বৃদ্ধি

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন রাজ্যের খাদ্য [illegible]স্যা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য দিল্লী চলেছেন। এ রাজ্যে [illegible]দ্যশস্য ব্যবসায়টি রাষ্ট্রীকরণ করা হবে না একথা ইতিমধ্যে [illegible]ষ্ট হয়ে উঠেছে। মুখ্যমন্ত্রীর হিসাবে বর্ত্তমান বৎসরে [illegible]শ্চিমবঙ্গে ৫০ লক্ষ টন আমন ও ৫ লক্ষ টন আউস [illegible]নের চাউল উঠবে। এর মধ্যে মাত্র ১৫ লক্ষ টন চাউল [illegible]জারে আসবার সম্ভাবনা। শহরাঞ্চলে পূর্ণ র‍্যাশন [illegible] গ্রামাঞ্চলে মডিফায়েড র‍্যাশন ব্যবস্থা আগামী ১লা [illegible]নুয়ারী থেকে চালু করার সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করতে হলে [illegible]কারী ভাণ্ডারে ১০ লক্ষ টনের উপরে চাউল সংগৃহীত [illegible]রা প্রয়োজন। সরকারী হিসাব মত রাজ্যের নিজের ফসল থেকে সংগ্রহের পরিমাণ ৬ লক্ষ টনের অধিক হ[illegible] সম্ভাবনা নেই। এই সংগ্রহ করবার ব্যবস্থা চা[illegible] মিলগুলির কাছ থেকে করা হবে, কোন ভিন্ন সরক[illegible] সংগ্রাহক আয়োজনের হাত দিয়ে নয় এবং মিলগুলি[illegible] পূর্ণ উৎপাদন সরকারী মজুদে সংগ্রহ করতে পারলে ত[illegible] এই ৬ লক্ষ টন পরিমাণ চাউল পাওয়া যাবে। গত কয়[illegible] বৎসর ধরে বেসরকারী আয়োজনে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বৃ[illegible] থেকে মোটামুটি বার্ষিক তিনলক্ষ টন চাউল আমদা[illegible] হয়েছে। গতমাসে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রীর কলিকাতায় সফর[illegible] সময় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর কাছ থেকে কেন্দ্রীয় মজুদ থেকে ২ ল[illegible] টন চাউল পশ্চিমবঙ্গকে দেবার জন্য আবেদন জানান কি[illegible] এ অনুরোধ রক্ষা করতে তিনি অসামর্থ্য জানিয়েছে[illegible] এখন শ্রীপ্রফুল্ল সেন অন্যান্য উদ্বৃত্ত রাজ্যগুলিকে আবে[illegible] জানিয়েছেন। তাঁরা যেন পশ্চিমবঙ্গের এই ঘাটাত মেটা[illegible] সাহায্য করেন।

এই গেল মোটামুটি এই বিষয়ে সম্ভাব্য সরকা[illegible] আয়োজনের চিত্র। ইতিমধ্যে রাজ্যে খাদ্যের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা আরও সঙ্গীন হয়ে এসেছে। পুলিশের ধরপাক[illegible] কমে গিয়েছে বটে এবং ফলে সরবরাহ খানিকটা বেড়েছে কিন্তু বাজার মূল্যমান আরও অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পেয়েছে কলকাতা ও নিকটবর্তী অঞ্চলে সবচেয়ে মোটা ও নীরেস চালের এখন খুচরা দর কিলো প্রতি ১টা ২০ পঃ থেকে ১টা ২৫ পঃ। সরকারী নিয়ন্ত্রণ অনুযায়ী এর মূল্য কিলো প্রতি ৬৮ পয়সার বেশী হ'বার কথা নয়। এ ছাড়া ডালের মূল্য ১টা ৪০ পঃ, গুড় ১টা ৪০ পঃ, সরিষার তেল ৫টা ৬টা ৮০ পঃ পর্য্যন্ত; বনস্পতি ৪টা ৫০ পঃ, বাদাম তেল ৪টা। কাঁচা বাজারে মাছ এখন কিছুটা রোজই উঠছে কিন্তু দামের কোন স্থিরতা নেই, সাধারণতঃ ৪টা থেকে ৮টা পর্য্যন্ত দরে বিক্রী হচ্ছে। আলুর দর ১টা ১০ পঃ, অন্যান্য সব্জী কোনটাই ৭০ পয়সার কম নয়; বেগুন ১টা ৫০ পঃ, পটল ১টা ৫০ পঃ, সাধারণ শাক ৪০।৫০ পঃ। এবং প্রতিদিনই বাজার চড়েই চলেছে। সরকারী প্রয়োগের সাফল্যের দাবীর এর চেয়ে নিদারুণ ব্যর্থতা আর কি হতে পারে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই অবস্থার বিরুদ্ধে খরিদ্দার প্রতিরোধের (Consumer ressistance) কোন লক্ষণ দেখা যায়না। নেতৃবৃন্দ নীরব; সংবাদ পত্রের দল উদাসীন। কয়েক মাস পূর্ব্বে খাদ্য সমস্যা সম্বন্ধে যে চাঞ্চল্য ও আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, তা এখন যেন সম্পূর্ণ থিতিয়ে গেছে। এ যেন ঝড়ের পূর্ব্বেকার ভয়াবহ নীশ্চলতার মতন, কোথাও কোন আন্দোলন, কোন চাঞ্চল্যের আভাস নেই। নূতন ফসলের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার কোন বদল হবে এমন আশা করাও যায় না। বরং পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের মুনাফাখোর গোষ্ঠির নিকট আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত হয়ে চলেছেন তার লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সবই সম্ভব

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

[পু]বপাড়ায় কুলি রাস্তার চৌমাথায় একখানি দু'খোপা মাটির ঘর, সামনে চওড়া দাওয়া; খড়ের ছাউনি। উত্তরের খোপখানির দরজা ভিতরের দিকে, সেখানি গৃহস্থালি ঘর; দক্ষিণের খোপটির দরজা রাস্তার দিকে—দাওয়ার একপ্রান্তে, সেটা দোকান ঘর। পিছনে একফালি উঠান; তার এক-পাশে রান্নাঘর ও চাতাল, অপর প্রান্তে ছোট একখানি গোয়াল-ঘর: ছোট মানে খুবই ছোট, কায়ক্লেশে সবৎসা একটি গাভী সেখানে রৌদ্রে-জলে আশ্রয় নিতে পারে। এইটুকুই মহেন্দ্র প্রামাণিকের সামগ্রিক আস্তানা। আর সেই আস্তানার মূল উৎস ওই দোকান ঘরটি—কৃষক-পল্লীর মাঝখানে অতি ক্ষুদ্র একটি মুদিখানার দোকান, যার সমৃদ্ধি ও মূলধন কোন দিন একশো টাকা ছাড়িয়ে যায় নি।

মুদিখানা। সাইনবোর্ডের প্রয়োজন নেই, তাই ছিলও না কোন দিন। মুখে মুখে প্রচারিত নাম। প্রবীণ ও সমবয়সীরা বলে মহিন্দির দোকান, অল্পবয়স ও জেলে-মালো-কামারিরা বলে পরামাণিকের দোকান। পদবী প্রামাণিক, কিন্তু জাতে ওরা গন্ধবণিক। ঘন-শ্যামবর্ণ পেশিবহুল দীর্ঘ দেহ প্রামাণিকের, কিন্তু জীবন-যুদ্ধে শ্রান্ত সৈনিকের মত সে দেহ এখন শিথিল হয়ে এসেছে। কিন্তু মনটা আজও কুঁচকে যায় নি। সহজ সরল বলিষ্ঠ মনের মানুষ।

দোকান ছোট হ'লে কি হয়! কেনা-বেচার অন্ত নেই। সকাল থেকে বেলা তিন প্রহর পর্যন্ত একের পর এক খদ্দেরের অন্ত নেই। মালো পাড়া, তিওর পাড়া, বাগদি পাড়া ও বাজি পাড়ার ছোট-বড় ছেলেমেয়ে ও বর্ষীয়সীরা আসে সওদা করতে। কারও আঁচলে চারটি চাল, কারও হাতে একটা বা দুটো তামার পয়সা, ভাঙা একটা কাঁচের শিশি না-হয় মাটির কুপি।

একজনের কেনা শেষ হ'লে, আর-একজন এগিয়ে আসে দরজার সামনে।

নাকের ওপর নিকেলের ডাঁটভাঙা পুরাণো চশমাটা সুতো দিয়ে কানের সঙ্গে বাঁধা। চশমাটা একটু তুলে নিয়ে, ভাঙা দাঁতের ফাঁকে একটুকরো হাসি টেনে এনে পরামানিক বলে, 'কি গো, তোমার কি চাই?'

হাতের তামার পয়সা দু'টি টাটের দিকে এগিয়ে দিয়ে, বাগদিবৌ বলে, 'আধ পয়সার তেল, এক সিকির নুন, এক সিকির লঙ্কা আর আধ পয়সার সাজিমাটি।'

ভাঙা শিশিটা সামনে রেখে, আঁচল পাতে বাকী সওদা-গুলো কাপড়ের খুঁটে বেঁধে নেবার জন্য। শিশিতে তেল নিয়ে, হাসিমুখে হাত পেতে একটা আধলা ফেরত নেয়।

এমনি ক'রে চলে দিন।

সংসার বলতে মহেন্দ্র প্রামাণিকের প্রৌঢ়া স্ত্রী, একটি বিধবা কন্যা ও তার অপোগণ্ড এক পুত্র। প্রাচুর্য নেই, তবুও এক বাটি গুড়-মুড়ি ও দু'বেলায় দু'মুঠো মোটা ভাতের সংস্থান কোনরকমে হয় ওই দোকান থেকে।

বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খদ্দেরের ভিড় তেমন থাকে না। দু'-চারজন আসে দু'-এক পয়সার কেরোসিন তেল না-হয় তামাক কিনতে।

প্রতিদিনই সন্ধ্যার পর দাওয়ায় বসে প্রতিবেশীদের মজলিস। ভিন্‌পাড়া থেকেও কেউ কেউ আসে। ও পাড়ার দাদাঠাকুরও মাঝে মাঝে আসেন—'কি গো মহিন্দির, সব ভাল ত?'

'আজ্ঞে, আপনার আশীর্ব্বাদে—'

মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠে, দাদাঠাকুরের পায়ের ধুলো নেয়। চাটাইখানা ঠুকে, ধুলো ঝেড়ে একপাশে পেতে দেয় বসবার জন্য।

দেয়ালের গায়ে পেরেকে ঝুলানো থাকে দু'টি ডাব হুঁকো—একটি কড়ি-বাঁধা, আর একটিতে বাঁধা সুপারি। কড়ি-বাঁধাটি বামনে হুঁকো, আর সুপারি-বাঁধা কায়স্থদের।

কড়ি-বাঁধা হুঁকোটি নামিয়ে, জল বদলে, মহেন্দ্র নিজে তামাক সাজতে বসে দাদাঠাকুরের জন্য।

দাওয়ার একপাশে তুষ আর ঘুঁটে দিয়ে মাটির এক মালসায় আগুন জাগানোই থাকে।

সন্ধ্যার পর প্রায়ই মোড়লদের সীতানাথ আসে রামায়ণ পড়তে। তেল-তামাক পরামাণিকের। পরামাণিক কেরো-সিনের ডিবেটা জেলে, জলচৌকি ও রামায়ণখানা এনে করে দেয়।

সীতানাথ সুর ক'রে রামায়ণপাঠ আরম্ভ করে। পু[ণ্য]-লোভাতুর শ্রোতারা এসে একে একে বসে দাওয়াটা জুড়ে। মহেন্দ্র প্রামাণিক গলবস্ত্র হয়ে ব'সে থাকে দোকানঘরের দরজাটার পাশে। একঘেয়ে জীবন সন্ধ্যায় অবসরে ভরে হয়ে ওঠে আনন্দ ও বেদনার অশ্রুতে।

...তানাথের সামনে রাখে: 'আজ কি
...হরণ!'
...
...হ'ল।
...শ্রোতারা এসে ঘিরে বসল সীতানাথকে।
সীতানাথ সুর করে রামায়ণ পড়ে:
...কে থেকে ভাবাবেশে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে।
...কুর এসে উপস্থিত হলেন। রামায়ণ-পাঠের
...র যথাকর্তব্য বিস্মৃত হ'ল না। তাড়াতাড়ি
...টা নামিয়ে নিয়ে, দাদাঠাকুরের জন্য সে
... বসল।

রামচন্দ্র গেলেন সেই স্বর্ণমৃগের সন্ধানে। লক্ষ্মণ প্রহরী। সীতা অধীর হয়ে উঠলেন। ...য় লক্ষ্মণ গেলেন অগ্রজের সন্ধানে। একাকিনী রইলেন কুটারে, তাই যাবার বেলায় ...-বেষ্টনী এঁকে দিয়ে গেলেন কুটীরের সামনে—...রেখা।

...ীর বেশে এল রাবণ, ছলে ও বলে অপহরণ করে ... মা-জানকীকে। হায়! হায়!

...লের অন্তর আলোড়িত হয়ে উঠেছে। কেউ করছে ...ণের মুণ্ডপাত, কেউ বা অশ্রু মোছে।

আ...তে সন্ধ্যার অন্ধকারে যমদূতের মত হন্ হন্ করে ...সে হাজির হ'ল সেই ছোকরা! মাথায় একটা ঝাঁকা!

ঝাঁকাটা দাওয়ার একপাশে নামিয়ে, ছোকরা ব'লে উঠল—'কই গো পরামাণিক! গুণে লাও।'

ছাঁৎ ক'রে উঠল মহেন্দ্র পরামাণিকের বুকের ভেতরটা। পা থেকে মাথা পর্যন্ত নিমেষে ঝিম ঝিম করে উঠল—'একি সেই আমড়া?—বাজি!—এনেছে ছোঁড়া!'

'এই লাও। একটো একটো করে গুণে লাও।' —আমড়ার থোকাটা দাওয়ায় নামিয়ে দিয়ে, মাথার গামছা-খানা খুলে ছোকরা দুলিয়ে দুলিয়ে বাতাস খেতে লাগল। মুচকি মুচকি হাসে আর আমড়াগুলোর দিকে তাকায়।

রামায়ণ বন্ধ হয়ে গেল। লণ্ঠন আর লম্ফ নিয়ে লোকগুলো হুমড়ি দিয়ে এসে পড়ল আমড়া থোকাটার ওপর। দাদাঠাকুরও।

'রাম, দুই, তিন, চার—'

অদ্ভুত চাঞ্চল্য! ওরা গুণে চলল আমড়া।

মহেন্দ্র প্রামাণিক পাথরের মুর্তির মত স্থির হয়ে গেল। চোখে তার পলক পড়ে না। —'তাই হ'ল! সেই অঘটনই ঘটল!......এক পণ তিনটে আমড়া আছে থোকাটায়। সর্বেশ্বর পরামাণিকের ছেলে সে, বাক্ দিয়েছে। পিছিয়ে আসবে না। বংশের মান সে রাখবে। কিন্তু কারবারের মূলধন ওর মাত্র শ'খানেক টাকা!......দুপাট্টা তামাক—বাইশ বাইশ চুয়াল্লিশ, আর আঠার টিন চিটেগুড়......। বাকী যে মূলধন থাকবে, তা দিয়ে দু'বেলা কেন, একবেলার একমুঠো করে মোটা ভাতও জুটবে না।'

ওদের উৎসাহ তখন উথলে উঠেছে। উল্লাসে মাতামাতি করে সব।

'কই গো পরামাণিক, তামাকের পাট্টা আর চিটে-গুড়? বার কর, বার কর এখুনি। আমরা সব সাক্ষী। —ওরে মরা হাতীও লাখটাকা।'

'তা-ই।'

টলতে টলতে ঘরের ভেতরে গিয়ে, মহেন্দ্র প্রামাণিক তামাকের পাট্টা দুটো ঠেলে নিয়ে এল দরজার কাছে। ওরা ঝুঁকে পড়ল।

গাড়ির চাকার মত বড় বড় পাট্টা দুটোকে গড়িয়ে নিয়ে এল দাওয়ায়। তারপর সুরু হ'ল ভাগাভাগি। ডালপালা সমেত তামাকের ঝাড়গুলোকে ওরা টেনে টেনে বের করে পাট্টার ভেতর থেকে। মহেন্দ্র প্রামাণিকের মনে হয়, ওর বুকের পাঁজরাগুলো ওরা ভেঙ্গে ভেঙ্গে ছাড়িয়ে নিচ্ছে। কিন্তু সে নির্বাক্। তারপর বাইরে নিয়ে এল গুড়ের টিনগুলো। মুখে মুখে হয়ে গেল ভাগাভাগি। এক-একজনের জিম্মায় রইল এক-একটা টিন। ওরা নিয়ে গেল। কোলাহল শুনে দোকানঘরের দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে মহেন্দ্র পরামাণিকের স্ত্রী ও বিধবা কন্যা। অপোগণ্ড নাতিটা তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। ক্ষণকাল পরেই দোকানের দাওয়া আবার জনহীন হয়ে গেল। সব নীরব।

দিন যায়, দিন আসে।

মহেন্দ্র পরামাণিকের দাওয়ায় আর বসে না সন্ধ্যার মজলিস, রামায়ণ-পাঠের আসর। দিনে বাগদি-পাড়া ও ফরাজি পাড়ার দু'চারজন পুরাণো খদ্দের আসে—হয় আঁচলে চারটি চাল, না-হয় হাতে দুটো তামার পয়সা নিয়ে।

সেই কেনা-বেচা—এক সিকির নুন, এক সিকির শুক্‌নো লঙ্কা, আধ পয়সার তেল, না-হয় সাজিমাটি।

কোনদিন একমুঠো মোটা ভাত জোটে, কোনদিন জোটে না। খৈল-বিচালি যোগাতে পারে নি ব'লে, গাভিন গরুটাকে ষোল টাকায় বিক্রি ক'রে সে টাকাও দোকানে লাগিয়েছে, তবুও দোকান চলে না। সাহানীর

সামান্য কয়েকটা টাকা আজও শোধ করে উঠতে পারে নি। সেও মাঝে মাঝে এসে তাগাদা দেয়

মেরামতের অভাবে দোকানের দাওয়াটা ভেঙ্গে পড়েছে। শুধু দোকানঘরের সামনেটুকু খাড়া হয়ে আছে বাঁশের খুঁটি ভর করে। সেইখানে দরজার পাশে ঠেস দিয়ে ব'সে থাকে মহেন্দ্র। বয়েস সত্তর ছাড়িয়ে গিয়েছে। চোখে আর ভাল নজর চলে না।

কাহিনীটা গাঁয়ের ছেলেমেয়ে কারও অজানা নয়। পাড়ার ছেলেগুলো সেই পথে যেতে যেতে হঠাৎ একবার করে থমকে দাঁড়ায়—'ও পরামাণিক!'

'বল, ভাই।' পরামাণিক কম্পিত কণ্ঠে উত্তর দেয়।

ওরা বলে—'সহরে দেখে এলাম, একটা ছুঁচের ছিদ্দির দিয়ে একশ'টা হাতী ছুটে যাচ্ছে আর আসছে।'

পরামাণিক গলা ঝেড়ে বলে—'তা হবে। দুনিয়ায় সবই সম্ভব। কিছুই বিচিত্র নাই।'

'তাই ব'লে কি ছুঁচের ভেতর দিয়ে হাতী যেতে পারে?'

'তা পারে। অবিশ্বাস করবার নাই কিছু। সবই সম্ভব। আর সে দু'পাটা তামাকও নাই, আঠার টিন চিটেগুড়ও নাই।'

ওরা হাসে, কিন্তু পরামাণিকের মুখখানা নৈরাশ্যে ভরে ওঠে।

'শুনেছ, মহিন্দির দাদা?' —পথ চলতে চলতে আবার কেউ এসে দাঁড়ায়।

'কি?'

'কেনারামের পিসি তার নাত্-জামাইয়ের সঙ্গে বৃন্দাবন গিয়েছিল।'

'তা হবে।'

'ওগো, বৃন্দাবন নয়, মিছে কথা। পালিয়েছিল। তারপর সেখান থেকে কলকাতায় কালীঘাটে বিয়ে করেছে। পাঁচুকাকা দেখে এসেছে, এখন তারা তেলেভাজার দোকান করেছে বেনেপুকুর মোড়ে। নাত্-জামাইটা ছেলের কাঁথা কাচে, কেনারামের পিসি মাথায় সিঁদুর দিয়ে নরম নরম বড়া ভাজে। দাঁত নাই ত তার।'

'তা হবে। দুনিয়ায় সবই সম্ভব। যে যুগ পড়েছে।'

'সেটা না হয় সম্ভব হ'ল। কিন্তু ওপাড়ার লোকে যে বলছে, হরিশ বাগদির ছাগলটা নাকি সেদিন কি-গাছের পাতা খেয়ে, রাতারাতি কলেজ-পাশ মেয়েছেলে হয়ে বাড়ী থেকে পালিয়েছে! এখন সে কোন্ অ... রাজ্যের মন্ত্রী!' রাতদিন উটে চড়ে গণ্ডার শিকার ক... বেড়াচ্ছে।

'সবই সম্ভব, ভাই! এ-যুগে সবই সম্ভব। বড় হ... আপনিই বুঝবে।......আর আমার সেই দু'পাটা তামা... নাই, আঠারো টিন চিটেগুড়ও নাই। সম্ভব, স... সম্ভব।

মহেন্দ্র পরামাণিকের মুখখানা লোহার মত শক্ত হ... গেল।......'সম্ভব, সবই সম্ভব।'

যতীন্দ্রবিমল স্মরণে

শ্রীহেমেন্দুবিকাশ নাগ

তকুন্তলা সরিৎমেখলা চট্টলার তথা ভারতের অন্যতম
ী সন্তান ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর মহাপ্রয়াণ
ান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং নির্ভীক কর্মসাধনায়
াসিত একটি গৌরবময় জীবনের উপর যবনিকা
নিয়া দিল।

সংস্কৃত ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন—বিশেষতঃ সংস্কৃতের
ল প্রচার এবং ব্যাপকতর পঠন-পাঠনের জন্য নিরন্তর
চেষ্টায় তিনি তাঁর দেহমন পরিপূর্ণ ভাবেই নিযুক্ত
রিয়াছিলেন। তাঁর সুমহান আদর্শের ধ্রুবতারার
কে লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখিয়া তিনি দিবারাত্রি যেভাবে
াহার-নিদ্রার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া মহান্ যোগীর
চ কর্মসাধনায় মগ্ন থাকিতেন তাহা নিতান্ত বিরল।
র প্রশস্ত ললাট, প্রসন্ন আনন, আয়ত নয়ন, মস্তকে
তশুভ্র দীর্ঘ কেশরাশি এবং সর্বোপরি তাঁর শান্ত
ৌম্য মূর্তি দেখিলে তাঁকে ঋষি বলিয়াই মনে হইত।

সংস্কৃতের প্রতি অনুরাগ ডক্টর যতীন্দ্রবিমলের সহজাত
ল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। চট্টগ্রামের সুদূর পল্লীতে
ধুরখীল গ্রামে এক বিত্তশালী পরিবারে যতীন্দ্রবিমলের
ন্ম হয়। তাঁহার পিতা একাধারে শিক্ষক ও
ম্যাধিকারী ছিলেন। যতীন্দ্রবিমলের শুভজন্মলগ্নে
চ্চারিত মঙ্গলাচরণের পবিত্র সংস্কৃত মন্ত্র নবজাত শিশুর
ন যে ধ্বনি অনুরণিত করিয়াছিল তাহাই যেন পরবর্তী
বনে—বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে ও প্রৌঢ় অবস্থায়—
তীন্দ্রবিমলের হৃদয়-বীণায় বিশিষ্ট সুরের লহরী
গাইয়াছে। বাড়ীর প্রশস্ত উঠানের একপ্রান্তে
ীমণ্ডপ—বারোমাসের তের পার্বণের ঘনঘটা লাগিয়াই
াছে। বাড়ীর অন্যান্য শিশুরা হৈচৈ নিয়ে ব্যস্ত, কিন্তু
উ যতীন্দ্রবিমল পুরোহিতের নিকটে বসিয়া সুমধুর
স্কৃতের মন্ত্রপাঠ শুনিতেছে মন্ত্রমুগ্ধের মত। যতীন্দ্র-
মলের জ্যেষ্ঠ অগ্রজ যোগেন্দ্রনাথ পরবর্তী জীবনে
্যাসধর্ম গ্রহণ করিয়া হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে আশ্রয়
ন, আর প্রত্যাবর্তন করেন নাই। অল্প বয়স
কেই যোগেন্দ্রনাথ সুমধুর আপনভোলা সুরে ঈশ্বর
াসনা করিতেন, আর তাঁহার সেই মধুর সংস্কৃত
াত্রপাঠ বালক যতীন্দ্রবিমল একাগ্র মনে শুনিতেন
বং কয়েকটি কলি নিজেই আবৃত্তি করিতেন। বিদ্যালয়ে
পড়িবার সময় সংস্কৃতের প্রতি যতীন্দ্রবিমলের বিশেষ
অনুরাগ দেখা যায়। চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল স্কুলে পড়িবার
সময় তাঁহার আগ্রহে সংস্কৃত পড়াইবার জন্য একজন
সংস্কৃত পণ্ডিত নিযুক্ত করা হয়। সংস্কৃতে বিশেষ
ব্যুৎপত্তির দরুণ যতীন্দ্রবিমল বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় এবং
ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রায় পূর্ণ নম্বর অর্জন
করিয়াছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়নের সময়
যতীন্দ্রবিমল সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।
কলেজ-ছুটির অবকাশে যখন তিনি চট্টগ্রামে নিজের
বাড়ীতে যাইতেন তখন প্রায়ই তাঁহাকে সংস্কৃত উপাধি-
ধারী পণ্ডিত মহাশয়দের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনায় মগ্ন দেখা
যাইত। কোন কোন ক্ষেত্রে উক্ত পণ্ডিত মহাশয়দের
সঙ্গে তাঁহার মতান্তর ঘটিলে তিনি বাধা-বিপত্তি দুর্যোগ
উপেক্ষা করিয়া, কয়েক ক্রোশ পথ পদব্রজে অতিক্রম
করিয়া তাঁহার স্বনামখ্যাত আদি শিক্ষাগুরুর (৺জগৎচন্দ্র
স্মৃতিতীর্থ) নিকট গিয়া আপন মতের সত্যতা যাচাই
করিতেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়নকালীন বিশ্ব-
বিদ্যালয়ের অঙ্কশাস্ত্রে তাঁর পরীক্ষার নির্দিষ্ট দিনে সকাল
বেলা হিন্দু হোষ্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁকে পাঠ্য-
বহির্ভূত সংস্কৃত পুস্তক অধ্যয়নে অভিনিবিষ্ট দেখিয়া বিস্ময়
প্রকাশ করেন। সংস্কৃত সাহিত্যে যতীন্দ্রবিমলের অপরি-
সীম অনুরাগ ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে।

তখনকার অন্যান্য অভিভাবকের মত যতীন্দ্রবিমলের
পিতার ইচ্ছা ছিল তাঁর ছেলে প্রতিযোগিতামূলক
পরীক্ষার মাধ্যমে ম্যাজিষ্ট্রেট, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইবেন।
পিতার ইচ্ছানুযায়ী যতীন্দ্রবিমলকে তার জন্য প্রয়াসও
করিতে হইয়াছিল। কিন্তু যাঁর চিত্ত সংস্কৃত সাহিত্যে
নিহিত, মধু আহরণ ও আকণ্ঠ পান করিবার
জন্য নিত্য ব্যাকুল তাঁর কি অন্য কোন কাজ ভাল
লাগে? বিলাতে যতীন্দ্রবিমল সংস্কৃত অধ্যয়ন ও
গবেষণায় তনু মন ধন অর্পণ করিলেন। ভাগ্যলক্ষ্মী
প্রসন্না হলেন। যতীন্দ্রবিমল কেবল ডক্টরেট উপাধি
পাইলেন তাহা নহে, তিনি লণ্ডনে স্কুল অব ওরিয়েণ্টাল
ষ্টাডিজের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। এই সময় লণ্ডনে
ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর অধীনে যাবতীয় সংস্কৃত
পাণ্ডুলিপির বিশদ ও বর্ণানুক্রমিক তালিকা প্রণয়নে

যতীন্দ্রবিমল কঠোর পরিশ্রম করেন ও কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

ডক্টর যতীন্দ্রবিমল আকৈশোর নারী-প্রগতির একজন উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। তাঁহার জন্মভূমিতে নারী-শিক্ষা প্রসারের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন ও সমাজ-সেবামূলক কাজে মেয়েদের অংশ গ্রহণে উৎসাহদান ইত্যাদি ছাত্রাবস্থায়ই তিনি করিতেন। প্রাচীনযুগে নানা ক্ষেত্রে নারীদের গৌরবময় ভূমিকার বিষয় তিনি গর্বের সহিত আলোচনা করিতেন। পরবর্তী জীবনে তাঁহার প্রথম গবেষণা-গ্রন্থ "সংস্কৃতে নারী কবি" বা "সংস্কৃত সাহিত্যে নারীর দান" হইতেই প্রতীয়মান হয় যে-সমাজের অবহেলিত অর্দ্ধাংশ নারী যাহাতে পূর্ব গৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশ ও সমাজকে সর্বক্ষেত্রে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে পারে সেজন্য তাঁহার দরদী মন সজাগ ও সচেষ্ট ছিল। কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা ও অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ডক্টর যতীন্দ্রবিমলের দরদী মন নূতন রূপে প্রকাশ পায়। যিনি কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে ছিলেন 'দরদী' তিনি ক্রমশঃ হইলেন 'পূজারী'। ডক্টর যতীন্দ্রবিমল নারীদের মধ্যে মাতৃশক্তির প্রকাশ হৃদয়ঙ্গম করিলেন। সীতা, যশোধরা, বিষ্ণুপ্রিয়া, রাধা ও সারদামণির পুণ্যজীবন বিশদভাবে পর্যালোচনা করিয়া তিনি মাতৃতত্ত্ব প্রচার করিতে লাগিলেন। সর্বশক্তিময়ী করুণাময়ী বিশ্বজননীর আরাধনায় তিনি মাতিয়া উঠিলেন। 'মা' 'মা' ডাকে তিনি বিভোর হইয়া থাকিতেন সময় সময়। ক্রমশঃ তাঁহার নিকট পার্থিব জীবন ও দিব্য জীবনের ব্যবধান দ্রুত ঘুচিয়া আসিতেছিল।

ডক্টর চৌধুরীর দেশাত্মবোধ বরাবরই প্রখর ছিল। প্রথম জীবনে তিনি মাতৃভূমির মুক্তিসাধনে উৎসর্গীকৃত প্রাণ বিপ্লবীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেন। যদিও তিনি রাজনৈতিক আবর্তের বাহিরে নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্র বাছিয়া লইয়াছিলেন, তথাপি সুযোগমত বিপ্লবীদের সহায়তাদানে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। স্বাধীনতালাভের পরবর্তীযুগে তিনি বিশ্বাস করিতেন ও প্রচার করিতেন যে সংস্কৃতের প্রচার মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষাগত ভেদবৈষম্য দূর করিয়া জাতীয় ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষা সম্পূর্ণ সম্ভব। তিনি উন্নততর স্বদেশপ্রেমের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে তাঁর রচিত ভাবনাময়ী সংস্কৃত নাটক অভিনয়ের মাধ্যমে জাতীয় ঐক্যের আদর্শ-প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন।

ডক্টর যতীন্দ্রবিমলের চরিত্রের মধুরতম আকর্ষণীয় দিক ছিল তাঁর সরল, অকৃত্রিম এবং অমায়িক ব্য[বহার]। বাল্যে এবং কৈশোরে চট্টগ্রামের নয়নাভিরাম প্র[াকৃতিক] সৌন্দর্যের প্রাচুর্য তাঁহার মনকে স্নিগ্ধ সরল ও [...] করিয়া গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছিল। ঐ [...] মধ্যে তিনি একাকী কর্ণফুলির তীরে বসিয়া স্রোত[ের] সুমধুর কলধ্বনি শুনিতেন। মধ্যে মধ্যে [...] চট্টগ্রামের উপকণ্ঠে বঙ্গোপসাগরের উত্তাল তর[ঙ্গ] তাঁর তরুণ মনে অনন্ত ও অসীমের সুর জাগাইয়া তু[লিত]। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি চট্টলা একদিকে তার এই প্রিয় সন্তানের মধ্যে কমনীয়তা মূর্ত [করিয়া] তুলিয়াছিল, অন্যদিকে চট্টগ্রামের সারি সারি পাহা[ড়] মনে দুর্জয় সঙ্কল্প এবং আদর্শনিষ্ঠা সঞ্চারিত করিয়া[ছিল]।

যতীন্দ্রবিমল প্রথম জীবন হইতেই সঙ্গীত [ও] কীর্তনপ্রিয় ছিলেন। কলেজ-ছুটির সময় গ্রামে [...] তিনি তাঁর কীর্তনের দল গঠন করিয়া বিভিন্ন জ[...] কীর্তনের আনন্দে মাতিয়া উঠিতেন। চণ্ডীদাস প[দাবলী] কীর্তন তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। এই সময়ে ছো[ট] নাটক অভিনয়ে তাঁর বিশেষ উৎসাহ দেখা যা[য়]। প্রথম জীবনে তাঁহার মধ্যে নাট্যপ্রতিভার যে [...] হইয়াছিল তাহাই শেষ জীবনে বিশেষ ভাবে বি[কশিত] হইয়া তাঁহার সুললিত ভাষায় রচিত অর্দ্ধশত [...] সংস্কৃত নাটকের রূপায়ণে ভারতের অগণিত নরনা[রীকে] আনন্দদান করিয়াছে। তাঁহার মধ্যে নেতৃসুলভ [...] গুণ কিশোর বয়স হইতেই দেখা যায় এবং উত্তর[কালে] এ সকল গুণরাশি তাঁর মধ্যে সম্যক্‌বিকাশ লাভ ক[রে]।

তিরোধানের কিছুকাল পূর্ব হইতেই ডক্টর যত[ীন্দ্র]বিমলের কর্মসাধনা দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। স[ংস্কৃত] ভাষাকে সহজ ও সরল করিয়া জনসাধারণের বোধ[গম্য] করা এবং সংস্কৃত প্রচারের দুর্বার স্রোতে দেশের স[...] ভাষা-ভিত্তিক বিভেদ প্রচেষ্টাকে ভাসাইয়া দে[ওয়া] তিনি অন্যতম ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সংস্কৃ[ত] ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই কর্মযোগীর নেতৃত্বের প্রয়োজ[ন] যখন দেশে সত্যই প্রয়োজন ছিল তখনই মহাকা[ল] তাঁহাকে ছিনাইয়া লইয়া গেল।

বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের পুনর্বিন্যাস এব[ং] পরিবর্দ্ধন ডক্টর যতীন্দ্রবিমলের বিরাট কর্মশক্তির অমো[ঘ] সাক্ষ্য। তিনি বাংলার তথা ভারতের প্রত্যেক সংস্কৃত-সেবী এবং সংস্কৃতজীবী পণ্ডিতকে পরম আত্মীয়জ্ঞানে সর্বপ্রকার সাহায্য করিবার চেষ্টা করিতেন। যতীন্দ্র-বিমলের তিরোধানে এই বিরাট পণ্ডিত সমাজ সত্য সত্যই আজ একজন অকৃত্রিম সুহৃদকে হারাইল।

ক্টর যতীন্দ্রবিমলের জীবন-কথা পর্যালোচনা করতে গেলে তাঁহার পরমা বিদুষী সহধর্মিণীকে বাদ দেওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে ডক্টর রমা চৌধুরী তাঁহার সর্ববিধ কর্মপ্রচেষ্টায় প্রেরণার প্রধান উৎস ছিলেন। তিনি বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা বিদ্যায়তনের ভার গুরুদায়িত্ব পালন করিয়াও নিরন্তর তাঁহার স্বামীর দৈনন্দিন কাজে সক্রিয় সহযোগিতা করিয়াছেন। যতীন্দ্রবিমলের সংস্কৃত নাট্যরচনায়ও তাঁর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। পরলোকগত নেতা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই দম্পতির মিলনবাসরে মন্তব্য করিয়াছিলেন—"This is a union between Sanskrit and Philosophy." সত্যসত্যই সংস্কৃত ও দর্শনশাস্ত্রে পারদর্শী এই দুইটি পণ্ডিতের মিলন সমাজকে বিশেষ অবদানে সমৃদ্ধ করিয়াছে। Dr. and Mrs. Rhys Davids, যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ীরূপে এই সুধী দম্পতির উপমা কেহ কেহ দিয়াছেন তাতে কোন অত্যুক্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। উভয়েই সরকারী সংস্থায় চাকুরী গ্রহণ করিয়া অনায়াসেই—আর দশজনের মত নির্ঝঞ্ঝাট আরামের জীবন যাপন করিয়া তাঁহারা সুখে থাকিতে পারিতেন। কিন্তু সেই পার্থিব সুখ উপেক্ষা করিয়া এই আদর্শ দম্পতি 'বহুজন হিতায়' নিজেদের বিলাইয়া দিয়াছেন। ইহার জন্য ডক্টর রমা চৌধুরী অধিকতর কৃতিত্বের অধিকারী। তাঁহার নিত্য সাহচর্য, প্রেরণা, গ্রন্থ-রচনায় পারস্পরিক অংশগ্রহণ ব্যতীত ডক্টর যতীন্দ্রবিমলের পক্ষে স্বল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে এরূপ ব্যাপক কর্মসাধন সম্ভব হইত না। উভয়ের যুক্ত প্রচেষ্টায় প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে তাঁহাদের পরম আদরের গবেষণাগার 'প্রাচ্যবাণী' প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের সর্বত্র আজ প্রাচ্যবাণী সুপরিচিত। বিভিন্ন স্থানে প্রাচ্যবাণীর শাখা সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রাচ্যবাণীর সভ্যবৃন্দ ও শিল্পীরা ডক্টর যতীন্দ্রবিমল বিরচিত বহু সংস্কৃত ও বাংলা গান তাঁদের সুমধুর কণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন, তাঁহার নিতান্ত সরল ও সুললিত ভাষায় রচিত অপূর্ব নাট্যগ্রন্থগুলি তাঁহাদের অনবদ্য অভিনয়ের মাধ্যমে সর্বত্র জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছেন। এই সমস্ত সঙ্গীত ও ও নাট্যানুষ্ঠানে প্রযোজনার গুরুদায়িত্বভার বরাবরই ডক্টর রমা চৌধুরী স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাকে সত্যসত্যই আক্ষরিক অর্থে মহান্ স্বামী যতীন্দ্রবিমলের সহধর্মিণী বলা যায়।

বাংলা দেশে একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ডক্টর যতীন্দ্রবিমলের সর্বাপেক্ষা প্রিয় লক্ষ্যগুলির অন্যতম ছিল। এই মহান্ লক্ষ্যে পৌঁছাইবার জন্য তিনি বহু বৎসর যাবৎ অমানুষিক পরিশ্রম করিয়াছেন। ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত সংস্কৃত কমিশনের অন্যতম সদস্য হিসাবে তিনি একদিকে যেমন ভারতের অন্যান্য রাজ্যে সংস্কৃত শিক্ষাপ্রসারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনই বাংলা দেশে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ ত্বরান্বিত করিবার জন্য সর্বতোভাবে নিরন্তর প্রয়াসী ছিলেন।

বাহিরের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রচণ্ড কাজের চাপ সত্ত্বেও ডক্টর যতীন্দ্রবিমলের সৃজনীশক্তি মোটেই হ্রাস পায় নাই। সারাদিন দায়িত্বপূর্ণ এত কাজ করিবার পরও তিনি অধিক রাত্রি পর্যন্ত গ্রন্থ রচনার কাজে ব্যাপৃত থাকিতেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এই মহান্ কর্মযোগী যদি তাঁহার দৈনন্দিন প্রচণ্ড খাটুনির বহর কমাইয়া চলিতেন, হয়ত এত শীঘ্র এই অমূল্যজীবন নিঃশেষ হইয়া যাইত না। যতীন্দ্রবিমলের তিরোধানে সংস্কৃত ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক খসিয়া পড়িল। তাঁহার এই অভাব পরিপূরণ করা অসম্ভব। নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, ডক্টর যতীন্দ্রবিমলের পরম সাধের স্বপ্ন বাংলা দেশে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন যখন বাস্তব রূপ গ্রহণ করিতে চলিয়াছে তখনই এই উৎসর্গীকৃত প্রাণ মহান্ কর্মনায়ককে আমরা হারাইলাম।

—

রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের ইংরেজী অনুবাদের তালিকা

শ্রীসুধাময়ী মুখোপাধ্যায়

(১৯১৪) গীতিমাল্য—র র ১১

আমি হাল ছাড়লে তবে—Gitanjali 90—When I give up the helm (46)

* আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ—Gitanjali 41—This is my delight thus to wait (2

* কোলাহল ত বারণ হল, এবার কথা—Gitanjali 89—No more noisy loud words (12)

* রাত্রি এসে যেথায় মেশে—Crossing 29—I have met thee where the night (275)

* আজ প্রথম ফুলের পাব প্রসাদখানি—Crossing 41—The gift of the earliest flower

ভাগ্যে আমি পথ হারালেম কাজের পথে—Lover's Gift 48—I travelled the old road every day (

এই যে এরা আঙিনাতে এসেছে জুটি—Fugitive III 4—In the evening after they had brought

আমি আমায় করব বড় এই তো—Gitanjali 71—That I should make much (33)

* এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার—Gitanjali 21—I must launch out my boat (11)

অনেক কালের যাত্রা আমার—Gitanjali 12—The time that my journey takes (7)

* যেদিন ফুটল কমল কিছুই—Gitanjali 20—On the day the lotus bloomed (10)

এখনো ঘোর ভাঙে না যে তোর—Gitanjali 55—Langour is upon your heart (28)

* তুমি একটু কেবল বসতে দিও কাছে—Gitanjali 5—I ask for a moment's indulgence (4)

* কেগো অন্তরতর সে—Gitanjali 72—He it is, the innermost one (34)

* আমারে তুমি অশেষ করেছো—Gitanjali 1—Thou hast made me endless (3)

* এবার তোরা আমার যাবার বেলাতে—Gitanjali 94—At the time of my parting (44)

* হারমানা হার পরাব তোমার গলে—Gitanjali 98—I will deck thee with trophies (45)

* পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহ ভাই—Gitanjali 93—I have got my leave (43)

তব রবিকর আসে কর বাড়াইয়া—Gitanjali 68—The sunbeam came upon this earth (32)

* সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি—Gitanjali 53—Beautiful is thy wristlet (26)

এই দুয়ারটি খোলা—Fugitive III 35—In the evening, when the dew glistened

কে নিবি গো কিনে আমায়—Crescent Moon—The Last Bargain (86)

...াছে তোমার—Poems 52—Infinite is your wealth

...র নাহি সাজে—Fruit Gathering 11—It decks me only to mock me (180)

... ফুলের মত—Fruit Gathering 2—My life, when young, was like a flower (177)

...নি—Fruit Gathering 23—The poet's mind floats and dances ?

...বাবে—Fruit Gathering 51—I know that at the dimend (202)

Presidency Coll. Magazine Sept. 1919—'I know one day'—By K. C. Sen

Modern Review, Dec. 1929—'I know my days will end'— By Indira Debi

...র খেলা—Fruit Gathering 38—This is no mere dallying of love (195)

... নাম বলব নানা ছলে—Fruit Gathering 82—I will utter your name (216)

...বেলায় কখন এসে—Fruit Gathering 38—I did not know that I had thy touch

...খুশির তুফান উঠেছে—Fruit Gathering 76—Timidly I cowered in the shadow (214)

...ম দিলে না প্রাণে—Crossing 30—If love be denied of me, then why (275)

...র সকল কাঁটা ধন্য করে—Poems 53—I know that the flower

Sheaves—Fulfilment—Filling all my thorns with gratitude

...কিয়ে আস আঁধার রাতে—Sheaves—The Friend Secretly thou comest in the dark night

...আমার কণ্ঠ তারে ডাকে —Sheaves—Truants—When my voice calls him

...তোমার বীণা যেমনি বাজে—Sheaves—New Worlds—Lord, as thy harp sounds

...র আমায় মিলন হবে বলে—Sheaves—The Bridegroom—Because you and I shall meet

...দি জানতেম আমার কিসের ব্যথা—Presidency Coll. Magazine March 1925—'The Sanctuary of sorrow'

—By Saroj Kumar Das

...সুর বাজেরে—Sheaves—The Right Note—No where else but in thy own self

...জপুরীতে বাজায় বাঁশি—Crossing 64—While I walk to my King's House

...ত আলো জ্বালিয়েছ—Fruit Gathering 70—When you hold your lamp (211)

...র রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল—Crossing 21—"On that night, when the storm broke"

Presidency Coll. Magazine Sept. 1917—"The Night you came"

—By Profulla Kumar Das

...াড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে—Fruit Gathering 67—You always stand alone beyond

...জানি নাই গো সাধন—Fruit Gathering 16—They knew the way and went (183)

...যা আমি কী সন্ধানে—Sheaves—Needless Quest—Whom shall I ask

...দর কথায় ধাঁধাঁ লাগে—Fruit Gathering 15—Your speech is simple, my master (182)

...ওয়া লাগে গানের পালে—Crossing 3—The wind is up, I set my sail

...বল তো এই বারের মত—Fruit Gathering 1—Bid me and I shall gather (177)

* তুমি যে সুরের আগুন—Poems 54—My heart is on fire

* ওদের সাথে মেলাও—Sheaves—The Message—Let me mingle with them

সকাল সাঁঝে ধায় যে ওরা—Sheaves—His Road—Morn and eve they hurry on

* আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে—Fruit Gathering 69—You were in the centre of my heart (211)

* তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে—Fruit Gathering 72—The joy ran from all the world (42)

* এই তো তোমার আলোক ধেনু—Sheaves—The Kine of Light—Here are thy kine of light

* এরে ভিখারী সাজায়ে কি রঙ্গ তুমি করিলে—Fruit Gathering—A smile of mirth spread over (189)

—

ঋষি লিও টলস্টয়ের প্রথম জীবন

শ্রীকমলা দাশগুপ্ত

ককেশাস

ককেশাস্ গিয়ে লিও টলষ্টয়ের জীবনে একটি নতুন অধ্যায়ের সুরু হ'ল। ভাই নিকোলাস-এর সঙ্গে তিনি নানা স্থানে বেড়াতে যেতেন। এখানকার পর্ব্বতশ্রেণী তাঁকে মুগ্ধ করে। তাঁর "কসাক্" পুস্তকে এর চমৎকার বর্ণনা রয়েছে। তিনি আন্টি টাটিয়ানাকে এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা দিয়ে লিখেছিলেন, বিরাট্ পর্ব্বতমালা যেন একটার উপর আরেকটা উঠে গেছে, পাহাড়ের মাঝে মাঝে গরম জলের স্রোত নেমে আসছে, জল এত গরম যে ভাপ উঠে, তিন মিনিটেই ডিম সেদ্ধ হয়ে যায়। তাতার রমণীগণ অবিরাম আসে পা দিয়ে কাপড় কাচতে। তাদের দারিদ্র্য এবং প্রাচ্য পোশাক সত্ত্বেও তারা রমণীয়। পর্ব্বতের উপর থেকে দেখলে এই সৌন্দর্য্য আরও মুগ্ধকর। লিও টলষ্টয়ের পায়ে একটা ব্যথা ছিল। এখানকার লৌহকণাময় গরম জলে স্নান করার ফলে তাঁর ব্যথা একেবারে সেরে যায়। নিকোলাসের একটা কুকুর নাকি এই গরম জলে পড়ে গিয়ে ঝল্‌সে মারা যায়।

এই সময় টলষ্টয়ের মনোভাবে একটা পরিবর্ত্তন দেখা যায়। তাঁর প্রার্থনার কথা তিনি তাঁর ডায়েরীতে লেখেন ১১ই জুন, ১৮৫১। এটি অন্যদিনের মত সাধারণ প্রার্থনা ছিল না। সর্ব্বোত্তম এবং কল্যাণময় কিছু তিনি পেতে চেয়েছিলেন। বিশ্বসত্তার মধ্যে তিনি বিলীন হ'তে চেয়েছিলেন। (I wished to merge into the Universal Being)-নিজের দোষের জন্য ক্ষমা চাইলেন, আবার তাঁর মনে হ'ল ঈশ্বর ত ক্ষমা করেই ব'সে আছেন। তিনি অনুভব করতে লাগলেন প্রার্থনা করবার মত কিছুই ত তাঁর নেই। তাঁর মনে হ'ল প্রার্থনা করতে তিনি জানেন না, পারেন না। ভয় কোথায় চ'লে গেল। বিশ্বাস, আশা এবং ভালবাসা সব এসে একত্র মিলে গেল, এ তিনের কোন পার্থক্য রইল না সেই মুহূর্ত্তে। এ-অনুভূতি ছিল তাঁর জগদীশ্বরের প্রতি পবিত্র নিষ্কলুষ প্রেম, যা-কিছু মন্দ তা দূর হয়ে গিয়েছিল, শুধু যা-কিছু ভাল তাই রয়ে গেল। পরমেশ্বর তাঁকে গ্রহণ করুন এই প্রার্থনাই শুধু তিনি করছিলেন।......আবার কিন্তু জগতের মন্দ চিন্তা তাঁকে জড়িয়ে ধরেছিল। তিনি প্রাণপণে তা ছাড়াতে চেষ্টা করেছেন......তারপরে ঘুম এসে তাঁকে বিশ্রাম দেয়।

এখানে এসে তিনি 'শৈশব' পুস্তক পুনরায় লিখতে থাকেন—মস্কোতেই তিনি লেখা শুরু করেছিলেন। ওদিকে টিফ্লিস বেড়াতে গিয়ে সেনাবিভাগে চাকরীর জন্য পরীক্ষাও দিলেন।

১৮৫২ সালের জানুয়ারী মাসে আন্টি টাটিয়ানাকে তিনি লেখেন, আন্টির চিঠি পেলেই তিনি এমন কাঁদেন ঠিক যেন সেই শিশুকালের 'কাঁদুনে ছেলে লিও'ই রয়ে গেছেন। টাটিয়ানা লিখেছেন, তাঁর প্রিয়জনেরা যেখানে চ'লে গেছেন সেখানে যাবার পালা এবার টাটিয়ানার। সেখানে যেতেই তিনি প্রার্থনা করছেন, প্রার্থনা করছেন তাঁর জীবনের সীমারেখা টেনে দিতে, আর তিনি একা বইতে পারছেন না এ জীবনভার। টলষ্টয় আন্টির এই প্রার্থনা সহ্য করতে পারেন নি। তিনি উত্তরে লিখছেন, আন্টি একথা ব'লে ভগবানের কাছে এবং টলষ্টয়ের কাছে অপরাধ করছেন, কারণ তাঁরা তাঁকে ভালবাসেন। আন্টির মৃত্যু এবং নিকোলাসের মৃত্যু টলষ্টয়ের পক্ষে হবে চরম দুর্ভাগ্যের। টলষ্টয় লিখেছেন, তোমার মৃত্যু হ'লে আমার কি হবে? তখন আমি কাকে খুশী করবার জন্য ভাল হ'তে, ভাল গুণ অর্জ্জন করতে এবং যশস্বী হ'তে চেষ্টা করব? যখন আমি নিজে সুখী হবার কথা ভাবি, অমনি সঙ্গে সঙ্গে তুমি সে সুখের অংশ গ্রহণ করছ সে-কথাও জড়িয়ে থাকে। যখন আমি কোন ভাল কাজ ক'রে তৃপ্তি পাই তক্ষুনি সে-সঙ্গে জানি তুমিও আমার সঙ্গে তৃপ্তি পাবে। আমি খারাপ কাজ করলে তোমাকে কষ্ট দিচ্ছি মনে

ক'রে ভয় পাই। তোমার ভালবাসাই আমার সব।— হয়ত তুমি ভাবছ, আমি বাড়িয়ে লিখছি, তবু আমি এ চিঠি লিখতে গিয়ে চোখের জলে ভাসছি।

টলষ্টয় সেনাবিভাগে যোগদান করেন। কয়েকটা ছোট ছোট যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন তিনি ১৮৫২ সালে। তিনি যে সিভিল সার্ভিস ছেড়ে দিয়েছেন সেই সার্টিফিকেট তিনি বাড়ী থেকে আনেন নি, কারণ সেনা-বাহিনীতে যোগদানের পরিকল্পনা তখন তাঁর ছিলই না। কিন্তু এখন এই সার্টিফিকেট সঙ্গে না থাকায় যুদ্ধে বীরত্ব প্রকাশের জন্য তাঁর প্রাপ্য 'সেন্ট জর্জ্জ ক্রশ' পুরস্কারটি তিনি পেলেন না। ক্রশটি না পাওয়াতে খুব দুঃখ করে আন্টি টাটিয়ানাকে একটি চিঠি লেখেন।

১৮৫২-৫৩ সালে আবার একটি ক্রশ পাবার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু বেশী রাত পর্য্যন্ত দাবা খেলার জন্য সকালে উঠতে দেরি হয়ে যায়। তাঁর বিভাগের সেনাপতি তাঁকে পরদিন প্রাতে অনুপস্থিত দেখে গ্রেপ্তারের আদেশ দেন এবং পুরস্কার পাবার যোগ্য লোকেদের তালিকা থেকে তাঁর নামটি কেটে দেন। গ্রেপ্তার অবস্থায় যখন তিনি পুরস্কার বিতরণের সময়কার ব্যাণ্ডের আওয়াজ শুনছিলেন তখন তিনি মর্ম্মান্তিক দুঃখ পেয়েছিলেন।

যুদ্ধযাত্রা না থাকলে টলষ্টয়কে সাধারণতঃ কসাকদের গ্রামে থাকতে হ'ত। তিনি 'কসাক' নামে যে বইখানি লিখেছেন তার মধ্যে এখানকার জীবনের অবিকল বর্ণনা দেওয়া আছে। রাশিয়ার জারদের অত্যাচার থেকে পালিয়ে অনেক রাশিয়ান এসে এখানকার টেরেক নদীর ধারে বসবাস করত মুসলমানদের মধ্যে। তারা রুশ ভাষা বলত, কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীদের আচার-ব্যবহার নিজেদের সঙ্গে মিশিয়ে গ্রহণ করেছিল। তারা স্বাধীনতাপ্রিয় ছিল, অলস ছিল। তারা লুটপাট করত শিকার করত, এবং যুদ্ধবিগ্রহ করত। স্থানীয় আধা-অসভ্য অধিবাসীদের চেয়ে নিজেদের উঁচুদরের মনে করত। কাজকর্ম্ম মেয়েরা ক'রে দিত অথবা ভাড়া-করা তাতার লোকেরা ক'রে দিত। পুরুষের অপেক্ষা নারী বেশি স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের অধিকারী ছিল। মেয়েদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বিশেষতঃ বিবাহের আগে।

এখানে এসে টলষ্টয়ের খুব ভাল লাগল। সরল জীবন, সরল প্রকৃতি, শিকারের নিপুণতা, [illegible] ও দুর্ব্বলতার প্রতি ঘৃণা, নৈতিক দ্বন্দ্বের থেকে মু[illegible] তাঁকে আকর্ষণ করত। একটি মেয়েকে তাঁর [illegible] লেগেছিল। কিন্তু রাশিয়ার সেনাবাহিনীর এই লোকটিকে কসাক মেয়েটি কোন গ্রাহ্যই করল না, [illegible] রাশিয়ান যুবকটি শিকারে এবং যুদ্ধে কসাক জা[illegible] চেয়ে নিকৃষ্ট ছিল। রাশিয়ান যুবকটি কসাক যুবকে[র] মত গরু-ভেড়া চুরি করতে, মদ খেতে, গান গাইতে খুন করতে তেমন সুদক্ষ ছিল না ব'লে রাশিয়ান টলষ্ট[য়] এখানে এসে প্রেম নিবেদনে পরাজিত হলেন।

'কসাক' বইতে আছে, লুকাস্কা নামে একটি কসাক ছিল। সে বীর তাতারকে রাতে মেরে ফেলে। লোকেরা তাকে খুব বাহবা দিল, নিজেও নিজেকে বড় ব'লে ভাবল। তারপরই চিন্তা এসে ঘনিয়ে ধরল— কি অদ্ভুত চিন্তা! মানুষকে মানুষ খুন ক'রে এতখানি তৃপ্তি কি ক'রে পায়, যেন চমৎকার একটা কাজ করেছে! এতে যে আনন্দের কিছুই নেই সেকথা সে কেন বোঝে না? কেন সে বোঝে না, অন্যকে হত্যা করায় আনন্দ নেই, আনন্দ আছে আত্মত্যাগে।

১৮৫২ সালের জুলাই মাসে 'শৈশব' (Childhood) লিখে শেষ ক'রে তিনি ছাপতে দেন। বই প্রকাশিত হবার পর তিনি খ্যাতি পেতে লাগলেন। তাঁর নিজস্ব শৈলী এর মধ্যে ফুটে ওঠে। টলষ্টয় নানা পত্রিকাতে নিজের নামে ও বেনামে লেখা প্রকাশ করতে লাগলেন। লেখাগুলি এত সুন্দর হ'ত যে, বিখ্যাত লেখক টুর্গেনিভ, ডস্টওস্কি ও অন্যান্য সাহিত্যিকগণ টলষ্টয়ের প্রতিভার উন্মেষ দেখে প্রশংসা করতে থাকেন। সরলতা এবং নৈতিক স্পর্শ ছিল লেখার প্রধান আকর্ষণ।

তাঁর সৈন্য-বিভাগীয় জীবন তাঁকে তৃপ্তি দিচ্ছিল না। তিনি সেনাবিভাগ থেকে অবসর গ্রহণ করবার কথা ভাবতে লাগলেন।

আত্মা অবিনশ্বর কি না সে-সম্বন্ধে তাঁর মনে দ্বন্দ্ব চলছিল। রুশো-লিখিত 'এমিলি' বইখানি পড়ার পর

২৯শে জুন তিনি ডায়েরীতে লেখেন, তিনি ...র্ম্মপ্রধান স্থান দেন। যার জীবনের লক্ষ্য ...সে খারাপ; যার লক্ষ্য অন্যের প্রশংসা পাওয়া ... যার লক্ষ্য অপরের সুখ, সে ধার্মিক; যার ...ক্ষ্য ভগবান্, সে মহান...। অন্যের পক্ষে যা ...আমার পক্ষেও খারাপ, যা অন্যের পক্ষে ভাল ...মারও ভাল। ১৮ই জুলাই ডায়েরীতে ...ছেন, মন্দ কাজ করার প্রলোভন থেকে তাঁকে যেন ...বান্ মুক্তি দেন, যেন ভাল কাজ তিনি করতে পারেন। 'দি রেইড' (The Raid) নাম দিয়ে যুদ্ধের একটি ...হাসেবকের গল্প ১৮৫৩ সালে তিনি প্রকাশ করেন। ...রাতে তাতারদের উপর আক্রমণের সময় ককেশাস ...চমৎকার প্রকৃতির মধ্য দিয়ে যেতে যেতে তিনি ...যাচ্ছেন—প্রকৃতি সুন্দর, তেজোময়, শান্তিকামী। ... সময় এই সুন্দর পৃথিবীতে অসংখ্য তারাভরা ...শের তলায় মানুষের থাকবার স্থান নেই। এ ...ন ক'রে হয়? এমন মুগ্ধকরা প্রকৃতির মধ্যে ...দের মনে শত্রুতা, প্রতিহিংসা, ধ্বংস-করার প্রবৃত্তি ...ন ক'রে জাগে? যে-প্রকৃতি সুন্দর এবং মঙ্গলময় ... সংস্পর্শে এসে মানুষের ভিতরের গ্লানি লুপ্ত হয়ে ...।

১৮৫৩ সালে 'শামিল'-এর বিরুদ্ধে তাঁকে যুদ্ধের ...ভযান করতে হয়। 'গ্রোজনী কোর্ট'-এ তাঁর ...তিরিক্ত অমিতাচার প্রকাশ পায়। তিনি লিখেছেন—...জেকে চিনতে পারছি না, তাস খেলছি, খেলব।' ...র মনে হ'ত সেনাবিভাগের কাজে এসে তিনি মঙ্গল-...থ থেকে ভ্রষ্ট হচ্ছেন। মুক্তি পাবার জন্য প্রার্থনা ...রতে থাকেন। সেই বছরেরই শেষের দিকে সংযমের ...থে তিনি শান্ত হলেন।

ভাইকে লিখলেন, সৈন্যবিভাগ থেকে মুক্তি পাবার ...ন্য তিনি দরখাস্ত করেছেন এবং ছয় সপ্তাহের মধ্যেই ...ত তিনি স্বাধীনভাবে বাড়ী ফিরবেন। কিন্তু হায়, সৈন্য...ভাগে ঢোকা যত কঠিন ছিল তার চেয়েও অনেক ...বশি কঠিন ছিল সেখান থেকে বে'রয়ে আসা। ছয় ...প্তাহ দূরের কথা, কয়েক বছর লেগেছিল তাঁর এখান ...থকে মুক্তি পেতে।

একটা দুঃসাহসিক কাজ করতে গিয়ে তাঁর জীবন বিপন্ন হয়—কাহিনীটি নিয়ে গল্প লিখলেন 'ককেশাসে বন্দী।' যুদ্ধযাত্রার সময় দলচ্যুত হয়ে একা কোথাও যাওয়া নিষেধ ছিল। পদাতিক সৈন্য এত ধীরে অগ্রসর হ'ত যে, অশ্বারোহী সৈন্যরা অধৈর্য্য হয়ে উঠত—তাতার সৈন্যদের দ্বারা আক্রান্ত হবার বিপদও তারা অগ্রাহ্য করত। এইভাবে একদিন পাঁচজন অশ্বারোহী সৈন্য আইন ভঙ্গ করে বেরিয়ে পড়লেন। তার মধ্যে ছিলেন টলষ্টয় ও তাঁর বন্ধু সাডো। তাঁরা দুই বন্ধু পাহাড়ের উপরে উঠলেন শত্রু আসছে কি না দেখতে। বাকী তিনজন নীচে দিয়ে চলতে লাগলেন। পাহাড়ে উঠতে-না-উঠতেই তাঁরা দেখলেন, ত্রিশজন অশ্বারোহী তাতার ছুটে আসছে। আর সময় নেই দেখে নীচের বন্ধুদের চীৎকার করে সাবধান করে নিজেরা দু'জন পাহাড় বেয়ে গ্রোজনী কোর্ট-এর দিকে ছুটলেন। নীচের বন্ধু তিনজন অতটা গ্রাহ্য না করাতে তাতার সৈন্যের কবলে পড়ে গেলেন এবং দু'জন গুরুতর ভাবে আহত হলেন। পরে অন্যরা টের পেয়ে এসে শত্রুদের তাড়িয়ে দিয়ে তাঁদের রক্ষা করেন। টলষ্টয় এবং সাডোর পশ্চাতে সাতজন শত্রুসৈন্য তাড়া করে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে। ইচ্ছা করলে টলষ্টয় তাঁর ভাল ঘোড়ায় আরও দ্রুত পালাতে পারতেন কিন্তু সাডোকে ফেলে তিনি দ্রুত গেলেন না। মনে হ'ল দু'জনেরই শেষ-মুহূর্ত্ত আসন্ন। অবশেষে গ্রোজনীর একজন সান্ত্রী তাঁদের অবস্থা দেখে তাঁদের রক্ষা করতে কয়েকজন কসাক সৈন্য পাঠিয়ে দেন। কসাকদের দেখে তাতাররা পালিয়ে যায়। টলষ্টয়রা দুই বন্ধু অক্ষত অবস্থায় বেঁচে যান।

১৮৫৩ সালের জুলাই মাসে টলষ্টয় ভাইকে লিখলেন, টার্কির সঙ্গে যুদ্ধ লেগেছে, তাই তাঁর আশঙ্কা, তাঁর পদত্যাগপত্র গৃহীত হবে কি না। বাড়ী যাবার জন্য এবং শান্ত জীবন-যাপন করবার জন্য তিনি তখন উৎকণ্ঠিত।

বাড়ী যাওয়া তাঁর সত্যই হ'ল না? তাঁকে তখন সেনাবিভাগে থাকতেই হবে। তাই তিনি টার্কির

যুদ্ধেই যেতে চেয়ে দরখাস্ত করেন এবং বাড়ী থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র চেয়ে পাঠান।

আড়াই বছরেরও বেশি সময় টলষ্টয় ককেশাস ছিলেন। শেষের বছরে লিখেছিলেন তিনি 'বাল্যকাল' (Boyhood) এবং 'বিলিয়ার্ড মেকারের স্মৃতি' (Reminiscences of a Billiard Maker), 'এক জমিদারের প্রভাত' (A Landlord's Morning), এবং 'কাঠুরিয়া' (The Wood-felling)। তাঁর নিজের উপরের বিরক্তি ফুটে উঠেছিল বিশেষ করে তাঁর 'বিলিয়ার্ড মেকারের স্মৃতি' পুস্তকে।

সেনাবিভাগের জীবন তাঁর নৈতিক জীবনের পক্ষে ভাল ছিল না। সেজন্য তাঁর ডায়েরীর পৃষ্ঠাগুলিতে এখানে তাঁর পতন ও মুক্তি পাবার সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত দেখতে পাওয়া যায়। বাজিখেলা, ঋণ করা, মদ খাওয়া, নারীসম্ভোগ সবই তাঁকে জড়িয়ে ধরেছিল। পরেই আবার প্রবল প্রচেষ্টায় তাকে তিনি ছাড়িয়ে উঠেছেন। মদ ও স্ত্রীলোক থেকে তিনি সংযত হ'তে চেষ্টা করতে লাগলেন। বার বারই তাঁর পতন হয়ে বার বারই তিনি মর্ম্মবেদনায় ও অনুশোচনায় দগ্ধ আবার কাটিয়ে উঠেছেন।

১৮৫৪ সালের জানুয়ারী মাসে অবশেষে তাঁর প্রতীক্ষিত সাময়িক ছুটির অনুমতি এল। যশ ফিরে চললেন তিনি। রাস্তায় এল ভীষণ ঝড়। নিয়ে লিখেছিলেন 'বরফের ঝড়' (The Sn Storm)। যশনায়া পৌঁছে বড় ক্লান্ত ও অসুস্থ করেন তিনি। নিজেকে তাঁর বেখাপ্পা, পুরাতন লোক এবং বয়স্ক ব'লে মনে হ'তে লাগল।

ঐ সালেরই ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি মিলি বিভাগে তাঁর প্রমোশনের সংবাদ পান। রুশো-তু যুদ্ধ যখন পূর্ণ উদ্যমে সুরু হয় তখন টলষ্টয়ের পূর্ব্ব দর অনুযায়ী তাঁকে ডেনিউব-এর সেনাবাহিনীতে যোগ করতে আদেশ দেওয়া হয়। তিনি সেখানে গেলেন।

ভারতের সর্ব্বপ্রথম সংবাদপত্র

পলাশীর যুদ্ধের ঠিক সাত বৎসর পরেই অর্থাৎ ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা নগরীতে ভারতের সর্ব্বপ্রথম সংবাদপত্র মুদ্রিত হয়। ইহার পূর্ব্বে মুদ্রাঙ্কন কার্য্যও আর এদেশে ছিল বলিয়া বোধ হয় না। James Augustins Hicky নামক এক ইংরেজ ইহা প্রকাশিত করেন।

১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের ২৯শে তারিখে শনিবারে হিকি তাঁহার কাগজ বাহির করে। উহার নাম ছিল "The Bengal Gazette", অথবা সম্পাদকের নামে জনসাধারণে প্রচলিত ছিল Hicky's Gazette বা Journal, কাগজের গোড়াতেই সম্পাদক বড় করে ইহার উদ্দেশ্য ঘোষণা করিয়া লিখিয়াছিল, A weekly political and commercial paper open to all parties but influenced by none.

চশমার ইতিহাস

চশমা কবে, কি করিয়া আবিষ্কৃত হইল সে-সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্য হইতে সত্যকে বাছিয়া লওয়া খুব সহজ ব্যাপার বলিয়া মনে হয় না। চীনেম্যানরাই সর্ব্বপ্রথমে ইহার ব্যবহার করিতে শিখে, এইরূপ বিশ্বাস লোকের মনে অনেকদিন হইতে অবস্থিতি করিতেছিল। কিন্তু কলম্বিয়া য়ুনিভার্সিটির অধ্যাপক লওফার সে বিশ্বাস একবারে ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে চশমার সৃষ্টি সর্ব্বপ্রথমে রোম নগরে হইয়াছিল। তাঁহারা যে-যুক্তির বলে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন, আমাদের কাছে তাহা খুব সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। ইতিহাস পাঠে জানা যায় বটে যে, কিছু দেখিতে হইলেই সম্রাট নীরো তাঁহার চক্ষুর সম্মুখ খানা পান্না পাথর ধারণ করিতেন। ইহা হইতে এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, দূরের জিনিস স্পষ্ট দেখিবার জন্যই নীরো এইরূপ পাথর ব্যবহার করিতেন। নীরো যে খাটো-দৃষ্টি (শর্ট সাইটেড্) ছিলেন ইতিহাসে তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তিনি একজন দক্ষ রথী ছিলেন। যে, ব্যক্তি দূরের জিনিস ভাল দেখিতে পায় না, তাহার পক্ষে একজন যশস্বী রথী হওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নয়। আমাদের মনে হয়, নীরো তীব্র আলোক সহ্য করিতে পারিতেন না, তীব্র আলোকে কিছু দেখিতে হইলে, তাঁহার চোখে জল দেখা দিত—সেই জন্যেই সম্ভবতঃ তিনি সবুজ পাথর ব্যবহার করিতেন। নীরোর সময় লোকে যে চশমার ব্যবহার জানিত ইতিহাসে তাহার অন্য কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না।

অনেকে আবার রজার্ বেকন্‌কে চশমার আবিষ্কারক বলিয়া স্বীকার করিতে চেষ্টা করেন। রজার্ বেকন্ আলোক ও দৃষ্টি সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাকে চশমারও আবিষ্কারক বলিতে হইবে, ইহার কি অর্থ আছে। Glass Sphere বা কাঁচের গোলক যে বর্দ্ধিতায়তন দেখাইবার (ম্যাগ্‌নিফাইং) শক্তি রাখে। রজার্ বেকনের পূর্ব্বেও লোকে তাহা না জানিত এমন নহে।

আমাদের মনে হয়, খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে পৃথিবীর নানা দেশে একই সময়ে চশমার উদ্ভব হইয়া থাকিবে। এসময়ে ফ্লোরেন্স নগরে এক ব্যক্তির সমাধিস্তম্ভে নিম্নের কথা কয়টি লিখিত থাকিতে দেখা গিয়াছিল—"এখানে Salvino Armeti নিদ্রা যাইতেছেন, ইনিই সর্ব্বপ্রথমে চশমার আবিষ্কার করেন। ঈশ্বর ইঁহার পাপ ত্রুটি প্রভৃতি মার্জ্জনা করুন। খ্রীঃ অব্দ ১৩১৭।"

পীজা নগরে ১২৯৯ খ্রীঃ অব্দে লিখিত একখণ্ড কাগজ পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে লেখক বলিতেছেন, নূতন আবিষ্কৃত চশমা ব্যবহার করিয়া তিনি বিশেষ ফল পাইয়াছেন।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্য্যন্ত শুধু 'চালশে' দোষ নিবারণ করিবার জন্যই চশমার ব্যবহার হইত। ন্যুজ কাঁচ (Concave glass), যাহার ব্যবহারে দূরের জিনিস স্পষ্ট দেখা যায়—তখন পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। র‍্যাফেল্ দশম পোপ লিয়োর একখানি ছবি আঁকিয়াছিলেন, ইহাতেই আমাদের সর্ব্বপ্রথমে ন্যুব্জপৃষ্ঠ কাচের সহিত পরিচয় হয়।

প্রথম প্রথম কাচের চশমাই ব্যবহৃত হইত, পাথরের চশমার বড় একটা প্রচলন ছিল না। ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত Marano নামক স্থানেই একমাত্র চশমার কারখানা থাকিতে দেখা যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে কনিগস্‌বার্গ শহরে এম্বার নামক পদার্থ হইতে চশমা প্রস্তুত হইতে থাকে।

গাছের স্বকীয় আঘাত চিকিৎসা

জীব যত নিম্নস্তরের হয় তাহার ক্ষত আরোগ্য করিয়া তুলিবার শক্তি তত বেশী থাকে। আতরল এমিবার গায়ের কাটা জলের উপর দাগ কাটার মতন যখনই তখনই জুড়িয়া যায়। কাঁকড়ার দাঁড়া ভাঙ্গিয়া দিলে তাহার অসুবিধা হয় অল্পদিনের জন্য, কারণ শীঘ্রই সে আর এক জোড়া নূতন দাঁড়া গজাইয়া তোলে। কিন্তু মানুষের হাত কাটা পড়িলে সে জীবন-ভোর নুলোই থাকিয়া যায়।

গাছের আঘাত সারাইয়া তুলিবার অসাধারণ শক্তি আছে। এমন কি, অনেক সময় গাছের গায়ে ক্ষত হইলে তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টির ও সুপ্ত অঙ্গের স্ফূর্ত্তির সাহায্য হয়। গাছের মধ্যে কতকগুলি সুপ্ত মুকুল থাকে; গাছ সুস্থ অনাহত থাকিলে তাহারা কখনই জাগে না; কিন্তু গাছের একটি ডাল কাটিয়া তাহার একাঙ্গ বিকল করিয়া তাহার বৃদ্ধিতে বাধা দিলে সুপ্ত মুকুলগুলি অমনি জাগ্রত হইয়া নূতন কচি পাতা আর ফেঁকড়ি ডালের আকারে বাহির হইয়া পড়ে, এবং গাছ যে-অঙ্গ হারাইয়াছিল তাহার সেই ক্ষতি সম্পূরণে আপনাদের উৎসর্গ

করিয়া দেয়। গাছের গায়ের ক্ষত যদি আংশিক ও উপর-উপর হয় তবে কতকগুলি কোষ কঠিন কাঠ হইয়া ক্ষত সারাইয়া আনে। কোন বাহিরের বস্তু গাছের অঙ্গে বিদ্ধ হইয়া গেলে গাছ যদি তাহা ত্যাগ করিতে না পারে তবে তাহারই চারিদিকে ঢাকা গজাইয়া ক্ষতমুখ রুদ্ধ করিয়া দেয়। এইরূপে গাছের গায়ে গুলী কি পেরেক বিদ্ধ হইলে তাহা গাছের মধ্যেই থাকিয়া যায়, তাহাকে ঢাকিয়া গাছের কোষ ও ত্বক জন্মে এবং সে স্থানটা একটু উঁচু হইয়া থাকে, বহুকাল পরে গাছ কাটিলে ঐ সব জিনিস পাওয়া যায়। পাছে ক্ষতস্থান হইতে অধিক রক্তস্রাব হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়ে বা বিষাক্ত পদার্থ বা অপকারক কীটপতঙ্গ ক্ষতমধ্যে প্রবেশ করে এই ভয়ে গাছ চট্‌পট্‌ একরূপ আঠা দিয়া ক্ষতস্থান ঢাকিয়া দেয়, তারপর সেই ক্ষতমুখ বন্ধ করিতে থাকে—ইহা যেন ডাক্তারের এন্টিসেপ্‌টিক ব্যাণ্ডেজ। এই আঠার সঞ্চারের জন্য ক্ষতস্থান প্রথমে হলদে ও পরে তামাটে রং ধরে। ক্ষত গভীর হইলে সেই ক্ষতস্থানে মরা আঁশ ও আবরক আঠা জমিয়া থাকে, তাহার উপরে কাঠ ও ছাল ঢাকা পড়ে, এজন্য সেই জায়গাটা আবের মতন উঁচু হইয়া থাকে; ইহা কুদৃশ্য হইলেও ইহার দ্বারা গাছের প্রচুর জীবনী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

অতিকায় ফল

একটা ফুল, একটা কুমড়া, এক ঝাড় আককে বাড়াইয়া তোলাতে চাষীর নিপুণতা প্রকাশ পায় সত্য, ইহা তাহার অব্যবসায়েরও নিদর্শন। কিন্তু দেশের ধন বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হইলে মিতব্যয়িতার দিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অপরিমিত খরচ করিয়া সুবৃহৎ ফল-ফুল উৎপাদন দ্বারা লোকের বিস্ময়োৎপাদন করাকেও অমিতব্যয়িতা বলা যায়।

যে-গাছে ২০টা বেগুন ফলিতে পারে তাহাতে ২টি মাত্র মুকুল রাখিয়া বাকিগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিলে দুইটি বড় বেগুন উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু এই দুইটা বেগুনের ওজন ২০টা বেগুনের ওজন অপেক্ষা নিশ্চয় কম। সুতরাং ২০টার স্থলে বহু আয়াসে ২টা বেগুন ফলাইয়া কি লাভ হইবে? লাভ যে একবারে নাই তাহা নহে। আর্থিক হিসাবে বর্ত্তমানে কোন লাভের আশা না থাকিলেও, বীজ সঞ্চয়ের জন্য বড় ফল উৎপাদন করায় ভবিষ্যতে লাভ আছে। ক্ষেতের মধ্যে তেজস্কর গাছটি বাছিয়া লইয়া তাহার মূল শাখাতে ২ বা ৩টা ফল উৎপাদন করিলে ফলগুলি স্বভাবতই বড় হইবে। ফল বড় করিতে হইলে পটাস-প্রধান সার প্রয়োগ করিয়া গাছটিকে বিশেষ তদ্বিরে রাখিতে হয়। এবম্প্রকার গাছের সুপক্ব ফল হইতে বীজ সংগ্রহ করিলে তাহা হইতে যে চারা হইবে তাহার ফল সাধারণতঃ বড় হইবে। এইরূপে কোন একজাতীয় ফলের উন্নতি বিধান করা সম্ভব। অতএব এস্থলে খরচের আতিশয্যে কুণ্ঠিত না হইয়া বীজের জন্য বৃহৎ ফলই উৎপাদন করাই কর্ত্তব্য।

কোন ক্ষেতে উচ্চ মাচায়, ভাল সারমাটি সংযোগ করিয়া, কয়েকটা কুমড়া গাছ জন্মান গেল। গাছটিতে ফুল ধরিতে আরম্ভ হইলে মূল ডগায় ফলোৎপাদনকারী একটা ফুল রাখিয়া বাকি মুকুলগুলি, এমন কি কতক-গুলি প্রশাখা ও কতকগুলি পাতা ছিঁড়িয়া দেওয়া গেল। ফলটা যখন মানুষের হাতের মুঠার মত বড় হইল, তখন কুমড়ার লতার দুইপাশে দুইটা মাটির টবে চিনির জল রাখিয়া নরম সুতার পলিতা পাকাইয়া এক মুখ চিনির জলে পূর্ণ পাত্রে স্থাপন করিতে হয়, অন্য মুখ কুমড়ার বোঁটার উপর ছিদ্র করিয়া প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়। এই উপায়ে কুমড়া পলিতার দ্বারা ক্রমশঃ জল টানিয়া লইবে ও বড় হইতে থাকিবে এবং এক সপ্তাহ মধ্যে উহা অতিকায় উঠিবে।

চিনির রস সহজেই করিয়া লওয়া যায়। গরম জলে ক্রমশঃ চি মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত পরিমাণ ঘন রস প্রস্তুত করিয়া লওয়া যা জল আগুনের তাপ হইতে নামাইয়া তবে তাহাতে চিনি সংযোগ করি হয়। জ্বালে চিনির রস চাপান থাকিলে রস চিট্‌ হইয়া যাইবে। রস সুতার পলিতা বহিয়া লতার শরীরে প্রবেশ করিতে পারিবে ন যেরূপ রস এখানে ব্যবহারযোগ্য তাহাকে চিনির রস না বলিয়া চি জল বলাই ভাল। শীতল অপেক্ষা গরম জলে চিনি শীঘ্র দ্রব হ চিনির জলে সর্ব্বদাই গামলা পূর্ণ রাখা কর্ত্তব্য। এ-প্রকারে লাউ কুম তরমুজ শশা অতি-বড় করা যায়। বীজের জন্য ফল বড় করিতে হই কৃত্রিম অপেক্ষা স্বাভাবিক উপায় অবলম্বন করাই ভাল।

কলার রস সর্প-বিষের প্রতিষেধক

সর্প-দংশনে প্রতি বৎসর অসংখ্য লোককে প্রাণ দিতে হয়। ম্যা রিয়া, প্লেগ, কলেরা প্রভৃতির ন্যায় সর্পও মানবের এক প্রতিবাসী শত্রু সর্পদষ্ট হইয়া যে-পরিমাণ লোকের মৃত্যু হয়, আরোগ্যলাভের সংখ্যা অনুপাতে অনেক কম। পূর্ব্বে এদেশে সর্পাঘাত হইলে ওঝা-মন্ত্রে ব্যবস্থা ছিল। ইদানীং যে কারণেই হউক, সেসব ক্রমশঃ লে পাইতেছে। এখন সর্পবিষ নষ্ট করিবার নানাবিধ ঔষধ প্রস্তুত হইতে —নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক উপায়ও উদ্ভাবিত হইতেছে। অনেকস্থলে সফলও হয়, বিফলও হয়। কিন্তু সর্পের প্রধান আড্ডা পল্লী অঞ্চলে এ-সকলের প্রচলন না থাকায় এদেশে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ি বই কমিতেছে না।

শ্রীযুক্ত ডড্‌জী নামক একজন ভদ্রলোক পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ ক ছেন যে, কলার রস সর্পদংশনের অব্যর্থ ও আশুফলদায়ী মহৌ কয়েকজন ডাক্তারের সম্মুখে এই বিষয়ের পরীক্ষা দেখান হইয়াছি সদ্যধৃত এক বিষধর সাপের নিকট একটি বিলাতী কুকুর ছাড়িয়া দে হইল। কুকুরকে দেখিবামাত্র সাপটা গর্জ্জন করিয়া উঠিল, কিন্তু তাহা কামড়াইতে পারিল না। কুকুর সাপটাকে আক্রমণ করিয়া তা পৃষ্ঠদেশ ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিল। সেই সময় আর একটা দেশী কুকুর তথায় ছাড়িয়া দেওয়া হইল। এইবার সাপটা এই কুকুরটাকে সজো বারংবার দংশন করিল। কুকুর যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে লাগিল, ও তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হইয়া গেল। তখন কুকুরটার মুখে সদ্য-সংগৃহীত ক রস একটু একটু করিয়া ঢালিয়া দেওয়া হইল। এক পোয়া আন্দাজ কুকুরটার পেটে গেলে তাহার ক্রমশঃ চেতনা হইতে লাগিল এবং ঘণ্টার মধ্যে সে সবল হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিল। অতঃপর তা শরীরে যে বিষের ক্রিয়া বিদ্যমান ছিল সেরূপ কোনও লক্ষণ দেখা না।

আর একবার একটা কাক ধরিয়া উক্ত ভদ্রলোক এই বিষয়ের পর করিয়াছিলেন। ইহাতেও এইরূপ আশ্চর্য্যজনক ফললাভ হইয়াছিল।

এই হিতকর আবিষ্কারটি মনুষ্য শরীরেও ফলদায়ী কি না সে বি পরীক্ষা হওয়া উচিত।

ছেলেমেয়েরাও টাকার মূল্য বোঝে

সাধারণতন্ত্রী ফেডারেল জার্মানীতে ব্যক্তিগত হিসেবে ব্যাঙ্কে যত টাকা জমা আছে তার মধ্যে শতকরা ২৮ ভাগের মালিক হল ছি

কিশোরগণ। ওরাও টাকার মূল্য বোঝে এবং পকেট খরচ বা অর্জিত অর্থ হিসেবে ছেলেমেয়েরা যা পায় তার একটা বড় অংশই সঞ্চয় করে।

১৯ বছর বয়স্ক পিটার, টেলিভিশন মেকানিক হিসেবে মাসিক ৫০০ মার্কেরও বেশী উপার্জন করে। সে তার উপার্জনের একটা অংশ মা-বাবাকে দিয়ে দেয় এবং নিজের বাড়ী তৈরী করার জন্য ব্যাঙ্কের সেভিংস হিসেবে ২০০ মার্ক ক'রে সঞ্চয় করে। নিজের একখানা বাড়ী থাকার যে কি আরাম পিটার তা ওর বাবা-মা'র কাছ থেকে শিখেছে। এর পর যা অবশিষ্ট থাকে তা দিয়ে ও নিজের সখের জিনিষ কেনে যেমন রেডিও, রেকর্ড-প্লেয়ার, ছোট-খাট একটি লাইব্রেরি ইত্যাদি। প্রত্যেক বছরে কোথাও বেড়াতে যাওয়া চাই এবং সেই ব্যয় ও নিজেই বহন করে। পিটারের মেয়ে-বন্ধু ইঙ্গের বয়সও ওর সমান। ও একটা বিভাগীয় বিপণীতে মাসিক ৩৫০ মার্ক বেতনে কাজ করে। এই বেতনের কিছু অংশ ও মা-বাবাকে দেয়। তবে ইঙ্গেও প্রতি মাসেই ভাবে যে কিছু সঞ্চয় করবে। কিন্তু ব্যাঙ্কে যাওয়ার পথে যখন দোকানগুলিতে অতি আধুনিক ডিজাইনের জুতো, সোয়েটার, জামা বা অন্য কিছু দেখে তখন লোভ সামলাতে না পেরে কিছু কিনে ফেলে এবং মধ্যে মধ্যে আবার ভাবে যে চুল কাটাতে হবে, কাজেই ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেওয়ার কোন অর্থই হয় না। পরের মাসে আবার ভাবে যে, এই মাসে ব্যাঙ্কে কিছু টাকা রাখবেই কিন্তু সেই মাসেও কোন-না-কোন কারণে আর জমা রাখা হয় না।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অসংখ্য উদাহরণ থেকে দেখা যায় যে, ছেলে-মেয়েরা তাদের টাকা পয়সা অযথা নষ্ট করে না। এরা স্বাভাবিকভাবেই আধুনিক ধরণের জিনিষপত্র পছন্দ করে এবং নিজেদের পছন্দ-অনুযায়ী কিছু কেনার জন্য বাবা-মা'র কাছে টাকা চায় না। নিজেদের ব্যয় নির্বাহ করার জন্য, স্কুলের খরচের জন্য এবং কোন কাজ শেখার জন্য ছেলেমেয়েরা যথাসাধ্য বাবা-মাকে সাহায্য করে।

৬ কোটি বছর পরেও বীজাণু জীবিত

পশ্চিম জার্মানীর নাওহেইম স্পার উষ্ণ প্রস্রবণ থেকে ডাঃ ডমব্রাওস্কি কয়েক বছর পূর্বে এক ধরনের অতি প্রাচীন অণুবীজাণু পেয়েছেন। যে ধাতুস্তর এই উষ্ণ প্রস্রবণটির উৎস, সেই ধাতুর মধ্যে তিনি বহু লক্ষ বছরের প্রাচীন কতকগুলি বীজাণু পান, যেগুলি এখনও জীবিত। বর্তমানে এই জার্মান বৈজ্ঞানিক পার্বত্য নুনের একটা ঢেলার মধ্যে অতি প্রাচীন এক রকমের বীজাণু পেয়েছেন, যেগুলির বয়স ৬ কোটি বছরেরও বেশী। অন্য কোন বীজাণু বের করে দেওয়ার জন্য নুনের টুকরো-গুলিকে বীজাণুমুক্ত একটি গবেষণাগারে আগুনের মধ্যে রাখা হয় এবং পরে সেগুলি একটা পুষ্টিকর দ্রবণের মধ্যে দেওয়া হয়। তারপরে আবার যখন দ্রবণের মধ্যে রাখা হ'ল তখন আবার সেগুলি সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যায় বাড়তে সুরু করল। প্রাচীন সমুদ্রগুলি যখন শুকিয়ে যায় তখন এই বীজাণুগুলি নুনের মধ্যে ঢুকে যায়। নুনে স্বাভাবিক অবস্থাতেই প্রোটিনগুলি ছিল এবং এত বছরেও তার কোন পরিবর্তন হয় নি ব'লে মনে হয়। নুন থেকে বের করে বীজাণুগুলিকে যখন পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া হ'ল তখন তাদের যুগ যুগ ব্যাপী ঘুম ভেঙ্গে গেল। এই রকম বীজাণুর কিছু নমুনা গত পাঁচ বছর যাবৎ রেখে দেওয়া হয়েছে এবং সব গুলিই জীবিত রয়েছে। পুষ্টিকর কিছুর মধ্যে দিলেই সেগুলি আবার জেগে উঠে সংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকে। বীজাণু-বিশেষজ্ঞগণ বহু পূর্ব থেকেই জানেন যে, "হ্যালোফিলিক" (নুন-প্রেমিক) বীজাণু আছে, প্রোটিন, বিশেষজ্ঞরাও জানেন যে, নুন কয়েক রকমের প্রোটিনকে সেগুলির স্বাভাবিক অবস্থায় বহুদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে পারে। তবে এই পরীক্ষা যে ৬ কোটি বছর পরেও সফল হয় এইটেই সব চাইতে আশ্চর্য-জনক।
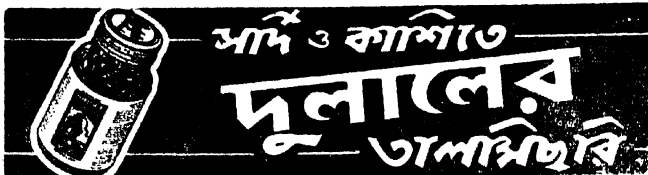
ভারতচন্দ্র ও চন্দননগর

শ্রীপরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অতীতের বিভিন্ন সাহিত্যিক বা গ্রন্থকারদের রচনা থেকে বিখ্যাত কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের জীবনী ও রচনার বিষয়ে সবিশেষ জানিতে পারা যায়। এই কবির জীবন যে বেশ ঘটনাবহুল এবং বিভিন্ন স্থানের সঙ্গে জড়িত, এটা বেশ পরিষ্কার ভাবে জানা যায়। কবির নাতিদীর্ঘ জীবনে বিভিন্ন স্থানের সঙ্গে তাঁর যোগ-সূত্র বিষয়ে উল্লেখ করে এটা প্রমাণ করা খুবই সম্ভব যে, তাঁর প্রতিভা কিভাবে বিকাশলাভ করে এবং এদিক্ থেকে কোনও বিশেষ স্থানের দাবি গ্রহণযোগ্য কি না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে কবির বিভিন্ন গ্রন্থ ও কবিতা রচনার সময় ও স্থানের সম্ভবমত উল্লেখ করে দেখান হবে, যে কবির প্রতিভার বিকাশ লাভের জন্য চন্দননগরের অবদান খুবই নগণ্য। যদিও বর্ত্তমানের মুষ্টিমেয় লেখক-গোষ্ঠী দাবি করেন যে, এই চন্দননগর থেকেই কবির সকল প্রতিভা বিকাশলাভের সুযোগ পায়। কবির জীবনী ও তাঁর রচিত গ্রন্থ আলোচনা করলেই এই বিষয়ে কোনও সংশয় থাকে না যে, উক্ত তথ্যের মূল্য খুবই সামান্য।

ভুরিশ্রেষ্ঠ রাজবংশের শেষ রাজা নরেন্দ্র রায়-এর কনিষ্ঠ পুত্র ভারতচন্দ্র ১৭১২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার বাল্যকালেই বাসভূমি "পাঁড়ুয়াগড়" বর্দ্ধমানের মহারাণী কার্ত্তিচন্দ্রের জননী এক সীমানা-বিরোধের সুযোগে আক্রমণ করেন। এই সময়ে কবি তাঁহার মামার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং এই নওপাড়া গ্রামে থাকিয়াই তিনি ব্যাকরণ ও অভিধান পাঠ করেন। এইখানে থাকিতেই তিনি ১৪ বৎসর বয়সে বিবাহ করেন, যার ফলে তাঁর অভিভাবকগণ তাঁকে খুব তিরস্কার করেন।

অভিমানে ক্ষুব্ধ বালক ভারতচন্দ্র এর পরই দেবানন্দ-পুরের রামচন্দ্র মুন্সির আশ্রয়ে থাকিয়া পার্শি ভাষা

শিখতে থাকেন। এখানে থাকতেই তিনি 'সত্য-নারায়ণের ব্রতকথা' রচনা করেন। ২০ বৎসর বয়সে (১৭৩২ খৃঃ) তিনি বাড়ীতে ফিরে আসেন। এর কয়েক বছর পরে দ্বিতীয় "সত্যনারায়ণের ব্রতকথা" চৌপদিতে রচনা করেন। তাঁদের সমগ্র জমিদারী বর্দ্ধমানরাজ দখল করিলেও পরে কিছু ভূসম্পত্তি ইজারা হিসাবে তাঁরা ফেরৎ পান। বড় ভাইদের আদেশ-মত ভারতচন্দ্র ঐ ইজারার জমির খাজনা জমা প্রভৃতি বৈষয়িক বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত "মোক্তার" হিসাবে বর্দ্ধমান যাত্রা করেন।

মাত্র কয়েকমাস বর্দ্ধমানে থাকিতেই তাঁদের ইজারার জমি খাস করা হয়, ফলে তাঁদের মধ্যস্বত্ব লুপ্ত হয় এবং কুচক্রী কর্ম্মচারীদের শঠতায় তিনি বন্দী হন। কারা-ধ্যক্ষের করুণায় তিনি মুক্তিলাভ করেন। এই সময় তাঁহার বয়স ২৫ বৎসর। কারাধ্যক্ষের নির্দ্দেশমত সুবা বাংলার বাইরে উড়িষ্যার সুবেদারের নিকট তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন। ২৫ বৎসর হইতে ৯ বৎসর পর্য্যন্ত সন্ন্যাসীর বেশে তিনি বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন। ভক্ত বৈষ্ণবের মত পদব্রজে পুরী হইতে রওনা হইয়া খানাকুল ও কৃষ্ণনগরে আসেন। এই কৃষ্ণনগরেই তাঁহার শালিকাপতি তাঁহাকে সন্ন্যাস-জীবন ত্যাগ করিতে বাধ্য করেন ও তাঁহার শ্বশুরের বাড়ীতে লইয়া আসেন। এইভাবে তাঁহার সুদীর্ঘ ১৪ বৎসরের সন্ন্যাস-জীবন সমাপ্ত হয়।

এর পরই তিনি চাকুরি লাভের আশায় ফরাসী চন্দননগরের ইজারাদার বা দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট আসেন। চৌধুরী মহাশয় ভারত-চন্দ্রের সব কিছু পরিচয় নিয়ে তাঁকে কোন চাকুরি দিতে অসম্মত হন। কারণ ভারতচন্দ্রকে কোন চাকুরি দিলে কবির গুণের গৌরব গোপন থাকবে এই আশঙ্কাতেই চাকুরি দিতে রাজী হন নি। তবে কবিকে গুণগ্রাহক মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে সমর্পণ করবেন ব'লে আশ্বাস দেন।

এই সময় কবি কিন্তু চৌধুরী মহাশয়দের নিকট আহার বা বাসস্থান কিছুই গ্রহণ করেন না। তার কারণ তখন চৌধুরীদের জাতিগত একটা অপবাদ ছিল। এই অপবাদ কি ধরণের তার কিছুটা সংক্ষেপে উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই সময়ে ফরাসডাঙ্গার "সমাজপতি" ছিলেন গোন্দলপাড়ার হালদারগোষ্ঠীর প্রধান ছকড়ি হালদার। এই সময়ে অর্থাৎ ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে ইন্দ্রনারায়ণ ও তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাজারাম উভয়েই সম্মান, প্রতিপত্তি ও বৈভবে শীর্ষস্থানীয় হওয়ায় গোন্দলপাড়ার হালদার পরিবার বিশেষ ঈর্ষ্যান্বিত হন। তাই যে-কোনও উপায়ে চৌধুরী-পরিবারকে অপদস্থ করার একটা ইচ্ছা তাঁদের মনে ছিল। ইচ্ছা প্রবল হওয়ায় সামান্য কারণ থেকেই যে উপায় খুঁজে পাওয়া যায় তাও এই ঘটনা থেকে বেশ বোঝা যায়। কত সামান্য কারণে লোককে সমাজচ্যুত করা হ'ত তাও ২০০ বছর আগের এই কাহিনী থেকে জানা যায়। এদিক্ থেকে আজকের বাঙ্গালী সমাজের কাছে এই কাহিনী খুবই আনন্দদায়ক।

চৌধুরী-পরিবারের অপরাধ যে তাঁদের অজ্ঞাতসারে সৎ শূদ্রজাতীয় পরিচয়ে এক স্ত্রীলোক তাঁদের দেবালয়ে ও অতিথিশালায় পরিচারিকার কাজ করিতে থাকে। পরে প্রকাশ হয় ঐ স্ত্রীলোক চর্ম্মকার-জাতীয়। শুধু এই অপরাধে চৌধুরীদের সমাজচ্যুত বা একঘরে করা হয় এবং এরই ফলে চৌধুরীদের অপর "ব্রাহ্মণদের সহিত ভোজ্যান্নতা ছিল না।"

অনুমান করা মোটেই কঠিন হয় না যে, শুধু এই অপবাদের বিষয় জানতে পেরেই কবি ভারতচন্দ্র ইন্দ্র-নারায়ণের বাড়ীতে আহার বা বাসস্থান গ্রহণ করেন নি। তিনি চন্দননগর থাকাকালীন বরাবরই গোন্দলপাড়া-নিবাসী চুচুঁড়ার ডাচ্ সরকারের দেওয়ান রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়-এর বাড়ীতে বাস করেছেন। কবি প্রতি-দিন সকালে ও বিকালে ইন্দ্রনারায়ণের নিকট "উমেদারী" করতে আসতেন। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, স্থানীয় পৌরসভা কর্তৃক কবির নামে রাস্তাটি কবির প্রকৃত বাসস্থান অনুসন্ধানে অনেকের ভিতর বিভ্রান্তির কারণ হয়েছে। কবির প্রকৃত বাসস্থান ছিল উক্ত মুখোপাধ্যায়

মহাশয়ের বাড়ী, যাকে "দেওয়ানবাড়ী" বলা হয় আর সে বাড়ীটি ঐ রাস্তা থেকে অনেকটা দূরে অবস্থিত। তবে কবি যে বর্ত্তমানে তাঁর নামাঙ্কিত রাস্তার কিছুটা অংশের উপর দিয়ে অতীতে যাতায়াত করেছেন সেটা নিশ্চিতভাবে গ্রহণ করা যায়।

কবির চন্দননগরে অবস্থান চার হইতে ছয় মাস-এর বেশী নয়। কারণ তাঁর ৩৯ ও ৪০ বৎসর বয়সের সময় অর্থাৎ ১৭৫১ ও ১৭৫২ খৃঃ—এই সময়ের মধ্যে মাত্র দেড় বৎসরে তিনি খানকুল, কৃষ্ণনগর (হুগলী), সারদা, চন্দননগর ও কৃষ্ণনগর (নদীয়া) এই সব যায়গায় বাস করেছেন এবং কৃষ্ণনগরের মহারাজার "সভাকবি" হিসাবে "অন্নদামঙ্গল" রচনা শেষ করেছেন। কৃষ্ণচন্দ্রের চন্দননগরের ইন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ না-হওয়া পর্য্যন্ত কবিকে চন্দননগরে বাস করতে হয়। এই সাক্ষাতের একমাস পরেই তিনি কৃষ্ণনগরে কবির চাকুরি গ্রহণ করেন। যে অল্প কয়েকমাস কবি চন্দননগরে বাস করেন তার মধ্যে তাঁর রচিত কোনও কবিতা ছিল এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

"অন্নদামঙ্গল" রচনার নির্দ্দেশ দেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এবং এই কাব্য-রচনায় সন্তুষ্ট হয়েই তিনি কবিকে "রায়গুণাকর" উপাধি দান করেন। এর পর কবিকে বাসস্থান-এর জন্য কৃষ্ণচন্দ্র মূলাজোড়ে জমি দান করেন। এই সময়ে কবি চন্দননগরের নিকটবর্ত্তী জায়গা প্রার্থনা করেন, কারণ তাঁর "কল্পতরু"—ইন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ করার সুবিধা থাকে এই ইচ্ছা জানান। সেই সুবিধা দেখেই তাঁকে মূলাজোড়ে ভূমিদান করা হয়। কবির মূলাজোড়ে বাসস্থান নির্ম্মাণের মাত্র তিন বৎসর পরেই (১৭৫৬ খৃঃ) ইন্দ্রনারায়ণ মারা যান। এর পর কবির চন্দননগরের সঙ্গে যোগাযোগ খুবই ক্ষীণ হয়ে পড়ে। কবির অপর সব রচনা কৃষ্ণনগরে বা মূলাজোড়ে রচিত, যার মধ্যে ১। বিদ্যাসুন্দর, ২। রসমঞ্জরী, ৩। নাগাষ্টক এই কয়টিই প্রধান।

চন্দননগর থাকাকালীন তিনি যে কোনও কবিতা বা গ্রন্থ রচনা করেন নি এটা বেশ নিশ্চিতভাবে বলা যায়। ফরাসী জাতীয় গ্রন্থশালায় (Bibliathaque Nationale, Paris) রক্ষিত হাতে-লেখা পুঁথির মধ্যে যদি কবির কোনও রচনা আবদ্ধ থাকে তবে সে-বিষয়ে এ পর্য্যন্ত কোনও অনুসন্ধান করা হয় নি। যদিও সে বিষয়ে অনুসন্ধান করবার প্রয়োজন আছে। তবে কবির প্রতিভার বিকাশলাভের স্থান যে চন্দননগর নয়, এসম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। কারণ বর্ত্তমানের যে-সব প্রবন্ধলেখক কবির প্রতিভার সঙ্গে চন্দননগরের যোগসূত্র খুব ঘনিষ্ঠ ব'লে প্রকাশ করেন তাঁরাও সন্ধান করেন নি যে প্রকৃতই প্যারীতে কবির কোনও রচনা সংরক্ষিত আছে কি না।

কবির "কল্পতরু" ইন্দ্রনারায়ণ যে যোগ্য লোকের স্থান নির্ব্বাচনে দক্ষ ছিলেন এবং গুণের আদর করতেও জানতেন, এটা বেশ স্পষ্টই বোঝা যায়। কারণ কবিকে যদি কবির ইচ্ছামত একটি চাকুরি দিতেন তা হ'লে নিশ্চয়ই বাংলা সাহিত্য রায়গুণাকরকে লাভ করত না। তাই কবির কবি-প্রতিভার বিকাশলাভের সুযোগ যে চন্দননগরের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ দিয়েছিলেন, এবিষয়ে কোনও ভিন্নমত থাকা উচিত নয়। এদিক থেকে প্রতিভার বিকাশলাভের সুযোগ এখান থেকেই হয়েছিল, একথা সত্য। কিন্তু কবির রচনা বা গ্রন্থের দিক থেকে চন্দননগরের স্থান হিসাবে কোনও প্রতিভার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৭৭।২।১ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

হাটের পথে

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শিল্পী : তারক বসু

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৪শ ভাগ
২য় খণ্ড

দ্বিতীয় সংখ্যা
অগ্রহায়ণ, ১৩৭১

জবাহরলাল নেহরু

[illegible]নও ছয় মাসকাল পূর্ণ হয় নাই, জবাহরলাল আমাদের [illegible] গিয়াছেন। সেই কারণে, এক হিসাবে, এখনও [illegible] নাই তাঁহার জীবনের ও ব্যক্তিত্বের মূল্যায়নের। ইতিহাসের পাতায় বিশিষ্ট উল্লেখ ও স্থায়ী স্থান পায় [illegible] তাঁহাদের জীবনের কীর্ত্তি ও অবদান পরম্পরা [illegible] প্রবল ঘর্ষণে ইতিহাসের কষ্টি-পাথরের উপর উৎকীর্ণ [illegible] রাখিয়াছে কি ধাতুতে তাঁহাদের দেহ-মন-প্রাণ গঠিত [illegible]হার উজ্জ্বল প্রমাণ। কি সাক্ষ্য, কি প্রমাণ, কি [illegible]ণ্ডিত নিদর্শন অঙ্কিত থাকিবে ইতিহাসের পাতায় [illegible]লাল নেহরুর জীবন-আলেখ্য রূপে?

[illegible]হার মৃত্যুর পর দেশে-বিদেশে শত-সহস্র মুখে তাঁহার [illegible] যে শ্রদ্ধা-নিবেদন উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে [illegible]তে এই প্রশ্নের উত্তর আমরা পাই। ইহা বলিয়া- [illegible] জাতিসঙ্ঘে প্রেরিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত আড্‌লাই [illegible]ন, নিরাপত্তা পরিষদে। উহা এইরূপ :—

[illegible]Prime Minister Nehru's influence [illegible]nded far beyond the borders of his own [illegible]try. He was a leader of Asia and of all [illegible]ew developing nations. His vision and strength had much to do with the [illegible]nding role which those nations have come to play in recent years. And in other parts of the World as well his name had come to be synonymous with the spiritual goals and the worthy hopes of mankind. He was one of God's great creations in our time. His monument is his nation and his dream of freedom and of ever expanding well-being for all men. May that be our legacy and our dream, too."

"প্রধানমন্ত্রী নেহরুর প্রভাব তাঁহার নিজ দেশের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বহুদূর প্রসারিত হইয়াছিল। তিনি এশিয়ার ও সকল নূতন প্রগতিমুখী রাষ্ট্রের একজন নেতা ছিলেন। সাম্প্রতিক কালে এই সকল জাতি যে বিশ্বের কাজে ক্রমেই বর্দ্ধনশীল অংশ গ্রহণ করিতেছে তাহার মূলে তাঁহার ধ্যানদৃষ্টি ও শক্তি বিশেষভাবে ছিল এবং পৃথিবীর অন্য দেশেও তাঁহার নাম মানব-সমাজের আধ্যাত্মিক লক্ষ্যসমূহের ও মহত্তর আশার প্রতিশব্দ রূপেই গৃহীত হইতেছিল। আমাদের কালে ঈশ্বরের মহান সৃষ্টি সকলের অন্যতম ছিলেন তিনি। তাঁহার স্বজাতি ও সমগ্র মানবজাতির স্বাধীনতা ও চির-বর্দ্ধনশীল কল্যাণময় অস্তিত্বের সম্পর্কে তাঁহার স্বপ্ন, ইহাই থাকিবে তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ রূপে। উহাই যেন উত্তরাধিকার ও স্বপ্নরূপে আমাদেরও হয়।"

আডলাই ষ্টিভেন্সন বিদেশী এবং ভারত সম্বন্ধে তাঁহার কোনও মোহবন্ধন নাই। গোয়ার মুক্তিকালে জাতিসঙ্ঘে তিনি তীব্র ভাষায় ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। সুতরাং তাঁহার শ্রদ্ধাবাচনের মধ্যে অসার উচ্ছ্বাস না থাকারই কথা। আমাদের উপর এখন ক্ষুদ্রত্বের অভিশাপ বর্ত্তমান। সুতরাং আমাদের অনেকেরই আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে এই "ঈশ্বরের মহান সৃষ্টি"র পূর্ণ মহিমা লক্ষিত হইতেছে না।

খাদ্যসমস্যা ও ভেজাল

কয়দিন পূর্ব্বে এক সংবাদে দেখা গেল যে প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রী খাদ্য লইয়া মুনাফাবাজী ও চোরাকারবারী সম্পর্কে সরকারী মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে উহা দমনে সরকার দৃঢ়সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু সেই সঙ্গেই তিনি বলেন যে, যাহারা কঠোর দণ্ডদানের কথা বলেন তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, গণতন্ত্রের দেশে একনায়কত্ব রাষ্ট্রের মত সরাসরি কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করা চলে না। এখানে "কিছুদিন বুঝাইয়া বলিয়া" ঐরূপ সমাজ-বিরোধী দুষ্কৃতকারীদের মতিগতি বদলাইবার চেষ্টা করিতে হয় আবার তাহাতে ফল না হইলে পরে তখন দণ্ডদানের ব্যবস্থা করিতে হয়।

কথাটা সত্য, কিন্তু আংশিকভাবে সত্য। অর্থাৎ যে সত্যের পূর্ণ বিস্তারের সীমা নির্দ্দেশ নাই এবং সে কারণে উহাকে নিরুক্তিবিহীন ও অনির্দ্দিষ্ট বলা হয় এই সত্য সেই শ্রেণীর। "বলিয়া কহিয়া" ও "গায়ে হাত বুলাইয়া" কিছুদিন বুঝাইতে হইবে ইহা গণতান্ত্রিক দেশের নিয়ম, ইহা আমরা জানি। কিন্তু সেই কিছুদিন মানে কতদিন? কোন্ প্রগতিশীল গণতন্ত্রের দেশে এইভাবে গড়িমসি করিয়া বৎসরের পর বৎসর একদল অর্থপিশাচ দুর্ব্বৃত্তদের দেশের জনসাধারণের রক্তশোষণ করিতে দেওয়া হইয়াছে? কোন্ গণতান্ত্রিক দেশে এদেশের মুনাফাবাজ ও চোরাকারবারীদের মত দুষ্কৃতকারীদের এরূপ নির্লজ্জভাবে জনসাধারণের জীবনযাত্রা দুর্ব্বহ করার কাজ প্রকাশ্যে করিতে দেওয়া হইতেছে? কোন্ প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দেশে অত্যাবশ্যক পণ্য, যথা, খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ ইত্যাদিতে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করার কাজে কোনও বাধা নাই, কোন্ সভ্য দেশে খাদ্যে ভেজাল মিশাইয়া সারা জাতির জীবন বিপদসঙ্কুল করার মত সাংঘাতিক অপরাধের শাস্তি এ দেশের মত হাস্যকর? এক কথায় কোন্ সভ্যদেশে আইন-কানুন বিচার-ব্যবস্থা সব কিছুই "হিসাব-বহির্ভূত টাকার" মালিকগণ কর্ত্তৃক অবহেলিত ও পদদলিত হইতেছে, যেমন হয় আমাদের এই অভাগা দেশে? শাস্ত্রীজীর সম্মুখে এই প্রশ্নগুলি উপস্থিত করিলে তিনি কি উত্তর দেন সেটা জানা প্রয়োজন।

এই সেদিন কয়েকজনে অসাধু ব্যবসায়ীর গুদাম হইতে ১ লক্ষ টিন শিশুদের অতিপ্রয়োজনীয় খাদ্য পুলিশে ধরিয়াছে। যে দুষ্কৃতকারী পামরগণ এইভাবে অসহায় শিশুদের জীবন বিপন্ন করিয়া ৫ টাকা মূল্যের মাল ১২ টাকায় বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিল শাস্ত্রীজী তাহাদের জন্য কি ব্যবস্থা করিতে চাহেন? হরিসঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ ও মালসা ভোগ সেবনে কি এ জাতীয় অর্থপিশাচদের মনের কোন পরিবর্ত্তন সম্ভব তিনি মনে করেন?

ঢাকায় একদল ব্যবসায়ী এইভাবে দেশের লোকের খাদ্য কৃত্রিমভাবে মহার্ঘ্য করার চেষ্টা করিয়াছিল। সেখানে ইহার প্রতিকার হয় কয়েকজন দুর্লোদর ব্যবসায়ীকে ধরিয়া বাজারের মাঝে উলঙ্গ করিয়া প্রচণ্ড বেত্রাঘাত করায়। আমরা, সরাসরি বিচার ত দূরের কথা, এরূপ ক্ষেত্রে দুষ্কৃতকারীদের কোনও আইনের আওতাতেই এতদিন আনি নাই। এখন অবশ্য অর্ডিনান্স করিয়া সরাসরি বিচারের ব্যবস্থা করিতেছি। কিন্তু তাহার সীমা কতটুকু? এক মাসের কারাদণ্ড ও ২০০০ টাকা জরিমানা পর্য্যন্ত সরাসরি বিচারে দণ্ড দিলে তাহার বিরুদ্ধে আপীল চলিবে না। আমরা এই অর্ডিনান্সকে ভুয়া বলিব, কেননা, ইহাতে কিছু চুনাপুঁটি ঘায়েল হইতে পারে। কিন্তু এই মহাপাতকের মূলে যে-সকল অর্থপিশাচ তাহাদের কিছুই হইবে না। চোরাকারবারী ও মুনফাবাজীতে যাহারা পালের গোদা তাহাদের লাভের পরিমাণ সম্পর্কে নীচে "আনন্দবাজার" হইতে গৃহীত একটি উদ্ধৃতি দেওয়া গেল:

"দৈনিক কম করিয়াও ৫০ হাজার, মাসে ১৫ লক্ষ টাকা ইনকাম ট্যাক্স দেওয়ারও ঝামেলা নাই—'নাফার' এ হিসাব অবিশ্বাস্য হইলেও সত্য। গত কয়েকদিন যাবত বড়বাজারের চিনিপট্টি, কাঁটাপুকুর-মৌলালী খিদিরপুর-হাওড়ার কয়েকটি গুদাম এবং গোটা কলিকাতার মিষ্টি ও মিছরির বাজার ঘুরিয়া আমি জনা ছয়েক কারবারীর সন্ধান পাইয়াছি যাহারা

গত প্রায় সাত-আট মাস যাবত চিনির 'বিলাক মারকেটে' এই অবিশ্বাস্য হারে মুনাফা লুটিতেছে।

শনিবার সন্ধ্যায় বড়বাজারের সত্যনারায়ণ পার্কে চিনি-পটির তিনজন কর্ম্মচারী গোপনে আমাকে জানায়ঃ আমরা ভগবানের নামে দিব্যি করিয়া বলিতেছি, ইহাদের সঙ্গে সাপ্লাই দপ্তরের কয়েকজন বড় বড় কর্ম্মচারীরও যোগাযোগ আছে। সম্প্রতি এই ছয়জনার একজন ক্রি-স্কুল ষ্ট্রীটের এক কর্ত্তাকে সাত শ টাকা দিয়া স্যুট তৈরী করিয়া দিয়াছে। নগদ টাকাও নিয়মিত দেওয়া হয়। এই তিনজন কর্ম্মচারীর একজনের নিকট হইতে আটা-ময়দার কালোবাজারের খবর পাইয়াছিলাম। পুলিস সেই কালোবাজারীদের কয়েকজনকে ধরিয়াছে, সুতরাং ইহাদের সংবাদ অবিশ্বাস করার কারণ নাই।

দৈনিক ৫০ হাজার টাকা নাফার হিসাবটা কিরূপে পাওয়া গেল? গড়ে দৈনিক এই ছয়জন বেওসায়ী ৬৫০ বস্তা চিনি কালোবাজারে বিক্রি করে। চিনির নিয়মিত দর প্রতি কুইণ্টল ১৩২ হইতে ১৪৫ টাকা। কালোবাজারে বিক্রি ২০০ হইতে ২২৫ টাকা।"

আমরা এই সংবাদটি নিছক গল্প মনে করিতে পারি না, কেননা, আমাদেরও এ বিষয়ে কিছু অভিজ্ঞতা এক সময় হইয়াছিল। যাহাই হউক এইরূপ মুনফা যেখানে একটি দ্রব্যেই হইতে পারে—অন্ততঃ ইহার অর্দ্ধেকও যদি হইতে পারে—তবে ইহাদের অনুচরদের জন্য ২০০০ টাকা জরিমানা ও এক মাস জেল খাটার "মজুরি" বাবদ আরও এক হাজার টাকা, মোট ৩০০০ টাকা খরচ করিতে বাধা কোথায় ও কতটুকু?

তার পর ভেজাল। শাস্ত্রীজী খোঁজ লউন বিটেনে, পশ্চিম জার্ম্মানীতে ও মার্কিন দেশে দুধে ভেজাল ও মাখনে ভেজাল রোধ করার জন্য কিরূপ দণ্ডব্যবস্থা আছে। এদেশে সরিষার তেলে যেরূপ মারাত্মক পদার্থ ভেজাল দেওয়া হইয়াছে সেরূপ ক্ষেত্রে উত্তর আফ্রিকার এক দেশে কয়েকজন ব্যাপারীকে গুলী করিয়া মারা হয়। যে দুর্বৃত্ত অন্যায় লাভের জন্য অসহায় জনগণকে ঐভাবে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিতে পারে তাহার মৃত্যুদণ্ড হওয়াই উচিত—ন্যূনকল্পে দীর্ঘ দিনের কঠোর শ্রমযুক্ত কারাদণ্ড হওয়া একান্তই প্রয়োজন। নয়াদিল্লীর কাজীবর্গের বিচারে তাহার কাছাকাছিও কিছু ব্যবস্থা নাই। সুতরাং সারা পৃথিবীর মধ্যে ভেজালকারীদের "রামরাজত্ব" চলিবে এই অভাগা ভারতেই!

শাস্ত্রীজী অতি সৎ ও ন্যায়পরায়ণ লোক আমরা জানি। কিন্তু দোষী ও অপরাধীর প্রতি কঠোর মনোভাব প্রদর্শন না করিতে পারার জন্যই তিনি অনেকক্ষেত্রে ব্যর্থ হইয়াছিলেন—যেমন রেলমন্ত্রী হওয়ার সময়।

এই ত গেল মুনাফাবাজী ও ভেজালের কথা। তারপর আসে ন্যায্য মূল্যে "ভোগ্যপণ্য" সরবরাহের এবং জন-সাধারণের জীবনধারণের উপায়স্বরূপে ন্যায্য মূল্যে খাদ্য সরবরাহের কথা—অর্থাৎ কথা, কথা, কথা!

আজও শুনিতেছি আগামী বৎসরের কোন সময়ে সরকার বাহাদুর সত্য সত্যই কথার বদলে কাজে মন দিবেন—কাজ আরম্ভ করিবেন কবে সে বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট ঘোষণা এখনও পাওয়া যায় নাই। এ প্রসঙ্গ লিখিবার সময় শোনা গেলঃ—

"কলিকাতা, ১৬ই নভেম্বর—আসন্ন মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে যোগদানের প্রাক্কালে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন আজ সাংবাদিকদের নিকট ঘোষণা করেন, কোন অবস্থাতেই রাজ্য সরকারের খাদ্য নীতির পরিবর্ত্তন করা হইবে না। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন, আগামী জানুয়ারী মাসের সুরু হইতে কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলে বিধিবদ্ধ রেশনিং প্রথা চালু হইবেই।

তিনি জানান, প্রতি সপ্তাহে চাল-কলগুলির উৎপাদনের শতকরা ৫০ ভাগ লেভি করা হইবে। তা ছাড়া জেলাশাসক এবং সমবায়ের মারফৎ সোজাসুজি ধান সংগ্রহও করা হইবে। ন্যায্য মূল্যে চাষীদের নিকট হইতে ধান ক্রয়ের ব্যবস্থাও করা হইবে। এই ব্যাপারে সুদূর গ্রামাঞ্চলের চাষীদের ন্যায্য মূল্যপ্রাপ্তির উপর বিশেষ নজর দেওয়া হইবে।

খাদ্যশস্যের মূল্য স্থির রাখার জন্য অন্যান্য সকল রাজ্যে রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন আছে বলিয়া শ্রীসেন অভিমত প্রকাশ করেন।"

চাষীগণ ন্যায্য মূল্য পাইবে এটা ভাল কথা। কিন্তু আমরা, অর্থাৎ অচাষী জনসাধারণ, কি মূল্যে কতটা খাইতে পাইব সে বিষয়ে এখনও এক কথাও শোনা যায় নাই। অবশ্য

মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলন আগতপ্রায়, সুতরাং ধৈর্য্য ধরিয়া বসিয়া থাকাই শ্রেয়। আর মূল্যের বিষয়ে ত ঐ একই দিনে, একই সংবাদপত্রে (যুগান্তর) আর একটি সংবাদ আছে যাহা নিরীক্ষণে গৃহস্থজনের মন পুলকিত হইবেই। পাঠক অবধান করুন :—

"কলিকাতা, ১৬ই নভেম্বর—গম, এবং সেই বাবদ আটা, ময়দা, সুজি ও পাঁউরুটির মূল্য শীঘ্রই আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। কত বাড়িবে ঠিক জানা যায় নাই। তবে সরকারী মহলের ধারণা এক কিলো গমের জন্য শীঘ্রই ১৫ পয়সা করিয়া বেশি দিতে হইবে। আটা, ময়দা, সুজি ও পাউরুটির মূল্যও এই হারে বাড়িয়া যাইবে।

ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই মূল্যবৃদ্ধি ঘটিতেছে। সারা ভারতেই গম ও গমজাত দ্রব্যের দাম চড়িয়া যাইবে।"

এদিকে যে আলু কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও ২৸৵ টাকা মণ ছিল গঞ্জে এবং কলিকাতায় চার আনা সের হিসাবে অপর্য্যাপ্ত পাওয়া যাইত, তাহা আজ ঠাণ্ডা ঘরের কল্যাণে ও শ্রীমান লালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রমুখাৎ শাসক-প্রবরদিগের চগজানু গতিতে মুনাফাবাজী নিবারণ ও শাসন প্রচেষ্টার গুণে, ১৷০ কিলো দরে বিক্রয় করা হইতেছে। সুতরাং আগামী দিনের বার্ত্তার প্রতীক্ষা জনসাধারণ, বিশেষে মহানগর কলিকাতার নাগরিকজন, পুলকিত চিত্তে শুনিবে, না কম্পিত কলেবরে শুনিবে, তাহা বিধাতাই জানেন।

আমরা কতটা খাইতে পাইব সেটা ত এখনও উহ্য। ...ব সম্প্রতি পাউরুটি সম্পর্কে যে ঘোষণা করা হইয়াছে ...হাতে বুঝা যায় যে, সদাশয় সরকার বাহাদুর দেশবাসীর ...দ্যের পরিমাণ কতদূর কমানো যাইতে পারে সে-বিষয়ে ...বষণা এরই মধ্যে আরম্ভ করিয়াছেন। আগে রেশনে ...বা চাউল না পাইলে বা রেশনের বাহিরে চাউল বা ...টা না পাইলে পাউরুটিতে কতকটা ক্ষুধা নিবারণের পথ ...ল। যাহাদের ৯টা-৫টা খাটিয়া তিন-চার মাইল হাঁটিয়া ...ী যাইতে হয় তাহারা চায়ের সঙ্গে দু-স্লাইস রুটি খাইয়া ...ন রকমে জঠর-জ্বালা নিবারণ করিত। এখন সে পথ ...হইল। তারপর সিকি কিলো গম বা আটার বদলে ...কি কিলো পাঁউরুটি কে দেবে? কোন্ আইনে দোকানী ...ওজন করিতে বাধ্য?

গুণ্টুরে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি অধিবেশন

বিগত ৭ই, ৮ই ও ৯ই নভেম্বর গুণ্টুরের "নেহরুনগর" ছাউনিতে নিখিল ভারত কংগ্রেস ... তিনদিন ব্যাপী অধিবেশন হয়। নেহরুনগরে বিশেষ ...পূর্ণ আলোচনা হইবে বলিয়া আশা অনেকেই ...ছিলেন। কেননা চীনে পারমাণবিক বোমা বিস্ফো... পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার স... নীতি ও বর্ত্তমান সঙ্কটজনক খাদ্য পরিস্থিতির প্রতি... উদ্দেশ্যে ব্যাপক রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের প্রশ্ন, এ... বিষয়ই ঐখানে সম্যকভাবে আলোচিত হইবার কথা... এবং যেহেতু ভুবনেশ্বর অধিবেশনের পর কংগ্রেস ও ক... *কমিটিতে পুনর্বার প্রাণ সঞ্চার হইয়াছে—অর্থাৎ কংগ্রেসী সরকারের প্রতিধ্বনি ও প্রতিচ্ছায়া মাত্র নয়—ধারণা দেশের লোকের মনে আসিয়াছে, সে কারণে* আলোচনার উপর শুধু এদেশের নহে বিদেশেরও অনে... বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। আমাদেরও আ... ছিল যে, এই আলোচনায় আমরা নূতন চিন্তাধারার ও ... বুদ্ধিচালিত বিতর্কের পরিচয় পাইব। দুঃখের বিষয়... সকল আশাই ধূলিসাৎ হইয়াছে এবং আলোচনার আরে... যদিও কিছুটা বাস্তবমুখী চিন্তার পরিচয় পাওয়া গিয়াছি... তাহার শেষের দিকে অবাস্তব ও অসার ফেনিল উচ্ছ্বা... ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় নাই।

এই তিনদিনের অধিবেশনে যদি কোন কিছু সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়া থাকে, তবে তাহা এই যে, ভারতের কর্ণধাররূপে যাহারা বিরাজ করিতেছেন তাঁহাদের চিন্তা ও সমীক্ষণ শক্তি এখনও আড়ষ্ট, অনড় ও বাস্তববিমুখী... উপরন্তু তাঁহাদের কোনও বিষয়ে ধীর-স্থিরভাবে আলোচন... কিভাবে ও কি পরিবেশে করিতে হয় সে সম্বন্ধেও কোন... ধারণা নাই। নহিলে ঐরূপ দুইটি প্রশ্ন, যাহার মধ্যে দেশের স্বাধীনতা ও মরণ-বাঁচন সমস্যা নিহিত রহিয়াছে, তাহার আলোচনা ঐরূপ হাটের মাঝে যাত্রার পালাগানের প্রথায় পরিচালিত হইত না। খাদ্য সমস্যা সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, তাহার একাংশ—অর্থাৎ সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা—সম্পর্কে খাদ্যমন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মণ্যম সুস্পষ্টভাবে সরকারের ম...

করেন। কিন্তু আলোচনাকালে সেই নিয়ন্ত্রণ কতদূর ক হইবে এবং কিভাবে চালিত হইবে তাহার বিষয়ে হইল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আগামী ১৭ই ও ১৮ই নভেম্বরে দিল্লী মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে গৃহীত হইবে। এবং এ বিষয়ে ন্য বক্তাদিগের কথার মধ্যেও নূতন কোনও তথ্যের ন পাওয়া গেল না। এমনকি খাদ্যে অনটনের মূলে যে কময় প্রশ্ন রহিয়াছে, যাহাকে "জনসংখ্যা বিস্ফোরণ" হইয়াছে, সে-বিষয়ে কেহ একটা কথাও উচ্চারণ নেন না!

পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণ সম্পর্কে আলোচনায় কংগ্রেস দীয় পার্টির সম্পাদক শ্রীবিভূতি মিশ্র বলেন, "জাতীয় রক্ষার ব্যাপারে অন্যের উপর নির্ভর করা যাইতে র না। ভারতে পারমাণবিক অস্ত্র তৈয়ারী করা হইবে না সে বিষয়ে জাতির নেতারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লইতে ন না। এ বিষয়ে ভোট দ্বারা দেশবাসীর মতামত উচিত। আমরা পারমাণবিক বোমা প্রস্তুত না করার ন্ত যদি এখনই লই তবে হয়ত কিছুদিন পরে তাহা তে আমাদের বাধ্য হইতে পারে। চীন যদি আমাদের মণ করে তবে আমাদের আমেরিকা বা রাশিয়ার দের হইতে হইবে। ইহাতে চলিবে না, আমাদের ব অস্ত্র চাই।"

তিনি আরও বলেন, "ভারত যদি নিজেকে শক্তিশালী করিয়া তোলে তবে সে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির নিকট মর্যাদা পাইবে না। ভারত ইতিমধ্যে চীনের কাছে ত পাইয়াছে এবং ভারতের কিছু অংশ এখনও চীনের ল আছে। ক্ষুদ্রাস্ত্র দিয়া প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা বে না।"

বিহারের এম-পি শ্রীকমলনাথ তেওয়ারী বলেন যে, রক্ষার ব্যাপারে পারমাণবিক বোমা প্রস্তুতির বিষয়টি ধারে উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে না। এ ছাড়া কজন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যের মত ছিল—শ্রীবিভূতি তন্মধ্যে একজন—যে, এখন পারমাণবিক বোমা তৈয়ারী করা হউক, এখন হইতেই তাহার প্রস্তুতি অগ্রসর করা ত যাহাতে প্রয়োজন হইলে দ্রুত ঐ অস্ত্র নির্মাণ করা ব হয়।

চীনা আক্রমণের ফলে ভারতের যে অবস্থার অবনতি হয় তাহার মধ্যে এশিয়া ও আফ্রিকায় ভারতের মান-সম্ভ্রমে হানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেননা চীনের সম্মুখে আমাদের সেনাদল অতি নিকৃষ্ট অস্ত্র ও ততোধিক জঘন্য খাদ্য-শীতবস্ত্র ইত্যাদির কারণে পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হয়, একথা জগৎ জানিতে পারিয়াছে। আমাদের কর্তৃপক্ষ শুধুমাত্র গলাবাজি, অন্ধ বিশ্বাস ও ভাবের উচ্ছ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া দেশের প্রতিরক্ষা বিষয়ে বিষম অবহেলা করিয়াছেন একথা বিশ্বজগৎ জানে। এই অবহেলার কারণেই আমাদের সামরিক পরাজয়ের অপমান, এদেশের পবিত্র ভূমির দশ হাজার বর্গমাইল শত্রুকবলিত এবং বিশ্বজগতে মাথা হেঁট করা মানিয়া লইতে হইয়াছে। বর্তমানে চীন তাহার অস্ত্রবল বৃদ্ধি করিয়াছে এই পারমাণবিক বোমা নির্মাণের দ্বারা, যাহার ফলে সারা জগতের জোট-নিরপেক্ষ জাতিবর্গের মধ্যে চীনের সম্পর্কে কিরূপ ভয়মিশ্রিত সম্ভ্রম বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাও সকলেরই জানা। সুতরাং শ্রীবিভূতি মিশ্র ও তাঁহার সহিত পারমাণবিক অস্ত্রের বিষয়ে একমত যে-সকল সদস্য ছিলেন তাঁহাদের উৎকণ্ঠার যথেষ্ট কারণ আছে, একথা বিবেচক ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিবেন।

আরও বিশেষ কথা এই যে, ইঁহারা প্রস্তুতির কথা বলিয়াছেন। অস্ত্র নির্মাণ প্রতিযোগিতার কথা উঠে নাই, সে কথা অবান্তরভাবে ইঁহাদের বিরোধী "ওজনে ভারি" মহাশয়গণ তুলিয়াছেন। বিশ্বজগৎ জানে যে প্রতিরক্ষা বিষয়ে যে-প্রস্তুতি আমাদের করা উচিত ছিল ১৯৫৪ সালে, এবং যে প্রস্তুতির কথা আমরা, নিজেদেরই ন্যায়ধর্মনীতি-জ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া সারা জগৎকে "অহো আমি কি সাধু, আমি কি নিষ্ঠাবান ও ধর্মপ্রাণ, সে কথা বুঝহ" শুনাইবার কারণে, ভাবোচ্ছ্বাসে মগ্ন হইয়া, কাজের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃতির গর্ভে ঢালিয়া, আট বৎসর "তুরীয়" ভাবে কাটাইয়াছি, সেই প্রস্তুতি-বিষয়ক কাজই আজ আমরা চীনের নিকট বিষম ভাবে লাঞ্ছিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া, চতুর্গুণ খরচে ও বহুদেশের কাছে দরবার করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে করিতেছি। সুতরাং পারমাণবিক অস্ত্র বিষয়ে প্রস্তুতির কথা বলায় কি বেদ অশুদ্ধ হইয়াছে তাহা শুধু তাঁহারাই জানেন, যাঁহারা বাস্তবকে সাদা চোখে দেখা অন্যায় মনে করেন!

বিষয়টা ছিল প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত, অর্থাৎ চরম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন-সংক্রান্ত। কেননা, ইহার সঙ্গে ভারতের চল্লিশ কোটির

অধিক নরনারীর স্বাধীনতা, পবিত্র ভারতভূমির প্রতি অংশের অচ্ছেদ্য নিরাপত্তা ও ভারতীয় জাতির উন্নতশিরে জগতে থাকার প্রশ্ন ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। উচিত ছিল, সেই হেতু, প্রস্তাবিত বিষয়টির প্রতিটি অংশ, স্থিরচিত্তে ও বাস্তবমুখী দৃষ্টিতে, পরীক্ষা ও সমীক্ষা করা। আরও উচিত ছিল প্রথমেই বলা যে, এরূপ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিচার হাটের মধ্যে, ভিড়ের গোলেমালে, করা চলে না। সুতরাং বিশেষ অধিবেশনে, শুধু সদস্যদের সম্মুখে ইহার আলোচনা ও বিচার চলিবে। সেইরূপে আলোচনা ও বিচারের পর সিদ্ধান্ত যাহাই হইত তাহার একটা ওজন ও বিশেষত্ব থাকিত, সে সিদ্ধান্ত প্রস্তুতি বা নির্মাণের স্বপক্ষেই হউক বা বিপক্ষেই হউক। বিচার অবশ্যই বাস্তবমুখী হওয়া প্রয়োজন ছিল, অর্থাৎ প্রতিরক্ষার ব্যাপারে এই প্রস্তাবের অনুকূল বা প্রতিকূল প্রত্যেকটি কথা প্রতিরক্ষারই হিসাবে করা উচিত ছিল। ন্যায়নীতি, লোকধর্ম্ম ইত্যাদির প্রশ্ন তখনই উঠিত যখন ঐ অস্ত্র প্রস্তুত করিয়া পরীক্ষার ব্যাপার সম্মুখে আসিত। এখানে বলা প্রয়োজন যে, মস্কোতে যে পারমাণবিক অস্ত্র সম্বন্ধে চুক্তিতে ভারত স্বাক্ষর করিয়াছে তাহাতে ভূগর্ভ মধ্যে ঐরূপ পরীক্ষা-সংক্রান্ত বিস্ফোরণের নিষেধ বোধ হয় নাই। পারমাণবিক শক্তির কোনওপ্রকার পরীক্ষা হইবে না এইরূপ সর্ত্ত শুধুমাত্র আমাদের নেতৃবর্গের স্ব-স্বকপোল কল্পিত।

যদি ঐভাবে বিচারের ফলে কোনও বাস্তব কারণ— যাহার মধ্যে আন্তর্জ্জাতিক চুক্তি অবশ্যই ধরা যাইতে পারে —প্রদর্শিত হইত যাহা ঐরূপ অস্ত্র নির্ম্মাণ বা নির্ম্মাণ প্রস্তুতির বিরোধী, তবে সে কারণ দর্শাইয়া এই প্রস্তাব নামঞ্জুর করিলে কাহারও কোন কথা বলিবার থাকিত না। তাহার বদলে এরূপ লোকহাস্যকর ভাবোচ্ছ্বাস প্রদর্শনে আর যাহাই হউক বিশ্বজগতে আমাদের মান-মর্য্যাদা কমিবে ছাড়া বাড়িবে না। অবশ্য অনেক বন্ধু মনভুলানো কথা বলিবেন।

প্রস্তাবের বিরোধিতা যাঁহারা করেন তাঁহাদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রী যাহা বলেন তাহাতে ছিল (১) এক-একটি পারমাণবিক বোমা তৈয়ারী করিতে চল্লিশ-পঞ্চাশ কোটি টাকা খরচ করিতে ভারত সরকার রাজী নয়, (২) নৈতিক ও আন্তর্জ্জাতিক কারণে তিনি এই বোমা তৈয়ারীর বিরোধী। ইহা ভিন্ন তিনি বলেন, এই বোমাকে ঘিরিয়া সবরকম ভীতি ও ভ্রা আছে ভারত তাহা অপসারণের চেষ্টা করে সর্ব্বাগ্রেই তিনি বলেন (৪) "এমন প্রস্তাবের আ আমরা রাজী নই"।

অন্য বক্তাদের মধ্যে শ্রীদেবর ও শ্রীকৃষ্ণকৃ "গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি" পাড়িয়াছেন। প্রতিরক্ষা বিষয়ে কথা না বলাই উচিত ছিল কে ওদিকটাই তাঁহার বিবেচনার বাহিরে চিরদিন র সর্দার স্বরণ সিং এই প্রস্তাবকে পররাষ্ট্র নীতির পাকাইয়া দেখিয়াছেন এবং সে কারণে তাঁর অন্যথা পূর্ণ ভাষণের মধ্যে এই বিষয়টা অতি খেলোভাবে হইয়াছে। "দ্রুত পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য করিয়া চীনা বিস্ফোরণের সমুচিত জবাব" যদি তিনি সত্য বলিয়া থাকেন তবে বলিতে হইবে যে, তিনি শুধু যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে লঘুভাবে দেখিয়াছেন তাহাই নয়, অবান্তর প্রসঙ্গে তাহা চাপা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁ উক্তি এবং বাড়ীতে আগুন লাগিলে ভাইটামিন ভক্ষণ হরিতকী সেবন প্রায় একই পর্য্যায়ের বিধান!

শ্রীমেননের বাক্যরাজির মধ্যেও অসংলগ্ন ও অবা অনেক কিছুই আছে—যেমন থাকে উঁহার মন্তব্যে। ই মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত এক প্রশ্ন তিনি তুলিয়াছেন, "ধ আমরা আণবিক বোমা তৈরী করিলাম, কিন্তু ফাটা কোথায়—রাজস্থানে?" এরূপ প্রশ্নের সহজ উত্তর, " রাজস্থানে—ভূগর্ভে", যেমন হইতেছে রাশিয়ার ও মা দেশে, কিংবা বঙ্গোপসাগরের "ব্যারেন দ্বীপপুঞ্জে, মা নীচে"। কিন্তু ঐ প্রশ্নের পূর্ব্বে যে প্রশ্ন, প্রস্তুতি অং তৈয়ারী করার আয়োজন ও যোগাড় এবং প্রস্তুতকর মধ্যে যে প্রভেদ, সেটা কি বিবেচনা করা যায় না। "আ ঐরূপ বোমা প্রস্তুত করিতে সক্ষম" এই কথা কি আ পূর্ণরূপে সত্য? না ইহার জন্য অন্য অনেক ব্যবস্থা উপাদানের যোগাড় প্রয়োজন? যদি তাহা হয় তবে যে অগ্রসর করিলে অর্থব্যয় ছাড়া অন্যদিকে লোকসান কি লাভের হিসাবে যাইবে যে, আমাদের স্বপক্ষে যাহা যে রাষ্ট্রগুলি আছে তাহাদের অনেক ভরসা বাড়িবে।

শ্রীশাস্ত্রীর কথার মধ্যে (১) সম্বন্ধে হিসাব ঠিক কি

বিশেষ সন্দেহ আছে বলা যায়, (২) সম্বন্ধে বলা ষ্ট্রনীতির কঠোর বাস্তবময় দৃষ্টিতে যে নীতি দাঁড়ায় অন্য নৈতিক প্রশ্ন প্রতিরক্ষার ব্যাপারে অবান্তর। তিক কারণ কি তাহা তিনি জানান নাই। তি ও হুমকির প্রতিকার ভারত কিভাবে করিবে ষ্ট ভাষায় বলিলে তবে এই আশ্বাস গ্রাহ্য হইতে (৪) এরূপ উক্তি প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে করা উচিত ছিল তাহা তিনি নিজেই স্থিরচিত্তে চিন্তা করিলে না। যে একদল সদস্য কোন বিষয়ে আলোচনা তে উৎসুক, সেখানে তিনি "আলোচনা করিতে ী নয়" এরূপ মনোভাব প্রকাশ কি স্থিরভাবে বিবেচনা রিয়া বলিতে পারিতেন ?

শ্রীকৃষ্ণ মেননের ৪০ মিনিট ব্যাপী বক্তৃতার প্রধান বক্তব্য ছিল পারমাণবিক বোমার অমানুষিক বিনাশ-ক্তির পরিচয় ও ব্যাখ্যা। তাঁহার মতে "এই অস্ত্রকে যুদ্ধার বলা যায় না এবং ইহা আত্মরক্ষার্থ ব্যবহৃত হইতে পারে না বা শত্রু পরাজয়েও ব্যবহৃত হইতে পারে না, কেননা, হার শক্তি নিরবচ্ছিন্ন ও ব্যাপক ভাবে সর্ব্বধ্বংসাত্মক, বং ইহা যেখানে প্রয়োগ করা হয় সেখানের সর্বকিছুই চ্ছিন্ন হইয়া যায়। সংসদে বৎসরের পর বৎসর আমরা লিয়াছি যে, ভারত ধ্বংসাত্মক কাজে আণবিক শক্তির বহার করিবে না সুতরাং এই মূলনীতি সম্পর্কে কোনও রোধ হইতে পারে না। মস্কোর পারমাণবিক চুক্তি ক্ষরের সময়ও অনেকেই জানিত যে, চীন আণবিক বোমা টাইতে পারে সুতরাং সেই বিস্ফোরণে বিস্মিত হওয়ার কছু নাই।"

শ্রীকৃষ্ণ মেননের উক্তিগুলির মধ্যে কোনটা প্রায় সম্পূর্ণ ত্য এবং কোনটার মূলে সত্য ও বাকিটা ভুল ধারণা-প্রসূত। কিন্তু তাঁহার ভাষণের সমস্ত কিছুই যদি ধ্রুব সত্য লিয়া মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও কয়েকটা কথার বচার স্থির চিত্তে করা প্রয়োজন থাকে। এবং আমরা সেই কারণেই স্থির চিত্তে ও স্থির বিচারে এই বিষয়টি আলোচনা ও বিবেচনা করার উপর ঝোঁক দিতে চাই—কেননা আমাদের মতে এইরূপ চরম গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ের বিচার ঐরূপ ভাবোচ্ছ্বাসে বেসামাল হইয়া করা উচিত হয় নাই, যেভাবে উহা গুণ্টুরে করা হইয়াছে। সেই কারণে এই বিষয়ের পুনর্ব্বিচার প্রয়োজন, কেননা :—

প্রথমতঃ—পারমাণবিক অস্ত্র নি ... এবং উহার নির্ম্মাণের প্রস্তুতি—অর্থাৎ উহা নির্ম্মাণের পদ্ধতি, যন্ত্রপাতি, উপকরণ ও অন্য সরঞ্জাম যোগাড় ও আয়ত্তাধীন করা—সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু।

দ্বিতীয়তঃ—বর্ত্তমান জগতে দুর্ব্বলের অহিংসনীতি ও শান্তিবাদ ইত্যাদিকে অধিকাংশ দেশ ও জাতিই অসামর্থের আচ্ছাদন মনে করে এবং সেই কারণে মর্য্যাদা দেয় না। চীনের যুদ্ধ অভিযানের সম্মুখে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার শোচনীয় ব্যর্থতার পর আমাদের নীতিবাদ ইত্যাদিকে জগতের অধিকাংশ দেশই ভিন্ন চক্ষে দেখিতেছে। সে-কারণে সভ্যজগতে আজ আমাদের স্থান পূর্ব্বেকার মত উচ্চে নাই, ইহা আমাদের বুঝা উচিত এবং এই মর্য্যাদা-হানির ফল আমাদের পক্ষে কিরূপ ক্ষতিকারক হইয়াছে তাহাও আমাদের "খোলা চোখে" অবধারণ করা উচিত।

তৃতীয়তঃ—পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার মানবত্ব-বিরোধী ও মনুষ্যজগতের সকল কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও ন্যায়ধর্ম্মের পরিপন্থী, ইহা ধ্রুব সত্য। কিন্তু ইহাও সত্য যে, জগতে যতদিন হিংসাদ্বেষ, সাম্রাজ্য-লালসা ও ক্ষমতালোলুপতা থাকিবে, ততদিন এই পাপকলুষপূর্ণ মনুষ্যজগতের উপর বিধাতার চরম অভিশাপরূপে এই সভ্যতা ধ্বংসকারী অস্ত্রের ভয়ও থাকিবে। এবং সর্ব্বোপরি ইহাও কঠোর ও নির্ম্মম সত্য যে, এই অস্ত্রের অধিকারী যদি মানবত্ব বা ন্যায়ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য হয় তবে তাহাকে ঐ অস্ত্রপ্রয়োগ হইতে নিরস্ত করার একমাত্র উপায় ঐ অস্ত্র দ্বারাই প্রতিঘাতের অবশ্য-সম্ভাবতা প্রদর্শন করা।

এবং সবশেষে : ইহা সুস্পষ্টভাবে জানা প্রয়োজন যে, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সব কিছুই কঠিন ও কর্কশ বাস্তবের পর্য্যায়ে পড়ে। সুতরাং সেগুলির বিচার বাস্তবমুখী হওয়া নিতান্তই প্রয়োজন, কেননা, প্রতিরক্ষায় ভাবাবিষ্ট হওয়া মারাত্মক ভুল।

অবনীনাথ মিত্র

বিগত ১১ই নবেম্বর রাত্রে একটি কর্ম্মময় জীবনের অবসান হয়। বাঙ্গালী সাধারণজনের জীবনে, বিশেষে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারের সন্তানের জীবনে, ব্যর্থতার অভিশাপ আনয়ন করে যে সকল কারণ,, সে সকল কারণের প্রতিকার যে কতদূর সম্ভব, এই কর্ম্মময় জীবনটি ছিল তাহার

উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সাধারণ বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত পরিবারের সীমাবদ্ধ অর্থসঙ্গতি, উচ্চশিক্ষায় অপারগতা এবং যে সকল সুযোগ-সুবিধার দ্বারা বাঙ্গালী সাংসারিক উন্নতি সাধারণতঃ করে, সে সকলেরই অভাব ছিল অবনীনাথের কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভকালে। তবে তাঁহার ছিল দৃঢ়চিত্ত, আত্মনির্ভর ও অসাধারণ কর্ম্মলিপ্সা এবং ঐ সকল গুণের বশে তিনি সকল বাধা অতিক্রম করিয়া জীবন-সংগ্রামে সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন।

স্বদেশীযুগে বাঙ্গালীকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য রবীন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন, "এবার তোর মরা গাঙ্গে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাসা তরী।" সেই সঙ্গেই ছিল বাঙ্গালী জীবনের নিদারুণ ব্যর্থতার চিত্র—"দিনে দিনে বাড়্‌লো দেনা, করলি নাকো বেচা কেনা, হাতে নাইরে কড়ার কড়ি। ওরে, ঘাটে বাঁধা দিন গেলোরে, মুখ দেখাবি কেমন করে? দে, খুলে দে, পাল তুলে দে, যা হয় হবে বাঁচি মরি"।

অবনীনাথের কৈশোরের কিছুদিন কেটেছিল শান্তিনিকেতনে। হয়তো কবিগুরুর জাগরণের গান তাঁহার মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছিল এবং সেই কারণেই অন্যান্য অল্প-সম্বল বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সন্তানের মত নৌকা ঘাটে বাঁধিয়া ও কপাল চাপড়াইয়া জীবনের পথে দৈবের মুখ চাহিয়া চলার বদলে তিনি নিজের শক্তি সামর্থ ও উদ্যমের উপর নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন।

মহাকবি শেক্সপিয়র বলিয়া গিয়াছেন—

"There is a tide in the affairs of men,
Which, taken at the flood, leads on to fortune;
Omitted, all the voyage of their life
Is bound in shallows and in miseries."

"মানুষের জীবনযাত্রায় জোয়ার আসে, সেই ভরা জোয়ারে তরী বাহিলে সৌভাগ্যের লক্ষ্যে পৌছানো যায়; হারাইলে, (সে সুযোগ) জীবনতরীর সমস্ত যাত্রাই কাটে দুঃখে, মরা গাঙ্গে আটকা পড়িয়া।" অবনীনাথের জীবনের জোয়ার আসে বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের স্থাপনার কালে। তিনি পাঞ্জাবে বিস্কুট তৈয়ারী করা শিখিয়া ১৯০৮ সালে ফিরেন এবং অদম্য উৎসাহে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে এখানে বিস্কুটের কারখানা চালাইতে থাকেন। সেই সঙ্গে হাতের কাছে যে কোন কাজ আসিত, অর্থাগমের জন্য উদয়াস্ত খাটি কাজ করিতে তিনি চেষ্টিত হইতেন—যদি বুঝিতে কাজ তাঁহার যত্ন ও উদ্যমে সিদ্ধ হইতে পারে।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ছিলেন তাঁহার পিসতুতো বসু-বিজ্ঞান মন্দির স্থাপনার সময় আচার্য্য জগদী চাহিয়াছিলেন যে শুধু নামে নয়, আকারে প্রকা সৌষ্ঠবে উহা মন্দির তুল্যই হয়। তাঁহার সেই কল্পনা রূপায়ন সাধারণ ঠিকাদারের সাধ্য নয় এবং ইঞ্জিনীয়ারও প্রতিপদে নির্দ্দেশ না পাইলে ইহা সমর্থ হইবে না তিনি বুঝিয়াছিলেন। সেই কারণে বহু বয়ঃকনিষ্ঠ এই মামাতো ভাইকে তিনি নিয়োগ ক এই কাজে—তাঁহার উদ্যম ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ক্ষমতা দে —১৯১৭ সালে। সেইদিন হইতে জীবনের প্রায় শেষ পর্য্যন্ত তিনি বসু-বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিটি ইট-পাথর কড়ি বর্গাকে, প্রত্যেকটি লতাগুল্ম বৃক্ষকে, নিজের দেহের অং জ্ঞানে, পরম যত্নে রক্ষণাবেক্ষণে চেষ্টিত ছিলেন। নিদারু Perierhpial neuritis রোগে হাত পা অবশ ও অকর্ম্মণ্য হইবার পর তিনি বসু-বিজ্ঞান মন্দিরের কর্ম্ম-সচিবের পদত্যাগ করেন। তবে গভর্নিংবডি ও কাউন্সিলে তিনি ছিলেন এবং বিশেষ অসুস্থ না হইলে প্রত্যহ বিজ্ঞান মন্দিরে যাইতেন।

বন্ধুগোষ্ঠীর মধ্যে তিনি রসিক, সহৃদয় স্বচ্ছ ও সরল চিত্ত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। বহু সাহিত্যিক ও অন্য খ্যাতিপন্ন ব্যক্তি "চানুদা"কে চিনিতেন এবং সকলেই ছিলেন তাঁহার গুণমুগ্ধ। জীবনের শেষ কয় বৎসর ঐ নিদারুণ রোগে—যাহার কারণ নির্ণয় ও প্রতিকার এদেশের প্রসিদ্ধতম চিকিৎসক বা চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান, মায় ভেলোরের মার্কিন হাসপাতাল, করিতে পারে নাই—তাঁহার হাত পা ধীরে ধীরে অবশ হইতে থাকে। মৃত্যু পলে পলে অগ্রসর হইতেছে, দেহের যন্ত্রণাও দিবারাত্র চলিতেছে। এই অবস্থাতেও তিনি হাসি-কৌতুকের ঢেউ ছুটাইতেন বন্ধু সমাজে মিলিত-হইয়া, সে যেন মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া যমকে পরিহাস করার জন্য। কি অদম্য জীবনীশক্তি কি অসম্ভব দৃঢ়চিত্ত ছিল আমাদের এই প্রিয় বন্ধুর, সে কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার চিরশান্তির প্রার্থনা জানাই।

সুরের আসরে দুর্ঘটনা

সুরকার ও সঙ্গতকারের সহযোগিতায় আসরে অপূর্ব আনন্দময় রসসৃষ্টি হয়ে থাকে। তেমনি আবার অনেক অপ্রীতিকর ও নাটকীয় ঘটনা ঘটে গেছে সুরের আসরে। এমন কি মারাত্মক দুর্ঘটনা পর্যন্ত। তিনটি আকস্মিক দুর্ঘটনার বৃত্তান্ত এখানে বর্ণনা করা হবে। সব ক'টিরই ঘটনাস্থল কলকাতা। তিনটি দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটে সঙ্গতকারের, এ এক লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য।

অবশ্য সব ক্ষেত্রেই যে রেষারেষির ফলে মৃত্যু ঘটেছে, তা নয়। আকস্মিকভাবে হৃদ্-ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া কিংবা করোনারি থ্রম্বসিসের (সেকালে রোগের নির্ণয় এ নামে না হলেও) মতন কোন কারণে বাদকের মৃত্যু হয়েছে, মনে হয়। সেই তিনটি কাহিনী একে একে বিবৃত করা হবে।

(১) হীরা বুল্‌বুল্‌ ও গোলাম আব্বাস

উনিশ শতকের এক সুপ্রসিদ্ধা গায়িকা ছিলেন হীরা বুল্‌বুল্‌। অসামান্য কণ্ঠমাধুর্যের জন্যে বুলবুল শব্দটি তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় এবং সেই নামেই তিনি সুপরিচিতা ছিলেন সঙ্গীত-জগতে। সে আমলের গায়িকাদের মতন তিনিও ছিলেন বাঈ-শ্রেণীর এবং বিগত কালের অনেক সঙ্গীতনিপুণা বাঈজীদের মতন তিনি ধ্রুপদও গাইতেন। যেমন তাঁর পরবর্তীকালের শ্রীজান বাঈ এবং তাঁরও পরে গহরজান, আগ্রাওয়ালী মালকাজান প্রভৃতি ধ্রুপদ শুনিয়ে গেছেন আসরে। ধ্রুপদ গান তখন সঙ্গীতচর্চার ভিত্তি হিসেবে গণ্য হ'ত।

হীরা বুল্‌বুল উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কলকাতায় বিখ্যাত ছিলেন। সঙ্গীতক্ষেত্র ছাড়া আর একটি কারণেও হীরার জন্যে এক আন্দোলন হয়েছিল রাজধানীতে। এবিষয়ে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" গ্রন্থে জানিয়েছেন, "হীরা বুল্‌বুল্‌ নামে প্রসিদ্ধ বারাঙ্গণা তখন কলিকাতা সহরে বাস করিত। ঐ হীরা বুল্‌বুল্‌ একজন পশ্চিম দেশীয় স্ত্রীলোক ছিল। হীরা সহরের অনেক ধনী ও পদস্থ লোকের সহিত সংসৃষ্ট হইয়াছিল। অনুমান করি ১৮৫২ সালের শেষে বা ১৮৫৩ সালের প্রারম্ভে হীরা আপনার একটি পুত্রকে (নিজ গর্ভজাত কি পালিত, তাহা জানি না) তদানীন্তন হিন্দু কলেজে ভর্তি করিবার জন্য পাঠায়। ইহাতে বারাঙ্গণার পুত্রকে হিন্দু সন্তান বলিয়া কলেজে ভর্তি করা হইবে কি না, এই বিচার ওঠে।......এই বিষয় লইয়া তদানীন্তন এডুকেশন কাউন্সিল ও হিন্দু কলেজের ম্যানেজিং কমিটির মধ্যে মতভেদ ঘটে। সেই মতভেদ সত্বেও বালকটিকে ভর্তি করাতে দেশীয় হিন্দু ভদ্রলোকদিগের মধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দত্তপরিবারের সুবিখ্যাত বংশধর রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয় সেই আন্দোলনের সারথি হইয়া, এই ১৮৫৩ সালের শেষে বা ১৮৫৪ সালের প্রারম্ভে হিন্দু মেট্রপলিটান কলেজ নামে এক কলেজ স্থাপন করেন। সিন্দুরিয়াপটিস্থ সুপ্রসিদ্ধ গোপাল মল্লিকের বিশাল প্রাসাদে এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতঃপূর্বে কাপ্তেন ডি, এল, রিচার্ডসন এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি মহামতি (বীটন) বেথুন সাহেবের সহিত বিবাদ করিয়া গবর্নমেণ্টের শিক্ষা বিভাগ হইতে অপসৃত হইয়াছিলেন। রাজেন্দ্রবাবু তাঁহাকে ঐ কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন।"

এই হীরা বুল্‌বুলের গানের আসর সেবার বসেছিল শোভাবাজার রাজবাড়ীতে। তাঁর গানের সঙ্গে সঙ্গত করেন পাখোয়াজী গোলাম আব্বাস। সে আসরে দুর্ঘটনার কথা বলবার আগে গোলাম আব্বাসের একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। তখনকার স্বনামপ্রসিদ্ধ মৃদঙ্গ-বাদক গোলাম আব্বাস পশ্চিমা হলেও সুদীর্ঘকাল বাংলা দেশের সঙ্গীতক্ষেত্রে অবস্থান করেন। রামমোহন রায়

তাঁর ১৮২৮ খ্রীঃ স্থাপিত ব্রাহ্মসমাজে গোলাম আব্বাসকে নিযুক্ত করেছিলেন কৃষ্ণপ্রসাদ ও বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখ গায়কদের সঙ্গে সঙ্গত করবার জন্যে। পরে গোলাম আব্বাস সঙ্গতবিদ্যা শিক্ষা দেবার জন্যে কলকাতায় একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন বলেও জানা যায়।

হীরা বুল্‌বুল্‌ ও গোলাম আব্বাসের সেই শোভাবাজারের আসরে নিদারুণ দুর্ঘটনা ঘটে। বাজনা শেষ করবার পরেই সেখানে মৃত্যু হয় গোলাম আব্বাসের। কেন ও কিভাবে আসরে তাঁর আকস্মিক জীবনাবসান ঘটেছিল, তার দু'টি বিবরণ পাওয়া যায়। একটি জনশ্রুতি এবং আর একটি, সেকালের এক সঙ্গীতজ্ঞের লেখা বিবরণ। দু'টিই এখানে উল্লেখ করা হ'ল। মুখে মুখে প্রচলিত কাহিনীটি এইরকম শোনা যায়: সে আসরে হীরা বুল্‌বুলের গানের সঙ্গে পাখোয়াজ বাজাবার আমন্ত্রণ যখন গোলাম আব্বাস পেলেন, প্রথমে নাকি তিনি সম্মত হন নি। বাঈজীর গানের সঙ্গে সঙ্গত করলে তাঁর মর্যাদার হানি হবে, এমন মন্তব্য করেও উদ্যোক্তাদের আহ্বানে আসরে যোগ দেন শেষ পর্যন্ত। কিন্তু এই বিশেষ শ্রেণীর গায়িকার সম্বন্ধে তাঁর কটু মতামত হীরার কানে পৌঁছেছিল। তারই প্রতিক্রিয়ায় হীরা নাকি আসরে এমন কূট তাল নিয়ে ধ্রুপদ গেয়েছিলেন যে, প্রথমে গোলাম আব্বাস সঙ্গত করতে পারেন নি। পরে হীরা নিজের পায়ে ঠুকে সম দেখিয়ে দেওয়ায় সঙ্গত আরম্ভ করেন তিনি। এবং বাজনা শেষ হবার পরই এই প্রচণ্ড অপমানের জ্বালায় গোলাম আব্বাসের সেই আসরে মৃত্যু ঘটে।

গোলাম আব্বাসের মৃত্যুর অন্য এক কারণ জানা যায় মৃদঙ্গী গোপালচন্দ্র মল্লিকের বিবরণী থেকে।

মুরারিমোহন গুপ্তের শিষ্য গোপালচন্দ্রের কথা ... কেশবচন্দ্র মিত্রের প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। ...ন্দ্রর আর একটি পরিচয় ছিল—তিনি মনীষী ...পালের শ্বশুর। মল্লিক মহাশয়ের ওই বিবরণ ...ত নয়। তাঁর বোল্‌ ইত্যাদি সংগ্রহের খাতায়, সঙ্গীতজ্ঞদের নানা প্রসঙ্গ কথার এক স্থানে ...যে,—গোলাম আব্বাস পাখোয়াজী শোভাবাজার আসরে হীরা বুল্‌বুলের সঙ্গে বাজাবার পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর মৃত্যুর কারণ ...নেক গুজবের সৃষ্টি হয়, কিন্তু সেসব সত্য নয়। ...ই গোলাম আব্বাসের মৃত্যু হয়েছিল, ইত্যাদি। ...টি বিপরীত বিবরণের মধ্যে কোন্‌টি সঠিক বলা ...ন্যে দু'টি বৃত্তান্তই দেওয়া হ'ল, পাঠক পাঠিকাদের বিবেচনার জন্যে। লেখকের মনে হয়, গোপাল... মতামত সত্য হ'তে পারে। কিংবদন্তীটি মুখে মুখে ... কাহিনী বোধ হয়। কারণ পরে যে দুর্ঘটনার ... হবে তাতে দেখা যাবে যে, আধুনিককালেও এ... ঘটনাকে উপলক্ষ্য ক'রে কি রকম অলীক গুজ... হয়েছিল।

(২) দর্শন সিং

দ্বিতীয় দুর্ঘটনার স্থান হ'ল ১১ প্রেমচাঁদ ব... টপ্‌ খেয়াল-গায়ক লালচাঁদ বড়ালের বাড়ি। ... তখন স্বর্গত। তাঁর সঙ্গীতজ্ঞ পুত্রেরা যেসব ... আয়োজন করতেন, তারই একদিনের ঘটনা। ... উৎসব'-এর কোন দিনের কথা নয়, অন্য একটি আ...

১৯২৩-এর ডিসেম্বর কিংবা ১৯২৪ এর জানু... রাত্রে সেখানে জলসা বসেছে। উপস্থিত গায়ক... মধ্যে আছেন—ইন্দোরের বীণকার মজিদ খাঁ, ... গায়ক লছমীপ্রসাদ মিশ্র, সরোদবাদক হাফিজ ... তবলাবাদক দর্শন সিং প্রভৃতি।

রাত তখন দ্বিতীয় প্রহর। এবার হাফিজ... সরোদ বাজাবেন, তবলায় সঙ্গত করবেন দর্শন সিং... আলী সে-সময় সঙ্গীত জগতে ততখানি প্রসি... করেন নি। তিনি তখন যুবক, বয়স তিরিশের ... বেশি। খুব বিখ্যাত না হ'লেও, তাঁর অপূর্ব মিষ্ট... হাত এবং গুণপনার জন্যে তিনি সঙ্গীত মহলে ... হয়েছেন। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, তাঁকে কলকাতার ... রসিক সমাজে আসন নিতে অনেকখানি সাহায্য ক... বড়াল-ভ্রাতারা।

তবলিয়া দর্শন সিং-এর পরিচয় অন্ধ-গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে... প্রসঙ্গে দেওয়া হয়েছে। এই আসরের সময়ে তিনি কলকাতার সঙ্গীত-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সবিশেষ প্রসিদ্ধ। বয়স তখন ষাট পার হয়ে গেছে "সঙ্গীত সঙ্ঘ"র তবলা-শিক্ষক দর্শন সিং-এর।

সেদিন সিংজীর শরীর তেমন ভাল ছিল না। বাজাবেন কি না একথাও কেউ কেউ জিজ্ঞেস করেছিলেন। বাজাতে রাজি হন তিনি হাফিজ আলীর সঙ্গে, শ্রোতাদের খানিক আনন্দ দেবার কথায়।

হাফিজ আলীর সরোদের সঙ্গে তাঁর তবলা বাজনা আরম্ভ হ'ল। প্রথম দুর্ঘটনার কিংবদন্তীর মতন এখানে কোন কারণ অবশ্য দেখা দেয় নি। অর্থাৎ দুই গুণীর মধ্যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব ছিল না। সুতরাং বাজনা

ই। খাঁ সাহেবের সুমিষ্ট সুরলহরীর সঙ্গে দর্শন
াণ সঙ্গত" আসরের সকলে বেশ উপভোগ করতে
বাজনা চলল প্রায় এক ঘণ্টা।
র যথারীতি তাঁদের অনুষ্ঠান শেষ হ'ল। হাফিজ
টি তেহাই দিলেন এবং তবলাতেও একটি জবাবী
রে উপসংহার করলেন সিংজী।
ূর্তেই বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। দর্শন সিং তবলায়
িয়েই অকস্মাৎ ঢলে পড়লেন। তাঁর একপাশে
ন লছমীপ্রসাদ, অন্যদিকে রাইচাঁদ বড়াল।
তাঁর ওপর হেলে পড়তে আচমকা ভয় পেয়ে
াদ তাঁকে ঠেলে দিলেন রাইবাবুর দিকে। দর্শন
দেহ রাইবাবুর কোলে ঢলে পড়ল—বাক্যহীন,
ীন। সেই মুহূর্তে লছমীপ্রসাদ বা রাইবাবু বা
অন্য কেউ ভাবতেই পারেন নি যে, দর্শন সিং
লোকে নেই! এ যে অভাবিত ব্যাপার। যে সময়
ক ঘণ্টা তবলা বাজালেন প্রেমের সঙ্গে এবং যে
লয়ও এমন কিছু দ্রুত ছিল না, তিনি তেহাই
পরই মৃত্যুমুখে পড়বেন, এমন ধারণা করা কারও
সম্ভব হয় নি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সকলে বুঝতে পারলেন সেই
দুর্ঘটনার কথা। আসরে হুলুস্থুল পড়ে গেল।
নিয়ে আসা হ'তে তিনি পরীক্ষা করে জানালেন যে,
ংয়ের ইতিপূর্বেই মৃত্যু ঘটেছে।

াপারটি অতিশয় দুঃখের। কিন্তু দর্শন সিংয়ের দিক
দখলে বলা যায়—শিল্পীর আদর্শ মৃত্যু! সঙ্গীতের
ব'সে সঙ্গীত সাধকরূপে আপনার কর্তব্য জীবনের
হূর্ত পর্যন্ত সজ্ঞানে মাত্রায় মাত্রায় পালন করে ইহ
থকে তিনি বিদায় নিলেন। সঙ্গীতশিল্পীর পক্ষে
র কাম্য মৃত্যু আর কি হ'তে পারে?

আকস্মিক দুর্ঘটনার কথা কিন্তু গুজব-বিলাসীদের
ল্লবিত হয়ে একটি মুখরোচক কাহিনীতে পরিণত
সেই অলীক কিংবদন্তী এখনও কোন কোন ব্যক্তির
োনা যায়: যুবক হাফিজ আলী বৃদ্ধ দর্শন সিংকে
জব্দ করবার জন্যে প্রচণ্ড দ্রুত লয়ে সেদিন বাজিয়ে-
এবং সেই দ্রুত সঙ্গত করতে গিয়ে প্রাণান্ত হয়
র, ইত্যাদি।

গুজব কলকাতার কোন কোন সঙ্গীত-মহলে এমন
লাভ করে যে, হাফিজ আলী আসরে বাজাবার
ঠেকা দেবার তবল্‌চি পেতেন না বেশ কিছুদিন।
মুজরো এসেছে, কিন্তু সঙ্গতীর অভাবে তিনি সে
আসরে যোগ দিতে পারতেন না। অনেক সময় তিনি
রাইচাঁদবাবুকে (ওস্তাদ মসিদ খাঁর শিষ্য) তাঁর সঙ্গে
বাজাতে অনুরোধ করতেন এবং এই ভাবে তাঁর মহ্‌ফিল্
সম্ভব হ'ত। এমন অকারণ 'বদনাম' রটেছিল সরোদী
হাফিজ আলী খাঁর।

(৩) দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য

নিখিলবঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন-এর প্রতিষ্ঠাতা, সঙ্গীতপ্রেমী ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের পাথুরিয়াঘাটার (৪৬) বাড়ীতে তৃতীয় দুর্ঘটনা ঘটে। ১৯৩৮ খ্রীঃ (১৩৪৫ সালের ২৪ আশ্বিন) তাঁর ভবনের দোতলার ঘরে সেদিন সন্ধ্যার পর গানের আসর বসেছে। উপস্থিত আছেন ধ্রুপদী গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ধ্রুপদী অমরনাথ ভট্টাচার্য, গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, কৃষ্ণচন্দ্র দে, নাটোর মহারাজা যোগীন্দ্রনাথ রায়, মৃদঙ্গাচার্য দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য, তবলাগুণী হীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, অযোধ্যা পাঠক প্রভৃতি। দুর্লভচন্দ্রের পরিচয় আগেই দেওয়া হয়েছে। সেদিনের আসরে তিনিই ছিলেন প্রধান সঙ্গতকার।

প্রথমে অমরনাথ ভট্টাচার্য, তারপর গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানের সঙ্গে বাজাবার পর দুর্লভচন্দ্র মধুর কণ্ঠ ধ্রুপদী ললিতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সঙ্গত আরম্ভ করলেন। ললিতচন্দ্র হলেন রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী-শিষ্য মহীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র এবং কণ্ঠ-মাধুর্যের জন্যে স্মরণীয় গায়কদের অন্যতম। ললিতচন্দ্র প্রথমে পিতার এবং পরে রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর শিক্ষায় সঙ্গীত-জীবন গঠিত করেন।

ললিতচন্দ্র প্রথমে সে আসরে গাইলেন চৌতালে 'হে আদি অন্ত!' দুর্লভচন্দ্র বাজালেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নিপুণ রীতিতে। আসর সুরে, মৃদঙ্গের মেঘমন্দ্রধ্বনিতে ভ'রে উঠল। ললিতবাবু তারপর ধরলেন সুর ফাঁকতালে দরবারী কানাড়া—'বাজত ঝাঁঝ মৃদঙ্গ।'

তাঁর মধুকণ্ঠের সঙ্গে দুর্লভচন্দ্রের পাখোয়াজ মিলে আসর তখন জমজমাট।

হঠাৎ, যাঁরা ভট্টাচার্য মহাশয়ের সামনে বসেছিলেন তাঁদের চোখে পড়ল—তিনি শুধু বাঁ-হাতে বাজাচ্ছেন। কিন্তু তাঁরা কেউ ভাবতে পারেন নি যে, দুর্লভচন্দ্রের ডান হাত তখন সম্পূর্ণ বিবশ হয়ে পড়েছে এবং সেজন্যেই তিনি কেবল বাঁ-হাতে ঠেকা দিচ্ছেন! তারপরই তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন একেবারে। ল পড়বার আগে জড়িতস্বরে শেষ কথা উচ্চারণ করেছিলেন—'বাজাও।'

অকস্মাৎ তাঁকে জ্ঞানহারা হয়ে লুটিয়ে পড়তে দেখে ললিতচন্দ্র বিমূঢ় হয়ে গান থামিয়ে ফেললেন। হায় হায় করে উঠলেন শোকবিহ্বল অনেক শ্রোতা। সুরের শান্ত আনন্দময় আসরে যেন বজ্রপাত হল। ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ তৎপর হয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের আনালেন অবিলম্বে। কোন কিছুরই ত্রুটি হ'ল না। কিন্তু দুর্লভচন্দ্রের জ্ঞান আর ফিরে এল না। সেখানেই ২৮ ঘণ্টা জ্ঞানশূন্য অবস্থায় থাকবার পর শেষ নিঃশ্বাস পড়ল তাঁর। জ্ঞানের শেষ ক্ষণ পর্যন্ত সঙ্গীত-সাধনায় নিমগ্ন থেকে ভট্টাচার্য মহাশয় অনন্ত সঙ্গীত-লোকে প্রয়াণ করলেন।

কৌকভ খাঁ ও কোকভ রাগ বা কুকুভা

ওস্তাদ কৌকভ খাঁ তখন কিছুদিন থেকে কলকাতায় বসবাস আরম্ভ করেছেন। কিন্তু ভালভাবে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ করেন নি এখানকার সঙ্গীত-সমাজে। পেশাদার তিনি, তাই প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত ব্যবসায়ীদের প্রচ্ছন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে দিয়ে তাঁকে নিজের আসন ক'রে নিতে হচ্ছে। জাতিতে পাঠান, স্বভাবে আফগানী ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতার অভাব নেই। নতুন ক্ষেত্র কঠোর পৌরুষে জয় ক'রে নেবার দুর্বার মনোভাব আছে। আর সেই সঙ্গে অসাধারণ রেওয়াজী তৈরি হাত। শিশুকাল থেকে পিতা নিয়ামৎউল্লার তালিম পেয়েছেন, জ্যেষ্ঠ করামৎউল্লার সঙ্গে রেওয়াজ করেছেন জুটিতে। শুধু তৈরির দিক থেকেই আসর মাৎ করতে পারেন। তার ওপর রীতিমত গুণী। তাই কলকাতার সঙ্গীত ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে স্থান করে নিচ্ছেন। এমন সময়কার এক আসরের কথা।

অবশ্য কৌকভ খাঁ প্রথম থেকেই কলকাতার সঙ্গীত-প্রেমী বাঙ্গালী ধনী সমাজের আনুকূল্য পেয়েছিলেন। তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসেন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কাশী থেকে। সে হ'ল ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের কথা। তখন তাঁর পশ্চিমাঞ্চলে যথেষ্ট খ্যাতি হয়েছে, উত্তর ভারতের প্রায় সব দরবারে গুণপনার পরিচয় দিয়েছেন তিনি। কিন্তু স্থায়ীভাবে কোথাও বসবাসের সুযোগ পান নি। প্রথম চাকুরি হয় তাঁর কলকাতায়, যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গীত-দরবারে।

তারও প্রায় ৬ বছর আগে, বর্তমান শতকের প্রারম্ভে, কৌকভ খাঁ এক মহা গৌরব অর্জন করেছিলেন। বিশ শতকের প্রথম বছরে ফ্রান্সের রাজধানীতে যে বিশ্ববিখ্যাত প্রদর্শনী (Paris Exhibition) হয়, সেখানে পৃথিবীর জাতিদের সামনে ভারতের নানা শিল্পকৃতির পরিচয় দেন পণ্ডিত মতিলাল নেহরু। সেজন্য পণ্ডিত মতিলাল ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিনিধিত্ব করবার যোগ্য নানা শ্রেণীর শিল্পী, কারুশিল্পী প্রভৃতি এমন কি মল্লবীর পর্যন্ত বহু ব্যয়ে সেখানে নিয়ে যান। সেই দলে সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে ছিলেন কৌকভ খাঁ ও তাঁর জ্যেষ্ঠ করামৎউল্লা খাঁ। একজন ধ্রুপদী ও সঙ্গতকারও ছিলেন তাঁদের সঙ্গে। সেই প্যারীস প্রদর্শনীর একদিনের সঙ্গীতের আসরে সরদ বাজিয়ে সমবেত ইউরোপীয় শ্রোতাদের কৌকভ খাঁ চমৎকৃত করে দেন। সকলে বিশেষ ক'রে উদ্দীপিত হয়েছিলেন তাঁর অতি দ্রুত লয়ে বাজনার জন্যে।

সেই দ্রুততার জন্যে কলকাতার আসরেও তিনি চমক সৃষ্টি করতেন। অত দুনে বাজালেও তাঁর হাতে থেকে কখনও বেসুর শোনা যেত না—তাঁর বাজনা অনেকবার শুনেছেন এমন বিচক্ষণ শ্রোতাদের এই মত। অবশ্য, শুধু দ্রুত লয়ে বাজানোই তাঁর প্রধান বা একমাত্র কৃতিত্ব ছিল না—দ্রুততা ত শুধু অভ্যাসের ব্যাপার, সঙ্গীতের রস-সৃষ্টিতে তা কখনই বড় জিনিষ নয়। সেই সঙ্গে তাঁর রাগ-বিস্তারের নৈপুণ্য, রাগরূপের শিল্পসম্মত উপস্থাপনা ইত্যাদিও ওস্তাদসুলভ ছিল। সরদ ও ব্যাঞ্জো বাদকরূপে আসরে যথার্থ গুণী ও শিল্পী সত্তারই প্রকাশ করতেন তিনি।

তাঁর যে আসরে সেদিন বাজনার কথা এখানে বলা হবে, তা হ'ল ওয়েলেসলি ষ্ট্রীটের মহিষাদল রাজপরিবারের ভবন। কৌকভ খাঁ তখন কলকাতার সঙ্গীতজগতে উদীয়মান কলাবত, তাই সে আসরের শ্রোতারা তাঁর গুণের পরিচয় পাবার জন্যে উৎসুক ছিলেন। কয়েকজন পেশাদার সঙ্গীতজ্ঞও আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন, খাঁ সাহেবের গুণপনা সাক্ষাৎ জানতে।

এই আসরের আগে কোন কোন জলসায় এমন হয়েছে যে, কৌকভ খাঁ সুযোগ পেলে এখানকার গায়ক বা বাদককে অপদস্থ করেছেন। অন্য সঙ্গীতজ্ঞের ওপর নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা ক'রে আসরকে প্রভাবিত করতে চেয়েছেন বৃহত্তর সঙ্গীতক্ষেত্রে প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্যে। হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল মশায়ের সঙ্গীতসভার আসরে তাঁর সঙ্গীতগুরু নন্দ দীঘল সেতারীর সঙ্গে বচসা করেছেন তিলক কামোদ রাগের বিস্তারের পদ্ধতি নিয়ে। নন্দ দীঘল অপমানিত হয়েছেন। এ পর্যন্ত যাঁরা খাঁ সাহেবকে আসরে দেখেছেন তাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে তিনি রীতিমত দাপটওয়ালা লোক। তাঁর ধাতুতে একটা আক্রমণাত্মক ভাব আছে যা তিনি প্রয়োজন বোধ করলেই প্রকট করতে পারেন।

কিন্তু এদিনের আসরে, ওয়েলেসলির মহিষাদল ভবনে, খাঁ সাহেবের যুদ্ধবিলাসী মনের আর একরকম প্রকাশ দেখা গেল। এখানেও তিনি সহ-সঙ্গীতজ্ঞদের ভীষণভাবে এক হাত নিলেন, কিন্তু সে আক্রমণের পদ্ধতি বিচিত্র। তা যেমন রসিক, তেমনি তীব্র মর্মভেদী।

আসরে তিনি সচরাচর মাথায় পাগড়ি চড়িয়ে দরবারী সাজে বাজাতে বসতেন। এখানেও তেমনি মুরেঠা শোভিত হয়ে সরদ যন্ত্রটি স্বর মিলিয়ে নিলেন কোলে রেখে। আসরে কলকাতার কয়েকজন নামকরা গায়ক-বাদক ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন হলেন বিখ্যাত ধ্রুপদী গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কোকভ খাঁ যন্ত্রে ঝঙ্কার তুলে আলাপচারী আরম্ভ করলেন। যে রাগটি তিনি বাজাতে লাগলেন, তা তেমন প্রচলিত ছিল না। (এবং এখনও প্রায় অপ্রচলিত)। রাগের নাম কোকভ বা কুকুভা। এটি বিলাবল ঠাটের অন্তর্গত, সম্পূর্ণ জাতি। বাদী মধ্যম, সম্বাদী ষড়জ। উত্তরাঙ্গ প্রধান, অর্থাৎ তারা গ্রামে স্বরবিহার বেশি। দু'টি নিষাদেরই ব্যবহার হয়, বাকি স্বর শুদ্ধ। ঝিঁঝিট ও আলাহিয়ার মিশ্রণে কোকভ বা কুকুভা গঠিত। এ রাগের এই ধ্যান পাওয়া যায়—

> সুপোধিতাঙ্গী রতি মাণ্ডতাঙ্গী
> চন্দ্রাননা চম্পকদামযুক্তা।
> কটাক্ষিণী স্যাৎ পরমা-বিচিত্রা
> দানেন যুক্তা কুকুভা মনোজ্ঞা॥

খাঁ সাহেব এ রাগ কেন নির্বাচন করেছিলেন বলা যায় না। হয়ত কলকাতার আসরে অপ্রচলিত ও অপরিচিত হবে মনে ক'রে এবং নিজের নামের সঙ্গে সাদৃশ্যের জন্যেও বোধহয় আকর্ষণ বোধ ক'রে। যা হোক, খানিকক্ষণ আলাপ করবার পর বাজনা থামিয়ে যেন শিষ্টাচার বশে কাছাকাছি গুণীদের উদ্দেশে নিজের ভাষায় জিজ্ঞেস করলেন—কেমন, ঠিক হচ্ছে ত?

তাঁদের প্রত্যেককে আলাদা ভাবে সবিনয়ে ওই প্রশ্ন তিনি করলেন—কেমন লাগছে আপনার? রাগ ঠিক আছে ত?

যাঁদের কাছে জানতে চাইলেন, তাঁরা সকলেই জানালেন যে, হ্যাঁ, চমৎকার হচ্ছে, সব ঠিক আছে।

তাঁরা হয়ত অতশত ভেবে বলেন নি। সভার মধ্যে যেমন ভদ্রতা, সৌজন্য দেখাতে হয় সেইভাবেও বলতে পারেন, বলা যায় না সঠিক। তবে হিন্দুর ভদ্রতার সুযোগ রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতিতে যেমন বিদেশীরা বরাবর নিয়েছে, কোকভ খাঁ তেমনি সঙ্গীতের আসরেও নিলেন।

কিন্তু গোপাল বন্দোপাধ্যায় মশায়কে যখন কোকভ খাঁ ওইভাবে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি সম্মতি জানালেন না। গম্ভীর মুখে নিরুত্তর রইলেন। খাঁ সাহেবের কথার কোন জবাব না দেওয়ায় তাঁর আচরণ অনেকের কাছে ভাল লাগল না। অসৌজন্য প্রকাশ পেলে যেন। যাঁরা প্রশংসা করেছিলেন, তাঁদের ব্যবহার বড় ভদ্র মনে হ'ল। কিন্তু বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়ের ওইরকম স্বভাব ছিল, কি করবেন তিনি? যা মনোমত হয় নি তাকে সুখ্যাতি জানাতে পারতেন না। এজন্যে অনেক জায়গায় অপ্রিয় হতেন, জনপ্রিয় হ'তে পারতেন না কখনও। পছন্দ-অপছন্দ, শাদা কালো সত্য-মিথ্যা তাঁর কাছে সুস্পষ্ট ছিল, কখনও মিলে-মিশে একাকার হয়ে যেত না। বিবেক বিসর্জন দিয়ে সকলের প্রিয় হবার দিকে লক্ষ্য ছিল না তাঁর। যেমন খাড়া বসে থাকতেন, তেমনি রইলেন।

বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়ের উত্তরের আশায় খানিক অপেক্ষা ক'রে খাঁ সাহেব তাঁর বোমা বিস্ফোরণ করলেন। মারাত্মক শ্লেষের সঙ্গে বললেন—উও ত 'ড়ুম্' হায়! (ও ত লেজ!)

অর্থাৎ তিনি এতক্ষণ রাগের লেজ বা শেষাংশটি বাজিয়েছেন। রাগের পদ্ধতিগত সম্পূর্ণ রূপ এমন নয়।

যাঁরা সুখ্যাতি করেছেন, তাঁরা এই রাগের বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ। নির্বোধ প্রতিপন্ন করেছেন তাঁরা নিজেদের।

কোকভ খাঁর কথায় তাঁদের মাথা হেঁট হয়ে গেল। উঁচু মাথা রইল শুধু গোপালবাবুর।

মুচকি হেসে তারপর খাঁ সাহেব জানালেন যে, এইবার তিনি যথার্থ রীতিসম্মত রাগালাপ করবেন, সকলে শুনুন।

এই ব'লে বাজনা আরম্ভ করলেন।

বসন্তের সেই গানটি

কোন কোন গুণীর বেশি প্রিয় থাকে একটি বা কয়েকটি রাগ। সেই সব রাগ তাঁরা গভীরভাবে সাধনা করেন, তাদের প্রগাঢ় রহস্য আর সৌন্দর্যের সন্ধান ও আস্বাদন করেন নিত্য নতুন ক'রে। অন্তরঙ্গ অনুশীলনের ফলে রাগগুলির রূপ-বিস্তারে তাঁরা অনন্য অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হন। তখন বলা যায়, তিনি সেই রাগে সিদ্ধ। তাঁর মতন ক'রে সেই রাগ যেন অনেকেই ফোটাতে পারেন না। সেই রাগ আর কারও গলায় বা বাজনায় বুঝি তেমনটি আর শোনা যায় না।

এমনিভাবে অনেক গুণীর একটি-দু'টি রাগে সিদ্ধিলাভের কথা জানা যায়। সেই সব রাগের সঙ্গে তাঁদের সাধকদের নামের স্মৃতিও অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে আছে। যথা, ধ্রুপদী মুরাদ আলী খাঁর মালকোষ ও ইমন। বীণ্‌কার-রবাবী সাদিক আলী খাঁর শুদ্ধ কল্যাণ, ইমন কল্যাণ ও দরবারী কানাড়া। ধ্রুপদী যদু ভট্টের দরবারী কানাড়া। সুরবাহার-সেতারী ইমদাদ খাঁর পুরিয়া। ধ্রুপদী গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের ভৈরব। অঘোরনাথ চক্রবর্তীর ভৈরবী। সুরশৃঙ্গারবাদক প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাগেশ্বরী ও দরবারী কানাড়া। খেয়াল-গায়ক বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কামোদ। রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর দরবারী কানাড়া। ধ্রুপদী মহীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কেদারা। ধ্রুপদী ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরট ও ধুরিয়া মল্লার। ধ্রুপদী গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছায়ানট, ইত্যাদি।

তেমনি ধ্রুপদী হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বসন্ত। এন্টালীর মধুকণ্ঠ গায়ক হরিনাথের বসন্ত রাগের গান একটি শোনবার বস্তু ছিল। একে ত তাঁর কণ্ঠে হৃদয়স্পর্শী জোয়ারি—অমন জোয়ারিদার গলা খুব কম গায়কদেরই শোনা গেছে—তার ওপর তাঁর সাধা বসন্ত রাগের হিল্লোল। 'মাধব মাধব মাধব' উত্তরাঙ্গ প্রধান বসন্তের এই গানখানি যখন তিনি অপরূপ সুরেলা কণ্ঠে তদ্‌গত চিত্তে গাইতেন, আসরে উদ্দীপনার সঞ্চার হ'ত। এমন কোন আসর নেই যা' তিনি এই গানে মাতিয়ে দিতেন না। 'শঙ্কর উৎসব'-এর মতন বড় প্রকাশ্য জলসা থেকে আরম্ভ করে অনেক ঘরোয়া আসরে সমস্ত বসন্ত গাইতে তিনি অনুরুদ্ধ হ'তেন আর মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রাখতেন শ্রোতাদের।

এই গানটির প্রসঙ্গে নাটোর মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের কথা এসে পড়ে। সেকথা বলবার আগে হরিনাথের সঙ্গীত-জীবনের কিছু পরিচয় জেনে রাখা যায়।

বাংলার যে গুণীদের নাম কণ্ঠমাধুর্যের জন্যে অমর হয়ে থাকবার যোগ্য, বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট একজন। কিন্তু আত্মপ্রচারে একান্ত বিমুখতার জন্যে তাঁর গুণের উপযুক্ত খ্যাতি তাঁর হয় নি, যদিও অতি নিষ্ঠাবান সঙ্গীতসাধক ছিলেন। গ্রামোফোন কম্পানী একাধিকবার আমন্ত্রিত হয়েও সম্মত হন নি রেকর্ড করতে। নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনের এলাহাবাদ অধিবেশনে যোগ দিতে অনুরুদ্ধ হয়েও যান নি, দলাদলি এড়াবার জন্যে। অতি নির্বিরোধী, শান্তিপ্রিয় মানুষ। পরনিন্দা কোথাও হ'তে আরম্ভ হ'লে সেখান থেকে উঠে যেতেন, এমন চরিত্র বাংলা দেশে দুর্লভ!

শঙ্কর উৎসব প্রভৃতি অপেশাদার বার্ষিক জলসা ছাড়া কয়েকটি মাত্র ঘনিষ্ঠ বাড়ীর ঘরোয়া আসরেই বেশি গাইতেন তিনি। কলকাতার অন্য অনেক আসরেও কখনও কখনও গেয়েছেন এবং তখনকার সঙ্গীতরসিক ও গুণীরা তাঁর গুণপনার পরিচয় পেয়েছেন। স্বনামধন্য অঘোরনাথ চক্রবর্তী তাঁকে কৌতুক ক'রে এক একদিন বলতেন, 'তোর গলাটা আমায় দিতে পারিস্‌?' কিংবা 'তোর মতন গলা যদি পেতাম!' সরদী হাফিজ আলী খাঁ তাঁর গান শুনে বলেন, 'এমন সুরেলা গলা সারা ভারতে খুব কম শুনেছি।'

যে সব ঘরোয়া আসরে তাঁর গান বেশি হ'ত, তাদের মধ্যে উল্লেখ্য হ'ল—এল্‌গিন রোডের নাটোর ভবন, লালচাঁদ বড়ালের বাড়ী এন্টালীর দেব লেনের দেব-গৃহ প্রভৃতি। এন্টালীর এই দেব-পরিবারে গৃহ ছিল এ অঞ্চলে উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীতচর্চার প্রধান কেন্দ্র। এ বংশের ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দেব বিখ্যাত গায়ক গোপালচন্দ্র চক্রবর্তীর শিষ্য ছিলেন এবং রীতিমত সঙ্গীতচর্চা করতেন। এ পরিবারের আর এক ব্যক্তি, উপেন্দ্রনারায়ণ দেব এমন সঙ্গীতপ্রেমী ও সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন যে, ভারতের কোন গুণী কলকাতায় এলে তাঁর গান, বাজনার অনুষ্ঠান এ বাড়ীতে করতেনই, তা যত ব্যয়সাধ্যই হোক। এখানে আগমন ঘটে নি, এমন ওস্তাদ কমই ছিলেন। যারা এ বাড়ীর আসরে বেশিবার যোগ দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে নাম করা যায় রমজান খাঁ, বিশ্বনাথ রাও, অঘোরনাথ চক্রবর্তী, আলাউদ্দীন ও হাফিজ আলী খাঁ, লালচাঁদ বড়াল প্রভৃতির। গ্রামোফোন রেকর্ড তৈরির আগেকার যুগে এই পরিবারের উদ্যোগে গায়কদের মোমের চোঙায় ঘরোয়া রেকর্ড হয়েছিল। সেই সব ব্যক্তিগত রেকর্ডে লালচাঁদ বড়াল, হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির গান ধরা ছিল, কিন্তু পরে নষ্ট হয়ে যায়। সঙ্গীত ও সঙ্গীতজ্ঞদের এমনি নানা পৃষ্ঠপোষকতার জন্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন এন্টালীর এই দেব-পরিবার।

হরিনাথের সঙ্গীত শিক্ষা ও সঙ্গীতচর্চাও দেব-গৃহের জন্যে সম্ভব হয়েছিল। ছেলেবেলা থেকেই তিনি স্বভাব সুকণ্ঠ ছিলেন এবং গান শিক্ষা করতেন শুনে শুনে। তাঁর বাড়ীও দেব লেনে। নিকট প্রতিবেশী হওয়ায় স্কুলজীবন থেকেই দেব-বাড়ীর সঙ্গীতের আসরে নানা গুণীর গান শুনে সঙ্গীতে আরও আকৃষ্ট হন। এ বাড়ীর ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দেবের গান শুনে তিনি গাইতেন। একদিন এ বাড়ীর নীচের তলায় বসে তিনি গান গাইছেন, এমন সময় ব্রজেন্দ্রনারায়ণ ওপর থেকে তা শুনে হরিনাথের প্রতিভার পরিচয় পান এবং রীতিমত শেখাতে চান তাঁকে। এইভাবে

হরিনাথের গান শিক্ষা আরম্ভ হয়। নিয়মিত রেওয়াজও তিনি করতেন দেব-পরিবারেরই এণ্টালীর একটি বাগান-বাড়ীতে।

ছ'-সাত বছর তাঁকে গান শেখাবার পর ব্রজেন্দ্র-নারায়ণের মৃত্যু হয়। তার পর হরিনাথ অঘোরনাথ চক্রবর্তীর কাছে ক'বছর শিক্ষার সুযোগ পান, এই পরিবারেরই আনুকূল্যে। চক্রবর্তী মশায় মাঝে মাঝে দেব-বাড়ীতে গান উপলক্ষ্যে বাস ক'রে যেতেন। সেই সময় তাঁর কাছে শিখতেন হরিনাথ।

পরে তাঁর চাকুরিজীবন আরম্ভ হয়, কিন্তু সঙ্গীতচর্চা অব্যাহত ভাবেই চলে। সঙ্গীতকে সেকালের অনেক বাঙালী সঙ্গীতসাধকের মতন তিনি জীবিকারূপে নেন নি বটে, কিন্তু সঙ্গীতে তাঁর নিষ্ঠা ও নৈপুণ্য ছিল পেশাদার ওস্তাদদেরই সগোত্র। ভুবন মিত্র নামে তাঁর একজন শিষ্য ছিলেন। দেব-বাড়ীর সুরেন্দ্রনারায়ণকেও তিনি সঙ্গীত শিক্ষা দেন। কিন্তু দক্ষিণা নেন নি কখনও। সৌখীন সঙ্গীতজ্ঞই শেষ পর্যন্ত থাকেন। এই হ'ল তাঁর সঙ্গীত সাধনার ইতিবৃত্ত।

বসন্ত রাগে তাঁর সিদ্ধির কথা নিয়ে এ প্রসঙ্গ আরম্ভ করা হয়েছিল। তেমনি ভৈরবীতেও সিদ্ধ ছিলেন তিনি। তবে বসন্তের জন্যেই আসরে তাঁর সমাদর ছিল বেশী।

আগেও বলা হয়েছে, তাঁর গুণগ্রাহীদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট ছিলেন জগদিন্দ্রনাথ রায়। নাটোর মহারাজ অনেক গুণের আধার। একদিকে তিনি যেমন ক্রিকেট ক্রীড়া-মোদী, অন্যদিকে তেমনি সাহিত্যিক ও সাহিত্য-রসিক। আবার সেই সঙ্গে শুধু সঙ্গীতপ্রেমী বা সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক নন, নিজে সঙ্গীতজ্ঞও। সঙ্গতকার ছিলেন, পাখোয়াজ বাজাতেন। পাখোয়াজ শিখেছিলেন মৃদঙ্গী গিরীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। নিজের বাড়ীর কিংবা ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবদের ঘরোয়া আসরে পাখোয়াজ বাজাতেন। সঙ্গীতের সভায় একজন রসজ্ঞ সমঝদার ছিলেন জগদিন্দ্রনাথ।

হরিবাবুর গানের একজন মুগ্ধ শ্রোতা তিনি। কতবার বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়কে নিজের বাড়ীর আসরে আমন্ত্রণ করেছেন, তাঁর গান শুনেছেন। তাঁর গানের সঙ্গে বাজিয়ে-ছেনও কোন কোন দিন। বিশেষ করে, হরিবাবুর বসন্ত রাগের ওই গানখানি শুনতে তিনি ভালবাসতেন। কতবার ফরমায়েস ক'রে শুনেছেন—'বসন্তের সেই গানটি।' তাঁর আগ্রহে গানটি গেয়ে গায়কও বড় তৃপ্তি পেতেন।

ওই গানখানি জগদিন্দ্রনাথের এত প্রিয় হয়ে পড়ে যে, পরে আর তার সুরের নাম কিংবা ভাষাটাও বলবার দরকার বোধ করতেন না। শুধু বলতেন, সেই গানটি। আর হরিবাবু বসন্ত রাগে গাইতেন—মাধব মাধব মাধব।

জগদিন্দ্রনাথের যাঁরা অন্তরঙ্গ, তাঁরাও জানতেন হরি-বাবুর ওই গানখানি তাঁর কত প্রিয়—এতবার তাঁর অনুরোধে গানটি গেয়েছেন হরিবাবু।

আকস্মিক দুর্ঘটনায় জগদিন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। গড়ের মাঠে সকালবেলা বেড়াবার সময় একদিন মোটরের ধাক্কায় জীবনান্ত ঘটে তাঁর। আত্মীয়স্বজন থেকে আরম্ভ করে কলকাতার সাহিত্যিক সমাজ, সঙ্গীতজ্ঞ মহলেও এই বেদনা-দায়ক ঘটনা গভীর শোকের ছায়া ফেলে।

অনেক জ্ঞানীগুণীদের যে তিনি শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, তার পরিচয় পাওয়া গেল তাঁর শ্রাদ্ধবাসরে, তাঁদের উপস্থিতিতে। তিনি আর ইহলোকে নেই, কিন্তু তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর গৃহের শ্রাদ্ধসভায় তাঁরা সমবেত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন সঙ্গীতজ্ঞ আছেন, বিশেষ হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

খানিকক্ষণ পরে অন্দর মহল থেকে লোক মারফৎ হরি-বাবুর কাছে অনুরোধ এল—'সেই গানটি' তিনি যেন একবার শোনান।

'সেই গানটি' যিনি শুনতে এত ভালবাসতেন, তাঁর এই শ্রাদ্ধ-বাসরের শোক-গম্ভীর পরিবেশে গানখানি গাওয়া সময়োচিত স্মৃতিতর্পণই হ'ল।

বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় গাইতে আরম্ভ করলেন—মাধব মাধব মাধব···

সেই প্রাণস্পর্শী সুরে তেমনি গভীর দরদ দিয়ে তিনি গাইতে লাগলেন। জগদিন্দ্রনাথের আত্মা যেন সেখানে সমুপস্থিত, সভার সকলে যেন তাঁর স্নিগ্ধ-মধুর ব্যক্তিত্ব অন্তরে অনুভব করছেন, এমন আবহ সৃষ্টি হ'ল তাঁর গানে।

সকলের মনে হ'ল যেন কোন অদৃশ্য লোক থেকে আজও জগদিন্দ্রনাথ তাঁর সেই বসন্তের প্রিয় গানটি হরিবাবুর কণ্ঠে শুনছেন—

মাধব মাধব মাধব
মদন মথন মধুসূদন,
মনমোহন মদন জনক
মুকুন্দ মুরলিধর মুরারে।
মায়াপতি ভক্ত বৎসল হরে॥

বিশ্বামিত্র

চাণক্য সেন

।। বার ।।

হরিশংকর ত্রিপাঠি শিল্পমন্ত্রী হবার কিছু পরেই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাঁরা পাখা কেটে দিলেন।

রাজনীতির বাইরের লড়াই সবাকার চোখে পড়ে। দলে দলে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, নীতিতে নীতিতে লড়াই। সে-লড়াই যখন সংবিধান-অনুমোদিত খোলা রাজপথে সবাকার দৃষ্টির সামনে ঘটে, তাকে বলা হয় গণতন্ত্র। তন্ত্র যাই হোক, বাইরের লড়াই ছাড়া রাজনীতি নেই।

যা লোকচক্ষুর বাইরে তা হ'ল রাজনীতির গোপন সংঘাত। ঠাণ্ডা লড়াই। ক্ষমতার উত্তাপে রাজনীতির গর্ভদেশ সর্বদা জ্বলে; সেখানে সহকর্মীদের মধ্যে রেষারেষি, দুই আপাত-সমভাবীর মধ্যেও ভাবনা ও উচ্চাশার সংঘর্ষ।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন রাজনীতির এদিক বেশ ভাল জানেন; শীতল সংঘাতে হাত তাঁর পাকা। হরিশংকর ত্রিপাঠির সঙ্গে তাঁর মনের বা মতের মিল ছিল না। নিজেকে তিনি কখনও বিদ্বান্, উচ্চশিক্ষিত ভেবে অহংকার করতেন না, বড় বড় কিতাব পড়ে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতিতে যাঁরা পারদর্শী, তাঁদের দলে ছিলেন না কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল। কিন্তু হরিশংকর ত্রিপাঠি যে স্কুলের পরে কলেজের মুখ দেখেন নি এজন্যে তাঁকে তিনি কিছুটা তাচ্ছিল্য করতেন। শ্রমিক-নেতৃত্ব ব্যাপারটা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কাছে কখনও হাস্যকর, কখনও মেকি চাল মনে হ'ত। সমাজবাদী বা সাম্যবাদীরা শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করে রাজনীতির হাতিয়ার রূপে কাজে লাগাবে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তা বুঝতে পারতেন; তারা শ্রেণী-সংগ্রামে কম বেশি বিশ্বাসী; সমাজের চতুরবর্ণ নিয়ে যে-সংগঠন, তার এক বর্ণের সর্বাধিপত্য তাদের লক্ষ্য। কিন্তু কংগ্রেস ত শ্রেণী-সংগ্রামে বিশ্বাস করে না! কংগ্রেস চায় চতুঃবর্ণের যুগপৎ সর্বোদয়; তার কাছে মালিক ও শ্রমিক, জমিদার ও চাষী, দুই কণ্ঠ-পাকড়ি-ধরিছে-আকড়ি শত্রু নয়। গান্ধীজি ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম প্রজা-বিদ্রোহ ঘটিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি কৃষাণ সভা গঠন করে তার নেতা হয়ে বসেন নি। বল্লভভাই প্যাটেল 'সর্দার' খ্যাতি পেয়েছিলেন মজদুরদের সংঘবদ্ধ সংগ্রামে জয়লাভ করিয়ে: তিনিই সত্যিকার ভারতের প্রথম শ্রমিক-নেতা; অথচ, কই, তিনি ত পরিণত রাজনৈতিক জীবনে শ্রমিক-নেতার ভগ্ন ভূমিকা গ্রহণ করেন নি! অতএব, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিশ্বাস করতেন, কংগ্রেসে থেকে শ্রমিক-নেতা, কৃষাণ-নেতা, মালিক-নেতা, জমিদার-নেতা হওয়া অবাঞ্ছনীয়, বেআইনী। তা ছাড়া হরিশংকর ত্রিপাঠির শ্রমিক-নেতৃত্বের গোপন তথ্য তাঁর জানা ছিল। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের বলিষ্ঠ চরিত্র ভেজাল পছন্দ করত না। দুর্গাভাইএর গান্ধীপন্থী আদর্শবাদ তিনি শ্রদ্ধা করতেন। মন্ত্রীসভায় এমন চার-পাঁচজন সহকর্মী ছিলেন, কর্মক্ষমতা, বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব পরিমিত হ'লেও, তাঁদের মধ্যে ভেজাল ছিল না। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাঁদের স্নেহ করতেন, কিছুটা শ্রদ্ধাও। শ্রদ্ধা তাঁর একেবারে ছিল না মাধব দেশপাণ্ডের মত ভীরু স্বার্থান্বেষীর প্রতি অথবা হরিশংকর ত্রিপাঠির মত (তাঁর মতে) ভেজাল শ্রমিক-নেতাকে।

ভেজাল ঘাটতে হ'ত কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে প্রতিদিন। তাঁর নিজের মধ্যেও ভেজাল। সে খবর তিনি জানতেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের আত্মচেতনা ছিল রাজনৈতিক নেতার নয়, শিল্পীর। প্রদীপকে তিনি পাদদেশের অন্ধকারটুকু নিয়েই গ্রহণ করতেন। দেবতার পায়ে যে কাদা লেগে রয়েছে এ জ্ঞানটুকু তিনি কদাচ হারাতেন না। রাজনীতি করতে গিয়ে তিনি যতটা সম্ভব রসিক মন বাঁচিয়ে রাখতেন; তাঁর অন্তর্দৃষ্টিতে একটি গোপন কৌতুক-হাস্য সর্বদা চিক্ চিক্ করত। তিনি জানতেন রাজনীতির খেলা খেলতে গিয়ে তাঁকে অনেক ভেজাল ব্যবহার করতে হচ্ছে। এ প্রয়োগ অনেক সময় তিনি কৌতুকবোধ নিয়ে করতেন।

জানতেন, **ক্ষমতার** তপ্ত-স্বাদ তাঁর প্রিয়, পাওয়ারের মাদকতা রূপসী রমণীর কাঞ্চন যৌবনের মত নেশাপ্রদ। স্ত্রীলোকের নেশা কাটে, ক্ষমতার মাদকতা কাটতে চায় না। জানতেন, এ মাদকতা ব'য়ে বেড়াবার উপযুক্ত ব্যক্তির উদয়াচলে একমাত্র তাঁরই আছে। তাঁর ব্যক্তি-গত জীবন নিষ্কলুষ ছিল না; রাজনীতি করতে গিয়ে নিজের সন্তানদের ভবিষ্যৎকে তিনি উপেক্ষা করেন নি। কিন্তু তাঁর নীতিবোধ বর্ণ-পরিচয়ের সদা-সত্য-কথা-বলিবে না-বলিয়া-পরদ্রব্যে-হাত-দিও-না-র নিস্তেজ সীমানায় বন্দী ছিল না। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিশ্বাস করতেন, জীবনের নীতিবোধ দু'রকম, দুর্বলের ও সবলের। যে দুর্বল তার নীতিবোধ হওয়া উচিত শান্ত, শিষ্ট, সদাচার-অর্পিত। যে সবল, সে স্রষ্টা সে তার নিজের নীতি-মালার রচয়িতা। সিসিল রোড্‌স্ দুর্নীতি করেছিলেন, আবার তেমনি পুব-আফ্রিকায় ইংরেজের সাম্রাজ্যও স্থাপন করেছিলেন! কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কার্লাইলের কথায় সায় দিয়ে বলতেন, জীবনে চলতে গিয়ে শেষপর্যন্ত একটা প্রশ্নই বড় হয়ে দাঁড়ায়—হোয়েদার ইউ ওয়াণ্ট টু বি এ হীরো অর এ কাওয়ার্ড। তুমি বীর হ'তে চাও, না ভীরু?

হরিশংকর ত্রিপাঠির রাজনৈতিক পাখা কাটতে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মিছরি-ছুরি ব্যবহার করলেন।

একদিন ডেকে পাঠালেন ত্রিপাঠিজীকে জরুরী পরামর্শের জন্যে।

দুজনে একত্র হয়ে দু'চার দশটা সাধারণ কথা-বার্তার পর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আসল বিষয়ের অবতারণা করলেন।

মন্ত্রীদের মধ্যে কিছু কিছু দপ্তরের পুনঃ বণ্টন প্রয়োজন হয়েছে। কয়েকটি দপ্তরের পরিচালনায় তিনি সুখী বা সন্তুষ্ট নন। কোন কোন মন্ত্রীর সুদক্ষতার প্রমাণ পেয়ে তিনি তাঁদের অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিতে মনস্থির করেছেন। তাঁর নিজের দপ্তর-ভারও কিঞ্চিৎ লাঘব করা প্রয়োজন।

হরিশংকর ত্রিপাঠি বললেন, "আপনার এ সংকল্প প্রশংসনীয়, সন্দেহ নেই। আশা করি শ্রমিক-দপ্তর পরিচালনা আপনাকে কোনওরূপে হতাশ করে নি।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নিবেদন করলেন, "বরঞ্চ উল্টে ত্রিপাঠিজী। আপনার সুদক্ষ নেতৃত্ব দেখে আমি চমৎকৃত হয়েছি। মন্ত্রীসভা গঠনের সময় আপনি অধিকতর দায়িত্বপূর্ণ দপ্তর চেয়েছিলেন। অকপটে স্বীকার করছি তখন আপনাকে আমি পুরো বিশ্বাস করতে পারি নি না, না, মানুষ হিসাবে, কংগ্রেসের নিরলস কর্মী হিসাবে আপনাকে আমি চিরদিন শ্রদ্ধা করে এসেছি। কিন্তু মন্ত্রীত্বে আপনি কতখানি যোগ্যতা দেখাতে পারবেন, আমার কিছুটা সন্দেহ ছিল। তা ছাড়া, যাঁরা আপনাকে আমার চেয়ে তখন বেশি জানতেন, অর্থাৎ আপনার কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু, তাঁদের কেউ কেউ—নাম বলতে অনুরোধ করবেন না—আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। আজ অবশ্য আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এ ক'বছর যেভাবে আপনি শ্রমিক-দপ্তরের নেতৃত্ব ক'রে এসেছেন, তাতে আপনার যোগ্যতার প্রচুর প্রমাণ আমি পেয়েছি। সুতরাং আপনাকে আমি অন্য কোনও দপ্তরের দায়িত্ব দিতে চাই।"

বিগলিত হরিশংকর জোড় হাতে কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে নমস্কার করলেন।

বললেন, "কোশলজি, কারা আপনার কানে আমার সম্বন্ধে কুৎসা রটিয়েছে আমার জানা নেই। কিন্তু আমি কায়মনোবাক্যে আমার দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছি। আজ যদি আমার যোগ্যতা সম্বন্ধে আপনি নিঃসন্দেহ হয়ে থাকেন, সে আপনার গৌরব। শুধু এটুকু বলতে চাই, যে দায়িত্বই আমাকে দেন না কেন, আমি যথাসাধ্য পালন করব। এবং, আমাকে বিশ্বাস করে আপনি কদাচ ঠকবেন না।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হেসে বললেন, "সে আমি জানি হরিশংকরজি।"

কিঞ্চিৎ ইতস্তত ক'রে হরিশংকর প্রশ্ন করলেন, "কোন্ দপ্তরের ভার আমার ওপর ন্যস্ত হবে জানতে পারি কি?"

"এখনও তা আপনাকে সঠিক বলতে পারব না, ত্রিপাঠিজি। একাধিক দপ্তরের কথা আমি ভাবছি। কিন্তু পুনঃ বণ্টনের ব্যাপারে একসঙ্গে অনেক কথা বিচার করতে হচ্ছে। যে দপ্তরের ভারই আপনাকে দি' না

কেন, বর্তমানের চেয়ে আপনার দায়িত্ব অনেকে বেড়ে যাবে।"

এই কথাবার্তার এক সপ্তাহ পরে মন্ত্রীসভার দপ্তর পুনঃবণ্টিত হয়েছিল। হরিশংকর হয়েছিলেন শিল্পমন্ত্রী। নিজের একান্ত বিশ্বাসভাজন নিরঞ্জন পরিহারকে দেওয়া হয়েছিল শ্রমিক দপ্তরের দায়িত্ব।

হরিশংকর ত্রিপাঠি প্রথমে বেশ খুশি হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, তাঁর নিজস্ব শ্রমিক-দলের সাহায্যে শিল্পপতিদের সঙ্গে এক নতুন ধরণের সম্পর্ক তিনি স্থাপন করতে পারবেন। ভেবেছিলেন, প্রাদেশিক শ্রমিক কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে মালিকদের কাছে তিনি অসামান্য খাতির পাবেন; শ্রমিক ও মালিকদের সহযোগিতার নতুন পথের হবেন দিগ্‌দর্শক।

বছর খানেকের মধ্যে এ স্বপ্ন তাঁর ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

প্রথম ধাক্কা এল মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে। শাসন-ন্ত্রকে উন্নত করবার জন্যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রস্তাব করলেন ন্ত্রীদের কেউ কংগ্রেসের সংগঠন-ক্ষেত্রে নেতৃত্ব-পদে হাল থাকবেন না। হাই কমাণ্ড প্রস্তাব অনুমোদন রলেন। হরিশংকর ত্রিপাঠিকে প্রাদেশিক জাতীয় জদুর কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইস্তফা দিতে হ'ল। শুধু তাই য়, নিরঞ্জন পরিহার সুকৌশলে যাঁকে এ পদে বহাল রলেন তাঁর সঙ্গে হরিশংকরের প্রাচীন ব্যক্তিগত বরিতা।

কিছুদিনের মধ্যে বিলাসপুরের কাপড়ের কলে ধর্মঘট াধল। দেখা গেল, নিরঞ্জন পরিহারের শ্রমিক-নীতি ন্যপথ ধরেছে। তিনি শ্রমিকদের অধিকাংশ দাবি মর্থন করলেন মালিকরা ভূতপূর্ব মন্ত্রীর নীতি আঁকড়ে 'রে শ্রমিকদের কাছে হরিশংকর ত্রিপাঠির মান-র্যাদা অনেকখানি কমিয়ে দিলেন। নিরঞ্জন পরিহার খ্যমন্ত্রীর পূর্ণ সমর্থন নিয়ে শ্রমিক-মালিক বিবাদ মটাবার জন্যে এ্যাডজুডিকেটর নিযুক্ত করলেন। মিকরা পেল অনেক কিছু। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্রভাব বড়ে গেল তাদের মধ্যে। এ্যাডজুডিকেটরের াদালতে নিরঞ্জন পরিহারের উৎসাহ পেয়ে শ্রমিকদের খপাত্ররা এমন অনেক কিছু গোপন তথ্য প্রকাশ ক'রে দিল, যাতে শ্রমিকদের জানতে বাকী রইল না হরিশংকর ত্রিপাঠি আসলে তাদের চেয়ে মালিকদে স্বার্থকেই বেশি রক্ষা ক'রে এসেছেন।

হরিশংকর ত্রিপাঠির রাজনৈতিক জীবনে শ্রমি নেতার ভূমিকায় যবনিকা পড়ল।

এই নাটকীয় ঘটনার উদয়াচলের রাজনৈতিক র মঞ্চে একটি নারীর আবির্ভাব হ'ল। তার নাম সরোজ সহায়। হরিশংকর ত্রিপাঠি যে শ্রমিক-নেতৃত্ব চিরদিনে জন্যে ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন, যে-নেতৃত্ব গ্রহণ করবা যোগ্যতা নিরঞ্জন পরিহারের ছিল না, যার মূল্য ব প্রয়োজন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল তখনও অনুভব করে নি, সে-নেতৃত্ব হঠাৎ দখল ক'রে বসল সরোজিনী সহায়। পরবর্তীকালে দেখা গেল সরোজিনী সহা উদয়াচলের রাজনীতিতে ভ্রষ্ট উর্বশী।

হরিশংকর ত্রিপাঠি ও সুদর্শন দুবে একসঙ্গে কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাঁর মুখ্যমন্ত্রীপদে পুন-র্নির্বাচনের বিরোধিতা করছিলেন।

সুদর্শন দুবের উচ্চাশা মুখ্যমন্ত্রীত্ব নিজের আয়ত্তে আনা। কিন্তু হরিশংকরের সঙ্গে হাত মেলাতে গিয়ে তিনি এ উচ্চাশা সাময়িকভাবে হজম করতে প্রস্তুত ছিলেন। ত্রিপাঠিজিকে তিনি বুঝিয়েছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী হবার যোগ্যতা তাঁরই সবচেয়ে বেশি।

চন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে নিজের খাস দপ্তরঘরে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যখন কথা বলছিলেন, তখন মধ্যাহ্ন আহারের অবসরে হরিশংকর ত্রিপাঠির বাড়ীতে একটি রাজনৈতিক চক্রের বৈঠক বসেছিল। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন হরিশংকর, সুদর্শন দুবে, মহেন্দ্র বাজপাই, প্রজাপতি শেউড়ে এবং আরও চারজন কংগ্রেসী নেতা, যাঁদের সহযোগিতায় সুদর্শন দুবে অনেকখানি নির্ভর করছিলেন।

সুদর্শন দুবে বলছিলেন, "হাই কমাণ্ড থেকে আজ বা কাল পরিষ্কার নির্দেশ আসবার কথা। আমরা চাইছি, হাই কমাণ্ড নির্দেশ দিন কোশলজি মুখ্যমন্ত্রীত্বের জন্যে দাঁড়াতে পারবেন না। তার বিরুদ্ধে অভিযোগের যে স্মারকলিপি পাঠান হয়েছে তার ওপর আমরা হাই কমাণ্ডের অভিমত চেয়েছি।"

প্রজাপতি শেউড়ে বললেন, "নিরঞ্জন পরিহারের দিল্লী মিশন সম্বন্ধে কিছু খবর পেয়েছেন?"

সুদর্শন জবাব দিলেন, "যা জানতে পেরেছি তাতে হাই কমাণ্ডের মনোভাব ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।"

প্রজাপতি শেউড়ে পকেট থেকে একখানি পত্র বার করলেন। বললেন, "এই চিঠি গতকাল দিল্লী থেকে এসেছে। রমেশ পাতিলের চিঠি। লিখেছে, আমাদের অভিযোগে হাই কমাণ্ড খুব বেশি গুরুত্ব আরোপ করছেন না। তা ছাড়া, কোশলজির অনুপস্থিতিতে উদয়াচলে স্থায়ী ও বলিষ্ঠ মন্ত্রীসভা গঠন সম্ভব কি না সে বিষয়েও হাই কমাণ্ডের যথেষ্ট সন্দেহ আছে।"

সুদর্শন দুবে বললেন, "এ সন্দেহ দূর করতে হবে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল ছাড়াও উদয়াচলে কংগ্রেসী শাসন চলবে, বরং আরও ভালভাবে চলবে, হাই কমাণ্ডকে তা বোঝাতে হবে।"

মহেন্দ্র বাজপাই মন্তব্য করলেন, "আপনি ত বোঝাবার চেষ্টা কম করেন নি। কিন্তু বড় কর্তারা বুঝছেন কই?"

উত্তেজিত কণ্ঠে সুদর্শন দুবে বললেন, "যদি না বুঝে থাকেন, সে দায়িত্ব আপনাদের। আপনারা আমার সঙ্গে একমন নিয়ে দাঁড়াচ্ছেন না।"

এমন কঠিন অভিযোগের হরিশংকর ত্রিপাঠি ছাড়া কেউই প্রতিবাদ ক'রে উঠলেন।

সুদর্শন দুবে ব'লে চললেন, "আপনাদের মধ্যে এমন একজনও নেই যিনি সত্যিকারের মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত। কোশলজীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েও আপনারা তলে তলে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রেখে আসছেন। যদি আমি হারি, আপনাদের যাতে অন্তত মন্ত্রীত্বটুকু থাকে।"

এমন সময় চাকর এসে খবর দিল মাধব দেশপাণ্ডের উপস্থিতির।

মাধব দেশপাণ্ডে ঘরে ঢুকে দেখলেন আহার্য-সামগ্রী অর্ধভুক্ত প'ড়ে আছে, ঘরময় থমথমে গাম্ভীর্য।

বিব্রত হয়ে দেশপাণ্ডে বললেন, "অবস্থা বুঝি আশাপ্রদ নয়?"

সুদর্শন দুবে শুধু বললেন, "বসুন।"

মাধব দেশপাণ্ডে আসন গ্রহণ করলে হরিশংকর ত্রিপাঠি প্রথম কথা বললেন।

"কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল সহজ প্রতিপক্ষ নন। একবার হারলেও দ্বিতীয়বার তিনি হারতে চাইবেন না। সুদর্শন ভায়া, আপনি বোধ করি যথেষ্ট তৈরি না হয়েই সমরে নেমেছেন।"

সুদর্শন দুবে বললেন, "মোটেই নয়। প্রাদেশিক কংগ্রেস প্রায় সম্পূর্ণ আমাদের সঙ্গে। কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে পদত্যাগ করতে আমরা বাধ্য করেছি। দেখেছেন ত, বিধান সভার অধিকাংশ কংগ্রেসী সদস্য আমাদের পক্ষে ভোট দিয়েছে।"

"দিয়েছিল", হরিশংকর ত্রিপাঠি সুদর্শন দুবেকে সংশোধন করলেন। "প্রথম পর্বে আমরা জিতেছি। কিন্তু সে জেতার মধ্যেও অর্ধেক পরাজয়। যদি সেদিনই সে-সভায় আপনি নতুন নেতা নির্বাচন করিয়ে নিতে পারতেন, জয়লক্ষ্মী আপনার বশীভূত হতেন। আপনি—আমরা—তা পারি নি। কোশলজী এক সপ্তাহের সময় পেয়ে আসল সংগ্রামে অর্ধেক জিতে গেছেন।"

সুদর্শন দুবের মুখে কথা সরল না। কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পরে নিরুত্তেজ কঠিন স্বরে প্রশ্ন করলেন, "তা হ'লে এখন কি আমরা রণে ভঙ্গ দেব?"

ত্রিপাঠি বললেন, "না। আমাদের কাউকে দিল্লী যেতে হবে।"

"কে যাবে?"

"আপনি।"

"আমি যেতে প্রস্তুত। কিন্তু এখানকার সব কিছু আপনারা সামলাবেন ত?"

সাংগঠনিক চারজন নেতাই মত দিলেন, বর্তমান সঙ্গীন মুহূর্তে সুদর্শন দুবের বিলাসপুর ত্যাগ করা উচিত হবে না।

মহেন্দ্র বাজপাই বললেন, "উড়ে যাবেন, উড়ে আসবেন। দুদিনে এখানে এমন কি গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হবে?"

নেতা চারজন পুনরায় বললেন, এ কাজ উচিত হবে না।

হরিশংকর ত্রিপাঠি মৃদু হেসে বললেন, "সুদর্শনজি, দু'দিনের জন্যে যাদের ছেড়ে দিতে ভয় পান, তেমন সমর্থকদের নিয়ে রাজত্ব করা আপনার কঠিন হবে।"

সুদর্শন দুবে কঠোর স্বরে জবাব দিলেন, "আনুগত্য, ত্রিপাঠিজি, একমাত্র ক্ষমতার তাপে শক্ত হ'য়ে লেগে থাকে। যতক্ষণ দলের সদস্যরা ভাববেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলেই মুখ্যমন্ত্রীত্বে বহাল থাকছেন, ততক্ষণ তাঁদের আনুগত্য পদ্মপাতায় শিশিরবিন্দু। কিন্তু যে-মুহূর্তে আমরা তাঁকে গদিচ্যুত করতে পারব, সে মুহূর্তে সবাই একে একে, দলে দলে আমাদের সঙ্গে আঠার মত লেগে থাকবেন।"

মাধব দেশপাণ্ডে অভ্যাসবশত ব'লে উঠলেন, "নারায়ণ! নারায়ণ!"

মহেন্দ্র রাজপাল বললেন, "দুবেজি যদি দিল্লী যেতে না পারেন, তা হ'লে এ গুরু কর্তব্যের দায়িত্ব বহন করতে পারেন একমাত্র দেশপাণ্ডেজি।"

মাধব দেশপাণ্ডে ব'লে উঠলেন, "অসম্ভব। আমি কদাচ এ কাজ গ্রহণ করতে পারব না।"

সুদর্শন দুবে প্রশ্ন হাঁকলেন, "কেন?"

"আমার দেহ সুস্থ নেই। কাল থেকে বাতের ব্যথাটা বড় বেড়েছে।"

"কূটনৈতিক অসুস্থতা?"

"অসুস্থতাটা সত্যিকারেরই। তবে ইচ্ছে হ'লে কূটনৈতিকও বলতে পারেন। আমার পক্ষে এ ব্যাপারে দিল্লী যাওয়া যে কতখানি নিরর্থক, দুবেজি ভালই জানেন। উদয়াচলের রাজনীতিতে মহারাষ্ট্র-সম্প্রদায়ের স্থান নগণ্য। এ রাজনীতির নেতৃত্ব আপনাদের। হাই কমাণ্ডকে যদি বোঝাতে হয় আপনারাই বোঝাবেন।"

সুদর্শন দুবে ঈষৎ হেসে বললেন, "কিন্তু আপনাকে ত আমরা মুখ্যমন্ত্রী করব ভেবে এসেছি।"

মাধব দেশপাণ্ডেও পাণ্ডুর হাসলেন।

"দুবেজি, আপনি রসিক লোক ব'লে খ্যাতি অর্জন করেছেন। কিন্তু বাতব্যাধিতে আক্রান্ত মানুষের রসবোধটা যদি প্রখর না থাকে তা হ'লে মার্জনা করবেন।"

তের

সকালে পূজার ঘরে পদ্মাদেবী যখন মৃদু কণ্ঠে বলেছিলেন, "তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে," প্রশ্ন করেছিলেন, "কখন সময় হবে?" তখন কৃষ্ণদ্বৈপায়নের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না এই নিশ্ছিদ্র ব্যস্ততার দিনে পত্নীর সঙ্গে কথোপকথনে সময় নষ্ট করেন। কিন্তু পদ্মাদেবীর প্রশ্নের মধ্যে নিহিত কঠিন দাবির অনীহার ব্যঞ্জনা তখনই তাঁর কানে লেগেছিল। পরমুহূর্তে, তাঁর নিস্তেজ আপত্তি অগ্রাহ্য ক'রে পদ্মাদেবীর অনুরোধ আদেশের চেয়েও কঠোর ভাবে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল: "দুপুরে বাড়ী এসে খেও। তারপর কথা হবে।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বুঝেছিলেন, এ দাবি না মেনে উপায় নেই। সারাদিনে আজকাল বহুদিন পদ্মাদেবীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ সামান্য। বহুদিন দুপুরে খাবার পর্যন্ত তাঁকে দপ্তর-বাড়ীতে গ্রহণ ক'রে সারা অপরাহ্ণ অবিরাম কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। রাত্রেও অনেক সময় দপ্তর বাড়ীতেই তিনি শয্যাগ্রহণ করেন। পত্নীর সঙ্গে যে সাক্ষাৎটুকু তিনি একেবারে এড়াতে পারেন না তা হ'ল প্রাতঃকালে পূজার ঘরে পদ্মাদেবীর নীরব উপস্থিতি। পূজার সময় পদ্মাদেবী কথা বলেন না। দু'ঘণ্টা গৃহদেবতার পদতলে চোখ বুজে নীরবে স্বামীর দূরত্ব উপেক্ষা ক'রে তাঁর সঙ্গে একত্র ব'সে থাকেন। পূজার পর কখনও বা দু'চারটে মামুলী কথাবার্তা হয়, কোনও দিন বা হয় না। যেদিন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দুপুরে আহারের জন্যে বাড়ী আসেন, পদ্মাদেবী নিজের হাতে তাঁকে ভোজ্য পরিবেশন করেন। সাধারণত: এ সময়ে আরও কেউ কেউ নিমন্ত্রিত হয়ে থাকেন। তাঁদের সঙ্গে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের রাজনীতি বা দলনীতি নিয়ে আলোচনা চলে, পদ্মাদেবী নিজের উপস্থিতিকে যত সম্ভব সংক্ষিপ্ত, সংকুচিত রাখেন। মাঝে মাঝে রাত্রিবেলা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বাড়ীতে শুতে আসেন। পদ্মাদেবী স্বামীকে বিছানায় শুইয়ে মশারি গুঁজে দিয়ে কখনও কদাচিৎ পাশের চেয়ারে বসে দু'চারটে কথা বলেন নিতান্ত সাংসারিক বিষয়ে। আবার কখনও কোন কথাই বলেন না।

স্বামী-স্ত্রীর এ বিরাট ব্যবধান ধীরে ধীরে বহুদিনে

তৈরি; এখন দু'জনেরই প্রাচীন অভ্যাস। পরিণত যৌবনে জনসাধারণের কর্মপরিধিতে প্রবেশ করার পর কৃষ্ণদ্বৈপায়নের জীবনে অন্য রমণীর পদসঞ্চার ঘটেছে, কিন্তু পদ্মাদেবীর সঙ্গে ব্যবধানের তাই একমাত্র কারণ নয়। প্রধান কারণ কৃষ্ণদ্বৈপায়নের রাজনীতি। তার সঙ্গে পদ্মাদেবী নিজেকে একেবারে মানিয়ে নিতে পারেন নি: পদ্মাদেবীর কোন প্রয়োজন বোধও করেন নি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। দৈহিক সম্পর্ক তাঁদের মধ্যে বহু বছর শেষ হয়ে গেছে; আত্মিক কোনও সম্পর্ক গ'ড়ে ওঠে নি। পদ্মাদেবীর নীতিবোধ কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কাছে দুর্বল প্রতিবাদের চেয়ে বেশি মর্যাদা পায় নি। নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ঘরের সুনীতি দিয়ে যে রাজনীতি করা যায় না পদ্মাদেবীকে তিনি বার বার তা বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। সেও কয়েক বছর আগেকার কথা।

চন্দ্রপ্রসাদকে সঙ্গে নিয়েই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দপ্তর-বাড়ী থেকে নামলেন। সিঁড়ি অতিক্রম ক'রে নীচে আসতে দেখতে পেলেন তিওয়ারী দাঁড়িয়ে।

"দুর্গাপ্রসাদভাই তিনটের সময় আসছেন।"

"কে?"

"দুর্গাপ্রসাদভাই।"

"কি দরকার তার?"

"আপনি তাকে আসতে বললেন, তাই।"

"ও। আচ্ছা।"

"গোপালকৃষ্ণণকে চারটের সময় আসতে বলেছি।"

"বেশ।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পা বাড়ালেন।

"আরও খবর আছে।"

"বল।"

"কিছুক্ষণ আগে হরিশংকরজির বাড়ীতে ও-পক্ষের বৈঠক বসেছিল।"

"কে কে ছিল?"

"ত্রিপাঠিজি, দুবেজি, প্রজাপতি শেউড়ে, মহেন্দ্র বাজপাইজি, দেশপাণ্ডেজি।"

"ঐ মেয়েটি ছিল না?"

"না।"

"তার সঙ্গে দেখা করেছ?"

"সন্ধ্যাবেলা করব।"

"তুমি নিজে যেয়ো না।"

"না।"

"বৈঠকে কি হ'ল?"

"দুবেজি নাকি খুব গরম গরম কথা বলেছেন।"

"হুঁম্। একটা কাজ কর।"

"বলুন।"

"আচ্ছা, এখন যাব। আমি খেতে যাচ্ছি। তুমি খেয়েছ?"

"না।"

"খেয়ে নাও। পরে দেখা ক'রো।"

তিওয়ারী বিদায় নিলে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন চন্দ্রপ্রসাদকে বললেন, "তোমার খাওয়া হয়েছে, রাজকুমার?"

"অনেকক্ষণ, পিতাজি। বেকার মানুষের ভয়ংকর খিদে পায়।"

"পাইলট হ'তে যাচ্ছ। দেহ মজবুত রাখতে হবে ত!"

"দেহ খুব মজবুত আছে, পিতাজি।"

"তুমি একটা কাজ করতে পারবে?"

"নিশ্চয় পারব।"

"কি কাজ না জেনেই বলছ?"

"আপনি কি এমন কিছু কাজ আমায় দেবেন যা আমার অসাধ্য?"

"এ কাজটা সহজ নয়।"

"আপনার জন্যে দু-একটা কঠিন কাজ আমি করেছি, পিতাজি।"

"তা করেছ।"

"তা হ'লে বলুন।"

"বসন্তকে বিয়ে করতে পারবে?"

চন্দ্রপ্রসাদকে চুপ দেখে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তার কাঁধে হাত রাখলেন।

"চুপ কেন? লজ্জা করছে?"

"না পিতাজি।"

"যদি পার ক'রে ফেল। তোমরা দুজনে রাজী হ'লে আমি গিয়ে দুর্গাভাইএর কাছে প্রস্তাব করব।"

"আপনি?"

"দুর্গাভাই এ প্রস্তাব নিয়ে কদাচ আমার কাছে আসবেন না।"

"তাতে আপনার অসম্মান হবে, পিতাজি।"

"অসম্মান? অসম্মান হবে কেন? তুমিই ত একটু আগে বলছিলে তোমাদের জন্যে সত্যিকারের সম্মানজনক কিছু আমি করি নি। তুমি এয়ার ফোর্সে যাচ্ছ, তাও আমার কিছুমাত্র সাহায্য না নিয়ে, জেনে বড় আনন্দ হচ্ছে, রাজকুমার। তোমার জন্যে এটুকু করতে আমার অসম্মান হবে না।"

"কিন্তু, পিতাজি, কন্যাপক্ষেরই ত আপনার কাছে আসা উচিত।"

"দুর্গাভাই মেহ্‌তা সাধারণ লোক নন। তাঁর নীতি-বোধ অত্যন্ত প্রখর। আমি যতদিন মুখ্যমন্ত্রী, আমার পুত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে কখনও তিনি এ গৃহে উপস্থিত হবেন না।"

বাড়ীতে ঢুকে দেখলেন পদ্মাদেবী বারান্দায় অপেক্ষা করছেন।

হালকা সুরে বললেন, "আমি কি অতিথি যে দুয়ারে দাঁড়িয়ে আমার অপেক্ষা করছ?"

পদ্মাদেবী মৃদু স্বরে বললেন, "বড় দেরি হয়ে গেল। এত বেলায় খেলে শরীর ঠিক থাকে না।"

"তবু ভাল আজ নিমন্ত্রিত কেউ নেই।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন স্নানঘরে গিয়ে হাত-মুখ ধুলেন। খাওয়ার বড় ঘরের দিকে পা বাড়াতে পদ্মাদেবী বললেন, "ও-ঘরে নয়। আমার ঘরে তোমার খাওয়া দেওয়া হয়েছে।"

এঘর বাড়ীর ভেতরের দিকে, পেছনের বাগানের গায়ে। বহুদিন পরে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পত্নীর ঘরে প্রবেশ করলেন।

মেঝেয় রেশমী আসন পেতে আহারের ব্যবস্থা। কাঁসার থালে গরম লুচি, বেগুন ভাজা ও তরকারি। আচমন ক'রে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আহারে প্রবৃত্ত হলেন। পদ্মাদেবী অদূরে মেঝেয় বসলেন।

তরকারি মুখে দিয়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "নিজের হাতে রেঁধেছ দেখছি।"

পদ্মাদেবী ম্লান হাসলেন।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "কি সব কথা আছে বলছিলে, ব্যাপারটা গুরুতর মনে হচ্ছে। বলতে সুরু কর।"

"আগে খেয়ে নাও।"

"জানই ত আমি ধীরে-আস্তে খাই। খাওয়ার পরে বেশিক্ষণ বসতে পারব না। আজ এক মুহূর্তের অবকাশ নেই।"

"তা হ'লে বলি। আমার কোনও কথা তুমি কোনও দিন শোন নি। জানি আজও শুনবে না। তবু বলব।"

"বল।"

"তোমার সংগ্রামের সংবাদ কি?"

"জয় নিশ্চিত মনে হচ্ছে।"

"তা হ'লে আমাকে বলতেই হবে।"

"বলো না।"

"তুমি এই গদী এবার ছেড়ে দাও।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নীরবে একখানা লুচি শেষ করলেন।

তারপর বললেন, "কেন?"

"তোমার বয়স হয়েছে। এ পরিশ্রম আর তোমার সইবে না। দেহ ভেঙ্গে যাবে।"

"অর্থাৎ, মরে যাব। এ বয়সে মৃত্যুকে ত ভয় পাবার কথা নয়।"

"মরে যাওয়া-না-যাওয়া ভগবানের হাত। তোমার বয়স হয়েছে। অনেকদিন ত এ কাজ করলে। এবার অন্যরা করুক।"

"যাঁদের করার সম্ভাবনা তাঁদের বয়স আমার চেয়ে বিশেষ কম নয়।"

"তা হ'লে নতুন কাউকে এ দায়িত্ব দিয়ে দাও।"

"মুখ্যমন্ত্রীত্ব ত আমার জমিদারী নয় যে উইল করে কারুর হাতে তুলে দেব! এ হ'ল রাজনীতির লড়াই। আজ যদি আমি না থাকি, তবে কার হাতে যাবে আমি কি ক'রে বলব?"

"দেশ-শাসন কেবলমাত্র রাজনীতি হয়ে গেল কেন? দীর্ঘকাল তোমরা দেশের সেবা করে এসেছ। এখন করছ দেশের কল্যাণ, উন্নতি, সংগঠন। এর চেয়ে বড় কাজ আর কি হ'তে পারে? এত বড় উত্তরাধিকার বইতে পারার মত মানুষ তোমরা তৈরী করছ না কেন? কেন এই দেশকল্যাণ কেবল রাজনীতি হয়ে উঠল?"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সহজে প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেন না। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, "এ প্রশ্ন আমার মনেও অহরহ জেগে রয়েছে। আমরা স্বাধীনতা পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের প্রায় সব নেতাদেরই শাসনকার্যে যোগ দেবার আহ্বান এল। এমন যে নীতি-পরায়ণ দুর্গাভাই, তিনিও সরকারের বাইরে থাকতে পারলেন না। ক্ষমতার উত্তাপে আমাদের অন্তরে ঘুমন্ত সকল আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল: শাসনকার্যকে আমরা রাজনীতি ক'রে তুললাম। অথচ হাজার হাজার দেশকর্মী, যারা বছরের পর বছর ইংরেজ আমলে দেশের জন্যে আত্মত্যাগ করেছে, তাদের আমরা রাখলাম শাসন ও সংগঠনের বাইরে। পুরাতন আমলাতন্ত্র নিয়েই স্বরু হ'ল আমাদের জনকল্যাণ রাজত্ব। আজ আমরা রাজনীতির ঘূর্ণিপাকে এমন জড়িয়ে গেছি যে, এর থেকে মুক্তির পথ বুঝি আর খোলা নেই। এর মধ্যে, এই আমাদের সবকিছু প্রচেষ্টার মধ্যে, কোথায় যেন মস্ত বড় ফাঁক আর ফাঁকি রয়ে গেছে। তার আন্দাজ পাই, অথচ তার চেহারা খুঁজে বার করবার অবকাশ নেই, উপায় নেই। প্রদীপের আলো যখন কমে আসে, সে দপ্ দপ্ করে বেশি তেজে জলতে চায়; নতুন তেল না হ'লে যে সে আর জ্বলবে না এ জ্ঞান তার থাকে না।"

"তুমি ত অনেক করেছ। এবার তুমি এ দায়িত্ব ছেড়ে দাও।"

"আমি করি নি কিছুই, পদ্মাবাঈ। পাঁচ বছর মুখ্যমন্ত্রী থাকবার পরে এখন যেন পরিষ্কার দেখতে পাই কত কিছু না-করা রয়ে গেছে, যা-কিছু করেছি তার মধ্যে কত ফাঁক, কত ভেজাল। এ দেশের মাটিতেই বুঝি এমন কিছু রয়েছে যা পূর্ণতার পথ চিরদিন আগলে দাঁড়ায়। ধরো, এই এমন সাধের আমার বিদ্যামন্দির-গুলি। ভেবেছিলাম, সমস্ত উদয়াচলে হাজার হাজার বিদ্যামন্দির স্থাপন ক'রে দশ বছরে নিরক্ষরতা অনেকখানি দূর ক'রে দেব। গ্রামে গ্রামে স্কুল খোলা হ'ল, শিক্ষক নিযুক্ত হ'ল, অর্থ খরচ হ'ল অনেক। অথচ পরিণামে দেখা গেল, স্কুল আছে ত শিক্ষক নেই, শিক্ষক আছে ত ছাত্র নেই। এমন কি এমন অনেক 'স্কুল' আছে যার অস্তিত্ব কেবল সরকারী ফাইলে, রিপোর্টে।"

"এ গলদ দূর করবার ক্ষমতা তোমার আর নেই। তুমি বৃদ্ধ হয়েছ, তোমার শক্তি কমে গেছে। এবার তুমি ছেড়ে দাও।"

"বার বার তুমি একথা বলছ কেন?" কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কণ্ঠে এবার উষ্মা।

"শুধু এ জন্যে, যে আমার ভয় করছে।"

"কিসের ভয়?"

"এতকাল তুমি উদয়াচলের নেতৃত্ব করে এসেছ তোমার দুর্বলতা, আর কেউ না জানুক, আমি জানি। অন্যায় করেছ, স্খলন হয়েছে বার বার তোমার। তবু তোমার অসীম শক্তিতে তুমি তাদের উর্ধ্বে উঠতে পেরেছ। অনেকে তোমার বদনাম করে, নিন্দা করে, কিন্তু সবাই তোমাকে শ্রদ্ধাও করে। জানে, তুমি দশ ভাগ অন্যায় করেও নব্বুই ভাগ ন্যায় ক'রে থাক। গত পাঁচ বছরে তুমি মুখ্যমন্ত্রীর সমুচিত অনেক কিছু করেছ; সঙ্গে সঙ্গে উদয়াচলের জন্যে যা করতে পেরেছ আর কেউ তা পারত না।"

"তা হ'লে?"

"কিন্তু এবার তোমার পতন হ'তে স্বরু করেছে।"

"পতন!"

"হ্যাঁ। তুমি ক্ষমতার লড়াইয়ে জড়িয়ে গেছ, জিতবার জন্যে এমন মূল্য নেই যা তুমি দিতে তৈরি নও।"

"মিথ্যে কথা।"

"মিথ্যে কথা যে নয় তা তুমি খুব ভাল করে জান। তুমি শঠতা, ছল, চাতুরি, কূটনীতি সব কিছুর আশ্রয় নিয়েছ লড়াইয়ে জিতবার জন্যে। তুমি এমন লোকেদের সাহায্য নিচ্ছ যারা তোমার সামনে এসে দাঁড়াতে ভয় পেত। জিতবার পর তারা যা চাইবে, না দিয়ে তুমি পারবে না। সুদর্শন দুবের সঙ্গে লড়বার জন্যে তুমি তারই মত নীচে নেমে এসেছ। পাঁচ বছর আগে মুখ্যমন্ত্রীত্ব তুমি আপন গৌরবে অধিকার করেছিলে। দুর্গাভাইজি পর্যন্ত তোমার নেতৃত্ব মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। আজ তুমি আর তা নও।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নীরবে ভোজন করতে লাগলেন।

পদ্মাদেবী কাতর কণ্ঠে বললেন, "তা ছাড়াও তুমি

অন্যায় করেছ। তোমার ছেলেদের ভবিষ্যৎ রক্ষার জন্যে তুমি যা করেছ—অনেক গোপনে করলেও—আমি তা জানি।"

"মা হয়ে তোমার তাতে আপত্তি করা উচিত নয়।"

"আমি শুধু মা নই, তোমার স্ত্রীও। তুমি আমার সঙ্গে সম্পর্ক বহুদিন নষ্ট করেছ, তবুও আমি তোমার স্ত্রী। তুমি নিজের ন্যায় পরিশ্রমে ছেলেদের জন্যে কিছু রেখে যেতে পারলে আমার গৌরব হ'ত। তোমার ক্ষমতার আসন থেকে লুকিয়ে যা করেছ তাতে আমার গৌরব নেই, আছে অপমান।"

"থাক। অত বক্তৃতা দিও না।"

"বক্তৃতা দিতে আমি চাই নি। শুধু তোমায় বলতে চেয়েছি, এখনও তোমার মান, যশ, সুনাম অনেক। এসব তুমি সারা জীবনের অক্লান্ত পরিশ্রমে অর্জন করেছ। যদি এখন তুমি অবসর নাও, দেশশুদ্ধ লোক তোমায় ধন্য দেবে। যদি না নাও, যদি আবার তুমি মুখ্যমন্ত্রী হও, তা হ'লে এতকালের অর্জিত সব কিছু কয়েক বছরে তুমি হারাবে। যাদের নিয়ে, যে অস্ত্রের ব্যবহারে তুমি জিতবে তারা তোমায় একেবারে নীচে নামিয়ে আনবে।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়নের আহার শেষ হয়ে গেল। গণ্ডূষ ক'রে তিনি ন'ড়ে বসলেন। চোখে মুখে তাঁর ক্রোধের চিহ্নমাত্র নেই। বরং এক ক্লান্ত ঔদাসীন্য গৌরবর্ণকে পাণ্ডুর করেছে।

বললেন, "এ সব কথা আমিও যে না-ভাবি তা নয়। কিন্তু উপায় নেই। আমরা যারা দেশ-চালনার দায়িত্ব নিয়েছি, আমরণ সে দায়িত্ব পালন করতে হবে। যারা আমার নেতৃত্ব ভাঙতে চায় তাদের ভাঙতে না পারলে আমার তৃপ্তি নেই। ক্ষমতার নেশা আছে, মানি। কিন্তু আমার এ জেদ নেশাজাত নয়। আমি জানি, উদয়াচলের শাসনদায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে এমন ব্যক্তি এখনও একমাত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল। বাকী সবাই ভীরু, অপদার্থ, কাপুরুষ। দুর্গাভাই মেহতা পর্যন্ত। তাঁর সাহস নেই দলের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারেন, আমি তোমাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তুত। শুচিবাইগ্রস্ত বিধবার মত তিনি নিজের সুনাম বাঁচাবার জন্যে ব্যস্ত। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলের আড়ালে দাঁড়ি[illegible] তিনি শুচিশুদ্ধ। পদ্মাবাঈ, যে বীর—যার যোগ্[illegible] আছে, যে বড় কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে অনেক অন্যায় [illegible] দেহ স্পর্শ করে না। মহাভারতের কথা ভেবে দে[illegible] ভীম, অর্জুন, ভীষ্ম—অন্যায় করেন নি কে? অমন[illegible] যুধিষ্ঠির তাঁকে পর্যন্ত যুদ্ধে জিতবার জন্যে মিথ্যা বল[illegible] হয়েছিল। যে সংগ্রামে নেমেছি তাতে জয়লাভই আ[illegible] একমাত্র উদ্দেশ্য। জয়ের পরেকার ক্লান্ত দিনও [illegible] অবসাদ আনবে জানি। অনেক ভেজাল, অনেক মি[illegible] দিয়ে জয়লাভের পর মোটা মাশুল দিতে হবে, ত[illegible] জানি। কিন্তু পেছুবার আর উপায় নেই।"

পদ্মাদেবী অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "এবার আমি চলি। ক[illegible] রয়েছে।"

পদ্মাদেবী বললেন, "কাল ভোরে আমি ক[illegible] যাচ্ছি।"

"কোথায়?"

"কাশী।"

"কার সঙ্গে?"

"একজন কাউকে সঙ্গে নেব।"

"কবে ফিরবে?"

"কিছুদিন থাকব।"

"বাড়ীটা খালি আছে?"

"আছে।"

"বেশ। যাও।"

"আর একটা কথা আছে।"

"বলো।"

"কমলাকে আমি কিছু গহনা আর টাকা দি[illegible] চাই।"

"কোন্ কমলা?"

"তোমার পুত্রবধূ। দুর্গাপ্রসাদের স্ত্রী।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নীরব রইলেন।

"বিয়ের পর থেকে সে কিছু পায় নি। আম[illegible] বাপের বাড়ীর দেওয়া গহনার অর্ধেক আমি তা[illegible] দিতে চাই। আমার নামে যা টাকা আছে তা থে[illegible] পাঁচ হাজার টাকাও।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তখনও নীরব।

"কমলা কখনও কিছু চায় নি। নেবে কিনা তাও জানি নে। কিন্তু দিতে আমাকে হবেই। এবং আজই।"

"আজই?"

"হ্যাঁ। আজ রাত্রে আমি তার কাছে যাচ্ছি।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে, ক্লান্ত স্বরে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "বেশ।"

দরজার বাইরে যাবার মুখে ফিরে দাঁড়ালেন।

"একটা কাজ করো।"

"কি?"

"দুর্গাপ্রসাদের পত্নীকে দেব বলে একবার এক ছড়া হার কিনে এনেছিলাম। সেটা আছে?"

"আছে।"

"ওদের একটি মেয়ে আছে, না?"

"আছে। খুব সুন্দর দেখতে।"

"তার জন্যে নিয়ে যেয়ো।"

ক্রমশঃ

কথা ও কাজ

"এখন আর কথা কহিবার সময় নয়, কাজের সময় আসিয়াছে;" "বাঙ্গালী কেবল বকে, কাজ করে না;" "বক্তৃতা টক্তৃতা রাখিয়া দাও, কাজ কর;" "এইরূপ অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কথাগুলি ভাল কিন্তু ওগুলির মধ্যে সত্য আংশিকভাবে প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র। একটুও কথা না বলিয়া কোনও বড় কাজ করা যায় কি? কথা না বলিয়া কাজে প্রেরণা জন্মাইবে কেমন করিয়া? উদ্দীপনা কোথা হইতে আসিবে? কাজ যে কেন করা দরকার, তাহাও ত বুঝাইয়া দেওয়া চাই। কেমন করিয়া কাজ করিতে হইবে, তাহা বাক্যের দ্বারা জানান আবশ্যক। কাজ করিবার আদেশ বাক্যের দ্বারা দিতে হয়। যুদ্ধ যে একটা এতবড় কাজ, তাহাও বিনা বাক্যব্যয়ে হয় না। যাহারা খুব কর্মিষ্ঠ জাতি, তাহারা বাঙ্গালীর চেয়ে সোরগোল বেশী বই কম করে না। কিন্তু ইহা সত্য কথা যে, কেবল বকা ভাল নয়, ফাঁকা আওয়াজ ভাল নয়, কাজের চেয়ে বক্তৃতা বেশী হওয়া উচিত নয়। কথাও চাই, কাজও চাই। কোন্‌টির পরিমাণ বা অনুপাত কিরূপ হইবে, তাহা কেহ বলিয়া দিতে পারে না।

কথাও খুব বড় কাজ, যদি তাহার ভিতর প্রাণ থাকে। জগতের ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকেরা মানুষ ও পশুর চিকিৎসালয়, অন্ধ আতুরদের সেবাশ্রম, অনাথালয়, বিদ্যালয়, পতিতা নারীদের জন্য উদ্ধারাশ্রম, এসব স্থাপন করিয়া যান নাই; তাঁহারা কেবল কথা বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কাজের চেয়ে সেসব কথার মূল্য, সেসব কথার শক্তি, সেসব কথার ফল কম নয়।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বৈশাখ, ১৩২১।

কংগ্রেস স্মৃতি

শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল

দ্বাবিংশ অধিবেশন—কলিকাতা, ১৯০৬

ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের অগ্রদূত বাঙালী জাতিকে দুর্বল করার জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট বদ্ধপরিকর হয়। ইংরাজ শাসকগণ মনে করলেন যে যদি বঙ্গদেশকে খণ্ডবিখণ্ড করে বিভক্ত করা যায় তা হ'লে বাঙ্গালীর সংহতি শক্তি নষ্ট হবে। লর্ড কার্জন বড়লাট নিযুক্ত হওয়ার বহু পূর্বেই এই দুরভিসন্ধি ইংরাজ প্রভুগণের মস্তিষ্কে প্রবেশ করেছিল। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার কাছাড় ও শ্রীহট্ট (সিলেট) জেলা দুটি বিচ্ছিন্ন করে আসামের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। তৎপর ১৮৯১ সালে একটি পরামর্শ সভায় মিলিত হয়ে বাংলার ছোটলাট, আসাম ও বর্মার চীফ্ কমিশনারদ্বয় ও কতিপয় সৈন্য বিভাগের বড় কর্তা লুসাই হিল এবং সমগ্র চট্টগ্রাম বিভাগ আসামের সহিত যুক্ত করা সাব্যস্ত করেন। ১৮৯৬ সালে আসামের তদানীন্তন চীফ কমিশনার স্যর উইলিয়ম ওয়ার্ড অনুরোধ করেন যে, লুসাই হিল এবং চট্টগ্রাম বিভাগের সঙ্গে ঢাকা বিভাগের ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলাও যেন আসামের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ওয়ার্ডের পরবর্তী চীফ কমিশনার স্যর হেনরী কটনের বিরোধিতায় পরিকল্পনাটি ধামাচাপা পড়ে। কেবলমাত্র লুসাই হিল আসামভুক্ত করা হয়। (১)

উপরোক্ত ঘটনার অব্যবহিত পরে ক্ষমতাপ্রিয় দাম্ভিক লর্ড কার্জন ভারতবর্ষের বড়লাট নিযুক্ত হয়ে এদেশে আসেন। তিনি এসেই ভারতবাসীর অনিষ্টমূলক বহু আইনকানুন বিধিবদ্ধ করলেন। সেই সবের বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। কেবলমাত্র এই বললেই যথেষ্ট হবে যে, তাঁর কার্যাবলীর তীব্র প্রতিবাদ বঙ্গদেশেই আরম্ভ হয়। সুতরাং তিনি আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল বঙ্গদেশকে চূর্ণ করতে দৃঢ়সঙ্কল্প হন। দপ্তরের পুরাতন নথিপত্র ঘেঁটে বঙ্গদেশ বিভাগ করার ধামাচাপাপড়া পরিকল্পনাটি বের করলেন এবং ১৯০৩ সালের ৩রা ডিসেম্বর ভারত গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করল যে ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলাসহ সমগ্র চট্টগ্রাম বিভাগ আসামের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। এই প্রস্তাবে বঙ্গদেশ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল এবং বাংলার সর্বত্র প্রতিবাদ সভা আহূত হ'ল। ইহার ফলে বাংলা দেশে যে আন্দোলনের সৃষ্টি হ'ল তা—অভূতপূর্ব। দেশাত্মবোধের প্রবল স্রোতে সমগ্র বঙ্গভূমি যেন প্লাবিত হয়ে গেল। ধনী নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে দেশের সকলে ইহাতে যোগ দিল। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের সঙ্গীতের সঙ্গে কত অজ্ঞাত অখ্যাত কবির রচিত স্বদেশী সঙ্গীতে সমস্ত দেশ মুখরিত হয়ে উঠল। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে বাংলার আকাশ-বাতাস ধ্বনিত হ'ল। যারা এই স্বদেশী আন্দোলন প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরা এর কথা ভুলতে পারবেন না। যে-সকল ভূম্যাধিকারিগণ স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এবং ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে দেখে স্বয়ং লর্ড কার্জন বড়লাটের উচ্চাসন থেকে নেমে রাজনৈতিক আন্দোলনকারীর ভূমিকা গ্রহণ করে পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে বহির্গত হলেন এবং ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্য্যকান্ত রায় চৌধুরীর প্রাসাদে আতিথ্য গ্রহণ করলেন। মহারাজ যথারীতি অতিথি সংকার করলেন কিন্তু তিনি তাঁর সংকল্পে দৃঢ় রইলেন। ময়মনসিংহে বিফল মনোরথ হয়ে ঢাকায় গিয়ে এবং নানা প্রকারে প্রলুব্ধ করে ও ধর্মান্ধতা জাগিয়ে ঢাকার নবাব সলিমুল্লা প্রভৃতি কয়েকজন মুসলমান নেতাকে স্বমতে আনয়ন করলেন। ফলে পূর্ববঙ্গের মুসলমান সমাজের কতকাংশ বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব সমর্থন করল।

অতঃপর অকস্মাৎ মুষ্টিমেয় মুসলমান ব্যতীত বঙ্গদেশের সমগ্র জনমতকে উপেক্ষা করে ১৯০৫ সালের জুলাই মাসে ভারতসচিব ঘোষণা করলেন যে ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর তারিখ থেকে সমগ্র পূর্ববঙ্গ (ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ) এবং দার্জিলিং ব্যতীত সমগ্র উত্তরবঙ্গ আসামের সহিত যুক্ত হয়ে "ইষ্ট বেঙ্গল ও আসাম" গভর্ণমেণ্ট সৃষ্টি হবে। এই ঘোষণার পূর্বে ঘুণাক্ষরেও কেউ জানতে পারে

(১) Indian National Evolution by Ambica Charan Majumdar.

নি যে, উত্তরবঙ্গও এই ভাবে নবগঠিত প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত হবে। (২)

হতোদ্যম না হয়ে বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দেশব্যাপী আন্দোলন ক্রমে বেড়েই চলল। আমি তখন রাজসাহী জেলার নওগাঁও উচ্চ ইংরাজি স্কুলের ছাত্র ছিলাম। অন্যান্য অনেকের সঙ্গে আমিও আন্দোলনে মেতে উঠলাম।

পূর্ববঙ্গ ও আসামের ছোটলাট নিযুক্ত হয়ে স্যর ব্যামফিল্ড ফুলার স্বদেশী আন্দোলনকে গলা টিপে হত্যা করার জন্য ভীষণ চণ্ডনীতি আরম্ভ করলেন।

১৯০৫ সালের বারাণসী কংগ্রেসে বঙ্গভঙ্গ রদের প্রস্তাবে কোন ফল হ'ল না। বাংলা দেশে আন্দোলন ক্রমে ভীষণ আকার ধারণ করল। এই রকম পরিস্থিতিতে সুফলের আশায় সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতাগণ বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বিশ্বাসভাজন ভারতবর্ষের প্রবীণ দেশনায়ক অতিবৃদ্ধ স্যর দাদাভাই নৌরজীকে ১৯০৬ সালের কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনের সভাপতির পদ গ্রহণ করতে সম্মত করালেন। সেই সময় আমি রাজসাহী কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ছিলাম। তখনকার দিনে ডিসেম্বর মাসে বড়দিনের বন্ধের সময় কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ত। আমরা ১০।১২ জন সহপাঠীর একটি দল গঠন করে কংগ্রেসের অধিবেশনে দর্শকরূপে যোগদান করতে মনস্থ করলাম। তখন পর্য্যন্ত রাজশাহী সহর রেলপথ দ্বারা যুক্ত হয় নি। রাজশাহী থেকে কলকাতা আসতে হ'লে হয় ঘোড়ার গাড়িতে ২৮ মাইল অতিক্রম ক'রে নাটোরে ট্রেণ ধরে সারা ঘাটে নেমে ষ্টীমারে পদ্মা পার হয়ে দামুকদিয়ায় ট্রেণে চাপতে হ'ত অথবা ষ্টীমার বা নৌকাযোগে রাজসাহী থেকে দামুকদিয়া বা লালগোলা ঘাটে পৌঁছে ট্রেন ধরতে হ'ত। আমরা কংগ্রেস অধিবেশনের ২।৩ দিন পূর্বে প্রাতঃকালে নৌকা ভাড়া করে দামুকদিয়া রওনা হলাম। শীতকালের শীর্ণা পদ্মায় নৌকাযোগে যেতে ভয়ের কোন কারণ ছিল না। তখন পদ্মার বর্ষাকালের ভৈরবী মূর্তি অন্তর্হিত হয়ে স্নিগ্ধ কোমল মূর্তি ধারণ করেছে।

কলকাতায় এসে আমরা দিশাহারা হয়ে পড়লাম। আগে থেকে বাসস্থানের কোন বন্দোবস্ত করা হয় নাই। সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের জনৈক পরিচিত ছাত্রের সাহায্যে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের সংযোগস্থলের নিকটবর্তী পটুয়াটোলা লেনের একটি ছাত্রাবাসে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হ'ল। বড়দিনের বন্ধের ছুটির জন্য কয়েকটি ছাত্র বাড়ী যাওয়ায় কয়েকটা খালি ঘর পাওয়া গেল। অদূরবর্তী একটি হোটেলে আমাদের আহারের ব্যবস্থা হ'ল। তখনকার হোটেলের চার্জের কথা শুনলে এখনকার লোকেরা অবাক হবেন। মাত্র ১০ পয়সায় ভাত, মাছের ঝোল ও ঝাল, ডাল, ভাজা ও তরকারি—পেট ভরে ভাত খাওয়া যেত এবং রাত্রে মাছ ছাড়াও একটি গোটা হাঁসের ডিমের কালিয়া পাওয়া যেত।

পরদিন ২৫শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালে সভাপতি মহাশয় বোম্বাইয়ের অন্যান্য নেতৃবৃন্দসহ কলকাতায় পৌঁছবেন। হাওড়া ষ্টেশনে তাঁহার অভ্যর্থনার পর শোভাযাত্রা করে নির্দিষ্ট বাসস্থানে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। আমরা নিতান্ত মফঃস্বল কলেজের ছাত্র। রাস্তাঘাট ভাল চিনি না। শোভাযাত্রা হাওড়ার পুল পার হয়ে ষ্ট্র্যাণ্ড রোড ধরে বিডন ষ্ট্রীটের দিকে আসবে জেনে আমরা সকাল সকাল পদব্রজে বিডন উদ্যানের কাছে উপস্থিত হয়ে বিডন ষ্ট্রীট ও আপার চিৎপুর রোডের সংযোগস্থলে অপেক্ষা করতে লাগলাম। সভাপতিকে দেখার জন্য পথের দুধারে অসম্ভব ভিড়। পথের দু'ধারের বাড়ীর ছাদগুলি লোকে পূর্ণ ছিল। অলিন্দে অলিন্দে সার সার লোক। প্রত্যেক গৃহ পুষ্পমাল্যে শোভিত। এ রকম জন সমারোহ ইতিপূর্বে দেখা যায় নি।

আমরা অনেকক্ষণ ধরে শোভাযাত্রার প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। নেতাদের দেখার জন্য মন চঞ্চল হয়ে উঠল। স্কুলে পড়বার সময়ই দেশপ্রখ্যাত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রদীপ' মাসিক পত্রিকায় ছাপা—নেতাদের ছবি এবং রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত "বেঙ্গলী" সংবাদপত্রের "Art Supplement to the Bengalee"র কল্যাণে কংগ্রেসের নেতাদের ছবি আমার মনে মুদ্রিত হয়ে ছিল এবং তাঁরা আমার তরুণ হৃদয়ে দেবতার আসন গ্রহণ করেছিলেন।

অধীর প্রতীক্ষার পর ক্রমে শোভাযাত্রা দেখা দিল। একখানি বৃহৎ ল্যাণ্ডো গাড়িতে সৌম্যমূর্তি শ্বেত শ্মশ্রুশোভিত বৃদ্ধ স্যর দাদাভাই নৌরজী ও তাঁহার দুই পার্শ্বে স্যর ফেরজ শাহ মেহতা ও দিনশা ইদলজি ওয়াচা (পরবর্তীকালে স্যর উপাধিপ্রাপ্ত) উপবিষ্ট। নেতাদের পদপ্রান্তে "অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি"র শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু। নেতাদিগকে আর চিনিয়ে দিতে হ'ল না, আমার পূর্বদৃষ্ট ছবিগুলিকে যেন মূর্তি পরিগ্রহণ করে গাড়িতে উপবিষ্ট দেখলাম। গাড়ির

[২] Indian National Evolution by Ambica Charan Majumdar

ঘোড়া খুলে স্বেচ্ছাসেবকগণ গাড়ি টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। শোভাযাত্রা যখন আমাদের সম্মুখবর্তী হ'ল তখন সমবেত জনতা বিপুল হর্ষ ও "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি করতে লাগল। পার্শ্ববর্তী গৃহগুলির উপর থেকে নেতাদের উপর লাজ ও পুষ্প বর্ষিত হ'তে লাগল। শোভাযাত্রা ও নেতাদের দর্শন করে আমরা বাসায় ফিরে এলাম।

পরদিন ২৬শে ডিসেম্বর কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশন আরম্ভ হবে। চৌরঙ্গী রোডে (যেখানে বর্তমানে কিং এডওয়ার্ড কোর্ট অবস্থিত) একটি বৃহদায়তন প্যাণ্ডাল কংগ্রেসের অধিবেশনের জন্য নির্মিত হয়েছিল। আমরা ২৬শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালে সকাল সকাল আহারাদি সেরে কংগ্রেসের সভায় যোগদান করার জন্য রওনা হলাম। অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার বহুপূর্বে দর্শকের টিকিট কেটে প্যাণ্ডেলের প্রধান তোরণের সামনে দাঁড়ালাম। ক্রমে দর্শকের সংখ্যা বাড়তে লাগল এবং ভিড় এত বেশী হ'তে লাগল যে, মনে হ'ল যেন আমি লোকের চাপে পিষ্ট হয়ে যাব। বহুক্ষণ প্রতীক্ষার পর গেট খোলার সঙ্গে সঙ্গে জন-স্রোত প্রবল জলস্রোতের মত প্যাণ্ডেলের ভিতর প্রবেশ করতে লাগল। আমি ঐ স্রোতের আবর্তে যেন শূন্যে উত্থিত হয়ে ভিতরে উপনীত হলাম। ভিতরে লোকে লোকারণ্য। শুনলাম যে প্রায় ২১ হাজার লোক কংগ্রেসে যোগদান করেছিল। পরবর্তীকালে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক-দের যে রকম নিয়মানুবর্তিতা দেখেছি তা এই কংগ্রেসে দেখা যায় নি। সমস্ত বিষয়েই অব্যবস্থা বিশৃঙ্খলা। গেটে জনতা নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। ভিড়ের চাপে দর্শনার্থীদের টিকিট পরীক্ষার কোন প্রশ্নই উঠল না।

নির্দিষ্ট সময়ে নেতাগণসহ সভাপতি মহাশয় প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করে মঞ্চের উপর আসীন হলেন। সমবেত প্রতিনিধি ও দর্শকগণ দণ্ডায়মান হয়ে বিপুল হর্ষধ্বনির দ্বারা সভাপতি মহাশয়কে অভ্যর্থনা করল। মুহুর্মুহু "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি উত্থিত হ'তে লাগল। "ইণ্ডিয়ান মিরারে"র সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় সভার প্রারম্ভে প্রার্থনা করলেন। পরে সমবেতকণ্ঠে কতকগুলি বালিকা জাতীয় সঙ্গীত "বন্দেমাতরম্" গাইল। মাথায় পাগড়ি দুই-জন তরুণ একটি স্বদেশী সঙ্গীত (রাম রহিম না জুদা কর ভাই দিলকা সাচ্চা রাখ জী) গেয়ে সভাস্থ সকলকে মুগ্ধ করল।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ কলিকাতা হাইকোর্টের সর্বশ্রেষ্ঠ উকিল ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়। তিনি তাঁর অভিভাষণ পাঠ করলেন। সেই বৎসর বাংলার দুইজন সুসন্তান ও ভূতপূর্ব কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু মহাশয় পরলোকগমন করেন। এঁরা উভয়েই কলকাতা হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার ছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয় তাঁর অভিভাষণে এঁদের পরলোকগমনের জন্য শোকপ্রকাশ করেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণের পর উত্তর-পাড়ার রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরজীকে কংগ্রেসের সভাপতি পদে বরণ করার জন্য প্রস্তাব উপস্থিত করলেন। প্রস্তাব যথারীতি সমর্থিত হওয়ার পর সভাপতি মহাশয় সমবেত প্রতিনিধি ও দর্শক-মণ্ডলীর উল্লাস হর্ষধ্বনির মধ্যে আসন গ্রহণ করলেন। ৮১ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ, শারীরিক দুর্বলতার দরুণ সভাপতির আসন থেকে উঠে তাঁহার রচিত অভিভাষণের কিয়দংশ পাঠ করে শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গোখলে মহাশয়কে অভিভাষণের অবশিষ্টাংশ পাঠ করতে বললেন। তাঁহার অভিভাষণের সকল কথা এখন মনে নাই। কেবল এইটুকু মনে আছে যে, তিনি "স্বরাজের" দাবি করলেন এবং এতে সমবেত জনতার মধ্যে অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে গেল। কংগ্রেসে এই প্রথম 'স্বরাজ' কথাটি শোনা গেল।

সভাপতির অভিভাষণের পর বিষয় নির্বাচনী সমিতি গঠিত হ'ল। "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীত গীত হওয়ার সেদিনকার মত সভা ভঙ্গ হ'ল।

সভা ভঙ্গের পর আমরা স্বদেশী দ্রব্যের প্রদর্শনী দেখতে গেলাম। তখনকার দিনে কংগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী দ্রব্যের শিল্পপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হ'ত। এবার প্রদর্শনীর স্থান নির্বাচিত হয়েছিল কংগ্রেসের অদূরবর্তী পোড়া বাজারের মাঠে। (বর্তমানে চৌরঙ্গী টেরেস)। প্রদর্শনীতে নূতন স্বদেশী শিল্পের নানা সামগ্রী সজ্জিত ছিল। বিশেষ করে সাবানের তৈয়ারী নেতাদের আবক্ষ মূর্তি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

পরদিন ২৭শে ডিসেম্বর জাতীয় সঙ্গীতের পর কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন আরম্ভ হ'ল। শুনলাম যে বিষয় নির্বাচনী সভায় শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের সঙ্গে স্যর ফিরোজ শাহ মেহেতার স্বদেশী ও বয়কট প্রস্তাব সম্পর্কে খুব তর্ক বিতর্ক হয়েছিল।

পরলোকগত নেতাদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশের পর বিভিন্ন প্রস্তাব আলোচনান্তে গৃহীত হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীদের উপর অত্যাচরবিষয়ক সম্বন্ধে কয়েকজন ভাষণ দিলেন। এই দিনের একটি ঘটনা

আমার বিশেষ করে মনে আছে। মস্তকে পাগড়ি, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষাল তৎকালীন প্রচলিত পদ্ধতিমত ইংরাজিতে বক্তৃতা না দিয়ে দিলেন বাংলাতে।

কতকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর সেদিনকার মত সভার অধিবেশন শেষ হয়।

২৮শে ডিসেম্বর যথারীতি 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের পর সভার তৃতীয় দিনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। এইদিন গাইকোয়াড়ের মহারাজা তাঁহার প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে কংগ্রেসের অধিবেশনে উপস্থিত হয়ে সমবেত জনতা কর্তৃক অভ্যর্থিত হলেন।

এই দিন প্রথমেই ঢাকার নবাব খাজা সলিমুল্লার ভ্রাতা নবাব খাজা আতিকুল্লা বঙ্গভঙ্গ রদ করার প্রস্তাব উত্থাপিত করে বললেন যে, পূববঙ্গের মুসলমানগণ বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করে না, কেবল মুষ্টিমেয় কয়েকজন মুসলমান স্বার্থের কারণে বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করছে। এই প্রস্তাবের সমর্থনে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতায় সভায় জনমণ্ডলীকে মুগ্ধ ও অভিভূত করলেন।

ইহার পর যশোহরের স্বনামখ্যাত নেতা শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয় সুপ্রসিদ্ধ 'বয়কট' (বিদেশী দ্রব্য বর্জন) প্রস্তাব পেশ করলেন। প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বললেন যে, এই প্রস্তাব শুধু পণ্য বর্জনেই আবদ্ধ থাকবে না, পূববঙ্গের গভর্ণমেন্টের সঙ্গে সর্বপ্রকার সংশ্রব ও অবৈতনিক (অনারারী) পদসমূহ বর্জন করতে হবে এবং কেউ যেন ছোটলাটের সঙ্গে আইন সভায় সহযোগিতা না করে। বিপিনবাবুর বক্তৃতা সভায় বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল। অন্যান্য প্রদেশের নেতারা অভিমত প্রকাশ করলেন যে, বয়কট আন্দোলন যেন বঙ্গদেশেই সীমাবদ্ধ থাকে। এই প্রসঙ্গে বক্তৃতা দিতে উঠে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহাশয় বললেন যে, কংগ্রেস বিপিনবাবুর মত মেনে নিতে পারে না। এতে দর্শকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিল এবং তারা মালব্যজীর বক্তৃতার সময় বাধা দিতে লাগল। বিরোধিতার মধ্যে তিনি ধীর-স্থির ভাবে দণ্ডায়মান থেকে তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন। শ্রীযুক্ত গোখলের সমর্থনের পর প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর সভাপতি মহাশয় কিছু সময়ের জন্য বাহিরে গেলেন। সেই সময় ভূতপুর্ব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

অন্যান্য প্রস্তাব গৃহীত হবার পর স্বদেশী সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ নেতা রাও বাহাদুর আনন্দ চার্লু এই প্রস্তাব উপস্থিত করেন এবং পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, মহারাষ্ট্রকেশরী বালগঙ্গাধর তিলক, পাঞ্জাবের স্বনামধন্য নেতা লাজপত রায় এবং আরও কয়েকজন এই প্রস্তাব সমর্থন করার পর প্রস্তাবটি কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত হয়।

২৯শে ডিসেম্বর চতুর্থ দিনের অধিবেশন হয়। এদিনেও কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশন নাগপুরে আহূত হ'ল। এরপর সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী ও ভূতপূর্ব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ মহাশয় ওজস্বিনী ভাষায় সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় তাঁর বিদায় অভিভাষণে বললেন যে, কংগ্রেস দেশের সম্মুখে 'আত্মশাসন' বা স্বরাজের যে সুনির্দিষ্ট পন্থা স্থাপন করল তা যেন দেশের তরুণদের মনে পৌছায়।

সভাপতির অন্তিম ভাষণের পর কংগ্রেসের দ্বাবিংশ অধিবেশন সমাপ্ত হ'ল।

এই অধিবেশনে স্বায়ত্বশাসন সম্পর্কে একটি প্রস্তাবে আইন সভাগুলিতে অধিক সংখ্যক ভারতীয় প্রতিনিধি-নির্বাচনের দাবি করা হয়। এই প্রস্তাবের একটি ধারায় অনুন্নত শ্রেণীর জন্য আসন সংরক্ষণের দাবি ছিল। প্রস্তাবটি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় কর্তৃক উত্থাপিত ও যথারীতি সমর্থিত হওয়ার পর মিঃ মহম্মদ আলী জিন্না মূল প্রস্তাব থেকে শাসন সংরক্ষণের (Reservation of Seats) ধারাটি বর্জন করার জন্য একটি সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থিত করেন এবং মিঃ আবদুল কাসিম ও হাকিজ আবদুর রহিম উক্ত সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন করেন। ফলে কংগ্রেস কর্তৃক সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার ফলে মূল প্রস্তাব থেকে শাসন সংরক্ষণের ধারা বর্জিত হ'ল। অদৃষ্টের পরিহাস এই যে, যে জিন্না সাহেবের মাধ্যমে এই প্রকার সম্পূর্ণ জাতীয়তামূলক অসাম্প্রদায়িক প্রস্তাব গৃহীত হ'ল সেই জিন্না সাহেবেরই দ্বিজাতি-তত্ত্বের অবতারণা করে ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করলেন। (৩)

(•) এই বিবরণে যে-সকল ঘটনা লিপিবদ্ধ হ'ল তা অধিকাংশই আমার স্মৃতি হ'তে লিখিত। বাকি অংশ কংগ্রেস রিপোর্ট হ'তে গৃহীত।

সতীশের সংসার

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

বালীগঞ্জে বাস করলেও অনেকদিন পরে শ্যামবাজার এসেছি। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে, আমার পক্ষে ট্রাম বা বাসের হাতল ধরে দক্ষিণ কোলকাতা থেকে উত্তর কোলকাতা আসা দাক্ষিণাত্য থেকে উত্তরাপথে আসার মতই কঠিন হয়ে উঠেছে। তবু আজ বিশেষ দরকারে আসতে হয়েছে। পাঁচ মাথায় নেমে আর. জি. কর রোড ধরে চলেছি এমন সময় পিছন থেকে কে যেন চেঁচিয়ে ডাকল "এই"। থমকে দাঁড়িয়ে ফিরলাম, দেখি দু'হাতে দুটো আনাজপাতি ঠাসা থলে নিয়ে টাক মাথা, বেঁটে প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে হাসছেন। মুখখানা চেনা মনে হ'ল না। ভুল হয়েছে কি না ভাবছি এমন সময় ভদ্রলোক হো হো করে হেসে উঠলেন। মুখ চিনতে না পারলেও হাসি যেন চিনতে পারলাম, ভয়ে ভয়ে বললাম—"সতীশ!" ভদ্রলোক এইবার কাছে এগিয়ে এসে বললেন "ওরে রামচন্দ্র, তোকে দূর থেকে দেখেই আমি চিনেছি, তুই কিন্তু আমাকে চিনতে পারিস নি।" সত্যিই চিনতে পারি নি, অথচ সতীশ আর আমি সিটি কলেজে একসঙ্গে বি. এ পর্যন্ত পড়েছি, দীর্ঘকাল এক মেসে এক ঘরে থেকেছি। অসম্ভব পরিবর্তন হয়েছে ওর মুখের, টাক পড়েছে, লম্বা মুখখানা গোল হয়ে গেছে, অথচ গলার আওয়াজ ঠিক আগের মতই আছে। গলার আওয়াজেই ওকে চিনলাম। কি বন্ধুত্বই ছিল দু'জনে। আমার নাম রামপ্রসাদ সেন, ও আমাকে ডাকত রামচন্দ্র ব'লে। অনেকদিন পরে ওকে দেখলাম, আনন্দের আতিশয্যে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলাম। সতীশ হাসতে লাগল, বলল, "আমি কি করি বলত, আমার দুটো হাতই যে আটকা, আলিঙ্গন একতরফা হ'ল যে?" তাকে ছেড়ে দিয়ে বললাম, "তা হোক, এখন বল্ কেমন আছিস্, কি করছিস্।" সতীশ বলল, "চাকরি, চাকরি, শতকরা ৯৯ জন বাঙ্গালী যা করে। তুই ত ল' পাশ করেছিস শুনেছিলাম, ওকালতি করছিস নাকি? ওঃ, কতকাল পরে দেখা হ'ল বল ত? বি. এ. পাশ করে আমি চ'লে গেলাম বেরিলী, কোন্ বছর বি. এ. পাশ করলাম তাও ভুলে গেছি।" হো হো করে হেসে ওঠে সতীশ। বললাম, "১৯৩২ সালে রে।" মাথা নেড়ে সতীশ বলল, "ও", তার পরে তোর সঙ্গে দেখা হয় নি। চল, চল, বাড়ী গিয়ে সব শুনবো, এই কাছেই আমার বাড়ী, ভবনাথ সেনের লেনে।" বললাম "না ভাই, এখন ত যেতে পারব না, একটা বিশেষ কাজে এ পাড়ায় এসেছি।" "তা হ'লে কবে আসবি বল?" বললাম, "রবিবার ছাড়া ত আসতে পারব না। সামনের রবিবারে আসব।" সতীশ বললো "আসবি কিন্তু নিশ্চয় আসবি, ২৩৩ নম্বর ভবনাথ সেনের লেন।" বললাম "আসব।" থলে দুটো নিয়ে সতীশ ভিড় ঠেলে চ'লে গেল।

অনেকদিন পরে হঠাৎ সতীশকে দেখে পুরণো কথা একে একে মনে পড়তে লাগল। সতীশ পড়াশুনোয় ভাল ছিল আবার মুগুর ভাঁজত, কুস্তিও লড়ত। মারামারি থেকে সুরু ক'রে সাগরের মেলার ভলেন্টিয়ারী পর্যন্ত সব রকম কঠিন কাজে সবার আগে সে এগিয়ে যেত। চুপ ক'রে ব'সে থাকতে পারত না, সুস্থ-সবল দেহের স্ফূর্তিতে তরুণ প্রাণের প্রাচুর্যে সবসময় যেন টলমল করত। মনে পড়ল তার বিয়ে করার ব্যাপারটা। সে এক অদ্ভুত কাণ্ড। সে বছর বি. এ. পরীক্ষা দেবে, ঝড় আর বন্যায় মেদিনীপুরের অনেক গ্রাম ভেসে গেল, রামকৃষ্ণ মিশনের ভলান্টিয়ারদের সঙ্গে আর্তত্রাণ করতে বেরিয়ে পড়ল। মাস খানেক পরে যখন ফিরে এল তখন সঙ্গে নিয়ে এল একটি অনাথা তরুণীকে। বন্যায় তার পরিবারের আর সবাই ভেসে গিয়েছিল। আমরা বললাম, "ওকে আনলি কেন?" বলল, "কেউ ত নাই ওর, তা ছাড়া আমিই ওকে বাঁচিয়েছি, বানের জলে ভেসে যাচ্ছিল, ভীষণ স্রোত ঠেলে সাঁতরে গিয়ে আমি ওকে টেনে ডাঙ্গায় তুলেছি।" মেয়েটাকে নিয়ে রাখল ওর মাসীর বাড়ীতে। কিছুদিন পরে শুনলাম সতীশ তাকে বিয়ে করবে। আমরা আপত্তি করলাম, বললাম, "কার মেয়ে, কি জাত, কিছু জানিস নে, তুই বামুনের ছেলে তুই ওকে বিয়ে করবি কিরে?" জবাব দিল "বলেছে ও বামুনের মেয়ে" রেগে বল্লাম "বামুনের মেয়ে কিছুতেই নয় - মুসলমানও হ'তে পারে।" হেসে সতীশ বলল, "যে

হোক না, বামুনের সঙ্গে বিয়ে হ'লে বামুন হয়ে ।" অকাট্য যুক্তি, নিরুত্তর হয়ে গেলাম। বিয়ে গেল কিন্তু সতীশের বাবা মা মানবেন কেন, বউকে রে নিলেন না। আমরা বললাম, "এবার কি করবি ?" বলল, "আমার বোঝা আমিই বইব।" কিছুদিন পরে বি. এ. পাস করে বেরিলীতে চাকরি পেয়ে বউ নিয়ে চলে গেল। ষ্টেশনে গিয়ে আমি গাড়িতে তুলে দিলাম। সেই শেষ দেখা, তার পরে আজ হঠাৎ কতকাল পরে দেখা হ'ল।

সতীশের প্রতি সত্যিই একটা প্রাণের টান ছিল তাই রবিবার আসতেই মন উসখুস করতে লাগল. বিকেল হতেই শ্যামবাজার রওনা হলাম। যথাসময়ে নবনাথ সেনের ২৩৩ নম্বর বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালাম। দরজা বন্ধ, কড়া নাড়লাম। দরজা খুলে দিল একটি যুবক, প্রশ্ন করল, "কাকে চান ?" বললাম, সতীশবাবুকে চাই, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী।" যুবক বলল, আসুন।" ভিতরে ঢুকলাম, পাশের একটা ঘরে গিয়ে বসলাম, বসে বসে দেখতে লাগলাম—ঘরটি বেশ সাজান, দামী সোফা সেট, দেয়ালে ছবি, একপাশে ফোন। ভাবছি জীবন-সংগ্রামে সতীশের হার হয় নি মন সময় "কোথায় রে রামচন্দ্র" ব'লে হুঙ্কার দিয়ে রে ঢুকল সতীশ। হাসতে হাসতে সামনে এসে হাত রে টেনে তুলে বলল, "এখানে নয়, চল, ভিতরে গিয়ে সি। ওঃ কতকাল পরে তোকে পেলাম, কত ভালই লাগছে!" টানতে টানতে নিয়ে গেল অন্দরের কটা ঘরে, খাটের উপর বিছানা পাতা, সেদিকে লে দিয়ে বলল, "আরাম করে হাত-পা ছড়িয়ে বস।" সলাম। সিগারেট কেস আর দেশলাই এগিয়ে দিয়ে লল, "তখন ত খেতিস, এখন খাস কি না জানিনে, কটু বয়স হ'লে অনেকে সাধু হয়।" একটা সিগারেট নিয়ে সতীশকে নিশ্চিন্ত করলাম। সতীশ খুসী হয়ে হসে উঠল, তার পরে হাঁক দিল "ওরে নরেন, ও বৌমা, কাথায় রে ডলি, সরলা কোথায়, আয়, আয়, রামচন্দ্রকে াণাম কর এসে।" একে একে তারা এসে ঘরে ঢুকল। তীশ বলল, "এ নরেন, আমার ভাইপো, ব্যবসা করে, কটা ছোট প্রেস কিনে দিয়েছি, ভালই চালাচ্ছে; ার এইটি বৌমা, যেমন রূপ তেমন গুণ, আমার কি াগ্যি যে এমন লক্ষ্মী বৌ পেয়েছি; আর এইটি াতনী, নাম ডলি, দেখছ ত কেমন প্লাষ্টিকের পুতুলের মত দেখতে। চার বছরের নাতনী ফোঁস করে উঠল, বলল, "না, আমি প্লাষ্টিকের পুতুল নই, আমি ননীর পুতুল।" সতীশ তাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বলল, "বেশ, বেশ, তুমি ননীর পুতুল, এইবার নতুন দাদুকে প্রণাম ক'র ত।" ডলি বিছানায় উঠে পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল, নরেন ও বৌমা এসে প্রণাম করল। সতীশ হাঁকল, "বউমা।" বউমা এগিয়ে এসে বলল, "কি জ্যেঠামশাই ?" সতীশ হাত নেড়ে বলল, "যাও বউমা, খাবার করে নিয়ে এস, লুচি, আলুর দম, মামলেট, রাবড়ি। রামচন্দ্র এ সব খেতে ভালবাসে, আর নিয়ে এস গোটা বার সন্দেশ, জেনে রাখ রামচন্দ্র ছিল আমাদের মেসের নাম-করা খাইয়ে।" খাবারের দীর্ঘ তালিকা শুনে আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম, বললাম, "কি যে বলিস সতীশ, আমি ও সব কিছু খাব না!" অবাক হয়ে সতীশ বলল, "কি হ'ল তোর বলতো, অত খেতে পারতিস এখন কিছুই খেতে পারিসনে ?" বললাম, "না মশায়, খেতে পারিনে, বয়স হয়েছে সেটা ভুলে যাচ্ছিস কেন ?" হেসে ফেলল সতীশ, বলল, "বয়স যে হয়েছে সেটা ভুলে যাওয়াই ত ভালরে।" বললাম, "অম্বলের ব্যথা ভুলতে দেয় কোথায়!" বৌমা আস্তে আস্তে বলল, "কিছুই খাবেন না ?" বললাম, "না খেলেই ভাল হ'ত, তোমরা যখন বলছ তখন এক পেয়ালা চা আর দুখানা বিসকিট নিয়ে এস।" শুনে চোখদুটো বড় বড় করে সতীশ বলল, "অ্যাঁ, দুখানা বিসকিট! না বৌমা, যা যা বলেছি সব নিয়ে এস।" হুকুম শুনে বৌমা হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। হঠাৎ সতীশ আবার হাঁক দিল, "সরলা, সরলা এলিনে!" হাঁক শুনে ঘরে ঢুকল নিরাভরণা, থান কাপড়-পরা পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের একটি মেয়ে, ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে পায়ে হাত দিয়ে আমাকে প্রণাম করল। সতীশ বলল, "এটি আমার কন্যা, আমার সরলা মা।" মেয়েটি মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকল। দেখে আমার মনটা কেমন করে উঠল। সতীশ বলল, "কৃষ্ণচন্দ্র কোথায়? যা মা নিয়ে আয় তাকে, তোর কাকাবাবুকে দেখিয়ে দে।" সরলা মৃদুগলায় বলল, "খোকা ঘুমুচ্ছে বাবা।" "ঘুমুচ্ছে? আচ্ছা আমি তাকে তুলে নিয়ে আসছি"—এই বলে সতীশ বেরিয়ে গেল, একটু পরে একটি ঘুমন্ত শিশুকে কোলে ক'রে বিছানার উপর শুইয়ে দিল। দেখলাম ছেলেটি কষ্টি পাথরের মতই কাল, কৃষ্ণচন্দ্র নাম তার সার্থক হয়েছে।

আদর আপ্যায়ন, প্রণাম ও পরিচয়ের ফাঁকে ফাঁকে

আমার মনে হচ্ছিল গৃহকর্ত্রী কোথায়, তাঁকে ত দেখছি না। জিজ্ঞাসা করব এমন সময় দেয়ালে টাঙ্গান একখানা বড় ছবির দিকে নজর পড়তেই চিনলাম এই ত সেই। তিরিশ বছর আগে দেখলেও মুখখানা মনে ছিল। সতীশকে বললাম, "ছবিখানা বুঝি তোর—।" কথা শেষ করবার আগেই সতীশ বলল, "হ্যাঁ রে, আমার স্ত্রীর। মনে নেই তোর, বিয়ের পর তুই-ই ত ফটো তুলেছিলি!" এতক্ষণে মনে পড়ল ফটো আমি তুলে দিয়েছিলাম। সতীশ বলতে লাগল, "বিয়েতে তোরা বাধা দিয়েছিলি, কত ভয় দেখিয়েছিলি, কিন্তু আমি ত জানি কি জিনিসই পেয়েছিলাম। সে ছিল স্বর্গের দেবীরে, তাই বেশীদিন এ পৃথিবীতে থাকল না। দু'বছর বেরিলীতে ছিলাম, একটা ভাল চাকরি পেয়ে কলকাতা ফিরে এলাম। এখানে আসবার বছর খানেক পরেই সে মারা গেল, স্বর্গের দেবী স্বর্গে চলে গেল।" এই ব'লে সতীশ ছবির দিকে মুগ্ধনেত্রে তাকিয়ে থাকল।

একরাশ খাবার নিয়ে বৌমা ঘরে ঢুকল। সতীশের মন অতীত থেকে বর্তমানে ফিরে এল। সে খুশী হয়ে বসল, "সব এনেছ ত—দাও সামনে সাজিয়ে দাও।" আমাকে ঠেলে দিয়ে বলল, "আয় ভাই, উঠে আয়।" বললাম, "আমি অত খেতে পারব না।" "পারবি, পারবি" বলে সতীশ পাশে এসে বসল। খেতে বসলাম। কানের কাছে মুখ দিয়ে সতীশ বলল, "এইবার তোর কথা কিছু বল, প্র্যাকটিস্ কেমন জমেছে, ক'টি ছেলে, মেয়ে ক'টি?" তিরিশ বছরের ইতিহাস সংক্ষেপে ব'লে গেলাম।

খাওয়া শেষ করে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বসেছি, সতীশ হাঁক দিল, "বৌমা, ডলিকে নিয়ে এস।" ডলির হাত ধ'রে বৌমা এল। সতীশ ডলিকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বলল, "নতুনদাদুকে একটু নাচ দেখিয়ে দাও, তোমার নাচ দেখতেই নতুন দাদু আজ এসেছে।" ডলি তার ছোট্ট একটি পা তুলে বলল, "আমার ঘুঙুর নেই।" সতীশ বলল, "তাতে কি, ঘুঙুর না থাকলেও তুমি বেশ নাচতে পার।" ডলি মাথায় হাত দিয়ে বলল, "আমার চুলে মালা নেই।" সতীশ হো হো করে হেসে উঠল, বলল, "সন্ধ্যাবেলা মালা এনে দেব, এখন অমনি একটু নেচে দেখিয়ে দাও।" ডলি ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাত দু'খানা নাচের ভঙ্গিতে উঁচু ক'রে হঠাৎ ব'লে বসল, "মা না গাইলে আমি নাচব না।" সতীশ হাঁকল, "বৌমা।" বৌমা একটা রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতে লাগল, ডলি নাচতে লাগল। খুব ভাল লাগল আমার, সতীশকে বললাম, "তোর সংসার দেখে হিংসে হচ্ছে রে, এ যে আনন্দের হাট।" শুনে সতীশ হাসতে লাগল।

সন্ধ্যা হয়ে এল, আর বসা চলে না, বললাম, "এবার যেতে হবে রে।" সতীশ হাত চেপে ধরে বলল, "আর একটু বোস।" বললাম, "নারে, আর বসব না, দূরের পাল্লা যেতে হবে, আজকের মত উঠি।" ডলিকে কোলে তুলে নিয়ে উঠে পড়লাম। সতীশ বলল, "আর একদিন আসিস।" বললাম, "আমি ত আসব, তুই আমার ওখানে কবে যাচ্ছিস বল—যেতে হবে একদিন।" "ওরে বাপরে", বলে উঠল সতীশ, "আমার যে ভাই এক মিনিট ফুরসুৎ নাই, দেখছিস ত সংসারের খুঁটিনাটি সব আমাকে দেখতে হয়, এরা ছেলেমানুষ, গুছিয়ে একটা কাজও করতে পারে না। বললাম, "আমার ভাই উল্টো, সংসারের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই।"

দোরগোড়ায় এসে ডলিকে বললাম, "একদিন দাদুর সঙ্গে আমার বাড়ী এস দিদি," ডলি বলল, "তুমি এস।" কচি হাত দু'টি ধ'রে বললাম, "তুমি গেলে তবে আসব।" গম্ভীর হয়ে ডলি বলল, "তা হ'লে চিঠি লিখ।" কথা শুনে হেসে ফেললাম, বললাম, "চিঠি লিখব, তোমার নাম-ঠিকানা বলে দাও।" ডলি বলল "পুষ্প সরকার, ২৩৩ নম্বর ভবনাথ সেনের লেন।" অবাক্ হয়ে সতীশের মুখের দিকে তাকালাম। সতীশ একটু হাসল, বলল, "চল তোকে বাসে তুলে দিয়ে আসি।"

পথে বেরিয়ে সতীশ হাসতে লাগল তারপরে আমার কাঁধের উপর হাত রেখে বলল, "ঐ দেখ, তোকে বলা হয় নি। শোন বলি, যখন বেরিলীতে কাজ করতাম তখন নিতাই সরকার বলে আমার একজন বাঙ্গালী আরদালী ছিল, গরীব মানুষ, বউ আর ছোট একটা ছেলে নিয়ে আমার বাড়ীতেই থাকত। হঠাৎ কলেরায় আরদালী আর তার বউ দু'জনেই মারা গেল। ছেলেটার কি গতি হবে, বউকে বললাম, "তুলে নাও, ভগবানের দান।" ছেলেটা আমাকে জ্যেঠামশায় বলত। এখনও তাই বলে। আর ঐ যে সরলা, বড় ভাল মেয়ে, ওকে পেলাম বেয়াল্লিশের দুর্ভিক্ষের সময়। একটু ফ্যান চাইতে এল, কচি বয়েস, কঙ্কালসার চেহারা, চলতে পারে না। জিজ্ঞাসা করলাম, "কে আছে তোর?" বলল "কেউ নাই,

য়ে হয়েছিল, স্বামী মরে গেছে। বললাম, "থাকবি ামার কাছে? বলল, হ্যাঁ বাবা, থাকব। সেই বাবা বলল, আজও তাই বলে।" চলতে চলতে থেমে লাম, বললাম "তা হ'লে তোমার কৃষ্ণচন্দ্র?" হো হো রে হেসে উঠল সতীশ, বলল, "ওকে পেলাম সেদিন রে, বারকার হাঙ্গামায় পদ্মার পার থেকে যে জনস্রোত ভাগীরথীর পারে এসে ঢলে পড়ল তাতেই ভেসে এল কৃষ্ণচন্দ্র।" সতীশের হাসিভরা মুখের দিকে অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকলাম।

একটা ধাক্কা দিয়ে সতীশ বলল, "ঐ তোর বাস এসে পড়েছে।" যখন বাসে গিয়ে উঠলাম তখন চোখে ঝাপ্সা দেখছি।

—•—

জড়শক্তি ও আত্মিক শক্তি

দৈহিক বা জড়ীয় শক্তিতেই কাজ হয়, বুদ্ধিবল, চরিত্রবল, আত্মিক শক্তিতে কিছু হয় না; কিংবা বুদ্ধিবল, চরিত্রবল, আত্মিক শক্তিতেই সব হয়, দৈহিক বা জড়ীয় শক্তিতে কিছু হয় না; ইহার মধ্যে কোনটিই সম্পূর্ণ সত্য প্রকাশ করে না। জগতের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ দৈহিক শক্তিতে ভীম ছিলেন না, কিন্তু যদি তাঁহারা ক্ষীণজীবী, চিররুগ্ন হইতেন, তাহা হইলে সত্যপ্রচার তাঁহাদের দ্বারা হইত না। বড় বড় গ্রন্থকার, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। বাষ্পীয় কলের সৃষ্টির আগে মানুষকে নিজের হাতে যত কাজ করিয়া নানা শিল্পদ্রব্য গড়িতে হইত, এখন ততটা হয় না। কিন্তু এখনও কলকারখানার অল্পবুদ্ধি অশিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান শিক্ষিত কর্ম্মীদের মধ্যে প্রভেদ আছে, দুর্ব্বল ও বলিষ্ঠ কর্ম্মীদের মধ্যেও তদ্রূপ প্রভেদ আছে। বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলের মজুরেরা যে ল্যাঙ্কেশায়রের কাপড়ের কলের মজুরদের চেয়ে কম কাজ করিতে পারে, তাহা কেবল জলবায়ুর প্রভেদ বা শিক্ষার তারতম্যের জন্য নহে, শারীরিক বলের প্রভেদও তাহার একটা কারণ। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও দৈহিক এবং আত্মিক উভয় শক্তিরই প্রয়োজন লক্ষিত হয়। শারীরিক শক্তিতে পাঠানরা ইংরেজদের চেয়ে, আরবেরা ইটালীয়দের চেয়ে বা তুর্কিরা গ্রীকদের চেয়ে হীন নয়। কিন্তু তাহারা যুদ্ধে হারিয়াছে এইজন্য যে বুদ্ধি, শিক্ষা, কাজের শৃংখলা, আয়োজন, আধ্যাত্মিক শক্তি এবং শারীরিক শক্তি সব একত্র করিলে তাহারা হীন। তীতুমীরের লড়াইয়ে কোন ফল হয় নাই, ক্রমওয়েলের লড়াইয়ে ফল হইয়াছিল। রাষ্ট্রীয়-অধিকার-প্রার্থিনী সফ্রেজেটদিগের উপদ্রবে ও ধমকে এখনও কোন ফল হয় নাই, কিন্তু আয়র্লণ্ডের স্বায়ত্তশাসনবিরোধী সর্ এডওয়ার্ড কার্সন এবং তাঁহার দলের ধমকে কাজ হইয়াছে।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বৈশাখ, ১৩২১।

বৈষ্ণবপদাবলীতে অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব

শ্রীযোগীলাল হালদার

অবনত আনন কএ হম রহ লিহুঁ
বারল লোচন-চোর।
পিয়া-মুখ-রুচি পিবএ ধাওল
জনি সে চাঁদ চকোর॥
ততহুঁ সঞো হঠে হটি মোঞে আনল
ধএল চরণ রাখি।
মধুপ মাতল উড়এ ন পারএ
তইঅও পসারএ পাঁখি॥
মাধব বোলল মধুর বাণী
যে শুনি মুহু মোঞে কান।
তাহি অবসর ঠাম বাম ভেল
ধরি ধনু পাঁচ বাণ॥
তনু-পসেবে পসাহনি ভাসলি
পুলক তৈখন জাগু।
চুনি চুনি ভএ কাঁচুঅ ফাটলি
বাহু-বলয়া ভাগু॥
ভণ বিদ্যাপতি কম্পিত করহো
বোলল বোল না যায়—
রাজা শিব সিংহ রূপনারায়ণ
শ্যামসুন্দর কায়॥

সাধক-কবি বিদ্যাপতি এখানে পরকীয়া ভাবে আবিষ্ট হয়ে মধুর রসাশ্রিত পূর্বরাগের এই পদটিতে অতীন্দ্রিতত্ত্বের সার্থক পরিণতি দিয়েছেন। ভক্তকবি ভগবানকে প্রেমিক পুরুষরূপে গ্রহণ করেছেন। ভগবানের অনন্ত রূপ এখানে অনুপস্থিত, তার পরিবর্তে তিনি শান্তরূপে ভক্তহৃদয়ে আবির্ভূত। এখানেও সেই জটিলা কুটিলা। জড় সংসাররূপ স্বামী আয়ান তাঁকে আদৌ সুখ দিতে পারে না। তাই সংসারে থেকেও নেই। মন পড়ে আছে প্রাণবঁধুর দিকে। কিন্তু উপায়! পথ মিলছে না। সদা ভয়। পাছে লোকে কিছু বলে। চারিদিকে লোকের দৃষ্টি। সেই দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে তবে ত প্রাণবঁধুকে প্রাণ ভরে দেখে নিতে হবে। কিন্তু কই সে সুযোগ। হায় রে সংসার! এখানে ভক্তিপথের বহু বাধা। যেখানে সকলে অসার সংসার নিয়ে ব্যস্ত, সংসার ছাড়া আর কিছু ভাববার যেখানে বিন্দুমাত্র অবসর নেই, অর্থই যেখানে একমাত্র কাম্যবস্তু, আর সেই অর্থের জন্য যে-কোন কাজ করতে তারা দ্বিধাবোধ করে না, মনেও ভাবে না যে—অর্থ সঙ্গে আনে নি অথবা অর্থ সঙ্গে নিয়েও যেতে পারবে না, তবু যে-কোন প্রকারে অর্থ লাভে সচেষ্ট। সেখানে কেহ যদি সাধনমার্গে চলতে চেষ্টা করে, তবে সেই ভিন্নপথের পথিককে নানা বিদ্রূপ বাণে জর্জরিত হ'তেই হবে। তাই ভক্তের সদা এই ভয়-ভাব। লোকভয় সত্যই ভক্তিপথের বড় বাধা।

অথচ—অথচ ভক্তের গন্তব্য পথই ঐ ভক্তিপথ। যে-কোন প্রকারে ঐ পথে যেতেই হবে। তাই লুকোচুরির আশ্রয়। এ ছাড়া সংসারে আর উপায় কি? রাধারূপী ভক্তের তাই বড় সমস্যা। প্রাণবঁধু কৃষ্ণকে দেখবার জন্যে প্রাণে এসেছে আকুলতা। কিন্তু বাধা লোকভয়। চোখ শাসন মানে না। প্রতি তৃণে, গুল্মে, পত্রে-পল্লবে শ্যামসুন্দরকে দেখতে পাচ্ছে। অথচ সংসার-বন্ধন ছেদনের উপায় নেই। এই টানাপোড়েনে প্রাণ কণ্ঠাগত। লোক-লজ্জার ভয়ে প্রাণ ভ'রে পৃথিবীর শ্যাম-শোভার মধ্যে শ্যামসুন্দরকে দেখবার উপায় নেই। পাছে কেউ আকুল চোখের দৃষ্টি দেখে ফেলে। এই ভয়ে ভক্ত আপন মুখখানা নিচু করে রাখে। কিন্তু যে চোখে একবার শ্যামরূপ দেখেছে অনন্ত শ্যাম-শোভার মাঝে সে চোখ বাধা মানবে কেন? চকোর যেমন চাঁদের সুধা পান করবার জন্য ছুটতে থাকে, ভক্তের চোখ দু'টিও ঠিক তেমনি প্রাণবঁধুর শ্যামরূপ দেখবার জন্য চারিদিকে ছুটতে লাগল। কিন্তু সেই জটিলা-কুটিলার ভয়, ভয় সেই লোকলজ্জার। সংসারে নানা বাধা। ভক্ত কিছুতেই ভগবানকে ভাববার সময় পায় না, তথাপি ভগবানের জন্য তার

প্রাণ আকুলি-বিকুলি করতে থাকে। মাঝে মাঝে যে-কোন অসতর্ক মুহূর্তে ভগবানের বংশীধ্বনি শ্রবণে প্রবিষ্ট হয়, আর তখনই শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥
সই, কি আর বলিব।
যে পণ কর্যাছি মনে সেই সে করিব॥
রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে।
বল কি বলিতে পারি যত মনে উঠে॥
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা॥
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু ধার।
লহু লহু হাসে পহুঁ পিরীতির সার॥
গুরু গরবিত মাঝে রহি সখী সঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম পর সঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥
ঘরের যতেক সবে করে কানাকানি।
জ্ঞান কহে লাজ-ঘরে ভিজাই আগুনি॥

ভক্ত-কবি জ্ঞানদাস এখানে পরকীয়া ভাবে ভাবিত হয়েছেন। মধুর রসাশ্রিত পূর্বরাগের এই পদটি অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। রাধা-ভাবে ভাবিত কবির পূর্ণ আত্মসমর্পণের আকুতি প্রকাশ পেয়েছে এই কবিতায়। কবির অন্তরে অন্তরময় রূপে ভগবান্ বিরাজিত। তাই পার্থিব জগতের সর্বত্র তিনি শ্যামসুন্দরের শ্যামরূপ দেখছেন। দেখে তাঁর আশ মিটছে না। আনন্দাশ্রু উপচিয়ে পড়ছে চোখ দিয়ে। আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হচ্ছে না ব'লে প্রাণ তাঁর অস্থির। ক্ষণে ক্ষণে দর্শন ও স্পর্শের আশায় তাঁর শরীর এলিয়ে পড়ছে। কখন কখন তিনি ভগবানের হাসিমুখখানি যেন তাঁর সমুখে দেখতে পাচ্ছেন। গুরুজনদের কাছে থেকেও তাঁর হুঁশ নেই, তাই মাঝে মাঝে তাঁর দেহে অকারণ-অবারণ পুলকের সঞ্চার হয়। নয়নে আনন্দাশ্রু আসে। পুলক ও অশ্রু গোপন করবার জন্য তিনি কত চেষ্টাই না করেন। কিন্তু তাঁর সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। আর আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও গুরুজনের অগোচরে তাঁর সম্বন্ধে তাঁর এই ভাবান্তরে উদ্বেগ প্রকাশ করে কতই না আলোচনা করেন। ভক্ত তাতে লজ্জা পান না।

এমন পিরীতি কভু নাহি দেখি শুনি।
পরাণে পরাণে বান্ধা আপনা আপনি॥
দুহু কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥
জল বিনু মীন যেন কবহুঁ না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে॥
ভানু-কমল বলি সেহো হেন নয়।
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রয়॥
চাতক-জলদ কহি সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা॥
কুসুমে মধুপ কহি সোহ নহে তুল।
না যাইলে ভ্রমর আপনি না দেয় ফুল॥
কি ছার চকোর চান্দ দুহুঁ সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে॥

সাধক-কবি চণ্ডীদাসের এই পদটিও অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মধুর রসাশ্রিত পূর্ব্বরাগের এই পদে কবি ভক্ত ও ভগবানের তথা জীবাত্মা ও পরমাত্মার একাত্ম-ভাবের কথা প্রকাশ করেছেন। রাধাভাবে ভাবিত ভক্ত এবং ভগবানের সম্পর্ক অতীব আশ্চর্যজনক। উভয়ের প্রাণ একসূত্রে বাঁধা, মুহূর্তের অদর্শনও ভক্ত সহ্য করতে পারে না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় অত্যন্ত নিকটে থেকেও নিজেদের মধ্যে বিচ্ছেদ অনুভব করে ভক্ত আকুল হয়ে পড়েন। ভক্ত ও ভগবানের এ এক আশ্চর্য প্রেম! প্রেম রসাস্বাদনের এক অদ্ভুত নিদর্শন। কবিরা সূর্য ও কমলের ভালবাসার কথা ব'লে থাকেন বটে, কিন্তু ভক্ত ও ভগবানের প্রেমের তুলনায় সে ভালবাসা কিছুই নয়; কারণ শীতের সময় পদ্ম যখন মরে যায়, সূর্য তখনও দিব্য সুখে থাকে। যে-প্রেমে একজন আর একজনের সুখ-দুঃখকে নিজের করে নিতে পারে না, সে-প্রেমের সঙ্গে ভক্ত ও ভগবানের প্রেমের তুলনা হ'তে পারে না। মেঘ ও চাতক, পুষ্প ও ভ্রমর, চাঁদ ও চকোর—এদের সম্পর্ক সাময়িক, নিত্যকালের নয়। তাই এদের প্রেমে

দু'জনের সমান আগ্রহ নেই। কিন্তু ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্ক নিত্যকালের। তাই সর্বব্যাপী ভগবানের অত্যন্ত কাছে থেকে, সর্বত্র তাঁর অপরূপ রূপ নিরীক্ষণ করে, বিচ্ছেদের ব্যথা অনুভব করে ভক্ত আকুল হয়ে পড়েন। রাধাভাবে ভাবিত বৈষ্ণব-ভক্তের এই প্রেমের নিদর্শন অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের সারকথা। এই পার্থিব প্রেমের গুহ্যতত্ত্ব অবর্ণনীয়।

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনু- রাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলুঁ
শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥
কত মধু-যামিনী রভসে গোঁয়াইলুঁ
না বুঝনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তবু হিয়া জুড়ন না গেল॥
কত বিদগধ জন রসে অনুমগন
অনুভব কাহু না পেখ।
কহ কবি বল্লভ (বিদ্যাপতি কহ?) প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলিল এক॥

বিদ্যাপতির এই পদটিও অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মধুর রসাশ্রিত পূর্বরাগের এই পদে কবি ভক্ত ও ভগবানের অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা প্রেমের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। রাধাভাবে ভাবিত ভক্তের প্রেমের স্বরূপ বর্ণনাতীত। এ প্রেম জড় পদার্থের মত এক অবস্থায় থাকে না, আবার পুরাতনও হয় না; পরন্তু প্রতি মুহূর্তে নূতনত্ব প্রাপ্ত হয়। যে-প্রেম ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হয়, যে-প্রেম চিরনবীন চিরনূতন,—সে-প্রেমের স্বরূপ শুধু অনুভূতিগ্রাহ্য, অনুভববেদ্য অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের ইহাই চরম ভাব। ভগবান চিরনবীন চিরসুন্দর তাই তাঁর রূপ নয়ন ভরে দেখেও দেখার তৃপ্তি হয় না, প্রতিনিয়ত দেখবার আশা জাগে মনে। আকাশে-বাতাসে সর্বত্র প্রতিনিয়ত সে ধ্বনি ধ্বনিত হচ্ছে তার মধ্যে তাঁরই মধুর স্বর ভক্তের শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট হয়। সেই স্বরের এমনি মোহিনী শক্তি যে, জীবনভোর সে স্বর শুনলেও শোনার আশ মেটে না। লক্ষ লক্ষ যু ভগবানকে হৃদয়ে রেখেও অর্থাৎ ভগবানের স্প হৃদয়ে অনুভব করলেও আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না।

কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করি পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দূতর পন্থ গমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি॥
করযুগে নয়ন মুদি চলু ভামিনী
তিমির-পয়ানক আশে।
কর-কঙ্কন পণ ফণি মুখ-বন্ধন
শিখই ভুজগ গুরু পাশে॥
গুরুজন-বচন বধির সম মানই
আন শুনই কহ আন।
পরিজন বচনে মুগধি সম হাসই
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

গোবিন্দদাসের এই পদটিতে অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের একটি বিশেষ ভাব প্রকাশ পেয়েছে। মধুর রসাশ্রিত অভিসারের এই পদে কবি ভক্ত ও ভগবানের অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রেমের এক অপূর্ব ভাবময়তার সৃষ্টি করেছেন। ভগবানের বাঁশি যে কখন বাজবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। যে-কোন সময়ে কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে সে বাঁশি বাজতে পারে। তখন আর প্রস্তুতির সময় পাওয়া যাবে না। সেই না-প্রস্তুতি অবস্থাতেই বেরিয়ে পড়তে হবে। কোন শিক্ষা না থাকলে তখন সমূহ বিপদ আছে। —তাই সেই অসতর্ক মুহূর্তের জন্য সাবধানী ভক্তের প্রস্তুতি চলছে। যদি কণ্টকাকীর্ণ পথে চলতে হয় তবে সেই পথের কণ্টকে পদতল ক্ষতবিক্ষত হ'তে পারে। সে-জন্য যাত্রায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে। তাই ভক্ত আঙিনায় কাঁটা পুঁতে কণ্টকময় পথে চলার অভ্যাস করছে। বর্ষাকালে পিছল পথে আঁধার রাতে যদি চলতে হয়, তাই ভক্ত নিজ আঙিনায় জল ঢেলে পিছল করে রাত্রি জেগে চোখ বুজে চলার সাধনা

করছে। যদি সেই আঁধার রাতে সাপে কামড়ায় তাই সাপের সমুখে পড়লেও সাপ কোন প্রকার ক্ষতি করতে না পারে তার জন্য সাপের ওঝার কাছ থেকে বিশেষ শিক্ষা লাভ করছে। ভক্তের এই ভাব দেখে গুরুজনে যদি কোন কথা বলে তবে সে তাহা শুনেও শোনে না—যেন সে কালা। সে যে সত্যই কালা এমন ভাব দেখাবার জন্য কখন কখন এক কথার অন্য উত্তর দেয়। অন্য পরিজন যদি ভক্তের এই ভাব দেখে কোন কথা বলে তবে সে বিহ্বলের মত হাসতে থাকে। এমন ভাব দেখায় যেন সে কিছুই বুঝতে পারে নি।

মাধব কি কহব দৈব বিপাক।
পথ-আগমন-কথা কত না কহিব হে
যদি হয় মুখ লাখে লাখ॥
মন্দির তেজি যব পদ চার অওলুঁ
নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ।
তিমির দুরন্ত পথ হেরই না পারিয়ে
পদযুগে বেঢ়ল ভুজঙ্গ॥
একে কুল কামিনী তাহে কুহু যামিনী
ঘোর গহন অতি দূর।
আর তাহে জলধর বরিষয়ে ঝর ঝর
হাম যাওব কোন পুর॥
একে পদ পঙ্কজ (পদ কম্পিত?) পঙ্কে বিভূষিত
কণ্টকে জরজর ভেল।
তুয়া দরশন আশে কছু নাহি জানলুঁ
চির দুঃখ অবদূরে গেল॥
তোহারি মুরলী যব শ্রবণে প্রবেশল
ছোড়লুঁ গৃহ-সুখ-আশ।
পন্থক দুখ তৃণ— হুঁ করি না গণলুঁ
কহতহি গোবিন্দদাস॥

গোবিন্দদাসের এই পদটিতেও অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে। মধুর-রসাশ্রিত অভিসারের এই পদে অভিসার-অন্তে ভক্ত ভগবানের নিকট স্বতঃ-উৎসারিত মনোভাব নিবেদন করছে। সাধনার দুর্গম পথে চলতে ভক্তের যে চরম দুরবস্থা ঘটেছিল, ভগবানের পায়ে সেই অবর্ণনীয় দুঃখের সামান্যতম অংশ নিবেদন করে সে শান্তিলাভ করতে চায়। শান্তিলাভের সেই ত প্রকৃষ্ট পথ। ভক্ত একথা ভালভাবেই জানে। আর জানে বলেই সে অকপটে ভগবানের পায়ে তার হৃদয়ভরা দুঃখ নিবেদন করছে।

ভগবানের দর্শন আশা মনে জাগলে, পার্থিব সুখ-দুঃখের কথা আর মনে স্থান পায় না, সংসার অসার বোধ হয়। কঠিন দুঃখভোগের পর ভক্তের মনোমন্দিরে ভগবানের সঙ্গে তার যে মিলন হয়, সে মিলনের আনন্দ অবর্ণনীয়। জীবনের অনন্ত দুঃখ সেই মুহূর্তে দূর হয়ে যায়। অতীন্দ্রিয়ানুভূতির এই ত চরম প্রকাশ।

সখীর বচনে অথির কান।
বুঝন সুন্দরী তেজল মান॥
অরুণ নয়ান ঝরয়ে লোর।
গদগদ স্বরে বচন বোল॥
কেমনে সুন্দরী মিলব মোয়।
অনুকূল যদি বিধাতা হোয়॥
এত কহি হরি সখীর সঙ্গে।
মিলল রহি আনন্দ-রঙ্গে॥
হেরি বিধুমুখী বিমুখী ভেল।
কানুরে সো সখি ইঙ্গিত কেল॥
চরণ কমলে পড়ল কান।
সখীর বচনে তেজল মান॥
ধনি-মুখ-শশী হরি-চকোর।
হেরিতে দুহুঁক গয়য়ে লোর॥
হৃদয়-উপরে থুওল রাই।
প্রেমদাস তব জীবন পাই॥

প্রেমদাসের এই পদটিতে অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের এক অপূর্ব ভাব প্রকাশ পেয়েছে। মধুর রসাশ্রিত মান-এর এই পদে রাধাভাবে ভাবিত ভক্ত ভগবানের নিকট যে কত প্রিয় কত আপন—যেন অভিন্ন—তা পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে। ভক্ত ও ভগবান্ বা জীবাত্মা ও পরমাত্মা যে এক ও অভিন্ন এ কথা আমরা বহুবার বলেছি। অতীন্দ্রিয়বাদীর মনে সব সময় "সঃ অহম্, অহম্ সঃ"—এই ভাবটি জাগ্রত থাকে। তাঁর ফলে তার মন থেকে 'তিনি'—'আমি'র দূরত্ব দূর হয়ে মনে একীভাব আসে। ভক্ত ভগবানের সঙ্গে পূর্ণ মিলনপ্রয়াসী। কিন্তু ভগবানের সঙ্গে এই মানস-মিলন এখনও সম্ভব হয়

নি। তাই ভক্তের হয়েছে দারুণ অভিমান। সংসারে এরূপ অভিমানের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অভিমান সর্বজনবিদিত। কিন্তু সে মানভঞ্জন যে কত রকমের হয়, কাব্য-সাহিত্যে সব সময় তার পূর্ণ বিবরণ থাকে না। অবশ্য আমাদের আলোচ্য ভগবানের প্রতি ভক্তের এই অভিমান সম্পূর্ণ মানসজ—এবং ইহাই অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের মৌলভাব।

ভাবটি এইরূপ। ভগবানের সঙ্গে মিলনের জন্য ভক্ত অস্থির। কিন্তু অস্থির হ'লে কি হয়? সময় না হ'লে ত তার সঙ্গে মিলনও হ'তে পারে না। ভক্ত তা বোঝে না। তাই এই অভিমান। পরে যখন তার সজাগ মনে-পাতা-আসনে ভগবানের আবির্ভাব হ'ল, তখন ভক্তের দারুণ অভিমান। তাই ভগবানের আবির্ভাবে সাড়া দিল না ভক্ত। তখন ভক্তকে প্রসন্ন করার জন্য ভগবান্ তার পায়ে ধরলেন। এ যেন নিজের পায়ে নিজে হাত দিলেন। এই ত, "সঃ অহম্, অহম্ সঃ।" ভক্তের অভিমান দূর হয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে সে ভগবানকে মনোবেদীতে বসাল। এখানে জয়দেবের প্রভাব পূর্ণ বিদ্যমান। শ্রীগীতগোবিন্দে আমরা পাই—

স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসিমণ্ডনম্।
দেহি পদপল্লবমুদারম। ॥ ৯ ॥ ১০ম সর্গ

সুবাসিত বারি ঝারি ভরি তৈখনে
আনল রসবতী রাই।
দুখানি চরণ পাখালিয়ে সুন্দরী
আপন কেশেতে মোছাই॥

অঙ্গক ধূলি বসনহি ঝাড়ই
অনিমিখে হেরই বয়ান।
তুহুঁ সনে মান করলুঁ বর মাধব
হাম অতি অলপ পরাণ॥

রমণীক মাঝে কতুই শ্যাম-সোহাগিনী
গরবে ভরল মঝু দেহ।
হামারি গরব তুহুঁ আগে বাঢ়াঅলি
অবহুঁ টুটায়ব কেহ॥

সব অপরাধ খেমহ বর মাধব
তুআ পায়ে সোপলুঁ পরাণ॥

গোবিন্দদাস কহ কানু ভেল গদ্ গদ
হেরইতে রাই-বয়ান॥

গোবিন্দদাসের এই পদটি প্রেমদাসের উপরি-উক্ত পদটির ঠিক পরিপূরক। মধুর-রসাশ্রিত মান-এর এই পদে অতীন্দ্রিয়ভাবটি পরিপূর্ণ রূপে প্রকাশ পেয়েছে। ভক্তের অভিমান দূর হয়ে গেছে। তাই এখন ভগবানের সেবায় পূর্ণ আত্মনিয়োগের পালা। কতভাবে এই সেবা। এই সেবা-ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অতীত। ভক্তের একমাত্র কামনা—"যেন তোমার সেবায় রত থাকতে পারি।" এখানে রূপে-অরূপে একাকার হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের কথায়—"রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপরতন আশা করি।" ভক্ত এখানে ভগবানের সাকার রূপের মধ্য দিয়ে অরূপের উপাসনায় রত। তাই সুবাসিত বারির দ্বারা তাঁর চরণযুগল ধুয়ে স্বীয় কেশ দ্বারা মুছিয়ে দিচ্ছে। আপন অভিমানের কৈফিয়ৎ দিতে সে বলছে যে, তিনিই তার গর্ব বাড়িয়ে দিয়েছেন ব'লেই সেই অহঙ্কারে মত্ত হয়ে সে তাঁর উপর অভিমান করেছিল। এখন অনুতপ্ত হৃদয়ে তাই ক্ষমা চাইছে,—যেন শ্যামসুন্দর ক্ষমাসুন্দর চোখে তার দিকে দৃষ্টি দেন। আশা আছে ক্ষমা পাবেই সে।

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥
ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর॥
রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পিরীতি॥
কোন বিধি সিরজিল সোতের শেঁওলি।
এমন ব্যথিত নাই ডাকি বন্ধু বলি॥
বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥
বাঁশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়।
পরের লাগিয়ে কি আপন পর হয়॥

মধুর-রসাশ্রিত আক্ষেপানুরাগের এই পদটিতে দ্বিজ চণ্ডীদাস অতি নিপুণ ভাবে অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন। ভগবানের বংশীধ্বনি ভক্তের কানের মধ্য দিয়ে মর্মস্থলে প্রবেশ করলে ভক্ত যে কিরূপ ভাববিহ্বল হয়,

সাধক-কবি চণ্ডীদাস এখানে তার সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন। ভাববিহ্বল ভক্ত ভগবানকে পাবার জন্য কি না করতে পারে। ভগবৎ-সান্নিধ্য, ভগবৎ-প্রেম লাভের আশায় ভক্ত তার স্বভাব-সংস্কার, আচার-আচরণ এবং এমন কি প্রকৃতির আইন-কানুন পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য করে তার লক্ষ্যপথে অগ্রসর হয়। এর পরেও যখন তাঁর প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করতে অসমর্থ হয়, শুধু তখনই ভক্তহৃদয় ব্যথায় ভরে যায়। ভগবৎ-প্রেমের স্রোতে ভাসমান ভক্ত কুল না পেয়ে তখন অতি অসহায় ভাবে ভেসে চলে। ভগবানকে না পাওয়ার বেদনায় মাঝে মাঝে তার শ্যাম-সমান মরণকে বরণ করতে সাধ হয়।

বঁধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী॥
ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে॥
একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দু'টি কমল পায়॥
না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে
গতি যে নাহিক মোর॥
আঁখির নিমিখে যদি নাহি দেখি
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কয় পরশ রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি॥

মধুর রসাশ্রিত আত্মসমর্পণের এই পদে চণ্ডীদাস অতি চমৎকার ভাবে অতীন্দ্রিয়ভাবের সমাবেশ করেছেন। স্বকীয়া ও পরকীয়া—যে-কোন ভাবে এর ব্যাখ্যা চলতে পারে। নারী যেমন করে তার দয়িতের পদে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে—কিছুমাত্র ফাঁক রাখে না—এখানে ভক্ত ভগবানের পায়ে ঠিক সেইরূপে আত্মসমর্পণ করেছে। ভগবদ্ ভক্ত এখানে মুক্তিপ্রয়াসী নহে। তা ছাড়া বৈষ্ণব-ভক্তেরা মুক্তিপ্রয়াসী হয়ও না। একটি গানের কথা এখানে মনে আসছে। এক বৈরাগীর আখড়ায় অবস্থানকালে গানটি শুনেছিলাম অনেকদিন আগে। কবির নাম বা পূর্ণ গানটি আজ আর মনে নেই। তবু যেটুকু মনে আছে এখানে তার উল্লেখের প্রয়োজন মনে করি। গানটির ঐ অংশে আছে—

মুক্তি চাই না হরি (আমি মুক্তি চাই না)।
চিনি হওয়া চেয়ে চিনি খাওয়া ভালো
দেখিলাম চিন্তা করি (আমি মুক্তি চাই না)।

বৈষ্ণব-ভক্ত শুধু মৃত্যুর পূর্বাহ্নে নহে, জীবনের প্রতি মুহূর্তে ভগবানকে প্রাণপ্রিয় বলে মনে করে। আর এই মনোভাব শুধু এক জন্মের জন্য নয়। চক্রের আবর্তনের মত যতবার এই পৃথিবীতে আসা-যাওয়া করবে ততবারই ভগবান্ তার একমাত্র প্রিয় এই আশাই তার মনে বাসা বেঁধে আছে। ভগবানের চরণাশ্রয় ব্যতীত ভক্তের বাঁচবার কোন আশ্রয় নেই। কারণ ত্রিজগতে তার আপন বলতে আর কেউ নেই। ভগবানের বিচ্ছেদ মুহূর্তের জন্যও অসহনীয়। তাই তার একমাত্র প্রার্থনা—তিনি যেন তাকে মুহূর্তের জন্য চরণ ছাড়া না করবেন।

বঁধু, তোমার গরবে গরবিনী আমি
রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে করি ও দু'টি চরণ
সদা লইয়া রাখি বুকে॥
অন্যের আছয়ে অনেক জনা
আমার কেবল তুমি।
পরাণ হইতে শত শত গুণে
প্রিয়তম করি মানি॥
নয়নের অঞ্জন অঙ্গের ভূষণ
তুমি সে কালিয়া চান্দা।

জ্ঞানদাসে কয় তোমার পিরীতি
অন্তরে অন্তরে বান্ধা ॥

মধুর-রসাশ্রিত আত্মসমর্পণের এই পদটিতে জ্ঞানদাস অপূর্ব অতীন্দ্রিয়ভাব সমাবেশ করেছেন। স্বকীয়া ও পরকীয়া—এই দুই প্রকারেই এর ব্যাখ্যা চলতে পারে। সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণের সেই ভাবটি ভক্তের মনোমধ্যে এখানে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে। ভগবানের অতি প্রিয় বলে ভক্তের মনে যে একটি নিরীহ গর্বের ভাব থাকে, এখানে তা প্রকাশ পেয়েছে। ভগবদ্ পাদপদ্ম ছাড়া ভক্তের অন্তরে আর কিছুর ঠাঁই নেই। ভগবানই ভক্তের ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ, এমন কি নিজের প্রাণ থেকেও প্রিয়তর। শয়নে স্বপনে ভগবদ্-প্রেম উপলব্ধিই ভক্তের একমাত্র কর্ম।

এসখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর ॥
ঝাম্পি ঘন গর- জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরি খন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ।
সঘন খর শর হন্তিয়া ॥
কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া ॥
তিমির দিগ্ ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া ॥

মধুর-রসাশ্রিত মাথুর পর্য্যায়ভুক্ত এই পদটি বিদ্যাপতির কবি-প্রতিভার অপূর্ব নিদর্শন। এখানেও কবি অতি সুন্দর অতীন্দ্রিয়ভাব সমাবেশ করেছেন। সংসারের পিচ্ছিল পথে চলার কালে কখনও কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে ভক্তের মন থেকে ভগবান্ হঠাৎ অন্তর্ধান করেন। তারপর যখন ভক্ত-হৃদয়ে সম্বিত ফিরে আসে, তখন সে উপলব্ধি করে—তার হৃদয়স্থিত ভগবানের আসনখানা শূন্য। হৃদয়ভরা অনন্ত দুঃখ তখন তার অসহনীয় হয়ে ওঠে। সুন্দর পৃথিবীর সকলেই আনন্দিত; কিন্তু তার হৃদয়ের ধন কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে পালিয়েছেন বলে তার হৃদয় শূন্যতায় পূর্ণ হয়ে গেছে। সেই শূন্যতার ভার তার কাছে মৃত্যুতুল্য যন্ত্রণাদায়ক। ভগবানের মধুর স্পর্শ-বিনা তার কিভাবে সময় কাটবে, কতক্ষণে আবার ভগবানের আবির্ভাব ঘটবে তার হৃদয়ে সেই চিন্তায় ভক্তহৃদয় আকুলিত।

সই, জানি কুদিন সুদিন ভেল।
মাধব মন্দিরে তুরিতে আওব
কপাল কহিয়া গেল ॥
চিকুর কুরিছে বসন উড়িছে
পুলক যৌবন ভার।
বাম অঙ্গ আঁখি সঘনে নাচিছে
দুলিছে হিয়ার হার ॥
প্রভাত সময় কাক কোলাহলি
আহার বাঁটিয়া খায়।
পিয়া আসিবার কথা শুধাইতে
উড়িয়া বসিল তায় ॥
মুখের তাম্বুল খসিয়া পড়িছে
দেবের মাথার ফুল।
চণ্ডীদাস কহে সব ভেল শুভ
বিহি ভেল অনুকূল ॥

চণ্ডীদাসের এই পদটি অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের চরম নিদর্শন। মধুর-রসাশ্রিত ভাব সম্মেলনের এই পদে কবি ভক্ত ভগবানের তথা জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন। ভক্ত-হৃদয়ে ভগবানের আবির্ভাবের পূর্বে এক অপূর্ব আনন্দের সঞ্চার হয়। একদিন কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে তিনি ভক্ত-হৃদয় থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন—শুধু তার অন্তরের আকর্ষণ যাচাই করবার জন্য। যাচাই করে তিনি দেখেছেন যে সে হৃদয়ে একমাত্র তাঁরই স্থান। তাঁর অন্তর্ধানে সেখানে উত্তাল তরঙ্গ উঠেছে, আর সুদক্ষ নাবিকের মত ভক্ত হাল ধরে আছে। বিশ্বাস তার—কূল পাবেই। আজ যে তিনি অনুকূল হয়েছেন, আজ যে তার শূন্য হৃদয় ভরে যাবে তাঁর

আবির্ভাবে পূর্বাহ্নেই ভক্ত তা উপলব্ধি করতে পেরেছে। অন্তরের অন্তস্থল থেকে যে আনন্দের বার্তা আসছে, তা প্রকাশের অতীত। চারিদিকে সে নানা শুভ লক্ষণ দেখতে পাচ্ছে। অতীন্দ্রিয়বাদীর এই আনন্দ শুধু মরমী-রাই বুঝতে পারে।

পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে॥
বেদি করব হাম আপন অঙ্গমে।
ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে॥
আলিপন দেওব মোতিম হার।
মঙ্গল কলস করব কুচভার॥
কদলী রোপব হাম গুরুয়া নিতম্ব।
আম্র-পল্লব তাহে কিঙ্কিণী সুঝম্প॥
দিশি দিশি আনব কামিনী—ঠাট।
চৌদিগে পসারব চাঁদক হাট॥
বিদ্যাপতি কত পূরব আশ।
দুই-এক পলকে মিলব তুয়া পাশ॥

বিদ্যাপতির এই পদটিতে অতীন্দ্রিয়ভাবের পূর্ণ প্রকাশ হয়েছে। মধুর-রসাশ্রিত ভাব-সম্মিলনের এই পদে কবি ভক্ত ও ভগবানের তথা জীবাত্মা ও পরমাত্মার পূর্ণ মিলনের পন্থাটি অতি চমৎকাররূপে প্রকাশ করেছেন। রাধাভাবে ভাবিত ভক্তের দেহই মঙ্গল-আচারের সর্বোৎকৃষ্ট স্থান। দেহ-মন্দিরই ভগবানের অধিষ্ঠানের পরম ধাম। মানুষের তৈরী মন্দির ভগবানের উপযুক্ত স্থান নহে। অন্ততঃ অতীন্দ্রিয়বাদীর কাছে নহে। ভক্তের অঙ্গই বেদী। সে তার কেশ দিয়ে সে বেদী ঝাঁট দিবে। ভক্তের সংগে ভগবানের এই মিলন বর্ণনাতীত। এ শুধু অনুভূতিগ্রাহ্য, অনুভববেদ্য। ভক্তহৃদয়ে ভগবানের পুনরাবির্ভাবে ভাবোল্লাসের সুন্দর চিত্র এখানে চিত্রিত হয়েছে।

মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিলুঁ
দয়াজনু ছোড়বি মোয়॥
গণইতে দোষ গুণলেশ না পাওবি
যব তুহুঁ করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগ বাহির নহ মুঞি ছার॥
কিয়ে মানুষ পশু পাখী কিয়ে জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গ।
করম বিপাকে গতাগতি পুন পুন
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ—
ভনয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদপল্লব করি অবলম্বন
তিলএক দেহ দীনবন্ধু॥

শান্ত-রসাশ্রিত এই পদে বিদ্যাপতি বৈষ্ণব-ভক্তের আন্তরিক প্রার্থনা জানিয়েছেন। বৈষ্ণব ধর্মের উন্মেষ-পর্বে এই জাতীয় সাধনাই ছিল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মত ও পথ। এই পথেই ভগবানের সান্নিধ্য লাভ ঘটে ব'লে তাঁরা বিশ্বাস করতেন। ভগবানের সামীপ্য লাভই যে বৈষ্ণব ভক্তের একমাত্র কাম্য, একথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এই জাতীয় সাধনার ধারা পরিবর্তিত হয়ে ক্রমে ক্রমে, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের সাধনায় পরিণতি লাভ করেছিল, "জয়দেব ও অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব" প্রবন্ধে তা আলোচনা করেছি। বৈষ্ণবী সাধনার এই ধারাটি সর্বশেষে আলোচনার কারণ—বৈষ্ণব মতের ভাব-পরিবর্তন। এটি এখন সাধনার অঙ্গীভূত না হয়ে বৈষ্ণব-ভক্তের প্রার্থনায় পরিণতি লাভ করেছে। "যেন সেবায় রত রাখতে পারি।"—এই আকুলতাই এই জাতীয় প্রার্থনার ভাবসত্য। ভক্ত তিল তুলসী দিয়ে নিঃস্বত্ব হয়ে ভগবানকে তার দেহ-মন-প্রাণ দান করছে। "তুমি যেমন চালাও তেমনি চাল"—এই ভাবই এখন ভক্ত মনে বাসা বেঁধেছে। দিবারাত্র সেই ভাবেই সে এখন চলতে চায়। শুধু সেবা আর সেবা এই তার কাম্য। বৈষ্ণব ধর্মের লোকায়ত ভাবটি এর মধ্যে এই ভাবে প্রথম অঙ্কুরিত হয়েছিল ব'লে আমার বিশ্বাস।

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "বৈষ্ণব পদাবলী" (চয়ন) ৫ম সংস্করণ থেকে উক্ত পদগুলির পাঠ গৃহীত হয়েছে।]

রায় বাড়ী

গিরিবালা দেবী

হেমন্তের বেলা পাখীর মতন পাখা মেলিয়া যেন উড়িয়া যায়। তাহাকে ধরিয়া রাখিতে চাহিলেও সে ধরা দেয় না।

সেদিন অপরাহ্নে এ গ্রামের ছোট বড় বৌ ঝি সকলেই গ্রামপ্রসিদ্ধ মৈত্রবাড়ীর ঠাকুরকন্যা বিনুকে দেখিতে আসিলেন।

তখনকার কালে পল্লীগ্রামে বড় ননদিনীকে ছোট ভ্রাতৃজায়ারা 'ঠাকুরকন্যা' বলিয়া ডাকিত। ছোটরা ঠাকুজ্জি, শ্বশুর ঠাকুর, শ্বশুরের জ্যেষ্ঠ পুত্রেরা বটঠাকুর বা বড় ঠাকুর। দেবররা ছোট ঠাকুর, শাশুড়ী ঠাকুরাণী। বর্ত্তমান যুগের মত ঠাকুর নামধারী পাচক সে-যুগের রন্ধনশালার অধিশ্বর হইতে পারে নাই। সাধারণ গৃহস্থ গৃহে অজ্ঞাত-কুলশীল পাচকের রন্ধন অন্ন কেহ গ্রহণ করিত না। ধনী সম্প্রদায়ের ব্যবস্থা অবশ্য স্বতন্ত্র।

ঠাকুরকন্যার প্রকৃত নাম হইল শশীকলা। সে নামে ডাকিবার মানুষ এ গ্রামে আর একটিও অবশিষ্ট নাই। সে নাম বহু পূর্ব্বেই পৃথিবী হইতে মুছিয়া গিয়াছে। যাঁহারা একদা ইঁহাকে ঠাকুরকন্যা সম্বোধন করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন; তাঁহারা ত গিয়াছেনই, তাঁহাদের ছেলে-মেয়েরাও পাড়ি দিয়াছে ভবনদীতে। এখন নাতীদের পালা চলিতেছে। 'ঠাকুরকন্যা' কিন্তু বিরল পত্র বটগাছের মত এখনও দিব্য খাড়া রহিয়াছেন। কেহ বলে, "বুড়ীর বয়েস একশো দশ" কেহ বলে, "একশো পাঁচ।" যাহার যাহা খুসী বলিলেও তিনি বেশ আছেন। মাথার চুল এখনও কাঁচার ভাগ বেশি। দাঁত একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই, ফাঁকে ফাঁকে দুই-একটা হাসিলে ঝিলিক দেয়। সুঠাম মেদশূন্য, দেহ, অতসী ফুলের অনুরূপ গায়ের বর্ণ, এখনও উজ্জ্বল, অম্লান।'

কে জানে সে কত যুগ পূর্ব্বের কথা—শশিকলা অপূর্ব্ব রূপের জোরে এক সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারীর রাজ-অন্তঃপুর আলো করিয়া বৌরাণী নামে বরণীয়া হইয়াছিলেন। দীন দরিদ্রের কন্যার রাজ্যভোগ বেশি দিন হয় নাই। ফিরিতে হইয়াছিল সীমন্তের সিঁদুর মুছিয়া। শশিকলার সিঁদুর মুছিয়া গেলেও সে ফিরিল প্রচুর বিত্তশালিনী হইয়া। পিতার ভাঙ্গা গৃহ মনোরম অট্টালিকায় পরিণত হইল। জলাশয় খনন হইয়া স্বচ্ছ জলে টলমল করিতে লাগিল। ঘরে বসিয়া পেট পূজা করিবার বিঘা বিঘা ধান জমি হইল। কন্যার আনীত সম্পদের সুব্যবস্থা হইবার পরে বাপ ভাই লড়িলেন যাবজ্জীবনব্যাপী মাসোহারারও জন্যে। মোটা দাগে মাসোহারা ধার্য্য হইয়া গেল।

পুরাণে বর্ণিত আছে নাগকুলে দেবী মনসা যেমন পূজিতা হইয়াছিলেন তেমনি পূজিতা হইয়াছেন ঠাকুরকন্যা। পিতামাতা, ভাই ও বধূরা ঠাকুরকন্যাকে আরাধনা করিয়া বিদায় লইয়াছে। এখন তাঁহাদের নাতি ও বধূরা সযত্নে ঠাকুরকন্যার পূজার থালি সাজাইয়া রাখিয়াছে। দেবী অপ্রসন্ন হইলে বিষম বিপাক। সংসার বৃহৎ হইয়াছে, ব্যয় মাত্রা ছাড়াইয়া যাইতেছে। গোষ্ঠীসমেত সকলে চাহিয়া আছে ওই মাসোহারার দিকে। ঠাকুরকন্যার পায়ে কাঁটা ফুটিলে পরিবারের সকলে বুক পাতিয়া দেয়। হাঁচিলে-কাশিলে উদ্বেগের অন্ত থাকে না। কাজেই ঠাকুরকন্যা আছেন পরম সমাদরে পরম যত্নে।

ঠাকুরকন্যা আঙ্গিনায় পা দিয়া হাঁক দিলেন, "ওলো ঈশানের ঈশানী বড়বৌ, কোথায় তোরা? নাতনী এসেছে একদিন ত দেখাতেও নিয়ে গেলি না? সকলের জন্যেই পরাণটা আমার আকুলি-ব্যাকুলি করে। তাই নিজেই দেখতে এলাম।"

দুর্গাসুন্দরী বারান্দায় কুশাসন পাতিয়া দিয়া ঠাকুরকন্যাকে প্রণাম করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন "আসুন ঠাকুরকন্যা, বসুন। কালকেই আপনাকে প্রণাম করাতে বিনুকে নিয়ে যাব ভেবেছিলাম। শীতের বেলা, সংসার ফেলে বেরোন হয়ে ওঠে না। ও বৌমা, বিনু, ঠাকুরকন্যা এসেছেন, প্রণাম করে যাও।"

ঠাকুরকন্যা কুশাসন অধিকার করিলে মা ও মেয়ে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া, মা সরিয়া গেল। বিনু বসিল সেখানে।

ঠাকুরকন্যা সস্নেহে বিনুর চিবুক ধরিয়া আদর করিতে

লাগিলেন, "কতদিন পরে তোর সোনামুখ দেখলাম বিনু, তুই এখনও তেমনি ছোটখাটো রোগা রয়েছিস? শরীরের বাড়বাড়ন্ত বড় কম। এখন ত শীতকালটা থাকবি এখানে? নতুন বৌকে বিয়ের প্রথম বছরে সকলেই বাপের বাড়ীতে রেখে দেয়।"

বিনু কহিল, "আমাকে এই মাসেই নিয়ে যাবে।"

ঠাকুমা আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, "না ঠাকুরকন্যা, ওরা মেয়েটাকে থাকতে দেয় না এখানে। এই ত মাত্তর পনের দিনের কড়ারে আসতে দিয়েছে। পনের দিনের কেটে গেল কটা দিন।"

ঠাকুরকন্যা গালে হাত দিলেন, "ছটাকি জমিদারদের এ আবার কেমনধারা রীতি-প্রকৃতি? এদিক নেই, সেদিক আছে। বিয়ের নামে খোঁজ নেই কুলোপনা চক্কর। হ্যাঁ, সাবেক কালে রাজা-রাজড়াদের ঘরে বৌ আটকে রাখার নিয়ম ছিল বটে, কিন্তু তারা ছটাকি ছিল না, ছিল সেরকি। দেখ বড় বৌ, শশিঠাকরুণের সকলের ঘরের খবর নখদর্পণে। যত রাজা-রাজড়া জমিদার তাদের অধিকাংশ বারেন্দ্র সমাজের এই দেমাকে বারেন্দ্র বামুনরা আটখানা। কচি মেয়েটাকে ভরা শীতে আটক করিস কোন্ আক্কেলে? যত সব নাপতে কালাইয়ের কাণ্ডকারখানা।"

শ্বশুরকুলের কি কুচ্ছা ঠাকুরকন্যা ব্যক্ত করিবেন ভাবিয়া বিনু ক্ষুণ্ণ হইয়া নত নেত্রে বসিয়া রহিল। দুর্গাসুন্দরীরও প্রসন্ন হইলেন না। সকলেই জানে ঠাকুর-কন্যার মুখ আলগা। তিনি একদা নামকরা ঘরের বৌরাণী হইয়া গৌরব লাভ করিয়াছিলেন। এখনও জড়িত হইয়া রহিয়াছেন সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত জমিদার বংশের সহিত। কিছুকাল পূর্ব্বের শ্বশুরকুলের বিবাহ পৈতা ও অন্নপ্রাশন সকল অনুষ্ঠানেই তাঁহাকে যোগ দিতে হইত। অধুনা তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে। সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই।

দুর্গাসুন্দরী সভয়ে প্রশ্ন করিলেন, "বিনুর শ্বশুরদের কি আপনি আগে থেকেই চিনতেন ঠাকুরকন্যা?"

চারিণী যেন অকস্মাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, "কি বলিস বড়বৌ, রাজা দেবীদাসের বংশধরদের শশিঠাকরুণ চিনবে না? বঙ্গদেশে কে আবার ওদের না চেনে। আত্রাই নদীর তীরে ছাতকে ছিল রাজা দেবীদাসের 'রাজধানী'। নবাবের সঙ্গে বিবাদ করে রাজা দেবীদাস বিপদে পড়েছিলেন। নবাব হুকুম দেয় রাজার বংশ বিনাশ করতে। রাজার একমাত্র ছেলে তখন ছেলেমানুষ, অনেক দিনের পুরাণো বিশ্বাসী চাকর ছিল রাজার, তার নাম ভীমকালী নাপিত। রাজভবন যখন আক্রমণ হয় তখন ভীম নিজের ছেলেকে রাজপুত্রের পোষাকে সাজিয়ে শুইয়ে রেখেছিল বিছানায়। রাজার ছেলেকে সুড়ঙ্গপথে নিজের ভাইয়ের সঙ্গে পাঠিয়ে দেয় কাবারীখোলা গাঁয়ে।

পরে নবাবের সঙ্গে দেবীদাসের অনেক যুদ্ধ হয়, দুই পক্ষই ক্ষমতাশালী বলবান। শেষে নবাব সন্ধি করে। কিন্তু রাজপুত্র নামে যে ভীমের ছেলেকে বধ করা হয়েছিল সে আর ফিরে আসে না। তার পর থেকে রায়বংশধরেরা নিজেদের পদবীর সঙ্গে ভীমকালী জোড়া দিয়ে নিজেদের মহানুভবতার পরিচয় দিয়ে আসছে। দেবীদাসের রাজত্ব ক্রমে ভাগ বখরায় খণ্ডবিখণ্ড হয়ে ছটাকি জমিদারি হয়েছে।"

বিনু মোহিত হইয়া ঠাকুরকন্যার অতীত কাহিনী শুনিতেছিল। সে অল্পদিন পূর্ব্বে 'রাজস্থান' পড়িয়াছিল, রাজপুতের আদিজননী ধাত্রীপান্না তাহার হৃদয়ে গাঁথা হইয়া রহিয়াছে। ইতিহাস পান্নাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। বরেন্দ্র ভূমির ভীমকে কে স্মরণ করিয়া রাখিবে? বিস্মৃতির অন্তরালে কত ভীম-অর্জ্জুন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

কতক্ষণ পরে দুর্গাসুন্দরী ঠাকুরকন্যার প্রোজ্জ্বল মুখের প্রতি চোখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা ঠাকুরকন্যা, এঁরাও নাকি রাজা গণেশের শুনতে পাই? কিন্তু এঁদের ত কোথায়ও একছিটে জমিদারীর নামগন্ধও নেই।"

ঠাকুরকন্যা সগর্জ্জনে আবার সুরু করিলেন "থাকবে কি করে?" এরা যে হারে নারে বত্রিশ পাঁজরে হা-ভাতে বারেন্দ্র বামুনের ঝাড়। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে দিয়েছে! রাজা গণেশের বংশধরেরা বৈরাগী ঝুলি কাঁধে নিয়ে বিলিয়ে দিয়েছিল সর্ব্বস্ব। রাজা গণেশের ছেলে বাদশাজাদির প্রেমে পড়ে মুসলমান ধর্ম্ম নিয়ে বিয়ে করেছিল বাদশাজাদিকে। যদুর আগের বিয়ে-করা বৌ যদুকে পত্তর লিখেছিল, তোর মনে নেই বড় বৌ—

যবনের লাগি যার জাতি দেয় পতি,
কি পাঠ লিখিব তারে, কহ গৌড়পতি?"

দুর্গাসুন্দরী সবিস্ময়ে কহিলেন, "আপনার এতও মনে থাকে ঠাকুরকন্যা, কতকালের কথা মনে করে রেখেছেন? আমরা আজ যা শুনি কাল ভুলে যাই।"

"তোরা যে ঘোর সংসারী বড়বৌ, স্বামী পুত্র বৌ নাতনী শত জনের ভাবনা ভাবতে হয়। আমার জীবন হয়েছে বাউলের গানের মতন 'আমার যেমন বেণী তেমনি রবে চুল ভেজাব না।' এ জীবনের মত ভগবান্ সকল দরজা বন্ধ করে রেখে দিলেন। তাই যা শুনেছি সহজে ভুলি না। সেদিন ঈশেনকে তাই বলছিলাম—"নাড়িটেপা ব্যবসা করছ, এত অহঙ্কার ভাল নয় ঈশেন। রাজা রাজরার বাড়ীতে তোমার রোগী দেখার ডাক আসে, তুমি তাদের মুখের ওপরে চোপা নেড়ে চলে আস যা-তা ব'লে। নিজের 'আখের' ভুলে যাও। লক্ষ্মীর ঘট উল্টে দাও লাথি মেরে। রাজা গণেশের বংশধর হয়ে গণেশ উলটিয়েই ত রয়েছে।'

আমার কথায় ঈশেন হেসে কুটিকুটি, বলে, "ঠাকুর-কন্যা, যা বলেছেন, ইচ্ছা করলে আমি টাকার গদি পেতে শুতে পারতাম, কিন্তু অসত্যকে সইতে পারি না। আশীর্ব্বাদ করুন সত্য পথে আমি যেন জন্ম জন্মান্তর গরীব হয়েই থাকি। দারিদ্র্যই আমার গৌরব।" বলিয়া ঠাকুরকন্যা চুপ করিলেন।

বেলা ডুবুডুবু, বনতলে গোধূলির ম্লান আলোর সহিত শীতের কুয়াশা ধীরে ধীরে পুঞ্জীভূত হইতেছিল।

ঠাকুরকন্যা সচকিত হইয়া উঠিবার উদ্যোগ করিলেন। ভোগের ঘরের বারান্দায় দুইটা পাকা চালকুমড়া বেড়ার গায়ে হেলান দেওয়া ছিল। ঠাকুরকন্যা সেই দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "পাকা কুমড়া দেখছি, বড়ি দিবি নাকি বড় বৌ? পাকা কুমড়ার তিতকুমড়ি রাঁধবি কি? তোর রান্না তিতকুমড়ি একদিন খেয়েছিলাম, এখনও মুখে লেগে রয়েছে। কি চমৎকার রান্না!"

"বেশ ত ঠাকুরকন্যা মূলো ষষ্ঠী এসে গেল। সেদিন আমাদের নিরামিষ খাওয়া, আপনার সঙ্গে সকলেই একসাথে বসে শ্রীধরের প্রসাদ খাব। তিতকুমড়ি রান্না করব।"

"ষষ্ঠীর দিন কি তেতো খায় বড়বৌ, খেতে নেই। তিতকুমড়ি রাঁধবি কি লো? তোর ত নিত্যি তিরিশ দিন ঠাকুরভোগ রান্না রয়েছে, যেদিন খেতে ইচ্ছা হবে বলে যাব। এখন থাকুক।"

"থাকবে কেন ঠাকুরকন্যা? তিতকুমড়ি না হয় টককুমড়ি করে দেব। বৌরা ঠিকমত আপনাকে নিরামিষ রান্না রেঁধে দিতে পারে ত?"

"হ্যাঁ, তা পারে, ভাইদের নাতবৌয়েরা আমার রান্না নিয়ে এ ওর ওপরে টেক্কা দিয়ে ভাল করতে চায়। ভক্তিতে করে না, ভয়ে করে। 'গোবর পোড়ে ঘুঁটে হাসে।' আমিও হাসি—"সম্পদের বার ভাই বিপদের কেউ নাই।' মাসে মাসে একমুঠো করে টাকা আসে সংসারে, তার জন্যেই আমার সেবাযত্নর অবধি নেই। আমি খাই দাই পুরাণ পাঠ শুনে দিন কাটাই। ভগবান্ অমর করে দিয়েছেন রয়েছি। যাই না ব'লে আক্ষেপ করি না, থাকছি বলেও দুঃখ নেই। আমার এখানেও কোন প্রত্যাশা নাই, সেখানে কারও জন্যে কোন আশা নাই। জন্ম ঋণ শোধ করে যাচ্ছি এইমাত্র। আমি এবার চলি বড়বৌ, দেরি হ'লে ওরা আবার ছেলেমেয়ে পাঠিয়ে দেবে আমাকে ধরে নিতে। 'তোর পায়ে পড়ি না তোর গুণের পায়ে পড়ি। আমার হয়েছে সেই দশা।"

ঠাকুরকন্যা আঙ্গিনায় নামিয়া অনুচ্চস্বরে দুর্গাসুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাদবের মেয়েদের যে বিয়ে। আকাশির বিয়ে শুনেছিস বড়বৌ? দুই মেয়ের বিয়ে ঠেকে থাকে ব'লে যাদব আকাশির কুমারী নাম ঘুচিয়ে এক চণ্ডালের সাথে মালা বদল করাচ্ছে।'"

"চণ্ডাল! শুনেছি সে নাকি সৎব্রাহ্মণ নাম দয়াময়।"

"হ্যাঁ, দয়ার অবতার, কিসের বামুন, সে চণ্ডাল। যাদবকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে—মন্তর পড়ার পরে তার সাথে আকাশির কোন সম্পর্ক থাকবে না, সেও জীবনে কখনও ওকে স্ত্রী বলে স্বীকার করবে না। ওকেও করতে দেবে না। তার টাকার দরকার, টাকা না হ'লে নতুন বৌ নিয়ে বাসর সাজাবার ঘর পাবে না। ওকে তুই বামুন বলিস বড়বৌ, ও মানুষ নামের অযোগ্য। যাদবের যেমন কপাল, আকাশিরও তেমনি—আহা, পদ্মফুলের মত মেয়ে, একখানা হাতের দোষ, এই অপরাধ। আমি দিন-রাত ঈশ্বরকে বলি 'ঠাকুর নারীজন্ম তুমি আর দিও না।'

ঠাকুরকন্যা বাড়ীর পথ ধরিলেন। দুর্গাসুন্দরীর পর-দুঃখে কাতর হৃদয় আশ্বস্ত হইল। যাদব পণ্ডিতের ভিটেমাটি বাঁচিয়া যাইবে। মেয়েরা উদ্ধার পাইবে। তাহাদের দিকে ঠাকুরকন্যার দৃষ্টি পড়িয়াছে। এ গ্রামের যে-কোন জাতি যে-কোন সম্প্রদায়ের কন্যাদের বিবাহে ঠাকুরকন্যা গোপনে অজস্র দান করিয়া থাকেন। তিনি গোপনে দান করিলেও ফুলের সৌরভের মত তাহা গোপন থাকে না। তিনি পিতৃসম্পর্কীয় জন্মের ঋণ শুধু পরিশোধ করিয়া ক্ষান্ত থাকেন না, গ্রামের কুমারী-দেরও জন্মঋণ পরিশোধ করেন।

মূলকরূপিণী ষষ্ঠীদেবী যথাসময়ে আবির্ভূত হইলেন। "ষাট ষাট ষষ্ঠীর ধন"। বিনু উপস্থিত, এই আনন্দে দুর্গাসুন্দরী দিশাহারা।

মাইজ পাতায় পিঠালির গরু বাছুর তৈরি করিয়া জোড়ায় জোড়ায় মূলা কলা দিয়া ডালা সাজাইয়া ষষ্ঠীর আরাধনা করা হইল। বিনু রায়বাড়ীর উদ্দেশ্যে ভেংচি কাটিয়া মনে মনে বলিল, "কেমন জব্দ, এ অনুষ্ঠানে আমাকে তোমরা ধরিতে পারিলে না। দুধের কড়ার সামনে বসিয়া নিজেরা হটর হটর কর।"

বিনু সেই দিনই বৈকালে বাবার চিঠি পাইল। বিনু সংস্কৃত শিখিবে জানিয়া বাবা কত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। নফর কুণ্ডুর সহিত বিনুর জন্যে জামা-কাপড় আরও অন্যান্য জিনিষপত্র ও সংস্কৃত প্রথম পাঠ পাঠাইয়া দিয়াছেন। বিনু যেন তাহার ঠাকুমার নিকট হইতে অক্ষর পরিচয় ও অক্ষর লেখা শিখিয়া লয়। ইহার পরে সুবিধামত বাবা বাড়ী আসিয়া বিনুকে শশুরালয় হইতে আনাইয়া সংস্কৃত দ্বিতীয় পাঠ ধরাইয়া দিতে পারিবেন।

বিনু বাবার চিঠি পড়িয়া আনন্দে ও উৎসাহে অভিভূত। তাহার ত্বরা সহে না। তখনই শ্যাম ছুটিল বন্দরে নফর কুণ্ডুর কাছে।

বিনুর বাবা বিনুর জন্যে অনেক জিনিষ পাঠাইয়াছেন। কন্যা পিত্রালয়ে আসিলে তাহাকে নববস্ত্র প্রসাধন দ্রব্য দিতে হয়। বিনুর জন্যে আসিয়াছে চারিখানা শাড়ী, চারিটা সেমিজ জামা, একখানা ফুল-কাটা তোয়ালে, এক বোতল চামেলী ফুলের তেল অডিকলোন, চিরুণী, বেলকুঁড়ি কাঁটা, ফিতা, একপাতা টিপ, এক শিশি তরল আলতা আর সংস্কৃত প্রথম ভাগ।

দুর্গাসুন্দরী সমস্ত জিনিষ সযত্নে তুলিয়া রাখিলেন। বিনু তখনই তাঁহাকে চাপিয়া ধরিল সংস্কৃত অক্ষর পরিচয় করাইয়া দিতে। ঠাকুমা জানিতেন নাতনীর প্রকৃতি, সে যখন যেটা ধরিবে সেটা না হওয়া অবধি তাহার শান্তি নাই।

সন্ধ্যা হইতে রাত দশটা পর্য্যন্ত চলিল অক্ষর পরিচয়। বিনু অক্ষরের গোলমাল করিয়া ফেলে, সর্ব্বকর্ম্ম পরিহার করিয়া তিনি আর কতক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারেন।

শেষকালে বিনুরই পরিত্যক্ত ভাঙ্গা শ্লেট পেনসিল বাহির হইত। তাহাতে অক্ষর দাগিয়া দাগিয়া কয়েকটা অক্ষরের সহিত বিনুর পরিচয় হইল।

পরের দিন দিবসের আলো ভালরূপে ফুটিতে-না-ফুটিতে বিনুর বিদ্যারম্ভ সুরু হইয়া গেল। পেমো মলিন মুখে চাহিয়া চাহিয়া সরিয়া যায়। মা ফ্যানাভাত বাড়িয়া ডাকিয়া সাড়া পান না। ঠাকুমার প্রাণ ওষ্ঠাগত। স্নানের সময় আজ আর হীরাসাগর আকর্ষণ করিতে পারিল না। পুকুরেই স্নানপর্ব্ব সমাধা হইল।

চিরদিনের মূর্খ বিনু এক বেলায় মূর্ত্তিমতী সরস্বতী হইতে চায়। সে শুনিয়াছিল সাধনা করিলে সিদ্ধিলাভ হয়।

বিনু সাধনা করিতে লাগিল। গোটা দিন চলিল তাহার সাধনা। সাধনায় যেমন সিদ্ধি আছে, তেমনি বিঘ্নও কম নহে।

মা ডাকেন চুল বাঁধিয়া দিতে। ঠাকুমা লালমণির দুধে প্রস্তুত কাঁচাগোল্লা চটের মতন পুরু সর চিনি মুখের সামনে ধরেন। বিনু খাইতে বসিবে না ভাঙ্গা শ্লেটে মক্স করিবে আদি ভাষার আদি অক্ষর?

ইহারই মধ্যে বিনুর উৎসাহের শিখা স্তিমিত হইয়া আসিল। মনে পড়িতে লাগিল নঠাকুরদার রামপ্রসাদী গীত—

"আমি কারে দোষ দিব শ্যামা, স্বখাত সলিলে ডুবে মরি মা।"

এমন সময় শ্যাম আনিয়া দিল প্রসাদের চিঠি। এখানে ষ্টীমারে ডাক আসে, একবার মাত্র চিঠি বিলি হয় বৈকালে।

ঠাকুমা সহাস্যে পরিহাস করিলেন, "এই নে বিদ্যাবতী, তোর সাত রাজার ধন মাণিক এসেছে। কাল সন্ধ্যা থেকে আজ প্রায় সন্ধ্যা হয় অসাধ্য সাধন করলি, এখন বই-শ্লেট তুলে রেখে জিরিয়ে নে। ও কি এক দিনের জিনিষ, দিনে দিনে শিখতে হয়।"

ঠাকুমার সামনে স্বামীর চিঠি আসাতে বিনু ঈষৎ লজ্জিত হইয়া বলিল, "আমার অক্ষর চেনা হয়ে গেছে ঠাকুমা, এখন আকার-ইকারগুলো ঠিক করে নিতে পারলেই হয়ে যাবে।"

ঠাকুমা মুখ টিপিয়া হাসিলেন, "হয়ে যাবে, আহা, কি মগজ তোর বিনু, অক্ষর চিনলেই তুই সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শিনী হয়ে যাবি?"

বিনুর ঠাকুমার তামাসায় কান দিবার সময় ছিল না। সে অন্তরালে সরিয়া গেল প্রসাদের চিঠি লইয়া। সে এখানে আসিবার পূর্ব্বে স্বামীকে চিঠি লিখিয়া আসে নাই। আসিয়াও লেখা হয় নাই। প্রসাদ রাগে বিশ্বম্ভর হইয়া চিঠি লিখিয়াছে।

"বিনুর এ কিরূপ নীতি, অন্যের পত্রে জানিতে হয় স্ত্রী পিত্রালয়ে গিয়াছে। শ্বশুরালয় যেন কাজ-কর্মের হিসাব দাখিল করিতে হয়। বাপের বাড়ীর অজুহাত কি? এখন ত অখণ্ড অবকাশ, লেখাপড়া কতদূর অগ্রসর হইল। নম্বর দেওয়া খাতার কোন্ নম্বরে হাত দেওয়া হইয়াছে" ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বিনু টুলের উপরে হ্যারিকেন রাখিয়া পত্র পাঠ স্বামীকে পত্র লিখিতে বসিয়া গেল।

এখানে আসিবার পূর্ব্বে স্বামীকে চিঠি লিখিয়া আসিবার কথা সে ভুলিয়া গিয়াছিল। এখানে আসিয়াও তাহাকে স্মরণ হয় নাই। নম্বরী খাতা বিনু সঙ্গে ইচ্ছা করিয়াই আনে নাই।

স্বর্গে আসিয়া ধান ভানিতে তাহারও ইচ্ছা ছিল না। যেখানকার খাতা-বই সেইখানেই পড়িয়া আছে।

বিপন্ন বিনু এখন কি উত্তর দিবে? বিশ্বম্ভরের নিকটে বিশ্বেশ্বরী হইলে এক্ষেত্রে চলিবে না। ক্ষণকাল ভাবিয়া-চিন্তিয়া বিনু চিঠি লিখিল, বৌ মানুষ নিজের আসিবার কথা কি লিখিবে? যাঁদের কাছ থেকে এসেছি তাঁরা জানাবেন এই জন্যে আমি জানাই নি।

এখানে এসেও গোলমালের ভেতরে রয়েছি। সারাদিন ঠাকুমা-মা কাছে থাকেন তাঁদের সামনে স্বামীকে চিঠি লেখা চলে না। তা ছাড়া দিন-রাত লোক আসছে আমাকে দেখতে। ঠাকুমার সঙ্গে মাঝে মাঝে বুড়ো-বুড়ীদের সঙ্গে দেখা করতে এ পাড়ায় ও পাড়ায় যেতে হয়। না গেলে তাঁরা রাগ করেন।

এখানে নানা উৎসব লেগে রয়েছে। আমাদের লালমণির খুব সুন্দর একটা বাছুর হয়েছে তার নাম মঙ্গলা। সেদিন গোক্ষুর ধারে শোধ হ'ল। পাড়ার রাখালরা সবাই এসেছিল। তার পরেই গেল মূলোষষ্ঠী। আমি এখন বড় হচ্ছি, মা-ঠাকুমার কাছ থেকে কাজ শিখতে হয়, তাই চিঠি লেখবার সময় পাই নি।

আগের লেখাপড়া এখন আমার বন্ধ। বাবা সংস্কৃত প্রথম ভাগ পাঠিয়েছেন। আমি ঠাকুমার কাছে সংস্কৃত পড়ছি। অক্ষর চেনা হয়ে গেছে, লিখতেও পারি বেশ। আমাদের সেই সুন্দর মেয়ে আকাশির বিয়ে, এই মাসেই হবে। বর ব্রাহ্মণ হলেও সে চণ্ডাল বলছে। তার নতুন গয়না দেখি এসেছি। সংস্কৃত শিখছি বলে আমি চিঠি লিখতে পারি নি, তাতে রাগ ক'রো না।"

প্রসাদ বড় চিঠি লিখিতে বলে কিন্তু কি কথা দিয়া বিনু বড় চিঠি লিখিবে খুঁজিয়া পায় না। তবু অদ্যকার চিঠি তাহার ছোট হইল না এই আত্মপ্রসাদে বিনু পুলকিত হইল।

চিঠি লেখা শেষ করিয়া বিনু চলিল মায়ের সন্ধানে, মা রান্না চড়াইয়াছেন। ঠাকুমা মণ্ডপে জপ করিতেছেন। পেমো মা'র সহিত রাতের ভাত খাওয়া সারিয়া চলিয়া গিয়াছে। কাল প্রভাতে আসিবে কাজে। ঠাকুরদাও বাড়ী নাই, বাহির হইয়াছেন বন্দরে রোগী দেখিতে।

ব্রজেশ্বরী এক গামলা কলাইয়ের ডাল বাঁটিতে বসিয়াছে বিরস মুখে।

বিনু ডাল বাঁটার কাছে বসিয়া বলে, "কাল বুঝি বড়ি দেওয়া হবে বেজদিদি? এক রকম ডালের, না দু'রকম ডালের।"

ব্রজ বিরক্তির সহিত জবাব দেয়, "মটর, কাঁচা মুগ, ঠাকুরী (কাল কড়াই) ডালের কুমড়া বড়ি ওনারা ভোগের নেঙ্গে দিয়া রাখিছে। মুসুরী মাষকলাইএর কুমড়া বড়ি আমি দিয়া রাখিছি মাছের ঘরের লেগে। এ বড়ি হইবে বিনা কুমড়ায় তোমাগো দেওনের নেগে।"

বিনু এলোচুলে বসিয়াছিল, মা পিছন দিক্ হইতে তাহার চুল আঁচড়াইয়া দিতে দিতে বলিলেন, "কতবার ডাকলাম চুল বাঁধতে, তোর সময় হ'ল না। রাতে কি এমনি এলোকেশী হয়ে থাকে? সিধে হয়ে একটু বোস চুলটা বেঁধে দেই।" এমাসের প্রথমে শুক্লপক্ষে আমাদের প্রথম বড়ি দেওয়া হয়ে গেছে। এখন আর দিনক্ষণ দেখতে হয় না। মা বলছিলেন, "তুই বড়ি দিতে খুব ভালবাসিস, তাই ডাল ভেজান হয়েছে। কাল বিনে কুমড়ায় তুই বড়ি দিস।"

বিনু চুলের গোড়া-বাঁধা ফিতা ধরিয়া বলিল, "বিনা কুমড়ায় কেন মা? আমি ত চিরকাল কুমড়া দিয়েই বড়ি বসিয়েছি।"

"এতকাল যা করেছিস এখন কি তা করা চলে মা? তোর শ্বশুরবাড়ীতে কুমড়ার বড়ি দিতে নেই। তাদের নিয়ম এখন থেকে মেনে চলতে হবে।"

মা মেয়ের চুল বাঁধিয়া ভিজা গামছা দিয়া মুখ মুছাইয়া দিলেন। সিঁদুরের কৌটা আনিতে মা'র ভুল হইয়াছিল। বিনু যে এখন সীমন্তে সিঁদুর পরিবার অধিকারিণী হইয়াছে, সেটা মা ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

তিনি চুল বাঁধিবার হাত একচিমটি সাজি মাটি দিয়া ধুইতে ধুইতে বলিলেন "ঘরে গিয়ে সিঁদুর পর গে। বিনু, রাতে আয়নায় মুখ দেখতে নেই, আন্দাজে যদি সিঁথেয় সিঁদুর না দিতে পারিস তা হ'লে কৌটাটা আমার কাছে নিয়ে আয়।"

বিনু চলিয়া গেল। শয়ন গৃহে সিঁদুর পরিতে।

ক্রমশঃ

এখনও

শ্রীমতী বাণী রায়

যে সাঙ্গ অনাঙ্গরাঙ্গ, প্রণয়প্রসাঙ্গ,
যে সাঙ্গ মগধ দেশে মধুধ্বজ কাল,
সেখানে হৃদয় পায় অগাধ প্রশ্রয়,
সেখানে সবুজ দ্বীপে সুপ্ত মহাকাল।
হৃদয়, আশ্বাস পাও মুক্ত আলিঙ্গনে,
হৃদয়, সেখানে তুমি একক অপ্সরা,
মাগধী যৌবন জাগে মাধ্বীর চষকে,
অনন্ত বসন্ত ঋতু যাপে মুগ্ধ ধরা।
বর্তমান পদে পদে রক্তঝরা পায়ে
সেখানে আবীর হয় শীতার্ত শোণিত,
বন্ধন প্রয়াস থেকে সেখানেই চ্যুত,
গুহাশায়ী সুখ থাকে পালঙ্কে শায়িত।
জীবনযৌবন আর জরা আর মরা
একটি গানের সুরে সেখানে স্পন্দিত।

হৃদয়, শরণ নাও—বিলম্বিত ক্ষণ,
পিনেলোপী করাঙ্গুলি শেষ করে জাল,
ইউলিসিস নাই এলে বাঁধবে কঠিন,
মোহান্ধ যৌবনতটে ক্রুদ্ধ মহাকাল।
পাখীর ডানার বেগ নামাও শরীরে,
অবসাদ মননের ফেল গঙ্গাজলে,
পদ্মিনী সময় হাতে আনে পদ্মডালা,
বিস্মরণী স্বপ্ন তার লেখা পলে পলে।
ডালে ডালে যৌবনের অনেক লতিকা,
অতি বর্ষা ক্ষত দেহে করে উৎখাতিত,
সময় এবার হয় মাকড়সা-লূতা,
তুমি অভিমন্যু—সপ্ত সংগ্রামে পাতিত।
ধুলোর প্রসঙ্গে নিত্য বয় রাতদিন,
পূরবী বাতাস করে মধুঋতু ক্ষীণ।

এখনও সময় আছে, মৃত্যুর উদাস
বাতাস এখনও দূরে ; প্রান্তভাগে কাঁপে
দেহশাড়ি শুধু সেই হাওয়া লেগে লেগে,
এখনও কিশোরী রাধা অভিসার যাপে।
হৃদয়, চাতক নও জানি ভাল করে,
তবু জানি শূলপাণি দণ্ডীস্বামী নও,
মাথায় বইএর বোঝা অহেতুক বও,
তুমি এক কমলিনী দহ সরোবরে,
বেঁধেছ উদাসী করী—নাই তার গতি,
ভারতী নামালো লেখ্য—মঞ্চে নামে রতি।

চিরাচির

নিখিলকুমার নন্দী

রোজ যেই রোদটুকু ক্ষীণ এই বারান্দায় আসে
অজর সুনিত্য যেন কেঁপে ওঠে অনিত্য বাতাসে
এমনি হৃদয় তার নৃত্যছন্দ মুহূর্তমোহিত
অনন্ত সে নীল লীন অকস্মাৎ সান্তলোহিত
ক্ষণিকা শাশ্বতী যার ম্লান মালা চিরকাল-জ্বলা
তাকে-সে-ভুলেছে ভাব বস্তুতই স্বভাবের ছলা

যেমন এক্ষণ এল নম্র পদপাতে সেই মন্দগতি আত্মস্থ
জঙ্গমে,
সেই ঈষদ্বিকশিত দন্তমূলে উড়ু উড়ু চুলের সঙ্গমে,
সেই পাণ্ডু প্রিয় গালে অনু-রাগে তিলোত্তমায়,
পেলব কপালে স্বপ্ন-অনুভাবী উদাস বেলায়
চোখের আকুল কালো—সুব্যাকুল সমুদ্রের রাত,
আবছা সিঁথির পথে বড় টিপে উষাময়ী লালিমা
প্রভাত ;
চলেছে সে পথ বেয়ে ইতস্তত চাহনি চকিত
অগ্র ও পশ্চাতে স্থিরচিত্ততায় যেন আচম্বিত
দূর প্রত্যাশার রশ্মি লম্ববান বৈকালী প্রচ্ছায় ;
সকালের রুচিমত অরুণ বিরণে তার উত্তরীয়
জড়িয়েছে গায় ।

নিতান্ত অচেনা তবু তার মুখে অঙ্গভঙ্গে মুকুরের মায়া
ফুটিয়ে তুলেছে এ কি চিরাচির চেনাচেনা চূর্ণ চিকুরের
স্বর্ণছায়া
মর্মের দুরান্ত ছাপ ; শান্ত জীবন যাকে অনায়াসে
ভোলে
যখন অশান্ত এসে হানে সে-ই মুহূর্ত দুরন্ত করে তোলে
রাত্রি ঘন রাত্রি ছেয়ে সূর্যের প্রথম চুম্বন
ঠাণ্ডা এই বারান্দায় ক্ষীণতায় উদার উদাত্ত
আলিঙ্গন :
এসেছে যে চলে গেছে প্রাকৃত সে বারবার আসে ।

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গে বেকার-সমস্যা

সাম্প্রতিক একটি হিসাবে প্রকাশ যে, আজ সারা ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা সর্ব্বাধিক। হিসাবে প্রকাশ যে :

গত ৩০শে জুন পশ্চিমবঙ্গের এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জগুলির চালু খাতায় প্রায় ১,১৭,০৮৩ জন শিক্ষিত কর্ম্মপ্রার্থীর নাম ছিল—শিক্ষিত, অর্থাৎ ম্যাট্রিকুলেট ও তাহার উপরে। সারা ভারতে শিক্ষিত বেকারের মোট সংখ্যা ৮,০১,০৯৪।

উপরিলিখিত অঙ্কের মধ্যে নন-ম্যাট্রিকুলেটদের ধরা হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গে নন্-ম্যাট্রিকুলেট অথচ শিক্ষিত কর্ম্মপ্রার্থীর সংখ্যাও অনেক বেশী।

পশ্চিমবঙ্গের এই শিক্ষিত বেকারদের মধ্যে তফসিলী জাতি ও উপজাতিভুক্ত বেকারের সংখ্যা যথাক্রমে ৫,৫৭৪ ও ২১১।

পশ্চিমবঙ্গের পরে উত্তরপ্রদেশের স্থান। উত্তর-প্রদেশের আয়তন পশ্চিমবঙ্গের প্রায় চারগুণ এবং জনসংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার দ্বিগুণেরও বেশী। সেই উত্তরপ্রদেশের এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জগুলিতে ১,১৫,১০২ জন শিক্ষিত বেকারের নাম তালিকাভুক্ত আছে।

মহারাষ্ট্র আয়তনে আর জনসংখ্যায় আরও বড়, শিল্পে ও অন্য বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের সমতুল। কিন্তু সেখানে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যার অর্দ্ধেকের সামান্য কিছু বেশী। জুনের শেষে মহারাষ্ট্রের এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জগুলির চালু খাতায় মাত্র ৭২,৯৮৭ জন শিক্ষিত কর্ম্মপ্রার্থীর নাম ছিল।

মহারাষ্ট্রের আয়তন ১,১৮,৭১৭ বর্গমাইল, আর কেরলের ১৫,০০২ বর্গমাইল। কিন্তু কেরলে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বেশী—৭৭,৮৫৪।

শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা সবচেয়ে কম জম্মু ও কাশ্মীরে—মাত্র ১,১০৩। তারপর আসামে—১০,৩২২। শিক্ষিত অর্থে ম্যাট্রিকুলেট ও তাহার উপর।

কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের মধ্যে দিল্লীতেই শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা সর্ব্বাধিক—৫৩,৩৬২। কারণ, দিল্লী ভারতের রাজধানী, সারা দেশ হইতে লোক কর্ম্মের সংস্থানে এখানে আসে। দিল্লীর পরে সমস্যাজর্জ্জরিত ত্রিপুরার স্থান। সেখানে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ২,৬৪৯।

হিমাচল প্রদেশ আর পণ্ডিচেরীর সংখ্যা যথাক্রমে ২,২১৩ ও ৪৫১।

দেশের অন্যান্য রাজ্যে গড় ৩০শে জুন শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ছিল : অন্ধ্র প্রদেশ—৪৬,৮০০; বিহার—৪২,০২৭; গুজরাট—২৫,৪৩৪; মধ্যপ্রদেশ—৪৪,৮২৮; মাদ্রাজ—৫৫,৬৭২; মহীশূর—৪৭,৪৩৬; উড়িষ্যা—১২,১৩০; পাঞ্জাব—৪০,৮০১; রাজস্থান—৩১,৩২১ এবং মণিপুর—১,৫০৯।

কারিগরদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা কি রকম, সে সম্বন্ধে সরকার এখনও ব্যাপক পরীক্ষা গ্রহণ করেন নাই। তবে অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরল, মাদ্রাজ ও মহীশূর—এই চারটি রাজ্যে নমুনা পরীক্ষা চালাইয়া দেখা গিয়াছে যে, গত বছর ১৫ই জুলাই ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপ্লোমাধারী বেকারের সংখ্যা ছিল ৩,২৪৭।

পশ্চিমবঙ্গে যন্ত্রবিদ্ অর্থাৎ শিক্ষিত কারিগর বেকারের সংখ্যা অন্ততপক্ষে ১৫।২০ হাজার হইবে। ইহার দ্বিগুণ হইলেও অবাক্ হইবার কোন কারণ নাই।

এ রাজ্যে বেকার সমস্যা লইয়া আমরা বহুবার আলোচনা করিয়াছি—কিন্তু এ বিষম সমস্যার সমাধান যে কবে এবং কি ভাবে হইবে—তাহা কে বলিতে পারে জানি না।

ভারতের মোট জনসংখ্যার ১৩।১৪ শতাংশ বাস করে পশ্চিমবঙ্গে—কিন্তু সারা ভারতের মোট বেকারদের

প্রায় এক-পঞ্চমাংশই এ-রাজ্যের বাসিন্দা ! এবং ইহাদের মধ্যে আবার শতকরা ৮০।৯০ জনই বাঙ্গালী !

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বেকার সমস্যা সমাধানে তাঁহাদের বিচার-বুদ্ধিমত প্রয়াস করিতেছেন—ইহা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু পাশাপাশি রাজ্যগুলি যে-ভাবে এবং যে-টেকনিক অবলম্বন করিয়া রাজ্যবাসীদের বেকার সমস্যা লাঘব করিতেছেন, আমাদের রাজ্য সরকার "প্রাদেশিকতা" অপবাদ পাইবার ভয়ে সে পথে যাইতে নারাজ কিংবা সাহস করেন না।

শিশু মৃত্যুর হার

সম্প্রতি কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান ১৯৫৯-৬০ সালের কলিকাতার শিশুমৃত্যুর হারের এক ভীষণ চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন। কলিকাতা নামক অভিশপ্ত শহরের অসংখ্য, নোংরা এবং রোগের ডিপো বস্তি-গুলিতে, অন্ধকার অলিগলির স্যাঁতসেঁতে তথাকথিত ঘরের মাটির মেঝেতে যে-সকল হতভাগ্য শিশুর পৃথিবীতে প্রথম আগমন ঘটে—তাহাদের মধ্যে অন্তত শতকরা ৫০।৫৫ জনের জন্মের এক মাসের মধ্যেই পৃথিবী হইতে বিদায় লইতে হয় ! রিপোর্টে প্রকাশ :

১৯৫৯-৬০ সালে ৭০ হাজার ৬৭৬ শিশুর জন্ম হয়। ঐ বছরে মোট শিশুর মৃত্যু সংখ্যা ছিল ৯ হাজার ৮৬। প্রতি হাজারে মৃত্যুর গড়পড়তা হয় ১২৮.৬৫। শিশুমৃত্যুর মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। মুসলমানদের প্রতি হাজারে গড়পড়তা মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৩৯৯.৭৯, খ্রীষ্টানের ১২৩.৮২ এবং হিন্দুর ১১৩.৯৫। রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, গরীব মুসলমান সম্প্রদায় এখনও পর্য্যন্ত নানা কুসংস্কারে বিশ্বাসী। তাই এখনও অনেক মুসলমান শিশু জন্মের সময় ধাত্রী বা মহিলা চকিৎসকের সাহায্য লয়েন না।

রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, জন্মাইবার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শতকরা ৮.৭৭, এক হইতে সাত দিনের মধ্যে শতকরা ২৭.৬০ এবং এক মাসের মধ্যে শতকরা ৫০-৫৩টি শিশু মারা যায়।

শহরে যক্ষ্মারোগ

কলিকাতা শহরে যক্ষ্মারোগে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়িতেছে। ১৯৫৯-৬০ সালে যক্ষ্মারোগে মৃত্যু সংখ্যা ছিল ২ হাজার ৫৪৭। ১৯৫৮-৫৯ সালে মৃত্যু সংখ্যা ছিল ২ হাজার ৪০১। ঐ দুই বছরে হাজার-প্রতি গড়পড়তা মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে .৯৫ এবং .৮৯।

রিপোর্ট অনুযায়ী ১০ হইতে ৩০ বছরের মধ্যে য রোগী মহিলার মৃত্যু সংখ্যা পুরুষ অপেক্ষা দ্বিগু বেশী এবং ২০ হইতে ৪০ বছরের মধ্যে প্রায় দ্বিগু বহুক্ষেত্রে বাল্যবিবাহ যক্ষ্মারোগের কারণ বলি রিপোর্টে উল্লেখ করা হইয়াছে। ১৫ হইতে ২০ এব ২০ হইতে ৩০ বছরের মধ্যে যক্ষ্মারোগে পুরুষ ও মহিলার প্রতি হাজারে মৃত্যু সংখ্যা ছিল যথাক্রমে .২০ ও .৫১ এবং .৫০ ও ১.০৬। ৪০ হইতে ৫০ বছরের মধ্যে পুরুষ ও মহিলার মৃত্যু সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১.৩২ ও ১.১০।

শীতকালে মৃত্যু বেশী

গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা শীতকালে মৃত্যু সংখ্যা বেশী হয়। এপ্রিল মাস হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত হাজার-প্রতি গড়পড়তা মৃত্যু সংখ্যা ছিল ১.৮১। কিন্তু অক্টোবর মাসে গড়পড়তা মৃত্যু সংখ্যা ছিল ২.৭৩, নভেম্বর মাসে ৩.৪২, ডিসেম্বর মাসে ২.৮৯ এবং জানুয়ারী মাসে ২.৯৮।

কলিকাতা শহরে স্ত্রীলোকের মৃত্যু সংখ্যা পুরুষের তুলনায় বেশী। ১৯৫৯-৬০ সালে শহরে মোট পুরুষ ও মহিলার মৃত্যু সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১১ হাজার ৩৫১ এবং ১৫ হাজার ৩২। এই সংখ্যা অনুযায়ী হাজার-প্রতি পুরুষের মৃত্যু সংখ্যা দাঁড়ায় ১১.৩ এবং মহিলার ১৫.১৭। উল্লেখযোগ্য যে, শহরে মোট জনসংখ্যার মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ হইতেছে পুরুষ।

রিপোর্টে উল্লেখ আছে যে, গত কুড়ি বছরের মধ্যে ১৯৪৩-৪৪ সালে এবং ১৯৫০-৫১ সালে সর্ব্বাধিক মৃত্যু ঘটে। ১৯৪৩-৪৪ সালে মৃত্যু সংখ্যা ছিল ৫৯ হাজার ৭৩৯ এবং ১৯৫০-৫১ সালে ছিল ৫৫ হাজার ৪২২। ১৯৫০-৫১ সালে পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে হাজার হাজার উদ্বাস্তুর আগমন হয় এবং ঐ বছরে কলেরা ও বসন্ত রোগ প্রবল মহামারী আকারে দেখা দেয়। কুড়ি বছরের মধ্যে ১৯৫৪-৫৫ সালে সর্ব্বাপেক্ষা কম মৃত্যু সংখ্যা ছিল। ঐ বছরে মোট মৃতের সংখ্যা ছিল ৩২ হাজার ১৯৭।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মুসলমানদের মৃত্যু সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। প্রতি হাজারে মৃত্যুর গড়পড়তা ছিল ১৬.৩০, হিন্দুর ১২.৬৪, খ্রীষ্টানের ৭.৬৫।

ঐ সময়ে শহরে মোট জনসংখ্যার মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা হইতেছে ২২ লক্ষ ৬৫ হাজার ৭৬৬, মুসলমানের ৩ লক্ষ ১৪ হাজার ৩৭০ এবং খ্রীষ্টানের ৭৬ হাজার ৪৫২।

১৯৫৯-৬০ সালের পর পৌর কর্তৃপক্ষ এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ রিপোর্ট আবার কবে প্রকাশ করিতে পারিবেন তাহা কেহ বলিতে পারেন না। তাই ১৯৫৯-৬০ সালের

পর পৌর শাসনব্যবস্থা কোন্ ধারায় প্রবাহিত হইতেছে, পৌর কর্তৃপক্ষ নাগরিক উন্নয়নমূলক বা সেবামূলক কার্য্যে কতখানি হাত দিয়াছেন ও শাসনব্যবস্থা হইতে দুর্নীতি দমনের কতটা প্রচেষ্টা করিয়াছেন, প্রভৃতি সম্বন্ধে অদূর ভবিষ্যতে করদাতাদের সামগ্রিক রিপোর্ট পাইবার সম্ভাবনা কম।

১৯৬০-৬১ সালের রিপোর্ট যখন প্রকাশিত হইবে তখন আমাদের মধ্যে হয়ত অনেকেই ধরাধাম হইতে অন্য কোন লোকে প্রয়াণ করিব। কিন্তু যে লোকেই যাই না কেন—সেই লোকে কলিকাতা কর্পোরেশনের মত এমন সর্ব্বগুণাকর কোন প্রতিষ্ঠান নাই—এই আশা লইয়াই যাইব।

কলিকাতা শহরের বর্তমান অবস্থার সহিত নরকের তুলনা অনেকে করেন, কিন্তু এ তুলনায় হয়ত সেই কল্পিত-নরকবাসীরাও আপত্তি করিবে, কারণ সেই নরকের পথ-ঘাট এবং অন্যান্য সব কিছুর অবস্থা এই কলিকাতা অপেক্ষা বহুসাংশে শ্রেয়তর—এমন কথা 'প্রত্যক্ষ'দর্শীরা বলিয়া থাকেন। বর্তমান পৌর (উপ-) পিতারা গৌরী সেনের অর্থে নবাবী করিতেছেন—তাঁহাদের পক্ষে করদাতাদের জন্য কল্যাণকর কিছু করিবার সময় নাই বলিলেও চলে! কেহ পৈতৃক কারবার লাটে তুলিয়া পৌরপিতার বেশে লাটসাহেবী মেজাজে পৌর সংস্থার করের টাকার অপশ্রাদ্ধ ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক 'মট' লেনের গাড় মটকাইয়া—সেইখানে তাঁহার অজ্ঞাত, অক্রুত কিন্তু অবশ্যই পুণ্যশ্লোক দাদামহাশয়ের নাম বসাইতে লজ্জা বোধ করেন নাই! কেহ বা কলিকাতার বুকে বিনা অনুমতিতে বহুতলা-বিশিষ্ট বিরাট্ ফ্ল্যাট বাড়ী নির্মাণে গোপন সহায়তা দান করিয়া নিজের ভাঁড়ে বেশ কিছু টানিয়া লইতে কোন দ্বিধা-সঙ্কোচ বোধ করেন না। আবার এমন কিছু সংখ্যক খেঁকি পৌরপিতা রহিয়াছেন, যাঁহারা পৌর প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী এবং কর্মী-মহলকে তাঁহাদের অভদ্র এবং ইতর ব্যবহারে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতেছেন। যেমন দেখুন:

পৌরবাবাদের মোড়লী

সংবাদপত্রে প্রকাশ যে:

কলিকাতা পৌরসভার কয়েকজন কাউন্সিলারের "অত্যধিক মাষ্টারীপনায়" অফিসার মহল বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছেন। অফিসারদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ হঠাৎ মিলিতভাবে প্রতিবাদ আকারে বিস্ফোরিত হইবার আশঙ্কা আছে বলিয়া ওয়াকিবহাল মহল হইতে জানা গিয়াছে।

পৌরসভার যে ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি প্রশাসনিক কাঠামো নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন, সেই ফিনান্স কমিটির অধিকাংশ সদস্যের প্রতি অফিসারগণ বিরূপ। অফিসারদের অভিযোগ এই যে, কমিটির সভায় অনেক সময় সদস্যরা নাকি রুক্ষ মেজাজে ও অভদ্র ভাষায় অফিসারদের কার্য্যকলাপের নিন্দা করেন।

কাউন্সিলারদের এই আচরণে পৌরসভার সকল শ্রেণীর অফিসারগণ অস্বস্তিবোধ করিতেছেন। তাঁরা নীরবে ও নিঃশব্দে ইহার প্রতিকার দাবী করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

সম্প্রতি জনৈক উচ্চপদস্থ অফিসারের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করিয়া জনৈক প্রভাবশালী কংগ্রেস কাউন্সিলার বলেন যে, ইহার জন্য দায়ী কয়েকজন ফিনান্স কমিটির সদস্য। কমিটির সভায় দু-একজন সদস্যের অভদ্রোচিত ভাষা প্রয়োগ ও উগ্রভাব প্রকাশ করার দরুণ অফিসারটির মৃত্যু দ্রুত ঘনাইয়া আসে বলিয়া উক্ত কাউন্সিলার জানান।

আরও অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে যে, বিভিন্ন কমিটির রুদ্ধদ্বার বৈঠকে কাউন্সিলারগণ অফিসারদের প্রতি নানা কঠোর এবং অভদ্র বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। যেমন: কাউন্সিলারগণ নাকি বলেন, "তোমরা কিছু বোঝো না, তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি নেই, তোমাদের শিক্ষার বালাই নেই, তোমাদের ইংরাজী লিখবার ক্ষমতা নেই, বিভাগের পরিচালনার ক্ষমতা তোমাদের নেই, এমনকি তোমরা ঠিকমত রিপোর্ট দিতে পার না, তোমাদের অযোগ্যতা ও অপদার্থতা আর বরদাস্ত করা যায় না।" একটি কমিটির চেয়ারম্যান নাকি একজন অফিসারকে প্রত্যহ চাকুরি খতমের হুমকি দিয়া থাকেন। তিনি প্রায়ই শাসাইয়া বলেন, 'মনে রাখবেন আমার দয়ায় আপনি অফিসার পদটি পাইয়াছেন।' চেয়ারম্যানের এই আচরণে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মচারীগণও অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

অফিসার মহল হইতে পাল্টা অভিযোগ করা হয় যে, অনেক সময় কাউন্সিলারদের আবদার ও মেজাজী হুকুম পালন করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব না হইলে প্রতিশোধস্বরূপ তাঁহাদের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে অক্রমণ হইয়া থাকে। অফিসার মহল হইতে আরও বলা হয়

যে, কাউন্সিলারগণ পৌরসভাকে তাঁহাদের জমিদারী বলিয়া মনে করেন।

এই সকল ইতর এবং অভদ্রদের সর্ব্বপ্রকার বেয়াদবী রূপ রোগের সহজ এবং সর্ব্বত্র প্রযোজ্য টোটকা মহৌষধ আছে—এবং সেই ঔষধ যে কি তাহা খোলাখুলি বলিবার প্রয়োজন বোধ করি না।

কিন্তু পৌরপিতাদের ধর্ম্ম 'পিতা' অর্থাৎ করদাতাদের 'পিতামহ' শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয় তাঁহার স্নেহের ধন 'পুত্রদের' প্রতি কেন দৃষ্টি দিতেছেন না? জানি পিতা স্নেহময় কিন্তু পরম স্নেহময় পিতাও বহু ক্ষেত্রে সন্তানদের শাসন করেন বা করিতে বাধ্য হয়েন। আলোচ্য ক্ষেত্রে কেন তাহা হইতেছে না? শেষ পর্য্যন্ত লোকে অর্থাৎ করদাতারা বলিতে বাধ্য হইবে যে—"যেমন বাপ তেমনি ছেলে!"

শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয় হালে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেসীদের নানা অনাচার, ব্যভিচার নিরাময় করিয়া দিতেছেন তাঁহার অমোঘ কবিরাজী ঔষধের প্রয়োগে—কিন্তু প্রদীপের নীচের অন্ধকার কালো চশমা ঢাকা চোখে কেন পড়িতেছে না?

কলিকাতার পৌরসভা ; পাওনা ট্যাক্স ;

সদ্য প্রকাশিত কলিকাতা কর্পোরেশনের শাসন-সংক্রান্ত (Administrative) এক রিপোর্টে (১৯৫৯-৬০) প্রকাশ, যে, বাড়ীর ট্যাক্স বাবদ দেড় কোটির বেশী টাকা অনাদায়ী খাতে পড়িয়াছে—ইহা ছাড়া অন্যান্য ট্যাক্স বাবদও বহু অর্থ নাগরিকদের নিকট হইতে প্রাপ্য আছে।

পৌরসভার বাজেটে ট্যাক্স বাবদ বাৎসরিক টাকা আদায়ের যে অঙ্ক ধরা হয় তাহা অপেক্ষা অনেক কম আদায় হইয়া থাকে। প্রতি বছরই অনাদায়ী টাকার অঙ্ক স্ফীত হইতেছে।

কয়েক বছরের ট্যাক্স বাবদ কত আদায় ধরা হইয়াছিল, আদায় বাবদ টাকার অঙ্ক কত ছিল এবং কত কম টাকা আদায় হইয়াছিল, নিম্নে তার হিসাব দেওয়া হইল :

বছর	আদায়ের বাবদ	কত আদায়	কত কম
১৯৫৭-৫৮	৪,০৫,৫০,০০০	৩,৯২,৩৫,৬৩২	১,১৮,৩৯,৭৮৮
১৯৫৮-৫৯	৪,৬৬,০০,০০০	৪,১৮,৬৭,৪৮৮	১,৬৩,১৫,১৮০
১৯৫৯-৬০	৪,৭০,৫০,০০০	৪,১২,২৫,৮০০	১,৭৯,৬৯,৭৭১

পৌরসভার সদ্য প্রকাশিত ১৯৫৯-৬০ সালে এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ রিপোর্টে এই হিসাব আছে।

রিপোর্টে পাওয়া যায় যে, ১৯৩১-৩২ সাল হইতে কম ট্যাক্স আদায় সুরু হয়। ইহার প্রধান কারণ এই যে ১৯২৩ সালের মিউনিসিপ্যাল আইনের ১৪৬ ধারা অনুযায়ী অনেক বাড়ীর মালিক ট্যাক্স বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আপত্তি জানান। তদানীন্তন পৌর কর্ত্তৃপক্ষ আপত্তির শুনানীর সময় অধিক হারে ট্যাক্সের হার কমাইয়া ছিলেন। ১৯৩৮-৩৯ সাল হইতে অবস্থার উন্নতি হইতে থাকে। কারণ নূতন বাড়ীর সংখ্যা বাড়িতে থাকে। ১৯৪৮-৪৯ সাল পর্য্যন্ত এই অবস্থা চলিতে থাকে। ১৯৪৯-৫০ সালে ট্যাক্স আদায় খুব কমিয়া যায়। তারপর কয়েক বছর অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়। পুনরায় ১৯৫৫-৫৬ সাল হইতে অবস্থার অবনতি হইতে থাকে।

রিপোর্টে বলা আছে যে, ঐ বছরে ১৭৯১টি বাড়ীর ট্যাক্সের হার পুনর্নির্ধারণ করা হয়। পুনর্নির্ধারণের ফলে ট্যাক্সের ভ্যালুয়েশন ৩৭ লক্ষ ১৭ হাজার ১৯০ টাকা বাড়ে। কিন্তু ৭ হাজার ২৮৩ জন বাড়ীর মালিক ঐ পুনর্নির্ধারণের হারে আপত্তি জানান। পূর্ব্বেকার বছরগুলির যে আপত্তির নিষ্পত্তি হয় নাই সেই সংখ্যা লইয়া মোট আপত্তির শুনানী বাকী আছে ১৫০১৯।

পৌর কর্ত্তৃপক্ষ মহল হইতে জানানো হয় যে, রাজ্য সরকারের নিকট হইতে ট্যাক্স বাবদ প্রায় ২৪ লক্ষাধিক টাকা পাওনা আছে।

রাজ্য সরকারের নিকট হইতে ট্যাক্স বাবদ যাহা প্রাপ্য তাহা কেন যথাসময়ে আদায় করা হয় না, আমাদের পক্ষে তাহা বুঝা সম্ভব নহে। একথা বিশ্বাস করা শক্ত যে, পৌরসভার কর্ম্মকর্তারা যদি ঠিক সময়ে ঠিকমত রাজ্য সরকারের দরবারে তাঁহাদের দাবি পেশ করিতেন—এত টাকা কখনই অনাদায়ী খাতে পড়িত না। কিন্তু কর্পোরেশনের নবাবদের এ সব সামান্য বিষয়ে নজর দিবার সময়াভাব একান্ত! গৌরী সেনের পয়সায় যাঁহারা 'একদিন কা সুলতান' হইয়া বসিয়াছেন—তাঁহারা গৌরী সেনের অর্থের অপশ্রাদ্ধ কর্ম্মে যতখানি দক্ষ—ওই গৌরী সেনের অর্থ আদায়ে তাহা অপেক্ষা হাজারগুণ অকম্মা! তবে একটা কথা এই হইতে পারে যে, রাজ্য সরকার এবং কলিকাতা কর্পোরেশন—দুইটিই কংগ্রেসী মাসতুতো ভাইদের সুশাসনে—কাজেই এক মাসতুতো ভাই অন্য মাসতুতো ভাইকে টাকার জন্য তাগিদ দিতে পারেন না, বিশেষ করিয়া ছোট মাসতুতো

ভাইকে যখন বড়র কাছে নানা অছিলায় নানা ভাবে ভিক্ষার ঝুলি লইয়া হাজির হইতে হয়!

সর্ব্ব-ভারতখ্যাত অ্যান্টি-অনাচারী শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয় তাঁহার শাসনাধীন পৌরসভার দক্ষতা বিষয়ে কি ভাবেন? বলা বাহুল্য পৌরসভার ট্যাক্স ১৯৬০-৬১ হইতে ১৯৬৪ পর্য্যন্ত আরও হয়ত কোটি খানেক অনাদায়ী স্তূপে জমা হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের ঔষধের বাজার মারিবার প্রয়াস!

সংবাদপত্রে প্রকাশ পাইয়াছে যে,—

কলিকাতা, ২৭শে অক্টোবর—পশ্চিমবঙ্গে প্রস্তুত ঔষধের বাজার নষ্ট করিয়া এই রাজ্যের ভেষজ শিল্পের উপর চরম আঘাত হানিবার জন্য কোন কোন রাজ্যে এখনও ব্যাপকভাবে প্রচার অভিযান চলিতেছে।

কাশ্মীরে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য পরিষদের সম্মেলনে কোন কোন রাজ্য হইতে এই প্রকার ধারণা সৃষ্টির প্রয়াস হয় যে, পশ্চিমবঙ্গের সব ঔষধ ভেজাল, সুতরাং পশ্চিম বাংলার ঔষধের উপর আস্থা রাখা চলে না।

পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায় বিভিন্ন রাজ্যের পক্ষে এই প্রকার অপ-প্রয়াসের বিরোধিতা করেন। যে-সকল অসাধু ব্যবসায়ী ঔষধে ভেজাল দেয়, তিনি তাদের শাস্তি দিবার প্রস্তাব নিশ্চয় সমর্থন করবেন।

কিন্তু সেই অজুহাত দেখাইয়া পশ্চিমবঙ্গের সমৃদ্ধ ভেষজ শিল্পকে বিনষ্ট করার চেষ্টা করা হইলে, শ্রীমতী মুখার্জ্জি দেশের স্বার্থে তাহার বিরোধিতা করিবেন।

পশ্চিমবঙ্গের ভেষজ তদন্ত কমিশনের রিপোর্টকে উপলক্ষ্য করিয়া কয়েকটি রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের ভেষজ শিল্পের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করার সুযোগ গ্রহণ করে।

বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে প্রস্তুত পাচ কোটি টাকার ঔষধ ভারতবর্ষের বাজারে বিক্রয় হয়। বহুক্ষেত্রে বিদেশী সংস্থার সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করিয়াও মহারাষ্ট্রের ঔষধের বাজার পশ্চিমবঙ্গের অপেক্ষা বড় নহে।

বছর দুই পূর্ব্বে আর একবার পশ্চিমবঙ্গের প্রস্তুত ঔষধাদি সবই ভেজাল—এই প্রকার একটা প্রবল প্রচার প্রয়াস দেখা যায় এবং এই প্রচারের ঘাঁটি ছিল বোম্বাই।

সেই সময় বহু তদন্তাদিতে প্রকাশ পায় যে,ভেজাল এবং সাব-ষ্ট্যাণ্ডার্ড ঔষধের আকর বোম্বাই এবং অন্যান্য দু-একটি রাজ্য। একথাও জানা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানে বিশেষ করিয়া কলিকাতা শহরে এক শ্রেণীর অন্য-প্রদেশবাসী ব্যাপক ভাবে ভেজাল, জাল এবং নিগুর্ণ ঔষধের ফলাও কারবার চালাইতেছে। ইহাদের সঙ্গে কোন বাঙ্গালী যে ছিল না, এমন কথা আমরা বলি না—কিন্তু সেই কয়েকজনের অপরাধে পশ্চিমবঙ্গের বেঙ্গল কেমিক্যাল, ক্যালকাটা কেমিক্যাল, বেঙ্গল ইমিউনিটি, অ্যালবার্ট ডেভিড, ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্রভৃতি পুরাণো এবং বহুখ্যাত ঔষধের প্রতিষ্ঠানগুলির সর্ব্বনাশ করার চেষ্টা—(বলা বাহুল্য) অবাঙ্গালী (ঔষধের) কারবারীদের গোপন হস্তের দ্বারা পরিচালিত।

অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী এবং কারখানার মালিকরা পশ্চিমবঙ্গের সকল শিল্প-ব্যবসায় হইতে বাঙ্গালীকে প্রায় তাড়াইয়াছেন, এখন বাকি কেবলমাত্র এই ঔষধের ব্যবসা এবং ঔষধ উৎপাদনকারী কারখানাগুলি। এই-গুলি বাগাইতে পারিলেই অবাঙ্গালী মালিক এবং ব্যবসায়ীদের মনোবাসনা পূর্ণ হইবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সর্ব্বনাশ সাধনে কোন কোন রাজ্য সরকারও যে তাঁহাদের সহযোগিতার দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিতে পারেন—একথা ভাবিতেও আমাদের কেবল দুঃখ নহে, গভীর লজ্জাও হইতেছে!

বর্ত্তমান অবস্থায় এ-রাজ্যের ঔষধ কারখানাগুলি এবং ব্যবসায়ীমহল যদি সমবেত "প্রতিরক্ষা" ব্যবস্থা না করেন—অদূরে বিপদ দেখা দিবে।

কালোবাজারের উদ্ধারিত চাউল ও আটা

দেশে যে সময় চাউল ও আটার এত টানাটানি এবং হাহাকার—ঠিক সেই সময় সংবাদপত্রে এক বিচিত্র সংবাদ পাইলাম!

কালোবাজার হইতে আটক চাল ও আটা এখন ব্যারাকপুর মহকুমার বিভিন্ন থানার খুপরিতে পচিতেছে! শুধু চালেরই পরিমাণ হইবে পাঁচ শত মণের বেশী। দুর্ম্মূল্যের বাজারে এই বস্তুগুলির সদ্গতি করার জন্য পুলিশী দপ্তর খাদ্য দপ্তরের কর্ম্মকর্ত্তাদের শরণাপন্ন হইতেছে তিন-চার মাস যাবত। কর্ম্মকর্ত্তারাও কোন সময়ে তাহাদের বিমুখ করেন নাই, তবে আজ নয়, কাল। সেই আজ আর কালের ধাঁধায় পড়িয়া ক্ষুধার অন্ন এখন দুর্গন্ধের বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। অধিকন্তু থানার স্বল্প পরিসরে পুলিশের নিজের কাজ চালানোও এক দুর্ভোগ।

ইতিপূর্ব্বে, বাজারে সরকার নির্দ্ধারিত অপেক্ষা বেশী দামে চাল বিক্রয় প্রতিরোধ করিয়া স্থানীয় যুবকদল

ন্যায্য দামে সরবরাহের ব্যবস্থা করিতেন। পুলিশের মতে, কাজটা ভাল হইলেও আইনসম্মত নয়। তাই, পুলিশ কর্তৃপক্ষই ইদানীং ব্যাপকভাবে চাল, আটা এবং মাছের বাজারে হানা দিতে সুরু করে। একজন উর্দ্ধতন পুলিশ কর্মচারীই প্রশ্ন করেন—কালোবাজারের চাল-আটা আটক করা অত্যন্ত আইনমাফিক হইয়াছে, কিন্তু পচাইয়া নষ্ট করাটার কি হইবে?

চাল-আটা ছাড়াও থানায় গুঁড়া দুধ, সিমেন্টও জমিয়া রহিয়াছে। শুল্ক বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের নিকটও পুলিশ ইহা লইয়া যাওয়ার অনুরোধ জানায়। কিন্তু প্রায় ছয় মাস যাবত এই বিভাগেরও সাড়াশব্দ নাই। এখন বস্তা দুইটির কোন্‌টি সিমেন্ট আর কোন্‌টি গুঁড়া দুধ চোখে দেখিয়া বলা মুশ্‌কিল!

পুলিশ পক্ষের বক্তব্য: কালোবাজার হইতে আমদানী জিনিষ যদি থানার হেপাজতেই রাখিতে হয় হবে পৃথক্ কামরা ও তদারকী করার জন্য বাড়তি কর্মচারীর ব্যবস্থা করার দরকার।

এ বিচিত্র প্রশাসনিক ব্যবস্থার উপর মন্তব্য কি হইতে পারে—ভাবিয়া পাওয়া বিষম ব্যাপার!

কেবলমাত্র ব্যারাকপুরেই নহে—এ রাজ্যের অন্যান্য নানা স্থানের প্রকাশিত-অপ্রকাশিত সংবাদে একই ব্যাপার দেখা যায়। প্রবাদ বাক্যে বলে, "পুলিশে ছুঁলে আঠার ঘা!"—কিন্তু এ ত মানুষের বেলায়। চাউল, আটা, চিনি—এ সব বিষয়েও কি একই নিয়ম দেখা যাইবে?

শুনিতে পাই খাদ্য দপ্তরে উচ্চপদে বহু গুণী এবং জ্ঞানী ব্যক্তির সমাবেশ ঘটিয়াছে—কালো-গুদাম হইতে যে সব মাল উদ্ধার করে পুলিশ—সেই সব মাল নিকটস্থ র‍্যাশন দোকানে কিংবা চৌমাথায় নির্দ্ধারিত মূল্যে বিক্রয় ব্যবস্থা করিলে দোষ হয় কি? আর কিছু না হউক এই ব্যবস্থায় আটা সিমেন্টে, সিমেন্ট পাথরে, চাউল বেচালে পরিণত হইবে না। টাকাটা না হয় কালোবাজারীর, কিন্তু দ্রব্য-সম্ভারগুলি ত দেশের—না বিশেষ কোন বিদেশীর?

আশা করি এই সব বিচিত্র সংবাদ মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে আসে—তিনি আর কিছু না হোক্—এই বিশেষ বিষয়ে একটা সরকারী পরিসংখ্যান প্রকাশ করিয়া জনগণের চক্ষুদাহ হ্রাস করিতে পারেন।

'কল্যাণীর' নূতন বাড়ী—বিক্রয়?

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মানস-কন্যা 'কল্যাণী' সম্পর্কে প্রকাশ:

বিচিত্র নগরী কল্যাণী, তার বিধিব্যবস্থাও তদনুরূপ। বর্ত্তমানে একটি চূড়ান্ত অব্যবস্থা ও খামখেয়ালী নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, যাহার ফলে বহুদূরাগত বাড়ী ক্রেতাগণ কল্যাণীতে চরম হয়রানি ভোগ করিতেছেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে উন্নয়ন বিভাগ হইতে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে, কল্যাণীতে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিকট ৪ শত বাড়ী বিক্রয় করা হইবে। বিজ্ঞাপনে প্রতি বাড়ীর মূল্য ঘোষণা করা হইয়াছে ১৫ হাজার টাকা। প্রথমে নগদে দিতে হইবে ৭ হাজার টাকা, বাকি ৮ হাজার টাকা ২০ বা ২৫ বৎসরের কিস্তিতে দিতে হইবে। কিন্তু সরকার হইতে যে পুস্তিকা বিক্রয় হইতেছে তাহাতে লিখিত আছে বাড়ীর মূল্য ১১ হাজার টাকা। প্রথমে দিতে হইবে ৩ হাজার টাকা, বাকি ৮ হাজার টাকা পূর্ব্বলিখিত রূপে কিস্তিতে দিতে হইবে। জনসাধারণ হতভম্ব। কোন্ মূল্যটা ঠিক, পুস্তিকার না বিজ্ঞাপনের? তা ছাড়া আরও নাটকীয় ঘটনা রহিয়াছে। বিশদ বিবরণের জন্য কল্যাণীর জনসংযোগ অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য বলা হইয়াছে। জনসংযোগ অফিসার বাড়ী দেখাইতে পারিতেছেন না, শুধু প্ল্যানটিই দেখাইতেছেন; কারণ তালাবদ্ধ বাড়ীগুলি নাকি এখনও কণ্ট্রাক্টরদের হাতে-সরকারীভাবে হস্তান্তরিত হয় নাই। শত শত ক্রেতা সময় ও বহু অর্থব্যয় করিয়া চরম নৈরাশ্য ও বিরক্তি নিয়া ফিরিয়া যাইতেছেন। আরও আছে—বাহির হইতে বাড়ীগুলি দেখার পথ নাই। ঐগুলি জঙ্গলে ঢাকিয়া যাইয়া বিপদসঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছে। এ গাফিলতি আর অপচয়ের কৈফিয়ৎ কে দেয়?

বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, 'সেন-ডাইনেষ্টির'ও প্রধান, কাজেই জবাব তাঁহারই দেওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।

কল্যাণীর নব-নির্ম্মিত বাড়ীগুলি কাহাদের জন্য নির্ম্মিত বলা শক্ত।

তবে এইটুকু বলা যায়—ঐ বাড়ীগুলি মধ্যবিত্তদের জন্য নহে। কারণ কল্যাণীতে বাস করিলেও তাহাদের চাকুরি করিয়া সংসার চালাইতে হইবে, এবং ইহার জন্য কলিকাতায় প্রত্যহ আসা-যাওয়া করিতেই হইবে। কাজেই কল্যাণীতে বাড়ী কিনিলেই চলিবে না, একটি ছোট মোটর গাড়িও সেই সঙ্গে কিনিতে হইবে। রেলের উপর নির্ভর করা যায় না, কারণ রেলগাড়িগুলি আজকাল চলে খেয়াল-খুশিমত—কাহার দোষে জানি না। কিন্তু

চাকরি করিতে হইলে আপিসে সময় রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন—এবং রেলের উপর নির্ভর করিলে মাসে অন্তত দশ-পনের দিন কর্ম্মস্থলে আধঘন্টা হইতে দেড়-দুই ঘন্টা লেট্ হইতে বাধ্য। ইহার ফল কি তাহা জানে চাকুরিজীবী।

ভারতে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি

কয়েক মাস পূর্ব্বে প্রকাশিত এক হিসাবে দেখা গিয়াছিল যে, ১৯৫১-৬১ সালে ভারতের পাক্ সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে মুসলমান জনসংখ্যা ভয়াবহরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই হিসাবে প্রকাশ পায়:

আসামে বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ৩৮·৫৬ ভাগ, বিহারে ৩২·২৯, পশ্চিমবঙ্গে ৩৬·৪৮, পাঞ্জাবে ৩৮·০১, রাজস্থানে ৩২·৬২ ভাগ।

সমগ্র ভারতের অবস্থা হিসাব করিলে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ২৫·৬১ ভাগ।

সীমান্ত রাজ্যগুলিতে অন্য যে কোন সম্প্রদায়ের তুলনায় মুসলিম জনসংখ্যা অনেক বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে—এমন কি, দেশের সাধারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির (শতকরা ২১·৫১ ভাগ) চাইতেও বেশী।

পাকিস্তানে মুসলিম জনসংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে—শতকরা ৩০ ভাগ—তাহার তুলনায় সীমান্তবর্ত্তী ভারতীয় রাজ্যগুলিতে মুসলিম জনসংখ্যা বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সীমান্তবর্ত্তী রাজ্যগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জেলা-ওয়ারি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত বরাবর অঞ্চলেই মুসলিম অধিবাসীদের ভিড় অপেক্ষাকৃত বেশী। পুরুষের তুলনায় নারীদের সংখ্যার আনুপাতিক হার অনেকটা কমতির দিকেই রহিয়াছে।

পূর্ব্ব পাকিস্তানে এবং ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণে ধরা পড়িয়াছে যে, পূর্ব্ব পাকিস্তানে মুসলিম জনসংখ্যা হ্রাস এবং আসাম, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় সে সংখ্যা বৃদ্ধির মধ্যে কিছুটা সম্পর্ক রহিয়াছে। সরকারী হিসাবের দ্বারাই ইহা বুঝা যায়।

পূর্ব্ব পাকিস্তানে মুসলিম জনসংখ্যা শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া যদি ধরিয়া লওয়া হয়, তবে, দেখা যাইবে যে, সেখানকার রাজসাহী, খুলনা, ঢাকা ও চট্টগ্রাম ডিভিসনে মোট ঘাটতি পড়ে ১০ লক্ষেরও বেশী। এই ঘাট্‌তিটি আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও বিহারের পুর্ণিয়া জেলার বাড়তি মুসলিম জনসংখ্যার প্রায় কাছাকাছি গিয়া পৌঁছে।

এই প্রকার পাকিস্তানী অনুপ্রবেশ ব্রহ্মদেশেও পরিলক্ষিত হইয়াছে। ব্রহ্মের সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যায় যে একমাত্র আরাকানেই পাকিস্তানী অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা কমপক্ষে ২ লক্ষ! ব্রহ্মের সংবাদপত্রে আরও প্রকাশ যে, ব্রহ্মের বিভিন্ন অঞ্চলে বেআইনীভাবে প্রবেশকারী পাকিস্তানীদের পিছনে বেশ কিছু সংখ্যক লোক রহিয়াছে। ঐ সব লোকের নির্দ্দেশ অনুযায়ী অনুপ্রবেশকারীরা কাজ করিয়া চলিয়াছে।

গত কয়েক বছর ধরিয়া ব্রহ্মের আরাকান অঞ্চলে পূর্ব্ব পাকিস্তানীরা অনুপ্রবেশ করিতেছে। ঐ এলাকায় পাকিস্তানী অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা দুই-তিন লক্ষ হইবে। কিছুদিন পূর্ব্বে আরাকান এলাকাকে পাকিস্তানের সহিত যুক্ত করার জন্য যে আন্দোলন হয়, ব্রহ্ম সরকার তাহা দমন করেন।

ব্রহ্মের একটি পত্রিকা বলে: ১৯৫৮ সাল হইতে এ পর্য্যন্ত আরাকানের বুথিডং এবং মংড এলাকায় ২ লক্ষ পূর্ব্ব পাকিস্তানী বেআইনীভাবে প্রবেশ করিয়াছে।

ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে, পাক্ সরকারের সমর্থন-সাহায্য না থাকিলে এমন ঘটিতে পারে না। এই বিষয়ে পাকিস্তান তাহার নয়া দোস্ত চীনের টেক্‌নিক নকল করিয়া চলিয়াছে সার্থক ভাবে। বিনা বাধায় এই পাক-চক্র চলিতে থাকিলে দশ বৎসর পরে অবস্থা কি দাঁড়াইবে তাহা সহজ অনুমেয়। এই প্রসঙ্গে দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করিতে হইবে যে, ভারতে পাক্ অনুপ্রবেশে সরকারী মহল বাধা দিতে চাহিলেও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু সরকারী মহলের এই সৎ এবং দেশের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টায় সরকারী মহলকেই বাধা দেন। এমন মন্তব্যও তিনি করেন যে, "১০ বৎসরে দশ লক্ষ মুসলমানের আসামে অনুপ্রবেশ এমন কিছু ভয়াবহ ব্যাপার নহে!" নেহরু রোপিত বিষবৃক্ষে আজ ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বে প্রকাশিত সরকারী হিসাবে দেখা যাইতেছে:

আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরাতে পাক্-মুসলিম অনুপ্রবেশ ভয়াবহ !!

রিপোর্টে প্রকাশ:

১৯৫১ হইতে ১৯৬১ সাল। এই দশ বছরে আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় পাকিস্তানী মুসলমানদের

অনুপ্রবেশের ফলে এই তিন রাজ্যে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে সাংঘাতিক রকম। ইহার ফলে সমস্যাও দেখা দিয়াছে বিরাটভাবে। এই দশ বৎসরে আসামে মুসলিম বাসিন্দার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে ৩৯ শতাংশ, পশ্চিমবঙ্গে ৩৮ শতাংশ এবং ত্রিপুরায় বিপজ্জনক সংখ্যা ৬৮ শতাংশ। এই সমস্যার গুরুত্ব ও তীব্রতা সম্প্রতি, এই সর্ব্বপ্রথম আন্তর্জ্জাতিক জনমানসে তুলিয়া ধরা হয় কায়রোর নিরপেক্ষ রাষ্ট্র সম্মেলনে।

এই তিনটি রাজ্যে মুসলিমদের জন্মহার এই দশ বৎসরে যে পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, এই তিন রাজ্যের প্রকৃত মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে তদপেক্ষা অনেক বেশী। এই অতিরিক্ত বৃদ্ধির হার সংশ্লিষ্ট তিনটি রাজ্যে নিম্নরূপ:—ত্রিপুরায় ৪৭ শতাংশেরও বেশী, আসামে ১৮ শতাংশেরও বেশী এবং পশ্চিমবঙ্গে ১৭ শতাংশেরও বেশী। এই দশ বৎসরে পাকিস্তানে যে হারে মুসলমানের সংখ্যা বাড়িয়াছে, আসাম পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার এই হার বৃদ্ধির হিসাব তাহার সহিত তুলনামূলক বিচারে সাব্যস্ত করা হইয়াছে।

এই যে সমস্যা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলে তাহার একমাত্র উত্তর দাঁড়ায় যে, ১৯৫১ সালের আদমসুমারী ও ১৯৬১ সালের আদমসুমারীর মধ্যবর্ত্তীকালে এই পরিমাণ পাকিস্তানী মুসলমান ভারতে আসিয়া খুঁটি গাড়িয়াছে।

অন্য দিকের চিত্রে দেখুন:

পাকিস্তানী অত্যাচার

পাকিস্তানে কি রকম নিরবচ্ছিন্নভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উচ্ছেদকার্য চলিতেছে, এই পুস্তিকায় তাহারও চিত্র প্রকাশ করা হয়। ইহাতে বলা হয়:—১৯৫০ হইতে ১৯৬২ সালের মধ্যে পাকিস্তান হইতে হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের যত লোককে বিতাড়িত করা হইয়াছে, তাহার সংখ্যা সাত অঙ্কের। এই সব হতভাগ্য পাকিস্তানে নিরাপত্তা বোধ করিতে পারে নাই বলিয়াই তাহারা পিতৃ-পিতামহের বাড়ী-ঘর ছাড়িয়া ভারতে চলিয়া আসিয়াছে। এখন প্রশ্ন হইল, দেশ বিভাগের এত কাল পরেও পাকিস্তান তাহার নাগরিকদের এমনভাবে ভারতে তাড়াইয়া দিতেছে কেন? ইহার একমাত্র উত্তর ইহাই হইতে পারে যে, পাকিস্তানের শাসনকর্ত্তারা পশ্চিম পাকিস্তানের মত পূর্ব্ব পাকিস্তানেও এক জাতিতত্ত্ব কায়েম করিতে বদ্ধপরিকর।

এই পুস্তিকার পরিসমাপ্তিতে বলা হয়:—আন্তর্জ্জাতিক আইন স্বীকৃত বিধানবলে বে-আইনী অনুপ্রবেশকারীদের পাকিস্তানে ফিরিয়া যাইতে বলা হইলে পাকিস্তান যে নিজেদের এমন চমৎকার রেকর্ড লইয়া মড়া কান্নায় বিশ্ববাসীকে অভিভূত করিবার চেষ্টা করে, তাহাতে অবাক হইবার কোন কারণ থাকিতে পারে না! কিন্তু আমরা এই দেখিয়া সত্যই অবাক্ হই যখন দেখি ভারত সরকার পাক্-আবদারে গলিয়া গিয়া, নিজের প্রজাদের সকল দুঃখ অভাব অগ্রাহ্য করিয়া পাক এবং অনুপ্রবেশকারী পাক্-মুসলমানদের প্রেমে ডগমগ হইয়া কাছা-কোঁচা খুলিয়া ফেলেন!

অবস্থা ইতিমধ্যেই প্রায় আয়ত্তের বাহিরে গিয়াছে—আর কিছুদিন পরেই ভারতের মুসলিম সংখ্যাগুরু অঞ্চলগুলি পাকিস্তান-ভুক্ত করিবার জন্য দাবি যে উঠিবে, তাহাতে বিশেষ সন্দেহের কারণ নাই! এবং এই বেয়াদবী পাক্-দাবি সমর্থন করিতে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির অনেকেই আগুয়ান হইবে। এখন হইতে আমাদের আরও জমি ছাড়িবার জন্য প্রস্তুত থাকাই ভাল এবং বুদ্ধিমানের কাজ হইবে।

বাঙ্গালীর পরমায়ু আর কত দিন?

বলিতে পারি না, আমরা কি খাইয়া বাঁচিয়া আছি—বাঙ্গালীর প্রাণশক্তি অতি ভীষণ বলিয়াই হয়ত কেহ আমাদের ঘায়েল করিতে পারে নাই এখন পর্য্যন্ত। কিন্তু আর কত দিন—ক্ষীণপ্রাণ, হীনবল, জীর্ণদেহ বাঙ্গালী আর ইহজগতে বিচরণ করিবে—কেহই বলিতে পারিবেন না— কারণ? আমাদের দুধে প্রায় আধাআধি ভেজাল। ভেজালের চোটে বিশ্বের বাজারে ভারতের চায়ের চাহিদা নষ্ট হইতে বসিয়াছে। মাখনের তিন-চতুর্থাংশই ভেজাল। মিষ্টিওয়ালারা অবশ্য ইহাদেরও টেক্কা দিয়াছে আশি শতাংশের উপর ভেজাল দিয়া। তবে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, অ্যারারুট উৎপাদকদের সহিত কেহই পারিয়া উঠে নাই, কারণ তাহারা অ্যারারুট বলিয়া শিশু ও রোগীদের যাহা খাওয়াইতেছে তাহাতে শতকরা এক ভাগও অ্যারারুট নাই।

কলিকাতার পৌর কর্তৃপক্ষ এক বছরে বিভিন্ন রকমের ৩,৬০৩টি খাদ্যদ্রব্যের নমুনা পরীক্ষা করেন। পরীক্ষায় ১,২৫৮টি খাদ্যের নমুনা ভেজাল বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। দুধের নমুনা পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, উহার ৪৩·৩ শতাংশ ভেজাল। ভেজাল সন্দেহে বিভিন্ন

রকমের যে-সব খাদ্যদ্রব্যের নমুনা লইয়া পরীক্ষা করা হয় তার শতকরা ৩২-১ ভাগে ভেজাল পাওয়া গিয়াছে।

বিশ্বের বাজারে ভারতের চায়ের চাহিদা আছে। কিন্তু ভারতের সেই বাজার প্রায় যাইতে বসিয়াছে। চায়ের ভেজাল প্রতিরোধকল্পে টী মার্কেট বোর্ড একটি ইন্সপেক্টার পদের সৃষ্টি করিয়াছেন। কলিকাতা পৌর-সভার ফুড ইনস্পেক্টার এবং চা-পরীক্ষক একত্রে উক্ত ইনস্পেক্টারের সঙ্গে কাজ করিয়া থাকেন। কিন্তু এত যত্নের সত্ত্বেও নমুনার শতকরা ৪৮·২ ভাগ চায়ে ভেজাল পাওয়া গিয়াছে। ভেজাল সন্দেহক্রমে ২২৮টি চায়ের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। তন্মধ্যে ১১০টি নমুনা ভেজাল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

নিম্নে কয়েকটি প্রধান খাদ্যদ্রব্যের কতগুলি নমুনা সংগ্রহ করা হইয়াছে, কতগুলি ভেজাল প্রমাণিত হইয়াছে তার শতকরা হিসাব দেওয়া হইল :—

খাদ্যের নাম	পরীক্ষার সংখ্যা	ভেজালের সংখ্যা	শতকরা হিসাব
দুধ	১৫০	৬৫	৪৩·৩
ঘি	৩৪৫	১০৩	২৯·৮
মাখন	২৭	২০	৭৪·০৭
মিষ্টি	৪১	৩৩	৮০·৪
সরিষার তৈল	১০৯৬	১৯৫	১৭·৭
গম	৫	১	২০·০
সাগু	৯	৭	৭৭·৭
এ্যারারুট	৪২	৪২	১০০·০
ডাল	৩৪৫	১৯৭	৫৭·১
মসলা	৪৩৭	২২৫	৫১·৪
খয়ের	৩৬	২৭	৭৫·০
লজেন্স	৪	৪	১০০·০

উপরি-উক্ত হিসাব পৌরসভার ১৯৫৯-৬০ সালের সদ্য-প্রকাশিত রিপোর্ট হইতে দেওয়া হইল।

রিপোর্টে উল্লেখ আছে যে, ফুড ইন্সপেক্টারদের সতর্ক দৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও দিন দিন বিশুদ্ধ খাদ্য দুষ্প্রাপ্য হইতেছে। ইহার প্রধান কারণ আইনের ফাঁকের সুযোগে ভেজালকারিগণ দীর্ঘসূত্রতার পন্থা অবলম্বন করেন। আইনের গলদের দরুণ ব্যবসায়ীরা ভেজাল-মিশ্রিত খাদ্যদ্রব্য বেচিয়া যত টাকা লাভ করিয়া থাকেন আদালতের বিচারে তাহা অপেক্ষা অনেক কম টাকা জরিমানা দিতে হয়। লোভী ব্যবসায়িগণ প্রথমেই ধরিয়া লন যে, লাভের একাংশ জরিমানা দিতে হইবে। জরিমানা দিবার পর, বৃহৎ ব্যবসায়ীদের লাভের অঙ্কে সামান্যই হাত পড়ে।

বলা বাহুল্য—গত চারি বৎসরে এই ভেজালের পরিমাণ আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহার উপর চাউল, আটা, সুজি, চিনি, ঘি, তৈল প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যের মূল্য সাধারণের সাধ্যাতীত হওয়ায় মানুষ এখন খাদ্য-দ্রব্য মনে করিয়া অখাদ্যই গ্রহণে বাধ্য হইতেছে।

পৃথিবীর অন্য কোন সভ্য দেশে (অসভ্য দেশের মানুষ খাদ্যে ভেজাল কি এখনও জানে না—!) এমন ভাবে ব্যবসার নামে মানুষ হত্যা করার দেশব্যাপী বিরাট্ ষড়যন্ত্রের কথা শোনা যায় না! অন্যদেশে খাদ্য এবং ঔষধে ভেজালকারীদের সোজা বিচার করা হয়—ভেজালকারীর নিধনের সঙ্গে ভেজাল কারবারও অদৃশ্য হয়।

এ পোড়া দেশের যাঁহারা শাসক বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা চোখ রাঙাইয়া এবং অহরহ বিষম সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়াই বাজি মাৎ করিতেই জানেন। কিন্তু যে-ব্যবস্থা মাত্র দু'-চারটি ক্ষেত্রে কার্য্যকরী করিলে মানুষের দুঃখ-দুর্দ্দশা এক নিমেষেই দূর হইতে পারে—সেই সহজ 'মারো গুলী' ঔষধের ব্যবস্থা যাঁহারা করিতে পারেন না। কারণ তাঁহারা অহিংস মন্ত্রে 'দীক্ষা' লইয়াছেন।

বর্ত্তমান অবস্থায় সর্ব্ববৃহৎ এবং একমাত্র আশু কর্ত্তব্য

দেশের লোক অনাহারে মরিতেছে—পরণের কাপড় নাই, রোগে শতকরা ৬০ জন লোক ঔষধ পায় না, শিক্ষার ক্ষেত্র অতি সীমিত—তাহাও 'কন্‌ট্রোলিত'—আরও হাজার রকম অভাব-অনটনের চাপে যখন দেশের শতকরা ৮০ জন লোকের প্রাণ নাসিকাস্ত প্রাপ্ত—ঠিক সেই শুভসময়ে আমাদের অবশ্য এবং একান্ত প্রয়োজন (কর্ত্তাদের বিচারে)—

সর্ব্বপ্রধান সরকারী ভাষা—চালু করা।

এবং "যেহেতু আগামী ১৯৬৫ সালের ২৫শে জানুয়ারীর পরে হিন্দী সর্ব্বপ্রধান সরকারী ভাষা হিসাবে গণ্য হইবে, সেই হেতু এখন হইতেই তাহার প্রস্তুতি আবশ্যক। অতএব কেন্দ্রীয় সরকারের যত রকম রেজিষ্টার ফরম আছে, তাহার শিরোনামা (হেডিং) যাহাতে হিন্দীতেও ছাপা থাকে, আগামী জানুয়ারীর মধ্যে যেন তাহার ব্যবস্থা করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হইতে এই আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে ইহাও বলা হইয়াছে যে, হিন্দী অনুবাদ যথা-

যথ হইল কি না তাহাও যেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় ডাইরেক্টরেট দ্বারা ঠিক করিয়া লওয়া হয়। আদেশ হিসাবে ইহা ইস্যু করা হইলেও ইহা যে 'বাঞ্ছনীয়' তাহাও বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। কেহ কেহ হয়ত মুচকি হাসিয়া ভাবিবেন যে, এত বিনয়ে কি প্রয়োজন? যাহা করিতে হইবে, তাহা হইবে। কিন্তু তাঁহারা আরও বিনয় দেখাইয়া বলিয়াছেন, হিন্দীতেও ছাপা হইবে, একমাত্র হিন্দীতে নহে।"

কর্তাদের দয়া অসীম স্বীকার করিতেই হইবে।

হিন্দী জোর করিয়া অহিন্দীভাষীদের ঘাড়ে চাপানোর বিরুদ্ধে বহু আলোচনা আমরা ইতিপূর্ব্বে করিয়াছি—কিন্তু আমাদের মত ক্ষুদ্র-কর্ণদের কথা শাসক মহলের লম্বকর্ণদের বিচলিত বা কর্ত্তব্যচ্যুত করিতে পারে নাই। কারণ তাঁহাদের মতে ভারতে হিন্দীকে রাজ-সিংহাসনে বসাইতে না পারিলে দেশের ঐক্য নষ্ট হইয়া বিষম এক অনর্থ অরাজকতার সৃষ্টি করিবেই।

"আমরা মুখে সর্ব্বভারতীয় ঐক্যের কথা সর্ব্বদাই বলি এবং ঐক্যই যে আমাদের কল্যাণের একমাত্র পথ, ইহাও স্বীকার করি। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে যা-কিছু ঐক্যের পরিপন্থী, তাহারই দিকে আমাদের ঝোঁকটা প্রবল। সর্ব্বভারতের অনিচ্ছুক কাঁধে হিন্দী চাপানোর জিদ আমরা কোন কারণেই আপাতত সরাইয়া রাখিতে প্রস্তুত নই। হিন্দী যাহাদের মাতৃভাষা, এইভাবে তাঁহাদের একই দেশে একই গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামোতে একটি সুবিধাপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ে পরিণত করার যে চেষ্টা চলিতেছে, অথবা তাহার প্রতিক্রিয়ায় দ্রাবিড় কাজাগমদের উদ্যোগে যে অনিষ্টকর ভেদ-নীতির আন্দোলন চলিতেছে, তা প্রত্যাশিত সংহতির ঠিক বিপরীত পথেই কি আমাদের ঠেলিয়া দিতেছে না? খুঁটাইয়া দেখিলে এমনি আরও অনেক জিনিস পাওয়া যাইবে যে সম্বন্ধে আমাদের সতর্কতা প্রয়োজন। আসলে সংহতির শপথ-বাক্যে যখন আমরা বাহির হইতে আক্রমণের হাত হইতে দেশের অখণ্ডতা রক্ষার সঙ্কল্প ব্যক্ত করিতেছি, তখন যাহাতে ভিতরের বিপদ্ সম্বন্ধেও আমাদের সচেতনতার অভাব না হয়, সেদিকে আমরা নেতৃত্বকে হুঁসিয়ার হইতে আহ্বান করিতেছি।—"

কিন্তু কোন্ নেতৃত্বকে এ-কথা বলা হইতেছে? কেন এ সাবধান বাণী শুনিতে—লম্বকর্ণ হইলেই যে কেহ সব কথা শুনিতে পাইবে—এমন কোন নিয়ম নাই।

বর্ত্তমান প্রধানমন্ত্রী হালে বহু মূল্যবান্ বাস্তব কথা বলিতেছেন—তাঁহার বহু কাজ এবং বিচার-বিবেচ দেশের লোক শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করিতেছে—কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি হিন্দী-গোঁয়ার্তুমিকে প্রশ্রয় দিতেছেন দেশ অপেক্ষা কি হিন্দী বড় হইল?

শিক্ষার গঙ্গাযাত্রা!

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার ব্যাপারে যে ভেজাল চলিতেছে তাহার প্রতি সকলের দৃষ্টি আমরা পূর্ব্বে আকৃষ্ট করিবার প্রয়াস পাই—ফল? বিফলত!

"শিক্ষাক্ষেত্রে বর্ত্তমানে চালু ভেজাল প্রতিষ্ঠানগুলি তুলিয়া দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা-পরামর্শদাতা পর্ষদের বাঙ্গালোর অধিবেশনে একটি শাস্তিমূলক আইন প্রণয়নের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। শিক্ষাদানের নামে ছাত্রদের প্রতারিত করিয়া টাকা রোজগার করিয়া থাকে, এমন ভেজালকারবারীর সংখ্যা এ দেশে কম নয়। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ড দেখিয়া ছাত্রেরা আকৃষ্ট হয়, প্রয়োজন বিশেষে মোটা বেতনও দিয়া থাকে। বিনিময়ে সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা লাভ করিলেও তাহা কোন কাজে আসে না। কারণ প্রয়োজনীয় অনুমোদন না থাকায় কোথাও এই সব প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমার স্বীকৃতি মেলে না। টাকা রোজগারই সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা দেওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়ায় এইসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানেরও কোন ব্যবস্থা নাই। শিক্ষাক্ষেত্রে এই ধরনের দুর্নীতি কিন্তু বৎসরের পর বৎসর বিনা বাধায় চলিয়া আসিতেছে। ফলে জাতীয় অবক্ষয়ের পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। পানের দোকান খুলিতে বা ঠেলাগাড়ি চালাইতেও সরকারী ছাড়পত্রের দরকার হয়, কিন্তু এ-দেশে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান খুলিতে কোন অনুমতির প্রয়োজন হয় না। সকলের চোখের সামনেই এইসব প্রতিষ্ঠান দীর্ঘকাল ধরিয়া নির্ব্বিবাদে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ লইয়া ছিনিমিনি খেলিতেছে। অন্য কোন দেশে শিক্ষা লইয়া এমন প্রকাশ্য চোরাকারবার চলে বলিয়া আমাদের জানা নাই। আশার কথা, বিলম্বে হইলেও এই ধাপ্পাবাজি বন্ধ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীচাগলা নিজেই উদ্যোগী হইয়াছেন।

"সরকারী গাফিলতিই এই ভেজালকারবারীদের এতদিন প্রশ্রয় দিয়াছে। এগুলি বন্ধ করিবার জন্য আইন পাস হইতেছে, ভাল কথা। শিক্ষাক্ষেত্রে যে জালিয়াতির ফলে লক্ষ লক্ষ ছাত্রের ভবিষ্যৎ নষ্ট হইতেছে

যাহা বন্ধ করিতে হইলে কেবলমাত্র আইন পাস করিলেই চলিবে না, সমস্যার সমাধানের জন্য মূল ধরিয়াই টান দিতে হইবে। প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার সীমিত হওয়া সত্ত্বেও মাধ্যমিক পর্য্যায়ে ছাত্রসংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। দেশে ক্রমবর্দ্ধমান কল-কারখানার জন্য কারিগরি শিক্ষার চাহিদাও বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রয়োজনের সঙ্গে তাল রাখিয়া শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও বাড়ে নাই, শিক্ষার মান বজায় রাখিবার কোন চেষ্টাও হয় নাই। চাকুরিতে প্রবেশের ব্যাপারে সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমার উপর অতিরিক্ত গুরুত্বদান ছাত্রদের এইসব জালশিক্ষাবিদ্‌দের দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে। কারণ পঠিত বিষয়ে জ্ঞান অপেক্ষা সার্টিফিকেট-লাভের প্রশ্নই ছাত্রদের চিন্তাকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে। এই কারণেই ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা-বৈতরণী পার হওয়ার জন্য টিউটোরিয়াল হোমেও ভিড় জমায়।"

বর্ত্তমানে কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া আর সবগুলিই প্রায় 'কমার্শিয়াল' কারবার, একথা বলা অন্যায় হইবে না।

স্কুল-কলেজরূপ গুদামগুলিতে ছাত্রছাত্রীরূপ মাল ঠাসিয়া—বেতন বাবদ প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করাই যেন এই সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির একমাত্র কাম্য! আর এই বিচিত্র 'গুদামে' 'ঠাঁই' পাইবার জন্য অভিভাবকদের যে অসম্ভব ভাড়া (মূল্য?) দিতে হয়, তাহাও ক্রমশঃ মানুষের সাধ্যের বাহিরে যাইতেছে।

স্কুল-কলেজ বর্ত্তমানে wholeseller অর্থাৎ পাইকার ব্যবসায়ী এবং ব্যাঙের ছাতার মত হাজার হাজার যে টিউটোরিয়াল স্কুল বা কলেজ কলিকাতা এবং অন্যান্য শহরে দেখা যায়, তাহাদের retailer অর্থাৎ খুচরা কারবারীদের সহিত অবশ্যই তুলনা করা যায় এবং এক শ্রেণীর তথাকথিত শিক্ষক—দুইটি কারবারেই নিয়মিত শেয়ার হোল্ডার! অর্থাৎ পাইকার এবং খুচরা—দুই কারবার হইতেই 'ছাত্র-অভিভাবক-মার', নিজের শেয়ার অর্জ্জন করিতেছেন! বলা বাহুল্য ইঁহারা এই ব্যবসায়ে যথেষ্ট পরিমাণে 'ভেজাল' চালাইতেছেন—ভেজালের মাত্রা হয়ত শতকরা ৮০।৯০ হইতে পারে।

রিকশ টানিতে এবং কুলীগিরিতেও লাইসেন্স লাগে—কিন্তু ছাত্র-মার কারবার বেপরোয়া চালাইতে কোন বাধা নাই—বাধা দিবারও কেহ নাই!

ইতিহাস কথা কয়

শ্রীঅজিত চট্টোপাধ্যায়

দশ

তুঘলকাবাদ নতুন দিল্লী হ'তে বেশী দূর নয়। মাইল বারো দক্ষিণে। ক্রমানুসারে এটিই দিল্লীর চতুর্থ নগরী। দিল্লী অর্থে দিল্লীর সাম্রাজ্য। ইবনবতুতা এই মত সমর্থন করেছেন। প্রথম নগরী পুরাতন দিল্লী বা 'কিলা রায় পিথোরা'। দ্বিতীয় নগরী কিলোখেরী বা নয়া শহর। তৃতীয় সিরি এবং চতুর্থ তুঘলকাবাদ।

কিলা রায় পিথোরা (Qil'ah Rai Pithora) পৃথ্বীরাজ চৌহানের সৃষ্টি। চৌহানবংশীয় রাজা পৃথ্বীরাজের কাহিনী ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। শুধু বীরত্ব এবং শৌর্যের জন্য নয়, রাজা পৃথ্বীরাজের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি রোমান্সের কাহিনী। জয়চন্দ্র-নন্দিনী সংযুক্তার পরিণয় হয়েছিল রাজা পৃথ্বীরাজের সঙ্গে। কিন্তু সে মিলন যোগাযোগ করে স্থাপিত হয় নি। কনৌজের অধিপতি জয়চন্দ্র গাহড়বাল তাকে কন্যাদানে রাজী ছিলেন না, কিন্তু সংযুক্তার রূপ-গুণের খ্যাতি অনেকবার শুনেছেন পৃথ্বীরাজ। মনে মনে তিনি কামনা করেছিলেন সংযুক্তাকে। রাণীরূপে পেতে হ'লে এমনি মেয়েরই প্রয়োজন তার। সংযুক্তাও শুনেছিলেন পৃথ্বীরাজের বীরত্ব ও শৌর্যের কথা। স্বয়ম্বর সভায় বরমাল্য ত এমনি বীরেরই প্রাপ্য। কন্যার ইচ্ছায় স্বয়ম্বর সভা ডাকলেন জয়চন্দ্র। আহ্বান জানালেন খ্যাত-অখ্যাত বহু নরপতিকে। মালা হাতে সভায় এলেন সংযুক্তা। দাসী পরিচয় করিয়ে দিলেন মহামান্য নৃপতিদের সঙ্গে। কিন্তু রাজকুমারীর মন ওঠে না। কাজলকালো আয়ত দু'টি আঁখি কার স্থির শান্ত দু'টি চোখ খুঁজে ফেরে। একের পর এক রাজা-মহারাজাদের পেরিয়ে আরও এগিয়ে চলেন সংযুক্তা। তবু চারি চক্ষের মিলন হয় কই?

নিমন্ত্রণ পান নি পৃথ্বীরাজ চৌহান। কিন্তু নিমন্ত্রণ না পেলেই কি মুখ ফিরিয়ে থাকতে হয়? ছদ্মবেশে সভার দ্বারে এলেন পৃথ্বীরাজ। জয়চন্দ্র আহ্বান জানান নি বলেই কি সংযুক্তাকে অপরের ঘরণী হ'তে দিতে পারেন তিনি? ছদ্মবেশধারী পৃথ্বীরাজকে হয়ত চিনেছিলেন সংযুক্তা। সেই স্থির অচপল শান্তপ্রেমের দৃষ্টি মুহূর্তেই সংযুক্তাকে আবিষ্ট করে তুলল। কয়েক সেকেণ্ডের মাত্র ব্যাপার। সংযুক্তাকে নিয়ে সওয়ার হলেন পৃথ্বীরাজ। সুশিক্ষিত অশ্ব অল্পসময়েই তাদের নিয়ে এল কনৌজ হ'তে বহু দূরে। রাজা জয়চন্দ্রের সীমা ছাড়িয়ে—

আধুনিক ঐতিহাসিকগণ পৃথ্বীরাজ-সংযুক্তা কাহিনী এবং স্বয়ম্বর সভার উপর খুব একটা বিশ্বাস করেন না। অনেকের মতে পৃথ্বীরাজ এবং জয়চন্দ্রের মনোমালিন্য সংযুক্তাঘটিত নয়। বিবাদের আসল কারণ রাজনৈতিক। উত্তর ভারতের পরাক্রমশালী রাজা জয়চন্দ্র উদীয়মান রাজশক্তি পৃথ্বীরাজ চৌহানের দোর্দণ্ড... খর্ব করতে একান্তভাবে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তিনি হয়ত ভেবেছিলেন আক্রমণের পর মহম্মদ ঘোরী আবার ফিরে যাবেন এবং উত্তর ভারতে গাহড়বাল রাজার নিরঙ্কুশ একাধিপত্য স্থাপিত হবে। জয়চন্দ্রের দূরদর্শিতার অভাব ছিল। ইতিহাস তা প্রমাণ করেছে।

চাঁদ কবি পরবর্তীকালে তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'পৃথ্বীরাজ রসৌ'তে পৃথ্বীরাজ-সংযুক্তার কাহিনী ও স্বয়ম্বরসভা হ'তে সংযুক্তা হরণ লিখেছেন।

পৃথ্বীরাজ চৌহান সোমেশ্বরের পুত্র এবং বিশাল দেওএর নাতি। কানিংহাম সাহেবের মতে তার রাজত্বকাল বেশী দিনের নয়। মাত্র বাইশ বৎসর— ১১৭০-১১৯১ খ্রীঃ পর্যন্ত। কিন্তু সৈয়দ সাহেব এটিকে আরও দীর্ঘ ব'লে অভিহিত করেছেন। তার মতে রাজত্বকাল সুদীর্ঘ অর্ধশতাব্দীর মত। কর্ণেল টড বলেন যে, মাত্র আট বৎসর বয়সে চৌহানরাজ দিল্লীর সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন।

কিলা রায় পিথোরার সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল। উত্তর সীমান্তে তখন গজনীর মুসলমান সুলতান পাঞ্জাবের কিয়দংশে আধিপত্য বিস্তার করেছেন। যে-কোন সময়েই মুসলমান আক্রমণ দিল্লীর পথে ধাবিত হ'তে পারে। শহরকে সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে মুক্ত করবার জন্য কিলা রায় পিথোরা বা দুর্গ তৈয়ারী সুরু হ'ল। ইংরাজ ঐতিহাসিকের মতে এটি ১১৮০ খ্রীঃ কিংবা
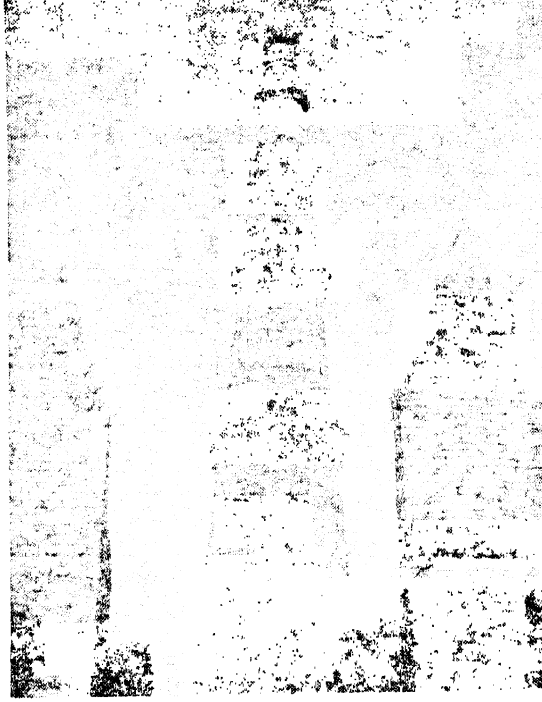
এই কুতুবমিনারের আশপাশের জায়গার উপর গড়ে উঠেছিল কিলা রায় পিথোরা এবং এরই কাছাকাছি কোথাও ছিল সিঁড়ি

১১৮৬ খ্রীঃ। আমেদ খান সাহেব বলেন যে, দুর্গ তৈয়ারী ১১৪৩ খ্রীঃ সুরু হয়।

কিলা রায় পিথোরা আজ প্রায় অস্তিত্বহীন। সেই বিশাল প্রাচীরবেষ্টনী, মধ্যবর্তী গেটগুলির সব ভগ্নস্তূপও চোখে পড়ে না, একদা এই দুর্গ এবং নগরীর পরিধি প্রায় পাঁচ মাইলের মত বিস্তৃত ছিল। সাকুল্যে দশটি সুন্দর গেট প্রাচীরবেষ্টনীর মধ্যে শোভা পেত। কারও কারও মতে গেটগুলির সংখ্যা আরও বেশী। সম্ভব যে চৌহান রাজাদের পরে খিলজী সুলতানেরা পুরাতন দিল্লী এবং রায় পিথোরার কেল্লার কিছু সংস্কার সাধন করেন। হয়ত সে সময় প্রাচীরবেষ্টনী এবং গেটগুলির কিছু পরিবর্তন করা হয়। সম্ভবত নামগুলিরও পরিবর্তন হয়।

Beglar সাহেব এই মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তার মতে দুর্গ মধ্যবর্তী একটি প্রাচীর আলাউদ্দিন খিলজী তৈয়ারী করেন। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বার্ণির বিবরণে আরও সমর্থন পাওয়া যায়। ১২৯৭ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সীমান্তে এক ঝোড়ো মেঘের আবির্ভাব হয়। মোঙ্গলরা তাদের নেতা সলদীর নেতৃত্বে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হয়। পুরাতন দিল্লী এবং কিলা রায় পিথোরা তখন ভগ্ন এবং জীর্ণ। দূরদর্শী সুলতান তখনই দুর্গ এবং পুরাতন শহরের সংস্কার-সাধনের আদেশ দিলেন। ১৩১ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দীনের পরবর্তী সুলতান মুবারক শাহ এই অসমাপ্ত কাজকে শীঘ্র সমাপ্ত করবার জন্য আর একটি আদেশ দেন। ১৩৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইবনবতুতা পুরাতন দিল্লী এসেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন দুর্গের প্রাচীরের

নিম্নভাগ পাথরে গঠিত, উপরের অংশ ইটে গাঁথা। প্রথমটি হিন্দু রাজার সৃষ্টি, দ্বিতীয়টি মুসলমান নরপতির।

গেটগুলির মধ্যে বদাউন গেটই প্রধান ও প্রসিদ্ধ ছিল। এক সময় সুরাপান নিসিদ্ধ এবং বেআইনী ঘোষণা করেছিলেন আলাউদ্দীন খিলজী। এই বদাউন গেটের সামনেই সুলতান তাঁর সুরাপাত্র এবং সুরাকে ছুঁড়ে ফেলে দেন। গেটের সামনে ছোট ছোট কক্ষে সুরাপান নিষিদ্ধ আইন অমান্যকারীদের বন্দী করে রাখা হ'ত। একদা এই বাদাউন গেটের সামনেই নৃশংসতার চরম খেলা দেখিয়েছিলেন আলাউদ্দীন। বার বার মোঙ্গলদের আক্রমণে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন সুলতান। সলদি, কুৎলুঘ খাজা, ইকবাল মন্দ বিভিন্ন মোঙ্গল নেতার নেতৃত্বে মোঙ্গলেরা দিল্লীর সীমান্তে উপনীত হয়েছে। আক্রমণ করেছে হিন্দুস্থান, আবার ব্যর্থ হয়ে ফিরে গিয়েছে। ক্রোধে উন্মত্ত সুলতান বন্দী মোঙ্গলদের হত্যা করে বদাউন গেটের সামনে কঙ্কালের এক পিরামিড গ'ড়ে তোলেন। হয়ত সুলতানের মনে হয়েছিল, অত্যাচারের এই চরম নিদর্শন দেখে মোঙ্গলরা আর কোনদিন হানা দিতে সাহস পাবে না।

এই পুরাতন দিল্লীর সঙ্গে বঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, হত্যাকাণ্ড, নৃশংসতা, অগ্নিকাণ্ড বহু কিছু লোমহর্ষক ইতিহাস জড়িয়ে আছে। এই পাঁচ মাইল পরিধির দুর্গ এবং শহরের মধ্যে অতীতের বহু দ্রষ্টব্য আজও বর্তমান, লৌহস্তম্ভ (যার কাহিনী আগেই বলা হয়েছে), কুতুবমিনার, পুরাতন হিন্দুরাজাদের মন্দিরের ভগ্নস্তূপ, দাসবংশীয় রাজাদের কীর্তি, নানা সমাধি,—সরকারের আর্কিওলজিক্যাল বিভাগ সযত্নে রক্ষা করছেন।

একদা যেখানে শত শত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে, মহারাজা এবং সুলতানদের আদেশে মেদিনী কম্পিত হবার উপক্রম হ'ত, আজ সেখানে শান্ত নিস্তব্ধতা। যেখানে রক্তনদী মৃত্তিকাকে রাঙিয়ে দিয়েছে, আজ সেখানে বিচিত্রবর্ণ কুসুমের সমারোহ। সত্যিই এই হলদে, গোলাপী, আকাশী-নীল রঙের নানা ফুলের পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের দুজনেরই কারও মনে হ'ল না যে, ইতিহাসের কোন মহাশ্মশানের ওপর আমরা এসে দাঁড়িয়েছি। সুনীল আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে সূর্যজলা সকালে, দুর্গ অভ্যন্তরের মাটি, বিচিত্রবর্ণ কুসুমরাজি, নানা দর্শকদের দেখতে দেখতে আমাদের মনে এক বিচিত্র অনুভূতির সৃষ্টি হ'ল। কবে কতদিন আগে সংযুক্তা এই মাটির বুকেই নরম নরম পা ফেলে হেঁটে গিয়েছেন। সুলতান ইলতুৎমিস জ্যোৎস্নারাতে বেগমদে নিয়ে সারাদিনের রাজ্যশাসনের ক্লান্তি অপনো করতেন। আর রাজিয়া? শাসনকার্যে পারদর্শি রাজিয়া অন্য সব বিষয়েও কম দক্ষ ছিলেন না। এ মাটিতেই পুরুষের পোষাক পরিধান করে রাজিয়া হেঁ গিয়েছেন। সে-সব দিন পৃথিবীতে বড় পুরাতন বৃদ্ধের মনে-আসা শৈশবের অসংখ্য চাপল্যের স্মৃতি মতই রোমান্সের গন্ধভরা।

এগার

কিলোখেরী (Kilokheri) বা কিলোখেরী (Kilugheri) অল্পসময়ের মধ্যে নয়া শহর নামে পরিচিত হয়। বলবনের পৌত্র সুলতান কাই কুবদ (Kai Qubad) আনুমানিক ১২৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এর প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ইতিহাস মতে সুলতান কাই কুবদের বহু আগেই কিলোখেরীতে একটি রাজ-আবাস গ'ড়ে উঠেছিল। তবে সম্ভবত সুলতান কুবদই এটিকে আরও বড় করে তোলেন। শোনা যায়, যমুনাতীরে তিনি সুন্দর একটি উদ্যান রচনা করেন এবং এই উদ্যান-সংলগ্ন একটি অট্টালিকায় পরিপূর্ণ বিশ্রাম উপভোগ করেন। দেখাদেখি বহু পাত্রমিত্র অমাত্যই কাছাকাছি বসবাস করতে সুরু করেন। তখনকার দিনে রাজার সঙ্গেই গ'ড়ে উঠত নগরী। তাই সুলতানের উদ্যান অট্টালিকার চারপাশে অল্পসময়েই তৈরি হ'ল একটি জনপদ।

পরবর্তী সময়ে জালালুদ্দীন ফিরোজ শাহ খিলজী কিলোখেরী দুর্গ দখল করেন এবং দুর্গটির নানাবিধ পরিবর্তন সাধন করেন। অল্পসময়ের মধ্যেই কিলা রায় পিথোরা পুরাতন দিল্লী আখ্যা পায় এবং কিলোখেরী নয়া শহররূপে পরিচিত হয়ে ওঠে।

কিলোখেরীর পর সিরি। এর অন্য নাম দিল্লী-আলাই বা আলাউদ্দীনের দিল্লী। মোঙ্গলদের আক্রমণে আলা-উদ্দীন খিলজীর মনে শান্তি ছিল না। তাই কিলা রায় পিথোরার তিনি সংস্কার-সাধন করেন। কাছাকাছি নতুন এক দুর্গ নির্মাণ করেন সুলতান। ইতিবৃত্ত বলে প্রায় আট হাজার মোঙ্গলের কঙ্কালের ওপর এই দুর্গের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন আলাউদ্দীন। প্রতিশোধের ইচ্ছা এমনি ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছিল আলাউদ্দীন খিলজীর হাতে। নতুন দুর্গের নাম সিরি। শুধু দুর্গ নয়, দুর্গকে কেন্দ্র করে এক জনপদ গ'ড়ে উঠল সিরিতে।

সিরি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় শেরশাহের আমলে। দুর্গ এবং নগরীর বহু উপাদানই কাজে লাগিয়েছিলেন শেরশাহ। তার নতুন নগরী শেরগড় গড়ে উঠল যমুনার তীরে। সিরি জনপদের এক সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন তৈমুর।...উঁচু উঁচু অট্টালিকা-শোভিত জনপদটি প্রায় গোলাকৃতি। দুর্গের প্রাকার পাথর এবং ইটের মজবুত সৃষ্টি। সাতটি গেট বা প্রবেশদ্বার আছে নগরীর। দুর্গ হ'তে পুরাতন দিল্লী পর্যন্ত একটি প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন সুলতান—

কিলোখেরী বা সিরির আর কোন চিহ্ন নেই। সময়ের কাছে হার মেনেছে এরা। কাল তাদের বিনষ্ট করেছে সম্পূর্ণ ভাবে। দীর্ঘ সাত শত বৎসরে, ইতিহাসের বহু অঘটন ঘটেছে। যুদ্ধে, বিদ্রোহে, অত্যাচারে, হিংসায়, দিল্লীর আকাশ-বাতাস চিরকালই গুমরে গুমরে কেঁদেছে। হাহাকারে আর আর্তনাদে ভরে উঠেছে যমুনার তীর। রক্তের বন্যা বয়ে গেছে নগরীর উপকণ্ঠে আর প্রান্তরে।

বার

ইতিহাসে গিয়াসুদ্দীন তুঘলক শাহ যথেষ্ট পরিচিত। তুঘলকাবাদ তার সৃষ্টি। দুর্গ এবং জনপদ নির্মাণ সম্ভবত ১৩২১ খ্রীঃ সুরু হয়। ১৩২৩ খ্রীঃ নির্মাণকার্য মোটামুটি শেষ হয়েছিল ব'লে জানা গিয়েছে।

তুঘলকাবাদের সঙ্গে গিয়াসুদ্দীন তুঘলক শাহ ছাড়া আর একটি নামও জড়িয়ে আছে। ইনি ফকির নিজামুদ্দীন আউলিয়া। নিজামুদ্দীন আউলিয়ার বিস্তৃত বিবরণ এই পরিচ্ছেদে নয়। সেটি অন্যত্র সন্নিবেশিত হবে। কিন্তু গিয়াসুদ্দীনের সঙ্গে নিজামুদ্দীন আউলিয়ার যে বিরোধ এবং মনান্তর সুরু হয়েছিল, কালক্রমে তাই তুঘলকাবাদের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তুঘলকাবাদের কথা জওহরলাল নেহরু তাঁর 'Glimpses of World History' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। দাস বংশের সুলতানদের কথা বলতে গিয়ে তিনি পরিচ্ছেদের যবনিকা টেনেছেন— 'Near Delhi you can still see the ruins of Tughlaqabad. This was built by Muhammad's father'.

তুঘলকাবাদ আজ ধ্বংসাবশেষ মাত্র। ছোট্ট একটি বসতি ছাড়া আর কিছু নয়। এর প্রসিদ্ধি শুধু ইতিহাসের সেই অধ্যায়ের জন্য, যখন গিয়াসুদ্দীন তুঘলক প্রবল প্রতাপশালী ছিলেন। যে সময় তার আদেশে শত শত শ্রমিক আর কুশলী শিল্পী গ'ড়ে তুলেছিল রাজধানী তুঘলকাবাদে।

তুঘলকাবাদের আকৃতি অনেকটা ষড়ভুজের অর্ধাংশের মত ছিল। পরিধিতে জনপদ প্রায় চার মাইলের মত বিস্তৃত ছিল। একটা পাথুরে জমির উপর দিকে দুর্গের অবস্থিতি। চারপাশে স্রোতজলে ক্ষয়প্রাপ্ত দীর্ঘ গভীর খাত। শুধু একপাশে একটি নীচু জমি। সম্ভবত ওটি কোন হ্রদের শুকনো তলদেশ। দুর্গের প্রাচীর বড় বড় পাথরের খণ্ডে নির্মিত। কানিংহাম সাহেব একটি পাথরের কথা উল্লেখ করেছেন। এটি প্রায় ১৪ ফুট লম্বা ছিল, আড়াই ফুটের মত চওড়া, ওজন ছয় টনের কম নয়।

দক্ষিণ দিকের দুর্গপ্রাকার প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচু। প্রাচীরগাত্রে ছোট ছোট গর্ত ছিল। নীচে প্রায় সাত ফুট চওড়া অট্টালিকার উপরিস্থিত ফাঁকবিশিষ্ট প্রাচীর। সম্ভবত এই প্রাচীরে দাঁড়িয়ে আক্রমণকারীদের ছোট ছোট ক্ষেপণাস্ত্র বা বর্শা-বল্লমের সাহায্যে প্রথম বাধা দেওয়া হ'ত। এরও পশ্চাতে প্রায় ১৫ ফুট উঁচু আর একটি প্রাচীর ছিল। সমভূমি হ'তে উচ্চতা সাকুল্যে নব্বই ফুটের মত। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে রাজপ্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল। সমস্ত স্থানটির প্রায় এক-ষষ্ঠাংশ জুড়ে রাজ-আবাস অবস্থিত ছিল। ঘরগুলি গম্বুজবিশিষ্ট এবং তার ওপর rampart বা দুর্গবপ্র রচিত হয়েছিল। জেনারেল কানিংহাম মনে করতেন যে, ঘরগুলিতে সুশিক্ষিত অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈন্য বাস করত।

তুঘলকাবাদ অনেকেরই মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। এই বিরাট পাথরগুলি একত্রে সংযোজিত করে এই বিশাল দুর্গের সৃষ্টি খুব সহজ কথা নয়। দেওয়ালগুলি এমন সুদৃঢ় ছিল যে, একমাত্র গুরুতর ভূকম্পন ছাড়া তা নষ্ট হওয়া সম্ভব ছিল না।

প্রধান প্রবেশদ্বারে পৌঁছবার পথটি খাড়াই এবং পাথুরে। বিভিন্ন ভগ্নাবশেষ পথের উপর এসে পড়ায় পথ আরও দুর্গম হয়েছে। তুঘলকাবাদের প্রবেশ-দ্বারও পাথরের নির্মিত। যে পাথর সাইজমত কেটে নেওয়া হয়েছে অসংখ্য বিভিন্ন বড় আকারের শিলা থেকে। তুঘলকাবাদের মোট তেরটি প্রবেশদ্বার ছিল এবং সাতটি পুষ্করিণী অধিবাসীদের জলের চাহিদা মেটাত।

গ্রীষ্মদিনের উত্তপ্ত সূর্যকিরণ থেকে অব্যাহতি লাভ করার জন্য গিয়াসুদ্দীন তুঘলক মাটির অভ্যন্তরে কতক-

গুলি প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করান। সুলতান নিজে আটটি গোলাকৃতি প্রকোষ্ঠের একটি আবাসে গ্রীষ্মদিন যাপন করতেন। এই আবাসটির ছাদ বা উপরিভাগ খিলানের আকারে গঠিত ছিল এবং প্রায় দু'ফুটের মত একটি ফাঁক বাইরের আলোক ঘরের ভিতর আনতে সাহায্য করত।

তুঘলকাবাদের উপরিভাগ প্রায় ধ্বংস। দূর থেকে লক্ষ্য করলে দর্শকের মনে যে গভীরতা রেখাপাত করে, কাছে এসে তার কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না। আজকের তুঘলকাবাদ অতীতদিনের এক বীভৎস কংকালমাত্র।

গিয়াসুদ্দীন তুঘলকের নামে তুঘলকাবাদ। খুব কঠোর লোক ছিলেন সুলতান। যোদ্ধা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন গিয়াসুদ্দীন। তখনকার দিনে তিনিই এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। গিয়াসুদ্দীন তুঘলক শাহের মৃত্যু সম্বন্ধে সুন্দর একটি গল্প আছে। গল্প নয়, ঐতিহাসিক সমর্থিত ঘটনা, তখনকার দিনে রাজ্যলাভের জন্য সর্বপ্রকার হীন ষড়যন্ত্র করতেও কেউ কুণ্ঠিত ছিলেন না। পিতাকে সরিয়ে তার স্থানে অভিষিক্ত হবার এক অদম্য ইচ্ছা পেয়ে বসেছিল সুলতান পুত্র মুহম্মদ শাহকে। হয়ত জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ঠিক পছন্দ করতেন না গিয়াসুদ্দীন। কাছে কাছে ছোট ছেলে মামুদকেই নিয়ে ফিরতেন। মুহম্মদ শাহের মনে ভয় ছিল। হয়ত গিয়াসুদ্দীন তুঘলক মামুদকেই দিয়ে যাবেন রাজধানী তুঘলকাবাদ। সেই পুরাতন বিদ্বেষ···। নিজের পথ নিষ্কণ্টক করার জন্য যে কোন পন্থা অবলম্বন। দিনে দিনে ধিকি ধিকি আগুন জ্বলতে লাগল মুহম্মদের মনে। কোন্ পথে মনস্কামনা সিদ্ধ হ'তে পারে?···

এই বাসনা পূর্ণ করতে এক ফকিরের আশীর্বাদ পেলেন মহম্মদ শাহ। ফকিরের নাম নিজামুদ্দীন আউলিয়া।

আনুমানিক ১৩২৫ খ্রীঃ গিয়াসুদ্দীন তুঘলক গিয়েছিলেন সুদূর বাংলা দেশ। বাংলার শাসনকর্তা বাহাদুর শাহ বিদ্রোহী হয়েছিলেন। সৈন্যদলসহ সুলতান পৌঁছলেন বাংলা দেশে। বিদ্রোহীদের দমন করতে দেরি হ'ল না তাঁর। বাহাদুর শাহকে বন্দী করে সুলতান পাঠিয়ে দিলেন দিল্লী।

নিজামুদ্দীন আউলিয়ার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না সুলতান। দিল্লীতে থাকতেন ফকির, তুঘলক শাহ তুঘলকাবাদে। বাংলা দেশ থেকে ফিরবার পথে কে একজন সুলতানের কর্ণগোচর করল যে ফকির ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, সুলতানকে আর ফিরতে হবে না। কথা শুনে জ্বলে উঠলেন তুঘলক শাহ। বললেন—দিল্লী পৌঁছে এই দুর্বিনীত ফকিরকে সমুচিত শাস্তি দেবেন। নৃপতিদের উক্তি দেশের এক প্রান্ত হ'তে অন্য প্রান্তে যেতে সময় লাগে না। সে দিনের বেতারহীন ভারতবর্ষেও গিয়াসুদ্দীনের এই উক্তি অল্পসময়ের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ল। নিজামুদ্দীন আউলিয়ার শুভানুধ্যায়ী ফকিরকে বললেন দেশ ছেড়ে চলে যেতে। কঠোর লোক সুলতান। কথায় আর কাজে ফারাক নেই বেশী। কিন্তু নিজামুদ্দীন যেন অনড়, অচল। তিনি হেসে বললেন—'দিল্লী দূর অস্ত—'। অর্থাৎ দিল্লী এখনও অনেক দূর।

এদিকে সদলবলে ছুটে আসছেন তুঘলক শাহ। দিল্লী আর দূর নয়। রাজধানী থেকে মাত্র ছয় মাইল দূরত্বে মুহম্মদ শাহ পিতাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য দাঁড়িয়ে। জায়গাটির নাম আফগানপুর। মাত্র তিনদিনে আফগানপুরে এক কাঠের মণ্ডপ তৈরি করিয়েছিলেন মুহম্মদ শাহ। তার মধ্যে বিশ্রামের জন্য ঘরও নির্দিষ্ট ছিল। শ্রান্ত, ক্লান্ত পিতাকে অভ্যর্থনা করতে হবে। সমস্ত রাত্রি বিশ্রাম নিয়ে গিয়াসুদ্দীন তুঘলক আবার ছুটে চলবেন দিল্লীর পথে। সেই দুর্বিনীত ফকির নিজামুদ্দীন আউলিয়াকে সমুচিত শাস্তি দেবেন তিনি।

শান্ত মধুর এক বিকেলে তুঘলক শাহ এসে থামলেন আফগানপুরে। অমাত্যের দল কুর্নিশ জানাল তাকে। আহারাদি শেষ করলেন গিয়াসুদ্দীন তুঘলক। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বার্নি বলেন যে, এই সময়ে আকাশ থেকে একটি বিদ্যুৎ নেমে আসে। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণ হারান গিয়াসুদ্দীন তুঘলক ও আরও অনেকে।

বজ্রপাতের এই কাহিনী নানা কারণে অনেকে বিশ্বাস করেন না। পর্যটক ইবনবতুতা গিয়াসুদ্দীন তুঘলকের মৃত্যু সম্বন্ধে অন্য এক কাহিনী বলে গেছেন। নিঃসন্দেহে সেটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

আসলে এই মণ্ডপটি মুহম্মদ শাহ একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে নির্মাণ করিয়েছিলেন। এর বিশেষ একটি অংশে আঘাত করলেই সমস্ত মণ্ডপটি ভেঙ্গে পড়বে। সুলতান তুঘলক শাহ এসে পড়ার খানিক পরেই মুহম্মদ শাহ পিতার কাছে এক প্রস্তাব করেন। তার সামনে হাতীদের এক শোভাযাত্রা হোক। সুলতান তা দেখতে দেখতে বিশ্রাম উপভোগ করুন। গিয়াসুদ্দীন সম্মতি দিলেন। ছোট ছেলে মামুদকে পাশে নিয়ে

বসলেন সুলতান। হস্তীদের আড়ম্বরপূর্ণ প্রদর্শন অবলোকন করার জন্য। অকস্মাৎ সেই অঘটন ঘটল। কড় কড় শব্দ। তারপরই সমস্ত মণ্ডপটি লুটিয়ে পড়ল ভূমিতে। হয়ত কোন একটি হাতীই সেই নির্দিষ্ট স্থানটিতে ধাক্কা দিয়েছিল। ফলে সমস্ত মণ্ডপটির ভূমি নিতে দেরি হয় নি।

তুঘলক শাহ মারা গিয়েছিলেন। বড় বড় কাঠের থাম সরিয়ে যখন তার মৃতদেহ পাওয়া গেল, তখনও এক মর্মস্পর্শী দৃশ্য অপেক্ষা করছিল। মরবার আগেও বৃদ্ধ পিতা দু' হাত বাড়িয়ে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন মামুদকে। ছোট ছেলের মৃতদেহের উপর তার দু'টি হাত শেষবারের মত বিছানো ছিল। অন্ধ পুত্রস্নেহ! আহা, যদি নিজে মরেও ছোট ছেলেটার প্রাণ রক্ষা করতে পারি। গিয়াসুদ্দীন তুঘলক শাহের মনে এই ছিল শেষ ইচ্ছা।

মুহম্মদ শাহের ষড়যন্ত্রের শেষ ছিল না। কাষ্ঠমণ্ডপ ভেঙে পড়ার বহুক্ষণ পরও, কুঠার ও শ্রমিকদের যন্ত্রপাতি হাতে দেখা যায় নি। সূর্যাস্তের বেশ কিছুক্ষণ পরে সুলতানের দেহের জন্য অনুসন্ধান সুরু হয়েছিল। গিয়াসুদ্দীন তুঘলকের মৃত্যু সম্বন্ধে আরও দু'টি মত আছে। কেউ বলেন যে কাষ্ঠমণ্ডপের নীচে সুলতানের মৃতদেহ পাওয়া যায়। আর একদল বলে যে অর্ধমৃত ও মূর্চ্ছিত সুলতানের দেহে যেটুকু প্রাণ ছিল তা মুহম্মদ শাহের দলবল শেষ করে দিতে এতটুকু দ্বিধা করে নি।

পরবর্তীকালের আবুল ফজল মুহম্মদকে এ ব্যাপারে অব্যাহতি দেন নি। তার মতে মাত্র তিনদিনে এই বিরাট্ মণ্ডপ রচনা করা এবং তাতে সুলতানকে রাত্রিবাস করবার আমন্ত্রণ জানান মুহম্মদ শাহের উচিত হয় নি। ইতিহাস বলে যে সমস্ত কাষ্ঠমণ্ডপটির প্ল্যান করেছিলেন উজীর খাজা-ই-জাহান। মুহম্মদ শাহ সুলতানের পদ পেয়ে তাঁকে ভোলেন নি। চিরদিন তাঁর প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেছেন।

তুঘলকাবাদ আজ সম্পূর্ণ বিনষ্ট। সে অতীতদিনের কোন আড়ম্বর, বৈভবের এককণা, ঐশ্বর্যের কোন রেশ সেখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। অবহেলিত, পরিত্যক্ত তুঘলকাবাদ আজ শুধু ইতিহাসের মূক সাক্ষী। বহুদিন সকলে তাকে পরিত্যাগ করেছে। আজ শুধু সে পুরাণো স্মৃতির ধারকমাত্র।

ভাঙ্গা বাড়ী এবং পাথরের ভগ্নাবশেষের ওপর প্রত্যূষে সূর্যের লাল আলো এসে পড়ে। জ্যোৎস্না-রাতে চাঁদ রূপালী কিরণ ফেলে। শীতে হু হু উত্তুরে হাওয়া বয়। হয়ত গিয়াসুদ্দীন তুঘলকের বিদেহী আত্মা আজও ভাঙ্গা বাড়ীর কোণে কোণে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

তুঘলকাবাদের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে একজন কিন্তু বহুদিন আগে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তিনি নিজামুদ্দীন আউলিয়া। দিল্লীতে বসেই একদিন তিনি অভিশাপ দিয়েছিলেন যে তুঘলকাবাদ আর থাকবে না, পরিত্যক্ত অথবা নগণ্য হয়ে পড়ে থাকবে তুঘলকাবাদ নগরী। আউলিয়ার কথা সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে। দিল্লীর চতুর্থ নগরী অতি অল্পদিনে তার প্রাধান্য হারিয়েছিল। নিজামুদ্দীন ঠিকই বলেছিলেন—ইয়া বসে গুজর

ইয়া রহে উজর।

অর্থাৎ

"Either be inhabited by Gujars
or be abandoned." [ক্রমশঃ

—*—

ছায়াপথ

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

একুশ

রাত্রে রামকিঙ্করের ঘুম ভাল হয় নি। অনেক রাত্রি পর্যন্ত সবিতার কথা ভেবেছে। তার গ্রাম্যমন সংস্কারে আবদ্ধ। সে ভাবতেই পারে না, কোন মেয়ে বিবাহে আপত্তি করতে পারে। নানা দিক্ দিয়ে নিজেকে সে বোঝাবার চেষ্টা করেছে: সবিতা গ্রামের মেয়ে নয়, ছোট মেয়েও নয়। সে শিক্ষিতা এবং বড় মেয়ে। কিন্তু তথাপি তার মন সংস্কারের ঊর্দ্ধে উঠতে পারে নি। ...কল সময় খুঁৎখুঁৎ করেছে।

বোধ হয় এই মানসিক চঞ্চলতার জন্যেই রাত্রে তার ...ল ঘুম হয় না। বুকের ওপর দুঃস্বপ্নের মত হরেকৃষ্ণ আছেই, তার ওপর জুটল সবিতার দুশ্চিন্তা।

সুতরাং খুব ভোরেই তার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

তখনও দোকানে কেউই ওঠে নি। রামকিঙ্কর নিচে ...স শিক-দিয়ে-ঘেরা সেই বারান্দায় বসল।

রাস্তায় তখনও অন্ধকার রয়েছে। গ্যাসের আলো ...ছে। কর্পোরেশনের লোকেরা রাস্তায় জল দিচ্ছে। ...কিঙ্করের মনে পড়ল কলকাতায় আসার প্রথম ...কের কথা। ভোরে এইখানটিতে এসে বসতে তার ...তে ভাল লাগত। সেদিন আজ কত দূরে পিছিয়ে ...ছে। এখন সে আর গ্রামের ছেলে নয়, শহরের ...ল। শহরের ছেলে, কিন্তু গ্রামের সহজ-সরল ...টি.ক এখনও বয়ে নিয়ে চলেছে।

অন্ধকার ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে আসতে লাগল। ...য়ায়, দেওয়ালের গায়ে, এখানে-সেখানে দু'একটা ...লোর আঁচড় পড়তে লাগল। দোকানের কর্মচারীরা ...ক একে এসে নিজের নিজের জায়গায় বসতে ...গল। যে ছেলেটি ধূপ-ধুনা দেয়, সে ঘরে ধূপ ধুনা ...য় গেল।

আরও একটু পরে উত্তর দিকের সরু গলিটা যেখানে ... বড় রাস্তায় এসে পড়েছে, সেইখানে আধ-ঘোমটা ...ওয়া একটি মেয়েকে দেখতে পেলে। মেয়েটি এই ...কই আসছিল। বোধ হয় রামকিঙ্করকে দেখেই ...খানে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

তাই বটে। মেয়েটি সারদা। চোখে চোখ পড়তে... ইশারায় তাকে ডাকলে।

রামকিঙ্কর তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল। দোকা... থেকে আড়ালে গলির মধ্যে সারদাকে নিয়ে গেল।

জিজ্ঞাসা করলে, কি খবর সারদা? তুমি কি... আমার কাছেই আসছিলে?

সারদা ফিক্ করে হেসে ফেললে: নয়ত আর কার কাছে?

অপ্রস্তুত ভাবে হেসে রামকিঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, কি ব্যাপার?

—অনেক দিন ও বাড়ি যান নি। বৌরাণী আপনাকে একবার ডেকে পাঠিয়েছেন।

রামকিঙ্কর বললে, ওদিকে যেতে ভয় হয়, সারদা। গিন্নীমার জন্যে। সেইজন্যে যাই নি। তবে ওই পার্কে কয়েকদিন গেছি। যদি তোমার সঙ্গে দেখা হয়।

—ওখানে আর আমি কি জন্যে যাব?

তাও বটে। রামকিঙ্করের জন্যেই ওখানে সারদার যাওয়া। সে নেই ত আর কি জন্যে যাবে?

রামকিঙ্কর বললে, বৌরাণীর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া কি ঠিক হবে?

—অসুবিধে কি?

—গিন্নীমা রেগে আছেন। বোধ হয় তাঁর ইঙ্গিতেই হরেকেষ্ট আমাকে দাঁতের জাঁতায় পিষছে। কতদিন চাকরি রাখতে পারব বুঝতে পারছি না। অনেক দুঃখের মধ্যে অনেক ভয়ে ভয়ে আছি। যদি বৌরাণী ডাকেন, আমাকে যেতেই হবে। কিন্তু ক'টা দিন একটু সাবধানে থাকাই কি ভাল নয়?

রামকিঙ্করের মুখখানি বড় করুণ লাগল।

সারদা একদৃষ্টে সেই চিন্তাক্লিষ্ট করুণ মুখের দিকে চেয়ে রইল।

বললে, তা হ'লে থাক। আমি বৌরাণীকে গিয়ে বলব। তার পরে কাল আপনাকে জানাব।

—কোথায়? এখানে নয়।

একটু ভেবে সারদা বললে, তা হ'লে বরং কাল সন্ধ্যায় সেই পার্কে যাবেন। সেখানে কথা হবে।

ব'লেই আর এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে হন হন ক'রে চলে গেল।

দোকানে ফিরে রামকিঙ্কর দেখে হরেকৃষ্ণ গদিতে বসেছে, এবং বোধ হয় তাকেই খুঁজছে।

রামকিঙ্কর যেতেই হরেকৃষ্ণ রুক্ষ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় গিয়েছিলে?

রামকিঙ্কর বললে, চা খেতে।

—চা ত সব আমরা এইখানে বসেই খাই।

—এ চাটা বাজে। গলির মধ্যে একটা চায়ের দোকান আছে, বেশ ভাল চা দেয়।

হরেকৃষ্ণ হাসলে! এই বাজে চা খেয়েই ত এতদিন চালালে। আর চলছে না?

—না। বলেই রামকিঙ্কর ভিতরে চলে গেল।

হরেকৃষ্ণ গজ গজ করতে লাগল: বড়লোকের বাড়ীতে বাস করার এই হচ্ছে বিপদ্। গরীবখানায় ফিরে কিছুই আর মুখে রোচে না।

তার কথা শুনে সবাই হাসতে লাগল। এই ক'টা মাস বড়লোকের বাড়ীতে বাস ক'রে রামকিঙ্করের যে চাল বেড়েছে, তা ওদেরও চোখে পড়েছে।

মুখের ওপর জবাব দেওয়ার জন্যেই হোক, রামকিঙ্কর একটা লম্বা তাগাদার ফর্দ পেল। রাণাঘাট লাইনের অনেকগুলো জায়গা। সন্ধ্যার আগে রামকিঙ্কর পার্কে উপস্থিত থাকবে কথা দিয়েছে। যেতেও হবে অনেকগুলো জায়গায়। টাকা আদায়ের ব্যাপার, সুতরাং প্রত্যেক জায়গায় বেশ কিছুটা করে সময়ও যাবে। রামকিঙ্কর কোনমতে নাকে-মুখে কিছু দিয়ে আটটায় বেরিয়ে পড়ল।

অসহ্য গরম পড়ে গেছে। তার ওপর দুর্দান্ত ভিড়। সন্ধ্যার মুখে যখন রামকিঙ্কর শিয়ালদহে এসে পৌঁছল, তখন তার দেহে আর পদার্থ নেই। শরীর এবং মন দুইই ধুঁকছে।

মন বিরক্তিতে পূর্ণ। রাগ হ'ল বৌরাণীর ওপর। বেচারা গরীবের ছেলে, কোনমতে সারাদিন খুটে খুটে গ্রাসাচ্ছাদন যোগাড় করছে। বৌরাণী যেন সেটুকুতেও বাদ সাধছেন। তাকে তাঁর কি কারণে দরকার হ'তে পারে? শাশুড়ীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তাকে রামকিঙ্কর কি সাহায্যই বা করতে পারে? ষাঁড়ে ষাঁড়ে লড়াই লাগে, নল-খাগড়ার প্রাণ যায়। রামকিঙ্করের হয়েছে সেই অবস্থা।

সে স্থির করলে আজকে সন্ধ্যায় সারাদাকে এই কথাটাই সে বুঝিয়ে বলবে, যাতে বৌরাণী আর তাকে ডাকাডাকি না করেন। একবার কোন রকমে বি. এ.টা পাশ করতে পারলে সে যেখানে হোক একটা চাকরি যোগাড় করে ওটা ছেড়ে দেবে। এই কটা দিন বৌরাণী যদি তাকে রেহাই দেন, সে বেঁচে যায়।

ভাবতে ভাবতে পার্কে এসে দেখে তাদের বসবার নির্দিষ্ট কোণটিতে সারদা আগেই এসে বসে আছে। আর প্রবেশপথের দিকে বারবার তার খোঁজে চকমক করে চাইছে।

দু'জনেই দু'জনকে দেখে হেসে ফেললে।

সারদা জিজ্ঞাসা করলে, এত দেরি হ'ল যে?

রামকিঙ্কর তখনও হাঁপাচ্ছে। বললে, আমার ত তোমার মত চাকরি নয়। সকাল আটটায় দুটো নাকে-মুখে গুঁজে রাণাঘাট লাইনে তাগাদায় ছুটেছিলাম। এই ফিরছি। এখনও দোকানেও যাই নি, মুখে-চোখে জলও দিই নি।

সারদা এত কথা জানত না। দেরির জন্যে পরিহাস করতে গিয়ে লজ্জা পেয়ে গেল। ব্যস্তভাবে বললে, আপনি তাড়াতাড়ি পুকুরে হাত-মুখ ধুয়ে আসুন। আমি বসছি।

গরমে ও ভিড়ে রামকিঙ্করের দেহ ও মন জলের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। সামনের পুকুরে হাত-পা মুখ ধুয়ে এবং অঞ্জলি ভরে খানিকটা জল পান করে সে সুস্থ হ'ল। মনও খানিকটা প্রফুল্ল হ'ল।

সারদার কাছে এসে স্মিতহাস্যে বললে, বল, কি খবর?

সারদা হেসে বললে, অনেক খবর।

—একটা একটা করে বল। শুনি।

সারদা বললে, বৌরাণীর ওপর বাবু আর অত্যাচার করেন না।

রামকিঙ্কর অবাক্: হঠাৎ তাঁর এই সুমতি হ'ল কি করে?

হাত উল্টে সারদা জবাব দিলে, কি জানি, বাবু। কেউ বলছে, বৌরাণী ওষুধ করেছেন।

রামকিঙ্কর হেসে ফেললে।

সারদা বললে, হাসলেন? কিন্তু ওষুধ সত্যি সত্যি আছে। যদিও বৌরাণী করেছেন কি না জানি না।

রামকিঙ্কর বললে, তুমি তাঁর খাস ঝি। ওষুধ করলে তুমি জানতে পারতে না?

—পারতাম। সেইজন্যে মনে হয়, ওষুধের কথাটা বাজে।

—হ্যাঁ। নিরীহ মানুষকে অকারণে আর কত মারা যায়? বিশেষ যে মানুষ মারলেও কাঁদে না, নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খায়। কিন্তু সন্ধ্যের সময় বাইরে বেরনোর অভ্যেসটা কি ছেড়েছেন?

সারদা ফিক্ করে হেসে ফেললে: না। সে সব ঠিক ঠিক আছে।

—তা হ'লে আর কি? বৌরাণীর যে দুঃখ, সেই দুঃখ।

সারদা বললে, না, তার চেয়ে কিছু কম দুঃখ। বৌরাণী এখন মাঝে মাঝে হাসেন।

ব'লেই গলার স্বর নামিয়ে বললে, কিন্তু সে হাসি যেন কি রকম। মাঝে মাঝে আমারই ভয় করে। আমার কি মনে হয়, জানেন?

—কি?

—বৌরাণী সর্বক্ষণ কি যেন একটা ভাবছেন। কি যেন একটা করবেন। সেই কাজে আপনাকে বোধ হয় তাঁর দরকার হবে।

রামকিঙ্কর সভয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কি কাজ?

—তা কি করে জানব? হয়ত কাজের মুখে বলবেন। তার আগে পাছে আপনি হাতছাড়া হয়ে যান, সেইজন্যে ছলে-ছুতোয় আপনার সঙ্গে যোগটা রাখতে চান। আলগা আলগা যোগ। আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আমাকে কখন ছুটি দিয়েছেন, জানেন?

—কখন?

—চারটেয়। আমি তখনই চলে আসছি দেখে বললেন, ওই রকম করে যাবি নাকি? আমি বললাম, তবে আর কি করে যাব? বললেন, একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যা। ওই রকম বেশে কি রাস্তায় বেরোয়?

সারদা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসতে লাগল।

রামকিঙ্করের দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। তার চোখ-কান দিয়ে যেন গরম হাওয়া বেরুচ্ছে।

বললে, বৌরাণীর মাথায় কি ঘুরছে তুমি কিছুই অনুমান করতে পার না?

সারদা বললে, না। তবে মনে হয়, একটা ভয়ঙ্কর কিছুর জন্যে তিনি তৈরি হচ্ছেন। তাঁর মনের কথা কেউ জানে ব'লে মনে হয় না। একটি যদি জানেন ত ডাক্তারবাবু।

—ডাক্তারবাবু!

—সেই যে যাঁর কাছে আপনাকেও যেতে হয়েছে চমৎকার। আজকাল বৌরাণীর খুব ঘন ঘন অসুখ হচ্ছে, তিনিও খুব ঘন ঘন আসছেন।

রামকিঙ্কর স্তব্ধভাবে বসে রইল।

সারদা বললে, আমার ভয় হয়, ডাক্তারবাবু না খুন হয়ে যান।

রামকিঙ্কর শিউরে উঠল: খুন!

—ও বাড়ীতে অনেক আগে এ রকম ঘটনা ঘটেছে বলে শোনা যায়। বড়লোকদের পক্ষে আশ্চর্য কিছু নেই।

রামকিঙ্কর সভয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কে খুন করবে! কেন খুন করবে!

—গিন্নীমাই করাবেন। স্বার্থের জন্যেই করাবেন।

—স্বার্থটা কি?

—তা কি আমি জানি? তবে বৌরাণীর ঘরে ডাক্তারবাবুর অত ঘন ঘন আসা নিশ্চয় তিনি পছন্দ করবেন না।

দু'জনে চুপ করে কিছুক্ষণ বসে রইল।

সারদা বললে, তবে হয়ত সাহস করবেন না।

—কেন?

—মনে হয় আজকাল গিন্নীমা যেন বৌরাণীকে ভয় করতে সুরু করেছেন।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। বৌরাণীর ব্যাপারে গিন্নীমা আজকাল বড় একটা নাক গলান না। যাকে শাসন করা বলে, তা ত একেবারেই করেন না। বৌরাণীরও চাল-চলনে আর সেই আড়ষ্ট ভাব নেই। এখন তাঁর নিজের মহলের ভার তিনি নিজেই হাতে নিয়েছেন।

রামকিঙ্কর ও বাড়ী থেকে কতদিন হ'ল এসেছে? বোধ হয় মাসখানেকের কিছু বেশী। এর মধ্যে ও বাড়ীতে এত পরিবর্তন এসেছে? আশ্চর্য!

তার মনে হ'ল, সে যেন একটা অত্যন্ত জটিল ডিটেকটিভ উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদ শুনছে। তার মনের মধ্যে আগ্রহ এবং কৌতুহল প্রবল হয়ে উঠল। ভেবেছিল, এর মধ্যে থাকবে না, এই কথাটাই আজ সারদাকে জানিয়ে দিয়ে আসবে। কিন্তু কৌতুহল বড় পাজি জিনিষ।

সে বললে, আমরা যে এখানে দেখা করি, এও ত গিন্নীমা নজর রাখতে পারেন?

—পারেনই ত। আর হয়ত করছেন। আমি যখন বেরিয়ে আসি, তখন আমার পিছু পিছু একজনের আসা কিছুই কঠিন নয়।

রামকিঙ্কর সভয়ে চারিদিকে চাইলে, কাছাকাছি বসে কেউ তাদের কথা শুনছে কি না।

বললে, তা হ'লে এখানে দেখা করা ত ভয়ের ব্যাপার।

ওর ভয় দেখে সারদা ফিক্ করে হেসে ফেললে। বললে, তা হ'লে কোথায় দেখা করব?

—অন্য কোন নিরাপদ জায়গা নেই?

একটু ভেবে সারদা বললে, আছে। কিন্তু সেখানে কি আপনি যাবেন?

—কোথায়?

—আমার বাসায়।

—তুমি ত ও বাড়ীতেই দিন-রাত্রি থাক। তোমার আবার বাসা আছে নাকি?

সারদা হেসে বললে, আছে। চাকরি আমাদের তালপাতার ছায়া। তার ওপর ভরসা করতে পারি না। তাই থাকি-না-থাকি, বাসা একটা রাখি। তার ভাড়াও দিয়ে যাই।

রামকিঙ্কর উৎসাহিত হয়ে বললে, সে ত ভাল কথা। সেইখানেই আমাদের মাঝে মাঝে দেখা হ'তে পারে। সে কত দূর?

—দূর বেশী নয়। কিন্তু—

সারদা থেমে গেল।

রামকিঙ্কর বললে, থামলে যে? সেখানে যাওয়ার কিছু অসুবিধা আছে?

—অন্য অসুবিধা কিছু নেই। কেবল—

—কেবল?

—জায়গাটা খুব ভদ্র নয়। বস্তি। যাবেন?

সারদা মুখ নামালে।

—কেন যাব না?—রামকিঙ্করের কণ্ঠে উৎসাহ অব্যাহত। বস্তি, তা কি হয়েছে? আমার যেতে কিছুমাত্র আপত্তি নেই। আসল কথা কি জান, গিন্নীমার ত গুণের ঘাট নেই। তাঁকে আমার বড় ভয় করে। সেইজন্যে এখানে দেখা করতে চাই না। তোমার বাসায় হ'লে নিশ্চিন্তে দেখা করতে পারি। ঠিকানাটা দেবে?

সারদার চোখে কৃতজ্ঞতার আভাস ফুটে উঠল।

লক্ষ্য করে রামকিঙ্কর বললে, আমাকে কি তুমি মস্ত বড় বাবু ঠাওরেছ, সারদা? আমিও তোমাদের মতই গরীব মানুষ। দিন আনি, দিন খাই। আমার কাছে তোমার কুণ্ঠার কিছু নেই।

সারদা আনন্দে গলে গেল। ঠিকানাটা দিয়ে বললে, আমি ত সেখানে রোজ যাই না। কচিৎ কখনও যাই। কবে আপনার যাওয়ার সুবিধা হবে, বলুন। আমি সেদিন থাকব।

হিসাব করে রামকিঙ্কর বললে, বিষ্যুৎবারে আমাদের দোকান বন্ধ থাকে। সেইদিন আমার পক্ষে যাওয়া সুবিধা। কখন যাব বল?

সারদা বললে, সন্ধ্যের মুখে। যেমন সময় আজ এখানে এসেছিলেন। অসুবিধা হবে?

—কিছুমাত্র না।

—চিনে যেতে পারবেন ত?

—কেন পারব না? তুমি বরং রাস্তাটা একটু বুঝিয়ে দাও।

সারদা রাস্তাটা বুঝিয়ে দিলে।

উঠতে উঠতে রামকিঙ্কর বললে, ঠিক আছে। আমি ঠিক সময়েই যাব। তুমি উপস্থিত থেক।

কথাটা রামকিঙ্করের মাথায় ঢোকে নি, সুবলই ঢুকিয়ে দিলে।

তাগাদা সেরে রামকিঙ্কর যখন ফিরল, তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। রোজই এইরকম হয়। সকাল আটটায় বেরোয়, ফেরে সন্ধ্যা সাতটায়।

সুবল বললে, ব্যাপারটা বুঝছ না, রাম?

—কি ব্যাপার?

—এমন ভাবে তোমাকে তাগাদায় পাঠানো হয় যে, সকাল আটটায় বেরিয়েও সন্ধ্যা সাতটার আগেও ফিরতে পার না।

—যত পারছে খাটাচ্ছে। তা ছাড়া আর কি বল?

—আরও একটু আছে।

—কি বল।

—হরেকেষ্ট, যে কারণেই হোক, তোমাকে দোকানে বসতে দিতে চায় না। সব সময়ে বাইরে বাইরে রাখে।

কথাটা রামকিঙ্করের মনে লাগল

বললে, কেন বলত?

—তুমি কিছু আন্দাজ করতে পার না?

রামকিঙ্কর আন্দাজ করতে পারে। কিন্তু মুখে বললে, না।

—এই দেখ! এত লেখাপড়া শিখেছ, আর এই সোজা কথাটা আন্দাজ করতে পারছ না?

—কই আর পারছি?

—হরেকেষ্টর চেহারাটা লক্ষ্য করেছ?

—না।

—চেহারাটা বেশ একটু শাঁসালো হচ্ছে না? গালে মাংস লাগছে। ভুঁড়িটা একটু নেয়াপাতি ধরনের হচ্ছে।

রামকিঙ্কর নিজেও তা লক্ষ্য করেছে।

বললে, কি ব্যাপার বল ত?

—ব্যাপার আর কি। রস জমছে।

—কোথা থেকে?

—এই দোকান থেকেই নিশ্চয়। খাতাপত্র বোঝ একমাত্র তুমি। তা তোমাকে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত বাইরে রেখেছে। সুতরাং ডান হাত, বাঁ হাত সমানে চলছে। কাজেই গালেও মাংস লাগছে। ভুঁড়িও ফুলছে।

রামকিঙ্কর বললে, তোমরা কিছু ধরতে পার না?

—বুঝতে পারি, কিন্তু ধরব কি করে?

তা ঠিক।

রামকিঙ্কর বললে, মালিকরাও কেউ খোঁজ রাখেন না। সুতরাং সুবিধাই হয়েছে।

সুবল বললে, আগে গিন্নীমা মাঝে মাঝে খাতা তলব করতেন। বাবুও হঠাৎ একসময় ধূমকেতুর মত এসে উদয় হতেন। কি জানি কেন, দু'জনেই এখন চুপচাপ।

রামকিঙ্কর ভাবতে লাগল।

সুবল ব'লে চলল, দোকান আর বেশীদিন চলবে না, বুঝলে? তোমার আর কি? বি. এ. পাস করে তুমি কোথাও একটা ঢুকে পড়বে। বিপদ্ হবে আমাদেরই। কোথায় চাকরি পাব, বল?

রামকিঙ্কর চিন্তিত হ'ল। দোকানের জন্যে নয়, সুবলদের জন্যে নয়, নিজের জন্যেও নয়। ভিতরে ভিতরে গিন্নীমা ও বৌরাণীর মধ্যে যে দড়ি টানাটানির গোপন খবর সে পাচ্ছে, একি তারই ফলশ্রুতি? গিন্নীমা কি ধীরে ধীরে ঢিল দিচ্ছেন? অথবা দিতে বাধ্য হচ্ছেন? গিন্নীমা যেরকম অসামান্যা বুদ্ধিশালিনী মহিলা, তাতে বৌরাণীর মত ছেলেমানুষের পক্ষে এত অল্পদিনের মধ্যে পাঞ্জায় এতখানি জোর আনা কি সম্ভব?

সারদার সঙ্গে এর পরে যেদিন দেখা হবে, সেদিন হয়ত কিছুটা আভাস পাওয়া যেতে পারে। অথবা নাও পাওয়া যেতে পারে। বৌরাণী সারদাকেও সব কথা বলেন না। কিছু কিছু সারদা যে বুঝতে পারে, তা নিজের বুদ্ধিতে বোঝে।

রামকিঙ্কর মনে মনে স্থির করলে, ক'টা দিন সে বাইরে তাগাদায় বেরুবে না। হরেকৃষ্ণ কি করছে, একটু লক্ষ্য রাখা দরকার। বৌরাণী হয়ত তার ভরসা করেন।

পরদিন সকালে মাথায় একটা রুমাল বেঁধে সে নিচে দোকানে নামল। তার দিকে না চেয়েই হরেকৃষ্ণ তার আসা টের পেলে।

বললে, রাম, আজ তোমাকে যেতে হবে গার্ডেন-রীচের দিকে। সেখান থেকে একবার শিবপুরে যাওয়া দরকার।

রামকিঙ্কর বললে, আজকের দিনটা বাদ দিন।

—বাদ দেব! রামকিঙ্করের মুখের দিকে চেয়ে সবিস্ময়ে হরেকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলে, মাথায় ওটা কি বেঁধেছ?

—রুমাল। যন্ত্রণায় মাথা যেন ছিঁড়ে আসছে।

হরেকৃষ্ণ কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল। যন্ত্রণার কথায় তার মন কিছু নরম হ'ল ব'লে বোধ হ'ল না।

বললে, দেখ বাপু, আমরা গরীব মানুষ। খেটে-খুটে খাই। মাথাই ছিঁড়ুক, গড়িয়ে গড়িয়েও আমাদের কাজে বেরুতে হবে। তাগাদাটা বিশেষ দরকার।

রামকিঙ্কর বললে, তা হ'লে অন্য কাউকে পাঠান। আমি বরং গদিতে ব'সে ব'সে যে-সব কাজ, তাই করি।

হরেকৃষ্ণ হাসলে: গদিতে ব'সে ব'সে যে-সব কাজ, তা করবার লোক আছে। কিন্তু তাগাদায় যাবার লোক তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। বিলেত-বাকি জোর তাগাদা দিয়ে আদায় করতে হবে। বাবু মুহুর্মুহু টাকা চাইছেন। না দিতে পারলে রেগে যাবেন। তখন আবার আর এক বিপদ্ আসবে।

সেকথা রামকিঙ্কর ভ্রূক্ষেপও করলে না। গদির একপ্রান্তে চেপে বসল।

বললে, কিন্তু আজ আমি কিছুতেই বেরুতে পারব না। বিপদই আসুক, আর যাই আসুক।

রাগে হরেকৃষ্ণর মুখ লাল হয়ে উঠল। এবারে বাবুদের বাড়ী থেকে আসার পর থেকে রামকিঙ্কর নিচু হয়েই আছে। কেন নিচু হয়ে আছে, গিন্নীমা পরিষ্কার

করে না বললেও, সুচতুর হরেকৃষ্ণ টের পেয়েছে, রামকিঙ্করের উপর গিন্নীমার আগেকার অনুগ্রহ আর নেই।

বললে, তা হ'লে আমাকে গিন্নীমাকে জানাতে হয়।

—জানাবেন। বলবেন, আমি মরতে মরতে তাগাদায় যেতে পারব না।

দাঁতে দাঁত চেপে হরেকৃষ্ণ বললে, আচ্ছা।

গদির মাঝখানে হরেকৃষ্ণ রাগে কাঁপছে। অন্যপ্রান্তে রামকিঙ্কর নিশ্চিন্তে গুম হয়ে বসে। সমস্ত দোকান নিস্তব্ধ। হরেকৃষ্ণর রাগ দেখে সুবলরা দোকানের আনাচে-কানাচে স'রে পড়ল। তারা ভয় পেয়ে গেল বটে, কিন্তু মনে মনে খুশীও হ'ল। ইদানীং হরেকৃষ্ণর বার বড্ড বেড়েছে। রামকিঙ্করের কাছে এমনি একটা ধাক্কা খাওয়া দরকার ছিল।

সুবল খানিকটা অনুমান করলে, রামকিঙ্করের তাগাদায় না যাবার কারণটা কি হ'তে পারে। সম্ভবতঃ, সে গদিতে বসে হরেকৃষ্ণর কার্যকলাপ লক্ষ্য করতে চায়।

অন্যেরা খুশী হয়ে বলাবলি করতে লাগল: আরে বাবা, ও আজ বাদে কাল বি. এ পাস করবে। ও কি তোমাকে গেরাহ্য করে, না তোমার তিন পয়সার চাকরিকে গেরাহ্য করে? গিন্নীমাকে ব'লে তুমি আর ওর কি করবে? গিন্নীমার কাছে যা পাবার, তা ওর পাওয়া হয়ে গিয়েছে। এখন ওর পাখা গজিয়েছে। যখন দরকার হবে, বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ফুড়ুৎ করে উড়ে পালাবে।

খদ্দের আসে, যায়। সেই থমথমে অবস্থাতে দোকানের কাজ চলে।

অনেকক্ষণ পরে হরেকৃষ্ণ একটু নরম হয়ে বললে, শরীর যখন খারাপ, তখন এখানে বসে না থেকে ওপরে গিয়ে শুয়ে পড়লেই ত পার।

রামকিঙ্কর মনে মনে নিজেকে তৈরি করে ফেলেছে। বললে, এখানে থাকলে আপনার অসুবিধা আছে?

থতমত খেয়ে হরেকৃষ্ণ বললে, আমার আর অসুবিধা কি? তোমার ভালর জন্যেই বলা।

রামকিঙ্কর বললে, এইখানেই এখন থাকি, যতক্ষণ পারি। না পারলে, ওপরে যাব।

হরেকৃষ্ণ আর কিছু বললে না।

ক্রমশঃ

—*—

ঋষি লিও টলস্টয়ের প্রথম জীবন

শ্রীকমলা দাশগুপ্ত

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ

পঁচিশ বছর বয়সের সময় টলষ্টয়কে ইউরোপের একটা বড় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হয়। সেখানকার অভিজ্ঞতা তাঁর পরবর্তী জীবন ও সাহিত্যসাধনাকে প্রভাবান্বিত করে।

তিনি ডেনিউব গেলেন। টার্কির সঙ্গে যুদ্ধ চলছে রাশিয়ার। তিনি রাজকুমার গর্চাকভ-এর অধীনে ছিলেন। তাঁকে টলষ্টয় অনুরোধ করেন তাঁকে যেন যুদ্ধের গুরুতর ক্ষেত্রে পাঠান হয় যেখানে তাঁর সেবা সর্বাধিক হ'তে পারে। টলষ্টয় টার্কি ছেড়ে কিশিনেভ পৌছলেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগ দিতে চেয়েছিলেন বলে তাঁকে সেভাষ্টাপোল পৌছতে হয় ৭ই নবেম্বর, ১৮৫৪। তিনি সাব-লেফটানান্ট পদে প্রমোশন পেয়েছিলেন।

মিত্রপক্ষের সেনাবাহিনী সেভাষ্টাপোলের উত্তরে ক্রিমিয়াতে পৌছেছিল ১৪ই সেপ্টেম্বর। তারা আল্মাতে রাশিয়াকে পরাজিত করেছিলেন। রাশিয়ান সেনাপতি মেনশিকভ শহরটা ছেড়ে দিয়ে উত্তরে সরে গিয়েছিলেন। নৌসেনাবাহিনীর সেনাপতি কর্নিলভ তাঁর নৌসেনা-বাহিনী নিয়ে আপন প্রাণের বিনিময়ে এই সময় রাশিয়াকে রক্ষা করেছিলেন। রাশিয়ার সমগ্র সেনা-বাহিনী কর্নিলভ-এর এই বীরত্বে উদ্দীপ্ত হয়ে মেনশি-কভকে দিয়ে রাশি রাশি অস্ত্রশস্ত্র যুদ্ধরসদ আনিয়ে এগার মাস ধ'রে সেভাষ্টাপোল রক্ষা করেছিলেন। যদিও মিত্রপক্ষ তখন আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে ও সমরসম্ভারে বিপুল-ভাবে সজ্জিত ছিল।

আত্মরক্ষার প্রস্তুতি যখন সম্পূর্ণ, তখন টলষ্টয় সেভাষ্টাপোল পৌছলেন। দিন পনের পরে টলষ্টয় তাঁর ভাই সার্গিকে লিখলেন—চারদিন আগে আমি সেভাষ্টাপোল ছিলাম। শত্রু দক্ষিণ দিক্ থেকে শহরটা আক্রমণ করে। তখন আমাদের সেখানে রক্ষা ব্যবস্থাই ছিল না। এখন সেখানে দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করা হয়েছে। সেখানকার দুর্গে আমি প্রায় সপ্তাহখানেক ছিলাম। ওখানে কামানশ্রেণী ও সৈন্যশ্রেণীর গোলকধাঁধায় পড়ে আমি শেষদিন পর্যন্ত পথ হারিয়ে ফেলেছি, ঠিক যেমন করে লোকে ঘনজঙ্গলে হারিয়ে যায়। শত্রু-সৈন্য আর অগ্রসর হতে পারছে না, কামানের গোলা তাদের আটকে দিচ্ছে।

আমাদের সৈন্যদের মনোবল চমৎকার রয়েছে। পুরাকালের গ্রীক বীরগণও বুঝি এমন বীরত্ব দেখায় নি। নৌসেনাপতি কার্নিলভ সৈন্যবাহিনীর মধ্য দিয়ে যাবার সময় তাদের স্বাস্থ্যকামনা করেন না, তিনি বলেন, "বালকগণ, মরতেই যদি হয় এখন মরবে?" সেনাবাহিনী পরমশ্রদ্ধাভরে এবং উৎসাহের সঙ্গে চীৎকার করে ওঠে, "আমরা মরব।" তাদের মুখে প্রতিজ্ঞার রেখা ফুটে ওঠে। বাইশ হাজার সেনা ইতিমধ্যেই তাদের শপথ রক্ষা করে মৃত্যুবরণ করেছে।

একটি মরণোন্মুখ সেনা আমাকে বলেছে, তারা একটা ফরাসীবাহিনীকে পরাজিত করেছিল, কিন্তু পুনরায় যুদ্ধরসদ এসে আর পৌছল না। একদল নৌসেনা ত্রিশ দিন কামানের গোলার মধ্যে থেকে যুদ্ধ করার পর তাদের সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ব'লে ঘোর আপত্তি জানায়। কোথাও গোলা পড়লে পর সৈন্যবাহিনী সেই গোলা থেকে ফিউজ বার করে নেয়। মেয়েরা সৈন্যদের জন্য বুরুজ (Bastions) তৈরি করে। আহত এবং নিহতের সংখ্যা গোনা যায় না। গোলাবৃষ্টির মধ্যেই পাদ্রীগণ (Priests) ক্রুশ নিয়ে যুদ্ধের অগ্রভাগে বুরুজে চলে যান এবং কামানের গোলার মধ্যে থেকেই প্রার্থনা করেন। একটা ব্রিগেডের ১৬০ জনের বেশী লোক আহত হয় তবুও তারা যুদ্ধের ফ্রন্ট ছাড়তে চায় না। ২৪শে অক্টোবরের পর আমরা শান্ত আছি। সেভাষ্টাপোল চমৎকার লাগছে। শত্রু আর গুলী করছে না—তারা সেভাষ্টাপোল আর নিতে পারবে না, সে কাজ তাদের পক্ষে অসম্ভব। আমি এখনও যুদ্ধের সামনে গিয়ে কাজ করি নাই, কিন্তু এই গৌরবের দিনে যারা সামনে গিয়ে যুদ্ধ করছে তাদের দেখছি, তাই আমার সৌভাগ্য। ৫ই নবেম্বরের যুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়। ১৫০০ কামান দু'দিন ধরে অবিরাম আক্রমণ করে চলেছিল। সেভাষ্টাপোল তাতে পরাজিত ত হয়ই নি এমন কি

আমাদের সুসজ্জিত কামানশ্রেণী এবং সৈন্য ও রসদসম্ভার দুইশত ভাগের একভাগও নষ্ট করতে পারে নি। শত্রু-পক্ষ কিন্তু সকল বিষয়ে আমাদের চেয়ে উন্নত ছিল।

যখন আমি ফ্রন্টিয়ারের বাইরে ছিলাম তখন ছিলাম রুগ্ন, একা, দরিদ্র। ফ্রন্টিয়ারের এদিকে এসে আমি ভাল আছি, ভাল বন্ধু পেয়েছি, কিন্তু টাকাগুলি যেন ফস্কে পালিয়ে যায়।

সেই সময় একটি সামরিক সংবাদপত্র প্রকাশ করবার অনুমতি সম্রাট দেন নি। তাতে টলষ্টয় খুবই মনঃক্ষুণ্ণ ও নিরাশ হয়েছিলেন। তাঁর পরিকল্পনাও বদলে গেল। তিনি আন্টি টাটিয়ানাকে লিখলেন—ক্রিমিয়ার যুদ্ধ যদি ভালভাবে শেষ হয় এবং আমার পছন্দমত ভাবে যদি আমাকে নিয়োগ করা না হয় এবং রাশিয়াতে যদি যুদ্ধ না থাকে তবে আমি সেনাবিভাগ ছেড়ে দেব এবং পিটার্সবার্গে গিয়ে মিলিটারী একাডেমিতে যোগদান করব। কারণ আমি সাহিত্যসেবা ছাড়তে চাই না, ক্যাম্প-জীবনে তা অসম্ভব। তা ছাড়া আমি কিছু মঙ্গলকর কাজ করতে চাই, শুভব্রতী হ'তে চাই।

১১ই মার্চ গর্চাকভ সেভাষ্টাপোল এলেন। তিনি টলষ্টয়ের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করলেন কিন্তু তাঁকে ষ্টাফ-এর পদে উন্নীত করা সম্বন্ধে কোন সংবাদ দিতে পারলেন না।

১লা এপ্রিল বোমাবিধ্বংস হবার সময় টলষ্টয়দের সেনাবাহিনীকে সেভাষ্টাপোলে আবার পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে ১৫ই মে পর্যন্ত তাঁকে বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে থাকতে হয়। তিনি তখন চতুর্থ বুরুজের (Fourth Bastion) ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। এই বুরুজকে সেভাষ্টাপোলের দক্ষিণতম স্থানে পাঠান হয়। সেটা ছিল আত্মরক্ষার পক্ষে তখন বিপদের চরমসীমায়। কিন্তু টলষ্টয়ের ভাল লাগছিল বসন্ত ঋতুটা এবং নিজের লোকেদের। অত বড় সংকটের সময়েও ঐ ছয়টা সপ্তাহ তাঁর স্মৃতির একটা মধুরতম সময় মনে হয়েছিল। তারপরে তাঁকে ১৪ মাইল দূরে বেলবেক্ নামক স্থানে পাহাড়ের ওপর যুদ্ধ করবার জন্য একটা দলের ভার দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে গিয়েও তাঁর খুবই ভাল লাগছিল।

টলষ্টয় 'কন্‌টেম্‌পোরারি' নামক পত্রিকায় লিখেছিলেন, '১৮৫৪ সালের ডিসেম্বরে সেভাষ্টাপোল (Sevastapole in December 1854)।' এই প্রবন্ধে সেই সময় সেভাষ্টাপোলে চতুর্থ বুরুজের যুদ্ধ-কাহিনী তিনি জলন্ত ভাষায় বর্ণনা করেছিলেন। এক জায়গায় লিখেছেন—বিপদবরণ করায় একটা অবিরাম মোহ আছে, যে সৈন্যদের এবং নাবিকদের মধ্যে তিনি ছিলেন তাদের দেখতে এবং লক্ষ্য করতে তাঁর ভাল লাগত, যুদ্ধের শৃঙ্খলা ও পদ্ধতি সবই তাঁর এত ভাল লাগত যে, ওখানটা ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করত না। বিশেষ ক'রে তাঁর ভাল লাগত যেখানে আক্রমণ ও হতাহত হ'ত সেখানে নিজে উপস্থিত থাকতে।

এই যুদ্ধের পরে একদিন অফিসারগণ আগুনের চারিদিকে ঘিরে বসে গল্প করছিলেন। একজন প্রস্তাব করলেন, ষ্টাফ অফিসারগণ সঙ্গীত রচনা করবেন। সকলেই একটি করে কবিতা লিখবেন।

কবিতা লিখলেন অনেকেই, হ'ল যাচ্ছেতাই। তার পরদিন টলষ্টয় নিজে রচনা ক'রে একটা কবিতা পড়ে শোনাতে লাগলেন। সকলে গানটা লুফে নিলেন, তাঁরা গাইতেই আরম্ভ করলেন। দেখতে দেখতে সে গান সমস্ত সেনাবাহিনীতে মুখে মুখে ফিরতে লাগল গানের সুরে। এমন কি সমগ্র রাশিয়াতে ছড়িয়ে পড়ল গানের কপিগুলি।

আক্রমণের দিন সমাপ্ত হয়ে আসছিল। টলষ্টয় চেয়েছিলেন সেভাষ্টাপোল যেতে। সে অনুযায়ী তাঁকে ২৭শে আগষ্ট সেখানে রেডষ্টেড-এর উত্তরে ষ্টার ফোর্টে পৌঁছতে হয়। ঠিক সেই সময় ফরাসীরা মালাখভ দখল ক'রে নেয়।

মালাখভ দখল হয়ে যাবার পর সেভাষ্টাপোল রক্ষা করা আর সম্ভব ছিল না। পরদিন রাত্রে রাশিয়ানগণ নিজেরাই সেভাষ্টাপোলে আগুন লাগিয়ে দেন। যে-সমস্ত যুদ্ধরসদ সরিয়ে নেওয়া সম্ভব ছিল না তা তাঁরা পুড়িয়ে দিতে থাকেন। মিত্রপক্ষের হাতে শহরটা ছেড়ে দেবার আগে টলষ্টয়ের ওপর পঞ্চম এবং ষষ্ঠ বুরুজ সাফ ক'রে দেবার ভার ছিল। যখন এই ধ্বংসলীলা চলছিল রুশ শক্তি তখন সাময়িক ভাবে তৈরী একটা পোল দিয়ে রেড্‌ষ্টেড্ পার হয়ে ওপারে চলে যায়। সেভাষ্টা-পোলের উত্তরে গিয়ে রাশিয়ানগণ আত্মরক্ষার ক্ষেত্র রচনা করেন। সেখানেই তাঁরা অবস্থান করতে থাকেন যতক্ষণ না সন্ধি স্থাপিত হয়। সন্ধি হয় ১৮৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে।

৪ঠা সেপ্টেম্বর টলষ্টয় আন্টি টাটিয়ানাকে লিখলেন, ২৭শে আগষ্ট সেভাষ্টাপোলে একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটে। আক্রমণের দিনই আমাকে সেই শহরে পৌঁছতে হয়

এবং সেখানকার কাজে ইচ্ছা করেই আমি অংশগ্রহণ করি। ২৮ তারিখটা ছিল আমার জন্মদিন। জন্মদিনে শোক এবং স্মরণীয় ঘটনা ঘটল এই আমার দ্বিতীয়বার। প্রথমবার আমার এক কাকিমা মারা যান। সেভাষ্টাপোলের পতন হচ্ছে দ্বিতীয়। যখন দেখলাম শহরটাতে আগুন জ্বলছে এবং আমাদের বুরুজের ওপর ফরাসী-পতাকা উড়ছে তখন আমি কেঁদেছিলাম। এটা গভীর শোকের দিন ছিল।

পশ্চাদপসরণের পর টলষ্টয়ের উপর ভার ছিল আর্টিলারী কমাণ্ডারদের নিকট থেকে সংগ্রহ ক'রে প্রায় কুড়িটি রিপোর্ট লিখে দেওয়া। মিথ্যায় সাজিয়ে যুদ্ধের ইতিহাস লেখার উপর তাঁর এখান থেকেই ঘৃণা ধ'রে যায়। সেনাপতির আদেশে লিখতে হয় যা ঘটে নি তাই।

টলষ্টয় যে রিপোর্ট লিখলেন সেই রিপোর্টসহ তাঁকে বার্তাবহ হিসাবে পিটার্সবার্গে পাঠান হয় অক্টোবরের শেষে। এখানেই যুদ্ধে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা শেষ হয়। টার্কি এবং ক্রিমিয়ার যুদ্ধে তাঁর দেড় বছর কাটে, ককেশাস ছিলেন তিনি দুই বছর।

এণ্ডারসনের একটা গল্পে আছে যে, পোষাক পরিচ্ছদহীন রাজাকে যখন তাঁর মোসাহেবদল চমৎকার পোষাক পরিহিত আছেন বলে তারিফ করছিল তখন একটি শিশু বলে ওঠে, রাজা কেন উলঙ্গ আছেন? টলষ্টয়ও ঠিক সেই শিশুরই মত নিজের চোখ খুলে দেখবার এবং প্রকাশ করবার ক্ষমতা রাখতেন। সেই সঙ্গে ছিল তাঁর সত্যকথা বলবার মহান দৃঢ়তা। এই কারণেই তাঁর যুগেই তিনি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হ'তে পেরেছিলেন। নিজের দ্বিধা সত্ত্বেও এবং সেন্সারের কাটাকাটি সত্ত্বেও সে সময়ে ফরাসী এবং রুশ সৈনিকগণ যে বন্ধুর মত একত্র হয়ে মৃতদের সমাধিস্থ করেছিলেন সেই কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি একটা গল্পের এক জায়গায় লিখেছিলেন :—বুরুজে সাদা পতাকা উড়ছে, পুষ্পময় উপত্যকা মৃতদেহে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। নীল সমুদ্রে সূর্য আপন মহিমায় ডুবে যাচ্ছে। সমুদ্রের তরঙ্গ সূর্যের সোনালী কিরণে ঝলমল্ করছে। হাজার হাজার লোক পরস্পরকে দেখছে, হাসছে, কথা বলছে। যে ক্রীশ্চানগণ প্রেম ও ত্যাগকে সত্য বলে স্বীকার করে তারাই আজ এখানে দেখছে, তারা কি করেছে। যে ভগবান তাদের প্রত্যেককে জীবনদান করেছেন, মৃত্যুভয় দিয়েছেন, হৃদয়ে ভালবাসা দিয়েছেন যেন তারা কল্যাণ ও সুন্দরকে ভালবাসে সেই ভগবানের কাছে তারা কিন্তু নতজানু হয়ে আজ অনুশোচনা জানাচ্ছে না, তারা আজ আনন্দাশ্রু নিয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গনও করছে না।

সাদা পতাকা নামিয়ে দেওয়া হ'ল, আবার মৃত্যু ও যাতনার ইঞ্জিন চলছে, আবার নিষ্পাপের রক্ত বয়ে যাচ্ছে, আকাশ-বাতাস শোক ও অভিশাপের ক্রন্দনে ভরে যাচ্ছে।

প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর পরে টলষ্টয় তাঁর যুদ্ধের এক বন্ধুর লিখিত "সেভাষ্টাপোলের স্মৃতি" নামক পুস্তকে ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের একজন যুবক অফিসার সম্বন্ধে টলষ্টয় সেই ভূমিকায় লিখেছেন—যুবক অফিসার বলছে না যে, সে মিত্রপক্ষকে সেই রকম ঘৃণা করত যেমন করে আগেকার দিনে জু-গণ ফিলিষ্টাইনদের ঘৃণা করত। বরং কখনও কখনও দেখা যায় তাদের প্রতি তার ভ্রাতৃসুলভ সহানুভূতি আছে। সে একথাও বলছে না যে, জেরুজালেমের গির্জার চাবি আমাদের হাতে থাকা চাই অথবা আমাদের নৌবাহিনী থাকবে কি থাকবে না সে কথাও সে বলছে না। তার পক্ষে মানুষের জীবন-মৃত্যু রাজনীতির প্রশ্নের সঙ্গে সমানুপাতিক নয়।

কেন সে একাজ করেছিল তার উত্তরে এখানে টলষ্টয় বলেছেন—আমি যখন অল্প বয়সের ছিলাম তখন যুদ্ধের আগেই আমি যুদ্ধে নাম লিখিয়েছিলাম, কারণ আমার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। আমি এমন একটা জায়গায় গিয়ে পিছলে পড়লাম যেখান থেকে বেরিয়ে আসতে আমার ভীষণ কষ্ট করতে হয়েছিল। সেখানে আমি একটা জালে জড়িয়ে পড়েছিলাম এবং আমাকে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা অস্বাভাবিক কাজ করতে বাধ্য হ'তে হয়েছিল —যারা আমার কোন অনিষ্ট করে নি সেই ভাইদের আমার হত্যা করতে হয়েছিল, শাস্তি এবং লজ্জা থেকে বাঁচবার জন্য আমাকে একাজ করতে হয়েছিল। এই বইখানা (যে বই-এর ভূমিকা লিখছেন) পড়বার সময় মনে হয় লেখক জানেন যে, ভগবানের একটা বিধান আছে, প্রতিবেশীকে ভালবাস, তাকে হত্যা ক'রো না। এই বিধান মানুষের কৌশল দ্বারা রদ করা যায় না।

বইখানিতে যাতনা এবং মৃত্যুর বর্ণনা আছে। কিন্তু একথা নেই, কিসের জন্য এটা হয়। পঁয়ত্রিশ বছর আগে তা যদিও বা ভাল ছিল আর কিন্তু আরও অন্যকিছু প্রয়োজন। আমাদের জানতে হবে কিসের জন্য

নিকগণ যাতনা এবং মৃত্যুবরণ করবে– আমরা সেকথা নব এবং বুঝব। সেই মূল কারণ আমরা ধ্বংস করব। লোকে বলে, যুদ্ধ জিনিষটা আঘাত, রক্তপাত ও ত্যু নিয়ে অতি ভয়ঙ্কর। আমাদের রেড ক্রশ গড়ে তালা উচিত এসবের যাতনা কমাবার জন্য। কিন্তু আমি মনে করি আঘাত, যাতনা ও মৃত্যু যুদ্ধের ভয়ঙ্কর জনিষ নয়। মনুষ্যজাতি চিরদিন যাতনা ও মৃত্যু বরণ রতে অভ্যস্ত। যুদ্ধ ছাড়াও দুর্ভিক্ষে, বন্যায়, মড়কে াকে মরে। যাতনা এবং মৃত্যু নিজে ভয়ঙ্কর নয়, য়ঙ্কর হচ্ছে সেই কারণটা যে-কারণে মানুষ অন্যের াতনা ও মৃত্যু ঘটায়।

মানুষের শারীরিক যাতনা, অঙ্গচ্ছেদ অথবা মৃত্যু াস করার প্রয়োজন নেই—বন্ধ করতে হবে মানুষের ন্তরাত্মার মৃত্যুর। রেড ক্রশের দরকার নেই, দরকার ীশুর সাধারণ ক্রশ যা মিথ্যা এবং প্রতারণাকে ধ্বংস রবে।

এই ভূমিকা যখন আমি শেষ করতে যাচ্ছি তখন াকটি সৈনিক যুবক এসে আমার সঙ্গে ধর্ম সম্বন্ধে নানা ালোচনা করে। তারপর তাকে আমি মদ পান না রতে উপদেশ দেই। যুবকটি উত্তর দিল, 'মিলিটারীতে অনেক সময় এটা প্রয়োজন হয়।' আমি ভাবলাম শরীরের শক্তির জন্য বুঝি বলছে। আমি নিজের অভিজ্ঞতা ও বিজ্ঞান দিয়ে বুঝিয়ে দেব ভাবলাম। কিন্তু যুবকটি বলে, গেকটেপে নামক স্থানের অধিবাসীদের যখন নির্মমভাবে হত্যা করতে হয়েছিল তখন তার সৈন্যরা, তা করতে চায় নাই। সেই সময় সে সৈন্যদের মদ পান করিয়ে তারপর কাজ......। এখানেই আছে যুদ্ধের সর্বাপেক্ষা বেশী ভয়ঙ্করতা—অল্প বয়সের এই বালকের মুখে আছে তার চিহ্ন, আছে তার স্কন্ধের চামড়ার বন্ধনীতে, তার পরিষ্কার বুটের ওপর, তার সরল চোখে—জীবন সম্বন্ধে তার এই বিকৃত ধারণা।

এখানেই আছে যুদ্ধের প্রকৃত ভয়ঙ্করতা। যে ক্ষত যুবকের ঐ মন্তব্যের মধ্যে পতঙ্গের পালের মত ছড়িয়ে আছে তা লক্ষ লক্ষ রেড ক্রশ কর্মীরা কেমন করে আরোগ্য করবে? সেটা যে সমগ্র শিক্ষাপদ্ধতির পরিণতি!

(৪)

১৮৫৬ সালের ২০শে নভেম্বর টলষ্টয় সেনাবিভাগ পরিত্যাগ করেন। কিন্তু তাঁর রচনাবলীর কাজ পূর্ণ উদ্যমে চলতে থাকে।

—*—

জাতক

শ্রীদীপংকর চক্রবর্তী

প্রণব মনে মনেই বলল, "অন্ধকারই ভাল। এর মধ্যে শান্তি আছে, স্বস্তি আছে।" রূঢ় আলোক যেন ইঁদুরের মত তার বুক কুরে কুরে খায়। আমি অন্ধকারেই থাকব। আলো, তুমি আমার চোখে অস্ত্র হয়ে পড়ো না; পৃথিবী, তোমার আকাশ তোমার তারা তোমার মাটি ফলফুল গাছ-পাতা ঘাস আমাকে একটু ভোলাক, ভোলাক। না, একটা অসোয়াস্তির সুর বেজে উঠল প্রণবের আহত মনটায়। এই ত সারাদিন খাটাখাটুনির পর ঘরে ফিরেছি। এ সংসারে ঔদাসীন্যের ফল মারাত্মক। প্রেম প্রীতি স্নেহ দয়ামায়া মমতা মনুষ্যত্ব ছাপার পাতায় যখন স্থান নিয়েছে, তবে কেন তাকে বার বার স্মরণ করি।

রাত হওয়াতে ঘরটা আস্তে আস্তে চুপ করে গিয়েছিল। একমাত্র শিয়রে ঘড়িটাই নির্ভয়ে শব্দ করছিল। ঘড়িটা ঠিক সময় দেয় না। কখনও চলে, কখনও চলে না। উবু করে রাখতে হয়। প্রণব চুপ করে শুয়েছিল। ভাবছিল, আবার তা হ'লে পাত্তাড়ি গোটাতে হবে। একটু যা সামান্য স্থান সংকুলান করলাম তাও টিঁকল না? 'শা-লা, না-নাইয়ার শতেক নাও। একটু চিন্তা করতে-না-করতেই হাসি পেল ওর। চিৎপুর থেকে দমদম, দমদম থেকে নিমতলা, নিমতলা থেকে মানিকতলা। এবার কোথায়, কোথায়—ভেবে পেল না সে। ভালই হ'ত যদি সেই ট্রেণ দুর্ঘটনায় মারা যেতাম। তবু মরতে কি ইচ্ছে করেছে তার কখনও? বাঁচার একটা আলাদা স্বাদ আছে, একটা ভিন্ন অভিজ্ঞতার তীব্র গন্ধ আছে। মরলেই ত সব শেষ। কিন্তু বেঁচে থেকে সমস্ত গলিঘুঁজি পার হওয়ার মধ্যে অনেক শক্তি, অনেক ধৈর্য, সাহস কষ্ট-সহিষ্ণুতা দরকার। কিন্তু আমি যে বেঁচে আছি একে কি বাঁচা বলে? ভাবল, কিপ্টে আর কাকে বলে। কিপ্টের উদাহরণ জিজ্ঞেস করলেই সে অজান্তেই বলতে পারবে বিনোদিনী মল্লিকের নাম। এতগুলো ঘর থাকতেও বুড়ী এই ড্রাইভারের ঘর থেকেও উঠিয়ে দিতে চাইল। কোন জানোয়ারের কাছে কি শুনেছে, না তাই বিশ্বেস করে দিব্যি সিদ্ধান্তে পৌঁছল। শালা বলে কি না এখানে মেয়ের ব্যবসা চলে। হারামজাদা মেয়ে পটানোর আর জায়গা পেলি না, তোরা আ ব্যবহারের মতলবে আছিস্। ও মেয়ে মালতী, আ ছোট্ট খুকিটি নেই, ও যাবে না, যাবে না। ভাবে ভাবতে মাথা ফেতে উঠল প্রণবের।

প্রণব একটা জ্বালা অনুভব করল বুকের গভীরে।

যে লণ্ঠনটার বুকের আগুন প্রণব ফুঁ দিয়ে নিভি দিয়েছে, প্রণব আর তাকে দেখতে পেল না। কার অন্ধকারে সব সমান, কালো পর্দার গায়ে সব কিছু যে অদৃশ্য ছবি হয়ে দাঁড়ায়। প্রণব বুঝতে পারল, কুলিগুলো হৈ-হল্লা করে ঘুমিয়েছে। চারদিকে আগুন জ্বালি রামা-হৈ-এর কি পুনরাবৃত্তি। দুঃসহ। যে লোকটা অনেক রাত পর্যন্ত মেশিনের শব্দ করে জামা-প্যান্ট-ব্লাউজ তৈরি করে, সেও ঘুমিয়ে পড়েছে। তবু এখনও কেন ওর ঘুম এল না? ঘুম, ঘুম, ঘুম। কে বলছে, প্রণব ঘুমোস্ নে; কে বলছে, কাজ কর কাজ কর, কে বললে, প্রণব, আমরাও একদিন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, আর জাগতে পারি নি—ওরা জাগতে দেয় নি; প্রণব, তুমি আমাদের জাগাবে? অন্ধকারটা প্রণবের সামনে পাক খেতে লাগল। প্রণব অনুভব করল, কারা যেন তার সামনে ভিড় করছে, বিক্ষোভও জানাচ্ছে—প্রণব শুনতে পারছে না। প্রণব এবার নিজেকে আরও দৃঢ় করতে চেষ্টা করল, হীরের মতন কঠিন।

একটা সিগ্রেট ধরালে বেশ হয়, ভাবল প্রণব। চার্মিনারের প্যাকেটটা বালিশের পাশ থেকে হাতে উঠিয়ে নিল। প্যাকেটটা খুলে একটা সিগ্রেট ধরাল। একটা মাত্রই আছে। বালিশের তলায় হাত দিল। একটা বিড়িও নেই। দুস্ শা-লা। বিরক্তিতে সারা গা জ্বলে উঠল তার। একটা দেশলাইর কাঠি বার করল প্রণব। বারুদের একটু গন্ধও পেল সে। প্রণব কাঠিটা দেশলাইর বারুদে ঘষল। একটা শব্দ করে আগুনটা দমকা চিন্তার মত জ্বলে উঠল। প্রণব সিগ্রেট ধরাল। অন্ধকারের মধ্যে আলোর ঈষৎ অনুভূতি এখন একটু ভালই লাগল প্রণবের। প্রণব ফুঁ দিয়ে আগুন নেভাল। কাঠিটা খানিকটা পুড়ে ছাই হল।

...র চেয়ে চেয়ে দেখল। অন্ধকারে, এই চারদেয়ালের ...কারে, এই আগুন, সিগ্রেট আগুনটা তখন কিরকম ...স্পষ্ট উজ্জ্বল সুন্দর মনে হ'ল প্রণবের।

প্রকাশ করতে না পারার জ্বালায় যারা ভোগে, ...দের কথা ভাবতে গেলে প্রণব কষ্ট পায়। মা। ...কে সে সেই ছোট থেকে দেখে আসছে, মা স্বল্পভাষী, ...জা-আরচা নিয়ে দিন কাটে, হয়ত বা তা দিয়ে নিজেকে ...সতেও চায়। মা'র কথা মনে পড়তেই মনে পড়ল, ...বি ভাসল: মা'র পরনে থান কাপড়, গায়ের তামাটে ..., করুণ চিন্তাগ্রস্ত মুখ এবং যে পরের বাড়ীতে কাজ ...রে পেট চালায়, তাকে। অন্য এক মহিলা যেন তখন ...নে হয় মাকে। মাকে দেখতে যেতে হবে, ভাবল ...ণব, অসুখ হয়েছে রাঁধুনীর। বাড়ীর লোকের দায় ...ড়েছে সেবা করতে। না, সাগু-বার্লি দেবে নিশ্চয়ই। ...া'র শুকনো মুখটা চকিতে মনে পড়ল একবার। আশ্চর্য, ...াবা মারা যাবার পর মা'র মুখে হাসি দেখি নি। ...াসে নি ঠিক নয়, যেটুকু তা সৌজন্যের হাসি, যা ভদ্রসমাজে রীতিনীতির অন্তর্ভুক্ত,—এ ছাড়া তাকে আর বেশী বলা চলে না। হাসির শ্রেণীভাগ করলে মা'র হাসিকে যে তার কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত করা যায় ভাবতে গেলে অন্তত বেকুব বনবে প্রণব, সব গোলমেলে ঠেকে তার। তবে এটা নিশ্চিত, ক্ষোভ দুঃখ ব্যথা, বিদ্রোহ, অথচ নিষ্ফলতা—সব কিছু মিলিয়ে ঐ হাসিটা তৈরি। —মা তোমার কোলে মরা ছেলে, তুমি কাঁদ।

মা'র কথা ভাবতে ভাবতে বোন দুটোর কথাও মনে পড়ল তার। বোধ দুটো এখন ছোট, ফুল হয়ে ফুটেছিল, স্থির, কিন্তু ফুল শুকিয়ে শুকনো পাতা এখন। ও কি ফুলের চেহারা? তবু অভাব ওদের চেতনার প্রত্যক্ষে ভীষণ রূপ নিয়ে গলা জাপটে এখনও ধরে নি, তাই এখনও ওরা হাসে, হাসতে পারে। প্রণব নিজে প্রাণ খুলে হাসতে না পারলেও প্রাণখোলা হাসিকে বরদাস্ত করে; যারা হাসে তাদের না ভালবেসে পারে না। শৈশবটা বেশ, দিব্যি ঔদাসীন্য কল্পনায় কল্পনায় দিনরাত্রি প্রহর কাল ঘণ্টাগুলো কাটান যায়। বিনু অনু স্বপ্ন দেখে, স্বপ্নের কথা বলে। ওরা এখনও বুঝতে শেখে নি, ঐ দেশে সব রাজপুত্র রাজকন্যে, ওরা তাদের পাবে না—'জলবি, জলবি, তিলে তিলে জলবি, ভুলে যাবি', যেমন প্রণব ভুলেছে। দুখের ছেলেও যে নির্জলা সত্যবোঝে। স্বপ্ন-টপ্নের কথা শুনলে প্রণব চেঁচিয়ে ওঠে, রাগে অসন্তোষে। 'স্বপ্ন তুমি আমায় পথ ভুলিয়েছিলে।' কৈশোরের দিনগুলো তাই অতীতের জীর্ণ ইতিহাসের সামগ্রী হয়ে দাঁড়িয়েছে, আসল এই অন্যায় জীবনে তার কোন দাম নেই। এই ত তার অবস্থা। এই ভাঙ্গা ঘর—সে জীবন কাটায় উপবাসে, অর্ধ উপবাসে, ছেঁড়া চটি, ছেঁড়া জামা নিয়ে। একরকম তাই। ভাগ হ'ল দেশ। মহাজনের আশ্বাসের পরিণতি ত শেয়ালদা স্টেশন, ক্যাম্প আর বস্তি। 'বাবা মরে গিয়ে তুমি বেঁচে গেছ। বাঁচলে তোমাকেও শেয়ালদা স্টেশনে কাটাতে হ'ত, দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডা: চ্যাটার্জিকে কেউ পুছত না, বরং তুমি নিহত হ'তে বাবা, ঐ দাংগাতেই।' ভাবতে ভাবতে বুকে জ্বালা ধরে প্রণবের।

গরীব মেয়ের আবার আব্দার কি? নিজের ওপর তীব্র রাগে প্রণব ধৈর্য হারিয়ে ফেলে। অনু বিনু আব্দার করে, সামান্য, তাই রাখতে পারি না, দাদা হয়ে এর চেয়ে লজ্জার কি আছে। অনুর আব্দার, (একটু ভাবলেই বলা চলে, আংশিক বাদ দিয়ে সবটাই প্রয়োজন) মেটানো সম্ভব নয় আমার। পয়সা কই যে বই-পেন্সিল কিনে দেব। অথচ একটু যত্ন নিলে অনুটা বেশ ভাল হ'তো বাবার ব্রেন ও পেয়েছে। ভাবতে ভাবতে অনু বিনুর মুখ ভেসে উঠল প্রণবের চোখের সামনে। তার পর গোটা শরীর। উঃ' কি চেহারা, আমসি, মেরে গেছে। ছোটবেলাকার ছবিগুলো দেখে অনু বিনু দুজনেই হো হো করে হেসে ওঠে, বিশ্বেসই হয় না ওদের। ধ্যেৎ, তুমি কাদের ফটো এনে আমাদের বলে চালাচ্ছ। আবার কৌতুহলও জন্মে। প্রণব বলেছিল, মাকে জিজ্ঞেস করিস মা ত আর মিছে বলবে না। ছোট্ট উত্তর দিয়ে বিনু চুপ করেছিল সেদিন, 'আমরা নই' এবং এও মনে মনে বলেছিল, দেখো দাদা আমরা অনেক বড় হব।'

প্রণব ভাবল, ভেবে তার বড় আশ্চর্য লাগল, ঐ কচি মেয়ে দুটো ত কম পরিশ্রম করতে পারে না—আশ্রমের ডিউটি, নানান একাজ-সেকাজ, পড়া, টুকিটাকি কত কিছু। এইটুকুন মেয়ে কত ধকল সইবে। নিজেরাই পিষে ঘাস হয়ে যাচ্ছি। মা বলেছিল, খোকা, আর টিউশনি করে কতদিন চালাবি, এবার একটা চাকরি-বাকরি দেখ্ বাবা। কি ভাগ্যটাই না করেছিলাম বাপু, শেষে পরের বাড়ীতে রান্না করা, ঝি-গিরি, সেও ভাগ্যে ছিল। কতবার বলেছে তাকে, যা না, একবার কাকাদের কাছে, যেয়ে দেখ না। বড়লোক তারা, কিছু করে

দিতে পারবে। এক মায়ের পেটের ভাই। প্রণব যায় নি। চিঠি লিখেছিল নেহাৎ মায়ের অনুরোধে, উত্তর পায় নি। অন্য লোক মারফৎ তারা প্রণবদের আসার খবর পেয়েছিল, খোঁজ নেয় নি। বেহায়া নিল্লর্জের মত সেই বা যাবে কেন? গরীব আত্মীয় ঘৃণার যোগ্য। মা'র মুখে হাসি ফোটাতে আমিও ত চেয়েছিলাম। আমিও কি চাই মায়ের চোখের জল দেখতে, মাকে বোনকে নিরানন্দ অভাবগ্রস্ত দেখতে? প্রণব নিজের সম্বন্ধে সচেতন বলেই, আবেগে দুঃখের সামনেও স্থির দাঁড়িয়ে থাকে। অর্থহীন পরিকল্পনা সে করে না, কারণ, সে জানে, কৌশলে তা ঠকায়। ভাবতে ভাবতে ঘরটাকে আরও অন্ধকার মনে হয় প্রণবের। শিং মাছের মত অন্ধকারটা কাতরাতে থাকে, গায়ের মত পিচ্ছিল মনে হয় অন্ধকারটা। প্রণব সিগ্রেট টানে।

সিগ্রেট টেনে মুখ থেকে ধোঁয়া ছাড়ল প্রণব। সিগ্রেটের মুখে আগুন। প্রণব আবার মশারির ভেতর থেকে ঘরটা আবছা আবছা দেখতে পেল। প্রণব সিগ্রেটটায় সুখটান দিয়ে শেষ অংশটা এবার মশারির বাইরে দেয়ালের কোণে ছুঁড়ে দিল।

প্রণব নিজেকে ভুলতে চেষ্টা করল, নিজের চিন্তা-গুলোকে দুমড়ান নেকড়ার, রাংতার পুতুলের মত মনে হ'ল। মনে হ'ল ওরা সব ভিজে কাগজের নৌকো।

প্রণব এবার নিজেকে, নিজের চিন্তাকে, তার ঘর, তার পরিবেশ, আগামী, অতীত, ভবিষ্যৎ সবটাই তার মগজ থেকে সরিয়ে আলাদা করতে চাইল। দ্বিতীয় প্রণব হ'তে পারলে আজ তার অনেক ভাল হ'ত, খুব বেশি না হ'লেও স্বস্তি পেত সে ঘণ্টা কয়ের জন্যে।

কিন্তু প্রণব নিজেকে ভুলতে পারল না। একটা ভুলে-যাওয়া ফুলের গন্ধের মত সুতপাকে মনে পড়ল প্রণবের। বিচিত্র চিন্তার ভিড়ে, ঘোলাটে ঘুমের রাতে, এ অস্থির ঘরে। সুতপা, সুতপা। বেশ কয়েকবার আওড়াল নামটা। সুতপার সঙ্গে তার আর যে কোন দিন দেখা হবে সেদিন সুতপাকে দেখার এক সেকেণ্ড আগেও তা ভাবতে পারে নি প্রণব।

সুতপার সঙ্গে যে আমার দেখা হবে কে ভেবেছিল? আমি?—না। আমি ত ভাবতেই পারি নি; বোধ করি সুতপাও না। 'চিনতে পারছেন?' এই প্রশ্নটাই প্রণবকে রাস্তার মাঝে অপ্রতিভ করে তুলেছিল। সুতপার তুষারের মত সাদা মুখখানাকে সেদিন প্রণব আবার নতুন করে চিনতে পারল—নতুন দৃষ্টিতে।

সুতপার গভীর সান্নিধ্যে আসার পরেই প্রণবের মনে প্রশ্ন জেগেছিল: প্রেম করা কি পাপ? প্রেম যদি পাপ হয় তবে মানুষ প্রেমে পড়ে কেন? প্রেম যদি অন্ধকার হয় তবে মানুষ প্রেম করে কেন? প্রেম যদি স্থূল মাংস-পিণ্ডের লুব্ধতার সমাহার অথবা নামান্তর মাত্র হয়, তবে প্রেমের সার্থকতা কোথায়? প্রণব ভাবল, এ প্রশ্নের উত্তর সে পেয়েছে কি না।

প্রণব ভাবল, প্রণব গুনগুনিয়ে গাইল: যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে।

প্রণব জেনেছে, অন্ধকারে জীবন নেই, প্রেম নেই, কিচ্ছু নেই। অন্ধকার অভিশাপ, অন্ধকার হতাশ, ব্যর্থতা, মরা চোখের মত অন্ধকার। সমাজ? অন্ধকার। প্রেম? অন্ধকার। জীবন? অন্ধকার। অন্ধকার থলথলে কাদার মত, জ্যাবজেবে ঘামের মত মনে লেপ্টে আছে। আমরা সবাই অথই অন্ধকারে ডুবে আছি। আমরা সূর্য আছে জানি, সূর্য দেখি না, দেখতে পাই না; দরজা জানালা আকাশ আমাদের চোখের আড়ালে; আমাদের মুক্তির পথ নেই, আমাদের চারদিকে দেড় ইঞ্চি ফারাকে কাঁটাতারের বেড়া, প্রতিদিনের সংগ্রামে আমাদের বহু-শ্রমে সঞ্চিত রক্ত ঝরে পড়ছে। আমরা দিনের পর দিন অন্ধকারে ডুবছি। আমাদের সূর্য নেই, জীবনে আলো নেই, আমরা বন্দী, কয়েদীর অন্ধঘরে নিজেদের বন্দী রেখেছি।

মুক্তি?—পাব? ভাবল প্রণব। এ যুগ যে গর্ভ-যন্ত্রণার। এ যুগ বন্ধ্যা। নবজাতকের স্থান আছে? আছে। নবজাতক নেই। ঘর আছে? আছে। ঘরণী নেই। মা আছে, কোলে ছেলে নেই। প্রণবের চিন্তা প্রশ্নের আকার ধরল, মনে জাগল, প্রণব শুধাল: পৃথিবী, এ গর্ভযন্ত্রণার শেষ দিন কবে? উত্তর পেল না প্রণব। প্রণব আবার জিজ্ঞেস করল, এ গর্ভযন্ত্রণার কবে শেষ দিন? প্রণব উত্তর পেল না। প্রণব মৃদুস্বরে গলা বাজাল:

এখন আলোর স্ফটিকে কত নির্বাসিত মুখের ছায়া
তাদের সকলের রুদ্ধ শ্বাসের চাপে এই স্তব্ধতা কি
কাটবে না?

হে বন্ধ্যা, তোমার গর্ভে যন্ত্রণা একবার নড়ুক।

মা নিশ্চয়ই অমত করবে না সুতপাকে যদি আমি বিয়ে করি। অমত হওয়ার ত কোন কারণও নেই। সুতপা সুন্দরী। গোলযোগ মাত্র অসবর্ণ। এদ্দিনে মা'র গোঁড়ামি নিশ্চয়ই ভেঙে গেছে। আর যদি বা

কিছু থাকে তবে তা পরে ঠিক হয়ে যাবে। বুড়ো গাছকে উপড়ে এনে অন্য মাটিতে বাঁচান সম্ভব নয়।

ভেবে কুল পায় না প্রণব। সীতারামপুর থেকে চিঠি এসেছে মেজদির। ক্যানসার হয়েছে। বাঁচবার আশা নেই। ভুলু, পল্টু, মিতার অসুখ। 'বিপদ আর সারবে না দেখছি।' একটা যেতে না যেতে আর একটা। প্রণব চট্ করে ভেবে নিল, সীতারামপুর যেতে অন্ততঃ দশটা টাকা দরকার। মেজটি এবার খরচ পাঠায় নি। বোধ হয় অসুখের জন্যে, খরচ পত্তর ত কম হচ্ছে না! তবে গেলে ঠিক দিয়ে দেবে। কিন্তু আগেই বা জোগাড় করবে কোত্থেকে? শহরে কে কাকে ধার দেয়? তবে ওখানে গেলে একটা চাকরি মিলতেও পারে। ভেবে প্রণব আরও গাঢ় চিন্তায় ডুবে গেল।

একটা নক্ষত্রও নিরাপদ নয়। খরচ হাঁ করেই থাকে, মুখ আর বন্ধ করে না। পেট আর পকেট, পকেট আর পেট। এ সমস্যাতেই জীবনটা গেল। মগজ, মন এ যেন ফালতো, বিলাসের সামগ্রী। নিজেকে যন্ত্র ভাবতে চকিতে কারও ভাল লাগলেও, প্রণবের গা রি রি করে। প্রনব দিশেহারা হয়ে ওঠে খরচের পরিমাণ দেখে। কুলোবে কেমন করে? কলেজে ছ'মাসের মাইনে বাকি। এ মাসে কানাইবাবুর কাছ থেকে বিশ টাকা ধার করেছে, শোধ দিতে হবে- তারপর ডাইংক্লিন, টেলারিং-এ বাকি। অসুর আব্দার, সীতারামপুর যাওয়ার খরচ, নিজের জামা-প্যান্ট ছিঁড়ে গেছে, বানাতে হবে; একটা আলোয়ান নেই, অল্প দাম দিয়েও একটা কেনা উচিত, নয় শীতকে ঠেকানো যাবে না। ছেঁড়া চটি। মাথা ঝিন ঝিন করে ওঠে প্রণবের।

প্রণব প্রস্তুত ছিল না। একটা কান্নার আওয়াজ পেল সে। কয়েকটা বাড়ী ডিঙিয়ে আওয়াজটা আসছে, মনে হ'ল। একটু কান পাতল প্রণব। এবার ঠিক বুঝতে পারল, স্ত্রীশাসন চলছে। এ অঞ্চলে এ কোন নতুন নয়। কেউ মদ খেয়ে মাঝরাতে এসে মাতলামি করে, বউকে মারে; কেউ চুরি করে পালিয়ে এসেছে, রাত্রে পুলিসের ভ্যান আসে, হল্লা হয়। কখনও দারুণ তর্কাতর্কি গালাগালি খিস্তি মারামারি। গ্যাসের বাতির নীচে সেদিন শংকর আর পন্টিকে বড় বীভৎস মনে হয়েছিল প্রণবের। মাথায় রক্ত চড়ে গিয়েছিল পন্টির। শেষে তর্কাতর্কির পর গজ বার করেছিল। পন্টি। ভাগ্যিস পুলিসের ভ্যান এসেছিল, নয়ত বেগতিক শংকরের জানটা খেয়ে নিত। ছবিটা আর একবার চোখের সামনে ভেসে উঠল প্রণবের। প্রণব ঘেমে উঠল।

আতঙ্কে ঘেমে উঠেছিল প্রণবের সারা শরীর। বাইরে অনেকগুলো পুরণো লোহালক্কর, খণ্ড খণ্ড হয়ে নির্বিকার পড়ে আছে। নজর একদিন কারও ছিল, এখন নেই। একটা কুকুর-মা অনেকগুলো বাচ্চা বিইয়েছে। ওদের এখনও চোখ ফোটে নি। ওদের চোখ না ফোটাই ভাল। এখন ওরা অন্ধকারে কেঁউ কেঁউ করছে, দুধের বাঁটে মুখ দেওয়ার জন্যে কাড়াকাড়ি চলছে। মা হওয়া বড় জ্বালা। হা ঈশ্বর, ওদের বাঁচিও।

রাত বাড়ে। শেয়ালের ডাক শোনা যায়। রাস্তাটার ওপারে খালের মালবাহী নৌকোগুলো থেকে থেকে গোঙিয়ে উঠছে। ট্রেণের খচাং খচাং খচ শব্দ, বাঁশিও মৃদু হয়ে বাজে যেন প্রণবের কানে। চিন্তে আর করতে পারে না প্রণব। বিছের কামড়ের মত বুকে কি যেন কামড় দেয়। করাতের ঘায়ে-পড়া কাঠের গুঁড়োর মত প্রণবের সব আশাগুলো যেন ঝরে ঝরে পড়ছে।

প্রণব আর চিন্তে করবে না। চিন্তে করতে করতে সে পাগল হয়ে যাবে। প্রণব পাশ ফিরে শুল। ঘুমোতে চাইল। ঘুম আসে না। ঘুম আসবে কি করে। বুকে জ্বালা, চোখে জ্বালা। মশারির মধ্যে অনেক মশা ঢুকেছে, কামড়াচ্ছে। নাকের কাছে কানের কাছে গুঞ্জন শুনতে পেল প্রণব। দু-একটা মারলও সে। 'একটুও নিশ্চিন্দি নেই'। ময়লা কাঁথাটা ভালভাবে গায়ে জড়িয়ে নিল প্রণব। পা গুটিয়ে নিল, শীত কম লাগবে। পাশের বিছানায় ড্রাইভারটা বেশ ঘুমুচ্ছে। কতক্ষণ ধরে নাক ডাকছে ওর। যত বিপদ্ কি তবে এই প্রণবেরই? দুশ্চিন্তা থাকলে কি কেউ দিব্যি এরকম ঘুমুতে পারে? টিনের বেড়ার নীচ দিয়ে ইঁদুর-গুলো রাস্তা থেকে এসে সারা ঘরে ছুটোছুটি করছে। পুষিটা জেগে ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে মধ্যযুগীয় তেজী সেনাপতির মতন। মাঝে মাঝে তার রণহুঙ্কার শোনা যায়। হু হু ব-র ঠাণ্ডা বাতাসটা ঢুকে প্রণবের কাঁপুনিটা আর একটু বাড়ল। চালের দিকেও কত ফুটো। একটা বেশ বড়। শুলে আকাশটা দেখতে কষ্ট হয় না প্রণবের। শুয়ে শুয়ে প্রণব আকাশ দেখে।

বাইরে অন্ধকার। তারা জলে, নেভে। ঘুমুতে চাইল প্রণব।

দানাঅলা পুরো ভুট্টার গোছটার মত আজ মন্দিরটাকে মনে হয়েছিল প্রণবের। তার উঠোনে লাল-নীল রং-বেরং-এর মাছ। দেয়ালে টাঙানো ক্যালেণ্ডারের ছবিগুলোকে মনে পড়ল। একটা মেলার সুন্দর ছবি—বিচিত্র লোক, বিচিত্র রং, বিচিত্র বেশ। দ্বিতীয়টি ক্রুশ-বিদ্ধ যীশুর—আর্ত। প্রণব ভাবল, এই চারটে দেয়াল তাকে কত জোরে বেঁধে রেখেছে, আষ্টেপৃষ্টে, প্রতিদিন এ চৌকিতে বসতে হয়, শুতে হয়। এ ঘরে আসতে হয়। যাবতীয় ব্যবহার্য সমস্ত কিছুর রাখার একমাত্র জায়গা ত এই ভাঙা ঘরটাই। অথচ এটাও তার নিজস্ব নয়।

একটা দিন এখন মনেও পড়ে। প্রণব চিন্তা করে না। চিন্তা করলেই সে উন্মনা পাগল হয়ে ওঠে। অসুখের খবর পেয়ে সকালে উঠেই প্রণব সুতপাকে দেখতে বেড়িয়েছিল বিবেকানন্দ রোডে। হন্‌হন্‌ করে পা চালিয়ে বাড়ীর সামনে এসেই প্রণবের শরীর, স্নায়ু সব কিছু হিম হয়ে গিয়েছিল। আঁতকে উঠেছিল প্রণব। কল্পনায়ও সে আনতে পারে নি। সুতপা, সুতপার মৃত্যু, সুতপা যে মরে গেছে, মারা যেতে পারে, প্রণব তা মুহূর্তের জন্যেও ভাবতে পারে নি। অথচ সে জানে মানুষ মরে, প্রতিদিন সংখ্যাতীত ভাবে মরছে। চারদিকে অন্ধকার ঠেকেছিল প্রণবের। স্বপ্ন-জীবন সাধ আকাঙ্ক্ষা কি সহজে ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে পারে। কত অল্প সময়ে। প্রণব সেদিন, সেখানে দাঁড়িয়ে বুঝতে পেরেছিল। সুতপা। মৃত্যু। শাবল দিয়ে কে যেন খণ্ড খণ্ড করে দিয়েছিল প্রণবের বুকটা। এ যে ভেপসে মরার চেয়েও দারুণ, ভয়ঙ্কর, মর্মান্তিক। ব্লাষ্ট ফার্নেসে বরং তাকে ফেলে দিলে সে স্বস্তি পেত (মিহির যেমন মরেছে বার্ণপুরে)—ভাবল প্রণব।

ইচ্ছা সত্ত্বেও শবযাত্রার সঙ্গী হ'ল না সে। ভাবল, এখুনি নিশ্চই শ্মশানে নিয়ে যাবে সুতপার মৃতদেহটা। কিছুদূর এগিয়ে পার্কের বেঞ্চিতে বসে পড়ল। কি করবে ভেবে পেল না। মাথার শিরাগুলো টানটান হয়ে উঠেছে, চুলগুলো টেনে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে তার। 'সুতপাকে আমি ভালবেসেছিলাম, চলে গেল। সুতপা জীবনের প্রতি একটা মোহ, একটা নেশা ধরিয়ে-ছিল প্রণবের জীবনে, মনে। বাঁচবার চরম ইচ্ছেতেই প্রণব আরও লকড়ি জুগিয়েছিল, আগুন জ্বালিয়েছিল। এখন সে আগুনেই প্রণবকে পুড়তে হবে তিল তিল করে, বিন্দু বিন্দু করে। নিস্তার নেই। সুতপা নেই, তবে বেঁচে থেকে লাভ কি? কি নিয়ে বাঁচবে প্রণব? মা বোন তাদের নিয়ে? তাদেরই বা কতটুকু উপকার সে করেছে, করতে পারবে?

ঢং ঢং করে রাত তিনটে বাজে। ভাবতে আর পারে না প্রণব। বিনয়দার মতন লোকোশেডেই কাজ করবে সে। ক্লীনার, ফায়ারম্যান, ড্রাইভার কালিমাখা পোশাক, বেশ, তাই হবে সে, ফায়ারম্যানই হবে। কেউ তাকে চিনবে না, কালিঝুলিমাখা পোশাকে; কলকাতায় থাকবে না, বাইরে চলে যাবে, কলকাতা থেকে অনেক দূরে। পৃথিবীটা ত এই লোকোশেডেই রোজ নিজের রূপ নিচ্ছে।

মনে পড়ল, সেদিন বিনয়দার ডান-হাতটা পুড়ে ধক্‌ধক্‌ করছিল। প্রণবের বুকটাও যে পুড়ে ধক্‌ধক্‌ জ্বালা করছে, সারাক্ষণ, তা কি বিনয়দা খবর রাখে? বিনয়দাকে জিজ্ঞেস করাতে বলেছিল, 'নারে প্রণব, ওসব কিছু না, আমাদের সয়ে গেছে।' প্রণবেরও ইচ্ছে হয় সেও তার বুকের ভেতরের পোড়া ঘা-টা বিনয়দাকে দেখায়। দেখিয়ে বলতে ইচ্ছে করে, 'দেখ বিনয়দা, বুকের ভেতর তাকিয়ে দ্যাখ, যদি তোমার গভীরে তাকাবার চোখ থাকে, পুড়ে খাক্‌ হয়ে গেল, এ বিরাট ঘা আর শুকোবে না।' কিন্তু কেমন করে তা দেখাবে প্রণব, কেমন করে?

প্রণব একদিন মফঃস্বলে একজিবিশনে গিয়েছিল। সে একজিবিশনে মৃত্যুঝাঁপই নাকি ছিল শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। মস্ত বড় একটা সিঁড়ি ছিল। সিঁড়িটা আকাশের দিকে ওঠান। উপরে ছিল দাঁড়াবার জায়গা। ঠিক নীচেই একটা কুয়ো। গায়ে পেট্রল লাগিয়ে আগুন জ্বালাত একটা লোক। তার পর আগুন যখন দাউদাউ করে জ্বলে উঠত, তখন সে মরণপণ করে ঝাঁপ দিত কুয়োয়। উঁচুতে লোকটা যখন আগুন জ্বালাত তখন আকাশটা লাল হ'ত, লোকের মুখে শংকা জাগত। তবু মৃত্যুঝাঁপ দেখতে যেত সবাই দু' আনার টিকিট কেটে। প্রণবের সামনে এ ছবিটা বরাবর ভেসে ওঠে, কিছুতেই ছবিটাকে মুছতে পারে না, যত মুছতে যায়, ততই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

ক্ষুধিত জিহ্বা মেলে চিতার আগুনটা জ্বলছিল। প্রণব কখন এসে দাঁড়িয়েছিল খেয়াল নেই। সুতপার পোড়া খুলিটা পড়ে গিয়েছিল জ্বলন্ত কাঠগুলোর নীচে।

'যে যায় সেই বাঁচে, মরে আমিও যদি এই রকম বাঁচতাম।' বেঁচে এই বিবর্ণ কর্মক্ষত জীবনকে দেখবার বিলাস আর নেই। প্রণব তুমি মরবে? মরবে তুমি প্রণব? বেঁচে কি লাভ? দুঃখের তোড়ে ও ভাসচ, ভাসো, সমুদ্রে চল, মর তুমি প্রণব।

'আত্মহত্যা! হ্যাঁ, আত্মহত্যাই একমাত্র পথ তোমার।'

'মৃত্যু! হ্যাঁ, মৃত্যুই একমাত্র পথ তোমার।'

'জীবন! না, জীবন আমি চাই না।'

'ভালবাসা! না, ভালবাসা আমি চাই না।'

'পৃথিবী! না, পৃথিবী আমি চাই না।'

হঠাৎ সমস্ত আকাশ গঙ্গা ঘাট মানুষ চিন্তা জন্ম মৃত্যু আশা প্রেম হিংসা শাস্তি মাথায় জট পাকিয়ে গেল; টাল খেতে লাগল চোখের সামনে।

কলেজে দেয়ালে টাঙানো মিশকালো বোর্ডটার মত মনে হ'ল এ পৃথিবীটাকে। তার ওপর কয়েকটা চকের সাদা সরু সরু কাঁপা কাঁপা দাগ। ছায়া-ছায়া চেতনায় মনে হ'ল, এ দাগগুলি পৃথিবীর ক্ষুধিত মানুষের হৃৎপিণ্ডের দাগ, ওদের বেঁচে থাকার স্বাক্ষর। 'আমার যে ক্লোরোফর্ম করা মরা ব্যাঙ।'

'মরে লাভ?' নিভন্ত পিদিমের শিখাটা বুকে জ্বলছে। 'প্রণব, তুমি বাঁচবে না?' 'প্রণব, আমরা আবার ঘর বাঁধব, ভয় কি? তুমি আছ, আমি আছি।' 'প্রণব, তোকে যে বাঁচতে হবে, বাবা।' 'প্রণব, তুমি ভুল না মৃত্যু থেকে জীবন অনেক বড়, এর জন্যে লড়াই চাই।' মৃত্যুর মুখোমুখি অনেকগুলি উজ্জ্বল মুখ নাচতে লাগল।

প্রণবের মন আরও বিক্ষিপ্ত হ'ল।

নেপথ্যে প্রশ্ন উঠল, 'তোমরা সব ক্ষিপ্ত জুয়াড়ী, তাই বাঁচতে চাও।'

প্রণব উত্তর দিল: 'পরোয়া করি না, আমি বাঁচব, বাঁচতে চাই।'

—তোমার চারদিকে ষোড়শী মূর্তিদের তুমি বুঝি ভাবছ জীবনের একমাত্র আশা?

—ভাবলে দোষ কি? তবু বলছি, না।

—তোমরা সব স্বর্গের শিকার, তা তুমি জান?

—জানি।

—তবুও, জেনেশুনে মৃত্যুকে সামনে রেখেও তুমি বাঁচতে চাও?

—হ্যাঁ, আমি বাঁচব, মৃত্যুকে দুমড়ে হাতের মুঠোয় আনতে চাই।

ভূমিকম্পের মত নড়ে উঠল প্রণব। না, না, মৃত্যু নয়, আমি বাঁচব, বাঁচব—অনু, বিনু, মা, পৃথিবী আমি বাঁচব। আস্ত একটা জীবন চাই, একটুও যার ভাঙা নয়।

প্রণব হাঁপাতে লাগল। গায়ে শির শির একটানা একটা অনুভূতি প্রণব নিজের শরীরে অনুভব করল।

চারটের ঘণ্টা বাজল দূরের হষ্টেলে। কয়েকটা কাক ডাকল। ভোর হাওয়ার আগে অন্ধকারটা যেন আরও ভারি হয়ে বাড়ীগুলোর ওপর ঝুলে পড়েছে।

—*—

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীকরুণাকুমার নন্দী

খাদ্য সঙ্কট ও সরকারী অব্যবস্থিতচিত্ততা

খাদ্যসঙ্কট যেমন একদিকে উত্তরোত্তর ভয়াবহ পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে, তেমনি অন্যদিকে এই সঙ্কট উত্তীর্ণ হবার পথে সরকারী চিন্তার দৈন্য ও ব্যবস্থাপনায় অব্যবস্থিতচিত্ততার পরিচয় দিনে দিনে অধিকতর প্রকট হয়ে উঠছে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এ বিষয়ে সরকারী নীতি ও প্রয়োগের ব্যবস্থা আজ পর্য্যন্ত কেবলই রদবদল হয়ে চলেছে।

আমরা পূর্ব্বেই এই প্রসঙ্গের একাধিকবার বিস্তৃত আলোচনা করেছি। বর্ত্তমান সঙ্কটের কারণ বিশ্লেষণ ক'রে দেখা গেছে যে, এই পরিস্থিতি যতটা মূল্যসঙ্কটজনিত ততটা বাস্তবপক্ষে চাহিদার অনুপাতে সরবরাহে ঘাটতিজনিত নয়। দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদনের যে সাংখ্যিক হিসাব সরকারী ঘোষণাসমূহ থেকে পাওয়া গেছে, সেটি যদি বাস্তব ও নির্ভরযোগ্য হয় তবে একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার করতে হবে যে, দেশের সমগ্র ভোগ্যচাহিদার (consumption demand) অনুপাতে উৎপাদনে বাস্তবপক্ষে কোন ঘাটতি নেই। বিশেষ পরিমাণ উদ্বৃত্তও অবশ্য নেই। সেই কারণেই দেশের সামগ্রিক মূল্যসঙ্কটের প্রকোপটি সমধিক পরিমাণে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য অবশ্যভোগ্য পণ্যাদির উপরে বর্ত্তিয়েছে। বর্ত্তমান পরিস্থিতির আকৃতি ও প্রকৃতি থেকে এই অনিবার্য্য সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে হয় যে, কোথাও কোনপ্রকারে উৎপাদিত খাদ্যশস্যের একটা বিশেষ অংশ দেশের মানুষের ভোগ থেকে সরিয়ে ফলে খাদ্যশস্যের সরবরাহে ঘাটতি সম্পাদন ক'রে মুনাফাবাজীর সুযোগ সৃষ্টি ক'রে নেওয়া হচ্ছে।

বস্তুতঃ দেশের শাসনসংস্থার বিশিষ্ট অধিকারীগণও এই অভিযোগ স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। প্রায় মাসাধিক কাল পূর্ব্বে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন একটি বিবৃতি প্রসঙ্গে স্বীকার করেন যে, তাঁর নিজের হিসাব মতন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে বর্ত্তমান বৎসরে অন্ততঃ বিশ লক্ষ টন চাউল ভোগ থেকে সরিয়ে লুকিয়ে ফেলা হয়েছে। কয়েক মাস পূর্ব্বে প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী একটি ঘোষণায় বলেন যে, খাদ্যশস্যের মজুতদারেরা যদি তাঁদের অন্যায় ভাবে লুকিয়ে রাখা মজুত একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাজারে ছাড়েন তবে তাঁদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হবে না এবং যে পুঁজির সাহায্যে তাঁরা এই মজুত করতে সমর্থ হয়েছেন, কি ক'রে সেই পুঁজি তাঁরা সংগ্রহ করেছেন সে সম্বন্ধেও কোন অনুসন্ধান করা হবে না। কিন্তু নির্দ্দিষ্টকালের মধ্যে যদি এই মজুত-করা খাদ্যশস্য বাজারে পৌঁছুতে সুরু না করে, তবে তাঁদের বিরুদ্ধে কঠিন শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। প্রধানমন্ত্রী-নির্দ্দিষ্ট কালটি বহুদিন গত হয়ে গেছে, কিন্তু এই মজুত শস্য বাজারে ছাড়বার লক্ষণ আজিও দেখা যায় নাই এবং এঁদের বিরুদ্ধে আজ পর্য্যন্ত কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থারও পরিচয় পাওয়া যায় নি। এই রকম নিরর্থক ও নিষ্ফল হুমকি প্রচার ক'রে প্রধানমন্ত্রী কেবল যে নিজেকে সমগ্র দেশের জনগণের নিকট হাস্যাস্পদ ক'রে তুলেছেন শুধু তাই নয়, তাঁর এবং তাঁর অধীনস্থ শাসনসংস্থার গভীর অক্ষমতা সম্বন্ধেও তাঁরা উত্তরোত্তর নিঃসন্দেহ হয়ে উঠছেন। সম্প্রতি এই সম্পর্কে যে নূতন অর্ডিন্যান্স বা জরুরী আইন বিধিবদ্ধ ও প্রয়োগ করবার আয়োজন করা হয়েছে তার দ্বারা মূল অবস্থার যে কোন বিশেষ তারতম্য ঘটবে এমন আশা করবার মতন কোন কারণ ঘটে নি। নূতন জরুরী আইনের বলে যে অতিরিক্ত ক্ষমতা এখন সরকারের হস্তগত হয়েছে, তার চেয়ে বেশী ও ব্যাপক ক্ষমতা সরকারের উপরে দেশরক্ষা আইনের (Defence of India Rules) বলে পূর্ব্ব থেকে ন্যস্ত করা ছিল। সমাজবিরোধী খাদ্যশস্যের মজুতদার ও মুনাফাবাজদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক প্রয়োগের কোনপ্রকার সদিচ্ছা যদি সরকারের থাকত তা হ'লে দেশরক্ষা আইনের প্রয়োগের

ারা সেটি সহজেই সিদ্ধ করা চলত। সেটি তাঁরা করেন াই। নূতন আইনে শাস্তির যে চরমতম ক্ষমতা গ্রহণ করা য়েছে সেটি হাস্যকর রকমের সামান্যমাত্র। সরকার এবং ংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে খুব ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে যে, এই নূতন আইনের বলে অভিযুক্ত ব্যক্তির সাজার বিরুদ্ধে কোন আপীলের ক্ষমতা থাকবে না। বস্তুতঃ দেশরক্ষা আইনের প্রয়োগের ফলে কারুর সাজা হ'লে তার বিরুদ্ধেও সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির আপীলের অধিকার নেই। তবু কেন যে এই প্রকারের একটি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর াজার ব্যবস্থা-সম্বলিত নূতন আইনের প্রয়োজন ছিল সেটি াধারণ লোকের বোধগম্য হয় না। এই ব্যবস্থা থেকে দেশের জনসাধারণের মনে এই সন্দেহ আরও দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়ে উঠছে যে তাঁদের প্রাণধারণের জন্য অবশ্যভোগ্য খাদ্যপণ্যাদি নিয়ে যাঁরা মজুতদারী ও মুনাফাবাজী অবাধে করে চলেছেন, তাঁরা সরকারী মহলের বিশেষ অনুগ্রহপুষ্ট ও আশ্রিতগোষ্ঠী। এঁদের অন্যায় ও সমাজবিরোধী কার্য্য-কলাপের বিরুদ্ধে সার্থক প্রয়োগের কোন সদিচ্ছা কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারগুলির কথনও ছিল না, এখনও নাই। ইহা হয়ত স্বাভাবিক, কেননা ইঁহাদেরই অর্থানুকূল্যে কংগ্রেস দল আজ পর্য্যন্ত পর পর তিনবার প্রবল সংখ্যাধিক্যে ক্ষমতার গদী অধিকার ক'রে থাকতে সমর্থ হয়েছেন। ভবিষ্যতে আবারও এই গদী অধিকার ক'রে থাকতে হ'লে এঁদেরই বদান্যতার উপরে নির্ভর করতে হবে। অতএব এঁদের মুনাফাবাজী, সে যতই না দেশের জনসাধারণের পক্ষে প্রাণঘাতী হউক না কেন, কঠিন হাতে বন্ধ করবার মতন সৎসাহস ও ক্ষমতা বর্ত্তমান কংগ্রেস-অধ্যুষিত সরকারের নাই। তবু দেশের লোককে এঁদের সদিচ্ছার একটা প্রমাণ দেওয়া প্রয়োজন, কেননা যাহারই অর্থানুকূল্যে হউক না কেন, নির্ব্বাচনবৈতরণী উত্তীর্ণ হইতে জনসাধারণের পৃষ্ঠ-পোষকতা একান্ত প্রয়োজন। তাই নূতন জরুরী আইন প্রবর্ত্তন ও প্রয়োগের আয়োজন করে এই সদিচ্ছার প্রমাণ দেওয়া হ'ল। জনসাধারণের মনে বর্ত্তমান খাদ্যসঙ্কটে এমন একটা ধারণা ক্রমেই অধিকতর বদ্ধমূল হয়ে উঠছে।

বস্তুতঃ বর্ত্তমান সঙ্কটে সরকারী চিন্তা বা ব্যবস্থাপনার আজ পর্য্যন্ত যে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে তাতে এমন একটা ধারণার যথেষ্ট কারণ আছে। সরকারী চিন্তাধারার যে প্রাথমিক প্রকাশ কয়েক মাস পূর্ব্বে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে দেখা গিয়েছিল, সেই সম্মেলনের প্রায় অব্যবহিত পর থেকেই তাতে রদবদলের ধারা সুরু হয়েছে এবং আজ পর্য্যন্ত এ সম্পর্কে কোন একটা স্থির সিদ্ধান্ত এবং সার্থক প্রয়োগের পরিচয় পাওয়া যায় নি। প্রাথমিক সিদ্ধান্তে ঘোষণা করা হয়—(১) দেশের খাদ্যশস্যের ব্যবসায়টিকে রাষ্ট্রায়ত্ত ক'রে নেওয়া হবে; (২) দেশের খাদ্যোৎপাদক আয়োজনগুলিকেও (অর্থাৎ চাউলের কল ইত্যাদিকে) রাষ্ট্রাধিকারে নিয়ে আসা হবে; এবং (৩) দেশের সকল শহর ও শিল্পাঞ্চলগুলিতে পূর্ণ র‍্যাশনিং অর্থাৎ সরকারী প্রয়োগে বণ্টন নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা হবে। এই সিদ্ধান্ত ঘোষিত হবার মাত্র কয়েকদিন পরেই কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি-মন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মণ্যম পূর্ব্ব সিদ্ধান্তের নীতিতে একটি মূল পরিবর্ত্তন ঘোষণা করেন। প্রথমতঃ, খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীকরণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, দেশের সমগ্র খাদ্যশস্যের ব্যবসায়টি রাষ্ট্রায়ত্ত ক'রে নেবার সঙ্গতি বর্ত্তমানে সরকারের নেই, অতএব এই ব্যবসায়টির একটা সামান্য অংশ মাত্র রাষ্ট্রাধিকারের অন্তর্ভুক্ত ক'রে নেওয়া হবে। এর দ্বারা এবং খাদ্যশস্যের মূল্যের নিম্নতম ও উচ্চতম হার নিয়ন্ত্রণ করে এই ক্ষেত্রে দেশের সমগ্র ব্যবসায়ের উপর যে প্রভাব সৃষ্টি করা সম্ভব হবে, তার ফলে খাদ্যশস্যের খোলা বাজারে মূল্যমান একটা নির্দ্দিষ্ট পরিধির মধ্যে সীমিত ক'রে রাখা সম্ভব হবে বলে তিনি মনে করেন। দ্বিতীয়তঃ, খাদ্যোৎ-পাদক শিল্পগুলির রাষ্ট্রীকরণ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, বর্ত্তমানে চালু পুরাতন মিলগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত ক'রে নিয়ে খুব সুবিধা হবে না, রাষ্ট্রাধিকারে আধুনিক ধরনের কতকগুলি বৃহৎ মিল প্রতিষ্ঠা করবার আয়োজন করা হবে এবং বর্ত্তমানে চালু মিলগুলি যথাপূর্ব্বং ব্যক্তিগত অধিকারেই চালু থাকবে। শহর ও শিল্পাঞ্চলগুলিতে পূর্ণ র‍্যাশনিং প্রবর্ত্তন করবার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধেও বলা হয় যে, এই প্রয়োগ রাজ্য সরকারগুলির অভিমত-সাপেক্ষ।

বস্তুতঃ খাদ্যশস্য ব্যবসায়ের রাষ্ট্রীকরণ এবং র‍্যাশনিং প্রবর্ত্তন সম্পর্কে বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে বিরোধ ও মতভেদের লক্ষণ ইতিমধ্যে খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মোটামুটি প্রচারে অন্যরকম বলা সত্ত্বেও বাস্তবপক্ষে দেশের খাদ্যনীতির একটা জাতীয় (national) স্বরূপ এখনও স্পষ্ট হ'চ্ছে

ওঠে নি। উদ্‌বৃত্ত-উৎপাদক রাজ্যগুলি নিজেদের স্বয়ংসম্পূর্ণ এলাকা ব'লে মনে করেন এবং দেশের সমগ্র খাদ্যসঙ্কট সম্পর্কে তাঁদের কোন গভীর দায়িত্ব আছে এমন কোন স্বীকৃতির আভাস তাঁদের কথাবার্ত্তা বা কার্য্যকলাপে দেখা যায় না। ঘাটতি-উৎপাদক রাজ্যগুলি স্বভাবতঃই এই সম্পর্কে একটা একক (integrated) জাতীয় নীতির (national policy) প্রয়োজন গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা খানিকটা ঔদাস্যসূচক বলে মনে হয়। সম্প্রতি গুণ্টুরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনেও এত বড় একটা জাতীয় সঙ্কটে কোন একটা স্পষ্ট সামগ্রিক নীতির বিকাশের পরিচয় পাওয়া যায় নি; বিষয়টি একপ্রকার আগামী মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনের বিচারের উপরে ছেড়ে দিয়ে রাখা হয়েছিল। ইতিমধ্যে ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদে এই সম্পর্কে বিভিন্ন রাজ্যগুলির চিন্তাধারার একটা স্পষ্ট প্রকাশ পাওয়া যায়ঃ

কেরলের গবর্ণর ও বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তা শ্রী ভি, ভি, গিরি বলেন যে, বর্ত্তমান মূল্যসঙ্কটের জন্য কোন একটা একক কারণ দায়ী নয়; উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রয়োগের ফলে একটা সামান্য পরিমাণ মূল্যবৃদ্ধি অনিবার্য্য ছিল এবং পরিকল্পনার রূপায়ণেই তার আয়োজন বিধিবদ্ধ ছিল। এ ছাড়া উন্নয়নের ফলে যে অতিরিক্ত ক্রয়ক্ষমতা সাধারণের আয়ত্তাধীন হয়েছে তার ফলে ভোগবিধির অনেকটা পরিবর্ত্তন ঘটেছে; পূর্ব্বে যাঁরা মোটা (coarse) খাদ্যশস্যের উপরে নির্ভরশীল ছিলেন তাঁরা এখন চাউল এবং গম জাতীয় মিহি শস্যের ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন; এর ফলে এই সকল শস্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু উৎপাদন বাড়ে নাই। এর উপরে লোকসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির কারণে চাহিদা ও সরবরাহের অন্তর্বর্ত্তী ফাঁকটি আরও বেড়েছে। কিন্তু বর্ত্তমান গভীর মূল্যসঙ্কটের পেছনে যে ব্যবসায়ীগোষ্ঠীর অসহযোগিতাও ক্রিয়া করছে এ কথাও অস্বীকার করা চলে না। খাদ্যশস্যের বাজার সরবরাহের বর্ত্তমান বৎসরের স্বল্পতা যে কেবলমাত্র উৎপাদকের সরবরাহে ঔদাসীন্যের জন্য ঘটছে এ কথাও সম্পূর্ণ সত্য নয়। ক্ষেত্রেও অন্তর্বর্ত্তী ব্যবসায়ীগোষ্ঠীর ভূমিকা প্রবল; ৈলের ব্যাপারে মিল মালিক ও পাইকাররা এটি ঘটাচ্ছেন। ান অর্ডিন্যান্সের বলে এদের দমান সহজ হবে ব'লে । মনে করেন, এদের সমাজবিরোধী কার্য্যকলাপ দৃঢ়তার সঙ্গে দমন করতেই হবে। প্রতিবেশী রাজ্যগুলির আঞ্চলিক জোট তিনি সমর্থন করেন, কিন্তু খাদ্যসমস্যা সমগ্র জাতির সমস্যা এবং এর সমাধান সামগ্রিকভাবে জাতীয়ভাবে (national) করতে হবে। কেরলের মতন ঘাটতি রাজ্যে আঞ্চলিকভাবে এর সমাধান সম্ভব নয়; একমাত্র কেন্দ্রীয় প্রচেষ্টায় এবং জাতীয় সংহতির দ্বারাই এর সমাধান সম্ভব। আন্তঃরাজ্য খাদ্যশস্যের ব্যবসায় সম্পূর্ণভাবে সরকারী অধিকারে চালনা করা একান্ত প্রয়োজন; তবে সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত মালিকানার প্রয়োগও আন্তঃরাজ্য ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে চালু থাকতে পারে। মূল্যনিয়ন্ত্রণ ও সরকারী খরিদ-ব্যবস্থার (procurement) দ্বারা অতিরিক্ত মুনাফাবাজী বন্ধ করা সম্ভব। যদি ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীগোষ্ঠী সমাজ-বিরোধী ক্রিয়া বন্ধ না করেন তা হ'লে সরকার তাঁদের ব্যবসায় রাষ্ট্রায়ত্ত ক'রে নিতে পারেন। সকল শহরাঞ্চলে, তিনি বলেন, সরকারী বণ্টনব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা একান্ত প্রয়োজন। এটা কেবলমাত্র উদ্‌বৃত্ত রাজ্যগুলি যদি নিয়ন্ত্রণের দ্বারা ভোগসঙ্কোচ করতে রাজী হন তবেই সম্ভব, কেননা এই ব্যবস্থার উপরেই ঘাটতি রাজ্যগুলিতে সরবরাহ চালু রাখা নির্ভর করবে। সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার ফলে খাদ্যশস্য ব্যবসায়ের রাষ্ট্রীকরণের প্রয়োজন গভীরভাবে অনুভূত হয়েছে; স্বাভাবিক চাহিদা ও সরবরাহের (demand and supply) উপরে এই বিষয়টি ফেলে রাখা যায় না। ব্যবসায়ী-গোষ্ঠীর গত কয়েক বৎসরের ভূমিকা এই বিচারটিকে আরও দৃঢ়মূল ক'রে তুলেছে।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেনও বলেন, বর্ত্তমান বৎসরের অতিরিক্ত খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ একটি নহে মোটামুটি উৎপাদনে ঘাটতি, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, উৎপাদকের মজুত করবার ক্ষমতা বৃদ্ধি, সাধারণ মূল্যবৃদ্ধি (inflation) এবং জনসংখ্যার একটি বিশিষ্ট অংশের ভোগবৃদ্ধি, এ সকলই যৌথভাবে এতে ক্রিয়া করছে। সরবরাহের স্বল্পতা কোথাও মাল মজুত হয়ে থাকছে এই কথাটারই সূচনা করে। আসলে বৃহৎ উৎপাদকগোষ্ঠী ও পাইকাররাই এর জন্য দায়ী। বর্ত্তমান অর্ডিন্যান্সের বলে এদের দমন করা সহজ হবে। আঞ্চলিক নিয়ন্ত্রণ বর্ত্তমান সঙ্কটে অবশ্যই খানিকটা ক্রিয়া করছে; কিন্তু বিভিন্ন এলাকার লোকেদের খাদ্যের চাহিদার বিভিন্নতার কারণে আঞ্চলিক বাধা এখনই তুলে দেওয়া ঠিক হবে না।

ৃত্ত এলাকা থেকে ঘাটতি এলাকায় খাদ্যের চলাচল এবং মদানী খাদ্যের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বে য়া উচিত। বড় বড় শহরগুলিতে এখনই পূর্ণ বণ্টন ন্ত্রণ প্রবর্ত্তিত হওয়া প্রয়োজন এবং ক্রমে সকল শহরাঞ্চল-লিতেই এই নিয়ন্ত্রণ প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন। এখনই দ্য ব্যবসায়ের আংশিক রাষ্ট্রীকরণ হওয়া দরকার এবং এর া খোলা বাজারের উপরে মূল্যস্থিতি প্রভাবিত হবে।

আর একটি ঘাটতি রাজ্য, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণবল্লভ হায় বলেন যে তাঁর মতে বর্ত্তমান মূল্যবৃদ্ধির প্রধান কারণ য়নের লগ্নীর অনুপাতে আশানুরূপ উৎপাদন বৃদ্ধি না য়া। প্রথম পরিকল্পনাকাল থেকেই এই ব্যাপারটি ঘটে ছে। প্রথম তিনটি পরিকল্পনাকালে মোটামুটি পঁচিশ জার কোটি টাকা লগ্নী হয়েছে। একথা সত্য যে এর টা অংশ বৃহৎ উৎপাদক শিল্পসমূহে লগ্নী করা হয়েছে ং এর ফল পেতে খানিকটা দেরী হওয়া অনিবার্য্য। তবুও র পরিমাণ অনুযায়ী উৎপাদন যদি সাধারণতঃ আশানুরূপ বে বৃদ্ধি পেত তা হ'লে বর্ত্তমান সঙ্কটজনক মূল্য-স্থিতির উদ্ভব ঘটত না। আগামী চতুর্থ পরিকল্পনাকালে ... কোটি টাকা লগ্নীর আয়োজন করা হচ্ছে, কিন্তু লগ্নীর অনুপাতে যদি উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা না করা হয় মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা কোনমতেই সম্ভব হবে না। অন্ততঃ এলাকাগুলিতে অবিলম্বে র‍্যাশনিং প্রবর্ত্তিত হওয়া য়োজন, খাদ্যের অভাবে শিল্পোৎপাদন যাতে কোনক্রমেই ত না হয় তার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। উদ্বৃত্ত ঘাটতি উভয় এলাকায়ই ভোগনিয়ন্ত্রণ একান্ত প্রয়োজন। ত একটি পূর্ণ সমষ্টি, উদ্বৃত্ত এলাকা থেকে ঘাটতি কায় খাদ্য সরবরাহ জাতীয় (national) নীতির একটি প্রয়োজনীয় উপকরণ। এঁর মতে খাদ্যব্যবসায়ের রাষ্ট্রীকরণ হওয়া প্রয়োজন; এর ফলে অবশ্যই দেশের সাধারণের খাদ্যের প্রয়োজন মেটাবার গুরুদায়িত্ব কারের উপর বর্ত্তাবে। এখনই শহর ও শিল্পাঞ্চলগুলির বাসীদের খাদ্যের প্রয়োজন মেটাবার দায়িত্ব সরকারকে ণ করতে হবে। এই সম্পর্কে বর্ত্তমান সরকারী আয়োজন ল এবং অসম্পূর্ণ; এই ক্ষেত্রে অচিরে নূতন শক্তি সঞ্চার তেই হবে।

উত্তর প্রদেশের শ্রীমতী সুচেতা কৃপালানী মনে করেন একটি সর্ব্বভারতীয় জাতীয় খাদ্যনীতির রচনা একান্ত প্রয়োজন। এই নীতির রূপায়ণ কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব কিন্তু এতে রাজ্য সরকারগুলির সহযোগ একান্ত প্রয়োজন। আন্তঃরাজ্য সরবরাহের ব্যবস্থা এইভাবেই হওয়া দরকার। খাদ্যে ঘাটতির অবস্থায় র‍্যাশনিংই একমাত্র উপায় কিন্তু এর জন্য চাই উপযুক্ত পরিমাণ মজুত। অন্যথায় কেরালায় সম্প্রতি যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল অনুরূপ অবস্থা ঘটতে বাধ্য। রাষ্ট্রায়ত্ত খাদ্যব্যবসায় খোলা বাজারের মূল্যমানের উপরে প্রভাব বিস্তার করবে কিন্তু এর জন্য চাই সরকারী অধিকারে প্রচুর মজুত, যার থেকে সাময়িকভাবে সরকারী মজুত থেকে খোলা বাজারে প্রচুর সরবরাহের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়।

মহারাষ্ট্র রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ভি, পি, নায়ক বলেন মহারাষ্ট্রে চিরকালই খাদ্যশস্যে ঘাটতি ছিল। খাদ্যশস্যের বদলে অর্থকরী উৎপাদনে চাষীর অধিকতর নজর, বোম্বাই বন্দরে খাদ্যশস্য আমদানীকারক জাহাজ খালাসে বিলম্ব, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ইত্যাদি উদ্বৃত্ত রাজ্যগুলি থেকে খাদ্য-শস্য আমদানীতে বাধা, ইত্যাদি কারণে এই ঘাটতি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। বাজার সরবরাহের মন্দগতি ও পরিমাণের স্বল্পতা মজুতদারীর কারণে ঘটছে বলে তিনি মনে করেন না। ছোট চাষীর পক্ষে মাল মজুত ক'রে রাখা অসম্ভব; কিছু সংখ্যক জোতদারেরা নিজেদের একক সঙ্গতির বলে বা ব্যবসায়ীদের সহযোগিতায় এটি করতে পারেন—তবে কোন কোন পাইকার এ কাজ করছেন না বলা চলে না। খাদ্যে একটি সর্ব্বভারতীয় জাতীয় নীতি অনুসৃত হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন এবং উদ্বৃত্ত এলাকা থেকে ঘাটতি এলাকায় খাদ্য চলাচলের বর্ত্তমান আঞ্চলিক বাধা অপসারিত হওয়া প্রয়োজন। সরকারী নিয়ন্ত্রণে এবং অধিকারে আন্তঃরাজ্য খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। সরকারী নিয়ন্ত্রণে র‍্যাশনিং প্রবর্ত্তিত হ'লে সুবিধা হয়, তবে এর সাফল্য সরকারী মজুতের পরিমাণের উপরে নির্ভর করবে। মহারাষ্ট্রের মতন ঘাটতি এলাকায় র‍্যাশনিং কেবলমাত্র শহরাঞ্চলে সীমিত ক'রে রাখা সম্ভব নয়। এ বিষয়ে সর্ব্বস্তরে ভোগনিয়ন্ত্রণ একান্ত প্রয়োজন। খাদ্যব্যবসায়ের রাষ্ট্রীকরণ সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতেই মাত্র সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করা যেতে পারে। কিন্তু আভ্যন্তরীণ সরবরাহের ভিত্তিতে রাষ্ট্রায়ত্ত খাদ্যব্যবসায় সঙ্কট মোচনে সমর্থ হ'তে পারে না; একদিকে যেমন

উৎপাদন বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন, অন্যদিকে তেমনি অন্ততঃ কয়েক বৎসর ধরে আমদানী শস্যের উপরেও নির্ভর করতেই হবে।

উদ্‌বৃত্ত রাজ্যগুলির মধ্যে মহীশূরের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা বর্ত্তমান খাদ্যসঙ্কটকে বেশীর ভাগই শঙ্কা-জনিত, যতটা না ঘাটতির জন্য নয় ব'লে উল্লেখ করেন। এর খানিকটা অন্ততঃ দেশের লোকের খাদ্যব্যবহারের ধারার পরিবর্ত্তন থেকে উদ্ভূত। তা ছাড়া খাদ্যশস্যের বদলে অধিক মুনাফাপ্রসবী অন্যান্য পণ্যের চাষে চাষীর স্বাভাবিক টান খাদ্য উৎপাদনে উন্নতি ব্যাহত করছে। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে কতকগুলি সমাজবিরোধী ব্যক্তি অত্যধিক মুনাফার লোভে মূল্যবৃদ্ধি ঘটাচ্ছেন। এঁদের কঠিন হাতে দমন করা প্রয়োজন। নূতন অর্ডিন্যান্সের বলে সেটা করা সম্ভব হবে কি না, তার বিচার সময়সাপেক্ষ। খাদ্যনীতি অবশ্যই সর্ব্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে রচিত হওয়া দরকার, তবে বর্ত্তমানের আঞ্চলিক বাধাগুলি সম্পূর্ণ অপসারিত ক'রে দেওয়া ঠিক হবে না। প্রতিটি রাজ্য নিজ নিজ প্রয়োজন সম্বন্ধে স্বভাবতঃই বেশী ওয়াকিবহাল; ঘাটতি হ'লে উদ্‌বৃত্ত এলাকা থেকে বা তাতে না কুলাইলে কেন্দ্রীয় সরকার মারফৎ বিদেশ থেকে আমদানী করতে পারবেন; উদ্‌বৃত্ত থাকলে নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত শস্য ঘাটতি এলাকায় চালান দিতে পারবেন—এটি সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে নিয়মিত হওয়া দরকার। এই চলাচল সরকারী খাতে এবং কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে চালান দরকার। রাষ্ট্রায়ত্ত খাদ্যব্যবসায় আংশিকভাবে প্রবর্ত্তন করা চলতে পারে, সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীকরণ এবং বণ্টন নিয়ন্ত্রণ এখন অসম্ভব। ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীর ভূমিকা একেবারেই বন্ধ ক'রে দেওয়া সমীচীন হবে না। সমবায়ের ভিত্তিতে এ কাজ সুষ্ঠুভাবে হ'তে পারে।

অন্ধ্ররাজ্যের শ্রীব্রহ্মানন্দ রেড্ডী বলেন যে, চাহিদার তুলনায় চাউলের উৎপাদন একই পরিমাণের কিংবা কিঞ্চিৎ কম হওয়ায় ফলে সামান্য পরিমাণ মালও যদি কোথাও আটকে যায় তাতে একটা গোলযোগের সৃষ্টি হয়। সরকারী ব্যবস্থাপনায় সকল উদ্‌বৃত্ত চাউল মজুত করবার ব্যবস্থা ক'রে ঘাটতি এলাকায় সরবরাহ করতে পারলে তবে অবস্থায় উন্নতি হ'তে পারে। তা ছাড়া জনসাধারণের মনে খাদ্য-সঙ্কট সম্পর্কীয় শঙ্কাজনক আলোচনা সংবাদপত্রে, সরকারী মুখপাত্ররা এবং বিরোধী রাজনৈতিক দল করে চলেছেন এবং সমস্ত দেশে একটা ভীতির আবহাওয়া সৃষ্টি ক'রে বর্ত্তমান সঙ্কটটিকে আরও ঘোরাল করে তুলেছে। নূতন অর্ডিন্যান্সের বলে মানুষের খাদ্য নিয়ে যাঁরা মুনাফাবাজী করে থাকেন তাঁদের সাজার ব্যবস্থা সহজ হবে, তবে কেহ যদি মনে করেন এর ফলে ব্যবসায়ীদের মনে ভীতিসঞ্চার করবে তবে সেটা ভুল। সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে অবশ্যই খাদ্যনীতির রচনা করতে হবে, তবে বর্ত্তমানে প্রত্যেক রাজ্য সরকারকে এক-একটি সম্পূর্ণ অঞ্চল হিসাবে খরিদনীতি (procurement policy) সম্বন্ধে স্বাধীনতা দিতে হবে। সরকারী অধিকারে বণ্টন নিয়ন্ত্রণ নীতি হিসাবে মন্দ নয়, কিন্তু এটি করতে হ'লে সামগ্রিকভাবে সারা দেশের উপরে এর প্রয়োগ করতে হবে। বর্ত্তমানে সরকারের এতটা সঙ্গতি আছে কি? রাষ্ট্রায়ত্ত খাদ্যব্যবসায় ও নীতির দিক্‌ থেকে সুন্দর শোনায়, কিন্তু বর্ত্তমানে এটি করবার সঙ্গতি দেশের শাসনসংস্থার আছে কি না সন্দেহ। ব্যাপারটি সাবধানতার সঙ্গে বিচার করা প্রয়োজন।

ওড়িষ্যার খাদ্যমন্ত্রী শ্রীনীলমনি রাউতরায় বর্ত্তমান মূল্য-বৃদ্ধির একমাত্র কারণ খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে অসাফল্য বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ওড়িষ্যার ব্যবসায়ীরা পশ্চিমবঙ্গে চাউল রপ্তানী করতে খুব উদ্‌গ্রীব নন, কেননা পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে দর ধার্য্য করেছেন সেটা স্থানীয় খোলা বাজারেরই সমান। এই কারণে পশ্চিমবঙ্গে চাউল সরবরাহে আগ্রহের অভাব দেখা যায়, এ রাজ্যে নূতন অর্ডিন্যান্স প্রয়োগ করবার কোন কারণ ঘটে নাই। আঞ্চলিক বাধা অপসারণ করে সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে খাদ্যশস্য চলাচলের ব্যবস্থা করা উচিত এবং সুপরিকল্পিত সরকারী ব্যবস্থাপনায় আন্তঃরাজ্য এবং বিদেশ থেকে আমদানী খাদ্যশস্যের চলাচল নিয়ন্ত্রিত হওয়া দরকার। বৃহৎ শহরগুলিতে র‍্যাশনিং প্রবর্ত্তন করা চলতে পারে। উদ্‌বৃত্ত এবং ঘাটতি সকল এলাকায়ই খাদ্যের ভোগনিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে খাদ্য ব্যবসায়ের রাষ্ট্রীকরণ আংশিকভাবে প্রয়োজন, কিন্তু এই ব্যবসায়ে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীর ভূমিকা রক্ষা করা প্রয়োজন।

আসামের অর্থমন্ত্রী শ্রীফকরুদ্দীন আলী আহমেদ বলেন, খাদ্যসঙ্কটের জন্য প্রধানতঃ বণ্টন ব্যবস্থার অব্যবস্থা

...ী। কোথাও কেহ খাদ্যশস্যের চলাচলে ব্যাঘাত ঘটিয়ে ...বরাহে ঘাটতি সৃষ্টি করছেন। আসামেও উদ্বৃত্ত উৎপাদন ...য়া সত্ত্বেও এটি ঘটেছে। মিলমালিক ও বড় জোতদারেরা ...লে এটি ঘটাচ্ছেন। নূতন অর্ডিন্যান্সের বলে তাঁদের ...মন করা সম্ভব হবে। খাদ্যনীতি অবশ্যই জাতীয় ভিত্তিতে ...চিত হওয়া প্রয়োজন এবং ইহার পথে সকল আঞ্চলিক বাধা ...র হওয়া দরকার। আন্তঃরাজ্য খাদ্যব্যবসায় বৃহৎ পাইকারী ...মবায় সংস্থার মারফৎ চলা উচিৎ, বর্ত্তমানে সেটি সম্ভব ...না হ'লে সরাসরি রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে এর ব্যবস্থা হওয়া দরকার। কলিকাতার মতন কতকগুলি অতিবৃহৎ শহরাঞ্চলে র‍্যাশনিং অনিবার্য্য হ'লেও সাধারণতঃ, বিশেষ ক'রে আসামের কোন শহরে র‍্যাশনিংয়ের প্রয়োজন আছে ব'লে তিনি মনে করেন না। উদ্বৃত্ত ও ঘাট্‌তি উভয় এলাকাতেই খাদ্যে সমপরিমাণ ভোগনিয়ন্ত্রণ সম্ভব নহে; তা হ'লে অন্যান্য শিল্পজাত ভোগ্যেরও অনুরূপ সমপরিমাণ ভোগের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রায়ত্ত খাদ্যব্যবসায়ের অধিকারে প্রচুর মাল মজুত হ'লেই তবে খোলা বাজারের মূল্যমানে প্রভাব বর্ত্তাতে পারে।

উপরোক্ত বিবৃতিগুলির সংক্ষিপ্তসার থেকে দেখা যাবে যে, প্রায় সকল রাজ্যের শাসনকর্ত্তারাই স্বীকার করছেন যে, বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ভেদ্য (vulnerable) শহরাঞ্চলগুলিতে র‍্যাশনিং প্রবর্ত্তন করাই একমাত্র উপায়, কিন্তু যথেষ্ট মজুত ব্যতীত এর ফলাফল যে কেরলের মতনই বিষময় হয়ে উঠতে পারে সে আশঙ্কা করেন। কিন্তু এই মজুত রাজ্যের খরিদনীতির (procurement) সফল প্রয়োগের উপরে নির্ভর করে। এই প্রয়োগ প্রধানতঃ রাজ্য সরকারেরই উপর নির্ভর করে কিন্তু তার সফল প্রবর্ত্তনের দায়িত্ব এঁরা বহন করতে সাহস পাচ্ছেন না। বিহারের শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সহায় স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, এই দায়িত্ব গ্রহণ এবং বহন করবার সফল প্রয়োগের সঙ্গতি বর্ত্তমানে সরকারের আয়ত্তাতীত। আসামের শ্রী আলী আহমদ হয়ত এই কারণেই আসামে ভেদ্য শহরাঞ্চলেও র‍্যাশনিং প্রবর্ত্তন করবার প্রয়োজনীয়তা ...রাসরি অস্বীকার করেন। খাদ্যশস্যের ব্যবসায়টিকে ...াষ্ট্রায়ত্ত করবার প্রস্তাব সম্পর্কেও অনুরূপ দ্বিধা ও দায়িত্ব ...এড়াবার প্রচেষ্টার স্পষ্ট লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তা ছাড়া রাজ্য ...রকারগুলির নেতৃবর্গের বিবৃতির মধ্যে একটা কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সেটা এই যে, বর্ত্তমান খাদ্য পরিস্থিতির মূল কারণ সম্বন্ধে হয় তাঁরা সচেতন নন কিংবা ইচ্ছা করেই ইহার সঠিক বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হ'তে তাঁরা রাজী নন। যেমন রোগ নির্ণয় না হ'লে সার্থক চিকিৎসার প্রয়োগ সম্ভব নয়, তেমনি বর্ত্তমান সঙ্কটের সঠিক কারণ নির্ণিত না হ'লে সমস্যার সমাধানও সম্ভব নয়।

পূর্ব্বের আলোচনাগুলিতে আমরা দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, দেশে উৎপন্ন মোটা ও মিহি খাদ্যশস্যের উৎপাদনের মোট পরিমাণ আমাদের বর্ত্তমানের ভোগচাহিদার প্রায় সমপরিমাণ। উদ্বৃত্ত বিশেষ না হ'লেও তেমন একটা ঘাট্‌তি নেই। অবশ্য সম্প্রতি দেশের লোকের খাদ্য ব্যবহারে যে পরিবর্ত্তন ঘটতে সুরু করেছে তাতে মিহি খাদ্যশস্যের চাহিদা অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু গত কয়েক বৎসর ধরে বিদেশ থেকে মোটামুটি বার্ষিক প্রায় ৪০ লক্ষ টন গম ও আরও প্রায় ৪ লক্ষ টন পরিমাণ যে চাউল আমদানী হয়েছে তার ফলে বেশ একটা আরামপ্রদ উদ্বৃত্ত সরবরাহের অবস্থা থাকা উচিত ছিল। কিন্তু ১৯৬১-৬২ সন পর্য্যন্ত খাদ্য-সরবরাহে তেমন একটা গোলযোগ সৃষ্টি হয় নাই এবং মূল্যমানও মোটামুটি স্থির ছিল। এ বিষয়ে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৬০-৬১ এবং ১৯৬১-৬২ সন উভয় বৎসরেই খাদ্য উৎপাদনে কোন উন্নতি সাধিত হয় নাই। ১৯৬২-৬৩ সনে উৎপাদন বেশ খানিকটা বৃদ্ধি পায় কিন্তু ১৯৬২ সনের ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাস থেকেই দ্রুত খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। স্মরণ থাকা প্রয়োজন যে ১৯৬২ সনের অক্টোবর মাসে ভারতের উপর চীনা হামলা সুরু হয় এবং প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে যে অতিরিক্ত অর্থবরাদ্দের জন্য নভেম্বর মাসে তদানীন্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পার্লামেন্টের অনুমতি প্রার্থনা করেন তখন আমরা বলেছিলাম যে, সরাসরি ট্যাক্স ধার্য্য করে যদি এই অতিরিক্ত অর্থ টেনে নেবার ব্যবস্থা করা না হয়, তবে ভোগ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা কোনমতেই সম্ভব হবে না। আমাদের উপদেশে অবশ্য অর্থমন্ত্রী কর্ণপাত করেন নাই এবং অচিরেই খাদ্যমূল্যে আমাদের শঙ্কাজনক ভবিষ্যদ্‌বাণীর প্রতিফলন দেখা যেতে সুরু হয়ে যায়। ১৯৬৩-৬৪ এবং বর্ত্তমান বৎসরেও উৎপাদন আশাতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু মূল্যবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত ভাবেই চলে আসছে। স্বাভাবিক কারণেই মূল্যবৃদ্ধির চাপ

খাদ্যশস্যে, অন্যান্য খাদ্যপণ্যে এবং সাধারণতঃ সকল অবশ্য-ভোগ্য পণ্যের উপরে অত্যধিক বেশী পরিমাণে বর্ত্তাইয়াছে। সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত এখন আর এই ধারাটিকে নিয়ন্ত্রিত করবার কোন উপায় নেই।

কিন্তু সার্থকভাবে র‍্যাশনিং প্রবর্ত্তিত করতে হ'লে দেশের সমগ্র খাদ্যব্যবসায়ের সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীকরণ ব্যতীত অন্য কোন উপায় নেই। এই মূল ও বাস্তব সত্যটি সরকার হৃদয়ঙ্গম করতে পারছেন না কিংবা তাঁহাদের আশ্রিত বুনিয়াদী স্বার্থের উপর (vested interests) এই প্রয়োগের অনিবার্য্য অপঘাতের আশঙ্কায় এই দায়িত্বটিকে ইচ্ছা করেই এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করছেন। একথা স্পষ্ট করে উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজন যে, একমাত্র প্রাথমিক খাদ্য-উৎপাদক (Primary producers) ব্যতীত আর কাহাকেও বাদ দিয়া সার্থকভাবে র‍্যাশনিং প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। ভেদ্য শহরাঞ্চলগুলিকে র‍্যাশনিংয়ের আওতায় নিয়ে এলে অচিরেই সংশ্লিষ্ট শহরতলীগুলিও ভেদ্য হয়ে পড়বে এবং ক্রমে বিস্তৃততর এলাকাগুলিতেও এর প্রভাব বিস্তৃত হয়ে পড়বে। অতএব সার্থক র‍্যাশনিং প্রবর্ত্তনের একমাত্র উপায় সমগ্র দেশটিকে একযোগে এই ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত করা।

গত দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের সময় সমগ্র ইংলণ্ডে এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়েছিল। এবং সামগ্রিক র‍্যাশনিং প্রবর্ত্তন করতে হ'লে দেশে উৎপাদিত এবং বিদেশ থেকে আমদানী করা সকল খাদ্যশস্য সামগ্রিকভাবে সরকারী অধিকারের অধীন ক'রে নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। সেটি করতে হ'লে সমগ্র দেশের খাদ্যব্যবস্থাপনার নীতি ও প্রয়োগের কেন্দ্রীকরণ একান্ত প্রয়োজন। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় রাজ্য ও লোক সভার আলোচনায় এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের ঔদাসীন্য ও দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেই দিনই সন্ধ্যাকালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনের সিদ্ধান্তের যে সংবাদ এ পর্য্যন্ত প্রকাশ পেয়েছে, তাতেও একটা বলিষ্ঠ মূলনীতির আভাস পাওয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ বর্ত্তমান শাসনসংস্থার সঙ্গতি এই গুরু ও বিরাট্ দায়িত্ব গ্রহণে অক্ষম বলেই এই প্রকার অসার্থক ব্যবস্থাপনার বেশী কিছুর প্রয়াস করতে এঁরা সাহস পাচ্ছেন না। কিন্তু এভাবে যে সঙ্কট-মোচনের কোন আশা নাই সেটা খুবই স্পষ্ট। আগামী ফসলের দিকে তাকিয়ে এঁরা হয়ত আশা ক'রে আছেন যে, তখন এক রকম যা হোক ক'রে সঙ্কট উত্তীর্ণ হওয়া যাবে। তা যদি সম্ভব হ'ত তবে গত দুই বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের হ'ত।

কারলার চৈত্যগুহা ও ফ্রেস্কো চিত্র

শ্রীসুমিত সান্ন্যাল

"A major archeological discovery has been accidentally made at the ancient Karla Buddhist caves, where some paintings of unknown origin have come to light."

[Indian Express 24. 2. 63]

তাই আবার এলাম কারলা কেভ দেখতে। এর পূর্ব্বে '৬২ সালের সেপ্টেম্বরে এসেছিলাম। তখনও বর্ষা-শেষ হয় নি। পথ-ঘাট ভাল ছিল না। তাই খুব একটা লোকের ভিড়ও দেখি নি। তারপরে আবার ডিসেম্বরে এসেছিলাম। শীতের বেলা। রৌদ্রে আমেজ মাখানো। তাই দর্শকের সেদিন অভাব ছিল না। নারী-শিশু-যুবার কাকলিতে পরিপূর্ণ ছিল।

আবার এলাম। মার্চ্চের প্রারম্ভে। এ যেন শীতের শেষের তুষার-গলানো উত্তাপ। তবুও বহু দর্শকের আবির্ভাব। আমারই মত বোধ হয় ঐ খবরের আকর্ষণে এসে হাজির হয়েছেন, কারলার ফ্রেস্কো দেখবেন।

পুণা থেকে ৩৬ মাইল, আর বোম্বে থেকে ৭৯ মাইল দূরে। ঠিক এমনি জায়গা থেকে আরও দু' মাইল উত্তরে কারলা কেভ অবস্থিত।

বোম্বে-পুণা রোড থেকে বেরিয়ে গেছে সুন্দর পিচ-ঢালা পথ। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে এসে শেষ হয়েছে সে পথ। তাই গাড়ি আপনাকে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে এনেই নামিয়ে দেবে।

নিকটস্থ রেলওয়ে ষ্টেশন—"মালভালী"। লোক্যাল গাড়িই থামে কেবল। এখানে নামলে প্রায় তিন মাইল পথ আপনাকে হেঁটে যেতে হবে। কারণ ষ্টেশনে কোন গাড়ি পাওয়া যায় না সাধারণতঃ। তবে গরুর গাড়ি চড়তে যদি অসুবিধা না থাকে তবে শীতকালের মরশুমে তা পাওয়া যায়।

পাহাড়ের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে তাকালে মনে হবে, ওঃ বাবা! কত উঁচু পাহাড়। কেমন ক'রে উঠব? ভয় নেই। মাত্র পাঁচ শ' ফুট উঁচু। দেখতে দেখতেই চড়ে যাবেন। দ্বারের কাছেই বাস করেন সরকারী স্থাপত্য বিভাগের কর্ম্মচারী। তিনি

কারলা গুহা মন্দিরের একটি মিথুন মূর্ত্তি

জন-প্রতি ২০ নঃ পঃ দর্শনী গ্রহণ করে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেবেন।

'কেভ' কথার অর্থ পাহাড়ের মধ্যে গুহা বা গুম্ফা। আর সে গুহা কোন মানুষের তৈরি নয়। সেগুলো প্রকৃতির অবদান। আপনা থেকেই পাহাড়ের গায়ে সৃষ্টি হয় এরকম গুহা। ঠিক সেই অর্থে "কারলা কেভ", অজন্তা কেভ, ইলোরা কেভ, ভাজা কেভ, বেদখে কেভ, শেলারবাড়ী কেভ কিম্বা নাশিক কেভ ও জুনার কেভ নামগুলো বিভ্রান্তিমূলক।

কারণ এই সব গুহাগুলো ঠিক প্রকৃতির অবদান নয়। সুদক্ষ শিল্পীর ছেনি আর হাতুড়ির ঘায়ে পাহাড় কেটে গড়ে উঠেছে এই গুহা, আজ থেকে আরও প্রায় দু' হাজার বৎসর পূর্ব্বে। কাজেই এগুলোকে বলা উচিত অতীত স্থাপত্যের ও ভাস্কর্য্যের অভূতপূর্ব্ব নিদর্শন। আমার মনে হয় Percy Brown-এর উক্তি এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনি বলেন:

"Rock architecture to all intents and purpose is not architecture—it is sculpture, *but sculpture on a grand and magnificent scale.*"

কাজেই আমার ত মনে হয় 'কেভ' কথার পরিবর্ত্তে 'গুহামন্দির' কথাটা অনেক বেশী যুক্তিযুক্ত হয়।

এবারে প্রথমেই বলা যাউক, 'চৈত্য' গুহামন্দিরের কথা। কারণ এটাই এখানকার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। আর তাই বোধ হয় স্থাপত্য বিভাগ থেকে একে এক নম্বর গুহামন্দির ব'লে বর্ণিত হয়েছে।

'চৈত্য' গুহামন্দিরে ঢুকতে গেলেই প্রথমে বাঁ-দিকে পরে একটি থাম্বা। তার উপরে চারটি সিংহমূর্ত্তি। আর সবচেয়ে আশ্চর্য্যেরবিষয় যে, এই থাম্বাটির উপরি-ভাগ পাহাড়ের গায়ে যুক্ত হয়ে আছে। থাম্বাটির গায়ে শিলালিপি দেখে জানতে পারা যায় যে, এটি মারাঠীদের দান।

শোনা যায় 'চৈত্য' গুহামন্দিরের প্রবেশদ্বারের ডান-দিকেও আর একটি থাম্বা ছিল, কিন্তু সেটি নষ্ট হয়ে যায়। বর্ত্তমানে সেখানে একটি শিবমন্দির আছে। এই বিরাট্ থাম্বার উপরে ছিল একটি চাকা। এ দুটো বুদ্ধের জন্ম ও নীতির নিদর্শন।

চৈত্য গুহামন্দিরের দু' পাশে ১৫টি করে থাম্বা। শেষ প্রান্তের মাঝখানে 'স্তুপ'। পেছনে আরও সাতটি থাম্বা। স্তুপের ভিতরে হয়ত কোন বৌদ্ধ সাধকের অস্থি রক্ষিত আছে। এখানে প্রত্যহ বৌদ্ধভিক্ষুরা মিলিত হতেন—বৌদ্ধ আরাধনার জন্য। আর ঐ স্তুপের ডান দিক্ দিয়ে বৃত্তাকারে প্রদক্ষিণ করতেন। চৈত্যগুহার অভ্যন্তর ভাগ অনেকটা ইংরেজী 'U' অক্ষরের মত।

প্রবেশদ্বার থেকে পেছনের দেওয়াল পর্য্যন্ত ১২৪ ফুট ৩ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যে, ৪৫ ফুট ৬ ইঞ্চি প্রস্থে, আর মেঝে থেকে উপরের ছাদ পর্য্যন্ত উচ্চতায় ৪৬ ফুট।

চৈত্যগুহার বাইরে এবং ভিতরের দিকে চন্দ্রাতপে যে সূক্ষ্ম কারুকার্য্য আছে—পাথরের চন্দ্রাতপে এইরকম শিল্পনৈপুণ্য আর কোথাও দেখা যাবে না। আর এই শিল্পশোভার জন্যই কারলা গুহা বিশেষ ভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই কারুকার্য্যময় ছাদ নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ঠিক সময়মত স্থাপত্য বিভাগের হাত পড়ায় এই পুরাকীর্ত্তি আজও সযত্নে রক্ষিত আছে।

এবার 'বিহার'গুলির প্রসঙ্গে আসা যাক। চৈত্য গুহার বাঁ-দিকে একটি তিনতলা-বিশিষ্ট বিহার (২নং গুহা)। প্রথম তলাটি প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে। দ্বিতীয় তলার দু'দিকে চারটি করে কক্ষ। পেছনের দিকে সারিতে পাঁচটি করে কক্ষ। সামনে বেশ প্রশস্ত হল-ঘরের মত। এই হলঘরের সঙ্গেই প্রথম তলা একটি কাঠের সিঁড়ি দ্বারা যুক্ত। আর এই হলঘর থেকেই আর একটা কাঠের সিঁড়ি তেতলায় উঠে গেছে।

তেতলার ডানদিকে তিনটি কক্ষ। বাঁদিকে পাঁচটি কক্ষ। কোন কোন কক্ষে শয়ন করার জন্য পাথরের বেদী-মত আছে। ডান-দিকে এবং পেছনের দিকে দেওয়ালে বুদ্ধের মূর্ত্তিও খোদিত করা আছে। সামনের দিকে কাঠের রেলিঙ দেওয়া আছে।

আর একটু বাঁ-দিকে আর একটি 'বিহার' (৩নং গুহা)। এটি দুইতলা-বিশিষ্ট। প্রথম তলাটি নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু তার বাঁদিকে আরও কয়েকটি কক্ষ আছে। তিনটি জল ধরে রাখবার জায়গাও আছে। অনেকটা আমাদের কুয়ার মতন। আর একটি ক্ষুদ্র 'চৈত্য'ও আছে।

দোতলার দু'দিকে দু'টি করে কক্ষ আছে। পিছনের দিকেও চারটি করে কক্ষ আছে। কোন কোন কক্ষে শয়ন করার জন্য পাথরের বেদীও করা আছে। সামনের দেওয়ালে একটি দরজা ও দু'টি জানলা আছে।

'চৈত্য'গুহার ডান দিকে আরও কয়েকটি বিহার আছে। প্রথমটি একটি অসমাপ্ত 'বিহার'। তারপর ছোট একটি কক্ষ। সামনেটা ভেঙ্গে গেছে। আর পেছন দিকের দেওয়ালে একটি বুদ্ধের মূর্ত্তি। তার সঙ্গেই লাগানো আর একটি চৌবাচ্চার মত জল রাখবার জায়গা। চৌবাচ্চা বলছি এইজন্য যে, এটি নিতান্তই অগভীর।

তার পাশে আরও একটি বিহার (৪নং গুহা)। পেছনের দিকে চারটি কক্ষ। আর ডান-দিকে দু'টি কক্ষ, কিন্তু অর্দ্ধসমাপ্ত। পেছন দিককার দেওয়ালেও একটি

মূর্তি খোদিত আছে। মূর্তিটি বসা অবস্থায়, কিন্তু র পা পদ্মফুলের উপর ভর করে আছে। সামনের কে দেওয়ালে একটি দরজা ও দু'টি জানলা।

কারলার গুহামন্দির তৈরি সম্বন্ধে সঠিক কোন দিন তারিখ বলা যায় না। তবে এটুকু নিশ্চিত করে বলা য় যে, উত্তর ভারতের ক্ষহরাত বংশের রাজা নাহা-পানার কারলা দখলের পরে নয়। বরং তার আগেই কারলা গুহামন্দির তৈরি হয়েছিল। কারণ 'চৈত্য' গুহামন্দিরের গায়ে খোদিত শিলালিপিতে রাজ নাহা-পানার জামাতা উশভদত্তের কথা উল্লেখ থাকায় বিশেষজ্ঞরা এই অনুমান করেন। অবশ্য স্থাপত্যের ও ভাস্কর্য্যের রীতি দেখেও বিশেষজ্ঞরা এই ধারণা করেন যে-খ্রীষ্টজন্মের পর, প্রথম শতাব্দীর পরেই কারলার গুহামন্দির খোদিত হয়। আর সেই সময়টা সাত-বাহনদের রাজত্বকাল।

কারলার চৈত্যগুহা সারা ভারতের মধ্যে বৃহত্তম চৈত্যগুহা বলেই পরিচিত। কারণ বিখ্যাত স্থাপত্য বিশারদ ডাঃ ফার্গুসন সাহেব বলেন:

"The largest as well as the most complete Chaitya Cave in India was excavated at a time when that style was in its greatest purity and is fortunately the best preserved."

কিন্তু এই চৈত্যগুহায় গত ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে যখন সরকারী স্থাপত্য বিভাগের অন্তর্গত রাসায়নিক বিভাগের কর্ম্মচারীরা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে পরিচর্য্যা করছিলেন তখনই এই ফ্রেস্কো চিত্র-গুলি আবিষ্কৃত হয়। মোট পাঁচটি চিত্র এই সময় আবিষ্কৃত হয়।

প্রথম যে চিত্রটি আবিষ্কৃত হয় সেটি ডানদিকের ১৫টি থাম্বার মধ্যে ১০নং থাম্বার গায়ে। পোষাক পরিহিত একটি মনুষ্য চিত্র। মাথায় একটি টুপি। টুপিটি পাঠানদের কুল্লা জাতীয়। রঙ তার অনেকটা ইটের মত লাল। পোষাকটি শ্যাওলার মত সবুজ রঙের। কিন্তু সেই মনুষ্য চিত্রের পা দুটো খুব সুস্পষ্ট বোঝা যায় না। তবে এটুকু মনে হয় যেন একটি ধূসর রঙের কার্পেটের উপর দাঁড়িয়ে আছে।

এই চিত্রটির চারিদিকে বর্ডার দেওয়া আছে। সেই বর্ডারের মধ্যে পদ্মফুলের মত চিত্র আছে। একটি হলদে আর একটি ক্রীম রঙের। যতদূর মনে হয় ফুলের চিত্রগুলি পদ্মফুলের আলঙ্কারিক রূপ।

চৈত্য গুহা মন্দিরে ঢুকতে গেলে বাঁ দিকে পড়ে একটি থাম্বা

ঠিক এই ধরনের আর একটি চিত্র সাদা আর কালো রঙের পাওয়া গেছে।

তৃতীয় চিত্র 'স্তূপের পেছনে, পঞ্চম থাম্বার উপরিভাগে। এটি একটি লাল রঙের বৃত্তাকার। চতুর্থ চিত্রও খুব সুস্পষ্ট নয়। কোন একটি লাল রঙের লতার মত। এটি স্তূপের সামনে ১৬নং থাম্বার গায়ে।

পঞ্চম চিত্র একেবারেই অস্পষ্ট। চার পা-বিশিষ্ট কোন জন্তুর চিত্র বলে মনে হয়। 'স্তূপের' বাঁ দিকে অবস্থিত।

কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, কোন চিত্রই আমার ক্ষুদ্র ক্যামেরায় তুলতে পারি নি। কারণ ভিতরে খুবই অন্ধকার। সামান্য টর্চ্চের আলোতে কোনরকমে চিত্র-গুলি দেখা গেল।

তবে একটা কথা অত্যন্ত নিশ্চিত ভাবে বলা যেতে পারে যে, এই চিত্রগুলি অজন্তা গুহাচিত্রের মত নয়। চিত্রগুলির রেখা-বিন্যাসও অজন্তার গুহাচিত্রের মত সূক্ষ্ম ও সুন্দর নয়।

নারী-শিশু-যুবার কাকলিতে পরিপূর্ণ কারলা কেভ

এই চিত্রগুলি কে বা কারা অঙ্কন করল সে সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা না গেলেও ইতিহাসের পাতা থেকে এটুকু জানা যায় যে সেকালের বৌদ্ধভিক্ষুরাও শিল্পচর্চা

'চৈত্য' গুহার বাঁ দিকে ১৫টি থাম্বার মধ্যে ১২টি থাম্বা
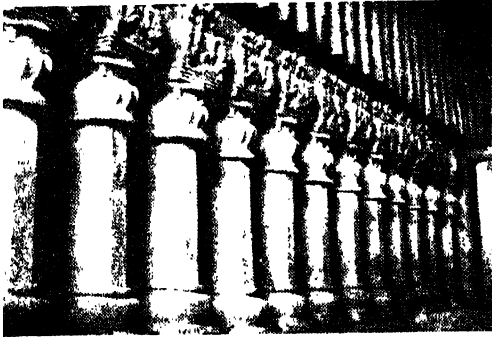
করতেন। কাজেই এটা বিচিত্র নয় যে, এই চিত্রগুলিও তদানীন্তন কোন বৌদ্ধভিক্ষুও অঙ্কন করে থাকতে পারেন। কারণ হ্যাভেল সাহেব তাঁর Indian Sculpture and Painting পুস্তকে বলেছেন :

"The Buddhist monks were often themselves practising artists. They used the arts not for vulgar amusement and distraction, but as instruments for the spiritual and intellectual improvement of the people."

অবশ্য এই চিত্রগুলি এখনও ভবিষ্যতের গবেষক ও তথ্যানুসন্ধানীদের যথেষ্ট আলোক সম্পাতের অবকাশ রাখে।

দুহাজার বছরের পুরাতন কারলার 'চৈত্য কেভ'

ফিরে আসার সময় একটা কথাই বার বার মনে হচ্ছিল যে, বাইরের বিজ্ঞপ্তিতে বিশেষ ভাবে নিষেধ থাকা সত্ত্বেও বহুজনকে দেখলাম, 'বিহার'গুলির মধ্যে বসে রীতিমত পিকনিক লাগিয়ে দিয়েছেন। এমন কি ষ্টোভ জ্বালিয়ে সব্জি রান্না পর্য্যন্ত হচ্ছে। অথচ এতে যদি কেভের কোন ক্ষতি হয়—তা হলে ভারতের জাতীয় ঐতিহ্যের যে কত বড় অপূরণীয় ক্ষতি হবে সেটা অনেকেই বুঝেও যেন বুঝতে চান না। তখন শুধুমাত্র কর্তৃপক্ষের উপর দোষারোপ চাপিয়ে সাফাই গাওয়ার প্রচেষ্টায় কোন লাভই হবে না।

তাই সেই ফার্গুসন সাহেবের কথাটাই বার বার করে মনে পড়তে লাগল :

"It would be thousand pities if this, which is the only original screen in India were allowed to perish."

যম

গী দ্য মোঁপাশাঁ
অনুবাদ—শ্রীপ্রিয়ব্রত মুখোপাধ্যায়

মৃত্যু-শয্যার পদপ্রান্তে ডাক্তারের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল কৃষকটি। শান্ত সহিষ্ণু চিন্তাহীন বৃদ্ধাটি দু'জনের দিকে তাকিয়ে তারা কি বলছে শুনছিল। সে মারা যাবে; এই সত্যটি সে স্বীকার করে নিয়েছিল; সময় আসন্ন, তার বয়স এখন বিরানব্বুই।

খোলা জানলা এবং দরজা দিয়ে জুলাইয়ের রোদ গলে পড়ছিল—গ্রামের চারপুরুষের কাঠের জুতোর দ্বারা স্পৃষ্ট, অসম বাদামী মাটির মেঝের উপর উত্তাপ ছড়িয়ে দিয়েছিল। শস্যক্ষেত্রের ঘ্রাণ শুকনো ঘাস, শস্য এবং মধ্যাহ্ন-সূর্যের আতপদগ্ধ গাছের পাতার গন্ধও গরম বাতাসে ভেসে আসছিল। পতংগরা গুঞ্জন করছিল, শিশুরা মেলায় যে কাঠের খেলনা কেনে তার ঝন্‌ঝন্ শব্দের মত তাদের কর্কশ ধ্বনিতে সারা গ্রাম ভরে গিয়েছিল।

ডাক্তার গলা চড়িয়ে বললেন: অনর, এই অবস্থায় তুমি তোমার মাকে ছেড়ে কোথাও যেতে পার না, যে-কোন মুহূর্তে উনি মারা যেতে পারেন।'

আর কৃষকটি হতাশ হয়ে বারবার বলছিল: কিন্তু যে ভাবেই হোক, গম আমাকে তুলতে হবে। অনেক-দিন হ'ল এটা পড়ে আছে। এমন আবহাওয়া ভাল। মা, তুমি কি বল?

সেই মুমূর্ষু স্ত্রীলোকটি চাহনি দিয়ে আর মাথা নেড়ে তার সম্মতি দিল। এখনও নর্মানদের চিরকালের লোভের বশবর্তী হয়ে গম গোলায় ভরবার আর তাকে একলা মরতে দেবার জন্য সে তার ছেলেকে জোর করতে লাগল।

কিন্তু ডাক্তারের মেজাজ বিগড়ে গেল, মাটিতে পা ঠুকে তিনি চীৎকার করে উঠলেন: তুমি একটা পাষণ্ড, বুঝলে? আমি তোমাকে নিষেধ করছি, শুনতে পাচ্ছ? আর যদি তুমি সত্যিই তোমার গম আজ ভরতে যাও, তা হলে এখনই যাও আর তোমার মাকে দেখা-শোনা করার জন্য মাদার রাপেটকে নিয়ে এস। আমি তোমাকে আদেশ করছি—বলি, শুনতে পাচ্ছ? যদি তুমি আমার কথা অমান্য কর, তা হ'লে শোন, যখন তুমি অসুস্থ হবে আমি তোমাকে কুত্তার মত মারব—বুঝলে?

লম্বা ছিপছিপে শ্লথগতি কৃষকটি কোন সিদ্ধান্তে আসতে না পারায় উদ্বিগ্ন ছিল। ডাক্তারের ভয়ে আর অর্থব্যয়ে প্রবল অনীহার মধ্যে সে দোল খাচ্ছিল; সে ভাবনা থামাল আর তোতলাতে থাকল: দেখাশোনা করার জন্য মাদার রাপেট কত নেন?

ডাক্তার চীৎকার করলেন: আমি কি করে জানব? তুমি কতক্ষণের জন্য তাকে চাও তার ওপর সেটা নির্ভর করছে। সব শিকেয় তুলে রেখে তুমি তার সংগে ব্যবস্থা কর। আমি চাই ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সে এখানে আসুক, শুনছ?

লোকটি মনস্থির করল: আচ্ছা, আমি যাব; রাগ করবেন না, ডাক্তারবাবু।

তুমি সাবধান হও। দেখ, আমার মেজাজ খারাপ হ'লে আমি কারুর তোয়াক্কা করি না।

একলা হ'লে পর কৃষকটি মায়ের দিকে ফিরে হতাশ কণ্ঠে বলল: মাদার রাপেটকে আনতে যাচ্ছি। আমাকে ডাক্তারবাবু বলেছেন অতি অবশ্য নিয়ে আসতে হবে। আমি এখনি আনব, তুমি ভেব না।' এবং সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

বৃদ্ধা রজকিনী মাদার রাপেট গ্রামের এবং চারপাশের মৃত এবং মুমূর্ষুদের দেখাশোনা করত। তার মক্কেল-দের শেষ শবাচ্ছাদনে ঢেকে দিয়েই সে ফিরে আসত জীবিতদের জামাকাপড় ইস্ত্রি করতে। গত বছরের আপেলের মত কুঞ্চিত, বদমেজাজী, হিংসুটে, অস্বাভাবিক কৃপণ সেই বুড়ী দ্বিগুণ বেঁকে গিয়েছিল—জামাকাপড়ের উপর অজস্রবার ইস্তারি চালনার জন্য তার পিঠ ভেঙে গিয়েছিল; মৃত্যুর জন্য তার অস্বাভাবিক রকমের হৃদয়হীনের মত আকর্ষণ ছিল বলা চলে। যতজনের এবং যতরকমের মৃত্যু সে দেখেছে সেই বিষয়েই সে কথা বলত; শিকারী যেমন বন্দুক নিয়ে অভিযানের কথা বলে সেই রকম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সে তার গল্প বলত, যার কোন নড়চড় হ'ত না।

অনর বনটেম্‌স তার বাড়ীতে ঢুকে দেখল সে গ্রামের মেয়েদের কলারের জন্য নীল তৈরী করছে। সে বলল: হ্যালো! শুভসন্ধ্যা! মাদার রাপেট, আশা করি তুমি ভাল আছ!

সে মাথা ঘুরিয়ে বলল: হ্যাঁ! একরকম আছি—তুমি কেমন?

ভাল। মা ভাল নেই।

তোমার মা?

হ্যাঁ, আমার মা।

তোমার মায়ের কি হ'ল?

শীগগিরই পটল তুলবেন।

বুড়ী জল থেকে হাত বার করল এবং স্বচ্ছ নীলাভ জল তার হাত বেয়ে গড়িয়ে পড়ল ধোবার গামলায়। সে আকস্মিক সহানুভূতির সংগে বলল: উনি ভাল নেই, সত্যি?

ডাক্তারবাবু বলেছেন আজকের বিকেলটা টিকলে হয়।

তা হলে ওনার অবস্থা সত্যি খারাপ!

অনর ইতস্ততঃ করছিল। তার মাথায় যে মতলব ঘুরছে সোজাসুজি সে বলতে চায় নি; কিন্তু অন্য কিছু কি বলবে খুঁজে না পেয়ে সে বলল: শেষ পর্যন্ত তাকে দেখবার জন্য তুমি কত নেবে? তুমি জান আমরা বড়লোক নই; চাকর রাখার ক্ষমতা আমার নেই। সেইজন্যই আমার বুড়ী মার এই হাল, তাকে খুব বেশি চিন্তা আর কাজ করতে হয়েছে। বিরানব্বই বছর বয়সে মা দশজনের কাজ করতেন। আজকালকার দিনে অমন পাওয়া যাবে না।

মাদার রাপেট ব্যবসাদারের ভঙ্গিতে উত্তর করলে: দু'রকমের দর নিয়ে থাকি। ভদ্রলোকদের জন্য দিনে দু'ফ্রাঙ্ক। আর রাতে তিন; অন্যদের জন্যে দিনে এক ফ্রাঙ্ক রাতে দু' ফ্রাঙ্ক। আমি তোমার কাছ থেকে এক আর দু'ফ্রাঙ্ক পেলে যেতে পারি।

কৃষকটি কিন্তু ভাবছিল। সে তার মাকে ভাল ভাবেই জানত; সে তার শরীরের শক্তি আর দৃঢ়তার বিষয় জানত। ডাক্তারে অভিমত দিলেও সে এক সপ্তাহ বাঁচতে পারে।

সিদ্ধান্ত নিয়ে সে বলল, না। মা মারা না যাওয়া পর্যন্ত কত দিতে হবে, সেটা আমাকে বল। আমাদের দুজনেরই বেশ জুয়ো খেলা হবে। ডাক্তারবাবু বলেছেন খুবই তাড়াতাড়ি মারা যাবে। যদি তাই হয় তা হলে তোমার পোষমাস আমার সর্বনাশ। কিন্তু যদি সে আসছে কাল বা তার চেয়ে বেশি বাঁচে তা হ'লে আমি জিতব, তুমি হারবে।

লোকটির দিকে সেই পর্যবেক্ষণকারিণী বিস্ময়ে তাকিয়েছিল। এর আগে সে কোনদিন ঠিকে মজুরিতে মুমূর্ষুর দেখাশোনা করে নি। সে ইতস্ততঃ করল, জুয়োর চিন্তায় আকৃষ্ট হ'ল, কিন্তু কোথাও ফাঁদ থাকতে পারে এমন সন্দেহ করল।

সে বলল, তোমার মাকে না দেখা পর্যন্ত আমি কিছু বলতে পারব না।

তা হ'লে আমার সংগে এসে তাকে দেখে যাও।"

রাস্তায় তারা কোন কথা বলল না। মাদার দ্রুত চলতে লাগল, কৃষকটি লম্বা লম্বা পা ফেলে চলল, যেন সে প্রতি পদক্ষেপে একটি স্রোতস্বিনী অতিক্রম করছে।

রৌদ্রতাপে পরিশ্রান্ত হয়ে যে-সব গরুগুলি শুয়েছিল তারা অলসভাবে মাথা তুলল এবং দ্রুত ধাবমান দু'টি মূর্তির দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত হয়ে মাথা নীচু করল যেন তারা কিছু তাজা ঘাস চায়।

বাড়ীর কাকাকাছি এসে অনর বনটেম্পস বিড় বিড় করল; সব শেষ হয়ে গেলে আমি আশ্চর্য হব না এবং তার অচেতন আশা তার কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠল।

কিন্তু বুড়ী মরে নি। সে তখনও চাকাওয়ালা ছোট খাটে পিঠ দিয়ে শুয়ে ছিল, হাত দুটো লাল রঙের ছিটের চাদরের উপর রাখা ছিল—তার হাত দুটো অসম্ভব রকমের সরু, গ্রন্থিল, ঠিক যেন দুটো কাঁকড়ার মত অদ্ভুত প্রাণী—বাত, কঠোর পরিশ্রম আর প্রায় এক শতাব্দী ধরে সে যা কাজ করেছে তার জন্যে গ্রন্থিসর্বস্ব।

মাদার রাপেট বিছানার কাছে গিয়ে মুমূর্ষু স্ত্রীলোকটিকে দেখল। নাড়ী দেখল, বুকে আওয়াজ করে দেখল, শ্বাসপ্রশ্বাস শুনল আর তাকে কথা বলাবার জন্য প্রশ্ন করল। তারপর অনেকক্ষণ ধরে ভাববার পর সে ঘর থেকে বেরল, অনরও তাকে অনুসরণ করল। বুড়ী রাত পর্যন্ত বাঁচবে না; সে তার মন স্থির করে ফেলেছে। কৃষক বলল—আচ্ছা—

পর্যবেক্ষণকারিণী উত্তর করল: হ্যাঁ, সে দু' দিন সম্ভবতঃ তিন দিন বাঁচতে পারে। আমি ছ ফ্রাঙ্কে কাজটা করতে পারি।

সে চীৎকার করে উঠল; ছ ফ্রাঙ্ক। ছ ফ্রাঙ্ক! তুমি কি পাগল নাকি? আমি তোমাকে বলছি মা পাঁচ-ছ ঘণ্টার বেশি বাঁচবে না।

দুজনেই একগুঁয়ে, তাই দর কষাকষি চলল অনেকক্ষণ। অবশেষে পর্যবেক্ষণকারিণী বাড়ী যাবার ভাণ করল—এদিকে সময় চলে যাওয়ায় গম ভেতরে আনা যাবে না তাই কৃষকটি রাজী হ'ল: আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি ছ ফ্রাঙ্কে রাজী—দেহ যতক্ষণ না সরান হয় ততক্ষণ পর্যন্ত। 'রাজী, ছ ফ্রাঙ্ক।'

সে গম তুলতে চলে গেল, গমগুলো জ্বলন্ত রোদে পড়েছিল। পর্যবেক্ষণকারিণী ঘরে ফিরে এল।

সে তার হাতের কাজ সংগে করে নিয়ে এসেছিল, যতক্ষণ সে মুমূর্ষু আর মৃতদের দেখাশোনা করত ততক্ষণ সে সেলাই করে—কখনও নিজের জন্য, কখনও সেই সব পরিবারের জন্য, যারা তাকে দুটো কাজের জন্য নিয়োগ করে, সেলাইয়ের জন্য বাড়তি পয়সা দেয়।

হঠাৎ সে জিগ্যেস করল; মাদার বনটেম্পস্, আপনি শেষ অনুষ্ঠান করেছেন?

কৃষাণী মাথা নাড়ল আর ধার্মিক মাদার রাপেট লাফ দিয়ে উঠল: হায় ভগবান্! আপনি কি বলছেন? আমি গিয়ে পুরুতকে ডেকে আনি।

আর সে তাড়াতাড়ি চলল পুরুতের বাড়ী, এত তাড়াতাড়ি যে পার্কের ছোট ছোট ছেলেরা তাকে প্রায় ছুটতে দেখে ভাবল যে নিশ্চয়ই কোন দুর্ঘটনা ঘটে থাকবে।

পুরুত গায়ে তার বিশেষ চাদর জড়িয়ে তখনই এল; আগে আগে একজন ছোকরা গায়ক ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে এল যাতে লোকে জানতে পারে যে গ্রীষ্মের শান্তিপূর্ণ গ্রামের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের দেহ চলে যাচ্ছে। দূরে যে-সব লোক কাজ করছিল তারা রোদ-টুপি খুলে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, যতক্ষণ না পুরুতের বিশেষ চাদর গোলার আড়ালে অদৃশ্য হ'ল; মেয়েরা শস্যকণা কুড়োতে কুড়োতে সোজা হয়ে দাঁড়াল ক্রুশ চিহ্ন আঁকার জন্য, কালো মুরগীগুলো ভয়ে গর্তের ধার দিয়ে তাড়াতাড়ি চলল ঝোপের মধ্যে তাদের গর্তের দিকে—তার মধ্যে শীঘ্রই তারা অদৃশ্য হয়ে গেল। মাঠের মধ্যে একটা অশ্বশাবক দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল, চাদর দেখে সে ভয় পেয়ে গোড়ালির সংগে বাঁধা দড়ির চারপাশে বৃত্তাকারে দৌড়তে আরম্ভ করল। লাল আঙরাখা-গায়ে ছোকরা গায়ক জোর কদমে চলল; পুরুত ঠাকুর ঘাড় কাৎ করে আর গায়ে চৌকো পোষাক জড়িয়ে তার পিছু পিছু চলল বিড় বিড় করে মন্ত্র বলতে বলতে। মাদার রাপেট পুরুত ঠাকুরের পোষাকের শেষাংশটুকু ধরে দ্বিগুণ বেঁকে চার্চের মত হাতদুটো জড় করে চলল।

অনর তাদের দূর দিয়ে যেতে দেখল। সে জিগ্যেস করল: পুরুতমশাই কোথায় যাচ্ছেন?

মালিকের চেয়ে যার কল্পনাশক্তি প্রখর সেই ভাড়াটে লোকটা বলল: নিশ্চয়ই উনি আপনার মায়ের জন্য পবিত্র মহাযজ্ঞ নিয়ে যাচ্ছেন।

কৃষকটি অবাক্ হ'ল না: 'সেটা খুবই সম্ভব' এবং সে তার নিজের কাজে চলে গেল।

মাদার বনটেমপ্‌স স্বীকারোক্তি করল, ক্ষমা পেল এবং পবিত্র যজ্ঞ করল, দু'টি স্ত্রীলোককে শ্বাসরুদ্ধ ঘরের মধ্যে রেখে পুরোহিত চ'লে গেল।

মাদার রাপেট মুমূর্ষু স্ত্রীলোকটির দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকাতে লাগল যদি সে বেশিক্ষণ বাঁচে।

সন্ধ্যা হয়ে এল: অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা বাতাস বাড়ীর মধ্যে বইতে লাগল ঝোড়ো হাওয়ার সাথে। একটা সস্তা তৈলচিত্র দুটো পিন দিয়ে দেওয়ালে টাঙান ছিল—সেটা দেওয়ালে ঠোক্কর খেল। জানলার পর্দাগুলো একসময় যেগুলোর রং ছিল সাদা—এখন কালের সঙ্গে সঙ্গে যাদের রং মেচেতার মত আর হল্‌দেটে হয়েছে—তাদের দেখে মনে হচ্ছে তারা যেন পালাবার পথ খুঁজছে, মুক্তি পাবার বাসনায় সংগ্রাম করছে—ঠিক ঐ বুড়ীর আত্মার মত।

নিষ্কম্প চোখ খোলা বুড়ীকে দেখে মনে হয় যেন সে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে—মৃত্যু যা অতি নিকটে কিন্তু যদিও তার আসতে দেরি হচ্ছে। ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য তার সর্দিজমা গলা দিয়ে একটু ঘড় ঘড় শব্দ বেরোচ্ছিল; শীঘ্রই এর ইতি হবে আর পৃথিবীতে একজন স্ত্রীলোক কমবে এবং তার জন্য কেউই দুঃখ পাবে না।

রাত হ'লে অনর ফিরল। বিছানার কাছে এসে দেখল তার মা এখনও বেঁচে রয়েছে এবং মা পীড়িত হলে সর্বদাই যেমন সে প্রশ্ন করে তেমনই করল: তোমার কেমন লাগছে?

মাদার রাপেটকে এই ব'লে সে পাঠিয়ে দিলে: কাল ভোর পাঁচটায়—নিশ্চয়ই আসবে।

সে বলল: ঠিক আছে, কাল ভোর পাঁচটায়। সে সত্যি ভোরবেলায় এসে হাজির হ'ল।

অনর তখন ঝোল খাচ্ছিল—কাজে যাবার আগে সে তৈরি করেছিল নিজের জন্যে। পর্যবেক্ষণকারিণী বলল, আচ্ছা, তোমার মা কি মারা গেছে?

সে বদমায়েসের মত চোখ পিট্‌পিট্‌ করে উত্তর দিল:

না, মনে হচ্ছে একটু ভাল। আর সে বাড়ী থেকে চ'লে গেল।

মাদার রাপেট ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছিল, সে মৃত-প্রায় স্ত্রীলোকটির কাছে গেল, স্ত্রীলোকটির অবস্থা একই রকম ছিল; সে খুব কষ্টে শ্বাস নিচ্ছিল, অনড় হয়ে পড়েছিল, তার চোখ দুটো খোলা আর হাত দুটো চাদরটাকে আঁকড়ে ধরা ছিল।

পর্যবেক্ষণকারিণী বুঝল যে এই অবস্থা দু'দিনও চলতে পারে, চারদিন অথবা সপ্তাহ ধরেও চলতে পারে এবং একটা আতঙ্ক তার মত কৃপণের বুকে চেপে বসল। সেই সংগে সে সেই চালাক লোকটি যে তাকে ফাঁদে ফেলেছে আর স্ত্রীলোকটি যে মর-মর করেও মরছে না তাদের উপর রেগে উঠল।

যাই হোক, সে তার কাজ করে গেল এবং মাদার বনটেম্‌পসের কুঞ্চিত মুখের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করল।

অনর দুপুরে খাওয়ার জন্য এল; সে খুব খোশ-মেজাজে ছিল; খাওয়ার পর সে আবার বেরুল। সে নিশ্চয়ই গম ভালভাবে ভেতরে তুলতে পারছে।

মাদার রাপেট ক্রমেই রাগে ফুলে উঠছিল। যতই সময় যাচ্ছে ততই তার মনে হচ্ছে সেই সময়টা নষ্ট হচ্ছে এবং সময়ের আর এক নাম অর্থ। এই একগুঁয়ে বুড়ী, এই জেদী বুড়ীটাকে গলা চেপে ধরার আর একটি মাত্র মোচড়ে এই ক্ষীণ দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করার একটি আদিম বাসনা সে তার বুকের মাঝে অনুভব করল—এর জন্যে তার সময় আর টাকা দুই-ই নষ্ট হচ্ছে।

কিন্তু সে ভেবে দেখল যে তাতে ঝুঁকি নেওয়া হবে; এবং আকস্মিক অনুপ্রেরণায় সে বিছানার কাছে গেল।

সে প্রশ্ন করল: তুমি কি যমকে কখনও দেখেছ?

মাদার বনটেম্‌প্‌স বিড় বিড় করে বলল: না।

তারপর সেই পর্যবেক্ষণকারিণী এই মুমূর্ষু বৃদ্ধাকে ভয় দেখাবার জন্য গল্প বলতে লাগল।

সে বলল, মরার কিছুক্ষণ আগে যম দেখা দেয় মুমূর্ষুকে। তার হাতে একটা ঝাঁটা থাকে আর তার মাথায় থাকে রান্নার পাত্র আর সে খুব জোরে চীৎকার করে। যখন সে দেখা দেয়, তখন সবই প্রায় শেষ, মুমূর্ষুরা আর কিছুক্ষণই বাঁচে। এবং সেই বৎসরই তার উপস্থিতিতে কতজনের কাছে যম এসেছে তার ফিরিস্তি শোনাল—যোশেফিন লয়জল, যুলানি র‍্যাটার, সোফি প্যাডাগল, সেরাফিন গ্রসপিড।

গল্প শুনে খুব অভিভূত হয়ে মাদার বনটেম্‌প্‌স বিছানায় নড়ে উঠল, মাথা ঘুরিয়ে ঘরের পিছন দিক দেখার চেষ্টা করল।

হঠাৎ মাদার রাপেট বিছানার শেষে অদৃশ্য হয়ে গেল। তাক থেকে একটা চাদর নিল, নিজের গায়ে জড়াল; মাথায় চাপাল রাঁধবার পাত্র যার তিনটি ছোট ছোট বাঁকান পা তিনটি শিংয়ের মত আটকে রইল; ডান-হাতে নিল একটি ঝাঁটা আর বাঁ-হাতে একটা টিনের বালতি—শব্দ করার জন্য সে সেটাকে শূন্যে ছুঁড়েছিল।

মাটিতে পড়ে তা থেকে প্রচণ্ড শব্দ হ'ল; তখনি পর্যবেক্ষণকারিণী একটি চেয়ারে উঠে বিছানার পায়ের কাছের পর্দা তুলে বেরুল। বিচিত্র অংগভংগি করে আর পাত্রটি যা দিয়ে সে তার মুখ ঢেকেছিল—তার ভেতর থেকে তীক্ষ্ণ চীৎকার তুলল—পাঞ্চর আর জুডির প্রদর্শনীর যমের মত ঝাঁটা তুলে সে সেই বৃদ্ধা মুমূর্ষু কৃষাণীকে শাসাতে লাগল।

ভয়ে আত্মহারা হয়ে মাদার বনটেম্‌পস্ উঠবার আর পালাবার জন্য অতিমানবীয় প্রচেষ্টা করলে; সে তার কাঁধ আর বুকটাকে বিছানা থেকে তুলেছিল; তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে পড়ে গেল। সব শেষ।

মাদার রাপেট শান্ত চিত্তে সব কিছু যথাস্থানে রাখল—ঝাঁটাটিকে তাকের এককোণে, চাদরটাকে তাকের মধ্যে, পাত্রটাকে অগ্নিস্থানে, বালতিটাকে তাকের উপর, চেয়ারটাকে দেওয়ালের সংগে ঠেস দিয়ে। তারপর সে পেশাদারের মত মৃতা স্ত্রীলোকের চোখ দু'টি বুজিয়ে দিল, বিছানার উপর একটি তালা রাখল, তারপর সামান্য পবিত্র জল ঢালল, দেরাজের উপরে পেরেক দিয়ে আটকান কাঠের শাখাটাকেও ভেজাল আর নতজানু হয়ে মৃতের জন্য প্রার্থনা করতে লাগল—তার পেশার জন্য যা সে ভালভাবেই জানে।

সন্ধ্যায় অনর এসে দেখল যে সে প্রার্থনা করছে আর তখনি সে হিসেব করে দেখল যে মাদার তার কাছ থেকে এক ফ্রাঙ্ক জিতে যাচ্ছে—কেননা সে মাত্র তিনবেলা আর একরাত্রি কাটিয়েছে—যার জন্য তার পাওনা হয় পাঁচ ফ্রাঙ্ক—কিন্তু সে তাকে ছ ফ্রাঙ্ক দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের ইংরেজী অনুবাদের তালিকা

শ্রীসুধাময়ী মুখোপাধ্যায়

(১৯১৪) গীতালি র র ১১

আমি হৃদয়েতে পথ কেটেছি—Sheaves—'Safety'—In my heart, I have cut a path

আবার শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে—Poems 56—Thou hast come again

এই শরত আলোর কমলবনে Lover's Gift 57—This autumn is mine (included in Sangeet Natak Akademi 100 songs Vol. I)

যখন তুমি বাঁধছিলে তার, সে যে বিষম ব্যথা Fruit Gathering 49—The pang was great (202)

পথ দিয়ে কে যায় গো চলে—Fruit Gathering 7—Alas, I cannot stay in the house (179)

যেথায় থাক না দ্বারে—Fruit Gathering 8—Be ready to launch forth (179)

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে—V.B.Q. Vol. XII Part III—Touch my life with the magic of thy fire

—Sheaves—The Magic Jewel of Fire—Touch my soul with the magic jewel of fire

তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে—Sheaves—Song of the Boat—If thy open wind hit the sail

এক হাতে ওর কৃপাণ আছে—Sheaves—The Victor—He hath a sword in one hand

—Poems 56—With a sword in his right hand

শুধু তোমার বাণী নয়গো হে বন্ধু হে প্রিয় Fruit Gathering 59—When the weariness of the road (206)

দ্বারে দ্বারে হবে না তোর স্বর্গ সাধন Sheaves—The Lover—Not the path of heaven for thee

অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন করে—Sheaves—The Harp of Fire—How dost thou strike

ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু—Poems 57—Forgive my langour (Facsimile of the poet's hand writing)

কাণ্ডারী গো যদি এবার পৌঁছে থাক কূলে V.B.Q. Vol. XXIV No. 2 Autumn 1958—Tr. by the author

ফুল ত আমার ফুরিয়ে গেছে—Sheaves The Last Offering—The flowers are finished

তোমার কাছে এ বর মাগি—Sheaves—A Boon—Grant thou me this boon

আপন হতে বাহির হয়ে—Sheaves—The Invitation—Come out of thyself

মেঘ বলেছে যাবো যাবো—Fruit Gathering 64—The cloud said to me "I vanish" (204)

বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছ Sheaves—Half and Half—The net is spread over the world

ঘরের থেকে এনেছিলেম প্রদীপ জেলে—Fruit Gathering 17—I brought out my earthen lamp

তোমায় সৃষ্টি করব এই ছিল মোর পণ—Fruit Gathering 33—When I thought, I would mould you (190)

আমি পথিক পথ আমারি সাথী—Lover's Gift—The road is my wedded companion (262)

সন্ধ্যাতারা যে ফুল দিল—Sheaves—My Part—The flower that the evening star offered

এ দিন আজি কোন্ ঘরে গো—Fruit Gathering 65—May be there is one house (211) (included in Sangeet Natak Akademi 100 songs Vol. I)

এখানে তো বাঁধা পথের অন্ত নাই—Fruit Gathering 6—Where roads are made, I lose my way (178)

যা দেবে তা দেবে তুমি —Fruit Gathering 11—My portion of the best in this world (182)
*পান্থ তুমি পান্থজনের সখা —Fruit Gathering 13—To move is to meet you (182)
[illegible] —Fruit Gathering 21—I will meet one day the life (185)
*পথের সাথী, নমি বারম্বার —Crossing 78—Comrade of the road (281)
[illegible] Sheaves—There and Then—When my moving steps come to a halt
*অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো—Fruit Gathering 58—Yours is the light that breaks [illegible]
*ভেঙেছে দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময় —Fruit Gathering 34—The wall breaks as under (196)
(included in Sangeet Natak Akademi 100 songs Vol. [illegible])
*যখন তোমায় আঘাত করি —Crossing 27—I came nearest to you (274)
কেমন করে তড়িৎ আলোয় দেখতে পেলেম—Fruit Gathering 50—In the lightning flash of a moment (2[illegible])

[illegible] Sheaves—Open thy Eyes—Run not anywhere
এই [illegible] মন্দির প্রাঙ্গণে—Crossing 75—Guests of my life

(১৯১৬) বলাকা

ওরে নবীন ওরে আমার কাঁচা—A Flight of Swans No. 1—O the youthful, the unripe
এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো—Crossing No. 22—It is the destroyer who comes
—A Flight of Swans No. 2—Now the All-Destroying is [illegible]
আমরা চলি সমুখ পানে—A Flight of Swans No. 3—We march forward
তোমার শঙ্খ ধূলায় পড়ে কেমন করে সইব—Indian Ink (Annual) Cal. 1914—The Trumpet—Tr. by the author
—Reprinted in Fruit Gathering 27—The Trumpet lies in the [illegible] (191)
—A Flight of Swans—Your trumpet lies in the [illegible]
মত্ত সাগর দিল পাড়ি—Indian Ink (Annual) 1914—'Crossing'—Tr. by the author
—Reprinted in Fruit Gathering 11—The Boatman is out crossing (196)
—A Flight of Swans No. 5—On this dark night, my boatman has gone cro[ssing]
তুমি কি কেবলি ছবি শুধু পটে লিখা—Lover's Gift 42—Are you a mere picture (261)
—A Flight of Swans No. 6—Art thou a picture, only a picture
—*Modern Review*, Sept. 1922—'Picture'—Tr. K. C. Sen
একথা জানিতে তুমি ভারতঈশ্বর সাজাহান—Lover's Gift 1—You allowed your Kingly power
—A Flight of Swans 7—This you knew, O Emperor Shah Jeh[an]
—Presidency Coll. May 1918—Tajmahal Tr. by K. C. Se[n]
March 1930. Prose Tr. by S. N. Moitra
—Presidency Coll. Mag. 1918—'Tajmahal' Tr. by K. C. Sen
By S. N. Moitra
হে বিরাট নদী, অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল—Fugitive I—Dark by you sweep on (405)
—A Flight of Swans 8—O Great River, Your unseen silent [illegible] flow ceaselessly
কে তোমারে দিল প্রাণ—A Flight of Swans 9—Who gives you life, O stone
হে প্রিয় আজি এ প্রাতে—Lover's Gift 2—Come to my garden (abridged) (255)
—A Flight of Swans 10—O Beloved, This noon what shall I bring the[e]

আমার কাছে রাজা আমার রইল অজানা—Fruit gathering 32—My King was unknown to me (190)
—A Flight of Swans 27—My King remains unknown to me

পাখীরে দিয়েছ গান, গায় সেই গান—Fruit Gathering 78—To the birds, you gave song (214)
—A Flight of Swans 28—To the bird, you have given song

সেদিন তুমি আপনি ছিলে একা—F. G. 80—You did not know yourself (215)
A.F.O.S. 29—When you were alone

এই দেহটির ভেলা নিয়ে দিয়েছি সাঁতার—F. G. 42—I cling to this living raft (198)
—A. F.O.S. 30 —On this tiny raft, I shall cross the river of li

নিত্য তোমার পায়ের কাছে—F.G. 77—The world is yours at once (214)
—A.F.O.S. 31—With all its riches, your universe lies at your feet

আজ এই দিনের শেষে—A Flight of Swans 32—The sunset sky put a jewel in her glistening hai

জানি আমার পায়ের শব্দ রাতে দিনে শুনতে—F. G. 81—You in your timeless watch (216)
—A.F.O.S. 33—My footsteps, I know you hear night and day

আমার মনের জানালাটি আজ হঠাৎ গেল খুলি—F. G. 68—Suddenly the window of my heart
A.F.O.S. 34—To-day, the window of my heart opens sudden

আজ প্রভাতের এই আকাশটি—A.F.O.S. 35—When dew falls as tears from the morning sky
—V.B.Q. July 1923—With the song, I am a song—Translated by K. C. Sen

সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোত—Fugitive III—29—When like a Flamming Scimitar (447)
—A.F.O.S. No. 1—The meandering current of the Jhelu
—March of India, February 1949—Flying Cranes—Tr. I Lila Roy—Reprinted in 'Kashmir' 1.12.50
—Presidency College Magazine March 1939—'Wild Swans'—Tr. by Lalitmohan Chatterji

দূর হতে শুনিস্ কি মৃত্যুর গর্জন ওরে দীন—F.G. 84—Do you hear the tumult (218)
—A. F. O.S. 37—Do you hear the tumult of death afar

সর্বদেহের ব্যাকুলতা কী বলতে চায় বাণী—Fugitive II—15—I have donned this new robe (421)
—A.F.O.S. 38—This yearning of my body

যেদিনে উদিলে তুমি বিশ্বকবি—A F.O.S. 39—To William Shakespeare—O Universal Poet

এইক্ষণে মোর হৃদয়ের প্রান্তে আমার নয়ন বাতায়নে—Lover's Gift—There is a looker on (260)
—A.F.O.S. 40—You who looked out through the windo

যে কথা বলিতে চাই—A.F.O.S. 41—All this I long to say
—Fugitive III No. 2—I have looked on this picture in many a month of Marc

তোমারে কি বার বার করেছিনু অপমান—Crossing 16—You came to my door in the dawn
—A.F.O.S. 42—You I have humiliated again and again

*ভাবনা নিয়ে মরিস্ কেন খেপে—A.F.O.S. 43—Why do you plague yourself with worries

যৌবনরে তুই কি রবি সুখের খাঁচাতে—A.F.O.S. 44—F. O Youth, must you remain imprisoned

পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি—Poems No. 58—Pilgrim, the night of the weary old year
—A.F.O.S. 45—The last tired night of the year

...াপনারে তুমি সহজে ভুলিয়া থাকো—V. B. Q. Jan. 1924—Dedication—To W. W. Pearson—Thy
(উৎসর্গ) nature is to forget thyself (457)

(১৯১৬) ফাল্গুনী র র ১২

...গো দখিন হাওয়া, ও পথিক হাওয়া—Modern Review, Aug. 1934—Breezy April, Vagrant April
—V. B. Q. April 1926—April
—Another Translation of this song in 'Cycle of Spring'—
—(Complete Translation of ফাল্গুনী by the author)—O South wind, the wanderer, come and rock me
Full translation of ফাল্গুনী
—'Cycle of Spring'—in collected poems and plays (333-401)

(১৯১৮) পলাতকা র র ১৩

...াতকা—ঐ যেখানে শিরীষ গাছে—Fugitive III—20—Days were drawing out as the winter ended (437)

...না—আমি যেদিন সভায় গেলেম প্রাতে—V.B.Q. III—4 (1926) Jan.—The Wreath of Victory (abridged)

...লো মেয়ে—মরচে পড়া গরাদে ঐ ভাঙা জানালাখানি—Fugitive II 2—Behind the rusty iron gratings of the opposite window

...কুরদাদার ছুটি—তোমার ছুটি নীল আকাশে—Fugitive III—12—Take your holiday, my boy (433)

...িয়ে যাওয়া—ছোট্ট আমার মেয়ে—Fugitive III—13—In the evening, my little daughter (434)

(১৯২২) শিশু ভোলানাথ র র ১৩

...শু ভোলানাথ - ওরে মোর শিশু ভোলানাথ—Poems 63—O my child, my infant Shiva

...লগাছ—তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে—Sheaves—The Palm—Standing on the leg

...বার—সোম' মঙ্গল, বুধ এরা—Sheaves—Sunday—Monday, Tuesday, Wednesday and all other days come quickly from afar

...ন পড়া—মাকে আমার পড়ে না মনে—V. B. Q.—May-July 1936, Reprinted in poems 64—I cannot remember my mother

...াতিথী—ঐ যে রাতের তারা—Sheaves—Star Maidens—Look at the stars, mother

...নরী—কোথায় যেতে ইচ্ছা করে—V. B. Q. Feb-Apr. 1936—Reprinted in poems 65—You ask me, mother

...মিস্ত্রী—বয়স আমার হবে তিরিশ—Sheaves—The Mason—You think, I am a little child

...বিনিময়—মা যদি তুই আকাশ হতিস্—Sheaves—Enchange—If you were the sky, mother

(১৯২) লিপিকা ২৬

চলার পথ—এই তো পায়ে চলার পথ—Fugitive III 36—The day grew dim, The early evening star faltered
—Golden Boat—'Pathway'

...দলা দিনে—রোজই থাকে সমস্ত দিন কাজ—Golden Boat (1932)—A cloudy day

—Hindusthan Standard Daily 18-12-52—On a Cloudy Day—By S. Moitra

[illegible]—Fugitive III—9—The clouds thicken (432)

বন্ধু—মিলনের প্রথম দিনে বাঁশি—Fugitive II—9—When we two first met (422)

—Golden Boat—Cloud Messenger

—V. B. Q. August-October 1950—Cloud Messenger—by S. Moitra

সন্ধ্যা ও প্রভাত—এখানে নামল সন্ধ্যা—Golden Boat (1932)—Eastern Eve and Western Dawn

[illegible]—Fugitive III 22—The house lingering on (439)

[illegible]—Fugitive III [illegible]—Our Lane is tortuous (438)

[illegible]—Fugitive II [illegible]—While stepping into the carriage (417)

—Eastern [illegible] Winter 1955-56—Glance Tr. by Sheila Chatterji

[illegible]—Fugitive II [illegible]—I remember the day (416)

—Golden Boat 1932—A rainy noon

[illegible]—Fugitive II 22—She went away when the night was about to wane (424)

[illegible]—Fugitive II 24—The name she called me by (425)

[illegible]—Fugitive II 27—I was walking along a path (426)

[illegible]—Fugitive II 21—The father came back (423)

—Hind. Std. [illegible]—The [illegible] Question—Tr. by H. P. Chattopadhyay

[illegible]—Golden Boat—Tell me a story

[illegible]—Golden Boat—Meenu

[illegible]—Golden Boat—Name

[illegible]—Fugitive III 25—The man had no useful work (44[illegible])

—Golden Boat 1955—[illegible] wrong man in workers' paradise

রাজপুত্র—রাজপুত্র চলেছে পরের রাজ্য ছেড়ে—Golden Boat—The Prince

—Hind. Std. Annual 1955—The Fairy Prince—by Khitish Ray

বিদূষক—কাঞ্চীর রাজা কর্ণাট জয় করতে গেলেন—Fugitive II—3—The general came before the silent andangry king (423)

সুয়োরাণীর সাধ—সুয়োরাণীর বুঝি মরণকাল এল—Golden Boat 1955—The Favourite Queen

ঘোড়া—সৃষ্টির কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে ছুটির ঘন্টা বাজে—Golden Boat—The Horse—Parrots Training

—The Trial of the Horse—By Surendranath Tagore

কর্তার ভূত—বুড়ো কর্তার মরণকালে দেশশুদ্ধ সবাই বলে উঠলো—Parrot's Training—Old Man's Ghost

—Golden Boat—The Ghost

তোতা কাহিনী—এক যে ছিল পাখী, সে ছিল মূর্খ—Parrot's Training and other stories—Parrot's Training

—The New Age 8-5-55—The Tale of a Parrot

অস্পষ্ট জানালার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায়—Golden Boat—Seen in Half light

পট—যে শহরে অভিরাম—Fugitive II—30—A painter was selling picture (427)

নতুন পুতুল—এই গুণী কেবল পুতুল তৈরি করত—Golden Boat—New Dolls and Old

—Sunday Std. Madras 23-5—The New Dolls—by Anjali Sarkar

উপসংহার—ভোজরাজের দেশে যে মেয়েটি—Golden Boat—The Last song

[illegible]—সেদিন যুদ্ধের খবর ভালো ছিল না—Golden Boat—The Trophy of Victory
—Hind. Std. Ann. 1962—Repetition—by S. Moitra

[illegible]—স্বর্গের অধিকারে মানুষ বাধা পাবে না—Fugitive III 23—In the depths of the forest (441)
—Golden Boat—Attainment—Alone in the depth of the forest

[illegible]—বধূর সঙ্গে তার প্রথম মিলন—Fugitive III 18—With the morning, he came out (436)

[illegible]—রথযাত্রার দিন কাছে—Fugitive III 19—The day came for the image (436)

[illegible]—বিরহিণী তার ফুলবাগানের একধারে—Golden Boat—Salvation—Sunday Std. Madras 8-5-55—Deliverance—By Anjali Sarkar

[illegible]—রাজপুত্রের বয়স—Fugitive III 27—It is said that the forest (445)
—Hindusthan Standard Annual 1950—The Fairy Revealed By S. Moitra
—Golden Boat 1955—The Fairy reveals Herself
Sunday Standard Madras 6-5-56—The Way of a Fairy—By Anjali Sarkar

[illegible]—আমার [illegible]—Golden Boat—Life and Mind

[illegible]—আয়োজন চলেইছে—Fugitive I 21—Why these preparations (413)
—Hindusthan Standard 4-4-54—A song of the coming—by Somnath Moitra

[illegible]—Golden Boat—Heaven and Earth

[illegible]—Fugitive I 35—Fiercely they rend in pieces

ভ্রম সংশোধন

ভাদ্র সংখ্যা ৫৬৩ পৃষ্ঠায়—"[illegible]"

(১) [illegible] (Pilgrim) উল্লেখ ভুলক্রমে এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(২) Visva Bharati Quarterly [illegible] January 1930 স্থলে 1929 হবে।

'[illegible]' [illegible] নং কবিতা—"পুরাতন [illegible]"

(১) Poems 58—The last tired night of the year

(২) Modern Review, April 1922—Pilgrim

সংযোজিত হবে :

গীতালি—"মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে"—Fruit Gathering 24—"The night is dark (486)

বিদেশের কথা

শ্রীযোগনাথ মুখোপাধ্যায়

মাল্টা

ভূমধ্যসাগরের প্রায় মধ্যস্থানে অবস্থিত তিনটি ক্ষুদ্র দ্বীপের সমষ্টি মাল্টা গত ২১শে সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করে। ১৮০২ সালে ব্রিটেন ফ্রান্সের দখল থেকে ঐ দ্বীপপুঞ্জটি ছিনিয়ে নেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ সরকার মাল্টাকে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করার প্রস্তাব করেছিলেন, কিন্তু মাল্টাবাসীরা গণভোটের মাধ্যমে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। তবে স্বাধীন হওয়ার পরেও মাল্টা কমনওয়েলথে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

যে তিনটি দ্বীপ নিয়ে মাল্টা দ্বীপপুঞ্জ, তাদের নাম মাল্টা, গোজো ও কোমিনো। মাল্টার আয়তন ৯৫ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা ৩ লক্ষ ২ হাজার ; গোজোর আয়তন ২৬ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা ২৭ হাজার, আর কোমিনোর আয়তন মাত্র এক বর্গমাইল ও দ্বীপটি প্রায় জনশূন্য। অর্থাৎ, সদ্য স্বাধীন মাল্টার আয়তন ১২২ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা তিন লক্ষ ত্রিশ হাজার। এমন একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ভারতের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন, কারণ এদেশের যে-কোন রাজ্যের ক্ষুদ্রতম জেলাও মাল্টার চেয়ে বড়।

প্রাকৃতিক সম্পদেও মাল্টা দীন, কোন উল্লেখযোগ্য খনিজ সম্পদ্ নেই সেদেশে। এমন কি একটি নদী বা ঝর্ণারও অস্তিত্ব নেই মাল্টায় ; কৃষি ও পানীয় জলের জন্য মাল্টাবাসীদের নির্ভর করতে হয় বৃষ্টির জলের উপরে। বৃষ্টির প্রতি ফোঁটা জল একারণে মাল্টাবাসীরা সযত্নে ধরে রাখে। তার পর যে সামান্য ফসল ফলে মাল্টায়, তাতে মাল্টাবাসীদের প্রয়োজন পূরণ হয় না। একারণে খাদ্য, বস্ত্র এবং প্রায় যাবতীয় নিত্যপ্রয়োজনীয় সমগ্রীর জন্য মাল্টাকে অন্যান্য দেশের শরণ নিতে হয়। এই ভাবে পরনির্ভর একটি দেশের স্বাধীন ভাবে চলা খুবই কঠিন। এই কারণে তার দেড় হাজার বছরের সভ্যতা[র] ইতিহাসে দেখা যায়, কখনও সে স্বাধীন থাকে নি[।] ফিনিশিয়-রোমান-আরব-তুর্কী-স্পেনীয় শাসকদের হা[তে] পর পর শাসিত হওয়ার পর মাল্টা চ'লে যায় ফ্রান্সে[র] দখলে। তার পর ফরাসী সৈন্যদের অত্যাচারে অ[তিষ্ঠ] হয়ে উনিশ শতকের প্রারম্ভে মাল্টাবাসীরা নিজের[া] ব্রিটেনের শরণাপন্ন হয়। মাল্টার আমদানি-রপ্তা[নির] হিসাব পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায় যে, ঐ দে[শ] দৈনন্দিন প্রয়োজনের জন্য কতটা অন্যের উপর নির্ভরশী[ল।] ১৯৬১ সালে মাল্টা রপ্তানি করে প্রায় সাড়ে ছেচ[ল্লিশ] লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের পণ্য, আর আমদানি করে দুই কো[টি] পঁচানব্বই লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের পণ্য। এই আমদা[নি-] রপ্তানিজনিত বিরাট্ ঘাটতি এতদিন পূরণ হ[তো] ব্রিটেনের রাজস্বভাণ্ডার ও মাল্টায় অবস্থিত নৌঘাঁটির ব্রিটিশ সরকারের ব্যয় থেকে। কিন্তু ব্রিটেন চলে যাও[য়ার] পর দশ বছরের মধ্যে ব্রিটিশ নৌঘাঁটি মাল্টা থেকে স[রিয়ে] প্রত্যাহৃত হবে এবং ব্রিটেনের রাজস্বভাণ্ডার থে[কে] মাল্টা আর ঘাটতি পূরণের টাকা পাবে না। সুত[রাং] ইতিমধ্যে অন্য উপায়ে মাল্টা স্বয়ংসম্পূর্ণ না হ'তে পা[রলে] মাত্র ১২২ বর্গমাইল ভূমিসম্বল ক্রমবর্ধিষ্ণু মাল্টাবাসী[কে] খুবই সঙ্কটের সম্মুখীন হ'তে হবে।

অবশ্য মাল্টার শাসকবর্গ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সচে[তন] এবং এ কারণে ইতিমধ্যেই মাল্টায় বহু ছোট শিল্প [গড়ে] উঠতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু মাল্টা সবচেয়ে বেশী গু[রুত্ব] দিচ্ছে পর্যটন ব্যবসায়ের উপর। ভূমধ্যসাগরীয় ঐ দ্বী[প-] পুঞ্জটির পুরাকীর্তি, আবহাওয়া ও পত্রপুষ্প বিশ্বের পর্য[টক-] দের কাছে এক দুর্নিবার আকর্ষণ। শিক্ষিত যুবক[দের] বিদেশে পাঠিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্যও ম[াল্টা] বিশেষ তৎপর। মাল্টা সরকার বেলজিয়াম, কানা[ডা,] অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতির সঙ্গে সরকারী ভাবে ব্যবস্থা ক[রে] কর্মদক্ষ যুবকদের ঐ সব দেশে পাঠান। ১৯৪৬ থে[কে]

১ সালের মধ্যে সত্তর হাজারেরও বেশী যুবক ঐ
ম্বানুসারে মাল্টা ত্যাগ করেছে।

মাল্টার রাজধানী ভালেট্টা একটি প্রাচীন শহর, তার
কসংখ্যা আঠার হাজারেরও বেশী। মাল্টার দৈনিক
াদপত্র আছে পাঁচটি, তার মধ্যে দু'টি ইংরেজী ও
াটি মাল্টিজ ভাষায় প্রকাশিত।

জাম্বিয়া

আফ্রিকার আরও একটি দেশ উত্তর রোডেশিয়া ২৪শে
ৌবর স্বাধীনতা লাভ করে এবং স্বাধীন হওয়ার পর
। নাম হয় জাম্বিয়া। জাম্বিয়ার আয়তন ২,৯০,৫৮৭
াইল, এবং ৬৩ সালের হিসাব অনুসারে লোকসংখ্যা
লক্ষ ৪০ হাজার। তাদের মধ্যে ৭২ হাজার শ্বেতাঙ্গ
নিবেশী এবং এশীয় ও মিশ্রজাতীয় কিঞ্চিদধিক এগার
ার। আয়তন ও জনসংখ্যার হিসাব থেকেই বোঝা
ব, জাম্বিয়া জনবিরল দেশ। প্রতি বর্গমাইলে লোক-
ত ঘনত্ব মাত্র আট।

প্রাকৃতিক সম্পদেও জাম্বিয়া সমৃদ্ধ, তার সবচেয়ে বড়
দ্ তামার খনি, যা থেকে বছরে সাড়ে তেত্রিশ কোটি
র আয় হয় তার। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই
ম্বিয়ার অধিবাসীরা তামার ব্যবহার জানত, পরে
রজ উপনিবেশীরা এসে ঐ সব তামার খনিকে বিরাট
ল্প পরিণত করে। কোবাল্ট ইউরেনিয়াম প্রভৃতি
ব পদার্থও পাওয়া যায় জাম্বিয়ায়। জাম্বিয়ার খনিজ
দের প্রাচুর্য তার কৃষিক্ষেত্রে অনগ্রসরতার অন্যতম
ণ। জাম্বিয়ার অন্যতম আকর্ষণ ভিক্টোরিয়া জল-
াত। নায়গ্রার চেয়েও উঁচু ও প্রশস্ত ঐ জলপ্রপাতটি
ম্বর পর্যটকদের অবশ্য-দ্রষ্টব্যগুলির বিশেষ একটি।

জাম্বিয়ার শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশীরা সেখানকার কোন
নৈতিক সমস্যা নয়। দক্ষিণ আফ্রিকা বা দক্ষিণ
ডেশিয়ার শ্বেতাঙ্গদের মত কোন বিশেষ রাজনৈতিক
কার তারা ভোগ করে না। জাম্বিয়ার মোট জমির
২·৫ শতাংশ আছে শ্বেতাঙ্গদের অধিকারে।
ম্বিয়ার আইন সভার ৭৫টি আসনের মধ্যে মাত্র ১০টি
ক্ষিত আছে শ্বেতাঙ্গদের জন্য। এই বছর জানুয়ারী
মাসে যেনির্বাচন হয় তাতে দশটি আসনই অধিকার
করে শ্বেতাঙ্গদের দল ন্যাশনাল প্রগ্রেসিভ পার্টি। ঐ
দলটির সঙ্গে জাম্বিয়ার বর্তমান শাসকদলের কোন
বৈরিতা নেই।

জাম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট কেনেথ কাউণ্ডাও বহিরাগত-
দের সম্বন্ধে উদার নীতি পোষণ করেন। তিনি বলেন,
বহিরাগত যে-সব নরনারী জাম্বিয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস
করছেন তাঁরা যদি জাম্বিয়াকে তাঁদের মাতৃভূমিরূপে
গ্রহণ করেন তবে জাম্বিয়ায় নিরাপদে ও সসম্মানে থাকার
ব্যাপারে তাঁদের কোনই অসুবিধা হবে না। বিদেশীদের
স্থান দেওয়ার মত যথেষ্ট জায়গা আছে জাম্বিয়ায়।

১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাসে জাম্বিয়ায় যে সাধারণ
নির্বাচন হয় তাতে কেনেথ কাউণ্ডার নেতৃত্বাধীন
ইউনাইটেড ন্যাশনাল ইণ্ডিপেণ্ডেন্স পার্টি ৭৫টি আসনের
মধ্যে ৫৫টিতে জয়ী হন। হ্যারী এনকুম্বলার নেতৃত্বাধীন
প্রধান বিরোধী দল আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস পান
১০টি আসন। কাউণ্ডা এবং এনকুম্বলা এক সময় একই
দলে ছিলেন এবং প্রেসিডেন্ট কাউণ্ডা এখনও তাঁর
প্রাক্তন সহকর্মী ও বর্তমান বিরোধী দলনেতা এনকুম্বলার
প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল। অনেকটা গণতন্ত্রের মৌলিক
প্রয়োজনেই আজ জাম্বিয়ায় দু'টি রাজনৈতিক দল গড়ে
উঠেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জাম্বিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক
যথেষ্ট নিকট ও সৌহার্দপূর্ণ হওয়ার সুযোগ আছে।
জাম্বিয়ার সর্বজনশ্রদ্ধেয় জননেতা কেনেথ কাউণ্ডা নিজেকে
গান্ধীবাদী বলে পরিচয় দেন। গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ ও
অহিংসা তাঁর রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত জীবনের আদর্শ।
গান্ধী-অনুসৃত পথেই তিনি জাম্বিয়ার স্বাধীনতা
আন্দোলন পরিচালিত করেন এবং শাসকপক্ষের শত
প্ররোচনাতেও সে-পথ থেকে বিচ্যুত হন না। জেলেও
তিনি গান্ধীর লেখা পড়ে সময় কাটাতেন। মাত্র চল্লিশ
বছর বয়সে কেনেথ কাউণ্ডা জাম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট
নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর প্রশাসনিক সাফল্য ও
জাম্বিয়ার অগ্রগতি ভারতবাসী মাত্রেরই আনন্দের কারণ
হবে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারত সারা বিশ্বের
বন্ধুত্বলাভের জন্য প্রাণপাত করলেও তার প্রকৃত বন্ধুর

সংখ্যা খুবই নগণ্য। সেইদিক থেকে বিচার করলে জাম্বিয়ার বন্ধুত্বের মূল্য ভারতের কাছে সীমাহীন।

কানাডায় বিক্ষোভ

গ্রেটব্রিটেনের রাণী ও কানাডার রাষ্ট্রপ্রধান এলিজাবেথের কানাডা সফরকে কেন্দ্র করে এবার কানাডায় খুব রাজনৈতিক চাঞ্চল্য দেখা দেয়। রাণীর সফর অবশ্য উপলক্ষ্যমাত্র, বিক্ষোভের প্রকৃত কারণ উত্তর আমেরিকার ঐ বিশাল দেশটির দুই প্রধান জাতীয়তার ক্রমবর্ধমান বিরোধ।

কানাডার এক কোটি আশি লক্ষ লোকের মধ্যে প্রায় পঞ্চান্ন লক্ষ ফরাসী, বাকি সকলে ইংরেজ অথবা ইংরেজী ভাষা। ঐ পঞ্চান্ন লক্ষ ফরাসীর মধ্যে আবার পঞ্চাশ লক্ষেরও বেশি বাস করে শুধু কুইবেক প্রদেশে। ১৭৬৩ সালে ইংরেজরা কুইবেক ফরাসীদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে কানাডার সঙ্গে যুক্ত করে। তারপর দু'শ বছর ধরে সম্পদ্‌বহুল ঐ দেশটিতে ইংরেজ ও ফরাসীরা মিলে-মিশে একটি জাতি গঠনের চেষ্টা করেছে, কিন্তু সাম্প্রতিক ঘটনাবলী থেকে বোঝা যায় যে, ঐ সংহতির প্রয়াস খুব বেশি সফল হয় নি। কানাডার পার্লামেণ্ট ও যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতে ইংরেজীর সঙ্গে ফরাসীও সরকারী ভাষা। কুইবেক প্রদেশেও ইংরেজীর মত ফরাসী সরকারী ভাষার মর্যাদা পেয়েছে। কিন্তু ফরাসীরা এইটুকু স্বীকৃতিতে সন্তুষ্ট নয়, তাদের দাবি কানাডার যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনের সকল বিভাগে এবং তার আটটি প্রদেশ ও দু'টি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ফরাসীকে ইংরেজী-ভাষার সমান মর্যাদা দিতে হবে। ফরাসীদের মধ্যে শতকরা কুড়িজনও ভাল ইংরেজী জানে না, এ কারণে কানাডার সকল সরকারী দপ্তরে বা রেল, বন্দর, ইত্যাদি বড় বড় সংস্থায় ফরাসী পদস্থ কর্মচারীর সংখ্যা অতি নগণ্য। দেশের শিল্প উদ্যোগেও ফরাসীদের ভূমিকা নগণ্য। এ সবের সঙ্গে ধর্মীয় পার্থক্যও কানাডার ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে কম ব্যবধান সৃষ্টি করে নি। কানাডার ইংরেজরা প্রোটেষ্টাণ্ট, আর ফরাসীদের মধ্যে শতকরা সাতাশিজন ক্যাথলিক। এসব কারণে কুই-বেকের ফরাসীদের একাংশ এখন এত বিক্ষুব্ধ যে, তারা নিজেদের কানাডিয়ান না ব'লে কুইবেকোস ব'লে পরি দেয় এবং কুইবেককে কানাডা থেকে বিচ্ছিন্ন করে তা একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ঐ বিচ্ছে কামীরাই রাণী এলিজাবেথের কানাডা সফরকালে এ প্রচণ্ড বিক্ষোভ সংগঠনের চেষ্টা করে। তারা র এলিজাবেথকে কানাডার রাষ্ট্রপ্রধান ব'লে স্বীকার ক চায় না। রাণী তাদের মতে 'এ্যাংলো-স্যাক্সন সাম্রা বাদের প্রতীক' যে 'সাম্রাজ্যবাদের বন্ধন' থেকে ত মুক্তি পেতে চায়। রাণীর সফরের পূর্বে কুইবেকের ফ পত্রিকাগুলির মাধ্যমে এমন গুজব পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে রাণী কুইবেক সফরে গেলে ফরাসী সন্ত্রাসবাদীরা হত্যা করতে পারে। কানাডা সরকারের দৃঢ়তার অবশ্য শেষ পর্যন্ত রাণীর কানাডা সফর নির্বিঘ্নে শেষ এবং নিশ্ছিদ্র পুলিশ প্রহরার মধ্যে বুলেট-প্রুফ গা চেপে রাণী কোনরকমে কুইবেক সফর শেষ আসেন।

কিন্তু কুইবেকের ফরাসীদের খুব সহজে শা নিরস্ত করা যাবে ব'লে মনে হয় না। কানাডার জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলি কুইবেকে খবই সেই প্রদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জীন লেসেজ সমর্থকরা "আমরাই আমাদের ভাগ্যনিয়ন্তা" এই দিয়ে নির্বাচনে জয়লাভ করেন। তাঁরা অবশ্য কুইবেকের স্বাধীনতার প্রস্তাব সমর্থন করেন না কানাডার ইংরেজ-প্রভাবিত জাতীয় আন্দোলনে তাঁদের বিরোধ সুস্পষ্ট।

ব্রিটেনে শ্রমিক শাসন ঃ

তের বছর বাদে শ্রমিক দল নির্বাচনে সংখ্যাগ লাভ করে আবার ব্রিটেনের শাসন দায়িত্বে হয়েছেন। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে দল যুদ্ধজয়ী চার্চিলের নেতৃত্বে পরিচালিত রক্ষণশীল বিরুদ্ধে আশাতীত সাফল্যলাভ করে ব্রিটেনের ধিকার লাভ করেন। কিন্তু পাঁচ বছর পরে আ সাধারণ নির্বাচন হয় তাতে শ্রমিক দল জয়ী আগের বারের মত সাফল্য অর্জন করতে পারে মাত্র সাত ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে মিঃ

...র মন্ত্রিসভা গঠন করেন কিন্তু সেই সামান্য সংখ্যা-ষ্ঠতাকে তিনি শ্রমিক দলের পক্ষে জাতির সুনিশ্চিত ব'লে ভাবতে পারেন না। এ কারণে কিঞ্চিদধিক বছরের ব্যবধানে, ১৯৫১ সালে আবার ব্রিটেনে ...রণ নির্বাচন হয়। সে নির্বাচনে শ্রমিক দল রক্ষণ-দলের চেয়ে ভোট বেশি পেলেও হাউস অফ কমন্সে ...শীল সতরটি বেশি আসন লাভ করেন, এবং স্যার ...ষ্টন চার্চিলের নেতৃত্বে আবার ব্রিটেনে রক্ষণশীল ...ন কায়েম হয়। তারপরেই নীতি ও কর্মসূচী নিয়ে ...ক দলের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয় এবং তার ফলে ...টনবাসীদের উপর তাদের প্রভাব হ্রাস পায়। এ ...ণে পরের দু'টি সাধারণ নির্বাচনেও শ্রমিক দলকে ...স্ত হ'তে হয়।

কিন্তু রক্ষণশীল দলের একটানা তের বছরের শাসনের ...ধ্যেও ব্রিটেনের জনমত ক্রমে শক্তিশালী হ'তে থাকে ...ঃ সুয়েজ সংকট, ইউরোপের খোলা বাজারে ব্রিটেনের ...দানের ব্যর্থতা, প্রফুমো কেলেঙ্কারী এবং পরিশেষে ...া নির্বাচনে দলাদলি রক্ষণশীল দলকে ব্রিটেনবাসীদের ...ছে ক্রমে ক্রমে অপ্রিয় করে তোলে। অপরপক্ষে ...ল্ড উইলসনের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে শ্রমিক দল ক্রমে ঐক্য-হয়ে ওঠেন এবং ব্রিটেনের নির্বাচকদের উপর তাঁদের ...াব দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রায় এক বছর আগেই ...চন বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, শ্রমিকদলের ক্রমবর্ধমান ...প্রিয়তা হঠাৎ কোন কারণে ক্ষুণ্ণ না হ'লে তাঁদের ...ল্য অনিবার্য হবে। শেষ পর্যন্ত তাঁদের ভবিষ্যৎ ...ই সত্যে পরিণত হয়েছে। কিন্তু শ্রমিক দলের সংখ্যা-ষ্ঠতা আশানুরূপ হয় নি। হাউস অব কমন্সের ...টি আসনের মধ্যে তাঁরা পেয়েছেন ৬১৭টি, রক্ষণশীল পেয়েছেন ৬০৪টি এবং তৃতীয় দল উদারনীতিকরা ...য়েছেন ৯টি। অর্থাৎ, শেষোক্ত দুই দলের মিলিত ...র চেয়ে শ্রমিক দল মাত্র চারটি আসন বে... ...য়েছেন। বলা বাহুল্য, এ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিরাপদ নয়, ...বা অনিবার্য কারণে অনুপস্থিতি যে-কোন মুহূর্তে সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতার অবসান ঘটাতে পারে। ...রণে শ্রমিকদলের কোন কোন নেতা লিবারেল দলেরও সঙ্গে কোয়ালিশন করার প্রস্তাব করেছেন। লিবারেল দলেরও তাতে খুব আপত্তি নেই, কারণ অবিলম্বে আবার একটা সাধারণ নির্বাচনের ঝুঁকি তাঁরাও নিতে চান না। কিন্তু শ্রমিক দলের ইস্পাত জাতীয়করণের প্রস্তাব তাঁরা মানতে রাজী নন, এবং শ্রমিক দলও তাঁদের নির্বাচনী ফতোয়া পুরাপুরি কার্যকরী করতে দৃঢ়সঙ্কল্প। এ অবস্থায় "লিব-ল্যাব কোয়ালিশন" হওয়া একটু কঠিন হবে। সুতরাং শ্রমিক দলের সাফল্যে যাঁরা আনন্দিত হয়েছেন, শ্রমিক দলের ক্ষমতাসীন থাকার অনিশ্চয়তা ইতিমধ্যেই তাঁদের চিন্তিত করে তুলেছে।

শ্রমিক দলের সঙ্গে এশিয়া ও আফ্রিকার প্রাক্তন ব্রিটিশ উপনিবেশগুলির অধিবাসীদের একটা আত্মিক সংযোগ আছে। কারণ শ্রমিক সরকারই ভারত, বর্মা, সিংহল প্রভৃতির স্বাধীনতা ত্বরান্বিত ক'রে যে উপনিবেশ-বাদ-বিরোধী অভিযান সুরু করেন তারই ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশে অর্ধশতাধিক দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে। আজও ব্রিটেনে শ্রমিক শাসন রোডেশিয়ার শ্বেতাঙ্গ শাসনের বিরুদ্ধে কৃষ্ণাঙ্গদের মুক্তি অভিযানকে নতুন করে অনুপ্রাণিত করে তুলেছে। এই মুহূর্তে কোন কারণে শ্রমিক শাসনের অবসান খুবই দুর্ভাগ্যজনক হবে।

ক্রুশ্চভের পদত্যাগ :

সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী পদ হ'তে নিকিতা ক্রুশ্চভের হঠাৎ অন্তর্ধান সারা বিশ্বকে ব্যথিত ও বিচলিত করে। যুদ্ধক্লান্ত বিশ্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা-কল্পে তাঁর অনলস প্রয়াস ও ষ্টালিনি সন্ত্রাস থেকে কম্যুনিষ্ট দেশগুলিকে মুক্ত করার ব্যাপারে তাঁর অভাবিত সাফল্য সারা বিশ্বের শান্তি ও মুক্তিকামী মানুষের মনে গভীর রেখাপাত করে, এবং সকলেই আশা করেন যে, শক্তিশালী সোভিয়েট জনগণের অধিনায়করূপে অনতি-বিলম্বে তিনি বিশ্ববাসীর সম্মুখে এমন আদর্শ স্থাপন করতে পারবেন, যা দীর্ঘকাল ন্যায় ও শান্তির পথের একমাত্র দিগদর্শনরূপে সার্বজনীন স্বীকৃতিলাভ করবে। কিন্তু সোভিয়েট নেতৃত্ব হ'তে তাঁর হঠাৎ অপসারণ বিশ্ববাসীর

সেই আশাকে সাংঘাতিকভাবে আহত করে। ক্রুশ্চভের পদত্যাগের কারণ এখনও পর্যন্ত সঠিক জানা যায় নি, তবে বিভিন্ন মহল থেকে প্রকাশিত সংবাদে মনে হয়, বর্তমান সোভিয়েট নেতাদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত বিরোধই এর জন্য মুখ্যত দায়ী। গোড়ার দিকে নানা রকম কথা শোনা গেলেও শেষ পর্যন্ত সোভিয়েট নেতারা যা বলেন তা সত্য হ'লে বুঝতে হবে যে, ক্রুশ্চভ না থাকলেও তাঁর নীতি সোভিয়েট ইউনিয়ন পূর্বের মতই অনুসরণ করবে। কম্যুনিষ্ট তথা অকম্যুনিষ্ট দেশগুলিতে ক্রুশ্চভের সমর্থনে প্রবল প্রতিক্রিয়াই বোধহয় নূতন সোভিয়েট নেতৃত্বকে আপাতত সংযত করেছে। ক্রুশ্চভের শাসনকালে সোভিয়েট ইউনিয়ন সারা বিশ্বের বিভিন্ন মহলে যে শ্রদ্ধা ও আস্থা অর্জন করেছে, এখনই ক্রুশ্চভ-বিরোধী জেহাদ ঘোষণা করলে তা যে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হবে এটা হয়ত নতুন সোভিয়েট কর্ণধাররা বুঝতে পেয়েছেন।

প্রেসিডেন্ট জনসন জয়ী

প্রেসিডেন্ট জনসন মার্কিন জনগণের বিপুল সমর্থন লাভ করে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শাসন-দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তাঁর ভোটের পরিমাণ নির্বাচন বিশেষজ্ঞদের সব অনুমান অতিক্রম ক'রে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের ইতিহাসে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি রাজ্যের মধ্যে ৪৪টি প্রেসিডেন্ট জনসনকে সমর্থন জানিয়েছে, এবং ৫৩৮টি নির্বাচনী ভোটের মধ্যে ৪৮৬টি গেছে তাঁর অনুকূলে। প্রতিদ্বন্দ্বী রিপাবলিকান প্রার্থী সেনেটর গোল্ডওয়াটার মাত্র ছয়টি বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণী রাজ্যের ও ৫২টি নির্বাচনী ভোটের সমর্থন পেয়ে শোচনীয় পরাজয় স্বীকার করেছেন। সাধারণ ভোটের হিসাবে দেখা যায়, জনসনের পক্ষে গোল্ডওয়াটারের চেয়ে প্রায় দেড় কোটি ভোট বেশি পড়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের কোন প্রেসিডেন্ট ইতিপূর্বে এত বেশি ভোটের ব্যবধানে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করতে পারেন নি। যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম মহান্ প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের ১৯৩৬ সালে এক কোটি দশ লক্ষ ভোটের ব্যবধানে জয়ই এতদিন বৃহত্তম জয়রূপে স্বীকৃত ছিল।

প্রেসিডেন্ট জনসনের এই বিরাট্ সাফল্য তাঁর জনপ্রিয়তার চেয়েও গোল্ডওয়াটারের সঙ্কীর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল নীতির প্রতি মার্কিণ জনগণের বিরূপতা বেশি প্রমাণ করে। কারণ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডিমক্রাট দল যে বিপুল সমর্থন লাভ করেছেন কংগ্রেসের দুই সভার সদস্য নির্বাচনে বা গভর্ণর নির্বাচনে সেরকম সমর্থন তাঁরা পান নি। এতে এইটাই প্রমাণ হয় যে, রিপাবলিকান দলের লক্ষ লক্ষ সমর্থক দলের প্রতি অনুগত থেকেও গোল্ডওয়াটারের বিরুদ্ধে জনসনকে সমর্থন করেছেন। আর দলকে যে তাঁরা এখনও সমর্থন করেন তার প্রমাণ দিয়েছেন অন্যান্য নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থীদের সমর্থন করে। নিউ ইয়র্ক, কালিফোর্ণিয়া, উইলকিনসন, কানসাস, কলোরাডো, ইলিনয়, ওকলাহোমা, ওয়াশিংটন, ফ্লোরিডা, মনটানা, নেভাদা প্রভৃতি রাজ্য গত নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থীকে সমর্থন জানালেও এবার ডিমক্রাটিক প্রার্থীর পক্ষে সমবেত হয়ে রিপাবলিকান প্রার্থীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের সরকারী মহল মার্কিণ নির্বাচনের ফলাফল সম্বন্ধে মন্তব্যকালে বলেছেন, যুদ্ধবাদী গোল্ডওয়াটারকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত ক'রে মার্কিণ জনগণ প্রমাণ করেছেন, তাঁরা শান্তির পক্ষে ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে।

শ্রীচিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

মূল্যমানের তুলনামূলক বিচার

গত আশ্বিন সংখ্যায় ও তার পূর্বে ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যায় আমরা ভারতীয় মূল্যমান সম্বন্ধে কিছু তথ্য বিশ্লেষণ করেছি। তার পরও দেখা যায় যে, মূল্যবৃদ্ধি অব্যাহত গতিতে চলেছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই চলেছে বিবিধ উপায়ে এই গতিরোধের জন্য সরকারী প্রচেষ্টা। ঠিক কোন্ কারণে বা কোন্ কারণগুলির সমন্বয়ে বর্তমান মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে তাই নিয়ে এ যাবৎ বহু আলোচনা হয়েছে ; কারও মত হচ্ছে কৃষিপণ্যের উৎপাদন হ্রাসই এর অন্যতম কারণ—অপর একজন বলেন, সরকারী মুদ্রা ও রাজস্ব-নীতির অদূরদর্শিতা, আবার অপর একদল বলেন, অসাধু ব্যবসায়ীদের কারসাজিই এর জন্য দায়ী। সম্ভবতঃ সবগুলিই কিছু পরিমাণে দায়ী। পূর্বের প্রবন্ধগুলিতে আমরা যে-সব তথ্য উপস্থিত করেছি তার থেকে সঠিক কারণ সম্বন্ধে মোটামুটি এক আভাস পাওয়া যায়।

বর্তমান প্রবন্ধে আমরা অন্যান্য দুই-একটি দেশের take off period-এর সময়কার মূল্যমানের গতির সঙ্গে আমাদের মূল্যমানের সাদৃশ্য বা পার্থক্য-সংক্রান্ত কিছু তথ্য উপস্থিত করছি। ইংলণ্ডের take off period বলা যেতে পারে ১৭৮৩ থেকে ১৮০২ পর্যন্ত ; যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৪৩ থেকে ১৮৬০ পর্যন্ত। ঐ দু'টি পর্বের সঙ্গে আমাদের take off period-এর মূল্যমান তুলনা করা নানান কারণেই ঠিক সম্ভব নয়। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। তা ছাড়া Index number তৈরীর উপাদান ও পন্থাও প্রভৃত বদলেছে ; উপরন্তু সরকারী ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্যকলাপের পরিধি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মূল্য-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিরও প্রচুর বদল ঘটেছে। এ সব পার্থক্যের কারণ উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও সাদৃশ্যও কিছু কিছু আছে, কেননা মূল অর্থনৈতিক নীতি বা মতবাদ মোটামুটি তুলনীয়। চাহিদা ও সরবরাহের দ্বারা, মূল্য নির্ধারিত হবে এবং ব্যক্তিগত লাভের তাগাদায় লোকে পণ্য উৎপাদন করবে, এই মূল নীতি প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থায় আছে। তাই যদিও তিনটি দেশের তিনটি বিভিন্ন সময়ের মূল্যমান বিচার করে আমরা কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারব না, তবু এই তুলনা থেকে আমরা পরবর্তীকালের জন্য কিছু চিন্তার উপকরণ পেতে পারি।

নিম্নলিখিত তালিকাতে তিনটি দেশের মূল্যমান উল্লেখ করা হ'ল—

ইংলণ্ড (১৭৯০=১০০)

(১) বছর	(২) মূল্যসূচক	(৩) বাৎসরিক শতকরা বদল
১৭৮২	১১৫	...
১৭৮৩	১১৫	...
১৭৮৪	১০৭	(−)৭
১৭৮৫	১০৪	(−)২.৮
১৭৮৬	৯৮	(−)৫.৮
১৭৮৭	১০০	(+)২.০
*১৭৮৮	১০০	...
১৭৮৯	৯৮	(−)২.০
১৭৯০	১০০	(+)২.০
১৭৯১	১০২	(+)২.০
**১৭৯২	১০৭	(+)৪.৯
*১৭৯৩	১১৪	(+)৬.৫
১৭৯৪	১১২	(−)১.৮
১৭৯৫	১৩৪	(+)১৯.৬
*১৭৯৬	১৪৪	(+)৭.৫
*১৭৯৭	১২৬	(−)১২.৫
১৭৯৮	১৩৬	(+)৭.৯
১৭৯৯	১৫০	(+)১০.৩
**১৮০০	১৬২	(+)৮.০
*১৮০১	১৭৬	(+)৮.৬
**১৮০২	১৩৭	(−)২২.২
*১৮০৩	১৪৭	(+)৭.৩

যুক্তরাষ্ট্র (১৭৯১=১০০)

(১) বছর	(২) মূল্যসূচক	(৩) বাৎসরিক শতকরা বদল
১৮৪০	৯৭	...
১৮৪১	৯৬	(−)১.০
১৮৪২	৮৩	(−)১৩.৫
১৮৪৩	৮১	(−)২.৪
১৮৪৪	৮৫	(+)৫.০
১৮৪৫	৮৮	(+)৩.৫
১৮৪৬	৮৯	(+)১.১
১৮৪৭	৯৮	(+)১০.১
১৮৪৮	৮৭	(−)১১.২
১৮৪৯	৮৬	(−)১.১
১৮৫০	৯৩	(+)৮.১
১৮৫১	৯২	(−)১.১
১৮৫২	৯৭	(+)৫.৪
১৮৫৩	১১১	(+)১৪.৪
১৮৫৪	১২২	(+)৯.৯
১৮৫৫	১২৭	(+)৪.১
১৮৫৬	১২৮	(+)০.৮
১৮৫৭	১৩৩	(+)৩.৯
১৮৫৮	১০৫	(−)২১.১
১৮৫৯	১০৮	(+)২.৯
১৮৬০	১০৪	(−)৩.৭
১৮৬১	১০৬	(+)১.৯
১৮৬২	১৫৭	(+)৪৮.১

ভারতবর্ষ ১৯৫২-৫৩=১০০

(১) বছর	(২) মাসের শেষ সপ্তাহের গড়	(৩) বাৎসরিক শতকরা বদল	(৪) মাসিক গড়	(৫) বাৎসরিক শতকরা বদল
১৯৫১-৫১	...	...	১১৮	...
১৯৫২-৫৩	১০০	...	১০০	(−)১৫.৩
১৯৫৩-৫৪	১০১.২	(+)১.২	১০৪.৬	(+)৪.৬
১৯৫৪-৫৫	৮৯.৬	(−)১১.৫	৯৭.৪	(−)৬.৯
১৯৫৫-৫৬	৯৯.২	(+)১০.৭	৯২.৫	(−)৫.০
১৯৫৬-৫৭	১০৫.১	(+)৫.৯	১০৫.২	(+)১৩.৭
১৯৫৭-৫৮	১০৬.১	(+).৯৫	১০৮.৪	(+)৩.০
১৯৫৮-৫৯	১১২.১	(+)৫.৭	১১২.৯	(+)৪.২
১৯৫৯-৬০	১১৮.৭	(+)৫.৪	১১৭.১	(+)৩.৭
১৯৬০-৬১	১২৭.৫	(+)৭.৪	১২৪.৯	(+)৬.৭
১৯৬১-৬২	১২২.৯	(−)৩.৬	১২৫.১	(+).২
১৯৬২-৬৩	১২৭.৪	(+)৩.৭	১২৭.৯	(+)২.২
১৯৬৩-৬৪	১৩৯	(+)৯.১	১৩৫.৩	(+)৫.৮

* বাণিজ্যচক্রে মন্দা শুরুর বছর

** বাণিজ্যচক্রে চড়া বাজার শুরু

তিনটি দেশের অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক পার্থক্য প্রচুর; (নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধ চলাকালীন ইংলণ্ডের ব্যবসাবাণিজ্য ও মূল্যমান কি ভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল তার চিত্র বর্তমান মূল্যসূচকে প্রতিফলিত হচ্ছে আংশিক ভাবে, আমেরিকার গৃহযুদ্ধের প্রতিফলনও বর্তমান তালিকায় সবটা ফুটে উঠছে না) তা সত্ত্বেও মূল্যমানের ধারা তুলনামূলক ভাবে দেখলে সাদৃশ্য ও পার্থক্য উভয়ই বিশেষ ভাবে নজরে পড়ে।

প্রথম পনেরো বছরে ইংলণ্ডের বা যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যমান উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে যতটা উঠেছে তার সঙ্গে আমাদের মূল্যমানের ঊর্দ্ধ গতি তুলনীয়। আর আমাদের Take off পর্বের ঠিক পূর্বে মূল্যমান কতটা বেড়েছে তা পাব তৃতীয় তালিকায়। এরই সঙ্গে তুলনীয় গত শতাব্দীর শেষাংশ থেকে তিনটি দেশের মূল্যের গতি; দ্বিতীয় তালিকায় সেই তথ্য উপস্থিত করছি—

প্রথম যুদ্ধকালীন মূল্যবৃদ্ধির হিসাব বাদ দিয়ে দেখা যাচ্ছে ইংলণ্ডে ১৮৮৬র তুলনায় ১৯৪০এ মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে ৮৫.৫% শতাংশ; যুক্তরাষ্ট্রে ৩৭.২% এবং ভারতবর্ষে ৫৭.৫%।

পূর্ব এক প্রবন্ধে আমরা দেখেছি ১৯২৯ এর তুলনায় ১৯৩৯এ ভারতবর্ষের মূল্যমান ১০০ থেকে ৭৭এ নেমে এসেছিল, আর ইংলণ্ডে ৯১ এবং যুক্তরাষ্ট্রে ৮১। এর থেকে মনে প্রশ্ন আসে, অন্যান্য দেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভারতবর্ষের মূল্যমান আরও কতদূর বাড়তে পারে?

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম পাঁচ বছরে দেখা গেছে যুদ্ধ-পূর্ব দশ বছরের (১৯২৯-১৯৩৯) মূল্যহ্রাসের তুলনায় পরবর্তী পর্বের মূল্যবৃদ্ধি বহু গুণ বেশি এবং অন্যান্য দেশের তুলনায়ও অত্যধিক—

	ইংলণ্ড		যুক্তরাষ্ট্র	ভারতবর্ষ		
বছর	(১) (১৮৬৭-৭৭ = ১০০)	(২) (১৯০০ = ১০০)	(১) (১৯০০ = ১০০)	বছর	(১) (১৯৫২-৫৩ = ১০০)	(২) ১৯০০ = ১০০
১৮৮৬	৬৯	৯৫.৮	১০২	১৮৮৬-৯০	১৮.৬	৮৩
১৮৯০	৭২	৯৬.০	১০৫	১৮৯১-৯৫	২০.৮	৯২.৮
১৮৯৫	৬২	৮২.৭	৮৫			
১৯০০	৭৫	১০০	১০০	১৮৯৬-১৯০২	২২.৪	১০০.০০
১৯০৫	৭২	৯৬	১০৫	১৯০৩-০৭	২৩.৬	১০৫.৩
১৯১০	৭৮	১০৪	১২৫	১৯০৮-১২	২৭.৪	১২২.৩
১৯১৫	১০৮	১৪৪	১২৪	১৯১৩-১৮	৩১.৮	১৪২.০
১৯২০	২৫১	৩৩৪.৭	২৭৬	১৯১৯-২৫	৪৪.৮	২০০.০
১৯২৫	১৩৬	১৮১.৩	১৮৪			
১৯৩০	৯৬	১২৮.০	১৫৪	১৯২৬-৩০	৪০.০	১৭৮.৬
১৯৩৫	৮৩	১১০.৭	১৪৩	১৯৩১-৩৫	২৪.৪	১০৮.৯
১৯৪০	১২৮	১৭০.৭	১৪০	১৯৩৬-৪১	২৯.২	১৩০.৩

১৯৩৯ = ১০০

	ইংলণ্ড	যুক্তরাষ্ট্র	কানাডা	অষ্ট্রেলিয়া	ভারতবর্ষ
১৯৪০	১৩২'৯	১০১'৯	১০৯'৯	১১০'১	১১১'১
১৯৪১	১৪৮'৪	১১৩'২	১১৯'২	১১৬'৯	১২৮'৭
১৯৪২	১৫৫'১	১২৮'১	১২৬'৮	১৩১'৫	১৭১'৩
১৯৪৩	১৫৮'৩	১৩৬'৭	১৩২'৬	১৩৮'২	২৮৪'৩
১৯৪৪	১৬'১১	১৩৪'৯	১৩৫'৯	১৩৯'৩	২৭৫'৯

অন্যান্য যুদ্ধরত দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের মূল্য-বৃদ্ধির হারে পার্থক্য সুস্পষ্ট। ১৯২৯-এর তুলনায় ১৯৪৪-এ ভারতের মূল্যসূচক ২১২, ইংলণ্ডে ১৪৬'৫ এবং যুক্তরাষ্ট্র ১০৯'৫।

মুদ্রাস্ফীতির এই চরম রূপ আমাদের দেশে যখন উপস্থিত, তারই পরে আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সুরু হয় এবং তাতে 'ডেফিসিট ফাইনান্স' (যাকে কোন বিশেষজ্ঞ বলেছেন "Development through inflation") অগ্রগতির এক প্রয়োজনীয় হাতিয়ার বলে গৃহীত হয়। পরিকল্পনা-পর্বের মূল্যমানের গতি নিয়ে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি।

মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব যে অর্থ নৈতিক কাঠামোর মধ্যে ব্যাপ্ত, সেই কাঠামোর উন্নতি সাধনের জন্য কতখানি 'ডেফিসিট ফাইনান্স' করা যায় তাই নিয়ে পূর্বেও মতভেদ ছিল, বর্তমানে সেই মতভেদ বৃদ্ধি পেয়েছে। চতুর্থ পরিকল্পনার মধ্যে 'ডেফিসিট ফাইনান্স' প্রাধান্য পাবে না এই মর্মে যে ঘোষণা করা হয়েছে তা আনন্দের কথা। কিন্তু দেশের মূল্যমান ঠিক কোন্ স্তরে স্থিতিশীল হবে বা রাখতে হবে সে-বিষয়ে সরকার যদি অবিলম্বে কোন সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ না করেন তা হ'লে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনার সম্মিলিত অঙ্ক ব্যয় করার যে শুভ সঙ্কল্প চতুর্থ পর্বের জন্য গ্রহণ করা হচ্ছে, তার কতখানি অংশ মূল্যবৃদ্ধির দরুণ ধুয়ে যাবে সে কথা বিশেষ ভাবে বিচার্য। পরিকল্পনার আকার সঙ্কোচন করার যুক্তি গ্রহণীয় নয়, কেননা আখেরে তার জন্য ক্ষতি সকলেরই। কিন্তু পরিকল্পনারই অন্যতম অঙ্গ হচ্ছে মূল্যমানের গতির মধ্যেও এক পরিকল্পিত ধারা বজায় রাখা এবং সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করার সময় উত্তীর্ণ হ'তে দেওয়া বাঞ্ছনীয় হবে না।

াসওয়ান বাঁধ

আসওয়ান বাঁধ আজও তৈরি হয় নি,—এই বাঁধ তৈরি নিয়ে অনেক
শেষ হয়েছে, বর্তমানে সোভিয়েত ইঞ্জিনিয়ারদের তত্ত্বাবধানে
ভিয়েত নক্সামতে তা তৈরি হচ্ছে। মিশরের নীলনদের বুকে বাঁধ
ছে, যে নদী আফ্রিকার এই সংগ্রামী দেশটিকে একাধারে বন্যা ও
দুই জুগিয়েছিল তার বুকে আজ বাঁধ পড়েছে। গত ১৫ই মে
রিখে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী শ্রীক্রুশ্চভ এই বাঁধ বাঁধার অনুষ্ঠানে অংশ
করেছেন। আসওয়ান বাঁধ তৈরি অবশ্য এখনই শেষ হয় নি। তার
টি পর্ব সমাপ্ত হ'ল মাত্র। মূল কাজ এখনও বাকি। আসওয়ান বাঁধ
১ গজ উচ্চতার জন্য পরিকল্পিত। নদীর জল ধরে রাখায় যে নূতন
ধার তৈরি হয়েছে (বাঁধ তৈরির কাজ শেষ হ'লে এই জলাধার
রও সম্প্রসারিত হবে) তাতে সাহারার প্রতিবেশী মিশর দেশের একটা
অঞ্চল উর্বর শস্যশ্যামল হয়ে উঠবে। চাষের জায়গা প্রায় ত্রিশ
মিক (শতাংশ) বেড়ে যাবে। ১৯৬৫ সাল থেকে জলের এই প্রাণ-
র শুরু হবে। ১৯৬৭ সালে বসান শেষ হবে প্রথম টার্বিন, জলের
' থেকে এভাবে বিদ্যুৎ 'মথিত' হয়ে উঠবে। ১৯৭০ সালের মধ্যে
জলবিদ্যুৎ তৈরির যন্ত্রটি সম্পূর্ণ হবে। তখন বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াবে ২'১ লক্ষ কিলোওয়াট।

আসওয়ান বাঁধ গড়ার অতীত ইতিহাস এভাবে প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের স্পর্ধা শুধু নয় ভবিষ্যতের জন্য মস্ত সম্ভাবনা ও সম্পদের উৎস হিসাবে জাগরূক থাকবে!

শান্তির জন্য পরমাণু : তৃতীয় আন্তর্জাতিক সভা

পরমাণু সভা শেষ হ'ল। ৩১শে আগস্ট তারিখে সুরু হয়েছিল, ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে শেষ হ'ল। জেনেভায় অনুষ্ঠিত এই আন্তর্জাতিক সমাবেশে (গত সংখ্যা প্রবাসীর "পঞ্চশস্য" পর্যায়ে যার উল্লেখ রয়েছে) ৭৭টি দেশের প্রায় চার হাজার বিজ্ঞানী রাষ্ট্রনায়ক এবং রাষ্ট্র-প্রতিনিধিরা মিলিত হয়েছিলেন। উদ্দেশ্য, বলা বাহুল্য, শান্তিপূর্ণ কাজে পরমাণু শক্তির নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করা। সেই সঙ্গে যে-সমস্ত উপায়গুলি সুপরিচিত, তাদের কাযে রূপায়ণের কারিগরি বাধাগুলির সমাধান খোঁজা। ১৯৫৫ এবং ১৯৫৮ সালে অনুরূপ দু'টি অধিবেশন বসেছিল। ১৯৬৪ সালে এটি তৃতীয় আন্তর্জাতিক সমাবেশ। রাষ্ট্র সংঘের সেক্রেটারী-প্রধান উ থান্ট তাঁর উদ্বোধনী বাণীতে এই

অধিবেশনকে "অপরিমেয় সম্ভাবনার দ্বার উদ্ঘাটন" বলেই স্বাগত জানিয়েছেন। সম্মেলনের সভাপতি ভ্যাসিলি আমিলিয়ানভ আশা পোষণ করছেন, এই মহতী শক্তি পরমাণু পৃথিবী থেকে ভয় ও সন্দেহ মোচন করে শান্তির প্রতিষ্ঠা করবে। এটাই মূল উদ্দেশ্য। সম্মেলনের আবহাওয়ায় সে উদ্দেশ্য সূচিত হয়েছে। দীর্ঘ দশ দিনের অধিবেশনে যে সহযোগিতার নিদর্শন পাওয়া গেছে তাতে কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি আবেষণের পথই সুগম হয় নি, দুনিয়ার রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক বুঝাপড়ার ক্ষেত্রেও সুযোগ এনে দিয়েছে।

সম্মেলনে মোট ৭৪৯টি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। শান্তিপূর্ণ কাজে পরমাণুর নানা প্রয়োগঘটিত এবং তত্ত্বগত সমস্যা তাতে আলোচনা হয়েছে। একটি প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল সমুদ্রের লবণাক্ত জলকে সুপেয় করে তোলা, চাষযোগ্য করে তোলা। পৃথিবীতে জলের অভাব নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও সমুদ্রতীরবর্তী অনেক অঞ্চল চাষবাসের অযোগ্য, ফলে মানুষের বসতিশূন্য। এসব অঞ্চলই আবার শস্যশ্যামল লোক বসতিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে যদি সমুদ্রের ঐ নোনা জল সুপেয় লবণমুক্ত করে তোলা যায়। তাতে পরমাণুর অফুরন্ত শক্তিই একমাত্র সমাধান। নানা রকম বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সমস্যা এর সঙ্গে জড়িত। তবে তার যদি কখনও সমাধান হয়, দুনিয়া অর্থনীতির এক বন্ধন থেকে মুক্তি পাবে। সম্মেলনের বিশেষজ্ঞরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

এই সম্মেলন বৈজ্ঞানিক সহযোগিতার ভিত্তি অনেক দৃঢ় করেছে। একে অপরের সমস্যা অনুভব করেছে। একে অপরের কাছ থেকে ধারণা গ্রহণ করছে। সব মিলিয়ে একটা সম্পূর্ণ দৃষ্টিলাভ হয়েছে। সম্মেলনের সভাপতি যথার্থই বলেছেন, "এই অধিবেশন মস্ত একটা ACCUMULATOR স্টেশনের মত আমাদের প্রত্যেকের মনে নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনিয়ারিং সমস্যা নিয়ে কাজ করার জন্য নূতন উৎসাহ-উদ্দীপনা সঞ্জীবিত করেছে।" এই উৎসাহ-উদ্দীপনার ফল একটি ক্ষেত্রে অন্তত বিশেষ করে অনুভূত হবে। তা হ'ল শক্তি উৎপাদন। পরমাণুর শক্তি-রহস্যকে আয়ত্তে এনে বিদ্যুৎ উৎপাদন। স্বনামধন্য বিজ্ঞানী সীবর্গ (SEABORG) বক্তৃতা দিতে গিয়ে সত্যই বলেছেন, "এই সম্মেলন উদ্বোধনের ফলে একটা নূতন যুগেরই সুরু হ'ল, তা হ'ল পরমাণু থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের যুগ।" ১৯৫৫ সালে পরমাণু-জাত বিদ্যুতের উৎপাদন ছিল মাত্র পাঁচ কিলোওয়াট (সারা পৃথিবীতে), বর্তমানে তা পাঁচ হাজারে এসে দাঁড়িয়েছে। ১৯৭০ সালের সম্ভাব্য পরিমাণ এর পাঁচগুণ, ১৯৮০ সালের মধ্যে তা বোধ হয় ১৫০ কিলোওয়াট ছাড়িয়ে যাবে। একদিন পরমাণু শক্তিই হবে দুনিয়ার শক্তি উৎপাদনের প্রধান উৎস। সত্যই পরমাণু যুগ আজ সমাগত। তাকে নানাভাবে আমাদের বুঝি নিতে হবে। তার সমস্যাগুলি, তার সম্ভাবনাগুলি। এভাবেই সময় এগিয়ে চলবে। তবে মূল লক্ষ্য শান্তির দিকে স্থির থাকবে।

আমিলিয়ানভ বলছেন, যুগের শ্লোগানই হবে এই—"প্রত্যেক পরমাণুর মিলন এবং প্রত্যেক পরমাণুর বিয়োজন—মোট কথা প্রত্যেক পরমাণুর বিস্ফোরণ, একটাই মাত্র উদ্দেশ্য সাধন করবে, তা হ'ল শান্তি।"

এই শান্তির উদ্দেশ্যেই সম্মেলনের প্রদীপ জ্বালান রয়েছে।

এ. কে. ডি

রামেন্দ্রসুন্দর

এ বছর—১৯৬৪ সাল—একটি শতবার্ষিক বছর। আজ হতে একশ বছর আগে—১৮৬৪ সালে, বাংলার বহু মনীষী মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এখন তাঁদের শতবর্ষপূর্তি বছর। স্যার আশুতোষ, গুরু ব্রজেন্দ্রনাথ, মনীষী রামেন্দ্রসুন্দর। ৫ই ভাদ্র ১৮৬৪ সালে রামেন্দ্রসুন্দরের জন্ম। শতবার্ষিক বছরের সুরুতে প্রবাসীর এক সংখ্যায় "পঞ্চশস্য" পর্যায়ে আমরা বাংলায় বিজ্ঞান ও দর্শন আলোচনার এই একনিষ্ঠ সাধকের সম্বন্ধে সামান্য আলোচনার সূত্রপাত করেছিলাম, কিন্তু তা আরম্ভই মাত্র। অথবা আরম্ভ বললেও বেশি বলা হয়। সে যা হোক, আধুনিক যুগের অনেক লেখক শত বছরের ব্যবধানে তাঁর সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করেছেন, এ বছরের "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" পত্রিকার "আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর সংখ্যাটি" আমাদের পক্ষে খুবই প্রীতিকর মনে হয়েছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ—যে প্রতিষ্ঠান আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর আজীবন সাধনায় প্রতিষ্ঠা করে গেছেন—কিন্তু দেরি হলেও, তাঁর রচনার একটা নির্বাচিত সংকলন প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। পুরাতত্ত্ববিদ্ যেমন পুরনো নিদর্শনগুলির মধ্য থেকে হারানো সম্পদ্ এবং তাৎপর্যপূর্ণ সংকেত গ্রহণ করেন, রামেন্দ্রসুন্দরও তেমনি বিজ্ঞানের বিষয়গুলির আলোচনায় খুব আধুনিকতার দাবি না করলেও তাঁর আলোচ্য বিষয়বস্তুকে স্পর্শ না করে আধুনিক ধারণার জগতের নিকটে আসা যায় না। উপরন্তু, তিনি সমস্ত কিছুকে এমন একটা নিবিড় ঐকান্তিকতার সঙ্গে উপস্থিত করেছেন যাতে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রখর এবং জিজ্ঞাসাবোধ উন্মুখ না হয়ে পারে না। সমস্ত বিষয়কেই তিনি আশ্চর্য আলোকে উদ্ভাসিত করেছেন, এই আলোই আমাদের আধুনিক বিজ্ঞান ভাবনার কাছাকাছি পথ করে দেয়। রামেন্দ্রসুন্দর সে দিক্ থেকে অবশ্য-পাঠ্য।

একটা ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ বলি। এই শতবার্ষিক বছরেই বাংলা সাহিত্যের রাজধানী কলেজ স্ট্রীটে এসেছিলাম রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনী ও রচনাবলী সংগ্রহে। রচনা ধূলিধূসরিত অবস্থায় অনেক খুঁজে যদিও বা মিলল, জীবনী নাস্তি। রামেন্দ্রসুন্দর নামে এক মহামনীষী দিক্‌পাল যে এককালে বাংলা দেশ আলো করে ছিলেন এই নিছক বাস্তব ঘটনাই আজ তার সমস্ত নিদর্শনসমেত অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সময় জটিল আবর্ত তুলে একটা মহৎ সাধনার ফসলগুলি তছনছ করে দিয়েছে। মনে তাই নানা চিন্তা ঘনিয়ে এসেছে। অতীতের অফুরন্ত সম্পদ্ যাদুঘরের সামান্য নিদর্শনগুলির মধ্যে ধরা থাকে; এখানেও সেভাবে রামেন্দ্র-রচনাবলীর ৬টি খণ্ড থেকে সামান্য কয়টি অংশ পাঠকদের সামনে তুলে ধরলাম—রচনাবলীর পাতায় সময়ের ধুলা জমা পড়েছে—তাই আবার আজকের আলোকে তুলে ধরার এই সামান্য চেষ্টা।

* * * * *

"বাহ্য-জগতের যে বাহ্যতা এবং সেই বাহ্যতা মধ্যে যে চাঞ্চল্য, তাহা সমস্তই এই বহু জীবের পরস্পর আদান-প্রদান হইতে উৎপন্ন। সমস্ত Extension এবং সমস্ত Motion সেই বহু-জীবতা হইতেই উৎপন্ন। বহু জীব হইতেই বাহ্য-জগতের উৎপত্তি এবং বহু-জীবের কর্ম হইতে বাহ্য জগতে কল্পিত চাঞ্চল্যের উৎপত্তি। এইরূপে আমাদের জীবনযাত্রা

প্রত্যক্ষ বিরোধের অনুভূতি, সেই Perceptual ভিত্তি অবলম্বন করিয়াই শেষ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকের বাহ্য-জগৎ, কাল্পনিক Conceptual জগৎ—বিজ্ঞান-বিদ্যার আলোচ্য বাহ্য-জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। ইহাকে সৃষ্টি না বলিয়া বিসৃষ্টি, বিসর্গ বা বিসর্জন বলাই ভাল। জীবনের প্রত্যক্ষ অনুভূতি, চেতন জীবের-প্রত্যক্ষ অনুভূতিকে যেন বাইরে বিসর্জন দেওয়া হইয়াছে, ছিঁড়িয়া ফেলা হইয়াছে। যাহা একান্ত অন্তরের নিধি, তাহাকে নিতান্তই স্বতন্ত্র করিয়া শব্দরূপে, সংজ্ঞারূপে, Concept-রূপে বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই Concept নিতান্তই জড় পদার্থ, কল্পিত পদার্থ, সৃষ্ট পদার্থ। সৃষ্টি করিয়া ইহাকে বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলাই ব্যবহারিক জড় জগতের সৃষ্টি। Concept-কে শব্দ বলা যায়, উহার রূপ যদি বাঙ্ময় রূপ হয়, তাহা হইলে শব্দ হইতে বাহ্য-জগতের সৃষ্টি এই অর্থে সত্য। বৈজ্ঞানিকের জড় জগতের লক্ষণ যে বাহ্যতা বা Extension, যে বাহ্যতা বা Extension আকাশরূপে আমাদের নিকট পরিচিত, আমাদের শাস্ত্রে সেই আকাশকে শব্দ প্রধান প্রকাশ বলা হয়, উহাও আমরা এই অর্থে গ্রহণ করিতে পারি। আমি বলিতে চাহি, এই যে ব্যবহারিক জগৎ, এই যে বাহ্য জগৎ, এই যে জড় জগৎ, তাহা বহু জীবের অস্তিত্ব হইতেই কল্পিত। জীবের মধ্যে আদান-প্রদান হইতেই উহার বিষমাকৃতি এবং সেই বিষমাকৃতির মধ্যে চাঞ্চল্য। এই যে আদান-প্রদান, ইহা বিরোধাত্মক। এই বিরোধটাই প্রত্যক্ষ বাহ্য জগতে বস্তুরূপে, Substance রূপে দেখা দেয় এবং একটা Substantial জগতের বিভীষিকা লইয়া আমাদের বুকের উপর চাপিয়া বসে। প্রাণেই এই আদান-প্রদান এবং প্রাণেই বিরোধ। প্রাণবিদ্যা বা Biology ইহার আলোচনা করে। এই প্রাণতত্ত্বটাকে আর একটু চাপিয়া না ধরিলে জগৎ-প্রবাহের উৎস খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

(বৈজ্ঞানিকের আকাশ: বিচিত্র জগৎ)

* * * * *

গৃহস্থ মাত্রেরই এই যজ্ঞ কয়টি কর্তব্য কর্ম। জগতে তিনি যে একা আসেন নাই, এবং একা যাইবেন না, সমস্ত জগতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বাঁধা আছে, সমস্ত জগৎ যে একযোগে তাঁহাকে স্থির করিয়া রাখিয়াছে, এইটি সর্বদা স্মরণ রাখিয়া জগতের যাবতীয় প্রাণীর নিকট ঋণ স্বীকারে তিনি বাধ্য আছেন, এবং প্রত্যহ কোন-না-কোন অনুষ্ঠান শ্রদ্ধার সহিত সম্পন্ন করিয়া, আমি যে ঋণী, এইটি সর্বদা মনে রাখিতে বাধ্য আছেন। বস্তুতঃ এই ঋণ কেহই শুধিতে পারে না; তবে ঋণটা স্বীকার না করিলে জগদ্ব্যবস্থার প্রতি, বিশ্বব্যাপারের প্রতি অনাদর ও অবজ্ঞা দেখান হয়। মানব, বিশ্বব্যাপারকে তুমি প্রণাম কর; এই অভিপ্রায়ে প্রত্যহ কিছু-না-কিছু ত্যাগস্বীকার কর। ব্যাপক ত্যাগেরই নামান্তর যজ্ঞ। এ স্থলে সমস্ত জগৎটাই দেবতা। জগতে যা কিছু আছে, সবই দেবতা। প্রত্যেকের নিকট মানুষ ঋণী এবং সেই ঋণ স্বীকারার্থে প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে কিছু-না-কিছু ত্যাগ স্বীকার করিয়া যজ্ঞ করিতে হইবে।... শতপথ ব্রাহ্মণ বলিতেছেন—"এই ব্রহ্মযজ্ঞ, বাক্যই এই যজ্ঞের জুহূ। মন ইহার উপভৃৎ, চক্ষু ইহার ধ্রুবা, মেধা ইহার স্রুব, সত্যই ইহার অবভৃথ স্নান, স্বর্গলোক ইহার উদয়ন বা সমাপ্তি। ঋক্‌মন্ত্র এই যজ্ঞের ক্ষীরাহুতি, যজুর্মন্ত্র ইহার আজ্যাহুতি, সামমন্ত্র ইহার সোমাহুতি, অথর্বাঙ্গিরস মন্ত্র ইহার মেদাহুতি, পুরাণ-ইতিহাসাদি ইহার মধু আহুতি। জল চলিতেছে, আদিত্য চলিতেছেন, চন্দ্রমা চলিতেছেন, নক্ষত্রেরা চলিতেছে। ইহাদের গতিক্রিয়া ক্ষান্ত হইলে জগদ্‌যন্ত্রের যে অবস্থা হয়, গৃহস্থ যে দিন অধ্যয়ন না করেন, তাঁহার গৃহেরও সেই অবস্থা ঘটে।" এই শেষের বাক্যটি আমাদের সেনেট হাউসের দরজায় (সিনেট হল আজ লুপ্ত—উদ্ধৃতিকার) খোদাই করিয়া রাখা উচিত।"

(পুরুষ-যজ্ঞ: যজ্ঞ-কথা)

* * * * *

মানুষকে সমাজের অধীন থাকিতেই হইবে। সমাজের আদেশ যুক্তিবিরুদ্ধ হইলেও মানিতে হইবে। সামাজিক জীব সমাজের অধীন। এই অধীনতার সীমা কোথায়, তাহার সদুত্তর নাই। বর্তমান প্রস্তাবে তাহার মীমাংসারও প্রয়োজন নাই। মানুষের স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এক দলকে সেই সীমারেখার এক পাশে রাখে; মনুষ্যের সমাজবশ্যতা অন্য দলকে অন্য পাশে রাখে। স্থিতিশীল ও উন্নতিশীল, উভয় দলের চিরন্তন বিরোধ। এই বিরোধের মীমাংসা কখনও হয় নাই; কখনও হইবে কি না জানি না। কিন্তু এই সনাতন বিরোধের ফলে এই সীমারেখা ক্রমশই সরিয়া গিয়াছে। বিরোধের ফলে মনুষ্যের ব্যক্তিগত চরিত্রের ও সমাজগত চরিত্রের ক্রমেই বহুবভাব ঘটিয়াছে। ইতিহাস সাক্ষী। অথবা প্রকৃতির বুঝি ইহাই নিয়ম। বিরোধই বোধ করি উন্নতির ও অভিব্যক্তির একমাত্র বিধাতৃবিহিত উপায়।

(ধর্মের অনুষ্ঠান: কর্ম কথা)

* * * * *

রত্নাকরের রাম নাম উচ্চারণে অধিকার ছিল না। অগত্যা মরা মরা বলিয়া তাঁহাকে উদ্ধার লাভ করিতে হইয়াছিল।

এই পুরাতন পৌরাণিক নজীরের দোহাই দিয়া আমাদিগকেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামকীর্তনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। নতুবা ঐ নাম গ্রহণ করিতে আমাদের কোনরূপ অধিকার আছে কি না, এবিষয়ে ঘোর সংশয় আরম্ভেই উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। বস্তুতই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এত বড় ও আমরা এত ছোট, তিনি এত সোজা ও আমরা এত বাঁকা যে, তাঁহার নামগ্রহণ আমাদের পক্ষে বিষম আস্পর্ধার কথা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।...

অণুবীক্ষণ নামে এক রকম যন্ত্র আছে, যাহাতে ছোট জিনিষকে বড় করিয়া দেখায়, বড় জিনিষকে ছোট দেখাইবার নিমিত্ত উপায় পদার্থ বিদ্যাশাস্ত্রে নির্দিষ্ট থাকিলেও, ঐ উদ্দেশ্যে নির্মিত কোন যন্ত্র আমাদের মধ্যে সর্বদা ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবন-চরিত বড় জিনিষকে ছোট দেখাইবার জন্য নির্মিত যন্ত্রস্বরূপ। আমাদের দেশের মধ্যে যাঁহারা খুব বড় বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত, ঐ যন্ত্র একখানি সম্মুখে ধরিবা-মাত্র তাঁহারা সহসা অতিমাত্র ক্ষুদ্র হইয়া পড়েন; এবং এই যে বাঙ্গালীত্ব লইয়া আমরা অহোরাত্র আস্ফালন করিয়া থাকি, তাহাও অতি ক্ষুদ্র ও শীর্ণ কলেবর ধারণ করে। এই চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ধবল পর্বতের ন্যায় শীর্ষ তুলিয়া দণ্ডায়মান থাকে; কাহারও সাধ্য নাই যে, সেই উচ্চ চূড়া অতিক্রম করে বা স্পর্শ করে।

(ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর: চরিত-কথা)

* * * * *

ব্যাকরণ কখনও নিয়ম বাঁধে না উহা নিয়ম আবিষ্কার করে মাত্র

ব্যাকরণ ভাষার উন্নতির প্রতিরোধ কিরূপে করিবে, ইহা বুঝিলাম না। ভাষা স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত ও পরিবর্তিত হইবে; ব্যাকরণও নূতন নূতন রূপ গ্রহণ করিবে; তাহাতে ভয় কি?

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেও ত তাহাই দেখি। আমাদের এই অতি-প্রাচীন বসুন্ধরার মূর্তি যুগ ব্যাপিয়া বিকৃত হইতেছে। এই বিকৃতির নিয়ম আবিষ্কার যে বিজ্ঞানের কাম, সেই বিজ্ঞানের নাম ভূবিদ্যা। কোটি বর্ষ পূর্বে পৃথিবীর অবস্থা যেরূপ ছিল, এখন ঠিক সেরূপ নাই। সে-সময়ে পার্থিব ঘটনা যে যে নিয়মে সঙ্ঘটিত হইত, এখন সে সে নিয়মে হয় না; আবার বহু বৎসর পরে, যখন সূর্যের তাপ মন্দ হইবে, যখন দিবাভাগের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে, যখন চান্দের আকর্ষণ মন্দ হইবে, তখন আর ঠিক বর্তমান নিয়মে পার্থিব ব্যাপার ঘটিবে না। কিন্তু ভূতাত্ত্বিকেরা বর্তমান কালের নিয়ম আবিষ্কার করেন বলিয়া ভূপৃষ্ঠের পরিণতি রোধ হয় না। ভাষার পক্ষেও সেই কথা। পাণিনি ব্যাকরণ রচনা করিয়া সংস্কৃত ভাষার বিকৃতি রোধ করিতে পারেন নাই। সংস্কৃত ভাষা স্বাভাবিক নিয়মেই অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে; অথবা বিকৃত ও রূপান্তরিত হইয়া অন্য ভাষায় পরিণত হইয়াছে। কোন বৈয়াকরণ এই স্বাভাবিক বিকার রোধ করিতে পারেন নাই।

(বাঙ্গালা ব্যাকরণ: শব্দ-কথা)

* * * * *

Science-এ কাজ মনন-কর্ম; বাহিরের প্রত্যক্ষগোচর কতকগুলি Percept মিলাইয়া, তাহা হইতে Concept তৈয়ার করিয়া, সেই সকল Concept-এর সম্পর্ক-নির্দ্ধারণ, ইহাই মনন-কর্ম। Inductive and Deductive logic এই মনন-কর্মের পদ্ধতি নির্দ্ধারণ করে। Concept-এ পৌঁছিতে হইলে প্রত্যক্ষ-লব্ধ Percept-গুলিকে বাছাবাছি করিয়া মিলাইয়া দেখিতে হয়। প্রত্যক্ষ জগতে কোন্ ঘটনার পর কোন্ ঘটনা আসিতেছে, কোন্টার সঙ্গে কোন্টা আসিতেছে, ইহা পর্যবেক্ষণ করিতে হয়; ইহার নাম Observation বা পর্যবেক্ষণ। [illegible] দেখিবার সময় তিনি নিজের ইন্দ্রিয়কে বিশ্বাস না করিয়া পাঁচজন পথের পথিককে ডাকিয়া আনেন। পথের পথিক একজন ছোটখাট বৈজ্ঞানিক, তাহাকেও পাঁচটি জিনিস দেখিয়া, পাঁচটি Concept গড়িতে হয় বটে, কিন্তু সে আপনার Immediate Interest লইয়া, আপনার জীবিকানির্বাহের ব্যাপার লইয়া এত ব্যস্ত যে, কোন সূক্ষ্ম Concept-এ পৌঁছিবার তাহার অবসর নাই। সূর্য ঘুরিতেছে কিংবা পৃথিবী ঘুরিতেছে, এ বিষয়ে তাহার মাথাব্যথার কোন প্রয়োজন হয় না। কেননা, ডাল-রুটি সংগ্রহ ব্যাপারে উভয়েই প্রায় তুল্যমূল্য; কাজেই সে পৃথিবীতে দাঁড়াইয়াই পর্যবেক্ষণ করে। [illegible]

...স্থলে উপস্থিত হইবার তাহার প্রবৃত্তি নাই। বৈজ্ঞানিকের ...rest আরও দূরব্যাপী। তিনি সাধারণ লোককে টানিয়া আনিয়া ...স্থলে উধাও হইয়া দৌড়িতে বলেন।...তাহার জন্য বিশিষ্ট রকমের ...যন্ত্র বা Tool তৈয়ার করিতে হয়, যন্ত্র-তন্ত্র, তোড়জোড় আবশ্যক ...এইরূপ যন্ত্র-তন্ত্র, তোরজোড় সাহায্যে যে Observation, তাহার Experiment বা পরীক্ষা। এইরূপ কোথায় দাঁড়াইয়া ...ervation করিতে হইবে এবং কিরূপ যন্ত্র-তন্ত্র দ্বারা Observe ...হইবে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি খাটাইয়া তাহা ঠিক করেন; কিন্তু ...ervation-এর ভারটা দেন—দশজন ... লোকের উপর। ... Observation-এর পর যে সাক্ষ্য দেয়—বৈজ্ঞানিক তাহাই ...করেন; দশজনের নিকট দশ রকম সাক্ষ্য পাইয়া অগত্যা ... Average-টা মানিয়া লন; এবং এইরূপে যাহা পান, তাহাই ...পূর্বক এবং সঙ্কলনপূর্বক তাহাদের Agreements ও Diffenc- ... আলোচনা করিয়া, সামান্য এবং বিশেষ ধর্মগুলি মিলাইয়া ...দের পৌর্বাপর্য দেখাইয়া নানাবিধ Relation বা সম্পর্ক প্রদান ... সাক্ষ্য গ্রহণের পর যে-সকল ফলাফল বা Result পান, ...তিনি Tabulate করেন, Classify করেন, generalise করেন ...একটা general Statement দিবার চেষ্টা করেন। এই সব ...neral Statement-কে বৈজ্ঞানিক ভাষায় Laws of Nature ...প্রাকৃতিক নিয়ম বলা হয়। Man is Mortal, এটাও যেমন ... প্রাকৃতিক নিয়ম, Pressure of a Gas varies as its ...mperature, এটাও তেমনই একটা প্রাকৃতিক নিয়ম। তবে ... আবিষ্কারে কোন বড় বৈজ্ঞানিক দরকার হয় নাই। পৃথিবীর ...কোটি মাঝারি বৈজ্ঞানিক উহা স্থির করিয়া লইয়াছে।

(বাঙ্ময় জগৎ : বিচিত্র জগৎ)

* * * * *

...কালের কুটিল চক্রে শিক্ষা আজকাল বিজ্ঞান শিক্ষা, সাহিত্য শিক্ষা, ...শিক্ষা, নীতি শিক্ষা, ইতিহাস শিক্ষা, হাতে-কলমে শিক্ষা বা টেকনি-...ক শিক্ষা ইত্যাদি নানা উপাধিতে অলঙ্কৃত হইয়া সহস্র শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে; এবং কোন্ শিক্ষা ভাল আর কোন্ শিক্ষা মন্দ এই তর্কের কোলাহলে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা এই কোলাহলের অর্থ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে একেবারেই অক্ষম। শিক্ষা বলিলে আমরা কেবল একটামাত্র শিক্ষাই বুঝিয়া থাকি; এবং সেই শিক্ষার অর্থ মনুষ্যত্বের বৃদ্ধি, স্ফূর্তি ও পরিপুষ্টি। যাহাতে অপুষ্ট মনুষ্যত্ব পুষ্টিলাভ করে, প্রচ্ছন্ন মনুষ্যত্ব বিকাশ পায়, হীন মনুষ্যত্ব স্ফূর্তি-লাভ করিয়া জাগ্রত ও চেতন হইয়া উঠে, তাহাকেই আমরা শিক্ষা নামে অভিহিত করিয়া থাকি, এবং সেই শিক্ষার আবার একটা ভিন্ন যে পাঁচটা পথ আছে, তাহাও আমাদের কল্পনায় আসে না। সত্য বটে, মনুষ্য বয়স্ক হইলে তাহাকে একটা ব্যবসায়-বিশেষ অবলম্বন করিয়া জীবিকা-নির্বাহ করিতে হয়—এবং সেই ব্যবসায় অভিজ্ঞতা লাভের জন্য কিছুদিন একটা সঙ্কীর্ণ রাস্তার শিকল পায়ে দিয়া বিচরণ করা আবশ্যক হইয়া উঠে। কিন্তু সে বয়সের কথা, বাল্যের কথা নহে।

...বস্তুর মধ্যে ঐক্য দেখিবে; সাদৃশ্যের মধ্যে পার্থক্য দেখিবে, পাঁচবার প্রতারিত হইবে এবং প্রতারিত হইয়া ভবিষ্যতে সাবধান হইবে, পুনঃপুনঃ তাহাকে প্রতারিত হইতে দিবে; যে কখন সংসারের মধ্যে প্রতারিত হয় নাই, তাহার ভাগ্যের আমি প্রশংসা করি না। সে পুনঃপুনঃ প্রতারিত হউক, তাহাকে প্রতারিত হইতে দেখিয়া তুমি দয়া করিবে না; কেবল আশার বাক্যে, উৎসাহের বাক্যে ও স্নেহের বাক্যে তাহার মনে আগ্রহের এবং প্রীতিকর ও ঔৎসুক্যের সঞ্চার কর। সে পুনঃপুনঃ প্রতারিত হউক ও অবশেষে সফলতা লাভ করিয়া পরমানন্দে ভাসিতে থাকুক; তুমি তাহার আনন্দে আনন্দ দেখাও, তাহার উৎসাহে উৎসাহিত হও, তাহার মনে উৎসাহের শক্তি আরও উদ্দীপিত করিয়া দাও। ইহারই নাম বিজ্ঞান শিক্ষা, ইহারই নাম সাহিত্য শিক্ষা, ইহারই নাম ধর্ম শিক্ষা। শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক ত্রিবিধ শিক্ষাই একই প্রণালীতে সম্পাদিত হইবে। যাহাতে শরীরে বল আসিবে, তাহাতে চিত্তে স্ফূর্তি জন্মিবে, তাহাতেই বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশ লাভ করিবে, তাহাতেই ধর্মপ্রবৃত্তি জাগ্রত হইয়া উঠিবে। ইহারই নাম আবার হাতে-কলমে শিক্ষা, যে ঠেকিয়া না শেখে, তাহার হাতে-কলমে শিক্ষা হয় না।

(শিক্ষাপ্রণালী : নানা কথা)

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ৫৭, ইন্দ্রবিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা—৩৭, মূল্য দশ টাকা।

বাংলার মধ্যযুগের ইতিহাসে ষোড়শ শতাব্দী যেমন ছিল স্বর্ণযুগ, বাংলার আধুনিক ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দী তেমনি একটি স্বর্ণযুগ। ইহার কারণ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংঘাতে এদেশে সূচনা হয় এক নবযুগের। ফলে, ধর্মে, সমাজে, শিক্ষায়, সাহিত্যে এক নবরূপায়ণ চলিতে থাকে। এই রূপায়ণ-কার্যে রাজা রামমোহন রায় হইতে স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় বহু মনীষী ও সংস্কারক অল্প-বিস্তর অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। এই যুগের ওই নবরূপায়ণ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞানলাভ করিতে হইলে বহু তথ্যসম্ভার পর্যালোচনা করা প্রয়োজন; কিন্তু ওই তথ্যসম্ভার সংগ্রহ এক বিশেষ আয়াসসাধ্য ব্যাপার। সরকারী নথিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, সরকারী রিপোর্টসমূহ, সমসাময়িক সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রাদি, মনীষিগণের দিনলিপি, চিঠিপত্র, আত্মজীবনী, সেকালের প্রখ্যাত জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের কার্য-বিবরণী প্রভৃতি হইতে সেই তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাহারই ভিত্তিতে গবেষণা-কার্য চালাইতে হইবে। এই দুরূহ কার্য করিবার মত লোক বাংলা দেশে অতি অল্পই আছেন। এই সকল আকরের ভিত্তিতে বিগত পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে গবেষণার যে নূতন ধারা প্রবর্তিত হইয়াছে, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় সেই গবেষণা-পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া বঙ্গীয় সমাজের শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-রাজনীতিতে ঢের নূতন আলোকপাত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই শ্রমসাধ্য কার্যের যে কুফল, তাহা তিনি স্বয়ং ভোগ করিয়া গবেষক ও অনুসন্ধিৎসু পাঠককে তাহার সুফলটুকু দান করিয়াছেন। সমাজকে অমৃত বিতরণ করিয়া গরলটুকু নিজেই লইয়া যোগেশবাবু 'নীলকণ্ঠ' হইয়াছেন,—আজ তিনি অন্ধত্বকে বরণ করিয়াছেন।

আলোচ্যমান গ্রন্থখানি উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবরূপায়ণের ইতিহাস। এই ইতিহাস দুইভাবে লিখিত হইতে পারে;—প্রথমতঃ মনীষিগণের জীবন-ভিত্তিক আলোচনায়; দ্বিতীয়তঃ শিক্ষা-সংস্কৃতি-সভ্যতা-কেন্দ্রিক আলোচনায়। যোগেশবাবু এই গ্রন্থে এক একটি জীবনকে কেন্দ্র করিয়া নবলব্ধ তথ্যসম্ভারের ভিত্তিতে নবরূপায়ণের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দেশী-বিদেশী, বাঙালী-অবাঙালী ষোলজন মনীষীর উল্লেখযোগ্য দানের কথা লেখক স্মরণ করিয়াছেন। বাংলার নবরূপায়ণ কার্যে ঐ সকল মনীষীর মধ্যে এমন অনেকে রহিয়াছেন যাঁহাদের সার্থক দান-সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান হয় অত্যন্ত সীমাবদ্ধ নতুবা একেবারেই নাই।

আলোচ্যমান গ্রন্থে যে ষোলজন মনীষীর জীবনী ও কার্যকলাপের মধ্য দিয়া উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে আছেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামলোচন ঘোষ, রুস্তমজী কাওয়াসজী, ডেভিড হেয়ার, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, ডেভিড লেষ্টার রিচার্ডসন, শিবচন্দ্র দেব, গুডিব চক্রবর্তী, জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন, ভগবান চন্দ্র বসু ও জেমস্ লঙ্। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতির সেবায় ইঁহাদের দান ভুলিবার নয়। প্রবীণ গবেষক যোগেশবাবু ওই সকল মনীষীর তথ্যনিষ্ঠ জীবনই যে আলোচ্যমান গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন তাহা নয়, ব্যক্তিমানুষের জীবনের খুঁটিনাটি তথ্য পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে ইঁহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া বাঙালী সমাজের বিভিন্ন দিকে যে নব-রূপায়ণের কার্য আরব্ধ হয়, লেখক তথ্য প্রমাণের সাহায্যে তাহাও বিবৃত করিয়াছেন। অতঃপর এই গ্রন্থ-সম্পর্কে লেখকের দাবি 'এখন উনবিংশ শতাব্দীর একটি পূর্ণ রূপরেখা ইহা হইতে স্পষ্ট হইতে পারিবে' একেবারেই অমূলক নয়। যোগেশবাবুর গবেষণার পন্থাও অভিনব। ইহাতে ব্যক্তি-জীবনের নানা তথ্য বিবৃতির সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী-জীবনের বিভিন্ন দিকেও নূতন আলোকপাত করার সুবিধা হইয়াছে। গ্রন্থের ভূমিকায় স্বর্গত সজনীবাবু যে কথা লিখিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায়, যোগেশ-বাবুর এই পুস্তকখানি দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া বহু আয়াসসাধ্য গবেষণার ফল। ব্রজেন্দ্রবাবুর অসম্পূর্ণ ও অলিখিত দিক্ এইরূপে যোগেশবাবু সম্পূর্ণ করিয়াছেন।

এই গ্রন্থে দুই-চার জন এমন ব্যক্তির কৃতকর্মের তথ্যভিত্তিক পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, যাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের কেবল ভাসা-ভাসা জ্ঞানই ছিল। প্রসঙ্গক্রমে রুস্তমজী কাওয়াসজী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, শিবচন্দ্র গুডিব চক্রবর্তীর নাম করা যাইতে পারে। পার্শীবাগান, রুস্তমজী ষ্ট্রীট প্রভৃতি দানবীর রুস্তমজীর স্মৃতি বহন করিলেও কলিকাতার উন্নতি-বিধানে, জ্ঞান বিস্তারে ও জনসেবায় এই মানবহিতৈষীর দান যে অবিস্মরণীয় লেখক বিস্তৃত আলোচনার সাহায্যে আমাদের তাহা বুঝাইয়াছেন। রসিককৃষ্ণ মল্লিক ডিরোজিওর নিকট অধ্যয়ন করিবার সুযোগ না পাইলেও ডিরোজিওর শিক্ষার প্রভাব ইঁহার উপর নিপতিত হইয়াছিল। রসিককৃষ্ণ ছাত্র-জীবনের শেষ হইতে আমরণ যে ভাবে দেশের ও সমাজের সেবা করিয়া গিয়াছেন তাহাতে ডিরোজিওর প্রভাবের

...ই আমাদের সর্বাগ্রে মনে পড়ে। স্বাদেশিকতাই যে রসিককৃষ্ণকে ...কাজে উদ্বুদ্ধ করিত—লেখক ইহা তথ্যভিত্তিক আলোচনায় ...ইয়াছেন। সূর্যকুমার চক্রবর্তী সম্বন্ধেও লেখক অনেক তথ্য পরিবেশন ...রিয়াছেন।

...হেনরি ডিরোজিও সম্বন্ধে আমাদের অনেকের বিরূপ ধারণা আছে ...। কিন্তু কিঞ্চিদধিক শতবর্ষ পূর্বে বাংলার শিক্ষিত-সমাজে যে ...বিপ্লবের উদ্ভব হয়, তথাকথিত ঐতিহাসিকগণ ইহাকে সমাজদ্রোহ ...খ্যা দিলেও ইহা যে নূতন চিন্তার জোয়ার—আমরা তাহা অনেক সময় ...ভাবিয়া দেখি না। শতাধিক বৎসর পূর্বে বাঙালীর মনে যে নূতন ...প্রচলিত ধর্ম, শিক্ষা, সাহিত্য ইত্যাদি যাচাই করিয়া লইবার ...জন্য আগ্রহ দেখা গিয়াছিল, তাহার মূলে কোন্ কোন্ শক্তি কার্য ...করিয়াছিল, তাহা জানিতে হইলে ডিরোজিওর কথা স্মরণ করিতেই ...। সে-সময়ে সমাজে যাহাকে অনিয়ম বা উচ্ছৃঙ্খলতা বলিয়া ...মনে হইয়াছিল, লেখকের ভাষায় তাহাকে এই ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, '...একটি অন্ধকার প্রকোষ্ঠ হইতে মধ্যাহ্ন-দিবাকরের প্রচণ্ড আলোতে হঠাৎ ...বাহির হইলে প্রথমটা চক্ষু ঝলসিয়া যায়, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আমরা ...তাহাতে অভ্যস্ত হই। ঐ সময়ের অবস্থাও কতকটা এইরূপ হইয়াছিল।'

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ, ও স্কুল-বুক সোসাইটি এবং ১৮১৮ ...তে স্কুল সোসাইটি কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। লেখক প্রমাণ ...দিয়া দেখাইয়াছেন যে, বাঙালী সমাজে যে চিন্তা-বিপ্লব উপস্থিত ...হইয়াছিল, ঐ তিনটি প্রতিষ্ঠান দ্বারা তাহার ক্ষেত্র পূর্ব হইতেই প্রস্তুত ...হইয়াছিল, আর এই ক্ষেত্রে বীজ বপনের ভার লইয়াছিলেন স্বদেশ-...প্রেমিক, উদার হৃদয় ও সাহিত্যপ্রাণ হেনরি ডিরোজিও। বাঙলায় ...যুগ প্রবর্তনের ইতিহাসে তাঁহার শিক্ষার দান অবিস্মরণীয়। লেখক ...শেষে বলিয়াছেন, 'ডিরোজিওর জীবন-কাহিনী এক-কথায় বঙ্গে নব-...যুগের গোড়াপত্তনের ইতিহাস।'

এইরূপে প্রত্যেকটি সংস্কারকের জীবন-কথার মধ্য দিয়া যোগেশবাবু ...বাংলার নব-জাগৃতির ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন। মনীষীদের ...জীবন-ভিত্তিক আলোচনায় শিক্ষা-সংস্কৃতি-সভ্যতার ইতিহাসও ইহার ...দ্বারা পরিস্ফুট হইয়াছে।

...সুলভ গল্প-রসের যোগান দেওয়াই যে-যুগে সাহিত্য-সৃষ্টির উদ্দেশ্য ...হইয়া দাঁড়াইয়াছে, শিক্ষা যে-যুগে পরীক্ষাভিমুখী হইয়া উঠিয়াছে, সে-যুগে ...যোগেশবাবুর ন্যায় জ্ঞান-তপস্বী গবেষকগণ অবহেলিত হইলেও, ভবিষ্যতের জন্য তাঁহাদের আসন নির্দিষ্ট হইয়া আছে। তিনি যেরূপ পরিশ্রম করিয়া বাংলার নবযুগের ইতিহাসের অনালোচিত দিকগুলি ক্রমশঃ উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, তজ্জন্য সমস্ত বাঙালী জাতির তিনি ধন্যবাদের পাত্র।

শ্রীঅমিয়কৃষ্ণ রায়চৌধুরী

জননায়ক জওহরলাল :—মণি বাগচি, সুতপা প্রকাশনী, কলিকাতা-২৩। দাম চার টাকা।

জীবনীকার হিসাবে মণি বাগচির নাম ইতিমধ্যেই জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষ করিয়া তাঁহার লিখনভঙ্গির গুণেই অপরাপর বইগুলি এতটা উপভোগ্য হইতে পারিয়াছে। জওহরলালের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় সমস্ত ঘটনাই গ্রন্থকার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া তাঁহার জীবন-ইতিহাসে সবচেয়ে যেটি বড় অধ্যায়—প্রধানমন্ত্রী জওহরলালের কার্যক্রম, তাহাও গ্রন্থকার বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তথাপি বলিব, মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বের ঘটনাগুলিকে তিনি সংক্ষিপ্ত করিয়া আনিয়াছেন। যেমন, জওহরলালের জীবনের সবচেয়ে বড় কথা তাঁহার পররাষ্ট্র নীতি। যাহার সাফল্যে পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রই স্তম্ভিত হইয়াছে। সেই অধ্যায়টিকে আরও ফলাও করিয়া বলা উচিত ছিল। অবশ্য তাঁর কথাতেও আছে: "১৯৫০ সন থেকে ভারত শাসন ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীরূপে নেহরুর কাজের বিরাম ছিল না। তখন থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত ভারতকে একটি প্রকৃত জনকল্যাণ রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলার জন্য তাঁর চিন্তা ও কাজের অন্ত ছিল না বললেই হয়। কত সমস্যার ভেতর দিয়ে তাঁকে চলতে হয়েছিল দেশের ভিতরে ঐক্য এবং সংহতির জন্য। তাঁকে যেমন সর্বদা সজাগ ও সতর্ক থাকতে হয়েছিল, তেমনি প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখার জন্য তাঁর চেষ্টার বিরাম ছিল না। তিনি ত শুধু প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না, বৈদেশিক দপ্তরের দায়িত্বও ন্যস্ত ছিল তাঁর ওপর। কত ধীর এবং স্থির মস্তিষ্কে তিনি এই দপ্তরের জটিল কাজ পরিচালনা করতেন তা ভাবলে পরে বিস্মিত হ'তে হয়। জোট-নিরপেক্ষ নীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁর বৈদেশিক নীতির সম্যক্ আলোচনা করলে পরে আমরা দেখতে পাই যে, ঘরে-বাইরে কত প্রতিকূল সমালোচনা সহ্য করে তিনি একান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত এই নীতিকে আশ্রয় করেই ছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা সত্যিই একটি নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছে।"

জওহরলালকে বুঝিবার পক্ষে এই অংশটুকুই যথেষ্ট। আকারে বৃহৎ না হইয়াও, চরিত্রের সকল দিকই ইহাতে দেখান হইয়াছে। ভাষার গুণে পড়িতেও ভাল লাগে। পাঠকমহলে আদৃত হইবে আশা করি।

বিবেকানন্দের রাজনীতি :—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য, ৩০, ডি ডি মণ্ডলঘাট রোড, দক্ষিণেশ্বর, আড়িয়াদহ, ২৪ পরগণা। মূল্য ২·৫০ নয়া পয়সা।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী অবলম্বনে গ্রন্থকার স্বামীজীর চরিত্র আলোচনা করিয়াছেন। দৃষ্টিভঙ্গি সকলের এক নয়—ইহা লইয়া তর্ক চলে না। তবে মনে হয়, স্বামিজী রাজনীতি হইতে চিরদিনই দূরে ছিলেন এবং আশ্রমের বিধি-নিষেধের মধ্যে এই কথা স্পষ্টতঃ উল্লেখ দেখিতে পাই : "The aims and ideals of the Mission being purely spiritual and humanitarian, it shall have no connection with politics." যাহার জন্য নিবেদিতাকে পর্যন্ত আশ্রম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হয়। ইহা ছাড়াও, গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত অভিমতই গ্রন্থখানিতে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সেই অভিমত মুখবন্ধেও প্রকাশ পাইয়াছে।

ব্যক্তিগত অভিমত লইয়া আলোচনা চলে না। তথাপি বইখানির প্রশংসা করিতেছি এই কারণে, স্বামিজীর বাণী আজকের দিনে যত প্রচার হয় ততই ভাল। স্বামিজী চাহিয়াছিলেন মানুষ গড়িতে। শরীর গঠন না হইলে, কাপুরুষের ধর্ম হয় না। যোগ-সাধনে যোগীরাও শরীর রক্ষার্থে 'আসন' করিতেন। স্বামিজীই একস্থানে বলিতেছেন, "কাপুরুষতা কিংবা রাজনৈতিক বাঁদরামোর সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই। আমি রাজনীতি মোটেই বিশ্বাস করি না। আমার রাজনীতি—ভগবান ও সত্য, আর সব ছাই আর ভস্ম।" গ্রন্থকার নিজেই একস্থানে স্বীকার করিয়াছেন, "তবে তাঁর রাজনীতি ও প্রচলিত রাজনীতিতে তফাৎ অনেক।" একথা স্বীকার করিয়া তিনি গ্রন্থের অন্য নামকরণ করিলেই ভাল করিতেন। তবে গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না সে হিসেবে গ্রন্থখানি অমূল্য।

শ্রীগৌতম সেন
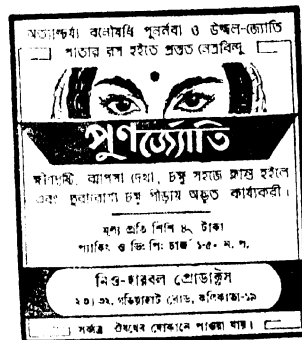
সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৭৭।২।১ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৪শ ভাগ
২য় খণ্ড

তৃতীয় সংখ্যা
পৌষ, ১৩৭১

বিবিধ প্রসঙ্গ

কটকে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের যে অধিবেশন সম্প্রতি কটকে হইয়া গিয়াছে তাহা এই সম্মেলনের নব-পর্য্যায়ে এতাবৎ যে কয়টি অধিবেশন ভারতের নানা স্থানে হইয়াছে সেগুলির অপেক্ষা অধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে মনে হয়। "মনে হয়" লিখিতেছি এই কারণে যে, আমাদের বিচার নির্ভর করিতেছে অধিবেশন-ফেরৎ কয়েকজন সাহিত্যিকের মতামত এবং দৈনিক সংবাদপত্রের রিপোর্টের উপর। সম্মেলনের সবিশেষ বিবরণ ও ভাষণগুলির ছাপা বৃত্তান্ত আমাদের চক্ষুগোচর না হওয়ায় সে-সকল মতামত ও রিপোর্ট যাচাই করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমরা নানা প্রাদেশিক ভাষার সাহিত্য সম্মেলন ইত্যাদির বিবরণ পাই—মায় তামিল পর্য্যন্ত—এবং কয়েকটি বিদেশী সাহিত্যসংস্থার বিবরণও নিয়মিতভাবে পাইয়া থাকি, সোজা ডাকযোগে কিংবা সেই দেশের দূতাবাসের সৌজন্যে। পাই তাহার কারণ ঐ সকল সাহিত্যিক সংস্থা ও সাহিত্য সম্মেলনের পরিচালকবর্গ জ্ঞাত আছেন যে, সাহিত্য-সম্পর্কিত সকল কার্য্যক্রমের মূল্যায়ন সম্ভব শুধু সেই সকল পত্রিকায় যাহারা দীর্ঘদিন সাহিত্যের আসরে ঐ কাজেই বিশেষভাবে নিযুক্ত আছে।

আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের দিল্লীস্থ কর্ত্তৃপক্ষের এতদিনেও চেতনার উদয় হইল না যে, তাঁহাদের সংস্থার প্রকৃত গুণাগুণ বিচার সাহিত্য-পরিবেশক পত্রিকারূপ কষ্টিপাথরেই হইতে পারে ও উহার নিকষে স্থিরীকৃত মূল্যায়নই তাঁহাদের প্রয়াসের যথার্থ পরিচয়। এবং ঐ সকল পত্রিকায় বৎসরের পর বৎসর প্রকাশিত ও স্থায়ীভাবে লিপিবদ্ধ বিবরণ ও আলোচনাই তাঁহাদের প্রয়াসের ধারাবাহিক পরিচয়। "সিনেমা-জ্যোতিষ্ক" সুলভ ক্ষণিকের ব্যক্তিগত "পাবলিসিটি" লাভের চেষ্টাই যতদিন তাঁহাদের চরম লক্ষ্য থাকিবে ততদিন এই পর্য্যায়ের বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন "নিখিল ভারতীয়" হইলেও চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত সংস্থার "খেলো সংস্করণই" থাকিবে। সাহিত্যের সেবা আতসবাজির প্রদর্শনী নয়। একথা তাঁহাদের বুঝিবার সময় হইয়াছে।

যাহাই হউক আমরা যে এত কথা লিখিলাম, তাহা অনুযোগ হিসাবে নয়। ইহা শুধুমাত্র বুঝাইবার চেষ্টায় জানাইলাম, কেননা এতটা শক্তি, সুযোগ ও বিভিন্ন সুধীজন পরিবেশিত মূল্যবান্ তথ্যের ও চিন্তাপ্রসূত বিচারের এরূপ "অদানে অব্রাহ্মণে" অপচয় আমাদের কাছে ক্লেশদায়ক মনে হইয়াছে।

কটকের অধিবেশনে কয়েকজন মনীষী সুচিন্তিত ভাষণ দিয়াছেন। তাহার 'সারাংশ' সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে—অন্ততপক্ষে কলিকাতায়। সেগুলির উপর কোনও আলোচনা হইয়াছিল কি না তাহার কোনও নির্দ্দেশ আমরা পাই নাই। প্রত্যক্ষদর্শী যাঁহারা আমাদের জানাইয়াছেন তাঁহারা বলেন বিশেষ কিছু হয় নাই, কেননা সেরূপ

ব্যবস্থা বিশেষ কিছু ছিল না। শাখাসাহিত্য সভাগুলিতে সভাপতি ছাড়াও অন্যেরা বলিয়াছেন শুনিলাম তবে তাহার কোনও বিশদ বৃত্তান্ত কেহই দিতে পারিলেন না।

অধিবেশনের উদ্বোধনে বিচারপতি শ্রীহরিহর মহাপাত্র যে ভাষণ দিয়াছিলেন তাহার সারাংশের মধ্যে আমরা সুচিন্তিত মন্তব্যের আভাস পাই। 'যুগান্তর' যে সারাংশ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে আছে :—

বিচারপতি শ্রীহরিহর মহাপাত্র বলেন যে, সমাজবাদী চিন্তাধারায় ভাষাকে এক নীতি, এক মাপকাঠি ও এক বর্ণের ভিতর দিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু উহাতে সৃজনশীল সাহিত্য সৃষ্টি হয় না।

তিনি বলেন যে, ভাষা কোন অঞ্চল বা রাজ্য বিশেষের সীমার মধ্য হইতে আসে নাই। চেতনা, কল্পনা ও ভাবনার মধ্য দিয়াই ভাষা গড়িয়া উঠিয়াছে। ঐ তিনের প্রকাশের মধ্য দিয়াই ভাষার যোগ্যতা বিচার করা হয়। যে ভাষার মধ্যে উহা নাই, সে ভাষা টিঁকিতে পারে না।

তিনি বলেন যে, বাঙ্গালীরা এক মহান্ ভাষা ও ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। কিন্তু তাঁহাদের একথা ভুলিলে চলিবে না যে, এই ভাষা ও ঐতিহ্যের উপর ভারতের প্রতিনিধি মানুষের সমান অধিকার আছে।

এই মন্তব্যগুলি সাহিত্য সভার পক্ষে অত্যন্ত সমীচীন ও প্রণিধানযোগ্য। এ বিষয়ে আলোচনার অবকাশ ছিল না কিন্তু বিচারপতি মহাপাত্র এই মন্তব্যগুলির ব্যাখ্যারূপে কোনও উদাহরণযুক্ত বিবৃতি দিয়াছিলেন কি না জানি না। খুব সম্ভব সেরূপ কিছু ছিল না। যাহা আমরা শুনিয়াছি তাহাতে কোনও বিবরণ পাই নাই।

মূল সভাপতি ছিলেন ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। ইঁহার ভাষণ নানাদিক হইতেই বিশেষ সময়োপযোগী মনে হয়। তবে তিনি এই মতামত আরও পূর্ব্বে এইরূপ স্পষ্ট ভাষায় যদি দিতেন তবে দেশের লোকের আগামী দিনের 'হিন্দী দিগ্বিজয়' অভিযানের সম্মুখীন হওয়ার প্রস্তুতি অনেক অগ্রসর হইয়া থাকিতে পারিত। বর্ত্তমান সময়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার শক্তিশালী লোকের মধ্যে হিন্দী সাম্রাজ্যবাদপোষক তিনজন আছেন। মধ্যমস্তরের ও সহকারী শ্রেণীর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বেশ কয়েকজনই আছেন যাঁহারা এ বিষয়ে আরও উৎকট ধারণা পোষণ করেন। যে সকল প্রদেশের লোক হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করিতে এখনও প্রস্তুত নহেন তাঁহাদের উচিত এবিষয়ে এখনই মুখর হইয়া উঠা।

জীবনে সমস্যার আধিক্যের কথার পর এক নূতন সমস্যা উল্লেখ ছিল। তিনি বলেন –

"এইরূপ শত-শত সমস্যা ও অসঙ্গতির মধ্যে, ধর্ম্ম বিদ্বেষের প্রতিস্পর্দ্ধী এক নূতন ধরণের মনোভাবের এ কর্ম্মপদ্ধতির আবির্ভাব, প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব বিগত বৎসরের মধ্যে ভারতের বহু স্থলে নূতন এক উৎপাতে মত দেখা দিয়াছে—সেটির ইংরেজী নামকরণ হইয়া 'লিঙ্গুইজম্'; ইহার বাঙ্গলা করিতে পারা যায় 'ভাষাবিদ্বে অথবা 'ভাষাবিষয়ক অসহিষ্ণুতা'। এই পাপ আমা দেশে পূর্ব্বে কখনও ছিল বলিয়া জানা যায় না।

এই ভাষাবিদ্বেষের বিষময় ফলভোগ করিতে হইয়া বিশেষ করিয়া বাঙ্গালীকে। উত্তর প্রদেশে ও বিহা বিদ্যালয়ে শিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের সব ক্ষেত্রে প্রবল অসুবিধা ভোগ করিতে হইতে বাঙ্গালাভাষীদের এই ভাষাবিদ্বেষের ফলে এবং ইহা ফলে আসামে ব্যাপকভাবে "বঙ্গাল খেদা" আন্দো এবং তাহার পরিণতিরূপে ঘটে নির্লজ্জ নিষ্ঠুর ও জাতীয় বিধ্বংসী নারকীয় কাণ্ড, বাঙ্গালীমেধ যজ্ঞ স্বাধীন ভারতে অন্যতম কলঙ্ক।

সুনীতিবাবু সেই সঙ্গে বলেন, "এই একটি বি বঙ্গভাষী জনগণ আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন তাঁহাদের মধ্যে কখনও এই 'Linguism' দেখা নাই—"

তবে ইংরাজী শিক্ষার সুফল স্বরূপে যে আমাদে মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হয়, সে কথা বলিয়া মা ভাষার ও ইংরাজীর সংস্পর্শে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হওয়ার ক সুনীতিবাবু স্মরণ করাইয়া দেন। আমাদের মধ্যে জাতি বা সাম্প্রদায়িক স্বার্থের ও দম্ভের প্রতীকরূপে মাতৃভাষা স্থাপিত করিবার চিন্তারও অবকাশ তখন (পূর্ব্বদিনে ছিল না।" এ-কথা তিনি জোর দিয়া বলেন। ভাষাবিদ্বেষের উৎপত্তির বিষয়ে তিনি বলেন

ভারতের এই "ভাষাবিদ্বেষ" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে 'হি বনাম ইংরেজী' এই প্রশ্নের উপরে। এই প্রশ্নের ন্যায়সঙ্গ ও ইতিহাসানুমোদিত সমাধান না হইলে ভাষাবিদ্বে মূলোৎপাত হইতে পারিবে না। উপস্থিত ক্ষেত্রে, ভারতে কোনও আধুনিক ভাষা, জ্ঞানবিজ্ঞান ও সংস্কৃতির বাহনরূপে বিশ্বসভ্যতার প্রকাশরূপে, ইংরাজীর স্থান লইতে পারে না বাঙ্গালা হিন্দী মারাঠী তামিল ইত্যাদির একটিও না। কে বিদেশী ভাষা বলিয়া ইংরেজীর শিক্ষা এবং ব্যবহার করিবার চেষ্টা আদৌ কার্য্যকর হইতেছে না। ভারতের প্র

খাঁটি কথাই বলিয়াছেন—ইংরাজী ভাষার সর্ব্বন্ধরতা হার বিশ্বব্যাপী প্রয়োগ বিচার করিয়া দেখিলে, এই কে আধুনিককালে সমগ্র জগতের পক্ষে একটি নতম ঐক্যসূত্র বলিতে হয় এবং ভারতবর্ষে যেমন । বিদেশ হইতে আগত বলিয়া ডাক ও তার বিভাগ, ওয়ে, বিদ্যুতের প্রয়োগ প্রভৃতিকে আমরা আর বর্জ্জন তে পারি না, তেমন সংযোগ ও ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে, নের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ হইতে আর ইংরাজীকে বিদায় ় পারি না। ধীরভাবে বিচার করিয়া এইরূপ ভাব হইতে মুক্ত হওয়া আবশ্যক।

ইংরাজী ভাষাকে বিদায় দিবার জন্য যে-সকল চষ্টা চলিতেছে এবং সেই সঙ্গে "হিন্দী বোলো" রদারদের মধ্যে যাহাদের অবস্থা ভাল তাহাদের ন্যাদের বিদেশী ধর্ম্মসম্প্রদায়-চালিত ইংরাজী-মাধ্যম প্রেরণরূপ জুয়াচুরি ও ভণ্ডামির কথাও সুনীতিবাবু ষ্টভাবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এইরূপ ভণ্ডামির শ্যে জনসাধারণকে ইংরাজী শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়া ইংরাজীর সাহায্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষা অর্জ্জন র দরুণ দেশের সর্ব্ব বিষয়ের নেতৃত্বে নিজের সন্তান তির একচেটিয়া অধিকার স্থাপনা।

ভাষা-সম্পর্কিত ব্যবস্থা কিরূপ হওয়া উচিত সে-সম্বন্ধে ন বলেন—

ভারত রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের দ্বারা গৃহীত সেই সব জ্যর সরকারী ভাষাই মুখ্যতঃ বিধান সভা ও পরিষদের । হইবে। রাজ্যের জন্য আইন প্রণয়ন করিতে হইলে য্যর সরকারী ভাষাকে অগ্রমর্য্যাদা দিতে হইবে, তবে াজীকে আবশ্যকমত রাখিতে হইবে। কেন্দ্রীয় আইন জীতেই রচিত হউক; কিন্তু আবশ্যক মত সাধারণ রিকগণের বুঝিবার জন্য হিন্দী বাঙ্গলা তামিল প্রভৃতি য় রাজ্যের নানা সম্প্রদায়ের ভাষায় এই সব আইন াদের ব্যবস্থা থাকুক।

াদেশিক নিম্ন আদালতের ভাষা, এখন যেমন চলিতেছে, ীয় রাজ্যভাষা, অথবা ইংরাজী অথবা মিশ্রভাবে ভাষা ও ইংরাজীই চলিতে থাকিবে। নিম্ন আদালতের রাজ্যের ভাষায় অথবা ইংরাজীতে দিতে পারা ইবে যেখানেই মোকদ্দমাকারিগণ চাহিবেন তাঁহাদের ধৃত ভাষায় রায়ের অনুবাদ দিতে হইবে। সুপ্রীম র্টের বয়ান এবং সুপ্রীম কোর্টের রায় ইংরাজীতেই ব, তবে সম্পৃক্ত রাজ্যের সরকারী ভাষায় তাহার াদের জন্য কেন্দ্র হইতে অথবা রাজ্য সরকার হইতে া থাকিবে।

হিন্দীভাষার বাধ্যতামূলক ব্যবহারের জন্য যাঁহারা প্রচণ্ড আন্দোলন করিতেছেন তাঁহাদের অভিপ্রায় যে হিন্দীভাষীদের সর্ব্ববিষয়ে বিশেষ অধিকার দিয়া ভারতীয় নাগরিকগণকে প্রথম ও দ্বিতীয় এই দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা সে-কথার আলোচনা করিয়া তিনি হিন্দী সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ বিবৃতি দেন। তারপর আসে বিভিন্ন রাজ্যের ভাষাগত সমস্যার চর্চ্চা। তিনি বলেন—

"ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ভাষাগত সমস্যা সর্ব্বত্র এক নহে। দিল্লীতে বসিয়া একই প্রকারের নীতি সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তিত করিতে গেলে বিভ্রাট ঘটিবে। যেমন প্রস্তাব করা হইয়াছে, ভারতের সমস্ত ভাষা নাগরী লিপিতে লেখা হউক, তাহা হইলেই পূর্ণ একতা হইবে। নাগরী লিপি প্রচলন করিলে (আমার অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি), বাঙ্গালা উড়িয়া তামিল প্রভৃতিকে হিন্দী বর্ণবিন্যাসের ছায়ায় আনিয়া, তাহাদের কতকগুলি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্যের হানি করা হইবে। ওদিকে বানান ব্যাপারে বাঙ্গালী জনগণের অন্য সমস্যা আছে—পূর্ব্ববঙ্গ বা ৬ কোটি বঙ্গভাষীদের ভুলিলে চলিবে না—ইঁহারা অধিক পরিমাণে মুসলমান, কিন্তু উর্দ্দুর চাপ হইতে বাঙ্গালাকে বাঁচাইবার জন্য ইঁহাদের ছাত্রেরা প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াছে, পূর্ব্ব বাঙ্গালার বাঙ্গালা এবং পশ্চিম বাঙ্গালার বাঙ্গলা এই উভয়কে বাঁধিয়া এক ভাষা করিয়া রাখিয়াছে বাঙ্গালা লিপি। পশ্চিম বাঙ্গালায় আমরা যদি নাগরী লিপিতে বাঙ্গালা লিখিবার ও ছাপিবার ব্যর্থ ও অনর্থকর চেষ্টা করি, তাহা হইলে জিদ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে আবার বাঙ্গালা ভাষাকে আরবী অক্ষরে লিখিবার চেষ্টা অবশ্যভাবী নূতনরূপে আত্মপ্রকাশ করিবে, এবং সাড়ে আট হইতে নয় কোটি বাঙ্গালীর ভাষা ভাঙ্গিয়া দুইটি পরস্পরের অবোধ্য ভাষায় পরিণত হইবে—যেভাবে উত্তর ভারতের হিন্দুস্থানী ভাষাকে নাগরী লিপিতে লেখা হিন্দী ও আরবী লিপিতে লেখা উর্দ্দু, এই দুইটি স্বতন্ত্র ভাষায় দাঁড়াইয়া উত্তর ভারতের তথা সমগ্র ভারতের পক্ষে জাতীয় সংহতির পথে এক দুরপনেয় বাধার সৃষ্টি করিয়াছে। এক্ষেত্রে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, ইউরোপে রোমান-লিপি ব্যবহার করে এমন জাতিসমূহের মধ্যেও রাজনীতিক ঐক্য বা সংহতি গড়িয়া উঠিতে পারে নাই।

সুনীতিবাবুর অভিভাষণ সাধারণ সাহিত্য সভার সভাপতির ভাষণ নহে। ইহা একদিকে বিচারকের রায়, অন্যদিকে উৎকল, বঙ্গ এবং সর্ব্বভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির যোগসূত্র নির্ণয় ও বর্ণনার ভিত্তিতে রচিত রসোত্তীর্ণ নিবন্ধ। বিচারকের রায় হিসাবে, বর্ত্তমান কালে মাতৃভাষা, রাষ্ট্র-

ভাষা ও ইংরাজী বহিষ্কার লইয়া একদল নেতৃপদে অভিষিক্ত রথীমহারথী ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে যে গোলযোগ বাধাইয়াছেন, এই অভিভাষণে তাহার সকল দিক বিচার করিয়া দেখানো হইয়াছে। এই বিচার-ফল নির্ণয়ের পিছনে রহিয়াছে সুদীর্ঘ দিনের বিদ্যার্জন, জ্ঞানান্বেষণ ও অধ্যাপনায় কৃতিত্বের খ্যাতি, ভাষাতত্ত্বে ও বিভিন্ন ভাষা-সাহিত্যে ব্যাপক জ্ঞান, দেশ-বিদেশে জ্ঞানীজনের সাক্ষাৎকারে লব্ধ পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং সর্ব্বোপরি রহিয়াছে, ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে চালিত ফাঁদফন্দি, সাচ্চা-ঝুটা, মেকি-আসল ইত্যাদি সম্পর্কে সাক্ষাৎ পরিচয় ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। সেই কারণে বাঙ্গালাভাষী তথা ভারতের অহিন্দীভাষীর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সমস্যা মীমাংসার সহিত ইহা নিকট ভাবে বিজড়িত। আমরা শুনিয়াছি এই অভিভাষণ ইংরাজীতেও মুদ্রিত হইয়াছিল। নিখিলভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল তাহার সর্বভারতীয় প্রচারের ব্যবস্থা করা—সংবাদপত্র ও পত্রিকার মাধ্যমে। বর্তমান সময়ের ভাষা সমস্যা ছেলেখেলার বস্তু নহে।

এখন সাহিত্যের আসরেই ফিরিয়া আসি।

সম্মেলনের বাংলা-সাহিত্য শাখার সভানেত্রী শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবীর ভাষণ বিচারের বস্তু নহে। আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, সমস্যা ও তাহার পূরণ সব কিছুই রহিয়াছে একত্রে এই ভাষণের মধ্যে। শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী তাঁহার মনের ধারায় যে জিজ্ঞাসাবাদ চলিতেছিল বর্তমান বাংলা-সাহিত্য লইয়া, তাহার সওয়াল-জবাব সব কিছুই সরস সহজ ভাষায় নিবেদন করিয়াছেন বাংলা সাহিত্যশাখার অধিবেশনে। জানি না ভাষণের বিষয়বস্তু লইয়া কোনও আলোচনা ঐ সভায় হইয়াছিল কি না। আমরা এই অতি-সুস্বাদ পাঁচমিশালি ব্যঞ্জনের মধ্যে পাইয়াছি একটি বিশেষ উপভোগ্য সারবস্তু। তাঁহারই ভাষায় উহা এইরূপ :—

"আমি নৈরাশ্যবাদী নই। আমার মনে হয় না, বর্তমান বাংলা-সাহিত্যে যা-কিছু হচ্ছে, তা 'কিছু হচ্ছে না'। অথবা যা কিছু হচ্ছে, তা সমস্তই একেবারে সর্বনেশে কাণ্ড হচ্ছে।"

"সাহিত্য চিরদিনই দুঃসাহসিক অভিযানের যাত্রী। প্রতি পদক্ষেপেই তার নতুন পরীক্ষায় চঞ্চল। বন্ধুর পথকে জয় করিতে পারাই তাহার উল্লাস। তাই অহরহই তাহার ভাঙ্গা-গড়ার খেলা। প্রতিনিয়তই সে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অস্থির। এই অস্থিরতাই সাহিত্যের ধর্ম্ম।"

আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীমতী আশাপূর্ণাকে সাধুবাদ

শিশুসাহিত্য শাখার সভাপতি শ্রীসুধীরচন্দ্র সর[illegible] তাঁহার অভিভাষণে শিশুসাহিত্যের পূর্ব্বেকার ধা[illegible] দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া যুগের পর যুগে তাহার নানা[illegible] যাত্রার কথা উল্লেখ করেন। সেই সঙ্গে বর্ত্তমানের বি[illegible] বলেন :—

"আজ পৃথিবীর রূপ নানাভাবে পাল্টে চলেছে, [illegible] দিকে নবজাগরণের সাড়া পড়েছে। আজকের এই নব[illegible] বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দিনে আমাদের ছেলেমেয়ে[illegible] মা-মাসীরা কল্পনাপ্রসূত গল্প বা নীতিকথা শুনেই আজ[illegible] ক্ষান্ত নয়। উত্তুঙ্গ তুষারাবৃত পাহাড়ের চূড়া আজ [illegible] হাতছানি দেয়, মরুভূমির বুকে তাদের মন ছুটে দিতে[illegible] অতল সমুদ্রের গহ্বরে ডুব দিয়ে তারা তুলে আনতে[illegible] অমূল্য অদৃশ্য রত্নরাজি। মহাকাশের বাইরের বায়ুম[illegible] যে অদৃশ্য জগৎ লুকিয়ে আছে, তার রহস্য তারা উদ[illegible] করতে চায়। দূর-দূরান্তরের অজানা সুর তাদের ক[illegible] ভেসে আসে—প্রাণে জাগায় নব নব আশা, কৌতূ[illegible] আনন্দ।"

"তাই আজকের দিনে আমাদের শিশুসাহিত্যের[illegible] বহু বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। কোনও এক বিশেষ দেশের[illegible] স্থানের মধ্যে সে আর আবদ্ধ হয়ে নেই।"—

প্রবীণ শিশুসাহিত্যিকের এই নির্দেশ কালোপযো[illegible] হইয়াছে।

সম্মেলনের অন্য অধিবেশনগুলির কোনও তথ্য আ[illegible] সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

কলিকাতায় বিজ্ঞান কংগ্রেস

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৫১ ও ৫২তম [illegible] অধিবেশন বিগত ৩১শে ডিসেম্বর হইতে ৬ই জানুয়ারী [illegible] কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৭ সালে শেষবার [illegible] কংগ্রেস কলিকাতায় বসে। গত জুন মাসে স্যার আশু[illegible] মুখোপাধ্যায়ের জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধন ক[illegible] রাষ্ট্রপতি। সেই সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপা[illegible] বিজ্ঞান কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষকে আহ্বান জানাইয়াছি[illegible] স্যার আশুতোষের পুণ্য স্মৃতি রক্ষার জন্য এই অধি[illegible] কলিকাতায় অনুষ্ঠিত করিতে, যেহেতু এই ভারতীয় বি[illegible] কংগ্রেস যে ১৯১৪ সালে জন্মগ্রহণ করে তাহার অ[illegible] কারণ স্যার আশুতোষের উৎসাহ ও আগ্রহ। [illegible] অধিবেশন গত সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে চণ্ডীগড়ে হইবার[illegible] ছিল। তাহা স্থগিত রাখিয়া এইবার এইখানে

াতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু এই অধিবেশনের ধন করেন।

শ্চিমবঙ্গ রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু তাঁহার ণ বলেন, এখন মানব সমাজের চূড়ান্ত ভাগ্যফল করিতেছে বৈজ্ঞানিকদিগের উপরেই। ভারতীয় ণের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ছাড়া তাহাদের সমাজ-ক লক্ষ্যে পৌছান অসম্ভব। এবং বিজ্ঞানের পথ ন ছাড়া উহার অন্য উপায় নাই।

শ্রীমতী নাইডু যাহা বলিয়াছেন সে কথাগুলি নিছক —বিশেষে বর্তমান ভারতে। শ্রীজবাহরলাল নেহরু কথাই তাঁহার সভাপতির ভাষণে বলেন ১৯৪৭ সালের ান কংগ্রেসে। তাঁহার ভাষা ছিল অপূর্ব। তিনি ন :—

"For a hungry man or a hungry woman, h has little meaning. He wants food. For a ry man, God has no maning. He wants food. India is a hungry, starving country and to of Truth and God and even of many of the things of life to the millions who are starving mockery. We have to find food for them. ing, housing, education, health an soon—all absolute necessaries of life that every man ld possess. When we have done that we can osophise and think of God. So science must in terms of the 400 million persons in India."

"ক্ষুধার্ত স্ত্রী বা পুরুষের কাছে সত্যের প্রায় কোনই অর্থ না। সে চাহে খাদ্য। ক্ষুধার্ত লোকের কাছে ঈশ্বরও ইন। সে চায় খাদ্য। এবং (যেহেতু) ভারত এক ও অন্নহীন দেশ এবং (সে কারণে) এদেশের কোটি ট ক্ষুধার্ত লোকের কাছে সত্য বা ঈশ্বর অথবা মানুষের নের উন্নততর ও সুন্দর বিষয়গুলির কথা বলায় তাহাদের গসই করা হয়। তাহাদের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, শ্রয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির ও জীবনের অতি-াজনীয় বস্তু সকলের—যাহা প্রত্যেক মনুষ্যেরই থাকা —সন্ধান ও ব্যবস্থা করিতে হইবে আমাদেরই। সেকাজ সম্পন্ন হইয়া যাইবে তখন আমরা দর্শনতত্ত্বের ও ঈশ্বরের চিন্তা করিতে পারি। সেজন্য বিজ্ঞানকে ভাবনা চিন্তা করিতে হইবে ভারতের ৪০ কোটি কের দায় বুঝিয়া।"

পণ্ডিত নেহরু ভারতে বিজ্ঞানের জন্য যাহা করিয়া ছেন, এদেশে বিজ্ঞানের প্রসার-ব্যবহার ও জনসাধারণের ানের মধ্যে উহার প্রতিষ্ঠার জন্য যে প্রয়াস, উৎসাহ সাহায্য তিনি অকুণ্ঠভাবে দিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা হয় না। এই আধুনিককালে অন্য কোন এক ব্যক্তির বা এক ব্যক্তি সমষ্টি ও তাহার অনুরূপ কিছু করিতে সমর্থ হয় নাই। তাঁহারই উৎসাহে এদেশে জাতীয় বিজ্ঞান গবেষণাগার কয়েকটিই প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেখানে ও অন্য বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানে অর্থ সাহায্য যাহাতে যথাযথ হয়, সে-ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছিলেন।

কিন্তু এই দরিদ্র দেশে একদিকে অর্থাভাব ও অন্যদিকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন করিবার জন্য যোগ্য লোকের অভাব চতুর্দ্দিকেই। সেই কারণে যখন বিগত দুই-তিন বৎসরের মধ্যে এই বৈজ্ঞানিক গবেষণার খরচ বার্ষিক দুই কোটি হইতে বৃদ্ধি পাইয়া দশ কোটির উর্দ্ধে যায়, তখন প্রশ্ন হয় যে, এই টাকা ঢালিবার ফলে দেশের কৃষি, শিল্প, পূর্ত ও ইঞ্জিনীয়ারিং, যন্ত্রনির্ম্মাণ বা প্রতিরক্ষা বিষয়ে কোথাও কিছু উন্নতি বা লাভ হইয়াছে, না কেবলমাত্র টাকার অপব্যয় ও অপচয়ই হইতেছে।

এই প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে আলোচনা এই প্রসঙ্গে অবান্তর। কিন্তু এইবারের বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি অধ্যাপক শ্রীহুমায়ুন কবির তাঁহার অভিভাষণে "রাষ্ট্র ও বিজ্ঞান" লইয়া যাহা আলোচনা করেন তাহাতে ইহারই ব্যাপক চর্চ্চা রহিয়াছে। অভিভাষণের শেষে তিনি সেই আলোচনার ফলস্বরূপে যে সাতটি প্রস্তাব বিজ্ঞান কংগ্রেসের বিবেচনার জন্য উপস্থিত করিয়াছেন 'যুগান্তর' তাহার চুম্বক এই ভাবে দিয়াছেন—

ইহাকে জাতীয় নীতি হিসাবে গ্রহণের তিনি পক্ষপাতী।

(১) জাতীয় আয়ের ১ শতাংশ বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে নিয়োগ করা হোক। আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত সঙ্গতি রাখার জন্য এই ব্যয় খুবই সামান্য।

(২) ন্যাশনাল রিসার্চ্চ কাউন্সিল গঠন করিতে হইবে যাহাতে এই সংখ্যা বৈজ্ঞানিক গবেষণাকারী বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির খুব নিকটে থাকিয়া ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিকদের উপযুক্ত শিক্ষায় সাহায্য করিতে পারে।

(৩) গবেষণার ক্ষেত্রে ন্যাশনাল রিসার্চ্চ কাউন্সিলকে সম্পূর্ণরূপে পরিচালনার দায়িত্ব দিতে হইবে।

(৪) প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিমাণে শিক্ষক সহ ৩টি অথবা ৪টি উন্নত গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করিতে হইবে এবং সর্বপ্রকার সাজসরঞ্জামের সুবিধা সহ ঐ সকল কেন্দ্রের অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের বিদেশ ভ্রমণের স্বাধীনতা দিতে হইবে।

(৫) যাহারা স্বাধীনভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় রত, তাঁহাদের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং উৎসাহ দিতে হইবে এবং

উদ্যমী তরুণ বৈজ্ঞানিকদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে।

(৬) ন্যাশনাল কাউন্সিল বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র হইতে প্রতিনিধি হিসাবে সরকারী সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিদের গ্রহণ করিতে হইবে।

(৭) সর্ব্বশেষে তিনটি জাতীয় গবেষণা পরিষদ— এ্যাটমিক এনার্জ্জি কমিশন বৈজ্ঞানিক প্রতিরক্ষা সংস্থা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং স্বাধীন বৈজ্ঞানিক প্রতিনিধি লইয়া একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করিতে হইবে। এই উপদেষ্টা পরিষদ সরকারী তহবিল যাহাতে বিভক্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিবে এবং বিভিন্ন গবেষণার ক্ষেত্রে যে-সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে এবং এই সকল পরিকল্পনার কর্ম্মসূচী প্রণয়ন করিবে।

দুর্গাপুরে কংগ্রেসের ঊনসপ্ততিতম অধিবেশন

দুর্গাপুরের কংগ্রেস অধিবেশনে এবৎসরও কংগ্রেস সরকারের দোষ-ত্রুটির সাফাই এবং অপ্রিয় প্রসঙ্গকে "ধামাচাপা" দেওয়ার প্রথাই বহাল ছিল। তবে পণ্ডিত নেহরুর বিরাট্ ব্যক্তিত্বের প্রভাব ব্যাপ্ত না থাকায় সাফাই-চুণকামের সময়ে নানা দিক হইতে খোঁচা ও ধাক্কা সমানে চলিতেছিল এবং ধামাচাপার কাজও পূর্ব্বেকার মত নির্বন্ধ মুক্ত হইতে পারে নাই। উপরন্তু কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকে. কামরাজ পূর্ব্বতন সভাপতিদিগের মত কংগ্রেস সরকার সকল কাজে প্রশংসা ও সকল মতে সায় না দিয়া অনেক বিষয়ে সতর্কবাণী বা প্রচ্ছন্নভাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। বলিতে কি মহাত্মাজীর তিরোধানের পর এই প্রথমবার প্রণিধানযোগ্য কংগ্রেস সভাপতির অভিভাষণ আমাদের সম্মুখে আসিয়াছে।

বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতিকে সরকারী কাজের তীব্র সমালোচনার মধ্যে আলোচনা চালাইতে হয়। ওয়ার্কিং কমিটি রচিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি বিষয়ক প্রস্তাব বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির সম্মুখে আসিলে পরে প্রায় দশ ঘণ্টা আলোচনা চলে (দুই দিনে)। ৪৫ জন সদস্য সমাজতান্ত্রিক আদর্শের রূপায়ণে সরকারী ব্যর্থতার কঠোর সমালোচনা করেন। প্রথম দিনেই ৭২টি সংশোধনী প্রস্তাব আসে। শেষে প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী দ্বিতীয় দিনে সমালোচকদিগকে এই আশ্বাস দিলে পরে যে, এখন হইতে সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন যে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয় পরিকল্পনাগুলির কাজ ঠিকমত আগাইতেছে কি না পরী করার জন্য সরকার একটি স্থায়ী সংস্থা গঠন করিবেন অবশ্য সেই সংস্থার সদস্য কে বা কি জাতীয় লো থাকিবেন, সে-কথার কোনও চর্চ্চা হয় নাই। এইর আশ্বাস দেওয়ার পর সংশোধনী প্রস্তাবগুলির প্রত্যাহার পরে "সর্ব্বসম্মতিক্রমে" মূল প্রস্তাব গৃহীত হয়।

প্রস্তাবের উত্থাপক শ্রীজগজ্জীবনরাম নিজেই সমালোচন খেই ধরাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি ৯৫ মিনিটের বক্তৃ সরকারী ব্যর্থতার নিদর্শনগুলিই তুলিয়া ধরিয়া দেখান এ সাফল্যের বিষয়ে প্রায় কিছুই বলেন নাই। প্রস্তাবের সমর্থ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ভিন্ন সুরে বক্ত করেন এবং সাফল্য ও ব্যর্থতা দুইয়েরই হিসাব দি ভবিষ্যতের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন। সমালোচ দিগের অভিযোগ সম্পর্কে 'আনন্দবাজার' সংবাদ দিয়া এইরূপ—

প্রতিনিধিদের প্রধান অভিযোগ ছিল সরকার সমা তান্ত্রিক অর্থনীতি ও সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য তে কোন চেষ্টা করিতেছেন না। সরকারী পদস্থ কর্ম্মচারী সময়ের প্রয়োজন অনুসারে চলিতে মোটেই রাজী নহে সমাজবিরোধী শক্তিগুলিকে শায়েস্তা করার তেমন কে তাগিদ দেখা যাইতেছে না। খাদ্যের ব্যাপারে রাজ্যগু নিজেদের খেয়ালখুশী অনুসারে চলিতেছে, কোন সর্ব্বভারতীয় নীতি নাই। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গৃহনির্ম্মাণ প্র বিভিন্ন বিষয়ে সরকারী ব্যর্থতারও কঠোর সমালোচনা ক হয়। কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টির সম্পাদক শ্রীরঘুন সিংহ অভিযোগ করেন, সবচেয়ে অবহেলিত জলপ পরিবহণ ব্যবস্থা এবং উহার উপর সর্ব্বাধিক গুরুত্ব দে দরকার।

সবসুদ্ধ কাগজে-কলমে এই অভিযোগ কঠোর ভাষায় পেশ করেন, প্রবীণ সদস্য শ্রী এন ভি গ্যাডগি তিনি বলেন, 'নেতাদের বোঝা উচিত, টন টন প্রস্তা চেয়ে এক কণা কাজের মূল্য অনেক বেশী।

"আন্তর্জ্জাতিক" প্রস্তাবের মধ্যে পারমাণবিক বোম কথা লইয়াও তীব্র মতভেদ হয়। আন্তর্জ্জাতিক প্রস্তা উত্থাপক শ্রীমোরারজী দেশাই দৃঢ়কণ্ঠে পারমাণবিক বোম বিরোধিতা করিলেও বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির অধিকা সদস্য পারমাণবিক বোমা তৈয়ারীর পক্ষে অভিমত প্রক করেন। ১৯জন বক্তার মধ্যে ১৪জনই ভারতে ঐ বো তৈয়ারীর দাবি জানান এবং তাঁহাদের বক্তৃতায় শ্রোতা

মোরারজী দেশাইয়ের বক্তৃতায় পারমাণবিক বোমা র বিরুদ্ধে যুক্তি ছিল সবই পুরণো—এবং অনেক ফাঁকা ও হাল্কা। তাঁহার মতে ভারত পারমাণবিক নির্ম্মাণ প্রতিযোগিতায় যোগ দিলে নিজের ধ্বংস ডাকিয়া আনিবে। তাহার বক্তৃতা ছিল :—

রমাণবিক অস্ত্র নির্ম্মাণ প্রতিযোগিতায় বিরত ার ও রাষ্ট্রজোটের বাহিরে থাকিবার যে সিদ্ধান্ত লওয়া ছে, তাহা ভারতীয় ইতিহাসের চিরায়ত ঐতিহ্যের তি। ভারত-রক্ষার উদ্দেশ্যে পারমাণবিক বোমা বার লোভে যদি আমরা বশীভূত হই তাহা হইলে া জাতির আত্মাকে খুন করিব।

প্রতিনিধিদের তিনি স্মরণ করাইয়া দেন যে, পারমাণবিক র বিরুদ্ধে কোনরূপ আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নাই। ভারত ন যদি পরস্পরের বিরুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগ তাহা হইলে উভয়েরই বিনাশ ঘটিবে।

এখন অভাবী দেশবাসীর অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয়ের সংস্থান বার ব্যবস্থা হইতেছে। এই সময় জাতির স্বল্প সম্পদকে প্রতিযোগিতায় অপচয় করার কোনই সার্থকতা নাই। পারমাণবিক বোমা বানাইবার পক্ষপাতীদের লক্ষ্য া তিনি বলেন, "আপনারা কোথায় এই অস্ত্রের পরীক্ষা বেন? ভারতে বসতি এত ঘন যে, যে কোন এলাকায় াণবিক বিস্ফোরণ ঘটাইলে সমগ্র জাতি বিপন্ন হইয়া বে।"

তাহা ছাড়া পারমাণবিক বোমা বানাইবার দাবি মহাত্মা ও শ্রীনেহরুর যাবতীয় শিক্ষার বিরোধী। কাজেই ভূতি মিশ্র—যিনি নিজেকে গান্ধীবাদী বলিয়া অভিহিত ন—এই বোমা বানাইবার অনুকূলে প্রস্তাব উত্থাপন তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। কাজেই পারমাণবিক া বানাইতে চাহিলে ভারত আর গান্ধী ও নেহরুর চ থাকিবে না।

তবে এই প্রসঙ্গটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া দিনের মত এই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটাইতে হইবে।

ই প্রস্তাবের সংশোধনী প্রস্তাব আনয়ন করেন শ্রীভগবৎ আজাদ ও শ্রীবিভূতি মিশ্র। তাঁহাদের বক্তৃতায় ছিল : চীন ভারত আক্রমণ করিলে আমরা কি করিব? রা কি অহিংসা পরমধর্ম্ম মন্ত্র আওড়াইব? তাঁহার মতে র পারমাণবিক বোমা নির্ম্মাণের উদ্দেশ্য দুইটি, যথা (১) া ও আফ্রিকায় প্রভুত্ব বিস্তার ও (২) ভারতের বিরুদ্ধে ই করিবার ইচ্ছা।

তিনি বলেন, পারমাণবিক বোমা বানাইবার পর চীনের বাড়িয়াছে। মাও সে-তুং এখন কূটনীতিক যুদ্ধে ভারতকে পরাস্ত করিতে চাহিতেছে। প্রসঙ্গত তিনি বলেন, কায়রো বৈঠকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী চীনকে পারমাণবিক বোমা বানানো বন্ধ করিতে নিবেদন জানান। কিন্তু দুঃখের বিষয় গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ দেশগুলির কেহ তাঁহাকে সমর্থন করে নাই।

শ্রীআজাদ বলেন যে, সকলেই শান্তি চায়। কিন্তু শান্তি স্থাপনের জন্যই শক্তি অর্জ্জন প্রয়োজন।

ইহার পর তিনি সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করেন। উহাতে বলা হয় যে, পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন কোন দেশের ভারত আক্রমণের আশঙ্কার কথা মনে রাখিয়া দেশের প্রতিরক্ষার জন্যই ভারতের পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদন করা উচিত।

শ্রীবিভূতি মিশ্র (বিহার) বলেন, চীনে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে প্রতিবেশী দেশগুলিতে ভারতের প্রতিষ্ঠা কিছুটা কমিয়াছে। তাঁহার মতে, দুনিয়া শক্তির পূজারী এবং যাহার শক্তি আছে, পৃথিবীতে তাহারই সম্মান। সুতরাং দেশের নিরাপত্তা ও সম্মানের খাতিরেই পারমাণবিক বোমা বানাইতে হইবে।

শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের বক্তৃতায় উচ্ছ্বাসের অংশই বেশী। যুক্তি যাহা আছে, তাহা কাটিতে কোনই কষ্ট পাইতে হয় না। পারমাণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় বিপক্ষের মনেও ভয় জন্মান যে এদিক হইতেও পাল্টা মারণাস্ত্র ক্ষেপ হইবেই। ভারত ও চীন পরস্পরের বিরুদ্ধে এই অস্ত্র-ক্ষেপ করিলে উভয়েরই বিনাশ হইতে পারে কিন্তু তাহার প্রতিকার কি চীনের একতরফা অস্ত্রক্ষেপে ভারতের আত্ম-বলিদানে স্বীকৃতি দেওয়া? খরচের কথা তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু আট-দশ বৎসর পূর্ব্বে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ়তর করার জন্য অস্ত্র ক্রয়, অস্ত্রনির্ম্মাণের কারখানা গঠন ইত্যাদির জন্য যখন সামরিক খরচের খাতে বেশী টাকা দেওয়ার কথা উঠে তখন এই মোরারজী দেশাইয়েরই সমমতাবলম্বী একদল এই একই সুরে "গেল গেল, শান্তিবাদ গেল, ধর্ম্ম গেল, অহিংসা গেল, মহাত্মাজীর পুণ্যস্মৃতি গেল। এ যে নিছক যুদ্ধপ্রবণতা war-mongering" ইত্যাদির চীৎকার সেই অস্ত্র ব্যবস্থায় বাধা দিয়াছিলেন। এবং দুঃখের বিষয়, পণ্ডিত নেহরুও সেই "যুক্তি"তে সায় দেওয়ার ফলে সে-সকল চেষ্টা পণ্ড হয়। ইহার প্রত্যক্ষ ফল স্বরূপে আমরা পাইয়াছি ১৯৬২ সনে বিশ্বাসঘাতক চীনের হস্তে পরাজয়ের নিদারুণ অপমান, হাজার হাজার বীরযোদ্ধার অস্ত্রাভাবে বিফলে প্রাণ দান এবং ১২ হাজার বর্গমাইল ভারতভূমি শত্রুর কবলস্থ হওয়ায়। এখন আবার সেই যুক্তি, সেই উচ্ছ্বাস

যাহাই হউক লালবাহাদুর শাস্ত্রী শেষ পর্য্যন্ত পরে অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা যাইবে একথা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন।

কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজের অভিভাষণ ছিল সংক্ষিপ্ত, ৩০ মিনিটকাল ব্যাপী মাত্র। কংগ্রেস সভাপতির ভাষণ হিসাবে ইহা বোধ হয় সংক্ষিপ্ততম! এই ভাষণের অন্য বৈশিষ্ট্যও ছিল, যাহার মধ্যে প্রধানতম হইল সরকারের কার্য্যপ্রকরণ, বিধিব্যবস্থা ও দেশ-পরিচালনা ইত্যাদির উপর তীক্ষ্ণ তদারকি দৃষ্টিভঙ্গির—যাহা প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের কংগ্রেসের প্রধান কাজ ছিল—পুনঃ প্রবর্ত্তন।

তাঁহার ভাষণের আরম্ভেই ছিল কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন সেই সকল কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের প্রতি, যাহারা নেহরুর আকস্মিক মৃত্যুর পর তাঁহার আসনে শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীকে অভিষেকের জন্য সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্ব্বাচন করিয়া ভারতে গণতন্ত্রের আদর্শকে জয়যুক্ত করেন। এখানে নিজের কৃতিত্ব শ্রীকামরাজ পরোক্ষভাবেও উল্লেখ করেন নাই। কংগ্রেসের ভুল-ত্রুটির কথা স্বীকার করিয়া তিনি বলেন, অতীতের সকল ভুল নেহরুর বিরাট্ ব্যক্তিত্বের আড়ালে চাপা পড়ে। কিন্তু অতঃপর আর জাতির নিকট হইতে ভুল-ত্রুটির ক্ষমা মিলিবে না। খাদ্যাভাব ও মূল্যবৃদ্ধির কথায় তিনি মুনাফাবাজির প্রসঙ্গ আনিয়া বলেন "সুখের বিষয় এই যে, কেন্দ্রে ও রাজ্যগুলিতে সরকার আজ (অর্থাৎ এতদিনে) অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বনের মত দৃঢ়তা দেখাইয়াছেন।" চতুর্থ পরিকল্পনায় খরচের ফলে মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কার কথা যেভাবে উল্লেখ করিয়া যেভাবে কংগ্রেস ও কংগ্রেসী সরকারের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য দেখাইয়াছেন তাহা 'যুগান্তর' হইতে নিম্নে উদ্ধৃত অংশে বুঝা যাইবে।

শ্রীকামরাজ বলেন, পরিকল্পনা-কমিশন চতুর্থ পরিকল্পনার জন্য যে-সব প্রস্তাব করেছেন, দেশের বর্ত্তমান খাদ্যাবস্থা দেখে সে সম্পর্কে আমাদের সকলকেই কিছুটা চিন্তা করতে হবে। এই প্রস্তাবগুলি জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয়েছে; এতে বিনিয়োগের পরিমাণ ধরা হয়েছে ২১,৫০০ থেকে ২২,৫০০ কোটি টাকা; হিসেব ধরা হয়েছে যে, এতে বার্ষিক উন্নয়নের হার দাঁড়াবে শতকরা ৬·৫। এত বিরাট্ পরিকল্পনায় হাত দিতে হ'লে [illegible] বিপুল দায়িত্বভার আমাদের গ্রহণ করতে হবে, তার কথ[illegible] আমাদের উপলব্ধি করা দরকার। আগামী পাঁচ বছ[illegible] ২১,৫০০ কোটি টাকা খরচ করবার প্রস্তাব করা হয়েছে[illegible] এর আগের তিনটি পরিকল্পনায় সাকুল্যে যে পরিমা[illegible] টাকা খরচ করা হয়েছে, এই অঙ্ক তার চাইতেও বৃহৎ[illegible] আগের তিনটি পরিকল্পনায় মোট ১৯,০০০ কোটি টাকা[illegible] কিছু বেশী খরচ করা হয়েছে। এত বিপুল পরিমাণ অ[illegible] বিনিয়োগ করলে দেশের মূল্যমানের উপরে তার [illegible] প্রতিক্রিয়া ঘটবে, সযত্নে তা বিশ্লেষণ করে ভেবে দে[illegible] দরকার। চারপাশের দারিদ্র্য, দুঃখ, বেকার-সমস্যা[illegible] শিক্ষা আমরা দ্রুত দূর করতে ব্যগ্র; যথাসম্ভব অ[illegible] সময়ের মধ্যে আমরা একটি আধুনিক সমাজে পরি[illegible] হ'তে ইচ্ছুক; আর সেইজন্যই হয়ত ক্রমেই আমরা বৃ[illegible] থেকে বৃহত্তর পরিকল্পনায় হাত দিতে চাইছি। কি[illegible] একই সঙ্গে দেখা দরকার যে, আমাদের কর্মসূচী যে[illegible] বিচক্ষণ বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

পরলোকে অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

প্রবীণ সাহিত্যিক অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় গত [illegible] ডিসেম্বর পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ব[illegible] ৮৩ বৎসর হইয়াছিল।

তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ম[illegible] মাটির স্বর্গ, জমাখরচ, শ্রী, সকলই গরল ভেল, বরদা ডাক্তা[illegible] প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তিনি ১২৮৯ সনে দক্ষিণ কলিকাতা কালীঘাটে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আদি বাড়ী ছি[illegible] জয়নগর মজিলপুর। তিনি সদালাপী বন্ধুবৎসল ছিলেন এরূপ লোক আজকালকার দিনে বিরল।

বঙ্কিমচন্দ্রকে যেমনটি বুঝেছি

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

ঙ্কিমচন্দ্র। ধূর্জ্জটির জটাজাল থেকে নেমে-আসা যেন জ্যোতির প্রপাত। ভেদবুদ্ধিতে শতধাবিচ্ছিন্ন জাতির চিত্তের অন্ধকারকে দেশাত্মবোধের আলোকচ্ছটায় আলোময় ক'রে তুলল তাঁর গগনস্পর্শী প্রতিভা। লেখনীমুখে তিনি চয়ন ক'রে আনলেন স্বর্গের আগুন।

যুগে যুগে দেশে দেশে প্রতিভা যে কাজ ক'রে এসেছে সেই কাজ তিনি করলেন। সেই কাজটি হ'ল, জগতের মঙ্গল সম্পর্কে একটা নূতনতর মূল্যবোধ জাগান, যাকে এ যুগের একজন খ্যাতনামা মনীষী বলেছেন, revaluation of the world's good. জিনিয়াসের কণ্ঠে নতুনের আবাহন গীতি। যার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে সেই পুরাণোকে ভাঙতে তার লেশমাত্র দ্বিধা নেই। ঈশ্বর মানুষকে যে বিশেষ অধিকারগুলি দান করেছেন তাদের সেরা অধিকার হচ্ছে, মহাপরাক্রমশালীর স্পর্দ্ধাকে সে ধূলায় লুটিয়ে দেবার শক্তি রাখে; ধূলায় অবলুণ্ঠিত যারা তাদের ললাটে সে এঁকে দেয় রাজটীকা। প্রতিভার বরপুত্রেরা আমাদের চোখে দেয় পৃথিবীর একটা নবতর স্বপ্ন। আমরা যে-সকল ধারণায় অভ্যস্ত ছিলাম প্রতিভার আনন্দ হচ্ছে সেই অভ্যস্ত ধারণাগুলিকে পাল্‌টে দেওয়ায়।

এই কাজটি বঙ্কিমচন্দ্র অতুলনীয় কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পাদন করলেন। যা পর্ব্বতের গরিমা নিয়ে বিরাজ করছিল আমাদের মনে তাকে তিনি অবনমিত করলেন বল্মীকের স্তূপের পর্য্যায়ে এবং যেগুলিকে আমরা বল্মীকের স্তূপ ব'লে অবজ্ঞা করতাম তাদের দান করলেন মহাপর্ব্বতমালার গৌরব। এইবার উদাহরণের দ্বারা এই সত্যকে পরিস্ফুট করা যাক।

বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে ইংরেজ শাসনের জয়ধ্বনিতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কণ্ঠ ছিল মুখর। ইংরেজের শাসন-কৌশলে দেশ নাকি দ্রুত মঙ্গলের পথে আগিয়ে চলেছে। এই মঙ্গল-বিচারের কষ্টিপাথর ছিল রেলগাড়ি, ষ্টীমার, টেলিগ্রাফ, নূতন চিকিৎসাশাস্ত্র, অতিকায় শহরগুলির পত্তন, বিজ্ঞানের নব নব দান। টেকনলজির দিক্ দিয়ে একটা চমকপ্রদ উন্নতিকে আমরা ভাবছিলাম দেশের শ্রীবৃদ্ধি।

বঙ্কিমচন্দ্র এসে একটা মহাজিজ্ঞাসা রাখলেন দেশবাসীর সামনে। এই মোক্ষম প্রশ্নটি হ'ল: ইংরেজের শাসন-কৌশলে দেশের প্রচুর কল্যাণ হয়েছে, এ কি সত্য, না কল্পনার বিকার? দেশের মঙ্গল—এই দু'টি কথার তাৎপর্য্য কি? দেশের সংজ্ঞা কি? মঙ্গলেরই বা সংজ্ঞা কি? ইংরেজ শাসনে শহরের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ব্যবসায়ী এবং চাকুরিজীবীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বেড়েছে ঠিকই। বঙ্কিম প্রশ্ন করলেন,

"তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয়জন? আর এই কৃষিজীবী কয়জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয়জন থাকে?"

নিজেই এই প্রশ্নের জবাব দিয়ে কম্বুকণ্ঠে নতুন ভারতের কর্ণে ঘোষণা করলেন,

"হিসাব করিলে তাহারাই দেশ—দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী।"

যারা ছিল বল্মীকের স্তূপের মতই অনাদৃত, বঙ্কিম সেই নিরন্ন নিঃসম্বল লাঞ্ছিত কৃষিজীবীদের ললাটে এঁকে দিলেন জয়তিলক। তাদের উপেক্ষিত জীবনকে দিলেন গিরি-শিখরের মর্য্যাদা। তারাই যে দেশ—অকুণ্ঠভাষায় দিগ্‌-দিগন্তে ছড়িয়ে দিলেন এই বাণী।

ইংরেজ শাসনে দেশের মেরুদণ্ড এই চাষীদের কি কোন মঙ্গল হয়েছে? ঐ হাসিম সেখ আর রামা কৈবর্ত্ত অস্থিচর্ম্ম-সার বলদের দ্বারা ধার-করা হালে চাষ করছে, 'ভাঙ্গা পাতরে রাঙ্গা রাঙ্গা বড় বড় ভাত লুন লঙ্কা' দিয়ে আধপেটা খেয়ে থাকবে, গোহালের একপাশে ভূমিশয্যায় শুয়ে রাত কাটিয়ে দেবে, রেলপথের দৈর্ঘ্য আর শহরের আকাশচুম্বী সৌধমালা ওদের নিষ্প্রদীপ জীবনের অন্ধকারে কোন্ সৌভাগ্যের আলো বহন ক'রে এনেছে? ইংরেজের শাসন-কৌশলে ওদের মঙ্গল হয়েছে কতখানি?

আর একটা সাংঘাতিক প্রশ্ন বঙ্কিমচন্দ্র রাখলেন যুগের সামনে। আর নিজেই প্রশ্নের জবাব দিলেন কঠিন ভাষায়। বললেন,

"আমি বলি অণুমাত্র না, কণামাত্রও না। তাহা যদি না হইল তবে আমি তোমাদের সঙ্গে মঙ্গলের ঘটায় হুলুধ্বনি দিব না।"

সেদিন ফেরঙ্গ সভ্যতার চোখ-ঝলসানো দীপ্তিতে অভিভূত হয়ে দেশের শিক্ষিত সমাজ যখন তারস্বরে ইংরেজ শাসনের

জয়ধ্বনি করছিল, জাতির সেই মহাদুর্দ্দিনের অন্ধকারে একজন পুরুষসিংহ অকুণ্ঠ পাদক্ষেপে মোহান্ধ স্বদেশবাসীদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন এবং নির্ভীককণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, 'হুলুধ্বনি দিব না।' একক কণ্ঠের সেই জোরালো 'না' ইংরেজ শাসনের মর্য্যাদাকে সেদিন যে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল সেই আঘাত থেকে সুরু হ'ল বিপ্লবের জয়যাত্রা। পরবর্ত্তী কালে গান্ধীর কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হয়েছিল 'Lord, give us the ability and willingness to identify ourselves with the masses.' হে ঈশ্বর, শক্তি দাও, প্রেরণা দাও যেন আমরা জনসাধারণের সঙ্গে প্রেমে এক হয়ে যাই। জনসাধারণের দুঃখকে নিজের দুঃখ বলে অনুভব করবার এই যে করুণা—এই করুণার সুরটির প্রথম বাম্ময় ঝঙ্কার বঙ্কিমের বঙ্গদেশের কৃষকে। আমাদের চেতনাকে তিনি ছড়িয়ে দিলেন দেশের কোটি কোটি হাসিম সেখ এবং রামা কৈবর্ত্তদের মাঝে! শিক্ষিত বাঙালী সমাজের চিন্তাজগতে এ যে কত বড় বিপ্লব—সে কথা আজ উপলব্ধি করা কঠিন। বিবেকানন্দের 'দরিদ্র-নারায়ণ' আর গান্ধীর 'কিষাণ-মজদুর-প্রজারাজ' এই দুইটি যুগবাণী আমাদের মনকে নূতনত্বে আর চমকে দেয় না। ওরা আমাদের ঘরের জিনিষ হয়ে গেছে। কিন্তু যে-মানুষটি প্রথম সাধারণ মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কষ্টিপাথরে দেশের মঙ্গলকে যাচাই করবার আদর্শ ঘোষণা করেছিলেন তাঁর চিন্তার মৌলিকতার এবং মননশীলতার গভীরতা আমাদিগকে বিস্ময়ে হতবাক ক'রে দেয়।

'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র এক ঢিলে দুই পাখী মারলেন। আমাদের অন্তরলোকে ইংরেজ শাসন যে একটি মর্য্যাদার আসন অধিকার ক'রে ছিল সেই মর্য্যাদায় তিনি হানলেন চরম আঘাত। আর একটি নিদারুণ আঘাত হানলেন শহরের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আত্মাভিমানে। তারা যে দেশ নয়, এই কথাটি নিষ্করুণ ভাষায় ঘা দিয়ে দিয়ে তাদের মনের মধ্যে বসিয়ে দিলেন! ইংরেজ বাহাদুর আর লেখাপড়া-জানা চশমা-নাকে বাবু-সম্প্রদায়ের আসন টলিয়ে দিয়ে জয়মুকুট পরালেন যাদের মাথায় তারা ছিল সকলের নীচে, সকলের পিছে। অতিকায় ঘটোৎকচদের ধরাশায়ী করবার এবং রিক্তভূষণ অবহেলিতদের কণ্ঠে জয়মাল্য দোলাবার অধিকার রাখে শুধু মানুষই। তারই মনে কখনও কখনও নেমে আসে সেই স্বর্গীয় প্রেরণা, যার হঠাৎ-আলোর ঝলকানিতে সে দেখতে পায় নূতন পথ, জানতে পারে কালপুরুষের নিগূঢ় ইঙ্গিত। The New Spirit গ্রন্থে এলিস (Havelock Ellis) ঠিকই বলেছেন : To abase the mighty and exalt the humble seems to man the divinest of prerogatives, for it is that which he himself exercises in his moments of finest inspirations.

দেশের মঙ্গল বলতে কি বুঝায় তার সংজ্ঞা নিরূপিত হ'ল। এই সংজ্ঞার পটভূমিতে ইংরেজ শাসনের যথার্থ মূল্যও নির্দ্ধারিত হ'ল। 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রকাশিত হয় ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ধর্ম্মতত্ত্বে গুরুর কণ্ঠে ঘোষণা করলেন :

আত্মরক্ষা হইতে স্বজনরক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম, স্বজনরক্ষা হইতে দেশরক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম। যখন ঈশ্বরে ভক্তি এবং সর্ব্বলোকে প্রীতি এক, তখন বলা যাইতে পারে যে ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন, দেশপ্রীতি সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম।

ধর্ম্মতত্ত্বের স্বদেশপ্রীতির বাণীর মধ্যে আনন্দমঠের 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'র প্রতিধ্বনি। Patriotism এর আদর্শকে ভারতীয় সংস্কৃতির রঙে রাঙিয়ে আমাদের হৃদয়-আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন বঙ্কিমচন্দ্র। ধর্ম্মতত্ত্বে গুরু বলছেন,

ভারতবর্ষীয়দিগের ঈশ্বরে ভক্তি ও সর্ব্বলোকে সমদৃষ্টি ছিল। কিন্তু তাঁহারা দেশপ্রীতি সেই সার্ব্বলৌকিক প্রীতিতে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা প্রীতিবৃত্তির সামঞ্জস্যযুক্ত অনুশীলন নহে। দেশপ্রীতি ও সার্ব্বলৌকিক প্রীতি উভয়ের অনুশীলন ও পরস্পরের সামঞ্জস্য চাই। তাহা ঘটিলে ভারতবর্ষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির আসন গ্রহণ করিতে পারিবে।

বঙ্কিমের Patriotism ইউরোপীয় Patriotism নয়। "স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্ব্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে"—বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় এই হচ্ছে ইউরোপীয় Patriotism-এর তাৎপর্য্য। বঙ্কিম লিখলেন "জগদীশ্বর ভারতবর্ষে যেন ভারতবর্ষীয়ের কপালে এই দেশবাৎসল্য ধর্ম্ম না লিখেন। পরবর্ত্তীকালে গান্ধীর সর্ব্বোদয়ের এবং জওহরলালের পঞ্চশীলের আদর্শের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের Patriotism ধর্ম্মেরই স্বীকৃতি।

"পরসমাজের অনিষ্টসাধন করিয়া, আমার সমাজের ইষ্টসাধন করিব না, এবং আমার সমাজের অনিষ্টসাধন করিয়া কাহাকেও আপন সমাজের ইষ্টসাধন করিতে দিব না।"

বঙ্কিমচন্দ্রের জোরালো কণ্ঠে আবার সেই 'দিব না' ইংরেজ শাসনের গুণকীর্ত্তনে আমরা যখন পঞ্চমুখ তখন

…ই মঙ্গল ছড়াছড়ির মধ্যে বঙ্কিম একা দাঁড়িয়ে বলে-লেন, 'আমি তোমাদের সঙ্গে মঙ্গলের ঘটায় হুলুধ্বনি …ব না।' ধর্ম্মতত্ত্বে সেই একই জোরের সঙ্গে ঘোষণা …লেন, 'আমার সমাজের অনিষ্টসাধন করিয়া কাহাকেও …পনার সমাজের ইষ্টসাধন করিতে দিব না।'

কিন্তু 'দেশরক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম'—এই যুগবাণী উচ্চারণ ক'রে বঙ্কিমের রসনা ক্ষান্ত হ'ল না। অবশ্যই এই আদর্শকে …বা ভারতের চিত্তে প্রতিষ্ঠিত করবার একান্তই প্রয়োজন ছিল। দেশ জীবন্মৃত। দেশের কোটি কোটি চাষী …রন্ন। তারা জীবন্ত নরকঙ্কাল। এই অগণিত চলন্ত কঙ্কালের মর্ম্মন্তুদ ছবি বঙ্কিমের সংবেদনশীল চিত্তকে খুব …র একটা নাড়া দিয়েছিল। কৃষ্ণকথিত সত্যতত্ত্বের মধ্যে …নি সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি …সংশয়ে উপলব্ধি করেছিলেন, 'যাহাতে লোকের হিত …হাই সত্য, যাহা তদ্বিরুদ্ধ তাহাই অসত্য।' এই উপলব্ধি …কেই এল দেশরক্ষার প্রেরণা, Patriotism ধর্ম্মের …। অন্নহীন বস্ত্রহীন, স্বাস্থ্যহীন নিরানন্দ দেশে নব …বনের …বন আনতে হ'লে আগে দেশকে বাঁচাতে হবে …দের হাত থেকে যারা দস্যুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে …মাদের স্বাধীনতা জোরপূর্ব্বক হরণ করেছে। কৃষ্ণচরিত্রে …চন্দ্র Patriotism-এর অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করলেন উলঙ্গ …স্পষ্টতার প্রদীপ্ত ভাষায়।

"ছোট চোরের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষার ইংরেজি নাম Justice; বড় চোরের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষার নাম Patriotism."

বড় চোরের ভূমিকা নিয়ে বণিকবৃত্তির আওতায় দেশের …দ যারা লুণ্ঠন করছিল তাদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা …বার জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র অবতীর্ণ হলেন Patriotism-এর …ophet-এর ভূমিকায়।

ইউরোপীয় Patriotism সম্পর্কে বঙ্কিম যে বিশেষণটা …য়োগ করেছেন তা হচ্ছে দুরন্ত। এই দুরন্ত দেশ-…ৎসল্যকে তিনি বলেছেন 'একটা ঘোরতর পৈশাচিক …প।' এর প্রভাবে পৃথিবীর অনুন্নত জাতিগুলির কি …নাশ হয়েছে সুপণ্ডিত বঙ্কিম তা ভাল ক'রেই জানতেন। …ও ইউরোপেরই দেশ। সুতরাং ইংরেজজাতির …triotism ইউরোপীয় Patriotism-এরই একটি …বিহ রূপ। ইংরেজের দেশবাৎসল্যের সর্ব্বনেশে চেহারার …ন তাঁর পরিচয় শুধু ইতিহাসের পাতায় নয়; অগণিত …সিম সেখ আর রামা কৈবর্ত্তের কঙ্কালসার মূর্ত্তিতে, কুটির …গুলির বিনাশের লোমহর্ষণ কাহিনীতে, দিগন্তপ্রসারী দারিদ্র্যের মর্ম্মান্তিক ছবিতে সেই উৎকট স্বদেশপ্রীতির ছাপ তিনি ভাল ক'রেই দেখেছিলেন। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের বলিষ্ঠ মনে ইংরেজ শাসনের প্রতি অনুরাগের লেশমাত্র থাকার কথা নয়।

ইংরেজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী—একথা বঙ্কিমচন্দ্রের ভারতকলঙ্ক প্রবন্ধের উপসংহারে আছে ঠিকই। মনে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, ইংরেজ যদি ভারতের পরম উপকারী হয় তবে বঙ্গদেশের কৃষক প্রবন্ধে তিনি এমন জোরের সঙ্গে ইংরেজ শাসনের জয়ধ্বনি দিতে অস্বীকার করলেন কেন? আপাতদৃষ্টিতে যে দু'টি উক্তিকে পরস্পরবিরোধী মনে হয়—তাদের মধ্যে কিন্তু একটি গভীর সামঞ্জস্য আছে। ইংরেজ আমাদের কোন উপকার করে নি, এ কথা বললে নিছক গোঁড়ামির পরিচয় দেওয়া হয়। বঙ্কিম ভারত-কলঙ্ক প্রবন্ধের শেষে লিখেছেন:

"ইংরেজ আমাদিগকে নূতন কথা শিখাইতেছে। যাহা আমরা কখন জানিতাম না তাহা জানাইতেছে; যাহা কখন দেখি নাই, শুনি নাই, বুঝি নাই তাহা দেখাইতেছে, শুনাইতেছে, বুঝাইতেছে; যে পথে কখন চলি নাই, সে-পথে কেমন করিয়া চলিতে হয়, তাহা দেখাইয়া দিতেছে। সেই সকল শিক্ষার মধ্যে অনেকখানি শিক্ষা অমূল্য। যে-সকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরেজের চিন্তা-ভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছি তাহার মধ্যে দুইটির আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম—স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং জাতিপ্রতিষ্ঠা। ইহা কাহাকে বলে তাহা হিন্দু জানিত না।"

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মৃত্যুবাণ ছিল বৃটিশ ঐতিহাসিকদের লেখায়, ইংরেজী সাহিত্যের বৈপ্লবিক মন্ত্র-বাণীতে। সেই ইতিহাস প'ড়ে, সেই সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে দেশের স্বাধীনতাকে আমরা ভালবাসতে শিখলাম; গণতন্ত্রের আদর্শে আমরা উদ্বুদ্ধ হ'লাম। আমরা বৃহত্তর জাতির একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ, আমাদের সত্তা কেবল গ্রামের চতুঃসীমানার মধ্যে সীমিত থাকা উচিত নয়, আমি সর্ব্বাগ্রে একজন ভারতীয় এবং ভারতবর্ষ আমার স্বদেশ—এই দেশাত্মবোধ জাগ্রত হবার জন্যে ইংরেজের চিন্তা-ভাণ্ডারের সঙ্গে পরিচয়ের অপেক্ষা করছিল। ভারত-বর্ষের বিপ্লব পুষ্ট হয়েছে অক্সফোর্ড আর কেমব্রিজের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্তন্যরস পান ক'রে। কেনেথ কাউণ্ডা, জোমো কেনিয়াট্টা, ডাঃ হেষ্টিংস বান্দা—এঁরা ত সবাই বিলেতে লেখাপড়া-শেখা মানুষ। কিন্তু এঁরা সবাই বিপ্লবীর ভূমিকা নিয়ে আফ্রিকায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মূলে কুঠার হেনে-ছেন। গান্ধী আইন-অমান্যের (Civil Disobedience)

অমোঘ অস্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন হেনরী ডেভিড্ থোরোর লেখায়। ইংরেজ মনীষী রাস্কিনের লেখা থেকে সর্ব্বোদয়ের আদর্শ পেয়েছিলেন। ইংরেজের চিন্তাভাণ্ডার থেকে গান্ধী অনেক অমূল্য রত্ন আহরণ করেছিলেন ব'লে ইংরেজ শাসনকেও মেনে নিতে হবে—এমন কোন যুক্তি তিনি খুঁজে পান নি। ইংরেজের পদপ্রান্তে ব'সে স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা ও জাতিপ্রতিষ্ঠার আদর্শ আমরা লাভ করেছি—একথা অনস্বীকার্য্য। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ইংরেজ আমাদের স্বাধীনতা হরণ করেছিল—এই নির্ম্মম সত্যকে বঙ্কিম এক মুহূর্ত্তের জন্যেও ভুলতে পারেন নি।

একথা বঙ্কিম নিঃসংশয়ে বুঝেছিলেন, বজ্রসুকঠিন রাজশক্তি সহজে আমাদের অপহৃত স্বাধীনতা আমাদিগকে ফিরিয়ে দেবে না। সেই স্বাধীনতা অর্জ্জনের পথ আবেদন-নিবেদনের মধ্য দিয়ে নয়, শক্তির মধ্য দিয়ে। আর শক্তি একতায়। তাই মহাসঙ্গীত বন্দেমাতরম। আমাদের মধ্যে আচারগত, ভাষাগত, ধর্ম্মগত, বর্ণগত যত অনৈক্যই থাকুক, এক জায়গায় আমাদের সকলের মিল আছে। ভারতবর্ষ আমাদের সকলেরই মা। আমরা সকলেই ভারতবাসী। আমরা যে প্রদেশের অথবা যে ধর্ম্মেরই মানুষ হই না কেন, জাতিতে আমরা সবাই ভারতীয়। মার্কিন কবি হুইট্‌ম্যানের মতই বঙ্কিম মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেছিলেন, "Affection shall solve the problems of freedom yet." স্বাধীনতার সমস্যাগুলির সমাধানের নিশ্চিত পথ হচ্ছে প্রেম। যারা পরস্পরকে ভালবাসে তারা দুনিয়ায় অপরাজেয় থাকবেই। একজন মহারাষ্ট্রীয়ের হাতের সঙ্গে হাত মেলাবে একজন রাজপুত। একজন আসবে পাঞ্জাব থেকে, একজন উৎকল থেকে, আর একজন গুজরাট থেকে আর এরা হবে একজন আর একজনের বন্ধু। এমনটি যদি হ'ত, জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সমস্ত ভারতবাসী যদি প্রেমে এক হয়ে যেত, ইংরেজের সাধ্য ছিল না ভারতবর্ষকে এতকাল শৃঙ্খলিত ক'রে রাখে। কিন্তু জাতিপ্রতিষ্ঠা ব'লে ত দেশে কিছু ছিল না। ভারতবর্ষ আমাদের সকলেরই স্বদেশ—দেশাত্মবোধের এই স্বর্ণসূত্রেই শুধু আমরা একত্র মিলিত হ'তে পারতাম। সেই প্রেমে, সেই ঐক্যে আমাদের শক্তি দুর্জ্জয় হ'ত আর সেই দুর্জ্জয় শক্তিতে আমরা হ'তাম বন্ধনমুক্ত।

'বন্দেমাতরম' মহামন্ত্রের উদ্গাতা খেয়ালের মাথায় ঐ মহাসঙ্গীত রচনা করেন নি। ঐ মহাসঙ্গীত রচনার পিছনে ছিল দীর্ঘকালের চিন্তা এবং স্বপ্ন। ভারত-কলঙ্ক প্রবন্ধের শেষের দিকে একটা মর্ম্মান্তিক আক্ষেপের সুর বেজে উঠেছে লেখার মধ্যে। লেখক ভারতের ইতিহাস বিশ্লেষণ ক'রে বলছেন, শিবাজীর নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রীয়ে মহারাষ্ট্রীয়ে যখন ভ্রাতৃভাব হয়েছিল, অজিতপূর্ব্ব মোগল সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব লোপ পেল সেই প্রেমের দুর্ব্বার ধাক্কায়। আর একবার পাঞ্জাবে জাতির অভিমান ভুলে ব্রাহ্মণ আর জাঠ যখন এক হয়ে গেল, রণজিৎ সিংহের নেতৃত্বে গ'ড়ে উঠল দুর্দ্ধর্ষ খালসা—ইংরেজকে রামনগর আর চিলিয়ানওয়ালায় প্রমাদ গুণতে হয়েছিল, ছাড়তে হয়েছিল ত্রাহি ত্রাহি ডাক। ইতিহাসের এই দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বঙ্কিমের চিত্তে গভীর রেখাপাত করে এবং তাঁর মনে একটি যুগান্তকারী ভাবের তরঙ্গ তোলে। বঙ্কিমের নিজস্ব ভাষায় এই ভাবটি হ'ল:

"যদি কদাচিৎ কোন প্রদেশখণ্ডে জাতিপ্রতিষ্ঠার উদয় এতদূর ঘটিয়াছিল, তবে সমুদয় ভারত একজাতীয় বন্ধনে বদ্ধ হইলে কি না হইতে পারিত?"

'কি না হইতে পারিত?' 'কি না হইতে পারিত?'—কত প্রভাতে, কত মধ্যাহ্নে, কত গভীর রাত্রির নিস্তব্ধ প্রহরে বঙ্কিমের সমস্ত চিত্তকে আলোড়িত ক'রে একটি প্রশ্ন ঠেলে উঠেছে: যদি সাম্প্রদায়িকতার, প্রাদেশিকতার, জাত্যাভিমানের সমস্ত বেড়াকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়ে ভারতবর্ষের কোটি কোটি নরনারী একটা বিরাট্ আদর্শের প্রেরণায় মিলে যেত তবে কি না হ'তে পারত? তবে কি মোগল সাম্রাজ্যের মত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যও ভারতবর্ষে ধূ... হয়ে যেত না? আর একটা চিলিয়ানওয়ালার সংগ্রামে সমস্ত ভারতের সম্মিলিত শক্তি ইংরেজ শাসনের দুর্গকে ধূলিসাৎ ক'রে দিত না?

সমুদয় ভারতকে একজাতীয় বন্ধনে বদ্ধ করবার স্বর্ণসূত্রটি বঙ্কিমচন্দ্র পেয়ে গেলেন দু'টি শব্দের মধ্যে। একটি শব্দ 'বন্দে' এবং অপরটি 'মাতরম্'। বন্দেমাতরম সোনার কাঠির ছোঁয়ায় ভারতবর্ষকে তন্দ্রাচ্ছন্ন অতীত থেকে জাগিয়ে দিল একটা নূতনতর চেতনায় অরুণ-রাঙা প্রভাতের মধ্যে। ধন্য জাতীয় জীবনের সেই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তটি যখন স্বর্গ থেকে আগুন নেমে এসেছিল বঙ্কিমের লেখনীর মুখে আর সেই অগ্নি থেকে বেরিয়ে এসেছিল মহাসঙ্গীত বন্দেমাতরম্।

নবজীবনের মন্ত্র পাওয়া গেল। ভেদবুদ্ধির সর্ব্বনেশে দানবটাকে পরাস্ত করবার পাশুপত অস্ত্র মিলল বন্দেমাতরম্-এর মহাগানের মধ্যে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীর বেয়নেটের মুখ থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে গেলে নিজেদের মধ্যে ঐক্য ত সর্ব্বাগ্রে চাই, আরও কিছু চাই। প্রেমের শক্তির সঙ্গে অস্ত্রবল। বঙ্কিমচন্দ্র গান্ধীপন্থী ছিলেন না। অবশ্য উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গিমায় মিল প্রচুর। দেশের নিরন্ন অর্দ্ধ-উলঙ্গ চাষীদের মঙ্গল উভয়েরই মর্ম্মমূলে। অন্যায়কে বাধা দেওয়ার বাণী

নেরই কণ্ঠে। স্বাধীনতা দু'জনেরই মর্ম্মের মহাসঙ্গীত। জনেই বিশ্বাস করতেন ইংলণ্ড ভারতবর্ষকে নিজস্ব সম্পত্তি রে রেখেছে নিছক বারুদের জোরে এবং দেশরক্ষা ন্তর ধর্ম্ম। বড় চোরের হাত থেকে নিজস্ব রক্ষার নাম atriotism—এই হচ্ছে বঙ্কিমের দেশবাৎসল্যের সংজ্ঞা। লণ্ড হাতে চোরাই মাল ছাড়তে বাধ্য হয়, তারই জন্যে Quiet India আন্দোলন। গান্ধী এবং বঙ্কিম উভয়েরই মূল ধারণা ছিল, সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতবর্ষের মত এত ড় একটা মূল্যবান্ সম্পত্তি স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করবে না। ান্ধী বলেছিলেন, force must be matched to orce. শক্তির বিরুদ্ধে শক্তিপ্রয়োগ করতে হবে। বঙ্কিমও াবেদন নিবেদনের পথে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনিও ক্তিপ্রয়োগে বিশ্বাস করতেন। তবে সেই শক্তি গান্ধীর অহিংস আত্মিক শক্তি নয়, গাণ্ডীবধন্বার ধনুর্ব্বাণের মারবার শক্তি। Patriotism-এর অনুপম বঙ্কিমীভাষ্যের পটভূমিতে কৃষ্ণচরিত্রের নিম্নলিখিত লাইনগুলি বঙ্কিমের জীবনদর্শনকে বুঝতে সাহায্য করবে প্রচুর।

"যে দস্যু ধৃতাস্ত্র হইয়া নিশীথে আমার গৃহ প্রবেশপূর্ব্বক সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিতেছে যদি বিনাশ ভিন্ন তাহাকে নিবারণের উপায় না থাকে তবে তাহাকে বিনাশ করাই আমার পক্ষে ধর্ম্মানুগত। যে বিচারকের সম্মুখে হত্যাকারীকৃত হত্যা প্রমাণিত হইয়াছে, যদি তাহার বধদণ্ড রাজনিয়োগসম্মত হয় তবে তিনি তাঁহার বধাজ্ঞা প্রচার করিতে ধর্ম্মত বাধ্য। এবং যে রাজপুরুষের উপর বধের ভার আছে, সেও তাহাকে বধ করিতে বাধ্য। সেকেন্দর বা গজনবী মহম্মদ আতিল বা জঙ্গেজ, তৈমুর বা নাদের, দ্বিতীয় ফ্রেড্রিক বা নাপোলেয়ন পরস্ব বা পররাষ্ট্রাপহরণ জন্য যে অগণিত শিক্ষিত তস্কর লইয়া পররাজ্য প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা লক্ষ লক্ষ হইলেও প্রত্যেকেই ধর্ম্মতঃ বধ্য। এখানে হিংসাই ধর্ম্ম।"

কিন্তু 'বাঙালীর হিয়া-অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।' জাতির হৃদয়-আসনে তখন বিরাজ করছেন চৈতন্যদেবের প্রেমময় কৃষ্ণ বাঁকা বাঁশরি হাতে শ্রীরাধাকে বামে নিয়ে। শিখিপুচ্ছধারী চৈতন্যের কৃষ্ণে একটি করুণ-কোমল শান্তস্নিগ্ধ লালিত্যের মধুর অভিব্যক্তি। কিন্তু কৃষ্ণ কি শুধু জয়দেব গোসাইয়ের এবং চৈতন্যমহাপ্রভুর প্রেমময় কৃষ্ণ? কুরুক্ষেত্রের কপিধ্বজরথের সারথীর মধ্যে গীতাসিংহনাদকারী যে প্রচণ্ড মনোহর কৃষ্ণকে আমরা দেখেছি প্রলয়ঙ্করের ভূমিকায়—সেই কৃষ্ণ কি নিছক কবিকল্পনা? Essays on the Gitaর মধ্যে গীতাভাষ্যের অরবিন্দ ভগবানের বিশ্বরূপের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে একটি কঠিন সত্য বলেছেন :

The weakness of the human heart wants only fair and comforting truths or in their absence pleasant fables ; it will not have the truth in its entirely because there is much that is not clear and pleasant and comfortable, but hard to understand and harder to bear.

"মানব-হৃদয়ের দুর্ব্বলতা সত্যগুলিকে চায় শুধু তাদের ললিতরূপে। মধুরে তার লোভ। মধুর সত্য না পেলে সে নিজেকে ভোলাবে কল্পিত কাহিনীর লালিত্য দিয়ে। সত্যকে তার সামগ্রিকরূপে সে দেখতে নারাজ। পরিপূর্ণ সত্যের মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে যা যতটা দুর্ব্বোধ্য তার চেয়ে বেশী দুঃসহ।"

অরবিন্দ বলছেন :

আমাদের এই সংগ্রামের এবং শ্রমের জগৎ ধ্বংসলীলায় ভীষণ। বিপুল সঙ্কটের আবর্ত্তসঙ্কুল জলরাশি ঠেলে আমাদের জীবনতরী টলমল করতে করতে চলেছে। এমন একটা জগতের মধ্যে আমরা রয়েছি যেখানে আমাদের প্রতি পদক্ষেপে কিছু না-কিছু চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। সে আমাদের ইচ্ছাতেই হোক্ আর অনিচ্ছাতেই হোক্। এখানে every breath of life is a breath too of death. জগতের মৃত্যুময়, পাপময় এই ভীষণ দিকটার জন্যে ভারতের আধ্যাত্মিক চিন্তা কোন মহাপরাক্রমশালী শয়তানকে দায়ী করে নি, অপরাধী করে নি কোন স্বাধীনসত্তা-বিশিষ্ট প্রকৃতিকে অথবা মানুষকে ও তার পাপকে।

অরবিন্দ আবার বলছেন :

We have to see that God the bountiful and prodigal creator, God the helpful, strong and benignant preserver is also God the devourer and destroyer.

অন্তহীন সৃষ্টির লীলায় যিনি স্রষ্টার এবং রক্ষাকর্ত্তার ভূমিকায় সেই ঈশ্বরকেই দেখতে হবে ধ্বংসের প্রলয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে।

বঙ্কিমচন্দ্র চৈতন্যের এবং জয়দেব গোসাইয়ের ললিত-মধুর প্রেমময় কৃষ্ণের পরিবর্ত্তে মহাভারতের শক্তিময় প্রচণ্ড-মনোহর কৃষ্ণকে প্রতিষ্ঠিত করলেন নব্যভারতের হৃদয়-মন্দিরে। কৃষ্ণচরিত্রে বঙ্কিম লিখেছেন,

"জয়দেব গোসাইয়ের কৃষ্ণের অনুকরণে সকলে ব্যস্ত—মহাভারতের কৃষ্ণকে কেহ স্মরণ করে না। এখন আবার সেই আদর্শ পুরুষকে জাতীয় হৃদয়ে জাগরিত করিতে হইবে।"

বঙ্কিম ক্ষমাসুন্দর খ্রীষ্টকে অথবা করুণাঘন বুদ্ধকে আদর্শ

পুরুষের আসন দেন নাই, কৃষ্ণের মাধুর্য্যস্রোতে সদা-ভাসমান গৌরাঙ্গকেও নয়। বঙ্কিমচন্দ্র বলছেন, য়িহুদীরা রোমকের অত্যাচারপীড়িত হয়ে যদি স্বাধীনতার যুদ্ধে যীশুকে সেনাপতিত্বে বরণ করত তিনি 'কাইসরের পাওনা কাইসরকে দাও' ব'লে প্রস্থান করতেন। বুদ্ধ বা গৌরাঙ্গ যুদ্ধের ধার দিয়েও যেতেন না। বঙ্কিমের মতে "কৃষ্ণও যুদ্ধে 'প্রবৃত্তিশূন্য—কিন্তু ধর্ম্মার্থ যুদ্ধও আছে। ধর্ম্মার্থ যুদ্ধ উপস্থিত হইলে অগত্যা প্রবৃত্ত হইতেন।" মহাভারতের কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে দিয়েছেন যুদ্ধ করবার প্রেরণা—কারণ গাণ্ডীবের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিপুঞ্জের অত্যাচারে জর্জ্জরিত আর্ত্ত মানবতাকে রক্ষা করবার আর কোন উপায় ছিল না।

ইংলণ্ড ভারতবর্ষকে তার সম্পত্তি করে রেখেছিল। পররাষ্ট্রাপহরণের অপরাধে সে অপরাধী। ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের উপরে তার ঐশ্বর্য্য। যিনি দেশরক্ষাকে গুরুতর ধর্ম্ম বলে বিশ্বাস করতেন, "আমার সমাজের অনিষ্টসাধন করিয়া কাহারেও আপনার সমাজের ইষ্টসাধন করিতে দিব না"—এই ছিল যার বজ্রদৃঢ় সংকল্প, তিনি ছিলেন আগা-গোড়া বিপ্লবীর ধাতুতে গড়া। আর সেই জন্যেই কৃষ্ণচরিত্র লিখলেন তিনি যেন কৃষ্ণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতবর্ষ স্বাধীনতার জন্যে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়।

বঙ্কিম ক্ষেত্রবিশেষে হিংসা ধর্ম্ম বলতে কুণ্ঠিত হন নি। গীতা ভাষ্যের অরবিন্দ লিখেছেন :

No real peace can be till the heart of man deserves peace; the law of Vishnu cannot prevail till the debt of Rudra is paid.

মানুষের হৃদয় যদি এখনও সেই আদিমবর্ব্বরের লীলা-ভূমি হয়ে থাকে। তবে প্রকৃত শান্তি কেমন ক'রে আসবে? রুদ্রের দেনা শোধ না করা পর্য্যন্ত বিষ্ণুর নীতি অচল থেকে যাবে। প্রেমধর্ম্ম প্রচারের জন্যে জগদ্‌গুরুদের আবির্ভাব হবেই, কারণ ঐ পথেই মানুষের পরম মুক্তি। কিন্তু এখনই দরকার অত্যাচারের বিলুপ্তি, এখনই প্রয়োজন দুষ্টের দমন এবং ধরিত্রীর উদ্ধার। আসুরিক শক্তিপুঞ্জের অত্যাচারে বিপন্ন মানবতা কাঁদছে গাণ্ডীবধন্বার আবির্ভাবের জন্যে। শক্তির অহঙ্কারে যারা অন্ধ তারা ত আর্ত্তের কান্নায় কান দেবে না। তাই ত জগৎ জুড়ে সশস্ত্র বিপ্লবের লীলা চলেছে আর এই নির্ম্মম বাস্তবতার দিকে দৃষ্টি রেখেই শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন :

But not till the Time Spirit of man is ready can the inner and ultimate prevail over the outer and immediate reality. Christ and Buddha have come and gone but it is Rudra who still holds the world in the hollow of his hand.

চরম সত্য আমরা কামনা করব নিশ্চয়ই। প্রেমের এবং ঐক্যের আদর্শকে আমরা কখনই বর্জ্জন করতে পারি নি। কিন্তু mankind এখনও unevolved. মানুষের হৃদয় থেকে এখনও ভেদবুদ্ধি বিদূরিত হয় নি তার স্বভাবে পশু এখনও প্রবল। এই তিক্ত সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে জগত এখনও রুদ্রের করতলগত হয়ে থাকবে এতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে! শৃঙ্খলিত মানবতা দুঃখমোচনের প্রতীক্ষায় কতদিন অপেক্ষা ক'রে থাকতে পারে? কবে অর্থগৃধ্ন সমাজপতি শাইলকেরা সর্ব্বহারাদের দুঃখে বিচলিত হয়ে স্বেচ্ছায় তাদের সম্পদে সবাইকে ভাগ দেবে, এর জন্যে ধৈর্য্য ধ'রে অপেক্ষা ক'রে থাকা সাধারণ মানুষের ধৈর্য্যের বাহিরে।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, এই যুদ্ধের পটভূমিতে অর্জ্জুনের মনে নীতিগত একটা সমস্যার উদয়, ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্যের আদর্শকে অনুসরণ ক'রে অর্জ্জুন সত্যের, ন্যায়ের এবং ধর্ম্মের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে নররক্তে পৃথিবী প্লাবিত করবেন, না যুদ্ধ থেকে, হিংসা থেকে বিরত থাকবেন, এই দ্বন্দ্ব। কৃষ্ণের বাণীতে এই সমস্যার সমাধানের আলো—এই সব নিয়েই গীতা। বঙ্কিম, অরবিন্দ, গান্ধী সবাই গীতার ভাষ্য করেছেন। গীতার মধ্যে গান্ধী দেখেছেন অহিংসার জয়জয়কার। গীতার ব্যাখ্যায় অরবিন্দের এবং বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গিমা স্বতন্ত্র। অরবিন্দ বা বঙ্কিম—কেউ যুদ্ধের সমর্থক নন। গান্ধীর মতই এঁরা শান্তিবাদী। কিন্তু হিংসার এবং অহিংসার আদর্শগত দ্বন্দ্বে অহিংসা গান্ধীর কাছ থেকে যে অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়েছে অরবিন্দের ও বঙ্কিমের কাছ থেকে তা পায় নি—একথা জোরের সঙ্গেই বলা যেতে পারে। শেষোক্ত দুই জন কি অধিকতর বাস্তববাদী ছিলেন?

ফানুস

শৈলেন রায়

হঠাং ছোট্ট একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ট্রেণটা থেমে গেল। বিহারের ছোট্ট একটা ষ্টেশন। বেশ রাত হয়ে গেছে। যাত্রীর ওঠানামা বিশেষ হ'ল না। হুইসিল দিয়ে ট্রেণ ছেড়ে গেল। হঠাং চলন্ত ট্রেণে আমাদের কামরাতেই লাফিয়ে উঠে পড়ল একটি লোক। শীতের রাত, গায়ে তার গরম ওভার-কোট, মাথায় ফেল্টের টুপি, চোখে কালো চশমা। এত রাতে, এভাবে এরকম একজন লোককে দেখে আত্মারাম ...াচাড়া হবার উপার আর কি! সেই এক মুহূর্তের মধ্যেই মনে হ'ল—ষ্টেশনে আমাদের কামরা থেকে কাঁচা বাচ্চাসহ সে বিহারী পরিবারটি নেমে গেলেন, তার পর আর দরজায় ছিটকিনি লাগানো হয় নি। কটমট করে স্বামীর দিকে তাকাতেই হঠাৎ কানে এল—'আরে, ছবিদি না?'

আগন্তুক ততক্ষণ মাথার টুপি খুলে হাসতে হাসতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। এ যে দেখছি অঞ্জন—কতদিন আগেকার সেই অঞ্জন। বিশেষ পালটায় নি কিন্তু অঞ্জন। সেই রকম একমাথা কোঁকড়ান চুল, সেই সমস্ত দাঁত বের করে প্রাণখোলা হাসি—এমন কি সেই কালো চশমাটা পর্যন্ত ঠিক সেই রকম আছে। এই চশমা নিয়ে যে কি ঠাট্টাই না করত বনানী!

বনানী বলত—'জান ছবিদি, ও কালো চশমা পড়ে কেন? চক্ষুলজ্জা কমে যায় বলে। আর তা ছাড়া—' চোখে-মুখে যেন দুষ্টুমি খেলে যেত বনানীর। 'আর তা ছাড়া—এদিক-ওদিক দেখবারও ভারী সুবিধে, তাই না?'

হো হো করে হেসে উঠত অঞ্জন—'তোমার কি হিংসে হয় নাকি তাতে?'

—আমার বয়েই গেছে—'এসব বিয়ের আগেকার কথা। বেশ অনেকদিন হয়ে গেল বৈকি!

—'ও হরি, তুমি আবার কি ভাবছ এত। জামাইবাবুর সঙ্গে গল্প করতে করতে তোমার কথা ত ভুলেই গিয়েছিলাম ছবিদি।'

কত কথাই মনে হয়। মনে হয়, এই সেদিনও 'দিদি চা খাব' বলে এসে দাঁড়াত সে। না বললেও রেহাই নেই। ঘ্যান ঘ্যান সুরু করে দেবে। বড্ড ঘ্যানঘ্যানে স্বভাব ছিল অঞ্জনের। এখনও কি সেরকমটি আছে, না পালটেছে একটু। ভাল করে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। একটু যেন মোটা হয়েছে অঞ্জন। মাথায় কোঁকড়ান চুল, লাল ঠোঁট দু'টি তার সেই আগেকার মতই আছে যেন।

বনানী বলত—'কাকাতুয়া! কাকাতুয়ার ঠোঁট লাল। আর তোমার ঠোঁটও যেন ঠিক কাকাতুয়ার মত। মেয়েলী ঠোঁট তোমার।'

অঞ্জন হারবার পাত্র নয়। সোফায় হেলান দিয়ে হাসতে হাসতে বলত—'কিন্তু চুল? তুমিই ত বলেছ, আমার চুল না কি—' ছুটে ঘর ছেড়ে চলে চলে যেত বনানী, লজ্জায়ই হয়ত।

—'তুমি কথা বলছ না কেন ছবিদি?' অঞ্জন খুসীর আনন্দে ঝলমলিয়ে ওঠে।

—'এই ত বলছি, কতদিন পর দেখা বল ত?'

—'তা হবে অনেকদিন, এই পর গিয়ে—থাক্ সেকথা, ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় পরেও পাওয়া যাবে। বাড়ী গিয়ে হিসেব করলেই হবে।'

—'বাড়ী?'

—'হাঁ, বাড়ী। আমার বাড়ী। পাটনার বাড়ী। যেখানে আমি থাকি, বনানী থাকে, বাব্লু থাকে, আমাদের বুড়ো রামধুন থাকে, আর—'

বাধা দিয়ে বললাম—'থাক, আর লিষ্ট বাড়াতে হবে না। বাব্লু ছেলে বুঝি? কই, সে খবর ত দাও নি।'

—'দেব কেন? কেই বা আর আমাদের খবর রাখে বল?' ঝাঁজিয়ে ওঠে অঞ্জন।

হেসে মেনে নিলাম—'তা বটে! যত দোষ আমার।' বলতে বলতেই গাড়ীর গতি কমে এল।

অঞ্জন ব'লে উঠল, 'পাটনা এসে গেল। জামাইবাবু উঠুন, ছবিদি তুমিও ওঠ ত, বিছানাটা বেঁধে ফেলি।'

—'সে কি ! বিছানা বাঁধবে কেন !'

অঞ্জনের আর এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াবার সময় নেই যেন—'ওঠ আগে, পরে বলছি।' উঠে দাঁড়াতেই বলল, 'নামতে হবে এখানে, আমাদের বাড়ী যেতে হবে, থাকতে হবে অনেকদিন, তোমাদের অত সহজে ছাড়ছি না।' হঠাৎ যেন উৎফুল্ল হয়ে উঠল—'কি খুসীই না হবে বনানী। তুমি কিন্তু আগে ঘরে ঢুকতে পারবে না ছবিদি। জামাইবাবু আপনিও বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবেন। আমি ডাকলেই ভেতরে ঢুকবেন। এমন মজা হবে—'চোখের সামনে মজার সেই দৃশ্য দেখে যেন আনন্দে হেসে ওঠে অঞ্জন। সেই আগেকার ছেলেমানুষী হাসি।

অঞ্জন যেন বড় হয় নি একটুও। সেই ছেলেমানুষী যেন রয়ে গেছে আজও। সেই সেদিনকার মত। যেদিন বি, এস-সি পাশ করেছিল সে।

তা প্রায় বছর দশেক হ'ল বৈ কি ! কি মজাই যে করেছিল বনানীকে নিয়ে সেদিন !

রান্না করছি সকাল বেলা। দৌড়তে দৌড়তে অঞ্জন এসে সোজা রান্নাঘরের সামনে হাজির। আনন্দে দিশে-হারা হয়ে এক হাত দূরের আমিকে চেঁচিয়ে ডেকে উঠল—

ছবিদি।

চমকে উঠে বললাম—'কি হল ?'

—'আমি পাশ করেছি ছবিদি।

—'ওমা, কি মজা, কি খাওয়াবে বল ?'

—'তুমি যা খেতে চাইবে। মিষ্টি, চপ, কাটলেট, মুরগীর মাংস—' হঠাৎ কি মনে হ'তেই একটু চুপ সে যায় অঞ্জন।

—'অবিশ্যি, তুমি ত এসবের কিছুই ভালবাস না ছবি-দি। তুমি ত শুধু চা—' কি রকম করুণ শোনায় তার গলা।

তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যেই যেন সেদিন বলেছিলাম—খাব না কেন ? মুরগীর মাংসই খাই ত, তোমার জামাইবাবুও মুরগীর মাংস ভালবাসে। তা ছাড়া—' হয়ত খানিকটা দুষ্টুমি করেই বলেছিলাম—' বন্যাও ত খুব ভালবাসে মুরগীর মাংস খেতে।'

অঞ্জন বড় বিব্রত বোধ করত আমার মুখে ঐ বন্যা নাম। ওটা যেন ওর নিজস্ব—শুধু ওরই। ওই নামটা আর কারুর মুখে শুনতে যেন চায় না সে। তবে কোন অসতর্ক মুহূর্তে ওর নিজের মুখ দিয়ে আমার সামনেই হয়ত বন্যা নামটা বেরিয়ে গিয়ে থাকবে। নইলে আমি জানবো বা কেমন করে ? যেটা ওদের নিজস্ব—একান্ত গোপনীয় নাম !

ছোট্ট 'একটা 'বেশ তাই হবে' ব'লে অঞ্জন চুপ করে গিয়েছিলো।

হঠাৎ কলিং বেলের আওয়াজ শুনতেই অঞ্জনের চোখে দুষ্টুমি খেলে যায়। বলে, 'নিশ্চয়ই বনানী। আজ বেশ মজা করা যাবে। তুমি ব'লো আমি ফেল করেছি আর আমি মুখ গোমরা করে বসে থাকব—' এতে কি মজা হবে তা অঞ্জনই জানত। তবে সেদিন তার কোন আনন্দই নষ্ট করতে আমার খারাপ লেগেছিল। আমি রাজী হয়ে গেলাম।

সামনের ঘরে অঞ্জন মাথা নীচু করে বসে আছে, দরজা খুলে দিতেই এক ঝলক দুরন্ত হাওয়ার মত বনানী ঘরে ঢুকে পড়ল। উচ্ছ্বাসে ভেঙ্গে পড়ল সে।

—'জানো ছবিদি, আজ রেজাল্ট বেরিয়েছে।' বলতে বলতেই অঞ্জনের দিকে দৃষ্টি পড়তেই থমকে গেল সে। জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

মুখ কাঁচুমাচু করে বললাম, 'খবর ভাল নয়', ততক্ষণ অঞ্জন দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলেছে। কান্নার আবেগে সমস্ত শরীর তার দুলে দুলে উঠছে বুঝি।

বললাম—'যাই, চা'র জল চাপিয়ে আসি', হাসি চাপতে চাপতে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

একটু পরে ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। দেখলাম, বনানী ঝুঁকে পড়ে দু হাত অঞ্জনের কোঁকড়ান চুলে হাত বুলচ্ছে আর বলছে—'তাতে কি হয়েছে অঞ্জু। সামনের বার নিশ্চয়ই হবে। আঃ, কি হচ্ছে। এরকম করে না। আমি যে তা হ'লে—' বলতে বলতে গলা ধরে আসে বনানীর। সেদিন সে-সময় ঘরে ঢোকা আমার আর হয় নি।

কতদিন আগেকার কথা, অথচ মনে হয় যেন সেদিন !

—'তুমি কি ঘুমিয়ে পড়লে ছবিদি। আমরা কিন্তু এসে গেলাম। মনে থাকে যেন। তোমরা আগে ঢুকবে না। ট্যাক্সিতেই ব'সে থেক তোমরা—আমি ডাকলে যাবে কিন্ত।'

তার সব কথাই শেনেছি, অঞ্জনের ডাক শুনে আমরা মেছি, তারপর যা কাণ্ড!

বনানী ত প্রথমটা কি করবে ভেবেই পায় না কিছু। তারপর ছুটে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরে সে কি আদর!

—'এতদিনে তবু খোঁজ পড়ল। সেই কবে বিয়ের র পাটনায় চলে এলাম। না একবার খোঁজ নেওয়া, না যেতে বলা।'

বলতে ইচ্ছে হ'ল— 'ওরে মুখপুড়ী! তখন কি তোদের সময় ছিল রে! বেশী খোঁজ-খবর নিলেই কি খুশী হতিস্ তখন?'

সেই বনানী। সেই ছোটখাটো মেয়েটি, দেখতে সুন্দরী না হ'লেও সুশ্রী বলা চলত তাকে। চোখ দু'টি জীবনের উচ্ছলতায় পূর্ণ। এ কি চেহারা হয়েছে বনানীর! মোটা হয়েছে—ভীষণ ভাবে মোটা হয়ে গেছে সে। গালের মাংসের চাপে অমন সুন্দর চোখ দুটি আজ যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। কিন্তু স্বভাবটা যেন আগের মতই আছে। আর কাউকেই কথা বলতে দেবে না সে। রাজ্যের যত কথা তার মুখে—'জান, ছবিদি, তোমার ওপর না ভীষণ রাগ হয়েছিল আমার। যখন তুমি আমার চিঠির জবাব পর্যন্ত দাও নি—'

তাকে বাধা দিয়ে বললাম— 'চিঠির জবাব ত দিয়েছিলাম। পাও নি কেন বুঝলাম না ত।'

—'ছাই দিয়েছ—' আরও কি বলতে যাচ্ছিল সে। অঞ্জন বাধা দিয়ে বলল— 'তোমরা কি ঝগড়াই করবে না খেতে-টেতে দেবে কিছু। বুড়ীর ত আবার চা না হ'লে চলবে না—তা রাত যতই হোক না কেন!'

বুড়ী বলে খ্যাপাত ওরা দুজনাই আমাকে, বিয়ের আগে থেকেই।

বেশ কয়েকটা দিন পাটনায় ছিলাম সেবার। কর্তা অবিশ্যি দু'দিন পরেই চলে গিয়েছিলেন।

ওরা আমাকে কিছুতেই যেতে দেয় নি। জোর করে ধরে রেখেছে। আগের মত ছেলেমানুষই রয়ে গেছে যেন দু'জনে।

বনানী কিন্তু সে কথা মানে না। জানো ছবিদি, ও যে কি রকম দিনকে-দিন যেন বদলে যাচ্ছে। কাজ আর কাজ। প্রায়ই বাইরে যেতে হয় কাজে। একা একা ভাল লাগে না থাকতে। প্রথম প্রথম ত ভয়ই লাগত, এখন অবিশ্যি অনেকটা গা-সওয়া হয়ে গেছে। তা ছাড়া বাবলু থাকায় সময়টাও কেটে যায়। বাবলু ঠিক অঞ্জনের মতই হয়েছে যেন দেখতে, একমাথা কোঁকড়ান চুল, লাল ঠোঁট দু'টি, টকটকে গায়ের রং। মোটা সোটা গড়ন। বহুদিন পর যেন অঞ্জন আবার ফিরে এসেছে বাবলুর মধ্যে।

বিয়ের আগে বনানী বলত—' আমি ত বিয়ে করব না। আমি চাকরি করব—স্বাধীন ভাবে থাকব, তোমাকে কিন্তু মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে থাকতে হবে ছবিদি।'

অঞ্জন ফোঁড়ন কাটত—'একা ছবিদি যেতে বসেছে জামাইবাবুকে ছেড়ে।' সান্ত্বনা দেবার জন্যেই যেন বলত 'আমি কিন্তু তোমাদের দুজনকেই নিয়ে রাখব ছবিদি। জানো ছবিদি, আমি কলকাতার বাইরে চাকরি করব, কলকাতার এই ঘিঞ্জি আমার ভাল লাগে না। বেশ নির্জন ছোট খাটো কোন সহর—গ্রাম হ'লেও আপত্তি নেই। বিয়ে করব না—বেশ থাকব একা একা।'

বনানী বহুদিন আমার গলা জড়িয়ে বলেছে—'তোমাকে আমি খুব ভালবাসি ছবিদি। অঞ্জনের কথা ছেড়ে দাও। পুরুষ মানুষ শুধু মুখে বলে। আমি কিন্তু তোমার পাশে পাশেই থাকব চিরদিন।'

কিন্তু আমার পাশে পাশে থাকা তার হয় নি। বিয়ে হ'লে, অঞ্জন চাকরি পেল। বনানীকে নিয়ে চলে গেল। যাবার দিন বনানীর সে কি কান্না!

যে ক'দিন পাটনায় ছিলাম, অঞ্জন অফিস যাওয়া ছেড়েই দিয়েছিল এক রকম। সকালবেলা কোনমতে বুড়ী-ছোঁয়া করেই চ'লে আসত, হাঁকডাক করে বলত—'চল ছবিদি, তোমাকে নালন্দা দেখিয়ে নিয়ে আসি। কোন দিন বা—'চল তাড়াতাড়ি, সহরের বাইরে ঘুরে আসা যাক, না হয় সহরের মধ্যেই ঘোরা যাবে খানিকটা।'

বনানী যেন আর পারছে না। এত ঘোরাঘুরি, দৌড়-ঝাঁপ আর যেন সইছে না তার। মাঝে মাঝে যেন

ভয় পেয়েই ধীরে ধীরে আপনার মনেই বলত—' অঞ্জনের যে কি হ'ল? এমনি কিন্তু অফিসের পর একেবারে বেরোতে চায় না। শুধু কাজ আর কাজ, না হ'লে বই মুখে নিয়ে চুপচাপ বসে থাকা।'

সত্যিই দশ বছর আগেকার অঞ্জন যেন আবার ফিরে এসেছে। সেদিন বিকেলে হাসতে হাসতে বলে— 'আচ্ছা ছবিদি, তোমার খুব কষ্ট হয় এভাবে ঘোরাঘুরি করতে, তাই না? কিন্তু কি করব বল—সব যে দেখাতে ইচ্ছে করে তোমাকে। আরও যে কত কি বাকী রয়ে গেল—কত কি যে তুমি দেখতে পেলে না।' নিজের মনেই হিসেব করতে বসে যায় যেন সে।

হেসে বলি— 'পাটনায় যে এত সব দেখবার জিনিষ ছিল আগে ত জানতাম না কোনদিন।'

মুরুব্বি চালে অঞ্জন বলে—' দেখবার চোখ থাকা চাই ত। যাক্, কথা বলে কাজ নেই। চল, আজ একটা বাংলা ছবি এসেছে, দেখা যাক্। কতদিন ছবি দেখি না। বনানী তুমিও ঠিক করে রেডি হয়ে নাও।'

বনানী যায় নি। শরীরটা তার আবার ভালো যাচ্ছে না ক'দিন মাথাও ধরেছে বুঝি। আমাদেরও আর যাওয়া হয় নি সেদিন।

...মাঝ রাতে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গতেই পাশের ঘর থেকে চাপা মেয়েলী গলার আওয়াজ কানে এল—' আপিস কামাই দিয়ে এত মাতামাতি আগে ত কোনদিন দেখি নি। দেখা হ'য়েছিল—নিয়ে এসেছো, বেশ করেছো ভালই করেছো, কিন্তু এদিকে খাবার যে নাম নেই—'

—চুপ করো। ছবিদি থাকছে না—তাকে জোর করে ধরে রাখা হয়েছে।

—'রাখা হয়েছে! কেন এতদিন ধরে কিসের রাখা—' সাপের ফণা লকলকিয়ে ওঠে।

—'চুপ করো, চেঁচিও না। নীচু মন তোমার। ছবিদি যদি শুনতে পায়—'

—কি, কি হবে তা'হলে? হাতে মাথা নেবে নাকি তা'হলে আমার—'গলা যেন বুজে আসে বনানীর। কিছুক্ষণ চুপ চাপ।

হঠাৎ অঞ্জনের চাপা গর্জ্জন—' খবর্দ্দার বনানী! চুল ধরে টানবে না কিন্তু। ঘুমোই নি আমি—'

—ঘুমোওনি ত মট্‌কা মেরে পড়ে আছ কেন। কথার জবাব দাও আমার—'

অনেকদিন আগেকার কথা, সব কথা আজ আর মনেও নেই, পরদিন সকাল বেলাই ক'লকাতার গাড়ী ধরলাম, অঞ্জন ট্রেণে তুলে দিতে এসেছিলো।

হুইসিল দিয়ে ট্রেণ ছেড়ে দিল, অঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগল। হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে উঠল—' আমি জানি ছবিদি, তুমি আর কোন দিন আসবে না—' গাড়ী তখন প্লাট-ফর্ম ছেড়ে এগিয়ে চলেছে।

তখনও দাঁড়িয়ে আছে অঞ্জন। ধীরে ধীরে কত দূরে সরে যাচ্ছে সে। ছোট হ'তে হ'তে বিন্দু হয়ে যাচ্ছে যেন অঞ্জন!

আমার সামনে ভেসে উঠল বহুদিন আগেকার ফেলে আসা একটি দিন! যেদিন বি. এস. সি পরীক্ষায় মিথ্যে ফেল করে মুখ কাঁচু মাচু করে আমাদের সামনের ঘরে বসেছিলো অঞ্জন। বনানীর সঙ্গে মজা করবার জন্য।

সেই দিনটি!

এল্‌গিন মার্ব্বলস্‌

জুল্‌ফিকার

দু'শ শ' বছরেরও আগের কথা, সে যুগে এথেন্সে ফাইডিয়াস্‌ নামে একজন অসাধারণ প্রতিভাবান শিল্পীর অভ্যুদয় হয়েছিল। এই গ্রীক্‌ শিল্পী রচিত মর্ম্মর মূর্ত্তিগুলি শিল্প জগতের অপার বিস্ময়! ভাস্কর্য্যে ফাইডিয়াসের অতুলনীয় সৃজন প্রতিভায় মুগ্ধচিত্ত শিল্প-বিশেষজ্ঞেরা তাঁকে এমন উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি জানিয়েছেন, আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর কোন শিল্পীর ভাগ্যেই ততখানি সোচ্চার প্রশংসা মেলে নি, ভবিষ্যতেও মিলবে কি না সন্দেহ। তাঁদের কথায়, 'His work stands unchallenged as the noblest ever produced by human hands.'

প্রাচীন গ্রীক্‌ বা হেলিনিক স্থাপত্যে শিল্প-দক্ষতার শ্রেষ্ঠ ও গৌরবময় নিদর্শন হচ্ছে পার্থিনন বা এথেনা দেবীর মন্দির এবং সেখানে স্থাপিত তাঁর বিশাল মর্ম্মর মূর্ত্তি। গ্রীকদের যিনি এথেনা, তিনিই পরবর্ত্তী যুগে রোমানদের মিনার্ভা—জ্ঞান ও প্রকর্ষবত্তার অধিষ্ঠাত্রী, হিন্দুদের যেমন সরস্বতী।...

এথেন্স নগরীর উপকণ্ঠে এ্যাক্রোপোলিস (উঁচু শহর) নামক ছোট পাহাড়ের উপর এথেনা দেবীর এই মন্দির—পার্থিনন স্থাপিত হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৪৪৭ থেকে ৪৩৮ সালের মধ্যে। ডোরিক (Doric) পদ্ধতিতে নির্ম্মিত এই দেবালয়টি দৈর্ঘ্যে ২২৮ ফিট, প্রস্থে ১০১ ফিট ও উচ্চতায় ৬৬ ফিট। এর ধ্বংসাবশেষ দেখতে আজও নানা দেশ থেকে হাজার হাজার দর্শক ও শিল্পানুরাগী এথেন্সে এসে থাকেন।

একধারে আটটি, অন্যধারে সতেরটি অত্যুচ্চ স্তম্ভের সারি, চারিদিকে ঘোরানো মার্ব্বেল পাথরের বারান্দা। মাঝে মন্দির-প্রকোষ্ঠে স্থাপিত হয়েছিল এথেনা পার্থিননের প্রতিমা—ভাস্কর ফাইডিয়াসের অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

*

পার্থিননের পূব ও পশ্চিম দিকের থামগুলোর মাথার উপর পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে অনেকগুলি মূর্ত্তি উৎকীর্ণ করা হয়েছিল। পূর্ব্ব ধারে দেখান হয়েছিল দেবী এথেনার জন্ম আর পশ্চিম ধারে এ্যাটিকার জন্ম ও এথেনার সঙ্গে বরুণদেবের (Poseidon) দ্বন্দ্ব যুদ্ধ।

উত্তর ও দক্ষিণ ধারে স্তম্ভ-শীর্ষে মূর্ত্তিলাঞ্ছিত যে চৌকো পাষাণ ফলক (metopes) ছিল, তাতে লাপিথাদের সঙ্গে নরাশ্ব বা Centaurs-দের লড়াই প্রভৃতি অনেকগুলো পৌরাণিক ঘটনাকে রূপায়িত করা হয়েছিল—ছাদের কার্ণিসের নীচে চারদিকে ঘোরানো লম্বা ফালি জায়গাটায় (Frieze) বিভিন্ন দেবদেবীর মিছিলের দৃশ্য—সর্ব্বত্রই শিল্পী ফাইডিয়াসের হাতের যাদু স্পর্শ।...

পার্থিনন সম্বন্ধে বিস্ময়-বিমূঢ় বিশেষজ্ঞদের অভিমত প্রশস্তির সীমাতিক্রান্ত। বস্তুতঃ কোন প্রশংসাই এই অনবদ্য স্থাপত্য শিল্পকর্ম্মের পক্ষে যথেষ্ট নয়। শিল্প-রসিকেরা বলেছেন—

—'Undoubtedly it was the most beautiful and noblest building ever erected by man and even as a ruin it is one of the wonders of the world.'

অপরূপ হেলিনিক শিল্প-সম্ভারের কিছু কিছু ব্রিটিশ মিউজিয়ামে স্থান পেয়েছে। সুদূর গ্রীস থেকে কি ভাবে এগুলোকে ইংল্যাণ্ডে নিয়ে আসা হ'ল, তার এক ইতিহাস আছে। সেই কথাটাই বলব এখানে।

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কনষ্টান্টিনোপলে (ইস্তাম্বুল) ব্রিটিশ রাজদূত নিযুক্ত হয়ে এলেন লর্ড এলগিন। গোটা গ্রীস দেশটা তখন রোমের বাদশার অধীন। গ্রীক্‌ শিল্পকলা বা হেলিনিক আর্ট সম্বন্ধে তুর্কী শাসকদের আদৌ আকর্ষণ বা উৎসাহ ছিল না। গ্রীসের প্রাচীন মন্দিরগুলো যে ভগ্নদশায়, আর সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তিগুলো—শিল্প-নৈপুণ্যের চরম উৎকর্ষের নিদর্শন,যে নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে, সে বিষয়ে তুর্ক কর্ত্তাদের বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা বোধ ছিল না।

লর্ড এলগিন ছিলেন শিল্পরসজ্ঞ, বিদগ্ধ ব্যক্তি, গ্রীক্‌ ভাস্কর্য্যের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হবার পর, তার প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা জেগেছিল তাঁর মনে।

পার্থিনন ও এথেন্সের অন্য একটা মন্দির নাইক এ্যাপ্টেরস (Nike Apteros) থেকে বহু অর্থব্যয়ে কয়েকটি চমৎকার মর্ম্মর মূর্ত্তি ও উৎকীর্ণ শিলাপট সংগ্রহ করে লর্ড এলগিন অনেক কষ্টে দেশে নিয়ে এসেছিলেন।

তাঁর এই মর্ম্মর শিল্প সংগ্রহ, যা বিলাতের যাদুঘরে রক্ষিত আছে—তাকে বলা হয়ে থাকে 'এলগিন্ মার্ব্বল্‌স্।'

*

তুরস্কে রাজদূত থাকাকালীন এথেন্সে সফরে এসে, লর্ড এলগিন প্রাচীন গ্রীক্ দেবালয়গুলির ধ্বংসোন্মুখ অবস্থা ও মূর্ত্তিগুলির দুর্দ্দশা দেখে নিতান্ত ব্যথিত হয়ে উঠলেন। মন্দির-গাত্রে গ্রীক্ ভাস্করেরা যে অপরূপ শিল্প-শৈলীর স্বাক্ষর রেখে গেছেন, তা বিলুপ্তির মুখে। পার্থিননের পশ্চিম ধারটায় আশেপাশে তুর্কীদের অনেকে বাড়ীঘর বেঁধে বাস করছে। একটা অপরিচ্ছন্ন বস্তি গড়ে উঠেছে অমন মহান্ ও সুদৃশ্য মন্দিরটির গা ঘেঁষে। এমন কি ফাইডিয়াসের হাতে-গড়া মূর্ত্তি ভেঙ্গে সেই পাথরের গুঁড়োর মশলা (mortar) দিয়ে কোন কোন জায়গায় গেঁথে তোলা হয়েছে দেওয়াল। বর্ব্বর তুর্কী-দের এই যথেচ্ছাচারে বাধা দেবার কেউ ছিল না। লর্ড এলগিন ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানালেন, গ্রীক্ শিল্পের এই সব অমূল্য নিদর্শন যাতে নিশ্চিহ্ন না হয়ে যায় পৃথিবীর বুক থেকে, সেজন্য যথাসম্ভব এই সব মূর্ত্তিগুলিকে ইংল্যাণ্ডের যাদুঘরে স্থানান্তরিত করা দরকার। তাঁর এই প্রস্তাবে ইংরেজ সরকার কোন সাড়া দিলেন না। সে-যুগের সরকারী চাঁইদের কেউই কোনরূপ উৎসাহ দেখালেন না এই শিল্প সংগ্রহের ব্যাপারে। অত দূর দেশ থেকে গুরুভার মূর্ত্তিগুলি সযত্নে বহন করে আনবার ব্যয়ভার বহন করতে গভর্ণমেণ্ট রাজী হলেন না।

অগত্যা এলগিন স্থির করলেন নিজের খরচায়ই এদেশ থেকে গ্রীক্ শিল্পের নমুনাগুলো সংগ্রহ করে, সঙ্গে নিয়ে দেশে ফিরবেন। যে-সব মূর্ত্তিগুলো ও প্রস্তরফলক তখনও অক্ষত ছিল, কিন্তু যেগুলি সহজে অন্যত্র নিয়ে যাবার সুবিধা ছিল না—এলগিন তাদের প্লাষ্টারের ছাপ তুলে নিলেন। আর যেগুলো স্থানান্তরিত করা সম্ভব, সেগুলোকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানর জন্য সংগ্রহ করে ইংল্যাণ্ডে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন।

১৮০১ সালে ইস্তাম্বুলের তুর্কী গভর্ণমেণ্ট এলগিনকে ঢালাও হুকুম দিলেন যে পার্থিনন মন্দিরের আশেপাশে তিনি ইচ্ছানুযায়ী খননকার্য্য চালাতে পারবেন এবং পছন্দমত যে-কোন মূর্ত্তি বা মর্ম্মর ফলক অপসারণ করতে পারবেন। এথেন্সের গভর্ণরের কাছ থেকেও আদেশ মিলল. একখানা মেটোপ ইংল্যাণ্ডে নিয়ে যাবার। লর্ড এলগিন এই কাজে তিন চার শ' মজুর লাগালেন। উঁচু থেকে অনেক মূর্ত্তি নীচে নামিয়ে আনা হ'ল। Frieze থেকে অনেকগুলো উৎকীর্ণ দৃশ্য খুলে নেওয়া হ'ল। অনেক তুর্কীর বাস্তু কিনে নিয়ে, ভেঙে তাদের ভিত খুঁড়ে উদ্ধার করা হ'ল কারুকার্য্যমণ্ডিত সাদা পাথরের ফলক। বছর খানেকের মধ্যে দু'শ' মস্ত মস্ত কাঠের বাক্সে প্যাক হয়ে অনেকগুলি পাথরের মূর্ত্তি ও ফলক, বাইরে পাঠানোর জন্য তৈরী হ'ল। কিন্তু এ দেশ থেকে ওগুলো নিয়ে যাবার পথে দারুণ একটা বিঘ্ন দেখা দিল।...

*

তখন ১৮০৩ সাল।

হঠাৎ ইউরোপে যুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে পড়ল, দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ বোনাপার্টের বিজয় অভিযানে তখন গোটা ইউরোপ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। এলগিন দেশে ফিরে আসার নির্দ্দেশ পেয়ে মালপত্তর-সমেত দেশের দিকে রওনা হয়েছেন, এরই মধ্যে লেগে গেল যুদ্ধ। ফ্রান্সে এসে তিনি আটকা পড়ে গেলেন। বেশ কয়েক বছর তাঁকে প্যারীতে বন্দী জীবনযাপন করতে হ'ল। তাঁর সংগৃহীত মর্ম্মর মূর্ত্তিগুলি বাক্সবন্দী অবস্থায় দীর্ঘ নয়-দশ বছর পড়ে থেকে, অবশেষে ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে এসে পৌঁছাল।

এই শিল্প সংগ্রহের কাজে লর্ড এলগিনের কমসে কম খরচ হয়েছিল সত্তর হাজার পাউণ্ড ষ্টার্লিং অর্থাৎ ন'লাখ টাকারও বেশী।

অনেক চেষ্টা-চরিত্রের পর পার্লামেণ্টে প্রস্তাব গৃহীত হ'ল যে, ইংরেজ সরকার মার্ব্বেলগুলো কিনে নেবেন, ব্রিটিশ মিউজিয়ামের জন্য।

দাম ধার্য্য হ'ল পঁয়ত্রিশ হাজার পাউণ্ড—অর্থাৎ লর্ড এলগিনের মোট ব্যয় হয়েছিল, তার মাত্র অর্দ্ধেক টাকা। কিন্তু এ নিয়ে আর কোন ওজর-আপত্তি তুললেন না লর্ড এলগিন। হয়ত দেশের চলতি প্রবচনটা তাঁর মনে পড়ে-ছিল—

'একদম রুটি না জোটার চেয়ে আধখানা রুটিও যদি মেলে মন্দ কি?'

তা ছাড়া আর্থিক অস্বচ্ছলতাও তাঁর বিশেষ ছিল না।

*

এই প্রসঙ্গে অনুরূপ আর একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে যখন লর্ড লিটন গ্রীসে মূর্ত্তি সংগ্রহে

ঠিক সেই সময় মিশর দেশে বিখ্যাত ব্রিটিশ
কিওলজিষ্ট স্যার র‍্যালফ এ্যাবারক্রোম্বী প্রত্নতত্ত্ব-
বিষয়ক অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। হঠাৎ একদিন
টি খুঁড়তে খুঁড়তে ভূগর্ভের অন্তরাল থেকে দেখা দিল
কম গ্র্যানিট (Granite) পাথরের সূক্ষ্মচূড় একটা স্তম্ভ
Obelisk)। তার গায়ে লেখা হাইরোগ্লাইফিক
Hieroglyphic) বা চিত্রাক্ষর থেকে জানা গেল যে,
মিশর-রাজ তৃতীয় থথেমিশ (Thothemis) খ্রীষ্ট-
র্ব ষোড়শ শতাব্দীতে, সূর্য্যদেব আমনরা'র পুণ্যস্মৃতি
দ্দেশে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, থিবস নগরে (গ্রীকেরা
র নাম দিয়েছিল হেলিওপোলিস বা সূর্য্য-নগর) তাঁর
জসভার সম্মুখস্থ চত্বরে।

এই বিশাল স্তম্ভটি উচ্চতায় সাড়ে আটষট্টি
ট আর ওজনে দুশো টন বা প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার
ণর কাছাকাছি। এই স্তম্ভটিকেও দেশে নিয়ে আসবার
া ভেবেছিলেন এ্যাবারক্রোম্বী, গ্রীস থেকে যেমন মূর্ত্তি
য়ে আসবার মনস্থ করেছিলেন লিটন। তাঁরও ভাগ্যে
কারী সাহায্য মেলে নি। ভদ্রলোকটি অতি কষ্টে
জার নয়েক পাউণ্ডের (অর্থাৎ প্রায় ১,২০,০০০৲)
মত অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন কিন্তু অকস্মাৎ তাঁর মৃত্যু
হওয়ায় তাঁর ইচ্ছা অপূর্ণ ই রয়ে গেল।

এর পর মিশর-রাজ খেদিভ মহম্মদ আলী রাজা
চতুর্থ জর্জ্জের রাজ্যাভিষেক কালে তাঁকে এই ঐতিহাসিক
স্তম্ভটি উপঢৌকন দিতে চাইলেন, কিন্তু ইংলণ্ডেশ্বর এই
অতিকায় প্রস্তর স্তম্ভটিকে বহন করে আনবার বিপুল
ব্যয়ের কথা চিন্তা করে বিনম্র ধন্যবাদ জানিয়ে উপহারটি
প্রত্যাখ্যান করলেন।

অবশেষে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বহুকষ্টে এটাকে ইংল্যাণ্ডে
নিয়ে আসা হ'ল কাঠের খাঁচায় পুরে, সমুদ্র দিয়ে
ভাসিয়ে। লণ্ডনে টেমস নদীর বাঁধের ধারে ওয়াটারলু
ব্রীজের কাছে এটাকে সংস্থাপিত করা হয়েছে। এর
নাম দেওয়া হয়েছে Cleopatra's Needle। এটা
আনবার জন্য এক পয়সাও ব্যয় করেন নি ব্রিটিশ
গভর্ণমেণ্ট। স্যার ইরাসমাস উইলসন নামক এক ভদ্র-
লোকের অর্থানুকূল্যে সুদূর মিশরের মরুভূমি থেকে এই
ভারী পাথরটাকে বয়ে আনা সম্ভব হয়েছিল।

উপরের দুটো ঘটনা থেকেই ইংরাজ জাতির শিল্প-
প্রীতি ও গভীর আদর্শনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়।

রায়বাড়ী

গিরিবালা দেবী

প্রভাতে বিনুর ঘুম ভাঙ্গে না। ঠাকুমা আসিয়া তাড়া দেন, "ও বিনু, বড়ি দিবি কখন? রোদ্দুরে যে বারান্দা ভরে গেল। রোদ লাগলে তোর মাথা ধরবে। উঠে মুখ ধুয়ে বাসি কাপড় ছেড়ে আগে বড়ি ক'টা বসিয়ে দে। তুই বড়ি দিতে ভালবাসিস বলেই ডাল ভেজানো।"

বিনু খুপরি পিঁড়িতে বসিয়া কলাইয়ের ডালের বড়ি দিতেছে। ব্রজ কাঁসি ভরিয়া ডাল ফেনাইয়া দিতেছে। আর মনে মনে রাগে ফুলিতেছে—"হাঁড়ি হাঁড়ি রকমারি বড়ি ঘরে থাকতে আবার বড়ির পাট। বাবা, কি আহ্লাদি মেয়ে। বড়ি দিতে ভালবাসে, ভেজাও ডাল। বেঁটে-ঘষে ফেনাও, তবে না খুকুমণি কাপড়ের টুকরোয় বড়ি বসাবেন। এত দিন যে মেয়ে আকাশের চাঁদ চেয়ে বসে নি, এই আশ্চর্য্য। এমন সোহাগের মেয়েকে পরের ঘরে পাঠায়? সেখানে দিচ্ছে ছেঁচে-কুটে।"

ঠাকুমা এগিয়ে আসেন, "এককাঠা ডালের বড়ি যে তুই এক দণ্ডেই বসিয়ে দিলি বিনু, হাত নয় ত কল যেন। আজ নাকি তুই ফ্যানাভাত খেতে চাস নি, পেমোর মা তোর জন্যে গরম চালভাজা, কাঁঠালের বীচি-ভাজা ক'রছে। হাত ধুয়ে গরম গরম খেয়ে নে।"

বিনু তেল-নুন মাখা কাঁঠালের বীচি ও চালভাজার বাটি নিয়ে পৈঠায় পা ছড়িয়ে খেতে বসে। তাহার পদতলে পেমো, তাহাকেও খাইতে দেওয়া হইয়াছে।

রৌদ্রে ঝলমল সকাল বেলাটা বিনুর বড় মিঠে লাগে। তরুপত্রের দুর্ব্বাদলের শিশির এখনও শুখায় নাই। মনে হয় কাহার যেন মুক্তার মালা ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

কয়েক দিন হইল বাহিরের আঙ্গিনায় ধান মাড়াই হইতেছে। ভিতরের আঙ্গিনায় রৌদ্রে শুখাইতে দেওয়া হইতেছে ধামা ধামা ধান। পায়রারা ঝাঁক ধরিয়া নামিয়া পড়িয়াছে ধান খাইতে। গৃহে প্রচুর পাইলে বাহিরে যাইবে কেন খাদ্যানুসন্ধানে।

গোক্ষুরধারের দিন মঙ্গলা বাছুরটা অন্দরে আসা- পেট ভরিয়া মায়ের দুগ্ধ পান করিয়া রৌদ্রে শ[illegible] করিয়া অঘোরে ঘুমাইয়া লয়। তাহার পরে [illegible] উর্দ্ধে তুলিয়া দৌড়াতে থাকে ভিতরের আঙ্গিনা[illegible] ধানের উপর দিয়া দৌড়াইয়া ধান ছিটাইয়া দেয় চা[illegible] দিকে। দাসী বিরক্ত হইলেও মুখে তাহা প্রক[illegible] করিতে পারে না গৃহিনীর ভয়ে। গৃহিণীর নাত[illegible] যে বাছুরের ছুটাছুটি দেখিতে ভালবাসে, গলা জড়া[illegible] ধরিতে ভালবাসে। সারাদিন তাহাদের ছড়া[illegible] ছিটান ধান ঝাড় দিয়া জড় করিতে হয়। বি[illegible] হৃদয় হইতে সেই অভিমানের ক্ষীণ মেঘরেখা নিঃশে[illegible] মুছিয়া গিয়াছে। প্রাপ্তির আনন্দে গৌরবে সে হইয়া[illegible] উচ্ছ্বসিত। অদর্শনে যাহারা দূরে সরিয়া গিয়াছি[illegible] অনুক্ষণ দর্শনে তাহারা আবার হৃদয়ের প্রান্তে নি[illegible] হইয়া সরিয়া আসিয়াছে।

দুর্গাসুন্দরী ভাবিয়াছিলেন জলযোগের প[illegible] তাঁহাকে লইয়া বিনু বোধহয় বিদ্যাচর্চ্চায় বসিয়া যাই[illegible] তাঁহার যে শত অজস্র কাজ, বিনুকে বিমুখ করি[illegible] কিরূপে? কিন্তু সে-পথে সে গেল না লক্ষ্য ক[illegible] তিনি আরামের নিশ্বাস ফেলিলেন।

বিনু পেমোকে সঙ্গী করিয়া চলিল বনবিতানে। বাধা দিলেন, "কোথায় চললি? বই-সেলেট নিয়ে এক[illegible] খানি বোস্ গে। ফেলে রাখলে কি কিছু শেখা হয়[illegible] কাল অত উৎসাহ দেখলাম, আজ বই ছুঁচ্চিস [illegible] কেন?"

বিনু গম্ভীর হইয়া জবাব দিল, "একটা দিন মা[illegible] করেছি ব'লে রোজ কি মাটি করব মা? আমা[illegible] কি আর কাজ নেই? এসে অবধি এপর্য্যন্ত বাগানে[illegible] চারদিকটা ভাল করে দেখাই হয় নি। পেয়ারা বাগা[illegible] কাল পেমো দুটো পাকা পেয়ারা দেখেছে উঁচু ডা[illegible] আমি এখন পেয়ারা পাড়তে যাচ্ছি। সমস্ত পাক[illegible] কলা কে তোমাদের কাটতে বলেছিল? এককাঁদি[illegible] গাছে রাখলে ত নন্দন পাখীটা চ'লে যেত না?"

"নন্দন পাখী, সে কি?"

পেমো বলে, "হ, বৌমা, আইছিল নন্দন পক্ষী কল[illegible]

...ায় দুটি বধূবরণ।" মা হাসেন। মেয়ে প্রবেশ ...র গভীর অরণ্যে।

আহারাদি মিটিয়া গেলে ঠাকুমা নিরালা অবকাশে ...কে ধরিলেন, "বাবা তোর জন্যে কত সুন্দর জিনিস ...ঠিয়েছে, তুই তার কিছুই ত ভাল ক'রে দেখলি না? ...য়, এখানে একটু থির হয়ে বসে সব দেখ।"

সত্যিই বিনু কাপড়-জামা প্রসাধন দ্রব্য ভাল করিয়া ...ক্ষণ করিবার অবসর পায় নাই। সংস্কৃত শিক্ষার ...থম উপাদান পাইয়া সে আনন্দে মত্ত হইয়াছিল। ... উদ্দীপনা যেমন জোয়ারের জলের মত সবেগে ...সিয়াছিল, তেমনি সবেগে চলিয়া গিয়াছে। সে ... রসের রসিক নহে, তাহার নিকটে রসের ভাণ্ডারের ...ল্য কি?

বিনু পিতার অসীম স্নেহের উপহার পাইয়া নাড়িয়া-...ড়িয়া দেখিতে দেখিতে কহিল, "আমার কত জামা-...পড় পরে রয়েছে আলমারিতে, বাবা ফের এত জামা-...পড় পাঠিয়েছেন। এত দিয়ে আমি কি করব ঠাকুমা? ...ই ঢাকাই শাড়ীটা, একটা সেমিজ জামা আমার ...কাশিকে দিতে ইচ্ছে করছে। ওর বাবা ত কলকাতায় ...কেন না, বাহারে শাড়ীও দেখেন না; ওর কিছু ...ই। চণ্ডালের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে।

"চণ্ডাল কথাটা তুই বুঝি ঠাকুরকন্যার কাছ ...কে শিখেছিস্। কলকাতা থাকলেই বাহারে শাড়ী ...না যায় না। কিনতে পয়সা লাগে। আকাশির ...য়েতে শাড়ী মিষ্টি ত আমাদের দিতেই হবে। আমি ...নে দেব। তার জন্যে তুই কেন দিতে যাবি তোর ...কাই শাড়ী?"

"আমার যে আরও অনেক রয়েছে ঠাকুমা, ওর ...টাও নেই। তুমি যদি দাও তা হ'লে ওর দুটো ...বে। নেমন্তন্ন বাড়ীতে পড়ে যেতে পারবে।

ঠাকুমা জানিতেন বিনুর প্রকৃতি ছেলেবেলা হইতে ...হার নিজস্ব যাহা তাহা সে একাকী ভোগ করিতে ...রে না। নিজের ভোগের জিনিস অপরকে ভাগ ... দিলে তাহার শান্তি হয় না। ইহাতে তাঁহারা ...েও তাহাকে বাধা দেন নাই। বাধা দিলে আত্মসুখ-...রায়ণ লোভসর্ব্বস্ব হইবে বলিয়া।

ঠাকুমা বলেন, "তোর যখন এত ইচ্ছে হয়েছে ...য় তা হ'লে তুই নিজে হাতে করে আকাশিকে দিয়ে ...সিস্।"

বিনু মাথা দোলায়, "না ঠাকুমা, গিন্নীপনা করে আকাশিকে দিতে আমার লজ্জা করবে। বিয়ের দিন তুমিই তাকে দিয়ে দিও। আমার অনেক হয়েছে ওরও কিছু হোক।"

বিনুর ত্যাগের সংকল্পে ঠাকুমা মনে মনে প্রীত হন। তাঁহাদের মধ্যবিত্ত সংসার ভোগের নয়, ত্যাগের।

তরুর অনেক অনেক দিন একপক্ষ কাল দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া আসিল।

সেদিন প্রভাতে রায়কর্ত্তার নিকট হইতে পত্রবাহক উপস্থিত হইল এবাড়ীর কর্ত্তার কাছে। "আগামী সোমবারে শ্রীমতী বধূমাতাকে আনিতে গাড়ি যাইবে। তাহাকে প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন।"

"মাটি নড়ে ত রায়বাড়ীর কথা নড়ে না", সকলেরই মন ভারী হইল, বিনুর ত কথাই নাই। কিন্তু বিনুর উপরে আরও কিছু ছিল "মড়ার ওপরে খাঁড়ার ঘা।" বৈকালে প্রসাদের চিঠি আসিল। বিনু সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতেছে সে ইহাতে মহা পুলকিত। সে লিখিয়াছে, "যে-কোন ভাষাই হোক না কেন তাহা শিক্ষা করা গৌরবের বিষয়। তোমাদের বাড়ীতে সকলে সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত। বংশের সম্মান বজায় রাখিবার জন্য বহুদিন পূর্ব্বেই তোমার সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন করা উচিত ছিল। যে যাহা হোক এখন যে শিক্ষার প্রতি তোমার মন হইয়াছে ইহাতে আমি আনন্দিত।

মার চিঠিতে জানিলাম আগামী সোমবারে তুমি আমাদের বাড়ীতে যাইতেছ। সেখানে গিয়া ভাল হইয়া থাকিবে। পড়াশোনায় মনোযোগী হইবে। আমার চিঠির জবাব এখান হইতেই দিয়া যাইবে। তুমি সংস্কৃত কেমন লিখিতে শিখিয়াছ তাহা সংস্কৃত অক্ষরে আমাকে লিখিবে।"

বিনুর তাসের ঘর বাতাসে ভাঙ্গিয়া পড়িল। সেই যে সংস্কৃত অক্ষর কয়েকটা চিনিয়া বইখানা সে ফেলিয়া রাখিয়াছে আর তাহা খোলার অবকাশ পায় নাই।

মা মেয়ের চুল বাঁধিয়া দিতে আসিয়া দেখিলেন মেয়ে স্বামীর চিঠি লইয়া আধোবদনে বসিয়া রহিয়াছে।

মাকে দেখিয়া চিঠিখানা লুকাইতেও সে ভুলিয়া গিয়াছে। সেকালের স্বামীর চিঠি গুরুজনদের সম্মুখ হইতে গোপনে রাখিতে হইত। এতদিন বিনুও তাহাই রাখিয়াছে আজ প্রথম তার ব্যাতিক্রম।

মা ব্যস্ত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, 'একি বিনু, তুই

চিঠি নিয়ে এমন ভাবে বসে রয়েছিস্ কেন? প্রসাদ ভাল আছে ত?"

"হ্যাঁ, আমাকে সংস্কৃতে পত্রের উত্তর দিতে লিখেছে। মা, তোমরা আমাকে এমন মূর্খ করে রেখেছিলে কেন? এখন আমি কি করি?" বলিতে বলিতে বিনু কান্নায় ভাঙিয়া পড়িয়া মা'র কোলে মুখ লুকাইল।

মা তাহার মস্তকে স্নেহ হস্ত বুলাইতে লাগিলেন। তাঁহার মনোনেত্রে ভাসিয়া আসিল একটি কচি কোমল সুমিষ্ট মুখচ্ছবি। তাহাকে অকালে হারাইয়া ইহার প্রতি তাঁহারা এতটুকু চাপ দিতে সাহস করেন নাই। যাহা লইয়া এ থাকিতে চায় থাকুক। হাত ধরাধরি করিয়া যেমন দুই ভাই-বোন এখানে আসিয়াছিল, অনাদরে উৎপীড়নে আবার যদি হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়া যায়।—এই আতঙ্কে বিনুকে লেখাপড়ার জন্য শাসন করা হয় নাই; তাড়ন করা হয় নাই।

মা নিজেকে সংযত করিয়া শান্ত মুখে বলিলেন এরই জন্যে কান্না, ছিঃ ছিঃ তুই কি বোকা। তোর মতন বয়েসের মেয়ের যা শেখা দরকার তা তুই বেশ শিখেছিস মা। গাঁয়ে মেয়েদের স্কুল নেই, তোর ঠাকুরদা-ঠাকুমাকে খালি বাড়ীতে ফেলে আমি তোর বাবার কাছে সহরে থেকে তোকে লেখাপড়া শেখাতে পারি নি। এখান থেকে যা সম্ভব তা তোর হয়েছে। আমি বুঝতে পারছি—তুই প্রসাদকে লিখেছিলি 'সংস্কৃত শিখেছি।' তা না হলে সে ত কাঁচা ছেলে নয় যে তোকে সংস্কৃতে পত্রের উত্তর দিতে লিখবে?"

বিনু কথাও বলে না, মুখও তোলে না, তেমনি অঝোরে কাঁদিতে থাকে। সকাল বেলা রায়বাড়ী হইতে তাহার আমন্ত্রণ লিপি আসিবার পর হইতে বিনুর হৃদয়ে ঘনঘোর কালো মেঘরেখার সঞ্চার হইয়াছিল, সেই মেঘ ঝরি-ঝরি করিয়াও এতক্ষণ ঝরিয়া পড়ে নাই। প্রসাদের চিঠি বর্ষণের উপলক্ষ্য মাত্র।

মা কোল হইতে বিনুর মুখ তুলিলেন, অঞ্চলে অশ্রুজল মুছাইয়া দিয়া কহিলেন, "তুই চুল বেঁধে গা মুছে তারপরে ধীরে-সুস্থে তাকে লিখে দিস, "আমি এখনও চিঠি লেখার মত সংস্কৃত শিখি নাই। শিখিলে লিখিব'।"

মা কত সহজে বিনুর এত বড় সমস্যার সমাধান করিয়া দিলেন। বিনুর মেঘম্লান হৃদয়-আকাশে নক্ষত্রের দীপ্তি ঝকমক্ করিতে লাগিল।

আবার সেই পথ। সেই ছায়া-ঢাকা পাখী-ডাকা মাঠ। সেদিন ছিল রৌদ্রকিরণোজ্জ্বল মধ্যাহ্ন। আজ অপরাহ্ন।

বিনু ফিরিয়া চলিয়াছে রায়বাড়ীতে। সেই জুড়ান গাড়োয়ান। নবীন ও কামিনীর মা সঙ্গী। সেদিন কত আশা-আনন্দে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়াছিল। আজ বিষাদ ও অশ্রুজল।

বিনু পর্দা-ঢাকা গাড়ির ছইয়ের ভিতরে শয়ন করিয়া চোখের জলে ভাসিতেছিল। পথ বা পথের পাশের কোন দৃশ্যাবলী আজ তাহাকে আকৃষ্ট করিতে পারিতেছিল না। বাহ্যদৃষ্টির সম্মুখ হইতে তাহার যাহা কিছু শোভাময় সরিয়া গিয়াছে। হৃদয়ের পট-ভূমিকায় জাগ্রত হইয়া রহিয়াছে কত মনোহর চিত্র, সুমধুর স্মৃতি।

কামিনীর মা বলে, "বৌমা, তুমি মুখ গুঁজে এমনি ধারা পড়ি রইলে ক্যানে? ত্থাশের গাছ-গাছালি, ত্থাশের মাটি চাইয়া দ্যাখ। মধ্যিখানে একটা মাঠ—দুই দিকে দুই গেরাম তার নেগে কেডা এত কাঁদন কাঁদে? নতুন ত যাইচ না, এইলো তোমাগো যাওন সইয়া যাইচে না ক্যানে। কত চ্যাংড়া ম্যায়ারা শ্বশুরঘর করিছে, তোমাগো নাগাল এত অবুঝ আর দেহি না। উঠি মাঠে-ঘাটে তাকাইয়া মনেরে সুস্থির কর। ম্যায়া জনম হইলেং পরের ঘরে যাইতে হয়। তার নেগে এত কাঁদে না কেউ।"

বিনু উঠিয়া বসেও না, কথাও বলে না। ঘরমুখো বলদ ছুটিয়া চলিয়াছে।

সাঁঝের প্রদীপ জ্বলিবার পূর্ব্বেই গাড়ি আসিয়া থামিল সিংহদরজায়। আবার বাড়ীর সকলে আগাইয়া আসিলেন বধূকে নামাইয়া লইতে।

সুমন্ত অধরে হাসির লহর ছুটাইয়া বিনুকে জড়াইয়া ধরিল 'বইদি' বলিয়া।

শ্বশুর-শাশুড়ীদিগকে প্রণাম করিয়া বিনু অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল তরুর সহিত। ঠাকুমা ও ছোটঠাকুমা হারাণী পসারীরা প্রাচীর দরজায় দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাদের ভিড়ে সরস্বতী অনুপস্থিত।

ঠাকুমা প্রণত বিনুর গায়ে হাত বুলাইয়া আদর করিয়া কহিলেন, 'আমার শূন্য পুরী আলো করি' এলি মণিবালা? ক'টা দিন তোর চাঁদমুখ না দেখে পরাণ আমার অস্থির করেছে।'

মনোরমা বলেন, "বৌমা, তুমি ঘরে যাও। কাপড় ছেড়ে হাত-পা ধুয়ে জল খেয়ে নাও।"

বিনুর সহিত ঠাকুমা কয়েক হাঁড়ি মিষ্টি দিয়াছেন। সন্দেশ, কাঁচাগোল্লা, পাটালি গুড় আর স্বহস্তে প্রস্তুত পাকা কুমড়ার মোরব্বা, লালমণির দুধের বড় বড় ক্ষীরের নাড়ু।

বিনু নিজের গৃহে প্রবেশ করা মাত্র তরু তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল, "ও বৌদি, তুমি ত এখানকার কাণ্ড-কারখানা জান না। আমার ফুলমণি আর নেই, পুড়ে মরেচে।"

বিনু সচমকে জিজ্ঞাসা করে, "ফুলমণি পুড়ে মরেছে কেমন করে? কই কামিনীর মা ত কিছু বলেনি?"

"আমিই তাকে বলতে মানা করে দিয়েছিলাম। তুমি শুভক্ষণে যাত্রা করে এখানে আসবে, তখন কি মড়া-টড়ার খবর দিতে হয়। পসারী ঢেঁকি-শালায় সেদিন মুড়ি ভেজে উনুনে ঢাকা না দিয়ে চলে গিয়েছিল। ফুলমণি ইঁদুর ধরতে গিয়ে রাতে উনুনে পড়ে গিয়েছিল, আর উঠতে পারে নি। সকাল বেলা সবাই দেখলে সে আর নেই।" ব'লে তরু ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। বিনুর চোখও শুষ্ক রহিল না। মনে পড়িল তাহাকে নিভৃতে বসিতে দেখিলে ফুলমণি লেজ ফুলাইয়া গরর গরর শব্দ করিয়া কোলে বসিতে উদ্যত হইত। বিনু বিরক্তি ভরে তাহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিত। সেই ফুলমণি আর কাহারও কোল অধিকার করিতে ফিরিয়া আসিবে না। লেজ ফুলাইয়া ডাকিবে না মিউ মিউ।

এ জগতে মানব হোক জীবজন্তু হোক কাহাকেও অবহেলা করিতে নাই। যাহাদের জীবন ক্ষণভঙ্গুর তাহাদের সকলের সহিত সদয় কোমল ব্যবহার করিতে হয়।

বিনু নিজের চোখ মুছিয়া গভীর স্নেহে তরুর অশ্রুমলিন মুখ মার্জ্জনা করিয়া প্রশ্ন করে, "ফুলমণির না দুটো বাচ্চা ছিল, তারাও কি মরে গেছে?"

তরু সবেগে ঘাড় দোলায়—"ওকি কথা বৌদি, ছিঃ। ষাট্, তারা দুই ভাইবোন বেঁচে রয়েছে। আমাদের কালজি যে কি কাণ্ড করেছে তা ত তুমি জান না,—উনুন থেকে সকাল বেলায় আধপোড়া ফুলমণিকে যখন তোলা হ'ল তখন লালজি-কালজির কি কান্না। আমি পচা পুকুরের পাড়ে তার মাথায় একটা তুলসী গাছ দিয়ে পুঁতে রাখতে বললাম হরিকে। এদিকে ছানারা ক্ষিধের জ্বালায় চিৎকার করে প্রাণ দেয় আর কি। চুমুক দিয়ে দুধ খেতে ত শেখেনি, করি কি? ঠাকুমা বলেন, 'ধরে ঝিনুকে করে দুধ খাইয়ে দে।'

"যেমন বাচ্চা দুটোকে উঠোনে এনেছি দুধ খাইয়ে দিতে তেমনি কালজি ছুটে এসে তাদের গা চেটে দিতে লাগল। তার পরে শুয়ে পড়ল। বাচ্চারা হাতড়ে হাতড়ে দুধ খেতে সুরু করলে কালজির। সকলে অবাক্ হয়ে দেখতে লাগল বেড়ালের বাচ্চার কুকুরের দুধ খাওয়া। পাড়ার লোক ছুটে এল দেখতে। তারপরে মা কুকুরের ছানা দুটোকে ভেতরে এনে ওদের থাকবার জায়গা করে দিয়েছেন কাঠের ঘরের কোণে। এখন ওরা সবাই সেইখানে থাকে। লালজি পাহারা দেয় বাইরে, কালজি ভেতরে।"

বিনু আশ্চর্য্য হইয়া যায়। "মাগো কি কাণ্ড, শুনিনি কোথায়ও। বেড়াল নাকি কুকুরের দুধ খায়?"

তরু কি যেন বলিতে গিয়া ক্ষিতিকে দেখিয়া থামিয়া গেল। ক্ষিতির সঙ্গে সুমন্ত।

ক্ষিতি বিনুকে হেঁট হইয়া প্রণাম করিয়া বলে "বৌঠান, অনেক দিন থেকে এলেন বাপের বাড়ী। কেমন ছিলেন?"

বিনু তাচ্ছিল্যভরে ঠোঁট বাঁকায় "অনেক দিন আবার কোথায়? মাত্তর পনেরটা দিন। তুমি ত বাড়ীর পাশ দিয়েই স্কুলে যাওয়া-আসা করেছ, এক-দিনও ত আমার সাথে দেখা করতে যাও নি?"

"যাব কি করে, সঙ্গে যে একগাদা ছেলে থাকত বৌঠান, তাদের নিয়ে কি যাওয়া যায়? তাই যেতে পারি নি। তুমি ত কতদিন বাদে ফিরলে, আমার জন্যে কি এনেছ বৌঠান?"

বিনু সহসা অপ্রতিভ হয়, লজ্জিত হয়। সে ত জানে না এক গাঁ হইতে আর এক গ্রামে গেলে ছোটদের জন্য কিছু আনিতে হয়। ঠাকুমা যে হাঁড়ি হাঁড়ি খাবার দিয়াছেন সকলের জন্যে সেটা উল্লেখ করিতে সে ভুলিয়া গেল।

ইতিপূর্ব্বে বিনু ক্ষিতিকে টাকাটা-সিকিটা দিয়া খুসী রাখিয়াছে। এক্ষেত্রেও সর্ব্বাগ্রে তাহার তাহাই স্মরণ হইল। ঠাকুমা তাহার খরচপত্রের জন্য কয়েকটা টাকা দিয়াছেন। বিনু আঁচলের চাবি দিয়া বাক্স খুলিতেই তাহার চোখে পড়িল মা বাক্স গোছাইয়া দিবার সময় অডিকলোনের বোতলটা ফুলকাটা ——— দিয়া জড়াইয়া ভাঙ্গিয়া যাইবার আশঙ্কায়

বাক্সের কোণে দাঁড় করাইয়া দিয়াছেন। মুহূর্তে বিনু স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইল।

অডিকলোনের বোতলটা ক্ষিতির দিকে ধরিয়া বলিল, "এই নাও, তোমার জন্যে এনেছি। সুমু এই তোয়ালে তোমার নাও। তরু, এই খেজুরছড়ি শাড়িখানা তুমি পরগে। কলকাতায় নতুন উঠেছে। বাবা পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

তিন ভাই-বোন অভাবিত প্রাপ্তিতে পুলকিত। জিনিস সামান্য হইলেও পল্লীগ্রামে তাহার মূল্য আছে।

ক্ষিতি-সুমু ছুটিল অডিকলোন ও তোয়ালে মাকে দেখাইতে।

তরু গম্ভীর হইয়া বলে, "বৌদি, তোমার বাবা তোমাকে যা দিয়েছেন তুমি নিজে না রেখে সকলকে কেন বিলিয়ে দিচ্ছ?"

"বাবা অনেক পাঠিয়েছিলেন। চারটে শাড়ী সেমিজ জামা, আমি কি করব অত দিয়ে? ঢাকাই শাড়ীটা দিয়ে এসেছি আকাশিকে। ওই যে হাত-বাঁকা সুন্দর মেয়ের গল্প করেছিলাম তোমার কাছে—সেই আকাশির বিয়ে। একটা তোমাকে দিলাম আরও দু'খানা শাড়ী আমার রইল। তরু, তুমি শাড়ীখানা এক্ষুনি পরে নাও, তোমার রং ফর্সা, তোমাকে খেজুরছড়ি শাড়ী পরলে খুব মানাবে।"

"কাল পরব বৌদি, আজ না সোমবার, নতুন কাপড় পরতে নেই। লোকে বলে, 'সোমের কাপড় ডোমে পায়।' তুমি নতুন নীলাম্বরী প'রে এলে কোন আক্কেলে?"

বিনু হাসে "না তরু আমার ঠাকুমার কোনটায় ভুল হয় না রবিবারেই কোমরে ছুঁইয়ে রেখেছিলেন শাড়ী। আচ্ছা কাল না তোমাদের পাটাই ব্রত; ভাল দিনেই নতুন কাপড় প'রো। তোমার পাটাই ত মিটে গেছে একবছরের মত?"

"হ্যাঁ বৌদি, কাল পাটাই পুজো করে ভরা তুললাম। তুমি ছিলে না, আমার ভারি দুঃখ লাগছিল। কাল পাটাই পুজো ক'রো তোমরা। এখন পথের কাপড় ছেড়ে পা ধুয়ে জল খাও গে। বাক্স বন্ধ করে রেখে দাও, খেয়ে-দেয়ে কাপড়-চোপড় আলমারিতে তুললেই হবে। এক্ষুনি কামিনীর মা আসবে সর্দারি করে ডাকতে। জল খাওয়া হলে তোমাকে দেখিয়ে আনব বাচ্চাগুলো। ভেতর-বাড়ীতে রয়েছে, দেখাশোনার খুব সুবিধা।"

তরু আলো ধরিয়া বিনুকে লইয়া গেল কাঠের ঘরে। ভোগের ঘরের পাশে রান্নাবাড়ীর কাঠ রাখিবার টিনের ঘর। টিনের বেড়া দেওয়া, মেঝে পাকা। পল্লীগ্রামে কাঠের চেলা করিয়া রৌদ্রে শুখাইয়া সযত্নে রক্ষা করিতে হয়। কয়লার প্রচলন নাই।

ক্ষুদ্র কাঠের ঘরে একদিকে তক্তার মাচায় স্তূপীকৃত চেরা কাঠ চাল-সমান করিয়া রাখা হইয়াছে। কাঠের আড়ায় রাশিকৃত করিয়া রাখা হইয়াছে উনুন ধরাইবার উপকরণ পাটকাঠি। অন্য পাশে খড়ের উপর চট বিছাইয়া কালজির শয্যা রচনা হইয়াছে।

তরু লণ্ঠন উঁচু করিয়া ধরিল। বিনু হাসিয়া অস্থির। কালজি টান হইয়া শুইয়া আছে—চারিটা শাবক চুক চুক শব্দে তাহার স্তন পান করিতেছে। বিনু সকৌতুকে তাকাইয়া বলে, "ছানা ক'টা কি মোটা-সোটা হয়েছে রে তরু। মোটার ঠ্যালায় কুকুর-বেড়াল চিনে নিতে হয়। ওরা—হাঁটা শিখেছে ত?"

"হ্যাঁ গুড়, গুড় করে ঘরময় হেঁটে বেড়ায়। চৌকাঠ পার হয়ে এখনও নামতে পারে না। দুটো ডাকে ভেউ ভেউ, দুটো বলে মিউ মিউ। শুনতে মজা লাগে। মোটা কি সাধে হয়েছে—মা একবাটি করে দুধ খেতে দেন কালজিকে, আমি চায়ের ঘরের দুধের কড়া থেকে আরও দু'বাটি দুধ লুকিয়ে খেতে দিই কালজিকে। মা-মরা বাচ্চারা দুধ না পেলে বাঁচবে কি করে?"

"সে ঠিক কথা তরু, বাচ্চাদের নাম রেখেছ কি?"

"ফুলমণির বাচ্চাদের নাম রেখেছি, সাহেব ও বিবি। কালজির বাচ্চাদের নাম, বাদশা, বেগম।"

নাম শুনে বিনু হাসে খিল খিল করিয়া, তরুও যোগ দেয় সেই হাসিতে। কে বলিবে ক্ষণকাল পূর্বেই ইহারা কত কান্না কাঁদিয়াছিল। কৈশোরের হৃদয়াকাশে মাধুরী-মাখা যেন শরৎকাল—এই মেঘ, এই রৌদ্র, এই অশ্রু, এই হাসি।

ঠাকুমা হাতীর মাথায় সমাসীনা হইয়া নাতনীদের লক্ষ্য করিতেছিলেন। সপেটা ও কাগজি লেবুর ঝোপের মধ্যে কাঠের ঘর। সেখানে ছেলেমানুষ বৌ-ঝির এত হাসি-মস্করা রাতে ভাল নয়। যদিও এটা সাপের সময় নয়, কিন্তু বাহির হইলে ঠেকায় কে?

ঠাকুমা তারস্বরে চিৎকার করেন, "ও তন্তি, মণিবালা, তোরা বেরিয়ে আয় লো, রাত-বেরাতে কি কাঠবোঝাই

যায় পরাণ পাখী।' আয় বেরিয়ে আয়, সকালে দেখিস্ বাচ্চা-কাচ্চা।"

বিন্নুরা বাহির হইয়া আসে। তরু বলে, "চল বৌদি, তোমার জিনিসপত্র আলমারিতে গুছিয়ে দিয়ে আসি।"

মনের মতন বাহারে শাড়ী পাইয়া তরু বিন্নুর প্রতি অতিশয় প্রসন্ন। শুধু শাড়ীর জন্যে নয়, বিন্নু যে তাহার ফুলমণির জন্যে চোখের জল ফেলিয়াছে তাহার কি দাম নাই?

নবীন গৃহে সেজ জ্বালাইয়া দিয়া গিয়াছে। উজ্জ্বল আলোকে সুসজ্জিত ঘর হাসিতেছে। ছোটঠাকুমা তখনও শয়ন করিতে আসেন নাই।

বিন্নু বাক্সের কাপড়-জামা তুলিয়া দিতেছে তরুর হাতে-তরু আলমারির তাকে সাজাইয়া রাখিতেছে।

এমন সময় মেনীকে লইয়া লবঙ্গ আসিল বিন্নুর সহিত দেখা করিতে। নিয়মের গৃহের সংলগ্ন প্রাচীরের দরজা খুলিলেই দুই বাড়ী এক হইয়া যায়।

লবঙ্গ পূজার পরে মামার বাড়ী গিয়াছিল। আসিয়াছে অল্প দিন হইল। মামাদের গ্রামে তাহার বিবাহ স্থির হইয়াছে। বিবাহ হইবে বৈশাখ মাসে। ঘর বর ভাল, ভাবী বর উপার্জ্জনক্ষম, পশ্চিমে চাকরি করে। বিবাহের পরে লবঙ্গ স্বামীর নিকটে থাকিবে। একে লবঙ্গ লাবণ্যময়ী হাস্যলাস্যময়ী তাহার উপরে বাঞ্ছিত বর পাইতেছে। সেই উল্লাসে সে উল্লসিত।

বিন্নু পিসশাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া বলে, "পিসিমা, মজার খবর পেলাম। আপনার মামাদের গাঁয়ের নাম কি? আমাদের পিসেমশায়ের সাথে আপনার কি দেখা-সাক্ষাৎ হ'ল?"

"দেখা হবে কি করে? ও যে পশ্চিমে থাকে, ওর ছোট বোনের সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হয়েছে। তার কাছে শুনেছি 'বঁধুর বরণ কালো।' কলস গ্রামে আমার মামাদের দেশ। শোননি বৌ 'গাঁয়ের মধ্যে কলস বিলের মধ্যে চন্দন' বিশ্ববিখ্যাত।"

লবঙ্গ বিন্নুর কানের কাছে মুখ লইয়া ফিস ফিস করিয়া কথাগুলি বলিতে বলিতে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

তরু ও মেনী ছোটঠাকুমার খাটে বসিয়া গুজগুজ ফুসফুস আরম্ভ করিতেছিল।

বিন্নু লবঙ্গকে চুপে-চুপে জিজ্ঞাসা করে, "আপনার বন্ধু তার দাদার কথা কি বলেছে, বলবেন না আমাকে?"

"বলার মত কি আছে বৌ?

'হাম যে অবলা হৃদয় অখলা ভাল মন্দ নাহি জানি,
বিরলে বসিয়া পটেতে লিখিয়া বিশাখা দেখাল আনি।"

বিন্নু বাক্সের জিনিষপত্র আলমারি-জাত করিতে করিতে ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করে, "আপনার বন্ধুর নাম বুঝি বিশাখা? সে কি পট আঁকতে পারে?"

লবঙ্গ হাসিয়া অস্থির, "মাগো, কি বোকা বৌ তুমি, আমি বোষ্টম পদাবলী তোমাকে একটা শুনিয়ে দিলাম; তুমি সেটা বুঝতেই পারলে না? ও বোতল বের করলে কিসের বৌ? ফুলেল তেলের? তোমার বাবা পাঠিয়েছেন? তোমার গোছা গোছা চুলে ফুলেল তেল মাখবার দরকারই হয় না। আমার পাতলা চুল ঘন করতে ফুলেল তেলের দরকার। কিন্তু দেবে কে?"

বিন্নু বলে "এটা আপনি নিয়ে যান পিসিমা, মাথায় মেখে চুল ঘন করবেন। এমনি আমার চুল শুকোয় না, এ তেল মাখলে, আরও ঘন হ'লে আর জন্মেও শুকোবে না।"

পিসিমা প্রীত হইয়া ফের জিজ্ঞাসা করেন, "ওটা কি কাপড় তুলে রাখলে বৌ? বৃন্দাবনী ছাপা শাড়ী! আহা, কি সুন্দর! ওসব কলকাতার আমদানী, আমরা চোখেও দেখতে পাই না। বৃন্দাবনী ছাপা শুনলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। পরলে কুৎসিতকেও সুন্দর দেখায়। এবার তুমি আগের চেয়ে দেখতে ভাল হয়েছ বৌ।"

বিন্নু বিগলিত হইয়া উত্তর দেয়, "আপনিও দেখতে খুব ভাল হয়েছেন পিসিমা। এ শাড়ীখানা আপনিই পরবেন। আমি আপনাকে প্রণামী দিলাম।"

পিসিমা প্রসন্ন হইয়া ভদ্রতা প্রকাশ করেন, "ভাল বলেছি ব'লে আমাকে কি নিতে হবে বৌ? তরুকে একখানা দিয়েছ, আমাকে দিচ্ছ, তোমার থাকল কি? তুমি বোকা-সোকা হ'লে কি হবে, তোমার মনটা খুব পরিষ্কার, আমার বৌদিদের এমন নয়। আজ যাই, রাত হয়ে গেছে। কাল দুপুরে তোমার কাছে এসে

অনেক কথা বলব। বলিয়া লবঙ্গ বৃন্দাবনী ছাপানো শাড়ীতে ফুলেল তেলের বোতলটা সযত্নে জড়াইয়া অঞ্চলের নিচে রাখিল।

তরু আড়চোখে সেদিকে চাহিয়া 'আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে' বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

ছোটঠাকুমা শয়ন করিতে আসিলেন।

মেয়েরা শ্বশুরালয়ে প্রস্থানের পরে মনোরমা তুইবোন বধূকে লইয়া আহারে বসিতেন। তরু অনেক রাত জাগিতে পারে না। সন্ধ্যার পরে খাইয়া ঘুমাইয়া পড়ে।

পাশাপাশি তুইজনা খাইতে বসিয়া মনোরমা শান্ত-গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন, "শোন বউমা, তোমাকে একটা কথা ব'লে সাবধান করে দিচ্ছি,—বৌমানুষের অত গিন্নীপনা ভাল নয়। কেউ যদি কোন জিনিস ভাল বলে তখুনি কি তাকে সেটা দিতে হয়? তরু তোমার আপনার জন, তাকে ভালবেসে যদি কিছু দাও তার সঙ্গে পাড়া-পড়শীর সমান হওয়া চলে না। তোমার বাবা সেই মুল্লুক থেকে তোমাকে যা পাঠান তুমি কোন্ সাহসে তা অন্যকে দিতে যাও। পরে যাকে যা দিতে চাও আমাকে বলে দিও। তোমার দিদিমা কাশী থেকে তোমাকে অত বড় একটা পিতলের বাক্স এনে দিয়েছিলেন সেটাও তুমি দান-খয়রাৎ করে বসেছিলে; তখন আমি কিছু বলি নি। আর একটা কথা, তোমার কাছে যে ছোটখাটো গয়নাগুলো রয়েছে কালকেই সেগুলো তুমি আমার কাছে এনে রেখ। আমি বুঝতে পেরিছি এর পরে সে-সব পগার পার হবে।"

বিনু অধোবদনে মাছের কাঁটা বাছিতে লাগিল। সে জীবনে কাহাকেও কিছু দিতে গিয়া বাধা পায় নাই। খেয়ালমত নিজস্ব যাহা অপরকে দান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছে। তাহার কাছে পাত্রাপাত্রীর বিচার ছিল না। ভাল-মন্দের তারতম্যবোধ ছিল না। কিন্তু আজ শাশুড়ীর উত্তাপহীন কোমল কণ্ঠস্বরে সে লজ্জিত না হইয়া পারিল না। বড়রা শুধু শাসনই করেন না তাঁদের দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী।

ক্রমশঃ

—*—

কংগ্রেস স্মৃতি

শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল

ষড়বিংশ অধিবেশন—কলিকাতা, ১৯১১

(এক)

...ী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল উভয় বঙ্গের ...মেণ্টের দমননীতি। বিপ্লবী দলের কার্য্যতৎপরতা ...চ চলল। দেশের সংহতি নষ্ট করার জন্য তদানীন্তন লাট মিণ্টোর প্ররোচনায় ঢাকায় সর্ব্বভারতীয় মুসলিম ...র সৃষ্টি হ'ল। গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশে বড় লাট লর্ড ...নের মুসলিম লীগের একটি ডেপুটেশন বিধান ...গুলিতে ও অন্যান্য সংস্থায় মুসলমানদের জন্য পৃথক্ ...ক্ষিত আসনের দাবি উপস্থিত করল। সুপ্রসিদ্ধ ...ানা মহম্মদ আলি পরবর্ত্তীকালে কংগ্রেসের সভাপতি- ... উক্ত ডেপুটেশনকে হুকুমপালন (Command ...rformance) বলে অভিহিত করেছেন। ডেপুটেশনের ... ১৯০৯ সালের আইনে (India Councils Act of ...09) বিধান সভাগুলিতে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের প্রথা ...র্ত্তন করে দেশের হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে রাজনীতি-...ত্রে বিভেদের সৃষ্টি করা হ'ল। এতেও না হয়ে ...র্ণমেণ্ট জেলা বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটী প্রভৃতিতে এই ...প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তন করল। এতে দেশব্যাপী ...রতর অশান্তির সৃষ্টি হ'ল। ১৯০৯ সালের অধিবেশনে ...গ্রেস সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র ...ালোচনা করে।

লর্ড মিণ্টোর পর ১৯১০ সালের নবেম্বর মাসে লর্ড হার্ডিং ...লাট নিযুক্ত হয়ে ভারতবর্ষে আসেন। নূতন বড় ...টের নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার নেতারা বঙ্গভঙ্গ রদের ...ন্দোলন নবীন উৎসাহে সুরু করে দিলেন এবং স্থির ...লেন যে, ১৯১১ সালের মে মাসে টাউন হলে একটি সভার ...য়োজন করে, বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সংযুক্ত বঙ্গের ক্ষোভ ...কাশ করা হবে। এই সিদ্ধান্তের অল্পকাল মধ্যে ...রতবর্ষের রাজধানী কলিকাতার পথে একজন পুলিশ ...মচারী বিপ্লবীদের হাতে নিহত হয়। এই ঘটনায় ...চলিত হয়ে বড় লাট সাহেব শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে আহ্বান করে বলেন যে, তাঁরা যেন গভর্ণমেণ্টকে আর বিব্রত না করেন। ক্ষোভ প্রকাশ করার উদ্দেশ্য যদি গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় তা হ'লে সে উদ্দেশ্য ভাল ভাবে সাধিত হবে যদি তাঁরা গভর্ণমেণ্টের নিকট তাঁদের দাবি লিখে জানান। তিনি আশ্বাস দিলেন যে, তাঁদের কথা বিশেষভাবে বিবেচিত হবে। তদনুসারে পরিকল্পিত টাউন হলের সভার আয়োজন পরিত্যক্ত হয় এবং গভর্ণমেণ্টের নিকট একটি মেমোরিয়াল পাঠান হয়। এরই ফলস্বরূপ ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর তারিখে দিল্লী দরবারে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা করলেন। এই ঘোষণানুসারে উভয় বঙ্গ নিয়ে সপরিষদ গভর্ণরের অধীনে একটি প্রদেশ; বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর নিয়ে সপরিষদ লেফটেনাণ্ট গভর্ণরের অধীনে "বিহার ও উড়িষ্যা" প্রদেশ, চীফ কমিশনারের অধীনে আসাম প্রদেশ গঠিত হ'ল এবং রাজধানী কলিকাতা হ'তে দিল্লীতে অপসারিত করা হ'ল।

বঙ্গভঙ্গরদের সংবাদ প্রকাশিত হওয়ামাত্র সমস্ত বাংলা দেশ যেন আনন্দ স্রোতে ভেসে গেল। কলিকাতা শহরে চরমপন্থী ও নরমপন্থী (Extremists and Moderates) যাহারা চলতিভাষায় গরম ও নরম দল নামে কথিত হ'ত) উভয় দলের নেতা বিপিনচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে একটি শোভাযাত্রা খোল-করতাল ও অন্যান্য বাদ্যভাণ্ড সহযোগে শহরের রাস্তায় রাস্তায় প্রদক্ষিণ করল। আমিও অন্যান্য ছাত্রসহ পরমানন্দে তাতে যোগ দিলাম। আনন্দের আতিশয্যে আমরা ভুলে গেলাম যে, এর দ্বারা বাঙ্গালী জাতির এবং সমগ্র ভারতবর্ষের কি অপূরণীয় ক্ষতি হ'ল। এই ব্যবস্থা দ্বারা বাংলা দেশ একটি চিরস্থায়ী সাম্প্রদায়িক সংখ্যাগুরু প্রদেশে পরিণত হ'ল। বাংলার সংহতি নষ্ট করার জন্য যে বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল পরবর্ত্তীকালে নূতন প্রদেশ গঠনের ফলে শুধু বঙ্গদেশই নয়, সমগ্র ভারতবর্ষ দ্বিধাবিভক্ত হ'ল। স্বাধীনতার যে আন্দোলন বঙ্গভঙ্গ দ্বারা সুরু হয়েছিল

গভর্ণমেণ্টের অর্থনীতি সমালোচনা করে অনর্গল তথ্যসমূহ কংগ্রেসের সামনে প্রকাশ করলেন। এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন বিনা বাক্যব্যয়ে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় (পরবর্ত্তীকালে ডাক্তার উপাধিভূষিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকনমিকসের মিণ্টো প্রফেসর)। এই প্রস্তাব এবং আরও কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় সেদিনকার মত কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হ'ল।

(পাঁচ)

তৃতীয় দিনের কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত গীত হ'ল। সভা আরম্ভের পর জানা গেল যে, মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিখ্যাত উকীল এবং মাদ্রাজের অন্যতম নেতা মাননীয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণস্বামী আয়ার অকস্মাৎ পরলোক গমন করেছেন। কংগ্রেস তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করল।

মহামতি গোখলে কর্ত্তৃক উত্থাপিত বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা বিলের সমর্থনে প্রস্তাব উপস্থিত করলেন —মাদ্রাজের শিক্ষানুরাগী মাননীয় দেওয়ান বাহাদুর এল. এ. গোবিন্দরাঘব আয়ার। এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন নাগপুরের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার হরি সিং গৌর (পরবর্ত্তীকালে স্যর উপাধিভূষিত), এলাহাবাদ হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল ডঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অসাধারণ বাগ্মী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণ। স্বয়ং গোখলে মহাশয়ও এই প্রস্তাব সমর্থন করে অতি সুন্দর অভিভাষণ দিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

এর পর ১৯০৯ সালের ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা আইনানুসারে (The India Councils Act of 1909) গঠিত নিয়মাবলীতে বিধান পরিষদসমূহে যে সাম্প্রদায়িক আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং বেসরকারী সংখ্যাগুরু সদস্য সংখ্যাকে প্রকৃতপক্ষে অকর্ম্মণ্য করা হয়েছে, সেগুলির পরিবর্ত্তনের দাবি জানিয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করেন কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় (পরবর্ত্তীকালে কলিকাতা হাইকোর্টের জজ ও স্যর উপাধিভূষিত) তিনি প্রস্তাব সম্বন্ধে তথ্য বহুল ও সুচিন্তিত বক্তৃতা দিলেন। যথারীতি সমর্থিত হয়ে প্রস্তাব মঞ্জুর হল।

... (Local Bodies) পৃথক

গোকরণ নাথ মিশ্র মহাশয় (পরবর্ত্তীকালে লক্ষ্ণৌ চীফ কোর্টের জজ)। যথারীতি সমর্থিত হয়ে প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

তৎপরে কতকগুলি মামুলি প্রস্তাব পাশ করার পর কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র মহাশয় (পরবর্ত্তীকালে "রাউলেট মিত্র" নামে কুখ্যাত, স্যর উপাধিভূষিত ও বাংলা গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী) ভারতীয় হাইকোর্টগুলি সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত করে বললেন যে, কলিকাতা হাইকোর্টের মত ভারতের অন্যান্য হাইকোর্টগুলির সম্পর্কও একমাত্র ভারত গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে থাকা উচিত। এ না হ'লে হাইকোর্টের স্বাধীনতা ও সম্ভ্রম ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা। স্বাধীন ভারতেও এই বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন। প্রস্তাব পাশ হ'ল।

অন্যান্য প্রস্তাবের পর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় (কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার, 'কলিকাতা উইকলি নোট্‌স্'-এর সম্পাদক, শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের ভ্রাতা এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জামাতা) দক্ষিণ আফ্রিকার সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। এই প্রস্তাবে দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্ণমেণ্টের সহিত আপোষের ফলে এশিয়া-বিরোধী আইন প্রত্যাহারের যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তজ্জন্য শ্রীযুক্ত এম্. কে. গান্ধী মহাশয়কে (তখন 'মহাত্মা' নামে পরিচিত হন নি) ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয় এবং দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী হিন্দু-মুসলমান, জরথুষ্টিয়ান (পার্শী) ও খ্রীষ্টান নির্ব্বিশেষে সমুদয় ভারতীয়গণকে তাঁদের ত্যাগ ও দুঃখবরণের জন্য অভিনন্দিত করা হয়। এই প্রস্তাব সমর্থন করেন বিখ্যাত সাংবাদিক শ্রীযুক্ত সি. ওয়াই. চিন্তামণি (পরবর্ত্তীকালে যুক্তপ্রদেশ, অধুনা উত্তর প্রদেশ গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী), দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর নেতৃত্বাধীনে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত সোরাবজী সাপুরজী (ইনি ৮ বার কারাবরণ করেন) এবং গান্ধীজীর সহকর্ম্মী ও ভক্ত সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ ইহুদি-নেতা শ্রীযুক্ত এইচ. এস্. এল. পোলক মহাশয়গণ। প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

আগামী বৎসরের অধিবেশনের জন্য পাটনাতে কংগ্রেস আহ্বান করেন কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ও বিহারের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত হাসান ইমাম (পরবর্ত্তীকালে কলিকাতা হাইকোর্টের জজ এবং কংগ্রেসের সভাপতি)।

পরিশেষে শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় কর্ত্তৃক

বাঙ্গালী ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

'কনট্রোল-কিং' শ্রীপ্রফুল্ল সেনের 'কিং-কনট্রোল'!

প্রভুদের কথা এবং প্রতিশ্রুতিতে যদি মানুষের পেট ভরে তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতার আজ আর দুঃখ-অভাবের কোন কারণ থাকিতে পারে না! —এ সোনার দেশে এখন আর কিসের অভাব? চাউল, আটা, ময়দা, সরিষার তৈল, মুগ-মুশুরী ডাইল, চিনি, দুধ, তরিতরকারিতে দেশ পূর্ণ—অর্থাৎ অবিলম্বে সবই মিলিবে, তাহারই বিষম প্রতিশ্রুতিতে পূর্ণ! মাত্র কয়েক দিন পূর্ব্বে এ-রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তাঁহার সুকণ্ঠে বেতার ভাষণে বলেন—"বন্ধুগণ! এবার ধানের ফসল আশাতীত রকম হইয়াছে" এবং অদূরে সেই সুদিনের আলো দেখা যাইতেছে যখন পশ্চিম বাংলার মানুষ বেদম আহার এবং নাকে খাঁটি সরিষার তৈল-প্রদান করিয়া পরম নিশ্চিন্ত মনে খাটিয়ায় নিদ্রা যাইবে! কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রকার ভরসার কথার সঙ্গে খাদ্য-শস্যের পরিসংখ্যান—ইতিপূর্ব্বে যতবার (এবং বহু-বছবার) আমরা শুনিয়াছি—প্রায় প্রত্যেক বারই বাস্তবে ফলিয়াছে তাহার বিপরীত! এবারেও যে তাহাই ঘটিবে না, এমন কথা সরকারী মহলে মুখ্যমন্ত্রীর প্রিয়জনেরাও জোর করিয়া বলিতে পারিতেছেন না। কেন্দ্রীয় সরকারের সত্য-সহযোগিতা পাওয়া গেলে হয়ত এতটা ভাবনার কথা কাহারও মনে হইত না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের উপর কেন্দ্রীয় কর্ত্তাদের একটা পরম দরদ-স্নেহের টান যে আছে এবং আমাদের বিপদ-কালে সেই স্নেহ যে সবিশেষ সক্রিয় হইয়া উঠে, তাহাও এ পোড়া-বঙ্গবাসীদের জানা আছে।

কর্ত্তাদের একটা কথা মনে করাইবার একান্ত প্রয়োজন, এবং তাহা এই যে:

"খাদ্যের অভাব একমাত্র খাদ্য দিয়াই মেটানো সম্ভব এবং ক্ষুধা কোন উপদেশও মানে না, কোন আইনও গ্রাহ্য করে না, ইহা অতি পুরাণো কথা। অথচ এই কথাটা আজ গোটা ভারতেই মর্ম্মান্তিক-ভাবে উপেক্ষিত হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গে আমরা চাউল, ডাইল, আটা, চিনি, তৈল, মাছ ইত্যাদির নিয়মিত অভাবে ও দফায় দফায় মূল্যবৃদ্ধিতে উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছি।...দেশজোড়া ব্যাপক বেকারী ও স্বল্প আয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়া বিপরীত হারে নিত্যব্যবহার্য্য খাদ্য-সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি সারা দেশেই একটা আশঙ্কিত দুর্নিমিত্তের ছায়াপাত করিয়াছে। তাহারই আংশিক চেহারা প্রকট হইয়াছে কেরলে এবং এখানে প্রকাশটা ক্রুদ্ধ ও উত্তেজনাপূর্ণ, সেই কারণেই আরও উদ্বেগ-জনক।

"...দেশের মানুষ আজ প্রশাসনের সঙ্গে কোন কল্যাণের যোগ লক্ষ্য করিতেছেন না। বরং সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট ও অনটন সম্পর্কে একটা ঔদাসীন্য বা উপেক্ষার ভাবই যেন আমাদের সরকারী কর্ম্মপদ্ধতির মধ্য দিয়া স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। আসল দুঃখ-দুর্দ্দশার চেয়ে ক্রমবর্দ্ধমান এই মানসিক অবসাদ ও হতাশাই হইয়াছে বেশী বিপজ্জনক, কারণ ইহার ফলে ব্যাপক একটা স্নায়বিক অসহিষ্ণুতা সারা দেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে। দেশ উন্নয়নের অধ্যায়ে দেশবাসীকে (পৃথিবীর সর্ব্বত্রই) কিছু ক্লেশ ও কৃচ্ছ্রতা হয়ত সহ্য করিতে হয়। কিন্তু কষ্টটা যদি উপরতলা-নীচুতলায় সমভাবে বণ্টিত হয়, তাহা হইলে তাহাই সমাজে একটা ভারসাম্য আনে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, এদেশে আঘাতটা শুধু নীচুতলার উপরই পড়িতেছে।

"এই কারণেই নিম্নতলায় প্রতিক্রিয়াজনিত বিষম চাঞ্চল্য দেখা দিতেছে, যা প্রশমিত করা দরকার। বলা বাহুল্য সে জন্য জীবনধারণের সর্ব্বনিম্ন প্রয়োজন যাহা, তাহা সাধারণের ক্রয়-সামর্থ্যের মধ্যে আনিতে হইবে। লাঠি দেখাইয়া নয়, শাস্তির গুণাগুণ ব্যাখ্যা করিয়াও নয়, খাদ্য দিয়াই ক্ষুধার নিবৃত্তি করিতে হইবে। এই সনাতন ও সুবিদিত পথ ছাড়া অন্য পথ নাই। গোটা ভারতের পক্ষেই একথা সমান প্রযোজ্য। সমাজ জীবন যদি

খাদ্যাভাবজনিত হৈ-হুল্লোড় ও অশান্তিতে আলোড়িত হইয়া উঠে, তাহা হইলে তাহার প্রতিক্রিয়া শাসকদের পক্ষে শুভ হইবে না।"

আমাদের বিচক্ষণ এবং পরম পরিসংখ্যানবিদ্ মুখ্যমন্ত্রী কন্‌ট্রোল দ্বারাই এবার এ-রাজ্যের খাদ্য এবং অন্যান্য সমস্যা দূর করিতে বিষম প্রয়াস করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। একথা স্বীকার করিব যে, ভাণ্ডার যদি পূর্ণ থাকে এবং র‍্যাশন যদি যথাযথ এবং পর্য্যাপ্ত হয়, তাহা হইলে কন্‌ট্রোল সার্থক হইতে পারে—কিন্তু ভাঁড়ারে কয়েক শত মণ চাউল, ডাইল, আটা-ময়দা, চিনি মাত্র সম্বল এবং হাতে ভিক্ষার থলি লইয়া কেন্দ্রের মুখ চাহিয়া কত দিন এবং কি ভাবে রেশন ব্যবস্থা চলিতে পারে জানি না।

কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে র‍্যাশন-ব্যবস্থাকে টর্পেডো করিবার জন্য ইতিমধ্যে একদল অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী খাস কলিকাতা শহরের বুকে বসিয়াই তাহাদের পাপ-পরিকল্পনা প্রায় পাকা করিয়াছে। এই ব্যবসায়ী-চক্রের বৈঠক গোপনে হইলেও তাহার কিছু সংবাদ প্রকাশ পাইয়াছে। অবশ্য কলিকাতার পুলিস এ-সংবাদ কর্ত্তামহলে দিয়াছেন, কিন্তু কর্ত্তামহল এ-বিষয়ে কি চিন্তা করিতেছেন—তাহা প্রকাশ পায় নাই। তবে এই-টুকু মাত্র বলা যায় যে, বিশেষ ব্যক্তি এবং সবিশেষ মহলে এই শক্তিশালী ব্যবসায়ীদের প্রতি শাসকদের মনোভাব ক্রমশ কোমল হইতে কোমলতর হইতেছে। শেষ পর্য্যন্ত দেখা যাইবে যে, যে ব্যবসায়ী-চক্র পশ্চিম-বঙ্গের বাঙ্গালীদের জীবন সর্ব্বদিক হইতে বিপর্য্যস্ত করিতেছে, সেই তাহারাই শাসক-মহলে 'মিত্রশক্তি' বলিয়া গৃহীত হইবে।

'নাই-রাজ্য' পশ্চিমবঙ্গ—বাঙ্গালী কি অবলুপ্তির পথে ?

ঘরে "চাল নেই, ডাল নেই, তেল নেই। যা আছে তাও সাধ্যের বাইরে। এদিকে বাড়ী নেই, চাকরি নেই—স্কুলে-কলেজে ঠাঁই নেই—এমন কি অপেক্ষাকৃত সামনের সারিতে বসে খেলা অপেরা দেখার মত নির্দ্দোষ আমোদগুলোও যেন আজ ক্রমেই মধ্য-বিত্তের হাতছাড়া। দারিদ্র্য মধ্যবিত্তের জীবনে অজ্ঞাত নয়। প্রায় দেড়শ বছর আগে মধ্যবিত্তের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন—মধ্যবিত্ত তাঁরাই, যাঁরা 'দরিদ্র অথচ ভদ্র'। বস্তুত প্রধানত এই 'ভদ্র' শব্দটি বলেই মধ্যবিত্ত, অন্যান্য খেটে-খাওয়া মানুষের থেকে স্বতন্ত্র শ্রেণী হিসাবে চিহ্নিত। উল্লেখিত সমীক্ষাটিতেও দেখা গেল—মধ্যবিত্ত তার ইতিহাসে এই অকালেও খরচের ভঙ্গিতে সম আয়বিশিষ্ট অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র। এখনও সে ভাল বাসা, ভাল পোষাক, ভাল শিক্ষা, ভাল চিকিৎসার জন্যে যত খরচ করে, তার স্তরে আর কেউ তার কাছাকাছি আসে না। এখনও ঘরে ডাল-ভাত খেয়ে মধ্যবিত্ত কর্ম্মক্ষম ছেলেকে কলেজে পাঠায়, এখনও সে কমপক্ষে একটা খবরের কাগজ রাখে, গৃহশিক্ষক রেখে মেয়েকে গান শেখাতে চায়।

"কিন্তু এই বেপরোয়া জীবনযুদ্ধ আর কতকাল সম্ভব? ঘরে-রাখা লক্ষীর ঝাঁপি বহুকাল আগেই শূন্য হয়ে গেছে, আপিসের কো-অপারেটিভ ইত্যাদিও সারা। ক্লান্তির লক্ষণ আজ মধ্যবিত্তের ঘরে ঘরে; ক্ষয় এবং স্খলন কোনটাই আজ আর সেখানে গোপন নয়। খাদ্যের বাজেট ক্রমেই ছাঁটাই হচ্ছে, বড়দের দুধ খাওয়া অনেক-দিন উঠে গেছে, বেবী ফুডের বিকল্প হিসাবে ঠাকুমা কি খাওয়াতেন তাই আবার চালু করার চেষ্টা চলছে; এমন কি সিগারেট পর্য্যন্ত ব্লেডে কেটে একাধিকবার খেতে বারণ নেই! শুধু কি তাই? দুই পরিবার আজ একটি খবরের কাগজে কাজ চালাচ্ছে, পারি-বারিক ডাক্তারকে 'কল' না দিয়ে মধ্যবিত্ত হাসপাতালের বেঞ্চিতে আশ্রয় নিচ্ছে; এবং রাত ন'টায় আলো নিভিয়ে দিলে কত পারসেণ্ট 'কারেণ্ট খরচ' কমে বসে বসে পরিবার-পরিজনকে তাই বোঝাচ্ছে। তার চেয়েও মারাত্মক খবর, আত্মীয়বাড়ী, গতায়ত ত বছরে এক-বার কি দু'বার, কাউকে চা-খেতে বলার আগে আজ তিনবার থতমত খায়, নতুন বইয়ের বিজ্ঞাপন দেখলে তাড়াতাড়ি পাতা উল্টে পালাতে চায়; অধিকাংশ বই-ই তার কাছে অপাঠ্য, সিনেমা 'বাজে', রেষ্টুরেণ্ট বিলাসিতা এবং অনেক আমোদই—'ভালগার'।"

কিন্তু প্রকৃত অবস্থা গত কিছুদিনের মধ্যে আরও খারাপের দিকে গিয়াছে। সিনেমার কিউ এবং ক্রিকেট-ফুটবল মাঠের ভিড় দেখিয়া কেহ যদি অদ্যকার বাঙ্গালী সমাজের অবস্থা-বিচারে প্রয়াস পান, তিনি প্রতারিত হইবেন্। জীবনের অন্য সকল দিকে ব্যর্থ হইয়া বেকার বাঙ্গালী যুবক এবং বালকের দল সিনেমা-থিয়েটার, ক্রিকেট-ফুটবলকেই মৃত-সঞ্জীবনী

রূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু ইহারাই বা শতকরা কতজন ?

একদিকে দেখিতেছি শহরে আট-দশ হইতে তের-চৌদ্দ-পনের-বিশতলা আকাশভেদী বিরাট্ বিরাট্ ম্যানসন্ নির্ম্মিত হইতেছে (অবশ্য এই সব ম্যানসনের মালিক কিংবা মালিকগোষ্ঠীর শতকরা ৯৯.৯ জন অন্য প্রদেশাগত) এবং সেই তালে জাতি হিসাবে বাঙ্গালী দ্রুতগতিতে পাতাল প্রবেশ করিতেছে! তের-চৌদ্দতলা বাড়ীগুলি হতভাগ্য বাঙ্গালীদের অবশ্যই কাজে লাগে এবং সেই অন্তিম কাজে—ঐ সব বাড়ীর ছাদ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া জীবন-সমস্যার পরম সমাধান! হিসাব লইলে দেখা যাইবে, এই ভাবে বহু হতভাগ্য বাঙ্গালী যুবকের স্বর্গ, (পাতাল ?) লাভ ঘটিয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও অধিক পরিমাণে ঘটিতে থাকিবে!

"ওরা জন্মেছে এই দেশে"—

'ওরা' অর্থাৎ এই পশ্চিমবঙ্গের ছেলেমেয়েরা। এদেরই সম্পর্কে দেশের নেতা এবং কর্ত্তারা বহুবিধ বাণী দিয়া থাকেন অহরহ। অদ্যকার ছেলেমেয়েরা ভবিষ্যতে কি করিয়া, কোন্ পথে জীবনে উন্নতি করিবে, দেশের মাথা উঁচু করিবে—এই বিষয়েও তাঁহারা মূল্যবান্ নির্দ্দেশ দিতেও কসুর করেন না। বলা বাহুল্য আমরা সাধারণ মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র ঘরের ছেলেমেয়েদের কথাই বলিতেছি।

এ-রাজ্যের মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েদের আজ প্রধান কাজ হইয়াছে, র‍্যাশনের দোকানে লাইন দেওয়া—প্রত্যহ প্রায় ৫ হইতে ৭।৮ ঘণ্টা ধরিয়া। এ-বিষয়ে এক ভদ্র-মহিলা লিখিতেছেন :

"রেশনের দোকানে লাইন দিতে হবে, কে যাবে (?) না বাড়ীর ছোট ছেলেমেয়েরা। তেলের দোকানে বলুন, ডালের দোকানে বলুন অর্থাৎ যেখানে লাইনের প্রশ্ন, সেখানেই বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ডাক। বাড়ীর কর্ত্তা অফিসে যাবেন তাঁর সময় নেই, আমরা বধূরা দোকানে লাইন দেব এমন সমাজ আমাদের না। বাড়ীতে ঝি নাই, চাকর নাই—আছে কেবল বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা। কাজেই রাত পোয়াতে-না-পোয়াতে কার্ড হাতে থলে দিয়ে ওদের দোকানে পাঠান ব্যতীত উপায় নেই। তা না হ'লে খাওয়া জুটবে না—উনুনে হাঁড়ি উঠবে না।

"নেতাবাবুরা সগর্ব্বে বলতে পারেন, হতভাগ্য জাতটাকে স্বাবলম্বী কষ্টসহিষ্ণু করার পক্ষে এটা একটা আদর্শ পথ। তা ঠিক আদর্শই বটে। বাবুদের খেলার মাঠে, রেলে, থিয়েটার-সিনেমায় যাতে লাইন দিতে না হয় তার জন্য কত ব্যবস্থা। ভবিষ্যৎ জাতি রেশনে বাজারে লাইন দিয়ে স্বাবলম্বী কষ্টসহিষ্ণু হচ্ছে না জাহান্নামে যাচ্ছে এই জিজ্ঞাসা নিয়ে নীচের কাহিনী অবতারণা করছি।

"রেশনের লাইনে ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে আমদানী হচ্ছে অশ্লীল-অশ্রাব্য কথাবার্ত্তা। ভালটা মানুষ যত তাড়াতাড়ি না শেখে খারাপটা শেখে তত তাড়াতাড়ি। রেশন লাইনে গীতা-রামায়ণের কথকঠাকুর থাকেন না—যারা থাকে তাদের কুকথার ভিতর দিয়ে ছোটদের মনে কুচিন্তা প্রভাব বিস্তার করছে। বিদ্যা অর্থাৎ লেখাপড়ার পাট প্রায় উঠে গেছে, আর এক বিদ্যে তাদের হচ্ছে। কি করে পরে গিয়ে আগে দাঁড়াবে, কি করে ব্ল্যাক মার্কেট করা যায়, কি করে দোকানীকে পয়সা কম দেওয়া যায়, ইত্যাদি সাত-সতের বিদ্যের জাহাজ তাদের মাথায় দানা বেঁধে উঠছে। কষ্টসহিষ্ণুতার চরমের ওপর চরম তারা করছে। পশুদের ক্লেশ নিবারণের সঙ্ঘ আছে—তারা যদি আমাদের বাচ্চাদের রেশন নেবার ক্লেশ দেখতেন ত মানুষ পশুর ক্লেশের তফাৎ করতে পারতেন না। সেই কোন্ ভোরে রেশন দোকানে লাইন দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোদ-বৃষ্টির মধ্যে পড়ে থাকা এবং ফাউ স্বরূপ ধাকাধাক্কি বচসা তাদের বরাদ্দে আছে। সর্ব্বশেষে বিজয়-গর্ব্বে রেশনের বোঝা নিয়ে বাড়ী ফেরে—সে দৃশ্য লিখে প্রকাশ করার শক্তি আমার নেই। বোঝা টানতে তাদের মেহনত কি করে বোঝাব ভেবে পাইনে। এত কষ্টের সান্ত্বনা তবুও থাকত যদি ওদের পেটে পরিপূর্ণ খোরাক দেওয়া যেত। পুষ্টিকর খাদ্য কেবল ওদের স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের বইতে লেখা আছে—চোখে দেখল না কেমন সে খাদ্য। নেতাবাবুদের লেকচারবাজির অভ্যাস যদি না থাকত তবে হলফ করে বলতে পারি রেশনের দোকানে কচি কচি ছেলেমেয়েদের পাঠাবার বিরুদ্ধে অর্ডিনান্স জারি করে দিতেন। অবশ্য 'ওরা' অর্থাৎ আমাদের পেটের সন্তানেরা জন্মেছে এই দেশে।"

—বারাসতের কথা।

ইহার উপর মন্তব্য করার কোন অবকাশ নাই।

"পঞ্চায়েতী"—বিলাস

"যারা চাষ করে খায় তাদের সবাইকে সংসার

চলার উপযোগী ভূমি দিতে হবে এই ছিল গান্ধীজীর একান্ত ইচ্ছা। ভূমি পুনর্বণ্টনের কাজে কবে নাগাদ হাত দেওয়া হবে, কি ভাবে জমি বিলি-ব্যবস্থা করা হবে, কতদিনের মধ্যে এ-কাজ শেষ করা হবে—এ-ধরণের কোন কথার উল্লেখ পঞ্চায়েতী রাজ উদ্বোধনের সভায় শুনি নি। অথচ আমরা সকলেই জানি উৎপাদন প্যাটার্ণ ও উৎপাদন পরিবেশের ওপরে উৎপাদনের পরিমাণ বহুলাংশে নির্ভর করে। যে-কোন একটা দিকে খানিকটা পরিবর্তন সাধন করলেই উৎপাদন বৃদ্ধি বজায় রাখা যায় না; উভয় দিকেই সমান দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। উন্নত বীজ, রাসায়নিক ও কম্পোষ্ট সার এবং রোগ ও কীটনাশক ওষুধ ব্যবহার করে যতটুকু উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব তা দিয়ে ক্রমবর্দ্ধমান অন্নের চাহিদা কিছুতেই মিটবে না। ভূমির পুনর্বণ্টন ও চকবন্দী করণের কাজে এখনই হাত দেওয়া উচিত; জমি হস্তান্তরের অবাধ অধিকার খর্ব্ব করা একান্ত প্রয়োজন, বিভিন্ন অঞ্চল অনুযায়ী নানা ধরণের বাস্তবানুগ ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনাকে বিশেষ ভাবে অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার। ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এই ধরণের কাজ গ্রহণ না করলে উৎপাদন বৃদ্ধির উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হবে না। কে না বোঝে—সুন্দর ও অনুকূল পরিবেশ মানুষের কাজের উদ্যম বাড়িয়ে দেয়, আর প্রতিকূল পরিবেশে মানুষ কর্ম্মবিমুখ হয়ে পড়ে।

"সচ্ছল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম গড়ে তোলা ছিল গান্ধীজীর লক্ষ্য—যেখানে আহার, বস্ত্র ও বাসস্থানের জন্য মানুষ পরনির্ভরশীল হবে না, যেখানে কর্ম্মক্ষম ব্যক্তিকে বেকার ও অর্ধবেকারের মত জীবন যাপন করতে হবে না। পঞ্চায়েতী রাজের উদ্বোধনী সভায় এ-আদর্শের অনুকূলে কোন কথা শুনি নি।

"খাঁটি জিনিস সংগ্রহ করা যখন অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, অসদাচার যে সময় অতি সাধারণ ব্যাপার হয়ে উঠেছে, সরকারী বিভাগগুলি যখন প্রাণহীনতার চরম পরিচয় দিচ্ছে এবং রাষ্ট্র-পরিচালকদের প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধা যখন দ্রুত নিম্নগামী হ'তে চলেছে তখন পঞ্চায়েতী রাজের এই রাজ্যজোড়া আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন এবং চা-পানের জন্য ২০ হাজারেরও অধিক অর্থ ব্যয়ের কি সার্থকতা ছিল তা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। বিশেষতঃ গান্ধীজীর জন্মদিনে—যিনি স্বাধীনতা [illegible] হিসেব করে ব্যয় করতেন এবং যিনি সঙ্কল্পের দিনকে প্রার্থনার দিন হিসেবে গণ্য করতে বলতেন।"

"ঈশ্বর রাষ্ট্রনায়কদের শুভবুদ্ধি দিন!!"—

('অভ্যুদয়' পত্রিকায় প্রকাশিত—"পঞ্চায়েতী রাজ ও গান্ধীজয়ন্তী—প্রবন্ধ হইতে।)

ঈশ্বর রাষ্ট্রনায়কদের শুভবুদ্ধি দিন!!—

—'আমেন'—

কোন অপরাধে?

খুলনার জগদীশ মল্লিক নামে এক হতভাগ্য উদ্বাস্তু স্রোতের জলে খড়কুটার মত ভাসিয়া সুদূর দক্ষিণ ভারতে কোয়েম্বাটুর শহরের উপকণ্ঠে এক শিবিরে ঠাঁই লইয়াছিলেন। সম্ভবত গত জানুয়ারীতে আয়ুব খাঁর মশালচিরা ইহার ঘর জ্বালাইয়াছিল। সন্ত্রস্ত পরিজনের হাত ধরিয়া আরও অসংখ্য ভাগ্যহত নরনারীর সঙ্গে উদ্বাস্তু জগদীশ মল্লিক চলিয়া আসিয়াছিলেন সীমান্তের এপারে, পশ্চিম বাঙ্গলায়। বৎসর ঘুরিল না। ১৩ই ডিসেম্বর মাদ্রাজ পুলিসের গুলীতে জগদীশ মল্লিক নিহত হইয়াছেন। ইহাই পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের নিদারুণ বিধিলিপি। একটা প্রবচন মনে পড়িতেছে—"রামে মারিলেও মরিব, রাবণে মারিলেও মরিব"। নিহত জগদীশ মল্লিকের ভাগ্যে ইহা অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া গিয়াছে। কে জানিত, রাবণের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া প্রজারঞ্জক রামচন্দ্রের নিযুক্ত পুলিসের হাতে এই বিড়ম্বিত মানুষটির মৃত্যু ঘটিবে? জগদীশ মল্লিক ইহা জানিতেন না, জানিলে, পিতৃপুরুষের ভিটা আঁকড়াইয়া মৃত্যুবরণ করাই তাঁহার পক্ষে শ্রেয় ছিল।

"মহাবীর ত্যাগী সরকারী নোট সম্বল করিয়া লোকসভায় এই হত্যাকাণ্ডের একটা বিবরণ দাখিল করিয়াছেন। ত্যাগীজী মন্ত্রীপদে না থাকিলে তিনি নিজেও এই বিবরণকে একতরফা ও হৃদয়হীন বলিতেন। পুলিস কনেষ্টবলের সঙ্গে উদ্বাস্তুদের বচসাকে কেন্দ্র করিয়া এই বিপত্তির উদ্ভব। বচসা হওয়া অসম্ভব নয়, উদ্বাস্তুরা ক্ষিপ্ত হইয়াছিল, ইহাও না হয় স্বীকার করিয়া লওয়া গেল। কিন্তু ত্যাগীজী ইহা বলুন, এর জন্য গুলী চালনার মত অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল কি না? আরও প্রশ্ন আছে, পুলিসের সঙ্গে উদ্বাস্তুদের বচসার কারণ কি? অধ্যাপক হেম বড়ুয়া বলিয়াছেন, পুলিস কনেষ্টবলটি নাকি একটি উদ্বাস্তু নারীর সম্ভ্রমহানির চেষ্টা করিয়াছিল। ত্যাগীজী এই প্রশ্নের উত্তর এড়াইয়া গিয়াছেন। বিবরটি তদন্তা-

যে লোকসভায় উত্থাপিত এই অভিযোগ সম্পর্কে সর-কারের নিকট হইতে আমরা স্পষ্ট উত্তর দাবি করিব। কারণ, কোয়েম্বাটুরের ঘটনা শুধুমাত্র একটি নিঃস্ব মানুষের প্রাণহানির ঘটনা নয়, ইহার সঙ্গে ভারত সরকারের বাস্তু পুনর্ব্বাসন নীতির প্রশ্ন জড়িত আছে।

"পশ্চিমবঙ্গে স্থানাভাব বলিয়া পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়াইয়া দেওয়া হইতেছে। ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই উদ্বাস্তুদের সব দায় আছে। উদ্বাস্তুদের দায়িত্ব সারা ভারতের। এই নীতি ভারত সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। এবং অন্যান্য রাজ্যও ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াছে। মাদ্রাজ সরকার আগ্রহের সঙ্গেই এই উদ্বাস্তুদের গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা উদ্বাস্তুদের সাহায্যও করিতে চান। কিন্তু সরকারী নীতির উদ্দেশ্য শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষাকারী পুলিসের হাতে কি এইভাবে নষ্ট হইবে? অতীত যাদের দুঃস্বপ্ন, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিতের অন্ধকারে আচ্ছন্ন। মানুষ যত দরিদ্রই হোক, নিজের ঘরবাড়ী ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে তার একটা সাযুজ্য ও সহমর্ম্মিতা থাকে। এজন্যই সে হইয়া উঠে সামাজিক মানুষ। দেশছাড়া, গৃহহারা এবং অপরিচিত পরিবেশে নিক্ষিপ্ত এই মানুষ-গুলির মনে ক্রোধ ও ক্ষোভ এমনিতেই পুঞ্জীভূত হইয়া আছে. পুলিসী ইতরতা ইহাতে আগুনের ইন্ধন দিয়াছিল। এবং অনুমান করা শক্ত নয়, এই কারণেই নারীর সম্মান-হানির আশঙ্কাতেই ইহারা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার জবাব মিলিয়াছে পুলিসের গুলীবর্ষণে।

"ত্যাগীজী বলিয়াছেন, ভাষা-বিভ্রাটই এই দুঃখজনক ঘটনার কারণ। ইহা খোঁড়া যুক্তি। উদ্বাস্তু নারীদের লাঞ্ছনা এই প্রথম ঘটিল না এবং স্বাধীন ভারতে আসিয়া অহিংসাবাদী রাষ্ট্রের পুলিসী নির্য্যাতনে কম উদ্বাস্তুর জীবন হানি ঘটে নাই। আমরা আশা করিয়াছিলাম, মহাবীর ত্যাগীর পরিচালনায় উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন নীতিতে মানবিকতা মর্য্যাদা ও সহিষ্ণুতা নামক শ্রেয় মূল্যবোধগুলিরও পুনর্ব্বাসন হইবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বহু দেশেই মানুষ উদ্বাস্তু হইয়াছে। কিন্তু আশ্রয়দানকারী দেশে সরকারী নীতির অদূরদর্শিতার ফলে এই ধরণের লাঞ্ছনার নজীর বিরল। এই ছিন্নমূল মানুষগুলিকে নগণ্য জীবজন্তুর মত দেশ হইতে দেশান্তরে লইয়া যাওয়া হইতেছে। নিজের দেশ, নিজের ভাষা এবং নিজের সমাজের শিকড়শুদ্ধ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তাহারা অপরিচিত জায়গায় গিয়া মাথা গুঁজিয়াছে শুধু বাঁচিবার অদম্য স্পৃহায়। আমরা তাহাদের উপযুক্ত খাদ্য কিংবা কর্ম্ম দিতে পারিতেছি না। কিন্তু ইহাদের শেষ সম্বল, নারীর সম্মান ও পারিবারিক একাত্মতাও কি ভ্রষ্টাচারী পুলিস ও নির্দ্দয় প্রশাসকদের নীতিহীনতায় জলাঞ্জলি দিতে বলিব? ইহারা ভারত-বর্ষের কাছে, মানবতার কাছে, দিল্লীর মহিমান্বিত শাসক-দের কাছে কি দোষ করিয়াছিল?"

'যুগান্তর'-এর মন্তব্যের সহিত কেবল বাঙ্গালী নহে, সকল সাধারণ ভারতবাসী মাত্রেই একমত, এবং ভারত সরকার, বিশেষ করিয়া শ্রীমহাবীর ত্যাগীর নিকট জবাবদিহি দাবি করিবেন। এই প্রসঙ্গে 'যুগান্তর'কে ত্যাগীর সম্পর্কে তাঁহাদের একটা পুরাণো মন্তব্যের কথা মনে করাইয়া দিতে চাই। অশেষ ত্যাগ স্বীকার করিয়া এই মহাবীর যখন কেন্দ্রে পুনর্ব্বাসন মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন, সেই সময় 'যুগান্তর' তাঁহার নিকট হইতে উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে সদয় এবং মানবিকতাপূর্ণ ব্যবস্থা বিধান আশা করেন। আমরাও তাই করিয়াছিলাম। কিন্তু আজ দেখিতেছি পুরাণো বাঙ্গলা প্রবাদ বাক্যের চরম বাস্তব-রূপ—'বিড়াল বনে গেলেই বন-বিড়াল হয়!' লোকসভার কোন সদস্য মন্ত্রী পরিষদভুক্ত হইলেই তাঁহার বহু বিপরীত পরিবর্ত্তন ঘটে! পূর্ব্বেও বহু ক্ষেত্রে ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে!

আরও আছে:

—পুনর্ব্বাসনের ব্যাপারে বিভিন্ন অব্যবস্থার অভিযোগে জানুয়ারী মাস হইতে দণ্ডকারণ্যে প্রেরিত ১ লক্ষ ৯৮ হাজার উদ্বাস্তু নরনারীর মধ্যে আজ পর্য্যন্ত ৪০ হাজার উদ্বাস্তু দণ্ডকারণ্যের শিবির ত্যাগ করিয়া পশ্চিম-বঙ্গে ফিরিয়া আসিয়াছে। কেন্দ্রীয় পুনর্ব্বাসন মন্ত্রণালয়ের শৈথিল্য এই শিবির ত্যাগের সমস্যাকে আরও ব্যাপক ও তীব্র করিয়া তুলিতেছে বলিয়া স্থানীয় এক সরকারী মুখপাত্র মন্তব্য করেন। দণ্ডকারণ্যে পুনর্ব্বাসনের জন্য এখনও পর্য্যন্ত প্রায় ২০ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া মাত্র ৭ হাজার পরিবারকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া সম্ভব হইয়াছে। অথচ শিবির ত্যাগের সংখ্যা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে পশ্চিমবঙ্গে আগত প্রায় ৮ লক্ষ উদ্বাস্তুর মধ্যে প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষ উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে রহিয়া গিয়াছেন। ইহার উপর এই প্রত্যাবর্ত্তনকারী ৪০ হাজার উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গের অর্থ-নীতির উপর আরও চাপ সৃষ্টি করিতেছেন।

কেন্দ্রীয় পুনর্ব্বাসন মন্ত্রণালয়কে এই সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তাঁহাদের

টনক নড়িতেছে না। নয়াদিল্লীতে এই মন্ত্রণালয়ের অধীনে একজন সেক্রেটারী, একজন অতিরিক্ত সেক্রেটারী, ৫জন ডেপুটি সেক্রেটারী এবং ১৭জন আণ্ডার সেক্রেটারীর বিরাট্ ফৌজ থাকা সত্ত্বেও শিবির ত্যাগের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে তাঁহাদের কোনরূপ শিরঃপীড়া দেখা যাইতেছে না।

জানা যায় পুনর্ব্বাসনের ব্যাপারে যথাযথ দেখা-শোনার অভাব উদ্বাস্তুদের মধ্যে নিরুৎসাহ ও হতাশার সৃষ্টি করিতেছে। ট্র্যানজিট ক্যাম্পের শিবিরবাসীদের ভাল করিয়া পরীক্ষা না করার ফলে, চাষের কাজে অনভিজ্ঞ লোকেদের ধান চাষ করিতে দেওয়া হইতেছে, আবার কৃষকদিগকে সাধারণ শ্রমের কাজে নিয়োগ করা হইতেছে। এই অব্যবস্থার ফলে, তাঁহারা কাজে কোনরূপ উৎসাহ পাইতেছেন না। ইহা ছাড়া, বহুসংখ্যক নরনারী ক্রমান্বয়ে মাসের পর মাস ট্রানজিট ক্যাম্পে থাকিয়া কোনরূপ কাজ না পাইয়া পশ্চিমবঙ্গে ফিরিয়া আসিতেছেন বাধ্য হইয়াই।

দণ্ডকারণ্যের পূর্ব্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসনের বাস্তব চিত্র এই—কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের এই দপ্তরে সু-উচ্চ বেতনভোগী অসংখ্য অফিসারের পূর্ণ বাহার আছে এবং দিনে দিনে আরও বাড়িতেছে। বলা বাহুল্য, কেন্দ্রীয় পুনর্ব্বাসন দপ্তরে শতকরা ৭০ জন অফিসারই অবাঙ্গালী এবং ভিটে হইতে উৎখাত বাঙ্গালীর প্রতি তাঁহাদের কানপ্রকার মমত্ববোধ আছে—এমন কথা এখন পর্য্যন্ত নি নাই। এই দপ্তরের কৃপায় বাঙ্গালী উদ্বাস্তু উদ্বাস্তুই হিয়া গেল, কিন্তু শত শত পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী এবং ন্যান্য প্রদেশের বিত্তবান ব্যক্তি 'উন্নত পুনর্ব্বাসন' প্রাপ্ত ইল!

শ্রীশৈবাল গুপ্ত দণ্ডকে কাজের কাজ কিছু করিবার াস পাইতেছিলেন, কিন্তু অন্যান্য কয়েকজন অফি-রের পক্ষে তাহাতে 'ব্যক্তিগত' স্বার্থে আঘাত লাগিল ং বিষম ত্যাগী মাহাবীর ত্যাগী শ্রীগুপ্তকে পদত্যাগ রতে বাধ্য করিলেন! এ-বিষয় আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও ছু করিতে পারিলেন না, বহু চেষ্টা সত্ত্বেও।

আজ প্রমাণিত হইল—পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে হরু-প্যাটেল এবং অন্যান্য কংগ্রেসী নেতারা যে-পবিত্র তিশ্রুতি দেন,তাহা কথার কথা মাত্র। ক্ষমতার আসনে বার লোভে এই প্রতিশ্রুতির মূল্য নেহাৎ সাময়িক । কিন্তু কেন্দ্রে যে দু-একজন বাঙ্গালী মন্ত্রী বিরাজমান রা দণ্ডক 'ইস্যু'তে কি পদত্যাগ করিতে পারেন ! স্বর্গত শরৎ বসু এবং শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গেই কি বাঙ্গালীর সব শেষ হইল? প্রভুপদ সেবাই কি আ বাঙ্গালীর শেষ সম্বল?

একটি পত্র

মহাশয়,

প্রথমে আপনাকে আমার আন্তরিক প্রণাম ও শুভে জানাই। "প্রবাসী" পত্রিকাটি আমি অত্যন্ত আগ্রহভ পড়িয়া থাকি। আমার এই আগ্রহের কারণ "বাং ও বাঙ্গালীর কথা" বিভাগটি। বাঙ্গালী ও বাংলা দেশে সমস্যাগুলিকে এইরূপ একটি বিশেষ বিভাগে তুলি ধরিবার জন্য আপনাকে এবং প্রবাসী কর্ত্তৃপক্ষকে জানা আমার আন্তরিক অভিনন্দন। গত শ্রাবণ সংখ্যা "আকাশবাণী ও শ্রীমতী গান্ধী" শীর্ষক শিরোনামা যে সমস্যা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাহা খুব যুক্তিযুক্ত হইয়াছে।

স্বাধীনতার পর স্বাধীন ভারতে যে ভাষা সবচে বেশী অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছে, সে-ভাষা হই আমাদের মাতৃভাষা—বাংলাভাষা। বাংলাভাষাকে ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন হইতে বহু দিন পূর্ব্বেই বিসর্জ্জন দেওয়া হইয়াছে। এখন চক্রান্ত চলিতেছে কেমন করিয়া ইহাকে ভারতের সাংস্কৃতিক জীবন হইতেও বিসর্জ্জন দেওয়া যায়। তাহা হইলেই হিন্দীভাষা একচ্ছত্রভাবে কায়েমী রাজত্ব চালাইতে সমর্থ হইবে। এই জঘন্য মনোবৃত্তির প্রকাশ দেখিতে পাই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিটি আচরণে।

বাংলাভাষার প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ আকাশবাণী আগাগোড়া করিয়া আসিতেছেন। আকাশবাণীতে বাংলা সঙ্গীতের সময় ক্রমশঃই কমাইয়া দিয়া হিন্দি-সঙ্গীত দিয়া সেই স্থান পূরণের ব্যবস্থা করা হইতেছে। হিন্দী সঙ্গীত প্রচারের জন্য ভিন্ন ট্রান্সমিটার পর্য্যন্ত বসানো হইয়াছে। বিবিধ-ভারতী অনুষ্ঠানে সাড়ে তিন কোটি তথা বিশ্বের আট কোটি বাংলা শ্রোতার জন্য কেন নির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা নাই—এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষ ও প্রাক্তন এবং বর্ত্তমান বেতার-মন্ত্রীদের পত্র লিখিয়া কোনরূপ সদুত্তর পাইতেছি না। পাক্-ভারত তিক্ত সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে 'External Service' হইতে বাংলাভাষায় অনুষ্ঠান প্রচারের অনুরোধ জানাইয়া বেতারমন্ত্রীকে একটি পত্র লিখিয়াছিলাম, তাঁহার সেক্রেটারী উত্তরে আমাকে লিখিয়াছেন যে আমার প্রস্তাব আকাশবাণীর কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বিবেচনার্থ প্রেরণ করা হইয়াছে।

আকাশবাণী কলিকাতা কেন্দ্র হইতে বাংলা সঙ্গীতকে কর্ষণীয় করিয়া তুলিতে এবং পরিবর্তে হিন্দী তকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে—একটা বিরাট্ ষড়যন্ত্র তেছে। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের 'রাষ্ট্রভাষা নীতির' য়ক পন্থা। কিন্তু দুঃখের বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের অপচেষ্টা শুধু ব্যর্থই হইবে না ভারতের বিপদ কিয়া আনিবে। কারণ আমরা রেডিও পাকিস্থানের ষ্ঠান শুনিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছি। ফলে গত য়েকদিন ধরিয়া ভারত-বিদ্বেষী প্রচার বাধ্য হইয়া নিয়াছি। কাজেই আকাশবাণীর কলিকাতা কেন্দ্র ইতে প্রচারিত বাংলা সঙ্গীত অপ্রিয় করিবার প্রচেষ্টা ত সফল হইবে, লোকে বিবিধভারতী তথা হিন্দী তে শুনিতেই ভালবাসিবে, অভ্যস্ত হইবে, কিন্তু ধীনচেতা বাঙ্গালীমনে বিদ্রোহ দেখা দিবেই। পূর্ব্ব-কিস্তানের বাঙ্গালীরা আমাদের সহায়ক হইবে। শ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষা ও বাঙ্গালীকে হিন্দী সাম্রাজ্য-াদের গ্রাস হইতে মুক্ত করিতে নিশ্চয় আগাইয়া াসিবে।

পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের মাত্র তিন-চার শতাংশ াহাড়ীয়া শ্রোতাদের জন্য ভিন্ন বেতার ষ্টেশন কার্শিয়াং কেন্দ্রটি স্থাপিত হইয়াছে। নেপালী ভাষা ইহার প্রচার াধ্যম। কিন্তু আসামের ৩০ শতাংশ বাঙ্গালীর জন্য ক ব্যবস্থা হইয়াছে? ত্রিপুরায় কেন এখনও বেতার কেন্দ্র স্থাপিত হইতেছে না? বিহার-উড়িষ্যার লক্ষ লক্ষ াঙ্গালী শ্রোতার জন্যই কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে? র্ত্তমানের আন্দামান এবং ভবিষ্যতের দণ্ডকারণ্যের শ্রাতাদের জন্যই বা কি ব্যবস্থা রহিয়াছে? নির্ভীক াংবাদিক হিসাবে এই সব প্রশ্নগুলি করুন। স্বজাতির ঃখ ও লাঞ্ছনার প্রকাশই সাংবাদিকতার আদর্শ। াজনৈতিক নেতারা চালবাজ, তাঁহারা চুপ করিয়া ইয়াছেন। আপনি বংলাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা রিবার পক্ষে জনমত গঠনের প্রচেষ্টা চালান। মাদ্রাজের . M. K. পার্টির ভয়ে কেন্দ্রীয় সরকার দক্ষিণ ারতীয়দের এবং তাহাদের ভাষাগুলিকে অনেক ক্ষেত্রে বশেষ সুযোগ-সুবিধা দিয়া থাকে। আপনি প্রশ্ন রুন, স্বাধীন ভারতে বাঙ্গালীরা কি পাইয়াছে?

ভবদীয়
'শঙ্কর'

(পত্রখানি প্রশংসাপত্র হিসাবে প্রকাশ করা হইল —পত্রে রেডিও সম্পর্কে মন্তব্যগুলির সহিত আমরা কমত, সেই কারণেই পত্র প্রকাশ করিলাম। বারান্তরে কলিকাতা রেডিও সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।)

হিন্দীর রাজ্যাভিষেক!

"অতি পরিচিত গানের ধূয়ার মত ভারতের সরকারী ভাষার প্রশ্নটি আর একবার বিগত ১২ই ডিসেম্বরের মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে জেগে উঠেছিল।

"সম্মেলন চূড়ান্তভাবে স্থির করেছেন যে, ১৯৬৫ সালের ২৬শে জানুয়ারী থেকে সরকারী ভাষা হিসাবে হিন্দী চালু করা হবে। সমস্ত রকম সরকারী নির্দ্দেশ ও পত্রালাপ চলবে হিন্দীতে। যে-সব রাজ্য সরকারী ভাষা হিসাবে হিন্দীকে গ্রহণ করেন নি তাঁদের ক্ষেত্রে এই সুবিধা দেওয়া হয়েছে যে, সেখানে মূল হিন্দীর সঙ্গে একটি প্রামাণ্য ইংরাজী অনুবাদও জুড়ে দেওয়া হবে।

মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনের এ-সিদ্ধান্ত অবশ্য আগেকার মত দেশব্যাপী জনমতের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে নি। সরকার ভাষার প্রসঙ্গটি আগে যখনই সরকারী পর্য্যায়ে আলোচিত হয়েছে তখনই নানা ভাবে বেসরকারী জন-মতের বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল। কাজেই এখন ধরে নিতে পারা যায় যে, হিন্দীওয়ালাদের ইচ্ছা প্রায় বিনা বাধায় পূর্ণ হ'তে চলেছে। ভারতের সংবিধান-স্বীকৃত অন্যান্য ১৪টি আঞ্চলিক ভাষার উপরে হিন্দীর এই অগ্রাধিকার ভারতের তাবৎ লোক-সাধারণ কতটা মেনে নেবে এবং ইরাজী ও অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার বিকাশ কতটা মার খাবে তা আগামী দিনের বিচার্য্য।

"ভারতীয় সংবিধানে ১৪টি আঞ্চলিক ভাষাকেই নীতিগত ভাবে সমমর্য্যাদাসম্পন্ন বলে স্বীকার করলেও হিন্দীকে সরকারী ভাষা হিসাবে চালু করার নির্দ্দেশ দেওয়া আছে। সংবিধানের ৩৪৩ ও ৩৪৪ সংখ্যক ধারায় হিন্দীকে সরকারী ভাষায় প্রতিষ্ঠিত করার কার্য্যকরী নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে।

"সংবিধানের ৩৪৪ ধারার নির্দ্দেশ অনুসারে রাষ্ট্রপতি সরকারী 'ভাষা কমিশন' গঠন করেন। শ্রীবি জি খেরের নেতৃত্বে ২০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত এই কমিশন ১৯৫৬ সালের জুলাই মাসে রাষ্ট্রপতির কাছে তাঁদের রিপোর্ট পেশ করেন। ১৯৫৭ সালের আগষ্ট মাসে রিপোর্টটি সংসদের বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হয়। এই রিপোর্ট নিয়ে সংসদের ভেতরে ও সংসদের বাইরে দেশের জনমতের মধ্যে প্রবল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। কমিশনের মূল বক্তব্য ছিল:

(১) সংবিধান অনুযায়ী ভারতে যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে ইংরাজী ভাষাকে আর ভারতের সরকারী ভাষারূপে চালু রাখা সম্ভব নয়। (২) সরকারী ভাষা হিসাবে ভারতের অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার তুলনায় হিন্দী সবচেয়ে সুবিধাজনক। কাজেই সর্বভারতীয় কাজের মাধ্যম একমাত্র হিন্দীই হতে পারে। (৩) ইংরাজী থেকে হিন্দীতে প্রবর্তনের প্রাথমিক পর্য্যায়ে অবশ্য হিন্দী-ইংরাজী দ্বিভাগ নীতি চালু থাকতে পারে।

"একমাত্র কৈফিয়ৎ হিসাবে কমিশন বলেন—হিন্দী-ভাষাতে ভারতের সর্বাধিক সংখ্যক (??) লোক কথা-বার্ত্তা বলতে পারে। অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে কমিশনকে প্রায় প্রকাশ্যেই বলতে হয় যে, আপাতত অন্তত প্রাথমিক পর্য্যায়ে সর্বত্র হিন্দীকে অবশ্য-শিক্ষণীয় ভাষারূপে গণ্য করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সর্বভারতীয় পরীক্ষা মাধ্যম, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা প্রভৃতি উচ্চতর ক্ষেত্রেও হিন্দীকে ক্রমশঃ চালু করার সুপারিশ করা হয় কমিশনের রিপোর্টে।

"সংবিধানের ৩৪৪ (৪) ধারা মতে সরকারী ভাষা কমিশনের এই সুপারিশসমূহ বিবেচনা করে রাষ্ট্রপতির নিকট রিপোর্ট দাখিলের জন্য তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগোবিন্দবল্লভ পন্থের সভাপতিত্বে ৩০ জন সদস্য নিয়ে একটি পার্লামেন্টারী কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি তাদের রিপোর্ট পার্লামেন্টে পেশ করেন ১৯৫৯ সালের এপ্রিল মাসে। বলা বাহুল্য, সরকারী ভাষা কমিশনের রিপোর্টের যে-অভিপ্রায় ছিল—'হিন্দীকে জোর করে অন্যান্য ভাষার উপরে প্রাধান্য দেওয়া'—সে অভিপ্রায় পার্লামেন্টারী কমিটির রিপোর্টেও অক্ষুণ্ণ ছিল। পার্লা-মেণ্টারী কমিটির রিপোর্টও সংসদের উভয় কক্ষের তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। তবে ১৯৫৭ সালের সরকারী ভাষা কমিশনের রিপোর্টের মতই সংসদীয় রিপোর্টটিও হিন্দীভাষীদের সংখ্যাধিক্যের জোরে পাশ হয়ে যায়। স্মরণ করা যেতে পারে যে, ভারতের গণ-পরিষদে হিন্দীকে সরকারী ভাষারূপে গ্রহণের প্রস্তাবও প্রথম দিনের ভোটাভুটিতে ৭০—৭০ এবং পরের দিনের ভোটে মাত্র ১ ভোটের আধিক্যে পাশ হয়েছিল। এবং সেই ১ ভোটের জোরেই হিন্দী সমর্থকেরা হিন্দীকে ভারতের জাতীয় ভাষা ও তাবৎ মাতৃভাষাকে আঞ্চলিক ভাষারূপে ... করতে সুরু করেন।

"ভাষা কমিশনের ২০ জনের মধ্যে ১৮ জন হিন্দীকে যথাসম্ভব শীঘ্র ইংরাজীর স্থলাভিষিক্ত করার মত দিয়ে-ছিলেন, যদিও ১৯৬৫ সালের মধ্যে স্থলাভিষিক্ত ক... ঔচিত্য সম্পর্কে কমিশন কোন স্পষ্ট মতামত দেন নি।

"পক্ষান্তরে দু'জন সদস্য ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডাঃ পি সুব্বারাওন জোর করে এবং তাড়াতাড়ি হিন্দী না চাপিয়ে ধাপে ধাপে হিন্দী প্রবর্তনের ... বলেছিলেন।

"বিহার, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান—এ চারিটি মাত্র প্রদেশ যথাযথ হিন্দী ভাষাভাষী। অর্থাৎ ৯।১০ কোটি লোকের ভাষা হিন্দী। কিন্তু কমিশন হিন্দী ... দূরতর উপভাষাগুলিকে একই সূত্রের আওতায় এনে হিন্দীভাষীর সংখ্যাটা যথাসম্ভব স্ফীত করে দেখাতে চেয়েছিলেন। এর বাইরে বাংলা, উড়িষ্যা, আসাম, গুজরাট, মহারাষ্ট্র এবং দক্ষিণাঞ্চলের অহিন্দীভাষী লোকের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৩০ কোটি। অর্থাৎ জোর ... দেখতে গেলে হিন্দীর বাধ্যবাধকতা কার্য্যত দুই-তৃতীয়াংশের ওপর এক-তৃতীয়াংশের ভাষাকে চাপিয়ে দেওয়া। কাজেই এই দুই-তৃতীয়াংশের প্রতিবাদ অহেতুক ছিল না।

"সংসদীয় কমিটির রিপোর্টের সঙ্গে একটি মতানৈক্য নোট পেশ করেন কমিটির অন্যতম এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সদস্য শ্রীফ্র্যাঙ্ক এণ্টনী। তিনি দাবি করেছিলেন ইংরাজীকেও হিন্দীর মতই অন্যতম সরকারী ভাষা হিসাবে গণ্য করা হোক। পরে সংসদের একটি পৃথক প্রস্তাবে তিনি তাঁর বক্তব্য পেশ করেন।

"ভাষাবিদ্ ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও অহিন্দী ভাষাভাষী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে হিন্দীকে জোর করে আবশ্যিক বিষয় রূপে চালু করা অনুচিত বলে মত প্রকাশ করেন। এই সব ছাত্রছাত্রীদের ডঃ চট্টোপাধ্যায় তৎকালে 'তথাকথিত দেশপ্রেমের শিকার' বলে বর্ণনা করেন। প্রসঙ্গত তিনি একথাও বলেন যে, 'ন্যায়বিচার ও সমতার খাতিরে ইংরাজীকেও অন্যতম ভারতীয় ভাষা হিসাবে স্থান দিতে হবে।'

"ভাষা কমিশনের রিপোর্টের সঙ্গে একমত না হয়ে ডঃ চট্টোপাধ্যায় সেদিন সুস্পষ্টভাবেই বলেছিলেন—"রাজনৈতিক বা শিক্ষামূলক কোন ক্ষেত্রেই হিন্দীর প্রয়ো-জনীয়তা নাই। হিন্দীর দ্বারা ইংরাজীকে দূর করে অহিন্দীভাষী অঞ্চলসমূহকে এতে বেশী প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টায় এই সকল অঞ্চলে গভীর আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।"

"অহিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলের জনমতের প্রধান প্রধান সমালোচনা ছিল :

কোন একটি আঞ্চলিক ভাষাকে অন্যদের ওপর য়ে দিলে জাতীয় সংহতি বিনষ্ট হতে পারে।
াংস্কৃতিক ও ভাষাগত বৈচিত্র্য নষ্ট হবার আশঙ্কা । সরকারী ভাষা হিসাবে হিন্দীর অনুশীলন বাড়লে ভাষার অনুশীলন কার্যত কমে যাবে।
অহিন্দীভাষীদের সর্বভারতীয় চাকুরি ও অন্যান্য অর্থ-তিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অধিকার সঙ্কুচিত হয়ে বে।

"কিন্তু কোন প্রতিবাদই আজ কার্য্যকর হয় নি। ীভাষীদের চাপে মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনকে সামনে রেখে ি ভারতবর্ষের ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে জোর করে াসন দখল করে নিয়েছে। এতে ভাষাসংহতি হবে ভাষা-সংহার হবে, তাই হিন্দী ছাড়া অন্য তেরটি ীয় ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের চিন্তার বিষয়।"

যুগান্তরে প্রকাশিত সম্পূর্ণ রিপোর্টটি উদ্ধৃত না করিয়া রিলাম না। কেন্দ্রীয় কয়েকজন হিন্দীভাষী মন্ত্রীর এই ুমের বিষয় আমরা পূর্ব্বেও বহু আলোচনা করিয়াছি। ন্ত সবই হইয়াছে অরণ্যে ক্রন্দন!

কোটি লোকের অর্দ্ধপক্ব এবং অর্ব্বাচীন ভাষাকে কোটি লোকের উপর জোর করিয়া চাপাইবার প্রয়াস ময়িক কালের জন্য হয়ত সার্থক হইবে—কিন্তু চিরকাল ই ভাষার জুলুম মানুষ সহ্য করিবে না। বর্ত্তমান মতাসীন কর্তৃপক্ষ ভারতকে যে-হিন্দীভাষার রজ্জুতে ধিয়া 'এক' করিবার চেষ্টা করিতেছেন, সেই হিন্দী-সারূপ রজ্জু একদিন, হয়ত দু'-চার বছরের মধ্যেই, ড়িয়া যাইবে এবং সেই সঙ্গে ভারতের সংহতিও বশেষ বিঘ্নিত হইবে।

গত প্রায় ৬০।৭০ বৎসর যাবৎ ভারতে যে সংহতি হিন্দীভাষার 'প্রতাপ' না থাকা সত্ত্বেও)—ভারতীয় ল প্রদেশের মানুষের মধ্যে যে একত্ববোধ ছিল, আজ হার কতটুকু আছে? কর্ত্তারা অবাস্তব হিন্দী-স্বর্গ তে মাটিতে নামিয়া আসুন—অনেক কিছু দেখিতে ইবেন। মানুষ বেশীদিন 'ফুলস্ প্যারাডাইসে' থাকিতে রে না। ভয় হইতেছে এই হিন্দী-ই ভারতকে বার শতবিভক্ত করিবে—দেশ হয়ত আবার ১০০ বছর র্ব্বকার অবস্থায় ফিরিয়া যাইবে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের পুনর্ব্বাসন॥

জানিতে পারিলাম যে কলিকাতা কর্পোরেশনের রচালনায় সুদূরপ্রসারী পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে লয়াছে। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল সংশোধিত বিলের বিভিন্ন ধারা অনুসারে পৌর কর্তৃপক্ষ পরিচালনা ব্যবস্থাকে অবিলম্বে ঢালিয়া সাজার কাজ আরম্ভ করিয়াছেন।

রাজ্যপাল উক্ত বিলের একশতটি ধারার যে অনুমোদন দিয়াছেন তাহা এক বিশেষ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। সংশোধিত বিলে মোট ১২৯টি ধারা সন্নিবেশিত আছে।

সংশোধিত বিলে কমিশনারের ক্ষমতা প্রসারিত করা হইয়াছে। ষ্ট্যাণ্ডিং ফিনান্স কমিটির ক্ষমতা হ্রাস পাইয়াছে। ফিনান্স অফিসার ও চীফ একাউণ্টেণ্টকে ছিটে-ফোঁটা কর্তৃত্ব দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

কমিশনারকে বিস্তৃত ক্ষমতা দানের ব্যবস্থার বিরোধিতা করিয়া রাজ্য আইন সভায় বিরোধী দল সরকারের কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন।

পৌরসভার অলডারম্যান ও কাউন্সিলারগণ গত ৫ই ডিসেম্বর হইতে মাসিক একশত টাকা ভাতা (অনারে-রিয়াম) পাইবেন। তাহা ছাড়া প্রতিটি পৌরসভার সাপ্তাহিক অধিবেশনে যোগদান ও ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটিতে যোগদান বাবদ সদস্যরা ১০ টাকা করিয়া পাইবেন। কিন্তু এই টাকা মাসিক ৫০ টাকার বেশী হইবে না।

কমিশনারকে যে-কোন কাজ বাবদ ২৫ হাজার টাকা অনুমোদনের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু পাঁচ হাজার টাকার বেশী যে-কোন বিষয়ে খরচা করিতে হইলে কমিশনারকে ফিনান্স অফিসার ও চীফ একাউনটেণ্টের সহিত পরামর্শ করিতে হইবে। এতদিন পর্য্যন্ত পাঁচ হাজার টাকার বেশী খরচের অনুমোদন ষ্ট্যাণ্ডিং ফিনান্স কমিটির ছিল।

কমিশনারকে মাসিক তিন শত টাকা পর্য্যন্ত বেতনের কর্ম্মচারীদের সরাসরি নিয়োগের ক্ষমতা দেওয়া হইবে। এবং ৩০১ টাকা হইতে ৫০০ টাকা পর্য্যন্ত নিয়োগের সুপারিশ মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশন করিবেন। কিন্তু অনুমোদন দান করিবেন কমিশনার।

কমিশনারকে ষ্ট্যাটুটারী অফিসার ছাড়া যে কোন অফিসার ও কর্ম্মচারীকে শাস্তি দিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এতদিন কমিশনার ২৫০ টাকা বেতন পর্য্যন্ত কর্ম্মচারীদের শাস্তি দিতে পারিতেন।

এতদিন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ফিনান্স অফিসার ও একাউণ্টেণ্ট পদের নিয়োগের অনুমোদনের ক্ষমতা কলিকাতা পৌরসভার ছিল। নূতন আইনবলে রাজ্য সরকার ফিনান্স অফিসার ও চীফ একাউণ্টেণ্ট নিয়োগের ক্ষমতা নিজের

হাতেই লইয়াছেন। চাকুরির নিয়মাবলী রচনাও রাজ্য সরকার করিবেন। ফিনান্স অফিসার ও চীফ একাউন্টেন্টকে যে-কোন আর্থিক বিষয়ে একাউন্টস এবং এষ্টিমেট কমিটিতে পরামর্শ দিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

নূতন আইনে পৌরপিতাদের আর একটি ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। পৌরসভা রাজ্য সরকারের অনুমোদন ব্যতীত কোন জমি পাঁচ বৎসরের বেশী লীজ বা দান করিতে পারিবেন না এবং কোন কাউন্সিলার কমিশনারের অনুমোদন ব্যতীত কোন অফিসারের নিকট হইতে কোন রেকর্ড চাহিতে পারিবেন না।

আশা করি কলিকাতা পৌরসভার নূতন ব্যবস্থা সম্পর্কে নগরপালদের পালের-গোদা শ্রীঅতুল্য ঘোষের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। গত কয়েক বৎসরে কলিকাতা শহরের অবস্থা যাহা দাঁড়াইয়াছে—আর মাত্র কয়েক বৎসর যদি এই কুকর্ম্মাদের উপর শহর রক্ষার ভার ন্যস্ত থাকে তাহা হইলে অচ্যকার এই কলিকাতাকে সোঁদর-বনের আওতায় পড়িতে হইবে।

সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতার যে ভবিষ্যৎরূপ কল্পনা করিয়া কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট পরিবর্ত্তন-সংশোধন করেন প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে, বর্ত্তমান অকর্ম্মা-ঢেঁকিদের কেরামতিতে বহু-গৌরবস্মৃতিজড়িত সেই একদা-বিখ্যাত প্রাসাদনগরী কলিকাতা আজ প্রায় ধ্বংসের মুখে!

আগামী পৌর-নির্ব্বাচনে কলিকাতার করদাতারা যদি বর্ত্তমান পৌর-(উপ-)পিতাদের ঝাড় সমেত করাতি-কাঁটার দ্বারা লবণ হ্রদে মাটি ভরাটের কাজে নিক্ষেপ করিতে পারেন—এ-শহর তবেই রাহুমুক্ত হইবে।

গদাধরের শ্রীপাদপদ্মে

—আমাদের মুখ্যমন্ত্রী প্রভুপাদ শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন আলুর রুটি, আটার রুটি, পাঁউরুটি উদ্ধার করিয়া এইবার দুধ হইতে ছানা তৈয়ারী বন্ধ করিবার শুভচিন্তা করিতেছেন। তিনি করুণা-বিগলিত বাণীতে বলিয়াছেন, শিশুরা দুধ পায় না, অতএব দুধ হইতে ছানা কাটা-বন্ধ করিতে হইবে। তবে রোগীদের জন্য প্রয়োজন হইলে ঘরে ছানা কাটিতে পারা যাইবে। চমৎকার পরিকল্পনা, শহরের ধনী বুড়া শিশুর দল এই ফাঁকে ঠিকই সুব্যবস্থা করিয়া লইবেন এবং এবার হইতে আমাদের জীবন্ত মুখ্যমন্ত্রীর জন্মতিথিতে উক্ত দুগ্ধপোষ্য-গণ "শিশু দিবস" পালন করিবেন। কিন্তু গোকুলের শ্রীনন্দের নন্দনের বংশধর যাদবকুলের কি অবস্থা হইবে? ইহাতে কি যাদবকুল ও মোদককুল বেকার হইবে না? একদিকের সমস্যা সমাধান করিতে গিয়া অন্যদিকে ছানার মুনাফাটা ত উৎপাদনকারীদের জল দিয়া পোষাইতে হইবে? তখন এ-যুগের শ্রীনন্দের পালিত পুত্র সদাচার সমিতির সাক্ষাৎ পিতৃপুরুষদেরও সাধ্য নাই যে তাহা হইতে পরিত্রাণ করে। সরকার বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য নাকি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করিতেছি, তাঁহারা বেকার সমস্যা সমাধানের স্থলে নূতন নূতন বেকার সমস্যার সৃষ্টি করিতেছেন। সরকারের বিভিন্ন কাজে সহস্র সহস্র লোক দীর্ঘ দিনের পেশা হইতে নূতন করিয়া বিচ্যুত হইয়া বেকার হইতেছে। চাউল, চিনি, তৈল, আটা, ময়দা প্রায় প্রতিটি প্রধান নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্য হইতে বঞ্চিত করিয়া কয়েক লক্ষ ক্ষুদ্র মুদি ও চাউল ব্যবসায়ীকে ধ্বংস করিয়াছেন। সম্প্রতি চিনি লইয়া যে ছিনিমিনি খেলিতে-তেছেন তাহাতে মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীরাও পথে বসিবার উপক্রম। আমরা আমাদের গণ্ডির মধ্যে বর্দ্ধমানের চিত্রই প্রত্যক্ষ করিতেছি। বর্দ্ধমান শহর এলাকায় প্রায় ১৫০টি মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী কয়েক সপ্তাহ হইতে নিয়মিতভাবে পরিমিত চিনি না পাওয়ায় তাহাদের দেকানগুলি প্রায় অচল হইয়াছে। অবশ্য দুই-চার জন বড় দোকান-দার যে-কোন উপায়েই পোষাইয়া লইতেছেন। কিন্তু সাধারণ মিষ্টান্ন দোকানদারদের কলিকাতা হইতে আকাশ ছোঁয়া দরে মিছরী আনিয়া পেটের দায়ে কিছু কিছু মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে হইতেছে। গত ১১ই নভেম্বর নবগঠিত বর্দ্ধমান মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতির অধিবেশনে অভিযোগ করা হইয়াছে যে, ৬৭ জন সাধারণ মিষ্টান্ন বিক্রেতাকে সপ্তাহে ৩৬·০৯ কেজি হিসাবে চিনি দেওয়া হইত, এক্ষণে উহার অর্দ্ধেক ১৮·০৪ কেজি করা হইয়াছে। উহাও আবার গত সপ্তাহ ও এই সপ্তাহে দেওয়া হয় নাই। আমরা বর্দ্ধমানের কর্ত্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা কি আর বর্দ্ধমানবাসীকে মিষ্টিমুখ করাইয়া মিষ্টভাষা শুনিতে চাহেন না? স্বাধীন ভারত নাকি একমাত্র চিনিতেই স্বয়ংসম্পূর্ণ—ইহা আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। শ্রীগদাধর যত শীঘ্র এই দয়ালু ও কর্ম্মঠ সরকারকে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে স্থান দেন দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল!—

—'দামোদরে'র দুঃখ করিবার কারণ নাই। আলোচ্য বিষয়ে কলিকাতার অবস্থাও চরম এবং আমরা হাড়ে হাড়ে তাহা অনুভব করিতেছি। এ বিষয় আমরা কোন মন্তব্য না করিয়া তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের [illegible]

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সরকারী পরিকল্পনাকে ভিনব' আখ্যা দিয়া বলেন, উহাতে বাংলার মিষ্টান্ন ল্পর উপর 'নির্ম্মম আঘাত' পড়িবে। তিনি বলেন—ধ সরবরাহের ভার যদি সরকার নিজের হাতে গ্রহণ করতেন, তা হ'লে এ আইন জারী করলেও সরকারকে পূর্ণরূপে দায়ী করা চলত না। কিন্তু সরকার হরিণ-টায় দুগ্ধ-কেন্দ্র স্থাপন করেছেন—কলকাতা থেকে টাল অপসারণ করছেন। দুধ সরবরাহের দায়িত্ব আজ পূর্ণরূপে সরকারের। সরকার তাতে ব্যর্থ হয়েছেন—মন ব্যর্থ হয়েছেন গভীর সমুদ্রে মাছ ধরা পরিকল্পনায়। জেদের অক্ষমতা ও ব্যর্থতার জন্য আজ তাঁরা যে াইন করতে চলেছেন—তাতে বাংলার একটি অতি ন্দর এবং প্রশংসার শিল্প নষ্ট হ'য়ে যাবে। বাংলার ানা থেকে তৈরী মিষ্টান্ন আজ পৃথিবীর বহু দেশে চ্চ প্রশংসা অর্জ্জন করেছে। শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণ-শিল্পীদের মত অসংখ্য মিষ্টান্ন শিল্পী-কারিগর—ব্যবসায়ী ারাও বেকার হয়ে পড়বে। তার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর রের আতিথেয়তা আপ্যায়ন তাও নষ্ট হবে। আজ দেশে অন্ন নাই,—তৈল নাই—মৎস্য নাই—শাকসব্জি—াল থেকে সুরু করে সমস্ত দ্রব্য অগ্নিমূল্য। দুধ াই শুনছি। মিষ্টি উঠতে চলেছে। আজ বিস্মিত য়ে ভাবছি পর পর তিনটি পরিকল্পনার প্রায় অন্তে খন এই অবস্থা, তখন আর একটি বা দু'টি পরিকল্পনার ার আমরা কোন্ অবস্থায় উপনীত হব?

"আমি সরকারকে অনুরোধ করছি, তাঁরা দুধের ৎপাদন বাড়ান। প্রয়োজনীয় সংখ্যক দেশ-বিদেশের ভাল গরু আমদানী করুন। অন্যদিকে রিণঘাটার বন্দোবস্ত ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি অনুসন্ধান রে তাকে নিখুঁত করুন। যে-সব শ্বেতহাতী জাতীয় র্ম্মচারীগুলি এসবের জন্য দায়ী, তাদের পরিবর্তন রুন। বাঙ্গালীর এমন একটি সুন্দর শিল্পকে নষ্ট করে বশ কয়েক লক্ষ মানুষকে বিপন্ন করে তুলবেন না।"

পশ্চিমবঙ্গে বেকার সমস্যা ভীষণতম—এমন অবস্থায় লক্ষ লোককে বেকার করিবার অভিনব পরিকল্পনা—জ্জার বালাই থাকিলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রহণ করিতে ারিতেন না।

পৃথিবীর উন্নত অন্যান্য দেশগুলির প্রতি আমাদের রম-গান্ধীবাদী এবং চরম-খাদীপ্রাণ মুখ্যমন্ত্রীকে দৃষ্টি-াত করিতে নিবেদন জানাই—কি ভাবে ঐ সব দেশে টির শিল্পগুলিকে দেশের সরকার সযত্নে রক্ষা করি-তেছে তাহা দেখিতে পাইবেন। এ দৃষ্টান্তে তিনি নিজেকে অনুপ্রাণিত করিয়া দেশের কুটির শিল্পগুলিতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে—এ-রাজ্যের অক্ষম, উদ্যমহীন কিন্তু স্বার্থপর সরকারী কর্ম্মচারীদের সম্পর্কে সক্রিয় চিকিৎসার বিধানও দিতে পারিবেন। স্বর্ণ-শিল্পীদের মত এ-রাজ্যের প্রায় ৫ লক্ষ মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী ও কর্ম্মীদের বেকার করিয়া তাহাদের স্থির মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিবার ব্যবস্থাকে সুশাসন বলে না—বলে ক্ষমতার অপব্যবহার এবং সরকারী নির্ম্মম স্বেচ্ছাচারিতা। শিশুদের বাঁচাইতে হইলে দুগ্ধ অবশ্যই চাই, কিন্তু এই দুগ্ধ সংগ্রহ মিষ্টান্ন-বিক্রেতা ও কর্ম্মীদের হত্যার বিধান দ্বারা হইবে না। এ-ব্যবস্থা এবং বিধান অক্ষম অসহায় ক্ষমতাসীন ব্যক্তির পক্ষেই শোভা পায়। রোগ নিরাময় করিবার নামে রোগীকে স্বর্গধামে চালান করার বিধান চিকিৎসা বলিয়া কেহই স্বীকার করিবে না।

কিছু সংখ্যক অসৎ ব্যবসায়ীর পাপের দণ্ডভোগ দেশের নিরপরাধী লোকদের কেন করিতে হইবে, তাহা আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে আসে না। বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই দেশের প্রায় সকল সংবাদ এবং সাময়িক পত্র খাদ্য বিষয়ে সরকারকে সতর্ক অবহিত হইবার নিবেদন জানায়—কিন্তু সরকারী হেড-ম্যান্ ভাবিয়াছিলেন তিনি বুঝেন বেশী, জানেন আরও বেশী এবং এই জানার জোরে বিগত ১৬।১৭ বৎসর যাবৎ টন মণের বিষম পরিসংখ্যানের চাপে লোকের দেহ-মন চাঙ্গা রাখিবার প্রভূত চেষ্টা ক্রমাগত করিয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ-প্রধানের বেকুবীর ফল শেষ পর্য্যন্ত ফলিল, তাঁহার চাল-পম-তৈলের পরিসংখ্যান—কেবল মিথ্যাই নহে, আজ বিষম এক ধাপ্পা বলিয়াই লোকের ধারণা হইয়াছে। ইংরেজীতে একটি প্রবাদ বাক্যের সত্যতা আজ বুঝিতে পারিতেছি।

চারি প্রকার মিথ্যা আছে—

১। Lies—সরল মিথ্যা

২। White Lies— শুদ্ধ শুভ্র খদ্দরী মিথ্যা

৩। Damned Lies—সাংঘাতিক মিথ্যা

৪। Statistics—ভীষণতম মিথ্যা

অন্যান্য ক্ষেত্রের কথা জানি না, কিন্তু এ-রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর খাদ্যশস্য বিষয়ে প্রায় সকল পরিসংখ্যানই দেশের লোককে আজ অ-ভক্ষ অপক্ব কদলী মাত্র প্রদর্শন করিতেছে!

আমরা সবকিছু সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে র‍্যাশনিং ব্যবস্থার সার্থকতা আশা করিব—এবং ইহা যদি বাস্তবে ঘটে তাহা হইলে হয়ত বা দেশের লোক—যত কমই হউক—

কিছু কিছু খাদ্য পাইবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের প্রয়োজনমত চাউল-আটা-গম-চিনি যোগানোর দায়িত্ব কেন্দ্র সরকারের। কেন্দ্র সরকার, আশা করি পূর্ব্বের মত এবারও তাঁহাদের কথার খেলাপ করিবেন না। কেরালা সম্পর্কে কেন্দ্র-কর্ত্তারা যে বিষম তৎপরতা এবং মনোভাব প্রদর্শন করেন, আশা করি আমাদের এ-পোড়া রাজ্য সম্পর্কে তাহার ব্যতিক্রম হইবে না। সকলপ্রকার নিরাশার মধ্যেও আমরা যেন ৫ই জানুয়ারী (১৯৬৫) তারিখটিকে এক শুভদিন বলিয়া ভবিষ্যতে স্মরণ করিতে পারি—আপাতত ইহার বেশী আর কিছু আশা করিবার নাই। এবার পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য-র‍্যাশনিং এবং-বিলি বণ্টন ব্যবস্থা যদি সুষ্ঠু এবং যথাযথ হয়, তাহা হইলে মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে ইতিপূর্ব্বে যতপ্রকার বিরুদ্ধ এবং অপ্রিয় সমালোচনা করিয়াছি তাহা প্রত্যাহার করিব সানন্দে এবং অকুণ্ঠচিত্তে। আর একটি কথা স্পষ্ট বলা দরকার—শ্রীপ্রফুল্ল সেন সম্পর্কে আমাদের ব্যক্তিগত কোন বিরুদ্ধ ভাব, বিদ্বেষ এবং অভিযোগ নাই—বরং তাঁহার নানা গুণের জন্য তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার ভাবই পোষণ করি।

'চাউলের জন্য কেন বেশী খরচ করেন··· ?'

সরকারী একটি বিজ্ঞাপনের হেড্-লাইন। (সরকারী পরিহাস?) এই বিজ্ঞাপন পাঠে জানিতে পারিলাম যে, আমাদের "···প্রয়োজন মেটাবার জন্য গমও ত রয়েছে।

"গমের পুষ্টিকারক গুণও বেশী; পুষ্টিকর খাদ্যের সমতা রক্ষার জন্য এবং খাদ্য-সম্পর্কিত ব্যয়ে সমতা রক্ষা করার জন্য বেশী পরিমাণে গম ব্যবহার করুন।

"তাছাড়া শাকসব্জি, ফল, মাছ, ডিম ও দুগ্ধ দ্রব্যাদির মত পুষ্টিকর খাদ্যও বেশী পরিমাণে করুন।

"উন্নততর ও সুষম খাদ্যের জন্য বেশী পরিমাণে ব্যবহার করুন!"

বিশেষ করিয়া (চাউল ছাড়া) যখন এই স খাদ্যদ্রব্যাদি দেশে ছড়াছড়ি যাইতেছে! আর গ রাস্তার মোড়ে মোড়ে বস্তা বস্তা গম বিক্রি হইতে যত ধরে পেটে—ভরিয়া যান।

মুক্তহস্তে দুর্গাপুর কংগ্রেসের চাঁদা

একটি সংবাদে প্রকাশ যে, মন্ত্রী খগেনবাবু জলপাই গুড়ি শহরে কয়েকদিন প্রতীক্ষা করিয়া অবশেষে এক জনসভায় দুর্গাপুর কংগ্রেসের জন্য বেশ মোটা পরিমা চাঁদার ভরসা পাইয়াছেন। একেবারে সঠিক হিসা নয়, তবে জানা গেল সেই অর্থের প্রতিশ্রুতি প্রায় পঞ্চাশ হাজার। ব্যবসায়ীদের কাছে মন্ত্রী মহাশয়ের আবেদন ব্যর্থ হয় নাই, তাঁহার প্রতীক্ষায় সার্থক হইয়াছে।

শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয়ও বার্ণপুর এবং অন্যান্য স্থানে ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে বেশ কয়েক লক্ষ টাকা চাঁদা হিসাবে লাভ করিয়াছেন।

খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা এবং জনপ্রিয় মন্ত্রীর দুর্গাপুর কংগ্রেসের জন্য চাঁদার আবেদন ব্যবসায়ীদের নিকট ব্যর্থ হয় নাই জানিয়া গভীর তৃপ্তিলাভ করিলাম।

এই প্রসঙ্গে আশা করা যাইতে পারে যে, উপর মহলে ব্যবসায়ীদের সামান্য 'আবেদন'ও একেবারে বৃথা যাইবে না।

বিশ্বামিত্র

শ্রীচাণক্য সেন

॥ চৌদ্দ ॥

দুর্গাভাই মেহতার বাংলোবাড়ী বিলাসপুর শহরের উত্তর-প্রান্তে। একদা-বিস্তীর্ণ সংরক্ষিত অরণ্যে উত্তর-প্রান্ত ছিল জনবিরল। ইংরেজ আমলে গভর্ণররা অরণ্যে পশু শিকার করতেন অরণ্য ঘিরে রয়েছে আরাবল্লী পর্বতমালার একাংশ; শাল, সেগুন ও অনেক রকম বন্য গাছের মধ্য দিয়ে মাঝে মাঝে সরু পথ। এখন অরণ্যের অনেকখানি জনপদে পরিণত। নতুন নতুন কলোনী তৈরী হয়েছে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলের রাজত্বে। একটি কলোনীর নাম কোশলনগর। অন্য নাম কে, ডি, নগর। কোশলনগরে তৈরী হয়েছে মন্ত্রী এবং উচ্চ-স্তরের রাজপুরুষদের জন্যে নতুন বাংলো। এর একটি দুর্গাভাই মেহতার। বাংলোটি এক পাহাড়ের ওপর। নীচে থেকে বেশ খানিক উঁচু উঠে গেছে পীচের রাস্তা বাংলোর গেট পর্যন্ত। গাড়ি সহজে উঠতে পারে, কিন্তু সাইকেল-রিকৃশা টেনে তুলতে মানুষ শীতেও ঘর্মাক্ত হয়। বাংলোর সামনে ফুলের বাগান। দক্ষিণ কোণে দুর্গাভাইএর খাস দপ্তর।

মধ্যাহ্ন আহারের পরে দুর্গাভাই কদাচ বিশ্রাম নেন না। সারাদিন কর্মব্যস্ততা গান্ধী-শিষ্য-জীবনের প্রাচীন অভ্যাস। আজও আহারান্তে বাগানে পাইচারি করছিলেন। মন অশান্ত। জীবনে অনেক সিদ্ধান্ত-সংকটে পড়েছেন দুর্গাভাই। কিন্তু আজকের, বর্তমানের, সংকট অন্য রকমের। যৌবনে সরকারী কলেজের অধ্যাপনা ত্যাগ ক'রে গান্ধীজির আহ্বানে স্বাধীনতা সংগ্রামের অহিংস সৈনিক হবার সময়ও সংকট দেখা দিয়েছিল। মনস্থির করতে কষ্ট হয় নি। মনস্থির ক'রে আনন্দ, তৃপ্তি, গৌরব হয়েছিল। স্বাধীনতার পরে পুনরায় সংকটে পড়েছিলেন। মন চাইছিল গান্ধীজির শিষ্য থেকেই শাসনপর্বের বহুদূরে গ্রামাঞ্চলে কাজ করতে। পারেন নি। উদয়াচলের কংগ্রেস-কর্মীদের দাবি, পত্নী মনোরমার সামাজিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা, পুত্রকন্যাদের অনুচ্চারিত ক্ষোভ—সব উপেক্ষা করবার সাহস ছিল, ছিল না মহাত্মার আদেশ লঙ্ঘনের। মন্ত্রীত্ব ক'রে পাঁচ বছর কেটে গেল। পাঁচ বছরে দেশের, দেশবাসীর যে-পরিচয় দুর্গাভাই পেয়েছেন তার কিছুই প্রায় জানা যায় নি সুদীর্ঘকালের দেশসেবায়। আজ একেবারে নতুন সংকট। দুর্গাভাই জানেন, ইচ্ছে করলে উদয়াচলের মুখ্যমন্ত্রী তিনি হ'তে পারেন। এক-দিক থেকে দেখতে গেলে হওয়া তাঁর দায়িত্ব, কর্তব্য। কংগ্রেস দলে যে ভাঙ্গন ধরেছে, জয়লাভ করলেও, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তা জুড়তে পারবেন না। পদ্মাদেবী ঠিক বলেছেন, জয়ের মধ্যেও কোশলজিকে পরাজয় মানতে হবে। পাঁচ বছর আগে তিনি যে-মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, আগামী সপ্তাহে, দলীয় সংগ্রামে জিতেও, তিনি আর সে-মুখ্যমন্ত্রী হ'তে পারবেন না। যাদের সাহায্য নিয়ে তাঁর জয় হবে, তাদের পুরস্কৃত করতে গিয়ে নিজের বল ও মর্যাদা তিনি অনেকখানি হারাবেন। যারা হারবে, তারা গোপন হিংসায় অনবরত ষড়যন্ত্র ক'রে যাবে, যতদিন না প্রতিশোধের উল্লাসে তাদের চিত্ত বিত্তহীন হয়ে উঠবে।

কংগ্রেস-শাসনকে এ সংকট হ'তে বাঁচাতে পারেন একমাত্র দুর্গাভাই। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আজও তাঁকে রাজ-মুকুট ছেড়ে দিতে রাজী আছেন। গতকালও বলেছেন, "আপনি যদি মুখ্যমন্ত্রী হন, দুর্গাভাইজি, আমি সানন্দে অবসর নেব।" কোশলজির প্রতিপক্ষও দুর্গাভাইকে প্রাধান্য দিতে তৈরী। সুদর্শন দুবে আজ সকালেও টেলিফোনে তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী হবার অনুরোধ করেছেন। হাইকমাণ্ড থেকেও তাঁর অভিমত জানতে চাওয়া হয়েছে। মনোরমা পুত্রকন্যাদের নিয়ে রীতিমত রাজ-নৈতিক আন্দোলন সুরু ক'রে দিয়েছেন।

অথচ দুর্গাভাই কিছুতে মনস্থির করতে পারছেন না।

আজ সকালে এ নিয়ে মনোরমার সঙ্গে আবার ঝগড়া হয়ে গেছে। মনোরমা যে সুদর্শন দুবের সঙ্গে রাজনৈতিক যোগাযোগ স্থাপন করেছেন দুর্গাভাই তা জানতেন না। খবর পেয়ে গেলেন অপ্রত্যাশিতভাবে কন্যা বসন্তের কাছে।

রাত্রে শুতে যাবার আগে বসন্ত তাঁর জন্যে একগ্লাস দুধ নিয়ে আসে। কালও এসেছিল। দুধ পান করে গ্লাস ফিরিয়ে দিতেও বসন্ত দাঁড়িয়েছিল।

দুর্গাভাই প্রশ্ন করেছিলেন, "কিছু বলবে ?"

"আপনি যদি অনুমতি দেন।"

"বল।"

"কোশলজি কি হেরে যাবেন ?"

"তুমিও রাজনীতি করছ নাকি ?"

"না। শুধু জানতে চাইছি।"

"মনে হয় না হারবেন।"

"কিন্তু—"

"কিন্তু কি ?"

"তা হ'লে কি আপনি হারবেন, পিতাজি ?"

"আমি ? আমি ত হেরেই আছি।"

"কোশলজি যদি জেতেন, তবে ত আপনার হার হবে।"

"কেন ? আমি ত তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী নই !"

"নন ?"

"না ত।"

"তবে যে মা বললেন—"

"মা কি বললেন ?"

"মা বললেন, সুদর্শনজি আপনাকে কোশলজির প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করাবেন। আর, আপনি তাতে রাজী হয়েছেন।"

"মা কি করে জানলেন ?"

"গতকাল সুদর্শনজি এসেছিলেন।"

"কেন ? কখন ?"

"দশটায়। মা'র সঙ্গে কথা বলতে।"

"হঠাৎ মা'র সঙ্গে কথা বলার কি দরকার হ'ল ?"

"হঠাৎ নয়, পিতাজি।"

"ও ! কথাবার্তা তা হ'লে চলে আসছে ?"

"মা বললেন, এবার কোশলজির পতন অনিবার্য।"

"তোমার মা রাজরাণী হ'তে চান। বহুদিনের সখ।"

"আপনি কি প্রতিদ্বন্দ্বী নন, পিতাজি ?"

"না। রাজা হবার সখ আমার নেই। মন্ত্রীত্বই হজম করতে পারি নি, আবার রাজা !"

"আমি যাই, পিতাজি।"

"শোন। তুমি কোন্ দলে জানতে পারি কি ?"

"আপনার দলে, পিতাজি।"

"তুমি চাও আমি মুখ্যমন্ত্রী হই ?"

"না, পিতাজি।"

"কেন ?"

"জানি না।"

"আচ্ছা, এস।"

বসন্তের সুন্দর মুখখানায় খুশির ছটা দেখতে পেয়েছিলেন দুর্গাভাই মেহতা। কারণ বুঝতে পারেন নি। ভেবেছিলেন, পিতার প্রতি অন্ধ অনুরাগ। বোঝেন নি, বসন্তের ভয়, আশা, আশংকা। কোশল পরিবারের সঙ্গে সে সংগোপনে একটি অনুরাগের সেতু তৈরী করেছিল। মনোরমা কোশলদের কোনদিন সুনজরে দেখেন নি। অধুনা তাঁদের নাম পর্যন্ত শুনতে পারেন না। এর ওপর যদি দুর্গাভাই ও কৃষ্ণদ্বৈপায়নে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় তার সেতুটি ধূলিসাৎ হবে।

প্রাতঃরাশের সময় দুর্গাভাই পত্নীকে কঠিন ভাষায় বলে উঠলেন, "তুমি রাজনীতি করতে চাও, কর। কিন্তু আমাকে নিয়ে নয়।"

"তার মানে ?"

"সুদর্শন দুবের সঙ্গে তোমার কি-সব কথাবার্তা চলছে ?"

"কে বলল তোমাকে এ কথা ?"

"যেই বলুক।"

"নিশ্চয় কে. ডি. কোশল ! মূর্তিমান শয়তান। সর্বত্র তার গুপ্তচর ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি জানতাম তার লোক আমার পেছনে লেগে রয়েছে।"

"কোশলজি বলেন নি। কিন্তু কথা তা নয়। কথা হচ্ছে, তুমি এ ব্যাপারে মাথা গলিও না।"

"কেন? আমি উদয়াচলের নাগরিক। কংগ্রেসের কাজ আমিও করেছি। উদয়াচলের শাসনে আমারও অধিকার আছে। কে মুখ্যমন্ত্রী হ'লে প্রদেশের ভাল হবে সে বিষয়ে আমারও বলবার আছে, করবার আছে।"

"তা আছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী যেই হোক, আমি হচ্ছি না।"

"কেন? তুমি কেন হবে না? প্রদেশের সবাই তোমাকে চাইছে। কংগ্রেসী দলের সবাই তোমাকে চায়। হাই কমাণ্ড তোমাকে চায়। তোমার কি অধিকার আছে এত মানুষের দাবি উপেক্ষা করার?"

"অধিকার আছে। বিবেকের অধিকার।"

"বিবেক! আসলে তুমি ভীরু, কাপুরুষ! দায়িত্বের ভয়ে তুমি অস্থির। কে. ডি. কোশলের ছায়ায় থেকে মন্ত্রীত্বের চেয়ে বড় কিছু তুমি ভাবতে পার না।"

"হয়ত তাই।"

"কিন্তু কেন তুমি ভাবতে পারবে না? তোমার মত নেতা ভারতবর্ষে ক'জন আছে? তুমি কত ভাল করতে পার উদয়াচলের! কংগ্রেসের মধ্যে যে মরণ-বিষ আজ ঢুকে গেছে তুমি তাকে বার করে দিতে পার। কে. ডি. কোশলের রাজত্বে যে ভীষণ দুর্নীতি, দৌরাত্ম্য, অত্যাচার, অনাচার, আত্মীয়পোষণ হয়ে এসেছে তুমি তা সব বন্ধ করতে পার। তোমার নেতৃত্বে উদয়াচলে রামরাজত্বের সূচনা হ'তে পারে।"

"অন্তত তুমি নিজেকে রাজরাণী মনে করতে পার।"

"চিরদিন তুমি আমায় বঞ্চিত রেখেছ। কোনও আশা আমার পূর্ণ হ'তে দাও নি। আজ, মরবার আগে, তোমাকে আমি সবার উচ্চাসনে দেখতে চাই। যে গৌরব, যে সম্মান, যে মর্যাদা তোমার প্রাপ্য, তা তুমি পেয়েছ, দেখতে চাই। তুমি আজও আমাকে বঞ্চিত রাখবে। এই তোমার বিচার?"

দুর্গাভাই তিক্ত, ভারি মন নিয়ে দপ্তর-ঘরে চলে এসেছিলেন। রমণীর মনে যখন উচ্চাশার আগুন জ্বলে, তখন বুঝি বিপদ্ সমাসন্ন।

মনোরমাকে দেখে, তাঁর কথা শুনে আর একটি নারীকে মনে পড়েছিল দুর্গাভাই-এর। তিনি তাঁর স্বামীর মাথা থেকে রাজমুকুট সরিয়ে নেবার জন্তে ব্যাকুল। যে-মুকুটের জন্তে মনোরমার লোভ অসীম, তাতে তাঁর নিস্পৃহা সীমাহীন। অথচ একদিকের লোভ অন্যদিকের নিস্পৃহা: দুই-ই সমান দুর্বল।

রাজনীতি নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকার দরুণ, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দৈনন্দিন শাসনভার প্রায় সম্পূর্ণ দুর্গাভাইএর হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালে বড় কোনও কাজ সরকার হাতে নিচ্ছিলেন না; নীতিগত সিদ্ধান্তগুলি স্থগিত রাখা হচ্ছিল। তবু একটা প্রদেশের দৈনন্দিন শাসনের সমস্যা কম নয়। সাধারণত যে-সব বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মতামত দরকার তার প্রায় সবগুলিই এ ক'দিন দুর্গাভাইকে দেখতে হচ্ছিল। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের এ অনুরোধ তিনি উপেক্ষা করতে পারেন নি। অনুরোধকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নীতির প্রলেপ লাগিয়ে আরও বাধ্যতামূলক করেছিলেন। একখানা পত্রে দুর্গাভাইকে লিখেছিলেন, "মন্ত্রীসভা পদত্যাগের পর এক অনিবার্য অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে। আপনি জানেন, মুখ্যমন্ত্রীত্বের জন্য আমি দলের সমর্থন চাইছি। যদি এই অনিশ্চিত সপ্তাহগুলিতে রাজকার্য আমি চালাই, কারুর কারুর সন্দেহ হ'তে পারে আমি শাসনযন্ত্রকে নিজের স্বার্থ-সাধনে বিনিয়োগ করছি। সুতরাং আমি দু'টি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। প্রথম, দৈনন্দিন শাসন-নেতৃত্বের দায়িত্ব অন্তর্বর্তীকালে আপনাকে গ্রহণের অনুরোধ করা। দ্বিতীয়ত, কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনি সিদ্ধান্ত নিতে না চাইলে তাকে ক্যাবিনেটে উত্থাপন করা। অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ইচ্ছে বা প্রয়োজন হ'লে আপনি সর্বদা আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে পারেন। না করলেও আমি আপত্তি জানাব না, কারণ উদয়াচলের স্বার্থ আপনার হাতে ন্যস্ত থাকলে আমার বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তার কারণ থাকবে না। আশা করি আমার এ অনুরোধ আপনি রক্ষা করবেন।"

পত্রখানা সারা ভারতবর্ষের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।

দুর্গাভাই সরকারের দৈনন্দিন দায়িত্ব গ্রহণে আপত্তি

জানান নি। মন্ত্রীসভা পুনর্গঠনের ব্যাপারে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আগাগোড়া তাঁকে শ্রদ্ধা, সম্মান ও সমীহ ক'রে আসায় তিনি প্রীত হয়েছিলেন। দুর্গাভাইএর চরিত্রের দুর্বলতা-টুকু কৃষ্ণদ্বৈপায়নের যতটা জানা ছিল তাঁর নিজের ততটাই ছিল অজানা। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন জানতেন দুর্গাভাইএর কঠিন নীতিবোধ ও কৃচ্ছ্রসাধনার পশ্চাতে রয়েছে তীক্ষ্ণ আত্মাভিমান। দুর্বলের, দুষ্টের প্রশস্তির উদ্দেশ্য তিনি বুঝতে পারতেন, কিন্তু যোগ্যের কাছে প্রশংসা ও সুখ্যাতির ওপর তাঁর দুর্বলতা প্রচণ্ড।

আজ সারা সকাল দুর্গাভাই সরকারী কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এরই মধ্যে বিলাসপুরের রাজনৈতিক সংঘাত কয়েকবার তাঁকে স্পর্শ করে গেছে। কাজের মধ্যে একবার সুদর্শন দুবে টেলিফোন করেছিলেন। দুর্গা-ভাইকে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীত্বের জন্যে দাঁড়াবার পুনর্বার অনুরোধ। দুর্গাভাই অনুরোধ রাখতে অসামর্থ্য জানিয়ে বাক্যালাপ বন্ধ করে দিয়ে-ছিলেন। দ্বিতীয় টেলিফোন এসেছিল এক অপ্রত্যাশিত ব্যক্তির কাছ থেকে।

তাঁর নাম হরিশংকর ত্রিপাঠি।

"নমস্তে দুর্গাভাইজি। আমি ত্রিপাঠি বলছি। হরিশংকর ত্রিপাঠি।"

"নমস্তে। বলুন।"

"খুব ব্যস্ত আছেন?"

"না। ব্যস্ত কোথায়?"

"আপনাকে একটা ফাইল পাঠিয়েছি। হিন্দুস্থান অটোমোবাইল কোম্পানীর নতুন কারখানা বিষয়ে।"

"ফাইল আমি পড়েছি।"

"এ বিষয়ে ক্যাবিনেটে একবার আলোচনা হয়েছে। কোম্পানী বিলাসপুরের কয়েকজন ব্যবসায়ী গঠন করেছেন। সরকারী ঋণ দেওয়ার প্রস্তাব ক্যাবিনেট মঞ্জুর করেছেন। এখন বাকী কাজটা শেষ হয়ে গেলে ভাল হয়।"

"কিন্তু, ত্রিপাঠিজি, এ ব্যাপারটা নিয়ে কতগুলি অভিযোগ কাগজে বেরিয়েছে।"

"মিথ্যা অভিযোগ।"

"তা হ'তে পারে। আমার মনে হয়, এ বিষয়টা বর্তমানে স্থগিত থাক। নতুন ক্যাবিনেট সব কি পুনর্বিবেচনা ক'রে যা কর্তব্য করতে পারবেন।"

"কিন্তু, দুর্গাভাইজি, আমি যে ওদের ক দিয়েছি—"

"সে কথার কি এখন কিছু দাম আছে, ত্রিপাঠিজি আজ বাদে কাল আপনি বা আমি মন্ত্রীসভায় থাক কি না তার নিশ্চয়তা নেই। আবার আপনি হয় মুখ্যমন্ত্রী হয়ে বসবেন। ব্যাপারটা কিছুদিনের জন্য স্থগিত থাকলে ক্ষতি হবে না। অন্তত আমার ত তা মত। আপনি অবশ্যি কোশলজিকে ব'লে দেখতে পারেন।"

"কোশলজিকে ব'লে কিছু লাভ নেই। আপনি যখন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন তখন দেখছি আর কিছু করার নেই।"

"কসুর মাপ করবেন।"

"না, না। তারপর ব্যাপার কেমন দেখছেন?"

"কোন্ ব্যাপার?"

"এই মন্ত্রীসভার?"

"আমি আর দেখছি কৈ? দেখছেন, দেখাচ্ছেন ত আপনারা!"

"আপনি কি সত্যি উদয়াচলের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে রাজী নন?"

"রাজী না-রাজীর কথা নয়, ত্রিপাঠিজি। যোগ্য নই।"

"তা হ'লে কোশলজিকে হারাবার উপায় রইল না।"

"আমার মতে, ত্রিপাঠিজি, কোশলজি হারবার পাত্র নন।"

"আপনাকে পেলে আমরা ওঁকে হারাতে পারতাম।"

"তাতে আপনাদের জয় হ'ত; আমার নয়।"

"আপনি শেষ পর্যন্ত কোশলজিকেই সমর্থন করবেন?"

"না। আমি কাউকে সমর্থন করব না।"

"আমার একটা অনুরোধ আছে, দুর্গাভাইজি।"

"বলুন।"

"একজনকে আপনার কাছে পাঠাতে চাই। আপনি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন?"

"কাকে?"

এক মহিলাকে।"

"মহিলা? কে তিনি?"

"তিনি একজন নামকরা শ্রমিক-নেত্রী। উদয়াচলের . এন. টি. ইউ. সির সভানেত্রী।"

"ও। সরোজনী সহায়?"

"জি।"

"আমার কাছে তাঁর কি কাজ?"

"তিনি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।"

"আজকাল আমার সময় বড় কম। কি ব্যাপারে া করতে চান জানলে ভাল হ'ত।"

"দুর্গাভাইজি, সরোজিনী সহায় উদয়াচলের জনীতিতে ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় কাজ করবে। আমার ভবিষ্যদ্বাণী নয়। তার সঙ্গে আলাপ করলে মার কথার সত্যতা আপনি যাচাই করতে পারবেন।"

"বেশ। তাঁকে পাঠিয়ে দেবেন।"

"কখন?"

"কাল কোনও সময়ে।"

"কাল সরোজিনী কানপুর যাবে। আজ হ'লে ল হ'ত।"

"বেশ। আজ বিকেল চারটের সময়।"

আহারান্তে দুর্গাভাই মেহতা বাগানে পাইচারি ছিলেন। মন সর্বদা অশান্ত। কোথায় যেন, সব-ছুর মধ্যে, মস্ত বড় ফাঁক আর ফাঁকি। আসলে রতবর্ষের ইতিহাসে। দুর্গাভাই ইতিহাসের ছাত্র , কিছু পাঠ করেছেন সযত্নে দীর্ঘকাল ধরে জেলে, লের বাইরে। ভারতবর্ষের ধারাবাহিক কোনও তহাসিক পরিচয় নেই। সম্রাটদের কাহিনীর জন্যে প্রজাদের চেনা যায় না। বড় বড় আলোকিত পমালার মধ্যে ভারতবর্ষের ইতিহাস অনন্ত-প্রবাহিত সীম গভীর কাল-সমুদ্র। আমাদের চিন্তাধারায়ও, ই, কালাতীত বিরাটতা আছে, বস্তুনিষ্ঠ, বাস্তবানুগ ত্তার স্বাক্ষর নেই। আমরা বাস্তবের চেহারা দেখতেই জী নই, বাস্তব থেকে পালাবার ইচ্ছা আমাদের জাগত। তাই আমাদের মুখে যত সহজে নীতির লিতবাণী উচ্চারিত হয় তত সহজে নীতি বাস্তবে পরিণত হ'তে চায় না। আমরা বৃহতের স্বপ্ন দেখতে ভালবাসি, বড়র মাহাত্ম্য আমাদের সম্মোহিত ক'রে রাখে; ছোট ছোট কাজের সুচারু সম্পাদনে আমাদের ধৈর্য নেই, আগ্রহ নেই। কোনও কিছুতে আমাদের গভীর, আন্তরিক বিশ্বাস নেই। কোনও কিছু ভাল ক'রে, পূর্ণ ক'রে সম্পূর্ণ করার আগ্রহ আমাদের নেই। অর্ধেক সফলতাতেই আমরা পরিতৃপ্ত; সব কিছু বিফলতার কারণ সংগ্রহে আমরা সহজ-পটু। পাঁচ বছরের মন্ত্রীত্বে দুর্গাভাই প্রতি পদে এ-সব দেখে এসেছেন। কোনও কিছুই কেন যেন পরিপূর্ণভাবে ক'রে ওঠা গেল না এ পাঁচ বছরে। নতুন নতুন মেডিকেল কলেজ হ'ল, হাসপাতাল হ'ল; অথচ রুগীরা এখনও অচিকিৎসায়, বিনা চিকিৎসায় শত শত মরছে; ডাক্তাররা কাজে ফাঁকি দিচ্ছে, রুগীর প্রতি তাদের প্রাণের দরদ নেই। শিক্ষকদের মাইনে বাড়ান হ'ল, কিন্তু শিক্ষার উন্নতি দেখা গেল না। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অমন সাধের বিদ্যামন্দিরগুলি ব্যর্থ প্রচেষ্টার করুণ সাক্ষী। বাঁধ তৈরী হ'লে তাতে ফাটল দেখা দেয়; নতুন তৈরী রাস্তা এক বছরে গর্তে গর্তে কুৎসিত হয়ে ওঠে; গোয়ালা ক্রমাগত দুধে জল মেশায়; ব্যবসায়ীরা খাদ্যে ভেজাল মেলায়।

দুর্গাভাই-এর ধারণা ভারতবর্ষের আসল অভাব চরিত্রের। ছ'হাজার বছরের একটানা বেঁচে থাকায় জাতির চরিত্রে দারুণ ঘুণ ধ'রে গেছে। অথচ তিনি নিজে দেখেছেন স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় দেশের ঘরে ঘরে চরিত্রের আশ্চর্য বিকাশ হয়েছিল। অত বড় আলো এত শীঘ্র কেন নিভে গেল দুর্গাভাই আর একবার এই হতাশ প্রশ্নের জবাব খুজে ব্যর্থ হলেন। কোথায় যেন মস্ত ফাঁকি আত্মগোপন ক'রে আছে। স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই এত সহজে এমন লোভী হয়ে উঠলাম কি করে? আজ যে মন্ত্রীত্ব নিয়ে এমন এক জঘন্য লড়াই চলেছে, আমাদের মধ্যে এমন একজনও কেন নেই যিনি ক্ষমতা ত্যাগ করবার জন্যে নিঃসংকোচে প্রস্তুত! কেন আমিও পারছি না সবকিছু ছেড়ে দিয়ে গ্রামে গিয়ে জনসেবায় বাকী জীবন কাটিয়ে দিতে? কিসের এই নিদারুণ মোহ—কোন্ সুরার এই অনির্বাণ নেশা?

দুর্গাভাইএর মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল। শরীর অসুস্থ বোধ হ'ল। বাগানে কয়েকখানা চেয়ার পাতা ছিল। তিনি বসলেন। চিন্তায়, ভাবনায়, কাজের চাপে দেহ ক্লান্ত, মন অবসন্ন।

মনোরমার দোষ নেই। সে চিরদিন চেয়েছে সুখ, মান, প্রতিপত্তি, অর্থ, বিলাসিতা। বড় লোকের ঘরে সুপাত্রের সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছিল। জীবনের সকল ভোগ-বিলাসের নিশ্চিত অধিকার নিয়ে সে দাম্পত্য জীবন সুরু করেছিল। কিন্তু ভাগ্য তার জীবনকে অন্য পথে নিয়ে গেল। আমি নেমে গেলাম স্বদেশী করতে; তার জীবনে আরম্ভ হ'ল অনিচ্ছুক আত্ম-নির্যাতনের পালা। দারিদ্র্য, সংযম, ক্লেশ কোনওদিন যে চায় নি আমি দীর্ঘকাল তাই তার জীবনে বোঝাই ক'রে চাপিয়ে দিলাম। অন্য দেশ হ'লে মনোরমা স্বামী ত্যাগ ক'রে অন্য জীবন বেছে নিত। ভারতবর্ষের সনাতন হিন্দু সমাজে তা সম্ভব ছিল না। তাকে কেবল আমার জীবনের তিক্ত সহগামিনী হ'তে হয় নি, আমার সন্তানের জন্ম দিতে হয়েছে, যে-সন্তানদের, একমাত্র বসন্ত বাদে, সে তার নিজের অতৃপ্ত ক্ষুধার তপ্ত জ্বালা দিয়ে মানুষ করেছে। গত পাঁচ বছরে মনোরমা অনেকাংশে তার প্রাচীন ক্ষুধা মেটাবার চেষ্টা করেছে। পারে নি। মন্ত্রীর সামান্য বেতনের বেশি অর্থ তার হাতে পৌঁছয় নি। অন্য মন্ত্রীদের বিত্ত হয়েছে, অর্থ জমেছে, বাড়ী হয়েছে, ছেলেরা বড় চাকরি পেয়েছে, ব্যবসা ফেঁদে প্রচুর রোজগার করছে; অথচ দুর্গাভাই দেশাই দরিদ্র, তার নিজের ঘরবাড়ী নেই, সন্তানদের জন্যে তিনি কিছু করতে পারেন নি। এই পাঁচ বছরে মনোরমার সঙ্গে মাধকরি এক সপ্তাহও তাঁর সদ্ভাবে কাটে নি। এখন তার জিদ চেপেছে সে উদয়াচলের মুকুটহীন রাণী হবে! আমাকে মুখ্যমন্ত্রীর সিংহাসনে বসিয়ে সে তার আজীবন গৌরব-লোভ চরিতার্থ করবে। অথচ সে জানেও না, তার বোঝবার ইচ্ছে নেই, ক্ষমতা নেই, কেন আমি মুকুট হাতে পেয়েও মাথায় পরতে রাজী নই। এ-জীবনের পরিণত শেষ বছরগুলিতে এতকালের সংরক্ষিত একমাত্র সম্বলটুকু লোভে পড়ে আমি হারাতে রাজী নই।

বাগান থেকে ঢাল রাস্তার নীচ পর্যন্ত অনেকখানি দেখা যায়। দুর্গাভাই হঠাৎ দেখতে পেলেন বেশ দূরে একটি লোক উঠে আসছে। আগন্তুকদের বেশির ভাগ আসে হয় মোটর গাড়িতে নয় সাইকেল রিকৃশায়। পায়ে হেঁটে আসে সাধারণত কুলি-মজুর, চাকর-বাকর, চাপরাশীরা আসে সাইকেল, যতক্ষণ পারে সাইকেল চালিয়ে, তারপর সাইকেল টেনে তুলে। বাগানে ব'সে দুর্গাভাই অনেকবার দেখেছেন আরোহী-সহ সাইকেল রিকৃশা টেনে তুলছে ঘর্মাক্ত মানুষ, আরোহী নেমে গিয়ে তার ভার লাঘব করা বাহুল্য মনে করেছে। আজ যে লোকটি পায়ে হেঁটে পাহাড়ী রাস্তা উঠে আসছে সে ভদ্রসন্তান। পরণে পায়জামা, সার্ট, জবাহর-কোট। উঠে আসছে মাথা নীচু করে, পিঠ বেঁকে, একটানা পায়ের পর পা এগিয়ে। অপরাহ্নের রোদ পড়েছে সারা রাস্তায়; আকাশ নেমে এসেছে রাস্তার শেষে। নীল আকাশের পটভূমিতে বাঁকা উঁচু পথে লোকটির উঠে-আসা দেখতে দুর্গাভাইএর কেমন ভাল লাগল। মনে হ'ল, মানুষ বুঝি এমনি জীবন-পথে উঠে আসে, নিজের আনন্দিত পরিশ্রমে, নীল আকাশের উদার অসীমকে পটভূমি ক'রে।

সমস্ত উঁচু পথে উঠে এসে লোকটি ক্লান্ত হয়ে খানিক দাঁড়াল। বাংলো থেকে তখনও সে প্রায় আধ ফার্লং দূরে। দু'-চার মিনিট দম নিয়ে আবার সে এগোতে লাগল। হঠাৎ থেমে তাকাল গাছের ডালে। বুঝি-বা দেখল কোনও গান-গাওয়া পাখী। রইল দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ। আবার এগোতে লাগল। আবার থামল। ছোট্ট এক প্রায়-উলঙ্গ ছেলে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে কি যেন বলল। পকেট থেকে কি যেন বার ক'রে দিল তার হাতে। নিশ্চয় পয়সা। এবার বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে এল। থামল এসে একেবারে বাড়ীর দরজায়। ফাটক খুলে ঢুকতে যাবে এমন সময় নজর পড়ল বাগানে চেয়ারে গা এলিয়ে-বসা দুর্গাভাই-এর ওপর। বিব্রত হয়ে থমকে দাঁড়াল।

দুর্গাভাই বললেন, "চন্দ্রপ্রসাদ যে। এস, এস।"

ফাটক বন্ধ ক'রে চন্দ্রপ্রসাদ এগিয়ে এল। দুর্গাভাই-এর হাঁটু স্পর্শ ক'রে প্রণাম জানাল।

"তারপর? পায়ে হেঁটে যে?"

"আমি ত পায়েই হাঁটি কাকাবাবু।"

"তাই নাকি?" দুর্গাভাই হেসে ফেললেন। "মুখ্য-র পুত্ররা পায়ে হাঁটে, এটা খবর বটে।"

"কাকাবাবু, আমি পায়ে হাঁটি, আবার পাখায় ও।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। তুমি ত পাইলট।"

"আপনার শরীর সুস্থ আছে ত, কাকাবাবু? নকদিন পরে আপনাকে এমন একা দেখতে পেলাম।"

"শরীরের কথা এ-বয়সে না তোলাই ভাল। একটু গে হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গেল। তাই এসে একটু ছি।"

"আপনাদের মাথা, কাকাবাবু, তাই সময়-অসময়ে আধটু ঘোরে। আমি যদি মন্ত্রী হ'তাম আমার দিনরাত বনবন ক'রে ঘুরত।"

"তুমি যাঁর পুত্র, তাঁর মাথা কদাচ ঘোরে না।"

"পিতাজির কথা বলছেন, কাকাবাবু?"

"উদয়াচলের মুখ্যমন্ত্রীর কথা বলছি।"

"তাঁকে ত আমি চিনি না, কাকাবাবু। তাঁকে নি, আপনারাই চেনেন।"

"তুমি তাঁকে চেন না?"

"না। আমি আমার পিতাজিকে এক-আধটু চিনি। তাঁর মাথা নিয়ে মাথা ঘামাবার মত মাথা ভগবান য় দেন নি।"

"তাই নাকি? বসো, বসো। তোমার সঙ্গে কথা ত ভাল লাগছে। হাল্কা কথা, হাসির কথা কাল শুনতেই পাই না।"

"মন্ত্রীরা বুঝি হাসেন না, কাকাবাবু?"

"নিশ্চয় হাসেন। দেখ না, আমি তোমার কথা কেমন হাসছি।"

"আমিও বন্ধুদের তাই বলি। বলি, মন্ত্রীরা শুধু ন না, হাসানও।"

"কাদের?"

"দেশশুদ্ধ সবাইকে। সারা দুনিয়াকে।"

"তাই বুঝি? তোমরা সবাই আমাদের নিয়ে ?"

"না, কাকাবাবু, কখনও না। আপনি আমাদের নমস্য।"

"সর্বনাশ। তোমাদেরও।"

"কাকাবাবু, দেবতাদের দুরবস্থা দেখুন। চোরও যদি পূজা দেয়, ঠেলতে পারেন না। আপনি আমাদের যতই অযোগ্য মনে করুন, নমস্য না হবার অধিকার আপনার নেই।"

"আচ্ছা, আচ্ছা। মানলাম। তা, বল দেখি ব্যাপার-স্যাপার চলছে কেমন?"

"আমার? যেমন চিরদিন চলে আসছে। পায়ে হেঁটে।"

"আর আমাদের?"

"ঝড়ের বেগে।"

"তাই নাকি? আমি ত ঝড় দেখতে পাচ্ছি নে।"

"ঝড় ত আছেই, কাকাবাবু। তবে মহীরুহ উৎপাটিত হচ্ছেন না।"

"ঠিক বলছ?"

"কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলকে তাঁর প্রতিপক্ষ চেনে না। তিনি ভাঙ্গবেন, কিন্তু নত হবেন না।"

"এবার তিনি ভাঙ্গছেন মনে হচ্ছে না।"

"আপনার আন্দাজের সঙ্গে আমার আন্দাজ মিলে যাচ্ছে কাকাবাবু।"

"তবু আমি মনে করি কোশলজি ঠিকপথে যাচ্ছেন না।"

"কেন?"

"আমি যদি তাঁর অবস্থায় পড়তাম, মন্ত্রীসভার পদত্যাগের পর হাই কমাণ্ডকে জানাতাম, হয় একেবারে নিজের পছন্দমত নতুন মন্ত্রীসভা গঠনের অনুমতি চাই, নয়ত মুখ্যমন্ত্রীত্বে আমার প্রয়োজন নেই।"

"এ পরামর্শ পিতাজিকে আপনি দিয়েছিলেন, কাকাবাবু?"

"দিয়েছিলাম। কংগ্রেস-সভাপতি যখন বিলাসপুরে এসেছিলেন, তখন।"

"কি বললেন তিনি।"

"যা চিরদিন আমায় বলে এসেছেন। আমার

আদর্শবাদ তিনি শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু রাজনীতি আমি বুঝি না।"

"আপনার সঙ্গে আমার এ বিষয়ে মিল আছে। রাজনীতি আমিও বুঝি না, কাকাবাবু।"

"তোমার ভাই-রা ত বেশ বোঝে।"

"তারা বুদ্ধিমান। আমার ও পদার্থের কিঞ্চিৎ অভাব।"

"তোমার মাতৃদেবী কেমন আছেন, চন্দ্রপ্রসাদ?"

"সুস্থ আছেন, কাকাবাবু। কাল সকালে কাশী যাচ্ছেন।"

"কাশী? হঠাৎ?"

"আজ দুপুরে পিতাজিকে পদত্যাগের অনুরোধ করেছিলেন।"

"কিসের?"

"মুখ্যমন্ত্রীত্ব গ্রহণ না করার। ভোটে জিতে, মুখ্যমন্ত্রীত্ব অন্য কাউকে দেবার।"

"তাই নাকি? তারপর?"

"পিতাজি রাজী হন নি।"

"তাই ভাবীজি কাশী যাচ্ছেন?"

"জি, কাকাবাবু।"

"তোমার মাতৃদেবী মহাপ্রাণা, চন্দ্রপ্রসাদ।"

"আমিও তাই মনে করি, কাকাবাবু।"

"সঙ্গে কে যাচ্ছে?"

"বাড়ীতে বেকার একমাত্র আমি। আমিই যাচ্ছি।"

"বেশ করছ। তুমি পুত্রের কাজ করছ।"

"মা আপনাকে একখানা পত্র দিয়েছেন।"

"পত্র? আমাকে? দাও।"

"আমি ভেতরে যেতে পারি, কাকাবাবু?"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। যাও, ভেতরে যাও। তোমার কাকীমা বোধকরি দিবানিদ্রা দিচ্ছেন। কিন্তু বসন্ত আছে। যাও।"

চন্দ্রপ্রসাদ বাড়ীর ভেতরের দিকে পা বাড়াল। হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, "কাকাবাবু, আপনি একমাত্র মন্ত্রী, যাঁর বাড়ীর দরজায় পুলিস পাহারা নেই। অর্থাৎ আপনি কারাবন্দী নন। মুক্ত মানুষ। আমাদের মত লোফাররাও বিনা বাধায় আপনার বাড়ী ঢুকতে পারে। আর যে-কেউ যখন খুশি বাড়ী থেকে বাইরে যেতে পারে।"

দুর্গাভাই দেশাই মৃদু হাস্যে একবার তাকালেন। পরক্ষণে, পদ্মাদেবীর পত্রে মনোনিবেশ করলেন।

দেখতে পেলেন না, মনোরমা বাড়ীর অন্যতম ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে বসলেন। চমকে উঠলেন, গাড়ি যখন ষ্টার্ট নিল। গাড়ি দরজা দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হ'ল। দুর্গাভাই জানতে পেলেন না মনোরমা কোথায় গেলেন। জানবার ইচ্ছেও হ'ল না।

পদ্মাদেবীর পত্র সংক্ষিপ্ত। পড়তে দু'মিনিট লাগল। লিখেছেন, "মাননীয় দুর্গাভাইজি, চন্দ্রপ্রসাদকে সঙ্গে নিয়ে আমি কাল প্রাতে ৺বারাণসী যাচ্ছি। কিছুদিন থাকবার ইচ্ছে। হয়ত আর নাও ফিরতে পারি। পবিত্র কাশীধামে মরতে পারলে বিশ্বনাথের চরণে স্থান পাব। যাবার আগে ওঁকে আমার শেষ অনুরোধ জানিয়েছিলাম। উনি রাখতে পারেন নি। ওঁর ভার আমি ভগবানের ওপর দিয়ে যাচ্ছি। আর কিছুটা আপনার ওপর। দেখবেন, এত বড় মানুষটা যেন অনেক নীচে না নেমে যান।

"আপনাকে আমার আর একটি অনুরোধ আছে। আমার পুত্রদের মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে দুর্গাপ্রসাদ আর চন্দ্রপ্রসাদের। দুর্গাপ্রসাদ অন্য পথ বেছে নিয়েছে। চন্দ্রপ্রসাদ বিমান বিভাগে কাজ পেয়েছে। পিতার কোনও সাহায্য না নিয়ে নিজের যোগ্যতায় সে মানুষ হ'তে চাইছে। সে যদি কোনও প্রার্থনা নিয়ে আপনার দরবারে হাজির হয়, তাকে নিতান্ত অযোগ্য মনে না করলে, অনুগ্রহপূর্বক ব্যর্থ করবেন না।"

॥ পনের ॥

বিলাসপুর শহরের কোনও সহজ-পরিচয় কেন্দ্রস্থল নেই, যেমন আছে কলকাতার চৌরঙ্গী, বোম্বাই-এর চার্চ-গেট, নতুন দিল্লীর কনট প্লেস। যে-অংশে ঐতিহাসিককালের মারাঠা দুর্গ, তার মাইলখানেক দূরে পুরাতন বাজার। হাল আমলে আর এক বাজার-বিপণি কেন্দ্র গ'ড়ে উঠেছে সদর-অঞ্চলে, এখানটা শহরের ফ্যাশন-পাড়া। অর্থাৎ চমকপ্রদ দোকানপাট ও অঞ্চলে। এখানকার বড় রাস্তার নাম এককালে ছিল

র রোড; স্বাধীনতার পরে হয়েছে লিবার্টি রোড। রাস্তায়ই লিবার্টি সিনেমা। সিনেমার ডানদিক্ দিয়ে কছু পথ এগোলে এক সারি কতকগুলি দোকান—রেডিও, বই, দর্জি, কাপড়-জামা ইত্যাদির। এই দোকানগুলির সামনে দিয়ে বেরিয়েছে আর একটা গলি ভতরের দিকে। এ গলির প্রান্তদেশে "মর্ণিং টাইম্স্" পত্রিকার দপ্তর এবং ছাপাখানা।

বাড়ীটা খুব সাধারণ। একতলা একটানা বাড়ী। লার ছাদ। মেঝে মাঝে মাঝে ভেঙ্গে গিয়ে দাঁত-বার-রা মাটির কুৎসিৎ ভেংচানি। বাড়ীটা এককালে ল মাধ্যমিক বিদ্যালয়। ঘরগুলি পর-পর পাশাপাশি। থম ঘরে বিজ্ঞাপন-ম্যানেজার, অ্যাকাউন্টেন্ট এবং কুলেশন ম্যানেজার একসঙ্গে বসে। দ্বিতীয় ঘর ম্পাদক সুভাষ চট্টোপাধ্যায়ের। তৃতীয় ঘরে দু'জন হকারী সম্পাদক এবং সম্পাদকের ব্যক্তিগত দক্রেটারী। চতুর্থ ঘর রিপোর্টারদের। পঞ্চম ঘরখানা বচেয়ে বড়: এখানে সাব-এডিটরদের দপ্তর। টেলি-প্রণ্টর মেশিনের অবিরাম আওয়াজ। তারপরে ছোট্ট ক্কার একটুকরো ঘরের মধ্য দিয়ে পেছনের দিকে পাখানায় যেতে হয়। ছাপাখানায় একটা লাইনো মশিন এবং অনেকগুলি হাতে-ছাপার কেস। 'মর্ণিং াইমস' লাইনো ও হাতে-ছাপার মিশ্রিত উৎপাদন। রাটারী নেই, বড় দুটো ইলেক্ট্রিক ট্রেড্‌ল্ মেশিনে াগজ ছাপার ব্যবস্থা। মুখ্যমন্ত্রীর কাগজ হ'লেও র্ণিং টাইমসের' প্রচার মাত্র সাত হাজার। রোটারীর য়োজন হয় না।

কাগজের পরিচালনার জন্যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যে-ব্যবস্থা রেছিলেন তাকে ত্রুটিহীন বলা চলে না। আইনত র্ণিং টাইমসের' মালিক অম্বিকাপ্রসাদ কোশল। ম্যানেজিং এডিটর হিসেবে রোজ কাগজে তাঁর নাম বরোয়। ম্যানেজারদের ঘরে তার জন্যে নির্দিষ্ট টেবিল-চয়ারও আছে। কিন্তু কার্যত অম্বিকাপ্রসাদ কাগজের ন্যে কিছুই করে না। সম্পাদকীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ রবার যোগ্যতা তার নেই। ব্যবসা সে বোঝে না। াসে দু'-একদিন কিছুক্ষণের জন্যে সে আসে, চ্যাটার্জির রে বসে গল্প করে, চা খায়; ম্যানেজারদের সঙ্গে দু'-চারটা কথা ব'লে বিদায় নেয়। কখনও-সখনও টাকার বিশেষ প্রয়োজন হ'লে তার দেখা পাওয়া যায়। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের আদেশ আছে তাকে কাগজের ম্যানেজিং এডিটর হিসেবে মাসে দু' শ টাকা পর্যন্ত দেবার। কিন্তু কোনও মাসেই সে পুরো টাকা নেয় না।

সম্পাদকীয় দায়িত্ব পুরো সুভাষ চট্টোপাধ্যায়ের। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাকে কাগজ চালাবার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। সপ্তাহে একদিন সুভাষ তাঁর সঙ্গে দেখা করে। কাগজ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রাদেশিক রাজনীতির ব্যাখ্যা করেন। কি কি বিষয়ে কিভাবে সম্পাদকীয় লিখতে হবে তার নির্দেশ দিয়ে দেন। বড় কোনও সংবাদ থাকলে সুভাষকে ডেকে পাঠান। একজন রিপোর্টার, সীতাচরণ পণ্ডিত, সর্বদা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নির্দিষ্ট নীতির চতুঃসীমানায় কাগজের দৈনন্দিন পরিচালনার দায়িত্ব পুরোপুরি সম্পাদকের। সম্পাদকীয় বিভাগে নিয়োগ, বেতন-বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়েও সুভাষ চট্টোপাধ্যায়ের কথাই মেনে চলা হয়।

সম্পাদনার বাইরে কাগজের সত্যিকারের পরিচালনার ভার জগন্মোহন তিওয়ারীর। নিউজ প্রিন্ট কেনা, ব্যবসাদারদের সঙ্গে সংযোগ করা, বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা, ছাপাখানার নানা সমস্যা সমাধান; সবই তিওয়ারীকে করতে হয়। এই আশ্চর্য কর্ম-ক্ষমতাবান্ মানুষটি রোজ একবার "মর্ণিং টাইমস" দপ্তরে আসে। তার জন্য কোনও নির্দিষ্ট বসবার স্থান নেই। সে ঘরে ঢুকলেই দু'জন ম্যানেজার চেয়ার ছেড়ে দেয়। কখনও সে বসে বিজ্ঞাপন ম্যানেজারের চেয়ারে, কখনও বা সার্কুলেশন ম্যানেজারের। সেখানকার কাজ সেরে সোজা চলে যায় ছাপাখানায়। ছাপাখানা থেকে বেরিয়ে বিদায় নেবার পথে সুভাষ চট্টোপাধ্যায়ের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে, "এডিটর সাহেব, কোনও সেবা করতে পারি কি?" সুভাষের কোনও কিছু বলবার থাকলে ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসে। "সমস্যা"র সমাধানে তিওয়ারী যাদুকর। লাইনো মেশিনের মেরামত দরকার—কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মিস্ত্রী এসে হাজির হয়। নিউজ প্রিন্ট মাত্র তিনদিনের আছে—

তৃতীয় দিনেই নতুন সাপ্লাই এসে হাজির। কোনও সাব-এডিটর এ্যাডভান্স কিছু টাকা চায় অথচ ক্যাশিয়ারের কাছে টাকা নেই; মণিব্যাগ থেকে তিওয়ারী টাকা বার করে দেয়। যদি-বা কখনও এমন কোনও সমস্যা দেখা দেয় যা তার সমাধানের বাইরে, সে বলে, "কোশলজির সঙ্গে কথা বলে আপনাকে কাল জানাব"; এবং কাল সাধারণত পর্শু হয় না।

তিওয়ারীর মত কর্মঠ, বিশ্বস্ত ও অনুগত সেবক সচরাচর দেখা যায় না। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল ছাড়া তার জীবনে আরকিছু নেই। কোনওদিন কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সামান্য সমালোচনাও কেউ তার মুখে শোনে নি। তাঁর প্রশংসা করবারও প্রয়োজন হয় না জগন্মোহন তিওয়ারীর। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সম্বন্ধে কোনও প্রশ্নই যেন তার মনে জাগে না; নিঃপ্রশ্ন নিরুত্তর আনুগত্যে তাঁর সেবাতেই সে পরিতৃপ্ত। জগন্মোহন তিওয়ারীর যে স্ত্রীপুত্রপরিবার বাড়ীঘর কামনা-বাসনা-ব্যথা-আনন্দ আছে একমাত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল ছাড়া আর কারুর মনে বোধকরি তা উদয়ও হয় না। সুভাষ চট্টোপাধ্যায় মাঝে-মধ্যে তাকে ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে গিয়ে বোবা জবাব পেয়ে নিরস্ত হয়েছে; নিজের কোনও কথাই যেন তিওয়ারীর [বল]বার নেই, অনুভব করার নেই। ভোর সকালে সে [কৃ]ষ্ণদ্বৈপায়নের গৃহে হাজির হয়; প্রভাতে গাত্রোত্থান [ক']রে বাইরে এসে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দেখতে পান সে হাজির; [দি]নের অর্ধেকের বেশি প্রায়ই তার কাটে মুখ্যমন্ত্রীর [কা]জে, সেবায়, না-হয় আদেশের অপেক্ষায়। সকাল-[বে]লা যেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন জগন্মোহন তিওয়ারী নামক [র]বোটের গায়ে দম লাগিয়ে দেন; দীর্ঘ-অগ্রসর রাত্রি [প]র্যন্ত তাঁর হাতে দম দেওয়া রবোট একটানা চলে।

সেদিন অপরাহ্ণে সুভাষ চট্টোপাধ্যায় নিজের ঘরে [টে]বিলে বসে টাইপ-রাইটারের ওপর সম্পাদকীয় প্রবন্ধ [লি]খছিল। এ কাজ তাকে রোজ করতে হয়, এবং [রো]জই করবার সময় সে অন্য-মানুষ হয়ে যায়। দেশের [ও] বহির্দেশের নানাবিধ সমস্যা সম্বন্ধে তার নিজের [ধ্য]ানকে বহুজনের মনে সঞ্চারিত করবার সময় আপনার [বু]দ্ধি, জ্ঞান, বিবেচনার দৈন্যের সঙ্গে কর্তব্যের অলঙ্ঘনীয় [দা]বি মিশে গিয়ে এক অনধিগম্য অনুভূতি সৃষ্টি করে। কেবল মনে হয়, আমার এমন কি যোগ্যতা আছে, [যে] নিজের বিচার বহুমানসে ব্যাপ্ত করতে যাচ্ছি? আ[মি] যা লিখছি, ছাপার অক্ষরে সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশি[ত] অবয়বে সে ত আমার বক্তব্য নয়, একখানা পত্রিকা[র] মন্তব্য! কয়েক হাজার মানুষ তা পড়বে, তাদে[র] চিন্তাধারা তার দ্বারা প্রভাবিত হবে: এই প্রভা[ব] বিস্তারের যোগ্যতা কি আমার আছে?

আজও প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে একই সন্দেহ সুভাষে[র] মনকে ভারাক্রান্ত ক'রে তুলেছিল। নিত্যকার এ ভা[র] তার সহনীয় হয়ে গেছে; এ ভারটুকু আছে বলেই, [সে] জানে, তার সম্পাদকীয় পাঠকের মন স্পর্শ করে। আশ্চর্য, এ ভারটুকু সর্বাগ্রে যিনি টের পেয়েছিলেন, তাঁর নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল। সুভাষ তখন সবেমাত্র "মর্ণিং টাইম্‌সে"র সম্পাদনা গ্রহণ করেছে। প্রথম সম্পাদকীয় লিখতে গিয়ে অন্তরে সে এ গুরুভার সর্ব-প্রথম টের পেয়েছে। যে-সব পাঠকদের সে চেনে না, জানে না, চেনবার জানবার কোনও উপায় পর্যন্ত নেই, অথচ যাদের সঙ্গে প্রতিদিন সকালে তার নৈর্ব্যক্তিক পরিচয় অনিবার্য, তাদের কাছে তার কুমারী নিবন্ধ দিয়ে সে জবানবন্দী রচনা করেছিল। সম্পাদকীয়ের নাম দিয়েছিল, "এ পেপার এ্যাণ্ড দি পিপল"—পত্রিকা ও জনসাধারণ। লিখেছিল, "সংবাদপত্রের কর্তব্য পাঠকদের কাছে রোজকার দেশ-বিদেশের সংবাদ পৌঁছে দেওয়া। সম্পাদকের কর্তব্য নির্দিষ্ট ঘটনার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা; দেশ-বিদেশের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা। এ আলোচনা সম্পাদক ও পাঠকের মধ্যে দৈনন্দিন ভাব আদান-প্রদানের সেতু। পত্রিকার মন্তব্য কোনও ব্যক্তি-বিশেষের মন্তব্য নয়; তার মূল্য প্রতিষ্ঠানিক। সম্পাদকের এমন কোনও অবধারিত ক্ষমতা নেই যা তাকে বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল পাঠকের ঊর্ধ্বে আসন দিতে পারে। দুনিয়াদারীর সঙ্গে বুদ্ধিগত, পেশাগত পরিচয় তার বেশি ব'লে সে হয়ত কোনও কোনও বিষয়ের তাৎপর্য বেশি বোঝে; কিন্তু পাঠক-মন প্রভাবিত করবার সময় সর্বদা প্রতি ছত্রে সে নম্র বিনয়ে মার্জনা চেয়ে থাকে। ভারতবর্ষের মত দেশে, যেখানে নিত্য নতুন সমস্যার সঙ্গে নবগঠিত দেশীয় সরকারের

...াম সংঘাত, যেখানে অনভ্যাসে অলস মানুষকে ...দিন নতুন নতুন দেশী-বিদেশী ঘটনার তাৎপর্য ...ক্তি করতে হয়, সংবাদপত্র সম্পাদক কামনা করে ...কের সঙ্গে নিবিড় কথোপকথন, সম্পাদকীয় স্তম্ভকে ...ভার মঞ্চে পরিণত ক'রে বক্তৃতার সন্দেহজনক ...প্রীতি নয়।"

...পরের দিন কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সঙ্গে দেখা করতে গেলে ...মে দু'-চারটে কুশল প্রশ্নের পর তিনি জিজ্ঞেস করে-...লেন, "সাহিত্য কর নাকি?"

"আজ্ঞে না।"

"বাঙ্গালী মাত্রেই ত কবি বা সাহিত্যিক। তুমিও ...য় ছোটবেলা কবিতা লিখতে। হয়ত এখনও লিখে ...ক।"

"এখন আর লিখি না।"

"তোমার সম্পাদকীয় পড়লাম। বেশ লাগল। ...খতে বসে বুকে ব্যথা করছিল, না?"

"আপনি টের পেয়েছেন?"

"তা একটু পেয়ে গেলাম। ওটার সঙ্গে আমারও ...পরিচয় আছে।"

"জানি। আপনার কবি-খ্যাতি আমার অজানা ...নয়।"

"খ্যাতিটা অনেকে জানে। ব্যথার খবর বড় কেউ ...রাখে না।"

"সৃষ্টির মধ্যে বেদনা ত থাকবেই।"

"তোমার বিনয় দেখে খুশি হ'লাম। সম্পাদকীয়ই ...লেখ, বা সাহিত্য-কাব্য রচনা কর, সৃষ্টির মধ্যে যেন ...র্বদা বিনয় থাকে। আমাদের উপনিষদের ঋষিরা ...লেছেন, যারা মনে করে আমরাই ধীমান, আমরা সব ...জেনে বসে আছি, তোমরা আমাদের কথা সসম্মানে শোন ...আর মান্য কর, তারা আসলে অজ্ঞান ও অবিদ্যায় অন্ধের ...রা চালিত হয়ে অন্ধের ন্যায় পরিভ্রমণ করে।"

"রবীন্দ্রনাথের কবিতায়ও এর অভিব্যক্তি দেখতে ...াই। একটু শুনবেন?"

"নিশ্চয়। বল। বুঝব না পুরো। তবু তাঁর ...বিতা শুনতেও ভাল লাগে।"

সুভাষ বলেছিল:

> যতবার আলো জ্বালাতে চাই
> নিবে যায় বারে বারে।
> আমার জীবনে তোমার আসন
> গভীর অন্ধকারে।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "না। ইংরেজীতে অর্থ বলে দিয়ো না। আর একবার ধীরে ধীরে বল। আমি বুঝতে পারব।"

দ্বিতীয়বার শুনে, "অতি বড় কথা। 'তোমার আসন গভীর অন্ধকারে'। বাঃ! এমন কথা আর কেউ বলেন নি। হ্যাঁ, তুমি মাঝে মাঝে আমাকে রবীন্দ্রকাব্য পড়ে শুনিও।"

"আপনার সময় হবে?"

"সময় করে নেব। আমরা রাজনীতি করবার সময় দুর্বিনীত, আত্মতৃপ্ত, দাম্ভিক ও ক্ষমতামত্ত হয়ে উঠি। আমি যদি সম্পাদকীয় লিখতে বসি, তা হ'লে, তুমি যা বলেছ, তাই হবে—মস্ত এক বক্তৃতা দিয়ে বসব। কিন্তু, ভগবানের কৃপায়, রাজনীতি আমার সবটুকু সত্তা গ্রাস ক'রে বসে নি।"

"সে আপনার সৌভাগ্য।"

"সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্য জানি নে। মাঝে মাঝে মনে হয়, দারুণ দুর্ভাগ্য। বয়স বাড়লে বুঝবে খণ্ডিত সত্তা নিয়ে জন্মানোর জ্বালা কি ভয়ানক। আমার মধ্যে যে-মানুষটা রাজনীতি করে, শিল্পী তাকে সর্বদা ব্যঙ্গ করে, ভর্ৎসনা করে তার দৈন্য দেখিয়ে দেয়। আর শিল্পী যখন একটু অবসর পেয়ে সৃষ্টির মোহে মগ্ন হ'তে চায়, রাজনৈতিক এসে তার পিঠে দারুণ কশাঘাত হানে।"

"দেশের লোক আপনার দু' পরিচয়কেই মান্য করে।"

"এ মান্য-করার মধ্যে অনেক ফাঁকি আছে, সুভাষ-বাবু। বহু বছর রাজনীতি করছি—এখন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। একদিন যা স্বপ্নেও ভাবি নি, আজ তাই হয়েছি—একটা সমগ্র প্রদেশের ভাল-মন্দের দায়িত্ব নিয়ে বসে গেছি। যে-আত্মসন্দেহ সম্পাদকীয় রচনার সময় তোমাকে ভারাক্রান্ত করে, আমাকেও অনেক সময় সে পেয়ে বসে। দেশশাসনের জন্য আমরা ত

কেউ নিজেদের তৈরী করি নি। স্বদেশী করেছি দেশকে বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত করতে; একদিন যে তার অগ্রগতির কর্ণধার হ'তে হবে এমন কথা কখনও মনে হয় না। আজ শাসন করতে গিয়ে প্রতি পদে নিজের দীনতা বুঝতে পারি। আপশোষ হয়। লেখাপড়ায় এমন ফাঁক রয়ে গেছে, অনেক সমস্যার প্রকৃত অর্থই যেন বুঝতে পারি নে। মনে হয়, যা করছি তা ঠিক করছি তো? প্রতিদিন প্রকাশ্যে সবাকার কাছে নিজের দুর্বলতা ঢাকতে ঢাকতে, প্রতিটি কাজকে সবচেয়ে ভাল ব'লে জাহির করতে করতে একদিকে যেমন আত্ম-সমালোচনার সময় পাই নে, অন্যদিকে সংক্ষিপ্ত নিরালা মুহূর্তে সংশয়, সন্দেহ যেন জমাট অন্ধকারের মত মনে চেপে বসে। জান সুভাষবাবু, রাজনীতির খেলা চলে শকুন্তলার আংটির জোরে। এ বস্তুটি যে কি তা জানবার জো নেই। যতক্ষণ সঙ্গে আছে, সবাই তোমায় চিনবে, মানবে, ভয় করবে, শ্রদ্ধা করবে। একবার হারাল ত তুমি একেবারে তলিয়ে গেলে। তখন আংটি ফিরে পেলেও আর নিতে নেই। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম' পড়েছ? মনে আছে শেষ দৃশ্যে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার পুনঃ পরিচয়ের কাহিনী। দুষ্মন্ত বলছেন—এই আংটি পেয়ে তোমাকে মনে পড়ল, তোমাকে চিনলাম। এবার তোমার আঙুলে এ শোভা-পাক। 'তেন হি ঋতুসমবায়চিহ্নং প্রতিপদ্যতাং লতাকুসুমম।' লতার ফুল ঋতুরাজ বসন্তের সঙ্গে মিলনের চিহ্ন ধারণ করুক। কিন্তু শকুন্তলা আর আংটি স্পর্শ করতে রাজী নন। 'ণ সে বিস্‌সসেমি'—এ আংটিকে আমি আর বিশ্বাস করি না। যে-কথা কালিদাস পরিষ্কার বলতে পারেন নি তা হ'ল, আমি তোমাকেও আর বিশ্বাস করি না। তুমি আংটি হারিয়ে আমাকে চিনতে পার নি, আমি তোমার মনে নিজের গৌরবে অধিষ্ঠিত নই। তোমাকে আর আমার সেই কুমারী জীবনের নিটোল বিশ্বাস দিতে পারব না। রাজনীতিতেও তাই। একবার আংটি হারাল ত বিশ্বাস গেল। পুনর্বার সে বিশ্বাস আর ফিরে আসে না।"

আজ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখতে বসে সুভাষ চট্টোপাধ্যায়ের শকুন্তলার আংটি মনে পড়ছিল। প্রবন্ধের সুভাষ সাধ্যমত কৃষ্ণদ্বৈপায়নের পতাকা তুলে ধরেছি সংবাদপত্রের মাধ্যমে। কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে সে শ্রদ্ধা করে তার প্রতিপক্ষকে শ্রদ্ধা করবার কোনও কারণ সে খুঁজে পায় নি। সুতরাং কৃষ্ণদ্বৈপায়নের পতাকা তুলে ধরা তার অন্তরে ক্ষোভ ছিল না। চাকরির দাবি ছাড়া আন্তরিক সমর্থনও তার ছিল। তথাপি বার বার মনে পড়ছিল কৃষ্ণদ্বৈপায়নেরই মুখে শোনা শকুন্তলার আংটির ব্যাখ্যা। এবার কি তিনি আংটি হারিয়েছেন? লোকের আস্থা, শ্রদ্ধা, ভয় আর কি তাঁর আয়ত্তে নেই? প্রতিদিন তাঁর নামে অনেক কুৎসা রটিয়েছে। তাঁর রাজত্বে অনেক দোষ, স্খলন, অন্যায় আজ জনসাধারণ জানতে পেরেছে। দুর্নীতি, দুরাচার, অত্যাচারের সুদীর্ঘ তালিকা পাঠান হয়েছে দিল্লীর দরবারে। এতে কি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন শকুন্তলার আংটি হারান নি? যা দিয়ে তিনি সংগ্রামে জেতেন, যে আস্থা ও শ্রদ্ধা উদয়াচলে এতদিন তাঁর প্রাপ্য ছিল, তা কি তিনি আর পাবেন? অথচ, কই, শকুন্তলার মত ত তিনি আংটি বর্জন করতে প্রস্তুত নন! খর্বিত জন-শ্রদ্ধা নিয়েও তিনি ক্ষমতায় আসীন থাকতে চান; ক্ষমতা ত্যাগের প্রশ্ন ত তাঁর মনে দানা বাঁধে নি।

সুভাষের মন একরকম ভাবছিল, মাথা অন্য হাত অন্যরকম লিখছিল, এমন সময় দ্বারপথে ধ্বনিত হ'ল, "এডিটর সা'ব, কোনও সেবা?"

সুভাষ তাকিয়ে দেখল, জগন্মোহন তিওয়ারী।"

বলল, "আসুন, তিওয়ারীজি, বসুন। একটু কথা আছে।"

তিওয়ারী ঘরে ঢুকে চেয়ার টেনে বসল।

"আপনাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে যে?"

তিওয়ারী কাজের কথার অপেক্ষায় নীরব রইল।

"খেয়েছেন?"

সেই একই নীরব অপেক্ষা।

"খবর চাই।"

"কোন্ খবর?"

"লড়াই-এর।"

"লড়াই কোথায়?"

আবার লড়াই !"

কোশলজির জয় নিশ্চিত ?"

নারায়ণ জানেন। আমি কি ক'রে বলব ?"

প্রতিপক্ষের খবর বলুন। কাগজে ছাপবার মত।"

আমি ত আপনার রিপোর্টার নই।"

কিন্তু আপনি যতটা জানেন, এ সহরে তত আর জানে না।"

তিওয়ারী সামান্য শুধু হাসল।

"কিছু নতুন হেড-লাইনের হরফ চাই।"

ছাপাখানায় শুনছিলাম। কি চাই বলুন।"

সুভাষ ড্রয়ার থেকে একখানা কাগজ দিল।

"কবে দরকার।"

"কালই।"

"বিজয়ের আগের দিন। পর্শু ত পার্টি-মিটিং।"

"আচ্ছা।"

তিওয়ারী বিদায় নিলে সুভাষ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ শেষ ল। সেক্রেটারীকে ডেকে বলল, ছাপাখানায় পৌঁছে ত।

চেয়ার ছেড়ে সাব-এডিটরদের ঘরে যাবে এমন সময় তে পেল তারই ঘরের বাইরে অম্বিকাপ্রসাদ।

"আসুন, অম্বিকাপ্রসাদজি। আসুন।"

"আপনার কাছে একটু দরকারে এসেছি সুভাষবাবু।"

"আজ্ঞা করুন।"

অম্বিকাপ্রসাদ ম্লান হাসল। চেয়ারে বসতে বসতে ল, "আজ্ঞা করার আমি কেউ নই, আপনি ভালই নন।"

"এককাপ চা খাবেন ? আনতে বলি ?"

"বলুন। একটা সমস্যায় আপনার পরামর্শ চাই ?"

"আমার পরামর্শে যদি কাজ হয় নিশ্চয় দেব। ও টি দিতে খরচ লাগে না।"

"আপনার কি মনে হচ্ছে ?"

"মুখ্যমন্ত্রীর বিষয়ে ?"

"হ্যাঁ।"

"আমার ত মনে হচ্ছে, চিন্তার কোনও কারণ নেই।"

"অর্থাৎ, পিতাজি জিতবেন ?"

"আমার ত তাই বিশ্বাস।"

"বিশ্বাসের হেতু ?"

"অনেক। প্রথমত, সুদর্শন দুবের নেতৃত্ব কেউ মানতে রাজী নন। তাঁর দল স্বার্থান্বেষীতে ভরা। এঁরা ইতিমধ্যেই নিজেদের মধ্যে কলহ সুরু করে দিয়েছেন। রাজনৈতিক পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে সুদর্শন দুবে দল ধরে রাখতে পারবেন না। শুনছি, এ লোভ আপনার পিতাজিও দেখাচ্ছেন। খবর পেয়েছি, সুদর্শন দুবের প্রধান সমর্থকদের কেউ কেউ এরই মধ্যে কোশলজির দলে ফিরে এসেছেন। তাঁরা কেউ মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করতে রাজী নন। তা ছাড়া, হাই কমাণ্ড বর্তমান সময়ে কোশলজির মত নেতাকে ত্যাগ করবেন বলে মনে করতে পারছি না। উদয়াচলে কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের নেতৃত্ব করবার মত যোগ্য লোক এখনও আর নেই।"

"কেন ? দুর্গাভাই মেহতা ?"

"তিনি ত নেতৃত্ব চান না।"

"সত্যি চান না, না তলে তলে নিজের আসন তৈরী করে নিয়েছেন ?"

"আমার মনে হয় সত্যি চান না বলা ঠিক হবে না। চান। তবে, দুর্গাভাই জানেন সুদর্শন দুবের দল নিয়ে সুশাসন সম্ভব নয়। দুর্গাভাই রাজনৈতিক সতীত্বে বড় বেশী বিশ্বাস করেন। নিজের সুনামটুকু তিনি কিছুতেই হারাতে চাইবেন না।"

"তা হ'লে আপনার বিশ্বাস দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই।"

"কোশলজির বিজয় সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ। তবে দুশ্চিন্তার অন্য কারণ থাকতে পারে।"

"কি কারণ ?"

"এই ধরুন, উদয়াচলে কংগ্রেসী মন্ত্রীত্বে এবার যে ভাঙ্গন ধরল তার পরিণাম কি হ'তে পারে। হেরে গিয়ে সুদর্শন দুবে যা করবে তাতে কংগ্রেসের আত্মশক্তি কতটা কমে যাবে। নতুন মন্ত্রীসভা গঠনে কোশলজিকে কি নীতি গ্রহণ করতে হতে পারে। তাঁর নেতৃত্বের এর পরে কি অবস্থা হবে। আরও অনেক প্রশ্ন দুশ্চিন্তার সৃষ্টি করতে পারে।"

"এবার আপনাকে আসল ব্যাপারটা বলি। আপনি জানেন আমার চাকুরি পাবার ইতিহাস ?"

"না।"

"এটুকু বুঝতে পারেন যে পিতাজির জন্যেই আমার চাকুরি?"

"তাই যদি হয়ে থাকে আশ্চর্যের কিছু নেই।"

"নিজের যোগ্যতায় ল কলেজে পড়ানর কাজ আমি পেতে পারতাম না।"

"নিজের যোগ্যতায় এদেশে অনেকেই কাজ পায় না। অন্তত যাঁরা ভাল কাজ করেন।"

"তথাপি, আমার কর্মজীবন নিয়ে মনে বড় অশান্তি।"

"কর্মজীবনে শান্তি, আনন্দ, সার্থকতা এদেশে অধিকাংশের ভাগ্যেই জোটে না।"

"অনেকের কথা আমি জানি নে। নিজের কথা জানি। আমরা পাঁচ ভাই পাঁচ রকমের। আমার মাকে আপনি জানেন না। তাঁর মত ন্যায়নিষ্ঠ সত্যপরায়ণ স্ত্রীলোক বেশি নেই। পিতাজিকে আপনি জানেন। উভয়ের চরিত্রের মিশ্রিত ছায়া আমাদের পাঁচজনের মধ্যে। আমি মা'র কাছ থেকে পেয়েছি অশান্ত বিবেক, কিন্তু পিতাজির পৌরুষ, আত্মবল আমার নেই। আমার পরের ভাই দুর্গাপ্রসাদই বাপ-মায়ের প্রকৃত পুত্র। সে নীচ জাতের বিধবা বিবাহ করে বামপন্থী রাজনীতির পথে চলতে চলতে পরিবার থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। সূর্যপ্রসাদ পিতাজি আর মায়ের চরিত্রের দুর্বলতা নিয়ে তৈরী। শ্যামা-প্রসাদের ওপর মায়ের প্রভাব নেই—পিতাজির কিছু আছে। আর সবচেয়ে ছোট চন্দ্রপ্রসাদ বাপ-মায়ের আদরের ছেলে, তার মধ্যেও বিদ্রোহ আছে, তবে সে কখনও রাজনীতি করবে না; তা ছাড়া পিতাজিকে সে অত্যন্ত ভালবাসে। এখন দেখুন, আমাদের ভাইদের মধ্যে মিল নেই একেবারে।"

"এমন অনেক পরিবারে দেখা যায় অম্বিকাপ্রসাদজি।"

"কলেজের কাজ পিতাজি আমায় করে দিয়েছেন। কিন্তু তিনি আমাকে সর্বদা হেয় চোখে দেখেন। নিজের যোগ্যতায় দাঁড়াতে পারি নি ব'লে আমার ওপর তাঁর শ্রদ্ধা নেই। এই যে বিরাট সংকট যাচ্ছে, তাঁর কোনও কাজে আমার ডাক পড়ে নি। কোনও দায়িত্বই তিনি আমায় দেন নি।"

"রাজনীতি সবার আসে না। আসা ভালও না

"চন্দ্রপ্রসাদকে তিনি অনেক কাজের ভার (আমার সঙ্গে কোনও বিষয়ে আলোচনাও করেন না।

"অম্বিকাপ্রসাদজি, আমাকে এসব কথা ব আপনার কষ্ট হচ্ছে। কেন বলছেন, বুঝতে পারছি ন

"এক্ষুণি বুঝবেন। আপনি পিতাজির আস্থাভা আপনাকে তিনি স্নেহ করেন। আমার একটা আপনাকে করতে হবে।"

"বলুন। নিশ্চয় করব।"

"পিতাজিকে আমার কথাগুলো বলতে হ যদি তিনি আমাকে জ্যেষ্ঠপুত্রের মর্যাদা না তা হ'লে আমার পক্ষে ল কলেজে কাজ করা আর পরিবারে এক অন্নে বাস করা আর সম্ভব নয়। তা আমি নিজের ভাগ্য নিজেই দেখব।"

"একথা আমায় বলতে হবে?"

"বললে আমি কৃতজ্ঞ হব।"

"আপনি বলতে পারেন না?"

"না। কোনওদিন কোনও গুরুতর বিষয়ে তাঁর আমার কথা হয় নি। আজ হঠাৎ একথা বলা স নয়।"

"একথা বলবার একটা সুযোগ বার করতে হবে।"

"কিন্তু তাঁকে খুব শীঘ্র বলা দরকার।"

"কেন? এত তাড়া কিসের?"

"তাড়া আছে।"

"চেষ্টা করব।"

"আপনি পরদেশী। আপনাকে অনেক কথা ব চলে। আশা করি কিছু মনে করেন নি।"

"মনে করব কেন? বরং আপনি সমস্যায় প আমাকে বন্ধু বলে মনে করেছেন তাতে আনন্দ পেয়েছি আমরা সাধারণ মানুষ। কিন্তু অম্বিকাপ্রসাদজি, মানুষের আসল সমস্যাই এক। আর, সব সমস্যা মধ্যে বিবেকের সমস্যা প্রধান। তা শ্রদ্ধার উদ্রে করে।"

অম্বিকাপ্রসাদ একটু চুপ ক'রে থেকে প্রশ্ন করা "আচ্ছা, সুভাষবাবু, তিওয়ারীকে আপনার কি ম হয়?"

"কোশলজির পরম অনুগত সেবক।"

"আর কিছু?"

"এছাড়া অন্য পরিচয় কিছু আছে নাকি?"

"একটা কথা আপনাকে বলি। তিওয়ারী আমার ছায়া পর্যন্ত মাড়াবার সাহস রাখে না।"

"কেন?"

"না, বলব না। বলা ঠিক হবে না।"

"তা হ'লে নিশ্চয় বলবেন না।"

"ওকে একটু সামলে চলবেন সুভাষবাবু।"

"তাই নাকি?"

"পিতাজি মুখ্যমন্ত্রীতে পুনর্বার বহাল হবার পর, আপনাকে বলে দিলাম, আপনার কাগজের মালিক হবে জগন্মোহন তিওয়ারী। ম্যানেজিং এডিটর হিসাবে নাম বেরবে তারই।"

ক্রমশঃ

ভক্তি ও সৎকর্ম্ম

যেমন কথা ও কাজের একটা অনাবশ্যক বিরোধ ঘটান হয়, তেমনি ভক্তি ও সৎকর্ম্মের মধ্যেও যেন কোন ঝগড়া আছে এইরূপ কথা মাঝে মাঝে শুনা যায়। যাহারা খুব ভাববিলাসী, তাহারা কাজের লোক না হইতে পারে। কিন্তু ভাব-বিলাসিতা যে ভক্তি তাহা কে বলিল? কথায় কথায় চোখে জল আসে এমন লোকেরও প্রকৃত ভক্তি না থাকিতে পারে; আবার যাহার চোখে সহজে জল আসে না এমন প্রকৃত ভক্তও অনেক আছেন। সকল প্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সৎকাজ করিবার শক্তি প্রকৃত ভক্তি হইতে পাওয়া যায়। কোন কাজ যে কাজের মত কাজ, ভগবানের সহিত যুক্ত না হইয়া তাহা স্থির করা কঠিন। যশের জন্য বা অন্য কোনপ্রকার লাভের জন্যও অনেক সময় সৎকাজ করা হয়। তাহা সাত্ত্বিক কর্ম্ম নহে। প্রকৃত ভক্ত যিনি তিনি সাত্ত্বিকভাবে কাজ করিতে পারেন। পূজা অর্চ্চনা ধ্যান ধারণায় বেশী সময় দিলে সৎকর্ম্মের জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যায় কিনা, তাহা বিচার্য্য বটে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে সময় ভাগ করিয়া দেওয়া কাহারও সাধ্য নয়। নিজ নিজ প্রকৃতি ও শক্তি অনুসারে প্রত্যেক সময় ভাগ করিয়া লইবেন। "মধ্যপথ অবলম্বন কর" বলা সহজ, কিন্তু এই মধ্যপথের রেখা নির্দ্দেশ কে করিবে?

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩২১

ইতিহাস কথা কয়

শ্রীঅজিত চট্টোপাধ্যায়

তের

দিল্লী জু দেখে আমরা হতাশ হয়েছিলাম। কালী-বাড়ী থেকে অনেকখানি পথ দিল্লী জু। চার মাইল ত হবেই। দিল্লীর পথে পথে সাদা বিচরণশীল ষ্টেট বাস দেখা যাবে না। বাসের নির্দিষ্ট সময় আছে। প্রায় বিশ মিনিট থেকে ত্রিশ মিনিট পর পর এক একখানি বাস আসে। যে কোন লোকের পক্ষে এই দীর্ঘ সময় ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা কঠিন। কিন্তু বাসের জন্য অপেক্ষা আপনাকে করতে হবে না। পথে পথে সতত ধাবমান অটোযানের সর্দারজী আপনাকে সহাস্য হাতছানি জানাবেন। মাইল মাত্র ছ আনা। তবে মিটারে কত উঠবে তা নিজেকেই ঠিক করে নিতে হবে। উঠবার সময় মাইল মিটারের সংখ্যাটা দেখে নিন। নামবার সময়ও তাই করতে হবে। যত মাইল অতিক্রম করলেন সেই হিসেবে ভাড়া।

কলকাতার কলকোলাহলের কাছে দিল্লী নিতান্তই শিশু। এখানের হৈ-হট্টগোলকে যদি সমুদ্র গর্জনের সঙ্গে তুলনা করি তবে দিল্লীর কলকাকলী মৃদু-ঝর্ণার মর্ম্মর ধ্বনি মাত্র। ঠিক এতখানি ফারাক। আকাশ আর জমিনের মত। সন্ধ্যাবেলায় কনট্ প্লেসে ঘুরে দেখেছি। অফিস ছুটির পর চৌরঙ্গীর যে অবস্থা হয় তার সঙ্গে কি কোন অংশে তুলনা চলে? দিল্লীর পথ শান্ত জনবিরল, কলকাতার রাস্তা মনুষ্যাকীর্ণ, কোলাহলমুখর। তবে সবদেশে সর্বকালে মনুষ্য-সমাজের হাসিকান্না, সুখদুঃখ, প্রেম-ভালবাসার যে চিত্রটি দেখা যায় তা দিল্লী আর কলকাতাতেও একই। সন্ধ্যার স্বল্প-আলোকিত অন্ধকারে কনট প্লেসের এককোণে ফিসফিস কথাবার্তায় মগ্ন প্রেমিক যুগলকে ঠিকই দেখা যাবে। পথপার্শ্বের ফুলদোকানীর কাছ থেকে রক্ত গোলাপের তোড়া সংগ্রহ করছেন কেউ, সাগ্রহে উপহার দিচ্ছেন কোন সুন্দরী যুবতীর হাতে। চেয়ে থাকলে হয়ত লক্ষ্য করবেন যে সলজ্জ প্রেমের মিষ্টি হাসি ফুটে উঠেছে প্রেমিকার চোখের কোণে। আর তখনই শুধু আপনার মনে হবে যে এই আকাশের নীচে কলকাতার ময়দান, ইডেন গার্ডেন আর লেকের [illegible]

মিশে গেছে দিল্লীর কনট প্লেস ও এমনি আরও না[illegible] স্থানের সঙ্গে।

দিল্লী জু আমাদের ভাল লাগে নি। অটো থে[illegible] নেমে টিকিট কেটে ঢুকলাম। শেষ ফেব্রুয়ারীতে[illegible] দিল্লী আর আগ্রার মধ্যে বেশ একটু তফাৎ। আগ্রা[illegible] দিনেও বেশ শীত-শীত অনুভব করেছি। কিন্তু দিল্লী[illegible] ঠিক উল্‌টো। দিনে বেশ একটু গরম, আর রাতে[illegible] শীতও প্রচণ্ড। গেট পেরিয়ে খানিকটা খোলা জায়গা[illegible] অপর্যাপ্ত ফুল ফুটেছে সেখানে। এত ফুল শুধু কি[illegible] দিল্লীতেই ফোটে? যেন এক ফুলের দেশে এসে[illegible] আমরা। সত্যি, কি বিচিত্র পুষ্পসম্ভার।

জু থেকে বেরিয়েই ঠিক করলাম যে নিজামুদ্দী[illegible] আউলিয়ার সমাধি দেখতে যাব। সারি সারি অটো[illegible] যান অপেক্ষা করছে। কতদূর হবে নিজামুদ্দী[illegible] আউলিয়ার সমাধি? সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে দু'জনে[illegible] উঠলাম অটোযানে। অটোযানের চালক এক অল্প[illegible] বয়সী সর্দারজী।

বললাম, 'নিজামুদ্দীন আউলিয়া দেখতে যাব। নি[illegible] চলুন।'

"নিজামুদ্দীন?" সর্দারজী প্রশ্ন করলেন।

বললাম, "হ্যাঁ। ফকির সাহেবের দরগা।"

অটোযানের গতি যেখানে শূন্য হ'ল, সেটি দিল্লীর[illegible] একাংশ। ফকির আউলিয়ার নামে জায়গাটিরও না[illegible] নিজামুদ্দীন। বিশ্বাসী জনের কাছে নিজামুদ্দী[illegible] আউলিয়ার সমাধি আজও তীর্থ-বিশেষ। ভাঙ্গাচোরা[illegible] ঘরবাড়ী, একচাপে মনুষ্যবসতি, সংকীর্ণ পথ—ফকি[illegible] সাহেবের দরগার চারপাশটি খুব একটা সমৃদ্ধির চি[illegible] বহন করে না।

ইতিহাসে নিজামুদ্দীন আউলিয়ার মত খ্যাতি এব[illegible] সম্মান অন্য কোন ফকির সাহেব পেয়েছেন বলে মনে হ[illegible] না। বিখ্যাত চিস্তি সম্প্রদায়ের শিষ্য নিজামুদ্দীন[illegible] আউলিয়ার অগ্রবর্তী অনেকের কাছেই রাজকীয় সম্মান[illegible] সাগ্রহে বহন করে নিয়ে গেছেন বিভিন্ন মুসলমান[illegible] [illegible] ছিলেন না[illegible]

মাত্র রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অধিকারী হয়েছিলেন নি।

আনুমানিক ১২৩২ খ্রীষ্টাব্দে নিজামুদ্দীন আউলিয়ার । দিল্লীতে এসে ঘিয়াসপুর গ্রামে বসবাস সুরু লেন তিনি। ঘিয়াসপুরের প্রতিষ্ঠাতা গিয়াসুদ্দীন বন। অল্প অল্প করে ফকির সাহেবের খ্যাতি ছড়াতে গল। মনুষ্য চরিত্রের গূঢ় ব্যাখ্যা নিজামুদ্দীন আউ-য়া সহজেই করতে পারতেন। অভিজ্ঞতা তাকে থষ্ট জ্ঞান দিয়েছিল এবং সেই অভিজ্ঞতা তিনি পুরোপুরি জে প্রয়োগ করতেন।

ফকির সাহেবের অলৌকিক শক্তির সম্বন্ধে কতকগুলি প্রচলিত আছে। শোনা যায় যে, উপাসনা করবার বিশেষ মুহূর্তে তিনি জানতে পারেন যে জালালুদ্দীন রোজ শাহ খিলজী মাণিকপুরে নিহত হয়েছেন। জের ভক্ত এবং শিষ্যদের কাছে এই কাহিনী তিনি যণা করেন। গিয়াসুদ্দীন তুঘলক যখন এগিয়ে সছিলেন দিল্লীর পথে তখন তিনি সহাস্যে ঘোষণা রেন—'দিল্লী হিনোজ দূর অস্ত।' দিল্লী এখনও অনেক । আফগানপুরে মারা গেলেন তুঘলক শাহ। লী পৌঁছান তাঁর আর হ'ল না। আর একবার এই লৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন নিজামুদ্দীন আউ-য়া। ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে তোর্মা শিরিণের নেতৃত্বে একদল াঙ্গল সৈন্য দিল্লীর সীমান্ত আক্রমণ করে। কিন্তু কস্মাৎ কিছুদিন পরই এই দুর্দান্ত লুঠেরার দল তাদের বু গুটিয়ে ফিরে যায়। জনশ্রুতি যে ফকির সাহেবের ার্থনার শক্তিতেই মোঙ্গলবাহিনী ফিরে যেতে বাধ্য । শ্লীম্যান সাহেব বলেছেন যে ঠগীর দল জাতি-ধর্ম-বিশেষে নিজামুদ্দীন আউলিয়ার দরগায় শ্রদ্ধা নিবেদন রত।

এই শান্ত-সুন্দর স্থানটির যারা রক্ষণাবেক্ষণকারী াদের অভ্যর্থনা এবং বিনয় প্রশংসার দাবি রাখে। টো থেকে নামতেই এক যুবক সহাস্যে আমাদের ভ্যর্থনা জানালেন। তাঁর সঙ্গেই আমরা ঢুকলাম কির সাহেবের দরগা দেখতে। সরু পথ। দু'পাশে ভখারীর সংখ্যা কম নয়। ডান-দিকেই ছোট্ট একটি কুরিণী। তিনদিক প্রাচীরে ঘেরা। পুকুরের জল কমন শ্যাওলা রঙের। এই শীতে জলও কম। সেই বকটি বললেন, 'এই হ'ল ফকির সাহেবের দীঘি। এরই াড়ে দাঁড়িয়ে ফকির সাহেব ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন—ল্লী দূর অস্ত।'

তুঘলকাবাদের অধিপতির সঙ্গে আউলিয়ার যে বিরোধ সুরু হয় তার মূলে এই পুষ্করিণী। ইতিহাসে ধর্মশক্তির সঙ্গে রাজশক্তির বিরোধের নজীর কম নেই। ইংলণ্ডের টমাস বেকেট এই প্রসঙ্গে একটি উজ্জ্বল নাম। বেকেটকে স্মরণ করে ইতিহাসে একটি স্মরণীয় উক্তি রয়েছে—'If ever a dead man won a fight, it was Thomas Becketee'. ধর্মশক্তির কাছে পরাজয় স্বীকার করেছিলেন দ্বিতীয় হেনরী। নিজামুদ্দীন আউলিয়া কিন্তু পরাভব স্বীকার করেন নি গিয়াসুদ্দীন তুঘলক শাহের কাছে। তুঘলক শাহই হেরে গিয়েছিলেন সে দ্বন্দ্বে। তবে বেকেট মরে হয়েছিলেন জয়ী, নিজামুদ্দীন জয়ী হয়ে জীবিত ছিলেন।

তুঘলকাবাদ গড়ে তুলেছিলেন গিয়াসুদ্দীন। দুর্গ, প্রাচীর, রাজপ্রাসাদ ও অন্যান্যদের বাসগৃহ। তখনকার দিনে মেসিনের সাহায্য ছিল না। যা-কিছু গড়তে হবে সবটুকু মানুষের হাতে। দূরদূরান্ত থেকে মালমশলা বয়ে আনবার জন্য মানুষ কিংবা গৃহপালিত পশু টানা শকটই ভরসা। তুঘলকাবাদের কাজে অনেক, অনেক শ্রমিকের প্রয়োজন ছিল সুলতানের। বহু শ্রমিকের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যদি তাড়াতাড়ি শেষ করা যায় তুঘলকাবাদের বসতি।

কিন্তু একই সময়ে ফকির সাহেব কাটাচ্ছিলেন দীঘি। অনেক শ্রমিক আউলিয়ার দীঘি কাটতে এল তুঘলকা-বাদের কাজ ফেলে। বিত্তহীনের কাছে রাজশক্তির কোন মোহ নেই, ফকিরের দরগা তাদের মনকে টানে। তারপর নিজামুদ্দীন আউলিয়ার মত ফকির সাহেব। যিনি নানা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন। রাগে তুঘলক শাহ আদেশ জারি করলেন। ফকিরের দীঘি কাটতে কোন মজুর যাবে না। দিবসে তারা কাজ করবে তুঘলক শাহের রাজপ্রাসাদ গড়ে তুলতে। সুলতানের ফরমান। জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভয় পেল শ্রমিকেরা। সুলতানকে তারা করত ভয়, ফকিরকে ভক্তি। ভয় দেখিয়ে কি ভক্তি কেড়ে নেওয়া যায় মানুষের মন থেকে? অমন ফকির সাহেবের কাজ কি ফেলে দিতে পারে নিরন্ন শ্রমিকের দল? এই বিশাল পৃথিবীতে তুঘলক শাহ তাদের আপন নয়, কিন্তু ফকির সাহেব নিঃসন্দেহে ভরসা।

সমস্ত দিন ধরে কাজ চলে তুঘলকাবাদ দুর্গের। গিয়াসুদ্দীন তুঘলক ভাবেন আউলিয়ার দীঘি খোঁড়া

আর হ'ল না। নিজের মনেই তিনি হাসেন। সামান্য ফকির। দেশের সুলতানের সঙ্গে পাল্লা দিতে চায়।

কিন্তু দীঘির খনন কাজ বন্ধ হ'ল না। শ্রমিকের দল আউলিয়ার প্রতি প্রেমের চরম নিদর্শন দেখাল। দিবস যদি কেড়ে নেয় সুলতান তাতে ভয় কি? 'রাতি কৈনু দিবস'। সন্ধ্যার পর শ্রমিকের দল জড় হ'ল ফকিরের কাছে। স্বল্প-আলোকিত রাতে একসার কোদাল পড়তে লাগল, ঝপা ঝপ, ঝপা ঝপ। লণ্ঠনের আলোয় শ্রান্ত-ক্লান্ত মুখগুলি নীরবে কাজ ক'রে যেতে লাগল। স্তব্ধ যামিনীতে আউলিয়ার দীঘির কাজ সুন্দর এগিয়ে চলল।

তুঘলক শাহ সব শুনলেন। তার আর সহ্য হচ্ছিল না। ফকিরের প্রতি এই প্রীতি প্রেম ও আনুগত্য রাজশক্তির প্রতি ভ্রূকুটি বলে মনে হ'ল তার। পুনরায় রাজ আদেশ ধ্বনিত হ'ল তার কণ্ঠে। ফকিরকে তেল বেচতে পারবে না কেউ। বিনা তেলে আউলিয়ার দীঘি কেমন করে কাটা হবে? লণ্ঠনের আলোয় অন্ধকারের কালিমা না দূর হ'লে কোদালের ঝপাঝপ শব্দ কেমন করে ভাঙবে তামস রাত্রির নিস্তব্ধতা।

কিন্তু অঘটন সেদিনও ঘটত। কাজ করতে গিয়ে শ্রমিকেরা দেখল তেলের প্রয়োজন জলই মিটিয়েছে। দীঘির বুকে শত শত কোদালের আঘাত বার বার ফিরে আসতে লাগল। আউলিয়ার দীঘি কাটা তুঘলক শাহ বন্ধ করতে পারলেন না।

লম্বায় প্রায় একশত আশী ফুট, চওড়ায় ওরই দুই-তৃতীয়াংশ। কিন্তু আউলিয়ার দীঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে আমরা আর সময় নষ্ট করতে পারলাম না। এরই মধ্যে সূর্য্য হেলে পড়েছে। রোদ বাদামী হয়ে এল। অনেক-গুলি সিঁড়ি ঘাটের উপর জেগে। সেই যুবকটি বললেন, এই দীঘির তলদেশ পর্যন্ত এমনি সিঁড়ি গেছে নেমে। সম্ভবত ১৯২১-২২ খ্রীষ্টাব্দে এর খনন কার্য শেষ হয়। ফকির সাহেব দীঘির জলকে তার আশীর্বাদ দিয়ে যান। আজও বহু লোক বিশ্বাস করে যে পুষ্করিণীর জলে দুরা-রোগ্য ব্যাধি দূর হয়।

নিজামুদ্দীন আউলিয়ার সমাধি বর্গাকৃতি বেদীর উপর। কুড়িটি মার্বেল পাথরের স্তম্ভ সমাধি সৌধের ভার বহন করছে। চারপাশে বারান্দা-বেষ্টিত একটি ঘরে আউলিয়ার প্রস্তরময় শবাধার। ঘরটিও বর্গাকৃতি এবং একটি মাত্র প্রবেশদ্বার। তবে বারান্দার থামগুলির মধ্যবর্তী প্রবেশ-পথ খিলানবিশিষ্ট। সমাধির উপর একটি

মার্বেলের দাগ সমস্ত গম্বুজটির চারিপাশে ছড়ান। সর্বোপরে একটি তামার চূড়া। উপরিভাগের চার কোণে চারটি ছোট ছোট গম্বুজ। এগুলিরও মাথায় ছোট ছোট তাম্রচূড়া। গম্বুজগুলিকে যুক্ত করে ছাদের আলিসার মত নাতি-উচ্চ বেষ্টনী। এর উপরেও ছোট গম্বুজ—
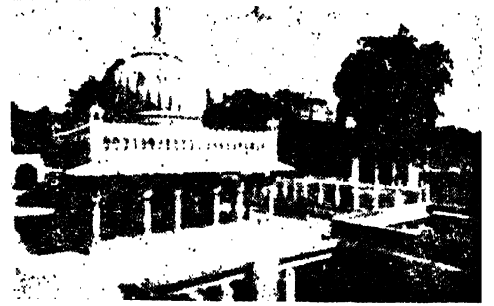
নিজামুদ্দিন আউলিয়ার সমাধি,—জাহানারা ও মহম্মদ শাহের সমাধিও এইখানেই

ঘরটির মধ্যে অনেকগুলি মার্বেলপাথরের জাফরিকাটা জাল। দেওয়ালের মধ্যখানের জাফরির কাজ, অন্যগুলির চেয়ে বিস্তৃত। ঘরের মধ্যে আলোকের বন্যা এরাই আনে।

সমাধির ঠিক উপরে একটি কাপড়ের চাঁদোয়া। এর চারপাশে নানা গ্লাস-বল অলংকারের মত সাজানো। প্রস্তরময় শবাধার বেষ্টন করে কাঠের একটি রেলিং। এটি সামান্য উচ্চ।

নিজামুদ্দীন আউলিয়ার এই সমাধি-সৌধ এবং এর মধ্যকার কারুকার্য ও নানা বিন্যাস বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সুলতান ও আমীর-ওমরাহের অবদান। এতে যোগ দিয়েছেন ফিরোজশাহ তুঘলক, সৈয়দ ফরিদ খান, মুর্তাজা খান, খলিউল্লা খান, দ্বিতীয় আলমগীর, আহমদ বকস্, ফৈজুল্লা ও দ্বিতীয় আকবর। এদের মধ্যে ফিরোজশাহ তুঘলক ঘরটিতে অলংকরণের ব্যয়ভার বহন করেন। কেউ সৌধগাত্রে লিপি উৎকীর্ণ করিয়েছেন। কেউ বা সমাধির জন্য একটি মুক্তা-শুক্তি-খচিত পর্দা উপহার দিয়েছেন। লাল বেলেপাথরের থামগুলি সরিয়ে নবাব আহমদ বকস্ খান মার্বেলপাথরের স্তম্ভ নির্মাণ করান। দ্বিতীয় আকবর শিখরের মার্বেল-গম্বুজ এবং চকচকে তাম্রকলকটি নির্মাণের আদেশ দেন। আসলে এ সবই

যুগে যুগে মানুষের ভোগলিপ্সা ও আসক্তি অনেকেরই মনে বৈরাগ্যের ছায়াপাত করে। মোগল যুগের এরকম একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ এখানে করা সমীচীন মনে করি। বাদশাহ আকবরের সভায় হুসেনউদ্দীন নামে একজন আমীর ছিলেন। হঠাৎ একদিন তার মনে এল সংসার-বৈরাগ্য। এই সংসার নিছক মায়া। বাদশাহ, অর্থবল, বৈভব, ক্ষমতা সবই পার্থিব। এর মূল্য নগণ্য। কাজেই এখানে মিথ্যে সময় নষ্ট করে লাভ কি?

হুসেনউদ্দীন বাদশাহকে নিবেদন করলেন মনোভিলাষ। সংসারে আর নয়—এবার সংসারের বাইরে। রাজপদ পরিত্যাগ করে হুসেনউদ্দীন চলে এলেন নিজামুদ্দীন আউলিয়ার দরগায়। আকবর বাধা দেন নি। সংসারের মায়া যে কাটাতে পেরেছে সেই ত জ্ঞানী। এই অল্পবয়স্ক জ্ঞানী মানুষটি প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরে ছিলেন দিল্লীতে। ফকিরের জীবন কাটিয়ে গেলেন বৈভব ও ঐশ্বর্য ত্যাগ করে।

চৌদ্দ

নিজামুদ্দীন আউলিয়ার সমাধি-প্রাঙ্গণে আরও তিনটি মার্বেল স্মৃতিচিহ্ন বর্তমান। এগুলির চারপাশে মার্বেল পাথরের পর্দাজাতীয় বেষ্টনী। এখানে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন দিল্লীশ্বর মহম্মদ শাহ, মোগল-বংশধর মীর্জা জাহাঙ্গীর ও শাজাহান-দুহিতা জাহানারা বেগম।

হতভাগ্য মহম্মদ শাহ। সমস্ত অঙ্গে অকল্পনীয় অপমানের কালিমা মেখেও দীর্ঘদিন দিল্লীর বাদশাহ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি। এই বিড়ম্বিত জীবনটির নশ্বর দেহ যেখানে রাখা হয়েছে তা একটি আয়তাকার মার্বেল পাথর গঠিত বেষ্টনীর মধ্যে। প্রাচীরটি প্রায় দেড় মানুষের মত উঁচু। ভিতরের বড় সমাধিটিই বাদশাহের।

দুর্ভাগ্য মহম্মদ শাহের জীবনের সঙ্গী হ'ল। যেদিনই তিনি বাদশাহ পদে অধিষ্ঠিত হলেন, সেইদিন থেকে। ফারুকশায়ার নিহত হওয়ার পর সৈয়দ ভ্রাতাদ্বয় আরও দু'জনকে দিল্লীর মসনদে বসিয়েছিলেন। কিন্তু তাদেরও জীবনান্ত হ'তে বেশী দেরি হয় নি। তারপরই মহম্মদশাহ এলেন দিল্লীর মসনদে।

মোগল সাম্রাজ্যের তখন আর সে জেল্লা নেই। হাটুভাঙ্গা 'দ'-এর মত অবস্থা। রাজ্য ভেঙ্গে যাচ্ছে টুকরো টুকরো হয়ে। প্রদেশের শাসনকর্তারা নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করছেন। মোগল রাজশক্তির সে বিদ্রোহ দমন করার মত শক্তি নেই।

এই ভাঙ্গা মসনদে বসে মহম্মদ শাহ শাসন করছিলেন। দাক্ষিণাত্যের গভর্ণর নিজাম-উল-মুলকের সঙ্গে তার বিরোধ সুরু হ'ল। মতবিরোধ থেকে মনান্তর। মনান্তর পরিণত হ'ল ঘোরতর বিবাদে। এরই মধ্যে একদিন ভূমিকম্প হয়ে গেল রাজ্যে। দুর্ভাগ্য ত একা আসে না। আসে মিছিল করে—গরুর গাড়ির মত সারিবন্দী হয়ে।

অপমানিত নিজাম-উল-মুলক পারস্যের নাদির শাহকে চিঠি লিখলেন। এই দুর্বিনীত সম্রাটকে উপযুক্ত শাস্তি দিন তিনি। আর শতগুণ করে বাড়িয়ে লিখলেন দিল্লীশ্বরের হীরা-জহরত, মণিমুক্তা, চুণী-পান্না, সোনা-দানার কথা। বলা বাহুল্য নাদির প্রলুব্ধ হলেন। ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে নাদির শাহ পারস্য হ'তে রওনা হলেন। সঙ্গে ছত্রিশ হাজার সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সৈন্য। খুব একটা কষ্ট হয় নি তার। আগমনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ না হলেও বহুলাংশে সুগম করে রেখেছিলেন নিজাম-উল-মুলক। লাহোর এবং পেশোয়ারের মোগল সুবেদারেরা যুদ্ধের একটা মহড়া দিলেন মাত্র। নাদির শাহের অশ্বারোহী সৈন্যের দ্রুতগতি দ্রুততর হ'ল দিল্লীর পথে।

মহম্মদ শাহের সৈন্যবাহিনী বাধা দিতে এগিয়ে গেল। কার্ণালের (Karnal) প্রান্তরে সারি সারি তাঁবু পড়ল মোগলবাহিনীর। দু'পক্ষই মুখোমুখি রইল বসে। একে প্রতীক্ষা করতে লাগল অন্যের আক্রমণের। তারপর হঠাৎ এক সময় সুরু হ'ল যুদ্ধ। ফল সুনিশ্চিত। মহম্মদ শাহ হারলেন নাদির শাহের কাছে।

কয়েকদিন নিজের মনে ভাবলেন মহম্মদ। পরামর্শ নিলেন। নিজামের বিশ্বাসঘাতকতা ও গোপন বৈরীভাব খানিকটা আঁচ করতে পারলেন। তারপর একদিন নাদির শাহের শিবিরে গিয়ে আত্মসমর্পণ করলেন।

নাদির শাহ কিন্তু রাজকীয় অভ্যর্থনা দিয়ে গ্রহণ করলেন মহম্মদকে। বন্ধুর মত ভৎসনা করলেন রাজ্যের সমস্ত বিষয়ে মন প্রয়োগ না করার জন্য। সৈন্যবাহিনীর ব্যর্থতাও বার বার উল্লেখ করলেন। দিল্লীর সাম্রাজ্য কুক্ষিগত করবেন না নাদির। রাজধানী ছেড়ে তিনি চলে যাবেন, এই বিশাল অভিযানের ক্ষতিপূরণ অর্থ পেলেই।

অপমানের পঙ্কে পা বাড়ালেন দিল্লীশ্বর। মার্চের প্রথম। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দ। আকাশ নির্মেঘ নীল, রৌদ্রদগ্ধ তপ্ত-পাণ্ডুর। নাদির শাহ আর তার সৈন্যবাহিনীকে পথ দেখিয়ে দিল্লীর দিকে যাত্রা করলেন মহম্মদ শাহ।
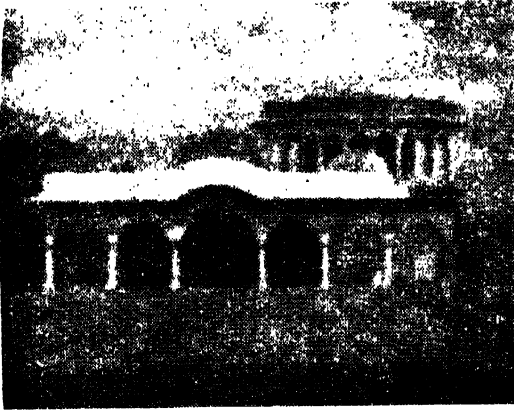
নাদির শাহকে নিজ আবাস ছেড়ে দিয়ে মহম্মদ শাহ এসে রইলেন শাহ বুজে।

রাজপ্রাসাদে বিশ্রাম গ্রহণ করলেন নাদির। বিজয়ীর প্রতি বিজিতের আতিথ্যে ত্রুটি রইল না কোন। সৈন্য-বাহিনীর ওপর কঠোর আদেশ ছিল পারস্যের অধিপতির। লুঠতরাজ, অত্যাচার, মেয়েদের সম্ভ্রমহানি যেন এতটুকু না হয়। একটুও বরদাস্ত করবেন না তিনি।

কিন্তু নীল আকাশের দেবতা বোধহয় নাদির শাহের ইচ্ছা শুনে মনে মনে হেসেছিলেন। যে রক্তস্রোত কয়েক ঘণ্টা ধরে দিল্লীর রাজপথে বয়ে গেল, ইতিহাসে তার তুলনা নেই। নাদির শাহ দিল্লী পৌঁছবার পরদিন সন্ধ্যায় একটা গুজব ছড়িয়ে পড়ল। নাদির শাহ নিহত হয়েছেন। গোলমাল প্রথম সুরু হয় পাহারগঞ্জ অঞ্চলে। কিছু পারসীক সৈন্য নিহত হ'ল জনতার হাতে। মধ্য-রাতে নাদির শাহের কানে যখন এ খবর পৌঁছল তখন তিনি তা বিশ্বাস করেন নি। খবরের সত্যতা যাচাই করবার জন্য দু'জন প্রহরীকে পাঠালেন তিনি। কিন্তু তারা আর ফিরে এল না। পরদিন সকালে নাদির শাহ ছুটে এলেন রোশনউদ্দৌল্লা মসজিদে। হঠাৎ একটা গুলী ভেসে এল তার দিকে। কোন্ অলক্ষ্য থেকে আততায়ী তাগ করেছিল। কিন্তু নাদির শাহ রক্ষা পেলেন। কার্তুজের বল তার পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে গেল।

নাদির শাহ আর অপেক্ষা করেন নি। সৈন্যবাহিনীকে আদেশ দিলেন তিনি। দিল্লীবাসী কেউ যেন রেহাই না পায়। লুঠতরাজ আর খুন-জখম সুরু হ'ল দিল্লীর পথে। বিস্তীর্ণ স্থান জুড়ে সুরু হ'ল বীভৎস হত্যালীলা। করে দাঁড় করান হ'ল যমুনার তীরে। উন্মুক্ত তরবারি দিয়ে মস্তক ছেদন করল পারসীক সৈন্যরা। দেহ ধড়ফড় করল মাটিতে, মুণ্ড ভেসে গেল যমুনার জলে।

সকাল সাতটা থেকে বিকেল পর্যন্ত চলল এই তাণ্ডব। সহস্র সহস্র মৃতদেহে ভরে উঠল রাজপথ, আর্তনাদ আর মিনতির করুণ সুরে বারবার বিদীর্ণ হয়ে গেল দিল্লীর আকাশ-বাতাস। অসহায় মেয়ে-পুরুষ, যুবা-বৃদ্ধ, শিশু ও পঙ্গু-সকলেই প্রাণ হারাল দুরন্ত এই মৃত্যুঝটিকায়। ইতিহাস বলে যে, ঘটনার পরিস্থিতি দেখে মুহম্মদ শাহ এক মিনতি-পত্র পাঠান নাদির শাহের কাছে। পত্র পড়ে হত্যালীলা বন্ধের আদেশ দেন নাদির শাহ শুধু মুহম্মদ শাহের করুণ মুখ চেয়ে।

আর একটি কাহিনীও আছে। মসজিদের সিঁড়িতে উপবিষ্ট ছিলেন নাদির শাহের প্রধান চিকিৎসক মীর্জা মেধী। মুহম্মদ শাহের প্রধানমন্ত্রী তার কাছে এক দীর্ঘ কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী আবেদনপত্র এনে অনুরোধ করেন। নাদির শাহের কাছে দিল্লীর অধিবাসীদের এই মিনতিপূর্ণ আবেদনপত্র পৌঁছে দেন তিনি। এই নারকীয় হত্যালীলা বন্ধ হোক।

প্রধানমন্ত্রী আসিফ জা-কে মীর্জা মেধী হেসে বলেছিলেন,— এই দীর্ঘ আবেদনপত্র পড়ে শেষ করবার আগেই দিল্লী যে জনশূন্য হয়ে যাবে। কাজেই প্রধান মন্ত্রী এই আবেদনপত্রকে আরও সংক্ষিপ্ত করে দিল। হতবুদ্ধি আসিফ জা হতাশ হয়ে বসে পড়লেন সিঁড়িতে। তার মুখে আর বাক্য সরে নি।

তখন মীর্জা মেধী নাদির শাহের কাছে গিয়ে বললেন—"হিন্দুস্থানের প্রধানমন্ত্রী নগ্নমস্তকে, অশ্রুজলে ভিজে আপনার দ্বারে উপস্থিত। শংকিত চিত্তে জাঁহাপনার কাছে একটি প্রশ্নের উত্তর চান তিনি। আর কতক্ষণ যুদ্ধজয়ী পারসীক সৈন্যরা তাদের হাত জলের বদলে শুধু শোণিতে ধৌত করবে।"

নাদির শাহ হত্যালীলা বন্ধ করার আদেশ দিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, উজীরের পাকা চুল আর দাড়ি তার মনের ক্রোধ ও বিদ্বেষ দূর করে দিয়েছে। এমনই নিয়মানুবর্তিতা যে, আদেশদানের সঙ্গে সঙ্গে হত্যা-লীলা, লুঠতরাজ সব বন্ধ হয়ে গেল। যে সৈনিক মস্তক ছেদনের জন্য তরবারি উন্মুক্ত করে হতভাগ্যের গলায় বসিয়েছিল, সে তখনই তার তরবারিকে সংযত করে নিল। সেই অভাগা দিল্লীবাসীকে আর প্রাণ দিতে

বহুদিন ধরে পরিত্যক্ত ছিল রোশনউদ্দৌল্লা মসজিদের চারিপাশ। যে গেটের কাছে প্রথম হত্যা সুরু হয়, আজও দিল্লীতে তার নাম 'খুনী দরওয়াজা'। মৃতদেহের স্তূপ সরিয়ে নগরীকে পরিষ্কার করতে বহুদিন লেগেছিল বাদশাহের। সমস্ত দিল্লীর বুকে বিভীষিকার এক প্রতচ্ছায়া অনেকদিন ধরে চেপে বসে রইল।

তারই মধ্যে একদিন বাজল পরিণয়ের সুর। কি যেন মনে হ'ল নাদির শাহের। যাবার আগে নিজের এক ছেলের সঙ্গে, এক শাহজাদীর বিয়ে দিলেন তিনি। হিন্দুস্থান আর পারস্যের মধ্যে মিলনের এক নূতন সেতু বাঁধতে চাইলেন সম্রাট্। যা হয়ে গেছে সে করুণ ভয়াবহ স্মৃতি ভুলে যাক সকলে। তবু তাই কি হয়? মাত্র এই ক'দিনের ব্যবধানে কেউ কি ভুলতে পারে এই বিভীষিকাময় ঘটনাবলী? জোর করে মুখে হাসি আনল দিল্লীবাসীরা। বিয়ের বাজনা বেজে উঠল। আনন্দ উৎসবের জোয়ার আনতে চাইল রাজপুরুষেরা। বার হ'ল! আলো জ্বলল, বাজি পুড়ল, নর্তকী নেচে নেচে যৌবনের জয়গান গাইল। সুরা আর বিভিন্ন উত্তেজক পানীয়ের স্রোত বয়ে গেল। সলমা চুমকির কাজ-করা ঘাগরা আর ওড়না পরে বাঈজী গান শোনাল। তবু নাদির শাহের মনে হ'ল কোথায় যেন একটা ভুল হয়েছে তার। তবলচীর হাতের তাল-লয় কেন কেটে যাচ্ছে? মাঝে মাঝে গানের সুর কেন বেখাপ্পা মনে হয় কানে?...... মহম্মদ শাহের মুখ উজ্জ্বল হয়। কিসের যেন একটা দুর্লংঘ্য বাধা দু'জনের মধ্যে। নাদির চিন্তিত হয়ে রইলেন।

নাদির শাহের পুত্রবধূ, সেই শাহজাদীর সমাধিও এখানেই। প্রসব হ'তে গিয়ে মারা যায় মেয়েটি। মা আর ছেলে দু'জনেই শুয়ে আছে চিরনিদ্রায়।

যাবার আগে অনেক কিছু নিয়ে গিয়েছিলেন নাদির শাহ। ইতিহাসে সেসব লেখা আছে। প্রায় চার কোটি টাকা, ময়ূর সিংহাসন ও ইতিহাসখ্যাত কোহিনূর হীরক। কিভাবে নাদির শাহ হীরকটি হস্তগত করেন সে সম্বন্ধে সুন্দর একটি গল্প প্রচলিত আছে। কোহিনূরকে আঁকড়ে ছিলেন মহম্মদ শাহ। তিনি জানতেন যে হাতে পেলে নাদির শাহ কিছুতেই রেখে যাবেন না এই দুষ্প্রাপ্য হীরকখানি। সন্তর্পণে কোহিনূরকে লুকিয়ে রেখেছিলেন মহম্মদ শাহ। তাঁর শিরস্ত্রাণের মধ্যে, যেন কেউ না জানতে পারে। কাকপক্ষীতেও না টের পায়।

হয়ত নাদির শাহ গণনা করতে পারতেন। কিংবা কোহিনূরই আর থাকতে চায় নি হতশ্রী মোগল বাদশাহদের কাছে। বিদায়ের দিন নাদির শাহ এলেন মহম্মদ শাহের কাছে। নানা ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর এক অদ্ভুত প্রস্তাব করলেন তিনি। আতিথেয়তা ও সৌজন্যের প্রতীক হিসাবে মস্তকের পরিধেয়টি দেওয়া-নেওয়া করতে চাইলেন। এই সুন্দর প্রস্তাবে কেউ কি অসম্মতি জানাতে পারে? কোহিনূর নিয়ে চলে গেলেন পারস্যের অধিপতি। কোহিনূর নয়, মোগললক্ষ্মীই চলে গেলেন হিন্দুস্থান ছেড়ে পারস্যের পথে।

বেলা পড়ে এসেছিল। সন্ধ্যার তরল অন্ধকার নামতে দেরি নেই আর। হতভাগ্য সম্রাট মহম্মদ শাহের সমাধির সামনে আমরা কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। এই প্রবঞ্চিত ও বিড়ম্বিত জীবনটির কথা ভেবে সকলেরই মন সহানুভূতিতে সরস হয়ে উঠবে। মসনদের ওপর বসেও যে যন্ত্রণা, জ্বালা ও অপমান ভোগ করেছেন বাদশাহ তা কল্পনাও করা যায় না। নাদির শাহ যখন প্রস্থানের উদ্যোগ করছেন তখন সভা ডেকে বিদায় দিতে হয়েছে তাকে। মুখে কৃত্রিম হাস্য এনে তাকে বলতে হয়েছে যে এত শীঘ্র নাদির শাহ চলে যাওয়ার জন্য সমস্ত দিল্লী এবং সম্রাট্ স্বয়ং বিষণ্ণ বোধ করছেন।

বিষণ্ণতা মহম্মদ শাহের সমস্ত জীবন জুড়ে। সুদীর্ঘ আঠাশ বৎসরকাল মসনদে থাকার পর ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে এই বিষণ্ণ জীবনদীপটি নির্বাপিত হয়।

চোখ

শ্রীপ্রণবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শাড়ির আঁচলটাকে ভাল করে জড়িয়ে নেয় আরতি। অগ্রহায়ণের শেষ দিক। খুব শীত না থাকলেও একটা শীত-শীত আমেজ এর মধ্যেই অনুভব করা যায় যেন। নিখিলেশ কোন কথা বলে না; সামনে ধূসর সন্ধ্যার দীর্ঘ ছায়া মিলিয়ে যাচ্ছে যেন। ধীরে ধীরে কালো হয়ে উঠল পদ্মার জলে। দূরে ও-পারের বাড়ীগুলির আলো জ্বলে উঠছে একটার পর একটা। এপারের নৌকাগুলি ঘাটে বাঁধা। দু'-একটা নৌকা পদ্মার মাঝ-জলে; পাল খাটানো সবগুলির। বেশ লাগছে একটানা জলের শব্দটাকে।

আরতি চোখ তোলে নিখিলেশের দিকে। নিখিলেশের চোখের তারায় সামনের ঘাটে-লাগানো নৌকার লণ্ঠনের আলোটা জ্বলছে যেন। নিখিলেশ চোখ ফেরায়। নিস্তব্ধ হ'ল দু'জনের চোখ।

আরতি বলল, তুমি ত বললে না?

নিখিলেশ বলে, কি?

আরতি নিজের হাত দুটো কোলের কাছে টেনে নিয়ে, বলে যা জানতে চেয়েছি।

নিখিলেশ চোখ দু'টি সরিয়ে নিয়ে আনে আরতির চোখ থেকে। কিছুক্ষণ পর বলে, যা বলতে চেয়েছি তা না বললেও কি আমার বলা হয় নি আরতি? পৃথিবীর এমন অনেক কিছুই আছে যা না বললেও অনেক বলা হয়ে যায়।

আরতি এবারে হাসল, পরে বলে, জানি তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ।

নিখিলেশ আবার চোখ টেনে আনে আরতির দিকে, বলল, আমি সবার কাছ থেকে মুক্তিই চেয়েছি। তুমি বুঝতে পার না যেন। আমি কিছুই লুকোই নি আরতি; আমি হাঁফিয়ে উঠি যখন দেখি সকলেই আমাকে বাঁধতে চায়। তুমি ত জান না, হয়ত সেদিন বিনতা আমার কাছ থেকে শুধু দুঃখই নিয়ে গেছে, আর তুমিও হয়ত দুঃখই নিয়ে যাবে।

আরতি চুপ করে থাকে। সামনে নদীর ঐ বালির সাদা চরটা নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে। সন্ধ্যার ধোঁয়াটে কুয়াশা জট পাকাচ্ছে যেন তাকেই ঘিরে।

নিখিলেশ বলে, কি, চুপ করলে যে?

আরতি নিরুত্তাপ কণ্ঠে উত্তর দিল, আমার তরফ হ'তে আর কিছু বলার নেই নিখিলেশ।

নিখিলেশ নিশ্চুপ, কিছুক্ষণ পর বলে ওঠে, তুমি ত জানই আরতি, আমি যে এক একসময় কেমন হয়ে উঠি, কি যে চাই, কিছুই বুঝি না। নিজেকে শুধরোবার কত চেষ্টাই যে করেছি, তার আর হিসাব নেই। ভাবি, এ এক অন্যায় প্রবঞ্চনা কিন্তু কিছুরই কূল-কিনারা করতে পারি না।

আরতি চুপ করে থাকে, আপনার মধ্যে আপনার প্রতিফলন আজ মিলিয়ে দেখতে চায় সে। নিখিলেশ হয়ত ঠিকই বলছে—এটা সৃষ্টিকর্তার এক অন্যায় প্রবঞ্চনা। যদি আরতি এলই তবে সে সুন্দর এক জোড়া চোখ নিয়ে এল না কেন? হয়ত নিখিলেশ বাঁধা পড়ত।

আবার চুপচাপ। মাঝিরা গান গাইছে। পাখীরা ঘরে ফিরছে। একটা উদাসী আত্মার নিঃশ্বাস বয়ে নিখিলেশের হাত-ঘড়িটা শব্দ করে চলেছে।

আরতি বলে, তুমি মুক্তিই যদি চেয়েছ নিখিলেশ তবে চৈতীকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চাইছ কেন বল ত?

খানিকটা আপন মনে হাসল নিখিলেশ, তারপরে শূন্যের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিল, এ বন্ধন মুক্তির আরতি।

বুঝতে পারলাম না। আরতি প্রশ্ন তোলে।

নিখিলেশ সহজ ভাবে বলে, এতে না বোঝার কি আছে আরতি? মন যেখানে মুক্ত হ'তে পেরেছে সেখানেই ত আসল মুক্তি।

আরতি চুপ করে থাকে। নিজের হাতের আঙুলগুলির দিকে তাকিয়ে ধীর গলায় বলে, তুমি যে কি নিখিলেশ, আমি বুঝি না।

নিখিলেশ বলে, সব জিনিসটা বুঝতে যাওয়া বোকামি আরতি। নাও রাত হয়ে এল, এবার ওঠা যাক।

আরতি দ্বিধা না করেই উঠে দাঁড়াল। আবার

মনের প্রশ্ন কেবল ভারী হ'তে লাগল। আরতি রে, তুমি কবে যাচ্ছ এখান থেকে?

নিখিলেশ বলে, আগামী শুক্রবার।

ঠের তাপ শীতল হয়ে এসেছে যেন। আরতি ব করল নিখিলেশের মনে আরতি বরফের পাহাড় গিয়েছে। কৌতূহল ঢেউ তুলল। আরতি প্রশ্ন , কাল কি করবে?

চৈতীর কাছে যাব। নিখিলেশের কণ্ঠস্বরে কোন ক্ষণ্য নেই। সহজ কথা সহজ করে বলে দিতে ল কিন্তু আরতির মুখটা কালো হয়ে এল, আরতি ও হাসবার চেষ্টা করল। না হাসলে সে নিজেকে মানিত করবে। তাই হাসতে হাসতে আগের দিন-দের মত সহৃদয় ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা তুলে ধরল, আসছে ত আসছ আমাদের বাড়ী?

নিখিলেশ মাথা নাড়ল।

তারপর বিচ্ছেদের কালো পাহাড়। আরতি বুঝতে রল সব। আজকের বিকাল সব পরিষ্কার করে বলে য়ে গেছে। এত সহজে সে হেরে যাবে কোন নও জানত না তাই নিজের ঘরে এসে কাঁদল। নিখিলেশ শুনতে পেল না। কেবল তার মনের আকাশে ইন্দ্রধনুর ছটা পড়ল। তারপর আগামী দিনের অনেক কিছুর পাওনা মিটবে ভেবে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন বিকালের সোনালী রোদ সোনালী স্বপ্ন য়ে নিখিলেশের কাছে এল। অপেক্ষমান হৃদয়ের র তৃষ্ণা অমৃত হয়ে ভরে উঠল। নিখিলেশ পা াড়াল। চৈতীর মন অনন্তের আকাঙ্ক্ষা হয়ে সকাল 'তে ডেকেছে, দ্বিধা আর লজ্জায় থেমে গিয়েছিল। এখন ত আর কোন বাধা নেই, তাই পায়ের চলায় দ তুলল। চৈতী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। দেখা হ'ল—অনেক তৃষ্ণা, অনেক গান, অনেক সুরে রে গেল। চৈতী বলল, সেই কখন থেকে তোমার ন্য অপেক্ষা করছি।

নিখিলেশ হাসল। চোখে চোখ রেখে অনেক তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলল, তারপর বলল, মাসীমা আছেন ত চৈ?

চৈতী নিয়ে এল নিখিলেশকে। ঘরে ঢুকেই প্রণাম করল মাসীমাকে। মাসীমা নিখিলেশকে আশীর্বাদ করলেন তারপর হঠাৎ কি কাজ মনে পড়তেই তিনি নিখিলেশ আর চৈতীকে বসতে বলে চলে গেলেন।

নির্জন ঘর। মুখোমুখি দু'টি হৃদয়। পাশের বড় দেওয়াল ঘড়িটা হ'তে পেণ্ডুলামের আওয়াজ। নিখিলেশ নিস্তব্ধতার তাল ভঙ্গ করল, ডাক দিল, চৈ।

চৈতী চোখ তোলে। নিখিলেশ সেই চোখের দিকে তাকাল, তারপর বিহ্বল হয়ে পড়ল। এবার লজ্জা পেল। চৈতী উত্তর দিল, কী বলছ?

মাসীমা চলে গেলেন কেন জান? নিখিলেশ জিজ্ঞাসা করল।

যদিও চৈতী জানে তবুও মিথ্যে করে বলল, না।

নিখিলেশ এমন উত্তর পছন্দ করল না কিন্তু মনে মনে লজ্জা পেল। লজ্জার মেঘ সরাতে অন্য কথা বলল, হাজারিবাগে কেমন কাটল দিনগুলি?

চৈতী সহজ হয়ে বলল, খুব ভাল, কিন্তু পুরোপুরি আনন্দের দিনগুলি উপভোগ করতে পারি নি।

নিখিলেশ জানে কেন তবুও প্রশ্ন করল, কেন বল ত?

এবার চৈতী হাসল। গালের দুটো দিকের নিখুঁত টোলটা নিখিলেশ লক্ষ্য করে। আরতিরও অমনি টোল পড়ত গালে। চৈতী এবারে বলে, বিয়োগের ফল সব সময়েই কম, তুমি এখানে আর আমি ওখানে কি করে হবে বল ত?

নিখিলেশ মুখ ঘোরায়। এত কথা জমেছিল নিখিলেশের মনে কিন্তু নিখিলেশ কেন জানি বলতে পারছে না সব। নিখিলেশের শুধু মনে হচ্ছে সে যদি কেবল চুপ করে থাকে তা হ'লে সব কথা তার বলা হয়ে যাবে। তাই সে চুপ করে থাকে। মাঝে মাঝে চৈতীর দিকে চোখ তুলে চেয়ে থাকে। চোখে চোখ পড়তেই চৈতীর টানা টানা চোখ দু'টি সে দেখতে পায়। অদ্ভুত মায়াঞ্জন লেগে থাকে যেন, মোহময় স্বপ্নমাধুরী দুটো চোখের স্বপ্নে যেন বার বার কথা কয়ে ওঠে। নিখিলেশের মনে হয় এক চোখপাগল মনের হরিণ আজ বিভ্রান্ত হয়ে পড়তে চায় বনহরিণীর চকিত চাউনিতে। এক দৃষ্টিসুন্দর ভাষাহীন রমণীয়তা সময়ের প্রতিটি স্পন্দনকে মধুময় করে তুলতে চাইছে যেন।

চৈতী প্রশ্ন করল, কি, কথা বলছ না যে?

নিখিলেশ সংহত হয়। মাসীমা ঘরে ঢোকেন। বনবীর ট্রে নামিয়ে দেয় সামনের টেবিলে। চৈতী ঘরের বাইরে যায়। পোষাক বদল করবে। কিছুক্ষণ পর আবার ঘরে ঢোকে। নিখিলেশ এতক্ষণ কথা বলছিল মাসীমার সাথে। চৈতীকে দেখে তাঁদের দু'জনের কথা থেমে যায়। চৈতী জানে এতক্ষণ তাদের কি কথা হচ্ছিল। তার না শুনলেও চলবে।

একটা ক্রীম-ইয়েলো শাড়ি গোটা গায়ে জড়িয়ে

পথ চলে চৈতী, সঙ্গে নিখিলেশ। মাসীমাই চৈতীকে নিয়ে বেড়াতে যাবার কথা বলেছেন নিখিলেশকে, পথে বসন্তের অভিসার। পথে কোন কথা বলা হ'ল না। কথা বলতে দু'জনের কারুরই ভাল লাগে নি। তাই নীরবে পরস্পর পরস্পরের সান্নিধ্য নিয়েছে। পদ্মার পারে এসে থেমে যায় দু'জনেই। সন্ধ্যা হয় নি তবুও সন্ধ্যার আভাস। নিখিলেশ স্তব্ধ। চৈতী চকিতা। নিখিলেশের একটা হাত এসে চৈতীর হাত ছুঁয়েছে। চৈতীর হাত বাঁধা পড়েছে, যেমন ভাবে মন তার বাঁধা পড়েছিল ছয় মাস আগে।

চৈতী কথা বলে না। নিখিলেশ চুপ করে থাকে। তবুও যেন চৈতী শুনতে পাচ্ছে নিখিলেশের কথা।

সবুজ ঘাসের ওপর তারা দু'জন বসে পড়ল। নিখিলেশ হাতটা এখনও ছাড়ে নি। চৈতী ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করে নি। কিছুক্ষণ চুপচাপ। নিখিলেশ বলে, হাজারিবাগে আমার অনুপস্থিতি তোমার কাছে খুব খারাপ লেগেছিল, তাই না?

চৈতী মাথা নেড়ে মৃদুস্বরে বলে, হুঁ। আবার চোখ তোলে সে নিখিলেশের দিকে। নিখিলেশ চোখ ফেরাতে পারে না। চোখে চোখ দিয়ে বহুক্ষণ কেটে গেল।

নিখিলেশ বলে, মাসীমা বলেছিলেন কি জান?

চৈতী বলে, কি?

সামনের ফাল্গুনে আমাদের বিয়েটা সেরে নিতে।

চৈতীর সপ্রশ্ন চোখ, তার উত্তরে তুমি কি বললে?

নিখিলেশ বলে, সেই উত্তরটাই ত তোমার কাছ হ'তে জেনে নেব।

চৈতী এবার মাটির দিকে তাকায়, পরে বলে, আমার উত্তরটাই কি তোমার উত্তর?

নিখিলেশ বলে, হ্যাঁ।

দূরে একটা পাখী ডাকল। আকাশটাকে আরও রঙীন লাগল, আর ধূসর সন্ধ্যা অনেক দূরে অস্পষ্টভাবে কথা বলল। চৈতী চুপ করে থেকে সময় গুণছিল, তারপর বলল, আমারও তাই মত।

আবার চুপচাপ। পদ্মার জল গতকালের মত কালো হয়ে এসেছে চৈতীর কালো চোখের মত। পদ্মার গভীরতাও চৈতীর চোখের গভীরতার কাছে হার মানে যেন।

চৈতীকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে নিখিলেশ তার বাংলোয় ফিরল। পৃথিবীটা অনেক সুন্দর, অনেক আনন্দময়, অনেক উচ্ছল। ভালবাসল আর বহুদিন পর নিখিলেশ নিজের ঘরে বসে গান করল।

পরদিন আবার বিকাল এল। পদ্মার ঘাটে নৌকা, এধারে সারি সারি আমগাছ। সন্ধ্যার ধূপছায়ায় বৈরাগ্যের ছাপ পড়েছে। কবির এক উদাস খেয়ালের মত প্রকৃতি আজ উদাসী। দূরের চরটা যেন নিশ্চিন্তে পদ্মার জলে মাথা গুঁজে দিয়ে শুয়ে আছে। তার পিঠে ধোঁয়াগুলি জট পাকাচ্ছে ধীরে ধীরে। আরতি সরে এল নিখিলেশের কাছে। নিখিলেশ চোখ তোলে।

আরতি বলে, আমি ভাবতেই পারি নি তুমি আজ আসবে।

নিখিলেশ বলে, কেন?

আরতি এবার খানিকটা অনুস্বরে বলে ওঠে, যে-চোখ তোমায় কাছে টানে, যে-চোখ তোমায় মুক্তি দেয়, সে চোখ ফেলে আমার কথার যে মূল্য দেবে আমি ভাবতেই পারি নি, তাই আমি এক একসময় ভাবি···।

নিখিলেশ বলে, কি?

আরতি বলে, তুমি এক অদ্ভুত; হয়ত আমার কাছে অদ্ভুত এক স্বপ্ন, জানি তোমায় পাব না তবুও তোমায় পূজা করি মনে মনে। বহু দূরে চলে গেলেও বহু দূরে তোমায় রাখতে পারি না। আবার মনে মনে কাছে টেনে নিই, তাতে শান্তি পাই।

সমবেদনায় মন ভরে ওঠে নিখিলেশের। কিন্তু সমবেদনা জানিয়ে আরতির প্রেমকে ছোট করতে চায় না সে, তাই সে বলে, এ তুমি জেনে-শুনে ভুল করছ আরতি। তোমার মধ্যে যে তুমি আছ তাকে ব্যথা দিয়ে শান্তি কখনই পাওয়া যায় না।

আরতি বলে, আমার মধ্যে যে আমি আছি সেই ত আমার সত্তা নিখিলেশ। আমার মন-প্রাণ সেই ত সব। আজ যেদিকে তাকাই সেখানেই দেখি তুমি। এক একসময় মনে হয়, প্রমথেশের ভালবাসাকে স্বীকার করি, তখনই সবদিক হ'তে বাধা আসে। আমার আমিই বিদ্রোহ করে ওঠে। তুমি কি চাও, আমি এই বিদ্রোহের মধ্যে আর একটা লোককে টেনে এনে তাকে আজীবন ফাঁকি দিয়ে যাব?

নিখিলেশ চুপ করে থাকে। কিছুক্ষণ পর বলে, তোমার মধ্যে এ বিদ্রোহকে জাগিয়ে রাখতে যাওয়াটাই তোমার মস্ত এক ভুল আরতি। এই গোটা বিশ্বে ত কত অশান্তি, কত ক্ষোভ, কত দুঃখ, যেটুকু সুখ আছে তা ত তার তুলনায় অনেক কম। সেই সুখের [illegible] দুঃখবাদী হওয়া

আর উপায় কি ? সেটা ত সুস্থ জীবনের পরিচয়

আরতি নিখিলেশের একটা হাত নিজের হাতের নিয়ে বলে, জীবনের সুস্থতা-অসুস্থতার প্রশ্ন এটা নিখিলেশ। এটা মনের প্রশ্ন। তুমি একাউনটেন্সি করেছ, ব্যাংকের লাভ-লোকসান তুমি হিসেব করে করতে পার। সেটা কাগজ-কলমের, কিন্তু মনের জ-কলমে তার সঠিক হিসেব হয় কি ?

নিখিলেশ বলে ওঠে, কি পেতে পার, কি পাওয়া চ পারত আর কি পাও নি এ হিসেব নিয়ে না লও এমন অসুবিধা কিছু একটা হয় না। এমন ক মানুষই ত আছে, যারা জীবনে সবচেয়ে দাবী ; সে যাক গে, প্রমথেশ যে তোমায় ভালবাসে ত মিথ্যে নয় ?

আরতি বলে, আমি যে তোমায় ভালবাসি এটাও থ্যে নয় ?

নিখিলেশ বলে, তাতে হ'ল কি ?

আরতি এবার হাসে, তুমি এখনও ছেলেমানুষ নিখিলেশ, ভালবাসা ভালবাসতে শেখালেও বাসা ভাগাভাগি সহ্য করে না।

নিখিলেশ চুপ করে থাকে। আরতি আবার বলে, াই ভালবাসার প্রতীক। খণ্ডতাকে আশ্রয় করে ভালবাসা, সে ভালবাসার অখণ্ড কোন সত্তা নেই। যে চৈতীকে ভালবাস, সে চৈতী কিন্তু তোমার ও ভালবাসার বস্তু নয়। তুমি চৈতীকে ভালবাস নি, বেসেছ চৈতীর চোখ দু'টিকে। সেটা খণ্ড ছাড়া কি ?

নিখিলেশ আহত হ'ল যেন। পরে বলে, খণ্ডতার দিয়েই ত অখণ্ডকে লাভ করা যায় আরতি। যে ী তার চোখ দিয়ে মনের ভাষাকে ফুটিয়ে তোলে চাউনিতে সেই চোখকে ভালবেসে তার মনকে বাসতে নিশ্চয়ই পারব, তুমি দেখে নিও।

একটা অনভিপ্রেত আঘাত এসে বিঁধল আরতিকে। ও সে চুপটি করে চেয়ে থাকে নিখিলেশের দিকে। তি একটু পরে বলে, ওটা প্রেম নয় নিখিলেশ, হ।

নিখিলেশ বলে, সব প্রেমের সুরুই ত মোহ দিয়ে।

আরতি বলে, না, মহৎ প্রেমের আদর্শ তা নয়।

নিখিলেশ আর কোন কথা বলে না। আরতি দূরে য় থাকে। সন্ধ্যে নামছে নিঃশব্দে। আরতির নিঃশ্বাসের মত নিঃশব্দে অন্ধকার টেনে আনছে যেন। আরতি বলে, রাত হয়ে আসছে, এবার ওঠা যাক।

নিখিলেশও বিশেষ আপত্তি করল না। দু'জনে পথ হাঁটে। আরতি প্রশ্ন করে—তুমি বোধ হয় আগামী পরশু রওনা হ'চ্ছ ?

হ্যাঁ। নিখিলেশের স্বরটা গম্ভীর।

আরতি বুঝতে পারে নিখিলেশ হয়ত তার কথায় আঘাত পেয়েছে। কিন্তু আরতি কি তাকে আঘাত দিতে চেয়েছিল ? মনের কোনেই হাতড়িয়ে ফিরল প্রশ্নটা। আরতি আঁচলটা বাঁ-হাত দিয়ে টেনে নেয়। সে বলে, ইচ্ছা ক'রে তোমায় দুঃখ দিতে চাই নি নিখিলেশ। যদি আমার কথায় দুঃখ একান্ত পেয়ে থাক তাতে আমি লজ্জিত।

নিখিলেশ এবার সাড়া দেয়, ক্ষোভ থেকে যে দুঃখের সৃষ্টি সে দুঃখ ঝেড়ে ফেলা যায় আরতি, কিন্তু দুঃখ থেকে যে দুঃখের সৃষ্টি, সে দুঃখ মোছা যায় না।

আরতি খানিকটা আনন্দিত মনে হ'ল, তবুও সংযত। পরে বলে, আমার ত একটা দুঃখ নয় নিখিলেশ, আমার দুঃখটা প্রমথেশকেও ঘিরে। ভাবি, এ এক অন্যায় বিচার, যে পেতে চায় সে পায় না আর যে পায় সে পেতে চায় না। এটাই হয়ত এ বিশ্বের বড় এক সংঘাত। এটাই সৃষ্টির মাঝে অনাসৃষ্টি।

নিখিলেশ ভাবে, কিছুক্ষণ পর বলে, তোমার সত্যকে শ্রদ্ধা না করে পারলাম না আরতি। তুমি যতই হাস না কেন ? তোমার সত্য যে তোমার কতখানি প্রীতির পাত্র সেটা তুমি নিজে না জানলেও আমি জানি। বিশ্বাস কর, আমি এক একসময় ভাবি কিন্তু ভাবতে গিয়েও নিজেকে হারাতে পারি না ; যে-ভাবনা নিজেকে হারাতে না জানলো সে-ভাবনা কি গভীর হ'তে পারে কখনও ?

আরতি চোখ তুলে একবার চেয়ে দেখে নিখিলেশকে, আবার দৃষ্টিটা মাটির দিকে রেখে পথ চলে। খানিকটা হেঁটে আরতি বলে, আজ বাড়ী ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল নিখিলেশ।

নিখিলেশের চিন্তাটা চমকাল একবার। আরতি প্রসঙ্গ পালটাতে চায় কেন ? আর বেশী কথা হ'ল না। বিদায় নেবার আগে আরতি বলে, কাল ত আর দেখা হচ্ছে না, দিল্লী থেকে ফিরে এলে আবার হয়ত দেখা হবে।

নিখিলেশ প্রশ্ন করে, কাল দেখা হবে না কেন ?

আরতি অতি সহজ সুরেই বলে ফেলে যেন, তোমার চোখ যে তোমার পথ চেয়ে রইবে। আরতি একথাটা বলেই যেন অপ্রস্তুত হ'ল মনে মনে। আরতি কিন্তু এ কথাটা বলতে চায় নি মোটেই।

নিখিলেশ ঘুরে তাকাল আরতির দিকে। আরতি জিজ্ঞাসা করে, রাগ করলে?

বেশ গম্ভীর গলায় নিখিলেশ উত্তর দিল, না।

পরদিন, দুপুর বেলায় নিখিলেশ বাইরের পৃথিবীর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিল। তারপর গতকালের কথা মনে পড়ছিল। বাইরের ডেকচেয়ারে বসে তাই সে ভাবছিল, আরতির ওপর অভিমান করা কি তার ঠিক হবে? অভিমানের ক্ষেত্রে অধিকারের প্রশ্ন আছে, তাই সে ঠিক করল, আজ যাবে না সে আরতির কাছে।

বিকালের একটু আগেই বের হ'ল সে। রাত করেই সে ফিরবে চৈতীর কাছ হ'তে।

বাইরের গেটটা খোলার শব্দ হ'তেই চৈতী বেরিয়ে আসে, চৈতী দেখে এটা নিখিলেশের ব্যতিক্রম। এতটা সকালে নিখিলেশ কোনদিনই তার সঙ্গে দেখা করতে আসে নি বড় একটা। যেমন ভাবে গোলাপ গাছে গোলাপ আপনি ফোটে ঠিক তেমনি ভাবে চৈতীর হাসি ফুটে ওঠে ঠোঁটে কিন্তু সপ্রশ্ন দৃষ্টি চোখে, এত সকালে যে?

নিখিলেশ বলে, কাজ ছিল না, তাই এমনি এলাম।

নিখিলেশের কথাগুলি খানিকটা লজ্জাজড়িত। সহজ হবার চেষ্টা করে সে, খুব আশ্চর্য হয়ে গেলে নিশ্চয়ই।

চৈতীর চোখ-মুখ দুটোই একসঙ্গে হেসে ওঠে।

নিখিলেশ প্রশ্ন করে, মাসীমা কি করছেন?

চৈতীর মুখে হাসি তখনও লেগে রয়েছে, বলে, মা নেই।

নিখিলেশ প্রশ্ন করে, কোথায় গিয়েছেন?

চৈতী বলে, ডাঃ মিত্তিরের স্ত্রীর সঙ্গে প্যালেস দেখতে, একেবারে ফাঁকা।

চৈতীর দিকে তাকিয়ে দেখল নিখিলেশ। চৈতী লজ্জা পেল খানিকটা। পরে নিখিলেশও অনেকখানি লজ্জা পেল।

নিখিলেশ বলে, একটু অসুবিধে হচ্ছে না?

চৈতী পাল্টা প্রশ্ন রাখে, কিসের অসুবিধা?

এই আমরা দুজনে কেউই সহজ হ'তে পারছি না। নিখিলেশ জানাল।

চৈতী কোন উত্তর দিল না। মুখটা নামিয়ে রাখে নীচের দিকে। হয়ত এ কথাটা তার নিজেরও।

কিছুক্ষণ পর নিখিলেশ বলে, আজ যাই চৈ।

চৈতী বলে, কেন?

নীচের দিকে মুখটা রেখে নিখিলেশ বলে, এটা প্রয়োজন।

চৈতী এবার কোন কথা বলে না; নিজের হাত মেলে আঙ্গুলগুলি একবার দেখে নেয় সে।

নিখিলেশ বলে, কি উত্তর দিচ্ছ না যে?

চৈতী বলে, তুমি কি কোন প্রশ্ন রেখেছ আমার সামনে?

নিখিলেশ এবার হাসল, আমার কথাগুলি কি প্রশ্ন হ'তে পারে না?

চৈতীও হাসল, পরে বলে, বলবার রীতি তার অনেকাংশে নির্ভর করে, যাক্ গে, তোমার কি হ'ল বল ত? কেবলই বাজে কথার জাল বুনছি আমরা।

নিখিলেশ বলে এটা এক ধরনের পলায়ন চৈ। তাই নয় কি? ভাল ছবির পিছনে পরিবেশ থাকে। ছবি ফুটে উঠবার তারও দায়িত্ব বড় কম নয়। আজকের খাপছাড়া পরিবেশ আমাদের সবার কথাগুলি লাগামছাড়া করে দিচ্ছে।

তাতে দোষটা কার? চৈতী প্রশ্ন করে।

সহজেই নিখিলেশ বলে ফেলে, দু'জনের।

চৈতী চুপ করে। নিখিলেশ যেন আর একমানুষ হয়ে পড়েছে। অদ্ভুত ত?

নিখিলেশ বলে, আমি কিছুতেই মানতে পারছি না চৈ, তুমি হয়ত জান না চৈ। তোমার সামনে আমার অব্যক্ত অনেক ব্যক্ত, তাই চুপ করে থাকি; তুমি হয়ত ভাব, আমি ভাবতে ভালবাসি, তা নয় চৈ। সেখানে অনুভব থাকে প্রবল তাই অভিব্যক্তি কম আর আজ চুপ করে থাকলে কোথায় যেন অনুভবে দ্বিধা আসে। সঙ্কোচে সঙ্কুচিত হচ্ছে সারা মন, তাই ভাব আমার ভাবনা হয়ে উঠেছে।

চৈতী বলে, তোমায় কোন দিনই বুঝতে পারি না নিখিলেশ। তুমি কি ভাবে ভাবতে ভালবাস, কি অনুভূতি তোমার অনুভব জাগায়, মাঝে মাঝে আমার অহঙ্কারকে পীড়িত করে অত্যন্ত নির্মমভাবে। তবুও আমার সান্ত্বনা···।

থামলে কেন চৈ? নিখিলেশ চোখ তোলে।

আমার সান্ত্বনা, সারা জীবন তুমি আমায় বুঝবার সুযোগ দেবে বলে। চৈতী বলে।

নিখিলেশ বলে, সুযোগ নেবার প্রশ্নেও যোগ্যতার প্রশ্ন দেখা দেয়।

চৈতী প্রশ্ন করে, সে যোগ্যতা আমার নিশ্চয়ই আছে?

নিখিলেশ তাকায় চৈতীর মুখের দিকে। চৈতীর চোখ ভারী হয়ে নেমেছে। নিখিলেশ বলে, তোমার-আমার মধ্যে আবার সন্দেহকে পথ করে দিচ্ছ কেন চৈ, ও বস্তু ভয়ানক অন্ধকারের। ওকে দূরে রাখাই ভাল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, আজ ছুটি দাও চৈ।

প্রথম কথাটা শুনে চৈতীর ঠোঁট দুটো মনের সাথে হেসে উঠল যেন। পরে শেষ কথাটা শুনে সেগুলি আচমকা থেমে গেল। চৈতী নিরুত্তর থাকে, পরে বলে, আর একটু বসবে না?

আজ নয় চৈ। মন যখন নিষেধ করেছে একবার তখন আজ যাই। কাল দিল্লী যাচ্ছি। এবার অপেক্ষা করার পালা। অনেক দিন-রাত্রি পেরিয়ে আবার দেখব, আবার দেখা হবে।

চৈতী মুখ ঘোরায়। মুখে রাঙ্গা হাসি, চোখে স্মিত দৃষ্টি. আলো আঁধারের ঘন ঘন ছায়া ছায়া ব্যক্ত-অব্যক্তের দোলা। হয়ত কিছু বলা, কিছু না-বলা মন আজ চোখে এসে বাসা বাঁধতে চায়। নিখিলেশ স্তব্ধ। চৈতীর হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে ছুটি নেয় সে।

বিকালের শেষ নিঙড়ানো রোদ, গলানো সোনার মত গাছের মাথায় মাথায় রঙের ছোপ ধরিয়েছে; গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে বাঁকা হয়ে এসে পড়েছে ওদের দু'জনের সামনে। দূরের পিচ-ঢালা পথটার দিকে তাকিয়ে নিখিলেশ বলে, তুমি বিশ্বাস কর আরতি, আমি আমার সত্যকে এড়াতে আজ পারি নি। ভেবেছিলাম আসব না, তবুও টেনে আনল। পারলাম না তাই নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিতে। তুমি কি বলতে চাও, এ সত্য আমার মনের নয়?

আরতি হাসল একবার, পরে বলে, আমি কি তাই বলেছি নিখিলেশ, তুমি অভিমান করে আসবে না ঠিক করেছিলে তবুও এলে, এতে আমারই এক বড় লাভ। যদি প্রশ্ন কর, কেন? 'তবে বলব, তুমিও আপার ওপর অভিমান করতে জান।

নিখিলেশ প্রশ্ন করে, এই সামান্য লাভেও তুমি সন্তুষ্ট আরতি?

আরতি বলে, সবটা লোকসানে যেতে দিতে মন চায় না।

মেঘটা খয়েরী ছিল একটু আগে সেটা গোলাপী হয়ে এল সহসা, সেদিকে তাকিয়েছিল এক নিবিষ্টে। আরতি নিখিলেশের দিকে একবার তাকিয়ে মুখটা নামিয়ে নেয়।

নিখিলেশ বলে, আমি বুঝতে পারছি আরতি, মনের খাতাটা ব্যাঙ্কের খাতার চেয়ে স্বতন্ত্র।

আরতি প্রশ্ন করে, কেন?

নিখিলেশ বলে, আমার মধ্যেও অনুতাপ আজ মাথা খুঁড়ছে বারে বারে। শুধু এই কথাই বলে চলেছে, অনুতাপ চিত্তের শোধন না চিত্তের দংশন।

এটা তোমার ভুল নিখিলেশ। মন যেখানে অনুতাপে পোড়ে সে অনুতাপ দুর্বলতার, ন্যায়-অন্যায় সবই ত তোমার মন জানে, তবে এ তোল কেন?

নিখিলেশ আবার চুপ করে, পরে বলে, মন না জানে এমন ন্যায়-অন্যায় আমরা অহরহই করে থাকি।

আরতি বলে, সে মন অন্ধকারের নিখিলেশ।

নিখিলেশ বলে, আমি বুঝি না আরতি, আমাদের সব চাওয়ার পিছনে পাওয়ার প্রেরণা থাকে সেই পাওয়াই যদি হারিয়ে গেল তবে এ চাওয়ার অর্থ কি?

আরতি হেসে ফেলে, বলে, সেটা সৃষ্টি নয়। প্রেরণার কথা যখন আনলে তবে বলব সেটা প্রেরণা নয়, প্রবৃত্তি। প্রেরণার উৎস আপন মনের গভীরতা থেকে।

নিখিলেশ এবার কিছু বলে না। আরতি বলে, তুমি জান না হয়ত আজ প্রমথেশ এসেছিল, নানা হাসি-গল্পে সকালটা কেটে গেল, আমি জানি ও কি বলতে চায়। কিন্তু তবুও ওকে এমন সুযোগ আমি দিই নি যাতে সে প্রসঙ্গও টানতে পারে। কিন্তু কি আশ্চর্য সে-প্রসঙ্গ ও টেনেছিল। বলত নিখিলেশ, যে-প্রসঙ্গ এড়ানোর জন্য আমি এত সজাগ ছিলাম সে-প্রসঙ্গ ও টেনে আনতে পেরেছিল কি ক'রে?

নিখিলেশ চেয়ে থাকে আরতির দিকে।

আরতি বলে, এটাই হ'ল ওর প্রেরণা। ওর মনের গভীরতা থেকে যে-প্রশ্ন বার বার উঁকি দেয় সে-প্রশ্ন ওর আপনা হতেই প্রকাশ পেল, আমি না চাইলেও।

নিখিলেশ বলে, তুমি কি বললে?

আরতি বলে, সেদিন যার আভাস মাত্র দিয়েছিলাম সেটা আজ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলাম।

তুমি ভুল করলে আরতি, এটা যে তার পক্ষে কত বড় আঘাত তা তুমি জানতে না?

আরতি বলে, আঘাত জেনেই ত আঘাত করলাম। ভাবলাম, আঘাত পেয়ে বকুল ঝরার মত ঝরে পড়বে

নিখিলেশ চোখ তোলে।

আরতি বলে, সে-কথার কোন প্রত্যুত্তরই দিল না। শুধু বলল, সব মিলিয়ে ভালবাসার সার্থকতাই ত এটা। সারা মনপ্রাণ দিয়ে ঢেলে যাকে সাজিয়েছি, সে সাজানো টাই আমার সত্য, এর বাইরে আমার কোন সত্য নাই।

নিখিলেশ প্রশ্ন করে, এর উত্তরে তুমি কিছু বললে না?

আরতি বলে, বলতে পারলাম কই? সব কথাই আমার হারিয়ে গেল। ভাবলাম, এটা কি হ'ল? অথচ এটা ত আমি চাই নি। পরে অবশ্য ওকে বলেছিলাম, আমার মধ্যকার ফাঁকি নিয়ে তুমি ফাঁক পূরণ করতে চেয়ো না প্রমথেশ। ওতে তোমার আদর্শ আহত হবে।

এর উত্তরে ও কি বলল জান? ও বলল, আমি ত শূন্য পূরণ করতে চাই নি আরতি, আমি চেয়েছি তোমার মধ্যেকার ফাঁকিকে ভরে তুলতে, কেননা তুমি ত নকল নও, তাই আদর্শের হাতে অচল হবার ভয় নাই।

নিখিলেশ বলে, এটা কথা না কথিকা বুঝি না আরতি।

আরতি বলে, আমিও ঠিক তাই।

সন্ধ্যা নেমেছে জানান না দিয়েই, ওরা কেউ বুঝতে পারে নি। শিশিরের শব্দের মত কখন যে সন্ধ্যা এসে গেছে খেয়াল ছিল না। অন্ধকার ঘিরেছে তাদের দুজনকেই, কুয়াশা পড়ছে ভয়ানক। কাছের আরতি মনে হচ্ছে দূরের যেন। অন্ধকারে আরতির মুখ আবছা দেখে নিখিলেশ। আরতির হাত টেনে নেয় নিখিলেশ। হঠাৎ হাতটা যে কেন টেনে নিল নিখিলেশ বুঝতে পারে না। আরতি হাতটা এলিয়ে দেয় নিখিলেশের কোলে। নিখিলেশ চুপ করে থাকে, কিছুক্ষণ পর বলে, তুমি প্রমথেশকেই বিয়ে কর আরতি।

আরতি চোখ তোলে। অনুমান হ'ল নিখিলেশের। প্রথমটা আরতি কোন কথা বলে না, পরে বলে, আমি তাই কিছু সময় চেয়ে নিয়েছি প্রমথেশের কাছে।

নিখিলেশ প্রশ্ন করে, প্রমথেশ আপত্তি করে নি?

আরতি বলে, না।

আবার চুপচাপ। একটা ছিপ নৌকা সামনে দিয়ে খুব জোরে বেরিয়ে গেল। মাছ-ধরার নৌকা হবে হয়ত।

আরতি বলে, রাত হয়ে এল অনেক, এবার ওঠা যাক।

নিখিলেশ আরতির হাতটা নামিয়ে দেয় কোল থেকে, পরে বলে, বেশ, ওঠ।

রাস্তায় আরতি বলে, তুমি কালকে ত দিল্লী যাচ্ছ ফাল্গুনের আগে ফিরছ না নিশ্চয়ই।

নিখিলেশ কথার কোন উত্তর দেয় না। মাথা নাড়ে শুধু।

আরতি নিজের ব্যাগ থেকে একটা ছোট্ট কার্ড বের করে, বলে, এটা আমার দার্জিলিং-এর ঠিকানা, তুমি যদি কখনও সময় পাও ত যেও।

নিখিলেশের সপ্রশ্ন দৃষ্টি আরতির ওপর, বলে, তুমি দার্জিলিং চললে নাকি?

সংক্ষেপে আরতি বলে, হুঁ।

নিখিলেশ বলে, কবে?

আরতি বলে, সামনের সপ্তাহে।

তারপর আর কোন কথা হয় নি। নিঃশব্দে বিচ্ছেদ হ'ল।

আরতি সেদিন দার্জিলিং পাহাড়ে। টেলিগ্রাম এল দিল্লীর ঠিকানায়। নিখিলেশ বিব্রত হ'ল। টেলিগ্রামের ভাষাই নিখিলেশকে বিব্রত করেছে। পর পর দুটো একটা বাড়ী থেকে আর একটা। চৈতীর মা করেছেন কলকাতা যেতে লিখেছেন।

কেমিষ্ট্রী ক্লাসে সামান্য অ্যাসিড সলিউশন করতে গিয়ে নাইট্রিক অ্যাসিড পড়ে একটা চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছে চৈতীর। হাসপাতালের বেডে কয়দিন থাকতে হয়েছিল তারপর আর হাসপাতালে নয়, গোটা একটা বাড়ী ভাড়া করেছেন চৈতীর বাবা।

নিখিলেশ স্তব্ধ, নির্বাক্। অস্ফুট বেদনা সারা মুখে এনে দিয়েছে বিষাদ আর নিরাশার ছবি। এ বেদনা, এ ব্যথা সারা মনের, সারা হৃদয়ের। চৈতী নিখিলেশের সাড়া পেয়েই সাড়া দিয়ে উঠেছে।

নিখিলেশ এগিয়ে গিয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসেছে নিজের জায়গায় এ চৈতী ত সে চৈতী নয়। কোথায় গেল সে? হারিয়ে গেল কি? নিজের মাথার চুলে হাত দিয়ে বাইরের চলমান জনসমুদ্রের দিকে তাকিয়ে একটা গোটা দিনই কেটে গেছে নিখিলেশের।

রাতে ডাক দিল চৈতী। নিখিলেশ সাড়া দিয়েছিল। চৈতী আবার ডাক দেয়, কোথায় তুমি, এত দূরে কেন নিখিলেশ?

নিখিলেশ উত্তর দিতে পারে নি। কে দূর করল নিখিলেশকে? প্রশ্নটা ছুড়ে দিল নিজের মধ্যে। প্রশ্ন ত আর চুম্বক নয় যেটা উত্তর টেনে বের করবে।

চৈতীর দুটো চোখই বাঁধা। একটা চোখ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছে ডাক্তার সেই কথাই বলেছেন। অপারেশন

। চৈতী আবার ডাক দেয়, একটু কাছে এস না
খিলেশ।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিখিলেশ কাছে যায়। নিখিলেশ
খ ঘুরিয়ে থাকে অন্যদিকে। চৈতী বলে, এ কি হ'ল
খিলেশ।

নিখিলেশ কথা বলে না। কে যেন বোবা করে
য়েছে তাকে।

এমারজেন্সী জানিয়ে সে ছুটি চেয়ে পাঠিয়েছে আরও
ত দিনের।

পাহাড়ের গায়ে দু'জনে তখনও বসে। সূর্য ডুবে
ছে, হিম পড়ছে বাইরে। ঘরে উঠে এল, বাইরের
তের চেয়ে আরতির মনের শীতলতা অনেক বেশী।

আরতি নিখিলেশের কথা শুনে হেসেছিল। নিখিলেশ
হত হ'ল ভয়ানক ভাবে। নিখিলেশ তবুও প্রশ্ন করে,
কি হ'ল আরতি?

আরতি কথা বলে না। নিখিলেশ বলে, তুমি কোন
থা বলছ না কেন আরতি?

আমার ত কিছু বলার নেই, নিখিলেশ।

তবুও তুমি চুপ করেই থাকবে?

আরতি বলে, তোমার কথাই চুপ করিয়ে দিয়েছে
মাকে, নিখিলেশ।

নিখিলেশ প্রশ্ন করে, কেন?

আরতি বলে, এতে আর প্রশ্ন তুলো না, তাতে
মার চেয়ে তুমিই বিব্রত হবে বেশী।

নিখিলেশ বলে, তোমার কিছু না-বলাতে কম বিব্রত
চ্ছি না।

আরতি চুপ করে থাকে। একটু থেমে পরে বলে,
মার কিছু বলাতেই কি সব প্রশ্নের উত্তর মিলবে?

উত্তর না মিললেও সান্ত্বনা মিলবে আরতি।

আরতি বলে, সান্ত্বনা চেয়ে আর ছোট হয়ো না
খিলেশ, বরং মেলাতে চেষ্টা কর।

খানিক থেমে নিখিলেশ বলে, চৈতী আর আমি
টো আলাদা হয়ে গিয়েছি, সেটা লক্ষ্য করেছ কি?
মলাতে চেষ্টা করলেও কি মেলানো সম্ভব হবে?

আরতি বলে, সেটাই সম্ভব করতে হবে নিখিলেশ।

এ তুমি অন্যায় বলছ আরতি। নিখিলেশের দৃষ্টিতে
প্রতিবাদের চিহ্ন।

আরতি বলে, এটা অন্যায় নয় নিখিলেশ। সেদিন
বলেছিলাম মনে আছে হয়ত তোমার, অখণ্ড সত্তাই
ভালবাসার প্রাণ। আজ চৈতীর একটা মাত্র অভাবই
তোমার চোখে বড় হয়ে ধরা দিল, বাকীগুলি তুমি
ভুলতে সুরু করলে।

নিখিলেশ বলে, তুমি প্রাণকে হত্যা করে প্রাণের
প্রতিষ্ঠা কি করে আশা কর আরতি? যে চৈতী একদিন
আমার সামনে আলো আনত, সেই চৈতী আজ অন্ধকার
আনছে। এত অন্ধকারের মধ্যে আলোর প্রতিষ্ঠা
কি করে সম্ভব, কি করে সম্ভব আবার নতুন করে নতুন
জীবনকে স্থায়িত্ব দেওয়া?

আরতি বলে, ওটা তোমার অনুযোগ নিখিলেশ।
পৃথিবীতে আলোও যেমন সত্য, অন্ধকারও ঠিক তেমনি
সত্য।

নিখিলেশ বলে ওঠে, পৃথিবীর সব সাধনাই ত
আলোর সাধনা।

আরতি বলে, অন্ধকারকে এড়িয়ে নয় নিশ্চয়ই।

নিখিলেশ চুপ করে। আরতি একটু থেমে আবার
বলে, তুমি ফিরে যাও নিখিলেশ। চৈতীকে গ্রহণ কর
তোমার সমস্ত অনুযোগ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে। অন্ধকারের
মধ্যে আলোকের প্রতিষ্ঠা কর, সেটাই কঠিনতম সাধনা,
সেটাই তোমার ব্রত। কিছুক্ষণ থেমে পরে আবার বলে,
ভালবাসা একটা ব্রত, এটা ভুলে যেও না নিখিলেশ।

নিখিলেশ নির্বাক্। কাঁচের সার্সি-আঁটা জানলার
দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে পরে চোখ তুলে চায় আরতির
দিকে। আরতি চেয়ে আছে নির্নিমেষ নয়নে। নিখিলেশ
বলে, তুমি আমার সঙ্গে চল আরতি।

আরতি বলে, না, সে হয় না নিখিলেশ, তুমি একাই
যাও।

নিখিলেশ প্রশ্ন করে, কেন?

আরতি বলে, আমি যে প্রমথেশকে কথা দিয়েছি।

গান

ভূমিকা

বাংলা দেশে বাঙালীর প্রতিষ্ঠিত প্রথম সেবা-প্রতিষ্ঠান দাসাশ্রম—মৃগাঙ্কধর রায়চৌধুরী, ক্ষীরোদচন্দ্র দাস ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যাহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন—সাধক ইন্দুভূষণ রায় ছিলেন সেই দাসাশ্রমেরই প্রধান সেবাদাস। ইন্দুভূষণ রায় মরমিয়া সাধক ছিলেন। ১৮৮০ হইতে ১৮৯০ সালের মধ্যে "প্রকৃতি-গায়িকা" নামে তিনি গানগুলি রচনা করেন। তিনি সুকণ্ঠ ছিলেন এবং ভক্তজনসমাজে, একতারা বা এস্রাজ সহযোগে, গানগুলি তিনি গাহিতেন। বরিশালে, অশ্বিনীকুমার দত্ত, জগদীশ মুখোপাধ্যায় (মাষ্টার-মশায়), মনোমোহন চক্রবর্তী, বরদাকান্ত রায়, রেবতীমোহন সেন, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা প্রভৃতি ভক্তদল তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিয়া ভাবোন্মত্ত প্রাণে তাঁহার গান শুনিতেন। জগদীশ মুখোপাধ্যায় যেমন জ্ঞানী তেমনি ভক্ত মানুষ ছিলেন। প্রধানতঃ তিনিই—মনে হয় অশ্বিনী বাবুর অর্থানুকূল্যে—গানগুলিকে "রসলীলা" এই নামে বিস্তারিত টীকাসহ পুস্তকাকারে মুদ্রিত করেন।

ভক্ত ইন্দুভূষণ—১৮৯৩ সালে—কিছুকাল দেওঘরে অবস্থান কালে রাজনারায়ণ বসু মহাশয়, নিত্য সন্ধ্যায় ডুলি করিয়া ইন্দুভূষণের সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইতেন।

"সে কোন জোছনা দেশ সই রে" এই গানটি শুনিতে শুনিতে বসু মহাশয় মত্ত হইয়া পড়িতেন এবং ইংরাজি ভাষায় উচ্চতম প্রশংসার বাণী সকল উচ্ছ্বসিত হইয়া উচ্চারণ করিতেন। জগদীশ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, ইংরাজিতে লিখিত সেই উচ্ছ্বাস বাণী রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের নিকট হইতে আনাইয়া "রসলীলা"র পিছনে মলাটের উপর ছাপাইয়াছিলেন, আমি সেই লেখা পড়িয়াছি। জ

বেহাগ | ত্রিতাল

সে কোন্ জোছনা-দেশ সই রে।
যেথা অগণন চকোর মধুপানে বিভোর
নাহি জানে নিত্য সুখ বই রে॥
পাষাণ ভেদিয়া ফুটে জীবনের ফুল রে,
সাগর অমৃতময় নাহি তার কূল রে,
সেথা প্রেম-নিঝরিণী যত উরধগামিনী
কই সে দেশ সই কই রে॥
বদন সোহাগে চুমে চরণের মূল রে,
প্রাণময়ী ভাষা যথা নাহি তায় ভুল রে,
যে দেশের অভিধানে দুখ মানে সুখ রে,
তুমি মানে আমি বই নই রে।
সাকার ডুবিয়া মনে নিরাকার চুপে,
নিরাকার ফুটে উঠে সাকার রূপে,
নিরাধার মহাপ্রাণ দিবানিশি জাগে,
কই সে দেশ সই কই রে॥

কথা ও সুর: ইন্দুভূষণ রায় সুরস্মৃতি: শ্রীজীবনময় রায়
স্বরলিপি: শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস

I গা গা গা -া | গা গা গমা রা | গা -মা পা মা | গা -া গমা -রা I
যে দে শে র্ অ ভি ধা০ নে দু খ্ মা নে সু খ্ রে০ ০

I রা গা মা পা | মা মা গা -া | রগা -গগা -গগা -ন্‌রা | সা -া -া -া I
তু মি মা নে আ মি ব ই ন০ ০০ ০০ ০ই রে ০ ০ ০

I পা পা -না না | না না না নর্সা | র্সা র্সা র্সা -া | সর্রা -নর্সা র্সা -া I
সা কা র্ ডু বি য়া ম রে০ নি রা কা র্ চু০ ০০ পে ০

I পা পর্সা র্সা -া | র্সা র্সা সর্রা র্সা | না -ধা ধপা -া | ধনা -র্সা ধনা -া I
নি রা কা র্ ফু টে উ০ ঠে সা ০ কা র্ রূ০ ০ পে ০

I {পা পা পা -া | পা পা পা -া | সপা পা পা পা | পা -া পা -ধা I
নি রা০ ধা র্ ম হা প্রা ণ দি০ বা নি শি জা ০ গে ০

I ণা-র্সা-ণা ণধা | ণর্সা-ণধা-পা-া | পা-ধা-পা-মপা | মগা-া (গা মা)} | রসা-ন্‌সা II II
ক ০ ই সে দে০ ০শ্ স ই ক ০ ০ ০ই রে০ ০ সে থা ০০ ০০

উর্বশীর মন

শ্রীঅজিত চট্টোপাধ্যায়

র্বশী সেনের রূপের সঙ্গে উর্বশীর কোন তুলনা হয় না। তবু মেয়ে হবার পর বাবা-মা আদর করে নাম রাখলেন উর্বশী। ছেলেপিলে সকলেই সুন্দর হয় না। তবু সুন্দর একটি নাম রাখতে সাধ যায় বৈকি! পাড়া-পড়শী আড়ালে বলেছিল, মায়ের রূপের একটুও পায়নি উর্বশী। সবটাই বাপের মত। কথাটা মিথ্যে নয়। উর্বশীর মা সত্যিকার সুন্দরী। বয়স এলেও শরীরের বাঁধন আজও ঢিলে হয় নি তার। গায়ের রং একটুও মলিন হয় নি। সেই যৌবনদিনের গোলাপী রঙের মত আজও তার ত্বক উজ্জ্বল, অমলিন।

সে তুলনায় উর্বশীর বাবা রীতিমত অসুন্দর। বেঁটে-খাটো ভদ্রলোক। গায়ের রং আঁধারবর্ণ। পুরু ঠোঁটের সঙ্গে মাংসল গাল দুটো তার চেহারাটাকে আরও বেমানান করে দিয়েছে। মাথার চুল মিশমিশে কালো কিন্তু পাতলা ও চিক্কণ নয়। বাপের গায়ের রং পুরোটাই উর্বশীর গায়ে এল। তেমন লম্বা হ'ল না মেয়ে। মরালীর মত গ্রীবাদেশ কাঁধ ছাড়িয়ে অনেকখানি উঠল না। শুধু চোখ দুটো মায়ের মত হ'ল উর্বশীর। টানা টানা আয়ত কালো চোখ। কাজল পরিয়ে দিলে আরও সুন্দর লাগত।

রূপ না থাকলেও রূপোর পয় উর্বশীর। ওর জন্মের পরেই বিপিনবাবুর প্র্যাকটিশ উঠল জমে। কেমন করে যে করে নাম ছড়াল, বিপিনবাবু নিজেই ভাল করে বুঝে উঠতে পারলেন না। শুধু একদিন মনে হ'ল এটর্ণীরা যে পাড়াবন্দী কেস পাঠাচ্ছে আর সেগুলি নেওয়া যাবে না।

বছর না ঘুরতেই বিপিনবাবু ফুলে-ফেঁপে উঠলেন। পুরণো গাড়িটা বেচে দিয়ে নতুন মডেলের বিলিতী গাড়ি এল। শ্যামবাজারের বাড়ী ছেড়ে দিয়ে বালিগঞ্জের নতুন বাড়ীতে এলেন উঠে। জায়গা কিনলেন লেকের কাছে। একটা নাম করা কন্ট্রাক্টর ফার্মকে প্ল্যানমাফিক বাড়ী করতে বলে পাঠালেন।

নতুন বাড়ীতে এসে উর্বশীর ঠাকুমা একদিন বলেছিলেন,—'এ মেয়ের নাম তুই পাল্টে দে বিপিন। উর্বশী কেন হবে, মেয়ে তোর লক্ষ্মী। যেদিন তোর ঘরে এসেছে সেদিন থেকেই বাড় বাড়ন্ত। তুই নিঃশ্বেস ফেলতে সময় পাচ্ছিস নে।' একটু থেমে আবার শোবার ঘরের দিকে চেয়ে জোর গলায় বললেন, 'রূপ নিয়ে কি হবে? শুধু রূপ ধুয়ে ত আর জল খাওয়া যায় না। আয়-পয় থাকে তবে বুঝি—'

কথাটা উর্বশীর মাকে উদ্দেশ্য করে শোনানো। বাপের অবস্থা ভাল নয় তেমন। শুধু রূপের জোরেই বিয়ে হয়েছিল। ভাল ঘরে, ভাল বরে। তখন ওকালতি সবে সুরু করেছেন বিপিন। একদিন মক্কেল আসে ত, দশদিন মাছি তাড়াতে হয়। এমনি অবস্থা প্রায় ছ'বছর। সে দিনগুলো মনে পড়লে ভয় পান বিপিনবিহারী।

দেখতে-শুনতে তেমন না হ'লেও লেখাপড়ায় মাঝামাঝি। লরেটো থেকেই স্কুলের গণ্ডি পেরুল উর্বশী। লরেটো কলেজেই রয়ে গেল। একবার ইচ্ছে হয়েছিল স্কটিশে যায়। কিন্তু বিপিনবিহারী মত দেন নি। তাছাড়া বড্ড দূর। লেক থেকে অনেকখানি।

মেজে-ঘষে নিজেকে মোটামুটি চলনসই করে নিল উর্বশী। কলেজে এসে প্রথম জানল নিজেকে। ভেজানো ঘরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। শরীরের সমস্ত গঠন, খুঁত, সৌন্দর্য আঁতি-পাতি করে খুঁজে বেড়াল। তারপর থেকেই নিজেকে নিয়ে পড়ল উর্বশী। সবটুকু আড়াল করে শুধু সৌন্দর্য-টুকু মেলে ধরা। নিরলস সাধনা উর্বশীর। অল্পদিনেই নতুন আর্টে সে পারদর্শিনী হয়ে উঠল। কলেজে সঙ্গিনীদের মধ্যে, বাড়ীতে ঘরোয়া পরিবেশে, বাইরের পার্টি আর পিকনিকে উর্বশী সেন অনায়াস দক্ষতায় সকলের সঙ্গে সুন্দর ভাবে মিশল।

বি. এ. পাশ করে বেশীদিন বসে থাকতে হ'ল না। বাইশ পেরোবার আগে পদবী বদল হ'ল উর্বশীর। রায় থেকে সেন। ওর প্রিয় বন্ধুরা বলল, গায়ের রং ফর্সা না হ'লে কি হবে? উর্বশী সব মিলিয়ে দেখতে কি খারাপ? বিমান সেন পছন্দ করেই বিয়ে করেছেন। চমৎকার ম্যাচ হয়েছে দু'জনের।

উর্বশীকে যারা হিংসে করত, তারা অন্য কথা রটাল। উর্বশীকে বিয়ে না করে উপায় ছিল না বিমান সেনের। নতুন উকীলের কি অমনি পসার হয়? শ্বশুর যদি মুরুব্বী হন তা হ'লে জুনিয়র করে নেবেন অনেক কেসে।

ছোটখাটো মোকদ্দমার নিজেই সওয়াল করবে। কদিন আর হাইকোর্টে বেরুচ্ছে বিমান সেন? অমন উকীল করিডোরে গিজগিজ করছে। আর কম টাকা নিয়েছে না কি বিমান সেন? পেইন্টের আড়ালে কতখানি আর লুকোতে পেরেছে উর্বশী, কালো মেয়ে ব'লে কি দ্বিগুণ টাকা ঢালতে হয় নি বিপিনবাবুকে?

টাকা নিয়ে বিপিনবাবুর চিন্তা ছিল না। কোন এক অদৃশ্য দেবতা কয়েক বৎসর ধরে তার দিক লক্ষ্য ক'রে শুধু নোটের তোড়া ছুঁড়ে চলেছেন। বিপিনবাবুর কাজ শুধু লুফে নেওয়া। খেলা বেশ জমে উঠেছে। লোফা-লুফি খেলা। বিপিনবাবু শুধু লুফে নিচ্ছেন।

বিমান সেনের অবস্থা ভাল। সত্যি লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে উর্বশী। বাড়ীতে আসার পরই রোজগার বেড়ে গেল বিমান সেনের। পৈতৃক আমলের হিলম্যান গাড়ি ছিল। সেটা ছাড়া আর একটা ফিয়াট্ নিল উর্বশী। ছোটখাটো গাড়ি। নিজেই চালাবে। নিউ আলিপুরের বাড়ীর লনে ছুটির দিনের সন্ধ্যেয় বুফে ডিনারের আয়োজন প্রায়ই হতে লাগল। দরজা-জানলার পুরণো পর্দাগুলো বাতিল করে সুন্দর জাপানী কাপড়ের পর্দা ঝুলিয়ে দিল উর্বশী। আসল কথাটা হ'ল রুচি। পয়সা অনেকেরই থাকে। কিন্তু সুন্দর ছিমছাম জীবনযাত্রা ক'জন লোকের? বেঁচে থাকা একটা আর্ট। উর্বশী সেন বিমানকে কথাটা নানাভাবে বোঝাল।

মোটামুটি বশ করেছিল উর্বশী। বিমান ওকে ভালবাসতে সুরু করল। রঙে যেটুকু ঘাটতি ছিল, লাস্যে-হাস্যে সেটুকু পুরণ করে দিল উর্বশী। আদর করে একটা ছোটখাটো নাম দিতে চেয়েছিল বিমান। কিন্তু উর্বশী রাজী হয় নি। বিমানের কানের কাছে মুখ এনে সে শুধু ফিসফিস করে বলল, 'অন্য নাম নয়, তোমার কাছে শুধু উর্বশী নামেই থাকতে চাই।'

দু'বৎসর পর মেয়ে এল কোলে। উর্বশীর মেয়ে। বিমান বলেছিল, মেনকা নাম থাক।

ঠোঁট উল্টিয়ে উর্বশী বলল, 'ছাই পছন্দ তোমার। ওর নাম রাখব ডোডো।'

'সে কি?' বিমান হেসে বলল, 'উর্বশীর মেয়ে ডোডো হবে কেন?

'আমার ইচ্ছে'। একটা নারীসুলভ কটাক্ষ করল উর্বশী। বলল, 'বিমানবাবুর মেয়ের নাম তা হ'লে এয়ার হোস্টেস রাখতে হয়।

দুপুরের দিকে হাত খালি। কোন কাজ নেই। ডোডো ঘুমোয়। অবশ্য ওর জন্য আয়া আছে। তারই হেফাজতে ডোডো থাকে। উর্বশী শুধু গাল টিপে আদর করে মেয়েকে। কিংবা আয়া সাজিয়ে দিলে অতিথি-অভ্যাগতের সামনে মেয়েকে কোলে নিয়ে দাঁড়ায়।

কার্তিকের শেষে হাওয়ায় শীতের ঈষৎ কাঁপন লেগেছে। নিউ আলিপুরের গাছে গাছে পাতা ঝরার দিন এল ব'লে। আকাশ ঝকঝকে নীল। রোদ ম্লান, নিরুত্তাপ।

অন্য দিনের মতই ফিয়াট্ গাড়িখানা নিয়ে বেরুল উর্বশী। বাপের বাড়ীতেই ড্রাইভিং শিখেছিল; লাইসেন্স নিয়েছে। বিয়ের পর এলোমেলো মোটরিং করে অনেক সহজ হয়েছে। এখন অনায়াসে এগিয়ে যায় কলকাতার রাজপথে ভিড়ের মধ্যেও দ্রুতগতিতে গাড়ি চালাতে অনেকে দেখেছে উর্বশীকে। চোখে সানগ্লাস, কানের কাছে চুলগুলো অল্প অল্প উড়ছে।

পার্ক ষ্ট্রীটে ঢুকে বাঁ-দিকে থামল উর্বশী। গাড়িখানা রাখার পক্ষে এই জায়গাটাই ভাল। কি ভীষণ বেড়ে গেছে গাড়ির সংখ্যা। কলকাতায় হয়ত এমন দিন আসবে যখন মাইলখানেক দূরে গাড়ি রেখে মানুষকে হেঁটে গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে হবে। নিজের মনে একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব অনুভব করল উর্বশী। জিভের সাহায্যে একটা চুক্ চুক্ শব্দ করল।

রাস্তা পেরিয়েই বড় দোকানটা। নানা ধরণের পাথর আর গহনার সম্ভার। শপিং করতে এসে মাঝে মাঝে এখানটায় ঢোকে উর্বশী। পাথর খুঁজে বেরানো একটা 'হবি' ওর। গহনায় পাথর বসিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখবে। ওর অধিকাংশ গহনাতেই পাথর সেটিং আছে। মাঝে মাঝে বদলায় উর্বশী। একটা পাথর অনেকদিন ধরে পরবে না।

দোকানদার চেনে ওকে। মোটা মতন গুজরাতী ভদ্রলোক, জহুরীর চোখ। শুধু পাথর নয়, ইচ্ছুক ক্রেতাদের মধ্যে আসল আর মেকি যাচাই করে নিতে দেরী হয় না, উর্বশীকে প্রথম দিনই আবিষ্কার করেছিলেন ভদ্রলোক। সমাদর করে নিয়ে এসেছিলেন ভিতরে। চেয়ারে বসিয়ে আগেই অফার করলেন এক পাত্র দামী আইসক্রীম।

উর্বশী মৃদু আপত্তি জানিয়েছিল।

সেই থেকে দোকানটায় মাঝে মাঝে আসে উর্বশী বিমানকেও নিয়ে এসেছে দু'একবার।

গুজরাতী ভদ্রলোক কাজ করছিলেন। ঝানু সেলসম্যান। ক্রেতার মনোরঞ্জন করা সুন্দর আয়ত্ত। উর্বশীকে দেখে হেসে বললেন, 'আসুন ম্যাডাম

...স মাস ধরে ত আপনাকেই প্রতীক্ষা ...ছি।'

'কেন? আমি ছাড়া আর কি খদ্দের নেই আপনার?'

ভদ্রলোক উদাসীনের মত হাসলেন।

'নেই কেন? কেনার লোক ত অনেকই আছে। কিন্তু আসল ব্যাপার জানেন কি ম্যাডাম। আমার জিনিসগুলো তাদেরই হাতে দিতে মন চায়, যাদের রুচি আছে। শিল্পীর মন আছে।'

অল্পবিস্তর তোষামোদ। উর্বশী বোঝে। তবু শুনতে ভাল লাগে। শুনতে ইচ্ছে করে। বিশেষ করে মেয়েদের। স্তুতি পেলে আর কিছু চায় না। তাকে ...র তুলে দিতে পারে। কিছু অদেয় থাকে না।

'নতুন কি পাথর-টাথর এসেছে দেখান।' উর্বশী চেয়ারে বসতে বসতে বলল।

ভদ্রলোক যেন তৈরী ছিলেন। দুটো বাক্স খুলে ধরলেন সামনে। নানা রঙের, নানা ধরণের। নানা সাইজের পাথর।

একটা মালা ভারী পছন্দ হ'ল উর্বশীর। লাল পাথরের সারি, অনেকটা রুদ্রাক্ষের মালার মত। গুণে গুণে পাথরগুলো দেখল উর্বশী। গলায় পরল একবার। দোকানের চেম্বারে ঢুকে আয়নার সামনে দাঁড়াল। নানা-ভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিজেকে দেখল। তাকে মানায়। খুব সুন্দর লাগে।

গুজরাতী ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'ম্যাডাম, ক্ষমা করলে একটা কথা বলি।'

'বলুন না।' উর্বশী অভয় দিল।

'আপনাকে যা দেখাচ্ছিল না। স্প্লেনডিড।'

উর্বশী খুশী হ'ল। মালাটা খুলতে খুলতে বলল, 'কি দাম বলুন?'

'সাত শ।'

একটু যেন মিইয়ে গেল উর্বশী। চোখ দুটো সামান্য করুণ দেখাল। ঠিক এতটা দাম আশা করেনি। একটু ভারী গলায় বলল, সাত'শ দাম?

'ওটা রেয়ার ষ্টোন ম্যাডাম। একটাই মালা এসেছে।'

কি একটু ভাবল উর্বশী। তারপর আবার ঝল্-মলিয়ে উঠল। চোখ দু'টি খুশী-খুশী, ঠোঁটের কোনে মিষ্টি হাসি। বলল, 'রেখে দিন আজ। কাল-পরশুই ওকে নিয়ে আসছি। দেখবেন, আবার কাউকে বেচে দেবেন না যেন।'

ভদ্রলোক এমন একটা ভাব দেখালেন যেন মালা-খানা দু-চারদিনের জন্য নয়, সমস্ত জীবনভোর উর্বশীর জন্য তুলে রাখবেন।

বলচেন, 'আগেই ত বলেছি ম্যাডাম। আমার জিনিষ সবাইকে বিক্রী করতে মন যায় না। আপনি বললেন, আর কি যাকে-তাকে বেচে দিতে পারি?'

রাস্তায় নামল উর্বশী। ঘড়ির কাঁটায় চোখ রাখল। তিনটে বাজতে দেরি নেই। এবার ফিরবে। হঠাৎ ওর মনে কেমন একটা বিষণ্ণ আর্দ্রতা ভেসে এল। লাল পাথরের মালাটা নিয়ে ফিরতে পারলে খুব উৎসাহিত বোধ করত উর্বশী। কিন্তু সাত শ' টাকা দাম, বিমানকে না ব'লে কাজটা করা ঠিক হ'ত না।

গাড়ির কাছে আসতেই কে একটি মেয়ে এগিয়ে এল ওর কাছে। উর্বশী মুখ তুলে চাইল। অল্পবয়সী মেয়ে। বাইশ-তেইশের বেশি নয়। পরণের কাপড়-চোপড় অতি সাধারণ। পায়ের স্লিপারগুলো রীতিমত জীর্ণ।

'একটু সাহায্য করবেন আমায়?'

'কি সাহায্য?' উর্বশী যেন খানিকটা আঁচ করল।

'বড় বিপদে পড়েছি, কয়েকটা টাকা পেলে'—

টাকা?'

'বললে বিশ্বাস করবেন না, আজ দু'দিন একবেলা খেয়ে আছি।'

এই মরমর কার্তিকের বিকালে হঠাৎ মনটা কেমন সহানুভূতিশীল হয়ে উঠল উর্বশীর। দুঃখ, বেদনাবোধ, পরোপকার করবার একটা প্রবৃত্তি ওর মনকে সিক্ত করে তুলল। মেয়েটির দিকে মমতামাখানো দৃষ্টিতে চাইল সে। বলল, 'কয়েকটা টাকায় তোমার কি হবে? তার চেয়ে আমার সঙ্গে চল, তোমার সব কথা শুনে কোন একটা চাকরি-বাকরির ব্যবস্থা করে দেব।'

মেয়েটি কি যেন ভাবল। তারপর আমতা আমতা করে প্রশ্ন করল, 'যাব? মানে আপনার সঙ্গে?'

'হ্যাঁ। আমাকে ভয় কিসের? আমি তো তোমারই মত মেয়ে।'

গাড়িতে উঠে মেয়েটি জড়সড় হয়ে বসল। কেমন একটা কুণ্ঠিত-কুণ্ঠিত ভাব। এমন গাড়িতে হয়ত কোনদিন বসেনি। হয়ত কোনদিন ভাবতেও পারে নি এমনি গাড়িতে উর্বশীর মত মেয়ের সঙ্গে যাবে।

মাঝেরহাট ব্রীজ পেরিয়ে গাড়ি নিউ আলীপুরে ঢুকল। ইতিমধ্যেই দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করে নিয়েছে উর্বশী। ক'ভাইবোন ওরা? বাবা-মা কোথায় আছেন? কতদিন এসেছে কলকাতায়? লেখাপড়া কতদূর শিখেছে।

এখন অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে মেয়েটি। উর্বশীকে একটু আপন আপন মনে হচ্ছে। নির্ভর করতে পারা যায় এমন একজন।

উর্বশী ভাবছিল অন্য কথা। চট্ করে মেয়েটিকে গাড়িতে তোলা ঠিক হল কি? কিন্তু সাত শ' টাকার পাথরের মালাটা না কিনে আনতে পারার জন্য অবসাদ তার মনে অদ্ভুত একটা মমতার সঞ্চার করল। এ জগতে যারা বঞ্চিত, তাদের জন্য অনুভব করা, সহানুভূতি জানানর একটা অদম্য প্রবৃত্তি তাকে হঠাৎ পরোপকারী করে তুলল।

ড্রয়িং-রুমে এসে সোফার উপর ওকে বসাল উর্বশী। বয়কে ডেকে খাবার দিতে বলল। জিজ্ঞেস করল, 'চা খাবে, না কফি?'

মেয়েটি বলল, 'শুধু চা'ই বলুন। আবার খাবার-টাবার কেন?'

'তাতে কি হয়েছে? খেয়ে-টেয়ে আগে সুস্থ হয়ে নাও।'

বাথরুমে ঢুকল মেয়েটি, মুখহাত ধোবে। ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে বাথরুম। মার্বেল পাথরে এতটুকু দাগ নেই। দেওয়ালে চৌকো আয়না, বেসিনের কাছে ছোট্ট একটা তাক মতন। তাতে হেয়ার ক্রীম, সুগন্ধি তেল, দাঁত মাজবার পেষ্ট, ব্রাশ, টুকিটাকি প্রসাধন সামগ্রী, সব সাজানো।

ভাল করে মুখ হাত ধুল মেয়েটি। পরিষ্কার করে মুছল। চুলগুলো আঁচড়াল সযত্নে। নারীসুলভ বাসনাকে দমন করতে না পেরে সামান্য একটু প্রসাধন করল।

সোফার সামনে টেবিলে খাবার দিয়েছে বয়। নানা ধরণের খাবার। কেক, স্যাণ্ডউইচ থেকে সন্দেশ পর্যন্ত। অনেক, একরাশ।

মেয়েটি বলল, 'এত খাবার আমি কি খেতে পারব?'

'যা পার তাই খাবে।' উর্বশী হেসে বলল।

অল্প অল্প কিছু খেল মেয়েটি। লজ্জা আর অপরিচিত পরিবেশকে কাটিয়ে উঠতে পারল না। উর্বশী বুঝতে পারল। ওকে আর পীড়াপীড়ি করল না।

বাইরে গাড়ির শব্দ। উর্বশী জানলা দিয়ে দেখল। আজ একটু তাড়াতাড়ি ফিরেছে বিমান। অন্য দিনের তুলনায় বেশ একটু আগে।

ড্রয়িং-রুমে ঢুকে বিমান অবাক্ হ'ল।

'কি ব্যাপার উর্বশী? উনি—'

'তোমাকে বলছি সব। জামা-কাপড় ছেড়ে এস।'

বিমান ভিতরে গেলে উর্বশী হেসে বলল, 'আমার স্বামী। তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব এলে।'

'তুমি একটু আসবে এদিকে।' ভেতর থেকে ডাকল বিমান।

'যাচ্ছি।' উর্বশী সাড়া দিল। মেয়েটিকে বলল 'তুমি বস একটু। আমি এখনই আসছি'

কাছে যেতেই বিমান বলল, 'মেয়েটি কে?'

'খুব বিপদে পড়েছে, পার্ক ষ্ট্রীটে দেখা। সাহায্য চাইছিল আমার কাছে। বাড়ী নিয়ে এলাম।'

'যত সব ঝামেলা তুমি জোটাও।'

'আস্তে'। উর্বশী চাপা গলায় বলল। 'মেয়েটি ভদ্রঘরের। একটা চাকরি চায়। ভাবছি আমাদের ইভ'স ক্লাবের ওকে সেক্রেটারী করে নেব। তুমি কি বল?'

'নট এ ব্যাড আইডিয়া।' বিমান টাইয়ের বাঁধন খুলতে খুলতে বলল। 'তুমি তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও। লাইটহাউসে ভাল ছবি এসেছে—ফেয়ার-ওয়েল টু আর্মস। ওকে বরং তাড়াতাড়ি ছেড়ে দাও।'

'দাঁড়াও। অত চট্ করে কি বিদেয় করা যায়! একটা ভদ্রতা ত আছে।'

'ও। আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না? ওকেও না হয় সঙ্গে নিলে। হয়ত এসব হলে কোনদিন যায় নি।'

'ওকে?' উর্বশী মুখ তুলে চাইল।

'হ্যাঁ। ভারী চার্মিং মেয়েটি। মুখখানা দেখেছ, কি সুন্দর। ফিগারটাও বেশ। আমি ত ভাবলাম, তোমার কোন পুরণো বান্ধবী-টান্ধবী।'

হাসি হাসি মুখখানা কেমন শক্ত দেখাল উর্বশীর। শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের ঘরে ঢুকল। দেরাজের টানা থেকে দশটা টাকা বের করল। টাকাগুলো নাড়া-চাড়া করতে করতে কি যেন ভাবল উর্বশী। সাহায্যের পক্ষে দশটা টাকাই যথেষ্ট। বিমানের কথাগুলো ওর মনে পাহাড়-ঘেরা উপত্যকায় ধ্বনিত-হওয়া প্রতিধ্বনির মত বার বার অনুরণিত হ'ল। ··· মেয়েটি চার্মিং··· মুখখানা সুন্দর····। আর ফিগারটা বেশ। উর্বশী ত ঠিক এভাবে চিন্তা করে নি।

মিনিট দশ পরে আবার শোবার ঘরে এল উর্বশী। বিমান তখনও বিছানায় শুয়ে।

'কি ব্যাপার? তুমি তৈরী হচ্ছ না?'

এখনই হচ্ছি। কতক্ষণ আর লাগবে। মেয়েটি গেল কি না। ওকে এগিয়ে দিয়ে এলাম।'

চলে গেল?' বিমান উঠে বসল।

—'হ্যাঁ। সিনেমা যাওয়ার কথা ওকে বললাম। মেয়েটি রাজী হ'ল না।'

'কেন?'

'কি জানি। রেফুজী মেয়ে সব। কেমন ধরণের।'

বিমান চুপ করে রইল।

একটুখানি থেমে উর্বশী আবার বলল, 'ভেবে লাম ইভ'স ক্লাবের কেরাণীর চাকরিটা ওকে দেওয়া হবে না। অজানা-অচেনা মেয়ে। শেষে কি গোল করে বসবে।'

বিমানের কোন ভাবান্তর হ'ল না।

সে তাড়া দিয়ে বলল, 'আর দেরি ক'র না, পাঁচটা বেজে গেছে। তৈরী হও এবার।'

'যাচ্ছি গো যাচ্ছি।' উর্বশী একটা কটাক্ষ করে র দিল।

অনেকক্ষণ ধরে উর্বশী সাজল। ড্রেসিং আয়নার সামনে করে প্রসাধন করল। সেই নতুন ছাঁটের বিলিতী টর জামাটা গায়ে দিল। ঘাড়, গলা, পিঠের অনেক-ন অনাবৃত রইল। কানে হীরের ছুটো ছল, গলায় ল পোখরাজের মত চৌকো সাইজের পাথরের মালা। ল ঠোঁটে রং মাখল উর্বশী। নীলচে আলোয় ঘরের খানে এখন ওকে অপরূপ দেখাচ্ছে। অভিসারিকার চঞ্চল দৃষ্টি।

কখন পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকেছে বিমান। কাছে এসে উর্বশীর কাঁধে হাত রাখল।

অন্যদিন হ'লে নিজেকে সরিয়ে নিত উর্বশী। প্রসাধন নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকায় বিমানকে দূরে যেতে বলত। আজ কিন্তু এতটুকু নড়ল না উর্বশী। বরং মাথাখানা হেলিয়ে দিল বিমানের বুকে। ঘাড় ফিরিয়ে বিমানের চোখে চোখ রাখল, মদির, কামনাভরা দৃষ্টি। সম্মোহিত করার পক্ষে যথেষ্ট।

'বিমান।' মিষ্টি করে উর্বশী ডাকল।

'কি উর্বশী?'

'তুমি আমায় ভালবাস?'

—'ভীষণ।'

একটুক্ষণ থামল উর্বশী। বিমানের ঘাড়ে গলায় ওর অগ্রভাগে নেল পালিশ-করা আঙুলগুলি স্বচ্ছন্দ বিহার করতে লাগল।

'আজ চিমনলালজীর দোকানে গেছলাম।'

—'কি কিনলে?'—

—'কিনি নি। একটা পাথরের মালা দেখে এসেছি। সাত শ' টাকা দাম। তুমি ওটা আমাকে প্রেজেণ্ট করবে?' উর্বশীর গলা বেশ গাঢ় শোনাল।

'বেশ ত কালই যাওয়া যাবে।' বিমান স্ত্রীর দিকে চেয়ে বলল।

'এবার চল, ছ'টা যে প্রায় বাজে।'

না, সব কথা এখনও বলা হয় নি উর্বশীর। আরও কিছু বাকী। স্বামীর কাছ থেকে এক পা পিছিয়ে অপরূপ মোহিনী ভঙ্গিতে দাঁড়াল সে, ঠোঁটে বিজয়িনী নারীর চিত্তজয়ী হাসি ফুটে উঠল।

উর্বশী বলল, 'বিমান, এ্যাম আই চার্মিং?'

(বিদেশী গল্পের ছায়া আছে।)

—*—

অমৃতসর

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

জুন মাসের মাঝামাঝি। মধ্যাহ্নের...অনেক আগে থেকেই বহ্নি-বন্যার স্রোত বয়ে যাচ্ছে উত্তর প্রদেশের গ্রাম, জনপদের উপর দিয়ে। পূর্ণ মধ্যাহ্নে ট্রেণ-কামরা ত অগ্নিতপ্ত লৌহকটাহ। তারই মাঝখানে রোদে ঝলসান কিশলয়ের মত আমরা চলেছি দেশভ্রমণে—কাংড়া কুলুর দিকে। এইটিই নাকি ওই অঞ্চলে বেড়াবার উপযুক্ত সময়।

চলেছি অমৃতসর মেলে—পঞ্চাশ মাইলের মত ঘোরা পথে।

আগেকার দিনের কথা আলাদা—কাশ্মীর, ডালহৌসী অথবা কাংড়া উপত্যকায় যেতে হ'লে আজকাল বেশীর ভাগ যাত্রীই অমৃতসর হয়ে যায় না। ওটা ঘোরা পথ। সেকালে কাশ্মীর যেতে হ'লে পাঠানকোটের ধারে-কাছেও কেউ ঘেঁষত না—রাওলপিণ্ডি ছিল একমাত্র গতিমুক্তিদাতা। ভারত ভাগের পর পাঠানকোটের ভাগ্য ফিরল—কাশ্মীরের সঙ্গে ভারতের সরাসরি যোগাযোগ ঘটল এই পথে। আবার এই পথকে সংক্ষিপ্ত ও সুগম করতে মুকেরাইনে রেল-লাইন বসল। পঞ্চাশ মাইলের মত সংক্ষিপ্ত পথে সময়, অর্থ আর দেহক্লেশ বাঁচাতে যাত্রীরা জলন্ধর সিটি—মুকেরাইনের গাড়িতে চাপতে লাগলেন—অমৃতসর আরও দূরে স'রে গেল।

আমরা কিন্তু ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্নগুলির আকর্ষণে অমৃতসরকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারি নি। পাঞ্জাবে এসে অমৃতসরকে দেখব না এটা যেন দেবমূর্ত্তি না দেখে মন্দির পরিক্রমার মত মনে হয়েছিল। সুতরাং পরের দিন বেলা সাড়ে ন'টার সময়ে আমরা অমৃতসরে এসে নামলাম।

ষ্টেশনে নেমে প্রথম চেষ্টা হ'ল ভালমত একটি বিশ্রাম-স্থান ঠিক করা। যাঁরা হোটেল-রেস্তোঁরায় থাকা-খাওয়ার সুবিধা বোধ করেন, তাঁদের কাছে এটা একটা সমস্যাই নয়। আমাদের জায়গা বাছাবাছির হাঙ্গামা একটু ছিল। ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে সম্প্রতি ওটা মেনে নিতে হয়েছে। ডাক্তারের নির্দ্দেশ মত তেল ঘি মশলা বর্জ্জিত রান্নার ব্যবস্থা নিজেদেরই করে নিতে হয় ... বিভুঁয়ে এই বাধা মাঝে মাঝে বেশ প্রবল হয়ে ওঠে। কিন্তু ভ্রমণের নেশা লাগলে এ আর কতটুকু বাধা! ভালমত একটা আশ্রয় মিললে ষ্টোভ বা কুকারে আহার্য্য তৈরী করে নেওয়া সহজই। আশ্রয়স্থলটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হলে, আলো জল আর শৌচাগারের সুব্যবস্থা থাকলে সেই ত স্বভবনতুল্য সুখপ্রদ আবাস। অমৃতসরে তেমনি একটি আশ্রয় আমরা পেয়ে গেলাম।

রেল ষ্টেশনের সামনে মস্ত বড় একটা বাগান আছে। তার কিছু অংশ জুড়ে সরকারী দপ্তরখানা, কিছু অংশ এলোমেলো গাছগাছালিতে ভর্ত্তি—সাধারণের বিচরণ-ভূমি। তার ওপিঠে চওড়া রাজপথ। এখানে এলে শহরের চেহারাটা ঠিকমত মালুম হবে না, যেহেতু জনবসতিপূর্ণ শহর আরও খানিকটা দূরে। তবে এই জায়গাটাও হোটেল ধর্ম্মশালা চা এবং আনাজপাতির দোকানগুলি মিলিয়ে রীতিমত শহর হয়ে উঠেছে। একটা চটকদার সিনেমা হাউসও মাথা তুলেছে।

অমৃতসর নামটা শুনলে যেমন ইতিহাসের একটি গৌরবমণ্ডিত অধ্যায়কে মনে পড়ে এবং জাঁকজমকপূর্ণ একটি শহরের ছবি চোখে ভেসে ওঠে (ছবিটা সম্ভবত: আধুনিক ছাঁদের পথঘাট, বাড়ীঘর, আলোকসজ্জা ইত্যাদি নিয়ে), এ জায়গাটা মোটেই তা নয়। ইতিহাসের গৌরব অবশ্য কালজয়ী, কিন্তু ষ্টেশনটা সেই পুরাতন দিনের: পথঘাটে আধুনিক সংস্কারের চিহ্ন সামান্যই, সৌধ-বিপনিতে তেমন চমকই বা কই! শহরের পুরাতন অংশে পুরাতন দিনেরই আধিপত্য। নূতন অংশের সংযোজন তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

আমরা আশ্রয়ের সন্ধানে পার্কের ওপিঠে একটি ধর্ম্মশালায় এলাম। ম্যানেজার আমাদের দেখেই ঘাড় নাড়ল—অর্থাৎ স্থান নেই।

রিক্সাওয়ালা বলল, আরও দু'টি ধর্ম্মশালা আছে—চলুন দেখা যাক্। আধ ফার্লঙের মধ্যে পাশাপাশি তিনটি ধর্ম্মশালা। এলাম মাঝেরটিতে। এটি একতলা কিন্তু নূতন—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ম্যানেজার কোথায় গিয়েছিল—তার জন্য খানিকটা অপেক্ষা করতে হ'ল। জায়গাটা ভারি পছন্দ হয়ে গেল—ভাবছিলাম, জায়গা মিলবে কি ...

অবশেষে ম্যানেজার এলেন। একটি পঁচিশ-ছাব্বিশ ছরের যুবক। একহারা লম্বা চেহারা, দিব্য ফুর্ত্তিবাজ। ক হাতে খাবারের ঠোঙা অন্য হাতে চায়ের গ্লাস। নটা আদুরে দুলালের মত। মুখের ভাবটাও কেমন কমন, যেন নিজের ভাবেতেই মশগুল রয়েছে।

বললাম, জায়গা হবে? আমরা—

সবটা না শুনেই ঘাড় কাত করে হাসল। আমাদের ভতরে নিয়ে এসে তিন-চারখানা ঘর দেখিয়ে বললে—টা খুশি নিয়ে নাও।

মন্দ নয়—যেন সাক্ষাৎ কল্পতরু!

আমরা বাথরুমের সামনা-সামনি ঘরটা বেছে নিলাম। দ্য চুনকাম-করা ঘর—এখনও চুনের ঝাঁজালো গন্ধ বার চ্ছে। আলো আছে, খাটিয়া আছে। আরও গোটা ই কল আছে, শৌচাগারের অবস্থা সন্তোষজনক।

তখন বেলা এগারটা বাজে। সূর্য্য আকাশের প্রায় মাঝখানটিতে এসেছে এবং…ময়ূখমালা তীব্রতর য়ে উঠছে। কিন্তু উত্তর ভারতের মত অসহ্য জ্বালাময় প্রদাহ ছিল না। 'লু' ছিল না। উত্তাপ ছিল বাংলা দেশের মত, দেহ ঘর্ম্মাক্ত হচ্ছিল। রাত্রিতে এখানেও ঠোনে খাটিয়া পেতে শোওয়ার ব্যবস্থা দেখে আশ্বস্ত লাম।

আহার বিশ্রামে কিছু সুস্থ হয়ে বেলা চারটে আন্দাজ আমরা শহর দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। দিনটা ছিল মেঘলা। তাপ ছিল সামান্যই। টাঙ্গায় করে ঘোরাফেরার অসুবিধা হ'ল না।

আগেই বলেছি অমৃতসর নামটা যেমন শ্রুতিরোচক, শহরটি তেমন নয়নলোভন নয়। নূতন চওড়া পথের দু'ধারে নূতন নূতন সৌধ অট্টালিকা মাথা তোলেনি—সংখ্যার তারা স্বল্প। পুরাতন অংশ, সেই আদিকালের স্বপ্নে বিভোর। আঁকা-বাঁকা সরু সরু গলি, পাথর-বাঁধানো প্রায় অসমতল রাস্তা, তেমনি পুরণো ধাঁচের দোকান-পাট, পণ্যবস্তুর চেহারা বা বিন্যাস সেই পুরাকালের। পথের দু'পাশে খুপরিমত দু'-তিনতলা বাড়ী, জানালা-দরজার সৌষ্ঠব নাই। এই সব দৃশ্য পশ্চিমের যে-কোন মান্ধাতাগোছের শহরে এলেই দেখা যায়। লোকের ভিড়ে যানবাহনের বাধায় মাঝে মাঝে আমাদের গাড়িটা আটকে যাচ্ছে। ফলে ভাল করে চোখ মেলে কিছু দেখতে ইচ্ছা হচ্ছিল না।

তবু বৈচিত্র্য ছিল। মানুষের পোষাক-পরিচ্ছদ আর চেহারার বৈচিত্র্য। পোশাকের ও খাবারের দোকানগুলি একটু আলাদা চেহারার; বাসিন্দাদের রুচিকে প্রকাশ করছে। খানিকটা উত্তর প্রদেশের আদল এলেও মজ্জিমেজাজে ভিন্নতর। আবার ভূমি-প্রকৃতিও তেমন রুক্ষ নয়।

টাঙ্গাওয়ালা বলেছিল—দুর্গামন্দির, স্বর্ণমন্দির, জালিয়ানওয়ালাবাগ আর সরকারী উদ্যান ঘুরলেই মোটামুটি শহর দেখা হয়ে যাবে। সময়ও লাগবে অনেকখানি।

গাড়ি প্রথমেই এল দুর্গামন্দিরের সামনে। তখন আকাশে মেঘের দল জমাট আসর বসিয়েছে—শোঁ শোঁ শব্দ হচ্ছে। বৃষ্টি আসছে।

তাড়াতাড়ি নেমে পড়লাম গাড়ি থেকে।

পাথর-বাঁধানো প্রশস্ত অঙ্গনের পর সুউচ্চ তোরণ। সেই তোরণের মাঝখান দিয়ে সিকি ফার্লং-টাক গেলে তবে মন্দির। প্রকাণ্ড এক সরোবরের মাঝখানে রয়েছে মন্দিরটি—হুবহু স্বর্ণমন্দিরের ছবির ছকে ছক মিলিয়ে তৈরী। কিন্তু স্বর্ণমন্দিরের পরিবেশ আরও বিশাল গাম্ভীর্য্যময়, সরোবর আরও বিস্তৃত। এমনই দীর্ঘ সেই সারাবর যে, এপারে দাঁড়িয়ে ওপারের মানুষকে চেনা যায় না।

দুর্গামন্দিরের গঠন-নৈপুণ্য এমন কিছু নয়। উত্তর বা দক্ষিণ ভারতের কোন শিল্প-শৈলীকে আশ্রয় করে তা গড়ে ওঠেনি। মন্দিরের গায়ে শিল্প-সমাবেশও নাই। আগাগোড়া মন্দির, অঙ্গন তোরণ, আর তোরণ থেকে সেতুপথ পর্য্যন্ত বিজলী আলোর স্তম্ভ ঝাড় বাতিদান দিয়ে পরিপাটি করে সাজানো। রাত্রিতে আলো জ্বললে দীপান্বিতার শোভায় অপরূপ হয়ে ওঠে।

সেতুর মাঝ-বরাবর এসেছি, ঝড় উঠল। চারিদিক ধুলোয় ভরে উঠল। আঁধিই এসে গেল। আমরা তাড়াতাড়ি মন্দিরের মধ্যে চলে এলাম।

এই মন্দিরে দেবতার জন্য আলাদা গর্ভগৃহ নাই। সুপ্রশস্ত একটি হলঘরের একাংশে খানিকটা উঁচু বেদী—তারই উপরে দেবদেবীরা বিরাজ করছেন। হলঘরটি বিজলী ঝাড় লণ্ঠন ছবি আয়না দিয়ে সাজানো—মেঝেতে চওড়া একটি ফরাস পাতা। সেই ধবধবে ফরাসের উপর তাকিয়া ঠেস দিয়ে ও বাদ্যযন্ত্র কোলের কাছে রেখে কয়েকজন শ্রোতা ও শিল্পী ভজন গানের আসর বসিয়েছেন। শিল্পীদের সামনে মাইক যন্ত্র। যন্ত্র-বাহিত সুর লহরী হলঘর ছাপিয়ে সুবিস্তৃত বহিরঙ্গণে ছড়িয়ে পড়ছে। সেখানেও শ্রোতার সংখ্যা ত কম নয়।

এইভাবে ভজন সঙ্গীত পরিবেশনের ব্যবস্থা স্বর্ণ-মন্দিরেও পরে দেখেছিলাম। আর সে ব্যবস্থাটা

সাময়িক বলে মনে হয় নি—আমাদের দেশে অহোরাত্র-ব্যাপী কীর্ত্তন আসরের সমগোত্রীয় সেটা।

বিস্মিত হলাম দেবদেবী মূর্ত্তির সামনে এসে। কারণ, আমরা এসেছি দুর্গামন্দিরে অথচ সেই দেবীকে কোথাও দেখলাম না। দেখলাম, বেদীর মাঝখানে রয়েছেন লক্ষ্মীনারায়ণ—দু'পাশে রামসীতা আর রাধা-কৃষ্ণ। এঁরাই প্রধান মূর্ত্তি বলে মনে হ'ল। সেই এক আদ্যাশক্তির প্রতীক হিসাবে এঁদের প্রতিষ্ঠা কি না কে বলবে। তবে দেশটি যে পুরাণ-তন্ত্র-বিহিত পরমা-শক্তির মহিমা-কীর্ত্তনে পরাঙ্মুখ নয় সেই, মূর্ত্তির রূপ-কল্পনায় ও পূজা অর্চ্চনায় তন্ত্রবিধি অনুসরণ করে চলে, তার বহু প্রমাণ জলন্ধরে, জ্বালামুখীতে, কাংড়ায়—এমন কি হিমালয়ের অভ্যন্তর ভাগে পরে পেয়েছি।

দেবদেবীর সিংহাসন, বসন ভূষণ, পূজা অর্চ্চনার সমারোহ, মন্দিরের সজ্জা-ঐশ্বর্য্য দৃষ্টিকে টানে বই কি। আবার ভক্তিরস-ধারার প্লাবনে মনকে অভিষিক্ত করার বা ঐ জাতীয় একটি পরিবেশ সৃষ্টি করার প্রয়াসও প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। তবু স্বীকার করব, যে পরিবেশে দেব মহিমাকে সমগ্র চিত্ত দিয়ে অঙ্গীকার করা সম্ভব, এত আয়োজন উপকরণ সত্ত্বেও তা যেন এখানে মিলছে না। চণ্ডী স্তোত্রে শক্তি ও ঐশ্বর্য্যময়ী দেবীর মহিমার কথা বলা হয়েছে। তিনি সর্ব্বত্র রূপময়ী, সর্ব্বত্র সিদ্ধিদাত্রীও বটে, তবু বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্য, অযোধ্যার রাজ্যপাট অথবা বৃন্দাবনের প্রেম-মাধুর্য্যের সঙ্গে 'রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি'-কে মানিয়ে নেওয়া কঠিন। পাকা সাধকদের দেবদেবী কল্পনা—কোন বস্তু-আরোপিত রূপ বা গুণকে আশ্রয় করে বিকশিত হয় না—রূপগুণ-হীন কল্পনাতীতকে অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মকে তাঁরা ভজনা করে থাকেন। তাঁদের পক্ষে সবই সহজ। কিন্তু রূপের তরঙ্গ দিয়ে ভাবের বেলাভূমিকে যাঁরা সরস করে রাখতে চান, তাঁদের বেলাভূমি বিপরীত তরঙ্গ-বৃত্তের আঘাতে একটু কঠিন হবে—সে আর আশ্চর্য্য কি!

মন্দির দেখে বার হয়ে এলাম। তখন ঝড়ের তাণ্ডব থেমেছে, বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে রয়ে রয়ে। একটানা হ'লে মন্দির থেকে বার হওয়া যেত না। তাড়াতাড়ি কয়েকখানা ফটো নেওয়া হ'ল, তারপর গাড়িতে এসে বসা গেল। আকাশে কিন্তু দুর্য্যোগের ভয় লেগে রয়েছে। বৃষ্টি পড়ছিল টিপি টিপি।

ভাগ্য ভাল। জালিয়ানওয়ালাবাগের সঙ্কীর্ণ পথে গাড়ি দাঁড়াবার আগেই আকাশ খানিকটা পরিষ্কার হয়ে গেল। বাগের ঠিক সামনেই গাড়ি থামল না। খানিক পায়ে হেঁটে আমরা প্রবেশ-তোরণে পৌঁছলাম। জানি কেন বুকটা কেমন ভারি হয়ে উঠল।

ইতিহাসের পাতায় রক্তাক্ষরে লেখা সেই অমর নাম-জালিয়ানওয়ালাবাগ! ১৯১৯ সনের ১৩ই এপ্রিলের আ[illegible] এই নামের সঙ্গে ভারতবাসীর পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়নি-এই নাম আসমুদ্র হিমালয়ের নরনারীকে পরশাস[illegible] গ্লানি-মোচনের প্রয়াসে অধিকতর অধৈর্য্য করে তো[illegible]নি। ঘনবসতিপূর্ণ শহর এলাকায় ঘিঞ্জি গলিঘুঁ[illegible] আর সৌধ-অরণ্যের জটলায়, দোকান-পসরার ভিড়ে, ক্রেতা-বিক্রেতার হৈ হৈ হট্টগোলে এ নাম চাপা পড়ে-ছিল। সজ্জারিক্ত একান্ত অখ্যাত এই উদ্যান কোনদিনই হয়ত ইতিহাসের পাতায় উঠবে বলে স্বপ্ন দেখেনি। অথচ সেই একদিন·········

প্রথম মহাযুদ্ধান্তে ভারতবর্ষ আশা করেছিল আ[illegible]-নিয়ন্ত্রণের তথা স্বদেশে নিজেদের কর্ত্তৃত্ব স্থাপনের অধি-কার লাভ করবে। প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসন, মিঃ লয়েড জর্জ্জ প্রভৃতির ঘোষণায়, বক্তৃতায় ও বিবৃতিতে এমনই একটা বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছিল সর্ব্বদেশের স্বাধীনতাকামী জনগণের চিত্তে। কিন্তু যুদ্ধশেষে ভেরসাই সন্ধিপত্র রচিত হওয়ার পর এই বিজয়ী নেতা-দের সদিচ্ছা অন্যরূপ পরিগ্রহ করল। আশাভঙ্গে ভারত-বর্ষে জাগল বিক্ষোভ।

ইতিপূর্ব্বে স্বাধীনতার আন্দোলনকে (ইংরেজের ভাষায় বিদ্রোহ) দমন করার জন্য 'ভারত-রক্ষা' নামে একটি অস্থায়ী আইন বলবৎ ছিল। বিপ্লব ও অরাজকতা দমনের অজুহাতে এখন সেই আইনটিকে স্থায়ী এবং ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করার সুপারিশ করল রৌলট কমিটি। এর নাম হ'ল রৌলট আইন। এই আইনে ভারতবাসীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনার অধিকার খর্ব্ব ও সঙ্কুচিত করার ব্যবস্থা রইল। সন্দেহ-মাত্র গ্রেপ্তার ও নির্ব্বাসন আর অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য আটক। বিশেষ বিশেষ অঞ্চলকে আইনশৃঙ্খলা-ভঙ্গকারী বলে ঘোষণা করা যাবে—যার ফলে সেখানকার অধিবাসীরাও পাইকারী ভাবে এই আইনের আওতায় এসে অনুরূপ দণ্ডফলভাগী হবে। এমন কালো আইনের বিরুদ্ধে ভীষণ প্রতিবাদ সুরু হ'ল। কিন্তু সব প্রতিবাদ তুচ্ছ করে ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ভোটের জোরে এটা পাস হয়ে গেল—১৮ই মার্চ্চ ১৯১৯ সালে। আইনটির মেয়াদ হ'ল তিন বছর।

প্রতিবাদে মহাত্মা গান্ধী বোম্বাইয়ে সত্যাগ্রহ সভা

তরী করে হরতাল ঘোষণা করলেন ৩০শে মার্চ। রে তারিখ বদলে হ'ল ৬ই এপ্রিল। দিল্লীতে ও াঞ্জাবের কোন কোন জায়গায় দু'দিনই হরতাল য়েছিল। পাঞ্জাবের দু'জন জননেতা ডাঃ সত্যপাল ও াঃ সফিউদ্দিন কিচলু গ্রেপ্তার হলেন ৯ই এপ্রিল। রের দিন ১০ই এপ্রিল এরই প্রতিবাদে অমৃতসরে াবার হরতাল হ'ল। ওইদিন যখন সমবেত জনগণ রল ষ্টেশনের দিকে নিরুপদ্রব মিছিল নিয়ে এগিয়ে াসছিল—তাদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ দু'বার লিবর্ষণ করল। জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে কতকগুলি সরকারী াফিস ও ব্যাঙ্ক পুড়িয়ে দিল—ইংরেজ বাসিন্দাদের পর চড়াও হ'ল। ফলে কিছু লোক নিহত হ'ল।

এই সময়ে পাঞ্জাবের গবর্ণর ছিলেন মাইকেল ডায়ার। ১২ই এপ্রিল তিনি শহরে সৈন্য মোতায়েন রার আদেশ দিলেন আর জেনারেল ডায়ারের উপর দিলেন শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ভার। ওই দিনই সর্ব্বপ্রকার সভা-সমিতি বন্ধ করে দেবার বিজ্ঞপ্তি ঘোষণা রা হ'ল। কিন্তু সে নির্দ্দেশ যথাসময়ে জনসাধারণের গোচরে আসে নি। তারা পূর্ব্ব নির্দ্দেশমত জনপ্রিয় নতাদের মুক্তির দাবিতে ১৩ই এপ্রিল বৈকালে জালিানওয়ালাবাগে এক সভায় সমবেত হ'ল। দশ হাজার হিন্দু মুসলমান ও শিখ মিলে যখন সভার কাজ সুরু করেছে, সেই সময়ে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার অজুহাতে জেনারেল ডায়ার সৈন্যসামন্ত নিয়ে জালিয়ানওয়ালাবাগের একমাত্র প্রবেশ-পথটি অবরোধ করে বসল। বাগটির অবস্থান বড় বিচিত্র। একেবারে শহরের মাঝখানে, চারধারে দু'তিনতলা ইমারতের বেড়া দিয়ে ঘেরা, কোন কোন স্থানে পাঁচ-ছ হাত উঁচু পাঁচিল। প্রবেশ পথ মাত্র একটি, যার সামনে সশস্ত্র সৈন্য ও মেসিনগান সাজিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল জেনারেল ডায়ার। সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করে ডায়ার নির্ব্বিচারে নিরস্ত্র জনতার উপর গুলী চালনার হুকুম দিল। রক্তগঙ্গা বয়ে গেল বাগে। প্রায় হাজার জন গুলীর মুখে প্রাণ দিল, আহত হ'ল এর তিন গুণ। স্বাধীনতা সংগ্রামের রক্তাক্ত অধ্যায়ে আর একটি রক্তরাঙ্গা অধ্যায়—জালিয়ানওয়ালাবাগ এই ভাবে সংযোজিত হ'ল।

জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রবেশ-তোরণে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সেই লেখাগুলি চোখের সামনে জ্বল জ্বল করে ভেসে ওঠে। হ্যাঁ, মনের আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে স্মৃতি-সমুদ্রকে উদ্বেল করার অপেক্ষা রাখে না—চোখের সামনেই ইতিহাসের পাতাটিকে খুলে রাখার ব্যবস্থা করেছেন সরকার। সেই লেখা পড়ে চিত্ত ভারাক্রান্ত হবেই। বাগের মধ্যে সুউচ্চ শহীদ স্তম্ভগুলি বিষণ্ণ গাম্ভীর্য্যে থম থম করছে। আজকের মেঘ-মলিন আকাশের নীচেয় সেই দিনের দুঃস্মৃতি-ব্যথা নূতন করে জেগে উঠছে। আমরা ধীরে ধীরে পরিক্রমা সুরু করলাম। শহীদ স্তম্ভের বাঁ-ধারে একটা ইঁদারার কাছে এসে দাঁড়ালাম। আমাদের দেখে একজন শিখ যুবক আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন। বিষণ্ণ গলায় বললেন, জানেন, এই কুয়োর ইতিহাস? যখন গুলী চলেছিল—সেকালে এটার পাড় উঁচু করে বাঁধানো ছিল না এখন যেমন রয়েছে—সেই সময়ে গুলী-খাওয়া মানুষগুলো পালাতে গিয়ে যা ঘটেছিল—ওই দেখুন লেখা রয়েছে কুয়োর মাথায়।

পাথরের লেখাটা পড়লাম। শিউরে উঠলাম। দুর্ঘটনার পর একশো কুড়িটি মৃতদেহ তোলা হয়েছিল ইঁদারার ভিতর থেকে।

সরে এলাম সেখান থেকে। কিন্তু রক্তাক্ত স্মৃতির কবল থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় ছিল না! পার্কের দেওয়ালে, ইমারতের গায়ে আরও বহুতর গুলীর ছিদ্র চোখে পড়ল। অসহায় নিরস্ত্র মানুষের প্রাণ রক্ষার শেষ চেষ্টার মুখে মৃত্যুদূতের নিশানা! নির্ম্মম নরঘাতকের কলঙ্ক-চিহ্ন জালিয়ানওয়ালাবাগের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে।

ভারাক্রান্ত চিত্তে আমরা শহীদ স্মৃতিক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে এলাম।

এবার টাঙ্গা চলল ভিন্ন একটি প্রশস্ততর পথ দিয়ে। মনে হ'ল, এদিকটা শহর পরিকল্পনার অধুনাতন অংশ। বাড়ী-ঘরগুলি গায়ে গায়ে লাগানো নয়—গঠনরীতিতে কিছু সৌষ্ঠব আছে। পরিচ্ছন্ন বেশবাসের মানুষও কিছু দেখলাম। আমাদের টাঙ্গা এসে দাঁড়াল প্রকাণ্ড একটা দালানের সামনে। গঙ্গার ঘাটে যে রকম চাঁদনি থাকে, সেই রকম খোলামেলা একটি বড় দালান—তারই মধ্যে ফুল এবং আরও কয়েকটি জিনিসের পসরা সাজিয়ে বসে আছে দোকানীরা। এটি বিখ্যাত শিখগুরুদ্বার স্বর্ণমন্দিরের প্রবেশ-পথ।

একটা জলভর্ত্তি চৌবাচ্চার পাশ কাটিয়ে আমরা চাঁদনিতে ঢুকছিলাম, একজন ফুলের দোকানী হাতজোড় করে বিনীতকণ্ঠে বলল, বাবুজী, আগে জুতো খুলে রাখুন, ওই চৌবাচ্চার জলে হাত-পা ধুয়ে নিন, তারপর ভিতরে আসুন।

বললাম, মন্দির ত এখান থেকে বহুদূরে, সেখানে ঢুকবার আগে জুতো ছেড়ে নেব।

শিখ দোকানী সবিনয়ে বলল, না বাবুজী, গুরুদ্বারের চৌহদ্দির মধ্যে জুতো পরে চলা নিয়ম নয়। আর মাথায় একটা কিছু দিয়ে দিন। আপনাদের টুপি কি পাগড়ি ত নেই, রুমালটা বেঁধে নিন মাথায়।

চৌবাচ্চায় পা ধুতে গিয়ে দেখি এক শিখ যুবতী মাথায় জল ছিটিয়ে, সকলকার পা-ধোয়া সেই জল চরণামৃতের মত পান করল।

খালি পায়ে মাথায় রুমাল বেঁধে আমরা সেই চৌতারার প্রশস্ত সিঁড়ি বেয়ে সুবিশাল মন্দির অঙ্গনে নেমে এলাম। কি দীর্ঘ বিস্তৃত অঙ্গন! আবার তার কোলে তেমনি বিশাল সরোবর। এপারে দৃষ্টি মেলে ওপারের চেনা মানুষকে সনাক্ত করা যায় না। সরোবরের মাঝখানে ক্ষুদ্রায়তন স্বর্ণমন্দির—সোনার পাতে মোড়া অথবা সোনার জলে রং করা—ঝকঝক করছে। ডানদিকে ঘুরে আমরা মন্দির-তোরণে এলাম। প্রবেশ-তোরণটি বেশ উঁচু এবং কারুকার্যখচিত। ওই দরজার ভিতর দিয়ে একটি মাত্র প্রশস্ত সেতুপথ মন্দিরের সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়েছে। দলে দলে ভক্তিপ্রাণ শিখ নরনারী সেই পথে আসা-যাওয়া করছে। তারা সেতুপথে পা দেবার আগে তোরণে নতজানু হয়ে প্রণাম করছে—সেখানকার ধুলো তুলে মাথায় ঠেকাচ্ছে, আঁচল বা রুমাল দিয়ে সেই পথের ধুলো জঞ্জাল সাফ করছে। তারপর মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে সেতুপথ অতিক্রম করছে। ভিড় জমেছে রীতিমত। ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়ি নাই, কলকল কলরব নাই, শৃঙ্খলাবদ্ধ শান্ত-সংযত ভক্তিনম্র দু'টি বিপরীতমুখী মানুষের স্রোত ধীরে ধীরে মন্দিরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে—আর মন্দিরের দিক থেকে প্রাঙ্গণের দিকে ফিরে আসছে। মাইক যন্ত্র-বাহিত ভজন গানের সুর লহরী মন্দিরগর্ভ থেকে সেতু-পথ বেয়ে বিশাল অঙ্গনে ছড়িয়ে পড়ছে।

এই মন্দিরকে মাঝখানে রেখে শহর কায়াকান্তি-য় হয়ে উঠেছে দিনে দিনে। এই নদীতুল্য বিশাল সরোবরের নামেই শহরের খ্যাতি বিশ্বময়। হাঁ, অমৃতময় এই সরোবর—একটি বিশাল জনপদের জীবন-ধারার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত।

সে অনেক দিন আগেকার একটি ঘটনা। এখানে ন জনপদের অস্তিত্ব ছিল না। এক জনবসতি-। তৃণ-পাদপশূন্য সুবিস্তৃত প্রান্তর রৌদ্রদগ্ধ আকাশের চর মৃত্যুফাঁদ পেতে নিশ্চল দেহ এলিয়ে পড়ে থাকত, নিদাঘ মধ্যাহ্নে কোন যাত্রী এই প্রান্তরে পদপাত করত না। আশেপাশে গ্রাম ছিল যদিও, গ্রামবাসীরাও প সংক্ষেপ করতে এদিক দিয়ে হাঁটত না।

তেমনি এক নিদাঘ মধ্যাহ্নে গুরু নানক অতিক্র করছিলেন এই প্রান্তর। সঙ্গে ছিলেন বুধাভাই, নানকে প্রিয় ভক্তশিষ্য। মাথার উপরে প্রচণ্ড মার্তণ্ড অতি শয় অকরুণ হয়ে উঠেছিলেন সেদিন, দিশাহারা প্রা তীব্র ময়ূখমালার বহ্নিবলয় রচনা করে পথিকের জীবনী শক্তি শোষণ করার আয়োজন করেছিল। প্রাণঘাতী তৃষ্ণার তাপে জর্জরিত হয়ে উঠলেন বুধাভাই। গুরুকে বললেন, আর চলতে পারছি না, তৃষ্ণায় শুকিয়ে উঠে বুক।

নানক বললেন, এইখানে অপেক্ষা করছি, তুমি একটু এগিয়ে যাও। সামনেই দেখবে একটা সরোবর জলপান করে এস।

এগিয়ে গেলেন বুধাভাই। দেখলেন সরোবর কিন্তু সে মরীচিকা ছাড়া কিছু নয়। নিদারুণ রৌদ্রে ফুটিফাটা হয়ে গেছে সরোবরে সর্বাঙ্গ—এক ফোঁটা জল নাই, যা কণ্ঠতালুকে সরস করতে পারে। বুধাভাই হতাশ হয়ে ফিরে এলেন। গুরুকে জানালেন সব কথা।

গুরু হেসে বললেন, তুমি দেখছি গুরু আর সৎ-নামের উপর এখনও নির্ভর করতে শেখ নি। "ওয়াহ গুরু" ব'লে এগিয়ে যাও, সৎনাম জপ কর, তোমার তৃষ্ণা অবশ্যই মিটবে।

এবার গুরুনাম জপ করতে করতে এগিয়ে গেলেন বুধাভাই। অবাক হয়ে দেখলেন, পুকুরের তলদেশ থেকে উৎসারিত হচ্ছে স্নিগ্ধ সুপেয় জলধারা। বুধা-ভাইয়ের তৃষ্ণা মিটল—সঙ্গে সঙ্গে এই অলৌকিক শক্তির কথা ছড়িয়ে পড়ল চারিধারে। দলে দলে মানুষ এসে দেখল সেই দৃশ্য। পুনরুজ্জীবিত পুষ্করিণীটার নাম রটে গেল লোকের মুখে মুখে—অমৃত সায়র। অমৃত সায়র ঘিরে একটা জনপদ জন্ম নিল। পরে চতুর্থ শিখগুরু রাম-দাস এই পুষ্করিণীকে সুবৃহৎ জলাশয়ে পরিণত করলেন। মাঝখানে নির্মাণ করলেন শিল্পকলাময় একটি মন্দির। এই মন্দিরই শিখেদের চিরশ্রদ্ধার 'দরবার সাহিব' আর এই তীর্থ অমৃতসর।

পরবর্তীকালে শিখদের পরাভূত করে আহমেদ শাহ ধ্বংস করেন এই মন্দির। অমৃতসর পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের অধিকারে এলে উনি মন্দির পুনঃ-নির্মাণ করেন—সোনার পাত দিয়ে মন্দিরের গম্বুজ মুড়ে

দেন। তখন থেকে শিখ-স্বর্ণমন্দির নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে এই মন্দির।

পরবর্ত্তীকালে আরও সংস্কার হয়েছে মন্দিরের, সংযোজিত হয়েছে অনেক কিছু। বাবা অটল স্তম্ভ, শ্রীগুরু রামদাস নিবাস, গুরুকা লঙ্গর, শিখ মিউজিয়াম, শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটির কার্য্যালয়, একাধিক পুষ্পোদ্যান, জন সমাবেশের ময়দান, বাজার প্রভৃতি নিয়ে স্বর্ণমন্দির এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ এক নগর।

এই মন্দিরে কোন মূর্ত্তি নাই—রয়েছেন গ্রন্থ সাহেব। শিখ ধর্মগুরুদের উপদেশ আর অনুশাসনের বাণীবদ্ধ বৃহৎ গ্রন্থ। মূল্যবান্ চীনাংশুকে মোড়া ও পুষ্পমাল্যে সজ্জিত গ্রন্থ। গ্রন্থ সাহেবের সামনে বসেছে ভজন গানের আসর। বাদ্যযন্ত্র কোলে করে সঙ্গীতশিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করছেন।

সেই ভক্তি-গম্ভীর গানের অর্থ আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি, সুরসমৃদ্ধ স্বরলহরীতে আত্মনিবেদনের আকুতিকে অনুভব করেছিলাম। নীরবে শ্রদ্ধা জানিয়ে পরিক্রমা করেছিলাম মন্দির। তারপর সেতুপথ দিয়ে ফিরে এসেছিলাম অঙ্গনে। অনেকক্ষণ ধরে বসেছিলাম সেখানে। একটা জাতির জন্ম-রহস্যের যবনিকা ধীরে ধীরে অপসারিত হয়ে গিয়েছিল—ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ এক মহিমাকে অনুভব করেছিলাম। সেই মূলমন্ত্র দারুণ দুর্য্যোগের দিনেও জাতির চৈতন্য পথভ্রষ্ট হয় নি। আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান—তারই লাগি ত্বরা পড়ে গিয়েছিল।

কিন্তু শুধু প্রাণদানের দুর্জ্জয় সাহস ও সঙ্কল্প নয়, সুকোমল সেবাবৃত্তিতেও সেই সব চিত্ত ছিল সর্ব্বদিকে প্রসারিত। সেই বৃত্তি শুধু মন্দির দুয়ার মার্জ্জনার রীতিতে আবদ্ধ নয়, মন্দির-অঙ্গনে একটি ইঁদারার সামনেও প্রসারিত হয়েছে দেখলাম।

জল তৃষ্ণা পেয়েছিল। জলের সন্ধানে একটা ইঁদারার সামনে এসে দেখলাম, তৃষ্ণা নিবারণের দৃশ্য। একজন লোক ইঁদারা থেকে জল তুলছিল—জন দুই মিলে ভর্ত্তি করছিল জলপাত্রগুলি। গ্লাস বা ঘটি জাতীয় পাত্র নয়, পিতলের গামলা জাতীয় পাত্র। জল পানান্তে পাত্র নামিয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গে সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলারা সেই উচ্ছিষ্ট পাত্রগুলি ধুয়ে-মেজে পরিষ্কার করে দিচ্ছিলেন। এই কাজ তাঁরা আনন্দের সঙ্গেই করছিলেন। একদলের কাজ শেষ হতে-না-হতে আর একদল এসে তাঁদের হাতের কাজ তুলে নিচ্ছিলেন। মনে হ'ল মন্দির ঘুরে যারাই এদিকে আসছিলেন তাঁরাই পালা করে সেবাবৃত্তির সুযোগ গ্রহণ করছিলেন। বহুমূল্য পোষাক-পরিচ্ছদ আভরণ তাঁদের সেবাধর্ম্মের পরিপন্থী হয় নি। ধর্ম্মের এই সুস্থ ও সার্থক রূপ দেখে মুগ্ধ হলাম বই কি! সকল ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তকেরা মানবসেবাকে শ্রেষ্ঠতম বৃত্তি বলে কীর্ত্তন করেছেন। একটি মাত্র ঈশ্বরকে অন্বেষণ না করে মানুষের মধ্যে তাঁরই বহুরূপের মাহাত্ম্যকে উপলব্ধি করার কথা বলেছেন।

এই মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে শ্রীগুরু রামদাস নিবাস বা ধর্ম্মশালা। জাতি ধর্ম্ম বর্ণ নির্ব্বিশেষে যে কেউ এখানে আশ্রয় এবং আহার পেতে পারেন। সেবার পরিপূর্ণ রূপটি এখানে একটি রাত্রি বাস করলে চোখে পড়বে।

আকাশ এতক্ষণে মেঘমুক্ত হয়েছিল—অপরাহ্ণ বেলার আকাশে আলো নরম হয়ে উঠছিল। তবু এটা গ্রীষ্মকালের আকাশ—আর বাংলার চেয়ে এ আকাশে বিদায়ী সূর্য্যের স্থায়িত্বকাল অধিক। টাঙ্গা বালক তাড়াতাড়ি সরকারী উদ্যানের দিকে গাড়ি চালিয়ে দিল।

পথের এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে কিছু গরম দুধ পান করা গেল। এদিকে দুধটা মেলে প্রচুরই। কিন্তু শুধু দুধ খাওয়ার চেয়ে চায়ের সঙ্গে সেটা মিশিয়ে পান করাই রেওয়াজ। চায়ে দুধ মেশানো বলাটা হয়ত ঠিক হ'ল না, দুধে চা মেশানো বললে অর্থটা পরিষ্কার হয়। অর্থাৎ দুধ আর চা আধাআধি মিশিয়ে এক গ্লাস পানীয়। ছোট্ট একটুখানি কাপে করে চা খাওয়ার চলন দেখছি না—হয়ত সেটা রেষ্টুরেণ্টের ভব্য পরিবেশে ভব্য রকম ব্যবস্থা। পথের ধারে পাতা বেঞ্চিতে ব'সে যে চা-পানের বিধি (আর এইটাই ত যন্ত্র-তন্ত্র) তার অনুপান দুধ-চা আধাআধি, বেশ বড় চামচের দু'তিন চামচ চিনি আর আধার একটি বড় কাঁচের গ্লাস। একাধারে খাদ্য আর পানীয়। অন্ততঃ দু'কাপ পরিমাণ পানীয়-ভর্ত্তি একটি গ্লাস না হ'লে পানার্থীর মন ওঠে না। এমনি দু'গ্লাসের খরিদ্দারও অনেক দেখলাম।

এবার আমরা শহরের একটা দিক ঘুরে কোম্পানীর বাগানে এলাম। এদিককার রাস্তাগুলো চওড়া, বাড়ীগুলো ছাড়া-ছাড়া কোনটা বা কেয়ারি-করা আছে। প্রাচীন খানদানি বংশের মত তার বাহ্য অবয়বটা। বিপুল কলেবর আকাশ-ছোঁয়া সব মহীরুহ সারবন্দি দাঁড়িয়ে আছে সজাগ প্রহরীর মত। পুরাতন ইতিহাসের অনেক পাতা এদের সামনেই লেখা হয়েছে, অনেক প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের ক্ষত ওদের কাণ্ড ও শাখা-

দেহে সুচিহ্নিত। দু'চার ফার্লং জুড়ে এদের বিস্তার—আমাদের গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে লাগল। দূর থেকে তরুশ্রেণীর ঘন বিন্যস্ত শাখাপল্লব দেখে অরণ্য বলে ভ্রম হবে—এর মাঝখানে এলে অবশ্য সে ভ্রম থাকবে না, মনোরম একটি উদ্যানই তার সর্ব্বসাধ্য সাজ-সজ্জা নিয়ে মনোহরণ করতে চাইবে। উদ্যানের মাঝখানে একটা সরকারী দপ্তরখানাও রয়েছে। কেয়ারী-করা লনের কোথাও ছেলেরা ছুটোছুটি লাফালাফি করছে, দোলনায় দুলছে, উপর থেকে লাফ খাচ্ছে। কোথাও নিরালা কোণ বেছে নিয়ে কোন দম্পতি প্রেমগুঞ্জনে অভিনিবিষ্টচিত্ত, কোথাও বা তরুণ প্রণয়ীযুগল ভাবী মিলনের মধুর স্বপ্নজাল বুনছে। সমবয়সীরা মিলে সরবে রাজনীতির চর্চ্চা করছে এক জায়গায়, এও কানে এল।

বাগানটা তাড়াতাড়ি ঘুরে নিলাম। সারা উদ্যানে গাড়ি চলাচলের পথ গেছে এঁকে-বেঁকে, ছক কেটে কেটে। সেই পথে টাঙ্গা ঘুরতে লাগল। এক জায়গায় টাঙ্গা থামিয়ে জল খেয়ে নিলাম।

বাগান ঘুরতে ঘুরতে এক সময়ে আকাশের আলো ফুরিয়ে গেল। আমাদের টাঙ্গা বাগান থেকে বেরিয়ে আর একটি নূতন রাজপথ ধরল। অথবা সেই রাজপথই আলোর মালা প'রে আর এক চেহারায় নূতন হয়ে উঠল। কয়েক ঘণ্টায় মোটামুটি পরিক্রমা করে নিলাম শহরটাকে।

ধর্ম্মশালায় পৌছে দেখি বিরাট এক মেলা বসে গেছে। উত্তর প্রদেশের দু'-তিনটি কলেজ মিলিয়ে প্রমোদ-ভ্রমণার্থী শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীর দল জমায়েৎ হয়েছে সেখানে। দলটি কাশ্মীর ঘুরে এখানে এসেছে—গন্তব্য স্থান লখ্‌নাউ। ধর্ম্মশালার প্রায় সবটাই ওরা দখল করে নিয়েছে কিন্তু সেজন্য অসুবিধা বিশেষ হ'ল না। রাত্রিতে সুবিস্তৃত উঠোনে সারি সারি খাটিয়া পড়ল—মেয়েরা আশ্রয় নিলেন প্রশস্ত ছাদে। রাতটি আরামেই কাটল।

পরের দিন দুপুরে চাপা রোদের তেজটা বেশ চড়া লাগল। যেমন একটা অসহ গুমোটের ভাব।

আমরা স্থির করেছিলাম আজ বৈকালে অমৃতসর ত্যাগ করব। বেলা পাঁচটায় প্যাসেঞ্জার গাড়িটি ধরে রাত নটার পৌছব পাঠানকোট। ওখান থেকে রাত [illegible] সেটা

মালপত্র গুছিয়ে টাঙ্গা ডাকবার উদ্যোগ করছি—হঠাৎ সূর্য্যের আলো নিবিয়ে চারিদিক অন্ধকার করে ঝড় নেমে এল। কাল অপরাহ্ণ বেলায় সেই আঁধি, তবে বেগটা আরও দুর্দ্দান্ত। বাংলার কালবৈশাখীর মতই হাজিরাটা এর সময়মতই দেখছি। আজ শুধু ঝড়ই এলোনা। সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বর্ষণ এবং তার সঙ্গে করকাপাত। দুঃসহ তাপপীড়িত ধরিত্রীকে সুশীতল করার অপ্রত্যাশিত আয়োজন! যেমন বাংলায় তেমনি এখানেও, সব বয়সের নরনারী প্রকৃতির এই উদ্দাম লীলার সুযোগ নিয়ে শৈশব কালে ফিরে গেল। ছুটোছুটি হুড়োহুড়ি করে 'শিল' কুড়োবার সে কি ধুম! পিতা অন্তরীক্ষ এখন মাতা বসুমতীর কোলে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতে লাগলেন নানান সাইজের তুষারগোলক আর মায়ের ছেলেমেয়েরা বয়সের সীমা পদমর্য্যাদা শিক্ষা সহবৎ ভুলে আদিম উল্লাসে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে চীৎকার করে সেই খেলনা বা খাদ্য তুলে নিতে লাগল। আধঘণ্টা ধরে চলল এমন মাতামাতি। অতঃপর এখানকার রঙ্গমঞ্চে খেলা শেষ করে আঁধি অন্য রঙ্গক্ষেত্রে পাড়ি জমাল হয়ত। শীতল হ'ল অমৃতসর।

পরের দিন কাংড়ার পথে দেখেছি, ঝড়বৃষ্টির নাট্যলীলা সেদিককার রঙ্গমঞ্চেই ভাল ভাবে জমেছিল। শুনলাম ওই উপত্যকার রঙ্গমঞ্চটি সারা পাঞ্জাবের মধ্যে এমনি বাদল-নাট্য অভিনয়ের উপযোগী করে তৈরী। সেখানে বর্ষণ এবং করকাপাত এই কালের নিয়মিত ঘটনা।

যাক এদিকে অমৃতসর ঠাণ্ডা হ'ল—ভালই হ'ল খুশিমনে বেরিয়ে পড়লাম। ষ্টেশন ত কাছেই, ধর্ম্মশালা থেকে একটা ঢিল ছুঁড়লে তার সীমানায় অনায়াসে পৌছে যায়। সেখানেও ছোট্ট একটি কৌতুক নাটিকা অভিনয় অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্য। সে নাট্যোলীলা দেখে মন খারাপ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু আমরা হেসেছিলাম প্রচুর। আমাদের হাতে তখন প্রচুর সময় ছিল এবং আমরা একেবারে নিরুপায় হয়ে পড়ি নি বলে কৌতুকটা জমেছিল।

ব্যাপারটা এই—আমরা অমৃতসর-পাঠানকোট প্যাসেঞ্জার গাড়িটা ধরব বলে বেশ খানিকটা সময় থাকতেই ষ্টেশনে এসেছিলাম। গাড়িটা তখনও প্ল্যাটফর্মে আসেনি। আধঘণ্টা পরে গাড়িটা এল—ছাড়া

[আ]মাদের তুলে দিলে। কামরাটায় দ্বিতীয় প্রাণী ছিল [না]। আমরা কামরার দরজা-জানালা বন্ধ করে পরম [নি]শ্চিন্তে গল্প জুড়ে দিলাম। গল্প করছি-ত-করছিই হঠাৎ [এ]ক সময়ে খেয়াল হ'ল অনেকক্ষণ ত হয়ে গেল গাড়ি [ছা]ড়ছে না কেন। ষ্টেশনের ঘণ্টা বা গার্ডের বাঁশী কোন [কি]ছুর সাড়াশব্দ ত পাচ্ছি না—বরং যেটুকু সাড়াশব্দ [এ]তক্ষণ কানে আসছিল, তাও যেন ক্রমশ স্তিমিত হয়ে [আ]সছে। এটা কি ইঞ্জিন খারাপ, কি লাইন ব্লক কিংবা [আ]রও কিছু গরবর হওয়ার ইঙ্গিত! এমন ত হামেশাই [হ]চ্ছে।

[আ]মনে হ'ল অনেকক্ষণ বসে আছি। ঘড়ি দেখলাম, [গা]ড়ি ছাড়ার সময় পেরিয়ে আরও পনের মিনিট [গে]ছে। সন্দেহ হ'ল, ঘড়িটা কি আগিয়ে চলেছে!

নাতিকে বললাম, নেমে দেখ ত কি ব্যাপার।

নাতি প্ল্যাটফর্মে পা দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, গাড়িটা ত [না]ই।

সে কি—গাড়ি নেই কি কথা! একি ভোজবাজি! [তা]ড়াতাড়ি নেমে দেখি সত্যিই তাই। আমাদের [ব]গীটাই শুধু প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে—যাত্রীসমেত [গা]ড়িটাই অদৃশ্য!

আমাদের হতচকিত দেখে দু'জন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক [এগি]য়ে এলেন। বললেন, আপনারা কোথায় যাবেন?

পাঠানকোট।

সে গাড়ি ত এই মাত্র—এই পাঁচ মিনিট আগে ছেড়ে [গে]ল।

কিন্তু আমরা—, আর কিছু বলতে পারলাম না।

ভদ্রলোক বললেন, বুঝেছি, যা হয়েছে।

কি হয়েছে? হতভম্বের মত শুধোলাম।

আপনারা দুয়োর-জানালা বন্ধ করে বসেছিলেন—[তা]ই টের পান নি। ওরাও আপনাদের দেখতে [পা]য় নি।

কারা আমাদের দেখতে পায় নি।

ভদ্রলোক বললেন, এ বগিটা গাড়ির সঙ্গে জোড়া [ছি]ল ঠিকই, পরে যাবে না বলে কেটে রাখলে। [আ]পনাদের আগের কামরায় আরও জনকয়েক [প্যা]সেঞ্জার ছিল তাদের রেলের লোকরা নামিয়ে দিলে। [দু]য়োর বন্ধ করে বসেছিলেন বলে ওরা আপনাদের দেখতে পায় নি। তা কি আর করবেন, ঘণ্টাখানিক বাদে একটা এক্সপ্রেস ট্রেণ আছে—তাতেই চলে যান পাঠানকোটে।

এই কথায় আমাদের হতভম্ব ভাবটা কেটে গেল। আমার প্রাণভরে হেসে নিলাম। ভাগ্যিস্ আর একখানা গাড়ি আসছে, না হ'লে এটা বিয়োগান্ত নাটকের রূপ গ্রহণ করত না কি!

একস্প্রেসে প্রচুর ভিড় ছিল—কোনরকমে ঠেলেঠুলে ত ওঠা গেল। সান্ত্বনার কথা এইটুকু, কর্মভোগের স্থিতিকাল মাত্র চার ঘণ্টা। রাত এগারোটায় আমরা পাঠানকোট পৌঁছব।

লাইনটা মনে হ'ল অধুনা অবহেলিত—যেমন শাখা পথগুলি হয়ে থাকে। পথের মাঝে একটি মাত্র বড় ষ্টেশন—গুরুদাসপুর। স্থানটির সঙ্গে কিছু পরিচয় ঘটেছিল ইতিহাসের কল্যাণে।

ষ্টেশনটি জমকালো। অনেক শিখ জওয়ান এখানে নামল। লম্বায় চওড়ায় দশাসই চেহারা—বীরোচিত বপু। এরা বেশীর ভাগই পল্টনের লোক। জাঠ শিখ। অমৃতসরে কিন্তু বহু শিখকে দেখেছি খর্বাকৃতি, কৃশকায় বাংলা দেশের জলহাওয়ায় বাড়া মানুষের মত। তাদের নাকি পল্টনে নেয় না। অন্তত ইংরেজ আমলে সেই নিয়ম ছিল। এদের বলে রামদাসিয়া শিখ। এই দু'রকম শিখের কথা জানা ছিল না। শিখ বলতে আমরা দুর্দ্ধর্ষ জঙ্গী জোয়ান মানুষকেই জানি—সামরিক প্রয়োজনে যাদের শক্ত করে গড়ে তুলেছিলেন গুরু অর্জ্জুন তেজ বাহাদুর গোবিন্দ সিংএর দল। তেমনি ইংরেজ আমলে ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশ জানত বাঙ্গালীর একটিমাত্র পরিচয়—অসামরিক জাত, লেখনী চালনায় ও মন্ত্রণায় যাদের দক্ষতা অসাধারণ। বারভূঁইয়ার রাজ্যপাট, তাঁদের তৈরী বাঙ্গালী পল্টনের শৌর্য্যবীর্য্যের কথা—সে সব ত ইংরেজ আমলের কীর্ত্তি নয়। অতএব ইংরেজের লেখনীতে তাদের অন্য পরিচয়। তারও আগেকার ইতিহাস ত কিংবদন্তীর মত হয়ে গেছে। এখন স্বাধীন ভারতে এই সব অপ-কলঙ্ক অবশ্য দূর হয়ে গেছে। আধুনিক বিজ্ঞানের হাতিয়ারও দৈহিক যোগ্যতার মাপকাঠিকে বদলে দিয়েছে। অসামরিক দেশ বলে ভারতবর্ষের কোন স্থানটাই আর চিহ্নিত নয়।

ভিয়েৎনাম

শ্রীঅনিলকুমার দাশগুপ্ত

কিছুদিন আগে মার্কিন জাহাজ উত্তর ভিয়েৎনাম কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার ফলে আমেরিকা আক্রমণকারীদের দমন করার জন্য বিরাট্ নৌবহর পাঠিয়ে দেয়। অপর পক্ষে চীন তাদের সাহায্য দানের জন্য এগিয়ে আসে এবং মন্তব্য করে, আমেরিকার এই প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা বিশ্ব-সঙ্কট ডেকে আনবে। সোভিয়েট রাশিয়াও মুক্ত কণ্ঠে আমেরিকার এই কাজের নিন্দা করেছে। চীনের ঘোষিত এই বিশ্ব-সঙ্কট তথা বিশ্বযুদ্ধ হোক আর না হোক, এ কথা বলা চলে যে, কোরিয়া, সুয়েজ, কিউবা ও ভিয়েৎনাম পরিস্থিতি বিশ্বযুদ্ধের এক একটি সোপান। বড় রকমের যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার যে কতকগুলি বাধা আছে (এখানে সেই দীর্ঘ আলোচনার জায়গা নয়) তা অপসারিত হওয়া মাত্রই এই রকম কোন একটি উপলক্ষ্যে বিশ্বযুদ্ধ ঘটতে পারে।

অনুমিত বিশ্বযুদ্ধ কমিউনিষ্ট ও (বা পশ্চিমী অ-কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রসমূহ) রাষ্ট্রের মধ্যে হবে বলেই মনে করা হয়ে থাকে; তার কারণ, সমস্ত পৃথিবী এখন কমিউনিষ্ট ও অ-কমিউনিষ্ট এই দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে আছে। আরও দেখা যায় যে, উল্লিখিত যে-কোন সঙ্কটেই এই দুই দলই ঝাঁপিয়ে পড়ে। কোরিয়ায় ও কিউবায় আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যেই বিবাদ হয়। মিশরে পশ্চিমী রাষ্ট্রের সঙ্গে (সুয়েজ নিয়ে) যুদ্ধে প্রেসিডেণ্ট নাসের যখন ব্যতিব্যস্ত, তখন রাশিয়ার হুমকিতেই তিনি পরিত্রাণ পান। বর্তমানে ভিয়েৎনামেও দেখা যাচ্ছে সেই কমিউনিষ্ট ও অ-কমিউ-নিষ্টেরই দ্বন্দ্ব। এখানে একদিকে চীন ও অপরদিকে আমেরিকা লিপ্ত হয়ে পড়েছে।

ভিয়েৎনামের ইতিহাস নানা যুদ্ধবিগ্রহে ভরা। সংপ্রতি দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বুকের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে যে, অশান্তি আর হাঙ্গামা তার বিবরণ আগে দেওয়া হ'ল এবং এর পূর্বেকার ইতিহাস আনুপূর্বিক বর্ণিত হয়েছে পরে।

বর্তমান পরিস্থিতি

১৯৬৩ সালের গ্রীষ্ম ও শরৎ কালে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রেসিডেণ্ট নোদিন দিয়েম-এর সরকার ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিবাদের ফলে যে রাজনৈতিক সঙ্কট দেখা দেয়, তা নানা আকার গ্রহণ ক'রে দিনের পর

যদিও বৌদ্ধরা এখানে শতকরা ৭০ জন এবং রোমান ক্যাথলিকরা শতকরা মাত্র ১০ জন, তবুও প্রেসিডেণ্ট নো তাঁ'র নিজের ধর্মকে প্রাধান্য দিয়ে বৌদ্ধ ধর্মকে দমন করতে চাইলেন। তিনি ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মে হুয়ে-তে নো দিন থাক-এর বিশপরূপে অভিষেকের পঞ্চবিংশতি বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে পোপের পতাকা প্রকাশ্যে উত্তোলন করেন। অথচ প্রেসিডেণ্ট নো-র সরকার ৭ই মে ঘোষণা ক'রে ৮ই মে যে দিনটিতে বুদ্ধদেবের জন্মদিবস পালন করা হয়ে থাকে সেই দিনে বৌদ্ধ পতাকা উত্তোলন নিষিদ্ধ ক'রে দিলেন। আবার হুয়ে রেডিওকে নির্দেশ দেওয়া হ'ল তারা যেন ৮ই মে-র ধর্ম অনুষ্ঠানের বিবরণ প্রচার না করে। এর প্রতিবাদ জানাবার জন্য শিশু ও স্ত্রীলোক সহ ২০,০০০ লোক নিয়ে গঠিত এক বৌদ্ধ জনতা রেডিও ষ্টেশনের বাইরে সমবেত হয়। এই সময় সৈন্যদল আহূত হয়ে কাঁদনে গ্যাস ও পরে মেশিনগান থেকে গুলী ছোড়ার ফলে নয়জন হত ও প্রায় ২০ জন আহত হয়েছিল।

১৫ই মে (১৯৬৩ খ্রীঃ) বৌদ্ধ পুরোহিত প্রেসিডেণ্ট নো-র কাছে পাঁচটি দাবি পেশ করেন, যথা—(১) বৌদ্ধ পতাকা উত্তোলনের স্বাধীনতা; (২) বৌদ্ধধর্ম ও ক্যাথলিক ধর্মের আইনসঙ্গত সমান মর্যাদা; (৩) বৌদ্ধ নির্যাতনের অবসান; (৪) বৌদ্ধদের ধর্ম প্রচার ও পূজা করার স্বাধীনতা এবং (৫) ৮ই মে যারা নিহত হয়েছে তাদের পরিবারকে সাহায্য দান ও এর জন্য যারা দায়ী তাদের শাস্তিবিধান।

১৯৬৩ সালের ৩রা জুন হুয়ে-তে ছাত্র বিক্ষোভ ভেঙ্গে দেবার জন্য গ্যাস ছোড়া হ'লে দেশের অবস্থা আরও খারাপ হয়।

এবতাবস্থায় মার্কিণ দূত বৌদ্ধদের সঙ্গে মিটমাট করার জন্য চাপ দেওয়া সত্ত্বেও প্রেসিডেণ্ট নো তাতে কর্ণপাত করেন নি। তার কারণ অনুমান করা হয় যে, তিনি তাঁর পরিবার দ্বারা উৎসাহিত হয়ে নিজের ধর্ম-সংক্রান্ত নীতিতে অবিচলিত রইলেন। অবশেষে বৌদ্ধ-নেতারা ১২ই জুন ঘোষণা করলেন যে, তাঁরা ধর্মের ভিত্তিতে তাঁদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর।

১২ই জুন সায়গনের এক মাঠে ৭৩ বৎসর বয়স্ক এক বৌদ্ধ

লেন। অন্যান্য বৌদ্ধরা তাঁকে এমনভাবে ঘিরে রেখেছিল পুলিশ সে বেষ্টনী ভেদ করে তাঁকে বাধা দিতে পারে নি। অবশেষে ১৬ই জুন প্রেসিডেন্টকে বৌদ্ধদের সঙ্গে চুক্তি তে হয়। এই সর্তাবলীতে মার্কিনের হাত ছিল ব'লে ান পক্ষই সন্তুষ্ট হ'তে পারে নি।

অতঃপর বৌদ্ধদের আন্দোলন পুনরায় সুরু হ'ল। প্রসিডেন্ট নো-কে পত্রে জানিয়ে দেওয়া হ'ল যে, যদি ৬ই জুনের চুক্তি কার্যকরী করা না হয় তবে নতুন ক'রে ান্দোলন পরিচালনা করা হবে। ফলে, প্রেসিডেন্ট এই ক্তি কার্যকরী করার জন্য আদেশ দিলেন; কিন্তু নানা রোচনার জন্য আন্দোলন জোর হ'তে লাগল। আরও নেক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আত্মাহুতি দিল। ক্রমে সৈন্যদল র্তৃক প্যাগোডাসমূহ আক্রান্ত হ'ল এবং দলে দলে বৌদ্ধরা ন্দী হ'ল।

এইভাবে বিশৃঙ্খলা চলার সময় বৈদেশিক মন্ত্রী ভু ভান উপদত্যাগ করেন। এদিকে ছাত্ররাও সরকারের বিরুদ্ধে ান্দোলন চালাতে থাকে। এমনি অশান্তির মধ্য দিয়ে লতে চলতে আবার সামরিক অভ্যুত্থান হয়। সায়গনে ৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা—২রা নভেম্বর তুমুল যুদ্ধের পর প্রসিডেন্ট নো-র সরকার ক্ষমতাচ্যুত হয় এবং প্রেসিডেন্ট তাঁর রাজনৈতিক উপদেষ্টা নেচু দিন নু এই দু'জন নিহত া বা অন্যমতে আত্মহত্যা করেন।

সামরিক বিদ্রোহ কমিটি (Military Revolu-onary Committee) ৪ঠা নভেম্বরে গঠনতন্ত্রে সংশোধন পেক্ষে বন্ধ রেখে সাময়িক সংবিধান গ্রহণ করল এবং র হ'ল মেজর জেনারেল ডয়োং ভ্যান মিন রাষ্ট্রের প্রধান পে ক্ষমতা ব্যবহার করবেন।

এই সরকারও অধিক দিন স্থায়ী হ'ল না। ১৯৬৪ লের ৩০শে জানুয়ারী জেনারেল নুয়েন থান ও জেনারেল ন গিয়েন খিয়েম-এর নেতৃত্বে এক রক্তপাতহীন সামরিক ভ্যুত্থানের ফলে মেজর জেনারেল ডয়োং ভ্যান মিনের সনের অবসান হয়। তখন নুয়েন থান প্রধানমন্ত্রী সাবে ক্ষমতা গ্রহণ করেন।

সর্বশেষ খবরে প্রকাশ যে, দক্ষিণ ভিয়েৎনামের মতাসীন জঙ্গী চক্র-ছাত্র ও বৌদ্ধদের প্রতিবাদের নিকট তি স্বীকার করেছে এবং মেজর জেনারেল নুয়েন থানকে প্রসিডেন্টের পদ থেকে অপসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মেজর জেনারেল নুয়েন থান Nguyen Khanh) মাত্র দশ দিন পূর্বে প্রধানমন্ত্রী কে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রেসিডেন্ট (রাষ্ট্রপ্রধান) পদে তিষ্ঠিত হন।

ইতিহাস

ভিয়েৎনামীদের আদিম অধিবাস লোহিত নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলে। এখানে জলাভূমিগুলিকে চাষের উপযোগী ক'রে তারা খাদ্যশস্য উৎপাদন ক'রতে থাকে এবং ধীরে ধীরে তাদের বংশবৃদ্ধি হ'তে থাকে। ইন্দো-নেশীয়রা পার্শ্ববর্তী পর্বতসমূহ দখল ক'রে বাস করছিল; কিন্তু ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে ক্রমাগত চীন দেশ থেকে (আই, মান ও মেও) আক্রমণের ফলে তাদের সেখান থেকে হ'টে যেতে হয়।

চম্পা রাজ্য

মধ্যযুগে চাম (Chams) নামে ইন্দোনেশীয় এক-শ্রেণীর লোক সমুদ্রোপকূলের বৃহৎ অংশ—লোহিত নদীর ব-দ্বীপের দক্ষিণে এবং মেকং নদীর উত্তর ভাগ জুড়ে বাস করত। এরা খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারতীয় সভ্যতাধীনে এসেছিল। চাম-বা সমুদ্রে পার হয়ে মশলা, মুসব্বর (aloes) কাঠ ও গজদন্তের ব্যবসায় করত। তাদের শিল্প ক্মের-দের (Khmers) শিল্পের মত বিখ্যাত। চাম রাজ্য 'চম্পা'-র রাজধানী প্রথমে ছিল ইন্দ্রপুরায় (টৌবেনের নিকট) এবং পরে ছিল বিজয়-এ। এই রাজত্ব কম্বোডিয়ার সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধে লিপ্ত থেকেও দীর্ঘ ১২০০ শত বর্ষ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। ১৪৭০ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েৎনামীরা চাম-দের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হ'লে চম্পা রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে গেল এবং সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে এর অস্তিত্বই রইল না।

নাম-ভিয়েৎ বা আন্নাম রাজ্য

মেকং নদীর ব-দ্বীপ ক্মের রাজ্যের অংশবিশেষ ছিল। কোন এক চীনা সৈন্যাধ্যক্ষ যিনি চীন সাম্রাজ্যের দক্ষিণ অংশে শাসক নিযুক্ত হন, তিনি লোহিত নদীর তীরে নাম-ভিয়েৎ রাজ্য স্থাপন করেন। হুণ-বংশীয় চীনারা এই রাজত্বের অবসান ঘটায় খ্রীষ্ট পূর্ব ১১১ অব্দে। ফলে, এই স্থান সাম্রাজ্যের প্রদেশ রূপে পরিগণিত হয়ে গিয়াও-চি নাম ধারণ করে। পরবর্তী কালে এর নাম পরিবর্তন ক'রে রাখা হয় 'আন্নাম' অর্থাৎ দক্ষিণের রাজ্য। এইভাবে ভিয়েৎনামীদের চীনা সভ্যতা গ্রহণ করতে হয়। এরা মাঝে মাঝে বিদ্রোহ ক'রেছে বটে; কিন্তু কৃতকার্য হতে পারে নি।

তাং সম্রাটরা এই রাজ্য-শাসনকালে খুব নির্যাতন চালিয়েছিলেন; কিন্তু তাঁদের বংশধর বা উত্তরাধিকারীরা দশম শতাব্দীতে দুর্বল হয়ে পড়াতে ভিয়েৎনামের ওপর

আধিপত্য বজায় রাখতে পারল না। এই সময় ভিয়েৎনামীরা চীনের প্রভুত্ব স্বীকার করলেও কার্যত তারা স্বাধীন হ'ল।

কিছুকাল ধরে অরাজকতাপূর্ণ সামন্ত-শাসনাধীনে চলার পর দেশ 'লি' বংশের দ্বারা সুসংবদ্ধ বা ঐক্যবদ্ধ হয়। এই লি বংশের রাজত্বকাল চলে একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত। পরবর্তী তান রাজবংশ ত্রয়োদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত রাজত্বকালের মধ্যে কুবলাই খাঁ-র প্রেরিত মোঙ্গলদের আক্রমণ প্রতিরোধ করে এবং চম্পা রাজ্যের বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা করে। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এখানে আবার অল্প কয়েক বছর চীনের নিয়ন্ত্রণ চলার পর একটি নতুন রাজবংশ 'লে' চীনাদের সরিয়ে দেয়। লে-থান-টোন নামে শক্তিশালী এক শাসক (১৪৬৬-৯৭) ১৪৭০ খ্রীষ্টাব্দে 'চাম'-দের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হন।

ভিয়েৎনামীরা আগেকার চাম-রাজ্যের সবত্র সামরিক উপনিবেশ স্থাপন করে। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে আরম্ভ ক'রে তারা ক্রমে ক্রমে মেকং নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে লাগল এবং সেখানকার অধিবাসী ক্ষের-দের বিতাড়িত অথবা পরাস্ত করল। ১৯ শতকের প্রারম্ভেই তারা সমগ্র ব-দ্বীপে সম্পূর্ণরূপে অধিষ্ঠিত হয়।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে 'লে'-বংশের আধিপত্য নামে-মাত্র ছিল; কিন্তু আসল ক্ষমতা ত্রিন ও নুয়েন এই দুই পরিবারের মধ্যে বণ্টিত হয়েছিল। প্রথমোক্ত অর্থাৎ ত্রিন উত্তরে এবং শেষোক্ত পরিবার অর্থাৎ নুয়েন দক্ষিণে ক্ষমতাসীন হ'ল। চাম ও ক্ষের রাজ্যসমূহে সাম্রাজ্য বিস্তারের কাজ এই নুয়েন পরিবারের দ্বারাই হয় এবং এর ক্ষমতা যতই বৃদ্ধি পেতে লাগল ততই ত্রিন পরিবারের সঙ্গে সংঘর্ষ হতে লাগল, বিশেষতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে।

ইউরোপীয়দের আগমন ও ফরাসী অধিকার

ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজ জাহাজ ভিয়েৎনামের উপকূলে আসতে থাকলে ইউরোপের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রপাত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে ওলন্দাজ ও ইংরাজ বণিকরা হানয়-এ অধিষ্ঠিত হ'ল এবং ক্যাথলিক ধর্মযাজকরা আন্নামের সর্বত্র কাজ করতে লাগল। এই ধর্মযাজকদের অন্যতম আলেকজান্দ্রে দ্য রোদেস নামে একজন ফরাসী ভিয়েৎনামী ভাষার জন্য রোমান বর্ণমালা গ্রহণ করেন।

১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে টে-সোন, ত্রিন ও নুয়েন এই উভয়কেই ক্ষমতাচ্যুত করে; কিন্তু শেষোক্ত পরিবারের ১৫ বছর বয়স্ক একটি বালক—নুয়েন আন (১৭৬২-১৮২০) দক্ষিণে প্রতীপ বিদ্রোহ সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করে। একজন ফরাসী বিশপ ও কতিপয় ফরাসী পদস্থ কর্মচারীর সাহায্যে টে-সোনকে পরাস্ত ক'রে এই বালক উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হ'ল এবং হানয়ে প্রবেশ করল। অতঃপর ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে গিয়া-লং নাম ধারণ ক'রে ঐক্যবদ্ধ ভিয়েৎনাম-এর (আন্নাম) সম্রাট হ'ল। 'গিয়া-লং'-এর উত্তরাধিকারী সিন-মাং (১৮২০-৪১) ও তু-দাক (Tu-Duc, ১৮৪৮-৮৩) ফরাসীদের সঙ্গে বন্ধুত্বের নীতি পরিত্যাগ ক'রে খ্রীষ্টানদের ভয়ঙ্কর ভাবে নির্যাতন করতে লাগলেন। এর প্রতিকারের উদ্দেশ্যে এসে ফরাসীরা উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ভিয়েৎনাম জয় করল এবং দ্বিতীয় মহা সমরের পর যে পর্যন্ত না ভিয়েৎনাম পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করল ততদিন পর্যন্ত প্রভুত্ব করতে লাগল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ফরাসী রিপাবলিকের পতন ঘটলে ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে জাপানীরা চীন আক্রমণের জন্য টংকিং-এর ঘাঁটি ব্যবহারের অধিকার পায়। ক্রমে ১৯৪১ সালের জুলাইতে জাপানীরা দক্ষিণ ইন্দোচীন অধিকার করে।

ভিয়েৎনামীদের অভ্যুত্থান

১৯৪৫ সালের ৯ই মার্চ জাপানীরা ফরাসী শাসনের অবসান ঘটিয়ে তাদের নিজেদের লোক নিয়ে জাতীয় সরকার গঠন করল। এর মূলে ছিল 'এশিয়া এশিয়াবাসীদের জন্য'—নীতি। কিন্তু বেশিদিন যেতে-না-যেতেই ১৯শে আগষ্ট হিরোশিমা আণবিক বোমায় বিধ্বস্ত হওয়ার ফলে জাপানীরা ভিয়েৎনাম থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়। ইত্যবসরে ভিয়েৎনামীরা ক্ষমতাসীন হ'ল। এই 'জাতীয়' দলের নেতা হলেন হো-চি-মিন নামে একজন প্রবীণ কমিউনিষ্ট।

এদিকে মিত্রপক্ষীয়রা পট্‌সডামে স্থির করল যে, উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনাম যথাক্রমে চীন ও ব্রিটিশ কর্তৃক অধিকৃত হবে। কিন্তু শেষে ব্রিটিশের পরিবর্তে ফরাসীদের অধিকার হ'ল; অতএব তারা 'হো-চি-মিন'-এর সঙ্গে কথাবার্তা চালালেন। জেনারেল জ্যাক্‌স লেকলার্ক (Jaques Leclerc) ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মার্চ হাইফং-এ অবতরণ করেন এবং পরে হানয় অধিকার করেন। ফ্রান্স তখন ভিয়েৎনাম রিপাবলিককে ইন্দোচীন ফেডারেশন ও ফরাসী ইউনিয়নের অংশ হিসাবে স্বীকার করে নেয়।

১৯৪৬ সালের ২৩শে নভেম্বর ফরাসীরা হাইফং-এ অবৈধ অস্ত্র আমদানী বন্ধ করার চেষ্টা করলে গোলাগুলী বিনিময় হয়। এই থেকেই দীর্ঘকাল যুদ্ধের সূচনা হয়

ক্রমে ক্রমে ফরাসীদের এমন অবস্থা হ'ল যে, তারা 'কনভয়' অর্থাৎ রক্ষী ব্যতীত সহর ছেড়ে বের হ'তে পারত না। ক্রমে অবস্থার চাপে পড়ে ফরাসীরা আন্নামের ভূতপূর্ব সম্রাট্ বাও দাই-এর সঙ্গে মিটমাট করতে চেষ্টা করল। তদনুযায়ী ১৯৪৯ সালের ৮ই মার্চ যে চুক্তি হয় তার ফলে ভিয়েৎনাম ফরাসী ইউনিয়নের মধ্যে স্বাধীন হ'ল; কিন্তু বাও দাই-এর শাসন জনগণকে আশানুরূপ ভাবে আকৃষ্ট করতে পারল না।

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীরা চীন সীমান্তের লাওসোন (Laugson) অঞ্চল ছাড়তে বাধ্য হ'ল। ফলে কমিউনিষ্ট চীনের পক্ষে ভিয়েৎনামকে অবাধে অস্ত্র সরবরাহের সুবিধা হ'ল। ১৯৫১ সালে ফরাসীরা ব-দ্বীপ অঞ্চল থেকে শত্রু বিতাড়ন করতে সমর্থ হ'ল।

১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে থাই দেশ অধিকার ক'রে ভিয়েৎনামীরা লাওস আক্রমণ করে এবং উত্তর-পূর্ব অংশে স্বাধীন সরকার (প্যাথেট লাও) গঠন ক'রে প্রায় লুয়াং প্রবাং-এর উপকণ্ঠ পর্যন্ত অগ্রসর হয়। ১৯৫৪ সালের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারীতে ভিয়েৎনামীরা মধ্য লাওস দখল করে এবং মে মাসে দিয়েন বিয়েন ফু-তে প্রবেশ করে।

ভিয়েৎনাম বিভাগ

১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে পিয়েরে মেন্দেস্ ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী হয়ে ইন্দোচীনে দীর্ঘ যুদ্ধের অবসান করা স্থির করেন। তাঁর প্রস্তাবক্রমে ২১শে জুলাই জেনিভা সম্মেলনে এই যুদ্ধবিরতি স্বাক্ষরিত হয় এবং এখানে ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া, কমিউনিষ্ট চীন, (কার্যতঃ de facto) উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, লাওস ও কাম্বোডিয়া অংশ গ্রহণ করে। এই যুদ্ধবিরতির ফলে ইন্দোচীনে সপ্ত বর্ষব্যাপী যুদ্ধের অবসান হ'ল এবং স্থির হ'ল কিছুকালের জন্য ভিয়েৎনাম বেন হয় (Ben Hoi) নদী দ্বারা উত্তরে কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র ও দক্ষিণে জাতীয় রাষ্ট্র এই দুই ভাগে বিভক্ত হবে। এই নদী ১৭ অক্ষাংশের কাছ দিয়ে প্রবাহিত। উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্য নিয়ে এই উভয় অংশেই দু' বছর পরে নির্বাচন হবে স্থির হ'ল।

উত্তরে কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র

ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অফ ভিয়েৎনামের প্রেসিডেন্ট হ'লেন হো চি মিন এবং মন্ত্রীসভার (কাউন্সিল অফ মিনিষ্টারস্) চেয়ারম্যান হ'লেন ফান বান দোং। ২৯শে অক্টোবর (১৯৫৬) লাও দোং (কমিউনিষ্ট বা শ্রমিক) পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি, পার্টির প্রথম সম্পাদক ট্রুয়োং চিনকে বিতাড়িত করলে হো চি মিন রাষ্ট্রের প্রধান রূপে থেকেও তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন। এই রাজত্বকালে ত্রি-বার্ষিক পুনর্বাসন পরিকল্পনা ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদিত হয়েছিল। প্রায় ৮০টি বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের প্রবর্তন ও ২৪০টির পুনর্গঠন করা হয় চীন, সোভিয়েট, পোল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকীয়দের সাহায্যে।

দক্ষিণে জাতীয় রাষ্ট্র রিপাবলিক অফ ভিয়েৎনামের প্রধানরূপে এলেন আন্নামের ভূতপূর্ব সম্রাট্ বাও দাই; কিন্তু ১৯৫৫ সালের ২৩শে অক্টোবর শতকরা ৯৮ জনের ভোটে তিনি অপসারিত হলেন এবং প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হলেন প্রধানমন্ত্রী নো দিন দিয়েম। তিন দিন পরে সাধারণতন্ত্রের অস্থায়ী সংবিধান বলে তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রেসিডেন্ট ঘোষিত হলেন।

১২৩ জন নির্বাচিত সভ্য নিয়ে 'কনষ্টিটিউয়েণ্ট এ্যাসেমব্লী' গঠিত হ'ল ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে এবং নতুন গঠনতন্ত্র গৃহীত হ'ল ৭ই জুলাই। এই সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট ছয় বছরের জন্য সাধারণ নির্বাচন দ্বারা রাষ্ট্রের প্রধানরূপে নির্বাচিত হবেন।

১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত জেনেভা সম্মেলনের সহসভাপতি (Co-chairman) যুক্তরাজ্য ও সোভিয়েটের মধ্যে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মে এক চুক্তি স্বাক্ষর দ্বারা দুই ভিয়েৎনামকে সংযুক্ত করার ভিত্তিতে যে সাধারণ নির্বাচন হবার কথা ছিল তা স্থগিত রাখা হ'ল।

১৯৬১ সালে উত্তর ভিয়েৎনামীরা প্রবলভাবে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের শাসকদের উচ্ছেদ করার চেষ্টা করতে লাগল। ১৭ই আগষ্ট দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বৈদেশিক মন্ত্রী ভু ভান মাউ বৃটিশ ও সোভিয়েট বৈদেশিক মন্ত্রীদ্বয়, যাঁরা ১৯৫৪ সালে জেনেভা সম্মেলনের সহসভাপতি ছিলেন, তাঁদের কাছে কমিউনিষ্টদের দ্বারা যুদ্ধ বিরতির সর্তভঙ্গের তালিকাসহ নোট পাঠিয়েছিলেন। ১৮ই সেপ্টেম্বর বিদ্রোহী কমিউনিষ্টরা কয়েক ঘণ্টার জন্য ফু ও ক বিন দখল করেছিল। ভিয়েৎনামে আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (International Commission for Supervision and Control in Vietnam—I. C. S. C.) অধিকাংশ সদস্যই উত্তর ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে এই অভিযোগের সত্যাসত্য অনুসন্ধান করার ক্ষমতা কমিশনের ওপর দেওয়ায় উঃ ভিয়েৎনাম প্রবল আপত্তি করেছিল।

সোভিয়েট বিমান লাওসে প্যাথেট লাওকে সৈন্য সরবরাহের জন্য উঃ ভিয়েৎনামের বিমানক্ষেত্র ব্যবহার করতে থাকায় দঃ ভিয়েৎনাম তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল।

জেনেভায় লাওস সম্পর্কে ১৪ জাতির যে সম্মেলন হয় তাতে উভয় ভিয়েৎনাম থেকেই প্রতিনিধি যায়।

মে মাসে প্রেসিডেণ্ট কেনেডি দঃ ভিয়েৎনামকে অধিক সামরিক সাহায্য দান ঘোষণা করলে উঃ ভিয়েৎনাম I. C. S. C.-র কাছে প্রতিবাদলিপি পাঠায়।

৯ই এপ্রিল নো দিন দিয়েম দ্বিতীয় বারের জন্য ভিয়েৎনাম সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন। সারা বছর ধরে কমিউনিষ্ট সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ দ্রুত বেড়েই চলতে লাগল এবং কোন কোন জায়গায় সন্ত্রাসবাদীদের আধিপত্য বিস্তৃত হ'ল।

দঃ ভিয়েৎনামে সন্ত্রাসবাদীদের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য যুক্তরাষ্ট্র গেরিলা বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ কৌশল শিক্ষা দেবার জন্য বিশেষ সৈন্যদল ও ডিসেম্বর মাসে লোকজনসহ ৩৬টা হেলিকপটার পাঠিয়ে দিল।

উত্তরে ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অফ ভিয়েৎনামে এই বছরে (১৯৬১ সালে) দু'টি বিশেষ জিনিষ পরিলক্ষিত হ'ল যেমন—(১) ক্রমবর্দ্ধমান খাদ্য ঘাটতি ও (২) কমিউনিষ্ট শাসনের বিরুদ্ধে আভ্যন্তরীণ বাধা সৃষ্টি। জুলাই ও আগষ্ট মাসে পরিস্থিতি এতদূর খারাপ হ'ল যে, ধ্বংসকারীরা বড় বড় শস্যাগার পুড়িয়ে দিল এবং হাজার হাজার টন চাল নষ্ট করে দিল।

তখন দেশের অভ্যন্তরে সংখ্যালঘুদের মধ্যে প্রকাশ্য বিদ্রোহ দেখা দিল এবং বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হ'ল। উঃ ভিয়েৎনাম সরকার ঘোষণা করল যে, এই গণ্ডগোল সৃষ্টি করেছে দক্ষিণ ভিয়েৎনামীরা। এর প্রতিকারের জন্য নিরাপত্তা রক্ষাকারীদের শক্তি বৃদ্ধি করা সত্ত্বেও বিশৃঙ্খলা বেড়েই চলল।

ভৌগোলিক বিবরণ

ইন্দোচীনের পূর্ব অংশের নাম ভিয়েৎনাম। ভিয়েৎনামের অর্থ হচ্ছে দক্ষিণের দেশ (Land of the South) উত্তরে চীন, পূর্বে ও দক্ষিণে টংকিং উপসাগর ও দক্ষিণ-চীন সাগর এবং পশ্চিমে কাম্বোডিয়া ও লাওস দ্বারা ভিয়েৎনাম বেষ্টিত। ৮°৩৩´ থেকে ২৩°২´ উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত এবং ১০২°১১´ থেকে ১০৯°২৮´ দ্রাঘিমা পর্যন্ত জায়গা জুড়ে এর অবস্থান। ১৯৫৪ সালের ২১শে জুলাই থেকে ভিয়েৎনাম দু'টি স্বাধীন প্রজাতন্ত্রে (রিপাবলিক) বিভক্ত হয়েছে—(১) উত্তরে কমিউনিষ্ট শাসিত ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অফ ভিয়েৎনাম ও (২) দক্ষিণে রিপাবলিক অফ ভিয়েৎনাম।

[illegible] অনুসারী ভিয়েৎনামকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) উত্তর ভিয়েৎনাম, (২) মধ্য ভিয়েৎনাম, ও (৩) দক্ষিণ ভিয়েৎনাম।

(১) উত্তর ভিয়েৎনাম-এর দু'টি সুস্পষ্ট অঞ্চল দেখা যায়, যেমন ব-দ্বীপ অঞ্চল ও পার্বত্য অঞ্চল। দক্ষিণস্থ চীন স্তূপ পর্বতের প্রান্ত ভাগ এই পার্বত্য অঞ্চল সৃষ্টি করেছে লোহিত নদীর দক্ষিণে এই পর্বত উত্তর পশ্চিম দক্ষিণ-পূর্ব অভিমুখী এবং নদীগুলিও এই দিকে প্রবাহিত। সর্বোচ্চ শিখর ফান সি পান এবং তার উচ্চতা ১১,১১২ ফিট।

লোহিত নদী যুনান থেকে উঠে ৭৪৫ মাইল প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে পড়েছে। এর পলিমাটি জমে ব-দ্বীপের সৃষ্টি হয়েছে। সোং থাই বিন-এর ব-দ্বীপ, যার ওপর হাইফং বন্দর অবস্থিত তার সঙ্গে লোহিত নদীর ব-দ্বীপ মিশেছে।

(২) মধ্য ভিয়েৎনাম-এর দীর্ঘ উপকূলে পলিমাটি দ্বারা রচিত যে সব সমভূমি আছে তা আন্নামী পর্বতমালার সামনে অবস্থিত। এই সব ছোট ছোট সমভূমির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে থান হোয়া ও ভিন (উত্তরে অবস্থিত), হুয়ে (মধ্যে) ও কুই নোন—Qui Nhon (দক্ষিণে অবস্থিত)। সমুদ্রোপকূল বালুস্তূপ বা সৈকত শৈল (dunes) ও অন্তরীপে পরিপূর্ণ।

দক্ষিণে অনেক দূর প্রসারিত মই (Moi) মালভূমি এবং এর সর্বোচ্চ অংশ মাদার এ্যাণ্ড চাইল্ড (৬,৬৩৪ ফিট) ভারেলা অন্তরীপের কাছে অবস্থিত। লাওসের সঙ্গে মধ্য ভিয়েৎনামের যোগাযোগ সাধন ক'রছে গিরিবর্ত্মগুলি।

(৩) দক্ষিণ ভিয়েৎনাম—পুরাকালে মেকং নদীর পলিমাটি জমে জমে কোন এক উপসাগর বুজে যাওয়ার ফলে এই অঞ্চলের সৃষ্টি হয়। এর কিছু অংশ কালক্রমে শুকিয়ে যায় আর বাকি অংশ জলাভূমি রূপে থেকে যায়। পূর্বদিকে সায়গননদী (Riviere de Saigon) ও তার উপনদীসমূহ কতকগুলি পর্বতের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে এবং মেকং নদী কতিপয় শাখাসহ সমুদ্রে পড়েছে। পোলে কোণ্ডোর দ্বীপটি কূল থেকে ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত।

জলবায়ু

দক্ষিণে অবস্থিত সায়গনে বাৎসরিক উত্তাপের অল্পই তারতম্য ঘটে। জানুয়ারী মাসের গড় উত্তাপ ২৬° সেঃ ও এপ্রিল মাসের উত্তাপ ২৯° সেন্টিগ্রেড। উত্তরস্থ হানয়ের তাপমাত্রা জুন মাসে গড়ে ২৮°সেঃ, এবং সর্বনিম্ন তাপ ৬° সেন্টিগ্রেডে নেমে যায়।

ভিয়েৎনামে উষ্ণমণ্ডলীয় মৌসুমী জলবায়ু। প্রশান্ত মহাসাগর থেকে আগত গ্রীষ্মকালীন মৌসুমী বায়ু মে মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত বৃষ্টিপাত ঘটায়। মধ্য ভিয়েৎ-

নামে অল্প পরে বৃষ্টি আরম্ভ হয়। সায়গন (দঃ ভিয়েৎনাম) ও হ্যানয়ে (উঃ ভিঃ) ৫৮ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়; কিন্তু মধ্য ভিয়েৎনামে অনেক বেশি বৃষ্টিপাত হয়। এখানকার হুয়েতে (Hue) ১১৬ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয় এবং পর্বতে আরও বেশি হয়।

উদ্ভিদ

উত্তরদিকে অবস্থিত বনরাজির সঙ্গে দক্ষিণ চীনের বনসমূহের সাদৃশ্য আছে। এখানকার বনে নানা প্রকারের পতনশীল (deciduous) বৃক্ষ এবং বেত ও বাঁশ গাছ পাওয়া যায়।

দক্ষিণে নিরক্ষীয় চিরহরিত অরণ্য, তার মধ্যে আর্থিক দিক থেকে মূল্যবান্ নানাবিধ গাছ এবং বহু রকমের তাল জাতীয় বৃক্ষ আছে। পর্বতসমূহ পাইনের বনে আচ্ছাদিত।

জীবজন্তু

হরিণ, বুনো ষাঁড়, মহিষ, হাতী, বাঘ ও ময়াল সাপ পার্বত্য অঞ্চলে (বিশেষতঃ দক্ষিণে) প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। মাছ ও দৃঢ়বর্মী কাঁকড়া, চিংড়ি প্রভৃতি নদীতে, হ্রদে, এমনকি ধানক্ষেতে অজস্র মেলে।

ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অফ ভিয়েৎনাম টংকিং ও আন্নামের উত্তর অংশ নিয়ে গঠিত। এর উত্তর সীমায় চীন, পশ্চিমে লাওস, দক্ষিণে রিপাবলিক অফ ভিয়েৎনাম বা সপ্তদশ অক্ষাংশ এবং পুবে দক্ষিণ চীন সাগর অবস্থিত।

আয়তন— ৫৯,৯৩৪ বর্গমাইল

লোকসংখ্যা— ১,৫৯,১৬,৯৫৫ (১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে)

রাজধানী—হ্যানয়, লোকসংখ্যা: ৬,৩৮,৬০০ (১৯৬০ খ্রীঃ)

বন্দর— হাইফং,—লোক সংখ্যা: ৩,৬৭,৩০০ (১৯৬০)

রিপাবলিক অফ ভিয়েৎনাম

কোচিন চীন ও আন্নামের দক্ষিণ অংশ নিয়ে গঠিত। উত্তরে ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অফ ভিয়েৎনাম (১৭শ অক্ষাংশ), পশ্চিমে লাওস, কম্বোডিয়া ও শ্যাম উপসাগর এবং দক্ষিণ ও পুবে দঃ চীন সাগর দ্বারা বেষ্টিত।

আয়তন— ৬৬,৯৪৮ বর্গমাইল

লোকসংখ্যা— ১,৪১,০০,০০০ (১৯৬০ সালের গণনা অনুযায়ী)

রাজধানী—সায়গন

লোকসংখ্যা: ১.৪ মিলিয়ন (১৯৬০)

বন্দর—চোলন

প্রধান সহর—হুয়ে ,, ১,০২,৮১৪ (১৯৬০)

ভিয়েৎনামীরা দক্ষিণ শাখা মঙ্গোলীয় জাতির অন্তর্গত। তাদের ভাষা এক অংশাত্মিক (monosyllabic) এবং চীনা ধরণে অথবা কুয়ক-নু (Quoc-gnu রোমান অক্ষরের ভিত্তিতে) অক্ষরদ্বারা লেখা হয়। তারা সমভূমিতে বাস করে এবং সংখ্যায় ২,২০,০০,০০০ জনেরও অধিক। ভিয়েৎনামের দক্ষিণ দিকে বাস করে কাম্বোডীয়গণ (৩,০০,০০০), আন্নামী পর্বতমালায় বাস করে মই (৭,২০,০০০) এবং উত্তর পর্বতসমূহে বাস করে থাই (৭,০০,০০০), মুয়ং (২,০০,০০০), মান (৯০,০০০) ও মেও (৮০,০০০) প্রভৃতি। এ ছাড়া সহরে ৪,০০,০০০ চীনা ব্যবসায়ী এবং ৪০,০০০ ইউরোপীয় অথবা তাদের মিশ্রণে উদ্ভূতগণ বাস করে।

আমদানী ও রপ্তানী

চাউল, কয়লা, রবার ও ভুট্টা রপ্তানী হয়। শিল্পজাত সামগ্রী, যন্ত্র, মোটর গাড়ি ও বস্ত্র আমদানী করা হয়।

চা ও কফির চাষ যুদ্ধের জন্য ব্যাহত হয়েছে। আরণ্য দ্রব্য, ধৃত মৎস্য ও পালিত পশু দ্বারা স্থানীয় বাজারের চাহিদা মেটান হয়। প্রধান শিল্পগুলিও (সিমেন্ট, বস্ত্র ও সংরক্ষিত মাছ) স্থানীয় প্রয়োজন মেটায়।

ধর্ম

ভিয়েৎনামে কনফুশীয়, বৌদ্ধ ও রোমান ক্যাথলিক ধর্ম প্রচলিত। এ ছাড়া আধুনিক সম্প্রদায়ের লোক (যেমন—কাওদাই ও হোয়া-হাও) এখানে অনেক আছে।

—:—

ছায়াপথ

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

বাইশ

এদিকে রামকিঙ্করের পরীক্ষার ফল বার হবার সময় ঘনিয়ে আসতে লাগল। এবং যত ঘনিয়ে আসে ভিতরে ভিতরে রামকিঙ্কর তত দমে।

তার কলেজের বন্ধু বেশী নয়। বলতে গেলে একটিই—বিশ্বনাথ। বাকি যা, কলেজ বন্ধ থাকলে তাদের সঙ্গে দেখাই হয় না।

বিশ্বনাথ নিত্য নতুন গুজব নিয়ে আসে। সে গুজবের কোনটিই আনন্দদায়ক নয়। খবরের কাগজে একদিন বেরুল বি. এ.-র ইতিহাসের প্রথম পত্রের কিছু উত্তরপত্র খোওয়া গিয়েছে। পরীক্ষক কুলির মাথায় করে সেগুলি আনছিলেন। কিছুদূর আসার পর সেগুলিকে আর দেখতে পেলেন না। লোকটি কোথায় পালাল কে জানে!

রামকিঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, কি হবে তা হ'লে?

বিশ্বনাথ বললে, একটা কিছু গোঁজামিল দিয়ে কাজ সারা হবে আর কি!

—কি রকম গোঁজামিল?

—হয়ত অন্য পেপারের মার্ক দেখে সেই অনুপাতে একটা কিছু বসিয়ে দেবে।

রামকিঙ্কর রেগে বললে, সে ভারী অন্যায়। ধর, যারা হারানো পেপারে ভাল লিখেছে, এই ব্যবস্থায় তারা কম পেয়ে যাবে।

বিশ্বনাথ বললে, আর কি করা যাবে বল। যা হারিয়েছে, তা ত আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। আবার কারও কারও ভালও হ'তে পারে।

—কি রকম?

—যারা খারাপ লিখেছে অন্য পেপারের তুলনায়, তারা বেশী পেয়ে যাবে।

—তা যাবে।

হঠাৎ রামকিঙ্কর খুব খুশী হয়ে উঠল: আমার উত্তর-

কেন? ওটা ভাল হয় নি?

মোটেই না।

—তবে যে পরীক্ষা দিয়ে এসে বললি, ভালই হয়েছে?

রামকিঙ্কর অপ্রস্তুত ভাবে বললে, কি জানি, পরীক্ষা দিয়ে আমার পরে তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, সব কি রকম গুলিয়ে যাচ্ছে, এখন মনে হচ্ছে, কোন পেপারই আমার ভাল হয় নি। আমি ফেল করে যাব। তুই ত খুব ঘুরছিস। কিছু খবর যোগাড় করতে পারলি?

ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বিশ্বনাথ বললে, কিচ্ছু না। কত লোকের কাছে যে ধর্না দিচ্ছি রোজ, তার ইয়ত্তা নেই। সবাই ভরসা দিচ্ছে, কিন্তু কেউ কিছু খবর দিতে পারছে না।

রামকিঙ্কর হেসে বললে, আমার কাছে এলে আমি খবর দিতে পারতাম।

সোৎসাহে বিশ্বনাথ বললে, তোর কি কেউ জানা আছে না কি? আমার রোল নাম্বার ত জানিস। দেখবি একবার চেষ্টা করে?

গম্ভীর ভাবে রামকিঙ্কর বললে, দেখেছি।

—দেখেছিস! কি দেখেছিস?

—তুই যদি কাউকে না বলিস ত বলি।

—কাউকে বলব না। তুই বল।

-- তুই সেকেণ্ড ক্লাস অনার্স পেয়ে গেছিস।

তার নিজেরও মন এতে সায় দিলে। তবু দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করলে, গুল দিচ্ছিস না ত?

—না।

—তোর নিজেরটা জেনেছিস?

—সেও এক রকম জানাই।

—পাস করেছিস?

—না বোধ হয়।

—না বোধ হয়! বোধ হয় কেন?

দে। রোদে রোদে তুই আর ঘুরিস না। গ্যাট হয়ে বাড়ীতে গিয়ে বোস।

কিন্তু পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে দুশ্চিন্তা করে লাভ নেই, যা হবার, তা হবে।

রামকিঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা, সবিতা বিয়ে করতে রাজী হচ্ছে না কেন? যে ছেলেটির সঙ্গে কথা হচ্ছে, সে কি তেমন ভাল ছেলে নয়?

—দেখ, ভাল ছেলে আমরা কোথায় পাব? একটি ভাল ছেলে কিনতে যে টাকা লাগে, তা আমাদের নেই। গৃহস্থ ঘরের ছেলে, বি-এ পাস করেছে, মোটামুটি চাকরি করে, দেখতে-শুনতে মন্দ নয়, এই রকম একটি ছেলে যায় কি।

—তা হ'লে ত ভালই বলতে হবে। সবিতা কি আরও ভাল ছেলে চায়?

—তাও ত বলছে না। তা ছাড়া আমরা ভেবেছিলাম, ছেলেটির জন্যে অনেক টাকা খরচ করতে হচ্ছে, সেইটিতেই ওর বোধ হয় আপত্তি। কিন্তু তাও নয়।

—তবে?

—ও বলছে, বি. এ. পাস না করে বিয়ে করবে না। কথাটা কিছু মিথ্যে বলছে না। বাঙ্গালী পরিবারে উপার্জনে অক্ষম মেয়েরা অনেক অন্যায় অত্যাচার সহ্য করে। লেখা-পড়া শিখলে সেই অসহায় ভাবটা কেটে যায়।

রামকিঙ্কর বড় বড় চোখ মেলে বিশ্বনাথের কথা শুনছিল।

বিশ্বনাথ বললে, কিন্তু আমরা ভাবছি বাবার শরীরের কথা। বি-এ পাস করলেও মেয়ের বিয়ে বিনা খরচায় হবার জো নেই। বাবা যদি ততদিন বেঁচে না থাকেন? তার ওপর আর কয়েকমাস পরেই বাবা অবসর নেবেন। হাতে কিছু টাকাও থাকবে। টাকার পাখা আছে। সবিতা বি-এ পাস করা পর্যন্ত সে টাকা কি থাকবে? বাবা-মা সেই কথা ভাবছেন।

বলেই বললে, কিন্তু ভেবে আর কি হবে? ছোট মেয়ে ত নয়, বড় হয়েছে। নিজের ভালমন্দ বুঝতেও শিখেছে। ওর মতের বিরুদ্ধে কিছু ত করা যায় না।

রামকিঙ্করের মন কিন্তু তাতে সায় দিতে পারলে না। বড় হয়েছে? কত বড় হয়েছে? নিজের ভালমন্দই বা সে কতটুকু বোঝে? ওঁদের উচিত ছিল, জোর করে বিয়ে দেওয়া। কেন সাহস করলেন না, কে জানে!

কিন্তু মুখে সে কথা বললে না। অন্যের পারিবারিক ব্যাপারে কথা বলতে যাওয়া উচিত নয়। রামকিঙ্কর চুপ করে রইল।

দিন দশেকের মধ্যেই পরীক্ষার ফল বার হ'ল।

রামকিঙ্কর দোকানের কাজে খুব ব্যস্ত ছিল। সে টেরও পায় নি যে, খবর বেরিয়েছে। বিশ্বনাথ ছুটতে ছুটতে এসে খবরটা দিলে।

—রামকিঙ্কর, তুমি পাস করেছ।

রামকিঙ্কর এত বড় খবরের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। সে ধরেই নিয়েছিল ফেল করবে। তার মনকেও প্রায় প্রস্তুত করেই এনেছিল। খবরের জন্যে কোন প্রকার ব্যস্ততাও ছিল না। আজ যে খবর বেরুচ্ছে, তাও সে জানত না।

জিজ্ঞাসা করলে, আমি কি রকছে?

ওর পিঠে দুটো থাবা দিয়ে বিশ্বনাথ চিৎকার করে বললে, পাস করেছ! পাস করেছ!

এতক্ষণে রামকিঙ্কর যেন ব্যাপারটা বুঝলে। তার মনের মধ্যে একটা হিল্লোল উঠল। কিন্তু শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, আর তুমি?

—আমিও সেকেণ্ড ক্লাস পেয়েছি। তোমার খবরটা ঠিক। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে তুমি ভুল খবর সংগ্রহ করেছিলে।

রামকিঙ্কর হাসলে। বললে, আমার দুটো খবরই আমার নিজের কারখানায় প্রস্তুত। খবরের জন্যে আমি কোনদিন কোথাও বেরুই নি। সে সময়ও নেই।

এতক্ষণে সে দোকানের অন্য লোকদের মুখের দিকে চাইবার সময় পেল। ঘর নিস্তব্ধ। সকলেই যেন কি রকম স্তব্ধ হয়ে গেছে। হরেকৃষ্ণর মুখখানি ছোট হয়ে গেছে। চোখে দুশ্চিন্তা, যেন রামকিঙ্করের সঙ্গে যুদ্ধে সে হেরে গেছে।

রামকিঙ্কর কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বিশ্বনাথকে বললে, চল, বাবা-মাকে প্রণাম করে আসি। তাঁরা খবরটা জানেন?

বিশ্বনাথ বললে, না। আমি রাস্তায় কাগজখানা দেখে তাড়াতাড়ি তোমার কাছেই আসছি। চল, যাই।

সুলোচনা তখন রান্না করছিলেন। চন্দ্রনাথের আপিসের

ভাত, সেই সঙ্গে সবিতার স্কুলেরও ভাত। চন্দ্রনাথ তেল মাখছিলেন। এমন সময় ওরা দু'জন এল।

দু'জনেই টিপ টিপ করে চন্দ্রনাথকে প্রথমে প্রণাম করলে। চন্দ্রনাথ অবাক্। প্রণামটা কিসের?

সবিতা ঘরের মধ্যে ছিল। সে সেইখান থেকেই চিৎকার করে উঠল, মা, দাদা, রামদা দু'জনেই পাস করেছে।

এতক্ষণে চন্দ্রনাথ ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করলেন।

—পাস করেছিস? ফল বেরুল?

—হ্যাঁ।

রামকিঙ্কর বললে, বিশু অনার্স পেয়েছে, সেকেণ্ড ক্লাস।

—তাই নাকি? তোর অনার্স ছিল?

—ছিল।

ওরা দু'জনে ছুটল রান্নাঘরে মা-কে প্রণাম করতে।

বিশ্বনাথ বললে, আপিসের কাজ এবং বাড়ীর তামাক—এ ছাড়া সংসার সম্বন্ধে বাবা আর কোন খবরই রাখেন না।

সুলোচনা রান্না করছিলেন। সবিতার চিৎকার হয়ত কানে গিয়েছিল কিন্তু রান্নার ব্যস্ততার মধ্যে তার অর্থ ঠিক বুঝতে পারে নি। ওরা এসে প্রণাম করতেই বুঝলেন।

তাড়াতাড়ি বললেন, পাস করেছিস? দাঁড়া, তোরা ও-ঘরে বোস, মাছের ঝোলটা নামিয়েই যাচ্ছি।

মিনিট দশেক পরেই তিনি এলেন, দু'হাতে দু'প্লেট খাবার নিয়ে।

বললেন, আজ তোদের জীবনের একটা মস্ত বড় দিন। আমি আশীর্বাদ করি, তোদের কল্যাণ হোক।

তারপর বললেন, বিশু ত এম-এ পড়বে, আর তুই কি করবি, রাম?

রামকিঙ্কর বললে, কিছুই ভাবি নি, মা। পাস করবো ব'লে আমি তৈরী ও ছিলাম না।

—দোকানেই থাকবি? না, অন্য কোন চাকরি-বাকরি দেখবি?

রামকিঙ্কর বললে, দোকানে থাকতে পারব না বলে মনে হচ্ছে না, মা। আবার চাকরিই বা কোথায় পাব, তাও জানি না।

—থাকতে পারবি না কেন?

—অনেক গোলমাল, মা। দোকানেও, বাবুদের বাড়ীতেও।

—কিন্তু গিন্নীমা ত তোকে খুব ভালবাসেন।

—বাসতেন নিশ্চয়ই। নইলে আমার পক্ষে লেখাপড়া শেখা সম্ভবই হ'ত না। কিন্তু এখন যেন কেমন-কেমন মনে হচ্ছে।

—কেন?

—সে অনেক কথা, মা। কিন্তু বড়লোকের বাড়ীর ব্যাপারে না থাকাই ভাল।

শুনে সুলোচনার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। একটুখানি চুপ করে থেকে বললেন, তা সে যাই হোক, তাঁকে তুমি কোনদিন ভুল না। তোমার মা যা করতে পারতেন, তার চেয়ে তিনি বেশি করেছেন। হয়ত কোন কারণেই তিনি তোমার ওপর চটে গেছেন, তাঁকে খুশি করবার চেষ্টা ক'রো।

রামকিঙ্কর হাসলে। বললে, মা, তাঁকে আপনি কোনদিন দেখেন নি। পুরুষের মত শক্ত একটি মেয়ে। এই বিপুল সম্পত্তি তিনি চালাচ্ছেন। তাঁকে কেউ খুশি করতে পারে না, যতক্ষণ না তিনি নিজের ইচ্ছায় খুশি হচ্ছেন। ব্যবহার থেকে বোঝবার উপায় নেই, তিনি কার ওপর খুশি আর কার ওপর চটা। খড়্গ ঘাড়ে পড়বার আগে কিছু বোঝা যায় না। আর যখন ঘাড়ে এসে পড়ে, তখন করবার কিছু থাকে না। সব শেষ হয়ে যায়।

সুলোচনা জিজ্ঞাসা করলে, পাসের খবর তিনি জানেন? তাঁকে প্রণাম করতে গিয়েছিলি?

রামকিঙ্কর বললে, এই ত খবর পেলাম। এখুনি যাব।

সুলোচনা বললেন, তাই যা বরং। আগে তাঁকে প্রণাম করে আয়।

গরদের শাড়ীখানি পরে গিন্নীমা ঠাকুরদালানে তাঁর অভ্যস্ত জায়গাটিতে বসেছিলেন। রামকিঙ্কর তাঁকে প্রণাম করে হাসিমুখে মুখ তুলে চাইলে।

গিন্নীমা বোধ হয় একটা কিছু ভাবছিলেন। অন্যমনস্ক ছিলেন। রামকিঙ্করের আকস্মিক আবির্ভাবে চমকে উঠলেন। কিন্তু তখনি নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি খবর?

রামকিঙ্কর বললে, আমি পাস করেছি।

শুনে গিন্নীমার ঠোঁটে একটা শীর্ণ হাসির রেখা ফুটে উঠল।

বললেন, বেশ, বেশ। তোমার সম্বন্ধে আমার ভয় ছিল। নানা কারণে তোমার পড়ায় অনেক বাধা হয়েছিল। এবার কি করবে ঠিক করছ? এম. এ. পড়বে?

—আজ্ঞে, না।

—কেন? টাকার প্রশ্ন?

রামকিঙ্কর হেসে বললে, আজ্ঞে. না। আপনি যতক্ষণ আছেন, ততক্ষণ টাকার চিন্তা করি না।

রামকিঙ্কর লক্ষ্য করলে, এই কথায় গিন্নীমা যেন খুব প্রসন্ন হলেন না।

সে বলতে লাগল, আমার ত অনার্স ছিল না। তাই এম. এ-তে ভর্তি হ'তে পারব না। আমার নিজেরও খুব পড়বার ইচ্ছা নেই। আপনার দয়ায় এই যতটা হ'ল, তাই যথেষ্ট।

রামকিঙ্কর তোয়াজের ভঙ্গিতে হাসতে লাগল।

গিন্নীমা জিজ্ঞাসা করলেন, এর পরে কি করবে ভাবছ? কোন ভাল চাকরি-বাকরির চেষ্টা করবে নিশ্চয়?

উদাস কণ্ঠে রামকিঙ্কর বললে, কোথায় পাব? মুরুব্বির জোর না থাকলে চাকরি পাওয়া যায় না। আমার ত মুরুব্বির জোর নেই।

—তা বটে। গিন্নীমা ঘাড় নাড়লেন।

এই সময় সারদা অন্দর থেকে বেরিয়ে ঠাকুরদালানের উঠান পার হয়ে ব্যস্তভাবে বাইরে চলে গেল। তাদের দিকে চাইলেই না। রামকিঙ্করের বুঝতে বাকী রইল না যে, এই ব্যস্তভাটা ভানমাত্র। ওদের দিকে না চাওয়াটা সারদা, এবং সম্ভবতঃ বৌরাণীও, তাকে আগেই লক্ষ্য করেছে। এবং তার সঙ্গে কথা বলবার জন্যে বাইরের মোড়ের মাথায় অপেক্ষা করছে।

গিন্নীমাকে রামকিঙ্কর যথেষ্ট ভক্তি করে। তাঁর কাছে সে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। কিন্তু বৌরাণী সারদার মারফৎ মধ্যেখানে এসে পড়লেই তার সব কেমন গোলমাল হয়ে যায়। কেন হয়, সে নিজেও জানে না।

সারদা চলে যেতেই রামকিঙ্কর উসখুস করতে লাগল। সে ভুলেই গেল যে, সে গিন্নীমার সামনে বসে আছে এবং গিন্নীমা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকে লক্ষ্য করছেন। সারদার ব্যস্ত-ভাবে এবং কোনদিকে না চেয়ে চলে যাওয়া তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি।

একটুক্ষণ উসখুস করে রামকিঙ্কর গিন্নীমাকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল।

গিন্নীমা জিজ্ঞাসা করলেন, চললে।

রামকিঙ্কর বললে, যাই। দোকানে অনেক কাজ পড়ে আছে।

—আচ্ছা।

প্রতিবার পাস করার পর যখনই রামকিঙ্কর গিন্নীমাকে প্রণাম করতে এসেছে, গিন্নীমা তাকে পেট ভরে মিষ্টি খাইয়েছেন। এবারে সে বিষয়ে কোন কথাই বললেন না। হয়ত ভুলে গেছেন, নয়ত ইচ্ছা করেই খাওয়ালেন না। রাস্তায় এসে পড়ার আগে রামকিঙ্করেরও তা খেয়াল হয় নি। খেয়াল হ'তে তার মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। গিন্নীমা কি সত্যিই তার ওপর অপ্রসন্ন হয়েছেন?

মোড়টা ফিরতেই রামকিঙ্কর দেখলে, রাস্তার একপাশে সারদা দাঁড়িয়ে। রামকিঙ্করের চোখে চোখ পড়তেই সারদা হাসলে।

বললে, বাবাঃ! কতক্ষণ থেকে আপনার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি! গিন্নীমার সঙ্গে কথা আর শেষ হয় না। কি অত কথা?

রামকিঙ্কর হেসে বললে, আজে-বাজে কথা। কিন্তু তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন?

সারদা বললে, দরকার আছে ব'লেই দাঁড়িয়ে আছি। বৌরাণী এই দশটা টাকা দিলেন আপনাকে মিষ্টি খাবার জন্যে।

রামকিঙ্কর অবাক্ঃ আমাকে! কি ব্যাপার?

সারদা হাসতে হাসতে বললে, আপনি পাস করেছেন। তাই আপনাকে মিষ্টি খাওয়াচ্ছেন। আপনাকে ডেকে পাঠাবার ত উপায় নেই, তাই আমার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন।

—আমি পাশ করেছি উনি জানলেন কি করে?

—তা জানি না। বোধ হয় গিন্নীমাকে প্রণাম করতে দেখে অনুমান করেছেন।

—আমাকে ডেকে পাঠালেই ত পারতেন।

—ওই যে বললাম, তার উপায় নেই।

—কেন?

চোখ গজিয়েছে। আমাদের তিনজনকে তিনি সন্দেহ করেন। তিনজনের ওপরেই তাঁর খর দৃষ্টি। চর আছে সর্বত্র। খুব সাবধানে থাকবেন। আমি আর দাঁড়াব না।

ব'লেই হন হন করে বাড়ীর দিকে চলতে লাগল।

রামকিঙ্কর ত'পা ছুটে এসে তাকে ধরলে। জিজ্ঞাসা করলে, কি ব্যাপার কিছু বললে না?

সারদা খুব ব্যস্ত। বললে, এখন নয়। দেখা হ'লে আরেক দিন বলব।

—কবে দেখা হবে?

সারদা একটু ভাবলে। বললে, এখনি বলতে পারছি না। বৌরাণীকে জিগ্যেস করে আপনাকে জানাব। এখন যাই, কেমন?

সারদা চলে গেল।

একটু থমকে দাঁড়িয়ে থেকে রামকিঙ্করও দোকানের দিকে ফিরতে লাগল। মনে মনে চিন্তা: এরা কি একটা ডিটেকটিভ উপন্যাস রচনা করছে? এবং সেই উপন্যাসের সেও কি একটা চরিত্র? অথচ সে নিজে কিছুই জানে না।

ওঁদের পরিবারে কোন ষড়যন্ত্র আরম্ভ হয়েছে কি না, সে তার কিছুই জানে না। তাকে জানাবার কেউ কোন প্রয়োজনও বোধ করে নি। তেমন গুরুতর ব্যক্তিও সে নয়। শুধু বৌরাণীর কয়েকদিন ফরমাস খেটেছে বলেই গিন্নীমা যদি তাকে সন্দেহ করেন, তা হ'লে তিনি তার ওপর অবিচার করেছেন। গিন্নীমার ক্ষতি হ'তে পারে, এমন কোন কাজ সে করে নি। অত্যন্ত সন্দিগ্ধ প্রকৃতির মহিলা ব'লেই তিনি তাকে সন্দেহ করেন। নইলে সন্দেহের যথার্থ কোন কারণ নেই। এ বিষয়ে রামকিঙ্করের বিবেক পরিষ্কার। গিন্নীমা তাকে স্নেহ করেন ব'লে আর কেউ তাকে স্নেহ করতে পারবে না, তার কোন মানে নেই। এই স্নেহের জন্যে সে যেমন গিন্নীমার কাছে কৃতজ্ঞ, তেমনি বৌরাণীর কাছেও। বরং বলা যেতে পারে, অন্যায়ভাবে গিন্নীমার স্নেহে আজ ভাঁটা পড়েছে, কিন্তু বৌরাণীর স্নেহ সমান আছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ এই দশটি টাকা। আনন্দ করে কত গোপনে সারদার হাত দিয়ে পাঠিয়ে ত দিয়েছেন। সুখবরটা দিতে সে বৌরাণীর কাছে যায়ও নি। অত্যন্ত স্নেহ করেন বলেই খবরটা অনুমান করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

অথচ গিন্নীমা, যাঁর কাছে খবরটা দিতে সে নিজে গিয়েছিল, এবং অতক্ষণ বসেছিল, মিষ্টি খাওয়াবার কথা তাঁর খেয়ালই হ'ল না!

ওঁদের বাড়ীতে কিছু যে একটা গোলযোগ চলছে, সে সন্দেহ রামকিঙ্করের মনে উঠেছে। যদিচ কি নিয়ে গোলযোগ, তা সে জানে না। সারদা জানতে পারে। কিন্তু তাকে কোনদিন বলে নি। বিশেষ আজ সারদার ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকা তার কাছে বিসদৃশ ঠেকেছে।

রামকিঙ্কর ভাবতে ভাবতে চলেছে, হঠাৎ সুবলের সঙ্গে দেখা।

জিজ্ঞাসা করলে, অমন হন্তদন্ত হয়ে কোথায় চলেছ সুবল?

সুবল বললে, তোমার খোঁজেই।

—আমার খোঁজে!

—হ্যাঁ। পরীক্ষার ফল শুনে সেই কখন বেরিয়েছ ফেরার নাম নেই। হরেকেষ্ট রেগে কাঁই।

—কি বলছে সে?

—বলছে, বি-এ পাস করে তুমি ত দোকানের মাথা কিনে নাও নি, তার জন্যে দোকানের কাজও বন্ধ থাকবে না।

রামকিঙ্কর হেসে বললে, কে বলছে বন্ধ রাখতে? আমার যদি জ্বর হ'ত, তা হ'লে কি হ'ত? দোকানের কাজ বন্ধ থাকত? দোকানে কাজ করবার আর কেউ নেই?

সুবল মাথা নেড়ে বললে, অত আমি জানি না বাবা। বললাম ত, হরেকেষ্ট রেগে কাঁই। অনেক নাকি কাজ পড়ে রয়েছে। তার সঙ্গে মোকাবিলা করবে চল।

ক্রমশঃ

মায়া

শ্রীবিভূতিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়

অন্তরে যে নিতুই যাওয়া-আসা,
দেশান্তরে থাকা তোমার সাজে?
ছন্দে মম গাঁথা তোমার ভাষা,
কণ্ঠে মম তোমারি গান বাজে।
ফাগুন যবে পলাশ ডালে-ডালে
আগুন জ্বালে নাচের তালে-তালে,
নিঃশ্বাসে তা'র দূরের মায়া-জালে
আগুন লাগে, লুটায় সে যে লাজে—
তখনও মায়া, কেমনে রও দূরে,
জীবন মম বাঁশরী সম
যখন মরে ঝুরে?

নিদাঘে যবে বিবশ বন-ডালে
গলিত ফুল, চকিত পশুপাখী,
ঘূর্ণি হাওয়া চূর্ণি ধূলি-জালে
অন্ধ করে দিগন্তের আঁখি,
তৃষার বাণে চাতক জর'-জর',
বেতসী কাঁপে হুতাশে থর' থর',
বিষাদ-বিষে মালতী মর' মর'
লুটায় ভূমে ধুলায় দেহ ঢাকি'—
তখনও মায়া, কেমনে রও দূরে;
বেদনা যবে বাঁশরী রবে
ফুকারে সুরে সুরে?

শাঙনে নভ-আঙনে কালো মেঘে
পুলকে নাচে যবে বিজলী-বালা,
ভিজে হাওয়ার পরশ বুকে লেগে
শিহরি কাঁপে তরুণী বন-মালা,
ভাদরে মেঘ-আদরে ভরা নদী
রসোচ্ছ্বাসে উছল নিরবধি,
বিরহ-গীতি জাগায় প্রাণে যদি,
কদম-কেয়া সাজায় যদি ডালা—
তখন মায়া, যতই থাকো দূরে,
বিরহ মম বাঁশরী সম
ডাকিবে সুরে সুরে।

শরতে প্রাণ-পরতে আঁকো ছবি
শুভ্রতার বিজয়-বাণী-ভরা,
কবির মাঝে তুমি যে মম কবি,
আমার এ দীন জীবন -মনোহরা!
হেমন্তেরি কুহেলি-ভরা প্রাতে
কুহক-খেলা দিগন্তেরি হাতে,
সে খেলা হেরি প্রভাত-শিশু মাতে
হাসিটি তা'র বিহগ-গীতি-ঝরা—
তখনো মায়া, রইতে পারো দূরে?
হাসিতে তব বাঁশরী নব
বাজে না সুরে সুরে?

শীতের মাঠে উদাস বাটে বালা,
আপন মনে ভ্রম কি অভিমানে?
এবার আনো ভুলে থাকার পালা,
তুলে রাখার স্বপ্ন ভাঙো প্রাণে।
আজিকে আশা-রিক্ত-তরু-শাখে
বেদনা মম বিহগ-সম ডাকে,
সিক্ত হাওয়া হাঁকিছে নদী-বাঁকে
মিশায়ে সুর নদীর কলগানে।
সুদূর তব মধুর,—মায়া,—জানি;
নিকট কর মধুরতর
আবির্ভাবে রাণি!

কেশবতী কন্যা গো—

শ্রীকৃষ্ণধন দে

কেশবতী কন্যা গো, বাঁধবে না কেশ ?
মন্থর সন্ধ্যা যে এল শিয়রে,
বনতুলসীর মৃদু গন্ধভরা
ফাগুনের লিপি এল তোমারি ঘরে !
দিগন্তে বাঁকা চাঁদ মিটি-মিটি চায়,
ফসলহারানো মাঠ ঢুলে তন্দ্রায়,
জোনাকিরা জ্বালে দীপ বনের ছায়ায়,
মায়াবী রাতের নেশা উতলা করে !

কেশবতী কন্যা গো, বাঁধবে না কেশ ?
গভীরা রজনী হ'ল অধীরা আরও,
শোননি চাঁপার বনে হাওয়ার হাসি ?
—ঢেউয়ে ঢেউয়ে কেঁপে যায় সুরটি তারও !
রাতজাগা পাখী যদি কাঁপায় ডানা
অভিসারিকার সে কি হবে নিশানা ?
কেতকী-বীথির পথ নাই যে জানা,
কাঁটায় জড়াল বুঝি আঁচল কারও !

কেশবতী কন্যা গো, বাঁধবে না কেশ ?
তামসী রাত্রি হ'ল ধ্যান-মধুরা,
দিগন্তে কেঁপে ওঠে ডুবুডুবু চাঁদ,
ছায়াপথে নেমে আসে দিগ্বধূরা।
উতলা হাওয়ায় ঘুমজড়ানো চোখে
তোমায় কি ডাকে তা'রা কল্পলোকে
সিঁথির সিঁদুর খোঁজে রাঙা অশোকে,
বেণীতে দোলাতে চায় কৃষ্ণচূড়া ?

কেশবতী কন্যা গো, বাঁধবে না কেশ ?
নিশিগন্ধার মালা নেবে না তুলে ?
ঘুম-ঘুম বাতাসের পেয়ে চুম্বন
জড়াবে না বেল-কুঁড়ি তোমার চুলে ?
আঁকাবাঁকা পথ গেছে নদীর পারে,
ঝিল্লীনূপুর বাজে সুরবাহারে,
হাতছানি দেয় কারা আলো-আঁধারে
—প্রায়ের শিশির মোছে আঁচল খুলে !

কেশবতী কন্যা গো, বাঁধবে না কেশ ?
শুকতারা ডেকে ডেকে গেল যে ফিরে,
বাতাসে জানি না কোন্ সুরা মেশানো,
তৃষার স্বপন কাঁপে অধর ঘিরে !
উষার নীলাভ আলো গেল ছড়ায়ে
তন্দ্রা-অবশ দুধ-বরণ কায়ে,
তোমার মনের রঙে রঙ্ মিশায়ে
রূপকথা ছবি হ'ল পূরব তীরে !

বিদেশের কথা

যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

মার্কিন নির্বাচন : উত্তর সমীক্ষা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বৈশিষ্ট্যগুলি নানা কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রেসিডেন্ট জনসনের আগে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণী রাজ্যগুলি থেকে কেউ কোনদিন ডিমক্রাটিক বা রিপাবলিকান দলের প্রার্থীরূপে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নি। অথচ আশ্চর্যের বিষয় যে, যুক্তরাষ্ট্রের পঞ্চাশটি রাজ্যের মধ্যে মাত্র যে ছয়টি রাজ্যের সমর্থন জনসন পান নি তার মধ্যে পাঁচটি দক্ষিণের এবং আর একটি তাঁর রিপাবলিকান প্রতিদ্বন্দ্বী গোল্ডওয়াটারের নিজ রাজ্য এরিজোনা। দক্ষিণের অন্যতম রাজ্য আলবামা দীর্ঘকাল ডিমক্রাটিক দলের সমর্থক থাকলেও এবারের নির্বাচনে জনসনের বিরোধিতা করেছে। অন্যান্য রাজ্যগুলির মধ্যে মিসিসিপি ১৮৭২ সালের পর এই প্রথম রিপাবলিকান প্রার্থীকে সমর্থন করল এবং দক্ষিণ ক্যারোলিনা করল ১৮৭৬ সালের পর এই প্রথম। জর্জিয়াও ইতিপূর্বে কখনও ডিমক্রাটিক দলের বিরুদ্ধে যায় নি। আবার অপরদিকে ভারমণ্ট রাজ্য এইবারই প্রথম ডিমক্রাটিক প্রার্থীকে সমর্থন করল ; মেইন রাজ্যও এইবার নিয়ে মাত্র দ্বিতীয়বার ডিমক্রাটিক দলের অনুকূলে গেল। ১৯১২ সালে আর একবার মেইন ডিমক্রাটিক প্রার্থীকে সমর্থন জানিয়েছিল।

এবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মোট ৬ কোটি ৯১ লক্ষ ৬৯ হাজার ভোটার ভোট দেয়, এত বেশী ভোটার যুক্তরাষ্ট্রের কোন নির্বাচনে অংশ নেয় নি। '৬০ সালের নির্বাচনে ভোটারের সংখ্যা ছিল ৬ কোটি ৮৮ লক্ষ ৩৯ হাজার। ভোটার সংখ্যা অবশ্য লোকবৃদ্ধির জন্য প্রতিবারই বাড়ার কথা। কিন্তু এবারের বৃদ্ধি আশানুরূপ হয় নি, কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে যেসব শিশু ভূমিষ্ঠ হয় তাদের সকলেরই এবার ভোটার হওয়ার কথা। তার ওপর ওয়াশিংটন, ডি-সি'র অধিবাসীরা এইবারই প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সুযোগ পেলেন, সেখানে ভোটার সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ। যুক্তরাষ্ট্রের ভোটার তালিকায় যাদের নাম আছে তাদের মধ্যে শতকরা ৭৮ জন এবারের নির্বাচনে ভোট দেয়।

প্রেসিডেন্ট জনসন নির্বাচনে মোট ভোট পান [illegible]

১৯৫৬ সালের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার পেয়েছিলেন ৩,৫৫,৯০,০০০ ভোট। প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে এত বেশী ভোটের ব্যবধানও ইতিপূর্বে কেউ রাখতে পারেন নি, গোল্ডওয়াটারের চেয়ে তিনি প্রায় এক কোটি সাতান্ন লক্ষ ভোট বেশী পান। ১৯৩৬ সালের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সঙ্গে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর ভোটের ব্যবধান ছিল প্রায় এক কোটি এগার লক্ষ। প্রদত্ত ভোটের মধ্যে জনসন পেয়েছেন ৬১'২ শতাংশ ; ইতিপূর্বে ১৯৩৬ সালে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট পেয়েছিলেন ৬০'৮ শতাংশ ও প্রেসিডেন্ট হার্ডিং ১৯২০ সালে ৬০'৪ শতাংশ।

মার্কিন কংগ্রেসের দুই সভা 'সেনেট' ও 'হাউস অফ রিপ্রেজেণ্টেটিভস'-এও দীর্ঘদিন প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে এত বেশী শক্তির পার্থক্য ঘটে নি। সেনেটে একশ' জন সদস্যের মধ্যে এখন ডিমক্রাটের সংখ্যা ৬৮ ও রিপাবলিকানের সংখ্যা ৩২ ; এবারের আংশিক নির্বাচনে ২'টি আসন রিপাবলিকানদের হাতছাড়া হয়েছে। আর হাউস অফ রিপ্রেজেণ্টেটিভসে হাতছাড়া হয়েছে ৩৮টি আসন। 'হাউসে'র ৪৩৫টি আসনের মধ্যে ডিমক্রাটরা জয়ী হয়েছেন ২৯৫টিতে ও রিপাবলিকানরা ১৪০টিতে। যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি রাজ্যের মধ্যে ৩৩টির গভর্ণর ডিমক্রাট ও ১৭টির রিপাবলিকান।

ডিমক্রাট দলের বিপুল সাফল্যের কারণ বিশ্লেষণকালে প্রেসিডেন্ট জনসন বলেন, প্রেসিডেন্ট কেনেডি যে ন্যায় ও শান্তির পথে যুক্তরাষ্ট্রকে চালিত করতে চেয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রবাসীরা প্রকৃতপক্ষে সেই পথই বেছে নিয়েছেন। রিপাবলিকানপ্রার্থী গোল্ডওয়াটার যে সঙ্কীর্ণ, প্রতিক্রিয়াশীল ও বিপজ্জনক নীতি অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন লক্ষ লক্ষ রিপাবলিকান সমর্থকও তা অনুমোদন করেন নি।

গোল্ডওয়াটার কিন্তু এতে নিরাশ হন নি। নির্বাচনের পর এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের আড়াই কোটিরও বেশী লোক তাঁকে ভোট দিয়ে প্রকৃতপক্ষে রিপাবলিকান দলের নীতি ও পথের প্রতিই পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। ৩রা জানুয়ারীর পর তাঁর যখন আর কোন কাজ থাকবে না তখন দলকে নূতন আদর্শের ভিত্তিতে গ'ড়ে [illegible]

কঙ্গোয় সঙ্কট ঃ

স্বাধীন কঙ্গোর চার বছরের ইতিহাস নিরবচ্ছিন্ন হানাহানি ও অনর্থক রক্তপাতের ইতিহাস। বেলজিয়ান সাম্রাজ্যবাদীরা ঐ বিশাল রত্নগর্ভা দেশটিকে দীর্ঘকাল নিষ্ঠুরভাবে শোষণ করেছে কিন্তু তার বিনিময়ে ন্যূনতম রাজনৈতিক শিক্ষাটুকুও কঙ্গোলীদের দেয় নি। ফলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনার চাপে যেদিন বেলজিয়ান সরকার কঙ্গোর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে সেইদিনই কঙ্গোর উপজাতিগুলির মধ্যে ক্ষমতার লড়াই সুরু হয়ে যায়। আজও তার অবসান হয় নি।

প্রথমে বেলজিয়ানদের প্ররোচনায় ও সক্রিয় সহযোগিতায় শোম্বের নেতৃত্বে কঙ্গোর সবচেয়ে সমৃদ্ধ প্রদেশ কাতাঙ্গা বিদ্রোহ করে। কঙ্গোর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অস্বীকার করে কাতাঙ্গায় স্বাধীন সরকার গঠন করেন শোম্বে, ফলে সারা কঙ্গো জুড়ে গৃহযুদ্ধ সুরু হয়ে যায়। সেই গৃহযুদ্ধের আগুনে কঙ্গোর প্রথম প্রধানমন্ত্রী প্যাট্রিস লুমুম্বা প্রাণ হারান, অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে সারা দেশ রসাতলে যাওয়ার উপক্রম হয় ও প্রায় প্রত্যেকটি প্রদেশে একটি করে পাল্টা সরকার গঠিত হয়ে আফ্রিকার মানচিত্র থেকে কঙ্গোর নাম প্রায় মুছে যায়। রাষ্ট্রসঙ্ঘের হস্তক্ষেপের ফলে ঐ শোচনীয় অবস্থা থেকে কঙ্গো শেষ পর্যন্ত রক্ষা পায়, কিন্তু কঙ্গোর দুঃখের অবসান তাতে হয় না। কারণ কঙ্গোর ভৌগোলিক অখণ্ডতা কোনরকমে বজায় থাকলেও তার রাজনৈতিক বিভেদ ও বিভ্রান্তির সুযোগ নিয়ে কঙ্গোর শাসনব্যবস্থার পুরোভাগে প্রতিষ্ঠিত হন, তার সব দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের মুখ্য কারণ শোম্বে। শোম্বে তাঁর অপ্রিয়তা ও কুখ্যাতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন, তাই বেলজিয়ান বন্দুক ও শ্বেতাঙ্গ সৈন্যবাহিনীর সঙিনের জোরেই তিনি ক্ষমতাসীন থাকতে চান।

কিন্তু কঙ্গোর স্বাধীনচেতা মানুষরা স্বাধীনতার ছদ্মাবরণে নয়া উপনিবেশবাদ মেনে নিতে অসম্মত হয়। তাই শত [illegible]তিকূলতার মধ্যেও আবার কঙ্গোর বিভিন্ন স্থানে শোম্বে-[illegible]রোধী অভিযান সুরু হয় ও কঙ্গোর উত্তর-পূর্ব দিকে [illegible]নলিভিল নগরে প্রতিষ্ঠিত হয় বিদ্রোহীদের পাল্টা সরকার। [illegible]ম কঙ্গোর সমগ্র উত্তর ও পূর্ব অংশ বিদ্রোহীদের দখলে [illegible] যায় এবং শোম্বের ভাড়াটে সৈন্যবাহিনী সেই প্রচণ্ড [illegible]মণে পর্যুদস্ত হয়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়। আফ্রিকার [illegible] বিশ্বের প্রায় সকল সদ্যস্বাধীন দেশগুলির পূর্ণ সমর্থন [illegible] করে কঙ্গোর বিদ্রোহী পাল্টা সরকার। শোম্বেকে [illegible] কঙ্গোর প্রকৃত প্রতিনিধি বলে স্বীকার করে না এবং [illegible] আন্তর্জাতিক সম্মেলন থেকে চরম অপমানিত হয়ে ফিরে আসতে হয়।

কিন্তু কঙ্গোর পাল্টা সরকারের প্রধান ক্রিস্টোফ গিব[illegible] ক'দিন আগে স্ট্যানলিভিলে ও বিদ্রোহীদের অধিকারভুক্ত অন্যান্য স্থানের শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের নজরবন্দী ক'রে মার্কিন মেডিক্যাল মিশনারী ডাঃ পল কার্লসনকে গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ক'রে এক সাংঘাতিক ভুল করেন। গিবেঙ্গা হয়ত আশা করেছিলেন যে, শ্বেতাঙ্গদের গ্রেপ্তার করে বা তাদের উপর পীড়নের ভয় দেখিয়ে তিনি কঙ্গোর ঘরোয়া ব্যাপারে পশ্চিমীদের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে পারবেন। কিন্তু তিনি বোধহয় ভাবতেই পারেন নি যে, ঐ শ্বেতাঙ্গদের উদ্ধারের অজুহাত কঙ্গোর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে পশ্চিমীদের সরাসরি হস্তক্ষেপের সুযোগ এনে দেবে। তা ছাড়া স্বদেশবাসীদের জীবনের অনিশ্চয়তা ও চরম বিপন্ন অবস্থা কোন মর্যাদাসম্পন্ন রাষ্ট্র কখনও নীরবে মেনে নেয় না। রাজনৈতিক ন্যায়-অন্যায়ের চেয়ে অনেক বড় নিরপরাধ মানুষের জীবন। এ কারণে কঙ্গোর বিদ্রোহী সরকার সহস্রাধিক শ্বেতাঙ্গ সম্বন্ধে কঠোর মনোভাব নেওয়া মাত্রই বেলজিয়ান ছত্রী সৈন্যবাহিনী মার্কিন বিমানবাহিত হয়ে ব্রিটেনের সহায়তায় স্টানলিভিলে অবতরণ করে ও তড়িৎগতিতে বিদ্রোহীদের ঘাঁটিগুলি দখল করে নেয়। বিদ্রোহী সরকারও তখন মরিয়া হয়ে শ্বেতাঙ্গদের উপর নিষ্ঠুর পীড়ন সুরু করে, যার ফলে অল্পক্ষণের মধ্যেই ডাঃ কার্লসনসহ শতাধিক শ্বেতাঙ্গ নরনারী ও শিশু প্রাণ হারায়। অন্য বন্দীদের কোনরকমে উদ্ধার করে বেলজিয়ান ছত্রী সৈন্যবাহিনী। আর ঐ সুযোগে শোম্বের ভাড়াটে সৈন্যবাহিনীও বিদ্রোহীদের ঘাঁটিগুলি পুনর্দখল করে নেয়। কয়েকদিনের মধ্যে বিদ্রোহী সরকার প্রায় সম্পূর্ণ নির্মূল হয় ও বিদ্রোহী সরকারের নেতারা নিরুপায় হয়ে উত্তরপূর্ব সীমান্তবর্তী রাজ্য সুদানে গিয়ে আশ্রয় নেন। বিদ্রোহীদের দখল করা প্রায় সব অঞ্চলই এখন শোম্বের দখলে, শোম্বের ভাড়াটে সৈন্যদের অত্যাচারে চরম সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়েছে সে সব স্থানে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, বেলজিয়ান সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থবহ শোম্বের বিরুদ্ধে কঙ্গোর স্বাধীনতা মানুষদের অভিযান যে সাময়িকভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল তার জন্য বিদ্রোহীদের হঠকারিতাই বেশী দায়ী।

রুশ-চীন বিরোধ ঃ

ক্রুশ্চেভের অপসারণের পর বিশ্বের বিভিন্ন মহলে রুশ-চীন আঁতাত সম্বন্ধে যে আশা বা আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল তা ইতিমধ্যে প্রায় সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে। ক্রুশ্চভ দূরে সরে যাওয়ার পরেই সোভিয়েট ইউনিয়নের বর্তমান নেতারা বোধহয় বুঝতে পারেন যে [illegible] সোভিয়েট

নিয়নের ভিতরে ও বাহিরে, সারা বিশ্বের রাজনীতিতে গভীর ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেন। কম্যুনিষ্ট য়ায় এ ধরনের ক্ষমতার হাতবদল কোন নতুন ঘটনা নয়, তা কখনও বিশ্বের রাজনীতিকে এমনভাবে লোড়িত করে নি। ইউরোপের কম্যুনিষ্ট দেশগুলি খোদ সোভিয়েট জনগণ ইতিপূর্বে কখনও একটি য়ের পক্ষে এমনভাবে রুখে দাঁড়ায় নি। ফলে সোভিয়েট নিয়নের বর্তমান নেতৃবৃন্দের পূর্ব-মনোভাব যাই থাকুক কেন, এখন তাঁরা স্পষ্ট করেই এ কথা জানিয়ে দিয়েছেন "বার্ধক্য ও অসুস্থতার জন্য" ক্রুশ্চভ পদত্যাগ করলেও ভিয়েট ইউনিয়নের আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতির কোন খযোগ্য পরিবর্তন হবে না। ভারতকে তাঁরা জানিয়ে য়েছেন, ভারত-সোভিয়েট মৈত্রী পূর্বের মতই দৃঢ় থাকবে সোভিয়েট ইউনিয়নের পূর্ব-প্রতিশ্রুত কোন সাহায্য ও যোগিতা থেকে ভারত বঞ্চিত হবে না। ভবিষ্যতে দুই শর মৈত্রীবন্ধন আরও দৃঢ় করার জন্য উভয় দেশের বৃন্দই আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। পারমাণবিক ক্ষা বন্ধের চুক্তি লঙ্ঘন করে চীন যে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, বিরুদ্ধেও সোভিয়েট ইউনিয়নের বিভিন্ন মহল থেকে তিবাদ জানান হয়েছে। সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ দৃঢ়তার ঘোষণা করেছেন, শান্তি ও সহ-অবস্থানের নীতিই ভিয়েট নীতি এবং তা সফল ও সার্থক করার জন্য তাঁরা র মতই সচেষ্ট থাকবেন।

সুতরাং ক্রুশ্চভের অন্তর্ধানের পর যতটা আশা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই মস্কোয় গিয়েছিলেন, তার নক বেশী নৈরাশ্য নিয়ে তাঁকে ফিরে আসতে হয়েছে। পত্রিকাগুলিতে এখনই বলা সুরু হয়েছে যে, ক্রুশ্চভের ন হ'লেও ক্রুশ্চভবাদের অবসান হয় নি; আর ভবাদ হ'ল নিছক শোধনবাদ ও বিপ্লববিরোধী ত।

হল মন্ত্রিসভার পতন :

সিংহলে বাহান্ন মাস স্থায়ী সিরিমাভো মন্ত্রিসভার স্মাৎ পতন শুধু ঐ দ্বীপরাষ্ট্রটিরই নয়, সারা এশিয়া'র নীতির পক্ষে একটি উদ্বেগজনক সংবাদ। এশিয়ার াধীন দেশগুলির প্রায় সবক'টিতে গণতন্ত্রের অপমৃত্যু ও ভারত ও সিংহল এখনও পর্যন্ত গণতন্ত্রের পথ ত্যাগ নি। কিন্তু সিংহলে ক্রমে ক্রমে যেসব অনিবার্য স্থিতির উদ্ভব হচ্ছে তাতে ঐ দেশটির পক্ষে খুব বেশীদিন ান্ত্রিক কাঠামো বজায় রাখা সম্ভব হবে ব'লে মনে া।

সিংহলে গণতান্ত্রিক শাসনের প্রধান বাধা তার অগণিত রাজনৈতিক দল। সিংহল স্বাধীন হওয়ার সময় তার প্রধান রাজনৈতিক দল ছিল ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টি; সে দলটি এখনও বৃহত্তম দল হ'লেও আর ক্ষমতাসীন নয়। অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টিকে ক্ষমতাচ্যুত করে, কিন্তু বিরোধী দলগুলির ঐ ঐক্যও শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে না। সিংহলের দ্বিতীয় বৃহৎ দল শ্রীমতী বন্দরনায়েকের নেতৃত্বাধীন শ্রীলঙ্কা ফ্রীডম পার্টি: ১৯৬০ সালের সাধারণ নির্বাচনে ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টির চেয়ে শ্রীলঙ্কা ফ্রীডম পার্টি প্রায় ১২ শতাংশ ভোট পেলেও অন্যান্য দলগুলির সহায়তায় পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে সমর্থ হয়। সিংহলের তৃতীয় বৃহৎ দল ট্রটস্কিপন্থী সম-সমাজ পার্টি। যাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে শ্রীমতী বন্দরনায়েক প্রথম মন্ত্রিসভা গঠন করেন তাদের অনেকে শেষ পর্যন্ত মন্ত্রিসভার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করায় শ্রীমতী বন্দরনায়েক পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখার একান্ত প্রয়োজনে এই বছর আগষ্ট মাসে সম-সমাজ দলের সঙ্গে কোয়ালিশন গঠন করেন। কিন্তু সেটা শ্রীমতী বন্দরনায়েকের প্রধান নির্ভর, তাঁর মন্ত্রিসভার প্রবীণতম সদস্য শ্রী সি. পি. ডি' সিলভার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হয় না, এবং তিনি তাঁর তেরজন অনুগামী নিয়ে অকস্মাৎ বিরোধী দলে যোগ দেওয়াতেই মুহূর্তের মধ্যে সিরিমাভো মন্ত্রিসভার পতন হয়। সংবাদে প্রকাশ, শ্রী ডি' সিলভা আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য নূতন একটি দল গঠন করবেন। তামিলভাষীদের ফেডারেল পার্টি সিংহলের আর একটি উল্লেখযোগ্য দল; তা ছাড়াও আছে কম্যুনিষ্ট পার্টি, ক্ষুদ্র রাজনৈতিক জোট 'মহাজন একসাথ পেরামুনা,' 'জাতিকা বিমুক্তি পেরামুনা,' ইত্যাদি। মার্চ মাসে সিংহলে সাধারণ নির্বাচন হওয়ার কথা হচ্ছে; তা যদি হয় তবে ইতিমধ্যে কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে এমন অবস্থা কিছুতেই সৃষ্টি করা সম্ভব হবে না, যাতে তাদের পক্ষে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ সম্ভব হ'তে পারে। সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে এই পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত।

শ্রীমতী বন্দরনায়েকের মন্ত্রিসভার পতন ঘটায় সিংহলস্থ ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের ভবিষ্যৎ আবার অনিশ্চিত হয়ে পড়ল। কারণ সিরিমাভো বন্দরনায়েক ভারতে এসে এ সম্বন্ধে যা ব্যবস্থা ক'রে যান তা সিংহল পার্লামেন্টে অনুমোদিত হওয়ার সুযোগ পেল না। সুতরাং সাধারণ নির্বাচনের পর সিংহলের নতুন সরকার নয়াদিল্লী চুক্তি অনুমোদন না করা পর্যন্ত এ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত কিছুই বলা যাবে না।

হলডেন

জন বার্ডন স্যাণ্ডারসন হলডেন সম্প্রতি গত হলেন অধ্যাপক জে বি এস হলডেন নামেই তিনি আমাদের এবং বিশ্বের বিজ্ঞানীসমাজে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তাঁর প্রসঙ্গে আমার একটা গল্পের কথা মনে পড়ে। সে গল্পটা আগে বলে নি। জার্মানের এক হিল ষ্টেশনে (Hill Station) বেড়াতে গিয়ে এক ইংরেজ ভদ্রলোকের সঙ্গে স্থানীয় এক রাসায়নিকের পরিচয় হ'ল। আগন্তুক ভদ্রলোক রসায়নশাস্ত্রের লোক না হ'লেও বিজ্ঞান হ'ল তাঁর সাধনার বিষয়— তিনি একজন পদার্থবিদ্। তাঁদের আলাপ তাই স্বাভাবিকভাবে বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ নিয়ে উঠল। আগন্তুক ভদ্রলোক বললেন, দেখুন, আমি রসায়নশাস্ত্রের লোক না হ'লেও এ বিষয়ে আমার ইণ্টারেষ্ট আছে। আমি এ সম্বন্ধে যথাসম্ভব খোঁজ রাখার চেষ্টা করি। আচ্ছা, রসায়নের কি নিয়ে আপনার কাজ।

জার্মান রাসায়নিক। কয়লাজাত জিনিষ হ'ল আমার গবেষণার বিষয়।

পদার্থবিদ। কয়লাজাত জিনিষ। সত্যি, এ বড় আশ্চর্য ব্যাপার। কয়লা থেকে যে হরেক রকম ওষুধ পাওয়া যেতে পারে কে আগে তা ভাবতে পেরেছিল।

রাসায়নিক। দেখুন, সে বিষয়ে আমি বিশেষজ্ঞ নই। কয়লাজাত রং সম্বন্ধেই আমি বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছি।

পদার্থবিদ। কয়লা থেকে এত রকমের রং তৈরি হয়েছে এ সম্বন্ধে যত ভাবি ততই আমি অবাক্ হই। কয়লা কালো, অথচ—। সত্যি, রসায়ন বড় আশ্চর্য বিষয়।

রাসায়নিক। আপনি একটু ভুল করছেন। কয়লা থেকে তৈরি সমস্ত রং নিয়ে আমি কাজ করি নি। কয়লাজাত একমাত্র এনিলিন ডাই সম্বন্ধেই আমি বিশেষজ্ঞ।

পদার্থবিদ। এনিলিন ডাই-এর আমি নাম শুনেছি। আমাদের ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা এ নিয়ে অদ্ভুত সব কাজ করেছেন শুনতে পাই। টেষ্ট টিউবে এনিলিন ব্লু রং আমি নিজেই দেখেছি। সত্যি, বড় অপূর্ব।

রাসায়নিক। দেখুন, এনিলিন ব্লু সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা নেই, কালো রং-এর এনিলিন ব্লাক সম্বন্ধেই আমি বিশেষজ্ঞ।

অনুরূপ আরেকটা গল্প শুনেছিলাম ডাক্তারদের নিয়ে। কিন্তু অধিক বলার প্রয়োজন দেখি না। গল্পের তাৎপর্য একটিতেই পরিস্ফুট হয়েছে। বিজ্ঞান দিয়ে যাঁরা কাজ করেন, যাঁরা বিজ্ঞানী গবেষক, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ তাঁদের নিজের বিশেষ বিষয়টি নিয়েই সন্তুষ্ট, তার বাইরে—এমন কি বিজ্ঞানেরই অন্য বিষয়ে পর্যন্ত তাঁদের জ্ঞানের বহর আর পাঁচজন সাধারণের মত। গল্পের ঐ বিশেষজ্ঞ রাসায়নিকের সঙ্গেই তাঁদের তুলনা। বিজ্ঞানের নানা শাখায় পারঙ্গম বিশেষজ্ঞ সত্যিই বড় দুর্লভ। অধ্যাপক হলডেন এই দুর্লভদেরই একজন ছিলেন। গল্পের পদার্থবিদ ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর তুলনা। বরং তুলনায় থেকেও কিছু বেশী। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদলাভ নিঃসন্দেহে বিশেষ একটি বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানলাভের নিদর্শন। হলডেন তাঁর সুদীর্ঘ শিক্ষক জীবনের বিভিন্ন সময়ে ফিজিওলজি (শারীরবিদ্যা), বাও-কেমিষ্ট্রি (জীব-রসায়ন), জেনেটিকস্ (প্রজনন-তত্ত্ব) এবং 'বাও-মেট্রি'র অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন।

হলডেনের সম্বন্ধে আরও বড় কথা-বিজ্ঞানের বহুমুখী বিষয়গুলির বাইরেও তাঁর আগ্রহ ও কৌতূহল পরিব্যাপ্ত ছিল। যে বৈজ্ঞানিক ধারণা ও চিন্তাপ্রণালী বর্তমান যুগের বিশেষত্ব, আশ্চর্যের কথা এই যে, সেই ধারণা ও মন অধিকাংশ বিজ্ঞানীর পক্ষেই ল্যাবরেটরীর সীমানার বাইরে নিষ্ক্রিয় থাকে। পৃথিবীর নানা জটিল রাজনৈতিক আবর্তের মধ্য থেকে তিনি ঘটনার তাৎপর্য সন্ধান করতেন। বিজ্ঞানের বিচিত্র বিষয়ে গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা ছাড়াও তিনি "ডেলি ওয়ার্কার" পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন। এক প্রখর রাজনৈতিকবোধ তাঁর জীবনবোধকে বিশেষত্ব দান করেছিল। জীবনের কোন পর্যায়েই তিনি স্থির হয়ে বসে থাকেন নি। প্রবীণ বয়সে ত (১৯৫৭ সালে) জন্মভূমি ইংলণ্ড ত্যাগ করে এই ভারতকে স্বদেশ বলে গ্রহণ করলেন। এখানেও তিনি এক জায়গায় টিঁকে থাকেন নি। বরানগরের ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইন্ষ্টিটিউশন ছেড়ে ভুবনেশ্বরের জেনেটিক্স্ ও বাওমেট্রি ল্যাবরেটরীর কর্মভার গ্রহণ করলেন। এখানেই তাঁর শেষ কর্মজীবন।

অধ্যাপক হলডেনের জীবনে বার বার পালাবদল হয়েছে। বহু বিষয় মত ও দেশের মধ্যে তাঁর জীবন বিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু এ সমস্ত নানা পরিবর্তন, অস্থিরতা ও প্রতিভাত পাগলামির পিছনে এক সূর্যমুখী ধারণা ও মন সর্বদা কাজ করত।

ফুল সূর্যমুখী সারাদিন সূর্যের দিকে মুখ তুলে থাকে। হলডেনের মহাজীবন এ রকম এক শুভ্র সূর্যমুখী ফুল। এই সূর্যের নাম সত্য ন্যায়বোধ ও অবিচল বিশ্বাস।

এ. কে. ডি

শিল্পমেলা

মেলা হ'ল মিলনক্ষেত্র। আবহমানকাল থেকে মেলার এই পরিচয়ই আমরা জানি। আধুনিক যুগে এই মেলা শিল্পমেলার রূপ নিয়েছে শিল্পমেলা মিলনক্ষেত্র, সে-ই সঙ্গে বিজ্ঞানের অগ্রগতি কতটা হ'ল না হ'ল তা জেনে নেওয়ার মাপকাঠি বটে। বিজ্ঞানের যে অফুরন্ত সম্ভার তার সামান্য কয়টি মাত্র সাধারণের জীবনে এসেছে। বিজ্ঞানের অসামান্য দিকগুলি জেনে নিতে হ'লে আমাদের তাই শিল্পমেলার দর্শক হ'তে হয়। শহরে, জনপদে উঁচু উঁচু স্তম্ভ থাকে, খুব অল্প লোকেই তার উপরে গিয়ে ওঠে, কিন্তু সকলের পক্ষেই তা দর্শনীয়। শিল্পমেলাকে

ন্যু ইয়র্ক বিশ্ব শিল্পমেলার অভিনব প্রতীক

ন্যু ইয়র্কের শিল্পমেলার একটি প্রধান আকর্ষণ আলোকস্তম্ভ
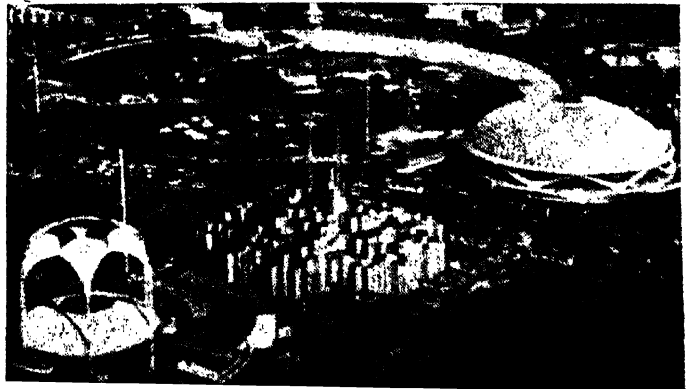
আমার কাছে এ সব উঁচু স্তম্ভ বা চূড়াগুলির মতই মনে হয়। বিজ্ঞানের যে-সমস্ত অভিনব ফসলগুলি সাধারণের পক্ষে কখনই সম্ভব হ'ত না, শিল্পমেলার আলোকিত অনুষ্ঠানের মধ্যে তাই একবার জীবনে সত্য হয়ে ওঠে। যা আছে অথচ যা কি না ধরাছোঁয়ার বাইরে মানুষ তার দিকে অবাক্ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। শিল্পমেলার উদ্দেশ্য এভাবে আর এক উপায়ে সার্থক হয়ে ওঠে।

সম্প্রতি (গত এপ্রিল মাসে) আমেরিকার নু ইয়র্কে যে আন্তর্জাতিক শিল্পমেলার আয়োজন হয়েছিল তার রূপায়ণের মধ্যে এ কথারই তাৎপর্য সত্য হয়ে উঠেছে। আমাদের পক্ষে যখন তার দর্শক হওয়ার কোন উপায় নেই, কয়েকটি ছবির মধ্য দিয়েই আমাদের তুষ্ট হ'তে হবে।

ভারত কি এটম বোমা তৈরি করবে ?

এ প্রশ্নেরই এক পরিপূরক প্রশ্ন : ভারত যুদ্ধসজ্জায় পরমাণু শক্তি ব্যবহারের পক্ষে কি বিরোধী ? এক প্রশ্নের সঙ্গে আর এক প্রশ্নের গিঁট বাঁধা রয়েছে। একটি প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গিয়ে আর একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাবে না। ভারত দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর অনেক আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছিল। মানুষের নূতন শক্তি যে পরমাণু তার ব্যবহার মানুষের মঙ্গলের জন্যই একমাত্র নিয়োজিত থাকবে, যুদ্ধের প্রয়োজনে তার ব্যবহার পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা উচিত—এসব কথা ভারতের জনগণমন অধিনায়ক নেতারা বার বার ঘোষণা করেছেন। মোট কথা, ভারত যে অস্ত্র হিসাবে পরমাণু শক্তি ব্যবহারের বিরোধী, এ নিয়ে কোন সংশয়ের অবকাশ দেখা যায় নি। কিন্তু যা এতদিন স্পষ্ট ছিল, যার উত্তর এতদিন সুনির্দিষ্ট ছিল, তাই যেন আবার নূতন করে গোলমেলে মনে হচ্ছে। অবশ্য বিষয়টি যখন পরমাণু-সংক্রান্ত—আলোচনার ডালপালা নানা দিক থেকে উঁকি মেরে সমস্ত প্রসঙ্গটাকে জটিল (অথবা আপাত-জটিল) করে তোলে এ সমাধানের স্পষ্ট নির্দেশ তাই কম্পাসের কাঁটার মত বার বার কেঁপে কেঁপে ওঠে। প্রতিটি পুরাণো প্রশ্নের উত্তরই এভাবে নূতন পরিস্থিতির সূচনায় যাচাই করে নিতে হয়। চীন কর্তৃক পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ এমন একটি উপস্থিত ঘটনা। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নূতন করে প্রশ্ন উঠেছে : ভারত কি পরমাণু অস্ত্রসজ্জায় নিষ্ক্রিয় থাকবে ? এ প্রশ্ন স্বাভাবিক, চীনের সঙ্গে ভারতের বর্তমান সম্পর্কের কথা চিন্তা করলে এ প্রশ্ন অস্বীকার করা যায় না। অনেকের মুখে প্রশ্নটি তাই আরো তোপা হয়ে উঠেছে : ভারত কি এবার এটম বোমা তৈরি করবে না ? প্রশ্নের মধ্যেই প্রশ্নকর্তার জবাব প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

পৃথিবীতে শক্তির এক বিরাট্ মহিমা আছে, বিশেষতঃ তা যখন রুদ্র, ধ্বংসের রূপ। মানুষ এটম বোমার নিন্দা করছে, কিন্তু তার অভাবনীয় ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করে বিস্মিতও হয়েছে। তার নির্মাণকারী বিজ্ঞানীদের দিকে প্রশংসার চোখে তাকিয়েছে। এটম বোমা মানুষের শ্রেষ্ঠ চিন্তা ও সংগঠন শক্তির ফসল। এটম বোমার প্রশংসা করে মানুষ বোধ হয় সেই বিশেষ গুণাবলীরই প্রশংসা করে থাকবে। ডাকাতের সাহসের যেমন আমরা প্রশংসা করে থাকি। আমরা এতগুলি কথা বললাম, তার কারণ এই যে, বোমা তৈরির মূল উদ্দেশ্য যাই থাক তার তৈরির মধ্যেই একটা গৌরব বোধ রয়েছে। যেমন রয়েছে রকেট ছোঁড়া বা স্পুৎনিক ওড়ানোর মধ্যে। বিতর্কের অবকাশ যাতে না থাকে

গাঁথতে যাই নি, বলার উদ্দেশ্য এই যে, বিজ্ঞানের সাধনা একটি বিশেষ পর্যায়ে উঠলেই একমাত্র এটম বোমা বা স্পুৎনিক সম্ভব হ'তে পারে। সেদিক দিয়ে এই পাওয়ার একটা বিশেষ দাম আছে। যে-সব দেশের তা আছে, সে-দেশের লোকেরাই তার উপভোগ করে। রাশিয়া স্পুৎনিক ওড়ালে চীন বা পোল্যাণ্ড (মূল একই মতবাদে বিশ্বাসী বলে) আনন্দ পায় কিন্তু রুশজাতি যতটা পায় ততটা নিশ্চয়ই নয়। আমাদের মন্তব্যের উদ্দেশ্য স্পষ্ট, তাই প্রশ্ন হ'ল ভারতে এটম বোমা যদি সম্ভবপর হয় তবে সাধারণ দেশবাসী হিসাবে আমরা কতটা গৌরবভাগী হব এবং সামরিক বাহিনীই বা কতখানি মনোবল ফিরে পাবে। তার পরেও প্রশ্ন থেকে যায় : ভারত যদি বোমা তৈরি করতেও চায়, অদূর ভবিষ্যতে তা সম্ভব হবে কি না। ভারত নদীর বুকে বড় বড় বাঁধ বসিয়েছে, বড় বড় ইস্পাত কারখানা বসিয়েছে, এমন কি গবেষণামূলক রকেট পর্যন্ত আজ ভারতের মাটি থেকে আকাশে উঠছে। কিন্তু এ সমস্ত বড় বড় ঘটনার আড়ালে আর একটা প্রশ্ন আমাদের যাচাই করে নিতে হয় : এ সমস্তের মূলে ভারতীয় যন্ত্র, কারিগরি বুদ্ধি এবং অর্থ কতখানি কাজ করেছে। ভারতে ইউরেনিয়াম আজ উৎপন্ন হচ্ছে, কিন্তু পুরো এটমিক রিয়েক্টার যন্ত্রটিই বিদেশ থেকে আমদানী হয়েছে। বহু বিদেশী বিজ্ঞানী আমাদের পরমাণু শক্তি কমিশনের কাজে নিযুক্ত রয়েছেন। ভারত অবশ্য ধীরে ধীরে স্বাবলম্বী হয়ে উঠছে, কুশলী বিজ্ঞানী ইঞ্জিনিয়ার এবং যন্ত্রকর্মী তৈরি হচ্ছে। কিন্তু আর্থিক প্রতিবন্ধকতা আরও অনেক দিন পর্যন্ত আমাদের অগ্রগতির পথে বাধা থাকবে।

ভারতে এটম বোমা তৈরি করা হবে কিনা—গুণ্টুর কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে যখন এ সম্বন্ধে আলোচনা চলছিল তখন তারই অনতিদূরে শিশুপুত্রের জননী রেশন দোকানে চালের দোকানে মারা যায়। ভারত বোমা তৈরি করবে কি করবে না, আমাদের মতে প্রশ্নের উত্তর এই শোচনীয় ঘটনার মধ্যে নিহিত আছে।

মূল্য

সারা পৃথিবীতেই আজ শিক্ষকের ঘাটতি। শিক্ষাই মানুষকে তার এই বর্তমান উন্নতির স্তর থেকে ভবিষ্যতের আরও উন্নতির স্তরে নিয়ে আসে। অথচ মূলেই এই অসামঞ্জস্য। এর পরিপ্রেক্ষিতে নূতন কয়েকটি তথ্য জেনে রাখুন, বিজ্ঞানের নূতন নূতন আবিষ্কার অভিনব ফসল সাধারণের কাছ থেকে কি পরিমাণ দাম আদায় করে নিচ্ছে।

নূতন এক ধরনের (PROTOTYPE) বোমারু বিমানের দাম না দিয়ে ২,৫০,০০০ (আড়াই লক্ষ) স্কুলশিক্ষকের এক বছরের মাইনে দেওয়া যায়। অথবা ঐ পরিমাণ টাকায় এক হাজার ছাত্রের পড়ার ব্যবস্থাসহ ৩০টি বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান তৈরি করা যায়।

একটি সুপারসনিক (শব্দের চেয়ে দ্রুতগামী) যোদ্ধা বিমান শুধু ডিজাইনে তৈরি করতে সর্বসাকুল্যে যা খরচ তা দিয়ে তিরিশ লক্ষ লোকের বাসোপযোগী ছ' লক্ষ বাড়ী তৈরি করা যায়।

বিজ্ঞানের প্রতিটি চিত্তাকর্ষক দর্শনীয় জিনিষগুলির মূলে এমনি সব বেহিসাবী হিসাব রয়ে গেছে। বিজ্ঞানের এত উন্নতির ফলেই তাই সারা পৃথিবীতে সাধারণের অবস্থার তেমন উন্নতি হচ্ছে না। মানুষের যা নিয়ে এত গর্ব, বিজ্ঞানের সে-সমস্ত ঘটনাগুলির দাম এ সব সাধারণ

শ্রীচিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

চতুর্থ পরিকল্পনার প্রস্তুতি

চতুর্থ প্ল্যানের খসড়াতে দু'টি উল্লেখযোগ্য কথা আছে (১) সাময়িক এবং কিছু পরিমাণে অনিবার্য মূল্যবৃদ্ধি-জনিত অসুবিধা সত্ত্বেও পরিকল্পনার আকার ছোট করা হবে না, (২) ডেফিসিট ফাইনান্স-এর সাহায্যে পরিকল্পনার ব্যয়ভার মেটানো আর হবে না।

বিশদ বিবরণী প্রকাশসাপেক্ষে মনে হচ্ছে যে যদি সম্ভাব্যতার আওতার বাইরে না যায় তা হ'লে এর থেকে সুবিবেচনার কাজ আর হ'তে পারে না।—এই সূত্রে আমরা তিনটি পরিকল্পনার কতকগুলি বিশেষ তথ্য এই প্রবন্ধে উপস্থিত করছি, এর থেকে আমাদের পরবর্তী অধ্যায়ের গতি বিশ্লেষণ করা সহজ হবে।

প্রথম প্ল্যানপর্ব থেকে টাকার বরাদ্দ কত হয়েছে বা করা হবে স্থির হয়েছে এবং জাতীয় আয়বৃদ্ধির হার কত আশা করা হচ্ছে তা নিম্নলিখিত তালিকায় লক্ষ্য করা যায় (টাকার অঙ্ক কোটি টাকা)।

(১নং তালিকা দ্রষ্টব্য)

প্ল্যানের প্রথম দশ বছরে যত টাকা ব্যয় করা হয়েছে, সমপরিমাণ টাকা পরবর্তী পাঁচ বছরে এবং সেই অঙ্কের দ্বিগুণ পরিমাণ টাকা পরবর্তী পাঁচ বছরে বরাদ্দ করা হয়েছে। পূর্ব-নির্দিষ্ট হারে জাতীয় আয়বৃদ্ধি করতে হ'লে এর থেকে ধীর গতিতে মূলধন বিনিয়োগ করা চলে না; অতএব চতুর্থ প্ল্যানপর্বে যত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে সেই টাকা জোগাড় করতেই হবে। মূল্যবৃদ্ধি-জনিত যে সমস্যা বর্তমানে সকলকে চিন্তিত করেছে, সেটি রোধ করার জন্য প্ল্যানের আকার খর্ব করা আপাত-দৃষ্টিতে যুক্তিযুক্ত মনে হ'লেও ভবিষ্যতের কথা ভেবে বাতিল করা হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দেখা যাচ্ছে আরও কিছুকাল হ্রাস পাবে না, অতএব মোট জাতীয় আয় বাড়লেও মাথাপিছু আয় আশানুরূপ হবে না।

যত টাকা এযাবৎ ব্যয় করা হয়েছে তার সম্পূর্ণ অংশ এখনও দেশের উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি করার কাজে সম্পূর্ণ নিয়োজিত হয় নি, তার জন্য আরও কিছুকাল অপেক্ষা করতে হবে। ইতিমধ্যে আমাদের মূলধন বিনিয়োগের হার উত্তরোত্তর বাড়িয়ে যেতেই হবে; মূল্যমানের ওপর এর জন্য যে চাপ অনিবার্যভাবে পড়ছে, তা রোধ করতে হ'লে প্রশাসনিক ব্যবস্থার সংস্কার বা উন্নতি ঘটানো দরকার, প্ল্যানের আকার ছোট করলে সেই সমস্যার স্থায়ী সমাধান ঘটবে না।

প্রশ্ন ওঠে: (১) যত টাকা ব্যয় করা হয়েছে তার সমস্ত অংশটিই কি অপরিহার্য ছিল? অথবা (২) বিভিন্ন খাতে যে বরাদ্দ ধরা হয়েছে, তার মধ্যে কোন পরিবর্তন সাধন করলে অগ্রগতির সঙ্গেই মূল্যবৃদ্ধি রোধ সম্ভব হয় কি না।

যত টাকা ব্যয় করা হয়েছে তার থেকে কম ব্যয় করে সমপরিমাণ ফল পাওয়া যেত কি না, এ প্রশ্নের জবাব খুঁজে বার করতে হ'লে প্ল্যানের নীতিকথায় যেতে হবে না; পরিকল্পনার রূপায়ণে যাঁরা লিপ্ত, তাঁরা সকলেই এর উত্তর দিতে পারবেন। অপর প্রশ্নটি আলোচনা করতে হ'লে বিভিন্ন খাতে যে ব্যয়-বরাদ্দ ধরা হয়েছে সেই তথ্য বিচার করে দেখতে হয়:

(২নং তালিকা দ্রষ্টব্য)

[১নং তালিকা]

	১ম প্ল্যান (১)	২য় প্ল্যান (২)	উভয়ের যোগফল (৩)	৩য় প্ল্যান (৪)	চতুর্থ প্ল্যান (৫)
১। মোট সরকারী ব্যয় (Plan outlay Public Sector)	১৯৬০	৪৬০০	৬৫৬০	৭৫০০	১৫৬২০
বেসরকারী ব্যয় (Private Sector)	১৮০০	৩১০০	৪৯০০	৪১০০	৬৯৮০
মোট	৩৭৬০	৭৭০০	১১৪৬০	১১৬০০	২২৬০০
২। মূলধন বিনিয়োগ (Investment) সরকারী ও বেসরকারী	৩৩৬০	৬৭৫০	১০১১০	১০৪০০	২১২৭৫
৩। জাতীয় আয়ের তুলনায় মূলধন বিনিয়োগের হার	৬.৭%	১০.৮%		(১৪ – ১৫%)	(১৭ – ১৮%)
৪। জাতীয় আয় (১৯৬০।৬১ মূল্যে) (১৯৫০-৫১) (প্ল্যানপর্বের শেষ বৎসরে)	১০২৪০ (১৯৫৫-৫৬) ১২১৩০	১৪৫০০		১৯০০০	২৫০০০
৫। জাতীয় আয়-বৃদ্ধির হার	—	+২০%		+৩১%	+৩১.৬%
৬। মাথাপিছু গড় আয় (টাকা) (১৯৬০-৬১ মূল্যে)	—১৯৫০-৫১ ২৮৪ ১৯৫৫-৫৬ ৩০৬	৩৩০	——	৩৮৫	৪৫০
৭। মাথাপিছু আয়-বৃদ্ধির হার	—	+৭.৮%	......	+১৬.৭%	+১৬.৯%
৮। জনসংখ্যা (মিলিয়ন) ১৯৫০-৫১	৩৬১	৪৩৯	——	৪৯২	৫৫৫
৯। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ...		+২১.৬%	......	......	+২৬.৪%

(২নং তালিকা)

	পরিকল্পনার ব্যয় (কোটি টাকা) কৃষি, সেচ, ইত্যাদি (১)	খনি, শিল্প ইত্যাদি (২)	যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা (৩)	অন্যান্য (৪)	মোট (৫)
১। প্রথম পরিকল্পনাপর্ব—					
(ক) সরকারী মোট বিনিয়োগ	৬০১	৩৭৭	৫২৩	৪৫৯	১৯৬০
	(৩১%)	(১৯%)	(২৭%)	(২৩%)	(১০০)
(খ) বেসরকারী মূলধন বিনিয়োগ	—	—	—	—	১৮০০
					মোট ৩৭৬০
২। দ্বিতীয় পরিকল্পনাপর্ব—					
(ক) মোট সরকারী মূলধন বিনিয়োগ	৬৩০	১৪০৫	১২৭৫	৩৪০	৩৬৫০
(খ) বেসরকারী	৬২৫	৮৯০	১৩৫	১৪৫০	৩১০০
	১২৫৫	২২৯৫	১৪১০	১৭৭০	৬৭৫০
	(১৮%)	(৩৪%)	(২১%)	(২৭%)	(১০০)
৩। তৃতীয় পরিকল্প৪াপব—					
(ক) মোট সরকারী মূলধন বিনিয়োগ	১৩১০	২৬৮২	১৪৮৬	৮২২	৬৩০০
(খ) বেসরকারী	৮০০	১৩৭৫	২৫০	১৬৭৫	৪১০০
	২১১০	৪০৫৭	১৭৩৫	২৪৯৭	১০৪০০
	(২০·৩%)	(৩৯·%)	(১৬·৭%)	(২৪%)	(১০০)
৪। চতুর্থ পরিকল্পনাপর্ব—					
(আনুমানিক অঙ্ক)	৪০০০	৮৪৫০	৩৬৫০	৫১৬০	২১২৭৫
	(১৮·৮%)	(৩৯·৭%)	(১৭·২)	(২৪·৩%)	(১০০)

দেখা যাচ্ছে যে পূর্ববর্তী পর্বের তুলনায় মোট অঙ্ক উত্তরোত্তর বেশি ধার্য হ'লেও কৃষি, সেচ প্রভৃতি বাবদ ব্যয়ের অংশ যথেষ্ট বাড়ে নি। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিভক্ত ব্যয়বরাদ্দের শতকরা ভাগ কত, সেটি নীচের তালিকায় উপস্থিত করা হ'ল :—

(৩নং তালিকা দ্রষ্টব্য)

[তালিকা নং ৩]

	(১) কৃষি, সেচ ইত্যাদি	(২) খনি, শিল্প ইত্যাদি	(৩) যানবাহন ও যোগাযোগ	(৪) অন্যান্য	(৫) মোট
*প্রথম প্ল্যানপর্ব	৩১%	১৯%	২৭%	২৩%	১০০
দ্বিতীয় প্ল্যানপর্ব	১৮%	৩৪%	২১%	২৭%	১০০
তৃতীয় প্ল্যানপর্ব	২০·৩%	৩৯%	১৬·৭%	২৪%	১০০
চতুর্থ প্ল্যানপর্ব	১৮·৮%	৩৪%	২১%	২৭%	১০০

* প্রথম পর্বের সঙ্গে পরবর্তী পর্বগুলির অঙ্ক ঠিক তুলনীয় নয় ; প্রথমটিতে সরকারী (Public Sector) ব্যয়বরাদ্দ (Plan outlay);

দ্বিতীয় প্ল্যানপর্ব থেকে কৃষির জন্য বরাদ্দ টাকার হার অপেক্ষাকৃত হ্রাস পেয়েছে দেখা যাচ্ছে। অনেকের মতে এই শ্রেণীতেই অপেক্ষাকৃত বেশি হারে টাকা বরাদ্দ না করলে দেশের খাদ্যসমস্যাও মিটবে না এবং কৃষি ও শিল্পে উচিত ভারসাম্যও প্রতিষ্ঠিত হবে না।—চতুর্থ পর্বে মোট অঙ্ক কৃষির জন্য অনেক বেশি ধরা হলেও হারাহারি ভাবে পূর্বের মতই রয়ে গেছে দেখা যাচ্ছে। —অতঃপর আমরা সরকারী মোট ব্যয়ের ধারা বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি।

[তালিকা নং ৪]

সরকারী (Public Sector) মোট ব্যয় (Plan outlay)

	কৃষি, সেচ ইত্যাদি (ক)	খনি, শিল্প ইত্যাদি (খ)	যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা (গ)	অন্যান্য (ঘ)	মোট (ঙ)
১। প্রথম প্ল্যান	৬০১ (৩১%)	৩৭৭ (১৯%)	৫২৩ (২৭%)	৪৫৯ (২৩%)	১৯৬০ (১০০)
২। দ্বিতীয় প্ল্যান	৯৫০ (২০%)	১৫২০ (৩৪%)	১৩০০ (২৮%)	৮৩০ (১৮%)	৪৬০০ (১০০)
৩। প্রথম পর্বের তুলনায় দ্বিতীয় পর্বে শতকরা বৃদ্ধির হার	৫৮%	৩০৩%	১৪৮.৫%	৮০.৮%	১৩৫%
৪। তৃতীয় প্ল্যান	১৭১৮ (২৩%)	২৭৯৬ (৩৭%)	১৪৮৬ (২০%)	১৫০০ (২০%)	৭৫০০ (১০০)
দ্বিতীয় পর্বের তুলনায় ৫। তৃতীয় পর্বে শতকরা বৃদ্ধির হার	৮০.৮%	৮৩.৯%	১৪.৩%	৫৬.৬%	৬৩%

চতুর্থ পর্বের সরকারী ব্যয়ের তুলনীয় তথ্য সঠিক-ভাবে এখনও প্রকাশিত না হওয়ায় ঐ অঙ্কটি এখানে উল্লেখ করা গেল না।—তিন ও পাঁচ কলমে দেখা যাচ্ছে বৃদ্ধির হারে প্রচুর পার্থক্য ; তিন নং, কলমে মোট বৃদ্ধি যেখানে ১৩৫%, সেখানে কৃষির ক্ষেত্রে ৫৮%, শিল্প প্রভৃতির ক্ষেত্রে ৩০৩%; অপর দিকে যানবাহন ও যোগা-যোগ ব্যবস্থায় তিন নম্বরের তুলনায় পাঁচ নম্বর কলমের পার্থক্যও লক্ষ্যনীয়। জাতীয় সঞ্চয়, বৈদেশিক সাহায্য ও ডেফিসিট ফাইনান্স-এর সমষ্টিগত অঙ্কও যখন অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, তখন উদ্যোগপর্বে শিল্পোন্নয়নের দিকেই ঝোঁক দেওয়া ছাড়া উপায় নেই, সে কথা অতি সত্য। এখানেই অবশ্য প্রশ্ন আসে ; কৃষির জন্য যে টাকা ব্যয় করা হয়েছে তা যথেষ্ট ব'লে মেনে নিলেও, ফলাফল যদি আশানুরূপ না হয় তা হ'লে ত্রুটি কোথায় থেকে যাচ্ছে? আগেকার দিনে কৃষকের চেষ্টা ব্যর্থ এমন এক জটিল সমস্যার কথা ওঠে, যা নিয়ে বহুকাল হ'ত প্রকৃতির খামখেয়ালীর জন্য ; জলসেচ ব্যবস্থার ব্যাপক আয়োজনের পর কৃষি-উৎপাদনে অপ্রতুলতার জন্য ঠিক পূর্বের মতই প্রকৃতিকে দায়ী করা চলে না। আর অগণিত কৃষকগোষ্ঠী যদি আশানুরূপ উৎপাদন বৃদ্ধি না করে থাকতে পারে তার একটি কারণ হচ্ছে উৎপাদন ও মূল্যের অসামঞ্জস্য ; এবিষয়ে পূর্বের এক প্রবন্ধে আমরা বিশদ আলোচনা করেছি। কৃষির জন্য ব্যয়বরাদ্দ যদি যথেষ্ট হয়ে থাকে তা হ'লে ফল আশানু-রূপ কেন হচ্ছে না তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ধরে বহু আলোচনা হয়েছে কিন্তু ফল কিছু হয় নি। কৃষি ও শিল্পে ভারসাম্য বজায় রাখার যে কঠিন কাজ আমরা গ্রহণ করেছি, সেই কাজ সম্পাদন করতে গিয়ে, হয় টাকার বরাদ্দে ঘাটতি পড়ছে না হয় ত ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি থেকে যাচ্ছে। এ বিষয়ে বারান্তরে আলোচনার ইচ্ছা রইল।

অতঃপর চতুর্থ প্ল্যানের সূত্রে যে প্রশ্ন অনিবার্যভাবে আসছে সেটি হচ্ছে অর্থসঙ্গতির কথা। ডেফিসিট ফাইনান্স আর করা হবে না; বৈদেশিক সাহায্যের হারও কমিয়ে আনতে হবে ; অতএব আভ্যন্তরীণ সূত্র থেকেই প্রয়োজনীয় টাকা তুলতে হবে।

তৃতীয় প্ল্যানে সরকারী খাতে ব্যয়বরাদ্দ আছে ৭৫০০ কোটি টাকা ; চতুর্থ প্ল্যানে বরাদ্দ হচ্ছে ১৫৬২০ কোটি টাকা, অর্থাৎ দ্বিগুণেরও বেশি।

তৃতীয় প্ল্যানের অন্তর্বর্তী রিপোর্টে (mid-term

appraisal) দেখা যাচ্ছে মোট ৭৫০০ কোটির মধ্যে ৪৭৫০ কোটি (অর্থাৎ ৬৩·৩% শতাংশ) আভ্যন্তরীণ ঋণ, ট্যাক্স ও অন্যান্য সূত্রে সংগৃহীত হবে ; বাকী টাকার মধ্যে বৈদেশিক সাহায্য ২২০০ কোটি (অর্থাৎ মোট অঙ্কের ২৯·৪ শতাংশ) আর ডেফিসিট ফাইনান্স ৫৫০ কোটি টাকা (অর্থাৎ মোট অঙ্কের মাত্র ৭·৩ শতাংশ)। তৃতীয় প্ল্যানের প্রথম তিন বছরে যত টাকা ব্যয় হয়েছে (৪১৯৮ কোটি টাকা) তার মধ্যে ৫৬·৬% এসেছে আভ্যন্তরীণ সূত্র থেকে, ২৮·৭% এসেছে বৈদেশিক সাহায্য থেকে এবং বাকি ১৪·৭% এসেছে ডেফিসিট ফিনান্স থেকে।—চতুর্থ প্ল্যানের ব্যয়বরাদ্দ দ্বিগুণ করা হয়েছে এবং ডেফিসিট ফিনান্স খুব সঙ্গত কারণেই বর্জন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। মোট ১৫৬২০ কোটি টাকার কতখানি কোন্ সূত্র থেকে সংগৃহীত হবে ?

এই বিষয় নিয়ে আগামী বারে আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের ইংরেজী অনুবাদের তালিকা

শ্রীসুধাময়ী মুখোপাধ্যায়

(১৯২৫)—পূরবী—র র ১৪

বিজয়ী—তখন তারা দৃপ্ত বেগের বিজয় রথে—Poems 60—From triumph to triumph
—Fruit Gathering 86—Those Walk on the Path of Pride (22)

পঁচিশে বৈশাখ—রাত্রি হ'ল ভোর—*Hindusthan Standard* 8-5-1945—The Twentififth Baisakh
—By Indira Devi
Reprinted in V. B. Q. May-July 1945

আনমনা—আনমনা গো আনমনা—Poems 67—My heart feels shy

আশা—মস্ত যে সব কাণ্ড করি—V. B. Q.—July 1925—With a grand scheme in mind

ঝড় ১—সুপ্তির জড়িমা ঘোরে—Poems 71—Half asleep on the shore

ভাবীকাল—ক্ষমা করো, যদি গর্ব ভরে—Poems 70—Pardonme, if in my pride

অতিথি—প্রবাসের দিন গুলি মোর পরিপূর্ণ করি দিলে নারী—Poems 72—Woman, thou hast made my days
of exile tender

অন্তর্হিতা—প্রদীপ যখন নিবেছিল—Golden Boat—The Vanished one—The Lamp had been put out

আশঙ্কা—ভালোবাসার মূল্য আমায়—V. B. Q.—Aug-Oct. 1941—Love's price—Tr. by The Author

কঙ্কাল—পশুর কঙ্কাল ওই—Poems No. 73—A beast's bony frame
—Golden Boat 1932—Skeleton—An animals bones lie crumbling
—V. B. Q. April 1925—The Skeleton—Tr. by the Author

বদল—হাসির কুসুম আনিল—Poems 74—She left me her flower of smile

(তুলনীয়—তার হাতে ছিল হাসির কুসুম···গান)

ইটালিয়া—কহিলাম ওগো রাণী—V. B. Q. April 1925—To Italia

নমস্কার—অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার—V. B. Q. VI 3, Oct. 1928—Namaskar (abridged)
—Tr. by Kshitish Chandra Sen

পাদটীকা ১। প্রবাসী ১৩৩১ চৈত্র—পৃষ্ঠা ৭১৩ দ্রষ্টব্য। 'ঝড়' কবিতা আরম্ভ হয়েছে 'সুপ্তির জড়িমা ঘোরে' থেকে।—এর আগে 'ঝড়' নামে রবীন্দ্র রচনাবলীতে যে কবিতা আরম্ভ হয়েছে 'অন্ধ কেবিন আলোয় আঁধার গোলা' পংক্তি দিয়ে সে 'বিশ্ব ডংকা' নামে প্রবাসী ১৩৩১ জ্যৈষ্ঠে ছাপা হয়।

[পূরবী ১ম সংস্করণ সঞ্চিতা অংশে ছিল, বর্তমানে সঞ্চয়িতায়]
—Translation of the whole poem by Kshitish Chandra Sen was reprinted in the Sri Aurobindo Mandir Annual Cal. in 1944, and in Salutation to Sri Aurobinda, Sri Aurobindo Asram, Pondicherry in April 1949

শিবাজী উৎসব—[পূরবী ১ম সংস্করণ সঞ্চিতা অংশে ছিল, বর্তমানে সঞ্চয়িতায়]—*Hindusthan Standard* Ann. 1955 —Shivaji Festival—by Lila Majumdar

(১৯২৭)—লেখন—রবীন্দ্ররচনাবলী ১৪

বড়ো কাজ করি—V. B. Q. Feb—April 1941—God honours me when I Sing Reprinted from Fire-flies (1928) page 105

অকালে যখন বসন্ত—V. B. Q. May—Oct. 1941—Spring hesitates at Winter's door —Reprinted from Fire-flies—page 88

স্ফুলিঙ্গ—(স্ফুলিঙ্গ বইতে গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য

অন্নহারা গৃহহারা চায় ঊর্ধ্বপানে—India Speaks. May 1946 The Fanished, the homeless Liberty. 6 Sept. 1931

হে সুন্দর খোলো তব নন্দনের দ্বার—V. B. Q. Aug—Oct. 1946—A Translation by Haridas Mitra. This poem was composed on the Occasion of the Opening of Santiniketan Kala Bhavan in Decembr 1929

গান্ধী মহারাজ—Gandhi Maharaj—Tr. by the Author in V. B. Q. Feb. 1941

নববর্ষ এল আজি দুর্যোগের ঘন অন্ধকারে—*Hindusthan Standard* Daily 16-4-39—The New Year comes encircled by the darkness of danger and difficulties

(১৯২৯) মহুয়া—র র ১৫

উজ্জীবন—ভস্ম অপমান শয্যা ছাড়ো পুষ্পধনু—The Herald of Spring p. 23—Resurrection—Leave you bed of ashes, O God of love

বিজয়ী—বিবশ দিন বিরস কাজ—The Herald of Spring p. 80—The conqueror—The day was dull, cheerless the work

দ্বৈত—আমি যেন গোধূলি গগন, ধেয়ানে মগন—The Herald o Spring p. 67—Duality—I am like the twilight dust lost in meditation

সন্ধান—আমার নয়ন তব নয়নের নিবিড় ছায়ায়—The Herald of Spring p. 78—Search—Under the profound shadow of your eyes

উপহার—মনিমালা হাতে নিয়ে দ্বারে গিয়ে এসেছিনু ফিরে—The Herald of Spring p. 75—Gift—With a necklace of diamonds did I approach

মায়া—চিত্তকোণে ছন্দে তব বাণীরূপে সংগোপনে—The Herald of Spring p. 50—Mark—In the rhythm of your mind

নির্ঝরিণী—ঝরণা তোমার স্ফটিকজলের স্বচ্ছ ধারা—The Herald of Spring p. 68—The Waterfall—O Waterfall in thy clear sparkling stream

প্রকাশ—আচ্ছাদন হতে ডেকে লহো মোরে তব চক্ষুর আলোতে—The Herald of Spring p. 74—Unfolding—From obscurity bring me into the light

*বরণডালা—আজি এ নিরালা কুঞ্জে, আমার অঙ্গ মাঝে—The Herald of Spring p. 24—The Tray of offerin
—To-day in this sheltered grove

উদ্ঘাত—অজানা জীবন বাহিনু রহিনু
আপন মনে —The Herald of Spring p. 82—Revealed—My life have I borne so long

অসমাপ্ত—বোলো তারে, বোলো এত দিনে তারে দেখা হল —The Herald of Spring p. 25—Incomplete
—Tell him. Oh tell, At last have I caught a glimpse

অচেনা—রে অচেনা, মোর মুষ্টি ছাড়বি কী করে —The Herald of Spring p. 43—The unknown—
O unknown one, How will you escape my grasp

অপরাজিত—ফিরাবে তুমি মুখ, ভেবেছ মনে আমারে দিবে
দুখ ? —The Herald of Spring p. 33—Unconquered—Will you turn away your face from me

*নির্ভয়—আমরা দুজনা স্বর্গ খেলনা গড়িব
না ধরণীতে—The Herald of Spring p. 65—Fearless—We two shall not dally

দূত—ছিনু আমি বিষাদে মগনা অন্যমনা —The Herald of Spring p. 35—Messenger, Listless, immersed i
sorrow, I lingered

দায় মোচন—চিরকাল রবে মোর প্রেমের
কাঙাল —The Herald of Spring p. 70—Debt Remission—If it pleases you, then say

সবলা —নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার —The Herald of Spring p. 45—Sabala'—O Lord of Destiny !
—Poems 89—Why deprive me, my Fate, of my Worker's right
—*Modern Review*—June, 1936—Why deprive me of my Fate

প্রতীক্ষা—তোমার প্রত্যাশা লয়ে আছি —The Herald of Spring p. 29—Expectation—In anxious expecta
tion, I am waiting

সাগরিকা—সাগর জলে সিনান করি —March of India, 1959—The Lady of the Sea—Tr. by Humayun
Kabir

পথবর্তী—দূর মন্দিরে সিন্ধু কিনারে —The Herald of Spring p. 72—By the Way side—You walk along
the sea shore

মুক্তরূপ—তোমারে আপন কোণে স্তব্ধ করি
যবে —The Herald of Spring p. 56—The full vision—When I hide you in a corner

আহ্বান—কোথা আছ ? ডাকি আমি।
শোনো শোনো —The Herald of Spring p. 77—Call—Where are you ? O hark to my call

দীনা—তোমারে সম্পূর্ণ জানি হেন মিথ্যা কখনো কহিনি —The Herald of Spring p. 31—The poverty stricken
—I never boasted, I knew you completely

সৃষ্টি রহস্য—সৃষ্টির রহস্য আমি তোমাতে করেছি অনুভব —The Herald of Spring p. 83—The mystery
of creation—The mystery of creation have I realised

হেঁয়ালী—যারে সে বেসেছে ভালো তারে সে কাঁদায়—The Herald of Spring p. 44—Riddle—She makes him
weep whom she loves

দর্পণ—দর্পণ লইয়া তারে কী প্রশ্ন শুধাও এক মনে —The Herald of Spring p. 69—The Mirror—O fair
one ! looking at the mirror

একাকী —চন্দ্রমা আকাশতলে পরম একাকী —The Herald of Spring p. 47—The lonely one—The moon is
infinitely lonely

আশীর্বাদ—অজিন অরুণ রশ্মি আজি ওই তরুণ প্রভাতে —The Herald of Spring p. 61—Blessing
—The soft light of the morning sun has flooded the sky

নববধূ—চলেছে উজান ঠেলি তরণী তোমার—The Herald of Spring p. 41—The young bride—The boat is sailing upstream

পরিণয়—শুভখন আসে সহসা আলোক জেলে—The Herald of Spring p. 27—Marriage—The auspicious moment comes

গুপ্তধন—আরো কিছুখন না হয় বসিয়ো পাশে-The Herald of Spring p. 63—Hidden Treasure—O Stranger, Tarry a while

প্রত্যাগত—দূরে গিয়েছিলে চলি—The Herald of Spring p. 48—The Returned—You wandered far away

পুরাতন—যে গান গাহিয়াছিনু কবেকার
দক্ষিণ বাতাসে—The Herald of Spring p. 76—The past—The airs that I hummed long ago

ছায়া—আঁখি চাহে তব মুখ পানে—The Herald of Spring p. 52—Shadow—Mine eyes gaze at you

বিদায়—কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও—The Herald of Spring p. 37—Parting—The chariot of time rushes past—V.B.Q. Nov. 35—Jan. 36—Farewell, my friend—Tr. by the Author

প্রণতি—কত ধৈর্য্য ধরি ছিলে কাছে
দিবস শর্বরী—The Herald of Spring p. 61—Salutation—With what patience, you stayed

নৈবেদ্য—তোমারে দিইনি সুখ, মুক্তির
নৈবেদ্য গেনু রাখি—The Herald of Spring p. 81—Offering—To you I have not given happiness

অশ্রু—সুন্দর তুমি চক্ষু ভরিয়া এনেছ অশ্রুজল—The Herald of Spring p. 79—Tears—O Beautiful one! You have come, eyes filled with tears

অন্তর্ধান—তব অন্তর্ধান পটে হেরি তব রূপ চিরন্তন—The Herald of Spring p. 60—Disappearance—In thy parting canvas, I behold thy eternal form

বিরহ—শঙ্কিত আলোক নিয়ে দিগন্তে উদিল শীর্ণ শশী—The Herald of Spring p. 40—Separation The crescent moon climbed the sky

বিদায় সম্বল—যাবার দিকের পথিকের পরে ক্ষণিকের স্নেহখানি—The Herald of Spring p. 54—The parting assurance—She whispered into the ears of the parting traveller

দিনান্তে—বাহিরে তুমি নিলে না মোরে, দিবস গেল বয়ে—The Herald of Spring p. 55—Day's end—The last rays of the sun have departed

*অবশেষ—বাহির পথে বিবাগী হিয়া
কিসের খোঁজে গেলি—The Herald of Spring p. 58—O Restless heart! In search of what

ক্রমশঃ

———

গ্রন্থ পরিচয়

ললিত-রাগ :— রণজিৎকুমার সেন, দেবশ্রী সাহিত্যসমিধ, ৫৭ সি, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২। দাম চার টাকা।

বইখানি উপভোগ্য উপন্যাস। ঘটনা-চিত্রণে নয়, চরিত্র-চিত্রণে মধুর। চরিত্রগুলিই গল্পকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। নইলে এমন কোন নূতন দিগ্‌দর্শন নাই, এমন কোন প্লটের কসরৎও নাই—তবু, পড়িতে ভাল লাগিল, এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া গেলাম। আমার মনে হয় গ্রন্থ সম্বন্ধে ইহাই বড় প্রশস্তি। ইহার ব্যাকগ্রাউণ্ডও বৃহৎ নয়—একটি ক্ষুদ্র পরিবেশ। রিটায়ার্ড জজ যতেনবাবুর বাড়ী। হেনাই এ বাড়ীর 'মক্ষিরাণী'। উচ্চশিক্ষিতা হেনা মনের দিক থেকেও কালচার্ড। যাহারা আসে তাহারা হেনারও যেমন বন্ধু, যতেনবাবুরও তেমনি বন্ধু। এই সহজ সরল অমায়িক লোকটি কেহ আসিলে আর ছাড়িতে চান না। এই পরিবারে যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহারাই মিশিয়া গিয়াছেন। যেমন করিয়া মিশিয়াছে পল্লব ও বীরেন। পল্লব হেনার গানের শিক্ষক, বীরেন ক্লাসমেট। দুজনের প্রতিই সমান আকর্ষণ হেনার। সময় সময় এই আকর্ষণ-দ্বন্দ্বে হেনাকে দুলিতে হইয়াছে। হেনার মা করবী দেবী, সত্যই মা। সুন্দর এই চরিত্রটি। আর একটি চরিত্র কপিল। লেখক এই কপিলকে আনিয়া, গল্পের যে ভাবে মোচড় টানিয়াছেন তাহাতে তাঁহার কুশলী হাতের পরিচয় পাওয়া যায়। কপিলের আগমনেই পল্লব চরিত্রটি এমন উজ্জ্বল হইয়া ধরা দিয়াছে।

আর ভাল লাগিল গল্পের সমাপ্তিরেখা। গ্রন্থের নামকরণের সঙ্গে সুন্দর একটি সঙ্গতি আছে।

শ্রীগৌতম সেন

শিক্ষাগুরু আশুতোষ :—শ্রীমণি বাগচী। জিজ্ঞাসা, ৩৩নং কলেজ রো, কলিকাতা, ডিমাই ৮ পৃঃ, ২২৬ পৃ।

গ্রন্থটি আশুতোষের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গ্রন্থকারের সময়োপযোগী নিবেদন। অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন গ্রন্থের ভূমিকায় বলিয়াছেন, "মণিবাবুর সময়োচিত পুস্তক 'শিক্ষাগুরু আশুতোষ' এখনকার পাঠকেরা যত্ন করিয়া পড়িবেন, এরূপ আশা করা যায়। এই গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠায় কৃতী লেখকের সযত্ন তথ্যানুসন্ধান, নিরাসক্ত বিচার-বিশ্লেষণ আর ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বিদ্যমান।"

আশুতোষ অনন্যসাধারণ মনীষা ও কর্মশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই মনীষা ও শক্তি তিনি দেশের শিক্ষার বুনিয়াদ গড়িয়া তুলিবার কাজে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। পরাধীন দেশে জাতির মনীষা ও চরিত্র গঠনের এই মূল কাজটি করিবার জন্য তাঁহাকে কি প্রাণান্তকর পরিশ্রম করিতে, কত অলঙ্ঘনীয় বাধা ও বিপত্তি অসম সাহসের সহিত ও অদমনীয় উদ্যম ও সাধনার দ্বারা অতিক্রম করিতে হইয়াছিল তাহার ইতিহাস আজ প্রায় বিস্মৃতির অন্তরালে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। কোন জাতিই তাহার বিশিষ্ট পথিকৃৎদের কথা ভুলিয়া গিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। তাঁহাদের সাধনার মধ্যে যে ভবিষ্যতের পথের ইঙ্গিত থাকিয়া। সে কথা ভুলিয়া গেলে ইতিহাসের গতি বিপথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অব[শুষ্ক] শুষ্ক হইয়া পড়ে।

দেশে লোকশিক্ষা প্রচারের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত জরুরী, এ[কথা] কেহই অস্বীকার করিবে না। কিন্তু ইহার মূল শক্তি ও প্রে[রণা] যোগায় উচ্চশিক্ষার বনিয়াদটি। উচ্চশিক্ষা ব্যতীত স্বাধীন ও নিভ[ীক] চিন্তাশক্তির ও চরিত্রের বিকাশ সম্ভব হয় না। এবং এই উপাদা[ন] হইতেই জাতির জীবনের সকল ক্ষেত্রে গঠনের শক্তি সঞ্চারিত হ[য়]। এই উচ্চশিক্ষার কাঠামোটি গঠন করিতে আশুতোষ তাঁহার বি[রাট] প্রতিভার সকল শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। পরাধীন রাষ্ট্রে [এ] কাজটি কত কঠিন ছিল তাহা আজ হয়ত অনুমান করা সহজ হ[ইবে] না। কিন্তু তথাপি, আশুতোষের নেতৃত্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যাল[য়ের] স্নাতকোত্তর বিভাগগুলি এবং বিশেষ করিয়া মূল গবেষণায় কে[বল] দেশের নহে, বিদেশেরও প্রতিষ্ঠাবান্ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শ্রদ্ধা [ও] সহযোগিতা আকর্ষণ করিয়াছিল।

দেশে আজ উচ্চশিক্ষার কাজে গভীর ব্যর্থতা ও অব্যবস্থিতচিত্তত[ার] পরিচয় প্রকট হইয়া উঠিতেছে। পুরাণো কাঠামো ভাঙ্গিয়া ফেলি[য়া] নূতন ভাবে এই স্তরের শিক্ষার ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার একটা প্রয়া[স] চলিতেছে। নূতন করিয়া কিছু গঠন করিতে গেলে হয়ত পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া ফেলা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। আজ উচ্চশিক্ষায় বিশেষজ্ঞতা (Specialization) ও প্রয়োগশীলতার (appliance) উপর অত্যধিক জোর প্রায় মাধ্যমিক স্তর হইতেই দিবার প্রয়াস করা হইতেছে। ইহার ফলে যে মাধ্যমিক উদার বিস্তারের উপরে আশুতোষ তাঁহার পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থায় স্নাতকোত্তর বিশেষজ্ঞ শিক্ষার কাঠামো গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। ইহার ফল ভাল কি মন্দ হইতেছে তাহার বিচারের প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরী হইয়া পড়িয়াছে।

...ই দেখা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান বিশেষজ্ঞতা ও প্রয়োগশীলতার উপরে ...ধিক আস্থা, শিক্ষার্থীর মননশীলতাকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ...া ফেলিতেছে। জাতির জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগের ...যে উদার দৃষ্টি, বলিষ্ঠ চরিত্র ও স্বাধীন চিন্তার বিকাশের প্রয়োজন, ...র যে নূতন পরিবেশ এখন গড়িয়া উঠিতেছে তাহার মধ্যে যেন ...র আভাস ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে। আশুতোষের শিক্ষা ...র মধ্যে এই গণ্ডিবদ্ধতা অতিক্রম করিয়া উদার, বলিষ্ঠ পরিবেশে ...কে অগ্রসর করিবার পথের নির্দ্দেশ পাওয়া যাইবে।

...র্ত্তমান গ্রন্থে গ্রন্থকার আশুতোষের জীবনের এই বিশেষ সার্থকতা-...ই প্রধান স্থান দিয়েছেন। আশুতোষের জন্মশতবর্ষপূর্ত্তি উপলক্ষ্যে ...রের এই প্রচেষ্টার একটা বিশেষ সার্থকতা আছে। গ্রন্থটি সুখপাঠ্য, ...সাবলীল এবং ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর। গ্রন্থটি বহুলপ্রচার ...দেশের ও জাতির, বিশেষ করিয়া বঙ্গভাষাভাষীর উপকার হইবে ...া মনে করি।

বিপ্লবের অন্তরালে—বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য। সুশীলা প্রকাশনা, ...রনা রোড সাউথ সেকেণ্ড লেন, কলিকাতা ৩৩। ডিমাই ৮ পেজী, ...। মূল্য ৫২ টাকা মাত্র।

মহাত্মা গান্ধী ভারতের স্বাধীনতা যজ্ঞের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার পর ... বিপ্লববাদী দেশসেবকদের প্রতি নেতৃমহলে একটা অশ্রদ্ধা ও ...তার আবহাওয়া সৃষ্টি করিবার প্রয়াস চলিয়া আসিতেছে। ইহা কেবল যে অন্যায় তাহা নহে, দেশের রাষ্ট্র-স্বাধীনতা যজ্ঞে বিপ্লববাদের যে একটা বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল এবং সেই অসংখ্য একনিষ্ঠ দেশসেবকের দল সকল প্রকার স্বার্থত্যাগ করিয়া আপনাদের জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সেবার কথা অস্বীকার বা উপেক্ষা করিলে, ইতিহাসকেই অস্বীকার করিতে হয়। মহাত্মা গান্ধী দেশসেবার নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার পূর্বে যে প্রস্তুতির ইতিহাস ছিল, তাহাকে অস্বীকার করিলে সত্যকেই অস্বীকার করিতে হয়। এমন কি এ কথাও অস্বীকার করা চলে না যে, গান্ধী নেতৃত্বের সমসাময়িক কালেও এই আত্মত্যাগী বিপ্লববাদীর দল যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহার দ্বারা দেশের রাষ্ট্রস্বাধীনতা অর্জ্জনের কাজটি অনেক পরিমাণে সুগম হইয়াছিল। ইঁহাদের নিষ্ঠা ও ত্যাগ অতুলনীয় ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার যোগ্য। একমাত্র দেশের স্বাধীনতা ব্যতীত ইঁহাদের জীবনের আর কোন আকাঙ্ক্ষা ছিল না, এমন কি খ্যাতির আকাঙ্ক্ষাও নহে। এই নিষ্ঠা মহৎ নিষ্ঠা, এই ত্যাগ মহত্তম ত্যাগ।

বর্ত্তমান গ্রন্থে গ্রন্থকার এই সকল জাতকের উপাদান অবলম্বন করিয়া একটি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। ইহাই বর্ত্তমান গ্রন্থের আসল মূল্য। সাহিত্যের বিচারেও ইহাকে সুখপাঠ্য বলা চলে।

করুণাকুমার নন্দী

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৪শ ভাগ
২য় খণ্ড

চতুর্থ সংখ্যা
মাঘ, ১৩৭১

রাষ্ট্রভাষা সমস্যা

বিগত গণতন্ত্র দিবসের দিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার হিন্দী-সমর্থকগণের বিশেষ উৎসাহের ফলে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা রূপে ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণা বেতার ভাষণের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ সর্ব্বভারতে প্রচার করেন। এই ভাষণ দিয়াছিলেন হিন্দীতে এবং অবশ্য সেই সঙ্গে অহিন্দীভাষীদেরও কিছু আশ্বাস দেন যে, হিন্দী রাষ্ট্রভাষা রূপে গৃহীত হইলে তাঁহাদের যাহাতে অসুবিধা না হয় সরকার সেদিকে দৃষ্টি রাখিবেন। অন্যদিকে কনষ্টিটিউশন ক্লাবে সরকারী ভাষা সম্মেলনের উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রী কতগুলি কথা বলেন, যাহার মধ্যে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনার কোনও চিহ্ন ছিল না। প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনী প্রসঙ্গ এবং শ্রীগুলজারীলাল নন্দের বেতার ভাষণের সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ—

নয়াদিল্লী, ২৭শে জানুয়ারী—সরকারী ভাষারূপে হিন্দীকে ইংরাজীর স্থলাভিষিক্ত করিবার জন্য গতকাল প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী ব্যবস্থা গ্রহণকল্পে ২৭শে আহ্বান জানান। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সতর্ক করিয়া দেন যে, হিন্দীকে ঐ আসনে বসাইতে গিয়া দেশের ঐক্য ক্ষুণ্ণ হইতে পারে এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত হইবে না।

মাদ্রাজে হিন্দীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য প্রধানমন্ত্রী ডি-এম-কে দলকে তিরস্কার করেন এবং বলেন, যাঁহারা হিন্দীর বিরোধিতা করিতেছেন, তাঁহাদের ইহা বোঝা উচিত যে, সংবিধানের তিনটি নীতিনির্দ্দেশক নীতি অনুসারেই সরকার এই ব্যবস্থা গ্রহণে অগ্রসর হইয়াছেন।

এখানে কনষ্টিটিউশন ক্লাবে সরকারী ভাষা সম্মেলনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে শ্রীশাস্ত্রী এই কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী জনগণকে এই বলিয়া আশ্বাস দেন যে, ইহার পর হইতে ইংরাজীর স্থলে হিন্দীকে বসাইবার দ্রুত ব্যবস্থা করা হইবে। তবে তিনি এ কথাও বলেন যে, ইহা করিতে গিয়া যদি জাতীয় ঐক্য বিঘ্নিত হয় তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে।

শ্রীশাস্ত্রী বলেন, সত্যি করিয়া বলিতে গেলে আজিকার দিনে ইংরাজীর স্থলে পুরাপুরিরূপে সরকারী ভাষার আসনে হিন্দীরই অধিষ্ঠিত হওয়া উচিত; কিন্তু অহিন্দীভাষী জনগণের অসুবিধা যাহাতে না হয় তজ্জন্য হিন্দীর সহিত ইংরাজীর ব্যবহার অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুলজারিলাল নন্দ গতকাল জনগণের উদ্দেশে আশ্বাস দেন যে, সরকারী কাজকর্ম্মের ব্যাপারে হিন্দীর প্রচলনকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হইবে যাহাতে সরকারী কাজ চালাইয়া যাওয়ার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা না হয়।

শ্রীনন্দ বলেন, যাহারা হিন্দী জানে না, হিন্দী

ব্যবহারে তাহাদের যাহাতে অসুবিধা না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা হইবে।

প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীর ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই সকল ঘোষণায় দেশের অ হিন্দীভাষীদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, কেননা সারা দেশের উপর এইরূপে হিন্দী চাপাইয়া দিবার কোনও অধিকার গণতন্ত্রবাদসম্মত কোনও মন্ত্রীসভার নাই। শ্রীশাস্ত্রী বলেন যে, সংবিধানের তিনটি নীতিনির্দেশক ধারা অনুসারেই সরকার এই ব্যবস্থা গ্রহণে অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি একথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, সারা ভারতের শতকরা প্রায় ৭০ জনের কাছে হিন্দী অবোধ্য বিদেশী ভাষা রূপেই এখনও রহিয়াছে। হিন্দীকে সংশোধন ও সহজ করার প্রায় কোনও সুসংবদ্ধ চেষ্টা এই দীর্ঘ ১৭ বৎসরে করা হয় নাই। উহা সর্ব্বভারতে গ্রহণযোগ্য ও ব্যবহারযোগ্য করার কোনও বিশেষ চেষ্টা না করার পিছনেও হিন্দীওয়ালাদিগের বিশেষ মতলব আছে, এ সন্দেহও অহিন্দী অঞ্চলের লোক করিতেছে।

"হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ" অহিন্দীভাষীদের কাছে কোনও অলীক উপাখ্যান বস্তু নয়। সংবিধানের ৩৪৩ ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা হইলে সরকারী সকল কাজে, সরকারী সকল চাকুরীর বা শাসনতন্ত্রের সকল অধিকারীর পদের জন্য প্রতিযোগিতায় অহিন্দীভাষীদের অন্যায় ও অসম বাধার সম্মুখীন হইতে হইবে। বিচার ব্যবস্থায় হিন্দী চলিলে অহিন্দীভাষীদের উপর যে ভাষার দরুন অবিচার করার ও জুয়াচুরীর পথে ঠকাইবার পথ খুলিয়া যাইবে তাহা ত বিহারে ও মধ্যপ্রদেশে অহিন্দীভাষীগণের অভিজ্ঞতায় নিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত হইয়া যাইতেছে। সুতরাং বর্ত্তমান অবস্থায় হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষার পূর্ণ মর্য্যাদা দান যে অহিন্দীভাষীদের দাসত্বের প্রকরণ, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

এ সকল কথা অহিন্দীভাষী অঞ্চলে প্রকাশ্যে, সভা-সমিতিতে ও সংবাদপত্রে, কিছুদিন যাবৎ ব্যক্ত হইতেছে। কেন্দ্রীয় সংসদে এই সকল বিষয়ে প্রবল বিতর্কের পর ১৯৬৩ সনে, পণ্ডিত নেহরুর বিবেচনাপূর্ণ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এক আইন প্রবর্ত্তিত হয়, যাহার অর্থ এই যে, যতদিন না অহিন্দী অঞ্চলের জনসাধারণ হিন্দীকে ভারতরাষ্ট্রের সরকারী ভাষা রূপে গ্রহণ করিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া চাহিবে, ততদিন ইংরাজী সহযোগী ভাষা রূপে চলিবে এবং সরকারী ব্যবস্থায়, পরীক্ষায়, বিচারে ও অন্য সকল কাজে ইংরাজীর ব্যবহারে কোনও বাধা বা প্রতিকূল ব্যবস্থা থাকিবে না।

শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী ও শ্রীগুলজারীলাল নন্দ এ সকল কথাই জানেন এবং তাঁহাদের সততা ও দেশপ্রেম সন্দেহের অতীত। কিন্তু এ সবকিছু জানিয়াও তাঁহারা ঐরূপে হিন্দীর রাজ্যাভিষেক করায় প্রবৃত্ত হইলেন কেন? ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, তাঁহারা প্রাদেশিক ভাষার গণ্ডির উর্দ্ধে উঠিতে এখনও সমর্থ হন নাই এবং সে কারণে পণ্ডিত নেহরুর ন্যায় প্রায় সর্ব্বভারতীয় অনুভূতি তাঁহাদের মধ্যে এখনও সঞ্চারিত হয় নাই। সে কারণে মাতৃভাষা'কে "রাজ-ভাষা"রূপে বরণ করার উল্লাসে তাঁহারা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন যে, ইহার ফলে ভারতের সকল অহিন্দীভাষী অঞ্চলে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে এবং দেখা দিয়াছেও সেইভাবে। ২৭শে জানুয়ারী মাদ্রাজ হইতে নিম্নলিখিত সংবাদ আসে—

মাদ্রাজ সরকার শহরের সমস্ত কলেজের কর্তৃপক্ষকে সোমবার পর্য্যন্ত কলেজ বন্ধ রাখার নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

আজ প্রত্যূষে মাদ্রাজের শহরতলী 'ভিরুগাম্বাক্কমে' রঙ্গরাজন নামে ৩২ বৎসর বয়স্ক একজন ডাককর্ম্মী নিজের দেহে আগুন লাগাইয়া আত্মহত্যা করেন।

নিজের দেহে কেরোসিন ঢালিবার ও অগ্নিসংযোগের আগে রঙ্গরাজন 'তামিল দীর্ঘজীবী হউক' বলিয়া চীৎকার করেন। তিনি নানারূপ হিন্দীবিরোধী ধ্বনিও করিতে থাকেন।

হিন্দীকে কেন্দ্রীয় সরকারী ভাষা হিসাবে ঘোষণার প্রতিবাদে গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে হিন্দী বিরোধীদের ইহা হইল দ্বিতীয় আত্মহত্যা।

গতকাল মাদ্রাজের আর একটি শহরতলী কোদম্বক্কমে ২২ বৎসরের যুবক শিবলিঙ্গম্ নিজের দেহে আগুন লাগাইয়া আত্মাহুতি দেন।

তিরুচিরাপল্লীতে তিনদিনের জন্য সমাবেশ ও মিছিল নিষিদ্ধ করিয়া ১৪৪ ধারা অনুসারে আজ এক আদেশ জারী করা হইয়াছে।

দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাজাঘাম দলের সদস্যারা জাতীয় পতাকাকে টানিয়া নামাইবার চেষ্টা করিলে এই নিষেধাজ্ঞ জারী করা হয়।

চিদাম্বরমে ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলী চালনার ফলে

একজন ছাত্র নিহত হয় ও কয়েকজন আহত হয়। মাদ্রাজেও একদল উত্তেজিত ছাত্রকে হটাইবার জন্য পুলিশ লাঠি চালনা করে।

আজ ও কাল মাদ্রাজ, কোয়েম্বাটুর, মাদুরা প্রভৃতি সহরে ব্যাপক ধরপাকড় হইয়াছে। এই দুইদিন ধরিয়া দক্ষিণ ভারতের সহরগুলির পথে পথে বাহির হইয়াছে অসংখ্য হিন্দী-বিরোধী মিছিল। কয়েকটি স্থানে অগ্নি সংযোগের ঘটনাও ঘটিয়াছে। এখানকার অধিকাংশ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররাই ক্লাসে যোগদান করে নাই।

মাদ্রাজ রাজ্যে প্রবল বিক্ষোভ ব্যাপকভাবে দেখা দিবার [illegible] মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্টই বলেন যে, ইংরাজীর বহিষ্কারে তিনি সম্মতি দেন নাই এবং সকল কাজে ও সকল বিষয়ে [illegible]দের ইংরাজী ব্যবহারের অধিকার অব্যাহত [illegible] এবং হিন্দী না জানার দরুন তাঁহার রাজ্যের [illegible] কোনও বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হইলে তিনি তাহার [illegible] করিবেন। ইহাতেও আন্দোলন থামিয়া যায় [illegible] এবং উহা পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রদেশ ইত্যাদিতেও [illegible] হইতেছে দেখিয়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সদস্যদের [illegible]। প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হিন্দীভাষী অনুচরবর্গ [illegible] বুঝাইয়াছিল যে, এই আন্দোলন দ্রাবিড় মুন্নেত্রা [illegible] প্রমুখ বিরোধী দলের উস্কানিতে হইয়াছে। কিন্তু বিক্ষোভের [illegible] ভাব দেখিবার পর ও আন্দোলন অন্যান্য প্রদেশে সঞ্চারিত হইতেছে বুঝিবার পর দুইজনেই হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা রূপে অধিষ্ঠিত করার কাজ স্থগিত রাখা [illegible] এবং সেই বিষয়ে তাঁহাদের সুস্পষ্ট নির্দেশ ও [illegible] প্রচারিত হইবার পর এই বিক্ষোভের উত্তেজনা কিছু [illegible] প্রশমিত হইয়াছে।

[illegible] লাল বাহাদুর শাস্ত্রী সংবিধানের ধারা ও তিনটি [illegible] নির্দ্দেশের কথা তুলিয়া নিজ কার্য্যের সমর্থন করিয়াছেন। এখানেও বেশ কিছু বলিবার আছে। সংবিধানে ঐ ধারা ও নীতি-নির্দ্দেশ কিভাবে আসিয়াছিল তাহার পূর্ণ ইতিহাস বা বিবরণ সাধারণের নিকট প্রকাশিত হয় নাই। রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত প্রস্তাব যে কংগ্রেস "কনসামব্রি" পার্টির সভায় উত্থাপিত হয়—সেটা যে গণতন্ত্রমত অনুযায়ী সাধারণের নির্ব্বাচিত সদস্যদের সভা ছিল না, সে-কথাও দেশের অধিকাংশ লোকেই জানেন না। সেই সভার কাজের কিছু বিবরণ সেই সভায় সভাপতি ডাক্তার আম্বেদকার ও সেই প্রস্তাবের উত্থাপক শ্রীগোপালস্বামী আয়েঙ্গার তাঁহাদের লিখিত দুইটি পৃথক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অত্যন্ত তীব্র বাদানুবাদের পর দেখা যায় যে, ঐ প্রস্তাবের স্বপক্ষে ৭৭জন ও বিপক্ষেও ৭৭জন, তারপর নানা তর্কের পর দ্বিতীয়বার ভোট লইয়াও যখন পূর্ব্বের অবস্থাই আছে দেখা গেল তখন চেয়ারম্যান তাঁহার "কাষ্টিং ভোট" দিয়া এক ভোটে হিন্দীকে উদ্ধার করেন।

সংবিধানের অনেক কিছুই কাঁচা ও অকেজো, তাহার কারণ উহা রচিত, গঠিত ও বিবেচিত হইয়াছিল অনভিজ্ঞ ও অপ্রশস্ত জ্ঞানযুক্ত লোকেদের দ্বারা। সুতরাং অনেক ক্ষেত্রের উহার বিধান ভুল হয়।

এই প্রসঙ্গ শেষ করার সময় মাদ্রাজ হইতে যে সকল সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহা অতি নিদারুণ। হিন্দী-বিরোধী জনতা ঐ রাজ্যের নানা অঞ্চলে ব্যাপক হাঙ্গামা চালাইয়া অবস্থা দ্রুতগতিতে এরূপ আশঙ্কাজনক পরিস্থিতিতে আনিয়াছে যে মাদ্রাজ সরকার সামরিক বিভাগের সাহায্য চাহিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং ইতিমধ্যে প্রতিবেশী চারটি রাজ্য হইতে সশস্ত্র পুলিশ আনাইয়া কাজে লাগাইয়াছেন। শেষ সংবাদে জানা যায় এইরূপ—

হিন্দীকে সরকারী ভাষা হিসাবে গ্রহণ করার বিরুদ্ধে সমগ্র মাদ্রাজ রাজ্যে ছাত্ররা পুনরায় যে আন্দোলন সুরু করিয়াছে, আজ তাহার তৃতীয় দিনে মাদ্রাজ রাজ্যের তিনটি শহরে পুলিশের গুলীতে একুশজন নিহত ও অনেকে আহত হন। ছাত্রদের বিক্ষোভ দমনের জন্য পুলিশ গুলী চালায়। জনতার আক্রমণে গুরুতর আহত হওয়ার পর দুইজন দারোগা জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ হইয়া মারা যান।

কোয়েম্বাটুর ও মাদুরাইতে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের উপর কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ করে এবং লাঠি চালায়।

অবস্থা খারাপ হওয়ায় শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য প্রয়োজন হইলে অসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার জন্য সেনাদলকে প্রস্তুত থাকার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উপদ্রুত তিনটি এলাকায় (তিরুচেনগোড়ে, তিরুপপুর ও কারুর) সেনাদল প্রেরণের আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

সালেম জেলার তিরুচেনগোড়েতে জনতার উপর পুলিশের গুলীচালনার ফলে দুইজন নিহত ও দুইজন আহত

হইয়াছে। এখানে প্রাপ্ত সরকারী সংবাদে জানা যায় যে, আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহের জন্য জনতা থানা আক্রমণের চেষ্টা করিয়াছিল। অপরাহ্ণে পাঁচ হাজার লোকের এক উচ্ছৃঙ্খল জনতার উপর দ্বিতীয়বার গুলী চালাইতে একজন নিহত ও দুইজন আহত হয়।

কোয়েম্বাটুর জেলায় কোয়েম্বাটুর, তিরুপপুর ও ভেল্লাইকোয়েলেও পুলিশ গুলী চালায়। তিরুপপুরে চারজন ও কোয়েম্বাটুর শহরে দুইজন এবং ভেল্লাইকোয়েলে ১ জন নিহত হয়।

এদিকে কেন্দ্রীয় সরকার মাদ্রাজের বিক্ষোভ ভয়ানক রূপ গ্রহণ করায় বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। আনন্দবাজারের সংবাদ এইরূপ—

মাদ্রাজে হিন্দীবিরোধী আন্দোলনের প্রচণ্ডতায় উদ্বিগ্ন ভারত সরকার এখন বিবেচনা করিতেছেন অহিন্দীভাষীদের ভয় ঘুচাইতে আর কি করা যায়।

মাদ্রাজের ঘটনাবলী রাজধানীতে পৌছার পর প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীনন্দের সহিত এক জরুরী বৈঠকে বসেন। বৈঠকে হাজির ছিলেন অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী এবং খাদ্যমন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মণ্যম। শ্রীনন্দ মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীভক্তবৎসলম ও শ্রীকামরাজের সহিতও যোগাযোগ করেন। শ্রীনন্দ কেরল যাত্রা বাতিল করিয়াছেন।

একদল কাণ্ডজ্ঞানবিহীন লোকের "হিন্দীরাজ" স্থাপনের প্রবল চেষ্টায় এই অতি বিষম প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। আরও দুঃখের বিষয় যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী ঐ লোকদের চাপে পড়িয়া এরূপ বিপরীতমুখী, "হিন্দী প্রতিরোধ" আন্দোলনের সম্ভাবনার কথা ভাবিয়াও দেখেন নাই। আশা করা যায় এইবার সেই সকল লোক যে কতদূর স্বার্থসর্ব্বস্ব ও নির্ব্বোধ সেকথা ইঁহারা বুঝিবেন।

নির্ব্বোধ বলিলাম এই কারণে যে, যেভাবে হিন্দীকে সর্ব্বভারতীয় ভাষা দাঁড় করাইবার চেষ্টা তাঁহারা করিতেছেন তাহাতে না আছে বুদ্ধি-বিচারের চিহ্ন, না আছে পাণ্ডিত্যের কানও লক্ষণ।

এতদিন কাজ ও অঢেল টাকা খরচ করার পর সরকারী হিন্দী ডাইরেক্টোরেট" এক ইংরাজী ও হিন্দী "পারিভাষিক শব্দ সংগ্রহ" অর্থাৎ ইংরাজী-হিন্দী টেকনিক্যালেজ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে অতি সুস্পষ্টভাবে দু'টি কথা প্রমাণিত হইতেছে। প্রথম হিন্দী কিরূপ অনগ্রসর ভাষা ও দ্বিতীয়ত, ঐ ডাইরেক্টো[রেটের] কিরূপ কর্ম্মক্ষম!

বহু ইংরাজী শব্দের, যাহার অতি উত্তম বাংলা তৎ[সম] কথায় পারিভাষিক শব্দ রচিত বা যোজিত হইয়াছে, [তাহার] কষ্টকল্পিত পারিভাষিক শব্দ ইহাতে সংগৃহীত রহিয়াছে। [সে] শব্দগুলি সাধারণ হিন্দীভাষী জনে ত বুঝিবেই ন[া] কেননা তাহাতে পাণ্ডিত্য দেখাইবার চেষ্টা হইয়া[ছে] সহজবোধ্যে বা শব্দার্থ-অনুগামী করার কোনও চেষ্টাই ক[রা] হয় নাই। আবার অনেক ক্ষেত্রে, যেথানে একই ইংরাজ[ী] শব্দ নানা অর্থে প্রযুক্ত বা ব্যবহৃত হয়, সেখানে এম[ন] কয়েকটি অর্থ দেওয়া হইয়াছে যাহা সকল যৌগিক শব্দে ব্যবহার চলে না। যেমন Security শব্দের হিন্দী প্রতি শব্দ দেওয়া হইয়াছে "সুরক্ষা, প্রতিভূতি, জমানত, ঋণপত্র, ঋণ ধার"। বলা বাহুল্য এই পারিভাষিক শব্দগুলি যিনি বা যাঁহারা রচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের ইংরাজী শব্দার্থ—বিশেষে যেখানে বিভিন্ন সংজ্ঞায় একই শব্দে ব্যবহৃত হয় সে জাতীয় শব্দার্থ-সম্পর্কিত জ্ঞান অপেক্ষা বোধ হয় লেন্‌দেন রতি কারবারের জ্ঞান অধিক ছিল, সে কারণে টাকার লেন দেন বা ঋণ "সুরক্ষিত" করার জন্য খাতকের যে জামিন বা প্রতিভূ হয় তাহার কথাও ঋণ সুরক্ষা ব্যবস্থার কথাই ইঁহাদের মস্তকে প্রবেশ করে। তারপর Security শব্দযোগে উৎপন্ন নানা যৌগিক শব্দ ও তাহার পরিভাষা ইঁহারা দিয়াছেন যাহা সব কিছুই ঋণ সম্পর্কিত। কিন্তু যখন "Security Council"—অর্থাৎ জাতিসঙ্ঘের সেই কমিটি যাহার সম্মুখে ভারতকে বার বার দাঁড়াইয়া পাকিস্তানের মিথ্যা অভিযোগের উত্তর দিতে হইয়াছে সেই কমিটি বা কাউন্সিল—এই শব্দ তাঁহাদের সম্মুখে আসিল তখন ইঁহারা আকাশ পাতাল হাতড়াইয়া কোনও পারিভাষিক শব্দ রচনা করিতে পারিলেন না, কেননা উক্ত কাউন্সিল আর যাহাই বিচার করুক দেনা-পাওনার কথা করে না। শেষ পর্যন্ত ইঁহারা উক্ত যৌগিক শব্দটাই বাদ দিলেন।

আবার এক একটি শব্দের যে পারিভাষা রচিত হইয়াছে তাহা নিছক ও অনেক ক্ষেত্রে নিদারুণ ভুল। যেমন Sea-level-কে বলা হইয়াছে (level, Sea, Geog) সমুদ্রতল।

মহাশয় ইহা রচনা করিয়াছেন তিনি এ-বিষয়ে এতই ...ত যে, Sea-level শব্দের ব্যুৎপত্তি বা ব্যবহারের কোন ...জ করাও প্রয়োজন মনে করেন নাই। করিলে ...নিতেন যে উহার অর্থ সমুদ্র-পৃষ্ঠ সমুদ্র-তল নয়, কেননা ...দ্র-তল কোথাও বা Sea-level হইতে কয়েক ফুট মাত্র ...চে, আবার কোথাও বা উহা সাত মাইলেরও অধিক ...চে। সমুদ্র-তল বলিতে যে সমুদ্রের নিম্নদেশই ইনি ...য়াছেন সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই কেননা ঐ গ্রন্থেই ...a-bottom শব্দেরও অর্থ আমরা পাই "সমুদ্র-তল"।

...বাংলায় "Security Council অর্থে "নিরাপত্তা ...ষদ" ও "...ea level" অর্থে "সাগরাঙ্ক" শব্দদ্বয় ব্যবহৃত ... দুইটিই যথার্থ অর্থ বহন করে এবং দুইটিই সংস্কৃত ...হইতে গঠিত সুতরাং উহা অনায়াসেই উহাদের এই ...ভাষিক শব্দ-সংগ্রহে স্থান দেওয়া যাইত। কিন্তু ... হইলে "হিন্দীরাজ" কি অক্ষুণ্ণ থাকিত? যাই হোক ...গুলি দেখিলে বুঝা যায় যে, কেন্দ্রীয় সরকারের হিন্দী ...দপ্তরেতে মহাপণ্ডিত অনেক থাকিতে পারেন, কিন্তু ...পণ্ডিতেরা হিন্দীভাষার গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ এবং ...কোষ বা Lexicon জাতীয় অভিধান রচনা সম্বন্ধে ...দের কোনও জ্ঞান নাই।

...হিন্দীকে সর্বভারতীয় রূপ না দিয়াই উহাকে রাষ্ট্রভাষা ...র চেষ্টায় যে অনর্থ বাধিয়াছে তাহাতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় ...ও উদ্বেগ সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে যে সমস্যা-...ের কোনও ইচ্ছা বা চেষ্টা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সকল ...ভাষী সদস্যের মনে জাগিয়াছে মনে হয় না। নয়া-...ীর সংবাদে প্রকাশ—

নয়াদিল্লী, ১১ই ফেব্রুয়ারী—ভাষার প্রশ্নে মতবিরোধের ... কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রী সি সুব্রহ্মণ্যম আজ রাত্রে ...সভা হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ...ট্রোলিয়ম এবং রাসায়নিক দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী ও ভি ...লাগেসানও অনুরূপ কারণে তাঁহার পদত্যাগপত্র দাখিল ...রয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

এই প্রসঙ্গে শ্রীসুব্রহ্মণ্যম প্রধানমন্ত্রীকে একটি পত্র প্রেরণ ...রয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। তাহাতে তিনি নাকি ...খিয়াছেন যে, বর্তমান ভাষা-নীতিতে তিনি সন্তুষ্ট নহেন। ...রলোকগত জওহরলাল নেহরু ভাষা সম্পর্কে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহা বিধিবদ্ধ করা হউক তাহাই তিনি চাহেন।

জানা গিয়াছে, অহিন্দীভাষী অঞ্চলের মন্ত্রীরা নাকি এই বলিয়া দাবি করেন যে, অহিন্দীভাষী অঞ্চলের লোকেরা যে পর্য্যন্ত চাহিবেন সে পর্য্যন্ত ইংরাজী সহযোগী ভাষা হিসাবে চালু থাকিবে বলিয়া পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী যে আশ্বাস দিয়াছিলেন তাহা সংবিধান সংশোধন করিয়া তাহাতে যুক্ত করা হউক। হিন্দীভাষী অঞ্চলের মন্ত্রীরা কিন্তু তীব্র-ভাবে উহার বিরোধিতা করেন। পুনর্ব্বাসন মন্ত্রী শ্রীমহাবীর ত্যাগীই নাকি বিশেষভাবে সাংবিধানিক রক্ষাকবচের ব্যবস্থার প্রতিবাদ করেন।

হিন্দীভাষী মন্ত্রীদের একথাটা মাথায় ঢুকিতেছে না যে, যে-সন্দেহের দরুন মাদ্রাজের নানাস্থলে ও মহীশূর, কেরালা ইত্যাদি রাজ্যে এরূপ প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে এবং তাহার ছায়া অন্ধ্র, পশ্চিমবঙ্গ ইত্যাদি অঞ্চলেও ক্রমে ঘনীভূত হইতেছে, সেই সন্দেহ তাঁহাদের এই জিদ করার দরুন আরও দৃঢ়মূল হইবে। তাঁহারা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিবেন যে, সংবিধানে যাহাই থাকুক ভারতের জনগণের শতকরা ৭০ জনের প্রবল বাধা দেওয়া সত্ত্বেও উহা কার্য্যকরি করার ইচ্ছা বাতুলতামাত্র।

বস্তুতপক্ষে হিন্দীর রাষ্ট্রভাষা হওয়ার সকল সম্ভাবনা নষ্ট করিয়াছেন একদল নির্বোধ লোক, যাঁদের ধারণা ছিল যে, তাঁহারা ও তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিগণ শুধুমাত্র মাতৃভাষাকে সম্বল করিয়া সারা ভারতের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারিবেন। এবং এখন যাঁহারা সেই অলীক স্বপ্ন আঁকড়াইয়া আছেন তাঁহারা তাঁহাদের এই অন্যায় জিদের দরুন ভারতের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা কিভাবে নষ্ট করিতে চলিয়াছেন তাহা বুঝিবার ক্ষমতাও যেন হারাইতে চলিয়াছেন মনে হয়।

শ্রীযুক্ত লালবাহাদুর শাস্ত্রী বেতার ভাষণ দিয়া অহিন্দী-ভাষীদের আশ্বাস দিয়াছেন। ভাষণ হিন্দীতে হওয়ায় তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হওয়ায় বিশেষ বাধা পড়িয়াছে। তাঁহারও এদিকে চেতনার উদয় হওয়া প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গ বিধান মণ্ডলের বিরোধী দলগুলি

বর্ত্তমান বৎসরের বাজেট অধিবেশনের আরম্ভেই যে অপরূপ নাটকীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাহাতে পশ্চিমবঙ্গ বিধান মণ্ডলে সরকারের বিপক্ষ রূপে যাঁহারা অধিবেশনের

উদ্বোধনে বাধা দিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বিরোধী দলের নেতা সকলেই ও নির্দ্দলীয়ও একজন ছিলেন। ঘটনার বিবরণ (আনন্দবাজার) এইরূপ—

রাজ্যপাল শ্রীমতী নাইডু সদস্যদের সম্বোধন করিয়া তিন তিন বার তাঁহার ভাষণ পড়িতে সুরু করেন। কিন্তু বিরোধী পক্ষ হইতে সর্ব্বশ্রী হেমন্ত বসু, জ্যোতি বসু, শশাঙ্কশেখর সান্যাল ও অন্যান্য কয়েকজন বারবার তাঁহাদের বক্তব্য পেশ করিতে থাকেন সমস্বরে। রাজ্যপাল অবশেষে তাঁহার ভাষণের কপি টেবিলের উপর রাখিয়া সভা ছাড়িয়া চলিয়া যান।

রাজ্যপাল সভাকক্ষ ত্যাগ করার পর সদস্যদের মধ্যে একটা বিভ্রান্তি ও বিহ্বলতার সৃষ্টি হয়। মনে হয় অনেক সদস্যই এই অবস্থার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। সভাকক্ষের ভিতরে ও বাহিরে রাজ্যপালের সভাত্যাগকে কেন্দ্র করিয়া নিয়মতান্ত্রিক বাক-বিতণ্ডা চলিতে থাকে।

অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকায় পৃথকভাবে বিধান সভা ও বিধান পরিষদের বৈঠক সুরু হইতেই উত্তেজনার ঢেউ বাহির হইতে গিয়া সভাকক্ষ দুইটির ভিতরে ছড়াইয়া পড়ে। আবার তুমুল হৈ-হট্টগোল চলে। এই অবস্থায় কয়েক মিনিটের মধ্যে বিধান সভার অধিবেশন মুলতুবী হইয়া যায়।

বিধান পরিষদের বিরোধী সদস্যগণ পুনঃপুনঃ বলিতে থাকেন যে, রাজ্যপাল তাঁহার ভাষণ পাঠ করেন নাই। অতএব পরিষদের কাজ এই অবস্থায় চলিতে পারে কি না, সে সম্পর্কে তাঁহাদের সংশয় আছে। তাঁহারা চেয়ারম্যানের অভিমত জানিতে চাহেন। এবং এই বিষয়ে চেয়ারম্যানের অভিমতের সহিত একমত না হইতে পারায় বিরোধী সদস্যগণ প্রতিবাদে সভাকক্ষ ত্যাগ করিয়া যান।

শ্রীহেমন্তকুমার বসুর বক্তব্য ছিল—

খাদ্য সঙ্কটের দরুন বিরোধী পক্ষ হইতে রাজ্যপালকে শীতকালীন অধিবেশন আহ্বানের জন্য অনুরোধ জানান হইয়াছিল। সে অধিবেশন কেন ডাকা হয় নাই, তাহা তিনি জানিতে চাহেন। তিনি বলেন, শিক্ষকদের ব্যাপার লইয়াও এখনও পর্য্যন্ত কোন সুরাহা হয় নাই। সরকার ধানের যে দর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন সে দর কৃষকেরা পাইতেছে না। তাঁহার অভিযোগ, "দলগত স্বার্থের" জন্য রাজনৈতিক বন্দীদের ধরিয়া রাখা হইয়াছে। তাঁহাদের মুক্তি দেওয়া হইতেছে না।

শ্রীজ্যোতি বসুর বক্তব্য ছিল—

বিধান মণ্ডলীর ১৬ জন সদস্যকে বিনা বিচারে ভারত-রক্ষা বিধি অনুসারে আটক রাখা হইয়াছে। বিধান মণ্ডলীর বর্ত্তমান অধিবেশনের ব্যাপারে রাজ্যপালের সমন জেলের ভিতরে তাঁহাদের নিকট পৌছিয়াছে। তাঁহার মতে এই সমন রাজ্যপালের প্রথম আদেশ (অথাৎ আটক রাখার আদেশ) নাকচ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সরকার তাঁহাদের অধিবেশনে যোগ দিবার অনুমতি দেন নাই।

বিধান পরিষদের নির্দ্দলীয় সদস্য শ্রীশশাঙ্কশেখর সান্যাল কি বলিতে চাহিয়াছিলেন তাহার বিবৃতি কোথায়ও প্রকাশিত হয় নাই। সে বক্তব্য যাহাই হউক ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা প্রথম দিনের শেষ পর্য্যন্ত অধিবেশনে বাধা দেওয়ার প্রবল চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহাদের বক্তব্যের মধ্যে এমন কিছু আমরা পাইতেছি না যাহাতে বাজেট অধিবেশনের মধ্যে যথারীতি উত্থাপন করিয়া বিতর্কের সৃষ্টি করা যাইত না। এইভাবে বিধান মণ্ডলের মধ্যে হট্টগোলের সৃষ্টিতে তাঁহাদের কাহার কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল জানি না। তবে যদি শুধু-মাত্র বিধান মণ্ডলের কাজে বাধা দিবার ক্ষমতা তাঁহাদের কতটা আছে তাহার প্রকাশই উদ্দেশ্য ছিল তবে তাহারা সফলকাম হইয়াছেন।

কিন্তু এত আস্ফালন, এত তর্জ্জন-গর্জ্জন, বাক্‌বিতণ্ডা সব কিছুই দ্বিতীয় দিনের মধ্যে শেষ হইয়া গেল যেভাবে, তাহাতে মনে হয় যে, বাজেট অধিবেশন পণ্ড হইয়া যাইলে গণ্ডগোল সৃষ্টিকারীদেরও সুবিধা হইবে না, এ'বিষয়ে তাঁহাদের বেশ জ্ঞান ছিল।

প্রথম দিনের অধিবেশনে, বিরোধী দলের মতে রাজ্যপাল যথাযথভাবে উদ্বোধনী সম্পন্ন করেন নাই। এ বিষয়ে বিপক্ষের নেতৃবর্গের মধ্যে কথাবার্ত্তায় ও আলোচনায় কোন মতদ্বৈধ ছিল না। পরের দিন, মঙ্গলবার, প্রথম চার ঘণ্টা তীব্র বাদানুবাদ, তর্ক ও সোরগোলের মধ্যেও ঐ একই দৃ মতের প্রকাশ বিরোধী দলের তরফ হইতে আসে। তার পর অধিবেশন দেড় ঘণ্টার জন্য মুলতুবী রাখা হয় এবং সেই সময়ে স্পিকারের ঘরে বিপক্ষের নেতৃবর্গকে পূর্বদিনের অধিবেশনে গৃহীত টেপ-রেকর্ড চালাইয়া শোনান হয়। রেকর্ড শুনিয়া বিপক্ষ দল দমিয়া যান, কেননা তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে রাজ্যপাল তাঁহার ভাষণের প্রথম পঙক্তি পড়িয়া

উদ্বোধনের আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং পরের সোরগোলে তাঁহার গলার স্বর চাপা পড়িয়া যায়। বিপক্ষ নেতাদের উক্তি ছিল যে রাজ্যপাল তাঁহার ভাষণ আদৌ পড়িতে আরম্ভ করেন নাই। তিনি শুধু সদস্যদের বসিতে ও চুপ করিতে কয়েকবার অনুরোধ করিয়া সফলকাম না হওয়ায় সভাকক্ষ ছাড়িয়া যান। এবং যেহেতু ভাষণ প্রকৃতপক্ষে আরম্ভই হয় নাই অতএব বাজেট অধিবেশনও আরম্ভ করা হয় নাই এবং ঐ অবস্থায় যাহাই প্রস্তাবিত ও গৃহীত হইবে তাহা সংবিধান বিরোধী কাজের সামিল দাঁড়াইবে। টেপরেকর্ডে রাজ্যপালের কণ্ঠে স্পষ্টই শোনা যায়—"Members of the West Bengal Legislature, as I rise to welcome your···" তারপর বিপক্ষের চীৎকার ও তারপর রাজ্যপালের কণ্ঠে "Please sit down" "Silence please" ··

স্পীকারের রায়, যে অধিবেশনের উদ্বোধন যথারীতিই হইয়াছে এবং সংবিধানের ১৭৬ (১) ধারা প্রয়োজনীয় সর্ত্তগুলি পালিত হইয়াছে, এই টেপ-রেকর্ডের সাক্ষ্যের উপর স্থাপিত। বিপক্ষ দল ঐ রেকর্ড শোনার পর স্পীকারের রায় গ্রহণ করেন। এই ভাবে দুই দিনব্যাপী হট্টগোল ও বিতর্কের টানা-পোড়েনের শান্তি হয়!

বিধান মণ্ডলে ও সংসদে বিপক্ষ দল থাকা শুধু সমাজতন্ত্র ও সাধারণতন্ত্র সম্মত ব্যবস্থা নয়, যথাযথ ভাবে গঠিত ও উপযুক্ত নেতৃত্বের অধীনে চালিত হইলে উহা সাধারণতন্ত্রবাদসম্মত দেশে নানা ভাবে জনসাধারণের বিশেষ উপকারেও লাগে, কিন্তু বিরোধী দলের নেতৃবর্গ যদি শুধু নিজস্বার্থ ও দলগত স্বার্থপুষ্টি বা নিছক নেতিমূলক কাজের মারফৎ সরকারী ব্যবস্থা পণ্ড করাই তাঁহাদের চরম উদ্দেশ্য মনে করেন তবে তাঁহাদের অস্তিত্বের অধিকারই শুধু ব্যর্থ হয় না, উহা দেশের ও দশের স্বার্থেরও বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়। পশ্চিমবঙ্গ বিধান মণ্ডলে এবারে বিপক্ষ দল যে কাণ্ডকারখানা করিলেন তাহাতে আর যাহাই হউক জনস্বার্থের দিকে কোনও চিন্তার লক্ষণ ছিল না।

প্রকাশ্যভাবে খুন

এদেশে শান্তি-শৃঙ্খলার কি অবস্থাই না দাঁড়াইতেছে! দিনে দ্বিপ্রহরে লোকজনের সম্মুখে প্রকাশ্যে খুন-খারাপি যেন হঠাৎ চতুর্দ্দিকেই চলিতেছে। এই অল্প দিন পূর্ব্বে সংবাদপত্রে সর্দ্দার প্রতাপ সিং কায়রণের হত্যাকাণ্ডের যে খবর আসে তাহাতে ছিল যে বেলা সাড়ে এগারোটার সময় দিল্লী হইতে চণ্ডীগড় যাওয়ার রাজপথে, রাসোই নামে এক গ্রামের কাছে, সর্দ্দার কাইরণের গাড়ি এক রাস্তা-মেরামতি তদারককারী ফ্ল্যাগ দিয়া থামায়, যাহাতে অন্যদিকের গাড়িগুলি পাস করার পথ পায়। রাস্তা ঐখানে মেরামত চলিতেছিল বলিয়া তাহার সঙ্কীর্ণ অংশই খোলা ছিল। গাড়ি যেই থামিল সেই মুহূর্ত্তে চারিজন লোক—যাহারা সকাল আটটা হইতে বন্দুক ও পিস্তল লইয়া ঐখানে ছিল এবং লোকজনকে বলে যে, তাহারা খরগোস শিকারের জন্য আসিয়াছে—লাফাইয়া গাড়ির কাছে যাইয়া গুলী চালাইয়া গাড়ির মধ্যেই সর্দ্দার কাইরণ ও তাঁহার ব্যক্তিগত সহকারী অজিত সিংকে মারে। অন্য আরোহী পাঞ্জাব সরকারের অফিসার বলদেও কাপুর ও ড্রাইভার গাড়ি ছাড়িয়া পালাইবার চেষ্টা সত্ত্বেও একজন গাড়ির পাঁচগজ ও অন্যজন বিশগজের মধ্যে নিহত হন। হত্যাকারীরা তারপর পাশের ক্ষেতের পথে উধাও হয়।

দিনে-দুপুরে হত্যাকাণ্ড। যেখানে কুলী-মজুর তদারককারী কুলী-সর্দ্দার ইত্যাদি অনেকে ছিল এবং রাস্তায় মোটর চলাচলও ছিল, এমন স্থলে প্রকাশ্যে হত্যাকাণ্ড সারিয়া মেঠোপথে আততায়ীদের প্রস্থান। এবং খুনীদের একজনও ধরা পড়িয়াছে সে খবর এখনও জানা যায় নাই, যদিও চেষ্টা খুবই চলিতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে সমস্ত জিনিষটা অতি পরিপাটি ভাবে আগে থেকেই সাজানো ছিল। এই চারজন আততায়ী তিন-চার ঘণ্টা ধরিয়া হাসি-ঠাট্টা চালাইয়াছে, নিজেরা খাইয়াছে ও কুলিসর্দ্দারদের খাওয়াইয়াছে মুখ ঢাকিবার বা অস্ত্রশস্ত্র প্রচ্ছন্ন রাখিবার কোনও চেষ্টাই করেন নাই। মনে হয় এই হত্যার ব্যাপারে চক্রান্তকারীগণ বেশ নিশ্চিন্ত যে তাহারা ধরা পড়িবে না। যাহাই হউক, দেখা যাউক ইহার কিনারা হয় কি না।

তার পরের দিনেই কলিকাতার এণ্টালী অঞ্চলে হত্যা করা হয়। যুগান্তরে যে বিবরণ প্রকাশিত হয় তাহা এইরূপ—

কলিকাতা, ৭ই ফেব্রুয়ারী—আজ দুপুরে এণ্টালীর শম্ভুবাবু লেনে শ্রীনীরদবরণ পাল নামে এক ব্যক্তিকে কিছু লোকের দৃষ্টির সম্মুখেই গুলী করিয়া হত্যা করা হইয়াছে, শ্রীপাল ঐ এলাকায় পচাবাবু নামে পরিচিত এবং তাঁহার কিছু প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে।

এই হত্যার বিবরণ সম্পর্কে যতদূর জানা গিয়াছে, তাহা হইল এই যে, শনিবার রাত্রে পাড়ায় একটি 'ম্যাজিক শো'-র ব্যাপার লইয়া দুই দলের মধ্যে ঝগড়া হয় এবং শ্রীপাল ঝগড়ায় মধ্যস্থ হইয়া উহা মিটাইয়া দেন। কিন্তু এই ঝগড়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুই দলের এক দল আজ শ্রীপালের বাড়ীতে আসে এবং তাঁহাকে গালাগালি দিতে আরম্ভ করে। ইহাতে শ্রীপালের সঙ্গে উহাদের কথা কাটাকাটি আরম্ভ হইয়া যায়। কথা কাটাকাটি চলিতে থাকার সময় ঐ দলের একজন তাঁহাকে গুলী করে। মুহূর্ত্তে শ্রীপাল মাটিতে পড়িয়া যান এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার বাড়ীর খুব কাছেই এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড হয়। তাঁহার বয়স প্রায় ৪৫ বৎসর।

যাঁহাদের দৃষ্টির সম্মুখে এই ঘটনা ঘটিয়াছে, তাঁহাদের

মধ্যে দুইজন আততায়ীদের নাম বলিয়াছেন। প্রকাশ যে উহারা দাগী আসামী। কিন্তু আজ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

সাধারণভাবে খুন-জখম ইত্যাদি ত দেশে আছেই। কিন্তু এরূপ দুঃসাহসিক বেপরোয়াভাবে খুন যদি ঠিকমত তদন্ত ও জোর খোঁজের ফলে হয় তবেই ভাল, নহিলে বলিতে হইবে দেশের শান্তি-শৃঙ্খলারক্ষার ভার যাঁহাদের উপর তাঁহাদের কাজে ত্রুটি আছে।

মাদ্রাজে ভাষা লইয়া যাহা চলিয়াছে তাহারই প্রতিচ্ছায়ারূপে কলিকাতায় ভবানীপুর অঞ্চলে এক ছাত্র মিছিলের দলও যেভাবে তলওয়ার ও ভোজালী দ্বারা আক্রান্ত হয় তাহাও শাসনতন্ত্রের অধিকারীবর্গের নজরে আসা বিশেষ প্রয়োজন।

পরলোকে স্যার উইনষ্টন চার্চ্চিল

গত ২৪শে জানুয়ারী জীবনযুদ্ধে অপারজেয় উইনষ্টন চার্চ্চিল ৯০ বৎসর বয়সে মৃত্যুর সঙ্গে প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। উইনষ্টন চার্চ্চিল নিঃসংশয়ে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম মহানায়ক, জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা এবং রাষ্ট্রজ্ঞানী। তাঁহার নব্বই বৎসর বয়স না বলিয়া নব্বইটি যুগ বলাই সঙ্গত। তাঁহার এই একক জীবনে কি না হইয়া গেল! শান্ত ভিক্টোরীয় দিন হইতে পারমাণবিক যুগ—বুয়র যুদ্ধ, প্রথম মহাযুদ্ধ, রুশ বিপ্লব, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, সাম্রাজ্য সূর্য্যের উদয় ও অস্ত! তিনি স্বয়ং একটি ইতিহাস। এরূপ ঐতিহাসিক ব্যক্তি পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই।

তাঁর জীবনও বিচিত্র। ১৮৭৪ সনের ৩০শে নভেম্বর উইনষ্টন চার্চ্চিল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা লর্ড র‍্যানডলফ চার্চ্চিল মারলবরোর সপ্তম ডিউকের তৃতীয় সন্তান ছিলেন। চার্চ্চিল হ্যারো এবং স্যাণ্ডহার্ষ্টে পড়াশুনা শেষ করিয়া ১৮৯৫ সালে সামরিক বাহিনীতে যোগদান করেন। ব্রিটেনের ইতিহাসে এতবড় পুরুষ অল্পই জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর সময়ে তাঁর মত এতখানি ঘটনাবহুল, অভিযান-প্রমত্ত অথবা বিশ্ববিশ্রুত জীবন আর কেহই কাটান নাই। আর কাহারও জীবন এত বিচিত্র প্রতিভায় উদ্ভাসিতও ছিল না। সৈনিক, যুদ্ধের সংবাদদাতা, রাষ্ট্রনেতা, ঐতিহাসিক, গ্রন্থকার, চিত্রশিল্পী এবং বক্তা—একে একে সব ভূমিকাতেই তিনি ছিলেন। আর পাঁচজনের অবসর গ্রহণের বয়সে তিনি নিয়তির আহ্বানে সাড়া দিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ জনসাধারণের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। বহুধা প্রতিভা এবং ক্ষমতা, রাষ্ট্রসভায় তাঁর ব্যক্তিত্ব—সবকিছু মিলাইয়া তিনি খুবই অসাধারণ চরিত্রের মানুষ ছিলেন। জীবন-সাফল্যের সর্ব্বোচ্চ চূড়া তিনি অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন তাঁহাকে রণপোত বহরের অধিনায়ক রূপে মন্ত্রীসভায় লইয়াছিলেন। তারপর সামরিক বিপর্য্যয়ের ফলে যখন ব্রিটেন ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য অত্যন্ত শঙ্কাজনক পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে তখন সমস্ত পার্লামেণ্টের সম্মতিক্রমে তিনি প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন। এই পদে তিনি যে অপরিসীম শৌর্য্য ও বীর্য্যের পরিচয় দিয়াছিলেন এবং যে ভাবে শত্রু বিমানের আক্রমণে বিধ্বস্ত ও বিপরীত যুদ্ধ পরিস্থিতিতে আচ্ছন্ন দেশের লোককে বীরত্বপূর্ণ ভাষণে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা জগতের ইতিহাসে চিরদিন উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত থাকিবে।

তিনি সাম্রাজ্যবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং ভারত বা অন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশের লোককে সামান্য মাত্র স্বাতন্ত্র্য দেওয়ারও বিরোধিতা করিতেন। সুতরাং সে দিকে আমাদের বা অন্য ভূতপূর্ব্ব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশের লোকেদের তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা বা শ্রদ্ধা নিবেদনের কোনও কারণ তিনি দেন নাই। কিন্তু সভ্য জগৎ যখন হিটলারের আক্রমণের ফলে চরম দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়ার সম্মুখীন তখন ইঁহার অজেয় পৌরুষই তাহাকে প্রতিরোধ করে, সেকথা আমাদের স্মরণ করা উচিত।

পরলোকে ডাঃ রফিউদ্দীন আমেদ

গত ৯ই ফেব্রুয়ারী বিশিষ্ট দন্ত চিকিৎসক ও পশ্চিম বাংলার প্রাক্তন মন্ত্রী ডাঃ রফিউদ্দীন আমেদ পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৪ বৎসর হইয়াছিল।

তিনি ১৮৯০ সনের ২৪শে ডিসেম্বর ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আই. এস. সি পাস করিয়া তিনি আমেরিকায় যান এবং ১৯১৫ সনে আইওয়া বিশ্ববিত্যালয় হইতে গ্রাজুয়েট হইয়া ফিরিয়া আসেন। ১৯২০ সনে কলিকাতা ডেণ্টাল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি সুনাম অর্জ্জন করেন। রাজনৈতিক জীবনেও তাঁহার মত উদার ছিল। ১৯৩২ হইতে ১৯৩৬ সন পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার এবং ১৯৪২ হইতে ১৯৪৪ সন পর্য্যন্ত উহার অল্ডারম্যান ছিলেন। দন্ত-চিকিৎসক হিসাবে তাঁহার আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতি ছিল। ১৯২৮ সনে তিনি ইন্টারন্যাশন্যাল ডেণ্টাল কলেজের ফেলো হন এবং ১৯১৭ সনে বোষ্টনে আন্তর্জ্জাতিক ডেণ্টাল কংগ্রেসে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। রফিউদ্দীন আমেদ পশ্চিম বাংলায় ডাঃ রায়ের প্রথম মন্ত্রিসভায় যোগদান করিয়া ১৯৬২ সনের সাধারণ নির্ব্বাচন পর্য্যন্ত মন্ত্রী ছিলেন। রাজনীতির বাইরেও মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন জনবৎসল। চিকিৎসক হিসাবে তিনি দেশের অনেক কাজ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে দেশবাসী একজন দরদী চিকিৎসককে হারাইল।

রবীন্দ্রসাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব

ডক্টর দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রসাহিত্যে কোন্ কোন্ অংশে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব পড়েছে, তাই নিয়ে আলোচনা করতে হ'লে কবি-গুরুর সর্বপ্রথম রচনা নিয়েই অগ্রসর হওয়া সঙ্গত। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁর প্রথম দিকের রচনা অবলম্বনে বিস্তৃততর আলোচনা করা হয়েছে। (দ্রষ্টব্য প্রবাসী—কার্তিক ১৩৬৯, আষাঢ় ১৩৭০, শ্রাবণ ১৩৭০, কার্তিক ১৩৭১)। এই প্রবন্ধে রয়েছে আরও খানিকটা অগ্রগতির প্রয়াস।

বৈষ্ণব পদাবলীতে অভিসার একটি প্রধানতম অংশ। দয়িতের উদ্দেশ্যে মুগ্ধা নারীর সংকেত-স্থানে যাত্রাই অভিসার। যেমন তিনি অভিসারে যাত্রা করেন, তেমনই নায়কও ব্যাকুলচিত্তে তাঁর জন্য করেন প্রতীক্ষা। দুর্জয় ও অলঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করেই প্রিয়তমের সঙ্গে মিলতে হয় নায়িকাকে। অষ্টধা অভিসারের মধ্যে বর্ষাভিসার সর্ব-শ্রেষ্ঠ। শ্রাবণের ঘনতমসাবৃত দুর্যোগময়ী রজনী, ঘন ঘন মেঘগর্জন, কুলিশপতন, বায়ুর বিক্ষোভ ও প্রচণ্ড বেগ, কণ্টকাকীর্ণ সর্পসঙ্কুল পথ ইত্যাদি কোন বাধাই রাধিকাকে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারে নি। ভগবানের বংশীধ্বনি যে শ্রবণ করেছে তারই প্রাণে জেগেছে মিলনের সুগভীর আর্তি। ভগবানের সেই আহ্বান অহরহ ধ্বনিত হ'লেও সংসারহাটের কোলাহলে আমাদের কানে এসে পৌঁছায় না। অভিসারের পদে এই অধ্যাত্মব্যঞ্জনা সুপ্রকট।

বৈষ্ণব পদাবলীর এই অভিসার তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথের মনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। ১২৮৭ সালে রচিত বাল্মীকি-প্রতিভায় বর্ষাভিসারের অনুরূপ গীতধ্বনি শোনা যায় বনদেবীদের মুখে,—

রিম ঝিম ঘন ঘনরে বরষে।

গগনে ঘন ঘটা, শিহরে তরুলতা,

ময়ূর ময়ূরী নাচিছে হরষে।

দিশি দিশি সচকিত দামিনী চমকিত,

চমকি উঠিছে হরিণী তরাসে।

রবীন্দ্রনাথ-রচিত এই গানটিতে বিখ্যাত পদকর্তা গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, রায়শেখর প্রভৃতি পদকর্তাদের প্রভাব রয়েছে,—

ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।

শুনইতে শ্রবণে মরম জরি যাত॥

দশ দিশ দামিনী দহন বিথার।

হেরইতে উচকই লোচন-তার॥—গোবিন্দদাস

গগনে অবঘন মেহ দারুণ

সঘনে দামিনী চমকই।—রায়শেখর

ঝলকই দামিনী দহন সমান।

ঝন ঝন শবদ কুলিশ ঝন ঝন—শেখর

রজনী শাওন ঘন ঘন দেয়া-গরজন

রিমি ঝিমি শবদে বরিষে।—জ্ঞানদাস

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, বৈষ্ণব পদাবলী-নিহিত অভিসার রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সীমা-অসীমের মিলনই ব্যক্ত হয়েছে। এ-বিষয়ে 'ভারতী' পত্রিকায় তিনি বলেছিলেন—'ভগবান আমাদিগকে কখনই ছাড়েন না; পাপের ঘোর অন্ধকারে যখন আমরা পড়িয়া থাকি, তখনও সেই পাপীর দুঃখের ভার নিজ মাথায় লইয়া তিনি তাহার জন্য অপেক্ষা করেন। সংসারাসক্তচিত্ত আমরা সংসারের সহস্র ঝঞ্ঝাট ছাড়িয়া তাঁহার কাছে যাইতে পারি না। তিনি দুর্গম পন্থায় দাঁড়াইয়া আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতে থাকেন—পাপীর কাছে আসিতে কণ্টকাকীর্ণ পথে তাঁহার পদতল ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়, তথাপি তিনি আমাদের ত্যাগ করেন না।''

১২৮৮ সালে রচিত 'বৌঠাকুরাণীর হাট'-এ বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। একদিন রাত্রিতে বসন্ত রায় হঠাৎ উদয়াদিত্যকে দেখে বলে উঠলেন,—

বঁধুয়া অসময়ে কেন হে প্রকাশ?

সকলি যে স্বপ্ন বলে হতেছে বিশ্বাস।

চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে ছিলে সেথায় ত আদর মিলে?

এরি মধ্যে মিটিল কি প্রণয়েরি আশ?

উক্তিটি খণ্ডিতা রাধার অনুরূপ। কৃষ্ণের প্রতীক্ষায় রাধিকা সারারাত্রি অপেক্ষা করছিলেন সংকেতকুঞ্জে; কিন্তু কৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর সঙ্গে নিশি যাপন করেছেন—এই অনুমানে রাধিকা সখেদে সখীকে বলছেন—

আমারে নৈরাশ করি চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে হরি
নিশিবাস কৈল তার ঘরে।—বলরাম দাস

এদিকে রাত্রি প্রায় শেষ। রাধাকে মনে পড়ায় চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ ত্যাগ করে কৃষ্ণ রাধিকার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। তখন অভিমানে রাধিকা বলে উঠলেন,—

অসময়ে কেন আইলা চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে ছিলা
মিটিল ক্ষণেকে কিহে প্রণয়ের আশ।
এখনও হয়নি ভোর কাটিল কি ঘুমঘোর
রাধিকারে শুনইতে করুণার ভাস॥—শেখর

এখানে স্পষ্ট প্রতীয়মান রবীন্দ্রনাথ খণ্ডিতা রাধার মনের কথাই প্রকাশ করেছেন 'বৌঠাকুরাণীর হাট'-এ বসন্ত রায়ের মুখ দিয়ে। উদয়াদিত্যকে দেখে বসন্ত রায়ের উক্তি এবং চন্দ্রাবলীকুঞ্জপ্রত্যাগত কৃষ্ণের প্রতি অভিমানিনী রাধিকার উক্তির মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে।

১২৮৮ সালে রচিত 'রুদ্রচণ্ড'-এ অমিয়া চাঁদ কবির উদ্দেশে আক্ষেপ করে বলে,—

পাখী যদি হইতাম, দুদণ্ডের তরে
সুনীল আকাশে গিয়া উষার আলোকে
একবার প্রাণ ভরি দিতেম সাঁতার।

অমিয়া চাঁদ কবিকে ভালবাসে; কিন্তু পিতা রুদ্রচণ্ড বাধ সেজেছেন। যদি চাঁদ কবি রুদ্রচণ্ডের গৃহে আসে তবে তার মহা অকল্যাণ হবে—এ কথা জানিয়ে দেন রুদ্রচণ্ড কন্যাকে। তাই অমিয়ার আক্ষেপোক্তি, যদি সে পাখী হ'ত, তবে আকাশ দিয়ে উড়ে চাঁদ কবির সঙ্গে মিলতে পারত।

রাধিকার আক্ষেপ-উক্তিতেও অনুরূপ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় বৈষ্ণব পদাবলীতে। শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে কালিন্দীতটে বসে বংশীধ্বনি করেছেন। গৃহপরিজন-বেষ্টিতা রাধিকার মন আকুল হয়ে উঠেছে। রুদ্রচণ্ড-কন্যা অমিয়ার মত রাধিকাও গৃহশাসনে আবদ্ধ। তাই রাধিকা

পাখী নহোঁ তার ঠাই উড়ি পড়ি জাওঁ।—
বড়ুচণ্ডীদাস, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

পাখী জাতি যদি হউ পিয়াপাশে উড়ি যাউ
সব দুখ কহোঁ তছু পাশে।—বিদ্যাপতি

রাধিকার এই আক্ষেপের কথা কবিশেখরের কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য 'গোপালবিজয়'-এও দুর্লক্ষ্য নয়। কৃষ্ণবিরহাতুর রাধিকা বলছেন,—

হেন মন করে পাখি হইঞাঁ উড়ি পড়ি।

পাখী হয়ে প্রিয়তমের কাছে উড়ে যাওয়ার কল্পনা শুধু পদাবলীতে নয়; বৈষ্ণব কাব্যেও রয়েছে। এ ভাবনা রবীন্দ্রনাথ নিয়েছেন বৈষ্ণব গ্রন্থ থেকেই।

একদিন প্রভাতে শ্রীদাম, সুদাম, সুবলাদি সখা রাজপথে দাঁড়িয়ে আছে কৃষ্ণের জন্য। তারা কৃষ্ণকে নিয়ে যেতে চায় গোষ্ঠে; কিন্তু মাতা যশোমতীর অনুমতি না হ'লে ত কৃষ্ণ যেতে পারে না। তাই কৃষ্ণ মায়ের কাছে মিনতি জানায়,—

আগো মা আজি আমি চরাব বাছুর।
পরাইয়া দেহ ধড়া মন্ত্র পড়ি বান্ধ চূড়া
চরণেতে পরাহ নূপুর॥
অলকা-তিলক ভালে বনমালা দেহ গলে
শিঙ্গাবেত্র বেণু দেহ হাতে।
শ্রীদাম সুদাম দাম সুবলাদি বলরাম
সভাই দাঁড়াইয়া রাজপথে॥
—বিপ্রদাস ঘোষ, পদরত্নাবলী

কৃষ্ণকে বাদ দিয়ে শ্রীদামাদি সখা গোষ্ঠে যাওয়ার কল্পনাও করতে পারে না; তাই তারাও নন্দরাণীর কাছে গিয়ে কৃষ্ণের জন্য কাতরতা প্রকাশ করেছে কৃষ্ণকে ছেড়ে দিতে। কৃষ্ণসখাদের করুণ মিনতিপূর্ণ অনুরূপ এই কাতরতা প্রকাশ পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্য 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর কৃষকদের গানের মধ্য দিয়ে,—

হেদে গো নন্দরাণী,
আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও।
আমরা রাখাল বালক দাঁড়িয়ে দ্বারে,
আমাদের শ্যামকে দিয়ে যাও।
হেরো গো প্রভাত হ'ল, সূর্যি উঠে,

আমরা শ্যামকে নিয়ে গোষ্ঠে যাব
আজ করেছি মনে।
ওগো পীতধড়া পরিয়ে তারে
কোলে নিয়ে আয়।
তার হাতে দিয়ো মোহন বেণু,
নূপুর দিয়ো পায়।
রোদের বেলায় গাছের তলায়
নাচব মোরা সবাই মিলে।
বাজবে নূপুর রুনুঝুনু
বাজবে বাঁশি মধুর বোলে।
বনফুলে গাথব মালা
পরিয়ে দিব শ্যামের গলে।

কৃষ্ণসহ রাখাল বালকদের গোষ্ঠগমন-চিত্র রবীন্দ্রনাথের মনে গভীর রেখাপাত করে। ছেলেরা যমুনাতীরে অফুরন্ত প্রকৃতির মুক্ত সম্পদের মধ্যে যে-প্রাণের স্পর্শ পেয়েছিল তা তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ না করে পারে নি। তাই 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর সন্ন্যাসীকে ছেলেদের মুখে গোষ্ঠের গান শুনিয়েছেন।

যমুনা-পুলিনে সংকেতকুঞ্জে রাধাকৃষ্ণের মিলনচিত্র রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল। সংকেত করেও কৃষ্ণ ঠিক সময়ে না আসায় রাধিকার বেদনার কথাও কবিগুরুর মনে গভীর রেখাপাত করে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ গোপিনীদের গানের মধ্য দিয়ে সে বেদনার প্রকাশ দেখতে পাই নিম্নোক্ত গানে,—

কই সে হ'ল মালা গাঁথা, কই সে এল হায়!
যমুনার ঢেউ যাচ্ছে বয়ে, বেলা চলে যায়।

গোপীদের মন নিয়ে খেলা করছেন কৃষ্ণ। রাধা ও গোপীরা আক্ষেপ করে বলে, কৃষ্ণের জন্য তাদের কুলাচার, গৃহধর্ম ছারখার হয়ে গেল; অথচ কৃষ্ণ তাদের কাছে ধরা দিচ্ছেন না। তাই গোপীরা আক্ষেপ করে বলছে,—

মন-চোরার বাঁশী বাজিও ধীরে ধীরে।
আকুল করিল তোমার সুমধুর স্বরে॥
আমরা কুলের নারী হই গুরুজনার মাঝে রই
না বাজিও খলের বদনে।
আমার বচন রাখ নীরব হইয়া থাক
না বধিও অবলার প্রাণে॥—কানাই

ঠিক অনুরূপ মনোবেদনা ব্যক্ত হয়েছে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ কৃষ্ণরমণীদের মুখে। তাদের প্রাণ নিয়ে পুরুষজাতি ছিনিমিনি খেলছে। তাই মদনশরাতুরা মেয়েরা বড়ই আক্ষেপে নিজেদের মনের কথা প্রকাশ করছে ব্রজলীলার গান গেয়ে—

কথা কোস নে লো রাই, শ্যামের বড়াই বড়ো বেড়েছে।
কে জানে ও কেমন করে মন কেড়েছে।
শুধু ধীরে বাজায় বাঁশি, শুধু হাসে মধুর হাসি,
গোপিনীদের হৃদয় নিয়ে তবে ছেড়েছে।

বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার রসের অন্তর্গত মানের পরিচয় দুর্লভ নয়। উক্ত নাট্যকাব্য 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ পর্বতপথচারিণী রমণীদ্বয়ের পরস্পর কথাবার্তার মধ্য দিয়ে রাধিকার মানের কথাই প্রকাশ হয়ে পড়ে,—

বনে এমন ফুল ফুটেছে,
মান করে থাকা আজ কি সাজে!
মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে
চলো চলো কুঞ্জমাঝে।
আজ কোকিল গেয়েছে কুহু, মুহুরমুহু
আজ কাননে ঐ বাঁশি বাজে।
মান করে থাকা আজ কি সাজে!

যমুনাতীরে কুঞ্জে বসে কৃষ্ণ রাধা রাধা ব'লে বাঁশি বাজান। সেই ধ্বনি আকুল করে রাধিকার মন। সংসারের কাজে পড়ে তার সহস্র বাধা; কাজের মধ্যে ত্রুটি ধরা পড়ে ক্ষণে ক্ষণেই; আর অসংখ্য গঞ্জনাবাণ বর্ষিত হ'তে থাকে চারদিক থেকে। চোখের জলে রাধিকার বুক ভেসে যায়। শেষে আর সহ্য করতে না পেরে কৃষ্ণের কাছে ছুটে চলে রাধিকা শত বাধা-বিপত্তি, লোকলজ্জা অগ্রাহ্য করে। কবিশেখরের 'গোপাল বিজয়'-এ এই চিত্র অপরূপ তুলিকায় অঙ্কিত,—

বাঁশী-মান শুনি গোপী হাকলি বিকলি।
চন্দ্রের উদয়ে যেন সমুদ্রে উথলি।
সঙ্কেত পাইয়া গোপী করিল পয়ানে।
চালিল সাপিনী যেন মন্ত্র নাহি শুনে॥

'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ একদল পথিকের গানের মধ্য দিয়ে উক্ত ভাবটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে,—

মরি লো মরি

আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে!

ভেবেছিলেম ঘরে রব, কোথাও যাব না—

ওই যে বাহিরে বাজিল বাঁশি বলো কি করি?

শুনেছি কোন্ কুঞ্জবনে যমুনাতীরে

সাঁঝের বেলা বাজে বাঁশি ধীর সমীরে—

ওগো তোরা জানিস যদি

আমায় পথ বলে দে।

আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে!

এখানে লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথের যে গ্রন্থচতুষ্টয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলি কবির তরুণ বয়সে রচি এই সময় কবির মনে নানা ভাবাবেশের সঞ্চার হ বৈষ্ণব পদাবলীর মূল সুরটি সর্বত্রই অব্যাহত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সিদ্ধান্ত তিনি সর্বত্র মেনে নেন তথাপি বৈষ্ণব পদকর্তাদের অনুসরণ করতে গিয়ে তি তাঁদের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাই নিবেদন করেছেন। কো তিনি বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, কোথাও বা দেখিয়ে স্বাতন্ত্র্য; কিন্তু বৈষ্ণব-সাহিত্যের রসধারা তাঁর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল—কবিগুরুর রচনার মধ্যে এর সাক্ষ্য রয়েছে।

যোগ্যং যোগ্যেন

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

[ক]ই থেকে কখনও কোন বিয়ের ব্যাপারে কেউ যদি পাত্র-পাত্রীর সন্ধানে আমার কাছে আসে, আমি স্পষ্ট তাকে জানিয়ে দিই—এ ব্যাপারে আমার কিছু করবার নেই।

অথচ আগে অনেক করেছি, অনেক করবার ছিল। তাতে ছেলেপক্ষ এবং মেয়েপক্ষ উভয়েই উপকৃত হয়েছে। আমার বড়জোর এক সন্ধ্যা নেমন্তন্ন জুটেছে; ভেবেছি—কারুর জন্যে কিছু করা গেল।

কিন্তু বিধাতার বোধ করি ইচ্ছে ছিল না—এ কাজে আমি আর অগ্রসর হই। তাই চৌরঙ্গীর রেস্তোরাঁয় সেদিন সন্ধ্যা চায়ে বসে অমন একটা বিপর্যয় আমাকে সহ্য করতে হ'ল।

ব্যাপারটা খুলেই বলি।

রিটায়ার্ড সেরেস্তাদার অমর চৌধুরী আমাকে ধরেছিলেন তার ছেলে অমলের জন্যে একটি পাত্রী দেখে দিতে। অমল আমার অপরিচিত ছিল না, দরকারমত মাঝে মাঝে আমার কাছে আসত। আধুনিক যুগের ছেলে, হাল-আমলের কিছু কিছু সমাজ-কর্মের দিকে তার ঝোঁক ছিল। যেমন—লাইব্রেরী গড়ে তোলা, কোন বিশেষ বিষয়ের বিতর্ক আলোচনায় যোগ্যতানুযায়ী পুরস্কার দেওয়া ইত্যাদি। এসব কাজে আমার উৎসাহ আগাগোড়া। সেই সূত্রেই অমল মাঝে মাঝে আমার কাছে এসে তার পরিকল্পনার কথা বলত, শুনে আমি খুসী হ'তাম। পাত্র হিসেবেও সে মোটামুটি ভাল। গায়ের রং ফর্সা, লম্বা-চওড়া চেহারা, স্বাস্থ্যবান্ এবং রুচিবান্। যে-কোন মেয়ের পক্ষেই লোভনীয়। আরও লোভনীয় যে, মধ্যবিত্ত যে-কোন ছেলের তুলনায় তার রোজগারটা খারাপ নয়, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড আর ইনকাম ট্যাক্স কাটাকুটি গিয়েও মোটামুটি শ' তিনেক টাকা ঘরে আনত। বয়সের দিক দিয়েও খুব বেশি এগিয়ে যায় নি, সবে তখন ত্রিশে পড়ল। পাড়ার সুবাদে আমাকে সে দাদা বলেই ডাকত।

এক সময় অমলকে কাছে ডেকে তার বাবার প্রস্তাবটা তার কানে তুলে বললাম, 'তোমার বাবা ত মেয়ে দেখতে বলেই খালাস, মোটামুটি ভাল ঘর ও স্বাস্থ্যবতী হ'লেই তিনি খুসী। কিন্তু তোমারও ত একটা স্বতন্ত্র রুচি আছে! কি রকম মেয়ে চাও তুমি, বল।'

প্রথমটা লজ্জায় কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে রইল অমল, পরে বলল, 'বাবার সঙ্গে যখন আপনার কথা হয়ে গেছে, তখন এ সম্পর্কে আমি আর কি বলব, বলুন?'

বললাম, 'না বললে আর জিজ্ঞেস করছি কেন? আধুনিক ছেলে তুমি, বিয়ের ব্যাপারটা যখন সবই জানো, তখন ক'নের গলায় মালা দেবার আগে তার সম্পর্কে এমন অহেতুক লজ্জারই বা কি আছে? বল, ব'লে ফেল কি রকম মেয়ে চাই, সেই বুঝে কাজে লাগি।'

অমলের মুখে এবারে বুঝি এক টুকরো হাসি ফুটল! গামছা নিংড়াবার মত দু'হাত কচলাতে কচলাতে বলল, 'মানে—একেবারে ঠিক ঘরের ঝি-রাঁধুনি নয়, সঙ্গে নিয়েও যাতে দুটো ভাল যায়গায় বেরনো যায়, এই রকম আর কি!'

—'অর্থাৎ, ঘরের ঘরণীকে পথের বান্ধবী হিসেবেও চাও, এই ত?' বলে অমলের মুখের দিকে তাকাতেই গদগদকণ্ঠে এবারে হেসে উঠল সে, বলল, 'মানে—আপনি ত বুঝতেই পারছেন, আমি আর কি বলব!'

—'ঠিক আছে, আর কিছু বলতে হবে না।' বললাম, 'শেষ পর্যন্ত দু'দিকের ব্যালান্স যদি না রাখতে পার, তবে সামলাতে হবে তোমার নিজেকেই; তখন আমাকে কিংবা তোমার বাবাকে দায়ী করলে চলবে না।'

—'না, না, তা কেন করব, সে কি একটা কথা নাকি!' বলতে বলতে এবারে পাশ কাটিয়ে উঠে গেল অমল।

কিন্তু অমর চৌধুরীকে যখন আমি আশ্বাস দিয়েছি, তখন এই ফাল্গুনেই যাতে শুভ কাজটা চুকে যায়, সেদিকে খানিকটা মন দিলাম। অমল বলেছে মিথ্যে নয়, ছেলেটার রুচি আছে। তার সেই রুচিমতই এবারে কাজে অগ্রসর হলাম। বাংলা দেশে মেয়ের বাপের যা দৈন্যদশা, তাতে

কয়েকদিনের মধ্যেই প্রায় ডজনখানেক মেয়ের সন্ধান পাওয়া গেল। কিন্তু কথাবার্তা চালিয়ে দেখলাম—এর কোনটিই অমলের মনে ধরবে না। অতএব এহো বাহ্য।

আবার নতুন করে জাল ফেললাম। এবারে যে মেয়েটির সন্ধান পাওয়া গেল, সে দেখতে-শুনতে মোটামুটি সুন্দরী ইতিমধ্যেই কি একটা স্কুলে মিস্ট্রেসের কাজে ইণ্টারভিউ দিয়ে এসেছে; গৃহকর্মে পারদর্শিনী। এমন ঘরণীকে পথের বান্ধবী ক'রে নিতে অমলের অসুবিধে হবে না। যে লোকটি খোঁজ এনেছিল, তাকে নিয়ে গিয়ে প্রাথমিক কথাবার্তা সেরে এলাম মেয়েপক্ষের সঙ্গে। শুনলাম মেয়েটির নাম উর্বসী বিশ্বাস। আলাপ করে ভাল লাগল। চোখে গগল্‌স্‌, কপালে কুমকুম-টিপ, উন্নত নাসিকা, হাসলে গালে টোল পড়ে, চিবুকের পাশের ছোট্ট একটি তিল সারা মুখের সৌন্দর্য যেন আরও বাড়িয়ে তুলেছে। যে পরিবারের মেয়ে, সেই বিশ্বাসদের কোন বাজে সংস্কার নেই। মেয়েদের সঙ্গে অবাধে মিশবার সুযোগ আছে।

এসে অমলকে বললাম, 'এবারে যা হোক্ একটা চান্স পেলে। চল, আলাপ করিয়ে দিই। কিছুদিন মেলামেশা করে দেখ দু'জনে মিলে ঘর বাঁধতে পারবে কি না! সেই বুঝে তোমার বাবাকে কথা দিই।'

অমলও হয়ত এতকাল এরকম একটা কিছু সুযোগই খুঁজছিল, এবারে বেশ উৎসাহের সঙ্গেই সে নিজের সম্পর্কে বিশেষ তৎপর হয়ে উঠল।

কয়েকদিনের মধ্যে তাকে আর কোন সমাজকর্মে বা সাংস্কৃতিক কাজে চোখে পড়ল না। এতদিন এ সব ব্যাপারে অমলই ছিল পাণ্ডা, এবারে দেখলাম—তার অনুপস্থিতিতে এদিকটা এবারে ঠাণ্ডা হয়ে যাবার মত অবস্থা। তবু মনে মনে এই ভেবে নিশ্চিন্ত হ'লাম যে, সমাজের এদিকটা ঠাণ্ডা হ'লেও সংসারের একটা বড় দিক ধীরে ধীরে বেশ গরম হয়ে উঠছে। প্রেমের উষ্ণতা সে কি কম? উর্বসীর সঙ্গে হয়ত রীতিমত জমে উঠেছে সে!

ধারণাটা আমার মিথ্যে নয়। জমেই উঠেছিল অমল। দিন কয়েক বাদে হঠাৎ সে এসে আমার সামনে দাঁড়াল। কি সপ্রতিভ দৃষ্টি, সমস্ত সত্তায় কি যেন এক অদ্ভুত চাঞ্চল্য! ভাবলাম, নারীপ্রেম পুরুষকে হয়ত এমনিই চঞ্চল করে!

অমল বলল, 'আমি উর্বসীর কথা পেয়েছি, বিয়েতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। বাবাকে যা বলবার আপনি বলবেন। তবে উর্বসী হয়ত নিজের মুখে আপনাকে কিছু বলতে চায়। সেজন্যে কাল সন্ধ্যায় চৌরঙ্গীর কোন রেস্তোরাঁয় আমরা মিলতে চাই। চা খেতে খেতে দিব্যি কথা হ'তে পারবে।'

বললাম, 'বেশ ত, সেখানে হয় আমাকে নিয়ে যেয়ো।'

তাই গেল অমল। এনগেজমেন্ট অনুযায়ী উর্বসীও যথাসময়ে এসে রেস্তোরাঁয় পৌঁছাল। এবারে একটা কেবিন বেছে নিয়ে আমরা গিয়ে ব'সে পড়লাম।

ইতিপূর্বে উর্বসীর সঙ্গে আমার খুব একটা তেমন কথা হয় নি। কাকার সংসারে সে মানুষ, তার কাকার সঙ্গেই যা প্রাথমিক আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু তা নিয়ে উর্বসীর দেখলাম কোন সঙ্কোচ নেই। বলল, 'আমার একটা চাকরি পাবার কথা আছে, পেলে আপনাদের তরফ থেকে কোন আপত্তি থাকবে না ত?'

বললাম, 'আপত্তি যাতে না ওঠে, অমলের বাবাকে আমি সেই ভাবেই বলব। এ বাজারে ঘরকরণার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরাও অর্থকরী কিছু করুক, ব্যক্তিগতভাবে আমি তা পছন্দ করি। আর এ ব্যাপারে অমলের বাবারও মনে হয় না যে কোন আপত্তি থাকবে, বিশেষতঃ তিনি যখন রিটায়ার্ডম্যান, না কি বল অমল?'

অমল বলল; 'এব্যাপারে দয়া করে আমাকে টানবেন না।'

ইতিমধ্যে পর্দা সরিয়ে বয় এসে সামনে দাঁড়াল। অর্ডারটা অমলই দিতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে আমি বললাম, দাঁড়াও, আমি বলছি। শুধু চা ত ঠিক জমবে না, তার আগে বরং তিনটে মোগ্‌লাই পরটা আর কষা মাংস দিক।'

অর্ডার নিয়ে বয় চলে গেল।

উর্বসী বলল, 'আমার কিন্তু এসবে কিছুই দরকার ছিল না!'

বললাম, 'দরকার কি আমারই ছিল? তবু এত দূরে এসে শুধু এক কাপ চা খেয়ে ফিরে যাবার কোন মানে হয় না। চায়ের সঙ্গে তাই যা সামান্য কিছু-টা—'

এবারে মুখ টিপে হেসে অপাঙ্গে একবার অমলের মুখের দিকে তাকাল উর্বসী।

বয় এসে খাবার দিয়ে গেল।

বললাম; 'এ ত কিছুই নয়। এর পর তোমাদের হাতে [illegible]-ত খাব।'

এবারে দু'জনে প্রায় সমস্বরেই ব'লে উঠল, 'সে ত আমাদের সৌভাগ্য।'

সঙ্গে সঙ্গে কাঁটা-চামচ চলতে লাগল। দেখলাম—উষসীর তাতে একটুও অসুবিধে হ'ল না; বুঝলাম—অভ্যাস আছে।

ছোটখাটো কথাবার্তা চলতে লাগল, সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে এগোতে লাগল খাওয়া। কিন্তু যে ব্যাপারটার জন্যে আমি আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না, হঠাৎ এবারে তাই ঘটে গেল। এতক্ষণ দিব্বি খাচ্ছিল অমল, কোন অসুবিধেই হচ্ছিল না। হঠাৎ সে পরটার সঙ্গে হাড়সহ একখণ্ড মাংসে কামড় দিতেই তার উপরের পাটির পুরো সেট দাঁত খুলে খসে পড়ল পরটার ডিসের ওপর। অন্য কোন ব্যাপার নিয়ে [illegible] হ'লে মনে ক্ষোভ থাকত না অমলের। কিন্তু উষসীর সঙ্গে প্রণয়-রঙ্গে ও প্রাক্-পরিণয় মুহূর্তে মনে হ'ল—[illegible] যেন তার ধ্বসে গেল। দেখতে দেখতে সারা মুখ লাল হয়ে উঠল তার; আমার বা উষসীর মুখের দিকে [illegible] চোখ তুলে তাকাবে, এমন আর সাধ্য রইল না অমলের।

বিস্ময়ে আমার সমস্তটা মন ভ'রে গেল। অমলের যে ফল্‌স টিথ, তা এই প্রথম জানলাম, আগে জানবার কোন অবকাশ হয় নি। উষসীও নিশ্চয়ই জানত না; তাই প্রথমটা হতচকিতের মত হাতে তার কাঁটা-চামচ থেমে গিয়েছিল। তারপর হঠাৎ কেমন একটা উদ্‌গত হাসিতে ফেটে পড়ল সে, হাসতে হাসতে দু'চোখ বেয়ে তার জল নেমে এল। চোখে কিছুতেই আর গগল্‌স চেপে রাখতে পারল না; নামিয়ে হাতে নিয়ে রুমাল বার করতেই আমার চোখে পড়ল—এক চোখে তার জল, আর একটা চোখ স্থির হয়ে আছে, সে চোখটা পাথরের।

বিস্ময়ে আর-একবার আমি নিজের মধ্যে চমকে উঠলাম। উষসীর গগল্‌স ব্যবহারের রহস্যটা এতক্ষণে দিনের মত পরিষ্কার হয়ে গেল আমার কাছে।

কিন্তু উষসী একটা মিনিটও আর অপেক্ষা করল না। বলল, 'কিছু মনে করবেন না, আমি আর বসতে পারছি না, আমি চলি।' ব'লে প্লেটের খাবার অসমাপ্ত রেখেই দ্রুত সে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল।

অমলের সঙ্গে তার যেমন কোনদিনই আর দেখা হয় নি, আমিও তেমনি তাদের হয়ে অমর চৌধুরীকে কোন কথা দিতে পারি নি।

লিরিক কবি এমিনেস্কু

অমিতা রায়

বিপুলা এ পৃথিবীর কোথায় যে কোন বিস্ময় লুকিয়ে আছে বলা শক্ত। ইউরোপের পূর্বপ্রান্তের কোন দেশের প্রকৃতিতে ভারতের পূর্বশেষ বাংলা দেশের প্রকৃতির মতন স্নিগ্ধ শ্যামলিমার দর্শনলাভ যেমন বিস্ময়কর, তেমনি বিস্ময়জনক সেই দেশের কাব্যে বিশ্বপ্রকৃতির আর মানবপ্রকৃতির সেই সুরে বেজে ওঠা—যে-সুরে সে বারে বারে বেজেছে বাঙালীর মনে—বাঙ্গালীর গানে।

পূর্ব ইউরোপের অন্তর্গত রুমানিয়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে বাংলা দেশের প্রকৃতির সাদৃশ্য সত্যিই লক্ষ্যণীয়। রুমানিয়ার ভেতর দিয়ে যদিও চলে গেছে তুষারমৌলি আল্পসের গিরিমালা আর যদিও শীতে তার উত্তাপ নেমে যায় হিমাঙ্ক ছাড়িয়েও বহু নীচে—তবুও শরতে-বসন্তে তার সমতলভূমি বাংলার মতনই শস্যশ্যামলা। 'ডনারেয়া', 'প্রাহোভা' আর 'বিস্তৃৎসা'-র জলধারায় সে বাংলার মতনই নদীমাতৃক আর তেমনি করেই তার এক প্রান্ত জুড়ে রয়েছে সমুদ্রের উর্মিমুখর বালুবেলা। বাংলার পলিমাটির গুণে যেমন কোমল বাঙালীর মন—রুমানিয়াবাসীর মনও তেমনি কোমল, তেমনি আবেগপ্রবণ। তেমনি গীতিময় তার ভাষা।

বাংলা সাহিত্যে বৈচিত্র্যের অভাব নেই। তবু সব ফেলে বাঙালীর মন ধায় কবিতা আর সঙ্গীতের দিকে। রুমানিয়ার লাতিন মনেরও সেই অবস্থা। তেমনি-ই তারা গান-পাগল। তাদের সাহিত্যের আসরে তাই সর্বজনের মনের রাজা হলেন কবি-রাজ এমিনেস্কু। মিহাইল এমিনেস্কু।

বাঙালী কবির মতনই লিরিক কবি এমিনেস্কুর কাব্যে বেজে উঠেছে নদীজলের তরল-কল্লোল। বেণুবনের মর্মর। রাখাল ছেলের বাঁশির সুর আর—আর যা বেজেছে, তা চিরকালের সাহিত্যের উপজীব্য—মানুষের মনের দু' একটি চিরন্তন অনুভূতি।

আজ থেকে এক শ' বছরেরও আগে—১৮৫০ সালে—ন্মানিয়ার এক গ্রামে জন্ম হয় মিহাইল এমিনোভিচের। ।মিনেস্কুর পারিবারিক নাম ঐটাই। তারপরে তাঁর বাল্য াার কৈশোর কাটে গ্রাম্য- প্রকৃতির-কোলে—বনের ছায়ায়, দের তীরে আর পাহাড়ের উপত্যকায়। তখন থেকেই তিনি স্কুল-পালানো ছেলে। জার্মান স্কুলের নিয়ম-নীতির কঠোরতা যখনই অসহ্য হয়ে উঠত, তখনই কিশোর মিহাইল পালিয়ে যেত কৃষকদের ঘরে। মাঠের ওপরে যেখানে থোকা থোকা সাদা ফুলের মতন ভেড়ার পাল চরাচ্ছে মেষপালকেরা সেইখানে। লোকসঙ্গীত আর রূপকথার আকর্ষণে মিহাইল গিয়ে জুটেছে সেখানে। নয়ত বনের মধ্যে চিন্তায় বিভোর হয়ে বসে থেকেছে।

অবশেষে চোদ্দ বছর বয়সে মিহাইল একদিন ঘর ছেড়ে চলে গেল। লোকসঙ্গীত আর লোকসাহিত্য সংগ্রহের জন্যে পায়ে হেঁটে ফিরতে লাগল গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। যে গরুর গাড়ির গাড়োয়ান, রাখাল, চাষী আর যত গাঁয়ের বুড়ো-বুড়ীর কাছে ধর্ণা দিল সে। পরবর্তীকালে এই লোক-সাহিত্যের প্রভাব এমিনেস্কুর কাব্যে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল।

মিহাইলের বাবা ছিলেন সম্পন্ন গৃহস্থ। বাউণ্ডুলে পাগল ছেলেকে নিয়ে তাঁর চিন্তার শেষ ছিল না। তাকে ঘরে ধরে এনে জোর করে আবার স্কুলে পাঠালেন। যুগ-যুগান্তরের লোকের মুখের গান তখন কিশোর মিহাইলের মনে বাসা বেঁধেছে। তার কাব্য-প্রচেষ্টার সুরু তখন থেকেই।

ষোল বছর বয়সে মিহাইল তার প্রথম কবিতা পাঠাল একটি মাসিক পত্রিকায়। কবিতার ভাব কাঁচা। ভাষায় রয়েছে পূর্বসূরীদের আঙ্গিকের ছাপ। তবু যেন পত্রিকার সম্পাদক কি এক সম্ভাবনা দেখলেন তার মধ্যে। বালককে উৎসাহ দেবার জন্যে সেই কবিতা প্রকাশিত হ'ল। কি ভেবে যেন সম্পাদক লেখকের নামটা সামান্য বদলে দিলেন। লিখলেন—মিহাইল এমিনেস্কু। কেন যে তিনি তা করেছিলেন, সেকথা কেউ জানে না। তিনি নিজেই কি জানতেন যে, এই নাম একদিন তাঁর দেশের সাহিত্য-জগতে আলোড়ন তুলবে? ছড়িয়ে যাবে দেশান্তরে?

মিহাইল এমিনেস্কুর সেই প্রথম আত্মপ্রকাশ 'ফামিলিয়া' পত্রিকার পাতায়। তারপর কাব্যচর্চা বাড়তে লাগল। বাবার উদ্বেগও বাড়তে লাগল সেই সঙ্গে। তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য ছেলেকে পাঠালেন ভিয়েনায়।

এমিনেস্কুর প্রথম যৌবনের পাঁচ বছর কাটল ভিয়েনা আর বার্লিনে দর্শন শাস্ত্রের অধ্যয়নে। আর সাহিত্য? সে আকর্ষণ ত তার অন্তরের অন্তরতম দেশে স্থান নিয়েছে।

মিনেস্কুর বাবা বিদগ্ধ লোক ছিলেন। তাই কৈশোরে নিজ হেই মলিয়ের আর ভলতেয়ার পড়া ছিল এমিনেস্কুর। থন তার সঙ্গে যোগ হ'ল শিলার, গ্যয়টে, হাইনে। তরুণ মিনেস্কুর প্রতিভার দীপে হ'ল অগ্নিস্পর্শ।

বিদ্যার এমন কোন শাখা ছিল না, যেখান থেকে মিনেস্কুর আগ্রহ পল্লব সঞ্চয় করে নি। সাহিত্য, দর্শন, বজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি—এমন কি শারীরবিদ্যাও। গ্রাসী মনের পিপাসা মেটাতে কঠিন পরিশ্রমে দেহ হ'ল কৃষ্ট।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে ১৮৭৪ সালে যখন তিনি মানিয়ায় ফিরে এলেন, তখন এমিনেস্কু সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। র্ণ দেহ, প্রদীপ্ত আয়ত চক্ষু, কাঁধের ওপর লুটিয়ে-পড়া চুল যার চোখমুখে কি যে চাঞ্চল্য, কি যে উদ্‌ভ্রান্ত ভাব—যেন নতার মধ্যে থেকেও কোন্ সুদূরে তাঁর মন বিচরণ করছে। স যেন এক প্রতিভার জলন্ত মশাল।

রুমানিয়ার 'ইয়াশ' শহর সংস্কৃতির জন্য বিখ্যাত। সইখানে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পরিচালকের পদ গ্রহণ করলেন তনি। সেই সঙ্গে আকাদেমী ইনষ্টিট্যুটে তর্কশাস্ত্রের ও পরে র্মান ভাষার অধ্যাপকের পদও তিনি পেলেন। বই আর াঙ। জ্ঞান-আহরণ আর সাহিত্য-সৃষ্টি। কর্মের উন্মাদনায় গল দু'বছর।

তারপর রাজনৈতিক আকাশে এল পরিবর্তন। দেশের ন্ত্রিসভা বদলাল, সেই সঙ্গে বহু কর্মীর পদচ্যুতি হ'ল। মহাইল এমিনেস্কু পথে এসে দাঁড়ালেন। অন্য এক হিত্যিক-বন্ধু তাঁকে নিয়ে গিয়ে রাখলেন নিজের বাড়ীতে। রিই উদ্যোগে এক সংবাদপত্রের সম্পাদকের পদ পেলেন মিনেস্কু। ইয়াশ থেকে কিছুদিন পরে এলেন রাজধানী খারেষ্টে। এক পত্রিকা ছেড়ে অন্য পত্রিকায়।

তারপর দারিদ্র্য আর সংগ্রামের ইতিহাস। চিরদিনের ল্পী-জীবনের ইতিহাস। অনাহার, অনিদ্রা, সমালোচনা, দগত রাজনীতির চক্রান্ত। তারই মধ্যে দুর্বার প্রেরণার বি। অশান্তির আঘাতে বাজানো সুরের বীণা। পারি-শ্বিকের অসুন্দরের বেড়া ডিঙিয়ে চিরন্তন সুন্দরের সাধনা। দনার হোমাগ্নিতে সত্যের পরিচয়।

চিরকালের লিরিক কবিদের মতন এমিনেস্কুরও কাব্যের ধান অবলম্বন হ'ল—প্রকৃতি আর প্রেম। তবু প্রকৃতি—ার প্রথম জীবনের লীলাসঙ্গিনীই তাঁর প্রথমা। তাঁর দ্বিতীয়া। প্রকৃতির পটভূমিকাতেই যে শুধু তাঁর প্রেম স্পূর্ণ তা নয়। তাঁর মনের বিচিত্র অনুভূতিরও তুলনা ঐ াকৃতির মধ্যেই।

"আর যেমন…" এই নামে একটি তিন স্তবকের কবিতা তাঁর প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মবোধের সাক্ষ্য বহন করে তিন ফোঁটা অশ্রুবিন্দুর মতন মুক্তার দ্যুতিতে টলমল করছে।

আর যেমন…

আকুল হাওয়ায় 'প্লোপি'র শাখা
মোর জানালায় আছড়ে পড়ে
আমার হৃদয় যেমন করে
তোমায় কাছে পাবার তরে।
গহন দীঘির অতল কালোয়
তারার ক্ষীণ রশ্মি জ্বলে
যেমন তোমার ভাবনা দিয়ে
উজল করি বেদনারে।
নিবিড় মেঘের আঁধার হতে
চাঁদের কিরণ ভরল ধরা
বিরহ মোর হোক না আঁধার
স্মৃতি তো মোর আলোক-ভরা।

প্রকৃতির মধ্যেই যেমন তার অন্তরের অনুভূতির তুলনা, তেমনি প্রকৃতির সান্নিধ্যেই তিনি খুঁজেছেন প্রিয়ার সঙ্গ। প্রেম তাঁর সেইখানেই সার্থক। প্রেম আর প্রকৃতি মিশে গেছে তাঁর কবিতায়। তার ভাবে, ভাষায় ফুটে উঠেছে লোকসঙ্গীতের সহজ সৌন্দর্য। এমনি একটি কবিতা—পাহাড়ী সাঁঝ।

পাহাড়ী সাঁঝ

সন্ধ্যা হল—একটি দুটি ফুটছে তারা আকাশ মাঝে
গাভীরা ধায় গোষ্ঠপানে, রাখাল ছেলের শিঙা বাজে।
ঝর্ণাধারার উৎসমুখে জলের রোদন আকুল করে
সালক্যিমেরি তলায় প্রিয়ে, দাঁড়িও ক্ষণেক আমার তরে॥
পাতার ঘন জাফরি দিয়ে দীঘল চোখের দৃষ্টি হানি
দেখো ক্ষণেক—আকাশ পরে ভাসছে চাঁদের তরীখানি।
ঝরিয়ে দিয়ে হিমের কণা মেঘ ভেসে যায় ধীরে ধীরে
উপত্যকায় নামল ছায়া—চাঁদ জাগে ঐ গিরির শিরে॥
কুয়োর থেকে তুলছে কে জল—আওয়াজ তারি আসছে ভাসি
পাহাড় চূড়ার গোষ্ঠগৃহে রাখাল বুঝি বাজায় বাঁশি।
লাঙল কাঁধে ফিরছে ঘরে ক্লান্ত চাষী দিনের শেষে
গীর্জাঘরের ঘণ্টাধ্বনি সাঁঝের বায়ে আসছে ভেসে॥
আঁধার ঘনায়—গ্রামের ঘরে নামবে এবার নীরবতা
'সালক্যিমেরি' তলায় বসে আমরা শুধু কইব কথা।
হেলিয়ে মাথা তোমার কাঁধে ধরে তোমার কোমল পাণি
প্রহর ভরে শুনব শুধু তোমার মুখের প্রেমের বাণী॥

রাত্রি যখন গভীর হবে ঘুমের কোলে পড়ব ঢলে।
এমন রাত কি এই জীবনে আসবে সখি এবার গেলে?

ঐ প্রকৃতির কোলেই যে কেটেছে তাঁর শৈশব। আজও যে তার ডাক তাঁকে উন্মনা করে তোলে। সেই আহ্বান ভাষান্বিত হয়েছে তাঁর "যেয়োনাকো" কবিতায়।

যেয়োনাকো

—আমায় ছেড়ে যাস নে বাছা
কতই তোরে ভালবাসি
আমি ছাড়া কে বোঝে বল
তোর প্রাণের ঐ কান্নাহাসি।

বিজন বটের আঁধার ছায়ায়
বসিস আমার রাজার ছেলে
জলের পানে কি যে দেখিস
কাজল দুটি নয়ন মেলে।

জলের ঢেউয়ের কলরোলে
ঘাসের বনের মরমরে
ত্রস্ত মৃগীর চলার ধ্বনির
অর্থ যত শিখাই তোরে।

মগ্ন হয়ে চাঁদের আলোর
বিস্ময়েতে অনুপম
নিমেষ মানিস বরষ হেন
বরষ কাটে নিমেষ সম।'

বনভূমির নিবিড় মোহে
হারিয়ে সেদিন আপনাকে যে
শুনতে পেতাম সকল কথা
উঠত সে গান মর্মে বেজে।

আজ যবে যাই তাহার কাছে
ভাষা তাহার আর না বুঝি
কৈশোরের সে অরণ্যে আর
কেমন করে পাব খুঁজি?

শুধু আনন্দে নয়, বেদনাতেও বাঁশি বেজেছে—রুমানিয়ার প্রান্তরের বাঁশি ধ্বনিত হয়েছে কবির অন্তরে। সেই বাঁশি শোনা যায় 'গিরিশৃঙ্গে' কবিতায়।

গিরিশৃঙ্গে

গিরিশৃঙ্গে পাণ্ডুর চন্দ্রিমা
ম্লান আজি জোৎস্নার হাসি
অরণ্যের শুষ্ক পত্রদলে
বেজে ওঠে বিচ্ছেদের বাঁশি।

মরণের মধুর বিরহ
ছায় মোরে নিশীথিনী সম
বনানীর বাঁশরীতে বাজে
ভাষাহারা ক্রন্দন মম।

এমিনেস্কুর সমস্ত সত্তায় জড়িয়ে আছে প্রকৃতি—এ তার সঙ্গে মিশেছে প্রেমের অনুভূতি। কিন্তু সেখানেও তি সম্পূর্ণ রোমান্টিক। তাঁর মানসী—জায়া নয়, বধূ নয়, প্রেয়সী। সে কখনও দেহধারিণী, কখনও স্বপ্ন, কখ কল্পলোকবিহারিণী। সে অর্ধেক মানবী আর অ কল্পনা।

যে-কোন রোমান্টিক কবির মতনই তাঁর প্রেরণার উৎস আপনহারা বিস্মৃতি। মর্ত্য-পরিবেশের ঊর্ধ্বে তাঁর কাব্যলো কিন্তু সেই কাব্যলোক থেকে যে-মুহূর্তেই তিনি বাস্তব জগ ফিরে এসেছেন, সেই মুহূর্তেই গানের খেয়া গেছে হারি তখনই এসেছে বিষণ্ণতা। শ্রীহীন ঘর, সঙ্গীহীন জী জাগিয়েছে বেদনা। অমনি কবির মন উধাও হয়ে ভাবলোকে। জেগেছে সুর—সুরের পথ বেয়ে সুরু হ স্বপ্নস্বরূপিণীর অভিসার। এমনি নিরাশা আর কল্প সমন্বয়ে অনবদ্য হয়ে উঠেছে 'নিঃসঙ্গতা' নামে এ কবিতা।

নিঃসঙ্গতা

নিশীথ রাতে ঘরের কোণে
অগ্নিশিখা উঠছে কাঁপি
স্ফুলিঙ্গ ধায় শূন্যপানে
স্তব্ধ প্রহর একলা যাপি।

কুলায়ে ফেরা পাখীর মতন
আবেশ ঘেরে হৃদয় মম
কত মধুর মোহের স্মৃতি
ঝঙ্কারিছে ঝিল্লী সম।

যীশুর পায়ে যেমন করে
মোমের ফোঁটা গলে পড়ে
আমার মনের জ্বালার স্মৃতি
তেমনি ধীরে পড়ছে ঝরে।

শূন্য আমার এ ঘর-দুয়ার
সবই শ্রীহীন সবই মলিন
যতই ভাবি সাজাব ঘর
বিষণ্ণতায় যায় কেটে দিন।

ভাবনা আমার বুকের ভিতর
ব্যথার প্লাবন দেয় ছুলিয়ে
অমনি জাগে সুরের জোয়ার
দেয় সে সকল কাজ ভুলিয়ে।

তারই মাঝে একেক রাতে
বাতি যখন ফুরিয়ে আসে
চমক দিয়ে বক্ষে মম
সে এসে মোর দাঁড়ায় পাশে।

শূন্য এ ঘর পূর্ণ করে
ভরিয়ে সে দেয় শূন্য হিয়া
আঁধার ভরা এই জীবনে
লক্ষ প্রদীপ উজলিয়া।

রজনী মোর প্রহর হারায়
সময় কাটে আপন মনে
নিবিড় তাহার বাহুর ডোরে
অস্ফুট প্রেম-গুঞ্জরণে।

লাতিনজাতিসুলভ রোমান্টিক মন—তার সঙ্গে শেছে দর্শনের গভীরতা। এমিনেস্কুর বিখ্যাত কবিতা-চ্ছ 'পাঁচটি পত্রে'র প্রথম পত্রে পড়েছে সেই দার্শনিক ন্তার ছায়া। পূর্ণিমার চাঁদ সেখানে কবির মনে মিলনের নন্দ আর বিরহের বেদনা জাগায় নি, জাগিয়েছে নাদি অনন্তকালের জিজ্ঞাসা। প্রথম পত্রের সুরু হয়েছে ই চিরন্তনের ধ্যান দিয়ে।

"বিধুর সায়াহ্ন যবে ক্লান্তপক্ষে নিঃশ্বসিয়া ওঠে
সময়ের দীর্ঘপথ মুহূর্তেরা করে উত্তরণ—
বাতায়ন পথে নামে পূর্ণিমার আলোর জোয়ার
শতাব্দীর বেদনার স্মৃতি যেন তার সাথে ভাসে।
তখন সহসা মনে জাগে—
কিছু তার ছিল স্বপ্নে কিছু অনুভবে।"

বিশ্বনিখিলের অনুভূতিতে সেখানে কবির মন বিলীন য়ে গেছে। বিশাল বিশ্বের ক্ষুদ্র গ্রহের ক্ষুদ্র প্রাণী এই নুষের দল। রাজ্য-সাম্রাজ্যের পতন-উত্থান, এত যুদ্ধ, ত গবেষণা এত শুধু সূর্যালোকে ধূলিকণার নৃত্য। এক-দন শূন্য থেকে উৎসারিত হয়েছিল জীবন। বিশৃঙ্খলা থেকে এসেছিল সৃষ্টি। তারপরে এল স্থিতি, এল সুন্দর। লল অন্তহীন তরঙ্গলীলা। আর সব তরঙ্গ লয় হ'তে থাকল অশেষের সমুদ্রে। সহস্র জীবনের বুদ্বুদ সৃষ্ট হ'ল, নিঃশেষে হ'ল লুপ্ত।

কত যুগের কত দেশের কত মানুষের সুখদুঃখ—আপাত-দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ সেই সব নগণ্য ঘটনার সাক্ষী এই পূর্ণিমার চাঁদ। কত মরু, কত নন্দনকানন, কত উৎসব, কত ক্রন্দন সে ভরিয়ে দিচ্ছে তার নির্বিকার নিরপেক্ষ জ্যোৎস্নার প্লাবনে। নিঃসঙ্গতার সমুদ্রে ভাসমান সেই চাঁদের স্তব ধ্বনিত হয়েছে এই সুদীর্ঘ কবিতাটিতে।

দর্শন-প্রভাবিত আর একটি কবিতা—'সম্রাট ও প্রোলে-তারিয়া।' তার মধ্যে রয়েছে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমগ্র মধ্য ইউরোপের তৎকালীন মনোভাবের চিহ্ন।

ধূমাচ্ছন্ন জানলার কাঁচের মতন যাদের অস্বচ্ছ ভবিষ্যৎ—সেই প্রোলেতারিয়ার দিকে চেয়ে থেমে গেছে কবির সুললিত বাণী। দৃপ্ত কণ্ঠে প্রেরণা দিয়েছেন তাদের—জানতে বলেছেন আপনাকে—জাগতে বলেছেন আপন অধিকারে। সেই আত্মবিস্মৃত চিরবঞ্চিতদের ডেকে তিনি বলেছেন—

ভুলো না তুমি কত শক্তিশালী। তুমি সংখ্যাগরিষ্ঠ। জীবন তোমাদের জন্যই। ভেঙ্গে ফেল এই অসাম্য। বহুজনের রক্তের মূল্যে আর ভরিয়ো না একজনের পানপাত্র। ভুলো না প্রবঞ্চকের মিথ্যা আশ্বাসে। জীবনের সুখদুঃখ জীবনের সঙ্গেই শেষ। পরলোকের প্রাপ্তির আশায় ইহলোকে বঞ্চিত ক'রো না নিজেকে।

রুমানিয়ায় তখন একদিকে বিলাসের বাহুল্য আর এক-দিকে পুঞ্জীভূত দুর্দশা। ফরাসী ভাবধারার বিকৃত অনুকরণের বাতি জ্বলছে তার সাজঘরে। রুমানিয়ার যৌবনকে ডেকে সেদিন এমিনেস্কু বারে বারে বলেছেন—অনুকরণে মহত্ত্ব নেই, আছে আত্ম-অবমাননা। 'পাঁচটি পত্র' কবিতাগুচ্ছের তৃতীয় পত্রে রুমানিয়ার এক বীর রাজকুমারের যুদ্ধের বর্ণনা-ছলে দেশবাসীর মনে প্রেরণা দিয়েছেন তিনি দেশপ্রেমের। বিদেশী সৈন্যদের আক্রমণ প্রতিহত করেছে যে-দেশ, সে-দেশ কি পারবে না বিদেশী বৈভবের মোহ এড়াতে? এমিনেস্কুর 'তৃতীয় পত্র' তাই দেশপ্রেমের গভীরতায় ও ভাষার মাধুর্যে রুমানিয়ার জনপ্রিয়তম কবিতাগুলির মধ্যে স্থান পেয়েছে।

সকলের বেদনা যে অন্তরে গ্রহণ করে তার বেদনার দোসর পাওয়া ভার। তার জ্বালার শেষ নেই। দীপশিখার মতন জ্বলতে জ্বলতে এমিনেস্কুর সমস্ত সত্তা যেন ক্ষয় হয়ে যাচ্ছিল। তার ওপর বাইরের জগতের ঘাত-প্রতিঘাত। ব্যক্তিগত জীবনে সংগিহীনতা। সবচেয়ে বড় নিঃসঙ্গতা মনের। এমন কেউ নেই যার কাছে যাওয়া যায়, যাকে পাওয়া যায়, যাকে সব কথা বলা যায়। তাঁর প্রতিভার জ্যোতির গণ্ডি পেরিয়ে কে আসবে তাঁর কাছে?

১৮৮৩ সালে লেখা এমিনেস্কুর রূপক-কাব্য 'শুক্রগ্রহ' তাঁর উত্তরসূরীদের কাছে তাঁর জীবনদর্শনের মতন প্রতিভাত হয়েছে।

কোন্ রূপকথার যুগে এক রাজকন্যা নির্জন নিশীথে দূর আকাশের শুক্রগ্রহকে দেখে তাকে ভালবাসল। প্রতি সন্ধ্যায় জানলায় দাঁড়িয়ে সে অধীর হয়ে ডাকতে লাগল আকাশচারী নক্ষত্রকে—এস আমার ঘরে, এস আমার চিন্তায়—তোমার কিরণধারায় উদ্ভাসিত করে তোল আমার জীবন।

রাজকুমারীর সেই আহ্বান পৌঁছাল নক্ষত্রের কানে। অবশেষে সে একদিন মানবদেহ ধরে এল তার ঘরে। নক্ষত্রের জ্যোতিতে রাজকুমারীর চোখ ধাঁধিয়ে গেল। তার মূর্তি দেখে ভয় পেল রাজকন্যা। নক্ষত্র চাইল মর্ত্যলোকের প্রেয়সীকে নিয়ে যেতে তার আপন জগতে—অমর্ত্যলোকে। রাজকন্যা তার প্রিয়কে পেতে চাইল মাটির পৃথিবীতে—সাধারণ মানুষ রূপে।

দেবযানী যেমন চেয়েছিল কচ তার বৃহৎ কর্তব্যের জগৎ ত্যাগ করে ধরাতলে তার নিত্যদিনের সঙ্গী হোক—তেমনি এমিনেস্কুর নায়িকা চাইল আকাশের নক্ষত্র তার মাটির ঘরে নরদেহ ধরে নেমে আসুক।

অবশেষে রাজকন্যার আকর্ষণে শুক্রগ্রহ ত্যাগ করতে চাইল তার অমরত্ব। বিশ্ববিধাতার কাছে গিয়ে সে বলল—প্রভু, ফিরিয়ে নাও আমার অমরত্ব। বিদায় দাও আমাকে তোমার নক্ষত্রের সভা থেকে। আমি মানুষের দেহ ধরে মাটির ঘরে জীবন যাপন করতে চাই।

কিন্তু শ্রেষ্ঠত্বের থেকে নিবৃত্তি চাইলেই কি নিবৃত্তি মেলে? বিধাতা তার নিবেদনে কর্ণপাত করলেন না। বললেন—নির্বোধ, চেয়ে দেখ, একবার পৃথিবীর দিকে। দেখ, কার জন্যে, কিসের জন্যে বিসর্জন দিতে চাইছ তোমার দুর্লভ অমরত্ব?

শুক্রগ্রহ চেয়ে দেখল নীচে। রাজকন্যা তখন প্রাসাদের এক ক্রীতদাস যুবকের প্রণয়ে মত্ত। তার আহ্বানে সাড়া দিয়েছে রাজকুমারীর দেহমন। সে-ও যে তারই মতন মাটির জীব। তাকে সে জানে, চেনে, ভালবাসে। দূর আকাশের নক্ষত্র মোহ জাগায়, কিন্তু ঘরের মধ্যে তার নৈকট্যের ভয়ঙ্করতা সহ্য হয় না।

তবুও—প্রেমিকের বাহুবন্ধনের মধ্যে থেকেও রাজকুমারীর চোখ পড়ল শুক্রের প্রতি। আবার সেই হারানো মোহ জাগল তার মনে। সে ডাক দিল—এস আমার ঘরে। আলোকিত কর আমার জীবন।

ক্ষুদ্র গণ্ডির প্রেমে তখন শুক্রগ্রহের বিতৃষ্ণা এসেছে তার মন উঠেছে বিরূপ হয়ে। মর্ত্যের কন্যা—তার কাছে প্রাসাদের ক্রীতদাস আর আকাশের নক্ষত্র দু'-ই সমান নক্ষত্রের অমরত্ব বিসর্জনের সে যোগ্য নয়। সে ত্যাগের মহিমাও সে বুঝবে না।

নক্ষত্রের নিঃসঙ্গ আত্মা তাই অনন্তকালের শূন্য পরিক্রমার পথই বেছে নিল। তার ক্ষুব্ধ হৃদয়ের বেদনা গুমরে উঠল—তোমরা ত তোমাদের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে নিজ নিজ ভাগ্যে সুখী। আর আমার যে রয়েছে অসীম অমরত্ব অনন্তকাল ধরে এই তুহিনশীতল নিঃসঙ্গতাকে বহন করে বেড়াতে হবে আমাকে।

কবির জীবনেও প্রেমের স্থান নিল ব্যর্থতা। এল একাকীত্ব—এল অবসন্নতা। তখন হেমন্তের ঝরাপাতা দেখে মনে পড়ে বিবর্ণ প্রেমপত্রের কথা। উর্বশীর প্রেমে যে শান্তি নেই—আছে জ্বালা। তারপরে দীর্ঘশ্বাস আর ক্রন্দন। তখন ঐ ঝরাপাতার পথ বেয়ে যাওয়া।

তখন—'ঝরা পাতা গো আমি তোমারি দলে
অনেক হাসি অনেক অশ্রুজলে
ফাগুন দিল বিদায়-মন্ত্র
আমার হিয়াতলে'

—রবীন্দ্রনাথ

রুমানিয়ার কবি এমিনেস্কুও গেয়েছেন ঝরাপাতার গান। সে গান বৈরাগ্যের নয়—মরণের প্রতীক্ষার।

ঝরা পাতা

বাতায়ন-পথে হেমন্ত-বায়ু
দিয়ে গেল ঝরা পত্রখানি
মরণই বুঝি বা তার হাত দিয়ে
পাঠাল আমারে তাহার বাণী।

এমনি পত্র কত না পেয়েছি
পূর্ণ প্রেমের মধুর রাগে
বিবর্ণ তারা আজি এরই মত
সে শুধু আমারই মরমে জাগে।

ঝরে-পড়া পাতা ফেলে-আসা দিন
সে কি কভু কেউ স্মরণে রাখে
প্রণয়ের লিপি যে লেখে সে ভোলে
যে পায় সে তারে যতনে রাখে।

আজও তারা মোর ডালিতে রয়েছে
মৃত প্রণয়ের সাক্ষ্য বহি
জানি সে ভ্রান্তি তবু সে ভুলের
স্মৃতির অনলে নিজেরে দহি।

মাধুর্যে ভরা সে ব্যর্থতারে
পারি না ভুলিতে ক্ষণিকের তরে
শুধু দিন গুনি, শেষের অতিথি
মরণ কখন আসিবে ঘরে।

ব্যর্থ প্রেমের সে-রাগিণী আজও
বাজে হৃদয়ের বিষণ্ণতায়
তারি মাঝে যেন ঝরাপাতাখানি
আনিল বহিয়া হেমন্ত-বায়।

[illegible] তাহার চরণশব্দে
শুনি মৃত্যুর পদধ্বনি
সব জ্বালা মোর সে এসে জুড়াবে
দিবে সে শান্তি চিরন্তনী।

[illegible] মরণই একমাত্র প্রিয়। নিরুদ্দেশ-যাত্রার শেষ

[illegible]দিকে অন্তর-ভরা বিষাদ, আর একদিকে বহি-
[illegible] সংঘাত। সমালোচকদের চুলচেরা বিচার—
[illegible] তুলনামূলক সমালোচনা। অলঙ্কার-
[illegible] সমালোচকদের প্রতি বিতৃষ্ণায় বিদ্রূপ করে
[illegible] লিখলেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা—'আমার
[illegible]চকরা'।

আমার সমালোচকরা

কুসুম ফোটে লক্ষ কোটি
ফল ফলে না সব কুসুমে
অনেক কলির রঙীন জীবন
মরণ এসে ঝরায় ভূমে।

সহজ বড় কথার পরে
কথার মালা গেঁথে যাওয়া
অর্থহীন শূন্যধ্বনি
ছন্দে মিলে যায় তো গাওয়া।

কিন্তু যখন তীব্র ব্যথা
অনুভূতি, আবেগ, আশা
হৃদয় মাঝে আছড়ে ফিরে
আকুল হয়ে যাবে ভাষা।

কুঁড়ির দ্বারে গন্ধ যেমন
অন্ধ বেগে আঘাত হানে
তেমনি করে বেদন যখন
কোন বাধার বাঁধ না মানে।

বক্ষ-ফাটা সেই বেদনায়
মুক্তি দিতে, দিতে বাণী
সফল হবে, হে বিচারক,
তোমার শীতল তৌলখানি?

সত্য যখন তোমার কাছে
কণ্ঠ চেয়ে কেঁদে মরে
তখন বুঝি, সমালোচক,
মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে?

বিচারপতি, প্রণাম তোমায়,
একটি কথা জানাই খালি
কাব্য তোমার কথার মালা,
ব্যর্থ তোমার ফুলের ডালি।

নিরন্তর আত্মপীড়নে এমিনেস্কুর শরীর-মনের সমস্ত শক্তি শেষ হয়ে আসছিল। এমিনেস্কুর এক উত্তরসাধকের লেখায় তাঁর মনের সেই সময়কার অস্থির যন্ত্রণার কথা জানা যায়।

—"এক সন্ধ্যায় গেছি তার কাছে। মাথায় লম্বা লম্বা চুলের মধ্যে আঙুল চালাচ্ছেন আর অস্থিরভাবে সারা ঘরে পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন। আমাকে দেখে বলে উঠলেন—আর আমি সহ্য করতে পারছি না। বললাম—কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম নাও না কেন? বললেন—কেমন করে নেব? কোথায় যাব? টাকা নেই, সময় নেই, আর সবচেয়ে বড় কথা, এমন কেউ নেই যার ওপরে কাজের ভার দিয়ে যেতে পারি। কত কাজ আছে। কত কথা বলার আছে, কে নেবে সেই ভার? সেদিন বুঝি নি কেন এই অস্থিরতা, কেন এত দুশ্চিন্তা। বুঝলাম এক সপ্তাহ পরে। কাগজে খবর—মিহাইল এমিনেস্কুর মস্তিষ্ক-বিকৃতি হয়েছে।

অসামান্য ভাবনার বোঝা আর বহন করতে পারল না তাঁর মস্তিষ্ক। নক্ষত্রের জ্যোতিতে মানুষের দেহ গেল জ্বলে। সে হ'ল ১৮৮৩ সাল। এমিনেস্কুর তখন মাত্র ৩৩ বৎসর বয়স। বন্ধুরা তাঁকে চিকিৎসার জন্য পাঠালেন ভিয়েনায়। জনসাধারণের কাছে, ধনীদের কাছে পাতলেন ভিক্ষাপাত্র। সুস্থ হয়ে উঠে সেই গ্লানিই এমিনেস্কুকে পীড়িত করল সব-

চেয়ে বেশী। চিঠি লিখে মিনতি জানালেন এক বন্ধুকে—ক্ষান্ত দাও। আর ভিক্ষা নয়। এ জীবনে আমার রুচি নেই।

তখন জনমতে এসেছে বিতৃষ্ণা। প্রশস্তিতে তখন তিনি বিগতস্পৃহ। সব কবির মতন তাঁরও শেষের বাসনা তখন নির্জন সমারোহহীন মৃত্যু—নিঃশব্দে মিশিয়ে যাওয়া ধরণীর সঙ্গে।

এই সময়ে লেখা তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গান—"আছে শুধু একটি তিয়াষা।"

আছে শুধু একটি তিয়াষা—
প্রদোষের নিঃশব্দ তিমিরে
আমারে মরিতে দিয়ো একা
জনহীন সমুদ্রের তীরে।

শবাধার মোর তরে নয়
পট্টবস্ত্রে নাহি প্রয়োজন
বসন্ত-তরুর শাখা দিয়ে
রচিয়ো আমার আচ্ছাদন।

লঘুগতি সায়াহ্নের চাঁদ
ভেসে যাবে ঝাউবন-শিরে
গাভীদের ঘণ্টাধ্বনি যবে
মিশাইবে শীতল সমীরে।

তখনি পর্বতগাত্রে বুঝি
নির্ঝরিণী উঠিবে আকুলি
নির্জন সমাধি-'পরে মম
ঝরিবে 'তেই'-এর পাতাগুলি।

পুঞ্জীভূত স্মৃতির হিমানী
মৃত্যুর শূন্যতা দিবে ভরি'
সন্ধ্যাতারা উদিবে আবার
কত না রাতের ব্যথা স্মরি'।

আমার বিদায় ব্যথা ভরে
ঝরে নাকো যেন অশ্রুজল
বনান্তের বহিবে বিলাপ
কেয়াক্ষেতের শুষ্ক পত্রদল।

উচ্ছসি উঠিবে দীর্ঘশ্বাস
অশান্ত সমুদ্র-সমীরণে
অখণ্ড নৈঃশব্দ্য মাঝে যবে
মিশে যাব পৃথিবীর সনে।

এক বছর পরে সুস্থ হয়ে কবি দেশে ফিরলেন। আব
এলেন 'ইয়াশ' শহরে। দীপ্তিহীন নক্ষত্রের ভাষাহীন দৃ
দেখে অনুরাগী বন্ধুরা বেদনায় শিউরে উঠলেন। এবা
কবির ভাগ্যে ছিল বাণিজ্য-বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কাজ করে
জীবিকা-নির্বাহ করা। পড়াতে হ'ল ভূগোল আর সংখ্যা
তত্ত্ব। ভিয়েনায় ছাত্রজীবনের নির্বিচার জ্ঞান সাধনার এ
কি সার্থকতা? ক্লান্ত দেহ, সদ্য-রোগমুক্ত মস্তিষ্ক। তা
ওপর অনভ্যস্ত বিষয়ে শিক্ষকতা। আবার পরিশ্রম, আবার
অসুস্থতা। দু'বছর বাদে আবার মানসিক চিকিৎসালয়।
তখন জনসাধারণের আবেদনের ফলে তৎকালীন রাজা ও
রাজসরকার এমিনেস্কুকে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যৎসামান্য
মাসিক ভাতা মঞ্জুর করলেন।

কিছুদিন পরে এমিনেস্কু সেরে উঠলেন। তাঁর
এক বোন তখনও জীবিত। তাঁরই সেবা-শুশ্রূষায় আবার
যেন হারানো শক্তি ফিরে পেলেন কবি। ছাই-চাপা আগুন
নেববার আগে একবার জ্বলে উঠল।

এবারে কবি এলেন বুখারেষ্টে। আবার সংবাদপত্র
সম্পাদনা। এবারে আর কবিতা নয়। জীবনের শেষ
পর্বে কয়েকটি নিবন্ধে এমিনেস্কু লিপিবদ্ধ করে রেখে গেলেন
কাব্য সম্বন্ধে তাঁর চিন্তাধারা। তার মধ্যে অমর করে দিলেন
রুমানিয়ার লোকসঙ্গীতকে।

১৮৮৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে ৩৯ বৎসর বয়সে এমি
নেস্কুর যন্ত্রণাময় জীবনের শেষ হ'ল। রুমানিয়ার কাব্য
সাহিত্যের উজ্জ্বলতম অধ্যায়ে পড়ল সমাপ্তির রেখা।

জীবন ত শেষ হ'ল। শেষ হ'ল যন্ত্রণার। কিন্তু চিরায়
কালের হাতে কি কিছুই থাকবে না? এমিনেস্কু একবা
এক বন্ধুকে চিঠিতে লিখেছিলেন—আমার জীবনের বঞ্চনা
আর অনাহারের গ্লানির দলিল কি রেখে যাব ভবিষ্যকালে
জন্যে? না—আমার সৃষ্টিতে যেন আমার ব্যক্তিগত
সুখদুঃখের ছাপ না পড়ে।

এমন কথা কি রবীন্দ্রনাথও বলেন নি? বলেন নি কি
—'দুঃখের দিনে লেখনীকে বলি লজ্জা দিও না। যে দুঃ
সকলের নয়, তাকে প্রকাশ করো না সকলের কাছে।'

লেখনী তাঁদের লজ্জা দেয় নি। নরদেহধারী কবিদে
ব্যক্তিগত সুখদুঃখ আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। অমর হয়ে
আছে তাঁদের কাব্য।

এমিনেস্কুর স্বদেশ তাঁকে চিনেছে। তাঁর মৃত্যুর পর অপ্রকাশিত বহু কবিতা উদ্ধার করে প্রকাশ করা হয়েছে। আজকের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কনস্তান্তসার সমুদ্র-র আজ স্থাপিত হয়েছে কবির মূর্তি। হয়ত তাঁর আত্মা হয়েছে তাতে। শেষের বাসনা মেটাবার প্রয়াস করেছে দেশের লোকেরা এমনি করে।

আর এমিনেস্কু বেঁচে আছেন অসংখ্য রুমানিয়াবাসীর র খেলায়—তাদের হাসিকান্নার গানে। সেই ত চিরস্থায়ী দলিল।

গানপাগল বাঙালীর কবি তাঁর শেষ পারানির কড়ি নিয়েছিলেন গান। আর গান-পাগল রুমানিয়ার কোলাহলের সাগরের মধ্যে ভাসিয়ে দিয়েছেন গানের সেই গানই তাঁকে কালের সাগর পার করে নিয়ে —

লক্ষ শত তরী যারা
সাগরজলে ভাসল হেলায়
ডুববে কতই মাঝ-দরিয়ায়
ঢেউয়ের দোলায় হাওয়ার খেলায়।

লক্ষ পাখী যাযাবরী
এ কূল হতে ও কূলে ধায়
কতই হবে দিশাহারা
ঢেউয়ের দোলায় হাওয়ার খেলায়।

লক্ষ মানুষ পথ হারাল
আশার কুহক মরীচিকায়
শূন্যে তারাও মিলিয়ে যাবে
হাওয়ার খেলায় ঢেউয়ের দোলায়।

অবুঝ মনের ভাবনা যত
কূল হারাল গানের ভেলায়
বাজবে তারাই অনন্তকাল
ঢেউয়ের দোলায় হাওয়ার খেলায়।

(কবিতাগুলি মূল রুমানিয়ান থেকে লেখিকা কর্তৃক অনূদিত)

———

রায়বাড়ী

গিরিবালা দেবী

"কুতুর কুতুর ময়না, কাল দেব গয়না, আজ দিলাম বায়না।"

তরু প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিয়া কাঠের ঘরের পৈঠায় বসিয়া কুকুর বিড়ালের বাচ্ছাদের আদর করিতেছিল। তাহারা এখন দিব্যি বড় হইয়া উঠিতেছে। মানুষের আদর সোহাগ বিলক্ষণ রূপে বুঝিতে পারে। পারে না নামিতে পৈঠার নীচে। চারিটা বাচ্চা তরুর সম্মুখীন হইয়া হাত চাটিয়া দিতেছে লেজ নাড়িতেছে ভেউ ডাকিতে মিউ তাহাদের বিচিত্র কলরবে সচকিত হইয়া কালজী একবার আসিয়া দেখিয়া গিয়াছে শাবক কয়টিকে।

বিনু তরুর কাছে আসিয়া হাত বাড়াইয়া ছানাগুলিকে আদর করিতে লাগিল।

তরু বিনুর হাত সরাইয়া দিয়া চাপা স্বরে ধমক দিল "এদের ছুঁয়ো না বৌদি। ছুঁলেই তোমার জাত যাবে। নেয়ে শুদ্ধ না হওয়া অবধি তুমি নিয়মের ঘরের বারান্দায় উঠতে পারবে না। তরকারীর জালা ছুঁতে পারবে না বারান্দায় আমার নাকি জাত গেছে। আমিও যাই না ওদের ত্রিসীমানায় মাড়াতে; আমার দরকার কিসের? ওঁরা সারাদিন যা খুট খুট করে তৈরী করেন আমার খাবার ইচ্ছা হ'লে মা'র কাছে চাইলেই পাই। এখন ত তুমি এসেছ আজ থেকে তোমার হাতেও সরাকাঠি পড়বে, তুমিই আমাকে দিও বাপু এটুকু-সেটুকু খেতে।"

বিনু বলিল, "আমি এখন কি কাজ করব তাই ভাবছি, কয়েকদিনের পরে আমার যেন কেমন নতুন নতুন লাগছে।" কামিনীর মা অনবরত ঠেলিয়া ঠেলিয়া রায়বাড়ীর গণ্ডির ভিতরে তাহাকে অনেকটা প্রবেশ করাইয়াছিল, কয়েকদিনের অনুপস্থিতিতে সে গণ্ডির দ্বার যেন বন্ধ বন্ধ লাগিতেছে। তাই বিনু তরুর শরণাপন্ন হইতে আসিয়াছে।

তরু বলে, "বৌদি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? মা চায়ের ঘরে গেছেন, তুমি সেখানে চলে যাও। আজ না তোমাদের পাটাই পুজো। তোমাদের কাজের ঘটা-পটা রয়েছে। দেখ গে ঠাকুমা ঢাক বাজাচ্ছেন পচা [illegible]

বিনু নীরবে পা বাড়াইতেই তরু তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "শোন বৌদি, আর একটা কথা—তুমি তোমার সমস্ত জিনিস আমাদের বিলিয়ে দিয়েছ দেখে মা রাগ করছেন। বললেন, 'ওর বাবা ওকে ভালবেসে যা দিয়েছেন তাতে তোরা ভাগীদার হ'লি কেন?' আমিও শুনিয়ে দিয়েছি, বৌদি ভালবেসে দিয়েছে আমরা নিয়েছি। আমরা ত পর নয়। পরে নেয় কেন? আমাদের জিনিস হ'লে আমরাও বৌদিকে দেব। তুমি কিন্তু রাগ ক'রো না, তোমার বৃন্দাবনী শাড়ীর কথা, ফুলেল তেলের কথা আমিই মাকে বলে দিয়েছি।"

বিনু সে-কথার জবাব না দিয়া চলিয়া গেল চায়ের ঘরে।

ঠাকুমা তখন হাতীর মাথায় বসিয়া গালবাদ্য বাজাইতেছিলেন, "ও পচার বৌ, শোন লো, পচার ত মনে আছে—আজ পাষাণ চতুর্দ্দশী পুজো। কুশ দিয়ে পাঠাই ঠাকরুণ যে তাকে গ'ড়ে দিতে হবে? নাটাইয়ের কনার চাওর-এর কুশ, দেখতে এক রকমই। যে ব্রতী, তাকে উপোষ করে থাকতে হয়। বিকেলে পুজো করে ভোগ দিয়ে কথা শুনে তবে জল খাওয়া। পুরোহিত মন্তর পড়ান বটে কিন্তু যার নামের পুজো তাকেই বসে করবার নিয়ম। ভোগ একটা সাধারণ, মাছ ভাত ডাল তরকারি ভাজা অম্বল। আসল কথা হ'ল পাষাণাকৃতি পিঠে পায়েস ভোগে দিতে হবে।"

মালীবৌ সায় দেয়, "আপনাগো বাড়ীতে পিঠে পায়েস বাদ যায় কবে মাঠান। শীত ক্যাবলি আসিতেছে, শীতভোর নাগাই থাকিবে পিঠা খাওন। আমি ঝাড়-ছড়া দিবার লেগে আইমার কালে দ্যাখ আইছি, বাড়ীওয়ালা কুশা নয়া পাঠাই বানাইতে বসিছে। হইয়া গিলেই দিয়া যাইবে। আপনাগো পূজ্যা ত সেই সাঁজের খনে?"

ঠাকুমা অকস্মাৎ মালীবৌয়ের প্রতি বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "তুই কি কইছিস বৌ, তোর যে 'এক মাঘেই শীত পালায়।' চিরটা কাল করছিস কর্ম্মাছিস, খাচ্ছিস-দাচ্ছিস, তবু ভুল করিস কেনে? রায়বাড়ীতে সাঁঝে আবার পাঠাই হ'য়ে থাকে? দুপুর গড়াস্তে আমাদের [illegible]

আমাদের রাতের পুজোই হ'ত। আমার দিদিশাশুড়ী লোভে পরে বিকেলে করে গেছেন।"

মালীবৌ উঠোন ঝাড় দিতে দিতে চোখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ, তেঁনার বুঝি সখ হইছেল বেলা-বেলি মারন-তাড়ন করিতে?"

"সখ না সখ, নেমন্তন্নের লোভ। সেবার ভূঁইয়া বাড়ীর বড় ছেলের বিয়ের খুব ধুমধাম হয়েছিল। গ্রামসুদ্ধ ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীদের নেমন্তন্ন হ'য়েছিল বৌভাতে। সেদিন ছিল পাষাণ চতুর্দ্দশী ব্রত। শহরের মতন এদেশে তো রাত-বেরাতে ভোজ হয় না। যা হয় দিনে-দুপুরে। আমার দিদিশাশুড়ী নেমন্তন্নে যাবেন বলে বিকেলেই পুজো সেরে রাখলেন। সেই থেকে দুপুরের পরে আমাদের পুজো হয়।"

মালীবৌ হাসে, "এমনি কত্তা শুনি নি মাঠান, আগে-ভাগে পুজ্যা সারি বিয়াবাড়ী যাওন। নেমন্তন্নের খাওনের এত সখ?"

"সেকি খাওয়ার জন্যে, তা নয়। বাড়ীতে কি কম খেত তারা? সকল বাড়ীর বৌ-ঝি এক জায়গায় জুটে, কার কি নতুন গয়না হয়েছে, কে কেমন ভাল শাড়ী পেয়েছে তারই সন্ধান নিতে গাঁ ঝেঁটিয়ে একখানে যাওয়া। একজনার দেখলেই আর একজন এসে কর্ত্তা-দের কাছে বায়না ধরত—'অমুকের তমুক আছে, আমার নেই'।"

মালীবৌয়ের এ-দিকটা ঝাড় হইয়াছিল। সে উত্তর না দিয়া সরিয়া গেল অন্যদিকে।

ঠাকুমা স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। ছোট হোক, বড় হোক একটা অনুষ্ঠান আছে, নাকে সরিষার তৈল দিয়া তিনি ঘুমাইয়া থাকিলে চলিবে কেন? সকলের পিছনে গরু না তাড়াইলে ইহাদের কোন কাজ সিদ্ধ হয়? দাঁত থাকিতে কেউ দাঁতের মর্য্যাদা বোঝে না। ঠাকুমা দাঁতের মর্য্যাদা বুঝাইতে গেলেন ওই দিকে।

এদিকে বিনুও কাজের নির্দ্দেশ পাইয়া বর্ত্তিয়া গেল।

মনোরমা বধূর পিত্রালয়ের আনীত মেঠাই সকলকে ভাগে ভাগে সাজাইয়া চায়ের সঙ্গে খাইতে দিলেন। ভোজনের সময় তরু কোনকালে পিছাইয়া থাকে না। প্রসাদ বাঁটার সময় ঠিক হাজির।

মা দুইখানা রেকাবিতে তরু ও বিনুকে খাবার দিয়া বলিলেন, "বৌমা, তুমি খেয়ে হাত ধুয়ে তরকারি নিয়ে ব'সো গে। কোটাকাটি হয়ে গেলে পুজোর সাজ-নৈবিদ্য ফল কেটে জলপানি সাজিয়ে রাখতে হবে। কামিনীর মাকে বলেছি বড়ভোগের ঘর ধুয়ে-মুছে মাটি দিয়ে পুকুর তৈরি করে বেদী গেঁথে রাখতে। ঐখানেই পুজো হবে, ঐখানে ভোগ বেঁধে দেব।

তরু বলে, "তোমাদের পাটাই বর্ত্ত ঠিক আমার নাটাই বর্ত্তের মত, না মা? তফাৎ, কলার ডাঁটার বদলে কুশের প্রতিমা। ভোগে তারও পিঠে, এর আবার পিঠে, পায়েসের সাথে ভাত-মাছের ভোগ। আমার পুজোয় পুরুত লাগে না, তোমাদের পুরুত এসে মন্তর পড়ায়। তুমি ভোগে কি রান্না করবে মা?"

"যা সাধারণ তাই, তবে পায়েস পিঠে লাগবে। ভাবছি, এক্ষুনি নেয়ে ছোটভোগের ঘরে গিয়ে ভোগ চড়িয়ে দেইগে। এক রান্না দুই জায়গায় করে কি হবে? রান্না করে নারায়ণের ভোগ, পাটাইয়ের ভোগ দুই বাসনে ঢেলে রাখব। পিঠে পায়েস ও-ঘরে হ'লে ওরাও ভোগের পরে মুখে দেবে। ভোগ সেরে এদিকে এসে মাছ আর আতপ চালের এক হাঁড়ি ভাত হ'লেই এদিকের ভোগ হয়ে যাবে'খন।"

বিনু তরুর কানে কানে কি যেন বলিল।

তরু কহিল, "বৌদি, পাটাই পূজোর মাছ-ভাত রাঁধতে চাচ্ছে মা।"

মায়ের মুখে আনন্দের দীপ্তি খেলিয়া গেল। তিনি স্নিগ্ধ স্বরে কহিলেন "উপোস করে যে ভোগ রাঁধতে হয় বৌমা, পরে সারাজীবন ভরে কত ভোগ-রাগ রান্না করতে হবে। আজ তুমি জল খেয়েছ, না খেলেও গোটা বেলা উপোসী থেকে পারতে না, কষ্ট হ'ত। তুমি পাঁচমিশালী একটা তরকারি কোটগে। ছোলা ভেজানো আছে, ছোলা দিয়ে রান্না হবে। পরে আর যা কুটতে হবে আমি বলে দেব। পসারীকে মটরের শাক তুলতে বলেছি, বড়ি দিয়ে শাক-পিঠালি হবে। চালতের অম্বল। পাঁচ পদের ভাজা।"

মনোরমা চায়ের পর্ব্ব মিটাইয়া দিয়া অন্য কাজে চলিয়া গেলেন।

তখনও তরু-বিনুর খাওয়া শেষ হয় নাই। তরু বলে, "বৌদি, তুমি যে মা'র কাছে পাটাইয়ের ভোগ রান্না করতে চাইলে মা যদি স্বীকার হ'তেন তা হ'লে কি করতে? তুমি যে কিছু রান্না জান না!"

"তোমার কাছ থেকে শিখে নিতাম তরু, তুমি আমার চেয়ে ভাল জান।"

তরু প্রসন্ন হইল। উনুনের উপরে কড়ায় চায়ের

জন্য খানিকটা দুধ বসান রহিয়াছে। তরু হাত ধুইয়া সেই দুধ হইতে কয়েক হাতা দুধ পিতলের মগে লইয়া বাহির হইয়া গেল কালজিকে দিতে। কালজিকে প্রচুর দুধ না দিলে তরুর আদরের মাতৃহীনা শিশু দুইটি স্তনদুগ্ধ-বিনে মরিয়া যাইবে।

কামিনীর মা ঘর পরিষ্কার করিতে আসিয়া আহ্লাদে আটখানা। "বৌমা, তুমি নাকি পাটাই পূজ্যার ভোগ রাঁধিতে চাইছিলা, তোমাগো শাউরী খুসী হইয়া কইল আমারে। পরের ঘরে বুদ্ধি খাটায়ে থাকন লাগে মা, এই ত তোমাগো রাঁধন করিতে হইল না, একডা মুকের কতায় কত তুষ্ট হইলেন। তোমার 'নাঠিও ভাঙ্গিল না; সাপও মরিল না।' এমতি বুদ্ধি খাটাইবা পায়ে পায়ে। আচ্ছা বৌমা, সাহস করি যে কইছিলা—যদি সত্যি রাঁধিতে হইত তবে কি করিতা?"

"কি আবার করতাম, তোমাকে নিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখতাম মাসী।"

"হ, পূজ্যার ভোগে আমাগো যাইতে দিইত কি না ঘরে।"

"ঘরে না যেতে জানলায় দাঁড়িয়ে থাকতে বাইরে।"

কামিনীর মা হাসে, "সাবাস বুদ্ধি ম্যায়ার, এবারে বুদ্ধি খুলিচে। এহন বড় হইতেছ, সগল দিকে মাথা খাটাইবা। 'করিলে পরের ঘর, ঘাম দিয়া ছাড়ে জ্বর'।"

দুর্গোৎসবের বড়ভোগের গৃহের মাঝখানে পটাই পূজার জলাশয় তৈরী হইয়াছে মাটি দিয়া, বেদীও মাটির। মণিরাম ভোগের জল তুলিয়া চাল ধুইয়া ভোগের আয়োজন করিয়া রাখিয়াছে। বিনু নিয়মের পূজার সাজ-নৈবিদ্য-জলপানি গোছাইয়া রাখিয়া তরুর সহিত ক্ষুদ্র পুকুরের পাড়ে ও বেদীর ওপরে আলপনা দিতেছিল।

বিনু তরুকে শিখাইতেছিল তরুলতা ও কলমিলতা আঁকা। বিনু স্নানান্তে খেজুরছড়ি শাড়ীখানা পরিধান করিয়াছে, তাহাকে মানাইয়াছে চমৎকার।

ছোটভোগের ঘরে তুমুল সমারোহ তখন শেষ হয় নাই।

এমন সময় লবঙ্গ একটা বোনা হস্তে উপস্থিত হইল বিনুদের নিকটে। লবঙ্গ বোনা-সেলাইয়ের ওস্তাদ। লোকে তাহার শিল্পকলা দেখিয়া ধন্য ধন্য করে। লবঙ্গ মেনীর গায়ের একটা উলের জামা আরম্ভ করিয়াছে। প্যাটার্ণ যুঁই ফুলের ঝাড়।

বিনু একখানা খবড়ি পিঁড়ি পাতিয়া আহ্বান করিল, "আসুন পিসিমা, বসুন, কি সুন্দর আপনার বোনা হচ্ছে।"

তরু লোলুপ দৃষ্টিতে বারেক বোনার দিকে তাকাইয়া বলে, "বৌদির আলপনা দেখেছেন পিসিমা? কি সুন্দর কলমিলতা তরুলতা দিয়েছে। তরুলতা আমাকেও শিখিয়ে দিয়েছে। এই ধারের লতাটা আমি দিয়েছি কিন্তু বৌদির মত সোজা হয় নি।"

"ক্রমেই হবে। প্রথমে সকলের হাতে বাঁকা-চোরা হয়। তুই নিজেই তরুবতী, তোর আবার তরুলতা আলপনা! মেনীর জন্যে শীতের জামাটা বুনতে নিয়েছি। মনে হচ্ছে কাঠ-গোলাপ রংএর উল যা আমার আছে তাতে কুলোবে না। বৌয়ের বাক্সে দেখেছিলাম বাণ্ডিল বাণ্ডিল উল। ও ত বুনতে জানে না, শুধু শুধু নষ্ট হবে। চল না বৌ, চট করে তোমার উলের সঙ্গে আমারটা মিলিয়ে দেখিগে।"

বিনুর আলপনা শেষ হইয়াছিল, সে উঠিয়া লবঙ্গর সহিত যাইতে উদ্যত হইল।

তরু বাধা দিল, "বৌদি, তুমি এখন শোবার ঘরের আলমারি বাক্স খুললে সেজদি তোমাকে পূজোর কাজে হাত দিতে দেবে না। আমি নতুন কাপড় জলে না ধুয়ে পরেছি বলে আমাকে কিছু ছুঁতে দিচ্ছে না। মা বলেছেন আলপনায় দোষ নেই, তাই আলপনা দিচ্ছি। কাঠগোলাপী উল বেড়ার বন্দরে নাকালিকায় বন্দরে ঢের পাওয়া যায়, সেজদি কার্পেট বুনছে কত রং-বেরংএর উল আনিয়ে।"

লবঙ্গ ক্ষুন্ন হইয়া বলিল, "তা হ'লে এখন আমি চলি। বিকেল বেলা ত তোমাদের পুজো-অর্চনা। রাতে আবার রং ঠাওর করা যায় না। কাল দুপুরে আসব।"

লবঙ্গ চলিয়া গেলে তরু বিজ্ঞের মত গম্ভীর মুখে বলিল, "বৌদি, তুমি বড় বোকা। তোমার উল নেবার ফিকিরে আসা হয়েছিল। সেজদি ত তোমার জিনিস নেবে না। ওর ভারী হিংসুটে স্বভাব। সেজদি এলে তাকে দিয়ে বুনিয়ে নিলেই হবে। আচ্ছা বৌদি, তুমি বোনা শেখো নি, তবু তোমার বিয়ের সময় বোনার বাক্স দিয়েছিলেন কেন? তুমি যদি জামা বুনতে জানতে তা হলে মেনীর মত আমারও হ'ত।"

বিনু ধীরে বলে, "জামা আমিও জানি তরু, কিন্তু যুঁই ফুল জানি না। কল্কিপাতা, ঝিনুক বরফি এই সব।"

তরুর দীঘল চোখ আনন্দে জ্বল জ্বল করিতে লাগিল, 'তুমি যদি এত সব জান বৌদি, তবে বোন না কেন? তাই ত বলি. বোনা না জানলে ওঁরা বেতের

বোনার বাক্স ভরে কাঁটা হাড়ের কাঁটা কুশ কাঠি সূচ সুতো কাঁচি রাজ্যের পশম দেবেন কি কারণে? তুমি আমাকে কফিপাতা জামা করে দিও। কতদিন লাগবে তোমার? মেনীর জামা হবার আগে পারবে ত?"

"খুব পারব, বুনলে আবার ক'দিন? তুমি কি রং ভালবাস সেটা আজ ঠিক করে দিও, আমি আজ থেকেই সুরু করে দেব।"

"তোমার চাবি কোথায় বৌদি, আমি আলমারি খুলে উলের রং ঠিক করিগে। বিছানার নীচে চাবি রেখে দাও কেন? ওটা ভারি খারাপ। যার ইচ্ছে সেই হাতিয়ে বের করে নিতে পারে সব। বৌ-মাহুষের আচলে চাবি রাখলে ঘোমটার কাপড় সরে যায় না। আমি আঁচলে চাবি রাখতে খুব ভালবাসি। সেই জন্যে মা আমাকে এক গোছা রূপোর চাবি গড়িয়ে দিয়েছেন।"

"আমার দাদামশাই আমাকেও রূপোর রিংএর বারটা রূপোর চাবি গড়িয়ে দিয়েছিলেন আমি তা আকাশিকে দিয়েছি। একখানা হাত ওর অবশ বলে কাপড় এলোমেলো হয়ে যায়। ওর মা কোমরে এঁটে কাপড় পরিয়ে পিঠে চাবি ঝুলিয়ে দেন, এখন কাপড় ঠিক থাকে।"

"তুমি বড় উড়নচণ্ডী বৌদি, বারো বারোটা রূপোর চাবি একজনাকে দিয়ে দিলে? কেউ ভালবেসে কিছু দিলে সমস্তই কি ধরে দিতে হয় অন্যকে? তোমার এ স্বভাব ভাল না বাপু?"

বিনুর আর জবাব দেওয়া হইল না। মনোরমা ওদিকের কাজ সারিয়া এদিকে আসিলেন।

সপ্রশংস নেত্রে আলপনা নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন "বৌমা বুঝি আলপনা দিয়েছে, দিব্যি হয়েছে। তুই ওর কাছ থেকে শিখিস তরু?"

তরু সোৎসাহে বলে, "তাই শিখছি মা, বৌদির দেখে এদিকের তরুলতা আমি দিয়েছি। দেখ মা, একটা কথা, কেউ আমার নাম জিজ্ঞেস করলে এখন থেকে তুমি কখনো বলতে পারবে না "তরুবতী"। বতী শুনে আমার ঘেন্না করে, এখন থেকে আমি তরুলতা হ'লাম।"

মা হাসিতে হাসিতে ভোগ চড়াইয়া দিলেন।

বিনুকে বলিলেন, "পূজোর সব এখানে সাজিয়ে এনে রাখ বৌমা। রেখে যাও ছোটভোগের ঘরে, ওঁরা এখন খেতে বসবেন।"

রাত হয়েছে। আজ খাওয়া-দাওয়া মিটে গেছে তাড়াতাড়ি।

যথাসময় পুরোহিত আসিয়া পাষাণ চতুর্দ্দশীর পূজা করাইয়া গিয়াছেন মনোরমাকে দিয়া। এ পূজায় ঢাক ঢোল বাজে না। শঙ্খ-ঘণ্টা ও উলুধ্বনিতেই পার্ব্বণ সমাধা হয়। সারাদিন উপবাসের পরে মনোরমা সন্ধ্যা হইতে-না-হইতেই ছেলে মেয়ে বৌকে লইয়া প্রসাদ খাইয়া উঠিয়াছেন।

কর্ত্তা রাত্রে ভাত খান না। প্রচুর গাওয়া ঘৃতে ময়ান দেওয়া আটার রুটি, ক্ষীর ও দুই-একটা মিষ্টি খাইয়া থাকেন।

আজ তাঁহার খাবার শয়নগৃহে ঢাকা পড়িয়াছে। নিয়মের ঘরে দুধেরও তেমন হাঙ্গামা ছিল না। পনের আনা দুধের পায়েস পিঠা হইয়াছে। বাকী দুধ বিনু জ্বাল দিয়া ক্ষীর করিয়া রাখিয়া দিয়াছে।

ঠাকুমা এখন বচন ঝাড়িতেছেন বিনুর গৃহের সিঁড়িতে বসিয়া। ছেলের ভয়ে সন্ধ্যার পরে হাতীর সিংহাসনে আসন পাড়িতে পারিতেছেন না। অগ্রহায়ণ মাস যায়, উত্তুরে বাতাসে শীতের আমেজ দিতেছে। খোলা বারান্দায় রাতে মাকে বসিয়া থাকিতে মহেশবাবু নিষেধ করিয়াছেন। সে নিষেধ ঠাকুমা সম্পূর্ণ পালন না করিলেও কিছু কিছু মানিতে হয়। তিনি বিলক্ষণরূপে জানেন তাঁহার পুত্রের অন্তঃপুরে গতিবিধির সময়।

ছোট ঠাকুমা মালা জপিতে বসিয়াছেন তাঁহার ছোট-ভোগের ঘরে। সরস্বতী পাতলা একটা পশমের গায়ের কাপড় গায়ে জড়াইয়া গড়াইতেছে নিয়মের বারান্দার বেঞ্চিতে। সুমন্তকে লইয়া মনোরমা শয্যা লইয়াছেন।

রন্ধনশালায় পাচকরা দাসদাসীদের হাঁড়ি হাঁড়ি ভাত রান্না করিতেছে। মালীবৌ তাহাদের দুই স্বামী-স্ত্রীর পাওনা এক গামলা প্রসাদ লইয়া গিয়াছে। প্রসাদ আছে প্রচুর, শুধু ভাত হইলেই দাসদাসীরা রাতের আহার মিটাইতে পারে।

কামিনীর মা ঠাকুমার অনতিদূরে প্রদীপের সলতে পাকাইতে নিমগ্ন। নিয়মের দিকে শূদ্রাণী দাসীর সলতে অচল। চলের সলতেও কম নয়। রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত হলঘরে তেলের প্রদীপ জ্বলে। তাহার পরে তেলের সন্ধ্যাপ্রদীপ দেখাইতে হয় প্রতি ঘরে। মণ্ডপের ও তুলসীতলায় বেলতলায় প্রদীপ দিতে হয় রায়-রঙ্গিণীদের।

বিনু-তরু ঘরের নিভৃতে আলোর সামনে ঘনিষ্ঠ হইয়া বসিয়াছে।

ঠাকুমা আক্ষেপ করিতেছেন, "শোন রাজেশ্বরী, আজ আমার [illegible] জন্মতিথি। চতুর্দ্দশী ছেড়ে [illegible]

পূর্ণিমা লাগল, তখুনি শাঁখ বেজে উঠল সূতিকা-ঘরে। কর্তার কাছে খবর গেল পূর্ণিমায় তাঁর বংশের প্রথম 'পূর্ণচন্দ্র' উদয় হয়েছে।

কর্তার গায়ে ছিল দামী শাল, যে খবর দিয়েছিল তখনই তিনি তাকে শাল খুলে দিলেন, হাতের আংটি খুলে দিলেন। তার পরে ঝি-চাকরদের কি দেওয়া-থোওয়া। টাকার বৃষ্টি করে ফেলেন। কলসী থালা ঘটি উজার করে দিলেন। সেই দণ্ডে লোক ছুটলো বন্দরে বন্দরে। গামলা গামলা রসগোল্লা সন্দেশের ছড়াছড়ি। পাড়ায় পাড়ায় থালা থালা মিষ্টি বিতরণ। খবর পেয়ে ঢোলওয়ালারা ছুটে এসে ঢোল-কাঁসিতে ঘা দিলে। বস্তা বস্তা কাপড় পেল সকলে। আমার সেই পেসাদ।"

ঠাকুমা ক্ষণেক মৌন হইয়া রহিলেন।

কামিনীর মা পায়ের হাঁটুতে সলতের পাক দিতে দিতে বলে, "মাঠান, নাতি আপনাগো কি ভাগ্যিমানী, এমতি দিনে জন্ম হয় যার সে হয় লক্ষীমন্ত। রায়-বাড়ীতে জন্মতিথির পূজ্যা-পাল নাই, কিন্তুক দাদাবাবুর জন্মদিনে এমতি পূজ্যা হইয়া যায়। পুরুত ঠাকুর আসেন, খাওন-দাওনের ঘটা হয়। পরাণ ভরে সগলে পিঠা পায়েস খায়। এডা কম কতা নাকি?"

ঠাকুমা ক্ষুণ্ণ স্বরে বলেন, "সবই ত হয় রাজেশ্বরী, কিন্তু আমার সোনার চাঁদের মুখে যে এর এতটুকুও যায় না। এই দুঃখে আমার মন অস্থির করে। সে যে জায়গায় রইছে সে-দেশে নাকি এমন খাবার দেব্যজাত মেলে না। কলের জল দিয়ে পেট ভরাতে হয়? তার ঘরে জিনিসের হেলাফেলা, সে আমার কিছু পায় না।

'ছাড়িয়া অযোধ্যাপুরী রাম করে বনবাস,
চোদ্দ বছর পরে হবে ফের তার পরকাশ'।"

কামিনীর মা রাগ করে, "ছিঃ মাঠান, কি কইচো? এই ত পূজ্যার কালে দাবাবু আইসি থাকি গ্যাল এক মাস, ফের ছুটি পাইলেই আসিবে। তুমি যত না ভাবন কর আসলে কলকেতা ত্যামতি নয়। বন্দরের কুণ্ডুরা ত আমাগো জাতভাই, তারা বেবসা করি খায়। মাসের মধ্যে সাড়ে সতেরবার যায় কতকেতায় মাল আনতে। সে ত্থাশের খাজাগজা বাণ্ডিল ভরি ভরি আনেঁ, ছাওয়াল ম্যায়ার লাগি। খাইতে খুব সোন্দর। দাবাবু ত দিবারাত তাই খাইচে। না খাইয়া থাকনের বান্দা রায়বাড়ীর ছাওয়াল লয়। যে ত্থাশের যে দেব্য। তার নেগে দুখু ক্যানে?"

"দুঃখ যে কেন, ঠাকুমা সেটা কামিনীর মাকে বুঝাইতে

পারিলেন না। গলা বাড়াইয়া তাকাইলেন ঘরের ভিতরে।

আলোর সামনে বসিয়া তাঁহার আদরের মণিবালা কি করিতেছে। লম্বা সাদা দুইটা কাঠি, কোলের উপরে এক গোছা নীল রংএর পশম। নিকটে তরু, পুলকে যেন কদম কেশর।

আজ তরুর ঘুম নাই চোখে। লোকে যে বলে 'গরজ বড় বালাই'। তরুর গরজ বেশি, মেনীর আগে সে পশমের জামা গায়ে দিয়া সকলকে তাক লাগাইয়া দিতে চায়। মেনীকে সে ভালবাসিলেও রেষারেষি ভীষণ। সেই রেষারেষির ফলে বিনুর অনেক কাজ তরু করিয়া দিয়া বিনুকে বুনিবার সুযোগ দিয়াছে।

ঠাকুমা বলিতেন, "বিনুর আমার কলের হাত। কাজ হাতে লইলে নিমেষে সারা হয়।"

এ নিমেষে শেষ হইবার কাজ নয়। তবু ফাঁকে ফাঁকে বুনিয়া বিনু তরুর জামা অনেকটা করিয়া ফেলিয়াছে। কফিপাতা প্যাটার্ণ হাড়ের কাঠির বুনানি, অল্পেই বাড়িয়া যায়। তরু নীল রং পছন্দ করিয়া সেই বাণ্ডিলটা রাখিয়া অন্য পশমগুলি কোথায় যেন সন্তর্পণে সরাইয়া রাখিয়াছে। যাহাতে লবঙ্গ তাহার সন্ধান না পায়। তরুর উপস্থিত বুদ্ধিতে বিনু কৌতুক বোধ করে। এইটুকু মেয়ের কি বুদ্ধি, যেন ধানী লঙ্কা! ইহাদের মাথায় এতও আসে। রায়বাড়ীর মেয়ে—অ-রায়বাড়ীর মত ভোঁতা মাল নয়। রাত দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে তরু ঘুমাইতে গেল। ধীরে ধীরে সারা বাড়ী নিঝুম হইল। ছোট ঠাকুমা লেপ মুড়ি দিয়া নাক ডাকাইতে লাগিলেন।

বিনু তখনও শয্যা লইতে পারিল না। তাহার যে 'দুই নৌকায় পা'। এক নৌকা সামাল দিলে অন্য নৌকা সরিয়া গেলেই সলিলে পতন। প্রসাদকে চিঠি লিখিতে হইবে।

বিনু আলো আড়াল করিয়া জাগিয়া স্বামীকে চিঠি লিখিতে লাগিল। তাহার সহিত জাগিয়া রহিল পূর্ণিমার চন্দ্র। শুধু জাগিয়া রহিল না, বাতায়ন-পথে শুভ্র কিরণ-রেখার অঞ্জলি ঢালিয়া দিতে লাগিল বিনুর সর্ব্বাঙ্গে।

পুণ্য পৌষ মাস। সকলে বলে লক্ষ্মীমাস। এ বাড়ীতে বারমেসে লক্ষ্মীপুজো নাই। পৌষ মাসের চারিটা বৃহস্পতি বারে নতুন ধানের খাইল ও ক্ষীরের নাড়ু দিয়া লক্ষ্মীর ঝাঁপির নিকটে বসিয়া লক্ষ্মীর ব্রতকথা বলিতে হয়। উলু দিয়া ঝাঁপি নামাইতে হয়, তুলিয়া রাখিতে হয়। লক্ষ্মীর ঝাঁপিকে [illegible] লক্ষ্মীর কাঠা বলে।

ছোট একটা বেতের ধামার সারা গায়ে সিঁদূরের ফোঁটা। তাহার ভিতরে থাকে আয়না চিরুণী শাঁখা সিঁদুর শঙ্খ পাতা আলতা, আর সিঁদুরমাখা রাশি রাশি ছোট-বড় কড়ি, সমুদ্রের ঝিনুক। পট্টবস্ত্রের টুকরা দিয়া ধামার মুখ ঢাকা থাকে। ইনিই হইলেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। লক্ষ্মীপূজায় চিত্রিত লক্ষ্মীর আসনে আগে লক্ষ্মীর ঝাঁপি স্থাপন করিয়া ঘটে-পটে পূজা হয়।

বিনুর শয়নগৃহের বারান্দা গোবরজল দিয়া ধুইয়া-মুছিয়া রাখা হইয়াছে। নবীন ধানের দুইটা বাইল আনিয়া রাখিয়াছে।

মনোরমা লক্ষ্মীর কাঠা সেইখানে নামান মাত্র ঠাকুমা উলু দিতে লাগিলেন। তাহার পরে ক্ষীরের নাড়ু দিয়া অনুচ্চস্বরে লক্ষ্মীর কথা বলা হইল। এ ঘটার কিছু নহে। কেহ লক্ষ্মীর কথা শুনিতে আগাইল না। ঠাকুমা পুত্রবধুকে সচেতন করিতে আপনার মনেই আরম্ভ করিলেন, "পৌষ মাসের চারটা বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মীর কাঠাকে চারটে কথা শোনাতে হয়, কুকুর পিঠে, তিলের ফুল, বামুন-বামুনী, পুকুর কাটা—এই চারটে কথা। এ মাসে আমাদের পাটাইয়ের কোলের করা আছে। হয় লোটিন দিয়ে কথা শুনে ছয় আনাজের ঝোল দিয়ে একবেলা নিরামিষ খাওয়া। বারমেসে ষষ্ঠী নেই আমাদের, আর সেই জষ্ঠিমাসে আমষষ্ঠী। পৌষ পার্বণের আগে সকলে জিরিয়ে সাধিয়ে নিক। মাঘ মাসে আবার নানান খানা।"

ঠাকুমার অজস্র বকুনির মধ্যে তরু সগর্ব্বে উপস্থিত হইল। তাহার চোখে-মুখে পুলক যেন উছলিয়া পড়িতেছে। তরুর গায়ে ঘন নীলবর্ণের সদ্য-বোনা গলাফ কোট। কোটের হাতে গলায় ঝুলে কাঠগোলাপী রঙের ছোট ছোট ঘুন্টি বসানো। যে কাঠগোলাপ রঙের বোনার সূত্রপাত হইয়াছিল নীলের গায়ে তাহার কত বাহার খুলিয়াছে।

তরু উজ্জ্বল মুখে বলে, "ঠাকুমা, ভাল করে চেয়ে দেখ আমাকে কেমন দেখা যাচ্ছে? বৌদি বুনে দিয়েছে। কত প্যাটার্ণ জানে। চুপ করে ঘোমটা দিয়ে থাকে বলে সকলে পাড়ায় পাড়ায় বলে বেড়ায়, 'বৌ কিছু জানে না, গবা।'"। তরু নিয়মের ঘরের দিকে তাকাইল। যেখানে সরস্বতী কি যেন কাজ করিতেছিল।

ঠাকুমা হাত বাড়াইয়া তরুর জামার ঘুন্টিগুলিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, "বাঃ, দিব্যি হয়েছে। আহা, আমার মণিমালার কত যোগ্যতা। আমি কি এমনি ওর মণিমালা নাম থুইচি। তোর জামাজোড়া গায়ে দিয়ে বেশ দেখা যাচ্ছে তন্যি, তুই নীরদবরণ সেজেছিস?"

মনোরমা লক্ষ্মীর কাঠা যথাস্থানে তুলিয়া রাখিয়া মেয়ের গায়ের জামা দেখিয়া পুলকিত হইলেন।

এমন সময় সুমু আসিয়া বিনুকে জড়াইয়া ধরিল, "বউদি, আমাকে দিলে না নতুন জামা, লাল টুকটুকে?"

বিনু তাহাকে আদর করিয়া কানে কানে বলিল, "এবার তোমাকে দেব সুমু। তুমি লক্ষ্মী ছেলে, তোমাকে সুন্দর জামা করে দেব।"

তরু ছুটিয়া গেল সকলকে জামা দেখাইতে। মেনীর জামা এখনও শেষ হয় নাই। মেনীর আগে তরুর অঙ্গে নূতন জামা উঠিয়াছে এ গৌরব যে সীমাহীন।

কামিনীর মা পাথরকুচি গ্রামের মেয়ের অপটুতায় এতদিন ম্লান হইয়াছিল। এখন তাহারও বলার সময় আসিতেছে। বরাবরই সে স্নেহের সহিত, সহানুভূতির সহিত বিনুর দোষ-ত্রুটি ঢাকিয়া রাখিতে ব্যগ্র। সে সামান্য দাসী হইলেও তাহার হৃদয় আছে। এবার বিনুকে আনিতে গিয়া সেই স্নেহ-নদীতে জোয়ার লাগিয়াছে।

বিনুর মা তাহার হাত ধরিয়া মাথার দিব্য দিয়া বলিয়াছে বিনুর তত্ত্বাবধান করিতে। ঠাকুমা তাহাকে একজোড়া ধুতি, পাঁচটি টাকা পারিতোষিক দিয়াছেন। সেখানে সামান্য দাসী হইয়া সে যে আদর-যত্ন পাইয়া আসিয়াছে, রায়বাড়ীতে সেটা দুর্লভ। কামিনীর মা অকৃতজ্ঞ নয়।

সে ঠাকুমার কথায় সায় দিল, "যা কইলে মাঠান, বৌ তোমাগো দিব্য হইচে। আহ্লাদি ম্যায়া মাসের মধ্যে সাতবার করি কাকেতায় থাকিছে, গাঁয়ের কাজ-কামে যুত করিতে পারে নাই। এহন দ্যাখন-শুননে শিখা লইবে সব। হাতে পায়ে কাজ য্যান নাগেনা। এই ধরিছে, এই সারিছে। বড় খর কর্ম্মা ম্যায়া।"

খরকর্ম্মা মেয়ে লজ্জায় সেস্থান হইতে পলায়ন করিল নিজের নিভৃত গৃহে। এখানে আসিয়া এ পর্য্যন্ত বোনা লইয়া একদিনও সে হাতের লেখা লিখিতে পারে নাই। এবার সে সংকল্প করিল সকল কাজের ভিতরে এবার সে খাতার পাতা ভরাইয়া রাখিবে।

খেয়ালী বিনুর সময়ের জ্ঞান কম, তখনই সে বসিয়া গেল হাতের লেখা লিখিতে। সংস্কৃত প্রথম ভাগ খানা সে মাথায় ঠেকাইয়া সযত্নে তুলিয়া রাখিল তাহার পাঠ্য-পুস্তকের সহিত। বাবা দিয়াছেন, বাবার হাতের লেখা জলজল করিতেছে শ্রীমতী বনলতা দেবী।

বাবার হস্তাক্ষর নিরীক্ষণ করিয়া বিনুর দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। একে একে মনে পড়িতে লাগিল তাহার পনের দিনের জীবনযাত্রারার ইতিহাস। ভুলিয়া থাকিতে চাহিলেই কি ভোলা যায়? জীবনের সহিত যাহারা জড়িত হইয়া আছে তাহাদিগকে হৃদয় হইতে কিরূপে মুছিবে বিনু? অদর্শনে তাহারা ক্ষীণপ্রভ তারকার মত হৃদয়াকাশে অস্পষ্ট হইয়া অন্তরাল রচনা করে থাকে, কিন্তু অন্তর্হিত হয় না।

তরু গায়ের জামা দেখাইতে পাড়া প্রদক্ষিণ করিয়া আসিল। এই অসময়ে বিনুকে খাতায় হাতের লেখা লিখিতে দেখিয়া তরুর বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

তরু প্রশ্ন করিল, "বৌদি, এখনও তুমি নাইতে যাও নি? বাড়ীর সবাই নেয়েছে শুধু আমি বাকী।"

বিনু অম্লান বদনে বলিল, "আমি তোমার সঙ্গে নাইব বলে বসে রয়েছি। এখন ত কাজকর্ম্ম পাতলা হয়ে গেছে। হবিষ্যি ঘরে করবারই বা কি আছে?"

"কি যে বলো বৌদি, তোমাদের এ-বাড়ীতে মেজদি নতুন কাজের পত্তন করে চেল্লাতে থাকে। ক'দিন তুমি আমার জামা বোনাতে একটু ঢিল দিয়েছিলে সেই আক্রোশে দাপিয়ে মরচে। যেমন আমার মেজদি তেমনি হয়েছে তার সঙ্গী সাথীরা। আমার গায়ের জামা দেখে লবঙ্গ পিসীর মুখ চুণ। উনি ছাড়া আর যদি কেউ কিছু করে দেখতে পারে না। উল না পেয়ে রাগে ফুলছে।"

"তুমি কোথায় উল লুকিয়ে রেখেছ তরু, তার থেকে আমাকে লাল টুকটুকে দেখে এক বাণ্ডিল বের করে দাও। আমি আজ দুপুর থেকেই সুমুর জামা সুরু করে দেব।"

তরু খুশী হয়, সুমু ছোট্ট, তাকে ত আমার আগেই করে দিতে হত বৌদি। দেখ, একটা ভাল কাজ করলে হয়, তুমি বসে বসে সুমুর জামা বোন, আমি নেয়ে-ধুয়ে তসরের শাড়ী পরে নিয়মের কাজ করে দেই।"

"তুমি ত আমার অনেক কিছু করে দিচ্ছ তরু, তুমি ছোট, তোমার সাধ্যি নেই ক্ষীর ছানা সন্দেশ করতে। সুমুর হাতকাটা সোয়েটারে বেশি সময় লাগবে না। চল, আমরা নেয়ে আসি। তরু গায়ের কোট খুলিয়া চুল খুলিতে বসিল। এই জামা উপলক্ষে তরুর সহিত বিনুর একটা হৃদ্যতা জন্মিয়াছে। মুখরা তরু বিনুকে বসাইয়া রাখিতে চাহেন, নিয়মের কাজের মধ্য হইতে ছলছুতায় বাহিরে টানিতে চাহে। কিন্তু টানিবে কাহাকে? সে গোলকধাঁধায় একবার প্রবেশ করিলে কাহার সাধ্য খুঁজিয়া বাহির করে।

সম্প্রতি তরু হইয়াছে রায়বাড়ীতে অপাংক্তে অস্পৃশ্য। কুকুর-বিড়ালের শাবক চারটি ইহার কার তাহারা এখন কাঠের ঘরের পৈঠা ডিঙ্গাইয়া আনা কানাচে অলনে খেলিয়া বেড়ায়। খুঁটিয়া খাই শিখিয়াছে। তরু হাট হইতে পিতলের ঘুঙুর আনা বাঁধিয়া দিয়াছে তাহাদের গলায়। তাহারা নড়ি চড়িলে ঝুম ঝুম শব্দে বাজে।

এখন আর কালজিকে বাটি বাটি দুধ খাওয়াইতে না। বাচ্চা কয়েকটা দুধের বাটি ধরিয়া দিলে নিজের চুক চুক করিয়া খায়।

দুধ অপরিয্যাপ্ত, কে তাহার হিসাব রাখে। বাড় গাভীরা কলসী কলসী দুধ দিতেছে, বাজারের দুধ পয়সা চারি পয়সার উর্দ্ধে দাম ওঠে না। তখনকার লোকে অনায়াসে দুধে স্নান করিতে পারিত।

তরুর পোষ্যরা দুধে স্নান না করিলেও প্রচুর খাইতে পায়। দুধে-মাছে এক একটা হইয়াছে নধ কান্তি। কিন্তু 'স্বভাব যায় না মলে', সাহেব বিবির লম রন্ধনশালায়, কেহ আহারে বসিলে সেইখানে উপস্থি হইয়া লেজ ফুলাইয়া ঘুর ঘুর করিবে, মিউ মিউ ডাকিবে বাদশা বেগম সাথীদের অনুকরণ করিতে গিয়া অবিরত তাড়া খায় "দূর দূর ছাই ছাই।" তাহাদের আস্তান আস্তাকুঁড়ে।

চিরকাল ইহাদের বিড়ালরা শুচি আখ্যা পাইয়া নিয়মে ঘর ও ভোগশালা বাদে গোটাবাড়ী বিচরণ করিয় বেড়াইত। কিন্তু এখন তাহাতে নিষ্ঠাবতী সরস্বতীর মহা আপত্তি। কুকুরের দুধ খাইয়া যে বিড়াল জীবনধার করিয়াছে, তাহার বিড়ালত্ব কোথায়! সে কুকুর হইয় গিয়াছে।

তরুর মহা মুশকিল, ওই বিছানা ছুঁইয়া দিল, রান্নাঘরে ঢুকিল। নিয়ম-কক্ষের সিঁড়িতে বসিয়া আছে। তার বাহির মহলে চালান করিয়াছে, দূর দূর ছাই ছাই।"

পোড়ারমুখো কুকুর-বিড়াল শাবক কিছুতেই বাহিরে যাইয়া থাকিতে চায় না। ঘুরিয়া-ফিরিয়া সেই অন্দর মহলে। সেইজন্য তরু বৌদির প্রতি সদয় হইলেও কাজে সহায়তা করিতে পারে না।

ক্রমশঃ

ভাষাচার্য হরিনাথ দে

(১৮৭৭—১৯১১)

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

াচর্চায় অপূর্ব প্রতিভার জন্ত হরিনাথ দে-র নাম
ীয় হয়ে আছে। এমন বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত সব
শই দুর্লভ। বিশেষ সেকালের আমাদের দেশে। এ
য়ে তাঁর স্থান শুধু বাংলায় নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে
ন্থ ছিল। পৃথিবীর নানা ভাষায় তাঁর অধিকারের
া প্রবাদ বাক্যের মতন প্রচলিত হয় তখনকার যুগে।
ংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তানরূপে তিনি
রিগণিত হন। এত বিভিন্ন ভাষায় তিনি ব্যুৎপন্ন ছিলেন
বং এত অল্প বয়স থেকে নানা ভাষাগোষ্ঠীর অনুশীলন
রম্ভ করেন যে, তিনি এক আদর্শ দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন
ই বিশেষ ক্ষেত্রে।

বিদেশী ও স্বদেশী যে-সব ভাষায় আচার্য হরিনাথ
তিত্ব অর্জন করেছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখ্য হ'ল
-ল্যাটিন, গ্রীক, হিব্রু, ফরাসী, জার্মাণ, রুশ, স্পেনীয়,
ালিয়ান, মিশরী, চীনা, আরবী, ফারসী, উর্দু,
স্কৃত, পালি, প্রাকৃত, মারাঠী, হিন্দী, উড়িয়া প্রভৃতি।
তাছাড়া, বর্মী, সিংহলী এবং সায়ামী (শ্যামদেশীয়)
নায় তাঁর প্রাথমিক জ্ঞান ছিল। তিব্বতী ভাষাও তিনি
খতে আরম্ভ ক'রে খানিকদূর অগ্রসর হয়েছিলেন,
ু তা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করবার অবকাশ পান নি।
কস্মিক মৃত্যু অপূর্ণতার ছেদ টেনে দেয় তাঁর জীবনে।
মাত্র ৩৪ বছরের সংক্ষিপ্ত আয়ু! তার মধ্যেই এত
া আয়ত্ত করে জ্ঞান-প্রবীণ হয়েছিলেন।
পাঁচটি ভাষায় হরিনাথ এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন
জীবনে। ল্যাটিন, গ্রীক, পালি ও সংস্কৃতে দু'বার
বৈদিক সংস্কৃত ও সংস্কৃত সাহিত্য।
তাঁর আর এক স্মরণযোগ্য পরিচয় হ'ল—বর্তমান
নাল লাইব্রেরীর পূর্বরূপ ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর
ন প্রথম এবং দ্বিতীয় গ্রন্থাগারিক। মৃত্যুর
, কর্মজীবনের শেষ ৪ বছর তিনি এই পদে প্রতিষ্ঠিত
ক বিদ্বৎ-সমাজে সুপরিচিত ছিলেন।
বিভিন্ন গোষ্ঠীর, বিশেষ বিদেশী ভাষার অনুশীলনে
নাথের প্রতিভার সম্যক্ ধারণা করা যায় সে-যুগের
প্রেক্ষিতে বিবেচনা করলে। তাঁর স্থান-কালের
ভূমিতে স্থাপন না করলে তাঁর ভাষাকৃতির মর্যাদা
সঠিক দেওয়া যাবে না। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-উত্তর
এবং যন্ত্রসভ্যতার যানবাহন ইত্যাদি সংক্রান্ত অগ্রগতির
এই দিনে সুদূর দেশ, জাতি তাদের ভাষা, সংস্কৃতি
নিয়ে হয়েছে অতিনিকট। বিদেশে যাতায়াত তথা
ভাবের ভাষার আদান-প্রদান, পারস্পরিক সংস্পর্শ ও
সহযোগিতা এবং ভারতের প্রদেশে প্রদেশে ঘনিষ্ঠতা
অভাবিত বৃদ্ধি পেয়েছে। দূর বিদেশ আজ প্রতিবেশী
এবং প্রদেশগুলি আত্মীয়ের মতন অতি পরিচিত হওয়ার
ফলে বৈদেশিক ও প্রাদেশিক ভাষা-শিক্ষা আজ বহুল
পরিমাণে সহজতর। কিন্তু ৬০।৭০ বছর আগে, হরি-
নাথের সময়ে, তেমন অবস্থা ছিল না। সে-যুগে তাঁর
তুল্য ভাষাচার্য হওয়া অসামান্য মেধার পরিচায়ক।

ভাষা আয়ত্ত করতেন তিনি সম্পূর্ণভাবে। যে-সব
ভাষা তিনি চর্চা করতে ইচ্ছুক হতেন, তা শুধু লিখতে বা
পড়তে শিখতেন না, সে-ভাষায় কথাবার্তা বলার দিকেও
তাঁর লক্ষ্য থাকত এবং যথাসম্ভব তা' অভ্যাস করতেন।
বিদেশী ভাষায় তাঁর কথোপকথনের কয়েকটি দৃষ্টান্ত
এখানে উল্লেখ করা হ'ল।

স্যার আশুতোষ তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
ভাইস-চ্যান্সেলর। রাশিয়ার সেণ্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ব-
বিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক শেরবাট্স্কি (Prof.
Tcherbartsky) এখানে আসেন এবং এখানকার
কোন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সঙ্গে সংস্কৃতে আলাপ-
আলোচনা করবার ইচ্ছা জানান। স্যার আশুতোষ
সেজন্যে সংস্কৃত কলেজের এক খ্যাতনামা অধ্যাপককে
এনেছিলেন অধ্যাপক শেরবাট্স্কির সঙ্গে কথাবার্তা
বলবার জন্যে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই সংস্কৃত
অধ্যাপকের কথ্য ভাষায় তেমন অধিকার বা অভ্যাস
না থাকায় রুশ অধ্যাপকের সঙ্গে আলোচনা করতে
অপারগ হ'লেন। আশুতোষ অবস্থা দেখে বিব্রত হয়ে
হরিনাথকে খবর পাঠালেন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে,
(তিনি তখন সেখানকার লাইব্রেরীয়ান) অবিলম্বে তাঁর
ধরে আসবার জন্যে। হরিনাথ এসে রুশ অধ্যাপকের
সঙ্গে সংস্কৃতে অনর্গল কথোপকথন করলেন। শুধু তাই
নয়, তাঁর সঙ্গে রুশ ভাষাতেও খানিকক্ষণ কথা বললেন

হরিনাথ। শেরবাট্‌স্কি এতখানি আশা করতে পারেন নি। যেমন বিস্মিত, তেমনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন তিনি। এবং আশুতোষের মুখরক্ষা ও মানরক্ষা হ'ল—ভারত-বর্ষেরও।

ত্রেডেনবার্গ নামে প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূ-তত্ত্বের এক জার্মাণ অধ্যাপক ছিলেন। তিনি হরিনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে হরিনাথ অনর্গল জার্মাণ ভাষায় কথাবার্তা বলতেন, তাঁকে মাঝে মঝে চিঠি লিখতেন জার্মাণ ভাষায়।

তখনকার পুরাতত্ত্ব বিভাগে পূর্বাঞ্চলের অধিকর্তা থিওডোর ব্লক-ও (জার্মাণ) ছিলেন হরিনাথের এক প্রিয় সুহৃদ এবং তাঁর সঙ্গেও তিনি জার্মাণে কথাবার্তা বলতেন।

জার্মাণের মতন ফরাসী ভাষাতেও অনর্গল কথা বলতে এবং যে-কোনও বিষয়ে লিখতে পারতেন হরিনাথ। অগস্ত্ কর্তিয়ে নামে একজন ফ্রেঞ্চ্-ক্যানাডিয়ান পর্যটক কলিকাতায় আসেন ও হরিনাথের সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি তাঁকে এখানকার একটি কলেজে ফরাসী ভাষার অধ্যাপক ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক নিযুক্ত হ'তে সাহায্য করেছিলেন। সেই কর্তিয়ে সাহেবের সঙ্গে হরিনাথ আলাপ-আলোচনা করতেন ফরাসী ভাষায়। প্রসঙ্গত বলা যায়, ফরাসী ভাষায় তাঁর কলমও অবাধে চলত। রবীন্দ্রনাথের 'কেন যামিনী না যেতে জাগালে না মোরে' গানখানি তিনি ফরাসীতে অনুবাদ করে-ছিলেন। গিরিশচন্দ্রের নিষিদ্ধ নাটক 'সিরাজদ্দৌলা' ফরাসীতে অনুবাদ করে ফ্রান্স থেকে প্রকাশ করবার কথাবার্তা বলেছিলেন হরিনাথ। কিন্তু অকালমৃত্যুর জন্যে তা লেখা ও প্রকাশ ঘটে ওঠে নি।

বিস্কাল্লা মালাটি নামে একজন (কপ্‌টিক্ খ্রীষ্টান) মিশরীকে তিনি কয়েক মাস বাড়ীতে রেখেছিলেন আরবী কথ্য ভাষায় অভ্যাস রাখবার জন্যে। আরবীতে তাঁর সঙ্গে হরিনাথ সাবলীল ভাবে কথাবার্তা বলতে পারতেন।

তেমনি ফারসী (Persian) ভাষাতেও। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসীর অধ্যাপক আগা মহম্মদ কাজিম সিরাজী, আবুমুসা আহ্‌মেদুল হক (ব্যারিষ্টার স্যর আবদুল্লা সুহ্‌রাবর্দির শিক্ষাগুরু) প্রভৃতির সঙ্গে তাঁদের ফারসী ভাষায় অনর্গল কথা বলতেন হরিনাথ।

এমনি আরও দৃষ্টান্ত আছে, অধিক উল্লেখ নিষ্প্রয়ো-জন। যে-সব ভাষায় তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন, তাতে লিখতেনও এবং প্রত্যেক ভাষাতেই তাঁর হস্তাক্ষর সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন ছিল। এমনি ভাবে পাওয়া যায় পরিষ্কার ছাঁদের চীনা ভাষায় লেখা, ফুলস্ক্যাপ কাগ চীনা কালিতে। হরিনাথের আরবী, ফারসী, সং এবং চীনা প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় হস্তাক্ষরের সেই নিদর্শন তাঁর নানা রচনার সঙ্গে ন্যাশনাল লাইব্রেরী রক্ষিত আছে।

জীবনকথা

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট আড়িয়াদহে মাতুলা হরিনাথের জন্ম হয়। সেখানকার সম্পন্ন গৃহস্থ এবং রূপবান্ পরিবারের কর্তা উমাচরণ মিত্র ছিলেন পিতামহ। আর্ণষ্ট হ্বাকুসেন নামে এক জার্মাণ ক্যা ক্যাশিয়ার উমাচরণ মেয়েদের বাড়ীতে ভাল লেখা শিখিয়েছিলেন। হরিনাথের জননী তাঁর কনিষ্ঠ-কন্যা

উমাচরণ জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ দেন কলকাতার ধনী ও অভিজাত পরিবারে। কিন্তু জামাতার প দোষ ইত্যাদির জন্যে সুখী হ'তে পারেন নি। তাই করেন যে, কনিষ্ঠা কন্যাকে কোন দরিদ্র, বংশ-পরিচয়হী সচ্চরিত্র পাত্রে সম্প্রদান করবেন। সেই উদ্দেশ্যে সং করে ২৪ পরগণা জেলার বহড়ু গ্রাম-নিবাসী ভূতনাথ নামক এক যুবকের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিলেন তি ভূতনাথকে তাঁর আদর্শ পাত্র মনে হয়েছিল। কা এই যুবক শুধু দরিদ্র নন, একেবারে নিঃস্ব, পি মাতৃহীন, গৃহবিহীন। বহড়ু গ্রামের দ্বারকানাথ নামে এক পরোপকারী ব্যক্তির আশ্রয়ে বাস করে কিন্তু অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র, এম. এ. পর্যন্ত পড়ে পরবাসে থেকে।

বিবাহের পর নবপরিণীতাকে নিয়ে ভূতনাথ দ্বারকানাথ ভদ্রের বাড়ীতেই রইলেন। তারপর আ পাঠ করে তার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'লেন তিনি। উ চরণের উদ্‌যোগে কিছুদিন পরে তিনি ওকালতী করব জন্যে মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে বাস করতে গেলেন।

উমাচরণের কনিষ্ঠা কন্যা এবং ভূতনাথের প্রথম সন্ত হরিনাথ দে। তাঁর বাল্যকাল ও প্রথম শিক্ষাজীবন রা পুরেই অতিবাহিত হয়েছিল।

তাঁর জননী সেকালের হিসাবে শিক্ষিতা ছিলেন, যায়। পিত্রালয়ে (বিবাহের পূর্বে) বাস করবার স তিনি পিতাকে প্রতিদিন তাঁর কাজ থেকে ফেরবার সন্ধ্যায় টেলিমেকাস, বামাবোধিনী পত্রিকা (প্যারীচ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার সম্পাদিত) ও অন্যান্য সাহিত

ও পুস্তকাদি পাঠ করে শোনাতেন। এইভাবে তাঁর ...রও বিদ্যাচর্চা হ'ত। তিনি বিশেষ বুদ্ধিমতী ও ...ম্বিনী ছিলেন। হরিনাথের পিতা একদিকে যেমন ...ন-বৎসল, তেমনি ছিলেন শিক্ষানুরাগী এবং কৃতী-...ন।

রায়পুরে অবস্থান কালে ভূতনাথ আইনজীবীরূপে ...ত সাফল্য ও অর্থোপার্জন করেন। তিনি ছিলেন ...নকার রায়পুরের তিন শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী আইনজ্ঞের ...তম। অন্য দু'জন হলেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার এবং ...দাস বন্দ্যোপাধ্যায় (কবি প্রিয়ংবদা দেবীর স্বামী, ...বয়সে পরলোকগত)। স্বামী বিবেকানন্দের পিতা ...ভোকেট বিশ্বনাথ দত্তও সে-সময় বছর দেড়েক ...নে আইন ব্যবসায়ের জন্যে বাস করেছিলেন।

...রিনাথের পিতা প্রচুর উপার্জন করেন এবং পরে ...রী উকীল হন। রায় বাহাদুর খেতাবও লাভ ...ন তিনি। রায় বাহাদুর ভূতনাথ দে রোড তাঁর ...সেখানে স্মরণীয় করে রেখেছে।

...তিনি সেখানে বিরাট্ গৃহ নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু ...ছাদে একটি পর্ণ কুটির তৈরী করান, প্রথম জীবনের ...দ্র্য আজীবন মনে রাখবার জন্যে।

এক বছর বয়স থেকে হরিনাথের রায়পুরে বাস। ...রিনাথ উত্তরকালে এত বড় প্রতিভাধর ও বিদ্বান্ ...ছলেন, আশ্চর্যের বিষয় যে তিনি বাল্যে লেখাপড়ায় ...অমনোযোগী তেমনি অকৃতী ছিলেন। বিদ্যাভ্যাসে ...ইচ্ছা না থাকায় প্রাইমারী স্কুলজীবনে চূড়ান্ত ...হন তিনি। ক্লাসে শাস্তিস্বরূপ বেঞ্চে দাঁড়ান, ...কে পলায়ন, সারাদিন কোম্পানীর বাগানে ঘুরে ...য়ে বাড়ী ফেরা—এই সব ছিল তাঁর সে-সময় নিত্য-...।

...বছর বয়স পর্যন্ত এমনি অপদার্থতার বদনাম তাঁর ...। তারপর তাঁর বিদ্যাশিক্ষার আমূল দিক্-পরিবর্তন ...নাটকীয়ভাবে।

...ই সময় একদিন সহপাঠী সঙ্গী নাটুর বাড়ীতে তার ...হরিনাথকে দেখতে পেয়ে খুবই অপমান করে। তাঁর ...তাকে মেলামেশা করতে নিষেধ করে দেন। ...থের সঙ্গদোষে তাঁর ছেলে নাটুও অমনি খারাপ ...পারে।

...এই তাড়নার ফলে হরিনাথের মনে দেখা দেয় ঘোর ...ক্রিয়া। সেদিন বাড়ীতে ফিরে পিতাকে বলেন, ...ম এবার থেকে ভাল করে পড়ব, আমায় বই-টই সব ...দিন।'

ভূতনাথ পুত্রের কথা শুনে সানন্দে রায়পুরে এক পার্শীর বড় বইয়ের দোকানে ব্যবস্থা করে দেন—হরিনাথকে যেন মাসে ১০০ টাকার বই ইত্যাদি যা-কিছু প্রয়োজন দেওয়া হয়, তিনি মাসিক বিল চুকিয়ে দেবেন।

তখন থেকে হরিনাথ সেই দোকানে নিয়মিত নানা ধরনের বই দেখতেন, পড়তেন এবং সেখান থেকে বাড়ীতে নিয়ে যেতেন ইচ্ছামতন। সেই সব বই যথাসাধ্য অধ্যয়ন করতেন, বুঝতে না পারলে মা-বাবার কাছে জানতে চাইতেন, 'ইস্‌কো মতলব ক্যয়া?' অর্থাৎ এর মানে কি?—হিন্দীতেই কথাবার্তা তখন অনেক সময় বলতেন। এইভাবে জ্ঞানস্পৃহা ও জ্ঞান সঞ্চয় অদম্য ভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে সেই বালক বয়স থেকে এবং জ্ঞানসাধনার মহৎ জীবনের সূত্রপাত হয়। সম্পূর্ণ ভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায় তাঁর জীবনের গতি-প্রকৃতি।

পিতা রায়পুরের মিশনারী সাহেবদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত ছিলেন। সেই সূত্রে হরিনাথও মিশনারীদের সঙ্গে মেলামেশা আরম্ভ করেন এবং তাদের সাহায্যে বাইবেলের tracts হিন্দীতে অনুবাদ করতে থাকেন অল্প বয়সেই।

তারপর থেকে তাঁর আন্তরিক ভাবে লেখাপড়া করার সুফল স্কুল জীবনেও প্রত্যক্ষ হ'ল। তিনি প্রাথমিক ছাত্রদের বৃত্তি পরীক্ষায় সফল হয়ে মাসিক ৬ টাকা নাথ-গাঁও স্কলারশিপ লাভ করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ল অতিরিক্ত পড়াশোনার জন্যে। এমন কি, অত্যধিক অসুস্থতার জন্যে তাঁকে স্কুল ছাড়িয়ে নিতে হ'ল। রায়পুরে শরীর সারবার কোন লক্ষণ আর দেখা গেল না হরিনাথের।

তখন তাঁকে ভূতনাথ কলকাতায় রেখে পড়াবার ব্যবস্থা করলেন মিশনারীদের সহায়তায়। রায়পুরের পাদরিদের কলকাতায় ম্যাগ্‌রা নামে এক বিশেষ আলাপী ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁর রিপন ষ্ট্রীটের বাড়ীতে হরিনাথ ও তাঁ... কনিষ্ঠ ভাই ভবনাথের থাকবার ব্যবস্থা হ'ল, লেখাপড়ার জন্যে। সেখানে তাঁরা এক বছর বাস করেন। এই সময় সারাদিন সাহেব ও মিশনারীদের সহবাসে হরিনাথের রীতিমত অধিকার জন্মায় কথ্য ইংরেজীতে।

ম্যাগ্‌রা সাহেবের বাড়ীতে থাকতেই তাঁর ও মিশনারীদের সাহায্যে সেন্ট জেভিয়ার্সের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে হরিনাথের যোগাযোগ ঘটে। এবং ১০ বছর বয়সে তিনি ভর্তি হন সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে। এখানে প্রবেশ করবার ... থেকেই তিনি অসাধারণ মেধার পরিচয় দেন। ...

ভাষা-শিক্ষায় তাঁর আগ্রহ ও দক্ষতা প্রকাশ পেতে থাকে এবং তখন থেকেই দেখা যায় তাঁর ল্যাটিনে ঝোঁক।

ফাদাররা তাঁর শেখবার এমন ইচ্ছা ও যোগ্যতা স্কুলপাঠ্য বিষয়বস্তুর বাইরে নানা সংশ্লিষ্ট বিষয় শোনাতেন, শেখাতেন। তাঁদের সংসর্গ দিনের অনেকখানি সময় লাভ করতেন তিনি। কারণ সেণ্ট জেভিয়ার্সে তিনি বরাবর বোর্ডার ছিলেন, এনট্রান্স পরীক্ষা পর্যন্ত।

শুধু মিশনারীদের সঙ্গে নয়, তাঁদের এবং ম্যাগ্‌রা সাহেবের বাড়ীর যোগাযোগে ফিরিঙ্গী সমাজে হরিনাথের ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা আরম্ভ হয়েছিল। তার ফলে সু এবং কু দুই-ই কিছু বেশী পরিমাণে লাভ হয় তাঁর। সেই পরিবেশে একদিকে যেমন ল্যাটিন ইত্যাদি ভাষাশিক্ষা ও বিদ্যাচর্চায় তাঁর উন্নতি হ'ল, অন্যদিকে তেমনি গুরুতর দোষ সংক্রামিত হল তাঁর চরিত্রে। তিনি সেই স্কুলজীবনেই শুধু সিগারেট নয়, সুরাপান পর্যন্ত ধরলেন! পিতামাতার সঙ্গে বাড়ীতে থাকলে নিশ্চয় এমন ঘটতে পারত না।

সেণ্ট জেভিয়ার্স বোর্ডিং-এ থেকে এনট্রান্স পরীক্ষা দেবার মাস আগে এক দুর্ঘটনায় বিপর্যস্ত হলেন হরিনাথ। সিগারেট খেতে খেতে পড়ার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল. একদিন সেইভাবে পড়ছিলেন। সিগারেটের ছাই ফেলছিলেন বইয়ের পাশে-রাখা একটি পাত্রে। লক্ষ্য করেন নি, এক দুষ্ট বোর্ডার নষ্টামি করে সেই ছাইদানিতে বারুদ রেখে দিয়েছিল। হরিনাথের জলন্ত সিগারেটের অবশেষ বারুদের ওপর পড়তেই বিস্ফোরণ হয় এবং তাঁর চোখ পুড়ে যায়। মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত হন তিনি চোখের চিকিৎসার জন্যে। সেখানে প্রায় ৩ মাস চোখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় থাকেন, নিজে আর সে সময় পড়তে পারেন নি। তাঁর এক জ্ঞাতি ভাই তাঁর কেবিনে গিয়ে পরীক্ষার পাঠ্য-বিষয় তাঁকে পড়ে শোনাতেন। এইভাবে প্রস্তুত হয়ে এনট্রান্স পরীক্ষা দিলেন। [স্ক]লারশিপ পেলেন না বটে, কিন্তু ল্যাটিন ও ইংরেজীতে [অ]তি উচ্চস্থান অধিকার করে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হলেন [হ]রিনাথ। তখন তাঁর বয়স ১৪ বছর ১০ মাস। ১৮৯২ [খ্রী]ষ্টাব্দ।

তারপর সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়ে এফ. এ. [পা]শ করলেন ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে। এবার চতুর্দশ স্থান অধিকার [ক]রলেন এবং ল্যাটিন ও ইংরেজীতে সর্বোচ্চ স্থান। [সে]জন্যে Language-এ ডাফ্‌ স্কলারশিপ পেলেন।

[দু]'বছর পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ. পরীক্ষা দিলেন ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে। Double Honours পেলে[ন] ল্যাটিন ও ইংরেজীতে। ল্যাটিনে প্রথম ও ইংরেজীতে চতু[র্থ] হ'লেন। ইংরেজীতেও আরও উচ্চ স্থান অধিকার করতে[ন] কিন্তু দর্শনে ফেল করায়, এত মেধাবী ছাত্রের কথা বিশে[ষ] বিবেচনা করে ইংরেজী থেকে ১৫ নম্বর নিয়ে পাশ করি[য়ে] দেওয়া হয় দর্শনে। তবু ল্যাটিনের সঙ্গে ইংরেজীতে[ও] ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলেন।

হরিনাথ আই. সি. এস. পড়েন। পিতার এই ইচ্ছ[া] ছিল। সেজন্যে তিনি আই. সি. এস. পড়তে ইংল[ন্ড] যাওয়া স্থির করলেন। সেকালে বি. এ. দেবার ছ'মাস পরে এম. এ. দেওয়া যেত। তাই হরিনাথ বললেন—তা হ'লে এম. এ.-টা দিয়ে যাই।

ল্যাটিনে এম. এ. দিলেন বি. এ.-র ছ মাস পরে। এম. এ.-তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হলেন।

বিলাত যান ১৮৯৭। সেখানে কলেজে প্রবেশ করবার আগে যে অবকাশ পেয়েছিলেন তাইতে আর একবার এম. এ. দিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই সে ব্যবস্থা হ'ল, এখান থেকে প্রশ্নপত্র গেল বিলাতে। এবার পরীক্ষায় তাঁর বিষয় ছিল গ্রীক এবং তাতে তিনি ফার্স্ট ক্লাস পেলেন।

কেম্ব্রিজে ছাত্রজীবন আরম্ভ হ'ল Classical & Modern Language-এ ট্রাইপস্‌ নিয়ে।

বিলাতে যাবার পরে তাঁর গুণপনার আর একটি স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। তাঁর অসাধারণ কৃতিত্বের জন্যে ভারত সরকার তাঁকে দু'বছর মাসিক ২৫০ টাকা স্টেট স্কলারশিপ দেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে।

পিতাকে এ সংবাদ পত্রে জানিয়ে হরিনাথ লেখেন যে, স্কলারশিপ পেয়েছি। আর কেন টাকা পাঠাবেন।

ভূতনাথ উত্তরে সস্নেহে জানালেন—না, টাকা যেমন পাঠাচ্ছি পাঠাব। এ থাক, বই কিনো।

সে-সব নিজের কথা উল্লেখ করে হরিনাথ পরবর্তীকালে হেসে বলতেন, বিলেতে রাজার হালে থেকেছি।

কিন্তু সেই সুদূর বিদেশের নানা প্রলোভনের মধ্যে পড়ে এবং কুসঙ্গে মিশে পিতার এই স্নেহের দানের অসদ্‌ব্যবহারও কিছু করলেন তিনি। উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়লেন, সেণ্ট জেভিয়ার্স জীবনের সুরাপানের প্রবৃত্তি অবাধ হ'ল। পরীক্ষার প্রস্তুতি সেই সব কারণে উপযুক্ত হয় নি। তবু Classical Language-এ পেলেন ফার্স্ট ক্লাস। Modern Language-এ সেকেণ্ড ক্লাস পান বটে, কিন্তু তার একটু ইতিহাস আছে। এই পরীক্ষার আগের রাত্রে বন্ধুদের সঙ্গে

ডিনার পার্টিতে যোগ দেন এবং অত্যধিক পানের [illegible] সেখানেই থেকে যান ফিরতে অসমর্থ হয়ে। অধ্যা-[illegible]দের প্রিয় ছাত্র বলে এবং তাঁদের মধ্যে কোন কোন [illegible] তাঁর ডিনার পার্টিতে যাবার কথা বোধ হয় জেনে, [illegible]ক্ষার সকালে তাঁর ফ্ল্যাটে খোঁজ নিতে আসেন। [illegible]খানে না পেয়ে সন্ধান করে যথাস্থান থেকে, তাঁকে এক [illegible]য় ধরাধরি করে উপস্থিত করেন পরীক্ষা হলে। এই [illegible]বে পরীক্ষা দিয়েও সেই কঠিন বিষয়ে সেকেণ্ড ক্লাস [illegible]ওয়া হরিনাথের পক্ষেই সম্ভব।

কেম্ব্রিজের পাঠক্রমের বাইরেও তাঁর বিদ্যাচর্চা ছিল। [illegible]সের সোরবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসী এবং জার্মাণীর [illegible]বুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্মাণ ভাষাচর্চায় ডিপ্লোমা পান [illegible]নি। এই দু' জায়গায় পাঠের ফলে কন্টিনেন্টাল [illegible]ভিজ্ঞতাও তাঁর লাভ হয়।

তা ছাড়া স্কীট মেমোরিয়াল পুরস্কার পান তুলনাত্মক [illegible]তত্ত্বে। এই পরীক্ষার মান অতি উচ্চ। সব বছর পুরস্কার ছাত্ররা লাভ করতে পারতেন না।

আরও একটি পুরস্কার পেয়েছিলেন ল্যাটিন ও গ্রীক [illegible] কবিতা রচনা করে। এখানে পরীক্ষার গৃহে [illegible]তার বিষয়বস্তু জানান হ'ত এবং improptu ওই [illegible] ভাষায় কবিতা লিখতে হ'ত। এ পরীক্ষাও বিশেষ [illegible]ঠিন ছিল।

কিন্তু আই. সি. এস্ পরীক্ষায় হরিনাথ ব্যর্থ হন দু' [illegible]রই। অঙ্কে স্থান পেতেন নীচের দিকে, সেজন্যে অন্য [illegible]য়ে চতুর্থ, পঞ্চম হওয়া সত্ত্বেও ফেল করতেন। আর, [illegible]রত সরকারের যে ক'টি পদ খালি থাকত বা প্রয়োজন [illegible]ত, সেই হিসাবেও পাশের সংখ্যা নির্ধারিত হ'ত।

যা হোক, অঙ্কে কাঁচা না হ'লে হরিনাথ যে উচ্চস্থান [illegible]ধিকার করতেন, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেই দু'-[illegible]রই তাঁর কাছে আই. সি. এস পরীক্ষার নানা বিষয়ে [illegible]ঠ নিয়েছেন, এমন ছাত্রও আই সি এস হয়েছেন [illegible]না যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা চলে যে, তাঁর জ্যেষ্ঠ [illegible] প্রাণধন অঙ্কে পারদর্শী হয়েছিলেন এবং বি এ-তে [illegible]ঙ্কে ফার্ষ্ট ক্লাস অনার্স পান। প্রাণনাথের আকস্মিক [illegible]ত্যু হয়েছিল কলেরায়।......

এদিকে হরিনাথের পিতা আই, সি. এস-এ ব্যর্থতার [illegible]বর পেয়ে চিন্তিত হ'লেন। তিনি তখন রায় বাহাদুর [illegible]বং সরকারী আইনজ্ঞ হওয়ায় অনেক বড় রাজকর্মচারীর [illegible]ঙ্গে তাঁর খাতিরের সম্পর্ক ছিল। পুত্রের জন্যে তদ্বির [illegible]রতে লাগলেন তিনি। তাঁর বিশেষ পরিচিত, অবসর-[illegible]প্ত আই. সি. এস. রীচি সাহেব তখন বিলাতে।

ভূতনাথের অনুরোধে তিনি এ-বিষয়ে সচেষ্ট হন এবং সেক্রেটারী অব ষ্টেটকে হরিনাথের অনন্য ছাত্রজীবনের পরিচয় জানাবার পর হরিনাথ একেবারে ইম্পিরিয়াল এডুকেশনাল সার্ভিসে নিযুক্ত হ'লেন।

তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি আই. ই. এস-এ প্রবেশ করলেন এবং তখন তিনি ২৩ বছরের যুবক। বিশেষ জগদীশ বসু, পি. কে. রায়, পার্সিভ্যাল প্রভৃতির তুল্য ব্যক্তি তখন প্রভিন্সিয়াল এডুকেশনাল সার্ভিসে ছিলেন। সেজন্যে হরিনাথের নিয়োগের সংবাদে ভারতবর্ষে তখন একটা সাড়া পড়ে যায়।

তারপর হরিনাথ স্বদেশে ফিরে আসেন, জাহাজে বহু টাকার বই সঙ্গে নিয়ে। এই বই কেনার অভ্যাস তাঁর শেষ পর্যন্ত ছিল। মাসে শ' দুই টাকার বিভিন্ন ভাষার বই ইউরোপ থেকে তিনি নিয়মিত আনাতেন।

এখানে এসে প্রথম পদ পেলেন, (১৯০১ খ্রীঃ) ঢাকা কলেজে, ইংরেজী অধ্যাপকের। পি. কে. রায় তখন সেখানে প্রিন্সিপ্যাল। হরিনাথ ঢাকায় থাকবার সময় লর্ড কার্জন তাঁর গুণমুগ্ধ হন। সে-সময় কার্জনের ঢাকায় আগমন উপলক্ষ্যে একটি যে মুদ্রিত পুস্তক উপহার দেওয়া হয়, তাতে ছিল ইবনে বতুতার পার্শী ভাষায় লেখা ভারত ভ্রমণ বৃত্তান্তের ঢাকার অংশটির হরিনাথ-কৃত ইংরেজী অনুবাদ এবং তাঁরই রচিত ল্যাটিনে কার্জনের উদ্দেশে উৎসর্গ পত্র।

হরিনাথ অসুস্থতার জন্যে সে অভিনন্দন-সভায় উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু কার্জন লেখা দু'টি পড়ে এত মুগ্ধ হন যে, তার সঙ্গে আলাপ করতে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন। উদ্‌যোক্তারা হরিনাথকে বাড়ী থেকে নিয়ে গিয়ে কার্জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দেন। লর্ড কার্জন সেদিন তাঁর ছাত্রজীবনের কৃতিত্বপূর্ণ ইতিবৃত্ত, কেম্ব্রিজের পাঠজীবন সব জানতে পারেন এবং পরে বরাবর তার শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন।

ঢাকা কলেজে থাকবার সময়, ১৯০৩ খ্রীঃ, তাঁর পিতার মৃত্যু হয় রায়পুরে। তার এক বছর পরে ১৯০৪ খ্রীঃ হরিনাথ কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কলকাতায় থাকতে ১৯০৬ খ্রীঃ আবার এম. এ. দিলেন, পালি ভাষায়। ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হলেন। পরীক্ষকদের মধ্যে ছিলেন স্বনাম-ধন্য অধ্যাপক রীস্ ডেভিস। একটি প্রশ্নের উত্তরে হরিনাথ পালিতে অনুবাদ করেন পদ্যে। তা দেখে পণ্ডিত রীস্ ডেভিস বলেছিলেন—এমন আগে কখনও দেখি নি।

তারপর হরিনাথ হুগলী মহসীন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হয়ে সেখানে চলে যান। সেখানে ছ'মাস থাকবার পর তাঁর দ্বিতীয়বার বিলাত-যাত্রার সুযোগ আসে।

বর্ধমানের মহারাজা বিজয়চাঁদ মহতাব তখন ইউরোপ ভ্রমণের উদ্‌যোগ করছিলেন। ইউরোপের কয়েকটি ভাষা-জানা লোকের প্রয়োজন হ'ল তাঁর। হরিনাথকে সে-বিষয়ে সর্বোত্তম ব্যক্তি বিবেচনা করে গভর্ণমেন্টকে বলে তাঁকে নিয়ে যাত্রা করলেন।

বিজয়চাঁদের সঙ্গে এই ক'মাসের ইউরোপ ভ্রমণের মধ্যে তাঁর জীবনে আর একটি সুযোগ এল এবং সেই সুযোগ গ্রহণ করতে সচেষ্টও হ'লেন তিনি। তা হ'ল ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিকের পদ।

তার বছর চারেক আগে লর্ড কার্জন রাজধানী কলকাতায় ভারত সরকারের ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। লাইব্রেরী তখন ছিল ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের ধারে, মেটকাফ্ হলে।

কার্জনের ব্যবস্থাপনায় দু'টি লাইব্রেরীর যুক্তকরণের ফলে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী ১৯০৩ খ্রীঃ গঠিত হয়। ভারত সরকারে হোম ডিপার্টমেণ্ট লাইব্রেরী এবং বিগত যুগের বিখ্যাত ক্যালকাটা লাইব্রেরী (যার স্থাপনায় দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাম এবং গ্রন্থাগারিকরূপে প্যারীচাঁদ মিত্রের নাম স্মরণীয়)। মেট্‌কাফ্ হলে ক্যালকাটা লাইব্রেরীর তখন নিতান্ত ভগ্নদশা ও শোচনীয় অবস্থা দেখে লর্ড কার্জন তার সঙ্গে সম্মিলিত করলেন হোম ডিপার্টমেণ্টের লাইব্রেরীকে। ক্যালকাটা লাইব্রেরীর ৬ হাজার এবং হোম ডিপার্টমেণ্ট লাইব্রেরীর ৯৪ হাজার—এই এক লক্ষ বই নিয়ে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী লর্ড কার্জনের উদ্‌যোগে প্রবর্তিত হ'ল। তিনিই ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে ম্যাক্‌ফার্লেন সাহেবকে নির্বাচন করে ইম্পিরিয়াল লাবব্রেরীর গ্রন্থাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন।

হরিনাথ যখন বর্ধমান মহারাজার সঙ্গে ইউরোপ-যাত্রা করেছেন, তখন ম্যাক্‌ফার্লেনের হঠাৎ মৃত্যুতে পদটি খালি হয়। হরিনাথ গ্রন্থাধ্যক্ষের এই কাজ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হয়ে কিছু তদ্বির করেছিলেন লণ্ডনে থাকবার সময়।

দেশে ফেরবার পর, ১৯০৭ খ্রীঃ তাঁর নাম গেজেট-ভুক্ত হয় ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক রূপে। তাঁর এই নিয়োগের খবর পেয়ে লর্ড কার্জন অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বিলাত থেকে একটি ব্যক্তিগত পত্রে লেখেন—Right man in the right place. ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী কার্জনের প্রাণের বস্তু ছিল। এই বহু-আকাঙ্ক্ষিত পদটি গ্রহণ করাই হরিনা[থের] জীবনের কাল হয়েছিল। সে অধ্যায়ের বর্ণনা কর[বার] আগে তাঁর শেষ দু'বার এম. এ. দেবার প্রসঙ্গ এখ[ন] উল্লেখ করে নেওয়া হবে।

গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হবার এক বছর পরে আ[বার] ১৯০৮ খ্রীঃ তিনি দু'বার এম. এ. দিলেন। একই ব[ছরে] এবং সংস্কৃতের দু'টি গ্রুপে—সাহিত্য ও বৈদিক সংস্কৃ[ত] দু'টিতেই ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হ'লেন।

বেদের গ্রুপে যে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হ'লেন, হওয়া অত্যন্ত কঠিন। বিশেষ তিনি যখন একম[নে] সংস্কৃত চর্চা নিয়েই ছিলেন না। বৈদিক সংস্কৃ[তে] ব্রাহ্মণ ভিন্ন ফার্স্ট ক্লাস কদাচিৎ পেতেন। আর তি[নি] সংস্কৃতে দু'টি গ্রুপে একই বছরে পর পর পরীক্ষা দিয়ে এমন ফল দেখালেন। বৈদিক বিভাগে দ্বিতীয় স্থ[ান] অধিকার করেন পরবর্তীকালে বিখ্যাত কবিরা[জ] গণনাথ সেন।

পরীক্ষার প্রসঙ্গে হরিনাথের আর কয়েকটি কৃতিত্বে[র] কথা বলা হয় নি। সে-সবও উল্লেখ করবার যোগ্য যদিও বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা-সংক্রান্ত নয়—ইম্পিরিয়া[ল] এডুকেশনাল সার্ভিসের ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষা। সে-স[ব] পরীক্ষায় তিনি সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে মোট ১[...] হাজার টাকা পুরস্কার লাভ করেন। কিন্তু তাও বড় কথ[া] নয়। লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, সে-সমস্ত পরীক্ষার উত্তর তিনি ইংরেজীতে না লিখে—যা তিনি অনায়াসে পারতেন—বিভিন্ন ভাষায় দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁর আগে বা পরে আর কেউ এমন করেন নি। যথা—(প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনার সময়) এডুকেশনাল সার্ভিসের ডিগ্রী অব্ অনার্স পরীক্ষা দেন সংস্কৃতে এবং ৫ হাজার টাকা পুরস্কার পান। আগে higher proficiency-র জন্যে পেয়েছিলেন ২ হাজার টাকা। তার এক বছর পরে আরবী ভাষায় ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষা দিয়ে ৫ হাজার ও ২ হাজার টাকা পুরস্কার লাভ করেন। শেষে আর একটি ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষা দেন উড়িয়া ভাষায় এবং ১ হাজার টাকা পুরস্কার পান। এ সবই প্রায় ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান হবার আগেকার কথা। নানা ভাষাচর্চা করতে যে তিনি কত ভালবাসতেন এবং তাদের ওপর তাঁর কতখানি দখল ছিল—এসবও তাঁর উজ্জ্বল নিদর্শন।

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিকরূপে চারটি বছর (১৯০৭-১৯১১ খ্রীঃ) তাঁর জ্ঞানসাধক স্বল্পায়ু জীবনের

য় অধ্যায়। তাঁর বহিরঙ্গ জীবনে তা যত গৌরবময় াক, তাঁর ব্যক্তিজীবনের পক্ষে করুণতম এবং বাদাচ্ছন্ন পরিচ্ছেদ, বলা যায়। কারণ এই পদ হণের জন্যেই তাঁর জীবনে এমন চরম বিপর্যয় ঘনিয়ে াসে, যা ছিল তাঁর ধারণার অতীত।

৩০ বছর বয়সের যুবক হরিনাথ যখন ভারতের ন্যতম শ্রেষ্ঠ এই জ্ঞাননিকেতনের ভারপ্রাপ্ত হ'লেন, যনি তখন শুধু এই বিরাট্ প্রতিষ্ঠানটির সাংস্কৃতিক কটির কথা চিন্তা করে পরম পরিতুষ্ট হয়েছিলেন। যবেছিলেন, মহৎ আশা তৃপ্ত করে জ্ঞান-সাধনার গতে বিচরণ করবেন অব্যাহত ভাবে। বাস্তব জগতের তি নীচ ও নিষ্ঠুর অস্তিত্বের কথা ধর্তব্যের মধ্যে ল না। এত বড় প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনের দিক এবং র পরিচালনার বাস্তব দায়িত্বের বিষয় সম্যক্ চিন্তা রেন নি তিনি। যে লোকদের নিয়ে এই সংস্থা র চালনা করতে হয়, তাদের সম্পর্কে যথোচিত বহিত ছিলেন না। অনভিজ্ঞই ছিলেন মানুষের রত্রে, বিশেষ সাধারণ বাঙ্গালী চরিত্রে। তিনি নাও করতে পারতেন না—কোন কোন মানুষের মনে ও আড়ালে কতখানি বিপরীত দু'টি রূপ থাকতে রে। নিয়মিত বেতনের বিনিময়ে তারা কতদূর নিয়মিত ও কর্মবিমুখ হ'তে পারে। যাদের কষ্ট-িতে বিচলিত হয়ে অনুগ্রহ করে তিনি অন্নসংস্থান র দিয়েছেন তারা কেমন নির্বিবেকে অন্নদাতার বিরুদ্ধে ন, অন্যায় চক্রান্তে যোগ দিতে পারে। দুঃখীকে । দেখিয়ে, মানুষকে বিশ্বাস করে, কর্মহীন বিপন্নকে কারা চাকুরি করে দিয়ে এবং পরদুঃখকাতর হয়ে নাথ যে অপরাধ করেছিলেন, তার প্রায়শ্চিত্ত প চূড়ান্ত মূল্য দিতে হয়েছিল তাঁকে।

ঘটনা এই যে, উক্ত উচ্চ পদলাভে তিনি যেমন বহু ক্ষত ব্যক্তির শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছিলেন, তেমনি তাঁর ভাগ্যে বাঙ্গালীসুলভ ঈর্ষায় জর্জরিত হয় কোন ন ব্যক্তি। এবং সেই জ্বালায় বিদ্ধ হয়ে অকারণ র ক্ষতিসাধন করতে চায়।

সংসারে কারুর মঙ্গলের চেয়ে ক্ষতি করা অনেক জ হ'লেও, হরিনাথের ক্ষতি তারা হাজার ইচ্ছা লেও করতে পারত না, দেশের ও দশের চোখে ন সম্মানের আসনে তিনি তখন সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু কে বাধের শত্রুতার মুখে পড়তে হয়েছিল। রয়াল জল টাইগার স্যর আশুতোষের। তাঁর শত্রুতার লে হরিনাথের সর্বনাশ সমুৎপন্ন হয়। আগে থেকে যারা অসূয়া-পরবশ হয়ে হরিনাথের অমঙ্গল ঘটাতে সচেষ্ট ছিল, তারা তা চরিতার্থ করে আশুতোষকে আশ্রয় ক'রে।

যে হরিনাথ কলেজের ছাত্রজীবন থেকে আশুতোষের বিশেষ প্রিয়পাত্র, আশুতোষ যাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ ছিলেন, ঘটনাচক্রে তাঁদের মধ্যে দুস্তর মনান্তর ঘটল। সেই অতিশয় বেদনাদায়ক ঘটনাবলীর মূল সূত্র অনুসরণ করে কার্যকারণের এই রকম পারম্পর্য জানা যায়:

হরিনাথ যখন গ্রন্থাগারিকের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার আশুতোষ তখন এই বিশ্ববিদ্যালয়কেই তাঁর কর্মকেন্দ্র করে দেশে শিক্ষাবিস্তারের মহৎ কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। জনসাধারণের মধ্যে তাঁর এই শিক্ষাবিস্তারের প্রকল্প বিদেশী শাসকশ্রেণী সুনজরে দেখেন নি, এবং শিক্ষা-প্রসারের অগ্রগতি রোধ করতে যথাসাধ্য চেষ্টিতও ছিলেন। সিনেট ও সিণ্ডিকেটে প্রভু-স্বার্থের প্রবল বাধা অতিক্রম করে, অনেক সময় সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে আশুতোষকে শিক্ষা-সম্পর্কিত প্রস্তাবাদি অনুমোদন করিয়ে নিতে হ'ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ামক সভা-সমিতিতে সেজন্যে তিনি চাইতেন নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব। শুধু বিরোধিতা নয়, কেউ সমর্থন না করলেও তিনি তা সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর স্বভাবেও যোদ্ধা-সুলভ এই মনোভাব ছিল।

হরিনাথ সিনেট ও সিণ্ডিকেটের এক বিশিষ্ট সদস্য। শিক্ষাক্ষেত্রে তখন তাঁর যে আসন, তাতে কোন প্রস্তাবে তাঁর সমর্থন করা-না-করার গুরুত্ব অনেকখানি। তিনি অনেক সময়েই আশুতোষের পক্ষে সমর্থন জানাতেন। কিন্তু প্রত্যেক মিটিংএ সরকারী দলের বিরুদ্ধে আশুতোষের পক্ষে যোগ দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি Covenanted Service-এর সরকারী চাকুরে। সরকারের মুখপাত্রদের বিপক্ষে আশুতোষের জোটের মধ্যে তিনি কি করে সর্বদা যান? কিন্তু আশুতোষ তাঁর অসুবিধার কথা বুঝতে চাইতেন না। তা ছাড়া, এমন কোন কোন প্রসঙ্গ আসত, যা ঠিক আদর্শগত নয়, দলগত ব্যাপার। হরিনাথের স্বাধীন-চেতা স্বভাব প্রত্যেক বিষয়ে আশুতোষের অন্ধভাবে অনুসরণ করতে পারত না। হরিনাথের একান্ত অনুগত না হওয়া, কর্তৃত্বপরায়ণ আশুতোষের ব্যক্তিত্বের কাছে অত্যন্ত বিরক্তির কারণ হ'ল।

তাঁর বিরক্তির দ্বিতীয় কারণ—হরিনাথের সম্মাননায় কাতর কয়েকটি নিন্দুকের অবিশ্রান্ত মন্ত্রণা। হরিনাথের

প্রতি হিংসার্ত এবং আশুতোষের স্তাবক কয়েকজন হীনমনা লোক হরিনাথ সম্পর্কে আশুতোষের অসন্তুষ্ট মতিগতির সুযোগ বুঝে তাঁর কাছে হরিনাথের কুৎসা প্রচার করত এবং আশুতোষ সেসব কথায় কর্ণপাত ও বিশ্বাস করতেন।

শুনলে ঘৃণার উদ্রেক হবে, হরিনাথের চরিত্র নিয়ে এমন ইতর অপবাদ রটনা করত তারা। তিনি থিয়েটার দেখতে ভালবাসতেন এবং কখনও কখনও গিরীশচন্দ্র, অমৃতলাল প্রভৃতির নাটক দেখতে যেতেন। অমনি অপযশ শোনা গেল যে, অমুক বিখ্যাত অভিনেত্রী তাঁর রক্ষিতা!

তাঁর সুরাপানের অভ্যাসের কথা সে-সময় ধর্তব্য ছিল না, কারণ তার কয়েক বছর আগে থেকেই প্রায় পরিত্যাগ করেছিলেন। কখনও কখনও সে-ধরনের পার্টি বা ডিনারে উপস্থিত হ'লে নিয়মরক্ষার মতন নামমাত্র পান করতেন। পানের অভ্যাস আর ছিল না, বলা যায়। তিনি স্পষ্টই বলতেন—'আর stand করতে পারি না। ওসব যা করবার বিলেতে করেছি।' সত্যভাষী হরিনাথ নিজের দোষের কথাও গোপন করতেন না। ছাত্রজীবনে যে বিশৃঙ্খল হয়েছিলেন, সে-কথা স্বীকার করতেন নিজের মুখে পানত্যাগ না করলে উল্লেখ করতে নিরস্ত হ'তেন না। কিন্তু নিন্দা রটনা যাদের পেশা তাদের সত্য নিয়ে কারবার নয়। তাই হরিনাথের বিগত জীবনের সেই সব ক্রটি-বিচ্যুতি পল্লবিত করে তাঁর বর্তমানকে মসীলিপ্ত করা ভুল।

আশুতোষ এই সমস্ত কলঙ্কের কথা বিশ্বাস করে নেবার আগে, নিরপেক্ষ সূত্রে অপবাদের সত্যতা বিচার করলেন না। একবার বিবেচনা করে দেখলেন না, যারা নিন্দায় মুখর হয়ে উঠেছে, হরিনাথের প্রতি তাদের ব্যক্তিগত ঈর্ষা ও আক্রোশ আছে কি না। সত্যাসত্য যাচাই করে নিয়ে হরিনাথের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হ'লে আশুতোষের পক্ষে যোগ্য হ'ত।

কিন্তু নির্বিচারে আশুতোষ হরিনাথের প্রতি এতদূর বিদ্বিষ্ট হয়েছিলেন যে, একদিন সিণ্ডিকেটের মিটিং-এ উত্তেজিত হয়ে হরিনাথকে বলে উঠলেন, 'তোমার কীর্তিকলাপ সব আমি জানি।'

এত সব সম্মানিত লোকের সামনে প্রকাশ্য সভায় এমন কটূক্তিতে হরিনাথ অপমানিত বোধ করলেন। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, 'কি কীর্তিকলাপ জানেন?'

সকলের সামনে দু'জনে সেদিন বচসা হয়ে গেল।

তাঁকে দেখে নেবেন—এই ধরনের কথা বলে শাসিয়ে দিলেন আশুতোষ।

মিটিং থেকে বাড়ী ফিরে সে-রাত্রে অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে রইলেন। কারুর সঙ্গে বিশেষ কথা বললেন না। ক্ষোভে, অপমানে এবং বিপদের আশঙ্কায় অবসন্ন হয়ে পড়লেন তিনি। আশুতোষের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের কোন দিক তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। যাঁর প্রতি তাঁর বৈরীভাব জাগত, ছলে-বলে-কৌশলে যে-কোন প্রকারে হোক তাঁকে বিধ্বস্ত না করে ক্ষান্ত হ'তেন না বাংলার ব্যাঘ্র!

হরিনাথের দুর্ভাগ্য, বাংলা দেশেরও দুর্ভাগ্য যে তাঁকে আশুতোষের মতন ব্যক্তি শত্রুরূপে গণ্য করলেন। চূর্ণ করতে মনস্থ করলেন এই বহুমূল্য হীরকখণ্ডটি!

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর গভর্ণিং বডির আশুতোষ একজন প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন। সেই পদাধিকারের সুযোগে হরিনাথকে অপদস্থ করবার উপায় সন্ধান করতে লাগলেন তিনি।

সে কাজ কঠিন হ'ল না। হরিনাথ দু'-একটি অযোগ্য, অসৎ ও বিশ্বাসঘাতক লোককে লাইব্রেরীতে চাকুরি দিয়েছিলেন। তাদের সততা ও যোগ্যতার অভাব জেনে নয়, তাদের অভাব-অনটনের কথা শুনে উপকার করবার জন্যে। এখন তাদেরই দুর্নীতি ও কর্তব্যে ক্রটির ঘটনাগুলি হরিনাথের বিচ্যুতি ও অযোগ্যতার দৃষ্টান্তরূপে যথেচ্ছ ব্যবহার করা হ'তে লাগল। এমন-কি যাদের মঙ্গল করতে গিয়ে হরিনাথ কলঙ্কের ভাগী হ'লেন, তারাই গোপনে শত্রুপক্ষে যোগ দিয়ে এদিকের ক্রটি-বিচ্যুতির নিদর্শন সরবরাহ করে আসত। আর আশুতোষ গভর্ণিং বডির সভায় তীব্র সমালোচনা করতেন হরিনাথকে দায়ী করে। হরিনাথের বিরুদ্ধে যে-চক্রান্ত হ'তে লাগল, তাতেও কোন কোন বিশ্বাস-হন্তা গুপ্তভাবে সাহায্য করতে লাগল। যেমন, এক-দিন মেট্‌কাফ হলে লাইব্রেরীর গভর্ণিং বডির সভায় ইলেকট্রিক আলো সব হঠাৎ নিভে গিয়ে সভা পণ্ড হয়ে গেল। আশুতোষ অন্ধকারে গর্জন করে উঠলেন, 'এ হরিনাথের কাজ।'

কাজটি বাস্তবিকই হরিনাথের নয়, তবে তাঁরই অনুগ্রহপুষ্ট কোন কর্মচারীর প্রত্যুপকার বটে। এমনি ভাবে হরিনাথ অপমানিত, অপদস্থ হ'তে লাগলেন। তার মাত্রা বৃদ্ধি হ'তে হ'তে শেষ পর্যন্ত গভর্ণিং বডির সভায় চূড়ান্ত অভিযোগ নিয়ে এলেন আশুতোষ। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর টাকা খরচপত্রের ব্যাপারে

দ ধরা পড়েছে। হরিনাথের দায়িত্ব আছে এ যয়ে, ইত্যাদি অভিযোগ।

অভিযোগের যাথার্থ্য তদন্তের জন্যে হরিনাথ ছ'মাস কাজে যোগ দিতে নিষিদ্ধ হ'লেন। এই Suspension rder পাবার পর তাঁর কর্মজীবন একরকম শেষ হ। সেই ছ'মাস শেষ হবার আগেই তিনি টাইফ-ড রোগে আক্রান্ত হন এবং ১৩ দিন পরে সমস্ত াথিব অভিযোগ ও যন্ত্রণার পরপারে উত্তীর্ণ হয়ে ান!

মৃত্যুর কয়েকদিন আগে তদন্তের ফলাফলের কিছু ছু অপ্রকাশিত সংবাদ এই পাওয়া যায় যে, গভর্নমেন্ট ানতে পেরেছেন যে, লাইব্রেরীর কোন দুর্নীতির ঙ্গে হরিনাথ দায়ী ছিলেন না। অন্য লোক দোষী। রিনাথ সসম্মানে সমস্ত অভিযোগ থেকে মুক্তি পাবেন। কিন্তু তখন আর তাঁর সে-কথা শোনবার বিশেষ ময় নেই!

কয়েকটি তথ্য

২০,০০০-এরও বেশি বই (বিভিন্ন ভাষায়) তাঁর ক্তিগত সংগ্রহে বাড়ীতে ছিল, প্রতি মাসে শ'দুয়েক কার পুস্তক ক্রয়ের ফলে। ২০টি আলমারিতেও ্যবের স্থান-সঙ্কুলান হয় নি। ঢাকায় কেনা একটি মাণ্ড ডাইনিং টেবিলের ওপরেও স্তূপীকৃত থাকত । মৃত্যুর ক'দিন মাত্র আগেও এক বাক্স ফরাসী ই আসে। তিনি তখন শেষ শয্যায় শয়ান। বাড়ী কে ফেরৎ দিতে চাওয়ায়, বিক্রেতা বলেন, 'এ বই র জন্যেই আনা। টাকা দিতে হবে না। বহু ইনি এতদিন কিনেছেন।'

জীবনের শেষ ৪ বছর (১৯০৭-১৯১১ খ্রীঃ) মৃত্যু পর্যন্ত পাড়ে যে পৈত্রিক বাড়ীতে বাস করেন, সেই বাড়ীর টি তাঁর স্মৃতি বহন করছে—হরিনাথ দে ষ্ট্রীট।

তার আগে, ১৯০৪-১৯০৭ খ্রীঃ, ৭৮, ধর্মতলা ষ্ট্রীটের যে ড়ীতে ছিলেন, তা এখন নিশ্চিহ্ন। তারও আগে র বছর (১৮৯৭-১৯০১ খ্রীঃ) বিলাতে বাস করেন।

যিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছেন, তিনিই কোন-কোন ভাষা শিক্ষা বিষয়ে উপকৃত ও অনুপ্রাণিত য়েছেন।

তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে কয়েকমাস কলকাতা বিশ্ব-দ্যালয়ের অবৈতনিক অধ্যাপনা করেছিলেন। তা ড়া, নানা ভাষার পরীক্ষায় পরীক্ষক থাকতেন।

এসিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল, ক্যালকাটা হিস্টরিকাল সোসাইটি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও কার্যকরী ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

অত্যন্ত পরোপকারী, দয়ালুচিত্ত ও দরদী ছিলেন। কন্যাদায়গ্রস্ত থেকে আরম্ভ করে বহু দুঃস্থ পরিবারকে ও লোকদের সাহায্য করতেন, বেশির ভাগই গোপন দান।

নিজের বেশভূষার কোন বাহুল্য বা পারিপাট্য দেখা যেত না। সরল প্রাণখোলা ন্যায়বান্ ব্যক্তি, কোন রকম কপটতা ও ভণ্ডামি ছিল না। সঙ্গীত শুনতে বিশেষ ভালবাসতেন। শরীর খুব সুস্থ ছিল না। হাঁফানিতে মাঝে মাঝেই কষ্ট পেতেন ১০-১২ দিন ধরে।

এফ. এ. পড়বার সময় বিবাহ হয়েছিল, গরাণ-হাটার বসু পরিবারে। ৩ পুত্র ও ৩ কন্যার মধ্যে কন্যার ধারায় বংশ বর্তমান আছে।

শেষ ১০ বছরের রচনাদি

যত বড় প্রতিভাধর ভাষাচার্য ও পণ্ডিত ছিলেন, তার উপযুক্ত অবদান সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তিনি রেখে যেতে পারেন নি, সত্য। কিন্তু এমন মর্মান্তিক অকাল-মৃত্যু না ঘটলে স্থায়ী মূল্যের কিছু বড় দান তাঁর কাছে দেশ সম্ভবত পেত। তবু ছাত্র-জীবনের পরে যে ১০ বছর স্বদেশে ছিলেন, তা যে নিরলসভাবে অতিবাহিত করে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভার স্মারকচিহ্ন কিছু রেখে যান সে-কথা তাঁর রচনাদির নিম্নলিখিত তালিকাটি থেকে বোঝা যায়। এ প্রসঙ্গে অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, শেষ ১০ বছরের (২৪ থেকে ৩৪ বছর বয়সের) এই সব কাজ তিনি করেছিলেন তাঁর কর্মের অবসরে (অর্থাৎ অধ্যাপক ও গ্রন্থাগারিকের কর্তব্যের অতি স্বল্প অবসরে, সকালে বা রাত্রে, কিংবা ছুটির দিনে। তা ছাড়া, এই শেষ পর্বে অধ্যাপনা ও লাইব্রেরীয়ানের কাজ ভিন্ন তিনি বার এম. এ. পরীক্ষা ও কয়েকবার ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষা দেন, দ্বিতীয়বার ইউরোপ ভ্রমণ করেন কয়েক-মাস এবং শেষের প্রায় দু'বছর আশুতোষের সঙ্গে মনোমালিন্যের জন্যে অশান্তি ও উদ্বেগের মধ্যে কাটান। এই সবের মধ্যেও তাঁর এতগুলি সম্পাদিত ও লিখিত পুস্তক পুস্তিকা ও পত্রিকাদি প্রকাশিত হয়:

1. Macaulay's essay on Milton—Edited with introduction.

2. Macaulay's essay on Boswell's Life of Johnson—Edited.

3. Macaulay's Life of Goldsmith—Edited.

4. Palgrave's Golden Treasury—Edited with notes and many parallel passages.

5. Burke's Letters to the Sheriff of Bristol—Analysis for students.

6. Burke's speeches on American Taxation—Analysis for Students.

7. Readings from the Waverly Novels—Selected translated by Harinath De.

8. The English diary of an Indian Student by Rakhaldas Halder. with an introduction by Harinath Dey.

৯) কালিদাসের শকুন্তলার প্রথম দু'অঙ্ক ইংরেজীতে পদ্যে অনুবাদ।

১০) গিরীশচন্দ্রের 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের প্রথম তিনি অঙ্ক ইংরেজীতে অনুবাদ। ফরাসীতেও অনুবাদের ইচ্ছা ছিল।

১১) অমৃতলাল বসুর 'বাবু' নাটক ইংরেজীতে অনুবাদ। মাসিক বসুমতীর ইংরেজী সংস্করণে প্রকাশিত।

১২) মঁসিয়ে ল'র ডায়ারী ১১ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত অনুবাদ, মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে।

১৩) পালি ধনীয় সুত্তের ইংরেজী পদ্যে অনুবাদ। ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট জার্নালে প্রকাশিত।

১৪) অনেক পার্শী গজল, মৈথিলী কবিতা (বিদ্যাপতি প্রভৃতির), বাংলা গানের ইংরেজী পদ্যে অনুবাদ।

১৫) Herald ত্রৈমাসিক পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ। প্রায় তিন-চতুর্থাংশ রচনা তাঁরই থাকত।

১৬) ইবন্ বতুতার ভ্রমণ-বৃত্তান্তের পূর্ববঙ্গ অংশ যে ফার্সী থেকে লর্ড কার্জনের জন্যে ইংরেজীতে করেন, তাও পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়।

পূরণচাঁদ নাহারকে History of Jainism লেখবার সময় হরিনাথ প্রভূত সাহায্য করেন।

রবীন্দ্রনাথের 'যামিনী না যেতে জাগালে না কেন' গানটির যে ইংরেজী অনুবাদ করেছিলেন, তার দু'টি লাইনের (নিবিয়া বাঁচিল নিশার প্রদীপ উষার বাতাস লাগি; রজনীর শশী গগনের কোণে লুকায় শরণ মাগি।') তর্জমা তাঁর অনুবাদ শক্তির নিদর্শন স্বরূপ দেওয়া হ'ল :—

The lamp of light is fain to die.
Touch'd by the break of morn:
Absorbed the moon behind the sky
For shelter hath withdrawn.

তা ছাড়াও, তাঁর আরও বহু রচনা অসম্পূর্ণ অবস্থায় রয়ে যায় এবং তা অনেকাংশে ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে তাঁর স্মৃতি স্বরূপ সংরক্ষিত আছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল :—

১) ফরাসী ভাষায় লিখিত একটি নাটকের তৃতীয় অঙ্ক।

২) ঋগ্বেদের নির্বাচিত অংশের ইংরেজী অনুবাদ।

৩) ইংরেজী-পারস্য ভাষার একটি বিরাটকায় শব্দার্থ অভিধান (এটিও সম্পূর্ণ করবার অবসর পান নি)।

৪) কিরাতার্জুনের বাংলা অনুবাদ।

৫) সুবন্ধুর বাসবদত্তার ইংরেজী অনুবাদ।

৬) রামায়ণের অংশাবলীর ইংরেজী অনুবাদ।

৭) মুদ্রারাক্ষস সম্পর্কে introductory notes.

৮) আল্ ফকৃরির পুস্তকের অংশ বিশেষের আরবী থেকে ইংরেজী অনুবাদ।

৯) চীনা ও তিব্বতী গ্রন্থ থেকে অনুবাদ।

১০) হাফিজের Ode to Sultan Giyasuddin অনুবাদ।

১১) পালি ভাষায় রচিত খুদ্দকপর্ব সংশোধন ও পরিমার্জন।

১২) তারিখ-ই-নসরৎজঙ্গি সম্পাদনা।

Fragments of Balavataro (a Pali grammer).

Transcription of some Buddhist Hieratic writings in Chinese..... ইত্যাদি

বাংলা ও বাঙালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

সংহতির বদলে কি ? হিণ্ডীয়া ?

১৯৬৫—২৬শে জানুয়ারী—আগামী কিছু কালের মধ্যেই ভারতে সংহতি-সংহার দিবসরূপে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইবে এবং এই সংহতি-সংহারের একমাত্র কারণ হইবে হিন্দীর ভারতের একমাত্র জাতীয় কিংবা সরকারী ভাষারূপে অভিষেক ! হিন্দীভাষী লাট-বেলাট-গণ জেদ এবং জবরদস্তির দ্বারা ভারতের বাকী ১৩টি ভাষাকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করিয়া একমাত্র হিন্দীভাষা দ্বারাই ভারতে সংহতির মিলনসেতু গঠন করিবার অবাস্তব এবং অসম্ভব পরিকল্পনার আকাশ কুসুম রচনা করিলেন ! হিন্দী-ফ্যানাটিকদের কার্য্যকলাপ এবং চিন্তাধারা দেখিয়া মনে হইতেছে যেন আমাদের দেশ এবং জাতির পক্ষে বর্ত্তমানে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন—হিন্দীকে সরকারী ভাষারূপে চালু করা। দেশের এবং জাতির এখন আর অন্য কোন বিষয়ে কোন অভাব নাই, তিনটি পাঁচসালা পরিকল্পনার ফলে ভারতের জন-জীবনের সকল অভাব, দৈন্য দূর হইয়া দেশে এখন মধু এবং ক্ষীরের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। এমন কি চীনা আক্রমণের কোন ভয়ই আর নাই—হিন্দীর মাধ্যমে রচিত সংহতির প্রতাপে চীনারা আর ভারতের ছায়া মাড়াইতে ভরসা করিবে না ! ১৯৬২ সালে যদি হিন্দী সর্ব্বভারতীয় ভাষারূপে গৃহীত হইত, তাহা হইলে বোধহয় চীনারা ভীরু কাপুরুষের মত ভারত আক্রমণ করিয়া কয়েক হাজার বর্গমাইল ভারতীয় জমি দখল করিতেও পারিত না ! আমরা অহিন্দীভাষী মূর্খের দল একথা যদি বুঝিতে পারিতাম কয়েক বৎসর পূর্ব্বে—তাহা হইলে হয়ত ভারতের এই অবস্থা আজ ঘটিত না। এখন সকলে মিলিয়া তারস্বরে যদি "জয়-হিন্দী" বলিয়া গগন বিদারিত করিতে পারি, একমাত্র তাহা হইলেই চীনারা হিমালয় পরিত্যাগ করিয়া উত্তর কোরিয়াতে অবশ্যই আত্মগোপন করতে বাধ্য হইবে ! অতএব আসুন, সকলে মিলিয়া খোল-করতাল বাজাইয়া "জয়-হিন্দী" ব্রাণমন্ত্র কীর্ত্তন করিতে থাকি।

হিন্দী-ভক্ত এবং হিন্দীভাষী কর্ত্তারা বলিতেছেন ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যক লোকই হিন্দীভাষী এবং হিন্দীতেই তাহাদের সকল প্রকার কাজকর্ম্ম, বার্ত্তা বিনিময় এবং আলাপ-আলোচনা করিয়া থাকে কিংবা করিতে সক্ষম। কিন্তু এই সংখ্যাগরিষ্ঠতার অজুহাত ভুয়া :

"সংখ্যাগরিষ্ঠতার যে অজুহাতে হিন্দীকে কেন্দ্রীয় সরকারী ভাষার মর্য্যাদা দেওয়ার প্রস্তাব হয়েছিল, তা কতটা যুক্তিপূর্ণ ? বিহার, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান—প্রকৃতপক্ষে এই চারটি প্রদেশ হিন্দীভাষী। চারটি প্রদেশে হিন্দীভাষীর সংখ্যা বড় জোর ১০ কোটি। অথচ বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র, গুজরাট এবং দক্ষিণাঞ্চলের অহিন্দীভাষী অধিবাসীর সংখ্যা অন্ততপক্ষে ৩০ কোটি। সুতরাং স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, সংবিধানের ৩৪৩ অনুচ্ছেদ, সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর বাধ্যতামূলকভাবে সংখ্যালঘিষ্ঠের ভাষাকে চাপিয়ে দেবারই চেষ্টামাত্র।

"বস্তুতপক্ষে ভারতবর্ষের হিন্দীভাষাভাষী অঞ্চলগুলি অহিন্দীভাষীদের দ্বারা কম অধ্যুষিত এবং সেগুলি দেশের প্রাণকেন্দ্রের মত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত হওয়ায় সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অপরপক্ষে অহিন্দীভাষী জনসাধারণের সংখ্যা হিন্দীভাষীদের তুলনায় অনেক বেশী হওয়া সত্ত্বেও সারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে তারা ছড়িয়ে থাকায় তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপিত হয় নি।"

এবং ইহারই ফলে—দেশ স্বাধীন হইবার সঙ্গে সঙ্গে উৎকট-উদ্ভট হিন্দীওয়ালাদের অশোভন এবং অস্বাভাবিক দ্রুততার সঙ্গে—ভারতীয় সংবিধানের সংশোধন এবং নূতন ধারার সংযোজন সম্পাদিত হয়। ইহারই ফলে একটি মাত্র বেশী ভোটে (তাহাও সভাপতির কাষ্টিং ভোট !) গৃহীত—হিন্দীকে সর্ব্বভারতীয় ভাষারূপে গায়ের জোরে গ্রহণ করা হয় ! এইভাবে ভারতীয় অন্যান্য তেরটি সমৃদ্ধতর ভাষাকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে নিক্ষেপ করিয়া —ঐ সকল অহিন্দীভাষীদেরও দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে

পরিণত করার অপচেষ্টার যে বিষম মূল্য ভারতকে দিতে হইবে—তাহার আভাস ইতিমধ্যেই প্রকট হইতেছে। উৎকট হিন্দীপ্রেমিকদের দাপট এবং আস্ফালন—গত কিছুকাল যাবৎ ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করিয়া ভদ্র-মানুষের পক্ষে অসহ্য হইয়াছে।

রাজাজী সত্য কথাই বলিয়াছেন যে—হিন্দীকে ভারতের ৩০।৩৪ কোটি লোকের উপর জোর করিয়া চাপাইবার চেষ্টার একমাত্র পরিণতি হইতে—সংহতির পরিবর্ত্তে—ভারত অচিরে আবার তের-চৌদ্দ ভাগে বিভক্ত হইয়া যাইবে! এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখা প্রয়োজন যে:

"হিন্দীভাষী প্রদেশগুলি, বিশেষ করে বিহার এবং উত্তর প্রদেশ অস্বাভাবিকভাবে মতবাদপ্রিয় এবং স্বার্থপর হওয়ায় ভারতের বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভাববার সময় তাদের নেই। তাই একথা আজ খুবই স্পষ্ট যে ভারত-বর্ষ যদি ভাষাগত ঐক্য কামনা করে, তা হ'লে হিন্দী-প্রেমিকদের মতানুযায়ীই তা করতে হবে। অর্থাৎ অন্যান্য সব ক'টি আঞ্চলিক সংস্কৃতিকে বিনষ্ট করে সেই সংস্কৃতির ধারকদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে রূপান্তরিত করা হবে। হিন্দীকে জোর করে সকলের স্কন্ধে চাপিয়ে দেওয়ার এক- মাত্র অর্থ এই।

"হিন্দীভাষীদের উগ্র স্বাদেশিকতার সঙ্গে আপোষের চেষ্টা অর্থহীন। কিছুদিন আগে ইন্দোরের অতিরিক্ত জেলা শাসক এবং দায়রা জজ একটি মামলা প্রত্যাখ্যান করেন। তার কারণ মামলার আবেদনটি ইংরেজীতে লেখা হয়েছিল। একজন ভারতীয় নাগরিক যদি অন্যের অন্ধ ভাষা-প্রীতির ফলে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়, তাহ'লে বিচারের বাণী শেষ পর্য্যন্ত প্রহসনে পরিণত হ'তে বাধ্য।"

রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয় কিছুদিন পূর্ব্বে এক ফর্ম্মাণ জারী করিয়া জানাইয়াছেন: ১৯৬৭ সাল হইতে উক্ত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষার উত্তরপত্রগুলি ছাত্রদের দেব-নাগরী হরফে লিখিতে হইবে। বাঙ্গলা, ওড়িয়া, উর্দ্দু প্রভৃতির পরীক্ষার উত্তরপত্রগুলি সম্পর্কে বিশেষ করিয়া ইহা প্রযোজ্য হইবে! বাঙ্গালী ছাত্রদের বাঙ্গলা ভাষা ব্যবহার করা বন্ধ (আপাতত) হইবে না, কিন্তু প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে বাঙ্গলা অক্ষর ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হইল! সংবাদটি এইরূপ:

"The University at Ranchi (Bihar) has decided that examination in Urdu, Bengali and Oriya language papers will, from 1967, have to answer questions in the Devanag Script."

অথচ ভারতীয় সংবিধানের আর্টিকল ২৯ (১) আছে যে:

Any section of the citizens residing i the territory of India or any part there having a distinct language, script or cultu of its own shall have the right to conser the same.

—Article 29 (1)—Indian Constitutio

দেখা যাইতেছে—বিহারের হিন্দী মালিকদের কাছে ভারতীয় সংবিধানের কোন মূল্যই নাই এবং এই সম্বন্ধে বিষয়ে স্বাধীন (স্বেচ্ছাচারী?) কর্ত্তাব্যক্তিরা যখন ইচ্ছা তাঁহাদের মর্জ্জিমত সংবিধানের ধারা বাতিল সংশোধন এবং সংযোজন করিতে পারেন। ইহাতে বাধা দিবার কেহ নাই এবং সে-চেষ্টা যে বা যাহারা করিবে—তাহাদের ভারতরক্ষা (?) আইনে পাকড়াও করিয়া নির্জ্জন কারাবাসের ব্যবস্থা করা ... সমীচীন হইবে!

বিহারী বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়া নির্দ্দেশের প্রতিক্রিয়া কি হইবে, তাহা বর্ত্তমানে বলা কঠিন, তবে আমরা আশা করিব যে, কলিকাতা, উৎকল এবং আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বাংলা, ওড়িয়া এবং উর্দ্দু হরফের উপর তাঁহাদের পাল্টা হুকুম জারি করিতে দ্বিধা করিবেন না।

দিল্লীর অভিযান—কোন্ পথে?

"২৬শে জানুয়ারী হিন্দীর রাষ্ট্রীয় অভিষেক দিবস হইতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দ্দেশ অনুসারে প্রজাতন্ত্রী ভারতের উত্তর ও মধ্য খণ্ডে হিন্দীরই একাধিপত্য। কেন্দ্র এবং উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, বিহার, মধ্যপ্রদেশ এবং দিল্লী ও হিমাচল প্রদেশের সরকারী বার্ত্তাবিনিময় চলিবে হিন্দীতে। অন্যান্য অর্থাৎ অহিন্দীভাষী রাজ্যগুলি অবশ্য ইংরেজীতে চিঠিপত্র লিখিতে পারিবে, কিন্তু জবাব দিবার সময় দিল্লীর কেন্দ্রীয় কর্ত্তারা ইংরেজীতে লিখিত চিঠির সঙ্গে একখানি হিন্দী অনুবাদও জুড়িয়া দিতে পারেন। উহা একান্ত দরকারী না হউক, কেন্দ্রীয় সরকারী ভাষা হিন্দীর রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদা ত এইভাবে রাখা যাইবে! সাধ্যে না কুলাইলেও সাধ মিটাইতে সময়, সামর্থ্য এবং অর্থের শ্রাদ্ধ করিতে আমাদের রাষ্ট্রের দপ্তরকর্ত্তাদের দিগ্‌বিদিক জ্ঞান নাই। কাজেই দেখি-

তছি হিন্দী চালু করার নূতন নিয়মকানুনগুলি হইয়াছে কেবারে নিশ্ছিদ্র।

"একটি ভাষাতে কাজকর্ম চালাইতেই সরকারী কর্ত্তাদের আঠার মাসে বছর। এখন তাহার উপর ভাগ ন্দোবস্তের রকমারি নিয়ম ও ব্যতিক্রমের মারপ্যাচে হিন্দী এবং ইংরেজীর সাড়ে বত্রিশ ভাজা মিলাইতে াসিয়া কেন্দ্রীয় কর্ত্তারা এই আপৎকালীন অবস্থাতেও তন আপদ ডাকিয়া আনিতেছেন। দ্বৈতশাসনের মত রকারী কাজকর্মে দ্বিভাষার ব্যবহার কেবল অনর্থই াড়াইবে। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীরা নাকি ইচ্ছা রিলে হিন্দীতে অথবা ইংরেজীতে নোট লিখিতে পারিবেন। সুতরাং একই ফাইলে হিন্দী এবং ইংরেজী নোটের অবস্থান ঘটিবে। ব্যাপারটা খুব শান্তিপূর্ণ ও স্বচ্ছন্দ হইবে না, হিন্দীপ্রেমী কর্ত্তারাও তাহা কিছুটা আঁচ রিয়াছেন। অহিন্দীভাষী কর্মচারীরা হিন্দীতে লেখা নাট বুঝিতে পারিবেন না, সুতরাং সরকারী কাজকর্ম লু রাখিতে হইলে হিন্দী নোটের আবার ইংরেজী নুবাদ নোট করিতে হইবে। অতএব দপ্তরে দপ্তরে াই অনুবাদ শাখা। এই সমস্ত অনুবাদ শাখায় হিন্দী ইতে ইংরেজীর পাতা গজাইতে সরকারী কাজকর্মের টা বাড়িবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তর্জ্জমা-নথির বংশদ্ধির খরচ? পরিকল্পনায়, প্রতিরক্ষায় প্রয়োজনীয় কায় টান পড়িলেও হিন্দীকে রাজ্যপাটে বসাইবার জন্য ই এলাহী খরচে দেখিতেছি কেন্দ্রীয় কর্ত্তারা পিছপাও ।"

আনন্দবাজারের মতে—বন্দোবস্ত পাকা। কেন্দ্রীয় াষ্ট্রমন্ত্রীর আদেশ:

—"২৬শে জানুয়ারী হইতে কেন্দ্রের প্রধান সরকারী যা হইবে হিন্দী। অতিরিক্ত সরকারী ভাষা হিসাবে রেজীর নামটা অবশ্য উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহা না রয়া উপায় নাই, কারণ ১৯৬৩ সালে প্রথম সরকারী যা আইনের বিধানে হিন্দীর সঙ্গে সরকারী ভাষারূপে রেজীরও তুল্য মূল্য পাইবার কথা। কিন্তু কেন্দ্রীয় াষ্ট্রমন্ত্রীর বিস্তারিত নির্দ্দেশাবলীর ধরণ দেখিয়া একথা ন না করিয়া উপায় নাই যে, হিন্দীকেই এখন হইতে কারী কাজকর্মে পনের আনা দখল দিবার ব্যবস্থা, রেজীর স্থান নিতান্ত গৌণ।

"কতকটা সরকারী ভাষা আইনের মান রক্ষার জন্য র কতকটা অহিন্দীভাষীদের প্রবোধ দিবার উদ্দেশ্যে যা হইয়াছে বটে যে, অতিরিক্ত ভাষা হিসাবে ইংরেজী র ব্যাপারেই [illegible]

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দ্দেশাবলীর লক্ষ্য হিন্দীর হুকুমত প্রতিষ্ঠা। হিন্দী এবং ইংরেজী ব্যবহারের ভাগাভাগি ব্যবস্থায় ইংরেজীর ভাগ সংকীর্ণ ও সংক্ষিপ্ত; এই ব্যবস্থার চূড়ান্ত পরিণতি ইংরেজী হঠানেওয়ালাদের মনস্কামনা সিদ্ধি, সে-বিষয়ে এখন আর কিছুমাত্র সংশয় থাকিতেছে না। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীচাগলা ইংরেজীকে "লিঙ্ক ল্যাঙ্গুয়েজ" রূপে চালু রাখার সপক্ষে দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করায় হিন্দীওয়ালারা বিষম রুষ্ট হইয়াছিলেন। এখন তাঁহাদের তুষ্টির জন্যই বোধ করি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দ্দেশগুলি এমন আটঘাট বাঁধিয়া রচিত যে, সরকারী ভাষা আইনের স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও ইংরেজীকে একেবারে কোণঠাসা করার ব্যবস্থা হইয়াছে।"

সর্ব্বভারতীয় সরকারী চাকুরীর জন্য পরীক্ষা দিতে হিন্দীভাষীদের বিশেষ সুবিধাদানের ব্যবস্থাও পাকাপাকি করা হইয়াছে। ইহার সোজা অর্থ এই যে, ২৬শে জানুয়ারী হইতে প্রজাতন্ত্রী ভারতে অহিন্দীভাষীরা হইল দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। জাতীয় সংহতির ভিত্তিতে ইহাকে প্রচণ্ড আঘাত ছাড়া আর কি বলা যায়?

হিন্দীকে রাজতক্তে বসান সম্পর্কে আনন্দবাজারের মন্তব্য অহিন্দীভাষী ভারতীয়দের প্রণিধানযোগ্য—

—কেন্দ্রীয় কর্তারা জানেন, এমন কি হিন্দীওয়ালারাও মুখে অন্তত স্বীকার করেন যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, উচ্চশিক্ষাচর্চ্চায় এবং আইন-আদালতে ইংরেজী ছাড়া গতি নাই। হিন্দীকে রাজতক্তে বসান হইলেও উচ্চশিক্ষায় ইংরেজীর প্রাধান্য থাকিবেই। সুতরাং উচ্চশিক্ষায় এক ভাষা, কেন্দ্রীয় সরকারী কাজকর্মে ও সর্ব্বভারতীয় চাকরির জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আর এক ভাষা, এমন হ য ব র ল চালাইতে গেলে জাতীয় সংহতির সর্বনাশ হইবেই, সরকারী কাজকর্ম এবং বৈষয়িক উন্নয়ন প্রকল্পের গতিও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইবে। বিস্তর জরুরী দরকারী কাজ ফেলিয়া রাখিয়া হিন্দীকে সরকারী শিরোপা পরাইবার উৎসাহে কেন্দ্রীয় কর্ত্তারা এই যে অনর্থ ডাকিয়া আনিতেছেন তাহার প্রতিবাদে ও প্রতিবিধানে অহিন্দীভাষীদের দৃঢ়ভাবে উদ্যোগী হওয়া কর্ত্তব্য।—

মোট কথা—দেশের সবকিছু চুলোয় যাক—কিন্তু হিন্দী চাই-ই—হিন্দী ছাড়া আর অন্য কিছু আমাদের প্রয়োজন নাই—অতএব "জয়-হিন্দ-ী"।

'হিণ্ডীয়ার' রাজপত্র?

আর তর সহিল না। পাছে রাজত্ব ফসকাইয়া যায়,

এই ভয়ে—দিল্লীতে বিগত ২৫শে জানুয়ারী হিন্দী-রাজের সূচনা করা হইয়াছে হিন্দীতে 'ভারত-কা-রাজপত্র'—(অর্থাৎ গেজেট অব ইণ্ডিয়া) প্রকাশ করিয়া। অতএব ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইয়া গেল—ভারতের সর্ব্বাধিক ১০ কোটি লোকের ভাষা—হিন্দী, যাহা অবশিষ্ট ৩৪ কোটি অহিন্দীভাষীদের অবনত মস্তকে রাজ-আজ্ঞা বলিয়া গ্রহণ করিতেই হইবে! কিন্তু হিন্দীভাষী মহারাজদের এ-বাসনা কতটুকু পূর্ণ হইবে?

হিন্দীরূপী যে বিষবৃক্ষ ১৫ বৎসর পূর্ব্বে রোপন করা হয় কয়েকজনের জোর জবরদস্তিতে—সেই বৃক্ষে ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে এবং অচিরে এই বিষ ফল সারা ভারতে যে প্রচণ্ড বিষক্রিয়া সৃষ্টি করিবে—তাহা সামলাইতে দিল্লীস্থ হিন্দী-প্রেমিকরা পারিবেন কি? ইতিমধ্যেই দক্ষিণ ভারতে বিষক্রিয়া প্রকট হইয়াছে এবং আশা করা যায়—অনতিবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িষ্যা, আসাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি অহিন্দীভাষী অঞ্চলেও হিন্দী বিষফলের শোচনীয় প্রতিক্রিয়া অবশ্যই দেখা দিবে। পশ্চিমবঙ্গে কয়েকজন রাজ্যমন্ত্রী এবং সামান্য সংখ্যক স্বার্থপর কংগ্রেসী ব্যতিরেকে—অন্যান্য সকলেই হিন্দীকে রাজতক্তে বসানোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। এখন যদিও এই প্রতিবাদ কেবলমাত্র বাক্যে এবং কাগজ-পত্রেই হইতেছে, কিন্তু সেদিনের দেরি নাই যখন এই প্রতিবাদ রাজ্যের সর্ব্বত্র সকল মহলকে সক্রিয় চঞ্চল করিবে। কয়েকজন হিন্দীভাষী কর্ত্তাস্থানীয় ব্যক্তির বেকুবী এবং জবরদস্তির প্রায়শ্চিত্ত সমগ্র ভারতকে করিতে হইবে। মূর্খ যখন "পণ্ডিত" হয়—তাহার কাছে হিতবাক্য বলার কোন অর্থ হয় না। যাদের দৃষ্টির সীমা নাকের ডগাতেই আবদ্ধ—তারা সামান্য দূরের বিপদ সঙ্কেত দেখিতে পায় না বলিয়া নিজেদের সঙ্গে দেশেরও সর্ব্বনাশ করে। ক্ষুদ্র সীমিত-দৃষ্টি শাসকের দল আজ ভারতের এই সর্ব্বনাশ করিতে বদ্ধপরিকর। ভারতের সংহতি আজ নির্ব্বাণের পথে চলিল!

হিন্দীর রাজপাঠলাভে প্রতিক্রিয়া—

"আগামী ২৬শে জানুয়ারীর শুভদিনে এক নতুন অভিশাপ নেমে আসছে ভারতের অধিকাংশ জনজীবনে। এই দিন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দী চালু হচ্ছে ভারতের সরকারী ভাষারূপে। অর্থাৎ, ভারত রাষ্ট্রের আর সব ভাষা, তা যত সমৃদ্ধ, যত ঐশ্বর্য্যশালী, যত ঐতিহ্য পর্য্যবসিত হচ্ছে দ্বিতীয় শ্রেণীতে। এদিন থেকে হিন্দী ছাড়া আর সব ভাষা ভারত রাষ্ট্রের ভাষা নয়। আঞ্চলিক ভাষার মর্য্যাদা নিয়ে এই সব ভাষা এই দিন থেকে সেলাম জানাবে হিন্দীকে।

"বাঙ্গলাকে যে কোন মহল আঞ্চলিক ভাষায় চিহ্নিত করুন না কেন, তাতে আমাদের অপমানিত বোধ করার কারণ আছে। ভারতীয় ভাষাকে ইংরেজরা এক সময় বলত, ভার্ণাকুলার বা ক্রীতদাসের ভাষা। ভার্ণাকুলার দেশছাড়া হয়েছে, কিন্তু সে জায়গায় আমদানী হয়েছে আঞ্চলিক শব্দ। এই শব্দ অনেকটা অপবাদের মত। আমাদের লড়াই এই অপবাদের বিরুদ্ধে ও ভারতের অন্যান্য ভাষাবৈভবের কথা বিস্মৃত না হয়েও বলা চলে, বাঙ্গলা অন্ততঃ কম করেও সাড়ে দশ কোটি লোকের ভাব প্রকাশের মাধ্যম, অন্ততঃ একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে বাঙ্গলা রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত, ভারত রাষ্ট্রের যাবতীয় ভাষার মধ্যে একমাত্র বাঙ্গলাই বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকৃত্যের মাধ্যমরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বিশ্বের বহু দেশে ভারতবিদ্যা বিদ্যাবলীর মধ্যে বাঙ্গলার স্থান অনেকের ওপরে।

"আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দী চালু করার আগেও নানা চোরাগোপ্তা পথে দেশের ঘাড়ে হিন্দী চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। রেলের স্টেশনে-স্টেশনে, ডাক বিভাগের টিকিটে, টাকার ছাপে, কাগজপত্রে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাধীন আরও বহু ক্ষেত্রে তার স্বাক্ষর মিলবে।

"হিন্দী চালু করার পক্ষে যে বড় যুক্তি দেওয়া হচ্ছে, তাহা ভারতীয় রাষ্ট্রের সংহতি। জোর-জুলুম করে একটা ভাষা অনিচ্ছুকদের ওপর চাপিয়ে দিলেই যে যন্ত্রের ক্রিয়ার মত রাষ্ট্রীয় সংহতি প্রতিষ্ঠিত হবে, এমন যুক্তি অচল। আর সংহতি রাষ্ট্রীয় জীবনের আরও অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। সে-সব ছেড়ে সর্ব্বাগ্রে ভাষার ব্যাপারে এমন তৎপরতা দূরদৃষ্টির অভাব বলেই মনে হয়। ভাষা-প্রশ্ন স্বভাবতঃই সংবেদনশীল।

"দেশ আজ বহুবিধ সমস্যায় শতচ্ছিন্ন। বর্তমানের সর্ব্বাধিক সমস্যা অন্নবস্ত্রের সংস্থান ও অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়। সমাজদেহে নানা অসঙ্গতি এখন সমগ্র রাষ্ট্রকে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় করে রেখেছে। সর্ব্বোপরি দেশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শত্রুদের তৎপরতা, পাকিস্তানের ক্রমাগত ভারত-বিদ্বেষী ক্রিয়াকলাপ, সীমান্তশিয়রে চীনের হামলাবাজি রাষ্ট্রকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে। এর সঙ্গে আছে ... শ্রেণীর

কারী কর্ম্মচারীর অসদাচরণ, এক রাজ্য কর্ত্তৃক অপর জ্যের প্রতি আধিপত্য বিস্তারের প্রয়াস, অর্থনৈতিক ষণ, ধর্ম্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা, ভাষার ব্যাপারে অত্যুগ্র চরণ ইত্যাদি। এত সব অনৈক্যের ঘূর্ণাবর্ত্তে গণ-নস স্বভাবতঃই ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট। এর উপরে যদি জবরদস্তি র অনিচ্ছুকদের উপর কোনা ভাষা চাপিয়ে দেওয়া , তবে তা ক্ষোভ ও রোষাগ্নিতে ইন্ধন যোগানোরই মিল হবে। এর বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিবাদের ভাষা নও হয়ত আন্দোলনের পথ অবলম্বন করে নি কিন্তু কোনদিন জনমতের প্রতিবাদধ্বনি আন্দোলনের গ্রহণ করে, তখন সমস্ত ক্ষোভ একত্রিত হয়ে যে-বানল সৃষ্টি করবে, তা অনেক কিছু পুড়িয়ে ছাই করে বে বলে আমরা আশঙ্কা করি। মনে হয়, আমাদের সন-কর্ত্তৃপক্ষ দেওয়ালের লিখন পড়তে পারেন না। দের কাছে আমাদের অনুরোধ, এখনও সময় আছে, বনও তাঁরা নিরস্ত হোন।—"

বিগত ২৩শে জানুয়ারী তারিখে উপরি-উক্ত বিবৃতিটি : রমেশচন্দ্র মজুমদার, অধ্যক্ষ খগেন্দ্রনাথ সেন, সর্বশ্রী দেব চৌধুরী, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, সাতকড়ি-তি রায়, জ্যোতিশ চন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি বিশিষ্ট পণ্ডিত ক্ষাত্রী, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক এবং সমাজসেবীর ক্ষরে সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য মাদের মত নগণ্য ব্যক্তিরাও এই বিবৃতির পূর্ণ র্থক।

হিন্দীকে সর্ব্বগ্রাসী ভারতীয় ভাষা করিবার অভদ্র, যৌক্তিক এবং অনাবশ্যক যে-প্রয়াস আমাদের হিন্দী ষী মালিকরা করিতেছেন তাহাতে বলিতে ইচ্ছা হয়।

"বিধির বিধান কাটবে তুমি (তোমরা?) এমন
শক্তিমান
মোদের ভাঙ্গাগড়া তোমার (তোমাদের?)
হাতে এতই অভিমান!"

রাজ্যের সরকারী ভাষারূপে বাঙ্গলা

প্রজাতন্ত্র দিবস হইতে বাংলা ভাষা রাজ্যের সরকারী ষার মর্যাদা লাভ করিতেছে। অতঃপর সরকারী জকর্ম্মে যথাসম্ভব বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হইবে। র্জ্জিলিং জেলার ৩টি মহকুমায় নেপালী ভাষার ব্যবহার লু হইবে। আন্তঃরাজ্য কাজকর্ম্মে অবশ্য ইংরাজীর বহারই চালু রহিবে।

একমাত্র হাইকোর্ট ছাড়া আর সব আদালতে ক্রমশ বাংলা ভাষা চালু ...

জন্য বিল, প্রশ্ন ইত্যাদি বাংলা ভাষায় রচিত হইবে। তবে বিধানমণ্ডলীর আগামী অধিবেশনেই সমস্ত বাংলা ভাষায় করা সম্ভব হইবে না বলিয়া রাজ্য সরকার মনে করেন।

ইতিমধ্যে রাইটার্স বিল্ডিংসে কাজের উদ্দেশ্যে ৩০০ বাংলা টাইপরাইটারের জন্য অর্ডার দেওয়া হইয়াছে।

কয়েক দিন পূর্ব্বে উপরি-উক্ত সংবাদটি প্রকাশিত হয়। আশা করি, রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী এবিষয়ে তাঁহার যথাসাধ্য করিবেন—এবং সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাহায্য-প্রাপ্ত হাসপাতাল, বিদ্যালয় এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও যাহাতে বাংলার মাধ্যমে সকল কাজ করেন, সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন।

কলিকাতায় এমন কতকগুলি সরকারী এবং বেসর-কারী (সাহায্যপ্রাপ্ত) হাসপাতাল এবং সাধারণ সংস্থা আছে, যাহাদের কর্ত্তাস্থানীয় ব্যক্তিরা এখনও বাঙ্গলার নামে নাসিকা কুঞ্চিত করেন। এই-শ্রেণীর কর্ত্তাব্যক্তি-দের বাঙ্গলার প্রতি হেনস্থার ভাব অবশ্যই পরিবর্জ্জন করিতে হইবে।

হিন্দী সম্পর্কে দিল্লী বাদশাহদের হুকুম-নির্দ্দেশাদির যদি কোন পরিবর্ত্তন না হয়, তাহা হইলে পশ্চিম বঙ্গে যে সকল অবাঙ্গালী ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান আছে—তাহাদেরও সরকারের সহিত বাঙ্গলাতে পত্রালাপ করি-বার নির্দ্দেশ রাজ্য সরকার দিবেন—এ-আশাও আমরা করি। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী চোস্ত হিন্দীতে ভাষণাদি দিয়া থাকেন—বাঙ্গলার বাহিরে গিয়া তিনি যত ইচ্ছা হিন্দী বলুন—তাঁহার অবাঙ্গালী হিন্দীভাষী 'মিত্রো'দের হিন্দীতে প্রীতি নিবেদন করুন, কিন্তু খাস বাঙ্গলাতে বসিয়া বাঙ্গলা দেশকে আর অযথা হিন্দীবুলিতে আলাই-বেন না—এই নিবেদন।

স্কুলে ৪র্থ শ্রেণী হইতে হিন্দীকে অবশ্যপাঠ তালিকা হইতে অবিলম্বে বাদ দিতে হইবে—হিন্দীর বদলে আমরা তামিল তেলেগু শিখিতেও রাজী আছি—কিন্তু হিন্দী? কদাপি নহে!

বিগত দুর্গাপুর কংগ্রেসে আমাদের শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয়, প্রতিবাদ সত্ত্বেও, বাঙ্গলাতেই তাঁহার ভাষণ দান করেন। কিন্তু ইহার বিপরীত কাজ করেন—আমাদের মুখ্যমন্ত্রী। তাঁহাকে বাঙ্গলায় ভাষণ দিতে বলা হইলে তিনি উন্নতশিরে এবং সগৌরবে ঘোষণা করেন—তাঁহার জন্ম বিহারে এবং তিনি হিন্দী ও বাঙ্গলার মধ্যে কোন তফাৎ দেখেন না—কাজেই তিনি হিন্দীতেই ভাষণ দান করিলেন এবং হিন্দীভাষী দেশি-

গেটদের নিকট হইতে ভীষণ করতালি লাভ করেন! (হাততালি কি কারণে পাইলেন বলা শক্ত, তবে আশা করি ইহা পরিহাসসূচক নহে।

হিন্দীর প্রতি আমাদের ব্যক্তিগত কোন বিদ্বেষ নাই—কিন্তু বিদ্বেষ নাই বলিয়াই যে একদল লোক ঐ হিন্দীকে আমাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দিবে—ইহা অসহ্য এবং আমরা যথাসাধ্য ইহার প্রতিবাদ—প্রতিরোধ সর্ব্বভাবে, সর্ব্বদা করিব।

হিন্দীকে রাজভাষা করার চেষ্টা—শৃগালকে পশুরাজের আসনে বসানর মত একটা বিকট অসম্ভব দুরাশা, নিষ্ঠুর পরিহাস!

বিহারের নূতন যুগ? সংহতির প্রথম ধাপ?

২০শে জানুয়ারী '৬৫ তারিখের সংবাদে প্রকাশ পাইয়াছে যে:

চাকুরিতে লোক নিয়োগের ব্যাপারে বিহার সরকারের এক সাম্প্রতিক নির্দ্দেশে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। বিহার সরকারের উক্ত নির্দ্দেশে প্রাদেশিকতার মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া এখানকার ওয়াকেবহাল মহল মনে করেন।

কলিকাতায় আসন্ন পূর্ব্বাঞ্চল পরিষদের বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিনিধিরা ঐ বিষয়টি উত্থাপন করিবেন বলিয়া উক্ত মহল আশা করিতেছেন।

এখানকার সরকারী মহলের সংবাদে প্রকাশ যে, বিহার সরকারকর্তৃক প্রদত্ত এক সার্কুলারের কপি পশ্চিমবঙ্গ সরকার সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সার্কুলারের প্রতিটি ছত্রে সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে। উক্ত মহল মনে করিতেছেন যে, বিহার সরকারকে বুঝাইয়া (?) অথবা চাপ সৃষ্টি করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার যদি অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন, তবে ভারতের সংহতি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে।

তাহা ছাড়া, বিহার সরকার কর্ত্তৃক প্রদত্ত এই সার্কুলার সংবিধান-বিরোধী।

নির্ভরযোগ্য সূত্রের সংবাদে আরও প্রকাশ যে, বিহার সরকার সম্প্রতি চাইবাসার খনির মালিকদের নিকট প্রদত্ত এক সার্কুলারে জানাইয়াছেন, খনিগুলিতে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারে বিহারের স্থায়ী বাসিন্দাদের যেন নিয়োগ করা হয়। এখানকার রাজনৈতিক মহল মনে করিতেছেন যে, এই সার্কুলার প্রদানের দ্বারা চাইবাসা ও পার্শ্ববর্তী হইল। অবশ্য বিহার সরকার তাঁহাদের "সার্কুলারে বিহারের স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগের কথা বলিয়াছেন কিন্তু আসলে তাঁহাদের অন্য উদ্দেশ্য প্রমাণিত হইতেছে।

পূর্ব্বাঞ্চল পরিষদের আসন্ন বৈঠকে বাংলা ও বিহারের মধ্যবর্ত্তী একটি বনপথ লইয়া যে গোলযোগ চলিতেছে তাহাও আলোচিত হইবে বলিয়া আশা করা হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিনিধিরা এই বিষয়টিও উত্থাপন করিবেন।

রাজ্য সরকারের জনৈক মুখপাত্র জানান যে, আসন্ন বৈঠকের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রাজ্য সরকারের নিকট হইতে তাঁহারা এখন পর্য্যন্ত কোন কার্য্যসূচী পান নাই। তবে কোন কোন মহল মনে করিতেছেন যে, আসাম, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত সুদৃঢ় করার সহিত জড়িত নানাবিধ সমস্যা লইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি আলোচনার সূচনা করিতে পারেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুলজারিলাল নন্দের এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করিবার কথা।

একদিকে হিন্দীদ্বারা দেশের সংহতি রক্ষার সাংঘাতিক প্রয়াস, অন্যদিকে বিহারে 'বাঙ্গাল খেদা'—সরকারীভাবে চালু করিয়া বাঙ্গালীকে কোণঠাসা করিয়া মারিবার পুণ্য-প্রচেষ্টা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যদি পশ্চিমবঙ্গেও বিহারের মত পাল্টা সমপ্রকার বিধান চালু করা হয়—বিহার সরকার এবং দিল্লীস্থ তাঁহাদের মামাতো-মাসতুতো ভাই ব্রাদারিয়ারা কি করিবেন, কি বলিবেন? অবশ্য এ-কথা আমরা জানি যে, পশ্চিমবঙ্গে—এ-রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী 'বিহারী-বাঙ্গালীর মধ্যে হাওড়া ব্রীজ', কখনও, পশ্চিমবঙ্গে বিহারী এবং অবাঙ্গালীদের চাকুরির ক্ষেত্র সঙ্কুচিত করিবেন না, কিংবা করিতে সাহস করিবেন না! ঘরের ছেলে বেকার থাকুক ক্ষতি নাই কিন্তু পরের ছেলে যেন কখনও এখানে আসিয়া চাকুরিহীন অবস্থায় না থাকে—ইহা অবশ্যই দেখিতে হইবে, কারণ, তাহাতে বাঙ্গালীকে প্রাদেশিকতা দোষে দুষ্ট হইয়া দিল্লীর আদালতে কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে হইবে। শূন্য-উদর বাঙ্গালী উদারতা হারাইলে, বাঙ্গলার বদনাম হইবে!

বিহার সরকার প্রথম শ্রেণীর চাকরিতে বিহারী নিয়োগ করার বিষয়ে কোন আইন কেন করিতেছেন না জানি না, পাঞ্জাবী মাদ্রাজী-উত্তর প্রদেশীকে এই শ্রেণীতে নিয়োগে বাধা দিতে চাহেন না বা পারিবেন না বলিয়াই কি? কেন্দ্রীয় সরকার কার্য্যতঃ ভারত সরকারের উচ্চতম নিয়োগ হইতে বাঙ্গালীকে একেবারেই

টিয়া অধিকার? মিঃ বি. আর. সেন, মিঃ এস. কে. , প্রভৃতির মত পাকা এবং দক্ষ আই সি এস আজ ন দেশছাড়া? কলিকাতার কেন্দ্রীয় সরকারের বড় ড় পদগুলিতে বাঙালীর সংখ্যা শতকরা সাড়ে সাত হবে কি? কলিকাতার বিখ্যাত অবাঙালী এবং বিদেশী াণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে, যথেষ্ট পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও, াঙালী নিয়োগ হয় না কেন? এ-বিষয়ে দিল্লীর ক্তব্য কি?

পৌর (উপ-) পিতাদের কর্তব্যনিষ্ঠা

"—কলিকাতার নাগরিক জীবনে পানীয় জলের ই যেন চিরস্থায়ী হইতে চলিয়াছে। প্রয়োজন অনু- রে জল পাওয়া দূরের কথা, কর্পোরেশন এতদিন যে- রিমাণ পানীয় জল সরবরাহ করিতেছিলেন, তাহাও রিকদের ভাগ্যে জুটিতেছে না। আপাতত গোলমাল তার বাষ্পচালিত পাম্পে। চারিটি পাম্পের একটি ল, একটিতে বৈদ্যুতীকরণের কাজ চলিতেছে এবং মানের কয়লায় প্রয়োজনীয় উত্তাপের অভাবে অপর টি পাম্পও পুরাদস্তুর চালু রাখা সম্ভব হইতেছে না। অবস্থা অবশ্য একদিনে সৃষ্টি হয় নাই। বেশী দাম য়া নিম্নমানের কয়লা সরবরাহের অভিযোগ অনেকদিন গেই উঠিয়াছিল। এ ব্যাপারে নাকি তদন্তও হইয়াছে। াধু উপায়ে অর্থ উপার্জনের জন্য মহানগরীর পানীয়জল বরাহের ব্যবস্থা বানচাল করিতে ঠিকাদারদের বিবেকে টকায় নাই। হয়ত পৌরসভার উপরের স্তরে পুঞ্জীভূত তি এই ধরণের কাজকে বৎসরের পর বৎসর প্রশ্রয় আসিয়াছে। পলতার ওয়াটার ওয়ার্কসের কাজ াইত রাখিবার জন্যও পৌরকর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ন নাই। পলতায় দীর্ঘ চার বৎসর যাবৎ মেকানি- ল ও ইলেক্‌ট্রিক্যাল অ্যাসিস্টান্ট ইঞ্জিনীয়ারের পদ শূন্য পড়িয়া আছে। এই দুইজন ইঞ্জিনীয়ারের বে কাজের অসুবিধা হইতেছে,—পলতা ওয়াটার কসের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তাঁহার নোটে তাহা নাকি বার জানাইয়াছেন। জরুরী মেরামতির জন্য যন্ত্রপাতি ত রাখার পাটও নাকি এখন উঠিয়া গিয়াছে। কলি- তার কয়েকটি বিশেষ এলাকা ছাড়া মহানগরীর অন্যান্য লের অধিবাসীদের পলতার জল সরবরাহের উপরেই র করিতে হয়। মহানগরীর পানীয় জল সরবরাহ- েখা দেখাশুনার জন্য পৌরসভায় একটি বিশেষ কমিটিও ছে। কিন্তু তাঁহাদের কাজকর্ম দেখিয়া এ কথা মনে অসঙ্গত নয় যে, নাগরিকদের স্বার্থরক্ষার প্রশ্নটি তাঁহারা তাঁহাদের দায়িত্বের তালিকা হইতে একেবারেই ছাঁটাই করিয়া ফেলিয়াছেন।"

বহু আশার পর প্রায় ৭।৮ মাস পূর্ব্বে বাহাত্তর ইঞ্চি পাইপ শেষ পর্য্যন্ত বসান হইয়াছে—কিন্তু এই পাইপের উদ্বোধন সত্ত্বেও কলিকাতা শহরে জলের সরবরাহ না বাড়িয়া—ক্রমশ কমের দিকেই যাইতেছে!

পলতা হইতে টালায়—

"জল-পরিবহণের পাইপ বসাইলেই জল আসিতে পারে না। গঙ্গার লবণাক্ত ও পলিবহুল জল পানীয়ের উপযুক্ত ত নয়ই, ওই জল সোজাসুজি টালাতে পাঠানও অসম্ভব। এতদিন পরে গঙ্গার জল রাখার জন্য পলতায় পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইনটেক স্টেশন সবে তৈয়ারি হইয়াছে, কিন্তু নদী হইতে জল তুলিবার ব্যবস্থা আজও হয় নাই—ইনটেক জেটি নির্ম্মাণের অনুমোদন মাত্র কিছুকাল আগে পাওয়া গিয়াছে। পলতা হইতে অতিরিক্ত জল সরবরাহ করিতে হইলে টালা পাম্পিং স্টেশনেও নূতন জলাধার নির্ম্মাণ করা দরকার। কিন্তু টালায় ভূগর্ভস্থ জল-শোধনাগার নির্ম্মাণের কাজ নাকি সবে সুরু হইয়াছে। পৌর-কর্তৃ- পক্ষের কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা থাকিলে সব কাজই একসঙ্গে আরম্ভ করা যাইত। অতিরিক্ত পানীয় জল সরবরাহের সঙ্গে যে-সব পরিকল্পনা যুক্ত, সেগুলি একটি একটি করিয়া কার্য্যকর করিবার কি অর্থ হইতে পারে, তাহা বোঝা যায় না। ইহাতে হয়ত ঠিকাদারদের সুবিধা হয়, কিন্তু নাগরিকদের হয়রানির পর্ব্ব ক্রমেই দীর্ঘ হইতে থাকে।"

কলিকাতায় জল সরবরাহ প্রসঙ্গে আমরা 'আনন্দ- বাজারে'র সহিত একমত।

কলিকাতায় জল সরবরাহ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোন দায়িত্ব আছে কি না জানি না—তবে থাকা উচিত বলিয়া মনে করি। বেশ কিছুকাল পূর্ব্বে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে সস্তায় ইট প্রস্তুতের জন্য রাজ্য সরকার পলতা ওয়াটার ওয়ার্কসের প্রিসেটলিং ট্যাঙ্কের পলি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত করেন। পৌরসভার সঙ্গে এক চুক্তিতে স্থির হয় যে, রাজ্য সরকার ওই ট্যাঙ্কের মাটি কাটিবেন এবং তাহার বদলে পৌরসভা কিছু ইট পাইবেন। কিন্তু রাজ্য সরকার তাঁহার দায়িত্ব পালন না করায় সব কয়টি ট্যাঙ্কেই পলি জমিয়াছে, একটিতে পলির পরিমাণ অস্বাভাবিক রকম বেশী। এ ব্যাপারে কাহার দায়িত্ব বেশী, সে বিতর্কে প্রবেশের প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, মহানগরীর ত্রিশ (?) লক্ষ নরনারীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বজায় রাখিবার ব্যাপারে রাজ্য সরকার ও

পৌরসভা চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়াছেন। কেবল দায়িত্বহীনতাই নহে, পরম নিষ্ঠুরতাও বলা উচিত।

আবার মূল্যবৃদ্ধি ?

সরকারী মতে এবৎসর ফসল প্রভূত পরিমাণে বাড়িয়াছে—এবং সেই কারণে আগামী দুই মাসের মধ্যেই দেশের খাদ্য সঙ্কট মোচন হইবে। কেন্দ্রীয় খাদ্য-মন্ত্রীও এই ভরসা দিয়াছেন। কিন্তু :

"মাঘ মাসের প্রথম সপ্তাহ পার হওয়ার পরেও যে এরকম আশ্বাস দিতে হয়, ইহাই সরকারী খাদ্যনীতির পক্ষে কলঙ্ক। কেননা, গত দুই মাস যাবৎ বিস্তীর্ণ অঞ্চল ব্যাপিয়া নূতন ফসল উঠিতেছে। স্বাভাবিক অবস্থায় অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত বাজার নূতন ফসলে ছাইয়া যায়; ফলে দরও অনেক নামিয়া থাকে। তৎ-সত্বেও এখন পর্য্যন্ত বিক্রয় কেন্দ্রগুলিতে দর নামে নাই কেন—ইহাই একটা দুর্জ্ঞেয় রহস্য। দর নামা দূরে থাকুক, স্বয়ং সরকারই রেশন এলেকায় "ন্যায্য মূল্যের" দোকান হইতে বিক্রীত চাউল ও গমজাত দ্রব্যাদির দর অনেক চড়াইয়া একটা বিভ্রাটের সূচনা করিয়াছেন।

"বৃহত্তর কলিকাতার পুরাপুরি রেশন এলেকায় 'বাঙ্গলার মাঝারি চাউল' (বেঙ্গল ফাইন) নামে যাহা বিক্রয় হইতেছে—খোলা বাজারে কোনদিনই তাহা 'মাঝারি' চাউল বলিয়া গণ্য হয় নাই। বরঞ্চ 'কমন' অর্থাৎ নিম্নতর স্তরের 'সাধারণ চাউল' বলা যাইতে পারে। গত ১লা জানুয়ারী তারিখে ইহার দর ধার্য্য হইয়াছে কিলো-প্রতি ৭০ পয়সা। অথচ সরকার রেশন এলেকায় ক্রেতাদের নিকট আদায় করিতেছেন ৮০ পয়সা—অর্থাৎ আইনানুযায়ী ধার্য্য দর অপেক্ষা ১০ শতাংশ বেশী। গমের দরও কিলো-প্রতি ৪০ পয়সার স্থানে ৫০ পয়সা অর্থাৎ এক ধাপে ২৫ শতাংশ চড়ান হইয়াছে। মূল্যবৃদ্ধির অনুকূলে তাঁহাদের যুক্তি : বিদেশ হইতে আমদানী গমই রেশনের দোকানে বিক্রয় হয়। ইহার দর দেশী গমের তুলনায় অনেক কম হওয়ায় সর্ব্বত্রই সরকারী গোলা হইতে আমদানী গম সরবরাহের দাবি উঠিয়াছে। তাহা পূরণ করা সম্ভব নয়। তাই আমদানী গমের বিক্রয়-মূল্য ড়াইয়াই সরকার দু'রকম গমের মধ্যে দরের সমতাস্থাপন করিতেছেন। যুক্তিটি কি চমৎকার! ইহা ঈসপের ল্পে পিঠা ভাগ করার কাহিনীই স্মরণ করাইয়া দেয়। কন্তু দেশের ক্ষেতে উৎপন্ন গমের দর চড়া হইলে তাহা াসের দ্বারা মূল্য হ্রাসের অনুকূল পরিবেশ গড়িয়া

এলাকায় গমের দর চড়াইয়া সরকার দেশী গমের দা চড়া রাখিতে প্রেরণা দিলেন কেন? রেশন দোকা 'বাঙ্গলার সাধারণ চাউলে'র দর চড়াইবার মূ সরকারের যুক্তি এই যে, তদপেক্ষা কম দরে উহা বিক্র করিলে রাজকোষের নাকি লোকসান হইবে। ইহ সত্য হইলে এ ধারণাই অনিবার্য্য যে, সরকার গোলায় চাউল-বিক্রেতার কম দরের 'কমন' চাউ বেচিয়া 'ফাইন' চাউলের জন্য নির্দ্দিষ্ট চড়া দর আদা করিতেছেন। অর্থাৎ ১৯৪৩ সালে মন্বন্তরের সময় সরকারের নিকট খারাপ চাউল বেচিয়া চড়া দর আদায়ের যে মওকা দেখা গিয়াছিল, এবার ইতিমধ্যে তাহা সুরু হইয়াছে।

"রেশন এলাকায় সাধারণ লোকের উপর ইহা অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া, কিংবা সমগ্র দেশে মূল্যস্থিতি ব্যাপারে ইহার প্রভাব সরকার চিন্তা করিয়াছেন কি পূরাপূরি এবং আংশিক—দু'রকম রেশন এলাকাতে অধিকাংশ লোক নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণীভুক্ত। শীতকালে সবরকম খাদ্যের প্রাচুর্য্য ঘটিবার ও দর কমিবার কথা কিন্তু এবার ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। দাইল ও রাঁধি বার তৈল দুষ্প্রাপ্য; মাছ, সব্জি ও তরকারি স্বাভাবিক অবস্থার সহিত তুলনায় দ্বিগুণ কিংবা ততোধিক চড়া দরে বিক্রয় হইতেছে। ফলে, সাধারণ লোকের সংসারে দুর্দ্দশার আর অন্ত নাই। ইহার উপর স্বয়ং সরকার চাউল ও গমের দর চড়াইয়া দেওয়ায় তাহাদের জীবনযন্ত্রণা আরও বৃদ্ধি পাইবে। ইহার সহিত সামঞ্জস্য রাখি মাগ্গি ভাতা চড়াইবার দাবী উঠিলে সরকার তা সামলাইতে পারিবেন ত?

"রেশন-বহির্ভূত এলাকায় বাজার-দরের উপর ইহা প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত ভয়াবহ। পৌষ মাসের মাঝামাঝি হইতে রেশন এলাকায় 'সাধারণ চাউলের' দর চড়িবা পর অন্যত্র, শহর অঞ্চলে বিক্রেতারা তদপেক্ষা কম দরে সন্তুষ্ট হইবে না। গ্রামের হাটেও ইহার কাছাকাছি দ আদায়ের জন্য বিক্রেতারা যথাসাধ্য চাপ দিবে। ফলে আষাঢ়ের সময়ই সাধারণ চাউলের দর যদি কিলো-প্রতি ৭৫ বা ৮০ পয়সা দাঁড়ায়, শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে স্বাভাবিক ঘাটতির সময় দর কোন্ স্তরে উঠিবে। রেশন এলাকা লোকের তবু সান্ত্বনা আছে যে, বছরের সব সময় একই দা বলবৎ থাকিবে। (অবশ্য যদি লোকসানের অজুহাতে তখ আবার দর চড়ান না হয়) কিন্তু, রেশন-বহির্ভূত এলাকা শ্রাবণ-ভাদ্র মাস হইতে দর চড়াইবার চিরন্তন কৌশ

যে, রেশন এলাকায় গম-চাউলের মূল্যবৃদ্ধি দ্বারা সরকারই বছরের মাঝামাঝি দেশের সর্বত্র আরও দর চড়াইবার পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন।

"কৃষক কর্তৃক প্রাপ্য মিহি ধানের দর মণ-করা ২২৲ না হইলেও, অন্ততঃ ২১৲ ধার্য করার জন্য জনৈক কৃষিব্যবসায়ীর বক্তব্য পূর্ব্বে 'যুগান্তরে' প্রকাশিত হইয়াছে। কতগুলি যুক্তি যেমন একতরফা, তেমনই সামঞ্জস্য-বহির্ভূত। কারণ,প্রতি বিঘা জমিতে আধ মণ মিশ্র সার ও আধ মণ বাদামের খৈল প্রয়োগ করিলে বিঘা-প্রতি মাত্র আট মণ ধান ফলিবার কথা নয়, অন্তত দশ মণ,কিংবা তারও বেশি ফসল উঠিবে। অন্যদিকে, চাষের খরচ সম্পর্কে হিসাবটাও ভ্রান্ত। ক্ষেতের কাজ বন্ধ থাকার জন্য বছরে প্রায় সাত মাস নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকিলে তখনকার সম্পূর্ণ সংসার খরচও ক্ষেতে পাঁচ মাসের শ্রম হইতে উশুল করা সম্ভব নয়। কিংবা চাষ বন্ধ করিলে ধানী-জমিগুলি বিঘা-প্রতি বারো শত টাকা দরে বিক্রয়ের কল্পনা সম্পূর্ণই অবাস্তব। কারণ, তখন ধানী-জমির খরিদ্দাররা উপিয়া যাইবে। সংসার-খরচ চড়িবার জন্য অন্যান্য নিম্নবিত্তের মত চাষীও কষ্ট ভোগ করিতেছে। ইহার প্রতিকার করিতে হইবে —ন্যায্য দরে বিকিকিনির সুনিশ্চিত ব্যবস্থা দ্বারা। তৎপরিবর্ত্তে ধানের ২২৲ টাকার ভিত্তিতে মোটা ও সাধারণ চাউলের খুচরা দর মণ-করা ৩৮।৪০ টাকায় তুলিয়া দিলে অন্যান্য কার্য্যে রত লোকগুলির দুর্দশা বাড়িতে পারে; কিন্তু চাষীর কোন উপকার হইবে না। কারণ, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য জিনিসের দর আরও বেশী চড়িয়া যাওয়ায় চাষীর অতিরিক্ত আয় হাওয়ায় মিলাইয়া যাইবে।"

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের বর্ত্তমান বিষম অবস্থার কথা লইয়া বহুবার বহু আলোচনা হইয়াছে—কিন্তু যাঁহাদের হাতে এই ভাগ্যহত দেশের হতভাগ্য জনগণের জীবনমরণ নির্ভর করিতেছে, রেশনের থলি হাতে করিয়া তাঁহাদের বাজারে ঘোরাঘুরি করিতে হয় না বলিয়া, তাঁহারা আমাদের প্রকৃত অবস্থার বাস্তবরূপ কল্পনা করিতে পারিবেন না। উপরে উদ্ধৃত যুগান্তরের মন্তব্যে তাঁহারা বিচলিত হইবেন কি?

কি ফল লভিনু হায়!

যুগান্তরের ষ্টাফ রিপোর্টার সংবাদ দিতেছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার রেশনের চাউল, গম ও গমজাত সামগ্রীর মূল্য আর এক ধাপ বাড়াইবার জন্য রাজ্য সরকারের উপর চাপ দিতেছেন। [illegible] করিতেছেন, কিন্তু কেন্দ্রের চাপ ঠেকাইতে পারিবেন কি? যুগান্তরের (এবং আমাদেরও) মতে—

"এই সংবাদ অত্যন্ত উদ্বেগজনক। বৃহত্তর কলিকাতা এলাকায় পুরাদস্তুর রেশন প্রবর্ত্তনের সরকারী সিদ্ধান্তকে আমরা অকুণ্ঠচিত্তে সমর্থন জানাইয়াছিলাম। কিন্তু তাহা এইজন্য নহে যে, দোকানদারদের ব্যবসা তুলিয়া দিয়া সরকারী খাদ্য বিভাগ নিজেরাই নিকৃষ্ট দোকানদারিতে নামিয়া মানুষের পকেট হাল্কা করার ফিকিরে থাকিবেন। অথচ বিধিবদ্ধ রেশন চালু হইবার সঙ্গে সঙ্গেই কলিকাতার মানুষ দোকানে গিয়া শুনিলেন, গমের দাম কিলো-প্রতি দশ পয়সা করিয়া ও "বেঙ্গল ফাইন" চালের দাম কিলো-প্রতি চার পয়সা করিয়া বাড়িয়া গিয়াছে। মুনাফাখোরি ও চোরাকারবারির হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া ও বাঁধা দরে বরাদ্দমত জিনিস পাইয়া মানুষ কোথায় হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিবে এবং অসুবিধা সহ্য করিয়াও রেশন ব্যবস্থার জন্য সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করিবে, তাহা নহে, রেশনিং এর প্রথম প্রভাতেই মানুষকে এইভাবে তিক্তবিরক্ত করিয়া দেওয়া হইল। এখন যদি আর একবার মোচড় দিয়া সাপ্তাহিক রেশনের দাম চড়াইয়া দেওয়া হয় তাহার পরও মানুষ রেশনের নামে জয়ধ্বনি দিবে, এতটা আশা করা কঠিন।

"বাজার দর আয়ত্তের মধ্যে রাখা সরকারী নীতির বিঘোষিত লক্ষ্য। এই সেদিন দুর্গাপুর কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবেও এই বলিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করা হইয়াছে যে, 'বিশেষ করিয়া খাদ্যশস্যের মূল্যহার অতি দ্রুত ও উদ্বেগজনকভাবে চড়িয়া গিয়াছে।' বেসরকারী ব্যবসায়ীদের একাংশ দাম চড়াইতেছেন বলিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে মুনাফাখোরির অভিযোগ উঠিয়াছে এবং বণ্টন ব্যবস্থায় সরকারী হস্তক্ষেপ অনিবার্য্য হইয়াছে। অথচ সরকারও যদি বেসরকারী ব্যবসায়ীদের রাস্তাই ধরেন এবং নিজেদের পণ্যদ্রব্যের দাম চড়াইতে থাকেন তাহা হইলে সরকারী নীতির অর্থ কি দাঁড়ায়?

"বলা হইয়াছে যে, খুচরা খরিদ্দারদের কাছে সরকারী চাউল ও গম যে দামে বিক্রয় করা হয়, তাহাতে পড়তা পোষায় না। এতদিন ঘাটতিটা সরকারী কোষাগার হইতে পুরাইয়া দেওয়া হইতেছিল। কিন্তু এখন কেন্দ্রীয় সরকার নাকি স্থির করিয়াছেন যে খাদ্যশস্যের ব্যবসায়ে সরকারী "সাবসিডি" তুলিয়া দেওয়া হইবে। এতদিন ধরিয়া যদি 'সাবসিডি' দিতে পারা গিয়া থাকে তাহা হইলে আজ খাদ্যাভাব ও মূল্যবৃদ্ধির এই সঙ্কটের সময় [illegible] প্রত্যাহার করিয়া লওয়ার এমন কি জরুরী

প্রয়োজন ঘটিল, তাহার কোন কৈফিয়ৎ কেহ দেন নাই। তাহা ছাড়া এই একই কারণ দেখাইয়া কিছুদিন পূর্ব্বে চাল ও গমের দাম বাড়ান হইয়াছে। এখন আবার নূতন করিয়া দাম বাড়ানর কি কারণ ঘটিল তাহাও দেশের মানুষ জানিতে চাহিবে। পশ্চিমবঙ্গে সরকার চাউলের যে-দাম বাঁধিয়া দিয়াছেন নিজেরা রেশনের দোকানের মারফৎ তাহার চেয়েও বেশী দামে চাল বিক্রয় করিয়াছেন। তবুও লোকসান ও 'সাবসিডি'র কথা ওঠে কেন?

"গমের দাম কুইণ্টাল-প্রতি দশ টাকা বাড়াইবার সরকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিগত দুর্গাপুর কংগ্রেসে তীব্র সমালোচনা হইয়াছে। একাধিক বক্তা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিয়াছেন যে, সরকার যে বলেন এক, করেন আর এক, তাহার একটি বড় উদাহরণ হইতেছে এই মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত। একজন এ আই সি সি সদস্য এই অভিযোগও করিয়াছেন যে, সরকার যে পরিমাণ 'সাবসিডি' দেন তাহার চেয়ে বেশী পরিমাণ টাকা আমদানী-করা গমের দাম চড়াইয়া উশুল করিয়া লইবেন, অর্থাৎ এই গম বেচিয়া তাঁহারা মুনাফা কমাইবেন। খাদ্যমন্ত্রী [সুব্রহ্মণ্যম দুর্গাপুর অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়াও এই অভিযোগের জবাব দেন নাই। একথাও বলা হইয়াছে যে, আসলে বন্দরে জাহাজগুলির মাল খালাস করিতে বিলম্বের ফলে যে খেসারৎ দিতে হইতেছে তাহার জন্যই আমদানী-করা খাদ্যশস্যের পড়তা খরচ চড়িয়া যাইতেছে। যদি একথা ঠিক হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সরকারেরই অন্য একটি বিভাগের অকর্ম্মণ্যতার দায় রেশন-গ্রহীতাদের উপর বাড়তি বোঝা হইয়া চাপিতেছে। ইহা রেশনিং ব্যবস্থাকে জনপ্রিয় করার পথ নহে, রেশনিং-এর উপর মানুষের ধিক্কার জন্মাইয়া খোলা বাজারের মুনাফাখোরদের দিকেই আবার মানুষকে ঠেলিয়া দিবার পথ।"

খাদ্যসামগ্রীর কালোবাজারী রোধ করিবার সরকারী পদ্ধতি বোধহয় ইহাই। যে-মূল্যবৃদ্ধি করিলে সাধারণ ব্যবসায়ী দণ্ডনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত, ঠিক সেই মূল্যবৃদ্ধি করিলে সরকার বাহাদুর আইনসঙ্গত কাজ করিলেন বলিয়া আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে! এমন অবস্থায় লোকে যদি কালোবাজারী এবং সরকারকে একই পর্য্যায়ে ফেলে—তাহাতে আপত্তি করিবার কোন যুক্তি আছে কি?

একদিকে সরকার ধাপে ধাপে মূল্যবৃদ্ধি করিতেছেন আর অন্যদিকে সাধারণ মানুষ ধাপে ধাপে পাতালের

কার এবং স্ফীতোদর নেতাদের মতে কল্যাণ-রাষ্ট্রের প্রকৃত রূপ হয়, তাহা হইলে কংগ্রেস, কংগ্রেসী সরকার এবং কংগ্রেসী তথাকথিত নেতাদের যত শীঘ্র নির্ব্বাণ-প্রাপ্তি হইবে, দেশের পক্ষে ততই কল্যাণকর হইবে। সহজ পথে যদি এ নির্ব্বাণ না হয়, তাহা হইলে একদিন—তাহাও হয়ত অবিলম্বে—কঠিন পথে জনগণ কঠিন হস্তে কংগ্রেস এবং কংগ্রেসী সরকারের বিলোপ সাধন করিবে!

আনন্দ সংবাদ? সিনেমার সংখ্যাবৃদ্ধি

আমাদের সরকারের তাল-মান-মাত্রা জ্ঞান যে প্রচণ্ড, তাহা কেহই অস্বীকার করিবে না। তাহা না হইলে দেশের এই স্বচ্ছল-নিরাময়-নিশ্চিন্ত অবস্থায় সরকার বাহাদুর দেশের সর্ব্বত্র সিনেমাগৃহের সংখ্যাবৃদ্ধির কথা কেন চিন্তা করিলেন? কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত।

—"চিত্রগৃহ তৈয়ারী সম্পর্কে আঁটসাট কয়েকটি নিয়ম ছিল; রাজ্য সরকার বাঁধন কিছু আলগা করিয়াছেন, ফলে নাকি শহর ও গ্রামাঞ্চল নূতন নূতন ছবিঘরে ছাইয়া যাইতে দেরি হইবে না। খোশ খবর, সুতরাং চিত্রপিপাসু মহলে খুশির ঢেউ বহিয়া গেল বলিয়া, তবু আমরা বেসুরো কয়েকটা প্রশ্ন তুলিতে চাই। লোকের হাতে অধুনা টাকা ধরে না, প্রথমত জানিতে সাধ হয়, এই তথ্য সরকারের গোচরে পেশ করিয়াছেন কোন্ সমীক্ষকেরা। আয় যদি বাড়িয়া থাকে, ব্যয়ও বাড়িয়াছে। রোজগারে-খরচে কাটাকুটি করিয়াও যাহাদের হাতে কিছু বাঁচে সেই ভাগ্যবানেরা হয় সমাজের উপরতলায়, নয় নীচের দিকে। মাঝের তাকে ছিটাফোঁটাও সম্ভবত অবশিষ্ট থাকে না। তাহা ছাড়া বাড়তি কিছু থাকিলেই প্রমোদে ঢালিয়া দিয় মন—ফূর্তিতে সব উড়াইয়া দিতে হইবে, ইহাকে ঠিক সুস্থ সমাজবোধ বলে না, হায় সমাজতন্ত্র! উদ্বৃত্ত, উদ্ধাস ইত্যাদিকে জাতীয় স্বার্থে বিনিয়োগ করার আরও রাস্তা আছে। কিন্তু ইণ্ডাস্ট্রির স্বার্থের অজুহাতও এ ক্ষেত্রে খাটিবে না, কারণ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা বলিয়া দিতেছে যে, বাংলায় রাশি রাশি চিত্রগৃহ খুলিলেই বাংলা চিত্রশিল্পের সুরাহা হয় না। এই কলিকাতা শহরে ও শহরতলিতে একমাত্র বাংলা ছবি দেখান হয় এমন সিনেমার সংখ্যা গুনিতে আঙুলের সব কয়টি করও লাগে না। নির্ব্বিচার লাইসেন্স-বিলি ব্যবস্থার কল্যাণে বসত-অঞ্চলে হাউসের ছড়াছড়ি, অথচ মুক্তি প্রতীক্ষায় একের পর এক বাংলা ছবি বসিয়া বসিয়া পথ চায় আর কাল গোণে! রাতারাতি

নেকের হুঁশও নাই। ভাল, নূতন চিত্রগৃহের মঞ্জুরী যদি তেই হয়, তবে সেগুলিতে বাংলা ছবি—একমাত্র যদি া-ও হয়, অন্তত শতকরা আশি-নব্বই ভাগ—দেখানর ধ্যবাধকতার শর্ত সরকার আরোপ করিতে পারিবেন ক? না পারিলে হিন্দী ছবিরই কাউ-মওকা—অধিকন্তু াহায্য-রজনী ও ম্যাটিনি মিলিয়া গেল। হিন্দী ছায়া- ত্র হিন্দীর অনুপ্রবেশের—অনুপ্রবেশ কেন, অভিযানের -সেকেণ্ড ফ্রন্ট। এই দুই নং অঙ্গনটাই ক্রমশ কেমন ধান হইয়া উঠিয়াছে সেটা রকে-রাস্তায়, হাটে- জারে, পূজার বারোয়ারীতলায় হাঁটিতে গেলে ন্দী গানা"র সম্প্রসারে-অত্যাচারে অথবা শুন- ানিতে নিত্যই মালুম হয়।"

আমরা সিনেমা—বিরোধী নহি—সিনেমা ছবি দেখি, রখানি বাঙ্গলা এবং ইংরেজী ছবি (টকি) ভালও গে, কিন্তু তাই বলিয়া সিনেমাকেই জাতীয় জীবনের উন্নতি এবং সাংস্কৃতির ধারক ও বাহক বলিয়া মনে না। দেশের পক্ষে এবং জাতির জীবনে একান্ত াজনীয় বস্তুগুলিকে বাদ দিয়া সিনেমাকে াধিকারও আমরা দিতে পারি না।

একথা অবশ্যস্বীকার্য্য যে—সিনেমা-শিল্পে বহু বাঙ্গালী র করে, কিন্তু তাহার সংখ্যা নগণ্য। আমাদের দেশে মাকে ঠিক 'ব্যবসা' বলা যায় কিনা—তর্কের বিষয়। দেশে যাঁহারা সিনেমা চিত্র-নির্মাণে অর্থ এবং আত্ম- াগ করেন, তাঁহাদের মধ্যে এমন একজনের নামও যায় না, যিনি শেষ পর্য্যন্ত প্রচুর বিত্ত লইয়া অবসর করেন। বাঙ্গলা দেশে ম্যাডান থিয়েটার্স, নিউ টার্স, কালি ফিল্মস, রাধা, ইষ্ট ইণ্ডিয়া, এম.পি. তি একদা-খ্যাত সিনেমা কোম্পানিগুলির অস্তিত্ব নাই—এবং এই সব প্রতিষ্ঠানের মালিকগুষ্টিও আজ এবং বৃত্তিহীন। যে চিত্রপ্রতিষ্ঠানের এবং প্রতিষ্ঠা- মালিকের নাম ও খ্যাতি ছিল ভারতজোড়া, সেই থিয়েটার্স'ও আজ কারবার বন্ধ করিতে বাধ্য ছে। অথচ এই নিউ থিয়েটার্স'ই একদা ভারতীয় শিল্পের অগ্রগতির জন্য যাহা করে, তাহার তুলনা । সিনেমাকে যদি ব্যবসা বলিয়া ধরিতে হয়, তাহা ল এই ব্যবসায়ে পয়সা করেন একমাত্র পরিবেশক প্রদর্শক। তাঁহাদের লোকসান হয় না, কারণ াদের ঘরের কড়ি দিয়া ছবি তৈয়ার করিতে হয় না। ভারতের অন্য প্রদেশের কথা বলিতে চাহি না, কিন্তু বঙ্গে আজ বিবিধ সমস্যা—মানুষের জীবনকে সর্ব্ব- হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছে। দেশে শিক্ষার অভাব, গৃহের অভাব, খাদ্যাভাবের কথা না বলাই ভাল। বেকার-সমস্যা আজ শিক্ষিত-অল্পশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত বাঙ্গালী কর্ম্মক্ষম ব্যক্তিদের ধীর এবং নিশ্চিত অবলুপ্তির দিকে ঠেলিয়া দিতেছে—দেশের এই অবস্থায় হঠাৎ সিনেমা-গৃহের সংখ্যাবৃদ্ধির কি কারণ ঘটিল জানি না। মানুষ যখন লোহা, সিমেণ্ট, ইষ্টক প্রভৃতির অভাবে দেড়-দুই কামরা বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারিতেছে না, ঠিক সেই সময় হঠাৎ আরও নূতন সিনেমা গৃহ নির্ম্মাণ কি এতই অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িল?

আরও ভাবিবার কথা—নূতন যে-সব সিনেমা নির্ম্মিত হইবে, তাহার কয়টি হইবে বাঙ্গালীর টাকায়; বাঙ্গালীর টাকায় যদি বা সিনেমা নির্ম্মিত হয়, তবে তাহা কতদিন বাঙ্গালীর হাতে থাকিবে? আরও চিন্তার কথা—বাঙ্গলা দেশের সিনেমাগুলির শতকরা অন্ততপক্ষে ৭০।৮০টি সিনেমাতে হিন্দী—বাজে ধিক্কারজনক হিন্দী ছবিই প্রদর্শিত হয় এবং এই সকল ছবি দেখিয়া বাঙ্গলার যুবক যুবতী, বালক-বালিকারা যে-সব আদব-কায়দা, বাতচিৎ এবং 'দিল দেকে দেখো' বিষয়ে অতি উৎসাহী হইয়া পড়িতেছে—তাহাতে উদ্বেগের কারণ আছে যথেষ্ট। বাঙ্গলা ছবি সাধারণত "ভালগার" হয় না, কিন্তু হিন্দী ছবির প্রভাবে এই সব বাঙ্গলা ছবি—বাঙ্গালী দর্শকমহলে খুব আদর পায় বলিয়া মনে হয় না। হিন্দী ছবির আধিক্যে এবং 'নয়ন-মন-মজান' ভাবভঙ্গি এখন বাঙ্গালী দর্শকমহলে প্রিয়তর হইতেছে—সিনেমার সংখ্যা বাড়িলে আরও হইবে। ফলে বাঙ্গলা ছবির অতি সীমিত ক্ষেত্র আরও সঙ্কুচিত হইতে বাধ্য।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থা এবং বিবিধ প্রকার গুরুতর সমস্যার কথা মনে রাখিয়া হতভাগ্য বাঙ্গলা দেশে এখন আর কোনক্রমেই সিনেমা-গৃহের সংখ্যা বাড়াইতে দেওয়া হইবে একান্ত অনুচিত এবং আমাদের জাতীয় জীবনের পক্ষে অতীব ক্ষতিকর। সিনেমার সংখ্যা না বাড়াইয়া—বাঙ্গলা দেশে যদি বাঙ্গালীর অধীনে সিনেমা- গুলিতে কেবলমাত্র বাঙ্গলা ছবি দেখান, অন্তত শতকরা :০টি বাঙ্গলা ছবি, বাধ্যতামূলক করা হয়—বিষম অমঙ্গ- লের মধ্যেও কিছু মঙ্গল অন্তত আর্থিক দিক্ দিয়া হইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের শাসক মহল আশা করি—সকল দিক আবার সবিশেষ চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন।

সীমান্তে পাকিস্তানী পুলিসের 'ক্রনিক' হামলা!

কয়েকদিন পূর্ব্বে বসিরহাট মহকুমার খোজাডাঙ্গা

সীমান্ত পুলিশ ফাঁড়ির সম্মুখ হইতে দিনের বেলায় এক-জন ভারতীয় পুলিশ কনষ্টেবল পাক সীমান্ত পুলিশ দল কর্তৃক অপহৃত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই ব্যাপারে ভারতীয় পুলিশের পক্ষ হইতে নাকি একটি গুলীও বর্ষিত হয় নাই।

প্রকাশ যে, বেআইনীভাবে ভারতে আগত কয়েক-জন পাকিস্তানীকে আদালতের আদেশ অনুযায়ী বহিষ্কৃত করিবার উদ্দেশ্যে একজন পুলিশ কনেস্টবল তাহাদিগকে লইয়া খোজাডাঙ্গা সীমান্তে উপস্থিত হয়। সে ভারত সীমান্তে দাঁড়াইয়া পাকিস্তানীদিগকে সীমা পার করিয়া দিয়া তাহাদের গতিপথ নিরীক্ষণ করিতেছিল। বহিষ্কৃত পাকিস্তানীগণ সীমান্তের অপর পারে গিয়া পাকিস্তানী পুলিশের সহিত কথাবার্ত্তা বলে। সঙ্গে সঙ্গে একজন পাক-পুলিশ কিছু বলিবার জন্য ভারত সীমান্ত অভিমুখে অগ্রসর হয়; আরও কয়েকজন পাকিস্তানী পুলিশ তাহাকে অনুসরণ করে। ভারতীয় পুলিশ কনেস্টবলটির সহিত তাহাদের কি যেন কথা হইল। হঠাৎ পাকি-স্তানী পুলিশেরা ভারতীয় কনেষ্টবলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাকে টানিয়া পাকিস্তান এলাকায় লইয়া যায়। এই ঘটনা ঘটে ভারতের খোজাডাঙ্গার সীমান্ত পুলিশ ফাঁড়ির অতি সন্নিকটে। ভারতীয় কনেষ্টবলটি একজন বিহারী মুসলমান।

ইহা উল্লেখযোগ্য যে, সরকারের ঔদাসীন্যের ফলে এই সীমান্তে ভারতের একশত গজের অধিক প্রশস্ত এলাকা পাকিস্তান সরকার বলপূর্ব্বক দখল করিয়া রাখিয়াছেন।

র‍্যাডক্লিফ্ রোয়েদাদের ফলে পশ্চিমবঙ্গের পাকি-স্তানের সহিত কোন প্রাকৃতিক সীমারেখা নাই। বসির-হাট মহকুমার ইটিণ্ডা পঞ্চায়েতের খোজাডাঙ্গা সীমান্ত পুলিশ ফাঁড়ির পাশ দিয়া একটি ছোট খাল প্রবাহিত। ঐ খালের উপর একটা পাকা সেতুও আছে। ভারতীয় দলিল-দস্তাবেজে উক্ত খালের অপর পারে একশত গজ প্রশস্ত জায়গা ভারতের বলিয়া চিহ্নিত আছে। অথচ ভারতের সেই জায়গায় পাকিস্তানী সীমান্ত পুলিশের ঘাঁটি নির্ম্মিত হইয়াছে। ভারত সরকারের পক্ষ হইতে কোন আপত্তি উঠিল না। পরন্তু সেতুর অর্দ্ধেকটা পাকিস্তানকে দেওয়া হইয়াছে। এই সীমান্তের পাইকের-ডাঙ্গা এইরূপ অপর একটি অরক্ষিত এলাকা। যে-কোন মুহূর্ত্তে এই সীমান্ত-পথ দিয়া পাকিস্তানীরা অনুপ্রবেশ করিতে পারে। সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এই শেষোক্ত এলাকা মুসলমান-অধ্যুষিত।

এই প্রকার ঘটনা অহরহ ঘটিতেছে, কিন্তু 'হিন্দী' প্রচারে অতি-তৎপর ভারত এবং রাজ্য সরকারের এ-বিষয় কোন মাথাব্যথা আছে বলিয়া মনে হয় না। পাকিস্তানী হামলা বন্ধ এবং প্রতিরোধ করিবার সহজ ব্যবস্থা সরকার বাহাদুর গ্রহণ করিবেন না কেন জানিতে ইচ্ছা হয়। 'দাঁতের বদলে দাঁত এবং নাকের বদলে নাক' —এই নীতি যে-কোন আত্মসজাগ এবং দেশের প্রতি কর্ত্তব্যপরায়ণ সরকার গ্রহণ করিয়া থাকেন—কিন্তু আমাদের অহিংস সরকার ক্রমাগত এক গালে চড় খাইয়া অন্য গালটি চড় খাইবার জন্য ফিরাইয়া দিতেছেন!

পাকিস্তানের হাতে সর্ব্বভাবে সর্ব্বপ্রকার অপমান-অভদ্রতা আমাদের সরকার অতি বিনীত এবং নম্রভাবে স্বীকার করিয়া চলিয়াছেন, পাকিস্তানের অপ-জন্মের পর হইতেই! ভারত সরকার হয়ত মনে করেন—এইভাবে পাকিস্তানী অনাচার-অভদ্রতা স্বীকার দ্বারা তাঁহারা বিশ্বের দরবারে প্রশংসা-গৌরব অর্জ্জন করিতেছেন, বাহবা পাইতেছেন। কিন্তু আসলে তাঁহারা পাইতেছেন ক্লৈব্যের চরমতম ঘৃণা এবং কাপুরুষতার তিলক!

আমাদের রাজ্য সরকার কনট্রোল-র‍্যাশন ব্যবস্থা সার্থক করিতে যে বিষম পুলিশবাহিনী নিযুক্ত করিয়াছেন —তাহাতে এক ছটাক চাউলও হয়ত যাদবপুর-বেহালা হইতে কলিকাতায় পাচার হইবেনা—কিন্তু সীমান্তবরাবর যে চোরাপথে হাজার হাজার বস্তা চাউল, চিনি, গম, আটা-ময়দা পাকিস্তানে পাচার হইতেছে—তাহা রোধ করা সম্ভব হইয়াছে কি? কেন হয় নাই? পুলিশের সাহায্য-সহায়তায় এই কারবার এখনও চলিতেছে না কি? এ-প্রশ্নের জবাব পাইব না জানি।

সাধারণ লোকেও এখন স্পষ্ট কথায় বলিতেছে—যে-সরকার দেশ এবং দেশের মানুষকে রক্ষা করিবার শক্তি রাখেন না, সেই সরকারের একমাত্র কর্ত্তব্য—অবিলম্বে গদি পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ান। স্বেচ্ছায় ইহা না করিলে শেষ পর্য্যন্ত অনিচ্ছায় করিতেই হইবে।

বন্ধ ক'রো না পাখা

শ্রীসমর বসু

ধীরেনবাবুর সংসারটা খুব বড় না হ'লেও, ঠিক ছোট বলা যায় না। স্বামী স্ত্রী ছ'টি ছেলেমেয়ে, বাপ-মা-মরা একটি ভাগনে। কিছুদিন হ'ল সংসারের জনসংখ্যা কিছু কমেছে, কিন্তু তাতে ধীরেনবাবুর কোন সুসার হয় নি। বরং আর্থিক অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে।

খেতে বসে স্ত্রীর সঙ্গে সেই প্রসঙ্গেই আলোচনা হচ্ছিল। সামনে পুজো আসছে, কি করে কি হবে। ধীরেনবাবু একা কি করে সব দিক সামলাবেন।

—এতদিন যে-করে সামলেছ সেই ভাবেই সামলাবে। কথাগুলো একটু ঝেঁজেই বলেছিলেন অপর্ণাদেবী।

—এতদিন আমার সংসারে মৃণাল ছিল, দীপা ছিল। এখন তারা নেই।

—নাই বা থাকল, তাদের ভরসায় আমাদের থাকতে হবে নাকি!

তারপর কথা কাটাকাটি, তর্ক-বিতর্ক। বাইরে তখন ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে।

ভাতের থালা ঠেলে দিয়ে ধীরেনবাবু উঠে পড়লেন।

—তা তুমি উঠলে কেন! খেয়ে নাও।

ধীরেনবাবু কোনও কথা শুনলেন না। মুখ-হাত ধুয়ে এসে ঘরে বসে গুম হয়ে রইলেন।

অপর্ণাদেবীও কিছু মুখে দিলেন না। রান্নাঘরে বসে গজর গজর করতে লাগলেন আর কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে এক সময় ঘরের শেকল তুলে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

মৃণাল চলে যাবার পর থেকেই ধীরেনবাবু কেমন যেন খিটখিটে হয়ে গেছেন। কোনও কাজেই বেশ মন দিয়ে করতে পারেন না। অফিসেও অনেকের সঙ্গে খিটি-মিটি লাগে। অন্তরঙ্গ বন্ধুরা এসে বোঝাবার চেষ্টা করেন, ধীরেনবাবু দোষ স্বীকার করে দুঃখ প্রকাশ করেন, কিন্তু নিজেকে শোধরাতে পারেন না।

আশাভঙ্গজনিত মনোবেদনা,—না অন্য কিছু! ধীরেনবাবু ...

ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। ওপরের বিক্ষিপ্ত মনটা ক্রমশ স্থির হয়ে আসছে। নিজের সম্বন্ধে, স্ত্রীর সম্বন্ধে, বিশেষ করে—মৃণাল-দীপা এবং জয়ন্তী সম্বন্ধে অনেক ভাবনা মনটাকে ক্রমশ আচ্ছন্ন করে ফেলল। ধীরেনবাবু চিন্তামগ্ন হ'লেন।

ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্কভাবে একবার রাস্তার দিকে তাকালেন। বারান্দা থেকে বড় রাস্তাটা স্পষ্ট দেখা যায়। লোকজন যাওয়া-আসা করছে। দু'-একখানা সাইকেল রিক্সাও। চার-পাঁচটা মেয়ে দল বেঁধে চলেছে, হাতে বই-খাতা। বোধহয় কলেজ থেকে ফিরল।

—চিন্তায় বাধা পড়ল। মনটা আবার বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠল।

—আজ কি তা হ'লে কলেজ খোলা! অফিসের ছুটি, স্কুলের ছুটি। অথচ কলেজ খোলা কেন! হঠাৎ মনে পড়ে গেল, ওরা কলেজ থেকে ফিরছে না, ফিরছে শরদিন্দুর বাড়ী থেকে। স্থানীয় কলেজের অধ্যাপক শরদিন্দু চৌধুরীর কাছে মেয়েগুলো পড়ে।

দীপাও পড়ত। দীপাও ঠিক ওদের মত সন্ধ্যের আগে ফিরে আসত। সপ্তাহে মাত্র দু'দিন যেতে হ'ত তাকে। শরদিন্দু ভালই পড়ায়। ওর কাছে যারা পড়েছে, তারা সবাই ভালভাবেই পাশ করেছে। দীপাও ভাল রেজাল্ট করেছিল। ইচ্ছে ছিল এম. এ. পড়ে।

কিন্তু ধীরেনবাবু ঠিক মত দিতে পারেন নি। হ্যাঁ-না, কিছুই বলতে পারেন নি। কেননা অন্য ছেলে-মেয়েরাও তখন স্কুলে ঢুকেছে। বড়রা উঁচু ক্লাসেও উঠেছে। আর সেই সময় ভাগ্নেটাও এসে পড়েছিল। মৃণালের চাকরিটাও তখন হয় নি। সবদিক ভেবেচিন্তে তাই তাঁকে চুপ করে থাকতে হয়েছিল। সাধ ছিল, কিন্তু সাধ্য ছিল না ধীরেনবাবুর।

অপর্ণাদেবী কিন্তু স্পষ্টই বলে দিয়েছিলেন, দু'দিন

বইগুলোর কি দশা হবে ভেবে দেখেছিস। রাতের পর রাত জেগে, নোট মুখস্থ করে, যে কাগজখানা তুই নিয়ে আসবি, বাইরের থেকে তাকে হয়ত অনেকেই সম্মান দেবে কিন্তু দুদিন পরে দেখবি,তুইও আমাদের মত কাণা-কড়ির মূল্যে বিকিয়ে গেছিস। আমাদের ঘটে কিছু ছিল না, তাই ভাগ্যকে দোহাই দিয়ে বেশ কাটিয়ে দিলাম। কিন্তু তুই ত তা পারবি না। তাই বলছি, আর না, যা পেয়েছিস তাই ঢের।

ধীরেনবাবু স্ত্রীর কথায় সায় দিতে পারেন নি। বলেছিলেন, তোমাদের সময় যে অবস্থা ছিল, এখনও তাই আছে না কি।

—নিশ্চয়ই আছে। চিরকাল থাকবে। ঘর-করণার কাজ মেয়েদেরই করতে হবে। তা সে লেখাপড়া শিখুক আর নাই শিখুক। সুতরাং আর কলেজে না পাঠিয়ে যাতে পরের বাড়ী পাঠাতে পার, সেই ব্যবস্থাই বরং কর।

—কিন্তু পরের বাড়ী পাঠাব বললেই ত আর পাঠান যায় না।

—তা ত যায় না। মেয়ে পার করতে হ'লে অনেক কিছুই চাই। অতএব টাকাকড়ি যতদিন না জোগাড় করতে পারছ, ততদিন ও ঘরেই থাকুক। কলেজে বেরুলে আবার তুমি সব ভুলে বসবে। তোমার কোনও খেয়ালই থাকবে না।

—কি খেয়াল থাকবে না?

—মেয়ে তোমার বড় হয়েছে। তার বিয়ে দেওয়া উচিত।

—আমি কি বলেছি, বিয়ে দেব না?

—না, তা অবশ্য বল নি। কিন্তু তার ব্যবস্থাও ত কিছু কর নি। কলেজে না বেরিয়ে, ও যদি ঘরের মধ্যে জটুবুড়ি হয়ে বসে থাকত, তা হ'লে ঐ ভাবনাটাই তোমায় পেয়ে বসত। এবং তার ব্যবস্থাও তুমি করতে।

ধীরেনবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন,—তা হয়ত সত্যি।

কিছুদিন পর থেকেই ধীরেনবাবু চেষ্টা করতে লাগলেন কি করে দীপাকে পার করা যায়। মৃণালের

ধারধোর করে দীপার বিয়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। মাসে মাসে মাইনে থেকে যা কাটা যাবে, মৃণালের উপার্জন থেকে তা পূরণ হয়ে গিয়েও কিছু উদ্বৃত্ত থাকবে। সুতরাং সংসারের চাকা বন্ধ হয়ে যাবে না। এই সব ভেবেচিন্তে ধীরেনবাবু চেষ্টা করতে লাগলেন। এখান-ওখান থেকে দেখেও গেল অনেকে, কিন্তু কেউ পছন্দ করল না।

কি করেই বা করবে! দীপার স্বাস্থ্য খারাপ। রোগাই বলা চলে। অত্যধিক পড়াশোনা করে এবং পুষ্টিকর খাদ্য খেতে না পেয়ে দীপার স্বাস্থ্য গেছে।

তা ছাড়া দীপার রঙও ময়লা। তার জন্যে না কি ধীরেনবাবুই দায়ী।

—মায়ের মত সুন্দরী না হয়ে, বাপের মত কুৎসিত হয়েছে ব'লেই, দীপাকে কেউ পছন্দ করছে না।

ছেলেমেয়েদের সামনেই অপর্ণাদেবীর এই কদর্য মন্তব্য ধীরেনবাবু সহ্য করতে পারলেন না। বললেন, দীপা শুধু আমার দেহের রঙ পায় নি, বুদ্ধির জৌলুসও পেয়েছে। এবং সেই জন্যেই দীপা গ্র্যাজুয়েট হ'তে পেরেছে। অবশ্য আমার মত ইংরাজীতে অনার্স পায় নি, পেয়েছে বাঙলায়।

—হ্যাঁ, ঐ অনার্স নিয়ে ধুয়ে ধুয়ে জল খাও। অনার্স দেখে কেউ আর দয়া করে বিনাপয়সায় ওকে ঘরে তুলবে না। কিন্তু রূপ থাকলে কি হ'ত বলা যায় না।

রূপ দেখেই ধীরেনবাবুর মা, অপর্ণাকে বিনা যৌতুকেই ঘরে এনেছিলেন। বহুবার বহু প্রসঙ্গে এই খোঁটা দিয়েছেন অপর্ণাদেবী। এই মুহূর্তেও সেই লোভ আর সামলাতে পারলেন না।

মেয়েকে উপলক্ষ্য করে মা-বাবার এই কলহ, সেদিন শুধু দীপার মনটাকে ক্ষত-বিক্ষত করে নি, মৃণালকেও ক্ষুব্ধ করেছিল। দীপা সেটা বুঝতে পেরেছিল, তাই সেই-দিন রাত্রেই মৃণালের কাছে গিয়ে দীপা বলেছিল, তোমাকে একটা কথা বলতে এলাম, ভরসা দাও ত বলি।

—বল না, আজ আবার আমায় এত ভয় কেন! কোনও দিন ত আমাকে 'কেয়ার' করিস নি।

তোমার কাছে এলাম। তোমাকেই একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

মুচকে হেসে মৃণাল বলল, তোকে আর বলতে হবে না। আমি সব বুঝতে পেরেছি। আমিও এতক্ষণ সেই কথাই ভাবছিলাম। একটা মতলবও স্থির করে রেখেছি। দেখি কতদূর কি করতে পারি। কিন্তু একটা কথা, এখন যেন কেউ টের না পায়।

—আমিও তাই চাই।

—তারপর ভাইবোনে অনেক পরামর্শ হ'ল। দু'দিন ধরে কি সব লেখালেখি হ'ল। মৃণালের সঙ্গে দীপা কোথায় বেরিয়ে গেল। বিকাল বেলায় আবার দু'জনে ফিরে এল কিন্তু কাউকে কিছু বলল না। বাবা-মা, কেউই কিছু বুঝতে পারলেন না।

যেদিন পারলেন, সেদিন ধীরেবাবু আনন্দে উচ্ছল হয়ে ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাজারে চলে গেলেন, খাবার-দাবার কিনে আনবার জন্যে।

আর বাড়ীশুদ্ধ সকলকার রকম-সকম দেখে অপর্ণা-দেবী উনুন খুঁচকে, আলো নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকার রান্না-ঘরে গুম হয়ে বসে রইলেন।

আগের দিন দীপাকে দেখতে এসেছিলেন মণিশঙ্কর-বাবু। পাত্রের মামা। মৃণালের অফিসেই কাজ করেন। দেখে তাঁর অপছন্দ হয় নি। লেখাপড়া-জানা মেয়েদের প্রতি তিনি একটু বেশী শ্রদ্ধাশীল। তাই বোধহয় ধীরেন-বাবুর প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, আপনার মেয়ের স্বাস্থ্যটা হয়ত খারাপ, কিন্তু সেটা বাহ্যিক। অন্তরে যা সম্পদ্ আছে সেটা গর্বের। সে-সম্পদ্ যে-ঘরে যাবে, সে ঘরকেও সমৃদ্ধ করে তুলবে। সুতরাং এত বড় লাভ আমরা ছাড়ব কেন! তবে আমার দিদিকে একবার দেখাতে হবে। কেননা, তিনিই ত ঘর করবেন। সেই-দিনই না হয় পাকাপাকি কথা হবে।

ধীরেনবাবু কৃতজ্ঞতায় আনত হয়ে বললেন, দেখবেন যাতে শুভকাজটা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। আমি আর কি বলব বলুন।

পরের দিন সন্ধ্যেবেলায় মৃণাল যখন অফিস থেকে ফিরল, ধীরেনবাবু তখন এই বারান্দাতেই বসে ছিলেন। কিছুক্ষণ আগে তিনিও ফিরেছেন অফিস থেকে। তখনও হাত-মুখ ধোওয়া হয় নি। বারান্দায় বসে বসে একটু বিশ্রাম করছিলেন। দূর থেকে দেখতে পেলেন মৃণাল আসছে। হাতে সন্দেশের বাক্স। ভাবলেন, তা হ'লে নিশ্চয়ই মণিশঙ্করবাবুর কাছ থেকে কোনও ভাল খবর পেয়েছে। নইলে সন্দেশ কেন!

—দীপা, দীপা,—দীপা কোথায় গেল, বলতে বলতে মৃণাল সোজা রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল।

ধীরেনবাবু তাড়াতাড়ি এসে জিজ্ঞেস করলেন, কেন রে, দীপাকে কেন!

—একটা শুভ খবর আছে।

—তা ত বুঝতে পারছি। মণিবাবু কিছু বলেছেন বুঝি!

—কে মণিবাবু!—ও, না না, তিনি কিছু বলেন নি।

—তা হ'লে আবার কি শুভ খবর!—ধীরেনবাবু ভ্রূ কুঁচকে মৃণালের দিকে তাকালেন।

আর ঠিক সেই সময় মাথা নীচু করে দীপা এসে ঘরে ঢুকল।

ওকে দেখে মৃণাল যেন আরও উচ্ছল হয়ে উঠল। বলল, হয়ে গেছে! এই নে তোর চিঠি।

দীপা লজ্জায়, সংকোচে এবং গভীর আনন্দে বিহ্বল হয়ে রইল। তাড়াতাড়ি হাত বাড়াতে পারল না। তার আগেই ধীরেনবাবু চিঠিটা এক রকম কেড়ে নিয়েই বললেন, আমার চশমাটা নিয়ে আয় ত দীপা।

মৃণালের দিকে চেয়ে মুচকে হেসে দীপা চশমা আনতে চলে গেল।

ভাইবোনে ওরা ভেবেছিল, বাবা হয়ত খুব রেগে যাবেন। ওদের সঙ্গে কোনও কথা বলবেন না। কিন্তু ঠিক তার উল্টো হ'ল। চিঠি পড়েই চীৎকার করে উঠলেন ধীরেনবাবু, বললেন, এত বড় একটা সুখবর, তা কি শুধু এক বাক্স সন্দেশ দিয়ে প্রচার করা যায়। চল, আমার সঙ্গে বাজারে চল, তোরা দু'জনেই চল।

সেদিন বাড়ীতে ছোটখাটো একটা উৎসব হয়েছিল। অপর্ণাদেবী কিন্তু তা ভাল মনে নিতে পারেন নি। তাঁর

মনে হয়েছিল এতে বুঝি তিনি হেরে গেলেন। কিন্তু তবুও উৎসবে তিনি যোগ দিয়েছিলেন এবং সে-সময় তাঁর মুখে হাসিও লেগেছিল।

মণিশঙ্করবাবুর সার্টিফিকেট নিয়ে দীপাকে আর পরের ঘরে যেতে হ'ল না। ভাল সওদাগরী অফিসে একটা চাকরি পেয়ে গেল দীপা। বিয়ের কথাবার্তা আপাততঃ চাপা পড়েই রইল।

তারপরও কয়েক বছর কেটে গেছে। সংসারের অবস্থা বেশ সচ্ছল হয়ে উঠেছে। অনেকগুলো টাকা একসঙ্গে ঘরে আসে, সুতরাং ঘরটার চেহারা ফেরে, সেই সঙ্গে ঘরের বাসিন্দাদেরও। ধীরেনবাবু নিশ্চিন্তেই আছেন, কোথাও কোনও উদ্বেগের কারণ নেই।

কিন্তু হঠাৎ যেদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে দীপা এবং আর একটি ছেলে এসে ধীরেনবাবুকে প্রণাম করল এবং মৃণাল পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, ইনি আমাদের অফিসেই কাজ করেন, আমার বন্ধু; দীপারও। নাম—সমীরণ মুখার্জি। তখন ধীরেনবাবু স্তম্ভিত হ'লেন।

ঐটুকু বলেই মৃণাল থামলেও, বাকিটুকু ধীরেনবাবু অনায়াসেই বুঝতে পেরেছিলেন। বুঝে কিন্তু খুশী হ'তে পারেন নি; যদিও হাসিমুখেই ওদের আশীর্বাদ করেছিলেন।

অপর্ণাদেবী কিন্তু মনে মনে খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন। সে-আনন্দ প্রকাশও করেছিলেন। মৃণাল-দীপার বন্ধু সমীরণকে আদর করে ঘরে বসিয়েছিলেন। নিজের হাতে নানা রকম রান্নাবান্না করে খাইয়েছিলেন। যাবার সময় বলেছিলেন—দু'জনে তোমরা সুখী হও, দীর্ঘজীবী হও।

চাকরি-করা মেয়েরা সহজে বিয়ে করতে চায় না, এই ধরনের একটা ধারণা অপর্ণাদেবীকে মাঝে মাঝে পীড়িত করে তুলত। দীপা বিয়ে না করলে, পরের দুটোর বিয়ে দেওয়া আরও শক্ত হয়ে উঠবে, এ-আশঙ্কাও মনকে উদ্বিগ্ন করত। তাই সমীরণের সঙ্গে 'রেজিষ্ট্রেশন' হ'য়ে যাওয়াতে অপর্ণাদেবী খুবই খুশী হয়েছিলেন। যাক্, মেয়েটা তা হ'লে আর আইবুড়ো ধিঙ্গী হয়ে রইল না। কথা নয়! এবারে যেন অপর্ণাদেবীই জিতে গেলেন ধীরেনবাবু মুষড়ে পড়লেন।

মুষড়ে পড়লেন দুটি কারণে। প্রথম কারণ,—সংসারের আয়ের অঙ্ক থেকে মাসে মাসে বেশ মোটা টাকা বাদ পড়বে। সে-ঘাটতি মেটাবার সামর্থ্য নেই ধীরেনবাবুর। দ্বিতীয়তঃ, দীপা নিজেই তার স্বামী নির্বাচন করে নেওয়াতে ধীরেনবাবুর মনে হয়েছিল, দীপা যেন তার বাবাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, নিতান্ত স্বার্থপরতার জন্যেই তার বাবা ইচ্ছে করে এত দিন ধরে তার বিয়ের চেষ্টা করেন নি। তাই সে নিজে, নিজের ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছে। এই দুটো চিন্তা, বিশেষ ক'রে শেষেরটা, ধীরেনবাবুকে বহুদিন ধ'রে অস্থির ক'রে তুলত। কোনও কাজেই ভাল ক'রে মন দিতে পারতেন না। দেহে-মনে কেমন যেন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিলেন।

অনেক দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করে মেয়েকে তিনি লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন; অবশ্য তখন এ আশা করেন নি যে, মেয়ে তাঁকে চাকরি করে খাওয়াবে। তবে চাকরি যখন করতেই গেল, তখন একটু একটু করে অনেক রকমের বাসনাই মনের কোণে আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু আজ আর ধীরেনবাবুর কোনও আশাই রইল না। দীপা এখন পরের ঘরের বউ। তার উপার্জনের ওপর ধীরেনবাবুর আর কোনও দাবিই নেই, থাকা উচিতও নয়। সে-টাকা এখন তার স্বামীর, তার শ্বশুরের। মা-বাবার সমস্ত দাবি একদিনেই তাঁবাদি হয়ে গেল। অথচ দীপা তাদেরই কাছে মানুষ হয়েছে। যে বিদ্যা-বুদ্ধির সাহায্যে দীপা আজ অর্থ উপার্জন করছে, সে-সবই দীপা তার বাবার পরিশ্রমের বিনিময়েই লাভ করতে পেরেছে। সমীরণ কিংবা তার বাবা এ বিষয়ে কোনও সাহায্যই করে নি।

তা হ'লে মেয়েদের লেখা-পড়া শিখিয়ে লাভ কি। মূর্খ মেয়ে পার করতে গেলে, কিছু না হয় বেশী খরচ হবে, লেখাপড়ার পেছনেও ত কম পয়সা গলে যায় না! লেখাপড়া জানে বলেই ত আর কেউ বিনা পয়সায় মেয়েকে ঘরে তোলে না (উপহার বাবদ সমীরণকেও অনেক কিছুই দিতে হয়েছে), তারপর সেই লেখাপড়ার

মানুষলোক। যারা রোপন করল, অনেক যত্নে পালন করল, তারা শুধু ফলবতী বৃক্ষের দিকে নিরাশ চোখে চেয়েই থাকবে। ফলভোগ করবে যারা, তার কৃতজ্ঞতাটুকুও জানাবে না। তাই বোধহয় মণিশঙ্করবাবু বলেছিলেন, এ সম্পদ্ যে-ঘরে যাবে, সে-ঘরকেও সমৃদ্ধ করে তুলবে।

ভাবতে ভাবতে ধীরেনবাবু অস্থির হয়ে উঠলেন। বারান্দায় পায়চারি করতে করতে এক সময় রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

—শুনছ, আমি এবার মৃণালের বিয়ে দেব। চাকরি করা মেয়ে ঘরে নিয়ে আসব।

—কেন? বোয়ের পয়সা না হ'লে বুঝি সংসার চলবে না।

—কি করে চলবে! দীপার টাকাগুলো আসবে কোত্থেকে।

—ও, এই কথা। কিন্তু সব দিক ভেবে দেখেছ। সব মেয়েই যে দীপার মত হবে তার কি কোনও নিশ্চয়তা আছে। তা ছাড়া, আমার ত মনে হয়, মৃণাল ঠিক সমীরণের মত নয়। সুতরাং সব দিক ভেবে-চিন্তে কাজ করা উচিত। বেনোজল ঢুকে শেষকালে যেন ঘ'রো জলকে বার করে না নিয়ে যায়।

—তার মানে?

—ঠাণ্ডা মাথায় একটু ভাব, তা হ'লে অনায়াসেই তার মানে বুঝতে পারবে।

ধীরেনবাবু ঘরে এসে বসলেন। সুবিধা-অসুবিধা, অনেক কথা ভাবলেন। ভেবে নিজের সিদ্ধান্তেই স্থির হয়ে রইলেন।

অপর্ণাদেবী আর কিছু বললেন না। বয়সে যত না হোক, ধ্যান-ধারণায় তাঁকে প্রাচীন বলাই চলে। দিনগুলো যে-ভাবে দ্রুত বদলে যাচ্ছে, তার সঙ্গে তিনি তাল রাখতে পারছেন না। তাই ইদানিং আর বিশেষ কথা বলেন না। চুপচাপ থাকেন।

ওদের সংসার, ওরা যা ভাল বুঝবে তাই করবে, আমার দু'বেলা দুটো রান্না করে দেবার কথা, যদ্দিন গতর বইবে, তদ্দিন সেটুকু করতে পারলেই নিশ্চিন্ত।...

সুতরাং মায়ের মতামত না নিয়েই মৃণালের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন তার বাবা। জয়তী বলে একটি মেয়ের সঙ্গে মৃণালের একদিন বিয়ে হয়ে গেল। জয়তীরা ছিল পালটি ঘর, তাই হিন্দুমতেই বিয়ে হ'ল। দীপার মত রেজিষ্ট্রেশন করতে হ'ল না। তা ছাড়া জয়তী শুধু গ্র্যাজুয়েট নয়, সেই সঙ্গে 'ল' পাশও করেছে। আধা-সরকারী অফিসে কাজ করে অফিসর গ্রেডে। মাইনে পায় দীপার চেয়ে অনেক বেশী।

অনেক দিন আগে মৃণালের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ট্রামে। যাতায়াতের পথে। তারপর সহযাত্রী হিসেবে সে-পরিচয় আরও নিবিড় হ'ল। জানাশোনা হ'ল আরও গভীর। মনের মধ্যে নানা রঙের ছবি আঁকা সুরু হয়ে গেল। রঙে-রেখায় জীবন্ত হয়ে উঠল সে ছবি।

ধীরেনবাবুর সংসার আবার উচ্ছল হয়ে উঠল। কিন্তু অপর্ণাদেবী যেমন একপাশে নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলেন, তেমনিই রইলেন। সংসারের উচ্ছলতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারল না। কিংবা তিনি ইচ্ছে করেই স্পর্শ বাঁচিয়ে দূরে রইলেন।

দীপা থাকতেও যেমন, জয়তী আসতেও ঠিক তেমনি একলা হাতে সংসারের যাবতীয় কাজ তাঁকে করতে হয়। এ-দিকটায় কেউ ফিরেও তাকায় না। তাঁর যা দুঃখ, তা তাঁর নিজস্ব, কেউ তার অংশ এতকাল নেয় নি, ভবিষ্যতেও নেবে না।

আনন্দমুখর সংসারের কল-কোলাহলের মাঝখানে থেকেও অপর্ণা দেবী সম্পূর্ণ একা-একা বসে বসেই তাঁর নিজের দুঃখের কথা ভাবেন। ভেতরের বেদনা ভেতরেই চাপা থাকে; বাইরের কেউ তা জানতে পারে না।

কিন্তু বাইরের চেহারাটাই একদিন ধীরেনবাবুকে চিন্তিত করে তুলল। বহুদিন পরে স্ত্রীর দিকে ভাল করে তাকালেন ধীরেনবাবু, বললেন, তোমার কি হয়েছে বল ত? অমন চুপচাপ থাক কেন। রাতদিন শুধু আপনমনে কাজই কর। কি এত কাজ তোমার!

—সে-কথা কোনও দিন কি জানতে চেয়েছ? মেয়ে পরের বাড়ী চলে গেল, বউ এল। তাতে হয়ত তোমার সুবিধে হয়েছে, কিন্তু আমার! আমার দিকে কেউ কি একবার ফিরেও তাকাল। কোন্‌দিন খেলাম কি না খেলাম কেউ এসে জিজ্ঞেসও করে না। তিরিশ বছর আগে কাঁধে যে জোয়াল চাপিয়ে দিয়েছ, সে ত আমাকেই

বইতে হবে। দু'পাতা ইংরেজী যদি জানতুম, তা হ'লে হয়ত খাতির করতে। রাত-দিনের ঝি-চাকর রাখতে। তা যখন জানি না, তখন মুখ বুজে সব সহ্য করতে হবে বৈকি!

—অমন ঠেস দিয়ে কথা বলছ কেন?

—ঠেস আবার কোথায় দিলুম? চোখ বুজলেই টের পাবে। তখন বাপ-বেটায় কোনও কুল না পেয়ে ঝি-চাকরের দোরে দোরে ঘুরবে। তাতে পয়সা অনেক যাবে, অথচ এমন সুখটি পাবে না।

—সে কথা আমি পাঁচ শ' বার স্বীকার করি। কিন্তু তাই বলে অমন গুম হয়ে থাকবে কেন?

—তা হলে কি করব। শিক্ষিত বউ পেয়েছি বলে পাড়া মাথায় করে রাখব? অত আদিখ্যেতা আমার সয় না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধীরেনবাবু বললেন, চাকরির মেয়াদও ফুরিয়ে এল। ভাবছি সামনের শীতে মাস চারেক ছুটি নিয়ে কোথাও বেড়িয়ে আসব। ছেলেমেয়েরা আর কেউ ছোটটি নেই। যা হোক ব্যবস্থা ওরা করে নেবে'খন। বৌমা সেদিক দিয়ে চৌকস মেয়ে। ও এক-লাই সব ম্যানেজ করতে পারবে।

অপর্ণাদেবী হেসে বললেন, তা হ'লে আমাকেও ছুটি দিচ্ছ! তিরিশ বছরে একসঙ্গে চার মাসের ছুটি। মন্দ কি! কিন্তু বৌমা কি একা সবদিক সামলাতে পারবে। সারাদিন খেটেখুটে এসে—

—ঐ ত তোমার দোষ। পারে না পারে তারা বুঝবে। আমাদের ত অত ভাববার দরকার নেই।

—পারলেই ভাল।

কিন্তু শীত আসবার আগেই অঘটন ঘটল।

জয়ন্তীকে নিয়ে আলাদা ঘরভাড়া করলে মৃণাল। ধীরেনবাবু কোনও কথা বললেন না, আপত্তিও করলেন না। কেননা, ধীরেনবাবু জানতেন, আপত্তি করে কোন লাভ হবে না। জোর ক'রে কারোর কাছ থেকে ভক্তি-শ্রদ্ধা আদায় করা যায় না। ছেলে-বৌ, কেউ মূর্খ নয়। কর্তব্য-অকর্তব্য নির্দ্ধারণ করার মাকে ফেলে আলাদা থেকে যদি তারা সুখ পেতে চায়—পাক। তাতে ধীরেনবাবুর কিছু এসে-যাবে না।

এ-সব কিন্তু অভিমানের কথা। ধীরেনবাবু সত্যই ভেঙ্গে পড়লেন। এতখানি আঘাত সহ্য করার মত তাঁর মনের জোর ছিল না। তিনি অনেক আশা করেছিলেন। অনেক সুখের স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু সব ব্যর্থ হয়ে গেল। ধীরেনবাবু আবার মুষড়ে পড়লেন।

অপর্ণাদেবী কিন্তু আগে থেকেই খানিকটা অনুমান করে রেখেছিলেন। তাই ধীর-শান্ত গলায় ধীরেনবাবুকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,—এই সামান্য ব্যাপারে পুরুষ-মানুষের ভেঙে পড়া শোভা পায় না। এমন অবস্থা যে হ'তে পারে অনেকদিন আগেই ততোমাকে বলেছিলাম। আমি ত জানতাম, সব মেয়েই দীপার মত হ'তে পারে না, মৃণালও ঠিক সমীরণের মত নয়। দীপা সমীরণকে নিয়ে আলাদা হয় নি, সমীরও বাপ-মাকে ছেড়ে নিজের সুখটাই বড় ক'রে দেখে নি।

খেতে খেতেই কথাবার্তা হচ্ছিল। এক ঢোক জল দিয়ে গলার ভাতগুলোকে কোনও ক্রমে নামিয়ে দিয়ে ধীরেনবাবু বললেন, সামনে পুজো আসছে। আমি এখন একা সব দিক সামলাব কি করে।

—যেমন চিরকাল সামলে এসেছ, সেই ভাবেই সামলাবে?

—কিন্তু এতদিন ধরে সংসারটা যে অন্যভাবে চলেছে। পয়সা ছিল, অভ্যাসও তাই বদলে গেছল।

—এখন পয়সা নেই, আবার অভ্যাসটা বদলে ফেলতে হবে।

—দু'দিন পরে যখন 'রিটায়ার' করব, তখন?

—'রিটায়ার' ক'রেও ত অনেকে চাকরি করে, তোমাকেও সেই রকম একটা জুটিয়ে নিতে হবে।

—সে কি! তুমিও এই কথা বলছ! সারাজীবনই আমি খাটব না কি?

—আমি খাটছি না, তোমার সংসারে এসে আমার যে কি হাল হয়েছে, তা কি কোনও দিন চোখ চেয়ে দেখেছ!—বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন অপর্ণাদেবী। আর ধীরেনবাবু ভাতের থালা ঠেলে দিয়ে উঠে

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। বাতাসে শীতের আমেজ। কোঁচার খুঁটটা গায়ে জড়িয়ে নিলেন ধীরেনবাবু। গা'টা একটু গরম হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে মনেও জোর পেলেন। ভাবলেন, ঠিকই বলেছে অপর্ণা। একটা চাকরি জোগাড় করতে হবে। এখনই যদি 'পার্টটাইম্' কিছু পাওয়া যায়, তারও চেষ্টা করতে হবে। কারুর ওপর কোনও ভরসা নেই। দুনিয়ায় কেউ কারুর নয়। সমীরণ তার বাবাকে ছেড়ে আলাদা হয় নি, কেননা, তার বাবা একজন মোটা-মাইনের অফিসর। ধীরেনবাবুর মত যদি গরীব হ'ত তা হ'লে মৃণালের মত সমীরণও পালিয়ে যেত। দীপাও বাধা দিত না।

ছেলেমেয়েগুলো, যাদের পাখা গজায় নি, তাদের খাওয়াতে হবে, পরাতে হবে। তারপর যে দিন উড়ে যাবে, সেদিন মনে যেন কোনও ক্ষোভ না থাকে। অপর্ণা ঠিকই বলেছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধীরেনবাবু পশ্চিম আকাশের দিকে তাকালেন। দেখলেন, একদল পাখী উড়ে চলেছে দূর দিগন্তে। শেষ আলোর রশ্মি এসে লেগেছে তাদের ক্লান্ত পাখায়।

—•—

রবীন্দ্রনাথের "রাজা"

অধ্যাপিকা আভালতা কুণ্ডু

রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' এক সাঙ্কেতিক সাহিত্যের অপূর্ব সম্পদ্। ১৩১৭ সালের পৌষ মাসে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯১৪ সালে "King of the Dark Chamber" নামে গ্রন্থখানি অনূদিত হয়েছিল। মূল রচনা ও অনুবাদ উভয়ই স্বদেশে ও বিদেশে একখানি শ্রেষ্ঠ সাঙ্কেতিক বা রূপক নাট্যের পর্যায়ে স্থানলাভ করেছিল। কিন্তু প্রথমে কবি নিজে গ্রন্থটিকে রূপক ব'লে স্বীকার করতে নারাজ ছিলেন। বন্ধুবর C. F. Andrewsকে লিখিত পত্রে কবি লিখেছেন, "সমালোচক এবং গুপ্তচর স্বভাবতই বড় সন্দিগ্ধ। যেখানে রূপক বা বোমার নামমাত্রও নেই, সেখানেও ওরা তার গন্ধ পায়।" নাটকটিকে বাস্তবধর্মী বলে মেনে নিয়ে তার ভিতরকার সংঘাতটিকে রাণী সুদর্শনার অন্তর্দ্বন্দ্বের কাহিনী বলে গ্রহণ করতেই তিনি পরামর্শ দেন। তাঁর মতে Shakespeare-এর Lady Macbeth যদি বাস্তব চরিত্র হতে পারেন, রাণী সুদর্শনারও তা হতে বাধা নেই। তিনি বলছেন—Lady Macbethকে মানবহৃদয়ের আত্মঘাতী উচ্চাশার প্রতীক বলা যেতে পারে—অথচ আমরা তাঁকে বাস্তব চরিত্র ব'লে মেনে নিয়েছি। রাণী সুদর্শনাকে বাস্তব বলে গ্রহণ করতেই বা তবে আপত্তি কিসের?

পরবর্তীকালের নাটক রক্তকরবীর মধ্যেও রূপকের অনুসন্ধান করতে কবি নিষেধ করেছিলেন। বলেছিলেন —"রক্তকরবীর পাপড়ির আড়ালে অর্থ খুঁজতে গিয়ে যদি অনর্থ ঘটে তবে কবির তাতে দায় নেই।" কিন্তু অনর্থ ঘটতে পারে জেনেও মানুষের মন ত অর্থ খোঁজার নিবৃত্ত হ'তে চায় না। সমালোচকের চোখে রক্তকরবীও তাই সাধারণ নাটক নয় রূপক-সাঙ্কেতিক—রাজাও ঐ একই পর্যায়ের।

রাজা নাটকে যে উপাখ্যানটিকে কেন্দ্র করে নাটকের গতি আবর্তিত, সেটিকে বৌদ্ধজাতক কুশাবদান থেকে নেওয়া হয়েছে।

"মল্লরাজের জ্যেষ্ঠপুত্র ছিল অসাধারণ প্রজ্ঞাবান্ কিন্তু অত্যন্ত কুরূপ। তাহার বিবাহ হইয়াছিল অপূর্ব সুন্দরী মদ্ররাজ-কন্যা প্রভাবতীর সহিত। পাছে পতিকে দিবালোকে দেখিলে প্রভাবতী তাহাকে ঘৃণা করে—এই ভয়ে না। অবশেষে কুশের আগ্রহে তাহার মা ছল করিয়া প্রভাবতীকে দেখাইল। প্রভাবতী যখন স্বামীকে দেখিবার আগ্রহ করিল তখন সুরূপ দেবরকে দেখাইয়া তাহাকে প্রবোধ দেওয়া হইল। কিন্তু পতি-পত্নীর সাক্ষাৎ আর আটকাইয়া রাখা গেল না। প্রভাবতী স্বামীর কুরূপ দেখিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। কুশ তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য শ্বশুরালয়ে নীচবৃত্তি করিতে লাগিল এবং শেষে প্রভাবতীর পাণিপ্রার্থী রাজাদের হাত হইতে শ্বশুরকে রক্ষা করিয়া পত্নী-প্রেম লাভ করিল।"

কুশজাতকের এই গল্পটি সামান্য পরিবর্তিত করে রাজা নাটকের ঘটনা গড়ে উঠেছে। এ নাটকের পালা সুদর্শনার সঙ্গে রাজার সত্যকারের পরিচয় স্থাপনের পালা।

সুদর্শনা রাজার পরিণীতা স্ত্রী—কিন্তু তিনি তাঁর স্বরূপ সাক্ষাতে জানেন না। অথচ রাণীর সঙ্গে রাজার মিলন হয় প্রতিদিনই—আলোক-লেশশূন্য এক নিভৃত কক্ষে। যে কক্ষ পৃথিবীর একেবারে বুকের মধ্যে। কিন্তু সেখানকার অন্ধকারে রাণীর ভয় করে। সেইখানে রাণী প্রতিদিন রাজার আগমনকে অনুভব করেন—তাঁর বাণী তাঁর শ্রবণকে মুগ্ধ করে—তাঁর আলিঙ্গনে রাণী হন ধন্য। কিন্তু সার্থকতায় ভরে উঠল না সে মিলন—কারণ সুদর্শনা তাঁর অন্ধকারের রাজাকে তাঁর অন্তরাত্মার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারলেন না। চঞ্চল হ'ল সুদর্শনার মন—তাঁর রাজ-"দর্শনই" যে রইল বাকী। "দর্শনে"র জন্য রাণী হ'লেন ব্যস্ত ও ব্যাকুল—হাত বাড়ালেন যা দৃশ্য, যা প্রত্যক্ষ, তারই মধ্যে তাঁর হৃদয়রাজ খুঁজে নেবার ব্যাকুল প্রত্যাশায়। রাণীর ব্যাকুলতা দেখে সেবারকার বসন্ত উৎসবে চোখে দেখা দেবার আশ্বাস দিলেন রাজা। কিন্তু অন্তরের অন্তরলোকে রাণী তাঁর রাজাকে দেখেন নাই—তাই রূপের জগৎ তাঁর চোখ ধাঁধালো। বার বার সাবধান করল রাণীর সখী সুরঙ্গমা কিন্তু রাণী বুঝলেন না। রাণী ভুললেন রঙের মোহে—তাঁর মনে হ'ল "সুবর্ণ"ই সত্যকার রাজা। কিন্তু সুবর্ণের সুন্দর বর্ণ প্রমাণ হ'ল মেকী রাজা। বসন্তোৎসবের সন্ধ্যায় যে

া। তখন লজ্জার দুঃখে সুদর্শনার মুখ ঢাকবার ায়গা রইল না। সেদিনকার অগ্নিদাহের মধ্যে পরি-তারূপে হঠাৎ দেখা দিয়েছিলেন রাজা—কিন্তু তার ঙ্কর মূর্তি সুদর্শনাকে আকৃষ্ট করলে না। তিনি স্বামী-ত্যাগ করলেন। গেলেন পিতৃগৃহে। কিন্তু সুদর্শনার ামী যে রাজার রাজা! তাঁকে ছাড়ব বললেই ত ড়া যায় না। রাণী তাঁকে ছাড়লেও তিনি ত র্শনাকে ত্যাগ করতে পারেন না। তাই পিতৃগৃহে লিন্দের ধারে বসে রাণী শুনতেন কার অনাহত সুরের ঙ্কার—যে-সুরে তাঁর প্রাণমন বিগলিত হ'ত—মনে ত সেই বীণার সুরে সুরে কে তাঁকে ফিরে চাইছে। তৃগৃহে রাণী যে আশ্রয় পেয়েছিলেন তার মধ্যে কোন গৌরব ছিল না—কিন্তু সেই অগৌরবের মধ্যেও রাণীর শান্তি মিললো না। সেখানে তাঁর পাণিপ্রার্থী নানা মিথ্যে রাজায় মিলে বাধাল নিদারুণ অশান্তি। সেই দারুণ বিপর্যয়ে রাজার অহেতুকী করুণা আবারও তাঁকে রক্ষা করল। সর্বশেষে সব অভিমান ত্যাগ করে রাণী পায়ে পায়ে পথ চলে আবার ফিরে এলেন তাঁর নিজের গৃহে। সেখানে পতি-পত্নীর পুনর্মিলনে সব দ্বন্দ্বের অবসান হ'ল। রাজার অরূপ-রূপের অপরূপ জ্যোতি রাণীর চোখের সব কালিমা ধুয়ে-মুছে দিলে।

রবীন্দ্রনাথের রূপক নাট্যাবলীর মধ্যে রাজা বিশেষ গৌরবের আলোকে সমুজ্জ্বল। এ নাটকটি অধ্যাত্ম-তত্ত্বের বাহক, অথচ অতি সুন্দর এর আঙ্গিক। প্রাচীন জাতকের একটি গল্পকে সামান্য পরিবর্তিত করে নাটকের রূপ দিয়েছেন কবিগুরু। এই নাটকটির স্পষ্টার্থ অথবা বাচ্যার্থ অতি সুন্দর—অনবদ্য এর কথোপকথন—মর্মস্পর্শী এর সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা। কিন্তু বাচ্যার্থকে ছাপিয়ে ওঠে এর ব্যঞ্জনা। নাটকের প্রায় প্রতিটি দৃশ্যে যে সুরের ঝঙ্কার ধ্বনিত—সেই সুর নিয়ে আসে কোন লোকাতীত রহস্যের ইঙ্গিত। ধূলির ধরণী হ'তে প্রাণমনকে নিয়ে যায় কোন রহস্যময় লোকে—যেখানে মানবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার চিরমিলন আর চিরবিরহের সুর চিরকাল অনাহত সুরে বেজে চলেছে।

রাজা নাটকের অন্তর্নিহিতার্থ রবীন্দ্রনাথ তাঁর অপরূপ ভঙ্গিমায় ব্যক্ত করেছেন অরূপরতনের ভূমিকায়। সুদর্শনা রাজাকে বাহিরে খুঁজিয়াছিল। যেখানে বস্তুকে চোখে দেখা যায়, হাতে ছোঁওয়া যায়, ভাণ্ডারে সঞ্চয় করা যায়, যেখানে ধন-জন-খ্যাতি সেইখানে সে বরমাল্য পাঠাইয়াছিল। বুদ্ধির অভিমানে সে নিশ্চয় স্থির করিয়া-ছিল যে বুদ্ধির বলে সে বাহিরেই জীবনের সার্থকতা লাভ করিবে। তাহার সঙ্গিনী সুরঙ্গমা তাহাকে নিষেধ করিয়াছিল। বলিয়াছিল, অন্তরের নিভৃতকক্ষে যেখানে প্রভু স্বয়ং আসিয়া আহ্বান করেন সেখানে তাঁহাকে চিনিয়া লইলে তবেই বাহিরে সর্বত্র তাঁহাকে চিনিয়া লইতে ভুল হইবে না। নহিলে যাহারা মায়ার দ্বারা চোখ ভোলায় তাহাদিগকে রাজা বলিয়া ভুল হইবে। সুদর্শনা এ কথা মানিল না। সে সুবর্ণের রূপ দেখিয়া তাহার কাছে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিল। তখন কেমন করিয়া তাহাকে লইয়া বাহিরের নানা মিথ্যা রাজার দলে লড়াই বাধিয়া গেল—সেই অগ্নিদাহের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া আপন রাজার সহিত তাহার পরিচয় ঘটিল। কেমন করিয়া দুঃখের আঘাতে তাহার অভিমান ক্ষয় হইল এবং অবশেষে কেমন করিয়া হার মানিয়া প্রাসাদ ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইয়া তবে সে সেই প্রভুর সঙ্গলাভ করিল—যে প্রভু কোন বিশেষ রূপে, বিশেষ স্থানে বিশেষ দ্রব্যে নাই—যে প্রভু সকল দেশে, সকল কালে। আপন অন্তরের আনন্দরসে যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়—এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।"

অন্যত্র আমার ধর্ম প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে রাজা নাটকের আলোচনায় বলেছেন—

"রাজা নাটকে সুদর্শনা আপন অরূপ রাজাকে দেখতে চাইলে, রূপের মোহে মুগ্ধ হয়ে ভুল রাজার গলায় দিলে মালা—তার পর সেই ভুলের মধ্যে দিয়ে, পাপের মধ্যে দিয়ে অন্তরে-বাহিরে যে ঘোর অশান্তি জাগিয়ে তুললে তাতেই তাকে সত্য মিলনে পৌঁছিয়ে দিলে।"

মানবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে যে মধুর সম্পর্ক, তাই এই নাটকটির উপজীব্য। পৃথিবীর আর কোন দেশের সাহিত্যে এ তথ্যটি এত সুন্দর ভাবে দেখানো বোধহয় সম্ভবপর হয় নাই। মাটির পৃথিবীতে সীমার বাঁধনে বাঁধা মানুষ। তার আয়ু অল্প কিন্তু আশা অপরিমিত। সব সময়ে সে নিজেও জানে না তার জন্ম কেন এই পৃথিবীতে, জানে না কিসে তার শান্তি কিসে তার তৃপ্তি —কিসেই বা তার মুক্তি। রাজা নাটকে কবি দেখিয়ে-ছেন মানবাত্মার পরম গতি কোন্‌খানে—তার সমস্ত কর্ম, তার সমস্ত ভুল-ভ্রান্তির মধ্যে কে তাকে নিয়ত আকর্ষণ করছেন। অনন্ত সৃষ্টির মাঝখানে "সীমার মাঝে অসীম" নিজেকে বেঁধেছেন। আবার সেই সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ হচ্ছে মানুষ—"the roof and crown of creation"

মানুষকে ভগবান্ অনবদ্য করে সৃষ্টি করেছেন—তাকে শুধু রূপ দেন নাই দিয়েছেন স্বাধীন ইচ্ছা—দিয়েছেন

সৃষ্টির মধ্যে অনুপম। বিশ্বভুবনের রাজা হয়েও ভগবান্ এই মানুষেরই দ্বারে প্রেমের কাঙাল। তাঁর যে অসীম শক্তি আছে, সে শক্তিকে তিনি এখানে প্রয়োগ করেন না —দু'বাহু মেলে তিনি শুধু অপেক্ষা করে থাকেন কখন মানুষ তার ধন-জন-খ্যাতির সব মোহ তুচ্ছ করে তাঁর কাছে ফিরে আসবে। রাণী সুদর্শনা তাই বিশ্বমানবাত্মারই প্রতীক। এই ত সেই বিশ্বরাজের চিরকালের খেলা। তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিণয় "যে কোন চেতনার প্রত্যুষে একেবারে সমাধা হয়ে গেছে, সে কথা আমরা ত ভুলে বসেই থাকি। ভুল করে কত ভুলকেই না বরণ করি আমাদের পরম পাওনা বলে। সেই ভুল নিয়ে আসে কত-না আঘাত—কতই না বেদনা পাই সেই ভুলের মাশুল গুণে দিতে গিয়ে। শেষে বুঝতে পারি নিজের ভুল কিন্তু তখনও যায় না অভিমান—যে অভিমান ত্যাগ করলে তাঁকে অনায়াসে পেতে পারি। কিন্তু আমি তাঁকে ত্যাগ করতে চাইলে কি হবে? তাঁর কাছে আমি যে অপরিত্যাজ্য! তাই যখন তাঁর কাছ থেকে দূরে চলে যাই তখনও আমাদের সাধ্য নেই যে দূরে যেতে পারি।

তাঁর প্রেম আমাদের ঘিরে থাকে আমাদের অলক্ষ্যে, রক্ষা করে সকল আপদ্ হ'তে। ব্যাকুল বাঁশীর সুরে মনপ্রাণ উতলা করে ফিরে ডাকে—ফিরে এস বঁধু, ফিরে এস ব'লে। এমনি নিবিড়, এমনি গভীর তাঁর প্রেম, সে প্রেম হতে আমাদের দূরে যাবারও উপায় নেই। সুখে দুঃখে উত্থানে পতনে জন্ম জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে আমরা যারা ভুলেছি যে আমরা তাঁরই "পরিণীতা"। আমরা সকলেই সেই রাণী "সুদর্শনা"।

রাজা নাটকের পরিসমাপ্তিকে কবি দেখিয়েছেন সুন্দর করে। সুদর্শনার সারা জীবনের অনুসন্ধান, তার ভুল, তার প্রায়শ্চিত্ত, তার অভিমান, তার অভিমান-গলানো চোখের জল—সবকিছুর পরিসমাপ্তি হয়েছে চির-সুন্দরের সাথে চিরমিলনের মধ্যে। সুদর্শনার এই পরমাগতি সকল মানুষেরই প্রাপ্য, এই ইঙ্গিতটুকু অতি স্পষ্ট আর ইঙ্গিতের মধ্যে রয়েছে সকল মানুষের মুক্তির ইঙ্গিত। পরামুক্তির পরম আশ্বাসে এ নাটকের পরিসমাপ্তি সুন্দর।

আধুনিক যুগে জড়বিজ্ঞানে বিশ্বাসী মানুষ সব-কিছুকেই ধরাছোঁয়ার মধ্যে পেতে চায়। যা-কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় তাকেই সে আর বিশ্বাস করতে চায় না, হঠাৎ অবিশ্বাস করতে চায় তার অস্তিত্বকে। যে নিত্য পরিবর্তনশীল বস্তুপুঞ্জ তার সম্মুখে নিয়ত সমুপস্থিত —তাকেই চরম ও পরম সত্য বলে মনে করে। সুদর্শনার মত বুদ্ধির অভিমানে সে নিশ্চয় স্থির করে আছে যে, বুদ্ধির জোরে সে বাহিরের জীবনেই সাং লাভ করবে। যেখানে বস্তুকে চোখে দেখা যায়, ছোঁয়া যায়, ভাণ্ডারে সঞ্চয় করা যায়, যেখানে ধন-খ্যাতি—সেখানেই সে বরমাল্য অর্পণ করে বসে আ আধুনিক যুগের জড়বাদী মানুষকে এ কথা বিশ্বাস ক কঠিন যে, পরমাত্মার সহিত সত্যমিলনই তার একম পরম কাম্য! সুদর্শনার জীবনে তার স্বামীর সত্যস্বরূপ জানা এক কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জড়বা মানুষের পক্ষেও ঈশ্বরানুসন্ধান ও তাঁর স্বরূপকে উপল করাকে তার জীবনের চরম সার্থকতা বলে গ্রহণ করা এ সুকঠিন সমস্যা। রাণী সুদর্শনা বুঝেছিলেন নিজের ভু ফিরেছিলেন তাঁর রাণীর আসনে,—রাজার সঙ্গে প্রকৃ মিলনে তাঁর জীবন হয়েছিল ধন্য। জড়বাদী মানুষকে বুঝতে হবে তার ভুল, চোখের জলে একদিন ফিরে হবে তার সত্যকারের প্রভু যিনি তাঁরই কাছে অন্তরে গোপন নিভৃতকক্ষে ভিন্ন যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায় না।

রাজা নাটকে মানবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যে মধু রসময় সম্পর্কটি রাজা নাটকের উপজীব্য, তা অন্তর্নিহিত তত্ত্বটি অবশ্য ভারতীয় দর্শনে নূতন নয়। বৈষ্ণব-দর্শনে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা, সেও ঐ একই ভাবের বাহক। পরম বৈষ্ণব যাঁরা, তাঁদের সাধনার ধন যে-শ্রীকৃষ্ণ—তিনিও এমনি ব্যাকুল বাঁশির সুরে প্রেমবৃন্দাবনে হৃদয়-যমুনার তীরে ভক্তকে চিরকাল আহ্বান জানাচ্ছেন ব্যাকুল বাঁশির সুরে সুরে। প্রেমের বৃন্দাবনে তাই পরমপুরুষ শুধু একাই শ্রীকৃষ্ণ—বাকী সকলেই শ্রীরাধা অথবা গোপিনী-ভাবাশ্রিতা। রবীন্দ্রনাথ ধর্মমতের দিক দিয়ে বা ধর্ম-বিশ্বাসের দিক দিয়ে বৈষ্ণবদের একজন ছিলেন, একথা আমরা বলতে পারি না। কিন্তু বৈষ্ণবীয় দর্শনের মধুর রসের সাধনার ধারাটিকে তিনি যে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন তার ভূরি ভূরি প্রমাণ তাঁর কাব্যে, গানে ও অন্যান্য রচনার মধ্যে ছড়িয়ে আছে। বৈষ্ণবদর্শনে যিনি শ্রীকৃষ্ণ, রাজা নাটকের তিনিই 'রাজা'—। বৈষ্ণবদর্শনে যিনি রাধা, জীবাত্মাস্বরূপিণী—রাজা নাটকে তিনিই রাণী 'সুদর্শনা'।

রাজা নাটকে যে ভাবটি রূপক ও সংকেতের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে, সেই ভাবটি কবির অন্য কয়েকটি রচনায় স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। এগুলি "রাজা" নাটক রচিত হওয়ার পূর্বে লিখিত এবং শান্তিনিকেতন উপদেশ-মালার মধ্যে সন্নিবিষ্ট। এই গ্রন্থের প্রেম, পরিণয়, প্রেমের

অধিকার-শীর্ষক রচনাগুলিতে রাজা নাটকের ভাবটির সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাৎ মেলে। কতকগুলি উদ্ধৃতির সাহায্য নিলে এই কথাটি খুবই স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। পরিণয়-শীর্ষক প্রবন্ধে কবি বলছেন—"পরমাত্মা আমাদের আত্মাকে বরণ করে নিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে এর পরিণয় একেবারে সমাধা হয়ে গেছে। তার আর কোন কিছু বাকী নেই—কেননা তিনি একে স্বয়ং বরণ করেছেন। কোন্ অনাদিকাল হ'তে সেই পরিণয়ের মন্ত্র পড়া হয়ে গেছে। বলা হয়ে গেছে—"যদেতৎ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।" এর মধ্যে আর কোন ক্রমাভিব্যক্তির পৌরোহিত্য নেই।...পরিণয় ত সমাপ্তই হয়ে গেছে, সেখানে আর কোন কথা নেই। এখন কেবল অনন্ত প্রেমের লীলা। াকে পাওয়া গেছে তাঁকেই নানা রকম করে পাচ্ছি। —সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে, লোকে-লোকান্তরে। ধূ যখন সেই কথাটা ভাল করে বোঝে তখন আর তার কোন ভাবনা থাকে না। তখন সংসার আর তাকে পীড়া তে পারে না—সংসারে আর তার ক্লান্তি নেই, সংসারে তার প্রেম। তখন সে জানে যিনি সত্যং জ্ঞানমনন্তম্ হয়ে ন্তরাত্মাকে চিরদিনের মত গ্রহণ করে আছেন—সংসারে রই আনন্দরূপমমৃতং বিভাতি। সংসারে তাঁরই প্রেমের লা। এইখানেই নিত্যের সঙ্গে অনিত্যের চিরযোগ, নন্দের অমৃতের যোগ। এইখানেই আমাদের সেই চির-প্তকে, সেই একমাত্র প্রাপ্তকে বিচিত্র বিচ্ছেদমিলনের ধ্যে দিয়ে পাওয়া-না-পাওয়া বহুতর ব্যবধান পরম্পরার তর দিয়ে নানা রকমে পাচ্ছি। যাঁকে পেয়েছি, তাঁকেই বার হারিয়ে হারিয়ে পাচ্ছি, তাকেই নানা রসে পাচ্ছি। বধূর মূঢ়তা ঘুচেছে, এই কথাটা যে জেনেছে এই রস বুঝেছে—সেই "আনন্দো ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি দাচন।" যে না জেনেছে, যে সেই বরকে ঘোমটা খুলে খে নি, বরের সংসারকেই কেবল দেখেছে—সে সেখানে র রাণীর পদ—সেখানে দাসী হয়ে থাকে। ভয়ে মরে, খে কাঁদে, মলিন হয়ে বেড়ায়—

"দৌর্ভিক্ষাৎ যাতি দৌর্ভিক্ষং
ক্লেশাৎ ক্লেশং ভয়াৎ ভয়ম্।"

(শান্তিনিকেতন, ৯ ফাল্গুন ১৩১৫)

এই একই ভাবের কথা অন্যত্রও রয়েছে। একটি নের কথাই ধরা যাক—

"তাই তোমার আনন্দ আমার পর
তুমি তাই এসেছো নীচে
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে।"

যিনি তিন ভুবনের ঈশ্বর, তিনিই নাকি প্রেমের কাঙাল হয়ে নেমে এসেছেন মানুষের দ্বারে! হঠাৎ মনে হ'তে পারে, এ বড় স্পর্ধার কথা। কিন্তু কবি বলেন, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

"এমন যে অচিন্ত্যনীয় ব্রহ্মাণ্ডের পরমেশ্বর, তাঁরই সঙ্গে এই কণার কণা, অণুর অণু বলে কি না প্রেম করবে! অর্থাৎ তাঁর রাজসিংহাসনে তাঁর পাশে গিয়ে বসবে! অনন্ত আকাশে নক্ষত্রে নক্ষত্রে তাঁর জগৎযজ্ঞের হোম-হুতাশন যুগ-যুগান্তর জ্বলছে—আমি সেই যজ্ঞক্ষেত্রের অসীম জনতার একটি প্রান্তে দাঁড়িয়ে কোন দাবির জোরে দ্বারীকে বলছি, এই যজ্ঞেশ্বরের এক শয্যায় আমাকে স্থান দিতে হবে!...... মানুষ জগদীশ্বরের সঙ্গে প্রেম করতে চায় এ কি তার অত্যাকাঙ্ক্ষারই একটা চরম উন্মত্ততা? তার অহঙ্কারের অশান্ত পরিচয়?" এ প্রশ্নের উত্তরও কবি দিয়েছেন তাঁর স্বকীয় অপূর্ব ভঙ্গিতে—"কিন্তু এর মধ্যে ত অহংকারের লক্ষণ নেই। জগৎ-সৃষ্টির মধ্যে এইটিই সকলের চেয়ে আশ্চর্য যে মানুষ তাঁর প্রেম চায়।...কেন চায়? কেন না মানুষ যে অধিকার পেয়েছে। এই প্রেমের দাবি যিনি জন্মিয়ে দিয়েছেন তাঁরই সঙ্গে যে প্রেম এতে আর ভয়-লজ্জা কিসের?

...আমি যে একজন বিশেষ আমি, আমাতে তাঁর শাসন নেই, আমাতে তাঁর বিশেষ আনন্দ। সেই আনন্দের উপরেই আমি আছি, নিয়মের উপরে নেই—এইজন্যই এই আমির ব্যাপারটি একেবারে সৃষ্টিছাড়া। এইজন্যই এই পরমাশ্চর্য আমির দিকেই তাকিয়ে উপনিষদ্ বলে গিয়েছেন, "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।" এই আমি আর তিনি সমান বৃক্ষের ডালে দুই পাখীর মত দুই সখা একেবারে পাশাপাশি বসে আছেন।...আমার সঙ্গে তাঁর কথা এই যে, তুমি ইচ্ছা করে আমাকে যা দেবে তাই নেব—যদি না দাও তবু আমার যা দেবার তা থেকে বঞ্চিত করব না।

তিনি আমার এই আমিটুকুর কুঞ্জবনে বিশেষ করে নেমে এসেছেন, বন্ধু হয়ে আপনি ধরা দিয়েছেন। বলে দিয়েছেন, "আমার চন্দ্রসূর্যের সঙ্গে তোমার নিজের দামের হিসাব করতে হবে না। কেননা ওজনদরে তোমার দাম নয়। তোমার দাম আমার আনন্দের মধ্যে। তোমার সঙ্গেই আমার বিশেষ প্রেম বলেই তুমি তুমি হয়েছ।"

"এইখানেই আমার এত গৌরব যে তাঁকে সুদ্ধ আমি অস্বীকার করতে পারি। বলতে পারি, 'আমি তোমাকে চাইনে।' সে-কথা তাঁর ধূলিজলকে বলতে গেলে তারা সহ্য করে না, তারা তখনই আমাকে মারতে আসে।

কিন্তু তাঁকে যখন বলি, 'তোমাকে চাইনে, আমি টাকা চাই, খ্যাতি চাই' তিনি বলেন—'আচ্ছা বেশ'। বলে চুপ করে বসে থাকেন।

এদিকে কখন এক সময় হুঁশ হয় যে, আমার আত্মার যে নিভৃত নিকেতন, সেখানকার চাবি ত আমার খাতাঞ্চীর হাতে নেই—টাকাকড়ি ধন-দৌলত ত কোনমতে পৌঁছায় না, ফাঁক থেকেই যায়। সেখানকার সেই একলা জগতের আর একটি মহান্ একলা ছাড়া কেউ কোনমতেই ভরাতে পারে না। যেদিন বলতে পারব, চন্দ্র-সূর্যহীন আমার এই একলা ঘরটিতে তুমি আমার আর আমি তোমার'—সেইদিন আমার বরশয্যায় বর এসে বসবেন, সেইদিন আমার আমি সার্থক হবে।"

(শান্তিনিকেতন, ১৭ই পৌষ ১৩১৫)

আবার "প্রার্থনা" শীর্ষক ভাষণে তিনি বলছেন—"আমাদের অন্তর-প্রকৃতির মধ্যে একটি নারী রয়েছেন। আমরা তাঁর কাছে আমাদের সমুদয় সঞ্চয় এনে দিই। আমরা ধন এনে বলি, এই নাও। খ্যাতি এনে বলি, এই তুমি জমিয়ে রাখ। আমাদের অন্তরের তপস্বিনী এখনও স্পষ্ট করে বলতে পারছে না যে, এসবে আমার কোন ফল হবে না। সে মনে করছে—হয়ত আমি যা চাচ্ছি—তা বুঝি এইই। কিন্তু তবু সব নিয়েও, সব পেলুম বলে তার মন মানছে না। সে ভাবছে, হয়ত পাওয়ার পরিমাণটা আরও বাড়াতে হবে, টাকা আরও চাই, খ্যাতি আরও দরকার, ক্ষমতা আরও না হ'লে চলছে না। কিন্তু সেই আরও শেষ হয় না এবং উপকরণ যে অমৃত নয় এটা একদিন তাকে বুঝতেই হ একদিন এক মুহূর্তে সমস্ত জীবনের স্তূপাকার আব ঠেলে দিয়ে তাকে বলে উঠতেই হবে—"যেনাহং না স্যাম্, কিমহং তেন কুর্যাম্!"

..."এই অমৃতের স্পর্শ আমরা কোন্খানে পা যেখানে আমাদের প্রেম আছে। এই প্রেমেই আ অনন্তের স্বাদ পাই। প্রেমই সীমার মধ্যে অসীমতার ছা পুরাতনকে নবীন করে রাখে, মৃত্যুকে কিছুতেই স্বীক করে না। সংসারের বিচিত্র বিষয়ের মধ্যে এই প্রেমের আভাস দেখতে পেয়ে আমরা মৃত্যুর অতী পরম পদার্থের পরিচয় পাই—তাঁর স্বরূপ যে প্রেমস্বরূপ বুঝতে পারি, এই প্রেমকেই যখন পরিপূর্ণরূপে পাব জন্যে আমাদের অন্তরাত্মার সত্য আকাঙ্ক্ষা আবিষ্ক করি, তখন আমরা সমস্ত উপকরণকে অনায়াসেই ঠে দিয়ে বলতে পারি—'যেনাহং নামৃতা স্যাম, কিমহং তে কুর্যাম'?"

(শান্তিনিকেতন উপদেশমাল

শান্তিনিকেতন উপদেশমালার এই অংশগুলিতে ভাবের কথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে "রাজা নাটকের মূল কথাটিও সেই একই ভাবের ব্যঞ্জনা আনে যে-যুগে কবি 'রাজা' রচনা করেছিলেন সেটি খেয়া গীতাঞ্জলির যুগ, ভগবানকে কবি এসময়ে অন্তরে গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। "রাজা" সেই ভাবানুভূতিরই অনবদ্য ফলস্বরূপ।

—•—

ভারতীয় দর্শন কংগ্রেস

মাদ্রাজ অধিবেশন

ডক্টর সুধীর নন্দী

ঐতিহাসিক বলেন যে ইতিহাসের গতি না কি পুনরাবৃত্ত। অতীত বর্তমান হয়ে আপনাকে সম্প্রসারিত ক'রে দেয় ভবিষ্যের দিকে। ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে ঐতিহাসিক একরূপতা প্রত্যক্ষ করেন। আমরাও তা আশা করি এবং বর্ষান্তে দর্শন কংগ্রেসে যাবার জন্য তৈরী হই সপরিবারে। এবার মাদ্রাজের পালা। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের বিগত অধিবেশন হ'ল মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদার আতিথ্যের লোভনীয় পরিবেশে। ঊর্মিমুখর বেলাভূমি; কর্মব্যস্ত ধীবরসমাজ দৈনন্দিন জীবনায়নের অলাতচক্রে ঘূর্ণ্যমান; তাদের সেই দিন-যাপনের, প্রাণধারণের গ্লানিহীন মহিমাটুকু শিল্পী দেবী-প্রসাদের কালো পাথরে খোদাই-করা অনন্যসাধারণ শিল্প-কর্মে প্রমূর্ত হয়ে উঠেছে। আপনার কর্ম-মর্যাদায় সমাসীন ধীবরদের কৃষ্ণাবরণ ভাস্কর্যমূর্তি জলধির দিকে নির্নিমেষ নেত্রে চেয়ে আছে। পিছনে বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোহরণ হর্ম্যমালা। বিশ্ববিদ্যালয় শতবার্ষিকী ভবনের অনবদ্য কারুশিল্প। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের উদ্বোধনী সভা বসল। প্রশস্ত সিনেট হলে দক্ষিণী-স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন ইতস্ততঃ দৃশ্যমান। সুপ্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত এই সিনেট হলটি রুচিপূর্ণ সজ্জায় সজ্জিত হয়ে উঠেছে। মাদ্রাজের অস্থায়ী রাজ্যপাল মাননীয় পি. চন্দ্র রেড্ডী এই সভার উদ্বোধন করলেন। দর্শন কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষ্যে যে বিশেষ স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হ'ল তার উদ্বোধন করলেন মাদ্রাজ রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী শ্রী আর. ভেঙ্কটরমণ। জীবনের সঙ্গে দর্শনের যে যোগসূত্রটুকু অনাদি কাল থেকে উভয়কে গ্রন্থিবদ্ধ ক'রে রেখেছে তার কথা বললেন মাননীয় রাজ্যপাল। মানুষের জীবনচর্যার মূলে, তার গভীরে যে তন্ময় দার্শনিকতা, যা যুগযুগান্তের সীমারেখা পার হয়ে আধুনিক জীবনের মর্মমূলে সুপ্রতিষ্ঠ রয়েছে তার কথা বললেন শ্রী চন্দ্র রেড্ডি। ভারতীয় দর্শন-ঐতিহ্য অতীতে আমাদের যেভাবে নানান্ বিঘ্নবিপদ উত্তীর্ণ হ'তে সাহায্য করেছে, ভবিষ্যতেও যেন তার ব্যতিক্রম না ঘটে, এই আশা প্রকাশ ক'রে তিনি তাঁর উদ্বোধনী ভাষণ শেষ করলেন। মাননীয় ভেঙ্কটরমণ মহাশয় ব্যবসায়ের উপজীব্য দর্শন নিয়ে আলোচনা করলেন। ব্যবসায়ীরাও মানুষ; মানুষ হিসেবে তাঁদের জীবনদর্শন একটা নিশ্চয়ই আছে। আবার জীবিকার জন্য তাঁরা যে পথ বেছে নিয়েছেন তার মূলেও একটা নৈতিক মূল্যবোধটুকু তাঁদের জীবনদর্শনকে প্রভাবিত করে এবং তাঁদের জীবনদর্শনও যেন তাঁদের জীবিকা ও সর্বাত্মক মূল্যবোধকে অনুপ্রাণিত করে, এই আশা তিনি প্রকাশ করলেন। সম্মেলনের মূল সভাপতি অধ্যাপক মীর ভালিউদ্দিন সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে পারেন নি; তাঁর প্রেরিত ভাষণটি পাঠ ক'রে শোনালেন কংগ্রেসের সম্পাদক অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয় মজুমদার মহাশয়। সভাপতি মহোদয় তাঁর সুচিন্তিত ভাষণে সুফী দর্শনের দুঃখবাদের ব্যাখ্যা করেছেন। তাপদগ্ধ মানুষ দুঃখের দাহ থেকে শান্তি চায়; সান্ত্বনা খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হয়ে পড়ি আমরা। অধ্যাপক ভালিউদ্দিনের ভাষণে সেই দুঃখ-শান্তির ইঙ্গিত রয়েছে। সভাস্থ দার্শনিক ও দিকদেশাগত প্রতিনিধিবৃন্দ সহর্ষ অভিবাদনে সভাপতি মহোদয়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণটিকে অভিনন্দিত করল। সভার শেষে ভারতীয় মার্গ-নৃত্যের অনুষ্ঠান। কুমারী পদ্মা ও নৃত্যোদয় গোষ্ঠীর শিল্পীরা যে নৃত্যের অনুষ্ঠান করলেন তা কলারসিক মাত্রেরই আনন্দের বস্তু। যে মহতী সভার সুরু হয়েছিল ডক্টর প্রেমলতার মনোহারী উদ্বোধন সঙ্গীতে, তার শেষ হ'ল কুমারী পদ্মা ও তাঁর সঙ্গীদলের অনুপম নৃত্য-সৌকর্যে। আমরা সভাতে যখন বীচিবিক্ষুব্ধ বেলাতটে গিয়ে রাত্রির সমুদ্রের রূপ দেখেছি দু'চোখ ভ'রে, তখনও কানে বেজেছে নৃত্যপরা দক্ষিণী কন্যার চরণের নূপুর-ধ্বনি।

২৮শে ডিসেম্বরের সূর্য উঠল দূরসমুদ্রের দিগ্‌বলয়চুম্বিত সীমানায়। Legislators' Hostel-এ প্রতিনিধিরা রয়েছেন; কর্মব্যস্ত এম্ এল্ এ ভবন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস ছাড়ল সকাল আটটার সময়। সাড়ে আটটায় সভা বসল বিশ্ববিদ্যালয় শতবার্ষিকী ভবনে। পুস্তক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে; তার উদ্বোধন করলেন কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর টি আর ভি মূর্তি। প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাগ্রসর দর্শন অধ্যয়নের কেন্দ্র। এই কেন্দ্রটি ভারত সরকারের অর্থে ও আনুকূল্যে পুষ্ট। দর্শনের বই দেখানো হয়েছে এই প্রদর্শনীতে। ভারতীয় প্রখ্যাত প্রকাশকেরা, ব্রিটিশ কাউন্সিল ও ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস—এরা সবাই এই প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিছু কিছু দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপিও এই প্রদর্শনীতে দেখানো হ'ল। সব মিলিয়ে শিক্ষক ও ছাত্রদের কাছে এই প্রদর্শনীটি একটি দর্শনীয় বিষয় হয়ে উঠেছিল। আমরা নানান্ অধিবেশনের ফাঁকে ফাঁকে এখানে গিয়ে সময় কাটিয়েছি; পত্রপত্রিকায় যে সব আধুনিকতম প্রকাশনার কথা পড়েছিলাম, তার

সকাল নয় ঘটিকায় দর্শন কংগ্রেসের অধিবেশন বসল। শাখা সভাপতিরা তাঁদের ভাষণ দিলেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ডক্টর শশধর দত্ত দর্শনেতিহাস শাখার সভাপতি। তিনি তাঁর 'The Empirical Tradition' শীর্ষক সভাপতির ভাষণে আধুনিক দর্শনে ইন্দ্রিয়-গোচরতার বিশ্লেষণী ব্যাখ্যা ক'রে উপসংহারে বললেন :

"The practice of philosophy is to have a direct experience of the gradual transcendence of man's empirical limitations. Symbols are necessary in the begining of such a practice, but as one proceeds, these become one and more transporent and finally vanish away into an unsayble meaning."

সভাপতি মহোদয় তাঁর সুলিখিত ভাষণে ইন্দ্রিয়োপাত্তের সীমানা পার হয়ে এক অনির্বচনীয় অর্থে উত্তরণের ইঙ্গিত দিলেন। তাঁর পরে ন্যায়শাস্ত্র ও পরাবিদ্যা শাখার সভাপতি তাঁর ভাষণ দিলেন। এই শাখার সভাপতি ছিলেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ডক্টর সন্তোষ সেনগুপ্ত মহাশয়। তাঁর ভাষণের শিরোনামা হ'ল 'Statements about the future'। আমরা দৈনন্দিন জীবনে প্রতিনিয়তই ভবিষ্যৎ কাল সম্বন্ধে কথা বলি। 'কাল স্কুলে যাব', 'সূর্য উঠবে', এই ধরনের কথা আমরা প্রাত্যহিক জীবনে বলি, বিজ্ঞানেও ব্যবহার করি। এই ধরনের কথার তাৎপর্য কি, এ নিয়ে ডক্টর সেনগুপ্ত তাঁর সুবৃহৎ ভাষণে চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে উপসংহারে বললেন :

"My contention in that science so far as it demands that a statement about the future is knowledge is dogmatic what can be rationally demanded is that one can believe in the future and not know it."

বিজ্ঞান ভবিষ্যৎ কাল সম্বন্ধে যে উক্তি করে তাকে জ্ঞানের মর্যাদা দেওয়া যায় না; ভবিষ্যৎ বিশ্বাস করা যায়, তাকে জানা যায় না। বিশ্লেষণ আশ্রিত এই নৈরাশ্যবাদটুকু সম্বল ক'রে আমরা মাদ্রাজী খানা-ঘরের দিকে পা বাড়ালাম। রসম্, পুরী, মকর প্রমুখ নানাবিধ খাদ্যসম্ভার ও পান-সুপারীর আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। অম্বির কাফে আমাদের জন্য ভোগ্যবস্তুর কোন কার্পণ্য করেন নি।

সন্ধ্যায় দশপ্রকাশ হোটেলের সুবিস্তৃত Skyroof-এ ব'সে তামাম মাদ্রাজের তমালতাল-বনরাজি-বেষ্টিত মনোহর রূপ দেখলেন ডেলিগেটরা আর দেখলেন ভারতীয় নৃত্যকলার পরাকাষ্ঠা, ভরতনাট্যম্। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভেঙ্কটরমণের কন্যা উমা ও মহেশ্বরীর নৃত্যনৈপুণ্য ভোলবার নয়। তাঁরা যে রস পরিবেশন করলেন তা দুর্লভ। দশপ্রকাশ সব দিক থেকে দর্শনীয়। হোটেলটিতে নিরামিষ-ভোজনের বন্দোবস্ত। বিশুদ্ধ হিন্দুপ্রথায় বিরাট্ হোটেল যে চালানো যায় তা আমাদের দেখালেন হোটেলের মালিক শ্রী কে সীতারাম রাও। ধর্মপ্রাণ হিন্দুর সবটুকু ঐতিহ্য এই মহৎপ্রাণ দক্ষিণী ব্রাহ্মণ সযত্নে রক্ষা করছেন। রাত্রে তিনি আমাদের তাঁর গৃহে আমন্ত্রণ জানালেন ভজন গান শোনানোর জন্য। সে এক অপূর্ব দৃশ্য; পরিবারস্থ সকলেই গৃহদেবতার সামনে আত্মহারা হয়ে ভজন গান করছেন। বিদেশী ডেলিগেটরা আমাদের সঙ্গে একাসনে ব'সে সে গান শুনলেন, ভক্তি-আপ্লুত বয়ান গৃহকর্তা সকলের হাতে প্রসাদ দিলেন; গৃহদেবতার শ্রীচরণোদ্দেশ্যে আত্মনিবেদন ক'রে সকলে ক্যাম্পে ফিরলাম।

পরের দিন বিশ্ববিদ্যালয় শতবার্ষিকী ভবনে সকাল ৯টার কার্যসূচী অনুযায়ী সভা বসল। নীতিশাস্ত্র ও সমাজবিদ্যা শাখার সভাপতি অধ্যাপক জি. সুকুমারন্ নায়ার তাঁর ভাষণ দিলেন। কেরল রাজ্যের এন্ এস্ এস্ হিন্দু কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক তিনি। তাঁর অভিভাষণে অধ্যাপক নায়ার নীতিশাস্ত্র ও সমাজবিদ্যার মৌল নীতিগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করলেন। ভাল-মন্দের কি অর্থ, তার কি-ই বা ব্যঞ্জনা, এ নিয়ে তাঁর বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা ভালই লাগল। আবেগময় ভাষায় তিনি তাঁর ভাষণের উপসংহার করলেন মানুষের জীবনদর্শন ও জীবনচর্যার সেই চিরন্তন সমস্যাটির উল্লেখ ক'রে :

"The gulf between profession and practice is the perenial problem of human existence. In order to solve this problem satisfactority we may have to become martyrs. Let us welcome the crown of martyrdom and be honorable."

তারপরে ভাষণ দিলেন মনস্তত্ত্বশাখার সভাপতি ডক্টর ভাসভাদা। মনস্তত্ত্বের সাম্প্রততম গবেষণার উল্লেখ ক'রে সভাপতি মহোদয় তার বৈজ্ঞানিক চারিত্র্যের কথা বললেন। মানুষের মনের অপরিচ্ছন্ন অবজ্ঞাত পরিসরে যে-সব সত্য আত্মগোপন ক'রে থাকে যে মনুষ্য-জীবন, কর্ম ও চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করে তার উল্লেখ ও ব্যাখ্যা ক'রে মনোবিদ্যার সামগ্রিক ধর্মটুকু তিনি নিরূপণ করার চেষ্টা করলেন। তাঁর ভাষণটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ হয়েছিল। সুধীজনের সাধুবাদ অকৃপণ ভাষায় বর্ষিত হয়েছিল এই চারজন তরুণ দার্শনিকের ওপর। এঁদের পাণ্ডিত্যই এঁদের নেতৃত্ব দিয়েছিল এবং আপন আপন মনীষা ও মেধার বিকাশে এঁরা সমবেত গুণীজনকে মুগ্ধ করেছিল।

নীতিশাস্ত্র ও সমাজবিদ্যা, ন্যায় ও পরাবিদ্যা,

দর্শনেতিহাস ও মনস্তত্ত্ব এই চারিটি বিভাগে কয়েকটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ পঠিত হয়েছিল। ডক্টর চারীর 'Philosophical Exaggeration of Quantum Field Theory', ডক্টর বারলিঙ্গের 'Language and the World', অধ্যাপক বিনয়গোপাল রায়ের 'Pursuit of religious meaning', অধ্যাপক অমিয়কুমার মজুমদারের 'The concept of Rta in the Vedes', ডক্টর জে. এন. মহান্তির 'Two kinds of doubt', অধ্যাপক শ্যামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'Value and Reality' ডক্টর দেবব্রত সিংহের 'On Transcendental Method' ও ডক্টর শ্যামলা শর্মার 'The Predominance of Practice in Aesthetics' প্রমুখ প্রবন্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৬৪ সাল আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের শততম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপনের কাল। দর্শন কংগ্রেসে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্বের ওপর মূল্যবান্ একটি প্রবন্ধও পঠিত হ'ল।

দর্শন কংগ্রেস এ বছরে দু'টি আলোচনা-চক্রের অনুষ্ঠান করেছিল। প্রথমটির বিষয়বস্তু ছিল 'The knowledge of other minds' এবং দ্বিতীয়টির আলোচ্য বিষয় ছিল 'The place of religion in education'। আমরা আমাদের মনকে, আমাদের মনের ক্রিয়াকলাপকে জানতে পারি কি না এ নিয়ে বাদানুবাদের অন্ত নেই দার্শনিক মহলে। যদি নিজের মনকে, নিজের মানসিক ক্রিয়াকলাপকে সোজাসুজি জানার সম্ভাবনা থাকে তা হলে অনুরূপ পথে অন্য মনের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে হয়ত অনুমান করা চলে। অন্য মনের অস্তিত্ব কি এই অনুমান-নির্ভর? না অন্য কোন পথে সাক্ষাৎভাবে অন্যের মনকে জানা যায়? দীর্ঘ তিন ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা চলল এই সমস্যাটিকে ঘিরে। পরের দিনের আলোচনা-চক্রে শিক্ষা-ব্যবস্থায় ধর্মের স্থান নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করলেন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের Dr. Premnath; ইনি সুপণ্ডিত। তথ্যাশ্রয়ী, তত্ত্ববহুল আলোচনায় ইনি বললেন যে, মানুষের সমগ্র বিচারের মধ্যেই তার ধর্ম-জীবনেরও বিচার হয়। শিক্ষা যদি মানব অস্তিত্বের সমগ্রতার দিকে লক্ষ্য রেখে থাকে তা হ'লে ধর্মকে 'এহ বাহ্য' ব'লে গণ্য করা চলে না। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে-সব দর্শনবিদ্ পণ্ডিতেরা এসেছিলেন, তাঁরাও তাঁদের মতামত ব্যক্ত করলেন সুচিন্তিত ভাষার মাধ্যমে। Dr. Premnath এর সমর্থন পাওয়া গেল; বিরুদ্ধে যুক্তিশাসিত বিপরীত সিদ্ধান্তেরও অসদ্ভাব হ'ল না।

৩০শে ডিসেম্বর দর্শন কংগ্রেস অধিবেশন শেষ হ'ল। ৩১শে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিশেষ সেমিনার অনুষ্ঠিত হ'ল। এর উদ্যোগ করেছিলেন India International Centre ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-বিভাগের Centre for Advanced Studies; সেমিনারে স্বাগত ভাষণ দিলেন ডক্টর কে কে পিল্লাই; উদ্বোধন করলেন ডক্টর পি. ডি. রাজামান্নার ও সভাপতিত্ব করলেন মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার এ. এল্. মুদালিয়র। সেমিনারে আলোচ্য বিষয় ছিল: 'Tradition and Progress'। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নির্বাচিত বক্তারা এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কলিকাতা রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীশিবপদ চক্রবর্তী এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। বাংলা দেশ থেকে অধ্যাপক চক্রবর্তী ও বর্তমান নিবন্ধের লেখক এই আলোচনাচক্রে যোগ দেন। এতদ্ব্যতীত অধ্যাপক অরুমুগা মুদালিয়র, অধ্যাপক কালথাতগী, অধ্যাপক স্বামী, ডক্টর ছেন্নকেশবন্, অধ্যাপক ত্রিপাঠী, অধ্যাপক ঝা, অধ্যাপক নাগরাজ রাও প্রমুখ বিশিষ্ট পণ্ডিতেরা এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। বিদেশাগত অধ্যাপকদের মধ্যে হোয়াইট হার্ষ্ট, সপ্রাং ও জনৈকা ইতালীয় গবেষিকাও আলোচনা করলেন বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে। এ-কথা যুক্তিতর্কের সাহায্যে বলা হ'ল যে, ঐতিহ্য এবং প্রগতির মধ্যে কোন মৌল প্রভেদ নেই। বিভিন্ন-কালিক পরিপ্রেক্ষিতে একই সত্তার এই দ্বিবিধ নামকরণ করা হয়। ঐতিহ্যের ভালমন্দ নেই। যাকে দু'দিন আগে ভাল ব'লে 'প্রগতি' আখ্যা দিয়েছি, দু'দিন পরে তাকেই 'মন্দ ঐতিহ্য' ব'লে বিসর্জন দিয়েছি। এখানে ভাল-মন্দের আপেক্ষিক তত্ত্ব দিয়ে আমরা ঐতিহ্যকে বোঝাতে চাচ্ছি না; বলছি যে, 'ভালো' এবং 'মন্দ' এই ধারণা দুটো প্রগতি এবং ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে অচল। আলোচনাচক্রের শেষে মধ্যাহ্ন-ভোজনের বিপুল আয়োজন এবং মধ্যাহ্নভোজনান্তিক আলোচনা বিগত বৎসরের শেষ দিনটিকে স্মরণীয় ক'রে রাখবে।

এ বৎসরের প্রথম দিনটিতেও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদার আতিথেয়র মধুর আস্বাদ গ্রহণ করেছি। ওঁদের যন্ত্রযানে চ'ড়ে কাঞ্চীপুরম্ পর্যন্ত গেছি; পথে মহাবলীপুরমের সেই দৃশ্য ভোলবার নয়। সাগরোর্মিবিধৌত, ফেনলাঞ্ছিত মহাবলীপুরমের শান্ত স্থৈর্য চিত্তকে সমাহিত ক'রে দেয়। পক্ষীতীর্থে দেখেছি দেবতার প্রতিভূ সেই শ্বেতপক্ষ ঈগল পাখী দু'টিকে; তারা এল দক্ষিণ এবং উত্তর থেকে, প্রসাদ গ্রহণ করল, আবার অনন্ত আকাশের শেষে দিগ্বলয়ে মিলিয়ে গেল বিশাল দু'টি পাখা মেলে। ফেরার সময় কলকাতাগামী মেলে ব'সে মহাবলীপুরমের দেবতাকে যুক্তক'রে প্রণাম ক'রে আমার কন্যা শ্রীমতী ধৃতি বললেন:

"কত অজানারে জানাইলে, তুমি।"

বাইরে তখন দক্ষিণ সমুদ্রের উপকূলের লবণস্বাদসিক্ত বাত্যাবিক্ষোভের প্রবল গর্জন।

বিভূতিভূষণের ছোট গল্প

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের ছোট গল্প-রচয়িতাদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ লেখক ছিলেন। ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর স্থান আরও উঁচুতে। কিন্তু এই প্রবন্ধে আমরা কেবল ছোট গল্পের লেখকরূপে তাঁর কৃতিত্ব বিচার করব। তাঁর লেখা ছোট গল্পগুলির আলোচনাকালে গল্পকার হিসেবে তাঁর বিশিষ্টতা কোথায়, কেবল সে-প্রসঙ্গ আলোচনা করা যথেষ্ট। যে-সব ব্যাপারে তিনি অন্য সব বাঙালী গল্প-লিখিয়েদের সমধর্মী, সে-সব বিষয়ে সাধারণভাবে সব বাঙালী ছোট গল্প লেখকদের জন্যে যা, তাঁর সম্বন্ধেও মাত্র সেটুকু বলা যেতে পারে। তা এক বাক্যে এই রকম: বাঙালী কথাসাহিত্যিকসুলভ গল্পরচনানৈপুণ্য তাঁর যথেষ্ট পরিমাণে ছিল এবং অতি অল্প পরিসরের মধ্যে একটি চিত্র, একটি ঘটনা, একটি চরিত্র বিকশিত ক'রে রসান্বিত রূপে দেখাবার ক্ষমতা তাঁর ছিল।

কিন্তু যে-সব ক্ষেত্রে বিভূতিভূষণ সমকালীন গল্পকারদের থেকে স্বতন্ত্র, সে-সব ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্বের পরিমাপই তাঁর গল্পরচনানিপুণতার আসল বিচার। বিভূতিভূষণের এমন কয়েকটি স্বকীয়তা ছিল যার জন্যে তিনি যে কেবল বাংলা গল্প-সাহিত্যে নতুন সৃষ্টি করেছেন বলা যায়, তা নয়—উপরন্তু বিশ্বের ছোট গল্প-সাহিত্যেও তিনি অভিনব কিছু দান করেছেন, এমন ধরা যেতে পারে।

তাঁর রচনায় যেমন মৌলিকতা দেখা যায় বিষয়বস্তু ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে, তেমনি তাঁর প্রকাশভঙ্গি ও রূপরচনার মধ্যেও নিজস্বতা দেখা দিয়েছে অনায়াসসিদ্ধ ভাবে। তাঁর অভিনব বক্তব্য প্রকাশের নতুন ও বিশিষ্ট কৌশলটির পূর্বাভাষ কোথাও দেখা যায় নি। পরবর্তীকালেও তাঁর অক্ষম অনুকারকেরা সে-চেষ্টায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। এই কৌশলটির রহস্য এই: তিনি যা বলতে চান, তা বলার জন্যে আয়াস বা কষ্ট অনুভব করার কোন প্রয়োজন দেখেন না —যা সহজে তাঁর বিশ্রব্ধ ভঙ্গিটির মধ্যে এসে যায়, তাই যেন তিনি ব'লে যান, যত্ন ক'রে টেনে কিছুই বার করেন না। গল্প বলার অনায়াস ভঙ্গিই তাঁর গল্পগুলির মধ্যে মানব-মনের ও সাধারণ দরিদ্র জীবনের সুখদুঃখ স্বচ্ছন্দ ও বাহুল্যবর্জিত ভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতা এনে দিয়েছে। তাঁর রচনাবলীর কোথাও কোন অশান্ত আবেগ, প্রয়াসসাধ্য বিশেষণ বা অলঙ্করণের উৎকট সাধনা দেখা যায় না। ধীর শান্ত ভাবে যেন নিরালায় বন্ধুজনের কাছে গল্প ক'রে চলেছেন ব্যস্ততার কোন বোধ না নিয়ে, বিভূতিভূষণের ভাব এই রকম।

বর্ণনাভঙ্গির মধ্যে স্বকীয়তা আনা বহু-অধ্যয়নশীল লেখকের পক্ষেও দুরূহ। বিষয়বস্তুর স্বকীয়তা সৃষ্টি করা তত কঠিন নয়—কুশলী দ্রষ্টা সেটা সহজে পারেন। কিন্তু একটি নিজস্ব প্রকাশভঙ্গি আয়ত্ত করা—অথচ কোন কষ্ট-কল্পনা কিংবা উৎকট আয়াস বরণের পরিচয় না দেওয়া—এই আধুনিক অধোমুখ সাহিত্যরচনার যুগে অত্যন্ত মৌলিক প্রতিভার লক্ষণ, বিশেষ প্রশংসার কাজ।

বিভূতিভূষণের বিশেষত্ববর্জিত গল্পগুলিতে রবীন্দ্রনাথের সামান্য প্রভাব দেখা যায়। কিন্তু তাঁর স্বকীয়তা-মণ্ডিত গল্পগুলি সমসাময়িক বা পূর্বতন কারও প্রভাবে ঈষন্মাত্র আচ্ছন্ন নয়। কচিৎ কোন কোন ক্ষেত্রে অপরের সঙ্গে সামান্য সাদৃশ্য মাত্র আছে।

বিভূতিভূষণের গল্পের একটি মাত্র দোষ এই যে, অনেক সময় তিনি খুব বাজে একটা প্রসঙ্গ নিয়ে গল্প জমাবার চেষ্টা করেন, যা সহজে সম্ভবপর নয়। তার অনিবার্য পরিণামে তাঁর সহজ সরল আয়াসহীন শান্ত ভঙ্গি সত্ত্বেও গল্পের বিরক্তিকর একঘেয়ে বিষয়বস্তুর জন্যে রস ক্ষুণ্ণ হয়। পল্লীজীবনবিষয়ক কোন কোন গল্প এই ধরনের।

বিভূতিভূষণের স্বকীয়তা দু'রকমের গল্পে পরিব্যক্ত হয়েছে। এক শ্রেণীর গল্পে পল্লীপ্রকৃতির পটভূমিতে প্রবাহিত সুখে-দুঃখে ভরা প্রাত্যহিক জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। অন্য শ্রেণীর গল্পে দূরত্বের পরিপ্রেক্ষিতে লব্ধ এবং অতিপ্রাকৃতের ব্যঞ্জনাসমন্বিত রোমান্সের জ্যোৎস্নাবিজড়িত কুহেলিঘন পরিমণ্ডলের সূক্ষ্ম মসলিন আস্তীর্ণ। প্রথম ধরনের গল্পে তাঁর যে বৈশিষ্ট্য, তা পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়েছে তাঁর উপন্যাসগুলিতে, ছোট গল্পে নয়। দ্বিতীয় প্রকারের গল্পে তাঁর বিশেষত্ব পূর্ণ মহিমায় আত্মপ্রকাশ করেছে এবং রোমান্টিক ছোট গল্প রচনায় তাঁকে অভিষিক্ত করেছে শ্রেষ্ঠত্বের পদবীতে। তাঁর কোন কোন উপন্যাসে এই রোমান্টিক আবহ-রচনাশক্তি অপ্রাকৃত শক্তি সমূহের ব্যঞ্জনাক্রিয়ায় এত বেশি অগ্রসর হয়েছে যে, একটা

অস্বাভাবিক অবাস্তব অতি-ঘন হয়ে মানবিক রসের আস্বাদন প্রায় সম্পূর্ণভাবে অলৌকিক জগতে তুলে নিয়ে গিয়ে ব্যাহত করেছে—যেমন "দেবযান"-এ। কিন্তু তাঁর ছোট গল্পগুলি এই বৈলক্ষণ্য থেকে মুক্ত। সেখানে অতি-প্রাকৃতের ব্যঞ্জনা রমণীয়তায় অপূর্ব! তুহিন-নিশীথে যখন আকাশ থেকে জ্যোৎস্নাকিরণ তুষারকণা সংমিশ্রিত হয়ে স্বপ্নময়ী পৃথিবীর বুকে ঝ'রে পড়ে আর শিহরণ-কাতরা ধরণী নিদ্রার ঘোরে একবার কুয়াসার গাঢ় আঁচলখানি সর্বাঙ্গে ভাল ক'রে জড়িয়ে নেয়, তখন নির্জন প্রান্তরে একাকী দাঁড়িয়ে-থাকা নিঃসহায় পথিকের মনে যে বিস্ময়-আতঙ্ক-রোমাঞ্চ-বিভূষিত ভীষণ সুন্দরের উপলব্ধি জাগে, সেই অনুভূতিই পাঠকের মনে সঞ্চারিত হয় বিভূতিভূষণের লেখা অতিপ্রাকৃত-বিষয়ক গল্পগুলি পড়লে। অথচ, বাস্তববোধ কোথাও বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ ক'রে রোমান্সকে মরজগৎ থেকে অশরীরী প্রেতলোকে উত্তোলন করা হয় নি। মানবজীবনের মাধুরীভরা করুণ উপলব্ধিগুলি প্রচুর প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের পটভূমিকায় রোমাণ্টিক বিস্ময়াবেশে পাঠকের মনোবীণায় বেহাগ রাগে সন্ধ্যারঞ্জনীর সুরটি ফিরে ফিরে বাজিয়ে বারবার স্মরণ করিয়ে দেয় এক পরম অপূর্ণতার কথা, করুণ বিফলতার অসহায় পরিসমাপ্তির কথা।

মেঘমল্লার আর তারানাথ তান্ত্রিকের দ্বিতীয় গল্প পড়লে পাঠকের মনে প্রকৃত রোমান্সের অপ্রতিরোধ্য যে-প্রভাব জন্মান্তরীণ সৌহার্দ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, সেই প্রভাব মোহমায়ার রঙীন সূত্রে বয়ন-করা করুণ মাধুরীর স্বচ্ছ বসনখানি শীতের প্রভাবে তৃণভূমির ওপর নিপতিত সূর্যস্নাত শিশিরজালের মত ছড়িয়ে দেবে। এই সব গল্পের সঙ্গে মাত্র রোমাণ্টিক আবহের দিক থেকে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়-বিরচিত "জাতিস্মর" গল্পগুলির কিছু মিল আছে। কিন্তু বিভূতিবাবুর অসাধারণ শক্তির পরিচায়ক প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর বর্ণনশক্তি শরদিন্দুবাবুর মধ্যে নেই। বিভূতিভূষণের এই শক্তির শ্রেষ্ঠ বিকাশ হয়েছে আরণ্যক উপন্যাসে।

পল্লীজীবনবিষয়ক গল্পগুলির মধ্যে যে মানবপ্রীতি ও প্রকৃতিপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় তার শ্রেষ্ঠ বিকাশ হয়েছে 'পথের পাঁচালি' ও 'অপরাজিত' উপন্যাসে। কিন্তু ছোট গল্পের সঙ্কীর্ণ পরিসরে বিভূতিবাবু তাঁর উপন্যাসে লভ্য উৎকর্ষ ঠিকভাবে সবটা ফোটাতে পারেন নি। তাঁর স্বধর্ম, শান্তভাবে যা দেখেছেন, যা অনুভব করেছেন তার কথা বলা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এই সব গল্পে তাঁর মনোভাব :—

এই ত ভাল লেগেছিল আলোর নাচন পাতায় পাতায়···
সামনে চেয়ে এই যা দেখি চোখে আমার বীণা বাজায়।

এই মনোভাব এমন এক পথিকের, যে জগতের অনেকখানি দেখে এসে তারপর এক জায়গায় স্থায়ীভাবে বাসস্থান ঠিক ক'রে সেই কেন্দ্র থেকে অল্পে অল্পে চারপাশে তার ভ্রমণবৃত্তের পরিধি বিস্তৃত করতে চায়, তাড়াহুড়া না ক'রে একটু একটু ক'রে দেখতে চায়, আমেরিকান পর্যটককের ম'ত সপ্তাহে আড়াই হাজার মাইল দেখবার গরজ যার নেই; আনন্দের বিন্দু বিন্দু মধুক্ষরণ তার পক্ষে যথেষ্ট, এক নিঃশ্বাসে পানীয়টুকু শেষ ক'রে ফেলা তার স্বভাবে নেই। এই মনোভাবই যে তাঁর ছিল, তৃণাঙ্কুর গ্রন্থের দিনলিপিভঙ্গিম রচনায় বিভূতিভূষণ তা স্পষ্ট ক'রে খুলে বলেছেন।

কিন্তু পরম শান্তির এই অনুভূতি, অনাসক্ত জীবন-দর্শনের এই প্রকাশ ছোট গল্পের চেয়ে ডায়েরি-জাতীয় রচনাতেই ভাল ভাবে অভিব্যক্ত হয়। তবু, মৌরীফুল-ধরনের গল্পগুলিতে মানবজীবনের ক্ষুদ্র সুখদুঃখগুলি সরসভাবে রূপায়িত হয়েছে। খেলা, অবিশ্বাস্য প্রভৃতি ছোট গল্পে অপ্রত্যাশিত আঘাতে সংসারীর নীড় ভেঙে যাওয়ার কাহিনীগুলিও মর্মস্পর্শী।

তাঁর জীবনের শেষের দিকের কয়েক বছর বিভূতিভূষণ তাঁর সব গল্পেই একটু পারলৌকিকতার দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। অতিপ্রাকৃতের অভিব্যক্তি তাঁর রচনার স্বধর্ম বরাবরই; দৃষ্টিপ্রদীপ উপন্যাসে ঘরোয়া সুখদুঃখের কথা বলতে গিয়েও তিনি clairvoyance বা দিব্য-দর্শনের বর্ণনা দিয়েছেন; ক্রমশ তিনি মর্ত্য জীবনের নশ্বরতা, আকস্মিক বিলুপ্তি ও সূক্ষ্ম জগতের জীবদের অস্তিত্ব বিষয়ে বড় বেশি আগ্রহান্বিত হয়ে উঠছিলেন। নিজের আকস্মিক দেহত্যাগের বিষয়ে তাঁর কোন premonition বা পূর্বানুভূতি ছিল কি না, জানি না। কিন্তু ছোটনাগ-পুরের জঙ্গলেই হোক, অথবা কিলিমাঞ্জারোর পাহাড়েই হোক, জগৎ তাঁর কাছে সর্বত্রই তাদের অস্তিত্বে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছিল, যাদের এক সঙ্গে পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করা যায় না—দেখতে পেলে ছোঁয়া যায় না, শুনতে পেলে দেখা যায় না, স্পর্শলাভ করলে ধরা যায় না। এর ফলে তাঁর সব রচনায়, গল্পে-উপন্যাসে-স্মৃতিচারণে এক উদাস করুণ ম্লান ছায়া পড়েছে—যা-কিছু দেখা যাচ্ছে, বেশ ভাল লাগছে, চেয়ে চেয়ে দেখতে ইচ্ছে করছে, তা যেন হঠাৎ মিলিয়ে যাবে, এমন একটা ভাব। তার সঙ্গে মিশেছে অমর্ত্য জীবনের অস্তিত্বে প্রগাঢ় বিশ্বাসজনিত জীবন্ত আত্মার শান্তি।

কিন্তু এই শান্তি সত্ত্বেও যা হারিয়ে গেল, আর যা হারিয়ে যাচ্ছে, আর যা হারিয়ে যাবে, তার প্রতি রোমাণ্টিক ব্যাকুলতা, ক্ষোভাতুর মনের বিরহবিধুর অশ্রুপাত, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শূন্যে চাওয়া, বিদায়-পথে চরণ ফেলে চ'লে-যাওয়া দিনযামিনীর অলিতে-গলিতে ভ্রাম্যমাণের স্মৃতিচারণ--বিভূতিভূষণের রোমাণ্টিক শিল্পী-প্রকৃতির দিকে অভ্রান্তভাবে সঙ্কেত নির্দেশ করে। তাই তাঁকে শান্তি ও পারলৌকিকতা সত্ত্বেও দার্শনিক না হয়ে শান্ত অতি-প্রাকৃতের রোমাণ্টিক কথাশিল্পী হতে হয়েছে। ঝগড়া গল্পটির পাতায় পাতায় এই রোমাণ্টিক মনের অনবদ্য উৎকর্ষের পরিচয়।

বিভূতিভূষণকে রোমাণ্টিক আধুনিক কথাসাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী হিসেবে বিচার করলে তাঁর যোগ্য মর্যাদা দেওয়া হতে পারে। যে রোমাণ্টিক আধ্যাত্মিকতা বঙ্কিমচন্দ্রে প্রথম ক্ষীণভাবে দেখা দেয়, তা বিভূতিভূষণ ও দিলীপকুমারে পূর্ণ বিকশিত। দিলীপকুমারের মধ্যে অধ্যাত্ম-উপলব্ধি সুপরিণত ; বিভূতিভূষণে তা অতি-প্রাকৃতের সন্ধানে প্রকৃতির মধ্যে অবগাহনে পর্যবসিত। আরণ্য-প্রকৃতি আর অতিপ্রাকৃতের বর্ণনাই তাঁর বিশ্ব-সাহিত্যেও অভিনব দান—যা ভারতীয় রোমাণ্টিক পারলৌকিক মন ছাড়া অপর কোন বৈদেশিক মনের পক্ষে রচনা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব এবং আজ পর্যন্ত আর কোথাও সৃষ্টি করা হয় নি। তাঁর আরণ্যপ্রকৃতির বর্ণনার সঙ্গে হাডসন বা ফিকি বাউমের বর্ণনার, কিংবা তাঁর অতিপ্রাকৃতের ব্যবহারকৌশলের সঙ্গে ওয়েল্‌সের কৌশলের, অথবা তাঁর আধ্যাত্মিক মতবাদের সঙ্গে হাক্সলি, মম্‌ বা ঈশারউডের মতবাদের কোন রকম তুলনা না ক'রেও এ-কথা নির্ভয়ে বলা যায় যে, আরণ্য-প্রকৃতির বর্ণনায়, অতিপ্রাকৃতের প্রয়োগকৌশলে, অন্য জগতের অস্তিত্বসম্বন্ধীয় বিশ্বাসে বিভূতিভূষণ কেবল বাংলা সাহিত্যে নয়, বিশ্বসাহিত্যে একেবারে নতুন। আর সবচেয়ে বড় কথা এই যে, নূতনত্ব সৃষ্টি করতে তাঁকে কোন বৈদেশিক সাহিত্যের কাছে না ব'লে ঋণ গ্রহণ করতে হয় নি কিংবা অবচেতনের অতলে নেমে গিয়ে কষ্ট-কল্পনার আশ্রয় নিতেও হয় নি। স্বদেশেই সচেতন শিক্ষিত মন তাঁকে অভিনব উপকরণ আর অনুপম পরিবেশনসজ্জা এনে দিয়েছে।

বাংলা ছোট গল্পে উচ্চাঙ্গের অতিপ্রাকৃতের রহস্যরস পরিবেশনে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য সকলের চেয়ে বিভূতি-ভূষণ বেশি নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। ছোট গল্পের ক্ষুদ্র মণি-মঞ্জুষায় যে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির রত্নকণিকা তিনি বিতরণ করেছেন, সমস্ত পৃথিবীর সাহিত্যে আর তুলনা নেই। বাংলা সাহিত্যে এ দিক থেকে তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। তাঁর অধ্যাত্মবোধ রসানুভূতির সঙ্গে যে সামঞ্জস্য স্থাপন করেছিল, যে-কোন সাহিত্যশিল্পীর পক্ষে তা চির-দিন ঈর্ষার বিষয় হয়ে থাকবে।

—*—

বেকারের ভাবনা

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায়

মহেন্দ্রবাবু ভাবছেন। অনেকদিন থেকেই ভাবছিলেন। ভাবনাটা বেড়ে গিয়েছিল মাস দুয়েক আগে থেকে। এখন ত আর কূল-কিনারা দেখতে পাচ্ছেন না। ভাবনাটা জগদ্দল পাথরের মত বুকের মধ্যে চেপে বসেছে—একটুও নড়ছে না।

কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন মাস তিনেক হ'ল। এমন দিন যে আসবেই একদিন তা বুঝতে পেরেছিলেন বলেই ভাবনা আরম্ভ হয়েছিল। মাত্রা বেড়েছিল বেকারির দিন ঘনিয়ে আসতে দেখে। এখন ত পথে বসেই পড়েছে।

তা পড়ুক। কিন্তু একটা কিছু উপায় ত বের করতেই হবে। কিন্তু কিছুই মাথায় আসছে না যে!

অবশ্য বাড়ী একটা করেছেন মহেন্দ্রবাবু। কিছু আহামরি নয়। তবু মাথা গুঁজবার একটা ঠাঁই ত তবু রক্ষা। জীবনে এইটুকুই বুঝি তিনি সুবিবেচনার কাজ করেছিলেন। নইলে কোথায় উঠতেন তিনি? কোনও আত্মীয়ের বাড়ী? কোনও ভাড়াটে বাড়ীর একটা স্যাঁৎসেঁতে ঘরে? ভাড়াই বা জুটত কোথায়?

না, জুটত না। এমন একটা চাকুরি করেছেন যাতে পেন্সন নেই। এমন কিছু সঞ্চয় নেই যে বাকি জীবনটা নির্ঝঞ্ঝাটে কাটাতে পারেন। পেন্সন-পাওয়া বুড়োদের দুর্দশাও ত কম চোখে পড়ে নি তাঁর। বাজারের থলি হাতে ক'রে রোজ সকালে বাজারে যাওয়া, নাতি-নাতনীদের তদারক আর সাংসারিক নানা কাজে গৃহিণীকে সাহায্য করা। একটু নড়াচড়া না করলে বুড়োবয়সে শরীর টিঁকবে কি করে এ-কথা ত তাঁদেরও অনবরত শুনতে হয়। আর পেন্সনহীন ভদ্রলোকের কি অবস্থা দাঁড়াতে পারে ভাবতেই তাঁর হৃদ্‌কম্প হচ্ছে।

পেন্সন-পাওয়া বুড়োদের নিয়ে গল্প তিনি অনেক পড়েছেন। পড়ে হেসেছেন। কিন্তু চল্লিশ বছর চাকুরির পর শুধু-হাতে বেরিয়ে আসা যে কি মজাদার বস্তু, এমন কথা কি কোনও গল্পলেখক লিখেছেন?

তাই মহেন্দ্রবাবু ভাবছেন। এক নিরন্ত্র ভাবনা তাঁকে গিলছে।

বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা তাঁর বরাবরই কম। এখন ত আরও কম। কারও সঙ্গে যে মন খুলে কথা বলবেন এমন লোকও চোখে পড়ে না। যেখানে তাঁর বাড়ী, সেখানে তাঁরই মত আরও অনেকে নতুন বাড়ী করেছেন। জজ আছেন, ম্যাজিষ্ট্রেট আছেন, সিভিল সার্জেন আছেন, ডেপুটি আছেন, স্কুল ইনস্‌পেকটার আছেন, আরও অনেকে আছেন। বেশীর ভাগই অবসরপ্রাপ্ত, কেউ বা অবসর নেব নেব করছেন। কিন্তু তাঁদের কথা পৃথক। বেকার হ'লেও মোটা পেন্সন আছে। তবু তাঁদেরও দুর্ভাবনার অন্ত নেই। যাঁদের সঙ্গে আলাপ করেছেন তাঁরাও আয় কমে গিয়েছে বা যাবে ব'লে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে আছেন। তাঁদের ভাব দেখলে দুঃখের মধ্যেও তাঁর হাসি পায়।

সেদিন মহীতোষের চিঠি পেয়ে মহেন্দ্রবাবু একটু চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। মহীতোষ তাঁর অনেক দিনের বন্ধু, কলেজের বন্ধু। হ্যাঁ, সে তাঁর অকৃত্রিম বন্ধুই ছিল বটে। এখনও সে খোঁজ-খবর নেয়। তবে সে পেন্সন-পাওয়া বন্ধু। পুলিশের দারোগা থেকে সে পুলিশ সুপারিন-টেনডেণ্ট পর্যন্ত হয়েছিল। এখন পেন্সন পাচ্ছে, কলকাতায় বাড়ী করেছে। তার কথা আলাদা। কিন্তু সে একটা আইডিয়া দিয়েছে তার চিঠিতে।

লিখেছে—পেন্সন পাও না বলে তোমার ভাবনা কিসের মহেন্দ্র? এককালে তুমি আমাদের ঈর্ষার পাত্র ছিলে মনে আছে? তুমি লিখতে গল্প আর কবিতা। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও জানতে দাও নি যে তুমি সাহিত্যিক হওয়ার সাধনা সুরু করেছ। বি. এ. পড়ার সময় তোমার একটা গল্প যখন তখনকার দিনের প্রসিদ্ধ মাসিক 'বঙ্গবীণা'য় বের হয়, তখন আমাদের একেবারে অবাক্ ক'রে দিয়ে-ছিলে তুমি। প্রথমে ত বিশ্বাসই হয় নি যে তুমিই ওটার লেখক। আমাদের চমকে দেওয়ার জন্যই তোমারই নামের কোনও লেখকের লেখা নিজের নামে চালাচ্ছ। তুমি তখন মুচকি হেসেছিলে। কিন্তু আমাদের ভুল ভাঙ্গতেও দেরি হয় নি। তারপর যখন নানা সাময়িক পত্রে তোমার লেখা বেরোতে থাকে—বুঝতে আমাদের বাকি থাকে না যে, কালে তুমি একজন উঁচু-দরের সাহিত্যিক হিসাবে খ্যাতি লাভ করবে। আমাদের তখন তোমার ওপর দারুণ হিংসে হ'ত। তুমি ত ঠিকই করেছিলে যে, সাহিত্যসেবা করেই জীবনটা

কাটিয়ে দেবে। পরের দাসত্ব তোমার সইবে না। কিন্তু কয়েক বছর পরই তুমি চাকরিতে ঢুকে গেলে। তারপর ধীরে ধীরে তোমার লেখাও কমে এল। শেষে আর কোনও কাগজেই তোমার লেখা চোখে পড়ত না। তখন কম ক্ষুণ্ণ হই নি আমি। আমার যে একজন সাহিত্যিক বন্ধু আছে—পুলিশ মহলে তাই নিয়ে কত গর্বই না করেছি। তোমার লেখা বেরোলেই আমার সহকর্মীদের পড়িয়ে শুনিয়েছি। আর তোমার সেই কুকুরছানার গল্পটা? এখনও সেটা স্পষ্ট মনে আছে। মানুষের পশুত্ব আর পশুর মহত্ব তুমি কি আশ্চর্য্য সুন্দর ভাবে ফুটিয়েছিলে ঐ গল্পে। এখন ত তোমার অখণ্ড অবসর। আবার সুরু কর না কেন? শুনতে পাই দেশ স্বাধীন হবার পর বাজারে বাংলা বই বিক্রি বেড়ে গিয়েছে। লেখকরাও বেশ পয়সা পাচ্ছে। লেখার অভ্যাসটা এইবার ঝালিয়ে নাও। হয়ত গোলামির উপার্জ্জনের চেয়েও বেশী আয় করতে পারবে অবসর জীবনে।

দি আইডিয়া! মহেন্দ্রবাবুর ভাবনাটা কিঞ্চিৎ ফিকে হ'ল। শুধু শুধু ভেবে মরছেন কেন? লিখতে কি আর পারবেন না তিনি? সাঁতার শিখেছিলেন ছোট বেলায়। কতদিন যে তিনি জলে নেমে সাঁতার কাটেন নি মনেও পড়ে না। এখন যদি কেউ ধাক্কা দিয়ে জলে ফেলে দেয়, তিনি কি ডুবে মরবেন, না সাঁতরিয়ে কূলে উঠবেন? নিশ্চয়ই ডুবে মরবেন না। সাইকেল চড়া শিখেছিলেন সেই প্রথম যৌবনে। চাকুরে জীবনের প্রথমটায় সাইকেলেই টুর করতেন। শেষটায় অবশ্য সাইকেলে চড়তে হ'ত না। এখন কি আর সাইকেলে চড়ে ঘুরে বেড়াতে পারবেন না? নিশ্চয়ই পারবেন। ঐ যে পাড়ার নন্দদুলালবাবু, ষাট বছর বয়সেও পাকা চুলদাড়ি নিয়ে সাইকেলে চড়ে অবলীলাক্রমে বাজার-হাট করে বেড়াচ্ছেন, বুড়ো হয়েছেন ব'লে তিনিই বা পারবেন না কেন? প্রথমটা হয়ত একটু ভয় ভয় করবে কিন্তু শেষটায় কি নন্দদুলালবাবুর মত সাইকেলে চড়ে বাজার-হাট করতে পারবেন না? তবে?

আইডিয়াটা দিয়েছে ভাল মহীতোষ। এখন সেটাকে কাজে লাগাতে পারলে হয়। অনেক দিন পর তাঁর মনে একটু খুশির আমেজ দেখা গেল যেন।

মহেন্দ্রবাবু কণ্ঠে একটু জোর দিয়েই স্ত্রীকে ডাকলেন। সুনয়নী তখন রান্নাঘরে। বাড়ীতে স্থায়ীভাবে আসার পর তাঁর কাজের অন্ত নাই। তাঁর অবসর গ্রহণের আগে স্ত্রীর অবসর ছিল অনেকটা। সংসারের ছোটখাট কাজ করার পরও তখন যথেষ্ট সময় থাকত। সেই ফাঁকটা ভরতো গল্প-উপন্যাস পড়ে আর সিনেমা দেখে। তখন রান্না করার আলাদা লোক ছিল। অন্য কাজ করার জন্য একটা চাকরও ছিল। এখন ত শুধু একটা ঠিকে ঝিই সম্বল। তাও সে অন্তত মাসে চারটে দিন কামাই করবেই। সুতরাং সুনয়নীর মেজাজ ভাল থাকার কথা নয়।

স্বামীর অতর্কিত ডাকে তিনি উৎকর্ণ হ'লেন স্বামী ভাবনা-চিন্তায় ডুবে আছেন সেটা তিনি দেখছেন। কিন্তু উপায়ই বা কি? নিজের কর্মফল ভোগ করতেই হবে ত'? আজ হঠাৎ আবার ডাকাডাকি কেন?

রান্নাঘরের দরজা ভেজিয়ে তিনি স্বামীর কাছে এলেন। মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন একটুখানি। ভাবটা যেন একটু হাসি-হাসি মনে হ'ল। ব্যাপার কি?

—মহীতোষের একটা চিঠি পেলাম আজ। মহেন্দ্রবাবু বললেন।

ভ্রূ কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত হয়ে এল সুনয়নীর। মহীতোষ? কোন্ মহীতোষ?

—সেই যে আমার ছোটবেলার বন্ধু।

—সেই তোমার পুলিশ সাহেব বন্ধু ত?

—হ্যাঁ। পুলিশ সাহেব হয়েছিল বটে, কিন্তু পড়াশোনার দিকে ভারি ঝোঁক ছিল তার। আমাকে একটা আইডিয়া দিয়েছে সে।

সুনয়নীর ভ্রূ আরও একটু কুঞ্চিত হ'ল। আইডিয়াটা কি?

—আজকাল না কি আর বাংলা দেশের লেখকদের ভাবনা নাই। একটা কিছু লিখতে পারলেই পয়সা।

সুনয়নীর কোঁচকান ভ্রূ সোজা হ'ল। কিন্তু ঠোঁটের কোণে ব্যঙ্গের হাসি।

—লেখকদের ভাবনা না থাকতে পারে, কিন্তু তোমার ভাবনাটা তাতে যায় কি ক'রে?

—না, ঠিক ভাবনা যায় না। তবে একটু চেষ্টা করলে আপত্তি কি? একদিন আমিও ত কিছু কিছু লিখেছি। আবার সেটা আরম্ভ করলে কেমন হয়?

সুনয়নীর একেবারে গালে হাত। বললেন, তুমি লিখবে? তবেই হয়েছে। বরং উল্টো আইডিয়া দেও তোমার পুলিশ সাহেব বন্ধুকে। মোটা পেন্সন পায়। কাগজ আর কালি-কলম কেনার পয়সার তাঁর অভাব হবে না। নিজের জীবনের কাহিনীই বরং লিখতে বলো। পুলিশ সাহেবের আত্মকাহিনী। কাটবে ভাল। বরং তাঁর বই বিক্রির ক্যানভাসার হয়ো তুমি। তাতে যদি দু'চার পয়সা পাও।

স্ত্রীর মন্তব্যে মহেন্দ্রবাবুর মুখটা আবার ফ্যাকাশে হয়ে উঠল। তবু একটু হাসির ভাব বজায় রাখার চেষ্টা ক'রে বললেন, তা মন্দ বলনি। কিন্তু তুমি কি ভাব, চেষ্টা করলে আমি এখনও লিখতে পারি নে? যদি একটু সাহায্য কর—।

সুনয়নীর চোখে বিস্ময়। বললেন, সাহায্য করব? আমি? তোমাকে?

হেসে ফেললেন মহেন্দ্রবাবু।—হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। মহীতোষ কি লিখেছে জান? আমার সেই কুকুরছানার গল্পটা না কি তার এখনও মনে আছে। এত ভাল লেগেছিল তার। মনে আছে ত সে গল্পটার আইডিয়া তুমিই দিয়েছিলে। তেমন দু-একটা প্লট যদি জোগাতে পার আর একবার চেষ্টা করে দেখি।

স্বামীর খোসামোদের কথাতেও সুনয়নীর মুখের থমথমে ভাব ঘুচল না। জবাব দিলেন, সেদিন অনেকদিন চলে গিয়েছে। আর ফিরবে না। এক মণ তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না। তোমার ক্ষমতা কত, অনেকদিন থেকেই জানা হয়ে গেছে আমার!

মহেন্দ্রবাবুর পৌরুষ যেন একটু মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। বললেন, তোমাকে বলাই ভুল হয়েছে আমার। আচ্ছা, দেখা যাক লিখতে পারি কি না।

—তা চেষ্টা করে দেখতে পার। তবে লেখার কাগজ-কলমের পয়সাটা কোথা থেকে জোটাবে সেটাও ভেবে দেখ। জান ত, নষ্ট করবার মত পয়সা আমার হাতে নাই।

বিদ্রূপের কশাঘাত হেনে সুনয়নীদেবী চলে যেতে যেতেও বিষবাণ ছুঁড়ে দিলেন।—বসে বসে আকাশকুসুম রচনা না করে একটু সংসারের কাজে লাগলেও ত সুসার হয়। বাবুর এখনও সেই দেমাক! থলি হাতে বাজার করতে যেতে লজ্জা! আমার হয়েছে চারদিকে মরণ!

স্ত্রীর কথার ঝাঁঝে যতটা ক্ষিপ্ত হওয়ার কথা তেমন কিছু বিশেষ ভাবান্তর দেখা গেল না মহেন্দ্রবাবুর। একটু ম্লান হাসি হাসলেন। সত্যিই ত, লেখবার কাগজ-কলম আসবে কোথা থেকে। কিন্তু বাজার করা? ঐ কথা শুনলেই তাঁর গায়ে জ্বর আসে। ও জিনিষটাই তাঁর কাছে কেমন ভাল্‌গার মনে হয়। তাই এ পর্যন্ত, পারতপক্ষে ও দিকে পা মাড়ান নি। চাল, ডাল, নুন, তেল, আলু-পটল, শাকপাতা, মাছ নিয়ে দরাদরি করছে বাবুরা এ দৃশ্য দেখলেই তাঁর গা ঘিন-ঘিন করে এসেছে এতদিন। কিন্তু বোধহয় আর উপায় নাই। অবশ্য কিছুদিন আগে পর্যন্ত বাজারে যাওয়ার লোকের অভাব হয় নি। বাজারে যাওয়ার জন্য অনেকেই তাক করে থাকত। চাকর-বাকর কি হারে যে চুরি করে বাজারের পয়সা—এ-কথা সুনয়নীদেবী বারবার শুনিয়েছেন। নিজে দেখেশুনে বাজার করলে টাট্‌কা আর খাঁটি জিনিস খাওয়া যায় এবং তাতে যে স্বাস্থ্যও ভাল থাকে, এ সব কথা তখনও প্রায়ই শুনতে হ'ত তাঁকে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। এখন বুঝি ঐ দুর্দৈব ঠেকান যাবে না আর। বর্তমানে সম্বল একটি মাত্র ঠিকে ঝি। সে পাঁচ বাড়ীতে কাজ করে। তার সময়ই বা কোথায়, যদি ইচ্ছাও তার থাকে। না, ইচ্ছা তার আছে ঠিকই। সময়ও সে করে নিতে পারে কিন্তু ষোল আনা অনিচ্ছা তাঁর স্ত্রী সুনয়নীর। অনিচ্ছা থাকলেও তাকে দিয়েই কাজটা করাতে হয়। কিন্তু ফ্যাসাদ বাধে হিসেব নিয়ে। নিজের ভাবনা-চিন্তায় মগ্ন থাকলেও গিন্নী আর ঝিয়ের কথাবার্তা তাঁর কানে প্রবেশ করে। বেশ সরস বাক্যালাপ! মজা হয় যখন আনা পয়সাকে নয়া পয়সায় রূপান্তরিত করার ফ্যাশাদ এসে দু'জনের মধ্যে ধস্তাধস্তি সুরু হয়।

মহেন্দ্রবুবার হঠাৎ খেয়াল হ'ল। গিন্নী আর ঝিয়ের কথামৃত দিয়েও বেশ একটা সরস লেখা তিনি চেষ্টা করলে লিখতে পারেন বোধহয়। আজকাল যেন কি বলে ওকে? মনেও থাকে না ছাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, রম্য-রচনা। ঐ রকম ভঙ্গির লেখাতেই না কি পয়সা বেশী। পাঠকরা না কি আজকাল ঐ সবই বেশী পছন্দ করে। মহেন্দ্রবাবু এই কথামৃত পান করেন। তাঁর মনে দিব্যি গাঁথা হয়ে গিয়েছে নিত্য কথাগুলি। হোক না কেন একঘেয়ে, নিত্য একই কথার পুনরাবৃত্তি। তবে এই ব্যাপারে যখন তাঁকেও টানা হয় তখন আর তাঁর কাছে ব্যাপারটা মজাদার থাকে না। ভ'বেন, এই রে, এবার বুঝি বাজারের ঝুলি হাতে ঝুলোতেই হয়।

মহেন্দ্রবাবু চোখ মুদিত করে ভাবতে থাকেন। প্রথম দিনের ঘটনা। নব-নিযুক্তা ঠিকে ঝিয়ের হাতে দু'টি টাকা দিয়ে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পাঠিয়েছিলেন সুনয়নী বাজারে। বলেছিলেন, তরিতরকারি যা দেখ অল্পস্বল্প নিয়ে এস। মাছ এক পো। ডিম যদি সস্তায় পাও নিয়ে এস দুটো। টকের জন্য দু'পয়সার কাঁচা তেঁতুলও আনবে। ঘন্টাখানেক বাদে ঝি ফিরেছিল বাজার থেকে। বাজারের থলি নামিয়েই নগদ একটি নয়া পয়সা কর্ত্রীর সামনে ফেলে দিয়েছিল। বলেছিল, এই নেও মা ফিরতি পয়সা।

থলি থেকে একে একে বার করতে লাগলেন সুনয়নী বাজারের সওদা। মুখ বোধহয় অন্ধকার হয়ে উঠেছিল

তাঁর। থমথমে স্বরে বলেছিলেন, এই শুকনো বেগুনগুলো নিয়ে এলে বাছা। বাজারে কি ভাল বেগুন ছিল না? আর এইটুকু একফালি কুমড়া। বলি দাম কত? আলুর ত অর্দ্ধেকই পচা। একটু হাত দিয়ে নেড়েচেড়ে জিনিষ আনতে হয় বাপু। যা দিলে তাই নিয়ে এলেই কি আর হয়। যাকৃগে প্রথম দিন আর বেশী কি বলব। এরপর থেকে একটু বেছেকুছে বাজার ক'রো। মনিবের পয়সা কি আর পরের পয়সা মনে করতে হয়? মাছটা কি আনলে দেখি? এই মরেছে! আমেরিকান কৈ? এ মাছ ত উনি মুখে তুলতে চান না। আর কি মাছ ছিল না বাজারে?

ঝি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে গিন্নীর মন্তব্য শুনছিল গালে হাত দিয়ে। এই বার সে ছড়ান জিনিষের সামনে বসে পড়ল। বলল, আমার কি আর বাজার করনের অব্যেস আছে মা। আইছি পাকিস্থান ছাইড়্যা ভাইগ্যির দোষে। পোড়া-কপালে দুখ্‌খু না থাকলি কি এ-দ্যাশে আসতি হয়। তুমি আজ কথা শুনাইত্যাছ। শুকনা বায়গুণ আন্‌ছি লাগ্যা। আলুও পচা বার করলা। মনের দুখ্‌খুটা আর কারে শোনাইমু মা? তোমারেই কই। দ্যাশে কি বাজার যাওন লাগত আমাগো। দ্যাড়শো বিঘ্যা ধান-জমি, তিন তিনটে পুকুর, দুই বিঘ্যার মত তরকারির ক্ষ্যাত। বারমাস্যা চাকরই ত আছিল চারজন। আর চাষের মরশুমে আরও জনা দশেক। কতবড় ঘরের মাইয়া, বৌ আমি। কও?

ঝি'র কথায় গিন্নীর কিছুক্ষণ অবাক্ হয়ে তাকিয়ে থাকা ছাড়া বোধহয় উপায় ছিল না।

ঝি আবার বলে চলেছে। আমাগো ক্ষেতির কি বায়গুন সেডা কি আর এই খুলে কওন যায়। এক একটা ওজনে এক স্যার, ড্যার স্যার। খামু কি, ঝাঁকা-ভরতি বাইগুন দ্যাখলিই প্যাট ভর্‌য়্যা উঠতোক। হঃ, ত্যাল চুকচুক্যা বায়গুন এই দ্যাসে আছে না কি। সব সুটকি। হাতে ছুইলেই গাডা গোলাইয়া ওঠে। আর ঐ যে মাছের কথা কইলা না? আমেরিগান্ না কি কৈ কইলা যেনি? পোড়া কপালডা আমার! আমাগো দ্যাশে ঐ ছিরির কৈ মাছ আছিল না কি? অরই নাম কৈ? আমাগো দ্যাশের বিলির কৈ, হায় মরিরে! না দেখ্‌লি বিশ্বাস করবা না তুমি! এ্যাক এ্যাকটা দ্যাড় পুয়া আধ স্যার। আর এহানে? ঐ ত ছিরির মাছ। অরে কি আর কৈ কয় না কি। ঐ মাছ নেওনের জন্যি কি ভিড় মা, কি ভিড়। আমি মাইয়া মানুষ, সেই ভিড়ে কি ঢুকতি পারি? তুমিই কও মা।

মহেন্দ্রবাবুর ঐ চিত্রটি মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে রয়েছে। সত্যিই ত। অতবড় ঘরণীর কি পরিণতি! ঝিয়ের কথায় তাঁর নিজের কথাই মনে পড়ছিল। সেদিন পর্য্যন্ত তিনিও ত বড় একটা কম কিছু ছিলেন না। তাঁর হুকুমে কত লোক উঠত-বসত। একটা মুখের কথা বের হ'লে লোকজন হাঁ হাঁ করে ছুটে আসত। আর এখন? যত অনিচ্ছাই হোক বাজারের থলি হাতে উঠতেও আর দেরি নাই।

সুনয়নী সেদিন বলেছিলেন—সবই শুনলাম বাছা। ভাগ্য ছাড়া ত পথ নাই। এই আমাকেই দেখ না! যাকৃগে ওসব কথা। এখন হিসেব দেও ত দেখি। নগদ একটা নয়া পয়সা ত ফিরেছে। দু'টাকা দিলাম, সবই ত খরচ।

ঝি সুনয়নীর কথায় অবাক্ হ'ল। হিসেব? বাজার গালাম, জিনিস কিনলাম, দাম দিলাম। যা হাতে আছিল ফেরত দিলাম। আমার কাজ ঐ হানেই শ্যাষ।

সুনয়নী অবাক্। বলে কি ও। হিসেব দেবে না? এমন ফ্যাসাদে ত তিনি কখনও পড়েন নি। খরচ যাই হোক, হিসেব তাঁর কড়ায়-গণ্ডায় চাই-ই। যতক্ষণ হিসেব না পাচ্ছেন—তাঁর স্বস্তি নাই। আর সে ত সেই আগের আমলের কথা, যখন মাস গেলে অঢেল না হোক, নিয়মিত টাকা আসত। আর এখন? এক পয়সা আয় নেই—জমান টাকা থেকে খরচ। তাই বা আর কদ্দিন চলবে। ভাবতেও তাঁর বুক কেঁপে ওঠে। আর সেই পয়সারই হিসেব নেই? ঝি-টা বলে কি?

ঝেঁজে উঠলেন সুনয়নী। হিসেব না দিলে চলবে না বাছা। কোন্ জিনিষ কত দিয়ে কিনলে বলবে না তুমি? একটা নয়া পয়সা ছুঁড়ে দিলে আর হয়ে গেল!

ঝি'র কিন্তু আশ্চর্য নিরুত্তাপ কণ্ঠস্বর।—তা হবে ক্যান মা, হবি না। কিন্তুক আমারই কি খ্যায়াল থাকে, কোন্ জিনিষটা কত দরে কিন্‌ছি। মুখ্যুসুখ্যু মানুষ মা। আর ঐ যে তুমি কইলা না, আলুর আদ্দেকই পচা। তার আমিই বা কি করমু মা। আমাগো বাড়ীতে ঐ যে কলাম না, দুই বিঘ্যা জমি ক্যাবল তরকারিরই আবাদ। তার এক বিঘ্যাই আলুর চাষ। পাঁচ স্যার বেছনে পাঁচ মণ আলু। সে আলু বেচ্যাও যা থাকত মা, সম্বচ্ছর ফ্যালায়ে-ছড়ায়্যা খাওন চলত। প্যাট ত কম আছিল না। মজুরই দশ-বারটা। সেই আলু পচে নি? পচ্যাছে, স্যারে স্যারে পচ্যাছে। আলুর ধরণডাই ঐ।

তা এ ত বাজারের আলু। সবই যে পচে নাই সেই আমার গুরুবল।

গিন্নীর বোধহয় সহ্য হ'ল না। তিনি ছুটে এলেন মহেন্দ্রবাবুর কাছে।

—বলি, শুনছ ত, ঝি-টা বলে কি। নগদ দিলাম দু' দুটো করকরে নোট। আনল ত ঐ সব বাজার-কুড়োনো মাল। এখন বলে যে হিসেব জানে না। আমার মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করে। এই বুড়ে বয়সে আমার কি হাড়ির হাল হচ্ছে বল দেখি। তুমি যদি সংসারের কিছু করে উপকারে আসতে তা হ'লেও আমার কিছুটা সোয়াস্তি হ'ত। কাল থেকে তোমাকেই যেতে হবে বাজারে। ঐ ঝিকে আমি আর পাঠাচ্ছি না।

কিন্তু পরদিন ঝি-ই রক্ষা করেছিল মহেন্দ্রবাবুকে। সেই উপযাচক হয়ে বলেছিল সুনয়নীকে—দ্যাও দেহি মা, বাজারের পুইসা। কাল তুমি কথা শুনাইলা না, দেহি আজ কোন্ দোকানি আমারে ঠগায়। বাজারের স্যারো জিনিস আনুম আজ। পয়সা কিন্তুক বেশী লাগবো। জিনিসের দর এ পোড়ার দ্যাশে একিবারে আগুন। হাত দিয়া ছোঁওন যায় না কি! আর আমাগো দ্যাশে কি সস্তাই না আছিল মা—।

গিন্নী বিরক্তির সুরে বলেছিলেন—থাম বাছা। তুমি পাঁচ জায়গায় কাজ কর। সময় কই তোমার দেখেশুনে বাজার করার। আজ বাবুকেই পাঠাচ্ছি বাজারে। তুমি বাজারে যাবে, জিনিস কিনবে আর হিসেব দিতে পারবে না। ও চলবে না।

ঝিয়ের স্বর শুনতে পেয়েছিলেন মহেন্দ্রবাবু। খুব দরদমাখা স্বর। বাবু যাবি বাজারে? কি যে তুমি কও মা। বাবুর কি অব্যিস আছে বাজার যাওনের। আর যা ভিড়। বুড়া মানুষ, কষ্ট হবি। আর হিসেবই বা দিমু না ক্যানে, কড়ায়-গণ্ডায় বুঝায়ে দিমু।

সুনয়নীর মুখের ভাবটা অবশ্য দেখতে পান নি মহেন্দ্রবাবু। তবে আন্দাজ করেছিলেন। সেদিনও বোধহয় দুটো টাকাই অপ্রসন্ন মুখে তুলে দিয়েছিলেন ঝিয়ের হাতে।

মহেন্দ্রবাবু হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন। না, ঝি-টা বেশ দরদী ত। তবে ঐ বুড়ো মানুষ কথাটা তাঁকে বড্ড বেশী খোঁচা দেয় আজকাল। ও কথাটা না বললেই পারত। তিনি সত্যিই বুড়ো অথর্ব হয়ে পড়েছেন না কি?

ঝিকে বাজারে পাঠিয়ে সুনয়নী অপ্রসন্ন মুখে এসেছিলেন মহেন্দ্রবাবুর কাছে। বলেছিলেন, তুমি ত বেঁচে গেলে। কিন্তু নিত্যি দুটো টাকা আমি কোথা থেকে পাই বল ত? ঝি মাগির বাজারের রসে ধরেছে। পাঁচ বাড়ীতে করছে ঝি-গিরি। আর কোথায়ও বাজারে যেতে দেয় না কি? তোমার মত অকর্মা ত আর এ তল্লাটে কেউ নেই। আমার হয়েছে মরণ! ঐ যে জজ সাহেব। পেন্সন নিয়ে এসে বসেছেন। কত বড় লোক। তেতলা বাড়ী। উনিও নিজে যাচ্ছেন বাজারে। সঙ্গে চাকরটাকে পর্যন্ত নেন না। তবে? তোমারই বা অত আদিখ্যেতা কেন? পেন্সন-পাওয়া চাকরি কর নি বলে?

সেদিন বোধহয় মোটামুটি ভাল জিনিষই এনেছিল ঝি। বিশেষ মন্তব্য কিছু শুনতে পান নি মহেন্দ্রবাবু। তবে ধস্তাধস্তি আরম্ভ হয়েছিল হিসেব নেওয়ার সময়।

—বেগুন কতটা? এক পো? দাম কত?

—দশ আনা স্যার মা। মুখে আগুন এ দ্যাশের লোকের। ঐ দামের জিনিস আবার মুখে তোলে। দশ আনা স্যারের বায়গুনও দেখাইলা ভগবান।

—বলি দাম কত?

—দশ পুইসা।

—দশ পয়সা? কত নয়া পয়সা নিয়েছে বলবে ত?

—দিছি দশ, পাঁচ আর দুই নয়া। সতের হ'ল না?

গিন্নী ঝঙ্কার দিয়ে বলেন—এই মরেছে। দশ পয়সায় কি সতের নয়া হয়রে বাছা। ঠকেছ। কাল এক নয়া পয়সা ফেরত নিয়ে এস, বুঝলে ত।

ঝি কিন্তু নির্বিকার। সে বেশ রসিয়ে রসিয়েই বলেছিল সেদিন।

—আমারে ঠকায় এমন মানুষ এহানে নাই। তুমি পুয়া কইলা না? স্যার, পুয়া তোমাগো দ্যাশে কি আছে মা। এখন হইছে কেজি ফেজি কি যেনি কয়। আবার কয়, গেরাম। বায়গনওয়ালা কয় কি, তোমারে আড়াইশ' গেরাম দিলাম, এক পুয়ার অনেক বেশী। দাম সতের নয়া।

ঝি-র কথায় সুনয়নী হতভম্ব হয়ে পড়েছিলেন, আর দাম নিয়ে বেশী চেঁচামেচি করেন নি।

ঝি'র কথার উৎস কিন্তু থামে নি। টাকা, আনা, পুইসা ত ভালই আছিল মা। স্যার, পুয়া, ছটাকই বা দোষটা কর্‌য়াছিল কি? আমাগো পাকিস্তানে কিন্তু এ সব বালাই আছিল না। ভাগ্যির দোষে ঐ সোনার দ্যাশ ছাড়তি হইছে আমাগো। দুঃখির কথা আর কইমু কারে!

ঝি'র বাক্যস্রোতে আর ভাসতে ইচ্ছা ছিল না

সুনয়নীর। তিনি ছুটে এসেছিলেন মহেন্দ্রবাবুর কাছে।

—শুনলে ত ওর কথা। আমাকে আবার নয়া পয়সার ভেলকি দেখাতে চায়। বলি, প্রতি জিনিষে যদি একটি করে নয়া পয়সা সরায়, তা হ'লে দিনে কয় পয়সা বরবাদ যায় বল ত? তুমি বাপু এর একটা বিহিত কর। চুপ করে দিন-রাত বসে না থেকে একটু নড়াচড়া কর। শরীরও ভাল থাকবে, মনও ভাল থাকবে, সংসারে কিছুটা সুসারও হবে। না হয় বল ত আমিই বাজারে যাই। আমার ত হাড়ির হাল হচ্ছেই, ওটুকুও আর বাকি থাকে কেন?

মহেন্দ্রবাবু লেখার কথাই ভাবতে লগেলেন। মনে হচ্ছে একবার কলম আর খাতা নিয়ে বসতে পারলে আর রক্ষা নাই। গিন্নী আর ঝিয়ের কথামৃত দিয়ে লিখতে ত পারেনই। তা ছাড়া অনেক কিছুই তাঁর মনে ভাসছে। গল্প লেখার উপাদানের আজকাল অভাব আছে না কি? তিনি প্রায় বিশ বছর কোনও গল্প-উপন্যাসের বই হাত দিয়ে ছোঁন নি। কয়েক দিন হ'ল কিছু কিছু পড়া আরম্ভ করেছেন। পড়েন আর অবাক্ হন। গল্প লেখা যে আজকাল অত সহজ, যে-সে বিষয় নিয়েই যে গল্প লেখা যায় এমন অভিজ্ঞতা তাঁর আগে ছিল না। এককালে তিনিও লিখেছেন বটে। কিন্তু তখনকার দিন লিখতে গিয়ে কম কসরত করতে হয়েছে নাকি তাঁর। আর এখনকার লেখকেরা অনায়াসে লিখছেন—গল্প লেখার গল্প, গল্প না-লেখার গল্প। শূন্যের ওপর কারুকার্যময় প্রাসাদ গড়ে তুলছেন। না, তিনি একবার খাতা-কলম নিয়ে বসতে পারলেই আর কথা নেই। কলমের আঁচড়ে হু হু করে খাতার পাতা ভরে উঠবে।

অনেক দিন পর তাঁর মন একেবারে হালকা হয়ে গেল। তিনি দেখিয়ে দেবেন গিন্নীকে তাঁর কদর। তিনি সাঁতার দেওয়া ভোলেন নি, সাইকেলে চড়াও ভোলেন নি, লিখতেও তিনি ভোলেন নি। প্রমাণ করবেন—বয়সে তিনি প্রবীণ হয়েছেন বটে কিন্তু লেখক হিসাবে অতি আধুনিক।

ঝিয়ের কথামৃত দিয়ে তিনি লিখতে পারেন নিশ্চয়ই, কিন্তু তাতে তাঁর ঘরের কথাই ফাঁস হবে। ও না হয় এখন থাক। এখন লিখবেন প্রতিবেশীদের নিয়ে, যাঁরা তাঁর চারপাশে ছড়িয়ে আছেন। লিখবেন—ডাঃ চৌধুরী সাহেবের কথা, যাঁর পাচটি ছেলের পাঁচখানি মোটর। অথচ এ নিয়ে তাঁর অহঙ্কার নাই। সর্বদাই মুখে এঁটে রেখেছেন মোনালিসার হাসি। লিখবেন সেন সাহেবকে নিয়ে, যিনি সেকালের বিলেত-ফেরত হয়েও খালি গায়ে নাতিকে পারামবুলেটারে চড়িয়ে টেনে বেড়াচ্ছেন সদর রাস্তা ধরে—মুখে যাঁর সাধকের হাসি। লিখবেন—গাঙ্গুলী সাহেবকে নিয়ে, যাঁর মুখ দিয়ে কোটেশনের পর কোটেশন বেরিয়ে আসছে—ইংরেজী, সংস্কৃত, বাংলা, ফারসী। অগাধ পাণ্ডিত্য কিন্তু সহজে বুঝবার উপায় নাই—মুখে যাঁর লেগে আছে বুদ্ধিমন্তর হাসি।

মহীতোষ ঠিক আইডিয়াই দিয়েছে। সত্যিই সে অকৃত্রিম বন্ধু তাঁর।

সুনয়নীর কথার খোঁচা তিনি অবশ্য স্মরণ করলেন। কাগজ-কলমের পয়সা জুটবে কোথা থেকে? হ্যাঁ, লিখতে হ'লে কাগজ, কলম, কালি চাই বৈকি। শুধু মনের ভাবনা দিয়ে ত আর লেখা চলে না, ওসব উপকরণও দরকার। কলম—একটা ঝরণা কলম তাঁর এখনও আছে। বেশ দামী কলমই সেটা। এখনও বেশ লেখা চলে। কিছু কাগজের দরকার। কাগজের মধ্যে সম্বল একটি রাইটিং প্যাড। মাঝে মাঝে চিঠি লেখার জন্য দরকার হয়। তা তিনি কি এই কয় মাসেই এমন নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন যে, দিস্তাখানেক কাগজও কিনতে পারেন না? কিন্তু অকাজে ব্যয় করতে সুনয়নীর মহা আপত্তি। আর কিনতে হ'লে তাঁর কাছেই হাত পাততে হবে। পয়সা যে না দেবে তা নয়, কিন্তু পেন্সনহীন বেকার স্বামীকে বুঝিয়ে দেবে পয়সার মর্ম।

হঠাৎ মনে মনেই বলে উঠলেন—ইউরেকা। তিনি একটা মহা আবিষ্কার করে ফেলেছেন। তাঁর ত লেখার কাগজের অভাব হওয়ার কথা নয়। বিশ-পঁচিশ বছর আগে যখন তিনি লিখতেন, হরেক রকমের খাতা দপ্তরী ডেকে বাঁধিয়ে নেওয়া তাঁর একটা সখের ব্যাপার ছিল। সে-সব খাতার পাতা ত বেশীর ভাগই সাদা। একটা খাতার কয়েক পৃষ্ঠা লিখে আবার ধরেছেন নতুন খাতা। সে খাতা শেষ না হ'তেই আর একখানি। খুঁজে দেখলে হয়ত সাদা খাতাও দুই-একখানি পাওয়া যেতে পারে। খাত কিনেছিলেন বটে, কিন্তু লেখার খেয়াল তখন ছেড়ে গেছে।

মহেন্দ্রবাবুর মনে হ'ল খাতাগুলো তিনি নষ্ট করেন নি, সযত্নেই রেখেছিলেন। বাড়ীতে স্থায়ীভাবে এসে বসার সময় কতকগুলো বইয়ের সঙ্গে সে খাতাগুলোও এসেছিল মনে হচ্ছে। তবে আর তাঁকে পায় কে? স্ত্রীর কাছে আর কয়েকটি পয়সার জন্য হাত কচলাতে হচ্ছে না। কাগজ হ'ল, কলমও আছে, কালিরও একটা শিশি দেখে-

ছেন আলমারির মাথায়। এখন আর লেখার ভাবনা রইল কোথায়?

একেবারে মনস্থির করে বসলেন মহেন্দ্রবাবু। আলমারি খুলে বের করলেন বাঁধানো খাতা। এতদিন পর লিখলেও চুপ্‌সে যাবে না অক্ষরগুলো। কলমেও নতুন করে কালি ভরে নিলেন। নিরিবিলি ঘরেরও অভাব নাই। ছেলেরা থাকে তাদের কার্যস্থলে সপরিবারে। নাতি-নাতনীরা কাছে নাই যে, হৈ-হল্লা করে তাঁর লেখার ব্যাঘাত ঘটাবে। তাঁর বাড়ীতে নিঝুম নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে।

স্ত্রীকে বললেন, রাত্রিতে আজ আর কিছু খাব না।

—কেন, না-খাওয়ার আবার কি ব্যাপার হ'ল? শরীর খারাপ হ'ল না কি? কই, দেখি। সুনয়নী স্বামীর কপালে হাত দিলেন। গা ত ঠাণ্ডাই আছে।

মহেন্দ্রবাবু একটু মুচকি হেসে বললেন, শরীর ভালই আছে। আজ একটু রাত জাগতে হবে কি না। তাই পেটটা খালি রাখতে হবে।

বেকার স্বামীর সঙ্গে যত বচসাই করুন না কেন, তাঁর খাওয়ার দিকে সুনয়নীর এখনও সমান তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। একটুও এদিক-ওদিক হবার জো নাই। সেই আগের মতই স্বামীসেবা চলেছে। বললেন—রাত-উপোস ভাল নয়। তা রাতই বা জাগতে হবে কেন হঠাৎ।

মহেন্দ্রবাবু হেসে বললেন—রাতের অবশ্য অনেকটাই জেগে থাকতে হয় আমাকে। বেকার লোকের ঘুম আসবে কোথা থেকে, বল? তবে আজ অন্য ব্যাপার।

সুনয়নী হাসলেন। অনেকদিন পর সেই আগেকার মত হাসি। বললেন—বুঝেছি। কিন্তু লিখতে গেলে যে খেতে হয় না, এ তথ্য আমার জানা নেই। বেশী কিছু খেও না—একটুখানি দুধ, আর দুটো নতুন গুড়ের সন্দেশ। নতুন বাজারে উঠেছে। তোমার জন্য কিনেছি।

—বেশ, তাই হবে। কিন্তু রাত যদি বেশী হয় তুমি যেন আবার ডাকাডাকি ক'রো না শোওয়ার জন্য। রাত জেগে একটু লেখাপড়া করলে আমার কিছু হবে না, তুমি দেখ।

খাতা আর কলম নিয়ে মহেন্দ্রবাবু বসলেন অনেকদিন পর। শেষ যে কবে বসেছিলেন তাঁর মনেও নাই। মনটা বেশ খুসী খুসী মনে হচ্ছিল তাঁর। একটা লেখার মত লেখা লিখবেন। এখন লেখক হিসাবে কেউ তাঁকে চেনে না। এমন একটা গল্প লিখতে হবে যে একটাতেই কিস্তিমাৎ। অনেকদিন আগের পরিত্যক্ত আসনে তিনি আবার বসতে পারবেন।

কিন্তু, ভাবতে লাগলেন মহেন্দ্রবাবু, কি নিয়ে লেখাটা সুরু করবেন আর কোথায়ই বা শেষ করবেন। একটা নিটোল প্লটই কি মাথায় আসছে। ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে উঠল মহেন্দ্রবাবুর। পরিবেশটা ঠিক লেখার মত নয় মনে হ'ল। চেয়ারের সিটটা কাঠের, বড্ড শক্ত, বসতে অসুবিধা হচ্ছে। একটা ডানলোপিলোর ছোট্ট কুশন কিনতে হবে। লাইটের পাওয়ারটাও খুব কম। একটা বেশী পাওয়ারের বাল্বও কেনা দরকার। তাঁর আগেকার দিনের কথা মনে পড়ল—যখন তিনি লিখতেন। তাঁর লেখার জায়গাটা বড় সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছিলেন সুনয়নী। জানলার ধারে তিন-চারটে ছোট্ট ফুলের টব। প্রায় সব সময়েই একটা-না-একটায় ফুল ফুটে থাকত। কিন্তু এখন আর সুনয়নীর সে মন নাই। সে মন তিনিই নষ্ট করে দিয়েছেন।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল। একবার চোখেমুখে জল দিয়ে এলেন। ঘরের মধ্যেই পায়চারি করা সুরু করলেন। তারপর চেয়ারে বসে মাথা ঝাঁকালেন, কিছুক্ষণ পা দোলালেন। না, কোন মুষ্টিযোগই কাজে এল না। খাতায় আঁচড় কাটার মত একটা লাইনও তাঁর মনে এল না।

কখন বিছানায় এসে শুয়েছিলেন, কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তাঁর মনে নাই। পরদিন সকালে যখন উঠলেন, তখন অনেক বেলা হয়েছে। কোনও রকমে মুখহাত ধুয়ে মহেন্দ্রবাবু স্ত্রীর সামনে এলেন। হেসে বললেন—বাজারের থলিটা দেও ত।

সুনয়নী একবার স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন। বোধহয় ব্যাপারটা টের পেলেন, একটু মুচকি হাসলেন, তারপর বাজারের থলি আর দু'টি টাকা স্বামীর হাতে তুলে দিলেন। মুখ টিপে হেসে বললেন—হিসেব কিন্তু কড়ায়-গণ্ডায় চাই।

মহেন্দ্রবাবুর মনটা অনেকদিন পর খোলসা হয়েছে। বললেন—কড়া-গণ্ডার যুগ চলে গিয়েছে। হিসেব দেব নয়া পয়সায়।

অমৃতসর থেকে জ্বালামুখী

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

পাঠানকোটে ট্রেন পৌঁছল রাত এগারোটায়।

মস্তবড় লম্বা প্ল্যাটফরম। এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়োয় যেতে দু' ফার্লঙের মত মনে হয়। অন্তত কাংড়া ভ্যালির ছোট গাড়ি যে প্রান্তে রয়েছে, তার নাগাল ধরতে অতটাই হাঁটতে হ'ল। আবার মাঝ রাত্রিতে মজুরটি পারিশ্রমিক চাইল, তার অঙ্কটাও দিব্য স্ফীত। চাইবে না কেন— ওরা ত জানে আইনমত যে লেখাটা ওদের নীল কুর্তার গায়ে সেঁটে দেওয়া হয়েছে, সেটা মাঝ রাতের দূরতম প্রান্তিক প্ল্যাটফরমে পৌঁছে দেওয়ার জন্য নয়, সেটা অদৃশ্য কালির লেখা, প্রয়োজনের তাগিদে কুর্তার গায়ে আশ্চর্য্যভাবে আত্মগোপন করে। কর্তৃপক্ষ হয়ত এই বৃত্তান্ত জানেন। আইন প্রয়োগের দায়িত্বটা ওঁরা যাত্রীদের ওপর দিয়েই নিশ্চিন্ত। আর একরাশ মোটঘাট নিয়ে ক্লান্ত বিপর্য্যস্ত আসন-সংগ্রহের উদ্বেগে আকুল যাত্রী কোন্ ভরসায় বা আইনের ধারাটিকে বলবৎ করবে। সময়, শারীরিক সামর্থ্য, বাচনিক তেজ, মানসিক প্রস্তুতি কিছুই ত কার্য্যক্ষেত্রের অনুকূল নয়। অবশ্য যাঁরা মজুরের দাবিকে অগ্রাহ্য করার শক্তি রাখেন, তাঁদেরও দেখলাম। স্ত্রী-পুরুষ আণ্ডাবাচ্চা মিলে হাতে কাঁকে মাথায় কাঁধে বাক্স প্যাঁটরা পোঁটলা পুঁটুলি ঝুলিয়ে দিব্যি স্বচ্ছন্দে হেঁটে চলেছেন।

কাংড়া উপত্যকার গাড়িটা ছোট মাপের লাইনের মতই, যেন খেলনা-গাড়ি। ছোট ছোট বগি, সংখ্যাতেও কম। নেহাৎ লাইনটা পাতা রয়েছে বলেই চক্ষুলজ্জা এড়ানোর জন্য একটা ব্যবস্থা। তার আবার যেমন কামরা, তেমনি বেঞ্চি। খাড়া হয়ে দাঁড়ালে সাড়ে ছ' ফুট উঁচু মানুষটার মাথা ঠুকে যাবে গাড়ির ছাদে, বেঞ্চিতে বসলে নিতম্বের অর্দ্ধভাগ মাত্র সংস্থাপিত হবে কাষ্ঠাসনে—ইঞ্চি তেরো-চৌদ্দ মাত্র চওড়া সে আসন। পাশাপাশি দু'জন ছাড়া তিন জনের স্থান সঙ্কুলান হবে না—আবার সামনা-সামনি বসলে হাঁটুতে হাঁটু না মিলিয়ে উপায় নাই। মোট কথা অন্তরঙ্গতার নির্ভেজাল উদাহরণ হয়ে না চাপলে—এই গাড়িতে প্রতিটি মুহূর্ত্তে সংঘর্ষ অনিবার্য্য।

কিন্তু এসব বৃত্তান্ত পরে জানলাম, গাড়ির মধ্যে ঢুকে, আপাতত দেখছি প্রতিটি কামরার দরজা বন্ধ। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে যাত্রীরা নিদ্রাসুখে মগ্ন। সে নিদ্রা এমন গাঢ় যে, ধাক্কা মেরেও গাড়ির দরজা খোলানো গেল না। বেশ বোঝা গেল ভদ্রভাবে দরজায় ধাক্কা মেরে এই নিদ্রা ভাঙ্গানো যাবে না। অতএব জানালার কপাট ফেলে দিয়ে (রাষ্ট্রভাষায় খিড়কি পথে) নিদ্রিতদের কানের কাছে বিকট আওয়াজ তুললে মজুর। ফল হ'ল—কেওয়ার খুলল। কামরার দু'খানা বেঞ্চি দখল করে শুয়েছিল দু'জন ফৌজী সিপাই। আর একখানা বেঞ্চি ছিল একেবারে খালি। সেটা দখল করলাম আমরা। তাতে অবশ্য দু'জনেরই বসবার জায়গা হ'ল— আর একজন বিছানার বাণ্ডিলের উপর জায়গা করে নিলে। এমনি সঙ্কীর্ণ সেই বেঞ্চি যে, সুস্থির হয়ে বসবার উপায় ছিল না, অথচ ঐ দু'জন ফৌজী সিপাই, কি অনায়াসে দেহটাকে দু' ভাঁজ করে মুড়ে নিয়ে নিদ্রা দিচ্ছিল। নানা কৃচ্ছ্রসাধনায় অভ্যস্ত বলেই ওদের সাড়ে পাঁচ ফুট দেহটাকে তিন ফুট বেঞ্চিতে কুলিয়ে নিতে পেরেছিল। আমরা হলে দেহটাকে কোমর বরাবর দু'ভাঁজ করে মুড়ে নিতে পারতাম কি! ধন্য ওদের সাধনা! ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ঐ ভাবেই পাশ না ফিরে (পাশ ফিরবার উপায় ছিল না) চোখ বুজে পড়ে রইল। বইয়ে পড়েছি, নেপোলিয়ন অশ্বপৃষ্ঠে ঘুমিয়ে নিতেন। সেটা যে নেহাৎ গালগল্প নয়, এই মুহূর্ত্তে তা বুঝতে পারলাম।

বসেই রইলাম। চেয়ে রইলাম বাইরের দিকে। সন্ধ্যাবেলায় শিলাবৃষ্টি হওয়াতে আবহাওয়া ছিল ঠাণ্ডা— কিন্তু বাইরের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে কাংড়া উপত্যকায় তামসী মূর্ত্তির কোন রূপ ছিল না। আকাশে মেঘ ছিল বলে অন্ধকার এত গাঢ়। ঘট্ ঘট্ করে গাড়ি চলছিল, দোলা দিচ্ছিল, মাঝে মাঝে এক একটা জায়গায় থামছিল। জায়গাগুলো মনে হচ্ছিল ষ্টেশনই। অন্ধকারে ছায়া ছায়া

মূর্ত্তিগুলো এধার-ওধার নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছিল। সামান্য কণ্ঠস্বর কানে আসছিল। একটাও আলো জ্বলছিল না—শুধু গার্ডের হাতের আঁধারে লণ্ঠন থেকে একটা আলোর রেখা চকচকে ছুরির ফলার মত অন্ধকারকে চিরে চিরে দিচ্ছিল। গার্ডের বাঁশির তীব্র শব্দ মাঝে মাঝে অন্ধকারকে শাসন করছিল আর ইঞ্জিনটা ভাঙ্গা গলায় তার সঙ্গে তাল দিচ্ছিল।

একঘেয়ে অন্ধকার দেখতে দেখতে একটু ঢুল এসেছিল, অকস্মাৎ একটা প্রচণ্ড গর্জ্জনে তন্দ্রা টুটে গেল। চেয়ে দেখি ট্রেন থেমে আছে—কয়েকটি ছায়ামূর্ত্তি চলাফেরা করছে এবং আঁধারে আলো তাদের গায়ের ওপর এক একবার বুলিয়ে গার্ড সায়েব বাজখাঁই গলায় চীৎকার করছেন। লোকগুলিও চেঁচাচ্ছে। তারা সংখ্যায় বেশী হয়েও চীৎকারের ঐকতানে গার্ডের কণ্ঠস্বরকে পর্যুদস্ত করতে পারছে না। বক্তব্য দু' পক্ষেরই অস্পষ্ট কিন্তু বিষয়বস্তুটি অত্যন্ত স্বচ্ছ। এখানে এই রাত্রির মধ্যযামে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের সুযোগ নিতে চাইছিল যাত্রীগুলি, আর গার্ড সায়েবও আর এক অন্ধকারের পটভূমিকায় তাঁর দাবিটাকে প্রবল করে তুলতে চাইছিলেন। দুনিয়ার অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে কারবার আজ সংক্রামক ব্যাধির মত পরিপুষ্ট—এই দুপুর রাত্রিতে তারই চেহারাটা অতিশয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। আঁধারে আলোটা দাপাদাপি করছিল সারা প্ল্যাটফরমে, কখনও বা গেটের কাছে; একই সঙ্গে দু'পক্ষ নিজ নিজ বক্তব্য বলে যাচ্ছিল বীর রুদ্র আর করুণ রস মিশিয়ে, আর নিশ্চল গাড়িটাও পরমসহিষ্ণু শ্রোতার মত এই কৌতুক অভিনয় উপভোগ করছিল। আমাদের মত কিছু বীতনিদ্র যাত্রীও ছিল দর্শক। পয়সা দিয়ে টিকিট কেটেছিলাম সত্য, কিন্তু মূল নাটকের সঙ্গে এমন একটি উপভোগ্য ফাউ কল্পনা করতে পারি নি।

সময়টা বড় কম নয়—আধ ঘণ্টা ধরে চলল এমনি আলোর নর্ত্তন ও দু'পক্ষের সংলাপ-সঙ্কীর্ত্তন। সময়ানুবর্ত্তিতার কথা ভুলে গেল সবাই। দুষ্কৃত দলনের আবেগে উন্মত্ত হয়ে কিংবা দুর্নীতি পোষণের জিদের বশবর্ত্তী হয়েই এটা ভুলল। অবশেষে দু'পক্ষ শ্রান্তক্লান্ত হ'লে নাটকের যবনিকা পড়ল। গাড়ি আবার চলতে লাগল।

এরই জের টেনে ঘণ্টাখানিক দেরিতে গাড়ি পৌঁছল জ্বালামুখী রোড স্টেশনে।

তার আগেই রাত্রির তিমির যবনিকা অপসৃত হয়েছিল। সকালে দেখলাম উপত্যকার রূপ। বর্ষণ-ধৌত স্নিগ্ধ শ্যামল তনু তার—বিস্তীর্ণ-তরঙ্গায়িত। সমতল ভূমি থেকে বেশ খানিকটা উঁচু—তবু সমতলের সৌন্দর্য্যে বঞ্চিত নয়। বাঁশ-বন আছে, আমগাছ, জামগাছ আছে, আছে দু'পাশে ক্ষেত-খামার, জলে থই থই নালা জোল ডোবা। জমিতে সামান্য জল জমেছে, মাটি নরম হয়েছে, হাল-বলদ নিয়ে চাষারা নেমেছে মাঠে। জ্যৈষ্ঠের শেষে দু'এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেলে পল্লী-বাংলারও এই রূপ। নিদারুণ গ্রীষ্মের পর বর্ষার জলধারা পেয়ে মানুষ এবং ভূমি-প্রকৃতি দুইই নবজীবনের রসোল্লাসে মেতে ওঠে।

আরও এগিয়ে দৃশ্য গেল বদলে। ভূমি পাথরে কঠিন হয়ে উঠল। দু'পাশে পাহাড় দেখা দিল—একটা পাঁচশ' ফিটের মত খাদ বাঁ-ধারে এগিয়ে এল। তার কোলে একটি ক্ষীণ-স্রোতা নদী। এখন উপল-আকীর্ণ প্রস্তর-পঞ্জরাস্থিতে সুপ্রকট দেহবল্লরী অতি ক্ষীণ বেগধারায় তার প্রাণ-প্রবাহটি ধুক ধুক করছে। একটি সেতু পড়ল সামনে। এক পাহাড়-থেকে আর এক পাহাড়ে যাবার সংযোগ পথ। সেতু না সেতু! কয়েক-খানা লোহার পাতের উপর দুটো লাইন পাতা। গাড়িটা তার উপর দিয়ে খুব আস্তে আস্তে চলতে লাগল। আমরা যেন নাগরদোলায় চেপে শিউরে উঠলাম। দড়িটা যদি ছিঁড়ে যায়—যে ভাবনা প্রবল হয়ে উঠত ছেলেবেলায়, সেই ভাবনাই এখন পেয়ে বসল—গাড়িটা যদি উল্টে পড়ে লাইন থেকে। একই সঙ্গে দারুণ ভয় করছে—আবার ভালও লাগছে। আনন্দ এই দুই ভাবতরঙ্গে নিজের পাওনাটাকে সফল করে নিচ্ছে—পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠছে। বিপদের ছায়া পড়ে না যে সঞ্চয়ে, সে ত জঞ্জালেরই সামিল।

যাক, সেতুটাও পেরিয়ে এল গাড়ি। আবার তার গতি-বেগ বাড়ল। যত না গতিবেগ, শব্দ তার চেয়েও বেশী। অসমতল উঁচুনীচু পথে বাঁকে বাঁকে এঁকে-বেঁকে যাওয়াটা পরিশ্রমসাধ্য ত বটেই। পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনিত শব্দের রেশটাও দীর্ঘস্থায়ী। গাড়ি যে এক ঘণ্টা দেরিতে আসছে—সে কথা আর মনেই রইল না। লাবণ্যময়ী প্রকৃতি আমাদের মন থেকে হিসাবের কালো ছাপটুকু

অনায়াসে মুছে ফেলে দিল। জ্বালামুখী রোড স্টেশন এল অবশেষে।

জায়গাটা মোটেই সমতল নয়, তিনটি থাকে সাজানো স্টেশন। প্রথম থাকে প্ল্যাটফরম, দ্বিতীয় থাকে বুকিং আপিসসমেত শ্লেটপাথর-ছাওয়া খানিকটা আচ্ছাদন, ভদ্রভাষায় ওয়েটিং হল—তার পরের থাকে কর্মচারীদের বাসগৃহ প্রভৃতি। এই সব পেরিয়ে আরও খানিকটা উপরে উঠলে বাস স্ট্যাণ্ড। ওটা পাহাড়ের খাঁজ-কাটা কোলে বড় সড়কের লাগাও—তিন-চারখানা বাস পাশাপাশি দাঁড়াতে পারে এমন একটি জায়গা। এই পথটি সোজা এসেছে পাঠানকোট থেকে—শেষ হয়েছে কাংড়া উপত্যকা পেরিয়ে কুলুর শেষপ্রান্ত মানালীতে। দু'শ মাইলের মত একটানা পথ। এই পথের উপরেও আরও তিন-চারটি থাকে তিন চারখানা চায়ের দোকান, দোকানীদের বাসগৃহ, একটা মশলা মুদির দোকান ইত্যাদি রয়েছে। চায়ের দোকান মানেই হোটেলও। এখানে চা বিস্কুট কেক এবং কিছু তেল বা দালদা ভাজা খাবার মেলে। ভাত ডাল রুটি তরকারির ব্যবস্থাও আছে।

অমৃতসরে শিলাবৃষ্টির জেরটা এদিকে লেগে রয়েছে। মাত্রাটা বেশীই হয়েছিল মনে হচ্ছে। এখনও পথেঘাটে জল জমে রয়েছে এবং সকালে গায়ে চাদর জড়িয়েও শীত ভাঙছে না, রোদটা ভারি মিষ্টি লাগছে। আমরা বেঞ্চিতে বসে চা খেয়ে নিলাম।

ঘণ্টাখানিক অপেক্ষা করার পর বাস এসে গেল দু'-তিনখানা। কোনটা কাংড়া হয়ে যাবে ধরমপুর—কোন্‌টা বা জ্বালামুখী। বৈজনাথের দিকেরও রয়েছে একখানা—ওটা আসছে পাঠানকোট থেকে।

আমরা জ্বালামুখী মন্দিরের বাসে উঠলাম। ওটা মন্দির স্টেশন হয়ে যাবে হামিরপুর। বাসটা অবশ্য ঠিক সময়ে ছাড়ল না—বেশ খানিকটা দেরি করলে। তা হোক, আমাদের ত আর ট্রেন ধরতে হবে না।

এবার একটা নূতন পথে বাঁক নিল বাস। মনে হ'ল একটা গিরিবর্ত্ম পার হয়ে চলেছি। বেশ খানিকটা এমনি এসে পড়ল খোলামেলা জায়গায়। এবার পাহাড় সরে গেল বহুদূরে, প্রায় মিলিয়ে গেল। একটি সুবিস্তীর্ণ সমতল প্রান্তর প্রসারিত হ'ল সামনে। প্রান্তরটা উঁচুনীচু ঢেউ খেলানো। চলতে চলতে বাঁ-ধারে পাহাড়ের পাঁচীলটা আবার দেখা গেল—তার কোলে দু'চার মাইল মাঠের বেধ। ডান ধারের মাঠ অফুরন্ত। গ্রীষ্মকাল বলে মাঠে শস্য ছিল না। কিন্তু বৃষ্টির জল জমেছে মাঠে, আর হাল-বলদ নিয়ে চাষারাও নেমেছে দলে দলে। দু'দিকের মাঠে ভূমি প্রসাধনের মহোৎসব লেগে গেছে। লাঙলের ফলায় মাটির গায়ে আঁচড় পড়ছে—আর মাটি-কন্যা চুল আঁচড়ে মুখ দেখছে আকাশের আয়নাতে। প্রসন্ন সূর্য্যের আলো লেগে ঝক্ ঝক্ করছে আয়নাটা। পথের দু'ধারে অনেক গাছ—আম জাম, পাইনও কিছু কিছু। ফল কোন গাছে নাই, তবু ঘন পাতার সবুজ স্বাস্থ্যে প্রকৃতি শ্রীময়ী। চমৎকার লাগছে বাসের ভেলায় চেপে এই সবুজ নদীতে ভেসে যেতে।

এমন খুশি-খুশি ভাবটা বেশিক্ষণ রইল না। একটা চড়াই পথে উঠতে উঠতে বিশ্রীভাবে শব্দ করে থেমে গেল বাসটা। চালক নেমে গিয়ে কি সব কলকব্জা নাড়াচাড়া করে বাস চালু করলেন, কিন্তু অদৃষ্ট আমাদের সুপ্রসন্ন ছিল না—খানিকটা এসে আবার থেমে গেল বাস। এবার চড়াই পথে নয়, সমতলেই ঘটল অঘটন। কি ব্যাপার?

আবার নামলেন চালক। কিছুক্ষণ ধরে যন্ত্রপাতি এটা-ওটা নাড়লেন, কিছুই হ'ল না। তার পর এঞ্জিনের ঢাকনা তুলে তেলের ট্যাঙ্ক দেখে ওঁর চোখ কপালে উঠল। রসদ ফুরিয়েছে। এক ফোঁটা তেল নেই—বাস চলবে কি করে! তাড়াতাড়ি পেট্রলের টিনটা এনে উপুড় করলেন ট্যাঙ্কের মুখে। হা হতোস্মি! যেটুকু তেল তা থেকে পড়ল—তা তাতল সৈকতে বারিবিন্দুসম! চালক তেলের টিনটা মাটিতে ফেলে দিয়ে দু'হাত নাড়তে লাগলেন। এ যেন ছোট বাচ্চাদের হাত ঘুরিয়ে বলা হ'ল—নাড়ু ফুরিয়েছে, কি করব বল!...

করবার কিছুই ছিল না। বিজন মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে গাড়ি—আশেপাশে গ্রামের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না, লোকজন চলাফেরা করছে না। দু'একখানা লরি ও বাস আসাযাওয়া করছে অনেকক্ষণ অন্তর। তাদেরও করবার কিছু ছিল না। দূর-দূরান্তরের পাড়ি সবাইকার—কে আর তেল ধার দেবে।

বাংলা দেশ হ'লে ব্যাপারটা কতদূর গড়াত অনুমান

করা সহজ। এখানে পরমসহিষ্ণু যাত্রীরা মুখটি বুজে রইল। চালক কেন যাত্রার পূর্ব্বে তেলের হিসাব নেয়নি এ নিয়ে রীতিমত উত্তেজনা বৃদ্ধি হ'ত—এবং তার ফলে কি কি না ঘটতে পারত! এসব কিছুই হ'ল না, তেলের টিনটা তুলে নিয়ে চালক হাঁটতে সুরু করলেন।

জিজ্ঞাসায় জানা গেল, পেট্রল আনতে উনি নিকটবর্ত্তী পেট্রল স্টেশনে রওয়ানা হলেন।

পেট্রল স্টেশন! সে কতদূর? উদ্বেগ ভরে শুধোলাম।

করীব ছে সাত মীল! উদ্বেগ-লেশহীন কণ্ঠে উত্তর এল।

সর্ব্বনাশ! এখান থেকে পায়ে হেঁটে ছ'-সাত মাইল গিয়ে পেট্রল আনবে! তদুপরি সমাচার—ওরও নাকি হার্টের বেমারিও আছে! চলতে চলতে ওর যদি বাসের অবস্থা হয়, তা হলে ধূ ধূ মাঠের মাঝখানে আমাদের অবস্থা কেমন দাঁড়াবে?

সেই দৃশ্য ভাবতে ইচ্ছে হ'ল না। তার চেয়ে গাড়ি থেকে নেমে সবাই যেমন পথের ধারে বসে গল্পগাছা করছে—তেমনি ভাবে সময়টা কাটিয়ে যেওয়া যাক।

একটা মাথা-ঝাকড়া জামগাছের ছায়ায় এসে বসলাম। তখনও গত রাত্রির ঝড়-বাদলের ঠাণ্ডা আমেজ ছিল হাওয়ায়। ফুরফুরে মিষ্টি হাওয়া সারা অঙ্গে সুড়সুড়ি লাগাচ্ছে। একটা ঘুঘু ডাকছিল আমগাছের ঘন ছায়ায় বসে। কি মিষ্টি উদাস সুর! একদিকে সীমাহীন মাঠ, আর একদিকে মাইলখানিক উঁচুনীচু জমির 'পরে পাহাড় উঠেছে ঠেলে। পথটা পিছনের দিকে ঢালু হয়ে পাক খেতে খেতে নেমে গেছে। চালক এবারে হিসাব করে বাসের পিছনের চাকার তলায় দু'খানা বড় বড় পাথর ঠেক্‌নো দিয়ে গেছে—না হ'লে চাকা যদি কোনমতে একবার গড়াতে সুরু করে ত হড়হড় করে নেমে যাবে এক মাইল দু'মাইল যতক্ষণ না চড়াই আসে। বাঁকের মুখে এসে পাশের নালায় কাত হয়ে পড়াটাও স্বাভাবিক।

প্রথমটা ঘড়ি দেখেছিলাম, পরে সময়ের হিসাব রাখি নি ইচ্ছা করে। বার বার মনে আনবার চেষ্টা করছিলাম—এই বা মন্দ কি! জায়গাটা ত নতুনই—এখানে আর কোনদিনই আসব না—পিছনে কোন কাজেরও তাগিদ নাই, বসে বসে উপভোগ করি না এমন দৃশ্য-সৌন্দর্য্য! কিন্তু বেয়াড়া মন কিছুতেই কি বাগ মানছে! পথের দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছি, অনেকক্ষণ বাদে একটা গাড়ি আসতে দেখে আশা জাগছে, ওই বুঝি এল কাণ্ডারী। গাড়িটা হুস্ করে বেরিয়ে যেতেই বেশী করে মুষড়ে পড়ছি।

ক্রমে রোদ চড়ল, ঘুঘুর গান থামল—হাওয়ায় স্নিগ্ধ স্পর্শ ঈষৎ তপ্ত হয়ে উঠল। বাসের মধ্যে দু'-তিনটি কচি ছেলেমেয়ে ছিল, তারা কান্না সুরু করল, মায়েরা তাদের বৃথা আশ্বাস দেওয়ার চেষ্টা না করে উদাস মাঠের পানে চেয়ে রইল। ক্ষণপূর্ব্বের মোহময়ী প্রকৃতি জ্বালাময়ী নিঃশ্বাসে আমাদের খুশির রংটুকু নির্ম্মমভাবেই মুছে দিতে লাগল।

ইতিমধ্যে শক্ত-সমর্থ-গোছের দু'তিন জন পায়ে হাঁটতে সুরু করেছে। আমাদের সঙ্গে মালপত্র যা রয়েছে—সেই ত অকূল সমুদ্রে ভাসমান ব্যক্তির গলায় শিলাবৎ। আমরা চিন্তায় চঞ্চল হয়ে ওঠা ছাড়া আর কিছুই ত করতে পারছি না—পারবও না। আর সেই কারণে সমস্ত দেহমন রীতিমত পীড়িত হয়ে উঠছে।

একটি অনড় রোগী রয়েছে আমাদের বাসে—কয়েক মাইল দূরের একটা হাসপাতালে যাচ্ছে চিকিৎসার্থে। আরও রয়েছে কয়েকজন কর্ম্মী, যাদের কর্ম্মক্ষেত্রে সময়মত হাজিরা দেওয়া প্রয়োজন। দুধ নিয়ে চলেছে কয়েকজন দুগ্ধ-ব্যবসায়ী—ওদেরও সময়ের মূল্য আছে। আশ্চর্য্য, এই মুহূর্ত্তে ওদের কথাও ভাবতে পারছি না। এক একটা মিনিট আর এগুতে চায় না—প্রতীক্ষা দুঃসহ হয়ে উঠছে।

অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান হ'ল—একখানা মালভর্ত্তি লরি এসে থামল অদূরে। পেট্রল টিন হাতে আমাদের চালক নামলেন বিজয়ী বীরের মত। আমাদের মনেতেও বিজয় উল্লাসের ঢেউ এসে লাগল, মুক্তির স্বাদ অনুভব করলাম।

পেটভর্ত্তি খাদ্য নিয়ে দীর্ঘ আড়াই ঘণ্টা পরে আমাদের বাস ছুটল নবোদ্যমে। দু'পাশের প্রকৃতি আবার মোহময়ী হয়ে উঠল। ঘণ্টাখানিকের মধ্যে আমরা পৌঁছে গেলাম জ্বালামুখী শহরে।

বাস ষ্ট্যাণ্ডের সামনে বেশ খানিকটা প্রশস্ত জায়গা—ছোটখাট একটা মাঠই। দু'ধারে দোকান-পসারে-

জমাট—মাঠের মুখোমুখি প্রকাণ্ড এক ধর্ম্মশালা। সেই মাঠের কোল থেকে উঠেছে পাহাড়—এমন কিছু উঁচু নয়, লম্বাতে যদিও আদিঅন্তহীন। পাহাড়ের নাম কালীধর। মাঠ থেকে একটা চওড়া পথ উঠেছে পাহাড়ের গায়ে—একেবারে মন্দিরে গিয়ে শেষ হয়েছে। পথের দু'ধারে শহর জ্বালামুখীর ঘরবাড়ী দোকানপাট—শোভা ঐশ্বর্য্য; দোকানে আধুনিক জীবন-যাপনোপযোগী যাবতীয় উপকরণ, পথে বিদ্যুৎ আলো, জলের কল···

এসব দেখেছিলাম অপরাহ্ণ বেলায়—দেবী-দর্শনে যাবার সময়। আপাতত বাস থেকে নামতেই একটি চব্বিশ-পঁচিশ বছরের যুবক আমাদের সামনে এসে বলল, আপনারা জওলা-মাকে দর্শন করবেন ত?

ওর বেশবাস ও প্রশ্নের ধরন থেকে বুঝলাম, ইনি পাণ্ডা পুরোহিত কেউ হবেন—যাত্রী পাকড়াও করার উদ্দেশ্যে এসেছেন।

নীরস কণ্ঠে বললাম তা ছাড়া কি।

ও তাড়াতাড়ি বলল, আমার নাম রমেশ পাণ্ডা—আমরা মন্দিরের পূজারী।

বললাম, পাণ্ডার বাড়ী আমরা যাব না, ধর্ম্মশালায় থাকব।

আমার বিরক্তি গায়ে না মেখে ও বলল, আর একটা ধর্ম্মশালা আছে উপরে—সেখানে থাকলে মন্দির কাছে হবে।

হোক, আমরা এইখানেই থাকব। বলে পিছন ফিরলাম।

ছোকরা বেগতিক দেখে রণে ভঙ্গ দিল।

জানি পাণ্ডা-মাত্রই ফিকিরবাজ নয়—যাত্রীকে দোহন করার অভিপ্রায়ে ঘনিষ্ঠতা করে না। বিদেশ-বিভুঁয়ে ওরা যাত্রীদের ভরসাস্থল। গাইডও। ওরা পৌরাণিক কাহিনীর ধারক—ইতিহাসের-সূত্র সংযোজক! দেবতা বা দেব-মন্দির সম্বন্ধে ওরা যা বলে—তার অলৌকিকত্ব ও উচ্ছ্বাস অলঙ্কার বাদ দিয়ে নিলে সার জ্ঞাতব্য কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু যাত্রীর ভক্তিকে মূলধন করে জীবিকা-নির্ব্বাহের যে কৌশল অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়, তার প্রতি সাধারণের বিরাগ স্বাভাবিক। সৎ পাণ্ডাও অবশ্য বিরল নয়—তাদের কিছু কিছু পরিচয় কোন কোন স্থলে পেয়েওছি। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পাণ্ডার উপর শ্রদ্ধাভক্তি বজায় রাখা সম্ভব হয় নি। সেই সংস্কারবশতঃ আমরা রমেশ পাণ্ডাকে আমল দিলাম না। স্থির করলাম—পাণ্ডার সাহায্য নেব না। এই ত সামনেই পাহাড়—ফার্লং কয়েক উঠলেই দেবী-মন্দির; নিজেরা খুশিমত উঠব, এধার-ওধার ঘুরব—দর্শন করব, পূজা দেব। পাণ্ডার নির্দ্দেশে প্রতিটি শিলায় মাথা ঠুকে ঠুকে নির্ব্বোধ বনে কি লাভ!

কুলির মাথায় মাল চাপিয়ে আমরা ধর্ম্মশালায় এলাম। চমৎকার ধর্ম্মশালা। সুপ্রশস্ত অঙ্গন—সুপরিচ্ছন্ন ঘরদোর, কল জল শৌচাগারের এমন সুব্যবস্থা কম জায়গাতেই পাওয়া যায়। উপর-নীচেয় অনেকগুলি ঘর—কোলে চওড়া বারান্দা—স্থান সঙ্কুলানের কথা মনে ওঠে না। আবার ধর্ম্মশালার দুয়ারের বাইরে পা দিলেই যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী হাতের নাগালেই সাজানো রয়েছে। পাহাড়ের গা থেকে আসল শহরের একটা অংশ ছিটকে এসে এই ধর্ম্মশালার চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। চাল ডাল মশলাপাতি মনিহারী জিনিষের দোকান, আটার কল, আনাজের ষ্টল, চায়ের দোকান—খাবারের দোকান—আবার দু'-তিনটি নিরামিষ হোটেলও রয়েছে। পাই নি শুধু পানের দোকান—সেটা পাহাড়ের উপরে অবশ্য আছে।

কলে সর্ব্বক্ষণই প্রচুর জল থাকে। আমরা স্নানাহার সেরে বেশ খানিকটা বিশ্রাম করে নিলাম। অপরাহ্ণ বেলায় পাহাড়ের পথ ধরে দেবী-দর্শনে চললাম।

পথটা অল্পে অল্পে উপরে উঠেছে। পিচ-বাঁধানো খানিকটা—চওড়াও। যে-কোন অবস্থায় যাত্রী অনায়াসে ওঠানামা করতে পারে। খানিকটা উঠে দেখা গেল আর একটা নূতন পথ তৈরি হচ্ছে সরকারী তত্ত্বাবধানে। এটা তৈরি হয়ে গেলে মন্দিরে যাওয়ার পরিশ্রম ও সময় অনেক কমবে।

আমরা পুরণো পথ দিয়ে ঘুরে ঘুরে উঠছিলাম। দু'ধারে অসংখ্য দোকান—বাড়ীঘর, মানুষজন। একটা পাহাড়ের গা বেয়ে উঠছি, এটা কেবল ওপরে ওঠার পরিশ্রমে মনে হচ্ছিল। আর মাঝামাঝি এসে পথটাও এবড়ো-খেবড়ো পাথর-বিছানো বলে প্রতি পদক্ষেপে সাবধান না হয়ে উপায় ছিল না। বলাবাহুল্য শহরের এই অংশটা অত্যন্ত পুরণো, যে-কোন ঘিঞ্জিবসতি, প্রাচীন তীর্থপুরীর সমতুল্য। পথটা আগাগোড়াই অস্বস্তিকর, দম-আটকানো। পথের

শেষে একটি মুক্তিক্ষেত্র দেবীমন্দির না থাকলে এই পথ অতিক্রমের শ্রম সর্ব্বাংশেই ব্যর্থ। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে পথটা শেষ করতে চাইলাম।

পথের শেষে একটি পুল। পাহাড়ের একটি অংশের সঙ্গে অপর অংশের সংযোজক পথ। পুল পার হয়ে নূতন একটি দৃশ্যের মধ্যে এসে গেলাম। সামনে সুউচ্চ মন্দির-তোরণ পিছনে একেবারে খাড়াই পাহাড়। একখানা বড়মত পাথর গড়িয়ে পড়লে এই জায়গাটার কি দশা ঘটবে কল্পনাতে আনা সহজ, কিন্তু সহজে সে কল্পনাকে মনে স্থান দেয় না ভক্তি-প্রাণ নরনারী। দেব-মহিমা স্বীকৃত বলে এমন কল্পনা সৃষ্টি-বহির্ভূত।

যাই হোক, মন্দির কিন্তু পুরাকালের কাহিনীকে আশ্রয় করেও নূতন কালের—বেশে সৌষ্ঠবে সযত্ন সজ্জিত। সুউচ্চ তোরণ, সুপ্রশস্ত অঙ্গন, মূল মন্দিরের কায়া এবং মন্দিরের সামনেকার অলিন্দ চত্বর, মায় শিশু বকুল তরুটি পর্যন্ত নূতন কালের জয় ঘোষণা করছে।

অঙ্গন প্রশস্ত, খোলামেলা, অবাধ আলো, বায়ুর দাক্ষিণ্যে ঝলমল করছে। বাঁ ধারে দেবীর পূজা-উপচারের তৈজসপত্র ভেটের উপঢৌকন প্রভৃতি থাকার ঘর—সেবায়েতের গদি—খাজাঞ্চিখানা, ভোগরান্নার ঘর ডানধারে, মন্দির। মন্দিরের সামনে ছোটমত একটি নাটমন্দির, তার সামনে সিমেন্ট, বাঁধানো উঁচু প্রশস্ত চাতাল আর দেবীর বাহন একটি ব্যাঘ্রমূর্ত্তি। চাতালের মাঝখানে, একটি সুকুমার শ্যামকান্তি শিশু বকুল তরু—তার তলাতে একটি ত্রিশূল পোতা, তারই এক পাশে এক প্রৌঢ়া ভৈরবী ধ্যানস্তিমিত নেত্রা। সব মিলিয়ে পরিবেশটি তীর্থ-মাহাত্ম্যের অনুকূল।

সেই ছোট নাটমন্দিরটুকু পার হয়ে এলেই মন্দিরের গর্ভগৃহ। মন্দিরে কোন মূর্ত্তি নাই। দেওয়ালে দেওয়ালে আগুনের শিখা জ্বলছে। মাঝখানটায় কুণ্ডের মত বাঁধানো —গহ্বরের মধ্যে লক্ লক্ করছে অগ্নিশিখা। দিনে-রাতে সব সময়েই জ্বলছে আগুন। যুগ-যুগান্তর ধরে জ্বলছে আগুন। এত তেল আর দাহ্যবস্তু সঞ্চিত রয়েছে ওর গর্ভে যার দৌলতে দিনে-রাতে যুগে যুগান্তরের শিখা রয়েছে অনির্ব্বাণ!

যেখানে গহ্বরের ফাটলে লক্ লক্ করে উঠছে আগুনের শিখা, সেখানের পাথর ধোঁয়ার দাগে কালো আর ঈষৎ উত্তপ্ত। কিন্তু হাত দুই উপরের মেঝেটা উত্তপ্ত নয়। এ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার!

পাণ্ডারা বলেন—উপরটা উত্তপ্ত হবে কেন, এটা ত প্রাকৃত জনের হাতে জ্বালান-আগুন নয়—এ হ'ল জ্যোতিঃ-স্বরূপিণী মায়ের জিহ্বা। ভোজ্যবস্তু গ্রহণ করার জন্য সব সময়েই প্রসারিত। এ আগুনের ধর্ম্ম নয় পীড়ন।

দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে ঠিক মাঝ বরাবর একটি শিখা জ্বলছিল। শিখাটি কাঁপছিল না, কম-বেশি হচ্ছিল না। স্থির নিষ্কম্প ধ্রুবজ্যোতির মত সুন্দর লাগছিল শিখাটিকে। এইটি নাকি মায়ের আসল মূর্ত্তি—জ্যোতি-উদ্ভাসিত কলেবর। সাধকরা ভ্রূমধ্যস্থিত যে স্থির জ্যোতি-বিন্দুতে দৃষ্টি সংলগ্ন করে অমৃত সাগরে ডুব দেন—এটি তারই প্রতীক। স্থির লক্ষ্যের সঙ্কেত-চিহ্ন।

তখন সন্ধ্যাকাল। প্রবেশ-তোরণে জয়ঢাক বাজছিল—ঘণ্টা বাজছিল—বাঁশি বাজছিল। গর্ভগৃহে পঞ্চপ্রদীপ সাজিয়ে মায়ের আরতি করছিলেন তরুণ পুরোহিত। আমরা নাটমন্দিরে বসে বসে আরতি দেখলাম।

পুরোহিতের কপালে সিঁদুরের ফোঁটা—গলায় ও বাহু-মূলে রুদ্রাক্ষের মালা—এক হাতে আরতির উপচার (কখনও বস্ত্র, কখনও প্রদীপ, কখনও পুষ্প, কখনও বা চামর), অন্য হাতে নাদমুখর ঘন্টা। পরণে রক্তাম্বর, গায়ে লাল মেরজাই, বুকের ওপরে আড়াআড়ি ভাবে বাঁধা রক্ত উত্তরীয়। সমস্ত শরীর ওর আরতির তালে তালে নাচছিল। কত ক্ষিপ্র অঙ্গক্ষেপে ও আরতি করে চলে-ছিল! পাশে দাঁড়িয়ে আরতির উপচারগুলি এগিয়ে দিচ্ছিল রমেশ পাণ্ডা—বাস ষ্ট্যাণ্ডে দেখা সেই তরুণ। তারও ক্ষিপ্রতা উল্লেখযোগ্য। যেন রণরঙ্গমত্ত কামিনীর অস্থির উন্মত্ত পদক্ষেপের ইঙ্গিত বহন করে সবটাই দ্রুততালে এগিয়ে চলেছিল। রণমত্ততার ছোঁয়ায় দর্শকের মনও পরিপূর্ণ হয়ে উঠছিল—রুদ্ধনিঃশ্বাসে আরতি দেখছিলাম আমরা।

সারা পর্ব্বটা সারা হ'তে আধ ঘণ্টারও বেশি সময় লাগল। আরতি-শেষে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম সেরে ওরা মন্দির থেকে বার হয়ে গেল। যাত্রীরা প্রবেশ করল গর্ভগৃহে। এবার দেবস্থান স্পর্শ-প্রদক্ষিণ-স্তবপাঠ-প্রণাম···নিস্তব্ধ মন্দিরগর্ভ শব্দ চঞ্চল হ'ল। ভিড়ের স্রোতে গা ঢেলে আমরাও প্রদক্ষিণ

করছিলাম—এক গৈরিকধারী আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকলেন।

সেইখানে কুণ্ডের মধ্যে আগুন জলছিল। দাঁড়িয়ে ছিলেন ব্রহ্মচারী। আমাদের বসতে বললেন। বসলাম। দু'-তিন হাত নীচেয় অগ্নিকুণ্ড—মেঝেতে উত্তাপ ছিল না। জিজ্ঞাসা করলেন বাংলায়, আপনারা কোথা থেকে আসছেন?

উত্তর দিয়ে প্রতিপ্রশ্ন করলাম, আপনিও ত বাঙালী দেখছি—এইখানেই থাকেন, না তীর্থযাত্রী?

উনি বললেন, এইখানেই আছি—বার বছর। আগে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ছিলাম। এ জায়গাটা ভারি ভাল লেগে গেছে। দেবী-মাহাত্ম্য আছে—দেবী এখানে জাগ্রতা।

এর পর কুণ্ডের মধ্যে যে আগুন জলছে আর দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে যে শিখাগুলি প্রোজ্জল—তার পরিচয় দিতে লাগলেন। সবগুলিই আগ্যাশক্তির এক একটি অংশ—বিভিন্ন নামে চিহ্নিত।

পরিচয়-শেষে বললেন, জানেন—এমন জাগ্রত দেবী আর কোথাও নাই। কোথাও কি দেখেছেন দেবতা নিজে ভোগ গ্রহণ করেন? এখানে দেখতে পাবেন তিনি অগ্নিজিহ্বা দিয়ে নিবেদিত বস্তু গ্রহণ করছেন। আপনি ঘটিতে করে দুধ দিন—ঠোঙায় করে মিষ্টান্ন দিন—প্রত্যক্ষ করবেন দেবী তা গ্রহণ করছেন।

বললাম, এই যে আগুন জলছে, একি কখনও নেভে না?

না। গহ্বরের এই আগুন যুগ-যুগান্তর ধরে রাত্রি-দিন জলছে, অনির্ব্বাণ শিখা। তবে কুলুঙ্গির শিখাগুলি সর্ব্বদা উজ্জল থাকে না। কুলুঙ্গি অগ্নিগর্ভ হলেও মাঝে মাঝে শিখাগুলি অদৃশ্য হয়ে যায়, পুরোহিত পূজা-আরতির আগে জালিয়ে দেন। কুণ্ডের আগুন সব সময়েই জলছে। অবিশ্বাসীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন বহুবার। অনেকদিন আগে একবার আকবর বাদশা এই আগুন নেভাবার চেষ্টা করে কুণ্ডটা জলে ভর্ত্তি করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এমনই দেবমহিমা, জলে ভর্ত্তি হয়েও কুণ্ডের আগুন নিভে যায় নি। বাদশা দেবমহিমা স্বীকার করে ভক্তিভরে একটা সোনার ছাতা উপহার দিয়েছিলেন। কাল সকালে যখন দেবী-দর্শনে আসবেন—সেই ছাতা দেখতে পাবেন।

একটু থেমে বললেন, তবু কি অবিশ্বাসীর সংখ্যা কমেছে! এই কালে বরং বেড়েছে। ওরা আগুন জলার অন্য যুক্তি দেখায়। বলে—এই জায়গায় মাটির নীচেয় পেট্রোল আছে—পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে গন্ধক প্রভৃতি খনিজ পদার্থ আছে—আগুন নেভে না ওই কারণেই। বাসে আসতে আসতে দেখেন নি, মস্ত মড় একটা সরকারী দপ্তরখানা বসেছে পাহাড়ের গায়ে? ওখানে মাটি খোঁড়া-খুঁড়ি চলছে। কিন্তু ওই পর্য্যন্তই—মাটির নীচেয় কিছু পায় নি! পাবেও না। দেবী-মাহাত্ম্য মানলে ওরা এমন বৃথা চেষ্টা করত না।

হ্যাঁ, বাসে আসতে আসতে পাহাড়ের পাদদেশে ড্রিলিং আপিসের একটা ঘোষণাপত্র চোখে পড়েছিল বটে। কাগজেও পড়েছি ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ভূস্তরে পেট্রোলের সন্ধান চলেছে। গুজরাটে, আসামে, জালামুখীতে—এমন কি বাংলায় কোন কোন স্থানেও তৈল অনুসন্ধান কার্য্য চলছে। জালামুখী মন্দিরে অনির্বাণ অগ্নিশিখা থেকে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে এই উপত্যকায় খনিজ তেলের ভাণ্ডার আছেই আছে। ড্রিলিংএর কাজ চলেছে পুরোদমে। একটা বড় পাথরে বাধা পেয়ে কাজটা আর এগোয় নি। এমন বড় শক্ত পাথর ভেদ করার শক্তিশালী বেধযন্ত্র কোম্পানীর না থাকায় কাজটা আপাতত বন্ধ আছে। শোনা গেছে, বিদেশ থেকে যন্ত্র আনাবার তোড়জোড় চলছে—সেটা এলেই পুর্ণোগ্যমে সুরু হবে কাজ।

মনোবেদনা পাবেন বলে এইসব কথা ব্রহ্মচারীকে বললাম না।

ভূস্তরে অনেক নীচেয় তেল হয়ত আছে—পাহাড়ের এই মাঝপথে মন্দির-গর্ভে পাথরের ফাটলে আগুন জলার চমৎকারিত্বও ত কম নয়।

মন্দিরের পিছন দিকের সিঁড়ি বেয়ে উঠলে পাওয়া যায় উন্মত্ত ভৈরবের মন্দির। পীঠস্থানের নীতিই, এই যেখানে দেবী, ভৈরবও সেখানে। দক্ষযজ্ঞে স্বামীনিন্দা শ্রবণে দেহ-ত্যাগ করলে কি হবে—সতীর ত্যক্ত দেহাংশ যে যে জায়গায় পড়েছিল সেইখানেই মহাকালকে আসন পাততে হয়েছে। উমা ছাড়া মহেশ্বরকে কল্পনা করতে পারি না আমরা—যেমন হিমালয়কে বাদ দিয়ে কৈলাসকে।

উন্মত্ত ভৈরবের মন্দির ছোট। ছোট একটি পাতকূয়ার মধ্যে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে তাঁর মাহাত্ম্যকে প্রত্যক্ষ করতে হয়। সেখানকার একজন সেবক আমাদের নিয়ে নেমে এলেন পাতকূয়ার মধ্যে এবং একটি জায়গায় দেবদেবের মাহাত্ম্যকে প্রত্যক্ষ করালেন। পাতকূয়ার তলায় জল ছিল—আর চারপাশে পাথরের দেওয়ালে ছিল যে কয়েকটি গহ্বর। একটা গহ্বরে প্রদীপ জ্বলছিল। সেই প্রদীপের শিখায় শুকনো একটা কাঠি ধরিয়ে (অনেকটা পাটকাঠি জ্বালানোর মত) আর একটি গহ্বরের কাছে নিয়ে আসতেই দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠল—অগ্নিময় হয়ে উঠল গুহা।

সেবক বললেন, এইখানে ভৈরব রয়েছেন। মূর্ত্তি নাই—তেজরূপী ভৈরব।

কে জানে যুগ যুগ সঞ্চিত কি অফুরন্ত খনিজ পদার্থের সমাবেশ—শত শত বছর ধরে এমন একটি মহিমাকে সর্ব্বক্ষণ সমুজ্জ্বল রাখতে পারছে! প্রকৃতি অথবা প্রকৃতিরূপিণী দেবী-মহিমার আকর যিনিই হোন—লক্ষ লক্ষ মানুষের শ্রদ্ধা ভক্তি-বিস্ময় তাঁকে অবিনশ্বর করেছে।

প্রসঙ্গত মনে পড়ছে চন্দ্রনাথ তীর্থের কথা। সেই মহাতীর্থের বামে ও দক্ষিণে আরও দু'টি জায়গা আছে বড়িয়াঢালা ও বড়বাকুণ্ড। সেখানে মাটিতে আগুন জ্বলে, জলেও আগুন জ্বলে। দু'টিরই দূরত্ব চন্দ্রনাথধাম (আজ ওই নামই বহাল আছে কি না, কে জানে!) ষ্টেশন থেকে পাঁচ মাইল। বহুদিন আগে বড়িয়াঢালা ষ্টেশনে নেমে সহস্রধারা জলপ্রপাত দেখতে গিয়েছিলাম। ভালমত পথ ছিল না—বন আর মাঠের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। একটা উঁচু পাহাড়ের মাথা থেকে উদ্দাম বেগে নেমে আসছে জলপ্রপাত। খাড়া পাহাড় থেকে কতগুলি ধারায় কে জানে—সহস্র হওয়াও আশ্চর্য্য নয়—সবেগে আছড়ে পড়ছে জলরাশি। জায়গাটা বহুদূর পর্য্যন্ত জলীয় বাষ্পে আচ্ছন্ন—পাহাড়ের নীচেয় ঘন কুয়াশার জাল। সে জাল ভেদ করে ধারা গণনা সহজ কাজ নয়। সেই আশ্চর্য্য প্রপাতের কথা বলছি এই জন্য যে, তার চেয়েও একটি বিস্ময়কর ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছিলাম মাঠের মধ্যে, প্রপাত দেখে ফিরে আসবার পথে। ঐ দেশের একজন বাসিন্দা আমাদের দেখিয়েছিলেন।

তিনি বলেছিলেন, এই দশ-বিশ মাইলের মধ্যেকার সবটুকু স্থানই শিবক্ষেত্র। এখানে জলে-স্থলে রুদ্রের মাহাত্ম্য প্রকট। তাঁর তেজ সব জায়গাতেই দেখতে পাবেন। এখানে মাটির উপরে আগুন জ্বলে—জলেও আগুন। দেখবেন?

বলে তিনি একটা শক্ত কাঠি কুড়িয়ে নিয়ে মাঠের মাটি খুঁচিয়ে দিলেন। তারপর পকেট থেকে দেশলাই বার করে জ্বাললেন। জ্বলন্ত কাঠিটা সেই খোঁচানো জায়গায় আনতেই দপ্ করে জ্বলে উঠলো আগুন। গন্ধকের গন্ধও পাওয়া গেল।

মাটিতে আগুন জ্বালিয়ে তিনি দেব-মাহাত্ম্য প্রমাণ করলেন। আমরাও উৎসাহভরে সেই মাঠের যত্রতত্র আগুন জ্বালিয়ে আনন্দলাভ করেছিলাম। বড়বা কুণ্ডেও জলের উপর আগুন জ্বলা দেখেছিলাম—সেই উত্তপ্ত জলে স্নান করেছিলাম। মাহাত্ম্য যারই হোক—বিস্ময়ের বস্তু ত!

এবার জ্বালামুখী প্রসঙ্গে ফিরে আসি। পরের দিন গ্লাসে করে দুধ এনেছিলাম—পাতার ঠোঙ্গায় এনেছিলাম প্যাঁড়া আর এলাচদানা ভোগ।

আমাদের দেখে রমেশ পাণ্ডা এগিয়ে এল। বলল, পূজা দেবেন ত? দাঁড়ান, ফুল চন্দন জল নিয়ে আসি।

বুঝলাম—পাণ্ডা তার ব্যবস্থাটা এবার পাকাপাকি করে নেবে। মনে বিরূপ ভাবের চেয়ে কৌতুহলই প্রবল হ'ল—দেখাই যাক না পাণ্ডা ঠাকুর তাঁর দোহন কৌশল কি ভাবে প্রয়োগ করেন!

একখানা তামার থালে ফুল চন্দন অর্ঘ্য সাজিয়ে নিয়ে এল রমেশ পাণ্ডা। আমাদের নিয়ে গেল মন্দিরে। সেই কুণ্ডের ধারে এনে বসালে আমাদের। মন্ত্র পড়িয়ে পূজা দেওয়ালে। তারপর প্যাঁড়ার ঠোঙাটা কুণ্ডের পাথরের ফাটলের কাছে ধরে বলল, দেবী ভোগ গ্রহণ করলে দেখতে পাবেন—এই ঠোঙার উপরে আগুন উঠে আসবে। দেবী জিহ্বা দিয়ে স্পর্শ করবেন ভোগ।

আশ্চর্য্য, ঠোঙাটা পাথরের ফাটলের কাছে নিয়ে যেতেই আগুন উঠে এল তার ওপরে। এমনি করে দুধের গ্লাসের উপরেও আগুন উঠে এলো। অল্পক্ষণ রইল আগুন। অথচ গ্লাসে বা প্যাঁড়ায় দাহ্যবস্তু কিছু ছিল না।

মন্দিরের মধ্যে আর আশেপাশে আরও কয়েকটি দেবদেবীকে অর্চ্চনা করালে রমেশ পাণ্ডা। তারপর বলল, চারটে নয়া পয়সা দিন, দক্ষিণা।

মাত্র চারটি নয়া পয়সা দক্ষিণা! আশ্চর্য্য হবারই কথা!

এর পর পাণ্ডা বলল, এইবার গদিতে চলুন—দেবীর তৈজসপত্র—আকবর বাদশাহের সোনার ছাতা—আরও কয়েকটা জিনিষ দেখবেন। গদিতে যখন পুজোর টাকা জমা দেবেন—মুন্‌শি তখন জিজ্ঞাসা করবে—আপনার পাণ্ডা কে? আপনি বলবেন, রমেশ পাণ্ডা। কেমন?

নামটা ও বার দুই-তিন স্মরণ করিয়ে একরকম মুখস্ত করিয়ে নিলে। বুঝলাম—এইবারে ওর আসল মূর্ত্তিটা দেখতে পাব। তবু কৌতূহলী হয়ে শেষ পর্য্যন্ত দেখার অপেক্ষায় রইলাল।

দেবীর তৈজসপত্র; প্রণামী ও উপহার উপঢৌকনের দ্রব্যগুলি দেখলাম। আকবর বাদশাহের দেওয়া সেই ভারী সোনার ছাতাটা দেখলাম। সবটা ওর সোনা হয়ত নয়, সম্ভবত রূপো কিংবা অন্য কোন ধাতুদেহ আগাগোড়া সোনার জলে পালিশ (Lacquer) করা।

এই সব দেখে আমরা এসে বসলাম গদিঘরের বারান্দায়। সেখানে চশমা চোখে গম্ভীর প্রকৃতির মুন্‌শি বসে ছিলেন। তাঁর সামনে খাতাপত্রের স্তুপ। সেইখান থেকে একখানা খাতা টেনে নিয়ে ষ্টীলের কলম বাগিয়ে ধরে তিনি দেবী পূজার বিধিবিধানগুলি আমাদের বুঝিয়ে দিতে লাগলেন।

বললেন, এখানে পূজা মানেই ভোগ দেওয়া। দেবীর জিহ্বা পড়েছিল এইখানে—তাই দেবী রসনারূপিণী। রস হ'ল রসনার আশ্রয়, তাই প্রহরে প্রহরে নানা রসের ভোজ্যে দেবীকে আরাধনার প্রথা। মিছরী ভোগ, পুরী, অন্নভোগ, পরমান্ন ভোগ। এ সবই ভক্ত দাতাদের অর্থে এবং দেব-ষ্টেটের আয় থেকে সুসম্পন্ন হয়। ভক্তেরা যাঁর যেমন খুশি—পাঁচ দশ পঞ্চাশ, একশ যে যেমন পারেন দেবীর ভোগ বরাদ্দ করে দেন। যিনি যত সামান্য অর্থই দিন, তাঁর নাম উঠবে খাতায়, ভোগের হিসাব থাকবে।

এক টাকার হিসাবও লেখা থাকে?

নিশ্চয়, দানের মর্য্যাদা ত অর্থে নয়, আন্তরিকতায়।

খুশি হয়ে বললাম, তা হ'লে আমাদের নাম লিখতে পারেন।

আপনাদের পাণ্ডা কে? জিজ্ঞেস করলেন মুন্‌শি।

অসঙ্কোচে রমেশ পাণ্ডার নাম করলাম।

রমেশের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

অনুমান করে নিলাম—এইবার পাণ্ডা আসবে সুফল আদায় করতে। বহু তীর্থের অভিজ্ঞতা আমাদের ছিল।

কিন্তু, জ্বালামুখীর স্থান-মাহাত্ম্য কিন্তু ভিন্নতর ছিল—আমাদের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে বেশ কিছু পরিমাণ বিস্ময় সঞ্চিত করেছিল রমেশ পাণ্ডা। যথারীতি দেবীপুজা মন্ত্র-পাঠ ও অন্যান্য দেবদেবী দর্শন করিয়ে আধ ঘণ্টারও উপর আমাদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে মাত্র চারটি নয়া পয়সা দক্ষিণা নিয়ে সে সন্তুষ্টচিত্তে দেবীপূজার আয়োজন করতে গেল। সন্ধ্যায় আবার দেখা হ'ল তা'র সঙ্গে। আরত্রিক অন্তে আমাদের কপালে সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে হাত পাতল না। পরের দিন বিদায় বেলায় বাস ষ্ট্যাণ্ডে আবার ওকে দেখলাম—অপর যাত্রীর সঙ্গে আলাপ করছে। আমাদেরও দেখল রমেশ পাণ্ডা—কিন্তু পাওনাদারের মত লোলুপ দৃষ্টি ফেলে ছুটে এল না। তীর্থক্ষেত্রের পরমাশ্চর্য্য বই কি রমেশ পাণ্ডা!

বহু তীর্থ পর্য্যটন করেছি—এমন দৃষ্টান্ত কচিৎ চোখে পড়েছে। প্রথম জীবনে কামরূপ কামাখ্যাধামে দেখেছিলাম—তারপরে দেখেছিলাম সীতাকুণ্ডে, চন্দ্রনাথধামে। ঠিক মনে পড়ছে না—দক্ষিণতীর্থের দু'একটি স্থানেও যেন এই দৃষ্টান্ত দেখেছি। উত্তর ভারতে এই প্রথম দেখলাম। মনে হ'ল—দেবতার মহিমা মানুষকে নিয়েই পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। শ্রীরামানুজের শিক্ষাগুরু শ্রীযাদবাচার্য্য একটি শ্লোকাংশে যথার্থ বলেছেন: হে প্রভু, এই কথাও সত্য, ভক্ত না থাকলে ভগবানের মহিমাকে প্রকাশ করার উপযুক্ত আধারই বা কোথায় মিলত!

ছায়াপথ

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

(তেইশ)

দোকানে ফিরতে হরেকৃষ্ণর সঙ্গে রামকিঙ্করের একপ্রস্থ হয়ে গেল।

চোখ পাকিয়ে হরেকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলে, দোকানের কাজ কামাই করে কোথায় গিয়েছিলে আড্ডা দিতে?

রামকিঙ্কর একমুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপর শান্তকণ্ঠে বললে, আড্ডা দিতে যাই নি।

হরেকৃষ্ণ বললে, আড্ডা দিতে যাও নি ত কোথায় গিয়েছিলে? দোকানের কাজে?

—না, নিজের কাজে।

—ওকেই আড্ডা দেওয়া বলে। দোকানের কাজে ফাঁকি দিয়ে নিজের কাজে যাওয়াকে। মাস মাস মাইনে নিচ্ছ, সেটা খেয়াল থাকে না?

—মাস মাস মাইনে ত আপনিও নিচ্ছেন। নিজের কাজে আপনি বেরিয়ে যান না?

রাগে, বিস্ময়ে হরেকৃষ্ণর চোখ কপালে উঠল। চিৎকার করে বললে, আমার সঙ্গে তোমার তুলনা?

—কেন নয়? আমিও যেমন দোকানের কর্মচারী, আপনিও তেমনি।

হরেকৃষ্ণ লাফিয়ে উঠল: যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! তোমাকে আমি দোকান থেকে বের করে দিতে পারি, জান?

—না, পারেন না। পারেন মালিক, আপনাকেও, আমাকেও।

দোকানের অন্য কর্মচারীরা এতক্ষণ স্তব্ধ হয়েছিল। ঘটনাটা অত্যন্ত আচম্বিতে ঘটে গেল। এখন তারা দু'জনের মধ্যে পড়ে দু'জনকেই থামাতে লাগল। সুবল এবং আর কয়েকজন রামকিঙ্করকে ঠেলতে ঠেলতে ওপরে নিয়ে গেল। কয়েকজন বয়স্ক কর্মচারী হরেকৃষ্ণকে শান্ত করতে লাগল।

সরা জ্ঞান! যেন এর আগে আর কেউ বি. এ পাস করে নি। মুরুখ্খু ঘরের ছেলে ত, গরম হয়ে গিয়েছে। গরম আমি আজকেই ছোটাচ্ছি!

চিৎকার করেই হরেকৃষ্ণ বললে।

উপর থেকে পাল্টা চিৎকারে রামকিঙ্করও উত্তর দিলে, আপনার যা ক্ষমতা আছে, করুন। আমি আপনাকে থোরাই কেয়ার করি।

—আচ্ছা, দেখছি। বলেই হরেকৃষ্ণ উঠে পড়ল।

এই উঠে পড়ার অর্থ কি, সবাই জানে। হরেকৃষ্ণ হয় গিন্নীমার কাছে, নয় বাবুর কাছে গিয়ে সত্য-মিথ্যা সাতখানা করে লাগাবে। গিন্নীমার কাছে রামকিঙ্করেরও খাতির আছে। অথচ হরেকৃষ্ণের তেজ দেখে মনে হ'ল, তারও কোমর দড়। না হ'লে সে অমন করে তড়পাতো না। অনেক অনুনয়-বিনয় করে তারা হরেকৃষ্ণকে বসালে। বয়স্ক কর্মচারীদের উপরোধে হরেকৃষ্ণ বসল বটে, কিন্তু ঠিক শান্ত হ'ল বলে মনে হ'ল না।

বয়স্ক ব্যক্তিদের মেজাজ সাধারণত ঠাণ্ডা হয়। সকলেই ছা'পোষা খেটে-খাওয়া মানুষ। তারা রামকিঙ্করের ওপরেই চটল: হাজার হোক, হরেকৃষ্ণ ম্যানেজার ত বটে। বয়েসেও বড়। রাগের মাথায় যদি একটা কড়া কথা বলেই থাকে, তার উত্তরে রামকিঙ্করের চোখ গরম করা উচিত হয় নি।

তবু হরেকৃষ্ণকে ঠাণ্ডা করবার জন্যে তারা বললে, ছেলেমানুষ, তাতে সদ্য বি. এ পাস করার খবর পেয়েছে। আপনি ওর বাপের বন্ধু। আপনি যদি ওর ওপর রাগ করেন, ছেলেটা ভেসে যায়।

হরেকৃষ্ণ অট্টহাস্য করে বললে, ভেসে যাবে কি হে! এই তেলের দোকানের সামান্য চাকরি গেলে ওর কি হয়? আজ কাগজে খবরটা বেরিয়েছে, কাল দেখবে দোকানে সায়েবের ভিড় জমে গেছে।

—হ্যাঁ গো, সায়েবের ভীড়। ফুটফুটে সাদা চামড়ার সায়েব। ছোঁ মেরে ওকে তুলে নিয়ে গিয়ে তিনতলায় চেয়ারে বসিয়ে দেবে। সেটা জানে বলেই ত রাম আমার ওপরে চোখ গরম করতে সাহস পায়।

বয়স্কেরা হাসলে: সংসার ত দেখে নি। জানে না, কত ধানে কত চাল।

—এইবার জানবে। গিন্নীমা কতদিন আমাকে বলেছেন, ওটাকে সরাও। ছেলেটা ভাল নয়। আমিই সরাই নি। বন্ধুর ছেলে, সরালে খাবে কি? ওর যে এত তেজ হয়েছে, জানতাম না।

কি সর্বনাশ! গিন্নীমা নিজেই ওকে সরাতে বলেছেন? তা হ'লে ওর চাকরির পরমায়ু ঘনিয়ে এসেছে। একসঙ্গে থাকলে যেমন পরস্পরের ঈর্ষা হয়, তেমনি আবার একটা মমতাও বসে। ওরা কাজের এক ফাঁকে রামকিঙ্করের কাছে গেল। উদ্দেশ্য, তাকে ভয় দেখিয়ে নরম করা।

বললে, কাজটা ভাল কর নি, রাম। তা রাগের মাথায় যা করে ফেলেছ, করেছ। এখন চল, ওঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে ওঁকে শান্ত করবে।

স্নান করে নামমাত্র দু'টি খেয়ে রামকিঙ্কর চুপ করে শুয়েছিল। ঘুম আসে নি। ঘুম আসবার কথাও নয়। আজকের কলহের পরিণতি সম্বন্ধে তার মনে কোন সন্দেহ নেই। সে বুঝেছে, এখানকার অন্ন শেষ হয়েছে। হরেকৃষ্ণ কিছুই নয়। আসল ব্যক্তি গিন্নীমা। তার সম্বন্ধে গিন্নীমার মনোভাবের একটা ইঙ্গিত সে পেয়েই এসেছে: অন্য কোথাও চাকরি-বাকরির চেষ্টা করছ? সঙ্গে সঙ্গে গিন্নীমার মুখের সেই রূঢ় ভঙ্গি।

গিন্নীমার হুকুম হরেকৃষ্ণ তার নিজের স্বার্থে প্রয়োগ করবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ করবে, তার ক্ষমতা কত বেশি। তার দম্ভ বেড়ে যাবে।

হায়রে ভৃত্যের দম্ভ! 'তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।'

রামকিঙ্করের হাসি এল। শুধু এই জন্যেই নয়। তার মনে হ'ল, আজকের দিনটি তার জীবনে যুগপৎ লাল এবং কালো হরফের দিন। আজকেই তার বি. এ পরীক্ষার ফল বেরুল। আজকেই তার কর্মজীবনের একটি অধ্যায় শেষ হ'ল।

শেষ হ'লই বলা যেতে পারে। সন্ধ্যের আগেই হরেকৃষ্ণ তার বরখাস্তের হুকুম নিয়ে আসবে। দিব্যচোখে সে দেখতে পাচ্ছে। তারপরে কি তা সে জানে না। এ বাড়ীতে সম্ভবতঃ এই তার শেষ রাত্রিবাস। 'যাত্রা করে যাত্রীদল, বন্দরের কাল হ'ল শেষ।'

যাত্রা সুরু করবার জন্যে সে ত পোঁটলা-পুঁটলী বেঁধে তৈরিই হয়ে আছে। শুধু যদি বুঝতে পারত, তার নৌকা এর পরে কোন্ বন্দরের উদ্দেশে যাত্রা করবে, তা হ'লে মনটা সুস্থ হ'ত। মন তার চঞ্চল। নৌকা তার ভাঙা নয়। কিন্তু সমুদ্র বিক্ষুব্ধ। মন সেই জন্যেই চঞ্চল।

এই অবস্থায় বয়স্ক কর্মচারীটি এল তাকে বোঝাতে: রাগের মাথায় যা করে ফেলেছ, করেছ। এখন চল, ওঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে ওঁকে শান্ত করবে।

শোনামাত্র রাগে রামকিঙ্করের ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলে উঠল। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে একবার লোকটির দিকে চেয়ে সে সটান বললে, না।

লোকটি থতমত খেয়ে গেল। হরেকৃষ্ণ রামকিঙ্করের পিতার বয়সী। তার কাছে ক্ষমা চাইতে লজ্জার কিছু থাকতে পারে না।

জিজ্ঞাসা করলে, তাতে দোষ কি?

—দোষ কিছুই নেই। কিন্তু আমি ওর কাছে ক্ষমা চাইতে পারব না। তাতে চাকরি থাক আর যাক।

লোকটি রামকিঙ্করের ঔদ্ধত্যে ক্ষুণ্ণ হ'ল।

বললে, তুমি যা ভাল বোঝ, কর। আমার বলবার কি আছে? তবে আমার মনে হয়, যতদিন আরেকটা চাকরী না পাচ্ছ, হরেকেষ্টবাবুকে একটু তোয়াজ করে চললেই ভাল হয়। ধর, কালকেই যদি চাকরিটা যায়।

—যাবে।

—একটা আশ্রয় ত বটে। চাকরি গেলে থাকবে কোথায়?

—ফুটপাতে। যেখানে হাজার হাজার ভিখিরী থাকে, তাদের সঙ্গে।

লোকটি অবাক্ হয়ে ওর দিকে চেয়ে রইল। বললে, এ ত তোমার রাগের কথা, রাম।

রামকিঙ্কর বললে, না, রাগের কথা নয়। বেশ করে

ভেবে-চিন্তেই বলছি। যদি চাকরি যায়, দেখে নেবেন। মরি সেও ভাল, তবু ওই লোকটার অনুগ্রহ ভিক্ষা করব না।

সমস্তদিন রামকিঙ্কর তার ঘরে শুয়ে রইল। দোকানের কাজে নামল না। হরেকৃষ্ণ তাকে ডেকে পাঠালে না। সকলের মনেই একটি অস্বস্তি এবং দুশ্চিন্তা। একটা ছেলে এতকাল তাদের সঙ্গে রয়েছে। সে চলে যাবে। যদিও তার নিজের দোষে, তবু ভাবতে মন একটু ভারী হয় বইকি।

রামকিঙ্কর নিজেও অবাক্ হ'ল। দোকান কি আজ বন্ধ না কি? কারও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না? এমন কি দুমদাম করে তেলের পিপেগুলো পড়ে, সে শব্দও উঠছে না। ছুটির দিন ছাড়া এমন নিস্তব্ধতা সে কখনও দেখে নি।

কিন্তু যে দোকান সে ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তা চলছে কি চলছে না, তা নিয়ে তার দুশ্চিন্তা নিরর্থক।

পাঁচটা বাজে। শুয়ে থাকতেও আর ভাল লাগে না। জামাটা গায়ে দিয়ে সে নিচে নামল। বাইরে যাবার রাস্তাটা দোকান ঘরের ভিতর দিয়েই। কোনদিকে না চেয়ে রামকিঙ্কর দোকান ঘরের ভিতর দিয়ে গটগট করে বেরিয়ে গেল। দোকানের অন্য কর্মচারীরা কিংবা হরেকৃষ্ণ কি করছে, জানবার কোন কৌতূহল তার নেই।

বড় রাস্তা ধরে কিছুক্ষণ হেঁটে যাবার পর রামকিঙ্কর দাঁড়িয়ে পড়ল: কোথায় যাবে? কোথায় যাওয়া যায়? বেরিয়ে আসবার সময় সেই কথাটাই সে ভাবে নি।

দু'টি মাত্র যাবার জায়গা আছে। এক, বিশ্বনাথের বাড়ী। কিন্তু আজ সকালেই সেখানে গিয়েছিল। বিশ্বনাথ হয়ত তার ভর্তির ব্যবস্থা নিয়েই ব্যস্ত। তার সঙ্গে হয়ত দেখাই হবে না। মায়ের সঙ্গে গল্প করবার মত মনের অবস্থা তার নেই।

দুই, সারদার বাসায়। কিন্তু সারদা বাসায় আছে কি না, কে জানে। শুনেছে, প্রতিদিন এই সময় একবার করে সে বাসায় আসে। ঘর-দোর ঝাঁট দেয়। কেউ শুক আর না শুক, বিছানাটা একবার ঝেড়ে পাতে। ঘরে ধূপ-ধুনো দেয়। পাশাপাশি যারা থাকে, তাদের সঙ্গে একটু গল্প করে। তারপর চলে যায়।

সেখানে একবার চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। থাকে ভাল। না থাকে, পার্ক ত আছেই।

আসলে, কি জানি কেন, রামকিঙ্করের মন তাকেই খুঁজছে। দোকানের রাজনীতির সঙ্গে বিশ্বনাথের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু সারদার একটু আছে। দুঃখের কথা তাকেই বলা যায়। গিন্নীমার কাছে যাবার ইচ্ছা নেই, পথও নেই। বৌরাণীর কাছে সরাসরি যাওয়া যায় না। সেখানে যাবার রাস্তা সারদা।

সারদার বাসায় যেতেও তার কেমন সঙ্কোচ হয়। বস্তির অন্যান্য লোকেরা, এদের অধিকাংশই নানা বয়সের স্ত্রীলোক, তার দিকে কেমন করে যেন চায়। মনে হয়, মুখ টিপে টিপে হাসে। তবু সেই দিকেই চলতে লাগল। সারদার সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার।

সারদা তখন দাওয়ায় বসে কয়েকজনের সঙ্গে হাত-মুখ নেড়ে খুব গল্প জমিয়েছে। রামকিঙ্করকে দেখে অবাক্ হয়ে গেল।

বললে, হঠাৎ এলেন যে?

রামকিঙ্কর বললে, আসতে নেই?

—থাকবে না কেন? কিন্তু আজ সকালেই ত দেখা হয়েছিল। আসুন, ভেতরে আসুন।

সারদার ঘরে তক্তাপোষের ওপর একটি পরিষ্কার বিছানা সবসময়ে পাতা থাকে। সেইখানে রামকিঙ্করকে বসিয়ে সারদা মেঝেয় বসল।

বললে, হঠাৎ কেন এলেন বলুন। কিছু খবর আছে?

—গুরুতর খবর আছে। আমার চাকরিটা বোধহয় যাবে।

—সে কি!

—হ্যাঁ। দোকানের ম্যানেজার—

—হরেকেষ্টবাবু?

—তার নামটাও তুমি জান দেখছি।

—জানি। তারপরে বলুন।

—হরেকেষ্টবাবু এতক্ষণ বোধহয় গিন্নীমার কাছে চলে গেছে। দোকানে ফিরে শুনব, আমার চাকরি নেই।

রামকিঙ্কর হাসতে লাগল।

সারদা নিঃশব্দে কি যেন ভাবতে লাগল। তারপর বললে, এতখানি পথ হেঁটে এসে আপনি ত একটা খারাপ খবর দিলেন। আমি একটা ভাল খবর দি, শুনুন।

—বল।

—বৌরাণীর সন্তান হবে।

খুশি হয়ে রামকিঙ্কর বললে, তাই নাকি ?

—হ্যাঁ। গিন্নীমা খুশি, বাবু খুশি। বাড়ীতে একটা সাড়া পড়ে গেছে। বৌরাণীর কদর খুব বেড়ে গেছে।

রামকিঙ্কর বললে, তা হ'লে বৌরাণীর আর পরীক্ষা দেওয়া হ'ল না ?

—আর কি হবে দিয়ে ? বাবু একেবারে বদলে গেছেন। এখন একেবারে বৌরাণীর মুঠোর মধ্যে।

—মার-ধোর বন্ধ ?

—একেবারে। এখন বৌরাণী উঠতে বললে ওঠেন, বসতে বললে বসেন।

—মদ্যপান ?

—বেড়েছে। তবে আর বাইরে যান না। ইয়ার-বকসী নিয়েও নয়। যা করেন বাড়ীতে। তবে শরীরটা খুব খারাপ। পেটে একটা যন্ত্রণাও হচ্ছে। চব্বিশ ঘণ্টা মদ খেলে হবে না ?

—বৌরাণী কিছু বলেন না ?

—না। বাঘ সবে পোষ মানছে, এখনি অতখানি বোধহয় সাহস করেন না।

সারদা হাসলে। বললে, ডাক্তার দেখছে। কিন্তু মদ বন্ধ না করলে শুধু ওষুধে কি হবে ?

দু'জনে নিঃশব্দে বসে রইল।

একটু পরে সারদা জিজ্ঞাসা করলে, কি ভাবছেন ?

—ভাবছি, চাকরিটা গেলে খাব কি, থাকব কোথায় ?

সারদা ফিক্ করে হাসলে। বললে, ইচ্ছে করলে এখানে থাকতে পারেন।

রামকিঙ্কর হেসে ফেললে। বললে, তোমার এখানে !

—কেন, দোষ কি ?

গম্ভীরভাবে রামকিঙ্কর বললে, তা হয় না।

সারদাও হাসলে। বললে, সে আমিও জানি। বসুন, পালাবেন না। আপনার জন্যে একটু চা করে নিয়ে আসি।

একটু পরে ফিরে এসে সারদা জিজ্ঞাসা করলে, দোকানের কাজ আর আপনারও ভাল লাগছে না, না ?

—না।

—কিন্তু অন্য কোথাও চাকরি পাবার আশা আছে ?

—চেষ্টা ত করি নি। এইবার করতে হবে।

সারদা বললে, আপনার কথা বৌরাণী প্রায়ই জিগ্যেস করেন। তাঁর ভয়, বি. এ পাশ করলেন, এবারে আপনি হয়ত অন্য চাকরী পেয়ে চলে যাবেন।

রামকিঙ্কর হেসে বললে, চাকরি পাওয়া অত সহজ নয়। তাঁকে বোলো, চাকরি পাওয়ার আগেই হয়ত আমাকে চলে যেতে হবে।

—ভয় পাবেন না, চাকরি আপনার নাও যেতে পারে।

রামকিঙ্কর হেসে বললে, চাকরি যাবে না ? আমি ত চাকরি গেছে বলেই ধরে নিয়েছি। গিন্নীমার মনের কথা টের পেয়েছি। তিনি আমাকে চান না।

—কিন্তু মনে হয়, বৌরাণী আপনাকে চান।

—কি করে জানলে ?

—জানি।

—জান ? আমি ত ভেবে পাই না, আমি তাঁর কোন কাজে আসতে পারি।

সারদা বললে, কাজে আসাটাই কি বড় কথা ? আপনি যে সৎ লোক, এটা তিনি জানেন। তাই দোকানে আপনাকে তিনি রাখতে চান।

—কিন্তু তিনি ত আমাকে রাখবার মালিক নন।

এবারে সারদার চোখদুটো যেন দপ করে জ্বলে উঠল : কে বললে তিনি মালিক নন ? যে অধিকারেই গিন্নীমা মালিক, সেই অধিকারে তিনিও মালিক। গিন্নীমা যদি ছেলের সম্পত্তির মালিক হ'তে পারেন, তা হ'লে বৌরাণী স্বামীর সম্পত্তির মালিক হ'তে পারেন না ?

রামকিঙ্কর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সারদার মুখের দিকে চেয়ে রইল। এই একটা সন্দেহ তার মনের মধ্যে কিছুদিন থেকেই উঁকি দিচ্ছে। শাশুড়ী-বৌতে একবার লাগবে। বৌরাণী তার জন্যে অনেকদিন থেকেই প্রস্তুত হচ্ছেন। কে জানে, হয়ত এই জন্যেই তিনি স্বামীর পৈশাচিক অত্যাচার নিঃশব্দে সহ্য করেছেন। স্বামী-গৃহ ত্যাগ করে যান নি।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, গিন্নীমার মত তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিশালিনী মহিলার সঙ্গে যুদ্ধ করা ত সহজ নয়। ওঁকে কেউ হারাতে পারে, একথা ভাবতেই পারা যায় না।

কিন্তু এই নিয়ে সারদার সঙ্গে আলোচনা করে লাভ নেই। এটুকু আভাস পেলে যে, একটা যুদ্ধ আসন্ন। তার চাকরি সরু সুতোয় ঝুলছে। সুতরাং চাকরি নিয়ে আর

সে ভয় পায় না। এই অবস্থায় যদি ডামাডোল বেধে যায়, মন্দ কি!

কোনদিকে না চেয়ে রামকিঙ্কর দোকান ঘরের ভিতর দিয়ে সটান দোতলায় তার ঘরে চলে গেল। কোনদিকে না চেয়েও সে বুঝতে পারলে গদীতে সবাই সমাসীন। কিন্তু নিস্তব্ধ, যেন থমথমে ভাব।

চাকরিটা কি গেলই তাহলে? এই নিস্তব্ধতা এবং থমথমে ভাব কি সেই শোকে?

ঘরে গিয়ে পাঞ্জাবীটা খুলে সে বিছানাটা পেতে ফেললে। চাকরীটা যদি গিয়েই থাকে, তা হ'লে বোধহয় এখানে তার চাল নেওয়া হয় নি। আবার জামা পরে বাইরে যেতে হবে খেতে। কিন্তু তার এখনও দেরি আছে। এখন মোটে সন্ধ্যে সাতটা। ন'টার সময় হোটেলে গেলেই চলবে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে স্থির করে ফেললে, চাকরি গিয়ে থাকলেও তখনই তখনই এখান থেকে তাকে হরেকৃষ্ণ যেতে বলবে না। এতদিনের চাকরি, একটা চক্ষুলজ্জা তো আছে। কিন্তু তার পক্ষে একটা দিনও এখানে থাকা ঠিক হবে না। বাক্স-বিছানা নিয়ে সকালেই সে চলে যাবে বিশ্বনাথের ওখানে। মা হয়ত ছাড়বেন না। কিন্তু ওখানে সে খাবে না। খাবে হোটেলে। এবং ঘুরবে নানা জায়গায় চাকরির সন্ধানে। বড় জোর দু'চারটে রাত বিশ্বনাথের বাড়ীতেই কাটাবে।

তারপরে?

অন্ধকার। তার অদৃষ্টে কি আছে, সে জানে না।

ধীরে ধীরে সুবল এসে ঘরে ঢুকল। আড় চোখে একবার রামকিঙ্করের দিকে চাইলে। মুখখানি বিষণ্ণ। নিজের বিছানাটা পেতে নিঃশব্দে শুয়ে পড়ল।

শুষ্ক হাস্যে রামকিঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, চাকরিটা গেলই তা হলে? কিন্তু তার জন্যে অত শোক কিসের?

সুবল তড়াক করে বিছানায় উঠে বসল। রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলে, গেছে!

—আমি জানি না। তোমার কাছে জানতে চাইছি।

—আমরাও জানি না।

—হরেকেষ্ট কিছু বলে নি?

—না। বিকেলে একবার বেরিয়েছিল। বোধহয় গিন্নীমার কাছেই। ফিরে এসে পর্যন্ত গুম হয়ে বসে আছে। চাকরিটা যায় নি তা হ'লে?

সুবল খুশি হয়ে উঠল।

রামকিঙ্কর বললে, বললাম ত, আমি জানি না। গেলে গেছে, থাকলে আছে।

—তুমি তা হ'লে গিয়েছিলে কোথায়?

—অন্য জায়গায়। গিন্নীমার কাছে নয়।

তারপর বললে, আমার চাল নেওয়া হয়েছে কি না, জানো?

—চাল নেওয়া হবে না কেন? চাকরি গেলেও কি দু'একদিন তুমি খেতে পাবে না?

—কি জানি, হরেকেষ্টর ব্যাপার ত।

সুবল বললে, কেন, আমরা কি নেই? আমাদের বন্ধু-বান্ধব এলে তারা কি দু'একদিন খেতে পায় না?

তা পায়। তত অভদ্র এরা নয়। দোকানে যারা কাজ করে, তাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব মাঝে মাঝে আসে—থাকে, খায়। কেউ আপত্তি করে না।

একটু পরে চিন্তিত মুখে সুবল জিজ্ঞাসা করলে, তা হ'লে ব্যাপারটা দাঁড়াল কি? তোমার চাকরি আছে না গেছে? আমরা কেউ কিছু বুঝতে পারছি না।

রামকিঙ্কর বললে, বুঝে কাজ কি? হাতে পাঁজি মঙ্গলবার। গিয়ে থাকলে হরেকেষ্ট এখুনি আমাকে সুসংবাদটা দেবে। তখন আমিও জানতে পারব, তোমরাও জানতে পারবে।

রামকিঙ্কর হাসতে লাগল।

সুবল বললে, কিন্তু এখনও এসে যদি না জানায়?

—তা হ'লে বুঝতে হবে, কালকের দিনটা চাকরি আছে। এখন থেকে আমার রোজকার রোজ চাকরি। সূর্য অস্ত গেলে জানব, আজকের দিন চাকরি আছে। মাইনেটা পাব।

সুবল বললে, এমন করেই বা কদিন চাকরী করা যায়?

—যতদিন অন্য চাকরি না জোটে। জুটলে আমিই ছেড়ে দোব।

সুবল জিজ্ঞাসা করলে, গিন্নীমা কি তোমার ওপর এখন আর খুশি নন?

—সেই রকম শুনছ নাকি?

—ভাসা ভাসা শুনছি।

—জানি না ভাই। এতদিন আমাকে তিনি যথেষ্ট অনুগ্রহ করেছেন। আমি যেটুকু লেখাপড়া শিখলাম, সে তাঁরই দয়ায়। নিজের ইচ্ছাতেই গেছেন। আমি জানি না ভাই। আমরা সামান্য প্রাণী। বড় লোকের মন আমাদের কাছে অন্ধকার।

রাত্রে নটায় ওদের খাওয়া। হরেকৃষ্ণের খাবার তার ঘরে যায়। তার একটু বিশেষ ব্যবস্থা আছে। দোকানের অন্য কর্মচারীরা রান্নাঘরের সামনে বারান্দায় বসে খায়।

সুবল বললে, চল, খেতে যাই। সবাই বসে গেছে।

রামকিঙ্কর উঠতে গিয়ে আবার বসে পড়ল। বললে, ঠিক জানত, আমার চাল নেওয়া হয়েছে? গিয়ে অপদস্থ হব না ত?

তার হাত ধরে একটা ঝাঁকি দিয়ে সুবল বললে, না, হে না, অপদস্থ হবে না। চল।

অপদস্থ হলও না। বরং সবাই তাকে খাতির করে বসালে। যে লোকটি যে কোন দিন চলে যেতে পারে, সহকর্মীদের পক্ষে তাকে খাতির করা অস্বাভাবিক নয়। আবার এই খাতিরের মধ্যে কয়েক ফোঁটা করুণা থাকাও বিচিত্র নয়। আহা! বেচারা কতদিন এখানে চাকরী করলে আর নিজের গোঁয়ার্তুমিতে সেই চাকরীটা খোয়াতে চলেছে। বি. এ পাস করেছে, হয়ত এর চেয়ে একটা ভাল চাকরী কোথাও জুটে যেতে পারে। কিন্তু সেটা ত কথা নয়। যে চাকরীটা যেতে বসেছে, সেইটেই কথা।

রাত্রে পাশের বিছানায় শুয়ে সুবল ফিসফিস করে বললে, তোমার খাতিরটা আজ দেখলে হে!

—দেখলাম। কেন বলত?

—কেউ বুঝতে পারছে না, তোমার চাকরীটা থাকবে না যাবে। হরেকেষ্ট সোজা পাত্র নয়। তার নাকের ওপর তুড়ি মেরে তুমি যে আজকেও রয়ে গেলে, তারই জন্যে খাতির।

—এ কথা কেন মনে করছ?

সুবল হেসে বললে, কেন করছি? তোমার তাকং দেখে আমার নিজেরও যে তোমাকে খাতির করতে ইচ্ছা করছে। অন্ততঃ এটা আমরা বুঝছি, হরেকেষ্ট যেমনই হোক, তুমিও সামান্য নয়। এমন লোককে কেনা খাতির করে বল?

রামকিঙ্কর চুপ করে রইল।

সুবল বলে চলল, হরেকেষ্টর খোঁটার জোর আছে। আজ হোক, কাল, চাকরী হয়ত তোমার থাকবে না। না থাক, হরেকেষ্টকে ধাক্কাটা কম দিলে না। সন্ধ্যে বেলায় এসে যখন হরেকেষ্ট বসল, মুখখানা তার তেল হাঁড়ির মত। এতক্ষণের মধ্যে কারোর সঙ্গে একটা কথা বলে নি।

রামকিঙ্কর তথাপি চুপ করে রইল।

তাকে উৎসাহিত করবার জন্যে সুবল বললে, খাতির কি তোমাকে সবাই সাধে করছে হে! হরকেষ্টর মুখ দেখে সবাই সন্দেহ করছে গিন্নীমার কাছে সে খুব সুবিধা করে উঠতে পারে নি। [ক্রমশঃ]

—

কংগ্রেস স্মৃতি

একত্রিংশ অধিবেশন—লক্ষ্ণৌ, ১৯১৬

গিরিজামোহন সান্যাল

(এক)

১৯১১ সালের কংগ্রেসের অধিবেশনের ৪ বৎসর পরে আমি রাজসাহী জজ কোর্টে ওকালতি আরম্ভ করি; সে-সময় রাজসাহীতে কোন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ছিল না। আমি রাজসাহীতে সর্বপ্রথম জেলা কংগ্রেস কমিটি স্থাপন করি ও তাহার সেক্রেটারী নিযুক্ত হই।

১৯০৭ সালে সুরাটে অধিবেশন পণ্ড হওয়ায় এলাহাবাদ কনভেনসনে প্রস্তুত নিয়মের বলে কংগ্রেস থেকে গরমপন্থী দল বহিষ্কৃত হয়। ফলে ১৯০৮ সাল হ'তে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত কোন কংগ্রেসের অধিবেশনে গরমপন্থী দল যোগ দিতে পারে নি। ১৯১৫ সালে স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের সভাপতিত্বে বোম্বাই অধিবেশনে কংগ্রেস এলাহাবাদে গৃহীত নিয়মাবলী পরিবর্তন করে চরমপন্থীদের কংগ্রেস প্রবেশের পথ সুগম করে দেয়। মুসলিম লীগও তাহাদের নীতি পরিবর্তন করে কংগ্রেসের সহযোগিতায় কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং কংগ্রেসের সঙ্গে একই সময়ে, একই স্থানে মুসলিম লীগের অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়। এর ফলে ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে যোগদান করার জন্য দেশে বিশেষ রাজসাহী জেলা কংগ্রেস কমিটী কর্তৃক রাজসাহীর প্রবীণ উকিল, বঙ্গীয় বিধান সভার সভ্য, পরহিত ব্রত অমায়িক সুপ্রসিদ্ধ নেতা শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরী মহাশয়, রাজসাহীর উকিল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সরকার ও আমি লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের প্রতিনিধি নিযুক্ত হই। ইহাই আমার কংগ্রেস জীবনে প্রথম প্রতিনিধিত্ব। তৎকালে পাবনা তাড়াসের জমিদার মহাশয়গণ রাজসাহীর কংগ্রেস প্রতিনিধিদের মধ্যে একজনের কংগ্রেসে যোগদান করার ব্যয়ভার বহন করতেন। তাড়াসের রাজসাহীর উকিল শ্রীউপেন্দ্রনাথ সরকার উক্ত অর্থসাহায্যে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে যোগদান করেন। উপেনবাবু আমা অপেক্ষা অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ। তিনি এখনও বেঁচে আছেন এবং রাজসাহীতে (পূর্ব পাকিস্তানভুক্ত) ওকালতি করছেন।

লক্ষ্ণৌ যাওয়ার জন্য আমরা কলিকাতা পৌঁছুলাম। লক্ষ্ণৌয়ের পথে কয়েকজন প্রতিনিধিসহ আমি পাটনায় নেমে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে যোগদান করি। শ্রদ্ধেয় কিশোরী বাবুও এই দলে ছিলেন।

পাটনা থেকে আমরা ২৪শে ডিসেম্বর রাত্রের এক ট্রেণে রওনা হয়ে পরদিন প্রাতঃকালে মোগলসরাই পৌঁছে পাঞ্জাব মেলের জন্য অপেক্ষা করি। শুনলাম যে, এই মেলে নির্বাচিত সভাপতি ফরিদপুরের প্রবীণ নেতা শ্রীযুক্ত অম্বিক চরণ মজুমদার মহাশয়, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাংলার অন্যান্য নেতৃবৃন্দসহ আসছেন। পাঞ্জাব মেল অপরাহ্নে মোগলসরাই পৌঁছুবে। যে কয়জন আমরা পাটনা হ'তে এসেছিলাম, তার মধ্যে একমাত্র আমি মধ্যম শ্রেণীর (ইণ্টার ক্লাসের) যাত্রী। অন্যান্য সকলের দ্বিতীয় শ্রেণীর বার্থ রিজার্ভ করা ছিল। তাঁদের দু'খানি বগি মোগলসরাইতে কেটে রেখে ট্রেণ চলে গেল। আমার জিনিষপত্র তাঁদের এক কামরায় রাখলাম। আমি কংগ্রেসের প্রতিনিধি হয়ে ইণ্টার ক্লাসে যাচ্ছি জেনে কিশোরীবাবু ক্ষুব্ধ হলেন এবং বললেন যে, কংগ্রেসের প্রতিনিধির পক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর নীচের শ্রেণীতে ভ্রমণ করা অশোভনীয়। অত্যন্ত সাদাসিধে অনাড়ম্বর কিশোরী বাবুর মত ব্যক্তির এই মন্তব্যে তৎকালীন কংগ্রেসের আভিজাত্যের একটি চিত্র ফুটে ওঠে। দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ির সহযাত্রীদের মধ্যে ছিলেন কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ অ্যাটর্ণী, স্বনামধন্য দার্শনিক ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, অসাধারণ বাগ্মী মনস্বী নেতা শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, পাটনা হাইকোর্টের উকিল ও বেহারের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরী, অধ্যাপক ডঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অমল হোম প্রভৃতি মহাশয়গণ। এঁদের মধ্যে আমার বিশেষ পরিচিত ছিলেন শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত অমল হোম। অমল আমার ছাত্রজীবনের বন্ধু। ডঃ প্রমথনাথের সঙ্গে অল্প পরিচয় ছিল। পরবর্তীকালে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় দ্বয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসি। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের সহিতও পরিচয় হয়।

জানা গেল যে, নিকটেই একটি ভাল ধর্মশালা আছে। সেখানে স্নান আহারাদির ব্যবস্থা করতে আমরা সকলেই গেলাম, কেবল বিপিনবাবুই গাড়িতে বসে রইলেন। তিনি আমাদের সঙ্গে যেতে রাজি হ'লেন না। তাঁর খাবার গাড়িতে পাঠাতে বললেন। কে একজন বললেন যে, যদি খাবার গাড়িতে না দিয়ে যায় তখন কি হবে? বিপিনবাবু উত্তর দিলেন, "নারায়ণ যা করেন তাই হবে।" ঘটনাচক্রে বিপিন বাবুকে ষ্টেশনের খাবারেই ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হয়েছিল।

বিপিনবাবুকে গাড়িতে রেখে আমরা সকলে ধর্মশালায় গেলাম। কিশোরীবাবু স্নান-আহ্নিক সেরে পেতলের ঘটিতে জল গরম করে চা প্রস্তুত করলেন, নিজে খেলেন, আমাকেও দিলেন।

তারপর আহারের ডাক পড়ল। খাবার ঘরে গিয়ে দেখি বসবার স্থানগুলির চতুর্দিকে সিমেণ্ট-নির্মিত গণ্ডী। আমরা যে কয়জন বাঙ্গালী ছিলাম (কংগ্রেসের প্রতিনিধি ছাড়া অন্য বাঙ্গালী যাত্রীও ছিল) তাদের শালপাতায় ভাত ডাল তরকারি পরিবেশন করা হ'ল এবং ঘটিতে পানীয় জল দেওয়া হ'ল। কিন্তু বেহারী ও পশ্চিমাঞ্চলের যাত্রীদের থালায় ভাত, বাটিতে ডাল-তরকারি ও গ্লাসে জল দেওয়া হ'ল। এই না দেখে কয়েকজন বাঙ্গালী চেঁচিয়ে উঠলেন এবং বললেন, হাম লোক কি কুত্তা হ্যায়। হাম লোককো কেঁউ বর্তন নে'হ দিয়া। আমি বললাম যে, আমরা মৎস্য মাংসভোজী, সেজন্য এই দেশে এই ব্যবস্থা। আমার ঠিক পাশেই হীরেনবাবু এবং তাঁর পাশে বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ বসেছিলেন।

ধর্মশালা থেকে মোগলসরাই ষ্টেশনে ফিরে এসে আমরা পাঞ্জাব মেলের অপেক্ষায় রইলাম। পাঞ্জাব মেল এলে আমাদের বগি দু'টি তাতে জুড়ে ট্রেণ লক্ষ্ণৌ অভিমুখে রওনা হ'ল। মোগলসরাই ষ্টেশনের কিছু দূরে গঙ্গা পার হবার সময় যখন ট্রেণ পুলের ওপর চড়ল তখন আমি অপর পারে নদী তীরবর্তী বারাণসীর অপূর্ব শোভা সন্দর্শন করে মুগ্ধ হ'লাম। বলা বাহুল্য যে, আমি মোগলসরাইতে ইণ্টার ক্লাসেই উঠেছিলাম। তখনকার দিনে আজকালকার মত লোকের ভীড় না থাকায় গাড়িতে স্থানাভাব ছিল না। কোন কষ্টই হয় নি। সন্ধ্যার পর ট্রেণ লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনে পৌছল।

ষ্টেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যগণ ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও অগণিত জনসাধারণ উপস্থিত ছিল। ট্রেণ পৌঁছামাত্র সভাপতি মহাশয় ও নেতৃবৃন্দকে বিপুল হর্ষধ্বনি দ্বারা সকলে অভ্যর্থনা করলেন। তাঁদের অভ্যর্থনার পর স্বেচ্ছাসেবকগণের সাহায্যে আমরা বাঙ্গলার প্রতিনিধিগণের জন্য নির্দিষ্ট বাসায় নীত হ'লাম। হীরেনবাবু, বিপিনবাবু, অমল প্রভৃতি আমাদের সঙ্গে গেলেন না, তাঁহারা অন্যত্র গেলেন। প্রমথবাবু কিশোরীবাবু ও আমি এক বাসায় উঠলাম এবং একই কক্ষে স্থান পেলাম। ডিসেম্বর মাসের দারুণ শীতে আমাদের দেহ আড়ষ্ট হয়ে উঠছিল। কৃষ্ণনগরের উকিল শ্রীযুক্ত বেচারাম লাহিড়ী মহাশয় পূর্ব থেকে ঐ বাসায় ছিলেন। শীতের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়ায় তিনি মন্তব্য করলেন যে, "এ আর এমন বেশি কি শীত! কৃষ্ণনগরের শীত এ অপেক্ষা কম নয়।" সন্ধ্যার পর ঘোড়ার নাদ পোড়ান ধোঁয়ায় চতুর্দিক অন্ধকার, একটা বিশ্রী গন্ধ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ায় অস্বস্তিবোধ করতে লাগলাম।

তখনকার দিনে কংগ্রেস অধিবেশনের সময় বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিদের জন্য পৃথক্‌ পৃথক্‌ বাসস্থান ও আহারের ব্যবস্থা করা হ'ত এবং আহারের স্থানে জাতি-ভেদও যথাসম্ভব মেনে চলা হ'ত।

বিশ্রামের পর খেতে গিয়ে দেখলাম একটি লম্বা দড়ির আসন বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই আসনে একসঙ্গে বসে সকলকে খেতে হবে। বাল্যকাল থেকে পৃথক্‌ আসনে বসে খাওয়ায় অভ্যস্ত ছিলাম সুতরাং এই ব্যবস্থায় মন খুঁতখুঁত করতে লাগল। তার পর যখন ভাত পরিবেশন করতে পাচকের আবির্ভাব হ'ল তখন তাকে দেখে ত চক্ষু চড়কগাছ। মেহেদী রঙে ছোপান ছাঁটা চাপদাড়ি ও ছাঁটা গোঁফ দেখে তাকে মুসলমান বাবুর্চি বলে ভ্রম হ'ল। আমরা জেনে আশ্বস্ত হ'লাম যে, সে ব্রাহ্মণ এবং সকলে তাকে "মহারাজ" বলে সম্বোধন করছে।

(দুই)

পরদিন ২৬শে ডিসেম্বর বেলা ২টার সময় কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হ'ল। নির্ধারিত সময়ের পূর্বে আমরা কংগ্রেস সভামণ্ডপে (প্যাণ্ডেলে) প্রবেশ করে বাংলা দেশের প্রতিনিধিদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে আসন গ্রহণ করলাম। তখনকার দিনের প্রতিনিধিগণ প্রায় সকলেই কোট প্যাণ্টালুন বা চোগা-চাপকান পরে কংগ্রেসে যেতেন। বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিগণ বহু-বিচিত্র শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করতেন। মস্তকের পাগড়ী বা টুপি দেখে কে কোন্‌ প্রদেশের অধিবাসী তা সহজেই বোঝা যেত। বাঙ্গালী, উড়িয়া ও আসামীগণ প্রায়

খালি মাথায় যেতেন। আমি গলাবন্ধ সার্জের কোট ও প্যান্ট পরে এবং মাথায় একটি "পিরালী" পাগড়ি দিয়ে কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করেছিলাম। একজন বোম্বাইয়ের প্রতিনিধি আমাকে বললেন যে, মস্তকাবরণ দেখে বোধ হচ্ছে যে, আপনি বাঙ্গালী। লক্ষ্ণৌয়ের দুর্জয় শীতের পক্ষে সার্জের কোট-প্যাণ্টালুন নিতান্তই তুচ্ছ। এর পর উত্তর ভারতের বহু অধিবেশনে যোগদান করেছি। প্যাণ্টালুন আর পরি নি। আলোয়ানে সর্বাঙ্গ মুড়ে থাকার মত আরাম কোট-প্যাণ্টালুনে হয় না।

বৃহৎ প্যাণ্ডেল অতি সুন্দর ভাবে সজ্জিত ছিল। ডায়াসে বা বেদীতে নেতাদের জন্য স্থান সংরক্ষিত ছিল, ডায়াসের পশ্চাৎদিকে নেতাদের বৃহৎ বৃহৎ ছবি টাঙ্গান ছিল। প্রতিনিধিদের জন্য চেয়ার ও দর্শকদের জন্য গ্যালারির ব্যবস্থা ছিল। দীর্ঘ আট বৎসর পরে যুক্ত-প্রদেশে কংগ্রেসের মডারেট ও একষ্ট্রিমিস্ট বা নরম ও গরম দলের যুক্ত অধিবেশন হচ্ছে। বৃহৎ প্যাণ্ডেলের ভিতর তিল ধারণের স্থান ছিল না। সভায় উৎসাহ ও উদ্দীপনার শেষ ছিল না। বহু সংখ্যক মুসলমান প্রতিনিধি ফেজযুক্ত লাল তুর্কী ক্যাপে শোভিত হয়ে সভায় উপস্থিত ছিলেন। আমি ইতিপূর্বে একসঙ্গে এত অধিক সংখ্যক শিক্ষিত মুসলমানের সমাবেশ দেখি নি।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, ভূতপূর্ব কংগ্রেস সভাপতিগণ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দসহ নির্বাচিত সভাপতি প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করলেন। বিপুল হর্ষধ্বনি ও 'বন্দে-মাতরম্" ধ্বনি দ্বারা সমবেত প্রতিনিধি ও দর্শক সভাপতি মহাশয়কে অভ্যর্থনা জানাল।

সর্বপ্রথমে বাঙ্গালী মহিলাবৃন্দ কর্তৃক "বন্দে মাতরম" সঙ্গীত গীত হওয়ার পর স্থানীয় হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ দ্বারা হিন্দী সঙ্গীত গীত হ'ল।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিত্ব করার কথা ছিল ১৯১১ সালের সভাপতি শ্রীযুক্ত বিষণনারায়ণ দর মহাশয়ের। কিন্তু তাঁর অকস্মাৎ পরলোকগমনে উক্ত পদে নির্বাচিত হয় লক্ষ্ণৌয়ের প্রসিদ্ধ আইনজীবী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জগৎ-নারায়ণ মহাশয়। তিনি তাঁর অভিভাষণে পরলোকগত নেতাদের জন্য শোক প্রকাশ করলেন এবং স্বায়ত্ত-শাসন সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন যে, অদূর-দর্শিতার ফলে মুসলমানগণ পৃথকভাবে তাঁদের স্বার্থের জন্য আন্দোলন করত। সেই অদূরদর্শিতা এখন চিরকালের তরে লোপ পেয়েছে এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কর্তৃক রচিত স্বায়ত্ত শাসনের পরিকল্পনার ফলে দেশে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিরোধের অবসান হবে। হায়, কি দুরাশা!

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণের পর সর্ব-জনবরেণ্য রাষ্ট্রগুরু শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিপুল হর্ষধ্বনি ও করতালির মধ্যে দণ্ডায়মান হয়ে তাঁর অনির্বচনীয় ভাষায় সভাপতির নির্বাচন প্রস্তাব উপস্থিত করলেন। উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করলেন বিদর্ভের (বেরারের) সুপ্রসিদ্ধ নেতা মাননীয় শ্রীযুক্ত আর. এন. মুধোলকর, বোম্বাই হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ আইনজীবী শ্রীযুক্ত চিমনলাল শীতলবাদ (পরবর্তী কালে স্যর উপাধিপ্রাপ্ত) এবং মাদ্রাজ হাইকোর্টের উকিল মাননীয় দেওয়ান বাহাদুর এল্, এ, গোবিন্দ রাঘব আয়ার মহাশয়গণ।

যথারীতি নির্বাচিত হয়ে সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করলেন। দীর্ঘ শ্বেতশ্মশ্রু শোভিত চোগা-চাপকান ও পাগড়ি পরিহিত বৃদ্ধ সৌম্যদর্শন সভাপতি মহাশয় সকলের দৃষ্টি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করলেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক কর্তৃক কতকগুলি চিঠি-পত্র পঠিত হওয়ার পর সভাপতি মহাশয় তাঁর অভিভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। সুরেন্দ্রনাথ পুণা কংগ্রেসের সভাপতি-রূপে তাঁর ছাপা অভিভাষণ সম্পূর্ণ মুখস্থ বলেছিলেন। বর্তমান সভাপতি তাঁর পরমবন্ধু ও সহকর্মী সুরেন্দ্রনাথের অনুকরণে তাঁর মুদ্রিত অভিভাষণের মুখবন্ধটি মাত্র মুখস্থ বলে পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু মহাশয়কে অভিভাষণ পাঠ করতে আহ্বান করলেন। হৃদয়নাথকে তিনি Chip of an old block, Son of Pandit Ayodhanath" বলে বর্ণনা করলেন। পণ্ডিত কুঞ্জরু সভাপতির সুদীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করলেন, কেবল শেষাংশ পুনরায় সভা-পতি মহাশয় দাঁড়িয়ে মুখস্থ বললেন।

অভিভাষণ-অন্তে সভাপতি মহাশয় বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিগণকে স্ব স্ব প্রদেশ থেকে বিষয় নির্বাচনী সভার সভ্য নির্বাচন করতে নির্দেশ দিলেন। ভূতপূর্ব সভাপতি-গণ ও অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সভ্যগণ তাঁদের পদগৌরবে বিষয় নির্বাচনী সভার সভ্য। বিভিন্ন প্রদেশের জন্য প্রতিনিধি দ্বারা নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা নির্দিষ্ট ছিল। বাংলা দেশের অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সদস্যের সংখ্যা ছিল ২০। নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যাও ২০ ছিল।

বাংলা দেশের প্রতিনিধিগণকে প্যাণ্ডেলের বাইরে মিলিত হয়ে বিষয় নির্বাচনী সভার সদস্য নির্বাচনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হ'ল। উক্ত ঘোষণার পরই সেদিনের

মত কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশন শেষ হ'ল, তৎপর সভাপতি মহাশয় ও সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ বাংলার নেতৃবৃন্দ দৃপ্ত পদক্ষেপে বাংলার প্রতিনিধিদিগের প্রতি দৃকপাতমাত্র না করে সভামণ্ডপ ত্যাগ করে চলে গেলেন। তাঁদেরও যে উক্ত নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার দায়িত্ব আছে, তা তাঁরা মনেও করলেন না।

বাংলা দেশের তিনজন ভূতপূর্ব সভাপতি উপস্থিত ছিলেন, যথা শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যর রাসবিহারী ঘোষ ও শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়গণ। অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির যে ২০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন তাঁদের নাম এখানে লিপিবদ্ধ হ'ল। সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার নীলরতন সরকার (পরবর্তী কালে স্যর উপাধিভূষিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য), শ্রী এ. রসুল (প্রসিদ্ধ স্বদেশী নেতা আবদুল রসুল, কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার ও বঙ্গীয় আইন সভার সভ্য), শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র (সুপ্রসিদ্ধ স্বদেশী নেতা ও 'সঞ্জীবনী'র সম্পাদক), শ্রী জে. চৌধুরী (যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার, কলিকাতা উইকলি নোটসের সম্পাদক, শ্রীআশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের ভ্রাতা ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জামাতা), শ্রীরমণীমোহন দাস (বঙ্গীয় আইন সভার সভ্য), শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র রায় (প্রসিদ্ধ সাংবাদিক), শ্রীবসন্তকুমার বসু (কলিকাতা হাইকোর্টের নামজাদা উকিল), ডঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ব্যারিষ্টার ও অধ্যাপক—পরবর্তীকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিণ্টো প্রফেসর), শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা সিটি কলেজের অধ্যাপক), শ্রীললিতমোহন দাস (অধ্যাপক), শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মিত্র (কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল, পরবর্তীকালে বাংলা গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী ও স্যর উপাধিপ্রাপ্ত), শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক (কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল, আলিপুর বারের বিখ্যাত আইনজীবী, পরবর্তীকালে লণ্ডনস্থ ভারত সচিবের অন্যতম সদস্য, বাংলার ছোটলাটের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সভ্য, ইত্যাদি), শ্রীসত্যানন্দ বসু (নানাপ্রকার জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত), শ্রীকৃষ্ণদাস রায় (ফরিদপুরের জমিদার), শ্রীকিশোরীমোহন চৌধুরী, শ্রী জি. আর. দে, শ্রী আই. বি. সেন (ইন্দুভূষণ সেন, কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার), শ্রী বি. কে লাহিড়ী, (বসন্তকুমার লাহিড়ী, কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার), রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও শ্রী ডি. সি. ঘোষ (কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার ও পরবর্তীকালে কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট ট্রাইবুনালের সভাপতি) মহাশয়গণ।

আমরা বাংলার কতকগুলি প্রতিনিধি প্যাণ্ডেলের বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই অতি অল্প সময়ের মধ্যে ২০ জন বিষয় নির্বাচনী সভার সভ্য নির্বাচন করলাম, তার মধ্যে আমিও নির্বাচিত হ'লাম। নির্বাচিত সভ্যদের নাম দেওয়া গেল:—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীউপেন্দ্রনাথ বল (ক্যানিং কলেজের অধ্যাপক), শ্রী বি. সি চ্যাটার্জি (বিজয়ানন্দ চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম জামাতা), শ্রীমনমোহন নিয়োগী (ময়মনসিংহের উকিল), শ্রীরজনীকান্ত দে (কুমিল্লার উকিল), শ্রীকামিনীকুমার চন্দ (শিলচরের প্রসিদ্ধ নেতা, শিলচরের খ্যাতনামা আইনজীবী ও বড়লাটের আইন সভার সদস্য), শ্রীপূর্ণচন্দ্র মৈত্র (ফরিদপুরের বিখ্যাত উকিল), শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বসু (আলিপুর কোর্টের উকিল), শ্রীইন্দ্রভূষণ ভট্টাচার্য, শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল, শ্রীনন্দগোপাল ভাদুড়ী, শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ (মালদহের উকিল), শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন (খুলনার উকিল), শ্রীহরিনাথ ঘোষ (বরিশালের উকিল), শ্রীপ্রিয়নাথ সেন ('ঢাকা হেরাল্ড' পত্রিকার সম্পাদক), শ্রীআবদুল কাসেম (বিখ্যাত স্বদেশী আন্দোলনের নেতা, বাগ্মী, সাংবাদিক ও বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য), শ্রীরমেশচন্দ্র সেন (ময়মনসিংহের উকিল), শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল, শ্রী এইচ্. কে. ঘোষ (নোয়াখালীবাসী লক্ষ্ণৌয়ের ব্যারিষ্টার) ও শ্রী শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ঢাকার উকিল ও খ্যাতনামা নেতা) মহাশয়গণ।

উপরোক্ত বিষয় বির্বাচনী সমিতির সভ্য নিবাচনের পর ফিরবার পথে হঠাৎ প্যাণ্ডেলের অভ্যন্তরে নজর গেল। বিস্মিত হয়ে দেখলাম যে, প্যাণ্ডেলের এক অংশে একটি নাতি বৃহৎ সভা বসেছে। কৌতূহলী হয়ে ভিতরে ঢুকে লক্ষ্য করলাম্ যে মাদ্রাজের সমস্ত প্রতিনিধিগণ বিষয় সমিতির সভ্য নির্বাচনের জন্য সকলে মিলিত হয়েছেন, ২।১ জন নেতা ছাড়া মাদ্রাজের সমস্ত প্রতিনিধিই উপস্থিত ছিলেন। রীতিমত শৃঙ্খলার সহিত সভার কার্য পরিচালিত হচ্ছিল। মাদ্রাজ হাইকোর্টের উকিল ও মাদ্রাজ আইন সভার সদস্য মাননীয় শ্রী বি. এন. শর্মাকে (পরবর্তীকালে স্যর উপাধিভূষিত ও বড় লাটের একজিকিউটিভ কাউনসিলের মেম্বর) সভাপতি বরণ করে সভার কার্য আরম্ভ হ'ল। ভোট দ্বারা কোন্ বিভাগে কতজন সভ্য নির্বাচিত হবে প্রথমে স্থির করা

'ল। পরে সেই প্রথায় সভ্যগণ নির্বাচিত হ'ল। বাংলার ও মাদ্রাজের প্রতিনিধিগণের দায়িত্ব ও কার্যক্রমের প্রভেদ লক্ষ্য করলাম। এর পর বাসায় ফিরে সেদিনকার মত বিশ্রাম নিলাম।

[তিন]

তৎপরদিন অর্থাৎ ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশন হয় নি। সেদিন বিষয় নির্বাচনী সমিতির অধিবেশনের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। বেলা ১২॥ টার সময় উক্ত সমিতির অধিবেশন সুরু হ'ল তখনকার দিনে বিষয় নির্বাচনী সমিতির অধিবেশনে কোন দর্শক বা সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণের প্রবেশাধিকার ছিল না। এই প্রথা খুব ভাল ছিল। পরে বিষয় নির্বাচনী সমিতির সভাও ছোটখাটো কংগ্রেসের অধিবেশনে পরিণত হয়।

একটি সুদীর্ঘ লম্বা টেবিলের সম্মুখে মধ্যস্থলে সভাপতি মহাশয় এবং তাঁর দু'পাশে অন্যান্য বিশিষ্ট নেতাগণ আসন গ্রহণ করলেন। তাঁদের সম্মুখে অন্যান্য সভ্যগণ উপবিষ্ট হ'লেন। সকলের বসবার জন্য চেয়ারের ব্যবস্থা ছিল। পরদিনের অধিবেশনে যে-সকল প্রস্তাব উপস্থিত করা হবে সেগুলি আলোচনা দ্বারা স্থির হ'ল। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নিযুক্ত কমিটি কলিকাতার গত নবেম্বর মাসে সুরেন্দ্রনাথের অধিনায়কত্বে স্বায়ত্ত শাসনের একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করে। উক্ত পরিকল্পনাটি মুদ্রিত হয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। বিষয় নির্বাচনী সমিতির সভা শেষ হওয়ার পূর্বে প্রত্যেক সভ্যের হাতে একখানি করে পুস্তিকা দেওয়া হ'ল, যাতে তাঁরা পরিকল্পনাটি পড়ে পরবর্তী নির্বাচনী সমিতির সভায় আলোচনা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসতে পারেন। আমরা বাংলার প্রতিনিধিগণ সেগুলি সযত্নে পকেটস্থ করে পরমানন্দে লক্ষ্ণৌয়ের প্রসিদ্ধ ইমামবাড়া, ভুলভুলাইয়া, ছত্রমঞ্জিল, শাহনজফ্, অযোধ্যার নবাবগণের চিত্রশালা, বেলিগার্ড প্রভৃতি দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ দেখে বেড়াতে লাগলাম। পরিকল্পনাটি পড়ার আর অবসর পাওয়া গেল না।

এই কংগ্রেসেই পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু মহাশয়কে প্রথম দেখলাম। তিনি তখন প্রায় আমার সমান বয়স্ক, তরুণ যুবক, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ সুশ্রী চেহারা। তিনি তখন এলাহাবাদ হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার। তাঁকে অনন্যসাধারণ বাগ্মী, থিয়োসফিকাল সোসাইটির সভানেত্রী ভারতের সেবায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণা সর্বজনশ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ত মহোদয়ার সান্নিধ্যেই বেশী দেখা গেল। জওহরলালজী তখন বেসান্ত মহোদয়ার "হোমরুল লীগের" সদস্য। তাঁর সৌখীনতা ও বাবুগিরিও আমাদের নজরে পড়ল। ক্ষণে ক্ষণে তিনি বেশ পরিবর্তন করতেন। এই তাঁকে কোট-প্যান্ট-টাই শোভিত সাহেব মূর্তিতে দেখা গেল—পরক্ষণেই তাঁকে ধবধবে সাদা চুড়িদার পায়জামা ও শেরওয়ানী পরিহিত ও মাথায় কিস্তি টুপি শোভিত অবস্থায় দেখা গেল। নেহরু-পরিবারের বিলাসিতা তখন দেশের আলোচ্য বিষয় ছিল।

এই কংগ্রেসে যত অধিক সংখ্যক মুসলমান প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন ইতিপূর্বে কোন অধিবেশনে তত সংখ্যক মুসলমান যোগদান করেন নি। তখনকার দিনের জাতীয়তাবাদী নেতা শ্রীমহম্মদ আলি জিন্নার চেষ্টায় মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের অধিবেশন একই স্থানে, একই সময়ে হ'তে আরম্ভ হয়। এবার লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় জিন্না সাহেবের সভাপতিত্বে লক্ষ্ণৌয়ে প্রসিদ্ধ কৈসরীবাগের একটি হলে মুসলিম লীগের অধিবেশন হয়।

[চার]

২৮শে ডিসেম্বর বেলা ১১টার সময় কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হ'ল। যথারীতি বঙ্গীয় মহিলাগণ কর্তৃক "বন্দেমাতরম্" ও স্থানীয় হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ কর্তৃক জাতীয় সঙ্গীত গীত হ'ল।

সভা আরম্ভ হওয়ার অব্যবহিত পরে যুক্তপ্রদেশের লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণর স্যর জেমস মেষ্টন লেডী মেষ্টন ও অন্যান্য অনুচরগণ সমভিব্যাহারে কংগ্রেস প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করলেন। সমবেত জনতা দণ্ডায়মান হয়ে তাঁকে হর্ষধ্বনি দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করল।

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সভাপতি মহাশয় স্যর জেমস মেষ্টনকে অভ্যর্থনা করে একটি ভাষণ দিলেন। তাহাকে তিনি বললেন যে, কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে স্যর উইলিয়াম ওয়েডারবর্ণ, প্রফেসর ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রভৃতি ইংরাজ রাজপুরুষগণ কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় অধিবেশনের সময় বড় লাট লর্ড ডাফরিণের নিকট সভাপতি শ্রীদাদাভাই নৌরজী মহাশয়ের নেতৃত্বে একটি ডেপুটেশন উপস্থিত হয় এবং তৃতীয় অধিবেশনের সময় মাদ্রাজের ছোট লাট লর্ড কোনেমারা সমুদয় প্রতিনিধিকে অভ্যর্থনা করেন। তার পর দীর্ঘকাল কংগ্রেস রাজপুরুষগণের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত ছিল। এর পর ১৯১৪ সালে লর্ড পেণ্টল্যাণ্ড (মাদ্রাজের গভর্ণর) কংগ্রেসে উপস্থিত হন এবং আজ পুনরায় ছোট লাট কংগ্রেসে উপস্থিত হয়ে সকলকে ধন্য করলেন। সভাপতি মহাশয়

আশা করেন যে, ছোট লাট সাহেব জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতিশীল হবেন।

লাট সাহেব প্রত্যুত্তরে বললেন যে, কংগ্রেস ও তাঁর মধ্যে একটি আশ্চর্য্যজনক যোগাযোগ আছে। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের জন্ম হয় এবং ঐ সালেই তিনি ভারতের সেবায় নিযুক্ত হন। এই সুদীর্ঘ ৩১ বৎসর তিনি সহানুভূতির সহিত এই বিরাট্ আন্দোলনের গতি নিরীক্ষণ করেছেন কিন্তু এই প্রথম তিনি কংগ্রেসে দর্শকরূপে উপস্থিত হ'লেন। তাঁর অপ্রত্যাশিত অভিনন্দনের জন্য তিনি সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন।

তৎপর পণ্ডিত বিষণনারায়ণ দর, শ্রীসুব্রহ্মণ্য আয়ার ও শ্রীদাজ্ঞী আবাজী খারের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হ'ল। লর্ড কিচনারের মৃত্যুর জন্যও কংগ্রেস শোক প্রকাশ করল।

শোক প্রকাশের পর সভাপতি মহাশয় ভারত সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের (loyalty) প্রস্তাব উপস্থিত করলেন। মাননীয় পণ্ডিত গোকরণ নাথ মিশ্র কর্তৃক ঘোষিত (লক্ষ্ণৌ চীফ কোর্টের উকিল, যুক্তপ্রদেশের আইন সভার সদস্য এবং পরবর্তীকালে লক্ষ্ণৌ চীফ কোর্টের জজ) "থ্রি চিয়ার্স ফর হিজ ম্যাজেষ্টি দি কিং এম্পারার—হিপ্ হিপ্ হুরে" ধ্বনির মধ্যে প্রস্তাবটি গৃহীত হ'ল।

এর পর অস্ত্র আইন (Arms Act) রদ করে ভারতবাসীগণকে অস্ত্র ধারণের ক্ষমতা প্রদান করার জন্য প্রস্তাব উপস্থিত করলেন যুক্তপ্রদেশের আইন সভার সদস্য মোরাদাবাদের উকিল শ্রীরাধাকিষণদাস মহাশয়। কয়েকজন প্রতিনিধি কর্তৃক প্রস্তাবটি সমর্থিত হওয়ার পর বাংলা দেশের পক্ষ থেকে শ্রীবসন্তকুমার লাহিড়ী প্রস্তাব সমর্থন করলেন। এর পর প্রস্তাব সমর্থন করতে দাঁড়ালেন সুপ্রসিদ্ধা কবি কোকিলাকণ্ঠী শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু মহাশয়া। তিনি তাঁর অনির্বচনীয় ভাষায় ও সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে Your Honour, President and unarmed citizens of India" সম্বোধন করে অতি সুন্দর ভাষণ দিলেন। বাল্যকাল থেকে শ্রীমতী সরোজনী নাইডুর নাম শুনে আসছি, আজ তাঁকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করে নিজেকে ধন্য মনে করলাম। সরোজিনী দেবী তখন তন্বী ছিলেন, পরবর্তীকালের মত তাঁর মেদবহুল বিশাল বপু ছিল না। তাঁর বক্তৃতা সভাস্থ সকলে মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনছিল।

প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর স্যর জেমস ও লেডী মেষ্টন প্ল্যাটফরমে উপবিষ্ট বিশিষ্ট নেতাদের সহিত করমর্দন করে সদলবলে কংগ্রেস মণ্ডপ পরিত্যাগ করলেন। তাঁর প্রস্থানের সময় ১৯১১ সালের অধিবেশনের সভাপতি শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় "থ্রি চিয়ার্স ফর স্যর জেমস এণ্ড লেডী মেষ্টন—হিপ হিপ্ হুরে, হিপ্ হিপ্ হুরে" আওয়াজ তুললেন এবং বহু প্রতিনিধি সেই আওয়াজে যোগ দিলেন।

পরবর্তী প্রস্তাবে ভারতীয়গণকে স্বেচ্ছাবাহিনীতে যোগদান ও সৈন্যবাহিনীতে অফিসার নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করতে গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হ'ল। বাংলা দেশের প্রতিনিধি শ্রী বি. সি. চ্যাটার্জি এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

এর পর সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইন (Press Act) রদ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করেন মাদ্রাজ হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকিল শ্রী সি. পি. রামস্বামী আয়ার। তিনি সুবক্তা ও পণ্ডিত। একটি তথ্যপূর্ণ ভাষণ দিয়ে প্রেস অ্যাক্টের বিষময় ফল শ্রোতাদের সামনে উপস্থিত করলেন। অন্যান্য কয়েকজন প্রতিনিধি দ্বারা সমর্থিত হওয়ার পর "বোম্বে ক্রনিকেলের" সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক শ্রী বি. জি. হার্ণিম্যান প্রস্তাব সমর্থন করতে দাঁড়ালেন। তিনি জাতিতে ইংরাজ কিন্তু ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের সহিত যুক্ত হয়ে ভারতের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্খা নিজের করে নিয়েছিলেন এবং খুব জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি বেশ ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে প্রস্তাব সমর্থন করলেন। প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

এর পর চুক্তিবদ্ধ মজদুর নিয়োগ (Indentured Labour) সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত করতে উঠলেন সর্বজনবরেণ্য শ্রীমোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী মহাশয়। যদিও তখন তিনি মহাত্মারূপে দেশবাসীর নিকট পরিচিত হন নি, তথাপি দক্ষিণ আফ্রিকার কৃতকার্য্যের জন্য তাঁর খ্যাতি দেশময় ছড়িয়ে পড়েছিল এবং দেশবাসীর হৃদয়ে তিনি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ১৯১৪ সালে যখন তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন তখন তাঁর রাজনৈতিক গুরু পরলোকগত মহামতি গোপালকৃষ্ণ গোখলে মহাশয় তাঁকে এক বৎসরকাল দেশ পর্যটন করে দেশের অবস্থা সবিশেষ জ্ঞাত হওয়ার পর রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে উপদেশ দেন। গান্ধীজী মহামতি গোখলের উপদেশ পালন করে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে যোগদান করেন। এই প্রথম আমি গান্ধীজীকে দর্শন করলাম। পরিধানে ধুতি, গায়ে পাঞ্জাবীর মত একটি জামা, তার উপর

একখানি চাদর পৈতার ছায় লম্ববান, মাথায় কাঠিয়াড়ী পাগড়ি ও পায়ে চপ্পল। এইভাবে সজ্জিত হয়ে তিনি মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান হ'লেন। সমবেত প্রতিনিধি ও দর্শকবৃন্দ বিপুল জয়ধ্বনি দিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করল এবং 'হিন্দী হিন্দী' রব উঠতে লাগল অর্থাৎ উত্তর ভারতের অনেকে তাঁকে হিন্দীতে অভিভাষণ দিতে বলল। তিনি বক্তৃতার প্রারম্ভে বললেন যে, তামিল ভ্রাতাগণ তাঁকে ইংরাজীতে ভাষণ দিতে অনুরোধ করেছেন। তাঁদের অনুরোধ অংশত মেনে নিয়ে তিনি তাঁদেরকে (তামিল ভ্রাতাগণকে) একটি পাল্টা অনুরোধ করছেন। তিনি বললেন যে, আগামী বৎসরের মধ্যে যদি তাঁরা (তামিলগণ) lingua franca (হিন্দী) না শিখেন তা হ'লে অন্তত তাঁর (গান্ধীজীর) সম্বন্ধে তাদের বিপদ হবে, কারণ তিনি জানেন যে যখন ভারতকে স্বরাজ দেওয়া হবে তখন হিন্দীই হবে ভারতের lingua franca (১)। গান্ধীজি প্রথমে ইংরাজীতে বলে পরে হিন্দীতে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন।

মাদ্রাজের হাইকোর্টের উকিল ও মাদ্রাজ আইন সভার সদস্য মাননীয় এম্. রামচন্দ্র রাও মহাশয় প্রস্তাব সমর্থন করেন। এই রামচন্দ্র রাও মহাশয়ই রামানুজমের মধ্যে অঙ্ক শাস্ত্রে অসাধারণ প্রতিভা আবিষ্কার করেন এবং তাঁর এফ. আর. এস্. হওয়ার পথ সুগম করে দেন। প্রস্তাব যথারীতি পাশ হ'ল।

তৎপরে উপনিবেশের ভারতবাসী সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত করলেন দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর সহকর্মী ও শিষ্য ইংরাজ ইহুদী শ্রী এইচ. এস. এল্. পোলক মহাশয়। সুদীর্ঘ অভিভাষণ দ্বারা তিনি ব্রিটিশ উপনিবেশসমূহে বিশেষতঃ দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীদের দুর্দশা সম্বন্ধে আলোচনা করলেন। প্রস্তাব সমর্থন করলেন মাদ্রাজের "ইণ্ডিয়ান রিভিউয়ের" বিখ্যাত সম্পাদক শ্রী জি. এ. নটেশন মহাশয়। আরও কয়েক জনের সমর্থনের পর প্রস্তাব গৃহীত হল।

এর পর বেহারের তৎকালীন অন্যতম নেতা বাবু ব্রজকিশোর প্রসাদ মহাশয় বেহারের য়ুরোপীয় প্ল্যানটার ও রায়তের সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত করে উত্তর বেহারে রায়তের উপর প্ল্যান্টারগণের অমানুষিক অত্যাচার কাহিনী বিবৃত করলেন। বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ হিন্দীতে এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন। শ্রীকৃষ্ণ বাবু ও আমি একই বৎসরে, একই বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে এম্.এ. পাশ করি। পরে শ্রীকৃষ্ণ বাবু বেহারের মুখ্যমন্ত্রী হন এবং মৃত্যু পর্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রস্তাবটি আরও সমর্থিত হয়ে গৃহীত হ'ল।

তার পর এ দিনের মত কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হ'ল।

———

রৌদ্রের দাক্ষিণ্য আর

চিত্রভানু

রৌদ্রের দাক্ষিণ্য আর জলের সান্ত্বনা অকৃপণ
কোনো দিন হয় নি অভাব, তবু মানুষের মন
সুখের অভাবে কৃশ, আনন্দের কৃচ্ছ্রতায় দীন।
হায় সে খুঁজেছে সুখ মানুষের হাটে প্রতিদিন
কেনা বেচা পণ্যের নিয়মে ; সে যে মূঢ়, ভুল তাই
বিশ্বের আনন্দযজ্ঞে দানমুক্ত ধারা, খোঁজে নাই
সহজের অক্ষয় অঞ্জলি, নিত্য যাহা প্রসারিত
তারই চিত্ত তরে, ধূলিক্লিন্ন প্রত্যহের অগণিত
প্রয়োজন ধূলিজালে চিত্ত তার করেছে মলিন,
তাই সে মালিন্যমুগ্ধ অসুস্থ কোটরে অবলীন,
মর্ত্ত্য মানুষের দ্বারে ব্যর্থ করে স্বর্গের আহ্বান।
পায়ে তার মুক্তিহীন সময়ের শিকলের টান ;
তবু যে-মুক্তির ডাক আকাশে আলোকে জলে বাজে
কোলাহল পরিশ্রান্ত চিত্ত তার তা-ও শোনে না যে।

শীত আসে

কৃতান্তনাথ বাগচী

শীত আসে সীমাহীন বিস্মৃতির মত
ধূসর কুয়াশা নিয়ে দিগন্তের মনে,
কোথাও পাবে না খুঁজে স্থলপদ্মক্ষত
শারদ-রৌদ্রের-সিংহ-নখরিত বনে।
শূন্য প্রান্তরের প্রান্তে অবসন্ন দিন
বিষণ্ণ আলোর শস্য বয়ে চলে ধীরে,
বকের ডানার রেশ ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণ,
একটি নিঃসঙ্গ ছায়া ধরণীর তীরে।
তবু জীর্ণ পাতাদের মৃত্যুর উৎসবে
চিরপরিচিত ধূলি রঙের মাতাল,
গীতহারা অরণ্যের স্তব্ধতার স্তবে
দেখিবে তারার স্বপ্ন রাত্রির পাতাল।
শীত আসে, যত চোখে ছিল যত জল
নিভৃত সঞ্চয় তার পথের সম্বল।

ইডেন উদ্যানে সন্ধ্যা

সন্তোষকুমার অধিকারী

সব আলো ম্লান হ'লে অন্ধকার যেন পরিস্ফুট।
দীর্ঘ নীলদেহ তরু অপসৃত, প্রহরী ছায়ার
চরণে বিস্তৃত এক তৃণার্দ্র প্রান্তর ;
একটি নির্জন হাত
স্থির হয়ে প'ড়ে থাকে অবসন্ন শিথিল দু'হাতে।

মসীলিপ্ত জলরেখা প্রসারিত ছায়ার মতন।
অরণ্য নিবিড় মনে অন্ধকার,
থরথর কাঁপে বিন্দু সঙ্কীর্ণ আলোতে।
একটি নিঃসঙ্গ তাল বিষণ্ণ বিজন বেদনায়
ছুঁয়ে থাকে জলের হৃদয়,
একটি নিঃশব্দ হাত আমার দু'হাতে।

অনেক মুহূর্ত কাঁপে—কাঁপে দু'টি স্পন্দিত হৃদয়
এখনই ছিল যে মগ্ন হৃদয়ের অমেয় দীপ্তিতে—
এখনই সে বহুদূর —অতিক্রান্ত শতাব্দীর পথ।
স্মৃতির গাঢ়তা শুধু হানে তীক্ষ্ণ যন্ত্রণার আঁস
অন্ধকার কাঁপে চারধারে।

চোখ তোলো বনলতা, আলো দাও, দাও
তোমার দু'হাত এই হাতে ;
বলো, এই অন্ধকার সত্য নয়,
ম্লান নয় শূন্যতার মত।
বলো, এই মুহূর্ত আমার মিথ্যা নয়।
ইডেন উদ্যানে সন্ধ্যা স্তব্ধ অন্ধকারে ;
বনলতা,
হৃদয়ের স্পর্শ দাও, দাও
দু'হাত আমার দুই হাতে।

শ্রীকরুণাকুমার নন্দী

দুর্গাপুরে চতুর্থ পরিকল্পনা

দুর্গাপুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের গত বার্ষিক অধিবেশনে ক্ষমতাসীন দলের উচ্চতম অধিকারীদের মধ্যে আগামী চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্পর্কে দুইটি বিভিন্ন এবং মূলতঃ পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির অভিব্যক্তি দেখতে পাওয়া গেল। একদিকে কংগ্রেসপতি শ্রীকামরাজ বলেন যে, বর্তমান প্রচণ্ড মূল্যবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে ২১,৫০০ থেকে ২২,৫০০ কোটি টাকা লগ্নীর পরিকল্পনা ভয়াবহ রকমের অতিবৃহৎ বলে তিনি মনে করেন এবং সেই কারণে উক্ত পরিকল্পনার জন্য লগ্নীর পরিমাণ উপযুক্ত ভাবে কমিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। তিনি বলেন যে, বর্তমান মূল্যবৃদ্ধির দ্বারা দরিদ্র এবং দুর্বল শ্রেণীর দেশবাসীর উপরে যে প্রচণ্ড চাপ বর্তাইয়াছে, তার ফলে প্রস্তাবিত ২১,৫০০ কোটি টাকার লগ্নী তাহাদিগকে আরও দুর্বল ও দারিদ্র্যভার-প্রপীড়িত করে তুলবে। এই প্রস্তাবিত লগ্নী কার্যকরী করতে হ'লে যে অতিরিক্ত ৩,০০০ কোটি টাকার বরাদ্দের ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলিকে করতে হবে, তার দায় বহন করা অসম্ভব হয়ে উঠবে। এ সকল কারণে চতুর্থ পরিকল্পনার লগ্নীর আয়োজন উপযুক্তভাবে কমিয়ে আনা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

অপর পক্ষে কংগ্রেসের চিরাচরিত এবং বিরোধহীন ভাবে গৃহীত আর্থিক ও সামাজিক আদর্শ সম্পর্কিত প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, "আর্থিক উন্নয়নের গতিবৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন" এবং "দূরদর্শী আর্থিক ও সামাজিক নীতির অনুসরণে বৃহত্তর চতুর্থ পরিকল্পনাকে রূপদান করতেই হবে।" এই দুইটি বিভিন্ন ও স্পষ্টত পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির অভিব্যক্তির যে প্রকাশ দেখা গেল তাতে আশঙ্কা হয় যে, এই বিষয়ে কংগ্রেসের উচ্চতম অধিকারীগোষ্ঠীর পরস্পরের মধ্যে একটা ব্যবধান ও বিভেদ সৃষ্টি হয়ে চলেছে। এই সম্পর্কে বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য এই যে, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী কংগ্রেস সভাপতির দৃষ্টিভঙ্গির স্বপক্ষে রায় দেন। এর ফলে সম্ভবতঃ এই বিষয়ে নেতৃগোষ্ঠীর উচ্চতম পর্যায়ে খানিকটা পরিমাণে পুনর্বিবেচনার একটা আবহাওয়া ইতিমধ্যেই সৃষ্টি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী যে ইতিমধ্যেই পরিকল্পনা কমিশনকে এই বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করবার আবেদন জানিয়েছেন, তাতে এই ধারণাই বদ্ধমূল করে। সম্ভবতঃ শীঘ্রই এখন জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের (National Development Council) একটি সভা আহূত হবে এবং সম্প্রতিকার উচ্চতম পর্যায়ের আলোচনার ফলে যে দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি হয়েছে তাহারই অনুসরণে চতুর্থ পরিকল্পনার পুনর্বিন্যাসের আয়োজন হবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, চতুর্থ পরিকল্পনার জন্য প্রস্তাবিত ২১,৫০০ কোটি টাকার লগ্নী বাস্তবপক্ষে যতটা অতিবৃহৎ মনে করা হয় ততটায় দাঁড়ায় না। সরকারী হিসাবে দেখা যায় যে,১৯৬০-৬১ ও ১৯৬৩-৬৪ সনের অন্তর্বর্তী কালে দেশে মোটামুটি মূল্যবৃদ্ধির পরিমাণ (পাইকারী) হয়েছে শতকরা ২৫'৪ টাকা, কিন্তু খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির পরিমাণ হয়েছে শতকরা ৪৪'৪ টাকা। এই দুইটি অঙ্কের অন্তর্বর্তী সংখ্যাটিকে যদি মূল্যবৃদ্ধির বাস্তব পরিমাণ বলে ধরে নেওয়া যায় তবে ১৯৬০-৬১ সনের তুলনায় মোটামুটি মূল্যবৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়ায় এখন শতকরা প্রায় ৩৫ টাকা। অর্থাৎ ১৯৬০-৬১ সনের মূল্যের ভিত্তিতে চতুর্থ পরিকল্পনার লগ্নীর ২১,৫০০ কোটি টাকার বাস্তব মূল্য দাঁড়ায় মোটামুটি ১৩,৯১৫ কোটি টাকার মতন। এই হিসাবের ভিত্তিতে বিচার করলে দেখা যাবে যে, চতুর্থ পরিকল্পনার প্রস্তাবিত লগ্নীর পরিমাণ বাস্তবপক্ষে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনার মোট লগ্নীর চেয়ে বেশী ত নয়ই, বরং তার চেয়ে অনেক কম। তা ছাড়া বর্তমান মূল্যবৃদ্ধির আবহাওয়ায় লগ্নীর আর্থিক (financial) পরিমাণের সামান্য কম-বেশী হওয়া না হওয়া খুব একটা বেশী সুবিধা বা অসুবিধা সৃষ্টি করবার কথা নয়।

আসলে সমাজের যে দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণীর কল্যাণের জন্য শ্রীকামরাজ স্বল্পতর লগ্নীর ভিত্তিতে চতুর্থ পরিকল্পনার পুনর্বিন্যাসের দাবি জানিয়েছেন সে বিষয়টিই বিবেচনা করা যাক। দেশের আর্থিক অবস্থা যে আজ একটা সঙ্কটজনক পরিণতিতে এসে পৌচেছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। মূল্যমান ক্রমাগতই বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে. বিশেষ করে খাদ্য-পণ্যাদি এবং অন্যান্য অবশ্যভোগ্যাদির ক্ষেত্রে এর চাপ অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে একথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, এই সম্পর্কে সময়োচিত প্রয়োগ ব্যবস্থা

অবলম্বন করতে পারলে বর্তমান সঙ্কটের অনেকটাই এড়িয়ে চলা সম্ভব ছিল। আমাদের দেশের কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ যে বছরে বছরে বদলায়, এ তথ্যটি আজকেই হঠাৎ আমাদের উপলব্ধিতে ধরা দেয় নি। এবং খাদ্যশস্যের উৎপাদন যে আশানুরূপ বৃদ্ধি পাচ্ছিল না, এ কথাও হঠাৎ জানতে পারা যায় নি। তা ছাড়া প্রতি বৎসর দ্রুতগতিতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এবং কর্মসংস্থানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে প্রতি বৎসরই যে খাদ্য ব্যয় বেড়ে চলবে এ কথাটা আগে থেকে উপলব্ধি করবার জন্য খুব একটা অসাধারণ বুদ্ধি বা কল্পনাশক্তিরও প্রয়োজন হবার কথা নয়। তার ওপর গত দু'বছরের বাজেটে প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে প্রভূত পরিমাণ অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দের ফলে সঙ্কট আরও জটিল হয়ে উঠেছে। যাঁরা খুব জোর গলায় ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, প্রতিরক্ষা ও উন্নয়ন পারস্পরিক পৃষ্ঠপোষকতার দ্বারা একটা সুসমঞ্জস স্বয়ংক্রিয় গতির সৃষ্টি করবে, তাঁরা যে কেবলমাত্র দেশপ্রেমের উত্তেজনায়ই এ-রকমটা ভেবে নিয়েছিলেন এখন তারও প্রমাণের অভাব নেই।

অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে প্রভূত উদাহরণ পাওয়া যাবে যে, কোন কোন আপাতঃ-ফলপ্রসূ প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রেই মূল রোগটির চেয়েও বিষময় ফল প্রসব করতে পারে। অনেক ক্ষেত্রেই রোগের চিকিৎসা বলে যা প্রয়োগ করা হয় তাতে কোন ফলই বর্তায় না, যদিও এর দ্বারা গোষ্ঠী-বিশেষের কোন কোন ক্ষেত্রে প্রভূত লাভ হয়ে থাকে। দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে যে নূতন মূল্যায়নের প্রয়াস করা হয়েছিল তারই ফল তৃতীয় পরিকল্পনাকালে পরিবহন, বিদ্যুৎ-শক্তি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সঙ্কুচিতপথ (bottleneck) রূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে যে বৈদেশিকী মুদ্রার সঙ্কট দেখা দেয় সেটা প্রথম পরিকল্পনা-কালে কর্মসংস্থান-সঙ্কটের সমাধানকল্পে যে প্রয়োগ গৃহীত হয় তারই ফল। বর্তমান মূল্যসঙ্কট মোচনকল্পে যাঁরা অতি দ্রুত কিছু-একটা প্রয়োগ-ব্যবস্থা করতে উদগ্রীব হয়ে উঠেছেন তাঁদের অতীতের এই সকল উদাহরণের দিকে দৃষ্টি দেবার সময় বা ধৈর্য নেই বলেই মনে হয়।

চাহিদা কমিয়ে মূল্যবৃদ্ধি দুই সপ্তাহের মধ্যে নিরোধ করবার খেলায় মজা পাওয়া যেতে পারে সন্দেহ নেই, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এটা সম্ভব হয় না। বিশেষ করে জীবনধারণের নিত্যপ্রয়োজনীয় অবশ্যভোগ্য সাধারণ পণ্যাদির বেলায় এটা আরও অসম্ভব। কিন্তু বর্তমানের চাহিদা বৃদ্ধির ধারা সংযত করতে হ'লে ঠিক এখানটাতেই আঘাত করা একান্ত প্রয়োজন। বস্তুতঃ ভোগ্য আয়ের পরিমাণ সঙ্কুচিত করতে পারলেই কেবল এটা সম্ভব করা যেতে পারে এবং তা করতে গেলে বিশেষ ক'রে নিম্ন আয়মানের ক্ষেত্রেই এই ভোগ্য আয় কমান একান্তই জরুরী : এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে সঙ্কোচন সম্ভব হ'লেই তবে চাউল, অন্যান্য খাদ্যপণ্য, বস্ত্র ও অনুরূপ অন্যান্য অবশ্যভোগ্যাদির চাহিদা সঙ্কোচ করা সম্ভব হ'তে পারে।

অন্যপক্ষে এই তত্ত্বটিও বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, অবশ্যভোগ্য পণ্যাদির চহিদা কমান, নিম্ন আয়ের ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সঙ্কোচ করতে না পারলে সম্ভব হবে না। অন্যথায় মজুরের মজুরীর হার কমিয়েও তা করা সম্ভব হ'তে পারে। মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে যে সকল আন্দোলন ও আলোচনা সাধারণতঃ হয়ে থাকে তাতে একটা মূল বিষয়ের প্রতি ঔদাসীন্য লক্ষ্য করা যায়। সেটি এই যে, নিম্নতম মানের আয়ের একটা প্রশস্ত পরিধিতে যে অতিরিক্ত চাহিদার অবস্থিতি দেখা যায় সেটা মূলতঃ এই ক্ষেত্রে গত কয়েক বৎসরে কর্মসংস্থানের প্রসার ও আয়বৃদ্ধি থেকেই বর্তাইয়াছে। একথা সত্য যে, উচ্চতর আয়ের ক্ষেত্রে উৎপাদনের মান বা পরিমাণ সঙ্কোচ না করেও আয়-সঙ্কোচের প্রভূত অবকাশ বর্তমান রয়েছে। তবে এই ক্ষেত্রটিতে সহজে কেউ হস্তক্ষেপ করতে সাহস পাবেন না, একথা অনুমান করতে অসুবিধা হয় না। যাঁরা এই গোষ্ঠীর মধ্যে পড়েন তাঁরা বিশেষ বিবেচনার অধিকারী (privileged) এবং সাধারণতঃ রাজনৈতিক শক্তিতে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ এবং বর্তমান অবস্থায় অত্যন্ত কঠোর প্রয়োগ ব্যতীত এঁদের বিশেষ অধিকারে সার্থকভাবে হস্তক্ষেপ করবার ক্ষমতা সরকারের নাই। কঠোর ব্যবস্থা এঁদের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়, কেননা তা হ'লেই প্রতিবাদ ধ্বনিত হবে হয় যে গণতন্ত্র নষ্ট করে ফেলবার প্রয়াস করা হচ্ছে কিংবা উৎপাদন প্রয়াস (incentive) নষ্ট হ'তে চলেছে। অতএব যাদের সামান্য মাত্র বা কোন আয়ই নেই তাঁদেরই কর্মসংস্থান থেকে বঞ্চিত করাই একমাত্র উপায়।

এটা একটা বিকৃত চিন্তার ফলমাত্র নয়। যে আয়ের ব্যবস্থা এখনও সৃষ্টি হয় নি সেটাকে বাদ দেওয়াই সহজ পন্থা। তৃতীয় ও চতুর্থ পরিকল্পনার নির্দ্ধারিত লক্ষ্যে পৌছুতে পারা সম্ভব হ'লে এই আয় বর্তমান বণ্টন ব্যবস্থার অধীনেও সৃষ্টি হ'তে বাধ্য। ফলে অনুরূপ গতিতে আরও মূল্যবৃদ্ধি ঘটার আশঙ্কাও অমূলক নয়। সমাজের ঘাড়ে বর্তমানে চেপে-বসা সমস্যাগুলিকে অবশ্যই উপেক্ষা করা চলে না এবং তজ্জনিত মূল্যবৃদ্ধির প্রকোপ সম্বন্ধে উপযুক্ত এবং কার্যকরী প্রয়োগের অবশ্য-প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু এ সকল সমস্যার সমাধান খুঁজতে গিয়ে বর্তমানের পণ্য

রবরাহের অপ্রতুলতাকে চিরদিনের জন্য কায়েম করে রাখবার ব্যবস্থা করাও কোন সমাধান নয়। আপাত-সমস্যার সমাধান জরুরী। কিন্তু তার চেয়েও জরুরী ভবিষ্যৎ লক্ষ্যের একটা স্পষ্ট স্বরূপের উপলব্ধি বর্তমান সমস্যার চাপে এই লক্ষ্য যাতে জটিলতার মধ্যে লুপ্ত না হয়ে যায় সেদিকে অবহিত হওয়া নিতান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে।

এই লক্ষ্য চতুর্থ পরিকল্পনায় যতটা বলা হয়েছে তার চেয়ে আরও স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। সেটা হ'লেই তবে পরিকল্পনা-বিন্যাসে কোথায় কতটা ঘাটতি (lack) বা অসামঞ্জস্য রয়েছে সেটাও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এর কতকগুলি শ্রীকামরাজের ভাষণে বিবৃত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে লগ্নীর শুধু পরিমাণ নয়, তার বিন্যাস (pattern), গতি,-প্রকৃতি ও বিভিন্ন খাতের লগ্নীর পারস্পরিক সামঞ্জস্য ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে একটা স্পষ্টতর চিত্র প্রয়োজন। লগ্নীর মোট পরিমাণ যত বৃহৎ হবে ততই এই সামঞ্জস্যের প্রয়োজনীয়তা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে, কেননা এই সামঞ্জস্যের দ্বারাই বৃহত্তর লগ্নীগুলি থেকে প্রবাহিত মূল্য চাপসৃষ্টির (inflationary pressures) আশঙ্কাটিকে নিরোধ বা অন্ততঃ সংযত করবার একমাত্র উপায়। পরিকল্পনা কমিশনের এই বিষয়ে ধারণা ও উপলব্ধি এ পর্যন্ত স্পষ্ট নয় বলেই প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু সর্বাগ্রে প্রয়োজন আর্থিক উন্নয়নের একটা সুসমঞ্জস ও স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপ। পরিকল্পনা-বিন্যাসের এই অবশ্যপ্রয়োজনীয় উপাদানটি পরিকল্পনা কমিশনের চিন্তায় এ পর্যন্ত লক্ষিত হয় নি।

অতীত অভিজ্ঞতা ও বর্তমান পরিস্থিতির ফলে চতুর্থ পরিকল্পনার যে প্রাথমিক রূপের প্রকাশ এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে তার ফলে সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটির একটা আমূল পুনর্বিন্যাস যে একান্ত প্রয়োজন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে এক ভাষণে খ্যাতনামা শিল্পপতি শ্রীজাহাঙ্গীর গান্ধী এ কথাটাই খুব স্পষ্ট করে বলেন। বৃহৎ শিল্পক্ষেত্রে তিনি বলেন এখন সম্প্রসারণের চেয়েও স্থিতিস্থাপন (consolidation) চতুর্থ পরিকল্পনার প্রাথমিক লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন। অন্য পক্ষে ক্ষুদ্র এবং বিস্তৃত শিল্প প্রতিষ্ঠার দ্বারা ভোগ্যপণ্য সরবরাহের আয়োজন প্রভূত পরিমাণে প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন। এর দ্বারা একদিকে কৃষি-শিল্পের প্রয়োগ-বিধির ক্রমিক উন্নয়ন (gradual sophistication) যেমন সহজ হয়ে উঠবে, তেমনি বর্তমানের অতিরিক্ত ভোগ-চাহিদা অনুরূপ সরবরাহে সামঞ্জস্য লাভ করবে এবং মূল্যমান সংযত হবে ও স্থিতি লাভ করবে। পরিকল্পনার আকার সঙ্কোচ করে কেবলমাত্র সম্ভাব্য উন্নয়ন গতি শ্লথ করে দেওয়া হবে। তার ফলে যেমন বর্তমান সঙ্কট থেকে মুক্তি পাবার কোনই সম্ভাবনা নেই, তেমনি উন্নয়ন লক্ষ্যে পৌছিবারও কোন আশা সুদূর ভবিষ্যতেও নেই। তবে চতুর্থ পরিকল্পনার বর্তমান ধারায়ও সেটি হবার সম্ভাবনা যে নেই সেটাও স্পষ্ট বুঝা প্রয়োজন। একমাত্র ইহার আমূল পুনর্বিন্যাসের দ্বারাই সঙ্কট-মুক্তির ও লক্ষ্যে পৌছিবার পথ প্রস্তুত হ'তে পারবে।

কলিকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহণে আবার মাশুল বৃদ্ধি

কলিকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার কর্মকর্তারা আবার পুনর্বিন্যাসের নামে ভাড়া বৃদ্ধি করেছেন। বর্তমান মূল্যমান বৃদ্ধির ধারায় সরকারী সংস্থাগুলি কি ভাবে সক্রিয় সহযোগিতা করছেন এটি তারই একটি অন্যতম উদাহরণ। অথচ বক্তৃতায়, বিবৃতিতে এবং আরও নানাভাবে বর্তমান দেশজোড়া আর্থিক সঙ্কটের (economic crisis) জন্য যে এই ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধিই প্রধানতঃ দায়ী একথাও তাঁরা বারবার আবৃত্তি করে চলেছেন। অবশ্য বর্তমান ক্ষেত্রে কলিকাতা ষ্টেট্ বাস সার্ভিসের অধ্যক্ষ ভাড়া যে বাড়ান হ'ল এ কথা স্বীকার করেন নি; তিনি বলছেন, ভাড়ার কাঠামোটির পুনর্বিন্যাস মাত্র করা হ'ল। তা ছাড়া শেষ পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে মাসিক টিকিট ব্যবস্থা করবার পূর্ব প্রতিশ্রুতিও এঁরা এখন অস্বীকার করেছেন। ষ্টেট্ বাস সংস্থার প্রধানাধ্যক্ষ গাঙ্গুলী মহাশয় সম্প্রতি প্রচারিত একটি বিবৃতিতে বলেছেন যে, "নানা কারণে এখন মাসিক টিকিট ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব হ'ল না।" এই কারণগুলি যে কি তা তিনি স্পষ্ট ক'রে বলেন নি। কোন সত্যকার কারণ আছে যার জন্য এই প্রতিশ্রুত ব্যবস্থা প্রবর্তন সম্ভব হ'ল না, এমন কথাও মনে করবার মতন কোন কারণ তিনি দর্শান নি। তবে একটি কথায় এই সম্ভাব্য কারণের একটু আভাস তিনি দিয়েছেন; তিনি বলেছেন যে, বর্তমান বৎসরে এই সংস্থার সম্ভাব্য লোকসানের পরিমাণ ৪০ লক্ষ টাকার মতন হবে বলে মনে হয়। মাসিক টিকিট ব্যবস্থা প্রবর্তন করলে ভাড়া থেকে আয় খানিকটা কমে যাবে বলে আশঙ্কা করা যায়; তা হ'লে এই লোকসানের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাবে। সেই কারণেই হয়ত মাসিক টিকিট প্রবর্তন করবার পূর্ব-সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই লোকসানের আশঙ্কা হঠাৎ নিশ্চয় আবিষ্কৃত হয় নি? লোকসান যে হবেই সেটা নিশ্চয়ই আগে থেকেই অনুমান করা গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও তাঁরা এরকম প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কেন? কারণটা খুবই স্পষ্ট বলে মনে হয়। ভাড়ার পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাবের দরুন যে অনিবার্য প্রতিবাদ গড়ে উঠবে, সেটিকে এই রকম একটা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঠেকিয়ে

রাখবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কেননা জনসাধারণ আশা করেছিলেন যে, এই পুনর্বিন্যাসের ফলে তাঁদের উপরে যে ভাড়াবৃদ্ধির চাপ বর্তাবে, সেটি মাসিক টিকিট ব্যবস্থার দ্বারা খাইয়ে দেওয়া যাবে। তাঁরা আশঙ্কা করতে পারেন নি যে, কোন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী তাঁদের মাত্র ধোঁকা দেবার জন্যই এরূপ একটি অঙ্গীকার প্রচার করবেন এবং আপন উদ্দেশ্যটি হাসিল করে নিয়ে পূর্ব-প্রতিশ্রুতিটি বিনা দ্বিধায় বা লজ্জায় বাতিল করে দেবেন। বস্তুতঃ হয়েছে কিন্তু তাই। সরকারী মিথ্যাচারের এরূপ উদাহরণ আর খুব বেশী খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ভাড়ার পুনর্বিন্যাসের ফলে সৎযাত্রীদের উপর কতটা অতিরিক্ত চাপ বর্তাবে তার একটা আনুমানিক হিসাব সম্ভব। একটি মাত্র রুটের উদাহরণ নেওয়া যাক। এই রুটে গোড়া থেকে শেষ গন্তব্য পর্যন্ত ৯টি ষ্টেজ ছিল; যথা ৮ পয়সা, ৯ পয়সা, ১২ পয়সা, ১৬ পয়সা, ১৮ পয়সা, ২১ পয়সা, ২৪ পয়সা, ২৮ পয়সা ও ৩১ পয়সা। এখন এই ৯টির মধ্যে প্রথম দুইটি ষ্টেজের ভাড়া হবে ১০ পয়সা ক'রে, তার পরের দুইটি ষ্টেজের ভাড়া হবে ১৫ পয়সা করে, তার পরের দুইটির ২০ পয়সা করে, তার পরের একটি ষ্টেজে ভাড়া হবে ২৫ পয়সা এবং শেষ দুইটি ষ্টেজে ৩০ পয়সা। অর্থাৎ প্রথম দুইটি ষ্টেজে ১ ও ২ পয়সা করে ভাড়া বাড়বে, দ্বিতীয় দুইটি ষ্টেজের প্রথমটিতে ৩ পয়সা বৃদ্ধি ও দ্বিতীয়টিতে ১ পয়সা কমতি হবে, তার পরের দুইটি ষ্টেজের প্রথমটিতে ২ পয়সা বাড়বে এবং দ্বিতীয়টিতে ১ পয়সা কমবে, তার পরের একটি ষ্টেজে ১ পয়সা ভাড়া বাড়বে এবং শেষ দুইটি ষ্টেজের একটিতে ২ পয়সা বাড়বে এবং অন্যটিতে ১ পয়সা কমবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, মোট নয়টি ষ্টেজের মধ্যে ৬টি ষ্টেজের ভাড়া বাড়বে এবং মাত্র ৩টি ষ্টেজের ভাড়া কিছু কমবে। বাড়তি ষ্টেজের মধ্যে একটিতে ৩ পয়সা বাড়বে, ৩টিতে ২ পয়সা করে বাড়বে এবং মাত্র দু'টি ষ্টেজে ১ পয়সা বাড়বে। অন্য পক্ষে মাত্র ৩টি ষ্টেজে ভাড়া কমবে এবং সেই কমতির হার হবে মাত্র ১ পয়সা করে। অতএব মোটামুটি ফল এই পুনর্বিন্যাসের এই হবে যে, যাত্রীর পক্ষে ভাড়ার চাপ মোটামুটি এই রুটে প্রায় ১০ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাবে। এই ভাবে অন্য সকল রুটগুলিতেও যদি ভাড়ার বর্তমান পুনর্বিন্যাসের বিশ্লেষণ করা যায় তবে দেখা যাবে যে, সে সকল ক্ষেত্রেও মোটামুটি অনুরূপ অনুপাতেই ভাড়ার চাপ বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ কলিকাতা ও বৃহত্তর কলিকাতা এলাকার সকল নিম্ন ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতি পরিবারের এই খাতে খরচা মাসে গড়পড়তা শতকরা ১০ টাকা করে বেড়ে যাবে। এই প্রসঙ্গে একথা স্পষ্ট করে বোঝা উচিত যে, এই শ্রেণীর পরিবারগুলির অবশ্যভোগ্য ব্যয়গুলির মধ্যে প্রধান খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও পরিবহণ ব্যয়। কিছুকাল আগে আমরা একটি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মাসিক আয়-ব্যয়ের হিসাবের যে, খসড়া প্রকাশ করেছিলাম, তাতে দেখা গিয়েছে যে সাধারণতঃ নিম্নবিত্ত পরিবারগুলির যানবাহনের খরচাতেই মাসিক আয়ের প্রায় শতকরা ২ টাকা খরচা হয়ে যায়। বর্তমান পুনর্বিন্যাসের ফলে এই খরচা আরও প্রায় শতকরা ২॥০ বৃদ্ধি পাবে।

ষ্টেট্-বাস সার্ভিসের দক্ষতার পরিচয় এই যে আজ পর্যন্ত এটি লোকসানেই চলেছে। গাঙ্গুলী মহাশয় এর কারণ দর্শিয়েছেন সরকারী করভার। এই করভার ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত বাস সার্ভিসগুলির উপরে বিন্দুমাত্র কম নয়, বরং কিছু বেশী। তবু তারা এই ব্যবসায়ে মুনাফা করে থাকে, কেবল সরকারী পরিচালনায় চললেই লোকসান হতে থাকে। এর একটি প্রধাণ কারণ, এর শিরভার প্রপীড়িত (top heavy) উচ্চতম কর্মী-সংসদ। এক গাদা অকর্মণ্য মোটা মাহিয়ানার কর্মচারী এর জন্য প্রধানতঃ দায়ী। ষ্টেট্ বাস সার্ভিসের কারখানাগুলির দিকে তাকালেই এটা স্পষ্ট বোঝা যাবে। যতগুলি বাস রাস্তায় চালু থাকে তার তুলনায় কতকগুলি মেরামতের জন্য অচল হয়ে থাকে সেটা এর খানিকটা উদাহরণ। তার উপরে রাস্তায় চালু বাসগুলির দৈনিক কতকগুলি বাস চলতে চলতে অচল হয়ে পড়ে, তাও এর একটি অন্য উদাহরণ। তা ছাড়াও প্রচণ্ড ব্যয়ে চালু এদের নিজেদের কারখানায় ছাড়াও বাইরে কতটা মেরামতী খরচা ষ্টেট্ বাস সার্ভিসকে দিতে হয়, লোকসানের সেটি আরও একটি অতিরিক্ত কারণ। বাসযাত্রীদের অসুবিধার অন্ত নাই। প্রচণ্ড ভিড় ত দৈনিক বৃদ্ধি পাচ্ছেই। তার ওপর আছে প্রায়ই দুর্ঘটনা, ষ্টেট্ বাসের সময়ের অনিশ্চয়তা এবং অন্যান্য অনেক অসুবিধা। ড্রাইভার, কণ্ডাক্টারের যাত্রীদের উপরে ব্যবহারও প্রায়ই অত্যন্ত আপত্তিজনক হয়ে ওঠে। মোটামুটি এই ধারণা লোকের বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, পয়সা খরচ করেও যাত্রীদের অসুবিধা ও অপমান সহ্য করে চলতেই হবে। গাঙ্গুলী মহাশয় এর যে কোন প্রকার সুরাহা করবার চেষ্টা করেন এমন কোন প্রমাণ আজও পাওয়া যায় নাই। যেটুকু প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে সেটুকু একদিকে অকর্মণ্যতার ও অন্যদিকে ধূর্ত ব্যবহারের। বর্তমান ভাড়ার পুনর্বিন্যাস এই ধূর্তামিরই আর একটি উদাহরণ।

ভারতে বিদেশী পুঁজির লগ্নী

ভারতে আগামী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে অধিকতর

পরিমাণে বিদেশী পুঁজি লগ্নীর জন্য নানাবিধ সুযোগ-সুবিধার আয়োজনের কথা সকলেই জানেন। কিছুদিন পূর্বে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এই উদ্দেশ্যে এবং যাতে অধিকতর পরিমাণে বিদেশী ব্যক্তিগত পুঁজি লগ্নীর পক্ষে উপযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি হ'তে পারে এই জন্য কতকগুলি বিশেষ সুবিধার কথা ঘোষণা করেন। বর্তমানে এই সুযোগ আরও বিস্তৃত করে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত অধিকারের বাইরে শিল্পায়নে বিদেশী পুঁজির সহযোগিতার এতকাল একটি সর্ত ছিল; ভারতীয় শিল্পপতিরা এ-বিষয়ে প্রাথমিক আয়োজন গঠন করবেন এবং উপযুক্ত বিদেশী সহযোগিতা সংগ্রহ করবেন। এই নীতির ফলে ব্যক্তিগত মালিকানায় শিল্পায়নের ক্ষেত্রে কতকগুলি অনিবার্য বাধা ও বিলম্বের কারণ ঘটেছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে ভারতীয় শিল্পপতিরা নির্দ্ধারিত লাইসেন্স পাবার পরও বহুকাল পর্যন্ত বিদেশী সহযোগিতা সংগ্রহ করতে সফল হন নি; কোন কোন ক্ষেত্রে কাম্য বিদেশী সহযোগিতার ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও কোন কোন ভারতীয় শিল্পপতি নির্দ্ধারিত শিল্পটির প্রতিষ্ঠায় আর অগ্রসর হন নি। এসকল কারণে বিদেশী ব্যক্তিগত পুঁজি লগ্নী এদেশে অনেক সুযোগ ও সুবিধা সত্ত্বেও খুব একটা বিস্তৃতি লাভ করে নি। সম্ভবতঃ বিদেশী পুঁজিপতিরা ভারতীয় শিল্পপতির অধিকারে ও পরিচালনায় তাঁদের পুঁজি লগ্নী করতে খুব আগ্রহশীল হয়ে ওঠেন নি।

ভারতের উন্নয়নকল্পে বিদেশী পুঁজি লগ্নী এ পর্যন্ত কি সরকারী বা বেসরকারী প্রয়োগে বেশীর ভাগই ঋণের দ্বারা সাধন করা হয়েছে। এই ঋণ খানিকটা ঋণদাতা ও গ্রহীতা দেশ দুইটির দুই সরকারের মধ্যে চুক্তিদ্বারা সংগৃহীত হয়েছে; কিছুটা আবার ওয়ার্লড্ ব্যাঙ্ক, আই এম এফ এবং অনুরূপ আন্তর্জাতিক সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে পাওয়া গিয়েছে। এই ঋণের দায় এই পর্যন্ত যতটা গ্রহণ করা হয়েছে তার ফলে ১৯৬৫-৬৬ সন থেকে ভারতকে বার্ষিক ১১০০ কোটি টাকা হিসাবে শোধ দিতে সুরু করতে হবে— এর মধ্যে বার্ষিক ৬০০ কোটি টাকা সুদ হিসাবে দেয় হবে এবং বাকী ৫০০ কোটি টাকা আসলের কিস্তি। এই দায়টি নিতান্ত লঘু নয়। তার ওপর আছে আনুসঙ্গিক বিদেশী বিশেষজ্ঞ সহায়তার মূল্য; যার একটা মোটা অংশও বিদেশী মুদ্রায় দিতে হয়। তা ছাড়া, চতুর্থ ও পরবর্তী পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়ণের জন্য পূর্বের তুলনায় আরও অধিকতর পরিমাণে বিদেশী মুদ্রার প্রয়োজন হবে। গত দুই বৎসরে আমাদের রপ্তানী বাণিজ্য অনেকটা প্রসার লাভ করেছে সত্য, কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনা-কালে শিল্পযন্ত্রাদির আমদানীর প্রয়োজন এতটা বৃদ্ধি পেয়েছে যে আমাদের নীট দেয়ের পরিমাণ (balance of payments position) নিতান্তই সঙ্কটজনক অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। তার ওপর ঋণের কিস্তি ও সুদের দায় এই অবস্থাটিকে আরও সঙ্কটজনক করে তোলবার আশঙ্কা অবশ্যই আছে। তা ছাড়া বৃহত্তর চতুর্থ পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় আনুপাতিক বৃহত্তর অঙ্কের বিদেশী মুদ্রার চাহিদা বৈদেশিক ঋণ থেকে সম্পূর্ণ মিটবে এরূপ ভরসা করা যাচ্ছে না। ফলে এদেশে বিদেশী ব্যক্তিগত পুঁজি লগ্নীর স্বপক্ষে অধিকতর আগ্রহশীল আবহাওয়া সৃষ্টি করবার জন্য সরকার উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধার আয়োজন করে দেবার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছেন।

অন্যপক্ষে অনেকে মনে করেন যে, যতটা পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রার ঋণের প্রয়োজন বিদেশী পুঁজি লগ্নীর দ্বারা মেটান যায় ততই মঙ্গল। কেননা এই ক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধের দায় বা সুদের বোঝা ঘাড়ে পড়বে না। তা ছাড়া শিল্পায়নে এই ধরনের বিদেশী পুঁজি ও শিল্পপতিদের সহযোগীতা উপযুক্ত পরিমাণে সংগ্রহ করতে পারলে, সঙ্গে সঙ্গেই প্রয়োজনীয় বিদেশী বিশেষজ্ঞ সহযোগিতারও ব্যবস্থা হবে এবং পরিচালন দায়িত্বের বোঝাও খানিকটা তাঁরাই বহন করবেন। অতএব ঋণের চেয়ে এর বোঝা অনেক হাল্কা হবে। বিদেশী ঋণের যে মূল্য বর্তমানে ভারতকে দিতে হচ্ছে তার বোঝা যে প্রচণ্ড, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহের অবকাশ অবশ্য নেই। এ পর্যন্ত বিদেশ থেকে আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির সাহায্যার্থে যত ঋণ গ্রহণ করা হয়েছে তার বেশীর ভাগটাই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র থেকে এসেছে। এর মূল্যের একটা মোটামুটি হিসাবের খসড়া প্রস্তুত করা যেতে পারে। এ সকল ঋণের একটা সর্ত এই যে, প্রতিটি ঋণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিল্পের রূপায়ণের জন্য যে-সকল শিল্পযন্ত্রাদি বিদেশ থেকে আমদানী করতে হবে, তার অধিকাংশ অংশটাই ঋণদাতা দেশ থেকে নিতে হবে। দেখা গেছে যে, এই খাতে ব্যয়ের পরিমাণ গড়পড়তা মোট ঋণের শতকরা ৬০ ভাগ অধিকার করে। আমেরিকা থেকে এসব বস্তু খরিদ করবার মূল্যও অত্যধিক, সাধারণতঃ জগতের অন্যান্য দেশের তুলনায় এর মূল্য মোটামুটি শতকরা ৩৭ ভাগ বেশী। সুদের হার সাধারণতঃ বার্ষিক শতকরা ৫$\frac{3}{4}$ ভাগ এবং যতদিন পর্যন্ত ঋণের অর্থ সম্পূর্ণ পরিমাণে কাজে লাগান না হয়, ততদিন পর্যন্ত বার্ষিক ১% হারে ঋণ পরিচালনা খরচ (Loan servicing cost) দিতে হয়। সাধারণতঃ এই সময়টি ৩ থেকে ৫ বৎসর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। অর্থাৎ তিন বৎসরে এই খাতে ৩% ব্যয় করা প্রয়োজন হয়। এর উপরে শিল্পটির রূপায়ণ ও প্রাথমিক পরিচালনা কালের

পাঁচ বৎসরে সাধারণতঃ বিশেষজ্ঞ উপদেশের (Consultation Service) জন্য ও বিদেশী বিশেষজ্ঞ সহযোগিতার জন্য বার্ষিক প্রায় ৫% খরচ হয়ে থাকে। অর্থাৎ আমেরিকা থেকে সংগৃহীত ঋণের মূল্য দাঁড়ায় প্রায়—আসল ছাড়াও মোটামুটি—আরও প্রায় ১৪০ পার্সেণ্টের মতন কিংবা তার চেয়েও কিছু বেশী। অতএব বিদেশী ঋণের মূল্য যে দেশের পক্ষে প্রচণ্ড, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। তা ছাড়া এই ঋণের সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ সহযোগিতার সত্যকার কার্যকারিতা সম্বন্ধেও গভীর সন্দেহের অবকাশ আছে। এই বিষয়ে বিদেশী সরকার বা ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলির কোন সরাসরি দায়িত্ব থাকে না বা থাকা সম্ভব নয়। ফলে অনেক ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ কুশলীর বদলে যে আমরা কতকগুলি অপেক্ষাকৃত অকর্মণ্য ও উচ্চমূল্যের কারিগরমাত্র আমদানী করে থাকি এই উদাহরণও বিরল নয়। বিদেশী পুঁজি লগ্নীর ক্ষেত্রে এ সকল সমস্যার উদ্ভব হওয়ার আশঙ্কা কম। বিদেশী পুঁজিপতি বা শিল্পপতি মুনাফার লোভেই এ দেশে লগ্নী করতে আগ্রহ দেখাবেন আশা করা যায়। মুনাফা করতে হ'লে যে সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠানে তাঁরা লগ্নী করবেন তার কলকারখানাগুলি যাতে মজবুত ও আধুনিক হয়, যে-সকল কুশলী তাঁরা এর রূপায়ণ ও পরিচালনার জন্য এ দেশে পাঠাবেন তাঁরা যাতে সত্যিই দক্ষ ও নির্ভরযোগ্য হন এ বিষয়ে তাঁরা যে যত্নবান হবেন সেটা অনিবার্য। এবং এঁদের মজুরি যাতে শিল্পটির আয়ক্ষমতার আয়ত্তের মধ্যে সীমিত থাকে সেটাও তাঁরা নিশ্চয়ই দেখবেন। অতএব যাতে করে অধিকতর পরিমাণে বিদেশী পুঁজি এদেশে লগ্নীর জন্য আকৃষ্ট হ'তে পারে তার আয়োজন করতে কেন্দ্রীয় সরকারের মুখপাত্ররা তৎপর হয়ে উঠেছেন। এই সাপক্ষে পূর্বেই প্রভূত পরিমাণে ভারতীয় পুঁজিপতিদের আয়ত্তাতীত কতকগুলি সুবিধাজনক সর্তের প্রবর্তন করেছেন। বর্তমানে একটি মাত্র প্রতিবন্ধক যা এতদিন ছিল, অর্থাৎ এই সম্পর্কে একমাত্র ভারতীয় শিল্পপ্রযোজকদের প্রাথমিক অধিকার এরূপ সহযোগিতার আয়োজন করবার জন্য, সেটিও এখন প্রত্যাহৃত হ'ল। এখন যে কোন বিদেশী শিল্পপ্রযোজক আপন দায়িত্বে পরিকল্পনার কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নূতন শিল্প প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠার সকল প্রয়োজনীয় আয়োজন ভারত সরকারের অনুমোদন নিয়ে নিজেরাই করতে পারবেন। কেবলমাত্র এটি করতে হ'লে এদেশে তাঁদের একটি কোম্পানী আইনানুমোদিত প্রতিষ্ঠান রচনা করতে হবে এবং ভারতীয় লগ্নীকারককে ইহার একটা অংশ গ্রহণ করবার আমন্ত্রণ জানাতে হবে। যদি ব্যক্তিগত লগ্নীকারকরা এতে আকৃষ্ট না হন, তা হ'লে ডেভালাপমেণ্ট ব্যাঙ্ক, কিংবা আই এফ সি, এল আই সি বা আই সি আই সি আই বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠানগুলি এসকল কোম্পানীর ভারতীয় মুদ্রায় প্রয়োজনীয় পুঁজির ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন।

বলা হয়েছে যে, বিদেশী ঋণের চেয়ে এরূপ বিদেশী পুঁজি লগ্নীর ব্যয় দেশের পক্ষে অনেক কম হবে। আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হবে, বিশেষ করে যখন ঋণ পরিশোধের ও সুদের দায় থাকবে না। কিন্তু ঋণের দায় একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে লগ্নীকৃত বিদেশী পুঁজির মুনাফা ও বিদেশী কুশলী ও অধ্যক্ষগোষ্ঠীর সহযোগিতার মূল্য যতদিন এ সকল শিল্প চালু থাকবে ততদিনই দিতে হবে। তুলনায় কোন্ বোঝাটা শেষ পর্যন্ত বেশী ভারী হয়ে উঠবে বুঝতে খুব বেশী দূরদৃষ্টি বা বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। তা ছাড়া নূতন সর্তে বিদেশীদের আজ্ঞাধীন থেকে আত্মনির্ভরশীল ভারতীয় কুশলী ও পরিচালকগোষ্ঠী গড়ে ওঠার প্রচণ্ড বাধা সৃষ্টি হবার আশঙ্কা রয়েছে। তা ছাড়াও বিদেশী পুঁজিপতিদের যদি দেশের শিল্পক্ষেত্রে একটা এরূপ বিস্তৃত স্থান অধিকার করতে দেওয়া হয়, তা হ'লে আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা সত্ত্বেও যে বিদেশীর আর্থিক কুমতের অধীন হয়ে পড়বার আশঙ্কা আছে সেটাও ভাববার বিষয়।

সরকারী নেতারা মনে করেন যে, বর্তমান সর্তটি প্রবর্তিত হবার ফলে বিদেশী পুঁজির এদেশে লগ্নীর একটা প্রবাহ প্রবর্তিত হবে। অনুন্নত অন্যান্য দেশের তুলনায় এদেশে এখন একটা কায়েমী রাজনৈতিক শান্তি ও স্থিরতা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং সেইটিই হবে বিদেশী পুঁজি আকর্ষণ করবার প্রধানতম উপাদান। রাজনৈতিক স্থিরতা আছে সত্য, কিন্তু গত কয়েক বৎসর ধরে আমরা এদেশে দ্রুতগতিতে যে আর্থিক সঙ্কটের কূলে এসে পৌছেছি তাতে লগ্নীর নিরাপত্তা সম্বন্ধে আশঙ্কা হওয়া অস্বাভাবিক নয়, এমনকি বর্তমান রাজনৈতিক স্থিরতা (Political Stability) বিঘ্নিত হবার আশঙ্কাও নিতান্ত অমূলক নয়। স্থির মস্তিষ্কে বিচার করে দেখলে বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল প্রকৃতি এবং তার রূপায়ণের ধারাই বিশেষ করে আমাদের বর্তমান আর্থিক সঙ্কটের জন্য দায়ী।

পর্বতের মূষিক প্রসব ?

সম্প্রতি প্রকাশিত একটি সংবাদে জানা গেল যে, মাত্র অল্প কিছুদিন পূর্বে প্রবর্তিত (এবং এটিও বারে বারে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পরিণতি লাভ করেছিল) কেন্দ্রীয় খাদ্যনীতি আবার নূতন করে পরিবর্তিত হচ্ছে। অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য সম্পর্কে সত্যিকারের কোন সুস্থ ও

...র নীতি কখনও ছিল বা এখনও আছে এমন মনে করা ...ল হবে। বৎসরাধিক কাল ধরে দেশের খাদ্য পরিস্থিতি ...খন দ্রুত একটা গভীর সঙ্কটের দিকে এগিয়ে চলছিল, তখন কেন্দ্রীয় সরকার এবং তাঁদের খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত ...ন্ত্রী সর্দার স্বর্ণ সিংহ, নিতান্ত ঔদাস্যভরে চেয়েছিলেন মাত্র। অবশ্য তিনি এবং তাঁর সহকারী মন্ত্রী শ্রীটমাস যে ক্ষণে ক্ষণে খাদ্য ব্যবসায়ীগোষ্ঠী ও মুনাফাবাজদের প্রতি কঠিন হুমকি প্রয়োগ করেন নাই এমন নয়।

তারপর যখন শ্রীসুব্রহ্মণ্যম্ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ভার গ্রহণ করেন তখন তিনি একটি জাতীয় খাদ্যনীতি রচনার প্রয়োজনের কথা বলতে সুরু করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি খাদ্য ব্যবসায়টিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করবারও প্রস্তাব করেন। একই সঙ্গে ...তন প্রধানমন্ত্রী খাদ্যশস্য মজুতদারদের প্রতি হুমকি প্রয়োগ করেন যে, তাঁরা যদি দুই সপ্তাহের মধ্যে লুকোন মজুদ শস্য বাজারে না ছাড়েন তবে……ইত্যাদি। দুই সপ্তাহ প্রায় দুই মাসে পরিণত হ'ল। মজুতদারেরা সুস্থ চিত্তে বহাল তবিয়তে সরকারের এবং কংগ্রেস দলের উচ্চতম অধিকারীদের অন্দরমহলে যথারীতি আনাগোনা করিতেই ছিলেন, তাহাদের গায়ে আঁচটুকু পর্যন্ত লাগিল না।

তারপর হঠাৎ খাদ্যশস্যের মুনাফাবাজদের শায়েস্তা করবার জন্য একটি জরুরী আইন পার্লামেন্টের শীতকালীন অধিবেশনের মাত্র কয়েকদিন পূর্বে প্রবর্তিত হ'ল। চাউল, তৈল ইত্যাদির নিয়মতম ও উচ্চতম মূল্য বিধিবদ্ধ করা হ'ল এবং নির্দিষ্ট মূল্যের কমে বা বেশীতে কোন ব্যবসায়ী এ সকল পণ্য খরিদ বা বিক্রয় করলে তাদের সাজা দেবার ব্যবস্থা হ'ল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই জরুরী আইনের প্রয়োগ সম্পর্কিত কোন তথ্য আজ পর্যান্ত প্রচারিত বা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। এই বিষয়ে সকল প্রশ্নই সরকার যথাসম্ভব এড়িয়ে চলেছেন।

এখন জানা যাচ্ছে যে, আগামী ফাল্গুন মাসে গমের নূতন ফসল ওঠবার পরেও যে কোন ব্যবস্থা হবে এমন আশা নাই। কেন্দ্রীয় সরকার স্থির করেছেন যে, তাঁদের গুদামে খাদ্য-শস্যের মজুদের পরিমাণ যথেষ্ট বৃহদাকার না হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন প্রয়াসে ফল হবার সম্ভাবনা নেই। অবশ্য চালের বেলায় যা করা হয়েছে, গমের নূতন ফসল ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেও তার একটা নির্দ্ধারিত নিম্নতম খরিদ মূল্য ও উচ্চতম বিক্রয় মূল্য বেঁধে দেওয়া হবে, কিন্তু সেটি প্রয়োগ করবার কোন প্রয়াস করা হবে না। অর্থাৎ খোলা বাজারে সরবরাহ ও চাহিদার সামঞ্জস্যের ফলেই এর বাস্তব মূল্য নির্দ্ধারিত হ'তে থাকবে। এই সম্পর্কে যে বিষয়টি সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয় সেটি হ'ল একদিকে এই যে পর পর দুই বৎসর ধরে বৃহত্তম চাউলের উৎপাদনের কালেই দেশের কঠিনতম খাদ্য-সঙ্কট দেখা দিয়েছে এবং অন্যদিকে এ বিষয়ে কোন সার্থক আয়োজন বা প্রয়োগের বুদ্ধি বা শক্তি কোন-টাই আমাদের বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের নাই। হয়ত এরূপ কোন সার্থক প্রয়োগের সদিচ্ছাও তাঁদের কোন কালেই ছিল না।

ভারত কোষ ঃ বৈজ্ঞানিক শব্দ

অশোককুমার দত্ত

বহু প্রতীক্ষার পর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তত্ত্বাবধনায় "ভারতকোষ প্রথম খণ্ড" প্রকাশিত হ'ল। ভারতকোষ—নামেই প্রকাশ—বিশ্বকোষ বা বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ জাতীয় অনুসন্ধান বা রেফারেন্স বই নয়, বিশ্ববিদ্যার যে সমস্ত অংশ ভারত সম্বন্ধে বিশেষরূপে প্রযোজ্য তাই এখানকার আলোচনার বিষয়। ভারতকোষ গ্রন্থের উদ্দেশ্য তা বলে মোটেই খণ্ডিত ...র্থ নয়, বিশ্বকোষের সমস্ত বিষয় এখানে স্থান পায় না সত্য, কিন্তু বিশ্বকোষে যা নেই ভারত-সংক্রান্ত সে সমস্ত বিশেষ আলোচনা এখানকার উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ। সে হিসাবে ভারতকোষ বিশ্বকোষের অনুপূরক এবং বিশেষ উদ্দেশ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থ।

ভারত কোষ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, সে পরিসর বা প্রস্তুতি আমাদের নেই। তবে সীমাবদ্ধ ভাবে ভারতকোষে অন্তর্ভুক্ত বিজ্ঞান শব্দগুলি নিয়ে কিছু আলোচনার আমরা সূত্রপাত করতে পারি। সঙ্গত কারণেই বৈজ্ঞানিক জগতের কিছু কিছু পারিভাষিক কথা—বিজ্ঞানের নানা তথ্য ও ধারণা—ভারতকোষের প্রসঙ্গ হিসাবে স্থান পেয়েছে। প্রথম খণ্ডের দেওঘর থেকে উমানাথ সেন পর্যন্ত বিচিত্র বিষয়ে একমাত্র বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রসঙ্গ-সংখ্যা অন্যূন ৯৩টি। কোষ গ্রন্থের সম্পাদকমণ্ডলী—যাঁদের অন্তত তিনজনই বৈজ্ঞানিক—সবিশেষ বিজ্ঞান-চেতনার পরিচয় দিয়েছেন। আলোচিত বিজ্ঞান প্রসঙ্গগুলি মোটামুটিভাবে সুনির্বাচিত, তবে এরিয়েল, অ্যালকলি, অ্যামালগাম (পারা-মিশ্রিত সংকর ধাতু), অ্যামিনো এসিড, অ্যাকুয়া-রিজিয়া, ARE (মেট্রিক পদ্ধতিতে জমির মাপ, ১০০ বর্গমিটার বা ১১৯.৬ বর্গগজ), ইলেকট্রন-ভোল্ট, ইলেকট্রোপ্ল্যাটিং, এমালসন, এনজাইম, আইসোবার ইত্যাদি শব্দ আলোচিত হওয়া উচিত ছিল। INTERNATIONAL GEOPHYSICAL YEAR (আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ বিজ্ঞান বর্ষ) সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে, কিন্তু তার পূর্ববর্তী INTERNATIONAL POLAR YEAR

(আন্তর্জাতিক মেরু বর্ষ) সম্বন্ধে কোন আলোচনা নেই। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী থেকে সূচিত হ'লেও INTERNATIONAL QUIET SUN YEAR (আন্তর্জাতিক শান্ত সূর্য বর্ষ) সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় বা উপায় ছিল। ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিসটিক্যাল ইনষ্টিটিউট সম্বন্ধে আলোচনা রয়েছে, কিন্তু ভারতীয় শিল্পদ্রব্যের মান-নির্ণয় সংস্থা ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ইনষ্টিটিউশন (INDIAN STANDARD INSTITUTION) সম্বন্ধে কোন আলোচনা নেই দেখে বিস্মিত হয়েছি। বিজ্ঞানের বিষয়গুলিতে অন্তত, বিষয়-নির্বাচন ব্যাপারে সম্পাদক-মণ্ডলীর আরও বেশি সচেতন হওয়া উচিত ছিল।

কোষ গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে, তা একের চিন্তা বা পরিশ্রমের ফল-মাত্র নয়, বহু বিচিত্র ফুল থেকে সংগৃহীত মধুভাণ্ড মৌচাকের মত বহু লেখকের লেখায় কোষ গ্রন্থ কোষে কোষে জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। লেখা ও লেখকের এই বিচিত্র সমাবেশের ফলে সম্পাদনার দায়িত্ব বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সঙ্গীতের আসরে যেমন বহু যন্ত্রের বিচিত্র স্বরের মধ্য থেকে মূল একটি সুর জেগে ওঠে, কোষ গ্রন্থের প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে তেমনি একটা অখণ্ড বোধ যেন সঞ্চারিত হয়। এই মূল একটা সুরের অভাব ভারতকোষে বিশেষ করে অনুভূত হয়েছে। আমরা ভারতকোষে আলোচিত বিজ্ঞান বিষয়গুলিতেই মনোযোগ সীমাবদ্ধ করেছি। পৃথকভাবে দেখতে গেলে কতকগুলি বিষয় খুবই সুলিখিত, অপরাধ বিজ্ঞান আপেক্ষিকতাবাদ আলোক চিত্রণ ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা বিষয়ানুগ এবং সত্যসত্যই প্রশংসনীয়, কিন্তু এদের পাশাপাশি বহু প্রসঙ্গ রয়েছে, যাদের আলোচনা অসম্পূর্ণ অস্পষ্ট, শুধু তাই নয় ত্রুটিযুক্ত। কোষ গ্রন্থে ভুল আলোচনা কি ভাবে সন্নিবেশিত হ'তে পারে এ এক আশ্চর্য বিষয়। ভারতকোষ আরও তিনটি খণ্ডে সম্পূর্ণ হবে। প্রথম খণ্ডের ভুল-ত্রুটি যাতে পরবর্তী খণ্ডগুলিতেও সংক্রামিত না হয় এবং প্রথম খণ্ডের পরবর্তী সংস্করণ সংশোধনের সুযোগ পায়, সেজন্য সমালোচকের ছিদ্রান্বেষী মন নিয়ে কয়েকটি প্রসঙ্গে অঙ্গুলী নির্দেশ করছি।

অক্সিজেন। প্রায় এক পৃষ্ঠায় খুবই তথ্যপূর্ণ আলোচনা। অক্সিজেন গ্যাসের শিল্পগত ব্যবহার সম্বন্ধেও উল্লেখ রয়েছে। তবে এ প্রসঙ্গে ভারতের কথা কিছু উল্লেখ থাকলে ভারতকোষের মত গ্রন্থে খুবই উপযুক্ত হ'ত।

অগ্ন্যাশয়। আলোচনা প্রসঙ্গে এনজাইম্-এর উল্লেখ রয়েছে। এই এনজাইম কি, কোথাও তার উল্লেখ বা ব্যাখ্যা নেই।

অঙ্গুলি ছাপ। এ সম্বন্ধেও একই বক্তব্য। "তথাকথিত" সামুদ্রিক রেখার উল্লেখ রয়েছে। এ রেখা কি।

অটোক্লেভ। সঙ্গে একটি ছবি থাকলে আলোচনা সম্পূর্ণ হ'ত।

অণু। ইংরাজী MOLECULE বলতে যা বোঝায় তার পরিভাষা হিসাবে প্রসঙ্গ-লেখক অণু কথাটির ব্যবহার করেছেন। আমরাও তা সমর্থন করি। কিন্তু অণুর প্রসঙ্গে পরমাণুর ছবি দেওয়ার কি সার্থকতা আমরা বুঝি নি। আরও আশ্চর্য, হিলিয়াম কার্বন এবং বোরণের পরমাণুর ছবি এঁকে লেখক অণু বলেই তাদের অভিহিত করেছেন। অণু আর পরমাণু সম্বন্ধে এই উপস্থাপনা বিভ্রান্তিকর, এবং যে-কোন কোষ গ্রন্থে অযোগ্য।

অণু প্রসঙ্গে আন্তরাণবিক বলের উল্লেখ করা হয়েছে। কি এই বল? অনেক পরে অবশ্য তার ব্যাখ্যা আছে। ঈথার কি? ঈথার সম্বন্ধে ভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা রয়েছে। এখানে কিন্তু তার উল্লেখ মাত্র নেই। মোট কথা, সমস্ত অণু প্রসঙ্গটিই অগোছালো, এলোমেলো ভাবে রচিত।

অণুবীক্ষণ যন্ত্র। আমরা উত্তল ও অবতল এ দু'জাতীয় লেন্সের কথা জানি। অভিসারী কি ধরণের লেন্স? নূতন পরিভাষা, তাই সঙ্গে ইংরাজী প্রতিশব্দ থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল।

অনুভু, অপভু সঙ্গে ছবি থাকলে ব্যাখ্যা পূর্ণাঙ্গ হ'ত।

অন্ত্র। এখানেও ছবি না দিয়ে বিষয়টির প্রতি অযত্ন করা হয়েছে।

অবলোহিত রশ্মি। 'আলোক' প্রসঙ্গে যদিও তার ব্যাখ্যা রয়েছে, অ্যামষ্ট্রং কি?

অভিকর্ষ। MASS-এর বাংলা পরিভাষা হিসাবে বস্তু-পরিমাণ আমরাও ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। তবে চলন্তিকা-সমর্থিত ভর কথাটিই সমধিক প্রচলিত। কোষ গ্রন্থে অভিধান-সমর্থিত শব্দের ব্যবহারই বাঞ্ছনীয় ছিল।

অভ্র। ১৩নং লাইনে আছে—"ইহা শাদা ও স্বচ্ছ।" শাদা বলতে প্রসঙ্গ-লেখক এখানে বর্ণহীন বা COLOURLESS বুঝিয়ে থাকবেন।

অশ্বক্ষমতা। HORSE-POWER-এর বাংলা হিসাবে অশ্বশক্তি না বলে অশ্বক্ষমতা বলাই শুদ্ধ প্রয়োগ। কিন্তু এ প্রসঙ্গে অশ্বক্ষমতার যে বিচিত্র ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, একটা কোষ গ্রন্থে যে তা অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারে, সে এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। বিজ্ঞানের প্রাথমিক ছাত্রমাত্রেই জানে—জেমস ওয়াট এক মিনিটে ২২০ পাউণ্ড কুয়া থেকে ১৫০ ফুট উঁচুতে তুলতে যে ক্ষমতার প্রয়োজন তা দিয়ে অশ্বক্ষমতার পরিমাপের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন। অন্যভাবে বললে তা "৫৫০ পাউণ্ডের কোনও বস্তু সেকেণ্ডে ১ ফুট উঁচুতে তুলতে যে ক্ষমতা প্রয়োজন" তার সমান। উল্লেখ করার বিষয় এক ফুট, "এক মিটার" নয়। দশমিক প্রথা বলে কোন পরিমাপ পদ্ধতি নেই, লেখক মেট্রিক পদ্ধতির কথা উল্লেখ করে থাকবেন, কিন্তু মেট্রিক বা সি. জি. এস. পদ্ধতিকে দশমিক পদ্ধতি বলা যায় না। বস্তু ও দৈর্ঘ্য সেখানে দশমিক প্রথায়, কিন্তু সময় দশমিক গণনায় এখনও চিহ্নিত হয় নি।

আইনষ্টাইন। অত্যন্ত অযত্নে লেখা এই গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। আইনষ্টাইন ইঞ্জিনীয়ার হিসাবে কখনও চাকুরি করেন নি, ইঞ্জিনীয়ারিং বলতে যা বোঝায় সে সম্বন্ধে শিক্ষাগ্রহণও তিনি করেন নি। আইনষ্টাইন প্রিন্সটনে বহু বৎসর অতিবাহিত করেন সত্য, কিন্তু তাঁর শেষ জীবন সেখানে কাটে নি। বহু ভুল তথ্য ও মন্তব্যে এই প্রসঙ্গটি কণ্টকিত।

আয়ন। অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট।

অ্যাকুমুলেটার। ঐ। লেখা থেকে বোঝার উপায় নেই সাধারণ ব্যাটারী (PRIMARY CELL) এবং অ্যাকুমুলেটারের মধ্যে প্রভেদ কি।

উদাহরণ এভাবে আরও বিস্তৃত করা যায়। কিন্তু অধিক আর প্রয়োজন নেই। প্রসঙ্গ নির্বাচন এবং তার ব্যাখ্যায় আরও সচেতন, আরও বেশি সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। ছাত্রসুলভ ত্রুটি কোন কোষ গ্রন্থের থাকতে পারে এ সত্যই অবিশ্বাস্য, ভারতকোষে তাই সম্ভব হয়েছে। সম্পাদনায় সতর্ক দৃষ্টির অভাবই তার একমাত্র কারণ। বিজ্ঞান-বিষয়ক বর্ণনায় ছবি অনেক কথার কাজ করে, অনুপূরক বলতে যা বোঝায়, ছবি এখানে সে কাজই করে থাকে, অথচ বিভিন্ন বিজ্ঞান-প্রসঙ্গে ছবির প্রয়োজনকে অবহেলা করা হয়েছে। সমস্ত মৌলিক পদার্থ সম্বন্ধে

আলোচনা ভারতকোষে গ্রহণ করা হবে বলে মনে হয়, ভাল প্রস্তাব। কিন্তু ইণ্ডিয়াম এবং ইরিডিয়াম বাদ গেছে কেন বোঝা গেল না। এ সমস্ত মৌলিক পদার্থগুলির আলোচনায় ভারত সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য সন্নিবেশ আশা করা গিয়েছিল, কোষ-গ্রন্থকারেরা এ বিষয়েও নিরাশ করেছেন। বিশেষ করে ইউরেনিয়াম ধাতুর প্রসঙ্গে এ কথা সবাই অনুভব করবেন, ভারত পরমাণু গবেষণায় উদ্যোগী হচ্ছে, এজন্যই এ-বিষয়ে বিশেষ কৌতূহল।

মোট কথা, ভারতকোষ একটি কোষ গ্রন্থ রচনার নিয়ম মান পর্যন্ত বজায় রাখতে পারে নি, অথচ এতে তথ্যবহুল বহু সুলিখিত প্রসঙ্গ রয়েছে দেশের বহু জ্ঞানী-গুণী এতে সহযোগিতা করেছেন। বিষয় নির্বাচন সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ খাড়া করা যেতে পারে, কিন্তু ত্রুটিযুক্ত তথ্য প্রকাশের পক্ষে কোন যুক্তি বা কৈফিয়ৎ নেই। সম্পাদকীয় অমনোযোগিতা অসতর্কতাই তার একমাত্র কারণ। লেখক নির্বাচন সম্বন্ধে কোন মন্তব্য আমরা করতে চাই না, তবে এ বিষয়েও শেষ পর্যন্ত দায়িত্ব সম্পাদকমণ্ডলীর। আশা করি তাঁরা এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিও পুনরায় বিবেচনা করে দেখবেন।

প্রসিদ্ধ ফরাসী বিশ্বকোষ 'আঁসিক্লোপেদি'তে দিদেরো যা লিখেছিলেন ভারতকোষের মুখবন্ধে তার উল্লেখ আছে—'পৃথিবীময় যে জ্ঞান ছড়াইয়া আছে তাহা সমাহৃত ও সুবিন্যস্ত করা বিশ্বকোষের উদ্দেশ্য; উক্ত জ্ঞানের মর্ম সমকালীন জনসমষ্টির নিকট ব্যাখ্যাত করা ও ভবিষ্যদ্বংশীয়ের হাতে উহা পৌঁছানর ব্যবস্থা করা কোষ গ্রন্থের লক্ষ্য। ভারতকোষের বিজ্ঞান প্রসঙ্গগুলিতে অন্তত কোষ গ্রন্থের এই মহৎ উদ্দেশ্য সর্বাংশে সফল হয়েছে, এ কথা বলতে পারলাম না।

বিদেশের কথা

শ্রীযোগনাথ মুখোপাধ্যায়

পাক নির্বাচন:

ফীল্ড মার্শাল আয়ুব খাঁ পাঁচ বছরের জন্য পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচনে তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন পাকিস্তানের স্রষ্টা মহম্মদ আলী জিন্নার ভগ্নী মিস ফতিমা জিন্না। জিন্নার জীবিতকালে মিস জিন্না ভ্রাতাকে সর্বত্র ছায়ার মত অনুসরণ করতেন এবং ভ্রাতাভগ্নী উভয়েই পাক্-জনগণের কাছে সমান ভাবে সম্মানিত ছিলেন। মিঃ জিন্নার মৃত্যুর পর ফতিমা জিন্না নিজেকে ধীরে ধীরে পাক্-রাজনীতি থেকে সরিয়ে নেন। কিন্তু তবুও যে তাঁর সমাদর পাকিস্তানের সাধারণ কাছে বিন্দুমাত্রও হ্রাস পায় নি তার অভ্রান্ত পরিচয় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকালে পাওয়া যায়। পেশোয়ার থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত পাকিস্তানের যে-কোন স্থানে তিনি নির্বাচনী প্রচারে যান সেখানেই হাজার হাজার নরনারী সমবেত হয়ে তাঁকে মাদার-ই-মিল্লাত অর্থাৎ জাতির জননী বলে অভিনন্দন জানায়। শ্রীমতী ফতিমার পক্ষে এই অভূতপূর্ব জনজাগরণ শুধু জনাব আয়ুব নয়, তাঁর নিজের পক্ষেও কল্পনাতীত ছিল। এ কারণে এক সময় জনাব আয়ুবের সাফল্য সম্বন্ধে তাঁর অতিবড় সমর্থকের মনেও সন্দেহ দেখা দেয়। সকলেই এবিষয়ে একরকম নিঃসন্দেহ ছিলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানে জনাব আয়ুব ফতিমা জিন্নার চেয়ে কিছু বেশি ভোট পাবেন, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে ফতিমা জিন্না এত বেশী ভোট পাবেন যে, তার ফলে প্রেসিডেন্ট আয়ুবের জয় অসম্ভব হয়ে পড়বে।

কিন্তু নির্বাচনের ফলাফল সব অনুমান ও জল্পনা-কল্পনা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। পাকিস্তানের উভয় শাখাতেই জনাব আয়ুব শ্রীমতী ফতিমা জিন্নার তুলনায় এত বেশী ভোট পেয়েছেন যা কারও পক্ষেই চিন্তা করা সম্ভব হয় নি। মোট ৮০ হাজার ভোটের মধ্যে প্রেসিডেন্ট আয়ুব পান ৪৯,৯৫০ ভোট ও মিস জিন্না পান ২৮,৬৯৬ ভোট। পশ্চিম পাকিস্তানের চল্লিশ হাজার ভোটের মধ্যে প্রেসিডেন্ট আয়ুব পান ২৮,৯৩৯ ভোট আর মিস জিন্না পান ১০,২৫৭; আর পূর্ব পাকিস্তানের চল্লিশ হাজার ভোটের মধ্যে ২১,০১২টি ভোট পড়ে প্রেসিডেন্ট আয়ুবের পক্ষে এবং ১৮,৪৩৯টি পান মিস জিন্না। অপর দুই প্রার্থী কামাল ও বসির আমেদের মোট ভোটের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৮৩ ও ৬৫। ৮০৪ টি ভোট বাতিল হয়। মোটামুটি হিসাবে বলা যায় পাকিস্তানের প্রতি আটজন বেসিক ডিমক্রাটদের মধ্যে পাঁচজন ভোট দেন প্রেসিডেন্ট আয়ুবকে ও তিনজন সমর্থন করেন মিস জিন্নাকে। পাকিস্তানের দু'টি রাজধানীতেই মিস জিন্না প্রেসিডেন্ট আয়ুবের চেয়ে বেশী ভোট পান। ঢাকায় ৫৫৭ জন ভোটারের মধ্যে ৪৫৭ জন ভোট দেন মিস জিন্নাকে, আর মাত্র ১০০ জন ভোট দেন প্রেসিডেন্ট আয়ুবকে। করাচিতেও মিস জিন্না প্রেসিডেন্ট আয়ুবের চেয়ে বেশী ভোট পান। ভোটের ফলাফলের অন্যতম লক্ষণীয় বিষয় হ'ল, পশ্চিম পাকিস্তানে মিস জিন্নার অনুকূলে আশাতীত সমর্থন এবং পূর্ব পাকিস্তানে তাঁর কল্পনাতীত ব্যর্থতা।

প্রেসিডেন্ট আয়ুবের সাফল্য ও শ্রীমতী জিন্নার

পরাজয়ের কারণ অনুমান করা কঠিন নয়। প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের সাফল্যকে বড় জোর তার কূটনীতির সাফল্য বলা যায়, কিন্তু তা কোনমতেই পাক্-জনগণের সংখ্যা-গরিষ্ঠের রায় নয়। তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ, আয়ুবের সাফল্যে কোথাও পাক্-জনগণের উল্লাস প্রকাশ পায় নি, কোথাও আলোকসজ্জা ক'রে বা নিশান উড়িয়ে পাক্-জনগণ জানায় নি যে, নির্বাচনের এই ফলাফলই তাদের কাম্য ছিল। যদি সরাসরি নির্বাচন হ'ত তবে প্রেসিডেণ্ট আয়ুব যে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হ'তেন সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রেসিডেণ্ট আয়ুব নিজেও এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলেন বলেই তিনি মৌলিক গণতন্ত্রের ধুয়া তুলে পরোক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন এবং এমন একদল লোকের মধ্যে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন সীমাবদ্ধ রাখেন, যাদের জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বপক্ষে টেনে আনতে তাঁর খুব বেশী অসুবিধা হয় নি। বেসিক ডেমক্রাটরা যখন জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হন তখন একজনও প্রকাশ্যে বলেন নি, যে তিনি আয়ুবের সমর্থক। শোচনীয় ভাবে পরাজিত হওয়ার আশঙ্কায় আয়ুব-সমর্থক কোন প্রার্থীই আয়ুবের মুস্লিম লীগের টিকিট নিয়ে নির্বাচনে দাঁড়া নি। বরঞ্চ সকলেই নিজেদের বিরোধী দলের লোক ব'লে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে নির্বাচনে জয়ী হন। মাত্র তিন মাসের মধ্যে পাকিস্তানের উভয় শাখায় আশি হাজার প্রার্থী মনোনয়নের মত সাংগঠনিক সামর্থ্য বিরোধী দলগুলির ছিল না; তাই সুযোগ নিয়ে নিজেদের বিরোধী দলীয় ব'লে পরিচয় দিয়ে পাক্-জনগণের বিক্ষোভকে কাজে লাগায় আয়ুব-চক্র। শহরগুলিতে এ সুযোগ ছিল না। তাই প্রায় সব সহরেই জনাব আয়ুবকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হতে হয়। পাকিস্তানের উন্নয়নের নামে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয় ঐ বেসিক ডিমক্রাটদের হাত দিয়ে, সে টাকার প্রলোভন সংবরণ করা কম কথা নয়। যে ত্রিশ হাজার বেসিক ডিমক্রাট ঐ প্রলোভন সংবরণ করে ও প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের শাসনচক্রে পিষ্ট হওয়ার ঝুঁকি নিয়ে মিস জিন্নাকে সমর্থন করেন তাঁদের আদর্শনিষ্ঠা অবশ্যই প্রশংসনীয়।

ইন্দোনেশিয়ার মতিগতি :

মালয়েশিয়া স্বস্তি পরিষদের সদস্য হওয়ার প্রতিবাদে ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যপদ ত্যাগ করেছে। এ ব্যাপারে ইন্দোনেশিয়ার বক্তব্য : মালয়েশিয়ার আইনগত অস্তিত্ব সে স্বীকার করে না, সুতরাং রাষ্ট্রসঙ্ঘের একটি দায়িত্বপূর্ণ পদে মালয়েশিয়ার প্রতিষ্ঠা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। তা ছাড়া উত্তর বোর্ণিওর তিনটি প্রাক্তন ব্রিটিশ উপনিবেশ মালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করার ব্যাপারে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্ত যে-ভাবে ইন্দোনেশিয়ার ইচ্ছা ও স্বার্থের বিরুদ্ধে মালয়কে সমর্থন করেন সেটাও ইন্দোনেশিয়া বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে পারে না। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ত্যাগই ইন্দোনেশিয়ার পক্ষে একমাত্র বিধেয়।

এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের পক্ষ থেকে ইন্দোনেশিয়ার কাছে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্য অনুরোধ জানান হয়। মিশরের প্রেসিডেণ্ট নাসের, সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়েক ও যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেণ্ট টিটো মিলিতভাবে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেণ্ট ডঃ সুকর্ণকে রাষ্ট্রসঙ্ঘ ত্যাগ না করার অনুরোধ জানিয়ে পত্র লেখেন। কিন্তু তার পরেও ইন্দোনেশিয়ার সর্বোচ্চ জাতীয় পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রসঙ্ঘ ত্যাগের পক্ষে অভিমত প্রকাশ করে। ফলে ইন্দোনেশিয়া এখন আর রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য নয়, রাষ্ট্রসঙ্ঘের ইতিহাসে এ ঘটনা অভিনব।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে জাপান ক্ষমতায় অন্ধ হয়ে সাম্রাজ্যলিপ্সা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে লীগ অফ নেশনস ত্যাগ করে। তার ফলে জাপানকে শেষ পর্যন্ত যে রাষ্ট্রীয় দুর্যোগের সম্মুখীন হ'তে হয় জাপানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ইসাকু সাতো সে-কথা ডঃ সুকর্ণকে স্মরণ করিয়ে দেন, কিন্তু তাতে ডঃ সুকর্ণ সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার কোন তাগিদ অনুভব করেন নি।

বিশ্বের সকল দেশ যখন ইন্দোনেশিয়ার সিদ্ধান্তে মর্মাহত, তখন তাকে সোচ্চার অভিনন্দন জানিয়েছে শুধু কম্যুনিষ্ট চীন ও তার সম্পূর্ণ অনুগত তিনটি ক্ষুদ্র দেশ আলবানিয়া, উত্তর ভিয়েৎনাম ও উত্তর কোরিয়া। তাদের পক্ষ থেকে বলা হয়, রাষ্ট্রসঙ্ঘ এখন মার্কিন সমর্থনপুষ্ট সাম্রাজ্যবাদীদের ক্রীড়নক মাত্র, সুতরাং ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘ ত্যাগ করে উচিত কাজই করেছে। চীনকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য করার জন্য যারা অত্যন্ত আগ্রহী তাদের কাছে রাষ্ট্রসঙ্ঘ সম্বন্ধে চীনের এই তাচ্ছিল্যকর উক্তি কি রকম লাগবে তা বলা কঠিন, কিন্তু এ থেকে এই বিষয়টি আরও সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ হ'ল যে, কম্যুনিষ্ট চীন কোনদিন রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য হলেও আন্তর্জাতিক উত্তেজনা হ্রাসে তা এতটুকুও সহায়ক হবে না। প্রথমে সংবাদ রটেছিল, চীন ও তার অনুগত রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে পাল্টা

ষ্ট্রসজ্ঘ গড়ে তুলবে ইন্দোনেশিয়া। কিন্তু আর কোন শ ইন্দোনেশিয়ার নীতি ও কার্যক্রম সমর্থন না করায় ন্দোনেশিয়া ও ব্যাপারে আর অগ্রসর হয় না এবং ানিয়ে দেয় যে, ঐ ধরণের কোন পরিকল্পনা তার নেই। ৃথিবীর অকম্যুনিষ্ট দেশগুলির মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার ম্যুনিষ্ট পার্টি বৃহত্তম এবং ঐ দলটি সম্পূর্ণ চীনাপন্থী। ইন্দোনেশীয় কম্যুনিষ্ট-নেতা আইদিৎকে বারবার মস্কোয় আমন্ত্রণ জানান হয়েছে কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেন নি। ইন্দোনেশিয়ার শাসনব্যবস্থার ওপর আইদিতের প্রভাব ীমাহীন। ড স্থকর্ণকে সামনে রেখে ঐদেশে এখন াসনকার্য চালাচ্ছে উগ্র জাতীয়তাবাদী, মুস্লিম াম্প্রদায়িকতাবাদী ও চীনাপন্থী কম্যুনিষ্টরা। কোন েশের শাসনযন্ত্রে এমন অদ্ভুত তিনটি বিপরীত শক্তির মাবেশ ঘটতে কখনও দেখা যায় নি। ফলে এখন চরম বিভ্রান্তিকর অরাজকতা চলেছে ইন্দোনেশিয়ায়, যা ম্যুনিষ্টদের প্রভাব বিস্তারের পক্ষে আদর্শ পরিবেশ া যায়। কম্যুনিষ্টদের চাপে ডঃ স্থকর্ণ ইন্দোনেশিয়ার ন্যতম বৃহৎ বামপন্থী দল মুরবা পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করেছেন। যে অবস্থা চলেছে এখন ইন্দোনেশিয়ায় াতে যদি আর কিছুকাল পরে ঐ দেশটি সম্পূর্ণরূপে ম্যী চীনের তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হয় তবে কূটনৈতিক হল তাতে আদবেই বিস্মিত হবে না।

াক্ষিণ ভিয়েৎনাম ঃ

দক্ষিণ ভিয়েৎনমে শাসন-সঙ্কট অব্যাহত আছে। রাজনৈতিক কলহে বিপর্যস্ত ঐ দেশটিতে কয়েক মাস আগে ্রানভান হুয়ঙের প্রধানমন্ত্রিত্বে যে অসামরিক সরকার ায়েম হয় তা সংখ্যাগরিষ্ঠ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পক্ষে কিছুতেই গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হচ্ছে না। আর ঐ অসামরিক সরকার যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনপুষ্ট বলে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের জনমত ক্রমে তীব্র হয়ে উঠছে। গত ২৩শে জানুয়ারী কয়েক হাজার বৌদ্ধ নরনারী সায়গনস্থ মার্কিন তথ্য অফিস ও লাইব্রেরীতে হানা দেয় ও সেটিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের অপর বৃহৎ শহর হিউতেও মার্কিন-বিরোধী বিক্ষোভ প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিক্ষোভের সুযোগ নিয়ে কম্যুনিষ্ট গেরিলাবাহিনী ভিয়েৎ কঙও মার্কিন-বিরোধী অভিযানে যোগ দেয়। ভিয়েৎ কঙ ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন বনিবনা না থাকলেও মার্কিন-বিরোধী মনোভাব ক্রমে তাদের এক জায়গায় নিয়ে আসছে, এইটাই এখন কম্যুনিষ্ট-বিরোধী শক্তিগুলির কাছে সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তার বিষয়। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সামরিক বাহিনীর সঙ্গেও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক এখন অবনতির মুখে। মাত্র কয়েকদিন আগে ঐ দেশের সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল হুয়েন খান প্রকাশ্যে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেনারেল টেলর স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে ঐ বিরোধের নিষ্পত্তি করেন এবং চারজন জেনারেলকে অসামরিক সরকারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু সৈন্যবাহিনীর ক্ষোভ তাতে দূর হয়েছে বলে মনে হয় না। শুধু ক্যাথলিকরাই এখন অসামরিক সরকারের সমর্থক, কিন্তু দক্ষিণ ভিয়েৎনামের দেড় কোটি লোক-সংখ্যার মধ্যে তাদের সংখ্যা পনর লক্ষও নয়। বৌদ্ধ সম্প্রদায়, সামরিক বাহিনী এবং সর্বোপরি ভিয়েৎ কঙ গেরিলাদের সমবেত আক্রমণের বিরুদ্ধে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে কোন সরকারের পক্ষেই বেশীদিন টিঁকে থাকা সম্ভব নয়। তবু যে ত্রানভান হুয়ঙের অসামরিক সরকার অনেকদিন টিঁকে থাকতে পেরেছে তার একমাত্র কারণ যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন আছে ঐ সরকারের পিছনে। মোটামুটি হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে প্রতিদিন পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পায় দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, যে টাকা তার না পেলেই নয়। তার চেয়েও বড় কথা, যুক্তরাষ্ট্রের তের হাজার সৈন্য মোতায়েন আছে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে, যাদের সহায়তা ছাড়া দক্ষিণ ভিয়েৎনামের পক্ষে একদিনও কম্যুনিষ্ট আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। এ কারণে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ বা সামরিক বাহিনীর অধিনায়করা এমন কোন বিষয়েই জোর করতে পারেন না, যা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে কিছুতেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। আর যুক্তরাষ্ট্র সরকার স্থির করেছেন, দক্ষিণ ভিয়েৎনামে কোন সামরিক সরকারকে তাঁরা সমর্থন করবেন না। সেখানে তাঁরা ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক ও অসামরিক শাসন কায়েম করতে চান। কিন্তু যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে তাতে অসামরিক শাসন বেশীদিন কায়েম থাকা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।

ব্রিটেনের রাজনীতি

গত অক্টোবর মাসে মাত্র চারভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে শ্রমিকদল যখন ব্রিটেনে মন্ত্রিসভা গঠন করেন তখনই বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় যে, শ্রমিক দলের পক্ষে বেশীদিন শাসনকার্য চালান সম্ভব হবে না। সম্প্রতি একটি উপ-নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার

পর শ্রমিক দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা মাত্র তিনে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, ঐ পরাজয়ে শ্রমিক দলের মর্যাদা বিশেষভাবে ক্ষুন্ন হয়েছে। গত অক্টোবর মাসের সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিক দলের বিশিষ্ট নেতা প্যাট্রিস গর্ডন ওয়াকার স্মেথিক কেন্দ্রে রক্ষণশীল দলের প্রার্থীর কাছে পরাজিত হ'লেও মিঃ হ্যারল্ড উইলসন তাঁকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত করেন এবং জঘন্য বর্ণবিদ্বেষ প্রচার করে মিঃ গর্ডন ওয়াকারকে পরাজিত করা হয়েছে বলে রক্ষণশীল দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন। তারপর মিঃ গর্ডন ওয়াকারকে কমন্স সভার সদস্য করার উদ্দেশ্যে মিঃ সোরেনসেনকে লর্ডস সভার সদস্য করে লেটন নির্বাচনকেন্দ্রে উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। গত ত্রিশ বছর ধরে লেটন শ্রমিক দলের শক্ত ঘাঁটি, অক্টোবরের সাধারণ নির্বাচনেও মিঃ সোরেনসেন আট হাজার ভোটের ব্যবধানে রক্ষণশীল প্রার্থীকে পরাস্ত করে জয়ী হন। কিন্তু গর্ডন ওয়াকার সেখানেও জয়ী হ'তে পারলেন না। মর্যাদার লড়াইয়ে শ্রমিক দলের এই পরাজয় অনতিবিলম্বে ব্রিটেনে আর একটি সাধারণ নির্বাচন অনিবার্য করে তুলেছে।

— —

ইতিহাস কথা কয়

শ্রীঅজিত চট্টোপাধ্যায়

(১৫)

জাহানারা বেগম ঘুমিয়ে আছেন এখানেই। চির-নিদ্রায় শুয়ে আছেন জাহানারা। সে ঘুম আর ভাঙবে না। মোগল সাম্রাজ্যের সৌভাগ্য সূর্য্য যখন মধ্যগগনে উজ্জ্বল, সেই সময়ে পৃথিবীর আলো দেখেছিলেন জাহানারা। মমতাজের বড় আদরের মেয়ে। শাহজাহান ভেবেছিলেন কত সুখীই না হবে তার আদরিনী কন্যা। কিন্তু ভাগ্যকে এড়িয়ে চলতে পারা বড় কঠিন। বাদশা নফর, উজীর প্রহরী, প্রভু ভৃত্য, নবাব ও বান্দা সেখানে সবাই সমান। ভাগ্যকে এড়িয়ে চলা যায় না। তার ঘর্ঘর রথচক্র সকলকে নিষ্পিষ্ট করে যাবেই যাবে।

সুখ আর দুঃখ, আনন্দ আর বিষাদ, বিলাস আর বর্জন জাহানারার জীবন কাব্যে সবাই চক্রাকারে আবর্তিত। প্রথম জীবনে কত আরামেই না কাটিয়েছেন জাহানারা। সম্রাটের প্রিয়তমা কন্যা। তার মুখে এক চিলতে হাসি ফুটিয়ে তুলতে কত জনকেই কত আয়াস করতে হয়েছে।

মমতাজ মারা যাবার পর মেয়ের কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করেছিলেন শাজাহান। জাহানারাও কোনদিন বাপকে ভোলেননি। স্বেচ্ছায় বন্দিনী জীবন যাপন করেছেন পিতার সঙ্গে। সম্রাটের শেষ দিন পর্য্যন্ত কাটিয়েছেন তার পাশে থেকে। আওরঙ্গজেবের শত প্রলোভনেও পিতাকে ত্যাগ করেন নি।

রোশেনারা আর জাহানারা—শাজাহানের দুই কন্যা। রোশেনারা ছোট, জাহানারা বড়। ভাইদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে যখন বিবাদ সুরু হ'ল, তখন জাহানারা নিলেন বড় ভাই দারা শিকোর পক্ষ। আর রোশেনারা অবলম্বন করলেন আওরঙ্গজেবের আনুগত্য। ইচ্ছে করলে জাহানারা মত বদলাতে পারতেন। আওরঙ্গজেবের পক্ষ অবলম্বন করে সুখ আর বৈভবকে করায়ত্ত করে নিতে কষ্ট হত না। কিন্তু আওরঙ্গজেবকে চিরদিন এড়িয়ে চলেছেন জাহানারা। ঐহিক সুখের জন্য বঞ্চনা আর বিশ্বাসঘাতকতার মুকুট মাথায় তোলেন নি।

অনেক কিছু জীবনে দেখেছিলেন জাহানারা। ছোট-বেলায় মা আর্জ্জুমন্দ বেগমের মৃত্যু। মায়ের শেষ অবস্থা দেখে বাপকে ছুটে গিয়েছিলেন ডেকে আনতে। বড় হয়ে দেখলেন আদরের ভাই দারাশিকোর নির্ম্মম হত্যা। তারপর শাজাহানের জীবনদীপ নিবল তারই চোখের সামনে। বোন রোশেনারার মৃত্যুসংবাদও পেলেন। ভাই বোন অনেকেরই জীবনের আয়ু শেষ হ'ল তারই জীবদ্দশায়। এত শোক পেয়ে হয়ত পাথর হয়ে গিয়েছিলেন জাহানারা। মৃত্যুর আগে নিজেকে বড় দীন ও সামান্য মনে হয়েছিল তার।

বিয়ে হয়নি জাহানারার। আকবরের সেই আদেশ তার জীবনে কোনদিন আসতে দেয় নি পরমবাঞ্ছিত মধুর মিলনের লগ্ন। কেন জানিনা বাদশাহ আদেশ দিয়ে গিয়ে-ছিলেন। রাজ পরিবারের কোন লোকের সঙ্গে শাহজাদীর বিয়ে হবে না। ওদের জীবনে শুধু বাজবে বেদনভরা বসন্তের বিষণ্ণ মধুর রাগিনী।

জাহানারা বেগমের কবর নিতান্তই সাধারণ, শাহজাদী বেঁচে থাকতেই রচনা করে গিয়েছিলেন তার সমাধি। সমাধি স্থানের উপরে ছোট একটি বাক্সের আকৃতি বিশিষ্ট মর্মর স্মৃতি চিহ্ন। এই স্মৃতিচিহ্নটির মাঝখানে ফাঁকা মতন খানিকটা স্থানে মাটি ছড়ানো। এর উপর নেই কোন আচ্ছাদন, নেই কোন রাজকন্যার উপযুক্ত আড়ম্বর, বা ব্যয়বহুল চারু চিত্রণ। শুধু সামান্য অলংকরণ মার্বেল পাথরের গায়ে অল্প অল্প খোদিত রয়েছে।

কবিখ্যাতি ছিল জাহানারার। পিতার সঙ্গে স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব স্বীকার করে, অবসর কাটাতে কবিতা রচনাকে অবলম্বন করেছিলেন শাহজাদী। মৃত্যুর পর তার সমাধি স্থানে যা লেখা থাকবে, সে দুছত্রও তিনি রচনা করে গিয়েছিলেন। সমাধির ঠিক মাথার কাছেই একটি মার্বেল পাথরে কালো কালো অক্ষরে সেই দু ছত্র কবিতাও লেখা রয়েছে।

বেগায়র সবজা না পোশাদ্‌ কোসে মাজারে মারা
কে কবর পোষে গরিবান্‌ হামিন্‌ গিয়া বসস্ত।"

অর্থাৎ, আমার সমাধির উপরে একমাত্র ঘাস ছাড়া আর কিছু না থাকে। কারণ দীন অভাজনদের কাছে ঘাসই শ্রেষ্ঠ অ-চ্ছাদন—

মার্বেল পাথরের স্মৃতি চিহ্নটির মাঝখানে মাটি ছড়া'না সেখানে গজিয়ে উঠেছে ছোট বড় নানা সবুজ দুর্বাদল।

নিরলঙ্কার সমাধিটির উপর এগুলিই যেন একমাত্র অলংকারের চিহ্ন।

ছোট বোন রোশেনারার নামে দিল্লীতে গড়ে উঠেছিল রোশেনারা উদ্যান। সেখানে শেষশয্যা গ্রহণ করে'ছিলেন রোশেনারা। কিন্তু রোশেনারা বাগের সমাধি একদা অনেক বেশী আড়ম্বর ও ঐশ্বর্য্যের চিহ্ন বহন করত। জাহানারার সমাধির মত এত সাধারণ ও ঐশ্বর্য্যহীন ছিল না।

তবে উদ্যান জাহানারাও রচনা করেছিলেন। তার সৃষ্টি বেগমবাগ পরবর্তীকালে রাণীর উদ্যান নামে পরিচিত হয়েছে। কিন্তু জাহানারার ইচ্ছা ছিল অন্য রকম। ফকির নিজামুদ্দীন আউলিয়ার দরগার এক কোণে শেষ শয্যা নিতে চেয়েছিলেন শাহজাদী। ঐশ্বর্য্য, বৈভব, ক্ষমতা প্রতিপত্তি, বিত্ত, সামর্থ্য অনেক দেখেছেন জাহানারা। তাই চাঁদনী চকের বেগমবাগে শেষ শয্যা নিতে কিছুতেই রাজী ছিলেন না।

তার চেয়ে এই ভালো। ফকির সাহেব একদা যেখানে বসে প্রার্থনা করেছেন, সেই মাটিই তো পরম পবিত্র। সেখানের মাটিতেই রেণু রেণু হয়ে মিশে থাকে তার কোমল দেহের প্রতিটি কণা। সেই মাটিতে শুয়েই শান্তি পাবেন জাহানারা। শীতল শান্তি তার সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা জুড়িয়ে দেবে। বেগমবাগে শেষ শয্যা হলে মরেও শান্তি পাবেন না তিনি। আর ঐশ্বর্য্য, প্রতাপ, সৌন্দর্য্য, সম্মান? সেকথা শাজাহানের মত তার জীবনেও সত্য—

একথা ভাবিতে তুমি ভারত……
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধন মান'।

(১৬)

নিজামুদ্দীন আউলিয়ার দরগায় এসে আর একটি নাম হয়ত আপনার মনে পড়বে। সেটি আমীর খসরুর।

আসল নাম আবুল হাসান। পরে আমীর খসরু নামে বিখ্যাত হন। এক হিসেবে খসরুই ভারতের শ্রেষ্ঠ মুসলমান কবি। এই মিষ্ট ভাষী তোতা' (খসরুর এই নাম সমাধির বাইরে উৎকীর্ণ আছে) ভারতবর্ষেই জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তার মা বাবা ছিলেন জাতিতে তুর্কী। খুব ছোট বেলাতেই নিজামুদ্দীন আউলিয়ার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন খসরু এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ফকিরের এক অন্ধ ভক্ত ছিলেন। খিলজীদের আমলেই রাজ-অনুগ্রহ আমীর খসরুর জীবনে এসে পৌছায়। জালালুদ্দীন তাকে সভার আমীর পদে উন্নীত করেন। খিলজীদের সৌভাগ্য-সূর্য্য যতদিন অস্ত যায় নি, ততদিন খসরু রাজ-অনুগ্রহ হতে এক তিলও বঞ্চিত হন নি। আলাউদ্দীন পুত্র খিজির খান ও দেবলাদেবীর প্রেমের কাহিনী নিয়ে কাব্য রচনা করে গেছেন খসরু। ফার্সী সাহিত্যের তা এক সম্পদ। খিলজী-দের পরই তুঘলকদের আধিপত্য। কিন্তু অমন শক্ত জবরদস্ত পুরুষ গিয়াসুদ্দীন তুঘলকও খসরুর প্রতি কঠোর ছিলেন না। যতদিন জীবিত ছিলেন আমীর খসরুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন। গিয়াসুদ্দীনের পর মুহম্মদ তুঘলক শাহ। খসরুর প্রতিপত্তি সে সময় আরো বেড়ে গেল। পাঠাগারের সম্পূর্ণ অধিকার রইল খসরুর হাতে। বাংলা দেশে যাবার সময় সুলতান তাকে আমন্ত্রণ জানালেন পথের সঙ্গী হতে। আমীর খসরু সানন্দে যোগ দিলেন সুলতানের যাত্রা প্রস্তুতিতে।

বাংলা দেশে বসেই সেই দুঃসংবাদ খসরুর কানে পৌছল। ফকির সাহেব আর নেই। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন নিজামুদ্দীন আউলিয়া। মনে বড় ব্যথা পেলেন আমীর খসরু। তার কবিমনের নিভৃত স্থানটি বেদনায় টনটন করে উঠল। ইতিহাস বলে পরদিনই শোকে দুঃখে ম্রিয়মান খসরু বেরিয়ে পড়েন দিল্লীর পথে। একটুও দেরী করতে চাননি খসরু। আউলিয়ার সমাধির নিকট পর্য্যন্ত না পৌঁছে তার মনে একটুকু শান্তি নেই।

দিল্লী পৌছতে বন্ধু নাসিরউদ্দীন এলেন সান্ত্বনার বাণী শোনাতে। যে যায় সে'ত আর ফেরে না। কাজেই অকারণ শোক করে লাভ নেই। বরং ধৈর্য্য ধরে আবার বুক বাঁধুন খসরু। নতুন কাব্য লিখুন, নিপুণ লেখনীতে। যে কাব্যের ঝংকার মানুষের মনের শোক বিদূরিত করবে। শীতের হিম বায়ুকে দূর করে প্রবাহিত করে দেবে বসন্তের দখিনা সমীরণ। মৃত্যুর শীতলতাকে সরিয়ে সঞ্চার করবে প্রাণের স্পন্দন।

কিন্তু আমীর খসরু আর কাব্য লিখলেন না। কথিত যে, দীর্ঘ ছয়মাস ধরে তিনি উদাস নয়নে বসে রইলেন ফকির সাহেবের সমাধির পাশে। কালো পোষাকে সর্বাঙ্গ আবৃত করে শুষ্ক মুখে চেয়ে রইলেন খসরু। দিন যায়। কালচক্র আবর্তিত হয়। এক ঋতু পার হয়ে আসে অন্য ঋতু! হেমন্তের পক্ব শস্য ভরা মাঠ দেশবাসীর মনে খুশীর জোয়ার বয়ে আনে। শীতের মলিন দিন কেটে গিয়ে পৃথিবীর বুকে ভেসে আসে বসন্তের হাসি।

কিন্তু আনন্দ আর এল না খসরুর মনে। এল না খুশীর জোয়ার ছলছলিয়ে আমীর খসরুর মানস তটে। ছয় মাস পরে দেহত্যাগ করলেন কবি। মৃত্যুই তার মনের সব জ্বালা যন্ত্রণা জুড়িয়ে দিল।

তার বন্ধুরা ভাবলেন খসরুকে নিজামুদ্দীন আউলিয়ার সমাধির পাশেই কবর দেবেন। মরজগতে যারা ছিলেন

পরম মিত্র, জগতের ওপারের সেই অচেনা দেশেও দুটি আত্মা কাছাকাছি থাকুক। শেষশয্যা দুটি তাই যত কাছে হয় ততই মঙ্গল। কিন্তু সে ইচ্ছা তার পূর্ণ হয় নি।

শোনা যায় দিল্লীতে তখন পুণ্যশ্লোক নিজামুদ্দীনের বিশেষ ভক্ত ছিলেন এক প্রতিপত্তিশালী খোজা আমীর। আপত্তি জানালেন তিনি। পুণ্যাত্মা নিজামুদ্দীনের অত কাছে কখনই সমাধি হওয়া উচিত নয় আমীর খসরুর। তাই আমীর খসরুকে অন্যত্র সমাধিস্থ করা হ'ল। চবুতরায়, যেখানে বসে নিজামুদ্দীন বন্ধু বা শিষ্যদের সঙ্গে আলোচনা করতেন, পরম মিত্র আমীর খসরুকে তারই এককোণে শুইয়ে দেওয়া হ'ল শেষ শয়নে।

আমীর খসরু বহুদিন গত হয়েছেন, কিন্তু তার অসংখ্য গান আর ছড়া ছড়িয়ে পড়েছে উত্তর ভারতের বিভিন্ন অংশে। আজও সে গান গীত হয়। আমীর খসরুর রচনা মুখে মুখে ফিরে—

বসন্ত পঞ্চমীতে পাখী গান গায়। কিন্তু আমীর খসরু আর গান রচনা করবেন না। বসন্ত পঞ্চমীর দিনে আমীর খসরুর মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়। কবি সম্রাটের কথা লোকে স্মরণ করে।

আমীর খসরুর সম্বন্ধে শেষ কথা শ্রীম্যান সাহেবের ভাষায় বলি,...'his popular songs are still the most popular ; and he is one of the favoured few who live through ages in the every day thoughts and feelings of many millions,'

(১৭)

দিল্লীর রাজপথে বনমালাদির সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে আমি কখনও ভাবিনি। দেখা হয়ে যাবে জানলে বনমালাদির গল্প আমি মিসেসের কাছে নিশ্চয়ই করে রাখতাম। যে মেয়ের কথা আগে কোনদিন উল্লেখ করি নি, হঠাৎ তার সঙ্গে দেখা হবার পর অনর্গল কথা বললাম, তা দেখে ভদ্রমহিলার চোখের কোণে যদি সন্দেহের ছোট মেঘ দেখা দেয়, তবে তাকে বড় একটা দোষ দেওয়া যায় না। অবশ্য মেঘ মানেই কালবৈশাখীর তাণ্ডব নয়। কিন্তু কালবৈশাখী না হলেও চৈত্রের ধূলি ঝড় ত হতে পারে। তাই বনমালাদির মুখোমুখী হয়ে একটা অস্বস্তির কাঁটার খোঁচা মনের মধ্যে অনুভব করলাম।...

ফুলবাহার দেখে বেরিয়েছি মুঘলগার্ডেনস্ থেকে। কি সুন্দর সব ফুল। কেমন সাজানো গোছানো তকতকে বাগানখানা। আর রক্ষণাবেক্ষণ? সেটার কথা ত সর্বাগ্রে বলতে হয়। বাঁধানো পথ থেকে অসতর্কে যদি চরণযুগল একবার মখমলের মত ঘাসের উপর গিয়ে পড়ে অমনি পিছন আর সামনে থেকে মুহুর্মুহু বংশীধ্বনি। সতর্ক প্রহরী হাত নেড়ে অসতর্ক পথিককে সাবধান করে দিচ্ছে। ফুলের উপর যদি অজ্ঞাতে হাতখানা গিয়ে পড়ে, তাহলে ত কথাই নেই। প্রহরী তখন ছুটে আসবেন আপনার কাছে। মুঘল গার্ডেনসে ঢুকে ঢিলাঢালা হবার জো নেই। সদা সতর্ক থাকতে হবে আপনাকে। শৃংখলাবদ্ধ হয়ে ঘুরে বেড়ান, আবার বেরিয়ে আসুন উদ্যান ত্যাগ করে।

মুঘল গার্ডেনস থেকে বেরিয়ে আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। চওড়া পীচঢ'লা রাজপথ। দু'পাশে সুদৃশ্য কোয়ার্টার, শুনলাম পার্লামেন্টের সদস্যরা এসে ওঠেন এখানে। পথের দু'পাশে নয়াদিল্লীর সেই এক দৃশ্য। মনোহর নানাবর্ণের বিচিত্র পুষ্পসম্ভার। এক পথ থেকে অন্য পথে, হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলি।

সেক্রেটারিয়েট বাড়ীর কাছেই বাস ষ্টপ একটা। ওখান থেকেই বাস নেব ঠিক করলাম। দিল্লীতে বাস আসার একটা নির্দিষ্ট সময় আছে। কোন রুটের বাস ঠিক কোন সময়ে আসবে কাছাকাছি টাইম-অফিসে খোঁজ করলেই জানা যাবে। বাসষ্টপের কাছে আসতেই যেন চেনা চেনা মনে হল ভদ্রমহিলাকে। বাঙালী তো নিশ্চয়ই। হাতে বেঁটে লেডিজ ছাতা একটা। খাতা পত্র, কাগজ টাগজ একটা ফ্ল্যাট ফাইলের ভিতর থেকে উঁকি দিচ্ছে। কাছাকাছি আসতেই চোখাচোখি হল। আমায় দেখে যেন চিনতে পারলেন উনি।

অবশ্য আগের থেকে অনেক মোটা হয়েছেন বনমালাদি। গালের কাছে বেশ মাংস জমেছে। গলাটা আর আগের মত পাতলা দীঘল নয়। চিবুকের নীচে বেশ চর্বি মত একটু ঝুলে রয়েছে। রংটা আগের চেয়েও ফর্সা দেখাচ্ছে। ...

প্রায় একযুগ পরে দেখা। তখন চব্বিশ পঁচিশের বেশী বয়স ছিল না বনমালাদির। বরং কমই হবে। সেই পাখীডাকা, গাছপালা মোড়া ছোট্ট মফঃস্বল শহরটিতে বনমালাদিকে একডাকে চিনত সবাই। বি. এ. ক্লাসের ছাত্রী বনমালা সেনকে তারও অনেকদিন আগে থেকে চিনতাম আমরা। উনি স্কুলের গণ্ডী ছাড়িয়ে মফঃস্বলের কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে যেদিন এলেন সেদিন থেকেই আমরা ওকে চিনলাম। আমরা মানে, কলেজিয়েট স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্ররা।

চোখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে বনমালাদি বললেন,—'আপনি, মানে তুমি তমাল লাহিড়ী না?

হেসে উত্তর দিলাম,—'চিনতে পেরেছেন বনমালাদি? আমি মনে মনে ভাবছি আপনি হয়ত অন্য কেউ—

—চিনবো না মানে? নাহয় খানিকটা বড়ই হয়েছ,

তাবলে চিনে নিতে পারব না। সঙ্গে বউ নিশ্চয়ই। বিয়ে করেছ কতদিন? —'

ওকে ডেকে বনবালাদির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম। বললাম,—'একসময় আমাদের দেশে বনমালাদিরা অনেক বছর ছিলেন। প্রায় ছ বছর হবে, কি বলেন বনমালাদি?' —'ছ বছর তো বটেই।' বনমালাদি নিজের মনে কি একটা হিসেব করলেন; হেসে বললেন,—'বোধহয় সাতই—'

বনমালাদির পরণে পাতলা মিলের ধুতি। গায়ে ব্লাউজ সাদা রঙের। আজ চল্লিশের বুড়ী ছুঁই ছুঁই করে বনমালাদি আর সব রংকে বাহুল্য মনে করেছেন। শাড়ীর গায়ের মত মন থেকেও সব রংকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। কথাবার্তা শুনে তাই মনে হল আমার। ভদ্রমহিলা যেন বড় বেশী সাদা মাটা। অথচ সেই ছোট মফঃস্বলের শহরটিতে কত রংবাহার শাড়ীই না ব্যবহার করতেন উনি। কলেজ যাবার পথে সপ্তাহের ছ দিনে ছখানা নানা রঙের শাড়ী দেখেছি ওঁর পরণে। নিজেদের মধ্যে আমরা কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্ররা আলোচনা করতাম - বনমালাদির ক বাক্স শাড়ী আছে রে?

আমাদের মধ্যে সমীর ছিল বয়সে একটু বড়। সে হেসে বলত,—'বাক্স নয় রে। বনমালাদির এক আলমারী ভর্তি শাড়ী আছে।'

আমাকে দেখে বনমালাদি বললেন,—দিল্লী কেন এসেছ? বেড়াতে, না কোন সরকারী কাজেটাজে?'

হেসে বললাম,—'দুই'ই ধরতে পারেন।'

বনমালা সেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের মেয়ে। আমাদের ছোট্ট মহকুমা শহরটিতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অনেক উঁচু দরের লোক ছিলেন। তাই বনমালাদির ধারে ঘেঁষতে আমরা সাহস পাইনি। শীতের সকালে বনমালাদিকে বেড়াতে দেখতাম। হাতে কুকুরের গলায় বাঁধা চেনের শেষ অংশ। বিরাট আকৃতি বিলিতি কুকুর সামনে ছুটে যেতে চায়। বনমালাদিকে মাঝে মাঝে বেশ কসরৎ করতে হত যাকে টেনে ধরে রাখতে।

তবু বনমালাদির সঙ্গে একদিন আলাপ হয়ে গেল। ৺সরস্বতী পুজোয় চাঁদা চাইতে গেলাম ওঁর বাড়ী। বনমালাদির বাবা বাড়ী ছিলেন না। উনি এসে বললেন আমাদের। একটা পাঁচ টাকার নোট চাঁদা দিয়েছিলেন বনমালাদি। আমরা ভীষণ খুশী হয়েছিলাম। তখনকার দিনে পাঁচ টাকার দাম ছিল। আমরা বনমালাদিকে অনুরোধ করেছিলাম বার বার, উনি যেন আমাদের ৺পুজো দেখতে নিশ্চয়ই যান। সন্ধ্যের সময় আমরা যে নাটক আর আবৃত্তি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছি তা যেন উনি নিশ্চয়ই দেখতে আসেন। বনমালাদি আমাদের কথা দিয়েছিলেন। উনি ঠিক আসবেন।

আমাদের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল। বনমালাদি আসবেন শুনে আমাদের মধ্যে কেমন একটা অদ্ভুত উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল। সারা দুপুর করে আমি বারবার কবিতা পড়েছিলাম। আবৃত্তিটা ঠিকমত রপ্ত করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলাম। কেন জানিনা বনমালাদি আসবেন এই সামান্য কথাটা আমাদের মধ্যে এক অসামান্য উৎসাহের সঞ্চার করেছিল।

ওরই মধ্যে সেই ফিসফিসানি খবরটা আমাদের কানে এল, তখন আমরা ক্লাস নাইন থেকে টেন্ এ উঠেছি। শীত পেরিয়ে প্রথম ফাল্গুন দেখা দিয়েছে প্রকৃতিতে। স্কুলের পিছনের আমবনে কচি কচি মুকুল দেখা দিতে শুরু করেছে। টিফিনের সময় আমাদের মধ্যেই কে যেন খবরটা উচ্চারণ করল। বলল,—জানিস বনমালাদির বিয়ে হবে।'

—'বিয়ে হবে?' আমরা সমস্বরে প্রশ্ন করি।

'—হ্যাঁরে। বোসেদের বাড়ীর নির্মল বোসকে চিনিস, তারই সঙ্গে বনমালাদি এনগেজড্—

এনগেজড্ কথাটার মানে তখনও আমরা স্কুলের ছেলেরা ভালো করে বুঝিনি। তবু কথাটার সঙ্গে কি যেন একটা মাদকতা, কি একটা রোমাঞ্চের ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে তা আমরা বেশ উপলব্ধি করতে পারতাম। রহস্যভরা দৃষ্টি ছুড়ে আমি বললাম,—'এনগেজড্? তাই বুঝি?

খবরটা ব্যাপকভাবে আমরাই ছড়িয়ে দিলাম। বাড়ীতে মা মাসী, বৌদি দিদি থেকে শুরু করে এ বাড়ী সে বাড়ী গিয়ে বলে এলাম। সবাই অবাক, হল। বলল—বদ্যির সঙ্গে কায়েতের কি বিয়ে রে?

কথাটা বোধহয় বনমালাদির বাবার কাণেও গিয়েছিল। কারণ তারপর থেকেই হঠাৎ বনমালাদির বাইরে বেরোনো সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গেছল। কলেজের পথে আমরা স্কুলের ছেলেরা আর রংবাহার শাড়ী দেখি না। সেই সুন্দর ছিমছাম নারীমূর্তিটি বই হাতে কোনদিনই কলেজ ট্যাংকের পাশ দিয়ে আর হেটে গেলেন না।

মাসখানেক পরেই সংবাদটা থিতিয়ে এল। যে সংবাদ আমরাই ছড়িয়েছিলাম বিস্ময়, তাকেই আমরা ভুলতে বসলাম। ইতিমধ্যে নির্মল বোস চলে গিয়েছেন কোলকাতায়। ইউনিভার্সিটি ক্লাসে ভর্তি হয়েছেন বনমালাদি আবার কলেজে যাতায়াত সুরু করেছেন কলেজ ট্যাংকের পাশ দিয়ে যে সরু পথটা চলে গিয়েছে মিশনচার্চের দিকে, সে পথে নিত্যনতুন রংবাহার শাড়ী

লক্ষ্য করছি আমরা। কোনদিন মেঘডম্বুর বৃষ্টিধারা আঁকা, কোনদিন সাতরঙা রামধনু শাড়ী।

বর্ষার শুরুতেই আমরা আবার খবর পেলাম। আষাঢ়ের মাঝামাঝি বনমালাদির বিয়ে। বর আসবেন কানপুর থেকে। কানপুরে কলেজের প্রফেসর।

আমরা আশংকা করলাম হয়ত একটা কিছু কাণ্ড ঘটবে। নির্মল বোস হয়ত আসবেন কলকাতা থেকে। বিয়ের আগে বা বিয়ের সময় কোন অঘটন হয়ত ঘটে যাবে—

শুভদিন কিন্তু নির্বিঘ্নে কেটে গেল। আষাঢ়ের বৃষ্টিভেজা রাতে সানাইয়ের সুর তার মিষ্টতা ছড়িয়ে দিল চারপাশে। ডেলাইট আর হ্যাসাকের আলোয় কন্যা সম্প্রদান করলেন বনমালাদির বুড়ী ঠাকুমা। কানপুরের বর শক্তহাতে বনমালাদির হাতটা ধরে রইলেন। আমরা পরিবেশন করলাম একসাথে। পাতা পেতে ভুরিভোজন করলাম মহানন্দে।......

তার কিছুদিন পরই বনমালাদির বাবা বদলী হয়ে গেলেন কলকাতায়। ঘটনার স্রোতে পুরানো কাহিনী হারিয়ে যায়। কখন এক সময় বনমালাদির কথা আমরা ভুলতে সুরু করেছি, তা নিজেরাই খেয়াল করি নি।

আমার স্ত্রীর দিকে চেয়ে বনমালাদি বললেন—তোমাকে আমি খুব ছোট দেখেছি। তখন স্কুলে পড়ত। হাফ প্যান্ট আর শার্ট পরে আমাদের বাড়ী আসত চাঁদা চাইতে—

বললাম—এখন কোথায় আছেন বনমালাদি? নতুন কি একটা জায়গার নাম করলেন বনমালাদি। উত্তর প্রদেশের কোন একটা জায়গা হবে।

বললেন—'একটা হাইস্কুল নিয়ে রয়েছি। তোমরা এস না ফেরবার পথে দু একদিন থেকে যাবে'।

—'হাইস্কুলে রয়েছেন? কোথায় কানপুরে—'

বনমালাদি হাসলেন। 'স্কুলটা একরকম আমিই গড়েছি তমাল। দিল্লীতে এসেছিলাম, এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের কাছ থেকে একটা ভাল গ্র্যান্টের দাবী জানাতে। দেখছ না—হাতের একরাশ কাগজপত্রের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তিনি।

বললাম—'ফেরার সময় যদি পারি ত আপনার ওখানে ঠিক যাব।'

একটা কাগজ হাতে তুলে দিলেন বনমালাদি। অনেককিছু লেখা। স্কুলের নাম, ঠিকানা ইত্যাদি—

বনমালাদি বাসে উঠে গেলেন। ওঁর গন্তব্যস্থানের বাস এসে দাঁড়িয়েছিল।

আমার স্ত্রী বললেন—'ভদ্রমহিলা কতদিন বিধবা হয়েছেন বলত?'—

—'বিধবা? বনমালাদি বিধবা হবেন কেন?—'

—'বারে, তুমি লক্ষ্য কর নি ওঁর সিঁথির দিকে? দেখলে না, সিঁদুর মুছে ফেলেছেন।'

অবাক হয়ে আমি কাগজটার দিকে চাইলাম। বনমালাদির ঠিকানা দেওয়া কাগজটা। ওঁর স্বামীর নামে মেয়েদের হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল। কানপুর থেকে কয়েক মাইল পশ্চিমে এই স্কুলটার গ্র্যান্টের ব্যাপারেই এসেছিলেন বনমালাদি। এতক্ষণে সব ব্যাপারটা পরিষ্কার হল আমার কাছে। কিন্তু আশ্চর্য্য মানুষ বনমালাদি। এত বড় ভাগ্য বিপর্য্যয়ের কথা বেমালুম চেপে গিয়েছেন আমাদের কাছে।......

(ক্রমশঃ)

ইঞ্জিনীয়ারদের প্রতি

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যক্ষ শ্রীহেম গুহ ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারদের সম্প্রতি মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন। লণ্ডন ইন্‌ষ্টিটিউশন অব ইঞ্জিনীয়ার্সে'র সমুদ্রপারবর্তী শাখায় (OVERSEAS BRANCH) সভাপতির ভাষণ প্রসঙ্গে বিদেশী ইঞ্জিনিয়ারদের একাধিপত্য হানি এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের উদ্দেশ্যে তিনি আমাদের তরুণ ইঞ্জিনীয়ারদের কারিগরি পরামর্শদানের ক্ষেত্রে সঙ্ঘবদ্ধ হতে আহ্বান জানিয়েছেন। কনসালটিং (CONSULTING) একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তি, উন্নত দেশগুলিতে তার যথেষ্ট প্রসার ও কদর আছে। দেশের যে-সমস্ত ইঞ্জিনীয়ার নির্মিত ও যন্ত্র-চালনা কৌশলে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তাঁরা যেন সেই সঙ্গে প্রশাসন এবং অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির বিষয়ে আগ্রহী হন।

বহু ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ার দেশের বাইরে রয়েছেন। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক গুহ বলেন, উপযুক্ত বিধি-ব্যবস্থা বলবৎ করা উচিত, যাতে বেতন ইত্যাদির ক্ষেত্রে কোন রকম বৈষম্যমূলক আচরণ সমর্থন না পায়। তিনি আরও স্পষ্ট ভাষায় বলেন, কেবলমাত্র দেশপ্রেমের ধুয়া তুলে কাজ হবে না। তাঁর বলার উদ্দেশ্য, কার্যাকরী উপায়গুলি সম্বন্ধে সচেতন হ'তে হবে।

বিজ্ঞান একাডেমী

সাহিত্য একাডেমী রয়েছে, সঙ্গীত নাটক একাডেমী আছে, অথচ বিজ্ঞান একাডেমী নেই। সরকার সে-সম্বন্ধেও সম্প্রতি চিন্তা আরম্ভ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীজী দেশের বিশেষ প্রয়োজন ও অবস্থা বুঝে কাজ করার জন্য এ-জাতীয় একটা একাডেমী গঠন করার প্রস্তাব দিয়েছেন।

বোধ হয় অদূর ভবিষ্যতেই বিজ্ঞান একাডেমী চালু হবে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও আমাদের দেশে নানা ধরনের সংস্থা সংগঠনের অভাব নেই। বিজ্ঞান একাডেমী হবে তাদের মধ্যে নবতম। অন্যান্য বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানগুলি যা করতে পারে নি প্রস্তাবিত বিজ্ঞান একাডেমী যদি তা করতে পারে তবেই সব দিক দিয়ে সার্থক। এই মহান্ কাজটি হ'ল দেশব্যাপী সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপযোগী অনুকূল আবহাওয়া তৈরি করা। নচেৎ বীজ পুঁতলাম, চারা হ'ল, চারা বড় হয়ে মহীরুহ হ'ল, অথচ কোন ফল দিল না, তাতে বাগানের শোভা বাড়ে মাত্র, গৃহস্থের কোন কাজে আসে না।

বিজ্ঞান একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হোক!

যক্ষ্মা—"গণরোগ"

যক্ষ্মার আরেক নাম "রাজরোগ"। রাজাদের যে এই রোগ হয় তা নয়, আসলে তার চিকিৎসার রাজযোগ্য অর্থের প্রয়োজন। বর্তমানে অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বহু শক্তিশালী ওষুধ আবিষ্কার হয়েছে। যক্ষ্মাও আজ সারে। সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-র (WHO) আয়োজনে মালয়েশিয়ায় যে আন্তর্জাতিক যক্ষ্মা-নিবারণী সেমিনার অনুষ্ঠিত হ'ল তার মতে ১২ মাসের অব্যাহত চিকিৎসায় (STREPTO-MYCIN, THIACETAZON বা PAS ওষুধ প্রয়োগে) শতকরা ৮০ থেকে ৯০ ভাগ রোগীকে নীরোগ করতে সমর্থ। যক্ষ্মার বিরুদ্ধে অস্ত্র আজ তৈরি। তবু পৃথিবীতে আজ দেড় কোটি যক্ষ্মা রোগী। তাঁদের এক বৃহৎ অংশই হাসপাতাল, সেনেটোরিয়ামের দুয়ারে দুয়ারে ধর্না দিচ্ছে। যক্ষ্মা আজ বিজ্ঞানের চোখে মীমাংসিত সমাধান হলেও "গণরোগ" হিসাবে তা পরিব্যাপ্ত রয়েছে।

জলবিদ্যা

HYDROLOGY-র বাংলা বোধ হয় জলবিদ্যা। জলবিদ্যা জলের উৎস এবং তার ব্যবহার-সংক্রান্ত বিদ্যা। জল আমাদের কাছে প্রকৃতির এক আশীর্বাদ হিসাবে এসেছে। কিন্তু তার নূতন নূতন উৎসের খোঁজ এবং নানাভাবে ব্যবহার করার রীতি-পদ্ধতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে। আগে নদীর পাড়ে জনপদ বসত, বর্ষণ-সিক্ত উর্বর মাটিতে ফসলের চাষ হ'ত। প্রাকৃতিক জলপ্রবাহ এবং পরিমাণের উপর পুরাণো পৃথিবীর ইতিহাস ও ভূগোল অনেকটা নির্ভর করত। কিন্তু মানুষ আজ আপন ক্ষমতায় প্রকৃতির শক্তিকে নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসছে। নদীর বুকে তাই বাঁধ বসে, ঊষর মরুভূমি শস্যশ্যামল হয়, "বর্ষণহীন" মেঘ থেকে বৃষ্টিপাত হচ্ছে। কিন্তু এ সবের মধ্যেও জলের হিসাব-নিকাশ ঠিক ভাবে নেওয়া হয় নি। কোন্ অঞ্চলে কত বৃষ্টিপাত, সম্বৎসর নদীতে কি পরিমাণ জল বয়, ভূগর্ভে জলের পরিমাণ কত ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। অথচ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জলের প্রয়োজন বাড়ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে আগামী বিশ বৎসরে জলের ব্যবহার বেড়ে দ্বিগুণ হবে। চাষ-বাসের কথা চিন্তা করলে জলের কথা প্রথমেই মনে পড়ে। বিশ্ব কৃষি সংস্থা (FAO) পৃথিবী থেকে ক্ষুধা ও খাদ্যের ঘাটতি দূর করার জন্য অনেক পরিকল্পনা নিচ্ছেন। স্পষ্টতই, জলের সম্বন্ধে পূর্ণ তথ্য জোগাড় না করে এ বিষয়ে উদ্যোগী হওয়া যায় না। জলের আরেক নাম জীবন, সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে এই জলবিদ্যা বা HYDROLOGY মৌলিক সম্পর্কে বাঁধা পড়েছে।

এ সমস্ত দিকগুলি বিবেচনা করে সারা পৃথিবীতে জল সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ আয়োজন চলছে। এই পরিকল্পনা বহু লোকবল অর্থ সময়সাপেক্ষ। এই বছর (১৯৬৫) থেকে তাই "আন্তর্জাতিক জলবিদ্যা দশক" (INTERNATIONAL HYDROLOGICAL DECADE) সুরু হচ্ছে।

চাঁদের ঠিক নীচে

এই নামে মনোহর মাকওয়ানের ছবিটি প্রথম কোথায় দেখি মনে নেই, কন্তু তার ভাববস্তু তৎক্ষণাৎ মনে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। চাঁদ মানুষের পথে সেই পুরাণো চাঁদ হিসাবে নেই আর, তার অম্লান জ্যোৎস্না আজ ক নূতন পৃথিবীতে আলোকিত হচ্ছে। সেই শুভ্র রজত-গোলক যা স্বরূপ এক স্বপ্নমায়া রচনা করে অনন্ত নীলিমায় ভাসমান থাকত তার বাস্তবের রৌদ্রপীড়িত কুয়াশার মতই অবলুপ্ত হয়েছে, সেই স্বপ্ন যেখান সে শূন্যতার মধ্যে আজ মানুষের আশা ও স্বপ্ন ইমারত বেঁধে উঠেছে। চাঁদের চেহারাও পালটে গেছে। সেই জ্যোতির্ময় অখণ্ডতার মধ্য ভৌগোলিক বিবরণ খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙ্গে পড়ছে, যা তুচ্ছ, তাৎপর্যহীন কল্পমাত্র ছিল তা ভেদ করে আজ পাহাড় সমুদ্র উপত্যকা কালো কালো রেখায় চিহ্নিত হয়ে উঠেছে। সমস্ত চাঁদ ও চাঁদের আশেপাশের জ্যো মানুষের উপনিবেশ গড়ে উঠছে। এর মধ্যে পুরাণো কালের স্বপ্ন আত্মগোপন করেছে।

স্বয়ংক্রিয়তার সমস্যা

স্বয়ংক্রিয়তা যন্ত্রের রাজ্যে শৃঙ্খলা নিয়ে এসেছে। মানুষের অনেক চিন্তা ও বিবেচনায় অংশগ্রহণ করেছে—চিন্তার জগতে তা যেন এক "রোবট", লোডার (LODER) বা কনভেয়ার (CONVEYOR) যেমন যান্ত্রিক যুগে। স্বয়ংক্রিয়তা প্রথম শিল্প বিপ্লবের পর দ্বিতীয় এক বিপ্লব নিয়ে আসছে। প্রথম শিল্প বিপ্লবের মত সামাজিক ক্ষেত্রে তার প্রতিক্রিয়া দূরপ্রসারী—আরও দূরপ্রসারী হবে। তার একটি ইতিমধ্যেই প্রকট হয়ে উঠছে শিল্পোন্নত দেশগুলিতে। এই সমস্যা হ'ল বেকারীর সমস্যা। কলকারখানার যে অজস্র উৎপাদন, তা মানুষ এবং যন্ত্রের সহায়তায় সম্ভব হচ্ছে। ক্রমবর্ধমান স্বয়ংক্রিয়তার জন্য এ ব্যবস্থায় শ্রমের দিক থেকে মানুষের প্রয়োজন কমে আসবে। যন্ত্রই মানুষের কাজ আরও বেশি পরিমাণে করে দেবে। তার চেয়েও বড় কথা, আরও বেশি নির্ভুল উপায়ে, আরও তাড়াতাড়ি করে দেবে। মানুষ যা করত প্রয়োজনমত সিদ্ধান্ত নেওয়া, যন্ত্রও তা করে দিতে পারবে। মানুষের প্রয়োজন তাই সীমাবদ্ধ হবে। মানুষই যন্ত্রকে তৈরি করেছে, সমাধানের পথে সেই তাকে নির্দেশ দিয়েছে, কিন্তু তারপরেই তার প্রয়োজন ফুরোবে, যন্ত্রকে চালু রাখা, তার সেবা করা, শুশ্রূষা করা এটাই তার প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়াবে।

মানুষ যন্ত্রের কাছে খাটো হয়ে পড়ছে—হঠাৎ এ কথাই সত্য মনে হতে পারে। কিন্তু আসলে যা সত্য, মানুষের কাজ এবং কিছু পরিমাণ চিন্তার ভার যন্ত্র বহন করছে, বহন করছে প্রাগ্-নির্ধারিত উপায়ে—অর্থাৎ কতটা "চিন্তা" করবে, বিবেচনা করবে মানুষই তার সীমারেখা এঁকে দিচ্ছে। যন্ত্রকে আপাতদৃষ্টিতে যত বড়ই মনে হোক না কেন, তার চারিদিকে "লক্ষ্মণের গণ্ডি" কাটা রয়েছে, এই সীমানার বাইরে কাজ বা সমস্যা যত সহজই হোক না সমস্ত কুশলতা সত্ত্বেও যন্ত্র দিশাহারা হয়ে উঠবে। মানুষ আর যন্ত্রের মাঝখানে বিরাট ব্যবধান তাই বরাবরই থেকে যাচ্ছে, যন্ত্র তার সমস্ত যান্ত্রিকতা ও কুশলতা সত্ত্বেও মানুষের অধিক নয় কখনও। যন্ত্র বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মানুষকে ছাড়িয়ে উঠতে পারে এ পর্যন্ত, কিন্তু তা মানুষেরই সমর্থন ও মনন-শক্তির বলে।

তবু মাঝে মাঝে যন্ত্র মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। প্রথম শিল্প বিপ্লবের পর যে-কোন যন্ত্রের যান্ত্রিক শক্তি—তার নিছক কাজ করার শক্তি মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছিল। এর প্রতিঘাত সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিচিত্র আলোড়ন সৃষ্টি করে ইতিহাসের প্রবাহকে জটিল করে তুলেছিল। বর্তমানে বিজ্ঞানের বহুমুখী উন্নতির গুণে যন্ত্র আজ "চিন্তা" করতে শিখেছে। সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে। "লক্ষ্মণের গণ্ডি" প্রসারিত হয়েছে। মানুষ বৃহত্তর আঙ্গিনায় যন্ত্রের মুখোমুখি এসে দাঁড়াচ্ছে। মুখামুখি বললাম, প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা বললাম, আসলে কিন্তু মানুষের অনুকূল কাজের জন্যেই যন্ত্রকে এভাবে গড়া হয়েছে। স্বয়ংক্রিয়তা আজকের দিনেরই নূতন নয়, যন্ত্র গড়ার প্রথম দিন থেকেই স্বয়ংক্রিয়তা কিছু পরিমাণ ছিল, আজ তা বেড়ে উঠেছে। যান্ত্রিক দুনিয়া যে ভাবে জটিল হচ্ছে, তাতে তার নিয়ন্ত্রণে শুধু মানুষের বুদ্ধি বা চিন্তা মাত্র নয়, যন্ত্রের "বুদ্ধি" অর্থাৎ স্বয়ংক্রিয়তাও কাজে লাগাতে হচ্ছে। ঠিক এখানে যন্ত্র আর মানুষ মুখামুখি এসে দাঁড়াচ্ছে। যন্ত্র যখন মানুষের কাজ করে তখন সেই সীমাবদ্ধ বিশেষ কাজটুকু মানুষের থেকেও তা ভাল ভাবে করে। যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ যাদের হাতে, তারা তখন মানুষের দাবি বাদ দিয়ে যন্ত্রকেই গ্রহণ করে নেয়। মানুষের কাজ যন্ত্র করে, ফলে মানুষ—শ্রমিক মানুষ কর্মহীন হয়। সম্মুখ প্রয়োজনের কথা ভেবে যন্ত্রের আংশিক সুবিধাগুলির উপর যখন বিবেচনা করা হয়, বেকারীর সমস্যা সামাজিক ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। যন্ত্রকে যারা গ্রহণ করে মানুষের এই জীবিকার সমস্যার সমাধানে কার্যকরী হওয়া তাদেরই নৈতিক কর্তব্য। এই কর্তব্য অবহেলিত বা বিস্মৃত হ'লে স্বয়ংক্রিয়তার আশ্চর্য কুশলতা নূতন সমস্যার সৃষ্টি করে। বর্তমানে আমাদের দেশেও তার কিছু প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। সমাজবিজ্ঞানী এবং গণতান্ত্রিক সরকারকে এ বিষয়ে এখন থেকেই অবহিত হ'তে হবে।

এ. কে. ডি

স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী—কমলা দাশগুপ্ত লিখিত। মূল্য ১০.০০, ৪২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের দেশে স্বাধীনতার সংগ্রাম দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল, কখনও প্রবল ভাবে, কখনও ধীর গতিতে। এই সংগ্রামে প্রথম যে নারী যোগ দিয়েছিলেন প্রকাশ্যে, তিনি সরলাদেবী চৌধুরাণী। "তিনি কেবলমাত্র নারী-মহলে নন, সমগ্র জাতিরই সেদিন একজন অগ্নিবাহিকা নেত্রী।" সে ১৯৩০-এর অনেক আগে।

ক্রমে ক্রমে বহু নারী এই সংগ্রামে একে একে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ১৯৩০ সালের লবণ-আইন অমান্য আন্দোলনে মেয়েরা দলে দলে কারাবরণ করেন। তখন থেকে রাজনৈতিক কর্ম্মক্ষেত্রে মেয়েদের অবাধ আনাগোনা। কমলা দাশগুপ্ত স্বয়ং একজন এইরূপ মহিলা-কর্ম্মী। ইনি কল্যাণী দাস, সুরমা মিত্র প্রভৃতির সহিত ১৯২৮ সালে "ছাত্রীসংঘ" গঠন করেন। বীণা দাস, প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার প্রভৃতি পরবর্ত্তী কর্ম্মীরাও এই 'ছাত্রীসংঘে'র সদস্য হন।

স্বাধীনতা আন্দোলনে যে-সকল নারী নানা ভাবে যোগ দেন তাঁদের অনেকের বা অধিকাংশের সংক্ষিপ্ত জীবনী এই বইখানিতে কমলা দাশগুপ্ত লিখেছেন। অধিকাংশের ছবিও আছে। অবশ্য অনেক মেয়ের নাম নানা অসুবিধার জন্য বাদ গিয়েছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে ১৯৪৭ সালে। স্বাধীনতার পর কমলা "প্রগাঢ় নিষ্ঠার সঙ্গেই করে গেছেন কংগ্রেসের প্রচার কাজ এবং তেমনি গঠনমূলক কাজ।"

তাঁর এই বইটির বহুল প্রচার কামনা করি। আমাদের দেশের শিক্ষিতা ও অর্দ্ধশিক্ষিতা মেয়েরাও যে দেশের জন্য কত দুঃখবরণ করেছেন আজকের মেয়েদের তা জানা উচিত। জীবনটা যে কাজের জন্য একথা ভুললে চলবে না।

শ্রীশান্তাদেবী

তুয়া অনুরাগে: সমর বসু, সম্বোধি পাবলিকেশন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২২, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা—১। মূল্য ৪ টাকা।

বিষয়বস্তুর দিক হইতে কোন নূতনত্ব না থাকিলেও লেখার গুণে গ্রন্থখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে। পড়িতে বসিলে শেষ না করিয়া পারা যায় না। বিশেষ করিয়া, গল্পের মধ্য দিয়া অতীত-কাহিনী বলিয়া লইবার কৌশলটি চমৎকার হইয়াছে। তবে লেখক ঘটনাকে বিস্তৃত করিতে গিয়া ফাঁপড়ে পড়িয়াছেন। যে কাবেরীর প্রেমের মর্য্যাদা রাখিতে বীথিকে গ্রহণ করিতে পারিল না, সে মন্দিরাকে গ্রহণ করিল কোন্ যুক্তিবলে লেখক কোথাও তাহা বলেন নাই। এ অসঙ্গতি বড় চোখে পড়ে। নারী রহস্যময়ী। কোথাও সে শান্ত সংযত, কোথাও সে উদ্দাম—নিজেকে বাঁধিতে জানে না, আবার কোথাও নারী বলিয়াছে, সেই প্রেমই বড় প্রেম – সমাজকে লইয়া যে-প্রেম গড়িয়া উঠিয়াছে। কাবেরী তাহাই চাহিয়াছিল, পাইল না। লেখক এই তিন নায়িকার সৃষ্টি করিয়া নারীর বিভিন্ন দিকটিই দেখাইয়া দিয়াছেন। সুন্দর পরিকল্পনা। বইখানি সকলেরই ভাল লাগিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

বর্ণালী: হাসিরাশি দেবী, অনন্যা প্রকাশনী, ১৭, বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

কয়েকটি কবিতা এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কবি হিসাবে হাসিরাশির নাম আছে। কবিতাগুলি পূর্বে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। সুখপাঠ্য। আধুনিক কবিতার ধোঁয়াটে গন্ধ নাই। কবিতা যাঁহারা ভালবাসেন তাঁহাদের ভাল লাগিবে এটুকু বলা যায়। কবিতা শিল্প, কিন্তু ছাপার অ-পরিপাট্য মনকে পীড়া দেয়।

শ্রীগৌতম সেন

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৭৭।২।১ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৪শ ভাগ
২য় খণ্ড

পঞ্চম সংখ্যা
ফাল্গুন, ১৩৭১

বিবিধ প্রসঙ্গ

শিক্ষক ধর্ম্মঘটের অবসান

বিগত ১৯শে ফেব্রুয়ারী মাধ্যমিক পর্য্যায়ের শিক্ষকদের ধর্মঘট আরম্ভ হয়। গত রবিবার ৭ই মার্চ্চ এই কর্ম্মবিরতি ধর্ম্মঘট শেষ হয়। ঐ দিন, রবিবার এসপ্লানেড ইষ্ট অঞ্চলে যাঁহারা বসিয়াছিলেন তাঁহারা সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ সেখান হইতে চলিয়া যান।

রবিবার নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় এই আন্দোলন প্রত্যাহারের প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাহার পর এসপ্লানেডে ঐ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন, সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীমতী অনিলা দেবী। তাঁহার মতে শিক্ষকদের অর্থনৈতিক লাভ না হইলেও নৈতিক জয় হইয়াছে।

সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় যে, স্কুল ফাইনাল, হায়ার সেকেণ্ডারী প্রভৃতি পরীক্ষা যাহাতে নির্দ্দিষ্ট সময় (১৫ই মার্চ্চ) সুরু হয় ইহাই তাঁহারা চান। শিক্ষক আন্দোলনের ফলে পরীক্ষা স্থগিত রাখা হইল—এই অজুহাত সৃষ্টির সুযোগ তাঁহারা দিতে চান না। তাহা ছাড়া কতকগুলি দাবিও সরকার বিবেচনার আশ্বাস দিয়াছেন। ঐগুলির মধ্যে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি, শিক্ষক ছাড়া অন্যান্য কর্ম্মীদের বেতন হার সংশোধন, ক্রমশঃ বেশী সংখ্যক জুনিয়র হাইস্কুলকে ঘাটতি পুরণযোগ্য অর্থ মঞ্জুরী দান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ধর্ম্মঘট প্রত্যাহৃত হইয়াছে ইহাতে আমরা সকলেই সুখী। শিক্ষার পর্য্যায়ে বিক্ষোভ, আন্দোলন ইত্যাদি চিন্তাশীল লোক মাত্রেরই কাছে অতি উদ্বেগজনক পরিস্থিতির পরিচয় দিতে বাধ্য। এই ধর্ম্মঘট কোন প্রকারে দেশের শান্তিশৃঙ্খলা নষ্ট করে নাই ইহা আশ্বাসের কথা। কিন্তু মাঝে যেভাবে দুইটি মিছিল চালিত হইয়াছিল তাহাতে অশান্তির সম্ভাবনা বেশ স্পষ্টই দেখা দিয়াছিল। কেননা সেই মিছিলে একদল কিশোর ও যুবক "শ্লোগানের" চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে যেরূপ লম্ফঝম্ফ করিতেছিল তাহা অশান্তির পূর্ব্বলক্ষণ রূপে অন্যজাতীয় মিছিলে বহুবার দেখা গিয়াছে। সুখের বিষয় ঐরূপ "বিক্ষোভ প্রদর্শন" আর অগ্রসর হয় নাই। ঐ মিছিলে একদিকে যেমন শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের অভাব-পীড়িত অথচ স্থির মুখ দেখা যাইতেছিল অন্যদিকে সেই সঙ্গেই ঐ ভাবে অপরিণত-মস্তিষ্ক তরুণদের উদ্দাম "বিক্ষোভ সঞ্চালন"ও সমানে দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। এই দুইয়ের সংযোগ শুধু যে বিসদৃশ মনে হইতেছিল তাহাই নয়, সেই সঙ্গে মনে এ ভাবনাও দেখা দেয় যে, ইহার পর ঐ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীগণ ঐরূপ তরলমতি

কিশোর বা তরুণদের মধ্যে বিনয়-শৃঙ্খলার শিক্ষাদান করিতে পারিবেন কি না এবং তাহাদের সংযত করিতে সক্ষম হইবেন কি না।

শিক্ষকদের অভাব-অনটন সারা দেশের পক্ষে যেমন পীড়াদায়ক তেমনই লজ্জার বিষয়। কিন্তু শিক্ষাব্রতের সঙ্গে যে সংযম ও ধৈর্য্য এ দেশে চিরদিন বিজড়িত আছে তাহা নষ্ট হইলে শুধু শিক্ষকদের নহে, সমস্ত দেশেরই অমঙ্গল। শিক্ষক বা শিক্ষাব্রতী সম্পর্কিত কোনও আন্দোলনের কথা আলোচনা করার পূর্ব্বে একথা আমাদের বলিতেই হইবে যে, শিক্ষকের—বিশেষতঃ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্য্যায়ের বিদ্যায়তনে শিক্ষকদের—জীবনযাত্রা পথ এদেশে কোনদিনই সহজ ও সরল ছিলনা। তবে পূর্ব্বকালে অভাব-অনটন সত্বেও শিক্ষকের সংসার চলিত, তাঁহাদের পরিবারের ভদ্রস্থ রক্ষা সম্ভব হইত এবং উপরন্তু সমাজে শিক্ষকের মান-সম্ভ্রমও অবস্থার তুলনায় অনেক উচ্চে ছিল। আজ সেই অভাব-অনটন নিদারুণ কৃচ্ছ্রসাধনে পরিণত হইয়াছে। উপরন্তু পরিবারের প্রতিপালন অসম্ভব হইয়া পড়ায় শিক্ষকের জীবনের মান অবনত ও সমাজে প্রতিষ্ঠা লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। আজিকার দিনে, যেথানে সমাজে মানমর্য্যাদা সব কিছুরই পরিমাপ হয় টাকার ওজনে এবং সেই টাকা কোন্ পথে আসিয়াছে যখন তাহার কোনও বিচার হয় না তখন সেই সমাজে শিক্ষকের স্থান কোথায় নামিয়া গিয়াছে তাহার বিচারই বৃথা। সুতরাং শিক্ষকদিগের আন্দোলন ও অভাব জ্ঞাপনের সবিশেষ বিচার করার পূর্ব্বে আমাদের বলিতে হয় যে, যদি সমাজের কোনও শ্রেণীর লোকের দেশের অধিকারীবর্গের নিকট অভাব-অনাটন জ্ঞাপন ও তাহার প্রতিকার দাবি করার পূর্ণ কারণ থাকে তবে সে শিক্ষক শ্রেণীর। এবং এ কথাও সত্য যে, বিনা দাবী-দাওয়ায় ও আন্দোলনে বর্ত্তমান অবস্থায় কাহারও কিছু অভাব পূরণ হয় না।

কিন্তু শিক্ষক সম্প্রদায় সমাজের চিন্তাশীল ও বুদ্ধি-বিবেচনাসম্পন্ন স্তরের অংশ। তাঁহাদের দাবি-দাওয়া কি ভাবে কতটা পূরণ হইতে পারে সে সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করিবার মত জ্ঞান-বুদ্ধি তাঁহাদের অধিকাংশেরই আছে—অন্ততঃ তাহাই আমাদের ধারণা। বর্ত্তমান সময়ে যেভাবে শ্রমিক সম্প্রদায়ের দাবি-দাওয়া লইয়া এক শ্রেণীর শ্রমিক-নেতা রাষ্ট্রনৈতিক খেলা খেলিতেছেন—যে খেলার ফলে পশ্চিম বাংলা হইতে বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান অন্য প্রদেশে চলিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীগণও যে সেই জাতীয় নেতার ক্রীড়াকন্দুক হইবেন ইহা আমরা ভাবিতেও পারি নাই। অথচ ঠিক যে ভাবে ঐ শ্রেণীর নেতা যেমন কোন প্রকার যুক্তি-তর্ক বা বিচারের অবকাশ না দিয়া কেবলমাত্র বিক্ষোভ এবং বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়া ও নানাপ্রকার ভয় দেখাইয়া দাবি-দাওয়া পুরণের চেষ্টা করেন, শিক্ষকদের দাবি দাওয়ার আন্দোলনে তাঁহাদের নেতাগণেরও কতকটা সেই ধরনেরই কথাবার্ত্তা ও কার্য্য-কলাপ দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়াছি। সুখের বিষয়, ব্যাপারটা আরও গুরুতর অবস্থায় পৌছাইবার পূর্বে শিক্ষকদের মনে স্থির বুদ্ধি ফিরিয়া আসে।

"সরকারী ভাষা" ও সরকারী ভাষা আইন সংশোধন

লিখিবার সময় মাদ্রাজ রাজ্যে আবার হিন্দী-বিরোধী আন্দোলন চলিতেছে। এই হিন্দী-বিরোধী আন্দোলনের ফলে কোয়েম্বাটুর হইতে পঞ্চান্ন মাইল দূরে নীলগিরি পর্বত-মালার উপর অবস্থিত শৈলাবাস উতকামণ্ডে গুলী চলিয়াছিল। এই ঘটনার যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার কিছু অংশ নীচে দেওয়া হইল।

কোয়াম্বাটুর, ১২ই মার্চ্চ—আজ উতকামণ্ডে হিন্দী-বিরোধী বিক্ষোভকারীদের উপর পুলিস দুই জায়গায়—মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলের কাছে ও মার্কেট পোষ্ট অফিসের কাছে—লাঠি, কাঁদুনে গ্যাস ও শেষে গুলী চালায়। গুলীতে ৬৫ বৎসরের এক বৃদ্ধ মারা গিয়াছে। আহত হইয়াছে ১৪ বৎসরের এক বালক সমেত মোট দশজন।

ঐ শহরে আপাততঃ তিন দিনের জন্য ১৪৪ ধারা জারি হইয়াছে, কার্ফু বলবৎ হইয়াছে, পাঁচ লরী বোঝাই সৈন্য এবং দুই লরি বোঝাই সশস্ত্র পুলিস পাঠানো হইয়াছে।

সরকারীসূত্রে এখানে যে সংবাদ আসিয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, জনতা মারমুখী হইয়া উঠিলে পুলিস গুলী চালায়। শহরের দুইটি স্থানে গুলীবর্ষণের ঘটনা ঘটে। সহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলের সম্মুখে পুলিস জনতার উপর গুলীবর্ষণ করে। আবার ঘটনাটি

ঘটে বাজার পোষ্ট অফিসের নিকট। বাজারে জনতা ছত্রভঙ্গ করার জন্য প্রথমে পুলিস লাঠি চালায়।

ওয়েলিংটনের মাদ্রাজ রেজিমেন্টাল সেন্টার হইতে পাঁচ লরী বোঝাই সৈন্য ও কোয়াম্বাটুর হইতে দুই লরী বোঝাই মহীশূর স্পেশাল সশস্ত্র পুলিস উতকামণ্ডে পাঠানো হইয়াছে। শহরের প্রতি পথের মোড়ে সশস্ত্র পাহারার ব্যবস্থা হইয়াছে। টহলদারিও চলিতেছে।

উত্তর আর্কটের কয়েকটি জায়গায় বিক্ষোভকারীরা টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। থাক্কোলামে একটি ডাকঘর অক্রান্ত হয়। ভেল্লোরে বাস ও ভ্যানগুলির উপর হিন্দীবিরোধী পোষ্টার লাগানো হয়।—ইউ. এন. আই. ও পি. টি. আই.

মাদ্রাজ প্রদেশে হিন্দী-বিরোধী আন্দোলন এতদিন শান্ত ছিল। হঠাৎ পুনর্ব্বার এই ভাবে জনতা উত্তেজিত ও অশান্ত হইল কেন সে বিষয়ে সবিশেষ কোনও খবর এখনও আসে নাই। সংবাদটি শঙ্কাজনক সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। কেননা দেখা গিয়াছে জনতা যখন তাহার জন্মগত অধিকার অপহৃত বা ব্যাহত হইতেছে এই সন্দেহ করে তখন সেই বিক্ষুব্ধ জনতাকে গুলী চালাইয়াও শান্ত করা সম্ভব হয় না। এক জায়গায় গুলী চালাইয়া ক্রুদ্ধ জনসমষ্টিকে ছত্রভঙ্গ করিলে অন্য আর এক জায়গায় আগুন জ্বলিয়া উঠে। ক্রমে এই ভাবে বিক্ষোভ ব্যাপক হইলে তাহাকে সামলানো অতি দুরূহ ব্যাপার দাঁড়ায়। আশা করা যায় মাদ্রাজ কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে সচেতন আছেন।

অ-হিন্দীপ্রদেশ গুলির মধ্যে এখন সর্ব্বত্রই প্রতীক্ষা চলিতেছে যে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা ও সংসদ এই ভাষা সমস্যার নিষ্পত্তি কিভাবে করেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার দপ্তর-চালক আমলাবর্গের মধ্যে, হিন্দীওয়ালাদেরই ওজন বেশী এবং কয়েকটি প্রধান দপ্তরের কর্তাব্যক্তিদের—অর্থাৎ মন্ত্রীদের মধ্যেও হিন্দীভাষী বেশী। সুতরাং হিন্দী সরকারী ভাষা হওয়ায় স্বজন পোষণের আর একটি প্রশস্ত পথ খুলিয়া গেল ভাবিয়া আমলাতন্ত্র উৎফুল্ল হইয়া মহা উৎসাহে হিন্দীতে—বাগে অপরূপ মিশ্রভাষীকে এখন হিন্দী বলিয়া চালানো হইতেছে সেই ভাষায়—সরকারী চিঠিপত্র ইত্যাদি চালাইতে আরম্ভ করেন। এই উদ্যমে বাধা পড়িল সমস্ত দক্ষিণ-পূর্ব্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলে হিন্দী বিরোধের আগুন জ্বলিয়া উঠায়। সুতরাং "হিন্দী চালাও "আংরেজী হটাও" এই শুভ প্রচেষ্টা —যাহা পুরাদমে চালাইতে পারিলে হিন্দীভাষাজ্ঞানের অভাব হেতু অহিন্দীভাষীকে সরকারী সকল কাজ ও সকল উদ্যম হইতে বঞ্চিত ও ভাষাজ্ঞানের অজুহাতে আত্মীয়গোষ্ঠীর অনেক আকাট মূর্খকে "পার" করা যাইত—স্থগিত রাখিতে হইল।

তারপর অনেক জল্পনা-কল্পনা ও অনেক এলোমেলো কথাবার্ত্তা বলার পর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন বসিল এবং সেই অধিবেশনে সকল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের ডাকিয়া সলা-পরামর্শ দুইদিন ধরিয়া চলিল। সবশেষে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভাকে নির্দ্দেশ দেওয়া হয় ঐ প্রস্তাবকে কার্য্যকরী রূপ দিয়া অহিন্দী দেশ-বাসীকে আশ্বস্ত ও জাতীয় সংহতি রক্ষা করিতে।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবটি এক প্রকার "জোড়াতাপ্পি" দেওয়া ও দায়সারা প্রস্তাবই ছিল। নীচে সেটি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। কেননা যেভাবে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দপ্তরের ফন্দিবাজ কর্ত্তারা ঐ 'জোলো" প্রস্তাবে আরও জল ঢালিয়া নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিল করার চেষ্টা করিতেছেন তাহাতে অহিন্দী ভাষী চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই এবিষয়ে সচেতন থাকা প্রয়োজন। প্রস্তাবের নিম্নস্থ অনুবাদ আনন্দবাজারের :—

"সরকারের ভাষা নীতি এবং উহার রূপায়ণে আমাদের জনসাধারণের মনে এখনও যে আশঙ্কা রহিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিয়া ওয়ার্কিং কমিটি দুঃখিত হইয়াছেন। অথচ কংগ্রেসের প্রস্তাবে, জাতীয় সংহতি সম্মেলনের প্রস্তাবে, ভারত সরকারের সিদ্ধান্তে, স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহর-লাল নেহরুর আশ্বাসে এবং বর্ত্তমান প্রধানমন্ত্রী শ্রীলাল-বাহাদুর শাস্ত্রী কর্তৃক ঐ আশ্বাসের পুনরাবৃত্তিতে এই সম্পর্কে সব কিছুই পরিষ্কার করিয়াই বলা হইয়াছে।

জনসাধারণের সম্মতি ও সহযোগিতা দ্বারা সমস্ত জটিল সমস্যার সমাধানের উপরই বৈচিত্র্যে ভরা এই বিরাট্ দেশের স্থায়িত্ব ও উন্নতি নির্ভর করে—কংগ্রেস সর্ব্বদাই এই কথা বলিয়া আসিয়াছে। সেইভাবেই ভাষা সম্পর্কে মৌল নীতি বাহির করার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে। এই নীতি সব রাজ্যে সব লোকের জন্যই ন্যায়সঙ্গত হওয়া প্রয়োজন এবং এই নীতি যাহাতে দেশের সংহতি বজায় রাখিতে সাহায্য করে তাহাও দেখা দরকার। এই ব্যাপারে দেশের কাছে মহাত্মা গান্ধী এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর পথনির্দ্দেশ রহিয়াছে। ফলে ভাষা নীতি সম্পর্কে কতকগুলি ঐক্যমত লাভ করা সম্ভব হইয়াছে।

সরকারী ও জাতীয় ভাষা

এই পরিপ্রেক্ষিতেই ভারতীয় সংবিধানে লিখিত হয় যে, হিন্দীই ভারতীয় ইউনিয়নের সরকারী ভাষা হইবে। সেই সঙ্গে সব কয়টি প্রধান আঞ্চলিক ভাষাকেও দেশের

জাতীয় ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হইবে। সংবিধানের এই ব্যবস্থা অনুযায়ী আশা করা গিয়াছিল যে, এই ভাষাগুলির ব্যবহার ও উন্নতির জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। কমিটি মনে করেন, এই ব্যাপারে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। কমিটি ভারত সরকারকে অনুরোধ করেন যে, সরকার যেন রাজ্য সরকারগুলির সহযোগিতায় হিন্দী এবং সব কয়টি জাতীয় ভাষার ব্যবহার ও উন্নতির দিকে আরও দৃষ্টি দেন। ওয়ার্কিং কমিটি পরিষ্কার করিয়াই এই কথা বলিতে চান, জাতীয় ভাষাগুলির সম্পূর্ণ উন্নতি লাভ করা সম্ভব না হইলে দেশকে যথেষ্ট আগাইয়া লইয়া যাওয়া সম্ভব হইবে না এবং নূতন, ন্যায়সঙ্গত এবং সমৃদ্ধিশালী সমাজ গঠনের নির্দ্ধারিত লক্ষ্যের দিকে আমাদের কোটি কোটি জনসাধারণকে আমরা পরিচালিত করিতে পারিব না।

তবে জনসাধারণের মনে যথেষ্ট ভীতি রহিয়াছে যে, তাহাদের উপর হিন্দী বা ইংরাজী চাপাইয়া দেওয়া হইবে। স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, কংগ্রেস দৃঢ়ভাবে তাহা পালন করিবে ওয়ার্কিং কমিটি পুনরায় বিশেষ জোর দিয়া এই কথা বলিতে চান। কংগ্রেস এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবেই।

১৯৬৩ সনের সরকারী ভাষা আইনের তৃতীয় ধারায় আছে—

সংবিধান কার্য্যকরী হওয়ার পর পনের বৎসর অতিক্রান্ত হইলেও, নিদ্ধারিত দিন হইতে হিন্দী ছাড়াও ইংরাজী ভাষা চালু রাখা যাইতে পারে—

(ক) ইউনিয়নের সেই সমস্ত কাজের জন্য, যে সমস্ত কাজের জন্য ঠিক ঐ দিনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উহা ব্যবহার করা হইতেছিল। এবং

(খ) সংসদের কাজের জন্য।

সরকারী কাজ

তা ছাড়া, এই প্রতিশ্রুতি অনুসারে, প্রত্যেক রাজ্য নিজেদের পছন্দমত ভাষায় কাজ করার জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীন। —সেই ভাষা আঞ্চলিক ভাষা, হিন্দী বা ইংরাজী হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, এক রাজ্য হইতে অন্য রাজ্যে আদান-প্রদানের জন্য নির্ভরযোগ্য ইংরাজী অনুবাদ সহ হিন্দী বা ইংরেজী ব্যবহার করিতে হইবে; তবে যে সমস্ত রাজ্যের সরকারী ভাষা এক তাহারা ঐ ভাষায়ই আদান-প্রদান করিতে পারিবেন। তৃতীয়তঃ, অ-হিন্দীভাষী রাজ্যগুলি ইচ্ছা করিলে কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত ইংরেজীতে কাজ চালাইতে পারিবেন। চতুর্থতঃ, কেন্দ্রীয় পর্য্যায়ে কাজ চালাইবার জন্য অন্তবর্ত্তীকালে ইংরাজী সহযোগী সরকারী ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হইবে। রাজ্যগুলির মত না লইয়া এই ব্যবস্থার কোন পরিবর্ত্তন করা হইবে না।

ওয়ার্কিং কমিটি দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করিয়াছেন যে, কতকগুলি রাজ্য ত্রি-ভাষা নীতি কার্য্যকরী করেন নাই। দেশে ত্রি-ভাষা নীতি সকলেই গ্রহণ করিয়াছেন। জাতীয় সংহতি সম্মেলন এই নীতির উদ্ভাবক। ইহা কার্য্যকরী-ভাবে রূপায়িত করার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত বলিয়া ওয়ার্কিং কমিটি মনে করেন।

সর্ব্বভারতীয় চাকুরি

সর্ব্বভারতীয় চাকুরিতে পরীক্ষার মাধ্যমের প্রশ্নও ওয়ার্কিং কমিটি বিবেচনা করেন। ওয়ার্কিং কমিটি সুপারিশ করেন যে, যতশীঘ্র সম্ভব সর্ব্বভারতীয় চাকুরির পরীক্ষা হিন্দী, ইংরাজী বা প্রধান আঞ্চলিক ভাষায় গ্রহণ করিতে হইবে। পরীক্ষার্থীরা যে কোন একটি ভাষা বাছিয়া লইতে পারিবেন।

ইহাতে পরীক্ষার মান সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিতে পারে। কাজেই ওয়ার্কিং কমিটি ভারত সরকারকে এই প্রশ্ন এবং সর্ব্বভারতীয় চাকুরিতে বিভিন্ন রাজ্যের হারাহারি ভাগের প্রশ্নটি সব দিক দিয়া বিবেচনা করিতে বলেন।

এই প্রস্তাবের সমস্ত সুপারিশগুলি এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর আশ্বাস কার্য্যকরী করার জন্য ১৯৬৩ সালের সরকারী ভাষা আইন সংশোধন সহ সমস্ত ব্যবস্থাগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখার জন্য ওয়ার্কিং কমিটি ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলিকে অনুরোধ করেন।

বিগত ২৪শে ফেব্রুয়ারী এই প্রস্তাব গৃহীত ও প্রচারিত হয়। তার পর দিন যতই যাইতেছে সমস্ত বিষয়টা যেন ক্রমেই আরও "ঘোলাটে" ও অনিশ্চিতের দিকেই চলিতেছে। প্রধানমন্ত্রী ও হিন্দীভাষী কর্ত্তাব্যক্তি ও সংসদের সদস্যবর্গের মনে রাখা উচিত যে, কালের স্রোতে অ-হিন্দীভাষীদের দাবি ভাসাইয়া দেওয়ার চেষ্টা বিপজ্জনক।

হিন্দী সম্পর্কে অনেকের—বিশেষে কতকগুলি লোকের, যাঁহাদের মনের ভিতরে হিন্দী মারফৎ ভারতে আধিপত্য স্থাপনের লালসা অতিশয় উগ্রভাবে রহিয়াছে—নানাপ্রকার ভুল ধারণা আছে। প্রথমতঃ, হিন্দীভাষী বলিতে যে গোষ্ঠীকে বুঝায় তাঁহাদের সকলের মাতৃভাষা একই রূপ নহে। সম্প্রতি ভারতের ভাষা সম্পর্কিত পরিবীক্ষণের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, যদিও সর্ব্বসমেত ১৩ কোটি ৩০ লক্ষ লোকে হিন্দী বলে এই বলা হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে তাহা একেবারে ঠিক নয়। ঐ হিন্দীভাষী অঞ্চলে ১৯০টি

ভিন্ন ধরনের মাতৃভাষা প্রচলিত আছে। বিহারে ৭৯ লক্ষ ৬০ হাজার লোক বলিয়াছে তাহাদের মাতৃভাষা ভোজপুরী, ৯৯ লক্ষ বলিয়াছে মৈথিলী ও ২৮ লক্ষ বলিয়াছে মাগধী। সেই সঙ্গে যদি যাহারা আবাধী, বাঙ্গরু, ব্রজভাষা, বুন্দেলখণ্ডী ও রাজস্থানীকে মাতৃভাষা বলিয়াছে, তাহাদেরও গণনা করা হয় তবে দেখা যায় যে, খাঁটি হিন্দীভাষী বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিয়াছে যাহারা তাহারা সংখ্যায় কম। ২ কোটি ৩০ লক্ষ লোক এরই ভিতর আছে, যাহাদের মাতৃভাষা উর্দু। পরিবীক্ষণকারীরা এই সকল মাতৃভাষাকে হিন্দীগোষ্ঠীর অন্তর্গত বলিয়াছেন।

যদি ১৩ কোটি ৩৩ লক্ষ লোককেই হিন্দীভাষী বলা হয়, তবে হিন্দী সারা ভারতের শতকরা ৩০ জনের মাত্র মাতৃভাষা বলা যাইতে পারে। সে ক্ষেত্রে হিন্দীওয়ালাদের মধ্যে উগ্রপন্থীদের এই "হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের" প্রচেষ্টা যে বাতুলতা হইতে কতটুকু কম তফাতে আছে তাহা সহজেই অনুমেয়।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঐ সব মহাশয় ব্যক্তিদের মধ্যেও নিজ মাতৃভাষার উন্নয়ন সম্পর্কে কোনপ্রকার চেষ্টা বা ত্যাগস্বীকার কিংবা আত্মনিবেদনের কোনও নজীর পাওয়া যায় না। উত্তরপ্রদেশে স্বর্গত রামকালী চৌধুরী ও বিহারে প্রাতঃস্মরণীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের প্রচেষ্টাতেই হিন্দীর প্রথম সরকারী স্বীকৃতি লাভ ও পরে সংকলনসাধন সম্ভব হয়। তারপর হিন্দীতে পত্রিকা স্থাপনা, ইহা দ্বারা হিন্দীভাষার উন্নয়ন ও হিন্দী-সাহিত্যের প্রগতি, ইহাতেও বাঙ্গালী পথিকৃৎরূপে ও দীর্ঘ প্রচেষ্টা এবং বহু ক্ষতি স্বীকারের কারণে হিন্দীভাষীদের নিকট স্বীকৃতি পাইবার অধিকারী। আশ্চর্যের বিষয়, বর্ত্তমানের এই কট্টর হিন্দীওয়ালারা সে-সব কথা কানেও তুলিতে চাহেন না।

এই "কট্টর" হিন্দীওয়ালাদের পুরোভাগে আছেন কয়েকজন প্রধান, যাঁহাদের অন্যতম হইলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের গুরু ও প্রধান শ্রীগোলওয়ালকর। ইঁহাদের সঙ্গে চলিতেছিল এতদিন ভারতীয় জনসঙ্ঘ কিন্তু সেখানে বিভিন্ন নেতাদের মধ্যে মতভেদ হওয়ায় এখন আর ঐ দুই দলের মধ্যে বাঁধন অত মজবুত নাই।

অন্যদিকে হিন্দীকে যাঁহারা মাতৃভাষারূপে প্রেমদৃষ্টিতে দেখেন অথচ সেই প্রেম যাঁহাদের বিচারবুদ্ধিকে বা দায়িত্বজ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে নাই এরূপ লোকের কথা এখন ক্রমেই শোনা যাইতেছে। এইরূপ একটি ভাষণ দিয়াছেন সম্প্রতি এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রী এস্ এস্ ধাবন। তিনি এলাহাবাদের এক কলেজের বার্ষিক অনুষ্ঠানে যে ভাষণ দিয়াছিলেন (হিন্দীতেই) তাহার বাংলা অনুবাদের কিছু অংশ নীচে আনন্দবাজার হইতে উদ্ধৃত হইল।

"এলাহাবাদ—ফ্রান্সে ফরাসীর মত হিন্দী কখনও বহুভাষাভাষী ভারতের সরকারী ভাষা হইতে পারে না। কেননা ফ্রান্সে প্রত্যেক ফরাসীরই মাতৃভাষা ফরাসী। অথচ, ভারতে মাতৃভাষা চৌদ্দটি। হিন্দীর পক্ষে এদের কোনটিকেই নিজের এলাকায় উৎখাত করা সম্ভব নয়।

এখানকার এক কলেজের বার্ষিক অনুষ্ঠানে এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রী এস্ এস্ ধাবন স্পষ্টই একথা বলেন। তিনি অবশ্য হিন্দীতেই কথা বলিতেছিলেন।

তিনি প্রজাতন্ত্রের সরকারী ভাষা হিসাবে হটেনটট অথবা এমনকি চীনাদের ভাষাও গ্রহণ করিতে রাজী—অবশ্য, জাতির সংহতি রক্ষার উহাই যদি একমাত্র পথ হয়।

ভারতের প্রত্যেক হিন্দীভাষী নাগরিক অবশ্যই আব্রাহাম লিঙ্কনের দৃষ্টান্ত স্মরণ করিবেন এবং নিজেকে বলিবেন, 'জাতির ঐক্য ও প্রজাতন্ত্রের সংহতির স্থান প্রথমে এবং অবশ্যই সবকিছু দিয়া উহা রক্ষা করিতে হইবে।'

'যদি আমি প্রজাতন্ত্রকে ভিতরে ভিতরে শক্তিশালী করিতে পারি—আমি সানন্দে হিন্দীকে গ্রহণ করিব। কিন্তু যদি দেখি—কেবলমাত্র হিন্দীকে বাদ দিলেই প্রজাতন্ত্রকে বাঁচাইয়া রাখা সম্ভব—মনে আঘাত পাইলেও আমি প্রজাতন্ত্রের জন্য হিন্দীকে ছাড়িব।'

ভাষা প্রকাশের মাধ্যম—পূজার্চ্চনার বস্তু নয়।

জনসাধারণ বিশেষ কোন একটি ভাষায় পরস্পরের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানে ইচ্ছুক না হইলে সেই ভাষা তাহাদের ভাষা হইয়া উঠিতে পারে না। আজ যদি বাংলা, মাদ্রাজ ও কেরলের জনগণ উত্তরপ্রদেশের জনগণের সঙ্গে হিন্দী ভাষায় ভাবের আদান-প্রদানে অসম্মত হয় তাহা হইলে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে হিন্দীর মূল্য অন্তর্হিত হইবে।

তিনি আরও বলেন যে, দুর্ভাগ্যক্রমে কিছু সংখ্যক হিন্দীর ধ্বজাধারীরা এইরূপ ধারণার সৃষ্টি করিয়াছেন যে, সরস্বতী, দুর্গা, কালীর মত হিন্দীকেও যেন কোন একটি দেবী হিসাবে পূজা করিতে হইবে এবং অহিন্দীভাষী জনগণের উপর ঐ পূজা চাপাইয়া দিতে হইবে।

তিনি বলেন যে, কোন জটিল সমস্যাকে ভাবাবেগের দৃষ্টিতে দেখিলে এইরূপ হয়। অথচ এই সমস্যাকে বৈজ্ঞানিক ও রাজনীতিবিদের দৃষ্টি হইতে দেখাই সমীচীন। হিন্দীর সমর্থকরা ইহা, উপলব্ধি করিতে পারেন না যে তাঁহারা যদি মর্য্যাদা রক্ষার জন্য অহিন্দীভাষীদের উপর হিন্দী চাপাইয়া দেন তাহা হইলে উহাতে স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত লাগিবে এবং জাতীয় ঐক্য বিপন্ন হইবে।

তিনি আরও বলেন, 'সমস্যাটিকে এই ভ্রান্তদৃষ্টিতে দেখার ফলে আমরা যাহা করিতে চাহিতেছি তাহার বিপরীত ফল

হইতেছে। ইহা জাতীয় ভাষা না হইয়া ইহার পক্ষে একটি আঞ্চলিক ভাষায় পরিণত হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। একটি আধিপত্যশীল অঞ্চল বলপূর্ব্বক তাহার ভাষাকে অন্যান্য অঞ্চলের উপর চাপাইয়া দিতেছে এবং অন্যান্য অঞ্চল তাহার প্রতিরোধ করিতেছে। সুতরাং ইহা একটি সংহতিনাশক শক্তি হিসাবে গণ্য হইবে।"

বিচারপতি ধাবনের নিজ মাতৃভাষার প্রতি প্রেম ও নিষ্ঠা কিন্তু কাহারও চাইতেও কম নহে। তাহার প্রমাণ রহিয়াছে তাঁহার ভাষণের শেষাংশে। উপরে উদ্ধৃত সংবাদের শেষ এইরূপ :

"শ্রীধাবন অতঃপর উত্তরপ্রদেশ ও অন্যান্য হিন্দীভাষী অঞ্চলে ইংরাজীর স্থলে হিন্দী প্রবর্ত্তনের বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, হিন্দী আধুনিক ভাবধারা প্রকাশের ভাষা হইতে পারে না ইহা যাঁহারা মনে করেন তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহাদের মতৈক্য নাই। তিনি বলেন যে, এই ধারণা ভাষাতত্ত্ব ও ভাষায় ইতিহাসের ধারার বিপরীত। তিনি বলেন যে, প্রাথমিক স্তরের ভাষাও জটিল ভাবধারা প্রকাশের মাধ্যম হইতে পারে।

শ্রীধাবন বলেন যে, দুর্ভাগ্যের বিষয় এই রাজ্যে হিন্দীকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করিবার পরেও হিন্দীভাষায় বিদেশী পুস্তকাদি ও সাময়িকপত্র অনুবাদের কাজ সামান্যই অগ্রসর হইয়াছে। অবশ্য ব্যাপকভাবে হিন্দীভাষায় বিদেশী পুস্তক ও সাময়িক পত্রাদি প্রকাশ করিয়া সেইগুলি সুলভ মূল্যে ছাত্র ও পণ্ডিতদের নিকট পৌছাইয়া দেওয়া এক বিরাট ব্যাপার এবং প্রতি বৎসর উহার জন্য কয়েক কোটি টাকা ব্যয় হইবে। কিন্তু হিন্দীকে ভাব প্রকাশের ভাষা হিসাবে গণ্য করিতে হইলে তাহার মূল্য দিতে হইবে।

তিনি বলেন যে, রাজ্য শুধু হিন্দী প্রবর্ত্তন করিবে অথচ বিশ্বের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও মননশীলতার সঙ্গে তাহার কোন সংযোগ থাকিবে না ইহা সঙ্গত নহে। তিনি বলেন যে, ইহার ফলেই এই অভিযোগ আসে যে, হিন্দীকে দেবী হিসাবে পূজা করাই ইহাদের অভিপ্রায়, ইহাকে গভীর ভাব ও প্রগতিশীল চিন্তার প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম হিসাবে গড়িয়া তুলিবার কোন ইচ্ছা ইহাদের নাই।"

এখন আরও বহু হিন্দীভাষী নেতৃস্থানীয় লোকেই বিচারবুদ্ধির পথে চলিতেছেন। যাঁহারা হিন্দীকে সরকারী ভাষার অধিকার দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তাঁহাদের মধ্যেও দায়িত্ব জ্ঞানসম্পন্ন অনেকে এখন ধীরে চলিবার পরামর্শ দিয়াছেন। জোর করিয়া হিন্দী চাপাইবার চেষ্টা যে নির্ব্বুদ্ধি ও সংহতি-নাশের পথ, একথা তাঁহারাও বুঝিয়াছেন। সম্প্রতি বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সহায়ও ধীরে চলার পরামর্শ দিয়াছেন।

ভারতীয় কলাশিল্প নিদর্শন চুরি

কিছুদিন যাবৎ একদল দুর্ব্বৃত্ত এদেশের বিভিন্ন কলাশালা হইতে মহামূল্য ভাস্কর শিল্প ও চিত্রশিল্পের নিদর্শন চুরি করিতেছে। বলা বাহুল্য এই চুরিতে প্রধান অংশীদার ও উদ্যোগী প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রেই একদল ব্যবসায়ী, যাঁহারা এ জাতীয় শিল্প-নিদর্শন বিক্রয় করেন। ইঁহাদের খরিদ্দারদিগের মধ্যে বিদেশী শিল্প-নিদর্শন সংগ্রহকারীরাই বেশী মূল্যবান নিদর্শন ক্রয় করেন। এবং ইহা ভিন্ন কয়েকজন বিদেশী সংগ্রহ-শালার এজেণ্ট ও বিদেশী কলাশিল্পনিদর্শন বিক্রেতাও এদেশে প্রতি বৎসর আসিয়া থাকেন। ইঁহাদের ফরমাইস অনুযায়ী ঐ সকল স্থানীয় শিল্পকলা ব্যবসায়ী এবং কয়েকজন প্রচ্ছন্ন বিক্রেতা ঐরূপ শিল্প-নিদর্শন সন্ধান করিতে থাকেন। এতদিন এই বিক্রেতা ও ব্যবসায়ী দল স্থানীয় ভদ্রজনের নিজস্ব সংগ্রহ হইতে বাছিয়া এসব কেনা-বেচা করিত। সম্প্রতি বিদেশীরা চড়া দর দিতে প্রস্তুত হওয়ায় এই বিক্রেতাদের মধ্যে অনেকে অসৎ পথে নিজেদের অর্থাগম করিতে চেষ্টিত হইয়াছে।

জাতীয় সংগ্রহশালাগুলিতে রক্ষিত অনেক মহামূল্য শিল্প-নিদর্শন এখন ঐ সব অসৎ ব্যবসায়ী নানা কারচুপি করিয়া চুরি করাইয়াছে ও করিতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে দুইটি দুর্লভ প্রস্তরমূর্ত্তি চুরি যায়। মূর্ত্তি দুইটি বিষ্ণু হৃষীকেশের প্রতিরূপ।

কলিকাতার সরকারী মিউজিয়ম হইতে শুনা যায় যে শিল্পকলার নিদর্শন যাহা চুরি গিয়াছে তাহার সংখ্যা হাজারের কোঠায় পড়ে। এ সম্পর্কে কাণাঘুষা কিছুদিন যাবৎ চলিতেছে। তবে কোনও সরকারী তদন্ত হইয়াছে বলিয়া শোনা যায় নাই, সুতরাং এখনও উহা "শোনা কথার" পর্য্যায়েই রহিয়াছে। এ বিষয়ে মিউজিয়ম কর্ত্তৃপক্ষের উচিত সত্য-মিথ্যা সম্পর্কে সন্দেহভঞ্জন করিয়া দেওয়া।

সংগ্রহশালা হইতে চুরি যদি এই ভাবে চলে তবে এ দেশে আর আমাদের প্রাচীন শিল্প-গৌরবের কোনও নিদর্শন থাকিবে না। সরকার শুধু আইন প্রণয়ন করিয়াই নিশ্চিন্ত আছেন। কবে যে সেখানে চেতনার উদয় হইবে জানি না।

এদেশে এখন দারিদ্র্যের দরুন অসৎ ব্যবসায়ী ও অসৎ কর্ম্মচারীর মিতালী চতুর্দ্দিকেই হইয়াছে। তার সঙ্গে যদি চোর-ডাকাইতও জোটে এবং বেহুঁস সরকারের কৃপায় নিজেদের কুকার্য্য সমানে চালাইতে পারে তবে ত দেশের কপাল সত্যই পুড়িয়াছে।

শিক্ষার গলদ কোথায় ?

শিক্ষা-সমস্যা দিন দিন জটিল হইয়া উঠিতেছে। ধারণ মধ্যবিত্ত লোকের পক্ষে ছেলে-মেয়েদেরকে শিক্ষা ওয়া বুঝি আর চলে না। আগে ছেলে-মেয়েদের স্কুলে ঠাইয়া অভিভাবকরা নিশ্চিন্ত হইতেন। কারণ শিক্ষা ম্বন্ধে কোন গলদ ছিল না। এখন স্কুলের খরচ এবং পাঠ্য য়ের বোঝা বহিতে অভিভাবকদের প্রাণান্ত হইতেছে। ক্ষা-সংস্কার কাজে শিক্ষা পর্ষদ বছরে বছরেই নূতন নূতন রিকল্পনা করিতেছেন। ফলে প্রতি বছরেই জট কাইতেছে। আমরা দেখিতেছি পূর্ব্বের শিক্ষা-পদ্ধতি লই ছিল। তাহাতে আর যাই হোক, ছেলে-মেয়েরা ন্ততঃ লেখাপড়া শিখিত। এখন আড়ম্বর বাড়িয়াছে, ক্ষায় ভাটা পড়িয়াছে।

দিন দিন বই বাড়িতেছে, অথচ সে বইগুলি শেষ করা ইতেছে না। ছাত্রদের যদি কোন রকমেই স্কুলে সম্পূর্ণ এবং যথোচিতভাবে পাঠ্যবিষয়গুলি শেখানো সম্ভব না হয়, বে বিপুল হারে তাহারা ফেল করিবে—এ আর বিচিত্র ক! প্রায়ই শোনা যায়, পরীক্ষার আগে পর্য্যন্ত তাহাদের সিলেবাস শেষ হয় না। যদি সিলেবাসই শেষ করিতে না ারা যায়, তবে অতগুলি বই রাখিবার প্রয়োজন কি? হার উপরে আছে যোগ্য শিক্ষকের অভাব। শুধু সিলে-বাসের দীর্ঘতার তুলনায় ক্লাস করার দিনগুলির স্বল্পতা এবং শিক্ষকের অভাবই নয়, স্কুল-কর্তৃপক্ষের ও শিক্ষকদের নিস্পৃহতাও ক্লাসে সিলেবাস শেষ না হওয়ার আর একটি কারণ। আর এই কারণটি অল্পবিস্তর প্রায় সকল স্কুল সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। বর্ত্তমানে স্কুলে সিলেবাস শেষ না করাটা যেন একটা রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

স্কুলের শিক্ষা যেখানে এইরূপ সেখানে ছেলেদের শিক্ষা দিতে হইলে গৃহশিক্ষক রাখিতে হয়। আবার গৃহশিক্ষক একজন রাখিলেই চলিবে না। কেননা, এমন শিক্ষক দুর্লভ, যিনি তিনটি গ্রুপের সকল বিষয়েই যথোচিত শিক্ষাদানের ক্ষমতা রাখেন। ইংরাজী শিক্ষাদানে যিনি অদ্বিতীয়, তিনি অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারিবেন এমন কথা নয়। যেসব অভিভাবকের তাঁর ছেলেমেয়েদের জন্য একাধিক গৃহশিক্ষক রাখার সঙ্গতি নাই, তাঁহাদের একজন গৃহশিক্ষকের উপরই নির্ভর করিতে হয়। ফলে তাহারা যে তিমিরে সে তিমিরে। তা ছাড়া প্রত্যেক ছেলেমেয়ের জন্য একজন করিয়া যোগ্য গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করার আর্থিক ক্ষমতা কয়জনের আছে তাহাও ভাবিবার বিষয়! অথচ ছেলেমেয়েকে শিক্ষাদানের ইচ্ছা সকলেরই। অগত্যা তখন তাঁহাদের গৃহশিক্ষকের অভাবে বিকল্পের খোঁজ করিতে হয়। অর্থাৎ টিউটোরিয়াল বা কোচিং হোম।

এই হোমগুলির কাজ কি? স্কুলের মতই কয়েকটি ছেলেমেয়েকে (তা তারা বিভিন্ন ক্লাসেরও হইতে পারে) একত্রে শিক্ষাদান করা। শিক্ষাদান অর্থ, পরীক্ষায় আসিতে পারে এইরূপ প্রশ্নের সাজেশন দেওয়া। ইহাতে ছাত্রদের জ্ঞানের যে অপূর্ণতা স্কুলে না-শেখানো হেতু জন্মায়, তাহা থাকিয়াই যায়। স্কুলে প্রত্যহ অন্ততঃ পাঁচ ঘণ্টা ক্লাস করিয়াও বিভিন্ন বিষয়ের যোগ্য শিক্ষকমণ্ডলীর সাহায্যে যে বিষয়গুলি শিখাইতে পারা যায় না, তাহা একজন শিক্ষক এক বা দেড় ঘণ্টায় স্কুলের মতই সমষ্টিগতভাবে সবাইকে একসঙ্গে শিখাইতেছেন। জানিয়া-শুনিয়াও আমরা ইহা চোখ বুজিয়া সহ্য করিতেছি। কারণ ইহার বেশী আমাদের করিবার কিছু নাই।

স্কুলগুলির শিক্ষাদান-পদ্ধতির মধ্যেও এমন কতকগুলি মারাত্মক ত্রুটি আছে, যাহার পরিবর্ত্তন অত্যাবশ্যক। স্কুল-শিক্ষকদের শিক্ষাদান পদ্ধতি এখন যেন ক্রমশঃ কলেজী ধাঁচের হইয়া যাইতেছে। তাঁহারা অনর্গল বক্তৃতা দিয়া চলিয়া গেলেন—ছাত্রেরা বুঝিল, কি বুঝিল না তাহার খোঁজও রাখিলেন না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আমাদের পবিত্র শিক্ষাদান-কার্য্য এমন এক অপূর্ব্ব পদ্ধতিকে আশ্রয় করিয়াছে, যাহাতে ছাত্রকে সম্পূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয় শিখানো হইবে না, তাহার কোনও বিষয় আয়ত্ত করিতে অসুবিধা হইতেছে কিনা প্রশ্ন করিয়া জানা হইবে না এবং আয়ত্ত করিতে না পারিলে তাহাকে পুনরায় বিষয়টি আয়ত্ত করিতে সাহায্য করা হইবে না, তাহাকে কি ধরনের প্রশ্নের সাহায্যে পরীক্ষা করা হইবে তাহার আভাস মাত্রও দেওয়া হইবে না, কি ধরনের উত্তর বাঞ্ছনীয় সে সম্বন্ধেও অজ্ঞ রাখা হইবে, অথচ আশা করিব সে সাফল্যলাভ করুক।

আর একটি কথা এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—স্কুল-কর্তৃপক্ষের দায়িত্বহীনতা। স্কুল-কর্তৃপক্ষ যখনই একটি ছাত্রকে তাঁহাদের স্কুলে ভর্ত্তি করেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই ছাত্রটির শিক্ষার দায়িত্ব বর্ত্তায় তাঁহাদেরই উপর। সুতরাং ছাত্রটি যাহাতে অন্তত পাসও করে, এটুকু তাঁহাদের কাছ হইতে প্রত্যাশা করা অনুচিত নয়। অথচ কার্য্যত দেখা যায় কি? না, স্কুল যেন পর্ষদের মত পরীক্ষা গ্রহণের এক কারখানায় পরিণত। মেশিনের মত সেখানে যান্ত্রিক নিয়মে শুধু ছেলেদের পাস-ফেল করানো হয়—সেখানে দায়িত্ববোধের কোনও বালাই নাই—না সিলেবাস শেষ করানোর, না শিক্ষাদানের, না ছাত্রদের অন্তত পাস করিবার

মত তৈরি করানো, না ছাত্রদের শিক্ষামানের উন্নয়নের জন্য কোনও প্রচেষ্টার।

গলদ সর্ব্বত্রই। কিন্তু এ গলদ দূর করিবে কে?

আবার দাবি

আসামের আট হাজার বর্গমাইল বিস্তৃত মিজো পার্ব্বত্য এলাকার অধিবাসী-সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ। আসামের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত বিভিন্ন দিকে ব্রহ্মদেশ, পাকিস্তান, ত্রিপুরা ও মণিপুর সংলগ্ন এই জেলাটিকে ভারত রাষ্ট্রের অধীনে মিজো রাজ্য নামে একটি স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত করার দাবী উঠিয়াছে। মণিপুর, ত্রিপুরা, নাগাভূমি, মিজো জেলা, উত্তর কাছাড় জেলা, কাছাড় জেলা হইতে ১৩টি দেশের ৮০ জন প্রতিনিধির এক সম্মেলনে এই দাবি করা হইয়াছে। ব্রহ্মদেশ ও পাকিস্তানের যে অংশে মিজো উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা রহিয়াছে, তাহাকেও এই প্রস্তাবিত রাজ্যের অঙ্গীভূত করার প্রস্তাব হইয়াছে। স্কটল্যাণ্ডের স্বাতন্ত্র্যের ধাঁচে আসাম পার্ব্বত্য রাজ্যের স্বীকৃতির আশ্বাস ভারত সরকার ইতিপূর্ব্বে আসামের পার্ব্বত্য রাজ্যসমূহের নেতাদের দিয়াছেন। নাগাভূমি স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হইয়াও বৈরী নাগাদের সহিত আপোষের নামে ভারত সরকার নিজের নাগপাশ সৃষ্টি করিয়াছেন। এখন আবার মিজো রামরাজ্যের দাবি। রাণী গুইদালোর নরহত্যা-বাহিনীর সক্রিয়তাও সুবিদিত। কাশ্মীরের সুদীর্ঘ অমীমাংসায় অভেদ্য ভারতকে ভেদ-বিরোধে জীর্ণ করিবার উৎসাহ প্রশ্রয় পাইয়াছে। উদ্দেশ্য-পরায়ণ বাহির ও ভিতরের শক্তিসমূহ ভারতকে শক্তিহীন ও ভেদ-বিরোধে সর্ব্বদা বিব্রত রাখিবার জন্য নানাপ্রকার কৌশল উগ্র করিয়া তুলিতেছে। ইহাদের মধ্যে দেশী এবং বিদেশী সাধুবাবাদের মীমাংসার মোড়লী আরও ধোঁয়া বিস্তার করিতেছে। প্রীতির বুলি ও বৈরাগ্যের বুলি হইতে ক্রমাগত সাপ বাহির হইতেছে। ভারত সরকার দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়াও যদি দৃঢ় না হন, তাহা হইলে দেশবাসীকে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে।

এদেশের চাষের জমি

পশ্চিমবঙ্গ খাদ্যশস্য, গুড়-চিনি-শিল্পের কাঁচামাল ইত্যাদি সমস্ত কৃষিপণ্যের ব্যাপারেই পরমুখাপেক্ষী। এজন্য কৃষিজমিতে ফসল বৃদ্ধি করিবার এবং বন্যা, কীটপতঙ্গ ইত্যাদির উপদ্রব হইতে জমির ফসল রক্ষার প্রয়োজনীয়তা এই রাজ্যে খুবই বেশী। কিন্তু এজন্য বৎসর বৎসর প্রভূত অর্থব্যয় হইলেও এই সব ব্যাপারে তেমন কোন সুফল পাওয়া যাইতেছে না। বন্যায় প্রতি বৎসর বহু জমির ফসল সমূহ ক্ষতি হয়। এখানে খাদ্যশস্য, গুড়-চিনি, শিল্পের কাঁচামাল ইত্যাদির যে রকম ঘাটতি রহিয়াছে, বন্যার জন্য সেই ঘাটতির পরিমাণ আরও বাড়িয়া গিয়াছে। এজন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্ত্তব্য ছিল এতদিনে মানসিং কমিটির নির্দ্দেশমত সবগুলি প্রকল্প রূপায়িত করা। কেন যে তাহা হইল না সে-বিষয়ে জনসাধারণের সন্দেহভঞ্জন করা কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু সেচমন্ত্রী সে বিষয়ে কিছু বলেন নাই। তিনি এই বলিয়া আত্মপ্রসাদ উপলব্ধি করিয়াছেন যে, ১৯৪৭-৪৮ সনের তুলনায় ১৯৬৫-৬৬ সনে পশ্চিমবঙ্গে সেচের সুবিধাপ্রাপ্ত জমির পরিমাণ ছয় গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বিবরণে সেচের প্রসারের বিষয়ে কিছুই বুঝা যায় না। পশ্চিমবঙ্গে মোট কি পরিমাণ আবাদী জমি আছে, উহার মধ্যে গত ১৯৪৭-৪৮ সনে মোট কত জমি সেচের সুবিধা পাইতেছিল এবং এখন কত জমি সুবিধা পাইতেছে, সেচমন্ত্রী যদি তাহা বলিতেন তাহা হইলেই পশ্চিমবঙ্গে সেচের অবস্থার কতখানি উন্নতি হইয়াছে বুঝা যাইত। তবে সেচমন্ত্রী এ কথা স্বীকার করিয়াছেন যে, এই রাজ্যে সেচের কাজ যতটা অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল ততটা হয় নাই। কেন যে হয় নাই সে-সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন নাই। পশ্চিমবঙ্গে যে কেবলই বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচের কাজ উপেক্ষিত হইয়াছে তাহা নহে। এই রাজ্যে কৃষির প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাজও বিশেষভাবে উপেক্ষিত হইয়াছে। স্বাধীনতা লাভ করিবার সময়ে পশ্চিমবঙ্গবাসীকে ভরসা দেওয়া হইয়াছিল যে, দামোদর পরিকল্পনামূলে পশ্চিম-বঙ্গের ৯ লক্ষ ৭৩ হাজার একর খারিফ ফসলের এবং ১ লক্ষ একর রবি ফসলের জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইবে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত এই লক্ষ্য পূরণ হইবার কোন সম্ভাবনাই দেখা যাইতেছে না।

কৃষিজাত পণ্য অধিকতর পরিমাণে উৎপাদনের জন্য এই রাজ্যে কেবল যে জমিতে জলসেচের ব্যবস্থার এবং বন্যার আক্রমণ হইতে জমির ফসল রক্ষারই দরকার তাহা নহে। ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইলে ট্রাক্টর জাতীয় উন্নত যন্ত্রের সাহায্যে চাষ, উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বীজবপন, সার প্রয়োগ এবং কীটপতঙ্গ হইতে ফসল রক্ষা ইত্যাদিরও প্রয়োজন। কিন্তু এই সব কাজও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইতেছে না। বর্ত্তমানে এই রাজ্যের খুব কম কৃষকই উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বীজ, রাসায়নিক সার, কীটপতঙ্গনাশক দ্রব্য ইত্যাদি পাইয়া থাকে। কৃষকের মূলধনেরও অভাব খুব বেশী। তারপর অনেক জিনিষই সময়মত পাওয়া যায় না। এই সমস্ত সমস্যার সমাধান না হইলে কৃষিজমির ফলন বাড়াইয়া পশ্চিমবঙ্গকে কৃষিজাত পণ্যের ব্যাপারে স্বাবলম্বী করা সম্ভব

জন্মভূমি

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

"আমি অনেক ধনশালী বন্ধুর গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় সর্ব্ববিধ উপাদেয় সামগ্রী সম্ভোগ করিয়া যে সুখ পাই নাই, অনেক বালিকা-গৃহিণীর ধূলি-নির্ম্মিত ক্রীড়াভবনে নিমন্ত্রিত হইয়া, তিন্তিড়ীপত্ররূপী চিপিটক ভোজনের অভিনয় ও আহারান্তে তুলসীপত্রের তাম্বুল চর্ব্বণ করিয়া তদপেক্ষা অধিকতর আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। যে বালক রাত্রিকালে যাত্রা শ্রবণান্তর পর দিবস রাম সাজিয়া "রে দুর্ব্বৃত্ত দশানন" বলিয়া রাবণের উদ্দেশে বক্তৃতা না করিয়াছে, তাহাকে কেমন করিয়া বালক নামে অভিহিত করিব?

আমার মনে পড়ে, বাল্যকালে ভৌগোলিক আবিষ্ক্রিয়ার অভিনয় পর্য্যন্ত করিয়াছিলাম। আমাদের বাড়ীর নিকটেই একটি ক্ষুদ্র নদী আছে। একটি ছোট খাল ইহাতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এরূপ খালকে আমাদের জেলায় "জোড়" বলে। একদিন আমার ও আমার তিনজন সঙ্গীর ইচ্ছা হইল, এই জোড়টির উৎপত্তিস্থল আবিষ্কার করিতে হইবে! এরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষার সংবাদ শুনিতে পাইলে ষ্ট্যান্‌লী সাহেব ভয় পাইতেন কি না জানি না। যাহাই হউক, আমরা চারিজন জোড়ের তীর দিয়া প্রায় দেড় ক্রোশ গিয়া দেখিলাম, একটি ধানের ক্ষেতের মধ্যে সামান্য পয়ঃপ্রণালীর আকারে জোড়টি ঝির্‌ঝির করিয়া বহিতেছে। অনতিদূরে কয়েকস্থানে মৃত্তিকা ভেদ করিয়া অঙ্গুলি পরিমিত কুণ্ড হইতে জল নিঃসৃত হইতেছে। সেখানে তিনটি ছোট বাব্‌লা গাছ দাঁড়াইয়া আছে। উৎপত্তিস্থল আবিষ্কৃত হইল! এত বড় একটা মহৎ কাজ অঙ্গহীন থাকে কেন? যে সুবৃহৎ স্রোতস্বিনীর উৎপত্তিস্থল নির্দ্ধারিত হইল, তাহার নামকরণ একান্ত অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। আমরা স্ব স্ব নামের আদ্য অক্ষর সংযোজিত করিয়া জোড়টির নাম রাখিলাম "কারাপরা।" হায়, কারাপরা, অপরের কর্ণে তোমার নাম কর্কশ লাগিতে পারে, অপরের নিকট তুমি উপহাসের কারণ হইতে পার, কিন্তু আমার নিকট তোমার নাম বড়ই মধুর। তুমি আমার সোনার শৈশবের কথা মনে পড়াইয়া দিলে। তোমার সেতুর পার্শ্বে তৃণশয্যায় শুইয়া কত সুখস্বপ্নই না দেখিয়াছি। একদিন অপরাহ্ণে তোমার সেতুর পার্শ্বে শুইয়া তোমার ক্ষুদ্র জলপ্রপাতের কুলকুল ধ্বনি শুনিতেছিলাম। দুই দিকে দিগন্ত প্রসারিত ধানক্ষেত্র। বায়ুভরে ধানের গাছগুলি এক একবার শুইয়া পড়িতেছিল, আবার মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতেছিল। মধ্যে মধ্যে সমীরণ ধান্যরাজি হইতে সুস্নিগ্ধ অতি মৃদু সুমিষ্ট সৌরভ আনিয়া দিতেছিল—নাগরিকগণ নগরে থাকিয়া যতই অর্থব্যয় করুন না কেন, এই স্বর্গীয় সৌরভ হইতে বঞ্চিত থাকিবেন। ইহা একমাত্র জনপদবর্গেরই উপভোগ্য। ক্রমে সূর্য্যদেব অস্তাচলশায়ী হইলেন। পশ্চিমাকাশ যেন গতাসু সূর্য্যের চিতানল-শিখা দ্বারাই লোহিতাভ নানা বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। এই শোভা ক্ষণকাল পরেই অন্তর্হিত হইল। ধূসরবাসা সন্ধ্যাসতীর আগমনে সমস্ত প্রকৃতি অতি প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল। পশ্চিম গগনে শুক্রতারা তাঁহারই ললাটে সিন্দূর বিন্দুর মত শোভা পাইতে লাগিল। নদীটি এতক্ষণ সভয়ে ব্রীড়ান্বিতা কিশোরীর ন্যায় মৃদুগীতি গাইতেছিল। এখন সন্ধ্যা সমাগমে যেন সে হঠাৎ মুখরা হইয়া উঠিল। কিন্তু সে মুখরতা কেমন মর্ম্মস্পর্শিনী!...গ্রামের অদূরবর্ত্তী শালবনগুলি আমার বড় প্রিয়। প্রায় দুই বৎসর হইল, আমার এক কবি-বন্ধুর সহিত প্রাতে উহার মধ্যে

একটি বনে বেড়াইতে যাই। যখন নিকটে গেলাম, শালপত্রের উজ্জ্বল শ্যামল শ্রী চক্ষুর পরিতৃপ্তি সাধন করিল। এই স্থানের ভূমি ঈষৎ রক্তাভ ও এরূপ কঠিন যে বৃষ্টির পরও কর্দ্দমাক্ত হয় না। আমরা বনস্থলীর ভিতর প্রবেশ করিয়া বৃক্ষপরিবৃত একটি প্রশস্ত সুশীতল স্থানে উপবেশন করিলাম। স্থানটি এমনই পরিচ্ছন্ন, বোধ হইল যেন বনদেবতাগণ অতিথি-সৎকারের জন্য উহা সম্মার্জ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। স্থানমাহাত্ম্য বশতঃ আমরা উভয়েই নির্ব্বাক ও আত্মহারা হইয়া এক অননুভূতপূর্ব্ব গভীর শান্তিরসের আস্বাদন করিতে-ছিলাম; এমন সময় বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর শব্দে উদ্বুদ্ধ হইয়া উর্দ্ধে দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক দেখিলাম, সমীরণের একটি তরঙ্গ বৃক্ষশিরগুলি নত ও শাখাপত্ররাজি আন্দোলিত করিয়া চলিয়া গেল। শালতরুগুলি আবার চিত্রার্পিতপ্রায় নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, বনস্থলী আবার নীরব হইল। আমার বন্ধুগণও কখনও আমাকে কবিত্বাপবাদ দেন নাই। কিন্তু তৎকালে আমার মনে হইল, যেন বনদেবী মস্তক নত করিয়া সহস্র অঙ্গুলির সঙ্কেত সহকারে বৃক্ষপত্রের মর্ম্মরধ্বনি ব্যপদেশে তাঁহার মানব অতিথি দুইজনকে "স্বাগত" বলিয়া অভিবাদন করিলেন। আমাদের দুইজনের একবার ঐ স্থানের নিকটে বাসগৃহ বাঁধিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ আনন্দ সকল দিনে সম্ভোগ্য নয়; সর্ব্বদা সুলভও নয়। পূর্ব্ব দিবসের আমোদ কি সকল দিন পাওয়া যায়?... বাল্যসহচরী ক্ষুদ্র নদীটির মোহন মন্ত্রে পথ ভুলিয়া কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি! সাধে কি আত্মহারা হই? অপরের নিকট আমি সম্ভ্রান্ত মান্যগণ্য "বাবু" পদবাচ্য হইলেও হইতে পারি; অপরে আমার সহিত ভদ্রতা করে; তাহারা আদর করিলে মনে হয়, বুঝি বা ইহার ভিতর কত অনাদর লুকাইয়া আছে। কিন্তু যে জন্মভূমিতে আমি নগ্নদেহে অসভ্য অবস্থায় বিচরণ করিয়াছি, যাঁহার স্নেহে শরীর মন পুষ্ট হইয়াছে, যাঁহার নিকট আমার দেহ-মনের কোন সংবাদ অজানা নাই, যাঁহার গাছগুলি আমার দেহের সহিত বৎসরের পর বৎসর বৃদ্ধি পাইয়াছে, তিনি আমাকে যেরূপ অকপট স্নেহের সহিত কোলে নেন, এমন আর কে পারে? তাঁহার নিকট আমি যাহা ছিলাম, তাহাই রহিয়াছি। তাঁহার অঙ্গাভরণ এই ক্ষুদ্র নদীটির যে এত মোহিনী শক্তি থাকিবে, তাহা আর বিচিত্র কি?"

(দাসী, মে, ১৮৯৫। পৃষ্ঠা: ২৬৭—৭১)

—

বাঙালী হিন্দুর বিবাহ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

াধারণ মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ কৃত্য বিবাহ অনুষ্ঠানবহুল হৎ ব্যাপার। ইহার কিছু অনুষ্ঠান শাস্ত্রীয়, কিছু লৌকিক বা স্ত্রী-আচার। বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানে স্ত্রীয় অংশের মোটামুটি মিল আছে—লৌকিক অংশে নানারূপ স্থানীয় ও পারিবারিক পার্থক্য দেখিতে পাওয়া য়। এই সমস্ত পার্থক্য সমেত সমগ্র অনুষ্ঠানের নিখুঁত বরণ-সংকলন বাঞ্ছনীয় হইলেও দুঃসাধ্য কার্য[১]। বিশেষত নেক অনুষ্ঠান এখন লুপ্তপ্রায়, অবহুপ্রচলিত বা বিকৃত। খানে আপাতত বিবরণের একটি কাঠামো প্রস্তুত করা ইতেছে। যাঁহারা নৃতত্ত্ব আলোচনা করেন ইহা তাঁহাদের আলোচনার সহায় হইবে আশা করা যায়—ইহা সাধারণ ঠকেরও কৌতুহল কথঞ্চিৎ চরিতার্থ করিতে সমর্থ হইবে নে হয়।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে বিবাহ, অন্নপ্রাশন, নয়ন প্রভৃতি সম্পর্কিত খুঁটিনাটি সমস্ত কার্যই শুভদিন খিয়া অনুষ্ঠিত হয় এবং ইহাতে সধবা রমণীরাই (বিশেষ রিয়া যাঁহাদের প্রথম সন্তান জীবিত সেই জিয়স য়াতিরা) মুখ্য অংশ গ্রহণ করেন। অনেক ক্ষেত্রে বাদের উপস্থিতি পর্যন্ত নিষিদ্ধ। প্রতি অনুষ্ঠানে দের উলুধ্বনি বা জোকার বিশেষ প্রশস্ত। উলুধ্বনি ওয়ার মধ্যে একটা কৌশল আছে; সকলের সে কৌশল না নাই বা অভ্যস্ত নহে। সেইজন্য বর্তমানে শঙ্খধ্বনি লুধ্বনির স্থান গ্রহণ করিতেছে। এই উপলক্ষ্যে পূর্ববঙ্গে য়েদের গান একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ছিল। গানের পজীব্য রামসীতার প্রসঙ্গ। যেমন

ওগো রামের মা,
তোমরা রাম সাজাইতে জান না।
রামের সাজ ভাল হ'ল না।
ও সাজ খুলে ফেলে বনফুলে সাজায়েছি দেখ না।

থবা

আট বার বৎসরের সীতা তেরো নয় রে পোরে,
কও গিয়া সীতার মায়রে সীতা আথৈট করে
লক্ষ টাকার সাড়ী হইলে তোমার সীতা স্নান করে।

স্নান কর ওগো সীতা স্নান কর তুমি,
লক্ষ টাকার সাড়ী তোরে আন্যা দেব আমি।

বিবাহাদি কার্যের খুঁটিনাটি নানা অনুষ্ঠানে এই রকমের অজস্র গানের প্রচলন ছিল। অনেকে মিলিয়া সমবেত কণ্ঠে এই গান করিতেন। মেয়েদের আর একটি নৈপুণ্য-পূর্ণ কাজ ছিল বরণ। নানা সময়ে, নানা উপলক্ষ্যে এই বরণ করা হইত—এই কাজে এক এক জনের বিশেষ দক্ষতা ও প্রসিদ্ধি ছিল। প্রতিমা বিসর্জনের পূর্বে প্রতিমা বরণের মত বরের বিবাহযাত্রা, বধূসহ শ্বশুরগৃহ হইতে স্বগৃহে যাত্রা এবং সেখানে উপস্থিত হওয়ার সময় বরণ উল্লেখযোগ্য। গান ও বরণ সহ বিবাহের আনুষঙ্গিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে নানাস্থানে নানারূপ স্ত্রী-আচারের প্রচলন ছিল বা আছে। ইহাদের মধ্যে নবদম্পতির জীবন-যাত্রার গতি-নির্দেশ ও ভাগ্য পরীক্ষা অন্যতম। বরকে দিয়া বধূর হাতে চাল দেওয়ান হয়, বধূ তাহা ফেলিয়া দেয়। কয়েকবার এইরূপ করার পর উভয়ের মধ্যে চাল ভাগ করিবার ব্যবস্থা করা হয়। বর একটি মাটির সরার সাহায্যে জ্বলন্ত প্রদীপ ঢাকিয়া দিলে বধূ ঢাকা খুলিয়া ফেলে। কয়েকবার এইরূপ করার পর উভয়ে মিলিয়া ঢাকা খুলিয়া দেয় এবং বর স্ত্রীর সমস্ত ত্রুটি সারিয়া লইবার প্রতিশ্রুতি দেয়। বর ও বধূর টোপরের দুইখণ্ড সোলা জল ভরা হাঁড়ির জল নাড়িয়া তাহার মধ্যে ফেলিয়া দেখা হয় সোলা দুইখণ্ড মিলিয়া গেল বা কোন খণ্ড আগে ও কোন্ খণ্ড পিছনে রহিল। ইহা দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর ভবিষ্যৎ ঐক্য, অনৈক্য ও আনুগত্যের পরীক্ষা করা হয়।

বিবাহের প্রথম অনুষ্ঠান আশীর্বাদ, পাটিপত্র, পাকা দেখা, দিনাবধারণ, দই চিনি খাওয়া প্রভৃতি নানা নামে প্রসিদ্ধ। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া বিবাহের সম্বন্ধ ও তারিখ পাকা-পাকি ভাবে স্থির হয়। এই উপলক্ষ্যে বরপক্ষ হইতে কন্যাকে ও কন্যাপক্ষ হইতে বরকে আনুষ্ঠানিক ভাবে দেখা ও কিছু উপহারের দ্বারা আশীর্বাদ করা হয়—কোথাও কোথাও দেনা-পাওনার হিসাব লিখিত ভাবে দেওয়া-নেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে অভ্যাগতদের যে জলখাবারের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয় তাহার প্রধান উপকরণ ছিল মাঙ্গলিক দধি ও মিষ্টি; তাই অনুষ্ঠান কোথাও কোথাও 'দই চিনি খাওয়া' নামে পরিচিত।

বিবাহের দুই-এক দিন পূর্বে গায়ে হলুদ বা গাত্রহরিদ্রা,

১। শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষচৌধুরী মহাশয় তাঁহার 'আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ পদ্ধতি' গ্রন্থে (কলিকাতা ১৩৩৯) এই কার্যের সূচনা করিয়াছিলেন।

নারকোলভাঙ্গা বা আনন্দনাড়ু করা ও আইবুড়ো ভাত বা অব্যূঢ়ান্ন। প্রথম দুইটি অনুষ্ঠান অনেক স্থলে বিবাহের দিন সকালেও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বরের গায়ে কাঁচা হলুদ-বাটা স্পর্শ করান এবং মেয়ের বাড়ীতে পাঠান তাহার অংশ মেয়ের গায়ে স্পর্শ করান ইহাই হইল গায়ে হলুদ। অনেক স্থানে ইহা অধিবাসের অঙ্গ। কাঁচা হলুদ অতিশয় মাঙ্গলিক বস্তু বলিয়া পরিগণিত; বিবাহাদি ব্যাপারে ইহার বহুল ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। শুভদিন দেখিয়া অন্নপ্রাশন, উপনয়ন ও বিবাহের আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানের উপকরণ প্রস্তুত করিয়া রাখা একটি স্বতন্ত্র উৎসব। ইহাই নারকোলভাঙ্গা বা আনন্দনাড়ু তৈয়ারি করা নামে পরিচিত। বিবাহাদি কার্যে—বিশেষ করিয়া সংশ্লিষ্ট নান্দীমুখে—নাড়ু ব্যবহৃত হয়। তাহাই এই উপলক্ষ্যে পবিত্রভাবে তৈয়ারি করিয়া রাখা হয়। বিবাহের পূর্বে শুভদিনে অবিবাহিত পাত্রপাত্রীকে ভোজন করাইবার লোকাচারসিদ্ধ অনুষ্ঠান আইবুড়ো ভাত। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষ্যে পাত্রপাত্রীকে নূতন কাপড় দেওয়া হয়। এই নূতন কাপড় পরিয়াই অন্ন গ্রহণ করিতে হয়। পঞ্জিকায় এই অনুষ্ঠানের সংস্কৃত প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে অব্যূঢ়ান্ন। কোন কোন অভিধানকার ইহার সংস্কৃত রূপ কল্পনা করিয়াছেন আয়ুর্বৃদ্ধ্যন্ন। তবে আইবুড়ো শব্দের আশয় ইহাতে প্রকাশিত হয় না।

বিবাহের দিন ভোরে দধিমঙ্গলের অনুষ্ঠান দ্বারা কার্যারম্ভ। অন্নপ্রাশন ও উপনয়নেও এই অনুষ্ঠানের প্রচলন আছে। পবিত্র মাঙ্গলিক দধি মুখে দিয়া শুভকার্যের সূচনা করা দধিমঙ্গলের মুখ্য উদ্দেশ্য। গৌণ এবং ব্যাবহারিক উদ্দেশ্য, দধির সঙ্গে অন্যান্য খাদ্যবস্তুর দ্বারা যাহার বিবাহ তাহার উপবাসের ক্লেশ লঘু করা। প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার যে, বিবাহের দিন বিবাহকাল পর্যন্ত বর ও কন্যার উপবাসী থাকিবার প্রথা ছিল। এই দিন দিনের বেলার অন্য কার্য অধিবাস, আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ, বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ বা নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ এবং আনুষ্ঠানিক স্নান ও ক্ষৌরকর্ম। অভ্যুদয় বা বৃদ্ধি (নবগৃহ প্রবেশ, তীর্থযাত্রা, পুত্রকন্যার বিবাহাদি সংস্কার) উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া এই শ্রাদ্ধের নাম আভ্যুদয়িক বা বৃদ্ধি। এই শ্রাদ্ধে পিতৃপুরুষ নান্দী (প্রশস্তি) মুখে করিয়া উপস্থিত হন বলিয়া ইহার নাম নান্দীমুখ। এই উপলক্ষ্যে পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধ প্রমাতামহ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহীর শ্রাদ্ধ করা হইয়া থাকে। মুখ্যত যাহাদের অনুগ্রহে আমরা এই পৃথিবীতে আসিয়াছি, আনন্দের সময় তাঁহাদের সকলকে স্মরণ করা হয়। বিবাহের সময়ে খাইতে দেওয়ার ভাতের

চাল তৈয়ারির একটি অনুষ্ঠান কন্যাগৃহে কোথাও কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়। বিবাহের দিন কন্যার মাতা বা মাতৃস্থানীয়া অন্য কেহ ধান সিদ্ধ করিয়া শুকাইয়া সেই ধানের চাল প্রস্তুত করেন। সাত পাক ঘুরানর জন্য মেয়েকে পিঁড়িতে বসাইবার পূর্বে পিঁড়ির উপর এই চাল ছড়াইয়া দিয়া বরের ছাড়া কাপড় বিছাইয়া দেওয়া হয়। এই চাল দিয়াই রাত্রিতে বরের খাওয়ার ভাত রান্না করা হয়। ধান সিদ্ধ করিবার সময় একটি আখের পাতায় আঠার জন ভেড়য়া বা স্ত্রৈণ পুরুষের নাম লিখিয়া তাহা হাঁড়ির মধ্যে দেওয়া হয়। জ্বালানি হিসাবে আড়াইটি আখের পাতা অন্য কাঠের সঙ্গে উনানে দেওয়া হয়। রন্ধনকারিণীকে মিষ্টি মুখে দিয়া চুপ করিয়া থাকিতে হয়। বিবাহের পর বর এই চালের ভাত খাইবার ভান করিয়া নববধূকে খাইতে দেয়। এই ভাতের নাম দাড়ার ভাত। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল, মাগমঙ্গল ব্রতের ছড়া প্রভৃতিতে ইহার উল্লেখ আছে। কোথাও কোথাও প্রচলিত জলসওয়া, জলসাধা বা জলভরণ ও সোহাগমাগা অনুষ্ঠানও উল্লেখযোগ্য। অন্নপ্রাশন ও উপনয়নে এই অনুষ্ঠানের প্রচলন আছে। কয়েকজন সধবা মিলিত হইয়া নিকটবর্তী নদী বা জলাশয় হইতে ও কয়েকজন প্রতিবেশীর বাড়ী হইতে কিছু জল লইয়া আসেন। এই জল বিশেষ পবিত্র বলিয়া বিবেচিত। ইহা ঘরের এক কোণে সযত্নে রক্ষিত থাকে। বর-বধূর মাথায় ইহা ছিটাইয়া দেওয়া হয়। কোথাও কোথাও গৃহকর্তা ও গৃহিণীকে সম্মিলিতভাবে জলাশয় হইতে জল উঠাইতে হয়।

বিবাহের প্রধান কার্য (কন্যাপক্ষ কর্তৃক বরকে কন্যাদান) রাত্রিতে নির্ধারিত শুভমুহূর্তে বা লগ্নে কন্যাগৃহে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব লইয়া বর কন্যাগৃহে আগমন করেন এবং কন্যাপক্ষ কর্তৃক যথোচিত সংবর্ধিত হইয়া যৌতুকাদি সহ অলঙ্কৃতা কন্যাকে গ্রহণ করেন। কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে কন্যাকে বরের গৃহে আনয়ন করিয়া দান করিবার রীতি কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। ইহাদের মধ্যে বরপণের বদলে কন্যাপণের প্রচলন ছিল—কন্যাকর্তা বর পক্ষের নিকট হইতে চুক্তিমত পণ গ্রহণ করিয়া কন্যার বিবাহ দিতেন। বর বিবাহ সভায় উপস্থিত হইলে কন্যাদাতা তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া নূতন কাপড় চাদর দিয়া বরণ করেন। তারপর কন্যাকে পিঁড়ির উপর বসাইয়া দণ্ডায়মান বরের চারপাশে সাত পাক ঘুরান হয় এবং শুভদৃষ্টি বা মুখচন্দ্রিকা অনুষ্ঠান হয়। এই সময় আধুনিক রীতি অনুসারে বর কন্যাকে দিয়া পরস্পরের মধ্যে মালা বদল করান হয়। মন্ত্রহীন এই লৌকিক অনুষ্ঠানের পর কন্যাদাতা সংস্কৃত

উচ্চারণ করিয়া বরকে দেবতার মত বিষ্টর বা আসন, পাদ্য (পা ধোয়ার জল), অর্ঘ্য (দুর্বা, আতপ চাল ও চন্দনসহ পুষ্প), আচমনীয় (মুখ ধোয়ার জল), মধুপর্কের (কাঁসার পাত্রে করিয়া জল মিশ্রিত দধি, ঘৃত, মধু ও চিনি) দ্বারা অর্চনা করেন। মধুপর্ক দানের সময় পূর্বে গোবধের রীতি ছিল। গোবধ নিষিদ্ধ হওয়ার পরেও কন্যাকর্তা গরুর প্রসঙ্গ তুলিতেন এবং বর তাঁহার নিমিত্ত নিরপরাধ গরু বধ করিতে নিষেধ করিতেন ও বদ্ধ গরু ছাড়িয়া দিতে বলিতেন। গরু নাপিতের হেফাজতে থাকিত এবং নাপিত 'গৌর্গৌ' (এই যে গরু এই যে গরু) বলিয়া গরুর উপস্থিতি জানাইয়া দিত। এখন নাপিত 'গৌর-গৌর' শব্দ উচ্চারণ করে বা গৌরবচন পাঠ করে। গৌর বচনে হরগৌরী বা রামসীতার বিবাহ-ব্যাপারের বিবরণ থাকে। তবে পুরা গৌরবচন বর্তমানে অপরিচিত - সামান্য কয়েক ছত্র দিয়াই কার্য সমাধা করা হয়। কোথাও কোথাও কন্যাদানের পরেও এই কার্য করা হয়। অবশ্য বরকর্তৃক গোবধনিষেধের অনুরোধাত্মক বৈদিক মন্ত্র পাঠের ব্যবস্থা এখনও অব্যাহত আছে। অবশ্য পাঠকের নিকট তাহার তাৎপর্য অজ্ঞাত। কেবল গৌরবচন পাঠের কাজে নয় বিবাহ ও উপনয়নের অন্য কাজেও নাপিতের ও কোন কোন ক্ষেত্রে ধোপার প্রয়োজন হইত। ক্ষৌরকর্ম ও স্নান করান এই দুইটিই ছিল ইহাদের প্রধান কাজ।

আসল কন্যাদানের কার্য নিতান্ত অনাড়ম্বর ব্যাপার। একটি জলপূর্ণ পাত্রের উপরে বরের চিৎ-করা ডান হাতের উপর কন্যার ডান হাত ও তাহার উপর লাল গামছায় বাঁধা পাঁচটি ফল (পাঁচটি হরীতকী, বা আমলকী, হরীতকী, বহেরা, জায়ফল, সুপারি, এই পাঁচটি ফল) রাখিয়া হাত দুইখানি কুশ ও ফুলের মালা দিয়া জড়াইয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইলে কন্যাদাতা বর ও কন্যার পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের নাম তিন তিন বার উল্লেখ করিয়া সম্প্রদানকার্য সম্পন্ন করেন। সম্প্রদানের পর হাতের বাঁধন খুলিয়া দেওয়া হয় এবং ফল-বাঁধা গামছার এক প্রান্ত কন্যার কাপড়ের আঁচল ও আর একপ্রান্ত বরের চাদরের খুঁটের সঙ্গে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ইহারই নাম গাঁটছড়া বাঁধা। বিবাহের পর আট বা দশ দিনের দিন একটা ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া এই বাঁধন খুলিয়া দেওয়া হয়। এই কয়দিন বরবধূর একসঙ্গে বা জোড়ে থাকিতে হয়—বিজোড় হইতে নাই। কেবল বিবাহের পরের দিন রাত্রে একসঙ্গে থাকিতে নাই—এই রাত্রি কালরাত্রি নামে পরিচিত। সম্প্রদান-পরবর্তী বিবাহের অনুষ্ঠানগুলি সাধারণতঃ পাটির উপর বসিয়া করা হয়। তাই বেটীর সহিত পাটি দেওয়ার নিয়ম আছে।

সধবার প্রধান চিহ্ন ও শ্রেষ্ঠ অলংকরণ সিঁথির সিন্দুর। ইহা সম্প্রদানের পর বিবাহের দিন রাত্রিতে, রাত্রিশেষে বা বরের বাড়ীতে বধূবরণের সময় পারিবারিক নিয়ম অনুসারে বরের নিজ হাতে বধূর সিঁথিতে দেওয়া হয়। ইহা শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গ নহে। তবে উত্তর ভারতে ইহার ব্যবহার ব্যাপক ও সধবাদের পক্ষে অপরিহার্য। সিন্দূর সম্বন্ধে একটি কৌতুককর নিয়ম এই যে, স্ত্রী কখনও স্বামীর নিকট সিন্দুর চাহিয়া ব্যবহার করিবেন না। সধবা রমণীর সিঁথিতে সিন্দূর দেওয়া ও সধবাকে সিন্দুর দান করা মহিলাদের পক্ষে পুণ্যজনক কার্য বলিয়া বিবেচিত হয়। কেহ সিন্দুর পরিবার সময় অন্য কোন সধবা সামনে থাকিলে তাঁহাকেও সিন্দুর পরাইয়া দেওয়ার প্রথা আছে। সধবাকে আলতা সিন্দুর পরান এয়োসিন্দুর, নিত্য সিন্দুর প্রভৃতি বহু ব্রতের অঙ্গ। বস্তুতঃ সমাজে সধবা রমণীর স্থান বিশেষ গৌরবজনক। বাংলার বাহিরে সধবা সৌভাগ্যবতী বা সোহাগিন্ নামে পরিচিত। নানা উপলক্ষ্যে সধবাকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ান ও কাপড়চোপড় দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণভোজনের মত সধবাভোজন ধর্মকার্যের অঙ্গ ছিল। পক্ষান্তরে বিধবা রমণী সর্বসৌভাগ্য-বঞ্চিত। তিনি কঠোর জীবনযাপন ও ত্যাগের প্রতিমূর্তি। সকল প্রকার প্রসাধন ও অলংকরণ তাঁহার পরিত্যাজ্য। বিলাসহীন একাহারে তাঁহার দিন যাপন করিতে হয়। মৎস্য, মাংস, পান সুপারি, ও অন্য অনেক জিনিস তাঁহার বর্জনীয়। মাঝে মাঝে (একাদশী, অম্বুবাচী প্রভৃতিতে) উপবাস বা অন্নবর্জন তাঁহার পক্ষে অবশ্য-কর্তব্য। থান কাপড় তাঁহার পরিধেয়। বর্তমানে অবশ্য অনেকক্ষেত্রে এই কঠিন আচরণে কিছু কিছু শিথিলতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

বিবাহের বেশির ভাগ ও প্রধান শাস্ত্রীয় কার্য অনুষ্ঠিত হয় সম্প্রদানের পরে সেই দিন রাত্রেই বা তাহার পরদিন সকালে বা সুবিধামত অন্য কোন দিন। এই অনুষ্ঠানের সাধারণ নাম কুশণ্ডিকা। মূলতঃ ইহা হোমের অঙ্গ। বর্তমানে কুশণ্ডিকা বলিতে বিবাহের আনুষঙ্গিক লাজহোম, শিলা-রোহণ, সপ্তপদীগমন, পাণিগ্রহণ প্রভৃতি কর্ম ও তাহাদের অঙ্গীভূত হোমকে বুঝায়। লাজ বা খৈ মাঙ্গলিক বস্তু হিসাবে পরিচিত। বধূর ভ্রাতা বধূর হাতে খৈ তুলিয়া দিলে অগ্নিতে সেই খই আহুতি দেওয়া হয়। শিলারোহণে বধূর পা শিলের উপর তুলিয়া দিয়া তাহাকে শিলার মত স্থির হইবার নির্দেশ দেওয়া হয়। শাস্ত্রীয় এই শিলারোহণ ছাড়া বিবাহের স্ত্রী-আচারের মধ্যে বাসিবিবাহ ও বধূ

বরণের সময় বধূকে শিল ও পাথরের থালার উপর দাঁড় করাইবার প্রথা আছে। অধিবাসেও শিলা বিভিন্ন অঙ্গে স্পর্শ করান হয়। পর পর সাতটি আলপনার রেখার উপর দিয়া বর বধূকে এক এক পা করিয়া অগ্রসর করিয়া দেন। ইহাই সপ্তপদীগমন। আনুষ্ঠানিকভাবে বরকর্তৃক বধূর হস্তগ্রহণ করা পাণিগ্রহণ। এই সমস্ত অনুষ্ঠান বিবাহের অপরিহার্য অঙ্গ হইলেও বর্তমানে অল্পবিস্তর উপেক্ষিত। এই উপলক্ষ্যে পঠিত বা পঠনীয় বৈদিক মন্ত্রগুলির মধ্য দিয়া হিন্দু বিবাহের আদর্শ অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে কয়েকটি মন্ত্রের অনুবাদ এখানে দেওয়া যাইতেছে। বধূর প্রতি বরের উক্তি : শ্বশুর শাশুড়ী ননদ দেবর সকলের কাছে তুমি সম্রাজ্ঞী হও (ঋ, ১০।৮৫।৪৬)। তোমার এই যে হৃদয় তাহা আমার হউক, আমার এই যে হৃদয় তাহা তোমার হউক (মন্ত্রব্রাহ্মণ ১।৩।৯)। আমার ব্রতে তোমার হৃদয় স্থাপিত কর—আমার হৃদয়ের সঙ্গে তোমার হৃদয়ের ঐক্য হউক—এক মনে আমার বাক্য অনুসরণ কর—বৃহস্পতি তোমাকে আমার জন্য নিযুক্ত করুন (মন্ত্রব্রাহ্মণ ১।২।২১)। আমার প্রাণের সহিত তোমার প্রাণ, অস্থির সহিত অস্থি, মাংসের সহিত মাংস ও চর্মের সহিত চর্ম যুক্ত করিতেছি (পারস্কর ১।১১।৫) প্রজাপতি আমাদের সন্তান দান করুন; আর্যমা বৃদ্ধ বয়সপর্যন্ত আমাদের মিলিত করুন; মঙ্গলময়ী হইয়া তুমি পতিগৃহে প্রবেশ কর; তুমি মানুষের প্রতি মঙ্গলময়ী হও—তুমি পশুর প্রতি মঙ্গলময়ী হও (ঋ ১০।৮৫।৪৩)। বর-বধূর প্রার্থনা : সমস্ত দেবতা আমাদের হৃদয়কে অভিব্যক্ত করুন; মাতরিশ্বা, ধাতা, সরস্বতী আমাদের হৃদয়কে সম্যক্ যুক্ত করুন (ঋ, ১০।৮৫।৪৭)। বরব সম্পর্কে আত্মীয়দের প্রার্থনা : তোমরা এখানেই থাক, বিযুক্ত হইও না। পূর্ণ আয়ু লাভ কর; পুত্র-পৌত্রেরসঙ্গে নিজগৃহে আনন্দে অবস্থান কর (ঋ, ১০।৮৫।৪২)।

বিবাহ রাত্রের শাস্ত্রীয় ও লৌকিক অনুষ্ঠান শেষ হইলে স্বভাবত বাসরঘরে বরবধূর বিশ্রামের ব্যবস্থা করার কথা। কিন্তু কার্যতঃ এই বিশ্রামের সুযোগ ঘটিয়া উঠে না—হাস্য-কৌতুকে রাত্রি কাটিয়া যায়। এককালে সুপরিচিত ইহার অশোভন রূপের বিবরণ বঙ্কিমচন্দ্রের ইন্দিরা উপন্যাসে রক্ষিত আছে। রাত্রি প্রভাত হইলে সেজতুলুনি বা আনুষ্ঠানিক বিছানা উঠানর উৎসব। এই সময়ে উপস্থিত সধবাদের যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণাদানের রীতি আছে। পূর্বে পান-সুপারি, পানের মসলা, সরিষার তেল প্রভৃতিও দেওয়া হইত। এই দিন উঠানে চারটি কলাগাছ পুঁতিয়া তৈয়ারি করা ছাদনাতলা বা কলাতলায় বাসি বিবাহের লৌকিক অনুষ্ঠান। ইহার প্রকার মোটামুটি এইরূপ : বর ও তাহার পুরোভাগে বধূ যথাক্রমে শিল ও নোড়ার উপর পা রাখিয়া চার হাত এক করিয়া সূর্যকে অর্ঘ্য দেয়। তার পর, কলাতলায় নবগঠিত ক্ষুদ্র গর্ত বা জলাশয় অতিক্রম করিয়া সম্মিলিত ভাবে কলাতলা প্রদক্ষিণ করার পরে গৃহে প্রবেশ করে। বাসি বিবাহের পূর্বে বরবধূকে আনুষ্ঠানিক ভাবে স্নান করান হয়।

সাধারণতঃ এই সমস্ত অনুষ্ঠানের পর বর বধূকে নিয়া নিজ গৃহে যাত্রা করে এবং সেখানে পৌঁছিলে বৌ পুচ্ছা (বধূপৃচ্ছা) বৌপরিচয় বা বধূবরণ অনুষ্ঠান হয়। প্রথমে বরবধূকে উঠানে কলাতলায় নিয়া বরণ করা হয়। বধূকে দুধঢালা পাথরের থালার উপর দাঁড় করান হয়। তার পর তাহাদিগকে ঘরে নিয়া যাওয়া হয়। যাহাতে মাটিতে পা না পড়ে এই উদ্দেশ্যে উঠান হইতে ঘর পর্যন্ত কাপড় পাতিয়া দেওয়া হয়। ঘরের ভিতরে তৈয়ারি করা কৃত্রিম জলাশয়ের মধ্যে কড়ি থাকে। বধূ সেই লুক্কায়িত ধনরাশি উত্তোলন করে। তারপর, বধূকে গৃহের সমস্ত সামগ্রী দেখান হয় ও তাহার কানে মধু দেওয়া হয় যাহাতে সকলের কথা তাহার কানে মধুর মত বোধ হয়। শ্বশুরগৃহে বধূর প্রথম কার্য দুধ জ্বাল দেওয়া—যাহাতে দুধের মত সংসার উথলাইয়া উঠে।

বিবাহের তৃতীয় দিন ফুলসজ্জা। এই দিন ফুলের সাজে সজ্জিত বধূর সহিত বরের প্রথম বাধাহীন মিলন। এই দিন বা দুই এক দিনের মধ্যে পাকস্পর্শ বা বৌভাত উপলক্ষ্যে নববধূর পরিবেশিত বা স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণের মধ্য দিয়া আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক নববধূকে আপন জন বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া। ইহার মধ্যেই বা ইহার পরে নববধূর পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন এবং সেখান হইতে সুবিধামত পতিগৃহে আনুষ্ঠানিক ভাবে পুনরাগমন বা দ্বিরাগমন। বাল্যবিবাহ প্রথা লুপ্ত হওয়ার ফলে এই অনুষ্ঠান বর্তমানে অপ্রচলিত—কারণ বধূর বার বছর বয়স পার হইলে বা রজোদর্শন হইলে এই অনুষ্ঠানের কোনও প্রয়োজন থাকে না। বিবাহের পরে অনুষ্ঠেয় প্রথম রজোদর্শনের উৎসব বা দ্বিতীয়বিবাহ এখন আর অনুষ্ঠান করিবার সুযোগ হয় না। পূর্বে এই উপলক্ষ্যে উৎসব আড়ম্বরের প্রাচুর্য ছিল—গর্ভাধান সংস্কার ইহার আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান। উৎসবে মহিলাদেরই একাধিপত্য ছিল। নৃত্যগীতাদি অনেক সময় শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘন করিত।

প্রত্যাবর্তন

শ্রীশৈবাল চক্রবর্তী

রন্নার কাছে এসে দাঁড়িয়ে মণিমালা তার স্বামীকে ...কল, কই, শুনছ, বাজারের টাকা দিয়ে দাও ওকে। ...ন্না করতে করতে উঠে এসেছিল সে, হলুদ-লাগা আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে বলল, 'এ বাড়ীর সব ভাল, শুধু রান্নাঘরটাই যা ছোট—।

—টাকা দেব? কাকে? দাড়িতে সাবান লাগানো ...ন্ধ করে অরিন্দম স্ত্রীর দিকে তাকাল, লোক জোটালে কোথেকে তুমি?

মণিমালা ভুরু কোঁচকাল, বলল, থেকে থেকে যেন ...তুন মানুষ হও তুমি। লোক আবার জোটাব কোত্থেকে! ...সব করছে সে-ই ত রয়েছে।

—কে? ঐ শ্রীদাম? অরিন্দমের চোয়াল ঝুলে ...ড়ে। শ্রীদাম বাজার করবে?

মণিমালা একটু হাসে এবার, বলে, অবশ্য তুমি যদি নিজে যাও তা হ'লে আর ওকে পাঠাই না।

—আরে না না, অরিন্দম তাড়াতাড়ি উঠে ঘরের কোণে চলে যায়। জামার পকেট থেকে টাকা বার করতে ...তে বলে, ঐ বিশ্রী কাজটা থেকে তুমি যদি আমায় অব্যাহতি দাও তাহলে আমি দু'হাত তুলে নাচব।

—তা আর আমি জানি না। কাজকে এড়াতে ...রলেই ত তোমার সুখ···মাথা দুলিয়ে বলে মণিমালা। দিন দিন যা কুড়ে হচ্ছ তুমি···।

ব্যস্ ব্যস্, এখন আর আমার সুখ্যাতি গাইতে হবে না তোমায়—

বাইরে গলার আওয়াজ পাওয়া যায়। হাতের কাজ সেরে শ্রীদাম এসে দাঁড়িয়েছে, তার হাতে বাজারের থলি। অরিন্দমের হাত থেকে পাঁচটাকার নোটটা নিয়ে মণিমালা শ্রীদামের হাতে দেয়।

—ভাল মাছ নেবে একটা, বুঝলে? বেশ টাটকা হয় যেন। আর যা যা ফর্দয় লিখে দিয়েছি।

টাকা নিয়ে শ্রীদাম দরজার দিকে পা বাড়ায়। মণিমালা গিয়ে ঢোকে রান্নাঘরে। বাচ্চুকে দুধ খাওয়ানোর সময় হয়েছে।

বাজারটা এখান থেকে দূরে। ঠিক বাজার নয়, হাটের মতন। বেশীর ভাগ লোক সাইকেলে যায়। যারা বেড়াতে এসেছে তারা সাইকেল-রিক্শা ভাড়া করে। শ্রীদামের ভরসা তার নিজের দুটি শ্রীচরণ।

ভাতের গ্রাস মুখে তুলে অরিন্দম বলে, সত্যি, জানো, আমি ওকে যত দেখছি ততই অবাক হচ্ছি। যেন বিশ্বাস করতে পারছি না!

বাটিতে মাছের ঝোল তুলছিল মণিমালা, স্বামীর দিকে না তাকিয়েই বলে, কি বিশ্বাস করতে পারছ না?'

—তোমার ঐ শ্রীদামকে, অমন ভদ্র চেহারা, মিষ্টি কথাবার্তা অথচ মুখ বুজে কাজ করে যাচ্ছে চাকরের মত। বাজারটা পর্যন্ত করে আনল! এ যেন কেমন লাগছে আমার কাছে—

—বোধ হয় জানতে পেরেছে যে, এবাড়ীর বাবু একটি অকর্মার ধাড়ি। রসিকতা করলেও মণিমালার মুখ কিন্তু গম্ভীর।

—না, তা নয়, আমার কিন্তু সত্যি ভারী অদ্ভুত লাগছে।

—আমার ত প্রথমে খুবই সংকোচ লাগছিল ওকে বাজারের কথা বলতে···আসলে যা বুঝলাম, ও অনন্তবাবুর এই বাড়ী দুটো দেখাশুনা করে। অনন্তবাবু বছরের বেশির ভাগ সময়টাই ত কলকাতায় কাটান। হ্যাঁ, যা বলছিলাম ওকে বাজারের কথা বলব কি বলব না এমন সময় ও দেখি নিজেই বলল, আপনার কিছু আনতে হবে নাকি বৌদি? তখনই ত আমি বললাম।

খাওয়া থামিয়ে হঠাৎ সিধে হয়ে বসে অরিন্দম, গলা চড়িয়ে বলে, কি মনে হয় জান?

—আস্তে, মণিমালা সাবধান করে অরিন্দমকে, আড়চোখে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলে, ও কিন্তু কুয়োতলায়।

—আমার মনে হয়, এবার গলা নামিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলে অরিন্দম, ও নিশ্চয় ভদ্রলোকের ছেলে। হয়ত লেখা-পড়া জানে।

—দেবে নাকি তোমার অফিসে একটা চাকরি?

—না না, তা নয়, পাতে ভাত মাখতে মাখতে অরিন্দম বলে, চাকরি দেওয়া কি মুখের কথা! কথা হচ্ছে, ভদ্র-লোকের ছেলে, লেখাপড়া জানে, অথচ মুখ বুজে এই রকম

একটা কাজ করছে কেন? নিশ্চয় কিছু একটা ব্যাপার আছে।

—তা থাক। অসম্ভব কি, নিস্পৃহকণ্ঠে বলে মণিমালা। বাচ্চুকে বলে, কই হাঁ করো, বাচ্চুর গালে সে ডালমাখা ভাত তুলে দেয়। তারপর স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলে, আবার নাও হ'তে পারে। দেখতে-শুনতে ভাল হ'লেই যে ভদ্রলোকের ছেলে হ'তে হবে তারও কি কোন মানে আছে?

—না, তা ত নয়ই, তবে দেখে-শুনে যা মনে হচ্ছিল তাই বললাম···আর কিছু না বলে গ্রাসের পর গ্রাস ভাত মুখে তুলতে থাকে অরিন্দম। উপর্যুপরি বাধা পাওয়ার ফলে তার উৎসাহ উপে যায়।

কাচের ডিশে চাটনি তোলে মণিমালা। আজ অনেকগুলি পদ রেঁধেছে সে। বেশ গুছিয়ে বাজার করেছিল শ্রীদাম আর তাই রাঁধতেও সে বেশ মজা পাচ্ছিল। নতুন জায়গায় দু'দিনের অগোছালো সংসারে কাজ করার একটা আলাদা আনন্দ আছে। আজকে রান্নাঘরে গলদঘর্ম হয়ে রাঁধতে রাঁধতে সেই আনন্দে বিভোর ছিল মণিমালা।

—আমার কিন্তু মনে হয় না যে ও একটা ভণ্ড, মাছের মুড়ো ভাঙতে ভাঙতে বলে অরিন্দম, আমি ত দেখছি ওকে, কি ভীষণ ফেথফুল! কখন কি হুকুম হয় তার জন্যে যেন তটস্থ হয়ে থাকে ও। মণিমালার নিষেধ ভুলে গিয়ে গলার শির ফুলিয়ে সে বলে, দাড়ি কামিয়ে বুরুশ-বাটি রেখে ঘরে গেছি এসে দেখি যে, সে-সব ধুয়ে-মুছে তাকে তোলা হয়ে গেছে। বল ত, আজকালকার দিনে এরকম একটা লোক পাওয়া যায়? আমাদের শম্ভুটা কি রকম কুঁড়ে ছিল মনে আছে ত তোমার?

—তা আর মনে নেই! হাড় জ্বালিয়ে খেয়েছিল আমার। স্বামীর পাতের দিকে তাকিয়ে মণিমালা বলে কিন্তু তুমি হাত চালিয়ে খাও দিকি। আবার ত ঘুম হবে এক প্রস্থ। তিনদিন এসেছি, কোথাও এতটুকু বেড়ান হ'ল না! আজ বিকেলে কিন্তু ঐ পাহাড়টার ওপর চড়ব।

অরিন্দম চাটনির ডিশটা টেনে নেয়। হাত ধুতে বাইরে এসে আবার শ্রীদামকে দেখতে পেল মণিমালা। স্নান হয়ে গেছে, কুয়োতলায় দাঁড়িয়ে বালতির জলে চুবিয়ে কাপড় কাচছে সে এখন। তার চুলগুলো সপ্‌সপে ভিজে, বেশ বড় বড় চুল মাথায়। শ্রীদামের গড়ন বেশ ঢ্যাঙা, অরিন্দমের মত নাদুস-নুদুস নয় সে। তার শরীরে অনাবশ্যক মেদ নেই কোথাও।

কাপড়টা কাচার শেষে তারে মেলে দিচ্ছে এখন। আর কোন দিকে দৃষ্টি নেই। যখন যে কাজ করে তখন তাতে একেবারে মজে থাকে। এইবার ঘরে গিয়ে চুল আঁচড়ে, ধুতি পরে দালানে বসে খাবে ও। আসার দিন থেকে মণিমালা ওকে ঘরে খেতে বলেছে কিন্তু শ্রীদাম তাতে রাজী হয় নি। হেসে এড়িয়ে গেছে সে অনুরোধ। ঘরের ভেতর এটা-সেটা কাজ করতে করতে মণিমালা ওর খাওয়া দেখে। ভাতের গ্রাস মুখে তোলা, চিবোনো ও শেষে বাঁ-হাতে গেলাস ধরে জল খাওয়া পর্যন্ত সব ভঙ্গিগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা যে ওর কি সখ! ওর সব কিছুই ভদ্রলোকের মত, অরিন্দমের চেয়ে কত কম খায় ও! এত কম খেয়ে ও খাটে কি করে আর ওই ফালি ঘরটায় একা একা ওর দিনরাত কাটে কি ভাবে এই দুই প্রশ্নে রোজ ব্যতিব্যস্ত হয় মণিমালা।

এবার চেঞ্জে আসা সার্থক হয়েছে। আবহাওয়া ভারী সুন্দর, রোদ্দুরে যেন সোনা ঝরে পড়ছে। আকাশ নির্মল, স্বচ্ছ, মাঝে মাঝে দু'টি একটি মেঘ ভেসে আসছে। অল্প শীত পড়ছে, তাই বেশ ভাল—শেষ রাত্তিরে পাতলা একটা চাদর গায়ে টেনে নিলে ফুরিয়ে-যাওয়া ঘুমটা আবার জমে আসতে চায়। সর্বোপরি এই বাড়ীটা! এখানে যে এই রকম একটা ছোট সুন্দর বাড়ী পাওয়া যাবে তা কি ওরা স্বপ্নেও ভেবেছিল! সাঁওতাল পরগণার এই অখ্যাত, গ্রাম-ঘেঁষা শহরে আসতে মণিমালার একটুও মত ছিল না। কোথায় দুধ পাওয়া যাবে, অসুখ-বিসুখ হ'লে ডাক্তার মিলবে কি না এই রকম সাত-পাঁচ দুশ্চিন্তা ছিল তার। তার চেয়ে একটা দামী পাহাড়ী জায়গায় গিয়ে মাসখানেক থাকলে বেশ লোককে বলবার মত ব্যাপার হ'ত একটা। এক মাসের নিটোল এই ছুটিটা একটা চড়া দামের হোটেলে গিয়ে চুটিয়ে উপভোগ করা যেত। নিজের হাতে হাঁড়ি-কুঁড়ি ঠেলার ঝক্কি থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে মণিমালার হয়ত নিজেকে সম্রাজ্ঞী ভেবে আত্মপ্রসাদ পাবারও দরকার ছিল। যদিও টাকাগুলো গুণে দেবার সময় বেশ গা করকর করে তবু মণিমালার মনে হয়, এ সুখ তার ন্যায্য পাওনা, এ বিলাস করবার অধিকার সে বছরের বাকী মাসগুলোয় অন্ধকার রান্নাঘরে অফিসের ভাত ফুটিয়ে অর্জন করেছে।

কিন্তু একটা কথা, অন্ততঃ আজকে মণিমালা বুঝতে পেরেছে যে, এখানে এই ছোট দু'ঘরওলা বাড়ীটায় রান্না করে রোদ্দুরে ভিজে কাপড় মেলে যে আনন্দ, খুব নামকরা হোটেলে থেকে এক গাদা টাকা উড়িয়ে ফুর্তি করা তার কাছে কিছু না। এ বাড়ীটা পাওয়া যেন আশার অতীত

যেন স্বপ্নেও ভাবা যায় নি যে একমাসের জন্যে যে বাড়ীটা ওরা ভাড়া নেবে তাতে এমন একটা মস্ত উঠোন আর দু'-পাশে দুটো ফুলন্ত করবী ফুলের গাছ থাকবে। এর ওপর ঘোরানো সিঁড়িটা গিয়ে হাত মিলিয়েছে খোলা ছাদের সঙ্গে। প্রথমে ঢুকে চারদিকে তাকিয়ে মণিমালা বিশ্বাসই করতে চায় নি যে, এ বাড়ীটা এখন তাদের হাতের মুঠোয়। সে মনে মনে এঁচে রেখেছিল একটা চোখ-কাণ-বন্ধ এঁদো বাড়ী, যার ধারে-কাছে আলো হাওয়ার ছিটেফোঁটা নেই। কিন্তু একি! ওরা এসেছিল রাত্রে, আকাশে সে সময়ে জ্যোৎস্না ছিল না। কিন্তু তখন সেই সামান্য আলোয় বাড়ীটা কি রকম দেখিয়েছিল তা এখনও তার মনে আছে। মণিমালা একটু ভাবুক প্রকৃতির, কলেজে পড়ার কালে রাজ্যের বই ঘেঁটে সুন্দর সুন্দর লাইনগুলো তুলে রাখত সে খাতায়। মনের মত বাড়ীটা দেখে তার ইচ্ছে হয়েছিল দু'হাতে হাততালি দিয়ে উঠতে, কি কোন চেনা গান গুন-গুন করে গাইতে। তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে সে ছাদে উঠে গিয়েছিল। তাদের চন্দননগরের বাড়ীতেও ছিল এমনি খোলা ছাদ, সেখানে সে কতদিন শুয়েছে, পরীক্ষার সময় পড়াশুনো করেছে ঐ ছাদেই কেরোসিনের বাতি জ্বালিয়ে। কিন্তু বিয়ে হয়ে যেতে যেমন আগেকার জীবনের অনেক অনুভূতি, আলোর ইসারা আর মাধুর্য্য মুছে গেল তেমনি অদৃশ্য হ'ল ঐ খোলা ছাদটুকু। অরিন্দমের ফ্ল্যাটে দিনরাত্রির প্রভেদ বোঝা যায় কিন্তু ভোর কখন অস্পষ্ট আলোর সংকেত আনে আর দিনান্ত কোন্ সময় তার ম্লান মুখ তুলে ধরে আকাশের দিকে, তা বোঝবার উপায় থাকে না। ওদের ছাদের ওপর পেয়ারাগাছের ডাল নুয়ে থাকত আর সকালে অগুণতি পাখীর কলরবে ঘুম ভাঙত তার। ওপরে উঠে তার ভীষণ ভাল লেগেছিল, প্রায় হারিয়ে ফেলেছিল নিজেকে, আর কেমন এক বেদনার সঙ্গে মনে পড়েছিল তার অনাহত, সুকুমার শৈশবকে। সীমাহীন আকাশের তলায় সে একা, তাকে ঘিরে ছিল শুধু স্তব্ধ রাতের নৈঃশব্দ। উচ্ছ্বসিত গলায় মণিমালা ডেকেছিল, 'বাচ্চু, বাচ্চু, দেখবি আয়।' অরিন্দম ঠোঁটে চুরুট চেপে অল্প অল্প হাসছিল তার ছেলেমানুষী দেখে। ছোটাছুটি করলে তার স্ত্রীকে এত চঞ্চল দেখায়, শরীরে এমন আকর্ষণীয় ঢেউ জাগে তা সে আগে জানত না। শ্রীদামের ওপর তখনও কারও নজর পড়ে নি, উঠোনের একধারে তুলসীমঞ্চে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে, তার মুখ ভাল করে দেখবার উপায় ছিল না। অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়ে নেমেছিল উঠোনে। দূরের শালবন দেখতে পাওয়ার কথা এই ছাদ থেকে, আলোর অভাবে তাও ঠাহর করা যাচ্ছিল না। অনন্তবাবু বলেছিলেন, 'কেমন মা, ঘর পছন্দ হয়!' 'খুউব', হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করে মণিমালা ঘাড় নেড়েছিল। বাচ্চু তখন ছাদময় ছুটোছুটি লাগিয়ে দিয়েছে। অরিন্দম ব্যাগ খুলে টাকা গুণে অনন্তবাবুর হাতে দিতে দিতে বলেছিল, তা হ'লে ঐ কথাই রইল। এক মাসের ভাড়াটাই রাখুন আপনি।

—বাবুর গুণের কথা শুনেছ? অরিন্দমের গা ঘেঁষে বিছানায় বসতে বসতে ঠোঁট উল্টে বলে মণিমালা, 'আবার বাঁশী বাজানো হয়।'

—না কি? ঝপ্ করে খবরের কাগজটা মুড়ে ফেলে স্ত্রীর দিকে গোল গোল চোখ করে তাকাল অরিন্দম।

—হ্যাঁ গো, তবে আর বলছি কি! গুণের জাহাজ একটি। কালই ত ধরলাম। তুমি কাল যখন বাচ্চুকে নিয়ে বেরুলে আমি ত তখন বাড়ীতে একা। হাতে কাজ ছিল না, তাই একা একা ছাদে বেড়াচ্ছিলাম, হঠাৎ কাণে এল বাঁশীর সুর। প্রথমে ভাবলাম, রেডিওতে বাজছে নাকি? কিন্তু ভাল করে শুনে বুঝলাম যে, না, রেডিও'র বাঁশী এ নয়। ছাদের কোন্ থেকে তখন বাবুর ঘরের দিকে নজর পড়ল। দেখলাম বাবু ঘরে এক বন্ধুর সঙ্গে বসে, ঠোঁটে বাঁশী লাগানো।

স্ত্রীর মুখে কি যেন খোঁজে অরিন্দম। ভোমরার মত কালো চোখ দু'টিতে যেন কত কথা লুকানো! ক'দিনেই স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে মণিমালার, মুখে সুন্দর লাল আভা দেখা দিয়েছে। অরিন্দম হঠাৎ গর্ববোধ করে। তার স্ত্রী সুন্দরী এ কথা মনে পড়ায় বুক ফুলে ওঠে তার।

—লোকটা অদ্ভুত—তাই না? এত গুণ, চেহারাটা ভাল অথচ কিছু বোঝবার উপায় নেই।

মণিমালা বাইরের দিকে তাকায়। উদার সাঁওতালী মাঠের বিস্তার, দূর-দিগন্তে একটা ধূসর পাহাড়। এই বাধা-বন্ধনহীন প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কত অতীত দৃশ্য ভিড় করে এল তার মনে।

—কি দেখছ? শুয়ে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে অরিন্দম প্রশ্ন করে। স্ত্রী-র আদর পাবার আশায় তার হাতটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে সে।

বাইরের দিকে তাকিয়ে আনমনে মণিমালা বলে, না, ওই বাঁশীর কথাই ভাবছি। বেশ বাজাচ্ছিল।

—চেষ্টা করলে রেডিওতে চান্স পেতে পারে ও, অরিন্দম নিজের মত প্রকাশ করে। তার পর হাই তোলে দুটো। ঘুমকে আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। পিঠের ওপর

মণিমালার হাতের স্পর্শটা বেশ লাগছে। 'তোমার হাতে যেন সোনা মাখানো আছে', একদিন সোহাগ করে স্ত্রীকে বলেছিল সে।

পাশবালিশটা জড়িয়ে পাশ ফিরে শোয় অরিন্দম।

* * *

এখন রাত ক'টা বাজে তা ঠিক বোঝা না গেলেও নিস্তব্ধতা দেখে অনুমান করা যায় যে, বেশ রাত হয়েছে। মণিমালা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, স্থির নিষ্কম্প তার শরীর। বেশ শীত-শীত, গায়ে ভাল করে আঁচল টেনে দিল সে। উঠোনের ওপাশের ঘরটায় টিম টিম করে বাতি জ্বলছে একটা। হঠাৎ বাঁশির আওয়াজে যেন বাতাস দুলে উঠল, প্রথমে খুব মৃদু কিন্তু তার পর সুরেলা তীক্ষ্ণ স্বর যেন মর্মে গিয়ে বিঁধল। মণিমালা চকিত হ'ল, মধ্যরাতে যেন অব্যক্ত অতীত কথা কয়ে উঠতে চাইছে। সারাদিন কাজ করে গুমোট ঘরে রাত কাটায় যে লোক, সে এমন বাঁশী বাজায় কোন্ সখে? কি খুঁজে বেড়ায় লোকটা মণিমালার জানতে ইচ্ছে করল।

—তুমি?

—হ্যাঁ আমি।

একবার মুখ তুলে মণিমালাকে দেখে শ্রীদাম মাথা নামায়। বাঁশির সুর হারিয়ে যায়, মুখের ভাষা প্রকাশের পথ পায় না।

রাত কাঁপছে থরথর করে, বাতাস কাঁপছে বাঁশপাতায়। কানে কানে ফিসফিসিয়ে কারা কথা বলছে। রক্তে যেন কিসের সাড়া জেগেছে। কত আশ্চর্য, অদ্ভুত ইচ্ছেরা মাথা তুলছে নতুন ফুলের কুঁড়ির মতন। চোখ বুজে মণিমালা স্মরণ করল তার প্রথম যৌবনের চপলা মূর্তিকে, শরঘাসের জঙ্গলে এক আশ্চর্য হরিণী নিজের নিটোল অঙ্গের জ্যোতি দেখছে অবাক্ কৌতূহলে!

জানলার গরাদে মাথা তার, চুল এলানো, আস্তে আস্তে বলল, তুমি চন্দননগর ছাড়লে কবে?

—বছর চারেক হবে।

—সেই রেডিও-র কাজ শিখছিলে, তার কি হ'ল?

—কই আর, কিছু হ'ল না। যে দোকানে কাজ করতাম সেই দোকানেই চুরি হয়ে গেল। মালিক দোকান তুলে দিল।

আশ্চর্য! মণিমালা বিস্ফারিত চোখে শ্রীদামের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবল, কথা কইছে বটে, কিন্তু একবারও মুখ তুলে দেখছে না তাকে। ঘরের ভেতরও আসতে বলছে না তাকে।

পেছনে তার শোবার ঘরের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকা মণিমালা। অরিন্দম এখন গভীর ঘুমে নিথর। এ সময় তার একেবারে নিজস্ব। একটু কান পাতলে তার না ডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

—কিন্তু তুমি এটা কি করেছ? একি জীবন বে নিয়েছ? অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে মণিমালা। এ কে সর্বনাশা সখ তোমার!

—আমার এই ভাল, ম্লান হাসি হেসে বলে শ্রীদা চোখে জল চিক্ চিক্ করে ওঠে তার। সেই হাসি আলোয় মণিমালা যেন তার অতীতকে স্পষ্ট দেখতে পে কত কালের পথঘাট, আকাশ-বাতাস, ঘর-বাড়ী মন্দির অবিকল অটুট রূপ নিয়ে ফুটে উঠল তার সামনে। এ ক'বছরের মধ্যে কি আশ্চর্য পরিবর্তন এসেছে শ্রীদামে মধ্যে। কোথায় সেই উদ্দাম চঞ্চলতা আর কোথায় এ অভিমান আর বিনয়! সমস্ত পাড়াটাকে মাথায় নিয়ে একদিন হৈ হৈ করে বেড়াত, যে না থাকলে সমস্ত আমো প্রমোদ মাটি হয়ে যেত, আজ সে কুঁকড়ে কতটুকু হ গেছে! মণিমালার তখন প্রথম যৌবন, তার মনের মধ্যে একটা সদাচঞ্চল কৌতূহল, একটা অধীর-অস্থির উত্তেজনা ছাদে বসে ফার্স্ট ইয়ারের পড়া তৈরি করতে করতে মা তুলে কতবার সে এই গৌরবর্ণ যুবকটিকে দেখেছে। কি কোনদিন কথা বলার সুযোগ হয় নি।

মণিমালার মনে আছে শ্রীদামের সঙ্গে তার প্রথ আলাপ হয় মাধবীদের বাড়ীতে। মাধবীর বাবা ছিলে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। সেই সময় চন্দননগ যুব সঙ্ঘ নবদ্বীপ থেকে এক যাত্রার দলকে চন্দননগরে আনিয়েছিল, সেই যাত্রার ব্যাপারে আলাপ করবার জন্যে শ্রীদাম ও আরও কয়েকটি ছেলে অর্দ্ধেন্দুবাবুর কাছে এসেছিল। কথা বলতে বলতে শ্রীদাম হঠাৎ মাধবীকে ডাকতে ডাকতে ভেতরে ঢোকে।

ঘরে তখন মণিমালা একা। মাধবী তার বুড়ো দাদুকে ভেতরের উঠোনে বসিয়ে স্নান করাচ্ছিল।

হঠাৎ ঘরে ঢুকে মণিমালাকে দেখে অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল শ্রীদাম। কিন্তু পরমুহূর্তে সে ভাব সামলে নিয়ে হাসি-হাসি মুখে বলেছিল, 'মাধু কোথায়?

—ও ভেতরে গেছে। লজ্জায় আড়ষ্ট মণিমালা কোন রকমে বলতে পেরেছিল। সে বয়সটায় ভারী লাজুক ছিল সে। হাতের তেলো ঘামে ভিজে উঠেছিল।

—আপনি রমেন দা'র ভাইঝি না? ঐ তেঁতুলতলা

মণিমালা ঘাড় নেড়েছিল।

—আপনাকে দেখেছি আমি।

আমিও আপনাকে দেখেছি উত্তরে মণিমালা বলতে ছিল। কিন্তু সে-বয়সে অনেক মনের কথা মুখে করে বলা যেত না।

মাথা নামানোই ছিল, কয়েক মুহূর্ত পরে মুখ তুলে হঠাৎ যে শ্রীদাম তারই দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে ছে। যেন সমুদ্রে ক্লান্ত নাবিক দূরে তটরেখা দেখতে য়েছে।

মাঝের এই ক'টা বছরে যে ওর ওপর দিয়ে খুব ঝড় বয়ে ছে তা মণিমালা বুঝতে পারল ওর নিষ্প্রভ চোখেরই দিকে কিয়ে। সেই আগ্রহ আর উজ্জ্বলতা মুছে গিয়ে এখন খানে শুধু লেখা রয়েছে আত্মাবহনের প্রতিশ্রুতি।

ভেতরে চোখ ফেলে মণিমালা তার নিরাভরণ ঘরটিকে খে। সতরঞ্চি দিয়ে মোড়া ময়লা বিছানা আর রংচটা টা টিনের স্যুটকেশ ছাড়া আর কিছু সম্বল নেই দামের।

আর একটি জিনিস হ'ল ঐ বাঁশী।

মণিমালার মনে পড়ল চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো; আসরে বসে শ্রীদাম বাঁশী বাজাচ্ছে। প্রায় হাজার তারও বেশী লোক সেই আসরে বসে মন্ত্রমুগ্ধের মত দামের বাঁশী শুনত। সে বাঁশী শুনতে শুনতে কি রকম ল-পাথাল করত মণিমালার বুক, বাঁশী থামলে তবে যেন সহজে নিঃশ্বাস নিতে পারত।

—কেন তুমি অমন করে বাঁশী বাজাও?

—বাজাবো না? হাসি মুখে জিগ্যেস করেছিল দাম। তখনও তার হাতে বাঁশীটি ধরা।

—না। বাগানের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল ণিমালা। বাড়ীর ভেতরে এক চোখ তার আর এক চোখ মনে দাঁড়ানো লোকটির ওপর। 'বাঁশী শুনলে কষ্ট হয়। মি যখন থাকব না, তখন বাজিও।'

সেই থেকে ওপাড়ায় আর কেউ শ্রীদামের বাঁশী শুনতে য় নি। দূর দূর থেকে ডাক এলে সেখানে ছুটে গেছে, শী শুনিয়ে মাতিয়ে এসেছে। টাকার তোড়া, সোনার ংটি উপহার নিয়ে এসেছে। কিন্তু রথতলায় আর না।

মাধবী পর্যন্ত অনুযোগ করেছে মণিমালার কাছে, 'ভাখ ছিদামদাটা কি, এত করে সবাই বলছে তবু বাবুর মন ঠে না। বেশী অহঙ্কার...।'

বলতে ইচ্ছে হয়েছে, 'বাঁশী শুনে বুকের ভেতর ভূমিকম্প হয় নি ত তোর, তুই এর যাদু বুঝবি কি?'

আজ আবার সেই বাঁশী বাজল। আজ তার বুকের মধ্যে যেন ভাঙ্গা গলায় কে কেঁদে উঠল তা শুনে।

সময়টা মাস-বছরের হিসেবে কম, কিন্তু এক সওদাগরী অফিসের পেটমোটা বড়বাবুর গৃহিণী হয়ে চার বছর শহুরে জীবনযাপন করে, দু'বেলা পান-দোক্তা খেয়ে আর নিয়মিত হারে সিনেমা দেখে আজ তার কাঠামোটাই যেন বদলে গেছে। সেই দিনকার সেই সাধ আর স্বপ্নকে কবরস্থ করে তার ওপর এ সম্পূর্ণ অন্য কেউ দাঁড়িয়ে আছে।

হঠাৎ শ্রীদাম চোখ তুলে তাকায় তার দিকে, সে দৃষ্টিতে যেন আহ্বানের ভাষা!

মণিমালার বুকটা ধক্ করে ওঠে। অরিন্দমের ভয় নয়, রাত্তিরের এই সময়টা সে ডাকাত পড়লেও ওঠে না।

ভয় তার নিজের কাছে, রক্তে এমন কল্লোল জেগেছে যে তার ভয় হচ্ছে সে নিজেই তাতে ভেসে যাবে কি না।

—তুমি ত সুখী? ভালই আছ, তাই না···সঙ্কোচ-হীন দৃষ্টি তুলে শ্রীদাম তার দিকে তাকায়।

—হ্যাঁ, ভালই আছি। মন্দটা আর কোথায়? খাওয়া-পরার অভাব নেই কোন।

শ্রীদামের চোখ দু'টো ধক্ করে জ্বলে ওঠে। বোধ হয় তার মনে পড়ে যায় যে বাঁশী বাজানোর গুণে হাজার চেষ্টা করেও সে একটা চাকরি জোটাতে পারে নি।

আর মণিমালার মনে পড়ল যে, বাধাটা তার দিক থেকেই এসেছিল। শ্রীদামের প্রস্তাব ছিল কাউকে কিছু না বলে গৃহত্যাগ করা; মণিমালা তাতে রাজী হ'তে পারে নি।

—তুমি কোথায় যাবে এর পর? বাঁশীটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে প্রশ্ন করে মণিমালা।

—ঠিক নেই; অন্ধকারকে উদ্দেশ করে বলে শ্রীদাম, আমি ভেসে পড়েছি স্রোতে, আমাকে যে দিকে নিয়ে যাবে আমি সেদিকেই। একটু থেমে বলে, 'তবে দুর্গাপুরে আমার বন্ধু ঠিকাদারী পেয়েছেন সেখানে একটা কাজের ব্যবস্থা হতে পারে। তাই ভাবছি—'

কথা শেষ হবার আগেই শ্রীদামের একটা হাত চেপে ধরে মণিমালা, ফিস্‌ফিস্ করে বলে, আমায় নিয়ে যাবে?

—কোথায়? শ্রীদাম যেন ভূত দেখে।

—তোমার সঙ্গে।

শ্রীদামের মুখে একটা ভয়ের ছায়া পড়ে। সে মণিমালার এই শরীরের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নেয়।

আমার কাছে বিষ হয়ে উঠছে···তুমি আমাকে নিয়ে চল। যেখানে খুশী, যতদুর ইচ্ছে···আমি খুব খাটব, নতুন সংসার গড়ব আমরা।'

শ্রীদামের হাঁটুতে মুখ রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল মণিমালা। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল চন্দননগরের খোলা মাঠ, আর অনেক বিস্তৃত গুঞ্জনের মধ্যে শুনতে পেল আকুল-করা বাঁশী—তাকে ডাকছে।

কি করবে ভেবে পায় না শ্রীদাম। একটা হাত সে রাখে মণিমালার পিঠের ওপর।

এমন সময় বাচ্চুর কান্না শুনতে পাওয়া যায়। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত উঠে বসে মণিমালা। নিশ্চয় বিছানায় তাকে হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে না পেয়ে ভয় পেয়েছে ছেলেটা। ধড়মড়িয়ে উঠে আঁচলে চোখ মুছে সে শোবার ঘরের দিকে ছুটে য বাচ্চুর কান্না ক্রমান্বয়ে বেড়ে উঠছে। দরজা খুলে, মশ তুলে একেবারে ওকে বুকে টেনে নেয় মণিমালা। 'এ সোনা, কি হয়েছে, এই যে আমি। না না, কাঁদে ন বাচ্চুর কান্না তখন থেমেছে কিন্তু অভিমানে ঠোঁট দু'টি রয়েছে, এমন কোনদিন হয় নি। চিরকাল সে হাত বাড়ি মা-কে পেয়েছে।

—এই ত, কাঁদে না, রাগ হয়েছে? আহা রে···আ সোহাগে ছেলেকে পিষে ফেলে তার মুখ চুমোয় ভ দিতে দিতে মণিমালা ভাবে এমন একটা দুঃস্বপ্ন দেখার আর এ বাড়ীতে থাকা যায় না। কালই অরিন্দম বলতে হবে।

স্বদেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেম

পাশ্চাত্যদেশে স্বদেশের স্বার্থ অন্বেষণের নাম পেট্রিয়টিজম্। ইহার সঙ্গে বিশ্বপ্রেমের বিরোধ আছে। কারণ, দেখা যাইতেছে যে, মানুষ ইহার প্রেরণায় অন্য দেশের অনিষ্ট করিয়া, অন্য দেশকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া, অন্য দেশ লুণ্ঠন করিয়া, অন্য দেশকে ঠকাইয়া, স্বদেশের ধন ও ক্ষমতাবৃদ্ধির প্রয়াস পাইতেছে। কিন্তু দেশভক্তির সঙ্গে বিশ্বপ্রেমের এইরূপ বিরোধ যে থাকিবেই, তাহা নয়। "আমরা অন্য দেশকে বা অন্য জাতিকে আমাদের দেশের কোন প্রকার অনিষ্ট করিতে দিব না, আমাদের দেশ ও জাতিও অন্যের কোন অনিষ্ট করিবে না; আমরা এইভাবে আমাদের দেশের মঙ্গল-চেষ্টা করিব;" এবম্বিধ স্বদেশহিতৈষণা বিশ্বপ্রেমের অবিরোধী। ইহা বিশ্বহিতৈষণার অনুকূলও এই পর্য্যন্ত, যে, আমাদের দেশও ত বিশ্বের অন্তর্গত; তাহার হিতচিন্তা সুতরাং আংশিকভাবে বিশ্ব-হিতেচ্ছা। কিন্তু ইহাও অবশ্যস্বীকার্য্য যে ইহা বিশ্বপ্রেম অপেক্ষা সংকীর্ণ আদর্শ। বুদ্ধদেব কেবল মগধবাসী বা ভারতবাসীর মুক্তির জন্য নির্ব্বাণের পথ আবিষ্কার করেন নাই, সকল মানবের জন্য করিয়াছিলেন; তাঁহার হিতৈষণা স্বদেশহিতৈষীর উপচিকীর্ষা অপেক্ষা উদার ও মহৎ। কিন্তু তথাপি স্বদেশপ্রেমের প্রয়োজন আছে। নবজাত শিশুটির প্রতি মায়ের একনিষ্ঠ বাৎসল্যকে তুমি সংকীর্ণ বলিতে চাও বল, কিন্তু উহাই বিধাতার মঙ্গলবিধান। বৈষ্ণব ভগবানকে শিশু গোপালরূপে দেখিয়া তাঁহার প্রতি বাৎসল্য অনুভব করেন। আমাদেরও দেশপ্রীতি নিজ নিজ সন্তানের প্রতি বাৎসল্যের মত প্রগাঢ় হইতে পারে না কি?

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২১

স্বাধীনতা-সাধক জ্ঞান-তাপস

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

যৌবনে স্বদেশের মুক্তি-সংগ্রামে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ দেশসেবক। তারপর সুদূর বিদেশে বছরের পর বছর ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম সঞ্চালক। এবং উত্তর জীবনে দেশের প্রাচীন রাষ্ট্রনীতিক তথা সাংস্কৃতিক ইতিহাস যুগে যুগে বিবর্তিত সমাজ-পদ্ধতির রহস্য উদ্ঘাটনে আত্মনিমগ্ন তাপস। অগ্নিযুগের এক আদি যোদ্ধা, পণ্ডিতপ্রবর ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়। বাংলা দেশের মনীষী ও পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের এমন একনিষ্ঠ যোদ্ধা আর কজন ছিলেন?

একদিকে আপোষ-বিবর্জিত বিপ্লব-সাধক, অন্যদিকে অক্লান্ত নিরলস জ্ঞানযোগী। এই দুই আপাত-সম্পর্ক-হীন ধারার সমন্বয়ে গঠিত ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব। শ্রদ্ধা-ঋদ্ধ জাতীয়তাবোধ এবং নির্মোহ আন্তর্জাতিক দৃষ্টি তাঁর চরিত্রকে এক মহৎ স্বাতন্ত্র্যে মণ্ডিত করেছিল। একাধারে স্বাধীনতার সাধনা এবং জ্ঞানের আরাধনা যেন ইউরোপীয় মনের সঙ্গে ভারতীয় আত্মার সম্মিলন ঘটিয়েছিল তাঁর মধ্যে।

প্রাক্-ইতিহাসের বিস্মৃত অতীতকাল থেকে সমগ্র মানব সমাজের বিকাশের নানা পর্যায়ে তাঁর যেমন অক্লান্ত অনুশীলন ছিল, তেমনি বর্তমানের নানা দেশের প্রগতিশীল আন্দোলনে অপরিসীম আগ্রহ। সেজন্যে তিনি ছিলেন যুগপৎ জ্ঞানপ্রবীণ এবং চিরনবীন আধুনিক। জ্ঞানচর্চার বিপুল বিস্তৃত ক্ষেত্রে যাঁর অবাধ বিচরণ, বিংশ শতকের ভারতীয় বিপ্লববাদের তিনি অন্যতম প্রধান প্রবক্তা। একটি মহাজীবন ভূপেন্দ্রনাথের।

মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনের জন্যে স্বাধীনতার আন্দোলন এবং বহুমুখী বিদ্যাচর্চা এই দুই বিভাগেই একাধিক বিষয়ে তিনি পথিকৃৎ হয়ে আছেন। তাঁর জীবনকৃতি বিশ্লেষণ করে সেই সব গৌরবময় অবদানের কথা স্মরণ করা দেশবাসীর কর্তব্য।

প্রথমে তাঁর সম্পাদিত স্বনামধন্য 'যুগান্তর' পত্রিকার (১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্রথম প্রকাশ) কথা। বাংলা তথা ভারতের বিপ্লবী সংবাদপত্রের জগতে 'যুগান্তর' এক ঐতিহাসিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল বলা যায়। সেই অগ্নিযুগের চরমপন্থী ভাবধারা এবং সশস্ত্র সংগ্রামের আদর্শ প্রচারে এই পত্রিকা শ্রেষ্ঠ পথ-প্রদর্শক। তাই ব্রিটিশ সরকারের দমননীতির প্রথম লক্ষ্য হয় 'যুগান্তর'।

স্বরাজ-সাধনার সেই আদি যুগে নব-জাগ্রত চেতনার প্রসারে দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল। পত্রিকার মাধ্যমে আদর্শ প্রচারের ফলে আন্দোলনের অগ্রগতি অনেকাংশে সম্ভব হ'ত। উনিশ শতকের শেষ ভাগ ও বিশ শতকের সূচনা থেকেই বাংলা দেশে উন্মেষ হয় এক নতুন ও প্রবল জাতীয়তাবাদের। এই অনমনীয় জাতীয়তাবোধ আর আবেদন-নিবেদনের থালিতে দীন প্রার্থনার অর্ঘ সাজিয়ে তৃপ্ত থাকতে পারে নি। নতুন শতকের জন্মলগ্নে দেখা দিতে থাকে বিপ্লবী জাতীয় চেতনা। রাষ্ট্রনীতিক স্বাধীনতার আদর্শ তরুণ বাংলাকে মহান্ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে। তারই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বাংলা দেশে প্রথম বৈপ্লবিক সমিতি, গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ শতকের প্রথম দু'বছরের মধ্যেই। সে প্রসঙ্গ এবং ভূপেন্দ্রনাথের সে ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তির কথা পরে আলোচিত হবে। এখানে বক্তব্য এই যে, সেই নতুন চেতনা ও ভাবধারার বাহনরূপে যোগ্য মুখপত্রের প্রয়োজন অনুভূত হয় নেতৃবর্গের মনে। তারই সুবর্ণ ফল 'যুগান্তর'।

'যুগান্তর'-এর পরিকল্পিত স্বাধীনতার আদর্শ ছিল পূর্ণ স্বরাজ। পূর্ববর্তী যুগের নরমপন্থী নেতৃত্বের মতন তার লক্ষ্য ব্রিটিশ শাসনের মূল বন্ধনীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। নবযুগের এই বাণী প্রচারের মুখপত্ররূপে বিপিনচন্দ্র পাল সম্পাদিত 'নিউ ইণ্ডিয়া,' ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সম্পাদিত 'সন্ধ্যা' এবং শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ সম্পাদিত 'বন্দে মাতরম' পত্রিকাত্রয়ের নামও 'যুগান্তরে'র সঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু উক্ত তিনটির কোনটিই শেষোক্তের তুল্য অগ্নিমন্ত্রের বাস্তব উপাসনা করে নি। সশস্ত্র সংগ্রামের আদর্শ 'যুগান্তরে'র তুল্য ভাবে আর কোন পত্রিকায় প্রচারিত হয় নি সে যুগে। 'বন্দে মাতরম', 'সন্ধ্যা' এবং 'নিউ ইণ্ডিয়া'-তে বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কৌশলস্বরূপ প্রধানত নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের পথই অনুসরণ করা হ'ত। 'যুগান্তর' সেক্ষেত্রে অনন্য ছিল

সেকালে। এবং তার প্রথম সম্পাদকরূপে ভূপেন্দ্রনাথের নামও স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে বিস্মৃত হবার নয়।

সে পর্বে আরও এক কারণে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। তখনকার প্রথম রাজদ্রোহের মামলায় ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক অভিযুক্ত হন তিনি। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ: 'যুগান্তরে' কয়েকটি আপত্তিকর রচনা প্রকাশ। অভিযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বিদেশী শাসকের ইঙ্গিতে ও স্বার্থে পরিচালিত বিচারালয়ে এই উপলক্ষ্যে আরও একটি ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। আইনজ্ঞের সাহায্যে আত্মপক্ষ সমর্থনে দেশপ্রেমিকের আত্মসম্মানে আঘাত লাগল। বিচারালয়ের রীতি অনুসারে আইনের সহায়তায় আত্মসমর্থনে অসম্মত হ'লেন তিনি। আদালতে একটি বিবৃতি দিয়ে সেই বিপ্লবী পত্রিকার যোগ্য তরুণ সম্পাদক জানালেন যে, মাতৃভূমি ভিন্ন কারুর কাছে কোন জবাবদিহি করতে তিনি বাধ্য নন। যে স্বদেশকে তিনি সেবা করতে চান একমাত্র তার কাছেই তিনি দায়ী।

তাঁর এই দৃপ্ত, নির্ভীক ভাষণে নব জাগ্রত বাংলার প্রাণ-স্পন্দনই ধ্বনিত হয়েছিল এবং দেশময় একটি সাড়া পড়ে গিয়েছিল। তরুণতর সম্প্রদায়ের মনে নব-জাগরণের উদ্দীপ্ত প্রেরণা সঞ্চার করেছিল তাঁর এই ঘোষণা। শাসক সম্প্রদায়ের বিচারে তিনি এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হ'লেন। কিন্তু তরুণ বাংলা মনের মন্দিরে বরণ ক'রে নিলে তাঁকে হৃদয়ের অর্ঘ দিয়ে।

পরবর্তীকালের যুগান্তর দলের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নেতা ডঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় (তাঁর 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি' গ্রন্থে) তাঁদের মনে ভূপেন্দ্রনাথের এই বীরোচিত আচরণ ও কারাবরণ কি প্রভাব বিস্তার করেছিল সে সম্পর্কে বলেছেন: "ভূপেনবাবু বোধহয় নিজেও জানলেন না তাঁর এই আত্মদানে কত ছাত্রকে আত্মদানের দীক্ষা দিল। আমার কাছে তিনি আজীবন একটি দৃষ্টান্তস্থল হয়ে রইলেন। এই ত প্রথম নিজেদের মধ্যে থেকে আদর্শ পাওয়া গেল।" (পৃষ্ঠা ২৬৪)

ভূপেন্দ্রনাথের সেই নির্ভীক বিবৃতি, আত্মপক্ষ সমর্থন করতে অস্বীকার এবং কারাবরণ ও আত্মত্যাগের জন্যে তাঁকে ভারতের প্রথম যথার্থ সত্যাগ্রহী বলা যায়।

তাঁর দ্বিতীয় সত্তায় অর্থাৎ তাঁর জ্ঞানের সাধনায়—সমগ্রভাবে তাঁর জীবনের কথা বিবেচনা করে দেখলে যা তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয় মনে হয়—তিনি বহুমূল্য সম্পদ্ দান করে গেছেন তাঁর স্বদেশকে। যে-সব গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যার চর্চা তিনি আজীবন করেছিলেন ও তার ফলস্বরূপ মূল্যবান্ গ্রন্থাবলী দেশবাসীকে উপহার দিয়েছিলেন, তার মধ্যেও কোন কোন বিষয়ে তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে তাঁর অধিকার থাকলেও সমাজতত্ত্বই তাঁকে সর্বাধিক আকর্ষণ করত এবং এবিষয়ে শুধু স্মরণীয় অবদান রেখে যান নি, পথ-প্রদর্শকও ছিলেন। ভারতবর্ষে সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস তিনিই প্রথম গ্রথিত করেন, অধ্যাপক কোশাম্বী প্রমুখ পণ্ডিতেরা এ-বিষয়ে কার্য আরম্ভ করেছিলেন ভূপেন্দ্রনাথের পরে।

নানা বিদ্যার চর্চায় তিনি যেমন গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করেন তাঁর সুদীর্ঘ জীবন ধরে তাও অল্প পণ্ডিত ব্যক্তির জীবনেই দেখা গেছে। তাঁর জ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্র ছিল পরিধি ও প্রসারে বিরাট্। ভারতীয় সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস, হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠান পদ্ধতি, ভারতের ভূমি-বিষয়ক অর্থনীতি, হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের নৃতাত্ত্বিক বিচার ইত্যাদির তথ্য ও তত্ত্বদর্শী গবেষণা তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল। এবং এই সব বিষয়ে রচিত তাঁর আকর পুস্তকরাজি দেশ-বিদেশের পণ্ডিত সমাজে স্বীকৃতি লাভ করে মৌলিক চিন্তাধারার জন্যে।

বৈদিক আর্যগণ যে ভারতভূমির সন্তান এবিষয়ে তাঁর মতামত ও তথ্যপ্রদর্শনও মৌলিকতা ও যুক্তিবত্তার জন্যে গুণীজনের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছিল। স্বামী শঙ্করানন্দ প্রণীত এই সম্পর্কিত গ্রন্থে ভূপেন্দ্রনাথ লিখিত ভূমিকাটি তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বিচার-বিবেচনার নিদর্শনস্বরূপ। বৈদিক আর্যদের বিষয়ে তাঁর মতামত পণ্ডিত সমাজে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয় নি সত্য। পাশ্চাত্যের পণ্ডিত সমাজে তা মান্য হবার পথে জাতিগত শ্রেষ্ঠতাবোধ ইত্যাদি মনস্তাবজনিত নানা প্রকার বাধা আছে, বোঝা যায়। কিন্তু এ সম্পর্কে এ যাবৎ অনুসৃত পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের সিদ্ধান্ত যে যথেষ্ট নিরপেক্ষ ও যুক্তি-তথ্যভিত্তিক নয়—এ সন্দেহের অবকাশ তিনি ঘটিয়েছেন এবং তাও কম কৃতিত্বের কথা নয়।

জ্ঞানযোগী রূপে ভূপেন্দ্রনাথের যে বহুমুখী প্রতিভা তার দৃষ্টান্তও এদেশে বিরল। কারণ তিনি ছিলেন একাধারে সমাজতাত্ত্বিক ও নৃবিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিবিদ, ভারততত্ত্বের বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরম প্রাজ্ঞ। ভারতে মার্কসীয় চিন্তাধারার ক্ষেত্রেও তিনি অন্যতম আদি প্রবক্তা ছিলেন। জ্ঞানের রাজ্যে তাঁকে জীবন্ত বিশ্বকোষ আখ্যায় অভিহিত করলে বিশেষ অত্যুক্তি

হয় না। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর রচনাবলী তাঁর বিপুল পাণ্ডিত্যের কথঞ্চিৎ পরিচয়-জ্ঞাপক। কারণ তাঁর সমগ্র বিদ্যা ও চিন্তাধারার প্রকাশ রচনার মধ্যে ঘটে নি।

তাঁর সুদীর্ঘ নিরলস জীবন তিনি একান্তভাবে দেশের হিতার্থেই নিয়োজিত করেছিলেন। প্রত্যক্ষ রাজনীতিক সংগ্রামের ক্ষেত্র থেকে যখন তিনি অবসর নেন নানা দলীয় ও উপদলীয় চক্রান্তে বিরক্ত হ'য়ে এবং বিদ্যাচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন, তারপরেও স্বদেশসেবার কার্য ব্যাহত হয় নি। তা প্রবাহিত হয় অন্য ধারায়। তাঁর জ্ঞানের সাধনা এবং বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা দেশের সবারই প্রকারভেদ। জনসাধারণের মুক্তি ও স্বদেশের কল্যাণের জন্যে চিন্তায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি কাল-পরম্পরায় আগত সমাজ বিবর্তনের ধারার বিচার বিশ্লেষণে নিবিষ্ট হন। তাঁর বিদ্যার সাধনা এক হিসাবে তাঁর সুপ্রাচীন মাতৃভূমির মানব সমাজের জন্যে চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে অচ্ছেদ্য। সেই কল্যাণের চিন্তার প্রকাশ তাঁর রচনাবলীতে নানা ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর গবেষণা সাধারণ মানুষের শোষণমুক্ত ভবিষ্যৎ রচনার জন্যে ইতিহাসের পৃষ্ঠপটে যুক্তির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা। ভারতীয় ইতিহাসের সামাজিক তথা বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা মানবিকতাবোধের আধুনিক সংস্করণ এবং তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও গভীর মানবপ্রীতির একাত্ম প্রকাশ। ভারতবর্ষের ভূমিসংক্রান্ত অর্থনীতি তিনি বহু পরিশ্রমে পর্যালোচনা করেন শোষণ-জর্জর বিরাট কৃষক সম্প্রদায়ের দুঃখ-দুর্দশা নিরাকরণের তত্ত্ব অন্বেষণের জন্যে। তাঁর "যুগ সমস্যা" বা "জাতি-সংগঠন" বা "বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব" ইত্যাদি প্রায় সব গ্রন্থই তাঁর স্বদেশ-চিন্তার নানা সমস্যার সমাধানের প্রয়াস। দেশের কিংবা জনসাধারণের মুক্তি অথবা জীবনযাত্রা নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ জ্ঞানের চর্চা তিনি অল্পই করেছিলেন। কিন্তু একথায় তাঁর বিদ্যাবিষয়ে গৌরবের কোন হানি হয় না।

এইভাবে দেখা যায়, প্রথম যৌবনে দেশের মুক্তি সাধনার যে ঐকান্তিক ব্রত তিনি গ্রহণ করেছিলেন তা তাঁর মানসলোক প্রভাবিত এবং অনেকাংশে গঠিতও করে। রাষ্ট্রনীতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করবার কিছুকালের মধ্যেই তাঁর মন আকৃষ্ট হয় রাষ্ট্রের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে জড়িত সমাজের গতি-প্রকৃতির প্রতি। বিদেশে দীর্ঘকাল বাসের প্রায় প্রথম থেকেই রাজনীতিক কার্য-কলাপের সঙ্গে তাঁর সমাজতত্ত্ব ও ক্রমে নৃতত্ত্বে আগ্রহ ও অধ্যয়ন আরম্ভ হয়। সুদীর্ঘ ১৭ বছর নানা দেশ-বিদেশে অবস্থানের সময়েও ভারতের স্বাধীনতা প্রচেষ্টার সঙ্গে একাত্ম থেকে যখন প্রত্যাবর্তন করেন, তারপর থেকে তাঁর জীবনের প্রধান অবলম্বন হয় পূর্বোল্লিখিত বিভিন্ন বিদ্যায় গবেষণা। নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা। প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে পরবর্তীকালে আর বিশেষ সক্রিয় না থাকলেও নিরাসক্ত কখনই হন নি। তবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন মুখ্যত জ্ঞানের সাধনায়। এবং তাঁর সেই জ্ঞানযোগ স্বদেশ-চর্চা থেকে কোনদিন বিযুক্ত হয় নি। যেভাবে নানা প্রকার বাধা-বিপত্তি ও দারিদ্র্যের দুর্বিপাকের মধ্যেও শেষ জীবন পর্যন্ত অধ্যয়ন ও বিদ্যাচর্চায় সমাহিত থাকেন, তা আধুনিক কালে দুর্লভ দর্শন। আত্মভোলা এক জ্ঞানতাপস ছিলেন তিনি।

ব্যক্তি-জীবনেও তিনি প্রায় তপস্বীর মতন ত্যাগী ছিলেন। সন্ন্যাসীর নিরাসক্তিতে সমস্ত স্বার্থময় ভোগ-সুখে জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন, অঙ্গে গৈরিক বসন ছিল না এই শুধু পার্থক্য। এবং সন্ন্যাসীর ধর্মজীবনের সাধনের পরিবর্তে তাঁর ছিল স্বদেশকল্যাণের আদর্শ। সেই আদর্শের অনুসরণে সারা জীবন অতিবাহিত করতে গিয়ে ব্যক্তিগত কোন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃকপাত করেন নি। শুধু যে অবিবাহিত জীবন যাপন করেন তা-ই নয়, অর্থ উপার্জন ও সঞ্চয়ের চিন্তাও কখনও মনে স্থান দেননি, যা অনায়াসেই পারতেন অধ্যাপকের বৃত্তি অবলম্বনে। কারণ একাধিক বৈদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রীর অধিকারী তিনি ছিলেন।

এমন কি রাজনীতিক জীবনেও তৎপর হন নি আপন প্রতিষ্ঠা লাভের জন্যে। নচেৎ যৌবনকাল থেকে দেশের মুক্তির জন্যে চরম স্বার্থত্যাগ ক'রে এবং দেশ-বিদেশে অবস্থানকালে ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের পুরো-ভাগে থেকে যে বিপ্লবী যশ অর্জন করেছিলেন, তার সুযোগ গ্রহণ করলে উত্তর জীবনে অনেক সুখ-সুবিধা ও প্রতিপত্তি লাভ করতে পারতেন। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির লেশমাত্র লোভও অসম্ভব ছিল তাঁর চরিত্রে। সম্পূর্ণ অন্য ধাতুতে তিনি গঠিত ছিলেন।

বিশ্ববন্দিত বিবেকানন্দ স্বামীর সর্ব-কনিষ্ঠ ভ্রাতা তিনি, এবিষয়ে জ্যেষ্ঠের অযোগ্য ছিলেন না অবশ্যই। স্বার্থমগ্ন সংসারের সমস্ত ক্ষুদ্রতার বহু ঊর্ধে নভোচারী পার্বত্য ঈগল যেন। সাধারণের হিতার্থে জীবন উৎসর্গ করলেও সাধারণত্বের সু-উচ্চে জ্ঞানমার্গবিহারী। অথচ এই মহান্ অসাধারণতা সত্ত্বেও সাধারণের সঙ্গে সাধারণ মানবিক সম্পর্কে তাঁর কখনও ব্যত্যয় ঘটে নি। অহমিকা-

শূন্য ছিলেন বলে কারুর সঙ্গে কৃত্রিম দূরত্ব রক্ষা ক'রে চলেন নি কখন। আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও এমন নিরহঙ্কার নিরভিমান মানুষ এযুগে কদাচিৎ দেখা যায়। আত্মপ্রচারে ছিল তাঁর আন্তরিক বিমুখতা। নিজের বিপ্লবী জীবনের রোমাঞ্চকর ঘটনা-বৈচিত্র ও কৃতিত্বের কথা প্রকাশ করতেও পরাঙ্মুখ ছিলেন। এসব বিষয়ে কোন কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেত না তাঁর কাছে। স্বাধীনতার ইতিহাসে বহু তথ্যের আকার, তাঁর অ্যাডভেঞ্চারপূর্ণ প্রথমার্ধের জীবন তিনি রুদ্ধ পুস্তকের মতন সংগোপনে রেখে দিতেন। তার একটিমাত্র পৃষ্ঠাও উন্মোচিত করতে পারা যেত না বহু অনুরোধ-উপরোধেও। সেই ঐকান্তিক নিষ্ঠার যুগে মন্ত্রগুপ্তির প্রতিশ্রুতি তিনি চিরদিন পালন করেছেন। আত্মস্মৃতি কথনে তাঁকে কখনও সম্মত করা যায় নি। এই অসঙ্কোচ আত্মবিজ্ঞপ্তির আধুনিক কালে তিনি জীবনের শেষাংশ অতিবাহিত করলেও আদর্শ থেকে স্খলিত হন নি কোনদিন।

তাঁর যৌবন কালের দেশে-বিদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধে সংঘটিত কাহিনীর কিছু তিনি "অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস" পুস্তকে প্রকাশ করেছিলেন বটে, কিন্তু তা ঐতিহাসিক কর্তব্যবোধে। আত্মপ্রচারের উদ্দেশ্য লেশমাত্র সেখানে ছিল না, একথা তাঁর সঙ্গে সুপরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। সেসব প্রসঙ্গের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ তিনি উক্ত গ্রন্থে করবার এই কারণ জানাতেন: "ওঁরা (অর্থাৎ বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রভৃতি) misrepresent করতেন, তাই ও বিষয়ে বই লিখি।"

অগ্নিদিনের সেই সব অলিখিত ইতিহাসের কথা জানবার জন্যে পীড়াপীড়ি করলেও এড়িয়ে যেতেন। বলতেন, "কেন জানতে চাও? এসব গুপ্তকথা প্রকাশ হওয়া উচিত নয়।"

যদি তাঁকে বলা হ'ত, "কিন্তু আপনার আগেকার কথা জানতে ইচ্ছা হয়। সেসব জানারও দরকার।" তিনি অস্বীকার ক'রে বলতেন, "আমাকে যদি বুঝতে চাও, আমার বই ভাল ক'রে পড়।"

পঠন-পাঠনের বিষয়ে তাঁর একটি সাবধান বাণী প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ ক'রে রাখা যায়। ভারত তত্ত্বের নানা কথা আলোচনা করবার সময় তিনি মাঝে মাঝে বলতেন, "দেখো, Western Scholar-রা অনেক বিষয়ে আমাদের ইতিহাস আর culture misrepresent করেছেন। সে সব দিকে guard ক'রে প'ড়ো।"

উদার আন্তর্জাতিক দৃষ্টির অধিকারী হ'লেও জাতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির কোন বিষয়ে বিদেশী পণ্ডিতবর্গ বিকৃতি ঘটালে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। এক্ষেত্রে জাতীয়তাবোধ তাঁর আত্মসম্মানের তুল্য অপরিত্যাজ্য ছিল। এই প্রখর দেশপ্রেম এবং মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ জাতীয় চেতনা তাঁর চরিত্রে অনেকাংশে তাঁর মহান্ জ্যেষ্ঠ, স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব। স্বামীজী শুধু ভারতের আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্যে জীবনপণ করেন নি। নিদ্রিত ভারতবর্ষকে তিনি জাগরিত করতে চেয়েছিলেন বজ্র-নির্ঘোষে। অধ্যাত্ম-মুক্তির সঙ্গে তিনি নিরন্ন নিরক্ষর জনসাধারণকে মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত ক'রে সর্বাঙ্গীণ জাতীয় মুক্তি কামনা করেছিলেন। একথা পরবর্তীকালের ইতিহাসে লক্ষ্যগোচর হয়েছে যে, স্বামীজীর আধ্যাত্মিক সাংস্কৃতিক বাণী প্রচারের ফলে ভারতবর্ষের জাতীয় তথা স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল। তাঁর দেহত্যাগের তিন বছরের মধ্যেই যে বিপ্লব প্রচেষ্টা আরম্ভ হয় তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে। রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে বাংলার যে তরুণ দল অগ্নিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হন তাঁদের অন্যতম হ'লেন স্বামীজীর অনুজ ভূপেন্দ্রনাথ। স্বামীজীর মতবাদ ও আদর্শের প্রভাব তাঁর প্রথম জীবনে গভীর রেখাপাত করেছিল।

শেষ জীবনে ভূপেন্দ্রনাথ জ্যেষ্ঠের জীবনের অবদান নিয়ে নতুন ক'রে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন, এবং স্বরচিত 'Swami Vivekananda—Patriot Prophet' গ্রন্থে স্বামীজীর দেশপ্রেমিক সত্তা, জাতীয় জাগৃতিতে তাঁর ভূমিকা এবং সামাজিক-রাষ্ট্রনীতিক বিষয়ে তাঁর মতামত ও দূরদৃষ্টির সবিশেষ পরিচয় দিয়েছেন বিবেকানন্দের বহু উক্তির উদ্ধৃতি সহযোগে।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর কলকাতার শিমুলিয়ায় প্রতিষ্ঠাপন্ন দত্ত পরিবারে ৩, গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীটে ভূপেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। হাইকোর্টের তৎকালীন প্রসিদ্ধ এ্যাডভোকেট বিশ্বনাথ দত্তের তিনি দশম ও কনিষ্ঠতম সন্তান। আত্মীয়-পরিজন ও জ্ঞাতিবর্গের বিরাট্ পরিবারের কর্তা বিশ্বনাথ শুধু অর্থ ও প্রতিপত্তিশালী ছিলেন না, বিশেষ সংস্কৃতিবান্, সঙ্গীতপ্রেমী এবং মজলিশী ব্যক্তি ছিলেন। ভূপেন্দ্রনাথের জন্মের সময়ে বিশ্বনাথের সংসার সুখে সচ্ছলতায় সঙ্গীতচর্চায় ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপে সুপরিচিত ছিল শিমুলিয়া অঞ্চলে।

কিন্তু ভূপেন্দ্রনাথের শৈশবেই তাঁদের পরিবারে বিপর্যয় ঘটে যায়। অকস্মাৎ তাঁর পিতার যখন মৃত্যু হয়, ভূপেন্দ্রনাথের বয়স তখন ৪ বছরও পূর্ণ হয় নি। বিশ্বনাথ যেমন প্রচুর উপার্জন করতেন তেমন বিপুল পোষ্যবর্গ ইত্যাদির জন্য সমস্তই ব্যয় করতে অভ্যস্ত থাকায় তাঁর মৃত্যুর সঙ্গেই সংসারের স্বাচ্ছন্দ্য লোপ পায়। উপরন্তু তাঁর আশ্রিত জ্ঞাতিরা তাঁর স্ত্রী পুত্র কন্যাদের গৃহ থেকে উচ্ছেদ করবার জন্যে চক্রান্ত করে নানা প্রকারে। গৃহের অধিকার নিয়ে মামলা বাধে। নরেন্দ্রনাথ জননী ও ভগিনী-ভ্রাতাদের নিয়ে নিকটবর্তী মাতামহীর আলয়ে (৭, রামতনু বোস লেন) বাস করতে থাকেন। সেখানেই বাল্য ও কৈশোর কাল অতিবাহিত হয় ভূপেন্দ্রনাথের।

পিতার মৃত্যুর দু'বছর পরে নরেন্দ্রনাথ সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেন। ভূপেন্দ্রনাথ এবং দ্বিতীয় অগ্রজ মহেন্দ্রনাথের সেকালের জীবন যে কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তা সহজেই অনুমেয়। ভূপেন্দ্রনাথের ৭ বছর বয়সে নরেন্দ্রনাথ বরাহনগর মঠবাসী হন এবং তাঁর ১০ বছর বয়সে স্বামীজীর পরিব্রাজক জীবন আরম্ভ হয় ভারত পরিক্রমায়।

ভূপেন্দ্রনাথের ছাত্রজীবন সম্পর্কে এই মাত্র জানা যায় যে, তিনিও জ্যেষ্ঠের মতন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউশনে পাঠ করেছিলেন। স্বামীজী যখন শিকাগোর বিশ্ব ধর্ম মহাসম্মেলনে যোগ দিয়ে পাশ্চাত্ত্য জগতে ভারতবর্ষের নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেন, ভূপেন্দ্রনাথের তখন ১৬ বছর বয়স। স্বামীজীর ধর্মজীবনের আচরণের অন্তঃস্থলে যে প্রখর জাতীয় চেতনা ক্রিয়াশীল ছিল, তা সে-যুগের অগ্রগামী তরুণদের মনে নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধ সঞ্চারিত করে এবং ভূপেন্দ্রনাথও পরোক্ষভাবে জ্যেষ্ঠের প্রভাবে প্রভাবিত হন। স্বামীজীর সঙ্গে অবশ্য তাঁর পার্থক্য এই যে, তিনি ধর্ম ও সন্ন্যাসের পথ অবলম্বন না ক'রে জাতীয় মুক্তির জন্যে গ্রহণ করলেন রাষ্ট্রনীতিক পন্থা। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ভিন্ন জাতীয় জীবনের পূর্ণ বিকাশ অসম্ভব এই ধারণা প্রথম যে বাঙ্গালী তরুণের মনে জন্মায় এবং তাঁরা সকর্মক হন, ভূপেন্দ্রনাথ তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন। বাংলার প্রথম বিপ্লবী দলে যোগদান করলেন তিনি। তখন তাঁর বয়স ২২ বছর।

বাংলা দেশের যে প্রথম বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতি ১০৮ আপার সার্কুলার রোডে স্থাপিত হয়, তার সভাপতি ছিলেন পি. মিত্র নামে সুপরিচিত, ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্র। অরবিন্দ ঘোষ এবং চিত্তরঞ্জন দাস সহ-সভাপতি এবং সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। বরোদা থেকে অরবিন্দ ঘোষ যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাঠিয়েছিলেন এই সমিতির সংগঠকরূপে। এই সমিতিতে অচিরে যাঁরা যোগ দেন তাঁদের মধ্যে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, দেবব্রত বসু প্রভৃতির সঙ্গে ভূপেন্দ্রনাথের নামও উল্লেখ্য। কলকাতার এই গুপ্ত সমিতির দৃষ্টান্তে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে ক্রমে এই ধরনের সমিতি স্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে 'যুগান্তর' ও 'অনুশীলন' দু'টি পৃথক্ চরমপন্থী রাজনীতিক দল নামে সুপরিচিত হ'লেও, প্রথম যুগে দু'টি সংস্থার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না। একই বৃহৎ বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানের দুই শাখা স্বরূপ ছিল 'অনুশীলন সমিতি' এবং 'যুগান্তর'। প্রথমটির প্রধান লক্ষ্য শরীরচর্চা—লাঠিখেলা, ব্যায়াম ইত্যাদি। এবং দ্বিতীয় শাখার মূল উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লবের আদর্শ প্রচার। এই প্রচার-ধর্মীদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় হন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, দেবব্রত বসু প্রভৃতি। দু'টি বিভাগেরই পি. মিত্র সভাপতি ছিলেন এবং বাংলার এই বিপ্লবী দল নিখিল ভারত বিপ্লবী সমিতির সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। প্রতিষ্ঠানের বৈপ্লবিক প্রচারের বাহনরূপে 'যুগান্তর' নামে পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে এবং তার প্রথম সম্পাদক হন ভূপেন্দ্রনাথ। তিনি তখন ২৬ বছরের যুবক।

প্রথম বিপ্লবী দলে যোগদানের প্রসঙ্গে তিনি পরে তাঁর "অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস" গ্রন্থে লিখেছিলেন—"দুর্জয় সংকল্পে দৃঢ়নিষ্ঠ থাকিয়া লেখক যৌবনের প্রারম্ভে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তিলক-অরবিন্দ প্রমথনাথ মিত্র প্রতিষ্ঠিত বৈপ্লবিক সংঘে যোগদান করিয়া দেশমাতৃকার স্বাধীনতা-কল্পে ধর্মসাক্ষী করিয়া যে শপথ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি সমস্ত জীবনব্যাপী একনিষ্ঠার সঙ্গে পালন করিয়াছেন।"

তাঁর লেখা থেকে জানা যায় যে, বিপ্লবী সমিতির পি. মিত্র প্রমুখ যে ৪ জন নেতার নাম করা হয়েছে, তার কার্যকরী সমিতিতে ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন সদস্যা। তাঁদের ৫ জনকে নিয়ে প্রথম নিখিল বঙ্গীয় বৈপ্লবিক দলের কার্যকরী সমিতি স্থাপিত হয়। সেই সংস্থার যে প্রথমে কোন নাম ছিল না, সেবিষয়ে ভূপেন্দ্রনাথ উক্ত গ্রন্থে বলেছেন, "আমরা সংগঠনের কোন নামকরণ করি নাই। সরকারী দপ্তর মধ্যে আমাদের 'যুগান্তর' আখ্যা দিয়াছে। অবশ্য আমাদের গুপ্ত পত্রিকার

নাম ছিল 'যুগান্তর'। তাই থেকে মনে হয় নামকরণ হয়।

"যুগান্তরে" প্রকাশিত কোন কোন রচনায় রাজদ্রোহের প্ররোচনা দেওয়া হয়েছে, এই অভিযোগে পত্রিকা-সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথের এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং তাঁর জবানবন্দীতে দেশে যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, সেসব কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সে উপলক্ষ্যে দেশে সাড়া জাগবার আর একটি দৃষ্টান্ত এই যে, কলকাতায় একটি মহিলা সভা আহূত হয়ে ভূপেন্দ্রনাথের জননী শ্রীমতী ভুবনেশ্বরীকে অভিনন্দন জানানো হয়েছিল, এমন বীর সন্তানের জননী বলে। বিবেকানন্দ-ভূপেন্দ্রনাথের জননী সত্যই যে বীর-মাতা ছিলেন তার পরিচয় দিয়ে তিনি সেই মহিলাদের সভায় অভিনন্দনের উত্তরে বলেছিলেন যে, ভূপেনকে আমি দেশের জন্যে উৎসর্গ করেছি। তার কাজ মাত্র আরম্ভ হয়েছে।...

মাতা ও পুত্র দু'জনের বিবৃতিই তখন সমগ্র দেশে প্রচারিত ও প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। সেজন্যে কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশনের সভাপতি রাসবিহারী ঘোষ তাঁর সুরাটের অভিভাষণে ভারতের নারী জাগরণের প্রসঙ্গে শ্রীমতী ভুবনেশ্বরীর কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছিলেন।

এক বছর সশ্রম কারাবাসের পরে মুক্তিলাভ করবার অব্যবহিত পরেই ভূপেন্দ্রনাথ দেশত্যাগ ক'রে আমেরিকায় চলে যান। এই সময় থেকে তাঁর জীবনে আর এক বিপুল ঘটনা-বৈচিত্রে পূর্ণ অধ্যায়,তাঁর সুদীর্ঘ বিদেশ-বাস, আরম্ভ হ'ল। কিন্তু কি ভাবে এবং কেন এই পলায়নের আয়োজন তিনি করেছিলেন, সে-বিষয়ে কোন কথা জানতে পারা যেত না তাঁর কাছে। দেশত্যাগের এই সংকল্প জেলের মধ্যে থেকেই করেছিলেন মনে হয়। কারণ, যেদিন কারামুক্ত হন, সেদিনই কলকাতা ত্যাগ করেছিলেন আমেরিকা যাত্রার জন্যে। অবশ্য একথা বোঝা যায় যে, তিনি দেশের কাজের দায়িত্ব নিয়েই দূর বিদেশে গিয়েছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনকে অন্য দেশে থেকে অন্যভাবে সংগঠন ও পুষ্ট করবার অভিপ্রায় তাঁর ছিল, নচেৎ দেশপ্রেমিকের আরব্ধ কাজ অসমাপ্ত রেখে বৈদেশিক ডিগ্রী লাভের জন্যে স্বদেশ ত্যাগ করে যাবার মানুষ ছিলেন না তিনি।

উত্তর জীবনে তিনি তাঁর "আমার আমেরিকার অভিজ্ঞতা" পুস্তকের প্রথম খণ্ডে এ প্রসঙ্গে অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন, "নানা কারণে যৌবনের প্রাক্কালে আমি দেশত্যাগী হইতে বাধ্য হই।"

সে যাত্রায় আমেরিকায় তিনি একাদিক্রমে ছ'বছর বাস করেন। সেখানকার প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে মিলে ভারতের স্বাধীনতা ও মুক্তির কথা চিন্তা করতেন, চেষ্টা করতেন যথাসম্ভব। সেই সঙ্গে বিদ্যাচর্চায় তাঁর আত্যন্তিক প্রবণতার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন। এখানে তিনি পোস্ট গ্রাজুয়েট পাঠ সমাপ্ত ক'রে ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে। তার আগের বছর (১৯১২ খ্রী:) এখান থেকে বি. এ. ডিগ্রী পেয়েছিলেন। তিনি সমাজতন্ত্রের ছাত্র ছিলেন ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে।

বলা বাহুল্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী স্নাতকরূপে তিনি নিজের কর্তব্য শেষ করেন নি। সমস্ত অধ্যয়নের কালেই প্রবাসী ভারতীয় এবং আমেরিকাবাসীদের মধ্যে ভারতের স্বাধীনতার জন্যে প্রচার ও সংগঠনের কাজ অব্যাহত ছিল তাঁর। এবং ইউরোপে কার্যরত ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গেও তিনি নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছিলেন। তাই, ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. পাঠ সমাপ্ত করবার পর যখন ইউরোপের বৈপ্লবিক সমিতির নিকট থেকে সেখানে কাজে যোগ দেবার আহ্বান এল, তিনি ইউরোপ যাত্রা করলেন আমেরিকার পর্ব শেষ করে। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা যায় যে, আমেরিকাবাসের বিবরণ সম্পর্কে পরবর্তী কালে দু'খণ্ডে যে "আমার আমেরিকার অভিজ্ঞতা" লিখেছিলেন, তা আংশিকভাবে Monthly Messenger ও "ভারতী" পত্রিকায় প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল।

আমেরিকা থেকে ইউরোপ গমন কিন্তু ভূপেন্দ্রনাথের পক্ষে সহজে ঘটে নি। নানা বাধা-বিঘ্নের মধ্যে দিয়ে, বহু বিপদের সম্মুখীন হয়ে, নানা দেশ ঘুরে তাঁর গন্তব্য-স্থল বার্লিনে পৌঁছান শেষ পর্যন্ত। কারণ আমেরিকা থেকে ইউরোপে যাবার উপযুক্ত পাসপোর্ট তাঁর ছিলনা। কিন্তু তিনি সেজন্যে নিরস্ত না হয়ে পাড়ি দেন জাহাজে। তারপর গ্রীসে অবতরণ করতে গিয়ে আটক হন। সেখানে মাস চারেক পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকবার পর নিস্তার পান। এসময় ইউরোপের অনেক দেশে আত্মপরিচয় গোপন করে ভ্রমণ করতে হয় তাঁকে। ছাত্র পড়ানো প্রভৃতি নানা উপায়ে জীবিকার সংস্থান করতে হ'ত। ইটালিতেও অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তুর্কীতে প্রায় একমাস থাকেন ছদ্মবেশে।

সেসব দিনের কথায় উত্তর জীবনে উল্লেখ করেছিলেন, 'জীবনাবর্তের ঘূর্ণিতে পড়িয়া কুলালের চক্রের ন্যায় ঘূর্ণায়মান হইয়া পৃথিবীর অনেক দেশেই আমি ভ্রমণ করিয়াছি।" ("আমার আমেরিকার অভিজ্ঞতা," প্রথম খণ্ড)।

তাঁর সে রোমাঞ্চকর জীবন কোন অ-রাজনীতিক ব্যক্তির এ্যাড্‌ভেঞ্চারের মতন নয়, একথা বলা বাহুল্য। ভারতভূমির জন্যে এক বিপ্লবী-লক্ষ্য ধ্রুব রেখে গুপ্তভাবে নানা দেশ ভ্রমণ করে অবশেষে বার্লিনের বৈপ্লবিক সমিতিতে তাঁকে যোগ দিতে হবে। সেকালের প্রসঙ্গে তিনি একদিন বলেছিলেন, "সেসব দিনের thrill তোমাদের এখন বোঝান শক্ত। আমাদের তখন দিগ্বিদিক জ্ঞান ছিল না। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তখন World War-এ জড়িয়ে পড়েছে। অন্য আমরা ভেবেছি—এই এক মস্ত সুযোগ পাওয়া গেছে। এ সুযোগ নিতেই হবে।" এইভাবে দু' বছর ইউরোপের দেশে দেশে যে বৈচিত্রপূর্ণ জীবন যাপন করেন সে-প্রসঙ্গে পরিণত বয়সে "অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস" গ্রন্থে অতি সংক্ষেপে বলেছেন, "ছদ্মবেশে নানা দেশ হইতে ঘুরিয়া ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে বার্লিনে উপস্থিত হই, তখন কমিটির অন্য ব্যবস্থা হইয়াছে। তখন ইহা সম্পূর্ণ বিদেশী সম্পর্ক-রহিত ভারতীয় বৈপ্লবিক সমিতি, নাম Indian Independence Committee (ভারত স্বাধীনতা সমিতি)।"

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে, বিশেষ প্রথম মহাযুদ্ধের কালে বিদেশে ভারতের মুক্তিসাধনার অধ্যায়ে, এই সমিতি 'বার্লিন কমিটি' নামে সুপ্রসিদ্ধ। ভূপেন্দ্রনাথ যখন বার্লিনে পৌঁছলেন, তখন এই সমিতির সম্পাদক ছিলেন সেকালের ভারতের অন্যতম বিখ্যাত বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। বীরেন্দ্রনাথ ১৯১৫-১৬ খৃঃ বার্লিন কমিটির সম্পাদক থাকেন।

তারপর ১৯১৬ থেকে ১৯১৮ খৃঃ পর্যন্ত সমিতির সম্পাদক হন ভূপেন্দ্রনাথ। বার্লিন কমিটি গঠন ও পরিচালন সম্পর্কে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য তিনি তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন। তা থেকে জানা যায় যে বার্লিন কমিটি গঠনের পরেই জার্মান গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে ভারতীয় বৈপ্লবিকদের সংস্রব ঘটে, তার আগে নয়। গ্রন্থে সুদূর প্রাচ্য, পশ্চিম এশিয়া, তুর্কী, আমেরিকা, এবং সুইডেন প্রভৃতি ইউরোপীয় ভূখণ্ডের নানাস্থানে ভারতীয় বিপ্লবীদের কাজকর্মের বহু তথ্যপূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন ভূপেন্দ্রনাথ।...

বার্লিনে তিনি সবচেয়ে দীর্ঘকাল বাস করেন—প্রায় ১০ বছর। এই সময়ের মধ্যে অবশ্য তিনি ইউরোপের নানা অঞ্চলে, বিশেষ পূর্ব ইউরোপে এবং রাশিয়াতেও অবস্থান করেন।

বার্লিন বাসের সময়ে বৈপ্লবিক কাজের অবসরে ভূপেন্দ্রনাথ অক্লান্তভাবে বিদ্যাচর্চাও করতেন। নৃতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁর বিশেষজ্ঞদের অধীনে গবেষণা এবং রীতিমত অধ্যয়ন বার্লিনেই হয়েছিল। হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ডক্টরেট (Ph. D.) লাভ করেন নৃতত্ত্ব বিষয়ে নতুন গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ।

বার্লিনেই তাঁর প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয়েছিল—"How English Acquired India." এটি তিনি বৈপ্লবিক প্রচারের উদ্দেশ্যে রচনা করলেও, বইখানির ঐতিহাসিক মূল্য ছিল। পুস্তকটি ইংরেজী ও জার্মান দুই ভাষাতে প্রকাশ হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, ভূপেন্দ্রনাথ জার্মান, ফরাসী, গ্রীক, রুশ প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষায় ব্যুৎপন্ন হয়েছিলেন।

তিনি বার্লিনে সুপরিচিত ছিলেন বিপ্লবী এবং পণ্ডিতরূপে। তাঁকে কেন্দ্র ক'রে রাষ্ট্রনীতি এবং জ্ঞানমার্গ দুই পথের পথিকদেরই সম্মিলন ঘটত। তাঁর সেখানকার বাসগৃহ ছিল বিভিন্ন দেশের রাজনীতিক এবং পণ্ডিত ও ছাত্রদের মিলনস্থল। ভারতের বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু জার্মাণীতে তাঁর উদ্ভিদ জীবনের প্রাণ স্পন্দনের প্রদর্শক যন্ত্রের ক্রিয়া দেখাবার জন্যে সমাগত হ'লে, ভূপেন্দ্রনাথ সে অনুষ্ঠানের জন্যে বিশেষ তৎপর হয়ে সহযোগিতা করেছিলেন।...

অবশেষে সুদীর্ঘ প্রায় ১৮ বছর পরে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে। পশ্চিমে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন বরণীয় যোদ্ধারূপে বিপুল যশ ও বিদ্যাচর্চায় উচ্চ উপাধি লাভ করে এসে ভূপেন্দ্রনাথ পুনরায় দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির তিনি সদস্য ছিলেন কিছুকাল। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি আবার কারাবরণ করেছিলেন। ক্রমে তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতি ক্ষেত্র থেকে নানা কারণে সরে এসে জ্ঞানের রাজ্যে আত্মসমাহিত হন, কিন্তু তা থেকে একেবারে বিচ্যুত হন নি কখনও। তাঁর একটির পর একটি গ্রন্থ রচিত হ'তে থাকে এবং নানা পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়। বিদ্যার রাজ্যে তারপর থেকে প্রধানত তাঁর বিচরণ হ'লেও রাজনীতিক

আন্দোলনের সঙ্গে যোগ থাকে শেষ জীবন পর্যন্ত। তিনি অধিকতর যুক্ত হয়েছিলেন বামপন্থী আন্দোলনে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি ভারতবর্ষে মার্কসীয় চিন্তাধারার অন্যতম আদি প্রচারক ছিলেন। সেই সঙ্গে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠনের প্রথম যুগের অবদান আছে তাঁর। নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসেরও তিনি সভাপতি হয়েছিলেন। ছাত্র ও যুব সমাজের এবং প্রগতিশীল লেখক সম্প্রদায়ের বহু সভা সম্মেলনাদিতে উদ্বোধক বা সভাপতিরূপে যোগ দিতেন চিরতরুণ মনের পরিচয়স্বরূপ।

১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে ভারতের প্রাক্তন বিপ্লবীদের দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনেও তিনি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সেইটিই তাঁর বৃহৎ সমাবেশে শেষ যোগদান। জ্ঞানচর্চা কিন্তু তিনি জীবনের শেষ পর্যন্ত করে গেছেন। তাঁর রচিত বিপুল সংখ্যক মূল্যবান গ্রন্থাবলী ও প্রবন্ধাদির তালিকা থেকে বোঝা যায় যে, তাঁর আলোচিত বিষয়গুলি কতখানি সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁর অবদানের ফলে।

৮২ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল বটে, কিন্তু তাঁর অন্তর কখনও জরাগ্রস্ত হয় নি। যৌবনসুলভ সজীব মন শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রেখে ছাত্রের অক্লান্ত উৎসাহে জ্ঞানচর্চা করে গেছেন তিনি। তরুণ সমাজের চির-সুহৃদ ভূপেন্দ্রনাথের তরুণদের সঙ্গ বরাবর প্রিয় ছিল, তাদের ওপরেই তিনি আশা-ভরসা পোষণ করতেন। কেউ কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসু হয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হ'লে তাঁর সময়ের অভাব দেখা যেত না কখনও। প্রাচীন ইতিবৃত্ত কিংবা দেশ-বিদেশের ইতিহাস, ভারত-তত্ত্বের যে-কোন প্রসঙ্গ কিংবা বাংলা ও অন্যান্য দেশের আচার-ব্যবহার থেকে আরম্ভ করে বিচিত্র সব অনুষঙ্গের কথা তিনি অনর্গল বলে যেতেন। তিনি স্বয়ং ছিলেন বিদ্যার একটি বিরাট্ প্রতিষ্ঠান-বিশেষ। তাঁর সঙ্গ কিছুক্ষণের জন্যে লাভ করলেও যে-কোন শিক্ষার্থী কিছু-না-কিছু শিখে আসতেন। একটি বিষয়ে জানতে ইচ্ছুক হ'লে কথায় কথায় দশটি বিষয়ে জেনে নিতে পারতেন, বিদ্যার এমন অজস্র দাক্ষিণ্য ছিল তাঁর।

বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে বেশ বোঝা যেত যে, কত বড় জ্ঞানী তিনি ছিলেন এবং যে পরিমাণ জ্ঞানের সংগ্রহ তাঁর ছিল, তাঁর প্রণীত গ্রন্থাবলী তার সম্পূর্ণ পরিচায়ক নয়। যে কীর্তি তিনি রচনায় রেখে গেছেন, তার চেয়ে মহত্তর বিদ্বান তিনি ছিলেন, যদিও সে-বিষয়ে তাঁর সচেতনতা ছিল না। বরং আশ্চর্য রকম সরল ছিলেন এবং অন্তরের সেই অকৃত্রিম সারল্যে তাঁর মুখ উদ্ভাসিত থাকত। অবারি দ্বার ৩, গৌরমোহন মুখার্জী ষ্ট্রীটের বাড়ীতে সদ[রে] বাঁদিকের ঘরে এসে বসতেন এই নিরহঙ্কার জ্ঞানতাপ[স] যে-কোন ব্যক্তি সাক্ষাৎপ্রার্থী হোক বিমুখ করতেন কখনও। অসীম ধৈর্যে বিভিন্ন বিদ্যায় বিচিত্র [ত]ে আলোচনা করে যেতেন। তাঁর অধীত বিদ্যায় যে-কো[ন] প্রশ্ন করলেও উত্তর থাকত সদাপ্রস্তুত।

আর এই ফাঁকি আর মেকির যুগে এমন খাঁটি চরিত্রে[র] মানুষ তিনি ছিলেন যে, মনে হয় তাঁর সঙ্গে এক যুগেরও যেন অবসান ঘটে গেল।

তাঁর প্রণীত বাংলা ও ইংরেজী পুস্তকের তালিক[া] এখানে দেওয়া হ'ল :—

(১) তরুণের অভিযান। (২) যৌবনের সাধনা [(]৩) জাতি সংগঠন। (৪) যুগ সমস্যা (১৯২৬)। (৫, ৬) আমার আমেরিকার অভিজ্ঞতা (২ খণ্ড, ১৯২৬)। (৭) ভারতীয় একজাতীয়তা গঠন সমস্যা। (৮) সাহিত্যে প্রগতি (১৯৪৫)। (৯) বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব (১০,১১,১২) ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি (তিন খণ্ড, ১৯৪৬) (১৩) সমাজতন্ত্রবাদ—কাল্পনিক ও বৈজ্ঞানিক (ফ্রেডরি[ক] এঙ্গেল্সের পুস্তকের অনুবাদ (১৯৩৩)। (১৪) ভারতে[র] দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম (১৯৪৯)। (১৫) অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস (১৯৫৩)। (১৬ বাংলার ইতিহাস (১৭) স্বামী বিবেকানন্দ।

1. How English acquired India (In Englis[h] & German Editions. Germany). 2. Studies i[n] Indian Social Polity (1944). 3. Mystic Tales [of] Lama Taranath (1944). 4. Vivekananda, th[e] Socialist (1929). 5. Dialectics of Hindu Ritu[a]lism (Pt. I. From Rig Vedic time to upanishadi[c] Age. 1950). 6. Dialectics of Land Economics [of] India (1952). 7. Vivekananda—Patriot-Proph[et] (1954). 8. Indian Art in Relation to Cultu[re] (1956). 9. Dialectics of Hndu Ritualism (Pt I[I] From Post-Vedic Age to Modern Time, 1957) 10. Hindu Law of Interitence (An Anthropolo[-]gical study, 1957). 11. The Sayings of Swam[i] Vivekananda, with author's commentary.

নৃতত্ত্ব বিষয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধাবলীর তালিকা :

1. Observations on some Oblique-shape[d] Indian skulls (Man in India, Ranchi, 1932).

2. Traces of Totemism in some Tribes & Castes of Noth Eastern India (Man in India, 1933).

3. Anthropological notes on some West Bengal Castes (Man in India, 1934).

4. Ethnogical Notes on some of the Castes of West Bengal (Man in India, 1935).

5. Races of India (Journal of the Department of Letters, Vol. XXVI, Calcutta University, 1935).

6. An Enquiry for Traces of Darwin's Tubercles in the Ears of the Peoples of India (Man in India, 1935).

7. Vedic Funeral Customs & Indus Valley Culture (Man in India, 1936, 1937).

8. Anthropological Notes on some Assam Castes (Anthropological Papers, Calcutta University Press, 1938).

9. Notes on the Presence of Light-coloured Eye-Iris amongst the population of North Eastern India (Man in India. 1938).

10. A Note on the Foot & Stature Co-relation of certain Bengal Castes & Tribes. (Jointly with P. C. Mahalanobis, in "The Sankhya, Vol. 3, Pt 3. Calcutta, 1938).

11. An Enquiry into Co-relation between Age & Cephalic breadth, Age & Bigomatic breadth, Cephalic breadth & Bizogomatic breadth of the Bengal (Journal of Indian Medical Association, Calcutta, 1938).

12. An Enquiry into Co-relation between Stature of Arm length, Stature & Hand length, Stature & hand breadth, Stature & Hand-index. Arm length & Hand-index ; also Somatic differences between different Social & Occupational groups of the People of Bengal (Man in India, 1939).

13. Notes on Purification & Taboo in Society.

14. An Enquiry into Racial elements in Afghanistan, Baluchistan & neighbouring lands of Hindukush (Translated from the German version of the writer's dissertations for the Doctorate, 1923 (Man in India, 1939, 1940).

15. An Ethnology of Central India & its bearing on India (Man in India, 1942).

16. Origin & development of Indian Social Polity (Man in India, 1942).

17. Preface to "Rig Vedic Culture of the Pre-historic Indus" by Swami Sanharananda, Vol. I. (Calcutta, 1946).

18. Origin of the Indo-Aryans (Hindusthan Review, Patna, 1948).

অন্যান্য সাংস্কৃতিক বিষয়ে ইংরেজী সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশিত তাঁর নানা নিবন্ধ :—

1. On the formation of Indian Nationality (Calcutta Review, 1925).

2. Influence of French thought on the Political Philosophy of Thomas Jefferson (Calcutta Review, 1935. Baccalanreate dissertation, New York University, 1912).

3. Ancient Near East & India : Cultural Relation (Calcutta Review, 1937).

4. Population of Bengal (Modern Review, 1937).

5. Brahmanical counter revolution (Bihar, Orissa Research Society Journal. Patna, 1941).

6. The Rise of the Rajputs (Bihar, Orissa Research Society Journal, Patna, 1941).

7. Population & Castes of Bengal (Science & Culture, Calcutta).

8. Race or Backward People (Hindusthan Standard, Calcutta, 1944).

9. Genesis of the National Flag (Hindustan Standard 1945).

10. Nationalism & National Flag (Hindusthan Standard, Puja Number, 1945).

11. Rise of Gauriya Baishnavism in Bengal (Prachyavani, Calcutta).

তাছাড়া বহু বাংলা এবং কয়েকটি হিন্দী ভাষায় রচিত তাঁর প্রবন্ধ সমকালীন পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হয়, কিন্তু তার তালিকা প্রস্তুত করা হয় নি। ভিয়েনা থেকে প্রকাশিত Anthropos পত্রিকায় তাঁর সমাজতত্ত্ব-বিষয়ক গবেষণা এবং জার্মান ভাষায় একটি বিজ্ঞানের কোষগ্রন্থে (Encyclopaedia of Sciences) তাঁর ডক্টরেট লাভের থিসিসটি প্রকাশিত হয়—এ দু'টিই জার্মান ভাষায় রচিত।

বিশ্বামিত্র

চাণক্য সেন

ষোল

সূর্যপ্রসাদ গাড়ি নিয়ে বেরোবার সময় ভেবেছিল যাবে বাল্যবন্ধু ললিতচরণ সিংহের বাড়ী। গাড়ীতে ব'সে মন বদলাল। গিয়ে উঠল আইন ও স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী সরিৎসাগর কোঠারীর বাড়ীতে।

সরিৎসাগর ছিলেন বিলাসপুর হাইকোর্টের নামকরা ব্যবহারজীবী। ইচ্ছে করলে অনেকদিন আগে জজ হ'তে পারতেন। না হয়ে স্বদেশীতে নেমেছিলেন। নেমেছিলেন গান্ধীজীর মন্ত্রশিষ্য হয়ে নয়; নিজের অন্তরের উত্তপ্ত দেশপ্রেমে।

সরিৎসাগর কোঠারীর মধ্যে যৌবন থেকে বিদ্রোহের বীজ নিহিত ছিল। বাপ লক্ষণসাগর কোঠারী ধনী জমিদার হ'লেও উদারমনা ছিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল সরিৎসাগর আই. সি. এস. হয়। তাই তাকে অক্সফোর্ডে পড়তে পাঠিয়েছিলেন। ইতিহাসের ছাত্র সরিৎসাগর পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে স্ফূর্তিবাজিতেও সে-সময় অক্সফোর্ড ও লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিল। তার স্ফূর্তিবাজিতে উত্তেজিত আনন্দের প্রতি আকর্ষণের চেয়ে হিন্দু সমাজের প্রাচীন বাধা-নিষেধ, সংস্কার-আদেশ ভাঙার বিদ্রোহ প্রবল ছিল। মাংস, মাছ, ডিম প্রকাশ্যে খেত, পশ্চিমী নাচ নাচত উল্লাসে, শ্বেতাঙ্গিনী বান্ধবীর তার অভাব ছিল না। সে ফেবিয়ান সোসাইটির সভ্য হয়েছিল; ইণ্ডিয়া লীগে পাণ্ডাগিরি করত; অক্সফোর্ড য়ুনিয়নে গরম গরম বক্তৃতা। অথচ আই. সি. এস. পরীক্ষার জন্যে তৈরীও হচ্ছিল। এমন সময় সুভাষচন্দ্র বসু আই. সি. এস. পাস করেও সিভিলিয়নত্ব বর্জন করায় ইংলণ্ডের ভারতীয় ছাত্রমহলে যে নিদারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হ'ল, দেখা গেল সরিৎসাগর কোঠারী তারও পুরোভাগে। আই. সি. এস. না দিয়ে সে ব্যারিষ্টার হল। বন্ধুমহলে ঘোষণা করল, "সুভাষ বসু ও তাঁর শিষ্যদের আদালতে লড়তে হবে ত! তাই আমি ব্যারিষ্টার হয়ে দেশে যাচ্ছি। যারা স্বদেশী ক'রে ইংরেজ আইনের জালে জড়িয়ে পড়বে, তাদের জালমুক্ত করবার দায়িত্ব আমার।"

দেশের জন্যে সরিৎসাগর কোঠারী আর একটি ত্যাগ করেছিল, যার খবর তাঁর একান্ত অন্তরঙ্গ দু'চারজন ছাড়া অন্য কেউ জানত না। মার্গারেট ওয়াকার বান্ধবীর সীমা ছাড়িয়ে অন্তরঙ্গী হয়েছিল, সরিৎসাগর তাকে বিবাহ করবে মনস্থির করেছিল। জীবনবেদের হঠাৎ পরিবর্তনে তার সংকল্প এক্ষেত্রেও বদলে গেল। মার্গারেটকেও আই. সি. এস. ভবিষ্যত্তের সঙ্গে পশ্চাতে ফেলে সরিৎসাগর একদিন স্বদেশে ফিরে এসে বিলাসপুর হাইকোর্টে প্র্যাকটিশ সুরু করল। কয়েক বছরে তার প্রতিষ্ঠা হ'ল, রোজগার বাড়ল, নাম-ডাক হ'ল। রাজনৈতিক কর্মীদের কেস প্রথম থেকেই সে বিনা-ফি'তে গ্রহণ করত, এবং এতে দেশের সর্বত্র তার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। বড় বড় নেতাদের কেস করতে সে বিলাসপুরের বাইরে যেতে, ব্যবসার ক্ষতি সত্ত্বেও, কদাচ ইতস্তত করত না; তার চেয়ে উল্লেখযোগ্য, সাধারণ স্বদেশী কর্মীদের কেস পেলেও সে সমান উৎসাহে ও ঔদার্যে গ্রহণ করত; উপরন্তু, নিজের জুনিয়ারদের দিয়ে ছোট আদালতে বিনা পয়সায় এ-সব কেসের দায়িত্ব নিত।

সরিৎসাগর কোঠারী অন্য কোনও রমণীর পাণিগ্রহণ করে নি।

রাজনৈতিক সংগ্রামে প্রত্যক্ষ ভূমিকাও সরিৎসাগর কোনও দিন গ্রহণ করেন নি। কংগ্রেসী দলে নাম লেখেন নি, কংগ্রেসের কোনও পদে অধিষ্ঠিত হন নি। তা হ'লেও রাজনৈতিক কেসগুলির জন্যে এবং কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠিত অনেকগুলি কমিশন ও কমিটির চেয়ারম্যান বা সভ্যপদ গ্রহণ করায় তার সঙ্গে সরিৎসাগরের আত্মিক সম্পর্ক দীর্ঘকাল গ'ড়ে উঠেছিল। যে-সব কমিশন বা কমিটির বিষয়বস্তু ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র বা ইংরাজের এক বা একাধিক আইনের সংশোধন অথবা প্রত্যাহার দাবির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, একমাত্র তাতেই সরিৎসাগর অংশ গ্রহণ

করতেন। কালে তিনি দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসনতন্ত্র-আইনে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন। সুতরাং স্বাধীন ভারতবর্ষের সংবিধান প্রণয়নেও তাঁর অনেকখানি হাত ছিল। কনষ্টিটিয়ুয়েন্ট এ্যাসেম্বলির সভ্য হিসাবে দু'বছর কাটাবার পর, কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অনুরোধে, তিনি উদয়াচলের মন্ত্রীসভায় যোগ দিয়েছিলেন। মন্ত্রীত্বে তাঁর লোভ ছিল না। তথাপি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অনুরোধ তিনি উপেক্ষা করেন নি। উদয়াচলে এক সম্পূর্ণ নতুন ধরনের স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থা তৈরি করবার ইচ্ছে ছিল কৃষ্ণদ্বৈপায়নের। যে-ব্যবস্থা গ্রাম থেকে জন্ম নিয়ে, বিভিন্ন স্তরে, শহরের উচ্চতম ধাপ পর্যন্ত উঠে আসবে; যাতে বর্তমান মিউনিসিপ্যাল ব্যবস্থার গলদগুলি বাদ পড়বে; এবং যার মাধ্যমে সুপরিকল্পিত পথে প্রদেশের জনসাধারণকে পল্লী থেকে শহর পর্যন্ত নাগরিক জীবনের ব্যাপক পরিধিতে নানাবিধ কল্যাণসাধনে সক্রিয়ভাবে টেনে আনা যাবে। বিলাসপুর রোটারী ক্লাবে একদিন প্রধান অতিথির ভাষণ দিতে গিয়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন স্বায়ত্তশাসন পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছিলেন এবং এ কার্যে সুদক্ষ লোকেদের সাহায্য চেয়েছিলেন। বক্তৃতার পর কয়েকজনের সঙ্গে কিছু কথাবার্তাও হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সরিৎসাগর কোঠারী।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলছিলেন, "কোঠারী সাহেবকে ত আমরা আজকাল একেবারেই পাই নে।"

সরিৎসাগর জবাব দিয়েছিলেন, "জেলে ত আর যান না, আদালতেও আর ব্যারিষ্টারের প্রয়োজন নেই।"

"আমাদের সঙ্গে কি আপনার অতটুকু সম্পর্ক ?"

"কোশলজির রাজনীতিতে আমার উৎসাহ আছে, রুচি নেই। দল-গঠন ক'রে রাজনৈতিক কোন্দল পাতান আমি কোনও দিন পছন্দ করি নি। তাই, পার্টি-মাফিক রাজনীতি আমার দ্বারা আর আর হয়ে উঠল না।"

"তবু ত সারাজীবন আপনি দেশের জন্যে কম করেন নি।"

"দেশের জন্যে করা কথাটার, মাপ করবেন কোশলজি, কোনও মানে হয় না। অথচ সর্বদা, একথা এ-দেশের লোকমুখে শুনতে পাই। স্বদেশী করবার আগে বা করবার সময় আপনারা কেউ নিশ্চয় দেশের উপকার করবার পরিকল্পিত উদ্দেশ্য নিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন নি। যদি কেউ তাই করে থাকেন তবে তিনি স্বার্থপর। আমরা বড় কিছু করি নিজের তাগিদে, না-করে পারি নে বলে। গান্ধীজী অনেক সময় এ কথাটা বলতেন। বলতেন, ভারতবর্ষের জন্যে কিছু করার স্পর্ধা আমার নেই, এক সেবা ছাড়া। দেশের মুক্তি যদি চাই তা নিজের বন্দীত্ব অসহ্য বলে।"

"অতি সত্য কথা।"

"আমি দেশভক্ত এমন দাবি কদাচ করব না। ভারতবর্ষকে ভক্তি করা সহজ নয়। তার চেয়ে ভালবাসা সহজ। যাকে ভালবাসি তার দোষ দেখতে পাই নে। পেলেও ক্ষমা করি, বুঝতে চেষ্টা করি। কিন্তু দেশপ্রেম আমার কদাচ এখন উগ্র ছিল না যে আপনাদের মত সব ছেড়ে স্বদেশীতে নেমে পড়তে পারি। তা ছাড়া, বলতে দ্বিধা নেই, আপনাদের স্বদেশী অনেক সময় আমার কাছে হাস্যকর মনে হ'ত। আমি কেবল দু'জন মানুষের স্বদেশী তারিফ করতে পেরেছি—এক মহাত্মা গান্ধী, অন্য সুভাষ বোস।"

"কেন ? জবাহরলাল নেহরু ?"

"প্রধানমন্ত্রী আমাদের সবাকার মাননীয়। তাঁর রাজনীতির আমি প্রশংসা করি। কিন্তু তাঁর স্বদেশী সম্বন্ধে আমার মত খুব উঁচু নয়।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "ওসব আলোচনায় কাজ নেই। আমি চাই আপনি আমাকে সাহায্য করুন।"

"কি ভাবে ?"

"আসুন না একদিন আমার বাড়ীতে ? কথাবার্তা হবে।"

সরিৎসাগর কোঠারীকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মন্ত্রীত্ব গ্রহণে রাজী করিয়েছিলেন। কথা দিয়েছিলেন, কংগ্রেসের চার আনা সদস্য ছাড়া আর কিছু তাঁকে হ'তে হবে না। তিনি কোনও দল বা উপদলে থাকবেন না। তাঁর প্রধান দায়িত্ব হবে উদয়াচলে নতুন ধরনের স্বায়ত্ত শাসন গঠন করা। সঙ্গে সঙ্গে, আইন বিভাগের ভার তিনি নিলে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নিশ্চিন্ত হবেন যে প্রাদেশিক আইনগুলি সুচরিত হবে, হাইকোর্ট, সুপ্রীম কোর্ট তাদের বাতিল করতে পারবেন না।

কংগ্রেসী আন্দোলন সুরু। ইংরেজ আমলে আমরা স্বায়ত্ত-শাসন প্রসারিত ও শক্তিশালী করবার জন্যে বছরের পর বছর দাবি জানিয়েছি। আমাদের নেতাদের অনেকেরই জনকল্যাণের বাস্তবক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার হাতেখড়ি মিউনিসিপ্যালিটিতে। গান্ধীজী নিজে এ নিয়ে অনেক লিখেছেন, অনেক কাজ করে গেছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হবার সময় কি অভূতপূর্ব জন-আলোড়ন হয়েছিল। সর্দার প্যাটেল আহমেদাবাদ মিউনিসিপ্যালিটি, রাজেনবাবু পাটনায়, নেহরুজী এলাহাবাদে, নেতাজী কলকাতায় স্বায়ত্তশাসনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। অথচ স্বাধীন হবার পর আমাদের দেশে বোধ করি একটি কর্পোরেশন, একটি মিউনিসিপ্যালিটি জিলা বোর্ড বা য়ুনিয়ন বোর্ড নেই যা নিয়ে আমরা সামান্য গর্ব করতে পারি। দেশের শাসনভার যারা গ্রহণ করবে তাদের প্রথম শিক্ষানবীশির ক্ষেত্র হবে এ সব প্রতিষ্ঠান। অথচ, দুঃখের কথা, প্রদেশে প্রদেশে মিউনিসিপ্যালিটিগুলি সরকার নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসছেন, স্বায়ত্তশাসন মরে যাচ্ছে। কর্পোরেশনগুলি দুর্নীতি, আত্মীয়পোষণ, চুরি, অপটুতা ও ব্যর্থতার উদাহরণ হয়ে উঠেছে। আমার মতে এই হ'ল কংগ্রেস শাসনের প্রধান ব্যর্থতা। গ্রাম থেকে নগর পর্যন্ত জনসাধারণের হাতে ক্রমবর্ধমান স্থানীয় শাসনের ক্ষমতা আমরা তুলে দিতে পারি নি। শাসনকে ক্রমাগত কেন্দ্রীভূত করে চলেছি। আমি এ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন চাই। এবং এ দায়িত্ব আপনার। যথাসম্ভব এ দায়িত্ব পালনে আপনার পূর্ণ অধিকার থাকবে।"

সরিৎসাগর জানতে চেয়েছিলেন তাঁর তৈরী প্ল্যান ক্যাবিনেটের অনুমোদন-সাপেক্ষ হবে কি না। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলেছিলেন, "হবে। কিন্তু আমি আর আপনি একমত হ'লে ক্যাবিনেট নিয়ে ভাবতে হবে না।"

"যদি একমত না হই।"

"হবার সম্ভাবনাই বেশি। আমি আপনাকে নিমন্ত্রণ করে ক্যাবিনেটে আনছি।"

সরিৎসাগর ক্যাবিনেটে যোগ দিয়েছিলেন পূর্বোল্লিখিত বিভাগ পুনঃ বন্টনের সময়। মন্ত্রী হয়েই তিনি নতুন পরিকল্পনার খসরা করেন নি। প্রথমত, ভারতবর্ষে স্বায়ত্ত-শাসনের ইতিহাস অধ্যয়ন করেছেন। উল্লেখযোগ্য যতগুলি রিপোর্ট গত একশ বছরে লেখা হয়েছে তা পা করেছেন। কয়েকটি রিপোর্ট পাবার জন্যে তাঁকে ক বেগ পেতে হয় নি। স্বায়ত্ত-শাসন ক্ষেত্রে অভি ব্যক্তিদের সঙ্গে সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে গি আলাপ-আলোচনা করেছেন। উদয়াচলের স্বায়ত্ত-শাস ব্যবস্থার ইতিহাস বিশেষ যত্ন নিয়ে অনুধাবন করেছেন গ্রাম-কেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে গান্ধীজীর রচিত প্রব 'হরিজন' পত্রিকার বহু বছরের ফাইল জোগাড় ক'রে প' নিয়েছেন। তারপর নজর দিয়েছেন বিদেশের অভিজ্ঞতা ও প্রতিষ্ঠানে। সোভিয়েট য়ুনিয়ন, য়ুগোস্লাভিয়া, ইংল এবং স্ক্যানডিনেভিয়ান দেশগুলির স্থানীয় শাসন-ব্যব অধ্যয়ন করেছেন। তার পর উদয়াচলের বাইরে থেকে আমন্ত্রিত তিনজন এবং প্রদেশের দু'জন বিশেষজ্ঞ নি একটি কমিটি গঠন ক'রে সমস্ত বিষয়টির ওপর দীর্ঘকালী রিপোর্ট সংগ্রহ করেছেন। অবশেষে সরিৎসাগর নিজে বিবেচনা ও কমিটির সুপারিশ সম্বন্ধিত ক'রে নতু পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছেন।

এতে করে দু'বছর কেটে গেছে।

পরিকল্পনা মুখ্যমন্ত্রীর পূর্ণ সমর্থন পেয়েছিল। কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের রাজনৈতিক জীবনেরও হাতেখড়ি হয়েছিল জিল বোর্ডে: স্বায়ত্ত-শাসনের সমস্যাগুলির সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। সরিৎসাগর কোঠারী বিষয়টিকে এত বেশি গুরুত্ব দেওয়ায় তিনি সুখী হয়েছিলেন। কোন কো ক্ষেত্রে সামান্য মতবিরোধ ছাড়া সরিৎসাগরের পরিকল্পনা তাঁর আপত্তি ছিল না। মতবিরোধের ক্ষেত্র এত ক্ষুদ্র ছি যে মতানৈক্য ঘটাতে দু'জনকে বেগ পেতে হয় নি।

কিন্তু আজ পর্যন্ত সরিৎসাগরের পরিকল্পনা কার্যকরী হ নি। নতুন স্বায়ত্ত-শাসন বিল আজ পর্যন্ত বিধান সভা অনুমোদন পায় নি।

পরিকল্পনার মূল দর্শন ছিল স্বায়ত্ত-শাসন থেকে রাজনীতি দূরে সরিয়ে রাখা। সরিৎসাগর এই দৃঢ় সিদ্ধান্তে পৌঁছে ছিলেন যে, স্থানীয় শাসন দোষমুক্ত করতে হ'লে রাজনীতি থেকে তাকে বাঁচাতে হবে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এ সিদ্ধান্তে ম দিয়েছিলেন। গ্রাম পঞ্চায়েৎ থেকে নগর নিগম পর্যন্ত স্বায়ত্ত-শাসন পরিচালিত হবে উপযুক্ত জন-নির্বাচিত ব্যক্তি-দের দ্বারা, কোনও রাজনৈতিক দল দ্বারা নয়। পঞ্চায়েৎ

প্রধান নিজের দায়িত্বে সহকারী বেছে নেবেন এবং দু'বছর তাঁর শাসন চলবে; তিনি সাহায্য পাবেন জিলা অফিসরের কাছ থেকে। একই ভাবে, মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতি নির্বাচিত হবেন গণভোটে; তিনি তাঁর 'ক্যাবিনেট' বেছে নিয়ে তিন বছর নগর শাসনের দায়িত্ব নেবেন। নগর নিগমের মেয়রদের জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা। নির্বাচনের সময় কেউ রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি হবেন না; দাঁড়াবেন নিজের চরিত্র, কর্মশক্তি ও পুরাতন জনসেবার রেকর্ড নিয়ে। নগর নিগম থেকে পঞ্চায়েৎ পর্যন্ত নির্বাচিত কাউন্সিলারদের মেয়র থেকে প্রধান পর্যন্ত, প্রশাসন-নেতাদের পদচ্যুত করবার ক্ষমতা থাকবে না। অর্থাৎ, সরিৎসাগর কোঠারীর পরিকল্পনা গ্রাম থেকে নগর পর্যন্ত আগামী কালের প্রশাসন নেতা গঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত হয়েছিল। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যে তাঁর এই অভিনব প্রস্তাব সমর্থন করবেন, সরিৎসাগর আশা করেন নি। সমর্থনে আশ্চর্য হয়েছিলেন।

প্রথম বাধা এল ক্যাবিনেটে। দু'তরফ থেকে। দুর্গাভাই দেশাই আপত্তি জানালেন এক কারণে। বললেন, এই প্ল্যান প্রগতি-বিরোধী। কংগ্রেস এতকাল যে স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা সমর্থন করে এসেছে এ তার বিপরীত। অন্য আপত্তি এল সুদর্শন দুবের দল থেকে। মুখপাত্ররা বললেন, রাজনীতি বাদ দিলে জনগণকে ত বাদ দেওয়া হবে, বাদ দেওয়া হবে গণতন্ত্রকে। বললেন, রাজনৈতিক দল ছাড়া গণতন্ত্র হতে পারে না। স্বায়ত্ত-শাসনের উদ্দেশ্য গণতন্ত্রকে শক্ত করা, সবল করা। রাজনৈতিক দলগুলি যদি স্বায়ত্ত শাসনে যোগ না দিতে পারে, গণতন্ত্র গ্রামে পৌঁছবার রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে।

সরিৎসাগর প্রাণপণ লড়লেন। পুনরায় আশ্চর্য হ'লেন কৃষ্ণদ্বৈপায়নকেও সবটুকু শক্তি নিয়ে তাঁর পাশে দেখে। ব্যাপারটা গুরুতর হয়ে উঠল। দুর্গাভাই শেষ পর্যন্ত প্ল্যান মেনে নিতে রাজী হ'লেন। কিন্তু প্রাদেশিক কংগ্রেস মানল না। সুদর্শন দুবে প্রকাশ্যে প্ল্যানের বিরোধিতা করলেন। বলতে লাগলেন, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কংগ্রেসকে দুর্বল পঙ্গু করতে চান। উদয়াচলের অধিকাংশ কর্পোরেশন ও মিউনিসিপ্যালিটি বিরুদ্ধে দাঁড়াল। তাদের সবই কংগ্রেস-শাসিত। ব্যাপারটা সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ল। গণ-বিক্ষোভ দেখা গেল নতুন পরিকল্পনার বিরুদ্ধে। সুদর্শন দুবে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির শরণাপন্ন হ'লেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ও সরিৎসাগরকে দিল্লী যেতে হ'ল। বামপন্থী দলগুলিও বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিল।

মন্ত্রীসভায় ভাঙনের প্রথম প্রকাশ্য কারণ হ'ল স্বায়ত্ত শাসন।

সরিৎসাগর কোঠারী একদিন কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কাছে পদ-ত্যাগ পত্র নিয়ে হাজির হলেন। বললেন, "কোশলজি, আপনি অনেক লড়েছেন। আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধার সীমা নেই। কিন্তু আমরা হেরে গেছি। এবার আমাকে রেহাই দিন।"

"রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করছেন?"

"না। স'রে দাঁড়াচ্ছি। দলীয় রাজনীতিতে কোনও দিন আসতে চাই নি এই ভয়ে।"

"আপনি ত নিজের ইচ্ছায় আসেন নি। আমি ডেকে এনেছি। যদি আপনার পরিকল্পনা গৃহীত না হয়, পরাজয় আমারও। আমি এত সহজে হার মানি না।"

"আপনি কি মনে করেন পরিকল্পনা আপনি চালু করতে পারবেন?"

"নিশ্চয় মনে করি। এ ঝড় বয়ে যেতে দিন। পদ-ত্যাগ করবেন কেন? এ সময় আমাকে একা ফেলে আপনার স'রে দাঁড়ান কি ঠিক হবে?"

"কিন্তু—"

"এ ঝড় বয়ে যাক। ব্যাপারটা বহুদূর গড়াবে। মনে হচ্ছে মন্ত্রীসভার পতন হবে। হয়ত দেখবেন, দলের আস্থাও আমি হারিয়ে বসেছি।"

"আমার জন্যে আপনি অতটা করবেন কেন?"

"আপনার জন্যে নয়। আমি রাজনীতি করি। আপনার জন্যে আমার রাজনৈতিক বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিসর্জন দেব অত বোকা আমি নই। এ প্ল্যান আমার চাই। উদয়াচলের জন্যে, ভারতবর্ষের জন্যে। একদিন-না-একদিন সুদর্শন দুবেদের হাত থেকে মুক্তি না পেলে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আমাকে একটা প্রদেশের প্রশাসন চালাতে হয়। আমি জানি দলীয় রাজনীতি রাজনীতি কি তাতে সারা দেশের রক্ত দূষিত করে দিচ্ছে। আমি জানি কেন একজন ডেপুটি কমিশনারও জিলায় কাজ করতে পারে না, কাজ করতে চায় না। জিলা কংগ্রেস

নেতারা তাদের কাজ করতে দেয় না। মন্ত্রীদের পেছনে ঘুরতে ঘুরতে তারা হয়রান হয়ে যায়। পঞ্চায়েৎ থেকে নগর নিগম পর্যন্ত রাজনীতির অত্যাচার দেশকে দীন দুর্বল করে তুলেছে। আমাদের কাল ত শেষ হয়ে এল, কোঠারী সাহেব। আমরা আজ আছি, কাল নেই। কিন্তু দেশটা ত থাকবে—তার ভবিষ্যৎ আছে, তাকে বাড়তে হবে, এগোতে হবে। আপনি এত পরিশ্রমে যা করেছেন তা দেশের ভবিষ্যতের জন্যে। এত সহজে আমি তা ব্যর্থ হ'তে দেব না।

"যদি আপনাকে পর্যন্ত পদত্যাগ করতে হয়?"

"পদত্যাগ বোধহয় করতে হবে না। হঠাৎ একদিন দলে হেরে যেতে পারি। তাতে ভালও হ'তে পারে। নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করব।"

"আশ্চর্য আপনার আত্মবিশ্বাস!"

"তার ভিত্তি কি, জানেন? উদয়াচলের নাড়ী-নক্ষত্র আমি জানি। আমি জানি সুদর্শন দুবেকে, তার দলের প্রত্যেক মানুষকে। জানি, বিধান সভার প্রত্যেক সদস্যকে। প্রাদেশিক হ'তে মণ্ডল কংগ্রেস পর্যন্ত প্রত্যেক নেতাকে। জানি বলেই এ আত্মবিশ্বাস। জানি, কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে বাদ দিয়ে উদয়াচলের কংগ্রেস শাসন চলবে না। জানি, এরা যদি আজ আমার বিরুদ্ধে ভোট দেয়, কাল আবার আমারই পক্ষে ভোট দেবে।"

সরিৎসাগর সরকারী বাংলোয় থাকতেন না। বিলাসপুরে পিতার অট্টালিকা আছে, তাতেও তিনি বাস করেন নি, প্র্যাকটিসের প্রথম কয়েক বছর ছাড়া। শহরের পুব দিকে প্রাচীন ঝিল, তার কাছাকাছি সরিৎসাগরের নিজের বাড়ী। দু' একর জমিতে মস্ত লন, বিরাট বাগান, টেনিস কোর্ট, সাঁতারের পুকুর—এবং ছায়াছোট্ট বাসা। একতলা ধবধবে সাদা বাংলো প্যাটার্নের ছোট্ট বাড়ী—দু'খানা শোবার ঘর, লাইব্রেরী, বসবার ঘর, খাবার ঘর, বাথরুম ইত্যাদি। সবচেয়ে বড় হ'ল লাইব্রেরী ঘর। বাংলোর ডান ও বাঁ দিকে আরও দু'খানা ছোট বাড়ী, একখানায় সরিৎসাগরের দপ্তর, অন্যখানা অতিথিশালা। দপ্তরে মক্কেলদের বসবার জন্যে একখানা ঘর, মুহুরীদের জন্যে একখানা, জুনিয়রদের জন্যে দুখানা এবং সরিৎসাগরের নিজের জন্যে একখানা। অতিথিশালায় তিনখানা শোবার ঘর, একখানা বসবার ঘর এবং আনুষঙ্গিক বাথরুম ইত্যাদি। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে সরিৎসাগর অকৃতদার জীবনের জন্যে নিজেকে তৈরি করেছিলেন। বাড়ী নির্মাণের সময়ও একক জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে প্ল্যান তৈরি করিয়েছিলেন।

আইন-ব্যবসা ছাড়া তাঁর বহু বিষয়ে উৎসাহ ছিল। নিজের হাতে বাগান তৈরি—ফুল, ফল, সব্জি সবাইতে সমান উৎসাহ। পশুপক্ষী তিনি ভালবাসতেন; ভারতবর্ষে মুষ্টিমেয় পক্ষী-প্রেমীদের মধ্যে তাঁর নাম সবাই জানত। বাগানে নানারকম বিদেশী গাছ লালন করা সরিৎসাগরের আর এক নেশা। বাগানটিকে তিনি অনেক বছরের চেষ্টায় একটি ছোটখাট বোটানিক্যাল গার্ডেন-এ তৈরি করেছিলেন। বাগানের কেন্দ্রস্থলে ছিল কাঁচের বেড়া দেওয়া ঠাণ্ডা-ঘর: শীতপ্রধান দেশের গাছ-গাছড়ায় ভরতি। একপ্রান্তে ছিল সরিৎসাগরের নিজস্ব জলজপ্রাণী গৃহ: নানা রং-এর মাছ দেশ-বিদেশ থেকে তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। পাহাড়ে বেড়ান ছিল সরিৎসাগরের আর এক নেশা। ভারতবর্ষের এমন কোনও পাহাড়-পর্বত নেই যার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ নিবিড় পরিচয় ছিল না।

একক জীবন বেছে নিয়েও সরিৎসাগর নিরালা মানুষ ছিলেন না। বহু বন্ধু-বান্ধব তাঁর কাছে আসত, থাকত, আনন্দ-আহ্লাদ করত। তাঁদের সৎকারের ব্যবস্থায় সরিৎসাগর কার্পণ্য করতেন না।

সরিৎসাগরের বাড়ীতে কেবলমাত্র একখানা ছবি ছিল। লাইব্রেরী ঘরে টেবিলের ওপর রূপার ফ্রেমে বাঁধান। একটি ইংরেজ তরুণীর। হাস্যময়ী সুন্দরী মার্গারেট ওয়াকার।

মার্গারেট ওয়াকারকে বিবাহ না করতে পারার পরিণাম সরিৎসাগরের আজীবন কৌমার্য কিন্তু তাঁর জীবনে স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল না। ভাসাভাসা, ওপর ওপর, আনন্দ স্ফূর্তি-সম্ভোগ প্রবেশ। পছন্দমত স্ত্রীলোকরা সরিৎসাগরের শয্যায় স্থান পেত; অন্তরে কারুর স্থান ছিল না।

সূর্যপ্রসাদ যখন মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ি নিয়ে সরিৎসাগরের বাড়ীর ভেতরে ঢুকল, তখন সরিৎসাগর লাউঞ্জে বসে চারজন অতিথির সঙ্গে গালগল্প করছিলেন। অতিথিদের দু'জন দেশী, দু'জন বিদেশী। দেশীদের একজন বিলাসপুরের

উদীয়মান ব্যারিস্টার মদনমোহন সহায়, অন্যজন দিল্লীর ব্যবসায়ী, কুন্দনলাল সুদ। বিদেশীদের একজন ইংরেজ। সদ্য বিলাত থেকে এসেছেন ভারতভ্রমণে, উদ্দেশ্য ব্যবসার সুযোগ সন্ধান। নাম আর্থার হিউম। অন্যজন জার্মান রমণী, সরিৎসাগরের অন্যতমা বান্ধবী। মহিলার দিল্লীতে প্রবাস ; পশ্চিম জার্মানীর রাজদূতের উদ্যোগে জার্মান ভাষা শেখাবার জন্যে প্রতিষ্ঠিত স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল। নাম হিল্ডা ট্রাউস। কিছুদিনের জন্যে বেড়াতে এসেছেন বিলাসপুরে সরিৎসাগরের অতিথি হয়ে।

গাড়ি ফাটকে ঢুকতে দেখে সরিৎসাগর একটু চমকে উঠেছিলেন। পরক্ষণে আরোহীর ওপর নজর পড়তে হেসে ফেললেন।

বললেন, "চীফ মিনিষ্টরের গাড়ি। কিন্তু আগন্তুক মুখ্যমন্ত্রী নন। তাঁর পুত্র সূর্যপ্রসাদ কোশল। এম. এল. এ।"

মদনমোহন সহায় বললেন, "কে. ডি. কোশলের ভবিষ্যৎ কি?"

উত্তরে সরিৎসাগর বললেন, "কে. ডি. কোশলের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। ভদ্রলোকের গুণ অনেক, শক্তি অসাধারণ ; নিজের নৌকা নিজে সামলাবার ক্ষমতা রাখেন। তা ছাড়া, জীবন সুরু করেছিলেন কুশানপুরের জিলা আদালতে উকিল হয়ে। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাজনীতিতে। কালে উদয়াচলের মুখ্যমন্ত্রী। চাকরি যদি যায় হয় ভারত সরকারে মন্ত্রীত্বে প্রমোশন পাবেন, নয়ত রাজ্যপাল হয়ে নিশ্চিন্ত আরামপূর্ণ অবসর। আমার বরং মাথাব্যথা হয়, মাঝে-মধ্যে, একটা দেশের ভবিষ্যৎ ভেবে। তার নাম ভারতবর্ষ।"

আর্থার হিউম বললেন, "আমার ত মনে হয় আপনারা খুব ভাল ম্যানেজ করছেন!"

"তুলনাক্রমে করছি", সরিৎসাগর বললেন। "কিন্তু আমাদের সমস্যা বড় কঠিন। পৃথিবীর এমন আর একটা দেশ নেই যার সমস্যার সঙ্গে আমাদের অবস্থা তুলনীয়।"

হিল্ডা ট্রাউস বললেন, "ইণ্ডিয়া সত্যি অতুলনীয়।"

সরিৎসাগর বললেন, "উদার বৃহৎ আকাশ, উত্তরে গগনচুম্বী হিমালয়, দক্ষিণে পশ্চিমে সীমাহীন সমুদ্র। চার হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতা। বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত। বুদ্ধ, গান্ধী, বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ, অরবিন্দ। চল্লিশ কোটি লোক, বছরে বিশ লক্ষ তার বৃদ্ধি। ষোলটি ভাষা, কেউ অন্যের কাছে মাথা নত করবে না। শতকরা আশি জন নিরক্ষর। একশ' জনের মধ্যে সত্তর জনের পুরো দুবেলা আহার জোটে না। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র। চল্লিশ কোটি মানুষের সমান অধিকার। ভারতবর্ষের সত্যি তুলনা নেই।"

গাড়ি এসে লাউঞ্জের সামনে দাঁড়াল। দরজা খুলে বেরিয়ে এল সূর্যপ্রসাদ। একবার থমকে দাঁড়াল। তার পর হাতজোড় নমস্তে করল।

সরিৎসাগর এগিয়ে এলেন : "এস, সূর্যপ্রসাদ এস। গাড়ি দেখে একটু ভড়কেছিলাম। বোঝা উচিত ছিল, এ সময়ে কোশলজির পক্ষে আমার বাড়ী কেন, স্বর্গধামে যাওয়ারও উপায় নেই।"

সূর্যপ্রসাদ বলল, "পিতাজি বড় ব্যস্ত আছেন।"

"বুড়ো হয়ে গেছি সূর্যপ্রসাদ। নইলে এ কথাটা তুমি বলার আগেই বুঝতে পারতাম।"

পরিচয় করিয়ে দিলেন অতিথিদের সঙ্গে। "ইনি মিষ্টার হিউম। বিলেত থেকে এসেছেন। বলছেন, এতদিনের সাম্রাজ্য এখন স্বাধীন হয়ে বেশ ভালই সব কিছু চালাচ্ছে। ইনি ফ্রাউলিন ট্রাউস। জার্মান। বলছিলেন, ভারতবর্ষের তুলনা নেই। ইনি কুন্দনলাল সুদ। সারা ভারতবর্ষ নিংড়ে যে দৌলত দিল্লীতে জমা হয় তার বড় অংশীদার। আর মদনমোহন সহায়কে ত চেন। তোমার বাবা আমার যে ব্যবসাটি মেরেছেন মদনমোহন তা নির্বিবেকে দখল করে বসছে। আর ইনি? ইনি সূর্যপ্রসাদ কোশল। মুখ্যমন্ত্রীর পুত্র। আমাদের বিধান সভার অন্যতম কংগ্রেসী সদস্য।"

সূর্যপ্রসাদ নমস্তে, করমর্দন সমাপ্ত ক'রে চেয়ারে বসলে, সরিৎসাগর প্রশ্ন করলেন, "কি পান করবে? বীয়র না মার্টিনী? খুব চোস্ত ইটালীয়ন মার্টিনী আছে।"

সূর্যপ্রসাদ লাজুক গলায় বলল, "বীয়র।"

বেয়ারাকে অর্ডার দিয়ে সরিৎসাগর বললেন, "তারপর, সূর্যপ্রসাদ? কি মনে করে?"

"ভাল লাগছিল না। বাড়ীতে কেমন একটা গুমোট, অসহ্য পরিবেশ। পিতাজির ধারে কাছে যাওয়া যায় না।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতেও পারছি না। তাই চলে এলাম আপনার কাছে।"

"ভাল লাগছিল না, এখানে চলে এসেছে, শুনতে আমার মন্দ লাগছে না। খাও-দাও আনন্দ কর, বাগানে ঘুরে বেড়াও, বেড়াতে চলে যাও—দেখবে বেশ ভাল লাগবে। হিলডা—মানে মিস ষ্ট্রাউস—বিলাসপুরে বেড়াতে এসেছেন, আমার মতন বুড়ো মানুষ নিশ্চয় ভাল লাগছে না; তোমাকে সঙ্গী পেলে নিশ্চয় খুশি হয়ে বেড়াতে বেরোবেন। কিন্তু, সূর্যপ্রসাদ, রাজনীতির যুদ্ধের অবস্থা যদি জানতে চাও তুমি ভুল জায়গায় এসেছ। আমি এমন কোনও সঞ্জয়কে নিযুক্ত করি নি যে আমাকে অবিরাম রিপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে।"

"সে জন্যেই আপনার কাছে এসেছি। আপনি এ ব্যাপারে নির্লিপ্ত। আপনার মতামতের দাম অনেক। তা ছাড়া আপনার মত বুদ্ধিমান লোক উদয়াচলে আর কে আছে?"

"তাই নাকি? সূর্যপ্রসাদ, আপনারা সকলে শুনে নিন, আমাকে উদয়াচলের সবচেয়ে বুদ্ধিমান লোক বলছে। ধন্যবাদ। বৃদ্ধ বয়সে এ প্রশংসার দরকার ছিল। হ্যাঁ, সূর্যপ্রসাদ, আমি অনেকখানি নির্লিপ্ত। কিন্তু একেবারে নই। আমি জানি, বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের জন্যে অনেকখানি দায়িত্ব আমার। কোশলজি আমার পেছনে শক্তভাবে দাঁড়িয়েছেন, এজন্যে আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি। এবং একই কারণে আমি তাঁর বিজয় চাই। এর চেয়ে বেশি এ ব্যাপারে আমার লিপ্ততা নেই। কারণ, এ কথা সবাই জানে, নতুন মন্ত্রীসভায় স্থান পেলেও আমি নেব না। পাবার সম্ভাবনাও নেই।"

মদনমোহন সহায় বললেন, "আপনি মন্ত্রী হোন বা না-হোন, উদয়াচলের রাজনীতি থেকে একেবারে স'রে থাকা আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না।"

"হবে", সরিৎসাগর জোর দিয়ে বললেন। "এত দীর্ঘকাল আমি রাজনীতি করি নি, তাতে উদয়াচলের ক্ষতি হয়েছে বলে ত জানা নেই। যেই মন্ত্রী হ'লাম, অমনি গোলমাল বাধল। কোশলজি সুখে রাজত্ব করছিলেন, সুদর্শন হ্রদে পরমানন্দে কংগ্রেস নামক গাভীর দুগ্ধ দোহন করছিলেন। কোথা থেকে আমি উড়ে এসে জুড়ে বসে সবকিছু গোলমাল করে দিলাম। রাজনীতি আর নয়।"

হিউম বললেন, "রাজনীতি আপনার পেশা নয়?"

"পেশাও নয়, নেশাও নয়," সরিৎসাগর মন্তব্য করলেন। "পেশা আমার আইন। নেশা অনেক—কিন্তু রাজনীতি নয়। আমাদের দেশে রাজনীতি এত বেশি লোকের পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, বেকারের সংখ্যা অনেক, এবং রোজ বাড়ছে। ভারতীয় গণতন্ত্রের এ এক দারুণ দুর্বলতা। রাজনীতি যাঁদের পেশা তাঁরা যে-কোনও রকমে হোক রাজনীতি করবেই। আপনাদের দেশে ধরুন, চার্চিল। রাজনীতি করেন, এটা তাঁর পেশা। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী না হ'লে তাঁর বেকার থাকার কারণ ঘটে না। তিনি বই লেখেন, ছবি আঁকেন, সারগর্ভ বক্তৃতা করেন: সময় বেশ ভালই কাটে। ব্রিটেনের শাসনভার তাঁর হাতে না থাকতে পারে, কিন্তু যুগের পর যুগ তিনি যে নির্বাচন-এলাকার প্রতিনিধি হয়ে পার্লামেণ্টে স্থান পাচ্ছেন, তাদের প্রতি কর্তব্যটুকু সম্বন্ধে তিনি নিত্য সজাগ। আজ আপনাদের হারল্ড ম্যাকমিলান বিরাট্ ম্যাকমিলান কোম্পানীর বোর্ড অব ডিরেক্টরদের সভাপতি। একদিন হয়ত তিনি হবেন প্রধানমন্ত্রী। মন্ত্রীত্ব যাবার পর প্রত্যাবর্তন করবেন নিজের ব্যবসায়ে। অর্থাৎ, মন্ত্রীত্ব ছাড়াও তাঁদের করবার কিছু আছে। তাঁরা বেকার নন। আমেরিকায় আজ যিনি পররাষ্ট্রসচিব, কাল মন্ত্রীত্ব যাবার পর হয় তিনি কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি, নয় কোনও রিসর্চ ইনষ্টিটিউশনের ডিরেক্টর। আমাদের দেশেই দেখতে পাই এক বিরাট্ সংখ্যক নতুন শ্রেণী: রাজনীতি ছাড়া যাদের আর কিছু করবার নেই। সূর্যপ্রসাদ কিছু ক'রো না, কোশলজির কথাই বলছি। আসলে তিনি উকিল, কুশানপুর জিলা আদালতে তাঁর একদা প্র্যাকটিশ ছিল। কিন্তু আজ মুখ্যমন্ত্রীত্ব ত্যাগ করে কুশানপুর জিলা আদালতে ফিরে গিয়ে ওকালতী করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। মানে বাধবে, রোজগার হবে না; ভগ্নহৃদয়ে হয়ত মারাই যাবেন। সুতরাং মুখ্যমন্ত্রী হয়ে তাঁকে থাকতেই হবে, যদি একান্ত না হ'তে পারেন তা হ'লে, দিল্লীর দাক্ষিণ্যে হয় কেন্দ্রে মন্ত্রীত্ব নয় রাজ্যপালপদ পাওয়া দরকার হবে। নতুবা বেকার, করণীয় কিছু নেই। কোশলজি অবশ্য একেবারে বেকার নাও হ'তে পারেন, তিনি কবি, তাঁর কবিযশ আছে, যদিও এত বছর মুখ্যমন্ত্রীত্ব করবার পরও কবি-লক্ষ্মী তাঁর আয়ত্তে

আছেন কি না জানি নে। কিন্তু আমাদের দশজন রাজনৈতিক নেতা বা মন্ত্রীর মধ্যে ন' জনেরই নিজস্ব কোনও কর্মস্থান নেই। তাই দেখা যায় মন্ত্রীত্ব কেউ ছাড়তে চায় না। সবাই চায় আমরণ মন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী থাকতে। টিল্ ডেথ ডু আস্ পার্ট।"

"আপনার বেলা এ কথা নিশ্চয় খাটে না।" বলল মদনমোহন সহায়।

"নিশ্চয় না!" জোর দিয়ে বললেন সরিৎসাগর। "আমি মন্ত্রীত্ব চাই নি, চাই নে, চাইব না। আমার হাইকোর্ট আছে, বাগান আছে, গাছ-মাছ আছে, পাহাড়-পর্বত আছে, বন্ধু-বান্ধবী আছে; মন্ত্রীত্বে আমার লোভ নেই। এবং বিনয়ের সঙ্গে নিবেদন করছি, আমার মত লোক ভারতবর্ষে অনেক, অনেক না হ'লে আমাদের গণতন্ত্র রাজনীতির ভেজাল খেয়ে খেয়ে অদূর ভবিষ্যতে মারা যাবে।"

সূর্যপ্রসাদ প্রশ্ন করল, "রাজনীতি পেশা হতে পারে না কেন?"

"পারে, পারা উচিত নয়," বললেন সরিৎসাগর। "আমাদের রাজনীতির বারো আনা দলবাজি। দলের ইংরেজী প্রতিশব্দ হল পলিটিক্স। মধ্যে উপদল, উপদলের মধ্যে অপদল। রাজনীতির পলিটিক্স মানে আর্ট অব গভর্ণমেণ্ট। আমরা যাকে পলিটিক্যাল সায়ান্স বলি, মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তার নাম 'গভর্ণমেণ্ট'। পরাধীন দেশের রাজনীতি দেশকে স্বাধীন করা। স্বাধীন দেশের রাজনীতি দেশকে শাসন করা, উন্নতির পথে এগিয়ে নেওয়া। এর জন্যে চাই অধ্যয়ন, বিচার, বিশ্লেষণ, এবং সবার আগে, একনিষ্ঠ কাজ। আমাদের রাজনীতিতে কাজ খুব কম, অকাজ বড় বেশি। তাই দেখতে পাও আজ তুমি মন্ত্রী, তোমার আদর-আপ্যায়নের শেষ নেই—বাঘ আর গরু অনবরত তোমার ভয়ে একঘাটে জল খাচ্ছে। কাল তুমি মন্ত্রী নও—কেউ তোমার দিকে ফিরেও তাকাবে না—তুমি নিজেও না। যেহেতু তোমার আর কিছু করবার নেই তাই তুমি আবার চাইবে মন্ত্রী হ'তে। এবং হবার জন্যে তুমি কি করবে? রাজনীতি করবে। অর্থাৎ দল পাকাবে। দল পাকাবার জন্যে বর্তমান মন্ত্রীদের পেছনে লাগবে। জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িকতা, কুসংস্কার সব কিছুর ব্যবহার করবে তোমার দলশক্তিত্ব পোক্ত করার জন্যে। এই হ'ল ভারতবর্ষে পেশাদার রাজনৈতিকের জীবন। এতে দলপতি উপদলপতিদের আখের বেশ গোছান যেতে পারে, দেশটার সর্বনাশ হ'তে বাধ্য।"

সূর্যপ্রসাদ বলল, "এজন্যেই আপনার কাছে এসেছিলাম।"

"এসব সারগর্ভ কথা শুনতে? তা হ'লে প্রায়ই এস।"

"তা নয়। আমার মনে একটা সংশয় দেখা দিয়েছে।"

"বটে?"

"ভাবছি, পিতাজির সঙ্গে রাজনীতি করে যাব, না অন্য কিছু করব।"

"এ ত দেখছি বিরাট্ সমস্যা! হ্যামলেটকেও এমন সমস্যার মোকাবিলা করতে হয় নি।"

হিল্ডা স্ট্রাউস বলে উঠল, "সরিৎ, তুমি বড্ড ওঁর 'লেগ পুল' করছ।"

"মোটেই না। শোন সূর্যপ্রসাদ। ওকালতী করে করে আমার জিভের ধার বড্ড বেড়ে গেছে। যা বলব পরিষ্কার সোজা কথা। এটুকু তুমি নিশ্চয় বোঝ যে, তোমার বাবার প্রভাব-প্রতিপত্তি ছাড়া তুমি এম. এল. এ. হতে পারবে না।"

"বুঝি।"

"এখন প্রশ্ন হ'ল দুটো। প্রথম, বাপের যদি প্রভাব-প্রতিপত্তি থাকে, তা হ'লে তা ছেলেরা কেন ভোগ করবে না? দ্বিতীয়ত, যে যোগ্যতা আমি অর্জন করি নি, তা বাপ বা অন্য কারুর দাক্ষিণ্যে আমি নেব কি না। দুটোই গুরুতর প্রশ্ন। হিন্দু তার্কিকরা এ নিয়ে পাঁচ বছর অবিরাম তর্ক করতে পারেন। কিন্তু তর্কে মীমাংসা নেই। মীমাংসা ব্যক্তির সিদ্ধান্তে।"

"আপনি কি বলেন?"

"আমি? আমি বলার আগে তুমি বল। বল, তুমি রাজনীতি করতে চাও?"

"চাই।"

"তা হ'লে নিজের ক্ষেত্র গড়ে নাও। যেমন একদিন তোমার পিতাজি গড়ে নিয়েছিলেন। তাঁর বাপ ত তাঁকে নেতা বানান নি? তিনি স্বদেশী করেছেন, জেল

খেটেছেন, কংগ্রেসের নেতা নির্বাচিত হয়েছেন, উদয়াচলের কংগ্রেসকে নিজের আয়ত্তে রেখেছেন। তোমার ভাই দুর্গাপ্রসাদও স্বক্ষেত্র তৈরি করছে। হোক না সে বামপন্থী —তবু তার নিজস্ব রাজনৈতিক দাবি আছে। তোমার তা আছে কি ?"

"আমি ছাত্রনেতা ছিলাম অনেকদিন।"

"ছাত্রনেতা আবার কি ?"

"ছাত্র কংগ্রেসের নেতা ?"

"ছাত্রনেতা হন হয় মেধাবী ছাত্র, যে পরীক্ষায় প্রথম হয়, নয় গুণ্ডা-ছাত্র, যার দাপটে অন্য ছেলেরা সব কিছু করে, মাষ্টাররা ভয়ে পড়া বন্ধ করে দেয়। ছাত্র-কংগ্রেস নামক কোনও প্রতিষ্ঠান থাকার মানে নেই। ওটা হ'ল বামপন্থী দলগুলির নির্বুদ্ধি অনুকরণ। তা ছাড়া ছাত্ররা ত আলাদা ভোট দিয়ে তোমাকে বিধান সভায় নির্বাচন করতে পারে না।"

"না।"

"তা হ'লে! যদি রাজনীতি করতে চাও, নির্বাচন এলাকা বেছে নাও। গ্রামে বা শহরে। সে এলাকায় কাজ করো। কংগ্রেসের হয়ে করো বা অন্য দলের। জনসাধারণের কাছে তোমার যোগ্যতা প্রমাণ করো। নেতৃত্ব করার আগে জনসেবা করো। মানুষের শ্রদ্ধা, আস্থা অর্জন করো। জনস্বার্থের সঙ্গে নিজের স্বার্থ মিলিয়ে নাও। মাটি থেকে উঠে এস, সূর্যপ্রসাদ, মাটি থেকে। যারা মাটি থেকে উঠে আসবে না, ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষে তাদের নেতৃত্ব করা সম্ভব হবে না। দেখছ না, উঁচু স্তর কত তাড়াতাড়ি নিঃশেষ হ'তে চলেছে ? দেশ স্বাধীন হ'ল। শাসনের ডাক পড়ল। বড়, মাঝারি সব নেতারাই রাতারাতি মন্ত্রী উপমন্ত্রী রাজ্যপাল হয়ে গেলেন। একেবারে আর কিছু না হোক ত এম. পি. বা এম. এল. এ.। কংগ্রেসের কাজ, জনগণের কাজ করবার জন্যে বাকী রইল না আর কেউ। বর্তমান মন্ত্রীকুল ত অমর নয়! তারা মরলে দেশের নেতৃত্ব করবে কে ?"

সূর্যপ্রসাদ সভয়ে বলল, "কেন ? আমরা।"

"তোমরা ?" সরিৎসাগর বীয়র পান করতে করতে ব্যঙ্গ হাসলেন, "উত্তম। কিন্তু জনগণ তোমাদের মানবে কেন ? আজ তুমি এম. এল. এ. হয়েছ তোমার পিতার গৌরবে। তোমার নিজের অর্জিত নেতৃত্ব কোথায় ? দলের দাপটে জনগণ যদি তোমাদের মেনেও নেয়, দেশ শাসন করতে তোমরা পারবে না। তোমাদের বদিবে যে তারা গোকুলে বাড়ছে। বাড়ছে চাষের মাঠে, কারখানায়, বন্দরে: যেখানে অগণিত ভারতবাসী মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটছে, অথচ দুবেলা পেট ভরে খেতে পারছে না। গণতন্ত্রের বাণী তাদের কাছে পৌঁছে গেছে, তারা জানে যে আসলে রাজশক্তি তাদের হাতে। আমরা তাদের নাম নিয়ে যা কিছু করছি তার একাংশও তাদের কাছে পৌঁছয় না; আসলে, আমরা তাদের চিনি না, জানি না। আমরা তাদের মুখের ভাষা যদি বা বুঝি, শুনবার সময় পাই নে; বুকের ভাষা বুঝি নে। তোমাদের সঙ্গে তাদের কোনও কথোপকথন নেই। যদি তাদের মধ্যে থেকে নিজের কর্মশক্তিতে ও যোগ্যতায় নেতৃত্বের সোপান বেয়ে বেয়ে ওপরে উঠতে পার রাজনীতিতে তা হ'লেই সার্থকতা পাবে। তা নইলে, আমরা চলতি পথের যাত্রীরা বিদায় নিলে আধা অরাজক ভারতবর্ষে মাত্র কিছু দিন চলবে তোমাদের দৌরাত্ম্য। তারপর কি হবে সে ভবিষ্যৎ আমি কল্পনাও করতে পারি নে।"

আপিস ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল। বেয়ারা এসে বলল, "অর্থমন্ত্রী ফোন করছেন।" সরিৎসাগর সবার কাছে মাপ চেয়ে উঠতে উঠতে বললেন, "আমাকে ফোন করবার কোনও অর্থ নেই। তবু ওঁরা করেন। আমি এক্ষুণি আসছি।"

ক্রমশঃ

"আজও বাঁশী বাজে—"

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

পথ ঘুরে গেল…জয়রামবাটী…সাত মাইল।
সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হয়ে কত যাত্রী আসে,
মুকুলধরা আমগাছ, আকাশছোঁয়া তাল তমালের সারি,
বেণু বনের আঁকবাঁকা পথ, আমোদরের স্বচ্ছ নীল জল,
একে একে সরে দাঁড়ায় শেষ হয় সাত মাইল।
সারদা দেবীর পূত পুণ্য জন্মভূমি…
তাঁর পরশ রয়েছে এর মাটিতে—এর বাতাসে এর আকাশে।
মনের আকাশে অতীতের তারাগুলি ভিড় জমায়,
দেখি…পাঁচ বছরের মেয়ে গিয়েছে যাত্রা শুনতে,
ঐ পাশের গাঁয়ে…শিব সেজেছে…ঐ যে আত্মভোলা ছেলেটি…
মনে মনে…জনে জনে বলেছে ঐ আমার বর।

> সেদিনের স্বয়ম্বরা একদিন…সত্যি বরের মালা পরিয়েছিল,
> কামারপুকুরের ঐ যাত্রার দলের ছেলেটির গলায়।
> দেখলাম যেন…গদাধর বর বেশে এসেছেন,
> কত লোক এসেছে…যেখানে মাথা উঁচু করে উঠেছে মঠ।
> হয়ত…বরযাত্রীরা পাতা পেতে বসেছে বর-ভোজনে।
> কত কথা…কত আনন্দ…কত বিরহ মিলনের গাথা,
> মূর্ত্ত হয়ে আছে এর শ্যাম স্নিগ্ধ সময়ের দেওয়ালে।

সেদিন একটি মেয়ে শঙ্খ বাজিয়েছিল,
সিংহবাহিনীর মন্দিরে সে বুঝি আজও দাঁড়িয়ে আছে
দরজার পাশে দাঁড়িয়ে…সেই মেয়েটি আজও তার বাবাকে ডাকে…
মায়ের মন্দিরের আগল খুলে দাও।
দেবী সারদা…আর সিংহবাহিনী…
আমোদরের সানবাঁধা ঘাটে…আজও বুঝি কুলুকুলু ধ্বনি জাগে,
যখন মন্দিরে সন্ধ্যারতি হয়…
সন্ধ্যাতারা চেয়ে থাকে…জয়রামবাটীর আকাশে আকাশে।

জয়রামবাটীর মাটি মাথায় নিয়ে উঠে দাঁড়াই,
পথ বলে আর একটু এগিয়ে চলো···
তিন মাইল পথ।

ভূতির খাল পেরিয়ে গিয়ে···শিবের মন্দির আর হালদার পুকুর,
গাঁয়ের নাম কামারপুকুর।
গদাধরের নিজের হাতে লাগানো আমগাছ···সেই পর্ণকুটির,
ঢেঁকিশালের মাটির তিলক পরে মঠ দাঁড়িয়েছে।
রামকৃষ্ণ···নির্বিকল্প সমাধিতে বসে আছেন,
জোট বেঁধে ফুলেরা পায়ে লুটিয়ে পড়ে প্রতিদিন,
পরম পরিণতির বিপুল বিশ্বাস।

হঠাৎ দেখতে পেলাম যেন,
আপন হাতে আমগাছের চারাটি লাগিয়েছে···
যাত্রাদলের ছেলে গদাই···।
কেমন কচি কচি পাতায়...বেড়ে উঠেছে গাছটি,
চোখ ফেরান যায় না···চেয়ে চেয়ে দেখে আর দেখে।
কাল বোশেখীর ঝড়ে কেঁপে কেঁপে···দুলে দুলে উঠেছে সে,
বুক দিয়ে···জড়িয়ে ধরে আছেন কিশোর ঠাকুর সারাক্ষণ,
পাছে ঝড়ে ও ভেঙ্গে যায়···ও ব্যথা পায়।

ঝড় উঠেছে ঈশান কোণে···কালো কালো পুঞ্জীভূত মেঘের দৌরাত্ম্য,
সমগ্র মানবতার অমৃত-পাদপ ঝড়ের তাণ্ডবে কম্পমান,
বুঝি ভেঙ্গে পড়ে···বুঝি লুটিয়ে পড়ে ধুলায়।
কামারপুকুরের আমগাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছি,
দেখতে পেলাম যেন, কিশোর ঠাকুর আজও দাঁড়িয়ে আছেন,
আমগাছটি বুকে জাতীয় মুকুলের সমারোহে,
তাঁর মুখে অফুরন্ত হাসি···সেই হাসি।

জয়রামবাটী আর কামারপুকুর,
সারদাদেবী আর রামকৃষ্ণ ঠাকুর,
বৃন্দাবন আর মথুরা,

মাঝখানে তিন মাইল পথ,···কালের কালিন্দী
বাঁশী বাজে নিত্যকালের বিরহ যমুনার কূলে কূলে,
আজও বাঁশী বাজে।

——

বাংলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

দুর্গাপুর কংগ্রেস

শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় খ্যাতনামা খাদি-কর্ম্মী, নিষ্ঠাবান সমাজ কল্যাণব্রতী এবং গান্ধীভক্ত। তাঁহাকে আর যাহাই বলা চলে—কখনও মিথ্যাচারী, অন্যায়-অস্পষ্টভাষী এবং স্বার্থপর বলা যায় না। খাদির উন্নতি এবং প্রচারকল্পে তিনি তাঁহার এবং পরিজনবর্গের সকল স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া বিগত প্রায় ৪০ বৎসর পরম নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁহার বিচার-বুদ্ধিমত কাজ করিয়া যাইতেছেন। দুর্গাপুর কংগ্রেস অধিবেশন সম্পর্কে তাঁহার মতামত উপেক্ষা করা যায় না এবং এই মতামত কংগ্রেসী-অকংগ্রেসী সকলেরই শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, স্বয়ং মহাত্মাজীও সতীশবাবুর মতামত শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে, কখনও তাঁহার প্রতি কোন প্রকার উপেক্ষা প্রদর্শন করেন নাই।

'রাষ্ট্রবাণী' পত্রিকায় সতীশবাবু বলিতেছেন :

—কংগ্রেসের দুর্গাপুর অধিবেশন হইয়া গেল। প্রোগ্রাম মত সব ঠিক ঠিক নিষ্পন্ন হইয়াছে। উদ্যোক্তারা সন্তোষ অনুভব করিতে পারেন এমন সুন্দরভাবে অনুষ্ঠান ব্যবস্থিত ও পরিসমাপ্ত হইয়াছে।

কিন্তু দুর্গাপুর হইতে পাওয়া গেল কি? ৫৬ ঘণ্টা-কাল বিষয় নির্ব্বাচন কমিটির বৈঠক চলে। ৮ ঘণ্টায় দিন ধরিলে সাত দিনের সমকাল ধরিয়া বিচার-পরামর্শ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ দেশকে কি দিলেন? কিছুই না। তবে এত ঘটা করিয়া পরামর্শ করার সার্থকতা কি? পরামর্শ করার ঘটাটাই উহার সার্থকতা?—ভিতরে আর কিছু থাকার প্রয়োজন নাই?

তামাসা দেখাইয়া কংগ্রেসকে জনপ্রিয় করার দিন ইংরাজ আমলেই চলিয়া গিয়াছিল। এখন আড়ম্বর করাটা শুধু অনাবশ্যক নয়, অপরাধ। খোকাদের মত কেমন করিয়া সব বড় বড় নেতারা ক্ষুধার অপমানে ব্যর্থতায় অলক্ষ বঙ্গভূমিতে বসিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক অধিবেশনকে আমোদ আপ্যায়নে পরিতোষের ক্ষেত্র করিয়া কয়টা দিন কাটাইয়া যাইতে পারেন, ভাবিলে আশ্চর্য বোধ হয়।

কংগ্রেস সম্পর্কে ত জনতার কোনও উৎসাহ ছিল না—প্রদর্শনী সম্পর্কে ছিল। কিন্তু প্রদর্শনী সাজাইতে কংগ্রেস নগর গঠন করার প্রয়োজন ছিল না।

জনসাধারণের আগ্রহহীনতা এত বেশী ছিল যে কংগ্রেসের একটা খোলা অধিবেশন বিষয় নির্বাচন কমিটির মণ্ডপেই হয়। তবুও উহা পথের জনতাকে আহ্বান দ্বারা জনপূর্ণ করিতে হয়।

ব্যর্থতার শেষ দুর্গাপুরেই নয়। সেখানে এতটুকু আভাষ পাওয়া গিয়াছে যে, কংগ্রেস আর সে শ্রদ্ধামণ্ডিত সংস্থা নহে যাহা দেশের প্রাণস্পর্শ করিয়া কল্যাণের দিকে লইয়া যাইতে পারে।

এই ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়া আজ হয়ত দেখা দিবে না। যখন দেখা দিবে তখন হয়ত এমন আপদ লইয়া দেখা দিবে যে প্রতিকারের দিন অতীত হইয়া গিয়াছে।

যে যুবশক্তি দেশের প্রাণের স্পন্দনে সাড়া দিয়া থাকে সেই শক্তিকেও নানা মোহদ্বারা নিদ্রিত করিয়া রাখা হইয়াছে। মোহ বিতরণ করিতে খারাপ সিনেমাও একটা বড় মায়াময় জাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। খেলাধুলা কাল্‌চারেল সমাবেশ নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক উৎসব দ্বারা যুব-মন আচ্ছন্ন করিয়া রাখা হইয়াছে।

যখন জনগণ জাগ্রত হইবে তখন বিপ্লব দেখা দিবে। দেশে দেশে কালে কালে ইহাই হইয়া আসিয়াছে।

যুবশক্তি ও সত্যাগ্রহ

এই সত্যাগ্রহ কাহারা করিবেন? কাহারা সত্যাগ্রহের অমোঘ অস্ত্র প্রয়োগ করিবেন, পরিচালনা করিবেন? নিশ্চয়ই দেশপ্রেমিক যুবগণ। তাঁহারাই সকল দেশে সর্ব্বকালে পরার্থপরতায় উদ্দীপিত হইয়া আত্মত্যাগ ও আত্মবলিদান করিয়াআসিয়াছেন, এখানেও

তাহাই হইবে। যাঁহারা এদেশে গণতন্ত্র রক্ষা করিতে চান, সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে চান, ধনীকে আরও ধনী এবং গরীবকে আরও গরীব হইতে দিতে চান না—ধন-বৈষম্য দ্রুত দূর করিতে চান, জীবন-ধারণের উপযোগী বেতনের ব্যবস্থা করিতে চান, নিত্য অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ন্যায্য মূল্যে প্রাপ্তির ব্যবস্থা করিতে চান, বেকার সমস্যা দূর করিতে চান, তাঁহারাই দলে দলে এই সত্যাগ্রহে যোগ দিবেন। যত তাড়াতাড়ি এই সমস্যাগুলির সমাধান হয়, তত তাড়াতাড়ি চীনা কমিউনিষ্টদের প্রচেষ্টা নিষ্ফল হইবে। ধনীদেরও এই আন্দোলনকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করা উচিত, নতুবা ১৯১৭ সালে রুশে যাহা ঘটিয়াছিল, ১৯৪৯ সালে চীনে যাহা ঘটিয়াছে এখানেও রক্তাক্ত বিপ্লবের মাধ্যমে ধনিক সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করিয়া তাহাই ঘটিবে।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কলিকাতায় প্রেসের লোকের নিকট স্বীকার করিয়াছেন যে কংগ্রেসের প্রস্তাবের ও কার্য্যক্রমের মধ্যে ভীষণ পার্থক্য রহিয়াছে। একথা বলায় দুর্গাপুরে কংগ্রেস নেতারা অনেকে খুব অসন্তুষ্ট হন কিন্তু কংগ্রেসের সাধারণ কর্ম্মীরা এই কথা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছেন। তবুও সাহস ও দৃঢ়তার সহিত কাজে অগ্রসর হইতেছেন না—ইহাই পরম দুঃখের বিষয়।

দেশের দ্বারে সর্ব্বগ্রাসী মহাশক্তিশালী হিংসাশ্রয়ী চীন ভারতকে গ্রাস করিতে উদ্যত। জাগ্রত সত্যাগ্রহী জনশক্তিই এই শোচনীয় পতন রোধ করিতে পারে। যুবকগণ জাগো যুবতীগণ উদ্বুদ্ধ হও। সত্যাগ্রহ সংকল্প লও। সত্যাগ্রহে যোগদান কর।—

একই বিষয়ে 'পঞ্চায়েত' সাপ্তাহিক কি বলিতেছেন দেখুন :

—দুর্গাপুরে যে কংগ্রেস সম্মেলন হয়ে গেল তাতে যেটি সর্ব্বতোভাবে এবং সবচেয়ে বেশী প্রকট হয়ে উঠেছে তা হ'ল কংগ্রেসের জনপ্রিয়তার হ্রাস—ভুবনেশ্বরের পর এবং বিশেষ ক'রে গত পাঁচ-ছ মাসের মধ্যে জনপ্রিয়তার সব আবরণই তার খুলে পড়েছে। এই সঙ্গে আর একটি যে মূল জিনিষ অনুভূত হয়েছে বা হচ্ছে তা হ'ল কংগ্রেসের পাল্টা শক্তিশালী বিরোধী দলের অভাব, গণতন্ত্রের নিরাপত্তা ও দেশের সুষ্ঠু অগ্রগতির পক্ষে যা অপরিহার্য্য।

আমাদের রাজনৈতিক পর্য্যবেক্ষক দুর্গাপুরে সরেজমিনে হাজির থেকে জানাচ্ছেন : যে লক্ষ লক্ষ জনসমাবেশের আশায় বহু বহু লক্ষ টাকা সরকারী ও দলীয় সূত্রে খরচ ক'রে বিরাট্ রাজকীয় আয়োজন করা হয়েছিল সে আশা সম্পূর্ণই মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে। আরটিএ তথা ডিএম ও কংগ্রেসের চাপে চারি দিক থেকে যে-সব বাস দুর্গাপুর গিয়েছিল তারা যাত্রীর অভাবে অনেকেই আর যায় নি এবং যারাও বা গিয়েছিল তাদের দারুণ লোকসান হয়েছে। তারা অভিশাপ দিচ্ছে। ট্রেণেও আদৌ ভিড় ছিল না। দোকানগুলিতে বেচা-কেনা এতই কম ছিল যে, মোটা টাকার ভাড়া দিয়ে তারা মাথায় হাত দিয়ে বসেছিল। তবে, অবশ্য, ঢালাও পারমিটের মালের চোরাবাজারে লাভটা ভালই হয়েছে। কংগ্রেসের ভাড়ারে বা রান্নাশালাতেও লোকের অভাবে অপরিসীম অপচয় হয়েছে, যা দেখে এই দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্ম্মূল্যের দিনে দর্শকরা হতভম্ব হয়ে গেছে। রবিবারের জনসভায় আশা ছিল ৩।৪ লাখ লোক হবে, কিন্তু যা হয়েছিল তা ৩০-৩৫ হাজার হবে কি না সন্দেহ। আর প্রস্তাব ও ভাষণাদি? তা ইংরাজীতে যাকে বলে 'নূতন বোতলে পুরাতন মদ'—ছেঁদো কথার চর্ব্বিত চর্ব্বণ। তবে, মন্ত্রী ও নেতারাও ঘনায়মান বিপজ্জনক সঙ্কট এবং নিজেদের চরম ব্যর্থতা সম্বন্ধে সচেতন, তা তাঁদের ভাষণের মধ্যে থেকেই সবিশেষ প্রকাশমান। তাঁরা আশার বাণী শোনাবার চেষ্টা করেছেন,—এবার ঠিক পথে জোর কদমে চলবেন ব'লে জানিয়েছেন জনে জনে। কিন্তু পথটাই বা কি এবং কদমটাই বা কি তালের, সে সম্বন্ধে সজ্ঞানে নীরব ছিলেন। তবে একটা কথা—এবার সমাজবাদের বা সোস্যালিজমের কপচানিটা অনেক কমেছে—অনেক, অনেক। মানুষের পেটের অন্নের সংস্থান করবার পথ না পেয়ে এবার পারমাণবিক অস্ত্র সম্বন্ধে বীরোচিত তড়পানিটা বেশ জোরদার ছিল এবং "চোরের মার" মত মেননজীর তড়পানি বেশ উপভোগ্যই হয়েছিল। হুগলী-হাওড়া শিবিরে জোর একচোট মারদাঙ্গাতে মিয়ানো ভাবটা কেটেছিল। ভিড় ছিল সরকারী ছোট-বড় অসংখ্য কর্ম্মচারীর আর স্বেচ্ছাসেবক-সেবিকার। প্রদর্শনীটা সরকারী বললেই ঠিক বলা হয়।—মনে হয় যেন সমগ্র অনুষ্ঠানটাই সরকারী। সরকারী অর্থও ব্যয় হয়েছে বহু লক্ষ।

কংগ্রেসের এখনও ভরসা যে শক্তিশালী বিরোধী দল গড়ে ওঠে নি। জনসাধারণের, আবার, তার জন্যই নিদারুণ আক্ষেপ। আকাশ থেকে তা গ'ড়ে ওঠে না, জনসমর্থনেই জনসহযোগেই যে তা গ'ড়ে ওঠে, এই মূল

কথাটাই যদি জনসাধারণ বুঝে ওঠেন তবে কংগ্রেসের সমাধি ও দেশের দুর্ব্বার অগ্রগতি সুনিশ্চিত। তা না হলে ঘনায়মান সঙ্কট দেশকে তছনছ করে দেবে, দেশ সংহতি ও জাতীয়তার শত্রুরা তার সুযোগ নেবে,—তার জন্য ওঁৎ পেতে আছে ভেতরে ও বাইরে।

দুর্গাপুরের কঠোর সঙ্কেত সফল হোক, দুর্ব্বার গণতান্ত্রিক বিরোধী দল গড়ে তুলতে জনগণ অগ্রসর হোন, সংগ্রামী জনশক্তি গড়ে উঠুক!—

উঠিবে কি?

এইবার দেখুন বর্দ্ধমানের 'দামোদর' সাপ্তাহিক কংগ্রেসের দুর্গাপুর সেসন বিষয়ে কি বলেন :

দুর্গাপুরে : দধি কর্দ্দম

—না, দুর্গাপুরে কংগ্রেসী সার্কাস বিশেষ জমজমাট হইল না। পাঁচ দিনব্যাপী অধিবেশনের চারিটি দিন নিতান্ত ফাঁকা ফাঁকা গিয়াছে, শেষ দিন শীতকালের রবিবার। কলিকাতা হইতে বিত্তবানদের সারি সারি মোটরকারের চড়ুইভাতি ভ্রমণকারীর সংখ্যায় এবং তাঁবেদার সংবাদপত্রগুলির কল্যাণে ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া ভীড় দেখাইলেও জনসাধারণের ভক্তি ও আগ্রহের আসল রূপটি পরিস্ফুট হইয়া গিয়াছে। একেবারে নাককান কাটা তাঁবেদার কংগ্রেসী জয়ঢাক পত্রিকাগুলির কথা ছাড়িয়া দিলেও যে-সব পত্রিকা কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষক অথচ সংযত তাঁহারাও এবারে কংগ্রেস অধিবেশনের মৃদু সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন, এত ঘটা করিয়া দরিদ্র দেশে এত অর্থ ব্যয় করিয়া এইরূপ একটা বার্ষিক অধিবেশন করিবার কোন অর্থ হয় না। দামোদরের সংবাদ'সংগ্রহকারী কয়েকদিনের অধিবেশনে কংগ্রেসের নানা শিবিরে পরিভ্রমণ করিয়া কংগ্রেস প্রতিনিধি ও কর্ম্মীদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করেন নাই। জনসাধারণ, বিশেষ করিয়া শিক্ষিত যুবকগণ দুর্গাপুরের কংগ্রেস অধিবেশন পরিদর্শন করিয়া অর্থের চরম অপচয়ে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষকে ধিক্কার দিয়াছেন। এবার নিতান্ত স্বল্প টাকায় দুর্গাপুর কংগ্রেসের অধিবেশন হইতেছে এবং যে কয়েক লক্ষ টাকা এজন্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা সাধারণ লোকই দিয়াছে, ধনী ও ব্যবসাদারদের নিকট হইতে লওয়া হয় নাই—এই সব জলজ্যান্ত মিথ্যা উক্তি কংগ্রেস-নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ ঘোষণা করিলেও কেহ বিশ্বাস করে নাই। আমরা বর্দ্ধমানবাসী প্রত্যক্ষভাবেই জানি, যে বর্দ্ধমানের কুখ্যাত চাউল কল মালিকটি ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হইয়া কয়েকদিন কারাগারে গম্মার পিণ্ডি গিলিয়া মোটা জামিনে মুক্তি পাইলেন। পরিশেষে তিনি দুর্গাপুর কংগ্রেসে সরাসরি শ্রীঘোষের হাতে কয়েক সহস্র মুদ্রা নিক্ষেপ করিয়া শুদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত মিলিবে। শেষ পর্য্যন্ত অধিবেশন শেষে মোটা মুনাফার আংশিক নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিকে ৫০ হাজার টাকা দান করিবার সংবাদও সংবাদপত্রে দেখিতেছি। যাহা হউক শ্রীঘোষের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইয়াছে। এক্ষণে জনসাধারণের বিচার্য্য এত পর্ব্বত-প্রমাণ ব্যয় ও বায়নাক্কার ফলে শেষ পর্য্যন্ত মূষিকই প্রসব করিল, যাহা স্বাধীনতা প্রাপ্তির ১৮ বৎসরে জাতির সমস্ত শিরা-উপশিরাকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিতেছে। সমাজতন্ত্রের ভাঁওতা বুলি কপচাইয়া সমগ্র জাতিটাকে দিনের পর দিন অর্দ্ধাহারে রাখিয়া নির্ব্বীর্য্য করিয়াছে। আজ আবার সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুধাতুর রেশনের রাজ্যে রাজসূয় যজ্ঞ করিতে আসিয়া পশ্চিম-বাংলাকে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ উপহাসই করিয়া যাইলেন। কংগ্রেসী ধুলোটের দধিকর্দ্দমে নেতৃবৃন্দ দধি ভাগ এবং জনসাধারণ কর্দ্দম অংশ প্রাপ্ত হইলেন।—

'দৃষ্টি'র দৃষ্টিতে দুর্গাপুরে কংগ্রেস কিরূপ

--দুর্গাপুরে কংগ্রেসের ৬৯তম অধিবেশন নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হইয়াছে। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে এখানে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হইয়াছিল এবং তাহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নদীয়া জেলায় কল্যাণীতে কংগ্রেসের আর একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

কংগ্রেসের অধিবেশনের জন্য নদীয়ায় শুষ্ক মাঠ কল্যাণীতে রূপান্তরিত হইয়াছে, যদিও স্বাভাবিক দুর্য্যোগে অধিবেশন জমিয়া উঠে নাই। দুর্গাপুরে স্বাভাবিক কোন দুর্য্যোগ ছিল না; আড়ম্বর ছিল প্রচুর; শনি ও রবিবারে দর্শনার্থীর অভাব ছিল না, তথাপি অধিবেশন প্রাণবন্ত হয় নাই।

কল্যাণীতে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও শ্রীজওহরলাল নেহরু উপস্থিত ছিলেন। নব দুর্গাপুর ডাক্তার রায়ের সৃষ্টি এবং তাঁহার নাম বহন করিলেও মৃত্যু তাঁহাকে অপসারিত করিয়াছে; জ্যোতি ও প্রদর্শনীতে জওহর থাকিলেও শ্রীজওহরলাল নেহরু ছিলেন না। দুর্গাপুরের আদ্যন্তে ছিলেন শ্রীঅতুল্যচরণ ঘোষ, মধ্যে ছিলেন শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, অন্তে ছিলেন শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়।

কংগ্রেস অধিবেশনের আয়োজনের কার্য্যে প্রথমাবধি সরকারী যন্ত্র নিয়োজিত হইয়াছিল। পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রে সরকারী যন্ত্র দল-নিরপেক্ষ। কার্য্যতঃ কংগ্রেস

দল কংগ্রেসের সহিত সরকারকে একীভূত করিয়া ফেলিয়াছেন। কংগ্রেসের দুর্গাপুর অধিবেশন ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বাঁশ হইতে বিজ্ঞাপন ও বাস সংগ্রহ পর্য্যন্ত প্রতিটি কর্ম্মেই সরকারী লোক ও সরকারী প্রভাব নিয়োজিত হইয়াছিল।

বিভিন্ন রাজ্য হইতে প্রতিনিধি ও কংগ্রেসকর্ম্মীগণকে দুর্গাপুরে আনিবার জন্য ট্রেণের ব্যবস্থা হইয়াছিল অকৃপণভাবে; অনেক স্পেশ্যাল ট্রেণ প্রায় আরোহীশূন্য অবস্থায় দুর্গাপুরে উপনীত হয়; প্রথম কয়েকদিন আয়োজিত ভোজ্যদ্রব্যের বহু অংশের অপচয় হয়। ওয়ার্কিং কমিটির শূন্য পদ পূরণের জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বহুজনকেই বিশেষভাবে সংবাদ প্রেরণ করিয়া ভোট দিবার জন্য আনা হয়। অর্থাৎ দুর্গাপুরের কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদানের জন্য কংগ্রেস কর্ম্মীগণের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল না।

ভুবনেশ্বরে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র লইয়া বিতর্ক ছিল। দুর্গাপুরে এ প্রশ্ন ছিল না, কথা ছিল রূপায়ণের প্রশ্ন লইয়া, কথা ছিল চীনের অ্যাটম বোমা উদ্ভুত পরিস্থিতি লইয়া; কথা ছিল খাদ্য, কৃষি, দাম ও বেকার সমস্যা লইয়া; কথা ছিল দুর্নীতি লইয়া। কোন কথাই জমে নাই।

মহাত্মা গান্ধীর জীবিতাবস্থায় মহাত্মার কথাই কার্য্যতঃ কংগ্রেসের কথা ছিল। তাঁর পরবর্ত্তীকালে প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুর কথাই কংগ্রেসের কথা হয়। এখন নেহরু পরলোকগত; তাঁহার ব্যক্তিত্বের অধিকারী কোন পুরুষই কংগ্রেস নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত নহেন। কথা হইয়াছে কংগ্রেসে সকলে মিলিয়া-মিশিয়া চলিবেন—যৌথ নেতৃত্বে। কথা উঠিয়াছে কংগ্রেস দল এতকাল শ্রীনেহরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকারের অনুগমন করিয়া আসিয়াছেন; অতঃপর কংগ্রেস দল কংগ্রেস সরকারকে পরিচালিত করিবেন। প্রতিবারের ন্যায় এবারেরও কথা হইয়াছে আড়ম্বর বাদ দিয়া সাদাসিদে কাজের কংগ্রেস করিতে হইবে।

শ্রীনেহরুর সম্মতিসহ নাসিকে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে কংগ্রেস গণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট গঠিত হইয়াছিল; অতুল্য-বাবুদের ভীষণ চাপে ফ্রণ্ট ভাঙ্গিয়া যায়।

কংগ্রেসের সোসিয়ালিষ্ট ফোরাম নিঃসন্দেহে শ্রীনেহরুর আশীর্ব্বাদ হইতে বঞ্চিত হয় নাই; অতুল্য-বাবুদের চাপে গণতান্ত্রিক সোসিয়ালিজম উপচাইয়া পড়িতেছে। তলদেশে ফোরাম টিঁকিবে কি না সন্দেহ।

দুর্গাপুরে ফোরামের সভা অনুষ্ঠানের জন্য অনুমতিও ফোরাম নেতৃত্ব দুর্গাপুরের উদ্যোক্তাগণের নিকট হইতে পান নাই।

তদুপরি রাঁচীর ছোট্ট কংগ্রেস, শ্রীদয়বার সিংহের সহিত শ্রীকেশবদেও মালব্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কংগ্রেস নেতৃত্বের দীর্ঘদিনের আড়ম্বরপ্রিয়তার অভ্যাস এবং কর্ত্তা-ভজা বৃত্তি কংগ্রেসকে নূতন সংকল্পে বলীয়ান হইয়া নূতন পথে যাইতে দিবে বলিয়া মনে হয় না।

দলীয় শাখা কাশ্মীরে বিস্তারিত করিয়া দুর্গাপুরে কংগ্রেস একটি ভাল কাজ করিয়াছেন।—

দুর্গাপুর কংগ্রেস সম্পর্কে এই প্রকার আরও বহু মতামত প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু স্থানাভাব বলিয়া সব দেওয়া গেল না। কিছুকাল পূর্ব্বে প্রখ্যাত 'The Statesman' পত্রিকায় বিগত দুর্গাপুর কংগ্রেস অধি-বেশন সম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। বলা বাহুল্য, ঐ রিপোর্ট বঙ্গ-প্রধান শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয়ের ভাল লাগে নাই—না লাগিবারই কথা, কারণ রিপোর্টে কংগ্রেসের আলোচ্য অধিবেশনের আর্থিক দিকটি লইয়া স্পষ্ট বিরুদ্ধ নানা মন্তব্য করা হয়—অতুল্যবাবু ঐ রিপোর্টের প্রতিবাদ করেন, তাহাও উক্ত পত্রিকায় পুরাপুরি প্রকাশ করা হয়—কিন্তু প্রবল-প্রতাপ আগামী কংগ্রেসপতি শ্রীঘোষ মহাশয়, পরে প্রকাশিত ষ্টেটস-ম্যানের তিক্ত সম্পাদকীয় মন্তব্যের কোন জবাব এখন দিলেন না কেন (দিয়া থাকিলে তাহা আমাদের চোখে পড়ে নাই)? সে যাহাই হউক, কংগ্রেস অধিবেশন সম্পর্কে আমরা এবার যে-সকল মন্তব্যাদি প্রকাশ করিলাম তাহা 'The Statesman'-এর মন্তব্য অপেক্ষা বহুগুণে উগ্র, স্পষ্ট এবং দ্বিধাহীন। আশা করি শ্রীঘোষ এইগুলির যথাযথ জবাব দিয়া কংগ্রেসভক্ত, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও বিষম-তাপিত চিত্তে কিছু শান্তিবারি সিঞ্চন করিবেন। প্রখর-প্রতাপ বঙ্গপ্রধানের প্রতিবাদ-মন্তব্যাদি আমরাও প্রকাশ করিতে সকল সময় প্রস্তুত থাকিব।

আর একটি কথা: অতুল্যবাবু ঘোষণা করেন যে, দুর্গাপুর নব-নির্ম্মিত রেল ষ্টেশনটি কংগ্রেসের জন্য নির্ম্মিত হয় নাই—হইয়াছে সাধারণের ব্যবহারের জন্য এবং উহা বরাবর থাকিবে। অতুল্যবাবু দয়া করিয়া একটু খোঁজ লইয়া জানাইবেন কি—বর্ত্তমানে 'ডাঃ বি. সি. রায় রেল ষ্টেশনটি' এখন কোথায় অবস্থিত এবং কোন্ বিশেষ "সর্ব্বসাধারণের" জন্য ব্যবহৃত হইতেছে?

পূর্ব্ব পাকিস্তানে বাঙ্গালী হিন্দু আর কতদিন ?

সম্প্রতি প্রকাশিত রিপোর্ট হইতে জানা যাইতেছে যে, পূর্ব্ব পাকিস্তানে এখনও যে-সমস্ত বাঙ্গালী হিন্দু কোন-ক্রমে সকল অত্যাচার নিপীড়ন সহ্য করিয়া টি'কিয়া আছেন—আয়ুব খাঁ'র নির্ব্বাচনের পর তাঁহাদের মনোবল নিভিয়া গিয়াছে—পূর্ব্ব পাকিস্তানের উপর তাঁহাদের আর কোন বিশ্বাস নাই। এ বন্দী জীবন তাঁহাদের পক্ষে আর বেশী দিন সহ্য করা অসম্ভব। 'বারাসাতে' প্রকাশিত রিপোর্টে সবই স্পষ্ট প্রতিফলিত :

—পূর্ব্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘু হিন্দুদের বসবাস সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। নেহরু-লিয়াকত চুক্তির আর কোন দাম নাই। অথচ পূর্ব্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের ভারত প্রবেশের পথ মাইগ্রেশন প্রথার পর্ব্বতে আটক পড়িয়া আছে। মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট ব্যতীত পূর্ব্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের ভারতে আসা বাস্তব ক্ষেত্রে এক দুঃখজনক কাহিনী। কেননা ভারত সরকার মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট ব্যতীত পূর্ব্ববঙ্গাগত আশ্রয়-প্রার্থীদের উদ্বাস্তু হিসাবে স্বীকার এবং গ্রহণ করিতেছেন না। পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু পরিবারের মধ্যে যাঁহারা পূর্ব্বে ভারতে আসিয়াছেন এবং কিছুটা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন একমাত্র ঐ সকল পরিবারের লোকজন মাইগ্রেশন সার্টিফকেট না লইয়া ভারতে আসিতেছেন। তাঁহাদের কেহ কেহ পাকিস্তানের পাশপোর্ট ভারতে ফেরত দিতে-ছেন এবং অধিকাংশই পাশপোর্ট ছাড়া সীমান্ত ডিঙ্গাইয়া ভারতে আসিতেছেন। ইঁহারা সরকারের সাহায্য সহানুভূতির প্রত্যাশা তেমন করেন না। আত্মীয়-স্বজনের সাহায্যের উপর নির্ভর করিতেছেন। এরূপ ভারত প্রবেশকারী হিন্দুদের সংখ্যা খুব কম নহে। অথচ লক্ষ লক্ষ পূর্ব্ব পাকিস্তানের হিন্দু পরিবার ভারতে নিরাপদ আশ্রয় লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্ব পাকিস্তান এক বিভীষিকার রাজত্বে পরিণত হইয়াছে। অত্যাচার উৎপীড়নের সীমা নাই শেষ নাই। হিন্দুদের সামান্য বিষয়-সম্পত্তি বিক্রয় ও হস্তান্তরের কোনরূপ অধিকার নাই। দুর্দ্দিন দুরবস্থায় সামান্য বিষয় বিক্রয় বা হস্তান্তর করি-বারও উপায় নাই। পূর্ব্ব পাকিস্তানের শেষ আশা ছিল আয়ুব খাঁনের পরিবর্ত্তে মিস্ ফতেমা জিন্না পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট হইলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের প্রতি কিছুটা সুবিচার করা হইবে। সেই ক্ষীণ আশার আলো নিভিয়া গিয়াছে। এখন এক দুঃসহ জীবনের সম্মুখে পাকিস্তানের হিন্দুরা উপস্থিত হইয়াছে। যখন-তখন হিন্দুদের উপর গুণ্ডাদের হামলা, অত্যাচার আরম্ভ হইতে পারে। পূর্ব্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের প্রধান ভীতির কারণ হইতেছে চীন-পাক মিতালি। পাকিস্তানের উপর হইতে গোপনে সার্কুলার দ্বারা সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, কোন হিন্দু পরিবারের পাকিস্তান ত্যাগের বাধা প্রতিবেশী মুসলমান-গণ দিতে পারিবে না। এবং আরও নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, পূর্ব্ব পাকিস্তানের হিন্দুরা পাকিস্তানের দুশমন এবং পাকভূমি হইতে তাহাদের বিতাড়িত করিবার চেষ্টা প্রত্যেক পাকিস্তানী মুসলিমদের করিতে হইবে। পূর্ব্ব পাকিস্তানের অবাঙালী মুসলমানেরা হিন্দুদের উপর উৎপীড়ন, অত্যাচার করিতে লালায়িত, কেবলমাত্র বাঙ্গালী মুসলমানদের বাধায় তাহাদের লালসা চরিতার্থ হইতে পারিতেছে না। খুলনা, ফরিদপুর, যশোহর কয়েকটি জেলায় বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে তীব্র রেষারেষি চলিতেছে এবং কয়েক স্থানে ইতিমধ্যে তাহাদের মধ্যে মারপিট, দাঙ্গা হইয়াছে। পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে হিন্দু উচ্ছেদের পূর্ব্ব পরিকল্পনা ধীরে ধীরে ফলপ্রসূ হইতেছে। পূর্ব্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের মধ্যে যেরূপ আতঙ্ক ভীতি সৃষ্টি হইয়াছে ১৯৬৫ সালের মধ্যে পুনরায় লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু ভারতে উপস্থিত হইতে পারে। প্রত্যেকের মুখে এক কথা, "আর থাকা যাবে না।" মাইগ্রেশন সার্টিফিকেটের প্রত্যাশায় হাজার হাজার পরিবার পাকিস্তানে অপেক্ষা করিতেছে।—

এদিকের বহু সংবাদে জানা যায় যে, দণ্ডকারণ্যেও নানা প্রকার প্রশাসনিক এবং অন্যান্য কারণে হাজার হাজার বাঙ্গালী উদ্বাস্তু দ্বিতীয়বার উদ্বাস্তু হইবার মুখে। যাহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া এ-পারে আসিতে বাধ্য হয়, মহাবীর ত্যাগীর সুষ্ঠু শাসনে তাহারা কি আবার ও-পারে যাইবে—ধর্ম্মবদল করিয়া ?

ত্রিপুরার অভিযোগ—সীমান্ত যোগাযোগ

ত্রিপুরার 'সমাচার' সমাচার দিতেছেন :

—কেন্দ্রীয় যোগাযোগ দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীবিজয় ভগবতী সম্প্রতি রাজ্যের বিলোনিয়া মহকুমার প্রত্যন্ত সীমান্ত অঞ্চলে একটি নূতন ডাক ও তার অফিসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তাঁহার প্রদত্ত এক বক্তৃতায় রাজ্যের সীমান্তের অগ্রবর্ত্তী অঞ্চলসমূহের সহিত অভ্যন্তরের সকল প্রকার যোগাযোগ উন্নয়নের বিষয়টির প্রতি গভীরভাবে গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, এই যোগাযোগ স্থাপনের কাজ যত দ্রুত সম্পাদিত হয় ততই নিরাপদ। স্বাধীনতার পর সমগ্র দেশেই যোগাযোগ উন্নয়নের যে

ব্যাপক উদ্যম নিয়োজিত হয় তাহাতে আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা যে পরিমাণ উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহার তুলনায় সীমান্ত যোগাযোগের বিষয়টি এতকাল মোটেই গুরুত্ব লাভ করে নাই। ভারতের সীমান্তে চীনা আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্ন মারাত্মক জটিলতায় প্রকট হইয়া উঠিলেও সেই উদ্যোগ সম্পন্ন করার অবকাশ তখন আর অবশিষ্ট ছিল না।

উত্তর সীমান্তের এই ভয়াবহ শিক্ষাকে বিস্মৃত হওয়া আমাদের পক্ষে যে আত্মহননেরই সমান হইবে এই কথার পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র। ত্রিপুরার ৭২০ মাইল বিস্তৃত প্রায় অরক্ষিত সীমান্ত অঞ্চলে দিনে-রাত্রিতে যে লুণ্ঠন, গৃহদাহ চুরি, জোচ্চুরির অবাধ অরাজকতা চলিতেছে সমস্যার জটিল মানচিত্রের সহিত যোগাযোগের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটিকে এখন এক করিয়া বিচার করা উচিত। দুরধিগম্য, পর্ব্বত অরণ্যসঙ্কুল যে ক্ষীণ যোগাযোগ রাস্তাসমূহ অধিকাংশ অগ্রবর্ত্তী সীমান্ত অঞ্চলের সহিত অভ্যন্তরের যোগাযোগ রক্ষা করিতেছে উহা দ্বারা সীমান্ত নিরাপত্তার আপৎকালীন সাহায্য ত দূরের কথা, সীমান্তবাসীর জন্য প্রতিদিনের চাল, ডাল, তেল, নুন নিয়মিত পৌঁছাইতে পারে না। ত্রিপুরার বিস্তৃত সীমান্তে একদিকে অব্যাহত পাকিস্তানী হানাদারী, অন্যদিকে অন্নাভাব, দ্রব্যমূল্যের অবাধ ঊর্দ্ধগতি এবং পরিস্থিতির অবনতির সুযোগে ব্যাপক চোরাকারবারীর মুখে ত্রিপুরার সীমান্ত-জীবন আজ বিপন্ন।

ত্রিপুরার সীমান্ত যোগাযোগের প্রশ্নটিকে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টই বা এত ছোট করিয়া দেখিতেছেন কেন? ত্রিপুরার জনপ্রিয় মন্ত্রীমণ্ডলী এত প্ল্যান করিতেছেন, এত জায়গায় ফিতা কাটিয়া বেড়াইতেছেন কিন্তু এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিতে তাহাদেরই অনীচ্ছা থাকিবে কেন? আসন্ন পরিকল্পনায় রাজ্যের যোগাযোগ উন্নয়নের জন্য সর্ব্বাধিক ব্যয়বরাদ্দ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। রাজ্যের সীমান্ত যোগাযোগ উন্নয়নের সামগ্রিক পরিকল্পনা এই বরাদ্দের অন্তর্ভুক্ত কবার জন্য আমরা পূর্ব্বাহ্ণেই প্রস্তাব করিতেছি।—

'সমাচারের' মতে যাহা একান্ত প্রয়োজনীয়—কর্ত্তাদের মতে সে রকম না হইতেও পারে। বর্ত্তমানে দেশের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—ভারতে হিন্দীর সর্ব্বাত্মক প্রচলন এবং ইণ্ডিয়াকে 'হিণ্ডিয়া' করিয়া দেশের সংহতির প্রতিষ্ঠা করা পাকা ভিত্তিতে!

সর্ব্বভারতে হিন্দীর মাধ্যমে সরকারী-বেসরকারী যোগাযোগ একবার স্থাপিত হইলেই 'সীমান্ত-যোগাযোগ সমস্যার সকল সমাধান এক মিনিটেই হইয়া যাইবে এ-বিষয়ে ত্রিপুরার মাননীয় মন্ত্রীমণ্ডলকে দোষ দেওয়া বৃথা—কারণ, কেন্দ্রের মুখ চাহিয়া তাঁহাদের থাকিতে হইবেই! ইংরেজ আমলেও প্রদেশগুলির যে সকল বিষয়ে বহু স্বাধীনতা ছিল, কংগ্রেসী-শাসনে আজ রাজ্যগুলি সেই সব স্বাধীনতা একটির পর একটি নিজেদের দোষে কিংবা অযোগ্যতার কারণে কেন্দ্রের হাতে তুলিয়া দিতে লজ্জাবোধ করিতেছেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ—কিছুকাল পূর্ব্বে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কলিকাতায় আসিয়া—দাঙ্গা দমনে—কি ভাবে কলিকাতা পুলিশের কার্য্যাদি পরিচালন ব্যবস্থা করেন তাহা উল্লেখ করা যায়। আরও বহু দৃষ্টান্ত আছে কিন্তু বৃথা তালিকা বৃদ্ধি করার কোন প্রয়োজন আছে কি?

ত্রিপুরায়—পূর্ব্ব পাকিস্তান আগত উদ্বাস্তু—না ঘাটকা না ঘরকা

—পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে ত্রিপুরায় আগত শরণার্থীদের পুনর্ব্বাসনের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার অতঃপর আর বহন করিতে পারিবেন না—এই কথা ইদানীং সরাসরিভাবে ত্রিপুরাকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সংবাদটি নিঃসন্দেহে উদ্বেগের। নির্দ্দেশে বলা হইয়াছে: ত্রিপুরায় আগত শরণার্থী উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা অতঃপর ত্রিপুরার অভ্যন্তরেই সম্পন্ন করিতে হইবে।

ত্রিপুরায় যে শরণার্থী পুনর্ব্বাসন-এর শেষ সুযোগটুকুও ফুরাইয়াছে—এই আলোচিত সত্য ও তথ্য সম্পর্কে বহুবার ইতিপূর্ব্বে কেন্দ্রের চেতনা সৃষ্টির চেষ্টা হইয়াছে এবং হইতেছে। সরকারী তথ্যে দেখা যায়, এখনও প্রতিদিন ৩০।৩৫টি শরণার্থী পরিবার নিয়মিত ত্রিপুরায় প্রবেশ করিতেছে। ৪ লক্ষ নাগরিক অধ্যুষিত ত্রিপুরার লোকসংখ্যা হালে প্রায় ১৪ লক্ষের উপরে। বিগত এক বৎসরে বিপুল হারে শরণার্থী প্রবেশের ফলে রাজ্যের আর্থিক অবস্থা প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। ত্রিপুরায় এমন বহুসংখ্যক উদ্বাস্তু গড়াগড়ি খাইতেছে যাহাদের এখনও কোন পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা করা যায় নাই। রাজ্যের বিভিন্ন সাময়িক শিবিরগুলিতে অবস্থানরত উদ্বাস্তু পরিবারের সংখ্যা এখনও চার হাজার। এই রাজ্যে জমিতে আর অধিক সম্প্রসারণের

সুযোগ নাই। যোগাযোগহীন এই সীমান্ত রাজ্যে পরিকল্পিত শিল্পোন্নয়নের পক আম্রফল কবে আমাদের জীর্ণ রসনায় ছিঁড়িয়া পড়িবে সে-কথা ভবিতব্যই বলিতে পারেন।

সহস্র সমস্যাকণ্টকিত ও আর্থিক দিক হইতে চূড়ান্তভাবে বিপন্ন এই রাজ্যের উপর পুনর্ব্বাসনের দুর্ব্বহভার চাপাইয়া দেওয়ার চেষ্টাকে আমরা কেন্দ্রের অত্যন্ত দায়িত্বহীন সিদ্ধান্ত বলিয়াই বর্ণনা করিতেছি।

ইতিপূর্ব্বেও একই প্রশ্ন তুলিয়া সমস্যাকে দুই-একবার জটিলতর করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রীয় দায়িত্ব এবং সমস্যার ব্যাপকতা সম্পর্কে আমরা মোটেই অবহিত নই। কিন্তু মৃত অশ্বের পিঠে চাবুক চালাইয়া ফল কি হইবে? ত্রিপুরার পক্ষে পুনর্ব্বাসনের দায়িত্ব গ্রহণ একেবারেই অসম্ভব এবং অন্যান্য রাজ্যের সহযোগিতায় কেন্দ্রীয় সরকারকেই যখন তাহা নিষ্পন্ন করিতে হইবে—তখন এই নিরর্থক সিদ্ধান্তের দ্বারা সমস্যাকে বিড়ম্বিত করিয়া লাভ কি?—

('সমাচার')

এ-বিষয় পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরা 'একই প্রকার ফুটা-নৌকায়'! কেন্দ্রীয় সরকারের নব-কর্ত্তারা ক্রমশ উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে তাঁহাদের মনোগত প্রকৃত ইচ্ছা প্রকাশ এবং তাহার প্রয়োগ ধীরে ধীরে করিতেছেন। দেশ বিভাগের সময় বড় গলা করিয়া যাঁহারা পূর্ব্ব পাকিস্তানের হিন্দু উদ্বাস্তুদের সকল প্রকার দায়-দায়িত্ব লইবার ব্রত লয়েন, তাঁহাদের অনেকেই আজ হিসাব-নিকাশের দায় এড়াইয়া অন্য-লোকে প্রস্থান করিয়াছেন। বাকী যাঁহারা আছেন তাঁহাদের একদল মেকি, একদল খেঁকি এবং আর এক দল অকর্ম্মার ঢেঁকি। কথায় কথায় ইঁহারা কেন্দ্রের অর্থাভাবের কথা তোলেন—মনে হয় অর্থটা যেন কেন্দ্রের কোন পৈতৃক জমিদারী হইতেই আসে। অথচ অযথা অকাজে ইঁহাদের কোটি কোটি টাকা নষ্ট করিতে আটকায় না কেন? পাঁচ-সালা পরিকল্পনায় অযথা কত হাজার কোটি টাকায় কাহার পিতার শ্রাদ্ধ হইয়াছে, তাহার কোন হিসাব আছে কি? এই কর্ত্তাদের যদি কোন প্রকারে একবার বছর কয়েকের জন্য উদ্বাস্তু করা যায়, একমাত্র তাহা হইলেই এই সিংহ চর্ম্মাবৃতের দল বাঙ্গালী উদ্বাস্তুর দুঃখ-বেদনা হয়ত খানিকটা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কিন্তু আমাদের এ-আশা পূর্ণ হইবে কি?

প্রজাতন্ত্র প্রহসন?

'দামোদর'-এর মতে:

—১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট দেশ পরশাসন বিমুক্ত হইলেও ভারতের গণপরিষদ কর্ত্তৃক রচিত সর্ব্ববাদী-সম্মত সংবিধানকে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী হইতে আমরা অনুসরণ করিতেছি এবং ঐ দিনই প্রজাতান্ত্রিক ভারতবর্ষ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এবারের ২৬শে জানুয়ারী প্রজাতান্ত্রিক ভারত ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিল। ভারতের পবিত্র সংবিধানকে মনে-প্রাণে স্বীকার করিয়া লইবার পর হইতে গণতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত সরকার তাহার কতটা কার্য্যকরী করিয়াছে প্রজাতন্ত্রের ষোড়শ বর্ষে পদার্পন করিয়া তাহার হিসাব-নিকাশ খতাইয়া দেখা স্বাভাবিক। স্বাধীনতার সঙ্কল্প গ্রহণের সেই পবিত্র দিন ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সত্যকারের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্মদিবস এই সাধারণতন্ত্র দিবস সাধারণতন্ত্রী ভারতের জনগণের বিচার্য ও আলোচনার এবং সরকারের নিকট ইহা কৈফিয়ৎ চাহিবার দিন। চাণক্যের সংহিতামতে 'প্রাপ্তেতু ষোড়শে বর্ষে—' ভারত আর নাবালক নহে। গত ১৯৬৩ সালের এই প্রজাতন্ত্র দিবসে এক বিশেষ সঙ্কল্পবাণীতে ভারতের পবিত্র ভূমি হইতে আক্রমণকারী শত্রু অপসারণের যে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহা এ পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত হয় নাই। আজিও ভারতের উত্তর সীমান্তে কয়েক হাজার বর্গমাইল ভূখণ্ড চীনা কম্যুনিষ্টদের কবলিত হইয়া রহিয়াছে, পশ্চিম সীমান্তে কাশ্মীরের অর্দ্ধাংশ এখনও পাকিস্তান কবলিত। অথচ এই ভারতরক্ষার নামে দেশপ্রাণতার নিকট আবেদন জানাইয়া জনসাধারণের নিকট হইতে অজস্র অর্থ ও স্বর্ণালঙ্কার সংগ্রহ করা হইয়াছে। গোটা কয়েক ইমারত ও রাস্তা নির্ম্মাণ হইলেই সমস্ত হইল না। ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিয়া দেখিতেছি খাদ্য সঙ্কট চরমে উঠিয়াছে। দুই বৎসরের মধ্যে ভারতকে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ করিবার যে প্রতিজ্ঞা পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী করিয়াছিলেন তাহার সমাধান আজও হওয়া দূরে থাকুক খাদ্য সঙ্কট পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বেকারে দেশ ছাইয়া গিয়াছে। শাসনযন্ত্রের সর্ব্বস্তরেই দুর্নীতির রাজত্ব চলিতেছে। গণতন্ত্রের মুখোস পরিয়া ধনতন্ত্রবাদী শোষকগোষ্ঠীর তাণ্ডব চলিতেছে। গণমানস আজ নিরাশায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। জাতির জনকের স্বপ্নের গ্রামরাজ আজ কৃষক নিধন রাজে পরিণত হইয়াছে। উহাদের কবল

হইতে প্রজা সাধারণকে মুক্ত করাই আজ সাধারণতন্ত্র দিবসের সঙ্কল্প হোক। প্রজাতন্ত্র আজ প্রহসনে পরিণত হইয়াছে।—

নিজেদের যখন 'প্রজা' বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছি—তখন আজকের 'রাজা' কিংবা 'রাজাদের' খামখেয়ালী স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

প্রতি বৎসর তথাকথিত 'প্রজাতন্ত্র' দিবস (২৬শে জানুয়ারী) গরীব প্রজাদের লক্ষ লক্ষ টাকার শ্রাদ্ধ করিয়া পরম সমারোহ এবং ঢক্কানিনাদ সহযোগে প্রতিপালিত হয়। এই প্রজা-অর্থ-শ্রাদ্ধকারী উৎসবে ঘটা করিয়া কর্তাদের খানাপিনার সমারোহ সবিশেষ দেখা যায়। এ-বৎসরও ইহাই হইয়াছে—দেশের, বিশেষ করিয়া বাঙ্গলা দেশের শতকরা অন্তত ৭০।৮০ জন লোক যখন দিনান্তে এক বেলাও পেট ভরিয়া খাইতে পায় না! দেশের লোক মরুক, শ্মশানে মৃত দেহের কিউ লাগিয়া যাক—কর্তাদের আনন্দ বিলাস, বিশেষ ভ্রমণ এবং বিনামূল্যে বাণী বিতরণ ক্রমশ বৃদ্ধি-মুখেই চলিবে। প্রতিবাদ করিবার সক্রিয় উপায় নাই। মানুষ, এখন এদেশের এই নিরাশা, এবং দুঃখ-দুর্দ্দশাকে নিত্য সঙ্গী বলিয়া মানিয়া লইয়াছি।

ভেজাল আজ কেবল খাদ্যদ্রব্য এবং ঔষধেই নহে, ভেজাল নেতৃত্ব, ভেজাল শাসক এবং ভেজাল নীতি-বাক্যে দেশে অভিভূত! এই ভেজালরাজ বা ভেজালতন্ত্র হইতে বাঁচিতে হইলে এখন কয়েকটি মাত্র অভেজাল খাঁটি মানুষের প্রয়োজন একান্ত।

'ত্রিপুরা'র চোখে ২৮শে জানুয়ারী

—২৬শে জানুয়ারী। ভারতের জাতীয় তথা প্রজাতন্ত্র দিবস। স্বাধীনতার পূর্ব্বেও এই ২৬শে জানুয়ারী আমাদের নিকট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিবস ছিল। সেদিন প্রতি বছর এই দিনটিতে আমরা পরাধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্তিলাভের জন্ত সংকল্প গ্রহণ করিতাম; স্বাধীনতা সংগ্রামের শপথ লইতাম। পরাধীন ভারতে যে দিবসটি পালিত হইত সংকল্প দিবসরূপে, সেই ২৬শে জানুয়ারীই স্বাধীনতা লাভের পর ১৯১০ সাল হইতে প্রজাতন্ত্র দিবসরূপে উদ্‌যাপিত হইতেছে। সংগ্রাম-সাধনায় যে দিনটি ছিল ঐক্য-সংহতির আধার এবং শক্তি, সাহস, প্রেরণার উৎস, সংগ্রামশেষে রাষ্ট্র-পরিচালনার জন্ত সেই দিনটিতে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ১৯৫০ সালে। ২৬শে জানুয়ারীর সম্ভ্রমকে স্বীকৃতি ও মর্য্যাদা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই যে এই দিবসে ভারত রাষ্ট্র-কর্ণধারগণ সাধারণতন্ত্র তথা প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহা সেই দিন (প্রতিষ্ঠা দিবসে) ব্যাখ্যা করিয়া বোঝাইবার অপেক্ষা রাখে নাই। কিন্তু আজ, পর পর চৌদ্দটি ২৬শে জানুয়ারী অতিক্রান্ত হইয়া যাওয়ার পর পঞ্চদশ প্রজাতন্ত্র দিবসে সর্বত্র সর্ব্ব বিষয়ে প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে সেই ২৬শে জানুয়ারী যেন অতীতের অতি ম্লান ইতিহাসের মত মিলাইয়া যাইতেছে, সেদিন নিঃস্ব, রিক্ত, পরপদানত ভারতবাসীর মধ্যে আশা-আকাঙ্ক্ষায় যে বক্ষস্ফীতি, সংকল্পে যে দৃঢ়তা, প্রত্যয়ে যে পূর্ণতা, বিশ্বাসে অটলতা এবং কর্ম্মে যে নিষ্ঠা ও একাগ্রতা—সর্ব্বোপরি দেশ-উদ্ধারে সর্বস্ব ত্যাগ, এমনকি আত্মাহুতি দানে যে উৎসাহ, আগ্রহ ও উদ্যম লক্ষিত হইয়াছিল, আজ তার অণু-পরমাণুও খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। ভারত স্বাধীন হইয়াছে। সতেরো-আঠারো বছর হয় তাহার পর-পদানত জীবনের অবসান ঘটিয়াছে। সাধারণতন্ত্র ঘোষণা করিয়া চৌদ্দ বছর পূর্ব্বে প্রত্যেক ভারতবাসীকে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমানাধিকার দেওয়া হইয়াছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা রচনা করিয়া ভারত নিঃস্ব-মুক্ত ও পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে বলিয়া দফায় দফায় সরকারী পর্য্যায়ে জাতীয় আয়ও মাথাপিছু আয়ের ক্রমোন্নতি ঘোষণা করা হইতেছে; অঢেল প্রচার চলিতেছে মিল মেসিনারী কারখানা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার। শিল্প-সমৃদ্ধির বিপুল ভারে দেশ কেবল ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছে। দেশের ভার সম্পূর্ণ উল্টাভাবে যাইয়া চাপিতেছে দেশবাসীর ঘাড়ে। তাহাতে দেশবাসী যেন আজ আর মাথা তুলিতে পারিতেছে না। ক্ষুধা, রোগ ও দারিদ্র্যের যুগপৎ আক্রমণে ভারতবাসী আজ এমন এক স্তরে আসিয়া ঠেকিয়াছে, যাহাকে অন্তিম দশা বলিলেও কম বলা হয়। অন্তিমকালে ২৬শে জানুয়ারীর কথা ত ছাই, বাপের নামও যে ভুলিবার কথা। দেশবাসীর দুরবস্থার কথা কেবলমাত্র বিরোধী নেতৃবৃন্দদের বিরুদ্ধাচরণের মধ্যেই প্রকাশ পাইতেছে না. শাসকগোষ্ঠীর ভাষণেও সবিশেষ প্রকটিত। শ্রীজগজীবনরাম যিনি এই সেই দিন পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার গুরুত্ব ও দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, দুর্গাপুরে তিনিই বলিয়াছেন, জাতীয় আয়ের শতকরা ৯০ ভাগ মাত্র দশটি পরিবারে ভোগ করিতেছে। তারও কিছুদিন আগে প্রাক্তন কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট বলিয়াছেন, একদা যে-সকল কংগ্রেস-

কর্মী নিঃস্ব ছিল আজ তাহারা ধনকুবের হইয়াছে। দৃশ্যতঃ তাহাদের ধনাগমের কোন পন্থা নাই। প্ল্যানিং কমিশন আত্মসমালোচনায় বলিতেছেন—এতকাল খাদ্য উৎপাদন তথ্য কৃষির উপর যথাযথ গুরুত্ব না দেওয়া মারাত্মক ভুল হইয়াছে; চতুর্থ পরিকল্পনায় এই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করা হইবে। শিল্পায়নে ভারী শিল্প, হাল্কা শিল্প ও মৌলিক বা বুনিয়াদি শিল্প প্রভৃতি উদ্যমেও যথেষ্ট গলতি আবিষ্কৃত হইতেছে। এক কথায় বলা যাইতে পারে প্রজাতন্ত্রে প্রদত্ত সমানাধিকার ভোগ আজও ভারতবাসীর নিকট অতীতের (পরাধীন ভারতের) ২৬শে জানুয়ারীর সঙ্কল্প বাক্যের মতই অভিষ্টবাক্য মাত্র। তবে অতীত আর বর্ত্তমানের মধ্যে বিশেষ একটু তারতম্য আছে। তখন ছিলাম পরাধীন, আজ আছি স্বাধীন। প্রজাতন্ত্র আমাদিগকে চিন্তায়, বাক্যে ও প্রতীতিতে স্বাধীনতা দিয়াছে। যাহার অর্থ, আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি। তাহাও পাওয়ার মত পাওয়া নহে; অর্থনৈতিক স্বাধীনতা যেখানে সম্পূর্ণ অবিন্যস্ত তথা বিপর্যস্ত সেখানে রাজনৈতিক স্বাধীনতা সুখদা হইতে পারে না, বেশীর ভাগের পক্ষেই বিড়ম্বনাদায়ক হইয়াছে। স্বাধীন জাতির প্রধান ও প্রথম চাহিদাই হইল ক্ষুন্নিবৃত্তি ও রোগমুক্তি। এই দুই ব্যাপারে আমাদের রাষ্ট্রনায়কগণকে প্রায়ই আক্ষেপ করিয়া বলিতে হয় ইহা করা দরকার, উহা করা হইবে বা করিতে হইবে। তাঁহারা দীর্ঘ চতুর্দ্দশ বর্ষ পরিকল্পনা চালাইয়া খুব অল্প ব্যাপারেই বলিতে সক্ষম হইয়াছেন "আমরা ইহা করিয়াছি, আমরা উহা করিলাম।" নিতান্ত অসহায়ের মতই তাঁহারা বর্ত্তমানকে এড়াইয়া ভবিষ্যতের আশ্বাস ছাড়িতেছেন—যাহা শুনিতে শুনিতে আমাদের অন্তর আশার পথ হইতে নৈরাশ্যের দিকে ধাবিত হইতেছে। ইহার কারণ পরিকল্পনার ব্যর্থতা। পরিকল্পনা সামগ্রিক ভাবে ব্যর্থ হয় নাই ঠিকই, কিন্তু উদ্দেশ্য বহুলাংশে ব্যর্থ হইয়াছে। দেশের সাধারণ মানুষ পর পর তিনটি পরিকল্পনার পরেও তাহাদের সামান্যতম দাবি (ভরপেট খাদ্য) হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। অর্থাৎ আমাদের পরিকল্পনাসমূহ প্রজাতন্ত্রকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারে নাই। ইহাকে নেতাজীর কথায় ব্যাখ্যা করা যায় যে, প্রজাতান্ত্রিক অনুশাসনে (গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায়) সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক সংস্কার সাধন বাস্তবে অসম্ভব। অর্থাৎ আমাদের প্রজাতন্ত্র ও পরিকল্পনা দীর্ঘ চতুর্দ্দশ বৎসর সহ-অবস্থান নীতিতে এক-সঙ্গে চলা সত্ত্বেও দেখা যাইতেছে একে অন্যের পরিপূরক বা সহায়করূপে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হয় নাই; বরং বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে একে অন্যের পূরক বা সহায়ক না হইয়া অসহযোগীই হইয়াছে। অতএব আজ আমাদের ভাবের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। আজ এই ঐতিহাসিক পুণ্য দিনে প্রজাতন্ত্রে ঘোষিত অর্থনৈতিক সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অর্থনৈতিক সংস্কার সাধনের উপরই সর্ব্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। প্রয়োজন হয় জাতিকে আজ আবার ছত্রিশ বছর পিছাইয়া যাইয়া (২৬শে জানুয়ারীতে স্বাধীনতার সঙ্কল্প গ্রহণের ন্যায়) নূতন ভাবে অর্থনৈতিক সংস্কার সাধনের সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে হইবে। যে ছাব্বিশে জানুয়ারী রাজনৈতিক স্বাধীনতা আনিয়াছে সেই ছাব্বিশে জানুয়ারী আনিয়া দিবে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা।—

বলা বাহুল্য শতকরা অর্দ্ধেকেরও বেশী ভারতবাসীর কাছে—"২৬এ" জানুয়ারীর ঘনঘটা এবং উৎসব মাত্র উপরতলাবাসী জনকয়েকের জন্য—ইহাই মনে হয়। ইহার কারণ উৎসব করিবার মত দেহের অবস্থা এবং মনের প্রস্তুতি আমাদের শতকরা ৮০ জন লোকেরই নাই। কারণ কি তাহার ব্যাখ্যা প্রয়োজন নাই।

'হিন্দীয়া' সমাচার

কয়েক দিন পূর্ব্বে শ্রীলালবাহাদুর দিল্লীতে বলিয়াছেন যে, হিন্দী এবং ইংরেজি উত্তরপত্র সমভাবে মূল্যায়নের জন্য একটি 'মডারেশন ফরমুলা' উদ্ভাবিত অনুমোদিত না হওয়া পর্য্যন্ত ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় বিকল্প মাধ্যম হিসাবে হিন্দী ব্যবহৃত হইবে না।

সংবাদে প্রকাশ যে শ্রীশাস্ত্রী আরও বলেন:

চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব্বে অহিন্দীভাষী রাজ্যসমূহের মুখ্যমন্ত্রীদের সহিত পরামর্শ করা হইবে এবং তাঁহাদের অনুমোদনের পরই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ দক্ষিণ ভারতের লোকদের হিন্দীতে লেখা চিঠি ফেলিয়া দেওয়ার পরামর্শ দিয়াছেন বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, শ্রীশাস্ত্রীকে সে সম্পর্কে মন্তব্য করিতে বলা হয়। হিন্দী প্রবর্ত্তনের ব্যাপারে ধীরগতি অবলম্বনের জন্য শ্রীকামরাজ, শ্রীঅতুল্য ঘোষ এবং শ্রীসঞ্জিব রেড্ডী সম্প্রতি বাঙ্গালোরে যে বিবৃতি দিয়াছেন, সে সম্পর্কেও তাঁহাকে প্রশ্ন করা হয়।

উত্তরে শ্রীশাস্ত্রী বলেন, অহিন্দীভাষী রাজ্যে হিন্দীতে প্রাপ্ত চিঠিপত্রের উত্তর না দেওয়া সম্পর্কে শ্রীকামরাজ কি বলিয়াছেন, তাহা তিনি জানেন না। তিনি পুনরায়

দৃঢ়তার সহিত বলেন অহিন্দীভাষী রাজ্যগুলিতে জোর করিয়া হিন্দী চাপানো উচিত নয়।

প্রধানমন্ত্রীর এই ভাষণের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি সংবাদে প্রকাশ যে—

কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীভক্তদর্শন আজ এখানে সাংবাদিকদের নিকট বলেন যে, যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, সেসব বিদ্যালয়ে ইংরেজী ও হিন্দী অবশ্যপাঠ্য বিষয় হউক, ইহাই কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছা।

ইচ্ছা খুবই সাধু এবং এই সাধু ইচ্ছাই শেষ পর্য্যন্ত দেখা যাইবে যে 'হুকুমে' পরিণত হইবে। হিন্দী-ভক্ত মহামান্য ভক্তদর্শন ভারতে হিন্দী-সাম্রাজ্যের পবিত্র রূপ দিব্যচোখে দর্শন করিতেছেন—আশা করি ভারত ভাগ্যবিধাতারা ভক্তের মনোবাসনা অচিরে পূর্ণ করিবেন। আর একটি সংবাদে দেখি:

হিন্দী এখন কেন্দ্রের সরকারী ভাষা এবং সমস্ত কাজ-কর্ম্মই হিন্দীতে চলিবে।

কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয় হইতে ৩০শে জানুয়ারী তারিখে এইভাবে একটি ইস্তাহার প্রকাশ করা হয়। মন্ত্রণালয়ে ব্যবহারের জন্য ইস্তাহারে সরকারী পদগুলির হিন্দী প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের জনৈক কর্ম্মচারী ইউ-এন-আই-এর একজন প্রতিনিধিকে বলেন যে, হিন্দীর সহিত ইংরাজীর ব্যবহারও অব্যাহত থাকিবে বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকার যে নীতি ঘোষণা করেন, প্রকাশিত ইস্তাহারের বক্তব্যে তাহার প্রতিকূলতা দেখা যাইতেছে।

প্রতি পদে দেখা যাইতেছে কর্ত্তাদের কথায় এবং কাজে আকাশ-জমিন তফাৎ! ব্যাপার দেখিয়া মনে হইতেছে, পাকে-প্রকারে বিবিধ স্তোকবাক্য দ্বারা হিন্দীকে রাজাসনে কায়েম করাই দিল্লীর কর্ত্তাদের পরিকল্পনা।

দক্ষিণ ভারতে হিন্দীর বিরুদ্ধে বিষম প্রতিক্রিয়া দেখিয়াও দিল্লীর চেতনা হয় নাই—এমন কি আমাদের নবীনা-কর্ত্রী ঠাকুরাণী শ্রীমতী হিণ্ডীরা দেবীও বলেন যে —হিন্দীর বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চলিতেছে তাহা নগণ্য সংখ্যক লোকের দ্বারাই। বেশীর ভাগ লোকেরই হিন্দীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ কিংবা বিরুদ্ধভাব নাই এবং সকলেই মনে-প্রাণে হিন্দী কামনা করেন ভারতের সংহতি আরও জোরদার করার জন্য শীঘ্রই শ্রীমতী সর্ব্ববিষয়ে মতামত দেওয়া এবং মাষ্টারী করার ব্যাপারে তাঁহার স্বর্গত পিতাকেও বোধ হয় ছাড়াইয়া যাইবেন বলিয়া মনে হইতেছে! দিল্লীর 'কেবিনেট' লবণের গুণ আছে!

হিন্দীর পক্ষে কর্ত্তা এবং কর্ত্তাভজাদের সাফাই:

"—হিন্দী চাপাইবার স্বপক্ষে একটিমাত্র সাফাই দিল্লীর মহাপ্রভুরা গাহিয়া চলিয়াছেন—সংবিধান মান্য করাই তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। এত বড় মিথ্যা কথা বোধ করি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আর কেহ কখন বলে নাই। সংবিধানের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নাই। দ্রাবিড় কাজাঘাম সংবিধানের বই পোড়াইয়াছে, ইহারা সংবিধানকে ভিতর হইতে মোচড়াইয়া যখন যেমন তখন তেমন নিজেদের মতলব হাসিল করিয়াছেন। নিজেদের অসুবিধাজনক হাইকোর্ট জজকে অপসারণ করিতে সংবিধান বদলাইয়াছেন। আমেরিকান সংবিধানের প্রতিটি সংশোধনে জনসাধারণের অধিকার সম্প্রসারিত হইয়াছে, ভারতীয় সংবিধানের প্রতিটি সংশোধনে মূল সংবিধানে প্রদত্ত অধিকার অপহৃত হইয়াছে। সরকারী কর্ম্মচারীদের নিরাপত্তা সম্পর্কে যেটুকু অধিকার সংবিধানে প্রদত্ত হইয়াছিল তাহাও অপহরণের জন্য সংশোধনী বিল আসিতেছে। লজ্জা বা শালীনতার কোন বালাই থাকিলে ইহারা সংবিধান মান্য করার কথা তুলিতেন না।

"প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন আন্দোলনের দ্বারা কোন সমস্যার সমাধান হয় না। ভারতবাসীর অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। স্বাধীনতার পর তেলেগুভাষীরা স্বতন্ত্র অন্ধ্র প্রদেশের দাবি তুলিলে কেন্দ্রীয় নেতারা উহা মানিতে অস্বীকার করিলেন। শ্রীরামুলু অনশনে আত্মবিসর্জ্জন দিলেও তাঁহারা অটল রহিলেন। তারপর যখন সুরু হইল প্রচণ্ড আন্দোলন, রেল ষ্টেশন এবং থানা দাহন, রেল লাইন উৎপাটন, তখন প্রভুরা বলিলেন---রহ ধৈর্য্য, দিতেছি। স্বতন্ত্র অন্ধ্র দিলেন। সমস্ত ভদ্র প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া জবরদস্তি বোম্বাইকে দ্বিভাষী প্রদেশ করিলেন। বোম্বাই এবং আমেদাবাদের লাঠির চোটে অবশেষে মহারাষ্ট্র গুজরাট মানিয়া নিলেন। নাগাদের প্রথম জবাব দিলেন—ফুঃ। মারের চোটে এখন সেই নাগাদের পদলেহনের জন্য চর পাঠাইয়াছেন। ভদ্র শান্ত সংযত আন্দোলন তাঁহাদের প্রাণে সাড়া জাগায় না, তাঁদের একথা খুব ঠিক। এবং সেই সঙ্গে ইহাও ঠিক যে, আন্দোলন মারমুখী হইয়া উঠিলে তখন তাঁহারা নতজানু হইয়া বলেন—বন্ধু, এবার কোল দাও।

শান্ত সংযত প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া প্রহারের নিকট নতি স্বীকারের যে পলিসি দিল্লীর শাসকেরা অনুসরণ করিতেছেন তাহা অপেক্ষা ক্ষতিকর পলিসি আর কিছুই হইতে পারে না।—"

হিন্দীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অবিলম্বে আরও সক্রিয় এবং জোরদার না করিলে—পশ্চিমবঙ্গের হিন্দীপ্রেমী মুখ্যমন্ত্রী কি করিয়া বসিবেন বলা কঠিন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী হিন্দী সম্পর্কে ইতিমধ্যেই যে-সকল উক্তি করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ—তাহাতে আমাদের ভয় এবং সন্দেহ করিবার মত যথেষ্ট কারণ আছে বলিয়া মনে করি।

"দু'-একটি নামমাত্র বিবৃতি এবং কলিকাতা মহানগরীর ক্ষুদ্রতম হলে ছোট্ট দু' একটি গোষ্ঠী বৈঠকে বাঙ্গলার প্রতিবাদ শেষ হইয়াছে। সাহিত্য আকাদামির অনুগৃহীত কয়েক ব্যক্তি আলগোছে সব দিক বাঁচাইয়া একটি বিবৃতি দিয়া তাঁদের দায়িত্ব শেষ করিয়াছেন। ইহাদের প্রধান বক্তব্য—হিন্দী কেন্দ্রীয় ভাষা হইলে অন্যান্য ভাষার মর্য্যাদা কমিয়া যাইবে। ইহা যুক্তি নহে, কুযুক্তি। ইহা প্রাদেশিক ভাষাসমূহের মর্য্যাদার প্রশ্ন নহে, ইহা একটি প্রাদেশিক ভাষাকে কেন্দ্রীয় ভাষায় পরিণত করিয়া ঐ ভাষাগোষ্ঠীতে একটি স্বাতন্ত্র শাসকশ্রেণী গঠনের প্রশ্ন, ভারতের অগ্রগতি সহস্র বৎসর পিছাইয়া দেওয়ার প্রশ্ন, ভারতীয় সংস্কৃতিকে নিম্ন কালচারে নামাইয়া আনিবার প্রশ্ন।" 'যুগবাণী'—যথার্থ কথাই বলিতেছেন।

হিন্দী-প্রতিরোধের ব্যাপারে আমাদের আশা বাঙ্গালী ছাত্র-ছাত্রী সমাজ। সরস্বতী পূজা শেষ হইয়াছে কিছুদিন হইল—এবার তাঁহারা স্থির মস্তিষ্কে নিজেদের, বাঙ্গালী, বাঙ্গলা ভাষার, সেই সঙ্গে ভারতের অন্যান্য অহিন্দী-ভাষী প্রদেশ ও প্রদেশবাসীর—ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করুন।

কলিকাতাস্থিত কেন্দ্রীয় সকল সংস্থাগুলিতে সাইন বোর্ড হিন্দী এবং ইংরেজিতে। দেখিলে মনে হইবে—এ-রাজ্যে বা শহরে বাঙ্গালী বলিয়া কোন জাতি বাস করে না। ইহাকেও হিন্দী চাপাইবার কারণে জবরদস্তি ছাড়া আর কি বলিব?

হিন্দী মালিকদের দেওয়ালের লিখন চোখ (যদি থাকে) মেলিয়া পাঠ করিতে বলি—ভারতবর্ষকে হিন্দীর গুঁতা মারিয়া কোথায় লইয়া যাইতেছেন তাহা বুঝিতে পারিবেন।

হায়! ডাঃ রায়—হায়! 'কল্যাণী'!

কল্যাণী উপনগরী গঠন করিবার কালে স্বর্গত বিধানচন্দ্রের বাসনা ছিল যে,এখানে বিষম সমস্যাকুল কলিকাতা এবং সেই সঙ্গে বাঙ্গালীদের একটা সামান্য কিছু সুরাহা হইবে। কলিকাতার সন্নিকটে এই কল্যাণীতে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী একটু ভদ্রভাবে বসবাসের এবং সেই সঙ্গে রুজি-রোজগারের কিছু উপায়ও হয়ত পাইবে। একই স্থানে বসবাস, শিক্ষালাভ এবং অর্থোপার্জ্জনের সুবিধা বাঙ্গালী পাইবে—ডাঃ রায়ের মনের এই ইচ্ছা আজ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে পরলোক গমন করিয়াছে! এ-বিষয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্ট দেখুন—পুলকিত হইবেন।

কোন একদিন যদি এমন হয় যে, স্বর্গত মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার রায়ের স্মৃতিবিজড়িত কল্যাণীতে বাঙ্গালীর আর কোন স্থান নেই, তা হ'লে অবাক হবার কিছু থাকবে না।

"কথা ছিল, কল্যাণী শিল্পনগরী পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোন্নয়নে সাহায্য করবে। সমস্যাসঙ্কুল বাঙ্গালীদের দু'একটি সমস্যার সুরাহা হবে। স্বর্গত মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার রায়ের সেরূপই স্বপ্ন ছিল। কলিকাতার কাছে-পিঠে গড়া কল্যাণীর ছিমছাম পরিবেশে বাঙালী মাথার উপর খানিকটা খোলা আকাশ পাবে। বাসস্থানের সঙ্গে শিক্ষালাভের, অর্থোপার্জ্জনের সুবিধা পাবে।

"...কিন্তু আজ কল্যাণীর অবস্থা কি? সরকারের একটি শিল্প সংস্থাসহ কল্যাণীর বর্ত্তমান শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২১টি। তার মধ্যে ৩টি ছাড়া আর সব ক'টাই অ-বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান। আর সেই প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্য্যরত বাঙ্গালীর সংখ্যা শতকরা মাত্র ২৭ জন। তার মধ্যে আবার শতকরা ৩ জন তথাকথিত পদস্থ কর্ম্মচারী। বাকি সব সাধারণ শ্রমিক-মজুর, প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, এদের মধ্যে অধিকাংশই স্কুল-কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত।

"কল্যাণী নগর-পরিকল্পনায় বাঙ্গালীর বাসগৃহ সমস্যা বিবেচনা করে তাদের অগ্রাধিকারদানের কথা বিবেচনা করা হবে বলা হয়েছিল। অথচ আজ পর্য্যন্ত গুটিকয়েক ভাগ্যবান বাঙ্গালীই সেখানে বাসগৃহ জোটাতে পেরেছেন। কল্যাণীর উন্নয়ন দপ্তর নির্ম্মিত গৃহগুলির অধিকাংশই এখন অ-বাঙালীর আস্তানা।

"একরের পর একর জমি আজও সেখানে অনাবাদি অবস্থায় পড়ে আছে। আ-গাছা জঙ্গলে ছেয়ে গেছে চারিদিক। অথচ সরকারের কিছুই করবার নেই। এ সকল অঞ্চলের এক ছটাক জমির উপরও নাকি সরকারের

কোন হাত নেই। সবটুকু যারা আগেভাগে কিনে রেখেছেন, তাদের অধিকাংশই অ-বাঙ্গালী। কিছু কিছু ভাগ্যবান্ বাঙ্গালী যারা সুরুতে ওখানে জমি কিনেছিলেন, এখন তাদেরও দৃষ্টি নাকি কলকাতার লবণ হ্রদ এলাকার দিকে। তাদের অভিপ্রায় - উত্তরকালে কল্যাণীর জমি উঁচু দরে বিক্রি করতে পারলে তা দিয়ে লবণ হ্রদ এলাকায় জমি কিনে বাড়ী করতে হ'লে এখানেই করা যাবে, কল্যাণীতে কেন?

"অথচ সরকার যখন জমি বিক্রয় করেছিলেন, তখন চুক্তি ছিল ক্রেতাকে দুই-আড়াই বছরের মধ্যেই বাড়ী করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে বাড়ীর 'প্ল্যান' দাখিল করারও কথা ছিল। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তার কিছুই হয় নি। আশ্চর্য্যের কথা, সব কিছু জেনেও সরকার এ ব্যাপারে নীরব।

"জানা গেছে, সরকারের সঙ্গে বেশ দহরম-মহরম আছে, এরূপ এক অ-বাঙ্গালী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের নাকি এ ব্যাপারে যথেষ্ট প্রভাব আছে। সেই ব্যবসায়ী গোষ্ঠীই এখন প্রকৃতপক্ষে কল্যাণীর অধিকাংশ জমির মালিক। তাই জানতে ইচ্ছে হয়, তাদের কি অভিপ্রায়? সরকারী উদ্যোগের দৌড় ত দেখা গেল।"

গত ৩রা ফেব্রুয়ারীর আনন্দবাজারে প্রকাশিত উপরি-উক্ত সংবাদ আশা করি এ-রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টিগোচর হইয়াছে বিশেষ—করিয়া উদ্ধৃত রিপোর্টের শেষ প্যারাটির উপর।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহিত "দহরম-মহরম আছে" এরূপ অবাঙ্গালী ব্যবসায় সম্প্রদায়টির নাম-ধাম-গোত্র কি?

যে-ধারায় পরম যোগ্যতার সহিত পশ্চিমবঙ্গের শাসন কার্য চলিতেছে তাহাতে কেবল কল্যাণীর নয়, একে একে সব কিছুই বাঙ্গালীর হাতের বাহিরে যাইবে। দুর্গাপুর প্রায় গিয়াছে, বোটানিক্যাল গার্ডেনও আর আমাদের নাই, সল্টলেকের জমিও বেশীর ভাগ অবাঙ্গালীর হাতে, এ রাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্যের শতকরা ৮০ ভাগ অবাঙ্গালীর অধীন। কলিকাতার বসতবাটিগুলি ক্রমশ: অন্যরাজ্যের—বিশেষ করিয়া রাজস্থানীদের মালিকানায় যাইতেছে!

ডাঃ রায় পরমযোগ্য এক উত্তরাধিকারীর হাতেই আমাদের ভাগ্য অর্পণ করিয়া গিয়াছেন।

বিদ্যাদেবীর পূজা

সরস্বতী পূজা, প্রাক্কালে মাইক এবং লাউড স্পীকার ব্যবহার সম্পর্কে অন্য বৎসরের মত এবারও পুলিসের বিধি-নিষেধ ঘটা করিয়া প্রকাশিত হয় এবং এবারও যথারীতি ঐ পুলিসী বিধি-নিষেধ ভঙ্গ করিয়া উহা পরম নিষ্ঠার সহিত উৎসাহী ভক্তরা প্রতিপালন করিয়াছেন! আশা করি পুলিস কমিশনার মিঃ পি কে সেন এ সংবাদ পাইয়াছেন। আমাদের বিনীত নিবেদন, ভবিষ্যতে কলিকাতা পুলিস যেন এভাবে বিধি-নিষেধের প্রহসন পরিহাস না করেন। সরস্বতী পূজার আর একটি সংবাদ—

কলিকাতা, ৭ই ফেব্রুয়ারী—গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেন হইতে শ্রীরাধারমণ শীল নামে ৪১ বৎসর বয়স্ক এক ব্যক্তিকে আজ রাত্রে আহত অবস্থায় আর জি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন যে, এই ব্যক্তি সরস্বতী পূজার চাঁদা না দেওয়ায় প্রহৃত হইয়াছেন। —(যুগান্তর)।

এই প্রকার ঘটনা আগে ঘটিয়াছে কি না জানি না। কিন্তু চাঁদা না-দেওয়াতে বহুজন বিবিধ প্রকারে অপমানিত এবং নিগৃহীত হইয়াছেন—ইহা সত্য।

পূজা যদি প্রকৃত ভক্তি এবং 'ভাবগম্ভীর' (দৈনিকের ভাষায়) পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় সুখের কথা, এবং কাহারও আপত্তি করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। কিন্তু পূজার নামে আজকাল বাঙ্গলা দেশে কি ঘটিতেছে, তাহা দেশের মঙ্গলকামী ব্যক্তিদের একটু শান্ত ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে বলিব। বাঙ্গালী যুব সমাজের প্রাণশক্তি এবং কর্ম্মপ্রেরণা কি এই ভাবেই অপব্যয়িত হইতে থাকিবে? বিগত কালের সরস্বতী পূজা এবং আজ কালকার সরস্বতী পূজা—তুলনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে আজ বাঙ্গালী বালক এবং যুবক সমাজ কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। এ-বিষয় আমাদের আর কিছু মন্তব্য করিবার নাই।

আইন করিয়া মদ বিক্রয় বন্ধ করা যায় না

সকল বাস্তব দিক বিবেচনা করিয়া পশ্চিমবঙ্গে অবিলম্বে মদ বিক্রয় নিষিদ্ধ করা সম্ভব হইবে না বলিয়া রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত করা হয়। বৈঠকে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, কেবলমাত্র আইনের

সাহায্যে মদ বিক্রয় বন্ধ করিয়া মদ্য পান নিবারণ সম্ভব নহে। লোকশিক্ষার মারফৎ জনসাধারণকে মদ্যপানের কুফল সম্পর্কে অবহিত করা সম্ভব হইলে, তবেই মদ্যপান নিবারণ সম্ভব।

রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে টেকচাঁদ কমিশনের (আগামী ১২ বৎসরের মধ্যে সমগ্র ভারতে মদ্যপান ও মদ বিক্রয় নিষিদ্ধ করিবার পক্ষে) সুপারিশ আলোচনাকালে উল্লিখিত অভিমত প্রকাশ করা হয়। প্রকাশ, রাজ্য মন্ত্রিসভার উল্লিখিত অভিমতযুক্ত এক স্মারকলিপি কেন্দ্রের নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

মন্ত্রিসভার বৈঠকে এইরূপ মন্তব্যও করা হয় যে, ভারতের অন্যান্য যে-সকল রাজ্যে আইন করিয়া মদ বিক্রয় নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করা হইয়াছিল, সেখানেই বিপরীত ফল হইয়াছে। ঐ সকল রাজ্যে চোলাই মদ তৈয়ারী এবং সঙ্গে সঙ্গে আইন-শৃঙ্খলার সমস্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ইহা ছাড়া, মদ বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হইলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আবগারী শুল্ক হইতে প্রাপ্ত বার্ষিক প্রায় দশ কোটি টাকার মত রাজস্ব ঘাটতি হইবে। তবে বৈঠকে মদ্যপান নিবারণের উদ্দেশ্যে লোকশিক্ষার উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রিসভার বৈঠকে মদ্যপান-নিরোধ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত আমরা সমর্থন করি। ইতিপূর্ব্বে যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য কয়েকটি দেশে আইন বলে মদ্যপান বন্ধ করিবার চেষ্টা হয়—কিন্তু সর্ব্বত্রই এ-চেষ্টা পূর্ণ বিফলতা অর্জ্জন করে।

বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি রাজ্যে "নেশাবন্দী" খুব ঘটা করিয়া করা হয়, কিন্তু প্রকৃত খবর যাঁহারা জানেন—তাঁহারা বলেন, দেশী, বিলাতী, ভাল-মন্দ সর্ব্বপ্রকার মদের হাজার হাজার বোতল ঐ সব রাজ্যে প্রত্যহ কেনা-বেচা চলিতেছে। বলা বাহুল্য—এই কারবারেরও, সকল না হইলেও, বহু পুলিস অফিসার এবং কনেষ্টবলদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা বর্ত্তমান।

এমন ঘটনাও ঘটিয়াছে যে—পুলিশ অফিসার সাধারণ পুলিস সঙ্গে লইয়া হোটেলে মদ বিক্রয় ধরিতে গিয়া নিজেরাই পানানন্দে মত্ত হইয়া পড়িয়াছেন! একটি-দুইটি নহে, এমন বহু ঘটনা বোম্বাই, নাগপুর, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে ঘটিয়াছে—এখনও ঘটিতেছে! কাজেই মনে হয়—পশ্চিমবঙ্গ সরকার মদ্য বিক্রয় এবং পান সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে অটল থাকিবেন, কেন্দ্রের চোখ-রাঙ্গানি কিংবা স্তোকবাক্যে গলিয়া ঢলিয়া পড়িবেন না। শ্রীনন্দা হয়ত রাজ্য মুখ্য-মন্ত্রীকে 'নেশা-বন্দী'তে দীক্ষা দিবার প্রয়াস করিবেন—আশা করি, শ্রীসেন এ-দীক্ষা শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করিতে কোন দ্বিধা করিবেন না।

ভারতের পল্লীগীতি ও নৃত্য

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

ভারতের পল্লীতে পল্লীতে অজস্র লোকগীতি ছড়িয়ে আছে, সেগুলোর সব কিছুই শ্রেষ্ঠ কাব্যের পর্য্যায়ে পড়ে না। তবে তাতে কাব্যের আভরণ না থাকলেও সে গীতিকাব্যের প্রাণশক্তিতে সজীব। এসব পল্লীগীতি নানা বিষয় নিয়ে রচিত, তবে অধিকাংশ পল্লীগীতিতেই গ্রামের বধূদের দুঃখকষ্ট ও মর্ম্মবেদনার কাহিনী পাওয়া যায়। পূজাপার্ব্বণ, উৎসব বা বিয়েতে গ্রাম্যনারীরা এসব গীত গেয়ে উৎসবকে প্রাণবন্ত ক'রে তোলে। এই পল্লীগীতিগুলি থেকে আমরা নানাস্থানের সমাজচিত্র ও নারীহৃদয়ের নিবিড় অনুভূতির সহিত পরিচিত হই।

লোকগীতিতে প্রেমিক-প্রেমিকার মান অভিমান-বিরহ, সামাজিক কারণে মিলনে অসমর্থ নায়িকার ক্ষোভ ও ব্যথা, ননদিনীর ঈর্ষ্যালু হৃদয়, পিতৃগৃহবঞ্চিতা বালিকা-বধূর মনের ব্যথা, প্রতাপশালিনী শাশুড়ীর অত্যাচার ইত্যাদি বহু ধরণের চিত্র ফুটে ওঠে।

অনেক পল্লীগীতিতে দেখতে পাওয়া যায় রামসীতা বা রাধাকৃষ্ণকে নায়ক-নায়িকা ক'রে কবি গীত রচনা করেছেন। পূজাপার্ব্বণে ও বিয়ের উৎসবে সাধারণতঃ এ ধরণের গীত গাওয়া হয়।

যেমন বরকে যখন সাজান হয় মেয়েরা গীত গায়—

সাজ ওহে রাম, নব দুর্ব্বাদল শ্যাম
তুমি গুণধাম কৌশল্যা নন্দন।
চন্দন পরাব কাজল লাগাব
বাপের কোলে দিয়ে করব নিরখন।

অথবা বর খেতে বসেছে, নারীরা গাইছে—

জোনে দিন রাম জনকপুর আয়ে
দেখন আয়ী সারি দুনিয়া

জেওন ব্যঠে লছমন রাম
পরছন লাগি হ্যাঁয় জনক দুলারী
বিছিয়ান কিছিনকারী॥

রাম যেদিন জনকপুরে এলেন, পৃথিবীর সব লোক দেখতে এল।...রাম-লক্ষণ খেতে বসেছেন, জনককন্যা পায়ের আংটির ঝঙ্কার তুলে পরিবেশন করছেন ইত্যাদি।

অধিকাংশ পল্লীগীতিতে আমরা পল্লীনারীর আকাঙ্ক্ষা ও সুখ-দুঃখভরা কোমল হৃদয়ের স্পর্শ অনুভব করি। গ্রাম্য-কবিরা অতি সহজ-সরল কথায় গীতগুলি রচনা করেছেন। কিন্তু সেই অতি সাধারণ কথাগুলোই সুরের ঝঙ্কারে ও মূর্চ্ছনায় সরস হয়ে ওঠে। সব দেশেই লোকগীতির একটা বিশেষত্ব এই, তার পদাবলীর অর্থ বুঝতে না পারলেও সুরের বৈচিত্র্যে মন নানা রসে ভরে ওঠে।

পাশ্চাত্য দেশের যে কয়েকটি লোকগীতি শুনেছি, সেগুলোর সঙ্গে ভারতীয় লোকগীতির তুলনা করলে দেখতে পাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুরের কিছু-না-কিছু সাদৃশ্য আছে। দিল্লী হ'তে চৌদ্দ-পনের মাইল দূরে একটি গ্রামের গুর্জ্জর ললনারা যে পল্লীগীতি শোনাল তাদের সেই করুণ মধুর সুরের সঙ্গে সাদৃশ্য পেলাম স্প্যানীশ লোকগীতির সুরে।

সব দেশেই লোকগীতির তাল রাখবার জন্য একই পংক্তি বারে বারে গীত হয়। কোন কোন পংক্তিতে নিতান্ত অর্থহীন শব্দের প্রয়োগ হয় সুরের সংহতি রাখবার জন্য। আর পাশ্চাত্য হোক, ভারতীয় হোক, লোকগীতির একটা বিশেষত্ব এই, গানের ভিতর দিয়েই উত্তর-প্রত্যুত্তর চলে। শ্রোতাকে নিজ বুদ্ধি দিয়ে ধরে নিতে হয় কে প্রশ্ন করছে এবং কে উত্তর দিচ্ছে। পল্লীগীতির সজীবতা বহুগুণে বেড়ে যায় যখন তাকে বাদ্যের সঙ্গে নৃত্যে রূপায়িত করা হয়। কিন্তু ভারতের নারীপুরুষকে একত্র মিলে নাচগান করতে দেখা যায় শুধু আদিবাসীদের মধ্যে। মাদল বাজিয়ে, বাঁশী বাজিয়ে জোড়ায় জোড়ায় অথবা সারিবদ্ধভাবে স্ত্রী-পুরুষ লোকগীতির সঙ্গে নানা ধরণের নৃত্যাকার আনন্দে বিভোর হয়।

বাংলা দেশের সাঁওতালদের, মধ্যপ্রদেশের ও বুন্দেলখণ্ডের ভীল, গোণ্ড, বনজারা, সরগুজিয়া, মাড়িয়া ইত্যাদি বহুজাতীয় আদিবাসী নারী-পুরুষের নৃত্যগীত উল্লেখযোগ্য। তাদের বাদ্যে এবং নৃত্যে উচ্ছ্বাস আছে। যদিও অনেক সময় তাদের গীতির পদাবলী অর্থহীন বা অমার্জ্জিত।

ভারতের অন্য নারীপুরুষ একত্রে না নাচলেও পৃথক-ভাবে তাদের মধ্যে নাচের যথেষ্ট প্রচলন আছে। নারী-দের মধ্যে গুজরাটের গর্বা নৃত্য, বুন্দেলখণ্ডের কলা-নৃত্য, গোণ্ডদের গুঁয়া নৃত্য, রাজস্থানের ঘুমর ও মেহেদী নৃত্য, মহারাষ্ট্রের গৌরী নৃত্য বিশেষ সমাদৃত।

পুরুষালী নৃত্যগীতের মধ্যে পাঞ্জাবী ভাংরা নৃত্য, আদিবাসীদের শৈলানৃত্য, রাজস্থানের রণনৃত্য, বাংলা দেশের দেবীপ্রতিমার সামনে ধুনুচিনৃত্য, এবং পূর্ব্বকালের রায়বেশে নৃত্য বীরত্বব্যঞ্জক ও চিত্তাকর্ষক। বাংলা দেশে শ্রীচৈতন্যর কাল থেকে প্রচলিত সংকীর্ত্তন নৃত্যও পুরুষ নৃত্যের পর্য্যায়ে ফেলা যেতে পারে।

কিছুকাল পূর্ব্বে দিল্লীতে ভারতের গণতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে আগত নানা প্রদেশীয় অধিবাসীরা একটা বিশেষ অনুষ্ঠানে যে লোকগীতিসহ নৃত্য করল তা দেখে অনেক কিছু জানবার সুযোগ পেলাম। নৃত্যগীতি ও বাদ্যের সঙ্গে এদের পোষাকের বৈচিত্র্য দর্শকদের আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করেছিল। কড়ি, পুঁতি, পশুর শিং, বাঘের নখ, হাড়ের গয়না, ময়ূরের পালক ও নানা অদ্ভুত পোষাকে সজ্জিত আদিবাসীদের নৃত্য বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য ছিল। নারীরাও বর্ণোজ্জ্বল ঘাঘরা, কাঁচুলি, ওড়না, এবং রূপা, পিতল ও হাড়ের গয়নায় দেহ অলঙ্কৃত করে নাচের আসরে নেমেছিল। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে ঢোল, মৃদঙ্গ, বাঁশী, টিমকি ও চট্‌কোলা প্রধান।

বাংলার একান্ত নিজস্ব ভাটিয়ালী ও বাউল গান সাধারণত বাঙ্গালী পুরুষরা গেয়ে থাকে। নদীমাতৃক বাংলা দেশে নদীর বুকে পাল তুলে নৌকা ভাসিয়ে দিয়ে মাঝিরা এবং কখন কখন মাঠে মাঠে গরু চরাতে চরাতে রাখাল যুবকেরা গলা ছেড়ে যে ভাটিয়ালী গান গেয়ে থাকে তা অন্যত্র শুনতে পাওয়া যায় না। যেমন—

ওরে ওরে সুন্দইর‍্যা নাওএর মাঝি
কোনদিন ছাড়িবায়রে নাও, আমি যেন ভানি।

ও মাঝিরে আমার বাড়ী যাইও, মাঝি বইতে দিমু পিড়া
খাইতে দিমু তোমায় আমি শালী ধানের চিড়া।

ভাটিয়ালী ছাড়া বাংলার আর একটা নিজস্ব জিনিষ হ'ল একতারা বাজিয়ে দেহতত্ত্ব-সম্বলিত বাউল গান। বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর লাউ বাজিয়ে মধুর কণ্ঠের রাধাকৃষ্ণের প্রেম-বিরহ গীতিতেও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এছাড়া বাংলার পল্লীর নিজস্ব সম্পদ, বাইচ খেলার নৌকা দৌড়ের প্রতিযোগিতায়। পল্লীর বলিষ্ঠ যুবকরা সারি সারি নৌকায় বৈঠা বাইতে বাইতে দরাজ গলায় যে গান গায় তা প্রতিযোগিতার উত্তেজনায় অতি সরস হয়ে ওঠে কখন বীররসে, কখন হাস্যরসে।

বাংলা দেশে হাড়ী, বাউরী, বাগদী শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে বহু নৃত্যগীতের প্রচলন আছে। বাঁকুড়া জেলায় বাউরী ও বাগদীদের কাঠিনৃত্য একটি সুন্দর উৎসব। পুরুষরা রঙ্গীন শাড়ী কুচি দিয়ে ঘাঘরার মত করে পরে, গলায় হার, কাণে দুল দিয়ে নারী সাজে। তারপর চার, ছয় বা আট জনকে নিয়ে এক একটি দল গঠন করে। হাত দেড়েক লম্বা কাঠি দু'হাতে নিয়ে কাঠিতে কাঠিতে ঠকাঠক্ আওয়াজ তুলে নাচতে সুরু করে। প্রথমে তারা ধীরে ধীরে নাচে, তারপর ক্রমশঃ নাচের তালে দ্রুত থেকে দ্রুততর হ'তে থাকে, হাতের কাঠিগুলোও দ্রুত সঞ্চালনে অদৃশ্যপ্রায় হয়ে যায়। এই নাচের সঙ্গে তারা মনসামঙ্গলের ও কৃত্তিবাসী রামায়ণের পদাবলী অবলম্বনে স্বরচিত গীত গায়। কাঠিনৃত্য ছাড়া ধর্ম্মরাজের গাজন উৎসবে ঢাকীনৃত্যও উল্লেখযোগ্য। সে সময় কবিদের তরজা হয়। মানে দুইদল কবি মুখে মুখে গীত রচনা করে উত্তর প্রত্যুত্তর দেয়। প্রতিযোগিতা চলে, তবে এ উৎসবের বহু গীতই সুরুচিপূর্ণ নয়।

বাঁকুড়ার আর একটি বিশেষত্ব পটের গান। সেখানে মাল নামে এক সম্প্রদায় আছে, তারা ধর্ম্মে ও আচরণে মুসলমান ও হিন্দুর সংমিশ্রণ। তাদের ব্যবসা হ'ল মহাভারত, রামায়ণ, মনসামঙ্গল এসবের চিত্রপট দেখিয়ে গান করা, অনেক স্থলে পটগুলি বড়ই সুন্দর ও স্বাভাবিক হয়। কতক পট তারা নিজেরা আঁকে, কতক বা বড় বড় পটুয়াদের দিয়ে আঁকিয়ে নেয়। বর্ষা-শেষে এরা পট নিয়ে বেড়িয়ে পড়ে ও বাংলার নানা অঞ্চল ঘুরে-ফিরে ছয়মাস কাটিয়ে অর্থ উপার্জ্জন ক'রে ঘরে ফিরে। কোন কোন সময় তাদের পরিবারের মেয়েরাও সঙ্গী হয়, তবে তারা পটের গানে যোগ দেয় না। তারা কাঁচের চুড়ি ফেরি করে বাড়ী বাড়ী ঘুরে পল্লীবধূ ও কন্যাদের হাতে চুড়ি পরিয়ে বেশ দু'পয়সা রোজগার করে।

ত্রিপুরা জেলায়ও একশ্রেণীর লোক এরকম পট দেখিয়ে গাজীর গান গেয়ে ভিক্ষা ক'রে বেড়ায়, তবে সে পট হ'ল বাঘের। আর নানা কাহিনী অবলম্বনে সে গীত রচিত হয়, যেমন

গাও গাও, গাওরে ভাই বাঘের কাহিনী
পঞ্চকোটি বাঘ নিয়ে নামিল বাঘিনী ইত্যাদি।

পাঞ্জাবে পাঞ্জাবী পুরুষদের ভাংরা নৃত্য একটি প্রাণবন্ত নাচ। নৃত্যকারীরা রঙ্গীন পোষাকে সজ্জিত হয়ে উদ্দাম নৃত্য করে। প্রশস্ত খোলা ময়দানে তারা নাচের ব্যবস্থা করে। সেখানে প্রথমে একটি ছোট বৃত্ত এঁকে সেটাকে ঘিরে আরও চার-পাঁচটা বৃত্ত আঁকে। ঢোলক-বাদক তার গলা থেকে ফিতে দিয়ে ঢোলক ঝুলিয়ে সেই বৃত্তে দাঁড়ালে নৃত্যকারীরা নাচের পোষাকে সজ্জিত হয়ে ঢোলক-বাদককে ঘিরে প্রথম বৃত্তে দাঁড়ায়। তাদের নাচের পোষাক হ'ল আঁটসাট চুড়িদার পাজামা, আঁটসাট রঙ্গীন সার্ট, তার উপর রঙ্গীন জ্যাকেট বা ওয়েষ্টকোট। সবার মাথায় পাগড়ি থাকা চাই-ই। পায়ে ক্যানভাসের জুতোর উপর মোটা ঘুঙুর বাঁধা। প্রত্যেকের হাতে এক একটা ছড়ি, কোন কোন সময় ছড়ির বদলে লম্বা চিমটা, তাতে ধাতুর গোলাকার পাত, অনেকটা সিকি-দুয়ানির মত গাঁথা। নাচের সময় সেগুলো থেকে মিষ্টি আওয়াজ বের হয়।

ঢোলক-বাদক প্রথমে ধীরে ধীরে ঢোল বাজাতে সুরু করে তারপর ক্রমশ: তার তালের গতি দ্রুত হ'তে থাকে এবং সেই তালে তালে নৃত্যকারীরা এক বৃত্ত থেকে অপর বৃত্তে হাত-পা-শরীর ছুঁড়ে অঙ্গভঙ্গি করে নাচতে থাকে, সে কি উল্লাসকর নাচ! কখন কখন নাচ যখন দ্রুতগতিতে চলে তখন একজন নৃত্যকারী বাদকের নিকটে এসে দাঁড়ালে বাজনা থেমে যায়।

সে গীতের একপদ রচনা করে সুর তোলে। বাকী নৃত্যকারীরা একে দুয়ে মিলে সে গীতরচনা পুরো করে। এই গীতগুলিকে পাঞ্জাবীতে বোলিয়াঁ বলে। যখন মুখে মুখে গীতরচনা সমাপ্ত হয় তখন সেই বোলিয়াঁর সবচেয়ে ভাল পদটি নিয়ে আবার নাচ সুরু হয়ে যায়, ঢোল পুরাদমে বাজতে থাকে। এই বোলিয়াঁ রচনা পাঞ্জাবী গ্রাম্য সমাজের একটি অতি আনন্দের বস্তু। তার প্রাণের আনন্দে এসব বোলিয়াঁ তৈরী করে, সেগুলো নানারূপ হাসিঠাট্টাভরা এবং কখন কখন অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট থাকে। পূর্ব্বে আমাদের বাংলা দেশের গ্রামে যে কবিগান হ'ত, তাতে কবিরা মুখে মুখে গীতরচনা ক'রে দু'দলে তর্কযুদ্ধ লাগাত, এই পাঞ্জাবী বোলিয়াঁ অনেকটা সেই ধরনের কবিগান।

ভাংরা নাচ যে সব সময়ই তান-লয় সংযোগে হবে তেমন কিছু নয়, অনেক সময় এটাকে তাণ্ডব নাচও বলা যেতে পারে। এই ভাংরা নাচে নৃত্যকারীদের অন্য ধরণের পোষাক হ'ল ঢিলে লুঙ্গি, ঢিলে কুর্ত্তা, মাথায় পাগড়ি এবং হাতে রঙ্গীন রুমাল। তাদের উজ্জ্বল রংবেরং-এর পোষাক নাচের সময় সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে।

পাঞ্জাবী নারীরা বিয়ে এবং অন্যান্য উৎসবে খুব জমকালো রেশম পোষাকে সজ্জিত হয়ে গোলাকারে বসে এবং ঢোলক বাজিয়ে গীত গায়। ছোট একটুকরো নুড়ি পাথর দিয়ে ওরা বড় সুন্দর ভাবে ঢোল বাজাতে পারে। বাংলার বিশেষ করে পূর্ব্ব বাংলার আনাচে-কানাচে যে এখনও শুধু পল্লীগীতি নয়, পল্লীনৃত্যের প্রথাও একেবারে বিলুপ্ত হয় নি তা জানলাম বিখ্যাত পল্লীগীতি-গায়ক শ্রীহট্ট-বাসী শ্রীনির্ম্মল চৌধুরীর কাছ থেকে। তিনি বললেন, শ্রীহট্টের কোন কোন অঞ্চলে এখনও নাচগানের প্রচলন আছে। তাঁর মায়ের ও ঠাকুরমার আমলে নাকি চতুর্থ-মঙ্গল বিয়ের রাত্রে সালঙ্করা সুবেশা নববধূকে নেচে দেখাতে হ'ত। যে বধূ নাচতে জানত না তাকে পল্লীনারীরা বিশেষ কৃপার চক্ষে দেখতেন। নববধূর নাচবার কথা শুনে বেহুলার নাচের কথা মনে পড়ল। পৌরাণিক যুগে গৃহস্থ নারীদের নৃত্যগীতের চর্চ্চা ছিল। সতী বেহুলা তাঁর অপূর্ব্ব নৃত্যছন্দে দেবরাজ ইন্দ্রকে মুগ্ধ ক'রে মৃত স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে এনেছিলেন।

বর্ত্তমানে বাংলার আধুনিক সমাজে এসব লোকনৃত্য গীতের বিশেষ প্রচলন বা সমাদর নেই, কিন্তু রাজস্থানের, মধ্যপ্রদেশের, উত্তর প্রদেশের ও দাক্ষিণাত্যের কোন কোন পল্লীগুলি আজও নরনারীর নৃত্যগীতে মুখরিত হয়ে ওঠে।

—•—

অসবর্ণ

শ্রীসুনন্দা মুখোপাধ্যায়

গানের স্কুল থেকে ফিরেছি। টেবিলের ওপর একখানা চিঠি। হাতের লেখা দেখে বুঝলাম ছোড়দার। খুললাম চিঠিখানা। মধ্যপ্রদেশ থেকে লিখেছে। প্রায় ছ'মাস হ'ল ছোড়দা বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে। ছোড়দা আমার চেয়ে বছর দুয়েকের বড়। ওর সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা অপরিসীম। সেই ছোড়দা আজ কতদূরে চলে গেছে। বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। বাগানটা দেখা যায়। পুষ্পিত কাঞ্চন গাছ সূর্য্যাস্তের রঙে ঝলমল করছে। চড়াই পাখীর দল কুলগাছের ডালে বসে কিচির মিচির করছে অনর্গল। মা রান্নাঘরে, বাবা ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন। বড়দার অফিস থেকে ফিরতে আটটা বাজবে। বড় বৌদি বাপের বাড়ী। বারান্দায় মাটির ওপরই বসে পড়লাম।

আজ ছোড়দার চিঠিটা পাবার পর থেকে কেবলই নানা কথা মনে পড়ছে। মনে পড়ছে, ছোড়দাকে ছোট-বেলায় নাম ধরে ডাকতাম। মা খুব বকুনি দিতেন, মেরেছেনও কতবার। ছোড়দাও তারস্বরে প্রতিবাদ করত। কিন্তু শত শাসনেও ফল হয় নি। আমি বড্ড জেদী ছিলাম, নাম ধরে ডাকাটা ছাড়ি নি। কিন্তু তাই ব'লে ছোড়দার সঙ্গে ভাব এক তিলও কমে নি। ছেলেবেলায় দু'জনে এক বিছানায় শুয়ে অনেক রাত পর্য্যন্ত জেগে থাকতাম। ছোড়দা আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিত, আমি ছোড়দার কপালের এলোমেলো চুলগুলো আস্তে আস্তে সরিয়ে দিতাম। ছোটবেলা থেকেই বই পড়তে ভালবাসত ও। আমাকে রাজকন্যা শঙ্খমালার গল্প বলত। ওর বলার গুণে চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠত সব। রাজকন্যার মূর্ত্তিটা পুরোপুরি চোখে ভাসত, তার হীরের কঙ্কণের ঝংকার, সোনার নূপুরের রুনুঝুনু, বেনারসীর খসখস সবই যেন ধরা-ছোঁয়ার জিনিষ। কল্পনার ব্যবধানটুকুও থাকত না। একটু বড় হয়ে রাজকন্যার একখানা ছবি এঁকেছিল ছোড়দা। সে ছবি দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। বাড়ীতে দাদা আমাদের চেয়ে বয়সে অনেক বড়। সে চিরকাল গম্ভীর, চুপচাপ। নিজের লেখাপড়া নিয়ে থাকে। তারপর দিদি। সেও আমার চাইতে ছ'বছর আগে জন্মেছে। মনের সব কথা তাকে বলা যেত না। চিরকাল বড় হবার গর্ব্ব দিদি আর আমার মাঝখানে ব্যবধানের অন্তরাল রচনা করত। ছোড়দা আর আমার বয়সের তফাৎ কম। প্রকৃতিতেও তার সঙ্গে আমার অনেক মিল। তাই ওর সঙ্গেই সম্বন্ধটা নিবিড় ছিল।

ভোরের বেলা প্রায়ই শিশির-ভেজা ঘাসের ওপর বেড়াতে বেরোতাম। ছোড়দা আর আমি। অত ভোরে মা ছাড়া বাড়ীর কেউই উঠতেন না। তখন আমি একটু বড় হয়েছি। 'ভিজে ঘাসের গন্ধভরা বনপথে'র মর্ম্ম বুঝতে শিখেছি। নীল অপরাজিতার মখমলের ঘোমটার আড়ালে শিশিরের ফোঁটা বড় ভাল লাগছে। সোনা-ঝুরির স্বর্ণরেণুর অতলে তলিয়ে যেতে চাইছে মন। বসন্ত প্রকৃতিতে এলে আগে ত কখনও চেয়েও দেখতাম না। এখন মনেও তার অস্পষ্ট আভাস পাচ্ছি। ছোড়দাও আগের চেয়ে অনেক গম্ভীর হয়ে গেছে। চুপচাপ কি যেন ভাবে অনেক সময়। তার হাসির দীপ্তি আরও গাঢ় হয়েছে। বয়ঃসন্ধির সব অপ্রাচুর্য্য ঘুচে গেছে। ভারী সুন্দর লাগছে তাকে। আমার ছোড়দাকে সুপুরুষ বলা চলে না। রং তার কালো। কিন্তু তবু যৌবনের ঐশ্বর্য্য সেই কালো রঙের ভেতরও আলো জ্বেলে দিয়েছে, কিসের আভায় ঝক ঝক করছে তার প্রশস্ত ললাট। দু'চোখের দৃষ্টিতে অন্তহীন মাধুর্য্যের ভাণ্ডার। ছোড়দা তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ছে। আমি তখনও কলেজে ঢুকি নি। তাই কলেজ সম্বন্ধে অপার বিস্ময় ছিল মনে। ছোড়দার কাছে কত রকম গল্প শুনতাম। সেই ছোটবেলার রূপকথার জগতের মত আরেক পৃথিবীর দ্বারও খুলে যেত চোখের সামনে। কলেজ লাইব্রেরী, কফি-হাউস, ডক্টর সুদর্শন মিত্রের ইতিহাসের ক্লাস—সব মিলিয়ে সেও আরেকটা স্বপ্নের জগৎ, কিন্তু শুধুই স্বপ্ন নয়। জানতাম, আমিও সেখানে একদিন প্রবেশাধিকার পাব।

আমরা থাকতাম বেহালা ছাড়িয়ে, সেখান থেকেই রোজ যাতায়াত করত ছোড়দা। পথের দূরত্বকে আমল দিত না। ক্লান্তির ধার ধারত না। পথে নানাজনের সঙ্গে ক্ষণপরিচয়ের উন্মাদনায় বিভোর হয়ে থাকত,

তা ছাড়া কলেজের নবলব্ধ অভিজ্ঞতা, সেও ছিল আরেক সম্পদ্। আর সেই বিহ্বলতার স্বাদ আমিও পেতাম। বাড়ীতে আমিই ছিলাম ওর সঙ্গী। ভাইবোনেদের মধ্যে ছোড়দাই লেখাপড়ায় সবচাইতে ভাল ছিল। বাবা চাইতেন ও সায়েন্স পড়ুক। কিন্তু সায়েন্স ভাল লাগত না ছোড়দার। বাবার আপত্তি সত্ত্বেও আর্টস-ই নিল ও। সত্যিই ছোড়দা মনে-প্রাণে আর্টসের ছাত্র ছিল। বোটানীর ক্লাসে বসে রজনীগন্ধার বুক চিরে দেখা ওর সাধ্যাতীত। একবার কোন মেলা থেকে একটা কারুকার্য্যবিহীন মাটির ফুলদানি কিনে এনেছিল, গায়ে তার কালো রং। সেই ফুলদানিতে রজনীগন্ধার পুষ্পিত বৃন্ত প্রায় রোজই রাখত সে। কলেজ থেকে ফেরার সময় কিনে আনত, নিজেও বারান্দার টবে রজনীগন্ধার চারা বসাত সযত্নে···অনেক সময় বর্ষার রাতে আলো নিভে যেত···সেই সময় ছোড়দার ঘর থেকে ভেসে আসত গান···দীপ নিভে গেছে···রজনীগন্ধার গন্ধ ভরেছে মন্দিরে।

গাছ থেকে পড়ে-যাওয়া ছোট্ট চড়াই পাখীর বাচ্চা রুমালে করে তুলে নিয়ে এসে পলতে দিয়ে দুধ খাওয়াতে বলত আমাকে। এরকম ছেলের পক্ষে গিনিপিগের কণ্ঠছেদনও অসম্ভব। বড় মায়া ছিল ছোড়দার মনে। পৃথিবীর সব কিছুর ওপর অপরিসীম মমতা, কিন্তু তাই বলে ভীরু ছিল না ও। সাহস যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তবু ও বোধ হয় এ যুগে অচল। ক্লাস 'প্রক্সি' দিতে চাইত না বলে, ছেলেরা ওকে 'সাধু মহারাজ' বলে ডাকত। পরীক্ষার হলে ব'সে নিজের খাতার দিক থেকে চোখ ফেরাত না দেখে ওকে ব্যঙ্গ করত ছেলেরা, "শমীক আমাদের আদর্শবাদী হয়েছেন।" তীব্র ব্যঙ্গভরা অনেক কণ্ঠস্বরই কানে পৌঁছত। প্রতিবাদ সহজে করত না। কিন্তু যখন করত, একেবারে চরমে পৌঁছে দিত। স্কুলে যখন পড়ত তখন ত পেন্সিলকাটা ছুরিটা নিয়ে ধাঁ করে বসিয়ে দিত প্রতিপক্ষের কারও হাতের চেটোয়, তা না হ'লে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ঘুঁষি চালাত। বড় হবার পর আর হাতাহাতি করত না, কিন্তু কেউ বেশী বাড়াবাড়ি করলে তীব্র বাক্যবাণে বিদ্ধ করত তাদের, একেবারে মর্ম্মে গিয়ে পৌঁছত সে আঘাত। রণক্ষেত্র থেকে সব বীররাই অদৃশ্য হ'ত তখন। ছোড়দার ওই মূর্ত্তির সামনে কারও আর টুঁ করবার সাহস ছিল না। কিন্তু অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের প্রকাশ ঘটত কদাচিৎ। চিরকাল রাগটা দমন করতেই চেষ্টা করত ছোড়দা। শান্ত, নম্র, বিনয়ী হবারই প্রয়াস ছিল তার। কিন্তু ভেতরে ভেতরে একটা অগ্নিগর্ভ মানুষও লুকিয়ে ছিল তার মধ্যে। চেতনার অতল থেকে সেই অগ্নিময় পুরুষ একেক সময় আত্মপ্রকাশ করত, তখন সে জ্ঞান হারাত। বিচার করত না কিছুই। শুধু রুখতে হবে, এই কথাটাই মনে রাখত। এর থেকে কাউকেই বাদ দিত না ছোড়দা। এমন কি নিজের ভাইবোনেদেরও নয়। একদিন আমাকেই বলেছিল, "তুই যদি কখনও নোংরা কিছু করিস শম্পা, আমি কিন্তু তোকে ক্ষমা করব না।"

সত্যিই এজন্য মনে মনে তাকে একটু ভয়ও করতাম আমি। দিদি যখন এক কনট্রাকটরকে ভালবেসে বিয়ে করল, তখনও ছোড়দার সেই অগ্নিময় রূপ দেখেছি। বাবা-মা কেউই এ বিয়েতে বিশেষ আপত্তি করেন নি। দিদির স্বামী অজয়দার অর্থ-সম্পদ্ ছিল অগাধ। শুধু বিত্তবান্ নয়, রূপবানও ছিল সে। সেই ঐশ্বর্য্যের দীপ্তি সকলেরই চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল। প্রথম দিন অজয়দাকে দেখে আমিও কম মুগ্ধ হই নি। শুধু ছোড়দাকে দেখেছিলাম এর ব্যতিক্রম। সে পাথরের মত কঠিন হয়েছিল। জানত, তার আপত্তিতে কোন ফল হবে না। তাই মুখে কিছুই বলে নি, শুধু আমায় একবার ডেকেছিল নিভৃতে। বলেছিল, "দিদিটা শুধু শুধু এম. এ. পাস করেছে। ওর কোন বুদ্ধি হয় নি। অজয় রায়কে কে না চেনে কোলকাতায়? ও কি ভাবে টাকা করেছে···" বলতে বলতে ধক্ করে জ্বলে উঠেছিল ছোড়দার চোখ। বুঝেছিলাম সেই অগ্নিময় মানুষটা ওর সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। কথা না বাড়িয়ে সরে এসেছিলাম। দিদির বিয়ের দু'দিন আগে ছোড়দা বাড়ী থেকে চলে গিয়েছিল। গিয়েছিল শ্যামবাজারে এক বন্ধুর বাড়ী। দিদি শ্বশুরবাড়ী চলে যাবার পর ফিরে এসেছিল। ওর বিদ্রোহ আমাকে নাড়া দিয়েছিল ঠিকই কিন্তু বাড়ীর বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ জানান সম্ভব হয় নি আমার পক্ষে। আমি ছোড়দার চেয়ে অনেক দুর্ব্বল। বিয়ের পরে দিদি কয়েকবার এসেছে, অজয়দাও এসেছেন সঙ্গে। ওদের মোটরের আওয়াজ পাবার সঙ্গে সঙ্গে ছোড়দা ঘর ছেড়ে চলে গেছে বাইরে। হয় বাগানে, নয়ত অন্য কারও বাড়ীতে। তারপর দিদি একা এসেছে, তার ক্লান্ত বিষণ্ন মুখের দিকে চেয়ে আমার কান্না পেয়েছে, কিন্তু ছোড়দার দয়া হয় নি। সে দিদিকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারে নি। অথচ অজয়দার সঙ্গে ত বিয়ের দু'বছরের মধ্যেই ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে

দিদির। জব্বলপুরে একটা স্কুলে কাজ নিয়ে চলে গেছে সে। ছোড়দা তবু তার সম্বন্ধে এতটুকু কোমল হয় নি, বরঞ্চ বলেছে, "দিদি নিজের কাজের প্রতিফল পাচ্ছে। লোভ করলে এরকমই হয়।" ছোড়দার কথাগুলো মাঝে মাঝে বড় রসকষহীন ঠেকে। মনে হয়, বড় রূঢ়ও। আদর্শবাদ বজায় রাখতে গেলে কি এত নির্ম্মম হ'তে হয়, নিজের একান্ত আপনজন সম্বন্ধে এমন নিষ্করুণ অবজ্ঞা কি করে জাগল ওর মনে? ভুল দিদি করেছিল ঠিকই, কিন্তু তার ফলও ত পেল বেচারী হাতে হাতে। মরীচিকার দিকে দু'হাত বাড়িয়ে গিয়েছিল, পেল শুধু মরুভূমির স্বাদ। একটা সন্তান পর্য্যন্ত হয় নি, শুধু উচ্ছৃঙ্খল স্বামীর অত্যাচারের ক্ষত বহন করে এনেছে সর্ব্বাঙ্গে। তবু ছোড়দা তার সঙ্গে ভাল করে কথা বলে নি, জানতেও চায় নি কিছু। আমাকে বলেছে, 'মানুষকে না চিনে তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হওয়াই বা কেন?' ছোড়দার কথায় সেদিন ঠিক সায় দিতে পারি নি। কোন ভুলই কারও পক্ষে বিচিত্র নয়। তার জন্য এত কঠিন হ'য়ে লাভ কি? মানুষকে কি সব সময় চেনা যায়?

মা ভেতর থেকে ডাকলেন, "শম্পা কই রে?" ভেতরে গেলাম। মা একরাশ মাছের চপ গড়ছেন। "শৌভিক ওর ক'জন বন্ধুকে নেমন্তন্ন করেছে রাত্রে, আয় ত হাতে হাতে গড়ে দে।"

চপ গড়তে বসলাম। আবার ভাবনার ছিন্ন সূত্রটা জোড়া দিতে চাইলাম। মনে পড়ল নীলার কথা। নীলারা তখন প্রথম এসেছে আমাদের পাড়ায়, আমারই বয়সী ও। স্কুলেও এক ক্লাসেই ভর্ত্তি হ'ল। তখন আমি ক্লাস টেন-এ পড়ি। তের-চোদ্দ বছর বয়েস। নীলার সঙ্গে প্রথম দিনই বেশ অন্তরঙ্গ হ'লাম। প্রথমতঃ, দু'জনে এক পাড়ায় থাকি। দ্বিতীয়তঃ দেখলাম ও-ও রবীন্দ্রনাথের পরম-ভক্ত। তাজমহল কবিতার কথা বলতে গিয়ে জ্বলজ্বল করে উঠল ওর চোখ, কোন এক সময় কি আলোচনাসূত্রে বলল, কি অপূর্ব্ব লিখেছেন! "বিস্মৃতির মুক্তিপথ দিয়া আজও সে কি হয়নি বাহির?"

এরকম সঙ্গিনী আগে কখনও পাই নি। এ ধরনের আলোচনায় ছোড়দাই ছিল আমার একমাত্র সঙ্গী। শুধু সঙ্গী নয়, গুরু। বাগানের এক কোণে মোড়া পেতে বসে লিপিকা পড়ত ছোড়দা। ওর গলার স্বরে কি সম্পদ্ ছিল তা ভাষায় ব'লে বোঝান যায় না। আমার মনে হ'ত ওর স্বর যাদুকাঠি ছুঁইয়ে দিত সমস্ত প্রকৃতিতে। আকাশের তারা থেকে মাটির পৃথিবী পর্য্যন্ত সেই অনামা মন্ত্রের গুঞ্জরণে মুখর হয়ে উঠত। সেই স্বরের আভাস পেলাম নীলার কণ্ঠে, খুব ভাল আবৃত্তি করত নীলা। শুধু আবৃত্তি নয়, গানের গলাও ছিল তার। সবচেয়ে সুন্দর ছিল তার নাচ। ভর্ত্তি হবার দিনকয়েকের মধ্যেই স্কুলের অনুষ্ঠানে নাচতে দেখেছিলাম তাকে। মনে হয়েছিল ওর সর্ব্বাঙ্গে গানের অভিব্যক্তি। ওর দৃষ্টিতে সুগভীর আকুতি। ছোড়দাও গিয়েছিল সেই অনুষ্ঠানে। ফেরবার পথে আমিই বললাম, "ভাল লাগল নীলার নাচ? ওই যে 'শাওন গগনে' নাচল?"

"হ্যাঁ"। আর বিশেষ কিছু বলল না ছোড়দা।

এর ক'দিন পরে ওর চন্দন-কাঠের বাক্সের ভেতরে এক নৃত্যরতার ছবি আবিষ্কার করেছিলাম, ছবিটা ছোড়দার আঁকা। রেখে দিলাম ছবিখানা। ছোড়দাকে এ নিয়ে কিছু বলি নি। এর আগে কখনও কিছু গোপন করে নি আমার কাছ থেকে। মনে মনে একটু ব্যথা পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে গর্ব্বও হ'ল। নীলা ত আমারই বন্ধু। তার নাচ এতখানি প্রেরণা দিল ছোড়দাকে! এর ক'দিন বাদেই নীলা আমাকে ওদের বাড়ীতে নিয়ে গেল। আগে কখনও যাই নি। বাড়ীটা খুবই ছোট। একখানা ঘর। তাতেই থাকেন নীলার বাবা-মা আর তার চারটি ভাইবোন। এরই মধ্যে সব বেশ পরিচ্ছন্ন। নীলার মা'র মুখের হাসিটি ভারী মিষ্টি লাগল। তাঁর শীর্ণ শিরাবহুল হাতের সস্নেহ স্পর্শ মনের মধ্যে গাঁথা হ'য়ে রইল। নীলা একখানা প্লেটে দু'টি বাদামের বরফি এনে দিল। ওর বোন শীলা এনে দিল একগ্লাস লেবুর সরবৎ। খাবার পর পেছনের উঠোনে মোড়া পেতে বসলাম দু'জনে। অনেক কথা হ'ল। নীলার গভীর কাল চোখদুটো কেমন বেদনার্ত্ত মনে হ'ল। স্পষ্ট ক'রে কিছুই বলে নি নীলা। কিন্তু মনে মনে বুঝেছিলাম ওদের বাড়ীতে কেউই সম্পূর্ণ সুখী নয়। একটা অস্বস্তির ছায়া ওদের ঘিরে রয়েছে সর্ব্বদা। পরে আস্তে আস্তে জেনেছিলাম ওদের ইতিহাস। নীলার বাবা একসময় ভাল চাকরিই করতেন। স্নেহপরায়ণ, মমতাময় মানুষ ছিলেন তিনি। কর্ত্তব্যে তাঁর ত্রুটি হ'ত না কখনও। কিন্তু হঠাৎ একবার কয়েকজন সহকর্ম্মীর চক্রান্তে তাঁর চাকরি গেল। তিনি নিরপরাধ ছিলেন। তারপর থেকেই একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। মদ ধরলেন, আনুষঙ্গিক নানা দোষ দেখা দিল। সামান্য একটা চাকরি নিলেন। কিন্তু তার সব টাকাটা নীলার মায়ের হাতে এসে পৌঁছত না। তাই চরম দৈন্যের মধ্যে দিন কাটত ওদের। নীলার হাতে কয়েক গাছা কাঁচের চুড়ি ছাড়া অন্য অলঙ্কার দেখি নি। সাধারণ সাদা

খোলের দিশী তাঁতের শাড়ী ছাড়া অন্য শাড়ীও বিশেষ পরত না সে। দু'এক সময় যখন রঙীন শাড়ী পরে আসত, তখন মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতাম ওর দিকে। সত্যি! নীলাকে সব বেশেই এত মানায়। কে যে ওর নাম নীলা রেখেছিল, তাই ভাবি। পদ্মের আভা ওর সর্ব্বাঙ্গে। কিন্তু সে ত নীল-পদ্মের নয়, শ্বেত-কমলের শুভ্রতায় দীপ্তিময়ী ও। ওর মা মাঝে মাঝে দুঃখ করে বলতেন আমাকে, "এত রূপ নিয়ে কি হবে শম্পা? এ-রূপ দেখলে আমার ভয় করে। মেয়েটা ঠিক ওর বাপের মত দেখতে। ওঁর মতই স্বভাব। এমনিতে হাসছে, গান করছে। আবার বড্ড চাপা। শেষকালে হয়ত ওঁরই মত···" কান্নায় রুদ্ধ হয়ে আসত নীলার মা'র গলার স্বর।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে চপ গড়া শেষ হয়ে গিয়েছে খেয়ালই ছিল না···মা-ই তাড়া লাগালেন, "এই, হ'ল তোর? এবার যা, গা ধুয়ে নে।" সত্যিই বড্ড গরম লাগছিল, তাড়াতাড়ি স্নানের ঘরে চলে গেলাম। স্নান সেরে ওপরে গেলাম শোবার ঘরে। ছোড়দার চিঠিটা নিয়ে চন্দন-কাঠের বাক্সের মধ্যে রাখলাম। যাবার আগে এটা আমাকে দিয়ে গেছে ছোড়দা। ওর সবচেয়ে প্রিয় ছিল এই সুরভিত কাঠের বাক্সটি। ছোটবেলায় এর ওপর আমার বড় লোভ ছিল। না চাইতেই অনেক কিছু দিত ছোড়দা। কিন্তু এই বাক্সটা দিতে পারে নি। এর মধ্যে সে তার চিঠিপত্র রাখত। যাবার আগে বাক্সটার সব স্বত্ব ত্যাগ করে দিয়ে গেছে। খুলতেই সেই পরিচিত মৃদু গন্ধ এল নাকে। বাক্সের মধ্যে কয়েকটা চিঠি, ফটো, শুকনো ফুল, রঙীন কাগজ, ঝিনুক। চিঠিগুলো খুললাম, প্রায় সবই নীলার লেখা। একবার বাড়ীশুদ্ধ সকলে দীঘা বেড়াতে গিয়েছিলাম। তখন নীলা অনেকগুলো চিঠি লিখেছিল। ছোড়দা সেবার যায় নি। এখানেই ছিল। সে-সময় নীলার ছোটভাই নিতু ওর কাছে পড়তে আসত। সেই সূত্রে ওদের বাড়ীতে গিয়েছিল ছোড়দা। তখন লিখেছিল আমাকে—"তোর বন্ধুর বাড়ীতে গিয়েছিলাম। ভাল লাগল। তোর কাছেই শুনেছি, নীলার বাবার চরিত্র-দোষ আছে। কিন্তু তবু তাঁকে অশ্রদ্ধা করতে পারলাম না। এঁর সঙ্গে অজয় রায়ের কোন মিল নেই। এ হ'ল আত্মধিক্কারের প্রতিফল। তারপর যত নীচে নেমেছেন, নামটাই সত্য হয়ে গেছে। ধ্বংসের উন্মত্ততা পেয়ে বসেছে তাঁকে।" সেদিন নীলার বাবাকে নিয়ে ছোড়দার দার্শনিক বিশ্লেষণের অর্থটা ঠিক বুঝি নি। আসলে যে এটা ওর নিজের মনের কাছেই জবাবদিহি, তা ত বুঝি নি তখনও।

দীঘা থেকে ফিরে এলাম। দূর থেকে বাড়ীর বাগানটা নজরে পড়ল, দেখলাম কৃষ্ণচূড়ার ডালে রক্তিমার আভাস। ছোড়দা ষ্টেশনে আসেনি। মনে মনে সেজন্য একটু রাগ হয়েছিল। বাড়ীতে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলাম। দেখি, পড়ার টেবিলের সামনে বসে তন্ময় হয়ে কি পড়ছে ছোড়দা। আরও রাগ হ'ল, বিরক্তি গোপন করে উদাস স্বরে বললাম, "কত ঝিনুক এনেছি, তোকে একটাও দেব না"।

ঝিনুকের ভাগ নেওয়া সম্বন্ধে এতটুকু ঔৎসুক্য দেখলাম না ওর। অন্য সময় হ'লে এতক্ষণে কাড়াকাড়ি সুরু করত। অগত্যা কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেলাম। দেখি একটা নীল কাগজ ওর হাতে, তাতে লেখা—

আমার প্রেম গোলাপ সম উঠুক ফুটে
বসন্তেরই শ্যামল সরস পত্রপুটে,
আমার প্রীতি উছল সুরের ঝর্ণা ধারা,
মধুরতায় গভীরতায় আপনহারা।

হাতের লেখাটা পরিচিত। আমি উঁকি মেরে দেখছি দেখে ছোড়দা কৈফিয়তের ভঙ্গিতে বলল, ওই বার্ণসের কবিতার ক'টা লাইন, নীলা অনুবাদ করে আমায় দেখতে দিয়েছে। বলতে বলতে কাগজটা ভাঁজ করে ড্রয়ারের মধ্যে রেখে দিল। তারপর অকারণেই আঁচড় কাটতে লাগল খোলা খাতাটার ওপরে। নীলা কবিতা লেখে সে খবরটা জানা ছিল না। আমার আগে ব্যাপারটা ছোড়দা আবিষ্কার করেছে দেখে বলা-বাহুল্য একটুও খুশী হ'লাম না। কিছু না বলেই ছোড়দার টেবিলের কাছ থেকে সরে এলাম। অনেক গল্প জমা হয়েছিল, দীঘার সমুদ্রের অপরূপ বর্ণনা। কিছুই বলা হ'ল না। ওখানে তোলা আমার ক্যামেরার প্রথম ছবিগুলো ব্যাগের মধ্যেই রয়ে গেল। সেদিন বিকেলে নীলা এল, নিতুর হাত ধরে। দেখলাম এরই মধ্যে বেশে বাসে অনেক বদল হয়েছে তার। সাদা শাড়ীটা আর নেই। ঘন নীলরঙের শাড়ী পরেছে একখানা। নীলা আমাকে দেখে মিষ্টি হেসে এগিয়ে এল। বলল, 'আমার ঝিনুক কই?' দু'হাত বাড়াতেই আমি ঝিনুকের ভাণ্ডার উজাড় করে দিলাম ওর হাতে। ছোড়দার জন্য একটাও রাখলাম না। লক্ষ্য করলাম, কাঁচের চুড়িগুলি নেই ওর হাতে। তার বদলে দু'খানা হাতীর দাঁতের বালা। ছোড়দা বাড়ীতেই ছিল, বেরিয়ে এল একটু পরে। নিতুকে ডেকে বারান্দার একধারে

মোড়া পেতে বসল। একমনে দেখতে লাগল নিতুর ট্রানশ্লেশনের খাতা।

নীলাই বলল, "ছাদে যাবি?"

দু'জনে ছাদে গেলাম। নীলাকে কেমন অন্যমনস্ক মনে হ'ল। আলসেতে হেলান দিয়ে ও দূরের আকাশটাকে একমনে লক্ষ্য করছিল। হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "দেখেছিস, কেমন একটা একটা করে তারা ফুটছে। আকাশটাকে এমন সুন্দর মানিয়েছে। তা না হ'লে তারাদের কি এত সুন্দর দেখাত?"

"এটা কি তোর নূতন আবিষ্কার নাকি? আজকাল বুঝি খুব কবিতা লিখছিস্?"

"কবিতা ত অনেককাল আগে থেকেই লিখি। নূতন কিছু ত নয়।"

"কই, আমি ত কখনও দেখি নি।"

"দেখাব। আমাদের বাড়ী যাস্।"

কেন জানি সেদিন কথাবার্ত্তা এগোচ্ছিল না একটুও। বড় অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল নীলা। কোন আলোচনাই জমল না। দীঘার কথা তাকেও বলা হ'ল না। খানিক বাদে নীলাই বলল, "আজ যাই শম্পা। কাল কলেজে দেখা হবে।"

নীচে নামতেই দেখি ছোড়দা দাঁড়িয়ে। এতক্ষণ পরে ছোড়দা আমার দিকে ভাল ক'রে তাকাল। বলল, "চল্ না শম্পা, ওদের এগিয়ে দিয়ে আসি।" এতক্ষণে যা ভাল করে বুঝতে পারছিলাম না, সেটা স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল চোখের সামনে। বললাম, "না, তুমিই যাও। আমার বড্ড মাথা ধরেছে।" আমাকে অনুরোধ করাটা যে শুধু ভদ্রতা, তা ওর গলার স্বরেই বুঝেছিলাম।

এরপর থেকে অবশ্য আর কোন কিছুই গোপন রাখে নি ওরা আমার কাছে। আমি ছিলাম সেতু। নীলা আর ছোড়দার যোগসূত্র। ছোড়দা তখন ফিফ্‌থ ইয়ারে পড়ে। আমরা থার্ড ইয়ারে। কলেজ থেকে ফেরার পথে প্রায়ই দেখা হ'ত ছোড়দার সঙ্গে। লক্ষ্য করতাম, নীলাকে দেখবার সঙ্গে সঙ্গেই তার সারাদিনের ক্লান্ত ম্লান মুখখানা কিসের গোপন আভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। ট্রামে অজস্র ভিড়, নানা ধরনের লোকজন, পরিবেশটায় এতটুকু মাধুর্য্য থাকত না, কিন্তু তবু তারই মধ্যে কখন কোন্ জানলার ফাঁক দিয়ে গোধূলির রক্ত-আলোর দীপ্তি দু'টি হৃদয়কে রাঙিয়ে দিয়ে যেত। সত্যি, আমারও ভারী ভাল লাগত। ভাবতাম, ছোড়দা এতদিনে তার মনের মত সঙ্গিনী পেয়েছে। ওর সবতাতেই ত বাড়াবাড়ি, আদর্শ নিয়ে মাতামাতি করে সব সময়। এ যুগে ওর মনের মতন কাউকে পাওয়াই যাবে না ভেবেছিলাম। কিন্তু নীলা সত্যিই ওর যোগ্যা। ওর বাবা অবশ্য ওদের জীবনে একটা কালো ছায়ার মত জড়িয়ে আছেন। কিন্তু তবু সেই কালিমা নীলার কোথাও লাগে নি। সে নির্ম্মল। তার রুচি, বুদ্ধি, কাব্যপ্রীতি সবের সঙ্গেই ছোড়দার আশ্চর্য্য মিল। আগে ভাবতাম, ছোড়দা যদি বিয়ের পরে ছাদে ব'সে কবিতার বই পড়ে, আর তার বউ কোমরে কষে কাপড় জড়িয়ে ছ্যাঁচড়া রাঁধতে বসে, বাজারটা তেমন ভাল আনা হয় নি ব'লে সারাদিন ঘ্যানঘ্যান করে, তা হ'লে কি হবে? সংসারে ঢুকলে ছ্যাঁচড়ার তরকারি কোটাটা বাদ দেওয়া যায় না, সে কথা ছোড়দাও জানে। কিন্তু যে মেয়ে কাব্যরস বোঝে না, যার কোন এসথেটিক্ সেন্স নেই, সে শত রন্ধনপটু হ'লেও ছোড়দার জীবনে তার স্থান নেই।

সুন্দরী সম্বন্ধে কোনদিন কোন মোহ ছিল না ওর। রুচির প্রতি ছোড়দার চিরন্তন আকর্ষণ। তার মনের মধ্যে তিল তিল করে যে মূর্ত্তিটা গ'ড়ে উঠেছিল, তার পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা শক্ত। নীলার সঙ্গে সে মূর্ত্তির এতটুকু তফাৎ নেই, সে কথাও বলা চলে না। কিন্তু মিল অনেকটাই ছিল, বাস্তব আর কল্পনায় চিরকালই ব্যবধান থাকে। নীলা ছাড়া আর কেউ ছিল না কাছাকাছি, যে ছোড়দার মনে সাড়া জাগাতে পারে। লেখাপড়ায় নীলা একেবারে অসাধারণ ছিল একথা বলা চলে না, কিন্তু সাধারণের চেয়ে অনেক উর্দ্ধে ছিল তার স্থান।

পড়ার বইয়ে খুব যে একটা মনোযোগ ছিল তা নয়, কাব্যের মায়ালোকে ঘুরে বেড়াত তার মন। ইংরেজী সাহিত্যও পড়ত। পড়তে ভালবাসত খুব। কিন্তু পাঠ্য বই নিয়ে বেশীক্ষণ থাকতে পারত না। একই কথা বারবার পড়ার ধৈর্য্য ছিল না তার। অথচ লাইব্রেরী থেকে আনা বায়রণ আর কীট্‌সের কবিতাগুচ্ছ বারবার পড়তে অদ্ভুত ভাল লাগত ওর। মাঝে মাঝে দর্শনের তত্ত্বালোচনাও পড়ত। বৈষ্ণব-কাব্যের সুর-ঝঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে তার তথ্য ও তত্ত্ব কিছুই বাদ দিত না। ভারতবর্ষের কোটি কোটি দেব-বিগ্রহ সম্বন্ধে তার আগ্রহ অপরিসীম, মনে-প্রাণে তাঁদের ভক্তি করে সে।

এই একটা ব্যাপারেই বোধ হয় ছোড়দার সঙ্গে তার কোন মিল ছিল না। ছোড়দা কোনকালে দেবদেবীর ধার ধারত না, খুব হাল্কাভাবেই উড়িয়ে দিত সব। বলত, "ভক্তির তিলক-আঁকা যতজনকে দেখেছি, তারা হয় নিজেরা বোকা নয়ত বোকাদের ঠকিয়ে খাচ্ছে।"

নীলা ছিল ঠিক তার উল্টো। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে সে তার রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহের জন্য মালা গাঁথতে বসত। স্নান সেরে নিত তার আগে। মায়ের গরদের ছেঁড়া শাড়ীটি গুছিয়ে পরত। কতদিন দেখেছি, গুনগুন ক'রে গান গাইতে গাইতে আমাদের বাড়ীর বাগানে ফুল তুলতে এসেছে নীলা। রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছে না, হরি-নামের মহিমা ফুটেছে ওর স্বরে। কপালে চন্দনের টিপ। কোঁকড়া চুলের রাশে পিঠের আধখানা ঢাকা। একদিন ছোড়দাকে বলতে শুনেছি, "সকালবেলা এ বেশে তোমায় দেখতে বড় ভাল লাগে। কিন্তু এর মধ্যে শুধু এই বেশ-টুকুই সত্য, আর ত কিছুই খুঁজে পাই না।" নীলা কোনদিন তর্ক করে নি, কিন্তু মনে মনে বুঝতাম, ছোড়দার এ কথাটা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারে নি। ছোড়দাকে সে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করত, ভালবাসত। কিন্তু তার পূজার ব্যাপারে কারও হস্তক্ষেপ ওর ভাল লাগত না।.........আবার ভাবনা-সূত্র ছিঁড়ে গেল। নীচে বড়দার গলার আওয়াজ পাচ্ছি। ওর বন্ধুরা বোধ হয় এসে গেছে। আমাকে এবারে যেতে হবে নীচে। নেমে গেলাম একতলায়। বারান্দায় সবাই মিলে বসেছে। ঘরের মধ্যে রূপোর ছোট্ট থালায় একরাশ বেলফুল। আরেকটা সন্ধ্যা স্পষ্ট হোল চোখের সামনে। বেলফুলের মালা জড়িয়েছিলাম খোঁপায়, নীলার শত আপত্তি সত্ত্বেও তার খোঁপায় জড়িয়ে দিয়েছিলাম মালা। মোড়া পেতে বসেছিলাম ছাদে, ছোড়দাও এল। ওর হাতে চীনেবাদামের ঠোঙা। চোখ দুটো হাস্যোজ্জ্বল। নীলার দিকে তাকাল, মুগ্ধতা ফুটল ওর দৃষ্টিতে। অপরূপ এই সন্ধ্যার নিবিড় ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশ। বেলফুলের গন্ধ জড়িয়ে ছিল হাওয়ায়, দূরে কাদের ঘরে নিয়ন লাইট জ্বলছিল। সব মিলিয়ে একটা আশ্চর্য্য অনুভূতি জাগল। মনে হ'ল, ওদের মনের কথা কি আমার সামনে তেমন করে বলা চলবে? তার চেয়ে উঠে পড়া ভাল। নীলা কিছুতেই উঠতে দেয় নি, আঁচল চেপে ধরে রেখেছিল। অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছিল, সাহিত্যে রসবিকার নিয়ে আলোচনাটা জমে উঠল। ছোড়দাই বলছিল, যার পরিণতি সুন্দর নয়, সার্থক নয়, যার মধ্যে কোন প্রেরণা নেই, যে শুধু মনকে হাল্কা রঙের খেলায় ভোলায়, অগভীর উন্মাদনায় মাতায়—সে সাহিত্য মূল্যহীন। যার পরিণতি আনন্দে, অমৃত সঞ্চয় যার কোষে কোষে, যার মধ্যে অনুপ্রেরণা আর গভীর আবেগ—সেই ত সার্থক সাহিত্য। ছোড়দাই আবার বলল, "কে যেন একবার বলেছিলেন, 'মদনের বেশে দেখা দেন নি মহেশ্বর, তাঁর ভস্মময় অগ্নি মূর্ত্তিতেই মোহিত হয়েছিলেন উমা'।" কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই নীলা হাসল। আমি চুপি চুপি বললাম, ঠিক তোর দশা।

নীলা মুখ নীচু করে আবার একটু হাসল।

ছোড়দা কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আমার কথাটা ওরও কানে পৌঁছেছিল। মৃদু হাসল সে। ভাবতে ভাবতে খাবার ঘরে এসে পৌঁছলাম, মা'র নির্দ্দেশানুযায়ী টেবিলটা সাজালাম। ফুলদানিতে একগুচ্ছ রক্ত গোলাপ, ধবধবে সাদা চাদর, উপুড় করা চীনেমাটির প্লেট, কাঁচের গ্লাসে জল।

একে একে সবাই এসে খেতে বসলেন। খাবার সময় কত গল্প, হৈ হৈ। আমার মন কিন্তু এদিকে ছিলনা। বারে বারেই অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলাম। সবার খাওয়া-দাওয়ার পালা চুকতে চুকতে প্রায় সাড়ে নটা বাজল শোবার ঘরে ঢুকেও কিছুতেই ঘুমোতে ইচ্ছে করল না। টেবিলে এসে বসলাম চিঠির প্যাড আর কলমটা নিয়ে। ছোড়দাকে একটা চিঠি লিখব ভাবলাম। কিন্তু এক লাইনও লিখতে পারছি না। সেই হারানো দিনের স্মৃতি সার বেঁধে দাঁড়াল চোখের সামনে। আবার ফিরে গেলাম অতীতে।

ছোড়দার সঙ্গে নীলার বিয়ে হবে, একথা বাড়ীর সকলেই জানতেন। ওদের সঙ্গে জাতের অমিল থাকা সত্ত্বেও বাবা-মা'র কোন আপত্তি ছিল না। নীলাকে সকলেই ভালবাসতেন, ওর মা'র সঙ্গে আলাপ করেও সবাই খুশী হয়েছিলেন। বাবার ব্যাপারটাও জানতেন, কিন্তু সে নিয়ে প্রথমে একটু আপত্তি উঠলেও, পরে ব্যাপারটা চাপা পড়ে গিয়েছিল। ছোড়দার বেপরোয়া স্বভাবের কথা সকলেই জানতেন। ও যদি কাউকে চায়, তাতে বাধা দিয়েও কোন ফল হবে না, সে কথা বুঝতেন তাঁরা। তা ছাড়া পিতার দোষে কন্যাকে অপরাধিনী করা চলে না। অতখানি অনুদার নন আমার বাবা-মা। ছোড়দার পরীক্ষা হয়ে গেলেই বিয়ে হবে এরকমই ঠিক ছিল। ওর চাকরির জন্য কারও কোন ভাবনা ছিল না, পরীক্ষার ফলাফল ওর চিরকালই ভাল হয়। একটা প্রফেসারী যে করে হোক জুটে যাবেই।

পরীক্ষার মাসখানেক আগে ছোড়দা হঠাৎ আমার পড়ার ঘরে এসে হাজির। তখন নীলা বিশেষ আসত না, পরীক্ষার জন্যই ওরা দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ রেখেছিল। মাঝে মাঝে চিঠি লিখত। ছোড়দার হাতে একটুকরো

কাগজ, বলল, পড়ে দেখ। এর আগে নীলার কোন চিঠি আমাকে পড়তে দেয় নি ছোড়দা। সম্বোধনবিহীন দু'টি ছত্র—"মা'র গুরুদেব এসেছেন চন্দননগরে। আমি মার সঙ্গে যাচ্ছি। সাতদিন পরে ফিরব।" চিঠিটা পড়ে ছোড়দার মুখের দিকে তাকালাম। দেখলাম, সেই বুকোন আগুনের আভাটা আবার যেন দেখা দিচ্ছে ওর চোখে। মনে মনে নীলাকে উদ্দেশ্য করে বললাম, পাথরের পুতুল নিয়ে ছিলি, ভালই ত। এর ওপর আবার জীবন্ত মানুষ নিয়ে পুজো কেন? নীলা কি জানে না ছোড়দা কোন কালেই গুরুপূজা সইতে পারে না।

সাতদিন পরে নীলার মা ফিরে এলেন। খবর পেয়েই গেলাম ওদের বাড়ী। শুনলাম, নীলা আসে নি। ও নাকি গুরুদেবের সেবায় লেগেছে। চন্দননগরে তিনি আরও দিন ছয়েক থাকবেন। তারপর আসবে নীলা। কথাটা ছোড়দাকেও জানালাম। কিন্তু এ নিয়ে আমার সঙ্গে একটি কথাও বলল না সে। সাতদিন বাদে নীলা এল। বাইরে থেকে ওর পরিবর্ত্তন বিশেষ বোঝা গেল না। কিন্তু আমাদের বাড়ীতে একদিনও এল না আর, কলেজেও আমাকে এড়িয়ে গেল। ছোড়দাও আর যায় নি ওদের বাড়ী। আমাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করে নি। অথচ ওর মুখ দেখেই বুঝতাম, অন্তরে অন্তরে ও কতখানি বেদনার্ত্ত। কিন্তু এও জানতাম, শত বেদনাতেও ছোড়দা পরাজিত হবে না কিছুতেই। নীলা যতদিন নিজে থেকে কিছু না বলবে ততদিন নীরবই থাকবে সে। তাকে লুকিয়েই একদিন নীলাদের বাড়ী গেলাম। নীলা অন্যদিনের মতই হেসে অভ্যর্থনা করল। তবু আগেকার সেই দীপ্তিটা যেন খুঁজে পেলাম না, চোখের নীচে ক্লান্তির ছায়া। বসলাম ওর পাশে। হাতে সেই হাতীর দাঁতের বালা দু'টি নেই। নিরাভরণ শুভ্র হাত দু'খানা কোলের ওপর তুলে নিলাম। বললাম, "চুড়ি খুলেছিস কেন? যোগিনী হবি নাকি?"

"তাই ত ইচ্ছে মনে মনে।" একটু হাসলো ও।

বললাম, "তবে আমার ছোড়দার মন কেন ভালালি? এখন আর ফাঁকি দেওয়া চলবে না।"

এ কথার কোন জবাব দিল না ও। চোখের ক্লান্তির ছায়া আরও গাঢ় হ'ল। কথায় কথায় গুরুর কথা তুললাম। গুরুর নাম স্বামী সেবানন্দ। বয়েস বেশী নয়, সবে চল্লিশ পেরিয়েছে। চমৎকার গানের গলা, যখন কথামৃত পাঠ করেন, মুগ্ধ হয়ে শুনতে হয়। মনে মনে ভাবলাম, ওরই মধ্যে ময়ূরের কবিতা পাঠ ভুলে গেল নীলা? মাস দু'য়েক আগে ইউনিভার্সিটির আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় 'আফ্রিকা' কবিতায় কে প্রথম হয়েছে, সে কথা কি ওর মনে নেই? সে সময় ওর মুগ্ধ দৃষ্টি ত আমিও দেখেছি। বলেছিল, 'কি অপূর্ব্ব বলে শমীক। শেষ হয়ে যাবার পরেও অনেকক্ষণ ধরে কানের কাছে বাজতে থাকে ওর গলার স্বর।' আর আজ কোথাকার কোন সেবানন্দ! তার পাঠে এমন কি সুধা পেল নীলা? ওর এই অদ্ভুত উন্মাদনার অর্থ বুঝলাম না। গুরুভক্তি এর আগেও অনেক দেখেছি, মেয়েদের মধ্যে এ উন্মাদনাটা বেশী, এও জানি। আমাদের দেশের শতকরা নব্বই ভাগ মেয়ে নানাভাবে বঞ্চিত। স্ত্রীরা স্বামীদের কাছে অনেক সময়ই কিছু পায় না। সংসার সন্তানসন্ততি সবই আছে, কিন্তু তবু মনের কোন আকাঙ্ক্ষাই মেটে না। নিরুত্তাপ, বর্ণহীন জীবনের গ্লানিতে সমস্ত জীবন আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তখন একটু উত্তেজনা চায় মন, যাতে সহজে অবসাদ থেকে মুক্তি মেলে। অন্য মুক্তির পথ অধিকাংশেরই জানা নেই। আপাত-পবিত্র সহজতম পথ ভক্তিরসে (বা ভাবালুতায়) আপ্লুত হওয়া। ঠাকুর ঠাকুর খেলার মধ্যে বঞ্চিত মনের সব তৃষ্ণা মেটানো। অতৃপ্ত জীবনের সব আকাঙ্ক্ষা এই নেশাতেই পরিতৃপ্ত। পাথরের প্রতিমার চেয়ে অধিকতর কাম্য সজীব বিগ্রহ। সেখানে শুধু দান নয়, প্রাপ্তির আশাও কিছু থাকে। সেই প্রসাদ-টুকুতেই উন্মাদনা জাগায়, মনের ক্লান্তি ঘোচায়। আমরা অবশ্য চিরকাল এই গুরুপূজার ব্যাপার নিয়ে হাসাহাসি করেছি। বাবা অত্যন্ত র‍্যাশনাল লোক। মা-ও ওসব মানেন না। ফলে আমরা কিছুই মানি না। লোকে আড়ালে আমাদের পরিবারকে নাস্তিক বলত।

আজ নীলাকে দেখে অবাক লাগল, ও ঠাকুর-পুজো করে—সে কথা জানতাম। ভগবানে আমিও বিশ্বাস করি। কিন্তু মানুষ পুজোর নেশা ওকে পেয়ে বসবে, এ আমি কল্পনাও করতে পারি নি। ওর জীবনে আবার অতৃপ্তি কোথায়? ছোড়দার মত ছেলের ভালবাসায় যার জীবন ধন্য হয়ে গেছে, সে ত স্বর্গ পেয়েছে মুঠোর মধ্যে। এমন মানুষকে সর্ব্বস্ব বলে পাওয়া ত রাজৈশ্বর্য্য। অথচ অদ্ভুত মোহের নেশায় তাকেই অবহেলা করছে নীলা। সেদিন নীলার উপর খুব রাগ হয়েছিল। বেশীক্ষণ থাকি নি, চলে এসেছিলাম। এর পরও কিন্তু নীলা নির্ব্বিকার। ছোড়দার দিকে তাকাতে পারতাম না আমি। বাইরে থেকে তার মনের কথা বোঝা অসম্ভব। কিন্তু তার

দীপ্ত চোখের ওপর বেদনার ছায়াটা ত আমার চোখ এড়াত না। সেই বছরই তার এম. এ. পরীক্ষা। সারাদিন ঘরে বসে পড়াশুনা করত, মাঝে মাঝে দেখতাম, জানলা দিয়ে বাগানের দিকে চেয়ে আছে। যেখানে মাধবীলতার সাদা ফুলে অজস্র মৌমাছির ভিড়। শিউলির মৃদু গন্ধে উন্মনা ভোরের বাতাস। সেই-দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছে ছোড়দা। নীলার উপর প্রচণ্ড রাগ হ'ত। ও যে এ ভুল কেন করছে? একদিন কলেজে গিয়ে শুনলাম নীলা আসে নি। ও নাকি দমদমে গেছে। সেখানে সেবানন্দের জন্মোৎসবে মহাধুম। সেই উৎসবে কীর্ত্তন গাইবে নীলা। সেদিন বিকেলেই নীলাদের বাড়ী গেলাম, ওর মায়ের কাছেও মনের ক্ষোভ চেপে রাখতে পারলাম না। ছোড়দার সঙ্গে নীলার সম্পর্ক ওর মা'র অজানা নয়। দেখলাম নীলার মা-ও এই বাড়াবাড়িতে খুব অসন্তুষ্ট। বললেন, "বলেছিলাম না ও ওর বাপের স্বভাব পেয়েছে। যা-কিছু করবে চূড়ান্ত করে ছাড়বে। ও হতভাগীর কপালে অনেক দুঃখ আছে।" গুরুদেব পর্য্যন্ত বলেছেন, "তুমি এ পথে এস না। তোমার অল্প বয়েস, এখন মন দিয়ে লেখাপড়া কর, তারপর সংসার-ধর্ম্ম। সময় হ'লে আমি নিজেই ডাকব। তখন দীক্ষা নিও।" নীলা কিছুতেই সে কথা শোনে নি। এক অদৃশ্য মোহজাল ওকে ঘিরে ধরেছে। কি করব ভেবে পেলাম না। সে বছর আমাদেরও বি. এ. পরীক্ষা। দু' এক মাসের মধ্যেই টেষ্ট হ'ল। নীলা শেষ পর্য্যন্ত পীরক্ষাই দিল না। সেবানন্দও তাকে অনেক করে বলেছিলেন পরীক্ষা দিতে, নীলা শোনে নি। সে তাঁর পায়ের কাছে বসে তন্ময় হয়ে কীর্ত্তন শোনে। দিক্ষাও নিয়েছে তাঁর কাছে। এর মধ্যে আরেকদিন রাস্তায় দেখা, বললাম, 'তুই কি 'চতুরঙ্গে'র শচীশ হলি নাকি? যা সুরু করেছিস!" নীলা কথাটার কোন জবাব দিল না। আস্তে আস্তে চলে গেল। এরপরে নিতুর হাতে একখানা চিঠি পাঠাল আমার কাছে।

শম্পা,

আমাকে ক্ষমা করিস। এ ব্যাপারে শমীকের সঙ্গে আমার একেবারে মেলে না। তার পরীক্ষা, তাই তাকে এ ক'দিন আর বিরক্ত করি নি। মিছিমিছি মন খারাপ হবে। কিন্তু আমার মন সত্যিই বিশ্বাসে মগ্ন হয়েছে শম্পা। গুরুদেবের আকর্ষণকে কিছুতেই তুচ্ছ করতে পারছি না। সত্যিই তিনি অতুলনীয়। তাঁর জ্ঞান, বুদ্ধি, কোন কিছুরই তুলনা হয় না। তাঁর কাছ থেকে নেবার অনেক আছে। আর তাঁর গান! শুনলে নিজেকেও ভুলে যেতে হয়। তুই ত জানিস গান আমার কতখানি প্রিয়। সেই সুরের দেবতাকে তাঁর মধ্যে পেয়েছি। এমন জায়গায় আত্ম-সমর্পণ না করে পারা যায়? কিন্তু শমীক ত আমার কোন কথাতেই সায় দেবে না। তার এ-সবে বিশ্বাস নেই। তা ছাড়া সে ভয়ানক জেদী, তা না হলে দু'জনে মিলে দীক্ষা নিতে পারতাম, আর সেটাই ত সবচেয়ে ভাল হ'ত। আমি এর মধ্যে ইমোশনাল কিছু খুঁজে পাই না, একজন মানুষের মধ্যে সর্ব্বোত্তম যদি কিছু থাকে, তাকে শ্রদ্ধা করব না? সে-পথে যদি মুক্তি মেলে, তা হ'লে কেন দু'হাত বাড়াব না সেদিকে? আমি বিশ্বাস করি, কোন কোন মানুষ দেবতার অংশে জন্মায়, সেই দেব-শক্তি তাঁর আছে। তাই আমি তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়েছি। জানি শমীক আমাকে ক্ষমা করতে পারবে না। গুরু সম্বন্ধে ওর তীব্র বিতৃষ্ণার কথা আমি জানি। ওর কাছে ওর বিশ্বাস বোধ হয় ভালবাসার চেয়েও বড়। আমি কি করব, কিছুই বুঝতে পারছি না। তোর কাছে বলতে দ্বিধা নেই শমীকের প্রতি ভালবাসা একতিলও কমে নি আমার। কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে মেলাতে পারছি না। কি করব বলে দে।"

চিঠিটা পড়ে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলাম। কি করব বুঝতে পারি নি। শেষ পর্য্যন্ত ছোড়দাকেই দেখিয়েছিলাম চিঠি-খানা। পড়তে পড়তে প্রথমটা ছোড়দার মুখের ছায়াটা আরও গাঢ়তর হয়েছিল, শেষের দিকে দেখলাম মুখের সে কাঠিন্য আর নেই। অনেকদিন পর তার চোখের সেই দীপ্ত হাসিটা আবার ফিরে এসেছে। দরকার হ'লে ছোড়দা যে কতখানি নির্ম্মম হ'তে পারে, সে ত দিদির ব্যাপারেই দেখেছি। এক্ষেত্রে কিন্তু তার দৃঢ়তার বন্ধন শিথিল হ'ল। চিঠিটা পড়ার পর সব অভিমান বিসর্জ্জন দিয়ে নীলাদের বাড়ী গেল সে। আমিও গেলাম খানিক বাদে। দেখি তরমুজের সরবৎভরা গ্লাস ওর হাতে তুলে দিচ্ছে নীলা। অনেক দিন পর ছোড়দার মুখ হাসিতে উজ্জ্বল দেখলাম। এতদিনের সব ক্ষোভ মুছে গেল মন থেকে। ঘরের ভেতর গিয়ে দেখি নীলার মায়ের মুখখানাও হাসি হাসি।

সব মিলিয়ে ভারী ভাল লাগল। সেদিনের পর থেকে ছোড়দা প্রায়ই যাওয়া সুরু করল ওদের বাড়ী। ওর তখন M. A. পরীক্ষা হয়ে গেছে। প্রচুর অবকাশ। ছোড়দার সেই হাসি আবার শোনা যেতে লাগল। কবিতার সুর ভেসে আসতে লাগল কানে। স্নানের ঘরে ঢুকে চেঁচিয়ে গান ধরে। সব মিলিয়ে ছোড়দাকে আবার

নতুন করে ফিরে পেলাম যেন। এতদিন সব কিছুকে যেন চাপা দিয়ে রেখেছিল। শুনলাম ছোড়দার অনুরোধে নীলা আবার পড়াশুনা সুরু করেছে, আগামী বছর পরীক্ষা দেবে। ছোড়দা রোজ তাকে পড়ায়। একদিন আমাকে ডেকে বলল, "নীলার ও সমস্ত ভক্তি আমি ভাঙবই। আমি প্রতিদ্বন্দ্বী সইতে পারি না। সে যে রকমেরই হোক না কেন। আমি ছাড়া ও আর কারও জন্য মন-প্রাণ ঢেলে দেবে, তা হবে না। তখন কি জানত ছোড়দা প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীর হাত থেকে ঈপ্সিতাকে হরণ করা চলে কিন্তু এযে ভক্তির অবরোধ। স্বেচ্ছাবন্দিনীকে মুক্ত করা কি সম্ভব?

ছোড়দার সঙ্গে নীলার সম্বন্ধ আবার আগের মত সহজ হয়ে উঠল। সেই সন্ধ্যায় ছাদে বসে কবিতা পড়া, গান শোনা, মাঝে মাঝে বেরিয়েও পড়ত ওরা। কোলকাতার বাইরে, কোনদিন ডায়মণ্ডহারবার, কোনদিন বা শিবপুর বটানিকাল গার্ডেন্‌সে। নীলাকে এবারে জন্মদিনে আমার মা একখানা ঢাকাই শাড়ী দিয়েছিলেন, সবুজ রঙ, গায়ে জরির বুটী। সেই শাড়ীখানা প্রায়ই পরত ছোড়দার সঙ্গে বেড়াবার সময়। আরও সুন্দর লাগত ওকে। আমিই মুগ্ধ হয়ে যেতাম। ছোড়দা ত বিভোর। কিন্তু তবু নীলা একটা জিনিষ লুকিয়েছিল ছোড়দার কাছে। সেবানন্দের কাছে যাওয়াটা সে ছাড়াত পারে নি। প্রায়ই দুপুরে যেত বিকালের মধ্যে ফিরে আসত। একদিন ধরা পড়ে গেল। সেদিন মা আর বাবা ব্যারাকপুরে মামার বাড়ী গেছেন। আমাদের একটু তাড়াতাড়িই চা খাওয়া হয়ে গেছে। বাগানে এসে বসলাম, কৃষ্ণচূড়ার ছায়ায়। ছোড়দাও এল। ওর হাতে একখানা বই। হঠাৎ দেখি সামনের রাস্তা দিয়ে নীলা আসছে। ছোড়দা ঠিক লক্ষ্য করেছে। সে বই বন্ধ করে গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল, ডাকল, "নীলা, শোন।" নীলা এগিয়ে এল। তার পরণে একখানা পাড়বিহীন গরদের শাড়ী। নিরাভরণ অঙ্গ। কপালে চন্দনের টিপ।

ছোড়দা প্রশ্ন করল "কোথায় গিয়েছিলে?"

নীলার সঙ্গে কথা বলবার সময় যে কণ্ঠ মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ হয়ে থাকে, সে স্বর এত কঠিন শোনাল। নীলার মুখও বেশ গম্ভীর। "সব কৈফিয়ৎ কি তোমাকে দিতে হবে?

"হ্যাঁ, এদিকে শোন।"

রাস্তায় তখন বেশী লোক ছিল না। এমনিতেই এ গলিতে লোক-চলাচল কম। ছোড়দা শক্ত করে নীলার হাত চেপে ধরল। আস্তে আস্তে তাকে নিয়ে এল বাগানের মধ্যে। নীলার দিকে তাকিয়ে মনে হ'ল তার দেহে কোন স্পন্দন নেই। আমি সামনের বারান্দায় উঠে দরজার আড়ালে সরে দাঁড়ালাম। সেখান থেকে স্পষ্ট শুনলাম ছোড়দার গলা।

"জানি তুমি কোথায় গিয়েছিলে। একটা মানুষকে পুজো করতে লজ্জা করে না তোমার?"

"লজ্জা করার কোন কারণ নেই। তিনি শ্রদ্ধার যোগ্য।"

"শ্রদ্ধার যোগ্য ত একদিন আমাকেও মনে করো।"

"করতাম। কিন্তু আজ এই মুহূর্ত্তে সে শ্রদ্ধা আর রইল না। যে মানুষকে সে আসনে বসিয়েছিলাম, তার সঙ্গে তোমার কোন মিল নেই। এত হিংসে কেন তোমার? তোমাকে ত এমন কখনও ভাবি নি।"

হাত ছেড়ে দিল ছোড়দা। বলল, "এই তোমার শেষ কথা নীলা? সব ভুলে গেলে? আমাদের এতদিনকার সম্বন্ধের মধ্যে কোন কিছুই কি মনে রাখবার মত নয়? শেষ পর্য্যন্ত একটা গুরুর মোহে—"

"মোহ মোটেই নয়। তাঁকে আমি ভক্তি করি। তাই বলে সংসার-ধর্ম্ম করব না, সে কথা ত একবারও বলি নি। আমার নিজস্ব মতামত বলে কি কিছুই থাকবে না? এ তোমার অন্যায় দাবী।

"তুমি ত জানো নীলা, গুরুবাদ আমি মানি না! এখন আমরা দু'জন আছি। বিয়ের পরে সংসার হবে, তারপর শুধু দু'জন থাকব না—যাদের আনব তারা কি বিশ্বাস করবে আমাকে বলে দাও। আমাদের দু'জনের মতের দ্বন্দ্বই ত দেখবে তারা। কোন বিশ্বাস গড়বে না। আর তা ছাড়া এ বিশ্বাসের মধ্যে সত্যি ত কিছুই নেই নীলা। কেন তুমি একটা পুরণো পচা জিনিষকে আঁকড়ে রয়েছ। এটা ত তোমারও জেদ।"

"তুমি তোমার কোন কিছুই তিলমাত্র ছাড়বে না। আর চাইছ আমি আমার ভক্তি-বিশ্বাস সব ত্যাগ করি।

"আমি কি কিছুই ছাড়ি নি নীলা? নিজেকেই ত তোমার হাতে দিয়েছি। আর কি চাও? মিথ্যা, অন্যায় একটা জিনিষ তাকে আঁকড়ে থাকাটা তোমার কাছে আমার চেয়েও বড় হ'ল?" ছোড়দার গলার স্বরটা বড় করুণ শোনাল।

নীলা খানিকক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর আস্তে আস্তে বলল, "গুরুদেব ত মানুষ হিসেবে যথেষ্ট বড়। ভাল কাজ করেন, কত সেবা-প্রতিষ্ঠান খুলেছেন শিষ্যদের

টাকায়। চমৎকার পাঠ করেন, শাস্ত্রব্যাখ্যা করেন, ভাল কথাও বলেন। এর মধ্যে অন্যায়টা কোথায়?"

আবার তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল ছোড়দার গলার স্বর, "ভাল কথা? তুমি-আমি কি ভাল কথা বলি না? তা ব'লে পোজ্ করব কেন? ধরে নিলাম তাঁর আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়েছে। তাই বলে সমাজ-সংসার সব বিষয়ে নির্দ্দেশ দেবার অধিকার পেয়ে গেছেন তিনি? আর লোকে তাকেই আদেশ বলে মাথা পেতে নিচ্ছে? কেন, আমরা কি ভাবতে পারি না?" একটু থেমে খানিকক্ষণ গুম হয়ে রইল তারপর বলে উঠল, "টাকা দেন। বুঝলাম তিনি মহাদাতা। কিন্তু মানুষের মুক্তির পথ যে পুরোপুরি বন্ধ করে দেন। সমস্ত বোধ-বুদ্ধি ভাসিয়ে নিয়ে যান। এর মত জঘন্য পাপ..." আর বলতে পারল না গলার স্বর ক্রোধে অবরুদ্ধপ্রায়।

নীলা এরপর চুপ করেই ছিল। অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে কি বলল শুনতে পেলাম না। শুধু দেখলাম ছোড়দার একখানা হাত ওর কোলের ওপর তুলে নিয়েছে। আঙুলের ওপর আঙুল বোলাচ্ছে। ছোড়দার কণ্ঠস্বরও মৃদু, আমার কানে আর কিছুই পৌঁছল না। অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা বলল দু'জনে। আমি আর থাকি নি কাছাকাছি। উপরে চলে গিয়েছিলাম।

পরদিন বিকেলে ছোড়দা নিজেই বলল, 'চল, একবার নীলাদের বাড়ী যাই।' মনে মনে বুঝলাম কালকের তর্কটা নেহাতই মৌখিক। ওদের সম্বন্ধের গ্রন্থি তেমনই অটুট আছে। দু'জনে বেরোলাম। নীলাদের বাড়ী ঢোকার আগে কীর্ত্তনের সুর কানে এল। ঢুকে দেখি ঘরে অনেক লোকের ভিড়। সকলে তন্ময়চিত্তে গান শুনছে। একজন সুপুরুষ গেরুয়াবসনধারী সন্ন্যাসী গান গাইছেন। বুঝলাম, ইনিই নীলার আরাধ্য গুরুদেব। গানের গলাটি মধুর। "চতুরঙ্গের" লীলানন্দ স্বামীকে মনে পড়ল। আমি আর ছোড়দা মিলে কতবার যে বইখানা পড়েছি। ছোড়দা পড়েও শুনিয়েছে আমাকে। বইটি তার বড় প্রিয়।

ঘরে ঢুকে আমরা দরজার কাছাকাছি বসে পড়লাম। সামনে ভাল করে তাকিয়ে দেখি সেবানন্দের অত্যন্ত সন্নিকটে বসে আছে নীলা। ঘরের সব জিনিষ সরিয়ে ফেলা হয়েছে। সেবানন্দের সামনে বড় একখানা রূপোর থালায় এক রাশ শ্বেতপদ্ম। থরে থরে ফল সাজানো। ধূপের সুরভিত ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন ঘরের বাতাস। ঘরে নানাধরনের লোকের ভিড়। শুধু এ পাড়ার নয়, অপরিচিত অনেক মুখও দেখলাম। নারী পুরুষ সবই আছে। বাড়ীর সামনে দু'একখানা গাড়ীও দেখেছি। আমাদের কলেজের দু'তিনজন অধ্যাপিকাও এসেছেন। মোড়ের মাথায় প্রফেসার মিত্র অমিতাভ থাকেন। গত-বছর ডক্টরেট পেয়েছেন। তিনিও সেবানন্দ স্বামীর কাছেই বসে আছেন। দু'চোখ ভাবাবেশে নিমীলিত। শুনেছি ইনি একখানা বইও লিখেছেন সেবানন্দ সম্বন্ধে। আর আছেন সোমনাথ সাহা। নামকরা ব্যবসায়ী। শুনেছি কালোবাজারে অনেক টাকা করেছেন। তিনি সবচেয়ে কাছে বসে। গলায় সোনার হার। ইনি নাকি অনেক টাকা দান করেছেন। সেবানন্দের পাশে কয়েক-খানা বেনারসী শাড়ী রাখা আছে। শিষ্যা শিষ্যাদের সকলেরই নিমীলিত চোখ। কারও কারও চোখ দিয়ে জল পড়ছে। মুখে ভক্তি-গদগদ ভাব। কেউ কেউ সেবানন্দের পায়ের কাছ ঘেঁষে বসেছে। মাঝে মাঝে হাতটা মাথায় ঠেকাচ্ছে। সেবানন্দ গান গাইতে গাইতে থালা থেকে ফুল ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছেন। সমবেত ভক্ত-মণ্ডলী ভক্তিভরে তুলে নিয়ে কপালে ঠেকাচ্ছে। গুরুর প্রসাদ ফুল বলে মেয়েরা আঁচলে বাঁধছে, ছেলেরা পকেটে রাখছে। নীলাকেও দেখলাম, নিমীলিত দুই চোখ। সেই সাদা গরদ পরণে। হাত জোড় করে বসে আছে। ছোড়দা আমার দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বলল,—"দেখছিস ত এঁদের দশা। ভগবানের কথা চিন্তা করবে কখন? মানুষকে নিয়ে পড়ে আছে। তাকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করে দিয়েছে, তিনিই হাত ধরে মুক্তির পথে নিয়ে যাবেন।" ব্যঙ্গে তীক্ষ্ণতর হ'ল তার স্বর। "আসল কথা, সত্যিকার ভগবানের দিকে হাত বাড়াতেও সাহস হয় না। এত ছোট এরা।" আমি মনে মনে সন্ত্রস্ত হ'লাম। কথাগুলি যদি কারও কানে যায়। ছোড়দার মুখের দিকে তাকাতেও ভয় করল। কীর্ত্তন থামার সঙ্গে সঙ্গে সমবেত ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে গুঞ্জন উঠল। "বাবা, আরেকখানা করুন।" "কি চমৎকার, অপূর্ব্ব!" এই ধরনের প্রশংসাধ্বনিও কানে এল। নীলা একবার চোখ খুলে তাকাল। আমাদের দেখতে পেল না। তার দৃষ্টি ভাবাবেশে আচ্ছন্ন।

সেবানন্দ আবার গান ধরলেন। কথাগুলো পরিচিত লাগল। কিন্তু সুরটা একেবারে অন্য রকম। মনে হ'ল কথাগুলোকে নিজের সুরে ঢেলে গাইছেন। অন্যের গান বিকৃত সুরে গাওয়া ছোড়দা একেবারেই সইতে পারে না। দেখলাম ওর মুখ ক্রমশঃ কঠিন হয়ে উঠছে। মনে মনে ভাবলাম, নীলাও ত সুর সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ। সে এ ব্যাপারটাকে মেনে নিচ্ছে কি বলে?

যিনি গান রচনা করলেন, প্রাণ ঢেলে সুর দিলেন, যে সুর গানের প্রাণ, সেই প্রাণটিকে কেড়ে নিচ্ছেন সেবানন্দ, অথচ নীলা নির্বিকার চিত্তে সয়ে যাচ্ছে সব। সে কি ভক্তিতে অন্ধ, এমন কি বধির হয়ে গেছে? গাইতে গাইতে সেবানন্দ গলার মালাটি ছুড়ে দিলেন সামনে, নীলা দু'হাতে তুলে নিল সেটি, ভক্তিভরে মাথায় ঠেকাল। ছোড়দার দিকে আড়চোখে তাকালাম। মনে হ'ল একটা পাথরের মূর্ত্তিতে পরিণত হয়েছে ও। দেহে কোন স্পন্দন নেই। সেবানন্দের গান থেমে গেছে ততক্ষণে। এবার তিনি নীলাকে গাইতে বললেন। নীলা দু'হাত জোড় করে গান ধরল,—গানটি অপরিচিত। গুরুদেবের মহিমা সঙ্গীত। কেউ বোধ হয় সেবানন্দের প্রতি ভক্তি-পরবশ হয়ে লিখেছিল। মনে পড়ল মাস কয়েক আগেকার একটি সন্ধ্যা। বাগানে বসে আছি আমি আর নীলা। নীলা গাইল "তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়......" ছোড়দাও এসেছিল খানিকবাদে। সেদিনই বলেছিল নীলা, "সুর আর ভাব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। আর কারও গানের সঙ্গে কি তুলনা হয়?" সেই গান আজ কোথায় হারিয়ে গেল?...

ছোড়দা আর এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াল না। হনহন করে বেরিয়ে এল বাইরে। আমিও সঙ্গে গেলাম। সারাপথ তার সঙ্গে একটিও কথা হ'ল না। বাড়ী গিয়ে খবর পেলাম, ছোড়দা পরীক্ষায় ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হয়েছে।

নামজাদা কোন কলেজ থেকে চাকরির ডাকও এল দিন কয়েকের মধ্যে। কিন্তু এত আনন্দেও তেমন করে সুর বাজল না। উৎসব-সমারোহের অনেক কল্পনাই ছিল মনে, সব শেষ হয়ে গেল।

ছোড়দা শেষ পর্য্যন্ত লিখেই জানাল নীলাকে। চিঠিটা আমাকেও দেখিয়েছিল। লিখেছিল, "তোমাকে গুরুভক্তির কবল থেকে মুক্ত করবই, এই ছিল আমার পণ। বিফল হ'লাম। তবু আশা ছাড়িনি। যদি কোন দিন মুক্ত হ'তে পার, জেনো আমি তোমার জন্য অপেক্ষা ক'রে আছি।"

সে চিঠির জবাব পায়নি ছোড়দা। এর ক[illegible]ক দিনের মধ্যেই মধ্যপ্রদেশের সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি নিয়ে চলে গেল ছোড়দা।

বাড়ীর সকলেই তার ওপর বিরক্ত হয়েছিলেন। কি একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া করে বিয়ে ত করলই না, তার ওপর আবার দেশছাড়া হবার দরকার ছিল কি? ছোড়দার ব্যাপারটাকে সকলেই বাড়াবাড়ি মনে করেছিল। আমি কিন্তু রাগ করতে পারি নি—ব্যাপারটা উড়িয়ে দিতে পারি নি সামান্য বলে। নীলাকে না পাবার বেদনা কত গভীর হয়ে বেজেছে ছোড়দার মনে, সে ত একমাত্র আমিই জানি। কিন্তু যে নীলাকে এতদিন ধরে পেতে চেয়েছিল, সে নীলার সঙ্গে আজকের নীলার মিল কোথায়? এ অমিলটুকুকে স্বীকৃতি দেওয়া ছোড়দার পক্ষে অসম্ভব। সে সব সময় বলেছে, "ও ধরনের কম্প্রোমাইজের মধ্যে আমি নেই। অন্যায়কে কিছুতেই স্বীকার করে নিতে পারবনা।

টেবিলে বসে ছোড়দাকে চিঠি লিখতে গিয়ে আবার পড়লাম ওর চিঠিখানা। নীলার কথা কিছু জানতে চায় নি, কিন্তু জানবার জন্য যে কতখানি উৎসুক, সে ত আমি জানি। তবু জানানো হ'ল না। কত কথাই মনে পড়ছে, ওর ব্যথা কি সত্যিই মুছেছে? প্রথম লাইনটা লিখে কেটে দিলাম। কথাটা ওকে কিছুতেই লিখতে পারব না। অথচ সেই কথাটাই সমস্ত মন আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। কোনদিন ওর কাছে কিছু লুকোই নি। কিন্তু আজ এ কথাটা লেখা চলবে না কোনমতেই। কলম চলছে না। অন্য কথা লিখতে গিয়ে সেই কথাটাই মনে পড়ছে বারে বারে। আজ গানের স্কুলে গিয়ে খবরটা পেয়েছি। নীলা[illegible]দের পাশের বাড়ীর মীরার কাছে। নীলার বিয়ে ঠিক হয়েছে। সেবানন্দের মনোনীত পাত্র। তাঁর এক শিষ্যার পুত্র, ব্যবসা করে, লাখ টাকার সম্পত্তি, একটি ধানকল ও কাপড়ের দোকান আছে। এ ছাড়া প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক। এ যুগে নাকি এধরনের ভক্তি সহজে চোখে পড়ে না। পরিবারের সকলেই সেবানন্দের পরম ভক্ত। মেয়েকে নাকি দেখেনওনি তাঁরা। সেবানন্দের কথাতেই রাজী। নীলা সেবানন্দের প্রিয় শিষ্যা। সেজন্য আপত্তি করবার কোন কারণও ঘটে নি। নীলাও মত দিয়েছে। এবারে আর কোন বাধা নেই তার।

রবীন্দ্রনাথের "রাজা"

অধ্যাপিকা আভালতা কুণ্ডু

রাজা নাটকের ঘটনাপ্রবাহ—

নাটকের প্রথম দৃশ্যে দেখি বসন্ত পূর্ণিমার সন্ধ্যায় রাজার আগমনের প্রত্যাশায় রাণী সুদর্শনা অপেক্ষমানা। রাণী যে গৃহে অবস্থান করছেন সেটি একটি অন্ধকার কক্ষ —রাজপ্রাসাদের কোন্ বিশেষ অংশে এই কক্ষটি আছে রাণী নিজেও তা জানেন না। তাই দাসী সুরঙ্গমাকে জিজ্ঞাসা করছেন—"বল্ তো এটা আছে কোথায়?"

সুরঙ্গমা বললেন—"এঘর মাটির আবরণ ভেদ করে পৃথিবীর বুকের মাঝখানে তৈরি। তোমার জন্যেই রাজা বিশেষ করে করেছেন।"

অল্পক্ষণের মধ্যেই দ্বারদেশে আবির্ভাব হ'ল রাজার। অন্ধকার ঘরের দাসী সুরঙ্গমা—রাজাকে তার অচলা ভক্তি। অন্ধকারের মধ্যেই রাজার আবির্ভাব সে অনুভব করে। সুদর্শনা কিন্তু অন্ধকারে দিশেহারা। রাজার ব্যাকুল আহ্বানেও দ্বার খুলে দিতে তাঁর চরণ ওঠে না। দাসী সুরঙ্গমাই তখন দ্বার খুলে দিয়ে মিলনের সুযোগ রচনা করে দিয়ে প্রস্থান করে।

নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে রাজার কথাবার্তায় ফুটে ওঠে সুদর্শনার প্রতি তাঁর গভীর প্রেম। রাণী যে রাজাকে চোখে দেখতে চান। রাজা বার বার করে তার এই চোখে দেখার নেশাকে সংযত করতে চাইলেন। বললেন—"আলোয় তুমি হাজার হাজার জিনিষের সঙ্গে মিশিয়ে আমা'কে দেখতে চাও? এই গভীর অন্ধকারে আমি তোমার একমাত্র হয়ে থাকি না কেন?"

কিন্তু রাণী বুঝলেন না। চোখে দেখা তাঁর চাই-ই। বললেন—"আমাকে দেখা দিতেই হবে।"

শেষ বারের মত সাবধান করে দিয়ে রাজা বললেন— "সহ্য করতে পারবে না—কষ্ট হবে।"

তবুও মানলেন না রাণী—অন্তরের ধনকে তাঁর চোখে দেখা চাই।

তখন রাজা বল্লেন—"আজ বসন্ত পূর্ণিমার উৎসবে তুমি তোমার প্রাসাদের শিখরের উপরে দাঁড়িয়ো—চেয়ে দেখো—আমার বাগানে সহস্র লোকের মধ্যে আমাকে দেখবার চেষ্টা ক'রো।"

সুদর্শনা—"তাদের মধ্যে দেখা হবে ত"—

রাজা—"বার বার করে সকল দিক থেকেই দেখা দেব।"

দাসী সুরঙ্গমা এ-সংবাদ শুনে চমকে উঠল। যাঁকে চোখে দেখে সহজে চেনবার নয়—যিনি অন্তরের অন্তরতম, তাঁকেই রাণী দেখতে চান হাজার লোকের লুকোচুরির মধ্যে। রাণীকে সাবধান করে সে বলে উঠল—"রাণী তোমার কৌতূহলকে শেষে কেঁদে ফিরে আসতে হবে।" রাণী সে সাবধানবাণী শুনেও শুনলেন না।

দ্বিতীয় দৃশ্যে বসন্তোৎসবের সমারোহ। এই উৎসবে ছিল সবারই নিমন্ত্রণ—তাই দেশীয়দের সঙ্গে যোগ দিয়েছে বিদেশীরাও। বিদেশীরা রাস্তা চেনে না, জানে না উৎসবটা ঠিক কোন্‌খানে হচ্ছে। পথ জিজ্ঞাসা করাতে প্রহরীরা বললে—"এখানে সব রাস্তাই রাস্তা। যেদিক দিয়ে যাবে—ঠিক পৌঁছে যাবে। সামনে চলে যাও।"*

বিদেশীরা ঠিক বোঝে না—এ আবার কেমনতরো পথ বাতলানো? তাদের দেশে ত পথ সম্বন্ধে নানান কড়াকড়ি—পথঘাট এত বাঁকাচোরা যে পথ খুঁজে পাওয়াই কঠিন। শাস্ত্রের বিধান মানতে গিয়ে ওদেরই একজনের বাবা শাস্ত্রমতে গণ্ডি কেটে ঠিক উনপঞ্চাশ হাতের মধ্যেই জীবন কাটিয়েছিলেন। এ দেশের ধরন-ধারণ এদের কাছে বড়ই অদ্ভুত লাগে।

বিদেশীদের পিছনেই আছেন ঠাকুর্দা আর তাঁর বালকের দল। ঠাকুর্দা রাজার সখা—রাজার সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক। জীবনের সুখেদুঃখে আর নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে তিনি রাজাকে জেনেছেন নিবিড় করে। রাজার সাযুজ্য লাভে তিনি ধন্য—রাজা তাঁর কাছে পরমপূজ্য পিতার মত, আবার পরমপ্রিয় বন্ধুও। বালকের দল গান ধরল—

---

* পরমাত্মার সাথে মানবত্মার মিলনের যে চিরন্তন বসন্তোৎসব তাতে সব পথই সমান (যত মত তত পথ)—প্রহরী কি একথাই বলতে চেয়েছিল?

"আজি দখিন দুয়ার খোলা
এসো হে এসো হে এসো হে
আমার বসন্ত এসো।"

কিন্তু এই বসন্তোৎসবের কেন্দ্রে যিনি, তাঁকে ত কই দেখা গেল না? তিনি কোথায়? তাঁকে চোখে দেখার জন্য প্রায় সকলেই উৎকণ্ঠিত। রাণী সুদর্শনার মত দেশী-বিদেশী অনেকেই তাঁকে চোখে দেখবার জন্য ব্যস্ত। কিন্তু এ-রাজা যে রাজার রাজা! তিনি ত সকলের চোখ ধাঁধিয়ে কোনদিনই দেখা দেন না।

রাজাকে না দেখে নানান জনে নানা কথা সুরু করে দিলে। কেউ বললে রাজার বিকট চেহারা, তাই তিনি দেখা দেন না। কেউ বললে—আসলে রাজাই যে নেই দেখা দেবে কে?

সংশয়ের এই প্রচণ্ড আবর্তে আসল তত্ত্বটি জানতেন শুধু দু'জন—ঠাকুর্দা আর বাউল। ঠাকুর্দা সকলকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। এই বসন্তোৎসবের রাজা যে বিশ্বরাজ! তিনি সবার অন্তরে থেকেই নিজেকে প্রকাশ করেছেন—কোন বিশেষ স্থান-কালপাত্রে ত তাঁকে পাওয়া যাবে না! তিনি বললেন, রাজাকে খুঁজে বেড়ানই ভুল। তিনি তাঁর রাজসত্ত্বা আমাদের সকলের মধ্যেই বিলিয়ে দিয়েছেন। তাই তাঁকে বাহিরে খোঁজা বৃথা। বললেন সুরে সুরে—

"আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে
নইলে মোদের রাজার সনে মিলবো কী সত্ত্বে।
আমরা সবাই রাজা।"

বাউলও শোনাল ঐ একই সুরের কথা। তার সুরের অনুভূতি সে ছড়িয়ে দিল গানে গানে—

"প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
তাই হেরি তায় সকল স্থানে।"

কিন্তু বলার লোক মিললেও শোনবার মত তৈরী মন মিলল না। ঠাকুর্দা ও বাউলের কথার শ্রোতা মিলল না। সংশয় তাই বেড়েই চলল।

এই সুযোগে নিজেকে রাজা বলে জাহির করে বসল রাজবেশী সুবর্ণ। তার গঠন সুন্দর—কাঁচা সোনার মত গায়ের রং, তাঁর ধ্বজায় কিংশুক ফুল আঁকা।* সাধারণ লোকে দেখে বললে—"রাজার মত চেহারা বটে।" রাজ-প্রসাদ লাভের আশায় চারিদিকে ভিড় জমে উঠল। নকলরাজা সকলকেই ভোলালেন, পারলেন না শুধু ঠাকুর্দা ও বাউলকে। ঠাকুর্দা জানেন তাঁর রাজা কখনও পথের লোকের চোখ ধাঁধিয়ে বেড়ান না—দেখবার চোখ যাদের আছে শুধু তাদেরই চোখে ধরা পড়ে তাঁর অনাড়ম্বর নীরব আবির্ভাব। ঠাকুর্দা তাই বললেন—"ওরে, আমার রাজা কি কখনো পথের লোকের চোখ ধাঁধিয়ে বেড়ায়?" কিংশুক ফুলের ধ্বজা উড়িয়ে যে বেরিয়েছে সে যে মেকি রাজা তা তিনি জানেন। তিনি বললেন—"আমার রাজার ধ্বজায় পদ্মফুলের মাঝখানে বজ্র আঁকা।" সার্থক কল্পনা ঠাকুর্দার। রাজার রাজা যিনি, তাঁর প্রতীক এর থেকে সুন্দর আর কি হ'তে পারে? তিনি যে বজ্রাদপি কঠোর আর কুসুমাপেক্ষাও মৃদু।

কিন্তু ঠাকুর্দার কথা শুনলে না কেউ—রাজবেশী সুবর্ণের অনুচর সংখ্যা বেড়েই চলল। ঠাকুর্দা সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে সরে এলেন কুঞ্জবনের দ্বারদেশের দিকে। বাউল ধরল গান—

"প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
তাই হেরি তায় সকল স্থানে।"

তৃতীয় দৃশ্যের প্রারম্ভে কুঞ্জবনের দ্বারে উপস্থিত ঠাকুর্দা ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা। বসন্তোৎসবের পালা সুরু হয়েছে। গানে গানে মুখরিত হ'ল উৎসব প্রাঙ্গণ।

"আজি কমল মুকুল দল খুলিল!
দুলিল রে দুলিল!"

এদিকে আবার উৎসব-মঞ্চে আবির্ভূত হয়েছেন অবন্তী, কোশল, কাঞ্চী প্রভৃতির রাজাগণ। এ সংসারে ধনজন-খ্যাতি যাঁরা মানুষকে ভুলিয়ে রেখে তার মনকে কিছুতে ঈশ্বরাভিমুখী হ'তে দেয় না—এই রাজারা সম্ভবত তাদেরই প্রতীক। এই রাজারাও এসেছিলেন সেদিন-কার বসন্তোৎসবে যোগ দিতে। এঁরাও অন্বেষণ করে ফিরছিলেন এদেশের রাজাকে। কিন্তু রাজাকে দেখার আশা যখন দুরাশা বলে বোধ হ'ল তখন এ-দেশের রাণীকে লাভ করার আকাঙ্ক্ষা তাঁদের পেয়ে বসল। রাজগণের সঙ্গে পথেই দেখা হ'ল ভণ্ডরাজ সুবর্ণের। রাজবেশী সুবর্ণের মেকি সহজেই ধরা পড়ল বুদ্ধিজীবী সুচতুর কাঞ্চীরাজের চোখে। ধরা পড়ে সুবর্ণ পালাতে পারলে বাঁচে। কিন্তু আপন আপন কার্য-সিদ্ধির আশায় রাজগণ তাকে কপট রাজার ভূমিকায় বহাল রাখলেন। তারপর সকলে মিলে প্রবেশ করলেন কুঞ্জবনের অভ্যন্তরে।

---

* ফুল হিসাবে কিংশুকের কোন গৌরব নেই। বরং গন্ধহীন বর্ণ সর্বস্ব বলে সে অপাংক্তেয়। রাজা মেকি—তাই তার প্রতীক কিংশুক।

ঠাকুর্দা রয়ে গেলেন কুঞ্জবনের দ্বারে। তাঁর সঙ্গে রইল যত অকিঞ্চনের দল। ওরা সবাই মিলে ধরলে গান—সর্বহারার গান—

"মোদের কিছু নাই রে নাই
আমরা ঘরে বাইরে গাই
তাইরে নাইরে না—

*　　*　　*

যারা সোনার চোরাবালির পরে
পাকাঘরের ভিত্তি গড়ে—
তাদের সামনে মোরা গান গেয়ে যাই
তাইরে নাইরে না।"

উৎসবের কুঞ্জবনের সামনের পথে নানা লোকের ভিড়। দলে দলে লোক আসছে। একদল স্ত্রীলোক এল—ঠাকুর্দার সঙ্গে ওদের মিষ্টি রসিকতার সম্পর্ক। ঠাকুর্দা ওদের এগিয়ে দিলেন কুঞ্জবনের পথে। তারপরে এল নাচের দল। ওরা মনোহর নৃত্যের তালে তালে গেয়ে গেল গান—

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে
তা তা তাথৈ তা তা তাথৈ তাতা তাথৈ—

দলে দলে লোক এল আর গেল—উৎসবের অঙ্গনে লোকে লোকারণ্য। কিন্তু রাজার দর্শন পেল না তারা যাদের নেইক দিব্যদৃষ্টি। রাজা আছেন কি না আছেন সে তর্কের হ'ল না শেষ। পর পর পাঁচটি পুত্রের মৃত্যু-শোক বুকে নিয়েও ঠাকুর্দা কিন্তু তাঁকে চিনেছিলেন। সেদিনকার উৎসবের সব সুরই তাই তাঁর কাছে ঐকতানের মাধুরীতে ভরে উঠল—বেসুরো লাগল না কিছুই। যে বসন্তরাজের চরণতলে ফোটা ফুলের পাশে ঝরাফুল একই মহিমায় মণ্ডিত—সুবোধ ছেলের পাশে অবোধ ছেলেকে যিনি একই ক্রোড়ে স্থান দিয়েছেন, সেই রাজাধিরাজের প্রসাদধন্য ঠাকুর্দা—তাই তাঁর দুই চোখে আনন্দের অশ্রু টলমল করে উঠল।

চতুর্থ দৃশ্যে দেখি প্রাসাদ-শিখরে দণ্ডায়মানা রাণী সুদর্শনা ও তাঁর সখী রোহিণী। উৎসবের জনসমারোহের মধ্যে রাণী দেখেছেন সুবর্ণকে। তার চটুল রূপের মোহে রাণীর দুই চোখ বাঁধা পড়ল। তাকেই তিনি 'তার রাজা' বলে ভুল করে বসলেন। দাসী হ'লেও রোহিণীর মনে সংশয় জেগেছিল কিন্তু আপন বুদ্ধির অহঙ্কারে রাণী সুদর্শনা নিঃসংশয়ে ভুল করে বসলেন। সুরঙ্গমা সেদিন রাণীর পাশে ছিল না—তাই তেমন করে সাবধানও করলে না কেউ। রাণী রোহিণীর হাত দিয়ে তাঁর কণ্ঠের পুষ্পহার উপহার পাঠালেন সুবর্ণকে। বলে দিলেন, "কিছুই বলতে হবে না—এই মালাটি দিলেই আমার সব কথাটি বলা হবে।" কিন্তু রোহিণী ফিরে এলে আপনার ভুল বুঝলেন রাণী। সুবর্ণ পুষ্পহার পেয়ে কিছুই না বোঝার ভঙ্গিতে তাকিয়ে ছিলেন শুধু। কাঞ্চী-রাজ বলে দেওয়াতে তবে বুঝতে পারেন যে এ মালা রাণী সুদর্শনার দেওয়া। সুবর্ণ রোহিণীর হাত দিয়ে পাঠিয়েছেন বহুমূল্য রত্নহার—কিন্তু এও সেই কাঞ্চী-রাজেরই পরামর্শে। সুদর্শনা সব শুনে বুঝতে পারলেন তাঁর ভুল। আত্মগ্লানিতে ভরে উঠল তাঁর মন—। কিন্তু সুবর্ণের সুবর্ণকান্তি রাণীর মনকে ভুলিয়েছিল—তিনি পারলেন না—তার দেওয়া রত্নহার দূরে ফেলে দিতে।

পঞ্চম দৃশ্যে উৎসবের রাত গভীর হয়েছে। ঠাকুর্দা তখনও ছিলেন কুঞ্জবনের দ্বারে দাঁড়িয়ে যেন "কি এক সর্বনাশের আশায়।" প্রায় সব লোক যখন উৎসবের রঙে রাঙা হয়ে ফেরার পথে তখন ঠাকুর্দা প্রবেশ করলেন কুঞ্জবনে। কুঞ্জবনের একপ্রান্তে সাত রাজায় মিলে তখন ষড়যন্ত্রে মত্ত। রাণীর প্রাসাদ-সংলগ্ন করভোদ্যানে আগুন লাগিয়ে এঁরা কার্যসিদ্ধির আশায় ছিলেন। ঠাকুর্দা নেপথ্যে দাঁড়িয়ে এদের সব কথাই শুনেছিলেন—তাই দেখতে পেয়ে সাত রাজায় মিলে তাঁকে বন্দী করে রেখে দিলে।

ষষ্ঠ দৃশ্যে করভোদ্যানে আগুন লাগাবার পূর্বাহ্নে বিপদের আভাস পেয়ে রাজার বিশ্বস্ত অনুচরেরা উদ্যান ত্যাগ করে চলে গেলেন। রাণীর সহচরী রোহিণী দ্বিধায় পড়ে পিছিয়ে পড়েছিল। কোশলরাজ আর অবন্তীরাজের সঙ্গে ওর সাক্ষাৎ হ'ল। ওঁরাও পড়েছেন দ্বিধায়। করভোদ্যানের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছেন না পথ। রোহিণীর মন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠল। চারিদিকে কি এক অদ্ভুত ভয়ার্ততা! দিগন্ত হঠাৎ হয়ে উঠল লাল। রোহিণী তখন পথ খুঁজছে বাইরে যাবার। কিন্তু পথ খুঁজে পাওয়া যে দায়!

সপ্তম দৃশ্যে রাণীর প্রাসাদদ্বারে সমুপস্থিত রাজবেশী সুবর্ণ ও কাঞ্চীরাজ। আগুন তার লেলিহান শিখায় চারিদিক করেছে আবৃত। যেটুকু আগুন তাঁরা লাগাতে চেয়েছিলেন এ যে তার শতগুণ হয়ে জ্বলে উঠল। অগ্নি-কাণ্ডের মধ্যে তাঁরাও পথভ্রান্ত। এমন সময় কোথা হ'তে ছুটে এলেন রাণী সুদর্শনা। সামনেই সুবর্ণকে দেখে বলে উঠলেন—"রক্ষা করো রাজা, রক্ষা করো।" কিন্তু সুবর্ণই যে তখন রক্ষা পেলে বাঁচে! সর্বনাশের মুখে দাঁড়িয়ে সে

করল অকপট স্বীকারোক্তি—"আমি রাজা নই সুদর্শনা—আমি রাজা নই।"

সুবর্ণ ছুঁড়ে ফেলল তার ছদ্মরাজআভরণ। রাণী সুদর্শনা ম্লান হয়ে গেলেন অসহ্য লজ্জায় বেদনায়। তার মনে হ'ল এ-লজ্জার গ্লানি বহন করার থেকে তাঁর মৃত্যু ভাল। "ভগবান হুতাশন, গ্রাস করো আমাকে"—এই বলে তিনি আগুনে ঘেরা রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করতে উদ্যত হলেন আত্মবিসর্জন করবার উদ্দেশ্যে। সখী রোহিণী বাধা দেবার চেষ্টা করলেন—রাণী শুনলেন না সে নিষেধ।

৮ম দৃশ্যে দেখি রাণী রক্ষা পেয়েছেন অলৌকিক-ভাবে। আগুন তাঁকে গ্রাস করে নি। রাজার অযাচিত স্নেহ তাঁকে ঘিরেছিল সেই সর্বনাশের চরম মুহূর্তে। কিন্তু পরিত্রাণ পেলেও রাণীর ক্ষোভ অশান্ত। নিভৃত কক্ষে রাজার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রাণী অসঙ্কোচে ব্যক্ত করলেন তাঁর আত্মগ্লানির কথা। বললেন—

"রাজা, আমি ভুল করেছি। গ্রহণ করেছি অন্যের হাতের মালা। এই লাঞ্ছিত জীবন নিয়ে আজ আমি কি করবো?"

রাজা কত বোঝালেন—সান্ত্বনার স্নিগ্ধ স্পর্শে রাণীকে করতে চাইলেন শান্ত—কিন্তু রাণী বুঝলেন না। তাঁর মনের মধ্যে রাজার যে ছবিটি ছিল—সেদিনকার প্রলয়ের মুহূর্তে দেখা রাজার মূর্তিটি মেলে নি তার সঙ্গে। অভিমানে রাণী দূরে সরে যেতে চাইলেন। রাজার সব মিনতি ব্যর্থ হ'ল। জোর ক'রে রাণীকে ধরে রাখতে হয়ত তিনি পারতেন। কিন্তু জোর করে কিছু করবার রাজা ত তিনি নন। যিনি রাজার রাজা, মানুষের প্রেমের ভিখারীরূপে তিনি বরং সহস্র বৎসর অপেক্ষা করে থাকবেন কিন্তু আপনা হ'তে না দিলে তিনি ত কিছুই জোর করে আদায় করবেন না! তাঁর সমস্ত সূর্য-গ্রহ-তারকা যে নিয়মে চলে সেই নিয়মের বাইরে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাটুকুকে তিনি যে দিয়ে রেখেছেন বাখেরাজ সত্ব! তাই সুদর্শনা যখন রাজগৃহ ত্যাগ করলেন, তখন রাজা তাঁর পথ রোধ করলেন না—বললেন—"হাওয়ার মুখে ছিন্ন মেঘ যেমন করে চলে যায় তেমনি অবাধে চলে যাও তুমি।"

সুদর্শনা চলে গেলেন পিতৃগৃহে—কান্যকুব্জে। সেখানেও রাণীর অলক্ষ্যে রাজার অগাধ স্নেহ তাঁকে রইল ঘিরে। তাঁর অপার করুণার সাক্ষীরূপে চির-বিশ্বাসিনী সুরঙ্গমা গেল রাণীর সঙ্গে।

৯ম দৃশ্যে কান্যকুব্জরাজের গৃহে সুদর্শনার দুঃখের দিন হ'ল সুরু। কন্যার আগমনে পিতা সুখী হন নি। কুলত্যাগিনী কন্যা পিতার মুখ লজ্জায় অবনত করে দিলে। পিতৃগৃহে সুদর্শনা আশ্রয় পেলেন—কিন্তু কন্যার গৌরবে নয়। দাসীত্বের অগৌরবের মধ্যে তাঁর দিন কাটতে লাগল।

১০ম দৃশ্যে কান্যকুব্জরাজের অন্তঃপুরে রাণী আর তাঁর দাসী সুরঙ্গমা। রাণী পতিগৃহ ছেড়ে এসেছেন—কিন্তু ভুলতে পারছেন না তাঁর রাজাকে। ব্যথায় আর অভিমানে তাঁর অন্তর পরিপূর্ণ। পিতৃগৃহে তাঁর লাঞ্ছনার দিনগুলি এমনি নিভৃতে একটি একটি করে খসে পড়বে—এ তিনি সইতে পারছেন না। রাণীর মহৎ গৌরবের আসন থেকে তাঁর খসে পড়া সে কি শিউলি ফুলের খসে পড়ার মতই তুচ্ছ হবে? রাণীর আরও দুঃখ এই ভেবে যে, তিনি একাই এত দুঃখ ভোগ করছেন। কই রাজা ত একবারও এলেন না? সুরঙ্গমা বোঝায় রাণীকে—সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে। বলে—"তুমি একলা না রাণী—তুমি একলা না।" বলে তোমার সাথে তোমার অলক্ষ্যে তিনি আছেন, যাঁর তুমি চির-অপরিত্যাজ্যা! সুদর্শনার মন মানে না—রুদ্ধ আক্রোশে মরে মাথা কুটে!

এমন সময় মাঠের পরে ধুলো উড়িয়ে কারা যেন অভিযান করে আসছে দেখা গেল। সুদর্শনা দেখলেন অভিযাত্রীদের পুরোভাগে তাঁর পরিচিত কিংশুক-ধ্বজা। বলে উঠলেন—"ঐ আসছে আমার রাজা—আমাকে উদ্ধার করতে!" সুরঙ্গমা কিন্তু দেখেই চিনেছে এ সেই নকল রাজার দল। সে বললে—"এ তো আমার রাজা নয়—আমার রাজা আবার কবে এমন করে ধুলো উড়িয়ে আসে?"

কিন্তু ভণ্ডরাজ সুবর্ণ আসছে বুঝেও সুদর্শনা দুঃখিত হ'লেন না। তাঁর মনে হ'ল রাজার কাছে তাঁর কোন মূল্য যদি না থাকে তবে নাই থাকুক। অন্য কোথাও যদি তাঁর আদর থাকে তবে সেই তাঁর ভাল।

সুবর্ণকে সঙ্গে করে নানা রাজার দলে কান্যকুব্জে নিয়ে এল দুর্ভাগ্যের ঝড়।

১১শ দৃশ্যে সুদর্শনার পাণিপ্রার্থী রাজার দল সংবাদ পেয়েছেন তাঁর পতিগৃহত্যাগের কথা। পিতৃগৃহে দাসীত্বের খবরও তাঁদের কানে পৌঁছাল। সুদর্শনাকে লাভ করবার মানসে সাত রাজায় মিলে কান্যকুব্জে অভিযান করলেন তাঁরা। কান্যকুব্জরাজ পড়লেন মহা

বিপদে। কুলত্যাগিনী কন্যা এ কি দারুণ বিপদ্ নিয়ে এল তার সঙ্গে! কন্যাকে তিনি তীব্র ভর্ৎসনা করলেন —তারপর গেলেন যুদ্ধক্ষেত্রে।

কিন্তু ভাগ্যের বিড়ম্বনায় কান্যকুব্জরাজ পরাজিত হয়ে হ'লেন বন্দী!

১২শ দৃশ্যে কান্যকুব্জের রাজান্তঃপুরে সুদর্শনা ও সুরঙ্গমা কথোপকথনে রত। পিতার বিপদে রাণী অত্যন্ত বিচলিত। রাজার প্রতিই তাঁর যত অভিমান। কান্যকুব্জকে রক্ষা করতে তিনি ত কই এলেন না? রাণীর মনের অন্ধকারে কিন্তু কোথা থেকে হঠাৎ দেখা দিয়েছে আলো। রাজা যে তাঁকে এখানেও ত্যাগ করেন নি—তার আভাসটুকু তাঁর মনে থেকে থেকে দোলা দিয়ে যায়। একা গৃহকোণে বসে তাঁর মনে হয়—বাতায়নের নীচে কে যেন বীণা বাজাচ্ছে। কোথাও কাকেও দেখা যায় না—অতি-পরিচিত একটি সুরে রাণীর অন্তরটি পূর্ণ হয়ে ওঠে। তাঁর মনে পড়ে স্বামীগৃহের সেই বাতায়নটি, যেখানে সন্ধ্যার পর রাণী প্রত্যহ সাজগোজ করে দাঁড়াতেন তাঁর সেই দীপনেভানো বাসরঘরের অভিসারে। সেদিনও এমনি গানের পর গান, তানের পর তানে তাঁকে মুগ্ধ করে সেদিন পৌঁছে দিত সেই অন্ধকার বাসরকক্ষে, যেখানে তাঁর প্রভুর সঙ্গে নিয়ত তাঁর মিলন ঘটত। সেই গান কি রাণী আর কোনদিন শুনবেন না?

সুরঙ্গমা আশ্বাস দিলে—"আবার সেই গৃহে হাত ধরে আদর করে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন তিনিই।"

কিন্তু সুদর্শনার এত আশা করার শক্তি আসে নি তখনও। তাঁর সমস্ত অন্তর বেদনায় ক্ষতবিক্ষত। বেদনা আরও গভীর হ'ল ক্রমে। দ্বারপথে প্রবেশ করল দ্বারী। দুঃসংবাদ বহন করে এনেছে সে। কান্যকুব্জরাজ বন্দী। সুদর্শনা মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়লেন।

১৩শ দৃশ্যে সাত রাজায় মিলে করলেন স্বয়ম্বরের মন্ত্রণা। কান্যকুব্জে তাঁরা ত বিজয়মাল্য নিতে আসেন নি—এসেছেন সুদর্শনার হাতের বরমাল্য নিতে। কান্যকুব্জরাজ বন্দী হবার পরে সাত রাজার মিলে আর একবার যুদ্ধে নামার চেয়ে স্বয়ম্বর সভায় সুদর্শনার ইচ্ছার পরেই সবটুকু ছেড়ে দেওয়া ভাল—কাঞ্চীরাজের এ মন্ত্রণা সকলে সানন্দে গ্রহণ করলেন। কান্যকুব্জ-রাজকেও এ কথা জানান হ'ল। তিনি রাজী হ'লেন, কারণ তাঁর উপায়ান্তর ছিল না। কাঞ্চীরাজ জানতেন সুবর্ণের প্রতি রাণীর দুর্বলতার কথা। তাই স্থির হ'ল স্বয়ম্বর সভায় কাঞ্চীরাজের ছত্রধর হবে সুবর্ণ।

১৪শ দৃশ্যে রাণী, সুদর্শনা ও সুরঙ্গমাকে দেখা গেল প্রাসাদের একাংশে। স্বয়ম্বর সভায় যেতেই হবে সুদর্শনাকে, নতুবা পিতার প্রাণরক্ষা হয় না। সুবর্ণ এসে জানিয়ে গেছে সে-কথা। কিন্তু ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে রাণীর ঘটেছে মোহমুক্তি। সুবর্ণের প্রতি তাঁর আর কোন মোহ নেই। তার বাহ্যরূপের মোহে তাঁর চোখ যে একদিন ভুলেছিল, একথা স্মরণ করতেও তাঁর লজ্জা হ'ল।

গভীর অন্তর্গ্লানিতে ভরে গেছে রাণীর অন্তর। অনেক চিন্তার পর মুক্তির উপায় তিনি স্থির ক'রে ফেললেন। স্বয়ম্বর সভায় রাণী যাবেন—কিন্তু সে সভায় তাঁর বরমাল্য পাবেন না কোন রাজাই—সে-মালা তিনি মৃত্যুর কণ্ঠেই অর্পণ করবেন। বুকের মধ্যে রাণী লুকিয়ে নিলেন তীক্ষ্ণ ছুরিকা। অনুতাপের অশ্রু-জলে রাণীর অন্তরের সব কালো হয়ে উঠল উজ্জ্বল। রাজার প্রতি তাঁর প্রেমও হয়ে উঠল নিবিড়। তাঁরই নাম মুখে নিয়ে রাণী মৃত্যুবরণ করতে অগ্রসর হলেন।

১৫শ দৃশ্যে স্বয়ম্বর সভায় রাজগণ সমবেত। সকলেরই মনে উৎকণ্ঠা—রাণী সুদর্শনা কার গলায় না জানি মালা দেন। কাঞ্চীরাজের মাথায় ছত্রধারণ করে দাঁড়িয়েছিল সুবর্ণ। সকলের মধ্যে চলছিল আনন্দমুখর কথাবার্তা। হঠাৎ সভামধ্যে সবার আসন উঠল কেঁপে। কি ব্যাপার এ? একজন বলে উঠলেন—"এ কী ভূমিকম্প না কি?"

তখন সকলকে সচকিত করে যোদ্ধবেশে সভাক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন ঠাকুর্দা। তিনি তাঁর রাজার দূত হয়ে এসেছেন—জানাতে এসেছেন যে তাঁর রাজা সমুপস্থিত দ্বারদেশে। সকলকে রাজা ডাক দিয়েছেন তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য অথবা আত্মসমর্পণের জন্য। কোন কোন রাজা যুদ্ধের সম্ভাবনামাত্র শুনে রণক্ষেত্র ত্যাগ করলেন। কাঞ্চীরাজ গেলেন যুদ্ধে—তাঁর সঙ্গে আরও অনেকে।

১৬শ দৃশ্যে দেখি যুদ্ধ শেষ হয়েছে। রাজাদের যে কেমন করে হার হয়ে গেল তা কেউ বুঝে উঠতেই পারলেন না। রাণী সুদর্শনার মন এখন তাঁর রাজার জন্য ব্যাকুল। যুদ্ধশেষে রাজা তাঁকে আদর করে কাছে ডেকে নেবেন—এই ছিল তাঁর আশা। কিন্তু কই—রাজা ত এলেন না! সুদর্শনার মন ভরে উঠল অভিমানে। এত অনাদর তিনি সইবেন কি করে? রাজা যে তাঁকে চিরকাল সোহাগে সমাদরে ভরিয়ে রেখেছিলেন। রাণী জানতেন না যে তাঁর রাজা যেমন

কোমল, তেমনি কঠিনও তিনি হ'তে পারেন। যে পথ দিয়ে রাণী স্বামীগৃহ ছেড়ে এসেছেন, সেই পথের ধূলাতেই ধূসর হয়ে তাঁকে পায়ে পায়ে ফিরে চলতে হবে তাঁর দয়িতের কাছে। এ ছাড়া অন্য নেই। সুরঙ্গমা তাঁকে বুঝিয়ে বললে—এ অভিমান ঘোচাতেই হবে রাণী—ছাড়তেই হবে এ লজ্জা। বললে, "কেবল একটি ইচ্ছা থাকবে—নিজেকে নিবেদন করার ইচ্ছা।" সুদর্শনার মন মানতে চাইলে না একথা। তিনি সুরঙ্গমাকে পাঠালেন রাজার খোঁজে। রাজাকে না পেয়ে ঠাকুর্দাকে ধরে নিয়ে এল সুরঙ্গমা। রাজা তখন চলে গেছেন বহুদূরে—তিনি যে কোথায়—তা কেউ জানে না, ঠাকুর্দাও না। অভিমানে ভেঙ্গে পড়লেন রাণী।—বললেন সুরঙ্গমাকে—

"যা যা চ'লে যা—তোর কথা অসহ্য বোধ হচ্ছে। এত নত করলে তবু সাধ মিটল না? বিশ্বসুদ্ধ লোকের সামনে আমাকে এইখানে ফেলে দিয়ে চলে গেল?"

সপ্তদশ দৃশ্যে নাগরিকদলের মুখে শোনা যায় যুদ্ধোত্তর ঘটনার সংবাদ। যুদ্ধের শেষে সব রাজাই হয়েছিলেন বন্দী। এদের মধ্যে সবাই শাস্তি পেয়েছে কেবল কাঞ্চীরাজ ছাড়া। কাঞ্চীরাজ যুদ্ধে মৃতকল্প হয়েছিলেন, কিন্তু সুচিকিৎসকেরা তাঁকে সুস্থ করে তোলে। বিচারের শেষে তারি মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিয়েছেন রাজা। সাধারণ লোকে এ বিচারের মর্ম বুঝতে পারলে না। কাঞ্চীরাজই ত যত অনর্থের মূল—তবে তার এই সম্মান কেন? কিন্তু রাজার বিচারের ধারাই যে আলাদা—তাঁর বিচার সাধারণ লোকে কি বুঝবে? কাঞ্চীরাজ বীর—তিনি নির্ভীক রজোগুণ-প্রধান তাঁর চরিত্র। রাজা নাটকের কাঞ্চীরাজ আধুনিক জড়বিজ্ঞানের প্রতীক। এ বসুন্ধরা বীরভোগ্যা—তাই কাঞ্চীরাজকে রাজসম্মানে ভূষিত করলেন সেই রাজাধিরাজ।

১৮শ দৃশ্যে অমা-রজনীর নিশীথ প্রহরে পথের মধ্যে ঠাকুর্দা ও কাঞ্চীরাজ। রাজার প্রেমের ডাকে কাঞ্চীরাজকেও করেছে ঘরছাড়া। থালায় মুকুট সাজিয়ে তিনিও বেরিয়েছেন রাজার মন্দির খুঁজে বার করতে। আর ঠাকুর্দা বেরিয়েছেন তাঁর বালকদলকে নিয়ে বসন্তোৎসবের শেষ পালাটা চুকিয়ে দিতে। পথে কাঞ্চীরাজকে দেখে তাঁর বিস্ময়ের অন্ত রইলো না। এর পরেও যারা ঘরের কোণে বসেছিল তাদের পথে বার করবার পালা ঠাকুর্দার। তাঁর সঙ্গে তাঁর বালকসঙ্গীরা গান ধরলে—"আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে"—

১৯শ দৃশ্যে ঐ একই রাত্রে পথে বেরিয়েছেন রাণী সুদর্শনা আর সুরঙ্গমা। রাণীর অভিমান ভাঙল শেষে। কৃষ্ণা চতুর্দশীর ঘন অন্ধকার যামিনীতে রাণী শুনেছিলেন তাঁর রাজার আহ্বান। অদেখা বীণার তারে তারে কি করুণ রাগিণীতে সেদিন বেজেছিল রাণীকে ফিরে পাবার জন্যে রাজার সেই করুণ মিনতি! সেই সুর রাণীর কঠিন অভিমানকে দিলে গলিয়ে। রাণী পথে বেরোলেন অমারজনীর নিশীথ প্রহরে। তখন পথের ধূলিকেও তাঁর মনে হ'ল মধুময়—পথ চলার কষ্টও হয়ে উঠল দুর্লভ সুখ! একটু গর্ব শুধু ছিল বুঝি রাণীর মনে, যে তিনিই আগে পথে বেরিয়েছেন—কঠিন পথ ভেঙে চলেছেন তাঁর রাজার কাছে। তাঁর আসার অপেক্ষা তিনি করেন নি। কিন্তু সুরঙ্গমা বললে—

"সে গর্বও তোমার টিঁকবে না। সে যে তোমারও আগে এসেছিল, নইলে তোমাকে বের করে কার সাধ্য?"

গর্ব ছাড়লেন রাণী। অনুভবে বুঝলেন রাজা সেই গভীর অন্ধকারেই ধরেছেন তাঁর হাত—যেমন করে এক-দিন ধরতেন সেই অন্ধকার মিলন-কক্ষে। সুদর্শনার মন শান্ত হ'ল।

পথে চলতে চলতে ওঁদের দেখা কাঞ্চীরাজের সঙ্গে। কাঞ্চীরাজ সুদর্শনাকে মাতৃসম্বোধন করলেন। রাণীর পায়ে-চলার কষ্ট বাঁচাতে এনে দিতে চাইলেন তাঁর যোগ্য রথ। কিন্তু রাণীর যে রথের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। ধুলোমাটির পথে ধুলোমাটির রাজার সঙ্গে পদে পদে যে মিলন, সেই মিলনেই তাঁর চিত্ত তখন ভরপুর।

দেখতে দেখতে রাত ভোর হয়ে এল। পূবের আকাশে জাগল অরুণোদয়ের ছটা। রাজার প্রাসাদের সোনার চূড়া জেগে উঠল সামনে।

ঠাকুর্দাও চলছিলেন পথে। রাণীকে দেখে বলে উঠলেন, "ভোর হ'ল দিদি—ভোর হ'ল।" রাণী এসে পড়লেন তাঁর নিজগৃহের সম্মুখে। ঠাকুর্দা দুঃখিত হ'লেন রাজার উদাসীনতায়। রাণী এসেছেন দ্বারে, কই তার উপযুক্ত আবাহন? কোথায় রথ—কোথায় বাদ্য—কোথায় সমারোহ?

সুদর্শনার মনে কিন্তু আর কোন ক্ষোভ নেই। তিনি দেখলেন তাঁর জন্যে রাজার অভ্যর্থনা ছড়িয়ে রয়েছে

আকাশের রঙে রঙে—আর বাতাসের পুষ্পগন্ধের সমাবেশের মধ্যেই। তিনি যে আজ সকল অভিমান ছেড়ে এসেছেন। বললেন—"যে কেউ তাঁর আছে—আমি আজ সকলের নীচে।" পরম বৈষ্ণবের মতই রাণী তখন "তৃণাদপি সুনীচা"।

বিংশ দৃশ্যে অন্ধকার ঘরে রাজা ও রাণীর পুনর্মিলন ঘটল। সে মিলনে আর কোন ছেদ নেই। রাণী আজ কান্না-হাসির বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে চিনে নিয়েছেন তাঁর চিরদয়িতকে। তাঁর আর ভুল হবে না। রাণীর দু'চোখ ভরে উঠল রাজার কালো রূপের সমারোহে। বললেন—"তুমি সুন্দর নও প্রভু, সুন্দর নও, তুমি অনুপম।"

"তোমারই মধ্যে আমার উপমা আছে।" উত্তর দিলেন রাজা।

এইবার অন্ধকার ঘরের পালা শেষ হ'ল একেবারে। রাণীর হাত ধরে রাজা তাঁকে নিয়ে এলেন বাইরের জগতে—আলোয়। এখন থেকে অখিল বিশ্বচরাচরের আলোয় বিশ্বরাজের সঙ্গে সুদর্শনার নিত্যমিলনের পালা।

মাঘোৎসব বা এগারোই মাঘ

শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব

ক্ষুদ্র বীজ থেকে বনস্পতির সৃষ্টি। একটি মাত্র দিন থেকেও এক যুগের শুভ সূচনা হয়ে থাকে। এমন একটি দিন এই এগারোই মাঘ। এই দিনটির মধ্যে এমন সত্য নিহিত ছিল যা আজ মানবতাকে সঞ্জীবিত করছে।

'এগারোই মাঘ'-এর উৎসব ব্রাহ্মসমাজের উৎসব—এই হ'ল মোটের উপর সকলের ধারণা। কিন্তু এই ধারণার বশবর্তী হয়ে থাকলে এ-দিনের উৎসবের মর্মকথাটি জানা যায় না।

"ব্রাহ্মধর্মকে কয়েকজন মানুষের জীবনের মধ্য দিয়া দেখিতে গেলেও তাহাকে ছোট করিয়া দেখা হইবে। বস্তুত ইহা মানব ইতিহাসের সামগ্রী।...ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টির মধ্যে আমরা তাহারই পরিচয় পাই।"—ধর্মশিক্ষা: রবীন্দ্রনাথ।

এই সৃষ্টির মূলে যিনি আছেন—নিরঞ্জন নিরাকার নির্বিকার ব্রহ্ম—তাঁরই উপাসনা করতে হবে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রচিত ব্রাহ্মধর্মের বীজমন্ত্রে আছে—

"তস্মিন প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

কিন্তু যাঁকে দেখি না, যাঁর কথা শুনি না, তিনি উপাস্য হবেন কি করে? এ বড় জটিল কথা, জটিল প্রশ্ন। যাঁরা তাঁকে ধ্যানে ধারণায় পেয়েছেন, তাঁরা সকলেই জগতের কল্যাণকামী মানুষ, সাধক মহাপুরুষ। জটিল প্রশ্নের উত্তর তাঁরা যা রেখে গেছেন তাই পাই আমরা মন্ত্রে, গ্রন্থে, বাণীতে, দোঁহায়। মতে আর পথে বাদবিতণ্ডার অন্ত নেই। কিন্তু একটি সহজ কথা সকলেই স্বীকার করেন—ঈশ্বর স্বরূপতঃ অজ্ঞেয় বা দুর্জ্ঞেয় হ'লেও তাঁরই সঙ্গে মানুষের জীবন নিবিড়ভাবে যুক্ত। এই যুক্তিকে যিনি এই যুগে সকলের কাছে গ্রাহ্য করে উপস্থাপন করলেন তিনি যুগগুরু রামমোহন রায়। তাঁর যুক্তির মূলে আছেন এক ঈশ্বর—সকল মানুষের তিনি স্রষ্টা পাতা। এই প্রত্যয়ের মধ্যেই রয়েছে বিশ্বমানবের একত্ব বোধ। যে বোধ তাঁকে বুঝিয়েছিল সবচেয়ে প্রয়োজনীয় একটি কথা—পৃথিবীতে মানুষ চায় পরস্পরের সহযোগিতা। সহযোগিতা সকল বিষয়ে—ধর্মে কর্মে জ্ঞানে বিজ্ঞানে। শুধু বাইরের দেশে কালে নয়, অন্তর্জগতেও। এই ব্যাপক সহযোগিতার অবলম্বনস্বরূপ হবেন সর্বব্যাপী 'সর্বনিয়ন্তৃ সর্বাশ্রয় সর্ববিৎ সর্বশক্তিমৎ'-পরমেশ্বর এবং তাঁকে কায়মনোবাক্যে প্রত্যয়। এই প্রত্যয়ের গূঢ়ার্থ মানব জীবনে সর্বোচ্চ এক পরিণতির পথে যাত্রা। মতবাদের লক্ষ্য এই পরিণতির দিকে থাকলে কোনখানেই আর

দ্বন্দ্ব দেখা দেবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু কোন একটি মতবাদকে যাঁরা পরিণতি বলে ধরে রেখেছেন তাঁদের যাত্রা কোনদিনই গন্তব্য খুঁজে পাবে না। রামমোহনের জীবন-সাধনার এই হচ্ছে মূলকথা। লোকাচারে, সংস্কারে সত্য শিব সুন্দরের বিস্মৃতিতে জগৎটাকে বিভীষিকা বলে ধরে নেবার চরম দুর্দিনে দেখা দিলেন রামমোহন। চিন্তাবীর তিনি, জ্ঞানে ভাস্বর, বিচারবুদ্ধির সম্পূর্ণ বিকাশ তাঁতে বাধা পেল না। তিনি আঘাত করলেন জড়তার দ্বারে, তামসিকতাকে করতে চাইলেন নিশ্চিহ্ন। তাঁর চৈতন্যে উদ্‌ভাসিত হ'ল—ভূমৈব সুখম্।

জন্ম হ'ল ব্রাহ্মসমাজের। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০ আগষ্ট। ১৭৫৫ শকের ৬ই ভাদ্র বুধবার জোড়াসাঁকোতে কমললোচন বসুর বাড়ী ভাড়া নিয়ে সমাজ বসল। এই তারিখটি ব্রাহ্মসমাজের ভাদ্রোৎসব উদ্‌যাপনের জন্য চিহ্নিত হয়ে আছে। ১১ই মাঘ জন্ম নিয়েছে এই দিন থেকেই।

১১ই মাঘের উৎসব প্রথম অনুষ্ঠিত হয় ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারি। সে দিনটি ব্রাহ্মসমাজের প্রবর্তনের দিন নয়—নবগৃহ প্রবেশের দিন। সমাজের জন্য নির্দিষ্ট নবগৃহ প্রবেশ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত উৎসবই ১১ই মাঘের উৎসবরূপে প্রচলিত।

রামমোহন রায়ের মৃত্যু হয় ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর বিদেশে ব্রিষ্টল নগরে। সমাজের কাজে পড়ে বাধা। এই বাধা অপসারণের প্রস্তুতি চলে আরেকজনের জীবনে। রামমোহনের আরব্ধ কাজ সম্পাদনের গুরুভার গ্রহণ করলেন তিনি, যিনি আজ সকলের কাছে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নামে পরিচিত।

দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু কলেজ ছাড়লেন। সাংসারিক নানা দুর্যোগ এল তাঁর জীবনে। মুক্তির পথ খুঁজতে লাগলেন তিনি। তত্ত্বানুসন্ধানী হয়ে য়ুরোপীয় দর্শন ও দেশীয় শাস্ত্রাদি পাঠ করলেন। লকে এবং হিউম-এর গ্রন্থে জড়প্রকৃতির প্রাধান্য সিদ্ধান্তে বিষণ্ণ ও বিরক্ত হলেন তিনি। উপনিষদ আশ্রয় করলেন আত্মার শান্তির জন্য। পেলেন একটি সুন্দর কথা—য আত্মদা, বলদা, পেলেন আরও সুন্দর কথা—একং রূপং বহুধা যঃ করোতি। তত্ত্বানুসন্ধানের তৃষ্ণা থেকে জন্ম হ'ল তাঁর তত্ত্বরঞ্জিনী সভার। দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্বরঞ্জিনীকে তাঁর শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ পরিণত করলেন 'তত্ত্ববোধিনী'তে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর। সোসাইটি ফর দি অ্যাকুইজিশন অব জেনারেল নলেজ বা জ্ঞানোপার্জিকা সভা স্থাপন করেছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ। দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন তার সভ্য। এক ঈশ্বরের প্রতীতি জন্মে তাঁর মনে এই সময়েই। আর পরিচয় ঘটে রামমোহনের সঙ্গে। দল বেঁধে প্রতিজ্ঞা করলেন ভাইদের নিয়ে—'প্রতিমাকে প্রণাম করা হবে না।' ঈশোপনিষদের ছেঁড়া পাতা থেকে যে মন্ত্র পেয়েছিলেন।

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চজগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা, মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং।

তারই প্রেরণায় গড়লেন তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা—সুপণ্ডিত অক্ষয়কুমার দত্ত হ'লেন শিক্ষক। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হ'ল। সম্পাদনার ভার নিলেন অক্ষয়বাবু। এক তত্ত্ববোধিনী তিন শাখায় প্রসারিত হয়ে কর্মচঞ্চল করে তুলল দেবেন্দ্রনাথের দিনগুলি।

বিষয়সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য ট্রাষ্টডীড্ সম্পাদন করলেন পিতা দ্বারকানাথ ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে। তিন বৎসরের মধ্যেই উইলও সম্পাদিত হ'ল ১৮৪৩ সালে। দেবেন্দ্রনাথের সংসার-বিরাগ লক্ষ্য করে দুঃখিত হলেন দ্বারকানাথ। দুঃখ করে বললেন তাই,

"একে তার বিষয়বুদ্ধি অল্প, এখন সে ব্রহ্ম ব্রহ্ম করিয়া আর বিষয়কর্মে কিছুই মনোযোগ দেয় না।"

—মহর্ষির আত্মজীবনী, পৃ. ৭৮

পিতার কোপদৃষ্টিতে পড়ায় বাড়িতে আর উপনিষদের অধ্যয়ন চলল না। তত্ত্ববোধিনীর যন্ত্রালয় হ'ল এখন তাঁর অধ্যয়নের স্থান। অধ্যাপনা করেন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। এরই মধ্যে একদিন ব্রাহ্মসমাজ দেখতে গেলেন ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে। তত্ত্ববোধিনী সভাকে এই সমাজের সঙ্গে যুক্ত করেন এই ছিল ইচ্ছা। দুই সভারই উদ্দেশ্য এক—সকলকে ব্রহ্মের দিকে, পরমকল্যাণের দিকে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু লক্ষ্য করলেন, সমাজে বর্ণভেদ রক্ষিত হচ্ছে। শূদ্রের অসাক্ষাতে বেদপাঠ হয়, অথচ ট্রাষ্টডীডে লেখা আছে—'জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলে ব্রহ্মোপাসনা করতে পারবে একত্রে।' বেদনা বাজল তাঁর মনে। যে সর্ষে দিয়ে ভূত ছাড়াবেন, সেই সর্ষেতেই ভূত ঢুকেছে। ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য

বর্ণ থেকে যোগ্য লোক পাওয়া নাকি সহজ নয়। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ নিরস্ত হ'লেন না এতে। উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ করলেন।

ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে বসে আচার্যের উপদেশ দিতে পারবেন এমন লোক যে-কোন ব্রাহ্মণেতর শ্রেণীর মানুষ থেকেও বেছে নেবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থায় ব্রতী হ'লেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিলেন, "সংস্কৃতে নির্দিষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র চাই—উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তি দেওয়া হবে।"

ছাত্র জুটল। ছাত্রই একদিন শিক্ষা গ্রহণ করে আচার্যের গদীতে বসতে পারবে। মানুষে মানুষে কোনরূপ বর্ণবৈষম্য আর থাকবে না তা হ'লে।

তবু যেন দ্বিধা থেকে যায় মনে। যারা আসে-যায় ব্রাহ্মসমাজে, তাদের মধ্যেও বাছাই করতে হবে—আসল নকল। মন্ত্র উচ্চারণ করলেই ত হ'ল না। জীবনে তার প্রতিফলন চাই। পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করে যারা এক-ঈশ্বরের উপাসনা করতে ইচ্ছুক তাদের জন্য প্রতিজ্ঞাপত্র রচিত হ'ল। এই পত্রে রইল গায়ত্রীমন্ত্রের বৃহৎ ভাবনা দ্বারা দেহ-মনের সর্বোচ্চ বিকাশের পথে নবযাত্রা। রামমোহনের ব্রহ্মোপাসনার বিধান অনুসরণেই এই প্রতিজ্ঞাপত্র রচনা করলেন দেবেন্দ্রনাথ।

ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলেন তিনি রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর ১৭৬৫ শকাব্দের ৭ই পৌষ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায়। এই উপলক্ষ্যে বললেন তিনি,

"যাহাতে পরিমিত দেবতার উপাসনা হইতে বিরত হইয়া এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসনা করতে পারি, যাহাতে সৎ কর্মে আমাদের প্রবৃত্তি হয়, এবং পাপমোহে মুগ্ধ না হই, এইরূপ উপদেশ দিয়া আমাদের সকলকে মুক্তির পথে উন্মুখ করুন।"

আচার্য বিদ্যাবাগীশ উত্তরে বললেন,

"রামমোহনের এইরূপ উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু তিনি তাহা কার্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। এতদিন পরে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল।" —মহর্ষির আত্মজীবনী, পৃ. ৮৫

রামমোহনের ইচ্ছাপূরণের কথায় দেবেন্দ্রনাথ আনন্দিত হবেন, এ ত নিঃসন্দেহ। সত্যব্রত গ্রহণ করবার পর তিনি বললেন,

"তত্ত্ববোধিনী সভা যখন প্রথম সংস্থাপিত হয়, তখন সেই একদিন ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ৬ অক্টোবর আর অদ্য ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের এই আর একদিন ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর ৭ই পৌষ। ক্রমে ক্রমে আমরা এতদূর অগ্রসর হইলাম যে, অদ্য ব্রাহ্মধর্মের শরণাপন্ন হইয়া ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিলাম। এই ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়া আমরা নূতন জীবন লাভ করিলাম।"

—মহর্ষির আত্মজীবনী, পৃ. ৮৫

দুই বছরের মধ্যে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর অবধি ৫০০ জন ব্রহ্মভক্ত প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে সত্যব্রত গ্রহণ করলেন। প্রত্যেকের মধ্যে পরস্পরের এমন প্রীতির বাঁধন ছিল যা দুই সহোদরের মধ্যেও থাকে না। সদ্‌ভাবকে পুষ্ট করবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ একটি মেলার আয়োজন করলেন গেরিটি বা পলতার বাগানে। সকলের উপস্থিতিতে একটি মহোৎসব অনুষ্ঠিত হল। এই অনুষ্ঠানে ব্রাত্যদের উপবীত বর্জনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'ল। বর্ণভেদ দূর করবার এ আর এক উপায় বা প্রচেষ্টা।

চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষের উপর মানবতার উন্নতি নির্ভর করে। এ কথা দেবেন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন ভাল করেই। তাই এমন একটি মন্ত্রের অনুসন্ধান তাঁর বুদ্ধিতে ছিল যা হবে সকল ব্রাত্যের ঐক্যস্থল। তিনি বললেন,

"ইহাই ভাবিয়া আমি আমার হৃদয় ঈশ্বরের প্রতি পাতিয়া দিলাম। বলিলাম, আমার আঁধার হৃদয় আলো কর।"

সে আলোতেই তিনি খুঁজে পেলেন তাঁর ঈপ্সিত মন্ত্র। উপনিষদের মুখে নদীর স্রোতের ন্যায় সহজে সতেজে বলতে লাগলেন তিনি, আর লিখে নিতে লাগলেন তাঁর প্রিয়তম গুণগ্রাহী অক্ষয়কুমার দত্ত—

"ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি
যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"...ইত্যাদি।

"তিন ঘণ্টার মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ হইয়া গেল। কিন্তু ইহার

নিগূঢ় অর্থ বুঝিতে এবং তাহা আয়ত্ত করিতে আমার সমস্ত জীবন চলিয়া যাইবে, তথাপি তাহার অন্ত হইবে না।"

—মহর্ষির আত্মজীবনী, পৃ ১৭৯

মহর্ষির দীক্ষার দিন থেকে আরম্ভ করে জীবনের শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত তিনি অতিবাহিত করেছেন তাঁর সত্যোপলব্ধির আনন্দ সকল মানুষকে বিতরণ করার কাজে। বাধাবিঘ্ন কম ছিল না, তবু তিনি রামমোহনের নবযাত্রাকে জয়যাত্রায় পরিণত করার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। সেই জয়যাত্রার পথেই পাওয়া শান্তিনিকেতন আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত মহর্ষির ঈপ্সিত ব্রহ্মোপাসনার মন্দির—দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার ৪৮ বছর পরে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২১ ডিসেম্বর। ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ৭ই পৌষ তারিখে শান্তিনিকেতনের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হল (ভিত্তিস্থাপনের তারিখ ১৮৯০ অব্দের ৭ই ডিসেম্বর। ১২৯৭, অগ্রহায়ণ ২৮)। দেখা যাচ্ছে যে, দেবেন্দ্রনাথের দীক্ষাগ্রহণের তারিখটিকে শ্রদ্ধাসহকারে স্মরণ করার জন্যই শান্তিনিকেতন মন্দির তিনি সেই একই দিনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পুত্র রবীন্দ্রনাথও এই দিনটির সম্বন্ধে বলেছেন,

"এই সেই ৭ই পৌষ এই শান্তিনিকেতন আশ্রমকে সৃষ্টি করেছে এবং এখনও প্রতিদিন একে সৃষ্টি করে তুলছে।"

রবীন্দ্রনাথ যখন বিদ্যালয় স্থাপনের কথা ভাবেননি, তখনই তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতন মন্দিরকে কেন্দ্র করে একটি ব্রহ্ম বিদ্যালয় স্থাপনের আয়োজন করেছিলেন। তাঁর পরিকল্পিত বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান পদ্ধতির খসড়াটি দেখলেই সন্দেহ থাকেনা যে পিতামহ দেবেন্দ্রনাথের উপলব্ধ সত্যের প্রচার কামনাই ছিল এর মূলে। কিন্তু বলেন্দ্রনাথের অকালমৃত্যুতে (১৩০৬ ভাদ্র) রবীন্দ্রনাথ পিতৃদেব মহর্ষির অনুমতি নিয়ে শান্তিনিকেতনে গড়ে তুললেন ব্রহ্মচর্যাশ্রম। বলেন্দ্রনাথের পরিকল্পিত 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' আর রবীন্দ্রনাথের 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' নামের দিক দিয়ে শুনতে প্রায় সমপর্যায়ের মনে হ'লেও আসলে দুইজনের পরিকল্পনার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য বর্তমান ছিল।

তবু রবীন্দ্রনাথ দেবেন্দ্রনাথের পুত্র। পিতৃমন্ত্রে তাঁর দীক্ষা। শান্তিনিকেতন দেবেন্দ্রনাথের, রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের। ১১ই মাঘের উৎসব এখানকারও উৎসব। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "এ উৎসব নবযুগের উৎসব।"

তিনি বলেন,

"আমরা আজ পঞ্চাশ বৎসরের উর্দ্ধকাল এই ১১ই মাঘের উৎসব করে আসছি।···আমরা মনে করেছিলাম আমাদের এই উৎসব ব্রাহ্মসমাজের উৎসব। ···কিন্তু এইটুকুতেই উৎসবের শেষ পরিচয় আমরা লাভ করতে পারি নে। আমাদের এই উৎসব ব্রাহ্মসমাজের চেয়ে অনেক বড়, এমন কি, একে যদি ভারতবর্ষের উৎসব বলি, তাহলেও একে ছোট করা হবে। আমি বলছি এ উৎসব মানব সমাজের উৎসব। ···আমাদের উৎসবকে ব্রহ্মোৎসব বলব, কিন্তু ব্রাহ্মোৎসব বলব না। যিনি সত্যম্ তাঁর আলোকে এই উৎসবকে সমস্ত পৃথিবীতে আজ প্রসারিত করে দেখব। আমাদের এই প্রাঙ্গণ আজ পৃথিবীর মহা-প্রাঙ্গণ—এর ক্ষুদ্রতা নেই।

—শান্তিনিকেতন : রবীন্দ্রনাথ।

১১ই মাঘের ব্রাহ্মসমাজের সেই নবগৃহ প্রবেশ আজ বৃহৎ পৃথিবীতে বৃহৎ মানবপরিবারে প্রবেশ, সে কথা সত্য হোক!

রায়বাড়ী

গিরিবালা দেবী

সেদিন সে বিনুকে বলিয়াছিল, "কাজ এখন পাতলা হইয়াছে।" অল্প কাজের প্রতি বোধ হয় বিনুর চোখ লাগিয়াছিল। পল্লীগ্রামে মানুষের 'চোখলাগা' সোজা যায়।

কয়েক দিনের মধ্যেই তাহায় ফলস্বরূপ পাচক মণিরাম-ফণিরামের বৃদ্ধা মাতার মৃত্যু সংবাদ আসিল সুদূর উড়িষ্যা হইতে। মণিরামের স্বজনরা বুদ্ধি করিয়া তারেই সংবাদ দিয়াছিল। তার আসিল সাত দিন পরে।

দুই ভাইকেই রওনা হইতে হইল মায়ের শ্রাদ্ধ-শান্তি করিবার জন্য। কোন কারণবশতঃ একজনা অনুপস্থিত থাকিলে কাহারও অসুখ হইলে অপরে কাজ চালাইবার সুবিধার জন্যই জোড়া ধরিয়া তাহাদিগকে রাখা হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা অপর কেহ নহে, এক মা'র সন্তান।

কর্তা মণিরাম-ফণিরামকে যাতায়াতের খরচ দিয়া মায়ের শ্রাদ্ধের যাবতীয় টাকা দিয়া সাত দিন পরে ফিরিবার নির্দ্দেশে দেশে পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা নিয়মের চালের গুঁড়া কুটিতে এমনিই ঢেঁকিতে পা দেয় না; নিয়মের ডালের বড়ির জন্যে এমনিই গামলা গামলা ডাল বাঁটে না। কায়িক পরিশ্রম করিয়া দুই ভাই মিলিয়া একটা জমিদারি কিনিয়া রাখিয়াছে।

যাঁহারা বাকী খাজনার জন্য ভেকু সেখকে কয়েদ করিবার হুকুম দেন, তাঁহারাই আবার ধান উঠিলে বস্তা বস্তা ধান পাঠান তাহার গৃহে। পূজার সময় ভেকু-পরিবারের নূতন কাপড়, শীতের দোলাই কম্বল বিতরণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ক্ষুদ্র এলাকায় অনাহারে কেহ মরে না। তাঁহাদের চরিত্রের বিশেষত্ব, ভীষণে মধুর, কোমলে কঠোর।

মণি-ফণি তেপান্তরে পাড়ি ধরিলে রায়বাড়ীতে সকলের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। পল্লীগ্রামে রসুয়া ব্রাহ্মণের নিতান্ত অভাব। সাধারণতঃ গ্রামবাসী ব্রাহ্মণরা অজ্ঞাত-কুলশীল রসুয়া ব্রাহ্মণের হাতে খায় না। সেই কারণে পাচক সম্প্রদায়দের অত্যন্ত অভাব। পাবনা শহরে কখনও দোবে বা ওঝা দুই-একটা চেষ্টা করিলে কালে-ভদ্রে জুটিয়া যায়। রাজসাহী পাবনা বারেন্দ্রভূমি, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণরা প্রাণান্তেও পাচক-বৃত্তি অবলম্বন করে না।

অগত্যা মনোরমা ঢুকিলেন রন্ধনশালায়। তাঁহার মতন পাকা রাঁধুনী সেকালেও বেশি ছিল না। রান্না করিতে তিনি অতিশয় ভালবাসতেন। সেকালের মেয়েদের বাহিরের জগৎ বলিয়া কিছু ছিল না। লেখাপড়ার বালাই ছিল না। রান্না ভিন্ন তাঁহারা করিবেনই বা কি?

কামিনীর মা বিনুকে তালিম দিয়া ঠেলিয়া দিল শাশুড়ীর পিছনে। নিয়মের কাজে হাহাকার পড়িয়া গেল। সরস্বতী মুখে বাড়াইয়া দিবার ওস্তাদ, কিন্তু হাতে-কলমে করিতে নারাজ।

বিনু কিন্তু পুলকিত, দুধের সেবার অপেক্ষা রন্ধন তাহার ভাল লাগে। রান্না চড়াইয়া সে বুনিতে পারে সুখুর সোয়েটার। তরুর সহিত গল্পসল্পও দিব্যি চলে। শাশুড়ীর অনুপস্থিতিতে পোড়াকাঠের কয়লা দিয়া হিজিবিজি কাটিলেও কেহ দেখিতে আসে না।

কয়েকদিন মনোরমার সহযোগিতায় বিনু রন্ধনে অনেকটা অভ্যস্ত হইয়া গেল। এখন তাহার ভয় করে না। সাহস হইয়াছে।

সেদিন বিনু একাকী রান্না করিতেছে। মাছ আসিয়াছে তিন জাতের। কামিনীর মা কাছে নাই; তাহাদের নূতন ধানের চিড়া কোটার ধুম পড়িয়া গিয়াছে।

রন্ধনশালার পিছনে পুকুরে যাইবার রাস্তা। কামরাঙ্গা গাছের পাশ দিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে।

বিনু বাতায়ন-পথে তাকাইয়া সহসা চমকিত হইল। পুকুরের পাড় দিয়া কে আসে অন্দরে। গায়ে ওভারকোট, মাথায় কানঢাকা টুপি, মুখ ভাল দেখা যাইতেছে না, কেমন যেন ভালুকের মতন আকৃতি। দূর হইতে মূর্ত্তিটি জুতার মস মস শব্দ করিয়া বাতায়নের নীচে আসিল। বিনু সরিয়া গেল না, সেই দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার অজ্ঞাতসারে কণ্ঠ হইতে একটা অস্ফুট শব্দ বাহির হইল মাত্র।

বেলা বারটা বাজিয়া গিয়াছে। সকলে ব্যস্তসমস্ত। ঝিয়েরা সকলেই প্রায় উপস্থিত ঢেঁকিশালায়। ছোট ঠাকুমার ভোগ রান্না হইয়া গিয়াছে। তিনি পূজারীকে ডাকিতেছেন ভোগ সরাইতে।

মনোরমা বসিয়াছেন নিয়মের কর্ম্মশালায় দুধের কড়া লইয়া। ঠাকুমা হাতীর মাথায় বসিয়া অনিমেষে লক্ষ্য করিতেছেন কতক্ষণে ভোগ সরিবে।

তরু বিবিকে কোলে লইয়া বিড়ার চাপড়ার সন্ধানে অগ্রসর হইতে গিয়া আনন্দে চিৎকার করিয়া উঠিল, "দাদা, তুমি এসেছ? কি কাণ্ড, আসবে খবর দাও নি, বাইরে দিয়ে না এসে চোরের মতন পেছনে? ও ঠাকুমা, মা, দেখ দাদা এসেছে যে। ফুলদা কই, সুমু কোথায়? শিগগির এস সবাই, দাদা এসেছে।"

প্রসাদ ভিতরের উঠানে পা দেবামাত্র চারিদিকে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। যে যেখানে ছিল ছুটিয়া বাহির হইল।

মা বলিলেন, "প্রসাদ এলি, আগে জানাস নি? ষ্টেশনে গাড়ি পাঠান হয় নি। এতটা পথ হেঁটে এলি নাকি? তোর জিনিসপত্র কই?"

"কাল কলেজ হয়ে আমাদের বড়দিনের বন্ধ হ'ল মা, তাই রাতেই রওনা হ'লাম। মাত্র দশদিনের ছুটি, ভেবেছিলাম আসব না। তাই তোমাদের চিঠি লিখি নি। তারি ত এতটুকু রাস্তা, তার জন্যে আবার গাড়ি। শীত-কালে হাঁটতে ভালই লাগে। ক'দিনই বা থাকা, সামান্য জিনিস একটা ব্যাগে এনেছি। সেটা আনছে গণি মোল্লা।"

বলিতে বলিতে প্রসাদ মা'র পদধূলি লইয়া ঠাকুমার কাছে গেল।

ঠাকুমা তাঁহার অশেষ স্নেহের পাত্রকে কাছে পাইয়া দুই হাতে জড়াইয়া ধরিলেন, "পেসাদ, এলি ভাই, তুই আসবি বলেই সকালে আমার বাঁ চোখ নেচেছিল। কি পরে এসেছিস—সায়েবের মত, খুলে ফেল। গায়ে রোদ-বাতাস লাগুক। আমি পরাণ ভ'রে তোরে দেখি।"

প্রসাদ বলে, "শীতের জামা বোঝা না করে গায়ে চাপিয়েই এসেছি। বাবার সঙ্গে দেখা করে এক্ষুণি খুলে রাখছি, তুমি আমাকে পরাণ ভ'রে কত দেখতে চাও দেখ ঠাকুমা? হঠাৎ কাছে পেয়ে খুব আনন্দ হচ্ছে, না?"

"আনন্দ হবে না? গোকুলে যে আমার গোবিন্দের আগমন 'ব্রেহ্মা নাচে, বিষ্ণু নাচে, আর নাচে ইন্দ্র গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ'।"

প্রসাদ হাসে হা হা, "কি উপমা দিলে ঠাকুমা, চমৎকার, গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ। তোমার নাচা পরে শোনা যাবে, বাবার কাছে যাই।"

প্রসাদ হলঘরের মধ্য দিয়া চলিয়া গেল পিতার গৃহে।

ঠাকুমা মনের উল্লাসে হাঁক-ডাক সুরু করিলেন, "আলো ও মণিমালা, ভাগ্যে আজ অন্নপূর্ণা হয়েছিলি, তোর অন্ন ভিক্ষে নিতে শিব এসে উপস্থিত হ'ল। কি রান্না করেছিস? তখন যে কুটতে দেখলাম তিন রকম মাছ? একবার পাক-ঘর থেকে বের হয়ে চাঁদ মুখখানা দেখিয়ে যা না লো।

'আসিছে তোর চিকণ কালা, বনফুলে গাঁথ লো মালা।'

দিদি শাশুড়ীর সাদর আহ্বানে পরিহাসে বিনু বাহির হইতে পারিল না। কি এক সঙ্কোচে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। দূর হইতে নিজের স্বামীকে সে চিনিতে পারে নাই, এই লজ্জা তাহার মর্ম্মস্থলে কাঁটার মত বিঁধিতে লাগিল। ভাগ্যে কেহ কাছে ছিল না, থাকিলে তাহার ভীতিসূচক অস্ফুটধ্বনি শুনিলে কি ভাবিত? খিড়কির দরজা দিয়া ঢোকার মানে সকলকে চমকিত করা। ভরা দ্বিপ্রহরে কে আবার অমন বিজাতীয় পোষাকে মুখের অর্দ্ধেকটা টুপিতে ঢাকিয়া ঘরে ফেরে? এই রঙ্গ করিতেই বুঝি চিঠি লেখা বন্ধ হইয়াছিল। এতও জানে। এবার বোধহয় উনি আসিলেন বিনুর পড়া ধরিতে খাতা পরীক্ষা করিতে। এদিকে যে কত কাণ্ড সে-জ্ঞান নাই।

অশুভ ক্ষণে লবঙ্গ বোনা হস্তে কাঠগোলাপ রংএর উল সংগ্রহ করিতে আসিয়াছিল। তাহার পরে আরম্ভ হইয়া গেল কর্মনাশা ব্যাপার। তরু-সুমু নূতন জামা গায়ে দিয়া ওদিকে বুক ফুলাইতে লাগিল, এদিকে বিনু পড়িল আর এক ফ্যাসাদে। ক্ষিতি অভিমানে মুখ ফুলাইয়া বলিল, "বৌঠান, ওদের ত দিব্যি জামা বানিয়ে দিয়েছেন, আমি কি দোষ করেছি—আমাকে দেবেন না?"

বিনু অভদ্র নয়, বলিতে হইল, "ওরা ছোট, ওদের আগে দিলাম। এবার তোমাকে দেব, তুমি কি চাও?"

"এক জোড়া ফুল মোজা চাই, কালো পশমে করে দেবেন।"

বিনু স্বীকার হইয়া সুরু করিয়াছে ফুল মোজা। এদিকে মণিরাম-ফণিরামের মাতৃবিয়োগ। বুড়ীর যেন আর মরিবার সময় ছিল না। সে কি দশভুজা, তাহার কি বিদ্যা-শিক্ষা নাই? চিরকাল মূর্খ হইয়া থাকিলে তাহার কিরূপে চলিবে?

বিনুর হৃদয়ে ভয়-ভাবনা দোলা দিলেও এক অজানা পুলক-মিশ্রিত অনুভূতি জাগ্রত হইতে লাগিল।

ঠাকুমার মরা গাঙে জোয়ার আসিয়াছে। শুষ্ক তট-ভূমি প্লাবিত করিয়া উচ্ছ্বসিত আনন্দ বারি কলকল ছলছল করিতেছে। তিনি তাহাকে চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া পঞ্চমুখ হইলেন, "ওলো রাজেশ্বরী, তোর আক্কেল দেখে বাঁচি না। কত কাল পরে আমার ঘরের নিধি ঘরে ফিরল, তাতেও তোরা ধুম ধুম ঢেঁকুস ঢেঁকুস থামাচ্ছিস না। এত বেলায় হাড়ভাঙ্গা শীতে আমার পেসাদের পুকুরের শীতলকুণ্ডে নেয়ে কাজ নেই। তার নাইবার গরমজল বসা। জল গরম হ'লে হরিকে ডেকে পাঠিয়ে দে স্নানের ঘরে। ছেলেমানুষ বৌটা কি রান্না-বাড়া করেছে কে জানে। তুই গিন্নীবান্নি মানুষ, সেদিকেও ত নজর দিচ্ছিস না? আজকের দিনেই যেন তোদের নাও কাজ বিয়ে কাজ লেগে উঠেছে। 'কাজের মুখে আগুন দেই, পিজের কাজ আগে নেই'।"

কামিনীর মা বিরক্ত হইল, "কি কইচেন মাঠান, দুই দিনের নটর-পটর, একদিনে সারি থুইছি, তাইতে আমার কিসের দোষ হইচে? 'যার লেগে করি চুরি সেই কয় চোর।' এই হইয়া গ্যাল। তুলি-পাড়ি ঘরে তুল্লেই আমি খালাস। নব্‌নেড়াও ত দাদাবুর জেরানের লেগে এতক্ষণ আথা ধরায়ে একহাঁড়ি জল বসাইয়া দিতি পারিত। খালি আগডুম-বাগডুম গালগল্প।"

ঠাকুমা নরম গলায় বলিলেন, "তোরে ভিন্ন আমি কারে কিছু কই না রাজেশ্বরী, কইলে কেউ কান দেয় না। বেশি কইলে ব্যাজার হয়ে বকর বকর করে। আমার হইচে 'ছোটলোকের কথা না সয় গায়, মশার কামড় না সয় পায়।' তোর হইয়া গেল সারা, বাঁচলাম। এখন আগে রাঁধার ঘরে ঢুকে ঠাঁই পিঁড়ির যোগাড় কর। গরম জল তুলে দে। তুই যে আমার একে একশো। তুই না হ'লে রায়বাড়ীর কিছুতে সিদ্ধি নাই।"

কামিনীর মা মানুষ ভাল, ঠাকুমার তোয়াজে গলিয়া জল হইয়া গেল।

তিন ছেলেকে লইয়া কর্তা আহারে বসিয়াছেন। ক্ষিতির বড়দিনে স্কুল বন্ধ। গৃহিণী ভোজন স্থলে উপস্থিত, তরু দরজার পাশে বসিয়া, তাহার সাহেব-বিবি দরজার আড়ালে লুকাইয়া তির্য্যক দৃষ্টিতে সকলের খাওয়া লক্ষ্য করিতেছে। বিনু পরিবেশন করিতেছে।

এই প্রথম বিনু স্বামীর সামনে অন্ন ব্যঞ্জন ধরিয়া দিবার সুযোগ পাইয়াছে। এ পর্য্যন্ত বিনু খাবার এতটুকু জিনিষও প্রসাদকে হাতে করিয়া দেয় নাই। প্রসাদই বরং একদিন তাহাকে নাসপাতি খাইতে দিয়াছিল। বৌভাতের দিন বিনু বসিয়াছিল আলপনা-চিত্রিত এক বিরাট্ পিঁড়ায়, মাতৃ আদেশে প্রসাদ তাহার প্রসারিত দুই হস্তে বিবিধ খাদ্যপূর্ণ রূপার থালা অসংখ্য রূপার বাটিতে ব্যঞ্জন, রেকাবি ভরা মিঠাই-মণ্ডা, শ্বেত পাথরের বাটিতে দই-ক্ষীর কত কি, মায় জলপূর্ণ রূপার গেলাসটা দিতেও ভুল করে নাই। একখানা রূপার আধারে ছিল প্রসাধন দ্রব্য—বেনারসী শাড়ী জামা সেমিজ ইত্যাদি। সমস্ত জিনিষ বিনুকে অর্পণ করিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিল স্ত্রীর সারা জীবনের ভরণ-পোষণের। সেদিন মঙ্গল প্রদীপ জ্বলিয়াছিল, উলুধ্বনি হইয়াছিল। স্বামী ত দিয়াই রাখিয়াছে, স্ত্রীর এই প্রথম।

জলপিঁড়ির অন্তরালে লুকাইয়া বিনু ভাবিতেছিল, না জানি সে আজ আপনার মনে কি অপূর্ব রান্না রাঁধিয়া রাখিয়াছে। কামিনীর মা পর্য্যন্ত কাছে ছিল না। তরুকে দিয়া রান্নাদ্রব্য একবার চাখাইবার কথা তাহার স্মরণ হয় নাই। আর তরু কোথায়? সে দাদাকে পাইয়া তাহার প্রদত্ত ছবির বই উপহার পাইয়া সুমু ক্ষিতির সহিত একত্রে নাচিয়া বেড়াইতেছে। লোকটি সত্যই লেখাপড়া ভাল-বাসে। ভাইবোনদের জন্য রঙ্গীন ছবিভরা কি সুন্দর বই আনিয়াছে। বিনুর জন্য নিশ্চয় আনিয়াছে নীরস পড়ার বই, খাতার গাদা। সেই খাতাই যে বিনুর শেষ হয় নাই, বোনা না ধরিলে শেষ করিতে পারিত।

বোনার কথায় মনে পড়িল তাহার বাবার সংস্কৃত ছাত্রী রাশিয়ার কুমারী আরশোলাকে। সে বাবার নিকটে পড়িতে আসিত, তখন বিনুরা কলিকাতায় ছিল। সেই শিখাইয়াছিল বোনা। শুধু বোনা শিক্ষা দিয়া সে ক্ষান্ত হয় নাই। চমৎকার একখানা বোনার বই তাহাকে উপহার দিয়াছিল। সে বইখানা সে শাড়ীর বাক্সে সযত্নে লুকাইয়া রাখিয়াছে। লুকাইয়া রাখিবার মানে কেহ যদি বোনা শিখিতে লইয়া তাহার ভালবাসার বইখানা ছিঁড়িয়া দেয়। সে বোনা জানে বলিয়াই তাহার সঙ্গে বোনার সরঞ্জাম অভিভাবিকারা দিয়াছিলেন।

না, বিনুর ভয় কাটিয়া গেল। মনোরমা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বৌমা আজ কেমন রান্না করেছে? নিজেই রেঁধেছে, আমি এদিকে আসতে পারি নি।"

মহেশবাবু সহাস্যে উত্তর দিলেন, "বেশ হয়েছে রান্না। তোমাদের বড় কষ্ট হচ্ছে, মণিরামরা বোধ হয় কাল-পরশুর ভেতরে এসে যাবে।"

মনোরমা বলিলেন, "সংসারে থাকতে গেলে সময়ে সমস্তই করতে হয়, কষ্ট আর কি?"

শীতের রাত্রি, আটটা বাজিতে-না-বাজিতেই খাওয়া-দাওয়া হইয়া গেল। এবেলাও বিনু রান্না করিয়াছে।

কাপড় ছাড়িয়া লাল টুকটুকে একখানা আলোয়ান গায়ে জড়াইয়া বিনু প্রবেশ করিল তাহার শয়নগৃহে। আজ তাহার ঘরের দশবাতির ঝাড়টা তরু নবীনকে দিয়া জ্বালাইয়া দিয়াছে। এখানে ইতিপূর্বে ঝাড় জ্বলে নাই। আজ হইয়াছে তরুর খেয়াল, "যদি কোন দিনই নাই জ্বলবে তবে শুধু শুধু ঝাড় ঝোলানো কেন বাপু? বাতাসে ঠুং ঠুং শব্দ হয়, দোলে, তাই দেখেই সকলের আনন্দ। দাদা আজ বাড়ী এসেছে, ঝাড় জ্বালাতেই হবে।" শুধু ঝাড় জ্বলিতেছে না, মোটা একখানা আঙ্গুরলতা আঁকা কার্পেট মেঝেয় পাতা হইয়াছে। দুই খাটে দুইটি শুভ্র বিছানা, সাটিনের লেপ, মলমলের ওয়াড়ে আবৃত হইয়া পইথানে অপেক্ষা করিতেছে। শিথানে দুইজোড়া বালিশের পাশে কুন্দফুলের বাটি। ঝাড়ের আলোকে গৃহ উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর।

দ্বারের দিকে পিছন ফিরিয়া প্রসাদ টেবিলে বই রাখিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িতেছে। গায়ে তাহার বাসন্তী রংএর কাশ্মিরী শাল।

বিনু প্রসাধন-টেবিলের বৃহৎ স্বচ্ছ আয়নার দিকে বারেক তাকাইল—তাহার ললাটের কাঁচপোকার টিপটি আলোক পরশে ঝকমক করিতে লাগিল। ধুনোর আঠা দিয়া বিনুর মা স্বহস্তে তৈরি কাঁচপোকার টিপ তাহার কপালে পরাইয়া দিয়াছিলেন। এতদিনেও টিপ পরিয়া যায় নাই। ধুনোর আঠায় লাগিয়া রহিয়াছে। তাহাদের ওখানে খুব কাঁচপোকা। মা কাপড় দিয়া ধরিয়া কাঁচ-পোকার হুল ভাঙ্গিয়া পোকা উড়াইয়া দেন। পোকা মরে না ফের হুল গজায় তাহার। মা'র এক বাতিক কাঁচি দিয়া সুন্দর টিপ কাটিয়া কৌটা ভরিয়া তুলিয়া রাখেন। বিনুকে দিয়াছেন এক কৌটা টিপ, এক কৌটা ধুনোর আঠা।

বিনু তরুকেও পরাইয়া দিয়াছে একখানা টিপ।

—তা বিনুর সাজটা কিছু মন্দ হয় নাই। তরু আজ বৈকালে তাহার চুল বাঁধিয়া দিয়াছিল। তরু এখন তাহার অতিশয় অন্তরঙ্গ, বাধ্য। ছোট হইলে কি হইবে মেয়েটা তরতরে, থরথরে।

পরিধানের শাড়ীটাও বিনুর ফেলনা নয়, ধূপচ্ছায়া রং-এর মিহি সূতার শাড়ী।

বিনু ধীরে দরজা বন্ধ করিল। প্রসাদ ঘাড় ফিরাইয়া ডাকিল, "এই এসেছ, এস, বস চেয়ারে। তোমার মিটে গেল? তুমি ত বেশ রান্না করেছিলে, কার কাছে শিখলে?"

বিনু চেয়ারে বসিল আড়ষ্ট হইয়া। ঝাড়ের আলো যেন কোথায়ও আড়াল-আবডাল রাখে নাই। এত আলোয় কেমন যেন লজ্জাবোধ হয়।

বিনু চোখ নামাইয়া তাচ্ছিল্য ভরে বলে, "ভারি ত রান্না, শিখব কার কাছে? মা'দের রান্না দেখতে দেখতেই শিখেছি।"

"দেখেই শিখেছ, খুব ওস্তাদ ত! আমরা তিন ভাই, আর দুটি ভাই থাকলে তোমাকে দ্রৌপদী বলে ডাকতাম।"

বিনুর মহাভারত পড়া ছিল, দ্রৌপদীর উল্লেখে লজ্জায় তাহার মুখ আনত হইল। কিন্তু সেই লজ্জার মধ্যে কত আনন্দ গৌরব। যাহাকে সে এ পর্য্যন্ত কিছুই দেয় নাই,

দিতে পারে নাই, সেই তাহার সামান্য রান্না খাইয়া এত পুলকিত।

বিনু নীরব, প্রসাদ বধূর লজ্জা ভাঙাইতে নানা বিষয়ের অবতারণা আরম্ভ করিল, "তুমি ত দিব্যি বোনা জান, তরু-খুমুর গায়ের জামা দেখলাম। শুনলাম, ক্ষিতির মোজা হচ্ছে। ওরা ভাগ্যবান, তাই পায়। আমি অভাগা, কেউ কিছুই দেয় না। 'অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুথায়ে যায়'।"

প্রসাদ ইচ্ছা করিয়া গলার স্বর করুণ করিয়াছিল, বিনু তাহা বুঝিতে না পারিয়া বিগলিত হইল। বিনা বাক্যব্যয়ে সে আস্তে আস্তে উঠিয়া গেল তাহার কাপড়ের আলমারির নিকটে।

আঁচলের চাবি দিয়া আলমারি খুলিয়া তখনই সে ফিরিয়া আসিল প্রসাদের কাছে। কাগজের ঠোঙায় জড়ানো একটা জিনিস প্রসাদের হস্তে অর্পণ করিয়া বলিল, "এই নাও, তোমার জন্যে বানিয়ে রেখেছি। ক্ষিতির মোজা হয়ে গেলেই তোমাকে মোজা, সোয়েটার, মাফলার বুনে দেব।"

প্রসাদ কাগজের ভিতর হইতে বাহির করিল গাঢ় গোলাপি পশমে বোনা মস্ত একটা গোলাপ ফুল। থরে-বিথরে পাঁপড়ি মেলিয়াছে। গোলাপের নিম্নে পকেট-ঘড়ি লুকাইয়া রাখিবার একটি পকেট।

পুলকিত প্রসাদ পকেট হইতে বাহির করিল আতরে সিক্ত একটু তুলা। আতর সুবাসে ভরিয়া গেল কক্ষ।

তখন মেয়েদের কঙ্কণসদৃশ ছেলেদের হাত ঘড়ির প্রচলন হয় নাই। বিনুর বিবাহে বিনুর বাবা জামাতাকে সোনার পকেট-ঘড়ি, চেন যৌতুক দিয়াছিলেন। বিনু গোপনে প্রসাদের জন্য এটা বুনিয়া রাখিয়াছিল। এটা তাহাকে শিখাইয়াছিল সেই বাবার ছাত্রী আরগুলা।

প্রসাদ পত্নীর প্রথম উপহার নাকের কাছে ধরিয়া মুখে বুলাইয়া আনন্দে মুখর হইল—"বাঃ, কি সুন্দর গোলাপ করেছ বিনু, মনে হচ্ছে সত্যি ফুল। বুদ্ধি করে আতর মেখে রেখেছ, এতেই এর মূল্য আরও বেড়ে গেছে। তুমি আমাকে উপহার দিলে, আমিও তোমার জন্যে উপহার এনেছি এই দেখ কত বই।"

বই শুনিয়াই বিনুর মন দমিয়া গেল। বই সম্বন্ধে প্রসাদ তাহার মনে বিভীষিকার সঞ্চার করিয়াছে। কি নিরস, গম্ভীর পাঠ্য-পুস্তক। সে কি উপহারের বস্তু! তবু বিনু সাগ্রহে হাত বাড়াইল স্বামীর উপহার লইতে।

নূতন বাঁধাই ঝকঝকে একগাদা বই। 'কড়ি ও কোমল', সদ্য প্রকাশিত 'নৌকাডুবি' ও 'চোখের বালি', রমেশচন্দ্র দত্তের গ্রন্থাবলী, মেঘনাদ বধ কাব্য। ইহার মধ্যে বিনুর পাঠ্যপুস্তক একটিও নাই। বিনু স্বস্তির নিঃশ্বাস মোচন করিয়া আনন্দিত হৃদয়ে একটির পরে একটি বই চোখের সামনে খুলিতে লাগিল।

সে কত দিতেছে তাহার মনোতুষ্টির জন্য, বিনু ভদ্রতা করিয়া কহিল, "কি সুন্দর বইগুলি, এর একটাও আমি পড়ি নি। এত বই আমার, কি মজা। এবার বুঝি আমার পড়ার বই আন নি? পড়ার বই ক'খানা আমার পড়া শেষ হয়েছে। অনেক জায়গা মুখস্থ করে রেখেছি।"

"লক্ষ্মী মেয়ের কথা, কাল আমি সে-সব দেখব। তুমি গল্পের বই পড়তে ভালবাস, এখন এইগুলো প'ড় পরে আরও এনে দেব। পড়ার বই থাকুক এখন। কেউ বুঝিয়ে না দিলে যে কিছু জানে না তার পক্ষে পড়া মুস্কিল। আমার পরীক্ষা হয়ে গেলে আমি যখন বাড়ী আসব তখন আনব তোমার পাঠ্য বই। দুই-তিন মাস বাড়ী থাকব, তার ভেতরে তোমাকে মোটামুটি শিক্ষা দিতে পারব। তুমি যত ইচ্ছা বই পড়, হাতের লেখাটা বন্ধ ক'রো না।"

বিনু প্রশান্ত চিত্তে প্রশ্ন করে, "দোলের সময় ত তুমি আর একবার আসবে?"

"না, তখন আমার পরীক্ষা আরম্ভ হয়ে যাবে। পড়াশোনার সময় এখন না এলেই ভাল হ'ত, তবু এলাম সাত দিনের জন্যে।"

"সাত দিন কেন? বড় দিনের না দশ দিন ছুটি?"

"হ্যাঁ দশ দিন কলেজ বন্ধ। কিন্তু কত দূরে থাকি তার কি হিসাব নেই? যাওয়া-আসায় কত সময় নষ্ট হয়। ও কি বিনু, তোমার কি ঘুম পেয়েছে? চোখ বুজে রয়েছ কেন?"

বিনু সচকিত হইয়া মুখ তুলিল, 'ঘুম পাবে কেন? অত আলোয় কি কারও ঘুম পায়? নবীন যে ঝাড় নিবিয়ে দিয়ে গেল না, সব মোমবাতি পুড়ে যাচ্ছে?"

'মোমবাতি হয়েছে পোড়ার জন্যেই। যে আলো

…তদিন জ্বলে নি, আজ সে জ্বলুক। এক মোমবাতি পুড়ে …াবে আরও মোমবাতি আছে। ঝাড় নিবিয়ে দিতে …বীনের দরকার হবে না, সময় হ'লে আমিই নিবিয়ে দেব। …তামাকে এ অবধি আমি কোন ভাল বই পড়িয়ে শোনাই …ই। এই মেঘনাদ বধখানা এবার তোমাকে পড়ে …শানাব। অনেক বড় বড় কঠিন শব্দ রয়েছে, যা …তামাকে বুঝিয়ে না দিলে তুমি বুঝতে পারবে না। না …ঝলে লেখার রস পাওয়া যায় না। এই বইখানা বুঝতে …রলেই তোমার বাংলা শেখা এগিয়ে যাবে। এর পরে …মি ফিরে এসে মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত রঘুবংশ …মারসম্ভব; বানভট্টের কাদম্বরী পড়ে শোনালে সংস্কৃত ভাষার …ঙ্গে তোমার পরিচয় হবে। তার পরে ইংরাজী।"

ইংরাজী শব্দ শুনিয়া বিনু সভয়ে কম্পিত হইয়া বলে, …কি যে বল তুমি, আমি কি অত শিখতে পারব? আমার …মোটা মাথা? তা হ'লে অন্য বইগুলি আমি তুলে রেখে …সি। একখানা করে বের করব আর পড়া হবে। …রে রাখলে সকলে চেয়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলবে। …ঘনাদ বধ বাইরে থাকুক, তুমি পড়বে।"

বিনু উঠিয়া সবগুলি বই সস্নেহে বুকে চাপিয়া …লমারিতে তুলিয়া রাখিয়া আসিল।

কি জানি কি ভাবিয়া পানের কর্ত্রী কামিনীর মা তাহার শিয়রের রূপার ত্রিপদির উপরে রূপার ডিবায় কয়েক খিলি পান ও মশলা রাখিয়া গিয়াছিল। বিনু পান খাইতে ভালবাসে, ডিবা খুলিয়া দুই খিলি পান মুখে পুরিয়া মশলা আগাইয়া দিল প্রসাদকে। সে পান খায় না।

প্রখর আলোয় বিনুর অস্বস্তি লাগিতেছিল, তরুর প্রতি রাগ হইতেছিল। সখের বলিহারি! রাতকে দিন করিলেই কি সে দিবা হইয়া যায়? রাত্রি মানুষের আরামের, শান্তির। শীতের শীতল রাত লেপের তলায় না যাইয়া উনি এখন ঝাড়ের নীচে কাব্য আলোচনা করিতে বসিবেন। আশ্চর্য্য, অদ্ভুত রায়বাড়ীর বড়ছেলে। শয়নের নাম নাই, ঘুমের কথা নাই।

বিনু স্বামীর দিকে মেঘনাদ বধ বইখানা ঠেলিয়া দিয়া বলে, "তুমি এখন পড়া সুরু করে দাও, আমি বসে শুনি। এখন থেকে সুরু না করলে বই শেষ হবার আগেই তোমাকে চলে যেতে হবে। রাত বেশী হয়ে গেলে শীতে হাড় কাঁপবে, তখন চেয়ারে বসে থাকতে পারবে না।"

প্রসাদ সহাস্যে বলে, "তোমার হাড়ে শীতের কাঁপন লাগলে তুমি লেপের নীচে যেয়ো। আমার কাঁপন লাগে না। আজ আমি পড়ব না, কাল থেকে হবে। তোমার ভয় নেই বিনু, বই শেষ অবধি তোমাকে না শুনিয়ে আমি যাব না।"

—*—

কংগ্রেস স্মৃতি

শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল

একত্রিংশ অধিবেশন - লক্ষ্ণৌ—১৯১৬

[পাঁচ]

২৮শে ডিসেম্বর কংগ্রেসের দ্বিতীয় দিনের প্রকাশ্য অধিবেশনের পর বিষয় নির্বাচনী সমিতির কার্য আরম্ভ হয়। অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি ও মুসলিম লীগ কর্তৃক প্রস্তুত স্বায়ত্ত-শাসনের পরিকল্পনা বিষয় নির্বাচনী সভাতে বিশেষ ভাবে আলোচিত হ'ল। আমি পূর্বেই বলেছি যে, গত ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে বিষয় নির্বাচনী সমিতির অধিবেশনের সময় প্রত্যেক সদস্যের হাতে মুদ্রিত পরিকল্পনা দেওয়া হয় যাতে পরিকল্পনা পড়ে প্রস্তুত হয়ে তারা উক্ত সমিতির পরবর্তী অধিবেশনের আলোচনায় যোগ দিতে পারে। আমরা বাংলার প্রতিনিধিগণ সেগুলি পকেটস্থ করে লক্ষ্ণৌ সহরের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখে বেড়াতে লাগলাম সুতরাং ওগুলি পকেট থেকে বের করবার আর অবকাশ পেলাম না। আজ যখন সমিতির অধিবেশনে উক্ত পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হ'ল—তখন দেখে বিস্মিত হ'লাম যে, মাদ্রাজের প্রত্যেক প্রতিনিধি—কি বৃদ্ধ, কি যুবক—উক্ত পুস্তিকাগুলি লাল-নীল পেনসিলের দাগ দিয়ে ভাল করে পড়ে এবং মার্জিনে নোট করে আলোচনা সভায় যোগ দিতে প্রস্তুত হয়ে এসেছেন। যাঁরা আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক, জনপ্রিয় নেতা মহম্মদ আলি জিন্না, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুসলিম লীগের নেতা মজঃহর-উল হকের কথা বিশেষ ভাবে মনে আছে। লক্ষ্য করলাম যে, যখনই কোন বক্তা অসংলগ্ন কথা বলেছেন তৎক্ষণাৎ মাদ্রাজের কোন-না-কোন সদস্য—বৃদ্ধ অথবা যুবক—on a point of order বলে দাঁড়িয়েছেন। Point of order উত্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশবরেণ্য নেতাদের মধ্যে যিনি তখন আলোচনা করছিলেন তিনি তৎক্ষণাৎ আসন গ্রহণ করেছেন এবং সভাপতি মহাশয়ের সিদ্ধান্তের পর পুনরায় দাঁড়িয়ে তাঁর বক্তব্য বলেছেন। এই বিতর্ক সভায় জিন্না সাহেবের ডিবেট করার ক্ষমতা ও বিশেষ বাচনভঙ্গি পরিলক্ষিত হল। লোকমান্য তিলকের সহিত জিন্না সাহেবের বাদানুবাদ বিশেষভাবে উপভোগ্য হয়েছিল। জিন্না সাহেবের বক্তৃতায় তিলক মহারাজ মাঝে মাঝে বাধা দিচ্ছিলেন। জিন্না সাহেব এক সময় বললেন "You won't be able to side track me, Mr. Tilak." বাংলা দেশের বাঘা বাঘা ব্যক্তিগণ উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেহ এই বিতর্কে যোগ দেন নি। আলোচনার পর পরিকল্পনা গৃহীত হ'ল। পরিকল্পনা গৃহীত হওয়ায় সুরেন্দ্রনাথ বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করলেন এবং বললেন যে, এ দিন তাঁর জীবনের অতি গৌরবময় দিন (proudest day of my life)। সুরেন্দ্রনাথের আনন্দোদ্ভাসিত ও গৌরবদীপ্ত চেহারা আমার মনে এখনও মুদ্রিত হয়ে আছে। মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে পাটনা হাই কোর্টের সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মজঃহর-উল হক সাহেব আনন্দ প্রকাশ করলেন। এই মজঃহর-উল হক সাহেব পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধীর অধীনে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন এবং পাটনার বিখ্যাত সাদাকত আশ্রমে ফকিরের জীবন যাপন করেন। উপরোক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করে কংগ্রেস সর্বপ্রথম মুসলমানদের জন্য আইন সভা প্রভৃতিতে পৃথক নির্বাচনের প্রথা মেনে নিলেন এবং নেতারা মনে করলেন যে, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ চিরকালের জন্য নিবারিত হ'ল। বিপুল আনন্দের সঙ্গে আমরা সেদিন যে বিষবৃক্ষ রোপণ করলাম তার তিক্ত ফল স্বাধীন ভারতের নাগরিকগণ ও পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এখন ভোগ করছে। লক্ষ্ণৌয়ে রোপিত বিষবৃক্ষ ক্রমে মহীরুহে পরিণত হয়ে আমাদের দেশকে দ্বিধাবিভক্ত করল।

[ছয়]

২৯শে ডিসেম্বর মধ্যাহ্নে কংগ্রেসের তৃতীয় দিনের প্রকাশ্য অধিবেশন আরম্ভ হয়। যথারীতি বঙ্গীয় মহিলাগণ কর্তৃক 'বন্দে মাতরম' গান গীত হওয়ার পর জনৈক মুসলিম যুবক একটি উর্দু কবিতা পাঠ করলেন।

এবারকার কংগ্রেসের সর্বপ্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল কংগ্রেস লীগ কর্তৃক প্রস্তুত স্বায়ত্ত-শাসনের পরি-

কল্পনা। উক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ জন্য প্রস্তাব উপস্থিত করতে যখন সুরেন্দ্রনাথ দণ্ডায়মান হ'লেন তখন 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দ্বারা সমবেত জনতা তাঁকে বিপুল অভ্যর্থনা জানাল। হর্ষধ্বনি থামতে কয়েক মিনিট লেগে গেল। তৎপর সভাপতি মহাশয়ের নির্দেশে পণ্ডিত মদনমোহন কুঞ্জরু কংগ্রেস-লীগ স্কীম পড়লেন। তার পর সুরেন্দ্রনাথ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দ্বারা উক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ জন্য প্রস্তাব উপস্থিত করলেন। এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন সুপ্রসিদ্ধা শ্রীমতী অ্যানি বেশান্ত, লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক, মাননীয় শ্রীমজহর-উল্ হক, বোম্বাইয়ের ধনকুবের স্যর দিনশা পেটিট (জিন্না সাহেবের শ্বশুর), বিদর্ভের (বেরারের) নেতা মাননীয় শ্রী আর. এন্. মুধোলকর, বিদর্ভের অন্যতম নেতা শ্রী জি. কে. খপর্দে। যুক্তপ্রদেশের অন্যতম নেতা এলাহাবাদ হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ অ্যাডভোকেট মাননীয় ডঃ তেজ বাহাদুর সাপ্রু (পরবর্তীকালে স্যর উপাধিভূষিত ও বড়লাটের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের মেম্বর), মাদ্রাজ হাইকোর্টের উকিল মাননীয় রাও বাহাদুর বি. এন. শর্মা, বোম্বাই হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার শ্রীজোসেফ ব্যাপিষ্টা, বোম্বাইয়ের অন্যতম ধনকুবের শ্রীজাহাঙ্গীর বোমানজী পেটিট, লক্ষ্ণৌ চীফ কোর্টের উকিল শ্রীগোকরণ নাথ মিশ্র, মাদ্রাজ হাই কোর্টের উকিল মাননীয় গোবিন্দ রাঘব আয়ার, পাঞ্জাবের সুপ্রসিদ্ধ নেতা ব্যারিষ্টার অর্থনীতিজ্ঞ শিল্পপতি লালা হরকিষণ লাল। বেহারের তৎকালীন নেতা গয়ার ব্যারিষ্টার শ্রীপরমেশ্বর লাল, সুপ্রসিদ্ধা শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ও ভারতের অন্যতম স্বনামধন্য নেতা অসাধারণ বাগ্মী শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়গণ। এঁদের মধ্যে লোকমান্য তিলক, শ্রীমতী অ্যানি বেশান্ত, শ্রীখপর্দে ও বিপিনচন্দ্র পাল বক্তৃতা দিতে উঠলে সমবেত দর্শকমণ্ডলী বিপুল হর্ষধ্বনি দ্বারা তাঁদের অভ্যর্থনা করে। প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হ'ল।

তিলক, বেশান্ত, খপর্দে ও বিপিন পালের নাম তখন দেশের ঘরে ঘরে প্রচারিত ছিল।

১৯০৬ সালের কংগ্রেসে লোকমান্য তিলক উপস্থিত ছিলেন কিন্তু তাঁকে ভাল করে দেখতে পাই নি। এবার তাঁকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করলাম। সে সময়ে "লাল-বাল-পালের" (লালা লাজপৎ রায়, বালগঙ্গাধর তিলক ও বিপিনচন্দ্র পাল) নাম লোকের মুখে মুখে ফিরত। এই ত্রি-মূর্তির দু'জন এবার কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন।

লোকমান্য তিলক অসাধারণ পণ্ডিত ও তেজস্বী নেতা ছিলেন। তিনি সুরেন্দ্রনাথ, বিপিন চন্দ্র বা শ্রীমতী বেশান্তের মত ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিতে পারতেন না। ধীরে ধীরে যুক্তিপূর্ণ ভাষায় ভাষণ দিতেন।

শ্রীমতী অ্যানি বেশান্তকে এই কংগ্রেসে প্রথম দর্শন করলাম। তাঁর বাগ্মিতার ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। সুসাহিত্যিক বার্ণাড শ বলেছেন যে, তিনি (বেশান্ত) শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মী। তিনি থিওসফিকাল সোসাইটির সভানেত্রী ছিলেন এবং ভারতকে তাঁর মাতৃভূমি জ্ঞানে এ দেশের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য আত্মনিয়োগ করেছিলেন। মাদ্রাজ সহরের উপকণ্ঠে অ্যাডেয়ারে থিওসফিকাল সোসাইটির বিরাট্ প্রতিষ্ঠান ও বেনারস হিন্দু স্কুল তাঁর কর্মপ্রতিভার সাক্ষ্য দিচ্ছে। সৌম্যমূর্তি বেশান্ত মহোদয়া তাঁর বাগ্মীতায় আমাদিগকে বিস্মিত ও অভিভূত করলেন।

লালা হরকিষণ লালের নাম তখন সর্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এই কংগ্রেস অধিবেশনের বহু বৎসর পরে একবার আমি পরলোকগত বন্ধু নলিনীমোহন রায় চৌধুরীর সঙ্গে কোন ব্যবসা-সংক্রান্ত, বিষয়ে আলোচনা করার জন্য লালা হরকিষণ লালের সঙ্গে কলিকাতায় গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে দেখা করি। তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অসাধারণ মেধা দেখে আমরা বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছিলাম।

এর পরের প্রস্তাবে শ্রীসি. পি. রামস্বামী আয়ার প্রস্তাব রামস্বামী আয়ার মহাশয় স্বায়ত্ত শাসন লাভের জন্য প্রচার কার্য চালাতে কংগ্রেস কমিটিগুলিকে, হোমরুল লীগ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে আবেদন জানালেন। লক্ষ্ণৌয়ের "দি অ্যাড্‌ভোকেট" পত্রিকার সম্পাদক শ্রী সি. এস. রঙ্গ আয়ার প্রস্তাব সমর্থন করার পর প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

পরের প্রস্তাব উত্থাপন করলেন বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ অ্যাডভোকেট শ্রীচিমনলাল শীতল বাদ। এই প্রস্তাবটি ছিল যুদ্ধ ও জনবল সম্বন্ধে। এ দ্বারা ভারতীয় অফিসরের অধীনে একটি সৈন্যবাহিনী অবিলম্বে গঠন করার দাবি গভর্ণমেন্টের নিকট পেশ করা হয়। শ্রী জি. এ. নটেশন কর্তৃক সমর্থিত হয়ে প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

এই প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর সেদিনকার মত অধিবেশন শেষ হল।

অপরাহ্ণ ৫টার সময় বিষয় নির্বাচনী সমিতির অধিবেশন আরম্ভ হল। পরের দিনের প্রস্তাবগুলি আলোচনা করে সাব্যস্ত হ'ল।

[সাত]

৩০শে ডিসেম্বর প্রাতঃকাল ৯টার সময় কংগ্রেসের শেষ দিনের অধিবেশন আরম্ভ হ'ল। বঙ্গীয় মহিলাগণ কর্তৃক "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীত গীত হওয়ার পর সভাপতি মহাশয় অধ্যক্ষ মাননীয় আর. পি. পরাঞ্জপে মহাশয়কে পাটনা ইউনিভার্সিটি বিল সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত করতে আহ্বান করলেন। আমাদের ছাত্রজীবনে পরাঞ্জপে মহাশয় অঙ্ক শাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞান ও বিদ্যার জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন। সেই পরাঞ্জপে মহাশয়কে আজ দেখলাম। তিনি সুদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা পাটনা ইউনিভার্সিটি বিলের বহু দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করে সেগুলির সংশোধন দাবি করলেন। প্রস্তাব সমর্থন করলেন মাননীয় দেওয়ান বাহাদুর এল্. এ. গোবিন্দরাঘব আয়ার, সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক মিষ্টভাষী সৌম্যদর্শন মাননীয় ডাক্তার নীলরতন সরকার, শ্রী এস্. সিংহ (সচ্চিদানন্দ সিংহ, পাটনা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার ও সাংবাদিক) এবং লালা হরকিষণ লাল। প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হ'ল।

এর পর কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার শ্রীইন্দুভূষণ সেন ভারত রক্ষা আইন ও ১৮১৮ সালের ৩ নং রেগুলেশন (যার বলে বিনা বিচারে নির্বাচনের ও অন্তরীণের ব্যবস্থা ছিল) সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত করলেন। প্রস্তাব সমর্থন করলেন মাদ্রাজ হাইকোর্টের উকিল শ্রী কে. এন্, আয়ার, ঢাকার উকিল সুপ্রসিদ্ধ শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও লাহোরের ব্যারিষ্টার লালা নানক চাঁদ মহাশয়গণ। ৯১ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ শ্রীশ বাবু এখনও সুস্থ শরীরে কলিকাতায় বাস করছেন।

পরবর্তী শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রস্তাব উপস্থিত করলেন শ্রী জি. এস. আরেনডেল (ইংরাজ, থিওসফিকাল সোসাইটির অ্যাডায়ার সেবাশ্রমের কর্মী, শ্রীমতী অ্যানি বেশান্ত মহোদয়ার শিষ্য এবং সুপ্রসিদ্ধা নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী রুক্মিণী আরেনডেলের স্বামী)। প্রস্তাব সমর্থন করলেন মাদ্রাজ হাইকোর্টের উকিল মাননীয় এ. এস্. কৃষ্ণ রাও, মসলিপত্তনের অন্ধ্র জাতীয় কলাশালার অধ্যক্ষ শ্রী কে. হনুমন্ত রাও, পাঞ্জাবের লালা সুন্দর লাল ও সীতাপুরের (যুক্তপ্রদেশ) উকিল শ্রী এ. কে. বোস মহাশয়গণ। প্রস্তাব যথারীতি গৃহীত হ'ল।

পরে কতকগুলি মামুলি প্রস্তাব সভাপতি মহাশয় কর্তৃক উত্থাপিত হয়ে গৃহীত হওয়ার পর আগামী বৎসরের জন্য নির্বাচিত অল-ইণ্ডিয়া কমিটির সদস্যদের নাম সভাপতির নির্দেশে কংগ্রেসের সেক্রেটারী শ্রীসুব্বা রাও পাঠ করলেন।

সভাপতি মহাশয় তখন সকলের পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা সমিতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে আহ্বান করলেন। যথাযোগ্য ভাষায় ভূপেনবাবু ধন্যবাদ দিলেন।

এর পর প্রিয়দর্শন বিখ্যাত নেতা মাননীয় পণ্ডিত, মদনমোহন মালব্য মহাশয় তাঁর স্বাভাবিক সুললিত, ভাষায় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন। প্রত্যুত্তরে সভাপতি মহাশয় যথোচিত বললেন। একত্রিংশ কংগ্রেসের অধিবেশন এই খানেই সমাপ্ত হল।

লক্ষ্য করার বিষয়, জিন্না সাহেব যদিও বিষয় নির্বাচনী সমিতির বিতর্কে যোগদান করেছিলেন কিন্তু তিনি প্রকাশ্য অধিবেশনে কোন অংশ গ্রহণ করেন নি। তার কারণ হয়ত এই হ'তে পারে যে, তিনি মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে এসেছিলেন সুতরাং কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করা সমীচীন মনে করেন নি।

কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণ মুসলিম লীগের অধিবেশনে যোগ দিতে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। জিন্না সাহেব তখন আমাদের হৃদয়ে ভারতের স্বাধীনতাকামী বিশিষ্ট নেতারূপে প্রতিভাত ছিলেন, সুতরাং আগ্রহের সহিত অন্যান্য প্রতিনিধিদের সহিত আমিও মুসলিম লীগের অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলাম। জিন্না সাহেব য়ুরোপীয় পরিচ্ছদে শোভিত ছিলেন কেবল মাথায় ছিল ফেজযুক্ত লালটুপি (যাহা সাধারণে টার্কিশ ক্যাপরূপে পরিচিত ছিল)। মুসলিম লীগের সভায় যোগদান করে বিশেষ আনন্দলাভ করেছিলাম।

৩০শে ডিসেম্বর কংগ্রেস অধিবেশন শেষ হওয়ার পর অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে ঠাকুর রাজেন্দ্র সিং মহাশয় প্রতিনিধিগণকে কাইসার বাগে একটি সান্ধ্য সম্মিলনে নিমন্ত্রণ করেন। ঐ পার্টিতে যোগ দিতে গিয়ে কাইসার বাগের অঙ্গনে ভ্রাম্যমান লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে নিজেকে ধন্য মনে ক'রেছিলাম।

কংগ্রেস অধিবেশনের সমাপ্তির পর লক্ষ্ণৌ সহর ভাল ক'রে দেখার জন্য আমিনাবাদ পার্কে একটি বাঙ্গালী হোটেলে ২।৩ দিনের জন্য রয়ে গেলাম।

লক্ষ্ণৌ দেখার পর কলিকাতা ফেরার পথে কয়েকটি স্থান দেখার ইচ্ছা ছিল। কোন সঙ্গী পেলাম না। একাকীই রওনা হ'লাম। প্রথমে প্রতাপগড় দেখব মনে ক'রে ঐ ষ্টেশনে নামলাম কিন্তু শুনলাম যে সহর ষ্টেশন থেকে অনেক দূর, সুতরাং প্রতাপগড় দেখার ইচ্ছা দমন ক'রে ফৈজাবাদের ট্রেণের জন্য ষ্টেশনে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর ট্রেণ এল। তাতে চেপে যখন ফৈজাবাদ ষ্টেশনে পৌঁছুলাম তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। জানুয়ারী মাসের প্রচণ্ড শীতে যেন জমে গেলাম। মাথায় মাংকি ক্যাপ, গায়ে সোয়েটার, কোট ও ওভারকোট। হাতে গরম দস্তানা ও পায়ে গরম মোজা থাকা সত্ত্বেও শীতে কাঁপতে লাগলাম। গাইডবুকে ফৈজাবাদে কতকগুলি ধর্মশালার কথা লেখা ছিল, কোন একটি ধর্মশালাতে রাত্রি যাপনের মানসে একটি টাঙ্গাওয়ালার শরণাপন্ন হ'লাম। টাঙ্গাওয়ালাকে যে-কোন একটি ধর্মশালায় পৌঁছে দিতে বলায় সে বলল, "বাবুজী হিঁয়া ধরমশালা কাঁহা? ধরমশালা তো অযোধ্যাজী মে হ্যায়।" পুণ্যতীর্থ অযোধ্যা নগরী ফৈজাবাদ থেকে ৪।৫ মাইল দূরে অবস্থিত। আমি বিপন্ন বোধ করলাম। টাঙ্গাওয়ালা বলল যে, "হিঁয়া আচ্ছা মুসাফিরখানা হ্যায়।" আমি উত্তর দিলাম যে, "হুঁয়াই লে চল।" আমি ভাবলাম যে মুসাফিরখানা নিশ্চয়ই একটি ভাল বাসস্থান। টাঙ্গাওয়ালা আমাকে নিয়ে একটি প্রকাণ্ড ফটকের ভিতর দিয়ে মুসাফিরখানার চত্বরে পৌঁছুল। নেমে দেখি, অঙ্গনের চতুষ্পার্শ্বে টাঙ্গাওয়ালা ও অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর মুসলমানে ভর্তি। বেশ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম কিন্তু উপায় নাই। টাঙ্গাওয়ালার সাহায্যে আমার স্যুটকেশ, বিছানা ইত্যাদি লটবহর দোতলায় তোলা হ'ল। মুসাফিরখানা, দেখাশুনার ভার ছিল এক বৃদ্ধা মুসলমানীর ওপর। টাঙ্গাওয়ালা তাকে ডেকে নিয়ে এল। বৃদ্ধা আমাকে একটি কামরায় নিয়ে গিয়ে সেখানে যে একটি লোক খাটিয়ায় শুয়ে ছিল তাকে হটিয়ে দিয়ে সেই ঘরে আমার থাকার ব্যবস্থা ক'রে দিল। আমি টাঙ্গাওয়ালার ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে তাকে পরদিন প্রাতঃকালে এসে আমাকে নিয়ে ফৈজাবাদ-সহর দেখিয়ে অযোধ্যায় পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিলাম। টাঙ্গাওয়ালা চ'লে গেলে ঘরে আমার জিনিষ-পত্র বন্ধ ক'রে বাইরের শিকলে তালা লাগিয়ে সন্নিকট-বর্তী বাজারে আহারের ব্যবস্থা করতে গেলাম। গরম গরম পুরী ও মিষ্টান্ন দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি ক'রে মুসাফিরখানায় ফিরে এটাচি কেস থেকে মোমবাতি, বাতিদান ও দেশলাই প্রভৃতি বের ক'রে আলো জ্বাললাম। ঘরে দু-খানি খাটিয়া ছিল কিন্তু সভয়ে দেখলাম যে, দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করার কোন উপায় নেই। দরজায় ছিটকানি বা খিল কিছুই ছিল না। এতে আমার মানসিক উদ্বেগ কেমন হ'ল তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। খানিক বাদে মুশাফিরখানার কর্ত্রী সেই বৃদ্ধা আমার থাকার তদারক করতে এসে আমার মনোভাব অনুমান ক'রে আমাকে আশ্বাস দিল—"বাবুজী খটকা মত কিজিয়ে; হিয়া কোই ডর নেহী।" বুড়ী আমাকে আশ্বস্ত ক'রে চলে গেল। আমি দরজা বন্ধ ক'রে একটি খাটিয়া দরজার গায়ে লাগিয়ে আর একটি খাটিয়া তার সঙ্গে ঠেস দিয়ে বিছানা পেতে শয়ন করলাম। মনে মনে স্থির করলাম যে সারারাত জেগে কাটিয়ে দেব। এই মনে ক'রে আমার শিয়রের কাছে বাতিদান রেখে আমি একখানি বই পড়তে আরম্ভ করলাম। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়ে ছিলাম মনে নেই। পরদিন প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ ক'রে উঠে কোন বিপদ ঘটে নি দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

মুখ-হাত ধুয়ে দরজায় তালা বন্ধ ক'রে আমি দোকানে চা খেতে গেলাম, ফিরে বিছানা-পত্র বেঁধে প্রস্তুত হয়ে রইলাম। পূর্ব্বরাত্রির নির্দেশমত যথাসময়ে টাঙ্গাওয়ালা এসে হাজির হ'ল। মালপত্র সমস্ত টাঙ্গায় চাপিয়ে আমি সহর প্রদক্ষিণ করতে বেরুলাম। ফৈজাবাদ সহর যুক্তপ্রদেশের একটি জেলার প্রধান সহর। এখানে একটি সৈন্যদের ছাউনি আছে। পথে যেতে যেতে দেখলাম যে অনেকগুলি বাড়ীতে বাঙ্গালী উকিলের নামের প্লেট টাঙ্গানো আছে। তখন মনে হ'ল যে, এঁদের একজনের বাড়ীতে গত কাল রাত্রে অতিথি হ'লে আরামে ও নির্ভয়ে থাকতে পারতাম। কিন্তু জানা না থাকায় সে চেষ্টা করি নি।

অযোধ্যার নবাবদিগের প্রথম রাজধানী ফৈজাবাদে ছিল। পরে লক্ষ্ণৌ সহরে স্থানান্তরিত হয়। প্রথম পাঁচজন নবাব এখান থেকেই রাজত্ব করেছেন। তাঁদের সমাধি ও ইমামবাড়া প্রভৃতি দেখলাম। সমস্ত-গুলিই অতি সুন্দর ও পরিচ্ছন্নভাবে রক্ষিত হচ্ছে। লক্ষ্ণৌয়ের ইমামবাড়ার মত বৃহৎ না হ'লেও এখানকার ইমামবাড়াগুলিও দেখতে বেশ সুন্দর। পথে নদীর

তীরে এক জায়গায় টাঙ্গা থামিয়ে টাঙ্গাওয়ালা গফতর ঘাট দেখাল ও বলল যে রামচন্দ্র—নির্বাসনের সময় এই ঘাটে নদী পার হ'য়ে সীতা ও লক্ষ্মণ সহ দক্ষিণ দিকে গমন করেন।

ফৈজাবাদ পরিদর্শন ক'রে ঐ টাঙ্গায় আমি পুণ্যতীর্থ অযোধ্যা নগরীতে পৌঁছে এক বিরাটকায় পালোয়ানের মত চেহারার এক পাণ্ডার খপ্পরে তার বাসায় আশ্রয় নিলাম। পাণ্ডার সঙ্গে সরযূ নদীতে স্নান করতে গিয়ে দেখি যে নদী বৃহৎ বৃহৎ কচ্ছপে পরিপূর্ণ। নদীতে নামতে ভয় করতে লাগল। কোন প্রকারে স্নান সেরে রামচন্দ্রের জন্মস্থান দেখতে গেলাম। রামচন্দ্রের জন্মস্থান ব'লে যে জায়গা প্রসিদ্ধ তার একেবারে গা ঘেঁষে একটি মসজিদ দণ্ডায়মান। জন্মস্থান দেখিয়ে পাণ্ডা আমাকে অযোধ্যা রাজপুরীর ধ্বংসাবশেষ দেখাতে নিয়ে গেল। বিভিন্ন কক্ষে রাজা দশরথ, রাম সীতা লক্ষ্মণ প্রভৃতির মূর্তি রক্ষিত আছে। একটি ঘরে গিয়ে দেখলাম যে, সাদা পাথরের চাকতি-বেলনা একেবারে ঘরের মেঝের সঙ্গে আঁটা আছে। শুনলাম যে এটি রন্ধনশালা ছিল এবং সীতা-দেবী ঐ চাকতি বেলনায় পুরী তৈয়ারী করতেন। ক[illegible] রকমেই যে তীর্থস্থানে পয়সা উপার্জনের ব্যবস্থা হয়েছে[illegible]

দর্শনাদি সেরে ফিরে এসে পাণ্ডার বাসায় ঘৃত[illegible] সংযোগে অড়হরের দাল ও তরকারি সহ ভাত খে[illegible] কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে বেলা পড়ে এল। আমার [illegible] রাত্রে অযোধ্যায় থাকার ইচ্ছা ছিল কিন্তু পাণ্ডার ভাব[illegible] ভঙ্গি দেখে নানাপ্রকার আশঙ্কা হ'তে লাগল[illegible] বাসায় আমি ছাড়া দ্বিতীয় যাত্রী ছিল না। ওখানে রাত্রি[illegible] যাপনের জন্য পাণ্ডার পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও আমি জোর ক'[illegible] বেলা থাকতে থাকতে বেরিয়ে এসে একটি টাঙ্গাভাড়া[illegible] ক'রে ট্রেণের সময়ের বহুপূর্বেই ষ্টেশনে রওনা হ'লাম। যে ট্রেণে চড়লাম সে ট্রেণ বেনারসে বদলিয়ে অন্য ট্রেণে[illegible] কলিকাতা যেতে হয়। বেনারস ষ্টেশনে ট্রেণ থেকে নেমে কলিকাতার ট্রেণের জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল। আমার বেনারস দেখার ইচ্ছা ছিল কিন্তু অযোধ্যায় মন বিক্ষিপ্ত হওয়ায় আর কোথাও অপেক্ষা না ক'রে সোজা কলিকাতায় চ'লে এলাম এবং সেখান থেকে আমার কর্মস্থল রাজসাহী ফিরে গেলাম।

—*—

ইতিহাস কথা কয়

শ্রীঅজিত চট্টোপাধ্যায়

(১৮)

ইতিহাসে হাজী বেগমের কোন নাম নেই। অথচ শাজাহান অমর হয়ে রয়েছেন। মমতাজমহলের প্রতি তাঁর অচপল প্রেমের নিদর্শন মার্বেলের অবয়বে তাজমহল আজও সাক্ষ্য বহন ক'রে চলেছে। কিন্তু হাজী বেগমও অমর হয়ে থাকবার উপযুক্তা। পত্নীপ্রেমের প্রতিবিম্ব পতিপ্রেম তাকে মহীয়সী করে তুলেছে। তাজমহলের মতই সুন্দর এক স্মৃতিসৌধের স্বপ্ন শাজাহানেরও অনেকদিন আগে হাজী বেগম দেখেছিলেন চোখের আলোতে। সে স্বপ্নকে তিনি পার্থিব রূপ দিতে পেরেছিলেন বেশ কিছুদিন পরে, ছেলে আকবরের রাজত্বকাল সুরু হবার সামান্য কয়েকটি বছর গড়িয়ে গেলে।

হুমায়ুনের স্মৃতিসৌধ। স্বামীর উদ্দেশ্যে বিরহকাতরা বিধবা পত্নীর শ্রদ্ধার্ঘ। স্বামীর স্মৃতিকে চোখের সামনে ধরে রাখবার জন্য তিনি গড়ে তুলেছেন এক সুন্দর স্মৃতিসৌধ। নিজামুদ্দীন যাওয়ার পথে সেই স্মৃতিসৌধ নিশ্চয়ই আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

হাজী বেগম ছিলেন হুমায়ুনের প্রিয়তমা পত্নী। বাদশাহ আকবরের জননী। ইতিহাসে হুমায়ুন বড় দুর্বল হয়ে চিত্রিত রয়েছেন। পিতা বাবর তাঁর নিজের জীবন দিয়ে বাঁচিয়ে গিয়েছেন পুত্র হুমায়ুনকে। কিন্তু হুমায়ুন যেন অসাফল্যের এক মূর্ত প্রতীক। পিতার গ'ড়ে-তোলা সাম্রাজ্য পাঠান শেরশাহ তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন। রাজ্যচ্যুত হুমায়ুন ছুটে বেড়িয়েছেন দেশ থেকে দেশান্তরে। মরুপ্রান্তরে, জনহীন পথে, দুর্গম গিরিসংকটে তার নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী মূর্তি বারবার দেখা গিয়েছে। আশ্রয়ের জন্য হুমায়ুন ছুটে চলেছেন গিরিকন্দর, বিজন অরণ্য, নালা-নদী ডিঙ্গিয়ে পারস্যের পথে।

হাজী বেগম বা হামিদা বেগমের সঙ্গে সেই দুর্দিনে মিলন হয়েছিল হুমায়ুনের। সেই ভ্রাম্যমান জীবনে চতুর্দশী হামিদা বেগমের কোলে এলেন আকবর। এই এক হিসেবে হুমায়ুনের খ্যাতির তুলনা নেই। সুযোগ্য সন্তানের পিতা তিনি। শ্রেষ্ঠ মোগল সম্রাটের জনক নাসিরুদ্দীন মহম্মদ হুমায়ুন।

আর একটি বিষয়েও হুমায়ুনের নাম ইতিহাসে ছড়িয়ে আছে। তাঁর বিধবা পত্নী, সম্রাটের সমাধির উপর যে সুন্দর স্মৃতিসৌধ গড়ে তুলেছেন, তাজমহল অনেকাংশে সেই সৌধের নকল। তাজমহলের ডিজাইনার হুমায়ুনের সমাধিসৌধ দেখে অনেকখানি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ইতিহাস এইখানে হুমায়ুনকে চিরদিন স্মরণ ক'রে রেখেছে।

পিতার সাম্রাজ্য হাতে পেয়ে হুমায়ুন দিল্লীতে এক নতুন কেল্লা স্থাপনের কথা চিন্তা করলেন। তার সভাসদদের মধ্যে অনেক জ্যোতিষী ছিলেন। ১৫৩৩ খ্রী: তাঁরা সম্রাটকে বোঝালেন যে, বৎসরটি সম্রাটের পক্ষে খুব শুভ। অতএব দিল্লীর কেল্লা নির্মাণের কাজ অবিলম্বে সুরু করা হোক। কেল্লার নাম দিলেন হুমায়ুন 'দীন পানাহ' অর্থাৎ, ধর্মের আশ্রয়স্থল। দিল্লী পৌঁছে দুর্গের ভিত্তি-প্রস্তরটি স্থাপন করলেন সম্রাট। তারপর ফিরলেন আগ্রার পথে। এবার স্থলপথে নয়, যমুনার জলে ভেসে। সুন্দর এক প্রাসাদোপম বজরা গড়িয়েছিলেন সম্রাট। যমুনার বুকে সেই তরীতে ভেসে হুমায়ুন চললেন আগ্রার পথে।

শেরশাহের কাছে ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে নিদারুণ পরাজয় স্বীকার করতে হ'ল হুমায়ুনকে। কনৌজের যুদ্ধে হুমায়ুনকে পিছু হটতে হ'ল। হয়ত হারতেন না হুমায়ুন। কিন্তু নিজের চালে নিজেই জড়িয়ে পড়েছিলেন সম্রাট। রাজা হবার পর ভাই কামরাণকে পঞ্জাব, সিন্ধু নদীর পরবর্তী সমস্ত প্রদেশগুলি দিয়েছিলেন। ফলে নতুন সৈন্য আর নিযুক্ত করতে পারলেন না সম্রাট, পঞ্জাব এবং সিন্ধুনদীর তীরবর্তী কর্মঠ মানুষদের মধ্য থেকে। তা ছাড়া গৃহবিবাদ। ভাইরা কেউই তেমন সাহায্য করেন নি হুমায়ুনকে। ফল পরাজয় ও পশ্চাদপসরণ।

পাঠান শেরশাহ হুমায়ুনের চেয়ে অনেক দৃঢ়চেতা ও মনোবলসম্পন্ন ছিলেন। সামান্য কয়েক বৎসরের রাজত্বকালেই তিনি অসংখ্য প্রজাহিতকর কাজ ক'রে গেছেন। গ্র্যাণ্ড ট্রাংক রোড আজও তাঁর নাম সগৌরবে ঘোষণা করে। নানা কীর্তির জন্য খ্যাত এই পাঠান

সম্রাট বিচারক হিসাবেও যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর পক্ষপাতহীন বিচারের সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে।

একদা শেরশাহের বড় ছেলে আদিলশাহ বেরিয়েছেন আগ্রার পথে। বিরাট্ এক হস্তীর পিঠে আরোহণ করেছেন আদিলশাহ। তার সামনে-পিছনে চলেছে সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সৈন্য। হঠাৎ আদিলশাহের দৃষ্টি পড়ল পথপার্শ্বের একটি গৃহের দিকে। আগ্রার এক অধিবাসীর সুন্দরী স্ত্রী স্নান করছিলেন গৃহ অভ্যন্তরে। হাতীর পিঠ থেকে সুন্দরী মেয়েটিকে দেখলেন আদিলশাহ। সুন্দর টানা টানা চোখ, নিখুঁত অঙ্গসৌষ্ঠব। মেয়েটির অঙ্গে বসন ছিল না, শুধু শীতল জল রমণী-তনুকে সিক্ত ক'রে তুলেছিল। বাসনার তরল স্রোত প্রতিহত হ'ল আদিলশাহের মানস-তটে। মেয়েটিকে ভাল লাগল তার। তখনই মনে মনে সুন্দরীর সঙ্গ কামনা করলেন সম্রাট-সন্তান। একটি পান হাতে তুলে নিলেন আদিলশাহ। ছুঁড়ে দিলেন মেয়েটির দিকে। হাসলেন অর্থপূর্ণ হাসি।

কিন্তু রমণী মানেই স্বৈরিণী নয়। একথাটা জানা ছিল না আদিলশাহের। তিনি দেখেছিলেন শুধু নর্তকী আর বারবনিতা। কোনদিন খোঁজ নেন নি গৃহস্থবধূর শুচিমনের নির্মলতা। মেয়েটিকে তৎক্ষণাৎ সরে যেতে দেখলেন আদিলশাহ। গৃহদ্বার রুদ্ধ হ'ল। আদিলশাহের দেওয়া পান পড়ে রইল মাটিতে। মেয়েটি হেঁটে গিয়েছিল তার উপর দিয়ে। দুমড়ানো-মোচড়ানো পানটার দিকে চেয়ে সভয়ে সরে গেলেন আদিলশাহ।

পরদিন সেই নাগরিক এল সম্রাটের দরবারে। মেয়েটির স্বামী বলে পরিচয় দিল শেরশাহের কাছে। সমস্ত ঘটনা বিবৃত ক'রে বিচার চাইল সখেদে।

সম্রাট চিন্তিত হ'লেন। কি বিচার করবেন তিনি? মুসলমান আইনে প্রতিশোধ গ্রহণের নীতি ছাড়া অন্য কিছুর সন্ধান পেলেন না শেরশাহ। তাই রাজ-আদেশ ঘোষিত হ'ল তাঁর কণ্ঠে। অন্য কিছু নয়। ঐ নাগরিক হাতীর পিঠে চড়ে বের হবেন পথে। আদিলশাহের সুন্দরী স্ত্রী তখন স্নান করবেন নগ্ন হয়ে। সম্রাটের পুত্রের মতই পান ছুঁড়ে দেবে ঐ অপমানিত আগ্রাবাসী, আদিলসাহের সুন্দরী পত্নীর দিক লক্ষ্য করে।

শেরশাহের আদেশ হারেমের মধ্যে এক মৃত্যুশীতলতা এনে দিল। এ কি আজব আদেশ? সম্রাটের পুত্রবধূকে সইতে হবে এই অকথ্য অপমান?

হারেমের মেয়েরা লুটিয়ে পড়ল শেরশাহের চরণে। সম্রাট তুলে নিন তার আদেশ। এ নিদারুণ অপমান কোন মেয়েরই সইবে না। কিন্তু শেরশাহ অনড়, অটল। বিচারকের ভূমিকায় তিনি পক্ষপাতহীন। শেষে মেয়েদের মিনতিতে দ্রব হ'ল সেই নাগরিকের অন্তর। সম্রাটকে কুর্নিশ জানিয়ে বলল আগ্রাবাসী—রাজ-আদেশ জেনেই সে সন্তুষ্ট। আর সম্পন্ন করতে হবে না সেই আদেশ। সম্রাটের কাছে তার আর কোন অভিযোগ নেই।......

দীর্ঘ পনের বৎসর পরে আবার রাজ্য ফিরে পেলেন হুমায়ুন। শেরশাহ তখন মারা গিয়েছেন। সিংহাসনে সিকন্দর লোদী। ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সিরহিন্দের যুদ্ধে সিকন্দরকে হারিয়ে দিলেন হুমায়ুন। দিল্লী আবার তার করায়ত্ত হ'ল।

সিঁড়ি থেকে পড়ে মারা গিয়েছিলেন হুমায়ুন। কিন্তু তার আগের একটা ইতিহাস আছে। রাজ্য পুনরুদ্ধারের পর মাত্র কয়েক মাস বেঁচে ছিলেন হুমায়ুন। এই কয়েক মাসে জ্যোতিষের উপর ভয়ানক আস্থা জন্মেছিল সম্রাটের মনে। সুন্দর এক প্রাসাদ গড়ে তুলেছিলেন বাদশাহ। জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোচনা বসত এখানে। উজ্জ্বল পালিশসম্পন্ন ঘরগুলির নাম দিয়েছিলেন হুমায়ুন। কোনটির নাম মঙ্গল, কোনটি বুধ, কোনটি বা বৃহস্পতি। এক একটি গ্রহের নামে নাম। তার মৃত্যুর কারণও এই জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর অগাধ বিশ্বাস।

একদিন বাদশাহ শুনলেন যে শুক্রগ্রহ আজ সন্ধ্যাকাশে দৃষ্ট হবে। হুমায়ুন মনে মনে স্থির করলেন যে, শুক্রগ্রহ দেখতে পেলে তিনি কয়েকজন অমাত্যকে উচ্চতর পদে উন্নীত করবেন। এতে তার সাম্রাজ্যের ভিত্তি আরও সুদৃঢ় হবে। এই উদ্দেশ্যে হুমায়ুন উঠলেন শেরমণ্ডলের চূড়ায়। এমন সময় আজানের ধ্বনি শোনা গেল। কিলা কোণা মসজিদের উপর থেকে মোল্লা সুর তুলে আজান দিচ্ছিলেন। হুমায়ুন বসলেন সিঁড়িতে। আজান শোনা শেষ হ'লে নামবেন তিনি। তখন সন্ধ্যার তরল অন্ধকার ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে। আকাশে তারা ফুটেছে একটি-দু'টি। দিল্লী নগরীতে আলো জ্বলে উঠছে এক এক ক'রে। গৃহস্থবধূ শাঁখে ফুঁ দিয়ে সন্ধ্যাকে আহ্বান জানাচ্ছে।

আজান শোনা শেষ হ'ল। হুমায়ুন উঠলেন আবার। পা বাড়ালেন শেরমণ্ডলের সিঁড়িতে। কিন্তু নিয়তি দাঁড়িয়ে ছিল তাঁর সামনে। হুমায়ুনকে গ্রহণ করলেন হাত বাড়িয়ে। পা ফস্কে গেল বাদশাহের।

গড়িয়ে পড়লেন হুমায়ুন। সিঁড়ি বেয়ে গড়িয়ে চললেন নীচের দিকে। অন্ধকারে তার মৃত প্রাণহীন দেহ শেষ সিঁড়ির এক কোণে পড়ে রইল।

শেরমণ্ডল তৈরী করেছিলেন শেরশাহ। হুমায়ুন তাঁর লাইব্রেরী হিসেবে ব্যবহার করতেন এটি। জ্যোতিষ নিয়ে নানা চর্চা করেও হুমায়ুন কোনদিন টের পান নি, যে ঘরে বসে জ্যোতিষের নানা গ্রন্থ পাঠ করেছেন তিনি, সেই সৌধের সিঁড়িতেই তাঁর শেষ প্রাণবায়ু নির্গত হবে।

জ্যোতিষ তাঁকে মৃত্যুর সন্ধান দিতে পারে নি। শেষের সে ভয়ঙ্কর দিনটি তার কাছে কুয়াশাচ্ছন্ন গিরি-চূড়ার মতই রহস্যময় রয়ে গেল।

খানিকটা হেঁটে মাঝখানে এলেই সমাধিসৌধটির নিকটে। প্রায় পাঁচ ফুটের মত উঁচু একটি প্রশস্ত বেদী মতন জায়গা। আকারে প্রায় বর্গ, কিন্তু কোণগুলি কাটা। সব মিলিয়ে একটা অষ্টভুজের মত। মূল সৌধটির এই ছোট ছোট বাহুগুলির প্রত্যেকটিতে একটি খিলান-বিশিষ্ট দরজা। আর বড় বাহুগুলির উপর একসার খিলানের সুন্দর সৌষ্ঠব। এরই মাঝামাঝি ভিতরে ঢুকবার সিঁড়ি। আর তাই বেয়ে আমরা উপরে উঠলাম।

হুমায়ুনের এই সমাধি-সৌধের মধ্যে শেষশয্যা গ্রহণ করেছেন আরও অনেকে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম বেশ কয়েকটি। প্রিয়তমা পত্নী হামিদা বেগম স্বামীর সমাধির কাছেই পরম শান্তির ঘুমে চির আচ্ছন্ন
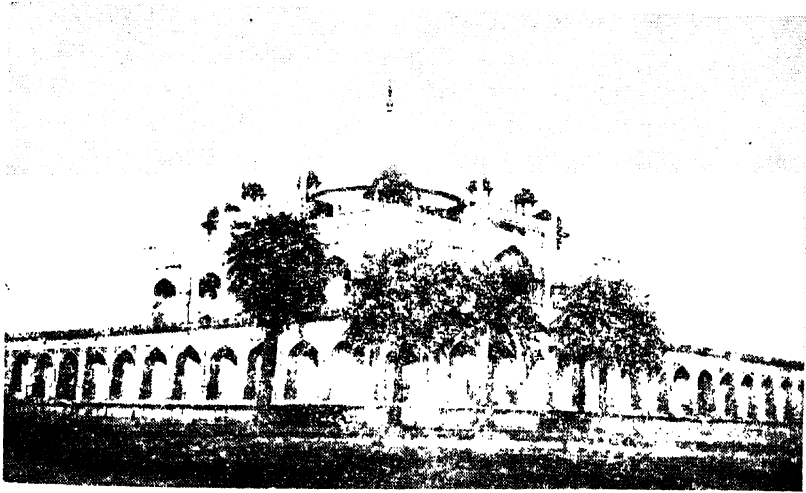
হুমায়ুনের সমাধি

(১৯)

যমুনার তীরে হুমায়ুনের সমাধি-সৌধ। চারপাশে প্রাচীরবেষ্টিত একটি উদ্যানের মধ্যে এই সুন্দর সৌধটির রচনা হয়েছে। পশ্চিম দিক হ'তে একটি সুন্দর ফটক বা প্রবেশদ্বার অতিক্রম ক'রে হুমায়ুনের সমাধিসৌধে পদার্পণ করতে হয়। প্রবেশদ্বারের দুইদিকে প্রাচীর সমান্তরাল ভাবে দাঁড়িয়ে আছে তার গায়ে খিলানের ভিতর ছোট ছোট ঘরের আকৃতি। প্রবেশ-দ্বার পেরিয়েই উদ্যানের ভিতর ঢুকলাম। সোজা

হয়ে আছেন। একদা স্বামীর নানা সুখ-দুঃখের যিনি হয়েছিলেন অংশীদার, নানা সঙ্কটে, দুঃসময়ের দিনে ও দুঃস্বপ্নের রাতে স্বামীর সঙ্গে থেকেছেন সহনশীলা পত্নী হিসাবে, মরণের পরে সেই স্বামীর সমাধির কাছেই তিনি রইলেন শেষ নিদ্রায় শায়িতা হয়ে। আর রয়েছেন দারাশিকো। শাজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র, নিষ্ঠুরভাবে যাকে হত্যা করিয়েছিলেন ঔরঙ্গজীব। দারাশিকোর মাথা-খানি কর্তন ক'রে পাঠান হয়েছিল শাজাহানের কাছে। মস্তকহীন দেহখানিকে সমাধিস্থ করা হয়েছে এখানেই। সম্রাট জাহান্দর শাহ (ঔরঙ্গজেবের পৌত্র) এবং তাঁর

দুর্ভাগা উত্তরাধিকারী ফারুকসিয়রের সমাধি এখানেই। ফারুকসিয়রকে বিষপানে হত্যা করিয়েছিলেন তাঁর প্রধানমন্ত্রী। আর রফিউড্ডারজৎ এবং রফিউদ্দৌল্লা, যাঁরা পর পর সম্রাটের আসন গ্রহণ করেছিলেন স্বল্পতম রাজত্বকাল (মাত্র তিনমাস) কাটাবার জন্য। দ্বিতীয় আলমগীরের সমাধিও এখানেই। মন্ত্রী ইমাদ-উল-মুলক ষড়যন্ত্র ক'রে, খুন করিয়েছিলেন দ্বিতীয় আলমগীরকে। আরও বহু রাজবংশধর, ইতিহাস যাদের স্মরণ করে রাখে নি তাদেরও সমাধি এই হুমায়ুনের স্মৃতিসৌধে।

মধ্যখানের ঘরটিতে হুমায়ুনের সমাধি। লাল বেলেপাথরে নির্মিত এই ঘরখানির গায়ে মার্বেলের সাহায্যে অলঙ্করণ করা হয়েছে। আকৃতিতে এটিও কোণ-কাটা বর্গক্ষেত্র বা প্রায় অষ্টভুজের মত। এই ছোট ছোট বাহুগুলিই বাইরের চারিটি অষ্টভুজাকৃতি বুরুজের এক একটি ভুজ। সমাধিসৌধের মাথায় একটি বৃহৎ আকৃতি মার্বেল গম্বুজ। বৃহৎ হ'লেও এর বহির্দিক হ'তে এটি দৃষ্টিশোভন নয়। Beglar সাহেব এটির সম্বন্ধে সুন্দর একটি তুলনা করেছেন। তাঁর মতে গম্বুজের ঘাড়টি পুরো গম্বুজটির আকৃতির তুলনায় নেহাৎই সরু। দেখলে মনে হয় কে যেন শ্বাসরোধ করে এর অপমৃত্যু ঘটিয়েছে।

গম্বুজের মাথায় একটি তামার চূড়া। অষ্টভুজাকৃতি বুরুজগুলির মধ্যে সুউচ্চ খিলান নির্মিত হয়েছে। এই খিলানের উপরের দেওয়ালকে আরও খানিকটা তোলা হয়েছে, যাতে গম্বুজটি যে সমবর্তুল ভিত্তির উপর নির্মিত, সেটি ঢাকা পড়ে। কিন্তু বুরুজের ছোট বাহুগুলির উপর খিলান অঙ্কিত হ'লেও সেখানে দেওয়ালের উচ্চতা আর বাড়ান হয় নি। পরিবর্তে এর প্রতিটি কোণে একটি আচ্ছাদনের মত রচিত হয়েছে। আচ্ছাদনের মাথায় ছোট ছোট মার্বেলের গম্বুজ।

মধ্যখানের ঘরটিতে হুমায়ুনের সমাধি। ঠিক উপরতলার ঘরটিতে অনুরূপ নকল সমাধি। সম্রাটের সমাধি উচ্চ পালিশসম্পন্ন মার্বেল পাথরে মোড়া। প্রায় ইঞ্চি ছয়েকের মত উঁচু। সাদা মার্বেলে বাঁধান সমাধির উপর কালো মার্বেল পাথরের দাগ সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু এর উপর কোন লিপি উৎকীর্ণ করা হয় নি।

একদা হুমায়ুনের সমাধিসৌধের গম্বুজের ভিতরের ছাদে সুন্দর কারুকার্য্যের সৃষ্টি করা হয়েছিল। ছত্রিগুলি ঢাকা ছিল নীল টাইলে। গম্বুজের ভিতরের মধ্যখান হ'তে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল সুন্দর স্বর্ণলেশ। কিন্তু পরবর্তীকালে জাঠেরা তাদের গোলাবারুদে এগুলি নষ্ট করে দেয়। খোঁজ করলে বুলেটের দাগ এখনও বোঝা যায়। নীল টাইলের বদলে আজ কলঙ্কের মত কালো কালো ছোপ ছাড়া গম্বুজের গায়ে আর কিছু দেখা যায় না।

দিল্লীর স্থাপত্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সৈয়দ মুস্তফা আলী লিখেছেন—'মোগল যুগ আরম্ভ হ'ল হুমায়ুনের কবর দিয়ে। সেখানে ইরাণ তুরানের প্রাধান্য। কিন্তু ছত্রি এবং পদ্মফুলের ডিজাইন এখানে প্রচুর এবং কারুকার্যেও হিন্দু প্রাধান্য বেশী'...।

হুমায়ুনের সমাধিসৌধের সঙ্গে তুলনা চলে তাজের। প্রথমটি বিরহকাতরা বিধবার সৃষ্টি, মৃত স্বামীকে স্মরণ করে। দ্বিতীয়টি এক প্রেমিক স্বামীর মর্মর স্বপ্ন, তার দয়িতাকে অমর করে তুলতে। একদা হুমায়ুনে ছিল, লাল বেলেপাথর, শুভ্র মার্বেল এবং নীল টাইলের সুন্দর সামঞ্জস্য। আর তাজমহল আজও শুভ্র ধবল। আলীসাহেব লিখেছেন,......'হুমায়ুনে দার্ঢ্য, তাজে মাধুর্য।' কারণ প্রথমটি পত্নীর সৃষ্টি, তাই পৌরুষের চিহ্ন বেশী। দ্বিতীয়টি স্বামীর রচনা, তাই রমণীসুলভ সুষমা ও লালিত্যের ছড়াছড়ি।

কিন্তু হুমায়ুনের সমাধিসৌধের সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি করুণ স্মৃতি। তার উল্লেখ করা সমীচীন। এখানেই দিল্লীর শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ শিপাহী বিদ্রোহের পর ইংরেজের কাছে ধরা দেন। আর তাঁর পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রদের দেখার সঙ্গে সঙ্গেই গুলী করে মেরেছিলেন ক্যাপ্টেন হডসন। এই সমাধিসৌধের চত্বরেই সেদিন রক্তাপ্লুত দেহগুলি ঢলে পড়েছিল। নির্মম ও নিষ্ঠুর সেই হত্যাকাণ্ডের কোন প্রতিবাদই সেদিন সম্ভব হয় নি।

এই সুপরিসর স্থানটির মধ্যে ছোটখাটো অনেকগুলি সমাধির সঙ্গে কয়েকটি প্রিয় সম্পর্কের চিহ্ন বিদ্যমান। ফহিম খান নামক জনৈক নফরের সমাধি এখানেই দেওয়া হয়। সে ব্যক্তি ছিল আবদুর রহিম খান খানানের ভৃত্য। হুমায়ুনের পরমপ্রিয় এক নাপিতকে শেষ শয্যায় শুইয়ে দেওয়া হয়েছে এখানে। আকবরের পরামর্শদাতা বৈরাম খানের পুত্রের একটি সুদৃশ্য সমাধিও চোখে পড়বে। এর উপরের মার্বেল গম্বুজটি শাহ আলম অযোধ্যার নবাব আসফ-উদ-দৌল্লাকে পঁচিশ হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করে দেন।

(২০)

কুতুব না দেখে দিল্লী দেখা কখনই শেষ হয় না। কুতুবমিনার,—যার নির্মাণকার্য শুরু হয়েছিল

(কু)তুবউদ্দীন আইবেকের রাজত্বকালে, এবং সারা হয়েছিল (তা)রও বহু বৎসর পরে। আজও তার সঙ্গে পাল্লা দেবার (মত) একটি মিনারও কেউ তৈরী করতে পারে নি। হ্যাঁ, (চে)ষ্টা করেছিলেন আলাউদ্দীন খিলজী। কিন্তু তাঁর সুন্দর (স্ব)প্ন পরিণতি লাভ করে নি। কিছু মিনারিকা (minaret) তৈরী হয়েছে। তাজমহলের মিনারিকাগুলি (ও) আহমদাবাদে রাণী সিপ্রির মসজিদে একটি সুন্দর (দ)র্শন মিনারিকা অনেকের চোখে পড়েছে। কিন্তু (কু)তুবমিনার স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল।

কুতুব দেখতে বেরুলাম খুব সকালে উঠে। কালী-(বা)ড়ীর সামনেই এক টাঙ্গাওলার সঙ্গে চুক্তি হ'ল। (সা)রো পাঁচ টাকা নেবে। তবে হ্যাঁ, টাঙ্গাতে চারজনের (ব)সবার জায়গা। ইচ্ছে করলে টাঙ্গাওলা ওখানে লোক (নি)তে পারে। পথের পাশে দাঁড়িয়ে যাঁরা অপেক্ষা (ক)রছেন তাঁরা এসে বসতে পারেন অন্য দু'টি সীটে, (স্ব)চ্ছন্দে। আপত্তি করবার মত কোন কারণ খুঁজে (পে)লাম না। আসুক না দু'জনে। এতটা পথ আলাপ (ক)'রে যাওয়া যাবে।

কুতুব যাওয়ার জন্য অবশ্য বাসও আছে। সামান্য (ভা)ড়া। আমি কিন্তু ইচ্ছে করেই বাস নিলাম না। যেতে (যে)তে ভাবলাম, ভাগ্যিস্ বাসে ক'রে যাই নি। বাসে (গে)লে এই মধুর শীতের সকালে এতখানি পথ এমন (সু)ন্দরভাবে উপভোগ করতে পারতাম না। সত্যি, (দি)ল্লী থেকে কুতুব বড় সুন্দর পথ। নয়া দিল্লীর বিখ্যাত (অ)শোকা হোটেলকে বাঁ দিকে ফেলে রেখে টাঙ্গা এগিয়ে (চ)লল। পথের মধ্যে অফিসযাত্রী মানুষের দেখা পেলাম। (দু)'টি-চারটি নয়···অসংখ্য। সাইকেলের মিছিল ক'রে (মা)নুষ চলেছে অফিসমুখো।···

কুতুবমিনারের চারপাশ বড় শান্ত ও নিস্তব্ধ। খোঁজ (নি)য়ে জানলাম, দ্বিতলের উপরে আর উঠতে দেওয়া হয় (না)। কবে কি দুর্ঘটনা যেন ঘটেছে, তাই কুতুবমিনারের (দ্বি)তলের ঊর্ধে যাওয়া হয়েছে নিষিদ্ধ। চারজনের একটি (ছো)ট্ট দলকে একসঙ্গে উঠতে দেওয়া হয় উপরে। এর (ক)ম হ'লে মিনারে উঠতে আছে বাধা।

টাঙ্গায় চড়ে আমাদের সঙ্গে আসেন নি কেউ কুতুব-মিনার দেখতে। সেজন্যই টিকিট কেটে অপেক্ষা করতে হ'ল আমাদের। প্রায় আধঘন্টা আমরা ঘুরে বেড়ালাম। কুতওতুল ইসলাম মসজিদের ধ্বংসাবশেষ, আলাউদ্দীন খিলজীর তৈরী দরওয়াজা, আর্চ ও লৌহ-স্তম্ভ ইত্যাদি কিছুই বাদ দিলাম না। কাজেই কুতুবে উঠবার অনুমতি পেতে আমাদের প্রায় দশটা বাজল। একসঙ্গে প্রায় জনদশেক লোক ঢুকলাম আমরা। তার মধ্যে একটি সুন্দর যুবক আর তার তরুণী সঙ্গিনীর কথা এখনও মনে আছে। মনে থাকার অবশ্য বিশেষ একটি কারণ আছে। কিন্তু সে কাহিনীর অবতারণা আরও কিছু পরে।

কুতুবমিনার কার সৃষ্টি সে বিষয়েও সামান্য কিছু মতভেদ আছে। ইতিহাস-মতে সুলতান কুতুবউদ্দীন আইবেক এর নির্মাণকার্য সুরু করেন। এমনও অসম্ভব নয় যখন তিনি মহম্মদ ঘোরীর অধীনে প্রদেশের শাসন-কর্তা ছিলেন তখনই এর নির্মাণকার্য সুরু হয়ে যায়। কিন্তু সুলতান কুতুবউদ্দীন তাঁর রাজত্বকালে একে সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি। এটি শেষ করেছিলেন সুলতান আলতামাস। আলাউদ্দীন খিলজী মিনারটিতে বেলেপাথর যোগ করেন। কিন্তু কিছুদিন পরে বজ্রাঘাতে এর উপরের দু'টি তলা বহুলাংশে নষ্ট হয়। তখন ফিরোজশাহ তুঘলক বদান্যতা দেখিয়ে এই দু'টি তলাকেই নতুন করে নির্মাণ করান। হয়ত সে সময়ই মার্বেলকে এই দু'টি তলাতেই লাল বেলেপাথরের সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

কিন্তু ফিরোজশাহ তুঘলকই শেষ নন। কুতুব-মিনারকে টিকিয়ে রাখতে আরও অনেককে সচেষ্ট প্রয়াস করতে হয়েছে। সিকন্দর লোদীর রাজত্বকালে বিদ্যুৎ আবার এর উপরে এসে পড়ে। সুলতান সিকন্দর লোদী সে ক্ষতিটুকু পূরণ করে দেন। তারপর বহুদিন কুতুব-মিনারের আর কোন সংস্কার হয় নি। কিন্তু ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দের এবং ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের ভূমিকম্পে কুতুবমিনার ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ব্রিটিশ আমলে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে মেজর রবার্ট স্মিথ বেশ কয়েক সহস্র টাকা ব্যয় ক'রে কুতুবমিনারের বহু জীর্ণতা দূর করেন। এই টাকার বেশ কিছুটা অংশ খরচ হয় মিনারের উপরের গোলাকার শীর্ষদেশটি তৈরী করতে।

কিন্তু মেজর স্মিথের তৈরী শীর্ষদেশটি বেশী দিন রাখা সম্ভব হয় নি। আসলে মেজর স্মিথ যা গড়েছিলেন তা এক হিসাবে কুতুবমিনারের ছ'তলা এবং সাততলা বলা যায়। ছয়তলাটি একটি লাল বেলেপাথরের গম্বুজ, আটটি পাথরের থামের উপর দাঁড় করান। এতে রেলিং ইত্যাদির মত আরও কিছু কারুকার্য করেছিলেন স্মিথ সাহেব। সাততলাটি আরও সাধারণ। এটি শিশুকাঠের একটি আচ্ছাদন-বেষ্টিত বস্তু। মাথায় পতাকা ধরবার একটি ধ্বজদণ্ড।

উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের আদেশে শিশুকাঠের এই

আচ্ছাদনযুক্ত মণ্ডপটিকে নামান হয়। নতুন তৈরী শীর্ষ দেশটিকে ব্যঙ্গ করে দিল্লীর বণিকরা তাদের নুন ও আচারের পাত্রগুলিকে নবনির্মিত কুতুবমিনারের আকারে তৈরী করে। ফলে ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জ এই আটকোণা শীর্ষদেশটিকেও অপসারিত করবার আদেশ দেন। কিন্তু স্মিথ সাহেব ফিরোজশাহ তুঘলকের নির্মিত শীর্ষদেশটি ঠিক হুবহু নির্মাণ করতে না পারলেও মিনারের সংস্কারকার্য তিনি যথেষ্ট পরিশ্রমের সঙ্গে সমাপ্ত করেন। এর পরের দু'-একটি ছোটখাটো ভূমিকম্পেও মিনারের কোন উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয় নি। বলা বাহুল্য এখন সরকারী আর্কিয়োলজিক্যাল বিভাগের পরিচালনাধীন হয়ে আছে কুতুবমিনার, ভাঙ্গা আলাই-দরওয়াজা, কুত্ত্ওতুল ইসলাম মসজিদের ধ্বংসাবশেষ, আর্চ ও অন্যান্য মূক ঐতিহাসিক সাক্ষীগুলি।

এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মিনারটিকে হিন্দুরাও নিজেদের দিকে টেনে নিতে চেয়েছে। এর সৃষ্টি যে এক হিন্দু রাজার, সে দাবি তারা যথাযথ উপস্থাপিত করেছে। কিংবদন্তীর মত সুন্দর গল্প তৈরী হয়েছে এই নিয়ে। প্রচলিত যে, ধনে, ঐশ্বর্যে, শক্তি ও ক্ষমতায় প্রবল প্রতাপশালী এক রাজা ছিলেন এ অঞ্চলে। পরমাসুন্দরী এক মেয়ে ছিল তাঁর। রাজকন্যা শুধু রূপমতী ছিলেন না, ছিলেন ভক্তিমতী। প্রতিদিন সকালে নদীতে গিয়ে স্নান করতেন রাজকন্যা। তার আগে জলস্পর্শ করত না মেয়ে। পুণ্যস্রোতা নদীকে না দেখে দিন সুরু করতে চাইত না তার মন। নয় রকমের পাথরে গাঁথা মালা দুলত রাজকন্যার গলায়। স্নান ক'রে সেই মালাটি নদীর জলে ধুয়ে নিতেন রাজকন্যা। তারপর গলায় পরতেন সটিকে সযত্নে।

কিন্তু পথ দিন দিন দূর হচ্ছিল, নদী তার গতিপথ করছিল পরিবর্তন। রাজকন্যাকে যেতে হ'ত অনেকখানি রাস্তা। প্রতিদিন এতখানি পথ যাওয়া পছন্দ হয় নি রাজার। মেয়েকে তিনি নানাভাবে বোঝালেন। অবশেষে রাজকন্যাও রাজী। তবে এক সর্তে। প্রতিদিন সকালে নদীর জল চোখের সামনে দেখতে হবে তাকে।

মেয়ের জন্য অসম্ভবকে সম্ভব করলেন রাজা। বিশাল এই মিনারকে গড়লেন তিনি। এর উপরে উঠে রাজকন্যা দেখুক না চিকচিকে নদীর বালি, ছলছল নদী-জল আর বহমান স্রোত।...

রূপকথার গল্পের মত এই কাহিনাকে বাদ দিলেও আর একটা দিক আছে। এত বড় মিনার তৈরী হয়েছে শুধু ভারসাম্য রক্ষা করে। গণিতের উপর যথেষ্ট দখল না থাকলে এই বিশাল মিনার গড়ে তোলা একান্তই অসম্ভব হ'ত। এই দক্ষতা হিন্দুদেরই ছিল। সেই হিসেবে ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ মনে করেন যে, এর সৃষ্টির মুখে হিন্দুদের যথেষ্ট প্রয়াস ছিল। কিন্তু মিনারের গায়ে কুতুবউদ্দীন আইবেক এবং মহম্মদ ঘোরীর নাম উৎকীর্ণ হয়েছে। কোরাণের নাম বাণী ও আল্লার নাম খোদিত হয়েছে কুতুবমিনারের বুকে। এ সবই সাক্ষ্য দেয় যে, কুতুবমিনার রচিত হয়েছিল মুসলমান নরপতির আদেশে। তবে একথা নিঃসন্দেহে সত্য যে, মিনার রচনা করতে যোগ দিয়েছিল বহু হিন্দু শ্রমিক ও স্থপতি। এমনও অসম্ভব নয় যে, সমস্ত মিনারটির প্ল্যান বা কৌশল কোন হিন্দু গণিতজ্ঞের অবদান।

দশজনের ছোট্ট দলটি আস্তে আস্তে উঠতে সুরু করলাম। সিঁড়ির গায়ে বেশ অন্ধকার। খাড়াই ও অপ্রশস্ত সিঁড়িগুলি উঠতে বেশ কষ্ট। একতলা পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই আমরা দু'-এক জায়গায় বসলাম খানিকক্ষণ। আবার উঠছি। উপরে সুন্দর প্রশস্ত ব্যালকনির মত। আলো, আলো···অন্ধকারের কণা মাত্র নেই।

কুতুবমিনারের দ্বিতলই বেশ উঁচু। এখান থেকে বহুদূর দেখা যায়। নয়া দিল্লীর প্রাসাদশ্রেণী, ইতিহাসের নানা ধ্বংসাবশেষ চেয়ে চেয়ে দেখলে চোখে আসে। সহযাত্রীরা সবাই ব্যস্ত। কেউ ছবি তুলছেন, কেউ সঙ্গিনীর সঙ্গে মশগুল গল্পে। উপর থেকে এখানের সব-কিছু দ্রষ্টব্যগুলিকে বার বার লক্ষ্য করলাম। কিছুক্ষণ পরেই সকলে নামতে সুরু করেছে। কোন একসময় আমরাও নামতে উদ্যোগ করেছি। সিঁড়ির বুকে পা দিয়ে আমার স্ত্রী বললেন, 'সবাই নেমে যাচ্ছে তাতে কি? চল না, আমরা আরও খানিকক্ষণ দাঁড়াই ওখানে।'

কি ভেবে আমিও ফিরলাম। কুতুবমিনারের নীচে, ব্যালকনিতেই এক সুন্দর প্রেমের দৃশ্য অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্য। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সামান্য একটু এগিয়েছি। কুতুবমিনারের দ্বিতলে আর কেউ নেই। শুধু সেই যুবক ও তরুণী। মিনারের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি। বড় বড় চোখে মিষ্টি হাসি। আর ছেলেটি সামনে দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে দেখছে ওকে। তর্জনী আর বৃদ্ধ অঙ্গুলির সাহায্যে মেয়েটির চিবুকটি তুলে ধরেছে সে। টকটকে লাল মেয়ের ঠোঁটটি। ওর গালের রং আরও গোলাপী। মেয়েটি কেমন অদ্ভুত দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে

দূর আকাশের দিকে। আমার মনে হ'ল ছেলেটি যেন এখনই ওর কানে কানে গান শোনাবে—'ও আমার গোলাপবালা গো, একটি চুম্বন মাগি।'

কুতুবমিনারের প্রথম তলার গায়ে কোণ আর বাঁশীর নক্শা। দ্বিতীয় তলাতে বাঁশী। তৃতীয় তলাতে শুধু কোণের ছড়াছড়ি। অপর দু'টি তল সাদামাটা। সেখানে এখন আর কোন নকশা নেই। একদল ছিল কি না কে জানে! মিনারে সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলা অনেকখানি শক্ত। ইমারতের সঙ্গে এখানেই পার্থক্য। কুতুবমিনার একটা আঙ্গুলের ডগায় দাঁড় করান সার্কাসবাজির লাঠির মত। সেখানে কলা-প্রচেষ্টা ফুটিয়ে তোলা এবং তাকে সার্থক করে তোলা দুরূহ প্রয়াস। কিন্তু কুতুব যাঁরা গড়েছিলেন, সেই মানুষগুলি এ প্রয়াসে সম্পূর্ণ সার্থক।

কুতুবমিনার সেরা মিনার। হয়ত কুতুবউদ্দীন আইবেকের নামেই এর নাম হয়েছে কুতুবমিনার। কিংবা কুতুব শব্দের অর্থানুসারে এর কুতুবমিনার (Kutb—pole of the earth) নাম করা হয়েছে। উচ্চতায় মিনারটি প্রায় ২৩৮ ফিটের মত উঁচু। প্রথম তলাটি কয়েক ফিট কম একশত ফিটের মত। সম্ভবত তিনশত ছিয়াত্তরটি ধাপ সিঁড়ি আছে এতে। এই বিশাল মিনারটি গড়তে অর্থ ছাড়াও পরিশ্রম প্রভূত ব্যয়িত হয়েছে। যে লাল বেলেপাথর এর অঙ্গে রয়েছে, তাকে আনতে হয়েছে সুদূর আগ্রা থেকে। মার্বেলের যেটুকু কাজ এতে শোভা পাচ্ছে তাকে আনয়ন করা হয়েছে সুদূর মাক্রানা (Makran) থেকে। কাজেই কুতুবমিনার গড়তে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়।

কুতুবের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মিনার গড়তে চেয়েছিলেন আলাউদ্দীন খিলজী। এই দুঃসাহসী সুলতানের পক্ষেই এ কাজ সম্ভব ছিল। কুতুবমিনারের কাছেই অসমাপ্ত আলাইমিনার সকলের চোখে পড়বে।

আলাইমিনারের কঙ্কালটি আমরাও দেখলাম। পরিধিতে বা বেড়ে এই মিনারটিকে কুতুবের দ্বিগুণ গড়তে চেয়েছিলেন সুলতান। আকৃতিতে সেই কুতুবমিনারের গড়ন। তবে বাহির থেকে বত্রিশটি দিক। প্রতিটি আট ফুটের মত লম্বা। অসমাপ্ত অংশটুকুর পরিধি দু'শত বাহান্ন ফুটের মত। সম্পূর্ণ তৈরী হ'লে বাঁশী আর কোণের সুন্দর নক্শা-জড়িত এই বিশাল মিনারটিকে কি চমৎকারই না দেখতে লাগত।

কিন্তু যে সুন্দর স্বপ্ন সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী দেখেছিলেন তা আর পাথরে, রঙে, নানা বিচিত্র আঁকিবুকিতে সম্পূর্ণতা পায় নি। মিনার শেষ হবার আগেই হানাহানি কাটাকাটি ভরা এই জীবনকে শেষ করে ফেলেছিলেন সুলতান। তার পরবর্তী কেউ আর একে সম্পূর্ণ করা প্রয়োজন মনে করে নি।

আলাইমিনারের ভূমিদেশে আজ ফুটেছে নানা বিচিত্র বর্ণ সীজন ফ্লাওয়ার। অসমাপ্ত মিনারটিকে তারা করেছে আরও শ্রীমণ্ডিত।...এ দৃশ্য সকলেরই ভাল লাগবে।

নিজের জীবনে কোন কিছুর কাছেই হার মানেন নি সুলতান আলাউদ্দীন। তাঁর দুর্মদ বাসনা, দুর্বার গতিতে গ্রাস করেছে সব কিছু। কিন্তু কুতুবমিনারের কাছে মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছে তার। পাল্লা দিতে সুরু করেও কুতুবকে অতিক্রম করতে পারলেন না আলাউদ্দীন। নতুন মিনার শেষ হবার বহু আগেই অন্য এক দেশের পরোয়ানা পেলেন তিনি। কুতুবমিনার অজেয়ই থেকে গেল।

ক্রমশঃ

ছায়াপথ

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

(চব্বিশ)

দু'তিনদিন রামকিঙ্কর দোকানে বসল না। অথচ খাওয়া-শোওয়া ওখানেই চালাতে লাগল। প্রতিদিন ভাবে, দরখাস্তের নোটিশটা আজ আসবে। কিন্তু আসে না।

সেও একটা অস্বস্তি। জনৈক তাঁতির ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। কিন্তু ফাঁসি আর হয় না। একদিন রেগে-মেগে জেলারকে বললে, মশাই, ফাঁসি দেবেন ত দিন। নইলে তাঁত কামাই যাচ্ছে!

রামকিঙ্করের সেই অবস্থা। তার চাকরিও যাচ্ছে না, নতুন চাকরি খোঁজার চেষ্টাও জাগছে না।

একদিন সকালে বাইরে বেরুবার জন্যে জামা পড়ছে, এমন সময় হরেকৃষ্ণ এসে উপস্থিত।

—বেরুচ্ছ?

তার দিকে না চেয়েই রামকিঙ্কর বললে, হুঁ।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে হরেকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলে, কি ঠিক করলে?

—কিসের?

—কাজের। তুমি কি এখানে কাজ করবে না?

এবার রামকিঙ্কর স্থির দৃষ্টিতে হরেকৃষ্ণের দিকে চাইলে। বললে, সেই কথা আমি আপনাকেই জিগ্যেস করব ভাবছিলাম। আমার চাকরি কি আছে?

হরেকৃষ্ণ হাসলে: না থাকলে কি তুমি জানতে পারতে না?

—জানতে পারছি না বলেই ত অস্বস্তি।

—অস্বস্তি আমরাও কিছু কম ভোগ করছি না।

—কেন?

—তুমি যেমন বুঝতে পারছ না, তোমার চাকরী আছে কি নেই, আমরাও তেমনি বুঝতে পারছি না, তুমি এখানে চাকরি করবে কি না।

—চাকরি থাকলে করব না কেন?

—বি. এ. পাস করেছ, এ চাকরিতে কি মন ভরে?

রামকিঙ্কর হাসলে। কোন জবাব দিলে না।

একটু অপেক্ষা করে হরেকৃষ্ণ বললে, করবে যদি দোকানে বসছ না কেন?

—আপনি বললেই বসতে পারি।

—আমার বলাবলির কি আছে? আমি ত তোমায় ছাড়াই নি। দোকানে বসতে নিষেধও করি নি।

—বেশ, আজ থেকেই বসব।

অস্বস্তি যে শুধু রামকিঙ্কর আর হরেকৃষ্ণই বোধ করছিল তাই নয়। দোকানের অন্যান্য কর্মচারীরাও সমান অস্বস্তি বোধ করছিল। সেটা বোঝা গেল, রামকিঙ্কর দোকানে এসে বসতে সুবল যখন চুপিচুপি বললে, বাঁচলাম।

রামকিঙ্কর জিজ্ঞাসা করলে, বাঁচলে কেন?

—তুমি দোকানে এসে বসার জন্যে।

বললে, জান, তোমার জন্যে আমাদের কারও কাজে মন বসছিল না। এ ক'দিন দোকানে কাজ হয় নি বললেই হয়।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। সমস্ত দিন সবাই চুপচাপ। গল্প-গুজব পর্যন্ত বন্ধ।

সেটা রামকিঙ্করও অনুমান করতে পেরেছিল। দোকান ত নয়, হরি ঘোষের গোয়াল। সেই গোয়াল নিস্তব্ধ ছিল।

সুবল বললে, শুধু আমরাই নয়, তোমার বন্ধু হরেকেষ্ট পর্যন্ত চুপচাপ।

রামকিঙ্কর বললে, হরেকেষ্ট চুপচাপ কেন? সে ত সব জানে, কি হয়েছে, না হয়েছে।

—জেনেই হয়ত চুপচাপ আছে। বুঝেছে, সুবিধা হল না। মনটা তাই ভাল নেই। চুপচাপ আছে।

একটু চুপ করে থেকে রামকিঙ্কর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, কিন্তু এমন করেই বা ক'দিন চলবে, সুবল? রোজ একটা করে খোঁচা আমি কতদিন সহ্য করতে পারব?

সুবল বললে, চাকরি করতে গেলে সব জায়গাতেই খোঁচা সহ্য করতে হবে। ওসব তুমি গেরাহ্যি ক'রো না।

রামকিঙ্কর বললে, গোয়ার্তুমি ত করি না। ঝেড়ে ফেলে দবার চেষ্টাই ত করি। কিন্তু এক এক সময় মাথায় যেন আগুন জ্বলে ওঠে। তখন আর পারি না।

বললে, হরেকেষ্টও ঘাগী লোক। বোঝে, কখন খোঁচা দিলে কাজ হয়। দেয়ও তাই। কিন্তু আমি ভাবছি, এবার হরেকেষ্ট সুবিধা করতে পারলে না কেন।

উৎসাহের সঙ্গে সুবল বললে, পারবে কি করে হে? যতক্ষণ গিন্নীমা তোমার দিকে, ততক্ষণ হরেকেষ্ট ত হরেকেষ্ট, স্বয়ং বাবুও পারবে না।

—না হে, এবারে ব্যাপারটা তা নয়।

—কেন?

—গিন্নীমা এখন আর আমার ওপর খুশী নন।

সুবল চমকে উঠল: বল কি হে!

—হ্যাঁ। কাজেই এবারে ওর সুবিধা করা উচিত ছিল।

—তবে পারলে না কেন?

—তাই ত ভাবছি।

রামকিঙ্কর অন্যমনস্ক হ'ল।

হরেকৃষ্ণ রামকিঙ্করকে ডাকলে। বললে, ক'জায়গায় তাগাদায় যাবার দরকার ছিল। কিন্তু আজ থাক, পরে গেলেই চলবে। আজ বরং,

রামকিঙ্কর ওর উদারতায় বিমূঢ়ের মত ওর দিকে চেয়ে থাকে।

হরেকৃষ্ণ বলতে লাগল, কলওয়ালাদের কাছ থেকে ক'খানা চিঠি এসে পড়ে আছে। সেইগুলোর জবাব দাও বরং।

বাইরে প্রচণ্ড রোদ। দুপুরে রাস্তা তেতে আগুন হয়। হাওয়ায় উঠবে আগুনের হল্কা। রাস্তায় গরু-মোষের গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে। এমন সুন্দর কাঠফাটা রোদে রামকিঙ্করকে তাগাদায় পাঠানোর লোভ হরেকৃষ্ণ কি করে সম্বরণ করলে, ভেবে দোকানের সমস্ত কর্মচারী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইল।

রামকিঙ্কর বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করলে, চিঠিগুলো কই?

তার বিনীত কণ্ঠস্বরে মুহূর্তের জন্যে হরেকৃষ্ণের মুখে বিদ্যুৎ-চমকের মত একটা হাসির রেখা খেলে গেল। সে একখানা একখানা করে চিঠি নিতে লাগল আর বলতে লাগল, কি লিখতে হবে। বলে আর একখানা একখানা করে চিঠি রামকিঙ্করের কাছে ফেলে দেয়।

হরেকৃষ্ণ সকলের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বলতে লাগল, এবারে আমাদের একখানা টাইপরাইটার কিনতে হবে।

সকলে বিস্মিতভাবে হরেকৃষ্ণের দিকে চাইলে।

হরেকৃষ্ণ বললে, রাম বি. এ. পাস করেছে। এখন থেকে আমরা সবাইকে ইংরেজীতে চিঠি দিতে পারব। ভাবছ কি, দোকান আমাদের ক'মাসের মধ্যে আপিস হয়ে যাবে!

হরেকৃষ্ণ হা হা করে হাসতে লাগল। কিন্তু সেটা ব্যঙ্গের, না আনন্দের, বোঝা গেল না।

সমস্ত দিন রামকিঙ্কর চিন্তিতভাবে কাটালে। হরেকৃষ্ণকে তার কেমন-কেমন বোধ হচ্ছে। তার হাসি আর মিষ্ট কথা যেন ব্যাপারটা আরও ঘোরালো করে তুলেছে। সমস্তই ধোঁয়া। ঠিক ব্যাপারটাকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। সারদার সঙ্গে একবার দেখা হওয়া দরকার। সে ছাড়া আর কেউ এই ধোঁয়া পরিষ্কার করতে পারবে না।

কিন্তু সন্ধ্যার সময় সারদার ঘরে গিয়ে সে অবাক্।

সারদা একখানা মূল্যবান জমকালো শাড়ী পড়েছে। মুখ রঙ করা। মাথায় পরিপাটি খোঁপাতে বেলফুলের মালা জড়ানো। চোখ দু'টি তার এমনিতেই সুন্দর। কাজল দিয়ে আরও সুন্দর করা হয়েছে।

রামকিঙ্কর দোরগোড়ায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল: কি ব্যাপার? আমি কি ভুল সময়ে এসে পড়লাম?

রামকিঙ্করের বিস্ময়ের কারণ অনুমান করে সারদা লজ্জিতভাবে মুখ ফিরিয়ে নিল। বললে, না, না। ঠিক সময়েই এসেছেন। আসুন, বসুন।

রামকিঙ্কর তথাপি দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে রইল। এদের কথা রামকিঙ্কর কিছু কিছু শুনেছে।

বললে, কারও কি আসবার কথা ছিল, সারদা? আমি যাই তা হ'লে।

ব্যস্তভাবে সারদা বললে, না, না। যাবেন কেন? বসুন। যার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম, তিনিই এসেছেন।

ধোপদুরস্ত বিছানায় বসে রামকিঙ্কর হাসিমুখে বললে,

ওটা তোমার বাজে কথা, সারদা। আমার ত আসবার কথা ছিল না।

পানের ডিবেটা খুলে সারদা ওর সামনে ধরল।

বললে, কথা কি সব সময় থাকে? তবু আমার মন বলছিল, আপনি আসবেন। তার প্রমাণ, আপনার জন্যে পান তৈরী করে রাখা।

—ওটা তোমার বাজে কথা, সারদা। পান অন্যের জন্যে তৈরী করে রাখা।

সারদা মুখ নামিয়ে হাসলে। বললে, জানি। আমাদের কথা কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। অথচ মাঝে মাঝে আমরা সত্যি কথাও বলি।

তারপরেই পরিহাসের মোড় ঘুরিয়ে বললে, আপনার খবর কি বলুন?

রামকিঙ্কর বললে, কি যে খবর, তাই জানবার জন্যেই তোমার কাছে আসা।

আমার কাছে! আপনাদের দোকানের খবর আমি কি জানি?

রামকিঙ্কর বললে, আমার চাকরিটা এখনও যায় নি, জান ত।

সারদা হেসে বললে, জানি। যাবে না তাও জানি।

রামকিঙ্কর হেসে বললে, তবে দোকানের খবর জান না বলছ কেন?

—ওটা কি দোকানের খবর? ওটা আপনার খবর, তাই জানি। বৌরাণী বলছিলেন, আপনার ব্যাপারটা নিয়ে গিন্নীমার সঙ্গে তাঁর নাকি কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে।

এই খবরটা জানবার জন্যেই রামকিঙ্করের এখানে আসা।

জিগ্যেস করলে, কি রকম?

সারদা বললে, রকম-সকম জানি না। যেটুকু শুনেছি, তাই বললাম।

রামকিঙ্কর বললে, এবারটা না হয় বৌরাণী বাঁচালেন। কিন্তু কতবার বাঁচাতে পারবেন? সময় থাকতে অন্য কোথাও চাকরির চেষ্টা করে সরে পড়াই বোধহয় ভাল।

সারদা বললে, বৌরাণীর বোধহয় তা ইচ্ছা নয়।

—কি করে জানলে?

সারদা মুচকি হেসে বললে, বৌরাণী জানেন অন্ততঃ অনুমান করেন, আপনার সঙ্গে আমার মাঝে মাঝে দেখা হয়। তাই একদিন বললেন, রামবাবুকে বলিস, রাগের মাথায় তিনি যেন চাকরি ছেড়ে না যান। তাঁকে আমার দরকার হবে। আমি থাকতে তাঁর চাকরি যাবার ভয় নেই।

রামকিঙ্কর বুঝলে, এই কথাটা বোধহয় হরেকৃষ্ণও বুঝেছে। তার ব্যবহার তাই পাল্টে গেছে।

রামকিঙ্কর বললে, আমি সামান্য একজন কর্মচারী, আমাকে তাঁর কি দরকার হ'তে পারে, সারদা?

সারদা হেসে বললে, আমিও ত সামান্য লোক, আমিই বা তা কি করে জানব? বৌরাণী যা বলেছেন, বোধহয় আপনাকে বলবার জন্যে, তাই আপনাকে বললাম।

বলেই বললে, ইদানীং একটা কি লক্ষ্য করছি জানেন?

—কি?

—গিন্নীমা যেন বৌরাণীকে সমীহ করতে আরম্ভ করেছেন।

—তাই নাকি?

—তাই ত মনে হয়।

—আর বাবু?

—বাবুর ব্যাপার ঠিক বোঝা যায় না।

—কেন?

—কখনও দেখি, বৌরাণীকে আদরে ভাসিয়ে দিচ্ছেন, আবার কখনও চাবুকও চালাচ্ছেন।

—চাবুক বন্ধ হয়েছে, বলছিলে না?

—বন্ধই হয়েছে। কিন্তু একেবারে নয়। যেদিন মদের মাত্রা একটু বেশী হয়ে যায়, অবশ্য কচিৎ কখনও, সেদিন চাবুক চলে।

—বাবু কি এখনও বাইরে বেরোন?

—না। যা করেন বাড়ীর ভেতরেই করেন। বৌরাণী নিজের হাতে মদ ঢেলে দেন।

—তবে মাত্রা বাড়ে কেন?

—কি জানি।—সারদা মুচকি হেসে বললে, মনে হয় ইচ্ছে করেই বাড়ান।

রামকিঙ্কর চমকে উঠল: ইচ্ছে করেই বাড়ান? মার খাবার জন্যে?

—আমার তাই মনে হয়। সারদার চোখে একটা রহস্যজনক হাসি।

রামকিঙ্কর জিগ্যেস করলে, পরীক্ষার জন্যে বৌরাণী খাটছেন ?

সারদা হেসে ফেললে, বললে, পরীক্ষা দিচ্ছেন না। বই-খাতাপত্র শিকেয় উঠেছে। আমরা দু'জনে মিলে এখন কাঁথা তৈরী করি।

রামকিঙ্করও হেসে ফেললে : যে আসছে তার জন্যে ?

—হ্যাঁ।

—তারও ত দেরি নেই।

—না। বাবুরও উৎসাহ কম নয়। এরি মধ্যে কত রকমের খেলনায় ঘর ভরে গেছে।

—আর গিন্নীমা ?

—উৎসাহ তাঁরও নিশ্চয় কম নয়। কিন্তু বাইরে সেটা বোঝা যায় না।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে সারদা ব্যস্ত হয়ে উঠল।

বললে, 'এবার আমাকে ফিরতে হবে। যাই হোক, ভয় পাবেন না। আপনার চাকরি কেউ খেতে পারবে না।

আলো নিভিয়ে ঘর তালাবন্ধ করে দু'জনে রাস্তায় বেরিয়ে এল।

হঠাৎ একসময় সারদা ফিক করে হেসে বললে, এখন বুঝলেন ত, আর কারও জন্যে পান তৈরী করি নি।

—কি করে বুঝব ?

—তা হ'লে তাকে দেখতে পেতেন না ?

রামকিঙ্কর গম্ভীরভাবে বললে, আমি চলে গেলে তুমি যে আবার ফিরে আসবে না, তা কি করে জানব ?

সারদা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল : উঃ, কি সাংঘাতিক লোক আপনি !

অনেকদিন পরে রামকিঙ্করের মনটা আবার ভাল হ'ল। চাকরি যাবার ভয়ে নয়, সে কি রকম অসহায় বোধ করছিল। ভাল লাগছিল না, হরেকৃষ্ণর কাছে হার হচ্ছিল বলে। রাগ হচ্ছিল, শুধু হরেকৃষ্ণের ওপর নয়, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ওপর। অথবা আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে, ঠিক কার ওপর রাগ হচ্ছিল, তা সে নিজেও জানে না। একটা অন্ধ, বোবা আক্রোশ এতক্ষণ তার ভিতরে জলছিল। এতক্ষণে সেইটে নিভে গেল।

তার মনে হ'ল, তারও সুহৃদ আছে। সে একা নয়। নিজের ক্ষয়-ক্ষতি, ভাল-মন্দ, লাভ-লোকসানের অংশ নেবার লোক আছে। গিন্নীমার ওপর ভরসা যদি শেষ হ'ল, বৌরাণী আছেন। সারদা আছে। দোকানের বন্ধুদেরও বাদ দেওয়া যায় না।

বৌরাণীর সঙ্গে দেখা করবার লোভ হচ্ছিল। মোড়ের মাথায় সারদা যখন ডানদিকে বেরিয়ে গেল আর সে বাঁদিকে, তখন একবার তার মনে হ'ল, ছুটে গিয়ে সারদাকে সে ধরে, তার পিছু পিছু গিয়ে বৌরাণীর সঙ্গে দেখা [illegible]য়ে আসে।

কিন্তু সেটা সম্ভব নয়।

তার নিজের পক্ষেও নয়, বৌরাণীর পক্ষেও নয়। বৌরাণী যেখানে থাকেন, সেখানে কথায় কথায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করা যায় না। কত ঊর্দ্ধে বৌরাণী, আর কত নিচে সে।

মনে করল, চাঁদ আর চকোরের উপমাটা। কোথায় চাঁদ আর কোথায় চকোর! দু'জনের মধ্যে কি দুস্তর ব্যবধান !

অথচ কবি-মনের কাছে ব্যবধানটা যেন কিছুই নয়। দুস্তর আকাশ-পারাবার একটি অপূর্ব কাব্যরসে মধুর। সেই মাধুর্য দুস্তর দূরত্বকে যেন নৈকট্যের চেয়েও মনোহর করে রেখেছে।

রামকিঙ্করের মনে হ'ল, সেই মাধুর্য যেন আজ তারও মনে তরঙ্গিত হচ্ছে।

হন হন করে চলতে চলতে রামকিঙ্কর থমকে দাঁড়াল।

দোকানে নয়, অন্য কোথাও। যেখানে বন্ধু-হৃদয় আছে। বিশ্বনাথের ওখানে গেলে হয়। অনেকদিন যায় নি সেখানে। বিশ্বনাথ এম. এ-তে ভর্তি হয়েছে নিশ্চয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস কেমন লাগছে, জানতে পারবে। চন্দ্রনাথবাবুর শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না। কেমন আছেন, দেখে আসা দরকার। সবিতা বিয়ে করতে রাজী হয়েছে ? তার খবরটাও নেওয়া দরকার। সকলের চেয়ে বেশি টান তার সুলোচনার ওপর। তাঁকে তার খুব আশ্চর্য লাগে। কাঁধের ওপর কত বোঝা। দুই হাতে কত কাজ। অথচ সকল সময়েই ঠোঁটে শান্ত হাসি।

রামকিঙ্করের মন আজ সকলের ওপর সহানুভূতিতে পূর্ণ।

বিশ্বনাথের বাড়ীর দরজায় গিয়ে সে কড়া নাড়লে।

একটু পরে সবিতা এসে দরজা খুলে দিলে।

রামকিঙ্কর সহাস্যে জিগ্যেস করলে, তুমি কি পড়া করছিলে?

সবিতা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বললে, না, না। আমি রান্নাঘরে মাকে রুটি বেলে দিচ্ছিলাম।

—বিশু কোথায়?

—দাদা পড়াতে গেছে।

—পড়াতে! সে কি মাষ্টারী করছে নাকি?

—জান না, দাদা ট্যুইশনি করছে? নিজের পড়ার খরচটা ত চলে যায়।

—ভাল। বাবা কেমন আছেন? মা?

সবিতা উত্তর দেবার আগেই রান্নাঘর থেকে প্রশ্ন এল: কে রে, সবিতা? কার সঙ্গে কথা বলছিস?

ততক্ষণে ওরা রান্নাঘরের দোরগোড়ায়।

সুলোচনা জিগ্যেস করলেন, এতদিন আসিস নি যে, রাম? শরীর ভাল ছিল ত?

হাত বাড়িয়ে সুলোচনার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে রামকিঙ্কর বললেন, একটা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে ছিলাম।

—কি আবার ঝঞ্ঝাট?

—চাকরিটা যেতে বসেছিল।

—তারপর?

—তারপর রয়ে গেল।

সুলোচনা হরেকৃষ্ণর কথা জানত। বললেন, সেই রেকেষ্ট ত?

আশ্চর্য, এই মুহূর্তে রামকিঙ্করের হরেকৃষ্ণর ওপরও কোন রাগ নেই।

বললে, সে উপলক্ষ্য মাত্র। যা হচ্ছে আর যা হচ্ছে না, সবই আমার অদৃষ্টের জন্য। বিশু পড়াতে গেছে?

—তার কাণ্ড দেখ দেখি! ওঁরও মত ছিল না আমারও মত ছিল না। নিজের জেদে ট্যুইশনটা নিলে।

—ভালই ত, মা। বাপ-মায়ের বোঝা যতটুকু হাল্কা করতে পারা যায়, সে ত মন্দ নয়। ফিরবে কখন?

সবিতা বললে, ফেরবার সময় হয়েছে।

বলতে বলতেই বিশ্বনাথ এল। রাম যে! কতক্ষণ? আয়, ও ঘরে যাই।

পাশের ঘরে গিয়ে রামকিঙ্কর জিগ্যেস করলে, একটা ট্যুইশন নিয়েছিস?

—নিলাম। বাবার শরীর ভাল নেই। অবসর নেবার সময়ও হয়ে এল। একটা ট্যুইশনি হাতের কাছে এসে গেল, নিয়ে নিলাম। যতটুকু তাঁর সাহায্য করা যায়। নিজের পড়ার খরচ ত হয়ে যাচ্ছে।

—ভাল করেছিস। কেমন ক্লাস হচ্ছে? কি রকম লাগছে?

—একটু নতুনতর। কিন্তু সে আর কতদিন থাকবে? দু'দিন পরে আবার থোড়-বড়ি-খাড়া, খাড়া-বড়ি-থোড় মনে হবে।

বিশ্বনাথ হাসতে লাগল।

রামকিঙ্কর জিগ্যেস করলে, বাবার শরীর কেমন?

বিশ্বনাথ বললে, শরীর বাবা-মা'র কারও ভাল নেই। কিন্তু সেটা ওঁরা কেউই স্বীকার করবেন না এবং চিকিৎসাও করাবেন না।

—সবিতা বিয়েতে রাজী হ'ল?

—না। বি. এ. পাশ করার আগে ও বিয়ে করবেই না। বাবা-মা যদি ততদিন না থাকেন, তাতে কোন ক্ষতি নেই। বলছে, ওর বিয়ের খরচের জন্যে আমাকে ভাবতে হবে না।

—ত কে ভাববে?

বিশ্বনাথ হেসে বললে, ও নিজেই ভাববে বোধ হয়। এখনকার মেয়েগুলো কি রকম খাপছাড়া হয়ে গেছে। আমারও ত ভয় হয়।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত দুই বন্ধুতে অনেক গল্প হ'ল। অতীতের কথা, বর্তমানের কথা, এমন কি কিছু কিছু ভবিষ্যতের কথাও। সেখান থেকে রামকিঙ্কর যখন ফিরল, তখন তার শরীরের যেন ওজন নেই। মন হাল্কা। মুখে হাসি।

পঁচিশ

বৌরাণীর সন্তান হবে, সে একটা সমারোহ ব্যাপার। লেডী ডাক্তারের যাওয়া-আসা গত কয়েকমাস ধরে ক্রমাগত চলেছে। তার সঙ্গে চলেছে ঝি-চাকরের দৌড়-ঝাঁপ।

বিশেষ করে সারদার। তার ত নাইবার খাবার সময় ছিল না।

যেদিন মালতীর শরীরটা খারাপ করত, সেদিন ত কথাই নেই। সকলকে সবচেয়ে বেশি ব্যস্ত করে তুলতেন বৃন্দাবনচন্দ্র স্বয়ং, হাঁক-ডাক করে। এমনিতে বৃন্দাবনচন্দ্রের সাড়া বড় একটা পাওয়া যায় না। কিন্তু মানুষটি এমনি দুর্বল প্রকৃতির য, কিছু একটা ঘটলে বাড়ী মাথায় তুলতেন।

ব্যস্ততার লক্ষণ ছিল না কেবল গিন্নীমার।

কোন কিছু ঘটলে তিনি শান্তভাবে ঠাকুরদালানে গিয়ে সতেন। মনে মনে কি করতেন তিনিই জানেন, কিন্তু খে একটা কথাও বলতেন না। নিঃশব্দে বসে থাকতেন।

দু'দিন গেল শুধু আঁতুর-ঘর বীজাণুমুক্ত করতে। নতুন াট-বিছানা এবং টেবিল এল। সহরের সবচেয়ে বড় াক্তার এল প্রসব করাবার জন্যে। সঙ্গে একজন মিড-য়াইফ এবং দু'জন নার্স।

সূতিকাগারে যাওয়ার আগে মালতী তার নিজের াশের ঘরে খাটে শুয়ে ছিল। মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন। কিন্তু াটের কোণে ভোরের চাঁদের মত বিবর্ণ হাসি।

সারদা কাছে এসে দাঁড়াল।

বাইরে বৃন্দাবনচন্দ্রের হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে।

মালতী বললে, হাঁক-ডাক শুনছিস?

সারদা বললে, কদিন ধরেই ত বাবুর এই চলছে। ত্রে ঘুমোন ত?

—কি জানি।

—সকাল থেকে অন্ততঃ বিশবার এঘরে এসেছেন আর য়ে গেছেন।

—জানি। ইচ্ছে করে চোখ বন্ধ করে পড়েছিলাম। াড়া দিই নি।

—কেন?

—ভাল লাগে না।

—যাই বলুন, বাবু কিন্তু আপনাকে ভালবাসেন। বারে তা বোঝা গেল।

একটা দমকা যন্ত্রণায় মালতী মুখ বিকৃত করলে। ামলে নিয়ে বললে, কি জানি। মানুষটাকে ঠিক বুঝতে ারলাম না। তিনদিন আগেও নিষ্ঠুরভাবে বেত মেরেছে।

একটু পরে বললে, তোরা পাঁচজনে মিলে ব্যাপারটা যা দাঁড় করিয়েছিস, মনে হচ্ছে, আমি যেন দিগ্বিজয়ে যাচ্ছি। কষ্ট হচ্ছে, হাসিও পাচ্ছে। গেরস্তঘরের মেয়ে, এমন রাজকীয় সমারোহের সঙ্গে পরিচয় নেই। এতে আমার ভয় বাড়ছে বৈ কমছে না। কিন্তু থামাই কাকে বল? বাড়িসুদ্ধ সবাই যেন গাজনে মেতেছে।

সারদা ওর মাথার চুল বিন্যস্ত করতে করতে বললে, আমাদের দোষ কি বৌরাণী? কত বড় একটা ব্যাপার। এত বড় মহামানী বংশে প্রথম ছেলে আসছে। গাজনের এখন কি দেখছেন? ছেলে হওয়ার পরে দেখবেন, শাঁখের আওয়াজে কানে তালা ধরে যাবে।

মালতী হাসলেঃ সে বেশ বুঝতে পারছে। কিন্তু ছেলে না হয়ে যদি মেয়ে হয়?

—ধুমধামের তাতেও কিছু কসুর হবে না। কিন্তু বাবু হয়ত একটু ক্ষুণ্ণ হবেন। গিন্নীমাও।

মালতী চুপ করে রইল।

তারপরে চার চাকার একটা ঠেলাগাড়ি করে মালতীকে সূতিকাগারে নিয়ে যাওয়া হ'ল। যাওয়ার সময় অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও মালতী চারদিকে একবার চাইল। দূরে একটা থামের কাছে বৃন্দাবনচন্দ্র পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে। পাশে পাশে চলেছে সারদা। গিন্নীমাকে কোথাও দেখা গেল না। বোধহয় তিনি ঠাকুরদালানে।

সারদা ফিসফিস করে জিগ্যেস করলে, কাকে খুঁজছেন বৌরাণী?

মালতী সাড়া দিলে না। ঠিক কাকে খুঁজছে, তা বোধহয় সে নিজেও জানে না।

সারদা জিগ্যেস করলে, বাবুকে কাছে ডাকব?

মালতী ঘাড় নাড়লেঃ না।

বাইরে কাতার দিয়ে ঝি-চাকর দাঁড়িয়ে। আর বন্ধ দ্বারের আড়ালে যন্ত্রণায় মালতী ছটফট করছে। মুখ রক্তহীন। দুই হাতের মুঠো শক্ত। দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ হচ্ছে। চোখ বন্ধ।

সৃষ্টির সুরু থেকেই জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর ধ্বস্তাধ্বস্তি চলে আসছে। কখনও জীবন জিতছে, কখনও বা মৃত্যু। মালতী দিগ্বিজয়ের কথা মিথ্যা বলে নি। দিগ্বিজয়ই বটে। জীবনের রথ চলেছে দিগ্বিজয়ে।

ঘণ্টা দুই চলল ধ্বস্তাধ্বস্তি।

ঘণ্টা দুই বললে ভুল হবে। সর্বক্ষেত্রে সময়কে ঘণ্টার মাপে মাপা যায় না। জীবন-মৃত্যুর সংগ্রামে নয়ই। কালের ধারা-প্রবাহ এক এক সময় অনন্তের মধ্যে হারিয়ে যায়। তখন আর তাকে ঘণ্টা মিনিটের মাপে মাপা যায় না।

বন্ধ দ্বারের অন্তরালে যখন অনন্তকালের লীলা চলছিল, বাইরে খণ্ডকালের মাপে তখন সময়টা ওই রকমই হবে।

বারান্দার দেওয়াল-ঘড়িটা রেডিওর সঙ্গে মিল করে নেওয়া হয়েছে। বৃন্দাবনচন্দ্রের হাতের ঘড়িটাও। সন্তানের জন্মের সময় কি, নিখুঁতভাবে জানা দরকার। দৈবজ্ঞ তাই দিয়ে জাতকের জন্মকোষ্ঠী তৈরি করবে। তাহ থেকে তার ভবিষ্যৎ জানা যাবে।

অপেক্ষমান জনতা উৎকণ্ঠিতভাবে দাঁড়িয়ে। মাছি নড়ে ত তারা নড়ে না।

নীড়ের নিস্তব্ধতা।

বন্ধ দ্বার ভেদ করে মাঝে মাঝে প্রসূতির শীর্ণ আর্তনাদ কানে আসছে। পর পর কয়েকবার। ও কার চিৎকার? জীবনের, না মৃত্যুর?

আবার একটা দীর্ঘতর আর্তনাদ।

তারপরেই সুগভীর স্তব্ধতা।

গভীর উৎকণ্ঠায় সবাই স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে।

একটু পরেই সূতিকাগারের দরজা ঈষৎ উন্মুক্ত হ'ল। আর তার ফাঁক দিয়ে নার্সের মুখ বেরিয়ে এল:

ছেলে।

সঙ্গে সঙ্গে শিশুর কান্না।

জীবনের জয়শঙ্খ।

বিমূঢ় জনতা চকিতে সচেতন হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খধ্বনিতে সমস্ত গৃহ মুখরিত হয়ে উঠল।

শঙ্খধ্বনি যেন থামতে চায় না।

বৃন্দাবনচন্দ্র তাঁর শোবার ঘরে গিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিলেন। ভদ্রলোকের বোধহয় উৎকণ্ঠায় গলা শুকিয়ে এসেছিল। একটু ভিজিয়ে নেওয়া দরকার।

এতক্ষণ পরে গিন্নীমা এলেন।

ঝি-চাকরেরা সমস্বরে চিৎকার করে উঠল: আমাদের বকশিস গিন্নীমা, আমাদের বকশিস!

গিন্নীমার ঠোঁটে মৃদু হাসি।

বললেন, পাবি। ব্যস্ত হচ্ছিস কেন? তোদের পাওন কে মারে? ষষ্ঠী পুজোটা হয়ে যাক, দাঁড়া।

একটু পরে বেরিয়ে এলেন বড় ডাক্তার। ফি-এর টাক পকেটে পুরে চলে গেলেন।

আরও খানিক পরে মিড-ওয়াইফ।

নার্সেরা রইল।

জ্ঞান হয়ে চোখ মেলে মালতীর প্রথম প্রশ্ন: কি হয়েছে?

নার্সেরা সমস্বরে বলে উঠল: ছেলে: ছেলে ছেলে। চমৎকার ছেলে হয়েছে। সুন্দর ছেলে হয়েছে দেখবেন?

ছেলেকে পরিষ্কার করানো হয়ে গিয়েছিল। একটি নার্স তাকে কোলে করে নিয়ে এসে দেখালে।

মালতী দুই চোখে সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করে শিশুটিকে দেখলে। তারপর ক্লান্তিতে তার চোখ বন্ধ হয়ে এল। শুধু ক্লান্তি। নইলে মুখ প্রশান্তিতে ভরে থাকত।

তার ছেলে হয়েছে। বংশধর ছেলে। এই বংশের ধারা সে রক্ষা করবে।

মুখে কাউকে কিছু বলে নি, কিন্তু মনে মনে গত কয়েক মাস সে পুত্র-সন্তান কামনা করে এসেছিল। তার কামনা পূর্ণ হয়েছে। মনে গভীর প্রশান্তি।

আর ভয় নেই। এখন সে এ বাড়ীর বংশধরের জননী। যেমন গিন্নীমা তার স্বামীর জননী। যে কারণে তাঁর এত দুর্দান্ত প্রতাপ। এতদিনে সত্য সত্য সে গিন্নীমার স্থলাভিষিক্ত হ'ল। আর সে কাউকে ভয় করবে না। শাশুড়ীকে না, স্বামীকেও না।

মালতীর শরীর ক্লান্ত, মন অবসন্ন। কিন্তু এই কথাটা ভাবতেই সে একটা প্রচণ্ড শক্তি অনুভব করলে।

ফীডিং বটলে করে সারদা দুধ নিয়ে এল। নার্স তার হাত থেকে দুধ সরিয়ে নিয়ে তাতে একটু ভাইনাম গ্যালিসাই দিয়ে একটু একটু করে মালতীকে খাইয়ে দিলে।

দুধটুকু খেয়ে মালতী সারদার দিকে চেয়ে হাসলে।

সারদা জিগ্যেস করলে, এখন একটু সুস্থ বোধ করছেন, বৌরাণী?

জবাব না দিয়ে মালতী শুধু একটু হাসলে! তার ঠোঁট ক্তহীন। সেজন্যে হাসিটা রহস্যময় বোধ হচ্ছিল।

সারদা সহাস্যে বললে, দেখ্‌লেন বৌরাণী, আমি লেছিলাম, ছেলে হবে।

সারদা কবে বলেছিল এবং আদৌ বলেছিল কি না লতী তা স্মরণ করবার প্রয়োজন বোধ করলে না। শু হাসলে।

জোরে কথা বলতে মালতীর কষ্ট হচ্ছিল। চোখের ারায় সারদাকে কাছে ডাকলে। অস্ফুটকণ্ঠে জিগ্যেস রলে, মা জানেন?

সারদা খিল খিল করে হেসে উঠল: তা আর জানবেন ? শাঁখের শব্দে পাড়াসুদ্ধ লোক টের পেয়ে গেছে। ল নি, গাজন সুরু হবে। গাজনই সুরু হয়েছিল। ন্দের বছর দেখে গিন্নীমা উৎসাহের সঙ্গে ঠাকুরদালান কে উঠে এসেছিলেন। বলতে হয় নি, ছেলে না মেয়ে।

তার পর গলা নামিয়ে বললে, আর বাবু একটু দাঁড়িয়ে থেকেই ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলেন।

কেন, তা মালতীকে বলবার দরকার ছিল না। মালতী জানে, সুখের সময় বৃন্দাবনচন্দ্রের মদ্যের প্রয়োজন হয়, দুঃখের সময়ও। অর্থাৎ কি সুখের, কি দুঃখের কোন একটা উপলক্ষ্য ঘটলেই বৃন্দাবনচন্দ্রকে মদ্যপান করতে হয়। অন্ততঃ সেটাকে তিনি অতিরিক্ত মদ্যপানের কৈফিয়ৎ হিসাবে ব্যবহার করেন।

শুনে মালতী হাসলে। সেই হাসির মধ্যে যেন একটু-খানি কৌতুক প্রচ্ছন্ন ছিল।

যাক, তার পুত্র-সন্তান হওয়ায় বাড়ীর সকলেই খুশী। তাতে অবশ্য আশ্চর্যের কিছু নেই। মেয়ে হ'লেও যে সবাই দুঃখিত হ'তেন, তা নয়। প্রথম সন্তান যা হয়, তাই ভাল।

ক্রমশঃ

—

বিদেশের কথা

শ্রীযোগনাথ মুখোপাধ্যায়

ম্বিয়া ঃ

পশ্চিম আফ্রিকায় ব্রিটেনের শেষ উপনিবেশ গাম্বিয়া ২ বছর বাদে গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ র। আফ্রিকার মূল ভূখণ্ডে ব্রিটেনের চোদ্দটি উপ-বেশ ছিল, গাম্বিয়া স্বাধীন হওয়ার পর শুধু রোডেশিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তর্গত বেচুয়ানাল্যাণ্ড, বাসুতো-াণ্ড ও সোয়াজিল্যাণ্ডের স্বাধীনতা বাকি রইল। দেশগুলির সঙ্গেও ব্রিটিশ সরকারের স্বাধীনতা সম্বন্ধে লাপ-আলোচনা চলছে এবং এবিষয়ে কোন সন্দেহ ই যে, অদূরবর্তীকালেই তারা স্বাধীন রাষ্ট্রসমাজের ানিত সদস্যরূপে স্বীকৃতি লাভ করবে এবং তার পরেই াফ্রিকায় ৪৭ লক্ষ বর্গমাইল আয়তনের ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তীতের ইতিহাসে পরিণত হবে। অবশ্য আফ্রিকার ন্যায় প্রাক্তন ব্রিটিশ উপনিবেশের মত গাম্বিয়াও কমন-ওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। শুধু তাই নয়, গাম্বিয়া ব্রিটেনের রাষ্ট্রপ্রধানকে তার নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধানরূপে গ্রহণ করেছে। গাম্বিয়া হবে আফ্রিকার ৩৬তম স্বাধীন রাষ্ট্র ও কমনওয়েলথের ২১তম সদস্য।

গাম্বিয়া অতি ক্ষুদ্র দেশ। মাত্র চার হাজার বর্গমাইল আয়তনের ঐ দেশটির লোকসংখ্যা তিন লক্ষ ষোল হাজার, এবং শুধুমাত্র বাদামের উপরেই তার জাতীয় অর্থনীতির সম্পূর্ণ নির্ভর। কিন্তু দারিদ্র্যের চেয়েও গাম্বিয়ার বড় ভয় তার প্রতিবেশী রাষ্ট্র সেনেগল। পশ্চিম আফ্রিকার মানচিত্রের দিকে তাকালেই দেখা যাবে সিংহের মুখের ভিতর একটি আঙুলের মত সেনে-গলের অভ্যন্তরে কোন রকমে শঙ্কিত অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রেখেছে গাম্বিয়া। দেশটির একমাত্র পশ্চিম উপকূল উন্মুক্ত, আর সকল দিকে তাকে ঘিরে রেখেছে সেনেগল।

গাম্বিয়া নদীর উভয় তীরে অবস্থিত দেশটির প্রস্থ মাত্র ১৫ থেকে ৩০ মাইল ও দৈর্ঘ্য ২০০ মাইল। সেনেগল বরাবরই গাম্বিয়ার উপর দাবি জানিয়ে এসেছে এবং সে দাবি সরাসরি উপেক্ষিত হয়নি কোনদিন। বলা হয়েছে, স্বাধীনতার পর গাম্বিয়া তার ভবিষ্যৎ স্থির করবে। এ-ব্যাপারে প্রধান বাধা দু'টি; গাম্বিয়া ব্রিটিশ উপনিবেশ, এ-কারণে তার ভাষা ইংরেজী, আর সেনেগল প্রাক্তন ফরাসী উপনিবেশ বলে তার ভাষা ফরাসী। সুতরাং ভাষা-বৈষম্য ঐক্যের পথে একটি বড় বাধা। দ্বিতীয় বাধা আরও গুরুত্বপূর্ণ। স্বাতন্ত্র্যসচেতন গাম্বিয়ার তিন-লক্ষ অধিবাসী সেনেগলের বত্রিশ লক্ষ লোকের মধ্যে নিজেদের হারিয়ে ফেলতে চায় না।

সেনেগলের বর্তমান প্রেসিডেন্ট লিওপোল্ড সেংহোর যতদিন ক্ষমতাসীন থাকবেন ততদিন হয়ত গাম্বিয়ার স্বাধীনতা হারানোর সম্ভাবনা নেই। কারণ সেংহোর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শ্রদ্ধাভাজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের নীতি ও আদর্শে আস্থাশীল উদারপন্থী নেতা। কিন্তু ভবিষ্যতে যে কোনদিন সেনেগল-প্ররোচিত সামরিক অভ্যুত্থান গাম্বিয়ার বর্তমান শাসকদের ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে এই আশঙ্কা গাম্বিয়াবাসীদের আছে। এইজন্যই গাম্বিয়ার প্রধান তিনটি রাজনৈতিক দল নিজেদের বিভেদ ভুলে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ডেভিড কুয়েসি জওয়ারার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। জওয়ারা উদারপন্থী রাজনীতিক এবং গাম্বিয়াবাসীদের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন। তিনি বলেন, গাম্বিয়ার প্রতিটি শত্রুর সঙ্গে পর্যন্ত তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় আছে। জওয়ারার নেতৃত্বে গাম্বিয়া ধীরে ধীরে অনন্যনির্ভর রাষ্ট্ররূপে, গড়ে উঠবে গাম্বিয়াবাসী সকল নরনারী এবিষয়ে নিঃসন্দেহ।

কেনিয়ায় হত্যাকাণ্ড :

পূর্ব আফ্রিকার দেশগুলিতে ভারতীয়-বিরোধী মনোভাব ক্রমে কি সাংঘাতিক হয়ে উঠছে কেনিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আফ্রিকার দেশগুলির মধ্যে কেনিয়াই ভারতীয়দের প্রতি সর্বাধিক সহানুভূতিশীল এবং প্রেসিডেন্ট কেনিয়াট্টা, টম এমবয়া প্রমুখ কেনিয়ার বিশিষ্ট জন-নায়করা বারবার একথা বলেছেন যে, কেনিয়াবাসী ভারতীয়রা নিজেদের ভারতীয় না ভেবে কেনিয়ার নাগরিক ভাবলেই কোন সমস্যা থাকবে না। কিন্তু কেনিয়া পার্লামেন্টের সদস্য পিও পিস্টোর হত্যায় কেনিয়াবাসী ভারতীয়দের রীতিমত বিচলিত করেছে। পিস্টো গোয়ার অধিবাসী হ'লেও তাঁর জন্ম নাইরবিতে এবং কর্মক্ষেত্রও ছিল কেনিয়া। শুধু তাই নয়, কেনিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার অভিযোগে ঐ রাষ্ট্রের প্রাক্তন ব্রিটিশ শাসকরা তাঁকে দীর্ঘকাল বন্দী করে রাখেন। কিন্তু কেনিয়ার এমন একজন অকৃত্রিম শুভাকাঙ্ক্ষী গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী আফ্রিকান আততায়ীদের গুলীতে নিহত হয়েছেন। মিঃ পিস্টোর মত লোককেও যদি আফ্রিকানরা তাদের আপনজন বলে গ্রহণ করতে না পারে তবে অন্য ভারতীয়রা যে তাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শঙ্কিত হবে, এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। প্রেসিডেন্ট কেনিয়াট্টা অবশ্য পিস্টোর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং আততায়ীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তি-বিধানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু কেনিয়া সরকার যদি ভারতীয়দের জীবন সম্পদ্ ও মর্যাদা রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে না পারেন তবে তার ফলভোগ শেষ পর্যন্ত ভারতকেই করতে হবে। পূর্ব-আফ্রিকার কেনিয়া, উগাণ্ডা, তানজানিয়া, মালয়ি, জাম্বিয়া প্রভৃতি দেশগুলির সঙ্গে ভারত সরকারের অনতিবিলম্বে এসম্বন্ধে বিস্তৃত ও ফলপ্রসূ আলোচনা হওয়া উচিত।

ব্রিটেনে শ্রমিক শাসন :

দীর্ঘ তের বছর ও চারটি সাধারণ নির্বাচনের পর মাত্র চার ভোটের সংখ্যাধিক্যে শ্রমিক দল গত অক্টোবর মাসে ব্রিটেনের শাসনাধিকার লাভ করেন। কিন্তু স্বভাব-রক্ষণশীল ব্রিটিশ জাতি এই ক্ষণিকের বিচ্যুতিটুকুকে কিছুতেই যেন মানিয়ে নিতে পারছেন না-বলে মনে হয়। ইতিমধ্যে ব্রিটেনে পাঁচটি উপনির্বাচন হয়ে গেছে এবং তার মধ্যে চারটিতে রক্ষণশীল দল জয়ী হয়েছেন। শ্রমিক দল একটিতে কোন রকমে জয়ী হয়েছেন এবং আর একটি মর্যাদার লড়াইয়ে পরাস্ত হয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ বিশেষভাবে অনিশ্চিত করে ফেলেছেন। অক্টোবরের সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিক দলের বিশিষ্ট নেতা প্যাট্রিক গর্ডন-ওয়াকার স্মেথিক নির্বাচন কেন্দ্রে পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন তাঁকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত করেন এবং পার্লামেন্টে জোর গলায় ঘোষণা করেন যে, রক্ষণশীলপ্রার্থী ঘৃণ্য বর্ণবিদ্বেষী নীতি অনুসরণ করে মিঃ গর্ডনওয়াকারকে পরাস্ত করেন। স্মেথিকের ভোটদাতারা বিভ্রান্ত না হ'লে তাঁর জয় অনিবার্য হ'ত, তারপরেই গর্ডনওয়াকারকে হাউস অফ কমন্সের সদস্য করার জন্য বিশিষ্ট শ্রমিক-নেতা সোরেনসেন লর্ডস হাউসের সদস্যপদ গ্রহণ করেন ও তাঁর নির্বাচন কেন্দ্র লেটনে গর্ডনওয়াকার পুনরায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। কিন্তু

আশ্চর্যের বিষয় যে, যে লেটন কেন্দ্র গত সাতাশ বছর ধরে শ্রমিক দলপ্রার্থীদের ক্রমান্বয়ে নির্বাচিত করেছে ও গত অক্টোবরেও মিঃ সোরেনসেন সেখান থেকে সাত হাজার ভোট বেশী পেয়ে জয়ী হন, যেখানেও মিঃ গর্ডন ওয়াকার পুনরায় ২০৫ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন। ফলে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং শ্রমিক দলের সংখ্যাধিক্য মাত্র তিনে এসে দাঁড়ায়। সংখ্যাধিক্য একটু বেশী রাখার জন্য শ্রমিক দল রক্ষণশীল দলের একজনকে স্পীকার করেছেন। কিন্তু মাত্র চার ভোটের জোরে কোন মন্ত্রিসভাই দীর্ঘদিন স্থায়ী হ'তে পারে না। সুতরাং শ্রমিকদলকে হয়ত এই বছরের শেষেই নতুন নির্বাচনের জন্য আহ্বান জানাতে হবে। তারপর পুনরায় শ্রমিক দল জয়ী হয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারবেন এমন আশা শ্রমিক দলের অতি বড় সমর্থকের মনেও আছে বলে মনে হয় না।

বন-কায়রো বিরোধ :

বন সরকারের দাবি, সারা জার্মানীকে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার শুধু তাঁদেরই আছে; সুতরাং অকম্যুনিষ্ট কোন দেশ যদি পূর্ব জার্মান সরকারকে স্বীকৃতি জানায় তবে পশ্চিম জার্মানী সেদেশের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করবে। পশ্চিম জার্মানীর এই দাবি মেনে নিয়ে সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র এতদিন পূর্ব জার্মানীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে নি। কিন্তু পশ্চিম জার্মানী হঠাৎ আরব জগতের এক নম্বর শত্রু ইস্রায়েলকে ব্যাপক সামরিক সাহায্য দিতে সুরু করায় সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট নাসের অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং পশ্চিম জার্মানীকে একটু শিক্ষা দিতে পূর্ব জার্মানীর কম্যুনিষ্ট-নায়ক ওয়াল্টার উলব্রিস্টকে কায়রো সফরে আমন্ত্রণ জানান। প্রেসিডেণ্ট নাসের একথাও বন সরকারকে জানিয়ে দেন যে, অবিলম্বে পশ্চিম জার্মানী ইস্রায়েলকে অস্ত্র সাহায্য বন্ধ না করলে তাঁর দেশ পূর্ব জার্মানীকে স্বীকৃতি জানাবে। পশ্চিম জার্মানী থেকেও তখন কায়রো সরকারকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, কায়রোর বন-বিরোধী নীতি পরিবর্তিত না হ'লে সব রকমের বৈষয়িক সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হবে; গত কয়েক বছরে প্রায় সাড়ে চার শ' কোটি টাকার সাহায্য পশ্চিম জার্মানী মিশরকে দিয়েছে। কিন্তু সাহায্য বন্ধের হুমকিতেও প্রেসিডেণ্ট নাসের বিচলিত না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত পশ্চিম জার্মানীকেই কিছুটা নরম হ'তে হয়েছে। কারণ মিশর তথা সমগ্র আরব জগতে ব্যবসার বাজার বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা আছে পশ্চিম জার্মানীর। বন সরকার শেষ পর্যন্ত ইস্রায়েলে অস্ত্র পাঠান বন্ধ করতে সম্মত হন এবং কায়রো সরকারও স্বীকার করেন যে, পূর্ব জার্মানীকে আপাতত তাঁরা কোন স্বীকৃতি জানাবেন না। কিন্তু এতেই বন-কায়রো মনোমালিন্যের অবসান ঘটবে বলে মনে হয় না। কারণ, পূর্ব জার্মানীর কম্যুনিষ্ট নায়ককে যেভাবে কায়রোতে রাজকীয় সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছে সেটা বন সরকারের পক্ষে সহজভাবে নেওয়া সম্ভব হবে না। তবে কায়রোর প্রতি অতিমাত্রায় বিরূপ হ'লে আরব জগতকে যে আরও কম্যুনিষ্ট পক্ষে ঠেলে দেওয়া হবে একথাটা কায়রো সম্বন্ধে নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বন বা পশ্চিমী দুনিয়াকে অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে।

ভিয়েৎনাম :

ভিয়েৎনাম পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল ও দুর্যোগপূর্ণ হয়ে উঠছে। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আত্মকলহে বিপর্যস্ত দক্ষিণ ভিয়েৎনামে কোন সরকারই স্থায়ী হ'তে পারছে না, আর তার ফলে ঐ খণ্ডিত উপদ্বীপটিতে কম্যুনিষ্ট গেরিলা ভিয়েৎ কঙদের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইতিমধ্যে উত্তর ভিয়েৎনাম ও কম্যুনিষ্ট অধিকৃত লাওসের মধ্য দিয়ে ভিয়েৎ কঙদের সংযোগ স্থাপিত হয়েছে, যার ফলে চীন ও উত্তর ভিয়েৎনামের কাছ থেকে ব্যাপক সামরিক সাহায্য পেতে তাদের কোনই অসুবিধা হচ্ছে না। মার্কিন সাহায্য ছাড়া তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সামান্যতম শক্তিও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের ক্ষণভঙ্গুর সরকারের নেই। আজ যদি দক্ষিণ ভিয়েৎনাম থেকে মার্কিন সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র প্রত্যাহৃত হয় তবে এক সপ্তাহের মধ্যেই সমগ্র দক্ষিণ ভিয়েৎনাম কম্যুনিষ্টদের দখলে চলে যাবে। এই নিষ্ঠুর সত্যটা বোধহয় যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে কিছুতেই মেনে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, কারণ এ পর্যন্ত দু'হাজার কোটি টাকা যুক্তরাষ্ট্র ব্যয় করেছে সেখানে। তা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র সরকার এবিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, সমগ্র ভিয়েৎনাম কম্যুনিষ্ট-কবলিত হ'লে লাওসেও দক্ষিণপন্থী বা নিরপেক্ষদের অস্তিত্ব থাকবে না, এবং এইভাবে সমগ্র ইন্দোচীন কম্যুনিষ্ট অধিকারে চলে যাবে। এই সকল কারণে ভিয়েৎনামে মার্কিন সামরিক তৎপরতা দিনে দিনে সাংঘাতিক রূপ নিচ্ছে, যেটা যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের কাছেও ভাল লাগছে না। ঐ দেশের বিভিন্ন কাগজে এখন সরকারের ভিয়েৎনাম

নীতির তীব্র সমালোচনা হচ্ছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থক বিশ্বের বিভিন্ন মহলে অবিলম্বে ভিয়েৎনাম ত্যাগের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে দাবি জানান হচ্ছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ইজ্জতের প্রশ্নটা খুব বড় হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়। সুতরাং সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা বিস্তারে দৃঢ়সঙ্কল্প জঙ্গী চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের একটা বড় রকমের সংঘর্ষ হয়ত শেষ পর্যন্ত অনিবার্য হয়ে পড়বে।

ভিয়েৎনামে যুক্তরাষ্ট্রের জঙ্গী জেহাদ কম্যুনিষ্ট দুনিয়ার বিশেষ উপকার করেছে। আদর্শ ও নীতির ব্যাপারে মতবৈষম্য কম্যুনিষ্ট দেশ ও দলগুলিকে দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরে বিভক্ত করে দিয়েছিল। এখন তাদের বিরোধ বহু পরিমাণে দূর হয়েছে এবং এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, মার্কিন সরকারের নীতি যত মার-মুখী হবে—কম্যুনিষ্ট দুনিয়ার ঐক্য ততই দৃঢ় ও উগ্র হয়ে উঠবে।

নেপালে খ্রীষ্টান মিশনারী

জুল্‌ফিকার

ক্যাথলিক মিশনারীরা বহুদিন ধরে নেপালে তাঁদের কর্ম্মক্ষেত্র গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আদৌ সফল হ'তে পারেন নি। নেপালে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের ক্ষমতা ছিল অপ্রতিহত এবং রাণারা ছিলেন তাঁদের অনুগত। এই ব্রাহ্মণ যাজকদের বিরোধিতায় পাদ্রীরা কিছুই সুবিধা করে উঠতে পারেন নি। ভস্মাচ্ছন্ন কৌপীনধারী সাধুর বেশে তাঁদের চলাফেরা করতে হয়েছে—বিশেষ যাঁরা সীমান্ত অতিক্রম করে তিব্বতে যেতেন।

তিব্বত ও নেপালে খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের ক্রিয়াকলাপের ধারাবাহিক বিবরণী সম্প্রতি রোমের Italian Institute for the Middle and Far East নামক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে Luciano Petech-এর সম্পাদনায় প্রকাশ হচ্ছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নিষিদ্ধ দেশ—নেপাল ও তিব্বতে ইউরোপীয় মিশনারীদের পায়ের ধুলো পড়ে। অনেকেরই কিন্তু ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে যে, প্রথম ইউরোপীয় হিসাবে নেপাল রাজ্যে প্রবেশ করেছিলেন জন কোম্পানীর (East India Company) জনৈক সামরিক কর্ম্মচারী।

আসলে সর্ব্বপ্রথম ইউরোপীয় যিনি নেপালে এসেছিলেন তিনি হচ্ছেন পর্ত্তুগীজ পরিব্রাজক পাদ্রী কাব্রাল (Joao Cabral)। ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা প্রতাপমল্লের সময় তিনি নেপালে যান, তিব্বতের শিগাৎসী থেকে বাংলায় ফেরার পথে, তখনকার দিনে গোয়ার পর্ত্তুগীজ ধর্মযাজকদের নেপালের চেয়ে তিব্বতের উপরেই লক্ষ্য ছিল বেশী। অষ্ট্রিয়ান জেস্যুইট গ্রুবার (Gruber) এবং বেলজিয়ান দোরভিল (d'Orville) দক্ষিণ সমুদ্রের বিস্তৃত অঞ্চল-ব্যাপী তৎকালীন প্রবলপ্রতাপ ডাচদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এড়িয়ে, হাঁটাপথে চীন ও ভারতের মধ্যে কোন সরাসরি বাণিজ্যের যোগাযোগ সম্ভব কি না—সে-বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে চীন থেকে পদব্রজে হিমালয় পর্ব্বতের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করে, নেপালের গহন অরণ্য ও বন্ধুর পথ বাহিয়া, অতিকষ্টে আগ্রায় এসে উপস্থিত হন। কিন্তু তাঁর এই সুদীর্ঘ, ক্লেশকর ও দুঃসাহসিক ভ্রমণের কোন বিবরণ রচনা করে যান নি।

মোগল সম্রাটদের আমলে জেস্যুইট পাদ্রীরা নেপালে তাঁদের একটা মিশন কেন্দ্র স্থাপন করতে মনস্থ করেছিলেন। জেস্যুইট সম্প্রদায়ের জনৈক আর্ম্মানী বণিক চীন দেশ থেকে, নেপাল পার হয়ে ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে পাটনায় এসে পৌছান। তাঁরই মুখে জেস্যুইট পাদরীরা খবর পেলেন যে নেপালের রাজা খ্রীষ্টধর্ম্মের অনুরাগী এবং চেষ্টা করলে তাঁকে ধর্ম্মান্তরিত করা সম্ভব। এই সুসমাচার পেয়ে ইটালীয়ান জেস্যুইট পাদ্রী মার্ক আন্তনিও সানতুচ্চি (Santucci) নেপালে রওনা দিলেন। আর্ম্মানী ভদ্রলোকের কথায় বিশ্বাস করে নেপালে গিয়ে তাঁর কষ্ট ও

যন্ত্রণানির একশেষ। অবশেষে কয়েক মাস বহুপ্রকার ক্লেশ ভোগ করে সানতুচ্চি ভগ্নমনোরথ ও অসুস্থ হয়ে পাটনায় ফিরে এলেন। এর পর বেশ কয়েক বছর মিশনারীরা নেপাল নিয়ে আর মাথা ঘামান নি।

জেসুইটদের পর নেপালে অভিযান চালালেন কাপুচিন (Capuchin) মিশনের পাদ্রীরা। তাঁদেরও দৃষ্টি নিবদ্ধ তিব্বতের দিকে। সেকালের মুসলমান বণিকদের মুখে প্রায়ই একটা গুজব শোনা যেত যে তিব্বতে নাকি বহু প্রাচীন একদল খ্রীষ্টানের বাস আছে। এই কিংবদন্তীর পিছনে আসলে কোন সত্য ছিল না। হয়ত, রোমান ক্যাথলিকদের সঙ্গে কোন বিশেষ মঠের লামাদের ভজন পদ্ধতির খানিকটা মিল থাকায়, এই রকম জনরবের সৃষ্টি হয়েছিল (ক্যাথলিকেরা ধূপ-দীপ দিয়ে মেরী-মাতার অর্চ্চনা করে)।

কাপুচিন মিশন থেকে প্রেরিত হয়ে যাঁরা প্রথম তিব্বতে যান, তাঁরা হচ্ছেন জুসেপ্পে দা এ্যাসকোলি (Guiseppe da Ascoli) ও ফ্রান্সেস্কো মারিয়া দা তুরস্ (Fransesco Maria da Tours)। এঁরা ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে পাটনা থেকে রওনা হয়ে, সানকুশী উপত্যকা অতিক্রম করে কাঠমাণ্ডুতে এসে পৌছান। ছদ্মবেশে নেপাল রাজ্য পার হয়ে তিব্বতে প্রবেশ করতে গিয়ে তাঁরা ব্যর্থকাম হ'লেন। যা হোক, শেষ পর্য্যন্ত শুল্ক হিসাবে তিব্বত সরকারকে কিছু অর্থ দিয়ে, তাঁরা লামায় এসে উপস্থিত হলেন। এখানে এসে তাঁদের দুর্দ্দশার অবধি ছিল না। ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সেস্কো ভারতে ফিরবার পথে কাঠমাণ্ডুতে আটকা পড়লেন। তখন তিনি কপর্দ্দকশূন্য। নেপাল সরকার তার কাছে তাদের প্রাপ্য টোল দাবি করে বসল। পাদ্রী তা দিতে সম্পূর্ণ অপারগ হওয়ায়, সরকারী হুকুমে তাঁকে বন্দী করা হ'ল। ১৭০৭ সালে ৮ই মার্চ্চ পাদ্রী জুসেপ্পে কাঠমাণ্ডু থেকে তাঁর যে প্রথম পত্র পাঠিয়েছিলেন, সেটা পড়ে বেশ বোঝা যায় যে, আর্থিক সমস্যাটাই তাঁদের কাছে সর্বাধিক প্রকট হয়ে উঠেছিল। এই সুদীর্ঘ চিঠিখানায় নেপালে সভ্যতার নানাবিধ নিদর্শন দেখে তাঁরা যে বেশ আনন্দলাভই করেছিলেন সেটা স্পষ্টই বলা হয়েছে। জুসেপ্পের এই চিঠিতে চান্দু নারায়ণ, বোধনাথ ও প্রসিদ্ধ পশুপতিনাথের মন্দিরগুলির বিস্তৃত বর্ণনা আছে। পুণ্য-সলিলা বাগমতী নদী ও সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজা প্রতাপমল্ল কর্তৃক পুত্রের স্মৃতিরক্ষার জন্য তৈরী কৃত্রিম হ্রদ (রাণী পোখরী) এবং তার মধ্যস্থিত পাথরের হস্তিমূর্ত্তির কথাও উল্লেখ আছে (উনবিংশ শতাব্দীতে হ্রদের চারপাশ পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে)।

১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দে জুসেপ্পে যখন লাসায় ও ফ্রান্সেস্কো কাঠমাণ্ডুতে তাঁদের দুঃখের দিন গুনছেন, তখন আরও দুইজন মিশনারী ফাদার ডোমিনিকো দ্য ফানো ও ব্রাদার মিকেলেঞ্জেলো দ্য বরগোনা (Borgogna) বাংলা দেশের চন্দননগর থেকে নেপালের পানে রওনা দিলেন। তাঁরা দু'জনেই চলেছেন সন্ন্যাসীর বেশে সজ্জিত হয়ে, গায়ে অঙ্গে ভস্ম লেপে। কাঠমাণ্ডুতে যখন ফ্রান্সেস্কোর সঙ্গে তাঁদের দেখা, তখন তাঁদের চিনতে পেরে ফ্রান্সেস্কো এমন সাদর সম্ভাষণ জানালেন, যে আশেপাশে লোকদের মনে সন্দেহের উদয় হ'ল। ফলে শেষ পর্য্যন্ত তারা সরকারী লোকদের হাতে ধরা পড়ে গেলেন।

সঙ্গে তাঁদের যা-কিছু সম্বল ছিল, সবই তুলে দিতে হ'ল রাণার লোকদের হাতে—রাজ সরকারের প্রাপ্য টোল, মায় ফ্রান্সেস্কোর বকেয়া পাওনা শোধ করবার জন্য।

দ্বিতীয় অভিযানও এই ভাবে ব্যর্থ হ'ল।

বছর পাঁচেক বাদ ফের আবার তিব্বতে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য একটা মিশন গঠিত হ'ল। স্থির হ'ল নেপালেও একই সঙ্গে কাজ চলবে। ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দে পাঁচজন তিব্বতযাত্রী পাদ্রী এসে পৌছুলেন নেপাল উপত্যকায়, শেষ পর্য্যন্ত কাঠমাণ্ডুতে থেকে গেলেন দু'জনা বাকী তিনজন পাড়ি দিলেন লাসার উদ্দেশে। নেপালে রইলেন ফেলিস দা মোরো ও জিওভ্যানি ফ্রান্সেস্কো। এঁদের ভাগ্য অনেকটা সুপ্রসন্ন ছিল। এঁরা দু'জনেই ছিলেন চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী। অল্পদিনের মধ্যেই জনসাধারণের কাছে সুচিকিৎসক হিসাবে তাঁদের বেশ নাম হ'ল এবং পসারও জমে উঠল। রাজা জগৎ মল্ল ওঁদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন এবং বাস করবার জন্য একটা বাড়ীও দিয়েছিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য ভাতগাঁওয়ের রাজা ভূপতীন্দ্রের সঙ্গেও এই পাদ্রী দু'জনার বন্ধুত্ব গড়ে উঠল।... ম্লেচ্ছ খ্রীষ্টান পাদ্রীদের সঙ্গে রাজার মাখামাখিটা দেশের লোকে, বিশেষ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা আদৌ সুনজরে দেখলেন না। এই নিয়ে লোকদের মধ্যে বিরুদ্ধ সমালোচনা সুরু হ'ল। অনেকেরই ধারণা হ'ল রাজা জগৎ মল্ল বোধ হয় গোপনে ওদের ধনরত্ন দিচ্ছেন। তাদের ভয়ও হ'ল পাছে রাজা খ্রীষ্টান হয়ে না যান। যা হোক যখন সবাই বুঝতে পারল রাজা বিদেশী ধর্ম্মপ্রচারকদের কোনরূপ অর্থসাহায্য করছেন না এবং স্বধর্ম্মের উপর তাঁর আস্থা বিন্দুমাত্র শিথিল হয় নি, তখন তারা নিশ্চিন্ত হ'ল। এর পর রাজা কি একটা অজ্ঞাত কারণে পাদ্রী দু'জনাকে কাঠমাণ্ডু ত্যাগ করবার নির্দ্দেশ দিলেন। তাঁরাও রাজার আদেশে কাঠমাণ্ডু পরিত্যাগ করে ভাতগাঁওয়ে রাজা ভূপতীন্দ্রের আশ্রয়ে চলে এলেন কিন্তু অর্থাভাবে শেষ পর্য্যন্ত মিশন বন্ধ করে তাদের ভারতবর্ষে ফিরে আসতে হ'ল (১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে)।

এরই কিছুদিন পরে মেক্সিকোর স্প্যানিশ ঔপনিবেশিক-দের অর্থসাহায্যপুষ্ট কাপুচিন মিশনের পাদ্রীরা ভাতগাঁওয়ে

এসে উপস্থিত হ'লেন। এই দলের অধিনায়ক ছিলেন ফাদার ট্রানক্যুইলো দ্য এপেচ্চিও (Tranquillo d'Apechhio)। রাজা ভূপতীন্দ্র তখন গত হয়েছেন, নতুন রাজা রণজিৎ মল্ল মিশনারীদের উপর মোটেই বিরূপ ছিলেন না। অনেক সময় তিনি তাঁদের ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনায়ও যোগ দিতেন।

খ্রীষ্টান মিশনারীদের উপর মহারাজের সদয় ব্যবহারের কথা মহামান্য পোপের (Pope Benedotte XIV) কানে পৌছিলে তিনি মহারাজা রাণা রণজিৎ মল্লের কাছে একখানা পত্র দেন। এর প্রত্যুত্তরে রণজিৎ মল্ল পোপকে যে চিঠি লিখেছিলেন, তা রোমের Holy Congregation for the Propagation of Faith নামক সমিতির দপ্তরে রক্ষিত আছে। নিজের অনুরূপ মর্য্যাদা দেবার জন্য তিনি পোপের নামের পূর্ব্বে দুটো 'শ্রী' যোগ করেছিলেন। চিঠিখানি সংস্কৃত-ঘেঁষা নেপালীতে লেখা। পোপের নিকট লিখিত এই চিঠিখানির মর্ম্মানুবাদ নীচে দেওয়া হ'ল :

শ্রীশ্রী জয় রণজিৎ মল্ল মহারাজার কাছ থেকে
শ্রীশ্রী চতুর্দ্দশ বেনেদেত্তো পায়াহায়া (রাজা)
সমীপে—

আপনার কুশল জানাবেন।

আপনার কুশল সমাচার জানলে খুসী হব। আপনার পত্র যথাসময়ে হস্তগত হয়েছে। ধর্ম্মের বিষয়ে যা জানতে চেয়েছেন (অর্থাৎ ধর্ম্মান্তর গ্রহণ সম্বন্ধে) বর্ত্তমানে সে ব্যাপারে কিছু করা সম্ভব হবে না। আমার প্রজাদের সম্বন্ধে কি যে বলব ভেবে পাচ্ছি নে। পাদ্রী-মহাশয়দের ডেকে বলে দিয়েছি—তাঁরা যেন তাঁদের প্রাপ্ত নির্দ্দেশ অনুযায়ী কাজ যথারীতি চালিয়ে যান। ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য তাঁরা তাঁদের পুরাতন কেন্দ্রই যেন বেছে নেন। স্বেচ্ছায় যদি কেউ আপনাদের ধর্ম গ্রহণ করে তবে সে ব্যক্তির কোন ক্ষতিই আমি করব না—অন্ততঃ এটুকু আশ্বাস আমি আপনাকে দিতে পারি।

ইউরোপ-জাত কোন শিল্পদ্রব্য আমাদের দেশে এর আগে আসে নি। আপনাকে ধন্যবাদ যে আপনার অনুগ্রহে কিছু ইউরোপে তৈরী জিনিষ পেয়েছি আর পেয়েছি পাদ্রী মহোদয়দের। যেহেতু তাঁরা আমার প্রজাদের সুখবিধান করছেন (চিকিৎসা দ্বারা রোগ নিরাময় করে), তাঁরা যাতে কষ্ট না পান সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখব।

আপনাদের দেশে দুর্লভ এমন কোন জিনিষ চেয়ে পাঠালে আমি নিশ্চয়ই তা এদেশ থেকে পাঠিয়ে দেব। বিনিময়ে আশা করি আপনিও ও দেশ থেকে এমন কিছু পাঠাবেন যা এখানে মেলা ভার। এখনকার ব্যাপারে আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমাকে আপনাদের বন্ধু বলেই মনে করবেন। আমি আপনাদের জন্য যথাসাধ্য করব।

এখানে ভাল চিকিৎসক নেই। ওখান থেকে আমার জন্য একজন দক্ষ চিকিৎসক ও একজন নিপুণ শিল্পী পাঠাবেন।

—ভাদ্র মাস, শুক্ল প্রতিপদ
৮৬৭ সন (১৭৪৪ খ্রীঃ, আগষ্ট-সেপ্টেম্বর)

যে সময়ের কথা বলছি তখন নেপাল কোন এক সার্ব্বভৌম নৃপতির অধীনে ছিল না। অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ভাতগাঁ ও কাঠমাণ্ডুতে পৃথক্ পৃথক্ রাজা ছিলেন। রাজাদের মধ্যে বেশ রেষারেষি ছিল। ভাতগাঁওয়ের রাজার দেখাদেখি এবং তাঁর উপর টেক্কা দিতে কাঠমাণ্ডুর রাজা জয়প্রকাশ মল্ল মিশনারীদের তাঁর ওখানে আসবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন।······

১৭৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে লাসা থেকে প্রত্যাগত মিশনারীরা যখন কাঠমাণ্ডুতে এসে পৌছলেন, তখন রাজা জয়প্রকাশ ওদের বাসের জন্য একটা গৃহ দান করেছিলেন। এই বাড়ীর দানপত্রটি এখনও আছে। এই দলিলে রাজার নামের সঙ্গে যে সমস্ত জমকালো উপাধি ব্যবহারের রেওয়াজ ছিল, সবই আছে।

দানপত্রটির বাংলা তর্জ্জমা নীচে দেওয়া হ'ল :

নমঃ

—যাঁর কেশদাম শ্রীপশুপতির পাদপদ্মের ধূলিরেণু রঞ্জিত (শ্রীমৎ পশুপতি-চরণ-কমল-ধূলি ধূসরিত-শিরোরোহ), যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবী মানেশ্বরীর কৃপায় উচ্চপদাধিষ্ঠিত, যিনি রঘুবংশজাত সূর্য্যকুলালঙ্কার, মহাবীর হনুমান যাঁর ধ্বজায় অঙ্কিত, যিনি রাজাধিরাজ, রাজন্যবর্গের রক্ষক ও প্রভু, দেবাদিদেবের কৃপাকটাক্ষ যাঁর উপরে নিয়ত নিবদ্ধ, যিনি হস্তী অধ্যুষিত তরাই অঞ্চল বিজয়ী গজেন্দ্র, সম্রাটশ্রেষ্ঠ যুধাজিৎ শ্রীশ্রীজয়প্রকাশ মল্লদেব সেক্রেড কনগ্রিগেশনের কাপুচিনদের ওয়নটু টোলের তুলসী থালি গৃহখানি দান করছেন।

চৌহদ্দী

জয়ধর্ম্ম সিংহের বাড়ীর পূর্ব্বে ধনচু সূর্য্যধন ও পুর্ণেশ্বরের বাড়ীর দক্ষিণে, রাজপথের পূর্ব্বে ও উত্তরে।···

রাজা জয়প্রকাশের গৌরব ও মর্য্যাদাসূচক উপাধি তাঁকে শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করতে পারে নি। গোর্খা-রাজ পৃথ্বী নারায়ণের সৈন্যদের হাতে তাঁকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। রাজা জয়প্রকাশ বীরের ন্যায় যুদ্ধ করেছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে মারাত্মকরূপে আহত হ'লে, অনুচরেরা তাঁকে পশুপতিনাথের মন্দিরে নিয়ে যায়। সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

গোর্খারা যখন সমগ্র নেপালে তাদের আধিপত্য বিস্তার

সুরু করল, সেই গোর্খা অভিযানের সময় মিশনারীরা গোর্খারাজ পৃথ্বীনারায়ণকে বহু প্রকারে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করেছিলেন। এই পাশ্চাত্ত্য ধর্মপ্রচারকদের চিকিৎসা-নিপুণতার সপ্রশংস হ'লেও পৃথ্বীনারায়ণ তাঁদের বিশেষ আমল দেন নি। হিন্দু ধর্মে তাঁর গভীর আস্থা ছিল। খ্রীষ্টধর্মের উপর জনসাধারণের ঘোর অনাস্থা দূর করতে না পেরে, শেষ পর্য্যন্ত মিশনারীরা তল্পিতল্পা গুটিয়ে কাঠমাণ্ডু ছেড়ে চলে এলেন। সাগৌলির পশ্চিমে বেত্তিয়া বলে একটা জায়গায় স্থানীয় নেপালী খ্রীষ্টানদের একটা উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে এই কলোনীর লোকদের সঙ্গে নিয়ে মিশনারীরা নীচে নেমে এলেন।

এই মিশনারীদের একজন ফাদার জুসেপ্পো দা রোভাটা সমসাময়িক নেপাল সম্বন্ধে একখানি পুস্তক রচনা করেন—প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। বইখানি ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে স্যর জন শোরের (পরবর্তীকালে ভারতের গভর্ণর) দ্বারা প্রকাশিত হয়।

এই বই থেকে জানা যায় যে নেপালের কোন কোন স্থানে ভূগর্ভে প্রচুর গুপ্তধন সঞ্চিত আছে। এগুলো হচ্ছে মন্দিরের প্রণামী-বাবদ প্রাপ্ত অর্থ ও অলঙ্কার। কোন মন্দিরে যখন প্রচুর ধনরত্ন জমে উঠত, তখন সেটা ভেঙে ফেলে, তার সঞ্চিত সমুদয় সম্পদ্ ভূগর্ভের অন্তরালে—একটার নীচে আর একটা—এইরূপ কয়েক সারি গুপ্ত প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ করে, তার মধ্যে রেখে দেওয়া হ'ত। টলু হচ্ছে এইরূপ একটা জায়গা। এই সব ধনরত্নে রাজা ব্যতীত অন্য কারও অধিকার ছিল না। নেহাৎ দায়ে না পড়লে রাজারও এই অর্থে হাত দেওয়া বারণ ছিল।

দা রোভাটা লিখছেন যে তিনি যখন নেপালে, তখন কাঠমাণ্ডুর রাজা জ্ঞানপ্রকাশ (Gainprejas) গোর্খারাজ পৃথ্বীনারায়ণের সঙ্গে যুদ্ধে নামবার ঠিক আগেই নিতান্ত অর্থ-সঙ্কটে পড়েছিলেন। রাজকোষ তখন অর্থশূন্য অথচ সৈন্যদের অনেক বেতন বাকী। রাজা জ্ঞানপ্রকাশ টলুতে অভিযান চালালেন গুপ্তধন সন্ধানের। মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে প্রথম যে গুপ্তকক্ষ (Vault) পাওয়া গেল, তা থেকে প্রায় লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা তুলে নিলেন।

আগেই বলেছি পৃথ্বীনারায়ণ গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। মিশনারীরা যাতে তাঁদের ধর্ম্ম বিস্তার না করতে পারেন সে বিষয়ে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল। অবিশ্যি তাঁদের তিনি রাজ্য থেকে একদম বহিষ্কৃতও করেন নি।

১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে পৃথ্বীনারায়ণের লোকান্তরিত হলে হলে তাঁর পুত্র প্রতাপ সিং শাহ রাজা হলেন। ইনি মিশনারীদের প্রতি বেশ সদয়-ভাবাপন্ন ছিলেন।

প্রতাপ সিং রাজা হয়ে মিশনারীদের রাজধানীতে ফিরে আসতে আমন্ত্রণ জানালেন। পশ্চিমদিকের পার্ব্বত্য রাজ্য কাসকি (Kaski) বা পাল্পা রাজ্য থেকে তাদের ডাক এল। কিন্তু এই সব রাজন্যবর্গের কাছ থেকে পৃষ্ঠ-পোষকতার আশ্বাস পাওয়া সত্ত্বেও, মিশনারীদের কাজ আশানুরূপ অগ্রসর হ'ল না। স্থানীয় লোকদের বিরুদ্ধাচরণ এর জন্য আদৌ দায়ী নয়। আসলে মিশনারীদের মধ্যে পূর্ব্বের ন্যায় নিষ্ঠা ও উৎসাহ ছিল না।

প্রতাপ সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা রাণী ও তাঁর ভাই বাহাদুর শার মধ্যে সিংহাসন নিয়ে কলহ দেখা দিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত রাণীই সিংহাসন পেলেন। বাহাদুর শা কাঠমাণ্ডু ছেড়ে বেত্তিয়ায় চলে গেলেন। সেখানকার মিশনারীরা তাঁকে একটা কঠিন ব্যাধি থেকে নিরাময় করেছিলেন।

এর পর রাণীর মৃত্যু হ'লে, বাহাদুর কাঠমাণ্ডুতে ফিরে গিয়ে রাজা হয়ে বসলেন। মিশনের লোকেরা স্বতঃই মনে ভেবেছিল, নতুন রাজার কাছ থেকে তাঁদের ডাক আসবে। ডাক শেষ পর্য্যন্ত এসেও ছিল। কিন্তু যে পাদ্রীপুঙ্গবকে কাঠমাণ্ডুতে প্রচারকার্য্যের জন্য পাঠানো হ'ল, তাঁর পরবর্ত্তী জীবন যেরূপ কালিমাময় হয়ে উঠেছিল, তাতে মিশনের লোকেরা তাঁকে শেষ পর্য্যন্ত একঘরে করতে বাধ্য হয়। ইনি তহবিল তছরুপ, নরহত্যা, গর্ভপাত প্রভৃতি অপকর্ম্মে জড়িত হয়ে পড়েন এবং শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে ভারতীয় কারাগারে কয়েদী জীবন যাপন করতে হয়।

নেপালের প্রথম ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট ক্যাপ্টেন নক্স (Knox) তাঁর স্মৃতি-কথায় নেপালে সমসাময়িক খ্রীষ্টীয় মিশন সম্বন্ধে লিখছেন :

On our arrival we found the Church reduced to an Italian padre and a native Portuguese who had been inveigled from Patna by large promises which were not made good and who would have been permitted to leave the country.

বর্ত্তমানে নেপালে যে মিশনারীরা আছেন, তাঁরা হচ্ছেন জেস্যুইট সম্প্রদায়ের। আবার আড়াই শো বছরের পর তাঁরা নেপালের কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরে এসেছেন। এবার নিছক ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশে আসেন নি। এসেছেন শিক্ষার অগ্রদূত হিসাবে। জেস্যুইট মিশন নেপালে দুটো বোর্ডিং স্কুল খুলেছেন। পাটানের উপকণ্ঠে তাঁদের প্রতিষ্ঠিত সেন্ট জাভেয়ার্স স্কুলটি (কেম্ব্রিজ ওভারসী স্কুল সার্টিফিকেট প্রিপেয়ারেটরী স্কুল) সত্যিই একটি আদর্শ বিদ্যায়তন।

আর্থিক প্রসঙ্গে

শ্রীকরুণাকুমার নন্দী

কেন্দ্রীয় সরকারের নূতন বাজেট

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে নয়া দিল্লীতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পার্লামেণ্টে আগামী ১৯৬৫-৬৬ সনের যে বাজেট পেশ করেছেন তাতে গত কয়েক বৎসরের যে ধারা অনুযায়ী বাজেট রচনা হয়ে আসছিল তার থেকে একটা মূল পরিবর্ত্তনের আভাস লক্ষ্য করা যায়। বর্ত্তমান অর্থমন্ত্রীর প্রথম দফার মন্ত্রীত্বের কাল থেকে সুরু করে কেন্দ্রীয় সরকারের ট্যাক্স নীতি, 'সহজতম উপায়ে প্রভূততম আমদানীর' (easiest methods of bringing in the maximum revenue receipts) পথ ধরে অগ্রসর হ'তে সুরু করেছিল। কৃষ্ণমাচারীর পর যখন মোরারজী দেশাই কেন্দ্রীয় অর্থ দপ্তরের ভার গ্রহণ করেন, তখন তিনি এই নীতির অধিকতম সুযোগ গ্রহণ করতে সুরু করেন, অবশ্য এর প্রথম পথপ্রদর্শক ছিলেন কৃষ্ণমাচারী স্বয়ং। এদেশে প্রত্যক্ষ ট্যাক্সের মাত্র দ্বিবিধ উপায় ছিল; ব্যক্তিগত আয়কর এবং কর্পোরেশন ট্যাক্স। উভয় ক্ষেত্রেই যথাসম্ভব করভার অবশ্যই চাপান হয়েছিল, ফলে দেশে পুঁজি সৃষ্টির গতি ক্রমেই মন্দীভূত হয়ে আসছিল বলে দেশের ব্যবসায়ী মহল আশঙ্কা করেন। কোন একটি বিশিষ্ট ভারতীয় শিল্পপতি সম্প্রতি একটি ভাষণে অভিযোগ করেন যে, এই করভার গত কয়েক বৎসরে এমন চাপ সৃষ্টি করেছে যে, মানুষের সঞ্চয় ও লগ্নীর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি প্রভূত পরিমাণে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন যে, আয়কারীর আমদানীর প্রতি টাকায় সরকার যদি চৌদ্দ আনা বাজেয়াপ্ত করে নেন, এবং ব্যবসায়ের মুনাফারও যদি তার চেয়েও অধিকতর অংশ কেড়ে নেন তবে সে কেন বেশী আয় করতে বা ব্যবসায় প্রসার করতে চাইবে?

প্রত্যক্ষ-করের সীমা

কিন্তু এতটা করেও প্রত্যক্ষ কর থেকে সরকারের নিয়ত বর্দ্ধমান চাহিদার সামান্য মাত্র অংশও মেটান সম্ভব হচ্ছিল না। এদেশে ব্যক্তিগত আয়কর দেবার মতন রোজগার করে থাকেন মাত্র ১৫ লক্ষ লোকেরও কম এবং তাঁদের মধ্যেও বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকা বা তন্নিম্ন আয়কারীর সংখ্যাই সমধিক। সরকারের শাসন সংগঠনের ব্যয় প্রতি বৎসরই বেড়ে চলেছে। ১৯৬০-৬১ সনের তুলনায় ১৯৬৪-৬৫ সন পর্য্যন্ত অতিরিক্ত ৭৮০ কোটি টাকার মত ব্যয়বরাদ্দ করতে হয়েছে। তার ওপর উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ ত আছেই। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে এই খাতে বরাদ্দের মোট পরিমাণ দাঁড়াবে ৮,০০০ কোটি টাকা। পরিকল্পনার খসড়ায় ৭৫০০ কোটি টাকার সংস্থান করা হয়েছিল, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে, অন্ততঃ আরও ৫০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হবে। এছাড়া আছে প্রতিরক্ষা বরাদ্দ। ১৯৬২ সনের অক্টোবর মাসে চীনা হামলা সুরু হবার পর থেকে এই খাতে ব্যয়বরাদ্দের প্রয়োজন সমধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। নানা দিক থেকে সরকারী ব্যয়ের চাপ যতটা সম্ভব প্রত্যক্ষ করের আমদানী থেকে মেটাবার প্রয়াসে ব্যয়কর (expenditure tax), সম্পদ-কর (wealth tax), পুঁজিবৃদ্ধি কর (capital gains tax), ইত্যাদি অন্যান্য ধরনের প্রত্যক্ষ ট্যাক্স বিধি রচনা ও প্রয়োগ করা হয়েছে। অবশ্য এর মধ্যে ব্যয়করের অন্যতম উদ্দেশ্যও ছিল, ভোগসঙ্কোচের দ্বারা চাহিদা বৃদ্ধি সংযত করা। অন্যপক্ষে সম্পদ-কর, উত্তরাধিকার কর (inheritance tax), পুঁজিবৃদ্ধি কর ইত্যাদির পরোক্ষ উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তিগত অধিকারে প্রভূত পরিমাণ সম্পদ্ ও আর্থিক শক্তির ঘনতা (concentration of wealth and economic power) সংযত করা।

কিন্তু এ সকলের সমবেত আমদানীর দ্বারা প্রসারমান সরকারী ব্যয়ের সামান্য অংশ মাত্র পূরণ করা সম্ভব ছিল। অতএব বিভিন্ন ধরনের পরোক্ষ করের প্রয়োগের দ্বারা সরকারী চাহিদা মেটাবার আয়োজন ক্রমে বেড়েই চলেছিল। প্রথম পরিকল্পনাকালে ভূতপূর্ব্ব কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীচিন্তামন দেশমুখ কতকগুলি রপ্তানী মালের উপরে প্রভূত পরিমাণে অতিরিক্ত রপ্তানী কর ধার্য করে একটা মোটা রকমের আমদানীর প্রয়াস করেছিলেন। যথা, কতকগুলি পাটজাত শিল্পদ্রব্যের উপরে তিনি একটা মোটা রকমের

অতিরিক্ত রপ্তানী কর ধার্য্য করেছিলেন। সে সময়ে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ভারত থেকে প্রভূত পরিমাণে চট, চটের থলে ইত্যাদি আমদানী করছিলেন। অভ্র, সাধারণ মানের চা ইত্যাদির রপ্তানীও খুব বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ সকল দ্রব্যের উপরেই অতিরিক্ত রপ্তানী কর প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু এর ফলে এ সকল মালের আমদানীকারী দেশে পৌছান পর্য্যন্ত মূল্যমান এত অসম্ভব রকম বেড়ে যায় যে, ক্রমে এসকল ভারতীয় রপ্তানীর চাহিদা দ্রুত কমে যেতে থাকে। বস্তুতঃ এই অবস্থার সুযোগে অন্যান্য প্রতিযোগী রপ্তানীকারী দেশগুলি ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের একটা মোটা অংশ অধিকার করে নিতে সক্ষম হন। পাকিস্তান ও এই সুযোগে নারায়ণগঞ্জে একটি বিরাট্ নূতন চটকল প্রতিষ্ঠা করে ফেল্লেন। ফলে ভারতে চটশিল্পে একটা সঙ্কটজনক অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং সরকার অতিরিক্ত রপ্তানী করটি মোটামুটি সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন। তথাপি চটশিল্পের পূর্ব্ব অবস্থা সম্পূর্ণভাবে আজ পর্য্যন্ত পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় নি। চায়ের ক্ষেত্রে সাধারণ মানের চায়ের রপ্তানি বাজারের বেশ একটা মোটা অংশ সিংহল এবং পূর্ব্ব আফ্রিকা এবং অংশতঃ সোভিয়েত রাশিয়া মনে হয় চিরকালের জন্য এখন দখল করে নিয়েছেন। অভ্রের ক্ষেত্রে ভারতের বিদেশী বাজারের একটা অংশ এখন কায়েমী ভাবে ব্রেজিলের দখলে চলে গিয়েছে।

পরোক্ষ কর

অতএব ক্রমেই বেশী করে পরোক্ষ করের উপরে নির্ভর করা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। পরোক্ষ করের মধ্যে সবচেয়ে সহজে প্রয়োগসাধ্য হয় ভোগ্যবস্তুর উপরে আবগারী কর। স্বাধীনতার অনেক আগে গভর্ণর জেনারেলের প্রশাসনিক কাউন্সিলের তদানীন্তন অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সদস্য স্যার জর্জ শুষ্টার এককালে চিনির উপরে আবগারী শুল্ক ধার্য্য করেন। এই বিষয়টি নিয়ে সেকালে তীব্র সমালোচনার সৃষ্টি হয়। ভারতীয় শর্করাশিল্পের বয়স খুব বেশী নয়; প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের অন্তর্বর্ত্তী কালে এই শিল্পটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সেকালের ভারতের চিনির বাজারটি একপ্রকার যবদ্বীপের একক অধিকারভুক্ত ছিল বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। ভারতীয় নিজস্ব শর্করাশিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত করবার মানসে এবং যবদ্বীপের প্রতিযোগিতা থেকে এটিকে রক্ষা করবার জন্য একটা উঁচু আমদানীকরের দেওয়াল খাড়া করে এই নূতন শিল্পটিকে প্রাথমিক সংরক্ষণ এবং সুপ্রতিষ্ঠিত হবার আয়োজন করে দেওয়া হয়। অল্পদিনের মধ্যেই শিল্পটি সুপ্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং প্রভূত মুনাফা করতে সুরু করে। স্যার জর্জ এই সুযোগে চিনির উপর প্রতি টনে একটি আবগারী শুল্ক ধার্য্য করে এই মুনাফার কিয়দংশ সরকারী তহবিলে শুষে নেবার ব্যবস্থা করেন। স্বাধীনতার পূর্ব্বেই এই আবগারী শুল্কের হার আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং স্বাধীনতার পরও এর হার আরও অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায়। সেই সময়ে এই শুল্কের বিরুদ্ধে সাধারণ্যে, বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট শিল্পপতিদের তরফ থেকে তীব্র প্রতিবাদ উত্থিত হয়। স্যার জর্জ শুষ্টারের মূল উদ্দেশ্য যদি এই সংরক্ষিত শিল্পের বর্দ্ধমান মুনাফার অঙ্কটি সঙ্কুচিত করা মাত্র হ'ত তা হ'লে তার প্রকৃষ্টতর উপায় ছিল শর্করাশিল্পের সংরক্ষণকল্পে যে উঁচু আমদানীকরের দেওয়াল খাড়া করা ছিল সেটিকে কিঞ্চিৎ খর্ব্ব করে দেওয়া। কিন্তু তিনি একাধারে মুনাফা সঙ্কোচন এবং সরকারী আমদানীবৃদ্ধি সাধন করবার জন্য এই আবগারী শুল্কটি প্রয়োগ করেন। কিন্তু প্রথমোক্ত উদ্দেশ্যটি যে অজুহাত মাত্র ছিল তার প্রমাণ অচিরেই পাওয়া গিয়েছিল; আবগারী শুল্কটির অনুরূপ অনুপাতে চিনির দর বৃদ্ধিতে। এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক, সেজন্য সাধারণতঃ ভোগ্যবস্তুর উপরে আবগারী শুল্ক প্রয়োগ-করা ট্যাক্সনীতির (taxation policy) দিক থেকে একটা কাম্য ব্যবস্থা মনে করা হয় না। এর ব্যতিক্রম সাধারণতঃ কেবল সে সকল ক্ষেত্রেই উচিত ব্যবস্থা বলে বিবেচিত হয়, যে-স্থলে কোন বিশেষ ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা ও ভোগ সঙ্কোচন ন্যায়সঙ্গত সামাজিক নীতি বলে স্বীকৃত হয়ে থাকে। এইরূপ ন্যায়সঙ্গত দৃষ্টান্ত হিসাবে মাদক দ্রব্যাদির উল্লেখ করা যেতে পারে। আমাদের দেশের সংবিধানে অবশ্য মাদক বর্জ্জনের নীতি রাষ্ট্রের অন্যতম মূলনীতি বলে গৃহীত ও প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু যে-সকল দেশে মাদক-ভোগকে সামাজিক দৃষ্টিতে নিন্দনীয় বা গর্হিত বলে গণ্য করা হয় না, সে-সকল দেশেও এ সকল দ্রব্যের সংযমহীন ভোগ বা ব্যবহার সুস্থ সামাজিক অবস্থা সূচিত করে না বলে স্বীকৃত হয়। সেই কারণে ভোগ্য-মাদক দ্রব্যাদির উপরে সকল দেশেই আবগারী শুল্ক প্রয়োগের ব্যবস্থা চালু আছে। এই আবগারী শুল্ক প্রয়োগের দ্বারা এ সকল দেশেও মাদক উৎপাদন ও ভোগ একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমিত করে রাখবার প্রয়াস করা হয়।

কিন্তু এ সকল বিশেষ বিশেষ পণ্য ব্যতীত অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের উপরে আবগারী শুল্কের প্রয়োগ সাধারণতঃ একটা সুস্থ শুল্কনীতির পরিচায়ক বলে স্বীকৃত হয় না। বিশেষ করে অবশ্যভোগ্যের ক্ষেত্রে এরূপ প্রয়োগকে

রীতিমত অবিধেয় বলেই মনে করা হয়। অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট বক্তৃতায় বলছেন :—

"পরোক্ষ শুল্কের ভূমিকা দ্বিবিধ : সরকারী আয়ের সংস্থানের প্রয়োজন সাধন করা, এবং মূল্যনীতি-নির্দ্ধারক আয়োজন হিসাবে এর প্রয়োগ। যে-সকল বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এই পরোক্ষ শুল্ক সরকারী আয় সাধনে প্রয়োগ করা সম্ভব, সেইগুলির বিষয়ে একই সঙ্গে দেশের নাগরিকদের ব্যক্তিগত ব্যয় বাজেটের উপরে তার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার কথাও বিবেচনা করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।"

বস্তুতঃ ভোগ্যপণ্যের উপরে আবগারী শুল্কের প্রয়োগ মূল্যমানের অস্থিরতায় প্রতিফলিত হয়ে বিষময় ফল প্রসব করার আশঙ্কা সর্ব্বদাই বিদ্যমান। সরবরাহের স্বাভাবিক অবস্থায় যখন চাহিদার সঙ্গে তার একটা সামঞ্জস্য থাকে তখন শুল্কের অর্থ আনুপাতিক মূল্যবৃদ্ধির দ্বারা ক্রেতার নিকট থেকেই অবশ্য আদায় হয়। সেক্ষেত্রে আবগারী শুল্ক প্রয়োগের দ্বারা শিল্পপতির অতিরিক্ত মুনাফা থেকে সেটুকু সাধারণতঃ আদায় করা সম্ভব হয় না; মুনাফা পুরোপুরিই তার ভাগে যেমন ছিল তেমনি থেকে যায়, শুল্কের অনুপাতে পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটে—এটিকে ক্রেতার পকেট থেকে বার করে নেওয়া হয়। কিন্তু চাহিদার তুলনায় যখন সরবরাহে ঘাটতি সুরু হয়, যার ফলে 'বিক্রেতা অধ্যুষিত বাজারের' (Sellers' market) সৃষ্টি হয়,—যেমন দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর কাল থেকে আজ পর্য্যন্ত চলে আসছে, তখন এই ধরনের ভোগ্যপণ্যের ওপরে আবগারী শুল্ক ব্যবসায়ীর অতিরিক্ত মুনাফার সুযোগ সৃষ্টি করে ক্রেতাকে বিপন্ন করে তোলে। অর্থাৎ, শুল্কটির বহুগুণ বেশী মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়ে একদিকে যেমন মূল্যমানের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে, তেমনি অন্যদিকে 'হিসাব-বহির্ভূত' কালোবাজারী মুনাফার সৃষ্টি করে বাজার চাহিদার আয়তনটি আরও ফাঁপিয়ে তোলে। অবশ্যভোগ্যের ক্ষেত্রে এর চাপ অন্যান্য পণ্যের তুলনায় আরও বেশী হয়ে থাকে। পাঠকের স্মরণ থাকবার কথা যে, শ্রীকৃষ্ণমাচারীর প্রথম দফা অর্থমন্ত্রীত্বের আমলে যখন তিনি সর্ষের তেলের ওপর মণপ্রতি ।।০ আনা (বর্ত্তমানের হিসাবে ৫০ পয়সা) আবগারী শুল্ক ধার্য্য করেন, সেটি সঙ্গে সঙ্গে খুচরা বাজারে সর্ষের তেলের সের-প্রতি ।০ আনা (২৫ পয়সা) মূল্যবৃদ্ধিতে প্রতিফলন লাভ করে। অর্থাৎ ক্রেতাকে সরকারী শুল্কের ২০ গুণ দাম যেমন বেশী দিতে হয়, তেমনি ব্যবসায়ীর মুনাফা মণপ্রতি প্রায় ৯।।০ টাকা বেড়ে যায়। কিন্তু এই অতিরিক্ত মুনাফাটি সরকারী হিসাবের আয়ত্তে আনা সম্ভব হয় না এবং এই ভাবেই

মোরারজি দেশাইয়ের অর্থমন্ত্রীত্বের কয় বৎসরে দেশের ওপরে পরোক্ষ করভার সমধিক বৃদ্ধি পায়। একটা পুরানো হিসাবে দেখা যায় যে, ১৯৫০-৫১ সনে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রয়োগের সময়ে দেশের মোট করভারের শতকরা মাত্র ৭ ভাগ পরোক্ষ কর থেকে আমদানী হ'ত। এই অনুপাতটি ক্রমে বৃদ্ধি পেতে পেতে ১৯৬৩-৬৪ সনের তাঁর শেষ বাজেটে এটি মোট করভারের শতকরা ৭০ ভাগে বৃদ্ধি পায়। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে বিবেচ্য যে ১৯৫০-৫১ সনে কেন্দ্রীয় শুল্কের মাথাপিছু পরিমাণ ছিল মাত্র ৮৲ টাকা; ১৯৬৩-৬৪ সনে এর পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় মাথাপিছু ৪৬৲ টাকা। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আরও বিশেষ করে প্রণিধানযোগ্য এই যে, এদেশের দ্রুতবর্দ্ধমান পরোক্ষ শুল্কের আয়তনের একটা মোটা অংশ অবশ্যভোগ্য পণ্যাদির ওপর আবগারী প্রয়োগের দ্বারা আদায় করা হয়ে থাকে। বর্ত্তমানে চিনি, ঔষধাদি, বস্ত্র, সাইকেল টায়ার ও টিউব, কেরোসিন, কতকগুলি খাদ্যপণ্য ইত্যাদি একটা বিস্তৃত ভোগ্যপণ্যের উপরে আবগারী শুল্ক প্রয়োগ করা রয়েছে। অন্যান্য নানাবিধ কারণ ব্যতীত গত কয়েক বৎসরের মধ্যে মূল্যমানের ওপরে ক্রমবর্দ্ধমান চাপের এটাও যে একটা অন্যতম কারণ সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই।

শ্রীকৃষ্ণমাচারী অনূ্যন দেড় বৎসর পূর্ব্বে পুনর্ব্বার অর্থ দপ্তরের ভার গ্রহণ করবার অব্যবহিত পরেই একটি প্রসঙ্গে বর্ত্তমানের প্রচণ্ড পরোক্ষ করভার লাঘব করবার একান্ত প্রয়োজনীয়তা স্বয়ং স্বীকার করেন। কিন্তু গত বৎসরের বাজেটে তিনি এই সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নি। তার বাধা অনেক ছিল, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সে-সকল বাধা সত্ত্বেও তিনি যদি এ বিষয়ে উপযুক্ত প্রয়োগ সুরু করতে পারতেন তবে গত এক বছরে দেশের আর্থিক পরিস্থিতিতে যে অতিরিক্ত অবনতি ঘটেছে, তার খানিকটা অন্ততঃ বাঁচাতে পারা যেত বলে মনে হয়। এই অবনতির ফলে তৃতীয় পরিকল্পনার রূপায়ণে পুনরায় যে বাধা সৃষ্টি হ'তে সুরু করেছিল তার স্বীকৃতি তাঁর বর্ত্তমান বাজেট বক্তৃতাতেই দেখতে পাওয়া যায়। তাঁহারই জবানিতে জানা যায় যে তৃতীয় পরিকল্পনার তৃতীয় বৎসরে শিল্পজ উৎপাদন প্রায় শতকরা ৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল, কিন্তু বর্ত্তমান বৎসরের (তৃতীয় পরিকল্পনার চতুর্থ বৎসর) প্রথমার্দ্ধে উৎপাদন গতি আবার মন্দীভূত হয়ে পড়ে। তিনি আশা করেন যে, বর্ত্তমান বৎসরের দ্বিতীয়ার্দ্ধে শিল্পোৎপাদন আবার বৃদ্ধি পেয়ে পূর্ণ বৎসরের [illegible] সম্ভব হবে।

আলোচ্য বাজেটে অর্থমন্ত্রী এই পরোক্ষ কর কিছুটা লাঘব করে দেবার যে প্রস্তাব পেশ করেছেন সেটা সুখের বিষয় সন্দেহ নেই। এতে সাহস ও দূরদৃষ্টির যে প্রয়োজন ছিল এ কথাও অস্বীকার করা যায় না। তবে গত দুই বৎসরের অতিরিক্ত সরকারী আয় সাধন এবং কিছুটা পরিমাণ ব্যয়সঙ্কোচ করা সম্ভব হবার ফলে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ যে খানিকটা পরিমাণে সহজ হয়েছিল সে কথাটি মনে রাখা প্রয়োজন। অর্থমন্ত্রী বলেন :

"পরোক্ষ কর লাঘব সম্পর্কে বর্ত্তমানে কেবলমাত্র কতকগুলি আবগারী শুল্ক সম্বন্ধে আমার প্রস্তাব সীমিত রাখা হয়েছে। জুতো, সাইকেল পার্টস্ এবং তার টায়ার-টিউব, দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ছাপবার ও লেখবার কাগজ, এই সকল পণ্যের ওপরে বর্ত্তমান আবগারী শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করা হবে। মূল্যনির্দ্ধারিত কোরা এবং অন্যান্য মোটা এবং মাঝারী মানের কাপড়ের ওপর বর্ত্তমান শুল্কটি অর্দ্ধেক কম করা হবে, বনস্পতির ওপর শুল্ক অর্দ্ধেক কমবে এবং সস্তা মানের ছাপবার, লেখবার ও টাইপ করবার কাগজের ওপর শুল্ক শতকরা ৩০ ভাগ কমান হবে।...এই শুল্ক লাঘবের ফলে ১৯৬৫-৬৬ সনে সরকারী আয় ২৯.৫ কোটি টাকা কমে যাবে।"

তিনি আরও বলেন যে, তিনি আশা করেন যে, যে-সকল পণ্যাদির ওপর এভাবে আবগারী শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করবার বা আংশিক ভাবে কমিয়ে দেবার প্রস্তাব করা হয়েছে, সেটার সবটাই আনুপাতিক ভাবে মূল্যমানে প্রতিফলিত হয়ে ক্রেতার ভোগে বর্ত্তাবে। তা না হ'লে পুনরায় পূর্ব্ব হারে এই শুল্কগুলি পুনঃপ্রয়োগ করা প্রয়োজন হবে। এই কারণে তিনি বর্ত্তমান বাজেট সংশ্লিষ্ট অর্থ বিলে (Finance Bill) বিধিবদ্ধ করে এই সকল শুল্ক প্রত্যাহার বা কমিয়ে দেবার প্রস্তাব করেন নি; সরকারী অতিরিক্ত ক্ষমতার বলে প্রচারিত একটি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধনের আয়োজন করা হয়েছে, যাতে করে প্রয়োজন হ'লে পরবর্ত্তী সংশোধনী বিজ্ঞপ্তির দ্বারা পূর্ব্বাবস্থায় ফিরে যেতে পারা যাবে।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। বর্ত্তমান বাজেটে আবগারী শুল্ক-খাতে অর্থমন্ত্রী সাধারণের উপর করভারের চাপ যে খানিকটা কম করবার প্রস্তাব করেছেন, তার পরিমাণ খুব একটা বেশী নয়। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হয়েছে বাজেটের হিসাব অনুযায়ী এর ফলে আগামী বৎসরে মাত্র আন্দাজ ২৯৷৷০ কোটি টাকা আমদানী কমবার সম্ভাবনা রয়েছে। বর্ত্তমান বৎসরের বাজেটে আগামী বৎসরের মোট রাজস্বের পরিমাণ হিসাব ধরা হয়েছে ১৮২৩.৬ কোটি টাকা; অন্যান্য আমদানী মিলে সরকারী মোট আয় হবে ২৩৪৬.৭ কোটি টাকা। বর্ত্তমান বাজেটে প্রস্তাবিত রদবদলগুলি না হ'লে মোট রাজস্বের পরিমাণ হ'ত ১,৮৫০ কোটি টাকা এবং মোট আয় ২,৩১৮ কোটি টাকা। পূর্ব্ব দুই বৎসরে যথাক্রমে রাজস্ব ও মোট আয়ের পরিমাণ ছিল ১৯৬৩-৬৪ সনে ১,৫১০ কোটি এবং ২,০০৫ কোটি টাকা এবং ১৯৬৪-৬৫ সনে ১,৫৭৯ কোটি এবং ২,১২৪ কোটি টাকা (১৯৬৪-৬৫ সনের 'রিভাইজড' হিসাবে এর পরিমাণ দেখা যায় যথাক্রমে ১,৬৮১ কোটি এবং ২,২২৮ কোটি টাকা)। মোট রাজস্বের তুলনায় পরোক্ষ শুল্কের চাপের পরিমাণ নীচের হিসাব থেকে স্পষ্ট দেখা যাবে :

(পর পৃষ্ঠায় দেখুন)

উপরোক্ত হিসাব থেকে দুটো জিনিষ স্পষ্ট করে বোঝা যাবে। প্রথমতঃ, নূতন বাজেট প্রস্তাবের ফলে আবগারী শুল্কে যে পরিমাণ রদবদল করা হ'ল, তার ফলে মোট রাজস্বের শতাংশ হিসাবে আগারী শুল্ক থেকে আয় পূর্ব্ব বৎসরের রিভাইজড হিসাবের তুলনায় আংশিক ভাবে ১.৯% কম হবে এবং অনুরূপ ভাবে কাষ্টমস্ শুল্ক এবং আবগারী শুল্কের মিলিত আয় মোট রাজস্বের শতাংশ হিসাবে পূর্ব্ব বৎসরের রিভাইজড হিসাবের তুলনায় ১% কম হবে। দ্বিতীয়তঃ, পূর্ব্ব বৎসরের রিভাইজড্ হিসাবের তুলনায় আবগারী শুল্ক থেকে এবং কাষ্টমস্ শুল্ক থেকে বর্ত্তমান নূতন বাজেট বৎসরে আমদানীর পরিমাণ যথাক্রমে ৫.৯% এবং ৯.০% বৃদ্ধি পাবে।

আপাতদৃষ্টিতে এর ফলে আগের তুলনায় খুব যে বেশী একটা তফাৎ হবে তা মনে হয় না। কিন্তু বর্ত্তমান প্রস্তাবে বাজেট রচনার কৌশলে একটা মূল পরিবর্ত্তনের ধারা যে প্রবর্ত্তিত হবার আশা আছে সে কথাটি নিঃসন্দেহে স্বীকার করা চলে। এর ফলে সাধারণ মূল্যমানের (general price index) ওপরে কোন আকঙ্ক্ষণীয় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে কিনা একথা নিশ্চয় করে বলা যায় না। তবে সংশ্লিষ্ট ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে মূল্যমানে আনুপাতিক নিম্ন চাপ (downward pressure) সৃষ্টি হবার আশা অর্থমন্ত্রী স্বয়ং ব্যক্ত করেছেন এবং অন্যথায় তিনি কি করবেন তার কথাও তিনি স্পষ্ট করেই প্রকাশ করেছেন। বর্ত্তমান বাজেট যদি ভবিষ্যৎ পরিণতির সূচক বলে ধরে নেওয়া যায় তবে একথা আশা করা যেতে পারে যে, রাজস্বের কাঠামোটি গত কয়েক বৎসরে যে ভাবে গড়ে উঠছিল তার ফলে তারই মধ্যে অন্তর্নিহিত যে মূল্যচাপ বৃদ্ধির উপাদান

শুল্কের বিবরণ	১৯৬৩-৬৪	১৯৬৪-৬৫ (বাজেট)	১৯৬৪-৬৫ (রিভাইজড)	১৯৬৫-৬৬ (বাজেট প্রস্তাব) (কোটি টাকায়)
কাষ্টমস্ শুল্ক	৩৩৫	৩৩৬	৩৮৫	৪০৫
পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় কাষ্টমস্ শুল্কের				+১৪.৫*
আমদানীতে ক্ষতি (—) বা বৃদ্ধি (+)	—	+.২৯%	+১৪.৬%	+৯.০%
আবগারী শুল্ক (কেন্দ্রীয়)	৭৩০	৭৭০	৭৭৩	৮২৭
পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় আবগারী শুল্কের				—৮*
আমদানীতে ক্ষতি (—) বা বৃদ্ধি (+)	—	+৫.৫%	+৩.৯%	+৫.৯%
কর্পোরেশন ট্যাক্স	২৭৫	২৯৭	৩৪২	৩১৬
পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় কর্পোরেশন ট্যাক্স				—-১৪*
আমদানীতে ক্ষতি (—) বা বৃদ্ধি (+)	—	+৮%	+১৫%	+৮.৯%
ব্যক্তিগত আয়কর	১৩৯	১৪০	১৪৪	১৭১
পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ব্যক্তিগত আয়করের আমদানীতে				
ক্ষতি (—) বা বৃদ্ধি (+)	—	+.৭১%	+১.৮%	+১৮.৭%
মোট রাজস্ব	১,৫১০	১,৫৭৯	১,৬৮১	১,৮৩০
পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় মোট রাজস্ব				—৬*
আয়ে ক্ষতি (—) বা বৃদ্ধি (+)	—	+৪.৬%	+৬.৪%	+৮.৫%
মোট রাজস্বের শতাংশ হিসাবে				
আবগারী শুল্কের আয়	৪৮.৩	৪৮.৭	৪৬.০	৪৪.৯
মোট রাজস্বের শতাংশ হিসাবে আবগারী				
ও কাষ্টমস্ শুল্কের মিলিত আয়	৭০.১	৭০.০	৬৮.০	৬৭.০

* নূতন বাজেট প্রস্তাবের ফল

গড়ে উঠছিল (inflationary potential of the taxation structure). সে সম্বন্ধে বর্তমান অর্থমন্ত্রী এখন সচেতন হয়ে উঠেছেন এবং তার ফলে ভবিষ্যতে অন্ততঃ দেশের রাজস্বের কাঠামোটিকে ধীরে ধীরে মূল্য-চাপমুক্ত করে নেবার প্রয়াস করা হবে সেটুকু আশা করা যেতে পারে।

হিসাব-বহির্ভূত অর্থ (Unaccounted Money)

এই প্রসঙ্গে যাকে হিসাব বহির্ভূত অর্থ আখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং দেশের মূল্য কাঠামোতে (Price struture) এই বস্তুটি কি ভাবে এবং কি পরিমাণে চাপ সৃষ্টি করে চলেছে তার যতটা সম্ভব বিশ্লেষণ করতে পারলে মোটামুটি [illegible] উঠবে। হিসাবে ধরা-ছোঁয়া যায় না এই অর্থের অবস্থানের পরিমাণ সঠিক কতটা জানা নেই কিন্তু গত কয়েক বৎসর ধরে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এবং তাঁদের উপদেষ্টা গোষ্ঠীর আনুমানিক হিসা[ব] অনুযায়ী বর্তমানে রাষ্ট্রকে ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে রা[খা] একমাত্র আয়করের পরিমাণই ১,০০০ হাজার থেকে ১৫[০০] হাজার কোটি টাকা বলে আন্দাজ করা হয়েছে। এ[ই] আন্দাজটিকে যদি বাস্তব বলে ধরে নেওয়া যায় এব[ং] ফাঁকি দেওয়া আয়করের বিভিন্ন স্তরের মোটামুটি দায় যদি আয়ের ৫০ শতাংশ বলেও ধরে নেওয়া যয়, তবে এভাবে ২,০০০ থেকে ৩,০০০ কোটি টাকা বাজারে চালু আছে বলে ধরে নিতে হবে। অর্থাৎ দেশে চালু হিসাবে ধরা যায় মোট অর্থের তলনায় এই অর্থের পরিমাণ প্রায় সমান

সমান। এই প্রচণ্ড পুঁজিটি বাজারে কি ভাবে ক্রিয়া করছে নানা ভাবে তার আভাস পাওয়া গেছে। গত বৎসরে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর একটি বিবৃতি অনুযায়ী এ রাজ্যে ঐ বৎসরে বাজার থেকে সরিয়ে-ফেলা চাউলের পরিমাণ ছিল তাঁর খাদ্য দপ্তরের হিসাব মতন আন্দাজ ২০ লক্ষ টন। এই পরিমাণ চাউল সরকারী নিয়ন্ত্রিত মূল্যেও মজুদ রাখতে হ'লে অন্ততঃ প্রায় ১৫০ কোটি টাকার প্রয়োজন হয়। অন্যান্য খাদ্যশস্য, খাদ্য-তৈল, বস্ত্র এবং নানাবিধ অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের বেলায়ও যে সরবরাহে ঘাটতি গত দুই বৎসর ধরে চলে আসছে সেটাও যে এরূপ মুনাফার লোভে মজুদদারী থেকে অন্ততঃ অংশতঃ ঘটেছে এ কথাত সকল সরকারী মুখপাত্র স্বীকার করেছেন। এ সকলই বাজার থেকে সরিয়ে মজুত করতে হ'লে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থ হিসাবে ধরা যায় এমন কোন স্থান থেকে সংগৃহীত হ'লে এই মজুতদারীও সহজেই সংযত করা সম্ভব হ'ত। তা ছাড়া বে-আইনী সোনার মজুতে কতটা পরিমাণ অর্থ লগ্নী করা হয়েছে সেটা সঠিক নির্ণয় করা সম্ভব না হ'লেও তার পরিমাণও যে অবশ্যই প্রচুর, এ কথাও অনুমান করা অসম্ভব নয়। অন্যান্য কারণ ব্যতীত এই হিসাব-বহির্ভূত অর্থের ক্রিয়াও যে বর্ত্তমানের ক্রমবর্দ্ধমান মূল্যমানের অন্যতম প্রধান কারণ সেকথা স্পষ্ট ও অনস্বীকার্য্য।

এই অর্থের পরিমাণ যাতে সঠিক ভাবে আবিষ্কৃত হিসাবের আয়ত্তে আনা যায় সেই প্রয়াসে সরকারী তরফ থেকে নানা আয়োজন করা হয়েছে কিন্তু আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নি। অথচ এটি যে দেশের জনসাধারণের জীবনে প্রভূত পরিমাণ অশান্তির (mischief) সৃষ্টি করছে এ কথা খুবই স্পষ্ট। নূতন বাজেটে অর্থমন্ত্রী এই বস্তুটিকে খানিকটা সংযম ও হিসাবের আয়ত্তে আনবার জন্য নূতন প্রয়োগ উদ্ভাবন করেছেন। প্রস্তাবটি এই যে, যাঁরা হিসাব-না-দেওয়া রোজগারের সম্পূর্ণ হিসাব এখন দাখিলক রবেন এবং স্বয়ং নিজে থেকে এই আয়ের শতকরা ৬০ ভাগ অর্থ নগদ রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা দেবেন, তাঁরা তাঁদের আয়কর হিসাব দাখিল করবার সময় বাকী ৪০ ভাগ অর্থের হিসাব তাতে দেখাতে পারবেন। এই বাকী ৪০ ভাগ অর্থ সম্বন্ধে আয়কর দাবি করা হবে না এবং হিসাব দাখিলকারী ব্যক্তিদের পরিচয় সাধারণ্যে প্রচার করা হবে না। এই সুযোগটি তিনমাস পর্য্যন্ত বলবৎ থাকবে এবং যাঁরা মার্চ্চ মাসের মধ্যে এই হিসাব দাখিল করবেন তাঁদের দেয় শতকরা ৬০ ভাগ অর্থ থেকে ৩ ভাগ মকুব পাবেন, অর্থাৎ তাঁদের আয়ের মাত্র শতকরা ৫৭ ভাগ দিতে হবে। যাঁদের আয়করের হার ৫৭% কিংবা ৬০%-এর কম হবে বলে তাঁরা মনে করেন তাঁরা স্বাভাবিক প্রথায় তাঁদের আয়ের হিসাব দাখিল করতে পারবেন এবং সেই অনুযায়ী তাঁদের ওপর আয়কর ধার্য্য করা হবে। অর্থমন্ত্রীর এ সম্পর্কে প্রস্তাবিত ব্যবস্থা বর্ত্তমান বৎসরের অর্থ বিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং তিনি যাতে করে আইনের সকল শক্তি প্রয়োগের দ্বারা এই বিষয়টির সমাধান করবার চেষ্টা হতে পারে সেই প্রতিশ্রুতি দেন।

ট্যাক্স ফাঁকি, সোনার চোরাকারবার, কালোবাজারী মুনাফা, এ সকল সমাজবিরোধী বিষয় সম্পর্কে সরকারের তরফ থেকে বারে বারে নূতন নূতন প্রয়োগ করবার আয়োজন করা হয়েছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত ফল বিশেষ কিছু হয় নি। তার প্রধান কারণ সম্ভবতঃ সরকার পক্ষ থেকে এ সকল বিষয়ে খানিকটা সাহসের অভাব এবং খানিকটা হয়ত ঔদাসীন্য। খাদ্যশস্য সম্বন্ধে গত কয়েক মাস ধরে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলির তরফ থেকে বারে বারে নীতি ও প্রয়োগ বদল হয়েই চলেছে, কিন্তু খাদ্যশস্যের মূল্যে সরকার-অধ্যুষিত সঙ্কীর্ণ গণ্ডির বাইরে কালোবাজারী কমে নাই, বরং বাড়িয়াই চলিয়াছে। অর্থমন্ত্রী তাঁর কয়েক দিন পূর্ব্বের পার্লামেন্টে পেশ করা দেশের ১৯৬৪-৬৫ সনের আর্থিক অবস্থার বিশ্লেষণে স্বীকার করেছেন যে, বর্ত্তমান বৎসরের প্রভূত উৎপাদন-উন্নতি সত্ত্বেও নূতন ফসলের সময় সাধারণতঃ খাদ্যশস্যের দর যতটা কমে থাকে এবার তা ঘটে নাই, বরং জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহ থেকেই খোলা বাজারে খাদ্যশস্যের মূল্য পুনরায় বৃদ্ধি পেতে সুরু করে। এর কারণ অবশ্য একটা এই যে, মূল্যবৃদ্ধি-সহায়ক আর্থিক অবস্থার সমাধান সহসা করা সম্ভব নয়। সোজা কথায় উৎপাদনের তুলনায় অর্থের সরবরাহ নানা কারণে—যথা উন্নয়ন-লগ্নী, প্রতিরক্ষা ব্যয়, সরকারী প্রশাসনিক খরচা বৃদ্ধি, ইত্যাদি কারণে—গত কয়েক বৎসরে অসম্ভব পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অর্থশাস্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়ার এই সকল কারণে অনবরত মূল্যবৃদ্ধি হয়েই চলেছে। হিসাব-বহির্ভূত অর্থ এই অর্থের সরবরাহের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করে মূল্যমানে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে এও একটা কারণ যে, বর্ত্তমান কালের ন্যায় অবশ্যভোগ্যাদির সরবরাহের পরিমাণ যখন অপ্রতুল হয়ে পড়ে, তখন সরকারী প্রশাসনিক আয়োজনের দ্বারা খানিকটা মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ করা যায়। যথা, যুদ্ধ ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় সঙ্কটকালে অবশ্যভোগ্যাদির সাধারণতঃ সরকারী প্রয়োগে বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং তার ফলে মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়। আমাদের দেশে গত বিশ্বমহাযুদ্ধ এবং তৎপরবর্ত্তীকালে দেখা গিয়েছে

যে, সাধারণতঃ সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিকবিভাগগুলির কর্ম্মকুশলতার এবং অনেক ক্ষেত্রে সততারও অভাবের ফলে বণ্টননিয়ন্ত্রণের কালেও বিস্তৃত কালোবাজারী কারবার ও মুনাফাবাজী চলেছে। এই দুষ্টচক্র ভঙ্গ করতে নিষ্ফলকাম হয়ে অবশেষে ভূতপূর্ব্ব কেন্দ্রীয় কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী স্বর্গগত রফি আহমদ কিদোওয়াই বণ্টন-নিয়ন্ত্রণ তথা সর্ব্বপ্রকার সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন। বর্ত্তমানে কলিকাতায় সর্ব্বাত্মক এবং অন্যান্য কোন কোন সহরাঞ্চলে আংশিক বণ্টন নিয়ন্ত্রণ প্রবর্ত্তিত হয়েছে কিন্তু এ সকল নির্দ্দিষ্ট এবং ক্ষুদ্র এলাকার বাইরে দেশের লোককে নিয়ন্ত্রণ-হীন খোলা বাজারের উপরেই নির্ভর করতে হয়। মোট কথা আইন বা প্রশাসনিক প্রয়োগের দ্বারা এই অবস্থার সংশোধন করা সম্ভব হয় নাই। অর্থমন্ত্রী এই সাপক্ষে কতকগুলি আর্থিক প্রয়োগেরও ব্যবস্থা পূর্ব্ব থেকেই করেছিলেন—যথা, গত পাঁচ মাসের মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঋণের ওপর সুদের হার দু'-দু'বার বাড়িয়ে বর্ত্তমানে শতকরা ৬%য়ে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাতে ফল দর্শায় নি। বাজারে চালু অর্থের পরিমাণ এত প্রচুর এবং পণ্য সরবরাহ এত কম যে, এই অবস্থা কেবলমাত্র যে মূল্যমানের ক্রমাগত বৃদ্ধিতে অনবরত প্রতিফলিত হচ্ছে শুধু তাই নয়, বর্ত্তমানে দেশের পুঁজির বাজারে যে অধিকতর এবং অস্বাভাবিক রক্তশূন্যতার লক্ষণ দেখা দিয়েছে তারও এ একটা অন্যতম প্রধান কারণ। ব্যাঙ্ক রেট বাড়িয়ে বর্ত্তমানে এই অবস্থার সমাধান হবার সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না।

হিসাব-বহির্ভূত অর্থ বন্ধ করতে হ'লে ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে যাঁরা এই অন্যায় পুঁজি সংগ্রহ করেছেন তাঁদের সঙ্গে আপোষ রকায় সেটি হবার সম্ভাবনা যে আদৌ নাই সেটা হয়ত অর্থমন্ত্রী নিজেও আজ পর্য্যন্ত স্পষ্ট করে বুঝতে পারেন নি। এবং এরা যে সরকারী হুমকিতে বিন্দুমাত্র ভয় পায় না সে প্রমাণ বারে বারে পাওয়া গিয়েছে। অতএব এদের বিরুদ্ধে এমন প্রয়োগ অবলম্বন করা প্রয়োজন, যাতে এদের সদিচ্ছার ওপরে তার সাফল্য নির্ভর না করে। অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে, বর্ত্তমানে প্রস্তাবিত প্রয়োগের ফলে এই সম্পর্কে সুফল যদি না পাওয়া যায় তবে তাঁকে অন্য ব্যবস্থার আয়োজন করতে হবে। আমরা পূর্ব্বেই বলেছি লুকানো অবশ্যভোগ্য পণ্যাদির এবং বিশেষ করে খাদ্যশস্যাদির মজুত আবিষ্কার ও জব্দ করা ভিন্ন এই বিষয়ে অন্য কি সার্থক প্রয়োগ হ'তে পারে তা কল্পনা করা যায় না। প্রশাসনিক সততা ও শক্তি নিতান্ত ভেঙ্গে না পড়লে এই ব্যবস্থাটি অসম্ভব হওয়া উচিত নয়। তবে একটা প্রচণ্ড বাধা থাকবার আশঙ্কা রয়েছে। এই মুনাফাবাজ কালোবাজারী গোষ্ঠীদের অনেকেই সরকারী মহলের উচ্চতম অধিকারীদের নিকটতম প্রিয়পাত্র বলে সাধারণের ধারণা বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে। এদের স্বার্থে আঘাত পড়তে পারে এমন প্রয়োগ করবার শক্তি বা সাহস কি সরকারের আছে? (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের ইংরেজী অনুবাদের তালিকা

শ্রীসুধাময়ী মুখোপাধ্যায়

(১৯৩১) পরিশেষ—র র ১৫

প্রশ্ন—ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ—Collected poems and plays p. 450—The Evilday—Age after age has Thou O Lord sent

বিস্ময়—আবার জাগিনু আমি। রাত্রি হল ক্ষয়—Poems 92—Once again I wake up

মৃত্যুঞ্জয়—দূর হতে ভেবেছিনু মনে—Poems 93—You seemed from afar titanic in your mysterious majesty

—V.B.Q. Aug.—Oct. 1943—A Translation by Kshitish Ray

শ্রীবিজয়লক্ষ্মী—তোমায় আমায় মিল হয়েছে—V.B.Q. Oct. 1927—To Java; Also published in *Modern Review*, Oct. 1927

বোরোবুদুর—সে দিন প্রভাতে সূর্য্য এই মতো—V.B.Q. Oct. 1927—Boro Budur—The Sun Shone on a far away morning (451)

সিয়াম—(প্রথম দর্শনে) ত্রিশরণ মহামন্ত্র—V.B.Q. Oct. 1927—To Siam—Reprinted in the *Modern Review.* Nov. 1927—Included in Buddhadeva publication

সিয়াম (বিদায়কালে) কোন্ সে সুদূর মৈত্রী—V.B.Q. Oct, 1927—Farewell to Siam—Reprinted in *Modern Review*, Feb. 1928

বুদ্ধদেবের প্রতি—ওই নামে একদিন ধন্য হল—Mahabodhi Nov.-Dec. 1931—To Gautama Buddha—Tr. by the Author
—Written on the occasion of the opening of the Mulagandha Kuti Bihar of Saṛanath
—Reprinted in poems 91—Bring to this country
—*Hindusthan Standard* Daily 16.9.56—To Lord Buddha—Tr. by H. P. Chattopadhyaya

(১৯৩২)—পুনশ্চ— র র ১৬

কোপাই - পদ্মা কোথায় চলেছে—V.B.Q.—May-July, 1935—The Kopai—Reprinted in —Poems 94
—Idly my mind follows the Sinuous sweep of the Padma

পত্র—তোমাকে পাঠালুম আমার লেখা এক
বই-ভরা কবিতা—Poems No. 1—Here I send you my Poems densely packed

শেষ দান—ছেলেদের খেলার প্রাঙ্গণ।
শুক্‌নো ধুলো—V.B.Q. Nov. 1938—The Kanchan Tree—Tr. by Kshitish Ray

একজন লোক—আধবুড়ো হিন্দুস্থানী রোগা লম্বা মানুষ—Poems 95—An Oldish Upcountry man tall and lean

প্রেমের সোনা—রবিদাস চামার ঝাঁট দেয় ধুলো—*Harijan*, May, 20, 1933—Raid as, the sweeper sat stilll lost in the solitude of his soul—Tr by the Poet (454)

স্নান সমাপন—গুরু রামানন্দ স্তব্ধ দাঁড়িয়ে—Poems 98—At the dusk of the early dawn Ramananda, the Brahmin Teacher stood

প্রথম পূজা—ত্রিলোকেশ্বরের মন্দির—*Hindusthan Standard*, Ann. 1954 —The First Puja—Tr. by S. Moitra

ছুটির আয়োজন—কাছে এল পূজার ছুটি—*Hindusthan Standard*, Ann. 1938, 1949
Preparing for the Puja Holidays. Tr. by K. Roy

মানব পুত্র—মৃত্যুর পাত্রে খ্রীষ্ট যেদিন মৃত্যুহীন প্রাণ
উৎসর্গ করলেন—The Son of Man—From his eternal Sea (453)

*একদিন যারা মেরে ছিল তারে গিয়ে—
১৯৩৯ খ্রীষ্টোৎসবে—*Modern Review*, Jan. 1940—Christmas, 1939—The In-dwelling Divinity—Tr. by Amiya Chakravarty
—Poems 112—Those who struck Him once

নাটক—(১৯-২০ পৃষ্ঠায় এই কবিতার শেষের
দিকে) গদ্য এল অনেক পরে—Prose came long after —The Later Poems of Tagore page 33

নূতনকাল—৪র্থ স্তবকে—তাই ফিরে আসতে হল (২২-২৩পৃষ্ঠা)—I had to return once more—Later Poems p. 34

বাসা—শেষ স্তবক-এই পর্য্যন্ত—এ বাসা আমার
হয় নি বাঁধা ৪৪ পৃঃ—**Thus Far**—This house of mine has neverbeen built—Later Poems p. 38

বাঁশি—মাঝে মাঝে সুর জেগে ওঠে পৃঃ ১১৮-১৯—There are moments when a tune awakens—L.P. p. 39

পুকুর ধারে—চেয়ে দেখি আর মনে হয় পৃঃ ৩২—As I look at these things........L.P. p. 43

---

* পাদটীকা—শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় The Leter poems of Tagore গ্রন্থে কবির শেষের দিকে রচিত কয়েকটি কবিতার বইএর উপর তাঁর মন্তব্য প্রকাশ প্রসঙ্গে ঐ বইগুলির কয়েকটি কবিতার মাঝে মাঝে অনুবাদ করেছেন। যেখান থেকে অনুবাদ করেছেন তার নিশানা দিয়েছেন ঐ সব বইএর পৃষ্ঠা সংখ্যা দিয়ে। আমরা সেজন্য ঐ বইগুলির থেকে কবিতার নাম ও অনূদিত অংশের পৃষ্ঠা সংখ্যা দিয়ে Later poemsএর অনুবাদের পৃষ্ঠা সংখ্যা দিলাম।

স্মৃতি—পশ্চিমে শহর পৃঃ ৫৬-৫৭ —It is a town in the West—L.P. p. 45-46
অপরাধী—প্রথম স্তবক ও শেষ—
—তুমি বল তিনু প্রশ্রয় পায় পৃঃ ৩৩-৩৬—You complain that I indulge Tinu—L.P. p. 47
ছেলেটা—শেষ স্তবকঅম্বিকে মাষ্টার আমা র কাছে দুঃখ করে গেল
পৃঃ ৬৩ ৬৪ —Ambikababu war telling me—L.P. p. 48
বালক—শেষ ৩ লাইন আর সেদিনকার আমারি মতো
অনেক ছেলে ঘরে ঘরে পৃঃ ৮১—Inside the many houses there are countless children—p. 49
শেষ চিঠি—৪র্থ স্তবক—শুনেছি ডুবে মরবার সময় পৃঃ ৭৩—It is said that before drowning p. 49
শেষ স্তবক—যাক সে সব কথা পৃঃ ৭৫—Oh, let these thoughts be—p. 50
সাধারণ মেয়ে—মাঝে—তাকে নাম দিয়ো মালতী পৃঃ ১০২ —Call her Malati p. 51 শেষ পৃষ্ঠা ১০৪—এইখানে
জনান্তিকে বলে রাখি —Let me here put in an aside
কাঁক—৩য় স্তবক বেলা দুপুর, আকাশ ঝাঁ ঝাঁ করছে পৃঃ৩৮—It is midday, the sky blazes hot ...... L.P. p. 53
বিশ্বশোক—দুঃখের দিনে লেখনীকে বলি পৃঃ ৬৯-৭১ —In the days of my sorrow—p. 54
প্রভেদ—তোমাতে আমাতে আছে ত প্রভেদ—Poems 96—Though I know, my friend, that we are different
বিদায়—তোমার আমার মাঝে হাজারবৎসর —Poems 97—A veil of a thousand years dropped between you and me

---

পাঠকশস্য

ভারতে পরমাণু শক্তির বিকাশ

ভারত এটম বোমা তৈরি করবে কি করবে না সে হ'ল অন্য বিবেচনা, সম্প্রতি এ নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে এবং মনে হয় ভবিষ্যতে আরও হবে। এ সমস্ত বাক-বিতণ্ডার মধ্যে একটা প্রশ্ন কিন্তু ইতিপূর্বেই মীমাংসিত : ভারত পরমাণুর নূতন শক্তিকে শান্তির কাজে লাগাতে যাচ্ছে, বিশেষত বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে। কয়লা, জলস্রোত এবং খনিজ তেল বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রথাগত উৎস। ভারতে খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস খুবই পরিমিত। দেশের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের—বর্তমানে ৮২·৬ লক্ষ কিলোওয়াট—মাত্র সামান্য অংশ (৩ লক্ষ কিলোওয়াট) এ থেকে পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রধানত কয়লা-নির্ভর। কয়লা দহন শক্তি থেকে বর্তমানে প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে। কিন্তু কয়লা সম্বন্ধে প্রধান আপত্তির ব্যাপার এই যে, তার পরিমাণ খুবই সীমিত। নূতন সমীক্ষায় জানা গেছে, ভারতে কয়লার সঞ্চয় আনুমানিক ৬০০০ কোটি টন। বর্তমানে যে হারে বিদ্যুতের ব্যবহার ৮ থেকে ৯ বছরের মধ্যে দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে তাতে ১০০ কি ১৫০ বছর পরে যাদুঘরের বাইরে কয়লার কারো বলতে কিছু থাকে কি না সন্দেহ আছে। এমন অবস্থায় দূর ভবিষ্যতের জন্য বিদ্যুৎ ব্যবস্থা কয়লার উপর বেশি ভরসা রাখতে পারে না। নদনদীবহুল ভারতে জল-বিদ্যুৎ—অর্থাৎ জলের প্রবাহ-শক্তি থেকে আহরিত বিদ্যুৎ খুবই সম্ভাবনাময়। কেন্দ্রীয় জল ও শক্তি কমিশন এ বিষয়ে বিস্তৃত সমীক্ষা নিয়ে দেখেছেন জলপ্রবাহ থেকে আমরা অন্তত ৪০০ লক্ষ কিলোওয়াট শক্তি পেতে পারি। দুঃখের বিষয় তার অতি সামান্য ভাগই এ পর্যন্ত সম্ভব হয়েছে। জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিশেষত্ব এই যে, তার যন্ত্র-স্থাপনার প্রাথমিক ব্যয়ভার খুবই অধিক, অতি ব্যয় সামান্য মাত্র। পরমাণু-জাত বিদ্যুতেও উৎপাদনের এই বিশেষত্ব।

সম্প্রতি ভারত এই পরমাণুর পথে অগ্রসর হয়েছে। এর কারণ, প্রাথমিক ব্যয়ভারের প্রশ্ন থাকলেও অন্যান্য এমন কতকগুলি সুযোগ সুবিধা রয়েছে যার ফলে সবদিক বিবেচনায় তৌলদণ্ড পরমাণুর দিকেই ভারী হয়ে ওঠে। কয়লার পরিমাণ সীমিত। ভারতে কয়লার খনিগুলি দেশের পূর্বাঞ্চলে বিহার ও পশ্চিম বাংলায় কেন্দ্রীভূত। এত বড় দেশের অন্যান্য প্রান্তে কয়লা-নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন তাই পরিবহনের দিক দিয়ে খুবই জটিল প্রশ্ন। উৎপাদনী ব্যয়ও তাই এ সব অঞ্চলে বেশি হবে। পরমাণু শক্তির মূল উপাদান—ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম ধাতু, ভারতে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। সহজে পরিশোধনীয় অবস্থায় তা যথাক্রমে ১৫,০০০ ও ১৫০,০০০ টনের কম হবে না। শক্তি উৎপাদনের উদ্দেশ্য ইউরেনিয়াম বা থোরিয়াম পরিমাণেও অনেক কম লাগে, এদিকে কয়লার সঙ্গে কোন তুলনাই চলে না। বর্তমানের উৎপাদনী ব্যবস্থায় এক টন ইউরেনিয়াম প্রায় চল্লিশ হাজার টন কয়লার কাজ করতে পারে। অভিজ্ঞতা এবং সেই সঙ্গে কারিগরি কৌশল উন্নত হ'লে আরও অল্প পরিমাণ ইউরেনিয়াম আরও অধিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে সমর্থ হবে।

ভারত বর্তমানে দেশের পশ্চিম-মধ্য ও দক্ষিণ অঞ্চলে পরমাণু-শক্তি জাত বিদ্যুৎ-উৎপাদনী যন্ত্র বসানো মনস্থ করেছে। বোম্বের অদূরবর্তী তারাপুরে ইতিমধ্যেই কাজ অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক যোজনাকালের মধ্যেই (১৯৬৭-৬৮) এখানকার পরমাণু শক্তি কেন্দ্র থেকে ৩·৮ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ মানুষের বশে আসবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরমাণু বিদ্যুৎ যন্ত্র স্থাপনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে রাজস্থানের রাণা প্রতাপ সাগর এবং মাদ্রাজের কল্পকম্-এ। উৎপাদনী ক্ষমতা যথাক্রমে ২ এবং ৪ লক্ষ কিলোওয়াট।

পরমাণু আধুনিক বিজ্ঞানের এক নূতন শক্তি। বহু হাজার বছরের ধ্যান-ধারণায় আজ তা মানুষের আয়ত্তে এসেছে। মানুষ কিন্তু এতদিন তার ধ্বংসের রূপটাই শুধু জেনেছিল। পরমাণু প্রথম প্রকাশে বোমা হিসাবেই দেখা দিয়েছিল। কিন্তু ধ্বংসই তার একমাত্র রূপ নয়। পরমাণুর অফুরন্ত শক্তিকে মানুষ শান্তির কাজেও লাগাতে পারে। ভারত এ পথেই অগ্রসর হয়েছে। শান্তির কাজে পরমাণুর ব্যবহার মানুষের সামনে অনন্ত সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। ভারত তা কাজে লাগাতে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে পরমাণু তারই একটা প্রধান উপায়। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির পক্ষে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ শক্তির বিকাশে পরমাণু স্থান করে নিচ্ছে।

ভাটনগর পুরস্কার

সম্প্রতি ভারত সরকার দেশের বিজ্ঞানীদের জন্য শান্তিস্বরূপ

ভাটনগর স্মৃতি পুরস্কার প্রবর্তন করেছেন। পুরস্কারের নগদ মূল্য দশ হাজার টাকা, গত ১৪ই জানুয়ারী নয়া দিল্লীর এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বারোজন বিজ্ঞানীকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়। বছরে চারজন ক'রে ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত তিন বছরের পুরস্কার একসঙ্গে ঘোষণা করা হ'ল।

পুরস্কার দানের অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় শিক্ষকমন্ত্রী শ্রী এম. সি. চাগলা বলেন যে, দেশে বৈজ্ঞানিক সমাজ গড়ে তুলতে হ'লে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের স্বীকৃতি জানাতে হবে। ডঃ ভাটনগরের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত এই পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানীরা তরুণ বিজ্ঞানীদের অনুপ্রাণিত করবেন এবং নোবেল পুরস্কার অধিকারীদের মতই সারা বিশ্বে সম্মানের অধিকারী হবে - শ্রীচাগলা এই আশা পোষণ করেন।

১৯৫৫ সালে ডঃ ভাটনগরের আকস্মিক মৃত্যুতে নেহরুজী ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক সভায় বলেছিলেন, "আমি সব সময়েই নানা ক্ষেত্রে বিখ্যাত লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করে থাকি, কিন্তু ডঃ ভাটনগর তাঁদের মধ্যেই ব্যতিক্রম, কাজ করার অদম্য ইচ্ছা তাঁকে বিশেষত্ব দান করেছিল। এর ফলে তিনি যা অবদান রেখে গেলেন তা সত্যই উল্লেখযোগ্য। আমি যথার্থ বলছি, ডঃ ভাটনগর না থাকলে আপনারা আজকের এই জাতীয় গবেষণা কেন্দ্রগুলি দেখতে পেতেন না।"

নেহরুজীর এই অকুণ্ঠ প্রসংশাবাণী সকলেই অনুধাবন করবেন। দেশের জাতীয় গবেষণাগুলি কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের কর্মসচিব হিসাবে ডঃ ভাটনগরের প্রেরণা ও নির্দেশে গড়ে উঠেছিল। ভারত সরকার সেই অসামান্য অবদানের কথা বিবেচনা করেই বর্তমানে জাতীয় বিজ্ঞান পুরস্কার তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত করলেন। তবে আরও অতীত ঐতিহ্যবাহী কোন নাম, যে নামের সঙ্গে তরুণ বিজ্ঞানীদের সাধ এবং স্বপ্ন জড়ানো-মেশানো, তা যদি এর সঙ্গে জড়িত হ'ত তবে পুরস্কারদানের মূল উদ্দেশ্য বোধহয় আরও অধিক পরিমাণে সফল বা সার্থক হ'ত। তা ছাড়া, ডঃ ভাটনগরের আগেও অনেক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার সুযোগ-সুবিধা আনার জন্য জাতীয় গবেষণা কেন্দ্র প্রবর্তনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ডঃ মেঘনাদ সাহার নাম এ প্রসঙ্গে খুবই উল্লেখযোগ্য।

ভোল্ট! সাবধান!—হিন্দী প্রসঙ্গে

প্রতিটি বৈদ্যুতিক যন্ত্রের গায়ে বিপদ-জ্ঞাপক নোটিশ টাঙ্গিয়ে দেওয়ার একটা বিধি আছে। বিদ্যুৎ যেহেতু বজ্রের মতই মারাত্মক প্রাণহারক, এমন একটা নিয়ম প্রবর্তনের অবশ্যই যৌক্তিকতা রয়েছে, যাতে জনসাধারণ বিপদের সম্ভাবনা বুঝে আগে থেকেই সাবধান হ'তে পারে। ভারতীয় মানক সংস্থা—ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ইনষ্টিটিউশন—শিল্পজাত বা শিল্পের পক্ষে প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিষের ষ্ট্যাণ্ডার্ড বা মান নির্ধারণ করেন। বিদ্যুতের ক্ষেত্রে ঐ সাবধানবাণী কি ভাবে লেখা হবে, কত বড় ক'রে লেখা হবে, ইত্যাদি খুঁটিনাটি এরা বিস্তারিতভাবে ঠিক করেছেন, সারা ভারতে যা কি না প্রবর্তিত হচ্ছে, হবে। আমরা তাদের পরিকল্পিত একটা নোটিশ-এর প্রতিলিপি এখানে ছাপিয়ে দিচ্ছি, মড়ার খুলি এবং দু'টি হাড় বিপদের কথা সংক্ষেই বুঝিয়ে দেয়। দুনিয়ার সর্বত্র এই ছবির প্রতীকে বিদ্যুৎ-ঘটিত বিপদের সম্ভাবনার কথা জানান হয়ে থাকে। কিন্তু এ ছবিটিই সব নয়, কি বিপদ, কি থেকে বিপদ, সাধারণের কাছে তা আরও স্পষ্ট হওয়া চাই। ভাষায় সেটা লিখে দেওয়া হয়। ২৩০ ভোল্ট, কি ৪৪০ ভোল্ট কিংবা ১১,০০০ ভোল্ট। আশ্চর্যের কথা এই যে, আমাদের জাতীয় মানক সংস্থা সাধারণকে বোঝানর জন্য যে নোটিশের নক্সাটি অনুমোদন করলেন তা থেকে এই পশ্চিম বাংলায় পশ্চিম বাংলার লোকদের জন্যই টাঙ্গান নোটিশ-লিপিটি থেকে কোন মর্মোদ্ধার করা সম্ভব হবে কি না সন্দেহ আছে, যদি কেউ ইংরাজী জানলেও হিন্দী না জানেন। নোটিশের প্রধান অংশ হিন্দী ভাষাই দখল ক'রে নিয়েছে, ইংরাজীতে ভোল্ট কথাটি পর্যন্ত লেখা নেই, জেলার প্রচলিত ভাষায় অবশ্য বিপদের কথা লিখে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু তাতে দার্জিলিং-এর মত জেলায় অবস্থা কি দাঁড়াবে। সেখানে জেলার ভাষা দু'টি, বাংলা ও নেপালী, বাংলা লিখি কি নেপালী লিখি। জায়গা নেই, তাই একটাকে বেছে নিলে আর একটাকে বাদ দিতে হবে। ফল দু' ক্ষেত্রেই সমান। এক ভাষায় লিখলে আর এক ভাষাগোষ্ঠী মানুষের কাছে বিপদের বার্তাটাই অজানা থেকে যাবে। হিন্দীর অনাবশ্যক বিস্তার এভাবে বিপদের গণ্ডিকে স্পর্শ করেছে।

এ. কে. ডি

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাশ, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৯ ১৭।২।১ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

আমার জীবন বীমার প্রয়োজন কি?

চাকরী থেকে আমার ভালই আয় হয়। আমি বাবা-মা'র সঙ্গে থাকি। আমার স্বাস্থ্য ভাল, তাছাড়া আমি ভাল শিক্ষা পেয়েছি। একদিন হয়ত বিয়েও করব। আর আজকাল যেমন অনেক বিবাহিতা মেয়ে চাকরী করেন, আমিও তাই করব।

তা সত্যি ..স্বচ্ছন্দ জীবন এখন মধুময়। যাতে ভবিষ্যতেও এই স্বাচ্ছন্দ্য বজায় থাকে, সেই জন্যেই এখন থেকেই আপনাকে নজর দিতে হবে। তার জন্যে চাই বৃদ্ধ বয়সে আপনার হাতে সঞ্চয়ীকৃত কিছু টাকা। জীবন বীমা সঞ্চয়ের শ্রেষ্ঠ পন্থা। একটি জীবন বীমার পলিসি নিয়ে আপনি অনায়াসেই এখন থেকেই কিছু প্রিমিয়াম দিতে পারেন। আর তাছাড়া, এই টাকা ছেলেমেয়েদের কাজেও আসতে পারে। তাই নয়?

জীবন বীমার
কোন বিকল্প নেই

CAS/LIC-40 BEN

সূচীপত্র—চৈত্র, ১৩৭১

সূচীপত্র—চৈত্র, ১৩৭১

সূচীপত্র—চৈত্র, ১৩৭১

—রঙীন চিত্র—

— দেবর্ষি নারদ —

শ্রীপূর্ণচন্দ্র সিংহ

সমঝদার লোকে জানেন
যে নতুন সাজে সিজার্সের স্বাদও নতুন
ইদানীং আপনি যদি
সিজার্স না খেয়ে থাকেন, একবার
ধরালেই বুঝবেন সিজার্সের তৃপ্তি এখন
অপূর্ব—টেনে সত্যিই আরাম।
W.D.&H.O.WILLS
SCISSORS
Diamond Jubilee
MADE IN INDIA
SCISSORS 10
সিজার্স নতুন সাজে, নতুন স্বাদে
IWTS 1999-A

দেবর্ষি নারদ

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৪শ ভাগ
২য় খণ্ড

ষষ্ঠ সংখ্যা
চৈত্র, ১৩৭১

বিবিধ প্রসঙ্গ

বর্ণবিদ্বেষ রাষ্ট্রনীতি ও নৈতিক মূল্যবোধ

আমাদের দেশে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে সম্পত্তির পরিমাপ অনুযায়ী, দুইটি শ্রেণীতে জনসাধারণকে বিভক্ত করা হয়। অতি অল্পসংখ্যককে বলা হয় "পাইয়াছে" দলের লোক এবং বিরাট্ সংখ্যক লোককে বলা হয় তাহারা 'পায় নাই" দলভুক্ত। অবশ্য এইরূপ শ্রেণী বিভাগ অন্য দেশেও আছে তবে সভ্য জগতের উন্নততর দেশগুলিতে ঐরূপ শ্রেণীবিভাগ কিছুমাত্রায় অর্থহীন হইয়া পড়িতেছে। কেননা সেখানে যাহারা "পায় নাই" শ্রেণীতে ছিল এখন কালের গতিতে তাহাদের অভাব-অনটন এমন কিছু নয় যাহাতে তাহাদের বা তাহাদের সন্তান-সন্ততির জীবন-যাত্রাপথ কঠিন বা বাধাপূর্ণ হইতে পারে। খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদি মানুষের জীবনে অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য্য যে সকল বস্তু, ঐ সকল দেশে প্রায় সকল কর্ম্মঠ লোকেই তাহা পায় এবং যাহারা বার্দ্ধক্য বা দৈহিক কর্ম্মশক্তির অভাব দরুন উপার্জ্জনে অক্ষম তাহাদেরও অধিকাংশ তাহা পায়। সুতরাং সে-সকল দেশে ঐ জাতীয় শ্রেণীবিভাগ ঠিক চলে না। কেননা যেখানে "পায় নাই" অর্থে বুঝায় "যথেষ্ট পায় নাই" বা তুলনামূলকভাবে "অত বেশী পায় নাই" সেখানে ঐরূপ বিভাগ করা অর্থহীন।

তবে সে-সকল দেশে রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ঐ জাতীয় শ্রেণী-বিভাগ অনেক সময় সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়—বিশেষ যে সকল দেশে বর্ণবিদ্বেষ আছে। এবং যেখানে রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার লোকে বসবাস করে সেইরূপ দেশ অর্থনীতির পরিমাপে উন্নত হইলেও নীতিগত মূল্যায়নে নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত। দক্ষিণ আফ্রিকা, পোর্ত্তুগিজ আফ্রিকার নানা অঞ্চল ইত্যাদিতে এইরূপ বর্ণবিদ্বেষ শুধু যে "কালা আদমী"-কেই অবনত করিয়া রাখিয়াছে তাহা নয়, 'ধলা"-দেরও অনেক ক্ষেত্রে পশুর অধম করিয়াছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার বোয়ার জাতি সভ্যতার পরিমাপেও নিকৃষ্ট সুতরাং বর্ণবিদ্বেষ যে তাহাদের নৈতিক মানকে খর্ব করিবে তাহা আর আশ্চর্য কি? কিন্তু সম্প্রতি ব্রিটেনে ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যাহা দেখা গিয়াছে তাহা বিস্ময়-কর। ব্রিটেনে বহু সংখ্যক ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বীপের লোক এবং ভারতীয় ও পাকিস্তানি লোকও শ্রমিক হিসাবে যাওয়ায় সেখানকার স্থানীয় শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ জাগিয়া উঠিয়াছে। সেই অসন্তোষের সুযোগে কতকগুলি শ্বেতকায় পশু নিরীহ পথচারী "কালা আদমী"কে প্রহার দিয়া ও নানাভাবে অপমান করিয়া নিজেদের বীরত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু ব্রিটিশ জজের ন্যায় অন্যায় জ্ঞান লুপ্ত না হওয়ায় এই সকল যুবক শ্রেণীর দুর্ব্বৃত্তরা অতি কঠোর সাজা পাইতে থাকে। সেই সাজা—

চার-পাঁচ বৎসর কঠোর পরিশ্রমসমেত জেলবাস—ইহাদের চেতনা দেওয়ায় ঐরূপ অত্যাচার করা ক্রমে বিরল হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু সেই বিদ্বেষের অন্য এক রূপ দেখা দিয়াছে রাজনীতির ক্ষেত্রে। সম্প্রতি ব্রিটেনে কয়টি উপনির্ব্বাচনে এই বর্ণবিদ্বেষকে কেন্দ্র করিয়াই রক্ষণশীল দল সমাজতন্ত্রী প্রার্থীকে হারাইয়া দেয়। সাধারণ নির্ব্বাচনেও রক্ষণশীল দল বহু প্রাদেশিক শহরে, যেখানের কলকারখানায় বহু "বর্ণযুক্ত" (coloured) শ্রমিক কাজ করে, এই বর্ণবিদ্বেষেরই প্রভাবে জয়যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে। ফলে ব্রিটেনের সমাজতন্ত্রী সরকার এই "বর্ণযুক্ত" লোকের ব্রিটেনে আগমন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অবশ্য এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পুরাণো রক্ষণশীল গভর্ণমেন্টই আরম্ভ করিয়া যায়। যাহাই হউক ব্রিটিশ লেবার পার্টি এ বিষয়ে এখনও দোমনা রহিয়াছে মনে হয়, কেননা এইরূপ নিয়ন্ত্রণে যে সমাজতন্ত্রী আদর্শবাদ ক্ষুণ্ণ হইবে এবং বর্ণবিদ্বেষ-জনিত নৈতিক অবনতি আসিবে ইহা তাঁহারা নিশ্চিত জানেন।

আরও ভয়ানক বর্ণবিদ্বেষ ও নৈতিক অবনতির পরাকাষ্ঠা সম্প্রতি দেখা গিয়াছে আমেরিকার "মার্কিন" যুক্তরাষ্ট্রে। যে অঞ্চলগুলিকে "দক্ষিণ-দেশ" বলে তাহার প্রায় সর্ব্বত্রই মার্কিনী নিগ্রোদের রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছে, যদিও মার্কিন নিগ্রো আইনত যে-কোন মার্কিন নাগরিকদের সহিত সমান অধিকার পাইতে পারে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণ-বৈষম্য অবশ্য আরো বহু অঞ্চলে আছে, তবে সেটা ঐ দক্ষিণ অঞ্চলের ন্যায় প্রখর ও হিংস্র নয়।

কিছুদিন যাবৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রো-অভ্যুত্থানের প্রবল চেষ্টা চলিতেছে। এবং সেই প্রচেষ্টাকে গান্ধীবাদের অহিংসরূপ দিয়া আরও শক্তিশালী করিয়াছেন নিগ্রো ধর্ম্মযাজক ডাক্তার মার্টিন লুথার কিং। ইঁহাকে সম্প্রতি শান্তি প্রচেষ্টার জন্য নোবেল পুরস্কারও দেওয়া হইয়াছে। গান্ধীজীর সত্যাগ্রহে যেভাবে আন্দোলনকারীরা মিছিল বাঁধিয়া প্রকাশ্যে রাজপথে চলিত বা বিশেষ কোনও প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করিত ঠিক সেইভাবেই মার্কিন দেশেও নিগ্রো অভিযান চালিত হইতেছিল। এবং যেভাবে এখানে পুলিশ ও সৈন্যদল মারপিট ও ধরপাকড় করিয়া সত্যাগ্রহ [illegible] ঐ "দক্ষিণ" অঞ্চলের মার্কিন পুলিশ ও প্রাদেশিক সৈন্যদল ঐ সকল অহিংস আন্দোলনকারীদের বাধা দিতে চেষ্টা করিয়াছে। তবে আরও অকথ্য অত্যাচার হইয়াছে এবং আশ্চর্য্য এই যে, যে-সকল শ্বেতাঙ্গ ঐ আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন তাঁহাদের খুন-জখম করিতেও ঐ সকল নর-রূপী পশুর দল ইতস্ততঃ করে নাই। একজন পাদরীকে (শ্বেতাঙ্গ) ঐ ভাবে প্রকাশ্যে ঠেঙ্গাইয়া খুন করায় সারা মার্কিন দেশে চেতনা আসিয়াছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জনসন ঐরূপ বিরাট্ শোভাযাত্রাকে সৈন্যদল দিয়া রক্ষণা-বেক্ষণ করিয়াছেন ও নূতন আইন প্রণয়ন করিয়া এইভাবে নিগ্রোকে রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার বঞ্চিত করা নিরোধ করিতেছেন।

"দ্বিধাগ্রস্ত" সরকার

কিছুদিন যাবৎ লোকসভায় তীব্র তর্ক-বিতর্ক ও অভিযোগ-অনুযোগ চলিতেছে। এতদিন সে-সকল কথাই আসিতেছিল বিভিন্ন বিপক্ষ দলের মুখপাত্রদের মারফৎ। সম্প্রতি দেখা যাইতেছে যে, কংগ্রেস দলেরই মুখপাত্র হিসাবে যাঁহারা পরিচিত, এরকম কয়জন প্রকাশ্যভাবে লোকসভায় কংগ্রেস সরকারকেই সমালোচনা করিতেছেন। অবশ্য এইরূপ সমালোচনা—দলগত নিষেধ না থাকিলে—রীতি-বিরুদ্ধ নয়, নীতিবিগর্হিতও নয়। কিন্তু সেই সমালোচনার প্রকৃতি হওয়া উচিত গঠনমূলক ও রাষ্ট্রচালন-সহায়ক, যখন নিজ দলেরই কার্য্যক্রমের আলোচনা দলেরই বিশিষ্ট লোকে করেন।

সেই দিক হইতে আমরা বলিতে বাধ্য যে, শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ও শ্রীকৃষ্ণমেননের বাজেট বিতর্কের মধ্যে বক্তৃতায় আমরা খুব বেশী গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাই নাই। দু'জনেরই দীর্ঘদিনের সংযোগ ছিল কংগ্রেসী সরকারের সঙ্গে। দুজনেরই দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা আছে সরকারী কাজের ও সরকারী অধিকারিত্বের। সুতরাং ইঁহাদের সমালোচনায় আরও বেশী সারবস্তু থাকিবে আমরা আশা করিতে পারি। কিন্তু বস্তুতঃ দু'জনেরই ভাষণে কোনও পদার্থ খুঁজিয়া পাইলাম না, পাঁচখানি দৈনিকের বিবৃতি দেখার পর। অবশ্য দু'জনেরই সমালোচনায় ধার আছে এবং কয়েকটি বিষয়ে "খোঁচা"ও প্রখর হইয়াছে কিন্তু যাচাই করিয়া

দেখিলে বোঝা যায় যে, কোনটাতেই শোধনের দিকে পথনির্দেশ নাই।

শ্রীমতী পণ্ডিতের ভাষণে আমরা পাই নানা কথা। তার মধ্যে তিনি সকলের চাইতে তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থার। "আমরা এই দ্বিধা-দোটানায় বন্দী হয়ে আছি," এই তাঁহার দোষারোপের প্রধান বস্তু। তাঁহার বক্তৃতার রিপোর্টে আমরা আরও পাই (আনন্দবাজার):—

"শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত লোকসভায় বলেন, ইহা দুঃখের কথা যে, কেরল থেকে কাশ্মীর এবং শেখ আবদুল্লা থেকে ভিয়েৎনাম, কোন গুরুতর ব্যাপারেই সরকার কোন দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন নি।

অর্থমন্ত্রী কৃষ্ণমাচারীর সমালোচনা করে তিনি বলেন, অসদুপায়ে অর্জিত অর্থের মালিকরা কর ফাঁকি দেবার জন্য তাঁদের সম্পদের পরিমাণ ঘোষণা করেন নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও অর্থমন্ত্রী তাঁদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করার চেষ্টা করছেন। তিনি কর ফাঁকিদারদের ঘুষ দিতে চেয়েছেন। কোন অবস্থাতেই ঐ ধরনের কোন কিছু মেনে নেওয়া উচিত নয়। অসদুপায়ে অর্জিত টাকা যেখানেই থাক, তা বের করার জন্য সরকারের সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করা উচিত।

লোকসভায় বাজেট বিতর্কে অংশ গ্রহণ করে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রী ও তাঁর সহকর্ম্মীদের কোন নীতি বিসর্জ্জন না দিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে বিরাট্ কর্ত্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হ'তে বলেন।

তিনি বলেন, ঐ ভাবে অগ্রসর হ'লেই ভারতের নবরূপায়ণ সূচিত হবে। আমরা সকলেই ঐ ব্যাপারে যথাশক্তি সাহায্য করব।

গত ক'মাস দৃঢ়হস্তে রাষ্ট্রতরণীর হাল ধারণ করার জন্য শ্রীমতী পণ্ডিত বক্তৃতার প্রারম্ভে শ্রীশাস্ত্রী ও তাঁর সহকর্ম্মীদের অভিনন্দন জানান।

এই প্রথম লোকসভায় বক্তৃতা দিতে উঠে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী বলেন, বর্ত্তমান নেতৃবৃন্দ সমাজতন্ত্রের প্রতি যে আনুগত্য দেখাচ্ছেন, তা মৌখিক। সমাজতন্ত্র আজ মাত্র একটি আওয়াজে পরিণত হয়েছে। মুষ্টিমেয় লোকের হাতে টাকার পাহাড় জমে উঠছে। সমাজে নৈতিক সঙ্কট ঘনিয়ে উঠেছে। এটাই দেশের বহু সমস্যার মূল কারণ।

আমরা দুর্নীতির মধ্যে বাস করতে শিখেছি। যে-মূল্যবোধ আমরা হারিয়েছি, কেউ যদি তা আমাদের ফিরিয়ে দিতে পারত, তা হলে হয়ত আমাদের এতটা দুর্গতি ঘটত না। খাদ্যসংকটের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, অপেক্ষা কর, খাদ্য পাওয়া যাবে, এই আশ্বাস আজ আর যথেষ্ট নয়। জনসাধারণ বেশ কিছুদিন ধরে অপেক্ষা করে আছেন, কিন্তু তাতে কিছুই লাভ হয় নি। বর্ত্তমান বৈষম্য দূর করার জন্য যদি অন্য ব্যবস্থা অবলম্বিত না হয়, তাহলে জনসাধারণ নিজেরাই ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অগ্রসর হবেন।

দিল্লীর ভোজসভার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন; আমাদের যখন বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানী করতে হচ্ছে, তখন ভোজসভায় এত প্রাচুর্য্য কেন?"

এই জাতীয় বক্তৃতা আমরা মনুমেণ্টের নীচে শুনিলে বলিতাম যে যথাযথ হইয়াছে। শ্রীমতী পণ্ডিত দীর্ঘদিন বিদেশে ভারত-প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত রূপে কাটাইয়াছেন। এদেশেও সরকারী ও বেসরকারী রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারীরূপেও তাঁহার অভিজ্ঞতা কমদিনের নয়। সুতরাং তাঁহার ভাষণে নিন্দাবাদ ও "খুঁত ধরার" সঙ্গে কিছু বাস্তবমুখী নির্দ্দেশ বা সিদ্ধান্তমূলক প্রস্তাব থাকিবে ইহা আমরা আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু দেখা গেল, যে সে পথেই তিনি চলিলেন না। এবং আরও আশ্চর্য্য কথা, এই ভাষণের গোড়ায় শ্রীশাস্ত্রী ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের "দৃঢ় হস্তে হাল ধারণ করার" জন্য প্রশংসাবাদ করিয়া পরে তাঁহাদেরই পদ্ধতিকে 'দোটানা-দোমনা' এবং প্রায় হাল ছাড়ার সামিল বলিয়া নিন্দাবাদও করিতে তিনি ছাড়েন নাই। আমরা বুঝিলাম না শ্রীমতী পণ্ডিত বর্ত্তমানের "দ্বিধাগ্রস্ত" নীতির পরিবর্ত্তে কি চাহেন। এখন জগতের যে পরিস্থিতি তাহাতে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে হঠকারিতা অত্যন্ত বিপজ্জনক। উপরন্তু বিগত ১৭ বৎসরের রাষ্ট্রচালনায়, অনভিজ্ঞতা ও অন্ধ-বিশ্বাসের কুফল স্বরূপে, এতই ভ্রম-প্রমাদ ও বিপরীত বুদ্ধির আবর্জ্জনা শাসনতন্ত্রে ও রাষ্ট্রচালন যন্ত্রে জমিয়াছে যে, সেখানে লম্ফ প্রদান করিয়া অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা বাতুলতামাত্র।

শ্রীমতী সমাজে নৈতিক সঙ্কটের কথা যাহা বলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু তিনি এতদিন কোথায় ছিলেন? তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ত প্রায় একচ্ছত্র অধিকারীরূপেই রাষ্ট্র-

চালনা করিয়া গিয়াছেন স্বাধীনতা লাভের পর হইতে তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত। তিনি রাষ্ট্র ও জাতিকে যেমন একদিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন সভ্যজগতে ও মানব সমাজে, অন্যদিকে এই রাষ্ট্রে দুর্নীতি প্রসারিত হইয়াছে তাঁহারই চাটুকাররূপে যে সকল ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ক্ষমতা ও অধিকার পাইয়াছে দেশে ও বিদেশে, প্রধানতঃ তাঁহাদেরই চক্রান্তে ও কারচুপিতে। শ্রীমতী পণ্ডিত কি সে কথা জানিতেন না? যদি জানিতেন তবে তিনি তাঁহার স্নেহশীল জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে সে-সবের প্রতিকার করিতে বলেন নাই কেন? যদি না জানিতেন তবে এখন তাঁর জানা প্রয়োজন যে, ভারত রাষ্ট্রের বর্ত্তমান দুরবস্থা ১৭ বৎসরের জঞ্জাল জমিবারই ফল। আমরা শ্রীমতী পণ্ডিতের ভাষণকে খুব বিশেষ মূল্যবান মনে করিতে অক্ষম।

অন্য কংগ্রেসীদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণমেনন ও শ্রীকেশব দেও মালব্য এই বাজেট বিতর্কে বাজেটের প্রতিকূল সমালোচনা করেন। শ্রীকৃষ্ণমেনন ও শ্রীমালব্য, দু'জনেরই বক্তব্যের মধ্যে ছিল বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগের ফলে ভারত বিদেশীর পদানত হওয়ার আশঙ্কা আছে। শ্রীকৃষ্ণমেনন ইহা ছাড়া অন্যদিকে কংগ্রেসী সরকার কিভাবে সমাজতন্ত্রের পথ হইতে সরিয়া যাইতেছে সেই বিষয় লইয়াও নানা কথা বলেন, কথা এই বর্ত্তমান বাজেট "ধনীর সহায়ক বাজেট", শিল্প ও অন্য উদ্যোগের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের (পাবলিক সেক্টর) সঙ্কোচন ইত্যাদি।

অর্থমন্ত্রী এইসকল সমালোচনার জবাবও সমান তালে দিয়াছিলেন। এবং সেই জবাবে শ্রীকৃষ্ণমেননকে স্বতন্ত্র-দলের মিঃ মাসানির সঙ্গে সমপর্য্যায়ে ফেলেন, কেননা (শ্রীকৃষ্ণমাচারীর মতে) দুজনেই নেতী ভাবে প্রভাবিত এবং দু'জনের উপরেই বিদেশী রীতিনীতির প্রভাব যথেষ্ট। শ্রীকৃষ্ণমেনন অর্থমন্ত্রীর খোঁচায় চটিয়া গিয়া বলেন যে, তাঁহাকে ও তাঁহার কথাগুলিকে ভুল ভাবে দেখানো হইতেছে। জবাবে অর্থমন্ত্রী শ্রীমেননকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, ভুল অর্থ করা বা ভুল বোঝান কোনও একজন সদস্যের একচেটিয়া অধিকার নয়। শ্রীকৃষ্ণমাচারী প্রবীণ লোক এবং ১৯৩৭ সন হইতে সংসদীয় বিষয়ে অভিজ্ঞ ও অভ্যস্ত। তাঁহার জবাব সমানে সমানে যায়। জবাবের সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট এইরূপ (আনন্দবাজার):—

শ্রীকৃষ্ণমাচারী তাঁহার বক্তৃতায় অধিকাংশ সময়ই স্বতন্ত্র দলের সদস্যদের সমালোচনার জবাব দিতে ব্যয় করেন। তিনি পরিষ্কার ভাষায় জানাইয়া দেন যে, সরকার চতুর্থ যোজনার আকার আর হ্রাস করিবেন না অথবা 'ব্যবসা-বাণিজ্যে অবাধ নীতি'তে ফিরিয়া যাইবেন না।

আজ বিতর্ক কালে যাঁহারা অর্থমন্ত্রীর সমালোচনা করেন, ভূতপূর্ব্ব প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমেনন তাঁহাদের অন্যতম। তিনি সমস্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের দাবি জানান। বৈদেশিক মূলধন আকর্ষণের জন্য যে পথ অর্থমন্ত্রী গ্রহণ করিয়াছেন, উহার সাফল্য সম্পর্কে তিনি সংশয় প্রকাশ করেন।

অর্থমন্ত্রীর জবাব লোকসভায় বেশ সমর্থন পায়। তাঁহার সরস বক্তৃতা সকলেই উপভোগ করেন।

কালো টাকার কথা ঘোষণা করার জন্য যে সুবিধা তিনি দিয়াছেন, তাহা কার্য্যকর হইবে কি না, সে বিষয়ে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত সংশয় প্রকাশ করেন। সরল প্রাণে তিনিও এক সময় তাহা স্বীকার করিয়া ফেলেন, তবে ইহাও বলেন, অর্থমন্ত্রীর যে টাকার দরকার, তাহা ভুলিলেও চলিবে না, ঐভাবে কিছু টাকা পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া তিনি আশা করেন।

বর্ত্তমান বাজেট সমাজবাদের পথ পরিত্যাগ করিয়াছে বলিয়া যে সমালোচনা করা হইয়াছে, তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে তাহা অস্বীকার করেন। তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে তিনি ঘোষণা করেন যে, তাঁহারা পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর নীতি সমর্থন করিয়া যাইবেন। আমরা নেহেরুর সফল উত্তরসাধক। আমি এইমাত্রই বলিতে পারি যে, এই সভার অপর দিকের কেহ যদি সূর্য্যের দিকে ধূলি নিক্ষেপ করে, তবে সে ধূলি তাঁহাদের চোখেই পড়িবে।

শ্রীমতী পণ্ডিতের অভিযোগের জবাব দিতে গিয়া অর্থ-মন্ত্রী বলেন, আমরা অস্থির-সঙ্কল্প নই। সরকার সিদ্ধান্ত-বিমুখ নয়। তবে আমরা মানুষ, ভুল আমাদেরও হইতে পারে।

ভারতে আরও বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগের ফলে দেশ পদানত হইবে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণমেনন ও শ্রী কে. ডি. মালব্য যে শঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভিত্তিহীন বলিয়া

তিনি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আরও বৈদেশিক মূলধন আহ্বানের পশ্চাতে আমার কোন স্বার্থ নাই। ভারতের স্বাধীনতা বিকাইয়া দিবার জন্ত আমি আসি নাই। আমি কাহারও নিকট মতি স্বীকার করি না। শ্রীমেনন ও শ্রীমালব্য বৈদেশিক মূলধনের প্রশ্নটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিয়াছেন। ভারত যে সর্ত দিবে, সেই সর্তেই বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগ করিতে দিব এবং যে-শিল্প ভারত গড়িয়া তুলিতে পারিবে না, কেবল সেই শিল্পেই উহা লগ্নী করা হইবে।

অর্থমন্ত্রী বলেন, আমি যে সমাজবাদে বিশ্বাসী, বাজেট বক্তৃতার সুরুতে একটি সঙ্কল্প-বাক্য পাঠ করিয়া তাহা ঘোষণার প্রয়োজন আছে বলিয়া আমি মনে করি না। প্রত্যেকটি কর-ব্যবস্থাই প্রমাণ করিবে যে, বাজেটটি সমাজবাদের আদর্শভিত্তিক।

পরিশেষে আমাদের মন্তব্য এই যে বাজেট আলোচনার ব্যাপারে লোকসভায় যে বিতর্ক চলিয়া গেল তাহা সেই প্রাচীন কথিকায় সাত অন্ধের হস্তী দর্শনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। দুই পক্ষের সকল ভাষণ-মন্তব্য ইত্যাদির সারফল যা হয় তাহা সাধারণ নাগরিকের বোধগম্য নয়। শ্রীকৃষ্ণমাচারীর বাজেট অতি বুদ্ধিমান লোকের কাজ। সুতরাং উহার দরুন লাভ ও ক্ষতির পূর্ণ পরিচয় এত সহজে পাওয়া যাইবে না। দেশের সাধারণজন ইহার প্রকৃত পরিচয় পাইবেন আরও পরে। আমরা উল্লাস বা হা-হুতাশ কোনটারই সমর্থন করিতে এখনও প্রস্তুত হই নাই।

সীমান্তে পাকিস্তানী উৎপাত

পাকিস্তানের জন্মই হিংসা হইতে একথা আমাদের কর্তৃপক্ষ যদি মনে রাখেন তবে তাঁহারা পাকিস্তানী হামলা বা গুলীগোলা চালনায় বিচলিত নাও হইতে পারেন। কাশ্মীরের এলাকায় ত হামলা ও গুলী-গোলা চালনা প্রায় সেদিন থেকেই চলিতেছে যেদিন পণ্ডিত নেহরুর বুদ্ধি-বিভ্রমের ফলে কাশ্মীরের মামলা জাতিসঙ্ঘের সম্মুখে যায় ও জাতিসঙ্ঘের হুকুমে পাকদখলীকৃত কাশ্মীর ও পাকহামলা-মুক্ত কাশ্মীরের মধ্যে একটা কৃত্রিম সীমান্তরেখা টানা হয়।

তারপর জন্মদাতা রক্ষণশীল ইংরাজ ও "মুরুব্বি" মার্কিন এই দুই খুঁটির জোরে পাকিস্তান ঐ জাতিসঙ্ঘেরই আদালতে ফরিয়াদি ভারতকে আসামীর কাঠগড়ায় ঢোকাইবার জন্য কত খেলাই খেলিয়াছে। উপরন্তু দুই অতি অজ্ঞ মার্কিনি পররাষ্ট্র নীতি-বিশারদ কম্যুনিষ্ট জগতের চতুষ্পার্শ্বে অবরোধ-প্রাচীর নির্ম্মাণের চেষ্টায় প্রথমে তুর্কী ও পরে পাকিস্তানে জলের স্রোতের ন্যায় অস্ত্রশস্ত্র সম্ভার এবং নগদ টাকা ঢালিতে থাকে। আজ সেই দুই বুদ্ধিমানের মধ্যে একজন মৃত ও অন্যজন রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্র হইতে একরকম বিতাড়িত। কিন্তু ইহাদের কীর্ত্তি-চিহ্ন রূপে পাকিস্তানে অস্ত্র সাহায্য ও অর্থ সাহায্য দুই চলিতেছে—যদিও যাহার সহিত বিরোধ করার জন্য মার্কিন রাষ্ট্র এত খরচ করিল পাকিস্তানের জন্য সেই কম্যুনিষ্ট চীনই এখন পাকিস্তানের নরা নাগর। এবং সেই বিনা মূল্যে প্রাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র গুলী-গোলা এখন সমানে খরচ হইতেছে ভারতের সঙ্গে বৈর সাধনায়। সুতরাং এক হিসাবে পাকিস্তানের এই সকল উৎপাতের আরম্ভ মার্কিন অর্থ-সাহায্য।

কাশ্মীরের "গুলী চালন বন্ধ" রেখায়, অর্থাৎ পাক-অধিকৃত ও স্বাধীন কাশ্মীরের সীমান্ত রেখায় গুলী-গোলা হামলা এত ধারাবাহিক ভাবেই চলিতেছে। তারপর চলে আসাম সীমান্তে লাটি-টিলা ও অন্য দুই-এক স্থলে। সম্প্রতি কিছুদিন যাবৎ পশ্চিমবঙ্গের উত্তর অঞ্চলে কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি এলাকায় একদিকে পাকিস্তানী দল চুরি-ডাকাইতি রাহাজানি—অর্থাৎ তাহাদের বংশগত পেশা—চালাইতেছে, পিছনে সশস্ত্র আনসার ও পূর্ব্বপাকিস্তান রাইফল্‌স্ লইয়া, আবার সেই সব চেষ্টা ব্যর্থ হইলে সমানে গুলী ও মর্টারের (খর্ব্বাকৃতি কামান) গোলা চালাইতেছে। এবং সেই সঙ্গে শোনা যায় সৌরাষ্ট্রে ও যোধপুরে সীমান্ত লঙ্ঘন করিয়া পাকিস্তানী হামলাকারিগণ উৎপাত করিতেছে। অবশ্য সেখানে অন্য তিনটি অঞ্চলের মত উৎপাতের বহর ও ব্যাপ্তি এত বেশি নয়।

কিছুদিন পূর্ব্বে পাকিস্তানের নিকট ভারত এক অস্ত্র-সংবরণের প্রস্তাব করে। পাকিস্তান ঐ প্রস্তাবে সম্মতও হইয়াছিল। সেই প্রস্তাবে ছিল যে প্রথমে দুই পক্ষই অস্ত্র সংবরণ করিবে এবং তারপর সমস্ত বিরোধের বিষয় আলোচনা করা হইবে। অবশ্য প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার

কোনও নজীর পাকিস্তানের ১৭ বৎসরের ইতিহাসে নাই। কিন্তু আমাদের কর্তৃপক্ষ বহুবার প্রতারিত হইবার পরও এই আশা ত্যাগ করিতে পারেন নাই যে, একদিন পাকিস্তানে শুভবুদ্ধির উদয় হইবে। উপরন্তু গোলাগুলী ও অস্ত্রশস্ত্র যদিও মার্কিন দেশের কৃপায় জোটে, মিথ্যার বান পাকিস্তানে প্রচুর তৈয়ারী হয়, কেননা পাকিস্তানের বড় বড় মুখপাত্রেরা এক একজন মিথ্যার কারখানাস্বরূপ। সুতরাং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে—কখনও বা চীনের দৃষ্টান্ত মত পূর্ব্বাহ্ণেই মিথ্যা দোষারোপ করিয়া ভারতকেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য দায়ী করা আরম্ভ হয়। এইবারের অস্ত্র-সংবরণ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের বেলায়ও সেই অপকার্য্যক্রম বাঁধাধরা পাকিস্তানী দস্তুর-মুতাবিকই হইয়াছে। লিখিবার সময় দুইটি সংবাদ একসঙ্গে আসে—একটি কোচবিহার-রংপুর সীমান্ত হইতে, অন্যটি আসে ঢাকা হইতে এবং দুইটিই শনিবার ২৭শে মার্চ্চের ঘটনা সংবাদের প্রথমটি আনন্দ-বাজারের ও দ্বিতীয়টি এক সংবাদ প্রতিষ্ঠানের।

"পাকিস্তান শনিবার সতীরপুলের নতুন এলাকায় হামলা সুরু করে। এদিন তিনবিঘা, থরথরিয়া, ঝিকাবাড়িতেও তারা প্রবল আক্রমণ চালায়। কোচবিহার-রংপুর সীমান্তের প্রায় নয় মাইল জায়গা জুড়ে পাক মর্টার রাইফেল ও মেশিনগান এখন তীব্র গোলাগুলী বর্ষণ করছে।

গোলার বিরাট্ আকার দেখে অনুমান করা হচ্ছে যে, এগুলো ৩ ইঞ্চি মর্টারের গোলা। এ গোলাগুলী অস্ত্রশস্ত্র, বিদেশের তৈরী বলেই মনে করা হচ্ছে! যে নিপুণ কৌশলে অবিরাম গোলাগুলী ছোঁড়া হচ্ছে বিশেষজ্ঞদের সন্দেহ, সেটা পাক সীমান্ত পুলিশের কাজ নয়, সেনা-বাহিনীর পাকা হাতের মার। সীমান্তের ভারতীয় এলাকায় অনেক বাড়ী পাক গুলীগোলার আঘাতে ঝাঁঝরা।

ভারতীয় ছিটের অবস্থা

কোচবিহারের খাগড়াবাড়ি, শালবাড়ি, কাজলদীঘি, কোতভাজিনী প্রভৃতি বড় বড় ভারতীয় ছিট তালুক দীর্ঘ-কাল যাবৎ ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন। গত জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারীতে শালবাড়ি ও কাজলদীঘি ছিট দুটো থেকে প্রায় তিন হাজার রাজবংশী সাঁওতাল ঘরবাড়ী ছেড়ে [illegible] করে উদ্বাস্তু হয়। কিন্তু আজও সেই ভারতীয় ছিটে ফিরে যাবার পথ পায় নি। এই ছিট দুটো মাত্র দু'বিঘা পাক অঞ্চল দিয়ে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন। অথচ পাকিস্তান ভারতভূমি তিনবিঘার ওপর দিয়ে দাহা গ্রাম পাক ছিটে যাবার অধিকার দাবি করছে। তিনবিঘার ওপর অবিরাম হামলা চালাচ্ছে।"

"ঢাকা, ২৭শে মার্চ্চ—ডাহাগ্রাম পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার জন্য পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব্ব পাকিস্তানের চীফ সেক্রেটারীদের মধ্যে এক বৈঠকের যে প্রস্তাব ভারতের পক্ষ হইতে করা হয়েছে পাকিস্তানের তার প্রতি সমর্থন আছে। গতকাল এই কথা বলে পূর্ব্ব পাকিস্তানের গভর্ণর শ্রীমোনিম খাঁ বলেন, "স্থিতাবস্থা পুনঃপ্রবর্ত্তিত" হ'লেই এই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হ'তে পারে।

ভারতবিরোধী প্রচারকার্য্য চালু রাখার জন্য গভর্ণর কিন্তু এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় ডাহাগ্রাম এলাকায় ভারতের বিরুদ্ধে আক্রমণের অভিযোগের উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, ভারত এখনও পাকিস্তানী অফিসারদের কোচবিহার জেলার দহগ্রাম ছিটমহল পরিদর্শনের পারমিট না দিয়ে "স্থিতাবস্থা পুনঃপ্রবর্ত্তনে ব্যর্থ হয়েছে'।"

এইভাবে উৎপাতের প্রসারণ ত সুচিন্তিত নক্সা অনুযায়ী হইতেছে সন্দেহ নাই এবং ইহার পিছনে চীনা সলা-পরামর্শ রহিয়াছে তাহাও নিশ্চিত। যেভাবে কাজ চলিতেছে তাহাতে এদিক হইতে নরম হইলেই পাকিস্তানী ফন্দি পুরাপুরি সফল হইবে। আশা করা যায় নয়াদিল্লীর দল সেটা বুঝিতে সক্ষম। পশ্চিমবঙ্গের সরকারী মহল এখন এ বিষয়ে স্থির সংকল্প আছেন শোনা যায়। তাঁহাদের মতে অস্ত্র সংবরণ সম্পর্কে নূতন প্রস্তাব বা কথাবার্ত্তা এখন পাকিস্তানের তরফ হইতেই আসা উচিত। এদিক হইতে সে প্রকার কোনও সাড়াশব্দ দেওয়া অত্যন্ত ভুল হইবে। সুতরাং এখন কঠোর প্রতিরোধ ব্যবস্থা খাড়া করা ও বহাল রাখাই একমাত্র পন্থা।

নয়াদিল্লীর পররাষ্ট্রবিদগণ যাহাই ভাবুন, জগতের অন্য সকলেই পাকিস্তানের ভাবগতিক সঠিক ভাবেই বুঝিয়া লইয়াছে এবং সেই মত নিজ নিজ বিচার অনুযায়ী পাকিস্তান ও ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করিতেছে চীন ভারতের পরম শত্রু এবং চীন বহুপূর্ব্বেই বুঝিয়

হইয়াছে যে, পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতির মূল সূত্রই ভারতের অনিষ্ট সাধন। এবং সেই সূত্রেরই ভিত্তিতে চীন পাকিস্তানের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে ভারতের সর্ব্বনাশ করার উদ্দেশ্যে।

এখন আমাদের সম্মুখে দুইটি প্রশ্ন রহিয়াছে। প্রথমটি হইল নয়াদিল্লীকে বুঝান যে, চীন ও পাকিস্তানের মধ্যে অন্যদিকে যে প্রভেদই থাকুক, ভারতের প্রতি বৈরাচরণ বিষয়ে দুই সমান। উপরন্তু পাকিস্তান মার্কিনী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এক অপরূপ সম্পর্ক রাখিয়াছে, যাহারদরুন একদিকে মার্কিন সরকারকে "বোকা বুঝাইয়া" বিনা পয়সায় অস্ত্রশস্ত্র ও বিরাট পরিমাণে আর্থিক সাহায্য আদায় চলে ও অন্যদিকে ভারতকে কোনপ্রকার সাহায্য দিলে মান-অভিমান ও চক্ষু রক্তবর্ণ করাও চলে—যদিচ ভারত কোনকিছুই বিনামূল্যে লহে না ও লয় নাই। সুতরাং পাকিস্তান সম্পর্কে আমাদের সতর্কতা ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা ঠিক চীনের দরুন যে ভাবে হইতেছে সেই ভাবেই হওয়া প্রয়োজন। এবং সেই ব্যবস্থা যত দ্রুত অগ্রসর হয় ততই ভাল।

কেননা পাকিস্তান যেভাবে ক্রমেই হামলা, গুলী-গোলা চালনা, সশস্ত্র পাকিস্তানী সেনা বা আনসারের সমর্থনে ভারতীয় এলাকায় হানাদার দুর্ব্বৃত্তদের আক্রমণ ও লুঠপাট, ইত্যাদি বর্দ্ধিত ও প্রসারিত করিতেছে, তাহাতে মনে হয় যে, চীন ও পাকিস্তানের মধ্যে গুপ্ত চুক্তি হইয়াছে ভারতের সহিত যুদ্ধ বাধাইবার। উপরন্তু পাকিস্তান ও চীন তাহাদের মিথ্যা প্রচারের বলে জগতের সামনে ভারতকেই ঐ যুদ্ধের জন্য দায়ী করিতে চাহে। এবং এ বিষয়ে তাহাদের সহায়ক ও পঞ্চম বাহিনীরূপে যাহারা এ দেশের ভিতরে রহিয়াছে তাহাদের মারফৎ এদেশের মধ্যেও অপপ্রচার চালাইবার এবং বিধ্বংসী কার্য্যক্রমের অনুশীলন ব্যবস্থাও তাহারা দ্রুত করিবার আয়োজন করিতেছে মনে হয়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন আমাদের পররাষ্ট্র দপ্তরকে বিদেশে পাকিস্তান সম্পর্কে প্রচার—অন্ততঃ পাকিস্তানী অপপ্রচার খণ্ডন—ব্যবস্থা সক্রিয় ভাবে চালু করার প্রয়োজন সম্পর্কে অবহিত করা যায় কি উপায়ে। এতাবৎ পাকিস্তান আমাদের উপর ক্রমাগত দোষারোপই করিয়া গিয়াছে এবং আমরা শুধু নাকিসুরে "হায়! কি দুর্ভাগা আমাদের যে পাকিস্তান আমাদের ভুল বুঝিল" এই জাতীয় বিলাপ গাহিয়াছে। এইরূপ মূর্খ আচরণের ফলেই আজ জগতে আমাদের আসন ক্রমেই নীচে নামিতেছে।

হিন্দী ও অহিন্দী ভাষীর সমস্যা

নয়াদিল্লীর কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে এখনও সর্ব্বভারতীয় দৃষ্টিকোণ হইতে কোনও সমস্যা দেখার প্রয়োজন খুব অল্প লোকেই বুঝিয়াছেন। অবশ্য আমরা বুঝি যে, জবাহরলাল নেহরুর বিরাট ব্যক্তিত্ব বর্ত্তমান মন্ত্রীসভার কাহারও কাছে আশা করা বাতুলতা। কিন্তু পণ্ডিতজী যে দীর্ঘদিন তাঁহার সহকর্মীদের চোখের সম্মুখে প্রাদেশিকত্ব বর্জ্জন করিয়া সর্ব্বভারতীয় জাতীয়তাবাদ স্থাপনার আদর্শ ধরিয়া রাখিয়াছিলেন তাঁহার সেই আদর্শবাদ কি তাঁহার সহকারীদের মনে আঁচও কাটিতে পারে নাই? ব্যক্তিত্ব সম্প্রসারিত বা সঙ্কুচিত হয় মনের প্রসার বা সঙ্কোচনের কারণেই। এবং মনের প্রসার তখনই সম্ভব যখন মানসচক্ষু মোহাচ্ছন্ন নয় এবং চিত্ত নিষ্কাম—অন্ততঃ ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত কামনালুব্ধ নয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার কর্ত্তাব্যক্তিদের এটুকু জ্ঞানেরও কি অভাব রহিয়া গিয়াছে?

নয়াদিল্লীতে বিগত ২৭শে মার্চ্চ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মহিলা আহ্বায়কদের তিনদিনব্যাপী এক সম্মেলন হয়। সেখানে উদ্বোধনকালে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যে বক্তৃতা করেন তাহাতে তাঁহার পিতার আদর্শবাদের প্রভাব দেখা যায়। কিন্তু শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী ঐদিনই ঐ সভায় যে বক্তৃতা করেন তাহা দ্ব্যর্থযুক্ত এবং বুঝা যায় যে, তিনি নিজ মাতৃভাষাকে "রাজভাষা"রূপে প্রতিষ্ঠিত করার লোভ পরিত্যাগ করিতে এখনও পারেন নাই। দুইজনের বক্তৃতার রিপোর্ট এইরূপ—

"নয়াদিল্লী, ২৭শে মার্চ্চ—কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ বলেন যে, ঘরোয়াভাবে ভাষা সমস্যা সমাধানের জন্য সকল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন আহ্বান করা উচিত।

শ্রীমতী গান্ধী প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মহিলা আহ্বায়কদের তিনদিনব্যাপী সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন. ভাষা সমস্যা সমাধানে আমাদের অতি

সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতে হইবে। বর্ত্তমান অবস্থায় হিন্দীর গতি ত্বরান্বিত করিতে গেলে সমস্যার সৃষ্টি হইবে।

দক্ষিণ ভারতে সাম্প্রতিক ভাষাবিদ্রোহ সম্পর্কে তিনি বলেন, হিন্দীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কিছু সংখ্যক হিন্দীভাষী যেরূপ অধৈর্য্যের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহারই ফলে দক্ষিণ ভারতে বিশেষভাবে মাদ্রাজে অহিন্দীভাষীদের মনে ক্রোধ ও আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। তিনি বলেন, মাদ্রাজ হাঙ্গামার অব্যবহিত পরে আমি মাদ্রাজ গিয়াছিলাম। আমি দেখিয়াছি, অধিবাসীরা হিন্দীবিরোধী নয়, কিন্তু কেহ তাহাদের উপর হিন্দী চাপাইয়া দিবে, ইহা তাহারা চায় না।"

"নয়াদিল্লী ২৭শে মার্চ্চ—ভাষা সমস্যা সম্পর্কে হিন্দী ও অহিন্দী ভাষী রাজ্যগুলির তুষ্টির জন্য "কোন একটি মধ্যপন্থা" উদ্ভাবন করিতে হইবে।- আজ প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রী প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির নারী আহ্বায়িকা সম্মেলনে বক্তৃতাকালে পূর্ব্বোক্ত মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন—ভাষা সমস্যা খুবই জটিল। এ ভাষায় কোন কর্ম্মসূচী রূপায়ণে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে। দাক্ষিণাত্যের কোন কোন বন্ধু ইংরাজীকে সহযোগী ভাষা হিসাবে চালু রাখার জন্য বিশেষ প্রতিশ্রুতি চান। আর্য্যাবর্ত্তবাসীরা কিন্তু মনে করেন যে, পণ্ডিতজীর আশ্বাসই যথেষ্ট। কাজেই এ অবস্থায় উভয় শ্রেণীর মনস্তুষ্টির জন্য একটা মধ্যপন্থা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

সংবিধান সংশোধনের জন্য রাজাজীর প্রস্তাবে তিনি সায় দিতে পারেন নাই। তিনি বলেন, হিন্দী সরকারী ভাষারূপে ব্যবহারের সময় ইংরাজী বা অন্য যে কোন উপযুক্ত প্রতিশব্দ প্রয়োজন হইলেই ব্যবহার করা চলিবে। তবে সংযোগ-রক্ষাকারী ভাষারূপে হিন্দীর ভূমিকা যেন সব সময় গঠনমূলকই হয়।"

শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী "আর্য্যাবর্ত্তবাসী" বলিতে কাহাদের কথা বলিয়াছেন জানি না। কিন্তু কথার ধরন দেখিয়া মনে হয় যে, "আর্য্যাবর্ত্ত" বলিতে প্রাচীনদের সংজ্ঞার্থ তিনি মানিয়া চলেন নাই। কৃষ্ণসার মৃগের বিচরণভূমির বদলে তিনি হিন্দীভাষীদের রাজ্যগুলিকেই আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়াছেন—এবং [illegible] সংবাদের কংগ্রেসী কথা বলা কি তাঁহার উচিত হইয়াছে? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনি এখনও বিষয়টি "শিকায় তুলিয়া" কার্য্যসিদ্ধির কথা ভাবিতেছেন!

পরলোকে কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় গত ২৪শে মার্চ্চ পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স সত্তর বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এখনও জীবিত রহিয়াছেন। তিনি 'ইউরোমিয়া' রোগে ভুগিতেছিলেন। অস্ত্রোপচারের পর তাঁহার মৃত্যু হয়।

১৩০১ সনে নদীয়া জেলার লোকনাথপুর গ্রামে সাবিত্রী-প্রসন্নের জন্ম হয়। ছাত্রজীবন তাঁহার বহরমপুরে কাটে। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর স্নেহচ্ছায়ায় তিনি মানুষ হইয়াছিলেন। শ্রীশচন্দ্র নন্দীর তিনি সহপাঠী ছিলেন। ছাত্রাবস্থাতেই দেশের কাজের জন্য তিনি কারাবরণ করেন। সেইজন্য এম. এ. পড়া আর তাঁহার হইয়া উঠে নাই। তাঁহার প্রতিটি রচনায় মধ্যেই দেশাত্মবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সত্যিকার কবি ছিলেন। তাঁহার প্রথম কবিতার বই 'পল্লী ব্যথা।' অন্যান্য কাব্য-গ্রন্থের মধ্যে 'জলন্ত-তলোয়ার', 'অনুরাধা', 'অতসী', 'মনোমুকুর', বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করে। 'উপাসনা' সাহিত্য-পত্রের তিনি সম্পাদক ছিলেন। ছোটদের জন্যও তিনি কয়েকখানি বই লিখিয়া গিয়াছেন। উহাদের মধ্যে 'কুঁড়ের বাদশা' 'বেঁটে বক্রেশ্বর' উল্লেখযোগ্য।

সাবিত্রীপ্রসন্ন হিন্দুস্থান লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানীতে প্রচার ও জনসংযোগ অফিসার নিযুক্ত হইয়াছিলেন পরে বীমা কোম্পানীর রাষ্ট্রীয়করণের পর তিনি জীবন বীমা কর্পোরেশনে সিনিয়ার অফিসারের পদে নিযুক্ত হ[illegible] ১৯৫৭ সনে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু অবসর গ্র[illegible] করিলেও, তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভা[illegible] পত্র-পত্রিকাগুলি গৃহে বসিয়া সম্পাদনা করিতেন। তি[illegible] রাজ্য সরকারের পাবলিকেশন রিভিউ বোর্ডেরও স[illegible] ছিলেন। তাঁহার অনেকগুলি গল্পগ্রন্থও ছিল। বি[illegible] করিয়া ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে রাসবিহারী বসুর দা[illegible] প্রসঙ্গ লইয়া তিনি যে একটি তথ্যবহুল গ্রন্থ রচনা ক[illegible] গিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। ব্যক্তি হিসাবে তিনি ছি[illegible] সদালাপী ও বন্ধুবৎসল। তাঁহার মৃত্যুতে দেশবাসী এব[illegible]

সত্যের বিরোধ ও সামঞ্জস্য

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

কোনও বিষয়ে একটি মন্তব্য প্রকাশ করিলাম, একটি প্রবন্ধ রচনা করিলাম। সত্য নির্ণয় ও সত্য প্রকাশ করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিলাম। পরে ভাবিয়া দেখি, সত্য বলিয়াছি বটে, কিন্তু আংশিক সত্যমাত্র বলিয়াছি।

সত্যকে সমগ্রভাবে উপলব্ধি করিয়া সম্পূর্ণ ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য, হয়ত অসাধ্য। মানুষ স্মরণাতীত কাল হইতে সত্যের সন্ধানে ফিরিতেছে; পাইতেছে, আরও পাইতেছে, কিন্তু সমস্তটা পাইতেছে না।

বিশ্ব এক, কিন্তু নানা বিপরীতকে লইয়া এক। একটি চক্রাকার পথের এক জায়গা হইতে যদি একজন পূর্ব্বমুখে চলিতে আরম্ভ করে, এবং আর একজন তাহার ঠিক বিপরীত স্থান হইতে পশ্চিম মুখে চলে, তাহা হইলে মনে হইবে বটে যে, তাহারা পরস্পর উল্টা দিকে যাইতেছে; কিন্তু বাস্তবিক তাহারা এক দিকেই যাইতেছে। কারণ, প্রথম ব্যক্তি যে-স্থান হইতে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, দ্বিতীয় ব্যক্তি সেই স্থানে পৌঁছিলে দেখা যাইবে যে, সেখানে প্রথম ব্যক্তির মুখ যে-দিকে ছিল, দ্বিতীয় ব্যক্তির মুখ সেই দিকেই রহিয়াছে।

ভারতবর্ষ হইতে পূর্ব্বাভিমুখে জাপান দিয়া আমেরিকা যাওয়া যায়, আবার পশ্চিমাভিমুখে ইংলণ্ড হইয়াও আমেরিকা যাওয়া যায়।

বিপরীতের একত্র সমাবেশে ও সামঞ্জস্যে জগৎ চলিতেছে। বিশ্বে আগুনও আছে, জলও আছে। জল আগুন নিবাইয়া দেয়, আগুন জলকে বাষ্পে পরিণত করিয়া উড়াইয়া দেয়। অথচ এই জল ও আগুনের সহযোগে রেলগাড়ী, ষ্টীমার ও নানা কলকারখানা চলিতেছে।

শুধু তাপেও বিশ্ব চলে না, শুধু শৈত্যেও চলে না; আবার খুব কম তাপেরই নাম শৈত্য। কেবলমাত্র তাপের বা শৈত্যের বিরুদ্ধে বা অনুকূলে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিলে তাহা সত্য হইবে না।

বিশ্বে জন্মও আছে, মৃত্যুও আছে। বীজ মরিয়া গাছ হয়। তবে কি মৃত্যু জন্ম ও জীবনের কারণ? না মৃত্যু জন্ম-জীবনের রূপান্তর মাত্র? বীজের যে দশা আমাদেরও কি তাই? আমাদের এই পৃথিবীতে মনুষ্যরূপে মৃত্যু অপর কোনও স্থানে অন্য কোনও জীবের আকারে জন্মের পূর্ব্বাবস্থা, নামান্তর বা রূপান্তর হইতে পারে না কি? তাহা হইলে অমুক মরিয়াছে বলিলে সম্পূর্ণ সত্য বলা হয় না; সঙ্গে সঙ্গে বলিতে হয়, অমুক জন্মিয়াছে। কিন্তু কোথায় কি আকারে, কে জানে?

বিশ্বে আলো ও আঁধার আছে। আলোর পরিমাণ যত কম হয়, আঁধার তত নিবিড় হয়। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন নিরেট আঁধার বলিয়া কিছু আছে কি? বাস্তবিক আঁধার আলোর শৈশবমাত্র। তাহা হইলে আলো-আঁধারের বৈপরীত্য কি সত্য!

জগতে স্থাবর জঙ্গম দুই আছে, গতি ও নিশ্চেষ্টতা আছে। কিন্তু সম্পূর্ণ স্থির ও স্থাবর কিছু আছে কি? গতি ভিন্ন স্থিতির জ্ঞানই জন্মিতে পারে না। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞান হয়। আলোক, শব্দ প্রভৃতি এক এক প্রকারের তরঙ্গ; আর তরঙ্গও এক রকমের গতি। কে চলিতেছে, কে দাঁড়াইয়া আছে, কে কর্ম্মিষ্ঠ, কে নিষ্ক্রিয় বলা কঠিন। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির সাক্ষ্য অনুসারে পৃথিবীর মত নিশ্চল ত কেহ নাই; কিন্তু জ্যোতিষী বলিতেছেন, যে, পৃথিবী অতি ভীষণ বেগে সূর্য্যের চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছেন। আমরা কোন একটা ঘটনার সত্যতার চূড়ান্ত প্রমাণ এই দি যে, উহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের

সাক্ষ্য কি সব সময়ে প্রামাণিক ? অথচ ইন্দ্রিয়কে অবিশ্বাস করিলেই বা চলে কেমন করিয়া ? সত্য নির্ণয় বড়ই কঠিন।

একটি আম পাড়িয়া হাঁড়ির ভিতর রাখিয়া দিলাম। আমি তাহার সম্বন্ধে তার পর আর কিছু করিলাম না, সেও নড়িল চড়িল না; কিন্তু ক্রমশঃ পাকিল, পচিয়া গেল। সুতরাং উহা স্থির নিশ্চল ছিল বটে, কিন্তু উহার ভিতরে ক্রিয়া চলিতেছিল।

চেতনের রাজ্যে কে অলস কে কর্ম্মিষ্ঠ, সহজে বলা যায় না। যে বুদ্ধদেব বৎসরের পর বৎসর বৃক্ষতলে নিশ্চলভাবে বসিয়া ছিলেন, তিনি কি অলস ছিলেন ? তাঁহার ভিতরে যে শক্তি কাজ করিতেছিল, তাহা এমন ধর্ম্মচক্র ঘুরাইয়াছে যে, তাহার প্রভাবে ছোট বড় হইয়াছে, বড় ছোট হইয়াছে, সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন ঘটিয়াছে, কত জাতি সুসভ্য হইয়াছে, এখনও কত কোটি লোক জীবনে পথ দেখিতে পাইতেছে, বল, সাহস, সান্ত্বনা ও শান্তি পাইতেছে। এই অদ্ভুতকর্ম্মা পুরুষকে নিষ্কর্ম্মা বলা চলে না।

যে বাষ্পীয় কল (ষ্টীম এঞ্জিন) পৃথিবীতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে, তাহাও একদিন নিশ্চলভাবে চিন্তামগ্ন এক স্কচ্ কারিগরের চিন্তামাত্র ছিল।

চঞ্চলতা বা গতিশীলতাই কর্ম্মিষ্ঠতা নয়, নিশ্চলতাও নিষ্ক্রিয়তা নহে।

শক্তি সঞ্চয়, শক্তি প্রয়োগের উপায় নির্দ্ধারণ, নিশ্চলতা নীরবতা নিস্তব্ধতার মধ্যে ঘটে।

চৈতন্য নিদ্রা সংজ্ঞাহীনতা সব অবস্থাই আমরা প্রত্যক্ষ করি। পূর্ণ সতর্ক সজাগ অবস্থা ও অন্যমনস্কতা, পাতলা ঘুম ও গাঢ়নিদ্রা, গাঢ়নিদ্রা এবং সংজ্ঞাহীনতা, এ সকলের মধ্যে প্রভেদ কি ? নিদ্রার সময়ে আমাদের চৈতন্য কি লুপ্ত হয়, না কোন অজ্ঞাতভাবে থাকে ? স্বপ্ন কি রকমের চৈতন্য ? স্বপ্নে কেহ কেহ যে শক্ত অঙ্ক কষিয়া ফেলে, উহা কিরূপ চৈতন্যের ক্রিয়া ? মৃত্যুকে আমরা যে চিরনিদ্রা বলি, ওটা কি একটা অলঙ্কারমাত্র, না বাস্তবিকই ইহলোকের চিরনিদ্রা লোকান্তরের জাগরণে পরিণত হয় ? তাহা হইলে মৃত্যুও কেবল চিরনিদ্রা নয়, জাগরণেরই নামান্তর।

বাস্তবিক জগতে একান্তভাবে কাহাকে ধরিব, একান্তভাবে কাহাকে ছাড়িব, বুঝিতে পারি না। ধ্যানের নিস্তব্ধতার মধ্যে ভগবদ্ভক্তি লাভ করা যায়; কিন্তু প্রমত্ত কীর্ত্তনের মধ্যেও ভক্তির ধারা অবতীর্ণ হয় না কি ? প্রেমের মহিমা অনির্ব্বচনীয়। কিন্তু যাহা অমঙ্গল অশুচি, তাহার সম্বন্ধে প্রতিকূল ভাব পোষণ না করিলে শ্রেয়ের প্রতি প্রেম পুষ্ট হয় কি ? প্রেমের কাজ আছে। হিংসাদ্বেষের কি কোন কাজ নাই ? আলোকের অভাব বা ন্যূনতা যেমন আঁধার, প্রেমের অভাব বা ন্যূনতা তেমনই দ্বেষ, তাহা ত বলা যায় না; তাহাকে বরং ঔদাসীন্য বলা যায়। দ্বেষের সত্তা প্রেমেরই মত প্রবলভাবে অনুভূত হয়। প্রেম দ্বারা অপ্রেমকে পরাজিত কর, এই সদুপদেশ বুদ্ধদেব ও তাঁহার পরে আরও অনেকে দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা অপ্রেমকে পরাজিত করিতেই বলিয়াছেন; অপ্রেমকে প্রেম করিতে, ভালবাসিতে বলেন নাই। বিশ্বের বিধানেও দেখিতেছি, তাহার মধ্যে অমঙ্গলের প্রতি হিংসা অর্থাৎ তাহাকে বিনাশ করিবার ইচ্ছা, এবং তদুপযোগী বন্দোবস্ত রহিয়াছে।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, বিশ্বে মঙ্গল অমঙ্গল দুই কেন আছে, অমঙ্গল কি, কে তাহার সৃষ্টি করিল, দেশকাল-পাত্রভেদে মঙ্গল অমঙ্গলের এবং অমঙ্গল মঙ্গলের স্বরূপ প্রাপ্ত হয় কেন ? এ-সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া আমার সাধ্যাতীত। এ বিষয়ে যাহা বক্তব্য আছে, তাহাও দুই এক কথায় সারিয়া দেওয়া যায় না। যে সকল সহজ বিষয় আপাততঃ বিপরীতধর্ম্মী মনে হয়, সেইরূপ আরও কয়েকটি বিষয়েরই আলোচনা করি। (প্রবাসী বৈশাখ ১৩২১ হইতে)

অভাজনের সত্যাগ্রহ

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

পরাধীর প্রাণদণ্ড হবে। ঘাতক চণ্ডালকে আহ্বান করা
। কিন্তু চণ্ডাল হত্যাকার্যে সম্মত হ'ল না। এমন
না পূর্বে কখনও ঘটে নাই। এ অপূর্ব, অত্যাশ্চর্য।
তকদের প্রভু ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে বললেন, "রাজাজ্ঞা
ান্য কর, এমন তোমার দুঃসাহস।"

চণ্ডাল শান্তভাবে বললে, "হত্যা পাপ—এ কথা যখন
তে পেরেছি, তখন তা করব না। প্রাণ দেব, তবু প্রাণ
না।"

"রাজ-অন্নে পুষ্ট দেহ মোর
এর পরে তাঁর অধিকার।
মারুন কাটুন এরে রাজা
করুন যা মনোবাঞ্ছা তাঁর।

"আর এক আছে দিব্যদেহ
সর্ব সদ্গুণের আধার।
উজলে যা মনের আঁধার
তারে কি মারিতে পারে কেহ?"

ঘাতকাধিপতি সেই চণ্ডালকে রাজসমীপে উপস্থাপিত
রে নিবেদন করলেন: "মহারাজ! এই চণ্ডাল রাজাজ্ঞা
মান্য করছে!"

রাজা চণ্ডালকে প্রশ্ন করলেন, "কেন তুমি রাজাজ্ঞা
মান্য করছ?"

চণ্ডাল বিনীতভাবে উত্তর দিলে:

"করুণার সিন্ধু যিনি, দীনবন্ধু যিনি
মোরও পরে বর্ষে তাঁর করুণার ধারা।
যতেক কলুষ মোর ধৌত তার দ্বারা।
সত্যেরে দেখেছি আমি মৃত্যুভয় জিনি।
পিপীলিকা, তারও লাগি ব্যথা জাগে মনে
প্রাণীশ্রেষ্ঠ মানুষেরে বধিব কেমনে?"

রাজা বললেন—"অন্যের জীবন যদি নিতে না চাও,
বে তোমার জীবন দিতে প্রস্তুত হও।"

সত্যদ্রষ্টা, দিব্য বলে বলীয়ান, চণ্ডাল মৃত্যুভয় জয় করেছে। সে নির্ভীকভাবে বললে—

"এ দেহের মালিক রাজা। একে নিয়ে তিনি যা-খুশি তাই করতে পারেন। কিন্তু আমার এ দৃঢ় সংকল্প! দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশেও আমি এই লোকটিকে হত্যা করব না।"

চণ্ডালের এই উদ্ধত উত্তর শুনে রাজা ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। তিনি তখন সেই চণ্ডালের ভ্রাতৃগণকে আদেশ দিলেন—অপরাধীকে হত্যা করতে। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউই তাঁর আদেশ পালন করলে না।

রাজাজ্ঞায় একে একে পাঁচ ভাইকে হত্যা করা হ'ল। অতঃপর সম্রাট তাদের ষষ্ঠ ভ্রাতাকে আদেশ দিলেন—ঐ অপরাধীর শিরশ্ছেদ করতে। সেও যখন আদেশ অমান্য করলে, তখন তাকেও হত্যা করা হল।

চক্ষের উপর এমন ভয়ংকর হত্যাকাণ্ড দর্শন করেও, সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজাজ্ঞা পালনে অসম্মতি জানালো।

রাজা যখন সেই সপ্তম ভ্রাতারও প্রাণদণ্ডের হুকুম দিলেন, তখন চণ্ডালদের বৃদ্ধা মাতা রাজসমীপে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করলেন—"প্রভু, এর প্রাণরক্ষা করুন।"

রাজা প্রশ্ন করলেন—"যাদের এইমাত্র বধ করা হ'ল—তারা কি তোমার সন্তান নয়?"

"তারা সকলেই আমার সন্তান"—বৃদ্ধা উত্তর দিলে।

"তা হ'লে পূর্বে তাদের প্রাণরক্ষার প্রার্থনা না করে কেবলমাত্র সপ্তম সন্তানের জন্যে প্রার্থনা করছ কেন?"

বৃদ্ধা উত্তর দিলেন:

"তারা ছিল মহাসত্ত্ব, শুদ্ধ দেবোপম।
সর্ববাধা-বন্ধ হ'তে মুক্ত ছিল তারা।
জন্ম মৃত্যু একাকার দেখেছিল যারা—
তাহাদের তরে চিন্তা ছিল না ত মম।

"অশক্ত এখনো মোর সপ্তম সন্তান
এখনও সে লভে নাই অমৃতের স্বাদ,
ঘাতকের অসি যবে নিতে যাবে প্রাণ—
পাপেতে মজাবে এরে বাঁচিবার সাধ।

"সেই ভয়ে নতজানু যাচি আমি আজ
সন্তানের প্রাণ ভিক্ষা দাও মহারাজ!"

যারপরনাই আশ্চর্যান্বিত রাজা বলে উঠলেন: "চণ্ডালের মুখে এমন আশ্চর্য কথা জীবনে শুনি নাই। আলোকবর্তিকার ন্যায় এই বৃদ্ধা আমার হৃদয় আলোকিত করল। যে-পল্লী এমন সাধু ব্যক্তিদের জন্ম দেয়—তাকে চণ্ডালপল্লী বলি কেমন করে?"

"আত্মীয়স্বজনের প্রতি এদের কোন আগ্রহ, কোন আসক্তিই নাই। যত আসক্তি, যত আগ্রহ—সত্যের প্রতি! সত্যকে অনুসরণ করতে এরা প্রাণদান করে:

"অভিজাত উচ্চবংশে জন্ম হ'ল যার
তার কেন হেন হীন নৃশংস আচার?
চণ্ডাল সে—চণ্ডতারে যে করে ভজন
রাজকুলে জন্মালেও চণ্ডাল সে জন।

"করুণায় পরিপূর্ণ যাঁদের হৃদয়,
সকল প্রাণীর প্রতি যাঁহাদের প্রীতি,
লোভ, ক্রোধ, ভয় যাঁরা করেছেন জয়,
তাঁদের চণ্ডাল বলি—এ কেমন রীতি?

"সেইরূপ প্রেমময়, দয়াময় নরে
প্রেম প্রীতি ক্ষমা দয়া করিয়া বর্জন
হত্যা করে ক্রোধে অন্ধ চণ্ড যেইজন
চণ্ডাল সে! চণ্ডাল সে—বিশ্বচরাচরে!"

চণ্ডালরূপী এই মহামানবগণের শবযাত্রায় সম্রা[illegible] সপরিবারে যোগদান করলেন। শ্মশানে তাঁদের চিতানলে[illegible] নিকট কৃতাঞ্জলি হয়ে রাজা এই গাথা উচ্চারণ করলেন:

"নরদেহ মধ্যে ছিল অমরার জ্যোতি,
সুকোমল প্রাণে ছিল বজ্রাধিক বল।
ভস্মে আচ্ছাদিত যথা বিরাজে অনল!
নরলোকে ছিল যারা অভাজন অতি
পরলোকে তাহাদেরই হবে পরাগতি।"*

* অধুনালুপ্ত সংস্কৃত সূত্রালংকার গ্রন্থের চীনা অনুবাদ হ[illegible] রচিত।

—•—

ফেরার (এ প্রাইস অন হিজ হেড)

শ্রীমতী আনা সেঘার্স

অনুবাদিকা—শ্রীমতী গীতা মুখোপাধ্যায়

প্রবাসীর আগামী সংখ্যা থেকে বিখ্যাত জার্মান লেখিকা শ্রীমতী আনা সেঘার্স-এর একখানি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের অনুবাদ সুরু হবে। বইখানির নাম "এ প্রাইস অন হিজ হেড" (সেভেন সিজ পাবলিকেশন)। বাংলা অনুবাদের নাম হয়েছে "ফেরার"।

আলোচ্য উপন্যাসখানি হিটলারের অভ্যুত্থানের মুহূর্তটিতে জার্মানীর গ্রামের পটভূমিকায় লেখা। বিশ্বব্যাপী অর্থ নৈতিক সঙ্কট কঠোর পেষণে বিপর্যস্ত করে ফেলল যুদ্ধক্ষত জার্মানীকে, বিহ্বল ক'রে তুলল তার কৃষকসমাজকে। ১৯৩২ সালের সেই বিহ্বলতার সাহিত্যরূপ শ্রীমতী সেঘার্সের এই সার্থক উপন্যাস।

গ্রামের পরিবেশে এসে পড়ল শহরের ছেলে ভিনদেশী জোহান, মাথার উপর তার খড়্গ ঝুলছে। তার সেই সংক্ষিপ্ত ফেরারী জীবনের পটভূমিকায় লেখিকা চিত্রিত করেছেন তৎকালীন জার্মানীর গ্রামের মানুষের দুর্বলতা আর মানবতায় মেশা এক বিচিত্র কাহিনীকে। সুযোগ-সন্ধানী যে লোকগুলো নাৎসী-বাদের পথ সুগম করেছিল তাদের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জাতিটা কেমন ক'রে এই বীভৎস পথে টানা হয়ে গেল তারও একটা আভাস এ উপন্যাসে পাওয়া যায়। আবার যে মুষ্টিমেয় মানুষ দূরদর্শনের দ্বারা একে প্রতিরোধ করতে চেয়েছিল উচ্ছ্বাস অত্যুক্তি ছাড়া তাদের শান্ত বাস্তব বীরত্বও এ কাহিনীতে স্থান পেয়েছে।

ফেরারী জোহানের হৃদয়াবেগ, তার মানবতাবোধ, তার অনভিজ্ঞ অধীরতা, তার হঠাৎ-পাওয়া প্রেম পাঠক-মনকে আকৃষ্ট করবে। অপরাপর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্যও পাঠককে বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ দেবে। সর্বোপরি ফেরারীর জন্য সদা বিরাজমান উৎকণ্ঠা রহস্যকাহিনীর মত পাঠকমনকে উৎসুক রাখবে।

শ্রীমতী সেঘার্স হিটলারের আমলে বহুদিন ইংলণ্ডে শরণার্থী হয়ে ছিলেন। তৎকালে তাঁর যে সব বিখ্যাত উপন্যাস বেরিয়েছিল তার মধ্যে ছায়াছবিতে রূপান্তরিত "সাইন অব দি ক্রশ" পৃথিবীকে বিস্মিত করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি স্বদেশে স্বস্থানে ফিরে আসেন, যে জার্মানীতে হিটলারের আমলে তাঁর উপন্যাসের বহ্ন্যুৎসব হয়েছিল সেখানেই আবার তিনি জার্মান লেখক-সঙ্ঘের সভানেত্রী নির্বাচিত হন এবং আন্তর্জাতিক শান্তি পুরস্কার পান। দু'বার তিনি সাহিত্যের জন্য জার্মান জাতীয় পুরস্কার পান।

অনুবাদটি "ফেরার" নামে প্রকাশিত হবে আগামী মাস থেকে। অনুবাদ করেছেন শ্রীমতী গীতা মুখোপাধ্যায়। এঁর অনূদিত "অমৃতের পুত্র" (ব্রুনো আপিৎস্-এর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন উপন্যাস "নেকেড অ্যামঙ উলভস্"-এর বাংলা) পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে এবং সমালোচকদের প্রশংসা অর্জন করেছে। কিছুকাল জার্মানীতে অতিবাহিত করার দরুণ বাস্তব পটভূমিকা সম্পর্কেও তাঁর ধারণা আছে।

আশা করা যায় "ফেরার" উপন্যাস পাঠক-পাঠিকাদের ঔৎসুক্য জাগিয়ে রাখবে। আগামী বছর বৈশাখ থেকে ক্রমশঃ হিসাবে উপন্যাসখানি প্রবাসীতে প্রকাশিত হবে।

রায়বাড়ী

গিরিবালা দেবী

ঠাকুমা একবুলি মুখে আজ শয্যাত্যাগ করেছেন, "ও রাজেশ্বরী, জয়ের ওখানে কয়েকটা ট্যাপের মোয়া বের ক'রে দিয়ে আয়। পেসাদ আমার ট্যাপ বড় ভালবাসে। লুচি ত কলকাতায় পায়, ট্যাপের মোয়া কে তারে দেবে? 'যার লেগে যার পরাণ কাঁদে, অন্য লোকে লাঠি ফাঁদে।' তোরা ধান নিয়েই মত্ত, ট্যাপের দিকে নজর দিলি না। ধানের খই-এর চেয়ে ট্যাপের খই যে কত উপকারী রোগে-ভোগে, তা ত জানিস নে? এক বছরের ট্যাপ আরও চারটে জোগাড় ক'রে রাখতে হ'ত।"

কামিনীর মা ঘর ঝাড় দিতেছিল, মুখ না তুলিয়াই বলিল, "এক জালা ভরি ট্যাপ জাত করি তুলি থুইছি। আর কত নাগবে তোমাগো। যখন চাকররা নাও নিইয়া খালে-বিলে সাঁকলার ফল তুলিতে গেইছিল, তহন আরও কাঁড়িখানিক তোলাইয়া রাখিলা না ক্যানে? যা আনি দিইছেল, তা ঝাড়ি-বাছি রোদ্দুরে ভাজা ভাজা করি গোলাঘরে তুলি থুইচি। কত শত দেব্য বলে জয়ের থনে গড়াগড়ি যাইচে তা থুইয়া দা বাবু দাঁতে কাটিবে ট্যাপের মোয়া? আপনি কইলা আমি কয়েকডা বার করি দিইয়া আসি।"

তরু চোখ মুছিতে মুছিতে জয়ের ঘরে যাইতেছিল, তাহার কোলে সাহেব। ঠাকুমা তাহাকে চাপিয়া ধরিলেন, "শোনছিস তন্থি, পুকুরের চালার জামগাছে কুটুম পাখী ডাকছে, ঐ শোন 'কুটুম আয় কুটুম আয়' ডাকছে। কুটুম আর কে আসবে, মণিরামরা আজ যদি আসে।"

"মণিরাম ঠাকুররা তোমাদের চাকর নফর, তারা আবার কুটুম হ'ল কিসের? কাল তোমার বাঁ চোখ নেচেছিল দাদা এল, তা যেন বুঝলাম। মণিরাম-ফণিরাম আমাদের কুটুম, ছিঃ।"

তরু আর দাঁড়াইল না।

ঠাকুমা এবার বিনুকে কাছে পাইলেন। বিনু মুখ ধুইয়া বাসি কাপড় ছাড়িয়া যাইতেছে শাশুড়ীর কাছে। ঠাকুমা হাত তুলিয়া ইশারা করিয়া তাহাকে নিকটস্থ হইবার ইঙ্গিত করিলেন। বিনু আগাইয়া আসিতেই চুপে চুপে কহিলেন, "পেসাদ কখন উঠে বার মহলে গেল লো? আমি তারে যেতে দেখলাম না; ভেবেছিলাম, 'প্রভাতে উঠিয়া সে মুখ দেখিব দিন যাবে ভাল ভাল'।" বিনু একথার কি উত্তর দিবে, শুধু একটু-খানি হাসিল।

বধূর সুমিষ্ট হাসিতে ঠাকুমা প্রীত হইয়া তেমনি নিম্নস্বরে বলিতে লাগিলেন, "কাল তোদের ঘরে ঝাড়ের বাতি বুঝি সারারাত জলেছিল? আমি শেষরাতে জানালা খুলে দেখলাম উঠোনে আলোর ফটিক ফুটেছে। নবনে যে তোর সিঁড়ির দুই দিকে সার দিয়া গাঁদা ফুলের গাছ লাগিয়ে দিয়েছে, কি ফুলটাই ফুটেছে। সেই ফুলের ওপরে পড়েছিল বাতির আলো। তোরা দেখেছিলি ত?"

বিনু নীরব।

ঠাকুমা সে নীরবতার ধার না ধারিয়া আপনার আনন্দে আপনি অধীর—"দেখ মণিমালা, এবারের যাত্রাগান তুই শুনেছিলি ত? ঐ যে কিসের পালা যেন, সখীরা নেচে নেচে গান গেয়েছিল, তোর মনে নেই? তোরা একালের মেয়ে, ঐ সব শিখে রাখতে হয়। পেসাদ আমার সোনার ছেলে কিন্তু বয়েসটা ডবকা। থাকে বিদেশে, তাকে কাছে পেলে তন্তর-মন্তর দিয়ে বশ করে নিতে হয়। কাল তোকে শিখিয়ে দিতে পারি নি, এখন শিখিয়ে দিচ্ছি সখীদের সেই গান—রাতে ঝাড় জ্বালিয়ে সাজগোজ করে পেসাদকে বলিস—

'রহিয়া রহিয়া কেন এই মুখ মনে পড়ে,
এ চাঁদের সুধা বিনা চকোর যে প্রাণে মরে'।"

বিনু আর হিতোপদেশ শুনিতে পারিল না, ত্বরিত পদে পলায়ন করিল।

মনোরমা ব্যাকুল হইলেন ছেলেকে পিঠা খাওয়াইতে। পৌষপার্ব্বণে সে থাকিবে না, দোলে সে আসিতে পারিবে না, তাহাকে এখনই পিঠা-পায়েস তৈরি করিয়া দিতে হইবে।

প্রসাদ চালের গুড়ার টিপি টিপি পিঠা ভালবাসে না। তাহার পছন্দ ক্ষীর-সর-ছানা।

মনোরমা স্নানান্তে বিনুর উপরে মাছের ঘরের ভার দিয়া ছোট ভোগশালায় ঢুকিলেন।

মাছ কম আসে নাই। বিনু পুলকিত হৃদয়ে মাছ রন্ধন করিতেছে, তাহার অন্তরের অন্তঃস্থলে ভ্রমর গুঞ্জন করিতেছে "তোমাকে দ্রৌপদী বলে ডাকতাম।"

কামিনীর মা হাজির, "বৌমা, কইমৌরি রাঁধতে পারবে? চিতল মাছের কোঁড়মা হবে। পাবদা মাছের হলুদ চচ্চড়ি, আমি কি দেখিয়ে দেব?"

বিনুর কানের পিপুল পাতা দোলে, "না মাসী, আমি নিজেই পারব, শিখে নিয়েছি। তুমি আমাকে মিহি ক'রে মৌরি বেঁটে দাও। কাঁচা লঙ্কা কুচিয়ে দাও।"

দেবতার ভোগের মতন অখণ্ড মনোযোগে বিনু থালায় থালায় রান্না করিয়া নামায়।

ভোগশালায় ভোগ প্রস্তুত। এখন সকলে ভোজনে বসিলেই হয়।

এমন সময় মণিরাম ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত হইল। ফণিরাম এখন কিছুকাল দেশে থাকিবে। তাহার পরিবর্ত্তে মণিরাম তাহাদের মাতুল কচিরামকে আনিয়াছে। আধ বুড়া একটা যণ্ডা-গুণ্ডা লোকের কচিরাম নাম শুনিয়া দাস-দাসীর মহলে হাসির হল্লোড় পড়িয়া গেল। মণিরাম পুরাতন লোক, কাণে জল ঢুকিলে সে জল বাহির করিবার রীতি জল দিয়া। মণিরাম অগ্রে পায়, "দেয়ও কিছু কিঞ্চিৎ না করে বঞ্চিত" এ নীতি বাক্য উড়িয়ার ছেলের অবিদিত নাই। মণিরাম বড় দুই দাদাবাবুর নিমিত্ত ঝিনুকের ধুপদানি আনিয়াছে। তরু-মুমুর ঝিনুকের কাকাতুয়া পাখী। আর সকলের কাঠির গায়ে কারুকার্য্য-করা পাখা। বেতের বাক্স ভরা মহাপ্রসাদ, বোতল ভরা চুয়া। একরাশি ঝিনুক।

মণিরামের আগমনে রায়বাড়ীতে নিশ্চিন্ততার বাতাস বহিয়া গেল। সকলেই খুসী, কিন্তু বিনু তেমন খুসী হইতে পারিল না। সে নূতন ব্রতী হইয়াছে, তাহার উৎসাহ অপরিমিত। সে আশা করিয়াছিল, প্রসাদ যে কয়দিন থাকিবে সেই রান্না করিয়া পতি-ভোজনের অক্ষয় পুণ্য অর্জ্জন করিবে। সাধে কি বিনু আশা করে তাহার হৃদয়বীণায় রহিয়া রহিয়া বাজে "দ্রৌপদী ব'লে ডাকতাম।"

সন্ধ্যা গড়াইয়া গিয়াছে। মণিরাম কচিরাম রন্ধনশালার ভার লইয়াছে। বিনু ফিরিয়া আসিয়াছে যথাস্থানে, বিরাট্ দুধের কড়ার সামনে।

ঠাকুমাকে লইয়া প্রসাদ বসিয়াছে তাহার শয়নগৃহের ঢাকা বারান্দায়। কনকনে শীতের রাত্রে খোলা হাতীর মাথায় ঠাকুমাকে দেখিলে সকলে রাগ করে।

সিঁড়ির দুই পাশে সারি সারি গাঁদা গাছে ফুল ফুটিয়া অঙ্গন আলো হইয়াছে। এ ফুল সরস্বতী পূজায় দিতে দেয় না। কুকুর-বিড়াল ছুঁইয়া দিতেছে, মালীবৌ গাছের গোড়ায় ঝাঁটা বুলাইতেছে।

ফুলের অপচয় হয় না দেখিয়া বিনু বড় আনন্দিত। যে বিশ্বশিল্পীর এমন অপূর্ব্ব রচনা, তাঁহার উদ্দেশ্যে তাঁহার রূপের ভাণ্ডার উজাড় করিতে বিনু ভালবাসে না। সে সময় সময় সন্তর্পণে ফুলগুলিকে স্পর্শ করিয়া আদর করে। নিশির শিশির-মণ্ডিত ফুলে ফুলে সে মুক্তা নিরীক্ষণ করিয়া মুগ্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া থাকে।

নাতিকে লইয়া ঠাকুমা সুখ-দুঃখের কাহিনী সবে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এমন সময় একদল কৃষক বালক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া জিগির দিতে লাগিল, 'জয় সোনা রায়ের জয়।' তাহাদের কাহারও হাতে ধামা, মাটির হাঁড়ি, তেলের বোতল, একজনার হস্তে বড় একটা টিনের কুপি মাটির সরায় বসানো, দপ দপ করিয়া জ্বলিতেছে।

প্রসাদ জিজ্ঞাসা করিল, "তোরা কোন্ পাড়া থেকে এসেছিস?"

"এঁজ্ঞে দাবাবু, মালদা পাড়ায় থাকি, সোনা রায়ের ভিক মাগিতে আইছি।"

পৌষপার্ব্বণের পূর্ব্ব হইতে এ-পাড়া সে-পাড়া হইতে চাষী বালকের দল সোনা রায়ের গান গাহিয়া পাড়ায় পাড়ায় চাল ও গুড় সংগ্রহ করিয়া থাকে। পৌষপার্ব্বণে বিলের কিংবা নদীর ধারে গাছের ছায়ায় নূতন মাটির পাত্রে পায়েস রাঁধিয়া তাহাদের বনের দেবতা সোনা রায়কে ভোগ দিয়া নিজেরা সারি সারি কলার পাতা পাতিয়া প্রসাদ খায়। বৎসরান্তে চাষী রাখালদের এই পৌষপরব।

ঠাকুমা বলিলেন, "ভিক মাগতে এসে গান গাইছিস না যে?"

ছেলের দল ধামা হাঁড়ি প্রদীপ নামাইয়া নাচিয়া নাচিয়া হাততালি দিতে দিতে গান ধরিল—

আইলাম রে অরণে সোনা রায়ের চরণে।
সোনার ঠাকুর দিল বর ধান চালে ঘর ভর।

সোনার ঠাকুর বিয়া কর‍্যা ব্যাভার পালে কি ?
থাল পাছি ঝারি পাছি, আর পামু কি ?
আটপৌরা ধুতি একখান ব্যাভার পায়াছি।

যায়রে যায় সোনার ঠাকুর শ্বশুরবাড়ী যায়,
তালের ছাতি মাথায় দিয়া সোনার নূপুর পায়।
হলদে বরণ চাদর সোনার ধুতির বরণ নীল,
বগলা ঘোড়ায় পাড়ি দেয় সিরণি গাঁয়ের বিল।

পাখ পাখালি সাথে চলে গায়ান গায় কোঁ,
'ছামাদ পায়্যা শাউরী নাচে ডঙ্কা বাজায় ভোঁ।
সোনার ঠাকুর দিল বর ধান চালে ঘর ভর॥

গীত শেষ করিয়া রাখাল বালকেরা হাঁকিল, 'মাঠান, সোনা রায়ের খাওন দ্যাও।"

রাখালদের মেঠো স্বরে আকৃষ্ট হইয়া ক্ষিতি তরু সুমুরা দাস-দাসীর সহিত আঙিনায় ছুটিয়া আসিয়াছিল। বিনুর দুধ-পর্ব্ব মিটিয়া গিয়াছিল, সেও আশ্রয় লইয়াছিল দ্বার-প্রান্তে। কোঁর সহিত 'ভোঁর মিলে সকলে হাসিয়া অস্থির।

মনোরমা কাঠা ভরিয়া চাল ধামায় ঢালিয়া দিলেন, বাটি ভরিয়া খেজুর গুড়।

ছেলেরা বলে, "ত্যাল দিলা না মাঠান, চ্যারাগের ত্যাল ?"

মাঠান ছোট্ট মাটির ভাঁড়ের খানিকটা তেল ঢালিয়া দিলেন বোতলে।

বালকের দল সোনা রায়ের গান গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল অন্য বাড়ীতে।

প্রসাদ ঠাকুমার শীর্ণ বাহু ধরিয়া তাগিদ দেয়, 'চল ঠাকুমা, তোমাকে তোমার ঘরে শুইয়ে লেপ চাপা দেইগে। বড় ঠাণ্ডা পড়েছে, বাইরে গরম কাপড় ছাড়া বসে থাকলে ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে।"

ঠাকুমা শীতে গরম কাপড় গায়ে দিতে পারেন না, তাঁহার গা কুট কুট করে। ছেলের বকুনিতে মোটা একটা বিছানার চাদর গায়ে জড়াইয়াছেন।

ঠাকুমা হাসেন মিটিমিটি, " 'মরণ যাবে ডভয়ে, তারে তারে এড়ায়ে।' আমার আবার শীত, আমার আবার ঠাণ্ডা। দেখ পেসাদ, তোর লেখন-পড়ন শেষ হ'তে আর কত দেরি রে ? তাড়াতাড়ি সেরে-তেরে বাড়ীতে এসে বস, বৌ যে দিনে দিনে সেয়ানা হচ্ছে। তুই কাছে থাকিস না জন্যে মনমরা হয়ে থাকে।"

"খুব সুখবর দিলে ঠাকুমা, আমি ত কোন লক্ষণ দেখছি না ? তুমি আমার জন্যে এত ভেব না। এবার পরীক্ষা হয়ে গেলেই আমি তোমার আঁচলের নীচে এসে বসে থাকব। কোথায়ও যাব না, কিছু করব না, শুধু খাওয়া আর বসা। তা হ'লে ত খুশী হবে তুমি ?"

ঠাকুমা নাতির কথায় গেলেন না। বিগলিত হইলেন মণিমালাকে লইয়া—"দেখ পেসাদ, তোরে চুপে চুপে কই—মণিমালা বড় ভাল মেয়ে। তোদের রায়-গোষ্ঠীর রক্ত গরম, চঞ্চল ; তুই ওরে হেনেস্তা করিস নে কখনও, আমারে কথা দে। বাইরের রূপ দেখে পাগল হোস না, মনে রাখিস, ঘরে রইছে তোর অমৃত ভাণ্ড।"

প্রসাদের অমৃত ভাণ্ড মধু ভাণ্ড লইয়া আলোচনা করিবার সময় হইল না।

রান্না প্রস্তুত, খাবার ডাক আসিল।

প্রসাদ উঠিয়া কহিল, "চল ঠাকুমা, তোমাকে ঘরে রেখে আমি খেতে যাই। শীতের রাতে বসে থাকতে লোকজনদের খুব কষ্ট হয়।"

ঠাকুমা নাতির হাত ধরিয়া চলিলেন শয়ন করিতে। যাইবার সময় হুল ফুটাইয়া গেলেন, "পেটে ক্ষিধে মুখে লাজ।"

"সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর চূড়ামণি"
বীরবাহু চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, "কহ, হে দেবি অমৃত ভাষিণি
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি পদে
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃ কুলনিধি
রাঘবারি ?"

নিস্তব্ধ গম্ভীর রজনী। চরাচর মহাসুপ্তিতে মগ্ন। কুজনহীন কানন ভূমিতে হিমেল হাওয়া শন্ শন্ শব্দে পত্রহারা তরুর বিলাপধ্বনির মতন বহিয়া যাইতেছে। কুয়াশার ঘন আবরণে আকাশ ও ধরিত্রী আবৃত হইয়া রহিয়াছে।

পালঙ্কের পাশের বাতায়ন রুদ্ধ, গৃহের অপর গবাক্ষ উন্মুক্ত। সেই পথে ঝাড়ের আলোর রশ্মি পিছনের বন-বনান্তরে সামনের গাঁদাফুলের স্তবকে লুটাইয়া পড়িয়াছে।

রজনীর প্রথম যামে বিনুর পাঠ্যপুস্তক ও খাতার লেখার পরীক্ষা-নিরীক্ষা লইয়া খানিকটা সময় অতিবাহিত হইয়াছে।

বিনু তাহার হাতের লেখার খাতায় শুধু স্বরচিত

...পাঁচালি দিয়াই ভরাইয়া রাখে নাই। মাঝে মাঝে ...হার চিত্র-বিদ্যারও পরিচয় দিয়াছে। কোন পাতায় ..., কোথায়ও বক-টিয়া পাখী ইত্যাকার। প্রসাদ স্ত্রীকে ...জ্ঞাসা করিয়াছে, "তোমার কি ছবি আঁকতে ইচ্ছা ...রে? তা হ'লে ছবি আঁকার সরঞ্জাম এনে দিতে ...রি।"

...শোন কথা, "গোদা পায়ে বিষ ফোঁড়া" যেন, এক ...শিক্ষায় বিনুর অন্তরাত্মা ত্রাহি মধুসূদন ডাকিতেছে, ...র উপরে আবার চিত্র বিদ্যা! মেয়েদের মেয়েলী ...অনুষ্ঠান আলপনার সহিত যে পুরুষ-প্রবরের পরিচয় ... তাহাকে নিরস্ত করিতে বিনুর বেগ পাইতে হইল ...। সে কাণের ঝুমকা দোলাইয়া কপালের কাঁচ-...কার টিপে ঝিলিক দিয়া স্বামীকে বুঝাইল, "এর নাম ... নয়। এটা প্রত্যেক ভারত মহিলার করণীয় ...চার। সুবচনী পুজোয় হাঁস না আঁকলে যে পুজো ... না। লক্ষ্মীর আরাধনায় ধানের শীষ, লক্ষ্মীর পা, ... চাই। নাগপঞ্চমীতে সারি সারি নাগ। আসন্ন ...পার্ব্বণে উঠোন-জোড়া হাতীর শুভাগমনে হাতীর ...র সম্মুখে আলপনায় অঙ্কিত করতে হবে বিশাল ...শয়। জলে বিরাজ করবে জলচর জীব মাছ শঙ্খ ... কুমীর কচ্ছপ মকর পোকা-মাকড়। জলাশয়ের ...ড় কলাগাছ লতা-পাতা, তার ফাঁকে ফাঁকে বক। ... পৌষপার্ব্বণে কেউ বিনুকে আলপনা দিতে বলে ... কারণে সে খাতায় বলাকাশ্রেণী অঙ্কন অভ্যাস করিয়াছে।"

ব্যস্, একেবারে ঠাণ্ডা—'রমণীর চাতুরিতে রমাপতি ...রে।'

চেয়ারে পা ঝুলাইয়া হিমবর্ষী নিশীথে বিনু কাব্য ...বণ করিতে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। কাজেই বাধ্য ...য়া প্রসাদকে বিছানায় আসন লইতে হইয়াছে।

প্রসাদের গায়ে গরম জামার উপরে শাল, ...পরায়ণা সতী স্বামীর কোমর অবধি ঢাকিয়া দিয়াছে সাটিনের লেপে।

নিজের বিছানায় শয়ন করিয়া গলা পর্য্যন্ত লেপে আবৃত করিয়া কাব্য শুনিতেছে। প্রসাদের আশঙ্কা ছিল, আরামে শয্যাসীনা হইয়া তাহার শ্রোতা বোধহয় নিদ্রিতা হইবে। না, প্রসাদ নিরর্থক 'বেনাবনে মুক্ত ছড়াইতেছে' না। বিনু শুনিতেছে উৎকর্ণ হইয়া।

প্রসাদের কণ্ঠস্বর গম্ভীর শঙ্খের মত দিকপ্রসারী, অথচ কোমল মধুর।

প্রসাদ এক এক অংশ অধ্যয়ন করিয়া তাহার ভাবার্থ সরল ভাষায় স্ত্রীকে বুঝাইয়া দিতেছিল। কিন্তু স্ত্রী যে তখন তাহাতে নাই। "কনক আসনে বসি, দশানন বলি"— সেইখানে চলিয়া গিয়াছে, সেই মণি-মুক্তা-প্রবালের রাজ্যে।

"এই, তুমি যে ঘুমিয়ে পড়লে? আমি রেখে দিলাম বই।"

বিনু লেপের তলা হইতে হাত বাড়াইয়া স্বামীর বাহু চাপিয়া ধরে—"না না, রেখে দিও না। আমি ঘুমুইনি শুনছি, এত আলোতে কখনও আমার ঘুম আসে না। তোমার মত ত আমার অতবড় চোখ নয়, হাতীর মতন কুতকুতে চোখ, নিচের দিকে তাকালে বোজা লাগে।"

"তা হ'লে আমাকে পদ্মপলাশ লোচন বলতে চাও?"

"তা পদ্মপলাশ বলা যায়, আবার পটোলচেরাও বলা যায়। থাকুক চোখের কথা, তুমি পড়। প্রমীলা সাজ করে চলেছে, তারপরে কি হ'ল?"

"তার পরের কথা কাল শুন, ঢের রাত হয়ে গেছে, এখন রেখে দেই।"

"রাত আবার কোথায়, মোটে দুটো, আরও খানিকটা পড়ে রাখ। কি সুন্দর, খালি শুনতে ইচ্ছা করছে।"

শুনিতে ইচ্ছা করিবে না কেন? কে কবে জ্ঞান-হীনা মূর্খ বিনুকে, 'মেঘনাথ বধ' মহাকাব্য পড়িয়া শোনাইয়াছিল। কে তাহার ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিল। অপার অনন্ত রসের সমুদ্র উপকূলে বিনু জীবনে উপনীত হইবার সুযোগ পায় নাই।

স্বামীর প্রতি এই প্রথম বিনুর সুকুমার চিত্ত অপরিসীম কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া গেল। বিশ্বের ভাণ্ডারে অমূল্য রত্নরাজি সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে, অমৃত রসের প্রস্রবণ বহিয়া যাইতেছে। কেহ যদি তাহার আস্বাদন বিনুকে দিতে উদ্যত হয় তাহাতে তাহার এত বিরাগ কেন?

প্রথম কাব্য শোনাইয়া প্রসাদও উপলব্ধি করিতে পারিল শিক্ষার চলতি পথে তাহার চপলমতী স্ত্রী অগ্রসর হইতে পারিবে না। তাহাকে উন্নীত করিতে হ'বে কাব্যে কবিতায় গল্পে উপন্যাসে।

সুউচ্চ বৃক্ষশিরে শীতের সুমিষ্ট রৌদ্র সবে আবীর মাখাইতে সুরু করিয়াছে।

তরু রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করিয়া ডাকিল, "দাদা ও দাদা, বৌদি, শিগ্‌গির উঠে খেজুরের জিরেনকাটা রস খেয়ে যাও। ভজা গাছি ভাঁড় ভরে নিয়ে এসেছে।"

প্রসাদ জাগিয়া বিনুকে জাগাইয়া তুলিয়া দিল। প্রসাদের চিরকালের অভ্যাসের আজ ব্যতিক্রম হইয়াছে। যে যত রাত্রেই শয়ন করুক না কেন ভোর পাঁচটায় জাগিবে কি জাগিবে। আজ ছয়টা বাজিয়াছে। রাত তিনটার পরে তাহাদের ঝাড় নিবিয়াছিল। বিনুর অনুরোধে সে বই বন্ধ করিতে পারে নাই।

প্রসাদ ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া দরজা খুলিয়া তরুর সহিত বাহির হইয়া গেল।

বিনু তাহার পিঠে ভাঙ্গিয়া-পড়া শিথিল কবরী বাঁধিয়া বারান্দার বালতি হইতে অঞ্জলি অঞ্জলি জলে জাগরণ-ক্লিষ্ট মুখ ধুইয়া রন্ধনশালার পেছনের পথ ধরিয়া চলিয়া গেল শাশুড়ীর কাছে। এত বেলায় সামনের উঠানে কাহারও সম্মুখীন হইবার ভয়ে বিনু সদরে পদক্ষেপ করিল না।

শীতের প্রভাতের উপভোগ্য পানীয় সদ্য-কাটা খেজুরের রস।

কাঁচের গেলাসে সফেন টাটকা রস লইয়া ক্ষিতি তরু সুমু কলরব করিতেছে। প্রসাদের রসের গেলাস হরি লইয়া গিয়াছে গোল বারান্দায়।

রূপার থালায় নানাবিধ মিষ্টান্ন ও গরম চা গৃহিণী গোছাইয়া দিতেছেন।

তরু ঠাণ্ডা রসে চুমুক দিয়া গায়ে শিহরণ তুলিয়া বলে, "বৌদি, তুমি এক্ষুনি এক গেলাস খেয়ে নাও। ফেনা মরে গেলে স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়।" বিনু চুপে চুপে বলে, "আমি খেজুরের রস খেতে পারি না। আমার গন্ধ লাগে।"

সকলে হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে, "মাগো, একি কাণ্ড! এমন ভাল জিনিষে তোমার গন্ধ লাগে? তুমি কি?"

মনোরমা বলেন, 'আপন রুচিতে খাওয়া পরের রুচিতে পরা।' তা নিয়ে তোদের হাসির কি হ'ল রে? বৌমা, তুমি যখন রস খেলে না, তখন এক বাটি চা খেয়ে নাও। শীতকালে চা খেলে শরীর ঝরঝরে হয়।"

বিনু চা খাইয়া তরুকে দিয়া মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করে, "কি আজ রান্না হইবে? কি তরকারি কুটিবে সে?"

"আমার এদিকে মিটে গেল, চল আমিও যাই। দেখি কি কোটা-কাটা। আজ একাদশী, বিধবাদের খাওয়া নেই। নারায়ণের ভোগের সামান্য কিছু রেঁধে দিলেই হবে।"

তরু বলে, "মা, বৌদি বলছে সে আজ ঠাকুরভোগ রাঁধবে।"

মনোরমা ভীত হইলেন "গৃহ প্রতিষ্ঠিত নারায়ণ, তাঁর সেবা ত করতেই হয়। বিধবা তোমার হাতে খায় না, আজ তাদের খাওয়া নেই, বেশ ত তুমিই ভোগ রান্না ক'রো। বড়ি ভাজা, একটা তরকারি করো, আর যা হয়। ভোগে তিন পদ রান্না দিতে হয়।"

মনোরমা চলিয়া গেলেন নিয়মের ঘরের দিকে। বিনু তাঁহার পিছনে। হাতীর সিঁড়িতে ঠাকুমা একগলা ঘোমটা দিয়া বসিয়া আছেন। বিনু তাঁহার পাশে গিয়া অনুচ্চ স্বরে বলে, "ঠাকুমা, আজ একাদশীর উপবাস, রাতে আমার খেয়াল হয় নি। আপনি শোবার আগে জল খেলেন না কেন? ওঁরা ত দুধ-মিষ্টি পাঠিয়েছিলেন তা ফেরৎ দিলেন।"

"পেটে যে সয় না মণিমালা, খেতে ভয় লাগে। তাই খাই না। তবু আমার খাওয়া হইচে। তুই যে আমারে তোর বাপের বাড়ীর পাকা কুমড়ার মেঠাই শিলে ছেঁচে তুলো তুলো করে কৌটা ভরে দিইছিলি শেষ রাতে তোদের ঘরের যখন ঝাড়ের বাতি নিবলো তখন তার এক খাবলা বাতাসা দিয়ে খেয়ে এক ঘটি জল খেয়ে নিয়েছি পরাণ ভরে ঢক ঢক করে। ওতেই আমার হয়েছে ক্ষিধে তেষ্টার কাজ।"

বিনু তরকারির ডালা লইয়া বসিল। গৃহিণী কি দিয়া কি হইবে নির্দ্দেশ দিতে লাগিলেন।

কামিনীর মা চিড়ার মোয়ার গুড় চড়াইয়াছে। খেজুর গুড়ের গন্ধে সারা বাড়ী ম ম করিতেছে। দাস-দাসাদের মধ্যে আবার ব্যস্ততা পড়িয়া গিয়াছে। পৌষ-পার্ব্বণের বেশি দেরি নাই। এতবড় বাড়ীর প্রত্যেক ঘর ঝাড়িতে হইবে, মুছিতে হইবে। কোথায়ও ধুলা বালি আবর্জ্জনা থাকা চলিবে না। পূর্ব্ব হইতে সুরু না করিলে কাজ সমাধা করা সম্ভব নহে।

সকলের গৃহেই পৌষপার্ব্বণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। দীনতম দরিদ্র যে তাহারাও মাটির ভাঙ্গা ডোয়া বাঁধিতেছে, মাটির দেয়াল লেপিয়া তকতকে করিতেছে। ছেঁড়া কাঁথা ন্যাতা ক্ষারে সিদ্ধ করিয়া কাচিতেছে। আস্তাকুঁড় পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করিতেছে।

নিরন্তর হিন্দুর সম্পর্কে আসিয়া মুসলমান সমাজের স্ত্রীলোকেরা পৌষপার্ব্বণ পালন করিতে শিখিয়াছে। তাহাদের গৃহেও নূতন চাল কোটার ধুম পড়িয়া গিয়াছে। তাহারা ব্যয়সাপেক্ষ রকমারি পিঠা করিতে জানে না। জানিলেও সাধ্যে কুলায় না। তাহারা করে ধামা ধামা সরাপিঠে। রাঙ্গা আলু সিদ্ধ করিয়া পুলি পিঠার মধ্যে পুর দিয়া গুড় সংযোগে সিদ্ধ করিয়া খায়। তাহারা

গরীব, নারিকেল কিনিবার পয়সা নাই। তবু তাহারাও পিঠা করে। ঘরদ্বার পরিষ্কার করে। ছেঁড়া কাপড় সাজিমাটি দিয়া পরিষ্কার করে। লক্ষ্মীমাস, মা লক্ষ্মী সকল জাতিরই দেবতা। তিনি বিমুখ হইলে অনাহারে প্রাণ দিতে হইবে। ভক্তিতে না হোক ভয় সকলেরই আছে। ভয়ের জন্যেই সকলে পৌষপার্ব্বণ না মানিয়া থাকিতে পারে না।

বিনুর তরকারি কোটা হইয়াছে। রান্নাঘরের তরকারি হারাণী রন্ধনশালার বারান্দায় কুটিয়া স্তূপ করিতেছে।

বিনু এবার স্নান করিয়া নারায়ণের ভোগ রাঁধিতে যাইবে ছোট ভোগশালায়।

সরস্বতী হল হইতে বাহির হইয়া মা'র প্রতি ঝাল ঝাড়িতে লাগিল, "শোন মা, কি কাণ্ড। বাবা আমাকে ডেকে বললেন, "কচিরাম ঠাকুরকে তোমরা নিয়মের কাজে লাগিয়ে দাও। তোমাদের নারকেলের কাজ, গুদের খাবার তৈরি করতে বড় পরিশ্রম হয়। লোকটা কাজে-কর্ম্মে ভাল, ওকে শিখিয়ে নাও'।"

মা মেয়ের মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন।

মেয়ে ইঙ্গিতে বিনুকে দেখাইয়া পুনরপি বলিতে লাগিল, "বাবার কথার মানে ত বুঝলে মা? আমাদের কারোর জন্যে নয়। কচি খুকীর নড়তে হচ্ছে তাতেই বাবা অস্থির হয়েছেন। কোথাকার কে কচিরাম বামুন কি উদ্ভুত সেই ঢুকবে নিয়মের কাজে। বুড়ো একটা মন্দ, সেই আমাদের গায়ে গায়ে বসে হাতে হাতে কাজ করবে। ঘেন্নায় যে আমি মরে যাব মা। তোমাদের ইচ্ছা হ'লে তোমরা করাও, আমি এর মধ্যে নেই। ছোট ভোগের ঘরে আমাকে বাধ্য হয়ে আস্তানা গাড়তে হবে। এতকাল যা হয় নি তাই হবে অবশেষে। 'এতকাল দেখি নি পিসী মাসী, সম্পদ কালে জোটে আসি।' তোমাদের আর কি, যত মরণ আমার।"

সরস্বতীর চোখ জলে ভরিয়া গেল।

মা বলিলেন, "উনি আমাদের সুবিধার জন্যেই বলেছেন, কাজ করানো না করানো আমাদের হাতে। তোকে ছোট ভোগের ঘরে আস্তানা নিতে হবে কেন? আমাদের যেমন কাজ চলছে তেমনি চলবে।"

বিনু তেল মাখিতে চলিল তাহার শয়ন-গৃহে।

নবীন বিছানা ঝাড়িয়া বৃন্দাবনী চাদরে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। ঘরের মেঝে হইতে যাবতীয় আসবাব ঝাড়িয়া-মুছিয়া ঝক-ঝকে করিয়া রাখিয়াছে। সাজান পরিচ্ছন্ন গৃহ বিনুর বড় ভাল লাগে।

টেবিলের একপাশে রহিয়াছে মেঘনাদ বধ কাব্য-খানা। বিনু তৃষাতুর নয়নে তাহার পাতা উল্টাইতে লাগিল।

ইচ্ছা হইতেছিল খানিকটা পড়ে। কিন্তু দেয়ালের ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল এখন তাহার আর পড়িবার সময় নাই। আজ যে তাহাকে নারায়ণের ভোগ রাঁধিতে হইবে। তাহা ভিন্ন কাব্যের মাধুর্য্য নষ্ট করিতে তাহার মন সরিল না। মনে পড়িতে লাগিল স্বামীর উদাত্ত কণ্ঠস্বর। শঙ্খের মত গম্ভীর অথচ মধুর। সংস্কৃত ভাষার বিশুদ্ধ বাংলা উচ্চারণ। প্রতি শব্দ সহজ-সরল করিয়া বুঝাইবার কত প্রয়াস। বিনুর হৃদয়-তন্ত্রীতে এখনও যেন বাজিয়া বাজিয়া উঠিতেছে সেই ধ্বনি, বাঁশরী ঝঙ্কার। ইহার পরে শত-সহস্রবার এই বই পাঠ করিলেও ইহার সবটা সে প্রসাদের নিকটেই শুনিবে। নীরব নিশীথের প্রতীক্ষায় বিনু কাজে মগ্ন হইয়া থাকিবে। কাটিয়া যাইবে সুদীর্ঘ দিবা, হিম-সিক্ত সন্ধ্যা। তাহার পরে—

অদ্য রাত্রি আড়াইটায় ঝাড়ের বাতি নির্ব্বাপিত হইল। লঙ্কার পঙ্কজ রবি অস্তাচলে গমন করিয়াছে।

বিনুর চোখ অশ্রুসিক্ত।

প্রসাদ বই রাখিয়া বলে, "এই, বই শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? তোমার ভয় হয়েছিল সাত রাতেও আমি বই শেষ করতে পারব না। এখন ত সাঙ্গ হ'ল? এবার ঘোমানোর পালা। কথা বলছ না কেন?"

বিনুর কণ্ঠস্বর অশ্রুজলে বাষ্পারুদ্ধ, সে ধরা গলায় ধীরে জবাব দেয়, "বড় কষ্ট লাগছে আমার, মেঘনাদের জন্যে। ওকে না মেরে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে বাঁচিয়ে রাখলে ভাল হ'ত।"

"সেটা যে অসম্ভব। বড় বড় বীররা না মরলে ত সীতাদেবী উদ্ধার হয়ে রামের কাছে আসতে পারেন না। তুমি সীতার দুঃখে দুঃখিত, অথচ কারোর মরণ সইতে পার না। সে হয় না। এক পক্ষকে আর এক পক্ষ না মারলে উপায় নেই। এখন ভাল করে লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে থাক। আর রাত জাগলে তোমার অসুখ করবে।"

"না, অসুখ ক'রবে কেন? তোমারও ত অসুখ হ'তে পারে? তুমিও ঘুমিয়ে থাক। কাল আবার কি বই পড়বে?"

"কাল তুমি পড়বে আমি শুনব। না ঘুমুলে

আমার অসুখ করে না। আমি বুড়ো, তুমি ছেলেমানুষ, ঘুম তোমাদেরই দরকার। আজ ঘুমিয়ে নাও কাল রবীন্দ্র কবিতা শুনিয়ো।”

বিনু কথা বলে না।

ক্ষণকাল পরে প্রসাদ টের পায় বিনু না ঘুমাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

এ-আবার কি? গভীর রজনীতে প্রসাদ ইহা প্রত্যাশা করে নাই। সে ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া সস্নেহে স্ত্রীর মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার কান্নার কি হ'ল বিনু? আমি ত তোমাকে এমন কিছু বলি নি, যার জন্যে তুমি কান্না সুরু করলে? কি হ'ল বল?”

তবু বিনু কথা বলে না। বাহিরে শীতের বাতাস শন্ শন্ রবে বহিয়া যায়। গৃহের পশ্চাৎ ভাগের উপবন হইতে শাখাচ্যুত স্খলিত পত্র ঝরিয়া পড়ে ঝর ঝর করিয়া।

দেওয়ালের ঘড়ি টিক টিক শব্দ করিতে করিতে ঢং ঢং করিয়া তিনটা বাজে।

প্রসাদ বলে, “এই, কি হ'ল তোমার? আজও তিনটে বেজে গেল, তুমি যদি এমনি করতে থাক; তা হ'লে তোমার কাছে ছোট ঠাকুমাকে ডেকে দিয়ে আমি বাইরে গিয়ে শুইগে।”

বিনু সভয়ে বলিল “না, আমার দুঃখ হ'ল আমি লেখাপড়া জানি না বলে, তুমি আমাকে কাল বই পড়ে শোনাতে বললে কেন? যে যা জানে না, তাকে তাই নিয়ে ঠাট্টা করতে কষ্ট হয় না?”

প্রসাদ কৌতুকের হাসি হাসে, “ও হরি, এতক্ষণে বুঝতে পারলাম। তুমি লেখাপড়া কম জান বলে আমি তোমাকে ছোট ভাবি না। সুযোগ হয় নি, শিখতে পার নি, তাতে কি হয়েছে? এর পরে শিখে নেবে। বারতের বছরের মেয়ে আর কত শিখবে? তুমি আমার স্ত্রী রত্ন। কি সুন্দর আমাকে রান্না করে খেতে দিয়েছ। আজও চমৎকার ঠাকুরভোগ রান্না করেছিলে, কি সুন্দর আমাকে পশমের গোলাপ বুনে দিয়েছ। তার ভেতরে তুলোয় করে আতর দিতেও ভোল নি। কাল তুমি যে বই পড়তে বলবে আমি পড়ে শোনাব। পরের বারে তোমার পড়া রইল তোলা, হ'ল ত?”

বিনু শান্ত হইল।

ভোর হইতে-না-হইতে দাসী মহলে কিসের যেন একটা চাপা জটলা চলিতেছিল।

বিনু মুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়ার পরে ক্রমে শুনিল, মথুর দত্তের দ্বিতীয়া পত্নী ললিতা বৌ সন্ধ্যায় পলায়ন করিয়াছে। বন্দরে এক খেমটার দল গান গাহিতে আসিয়াছিল তাহাদের সহিত। তাহারা দুইদিন গান গাহিয়াছিল। ললিতা দুই দিনই তাহার ননদ ও ভাগ্নেদের সহিত গান শুনিতে গিয়াছিল। বন্দরে মথুর দত্তের ঘর আছে, বেনেতি মশলার দোকান আছে। লোকে মানে, চেনে, মান্য করে।

সন্ধ্যাবেলা খেমটার নৌকা নদীতে ভাসার পরে যাহারা ললিতাকে যাইতে দেখিয়াছিল তাহারা আসিয়া মথুর দত্তকে খবর দেয়।

তাহার পরে চলে তুমুল কোলাহল। দুই-তিন খানা জেলে নৌকা সারারাত নদীর জল আলোড়িত করিয়া খেমটাওয়ালার নৌকার সন্ধান পায় না। “[illegible] পালাইলে বুদ্ধি বাড়ে।” কাহারও খেয়াল ছিল না, সেই খেমটার দল কোথা হইতে আসিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

বন্দরবাসীরা সকলেই খেমটার সখীদের নাচে-গানে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছিল। “তারা আপনি নাচে আপনি গায়, আপনি করে হায় হায়।” গলির ওপারে দত্তবাড়িতে কান্নার রোল উঠিয়াছে। বৃদ্ধ মথুরা দত্ত শোকে দুঃখে লজ্জায় শয্যা লইয়াছে। মা বুড়ী ইনাইয়া-বিনাইয়া বিলাপ করিতেছে—“ও জাতনাশী কুলনাশী, তোর মনে এই ছিল লো? তুই আমাগো বংশের মুখে চুণকালি দিইয়া কনে গেলি লো?”

পসারীর সহিত বিনু একবার পুকুরে গিয়া বৃদ্ধার কান্না শুনিয়া আসিল। পশ্চিমের ছোট বাঁধানো ঘাটের দিকে তাকাইয়া ললিতার জন্যে তাহার চোখ জলে ভরিয়া গেল। ঐ ঘাটে ললিতা আর নাহিতে আসিবে না। তিতপোল্লার খোসায় সাবান মাখিয়া অঙ্গ মাজিবে না। ছোট কলসীতে জল ভরিয়া সোপানে ভেজা পায়ের পদচিহ্ন আঁকিয়া মধুর হাসি হাসিতে হাসিতে নামিয়া যাইবে না গলির পথে। বার বার বিনুর হৃদয়ে প্রশ্ন জাগিতেছিল, কিসের দুঃখে ললিতা চিরদিনের জন্য চলিয়া গেল। মথুর দত্ত বিত্তবান্, তরুণী ভার্য্যাকে সর্ব্বাঙ্গ সোনার গহনায় মুড়িয়া দিয়াছিল। কত চওড়াপাড় শাড়ী তাহাকে পরিতে দিত। স্বামীর ভয়ে বড় বৌ কখনও সতীনকে সংসারের কুটোটা ভাঙ্গিতে বলে নাই। শাশুড়ী মনের আক্রোশে মনে মনে ফুলিলেও বাহিরে তাহা প্রকাশ করিতে পারিত না। এত সুখভোগ ফেলিয়া ললিতা কেন যে চলিয়া গেল বিনু তাহা ভাবিয়া পায় না। তাহার সুকুমার হৃদয়ে অতি সহজে রেখাপাত

করে। কোথাকার কে ললিতা পুকুর ঘাটে ক'দিনই বা তাহার সহিত সাক্ষাৎ, তাহার চলিয়া যাওয়ার সহিত বিনুর কিসের সম্পর্ক, তবু বিনুকে বিষণ্ণ করিয়া তুলিল।

বাড়ীতে পৌষপার্ব্বণের আয়োজন চলিতেছে। গোলাঘর হইতে এক ঝাঁকা নারিকেল চাকর বাহিরে লইয়া গেল ছাড়াইতে। তাহা দেখিয়াও বিনু আনন্দে নাচিয়া উঠিল না। সে শুনিয়াছিল ছানা ক্ষীর নারিকেলের সহিত সংযোগ হইবে। যাহা হইবার হোক, তাহাতে তাহার কি?

দুই স্বামী-স্ত্রী মিলিত হইল রাত্রে। ঝাড় লণ্ঠন জ্বলিতেছে, দিবাভ্রম হয়। প্রসাদের হস্তে 'কড়ি ও কোমল'। বিনু সারা দিনের পরে প্রথমেই স্বামী সম্ভাষণ করে, "শুনেছ, এক কাণ্ড হয়েছে। ললিতা মেয়েটা কার সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছে।"

প্রসাদ সবিস্ময়ে স্ত্রীর দিকে তাকায়, "ললিতা, ললিতা কে?"

"ঐ যে গলির ওপরে তোমাদের প্রজা মথুরা দত্ত, তার ছোট বৌ, যাকে সকলে ললিতা সখী বলে ডাকে, সেই।"

"না, মথুরা দত্তকে জানি, সেই বুড়োর আবার ছোট বৌ আছে নাকি? বুড়োর ছোট বৌ থাকলে সে পালিয়েই যায়, তাতে তোমারই বা কি? আমারই বা কি?"

বিনু অপ্রতিভ হইয়া বলে, "না, এমনিই বলছিলাম। ঘাটে নাইতে আসত রোজ, তাই দেখেছিলাম। তুমি ত জান না, এবার কার্ত্তিক পূজোর দিনে কারা যেন ইচ্ছে ক'রে ওদের বাড়ীতে জোড়া কার্ত্তিক ঠাকুর ফেলে গিয়েছিল, যাতে দুই বৌয়ের ছেলে হয়। খুব ধুম হয়েছিল পূজোয়। এ বাড়ীতে থরভরা মিঠাই মোণ্ডা পাঠিয়েছিল।"

"তা হ'লে তোমাদের লাভ মন্দ হয় নি? এখন জ্বলবে নাকি কড়ি ও কোমল? আজ কিন্তু রাত বারটার বেশি তোমার ঝাড়ের আলো জ্বলবে না।"

"কেন?"

"মোম পুড়ে শেষ হ'ল প্রায়। আর দু'রাতের জন্যে বাতি জ্বলবে না ঝাড়ে। আর যা বই তা তুমি নিজেই পড়ে বুঝতে চেষ্টা ক'রো। আমার পরীক্ষার পরে যখন এসে অনেক দিন থাকব তখন আবার ঝাড় লণ্ঠন জ্বলবে। পড়া হবে অনেক বই।"

বিনু ক্ষুণ্ণস্বরে বলে, "তুমি রটন্তী পূজোয় না এস, কিন্তু দোলের সময় না এলে ঠাকুমা অনর্থ করবেন। নাতি নাতি ক'রে উনি দিনরাত সারা হয়ে যান। সকলের ওপরে ওঁর বড় নাতি।"

প্রসাদ হাসিল, "টাকার চেয়ে যে সুদের মমতা বেশি তা কি জান না? তোমার যখন নাতি হবে তখন ঠাকুমার অবস্থা বুঝতে পারবে? ও কি, মুখ ফিরিয়ে বসলে কেন? লজ্জা হ'ল বুঝি? মানুষের জীবনের পরিণতির কথায় লজ্জা কিসের? ঠাকুমাকে আনন্দ দিতে পরীক্ষা ফেলে কি দোল খেলা চলে? তোমরা দোলে খুব হুল্লোড় করে আবীর খেল। আমাদের বাড়ীতে এই তোমার প্রথম দোল। বন্ধু-বান্ধবীদের জন্যে তোমার খুব মন খারাপ লাগবে। সেখানে রং আবীর পিচকারি নিয়ে মাতামাতি করবে কার সঙ্গে?"

"সেখানেও ঠাকুমা আমাকে ওসব করতে দেন নি। আমরা বড়দের পায়ে আবীর দিয়ে প্রণাম করেছি। তাঁরা আমাদের কপালে আবীরের টিপ পরিয়ে দিয়েছেন। কেউ কেউ মুখে-মাথায় আবীর দিয়ে রাঙ্গা ক'রে দিতেন। হুল্লোড় করত পাড়ার ছেলেরা মিলে। বাবা, সে কি কাণ্ড! বালতি বালতি রং গুলে পিচকারি দিয়ে সবাই রং মাখত। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি চলত তাদের হোলি খেলা। পরের দিন মেঠে হোলির সং সেজে সবাকে কি কাণ্ড করত!"

"তুমি যেতে না তাদের দলে?"

"মাগো, বলে কি? পুরুষ মানুষের সঙ্গে মেয়েরা হোলি খেলবে নাকি? আমার ঠাকুমা ওসব পছন্দ করেন না। ছেলেদের দেখাদেখি যদি ইচ্ছা হয় মেয়েয় মেয়েয় খেলবে। পুরুষের সঙ্গে মেয়েদের রং খেলা লজ্জার।"

"ভাগ্যে আমার পরীক্ষা দোলের সময়, নইলে আমি তোমাকে আবীর দিলে সেটা হ'ত তোমার লজ্জার?"

বিনু এ কথার উত্তর দিতে পারিল না। স্বামী যে স্ত্রীর নিকটে অপর পুরুষের পর্য্যায়ে পড়ে না এ খেয়াল তাহার হইল না।

পৌষপার্ব্বণের ধুমধামির মধ্যে প্রসাদের বিদায় লগ্ন উপস্থিত হইল। সেই রান্নার তাড়া, স্নানের তাড়া! ঠাকুমার মধুর বচন। গোপালের সাজন। লালজি-কালাজির অগ্রগামী হওয়া। সেই ষ্টীমারের ভোঁ ভোঁ, বিদায় জ্ঞাপন।

মকর সংক্রান্তির পূর্ব্ব দিন পাবনা জেলায় 'গোবর আলপনা' নামে খ্যাত। কয়েক দিন হইতেই নিত্য আঙিনা ও আনাচ কানাচ লেপিয়া রাখা হইতেছে।

শেষ রাতে সেই লেপার উপরে মালীবৌ আর একবার পালিশ লেপা দিয়া গিয়াছে।

স্নানান্তে সংক্ষেপে জপ-তপ সারিয়া সরস্বতী বড় একটা কাঁসার জামবাটিতে চালবাটা গুলিয়া উঠানে হাতী দিতে বসিয়াছে। শুভক্ষণ করিয়া হাতী প্রথম বেলাতেই আঁকিতে হইবে। আজ আবার শনিবার, প্রথম বেলায় হাতীর আকার দিয়া তাহার কপালে সিঁদুর, ধান-দুর্ব্বা ও সরিষার ফুল দিতে হইবে। নহিলে বারবেলা পড়িবে।

এ বিষয়ে ঠাকুমা সচেতন হইয়া মুখে তুবড়ি ছুটাইতেছেন। গোবর আলপনায় সরস্বতী বরাবর আলপনা দিয়া থাকে। তাহার আলপনার হাত চমৎকার। কত লোক তাহার হাতী দেখিতে আসিবে। প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইবে।

পৌষপার্ব্বণে পল্লীর অঙ্গনে অঙ্গনে হাতীর শুভাগমন অনিবার্য্য। অনেকে চালের গোলায় পুঁইডাঁটার রস মিশাইয়া সুতাকার রেখায় হাতীর পত্তন করিয়া থাকেন। রায়বাড়ীতে পুঁইডাঁটার রস ব্যবহার হয় না।

রৌদ্রে আঙ্গিনা ভরিয়া গিয়াছে। সরস্বতী ছাতা মাথায় দিয়া আলপনা দিতেছে।

হাতীর মুখের দিকের অংশটা আগে সমাপ্ত করিতে হইবে। কারণ, সেইখানেই প্রথম শুভক্ষণ।

হাতীর মস্তকের ভাগ দেখিতে দেখিতে হইয়া গেল। ললাটে চন্দ্র-সূর্য্য বিরাজ করিতে লাগিল। চন্দ্র-সূর্য্যের মাঝখানে দেওয়া হইল বৃহৎ একটা সিন্দুরের কৌটা ও ধান দুর্ব্বা সরষের ফুল একমুঠি। ঠাকুমা নিশ্চিন্ত হইয়া উলু দিলেন। না, সময় মতই হইয়াছে। শনিবারের বারবেলার এখনও অনেক দেরি।

বিদুর গৃহের সিঁড়িতে বসিয়া ঠাকুমা নাতনীকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন, "ও সরি, দিব্যি হয়েছে তোর হাতী, এবার হাতীর পিঠে হাওদায় রাজা দে। গলায় ঘণ্টা দিয়ে পোষ-পোষানী আঁক, তাদের কপালে সিঁদুর ধান দুর্ব্বো সরষে ফুল দিয়ে শুভক্ষণ কর। হাতীর সারা গায়ে লতা-পাতা, পিঠে টাকা-মোহর দিয়ে এখন ভরতে দে না তন্বি আর মণিমালাকে। আসল যা তা, তোর হাত দিয়েই বেরিয়েছে। এখন নকল আঁকি-বুঁকি দিয়ে ভরে দিক ওরা। নইলে আলপনা শেষ করতে তোর যে রাত দুপুর বেজে যাবে।"

সরস্বতী ঠাকুমাকে প্রচণ্ডবেগে ধমক দেয়, "তুমি থাম বাপু, যে ঘোড়া কেনে তার চাবুক জুটে যায়। আমার এত পরিশ্রমের জিনিষ আনাড়ির হাতে দিয়ে নষ্ট করতে পারব না। রাত দুপুর হয় হবে, তার জন্যে ব্যস্ত হ'তে হবে না তোমাকে।"

ঠাকুমা ক্ষুণ্ণ মনে উঠিয়া যান ছোট ভোগের ঘরের দিকে। সেখানে আজ ছোট ঠাকুমা একলা নাই মনোরমা বসিয়া গিয়াছে উনুনের পাড়ে। আজ হইতে পৌষপার্ব্বণের সূচনা।

গোবর আলপনার দিন নূতন মাটির সরায় সরাপিঠে করিতে হয়। তাহাকে সরা পোড়ানো বলে। যত পিঠাই হোক না কেন, সকলের আদি অকৃত্রিম হইল সরাপিঠা।

সন্ধ্যায় সরা পোড়ানোর নিয়ম হইলেও দ্বিপ্রহরেই সরাপিঠা করিতে হয় নারায়ণের ভোগ ও বিধবাদের জন্য। পিঠা-পায়েস অন্ন-তুল্য। অন্নের সহিত গ্রহণ করিতে হয়, দিনে বা রাত্রে একবার মাত্র।

রাত্রে গামলা গামলা পিঠাপুলি রান্নাঘরে করিয়া রাখিতে হইবে নহিলে আগামীকালের পিঠার সমারোহ নির্ব্বাহ দেওয়া কঠিন।

কাল পৌষপার্ব্বণে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইবে। তাহা ভিন্ন কামার কুমার ছুতার ভূমিমালী ইত্যাদির আদি-অন্ত থাকিবে না। পৌষপার্ব্বণের পরের দিন গ্রামের কৃষকের ছোট ছেলেমেয়েরা ছোট ছোট ধামা কাঁখে প্রভাতে পিঠা ভিক্ষা করিতে আসিবে। কাজেই তৈরি করিতে হইবে পিষ্টকের পাহাড়।

ঠাকুমার সহিত মনোরমার বাক্যালাপ বন্ধ। অথচ প্রাণের কথা ব্যক্ত না করিলে বুক ফাটিয়া যায়।

ঠাকুমা বারদুই কাশিয়া হাঁক দিলেন, "ও ছোট বৌ, তোরা সরা পুড়িয়ে এখুনি রাখছিস? তা প্রথম পিঠাখানা ঝাঁটার কাঠি বিঁধিয়ে উনুনের মুখে রেখেছিস তো? আর চারখানা পিঠা পাতায় ক'রে শেয়ালদের জন্যে রাখতে হবে। সন্ধ্যার পরে পুকুরের চাতালে দিয়ে এলেই শেয়ালরা এসে খাবে। মা ভগবতী শিবা রূপে ভোগ নিয়েছিলেন। সেই জন্যে শুভকর্ম্মে শিবাভোগ দেওয়া ভাল।"

ছোট ঠাকুমা পুলিপিঠা গড়িতে গড়িতে বলেন, "সব ঠিক মতন হচ্ছে দিদি, তুমি ব্যস্ত না হয়ে ছায়ায় গিয়ে বসে থাক গে। কড়া রোদ উঠেছে, রোদে ঘুরলে তোমার আবার ঘুরণী উঠে পড়বে।"

ঠাকুমা সেখান হইতে ছায়া খুঁজিতে খুঁজিতে উপনীত হইলেন পুকুর পাড়ের পশ্চিমের ছোট ঘাটে বাতাবী লেবু গাছের সুশীতল ছায়ায়।

ঘাটে নাইতে নামিয়াছে এ বাড়ীর ভূতপূর্ব্ব ধান-

ভাঙনী সোনা মিয়ার মা ও তাহার নাতনী খাতুন। সোনা মিয়ার মা এখন স্থবিরা বুড়ি, নাতনী হাত ধরিয়া জলে নামাইয়াছে।

ঠাকুমা বলেন, "সোনার মা, ভাল আছিস ত? নাতনী তোর বুড়া কালে স্যাবা-স্থাবা করে নাকি? সোনার দিব্যি মেয়ে হয়েছে, এবার সাদী দিবি না?"

"হ মাঠান, সাদীর কতা হইচে। ম্যায়াডা ভাল হইচে, আমাগো কত করন করি থায়। ওই ত হাতে ধরি লয়া আইসে নাওনের নাগি। এহন নড়ন-চড়নের আর সাধ্যি নাই মাঠান।"

"কতকাল আর সাধ্যি থাকে মানুষের? যে দুঃখ ধান্দায় সোনারে মানুষ করেছিলি তা আমরা জানি। দিনরাত তোর কেটে গিয়েছিল ঢেঁকির ওপরে। চিরকাল কি লোকের সমান যায়—'কখনও বনে বনে কখনও রাজাসনে।' ছেলে নাতিরা লায়েক হয়েছে—নাতনী সেবা করছে, এখন দিন কতক সুখ ভোগ কর। নাতনী তোর ভাত রান্না শিখেছে ত?"

"হ, মাঠান, ভাত রাঁধন, শাগ ভাজন শিখিছে। আমাগো ভাত-জল খাতুনিই দেয়।"

খাতুন ফিক ফিক করিয়া হাসে। হাসিতে হাসিতে সোনার মা বুড়ীর কানে কানে বলে, "নানী, মুই যে পিঠা রাঁধন শিখিচি তা কইলি না?"

"হ, মাঠান, নাতিন খাটা রাঁধিতে জানে। ভাত শাগ খাটা বেবাক দেব্য।" কহিতে কহিতে বুড়ি স্নানান্তে খাতুনের বাহু ধারণ করিয়া সোপান বাহিয়া প্রস্থান করে।

ঠাকুমা উদাস নয়নে তাকাইয়া থাকেন মথুর দত্তের বাড়ীর দিকে। গলির দিকে মুখ করিয়া টিনের নূতন চালা বাঁধা হইয়াছিল কার্ত্তিক পূজার জন্য। পূজার পরেও যুগল কার্ত্তিক বিরাজিত ছিল নূতন চৌকির ওপরে। মথুরের বড় বৌ প্রত্যহ নাইয়া-ধুইয়া শুচিবাসে শুচিকত বাতাসা জল ও ফুল নিবেদন করিয়া দিত যুগ্ম দেবতাকে। আবার সন্ধ্যায় ধুপ দীপ জ্বালাইয়া প্রণাম করিত।

ললিতা বৌ-এর পলায়নের পরে মথুর দত্ত জোড়া কার্ত্তিক বিসর্জ্জন দিয়াছে দুর্গাদহে। ঝাঁপ-মুক্ত চালা, শূন্য চৌকি খাঁ খাঁ করিতেছে। অপমানে লজ্জায় মথুর শয্যাগত। বড় বৌ ও মা'র মুখে রা নাই। গৃহে নিদারুণ নিরাশার স্তব্ধ নীরবতা নামিয়া আসিয়াছে। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূল্য নাই। তাহারা তিলে তিলে যাহা গঠন করে অলক্ষ্য হইতে বিধাতা নিমেষে তাহা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া দেন। তবু মোহগ্রস্ত মানব আশার জাল বুনিতে বিরত হয় না।

ভোর হইবার সূচনায় আবার রায়বাড়ী কল-কোলাহলে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। রাত জাগিয়া প্রদীপ লইয়া সরস্বতী তাহার আলপনা শেষ করিয়া রাখিয়াছিল। সে কি আলপনা—না-শুভ্র বর্ণের একখানা অপূর্ব্ব গালিচা প্রাঙ্গণে বিছান হইয়াছে। পাড়ার লোক দলে দলে সরস্বতীর শিল্পকলা নিরীক্ষণ করিয়া ধন্য ধন্য করিতেছিল। এই আনন্দটুকুই ভাগ্যবিড়ম্বিতা সরস্বতীর সম্বল। যে কাজটা লইয়া মেয়েটা ভুলিয়া থাকিতে চায়, সে কারুকার্য্যই হোক, আচার-নিষ্ঠা রেষারেষিই হোক মা তাহাকে সহজে বাধা দেন না। যেরূপেই হোক উহার সময় কাটিয়া যাইলেই হইল।

মকর সংক্রান্তিতে খাল খন্দ নালা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে গঙ্গাসাগরে পরিণত হইয়া যায়, এই বিশ্বাসের বশীভূত হইয়া গোটা রায়বাড়ী ভোরের শীতে ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে পুকুরে স্নান সারিয়া অক্ষয় পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছে।

ছোট ঠাকুমাকে ও মনোরমাকে প্রচণ্ড শীতে তেমন কাহিল করিতে পারে নাই, কারণ তাঁহারা উভয়ে বসিয়া গিয়াছেন দুই উনুন জ্বালাইয়া রকমারি রসের পিঠা প্রস্তুত করিতে।

রুচিরাম পাণ্ডা এতকাল ভোজনবিলাসী শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সূপকার হইয়া তাঁহার বাহান্ন বার ভোগের কত উপকরণ বানাইয়া দিয়াছে। পিঠাপুলি গজা দইবড়া লাড্ডু তাহার হস্তে চমৎকার উতরায়। সে বসিয়াছে রন্ধনশালার বারান্দার উনুনে পিঠা-পর্ব্বে। মণিরাম ভোজের রান্না করিতেছে।

বিশু ফরমাইস খাটিতে মহা ব্যস্ত। ছুটাছুটিতে তাহার শীত সভয়ে পলায়ন করিয়াছে। সরস্বতী গায়ে পশমের মোটা আলোয়ান জড়াইয়া বিগ্রহের পূজার আয়োজন করিতেছিল। বিশেষ দিনে নারায়ণের বিশেষ পূজা ভোগের অনুষ্ঠান করা হয়। আজ মকর সংক্রান্তি, নারায়ণ স্নান করিবেন। দধি দুগ্ধে ঘৃতে মধুতে। জলপানি খাইবেন ক্ষীর সর ছানা মাখন মিছরি, ফল-মূল ইত্যাদি। তাহার পরে ভোগ হইবে সারি সারি পাত্রে পিঠা-পায়েস দিয়া।

ঠাকুমার মহা অশান্তি, দুই দণ্ড স্থির হইয়া রৌদ্রে

বসিয়া রোদ পোহাইতে পারিতেছেন না। তাঁহার মন পড়িয়া রহিয়াছে বাহির মহলের গোশালায়। আজ গরু-বাছুরদের উত্তম রূপে স্নান করাইয়া তাহাদের পায়ের চারি ক্ষুরে ও শিংএ সরিষার তেল মাখাইয়া এক গামলা চালের গুঁড়া ঘন করিয়া গোলাইয়া মাটির নূতন কলিকায় গরু-বাছুরের সারা গায়ে ছাপ দিয়া তাহাদিগকে সযত্নে কলার পাতায় সরা-পিঠা খাইতে দিতে হইবে। কপালে সিঁদুর দিতে হইবে।

ঠাকুমার কি কম সমস্যা, তা শত্তুরের মুখে ছাই দিয়া ষাটের গরু-বাছুরের সংখ্যা রায়বাড়ীতে কম নহে। এক গোয়াল-ভরা গরু-বাছুর, ভৃত্য সম্প্রদায় ঠিক মতন নিয়মরক্ষা করিতে যদি না পারে সেই আশঙ্কায় ঠাকুমা চঞ্চল হইয়াছেন।

উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় রাত্রে তাঁহার ভাল ঘুম হয় নাই।

প্রথম রাতের শিবাভোজন তিনি সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, পাচক মণিরাম কলার পাতায় খানকতক পিঠা পুকুরের চাতালে রাখিয়া আসিয়াছিল। কতক্ষণ পরে ঠাকুমা অনুভব করিলেন, একপাল শৃগাল নিঃশব্দে পিঠা খাইতে আসিয়াছে। কিন্তু খাওয়া তাহাদের শেষ হইবার পূর্ব্বেই প্রখর শ্রবণ শক্তিসম্পন্ন লালজি কালজি গোঁ গোঁ করিয়া ছুটিয়া গিয়াছিল। কিন্তু ঠাকুমা বিলক্ষণ রূপে অবগত আছেন শিবারা খাদ্য ফেলিয়া পলাইবার পাত্র নহে। তাহারা চাতালে বসিয়া পিঠা না খাইলেও বাঁশবনে লইয়া খাইয়াছে। ঠাকুমার অতি সাধের শিবাভোগ হইয়াছে।

এদিকে ঠাকুমার যেমন অস্থিরতা ও'দিকে তেমনি তরুর। সকলের অলক্ষ্যে বিহু যোগ দিয়াছে তরুর সঙ্গে।

রাতেই সকল তরকারি কুটিয়া রাখা হইয়াছিল। রসের পিঠার রস তৈরি করিয়া রাখা হইয়াছিল। নিয়মের ঘরের কাজ ছিল অনেকটা হালকা।

গরু-বাছুরের গায়ে কলিকার ছাপ দিয়া পিঠা আঁকা হইবে। অথচ তরুর দুগ্ধপোষ্যগুলি কি এমনি সকলের লাথি-ঝাঁটা খাইয়া আস্তাকুঁড়ে পড়িয়া থাকিবে? তাহারা কি বানের জলে ভাসিয়া আসিয়াছে? তাহাদের কল্যাণ নাই, শুভক্ষণ নাই?

হারাণীকে দিয়া তরু এক বালতি জল গরম করাইয়া লইয়া গিয়াছে কাঠের ঘরের পিছনে। একদিকে ঘরের আড়াল আর একদিকে প্রাচীর, স্থানটা ভারী নিরিবিলি, কাহারও চোখে পড়ে না।

মায়ের আস্ত একখানা চন্দন সাবান গরম জল সংযোগে শাবক চারটির গায়ে মাখাইয়া ক্ষয় করিয়া ফেলিয়াছে। বিহু কাজের ফাঁকে ফাঁকে আসিয়া তরুর সহযোগিতা করিতেছে। অবাধ্য অবোধ জীবগুলিকে কিছুতেই শাসনে রাখা যাইতেছিল না। বিহুই বুদ্ধি করিয়া চায়ের দুধ হইতে একঘটি দুধ অঞ্চলের আড়ালে আনিয়া চারিটা বাটিতে তাহাদের মুখের সামনে ধরিয়া দিয়াছে। বিহু আরও সংগ্রহ করিয়া দিয়াছে প্রসাধনের নানা সামগ্রী। চালের গুঁড়া গোলা নূতন কলিকা। একবাটি চুন হলুদ, আলপনার মাটির খুড়িতে গোলা তেল সিন্দুর।

গত রাত্রে ঠাণ্ডা লাগিয়া তরুর চোখ [illegible] করিয়াছিল। বিহুই তাহাকে মনসা পাতার কাজল করিয়া দিয়াছিল চোখে দিতে। সেই কাজলের [illegible] পাতা কয়েকটাও সে আনিয়া রাখিয়াছে। লাল টুকটুকে শাড়ীর পাড় আনিতেও বিহুর ভুল হয় নাই।

চালের উপর দিয়া তেরছা হইয়া রৌদ্র আসিয়া পড়িল বাচ্চাদের গায়ে। গা শুকাইতে বিলম্ব হইল না।

কুকুর-বিড়ালের সর্ব্বাঙ্গে ছাপ দেওয়া হইল [illegible] শাড়ীর মোটা পাড়ে হলুদ-চুনে ডোরাকাটা হইল [illegible], চোখে মনসা পাতার কাজল, কপালে তেল সিন্দুরের বৃহৎ টিপে বাচ্চাগুলা সাজিল অভিনব বেশে।

তরু তাহাদিগকে আদর করিয়া বুঝাইতে লাগিল, "চল, এখন তোদের বাইরে নিয়ে রেখে আসি। গরু-বাছুরের গায়ে পিঠে দেওয়া হচ্ছে দেখ গে। খবরদার— উঠোনের আলপনায় পা ছোঁয়াবি না। তা হলে [illegible] কার দিনে শুনতে হবে মধুর বচন 'আপদ' 'বালাই' দূর দূর ছাই ছাই'।"

তরু পাকা গিন্নী, বাচ্চাদিগকে উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হয় না, বিহুকে বলে, "বৌদি, তুমি এবার হাত-পা ধুয়ে কাপড়-সেমিজ বদলে তোমার যজ্ঞশালায় যাও। তোমাকে না দেখলে ওদিকে আবার বকুনি সুরু হবে। কচিরাম বলে, 'মুই পাতকী হমু না।' কি জানি কুকুর-ছোঁয়া কাপড়ে আমাদের কি পাতক হবে কে জানে। তাই কাপড় ছাড়তে বলছি।"

তরু তাহার সাঙ্গ-পাঙ্গ লইয়া বাহির মহলে চলিয়া গেল।

যথাসময়ে নারায়ণের ভোগ সরিল। ব্রাহ্মণ ভোজন হইল। বড় আঙ্গিনা আলপনায় চিত্রিত। ছোট ছোট আঙ্গিনায় কামার-কুমারের দল বসিয়া গেল আহারে।

যেমন তাহাদের পিঠা-পায়েস খাইবার বছর, তেমনি পায়েস বাড়িয়া লইবার আগ্রহ।

শুভ্র জ্যোৎস্না অবারিত হইয়া ঝরিয়া পড়িতেছে শুভ্র আলিপনায়। চারিদিকে হাসিতেছে প্রফুল্ল চন্দ্র-কিরণে।

জেলে পাড়ায় খোল-করতাল সংযোগে কীর্ত্তন হইতেছে—

"শান্তিপুর ডুবু ডুবু ন'দে ভেসে যায়,
হরিনামের বানে
হরিনামের গানে
কে আছিস পাপী তাপী, আয় ছুটে আয়।"

সারাদিন পৌষপার্ব্বণের উৎসবে শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া সন্ধ্যার পরে সকলে শয়ন করিয়াছে। বিনু গৃহে খিল আঁটিয়া আলোর সামনে বসিয়াছে বোনা লইয়া। কাজের ফাঁকে এবং রাত জাগিয়া সে ক্ষিতির মোজা বুনিয়া দিয়াছে। ক্ষিতি মোজা পায়ে দিয়া বন্ধু মহলে দেখাইয়া বেড়াইতেছে। বিনু ভাবিয়া পায় না ইহারা এত অল্পে খুশী হয় কিরূপে? ইহাদের চরিত্রের এদিকটা উদার বলিতে হইবে। এদিকে একরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে, এখন বিনুর আসল দিকের ব্যাপার বাকী রহিয়াছে। বিনু আঙ্গুলে মাপিয়া স্বামীর পায়ের মাপ রাখিয়াছে। প্রথমেই "দেহি পদপল্লব মুদারম।" বিনু স্বামীর পায়ের মোজা বোনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। এবার শীতে স্ত্রীর স্বহস্তে রচিত মোজার আস্বাদ প্রসাদ পাইবে না। কিন্তু না পাক "এক মাঘেই ত শীত পালায় না।" স্বামীর জন্য কিছু করিতে বিনুর হৃদয়-মন উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। সে এ-অবধি তাহাকে কিছুই দিতে পারে নাই। কেবলই গ্রহণ করিয়াছে তাহার অজস্র দান দুই করপুট ভরিয়া।

গৃহে সারারাত্রি কেরোসিনের আলো জ্বলে বলিয়া খাটের অপর অংশের দুইটি জানালা খোলা রাখা হয়। সেই মুক্ত বাতায়ন-পথে হিমবর্ষী বাতাস আসিয়া ঝাড়ে দোলা দিতেছিল, কাঁচের বাঁশী বাজিতেছিল ঠুং ঠাং। বিনু সেইদিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে পড়িতে লাগিল বিগত রজনীর কথা।

সুদূর দেশ হইতে আবার কবে মধুর যামিনী ফিরিয়া আসিবে তাহার জীবনে? প্রসাদ উদাত্ত মধুর স্বরে আবার তাহাকে কাব্য পড়িয়া শোনাইবে? সে আশা দিয়া গিয়াছে ফিরিয়া আসিয়া মেঘদূত পড়িয়া শোনাইবে। মেঘদূতের বিষয় বিনু যে একটু-আধটু না জানে তাহা নহে। তাহার পিত্রালয়ের সকলে সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত। তাঁহাদের পাঠ-পঠন আলোচনার মধ্য দিয়া বিনুর হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়াছে মেঘদূতের অঙ্কুর। সেই বিরহী যক্ষ যাহার আকুল বিলাপ বিশ্বে ব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে, বিনু এবার শ্রবণ করিবে সেই করুণ কোমল আমূল কাহিনী। তখন ত শীত থাকিবে না, কিন্তু বসন্তও কি চলিয়া যাইবে? বিনুর বারান্দার নীচের গাঁদার ঝাড় শুখাইয়া যাইবে। গাঁদা শুখাইলে কুরচি ফুলে ভরিয়া যাইবে তাহার বাতায়ন-তল। তরু বলিয়াছে গাঁদার পালা শেষ হইলে সে এখানে রোপণ করাইবে বেল ও রজনীগন্ধার ঝাড়।

বিনু বুনিতে বুনিতে মানস নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল বেল ও রজনীগন্ধার কুঁড়ি। তাহারা ফোটো ফোটো হইয়াছে কিন্তু সম্পূর্ণ ফুটিতে পারিতেছে না। আরব্য উপন্যাসের একাধিক সহস্র রজনীর পুনরাবৃত্তি না হইলে ফুল ফুটিবে না, কোকিল গাহিবে না। পবন কুরচিবাস বিতরণ করিতে বিরত থাকিবে।

ছোট ঠাকুমা একঘুমের পরে জাগিয়া চমকিত হইলেন, "ও কি বৌ, এই দুরন্ত শীতে এখনও তুমি বাতির সামনে বসে রয়েছ। একালের কি ঢং হয়েছে সোয়ামীর কাছে পত্তর লেখন। এদিকে ঘুমে ঢলে পড়ে, ওদিকে ঘুম যায় কোথা?"

বিনু ঘড়ির দিকে চোখ তুলিল, রাত বারটা বাজিয়া গিয়াছে। আজ সকলে শয়ন করিয়াছিল নয়টায়। তখনও জেলে পাড়ার কীর্ত্তন থামে নাই। পুণ্যদিনে প্রাণ ভরিয়া সবাই ভগবানের নাম করিতেছে।

বিনু বোনাটা টেবিলের টানার মধ্যে সযত্নে রাখিয়া দিল। লণ্ঠনের শিখা কমাইয়া রাখিয়া আসিল আলমারির পেছনে খোলা জানালার পাশে। ছোট ঠাকুমা আলো সহিতে পারেন না।

বিনু লেপের নীচে শয়ন করিয়া কহিল, "আমি ত আজ চিঠি লিখতে বসি নি ছোট ঠাকুমা? একটু বুনতে নিয়েছিলাম।"

"আবার কিসের বোনা? জনা-জাত ত বুনি-টুনি জামা জোড়া, মুজা-টুজা দিলি। আবার কার লেগে তোর হাত সুর সুর করছে? আজ দিনমান খাটা হাঁটা গেচে, আজ রাত জাগতে হয় না, শুয়ে ঘুম দিতে হয়। দেখ বৌ, পেসাদ এবার এসে তোকে রাত জাগা শিখিয়ে গেচে। চিরকাল আমি তোকে নিয়ে শুচ্চি-

তোর ঘুমের বহর আমার অজানা নাই। আজ দুপুরে ভোগের রাঁধা-বাড়া কেমন খেয়েছিলি?"

ছোট ঠাকুমা যেমন রাঁধিতে ভালবাসেন, ততোধিক ভালবাসেন নিজের রান্নার সুখ্যাতি শুনিতে। সারা দিনের পিঠা-পর্ব্বে কাহারও মুখে সেটা শোনা হয় নাই। এখন বড় আশায় বিনুকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

বিনু বলে, "খুব সুন্দর রান্না হয়েছিল ছোট ঠাকুমা, মণিরাম-কচিরামের সাধ্যি নাই আপনার মতন নিরামিষ তরকারি রাঁধে।"

"চাপুড় ঘণ্ট, মটর শাকের তিল-পেটালি, পটোলের ঝাল, ছানার ডালনা—এর ভেতরে কোনটা তোর বেশি ভাল লেগেছিল বৌ?"

বৌ নীরব, তাহার আঁখি-পল্লবে নিদ্‌পরী সোনার কাঠির পরশ দিয়াছে। ছোট ঠাকুমার ভুল ধারণা প্রসাদ বধূকে নিশি জাগরণ শিক্ষা দিতে পারে নাই।

পরের দিন এত বেলাতেও রৌদ্রের দেখা নাই। নিবিড় কুহেলিকায় ভুবন ভরিয়া গিয়াছে। বনতল কুয়াশার চাদরে আবৃত।

ঠাকুমা সিদ্ধান্ত করেন এবার আম্র পল্লবে পল্লবে আমের মুকুল ভরিয়া যাইবার কুজ্ঝটিকা, এ তাহারই পূর্ব্বাভাস।

ক্রমে বেলা হয়, ধীরে ধীরে উড়িয়া যায় কুয়াশার আবরণ। কৃষক বালক বালিকারা আসে কলাইকরা সানকী থালা ও ছোট ছোট বেতের ধামা লইয়া পিঠা ভিক্ষা করিতে।

গৃহিণী বধূকে আদেশ দিলেন সবাইকে সমভাবে পিঠা বিতরণ করিতে। পাত্রে পাত্রে পড়িয়া আছে অপরিযাপ্ত সিদ্ধপুলি, সরা-পিঠা ও পাটিসাপটা। এগুলি কাল কচিরাম সারাদিনব্যাপী প্রস্তুত করিয়াছিল। ভাল ভাল রসের পিঠা প্রায় নিঃশেষ।

বিনু লোককে দিতে বড় ভালবাসে। সেখানে পৌষপার্ব্বণের পরের দিন ঠাকুমা তাহাকে ডাকিয়া বলিতেন, 'রাই, আমি যা চাই,' যা বিনু পিঠে বিলি করগে। সমান ভাগে দিস, একজনা বেশী পেল, আর-জনারা পেল না, সেটা দেখিস।"

সেখানকার সেই বিনু আজ রায়বাড়ীর পিঠা বিতরণের ভারপ্রাপ্ত হইয়া মহা পুলকিত।

কেহ বলে, "বৌমা, আমাগো ছোট ভাইডার নাগি দুইডা পিঠা দেও। সে ম্যালেরি জ্বরে ক্যাঁতা মুড়ি দিইয়া কাঁদন করিচে। মাতা তুলিতে পারিল না। একটু পরে জ্বর ছাড়ি যাইবে, তহন পিঠা খাইবে।"

কেহ অনুনয় করে, "ও বৌমা, মায়ের নাগি ভাঙ্গা-চেরা একডা পিঠা দেও। মা গিইছেল মিরগী বিলে কাদা হাতায়ে মাছ ধরিতে, জিয়াল মাছে পায়ে কাঁটা বিঁধাইয়া দিইচে। পা ফুলি ঢোল, নড়িতে পারে না।"

জনে জনের নানারূপ অনুযোগ-অভিযোগ শুনিয়া বিনু পিঠা দেয়। পাত্র প্রায় শূন্য হইয়া আসিতেছে। প্রার্থীর সংখ্যাও বিরল হইতেছে।

আজ বিনু এদিকে আবদ্ধ। গৃহিণী কচিরামের উপরে ভার অর্পণ করিয়াছেন তরকারি কোটার। সে বসিয়া গিয়াছে যজ্ঞশালার বারান্দায় বঁটি পাতিয়া। মেয়েলী কাজে কচিরাম ওস্তাদ। তাহার কর্ম্মকুশলতায় সরস্বতীও সদয় হইয়াছে।

পিঠার ঘরে দরজায় শিকল দিয়া বিনু গিয়া তাহার বিছানার উপরে চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল। হাতে তাহার "চোখের বালি"। ইতিপূর্ব্বেই তাহার স্বামী প্রদত্ত সমস্ত গ্রন্থের গল্পাংশ পাঠ করা হইয়াছে। তাহাকে পাঠ বলা চলে না, গোগ্রাসে গেলা। বিনু এবার স্বামীর ব্যবহারে তাহার প্রতি কিঞ্চিৎ প্রীত। সে খাতায় লেখার জোর দেয় নাই, অখাদ্য অপাঠ্য কতক-গুলো বই তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া তাহা মুখস্থ করিতে হুকুম করে নাই। শুধু আদেশ দিয়াছে একখানা পুস্তকের গল্প একবার পড়িয়া সে যেন তাহা রাখিয়া না দেয়। বার বার পড়িয়া সে যেন প্রতি শব্দের অর্থ বোধ করিতে চেষ্টা করে। সেই কারণে দুইবার পড়া চোখের বালি বিনুর হস্তে। বিনু প্রতি লাইনে চোখ বুলাইতে বুলাইতে ভাবে, আশার সহিত তাহার যেন কোথায় সাদৃশ্য রহিয়াছে। ভাগ্যে এখানে বিনোদিনীর আবির্ভাব ঘটে নাই, তাহা হইলে বিনু কি করিত! এমন সময় আঁচলের তলায় হাত লুকাইয়া তরু গৃহে প্রবেশ করিয়া ডাকে, "বৌদি, শুয়ে রয়েছ কেন? অসুখ করল নাকি?"

বিনু বই রাখিয়া উঠিয়া বসে, "না না, অসুখ করবে কেন? এমনি একটু গড়িয়ে নিলাম। এখন নাইতে যাব, বেলা দুপুর হ'ল; বড় হবিষ্যি ঘরে মুগুরের কাজ পড়ে আছে। আর দেরি করলে ওঁরা রাগ করবেন।"

"রেখে দাও ওঁদের রাগ। তুমি কি এতক্ষণ ব'সে ছিলে, কাঁড়ি কাঁড়ি পিঠের বিলি-ব্যবস্থা সেটা কি কাজ নয়? তোমার ভয় নেই, মা কচিরামকে ঢুকিয়েছেন

মেজদির তাঁবে। ও তোমার চেয়ে ভাল কাজ করছে দেখে মেজদি খুসীতে ডগমগ। এই দেখ কি এনেছি, পিঠে খেতে খেতে মুখ বিচ্ছিরি হয়ে গেছে, নাও, মুখে দাও।” বলিতে বলিতে তরু আঁচলের তলা হইতে বাহির করিল একটা পাথরের বাটি। বাটিতে রাঙ্গা রাঙ্গা এক বস্তু শালুপ পাতায় মাখা।

বিনু সাগ্রহে প্রশ্ন করে, “এ আবার কি মেখে এনেছ? এত লাল কেন?”

“চুকারী কি লাল না হয়ে সাদা হবে? গোয়ালের পেছনে আমাদের যে চুকারী গাছ আছে, তুমি ত তা দেখ নি, বৌমানুষ বাইরে গোয়ালের পেছনে যাবে কি? চুকারী শিলে ছেঁচে শালুপ পাতা দিয়ে মেখেছি। শীতের ঠ্যালায় একটা কামরাঙ্গাও পাকে নি। গাছভরা কুল, কষা। আমের মুকুল কত খুঁজলাম, সবে পাতার ভেতর থেকে উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে।”

বিনু হাত বাড়াইয়া সেই পরম উপাদেয় সামগ্রী মুখে দিল। মুখে চুক চুক শব্দ করিয়া প্রশংসায় মুখর হইল, “কি সুন্দর মেখেছিস তরু, খেতে চমৎকার হয়েছে। কখনও এমন খাই নি। পিঠে খেতে খেতে আমার মুখটাও যেন কেমন হয়ে রয়েছে। তোর চুকারী খেয়ে বাঁচলাম। আর ক'দিন পরেই কুল হবে, আমের মুকুলে ভরে যাবে গাছ। কুল আমের মুকুল দিয়ে মাখলে কি সুন্দর হয়?”

তরুর সহিত নিবিড় সখ্যতায় বিনুর ‘তোমার’ পরিবর্তে ‘তুই’ যে কখন হইয়াছে বিনু তাহা টের পায় নাই।

ঠাকুমা পাকা সন্ধানী, এতক্ষণ সন্ধানে সন্ধানেই ঘুরিতেছিলেন। বিনুর গৃহে ঢুকিয়া গালে হাত দিলেন, ‘ওমা, তোরা এখানে, আমি কই, গেল কনে ওরা? কি খাচ্ছিস লো, ঘর-ভরা পিঠে-পায়েস থুয়ে তোরা কি খেতে বসেছিস? চুকারী কি কাঁচা খাওয়া যায়?”

তরু বলে, “আমরা যে এঁটো ক'রে ফেলেছি, নইলে তোমাকে একটু চেখে দেখতে দিতাম কাঁচা খাওয়া যায় কি না? তোমার বাড়ীতে মিষ্টি খেতে খেতে জিবের স্বাদ নষ্ট হয়ে গেছে। আর ভাল লাগে না।”

“অমর্ত্তে অরুচি হইছে তোদের। তা এমাস ভরা চলবে এমনি ধারা খাওয়া-দাওয়া। আজ মাঘ মাস পড়ল। পরশু তোদের বাস্তু পুজো। বাস্তু পুজোর দিন রায়বাড়ীতে আবার পাঁঠা দিয়ে বাজারের জয়দুর্গার পুজো দিতে হবে। পাঁঠা বলি দিয়ে বাড়ীতে আনে। পুরোহিত খায় দুইজনা, বাস্তু পুজোর একজনা, জয়দুর্গা পুজোর একজনা। আমার মহেশের রাজার সংসার, দুইজনা কইলেই কি দুইজনা হয়। কত লোক আসবে যাবে খাবে নেবে তার ঠিক-ঠিকানা নাই। এত খাবার দেব্যজাত দেখে আমার পরাণটা কেঁদে ককিয়ে মরে পেসাদের জন্যে। ‘ব্রজভূমি করি আঁধার কোথায় গেছে গোপাল আমার’।”

ঠাকুমার গোপাল উল্লেখে তরু খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল। প্রিয়বিচ্ছেদকাতরা বৃদ্ধার খেদোক্তিতে বিনু আজ তরুর হাসিতে যোগ দিতে পারিল না।

বাস্তু পূজা হইতেছে উঠানে। গোবর-জলে লেপা জায়গায় আলপনা দেওয়া হইয়াছে। বাস্তু পূজার জলপানি সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে ছোট ছোট কলার পাতায়। দেবতা কি কম, ইন্দ্রাদি পঞ্চ দেবতা ছাড়া অগ্নির দাহন হইতে গৃহকে রক্ষা করিবার জন্য অগ্নি দেবতা। ঝটিকা হইতে রক্ষার নিমিত্ত পবন। জল-প্লাবনের দেবতা বরুণ। মেঘ-বৃষ্টির কর্ত্তা মেঘবাহন। লক্ষ্মীনারায়ণ শিবদুর্গা। সর্ব্বসিদ্ধি গণেশ সূর্য্য দেবতা-সর্ব্বোপরি মা বসুমতী, তিনিই যে সাক্ষাৎ বাস্তু দেবী।

ছোট ঠাকুমা পরমান্ন চড়াইয়া দিয়াছেন। পায়েস দিয়া সর্ব্ব দেবতার ভোগ দিতে হইবে।

প্রভাতে ছেলে-বুড়া স্নান সারিয়া লইয়াছে। পূজার স্থানে গোল হইয়া বসিয়াছে গৃহবাসীরা। গৃহকর্ত্তা পুরোহিতের পাশে কুশাসনে সমাসীন। শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসার ঝাঁজ বাজা মাত্র ঠাকুমা উলু দিলেন। ধুপ-দীপ জ্বলিল। ঘণ্টা দুই ধরিয়া চলিল বাস্তু পূজা।

ইহার পরে ভোগ দিবার সময় আসিল। ফের ধোয়া-মোছা কলার পাতা সাজান হইল আঙ্গিনায়। প্রত্যেক কলার পাতায় দেওয়া হইল পানের খিলি দই মিষ্টি।

মনোরমা মস্ত একটা পিতলের কড়ার দুই কান ধরিয়া উঠানে আনিয়া নামাইলেন। কড়া ভরা পায়েস, দেবতার প্রীতির জন্য তাহাতে মিলিত করা হইয়াছে ঘৃত মধু কর্পুর।

হাতা কাটিয়া কাটিয়া কলার পাতায় পায়েস দেওয়া হইল। দিনটা মেঘম্লান হইলেও মধ্যাহ্নে রৌদ্রের তেজ মন্দ ছিল না। বাহির হইতে আসিল অনেকগুলি ছাতা। রুচিরাম ব্রাহ্মণ, এসব কাজে তাহার অধিকার আছে। সে ছাতা মেলিয়া ধরিল পুরোহিত ও কর্ত্তার মাথায়।

অন্য সকলে ছাতা মুড়ি দিয়া বসিয়া বসিয়া লোলুপ দৃষ্টিতে প্রসাদের দিকে তাকাইতে লাগিল।

অবশেষে ভোগ হইয়া গেল। পুরোহিত কুশের ডাঁটায় শান্তিজল সকলের গায়ে ছিটাইয়া দিলেন।

সকলে বসিয়া গেল প্রসাদের পাতা লইয়া। বাস্তু পূজার প্রসাদ উঠানে বসিয়াই খাইতে হয়।

কর্ত্তা বসুমতীর প্রসাদের পাতা লইয়া চলিলেন বাড়ীর প্রধান গৃহের ঈশান কোণে পুঁতিতে।

পুরোহিত পায়েস প্রসাদ বাদে জলযোগ সারিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। পায়েস অন্নতুল্য। এক সূর্য্যে একবারের বেশি দিনে ব্রাহ্মণরা অন্ন গ্রহণ করতেন না।

সারি সারি পাতা লইয়া সরকাররা ও দাসদাসীর দল খানিকটা দূরে বসিয়া গেল। ঠাকুমা প্রসাদ প্রণাম করিয়া মুখে দিলেন।

তরু তারস্বরে চিৎকার করে, "ওবৌদি, এস না বাপু, তোমার প্রসাদে এর পরে ধুলো-বালি উড়ে পড়বে। এত লোকের ভেতরে খাবে কেমন করে? এই যে আমি ছাতার আড়াল করে দিয়েছি। ছোট ঠাকুমা মা প্রসাদ মুখে দিয়ে গেছেন, ওঁরাও পায়েস খাবেন না। মেজদির উঠোনের প্রসাদ অচল। উনি যে ঠাকুর দেবতার ওপরে বড় দেবতা।"

মনোরমা বলিলেন "যাও বৌমা, তুমি ছাতার আড়ালে ব'সে প্রসাদ মুখে দিয়ে এস। এক্ষুনি জয়দুর্গার বলির পাঁঠা এসে যাবে। মাংস রান্না হ'লে তবে না সকলের খাওয়া। খেতে খেতে দুপুর গড়িয়ে যাবে। তুমি দু'খানা পায়েসের পাতা নিও।"

বিনু ছাতার আড়ালে তরুর পাশে প্রসাদ লইয়া বসিল। ইতিমধ্যে তরু চারখানা পায়েসের পাতা সরাইয়া রাখিয়াছে এক পাশে। বিনু সেদিকে চোখ মেলিতেই তরু চুপে চুপে কহিল, "ওদের জন্যে সরিয়ে রেখেছি বৌদি। উঠোনে পুজো, ওরা ছুঁয়ে দেবার ভয়ে আমি কাঠের ঘরে শেকল দিয়ে রেখেছি। তোমার খাওয়া হ'লে চল ওদের খাইয়ে-দাইয়ে ছেড়ে দেইগে।"

বিনু ও তরু নিজেরা প্রসাদ খাইয়া সকলের অগোচরে চলিয়া গেল কুকুর-বিড়াল বাচ্চাদের ভোগ সরাইতে।

জয়দুর্গার বাড়ীতে বলি হইয়া আসিল পূজার ফল-মূল মিষ্টান্ন প্রসাদ ও বলির শিংওয়ালা প্রকাণ্ড একটা পাঁঠা। জয়দুর্গা বারোয়ারী পূজার মতন। তাঁহার অন্নভোগ নাই। বাজারের দোকানদারদের অনুরোধে ও পাড়ার নিম্নশ্রেণী লোকদের আগ্রহে রায়কর্ত্তা নিজের এলাকায় নিজে যাবতীয় ব্যয় বহন করিয়া জয়দুর্গার আটচালা টিনের মণ্ডপ করিয়া দিয়াছিলেন। মণ্ডপের দেয়াল ও মেঝে পাকা। বৈশাখী অমাবস্যায় জয়দুর্গার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়। সেই কারণে একবছর কাল দেবী-প্রতিমা মণ্ডপে বিরাজিত থাকেন। ফের বৈশাখে পুরাতন প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া নূতন প্রতিমার প্রতিষ্ঠা হয়। ইতর সাধারণরা বারমাস ভক্তিভরে প্রভাতে তাঁহার গৃহ মার্জ্জনা করিয়া ফুল দেয়। সন্ধ্যায় প্রদীপ ও ধূপ প্রজ্জ্বলিত করে। রোগে-ভোগে মানত করে, রোগমুক্ত হইলে পুরোহিত ডাকাইয়া পূজা দেয়, বলি দিয়া মহানন্দে বলির মাংস ভোজন করে।

পল্লীগ্রামে কসাইখানা নাই। অনেক নিষ্ঠাবান ব্যক্তি বৃথা মাংস স্পর্শ করেন না। মায়ের নামে পাঁঠা উৎসর্গ করিলেই তাহা মহাপ্রসাদে পরিণত হইয়া থাকে। সেই জন্য জয়দুর্গার অঙ্গনে বলির অভাব হয় না।

দুই পুরোহিত ঠাকুর মহাশয় পাচকের হাতে খাইবেন না। তাঁহাদের নিমিত্ত মনোরমা পৃথক মাছ রান্না করিয়া মাংস চড়াইয়া দিলেন। ডাল তরকারি ভাজা অম্বল ভোগশালাতেই হইয়াছে।

রায়বাড়ীর ভূরিভোজন মিটিতে অপরাহ্ণ গড়াইয়া গেল। সকলে পরিতৃপ্ত হইল বাস্তু পূজার সমাপ্তিতে। সূতায় গাঁথা হইয়া যেন রহিয়াছে—এক একটি পর্ব্ব। সূতা হইতে ফুলের মালার মত এক একটা খসিয়া গেলে কাজের লোকেরা আরাম বোধ করে।

ঠাকুমা আজ বড় উৎকণ্ঠিত, কামিনীর মা'র জন্য। কামিনীর মা গিয়াছে আজ তিন দিন হইল নাকালিয়ার বন্দরে তাহার অসুস্থ কাকাকে দেখিতে। বেচারার স্বজন বলিতে বিশেষ কেহ নাই। থাকিবার মধ্যে ব্রজেশ্বরী ভগিনী আর কাকা ও কাকিমা।

রায়বাড়ীর ব্যূহ ভেদ করিয়া কামিনীর মা সচরাচর বাহির হইতে পারে না। বালিকা বয়সে সে তিন মাসের কন্যা কামিনীকে লইয়া বিধবা হইয়াছিল। সে কামিনীও এক বছরের বেশি জীবিত ছিল না। কিন্তু নামটুকু রাখিয়া গিয়াছে। তাহার পরে ঠাকুরদার আমলে ভরা যৌবনে কামিনীর মা এখানে আসে। সর্ব্ব বিষয়ে সুনামের সহিত জীবন প্রায় কাটাইয়া আসিয়াছে। ঠাকুমা এতদিন যে তরুণীটিকে স্নেহে করুণায় সৎপথে পরিচালিত করিয়া রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন সে এখন আর দাসী পর্য্যায়ে পড়ে না। রায়-পরিবারের একজনা হইয়া গিয়াছে।

কথা ছিল আজ ভোরে কামিনীর মা আসিয়া পৌঁছিবে। তাহার ব্যতিক্রমে ঠাকুমা পথের পানে চাহিয়া আছেন। বিন্থকে শতবার প্রশ্ন করিয়াছেন, "দেখ লো মণিমালা, রাজেশ্বরীর জন্যে বাস্তু পুজোর পেসাদ রেখে দিয়েছিস ত? সে কথার নড়-চড় করবার লোক নয়। কাহিল কাতরের বাড়ী, ঠেকে পড়ে বের হ'তে পারে নি।"

বিন্থ বলে, "ভোগের তুই পাতা পায়েস আর সব জিনিস তার জন্যে ঢাকা দিয়া রাখা হয়েছে ঠাকুমা; ওবেলা আসতে পারে নি, এবেলা নিশ্চয় আসবে।"

বিন্থর আশ্বাসে ঠাকুমা আশ্বস্ত হন। "তাই কি মণিমালা, তোর মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। রাজেশ্বরী না থাকলে একবেলায় রায়বাড়ী অচল। একটা না মিটতেই আর একটা এসে উপস্থিত হয়। বাস্তু পুজো হ'ল, আসছে রটন্তী পুজো। সে হেলা-ফেলার দেবতা নয়, কাঁচা খেকো কালী। এখন থেকেই তার সাটর সুরু হবে। রাজেশ্বরী না হ'লে কারও সাধ্যি নেই তালে তাল দেওয়া।"

ঠাকুমার আকুলতায় দাসী মহলে পরস্পর পরস্পরের গায়ে ঠেলা দিয়া মুখ টিপিয়া হাসে বিদ্রূপের হাসি।

ক্রমশঃ

—*—

আগামী বৈশাখ সংখ্যা হইতে

নূতন বছরের নূতন উপন্যাস

লিখছেন—

শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

অঙ্কুরে বিনাশ

শ্রীযোগনাথ মুখোপাধ্যায়

ভারতে দ্রুতবর্ধিষ্ণু জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বিবিধ ব্যবস্থাবলম্বনের কথা চিন্তা করা হচ্ছে। সম্প্রতি সংসদে এই প্রসঙ্গ আলোচনাকালে সদস্যদের প্রশ্নের উত্তরে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ সুশীলা নায়ার বলেন, জন্ম-নিরোধক বিভিন্ন ওষুধ বা প্রক্রিয়া শতকরা শতভাগ সুনিশ্চিত নয় বলে গর্ভবিনষ্টি বিধিবদ্ধ করার প্রস্তাবও সরকারের বিবেচনাধীন আছে। বিহারের তথ্য ও পরিকল্পনা মন্ত্রী শ্রীমতী সুমিত্রা দেবীও গর্ভবিনষ্টির প্রস্তাব সমর্থন করে বলেছেন, তাঁর হাতে ক্ষমতা থাকলে তিনি গর্ভ-বিনষ্টি আইনসিদ্ধ করতেন।

মায়ের স্বাস্থ্য জীবন ও রক্ষার জন্য গর্ভবিনষ্টি অবশ্য এখনই আইনসঙ্গত। কোন চিকিৎসক যদি মনে করেন, গর্ভসঞ্চারের ফলে কোন নারীর জীবন বিপন্ন হয়েছে বা গর্ভজাতভ্রূণের কোন কারণে মৃত্যু হওয়ায় মায়ের জীবন সঙ্কট দেখা দিয়েছে তবে মাকে রক্ষার জন্য তিনি গর্ভস্থ ভ্রূণ বিনাশ করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। কিন্তু এখন নারীর জীবনের সঙ্গে সমগ্র দেশ ও সমাজের নিরাপত্তার প্রশ্নও পৃথিবীর সকল দেশে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। অগণিত অনাগতের অবাঞ্ছিত আবির্ভাব এখন সারা বিশ্বের সমস্যা। তাই গর্ভবিনষ্টি আইনসিদ্ধ করার জন্য পৃথিবীর দেশে দেশে জোরালো আন্দোলন গড়ে উঠছে। সমস্যাটি এখন আর শুধু চিকিৎসকের বিচার্য বিষয় নয়, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সমাজচিন্তা।

অবাঞ্ছিত সন্তানের আগমন প্রতিরোধের জন্য গর্ভ-বিনষ্টি একটি দীর্ঘাচরিত প্রথা। প্রাগৈতিহাসিক সমাজেও এর প্রচলন ছিল। খাদ্যের সন্ধানে যেদিন মানুষকে দেশ দেশান্তর ঘুরে বেড়াতে হ'ত ও বাঁচার জন্য বনের পশুর সঙ্গে অহর্নিশ সংগ্রাম করতে হ'ত, সেদিন সন্তান খুব কমজনেরই কাম্য ছিল। প্রিয়জনের সঙ্গে হারানোর ভয়ে বা চলার পথে নিঃসঙ্গ অবস্থায় পড়ে থাকার আশঙ্কায় অনেক নারীই সেদিন নির্দ্বিধায় আত্মজের ভ্রূণাবস্থায় অবলুপ্তি ঘটাত।

পরবর্তীকালে কৃষিবিদ্যা আয়ত্ত করে মানুষ যখন স্থায়ী জনপদ ও ক্ষেত খামার গড়ে তোলে তখন সহকারীর প্রয়োজনে সন্তানের সমাদর বাড়ে এবং স্বাভাবিকভাবেই ভ্রূণবিনষ্টি হ্রাস পায়। কিন্তু সভ্যতার জটিল অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এমন সব অবাঞ্ছিত কুসংস্কার ও কুপ্রথা সমাজে প্রবেশ করতে থাকে যার ফলে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে আবার গর্ভবিনষ্টির ব্যাপক চল সুরু হয়। বহু বিবাহ ও বালবৈধব্যের এই দেশে কত কোটি জীবনের সম্ভাবনা যে জঠরের অন্ধকারেই বিলুপ্ত হয়েছে তার হিসাব, কোন মতেই হওয়া সম্ভব নয়। প্রাচ্যের বহু রাজপরিবারে ও অভিজাত বংশে সামাজিক মর্যাদা রক্ষার জন্য মেয়ের বিয়ে দেওয়ার রীতি ছিল না। এখনও হায়দ্রাবাদের নিজাম পরিবারে মেয়েদের বিবাহ নিষিদ্ধ। যুদ্ধ বা রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে যখন কোন দেশে বহু যুবকের মৃত্যু হয় বা অর্থনৈতিক কারণে বিবাহ কঠিন হয়ে পড়ে তখনও অগণিত নারীকে নিঃসঙ্গ থাকতে হয়। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে মনুষ্য-সৃষ্ট এই সব বাধা যে অনিবার্যভাবে সংখ্যাতীত বিপর্যয় ঘটিয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা ও সেই সঙ্গে অবাধ মেলামেশা পাশ্চাত্ত্য সমাজে গর্ভবিনষ্টিকে প্রায় প্রতি পরিবারের স্বাভাবিক ঘটনা করে তুলেছে।

প্রাচীন কাল থেকে এই প্রথা প্রচলিত বলে প্রাচীন কাল থেকেই বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এসম্বন্ধে বিভিন্ন অভিমত প্রকাশ করে আসছেন। প্রাচীন রোম ও গ্রীসের অভিজাত পরিবারগুলিতে গর্ভবিনষ্টির ব্যাপক প্রচলন ছিল। ক্ষুদ্র নগররাষ্ট্রগুলিতে জনসংখ্যা একদিন সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়, এ কারণে প্লেটো ও এরিষ্টটল জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য গর্ভবিনষ্টি সমর্থন করেন। কিন্তু খ্রীষ্ট-পূর্ব-যুগের প্রখ্যাত রোমান চিন্তানায়ক ও রাষ্ট্রনেতা সিসারো গর্ভবিনষ্টির বিরোধী ছিলেন। তিনি ভ্রূণহত্যাকারিণী নারীর মৃত্যুদণ্ড সমর্থন করে বলেন—যে নারী তার সন্তানের পিতাকে সব আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্মৃতিরক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে, একটি পরিবারের ভবিষ্যৎ ভরসাকে নিশ্চিহ্ন করে ও রাষ্ট্রের নাগরিক সংখ্যা বৃদ্ধির পথে অন্তরায় হয় মৃত্যুই তার একমাত্র শাস্তি। সম্রাট নিরোর পরামর্শদাতা অপর রোমান চিন্তানায়ক সেনেকা গর্ভবিনষ্টিকে নীতিবিগর্হিত কাজ বলে মনে করতেন। কিন্তু আইন করে তা বন্ধ করা যাবে না বলে তিনি গর্ভবিনষ্টি আইনত নিষিদ্ধ করার পক্ষপাতী ছিলেন না জাষ্টিনিয়াম কোডে গর্ভবিনষ্টি নিষিদ্ধ। চিকিৎসব

জগতের গুরু হিপক্রেটিসও ছিলেন গর্ভবিনষ্টির বিরোধী। চিকিৎসকদের জন্য তিনি যে অঙ্গীকার পত্র রচনা করেন এবং যা আজ বিশ্বের সকল দেশের, সকল চিকিৎসকের আচরণ-বিধিরূপে স্বীকৃত, তাতে লিখিত আছে—I will not aid a woman to procure abortion.

খ্রীষ্টধর্মের বিধানে জন্মনিয়ন্ত্রণ বা গর্ভবিনষ্টি নিষিদ্ধ। কিন্তু প্রোটেষ্টান্টরা অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে অন্তত জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে মনোভাব পরিবর্তন করেছেন; ক্যাথলিকরা এব্যাপারে এখনও অবিচল। ফলে বিশ্বের ক্যাথলিকধর্মী রাষ্ট্রগুলিতে অবাঞ্ছিত জন্ম এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। লাতিন আমেরিকায় এমন দেশও আছে যার জনসংখ্যার প্রায় সত্তর শতাংশ অবৈধ। সেখানে খুব কম নারীর জীবনেই যৌবন বসন্তের বার্তা বহন করে আনে। আর্থিক অনটনের জন্য স্বামীর সংসার করার সুযোগ তাদের অল্প জনের হয়, কিন্তু সন্তান ধারণ তাদের সকলের জীবনের অনিবার্য অধ্যায়। দশ-বারোটি সন্তানের জন্ম না দিয়ে অব্যাহতি পেয়েছে এমন নারী অল্পই আছে লাতিন আমেরিকায়, এমনকি কুড়িটি সন্তানের জন্মদানও সে মহাদেশে স্বাভাবিক ঘটনা। বারো-তেরো বছরে সন্তানের জন্মদান আরম্ভ করে বত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে কুড়িটি সন্তানের জননী হয়েছেন এমন বহু হতভাগিনীর সন্ধান পাওয়া যাবে লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে। জন্মনিয়ন্ত্রণের বা প্রয়োজনে গর্ভবিনষ্টির সুযোগ না থাকলে একটি সমাজের অবস্থা কি ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে লাতিন আমেরিকার দিকে তাকালেই তা বুঝতে পারা যায়।

কিন্তু লাতিন আমেরিকা দরিদ্র মহাদেশ। ইচ্ছা থাকলেও চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়ার সুযোগ সেখানে সীমিত। চিকিৎসকের সাহায্য সহজলভ্য হ'লে নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও কি ব্যাপক হারে গর্ভবিনষ্টি চলে দেশে, তা সম্প্রতি জানিয়েছেন নিউ ইয়র্কের তিন হাজার চিকিৎসকের সংস্থা 'নিউ ইয়র্ক একাডেমী অফ মেডিসিন'। তাঁদের মতে, এখন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর অন্তত দশলক্ষ গর্ভবিনষ্টির ঘটনা ঘটে, যার মধ্যে প্রায় ৯৯ শতাংশই বে-আইনী। হাসপাতালে প্রকাশ্যে যে আট হাজার নারীকে অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় তার মধ্যে আইনসম্মত ঘটনা মাত্র কয়েকটি। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পঞ্চাশটি রাজ্যেই মায়ের জীবনরক্ষার অনিবার্য প্রয়োজন ছাড়া সকল কারণে গর্ভবিনষ্টি নিষিদ্ধ। কিন্তু কোন কোন হাসপাতালের ডাক্তার বিপন্ন ও অসহায় নারীর আবেদনে সহজেই সাড়া দেন, বিশেষ করে সে নারী যদি আত্মহত্যার ভয় দেখায় বা কুমারী ধর্ষিতা হয়।

একাডেমী অফ মেডিসিন বলেছেন, আইন থাকা সত্ত্বেও যদি এমন ব্যাপকভাবে গর্ভবিনষ্টি চলে দেশে, তবে সে আইন অপ্রয়োজনীয় ও অর্থহীন। কোন কোন চিকিৎসক এমন অভিমতও প্রকাশ করেছেন যে, জন-স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করেই সরকারের অবিলম্বে গর্ভবিনষ্টি আইনসম্মত করা উচিত। কারণ, আইনের ভয়ে বহু চিকিৎসক ওসব কাজ করেন না, ফলে অনেককেই হাতুড়েদের হাতে প্রাণ দিতে হয়। তারপর গোপনে তাড়াতাড়িতে এসব কাজ শেষ করতে হয় বলে অনেক ক্ষেত্রেই চিকিৎসা শাস্ত্রসম্মত ভাবে তা সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। অনেক চিকিৎসকও বিপন্নাদের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে জুলুম করে বেশী টাকা আদায় করেন। সুতরাং, গর্ভবিনষ্টি না ক'রে উপায় নেই যাদের, তারা যাতে সহজপথে অল্পায়াসে ও অল্পব্যয়ে আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ পায় সরকারের অবিলম্বে তার ব্যবস্থা করা উচিত।

একাডেমী তাই নিম্নলিখিত মর্মে প্রচলিত আইনের সংশোধনী প্রস্তাব করেছেন: যে মাতৃত্ব নারীর দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতির কারণ হবে, এবং যেক্ষেত্রে ভূমিষ্ঠ শিশুর দেহ ও মনের উপর তার জন্মের কারণ গুরুতর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে, সেক্ষেত্রে মাতৃত্ব অবাঞ্ছিত বিবেচিত হ'তে পারে এবং আইনের পথেই তার অবসান ঘটানো যাবে।

দুর্নীতির প্রতিষেধকরূপে একাডেমী শুধু প্রস্তাব করেছেন, বিধিসম্মত হওয়ার জন্য প্রত্যেকটি গর্ভবিনষ্টি হাসপাতালের চিকিৎসকদের নিয়ে গঠিত একটি কমিটির অনুমোদন-সাপেক্ষ হ'তে হবে এবং একমাত্র লাইসেন্স-প্রাপ্ত চিকিৎসকদের দিয়েই ঐ কাজ করানো হবে। নিরাপত্তার প্রয়োজনেও এই ব্যবস্থা দু'টি বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত বলে একাডেমী মনে করেন।

ব্রিটেনে ১৯৪৮ সালে যে 'ইউজেনিক প্রটেকশন অ্যাক্ট' পাশ হয় তার অভ্যাপাঃ লক্ষ্য সন্তানবতীর স্বাস্থ্য হ'লেও তার দ্বারা সকল কারণে গর্ভবিনষ্টি কার্যত আইনসিদ্ধ হয়। ঐ আইন পাশ হওয়ার পর থেকে ব্রিটেনে প্রতি-বছর আইনসম্মত ভাবেই কুড়ি লক্ষ গর্ভবিনষ্টি হচ্ছে। চিকিৎসকদের অনুমান, ফ্রান্সে প্রতি বছর ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ গর্ভের বেআইনী বিনষ্টিতে পরিসমাপ্তি ঘটে। ডেনমার্কে যত শিশু ভূমিষ্ঠ হয়, গর্ভবিনষ্টি হয় তার দ্বিগুণ।

সোভিয়েট ইউনিয়নে বিপ্লবের পরেই গর্ভ-বিনষ্টি আইনসঙ্গত করা হয়। পরে, ১৯২০ সালে, ঐ আইনের কিছুটা সংশোধন করে বলা হয়, হাসপাতালের বাইরে গর্ভবিনষ্টি আইনসঙ্গত হবে না। এখন যে-কোন নারী ইচ্ছা করলে ঐ আইনের সুযোগ নিতে পারেন। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের মতে গর্ভবিনষ্টি আইনসিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পায় নি। ইউরোপের অন্যান্য কম্যুনিষ্ট দেশগুলিতেও গর্ভবিনষ্টি আইনসিদ্ধ। হাঙ্গেরীর এক বছরের হিসাবে দেখা যায় সেখানে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে ত্রিশ হাজার, আর গর্ভ-বিনষ্টি হয়েছে পঞ্চাশ হাজার। কিন্তু এটাকে স্বাভাবিক ঘটনা বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে। আধুনিক দম্পতির কাছে বেবী খুবই প্রিয় কিন্তু 'বেবীকার' তার চেয়ে কম প্রিয় নয়। একটি-দু'টি সন্তান সকলেরই আছে এবং সেইটিকেই তারা মনের মত করে মানুষ করতে চায়। জাপানে গর্ভবিনষ্টি আইনসিদ্ধ হওয়ায় ঐ দেশের অশেষ কল্যাণ হয়েছে। সেখানে এখন প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ নারীকে অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। তাতে শুধু যে জাপানের লোকবৃদ্ধি সমস্যার সমাধান হয়েছে তাই নয়, তার ফলে ঐ দেশের প্রত্যেকটি মানুষ সুস্থ-সুখী জীবন যাপনের সুযোগ পেয়েছে, সকল দিক থেকে আধুনিক জগতের উপযোগী হয়ে জাপান গড়ে উঠতে পেরেছে।

গর্ভবিনষ্টি আইনসঙ্গত করার বিরুদ্ধে বহু ধর্মীয় ও নৈতিক যুক্তির অবতারণা করা যায়, কিন্তু তাতে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না যে, আগামী চল্লিশ বছরের মধ্যে পৃথিবীর জনসংখ্যা বর্তমানের দ্বিগুণ হ'লে তার পরিণতি কি হবে। লোকতত্ত্ববিদ্‌রা হিসাব করে বলেছেন, পৃথিবীর লোকসংখ্যা তিনশ' কোটি হ'তে আট লক্ষ বছর সময় লাগলেও ছ'শ কোটি হ'তে আর মাত্র চল্লিশ বছর সময় লাগবে। ভারতে এখনই চরম খাদ্যাভাব, কিন্তু যে-হারে এদেশের লোক বাড়ছে তা যদি অব্যাহত থাকে তবে ১৯৭০ সালে ভারতের লোকসংখ্যা পঞ্চাশ কোটি অতিক্রম করে যাবে, এবং ১৯৮০ সালে হবে ছাপ্পান্ন কোটি। আমরা কি আগামী পনের বছরের মধ্যে বর্তমান লোকসংখ্যার খাদ্যসমস্যার সমাধান ঘটিয়ে আরও বারো কোটি নতুন লোকের খাদ্যের ব্যবস্থা করে উঠতে পারব? এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, তখন বর্তমানের উদ্বৃত্ত দেশগুলির পক্ষেও আর খাদ্য যোগানো সম্ভব হবে না। কারণ, তাদের লোকসংখ্যাও সেদিন অনেক হয়ে যাবে। [illegible] যদি আমরা আসন্ন বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাবলম্বন না করি তবে কঠিন মূল্য দিয়েই আমাদের সে আহাম্মকির খেসারত দিতে হবে।

তা ছাড়া ভ্রূণকে জীব বলে ভাবাটাই ভুল। জীব অনন্যনির্ভর, ভ্রূণ যা নয়। শুধুমাত্র এই কারণেই ভ্রূণ বিনাশ জীব হত্যা নয়। জন্মনিরোধক যেসব ওষুধ ও সরঞ্জাম ব্যবহৃত হয় তা প্রতিনিয়ত লক্ষ লক্ষ জীবকোষ বিনষ্ট করে, ঐ জীবকোষের সঙ্গে ভ্রূণের প্রাথমিক অবস্থার পার্থক্য অতি সামান্য। সুতরাং জন্মনিরোধ যদি নির্দোষ হয় তবে ভ্রূণবিলোপও দোষের নয়। ক্যাথলিকরা প্রতিটি শুক্রকীটকেও প্রাণ বলে মনে করেন এবং এই কারণেই তাঁরা জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরোধী। কিন্তু বাস্তব অবস্থার ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে পারলে ঐসব সূক্ষ্ম বিচার-বিবেচনা অর্থহীন ও ক্ষতিকর বলে মনে হবে।

লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। মুহূর্তের ভুলে, প্রলোভনে পড়ে অনেক সময় অনেক মেয়ে যে বিপদে পড়ে তারও একটা আইন-সঙ্গত প্রতিকারের পথ থাকা দরকার। অনেক সময় অনেক হতভাগিনী ধর্ষিতা হয়েও চরম বিপদে পড়ে। আর ঐসব বিপন্ন অবস্থার সুযোগ নেয় অর্থলোলুপ চিকিৎসক ও অজ্ঞ হাতুড়ের দল। তা ছাড়া, যেকথা নিউ ইয়র্কের চিকিৎসকরা বলেছেন, গোপনে অতি দ্রুত ঐসব বেআইনী কাজ নিষ্পন্ন হয় বলে আধুনিক চিকিৎসা-ব্যবস্থার সুযোগ সবক্ষেত্রে নেওয়া সম্ভব হয় না। তার জন্য অনেক নারীর জীবনান্ত হয়, অনেককে সারা জীবন নানা রোগে ভুগতে হয়।

আইনকারদের এটা বোঝা দরকার যে, মাতৃত্ব যেক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নারীর অভিভাবকরা যেমন করে হোক তার অবসান ঘটান। তার জন্য তাঁরা হাজার হাজার টাকা ব্যয় করেন, জেলখাটার ঝুঁকি নেন, এবং বহুক্ষেত্রে অসহায় মেয়েটির মৃত্যুর কারণও হন। একমাত্র গর্ভবিনষ্টি আইনসিদ্ধ করেই এই অবাঞ্ছিত অবস্থার অবসান ঘটানো যায়। এতে ব্যভিচার বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক, গর্ভবিনষ্টি আইনসঙ্গত হ'লেও অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব লজ্জার বিষয়ই থেকে যাবে।

আইওয়ান ব্লচ গর্ভবিনষ্টির সমর্থনে বলেছেন, বর্তমান রাষ্ট্র শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে তার জীবনকে পবিত্র [illegible] করে এবং কেউ তার আগমন প্রতিরোধে তৎপর

হ'লে তাকে শাস্তি দেয়। অথচ সেই শিশুই ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সারাজীবন ধরে শোনে যে, সে জারজ, অসম্মানিত জীব। পিতার সম্পদ, এমনকি পদবীর উপরেও তার অধিকার রাষ্ট্র স্বীকার করে না। এই অসঙ্গতি হৃদয়হীন, অমার্জনীয়। যে প্রস্ফুটন অবাঞ্ছিত, অঙ্কুরে বিনাশই তার সঙ্গত পরিসমাপ্তি।

—*—

'নূতন জেলা-শহর বারাসত নূতন নয়'

শ্রীকিরণচন্দ্র ঘোষাল

বারাসত নূতন জেলার নূতন প্রধান শহর হচ্ছে। হালে জংশন ষ্টেশন হয়েছে। রেলগাড়ির বৈদ্যুতিকরণও হয়ে গিয়েছে। সরকারী প্রথম শ্রেণীর কলেজ, ষ্টেট ব্যাঙ্ক, সিনেমা, ছেলেমেয়েদের অনেকগুলো স্কুল, ঘরে ঘরে, রাস্তায় ঘাটে বৈদ্যুতিক আলো, প্রতি পাঁচ মিনিটে কলিকাতা-গামী বাস, আবার বসিরহাট, বনগাঁ, বারাকপুর, কল্যাণী প্রভৃতি স্থানে যাবার পীচের রাস্তা আর ঘন ঘন বাস। —তাই আমরা দেখতে পাই প্রতিদিন অগুন্তি পুরুষ ও মহিলারা ভিড় জমাচ্ছেন প্রতিটি বাড়ীতে। সকলের মুখে এক কথা—"ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই—"

আজ শুনছি, বারাসতে আকর্ষণীয় জায়গাগুলোতে পাঁচ হাজারেও এক কাঠা জমি পাওয়া শক্ত হয়েছে। বিশ বৎসর পূর্ব্বেও কিন্তু এই বারাসতে পাঁচ হাজারে এক বিঘা জমি কিনতেও মানুষ ইতস্ততঃ করেছে। তখন অবিশ্যি বৈদ্যুতিক আলো ছিল না—পীচের রাস্তাও ছিল না, আর ছিল না রাস্তার দু'ধারে সারি সারি দোকানে আলোর ঝলমলানি। রাস্তায় চলতে কনুই-এ কনুই-এ গুঁতোগুঁতিও হ'ত না। এমন কি, আজ যেটা শহরের কেন্দ্রস্থল অর্থাৎ কোর্ট-কাছারি পাড়া, সন্ধ্যার পর্ব্ব থেকেই সেখানে শেয়াল ডাকত। বিশেষ করে শীতের আর বর্ষার সন্ধ্যার পরে তখনকার জনবিরল রাস্তায় চলতে অনেকেরই গা ছম্ ছম্ করত। তখন বারাসত ছিল গ্রামীণ শোভায় সমুজ্জ্বল। তবু বলব, বারাসত নূতন শহর নয়। বারাসত প্রাচীন শহর—প্রাচীন তার মিউনিসিপ্যালিটি। এই অতীত দিনের বারাসত পরিক্রমায় আনন্দ আছে বই কি!

একজন পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী গল্প করছিলেন। বেশীদিনের কথা নয়—হয়ত বিশ বছরও হয় নি। বসিরহাট থেকে ফিরতি পথে বন্ধু বারাসতের মহকুমা শাসকের বাংলোয় ঢুঁ মেরে এক কাপ চা খেয়ে গলাটা একটু ভিজিয়ে যাবেন। দেগঙ্গায় এসে সূর্য্য ডুবেছে—সেখান থেকে মার্টিন কোম্পানীর রেলগাড়িতে এক ঘণ্টার পথ। বারাসত ষ্টেশনে নেমেছেন। যান-বাহনের বালাই নাই। খানিকটা রাত হয়েছে, টিপ্ টিপ্ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে—অল্প অল্প ঝোড়ো হাওয়া। রাত্রির অন্ধকারে কে চিনিয়ে দেবে মহকুমা-শাসকের বাড়ী? চাঁপাডালীর মোড়ের খানিকটা আগে বাঁ দিকে রাস্তা শুনেছিলেন ভদ্রলোক। কোথাও আলোর চিহ্নমাত্র নেই। ঐ বাঁ দিকের ছোট রাস্তাটার দিকে থেকে থেকে শেয়ালের ডাক শোনা যাচ্ছে। সঙ্গে টর্চ্চও নেই। ঝাউ গাছের শোঁ শোঁ শব্দ—সামনে দিয়ে কি যেন একটা জানোয়ার ছুটে গেল—কর্কশ কণ্ঠে কি একটা পাখী ডেকে উঠল। ভদ্রলোক না পারেন এগুতে, না পারেন পিছুতে। দেশলাই-এর বাক্সটা প্রায় শেষ হ'ল। কিন্তু কয়েক গজ মাত্র এগিয়ে আর কিছু দেখতে পাচ্ছেন না—শুধু সরু একটা কাঁচাপাকা রাস্তা—দুই পাশে ঘন কালো বন। গলা ভিজাতে এসে, ভয়ে না হলেও, ভরসার অভাবে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন কেশে উঠ্ল। ভদ্রলোক চম্‌কে উঠলেন! অন্ধকারে দেখা যায় না এমন একটা লোক, পরনে একটা কালো হাফপ্যাণ্ট—হাতে দিশী একটা লণ্ঠন। লণ্ঠনটির দুই দিকে কাঁচের বালাই নেই—খবরের কাগজ লাগানো, আর দুই দিকে কাঁচ আছে, তবে তার অর্দ্ধেকটার বেশী কালি মাখান—ভিতরে মিট্ মিট্ ক'রে একটি কেরোসিনের লম্প জ্বলছে। হাকিমের মতন পোশাক দেখেই লোকটি বিনীতভাবে

একটি সেলাম ঠুকে নিজের পরিচয় দিল। সে সাহেবের বাড়ীর জমাদার—নাম হরি।

পা টিপে টিপে খানিকটা এগুতেই মস্ত বড় লম্বা কালোমত যে বস্তুটি রাস্তার এক পাশ থেকে অপর পাশে তির্য্যক গতিতে চ'লে গেল, তা দেখে মনে সন্দেহ রইল না যে, হরি দয়াময়—নতুবা হরি এল কেন সেখানে লণ্ঠন নিয়ে।

বিরাট প্রাসাদোপম বাড়ী। নীচের তলা নির্জ্জন—শুধু একটি কোণের ঘরের বাসিন্দা হরি আর তার স্ত্রীর ভাই মতি।

"ছোটবেলার স্কুলের বন্ধু, সুতরাং রাত্রিতে ছাড়া পেলেন না। ছাড়া না পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বেঁচে গেলেন—বাব্বা, আবার ঐ অন্ধকারে!

বৃষ্টি তখন থেমে গিয়েছে, পঞ্চমীর চাঁদ ঢলে পড়েছে। বিরাট বাড়ী, দক্ষিণ-পশ্চিমে ঘেরা প্রশস্ত বারান্দায় মস্ত মস্ত নবাব-বাদশাদের বাড়ীর মতন পিলার। পিলারের কার্ণিসে পায়রা-দম্পতীদের পাখার ঝট-পটানি। যেখানে দুশো লোকের শয্যা রচনা চলে সেখানে একপাশে একটি ক্যাম্প-খাটের উপর তিনি শুয়েছেন। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। হ্যাঁ, হঠাৎই বই কি। পাশের ঘর থেকে ভেসে আসছে নাচের শব্দ! অনেকক্ষণ কান পেতে রইলেন তিনি। বাইরে আধ-আলো, আধ-ছায়ায় দাঁড়িয়ে কৃষ্ণচূড়া, মেহগিনি, মহুয়া, ঝাউ গাছের সারি—যেন দত্যিরা সব দাঁড়িয়ে আছে। ভদ্রলোকটি পায়ের কাছে পড়ে-থাকা চাদরখানাকে ভাল ক'রে টেনে নিলেন।

পরদিন বন্ধু-পত্নীর কাছে তিনি এ-বাড়ীর পুরণো ইতিহাস শুনলেন। তিনি বললেন—

তখন প্রবল প্রতাপান্বিত ব্রিটিশ-ভারতের প্রথম গভর্ণর-জেনারেল স্যার ওয়ারেন হেষ্টিংস। অষ্টাদশ শতাব্দীর সাতের কোঠায় একবার বিলেত থেকে ভারতে ফেরবার পথে জাহাজে তিনি জ্বরে পড়লেন। মিসেস মরিয়ম আসছিলেন একই জাহাজে তাঁর স্বামীর সঙ্গে। স্বামী সুস্থ ছিলেন—সেবার প্রয়োজন ছিল কম। পথে-পাওয়া আকাশচুম্বী বিরাট মর্য্যাদাসম্পন্ন বন্ধু লাটবাহাদুর হ'লেন শয্যাশায়ী। বড়লোকের কাণ্ডই আলাদা, কোন কিছুতেই অল্পে সন্তুষ্ট হন না। ভুগলেন বেশ কিছুদিন। মহিলা-বন্ধুর কাছ থেকে সেবাও পেলেন প্রচুর। সেবার ত্রুটি ছিল না—সুতরাং কৃতজ্ঞতারও ত্রুটি হ'ল না। ভারতে ফিরে এসে বন্ধুত্ব হ'ল গভীর ভারত মহাসাগরের মত। স্বামী বেচারি একা ফিরে গেলেন দেশে।

বিশ্রাম নিতে এসে জায়গাটি তাঁর ভাল লাগল। রাজধানীর অদূরে—মাত্র সাত ক্রোশ দূর, পছন্দ হ'ল এই বারাসত। বারাসত কথাটি উর্দ্দু শব্দ। অর্থ হচ্ছে প্রশস্ত পথ। বারাসতের উপর দিয়ে—অতি প্রাচীন আমল থেকেই ছিল যশোহর আর বসিরহাট, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে যাবার প্রশস্ত রাস্তা। রাস্তার উভয় পার্শ্বে বিশাল বিটপী-শ্রেণী। এই রাজপথের সমৃদ্ধি থেকেই এই শহরটি নাম পেয়েছিল বারাসত।

এই বারাসতে নেওয়া হ'ল দেড়শত বিঘা জমি। খনন করা হ'ল সাত-সাতটি সরোবর। আর নির্ম্মিত হ'ল বিরাট এক প্রাসাদ। সব ঘরের মেঝে পাকা হ'লেও, নাচ-ঘরের মেঝে হ'ল কাঠের। চল্লিশ ইঞ্চি পুরু দেয়াল, দশফুট উঁচু দরজা—কি কাঠের তৈরি জানা নেই। কিন্তু দুশো বছর পরে আজও মনে হয় যেন সাদা পাথরের তৈরি—যেমন ভারী তেমনি মজবুত।

মরিয়ম বিবি এখানেই রয়ে গেলেন। প্রতীক্ষারতা মরিয়ম—লাটবাহাদুর আর তাঁর বন্ধুরা আসতেন প্রকাণ্ড জুড়ি গাড়ি ক'রে লটবহর নিয়ে সপ্তাহ-শেষের ছুটির দিন উপভোগ করতে। কত বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা 'রাজা বাহাদুর' খেতাব লাভ করেছেন, আর পরগণার পর পরগণার' মালিক হয়েছেন—এই সপ্তাহ-শেষের মধুর দিনগুলোর খুশির খোরাক জুগিয়ে। সাগর পারে বার্ক সাহেবের বিখ্যাত অভিযোগে এই সব কত কিছু কীর্ত্তি-কলাপ ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে রয়েছে। কিংবদন্তী আছে, এই ঐতিহাসিক স্বপ্নপুরী থেকে মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসীর হুকুম দিয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন সুপ্রীম কোর্টের তদানীন্তন যে জজসাহেব, সেই স্যার ইলাইজা ইম্পের বাড়ী এরই সন্নিকটে—যেখানে বর্ত্তমানে মহকুমা শাসকের আদালত। এই বাড়ী পর্য্যন্ত একটা সুড়ঙ্গ পথ ছিল বিবি-সাহেবাদের নাচের পোষাকে যাতায়াতের জন্য।

কেবল বন্ধু-পত্নী নয়, অনেকের মুখ থেকেই শোনা গল্প। ইতিহাস ব'লে কেউ ভুল করবেন না।

অনেকে বলে থাকেন, মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির হুকুমের পরে মহারাজকে নির্জ্জন বাসে রাখা হয়েছিল এই মহকুমা-শাসকের বাড়ীর নীচের তলায় একটি ঘরে—যেখানে আজ ইলেক্‌সন অফিস। আবার একথাও প্রচলিত আছে যে, টিপু সুলতানের ছেলেকেও নাকি ঐ ঘরেই রাখা হয়েছিল। প্রাচীনরা বলেন, আজও নিশুতি-রাতে ঐ ঘর থেকে দীর্ঘ নিঃশ্বাসের শব্দ পাওয়া যায়।

সেদিন কি ছিল, আজ কি হয়েছে বলতে গেলেই অনেক কথা এসে পড়ে। লাট বাহাদুরের সখ ছিল।

আজ যেখানে নেতাজী পার্ক হয়েছে—সেই হাতী পুকুরের মাঝখানে আছে ছোট একটি দ্বীপ—পারের সঙ্গে সেতু দিয়ে যুক্ত। সেই দ্বীপটির চূড়ায় একটি নিভৃত কুঞ্জ আছে। লাটসাহেব এখানে বিশ্রম্ভালাপ করতেন।

হেষ্টিংস সাহেবের অবসরবিনোদের এই প্রশস্ত বারান্দা দেখে, আজ মনে করতে ভাল লাগছে—একদা সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্র এই প্রশস্ত বারান্দায় আলবোলা হাতে আরাম-কেদারায় বসে বই লিখে গিয়েছেন। কি বই লিখেছিলেন জানি না, কিন্তু এই বারাসতে তিনি হাকিম হয়ে এসেছিলেন দু'বার। একবার ১৮৭৪ সালে, আর বার ১৮৮২ সালে। লিখবার মত জায়গা বটে! চতুর্দিকে সবুজের সমারোহ, কত রকমের গাছ, কত বিচিত্র বর্ণের পাখী—একটা ভাব-গম্ভীর নিস্তব্ধতা!

বারাসতের আর একখানা কোম্পানী আমলের বাড়ী—বারাসতের জেলখানা। এ বাড়ীখানা ছিল বড়-লাট বাহাদুরের কাউন্সিলর ভ্যান্সিটার্ট সাহেবের সপ্তাহ-শেষের দিনে অবসর উপভোগের আসর। একেই বলে বিধাতার পরিহাস! যে প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়েছিল রাজকার্যে হাঁপিয়ে-ওঠা অবরুদ্ধ-মনের অর্গলমুক্ত স্বাধীন বিচরণের জন্য, আজ সেই প্রাসাদই পরিণত হয়েছে শতাধিক মানুষকে তাদের দেহ-মন শুদ্ধ আবদ্ধ ক'রে রাখার প্রাচীর-ঘেরা পিঞ্জরে। লৌহ কপাটের অন্তরালে গুম্‌রে মরছে অপরাধের ছাপমারা সব মানুষ। মস্তবড় তেতালা বাড়ী, আর তার চারদিকে বিস্তীর্ণ জমি—এই বারাসতের জেলের অধিবাসীদের তৈরি সব শাকসব্জী গাড়ি বোঝাই হয়ে যাচ্ছে দমদম আর আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে।

জেলখানার উল্টোদিকে বারাসত সরকারী উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয় আর রাষ্ট্রীয় মহাবিদ্যালয়। মহা-বিদ্যালয়টি হাল আমলের, কিন্তু উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়টি বহু পুরাতন। প্রতি জেলা শহরে একটি সরকারী জেলা স্কুল ছিল। বারাসত সরকারী স্কুলটি তার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

বারাসত শহর যে নূতন জেলার শহর হচ্ছে তা নয়। ১৮৬০ সাল পর্য্যন্ত বারাসত জেলার প্রধান শহর ছিল, এবং সাতক্ষীরা মহকুমা—যা আজ পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত, যেখানে বিনা ছাড়পত্রে গেলে আজ অপরাধ হয়। সেই সাতক্ষীরাও ছিল বারাসত জেলার অন্তর্ভুক্ত।

১৮৪৬ সাল। যাদের চুল পেকেছে এবং তাদের অনেকের বাবাদের কাছেও সুপরিচিত প্যারীচরণের ফার্ষ্ট বুক। সেই প্যারীচরণ সরকার ছিলেন তখন বারাসত সরকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক। ঐ সময়ে কালীকৃষ্ণ মিত্র প্রভৃতি চিরস্মরণীয় যে সব মনীষীরা বারাসতে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন—প্যারীচরণ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। এই বালিকা বিদ্যালয়টি প্রথম আরম্ভ হয়েছিল মাত্র তিনটি বালিকা নিয়ে। যে তিনটি বালিকার অভিভাবকরা তাদের মেয়েকে স্কুলে পাঠিয়েছিলেন, তখনকার গোঁড়া সমাজপতিরা সাহেবিয়ানার অপরাধে তাদের নিপীড়নের ত্রুটি করেন নি। আজ সেই বারাসতে তিন তিনটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আর ডজন খানেক বুনিয়াদি আর প্রাথমিক বিদ্যালয় বারাসত শহরের কয়েক সহস্র মেয়েদের স্থান দিয়েও বহু মেয়েকে বিমুখ করতে বাধ্য হচ্ছে।

বারাসতবাসী গৌরবের সঙ্গে দাবী করবে স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে বারাসতের প্রাচীনত্ব। বাংলার রাজধানী কলিকাতা মহানগরীর বিখ্যাত বেথুন স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা জন-ড্রিঙ্ক-ওয়াটার বেথুন সাহেব উক্ত স্কুলের প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে তদানীন্তন বড়লাট বাহাদুরের নিকট যে পত্র দিয়েছিলেন, সেই পত্রে উল্লেখ আছে বারাসত মহকুমার তিনটি বালিকা বিদ্যালয়ের—যথা বারাসত বালিকা বিদ্যালয়, নিবাধই (দত্তপুকুর) বালিকা বিদ্যালয় এবং ছোট-জাগুলিয়া বালিকা বিদ্যালয়। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং বেথুন সাহেব বারাসত এসে দেখে গিয়েছিলেন বারাসতের বালিকা বিদ্যালয়। বেথুন স্কুলের পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত বারাসতে স্ত্রী-শিক্ষার উদ্যোক্তাগণকে জানাই আজ প্রণাম।

কোম্পানীর আমলে এবং তারপরে বারাসত বহু বিষয়ে যে প্রাধান্য লাভ করেছিল তা যে কোন মফঃস্বল শহরের পক্ষে শ্লাঘার বিষয়। কোম্পানীর আমলে যে-সব ইংরাজ যুবক সৈন্য বিভাগে যোগ দেবার জন্য আসত, তাদের শিক্ষার কেন্দ্র ছিল এই বারাসত—এক কথায় বলা চলে যে, বারাসত ছিল তখনকার স্যাণ্ডহার্ষ্ট।

বারাসতের চৌধুরীপাড়া আর দক্ষিণ পাড়ায় ছিল জমিদার আর সব বনিয়াদী পরিবারের বাস। বহু পুরাণো বাড়ীর পুরাণো আমলের পাতলা ইট তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। শহরের উত্তর-পূর্ব্বাংশে কাজীপাড়ায় ছিল বহু খানদানী মুসলমান-পরিবারের বাড়ী। কাজীপাড়ার পীরসাহেবের দরগা বহু পুরাতন। পীরসাহেবের এখানে শুভাগমন ও সমাধির ইতিহাস আছে। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সম্মানভাজন ছিলেন পীর একদিল শাহ্ সাহেব। প্রতি বৎসর পীরসাহেবের মেলা তার সাক্ষ্য বহন ক'রে চলেছে। দাদুরা তাঁদের নাতি-নাতনীদের হাত ধরে মেলায় ঘুরে বেড়ান, খেলনা

কিনে দেন আর তার ফাঁকে ফাঁকে বলে চলেন পীর-সাহেবের পুণ্য কাহিনী।

আর আছে রথতলায় রথের মেলা। কতদিনের এই রথের মেলা—কতকাল ধ'রে চ'লে আসছে এই রথের মেলায় বন-মহোৎসবের মহড়া, তার হিসেব কেউ জানে না।

শহরের মাঝখানে শেঠ পুকুরটি কোন্ শেঠজী করেছিলেন জানি না। তবু শেঠ পুকুর আজও এক অজানা শেঠজীর স্মৃতির ভার বহন করছে। যেখানে স্নান ক'রে আজ কত নর-নারী প্রতিদিন পাশের রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ মন্দিরে প্রণাম জানাচ্ছে।

যেখানে আমরা মনোরম রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রম দেখতে পাচ্ছি, আজ থেকে এক শতাব্দী পূর্ব্বে ঐখানটায় ছিল পুণ্যশ্লোকা রাণী রাসমণির জমিদারীর কাছারি বাড়ী। ঐ কাছারি বাড়ীতেই বাস করতেন সপরিবারে রাণী রাসমণির আম-মোক্তার রামকানাই ঘোষাল মহাশয়। সাধক রামকানাই-এর পুত্র তারকনাথ আমাদের বারাসতের গৌরব, ভগবান পরমহংসদেবের অন্যতম পার্ষৎ স্বামী শিবানন্দ—যাঁকে স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, 'মহাপুরুষ মহারাজ'। এই মহাপুরুষ মহারাজের জন্মধন্য বারাসতের ধূলিকণা আজ মহানগরীর প্রাসাদ-বাসীদেরও টেনে আনছে বারাসতে আশ্রমের আঙিনায়।

—•—

কলা-শিক্ষাবিষয়ক পত্রাবলী

অধ্যাপক অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

(Introductory Note)

বহু বৎসর পূর্ব্বে, বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠার কিছু পরেই, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ে, ভারতীয় কলা-শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য "কলা-ভবন" প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহার প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন ৺অসিতকুমার হালদার। তাঁহার পরে, অনেক বৎসর অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করেন ডাঃ নন্দলাল বসু। "কলাভবনে" নন্দলালকে সাহায্য করিয়াছেন একাধিক প্রতিভাধর অধ্যাপক। তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইলেন কুমার ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মা। কলা-ভবনে ভারতীয় কলার মূল সূত্রের শিক্ষালাভ করিয়া, ডিপ্লোমা বা মানপত্র লইয়া দেশী-বিদেশী অনেক শিল্পী নিজস্ব সাধনার পথে যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য হইলেন, শ্রীযুক্ত ভি. এস. মাশোঙ্কী, শ্রীরামকিঙ্কর বৈজ, শ্রীকৃষ্ণপাল সিং, ৺রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীইন্দ্রকুমার দুগার প্রভৃতি। কলাভবনের শিক্ষা-পদ্ধতি অত্যন্ত কার্য্যকরী প্রশংসনীয় পদ্ধতি। যাঁহার মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভারতীয় কলার ভিত্তিগত বৈশিষ্ট্যে, শিক্ষার্থী বিশেষ শিক্ষালাভ করেন অথচ শিক্ষার্থী তাঁহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারান না। মধ্যে মধ্যে কলাভবনের শিক্ষার্থীরা অভিনব পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন। তাহার কিছু পরিচয় নিম্নে উদ্ধৃত পত্রাবলীতে পাওয়া যাইবে।

কুমার ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মণ
'কলাভবন', বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন

বৃহস্পতিবার
১১।২।৬৫

স্নেহাস্পদেষু,

সম্প্রতি শান্তিনিকেতনের কলাভবনের ছাত্র একজন জাপানী শিল্পী, নাম মিৎসুরু হিরাণা কলিকাতায় তাঁহার ছবির প্রদর্শনী করিয়া গেলেন। তিনি আমায় বলিলেন, তিনি Tokyo Art School-এ শিক্ষিত এবং কলাভবনের তিন জন আর্টের অধ্যাপকের নিকট ভারতীয় চিত্রকলা শিক্ষা করিতেছেন—এই তিন জন অধ্যাপক কে কে? তুমি, ও আর তিন জন কলাভবনের অধ্যাপক কি তাঁহার কলিকাতায় প্রদর্শিত চিত্রগুলি দেখিয়াছেন? যদি না দেখিয়া থাকেন তবে অবিলম্বে সেগুলি দেখা উচিত। চিত্রগুলি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

এই চিত্রগুলি দেখিয়া তোমার মন্তব্য ও মতামত শীঘ্র আমাকে লিখিয়া পাঠাইবে। আমার "আত্মজীবনী" বাংলা সাপ্তাহিক "অমৃতে" ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতেছে, পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

ভবদীয়
শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতন
পশ্চিম বাংলা
১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৫

শ্রদ্ধাস্পদেষু

বহুদিন পরে আপনার ১১ই ফেব্রুয়ারী লিখিত পত্র যথাসময়ে পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। জাপানী শিল্পী ও কলাভবনের ছাত্র মিৎসুরু হিরাণোর ছবির প্রদর্শনী দেখেছেন বলে মনে হচ্ছে। হিরাণোর ছবির বিষয়ে আপনি আমার মতামত জানতে চেয়েছেন। ভেবেছিলাম আপনার বিজ্ঞ অভিমত চিঠিতে জানতে পারব, কিন্তু আপনি এ বিষয়ে কিছুই উচ্চবাচ্চ করেন নাই। হিরাণোর যে ছবিগুলি প্রদর্শিত হল তার সম্বন্ধে আপনাদের সে কি বলেছে জানি না, তবে এ বিষয়ে একটা পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। কলাভবনে সে যে ছবি আঁকা শেখে তার সঙ্গে এই ছবিগুলির কোন সম্বন্ধ নেই। অবসর সময়ে তার নিজের রুমে বসে বসে এই চিত্রগুলি সে এঁকেছে, এইগুলি তার সম্পূর্ণ নিজস্ব ভাবনার রূপ। হিরাণোর প্রদর্শনীর বিষয়ে Statesman-এ ও দেশ পত্রিকায় সমালোচনা দেখলাম।

চিত্রে, সঙ্গীতে, সাহিত্যে সৃষ্টির কাজ যেখানে চলছে সেখানে নূতনের প্রতি, বৈচিত্রের প্রতি একটা স্বাভাবিক ঝোঁক রয়েছে, যদি এ না থাকতো তার সৃষ্টির কাজ হত না কিন্তু কেবল পুনরাবৃত্তি হত। নূতনের সন্ধানই হচ্ছে সৃষ্টির উৎস। শিল্পের ইতিহাস তাই প্রমাণ করছে। আমরা যদি শিল্পের ইতিহাস আলোচনা করি তবে দেখতে পাব বর্ত্তমান যুগের শিল্প হচ্ছে অত্যন্ত Individual Art. একজন শিল্পীর কাজের মধ্যে শিল্পীর নিজস্ব রূপটির রঙ থাকা চাই অথবা এই ভাবেও বলতে পারি তার শিল্পের যে subject সেটা প্রধান নয়, সেটা অবলম্বন মাত্র কিন্তু শিল্পীর যথার্থ রূপটিই প্রকাশ পাওয়া চাই। আমি কতকগুলি আর্টকে সাধারণত Illustrative Art বলি, সেখানে সর্ব্বদা subjectকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। Early Christian Art—সেখানে মেডোনা, খ্রীষ্টই প্রধান কিন্তু শিল্পী তাঁর skill কম-বেশী দেখাবার সুযোগ পেয়েছে এক একজন শিল্পী তাঁদের প্রতিভার তারতম্যে। শিল্পীর যথার্থ রূপটি সেখানে প্রধান নয়। রেণাসাস্ যুগেও তাই, তার পর ধীরে ধীরে বহু প্রকার ইজমের কোঠা পার হয়ে এসে এখন শিল্পীরা যেন বলছে এত দিন ত ধর্ম্ম, সম্রাট, যুদ্ধ, বীরের বা অন্যান্য প্রধান ব্যক্তি বা ঘটনাকেই রূপ দিলাম, কিন্তু আমার ভেতরে যে রূপটি কেবলমাত্র আমারই তাকে কিন্তু ফোটান হল না। ভারতীয় শিল্পেও তাই অজন্তায়—বুদ্ধ, রাজপুত চিত্রে—কৃষ্ণরাধা, মানুষের প্রেম ইত্যাদি, মুঘলে—সম্রাট বেগম এই সব চিত্রই Illustrative motive নিয়ে আঁকা। বর্ত্তমান শিল্পে বলছে পূর্ব্বে যে অবলম্বনকে আশ্রয় করে (subject) চিত্র আঁকা হয়েছে, তা আর নয়; এখন শিল্পীর ভাবনা, নিজের রূপটির পরিচয় দিতে হবে। প্রকৃতিকে দেখছি কিন্তু সে যখন canvas-এ প্রকাশ পাবে তখন শিল্পীর নিজস্ব রূপের সংস্পর্শে Abstraction আকার পাবে। সেখানেই শিল্পীর রঙের ছোঁয়া পেল। ভাল রাঁধুনি যখন আলু, কপি, বেগুন সবকে একত্রে রেঁধে পাতে পরিবেশন করল তখন স্বাদে বুঝা যায় কোন্‌টি আলু, কোন্‌টি কপি বলে অথচ তাদের পরিচয় রান্নার ধরনে—যেমন ডালনা, কারি ইত্যাদিরূপে। এই যে তরকারির অর্থাৎ আলু-কপির নিজস্ব রূপের খানিকটা বিলোপ, এই বিলোপই হয় শিল্পীর রঙের (colour বা রূপের) সংস্পর্শে। তবে এই Abstraction-এর সীমা কতদূর যাবে এটাই প্রশ্ন। হিরাণোর চিত্রে কতগুলি রঙ ক্যানভাসে ছড়ান, এতে চিত্র বলা চলে কি না জানি না। একটি পিয়ানোতে যেখান-সেখান থেকে সুরের কতগুলি আঘাত [illegible] কি না জানি না। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করব। আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করবেন। ইতি—

বিনীত
ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মণ

পুন: হিরাণোর চিত্র দেখে আপনার মনে যে চিন্তার (Reaction) উদয় হয়েছে তা আমাকে জানাবেন। আমি পরে ভাল ভাবে আমার মতামত জানাব। ইতি—
ধীরেন

কুমার ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মা
অধ্যাপক : কলাভবন শুক্রবার ১৯।২।৬৫

পরম স্নেহাস্পদেষু
কুমার বাহাদুর,

তোমার ১৭ই ফেব্রুয়ারীর পত্র পড়িয়া অত্যন্ত সুখী ও আনন্দিত হইয়াছি।

মিৎসুরু হিরাণো আমাকে বলেছিলেন যে তিনি কলাভবনের তিনজন অধ্যাপকের নিকট ভারতীয় চিত্র-শিল্প শিক্ষা করেছেন। আমার মনে একটা প্রশ্ন জেগেছে—তিনি যে চিত্রগুলি কলিকাতার প্রদর্শনীতে দেখিয়ে গেলেন, সেগুলি তাঁহার কলাভবনের অধ্যাপকদের কি দেখিয়েছিলেন? এখানে সেগুলি দেখাবার আগে, বিশ্বভারতীতে প্রদর্শনী করে, দেখান নাই কেন? এই প্রশ্নের উত্তর পেলে আমাদের অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

তিনি যে ছবিগুলি কলিকাতায় দেখিয়ে গেলেন—তাহার মধ্যে কি জাপানী, কি ভারতীয় চিত্র-রীতির কোনও আদর্শ বা সূত্রের (element) বা ধারার (tradition) কোনও চিহ্নই বিদ্যমান নাই। অর্থাৎ, তিনি এই দুই রীতির কলা-শিল্পকেই পদদলিত করে এক নূতন রীতির উদ্ভাবন করেছেন। ইহা খুবই আনন্দের ও গর্ব্বের কথা। কারণ রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর শিক্ষা-পদ্ধতি কোনও শিক্ষার্থীর স্বাধীন চিন্তার বাধা সৃষ্টি করিতে পারে না। সুতরাং, আমি আশা করিয়াছিলাম যে হিরাণোর চিত্রাবলীতে একটি নূতন স্বাধীন রীতির পরিচয় পাইব।

ইহার দৃষ্টান্ত আছে আকবর বাদশাহার চিত্রশালায় নূতন রীতির উদ্ভাবনে। বাদশাহ ২।৩ জন পারসীক

ওস্তাদদের এদেশে এনে, প্রায় ১২০ জন ভারতীয় চিত্রশিল্পীকে শিক্ষার ও সাধনায় নিযুক্ত করেছিলেন। বাদশাহার দরবারী চিত্রকরগণ যে রীতির উদ্ভাবন করিলেন—তাহা পারসীক রীতির পুনরুক্তি নহে, ভারতীয় রীতিরও পুনরুক্তি নহে,—পরন্তু এক নূতন রীতির সৃষ্টি, যাহার নাম "মুঘল-রীতি"।

হিরাণোর চিত্র সমীক্ষণ করিয়া দেখিলাম—তিনি স্বাধীনতার পথে, কোনও নূতন রীতির উদ্ভাবনা করিতে পারেন নাই,—তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা য়ুরোপের Ism-বাদী কলাশিল্পের অন্ধ অনুকরণ। কলা-সৃষ্টির পথে তিনি স্বাধীনতা লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার অনেক চিত্রই "চিত্র" নামের যোগ্য নহে। তুমিই লিখিয়াছ যে, "হিরাণোর চিত্রে কতকগুলি রঙ ক্যান্‌ভাসে ছড়ান—একে ছবি বলা যায় কি না জানি না।" তোমার এই মন্তব্যেই হিরাণোর চিত্র-সৃষ্টির সঠিক মূল্যায়ন ও বিচার হইয়া গিয়াছে।

আর একটা বক্তব্য এই—অবনীন্দ্রনাথ তাঁহার নূতন সৃষ্টিতে ভারতীয় চিত্র-রীতিকে অস্বীকার বা অবমাননা করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্য-রচনায় প্রাচীন বাংলা ভাষাকে বর্জ্জন করিয়া ফরাসী বা জার্ম্মান ভাষায় কাব্য রচনা করেন নাই। বাংলা দেশের বোধগম্য ভাষায় কাব্য রচনা করিয়াছেন।

হিরাণো—জাপানী চিত্রের ভাষা এবং ভারতীয় চিত্রের ভাষা—এই দুই ভাষাকেই অস্বীকার করিয়া, অপমান করিয়া, য়ুরোপের ফরাসী ও জার্ম্মানীর অতি আধুনিকদের ভাষা অবলম্বন করিয়াছেন। কোনও নূতন ভাষা সৃষ্টি করিতে পারেন নাই এই আমার অভিমত।

আর একটা কথা হইল,—চিত্রকলার ভাষা ভাব-বিনিময়ের ভাষা, ভাব-প্রকাশের ভাষা, এই ভাষা অন্ততঃ অভিজ্ঞ রূপ-রসিকদের বোধগম্য হওয়া উচিত। একটা কথা আছে—Art is communication. হিরাণোর চিত্রাবলীতে কোনও communication নাই। তথাকথিত স্বাধীনতার উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা।

কলাভবনের শিক্ষার ফলে, যদি এই রীতির উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি হয়—তাহা হইলে, কলাভবনের শিক্ষা-পদ্ধতি ঠিক পথে চলিতেছে কি না তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক। হয় কলাভবনের শিক্ষা এখন ভুল পথে চলিতেছে, কিংবা নূতন শিক্ষার্থীরা কলাভবনের শিক্ষার অবমাননা করিতেছেন। তোমার কাছে এই পত্রের উত্তর পাইলে আমি মাননীয় উপাচার্য্য মহাশয়ের নিকটে এই বিষয়ে আমার আবেদন জানাইব। একটা কথা আছে—A tree is known by its fruits—গাছের ফল দেখিয়াই গাছের উৎকর্ষ-অপকর্ষের বিচার করিতে হয়।

জাপানের ঋষি ও সুবিখ্যাত শিল্প-গুরু কাকাসু ওকাকুরার সাবধান বাণী আমি স্মরণ করিতেছি—"Victory from within, or Mighty death from without !"

আশা করি তুমি আমার মন্তব্য স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া, আমার যদি ভুল হইয়া থাকে তাহা দেখাইয়া দিয়া, শীঘ্র এই পত্রের উত্তর দিবে।

তোমার গুণমুগ্ধ
শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতন
পশ্চিম বাংলা,
২১।২।৬৫

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার ১৯শে ফেব্রুয়ারীর চিঠিখানি পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। আপনার বিস্তারিত বক্তব্যে উপলব্ধি করতে পারছি যে, হিরাণোর চিত্র দর্শনে আপনাকে একটু চিন্তিত করেছে। তার প্রধান কারণ সে জাপান থেকে এসেছে বলে—যে জাপান আমাদের নিকট পরিচিত স্বর্গীয় ওকাকুরা, তাইকানসান, আড়াইসানের মাধ্যমে। জাপানের কৃষ্টি আমাদের মনে বিশেষ শ্রদ্ধাসহকারে একটি স্থান দখল করে আছে। ওকাকুরার The Book of Tea, লরেন্স বেনিয়নের The Flight of Dragone ইত্যাদি এবং গুরুদেবের মুখে জাপানের বহু সুখ্যাতি শুনে ঐ দেশের প্রতি বিশেষ একটি উচ্চ ধারণা মনে পোষণ করি। দ্বিতীয় যুদ্ধে জাপান পরাজিত হ'লে younger generation-দের মনে একটা Inferior Complex দেখা

দিয়েছে। এই নবীনের দল জাপানের মহান্ আত্মার উপলব্ধির চেয়ে পশ্চিম, বিশেষ করে আমেরিকার, হাল-ফ্যাশান নকল করবার উৎসাহী। ১৯৫৪ সনে জাপানে গিয়ে আমার এই ধারণা হয়েছে। হিরাণো এই নবীনেরই একজন। জাপানের কৃষ্টি বিষয়ে যখন তাকে জিজ্ঞাসা করি তখন উত্তরে প্রায়ই বলে, জানি না। সেই কারণে হিরাণোর কাজে আমি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করি না। পূর্ব্ব পত্রে আমি লিখেছি যে, কলাভবনে ও যা শেখে তার সঙ্গে প্রদর্শিত চিত্রগুলির কোন সম্বন্ধ নেই, সে ঘরে বসে বসে নিজেই এঁকেছে। আমি তাকে অনেকবার বলেছি কলকাতায় প্রদর্শনী করার পূর্ব্বে কলাভবনে প্রদর্শনী করে আমাদের সকলকে দেখাতে। কিন্তু সে রাজি হয় নি। এতে আমার মনে হয় তার মনে কোনপ্রকার দ্বিধা আছে। হয়ত বা এই শিল্প-সৃষ্টিতে সে sincere নয়, শুধু ফ্যাশানের আবেগে এইগুলি এঁকেছে। Sincere হ'লে সাহসী হ'ত। শিল্পের সৃষ্টিতে জাপানীজ বা ভারতীয় দুই হবে না কিন্তু সম্পূর্ণ নূতন পদ্ধতির সৃষ্টি হবে তার দ্বারা। এটা ওর নিকট আশা করা বৃথা। কারণ সে এখনও ছাত্র, বহু চিত্র তাকে আঁকতে হবে, এবং একটি পদ্ধতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা থাকতে হবে বা বিশ্বাসী হ'তে হবে। যে-কোন পদ্ধতির প্রতি গভীর বিশ্বাসী প্রথমে হওয়া এটাও একটা সাধনা। যে লোক এক পদ্ধতির প্রতি বিশ্বাসী তার পক্ষেই অন্য পদ্ধতির প্রতি যদি আকৃষ্ট হয় তবে তার প্রতি শ্রদ্ধাবান ও বিশ্বাসী হ'তে পারে। কিন্তু যে অবিশ্বাসী সে কি করে যে-কোন পদ্ধতির প্রতি বিশ্বাসী হবে। হাল ফ্যাশানকে নকল করা সহজ। আপনি লিখেছেন হিরাণো কলা-ভবনের শিক্ষাকে অবমাননা করেছে। এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমার এক মত। কে হিসাব নেবে যে ভারতীয় অর্থে সে ভারতীয় চিত্র-শিক্ষা করতে এসে কতদূর ভারত অঙ্কনপদ্ধতি আয়ত্ত করল। আপনি আরও যে সব মত করেছেন তার সঙ্গে আমার দ্বিমত নেই। আমি কতগুলি কথা ভাবি এই বিদেশী scholar-দের সম্বন্ধে তারা কি কি গুণে এই সব বৃত্তি লাভের অধিকারী হয় কে তাদের নির্ব্বাচন করে? আরও কি ভাল মেধাবী ছা পাওয়া যেত না? এই ধরনের বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদে হাতের কাজ নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে তারা যে-সব Art Scho বা College-এ শিক্ষালাভ করবে তাদের কর্তৃপক্ষকে দেখিয়ে একটা মতামত গ্রহণ করা উচিত নয় কি? বৃত্তিধা যে course-এ ভর্ত্তি হ'ল সে course complete করে চলে যেতে পারে কি না? গেলে গবর্ণমেণ্ট কি করে পারেন এই বৃত্তিধারীকে নিয়ে? এই সব সুব্যবস্থা হও প্রয়োজন। আমাদের গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে কত thorough তা জানি না।

আমার পূর্ব্ব পত্রে লিখেছিলাম Modern Art-এ এখন একটি প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে অঙ্কন-বিষয়কে Abstrac-tion পরিণত করা। প্রাচীন ভারতীয় শিল্পী, এমন কি Folk Artist-রাও এই রহস্যের সন্ধান পেয়েছিলেন আহ্লাদী-পুতুল Abstraction-এর একটি প্রতীক হেনরি মুরও Figure-কে Abstraction করেছেন প্রথমটির Abstraction হ'ল feeling-এর থেকে, দ্বিতী Abstraction হ'ল intellectual থেকে। আলপনাও একটি অপূর্ব্ব Abstraction.

অনেকদিন আপনার সঙ্গে দেখা হয় নি। আশা করি শারীরিক কুশলে আছেন। আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করবেন। ইতি—

বিনীত

ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্ম্মা

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাঙ্গালীর সম্মান—

একটি বিশেষ সমাবর্ত্তনে নারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ এবং ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারকে সম্মানিত করা হইয়াছে—এই সংবাদে সুখী হইলাম। সংস্কৃত কলেজে অনুষ্ঠিত এই সমাবর্ত্তনে রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণ উপস্থিত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের একটি কথা মনে হইতেছে যে—এই অনুষ্ঠানে বাঙ্গলার একজন সর্ব্বোচ্চ মনীষী সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়কে উপেক্ষা করা হইয়াছে। ইহা শোভন হয় নাই। আধুনিককালে সংস্কৃত, পালি ও তিব্বতী ভাষায় এবং হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শনশাস্ত্রে সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়ের ন্যায় পণ্ডিত বিরল। বিহার তাঁহাকে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধাররূপে সমাদরের সহিত লইয়া গিয়াছিল। রাষ্ট্রপতি কর্ত্তৃক প্রদত্ত যে সম্মান তিনি লাভ করিয়াছেন তাহার জন্য বিহার সরকার অনুরোধ করিয়াছিল, বাঙ্গলা সরকার নহে। তিনি এখন অবসর গ্রহণ করিয়া বীরভূমে স্বগ্রামে বাস করিতেছেন। রেল ষ্টেশন হইতে আট মাইল দূরে তাঁর বাড়ীতে সিংহল এবং জাপান হইতে বহু গবেষক ছাত্র আসিতেছে। বিহার এবং উত্তরপ্রদেশও ছাত্র পাঠাইতেছে। বাঙ্গলা সরকার এ বিষয়ে উদাসীন থাকা স্বাভাবিক, কারণ তাঁহাদের মধ্যে পাণ্ডিত্যের মর্য্যাদা উপলব্ধি করিবার মত লোকের একান্ত অভাব। আধুনিক বাঙ্গালী জ্ঞান তপস্যা ছাড়িয়াছে। জ্ঞান তপস্যার মর্য্যাদাবোধও হারাইয়াছে, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ গৌরীনাথ শাস্ত্রী ইহা এবার প্রমাণ করিয়া দিলেন।—

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে—বাঙ্গলা-রাজ্য-সরকারকে এই বিষয়ে নিন্দা না করাই ভাল। কারণ এই রাজ্য সরকারের কর্ণধার যাঁহারা তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের মর্য্যাদা উপলব্ধি করিবার মত সময় নাই। দরিদ্র প্রজাবৃন্দের কল্যাণ চিন্তাতেই ইঁহারা অতি বিব্রত এবং ইহার উপরেও আছে দুর্গাপুরের মহা উৎসব, মায়াপুরে মায়ার-খেলা প্রভৃতি বিষম জনকল্যাণমূলক অনুষ্ঠানাদি। তাহা ছাড়া অন্ধের নিকট হইতে আলোর মর্য্যাদা স্বীকার আশা করাটাই একান্ত বুদ্ধিহীনের কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

হিন্দীর জয়যাত্রা—

অহিন্দী এলাকায় হিন্দীর বিরুদ্ধে প্রবল জনমত থাকা সত্ত্বেও দিল্লীর নব-বাদশারা বিবিধ প্রকারে এবং কৌশলে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চালাইবার সুখ-স্বপ্নে বিভোর রহিয়াছেন। হঠাৎ আমাদের চোখে এমন একটি বিষম মনোহর বস্তু পড়িয়াছে—যাহাতে বুঝিতে আর কষ্ট হইতেছে না যে, সত্যই হিন্দীর রাজ-ভাষা হইবার যোগ্যতা অর্জ্জিত হইয়াছে এবং সে-বিকট যোগ্যতার ঠেলা বেচারা ভগবানও অনুভব করিতে বাধ্য হইয়াছেন!

'হিন্দী-পাঠমালা'—পঞ্চম শ্রেণীর একটি পাঠ্য-পুস্তক। এই পাঠ্য-পুস্তকে বিশ্ববিখ্যাত হিন্দী কবির 'ঈশ্বর' নামক একটি কবিতা আছে। কবিতার পঞ্চম স্তবকটি দেখুন!

> হে ঈশ্বর! তু ক্যায়সা হোগা!
> লাড্ডু য্যায়সা পীলা হোগা,
> বরফোঁ সা চমকিলা হোগা।
> খরবুজে সা মোটা হোগা।
> রসগুল্লে সে ছোটা হোগা?
> হে ঈশ্বর! তু ক্যায়সা হোগা?

'হিন্দী পাঠমালা' নামক শিশুপাঠ্য পুস্তকে এই প্রকার ভক্তিমূলক কবিতা অবশ্যই থাকা প্রয়োজন। এই 'ঈশ্বর' নামক হিন্দী কবিতাটিকে কেহ যেন ঈশ্বরকে ভ্যাংচান বলিয়া মনে করিবেন না। কারণ লেখক কবি এবং একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভগবান-ভক্ত! তবে কবিতাটি রচনার কালে—

—কবি বোধ হয় কয়েকটি যথোপযুক্ত এবং সম্ভাব

উপমা অনেক গবেষণা করিয়াই বাহির করিয়া আবিষ্কারের আনন্দে হইয়াছেন আত্মহারা! সুতরাং তাঁর আনন্দের ভাগীদার সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের না করিলে চলিবে কি করিয়া? 'লাড্ডুর' বৈশিষ্ট্য 'মিঠা' নহে—'পীলা'; 'বরফোঁ' ঠাণ্ডা নহে—'চমকিলা'; 'খরবুজা' সরস নহে,—'মোটা'! আর 'রসগুল্লে'? কি আর বলিব? ইহার একমাত্র বৈশিষ্ট্য 'ছোটা'! দুর্ভাগ্য! 'একটা নতুন কিছু করার' উন্মাদনায় লেখক যথাসম্ভব ও যথা অসম্ভব কল্পনার আশ্রয় লইতে পারেন, কিন্তু সে সব 'উৎপাদন' পঞ্চম শ্রেণীর বালক-বালিকাদের যে সব সময়ে হজম হয় না তার প্রমাণ ঐ 'ঈশ্বর' কবিতাটি। এ যেন 'ঈশ্বর' বিষয়ে কোন কবিতার প্যারোডি।
কবিকে অভিনন্দন জানাইয়া সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা করি—

"হে ভগবান, কবিকে পুরস্কৃত এবং সুকুমারমতি শিশু পাঠকদের রক্ষা কর"—জয় হিন্দী! হায় বাঙ্গলা!!

হিন্দী-ভাষী বিচারপতির মুখে আশার বাণী

এলাহাবাদের একটি কলেজের বার্ষিক অনুষ্ঠানে এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি এস্.এস্. ধাবন (যাঁহার মাতৃভাষা হিন্দী) স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন যে:

"যদি আমি প্রজাতন্ত্রকে ভিতরে ভিতরে শক্তিশালী করিতে পারি—আমি সানন্দে হিন্দীকে গ্রহণ করিব। কিন্তু যদি দেখি—কেবলমাত্র হিন্দীকে বাদ দিলেই প্রজাতন্ত্রকে বাঁচাইয়া রাখা সম্ভব—মনে আঘাত পাইলেও আমি প্রজাতন্ত্রের জন্য হিন্দীকে ছাড়িব।"

ভাষা প্রকাশের মাধ্যম—পূজার্চ্চনার বস্তু নয়।

জনসাধারণ বিশেষ কোন একটি ভাষায় পরস্পরের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানে ইচ্ছুক না হইলে সেই ভাষা তাহাদের ভাষা হইয়া উঠিতে পারে না। আজ যদি বাঙ্গলা, মাদ্রাজ ও কেরলের জনগণ উত্তরপ্রদেশের জনগণের সঙ্গে হিন্দীভাষায় ভাবের আদান-প্রদানে অসম্মত হয় তাহা হইলে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে হিন্দীর মূল্য অন্তর্হিত হইবে।...

দুর্ভাগ্যক্রমে কিছু সংখ্যক হিন্দীর ধ্বজাধারী এইরূপ ধারণার সৃষ্টি করিয়াছেন যে, সরস্বতী, দুর্গা, কালীর মত হিন্দীকেও যেন কোন একটি দেবী হিসাবে পূজা করিতে হইবে এবং অহিন্দীভাষী জনগণের উপর ঐ পূজা চাপাইয়া দিতে হইবে।......

কোন জটিল সমস্যাকে ভাবাবেগের দৃষ্টিতে দেখিলে এইরূপ হয়। অথচ এই সমস্যাকে বৈজ্ঞানিক ও রাজনীতিবিদের দৃষ্টি হইতে দেখাই সমীচীন। হিন্দীর সমর্থকরা ইহা উপলব্ধি করিতে পারেন না যে তাঁহারা যদি মর্য্যাদা রক্ষার জন্য অহিন্দীভাষীদের উপর হিন্দী চাপাইয়া দেন তাহা হইলে উহাতে স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত লাগিবে এবং জাতীয় ঐক্য বিপন্ন হইবে।

'সমস্যাটিকে' এই ভ্রান্তদৃষ্টিতে দেখার ফলে আমরা যাহা করিতে চাহিতেছি তাহার বিপরীত ফল হইতেছে। ইহা জাতীয় ভাষা না হইয়া ইহার পক্ষে একটি আঞ্চলিক ভাষায় পরিণত হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। একটি আধিপত্যশীল অঞ্চল বলপূর্ব্বক তাহার ভাষাকে অন্যান্য অঞ্চলের উপর চাপাইয়া দিতেছে এবং অন্যান্য অঞ্চল তাহার প্রতিরোধ করিতেছে। সুতরাং ইহা একটি সংহতিনাশক শক্তি হিসাবে গণ্য হইবে।'...

"হিন্দী মনোনীত সরকারী ভাষা ছাড়াও একটি আঞ্চলিক ভাষা হওয়ায় সমস্যা আরও জটিল হইয়াছে। অহিন্দীভাষী অঞ্চলের জনগণ সন্দেহ ও আশঙ্কা করেন যে, অন্যান্য ভাষার ক্ষতি করিয়া হিন্দীভাষী লোকেরা হিন্দীভাষার উন্নতি করিতেছে। তাহার চেয়েও নিকৃষ্ট কথা এই যে, জাতীয়তাবাদের ধ্বনির আড়ালে তাহারা নিজেদের ছাত্রসমাজ, লেখক, সংবাদ-পত্র এবং প্রকাশ ভবনগুলির উন্নতি করিতেছে। অহিন্দী ভাষীদের মন হইতে এই আশঙ্কা দূর করা হিন্দী-ভাষীদেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু এই আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও তাহাদের উপর চাপাইয়া দিলে তাহা সংহতিনাশী শক্তি বলিয়া গণ্য হইবে।"

শ্রীধাবন আরও বলেন যে, দুর্ভাগ্যের বিষয় এই রাজ্যে হিন্দীকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করিবার পরেও হিন্দীভাষায় বিদেশী পুস্তকাদি ও সাময়িকপত্র অনুবাদের কাজ সামান্যই অগ্রসর হইয়াছে। অবশ্য ব্যাপকভাবে হিন্দীভাষায় বিদেশী পুস্তক ও সাময়িক পত্রাদি প্রকাশ করিয়া সেইগুলি সুলভ মূল্যে ছাত্র ও পণ্ডিতদের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া এক বিরাট্ ব্যাপার এবং প্রতি বৎসর উহার জন্য কয়েক কোটি টাকা ব্যয় হইবে। কিন্তু হিন্দীকে ভাব প্রকাশের ভাষা হিসাবে গণ্য করিতে হইলে তাহার মূল্য দিতে হইবে। (কে দিবে?)

শ্রীধাবন অতঃপর বলেন যে, রাজ্য শুধু হিন্দী প্রবর্ত্তন করিবে অথচ বিশ্বের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও মননশীলতার সঙ্গে তাহার কোন সংযোগ থাকিবে না ইহা সঙ্গত নহে। তিনি বলেন যে, ইহার ফলেই এই অভিযোগ আসে যে হিন্দীকে দেবী হিসাবে পূজা

করাই ইহাদের অভিপ্রায়, ইহাকে গভীর ভাব ও প্রগতিশীল চিন্তার প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম হিসাবে গড়িয়া তুলিবার কোন ইচ্ছা ইহাদের নাই।

"হিন্দী"—আর এক দিক!

পার্লামেণ্ট সদস্য ও হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম সভাপতি শেঠ গোবিন্দ দাস জাতীয় ভাষার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য কেন্দ্রে হিন্দীর পৃথক মন্ত্রী দপ্তর স্থাপনের দাবি জানাইয়াছেন।

সর্ব্বভারতীয় বিশেষ হিন্দী সম্মেলনে শেঠ গোবিন্দ দাস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি বলেন যে, এপর্য্যন্ত বিভিন্ন মন্ত্রী দপ্তর যেসব পরিকল্পনা তদারক করিতেছিল, অতঃপর হিন্দী দপ্তরই সেগুলির দায়িত্ব লইবে। কারিগরি শব্দ-সম্বলিত বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি পুস্তকাদি হিন্দীতে রচিত হইবে, এবং অন্যান্য মন্ত্রী দপ্তরে হিন্দীর সর্ব্বাধিক ব্যবস্থার প্রচলন করিতে হইবে।

দক্ষিণে হিন্দী-বিরোধী আন্দোলনের ফলে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, সে সম্পর্কে আলোচনার জন্য আহূত ৪ দিনব্যাপী এই সম্মেলনে দেশের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিরা উপস্থিত হইয়াছেন। শেঠ গোবিন্দ দাস ভাষা সমস্যার সমাধানের জন্য তিন দফা পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেন, এবং এই পরিকল্পনার ভিত্তিতে ভাষা সমস্যার সমাধানের জন্য আচার্য্য বিনোবা ভাবেকে তাঁহার প্রভাব প্রয়োগ করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

৩ দফা পরিকল্পনা:—(১) হিন্দীভাষী রাজ্যগুলির উপর ইংরেজী চাপান না হইলে কেন্দ্রকে সর্ব্বপ্রথম হিন্দী-ভাষী রাজ্যগুলির সহিত শুধু হিন্দীতে কাজ চালাইতে হইবে। (২) ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরির জন্য হিন্দীতেও পরীক্ষা দেওয়া চলিবে। তবে ইহা প্রার্থীদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে। (৩) হিন্দীভাষী অঞ্চলের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের ইংরেজী চাপান হইবে না।

অতি উত্তম প্রস্তাব সন্দেহ নাই। কিন্তু:—

"হিন্দীপ্রেমীরা হয়ত ভাবিতেছেন যত অনর্থ বাধাইয়াছে ইংরাজী ভাষা—তাহাকে যদি ছলে-বলে-কৌশলে দেশ হইতে বিদায় দেওয়া যায় তবে তাহার শূন্য সিংহাসনে হিন্দী জাঁকিয়া বসিবে। ইহাও তাঁহাদের বুদ্ধিভ্রংশের পরিচয়। নাই-মামার চেয়ে কানা মামা ভাল এ কথা লোকে কখনও কখনও মনে করে বটে কিন্তু সময় বিশেষে নাই-মামাকেই তাহারা পছন্দ করে। ইংরাজী যদিই বা যায় তাহার স্থান লইবে হিন্দী নয়—বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা। তখন বেশী কড়াকড়ি করিতে গেলে হিন্দীর মান বাঁচিবে না, থাকিবে না জাতির সংহতি। হিন্দীকে তাহার ন্যায্য পাওনার বেশী যাঁহারা দিতে চাহিতেছেন তাঁহারা দেশের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছেন এই নির্ম্মম সত্য তাঁহাদের স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন বিচারপতি ধাবন। বিচক্ষণ বিচারকের এই সতর্কবাণী যদি হিন্দীর উগ্র সমর্থকেরা অগ্রাহ্য করেন তবে তাঁহারা সারা দেশের বিপদ ডাকিয়া আনিবেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের অতি-প্রিয় হিন্দীরও।"— . .

একথা স্বীকার করিব যে

—বিচারকের যে স্বচ্ছ দৃষ্টি ও গভীর ধীশক্তি থাকে সাধারণ লোকের তাহা থাকিবার কথা নয়। যাঁহারা রাজনীতির চর্চ্চা করেন বিচারকের মননশীলতা তাঁহাদের নিকট হইতে কেহ আশা করে না। তাই বলিয়া বাস্তব বুদ্ধি তাঁহাদের কি কিছুই থাকিতে নাই? কাণ্ডজ্ঞান কি তাঁহাদের একেবারেই লোপ পায়? অন্তত এ দেশের রাজনীতির দিকপালদের আচরণ দেখিয়া সেই আশঙ্কাই হইতেছে। দক্ষিণে অশান্তির আগুন এখনও নেভে নাই, পশ্চিমবঙ্গে অসন্তোষ এখনও ক্ষোভে ফাটিয়া না পড়িলেও যথেষ্ট তীব্র। তবুও দেখি পশ্চিমবঙ্গ রাজনৈতিক সম্মেলনে তাঁহারা ধ্বনি তুলিয়াছেন হিন্দীকে সরকারী ভাষা শুধু নয় জাতীয় ভাষার মর্যাদা দিতে হইবে। মন্দের ভাল, এটুকু শিক্ষা তাঁহাদের হইয়াছে যে, কাজটা তাড়াহুড়া করিয়া করিলে অনর্থ বাধিবে। শনৈঃ পর্ব্বত-লঙ্ঘনম্ এ যে বুদ্ধিমানের কাজ সেটা তাঁহারা বুঝিয়াছেন। অতএব রাতারাতি হিন্দীর কপালে রাজ-টীকা আঁকিয়া দিতে তাঁহারা আর ব্যাকুল নন।

কিন্তু লক্ষ্য তাঁহাদের ঠিকই আছে। এত কাণ্ডের পরও সেটা একচুলও বদলায় নাই। বরঞ্চ দেখিতেছি সেটা আরও ব্যাপক হইয়াছে। এখন তাঁহারা হিন্দীকে শুধু কেন্দ্রের সহিত সংযোগের ভাষার সম্মান দিলেই যথেষ্ট হইবে বলিয়া মনে করেন না, তাহাকে একেবারে মর্য্যাদার তুঙ্গশৃঙ্গে তুলিয়া দিতে চাহিতেছেন তাহাকে ভারতবর্ষের জাতীয় ভাষার পোশাক পরাইয়া। যে-দেশে লোকেরা একটি মাত্র ভাষায় কথা বলে না সে-দেশে এ দাবি শুধু যে উৎকট আবদার নয় সংহতির মৃত্যুবাণ, এ খেয়াল তাঁহাদের নাই কিংবা থাকিলেও হিন্দীপ্রেমে

মশগুল হইয়া সেটাকে তাঁহারা আমল দিতেছেন না। বোধ করি ধরিয়া লইয়াছেন একবার যদি কাগজেকলমে হিন্দীকে সরকারী ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া যায় তাহা হইলে প্রথম প্রথম কিঞ্চিৎ গণ্ডগোল হইলেও লোকে হিন্দীর তাঁবেদারি স্বীকার করিয়া লইবে। সে আশা যে দুরাশাও নয়, মনের ছলনা মাত্র—এ কথা কি তাঁহারা কিছুতেই বুঝিবেন না পণ করিয়াছেন?—

এ-বিষয়ে সকলেই হয়ত একমত যে—

—হিন্দীকে যদি সকলে খুশীমনে গ্রহণ করিত তাহা হইলে এই রক্তপাত হইত না। ভাষা যখন রক্ত লইয়াছে তখনই বোঝা উচিত যে, এবার দ্বিতীয় চিন্তার সময়। এলাহাবাদের বিচারপতি শ্রী এস এস ধাবন হিন্দীভাষীদের সেই দ্বিতীয় চিন্তার আবেদন জানাইয়াছেন। তিনি মনে করাইয়া দিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ ইউরোপের ফ্রান্সের মত একভাষী দেশ নয়। এদেশে চৌদ্দটি প্রধান ভাষা। এই ভাষাগুলিকে দাবাইয়া হিন্দী যদি এককভাবে ক্ষমতার গদিতে বসিতে চাহে তাহা হইলে বিরোধ অনিবার্য্য। তাহা ছাড়া সরকারী ভাষার প্রয়োজন রাষ্ট্রের জন্য। ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের ঐক্যের প্রয়োজন যদি হিন্দীর দ্বারা মিটিত তাহা হইলে প্রত্যেক ভারতবাসীই বলিতেন যে, হিন্দী থাকুক। হিন্দীভাষীরাই একমাত্র স্বদেশী, অন্যান্যরা রাতারাতি ইংরেজিয়ানায় রপ্ত হইয়া উঠিয়াছে এমন মনে করার কোন কারণ নাই। আসলে হিন্দীকে সরকারী ভাষা করিয়া অন্যান্য ভারতীয় ভাষার প্রতি সরকার উপেক্ষা দেখাইতেছেন এবং সরকারী ভাষার সোপান অবলম্বন করিয়া হিন্দী এলাকার অধিবাসীরা উচ্চতর আসনে গিয়া বসিতে চাহিতেছেন। এই আশঙ্কা হইতেই ভাষা বিরোধের সৃষ্টি এবং নয়াদিল্লীর অস্পষ্ট মনোভাবের জন্য এই বিরোধ কিছুতেই মিটিতেছে না। বিচারপতি শ্রীধাবন যথার্থই বলিয়াছেন, "যদি হিন্দীর দ্বারা সাধারণতন্ত্র শক্তিশালী হয় তাহা হইলে আমি সানন্দে হিন্দী গ্রহণ করিব। কিন্তু যদি দেখি যে হিন্দীকে বাদ দিলেই সাধারণতন্ত্রের ঐক্য রক্ষা সম্ভব তাহা হইলে, মনে আঘাত পাইলেও আমি সাধারণতন্ত্রের জন্ত হিন্দীকে ত্যাগ করিতে বলিব।" শ্রীধাবন হিন্দী এলাকার হাইকোর্টের বিচারপতি এবং হিন্দী ভাষাতেই তিনি হিন্দীভাষীদের সামনে এই বক্তব্য পেশ করিয়াছেন। হিন্দীপ্রেমীদের কাছে হিন্দী একটা ধর্মীয় সত্তার মত হইয়া উঠিয়াছে। বিপদ ঘটিয়াছে এই হিন্দী পূজার প্রধান মোহান্ত শেঠ গোবিন্দ দাস এই সংস্কারাচ্ছন্ন উগ্রতার পরিচয় দিয়াছিলেন। আজও সেই সংস্কারই ভাষামত্ততাকে এতদূর ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছে। এখন আমাদের সামনে একটিই প্রশ্ন—হিন্দী রাখিব, না ভারতের সাধারণতন্ত্রকে বাঁচাইব?

বিচারপতি শ্রীধাবন সংস্কারমুক্ত উদারদৃষ্টিতে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া পাইয়াছেন। হিন্দীর প্রতি বিদ্বেষের জন্য নয়, ভারতীয় ঐক্যের প্রতি আনুগত্যের জন্যই আজ হিন্দী লইয়া বাড়াবাড়ি আমরা হইতে দিতে পারি না। দিব না।

পশ্চিমবঙ্গে বেকারীর চিত্র ঃ

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কত? এ প্রশ্নের উত্তর সঠিক সংখ্যায় দেওয়া হয়ত সম্ভব নয়। কিন্তু শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কত দ্রুত হারে যে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহার সাক্ষ্য এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের খাতার হিসাব। এখানে প্রতি পরিবারে একজন (পুরুষ অথবা মহিলা) শিক্ষিত বেকারকে ঘরে বসিয়া থাকিতে হইতেছে। নিজের যৌবন শক্তির অপচয় করিয়া। ইহার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিন্তু বেকার ব্যক্তিরা দায়ী নহেন। দায়ী আমাদের সমাজ।

একটি তুলনামূলক হিসাবে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধির হারের দু'টি ছবি ধরা যাইতে পারে। ১৯৬১ সালের ৩০শে জুন তারিখের হিসাবে ৪৪,৩৩৭ জন ম্যাট্রিক বেকারের উল্লেখ পাওয়া যায়। বছরটি ছিল তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম বছর। এই পরিকল্পনা শেষ হওয়ার ঠিক ১৫ মাস আগে অর্থাৎ ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ঐ সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৬,৯১৭-তে। একই যোগ্যতাসম্পন্না মহিলা চাকুরি-প্রার্থীদের সংখ্যা ঐ সময়ের ব্যবধানে ২,৭৯৬ থেকে দাঁড়ায় ৯,০০১-তে।

ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করা অথবা সমস্তরের বেকার সংখ্যার গত ডিসেম্বরের হিসাব ছিল ৮৩,২৩৬ জন। কিন্তু পরিকল্পনা সুরুর বছরে এই সংখ্যা ছিল ১৬,১৫০। ইহাদের মধ্যে মহিলা বেকারদের সংখ্যা চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, ১,১৭৬ হইতে ৮,১২২।

১৯৬৪ সালের শেষ দিনের যে হিসাব পাওয়া যায় তাহাতে বিভিন্ন বিষয়ক ১৮,২৪১ জন বেকার স্নাতকের উল্লেখ আছে। ১৯৬১ সালের ৩০শে জুন এই সংখ্যা ছিল ৭,৫৬৪।

শিক্ষার আগ্রহ অব্যাহত

যথাযোগ্য প্রতিষ্ঠা বা চাকুরি না পাওয়া সত্ত্বেও বাংলার যুবক-যুবতীদের মধ্যে শিক্ষা লাভের আগ্রহে কিন্তু কিছু মাত্র ভাটা পড়ে নাই, বাড়িয়াই চলিয়াছে। তিন বছর আগে যন্ত্রবিজ্ঞানে ৯৩ জন, চিকিৎসাবিজ্ঞানে ১০৩ জন এবং অন্যান্য বিষয়ে ৭,৩৬৮ জন স্নাতক চাকুরিপ্রার্থীদের খাতায় নাম দিয়াছিলেন। এবারে ঐ সংখ্যা হইয়াছে যথাক্রমে ৫৯৬, ১০৩ এবং ১৭,৫৭২। তিন বছরে মহিলা স্নাতকদের সংখ্যা ৪৯৮ থেকে ২,০০৩ হইয়াছে।

কর্ম্মসংস্থান কেন্দ্র

পশ্চিমবঙ্গে আছে ৩টি আঞ্চলিক এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ, ৭টি উপ-আঞ্চলিক এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ, ১৩টি জেলা এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ, কয়লা খনিসমূহের জন্য ২টি বিশেষ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ, প্রকল্পসমূহের জন্য ২টি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ। বরখাস্ত এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত সরকারী কর্ম্মচারীদের জন্য ১টি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি 'এমপ্লয়মেণ্ট এ্যাসিসট্যেন্স অ্যাণ্ড গাইডেন্স ব্যুরো' এবং অপূর্ণাঙ্গদের জন্য একটি বিশেষ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ আছে।

২০,৯১৯ জন মহিলা এবং ৩,৮৩,৪০৩ জন পুরুষ কর্ম্মপ্রার্থী ১৯৬৪ সালে বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে নাম রেজিষ্ট্রিভুক্ত করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে অবশ্য অনেকে নাম পুনর্নবীকরণ করিয়াছেন। কিন্তু সারা বছরে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ মোট মাত্র ৫০,৬৭৮ জনকে চাকুরি দিতে সমর্থ হইয়াছেন।

তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রদের সমস্যা আরও জটিল, ন্যাশনাল এমপ্লয়মেণ্ট সার্ভিস কর্ত্তৃপক্ষের মতে। কর্ম্মদাতারা সহজে এদের চাকুরি দিতে চাহেন না। যে কারণে বছরের পর বছর এদের আবেদনে কোন সাড়া আসে না।

মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রেও নূতন সমস্যা দেখা দিয়াছে। পূর্ব্বে ঐ শিক্ষিত মহিলারা শিক্ষিকার কাজেই বেশী উৎসাহী ছিলেন, কিন্তু বর্ত্তমানে ইঁহাদের মধ্যে অফিসে চাকুরির ঝোঁক বিশেষভাবে দেখা যাইতেছে।

এ-রাজ্যের বেকারী সমস্যা লইয়া পত্র-পত্রিকায় বহুবার বহু আলোচনা হইয়াছে। রাজ্য সরকারও তাহাদের সাধ্যমত বেকারদের কাজে নিযুক্ত করিতে প্রয়াস করিতেছেন—কিন্তু ফল আশামত হইতেছে না।

সমস্যা সমাধান কিছু পরিমাণে হয়—যদি অবাঙ্গালী মালিকদের কল-কারখানা এবং বাণিজ্য সংস্থাগুলিতে বাঙ্গালী নিযুক্ত করা খানিকটা বাধ্যতামূলক করা হয়। আইন না করিয়াও ইহা সম্ভব—যেমন বিহার, উড়িষ্যা, আসাম করিয়াছে।

বাঙ্গালী শ্রমিক সংখ্যা কমতি মুখে

কয়েকদিন পূর্ব্বে একটি সংবাদে প্রকাশিত হইয়াছে যে :—

> পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান-ব্যবসায় সংগঠন ও শিল্পে বাঙ্গালী শ্রমিক কর্ম্মচারীর হার আর একদফা কমিয়াছে।
>
> ১৯৬২ সালে পশ্চিমবঙ্গের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায় সংগঠনগুলিতে বাঙ্গালী শ্রমিক কর্ম্মচারীর গড়পড়তা হার ছিল মোট কর্ম্মচারীদের শতকরা ৫১.৭২ ভাগ। ১৯৬৩ সালে ইহা কমিয়া দাঁড়াইয়াছে শতকরা ৪৮.৪১ ভাগ। বাঙ্গালী শ্রমিক হ্রাস পাওয়ার ফলে যে কতটুকু হইয়াছে, সেটুকু পূরণ করিয়াছে পশ্চিমবঙ্গের বাহিরের রাজ্য হইতে আগত শ্রমিকেরা। ১৯৬২ সালে বহিরাগত শ্রমিকদের গড় হার ছিল শতকরা ৪৮.২৮ ভাগ। ১৯৬৩ সালে তাহা বাড়িয়া শতকরা ৫১.৫৯ ভাগে দাঁড়াইয়াছে।
>
> এই রাজ্যে ম্যানেজিং এজেন্সী, আমদানী-রপ্তানীর পাইকারি ব্যবসায়, প্রস্তুতকারি শিল্প, জাহাজ ও অন্তর্দ্দেশীয় নৌ-চলাচল, পরিবহণ ও পথ-পরিবহণ, ছাপাখানা, কাঁচ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ও শিল্পে ১৯৬৩ সালের সর্ব্বশেষ পরিসংখ্যান অনুসারে বাঙ্গালী শ্রমিক কমিয়াছে ও তাহার বদলে বহিরাগত রাজ্যের শ্রমিক অধিক-সংখ্যায় নিয়োগ করা হইয়াছে।
>
> যে দুইটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে এক বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালী শ্রমিক হ্রাসের হার শোচনীয়—সেই দুইটি প্রতিষ্ঠান হইল পথ-পরিবহণ আর উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ। পথ-পরিবহণ শিল্পে ১৯৬২ সালে বাঙ্গালী শ্রমিক ছিল ৫১.২৪ ভাগ। ১৯৬৩ সালে তাহা হ্রাস পাইয়া দাঁড়ায় শতকরা ৪২.৩০ ভাগ। অবাঙ্গালী শ্রমিক নিয়োগের হার ৪৮.৭৬ হইতে বাড়িয়া দাঁড়ায় ৫৭.৭০ ভাগ। পথ-পরিবহণে বাঙ্গালী শ্রমিক শতকরা ৫০ হইতে হ্রাস পাইয়া ৩৩.৩৩-এ দাঁড়াইয়াছে। অবাঙ্গালী শ্রমিক এই সময়ের মধ্যে ৫০ হইতে ৬৬.৬৭ ভাগে পরিণত হইয়াছে।

ইহার কারণ কি তাহা অনুসন্ধান করা অবশ্যই প্রয়োজন। আমাদের মনে হয় এ রাজ্যের ট্রেড-ইউনিয়ন সংস্থাগুলি বাঙ্গালী শ্রমিক সংখ্যা বছরের পর বছর কমতি মুখে যাইবার একটি প্রধান কারণ। গত কয়েক বছর ধরিয়া দেখা যাইতেছে কারণে-অকারণে, সামান্য যে-কোন অজুহাতে কলকারখানা, ব্যবসায় সংস্থা (বিশেষ করিয়া কলিকাতার ট্রামওয়েতে) হঠাৎ ধর্ম্মঘট! সর্ব্বসাধারণের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি শ্রমিক ইউনিয়নগুলির কোন দৃষ্টি নাই, ইহার কোন প্রয়োজনও তাহারা বোধ করে না। গোষ্ঠীস্বার্থই আজ প্রধান হইয়াছে। 'আমার দল বা গোষ্ঠীর লাভে যে অন্যের বিষম ক্ষতি হইতে পারে'—একথা কে বিবেচনা করে?

বাঙ্গালী ব্যবসায় এবং অন্যান্য বেসরকারী সংস্থায় আজ কর্তৃপক্ষ বাঙ্গালী পিওন-বেয়ারা নিয়োগে দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াছেন। বাঙ্গালী অল্প এবং অশিক্ষিত পিওন-বেয়ারা এই কাজ লইতে প্রথমে আপত্তি করে না—কিন্তু পিওন-বেয়ারার চাকরি পাইবার পরই তাহারা বাবু-শ্রেণীতে পরিণত হয়। বহু ক্ষেত্রে কথাবার্ত্তায়, ব্যবহারে ইহারা দুর্ব্বিনীত এবং সহবতবর্জ্জিত। কারণ ইহারা জানে একবার চাকরিতে পাকা হইলে, তাহাদের চাকরি হইতে তাড়ায় কে!

কলকারখানার অবস্থাও প্রায় একই প্রকার। সাধারণ বাঙ্গালী শ্রমিকের দাবি (ইউনিয়নের প্ররোচনাতে) হইয়াছে আকাশ-প্রমাণ—কিন্তু নিয়োগ-কর্ত্তার কোন দাবি ইহাদের নিকট কিছুই দাবি করিবার নাই। বাঙ্গালী-শ্রমিক নিয়োগে স্বভাবতই মালিক-শ্রেণী ভয় পাইতেছেন। কেন?

'কালো-টাকায়'—গ্রামের জমি?

—ঘরে বা ব্যাঙ্কে কোথায়ও যখন কালো টাকা লুকাইবার ভরসা নাই তখন গ্রামাঞ্চলের জমি মাটিতেই কালো টাকা বিনিয়োগের হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের বহু মুসলমান পরিবার জোত জমি ভিটামাটি বিক্রয় করিয়া পাকিস্তানে চলিয়া যাইতেছেন—কালো টাকার দৌলতে মোটা ভারতীয় টাকা তাঁহারা জমি-মাটির বিনিময়ে পাইতেছেন। বারাসত সাব রেজেষ্টারী অফিসে প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ টাকার জমি সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইতেছে। এই স্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, জমি সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে প্রকৃত [illegible] উল্লেখ করিয়া রেজেষ্টারী দলিলের ষ্ট্যাম্প ফাঁকি দেওয়া হইতেছে। পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে যেরূপ বাধানিষেধ আছে, ভারতে উহার কিছুই নাই। এই সুযোগে পাকিস্তান গমন অভিলাষী মুসলমান পরিবার মোটা টাকায় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ভারতীয় কারেন্সী নোট পাকিস্তানে পাচার করিতেছে। কালো টাকার দৌলতে সাধারণ যে-কোন জমির দাম অবিশ্বাস্য হারে উঠিয়াছে। জমি খরিদকারীদের উপর সরকারের বিন্দুমাত্র দৃষ্টি নাই। এই সুযোগ কালো টাকার অধিপতিরা পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিয়াছে। জমি খরিদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় সুবিধা হইতেছে বেনামীতে জমি কেনা যায়। সরকারের ইনকাম ট্যাক্স বিভাগ অথবা গোয়েন্দা বিভাগ যদি অনুসন্ধানের উপযুক্ত একটি নমুনা দেখিতে চাহেন তবে আমরা বারাসাত সাব রেজেষ্টারী অফিসের গত ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখের দলিল রেজেষ্টারীর দলিলগুলি অনুসন্ধানের আহ্বান জানাইতেছি। এইদিন অফিসের শেষ সময়ের পরে পঁচিশখানির উপর দলিল জমা পড়ে। যে সাব রেজেষ্টারী অফিস অফিসের নির্দ্দিষ্ট সময়ের এক মিনিট বিলম্বে দলিল গ্রহণ করে না সেই সাব রেজেষ্টারী অফিস টাইমের শেষে এতগুলি দলিল গ্রহণ করিল এবং রাত দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত দলিল রেজেষ্টারীর কার্য্য চলিল। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ২৪ পরগণা, হাওড়া ও হুগলী জেলার গ্রামাঞ্চলের জমির হাত-বিনিময় যেভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে—ইহা দেখিয়া মনে ভয় হয় অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত জমি কলিকাতার কালো টাকার অধিপতিদের খপ্পরে চলিয়া যাইবে। কলিকাতা করপোরেশন এলাকার জমি-বাড়ী খরিদের মধ্যে যেরূপ ঝামেলা আছে কলিকাতার বাহিরে তাহা নাই। কলিকাতা হইতে যশোহর রোড, টাকী রোড, কাঁচরাপাড়া রোডের পার্শ্ববর্ত্তী জমির দাম যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে ইহা কদাচ কৃষক পরিবারের উপযোগী নহে। মাত্র কয়েক বিঘা জমি লক্ষ লক্ষ টাকায় হাত বিনিময় হইতেছে। সরকারের অদূরদর্শিতা এবং অব্যবস্থার ফলেই কালো টাকা জমিতে লগ্নী হইতেছে, দেশত্যাগী মুসলমান পরিবার ভারতীয় কারেন্সী নোট পাকিস্তানে পাচার করিতেছে, কোটি কোটি টাকার জমি বিক্রয়ের ষ্ট্যাম্প ফাঁকি পড়িতেছে এবং জাতীয় স্বার্থের বিরোধী জমি সম্পত্তি পুঁজিবাদী। কালোবাজারীদের দখলে চলিয়া যাইতেছে।

'বারাসত' (৮ই ফেব্রুয়ারী) হইতে উপরি উক্ত তথ্য

পরিবেশিত হইল। কলিকাতায় বর্ত্তমানে সাধারণ বাঙ্গালীর বাড়ীঘর নির্ম্মাণের আশা নাই। কিছু আশা ছিল কাছাকাছি গ্রামাঞ্চলে—কিন্তু কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের 'সোসালিষ্টিক প্যাটার্ণে গড়া' রাষ্ট্রে 'সাম্যবাদ' সকলের ভোগের বস্তু নহে—এখানেও জাতি-ভেদ প্রকট! বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গবাসী প্রফুল্ল-বদনে ইহাই দেখিতেছে!

'মাথা' (?) ঠাণ্ডা রাখা চাই-ই!

সমস্যা-জড়িত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের শাসনকার্য্য পরিচালনা করা বিষম ব্যাপার সকলেই ইহা স্বীকার করিবেন এবং ইহা করিতে হইলে মন্ত্রী মহোদয় এবং উচ্চ পদাধিকারী অফিসারদের মাথা (যদি থাকে) ঠাণ্ডা রাখা একান্ত প্রয়োজন এবং এই 'অতি-অবশ্য' কার্য্যে "মাথা" ঠাণ্ডা রাখার খরচ—বছরে বছরে বৃদ্ধি মুখেই চলিতেছে। বিধান সভায় এক প্রশ্নের জবাবে পূর্ত্তমন্ত্রী বলেন :—

> ১৯৬৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত বাড়ীর সংখ্যা ছিল ৯৩। এই বাড়ীগুলি বাবদ সরকারের ১৯৬০-৬১ সালে ২১ হাজার টাকা, ১৯৬১-৬২ সালে ৬৬ হাজার ৭৭ টাকা, ১৯৬২-৬৩ সালে ১ লক্ষ ২২ হাজার ১ টাকা এবং ১৯৬৩-৬৪ সালে ১ লক্ষ ৬২ হাজার ৫ শত ৭২ টাকা খরচ হইয়াছে।

আমরা অনেকেই বোধ হয় জানি না যে, পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান মন্ত্রীদের প্রায় সকলেই মন্ত্রিত্ব লাভের পূর্ব্ব জীবনে জন্মাবধি শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত প্রাসাদেই বসবাস করিয়াছেন, কাজেই দেশ এবং দশের কল্যাণে অর্পিত মন্ত্রী-জীবনে তাঁহারা হঠাৎ চিরকালের অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য-পালনে বিফলতা অর্জ্জন করিতে পারেন না। ইচ্ছা না থাকিলেও তাঁহারা দেশের জন্যই ইহা করিতে বাধ্য হইতেছেন! বিশেষ করিয়া টাকাটা যখন গরীব প্রজারা প্রফুল্ল-চিত্তে বহন করিতেছে।

'মাথা-ঠাণ্ডী' খরচ ছাড়া মন্ত্রীবর্গ আরও কিছু সামান্য টাকা ভাতা হিসাবে দয়া করিয়া, প্রজার দান হিসাবে গ্রহণ করেন। যেমন :

> ১৯৬৪ সালে অন্যান্য এক-একজন পূর্ণমন্ত্রী মাসিক ৩৫০ টাকা বাড়ীভাড়া ভাতা হিসাবে ৪ হাজার ২ শত টাকা করিয়া এবং এক-একজন রাষ্ট্রমন্ত্রী মাসিক ৩ শত টাকা হিসাবে ৩ হাজার ৬ শত টাকা করিয়া পাইয়াছেন। রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মিশ্র এবং শ্রীস্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজভবনের মন্ত্রী-বাবদ ঐ আবাসে থাকেন। সুতরাং তাঁহাদের বাড়ীভাড়া টাকা দিয়া আবার সরকারই কাটিয়া লইয়াছেন। অবশ্য প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ৩১শে মে পর্য্যন্ত হিসাবে ১ হাজার ৭ শত ৫০ টাকা এবং নূতন শিক্ষামন্ত্রী শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহ ১১ই জুন হইতে হিসাবমত ২ হাজার ৩ শত ৩৩ টাকা পাইয়াছেন।

এই হিসাবে প্রজাপালন এবং দেশশাসন কার্য্যে প্রত্যহ ২৪ ঘণ্টা টেলিফোন বাবদ মাসে কত টাকা মন্ত্রী-মাথাপিছু খরচ হয়—এবার সে-তথ্য প্রকাশ করা হয় নাই, যেমন হয় নাই মন্ত্রীদের কাজে-অকাজে, ব্যক্তিগত-কাজে রেল-মোটর-হেলিকপ্টার বিলাস ভ্রমণের খরচ!

আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, উপরি উক্ত খাতে খরচ প্রদত্ত হিসাবের দশ বা বিশ গুণ হয় নাই!

পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তের দায় কাহার?

কয়েকদিন পূর্ব্বে বিধান সভায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন 'ক্ষুব্ধ কণ্ঠে' বলেন যে, বারবার অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘ সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণে রাজী হয়েন নাই। সীমান্ত দিয়া চীনা ও পাকিস্তানী মালের চোরাই কারবার বন্ধের জন্য যথোচিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিতে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে কয়েকবার অনুরোধ জ্ঞাপন করেন—কিন্তু

কেন্দ্রীয় সরকার কোন প্রকার ব্যবস্থাই গ্রহণ করেন নাই!

উপরি উক্ত সংবাদ পাঠে কেহ যদি ভাবে যে—পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য রক্ষার কোন দায়িত্বই যখন কেন্দ্রীয় সরকারের নাই, তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পশ্চিমবঙ্গকে "স্বাধীন" বলিয়া মনে করিলে—কাহারও কোন আপত্তি হইতে পারে না। এবং এ-রাজ্য যদি স্বাধীন বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে দেশ, বিশেষ করিয়া সীমান্ত রক্ষার কারণে পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বাধীন ভাবে সৈন্য-বাহিনী গঠন করিতে অবশ্যই পারে। এই বাহিনীকে "পশ্চিমবঙ্গ" সৈন্যবাহিনী রূপে অভিহিত করিয়া স্থল-জল এবং আকাশ বাহিনী গঠনও ক্রমে ক্রমে করা যাইতে পারে।

কেন্দ্রীয় সরকার সামান্য একটি 'বেঙ্গলী-রেজিমেণ্ট' গঠনেও গররাজী। ইহার বিরুদ্ধে যুক্তি এই যে—এই ভাবে কোন রাজ্যের নামে বিশেষ বাহিনী-গঠন দেশের সংহতির পক্ষে ক্ষতিকারক! কিন্তু "মহারাষ্ট্র", "পাঞ্জাব" প্রভৃতি রেজিমেণ্ট অবশ্যই থাকিতে পারে—কারণ, ইহা দেশের সংহতি রক্ষার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়! সর্ব্ব বিষয়েই পশ্চিমবঙ্গ এবং বাঙ্গালীর প্রতি কেন্দ্রীয় কর্ত্তাদের বিষম-বিরুদ্ধ-বিজাতীয় প্রেমের প্রকাশ প্রায়ই প্রকট হইতে দেখা যাইতেছে—। বাঙ্গালার অপরাধ—সে তাহার বুকের রক্ত, হাজার হাজার প্রাণ বলি এবং শেষ পর্য্যন্ত নিজের দেশের দুই-তৃতীয়াংশ বিসর্জ্জন দিয়া ভারতের এই তথাকথিত স্বাধীনতা অর্জ্জনে সাহায্য করিয়াছে! ভাগ্যের পরিহাস—স্বাধীনতার পূর্ব্বে এবং স্বাধীনতা অর্জ্জনের পরেও বাঙ্গালীকে সমভাবে সর্ব্ববিষয় বিষম মূল্যের সঙ্গে অপমান নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইতেছে!

দুঃখ হয় যখন দেখি কেন্দ্রের যে দু-একজন বাঙ্গালী মন্ত্রী আছেন, তাঁহারা বাঙ্গলা এবং বাঙ্গালীর দুঃখ অবসানের জন্য কিছু করিবার এমন কি মৌখিক প্রতিবাদ জানাইবারও প্রয়োজন বোধ করেন না! এমন প্রভুভক্ত "মন্ত্রী" নামক ভৃত্য বাঙ্গালী ছাড়া আর কে হইতে পারে?

—*—

গুরুদেব

শ্রীশৈবাল চক্রবর্ত্তী

পিসিমার গুরুদেব আবার এসে উপস্থিত হ'লেন। এইরকম হঠাৎই তিনি এসে হাজির হন। বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎ একদিন সদর দরজায় 'মা সুবাসিনী' গম্ভীর গলায় তাঁর এই ডাক শোনা যায়। দরজা খুলতেই চোখে পড়ে তাঁর বিভীষণ মূর্ত্তি, গলায় ত্রিপুণ্ডক, জটাজুট পরনে গেরুয়া। দাড়ি-গোঁফে মুখটাকে প্রায় সুন্দরবনের মত করে রেখেছেন গুরুদেব। তাঁকে দেখেই পিসিমা, 'বাবা এতদিনে দয়া হ'ল!' ব'লে পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। যত বারই আসেন গুরুদেব তত বারই পিসিমা ওই একই কথা বলে, একই ভাবে তাঁর পায়ের ওপর আছাড় খেয়ে পড়েন।

তার পর সুরু হয় আদরের ঘটা। তখনই বাজারে ডাক ছোটে সরু চাল আর পাকা কলা আনতে, ভাল ঘি খানিকটা জোগাড় হয়। পর পর তিন গ্লাস ঠাণ্ডা সরবৎ খান তিনি। অনেকটা পথ হেঁটে এসেছেন তাই এতটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। যতদূর থেকেই তাঁকে আসতে হোক তিনি হেঁটেই আসবেন। গুরুদেব ট্রামে-বাসে চড়েন না, তার হু'টি পা-ই ভরসা। এখন তাঁর সমস্ত শরীর বেয়ে ঘাম ঝরছে, মুখখানা টকটকে লাল। পিসিমা পাখা নিয়ে তার পাশে এসে বসলেন। সেবারে তিনি এলেন সোজা লাহিরীটোলার এক শিষ্যবাড়ী থেকে। সকাল থেকে পেটে কিছু পড়ে নি। আমাদের বাড়ীতে ফল-মিষ্টি খেয়ে তবে ঠাণ্ডা হ'লেন।

আমরা সবাই গুরুদেবকে খুব ভয়ে ভয়ে দেখতাম! তাঁর ঐ বিরাট্ চেহারা, ঘন কালো দাড়ি বুকের মাঝখান পর্য্যন্ত নেমে এসেছে, মাথার চুল বড় হয়ে জটার আকার ধারণ করেছে। চোখগুলি বড় বড়, বড়রা রাগ করলে যে রকম হয় সব সময় তেমনি লাল হয়ে থাকত। পরনের কাপড়ও লাল। আর অত্যন্ত গম্ভীর গলার আওয়াজ, ঠিক যেন মেঘ ডাকছে। প্রায়ই সংস্কৃত বলতেন, আমাদের দিকে তাকাতেন খুব কম। বাড়ীর সবাই তাঁকে নিয়ে তটস্থ থাকত। বাবা জোড়হাতে কাছে বসে থাকতেন, পিসিমা পা দু'টি জল দিয়ে ধুয়ে নিজের চুলের গোছা দিয়ে মুছিয়ে দিতেন। আমরা হাঁ করে এই সব দেখতাম। মা ফল কেটে পাথরের থালায় ফল, মিষ্টি সাজিয়ে রাখতেন। গুরুদেবের কোন ভ্রূক্ষেপ ছিল না এসব দিকে। তিনি সে-সময় হয়ত ঝোলা থেকে কোন পুঁথি বার করে তার পাতা ওলটাচ্ছেন, আর নয়ত দেয়ালে টাঙ্গানো কালীর পটের দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে আছেন। কখনও বা ভুলে আমাদের ওপরও চোখ পড়ে যেত।

পিসিমাকে প্রশ্ন করতেন, 'এটি বুঝি বাসুর ছোটটি?' পিসিমা বলতেন, হ্যাঁ। আমাকে বলতেন, প্রণাম কর। আমি হাত বাড়াতেই গুরুদেব বলতেন, 'থাক থাক। ক'টায় ওঠ?' হঠাৎ প্রশ্ন করতেন তিনি। ভয়ে হাত-পা কাঁপত আমার। কোন রকমে ঢোক গিলে বলতাম, 'সাতটায়। সীতুদা আরও পরে ওঠে।' হা হা করে হেসে উঠতেন এ কথা শুনে। আমি বুঝতাম না এতে হাসির কি আছে। হাসি থামলে উনি বলতেন, 'সীতুদার খোঁজ ত আমি চাই নি।' আমার হাতে একটা সন্দেশ তুলে দিয়ে বলতেন, 'আরও ভোরে উঠবে—কেমন? ছাতে বেড়াবে ভোরবেলা, ভোরবেলা সূর্য্যের আলো খুব ভাল।' ব্যস, ওই পর্য্যন্ত! এবার তিনি খেতে খেতে অন্য সবার খোঁজ নিতেন পিসিমার কাছ থেকে। জয়নগরের ঠাকুমা কেমন আছেন, বৈচির রাখাল দাদার শরীর কেমন এই রকম খোঁজ-খবর নেওয়া চলত। আমার ওদিকে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ত। যতক্ষণ তাঁর রক্তাভ চোখ দু'টি দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতেন তিনি ততক্ষণ আমার বুক গুড়গুড় করত। বাবার চেয়ে লম্বা আর অসুরের মত শক্তিমান গুরুদেব যতক্ষণ বাড়ীতে থাকতেন ততক্ষণ কোথাও কোন আওয়াজ পাওয়া যেত না। শুধু পিসিমা-মা'র ফিসফিশ কথাবার্ত্তা আর গুরুদেবের গম্ভীর গলার গমক ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। যেই তিনি চলে যেতেন তখনই আবার

সহজ হাওয়া বইত—কাকাতুয়াটাও ডাক ছাড়ত আগের মতন।

গুরুদেব আসতেন খুব কম এবং বরাবরই তাঁর আবির্ভাব ছিল আকস্মিক। কোন বারই তিনি খবর দিয়ে আসতেন না—হয়ত অন্য কোন শিষ্যবাড়ী যেতে যেতে খেয়াল হ'ল চলে এলেন, ঘণ্টাখানেক থেকে ফের রওনা দিলেন। মনে আছে একদিন ভারী হন্তদন্ত হয়ে এসেছিলেন। সদর দরজায় ঝুমঝুম্ করে ঘুঁঘির আওয়াজ। ঝি ঘুমোচ্ছিল। ধড়মড় করে উঠে বসেছিল সে। কানে এসেছিল গুরুদেব বাবাকে জিগ্যেস করছেন, 'কার অসুখ করেছে?' আচমকা এই প্রশ্ন শুনে অবাক্ হয়ে গিয়েছিলেন, 'অসুখ!' 'হ্যাঁ হ্যাঁ অসুখ', মনে হচ্ছিল গুরুদেব যেন ছুটে এসেছেন, তাঁর গলা কাঁপছিল। 'ছোটদের মধ্যে কে বিছানায় পড়েছে? আজ ভোরের দিকে স্বপ্ন দেখলাম যন্ত্রণায় কে যেন ছটফট করছে। মুখটাকে ভাল করে দেখতে পারি নি। গায়ে যেন দাগ দেখলাম কিসের···?'

বাবা পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে জোড়হস্তে উঠে দাঁড়িয়েছেন একটু অবাকও হয়ে গেছেন। মহাপুরুষের মনে আগামী দিনের ঘটনা ছায়াপাত করে যায় এ কথা শুনেছিলেন কিন্তু এখন তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে নির্ব্বাক হয়ে গেছেন। গুরুদেবকে সাদরে অভ্যর্থনা করে ওপরে নিয়ে এলেন তিনি। গুরুদেব এসে বসলেন মিনুর বিছানার পাশে। মাঝ রাত্তিরে জ্বর এসেছে তার, জ্বরের তাড়সে এপাশ-ওপাশ করছে। বিকালের দিকে গায়ে গুটি দেখা গেল। রাত্রে জ্বর বাড়তে গুরুদেবের কাছে লোক ছুটল। তিনি প্রসাদী ফুল ও নির্ম্মাল্য পাঠিয়ে দিলেন। একমাস পরে মিনু উঠে দাঁড়াল। বাবা সেবার একটা শাল কিনে গুরুদেবকে পরতে দিয়েছিলেন।

কি করে যে গুরুদেবের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ঘটেছিল তা আমরা জানতাম না। সীতুদা বলত, 'জানিস, গুরুদেব শাপ দিলে তুই এখনি ভস্ম হয়ে যাবি!' বললাম, 'তাই নাকি?' সীতুদা চোখ পাকিয়ে বলত, 'তবে! হিমালয়ে দশমাস থাকেন, মহাদেবের সঙ্গে কি আর দেখা-সাক্ষাৎ হয় না? ভীষণ শক্তি আছে ওঁদের। যার ওপর একবার চটবেন তার দফাগয়া।' সীতুদা বয়সে আমাদের চেয়ে বছর দু'য়েকের বড় ছিল, সকালে আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে ইংরেজী খবরের কাগজ এ-পাতা থেকে ও-পাতা পর্য্যন্ত পড়ে ফেলত—সুতরাং তার কথা না মেনে উপায় কি? গুরুদেব যখন কমণ্ডলু থেকে জল ছিটিয়ে পুজো করতেন, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মন্ত্র পড়তেন গম্ভীর স্বরে তখন তাঁর চোখ-মুখ হয়ে উঠত ভীষণ—আমি জানলার খড়খড়ির ফাঁক থেকে তাই দেখে ভয়ে সিঁটিয়ে যেতাম আর ভাবতাম ঠিক কথাই বলেছে সীতুদা।

আমাদের বাড়ীতে এসে ফল, সন্দেশ, কোরা ধুতি ইত্যাদি সব জিনিষের সঙ্গে তিনি যে কিছু কিছু নগদ টাকাও নিতেন এটা আমাদের নজর এড়াত না। ঠং ঠং করে রূপোর টাকার আওয়াজ হ'লেই আমরা এ-ওর মুখের দিকে তাকাতাম। গুরুদেব নাকি রূপোর টাকা ছাড়া অন্য টাকা গ্রহণ করেন না। এর নাম ছিল গুরুদক্ষিণা। বাবারা বলতেন, গুরুদক্ষিণা না দিলে নাকি গুরুভক্তি সম্পূর্ণ হয় না। এসব কথা বুঝতাম না বটে, তবে দেখতাম গুরুদেব টাকাগুলি গুণে তাঁর ট্যাঁকে গুঁজছেন। বয়স বুদ্ধি সব কম হ'লেও টাকা নেওয়ার এই ব্যাপারটা আমাদের কাছে খুব ভাল লাগত না। সাধারণতঃ তিনি না চাইতেই বাবা পিসিমা তাঁর সামনে টাকার থাক সাজিয়ে দিতেন। কিন্তু মনে আছে একবার তিনি যেচে টাকা চেয়েছিলেন। তাঁর এক ভাইঝির বিয়ে, তিনি দরিদ্র, শিষ্যরা তাঁকে সাহায্য না করলে এই দায় থেকে উদ্ধার পাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না এই কথাই তিনি বলেছিলেন। সব শিষ্যই তাঁকে কিছু কিছু সাহায্য করেছে। বাবা পিসিমা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। বাইরে এসে ফিসফিস পরামর্শ হ'ল। বাবা বোধ হয় সামান্য কিছু দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। ইতিপূর্ব্বেও পূজা-পার্ব্বণ উপলক্ষ্যে গুরুদেবকে কিছু কিছু অর্থসাহায্য করতে হয়েছে। সেইজন্যে বাবা আর এই প্রস্তাবকে তেমন প্রসন্নতার সঙ্গে নিতে পারছেন না। তা ছাড়া আগরপাড়ার ওই জমিটা কিনতে গিয়ে তাঁর হাতও এখন খালি। পিসিমার ভক্তি-বিশ্বাস তখন এমনই অটল যে, তিনি পারলে তাঁর সর্ব্বস্ব উজাড় করে দিতে পারলেই খুশী হন। কিন্তু তিনি গরীব তাঁর তোরঙ্গে বিধবার শেষ সম্বল যা ছিল তাই তিনি থমথমে মুখে বার করে আনলেন। বাবাও কিছু দিলেন। সব মিলিয়ে শ'তিনেক হ'ল। আমাদের তখনকার অবস্থা

টাকার দাম অনেক! বাবার দোকান তখন এতটা ফেঁপে ওঠে নি। গুরুদেব কিন্তু টাকার পরিমাণ দেখে খুব একটা খুশী হ'লেন তা মনে হ'ল না।

কিন্তু আস্তে আস্তে তাঁর সেই প্রচণ্ড মহিমার জ্যোতি নিষ্প্রভ হয়ে যেতে লাগল। তাঁর রংয়ের জেল্লা যেমন ম্লান, তেমনি নিভল তাঁর দোর্দ্দণ্ড দাপট। এর কারণ মায়েদের মধ্যে আলোচনা থেকে যা বুঝতাম তা হ'ল গুরুদেবের আর্থিক অবস্থা এখন সুবিধের নয়। মেয়েগুলি বড় হয়েছে, বড় ছেলেটি কোথায় একটা কাজে ঢুকেছে কিন্তু মাইনেপত্তর যৎসামান্য। শিষ্যদের ভক্তি এখন কমে গিয়েছে, তাই যে যার জ্বালায় জ্বলছে, পিতৃ-পিতামহের গুরুদেবকে ভক্তিশ্রদ্ধা জানাবার আগ্রহ-উৎসাহে এখন ভাঁটা পড়ে গিয়েছে। এই সব কারণে গুরুদেবের দিন চলা হয়ে উঠেছে কঠিন। এখনকার লোকে ঠাকুরদেবতার চেয়ে কাজকর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে বেশী ঝুঁকেছে, মন্দিরে না গিয়ে, যাচ্ছে আপিস-কাছারিতে, যেখানে দুটো পয়সার সংস্থান হ'তে পারে। কালের হাওয়া বদলাচ্ছে, বাপ যেখানে সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়ত পায়ে, ছেলে সেখানে কষ্টে-সৃষ্টে শুষ্ক হাসি হেসে হাত তুলে নমস্কার করছে।

সীতুদাকে বললাম, 'কি গো গুরুদেব ত শাপ দিয়ে ভস্ম করতে পারেন আর নিজের দরকারে ফুসমন্তরে কতকগুলো নোট তৈরি করতে পারছেন না? মাটি খুঁড়ে একটা সোনার খনি খুঁজে নিলেই ত পারেন।' সীতুদা চোখ-মুখ খিঁচিয়ে বলল, 'যা যা, মেলা বকিস নি। ওঁরা হ'লেন ত্যাগী মহাপুরুষ, নিজের জন্যে কিছু করেন না। তাই যদি হ'ত একদিন গাড়ি হাঁকিয়ে আসতেন আমাদের বাড়ী। অমন ধুলো পায়ে রুক্ষু জটা নিয়ে হাজির হতেন না। আসলে ওঁদের প্রাণ কাঁদে অন্যের জন্যে। তবে এটুকু জানিস' —সীতুদা চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলত, 'ওই কমণ্ডলুর জল যদি কারুর গায়ে ছিটিয়ে দেয় না ব্যস্, আর দেখতে হচ্ছে না— অমনি সব ফরসা! ভুস্ করে সব তলিয়ে যাবে।' সীতুদা বলত, আমরা সব হাঁ করে শুনতাম কিন্তু একটু যেন অবিশ্বাসের ছোঁয়া থাকত তার মধ্যে। সত্যিই যদি ওঁর এত ক্ষমতা, তা হ'লে নিজের জন্যে কিছু করতে এত দ্বিধা কেন? এই কষ্টভোগ, অন্যের কাছে নিজেকে হেঁট করার চাইতে নিজের ব্যবস্থা নিজে করে নেওয়া কি কম গৌরবের নয়? আমার ভাবতাম ... শক্তিময়তা আছে যা কি না এই সাংসারিক কষ্টের কাঁটা-গুলিকে ম্লান করে দিয়ে হাসতে থাকে। বাইরে যা দেখি সেটাই হয়ত সব নয় কিংবা আমরা যাকে উপবাসের কষ্ট বলে মনে করি আসলে তা হয়ত বৈরাগ্যের রুক্ষতা।

অল্প দিনের মধ্যেই দেখলাম তাঁর অবস্থা আরও খানিকটা নীচে গড়িয়ে গেল। চোখের কোল গভীর হ'ল, জটায় আরও পাক ধরল। মা'র মুখে শুনলাম তিনি দেনা করে মেজ মেয়েটির বিয়ে দিয়েছেন। এখন সেই চড়া সুদের টাকা গুনতে ওঁর প্রাণান্ত হচ্ছে। এদিকে অন্য দু'টি মেয়েও মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠছে। তাদের বিয়ের কথাও ভাবতে হচ্ছে এখন থেকে। এখনও গুরুদেব এলে তাঁর সামনে যথারীতি মিষ্টান্নের থালা ও তাঁর প্রাপ্য দক্ষিণার ক'টি রৌপ্য মুদ্রা তাঁর সামনে সাজিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁর সেই একনিষ্ঠ অটল ব্যক্তিত্ব, সেই একনিষ্ঠ মন্ত্রোচ্চারণ আর তেমন করে মনকে মুগ্ধ করে না। কেমন একটা ধোঁয়াটে আচ্ছন্নতা, সব কিছুর মধ্যে তাঁর সেই টাকাগুলো গুনে ট্যাকে পোরার দৃশ্যটাই প্রবল হয়ে চোখে পড়ে। আমাদের সঙ্গে দু'টি-একটি কথা বলেন। একদিন আমার মাথায় হাতও রেখেছিলেন, 'ক'টায় উঠছিস আজকাল?' 'আজ-কাল ও খুব ভোরে ওঠে,' পিসিমা আহ্লাদ করে বলে-ছিলেন। 'ভাল, খুব ভাল। ভোরে উঠতে হবে, শরীরটাকে গড়তে হবে মজবুত করে। জীবনে দুঃখু আছে অনেক'— বলেই সঙ্গে সঙ্গে আনমনা হয়ে গেলেন, জানলা দিয়ে কোন দূর লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে রইলেন উদাস চোখে।

কিন্তু এর পর এমন একটা ঘটনা ঘটল যার জন্যে আমরা কেউ-ই প্রস্তুত ছিলাম না। আমরা আমাদের সেই বয়স থেকেই বুঝতে শিখেছিলাম যে, বাস্তব জীবনের ঘটনা মাঝে মাঝে কল্পনাশক্তিকেও তাক লাগিয়ে দেয়। সীতুদা যে চিরকালই আমাদের মধ্যে সবজান্তা সেজে বেড়ায় সে-ও পর্য্যন্ত হাঁ হয়ে গিয়েছিল ব্যাপারটা দেখে।

সেটা ছিল একটা শীতকালের সন্ধ্যে। আমরা সব রেলের মাঠে ফুটবল পিটে বাড়ী ফিরেছি। নিয়ম ছিল, অন্ধকার হবার আগে বই খুলে বসতে হবে টেবিলে। সেই রকম ভাবে বই নিয়ে আমরা সব বসে আছি, এমন সময় দরজা দিয়ে কে একজন বাড়ীতে ঢুকল। এমন ভাবে ঢুকল

যেন এ বাড়ী তার বিশেষ চেনা কিন্তু আমরা আগন্তুককে দেখে ঠিক চিনতে পারলাম না। অবশ্য সদরের আলোটা জ্বালা না থাকায় মুখটাও ঠিক দেখা যাচ্ছিল না। লোকটি দরজার কাছে এসে দাঁড়াতে আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ কারও মুখে কথা নেই। হঠাৎ সীতুদা সবাইকে ডিঙ্গিয়ে এক লাফে তাঁর পায়ের ওপর গিয়ে পড়ল। তখন আমরা যেন চমকে জেগে উঠলাম ঘুম থেকে। আরে, এ যে গুরুদেব!

কিন্তু একি চেহারা হয়েছে তাঁর! সেই বিশাল জটা-দাড়ি সব অন্তর্হিত! ছাঁটা চুল, গায়ে খদ্দরের জামা, পরনে ধুতি। কে তাঁর সেই রক্তাম্বর ছিনিয়ে নিল! মুখে শান্ত হাসি, সেই রুদ্রতাকে এমন ভদ্র করে ছোট করে আনল কে?

গুরুদেব ধীরে ধীরে প্রবেশ করলেন, আগে তিনি সোজা হনহন করে ওপরে চলে যেতেন, কোনদিকে দৃকপাত করতেন না। আজ কিন্তু কুণ্ঠিত পদক্ষেপে ভেতরে ঢুকে একটি চেয়ারে বসে পড়লেন। চিন্তামগ্ন, ঈষৎ কৃশ গম্ভীর মুখ তাঁর। কার মুখে খবর পেয়ে পিসিমা তড়িঘড়ি নেমে এলেন। কিন্তু গুরুদেবের এই নতুন চেহারা দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন দরজার কাছে। গুরুদেবের মুখে একটা ম্লান হাসি ফুটে উঠল। নিজেকে সামলে কাছে এগিয়ে এসে পিসিমা বললেন, 'একি বাবা, আপনি!'

গুরুদেবের হাসিটা তেমনি জেগে রইল। আস্তে নীচু গলায় বললেন, 'হ্যাঁ, এই একবার এলাম। আমার এই জামা-কাপড়···খুব অবাক হয়েছ না?' বলে মাথা নীচু করে হাসতে লাগলেন।

লক্ষ্য করলাম তখনও পিসিমা ঝপাং করে ঝাঁপিয়ে পড়েন নি তাঁর পায়ের ওপর। 'একটা কাজ পেয়ে গেলাম,' গুরুদেব মাটির দিকে তাকিয়ে লজ্জা-লজ্জা মুখে বললেন, 'অশ্বিনী, আমার সেই বাগবাজারের শিষ্যই ঢুকিয়ে দিল···। তা কাজে-কর্ম্মে পোষাকটাও ত তেমনি হওয়া দরকার।' 'বাবা!' পিসিমা হঠাৎ আর্ত্তনাদ করে উঠলেন। কাটা মাছের মত ছটফট করে উঠে বললেন, 'আপনি শেষে—!' এতক্ষণে পায়ের ধূলো নিলেন তিনি হেঁট হয়ে। ছোকা আমার কানে কানে বলল, 'আবার টাকা নিতে এসেছে। বাবা বলেছে এবার টাকা চাইলে বার করে দেবে ঘাড় ধরে।' সীতুদার দিকে তাকালাম। সেও চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের বাইরে এসে চোখ মুছতে মুছতে পিসিমা বললেন, 'হাজার হোক গুরুদেব, বংশের ধারা ত রক্ষা করতে হবে।' ওপরে উঠে গেলেন তিনি। সমস্ত বাড়ীতে একটা থমথমে ভাব। বাবা রাগ-রাগ মুখে বললেন, 'ভাল আপদ হ'ল দেখছি। বছরে দশ বার করে আসবে। আর মুঠো মুঠো টাকা নিয়ে যাবে। একি বাপের জমিদারী নাকি!' পিসিমাকে বললেন, 'ত্যাখ্‌ একটা বুদ্ধি খাটাই। আমি আর সামনে যাব না, তা হ'লেই আবার কাঁদুনি গাইবে।' পিসিমা ঘাড় নেড়ে চলে এলেন ভাঁড়ারে। জলখাবারের থালা সাজাতে সাজাতে তিনি সহস্রবার ধিক্কার দিলেন নিজের ভাগ্যকে। মা সব শুনে গালে হাত দিয়ে বললেন, 'এমন কাণ্ড আমরা জীবনে শুনি নি!' পিসিমা ধরা গলায় বললেন, 'সে যাই হোক, এসেছেন যখন তখন ত চাইবেনই কিছু। তুমি দেখ ত শেতলাপুজোর জন্যে যে টাকাগুলো তোলা আছে, তা থেকে···।' পিসিমা খাবারের থালা নিয়ে নীচে নামতে লাগলেন। আমরাও তাঁর পিছু পিছু হুড়দাড় করে নেমে এলাম। এ যেন বেশ একটা মজা হচ্ছে, ভালুক নাচের মত অনেকটা!

আমাদের দেখে তাঁর মুখ একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, এই যে, পড়াশুনো করছিস ত? বেশ। এখন ক'টায় উঠছ তোমরা সব?'

'আমি এখন খুব ভোরে উঠছি,' সীতুদা বলল। কিন্তু ছোকা ঠোঁট ফুলিয়ে বসে রইল ও-কোণে। সে আটটার আগে লেপ ছাড়ে না কোনদিন। তা শুনে গুরুদেব হাসলেন, বললেন, 'তা হ'লে ওর সঙ্গে আমার আড়ি। যারা ভোরে ওঠে, শরীর শক্ত করে, তারা আমার বন্ধু। শোন, জীবনে অনেক দুঃখু পাবি, কিন্তু ডরবি না।'

এমন সময় ফল-মিষ্টির থালা এসে গেল। টেবিলের ওপরটা হাত দিয়ে মুছে থালাটা সেখানে রাখলেন পিসিমা। গুরুদেব বললেন, 'আবার এসব কেন? দাও, এদের সব ভাগ করে দাও।' বলে আমাদের দেখিয়ে দিলেন। 'আমি ক্যান্টিনে খেয়ে বেরিয়েছি।' এই বলে তিনি নিজে আমাদের হাতে ফল-মিষ্টি সব তুলে দিলেন। আমি পেলাম মুগের নাড়ু টা, সীতুদা ক্ষীরের বরফি, ছোকা পেল দুটো দানাদার। 'ওকি, আপনি যে কিছুই খেলেন না!' পিসিমা

বললেন। 'এই যে আমি খাচ্ছি,' বলে তিনি বাদাম টুকরোটা মুখে ফেলে দিয়ে চিবুতে লাগলেন। আর আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন। দাড়ি-গোঁফ ছাড়া তাঁকে একেবারে অন্য মানুষ, অনেক সহজ আর শিশুর মত লাগছিল। বাবা ইতিমধ্যে পেছনের দরজা দিয়ে দোকানে চলে গিয়েছিলেন। 'দাদা বাড়ী নেই,' অন্ধকার মুখে আঁচলের গেরো খুলতে খুলতে পিসিমা বললেন, 'আর আমাদেরও খুবই টানাটানি যাচ্ছে। বেশ কষ্টের সঙ্গেই বললেন পিসিমা। 'না না, থাক!' গুরুদেব হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন, তাঁর মুখে সেই পুরণো দীপ্তির ছোঁয়া দেখলাম। হাত নেড়ে ম্লান হেসে বললেন, 'এ সবের আর দরকার নেই। না না, সত্যি বলছি, আমি শুধু ওদের একটু দেখতে এসেছিলাম।' এই বলে আমাদের সবাইকে ঘরে রেখে গুরুদেব বেরিয়ে গেলেন।

সীতুদা বলল, 'দেখলি সবাইকে কি রকম বোকা বানিয়ে গেল! বলেছিলাম না, ওদের ক্ষমতা অনেক!'

আগামী বৈশাখ হইতে

নিয়মিত বিভাগ

'বিশ্ব-সাহিত্য'

কাংড়া—বজ্রেশ্বরী মন্দির

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

টাইম টেবলে দেখেছিলাম—জ্বালামুখী রোড স্টেশন থেকে কাংড়া মাত্র দশ মাইল। বড় জোর এক ঘণ্টার পথ। ঠিক করেছিলাম বাসেই যাব ওটুকু পথ। কিন্তু বাসের টিকিট কিনে হিসাবের ভুলটা ধরা পড়ল। জ্বালামুখী রোড থেকে মন্দিরের বাস ভাড়া নিয়েছিল পনেরো আনা—দূরত্ব তের মাইল। কিন্তু মন্দির থেকে কাংড়ার ভাড়া লাগল এক টাকা এগারো আনা। দশ মাইল নয়, তেইশ মাইলের ভাড়া। এ মন্দির থেকে ও মন্দির—রেল লাইনের বুড়ী না ছুঁয়ে যাওয়ার উপায় নাই। পাঠানকোট থেকে যোগিন্দর নগর পর্যন্ত রেললাইন আর বাস-পথ পাল্লা দিয়ে ছুটেছে। ঠিক পাশাপাশি নয়—কখনও ডান ধারে, কখনও বামে, কখনও নীচেয়, কখনও বা উপরে মাঝে মাঝে হারিয়ে গেছে—আবার আচম্বিতে সামনে এসে পড়েছে। দৌড়ের পাল্লায় দু'টি পথের লুকোচুরি খেলাটা বেশ জমেছে। এই খেলাতে আবার যোগ দিয়েছে নদী। সে এঁকে-বেঁকে বড় বড় পাথর-নুড়ি টপকে সকলের নীচে দিয়ে ছুটেছে। নামবার সময় এরা তিন সঙ্গীতে একমুখী, উর্দ্ধারোহণে নদী বিপরীতগামিনী। কাংড়ার নদীর নাম বনের। নামটা বলেছিলেন বৈজনাথ ধরমশালার পণ্ডিতজী। ইতিহাস খুঁজলে এর ভদ্রগোছ একটা নাম হয়ত মিলবে, কিন্তু বনের নামটিই বনঝোপ-ভরা পাহাড়ী নদীর পক্ষে মানানসই। এখন বর্ষাকাল নয়, নদীর জলধারা অত্যন্ত ক্ষীণ-অদৃশ্যপ্রায়। এর সর্বদেহে প্রস্তর-পঞ্জরাস্থি সুপ্রকট—রূপলাবণ্যহারা নদী। বর্ষাকালে এর সর্বনাশী রূপের সঙ্কেত দু'চারশো ফুট নীচেকার প্রস্তর-আকীর্ণ কায়াতে এখনও বিদ্যমান।

আমাদের বাসটা ফিরে আসছে—তের মাইলের মত সেই পুরাতন পথ ধরে জ্বালামুখী রোড স্টেশনে। গন্তব্যস্থান ধরমপুর। মাঝখানে কাংড়া শহর। জ্বালামুখী রোডের সেই চায়ের দোকানের সামনে বাস থামল। যে মজুরটি মন্দিরে যাবার দিন আমাদের মালপত্র বাসের মাথায় তুলে দিয়েছিল—তার সঙ্গে চোখাচোখি হ'তেই সে পরম আত্মীয়ের মত ঘাড় কাত করে হাসলে। কত সামান্য—অথচ কি অনির্বচনীয় এই ভাব-প্রকাশ। কতকগুলি দুর্লভ মুহূর্ত বুঝি জন্ম-জন্মান্তরের সঙ্গে প্রীতির সুতো দিয়ে এমনি করে বাঁধা থাকে। না হ'লে এক দেশের মানুষের দৃষ্টি অপর দেশের মানুষের মনে খুশির ঢেউ তোলে কেন।

মিনিট দশ থেমে বাস ছুটল নূতন পথে। এ বাস সরকারী নয়, কিন্তু সঠিক সময় ধরে চলে। কন্‌ডক্‌টার-ড্রাইভার অধিকতর নির্ভরযোগ্য। বাস মজবুত, সুন্দর—আরামদায়ক গদিমোড়া আসনগুলি। প্রত্যেক আসনে নম্বর দেওয়া। সমস্ত আসন ভর্তি হয়ে গেলে বাড়তি লোক নেয় না। বাসের মাথায় চাপান থাকে মালপত্র—এর জন্য আলাদা ভাড়া লাগে না। তবে পণ্যদ্রব্যের মাশুল দিতে হয়।

আমার পাশেই বসেছিলেন এই দেশের একজন সম্রান্ত ব্যবসায়ী। ভদ্র বেশবাস মার্জিত রুচির মানুষ। দেবদ্বিজে ভক্তিমান, কিছু কিছু তীর্থ ভ্রমণও করেছেন। উনি ধরমপুরে চলেছিলেন। ধরমপুরে দর্শনীয় কি আছে জিজ্ঞাসা করায় জানালেন ওখানে কয়েকটি সরকারী ও বেসরকারী দপ্তর আছে। জল হাওয়া ভাল। স্বাস্থ্যের জন্য অনেকে হাওয়া বদলাতে যান।

আমরা কাংড়া যাচ্ছি দেবী-দর্শনে শুনে প্রীত হ'লেন। বললেন, আমি কলকাতায় গিয়ে কালীঘাটে দেবী-পীঠ দর্শন করেছি। ইচ্ছা আছে কামরূপে যাব।

কামরূপে যাবার রাস্তা ও ভাড়ার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। পথটা মোটামুটি বাৎলে দিলাম, ভাড়ার কথা আন্দাজ মতও বলা সম্ভব হ'ল না। ভাড়া ত দফায় দফায় বাড়ছে। সামনে পয়লা জুলাই (১৯৬২) থেকে আর এক দফা বাড়বে।

অতঃপর কাংড়ায় কোথায় উঠব জিজ্ঞাসা করাতে উনি বললেন, আপনি যখন তীর্থযাত্রী, মন্দিরের কাছাকাছি থাকবেন।

স্টেশন থেকে মন্দির কতদূর?

উনি বললেন, যদি কাংড়া শহরের বড় স্টেশনে নামেন মন্দির দূর পড়বে। দু'মাইলটাক হবে। আপনি মন্দিরের কাছেই যে স্টেশন আছে সেইখানে নামবেন। মন্দিরের গায়েই পাবেন ধর্মশালা।

বললাম, কাংড়া তা হ'লে ত বেশ বড় শহর ?

উনি উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন, হবে না—এটা যে জেলা শহর! এখানে পুরণো কেল্লা আছে, স্কুল-কলেজ আছে, আদালত আছে ফরেস্ট আপিস আছে—সরকারের আরও অনেক দপ্তর আছে। রেল-স্টেশনও আছে দুটো, একটা কাংড়া আর একটা কাংড়া মন্দির। অনেকখানি চওড়া সমতল জায়গা, মনে হবে পাঞ্জাবের কোন বড় শহরে রয়েছেন।

বললাম, কিন্তু এখানে পাঞ্জাবীদের খুব কমই দেখছি।

হ্যাঁ, এ দেশে বেশীর ভাগ মানুষই রাজপুত। পাঞ্জাবীদের সঙ্গে এদের মিল কম। এই দেখুন না, আপনাদের বাঙালী মেয়েদের মত এদেশের মেয়েরাও হাতে লোহা পরে, মাথায় সিঁদুর দেয়। এদের পোষাক-পরিচ্ছদও পাঞ্জাবীদের থেকে আলাদা। খাওয়ার ধরনও এক নয়।

এরা কি রাজপুতানা থেকে এসেছিল ?

উনি বললেন, শুনি ত—আরও উত্তর থেকে এসেছিল। মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে হটে গিয়ে এদিকে এসেছিল। সে অনেককাল আগেকার কথা।

ইতিহাসের তথ্য উনি জানতেন না—প্রসঙ্গটা আর ওদিকে টানলেন না। বললেন, এ-শহরে মানুষজন বড় কম নয়, বাড়ী-ঘর-দুয়ারও প্রচুর।

বললাম, এখন কিন্তু এই পথ দিয়ে যেতে যেতে তা মনে হচ্ছে না। একধারে খাড়াই পাহাড় অন্যধারে গভীর খাদ। মাঝে মাঝে অবশ্য ক্ষেত-খামার দেখছি। আমবন, বাঁশবন, চাষ-আবাদ—সমতল জায়গার মতই মনে হচ্ছে, বাড়ীঘর তেমন দেখছি না।

উঁচু নীচু জায়গা ত, সবটা একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে না। গাড়ি এখনও শহরের বাইরে রয়েছে। শহরে এলে দেখবেন—দু'ধারে কত বাড়ী-ঘর, কত লোকজন।

প্রাসাদ অট্টালিকা দেখার কৌতূহল ছিল না। এই নূতন ধরনের পথই মনকে টেনে রেখেছে। বাঁকা-চোরা উঁচু-নীচু পথে দোলা দিতে দিতে চলেছে বাস—যেন নাগরদোলায় চেপে দোল খেতে খেতে চলেছি। এক একটা বাঁক ঘুরে নূতন এক একটি দৃশ্যের মধ্যে আসছে বাস। বাঁকের মুখে জমি কখনও সঙ্কীর্ণ হচ্ছে, কঠিন উদ্ধত পাহাড় বাসের বুক চেপে এগিয়ে আসছে, ভয়াল ভ্রূকুটি ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে নদীর খাদ—পরক্ষণেই বাঁক ঘুরে অতি-বিস্তৃত শস্যক্ষেত্রের উদার অভয় হাসি আশ্বস্ত করছে যাত্রীদলকে। আবার দু'একটি আমগাছ, কখনও ঘন বাঁশঝাড়, কখনও বা চিড় গাছের সুপরিচ্ছন্ন বিন্যাস আর বুনো ফুলের রূপসৃষ্টি দৃষ্টিকে মুগ্ধ করছে। মাঠের বুক চিরে পায়ে-চলা গ্রামের পথ চলে গেছে কতদূরে—পাহাড়ের ভৃগু-স্থানে ছাগল চরছে নির্ভয়ে—গরুর পাল তৃণ-সন্ধানে ভূমিলগ্ন মুখ···কাংড়া উপত্যকায় বাংলা দেশের ছায়া ভাসছে মাঝে মাঝে। আর একটি আশ্চর্য দৃশ্য—এক রকম ফুলের প্রাচুর্য এই উপত্যকায় যত এগিয়ে যাচ্ছি—ততই দু'ধারে চোখে পড়ছে। গাছগুলি বড় বড়, লম্বা লম্বা পাতার ফাঁকে নীলাভ, ফুল, ঢোল্-কলমীর বৃহৎ সংস্করণ। সবুজের সঙ্গে নীলের মিশ্রণ ভারি চমৎকার লাগছে। ফুলের নাম শুনেছিলাম বৈজনাথে পণ্ডিতজীর মুখে—গাগেুলা।

বাসের দোলা কিন্তু সকলের পক্ষে সুখপ্রদ নয়। একজন যাত্রী ত অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছেন দেখছি। একটু এগেই মেয়েটি বমি করতে সুরু করল। পাশের যাত্রীরা অসুবিধায় পড়লেন। কিন্তু বিরক্তিসূচক মন্তব্য করলেন না কেউ। পাহাড়ী পথে বাসের মধ্যে এসব যেন নিত্যদিনের ঘটনা। একে বলে 'চক্কর' লাগা।

বাসে বসেই কাংড়ার পুরণো কেল্লা দেখলাম। এখানে বেশ কিছুক্ষণ থামল গাড়ি। কিছু যাত্রী নেমে গেল।

বহু পুরাতন দুর্গ—পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু জায়গায় পুরণো ধাঁচে তৈরী। সেকালের নিয়ম অনুযায়ী যতখানি দুর্ভেদ্য করা সম্ভব—তা করা হয়েছিল। হাজার ফুট নীচেয় নদীগর্ভ থেকে খাড়াই উঠে গেছে দুর্গ-প্রাচীর, চারিধারে লুপ্ত পরিখার চিহ্ন, দুর্ভেদ্য পাথরের অতি চওড়া দেওয়াল। সেকালে গোলাবারুদের চলন ছিল না, উন্নততর রণ-প্রণালী ছিল অজ্ঞাত—সেইকালে, প্রায় হাজার বছর আগে এমনি একটি সুদৃঢ় দুর্গে আশ্রয় নিয়ে নিজেকে নিরাপদ করতে চেয়েছিলেন শাহী বংশের হিন্দু রাজা আনন্দ পাল। এই শাহী বংশ ছিল ভারত সীমান্তের সজাগ প্রহরী। এই বংশের কীর্তিমান রাজা জয় পাল সবুক্তগিনের সময় থেকে তুর্কী আক্রমণ প্রতিরোধ করার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। তুর্কীর উন্নততর রণপ্রণালী ও ক্ষিপ্রগতির জন্য তাঁকে বারবার পরাজয় বরণ করতে হয়। সবুক্তগিনের মৃত্যুর পর সুলতান মামুদও বারবার ভারত লুণ্ঠন করেছিলেন শাহী রাজধানীর মাঝখান দিয়ে। সেই পথ শাহী রাজারা সর্বস্ব বিনিময়ে রোধ করার চেষ্টা করেছিলেন। শাহী বংশ ধ্বংস হয়েছিল সেই সংঘর্ষে। তবু নতি

স্বীকার করেন নি। জয় পালের পুত্র আনন্দ পালের সঙ্গে কয়েকবার সংঘর্ষ বেধেছিল সুলতান মামুদের। শেষ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আনন্দ পাল আশ্রয় নিয়েছিলেন কাংড়া দুর্গে। তাঁকে অনুসরণ করে মামুদ এসেছিলেন কাংড়ায় এবং তাঁর হাতে এই জনপদ লুণ্ঠিত হয়েছিল নির্মমভাবে। এর পর এই দুর্গের গুরুত্ব তেমন ছিল না।

এই দুর্গের পর মাইল খানিক ঘন বসতিপূর্ণ রাস্তা দিয়ে বাস চলল। সমতল-লভ্য একটি পূর্ণাঙ্গ চেহারার শহরকে দেখলাম। এই শহরের মাঝখানেই আবার বাস থামল। বেশ বড় মত জমকালো স্টেশন—রেলওয়ে স্টেশনের মতই সুব্যবস্থা। এটি মণ্ডি-কুলু ট্রানসপোর্ট কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠান। বেশ বড় প্রতিষ্ঠান, গাড়িগুলি চমৎকার, নিয়মানুবর্তিতা প্রশংসনীয়। চালক ও কণ্ডাক্টরদের দক্ষ চালনায় ও সৌজন্যে যাত্রীদল প্রীত।

বাস থামলে সহযাত্রী ভদ্রলোক হাঁকাহাকি করে একটি মজুর ঠিক করে দিলেন। তাকে বুঝিয়ে বললেন, ইনি বিদেশী মানুষ, আমাদের অতিথি, এঁকে একটা ভাল ধর্মশালায় পৌঁছে দেবে।

আমার দিকে ফিরে দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে বললেন, নমস্তে।

প্রকাণ্ড একটা ময়দান আড়া-আড়ি পার হয়ে এলাম। এদিকের রাস্তাটা ঈষৎ উঁচু হয়ে উপরে উঠেছে—সামান্যমত একটা চড়াই। পথের ধারে জলের কলে ভিড় জমেছে মন্দ নয়। জল চলে যাবার সময়ই হয়ত হয়েছে।

তেমাথায় এসে মজুর একটি পুরাতন বাড়ীর সদর-দরজার রোয়াকে মোট নামাল। বলল, মালিকানকে বলে একটা ঘর নিয়ে নিন।

মাত্র চার-পাঁচখানি ঘর নিয়ে একটা ইমারত, চেহারা অত্যন্ত পুরাতন। সঙ্কীর্ণ উঠোন নোংরা আবর্জনায় ভর্তি। ঘরের ছাদ আর বারান্দা পাথরের টালি দিয়ে ছাওয়া—আকাশের আলোও সেই ছাউনির ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মারছে। জলের ব্যবস্থা দেখলাম না, শৌচাগারের কথা না বলাই ভাল। এটা আদৌ ধর্মশালা কি না কে জানে!

পছন্দ হ'ল না। মজুরকে বললাম, দোসরা ধর্মশালায় চল।

মজুর মাথা নেড়ে বলল, মন্দিরের কাছে ধর্মশালা এই একটি।

এমন বড় শহরে—ধর্মশালা এই একটি—আর তার এমন দুর্দশা! এদিক-ওদিক চেয়ে দেখি রাস্তায় মানুষজন চলছেই না—দু'ধারে দোকান-পাট বন্ধ। আজ রবিবার, দোকান-কর্মচারীদের ছুটি। কাকে যে জিজ্ঞাসা করি ভাল একটি আশ্রয়স্থানের কথা। মজুরের মেজাজটিও খুব মোলায়েম বলে বোধ হ'ল না। সারা কাংড়া ও কুলুতে দু'টি মাত্র মজুর দেখেছিলাম, যারা উচিত পারিশ্রমিক নিয়েও খুঁতখুঁত করেছিল এবং বিদেশীর জন্য কষ্ট স্বীকারে পরাঙ্মুখ ছিল। এ কিন্তু পারিশ্রমিক নিয়ে গোলমাল করে নি, আমাদের একটি ভাল আশ্রয়ে স্থিত করার পরিশ্রমটুকু স্বীকার করতে চায় নি।

গত্যন্তর ছিল না—প্রাপ্য নিয়ে মজুর চলে গেল—আমরা ধর্মশালাতেই রয়ে গেলাম।

ধর্মশালার মালিকান এখানেই ছিলেন। নীচের একটা ঘরে ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকেন তিনি। বিধবা, রোগে কিছু কাতর। মনে হ'ল বাত-জাতীয় কোন রোগে ভুগছেন। তারই ব্যথায় এক একবার কাতরোক্তি করছিলেন।

তাঁকে জলের কথা জিজ্ঞাসা করলাম।

ধর্মশালার বার-উঠানে প্রকাণ্ড একটা ইঁদারা দেখিয়ে দিলেন। বহুকালের অব্যবহার্য পুরণো ইঁদারা—সে জল পান করা ত দূরের কথা চোখে-মুখে দেওয়াও চলবে না। তা ছাড়া জল তোলবার সাজসরঞ্জাম কই! দড়া বা বালতি কিছুই দেখলাম না। শুধু ইঁদারা দেখে ত জলের অভাব মিটবে না।

উনি বললেন, জলের কল রয়েছে কাছে—তাই কেউ ইঁদারার জল তোলে না। না হ'লে এমন ইঁদারা এ তল্লাটে—

সে গুণ-কীর্তন শোনার ধৈর্য ছিল না—বললাম, এখন জলের কি ব্যবস্থা হবে?

উনি বললেন, তোমাদের দু' কলসী জল দিচ্ছি, রান্না-খাওয়া কর। আর বেলা একটার সময় কলে জল আসবে, সেই সময় জল ভরে নিও।

বললাম, পথে আসবার সময় ত দেখলাম কলে জল রয়েছে।

বললেন, ওটা নীচু জায়গা বলে জল রয়েছে। এ পথটা যে অনেকখানি চড়াই, বেলা দশটার পর চার-

পাঁচ ঘণ্টা জল পাওয়া যায় না। তা এখন নীচের থেকে জল আনতে পারবে কি?

দুটো জলের কলসী উনি এগিয়ে দিলেন।

জায়গাটা ভাল করে দেখবার জন্য খিড়কি দুয়োরটা খুলে ফেললাম। ঐখানেই ইঁদারাটা রয়েছে। অব্যবহার্য ইঁদারার পাড় ও উঠোন আবর্জনায় ভর্তি। সেই আবর্জনাস্তূপে কয়েকটা মুরগী উড়ে বেড়াচ্ছে—উঁচু ঢিবিটায় উঠে দুটো ছাগল গলা বাড়িয়ে একটা কলাগাছের পাতা ধরে টানাটানি করছে। একটু পরে দেখি দুজন লোক ইঁদারার পাশ দিয়ে ওধারের বসতির মধ্যে চলে গেল। ইঁদারাটা মনে হ'ল সরকারী সম্পত্তি। জলের কল না হওয়া পর্যন্ত এর কদর ছিল। এর পর থেকে কাঁচা গলিপথটা ওধারে একটা দুর্দশাগ্রস্ত পল্লী পর্যন্ত চলে গেছে। পাড়াটাও খুব ভাল বলে বোধ হ'ল না।

অপ্রসন্ন চিত্তে আকাশের পানে চাইলাম আর বলব কি, তৎক্ষণাৎ সমস্ত ক্ষোভ গ্লানি অসন্তোষ ধুয়ে-মুছে নিঃশেষ হয়ে গেল। মাটির পরিবেশ যত নোংরাই হোক—আকাশ-পটভূমিটির তুলনা নাই! সে আকাশ পরিবেশে নীলকান্ত মণির মত উজ্জ্বল বলে নয়—তার কোলে মহান হিমবন্তের অপরূপ বিন্যাস আমার সব অশান্তিকে মুহূর্তে দূরে ঠেলে দিলে। উত্তরের দিক-মণ্ডলে হিমালয়—স্তরে স্তরে শিখরের তরঙ্গ তুলে আকাশের কোলে মাথা তুলেছে বিশাল একটা সমুদ্রের মত। ধূসর শৈলের ঊর্দ্ধদেশে শ্বেত উত্তরীয়—শিরোদেশে শুভ্র তুষার কিরীট। উত্তর দিকের সবটাই চিত্রলেখাবৎ। জ্বালামুখীতে এমন ধবল শৃঙ্গ-ভূষিত গিরিমালা চোখে পড়ে নি, কাংড়া মন্দিরের পাদদেশে এসে এই ছবি দেখলাম। পরে শুনেছিলাম, এইটিই ধবলাধার গিরিশ্রেণী। অস্বাচ্ছন্দ্যময় পরিবেশ আর রইল না। কবি করুণানিধানের দু'টি অমর ছত্র মুখর হয়ে উঠল:

নীল আকাশে বুলিয়ে তুলি—
তুষার শাদা শেখরগুলি
কে আঁকিল মেঘ-সাগরের গায়।

ধর্মশালায় দ্বিতীয় কোন প্রাণী ছিল না। পথের ধারের সব দোকানই বন্ধ ছিল। কেমন নিঃঝুম ভাব চারিদিকে। একটু পরে ধর্মশালার অধিস্বামিনীও ঘরে তালা লাগিয়ে বাইরে যাবার উদ্যোগ করল। যাবার আগে আমাদের বলল, আমরা মেলা দেখতে যাচ্ছি, ফিরতে সন্ধ্যে হবে। তোমরা বিকেলে ঠাকুর দেখে এস।

ধর্মশালায় দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই—পথ জনমানবশূন্য, সামান্য একটি তালার উপর ভরসা ক'রে কোন্ সাহসে দেবী-দর্শনে যাব! সন্দেহটা ব্যক্ত করতেই উনি হেসে উঠলেন

আরে—ডরো মৎ! এখানে কোন ভয় নেই, কেওয়ার খোলা থাকলেও কেউ ঘরে ঢুকবে না। আমরা দুয়োর খোলা রেখে রাতে ঘুমুই।

হাসতে হাসতে ওরা নিশ্চিন্তমনে মেলা দেখতে গেল।

আমার কিন্তু একটা কথা মনে পড়ল। জ্বালামুখীর সেই বাঙালী সাধুটি একটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, খবরদার এদেশের কাউকে বিশ্বাস করবেন না। বিশ্বাস করেছেন কি দুর্ভোগ।

কথাটা শুনেছিলাম, মনের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারি নি। জানি না ব্রহ্মচারীর কোন তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিল কি না (কৌপীনবন্ত সন্ন্যাসীর কি বস্তুই বা খোয়া যাওয়া সম্ভবপর!)। আমরা উপদেশটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করার দায়িত্ব গ্রহণ করি নি। কথায় আছে বটে অজ্ঞাত কুলশীলস্য···বিদেশ-বিভুঁয়ে মানুষকে বিশ্বাস না করতে পারার অস্বস্তিও ত কম নয়! সন্দেহ-কণ্টক যে সর্বক্ষণই ভ্রমণ-আনন্দের গায়ে খোঁচা মারতে থাকে।

ব্রহ্মচারীর কথাটা মুহূর্তমাত্র মনে উঠে মিলিয়ে গেল। বেলা পাঁচটা বাজতে-না-বাজতে আমরাও দুয়োরে তালা লাগিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ইচ্ছে করছিল, শহরটার চারধার ঘুরে দেখে আসি। সন্ধ্যার সময় মন্দিরে গিয়ে দেবী-দর্শন করব। মন্দির ত ধর্মশালার কাছেই।

মন্দিরের পথটা ধর্মশালার গা থেকেই উপরে উঠেছে। কাংড়ার দুর্গ যেমন পাহাড়ের উঁচুতে—মন্দিরও তেমনি উঁচু টিলার মাথায়। এই মন্দিরের কোন একটি জায়গায় উঠে দাঁড়ালে সারা কাংড়ার ছবি স্পষ্ট হবে। পায়ের তলায় চারধারে ঢালু পথ নেমেছে—এক একটি পথের সঙ্গে বাড়ীঘর মাঠ প্রান্তর আপিস উদ্যান, বাস স্টেশন, রেললাইন, বনভূমি, পুরাতন কেল্লা, দূর বিসর্প ক্যানভাসে ছবির পর ছবি জমে শহরটাকে পূর্ণাঙ্গ দেখায়।

বন? হ্যাঁ, রীতিমত বন আছে কাংড়ায়। বুনো বরাহ মহিষ থেকে চিতা, ভালুক এবং নানা জাতের পাখীতে পরিপূর্ণ এর অরণ্যভূমি। শিকারীদের এটা

স্বর্গ ভূমিই। আমাদের প্রিয় বাসভূমির কথাও মনে পড়িয়ে দেয়। আমগাছের ডালে দেহ ঢেকে 'বউ কথা কও' বলে সকাতর মিনতি শুনেছি—কোকিল সাধা গলায় পঞ্চমে তান ধরেছে। জুন মাসের কোকিল—চ্যুতফলরসে ভেজা গলায় স্বরটা ঈষৎ কর্কশ হয়েছে তবু বাংলার পল্লী অঞ্চলের বসন্ত-সৌন্দর্য সেই সুধাক্ষরা সুরে ধরা পড়ছে। এই উপত্যকা যেখানে বহুলাংশে সমতল, যেখানে হালে বলদ জুড়ে লাঙলের ফলার সাহায্যে চাষী ভূমি-লক্ষ্মীর প্রসাধন করছে, যেখানে বনভূমি নিবিড় শ্যামল রূপে উদ্ভাসিত, আকাশ ঘন নীল এবং স্নিগ্ধ-ছায়া আমের শাখায় কোকিল এবং 'বউ কথা কও' এরা ডাক দিচ্ছে—বাংলার রূপ আর স্বপ্ন ত সেই রঙে সুরে কল্পনায়...বাঁধা পড়ে গেছে। বাংলাও আমাদের পাছু পাছু এসেছে হিমাচল সন্দর্শনে।

আমরা প্রথমে এলাম বাস স্টেশনে সন্ধান নিতে সকালের বাস কখন ছাড়বে। স্থির ছিল—বাসে চেপে বড় স্টেশনে গিয়ে ট্রেণ ধরব। বাস আপিসে যা জানালে —তাতে সকালের ট্রেণ ধরার আশা কম। সময় তালিকা অনুযায়ী বাস ছাড়ে বটে—এটা ত কাংড়া-কুলু ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর বাস নয়—ব্যতিক্রমও মাঝে মাঝে ঘটে। দশ পনেরো বিশ মিনিটের এদিক-ওদিক হয়ই—। অতএব এর ভরসা না রেখে ছোট রেল স্টেশনটা কোন্ দিকে সেইটি জেনে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে হ'ল। সেই সন্ধান নিতে গিয়ে একটি নিম্নমুখী পথের জনস্রোতে মিশে গেলাম। যত নেমে আসি জনস্রোত ততই উত্তাল হয়ে ওঠে। পরে মনে হ'ল, ধর্মশালার কর্ত্রী বলেছিল—আমরা মেলা দেখতে যাচ্ছি —এ হয়ত তারই চেহারা। একটু লক্ষ্য করে বুঝলাম অনুমান সত্য। উৎসবের সাজসজ্জা, হাসি-গল্প বেলুন বাঁশী, গৃহস্থালীর জিনিষপত্র আর পথের দু'ধারে নানা-বিধ খাবারের দোকান ক্রমশঃই মেলার রূপটিকে সজীব করে তুলছে। এমনি করে প্রায় মাইলটাক পথ পেরিয়ে বিস্তীর্ণ একটি মাঠ পেয়ে গেলাম। মাঠের একধারে ছোট একটি শিবমন্দির—আর সর্বত্র দোকানপসার, নাগরদোলা আর মাটির হাঁড়ি কলসী ভাঁড়ে ভর্তি। সমস্ত মাঠটাই নরসমুদ্রের রূপ নিয়েছে। নাগরদোলা দু'টো আর হাড়ি কলসীর গোটা তিনেক পাহাড়—মজ্জমান জাহাজের মাস্তুলের মত দেখাচ্ছে। আর মিলিত কণ্ঠের কোলাহল সমুদ্রগর্জনবৎ মনে হচ্ছে। মাটির জিনিষগুলি নকসা-কাটা, কোনটা বা রঙের ——— ———। [illegible] বিচিত্র। এক ধরনের ভাঁড়ের উপরই যাত্রীদের আকর্ষণ বেশী দেখছি—প্রায় সকলকার হাতেই একটা-না-একটা রয়েছে। মেয়েদের সাজ-পোষাকে পাঞ্জাবী এবং রাজপুতানা দুয়ের সংমিশ্রণ। কুর্তা কামিজ চোলি ওড়না পায়জামা শাড়ীর ধরনই যে কত রকম! আর অলঙ্কার-বৈচিত্র্য ত চেয়ে দেখবার মত। এগুলি সর্ব অঙ্গেই সুপ্রতিষ্ঠিত। বিশেষ করে চরণ-যুগল ও নাসাদেশ থেকে এখনও তার নির্বাসন ঘটে নি। যে নথ চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে অধিকাংশ বঙ্গ-ললনার মুখচন্দ্রের শোভাবর্দ্ধনকারী হয়ে নাসা-দেশে দোদুল্যমান থাকত,—অধুনা পুরাতত্ত্বের বিষয়ীভূত, কাংড়ায় তারই বৃহত্তর সংস্করণ প্রায় প্রতিটি মুখচন্দ্রিমাতে সগৌরবে বিরাজমান। পায়ে পায়জোড় বা মলের চলনও মন্দ নয়। এর গুরুত্বও অসাধারণ। তেমনি গুরুভার হাতের রৌপ্যকঙ্কণ। এগুলি একাধারে অলঙ্কার ও আয়ুধ।

আমরা কয়েকটি পাড়ার ভিতর দিয়ে মেলার মাঠে এসেছিলাম। পথের প্রথমভাগে ছিল একটি সম্ভ্রান্ত পাড়া, আইনজীবীরা এখানে থাকেন। বাড়ীর গেটে নামের ফলকে ওঁদের পরিচয়টা স্পষ্ট। তারপরে সাধারণ গৃহস্থদের বসতখানা—শ্লেট পাথরের ছাদ আর বাখারিতে পুরণো টিন বেঁধে উঠোনটাকে বেআব্রু থেকে বাঁচানোর চেষ্টা। সব শেষে অতি সাধারণদের আস্তানা। এখানে ঘরের ছাউনিটাই পর্যাপ্ত নয়—তার আব্রু বাঁচানোর প্রশ্ন! সর্বত্রই নিরাবরণ সহজ ভাব—পথে আর বনঝোপে গলাগলি মিতালী। সেই সব বাড়ীর ছেলেমেয়েরা উদোম গায়ে ধুলোবালি মেখে গৃহপালিত কুকুর ছাগলের গলা জড়িয়ে খেলা করছে—পুরুষরা দড়ির চারপাইয়ে বসে হুঁকোয় তামাক টানছে ভুড়ুক ভুড়ুক শব্দে—মেয়েরা গৃহস্থালীর কাজ-কর্ম করছে সরবে। এই পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তবে মেলার হাওয়াটা সকলকারই গায়ে লেগেছে। সবাই চঞ্চল, খুশি-খুশি ভাব। সংসার-সংগ্রামের ক্লেশ ক্লান্তি দুশ্চিন্তার ছায়া আপাতত কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

আমরা ঘুরে ঘুরে মেলায় দোকানপসার দেখছিলাম। (এ ছাড়া মেলায় দেখবার কিই বা আছে!) দোকান-পসারের চেহারা দেখছিলাম—যারা সজীব করেছে মেলা, তাদের হাবভাব লক্ষ্য করছিলাম। আসমুদ্র হিমাচল, সব দেশেই মেলার গোত্র এক—মানুষের মনোবিলাসের স্বাদবর্ণ এক। সেই সংসার, সঞ্চয়; ক্ষণিকের জন্য মুক্তির ক্ষেত্রে এসে একটুখানি বৈচিত্র্য উপভোগ।

আত্মীয় বন্ধু পারাচতজনের সঙ্গে পারস্পারিক সুখ-দুঃখের বার্তা-বিনিময়। আশ্চর্য, এমন একটি জিনিস দেখছি না যা কাংড়াতে আছে—বাংলাতে, উত্তর প্রদেশে নাই।

তবে একটি আশ্চর্য জিনিষের সাক্ষাৎ পেয়ে গেলাম। একটি পানের দোকান দেখলাম। বাংলা বা অন্য প্রদেশের বাসিন্দারা ভাববেন—এ আর এমন আশ্চর্য্য কি। পান ত সারা ভারতবাসীর নিত্য ব্যবহার্য জিনিস—সর্ব শুভকর্মের প্রতীক। পান-সুপারি দিয়ে নিমন্ত্রণ করার প্রথাটা এক সময়ে সর্বত্র চালু ছিল—অতিথি সৎকারের এটি একটি অপরিহার্য অঙ্গ। পূজা-পার্বণ, মাঙ্গলিক কর্ম বার ব্রত, কোন্‌টিতে না তাম্বুল গুবাকের প্রচলন রয়েছে! ভারতবর্ষের সর্বত্র এর অপ্রতিহত প্রভাব দেখেছি—শুধু পাঞ্জাবে এসে মনে হচ্ছে, এটি দুর্লভ দর্শন বস্তু। অমৃতসরে চা সরবত সিগারেটের দোকান দেখেছি অজস্র অথচ পানের দোকান কদাচিত চোখে পড়েছে। জ্বালামুখীতে বোধ করি—দু'টি দোকান দেখেছিলাম, কাংড়াতে একটিও নয়—এই মেলাতে প্রথম চোখে পড়ল। দাম শুনে চমৎকৃত হ'লাম—একটি আস্ত পানের দাম ছ নয়া পয়সা! অথচ এই বর্ষার প্রারম্ভে বাংলা দেশে পানের অসচ্ছলতা নিয়ে একটা গ্রাম্য প্রবাদই চলে আসছে মুখে মুখে!

বেশ খানিকক্ষণ মেলায় ঘুরে আমরা ধর্মশালায় ফিরলাম।

এসে দেখি ধর্মশালার কর্ত্রী মেলা থেকে ফিরে একটি খাটিয়া আশ্রয় করেছেন। কোমরের টাটানিটা তাঁর বেড়েছে—এক একবার অস্ফুট কাতরোক্তিতে বুঝতে পারছি। কিন্তু মেলার গল্পে মেতে তিনি সেটা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনছেন না। আমাদের দেখে খুশি হয়ে বললেন, বজ্রেশ্বরী মায়ীকে দর্শন করে এলে?

না,—আমরা মেলায় গিয়েছিলাম।

এই উত্তরে উনি আরও খুশি হয়ে উঠলেন। দেখলে মেলা! ভারি আজব, নয়? এমন মেলা—এ-তল্লাটে—

নিজের নিজের দেশের উৎসব-পার্বণ নিয়ে অল্পবিস্তর গৌরববোধ সকলকারই থাকে। উনি অনর্গল বলে গেলেন সে কাহিনী।

আমি বললাম, এইবার তা হ'লে মন্দির থেকে ঘুরে আসি।

ওর আঠারো বছরের ছেলেটি খাতা কলম নিয়ে এগিয়ে এল। বলল, আপনাদের নাম-ধামগুলো লিখিয়ে দিন। কোথা থেকে আসছেন, কোথায় যাবেন—

এতক্ষণে মনের ক্ষীণ সন্দেহটি দূর হ'ল। এটা তবে ধর্মশালাই। যদিও ধর্মশালার ঘোষণা এই ইমারতের কোথাও ছিল না।

আমাদের নাম-ধাম লেখা শেষ হ'লে বলল, ধর্মশালায় কিছু চার্জ দিতে হবে। আলো, খাটিয়া, চাকর-বাকরের জন্য বকশিস—

নড়বড়ে সুইচে আঁটা একটা তার যেন দেখেছিলাম ঘরের দেওয়ালে—একটা বালবও ঝুলছিল কড়িকাঠে কিন্তু চেষ্টা করেও সুইচটাকে কায়দা করতে পারি নি, আলো জ্বলে নি। খাটিয়াও একখানা ছিল ঘরের মধ্যে। এতই ঢিলে তার দড়ির বাঁধনগুলো যে, তাতে শোবামাত্রই বিছানা-সমেত মানুষ তালগোল পাকিয়ে যাবে বলে মনে হয়েছিল। হোল্ডঅলটা শুধু তার উপর রেখেছিলাম। আর, ঝি চাকরের নামগন্ধও ত এসে অবধি দেখছি না! জঞ্জাল-ভর্তি উঠোনটার পানে চেয়ে বললাম, চাকর! তা হ'লে এগুলো এখনও এখানে কেন?

ছেলেটি বলল, চাকরাণীটা মেলায় গেছে, ফিরলেই উঠোন সাফ্ করিয়ে দেব।

আলোর কথা বলাতে—উঠে এসে সুইচটাকে দেওয়ালের সঙ্গে চেপে ধরে জ্বালিয়ে দিলে। খাটিয়াটার প্রসঙ্গ উঠতে বলল, খাটিয়া যখন ঘরে দেওয়া আছে, ওর ভাড়াটা—

বুঝলাম—কাজে আসুক চাই না আসুক নিয়মটা চালু রাখা চাই। নিয়মের আর একটি অর্থ, এই দুর্দশাগ্রস্ত আশ্রয়স্থলটি দেখে অনুমান করে নিয়েছিলাম। একথা ঠিকই—একদা দাতার সদিচ্ছার দৌলতে এই ধর্মশালার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। কালচক্রের আবর্তনে সুখঃদুঃখের আসা-যাওয়ার ধ্রুব নিয়মে দাতা তাঁর ভূমিকা বদল করেছেন। ঝি জমাদার আলো খাটিয়া ইত্যাদির মাশুল চাপিয়ে পাওনার অঙ্কটিকে না ফাঁপাতে পারলে দিন-গুজরাণের সমস্যা সমাধান হয় কি করে!

সুতরাং সব হিসাব করেই মাশুল দিয়েছিলাম—মালিক তবু খুশি হয় নি। আমরাও প্রসন্ন হ'তে পারি নি। এর চেয়ে ধর্মশালায় কানুন না দেখিয়ে সোজাসুজি ঘর ভাড়া বলে কিছু চাইলে আমরা খুশি হ'তে পারতাম। যোগিন্দর নগরে, অমৃতসরে, কুলুতে ধর্মশালা বা মন্দিরে থেকেও যেমন এর ভাড়া শুনেও মন প্রসন্ন হয় নি।

জানি ধর্মশালা পুরোপুরি নিষ্কর অর্থে খুব কম জায়গাতেই পাওয়া যায়। আগেকার দিনে এটা হয়তো বর্ণে বর্ণে সত্য ছিল। এখনও সরাসরি এর ভাড়া বলে কিছু নেয় না বটে—আলো খাটিয়া ঝাড়ুদার জমাদার

প্রভৃতির হিসাবের মধ্যে ওটা প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে। এসব না থাকল ত সনাতন ধর্ম সংস্থার জন্য একটা চাঁদা অন্ততঃ চেয়ে নেওয়া হয়। কোন কোন বড় শহরে ধর্মশালা একটি সুবিধাজনক আয়ের পন্থা। সেখানে প্রতিটি ঘরের জন্য দৈনিক যে হারে ভাড়া আদায় করার ব্যবস্থা আছে,—তা পুরোবাড়ীটার মাসিক ভাড়ার তিন-চার গুণ বেশী। এ ছাড়া ধর্মশালার বহির্ভাগে দোকান ঘরগুলির ভাড়া ত ফাউ-স্বরূপ।

কাংড়া উপত্যকায় আমরা দু'টি মাত্র ধর্মশালা দেখেছিলাম—যা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় ও সুব্যবস্থায় যে-কোন প্রথম শ্রেণীর হোটেলের সমতুল্য। আক্ষরিক অর্থে নিষ্কর। যতক্ষণ খুশি আলো জ্বালিয়ে—যে-কখানা খাটিয়া প্রয়োজন মত দখল করেও—এক পয়সা ভাড়া দিতে হয় নি। জ্বালামুখী আর বৈজনাথের ধর্মশালা দু'টির কথা বলছি।

সন্ধ্যার মুখে আমরা বজ্রেশ্বরী মন্দিরে এলাম।

ধর্মশালা থেকে বেরিয়ে যে চৌমাথা রাস্তাটা পড়ে—তার ডান ধার ঘেঁষে—পাথরের রাস্তাটা বেশ খানিকটা উপরে উঠে গেছে। পথের একধারে মন্দির-সীমানায় দেওয়াল—যেন একটা দুর্গের সীমানা ঘিরে রেখেছে। যেমন উঁচু—তেমনি মজবুত। লম্বায় সে দেওয়াল প্রায় এক ফার্লং। মন্দিরের সামনে কয়েকটা বাতাসা ও ফুলের দোকান; কিন্তু ভিখারী আর সাধু-সন্ন্যাসী আস্তানা নিয়েছে। যাত্রীর ভিড় বিশেষ নাই। সিং দরজা বেশ উঁচু—রাত্রিতে সেটা বন্ধ করার ব্যবস্থা আছে। আর সেই দরজার সামনেই একটা পাথরে খোদাই করা আছে—ভক্ত বদান্য-দাতাদের নাম ও পদবী পরিচয়। এঁদেরই দানে মন্দির সুসংস্কৃত হয়ে বর্তমান কলেবর প্রাপ্ত হয়েছে।

অতি বিস্তীর্ণ সেই মন্দির-প্রাঙ্গণ। জনপদ থেকে সম্পূর্ণ ভাবে আলাদা করে নেওয়া হয়েছে একটি মুক্তির ক্ষেত্রকে। পুরাতনের মালিন্য কোথাও নাই—সবটাই সদ্য-সমাপ্তির ঔজ্জ্বল্যে ঝক্ ঝক্ করছে।

খোলামেলা নাট মন্দির—খোলামেলা মন্দির—আলোয় আলো করা ভুবন।...সিং দরজার পাশে বসে আছে ঢাকী আর শানাইদার।...প্রহরে প্রহরে ঢাক বাজছে, শানাই সুর আলাপ তুলছে। মন্দির-পরিবেশ সৃষ্টি করার আরও কিছু আয়োজন দেখা যায়; দেবীর বাহন একটি বাঘ, ত্রিশূল, একটি বেলগাছ। দেবী ঘটে এবং মূর্তিতে বিরাজমানা। একজন সেবক সর্বক্ষণই করে প্রসাদ এনে দিচ্ছেন তিনি। ...যে শুধু প্রণাম করে হাত পাতছে—তাকেও উনি মুঠো-ভরে বাতাসা প্রসাদ দিচ্ছেন। ...আইনের কোন কড়াকড়ি নাই—দেবীর কাছে এসে যতক্ষণ খুশি বসে থাকার বাধা নাই। ছুঁৎ-মার্গ টা অদৃশ্য বললেই হয়।

নাটমন্দিরের চাতালে বসে আমরা দেবীর বাহনটিকে দেখছিলাম। ওটি আমাদের পাশেই চাতালের উপর রয়েছে। ...মূর্তিটা সম্ভবত মাটির—আসল রয়াল বেঙ্গল টাইগার। জ্বালামুখীতেও দেবীর বাহন দেখেছিলাম একটি চিতাবাঘ। আমাদের দেশে হিমালয় দুহিতা কিন্তু সিংহবাহিনী। আসল হিমালয়ে সিংহ নাই বলে বুঝি এই বিকল্প ব্যবস্থা?

জ্বালামুখীর সাধু বলেছিলেন—কাংড়া হ'ল একান্ন পীঠের একটি পীঠ, এখানে দেবীর বাম স্তন পড়েছিল। এই তথ্য তর্কসাপেক্ষ বলে মনে হয়। পীঠস্থান মাহাত্ম্যে উল্লেখ আছে দেবীর বাম স্তন পড়েছিল জলন্ধরে (জ্বালামুখীতে), দেবী ওখানে ত্রিপুরমালিনী। এখানে দেবী বজ্রেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধা। ...পুরাণ কথা যাই বলুক, দেবী বজ্রেশ্বরীর শ্রদ্ধা-ভক্তির আসনখানি পাতা রয়েছে সারা পাঞ্জাব জুড়ে। এই প্রমাণ মন্দিরের প্রস্তর-ফলকে লিপিবদ্ধ দেখেছি।

অনেকক্ষণ বসে ছিলাম নাটমন্দিরে। সারাদিনের অস্বস্তিকর পরিবেশটুকু না থাকাতে সুস্থ বোধ করছিলাম। রাত্রিটা খোলামেলা নাটমন্দিরে কাটিয়ে দিতে পারলে আরও সুখী হ'তাম। কিন্তু সে উপায় ছিল না। রাত্রিতে মন্দিরের এলাকায় কাউকে থাকতে দেওয়া হয় না। শয়ন আরতির পর সিং দরজার ফটক বন্ধ হয়ে যায়।

শয়ন আরতি বসবে রাত ন'টা সাড়ে ন'টায়—ঘণ্টাখানেক লাগবে আরতি শেষ হ'তে। আমরা চলে আসছিলাম।

একজন সেবক বললেন, একটু বসে যাও—খানিক পরেই শয়ন আরতি হবে—দেখে যাও।

নাটমন্দিরের পাথরের মেঝেতে বসলাম। সিং-দরজায় বাঁশী বাজছিল, শানাই-এর মত তার সুরটি মিষ্ট। মাঝে মাঝে ঘণ্টা বাজছিল। মন্দিরে আসা-যাওয়ার কালে যাত্রীরা বাজাচ্ছিল। নিজের প্রার্থনা জানানোর উদ্দেশে দেবীকে অবহিত করা, না প্রণাম-প্রার্থনার আদি-অন্তে দেবীকে বাদ্যধ্বনির দ্বারা পরিতুষ্ট করা? এই রীতি মধ্যেই কি চঞ্চল বৃত্তিগুলিকে একটি কেন্দ্রে সু-সংহত করা প্রয়াস, অথবা মানস-তন্দ্রা ভাঙানোর ঘোষণা এটি ... অসুর-সংহারের নিমিত্ত দেবী যুদ্ধ

ন্ত্রে ঘণ্টাধ্বনি করেছিলেন। ঘণ্টার গম্ভীর নির্ঘোষে ;অসুর মোহগ্রস্ত মূর্চ্ছিত হয়েছিল,—বহু অসুর মৃত্যু-ণ করেছিল। এর ব্যাখ্যা আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে ীর অর্থব্যঞ্জক সন্দেহ নাই, কিন্তু একটি গম্ভীর মধুর দ্ব ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত উচ্চকিত মন যে সংকর্ষিত হয়ে কটি কেন্দ্রে লগ্ন হবার সুযোগ পায়, এই সত্য মনো-দ্রা অস্বীকার করেন না।

আমরা পাথরের মেঝেতে বসেছিলাম—একটু পরে রোহিত এলেন। পরনে রক্তাম্বর, গায়ে রক্ত অঙ্গা-ী, তার উপরে রক্ত উত্তরীয়, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, ঠে ও বাহুমূলে রুদ্রাক্ষ মালা, সৌম্যদর্শন প্রৌঢ় পুরো-ত পূজার আসনে বসলেন। আরম্ভ হ'ল শয়নকালীন াগ-পূজা আরতির পর্ব। পর্বটি দীর্ঘ—নানা বিধি-ষমে সুশৃঙ্খলিত। দেবীর স্নান-অঙ্গরাগ অর্চনা পূজা র ও প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারণ ভোগ নিবেদন আরতি, সর্ব-যে পরিপাটি করে শয্যা রচনা। সেই সুখরম্য শয্যায় াঁকে শয়ন করিয়ে তাঁর সর্বাঙ্গে অলঙ্কার সমাবেশ ও মর ব্যজন। পরে একখানি বহুমূল্য উত্তরীয়ে নিদ্রামগ্ন বীর অঙ্গ আচ্ছাদন করে একটি দিনের সেবা-কর্মসূচীর াপন।

ইতিপূর্বে স্নানের সময় দেবীর সামনে একখানা পরদা াড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। আজ মন্দিরে যাত্রী কম ছিল লে হয়ত সেবকরা আমাদের বললেন, গর্ভ মন্দিরে রদার ভিতরে গিয়ে বসতে। ভিতরে বসে দেবী-জার বিধিগুলি দেখতে লাগলাম। সংসারী মানুষের াচার-নিয়মগুলিকে দেবী প্রকৃতিতে আরোপ করে নুষ্ঠানটি সুচারুরূপে সম্পন্ন হ'তে লাগল। তার সঙ্গে ামরা একাত্ম হয়ে গেলাম। এ যেন প্রতিদিনে এবং প্রতিটি রাত্রিতে ঘুমের আগে পর্যন্ত আমাদেরই কর্ম ও বিশ্রামের নিয়মগুলি একটির পর একটি অনুবর্তিত হচ্ছে।

ক্রমশঃ রাত বাড়ছে দেখে আমরা ভোগ ও আরতি দেখে উঠবার উদ্যোগ করলাম।

একজন সেবক আমাদের হাতে প্রসাদ দিয়ে বললেন, আর একটু বস—দেবীর শয়ন দেখে যাও।

তবুও আমরা ইতস্ততঃ করছি দেখে বললেন, আরে, বসই না, এত দূর দেশে আর ত কোনদিনই আসবে না —শয়ান দেখে যাও।

কথাটা সত্য—আর কোনদিনই কি আসব এখানে! জীবনের ত অপরাহ্ণ বেলা—আয়ু-সূর্য এখন অস্তাচল চূড়াবলম্বী। দেবীর নিদ্রাটা দেখেই যাই। সঙ্গে সঙ্গে এই চিন্তাও [illegible]

বজ্রেশ্বরী মন্দির (কাংড়া)

জাগরণ আছে না কি? আমাদেরই চৈতন্যের উপর উনি চৈতন্যময়ী—প্রাক্-চৈতন্যে সুপ্তিমগ্না। আমাদের নিত্য অভ্যাস-লব্ধ কর্ম আচরণের প্রতিবিম্ব ফেলে এঁকে জাগাই—ওঁকে ঘুম পাড়াই। ওঁর সেবা পূজা ধ্যান আরাধনা সমস্তই ত আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে রচনা।

কৌতূহল ভরেই দেখছিলাম অনুষ্ঠানটি, শেষে একটু ছন্দপতন হ'ল।

দর্শকদের মধ্যে একজন দক্ষিণ ভারতীয় সন্ন্যাসী ছিলেন। দেবীর ভোগে উৎসর্গীকৃত ঘৃতসিক্ত পুরীর লোভনীয় আকৃতি। তিনি হয়ত বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁকে ছোলাসিদ্ধ প্রসাদ দিতে এলে তিনি দেবীর উৎসৃষ্ট প্রসাদের অংশ চাইলেন। সেই প্রসাদের বণ্টন-ব্যবস্থা হয়ত পূর্ব ব্যবস্থা মত ঠিক হয়ে থাকবে—সেবায়েৎ তাঁকে সবিনয়ে সেই কথাটি জানালেন। সেবায়েতের কথা উনি বুঝতে পারলেন না —উচ্চকণ্ঠে নিজের ক্ষুধার দাবি জানালেন। সেবায়েত তাঁর ভাষা বুঝতে পারলেন না, তবে ভঙ্গিতে বিষয়টি অনুমান করে নিয়ে বললেন, এই বরাদ্দমত ভোগ অন্যকে দেওয়া যাবে না। আপনি বরং মন্দিরের বাইরে যে-সব সাধু-সন্ন্যাসী বসে আছেন, তাঁদের সদাব্রতে চলে যান, ওইখানে প্রসাদ মিলবে অবশ্যই।

দক্ষিণী সন্ন্যাসী এই উপদেশে আরও ক্রুদ্ধ হয়ে গর্ভগৃহ থেকে বেরিয়ে গেলেন। নাটমন্দিরে একজন সেবক প্রসাদ বিতরণ করছিলেন। ছোলাসিদ্ধ প্রসাদ। ঘটনাটা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি সন্ন্যাসীর কাছে এগিয়ে

গিয়ে আরও কয়েক মুঠো ছোলা তাঁকে দিয়ে সদাব্রতের কথাটা ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন।

দক্ষিণী সন্ন্যাসী চলে গেলেন।

আমাদের মনে হ'ল—মাত্র একজন বিদেশী অথিতিই ত ছিলেন প্রসাদের দাবিদার—বরাদ্দের অংশ থেকে সামান্য কিছু দান করলে বরাদ্দের অধিকারী কি ক্ষুণ্ণ হ'তেন? যেখানে ভিখারীকে ডেকে মুঠোভরে বাতাসা প্রসাদ দেওয়ার উদারতা দেখলাম—সেইখানে নিরাশ্রয় অভুক্ত অতিথি যাজ্ঞা করে প্রসাদাংশ পেলেন না—এ কেমন যেন অস্বস্তিকর ব্যাপার! অস্বস্তিটা বেশী করে বোধ হ'তে লাগল যখন মন্দিরের বাইরে এসে দেখল দোকান-পাট সব বন্ধ হয়ে গেছে। সেই সদাব্রতে সন্ন্যাসীরা আহারের পাট সেরে দোকানঘরের কা পাটাতনে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছেন—কোথ জেগে নেই জনপ্রাণী; চারিদিকে নিশুতি নিরালো দক্ষিণী সন্ন্যাসীর চিহ্ন দেখলাম না কোথাও।

হাতে টর্চটা জ্বেলে ব্যথাভরা চিত্তে পাথর দিয়ে ঢালু পথ দিয়ে আমরা নামতে লাগলাম।

খালি মনে হচ্ছিল—প্রদীপের শিখাটুকু যদি পর্যন্ত উজ্জ্বল থাকত!

আগামী বৈশাখ হইতে

নিয়মিত বিভাগ

'এরাও মানুষ ছিল'

দুর্গেশনন্দিনীর শতবার্ষিকীর আলোকে বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীমণি বাগচী

বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে একদিন একজন অশ্বারোহী বিষ্ণুপুর হইতে জাহানাবাদের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন। দিনমণি অস্তাচল গমনোদ্যোগী দেখিয়া অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রান্তর; কি জানি যদি কালধর্মে প্রদোষকালে প্রবল ঝটিকা বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তবে সেই প্রান্তরে নিরাশ্রয়ে যৎপরোনাস্তি পীড়িত হইতে হইবেক। প্রান্তর পার হইতে না হইতেই সূর্যাস্ত হইল; ক্রমে নৈশ গগন নীল নীরদমালায় আবৃত হইতে লাগিল। নিশারম্ভেই এমত ঘোরতর অন্ধকার দিগন্তসংস্থিত হইল যে, অশ্বচালনা অতি কঠিন বোধ হইতে লাগিল। পান্থ কেবল বিদ্যুদ্দীপ্তি-প্রদর্শিত পথে কোন মতে চলিতে লাগিলেন।"

পাঠককে বলিয়া দিতে হইবে না যে, ইহা কোন্ স্মরণীয় উপন্যাসের আরম্ভ, অথবা সেই উপন্যাসের লেখক কে? উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'; আর এই ঔপন্যাসিক—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইবার ঠিক শত বৎসর পূর্ণ হইল (প্রথম প্রকাশ ১৮৬৫, এপ্রিল); বাংলা সাহিত্যে ইহা যে একটি স্মরণীয় ঘটনা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ "বাংলা গদ্য-সাহিত্যের দিগন্ত-সংস্থিত ঘোরতর অন্ধকারে স্বীয় প্রতিভার বিদ্যুদ্দীপ্তি-প্রদর্শিত পথে" সেদিন যিনি একাকী পথ চলিয়াছিলেন, তিনিই পরবর্তীকালে সাহিত্য-সম্রাটরূপে ও বাঙালীর ভাব-জীবনের স্রষ্টারূপে এবং উনিশ শতকের বাংলার অন্যতম রূপকার হিসাবে স্বীকৃত ও সম্পূজিত হইয়াছেন। বাংলা সাহিত্যের আলো-আঁধারের সন্ধিক্ষণে বঙ্কিম-প্রতিভার আবির্ভাব এবং পরবর্তী ত্রিশ বৎসর কালের মধ্যে তিনি তাঁহার স্বজাতিকে যাহা দিয়া গিয়াছেন তাহাকে আশ্রয় করিয়াই ত বাংলা সাহিত্য তাহার ইতিহাস-অভিপ্রেত পরিণতি লাভ করিতে পারিয়াছে। নিঃসন্দেহে বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিভার যুগাবতার।

কিন্তু দুর্গেশনন্দিনীর কথাই প্রথমে আলোচনা করিব। বঙ্কিমচন্দ্রের [illegible] যে তাঁহার পিতৃব্য যখন খুলনার হাকিম তখন তিনি দুর্গেশনন্দিনী লিখিতে আরম্ভ করেন (ইহা ১৮৬২-৬৩ সালের কথা; বঙ্কিমের বয়স তখন মাত্র চব্বিশ বৎসর) এবং বারুইপুরে বদলী হইয়া আসিবার পর তিনি ঐ অসমাপ্ত রচনা শেষ করেন। এই প্রসঙ্গে কালীনাথ দত্ত লিখিয়াছেন: "বঙ্কিমবাবু যখন বারুইপুর মহকুমার ভারপ্রাপ্ত মহকুমা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট সেই সময় তাঁহার সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হয়। তখন ইংরেজী ১৮৬৪ সাল।...বঙ্কিমবাবু এজলাসে আসিতেন, বসিতেন, মামলার বিবরণ শুনিতেন, কিন্তু এই সময়ে তাঁহাকে সর্বদা অন্যমনস্ক দেখা যাইত। এমন কি সাক্ষীর এজেহার লিখিতে লিখিতে তিনি কলম বন্ধ করিয়া ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনা হইয়া পড়িতেন, এবং হঠাৎ এজলাস পরিত্যাগ করিয়া, গৃহাভ্যন্তরে তাঁহার study-room-এ প্রস্থান করিতেন, চিন্তিত বিষয়টি লিপিবদ্ধ না করিয়া এজলাসে ফিরিতেন না।" (প্রদীপ, আষাঢ়, ১৩০৬)

এই কালীনাথ দত্ত ছিলেন বারুইপুর সাবডিভিশনের রেজিষ্ট্রেশন অফিসের হেড ক্লার্ক (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—২২ গ্রন্থে ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত ইঁহাকে "বঙ্কিমচন্দ্রের সহকর্মী" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; উহা ঠিক নয়)। তিনি আরও একটি কথা বলিয়াছেন। "দুর্গেশনন্দিনী লেখা শেষ হওয়ার সময় কিংবা উহা মুদ্রিত হওয়ার সময় আমি বঙ্কিমবাবুর পাঠকক্ষে কয়েক ভল্যুম স্কটের ওয়েভার্লি নভেলস্ দেখিয়াছিলাম। আমার অনুমান, ঐ বই লেখার পর পাণ্ডুলিপি অবস্থায় হয়ত তাঁহার কোন বন্ধু তাঁহাকে বলিয়া থাকিবেন যে, স্কটের আইভ্যান হো'র সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। কতখানি সাদৃশ্য তাহা মিলাইয়া দেখার জন্যই বঙ্কিমবাবু স্কটের গ্রন্থাবলী কলিকাতা হইতে কিনিয়া আনিয়াছিলেন, কেননা তাঁহার নিজের মুখে তিনি শতবার বলিয়াছেন যে, দুর্গেশনন্দিনী লিখিবার পূর্বে তিনি আইভ্যান হো পাঠ করেন নাই। বঙ্কিমবাবুর সততা ছিল unimpeachable, তাঁহার কথাই সকলে মানিয়া লইয়াছিলেন।"

মানিয়া লইলেও দুর্গেশনন্দিনীর আইভ্যান হো-সম্পর্কীয় অপবাদটি বরাবর রহিয়া গিয়াছে। বঙ্কিম-সাহিত্যের বিশিষ্ট সমালোচক অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত তাঁহার 'বঙ্কিমচন্দ্র' পুস্তকে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, স্কটের উপন্যাসের সহিত দুর্গেশনন্দিনীর সাদৃশ্য থাকিলেও, ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পূর্ণ মৌলিক রচনা। এই উপন্যাসের প্রকাশ কালে প্রতিকূল ও অনুকূল দুই রকম সমালোচনাই হইয়াছিল, তথাপি ইহা সত্য যে, "সে যুগের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালীরা ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দুর্গেশনন্দিনীর প্রকাশেই বাংলা-সাহিত্যের নূতন বিপুল সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন।" ইহার সাক্ষ্য দিয়াছেন দুইজন—রমেশচন্দ্র দত্ত ও রবীন্দ্রনাথ। রমেশচন্দ্র লিখিয়াছেন: যখন দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইল, তখন যেন বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে সহসা একটি নূতন আলোকের বিকাশ হইল। ...বঙ্গবাসিগণ বুঝিল সাহিত্যে একটি নূতন যুগের আরম্ভ হইয়াছে। একটি নূতন ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে।" আর রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন: "বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যের প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করিলেন। আমাদের হৃদ্‌পদ্ম সেই প্রথম উদ্‌ঘাটিত হইল।" আমাদের বলিবার কথা এই যে, স্কটের অনুকরণে যদি দুর্গেশনন্দিনী লিখিত হইত, তাহা হইলে বাংলা সাহিত্যে এই যুগান্তর কখনই আসিত না, বাঙালীর মানসলোক কখনই এমন ভাবে উদ্দীপ্ত হইত না। আরও একটি কথা। বঙ্কিমের প্রতিভা স্কটের প্রতিভা অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। প্রতিভার দিক দিয়া বিচার করিলে, ইংরেজী সাহিত্যের একমাত্র সেক্সপীয়র ভিন্ন আর কেহই বঙ্কিমের সহিত তুলনীয় নন।

কথিত আছে, দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া জ্যেষ্ঠ শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্র উভয়েই উহা প্রকাশের অযোগ্য বিবেচনা করেন। বঙ্কিম-জীবনীকার শচীশচন্দ্র এই প্রসঙ্গে আর একজনের নাম উল্লেখ করেন নাই। তিনি বঙ্কিম-সুহৃদ ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য। তখনকার দিনে ইনি একজন প্রসিদ্ধ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন এবং একজন সাহিত্য-[illegible] ব্যক্তি ছিলেন। দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি পাঠ [illegible]র প্রথম সৌভাগ্য ইঁহারই হইয়াছিল এবং ইনিই [illegible]কে বলিয়াছিলেন, "নবেল লিখিয়াছ ভালই, নবেলিষ্ট তোমার প্রতিষ্ঠা অবধারিত [illegible] ইহা [illegible] ছাপাইবার জন্য ব্যগ্র হইও না।" ইহাতে বঙ্কিমচন্দ্র কি[illegible] ক্ষুণ্ণ হন এবং সাময়িকভাবে বন্ধুবিচ্ছেদও ঘটিয়াছিল। [illegible] বাংলা কথাসাহিত্যে তখন একটি মহালগ্ন আসিয়া [illegible] যেমন আসিয়াছিল চার বছর আগে মেঘনাদবধ ক[illegible] প্রকাশিত হইবার সময়; তাই ঘরে-বাহিরে এই রকম [illegible] মন্তব্য সত্ত্বেও ১৮৬৫ সালের এপ্রিল মাসে দুর্গেশন[illegible] প্রকাশিত হইল। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এই [illegible] বৎসরই চিরকালের মত চিহ্নিত হইয়া থাকিবে।

ক্ষেত্রনাথের ভবিষ্যদ্বাণী নিষ্ফল হয় নাই, দুর্গেশন[illegible] পরবর্তী উপন্যাসগুলি একে একে রচনা করিয়া বা[illegible] প্রমাণ করিলেন যে, বাংলা-সাহিত্যে তিনি স[illegible] বিপুল সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি লইয়া আবির্ভূত হইয়া[illegible] আজ দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হওয়ার শতবর্ষ পরে[illegible] বঙ্কিমের তিরোধানের সত্তর বৎসর পরে আ[illegible] বঙ্কিম[illegible] সম্পর্কে, বিশেষ করিয়া শিল্পী বঙ্কিম সম্পর্কে নূতন মূল্য[illegible] করিতে পারি। আজও তিনি শিক্ষিত বাঙালীর [illegible] নবেলিষ্ট, বর্তমান কালের বুদ্ধিজীবী পাঠক আজও [illegible] উপন্যাস পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করেন। তিনি [illegible] জয়ী সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন এবং সে সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের দরবারে সমমর্যাদায় স্থান পাইবার যোগ্য। আজ আর আমাদের আলোচনার অপেক্ষা রাখে [illegible] ইংরেজীতে একটি কথা আছে—"To know Plato is know Europe." বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কেও এই উক্তি অক্ষরে অক্ষরে প্রযোজ্য। তাঁহাকে জানা মানেই উনি[illegible] শতাব্দীর বাংলাকে জানা। জাতির ভাবজীবনের [illegible] তিনিই। বঙ্কিমচন্দ্র আজ আমাদের নিকট হইতে বহু[illegible] অবস্থান করিতেছেন; তাঁহার ও আমাদের মধ্যে এখন [illegible] একটি শতাব্দীর ব্যবধান। এই দুস্তর ব্যবধান বা অন্তরাল অতিক্রমপূর্বক তাঁহার লোকোত্তর প্রতিভার অন্তঃপুরে প্র[illegible] করিতে পারিলেই বঙ্কিম-মানসকে আমরা উপলব্ধি করি[illegible] পারিব।

আজ প্রয়োজন বঙ্কিমের ধ্যান-ধারণার পুনরুজ্জীবন তাঁহার রচনা বৃহৎ এবং বিচিত্র। তাঁহার সমগ্র রচনা[illegible] কেন্দ্রস্থলে একটি অমূর্ত ভাবশরীরী বঙ্কিমকে পাওয়া যা[illegible] যেখান থেকে তাঁহার জীবনের সমস্ত দর্শন বিজ্ঞান ইতিহা[illegible]

দিকে বিচিত্র শিখায় বিবিধ বর্ণে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িয়াছে। শেক্সপীয়রের মতই বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার মধ্যে একটি উচ্চ দর্শন-শিখর আছে যেখান হইতে মানব প্রকৃতির সর্বাপেক্ষা ব্যাপক রূপ দৃষ্টিগোচর হয়। বঙ্কিম-প্রতিভা বুঝিতে হইলে সর্বাগ্রে সেই দর্শন-শিখরের সন্ধান লইতে হয়।

প্রাচীন সংস্কার আর নবীন ভাবাদর্শের সংঘর্ষের অভিব্যক্তিই বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁহার মধ্যে আমরা পাই নূতন পথ সন্ধানের বহুমুখী প্রয়াস। বঙ্কিম-মনীষার বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি বিশেষ ভাবে স্মর্তব্য। তিনি বলিয়াছেন —"রামমোহন বঙ্গসাহিত্যকে গ্রানিটস্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জন দশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহারই উপর প্রতিভার প্রবাহ ঢালিয়া স্তরবদ্ধ পলিমৃত্তিকা ক্ষেপণ করিয়া গিয়াছেন।" উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের দ্বিতীয় দশক হইতে বঙ্কিমের সাহিত্যজীবনের প্রকৃত আরম্ভ এবং তখন হইতে ত্রিশ বৎসরকাল তিনি বাংলা সাহিত্যের ধ্যানে এবং কর্মে নিজেকে অতন্দ্রভাবে নিয়োজিত রাখিয়াছিলেন। সাহিত্যের এই কর্মযোগীর স্বরূপটি রবীন্দ্রনাথের অনুপম বিশ্লেষণ এই ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে:

"তাঁহার প্রতিভা আপনাতে আপনি স্থিরভাবে পর্যাপ্ত ছিল না। সাহিত্যের যেখানে যাহা কিছু অভাব ছিল সর্বত্রই তিনি আপনার বিপুল বল এবং আনন্দ লইয়া ধাবমান হইতেন। কি কাব্য, কি বিজ্ঞান, কি ইতিহাস, কি ধর্মতত্ত্ব—যেখানে যখনই তাঁহাকে আবশ্যক হইত সেখানে তখনই তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া দেখা দিতেন। নবীন বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে সকল বিষয়েই আদর্শ স্থাপন করিয়া যাওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।"

এই আদর্শ সৃষ্টি বঙ্কিম-প্রতিভার একটি বড় লক্ষণ—এ লক্ষণ বিশিষ্ট বঙ্কিম-সমালোচকমাত্রেই স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার সমকালীন ইতিহাস এই সাক্ষ্যই বহন করে যে, বাংলা সাহিত্যের সংকীর্ণ ক্ষেত্রে তখন কোন উচ্চ আদর্শ ছিল না—আদর্শবোধও ছিল না। আজ যখন আমরা বঙ্কিম-প্রতিভার এই সংশয়াতীত মহত্ত্বের কথা স্মরণ করি, তখন বুঝিতে পারি কেন রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধির স্থান দিয়াছেন। এ গৌরব বাংলাদেশেই তাঁহার প্রাপ্য। [illegible]

চিন্তাধারার প্রবর্তক। জাতির জীবনে যে যুগান্তরের সমস্যা সেদিন বিরাট হইয়া দেখা দিয়াছিল, তাহারই সন্ধানে বঙ্কিমচন্দ্রের সারা চিত্ত যেন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। জাতির জাতিত্ব বজায় রাখিয়া এই নবযুগের প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁহার একমাত্র সাধনা। বঙ্কিম-সাহিত্যে সেই লোকোত্তর সাধনার সমুজ্জ্বল স্বাক্ষর বিদ্যমান।

বঙ্কিম-প্রতিভা প্রতিভা মাত্র নয়, ইহা তেজস্বী প্রতিভা। বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাসে এমন প্রতিভা দুই-চারিটির বেশি আজ পর্যন্ত দেখা যায় নাই। এই প্রতিভার বৈশিষ্ট্য ইহার বাণীর মধ্যে। মোহিতলাল যথার্থই লিখিয়াছেন, "তাঁহার বাণী একটা বড় চরিত্রের মতোই—যেমন সবল, তেমনি বলিষ্ঠ, যেমন সুবলয়িত তেমনই অসন্দিগ্ধ। বাণীর এমন দৃঢ়তা ও সুস্পষ্টতা আমাদের সাহিত্যে আর কোথাও আছে বলিয়া মনে হয় না।" এ জিনিষ তিনি কোথায় পাইয়াছিলেন? তাঁহার সাহিত্য-সাধনার প্রেরণা জোগাইয়াছিল প্রত্যক্ষভাবে স্বজাতি, স্বদেশ ও স্ব-সমাজ এবং পরোক্ষভাবে—মানুষের অদৃষ্ট ও মনুষ্যত্বের আদর্শ সন্ধান। "জাতির সমষ্টিগত আত্মরক্ষার উদ্যম যেন সেই একটি মানুষের মধ্যে পূর্ণশক্তি ধারণ করিয়াছিল—তাই বঙ্কিম-প্রতিভাকে দৈবী শক্তির স্ফুরণ বলিতে বাধা নাই। তাঁহার যতকিছু চিন্তা, তাঁহার ধ্যান, জ্ঞান ও কর্ম—একমাত্র স্বজাতির কল্যাণ চিন্তাতেই সার্থক হইয়াছে। আত্মভাব বা আত্মচিন্তার প্রচার-চেষ্টা তাঁহার মধ্যে অনুবাহিত। স্বজাতি, স্ব-সমাজ ও স্বদেশ—এই তিনে এক বা একে তিন ভিন্ন তাঁহার যেন স্বতন্ত্র অস্তিত্বই ছিল না।" যে দৃষ্টিকোণ হইতে মোহিতলাল এই কথা বলিয়াছেন, আমার বিবেচনায়, বঙ্কিম-প্রতিভা বিচারের ইহাই একমাত্র মানদণ্ড হওয়া উচিত। বঙ্কিম-প্রতিভা সাধারণ প্রতিভা নয়—ইহা একটি জাতির মর্মকথা ও সাধনার ইতিহাস। অরণ্যকে জানিলে যেমন আর এক-একটি বৃক্ষের কথা জানিবার প্রয়োজন হয় না, তেমনি কোন দেশের একজন লোকোত্তর প্রতিভাকে জানিলে আর কিছুই জানিবার থাকে না। সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের সংক্ষিপ্তসার (epitome) বঙ্কিমচন্দ্র, আজ দুর্গেশনন্দিনীর শতবার্ষিকী [illegible]

দেশপ্রেম শিখাইয়াছেন, এমনটি আর কেহ পারেন নাই—তাঁহার পূর্বেও নয়, তাঁহার পরেও নয়। পরানুকরণ জাতীয় আত্মসম্মানের বিরোধী—তাঁহার পূর্বে এমন স্পষ্টভাবে এই কথা আর কেহ বলেন নাই। সমগ্র দেশে সে যুগে অন্ধ অনুকরণের ফলে যে অবনতি দেখা দিয়াছিল, সেই অবনতি ও আত্মাবমাননার সম্বন্ধে তীব্র কশাঘাতে স্বজাতিকে সর্বপ্রথম সচেতন করেন বঙ্কিমচন্দ্র। নিজের দেশের যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু অনুকরণীয় সেই দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া ধার-করা বেশ-ভূষার চরম অপমান সম্বন্ধে দেশবাসী তখন সজাগ ছিল না। জাতীয়তাবোধের সেই নবীন উষায় বঙ্কিমচন্দ্র সর্বপ্রথম তাঁহার তীব্র খরসন্ধানী আলোর ছটায় আত্মবিস্মৃতির অন্ধতমঃ দূর করিয়াছিলেন বলিলে কোন অত্যুক্তি করা হইবে না। স্বদেশপ্রেমকে তিনি ধর্ম বলিয়া বিবেচনা করিতেন—"সকল ধর্মের উপরে স্বদেশপ্রীতি, ইহা বিস্মৃত হইও না।"—কালের প্রান্তর অতিক্রম করিয়া ঋষি বঙ্কিমের এই মহাবাক্য আজও কি আমাদের কানে প্রতিধ্বনিত হয় না?

যদি হইত, যদি তাঁহার এই উক্তিটি আমাদের সমস্ত অন্তর দিয়া গ্রহণ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে স্বাধীন ভারতবর্ষে বর্তমানে দুর্নীতির যে প্লাবন সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল স্তরে বহিয়া চলিয়াছে, তাহা বোধ হয় রোধ করা যাইতে পারিত। দেশকে তিনি স্বর্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন এবং এই কথাই তিনি তাঁহার সমগ্র রচনার মাধ্যমে তাঁহার দেশবাসীকে সারাজীবন ধরিয়া বুঝাইয়া গিয়াছেন। ইহাই তাঁহার স্বজাতিকে বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ দান। বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল ঐতিহাসিক মন ও অনুসন্ধিৎসা—তাই ত তিনি তাঁহার ধ্যানের মধ্যে দেশকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং দেশবাৎসল্য পরমধর্ম—এই সত্য বুঝিয়াছিলেন এবং আমাদেরও বুঝাইয়াছিলেন। মনীষাগত ধারণা নয়, কিংবা ভৌগোলিক সত্তা নয়, বঙ্কিমচন্দ্র সত্য সত্যই দেশভূমিকে মাতৃভূমিরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনিই আত্মবিস্মৃত জাতিকে বলিতে শিখাইলেন—"আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি জন্মভূমিই মা।" জাতির জন্য ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ। পরবর্তীকালের দেশব্যাপী রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন ও তাহার পরিণতি ইহার অভ্রান্ত সাক্ষ্য বহন করিতেছে। বাংলার একপ্রান্তে বাংলা ভাষায় রচিত একটি মন্ত্র—'বন্দেমাতরম'—কেমন করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষের মাতৃবন্দনার উদাত্ত সঙ্গীতের মর্যাদা লাভ করিয়াছে—শুধু সেই ইতিহাসটাই স্মরণে রাখিলে বঙ্কিম-প্রতিভার মহত্ত্ব সম্পর্কে আর কোন সংশয় থাকে না। রামমোহনকে বাদ দিয়ে যেমন আধুনিক ভারতবর্ষের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না, তেমনি বাংলার প্রাণপুরুষ বঙ্কিমচন্দ্রকে বাদ দিয়ে বাংলার দেশপ্রেমের কথা চিন্তা করা যায় না। যাঁহার চিন্তায় ও চেতনায় বাঙালীর জীবন-সত্য একথা অসংশয়িত বাণীতে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, আজ তাঁহারই উদ্দেশে, কবির কথায় বলি :

"Bankim! thou should'st be living at this hour Bengal has need of Thee:"

—০—

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাবুয়ানা ও বাংলা প্রহসন

ডক্টর জয়ন্ত গোস্বামী

আমাদের সমাজে একটি প্রসিদ্ধ ছড়া আছে—'ধনীর মধ্যে অগ্রগণ্য রামদুলাল সরকার। বাবুর মধ্যে অগ্রগণ্য প্রাণকৃষ্ণ হালদার। (বাংলা প্রবাদ—সুশীল দে) প্রাণকৃষ্ণ হালদারের পরিবর্তে অনেক সময় নীলমণি হালদারের নামও করা হয়ে থাকে, অন্ততঃ এ ধরনের ছড়াও মুদ্রিত অবস্থায় পাওয়া গেছে। গত শতাব্দীতে প্রকাশিত "সমাজ-কুচিত্র" পুস্তকে "নিশাচর" বাবুর তালিকা দিতে গিয়ে বলেছেন, "যথার্থ বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, নীলমণি হালদার, ছাতুবাবু, কালী সাণ্ডেল, ছাতু সিংহী, ইহা ভিন্ন ফেলা যায় না।" (পৃঃ ৫৭)। বস্তুতঃ এই সব বাবুদের আদর্শ করে একটি বিরাট্ বাবু সম্প্রদায়ের সৃষ্টি ঊনবিংশ শতাব্দীর একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।

মধ্যযুগের সামন্ত ও ভূম্যধিকারীদের মধ্যে বিলাসিতা থাকলেও সাধারণের মধ্যে তা অতটা বিস্তার পায় নি। সঞ্চিত ধন মধ্যযুগে কম ছিল না। রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মধ্যযুগের শেষের দিককার ভারতবর্ষের সঞ্চিত ধনের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন,—

"17th Century India was the richest country in the world—the agricultural mother of Asia and the Industrial Workshop of Civilization."

বিদেশী Commercial Capitalist-দের ব্যাপক বিস্তারে আমাদের দেশের আর্থিক দুরবস্থা ঘটলেও দেখা যাবে যে, আমাদের সাধারণের জীবনে সামগ্রীর চাহিদা ক্রমেই বেড়ে গেছে। ওয়ারেন হেষ্টিংস্ এবং জন ম্যালকমের সুপরিচিত মন্তব্য দু'টির মূলে Industrial Capitalist-দের বিরুদ্ধে স্বার্থরক্ষার প্রশ্ন যতই থাকুক না কেন, তখনকার সাধারণ মানুষের মধ্যে, বর্তমান বাবুয়ানার সামগ্রী বলতে যা বুঝি—তার চাহিদা ছিল না। হেষ্টিংস লিখেছিলেন,—

"The supplies of trade are for the wants and luxuries of a people; the poor in India may be said to have no wants. Their wants are confined to their dwellings, to their food, and to a scanty portion of clothing, all of which they can have from the said that they tread upon. (*Minutes of Evidence & C. on the affairs of the East India Company*, 1813, p. 3; (*cf. Indian Trade, Manu-*

জন ম্যালকম তখন ছিলেন বোম্বাইয়ের গভর্ণর। তিনি লিখেছিলেন—

"The Hindoo inhabitants are a race of man, generally speaking, not more distinguished by their lofty stature—than they are for some finest qualities of the mind; they are brave, generous, and humane, and their truth is as remarkable as their courage. They are not likely to become consumers of European articles, because they do not posses the means to purchase them, even if, from their simple habits of life and attire, they required them." (*Ibid*—Pp. 54 and 57).

এই মন্তব্য দু'টির মধ্যে এদেশের সাধারণ মানুষের দারিদ্র্যের কথা যতই থাকুক, সাধারণ বাবুয়ানার উপযোগী দ্রব্য-সামগ্রীর চাহিদাও যে ছিল না, এটা অস্বীকার করা যায় না। আমাদের জীবনমানের এই পরিবর্তনের কথা বলতে গিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর একটি গ্রন্থে বলা হয়েছে,—"ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের অভ্যুদয়ে চারিদিকে শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তার হইতেছে—রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ চালিত হইতেছে—বাণিজ্য স্রোত বহিতেছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে লোকের মন পরিবর্তিত হইতেছে, উচ্চ আশা জাগরিত হইতেছে—জীবনের নূতন আদর্শ মনের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে—সামাজিক পরিবর্তন হইতেছে—অভাব বাড়িতেছে। আমরা ৫০ বর্ষ পূর্বে যেরূপ সহজে জীবন ধারণ করিতে পারিতাম, এক্ষণে তাহা অসম্ভব, কারণ পূর্বাপেক্ষা আমাদের জীবন ধারণোপযোগী নানা অভাব বৃদ্ধি হইয়াছে। যদিও সমাজ-মধ্যে পূর্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে অর্থের ব্যাপ্তি হইতেছে—অর্জনের নানা পথ ক্রমে উন্মুক্ত হইতেছে কিন্তু তথাপি অভাব, দারিদ্র্য, চারিদিকে বিকটবেশে বিচরণ করিতেছে। (অপচয় ও উন্নতি—বিষ্ণুচরণ মৈত্র। ১৮৯০ খ্রীঃ। পৃঃ ২২৬)। অতএব আজকাল যাকে ঠিক 'বাবুয়ানা' বুঝি, তা আমাদের সমাজে আগে ছিল না। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্যয়ের মধ্যে দিয়ে আমাদের সঞ্চিত ধন নির্গমনের ব্যবস্থা ছিল।

"বাবু" শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে এক-একজন এক এক রকম

হয়েছে—"স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, মুসলমানদিগের নিকট হইতেই এই রত্নটি আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। কালে সংবাদ-পত্রের বহুল প্রচলন ও রাজপুরুষগণ কর্তৃক প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত হওন প্রযুক্ত দেশসুদ্ধ বাবু হইয়া উঠিলেন।" (মধ্যস্থ—চৈত্র, ১২৮০)। রাজশেখর বসু 'চলন্তিকা'য়, শব্দটির কোনো বুৎপত্তি দেখান নি। (৮ম সংস্করণ; পৃ: ৩৯৫) অনেকে এটাকে দেশজ শব্দ বলে উল্লেখ করেছেন। (বিশ্বকোষ—দ্বাদশ খণ্ড) শেষোক্ত মন্তব্যটিই আমার কাছে ঠিক বলে মনে হয়। প্রাগার্য বাংলা দেশের স্থানীয় ভাষার শব্দ ভাণ্ডারের অন্তর্গত সিনোটিবেটীয় গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারে। তিব্বতীয় ভাষায় 'বাবু' শব্দের অর্থ—'অলস ব্যক্তি'। নিন্দাসূচক এই মূল অর্থটিই পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে পরে সম্মানসূচক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের সমাজে বাবুয়ানা নব্য-সংস্কৃতিনির্ভর। তাই সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠাগত দিক থেকে বাবুয়ানার বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত হ'লেও আর্থিক অপব্যয়ের কারণ হিসেবেও দৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত হয়েছে। পূর্বে উল্লিখিত উনবিংশ শতাব্দীর পুস্তকটিতে বলা হয়েছে, "এ সম্বন্ধে একটি গুরুতর নিয়ম এই যে সর্বদা অবস্থানুযায়ী অবস্থান করিবে, এবং আয় অপেক্ষা কদাচ অধিক ব্যয় করিবে না। অনেক সময়ে মানসম্ভ্রম রক্ষা জন্য, বাহ্যিক দৃশ্য রক্ষা জন্য—লোকে ঋণ করিয়া থাকে। ভ্রান্ত মানব! তুমি ঋণ করিয়াই বস্তুত: মানসম্ভ্রম নাশের সূত্রপাত করিলে। অবস্থা অনুযায়ী অবস্থানই প্রকৃত মহত্ত্বের পরিচায়ক, ইহাতে যাহারা তোমার প্রতি দোষারোপ করিবে, তাহারা অদূরদর্শী—অন্ধ।" অপচয় ও উন্নতি—বিষ্ণুচন্দ্র মৈত্র। ১৮৯০ খ্রী:। পৃ: ২৪০, ২৪২)। সমসাময়িককালে রচিত একটি পদ্যেও বলা হয়েছে—

"ফকির হইব তবু কি ছাড়িব,
ভিক্ষাতেও বাবুগিরি চালাইব।
যশের পাতাকা তুলিয়া ধরিব,
উড়ে হে বাতাসে শন শন শন।।

(বাঙ্গালীর বাবুগিরি (১২৯৫ সন); —বৈতালিক রচিত)।

উনবিংশ শতাব্দীতে 'A Hindustani' রচিত 'The Babu' নামে একটি প্রবন্ধ Bengali Magazine-এ প্রকাশিত হয়। (Bengali Magazine—April, 1878)

(1) "The Babu has been represented, an justly represented as weak in body, timid in hear and imaginative in intellect." (2) "The Bab is said to be the very type of superficial, not soli education." (3) "This system again explains tha other defects of the Babu's intellect so frequentl pointed out and lashed, *viz.*, its want of creativ energy." (4) "The Babu is described as entirel denationalized by an out landish education whic has merely sharpened the imitative faculties of th soul, leaving its noble elements asleep in the back ground." (5) "The Babu is represented as havin lost the sedateness and suavity of the nationa disposition as having become ill-tempered an ill-natured rude in his manners and proud an presumptuous in his tone." (6) "The Babu' predilection of English, and his consequent ne lect of vernacular, have been the stock themes o ridicule, bitter sacasm and even ribaldry with class of writers." (7) "The Babu's antogonis to the ruling class has provoked much righteou indignation. and his supposed ingratitude ha been again and again censured in the bitteres terms conceivable." (8) "And, lastly, the Bab is stigmatized as a grumbled and an agitator, one not will affected towards British rule, and read in consequence to give vent to his spite in news paper firades and inflammatory speeches."

অনুরূপভাবে মধ্যস্থ পত্রিকাতেও কতকগুলো বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (মধ্যস্থ—চৈত্র, ১২৮০ সাল। পৃ: ৭৫৩)। বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য করলে দু'টি বক্তব্যের মধ্যে অনেকখানি মিল খুঁজে পাওয়া যাবে।

"(১) ইংরাজী স্কুল বা ইংরাজী প্রণালীর বাংলা বিদ্যালয়ে পড়িতে হইবে। কত কাল বা কতদূর পড়া—তাহার নিশ্চয়তা নাই। দিনকতক বা পাতকতক পড়িলেই যথেষ্ট। (২) ইংরাজী বুলি কতকগুলি পাকা ধরনে, বাঁকা টোনে ও একেলে উচ্চারণে (অশুদ্ধ বাঙ্গালার সহিত ভাঁজাল দেওনার্থ) অভ্যাস করা চাই। (৩) তোমার বিষয় আশয় যেমন তেমন হউক, ইংরাজী জুতা, পীরান, চিনা কোট, ফিগানো চুল, পায় হাফ মোজা, হাতে ষ্টিক্ একটা ত চাইই চাই, আর যদি উচ্চ ধরনের সাহেববাবু হইতে সাধ থাকে, তবে জ্যাকেট পেণ্ট,লেন, চেনঘড়ি, নাকে চশমা, চাপ দাড়ী, চুরোট, শীশ, কুকুর, [illegible] প্রয়োজন। (৪)

বৃদ্ধ ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে পরোক্ষ বা সমক্ষেও উপহাস, ভিক্ষুককে অনাদর, খবরের কাগজে আদর, রাজ্যের আগ্রহ, সভাটভার নামে রোমাঞ্চ, দলাদলির নামে খড়্গহস্ত, কথায় কথায় স্বাস্থ্য রক্ষার উল্লেখ, সর্বদাই অস্বাস্থ্যের অভিযোগ, আহারের দিন দিন স্বল্পতা, পদব্রজে গমনের ক্লেশ জ্ঞাপন—এসব নইলে নয়। (৫) পুরোহিতের পুত্র হও তো পূজা ত্যাগ, অধ্যাপকের হও তো সংস্কৃত পড়া ত্যাগ, কায়স্থ হও তো ঘরে রাঁধুনী রাখা বা সঙ্গতি অভাবে মা বোনকে দিয়ে সে কাজ সারা—তাঁকে হাঁড়ি ছুঁতে না দেওয়া, দোকানীর পুত্র হও তো দোকানের ত্রিসীমানায় লজ্জায় না যাওয়া, ময়রার হও তো তাড়ু ছাড়া, নাপিতের হও তো ভাঁড় জলে ফেলা, কলুর হও তো ধানগাছ পুঁতে ফেলা, চাষার হও তো হাল গরু বিলিয়ে দেওয়া—দেনা থাকলে বেচে ফেলা! এসব বাদে সকলকেই কতকগুলি পশম কিনে ঘরে কারপেটের কাজ কর্তে দিতে হবে।"

বাবুদের মধ্যে 'ফুলবাবু,' 'প্রগ্রেসিভবা', 'স্বাধীনবাবু' ইত্যাদির চালচলন প্রবন্ধকার সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন।

"যে যত বাপের মনে দুঃখ দিতে পারিবে, সে তত 'প্রগ্রেসিভ' বাবু হইবে। যে যত সমাজের বিপরীত আচরণ করিবে, সে তত সাহেবপ্রিয় বাবু হইতে পারিবে। যে যত পিতা, মাতা, ভ্রাতা, জ্যেষ্ঠতাত, খুল্লতাত প্রভৃতির প্রতি ভক্তি স্নেহ কাটাইতে, তাহাদিগের হইতে স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিতে এবং বাবার পরিবার বাবা পুষুন, আমার পরিবার আমি পুষি, এই বিলাতী পোলিটিক্যাল ইকনমি-মূলক লোকযাত্রা বিধান তন্ত্রের অনুগামী হইতে পারিবে, সে তত স্বাধীনবাবু বুক ফুলাইয়া বেড়াইবে। সেই সকল বাবু ইংরাজী পড়িয়া এবং ইংলণ্ডের ইতিহাস কণ্ঠস্থ করিয়া স্বাধীনতা নামা অমূল্য পদার্থের ঘোর ভক্ত হইয়া উঠিয়াছেন, এমন কি স্বাধীন না হইলে তাহাদিগের অন্ন পরিপাক হওয়া, কি জীবন ধারণ করাও ভার। কিন্তু রাজকীয় স্বাধীনতা পাইবার উপায় নাই—কেন না ইংরাজের মত এদেশে পার্লামেণ্ট স্থাপনের প্রস্তাব করিতে গেলেই "কিকিং" বই আর কিছুই লাভ হইবে না! —সংবাদপত্রে কিম্বা পুস্তকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন অভিপ্রায় প্রকাশের যো নাই। কেন না এখনি ছোটকর্তা শ্রীঘরে পাঠাইতে পারেন! তবেই হইল, উচ্চ অঙ্গের কোনো স্বাধীনতার মুখ দেখিবার কোনো প্রত্যাশা নাই, অথচ স্বাধীনতা ব্যতীতও প্রাণ হাঁপায়! এ অবস্থায় কি করেন আছেন, তাঁহারা আপনারা না খাইয়া আপনাদের সকল সুখ নষ্ট করিয়াও—এতকাল খাওয়াইয়া পরাইয়া লেখা-পড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়াছেন, যাহাতে সন্তানের সুখ হয় তাহাই করিয়াছেন, সকল আব্দার সহিয়াছেন, সকল সাধ পুরাইয়াছেন, এমন স্বাধীনতার সাধ পুরাইবার ভার তাঁহাদের বই আর কাহার স্কন্ধে চাপাইতে পারেন? তাহার পর নির্দোষা বোবা সহধর্মিণীদের মনে যে যত দুঃখ দিতে সমর্থ হয়, সে তত ফুলবাবু শিরোমণি হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর বাবুদের অগম্যাগমন ও অপেয় পান, এই দুটিই প্রধান গুণ। অধুনা এদেশে এ-শ্রেণীর বাবু যত, অন্য কোনো শ্রেণীর বাবু তত দেখা যায় না। এই বাবুরা একদিগে এবং প্রগ্রেসিভ বাবুরা একদিগে এবং স্বাধীনবাবুরা মধ্যস্থলে, এইরূপ অর্ধচক্রব্যূহ সাজাইয়া সামাজিকতার সহিত ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সূক্ষ্মদর্শী নিরপেক্ষ দর্শকের মতে ঐ তিনদল কদাচ জয়ী হইবে না—অথচ পূর্ব সামাজিকতাও যে অবিকল পূর্বাবস্থায় থাকিবে, তাহাও বোধ হয় না। অবশ্যই কিছুকালে একটা রফা হইয়া উভয় অন্তিম সীমার মধ্যবর্তী কোনো একটা বন্দোবস্ত হইতে পারিবে।"

মন্তব্য দীর্ঘ হ'লেও আকর্ষণীয় বলেই উপস্থাপন করা হ'ল। এর মধ্যে সমাজের সাংস্কৃতিক চিত্রটি বড় হ'লেও এর সঙ্গে আর্থিক দিকটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। আর দুয়েকটি উদ্ধৃতি টেনে প্রসঙ্গান্তরে যেতে হবে। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত (বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন, ১২৭৯, পৃঃ ৫১০—১২) বঙ্কিমচন্দ্রের "বাবু" প্রবন্ধটি অত্যন্ত সুপরিচিত থাকায় তার উদ্ধৃতি দেবার আবশ্যক নেই। তবে বান্ধব পত্রিকায় (বান্ধব—আশ্বিন, কার্তিক, ১২৮১, পৃঃ ৯৫) 'ব্যুৎপত্তিবাদ' নামে একটি প্রবন্ধে হাস্যরস সৃষ্টির জন্যে ভ্রমাত্মক ব্যুৎপত্তি বিচার করা হয়েছে। এর মধ্যে দিয়েও বাবুর স্বরূপ জানা যাবে। "বাবু—বব চাঞ্চল্যে, বৃথাভিমানে, পরানুকরণে, ধৃষ্ট ব্যবহারে চ। ঔনাদিক দুঃ প্রত্যয়ঃ। ণ ইৎ যায়, উ থাকে, আকারে বৃদ্ধি। যাহাদিগের স্বভাব চঞ্চল, অভিমান গগনস্পর্শী, চিত্ত পরানুকরণরত এবং ব্যবহার ধৃষ্ট, তাহারা বাবু। বাবু চাঞ্চল্যে ভ্রমর-সদৃশ, চিন্তাশক্তি কিছুতেই বহুক্ষণ অবস্থান করিতে পারে না, অভিমানে শরতের মেঘ, গর্জে কিন্তু বর্ষে না, অথবা বর্ষার ভেক, নিয়ত শব্দ করে, কিন্তু নিকটে আসিতে সাহস পায় না, পরদেশীয় ছন্দানুবর্তনে সর্বথা নিগারদিগের সমান, একবার আসবাব ও

উল্লঙ্ঘন করাও বিচিত্র নহে।"

বিভিন্ন প্রহসনেও বাবুর লক্ষণ নির্দেশ করা হয়েছে। প্রিয়নাথ পালিতের 'টাইটেল-দর্পণ' প্রহসনে (১৮৮৬ খ্রীঃ) আছে,—

"শুধু বাবু হয় নাই, আটটি লক্ষণ চাই,
তবে নাম জানিবে সকলে।
বেশ্যাবাড়ী ছড়ি ঘড়ি, বিকেলে ফিটনগাড়ি
দিবানিশি ভাস লাল জলে।
গান বাদ্য কর সার, মাছ ধর রবিবার,
চুল কাট অ্যালবার্ট ফ্যাসনে।
'বড়লোক বলি তবে. ঘুষিবে সুখ্যাতি সবে,
মার কথা দীনবন্ধু ভণে।"

অমৃতলাল বসুর 'বাবু' নাটকেও (১৮৯৪ খ্রীঃ) বৈষ্ণবীদের কীর্তনে বাবু সম্পর্কে যে বর্ণনা আছে, তা বেশ আকর্ষণীয়।

নব্য বাবুয়ানা ছিল নব্য সংস্কৃতিনির্ভর এবং তার মূলে ছিল Industrial Capitalist-দের বাজার সৃষ্টির উদ্দেশ্য। বাবুয়ানার দ্রব্য-সামগ্রী লক্ষ্য করলে তা স্পষ্ট বোঝা যাবে। দেশীয় জিনিষে বাঙ্গালীর অরুচি ধরিয়ে তারা তাদের কাজ সিদ্ধ করেছে। দুর্গাদাস দে-র লেখা "দ বাবু" প্রহসনে (১৮৯৮ খ্রীঃ) তাঁতিনী বলেছে,—"দেখুন, যে বাঙ্গালীরা ছেলেমেয়ের অসুখ হলে আর থই বাতাসা খাওয়ায় না, যে বাঙ্গালীরা আফিস থেকে আসবার সময় এক পয়সার তামাক বাদে পনের আনা তিন পাইএর বিলাতী জিনিষ কিনে আনে, যে বাঙ্গালীর মেয়েরা ফ্যান্সী পোষাকের জন্য স্বামী বেচারিকে ঋণগ্রস্ত করতে ত্রুটি করে না, যে বাঙ্গালীরা ছেলেমেয়েকে বিলাতী দাইএর দ্বারা লালন-পালন করায়, সেই বাঙ্গালীরা কি আবার দেশী কাপড় কিনে পড়বে আশা করেন?" দেবতাদের মধ্যে বাবু হচ্ছেন কার্তিক। কার্তিককে প্রতিভূ করে তাঁর বাবুয়ানার জন্যে ক্রেতব্য জিনিষের একটা তালিকা পাওয়া যায় অহিভূষণ ভট্টাচার্যের "বোধনে বিসর্জন" (১৮৭৬ খ্রীঃ) প্রহসনে। জিনিষগুলো এই—"তোয়ালে এক ডজন, বর্ডারদার সিল্কের রুমাল এক ডজন, পিওর সোপ এক বাক্স, ফ্লোরিডা ওয়াটার, ল্যাভেণ্ডার, অডিকোলন, পমেটম, রোজ এ্যাটো আতর, আয়না, ব্রুস, বার্ডসাই চুরুট, হোয়াইট টু লভিজ কোম্পানী পাম্প সুজ, মাছ ধরার যন্ত্রপাতি, হুইল বুগো সুতো ইত্যাদি।" দীনবন্ধু মিত্রের "সধবার একাদশী"তে (১৮৬৬ খ্রীঃ) মুক্তেশ্বরের জামাইয়ের চেহারার বর্ণনা নিমচাঁদের ভাষায়, "তুমি সিঁদুরে হাক চাপকান, গলায় বিলাতী ঢাকাই চাদর, বিদ্যাসাগর পেড়ে ধুতি পরা, পরমিকালে হোলমোজা পায়, তাতে আবার ফুলকাটা গার্টার, জুতো জোড়াটি বোধহয় পথে আসতে কিনেছো, ফিতের বদলে রূপার বগলস, হাতে হাঙ্গরের হাড়ের বেতের ছড়ি, আঙুলে দুটি আংটি।" চুনিলাল দেবের "কটিকচাঁদ" প্রহসনে (১৮৯৮ খ্রীঃ) বাবুর আত্মকথার মধ্যে দিয়ে বাবুয়ানার দ্রব্য-সামগ্রীর নমুনা পাই। কটিকের ছেলে দুটি গান ধরেছে,—

"চৌঘুড়ি হাঁকিয়ে যাব সুজেতে ইয়ার,
কালাপেড়ে ইউনিফরম কেষ্টা চাদর চুনটদার।
বেলদার জামা গায়ে, বল সু দিয়ে পায়ে
ফুল তোলা সিল্ক মোজা, সিল্কের গার্টার,
হীরে পান্নার আংটি হাতে, বুকে চেনের কি বাহার।
ঘুঁয়ের গোড়ে গলায় দিয়ে, এসেন্স মাখা রুমাল নিয়ে,
ক্রেককট টেরী মাথায়, ঢালবো ল্যাভেণ্ডার
চলবে বুলি মজাদারী, উড়বে খালি রোজ লিকার।।"

রাজকৃষ্ণ রায়ের "খোকাবাবু" প্রহসনে (১৮৯০ খ্রীঃ) বিবিয়ানার সমগ্রীর বর্ণনা আছে। দয়াল-গিন্নী ঝি-কে বলে,—"যা শিগ্‌গির পিয়ারের সাবানখানা গোলাপ-জলে ডুবিয়ে নিয়ে আয়। রেশমী রুমালখানা পসনেলের ফ্লোরিডা ওয়াটারে ভিজিয়ে নিয়ে আয়। ল্যাভেণ্ডা.র বড় তোয়ালেখানা ডুবিয়ে আন। সিন্দুরে একটু বেলার আতর মিশিয়ে আন।" বিবিয়ানার বিরুদ্ধেও আর্থিক দৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত হয়েছে, তবে এ বিষয়ে আলোচনার অবকাশ সৃষ্টির কোন প্রয়োজন নেই।

বস্তুতঃ বাবুদের এই উন্নত মানের জন্যে গ্রামীণ অর্থনীতি ভেঙে পড়ে। শ্যামাচরণ ঘোষালের "বারইয়ারী পূজা" প্রহসনে (১৮৭৮ খ্রীঃ) গ্রামের চাল-কাপড়ের দোকানদার বৈদ্যনাথকে বলে,—"আর কারবার! সে রামও নেই, আর সে অযোধ্যাও নেই, তবে কিনা বসে না থেকে ব্যাপার খাটি, দেখ এই রামবাবু আর নবীনবাবুর বাড়ী কাপড় দিয়েই বিলক্ষণ দশটাকা লাভ হতো, এখন আর তাঁরা এখানে কেউ নেই, প্রায় সকলেই কলকাতায়, কাজে কাজেই লাভের দফা হয়ে গেছে।" শুধু মাত্র বিদেশী দ্রব্য-সামগ্রীর জন্যে নয়, নব্য সংস্কৃতিনির্ভর বাবুয়ানার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল এমন কতকগুলো আচার যা রক্ষণশীলের কাছে অনাচার বলে বোধ হয়েছে। গ্রামে তার অনুষ্ঠান সুবিধাজনক ছিলো না। বাবুদের নগরপ্রীতির মূলে এটাও একটা কারণ।

সংস্কৃতি ও অর্থনীতির দিক থেকে বাবুদের তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। (ক) কোতো বাবু (খ) হঠাৎ বাবু এবং (গ) কাপ্তেন বাবু।

কোতো বাবু—বাবুয়ানার যাদু আকর্ষণ অর্থহীন ব্যক্তিকেও অপব্যয়ে প্ররোচিত করেছে। বৃথা মান ও প্রতিষ্ঠার জন্যে অর্থহীন ব্যক্তি একই সঙ্গে সকলকে এবং নিজেকে প্রতারিত করবার চেষ্টা করেছে। 'মধ্যস্থ' পত্রিকায় (মধ্যস্থ—চৈত্র, ১২৮০ সাল) কোতো বাবুর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে—"বাইরে বাবু নাম, ঘরে বাঙ্গারাম। অর্থাৎ বাস্তবিক ধনী নয়, অথচ ধনীর ন্যায় বাহ্য ভড়ং করিয়া চলিত, তাহাকে লোকে কোতোবাবু বলিত।" প্রিয়নাথ পালিতের "টাইটেল দর্পণ" (১৮৮৫ খ্রী:) প্রহসনে দীনবন্ধু ছড়া কেটেছে,—

"মনে করি গাড়ি চড়ি যদি উল্টে পড়ে যাই।
মন ত সকের বটে হাতে কিন্তু পয়সা নাই।

হরিহর নন্দীর "হাল নাই কুকুরের বাঘা নাম" প্রহসনেও (১৮৭৭ খ্রী:) এ ধরনের ছড়া আছে,

"জাগা নাই জমিন নাই, গল্প করে ভারি।
আগে পাছে লণ্ঠন, টাকার নামে ঠনঠন্
সবাই যোড়ান গাড়ী।
কানে কলম গুঁজে ফিরে, ছেঁড়া কাঁথা গায় ওড়ে
বাতি জ্বালার সেল্প
ইংরেজি বকেন মজা, ভেম্ ভেম্ যা ভেম্ ভেম্।"

এ ধরনের কোতো বাবারা সমাজে অবাস্তব ছিল না। গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "বিধবার দাঁতে মিশি" (১৮৭৪ খ্রী:) প্রহসনে আছে,—প্রেমানন্দ দাস তাঁর বরানগর বাড়ীতে ১৩ই ডিসেম্বর শনিবার একটা আমোদ দলে যোগ দিতে বন্ধু ও সাঙ্গোপাঙ্গকে নিমন্ত্রণ করেছেন। বিধু ও গোরা প্রেমানন্দ সম্পর্কে আলোচনা করে। সে পোশাক-আশাকে খুব বিলাসী, তার দুটো মোসাহেব আছে—ভূপাল ঘোষ ও রমেশ সেন। প্রেমানন্দ বড় বড় বাৎ মারে, কিন্তু এদিকে হাঁড়ি ঠন্ ঠন্। গোরা মন্তব্য করে—"কলকেতায় একচোকো বাবুর জামাই চটকদাসও ঐ দলের লোক।" এই ব্যক্তিগত আক্রমণ প্রতিষ্ঠাস্পৃহার স্বাক্ষর বহন করলেও বাস্তবতার স্বাক্ষরও বহন করে।

বাবুয়ানার সঙ্গে মিশেছিল কোতো সাহেবীয়ানা। অমরেন্দ্রনাথ দত্তের "কাজের খতম্" প্রহসনে (১৮৯৯ খ্রী:) যতি গণেশ ডাক্তারের সাংসারিক অনটনের কথা বলতে গিয়ে বলে—"পোশাকেতেই চটক বাবা! ঘরে হাঁড়ি [illegible] তত্ত্বপযুক্ত। গাউনের জন্যে আর কাউলের জন্যে বাপান্ত না করছে এমন দিনই নাই। ভাগ্যিস রমাকান্ত বাবুর Family Doctor হতে পেরেছিলে! তাই যা হোক করে চেয়ার বদলে কেরোসিনের বাক্সোর বস, আর টেবিলের বদলে কলুজিতে খাচ্ছ, আর দুএকটা মর্তমান রম্ভা বদনে দিতে পাচ্ছ।" "গণেশের স্ত্রী রঙ্গিনী গণেশকে বলেছে—"ভাত দেবার কেউ নয়, কিল মারবার গোসাঁই। অমন কতো সাহেবের মুখে মারি জুতোর বাড়ী!! জজেদের মেয়ের মত খেতে পরতে দিবি, আর একশো টাকা করে মাসোহারা দিবি! এইলোভে জাত খুইয়ে বে করেছিলুম!"

ব্যক্তিগত চুক্তিমূলক আয়ে বাবুয়ানা সম্ভবপর হয় না। তাই এই সব কতোবাবুদের আয় হয়ে গেছে দৌর্নীতিক। বাড়ীর টাকা গহনা ইত্যাদি চুরি বা প্রতারণা দ্বারা সংগ্রহ করে তারা বাবুয়ানার খরচ চালিয়েছে। হরিশচন্দ্র মিত্রের লেখা "ঘর থাকতে বাবুই ভেজে" প্রহসনে (১৮৬৩ খ্রী:) প্রমীলা কোতোবাবুদের কথা বলতে গিয়ে বলে, "এরা ১০৲ টাকা মাইনে পায় ২৫৲ টাকার মেয়ে রাখে।" যামিনী জিজ্ঞেস করে—"উপরি রাখে বুঝি?" প্রমীলা বলে—"উপরি রোজগার বাড়ীর মাথায় হাত বুলিয়ে।" দক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের "চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী" প্রহসনেও (১৮৭২ খ্রী:) আছে,—কোতোবাবু পরেশের স্বগতোক্তি—"আজ শনিবার প্রাণটা উড় উড় কচ্চে, মজাটজা করতে হবে। এমন মধুবারটা যে বুকের উপর দে কেটে যাবে, সেটা প্রাণে সইবে না। হাতে টাকা-কড়ি নেই, তা কি করব, মাগের একখানা গয়না বেচতে হবে, তা নইলে কি এমন মজা ছেড়ে দেব? যতদিন বাঁচব ইয়ারকি হদ্দমুদ্দ দেবো।" এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শনিবার হচ্ছে গত শতাব্দীর বাবুদের দুষ্কর্মের পর্বদিন। চন্দ্রকান্ত শিকদার এ সম্পর্কে "কি মজার শনিবার" (১২৭৭ সাল) নামে একটা ছড়ার বই লিখেছিলেন।

প্রহসনে এই সব কোতোবাবুদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করা হয়েছে এবং নিম্নস্তরের ব্যক্তিদের অশ্রদ্ধা প্রকাশের মাধ্যমে এই বাবুয়ানা ও কোতো সম্মানের অসারতা প্রচার করা হয়েছে। 'বৈকুণ্ঠ' (=ব্যয়কুণ্ঠ)-বাবুকে উদ্দেশ করে একটি বেশ্যার ছড়া উনবিংশ শতাব্দীতে সুপ্রচলিত ছিল,—

"পয়সা কড়ী নেই নাগরের

বোসে যদি থাকতে নারিস,
ঘুম লাগে তো ঘরকে যা।"

নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "বুঝলে কিনা" প্রহসনে (১৮৬৬ খ্রীঃ) ফতোবাবু অটল সম্পর্কে কোচোয়ান মন্তব্য করেছে,—

"খানে মে বড়া মকুবুদ, যৈসে ওয়েলর ঘোড়া,
লেকেন পয়সা দেনে মে বড়া আড়িয়ল হোতা।

বস্তুতঃ ফোতো বাবুয়ানা প্রতারণামূলক হওয়ায় এই ধরনের বাবুয়ানার দৃষ্টান্তে সমাজসভ্যের সাধারণ আয় ব্যয়ের অর্থনীতি সম্পূর্ণ ধ্বসে পড়ে।

হঠাৎ বাবু—অর্থসম্পন্ন অথচ 'সাংস্কৃতিক' দিক থেকে ঐতিহ্যহীন বাবুরা এই গোত্রে পড়েন। এদেশের গ্রাম্য জমিদাররা যখন নব্য Industrial Capitalist-দের শিল্পের জন্য কাঁচামালের যোগানদার হলেন, তখন এই "a race incorigible"-কে ইংরেজদের পক্ষ থেকে যথেষ্ট সম্মানের ব্যবস্থা করা হ'ল এবং অর্থ ও গ্রামীণ সংস্কৃতির দিক থেকে জমিদাররা হয়ে উঠলেন প্রতিপত্তিশালী। ইংরেজদের আনুকূল্যে অতি সহজে এঁরা নগরাশ্রয়ী নতুন সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকলেন। তাই এঁদের মধ্যে অনেকে গ্রাম ত্যাগ করে শহরে এসে 'হঠাৎবাবু' হ'লেন। জমিদারদের এ ধরনের অপব্যয়ে ইংরেজদের সমর্থন ছিল। এদেশের মূলধন যাতে লগ্নী কম হয়, সেদিকে ইংরেজদের দৃষ্টি ছিল। ইংলণ্ডের Capitalistরা অনুভব করেছিলেন যে, তাঁদের মূলধন ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ থাকলে Law of Diminishing Return"-এর সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন খরচা বাড়বে এবং মুনাফায় আঘাত পড়বে। তখন Capital রপ্তানীর প্রয়োজন দেখা দিল। Holt Mackanzie তখন পরামর্শ দিলেন, ভারত থেকে যে অর্থ ওদেশে পাচার হয়, তার থেকেই Capital গড়ে নেওয়া যেতে পারে এবং ভারতের মোটা মাইনের সাহেবরা তাদের উদ্বৃত্ত অর্থকে লগ্নী করতে পারবে। এই ভাবে ক্রমে ক্রমে বিদেশী মূলধন অক্টোপাশের মত সর্বত্র লগ্নী হবার সুযোগ খুঁজছিল। বিত্তবান জমিদারদের মূলধন লগ্নীর সুবিধা ছিল। কিন্তু তারা ইংরেজদের চক্রান্তে একাধারে বাবুয়ানার দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয় করে বিদেশী শিল্পের বাজার দৃঢ় করেছে, অন্যদিকে তেমনি মূলধনের উপযোগী অর্থ অনর্থক অপব্যয় করেছে।

হঠাৎবাবুদের বাবুয়ানার মূলে এই অর্থনৈতিক চক্রান্তের ইতিহাসটির প্রাসঙ্গিকতা আছে। এই হঠাৎ চলেছে। তাই রক্ষণশীল অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ এবং প্রগতিশীল অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ উভয় পক্ষ থেকেই বিদ্রূপের পাত্র হয়েছে। নব্য পরিবেশে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অভাবে কেমন করে হাস্যকর পরিস্থিতির মধ্যে পৌঁছায়, অনেক প্রহসনে তার বর্ণনা আছে। সাধারণ ভাবে হঠাৎবাবুদের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠাগত দৃষ্টিকোণই সংগঠিত হয়েছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রক্ষণশীল আর্থিক দৃষ্টিকোণও তার সঙ্গে জড়িত। আমাদের সমাজে ফোতোবাবু এবং হঠাৎবাবুর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য ধরা হয় না। অনেক ক্ষেত্রে কাপ্তেনবাবুকেও হঠাৎবাবু বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে। লেখক যে দিকটি লক্ষ্য করে হঠাৎবাবুদের পৃথক গোত্রে ফেলেছেন, উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-সম্পর্ক প্রহসনকাররা সর্বদা সেই অর্থে ফেলেন নি। হরিহর নন্দীর লেখা 'হঠাৎবাবু' (১৮৭৮ খ্রীঃ) প্রহসনটির বিষয়বস্তু পূর্বোক্ত বক্তব্যের প্রমাণ বহন করে।

কাপ্তেনবাবু—"সমাজ সংস্কার" নামে একটি গ্রন্থে অবতারচন্দ্র লাহা লেখেন—"আমি দেখিতেছি 'বাবু' শব্দের পশ্চাতে কেবলমাত্র একটি করিয়া 'ঘোর' যুড়িয়া দিলেও বাবুদ্বয়ের প্রকৃতিগত ভাবার্থ তত স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় না। সুতরাং বিস্তর গভীর গবেষণার পর এই স্থির করিলাম যে 'ঘোর' শব্দের পরে ও 'বাবু' শব্দের পূর্বে অর্থাৎ দুয়ের মধ্যস্থলে আরও একটি করিয়া বিশেষণ শব্দ ব্যবহার করিলে ভাল হয়। শব্দটি কিন্তু জাহাজী, তা করি কি—অর্থাৎ—'বাবু'—'ঘোরবাবু' —'ঘোর কাপ্তেনবাবু।' (পৃঃ ২)। লেখকের বক্তব্য থেকে পরিষ্কার বোঝাচ্ছে, যে কাপ্তেনবাবু বাবুর কোন জাত নয়, বাবুয়ানার মাত্রা-মাত্র। শরৎচন্দ্রের ভাষায় "ভয়ঙ্কর বাবু"। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে পরবর্তীকালে কাপ্তেনবাবু বলতে বুঝিয়েছে ধনীর বয়ে-যাওয়া নাবালক পুত্র। ফোতোবাবুর ওপর মোসাহেবদের আকর্ষণ নেই। কিন্তু হঠাৎবাবু এবং কাপ্তেনবাবুদের ওপর মোসায়েবদের আকর্ষণ তীব্র। উল্লিখিত "সমাজ সংস্কার" গ্রন্থে অবতারচন্দ্র লাহা লিখছেন—"যেমন প্রফুল্ল সরোবরে পদ্ম ফুটলে ভ্রমর-গুলো এসে গুণ গুণ করে, মধুর কলসি ভেঙ্গে গেলে মাছিগুলো এসে ভ্যান্ ভ্যান্ করে, বসন্তের উদয় হলে কোকিলগুলো এসে কুহু কুহু করে—আফিস অঞ্চলে একটা চাকরি খালি হলে, চারিদিক থেকে উমেদার এসে ভেড়ে, আর গো-ভাগাড়ে গরু পড়লে যেমন শকুনির টনক নড়ে, তেমনি বাজারে একটা কাপ্তেন বেরুলে মোসাহেবগুলো যেন [illegible] এসে পড়ে—অমনি মারে মারা,

পে খ্যাদান হাত হাবাতে উব পাঁজুরে, বরাখুরে প্রভৃতি মোসাহেব মহোদয়গণ চারিদিক থেকে এসে ধাঁ করে বাবুকে ঘিরে বসলো—ওহো! সে দৃশ্য অতি শোচনীয়। যেন জয়দ্রথ প্রভৃতি সপ্ত মহারথী একত্র করে ব্যূহ বন্ধনপূর্বক অর্জুননন্দন অভিমন্যুর প্রাণ সংহারে সমুদ্যত! সে ব্যূহ ভেদ করে বালকের প্রাণরক্ষা করে, কাহার সাধ্য?" (পৃ: ৫)। কাপ্তেনবাবুর অর্থব্যয়ের উপায় করে দেয় এই সব মোসাহেব। অনেক ক্ষেত্রে অর্থব্যয়ে বাবুর অনিচ্ছা থাকলেও মোসাহেবের তোষামোদে লোকের চোখে ঠুনকো সম্মান বজায় রাখবার জন্যে বাবু খরচে প্রবৃত্ত হন। এমন কি নাবালক অবস্থায় অর্থের অসুবিধায় এরা হ্যাণ্ডনোটে টাকা পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করে—তাতে মহাজনের সঙ্গে মোসাহেবদেরও বখরা থাকে। চুক্তি হয়, সাবালক অবস্থায় কাপ্তেনবাবু সে টাকা শোধ করবেন। মহাজনরা সাধারণত: নিশ্চিন্ত, কারণ একদিন কাপ্তেনবাবু বিষয়-আশয় পাবেন। অনেক সময় অনেক মোসাহেব নিজের বেনামী টাকা কাপ্তেনবাবুকে ধার দিয়ে পরে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। তা ছাড়া কাপ্তেনবাবুর ঘড়ি বোতাম আংটি ইত্যাদি উদ্যোগী হয়ে বিক্রী করে এবং ভাল মুনাফা পেয়ে থাকে। এদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় একটি পুস্তকে (আপনার মুখ আপনি দেখ—ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, ১৮৬৩ খ্রী:। পৃ:৩) লিখেছেন—"ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগকে নি:স্ব করিতে কিম্বা বিপদে ফেলিতে এই জানোয়ারেরাই মূল কারণ। কত কত ধনাঢ্য ব্যক্তি যে তাহারদিগের বুদ্ধি বশত: মনুষ্য নামের অযোগ্য হইয়াছেন তাহা পাঠক মহাশয়েরা স্মরণ করিলেই জানিতে পারিবেন। দুগ্ধকলা দিয়া কালসর্প পুষিলে যেমন ফললাভ হয়, তাহাদিগকে প্রতিপালন করাও সেইরূপ জানিবে। এমত অনেক দেখা গিয়াছে যে এই অন্নদাস জানোয়ারে অনেকের অন্ন ধ্বংস কোরে শেষে অন্নদাতার এমত অনিষ্ট সাধন করিয়াছে যে তাঁহার প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়িয়াছে।"

বিভিন্ন প্রহসনে কাপ্তেনবাবুর এই সমস্ত অপব্যয় দর্শনে সকলের ওপরেই একটা বিতৃষ্ণা ব্যক্ত হয়েছে। মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের "চার ইয়ারে তীর্থযাত্রা" প্রহসনে (১৮৫৮ খ্রী:) রামকৃষ্ণ বলেছে—"এই যারা পেটে না খেয়ে…টাকা জমায় আর সেই টাকা তারি ছেলেপিলেকে মজাবার উপায় করিয়া দেয়, সেই প্রকার টাকা জমান অতি মন্দ।" কাপ্তেন শিকারীদের সম্পর্কেও প্রহসনকারের দৃষ্টিকোণ অতি স্পষ্ট। কালীচরণ মিত্রের "কাপ্তেনবাবু" প্রহসনে (১৮৯১ খ্রী:) রামকৃষ্ণ ভড় একজন কাপ্তেন শিকারী মহাজন। তার সম্বন্ধে অমৃতলাল পাইন বলে—"ব্যাটা কত ছেলের এমনি করে সর্বনাশ করেছে। একগুণ দিয়ে চারগুণ আদায় করে।" একই প্রহসনে প্রহসনকার এই সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছেন। প্রহসনের শেষে জজ সংবাদপত্রে এই কথা ছাপাতে বলেন—'অদ্য হইতে যদি কোন মহাজন নাবালককে না বুঝিয়া টাকা ধার দেন, তাহা হইলে তিনি টাকা পাইবার পরিবর্তে আইনানুসারে দণ্ড ভোগ করিবেন'।"

এই ধরনের বকাটে ছেলে কাপ্তেনবাবুর দল ক্রমেই ব্যাপক হয়ে উঠেছিল। দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের "চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী" প্রহসনে (১৮৭২খ্রী:) প্রিয়নাথ এক জায়গায় বলেছে—"পেনটিতে ভাল পুষ্যিপুত্র দেখাও তো।" জগচ্চন্দ্র উত্তর দেয়—"ও গুলিখোরের দেশ, ওখানে আর পোষ্যপুত্র ভাল হবার যো আছে? যদি একজনের বাপ কতকগুলি বিষয় রেখে মরে যায় আর তার ছেলে যদি ছোট হয় তা হ'লে পাঁচ বেটা বওয়াটে এসে সেই ছেলেটির মোসায়েব হয়ে গাঁজা গুলি চরস চণ্ডু ও মদ খাইয়ে অবশেষে পথের ভিখারি করে।" তখন প্রিয়নাথ মন্তব্য করে—"শুধু ঐ দেশটি কেন? আজকাল ঐরূপ সব দেশ হয়েছে।"

বস্তুত: বাবুয়ানা আমাদের সমাজে অনর্থক অর্থব্যয়ের নামান্তর ছিল। আমাদের সমাজে বিদেশীদের আর্থনীতিক শোষণে আমরা যে হীন পর্যায়ে পৌঁছিয়েছি, সে অবস্থায় সঞ্চিত সামান্য অর্থ লগ্নীতে ব্যবহার না করে বাবুয়ানায় অপব্যয় করার অর্থ প্রকারান্তরে শিল্পপতি ইংরেজদের শিল্পের চাহিদা সৃষ্টি করা। ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের "কিছু কিছু বুঝি" (১৮৬৭ খ্রী:) গোড়াতে নট বলছে—"কিছু কিছু বুঝি ঐ বুঝলে কিনারই আদর্শ মত সুরাদোষ ইন্দ্রিয়দোষ যদেচ্ছাহার ও অনর্থক অর্থব্যয় প্রভৃতি দেশাচার সংশোধক বিষয়েই লিখিত হয়েছে। মদ্যপানও বাবুয়ানার অঙ্গ হিসেবে এবং সাধারণ প্রবৃত্তিতেও সমাজে "অনর্থক অপব্যয়ের" দৃষ্টান্ত এনেছে। লক্ষ্মীনারায়ণ দাসের "মোহন্তের এই কি কাজ" (১ম খণ্ড) নাটকে (১৮৭৩ খ্রী:) এক জায়গায় এই মাত্রাতীত ব্যয়ের প্রসঙ্গ আছে।—

"মাধব। তোমার এই ২০ টাকা মাইনাতে কি করে সব হয়, তাও ত কই পুরা মাইনা একবারও পাও না?"

কানাই। আরে বোকা ছেলে! যা পাই যেখানে

তার অর্ধেক আগেই মায়ের হাতে, না হয় গিন্নির হাতে দি, আর বাদ বাকি মামাদের দি।

মাধব॥ মামা কারা?

ডি সুজা॥ শুঁড়ীরা, যারা মদ বেচে।"

অতুলকৃষ্ণ মিত্রের "ভাগের মা গঙ্গা পায় না" প্রহসনে (১৮৮৯ খ্রীঃ) মদ্যপানের অর্থঘটিত দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। ভয়ানকচন্দ্রের মাতাল পুত্র বেঁড়ে "শালা" বাবার কাছে টাকা চাইতে আসে। সে মদ খেয়ে মাতলামো করায় হাকিম তার ২৫৲ টাকা ফাইন করেছে। বাইরে সিপাই অপেক্ষা করছে। মাতলামো করবার জন্যে তার মাকেও পাহারাওয়ালা আটক রেখেছে। ভয়ানকচন্দ্র রেগে গি য় বলে, প্রাইভেট ইস্কুলের মাষ্টারদের মাইনে মেরে একশো টাকা তার মায়ের হাতে দিয়েছে, সব খরচ করে আবার এই! তখন বেঁড়ে ভয়ানকের গলার কলার চেপে ধ'রে বলে,—"শালা নিদেন হামার পাঁচ টাকা দিবি কিনা বল? নইলে এক সেলারি blow-তে তোর বদন বিগড়ে দেবো।" ভয়ানক ভয়ে ভয়ে তাকে চেন ঘড়ি দিয়ে দেয়—বলে এটা বাঁধা দিয়ে সে টাকা সংগ্রহ করুক।

বাবুয়ানার অঙ্গ মদ্যপানের বিরুদ্ধে যে আর্থিক দৃষ্টিকোণ সংগঠন হয়েছে, তার মূলেও একটা বড় পরিকল্পনা থেকেছে। অমৃতলাল বসুর "বাবু" প্রহসনে (১৮৯৪ খ্রীঃ) তিতুরামের বক্তব্যটি এক্ষেত্রে লক্ষণীয়। তিতুরাম সমসাময়িক কালের ওপিয়ম কমিশন সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছে,—"ওপিয়ম কমিসন অর্থ ইংরেজদের নিজেদেরই লাভ, আফিমে দেশ সর্বনাশে যাচ্ছে বলে কমিসন বসে নি। মদ্যে আরও সর্বনাশ হচ্ছে। ইংরেজদের সর্বত্রই লাভের প্রশ্ন। তাদের নিজেদের আত্মীয়দের মদের ব্যবসায় আছে। তাইসেই ব্যবসায়ের লাভের জন্যই আফিম বন্ধ করছে। আফিমখোর আফিমের অভাবে মদ খাবেই। তাতে ইংরেজেরই লাভ।" মদ্যপান ও অপব্যয় সম্বন্ধে বলতে গিয়ে 'সুলভ সমাচার' পত্রিকায় (সুলভ সমাচার পত্রিকা—১০ই ফাল্গুন, ১২৭০ সাল) 'অপরিমিত ব্যয়' নামে একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছিল—"চালে খড় নাই চুলে পোমেটম, জামার পকেটে একটি আধলা পয়সাও খুঁজিলে পাওয়া যায় না, অথচ আস্তিনে রৌপ্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ চারটা দু'আনি, মা ছেড়া কাপড় পরে ঘর গোবর দেন, নিজের বুট, পেনেটলুন, চাপকান, জোব্বা এবং টাসল দেওয়া টুপি, বাড়ীতে ভাতে ভাত, আপিসে রোজ দুই আনা রকম টিফিন চলে না। অন্ন হউক না হউক মদ খাওয়াটি চাই এমন বাবুও অনেক দেখা যায়। তাহাদের যে কি কষ্ট তাহা তাঁহারাই বিলক্ষণ জানেন। তাঁহাদের বিষয় আমরা যাহা কিছু জানি তাহা কেবল দেখে শুনে তাহারা ভুক্তভোগী।

"আয় বুঝে ব্যয় কর হবে না অভাব,
আয় ছাড়া ব্যয় করা মূঢ়ের স্বভাব।"

বাবুয়ানার বিরুদ্ধে আমাদের সমাজে আর্থনীতিক দৃষ্টিকোণ ব্যাপক সমর্থনে পুষ্ট হয়ে উঠেছে। তবে বাবুয়ানার সঙ্গে নব্য সংস্কৃতি জড়িয়ে থাকায় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠাগত দিক থেকেও বাবুয়ানার বিরুদ্ধে দৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত হয়েছে। নব্য সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রী স্বাধীনতা, সমাজ-সংস্কার, দেশোদ্ধার, ব্রাহ্মধর্ম ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে প্রচুর প্রহসন লেখা হয়েছে এবং সেখানে বাবুয়ানার প্রসঙ্গে সমাজদর্শনের নতুন নতুন ক্ষেত্রেরও অবকাশ আছে। তবে এক্ষেত্রে তার অবতারণায় কোন প্রয়োজন নেই।

—•—

আচার্য কৃষ্ণকুমার মিত্র

শ্রীগজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ঊনবিংশ শতকে বিভিন্ন দিক উদ্ভাসিত করে ভারত-ভূমিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন কয়েক জন মহামানব। প্রত্যেকেই ছিলেন অসামান্য শক্তির অধিকারী। তাঁদের অবদানে দেশ হয়েছে সমৃদ্ধ। সে ঋক্‌থের উত্তরাধিকার পেয়ে আমরা ঐশ্বর্যবান্। জগৎ সভায় আমাদের আসন আজ আভিজাত্যমণ্ডিত। তাঁদের স্মৃতিতে আসে হৃদয়ে প্রেরণা, কর্মে উৎসাহ। আমরা তাই হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই তাঁদের উদ্দেশ্যে। মহা সমারোহে উদ্‌যাপন করি তাঁদের জন্মশতবার্ষিকী।

কিন্তু এমন একজন মহাপুরুষের কথা আমরা বিস্মৃত হ'তে চলেছি যিনি ছিলেন সর্বগুণাকর। আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সেই পুণ্যাত্মা তেজস্বী পুরুষসিংহ আচার্য কৃষ্ণকুমার মিত্রের নাম। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর সংস্পর্শ লাভের। দেখেছি তাঁর নীরব কর্মসাধনা। অগণিত মহৎ কাজ তিনি করেছেন নাম-যশের অপেক্ষা না করে। কি মহান্ হৃদয় নিয়ে যে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর প্রতিটি কর্মধারায়।

১৮৫২ সালে ময়মনসিংহ জেলার বাঘিল নামে এক অখ্যাত পল্লীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অতি সাধারণ পরিবেশে উদ্ভূত হয়েও তিনি পেয়েছিলেন অসম সাহসিকতা ও বলিষ্ঠ সংস্কার-মুক্ত মন। পাঠ্যাবস্থায় ব্রাহ্ম ধর্মের উদারতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তিনি ঐ ধর্মে দীক্ষিত হন। এ জন্য তিনি হিন্দু সমাজচ্যুত হয়ে আত্মীয়-স্বজনের বিরাগভাজন হন। এমন কি সর্বপ্রকার সাহায্যে বঞ্চিত হয়ে চরম অসুবিধার সম্মুখীন হন। কিন্তু বজ্র-কঠোর কৃষ্ণকুমার আপন সঙ্কল্পে অটল রইলেন।

তিনি একক যাত্রা করলেন সংসার পথে। সসম্মানে স্নাতকোত্তীর্ণ হ'লেন। প্রভূত অর্থোপার্জন-মানসে 'ল' কলেজে ভর্তি হ'লেন। কিন্তু শীঘ্রই বুঝতে পারলেন যে মিথ্যা ভাষণ ব্যতীত ওকালতিতে সাফল্য লাভ করা যায় না। সত্যের পূজারী কৃষ্ণকুমার তৎক্ষণাৎ সে পথ পরিত্যাগ করলেন। সে-যুগে গ্রাজুয়েটের সরকারী উচ্চপদ দুর্লভ ছিল না। কিন্তু বিদেশীর পদলেহন করে বিলাস-বৈভব ভোগ করা অপেক্ষা দারিদ্র্যবরণ শ্রেয় মনে করলেন। সামান্য বেতনে সিটি স্কুলে শিক্ষাব্রতীর কর্ম গ্রহণ করলেন।

আর্থিক অসাচ্ছল্য তিনি ভোগ করেছেন কিন্তু অর্থের লালসায় কখনও অসৎ পন্থা গ্রহণ করেন নি। অন্যায় যত সঙ্গোপনেই আসুক তাকে তিনি কখনও প্রশ্রয় দেন নি।

একটি ঘটনা স্মরণ করে আজও আমার মনে বিস্ময় জাগে। হয়ত এ ঘটনার আমিই একক সাক্ষী। প্রকাশ না করলে তাঁর জীবনেতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আমি তখন মাত্র কৈশোর অতিক্রম করেছি। আমাকে তিনি খুব স্নেহ করতেন। প্রায়ই যেতাম তাঁর বাসায় কলেজ স্কোয়ারে। একদিন গিয়ে দেখি ব্রাহ্ম সমাজের বিশিষ্ট কোন এক রায়বাহাদুর তাঁর সঙ্গে আলোচনায় রত। আমি গৃহকোণে অদূরে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। হয়ত আমার উপস্থিতির গুরুত্ব কেহ দেন নি। তাঁদের কথোপকথন শুনতে পেলাম। মাঘোৎসবের সময় তখন আনন্দ মেলা বসত। রায়বাহাদুর তাঁকে অনুরোধ করলেন সেই মেলায় জুয়া খেলার অনুমতি দিতে। তিনি জানালেন যে, এজন্য ছয় হাজার টাকা সেলামী পাওয়া যাবে। এই টাকাটার অর্ধেক রায়-বাহাদুর নিজে নেবেন এবং বাকী অর্ধেক তাঁকে দেবেন। তিনি আরও বললেন যে এজন্য কোন বেগ পেতে হবে না বা অন্য কেহ জানতেও পারবে না। শুধু তাঁর অনুমতি পেলেই টাকাটা অনায়াসে আদায় করা যায়। কিন্তু এই অযাচিত অর্থ তিনি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন। বললেন, "অন্যায় কাজের প্রশ্রয় আমরা দিতে পারি না। তা যেমনই হোক।" অন্তরে বাহিরে এমন করে অন্যায় বর্জন ক'জনে করতে পারে? যেখানে অর্থলোভে লোক বিবেকশূন্য হয়, নানা প্রকার ছল চাতুর্যের আশ্রয় গ্রহণ করে সেখানে নীতিরক্ষার জন্য এরূপ লোভ জয় করা যে কত কঠিন তা সহজেই অনুমেয়। এমনি আরও অনেক ঘটনা আছে যা তাঁর সুমহান্ চরিত্রেরই উপযোগী।

তাঁর ব্যক্তিত্বের মহিমায় তিনি ছিলেন দেশবরেণ্য। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে পাওয়া যায় তাঁর দেশপ্রেমের

একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য! ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বঙ্গদেশকে বিভক্ত করে। এই বঙ্গভঙ্গ রদ করতে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দেশব্যাপী এক বিরাট্ আন্দোলন সুরু হয়। ১৯০৬ সালে সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতারা বরিশালে মিলিত হন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সভাসমিতির উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে। 'বন্দেমাতরম' ধ্বনিও নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু আয়োজন অসমাপ্ত রাখা হ'ল না। সভার কাজ আরম্ভ হ'ল। এমন সময় একদল মিলিটারী উপস্থিত হ'ল সভা পণ্ড করতে। গুলী চলল। অনন্যোপায় হয়ে নেতারা সভাভঙ্গ করে চলে যাওয়াই স্থির করলেন। একে একে সকলে সভামণ্ডপ পরিত্যাগ করতে লাগলেন। কিন্তু নির্ভীক কৃষ্ণকুমার একাকী বেদীতে দাঁড়িয়ে সিংহ গর্জনে 'বন্দে মাতরম' ধ্বনিতে দিক প্রকম্পিত করতে লাগলেন। তাঁর পণ, গুলীবিদ্ধ হয়ে প্রাণ-বিসর্জন করবেন তথাপি এ অন্যায় আদেশ প্রতিপালন করবেন না। উন্নত শির, অকুতোভয়, অটল, অকম্পিত। সে এক মৃত্যুভয়লেশহীন তেজোময় হিমাচল মূর্তি। ক্ষণেকের তরে সৈনিকের হস্তও স্তব্ধ হয়ে রইল। কিন্তু সে নিমেষ মাত্র। মুহূর্ত পরেই বুঝি সব শেষ হয়ে যাবে। একটি মহামূল্য প্রাণের স্পন্দন চিরতরে লুপ্ত হবে। সুরেন্দ্রনাথ আর স্থির থাকতে পারলেন না। ছুটে গিয়ে ভলান্টিয়ারদের সাহায্যে জোর করে তাঁকে টেনে নিয়ে এলেন। সেই দৃপ্তমূর্তি কল্পনা করলে আজও প্রাণে উন্মাদনা জাগে।

সাধারণ একটি কুলীর দুঃখেও তিনি প্রাণে ব্যথা অনুভব করতেন। তখন চা-বাগানে শ্বেতাঙ্গ মালিকেরা কুলীদের উপর ভীষণ অত্যাচার করত। তিনি 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় তাদের এই নির্লজ্জ বর্বরতার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন চালিয়ে তা বন্ধ করেন।

সমাজের দুর্নীতি এবং পঙ্কিলতা দূর করতে তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন। সমাজে একটি সৎ আবহাওয়া প্রবাহিত হোক্ এই ছিল তাঁর কাম্য। চরিত্রবান্‌কে তিনি অশেষ শ্রদ্ধা ও সমাদর করতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, সর্বপ্রকার উন্নতির মূলে রয়েছে চারিত্রিক শুচিতার প্রভাব। শেষ জীবনে তিনি ধর্ম-প্রচারের জন্য দেশ পরিক্রমার উদ্যোগ করেছিলেন। কিন্তু বার্ধক্য পীড়িত হয়ে সে কাজ আর সম্পন্ন করতে পারেন নি।

নিপীড়িতা নারীদের রক্ষার জন্য তিনি সর্বতোভাবে চেষ্টা করতেন। এজন্য তিনি নারী রক্ষা সমিতি স্থাপন করেছিলেন। বহু অসহায়া নারীকে তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। একবার বিপন্না দু'জন মহিলাকে উদ্ধার করতে গিয়ে তিনি মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছিলেন। কলেজ স্কোয়ারের সম্মুখে গুণ্ডার হাত থেকে পরিত্রাণের আশায় দু'জন মহিলা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকে। দুর্ধর্ষ গুণ্ডাদের বাধা দেবার মত সেখানে তখন কেহ ছিল না। ভীতার্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে তিনি সেখানে ছুটে গেলেন। অসম সাহসী কৃষ্ণকুমার গুণ্ডাদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে উহাদের কবলমুক্ত করে মহিলা দু'টিকে নিজের বাসায় আনতে সক্ষম হন। এ সময় গুণ্ডাদের আক্রমণে তাঁর পাজরে ভীষণ আঘাত লাগে এবং তিনি দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী থাকেন।

১৯২৭ সালে ৮৫ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

তিনি ছিলেন ঋষিতুল্য, সত্যের পূজারী। সমাজ সংস্কারক ও দেশপ্রেমিক। সেই সুদীর্ঘ বপু, আজানুলম্বিত বাহু, প্রশস্ত বক্ষ, সমুন্নত শির, শ্বেতশ্মশ্রুশোভিত সৌম্যমূর্তি এখনও যেন নয়নে ভাসছে। তাঁর স্মরণে আজও কর্মে আনে উৎসাহ, মনে জাগায় সাহস ও দেহে সঞ্চার করে নবশক্তি। তাঁকে যেন আমরা বিস্মৃত না হই। বন্দে মাতরম্।

—•—

উপচ্ছায়া

শ্রীপঙ্কজভূষণ সেন

"তার পর—?"

"তারপর রাবণ রাক্ষস ভিখিরীর বেশ ধরে এসে দণ্ডকারণ্য থেকে সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেল লঙ্কাপুরী— রাম জানতেও পারল না—" একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস পরম নৈপুণ্যের সঙ্গে আত্মসাৎ করে ফেলল বুলা দেবী।

"আচ্ছা মা, রাম একটুও জানতে পারল না?"

"না শুমি, রাম একটুকুও জানতে পারল না—যারা সত্যিকার রাম তারা অন্তর্যামী হয়েও কোন দিনও এসব জানতে পারে না, সেদিন অভাগিনী সীতার বেলায়ও রাম জানতে পারে নি—" বুলা ভারি গলায় উত্তর দিল।

"জানতে পারলে কি হ'ত—?"

"জানলে—খুব সম্ভব গোটা রামায়ণ-পর্ব ঐ দণ্ডকারণ্যেই শেষ হয়ে যেত।"

"রাবণকে মেরে ফেলত?"

"নিশ্চয়।"

"বেশ হ'ত! সীতাকে তা হ'লে আর বনবাসে যেতে হ'ত না।"

"সীতার বনবাস তবুও আর হ'ত কি না বলা মুস্কিল—ওটা মহাকবি বাল্মীকিই বলতে পারেন, তিনি ভুল করেছিলেন কি না! সে যাই হোক, তুই ঘুমোবি, না সারা-রাত্রি বকবক করবি?"

"দাঁড়াও না, ঘুমোচ্ছি! রাবণ রাক্ষস সীতাকে লঙ্কাপুরী নিয়ে গিয়ে খেয়ে ফেলল না কেন মা?"

কেন যে খেয়ে ফেলল না—রাবণ রাক্ষসই জানে শুমি! খেয়ে ফেললেই বরং ভাল হোত—! কিন্তু যা ভাল রাক্ষসরা তা কখনই করে না। সে যুগেও যা এ যুগেও তাই।"

"যুগ কি মা?"

"যুগ মানে অভিধানে কত কি লেখা আছে—সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি। বড় হয়ে এসব ভাল করে জানতে পারবি। জানিস শুমি, ছেলেবেলায় আমার বাবা প্রত্যহ রামায়ণখানা পড়াতেন কিন্তু হ'ল না কিছুই—" এক মুহূর্তের জন্য বুলার মুখের ওপর নেমে এল কালো ছায়া কিন্তু পরক্ষণেই যা কে তাই—"হ'ল নাই বা কেন—ম্যাট্রিক পাশ করলাম, কলেজে ভর্তি করে দিলেন বাবা, স্কটিশচার্চে—স্বাধীন-ভাবে ট্রাম-বাসে একাই যাতায়াত করবার যুগ মেয়েদের তখন এসে গিয়েছে। বাবা কিন্তু একাল-সেকাল দুটোই মানতেন বলেই হয়ত অফিস যাবার সময় কলেজে নিয়ে যেতেন সঙ্গে করে আর ফিরবার সময় আমি কিন্তু ফিরতাম একাই! শুমি—ঘুমোলি?"

"না, বল না—তারপর—"

আশ্বিনের শেষ, সুতীর চাদরখানা শুমির গায়ে ভাল করে ঢেকে দিল বুলা মজুমদার। শুমিকে খাইয়ে-দাইয়ে ঘণ্টা খানেক গল্প করতেই হয়।

"কই, বল না—" গল্পের জন্য তাগিদ করল শুমি।

হ্যাঁ—কি বলছিলাম যেন?"

"কলেজে যখন পড়তে—তোমার বাবা নিয়ে যেতেন সঙ্গে করে—"

"কলেজের গল্প আর একদিন না হয় বলব, রাক্ষসের গল্পটাই বলি। বুঝলি শুমি—রাক্ষস পুরাকালে ত ছিলই, একালেও আছে?"

"আছে? একদিন দেখিও না মা।"

"দেখাব। কিন্তু তুই চিনতে পারবি ত? মানুষের মতই ওদের হাত-পা চোখ-মুখ! মানুষের মতই অবিকল এক—কিন্তু তবু ওরা রাক্ষস! মানুষের মধ্যেই ওরা ঘোরে-ফেরে কিন্তু শুমি, ওরা মোটেই মানুষ নয়—চিনে ওঠা কঠিন!"

"তুমি চিনতে পার?"

"পারি! কিন্তু যত দুঃখ ঐ চেনার পরে—আগে নয়! সীতারও তাই—লক্ষ্মণের গণ্ডি পেরিয়েই সীতা চিনল রাবণকে। যতদিন গণ্ডির মধ্যে ততদিন ওদের চিনবার যো নেই—গণ্ডি পেরুলেই ব্যস, রাক্ষস!"

"তা সীতা গণ্ডিটা পার হ'তে গেল কেন? লক্ষ্মণ ত নিষেধই করেছিল পই পই করে। আচ্ছা মা, তুমি হ'লে গণ্ডিটা পেরুতে?" শুমি মাকে প্রশ্ন করল পরম আগ্রহে।

"আমি—? আমার কথা ছেড়ে দে! আমি ত সীতা নই শুমি! আমি কৃষ্ণপ্রিয়া—"

"কি বললে মা? কৃষ্ণপ্রিয়া তোমার নাম?"

"আমার বাবার দেওয়া নাম—কিন্তু ও-নামটা রাক্ষসে খেয়ে ফেলল একদিন।"

খিল খিল করে হেসে ফেলল শুমি—"নাম আবার রাক্ষসে খায় নাকি"?

"সে-যুগের রাক্ষসে খেলে রক্ত-মাংসটাই খেত, এযুগে ওরা আগে খায় নাম—যাক্ এইবার ঘুমো দেখি।"

"খালি ঘুমো—ঘুমো দেখি! আমি যদি না ঘুমোই—?"

"বেশ—বেশ, ঘুমিও না! আমার আর কি—কাল সকালে তোমার দিদিমণি পড়াতে এসে দেখবেন, শুমি নাক ডাকাচ্ছে পড়ে পড়ে—"

"তুমি কি মা? কাল রবিবার না?"

ঠিক। বুলা চুপ করে গেল। বুলার শুমি খুব বুদ্ধিমতী—হবে নাই বা কেন! মহাপণ্ডিতের—

এক ঝলক রক্ত উঠে এল বুলার গালে কপালে। পণ্ডিত? দেবাশীষবাবু হয়ত তাই—দেশজোড়া নাম! গণিত শাস্ত্রে কি একটা নতুন আলোকপাত করেছেন, শুধু আলোকপাত করেন নি নিজের পরমাসুন্দরী গৃহিণীর দিকে। জীবনের সূর্যালোকের দিকে গাছপালাও নিজেকে সাজিয়ে ধরে। একটু প্রতিবাদ, একটু নিষেধও তিনি করতে পারতেন। গণ্ডিছাড়া সীতাকে উদ্ধার না করেই দিয়েছিলেন বনবাস—এযুগের রাম উদ্ধার-পর্বে আর এগুলেন না—

খিল খিল করে হেসে উঠল শুমি।

"হাসছিস যে?" বুলার মনের চিন্তাটা ধরে ফেলল নাকি শুমি?

"হাসছি—তুমি খালি বলব বলবই করছ কিন্তু কিছুই ত বলছ না—কলেজে পড়তে, তারপর?"

"তারপর পরীক্ষা এসে গেল—কি ভীষণ পরীক্ষা! এ পরীক্ষা যে মেয়ে দেয় সেই জানে, এ পরীক্ষার নাম—"

"সীতার অগ্নি পরীক্ষা—"

"ঠিক বলেছিস—সীতার অগ্নি পরীক্ষাই বটে! শুমি, তুই যদি মেয়ে না হয়ে ছেলে হতিস—"

"তা হলে কি হ'ত?"

"কত মেডেল, কত সার্টিফিকেট পেতিস তোর বুদ্ধির জন্য, হয়ত এক নতুন আলোকপাত করতিস গণিতে—" বুলা মজুমদার চুপ করে গেল সহসাই।

"মেয়েরা বুঝি পারে না?"

"হয়ত পারে। কিন্তু ঐ যে বললাম রাক্ষসের দৌরাত্ম্যিতে ওদের জীবন কখন যে জলেপুড়ে খাক হয়ে যায়—কখন যে ভুল করে পার হয় লক্ষ্মণের নিষেধ গণ্ডি! দেখলি না, সীতার কি হ'ল। লক্ষ্মণ সেদিন যে গণ্ডির দাগ দিয়েছিল—সে দাগ শুধু যে একা সীতার জন্যই দিয়েছিলেন তা নয়—সেই নিষেধের গণ্ডি এখনও সীতাদের জন্য [illegible]

তেমনি ওঁৎ পেতে দাঁড়িয়ে আছে নিরীহ ভিখিরীর বেশ ধরে!"

"রাক্ষসরা ছেলেদের ধরে না কেন মা?"

"ওদের হাড় খুব কঠিন। তা ছাড়া লক্ষ্মণ ত ছেলেদের জন্য কোন নিষেধের গণ্ডি দেয় নি। অবশ্য রাক্ষসী যে নেই তা নয়—ছেলেধরা রাক্ষসীও আছে। ভাল ছেলে পেলেই ওরাও ঘাড় মটকায় কিন্তু বুঝলি শুমি, ছেলেদের নিরাপদের জন্যও গণ্ডি একটা আছে—সে-গণ্ডি লক্ষ্মণের দেওয়া রামায়ণের গণ্ডি নাই বা হ'ল, সে গণ্ডি বাপমায়ের বুকে-আঁকা আশঙ্কার গণ্ডি—"

শুমি হাই তুলে বলল—"তোমার গল্প মোটেই ভাল নয়, কি যে বকে চলেছ, তুমিই জান—"

"না শুমি, আমি বাজে কথা একটুকুও বলি নি—আচ্ছা শুমি, রামচন্দ্র যদি চিঠি লিখে সীতাকে জানাত যে, লবকুশকে নিয়ে যেতে চায় রাজপ্রাসাদে, কারণ রাজার ছেলে রাজপ্রাসাদেই বাপের কাছে থাকবে, মানুষ হবে শিক্ষায়, দীক্ষায়। তা ছাড়া ছেলে-মেয়ে ত বাপের, মায়ের কেউই নয়! তা হ'লে লবকুশ কি মাকে ছেড়ে যেতে চাইত? না সীতা ছেড়ে দিত? আজ যদি কেউ লিখে পাঠায়, শুমিকে দিয়ে দিতে তার কাছে পাঠিয়ে, তা হ'লে তুই যাবি?

শুমি মুখে কিছু বলল না, শক্ত করে জড়িয়ে ধরল মায়ের গলাটা। ঝর ঝর করে ক'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল বুলার গাল বেয়ে—

"মা, তুমি কাঁদছ?"

"না। আমি একদিকে বুলা মজুমদার, অন্যদিকে শুমির মা! যত দুঃখই হোক বুলা কোনদিন চোখের জল ফেলে নি, যে চোখের জল ফেলে সে শুমির মা!

কিন্তু সে যাই হোক একদিন না একদিন শুমিকে দিয়ে দিতে হবে ওর বাপের কাছে—না দিলে আইন আছে। দিন তিনেক আগে দেবাশীষবাবু উকীলের নোটিস দিয়েছেন। আজ মনে হচ্ছে, সেদিন যার মেয়ে সেই দেবাশীষবাবুকে দিয়ে এলেই ভাল হ'ত। শাড়ি গয়না ঘর-দো'র সেদিন সবই যখন ছেড়ে এসেছিল তখন পরের দেওয়া মায়ার পুতুলটা আর সঙ্গে করে না নিয়ে এলেই ভাল করত বুলা মজুমদার—

"শুমি, ঘুমোলি—?"

আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না, পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছে শুমি। এখানে যতদিন আছে ঘুমোক এমনি করে। তারপর—?

বুলা বিছানা থেকে নেমে পাশের ঘরে গিয়ে দাঁড়াল বড় ড্রেসিং আয়নাটার সামনে। নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে

দেখল—চোখ মুখ বুক কাঁধ কোমর। একটু যেন ভারিকী দেখাচ্ছে নিজেকে। শুমির বয়স এখন সাত, বুলার ছাব্বিশ—আর কি! টুলে বসে একটু চিরুণী বুলিয়ে নিল চুলে। ক'টা বাজল? রাত্রি ন'টা দশ।

"দিদিমণি খাবার দিয়েচি—" পরিচারিকা দরজার ওদিক থেকে জানিয়ে দিল।

"এর মধ্যে?"

"ন'টা ত বাজল—"

"এক কাজ কর সাবি, তুই খেয়ে নে, আমি আজ আর খাব না, মোটেই খিদে নেই।"

"কাল রাত্রিতে খেলেন না, আজও খাবেন না—রেঁধে-বেড়ে সবই ফেলা যাচ্ছে রোজ রোজ।"

"ভয় নেই সাবি। আমি খাই বা না খাই তুই মাইনে পেয়ে যাবি ঠিকই।"

আর এক মিনিট দাঁড়াল না সাবি। রান্নাঘরে তালাটা বন্ধ করেই চাবিটা দেবার জন্য আবার এসে দাঁড়াল বুলার প্রসাধন-ঘরের সামনে—"এই নিন চাবিটা।"

"তুই খেলি না?"

"না।"

"চ—চ, আমি খাচ্ছি।"

"থাক, জোর করে আপনার খেয়ে কাজ নাই।"

খিল খিল করে হেসে উঠল বুলা—ঐ আর এক অশান্তি! দুনিয়ার সবাই যেন একসঙ্গে জট পাকিয়ে রাগ করতে সুরু করেছে বুলার ওপরে—এমন কি সাবিটা পর্যন্ত!

দু'জনেই চলে গেল রান্নাঘরে, খাওয়ার চেয়ে গল্প হ'ল বেশী।

সাবির বয়স যে কত সাবিই জানে—শরীরটা যে চামড়ায় পাকান দড়ি। দুঃখ-মেহনতের অদৃশ্য মোচড়ানিতে শরীরটা এমন এক অবস্থায় এসেছে যে, ওর যৌবন আছে কি নেই সে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার যে সাবিকে দেখে একমাত্র তারই।

"তোর স্বামী কি জন্ম থেকেই অন্ধ?"

"না, দিদিমণি। বিয়ের দু'বছর পরে অন্ধ হয়েছিল—কালীপুজোর দিন রাত্রিতে, তুবড়িতে আগুন দিতে-না-দিতেই তুবড়িটা ফেটে যায়। বারুদের আঁচে চোখ দুটো ঝলসে গিয়েছিল। বাঁচবারই কথা ছিল না, বেঁচে গিয়েছিল শুধু আমার কপাল খেতে আর সেদিন আগুনটা ও ত তুবড়িতে দেয় নি, দিয়েছিল আমার কপালে!"

"তা ঠিক সাবি—ছেলেপুলে?"

"না দিদিমণি, ওসব বেড়িবন্ধন আমার নাইকো—"

"আচ্ছা সাবি—" বুলা ইতস্ততঃ করে থেমে গেল, ঔচিত্যবোধে বাধছে কিন্তু জিজ্ঞেস করেই ফেলল—"স্বামী তোকে বিশ্বাস করে? আমি তোকে ভালবাসি বলেই জিজ্ঞেস করলাম—"

"বিশ্বাস করা-না-করা ওদের চোখের ধর্মের চাইতে মনের ধর্মই বেশী দিদিমণি। মন যার অবিশ্বাসী, তার চোখ থাকলেই বা কি, না থাকলেই বা কি!"

"ঠিক! তুই ত বেশ কথা বলতে জানিস লেখা-পড়া-জানা মেয়েদের মত—ধর, আজ রাত্রিতে বাড়ী না গিয়ে যদি আমার কাছে থাকিস তা হ'লে কি স্বামী রাগ করবে?"

"রাগ হয়ত করবে না কিন্তু ভাববে খুব। আপনি কি আজ এখানে থাকতে বলছেন আমাকে?"

"না—এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম।"

"থাকতে হয়ত বলুন—খবরটা দিয়েই ফিরে আসব আধ ঘণ্টার মধ্যে।"

"তাই আয় সাবি—"

সাবি আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে এল বুলার কাছে—ওর শোবার ব্যবস্থা বুলা নিজের ঘরেই করে দিল। সাবিত্রীর একটা কথাতেই বুলার কাছে ওর মূল্য অনেক বেড়ে গিয়েছে—স্বামীর বিশ্বাস, অবিশ্বাস? সেটা ওদের চোখের ধর্মের চাইতে মনের ধর্মই বেশী! খুবই খাঁটি কথা! চোখ থাকতেই কতজন অন্ধ, আবার যে অন্ধ সে স্ত্রীর সবটায় যেন দেখতে পায় চক্ষুষ্মানের মতই। সোজা কথায়, এমন অনেক জিনিষ আছে যেটা মন দিয়েই দেখতে হয়, চোখ দিয়ে নয়! এ তথ্য যে স্ত্রীলোক আবিষ্কার করতে পারে তাকে আর ছোট করে দেখা যায় না, তা সে যতই ছোট হোক।

"সাবি, তোর ঘুমের খুব অসুবিধে হ'ল আজ," বুলা কুণ্ঠিত ভাবেই বলল।

অসুবিধে? কি যে বলছেন—দিদিমণি! আমাদের শোবার ঘর যদি দেখেন—এইটুকু ছোট্ট!

"ঘর যত বড় হয় ঘুমও তত বেশী হয়—এই বুঝি তোর ধারণা? কিন্তু মোটেই তা নয় সাবি! তাই যদি হ'ত তা হ'লে বিপ্রদাস স্ট্রীটের অতবড় হল ঘরে শুয়েও কতদিন যে চোখের পাতা বুজি নি—"

সাবি আজ তিন-চার বছর হ'ল বুলার কাছে চাকরি করছে—বুলার ইতিহাস সবটা না হোক কিছুটা অবশ্য পরোক্ষভাবে শুনেছে এবং বিপ্রদাস স্ট্রীটে যে ওর শ্বশুরবাড়ী তাও সাবিত্রী জানে—

"দিদিমণি আপনি অন্যায় করেছেন বলতে ত পারি না কিন্তু ভুল করেছেন—"

"কেন? ভুলটা কি করলাম?"

"মনের চাইতে বেশী বিশ্বাস করেছেন নিজের চোখ

দুটোকে—চোখে যা ভাল লেগেছে তাই ভেবেছেন মনের ভাল লাগা। আপনি ত জানেন, চোখ বন্ধ করলেও দেখা যায়, আপনি সেই দেখা দেখুন চোখ বুজে—একদিকে দেবাশীষবাবু, অন্যদিকে শ্রীধরবাবু। মনকে ছেড়ে দিন খুঁজে নিতে, মন বলে দিক না তার দাবি কোন্‌টায়?"

অবাক্ হ'ল বুলা মজুমদার সাবির কথা শুনে—কথাগুলো যুক্তি-তর্কের আগুনে ফেলে দিলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, না ইস্পাতের ডলার মত রাঙা হয়ে উঠবে বুলা জানে না কিন্তু সে যাই হোক, ওর প্রত্যয়ের যে একটা গভীর নিষ্ঠা আছে, একথা বুলাকে মনে মনে স্বীকার করতেই হ'ল।

"আচ্ছা দিদিমনি—বিয়ে ভাঙার মামলাটা দুতিন বছর হ'ল চলছে, ধরুন বিয়েটা যদি ভেঙেই যায়, কষ্ট হবে না আপনার?"

বুলা হাসল। "কষ্ট? কষ্ট কেন হবে? মাটির একটা কলসিতে রাখা জলটা যদি অন্য কলসিতে রাখা হয় জলটার কি অসুবিধে হবে অন্য কলসিতে খাপ খাইয়ে থাকতে?"

"তা হবে না। কিন্তু মেয়েদের মন জল নয়, মেয়েদের মন গলা মোম—মেয়েদের যে পাত্রে ঢেলে দেয় সেখানেই জমে কাঠ, আজাড় করে দিলেও আর বেরুবে না দিদিমনি—"

"না তোকে আর পেরে উঠব না সাবি! এইবার ঘুমো রাত্রি হ'ল অনেকটা।"

পাঁচ দশ পনের মিনিটেই সাবি ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম নেই বুলার—মাথার বালিসটা গরম হয়ে উঠছে বারে বারে, উল্টে নিল বার কয়েক। নানা চিন্তার অদৃশ্য ঘূর্ণনে মাথার খুলিটাও গরম হয়ে উঠেছে।

বিপ্রদাস ষ্ট্রীটের প্রকাণ্ড নতুন বাড়ী—দেবাশীষ বাবু আর শ্রীধরবাবু—

বিয়ের মাস ছয়েক পরে একদিন তার স্বামী তার এক বন্ধুকে সাদরে নিয়ে এসে পরিচয় করিয়ে দিল—"এই আমার কলেজ-জীবনের বন্ধু শ্রীধর সর্বাধিকারী—অঙ্কে ওর চেয়ে বেশী নম্বর পেতে আমাকে রীতিমত বেগ পেতে হ'ত! ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে চাকরি ইচ্ছে করেই নেয় নি—এখন মস্ত কণ্ট্রাক্টার—বিয়ে-টিয়ে করে নাই, কি যে ওর মতলব ঐ জানে। রাজ্যের লোকের বাড়ী তৈরী করে বেড়াচ্ছে, শুধু বাড়ী করল না নিজের জন্য। এই যে বাড়ী দেখছ, এটা ওরই প্লান, ওরই তদারকে তৈরি, আমি মাঝে মাঝে একখানা করে চেক কেটে দিয়েই খালাস হয়েছি।"

শুনছি ওঁর কাছে, কি ভাগ্যি! আজ সাক্ষাৎ পরিচয় হ'ল আপনার সঙ্গে—'

শ্রীধরবাবু বুলার কোন কথা শুনতে পেয়েছেন বলে মনে হ'ল না—বিমুগ্ধ মানুষ যখন বিশেষ এক দৃষ্টি দিয়ে অন্য কাউকে দেখে তখন কান দুটো যেন হিংসা করেই অসহযোগিতা করে—বুলার কোন কথাই শুনতে পেল না শ্রীধরবাবু—

বাহ্যিক পরিস্থিতিটা অবশ্য একটু অবাঞ্ছিত কিন্তু বুলার মনটা খুসিতে ভরে উঠল। যে পুরুষ নারীর রূপে মুগ্ধ হয়েও মুগ্ধ না হওয়ার ভান করে কিংবা ঔদাসীন্য দেখায় তাদের জন্য ছাপার অক্ষরে যতই প্রশংসা-প্রশস্তি লেখা থাক না কেন, কোন রূপসীর কাছে সেটা মোটেই ভাল লাগে না।

'জান বুলা, বাড়ীখানা করতে আমার সাঁইত্রিশ হাজার মত খরচ হয়েছিল। একদিন শ্রীধর বলছিল—দে না বাড়ীখানা, বাহান্ন হাজারে নিতে রাজি আছি—তাই না শ্রীধর?'

"মাপ কর ভাই—এখন বিনা পয়সাতেও আর নেব না। অপরের বাড়ী তৈরি করে দেওয়াই আমার ব্যবসা—সুখের নীড় ভেঙে দেওয়া নয়!" হো হো করে হেসে উঠলেন শ্রীধর বাবু, তার পর বললেন—'কই ভাই, বললে না ত মিসেস মজুমদারের নাম কি।"

"নাম? ওটা তোমাদের পুরাণো স্থাপত্য ভেঙেচুরে নতুন করে গড়ার মতই রেখেছি—"বুলা"

"বুলা—বুলা! চমৎকার! কিন্তু তোমার মধ্যে এত কাব্য ছিল কই জানতাম না ত!"

"চমৎকার না ছাই! ওর চেয়ে আমার আগের নামটাই ছিল ভাল—" বুলা উত্তর দিল হেসে।

"কি নাম ছিল আগে—?"

"থাক আর শুনতে হবে না?"

"তা হ'লে বোঝ কি রকম নাম ছিল আগে—"

ঘণ্টা দুয়েক বেশ কেটে গেল হাসি গল্পে তার পর রাত্রির আহার সেরে বিদায় নিলেন শ্রীধরবাবু।

কিন্তু শ্রীধরবাবু বিদায় নিলেও শ্রীধরবাবুর অনেক কিছুই যেন থেকে গেল বুলার কাছে। এমনি হয়ত হয়, ধুনচি সরিয়ে নিলেও ধূপের গন্ধ এমনি করেই ঘরে থেকে যায় অনেকক্ষণ।

"মা জল খাব—" শুমি ঘুম ভেঙে জল চাইল।

শুমিকে জল খাইয়ে নিজেও খেয়ে নিল এক গেলাস। ঘুমের আর চিহ্ন নাই। ওদিকে কি গভীর ভাবে ঘুমোচ্ছে

[illegible] ঘুমের [illegible] রাত

দুপুরে কাদের বাড়ীর কচি ছেলে কাঁদছে—মা-টা হয়ত ঘুম মারছে কুম্ভকর্ণের ঘুম।

বিছানায় গিয়ে আবার গড়িয়ে পড়ল।

শ্রীধরবাবু প্রায়ই আসতে লাগলেন বন্ধুর বাড়ী। প্রথম প্রথম আসতেন স্বামীর উপস্থিতকালে, তার পর সময়-অসময়েই—স্বামী বাড়ীতে থাকা-না-থাকার প্রশ্নটা আর মোটেই ছিল না। বন্ধু এসে যদি বন্ধু-পত্নীর সঙ্গে দু'দণ্ড গল্প করে যায় তার মধ্যে বেয়াদপির কি আছে? আপত্তিও করেন নি দেবাশীষবাবু।

গাছপালাও নিজেকে সাজিয়ে ধরে সূর্যের দিকে—বুলার কি দোষ?

চাঁদোয়া-ঘেরা উঠোনটা দু'একদিন ভাল হয়ত লাগতে পারে কিন্তু চিরদিন ভাল লাগে না। বুলার জীবন জুড়ে এতদিন যে বিরাট চাঁদোয়া খাটান ছিল শ্রীধরবাবুর আবির্ভাবে সেটা যেন সরে গেল—আলোয় রৌদ্রে ভরে উঠল বুলার জীবনপ্রাঙ্গণ।

দেবাশীষবাবু—খান দা'ন বেরিয়ে যান কলেজে—কি যে ভাবেন পার্কের একধারে বসে। ওদিকে বুলা ভাবে অখণ্ড অবসরের নির্জনতায়—দেবাশীষ—? শ্রীধর—?

বিয়ের তৃতীয় বছরে এল শুমি—নামটা বুলা নিজে রেখেছিল। শ্রীধরবাবুও একটা নাম প্রস্তাব করেছিলেন কিন্তু বুলাই নাকচ করে দিয়েছিল। যতই হোক বাইরের লোকের দেওয়া নাম আর বাইরের লোকের দেওয়া পোষাক—একই কথা, দাবির চাইতে দাতাকেই বড় দেখায়।

একটা এরোপ্লেন সগর্জনে এত নিচু দিয়ে উড়ে গেল বুলার বাড়ীর ওপর দিয়ে যে, বাড়ীটা যেন থর থর করে কেঁপে উঠল—

—"শিগ্‌গির বুলা—। আর দেরি করলে চলবে না—" শ্রীধরবাবু তাড়া দিয়ে বললেন, হাতে একটা স্যুটকেস, গায়ে একটা মোটা ওভার কোট, মাথায় পশ্চিমা টুপি—

"শিগ্‌গির! সে কি—?" বুলা অবাক্ হয়ে প্রশ্ন করল!

"আঃ, এখনও প্রস্তুত হ'তে পার নি? অথচ তখন বললে যে, আর পারি না! প্রস্তুত হয়ে থাকব! প্রস্তুতেরই বা কি আছে? তুমি যা পর তাতেই তুমি সুন্দর—তাতেই তুমি অপূর্ব! চল—চল—" বিশেষ তাড়া দিল শ্রীধর, বাইরে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে।

"কোথায়—?"

"বাঃ, তুমিই ত বলেছিলে—যেখানে খুসি!"

"কিন্তু বলেছিলে ত [illegible]—[illegible] বাড়ী তৈরি করাই তোমার ব্যবসা, কারও সুখের নীড় ভেঙ্গে দেওয়া তোমার কাজ নয়—"

"সত্যি কি তোমার সুখের নীড় বুলা?"

কে জানে! একটু দ্বিধা এল মনে কিন্তু তবু বুলা বেরিয়ে গেল শ্রীধরবাবুর পিছু পিছু—পড়ে থাকল লক্ষ্মণের নিষেধ গণ্ডি!

আর দু'মিনিট দেরি হ'লে প্লেনটা আর ধরা যেত না। একই সিটে পাশাপাশি বসল বুলা আর শ্রীধরবাবু। বুলা জানলার দিকে, শ্রীধরবাবু ভিতর দিকে।

"আচ্ছা শ্রীধরবাবু, আকাশ থেকে আমাদের বিপ্রদাস ষ্ট্রীটের বাড়ীটা দেখা যাবে?" বুলা জিজ্ঞেস করল।

"আকাশে উড়লে ফেলে-আসা বাড়ী আর কেউ কি কোন দিন চিনতে পারে বুলা দেবী?"

কিন্তু আশ্চর্য! প্লেন থেকে স্পষ্টভাবে দেখা গেল বুলা মজুমদারের বাড়ীটা—লাল টুকটুকে রং! শুধু বাড়ী? দেবাশীষবাবু তোয়ালেতে জড়িয়ে শুমিকে নিয়ে আদর করছে ঝুল বারান্দায়—শুমিটা ট্যাঁ ট্যাঁ করে কি চেঁচাচ্ছে মায়ের জন্য। সবই দেখা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে—

তাই ত! বুলা আঁতকে উঠল—তাড়াতাড়িতে শুমিকে বাড়ীতে ফেলেই চলে এসেছে শ্রীধরবাবুর সঙ্গে! বুকটা অব্যক্ত ব্যথায় মুচড়ে উঠল, বুলার কচি মেয়েটা পড়ে থাকল কলকাতায়—"না না, শ্রীধরবাবু, আমি যাব না—"

"বস! লোকে কি ভাববে!" শ্রীধরবাবু চাপা গলায় ধমক দিয়ে বুলার হাত ধরে আবার বসিয়ে দিল সিটে।

"তার মানে?"

"তার মানে খুবই সোজা—তোমাকে নিয়ে চলেছি দূরে, কলম্বো হয়ে কন্টিনেন্টে—চলেছি পাশ্চাত্ত্য প্রগতির হাতছানিতে—

"কলম্বো? মানে লঙ্কায়?" বুলা কাঁদ কাঁদ হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

"হ্যাঁ, লঙ্কায়! যে লঙ্কায় সীতাকে একদিন নিয়ে গিয়েছিল রাবণ আর কলিযুগে বুলাদেবীকে নিয়ে যাচ্ছে শ্রীধর সর্বাধিকারী। কিন্তু বুলা, একটু তফাৎও আছে—সে-যুগের রাম নিজের জীবন তুচ্ছ করে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সব ছেড়ে দিয়ে সীতাকে উদ্ধার করতে গিয়েছিল লঙ্কায় কিন্তু এ যুগের রাম ওধার দিয়েও যাবে না—" হা হাঃ করে হেসে উঠলেন শ্রীধরবাবু। তারপর আবার আরম্ভ করলেন—অবিশ্যি আরও একটু তফাৎ আছে—সে-যুগের সীতাকে যেতে হয়েছিল নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিন্তু এখন যে যাচ্ছে, সে যাচ্ছে স্বেচ্ছায়! কি বুলাদেবী, আমি কি মিথ্যা বলছি?" ভ্রূকুটি করে জিজ্ঞাসা করলেন শ্রীধরবাবু।

গলা থেকে স্বর বেরুচ্ছে না বুলার—না শ্রীধরবাবুর কথা ত মিথ্যা নয়। এই রকম একটা কল্পনা যে মনের নিভৃতিতে ছিল, বুলা শ্রীধরবাবুর কাছে কোনদিন প্রকাশ না করলেও, শ্রীধরবাবু ত মানুষ—জানতে বাকী ছিল না ওঁর! কিন্তু সে যাই হোক—শুমিকে ছেড়ে বুলা অন্ত কোথাও যাবে না—"শুমি—!" বুলা আকুলভাবে চেঁচিয়ে উঠল—প্লেনের জানলা থেকে।

সাবি ট্রেতে দু'কাপ চা নিয়ে হাজির দেবাশীষবাবুর কাছে ঝুল বারান্দায়—এক কাপ ওঁকে দিয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল বুলার খোঁজে—

"তোমার দিদিমণিকে খুঁজছো?—ঐ দেখ প্লেনে—" দেবাশীষবাবু প্লেনের দিকে আঙুল বাড়ালেন।

"দিদিমণি চা—" সাবি গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে—

সত্যি সাবি বুলার জন্ত চা এনে গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে।

ধড়মড় করে উঠে বসল বুলা—ওঃ, বেশ বেলা হয়ে গিয়েছে। শুমি কই? বুলা ব্যগ্রভাবে তাকিয়ে দেখল শুমির বিছানার দিকে—"সাবি, শুমি কই?"

সাবি একগাল হেসে বলল, "ওর বাবার সঙ্গে গল্প করছে আপনার ঐ পাশের ঘরে। হেই দিদিমণি, দাদাবাবু নিজের থেকে এসেছেন—ঝগড়া মিটিয়ে ফেলুন, আর কেন!"

একঝলক রক্ত উঠে বুলার কান কপাল রাঙা করে দিল।

—•—

বৈশাখ সংখ্যায়

গল্প লিখছেন

কুমারলাল দাশগুপ্ত

ইতিহাস কথা কয়

শ্রীঅজিত চট্টোপাধ্যায়

(২০)

বাংলা দেশের একটি চলতি প্রবাদের কথা মনে পড়ল। বড় সরস প্রবাদটি। স্ত্রীর পিতাকে নিয়ে রচনা। এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ, সত্যি রঙ্গভরা।

কথায় বলেছে, 'ডালের মধ্যে মুসুর আর মানুষের মধ্যে শ্বশুর।' অর্থাৎ ডাল যদি খেতে চাও, তবে মুসুরের আগে কারও স্থান হবে না। আর মানুষজনের মধ্যে সবচেয়ে শাঁসালো শ্বশুরমশায় নামক ব্যক্তিটি। মুরুব্বীর জোর বলে কথাটা আজ হাটে-ঘাটে ছড়ান। শ্বশুর মুরুব্বী থাকলে আর ত কথাই ওঠে না। জয় অনিবার্য। পেলেও নয়, নিশ্চয়ই পাবেন বক্ষিত রতন।

শাজাহানের কথা ভাবছিলাম। বিখ্যাত সম্রাট্ শাজাহান। মোগল স্থাপত্য যার সময়ে উৎকর্ষতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল, আগ্রার তাজমহল, দিল্লীর লালকেল্লা বহু যুগ ধরে সগৌরবে যার নামকে স্মরণ করে চলেছে।

সেই শাজাহানের হয়ত সম্রাট হওয়াই হয়ে উঠত না। যদি-না কৌশলের অভেদ্য জাল পাততেন শ্বশুর-মশায় আসফ খান। মমতাজের বাবা, এদিকে নূরমহলের ভাই। আসফ খান ততদিনে উজীরের পদ পেয়ে স্থায়ী হয়েছেন।

কিন্তু সে গল্পের আগে আরও একটা কাহিনী বলি। যে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তিপ্রস্তর বাবর স্থাপন করেছিলেন বহু কষ্ট, বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম করে, তারই ছোট্ট এক ঘটনা।......

রাজ্যস্থাপন করে আগ্রাকেই রাজধানী করেছিলেন বাবর। মাত্র কয়েক বৎসরের রাজত্বকাল। তারও অধিকাংশ সময়ই যুদ্ধ-বিগ্রহে ভরা। ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে ভীষণ এক যুদ্ধের সম্মুখীন হ'লেন বাবর। প্রতিপক্ষ শক্তিশালী রাজপুত বীর রাণা সঙ্গ। প্রথম দিকে রাণা ভেবেছিলেন, লুঠেরার দলের মত বাবরও লুঠপাট করেই ফিরে যাবেন। তাই ইব্রাহিম লোদীর পরাজয় তিনি মনে মনে কামনা করেছিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ভুল ভেঙ্গে গেল রাণার। ফলে বাবরের ওপর মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠলেন তিনি।

বিরক্তির পিছনে আসে ক্রোধ। ক্রোধের পিছু পিছু জিঘাংসা। লোদী পরিবারের এক রাজপুত্রের সঙ্গে সখ্যতায় আবদ্ধ হ'লেন রাণা সঙ্গ। তিনি মাহমুদ লোদী, প্রস্তুতি শেষ হলে রাণা সঙ্গ চললেন এগিয়ে। বাবরের সম্মুখীন হ'তে।

তখনও ফতেপুর সিক্রী গড়ে ওঠে নি। হয়ত বন-জঙ্গলে-ঢাকা ছোট্ট এক গ্রাম ছিল সিক্রী। বাবরের এক সৈন্যদল কাছাকাছিই কুচকাওয়াজ করত। সীমান্তের প্রহরীর কাজ করত তারা। প্রথম আক্রমণেই রাণা সঙ্গ তাঁদের হারিয়ে দিলেন। উল্লাসে অধীর হয়ে উঠল রাজপুত ও লোদী সৈন্যদল।

বাবর সামান্য ধাক্কা পেলেন মনে। তার সৈন্যদলে ছড়াল চাপা নৈরাশ্য ও হতাশার বেদনা। তাতে ইন্ধন জোগালেন মহম্মদ শরীফ নামে কাবুল হ'তে আগত এক ভবিষ্যদ্বক্তা। তিনি বাবরের সামনে অকাতরে ঘোষণা করলেন যে, মোগলবাহিনীর পরাজয় অনিবার্য। মঙ্গল গ্রহ এখন পশ্চিমে। কাজেই বিপরীত দিক হ'তে যে-কেউ আসুক না, তার পক্ষে জয়লাভ করা প্রায় অসম্ভব।

কিন্তু বাবর কান দিলেন না সে-কথায়। মনে মনে দৃঢ় হয়ে রইলেন তিনি। সৈন্যদলে উৎসাহ সঞ্চারের জন্য তিনি অনেকগুলি কাজ করলেন পর পর। মদ্যপান বড় প্রিয় ছিল সম্রাটের। সেই মুহূর্তে মদ্যপান পরিত্যাগ করা তিনি ঘোষণা করলেন। পানপাত্র চূর্ণ করা হ'ল মাটিতে। কাবুল আর গজনী থেকে বহু কষ্টে বয়ে-আনা উত্তেজক পানীয়গুলি মৃত্তিকাকে সিঞ্চিত করে তুলল। দাড়ি রাখবেন বলে স্থির করলেন কারখানার এই সাহসী মানুষটি। সৈন্যবাহিনীর উদ্দেশ্যে এক বক্তৃতা করলেন বাদশাহ। অপমানের কালিমা ললাটে পরার চেয়ে মরণও শ্রেয়।

সৈন্যবাহিনী নতুন শক্তি পেল। হারানো সাহস ফিরে এল মনে। তুমুল যুদ্ধের পর বাবরই হ'লেন জয়ী, অসামান্য বীরত্ব ও শক্তির পরিচয় দিয়ে সেই জ্যোতিষীকে নিয়ে আসা হ'ল সম্রাটের সামনে। মহম্মদ শরীফ তখন প্রায় আধমরা। তবু ম্লান হাসি দিয়ে সম্রাটকে তিনি

জানালেন অভিনন্দন। বাবর তাঁকে পরিত্যাগ করলেন সেই দিনই। কিছু মুদ্রা উপহার দিলেন শেষ জীবনের সম্বল হিসেবে। মহম্মদ শরীফ বিদায় নিলেন দুঃখ-ভারাক্রান্ত চিত্তে। মোগলবাহিনীর ভবিষ্যৎ উচ্চারণ করে নিজের ভবিষ্যতের পথে অন্ধকারের কালিমাকে লেপে দিলেন তিনি।

এত দুঃখে-কষ্টে যে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, অতি অল্পদিনেই তার কি দুঃখজনক পরিণতি। হিংসা-বিদ্বেষ, প্রতিহিংসা-প্রতিশোধ, শত্রুনাশ, যে কোন কৌশলে রাজ্য পাওয়া সবকিছুই এসে জুটল একসাথে। বয়সের শেষ দিকে আকবরও তা বুঝতে পেরেছিলেন। হয়ত এই সম্রাটের মনে এসেছিল বার্ধক্য ও জরা।

হস্তীর যুদ্ধ ছিল আকবরের বড় প্রিয়। অবসরে, আনন্দ দিনে সম্রাট খুশী হ'তেন হস্তীদ্বয়ের সমর দেখে। একদা জাহাঙ্গীরের (তখন সেলিম) প্রিয় হস্তী গিরণবরের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষার আয়োজন হ'ল খসরুর হাতী আবরূপের। অসংখ্য দর্শক। মধ্যস্থলে সম্রাট আকবর নিজে। অল্পসময়ের মধ্যেই ভীষণ যুদ্ধ হ'ল সুরু। আবরূপ প্রাণপণে লড়ে চলল। কিন্তু গিরণবর যেন অজেয়। কোন দেবতার বরে সে যেন প্রতিপক্ষের শত আঘাতেও অজেয় অটল। খসরুর হস্তীকে পিছু হটতে হ'ল, কিন্তু গিরণবর মারমুখো। পিছু পিছু ধাওয়া ক'রে আবরূপকে সে নানাভাবে প্রহার করতে লাগল। হস্তী লড়াইয়ের নিয়মানুসারে একটি তৃতীয় হাতীকে রাখা হ'ত প্রস্তুত। একজন যদি হারে, প্রতিপক্ষের হাতে মার খায়, তখন তার সাহায্যার্থে পাঠান হয় সেই তৃতীয় হস্তীটিকে। যথাসময়ে পরাজিত আবরূপের সাহায্যার্থে পাঠান হ'ল অন্য হাতীটিকে। কিন্তু জাহাঙ্গীরের প্রিয় অনুচরেরা নতুন হাতীটিকে লক্ষ্য ক'রে ছুঁড়ে চলল ঢিল আর ইটের টুকরো। তাদের আশঙ্কা হ'ল হয়ত নতুন হাতীটির সাহায্য পেয়ে আবরূপ গিরণবরকে পরাস্ত করবে। নিয়মের লঙ্ঘন বাদশাহ আকবরের মনে সঞ্চার করল ক্রোধ। তিনি সেলিমের কাছে পাঠালেন নাতি খুররমকে। হস্তী-যুদ্ধের নিয়ম-কানুন কেন মানছে না তার অনুচরেরা, সেলিম এ বিষয়ে কৈফিয়ৎ দিক।

জাহাঙ্গীর কৌশলে পাশ কাটালেন। তিনি বললেন যে, এ ব্যাপারে তার কোন হাত নেই। অনুচরেরা যা করেছে তাতে সেলিমের কোন আদেশ [illegible] একটা খুশী হ'লেন না উত্তর শুনে। তবু গুম্ হয়ে বসে রইলেন তিনি। সাধ্যমত চেষ্টা করলেন ক্রোধ দমন করতে।

কিন্তু খসরু পারল না নিজেকে সংবরণ করতে। বাপের ওপর সে হয়ে উঠল অগ্নিশর্মা। কুৎসিত ভাষায় গালাগালি দিল খসরু। জাহাঙ্গীর খুব একটা প্রতিবাদ করতে পারলেন না।

দৃশ্য দেখে আকবরের চোখে ঘনিয়ে এল ব্যথার ছায়া। এমন যে হবে কোনদিন কল্পনাও করেন নি বাদশাহ। ছেলে বিশ্রী ভাষায় গালাগালি দেবে বাপকে। এ যদি অকল্পনীয় না হয় তবে কল্পনার বাইরে আর কি থাকবে? ······

মনের অশান্তি দেহেও ছড়িয়ে পড়ে। উৎসাহের অভাব বয়ে আনে অবসন্নতা। দিনে দিনে বাদশাহ হ'লেন অসুস্থ। পীড়িত আকবরের চোখের সামনে এগিয়ে আসতে লাগল শেষ বিচারের সেই ভয়ঙ্কর দিনটি। মোগল সাম্রাজ্যের ভবিষ্যত ভেবে বড় আশাহত হয়ে পড়েছিলেন এই সকলকাম পুরুষটি। বাদশাহ যেন বুঝতে পারছিলেন, আর বেশীদিন নয়। সূর্য এবার মাঝগগন অতিক্রম করেছে। তার ঢলে পড়তে দেরি নেই বেশী।

কিন্তু খসরুর ভাগ্য তার হাতী আবরূপের চেয়েও খারাপ ছিল। পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিলেন খসরু। পরাজিত হয়ে অন্ধত্ব বরণ করতে হয়েছিল তাঁকে। পরবর্তীকালে দ্বিতীয় পুত্র পরভেজ (Parwej) পিতার সঙ্গে খসরুকে আবার দিয়েছিলেন মিলিত করে। বৃদ্ধ বয়সে জাহাঙ্গীরেরও মনে মায়া জন্মাল। শত হ'লেও আপন সন্তান। কুপুত্র যদ্যপি হয়, পিতা কি কখনও চিরকাল বিমুখ থাকতে পারেন?

কিন্তু খসরুর জন্মলগ্নে সুগ্রহের দৃষ্টি ছিল না। অল্প-দিনের মধ্যেই তার জীবনের শেষদিনগুলি কাছাকাছি এল। দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করার আগে খুররম এসে পিতার কাছে নিবেদন করলেন,—খসরুকে সে সঙ্গে নিয়ে যাবে। পিতা যেন এতে আর অমত না করেন। অন্ধ সন্তান চোখের সামনে থাকলে পিতার মনে ব্যথা আরও বাড়ে। তাই খুররম (পরবর্তীকালে শাজাহান) পিতার দুঃখ লাঘব করার জন্য এই প্রস্তাব করেছেন।

খুররমের মনে প্রচ্ছন্ন দুরভিসন্ধি ছিল। জাহাঙ্গীর তা ধরতে পারলেন না। বৃদ্ধ বয়সে অশক্ত বাদশাহ অন্ধ খসরুকে পাঠালেন খুররমের সঙ্গে সুদূর দাক্ষিণাত্যে। মনে ভাবলেন কিছুদিন পরেই ঘুরে আসবে খসরু।

দাক্ষিণাত্যের জলহাওয়ায় ওর ভাঙা মন চাঙা হয়ে উঠবে।

কিন্তু খসরুকে আর ফিরতে হ'ল না। ঋণের শেষ আর শত্রুর শেষ কখনও রাখতে নেই। খুরম মনে মনে সেটি বহুপূর্বে গ্রহণ করেছিলেন। খসরু দাদা হ'তে পারে, কিন্তু সিংহাসনের পথে দাদা আর ভাইরাই ত আসল বাধা। আর অন্ধত্ব কোন কথা নয়। এদেশে ত অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র বহুদিন রাজত্ব করে গেছেন। গোপনে খসরুকে শেষ করলেন খুরম। দিল্লীর মসনদের একটি দাবিদারের জীবনদীপ নির্বাপিত হ'ল।

জাহাঙ্গীর মারা গেলেন। শাজাহান তখন সুদূর দাক্ষিণাত্যে। শুধু তাঁর শ্বশুরমশায় আসফ খান দিল্লীতে রয়েছেন। বাদশাহের মৃত্যুর পর আসফ খান খসরুর জ্যেষ্ঠপুত্র দেওয়ার বক্সকে (ডাক নাম বোলাকী) সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন। দিল্লীর ওমরাহ এবং অমাত্যের দল মনে মনে খসরুর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। তা ছাড়া অমন নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর খসরুর প্রতি দুর্বলতা জন্মানো এই পৃথিবীতে খুবই স্বাভাবিক। সেই হিসাবে আসফ খান ঠিকই করেছিলেন। সরাসরি খুরমকে সাহায্য করলে ওমরাহ আর অমাত্যের দল ভীষণ চটে যাবে। তাই আসফ খানকে বাঁকা রাজনীতির পথ মেনে নিতে হ'ল।

বোলাকী সম্রাট হ'লেন। আসফ খান তার উজীর। ধীরে ধীরে দরবারের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের নিজের দিকে টেনে নিতে চেষ্টা করলেন তিনি। কাউকে দেখালেন লোভ, কাউকে দিলেন স্তুতি। যে তোষামোদ ঘৃণা করেন, তাঁকে সেই গুণের কথা মধুনামের মত বার বার শুনিয়ে বশ করে ফেললেন। বেশ খানিকটা সফল হ'লেন আসফ খান। সামরিক বাহিনীর ওপরও অতি অল্পদিনে তাঁর প্রভাব জন্মাল। আসফ খানের গুটি সাজানো প্রায় শেষ। শুধু দান ফেলার অপেক্ষা।

ওদিকে লাহোরে শাহরিয়র নিজেকে সম্রাট ব'লে ঘোষণা করেছেন। বোলাকীকে নিয়ে আসফ খান তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে ছুটে চললেন। শাহরীয়র পরাজিত ও বন্দী হ'লেন দিল্লীর সৈন্যদলের হাতে। কঠিন শাস্তি দেওয়া হ'ল শাহরিয়রকে। যে দু'টি চোখ মেলে তিনি হ'তে চেয়েছিলেন এই বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর, সেই চোখ দু'টি তার নষ্ট ক'রে দেওয়া হ'ল। সারা-জীবন অন্ধত্ব মেনে নিতে হ'ল দুর্ভাগা শাহরিয়রকে।

বোলাকীকে নিয়ে আগ্রায় এলেন আসফ খান। রাজধানীতে রাজকার্য পরিচালনা শুরু করলেন বোলাকী। আসফ খান সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলেন। অকস্মাৎ একদিন তিনি ঘোষণা করলেন যে, খুরম গুরুতর-ভাবে পীড়িত এবং তার পরদিনই সম্রাটের কর্ণগোচর করলেন যে, তার জামাতা মারা গিয়েছেন। সংবাদ শুনে বোলাকী মনে মনে উল্লসিত হ'লেন। মসনদে কায়েম হয়ে বসবার পথের শেষ কাঁটাটি কেমন নির্বিঘ্নে সরে গেল। আসফ খান মনে মনে হাসলেন। কিন্তু করুণ মুখ করে বাদশাহের কাছে এক আর্জি পেশ করলেন তিনি। খুরমের মনে শেষ ইচ্ছা ছিল যে সেকেন্দ্রার এক কোণে তার শেষ শয্যা রচিত হবে। বাদশাহ তাতে সম্মতি দিন।

বোলাকী তথাস্তু করতে দ্বিধা করলেন না। আগ্রা থেকে সেকেন্দ্রার পথে শবযাত্রা হ'ল শুরু। মৌন শান্ত মিছিল ধীর পদে এগিয়ে চলল। আসফ খান বুদ্ধি ক'রে বোলাকীকে বললেন,—শবানুগমন করা বাদশাহের উচিত। মৃত ব্যক্তি তার খুল্লতাত। শিষ্টাচার অনুসারে বাদশাহেরও মিছিলে যোগ দেওয়া কর্তব্য।

কি ভেবে বোলাকীও রাজী হ'লেন। সাধারণের মত বাদশাহ চললেন শবানুগমন ক'রে। মস্ত এক কাঠের বাক্সে খুরম রয়েছেন শুয়ে। কায়দা ক'রে কফিনের মধ্যে একটা ফুটো তৈরী ছিল। তার সাহায্যে বাইরের বায়ু ভিতরে এসে ঢুকল।

পথিমধ্যে আসফ খান এক তাঁবু খাটিয়ে রেখেছিলেন। কফিনকে এখানে নামান হ'ল। উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের এবং সামরিক বাহিনীর প্রধানদের ডাকলেন আসফ খান। তাঁবুর মধ্যে তারা সবাই এসে দাঁড়াল।

তখন লগ্ন সমাগত। আসফ খানের আদেশে কফিনের ঢাকা খুলে দেওয়া হ'ল। উপস্থিত কর্মচারীরা এবং সামরিক প্রধানরা আগেই আসফ খানের কাছে আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিল। কফিনের মধ্য থেকে শাজাহান যখন উঠে দাঁড়ালেন, তখন সকলে তাঁকে জানাল কুর্নিশ। আসফ খান শাজাহানকে সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন।

বোলাকী পথে ছিলেন দাঁড়িয়ে। তাঁর অনুচরেরা তাঁকে করেছে পরিত্যাগ, সেনাপতির দল নিয়েছে আসফ খানের আনুগত্য। বেগতিক দেখে বোলাকী আর থাকতে সাহস পেলেন না। কোন আমিরই তাঁর সাহায্যে হাত বাড়াল না তেমন করে। কেউ তাঁকে দিল না আশ্বাস, কেউ তাঁর জন্য জানাল না এক ফোঁটা সহানুভূতি। পালিয়ে বাঁচলেন বোলাকী। আগ্রা থেকে সুদূর লাহোরে গেলেন চলে।

শাজাহান সম্রাট হয়ে ফিরে এলেন আগ্রায়। জয়ভেরী সগৌরবে নিনাদিত হ'ল। আমির ও ওমরাহের দল তাঁকে জানাল সম্ভ্রমপূর্ণ কুর্নিশ। সৈন্যবাহিনী সামরিক কায়দায় অভিবাদন জানিয়ে গ্রহণ করল নতুন সম্রাটকে। শাজাহান শাহাবুদ্দীন মহম্মদ নাম নিয়ে মসনদে আসীন হ'লেন।

কিন্তু মসনদে বসেও নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভ সম্রাটের ভাগ্যে জোটে নি। দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহ প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সুরু হ'ল। বিদ্রোহীকে দমন করতে গিয়ে এক নিদারুণ আঘাতে নিজেকেই ক্ষত-বিক্ষত ক'রে ফেললেন সম্রাট। একান্ত আদরের বেগম অর্জুমন্দ বানু চলে গেলেন তাঁকে ছেড়ে। দাক্ষিণাত্যের রণক্লান্ত সম্রাট আগ্রায় ফিরলেন বিরহীর শূন্য হৃদয় সম্বল ক'রে।

মোগল রাজকোষে তখন প্রচুর অর্থ, প্রচুর সম্পদ্, প্রচুর জহরত, প্রাচুর্যের জোয়ার। হীরা মণি মাণিক্যের ছটায় মোগল রাজসিংহাসন আপনাতে আপনি উজ্জ্বল। বিদেশীরা কি চোখে মোগল বাদশাদের দেখেছে তার ছোট্ট একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

জাহাঙ্গীরের কাছে সুদূর ইংল্যাণ্ড থেকে স্যর টমাস রো এসেছিলেন রাজা প্রথম জেমসের দূত হয়ে। সুরাটে নেমেছিলেন স্যর টমাস রো। তখন জাহাঙ্গীর থাকতেন আজমীরে। টমাস রো আজমীরে গেলেন। তাঁর সঙ্গে ইংল্যাণ্ড থেকে আনীত সামান্য কিছু উপহার ছিল। উপহারের মধ্যে বাদ্যযন্ত্র, ছুরি, সূচীকার্য করা শাল, তরবারি এবং একটি বিলিতী কৌচ ছিল। বাদশাহের কাছে সসম্মানে এগুলি নামিয়ে রাখলেন স্যর টমাস। এক ইংরেজ বাদ্যকর বাদশাহকে বাজনা শোনাল। সম্রাট উপহার পেয়ে খুশী হ'লেন। কৌচটি নুরমহলকে দিলেন জাহাঙ্গীর। তারপর টমাস রোকে উদ্দেশ্য ক'রে বললেন—ইংরেজরা কি তাঁর জন্য মূল্যবান মণিরত্ন উপহার এনেছে? দোভাষী স্যর টমাসকে তর্জমা ক'রে বোঝাল। বাদশাহের কথা টমাস সাহেব বুঝতে পেরে লজ্জার হাসি হাসলেন। কিন্তু স্থানবিশেষে ইংরেজও তেল ঢালে। কুর্নিশ জানিয়ে স্যর টমাস বললেন—সম্রাটের জন্য মণিরত্ন নিয়ে আসার স্পর্ধা তাদের নেই। মণিরত্নের দেশ হ'ল ভারতবর্ষ, স্বয়ং জাহাঙ্গীর সে দেশের রাজা। তাঁকে মণিরত্ন তাঁরা কি করে দিতে পারেন?

সে উত্তরে জাহাঙ্গীর নিশ্চয়ই দ্রব হয়েছিলেন। কিন্তু [illegible] ক'রে মোগল বাদশাহদের রাজকোষে হীরে জহরত মণি মুক্তার কি ছড়াছড়িই না ছিল।

লালকেল্লা দেখতে বাকী ছিল। না হ'লে দিল্লী দেখা প্রায় শেষ ক'রে ফেলেছি। এই ক'দিনে কালী-বাড়ীতে ক' ঘণ্টা সময়ই বা থেকেছি। সকালে উঠেই মুখ-হাত ধুয়ে সামান্য কিছু প্রাতরাশ গলাধঃকরণ ক'রে হঠাৎ উধাও। ক'মিনিট বা লেগেছে? তড়-বড় ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নামলেই প্রশস্ত রাজপথ। সকালের ম্লান রোদ পীচের গায়ে পিছলে যাচ্ছে। কলকাতার মত ভিড় নেই, হৈ চৈ নেই লেগে। প্রথম ফাল্গুনের সতেজ সমীরণ বসন্তের ধ্বনি বয়ে আনছে তার মৃদুমর্মরে। আর পাঁজি-পুঁথি অনুসারে ত বসন্ত জাগ্রত দ্বারে। কারণ, মাত্র দু'তিন দিন আগেই হোলি খেলা হয়েছে সাঙ্গ। এখনও পথে-ঘাটে আবীর আর অন্য রঙের ছোপ পাওয়া যায় খুঁজে। আর হোলীর দিনে সমস্ত মানুষজন যে রং মেখে হয়ে উঠেছিল উল্লসিত, এখন তা নিশ্চয়ই সাবানের ফেনায় ধুয়ে-মুছে গেছে। কিন্তু রং ত শুধু দেহেই লাগে না, লাগে মনের কোণেও। দেহের ওপর রঙের যে ছোপ তা সহজে ধুয়ে-মুছে যেতে পারে কিন্তু মনের রং কি অত শীঘ্র মিলায়?

বাংলা দেশে হোলী খেলার দিনটি আসতে এখনও দেরি আছে। সে তারিখটি আমরা সযত্নে মনে রেখেছি। কলকাতায় বসন্ত কখন আসে, কখন যায় কিছুতেই ধরা যায় না। এই শীত-শীত ভাব, দুপুরে সামান্য গরম, সন্ধ্যায় ঠাণ্ডা। তারপরই হঠাৎ যেন গ্রীষ্মের দহন জ্বালা এল ধেয়ে। বসন্ত কবে কোন সরুগলির পথ বেয়ে পালিয়ে গেছে তা জানতেই পারি না। কলকাতায় বসন্তকে উপলব্ধি করি শুধু হোলী খেলার দিনটি দিয়ে। আবীর আর রং দেখলেই মনে হয়—আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে। সত্যি, কলকাতায় হোলী খেলা যদি কোন অনিবার্য কারণে বন্ধ হয়ে যায় তবে সে বছরে বসন্তের আবির্ভাবই যাবে না বোঝা। কারণ, কলকাতায় বসন্ত ত বসন্তের (মহামারী) মধ্যেই সীমিত। মহানগরীতে তার আগমন বড় স্বল্প। 'সে কেবল দৃষ্টি এড়ায়, পালিয়ে বেড়ায়,—ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে।'

দাক্ষিণাত্য থেকে ফিরে এসে শাজাহান স্থাপত্যে মন দিলেন। জাহাঙ্গীর বেশী কিছু করে যান নি। সেকেন্দ্রার অসমাপ্ত কাজটুকু, আগ্রা কেল্লার জাহাঙ্গীর-ঈ-মহল, অপরূপ ইৎমাতুদ্দৌল্লা এবং জাহাঙ্গীরের প্রধান খোজা বুলান্দ খানের নামে সুন্দর বাগান ও সৌধের [illegible] তার প্রধান কীর্তি। কিন্তু শাজাহান কীর্তিতে

কলকে ছাড়িয়ে গেলেন। স্থাপত্য তার প্রচেষ্টায় শতদল হয়ে বিকশিত হয়ে উঠল। শুধু আগ্রা শহরেই তাঁর প্রধান কীর্তিগুলি দেখে কোন বিদেশী পর্যটকই মুগ্ধ না হয়ে ফিরে যান নি। কেল্লার শীষ মহল, মোতি মসজিদ, যমুনার তীরের মর্মর তাজ—প্রত্যেকটিই অতুলনীয়।

পর্যটকের দল শাজাহানকে আরও একটু বড় করে গেছেন। ওয়াণ্ডেলসোলো, ফ্রান্সিস বার্নিয়ার, এলফিনষ্টোন সকলেই আগ্রা নগরীর সৌন্দর্য এবং ঐশ্বর্যের সমান প্রশংসা ক'রে গেছেন। এ বিষয়ে তাভার্নিয়ে আরও একটু অগ্রসর। তাঁর মতে শাজাহানের রাজধর্ম পিতার দৃষ্টিসুলভ ছিল। প্রজাদের ওপর রাজশক্তি তিনি প্রয়োগ করেন নি। পিতার সহাস্য দৃষ্টি দিয়ে প্রজাদের মনোরঞ্জন ক'রে গেছেন।

কিন্তু পিতৃসুলভ রাজধর্মের দাবি ভারতের ইতিহাসে একজন সম্রাট করতে পারেন। তিনি সম্রাট অশোক। সাম্রাজ্য-শাসনে রাজার স্থান কোথায়, সে সম্বন্ধে তার প্রধানমন্ত্রী কৌটিল্য সুন্দর করে লিখে গেছেন।……

'In the happiness of his subjects lies his happiness, in their welfare his welfare, whatever pleases himself he shall not consider as good but whatever pleases his subjects, he shall consider as good ?

যে কোন মোগল সম্রাটই রাজধর্মের এই সংজ্ঞা থেকে বহুদূরে। তবে শাজাহানের রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের জাঁকজমক আর আড়ম্বরের অন্ত ছিল না, বরং এ বিষয়ে এলফিনষ্টোন আরও স্পষ্ট। বিখ্যাত গ্রন্থ 'রোমান সাম্রাজ্যের অবনতি ও পতনের' পাতায় গিবন সম্রাট সিভেরাসের কথা লিখেছেন। বাদশাহ শাজাহান এই রোমান সম্রাটের সঙ্গে তুলনীয়।

কিন্তু কথায় কথায় কি কথা এসে পড়ল। আগ্রা থেকে দিল্লী, স্থাপত্য ও সামাজ্য ইতিহাস থেকে রাজ-শক্তি রাজধর্ম—কতদূর না আমরা চলে যাচ্ছি। কাজেই আর এগিয়ে কাজ নেই। আবার ফিরে আসি লাল-কেল্লায়। প্রথম দিল্লী গিয়ে যা দেখতে সকলেই ছুটে যান। সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শাজাহানাবাদের কেল্লা।

দিল্লীতে নতুন এক নগরী গড়তে চেয়েছিলেন শাজাহান। ক্রমানুসারে দিল্লীর সপ্তম নগরী। আকবরের নামে আগ্রার নাম দিয়েছিলেন আকবরাবাদ। নিজের নামে নতুন নগরীর নাম দিলেন শাজাহানাবাদ।

রচনা। দিল্লীর সুবেদার গৈরাট খান দেখাশোনা করলেন প্রাথমিক কার্য। তারপর আল্লা ভের্দী খান এবং মাক্রামৎ খান যথাক্রমে এর পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। নয় বৎসরেরও কিছু বেশী সময় অতিবাহিত হয়েছিল এটি সম্পূর্ণ করে তুলতে। তখন আসফ খান মন্ত্রী নন। সাদউল্লা খান উজীর হয়েছেন। ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে লালকেল্লায় শাজাহান প্রবেশ করেন।

সমস্ত স্থানটি এক অসম অষ্টভুজের আকৃতি। পূবে ও পশ্চিমে বড় দু'টি বাহু—বাকী ছ'টি বাহু উত্তরে ও দক্ষিণে। পূবদিকের বাহুর উপরের সৌধগুলি থেকে নদীবক্ষ সুন্দর দৃষ্ট হয়। নদী আর প্রাসাদের মধ্যে বালির খানিকটা অংশ। একদা প্রাসাদে দাঁড়িয়ে এই বালুকাময় অংশের ওপর অনুষ্ঠিত হাতীর লড়াই লক্ষ্য করতেন সম্রাট ও অন্যান্য পরিজনেরা। পর্যটক বার্নিয়ার একবার এই বালুভূমির উপর এক ক্ষিপ্ত হস্তীর হাত থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পান।

ছোটখাটো প্রবেশদ্বারগুলির কথা বাদ দিলে লাল-কেল্লায় প্রধান প্রবেশদ্বার দু'টি। প্রথমটি লাহোর গেট—দ্বিতীয়টি দিল্লী গেট। শাজাহান দুর্গকে বড় সুন্দর ক'রে নির্মাণ করিয়েছিলেন। আজ তার বহু কিছু বিনষ্ট। নদীর দিকটা বাদ দিয়ে, দুর্গের বেষ্টনী প্রাচীরের চতুর্দিকে গভীর পরিখা রচিত হয়েছিল। সর্বদাই জলে পরিপূর্ণ থাকত খাদটি। আর অসংখ্য মীন মহাসুখে তাতে জলক্রীড়া করত। পরিখার পাশেই একদা শোভা পেত নয়নমুগ্ধকর সুচারু উদ্যান। সবুজের শ্যামলিমা নানা প্রস্ফুটিত কুসুমের শোভায় দ্বিগুণ সৌন্দর্য্য বিকশিত করে ইট-পাথরের বিশাল প্রাচীরের রুক্ষতা বহুলাংশে দূর করত।

লাহোর গেটই সচরাচর ব্যবহৃত প্রবেশপথ। আওরঙ্গজেব প্রবেশ-পথের মুখে স্থাপন করেছিলেন একটি প্রহরী মন্দির। গেটের দরজা খোলা হ'লেই প্রাসাদের একটা অংশ বাইরের লোকের চোখের সামনে উঠত ভেসে। এই প্রহরী মন্দির বা উপদুর্গ রচনা করে আওরঙ্গজেব সাধারণের দৃষ্টিতে প্রাসাদের কোন অংশ যাতে না পড়ে তারই ব্যবস্থা করলেন। পরিখার ওপর প্রবেশ-পথের মুখে শাজাহান তৈরী করিয়েছিলেন কাঠের টানা সেতু। যে সেতু ইচ্ছেমত টেনে আনা বা পিছিয়ে দেওয়া চলে। দ্বিতীয় আকবরের আমলে কাঠের সেতুর বদলে পাথরের ব্রিজ তৈরী করা

পাথরের ওপর বসে ভায়োলিন বাজাচ্ছেন। সুর শুনে তাঁর পায়ের কাছে মুগ্ধ হয়ে বসে আছে সিংহ, চিতাবাঘ ও ভীরু শশক। পরবর্তী সময়ে ইংরেজরা এটিকে স্বদেশে নিয়ে যায় এবং সেখানকার ভারতীয় মিউজিয়ামে এটিকে রাখা হয়।

বাদশাহ বসতেন সিংহাসনে। শ্বেত মার্বেলের এই সিংহাসনের মাথায় মার্বেল পাথরের চাঁদোয়া। নানা মূল্যবান পাথর-খচিত সিংহাসনের বিভিন্ন অংশে ফুল আর লতাপাতার চিত্র শোভিত। কাছাকাছি আর একটি মার্বেলের বেদী মতন আসন। এর ওপর বসতেন উজীর সমস্ত ঘরের মেঝেতে থাকত সিল্ক আর কার্পেট। থামের গায়ে ঝুলত বহুমূল্য ব্রোকেড। মাথার ওপর শোভা পেত ব্রোকেডের চাঁদোয়া।

সমস্ত আবেদনপত্র উজির তুলে দিতেন বাদশাহের হাতে ঘর নিস্তব্ধ শুধু প্রহরীরা, বাদশাহের গায়ে যাতে মাছি না বসতে পারে তার জন্য ময়ূর পালকের সুদৃশ্য পাখা জোরে ব্যজন ক'রে চলেছে। পাখার হাওয়ায় বাদশাহ ক্লান্তি অপনোদন করছেন। নকরখানা হ'তে মৃদু সঙ্গীতের সুর আসছে ভেসে। দরবার-গৃহের কাজ এক এক ক'রে সাঙ্গ হয়ে আসছে দিনের সঙ্গে।

কখনও বাদশাহ বসতেন প্রধান কাজীর আসনে। লিপিবদ্ধ আইন না থাকলেও শাস্তি ছিল কঠোর। তবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ক্ষমতা ছিল সম্রাটের স্বয়ং। সে মৃত্যুও অদ্ভুত ভাবে। কখনও হাতীর পায়ের তলায় নিষ্পিষ্ট ক'রে মারার আদেশ, কখনও কেউটের কামড়ে প্রাণ দিতে হ'ত হতভাগ্যকে। সম্রাট আকবর এক অদ্ভুত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছেন বহু অবাঞ্ছিত জনকে তাঁর সঙ্গে থাকত সুন্দর ডিবেতে মশলা-দেওয়া সুগন্ধী পান কোন কোন পানের মধ্যে থাকত বিষবটিকা। বাদশাহ অনুরোধ ক'রে খেতে দিলে কেউ অমান্য করতে সাহস পেত না কিন্তু সম্রাট স্বয়ং যাকে চাইতেন না, তার হাতেই তুলে দিতেন সেই বিষবটিকা-মিশ্রিত তাম্বুল। মৃত্যু এসে অবাঞ্ছিত হতভাগ্যের মরদেহের সব জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়িয়ে দিত।

শাজাহানের রাজত্বকালের সঙ্গে ময়ূর সিংহাসনের নাম অমর হয়ে আছে। সিংহাসনের পেছনে দু'টি পেখম-তোলা ময়ূরের মূর্তির জন্যই এর নাম ময়ূর সিংহাসন দেওয়া হয়। ফরাসী শিল্পী অষ্টিন দ্য বুর্দই ময়ূর সিংহাসন নির্মাণ করেন। কারও মতে বেবাদল খান নামক একজন স্বর্ণশিল্পী অষ্টিন ও বুর্দর সঙ্গে হাত মিলিয়ে সিংহাসনে? রাশি রাশি তোলা সোনা আর পৃথিবীর দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান হীরে-জহরৎ-মণিমুক্তা। প্রায় সাত বৎসরের মত সময় লেগেছিল ময়ূর সিংহাসন গড়ে তুলতে। এক লক্ষ তোলা সোনা লেগেছিল এর নির্মাণ-কার্য্যে। আর অগুনতি মরকত মণি, চুণী, ও হীরা-মুক্তা বার্নিয়ার বলেছিলেন, এর দাম চার কোটি টাকার কম নয়। অন্যরা প্রায় কাছাকাছি এর মূল্য নিরূপণ করেন।

দু'টি মোটাসোটা পায়ের ওপর ময়ূর সিংহাসন দাঁড়িয়ে। মাথার ওপর চাঁদোয়া—বারটি সোনার থাম এটিকে ধারণ ক'রে ছিল। থামের গায়ে চুণী বসানো। ময়ূরের পেখমে আর দেহে মরকত মণি, চুণী, নীলকান্ত মণি ইত্যাদি নানা মূল্যবান পাথরের সুদৃশ্য সংযোজন। চাঁদোয়ার সীমানার গায়ে সারি সারি মুক্তা সাজানো। সব মিলিয়ে বস্তুটি যে কি ছিল তার কাছে কল্পনাও হার মানে। পারস্যের শাহ আব্বাস জাহাঙ্গীরের কাছে একটি বহুমূল্য চুণী উপহার পাঠিয়েছিলেন। পাথরটির ওপর নানা জনের নাম খোদাই করা ছিল। ময়ূর সিংহাসনে এটিও বসিয়েছিলেন অষ্টিন সাহেব। দাম তখনই এক লক্ষ টাকার মত।

কিন্তু পারস্যের উপহারকে এদেশে ধরে রাখতে পারেন নি পরবর্তী মোগল বাদশাহেরা। সুদূর পারস্য থেকে নাদির শাহ এসে নিয়ে গেলেন সেই চুণী-খচিত সমস্ত ময়ূর সিংহাসনটিকে।

বসন্ত উৎসবের দিন ময়ূর সিংহাসনে আরোহণ করতেন মোগল বাদশাহেরা। তবে সেটা সর্বসাধারণের সামনে—দেওয়ানী আমে। এ ছাড়া ময়ূর সিংহাসন সম্ভবত থাকত দেওয়ানী খাসে,—একটি মার্বেলের বেদীর ওপর। বর্গাকৃতি মার্বেলের বেদী হয়ত এখনও ময়ূর সিংহাসনের জন্য নীরব দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

ঐতিহাসিক এবং পর্য্যটকরা বলেছেন যে, এত সাধের ময়ূর সিংহাসনে শাজাহানের আর আরোহণ করা হয়ে ওঠে নি। ঔরঙ্গজীবই প্রথম এটিতে আরোহণ করেন।

নদীতীর ঘেঁসে শাজাহান অনেকগুলি সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করিয়েছিলেন। এদের মধ্যে সৌন্দর্যে না হ'লেও অলঙ্করণে দেওয়ানী খাস শ্রেষ্ঠ। ফার্গুসনের বক্তব্য।......'If not the most beautiful, certainly the most highly ornamented of all Shabjahan's building'

দেওয়ানী খাস ত পৃথিবী নয়, পৃথিবীর স্বর্গ।
... ... বলছিল।

ই তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ এক শিল্পীকে দিয়ে দেওয়ানী স গৃহের কার্নিশের নীচে এক লিপি তিনি উৎকীর্ণ রিয়েছিলেন। কবিতার মত সুন্দর রচনা—

—'আগর ফারদৌস্ বা রুয়ে জমিন অস্ত্

হামিন অস্ত্ ও, হামিন অস্ত্ ও, হামিন অস্ত্'—

অর্থাৎ,—

'স্বর্গ যদি থাকে এ ধরায়—

তবে সে হেথায়, সে হেথায়, সে হেথায়।'—

আর স্বর্গ নয়ই বা কেন? শাজাহানের রাজত্বকালের জাকজমক ও আড়ম্বর ত শুধু ঘটনা নয়, ঘটনার চেয়েও অধিক রোমান্সের গল্পভরা গল্পের মতই চিত্তাকর্ষক।… সম্রাটের জন্য বরফ আসত সুদূর কাশ্মীর হ'তে।… মোগলাই খানার গন্ধে দিল্লী কেল্লার বাতাস 'ম' 'ম' করত এক সময়। যৌবনবতী মোগল রমণীরা অঙ্গে পরতেন বহুমূল্য ঢাকাই মসলিন। হ্যাঁ, বিশেষ বিশেষ নাম ছিল বস্ত্রের। আজকের দিনের মতই। কোনটি সাঁঝের শিশির', কোনটি 'বোনা বাতাস' কিংবা অন্য কোন নাম। একটা কাপড়ের ওজন দু'তিন আউন্সের তার মূল্য তখনকার দিনেই প্রায় অর্ধশত রৌপ্যমুদ্রা।

দেওয়ানী খাস শ্বেত মার্বেলে গঠিত এক সুদৃশ্য অট্টালিকা। চার ফুটের মত উঁচু একটি মার্বেলের বেদীর ওপর অট্টালিকাটি তৈরী হয়েছে। মাঝখানের একটি হল মহল দর বারোটি থামের ওপর দাঁড়িয়ে। চারপাশ বেষ্টন ক'রে বারান্দার মত খানিকটা স্থান—কুড়িটি স্তম্ভের ওপর ভার ন্যস্ত করে আছে। সাকুল্যে বত্রিশটি স্তম্ভ। স্তম্ভগুলির মধ্যে খিলানের মত প্রবেশ-পথ।

দেওয়ানী খাসে অপূর্ব অলঙ্করণ করিয়েছিলেন সম্রাট। স্তম্ভ ও খিলানের গায়ে পুষ্প, বৃক্ষ ও লতা-পাতার এক আশ্চর্য সমন্বয় সংঘটিত হয়েছিল। নানা মূল্যবান পাথরের সাহায্যে এই অলঙ্করণ—নীল, লাল আর নীল লোহিত বর্ণের porphyry, কর্ণেলিয়ান, লাপিস লাজুলী, ইত্যাদি। তার সঙ্গে সোনার জলের কাজ। দেওয়ানী খাস গৃহের ছাদের চারকোণে চারিটি রথের আকৃতি-বিশিষ্ট আচ্ছাদন নির্মিত হয়েছিল। গৃহ অভ্যন্তরের শীর্ষে এক সময় রূপোর পাতের আবরণ শোভা পেত। মারাঠারা সেগুলি লুণ্ঠন ক'রে নিয়ে যায়। অভ্যন্তরের ছাদের এই রৌপ্য পত্রাবরণটি (স্থানে স্থানে সোনার কাজও ছিল) প্রায় চ'ল্লিশ লক্ষ টাকা খরচ ক'রে তৈরী হয় এবং মারাঠাদের টাঁকশালে এটি গলিয়ে মোটামুটি আঠাশ লক্ষ টাকার মুদ্রা প্রস্তুত হয়েছিল।

দেওয়ানী খাসে 'প্রবেশ নিষেধ' জানাতে কোন ভয়ংকর মোগল-প্রহরী আজ তরবারি উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে নেই। পুরাণো স্মৃতির ধারক ছাড়া এই গৃহটি আজ আর কিছু নয়। ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে এলোমেলো সেই কথাগুলিই বার বার মনে পড়ল। কত বিদেশী ট্যুরিষ্ট ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে আমাদের সঙ্গে ঘুরছেন। গাইডের কথা কান পেতে শুনে পুরাণো কাসুন্দির গন্ধ পেতে চাইছেন সতৃষ্ণ কৌতূহল ব্যক্ত করে। এই হল গৃহেই একদিন সেই বিষণ্ণ সভা বসেছিল। কিঞ্চিদধিক দু'শত বৎসর আগে বাদশাহ মহম্মদ শাহ বিদায় সভা ডেকেছিলেন এখানেই। নাদির শাহকে এক শীঘ্র ছেড়ে দিতে সমস্ত হিন্দুস্থান (দিল্লীর সাম্রাজ্য) এবং সম্রাট স্বয়ং বিষণ্ণ বোধ করছেন, এই ক্লান্তিকর কথাগুলি এখানেই আবৃত্তি করেছেন। সুচতুর নাদির এই দেওয়ানী খাসেই বদল করেছিলেন মস্তকের পরিধান—লাভ করেছিলেন কোহিনূর হীরক।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় দেওয়ানী খাসে একবার সমবেত হয়েছিলেন ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর বিভিন্ন দেশীয় কর্মচারীরা। নামমাত্র মোগল সম্রাট শাহ আলমের বংশধরকে ভারতের সাম্রাজ্য ফিরিয়ে দেবার শপথ তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন।

দেওয়ানী খাসের উত্তরে বাদশাহ আর বেগমদের স্নানাগার। একে হামাম নামে অভিহিত করা হয়েছিল। মোগলাই খানার মতই মোগলদের স্নানাগারও উচ্চ প্রশংসার দাবি রাখে। দেওয়ানী ও খাস হামামের মধ্যে ছোট্ট একটি চত্বর। মার্বেল পাথরে মোড়া। ঢুকবার মুখে ছোট্ট একটি স্নানাগার সম্ভবত ছেলেদের জন্য ব্যবহৃত হ'ত। এক সময় এই ঘরের মাথায় দেওয়ালের বুকে জীবজন্তুর নানা চিত্র অংকিত হয়। বাদশাহ বেগমদের জন্য তিনটি সুন্দর ছোট ছোট কক্ষ স্নানাগার হিসেবে ব্যবহার করা হ'ত। এই কক্ষগুলির মেঝে শুভ্র মার্বেল পাথরে বাঁধান। চারপাশের দেওয়ালের কোমর-প্রমাণ অংশ, জলাধার এবং মার্বেল ফলকের ওপর একদা মূল্যবান পাথরের কাজ করা ছিল। কক্ষ তিনটির মধ্যে একটিতে তিনটি জলাধার। নদী-ধারের এই ঘরটির একদিকের দেওয়ালের সঙ্গে একটি ছোট্ট মার্বেল পাথরের ব্যালকনি লাগান। দুপাশেই দেওয়ালের বুকে মার্বেলের জাফরী-কাটা পর্দাজাতীয় কাজ। অন্য কক্ষ দুটির একটিতে জলাধারের সংখ্যা একটিই।

কাছাকাছি একটি মার্বেলের কৌচে স্নানের পর বিশ্রাম নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। জোয়ান কিংবা কোন

পানীয় এখানে বসেই গ্রহণ করতেন সম্রাট এবং অন্যান্যেরা।

জল গরম করবার জন্য সুন্দর বন্দোবস্ত ছিল। মোতি মসজিদের দিকে একটি গর্তের মধ্যে জ্বালানী কাঠ দেওয়া হ'ত ভ'রে। উত্তাপে গরম ঘরের জল উঠত তপ্ত হয়ে। তখন প্রয়োজন মত বিভিন্ন কক্ষে জলকে পাঠান হ'ত নির্দিষ্ট প্রণালীর ওপর দিয়ে। কথিত যে, বেশ কয়েক টন কাঠের প্রয়োজন হ'ত জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করবার জন্য।

লালকেল্লায় মোতি মসজিদ সম্ভবত আওরঙ্গজেবের একমাত্র সৃষ্টি। স্থাপত্যে আওরঙ্গজেবের হস্তক্ষেপ কম। বিবি কা মকবুরা (ঔরঙ্গাবাদ) আর মোতি মসজিদ ছাড়া উল্লেখযোগ্য তেমন কোন অবদানই নেই। মোতি মসজিদ ১৬৫৮—৫৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। দেড় লক্ষ টাকারও বেশী ব্যয় হয় তখনকার দিনে। মোতি মসজিদ শুধু শ্বেত মার্বেলের তৈরী। এমন চিত্তাকর্ষক সৌন্দর্যের বুঝি দোসর মেলা ভার। চেয়ে চেয়ে আঁখি আর ফেরে না। হারেমের বেগম, শাহজাদা-শাহজাদী ও নিজের জন্য এই ছোট্ট মসজিদের সৃষ্টি আওরঙ্গজেবের প্রয়োজন মনে হয়েছিল। জুতো বাইরে রেখে আমরা মসজিদে ঢুকলাম। আজ সেখানে নিবিড় শান্তি। একটি পিনের পতনও বোঝা যাবে। ভিতরের প্রাঙ্গণের মধ্যখানে ছোট্ট একটা জলাধার। একসময় হায়াৎবক্স উদ্যানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত খালের জল এটিকে সর্বদাই পরিপূর্ণ রাখত।

ঘুরতে ঘুরতে উদ্যানের মধ্যে গেলাম আমরা। হায়াৎ বক্স উদ্যান, জাহাঙ্গীর উদ্যান আজ সব একাকার। নদীধারের মোতিমহল আর নেই। বাহাদুর শাহ যে হীরামহল সৃষ্টি করেছিলেন গাইড কই তাও আমাদের দেখাল না। উদ্যানে ঘুরে বেড়িয়েছি কতক্ষণ। কি ফুলই না ফুটেছে লালকেল্লার মধ্যে। নয়াদিল্লীর সর্বত্রই ত সেই ফুলবাহার দেখছি।

হায়াৎ বক্স উদ্যান মোতিমহলের পিছনে তৈরী হয়। ব্যয় কম নয়। কিছু কম ত্রিশ লক্ষ টাকার মত। ঘুরে ঘুরে শাওন আর ভাদো গৃহ দু'টি দেখলাম। এই দু'টি আচ্ছাদনবিশিষ্ট গৃহের মধ্যে জল পড়ার এমন বিশিষ্ট কৌশল করা হয় যে, বারিপতন 'শাওন' আর 'ভাদো' মাসের প্রতীক হিসেবে বিরাজ করত।

আবার একসময় আমরা এসে পৌছলাম দেওয়ানী খাসের দক্ষিণে। এবার দেখলাম খাসমহল, মুসম্মন বাদশাহের নিজস্ব আবাস ছিল। মুসম্মন বুরুজ একটি আটকোনা স্তম্ভের মত। এখানে দাঁড়িয়ে সম্রাট নিয়ে অপেক্ষমান জনতাকে দর্শন দিতেন। ইতিহাস বলে যে, পঞ্চম জর্জ ও ইংলণ্ডের রাণী এখানে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। উনিশ শ এগারো খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর কৌতূহলী জনতা এখানেই তাঁদের দর্শন পায়।

আর রংমহল? পুরাণো দিনের সে এক বিষণ্ণ স্মৃতি মাত্র। রঙে-রসে একদিন যে মহল হয়ে উঠত উজ্জ্বল উচ্ছল, আজ সেখানে ছিটেফোঁটাও অবশিষ্ট নেই। রংমহলের সম্মুখের ঘরের মধ্যখানে প্রস্ফুটিত পদ্মের যে রূপ মার্বেল দেওয়া হয়েছিল, সেই পদ্ম-পাপড়ির ওপর দিয়ে একদা জল সুমিষ্ট শব্দে নিচের আধারে গিয়ে পড়ত। এই আধারটি মার্বেল পাথরের, এর মধ্যে গোলাপ আর ফোটা যুঁই ও মল্লিকার ছবি নানা রঙের পাথরের সাহায্যে ফুটিয়ে তোলা হয়। জলপড়ার সঙ্গে মনে হ'ত যেন ছবিগুলি ঘুরছে।

একসময় রংমহলের শীর্ষদেশ রূপার পত্রাবরণে আচ্ছাদিত ছিল। ফারুকশিয়রের সময় রূপার বদলে তামা ব্যবহার করা হয়। অবার দ্বিতীয় আকবর একটি চিত্রিত কাঠের আচ্ছাদন রংমহলের শীর্ষে ব্যবহার করেছিলেন।

পরবর্তী কালে রংমহল সৈন্যবাহিনীর পদস্থ কর্মচারীদের বাসস্থান রূপে ব্যবহৃত হ'তে থাকে। কিন্তু একসময় নির্মম কঠোর সৈন্যরা ভারী বুটের শব্দ তুলে রংমহলে প্রবেশ করতে কখনই সাহসী হয় নি। সুন্দরী মোগল রমণীর চরণ নূপুরের মিষ্ট মধুর ধ্বনিতে রংমহলের কক্ষগুলি উঠত ভরে। তাদের হাসির খিলখিল শব্দে রংমহলের ভারী ভারী পাথরগুলিও যেন জেগে উঠতে চাইত। মোগল সুন্দরীর সুর্মা-আঁকা চোখের কামনামদির দৃষ্টি ভেসে উঠত অলক্ষ্যে চকচকে মার্বেল পাথরের বুকে।

লালকেল্লায় ছিল অনেক কিছু। আজ বহু কিছু বিনষ্ট। বহু অংশ ব্যবহৃত হচ্ছে অন্য প্রয়োজন মেটাতে। নইলে দরিয়ামহল, খুর্দ জাহান, ছোট রংমহল, আরও কত কি দেখা যেত।

আমরা ত সামান্য দর্শক মাত্র। এত সাধের লালকেল্লা শেষ জীবনে শাজাহান আর একটি বার দেখতে পান নি। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে বন্দী সম্রাট পুত্র আওরঙ্গজেবের কাছে মনোভিলাষ ব্যক্ত করলেন। আর কিছু নয়। আগ্রা থেকে দিল্লী গিয়ে শেষবারের মত দু'চোখ —— লালকেল্লা আর শাজাহানাবাদকে দেখে আসবেন।

াওরঙ্গজেব চিন্তিত হ'লেন। অন্ত কথা হ'লে, না বলা হজ ছিল। কিন্তু বৃদ্ধ পিতার মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে এসেছে। ই শেষ ইচ্ছা কি করে খণ্ডন করা যায়।

অনেক ভেবে আওরঙ্গজেব মত দিলেন। তবে স্থল-পথে হাতীর পিঠে চড়ে যাওয়া চলবে না। শাজাহানকে যেতে হবে জলপথে, যমুনার বক্ষ দিয়ে। আসতেও বে সেই পথে। স্থলপথে বন্দী সম্রাটকে ছেড়ে দেওয়া ঠক নয়। সেনাপতি ও সম্রান্ত ওমরাহদের বিদ্রোহী হ'তে কতক্ষণ?

কিন্তু শাজাহান রাজী হলেন না। এই অপমান তার বুকে তীরের মত বিঁধল। কি নিষ্ঠুর পরিহাস বিধাতার। তার সৃষ্টি শাজাহানাবাদ দেখার জন্য তাকেই এতখানি অবমাননা সইতে হবে। এতখানি পরাধীনতা?

দিল্লী যাওয়া বাতিল করলেন বন্দী সম্রাট। চোখ মেলে আর দেখা হ'ল না। চোখ বুঁজেই সম্রাট ভাবতে শুরু করলেন লালকেল্লাকে। সব ভেসে উঠল এক এক করে চোখের সামনে,...দেওয়ানী আম,...দেওয়ানী খাস, ...রংমহল...সব কিছু।

শুধু চোখ খুললেই—কই সে দৃশ্য? বন্দী সম্রাট আগ্রা কেল্লায় বসে শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

শাজাহানের নানা কীর্তি দেখে শুধু একটা কথা মনে পড়বে। রাজকোষে প্রচুর অর্থ থাকলেই কি এত সুন্দর সুন্দর সৌধ রচনা করতে মন যায়। প্রচুর অর্থ, প্রচুর ধনরত্ন, প্রচুর ঐশ্বর্য ভারতবর্ষ এবং পৃথিবীর বহু দেশেই বহু নরপতি আয়ত্ত করেছেন। কিন্তু এমন অপরূপ তাজমহল, দেওয়ানী খাস, দেওয়ানী আম, এবং আগ্রা কেল্লার বহু সৌধ কোন নরপতি করে যান নি। সম্রাট শাজাহানের একটা অদ্ভুত অনুরাগ ছিল স্থাপত্যের ওপর। অনুরাগ না থাকলে শুধু ঐশ্বর্যবানের পক্ষে এমন সৃষ্টি কোনদিনই সম্ভব নয়।

পাশ্চাত্ত্য দেশের সঙ্গীতের কথা বলতে গিয়ে নেহরুজী লিখেছেন—

'As you know, Germans are the leaders in European music. Some of their great names appear even in the seventeenth century.......Two great names stand out in the eighteenth century—Mozart and Beethoven. They were both infant prodigies,—both composers of genius. Beethoven perhaps the greatest musical composer of the west, became strange to say quite deaf and so the wonderful music he created for others, he could not hear himself. But his heart must have sung to him before he captured that music.'

নিজের রচিত অপরূপ সোনাটা বিঠোভেন নিজের কানে শুনে যেতে পারেন নি। কিন্তু সুর কি শুধু কানে শোনারই বস্তু? হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বেজে বহু পূর্বে সে মর্মে গিয়ে করাঘাত করে। সে সুর হৃদয়ে না করাঘাত করলে বিঠোভেন কি পারতেন অমন সুরবাহার সোনাটা রচনা করতে?

শুধু অর্থ ছিল বলেই শাজাহান সৃষ্টি করে যান নি এই সুরম্য সৌধমালা। স্থপতির হাতে রূপ পাবার বহু পূর্বে সম্রাট স্বপ্ন দেখেছিলেন এই সুদর্শন অট্টালিকাগুলির। স্বপ্নলোকের সেই পরীরাজ্যের মত মোহময় ছবিগুলি তিনি বাস্তবে এনেছিলেন নিপুণ শিল্পী আর কৃতী স্থপতির সাহায্যে।

(২১)

দিল্লী থেকে এবার ফিরতে হবে।

রিজার্ভেশন পাওয়া গেছে। তবে তুফানে নয়, দিল্লী এক্সপ্রেসে। শুনে কিঞ্চিৎ খারাপ হয়ে গেল মনটা। তুফানে গেলে বেশ হ'ত। যমুনার ওপর দিয়ে যেতে যেতে আর একবার দেখা যেত তাজমহল। আর এক-বার দেখতে চেষ্টা করতাম শ্বেত মার্বেলের ইৎমাতুদৌল্লা। সেকেন্দ্রার গম্বুজ বহুদূর থেকে নিশ্চয়ই পড়ত চোখে।

শেষ দিনে ঘুম থেকে উঠে বেরিয়ে পড়লাম যন্তর-মন্তর দেখতে। পরদেশী এসেছি সেথা বলতে হ'ল না। ভিতরে ঢুকতেই পাহারাদার গোছের একটা লোক এসে পাকড়াও করল। ভিনদেশীকে সে ঠিক চিনেছে। যন্তর মন্তর ঘুরিয়ে দেখাবে। বুঝিয়ে দেবে সবকিছু। এই বলে মস্ত এক সেলাম দিল।

যন্তর-মন্তর ঘুরে দেখলাম। মহম্মদ শাহের রাজত্ব-কালে এর সৃষ্টি। অম্বরের রাজা জয়সিংহ এগুলি নির্মাণ করান। সম্ভবত ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে। তখন এর নাম ছিল সম্রাট যন্তর, পরে লোকের মুখে মুখে এর নাম হয়ে যায় যন্তর-মন্তর। সেই পাহারাদারটি আমাকে বোঝাল যে যন্তর মানে ইনষ্ট্রুমেন্ট আর মন্তর মানে কৌশল। পরীক্ষা করে সময় কত লোকটি আমাদের বুঝিয়ে দিল। আমার ঘড়ির সঙ্গে ঠিক এক। একটুও ফারাক নেই। আশ্চর্য রকমের বড় সূর্যঘড়ি। হুগলীর ইমামবাড়াতেও একটা আছে, কিন্তু সে নেহাতই ছোট।

বড় যন্ত্র বা সূর্যঘড়ির দুই পাশে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আকৃতির আরও দু'টি ছায়াঘড়ি। এই তিনটি একটি দেওয়ালের দ্বারা যুক্ত। এর ওপরই নির্মিত একটি খোদিত অর্ধবৃত্তের সাহায্যে যে-কোন বস্তুর পূর্বে বা পশ্চিমের অবস্থান নিরূপণ করা যায়।

দক্ষিণদিকে একই আকৃতির দু'টি গৃহের সৃষ্টি। গঠন অনেকটা গোলাকার। এর সাহায্যে নক্ষত্রের অবস্থান এবং উচ্চতা দেখা যায়। দু'টি গৃহের প্রয়োজন হয়েছিল সম্ভবত এই জন্য যে, একই ফল একটিতে আহরণ করে অন্যটির সাহায্যে মিলিয়ে সার্থকতা পরীক্ষা করা যায়। এই দু'টিরই ওপর দিকটা ফাঁকা। কেন্দ্রে স্তম্ভ মত একটি বস্তু। এই স্তম্ভটির একটি অংশ থেকে ভূমির ওপর সমান্তরাল হয়ে ত্রিশটি পাথরে নির্মিত ব্যাসার্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। সমস্ত বস্তুটি জ্যোতির্বিদ্যার যে-কোন ছাত্রের কাছেই একটি দর্শনীয় বস্তু বলে মনে হবে।

আমরা অরসিকের দল, তাই যন্তর-মন্তরে শুধু ঘুরেই বেড়ালাম। উদ্যানে কি সুন্দর ফুলই না ফুটিয়েছে এরা। পাহারাদারকে মিনতি জানিয়ে আমার স্ত্রী কতকগুলি ফুল সংগ্রহ করলেন।

আমি হেসে বলি—'আবার ফুল সংগ্রহ করলে কেন? তোমার সঙ্গে একটি ত রয়েছেই।'

—'আমার সঙ্গে ফুল কই? তিনি চোখের দিকে চেয়ে হাসলেন।

—'ফুল নেই? তবে তোমরা স্ত্রীরা স্বামীদের যে হাঁদারাম বল। তার মানে কি fool নয়?'

আমরা দু'জনেই হাসলাম

দিল্লী ছেড়ে চলে যাচ্ছি। কালীবাড়ীর ছাদে দাঁড়িয়ে চাঁদ দেখলাম। এই চাঁদ কলকাতায় এমনি হাসছে। তিন-চারশ' বৎসর আগেও এমনি করে হাসত। হয়ত শত শত বৎসর পরেও এমনি করেই শান্তমধুর হাসির আলোয় পৃথিবীকে ভরিয়ে দেবে।

উত্তর ভারতে একটি প্রবাদ ছিল। দরিয়া, বাদল আর বাদশাহ—এই তিন একত্র হ'লেই নগরী গড়ে ওঠে। দরিয়া অর্থাৎ নদী, নদীর তীরে গড়ে উঠবে নগরী। বাদল অর্থাৎ বৃষ্টিদায়িনী মেঘ, ঝরঝর জল ঢেলে জনপদ গড়ে উঠতে সহায়তা করবে। আর বাদশা থাকবেন ছড়ি ঘোরাতে। ছড়ি ঘুরিয়ে শাসন করবেন। এখন আর ও প্রবাদ খাটে না। এখন নগরী গড়ে ওঠে সম্পূর্ণ অন্য প্রয়োজনে। দুর্গাপুর, ভিলাই,...বোখারো এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

অনেক সময় হাতে। দিল্লী এক্সপ্রেস ছাড়ে দিল্লী ষ্টেশন থেকে—চার-পাঁচ মাইলের মত পথ। অনেক আগেই পৌঁছে যাব।

টাঙ্গা ছুটল। আকাশে ফেটে জ্যোৎস্না। প্রশস্ত রাজপথের দু'পাশে সারি সারি আলো। লোকজনে কি একটা জায়গা যেন জমজমাট। একটি সিনেমা হলের সামনে কি প্রচণ্ড ভিড়।

দিল্লী এক্সপ্রেস গতি নিল। যমুনার পুলে উঠেছে গাড়ি। ঝমা ঝম্ ঝম্ ঝমা ঝম্ শব্দ। কে একজন ভদ্রলোক দু'হাতে প্রণাম জানাচ্ছেন।

ঘুমোতে ঘুমোতে ষ্টেশনগুলোর নাম শুনছি। গাজিয়াবাদ, আলিগড়,...তারপর কানপুর। বনমালাদির ওখানে আর যাওয়া হ'ল না। হাতে সময় কই? বিধবা হয়ে প্রফেসর স্বামীকে যেন নতুন করে ভালবাসছেন বনমালাদি। তাঁর নামে স্কুল গড়ছেন উত্তর প্রদেশের কোন এক আধা-শহরে। কিন্তু কত তাড়াতাড়ি দিন কাটছে। মনে হ'ল মফঃস্বল শহরে কবে যেন চাঁদা চাইতে গেলাম বনমালাদির বাড়ী। চোখ বুজে ভাবলেই মনে হয়, এই ত সেদিন। জীবন কি আশ্চর্য! কি ক্ষণস্থায়ী সময়—

দুপুরের দিকে একটা ছোট্ট ষ্টেশনে গাড়ি থামল। ...বিন্ধ্যাচল। শান্ত জনবিরল ষ্টেশনটি। অনেকদিন মনে থাকবে ওর নাম। জীবনে কলকোলাহলের চেয়ে শুরু অলস মুহূর্তগুলি অনেক বেশী মনে থাকে। বড় বড় বহু ষ্টেশনের নাম ভুলে যেতে পারি। কিন্তু কোন নির্জন দুপুরে পুরাণো দিনের ঝাঁপি খুললেই বিন্ধ্যাচল ষ্টেশনে গাড়ি দাঁড়ানোর কথা সবচেয়ে আগে ভেসে উঠবে মনে।

বিকেলের দিকে এল দিলদারনগর,...আরো। অনেক রাতে কখন যেন পেরিয়ে গেছি ঝাঁঝা, শিমুলতলা আর মধুপুর—। গাড়ী হাওড়া পৌঁছল পরদিন সকালে।

ঘরমুখো ট্যাক্সি ছুটেছে। দেহ ক্লান্ত, কিন্তু মন আরও অবসন্ন।

ট্যাক্সি থেকে নামতেই ছেলে ছুটে এসে বলল,—বাবা, দিল্লী থেকে কি এনেছ?'

ওকে কোলে নিয়ে হাসলাম শুধু। চার বছরের শিশু, এই ক'টা দিন মাকে ছেড়ে মনে মনে কত কি না ভেবেছে।

জিনিষপত্র ঘরে এল। ট্যাক্সি চলে গেছে। —রান্না-ঘরের সামনে থমকে দাঁড়িয়েছেন ভদ্রমহিলা। অগোছালো ঘর, বিলি-বন্দোবস্ত নিশ্চয়ই পছন্দ হচ্ছে না। তবে

[illegible]

আসলে তা নয়। এই ক'টা দিনের মধুর স্মৃতিকে মন থেকে মুছে ফেলে আবার রান্নাঘরে নিজেকে নিয়োগ করতে হবে ভাবলে প্রথমটা ত কষ্ট হবেই। তাই বিষন্ন হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক। নিজেরা ফিরে এসেছি। মালপত্র, তল্পিতল্পা সব আমাদের সঙ্গেই হাজির। শুধু আসে নি তারা। সেই ক'টা দিন। দিল্লী আর আগ্রার পথে পথে যে মুহূর্তগুলি এক এক করে ঝরে পড়েছে। ভরিয়ে তুলেছে মন এক অনাস্বাদিত আনন্দে। কিন্তু তবু একটা সান্ত্বনা আছে। ঘরে না এলেও, মনে তাদের অবারিত দ্বার। নিত্য আনাগোনা। সুষমামণ্ডিত তাজ, ইৎমাতুদৌল্লার ছবি, সেকেন্দ্রার গম্ভীর শান্ত রূপ আর লালকেল্লার নানা সুরম্য সৌধমালা।

দিন পেরিয়ে মাস। মাস জুড়ে জুড়ে বছর। সময়ের চাকায় বছরের আয়ু নিঃশেষ হয়। যৌবন ক্ষয়ে গিয়ে নেমে আসে বার্ধক্য—চাঞ্চল্যের স্থান কেটে নেয় শীতল স্থবিরতা। রোমাঞ্চ আর জাগে না প্রাণে,—অবসন্ন মন থেকে শুধু ধ্বনিত হয় যৌবনকে আবার ফিরে পাবার জন্য যযাতির করুণ প্রার্থনা।

সেই বার্ধক্যের দিনে আরও নানা সঞ্চিত স্মৃতির সঙ্গে এই পথের স্মৃতিগুলিও প্রতিফলিত হবে মনে। শীতলতা দূর করে সামান্য উত্তাপ তারা সঞ্চার করবে প্রাণে। চোখ বুজে ভাব, আগ্রার তাজ, যমুনাতীরের ইৎমাতুদ্দৌল্লা,..লালকেল্লার দেওয়ানী খাস,...আগ্রার সেই বুড়ো টাঙ্গাওলা,...ট্রেণে আলাপ-হওয়া অধ্যাপক শর্মার গল্পগুলি।

...আবার নতুন করে ভালবাসব সেই দিনগুলিকে।...ভালবাসব পৃথিবীকে,...ভালবাসব নানা ধরনের মুহূর্তের মালা দিয়ে গড়া এই আশ্চর্য জীবনকে। আর সেই ভালবাসাই ত আসলে ভগবানকে ভালবাসা।

করুণাময়ের প্রতি হৃদয়ের অঞ্জলি।

কারণ. সেই দিনগুলি, এই পৃথিবী, জীবন-মৃত্যু সবই ত পরম কারুণিক ঈশ্বরেরই সৃষ্টি।

সমাপ্ত

—

মাষ্টারমশাই

সন্তোষকুমার অধিকারী

এক কিলো চাল দিতে পারো ?
বৃদ্ধ মাষ্টার মশাই
ম্লান প্রার্থনায় এসে দাঁড়ালেন দুয়োরে সহসা ।
কুণ্ঠিত, আজানুনত, দগ্ধ যেন শীর্ণ তালতরু ;
সেই রূঢ় কণ্ঠ নেই ; ভস্ম অবশেষ অঙ্গারের ।
চকিত বিস্ময়ে শুধু স্তব্ধ হয়ে চেয়ে দেখলাম :
মাষ্টারমশাই প্রার্থী ! শৈশবজীবনে জ্যোতিষ্মান
প্রদীপ্ত সূর্যকে জেনে আমি আজও দীপ্ত মনে মনে ।
প্রবাল পাথরে সেই অবিচল তেজের স্মরণে
হৃদয়ে গোপন এক মণিকোঠা তুলেছি শ্রদ্ধায় ।
আমি আজ ছাত্র নই, আমার পুত্রও নয়, দেহ
ভারগ্রস্ত ক্রমান্বয়ে । অন্যায়ে প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে
চেতনা যন্ত্রণাম্লান । চারিদিকে পুঞ্জীভূত ক্লেদ
সহস্র বিচ্যুতি ; তবু অম্লান দীপের একটি শিখা
জ্বালা ছিল এতদিন—সেই শিখা মাষ্টারমশাই ।

দেখেছি দারিদ্র্য তাঁকে কোনদিন করেনি বিনত,
সত্যার্থী প্রতিজ্ঞাদৃঢ়, দীণতায় ক্ষমাহীন ঘৃণা
কঠোর কর্কশভাষী, প্রচ্ছন্নভ, আজন্ম একক,—
ভস্মশেষ সেই ঋষি, ভূমিলগ্ন বিন্ধ্যগিরিশির !
মনে পড়ে, একবার বিদ্যালয়ে জেলাশাসকের
পুত্র এল ; অঙ্কে তার কোনদিন বুদ্ধিই খোলেনি ।
শাসকসাহেব যিনি প্রেসিডেন্ট স্কুলের—হঠাৎ
মাষ্টারমশায়ে ডেকে জানালেন—ছেলেটিকে তাঁর
অঙ্কে ফেল করানো চলবে না । সেদিন সোচ্চার ক
মাষ্টারমশাই শুধু বললেন—আমাকে বরং
এবার বিদায় দিন । মনে পড়ে—সেই দীর্ঘ দেহে
শক্তির দৃঢ়তা ছিল, দারিদ্র্যের দৃপ্ত অহঙ্কার ;
বহুশ্রমে 'পারিশ্রমিক' তাঁর ঘরে কোন উপহার
কোন অর্থমূল্য দিতে ; কে পারে সূর্যকে ঋণ দিতে !

অথচ এখন সেই বেদনার স্মৃতিবহ দিন
আর নেই । জাগ্রত স্বাধীন দেশে গুণী স্মরণের
নবলব্ধ প্রেরণায় আমরা মুখর । স্মরণীয়
নাম দিয়ে সাজিয়েছি সম্মানের রাজসিংহাসন
তবু ম্লান অন্ধকারে ভস্ম আচ্ছাদিত অগ্নিশিখা
শুধু আত্মদাহ আজ ; প্রার্থনায় মৃত্যুর বিনয়
মাষ্টারমশাই নয়, এ'যন্ত্রণা বিকৃত যুগের ।

কৃত্তান্তনাথ বাগচী

একটি পাতা খসে গেল কোথায় কোন বনে
রাখবে কে বা মনে !
অরণ্য যে ডালে ডালে
বরণ ডালার প্রদীপ জ্বালে,
বসন্তে আজ ব্যাকুল বেণু
দখিন সমীরণে।

আমি যে ঐ নামহারানো ঝরা পাতার সাথে
যাব নিশীথ রাতে।
ভোরের আলো আসবে ছুটে,
বিচিত্র প্রাণ উঠবে ফুটে,
মোর পরিচয় মুছে যাবে
নীরব অজানাতে !

তবু আমার রইল শুধু একটি অভিমান
গেয়ে গেলাম গান।
জমিয়ে পাড়ি কলরবে
যখন তোমার সময় হবে
শুনবে আপন গভীর বুকে
পাতবে যখন কান।

"যা পেলেম—।"

হাসিরাশি দেবী

আমার এ দুঃসাহস এতকাল পেয়েছে প্রশ্রয়
তোমার হৃদয়-রাজ্যে,—অন্তরের স্নেহান্ধকারে,—
যেখানে নিদ্রিত চিত্ত লভেছে অকুণ্ঠ বরাভয়,—
লজ্জাহীন-দৃষ্টি মোর—সঙ্কোচবিহীন বারে বারে !

আমার স্পর্দ্ধিত মনে—মাটির শ্যামল দুর্ব্বাদল
দু'পায়ে দলন ক'রে—আকাশেরে চেয়েছে দু'হাতে,—
ঈশানের পুঞ্জ মেঘে ফিরে গেছে যেই অশ্রুজল,—
বিদ্যুতে দেখেছি তারে,—বর্ণহীন আর এক নিশাতে।

আমার এ দুরাকাঙ্ক্ষা লঙ্ঘন করেছে বারবার
তোমার প্রেমের গণ্ডি—ক্ষুদ্র আর তুচ্ছতর ভেবে,
দম্ভের রোষাক্ত দৃষ্টি আগুনে ক'রেছে ছারখার,—
তুমি ফিরে চ'লে গেছ অন্তরের বেদনারে চেপে।

আজ ভাবি—যাবে যদি, ক'রে গেলে কেন অসহায়,
যেখানে নিঃসঙ্গ মন—কঠিন পাথরে আছড়ায় !

কেন্দ্রীয় বাজেট—১৯৬৫-৬৬

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আয়কর এবং কর্পোরেশন ট্যাক্স

আমাদের দেশের বর্তমান আর্থিক অবস্থায় কতকগুলি পরস্পরবিরোধী উপাদান দেখতে পাওয়া যায়। যথা, একদিকে ব্যক্তিগত আয়কর এবং কর্পোরেশনে ট্যাক্স বর্ত্তমানে এদেশে অত্যন্ত উঁচু, এমন কি ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রমুখ অনেক উন্নত দেশের তুলনায়ও বেশী। দেশের ব্যবসায়ী মহলের নেতৃগোষ্ঠী অভিযোগ করেন যে, এই কারণে মানুষের সঞ্চয় প্রবৃত্তি এবং নূতন ব্যবসায় বা শিল্প প্রযোজনায় লগ্নীর উৎসাহ দমিত হচ্ছে। অন্যদিকে এই উঁচু প্রত্যক্ষ করভার সত্ত্বেও দেশের বাজারে মূল্যমান ক্রমাগতই বৃদ্ধির দিকে এগিয়ে চলেছে সাধারণতঃ অতিরিক্ত অর্থবাহী বাজারে তার মূল্যমানের উপরে চাপ হাল্কা করবার অন্যতম উপায় হিসাবে ট্যাক্সের আশ্রয় নেওয়া হয়ে থাকে। এ ছাড়া নিম্নমানের আয়কারীদের উপরে মূল্যবৃদ্ধি তাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিপন্ন করে তুলেছে। এই অবস্থায় এই মানের আয়কারীদের নীট ভোগ্য আয় কিছুটা না বাড়লে জীবনধারণ প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠছে। উচ্চতর মানের আয়কারীরাই সাধারণতঃ সঞ্চয় ও পুঁজি সৃষ্টিতে সহায়তা করে থাকেন। ট্যাক্সের প্রচণ্ড চাপে তাঁদের সঞ্চয় প্রবৃত্তি ব্যাহত হচ্ছে এ কথা অর্থমন্ত্রী নিজেও স্বীকার করেছেন। অথচ বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে পুঁজি সৃষ্টি ও লগ্নীর জন্য ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের হার বৃদ্ধির প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে সংযম ঘটানোও সম্ভব হবে বলে আশা করা যায় এবং তার ফলে মূল্যমানের ওপরে ক্রমাগত যে অধিকতর চাপ সৃ হয়ে চলেছে সেটাও খানিকটা পরিমাণে এভাবে সং করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। বস্তুতঃ কয়ে বৎসর পূর্ব্বে বিদেশী ট্যাক্সবিশেষজ্ঞ অধ্যাপক কলডা সুপারিশ করেছিলেন যে, আয়করের হার প্রভৃত পরিমা কমিয়ে দিয়ে ব্যয়কর প্রবর্ত্তন করে রাজস্বের প্রয়োজ মেটাবার আয়োজন করলে একদিকে উচ্চতর হারে সঞ্চ তথা পুঁজি সৃষ্টিতে সহায়তা করতে পারে এবং অন্যদি আনুপাতিক পরিমাণে ভোগসঙ্কোচের দ্বারা মূল্যস্থির সম্পাদিত হবার আশা করা যায়। অধ্যাপক কলডার সুপারিশ পুরোপুরি গ্রহণ করা এখনই হয়ত সম্ভব কিন্তু এই দিকে রাজস্বের কাঠামো রচনায় একটি ন ধারার প্রবর্ত্তন সুরু হ'লে সম্ভবতঃ ভবিষ্যতে উন্নয়ন মূল্যচাপের দ্বারা ব্যাহত হবে না এমনটি আশা কর কারণ আছে।

নূতন বাজেটে অর্থমন্ত্রী কৃষ্ণমাচারী এরূপ একটি ধারা প্রবর্ত্তনের প্রয়াস করেছেন বলে দেখা যায়। ব গত আয়করের ক্ষেত্রে তিনি করভোগ্য (taxab সকল স্তরের আয়ের ওপরই করভার লাঘব ক আয়োজন করেছেন। এর ধারা এবং পরিমাণ নি হিসাব থেকে বোঝা যাবে ; (বিবাহিত : ২টি নির্ভ

র্ষিক য়ের র	এন্যুইটি ডিপোজিটের হার	সম্পূর্ণ অর্জ্জিত আয়ের (wholly earnd income) ওপর ট্যাক্সের পরিমাণ		সম্পূর্ণ অনার্জ্জিত আয়ের (wholly unearned income) ওপর ট্যাক্সের পরিমাণ	
		১৯৬৪-৬৫	১৯৬৫-৬৬	১৯৬৪-৬৫	১৯৬৫-৬৬
টাকা	টাকা পয়সা	টাকা পয়সা	টাকা পয়সা	টাকা পয়সা	টাকা পয়সা
,৫০০·০০		৩০·০০	১০·০০	৩০·০০	১০·০০
,০০০·০০		৬০·০০	৩৫·০০	৬০·০০	৩৫·০০
,০০০·০০		৩১০·০০	২৮৫·০০	৩১০·০০	২৮৫·০০
,০০০·০০		৬৮৫·০০	৫৩৫·০০	৬৮৫·০০	৫৩৫·০০
,৫০০·০০		১,০৬০·০০	৯১০·০০	১,১৯২·০০	৯১০·০০
৫,০০০·০০		১,৫৬০·০০	১,২৮৫·০০	১,৭৫৫·০০	১,২৮৫·০০
০,০০০·০০	১,০০·০০	২,৩৬০·০০	২,০৮৫·০০	২,৬৫৫·০০	২,২৪৫·০০
৫,০০০·০০	১,৮৮০·০০	৩,৮৩২·০০	৩,২২১·০০	৪,৩১১·০০	৩,৬০৮·২০
০,০০০·০০	৩,০০০·০০	১০,৩৭০·০০	৯,২৮৫·০০	১১,৮৯১·০০	১০,৮৮৫·০০
,০০০·০০	৭,০০০·০০	২৬,৫৯০·০০	২৩,৫৮৫·০০	৩০,৫৭৮·৫০	২৮,৪৩৫·০০
০,০০০·০০	১২,৫০০·০০	৪৪,৬১৫·০০	৩৯,১৬০·০০	৫২,৪২২·৬২	৪৭,৯০৩·৭৫
,০০০·০০	২৫,০০০·০০	১,১৫,৮৬৫·০০	৯৮,৪৭২·৫০	১,২৯,৫৩২·০০	১,১৮,৯৯৭·৫০

উপরোক্ত হিসাব থেকে দেখা যাবে যে, প্রথমতঃ পূর্ব্ব বছরের তুলনায় অর্জ্জিত ও অনার্জ্জিত আয়ের ট্যাক্স সমতার র্দি এবার আরও দুটি ধাপ বাড়িয়ে দিয়ে বার্ষিক ১৫,০০০ য়ার টাকা আয় পর্য্যন্ত সমান করে দেওয়া হয়েছে। এর রের স্তরগুলিতে অর্জ্জিত আয়ের তুলনায় অনার্জ্জিত আয়ের র ট্যাক্সের হার গত বছর যথাক্রমে ছিল—বার্ষিক ,০০০৲ হাজার টাকা আয়ের ওপর ১১·১% বেশী; ,০০০৲ হাজার ও ৭০,০০০৲ হাজার টাকা আয়ের ওপর % বেশী; ১,০০,০০০৲ লক্ষ টাকা আয়ের ওপর ১৪·৯% শী এবং ২,০০,০০০৲ লক্ষ ও তদূর্দ্ধ আয়ের ওপর ১০·৫% শী। বর্ত্তমানে এই তারতম্যের হার হ'ল যথাক্রমে %, ১০·৭%, ১৩·৯%, ১৮·২% এবং ১৭·১% বেশী। তিনীতির দিক থেকে বর্ত্তমান হারটি বেশী সমীচীন হয়েছে একথা উল্লেখ করা বাহুল্য।

বর্ত্তমান বাজেটে ব্যক্তিগত আয়করের ধারায় আর একটি বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধন করা হয়েছে। প্রথমতঃ এ র্য্যন্ত ব্যক্তিগত আয়করের প্রয়োগটি গভীর জটিলতাদোষ দুষ্ট ছিল। অর্থমন্ত্রী এর কাঠামোটিকে এবার যথাসম্ভব সহজ ও সরল করে দেবার প্রয়াস করেছেন। এর ফলে রাজস্বের পরিমাণ এই খাতে অল্পদিনের জন্য খানিকটা খর্ব্ব হবার আশঙ্কা আছে। কিন্তু এর প্রয়োগ অনেক বেশী বাধাহীন হবে বলে মনে করা যায়। তা ছাড়া বর্ত্তমানের ট্যাক্স মকুবের প্রাথমিক পরিমাণটিকে সম্পূর্ণ বর্জ্জন করে প্রতি করদাতার ব্যক্তিগত ভাতা হিসাবে বার্ষিক ২,০০০ হাজার টাকা, বিবাহিত হ'লে স্ত্রীর জন্য অতিরিক্ত ১,৫০০ টাকা এবং দুইটি নির্ভরশীল (dependent) সন্তান পর্য্যন্ত প্রতি সন্তানের জন্য বার্ষিক ৪০০ টাকা ট্যাক্স থেকে মাপ পাবে। এর ফলে দুইটি কাজ হবে; একদিকে অবিবাহিত কিন্তু উপার্জ্জনশীল স্ত্রী-পুরুষের উপর যে অন্যায় ট্যাক্স প্রয়োগ চলছিল সেটি বন্ধ হবে। এর ফলটি নিম্নলিখিত রূপ দাঁড়াবে:

১। অবিবাহিত ব্যক্তির আয় অনুযায়ী যত ট্যাক্স দেয় হবে তার থেকে তাঁরা মোট ১০০ টাকা মাপ পাবেন।

২। সন্তানহীন বিবাহিত ব্যক্তির আয় অনুযায়ী

যতটা মোট ট্যাক্স দেয় হবে, তার থেকে তাঁরা মোট ১৭৫ টাকা মাপ পাবেন।

৩। একটি নির্ভরশীল সন্তানসহ বিবাহিত ব্যক্তিরা আয় অনুযায়ী মোট ট্যাক্স থেকে ১৯৫ টাকা মাপ পাবেন।

৪। দুই বা তদূর্দ্ধ সংখ্যার নির্ভরশীল সন্তানসহ বিবাহিত ব্যক্তিরা আয় অনুযায়ী দেয় ট্যাক্স থেকে মোট ২১৫ টাকা মাপ পাবেন।

এই পরিবর্ত্তনটির ফলে বর্ত্তমান বৎসরে অনুমিত আয়কর রাজস্ব থেকেআন্দাজ ৩·৬৩ কোটি টাকা কমে যাবে বলে হিসাব করা হয়েছে।

আর একটি বিশেষ পরিবর্ত্তনও সঙ্গে সঙ্গে সাধন করা হয়েছে। জীবনবীমার চাঁদা, প্রভিডেন্ট ফণ্ডের দেয়, নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য বার্ষিক সঞ্চয় (cumulative time deposit) ইত্যাদি যে-সকল দায়ের উপর আয়কর থেকে মাপ পাবার ব্যবস্থা ছিল তার সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ এবার বার্ষিক ১০,০০০ হাজার টাকা থেকে ১২,৫০০ টাকায় বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া এই মাপের পরিমাণের হিসাব সরল করবার উদ্দেশ্যে এই সকল খাতে দেয় অর্থের অর্দ্ধেক পরিমাণ আয়কারীর আয় থেকে বাদ দিয়ে ট্যাক্সের হিসাব করবার ব্যবস্থা হয়েছে। এ ছাড়া প্রতিবন্ধক (handi-capped) নির্ভরশীলদের প্রতিষ্ঠানমূলক (institutional) যত্নের প্রয়োজনে বার্ষিক ২,৪০০ টাকা পর্য্যন্ত এবং অন্যভাবে যত্নের আয়োজন হ'লে ৬০০ টাকা পর্য্যন্ত আয় ট্যাক্স থেকে মাপ পাবে।

দেখা যাচ্ছে যে, মূল ট্যাক্সের হারের উচ্চতম স্তর বার্ষিক ৭০,০০০ হাজার থেকে ১,০০,০০০ লক্ষ টাকা আয়ে পৌছাবে। এই স্তরে গড়পড়তা ট্যাক্সের হার (অনার্জ্জিত আয়ের ওপরে) দাঁড়াবে আয়ের ৬৫% মতন। তা ছাড়া অর্জ্জিত আয়ের ওপর সারচার্জ্জ ১ লক্ষ থেকে ২ লক্ষ টাকার আয়ে পরিবর্ত্তন করে ৫% ধার্য্য করা হয়েছে ; ২ লক্ষ থেকে ৩ লক্ষ পর্য্যন্ত ১০% এবং ৩ লক্ষ টাকার ওপরে আয়ে ১৫% ধার্য্য করা হয়েছে। অনার্জ্জিত আয়ের ওপর সারচার্জ্জ ১৫,০০০ থেকে ৫০,০০০ হাজার টাকা আয়ে ২০% এবং ৫০,০০০ হাজার টাকার বেশী আয়ের ওপরে ২৫% ধার্য্য করা হয়েছে। অন্যদিকে ১৫,০০০ হাজার টাকা আয় পর্য্যন্ত আয়কর কাঠামোর বর্ত্তমান পরিবর্ত্তনের ফলে অনার্জ্জিত আয়ের ওপর সর্ব্বোচ্চ ট্যাক্সের হার পূর্ব্বের ৮৮·১২৫% থেকে কমে ৮১·২৫% দাঁড়াবে এবং অর্জ্জিত আয়ের ওপর এর হার পূর্ব্বের ৮২·৫% থেকে কমে দাঁড়াবে ৭৪·৭৫%।

উপরোক্ত রদবদলের ফলে ব্যক্তিগত আয়করের পরিমাণ বেশ খানিকটা কম হওয়া সত্ত্বেও এখনও এদেশে এইটি অন্যান্য উন্নত দেশের তুলনায় উচ্চতরই থেকে যাবে। কিন্তু উর্দ্ধতর আয়ের ক্ষেত্রে একই আয়-স্তরে উন্নত দেশসমূহের তুলনায় এদেশে যে আপেক্ষিক আর্থিক সঙ্গতি ও শক্তি সূচীত করে তা সে সকল দেশের তুলনায় অনেক পরিমাণে বেশী। যথা, এদেশে বার্ষিক ১ লক্ষ টাকা আয় মানে ইংলণ্ডে বর্ত্তমান বিনিময় হারে দাঁড়ায় মোটামুটি ৭০০০ পাউণ্ড। ঐ দেশের এটাই সাধারণ উচ্চ-মধ্যবিত্তের আয়ের মোটামুটি স্তর কিন্তু তুলনায় এদেশে বার্ষিক ১৫,০০০ হাজার থেকে ২০,০০০ হাজার টাকাই সাধারণ উচ্চ-মধ্যবিত্তের আয়ের মান, বার্ষিক ১০০,০০০ লক্ষ টাকা আয়ের অধিকারীদের ধনী বলে এবং অসীম আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন বলে মনে করা হয়। অতএব উন্নত দেশসমূহের তুলনায় একটা নির্দ্দিষ্ট স্তরের সম্পর্কে আয়ের ওপর অধিকতর পরিমাণে ট্যাক্সের চাপ অন্যায় বলে গণ্য করা চলে না। মোটামুটি বর্ত্তমান বাজেট প্রস্তাবগুলি এ সম্পর্কে কল্যাণসূচক বলেই গণ্য করা চলে।

কর্পোরেট ট্যাক্স

ব্যবসায়ী মহলে গত কয়েক বৎসর ধরেই কর্পোরেট ট্যাক্স সম্বন্ধে আন্দোলন চলে আসছে। তাঁরা অভিযোগ করেন যে, এই প্রচণ্ড ট্যাক্সের ফলে বেসরকারী এলাকায় নূতন শিল্পসৃষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে, পুঁজি সৃষ্টির ধারা মন্দীভূত হয়ে আসছে এবং এদেশের শিল্পে বিদেশী পুঁজি-লগ্নী ব্যাহত হচ্ছে। বর্ত্তমান বাজেটে এই সকল অভিযোগ নিরসন করবার প্রয়াসে কতকগুলি আয়োজনের প্রস্তাব করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী মনে করেন এই ক্ষেত্রে ট্যাক্স কাঠামোটি মূলতঃ সুস্থ ও বলিষ্ঠ, কিন্তু কোন কোন দিকে খানিকটা রদবদলের আবশ্যক আছে। যথা, মুনাফাকর (Divident Tax) নিয়ে বিস্তৃত আন্দোলন হয়েছে, কিন্তু তিনি মনে করেন যে, বর্ত্তমান অবস্থায় মুনাফা বণ্টন [illegible] প্রয়োজন আছে। অনুরূপ কারণে সার-

ট্যাক্স তুলে দিতেও তিনি রাজী নন। কিন্তু সাধারণতঃ কর্পোরেট ট্যাক্সের ক্ষেত্রে তিনি খানিকটা পরিবর্তন সাধন করেছেন।

প্রথমতঃ, কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট পণ্য-উৎপাদক শিল্পগুলিকে যে ট্যাক্স মাপ করবার নীতি গৃহীত ছিল সেটিকে আরও বিস্তৃত করে আরও কতকগুলি নূতন পণ্যকে এই সুবিধার অধিকারী হবে বলে ঘোষণা করা হবে। তা ছাড়া যে-সকল কোম্পানীগুলি খনিজ উৎপাদন, বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন ইত্যাদি শিল্পে নিযুক্ত এবং যাদের বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকার অধিক নয়, তাঁদের উপরে আয়ের প্রথম ২লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত ৫০% হারে ট্যাক্স ধার্য্য করা হ'ত। বর্ত্তমানে বিদেশী সংগঠন ব্যতীত এ সকল শিল্পে নিযুক্ত সকল কোম্পানীর ওপরে আয়ের প্রথম ১০ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত ৫০% হিসাবে ট্যাক্স ধার্য্য করা হবে। এই ধরনের আরও কতকগুলি পরিবর্ত্তন নূতন বাজেটে প্রস্তাবিত হয়েছে।

যে-সকল কোম্পানী ভিন্ন স্থানে অতিরিক্ত শিল্প সংগঠন প্রতিষ্ঠা করবার জন্য তাঁদের জমী বা বাড়ী বিক্রয়ের মুনাফার টাকা লগ্নী করবেন তাঁদের ওপর অতিরিক্ত পুঁজি ট্যাক্স (Capital Gains Tax) মাপ করা হবে; সংগঠনের কর্ম্মীদের জন্য বাসস্থান নির্ম্মাণের টাকাও এই সুবিধা পাবে।

ডেভেলপম্যাণ্ট রিবেটের কিছু রদবদল প্রস্তাবিত হয়েছে। এর বর্ত্তমান সাধারণ হার ২০% কিন্তু কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট শিল্পের ক্ষেত্রে (আয়কর আইনের একটি নূতন ৫ম সিডিউলে এসকল শিল্পগুলি নথীভুক্ত করা হবে) সেটি কমিয়ে ১৫% করা হবে কিন্তু কয়লাখনির যন্ত্রাদি উৎপাদকদের এবং জাহাজ-নির্ম্মাতাদের ক্ষেত্রে এর হার পূর্ব্ববৎই যথাক্রমে ৩৫% এবং ৪০% থাকবে। কিন্তু যে সকল পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠিত শিল্প বর্ত্তমান ২০% হারে ডেভেলপমেণ্ট রিবেট পাচ্ছিল, তাদের ক্ষেত্রে এই বর্ত্তমান হারই ১৯৭১ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত বলবৎ থাকবে।

কোম্পানীর আয়করের ক্ষেত্রে করের হার সর্ব্বোচ্চ স্তরে ৭০%-এ বেঁধে দেওয়া হ'ল। উৎপাদন বৃদ্ধি-কল্পে কেন্দ্রীয় আবগারী শুল্কের দায় অতিরিক্ত উৎপাদনের ওপর ২৫% পর্য্যন্ত মাপ করবার প্রস্তাব করা হয়েছে। অনুরূপভাবে অতিরিক্ত উৎপাদনজনিত ট্যাক্স ও সারট্যাক্স বৃদ্ধির পরিমাণের ২০% পর্য্যন্ত মাপ করা হবে। এ-সকল মাপ-করা অর্থের নির্দ্দেশক অঙ্কের ট্যাক্স ক্রেডিট সার্টিফিকেট সংশ্লিষ্ট শিল্প সংস্থাগুলিকে দেওয়া হবে। এর দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যয় সঙ্কুলান, দেনা শোধ ইত্যাদি করতে পারবেন। এ ছাড়া আরও কতকগুলি ক্ষেত্রেও সুবিধা দেবার প্রস্তাব করা হয়েছে।

বিদেশী কুশলী

বিদেশী কুশলীদের এদেশের শিল্পে নিযুক্ত করলে (অবশ্য সরকারী অনুমোদন নিয়ে), তাদের ক্ষেত্রে আয়কর থেকে কিছুটা অব্যাহতি দেবার পূর্ব্ব থেকেই বিধি ছিল। প্রথম তিন বৎসরের জন্য এই অব্যাহতি দেবার বিধি আছে এবং পরে আরও দুই বৎসরের জন্য এর মেয়াদ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘতর কালের জন্য এসকল কুশলীদের সহায়তা প্রয়োজন হয়, সেই কারণে দুই বৎসরের বর্দ্ধিত দ্বিতীয় দফার মেয়াদের পরও আবার সরকারী অনুমোদন নিয়ে এর মেয়াদ আরও অতিরিক্ত তিন বৎসরের জন্য বাড়াতে পারা যাবে।

এই অতিরিক্ত সুবিধাটি সম্বন্ধে একটি বিশেষ প্রশ্ন আছে। সেটি এই যে, বিদেশী কুশলী নামধারী যে সকল ব্যক্তিরা ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিযুক্ত আছেন, তাঁরা সত্যকার কুশলী কি না সে-বিষয়ে একটা বিশেষ অনুসন্ধান একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে দেশী বা বিদেশী কর্ম্মচারী নিযুক্ত করবার স্বাধীনতা শিল্প-মালিকের, তাতে হয়ত সরকারী হস্তক্ষেপের অবকাশ নাই। কিন্তু ট্যাক্স মকুব পাওয়া বা এদেশে রোজগার-করা অর্থ দেশের বাহিরে প্রেরণ করবার যে-সকল সর্ত্ত এঁরা ভোগ করে থাকেন সে-সম্বন্ধে সরকারী দায়িত্ব স্পষ্ট ও অনস্বীকরণীয়। এ সকল সুবিধা পেতে গেলে কতকগুলি সর্ত্ত নিতান্ত প্রয়োজন। প্রথমতঃ, দেশে পাওয়া সম্ভব নয় শুধু এমন সব বিদেশী শিল্পকৌশল বিশেষজ্ঞরাই এ-সকল সুবিধার অধিকার দাবি করতে পারবেন বলে নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ, এও একটি জরুরী সর্ত্ত হওয়া দরকার যে, বিদেশ থেকে আমদানী-করা কুশলীদের তাঁদের নিজ নিজ বিশিষ্ট কৌশলের ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোন কাজে তাঁদের নিযুক্ত করা হবে না। আমরা অনেক উদাহরণ জানি যে সকল ক্ষেত্রে কোন একটি বিশেষ কাজের জন্য লোক আমদানী

করে পরে তাঁদের অন্য কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে, যে-সব কাজে এঁদের কোন বিশেষ বিশেষজ্ঞ-কৌশল বা অভিজ্ঞতার অধিকার ছিল না। সবচেয়ে বড় কথা বিদেশী কোন কর্ম্মচারীকে এদেশের সরকারী বা বেসরকারী শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির সাধারণ পরিচালনার দায়িত্ব দেবার কোনই সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে যাতে এ ধরনের কাজে বিদেশী কর্ম্মচারী নিযুক্ত না করা হয় এরূপ নীতি অবিলম্বে অনুসৃত হওয়া প্রয়োজন। বেসরকারী মালিকানায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে এরূপ নীতি সরাসরি প্রবর্ত্তন করা হয়ত মালিকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সংবিধানগত অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হবে এবং সেই কারণে সেটা করা সম্ভব নয়। কিন্তু সে-সকল ক্ষেত্রে আয়কর থেকে অব্যাহতি পাওয়া এবং এদেশে অর্জ্জিত অর্থের নির্দিষ্ট অংশ বিদেশে প্রেরণ করবার যে-সকল সুবিধাগুলি বিদেশী কুশলীদের দেওয়া হয়, সেগুলি থেকে এঁদের বঞ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করি।

বস্তুতঃ এদেশে লগ্নীর জন্য বিদেশী পুঁজি আকৃষ্ট করবার তাগিদে এ সকল বিষয়ে সরকার পক্ষে একটা গভীর ঔদাসীন্যের লক্ষণ দেখা যায়। সেই কারণেই হয়ত বিদেশী কুশলীদের সম্পর্কে যে-সকল সুবিধাদানের বিধি প্রচলিত রয়েছে, সেগুলি এদেশে নিযুক্ত কুশলী বা অকুশলী সকল বিদেশীদের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করতে কোন সঙ্গত বাধাদানের চেষ্টা ত হয়ই নাই; বরং প্রশ্নটি এতাবৎ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেই চলা হয়েছে। এর ফলে এদেশে বিদেশী পুঁজি লগ্নীর পরিমাণ যে কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে কিংবা তার লক্ষণ দেখা গেছে এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অন্যদিকে কুশলী নামধারী বিদেশ থেকে আমদানী-করা অসংখ্য ব্যক্তি ভারতের সরকারী ও বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রের উচ্চতর স্থানগুলিতে এমন মৌরসী পাট্টা নিয়ে বসে গেছেন যে, দেশের সত্যকার কুশলী ও দক্ষ ব্যক্তিরা তুলনায় অবহেলিত ও অপমানিত বোধ করছেন। কিছুকাল আগে সঙ্কলিত একটি সরকারী হিসাবে অনুমান করা হয়েছে যে,ন্যূনাধিক অন্ততঃ দশ হাজার ভারতীয় কুশলী বিদেশের নানা শিল্পক্ষেত্রে নানারকম দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত আছেন। এঁদের স্বদেশে ফিরিয়ে এনে দেশের শিল্পসৃষ্টির কাজে লাগানোর একান্ত প্রয়োজনীয়তার কথা সরকার [illegible]

গত কয়েক বৎসরে কোন বিশেষ উন্নতি যে সাধিত হয়েছে এমন কোন লক্ষণ দেখা যায় না। বস্তুতঃ এ-সকল ভারতীয় শিল্পকুশলীরা দেশে ফিরে আসবার জন্য কোন ব্যগ্রতা দেখান ত নাই-ই; বরং প্রতি বৎসর দেশ থেকে আরও নূতন নূতন লোক বিদেশে কর্ম্মসংস্থানের চেষ্টা অনবরতই করে চলেছেন। কেহ কেহ বলেন যে, এর একটা প্রধান কারণ যে এঁরা এদেশের তুলনায় বিদেশে উন্নত প্রণালীর আধুনিক জীবনযাত্রায় একবার অভ্যস্ত হয়ে পড়ে আর স্বদেশের অপেক্ষাকৃত মধ্যযুগীয় জীবনপ্রণালীর মধ্যে ফিরে আসতে দ্বিধা বোধ করছেন। একথা হয়ত খানিকটা সত্য হ'তেও পারে। কিন্তু আসল কারণ সেটি যে নয় তার অনেক প্রমাণ আমরা জানি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এঁরা জানেন যে, দেশে ফিরে এলে সরকারের বিশেষ অনুগ্রহপুষ্ট কিন্তু সত্যকার অনেক নিকৃষ্ট মানের বিদেশী কুশলী বা তথাকথিত কুশলীদের আজ্ঞাধীন হয়ে এঁদের চলতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে এমনও ঘটেছে যে, ভারতীয় কুশলী বিদেশে তাঁরই নিজের আজ্ঞাধীন বিদেশী কর্ম্মচারীর অধীনে স্বদেশে ফিরে এসে চাকরি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। স্বভাবতঃই এসকল ভারতীয়েরা পুনর্ব্বার বিদেশে ফিরে যাবার সুযোগ খুঁজে আবার দেশ থেকে পলায়ন করে থাকেন।

আমরা মনে করি এ বিষয়ে একটা বিস্তৃত বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান অবিলম্বে হওয়া প্রয়োজন। যে-সকল ক্ষেত্রে উপযুক্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ভারতীয় কুশলীর অভাব রয়েছে, শুধু সে-সকল ক্ষেত্রেই—যত মূল্যই দিতে হউক না কেন তা স্বীকার করে—নির্দ্দিষ্ট কিন্তু পরিমিত সময়ের জন্য বিদেশী কুশলী আমদানী করা উচিত। কিন্তু এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন যে, যে বিশিষ্ট কৌশলের অভাব পূরণের জন্য এঁদের আমদানী করা হচ্ছে সে-বিষয়ে এঁদের সত্যকার জ্ঞান ও প্রয়োগ কৌশলের অভিজ্ঞতা আছে। এই প্রসঙ্গে আমাদের জানা একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কোন একটি বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান তাঁদের কাঁচামালের খনিগুলির একটিতে যন্ত্রীকরণের (mechanization) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁদের অধিকারভুক্ত বিভিন্ন খনির কোনটিতে [illegible] মজুত ছিল

তার একটা হিসাব করবার জন্য কয়েকটি বিদেশী আমদানী করা হয়। বৎসরাধিক কাল ধরে এদেশে মোটা বেতন ও অন্যান্য সুবিধা উপভোগ করবার পর দেখা যায় যে, উদ্দিষ্ট কাজের কিছুই এঁরা সম্পন্ন করতে পারেন নাই। তখন জানা গেল যে, এই কাজের জন্য উপযুক্ত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা কোনটাই এঁদের নাই। কিন্তু ইতিমধ্যে এঁরা যে কেবল মোটা বেতন ও আনুষঙ্গিক সুবিধা উপভোগ করেছেন তাই নয়, দেশের রাজস্বও কিছুটা পরিমাণে বঞ্চিত হয়েছে এবং খানিকটা পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রাও এঁদের জন্য বিদেশে চলে গিয়েছে। এরকম ঘটনা যে আরও ঘটে নাই বা এখনও ঘটছে না সেরূপ মনে করবার মত নিশ্চিত তথ্য জানা নেই। বরং আমাদের জানা আরও উদাহরণ আছে, যে সকল ক্ষেত্রে ঠিক উপরোক্ত ঘটনার মতন এতটা না হ'লেও প্রায় অনুরূপ ব্যবস্থা অন্যান্য ক্ষেত্রে আজও চলে আসছে। আমরা মনে করি বিদেশী কুশলী আমদানী করবার সময় প্রতিটি ক্ষেত্রে গুণাগুণ, পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা এবং নির্দিষ্ট শিল্পে এঁদের কৌশলের সহায়তা কতটা এবং কতদিনের জন্য প্রয়োজন এ-সকল বিশদভাবে বিচার করে তবেই ট্যাক্স অব্যাহতি বা বিদেশে অর্থপ্রেরণের সুবিধাগুলির সর্ত্ত স্বীকার করা উচিত। এবং প্রতিক্ষেত্রেই উপযুক্ত ভারতীয় কুশলী পাওয়া গেলে এ-সকল সর্ত্ত সরাসরি অস্বীকার করা প্রয়োজন। এবিষয়ে সরকারের এবং বিশেষ করে অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি অবিলম্বে আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।

ব্যবসায়ী মহলে বাজেটের প্রতিক্রিয়া

ব্যবসায়ী মহলে এ বৎসরের নূতন বাজেটের প্রতিক্রিয়া আশানুরূপ উৎসাহের সৃষ্টি যে করে নাই সেটি খুবই স্পষ্ট। ব্যবসায়ীগোষ্ঠী মনে করেন যে, যেটুকু সুবিধা ট্যাক্স সম্বন্ধে তাঁদের দেবার প্রস্তাব করা হয়েছে তার ফলে পুঁজির বাজারে উপযুক্ত পরিমাণ ভরসা (Confidence) বা শক্তি সঞ্চার করা সম্ভব হবে না। ব্যক্তিগত আয়করের ক্ষেত্রে ট্যাক্স মকুবের পরিমাণ খানিকটা বেশী অবশ্যই হয়েছে কিন্তু তার ফলে যতটুকু সঞ্চয়বৃদ্ধি হবার সম্ভাবনা ছিল তার অনেকটাই এন্যুইটি ডিপোজিটের ব্যবস্থা পূর্ব্ববৎ চালু থাকবার

মূল্যবৃদ্ধিতে খেয়ে যাবে। ব্যক্তিগত সঞ্চয় থেকে সরকার বৎসরে ৫৫-৬০ কোটি টাকার মতন বাজেয়াপ্ত করে নিচ্ছেন। এই সঞ্চয় থেকেই সাধারণতঃ বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে লগ্নীর পুঁজি সংগৃহীত হ'ত। এন্যুইটি ডিপোজিটের অর্থ যখন কিস্তি হিসাবে সরকার প্রত্যর্পণ করবেন তখন অবশ্য সেটুকু লগ্নীতে নিয়োজিত করা সম্ভব কিন্তু আগামী এক বৎসরের মধ্যে এই খাতে কোন অর্থ পাবার সম্ভাবনা নাই। তা ছাড়া কিস্তির টাকার খানিকটা অন্ততঃ যে ভোগব্যয়ে খরচ হয়ে যাবে সে-বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ নেই।

অর্থমন্ত্রী—ব্যবসায়ীগোষ্ঠীরা বলেন—একদিকে স্বীকার করছেন যে, সঞ্চয় ও লগ্নীর উৎসাহ বৃদ্ধি করা এবং ব্যবসায় সংগঠনগুলির যথেষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়া উন্নয়নের জন্য একান্ত প্রয়োজন এবং অন্যদিকে মুনাফাকর চালু রেখে এই উৎসাহ সঞ্চার দমন করবার আয়োজন করেছেন। অন্যদিকে ব্যাঙ্ক রেট ৬%-এ বাড়িয়ে দিয়ে ব্যাঙ্ক আমানতের সুদের হার আনুপাতিক পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়েছেন। কোম্পানীর প্রেফারেন্স শেয়ারে লগ্নী করলে ৭% থেকে ৮% মুনাফা পাওয়া যায়, ডিবেঞ্চারে ৬—৭%। ব্যাঙ্কে আমানতী সুদের হার এখন ৭% থেকে ৯%-এ উঠেছে। এই অবস্থায় লগ্নীকারক কেন কোম্পানীর শেয়ারে তার অর্থ লগ্নী করবার ঝুঁকি নিতে চাইবে? প্রেফারেন্স শেয়ার বা ডিবেঞ্চারের উপর কোন কর ধার্য্য করা নেই, কিন্তু নূতন কোম্পানী ব্যতীত সাধারণ শেয়ারের উপর ৬% মুনাফা লাভ হ'লেই মুনাফাকর দিতে হয়। এই করটি মকুব করে দিলে তার ফলে মূল্যবৃদ্ধিতে সহায়তা করবে অর্থমন্ত্রীর এরূপ মনে করবারও কোন সঙ্গত কারণ নেই। মুনাফাকরটি তুলে দিলে এর দরুন রাজস্ব ঘাটতি আন্দাজ বার্ষিক ১০ কোটি টাকার মতন হবার কথা। এই যৎসামান্য অর্থের দ্বারা মূল্যমানের ওপর চাপ সৃষ্টির আশঙ্কা অমূলক। অন্য পক্ষে এই করটি প্রত্যাহার করলে পুঁজি বাজারে একটা যে আগ্রহের সৃষ্টি হ'ত সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বরং লগ্নীর স্বপক্ষে এই নূতন আগ্রহ মূল্যমানে খানিকটা পরিমাণে সংযম প্রভাবিত করবার আশাই ছিল বেশী। বর্ত্তমান অবস্থায়, ব্যবসায়ী মহল মনে করেন, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি

পুঁজির প্রয়োজন মেটাবার চেষ্টা করবেন বলে আশঙ্কা করা যায়। বর্ত্তমানের চড়া সুদের বাজারে কমপক্ষে ১০% মুনাফার প্রতিশ্রুতি না দিলে প্রেফারেন্স শেয়ার দিয়ে পুঁজি সংগ্রহ সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। এত উচ্চহারে মুনাফা দেবার প্রতিশ্রুতির বোঝা শিল্পব্যবসায়ের ওপর বড়ই ভারী হয়ে পড়বে। তা ছাড়া একুইটি শেয়ার-ক্রেতাদের প্রতি এর দ্বারা অবিচার করা হবে। অন্য পক্ষে প্রেফারেন্স মুনাফা (dividend) ব্যবসায়ের মুনাফা থেকে রাজস্বের দায় মিটিয়ে তবে দিতে হয়। ডিবেঞ্চারের ওপর সুদ বা ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য অর্থপ্রতিষ্ঠান থেকে ধার-করা পুঁজির ওপর সুদ ব্যবসায়ের মুনাফা থেকে বাদ দিয়ে তবে ট্যাক্স ধার্য্য করা হয়। এ অবস্থায় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি যে অধিকতর পরিমাণে ডিবেঞ্চার ও অন্য ঋণের দ্বারা তাঁদের পুঁজির প্রয়োজন মেটাবার চেষ্টা করবেন এ বিষয়ে সন্দেহ কি? এ ভাবে একদিকে যেমন একুইটি পুঁজির ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান-গুলির ওপর সংযমের প্রভাব নষ্ট হবার আশঙ্কা, অন্যদিকে দক্ষতা ও উচ্চহারে উৎপাদনশীলতাও ব্যাহত হবার আশঙ্কা অমূলক নয়। তা ছাড়া এইরূপ ছক অনুসরণ করে যদি দেশের শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি প্রসার লাভ করতে থাকে তবে একটা সক্রিয় (dynamic) গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা (democratic society) গড়ে ওঠবার পথেও অলঙ্ঘনীয় বাধা সৃষ্টি হবে। কেননা এই ভাবে মুষ্টিমেয় সংখ্যক পুঁজিপতিদের হাতে আরও বেশী করে আর্থিক শক্তি সংহতি সহজ হয়ে উঠবে।

এই ভাবেই পুঁজিবৃদ্ধি (capital gains) ট্যাক্স ও বোনাস শেয়ারের উপর ট্যাক্স উন্নয়নবিরোধী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে চলেছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, বর্ত্তমান চড়া সুদের বাজারের অনিবার্য্য প্রতিক্রিয়া হিসাবেই বর্ত্তমানে একুইটি শেয়ারের বাজার এতটা মন্দা হয়ে পড়েছে। তাঁরা মনে করেন যে, বর্ত্তমানের উঁচু ব্যাঙ্ক রেট এবং তজ্জনিত উঁচু সুদের হারের ফলে একুইটির বাজারে মন্দাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই কারণে তাঁরা প্রস্তাব করেন যে, বর্ত্তমান অর্থনীতির (monetary policy) অবিলম্বে সংশোধন সাধন প্রয়োজন। সঞ্চয়বৃদ্ধি এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যয় প্রতিরোধে উচ্চ অর্থমূল্যের যথার্থ ভূমিকা সম্বন্ধে এঁরা (dear money policy) পরিপূরক হিসাবে একুইটি শেয়ারের মুনাফাবৃদ্ধির একান্ত প্রয়োজনীয়তার কোন সঙ্গত কারণ নেই। অন্যান্য দেশে উচ্চ অর্থমূল্য অবস্থা সত্ত্বেও এবং একুইটি শেয়ারের মুনাফা অনুপাতে বৃদ্ধি না পাওয়া সত্ত্বেও সে সব শেয়ারগুলির বাজার মূল্যে মন্দা ঘটে নি দেখা গেছে। জাপান, ইংলণ্ড, পশ্চিম জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশে আমাদের দেশের তুলনায় অনেক বেশী বার এবং অনেক উচ্চতর ব্যাঙ্ক রেট প্রবর্ত্তিত হয়েছে, কিন্তু তার ফলে আমাদের দেশের মতন একুইটি শেয়ারের মূল্যে মন্দা ঘটে নি। অনেক ক্ষেত্রেই উঁচু হারের সুদ ও নিম্নহারে একুইটি শেয়ারের ডিভিডেণ্ডের সহাবস্থান সহজ ও স্বাভাবিক দেখা গেছে। এর প্রধান কারণ সম্ভবতঃ ঐ সকল দেশে ব্যবসায়ের উপর রাজস্বের চাপ আমাদের দেশের তুলনায় অনেক হাল্কা। তা ছাড়া ঐ সব দেশের অর্থনীতি একুইটি মূল্যের পরিপন্থী নয়। লগ্নীকারকরা সাধারণতঃ নির্দ্দিষ্ট মুনাফায় লগ্নীর চেয়ে একুইটিই বেশী পছন্দ করেন ভবিষ্যতে উচ্চতর মুনাফা ও পুঁজিবৃদ্ধির আশায়। কিন্তু এই আশা যদি নষ্ট করে দেওয়া হয় তবে একুইটির প্রতি টানও অনুপাতে কমে যায়। আমাদের দেশে একইটি শেয়ারের ডিভিডেণ্ড নির্দ্দিষ্ট হারের চেয়ে বেশী হ'লে তার উপর ট্যাক্স দিতে হয়; যখন মুনাফার একটা অংশ সঞ্চয় করে পুঁজির সঙ্গে যুক্ত করা হয়, তখন সেই অতিরিক্ত পুঁজির উপরেও ট্যাক্স দিতে হয়। তা ছাড়া যে-সকল অংশীদাররা এর ফলে বোনাস শেয়ার পেয়ে থাকেন তখন এই পুঁজিবৃদ্ধির উপরও তাঁদের আবার ট্যাক্স দিতে হয়, যদিও এই পুঁজিবৃদ্ধি আক্ষরিক মাত্র, নগদ তাঁদের হাতে পৌঁছায় না। এই ভাবে বারংবার (multiple) ট্যাক্সের চাপের দরুনই একুইটির বাজার আজ এত বেশী মন্দা হয়ে পড়েছে; উঁচু ব্যাঙ্ক রেটের দরুন এটি ঘটে নি।

নূতন প্রস্তাবিত এবং জটিল ট্যাক্স ক্রেডিট ব্যবস্থার দ্বারা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে যে খানিকটা ট্যাক্স থেকে রেহাই দেবার আয়োজন করা হয়েছে এটিও একুইটির বাজারে আরও মন্দা ঘটাবে আশঙ্কা হয়। কেননা এই ক্রেডিটের দ্বারা কেবলমাত্র ঋণ পরিশোধ বা ডিবেঞ্চারের ধার শোধ করা মাত্র চলবে। ডিভিডেণ্ডের হার বৃদ্ধি করবার জন্য এই ক্রেডিট ব্যবহার করা চলবে না। এর ফলে কোম্পানী-

— শীরদ্ধ পুঁজির।

প্রয়োজন মেটাবার চেষ্টা করবেন বলে আশঙ্কা হয়; কেননা এ-সব কোম্পানীর কোন ঋণ নেই তাঁরা এই ক্রেডিটের কোন সুযোগ পাবেন না। তর্কের খাতিরে অবশ্য বলা যেতে পারে যে, কোম্পানীর ঋণ কমলে অনুপাতে একুইটি শেয়ারের মূল্যও বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু একুইটি শেয়ারের আয়ক্ষমতা যতক্ষণ নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা হবে, ততক্ষণ স্বভাবতঃই এর মূল্যও মন্দা চলতেই থাকবে।

উপরোক্ত কারণগুলির জন্য ব্যবসায়ী মহল মনে করেন যে, বর্তমান বাজেটে ব্যবসায়ের ওপর ট্যাক্স মকুব করবার যে-সকল প্রস্তাবগুলি করা হয়েছে সেগুলি বাস্তবিক পক্ষে বর্তমানের প্রচণ্ড করভার কিছুমাত্র লাঘব করতে সক্ষম হবে না। দেশের ভবিষ্যৎ আর্থিক প্রগতি ও বৃদ্ধির কল্যাণে তাঁরা মনে করেন ব্যবসায়ের প্রতি আরও সুবিচার হওয়া প্রয়োজন ছিল। একুইটি শেয়ারের বাজারে নূতন আগ্রহ সৃষ্টি হ'লে সঞ্চয় বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক হ'ত এবং তা হ'লে একদিকে যেমন পুঁজি সৃষ্টি দ্রুত ও বর্দ্ধিত পরিমাণে হ'ত তেমনি অন্যদিকে ভোগসঙ্কোচ অনিবার্য্যভাবে ঘটত এবং তার ফলে খানিকটা মূল্যবৃদ্ধির গতি ব্যাহত হওয়া সম্ভব হ'ত।

বস্তুতঃ দেশের ব্যবসায়ী মহল মোটামুটি গত বারো বৎসরের পরিকল্পনানুযায়ী আর্থিক উন্নয়নের সবচেয়ে মোটা অংশ আজ পর্য্যন্ত আত্মসাৎ করেছেন। উন্নয়ন প্রয়োগ করলে দেশে সম্পদ্‌ ও আর্থিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের যেটুকু তথ্যানুকূল প্রমাণ আজ পর্য্যন্ত পাওয়া গেছে তা থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী যে অভিযোগ করেছেন যে দেশের বৃহত্তর কল্যাণের প্রয়োজনে তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা আশানুরূপ পরিমাণে পাওয়া যায় নাই, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। অবশ্য সরকারী নীতির জটিলতা, তার প্রয়োগের দক্ষতার অভাব এবং আর্থিক নীতির (fiscal and monetary policies) অসার্থকতাও যে সমধিক পরিমাণে বর্তমান পরিস্থিতির জন্য বহুলাংশে দায়ী, সে কথাও অস্বীকার করা চলে না। বর্তমান বাজেটে এই নীতির সংশোধনের একটা প্রচেষ্টার আভাস দেখতে পাওয়া গেছে, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। ব্যবসায়ী মহল অবশ্য খুসী হন নি; না হবার কারণও যে নেই একথা অস্বীকার করা চলে না। তবে সবাই সমভাবে খুসী হ'তে পারে দেশের বর্তমান অবস্থায় তেমন একটি বাজেট রচনা যে সম্পূর্ণ অসম্ভব, সে-কথা স্পষ্ট করে বোঝা দরকার। দেশের কল্যাণে সর্বপ্রথম এবং আশু প্রয়োজন এখন মূল্যবৃদ্ধির ধারাটিকে সংযত করবার প্রয়াস করা। এই বস্তুটি যে কেবলমাত্র সাধারণের জীবনধারণ দুঃসহ করে তুলেছে তাই নয়, দেশের সামগ্রিক আর্থিক উন্নয়নও এর কারণে ব্যাহত হয়ে চলেছে। অতএব রাজস্বের কাঠামো থেকে সুরু করে যা-কিছু মূল্যবৃদ্ধির সহায়ক ছিল সব কিছু সম্বন্ধেই অচিরে সার্থক প্রয়োগ যে একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই।

নূতন বাজেটের আশা

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, যদিও উচ্চ হারে রাজস্বের চাপ সাধারণতঃ মূল্যবৃদ্ধি নিবারক বলে মানা হয়ে থাকে, কিন্তু এই উচ্চ হারের রাজস্বের কাঠামোটি যদি প্রধানতঃ পরোক্ষ ট্যাক্স দ্বারা সমধিক পরিমাণে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে তবে এই প্রচণ্ড ট্যাক্সের চাপও মূল্যবৃদ্ধির সহায়ক হয়ে পড়ে। এর চিকিৎসা সাধারণতঃ দুই প্রকারের হয়ে থাকে—একদিকে পরোক্ষ ট্যাক্সের তুলনায় প্রত্যক্ষ ট্যাক্সের পরিমাণ বাড়ান, অন্যদিকে সরকারী ও বেসরকারী অপ্রয়োজনীয় ও উন্নয়ন নিরপেক্ষ (non-developmental) ব্যয়সঙ্কোচ করা। সরকারী ব্যয়সঙ্কোচের খানিকটা প্রয়াস গত বৎসর থেকেই সুরু হয়েছে। তবে তার একটা সীমা আছে। উন্নয়ন ব্যয় বর্তমান অবস্থায় সঙ্কোচ করা সম্ভব নয়। সরকারী ভোগব্যয়ের মধ্যেও প্রতিরক্ষা ব্যয়বৃদ্ধি আপাততঃ সঙ্কোচ করা একেবারেই অসম্ভব। এই দুই দিক বাদে অন্যদিকে ব্যয়সঙ্কোচের চেষ্টা খানিকটা সুরু হয়েছে। আশা করা যায় বর্তমান বাজেট বৎসরে এদিকে অধিকতর নজর দেওয়া হবে। ব্যক্তিগত ভোগব্যয় সঙ্কোচ করা একমাত্র মূল্যবৃদ্ধি সংযত করতে পারলেই সম্ভব। বর্তমান বাজেটের প্রস্তাবগুলির দ্বারা এদিকে খানিকটা সুফল পাওয়া যেতে সুরু হবে আশা করা যায়।

তা হ'লেই সঞ্চয়ও বৃদ্ধি পাবে এবং পুঁজি-সৃষ্টির গতিও দ্রুততর হবে। দেশের রাজস্বের বর্তমান কাঠামোর পরিধির মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে কর্পোরেট ব্যবসায় ক্ষেত্রে রাজস্বের চাপ হাল্কা করা সম্ভব নয়। তবু অর্থমন্ত্রী উৎপাদন-সহায়ক কতকগুলি ক্ষেত্রে এই ভার খানিকটা লাঘব করবার আয়োজন করেছেন। এর বেশী যে আপাততঃ করা সম্ভব নয় সেটা বোঝা প্রয়োজন। মোটামুটি একথা স্বীকার করা যায় যে, বর্তমান বাজেটে অর্থমন্ত্রী একটা নূতন ও বলিষ্ঠ চিন্তার পরিচয় দিতে সুরু করেছেন। অনিবার্য্য কারণে কতকগুলি ক্ষেত্রে—যেমন আবগারী শুল্কের ক্ষেত্রে—যতটা অগ্রসর হবার প্রয়োজন আছে এখনই ততটা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু তার জন্য তাঁকে ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী করা চলে না। দেশের অর্থক্ষেত্রে যে-সকল গভীর লক্ষণ আজ প্রকট হয়ে উঠেছে, সেগুলির অধিকাংশই উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর স্কন্ধে এসে চেপেছে। রোগের মূল চিকিৎসা সুরু করবার পূর্বে তার বিকারের লক্ষণগুলিকে সামলিয়ে নিয়ে আপাততঃ প্রাণরক্ষার তাগিদ অনেক বেশী জরুরী হয়ে পড়েছে। বর্তমান বাজেটে তিনি সেই চেষ্টাই করেছেন বলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এর ফলে এবং আপাতঃ-সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে পারলে মূল মূল রোগের চিকিৎসার আয়োজন সুরু করা সম্ভব হবে। বর্তমান বৎসরের বাজেট সেই আশারই সূচনা করে বলে মনে হয়।

(সমাপ্ত)

কংগ্রেস স্মৃতি

শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল

দ্বাত্রিংশ অধিবেশন—কলিকাতা—১৯১৭

[এক]

গত বৎসর লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস কংগ্রেস-লীগ স্কীম গৃহীত হওয়ার ফলে ১৯১৭ সালে ভারতের সর্বত্র উক্ত স্কীম অনুসারে স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্তনের জন্য আন্দোলন সুরু হয়। অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্না অক্লান্তকর্মী শ্রীমতী অ্যানি বেশান্তের নেতৃত্বে হোমরুল আন্দোলন খুব জোরদার হয়ে ওঠে। সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপও বৃদ্ধি পেতে লাগল। ১৯১৭ সালের প্রারম্ভেই লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা রুজু হয় এবং এর ফলে বহু দেশকর্মীর সাজা হয়। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছিল। ভারত গভর্ণমেন্ট ভারতরক্ষা আইন পাশ করে স্পেশাল ট্রাইবুনাল গঠনের ব্যবস্থা করলেন। ভারতরক্ষা আইনের বিরুদ্ধে শ্রীমতী বেশান্ত প্রবল আন্দোলন গড়ে তুললেন এবং তাঁর সম্পাদিত, নিউ ইণ্ডিয়া" পত্রিকায় এই আইনের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে লেখনী পরিচালনা করতে লাগলেন। ফলে মাদ্রাজ গভর্ণমেন্ট "নিউ ইণ্ডিয়ার" জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করল। এই সময়েই আবার বেহারের চাম্পারন জেলায় গান্ধীজীর নেতৃত্বে নীলচাষীদের আন্দোলন সুরু হ'ল। পাঞ্জাবে হোমরুল আন্দোলন যাতে প্রসার লাভ করতে না পারে তজ্জন্য তথাকার ছোটলাট স্যর মাইকেল ওডোয়ার শ্রীযুক্ত লোকমান্য তিলক ও শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র মহাশয়দ্বয়ের উপর পাঞ্জাবে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন। বাংলা দেশে শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ, শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্তী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সক্রিয়ভাবে হোমরুল আন্দোলনে যোগ দিলেন। গভর্ণমেন্ট মনে করেন যে, হোমরুল আন্দোলনের প্রাণস্বরূপ শ্রীমতী বেশান্তকে যদি তাঁর কর্মক্ষেত্র হ'তে অপসারিত করা হয় তা হ'লে এই আন্দোলনের কণ্ঠ রোধ হবে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে গভর্ণমেন্ট শ্রীমতী বেশান্তকে অন্তরীণ করতে মনস্থ করল। অন্তরীণ হবেন বুঝতে পেরে শ্রীমতী বেশান্ত জুন মাসে একটি বাণী দ্বারা দেশবাসীকে আন্দোলন চালিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করলেন। এর কিছুদিন পরেই মাদ্রাজের গভর্ণর লর্ড পেণ্টল্যাণ্ডের আদেশে শ্রীমতী বেশান্তকে তাঁর সহকর্মী শ্রীযুক্ত আরেনডেল ও শ্রীযুক্ত ওয়াডিয়া সহ অন্তরীণ করা হ'ল। গভর্ণমেন্ট আশা করেছিল যে, এর ফলে হোমরুল আন্দোলন নিস্তেজ হবে কিন্তু ফল অন্যরূপ হ'ল।

ভারতবর্ষের সর্বত্র হোমরুল আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল। দলে দলে দেশের লোক হোমরুল লীগের সভ্য হ'তে লাগল এবং সর্বত্র সভাসমিতি আহ্বান ক'রে হোমরুলের দাবি জানাতে লাগল। পাঞ্জাব গভর্ণমেন্ট এই সকল সভার বিবরণ সংবাদপত্রে ছাপা নিষেধাজ্ঞা দ্বারা বন্ধ ক'রে দিল, ফলে দেশের সর্বত্র অশান্তির সৃষ্টি হ'ল।

দেশের প্রবল জনমত উপেক্ষা করতে না পেরে গত লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের আবেদনানুসারে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট আগষ্ট মাসে একটি ঘোষণা দ্বারা ভারতবর্ষে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্তন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল এবং জানাল যে ক্রমে ক্রমে দেশে স্বায়ত্ত-শাসন চালু করা হবে এবং এ সম্বন্ধে ভারতের জনমত জানার জন্ত ভারতসচিব মন্টেগু সাহেব ভারতবর্ষে আগমন করলেন।

এ বৎসর কংগ্রেসের অধিবেশন কলিকাতায় হবে। অন্তরীত অ্যানি বেশান্ত সমগ্র জাতির হৃদয়ে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন। দেশবাসী সকলের প্রাণে ইচ্ছা যে, এবারকার কংগ্রেসের সভানেত্রী—অ্যানি বেশান্ত নির্বাচিত হন। তখনকার দিনে প্রাদেশিক কমিটিসমূহের সুপারিশ বিবেচনা ক'রে অভ্যর্থনা সমিতি চূড়ান্তভাবে সভাপতি নির্বাচন করত। অধিকাংশ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি শ্রীমতী বেশান্তের নাম সভানেত্রী পদে সুপারিশ করে, কিন্তু পরম আশ্চর্যের বিষয়, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি শ্রীমতী বেশান্তকে কংগ্রেসের সভানেত্রী নির্বাচন সমীচীন মনে করল না। উক্ত কংগ্রেস কমিটির কর্ণধার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথের মতে ইহাতে গভর্ণমেন্টের বিরাগভাজন হ'তে হবে এবং তাতে কংগ্রেসের উদ্দেশ্যের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা হবে। কেউ কেউ বললেন যে অন্তরীত ব্যক্তিকে সভাপতি নির্বাচন করার মধ্যে কোন যৌক্তিকতা নেই, কারণ তিনি ত সভার কার্য পরিচালনা করতে পারবেন না।

কলিকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনের জন্ত যে অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয় তার সভাপতি নির্বাচিত হন শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ উকিল রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর। যেদিন কংগ্রেসের সভাপতি চূড়ান্ত নির্বাচনের জন্ত অভ্যর্থনা সমিতির সভা আহূত হয়, তার পূর্বদিন সুরেন্দ্রনাথের বিরোধী পক্ষ বহু সংখ্যক ব্যক্তিকে অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য ক'রে নেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভায় এই সকল নূতন সভ্যগণের বৈধতা সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপিত হয়ে উভয় পক্ষ-মধ্যে প্রবল বাদ-বিতণ্ডা আরম্ভ হয়। এর ফলে সভার কার্য পরিচালনা করা অসম্ভব হওয়ায় বৈকুণ্ঠবাবু সভার কার্য স্থগিত রাখলেন এবং সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ মডারেট নেতাগণ সভা-গৃহ পরিত্যাগ করলেন। এতে হতোদ্যম না হয়ে অধিকাংশ সভ্য অমৃতবাজার পত্রিকার সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক ও দেশসেবক শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষকে সভাপতির পদে বরণ ক'রে সভার কার্য পরিচালনা করলেন। এই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীমতী অ্যানি বেশান্ত কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হ'লেন এবং রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুরের স্থলে কবি-সম্রাট স্যর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হলেন। এর ফলে উভয় দলের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ চরমে উঠল। নিরপেক্ষ কয়েকজন গণ্যমান্ত ব্যক্তি উভয় দলের মধ্যে একটা আপোষের চেষ্টা করতে লাগলেন। এতে কোন ফল না হওয়ায় কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব জজ স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয় (ইনি কলিকাতা হাইকোর্টে সর্বপ্রথম ভারতীয় অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি পদে নিযুক্ত হন। তখনকার ভারত-বর্ষের কোন হাইকোর্টে স্থায়ী প্রধান বিচারপতির পদে কোন ভারতীয়কে নিযুক্ত করা হ'ত না। একমাত্র ব্যতিক্রম লাহোর হাইকোর্টে স্যর সাদিলালের নিয়োগ।) মফঃস্বলের নেতাদের আহ্বান ক'রে তাঁর বাড়ীতে একটি সভার আয়োজন করলেন। স্থির হ'ল যে, উভয় পক্ষই মফঃস্বলের নেতাদের সিদ্ধান্ত মেনে নেবে। ফলে একটা আপোষ হ'ল। বৈকুণ্ঠবাবু ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির পদ ত্যাগ করলেন, পরে সর্বসম্মতিক্রমে বৈকুণ্ঠবাবুকে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নিযুক্ত করা হ'ল এবং সম্মিলিত অভ্যর্থনা সমিতির সভায় শ্রীমতী অ্যানি বেশান্ত কংগ্রেসের সভা-নেত্রী নির্বাচিত হ'লেন।

ইতিমধ্যে দেশব্যাপী আন্দোলনের ফলে সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীমতী বেশান্ত তাঁর সহকর্মী আরেনডেল ও ওয়াডিয়া মহাশয়দ্বয়সহ মুক্তিলাভ করলেন।

এই রকম পরিস্থিতিতে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ল।

আমি রাজসাহী জেলার পক্ষ হ'তে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরী, সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও নাটোরের মহারাজকুমার সহ অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য হই এবং রাজসাহী জেলা কংগ্রেস কমিটির প্রতিনিধিরূপে কংগ্রেসে যোগদান করি।

অধিবেশনের পূর্বদিন ২৫শে ডিসেম্বর সভানেত্রী মহোদয়া তাঁর সহকর্মীগণ ও মাদ্রাজের অন্যান্য প্রতিনিধিগণ সহ কলিকাতায় পৌঁছলেন। তাঁকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা করে মহাসমারোহে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট বাসা সার্কুলার রোডস্থিত কবিরাজ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের সুরম্য ভবনে নিয়ে যাওয়া হ'ল।

[দুই]

পরদিন ২৬শে ডিসেম্বর বেলা ২ টার সময় কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হ'ল।

ঋগ্বেদের একটি শ্লোকের আবৃত্তি দ্বারা কার্য সুরু হ'ল। এর পর শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশের ভগ্নী কিন্নরকণ্ঠী শ্রীমতী অমলা দাশের পরিচালনায় শুভ্র বসন-পরিহিতা একদল মহিলা কর্তৃক "বন্দে মাতরম" সঙ্গীত গীত হ'ল।

তৎপর শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান হ'তে প্রাপ্ত শুভেচ্ছা-সূচক-টেলিগ্রাম পাঠ করলেন।

এর পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয় স্যর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে তাঁর উদ্বোধনী প্রার্থনা করতে আহ্বান করলেন। রবীন্দ্রনাথ যখন প্রার্থনা করতে দণ্ডায়মান হ'লেন তখন সমবেত দর্শকমণ্ডলী তাঁর অভ্যর্থনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। কবি যখন সুমধুর কণ্ঠে ইংরাজিতে লিখিত প্রার্থনামূলক কবিতা পাঠ করলেন তখন সকলে মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁর আবৃত্তি শুনল (১)

কবির আসন গ্রহণের পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয় তাঁর অভিভাষণ পাঠ করলেন। তিনি দেশের রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করে স্বায়ত্ত-শাসন সম্বন্ধে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের ঘোষণার কথা উল্লেখ ক'রে বললেন যে, আমাদের স্বরাজের স্বপ্ন সফল হ'তে চলেছে। তিনি আশা করেন যে, ভারতসচিব মিঃ মণ্টেগু, বড় লাট লর্ড চেলমসফোর্ড ও তাঁর কাউন্সিলের সদস্য শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও অন্যান্য সদস্যের সাহায্যে স্বায়ত্ত-শাসনের এমন একটা পরিকল্পনা করবেন যাতে আমরা সকলেই সন্তুষ্ট হব। পরিশেষে তিনি বাংলার পক্ষ থেকে প্রতিনিধিবর্গকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অতঃপর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আহ্বান করলেন সভানেত্রী নির্বাচনের প্রস্তাব উপস্থিত করতে। বিপুল হর্ষধ্বনি দ্বারা অভ্যর্থিত হয়ে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় শ্রীমতী বেশান্তের বিশ্বব্যাপী নাম ও খ্যাতির উল্লেখ ক'রে তিনি যে পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ বক্তা তার উল্লেখ করলেন এবং তাঁর হোমরূলের আন্দোলন দ্বারা তিনি যে দেশে স্বায়ত্ত-শাসনের পথ প্রশস্ত করেছেন তা বলে তাঁকে এই কংগ্রেসের সভানেত্রী নির্বাচনের প্রস্তাব করলেন।

মাদ্রাজ হাইকোর্টের উকিল দেওয়ান বাহাদুর গোবিন্দরাঘব আইয়ার, বোম্বাইয়ের শ্রীযুক্ত এস্. আর. বোমানজী (প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী), পাঞ্জাবের লালা হরকিষণ লাল (এঁকে তৎকালে 'Wizard of finance' বলা হ'ত), বেহারের শ্রীযুক্ত হাসান ইমাম (ব্যারিষ্টার, কলিকাতা হাইকোর্টের জজ ছিলেন, পরে পাটনা হাইকোর্ট স্থাপিত হ'লে জজিয়তি পদ ত্যাগ করে পাটনা আইন ব্যবসা সুরু করেন। ইনি এবং এঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর স্যর আলি ইমাম তৎকালে বিশিষ্ট প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন) ও লক্ষ্ণৌয়ের এডভোকেট মাননীয় শ্রীযুক্ত সমিউল্লা বেগ সুরেন্দ্রনাথের প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

সভানেত্রী নির্বাচিত হয়ে শ্রীমতী অ্যানি বেশান্ত

---

*Thou hast given us to live,
Let us uphold this honour with all our strength and will
For Thy glory rests upon the glory that we see,
Therefore in Thy name we oppose the power that would plant its banner upon our soul
Let us know that Thy light grows dim in the heart that bears its insult of bondage,
That the life, when it becomes feeble, timidly yields thy throne to untruth,
For weaknessa is the traitor whi betrays our soul,
Let this be our prayer to Thee—
Give us power to resist pleasure where it enslaves us,,
To lift our sorrow up to Thee as the summer holds its midday Sun.
Make us strong that our worship may flower in love and bear fruit in work.
Make us strong that we may not insult the weak and the fallen.
That we may hold our love high where all things around us are wooing the dust.
They fight and kill for self-love, giving it Thy name.
They fght for hunger that thrives on brother flesh.
They fight against thine anger and die.

বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন। অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই মহীয়সী মহিলা যিনি তাঁর পাণ্ডিত্যে বাগ্মিতায় ও লিপি-কুশলতায় বিশ্ব-বিশ্রুত হয়েছিলেন, তিনি ভারতবর্ষকেই তাঁর মাতৃভূমি জ্ঞানে আমরণ এই দেশের সেবা করে গেছেন। তাঁর সৌম্য ধীর গম্ভীর মূর্তি যাঁরা দেখেছেন এবং তাঁর অনবদ্য বক্তৃতা যাঁরা শুনেছেন তাঁরা কখনই তাঁকে ভুলতে পারবেন না।

নির্বাচনের পর সভানেত্রী মহোদয়া তাঁর সুচিন্তিত ও সুলিখিত দীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করলেন। তাঁর অভিভাষণে তিনি যুদ্ধ ও সামরিক ব্যয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদীর প্রয়োজনে ভারতীয় সৈন্যগণের বিভিন্ন দেশে প্রেরণ, এশিয়ার নব জাগরণ, ভারতবর্ষের হোমরুলের দাবি প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ক'রে বললেন যে, ভারতবর্ষের নিকট ১৯১৭ সাল একটি স্মরণীয় বৎসর, কারণ এই বৎসর ২০শে আগষ্ট তারিখে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট একটি ঘোষণা দ্বারা মূলতঃ গত বৎসরের কংগ্রেসের দাবি (কংগ্রেস-লীগ স্কীম) মেনে নিয়েছেন এবং ভারতসচিব মিঃ মণ্টেগু ইংলণ্ডের কতিপয় নেতা-সহ এখানকার বিভিন্ন দলের মত জানতে এসেছেন। তিনি বর্তমান গভর্ণমেণ্টের আমলা-তান্ত্রিক (bureaucratic) শাসন-নীতির বিরুদ্ধবাদীগণকেও, যথা, তাঁকে (সভানেত্রীকে) লোকমান্য তিলক ও মহাত্মা গান্ধীকে পৃথক পৃথক ভাবে তাঁদের মত প্রকাশ করতে সুযোগ দিয়েছেন। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের প্রধান ব্যক্তিগণের মতও তিনি শুনেছেন। সভানেত্রী মহাশয়া বিলাতে একটি প্রতিনিধির দল (deputation) প্রেরণ সম্বন্ধে বললেন। পরিশেষে তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় ভারতমাতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রে ভবিষ্যৎ আশার বাণী দিলেন।(২)

অতঃপর সমবেত কণ্ঠে একটি স্বদেশী সঙ্গীত গীত হওয়ার পর সভা সেদিনের মত শেষ হ'ল। সভানেত্রী মহোদয়ার নির্দেশে পরদিন ২৭শে ডিসেম্বর অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি ও বিষয় নির্বাচনী সভার অধিবেশনের এবং ২৮শে ডিসেম্বর বেলা ১২টার সময় কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনের ব্যবস্থা হ'ল।

[তিন]

২৮শে ডিসেম্বর সভার প্রাক্কালে অন্তরীত আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের (শ্রীযুক্ত মহম্মদ আলি ও শ্রীযুক্ত সৌকত আলি) মাতা শ্রীযুক্তা বাহু বেগম সমভিব্যাহারে সভা-নেত্রী মহোদয়া কংগ্রেস প্যাণ্ডালে উপস্থিত হ'লেন। বিপুল হর্ষধ্বনি ও ঘন ঘন "বন্দে মাতরম্" উচ্চারণের মধ্যে এঁদেরকে মাল্য ভূষিত করা হ'ল। বেগমসাহেবা

---

* Let us think of the Mother.

To see her free, to see her hold up her head among the Nations, to see her sons and daughters respected everywhere to see her worthy of her migghty Past, engaged in building a yet mightor Future—is not this work working for, worth suffering for, worth living and worth dying for? Is there any other land which evokes such love for her for her literature, such homage for her valour, as this grlorious Mother of Nations, from whose womb went forth the races that now in Europe and America, are leading the world? And has any land suffered as our India has suffered since her sword was broken at Kurukshetra, and the peoples of Europe and Asia sweft across her borders, laid waste her cities, and discrowned her Kings. They came to conquer, but they remained to be absorbed. At last, out of those mingled peoples, the Divine Artificier has wedded for a Nation, compact not only of her own virtues, but also of those her foes and brought to her and gradually eliminating the vices which they had also brought.

After a history of millennia strtching far back out of the ken mortal eyes; having lived with, but not died with, the mighty civilisations of the Past; having seen them rise, and flourish and decay, until only their remaiped, deep burried in earth's crust; having wrought, and triumphed, and suffend, and having survived all changes unbroken; India, who has been verily the crucified among Nations, now stands on this her Resurrection morning, the Immortal, the Glorious, the Ever-Young; and India shall soon be seen, proud and self-reliant, strong and free, the radiant splendour of Asia, as the Light and the Blessing of the World

বোরখা দ্বারা মুখ আবৃত করেন নি। বর্ষীয়সী মহিলা, অতিশয় সুশ্রী ও সৌম্যদর্শন ছিলেন।

এদিনের সভার প্রারম্ভে শ্রীমতী সরলাদেবী চৌধুরাণীর (প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবিকা, সুপ্রসিদ্ধা ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা। কবি রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী ও পাঞ্জাবের খ্যাতনামা নেতা শ্রীযুক্ত রামভুজ দত্ত চৌধুরী মহাশয়ের পত্নী) নেতৃত্বে সমবেত কণ্ঠে একটি স্বদেশী সঙ্গীত গীত হ'ল।

সঙ্গীতের পর সভার কার্য আরম্ভ হ'ল। প্রথমেই জনৈক মুসলমান প্রতিনিধি উর্দুতে ভারতমাতা সম্বন্ধে একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন।

তৎপর সভানেত্রী মহাশয়া দুইটি প্রস্তাব দ্বারা দাদাভাই নৌরজী ও আবদুল রসুলের পরলোক গমন জন্য শোক প্রকাশ করলেন।

তৃতীয় প্রস্তাব দ্বারা তদানীন্তন প্রথানুসারে ভারত-সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা হ'ল এবং চতুর্থ প্রস্তাবে রাইট অনারেবল্ ই. এস. মণ্টেগুকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হ'ল।

পঞ্চম প্রস্তাব ছিল, আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের অন্তরীণ হ'তে মুক্তির দাবি সম্বন্ধে। এই প্রস্তাব উপস্থিত করার পূর্বে সভানেত্রী বললেন যে, এই সভায় আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের জননী উপস্থিত আছেন। তিনি জানাচ্ছেন যে, তিনি মুসলিম লীগের অধিবেশনেও নিমন্ত্রিত হয়েছেন কিন্তু তিনি পূর্বে কংগ্রেসে না এসে ওখানে যেতে পারেন না, কারণ যদিও মুসলমানগণ ধর্মমতে তাঁর ভাই কিন্তু সমগ্র ভারতবাসীই তাঁর ভাই। সভানেত্রী মহোদয়া সকলকে দণ্ডায়মান হয়ে এই বীর জননীকে সম্মান প্রদর্শন করবার জন্য আহ্বান করলেন। সমবেত জনতা দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মান দেখালেন।

(এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গত কয়েক বৎসর ধরে জিন্না প্রভৃতি মুসলমান নেতাগণের চেষ্টায় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের অধিবেশন একই স্থানে, একই সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল।)

প্রস্তাব পেশ করতে শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয়কে আহ্বান ক'রে সভানেত্রী মহাশয়া বললেন যে, তিলক মহাশয় দেশের জন্য ৭ বৎসর কারাবরণ করেছেন এই কারণে বিশেষ ক'রে তাঁকে প্রস্তাবক নির্বাচিত করা হয়েছে।

আলি ভ্রাতৃদ্বয় গত ১৯১৪ সালের অক্টোবর মাস আইনানুসারে অন্তরীত আছেন। তাঁদের অন্তরীণের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করে লোকমান্য তিলক দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন এবং তাঁদের মুক্তি দাবি করে প্রস্তাব উপস্থিত করলেন।

প্রস্তাব সমর্থন করলেন বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী সুদর্শন যুবক শ্রীযুক্ত যমনাদাস দ্বারকাদাস, মাদ্রাজের তরুণ বক্তা শ্রীযুক্ত এস্. সত্যমূর্তি ও আরও কয়েকজন প্রতিনিধি। বাংলার তরফ থেকে শ্রীযুক্ত এ. সি. ব্যানার্জি সমর্থন করার পর প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

পরবর্তী প্রস্তাব উত্থাপন করলেন কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত জে. এন. রায় মহাশয়। এই প্রস্তাবে অধিক পরিমাণে ভারতবাসীদের সামরিক শিক্ষা প্রদানের দাবি করা হয় এবং সৈন্য বিভাগে অফিসার নিয়োগ সম্বন্ধে জাতিগত বৈষম্য দূর করে যে ৯ জন ভারতবাসীকে অফিসার পদে (Commissioned ranks of the army) নিয়োগ করা হয়েছে তজ্জন্য সন্তোষ প্রকাশ করে অধিক সংখ্যক ভারতবাসীকে অফিসার পদে নিয়োগের দাবি করা হয়।

এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন অন্ধ্রের শ্রীযুক্ত ভেঙ্কটাপতি রাজু, পাঞ্জাবের ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত বরকত আলি, যশোহরের উকিল রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর প্রভৃতি প্রতিনিধিগণ, এই অধিবেশনে প্রসিদ্ধ ব্যায়ামবীর সুবিশাল-বপু প্রফেসর রামমূর্তি উপস্থিত ছিলেন। তিনি হিন্দীতে এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

এর পরবর্তী প্রস্তাবটি ছিল ১৯১০ সালের সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইন প্রত্যাহার সম্বন্ধে।

বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ নির্ভীক সাংবাদিক ভারতপ্রেমী ইংরাজ মিঃ বি. জি. হরনিম্যান এই প্রস্তাব উপস্থিত করে তথ্যপূর্ণ সুচিন্তিত অভিভাষণ দিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল সুবক্তা শ্রীযুক্ত এ. কে. ফজলুল হক (পরবর্তীকালে অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী—শের-এ-বাংলা), কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু, কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত ডি. সি. ঘোষ, পাঞ্জাবের শ্রীযুক্ত সৈফুদ্দিন কিচলু (পরবর্তীকালের প্রসিদ্ধ ডাঃ কিচলু), কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ এটর্নি শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ খৈতান, মাদ্রাজ হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত টি. এম. কৃষ্ণস্বামী পণ্ডিত কাশীরাম তেওয়ারী প্রস্তাব সমর্থন করলেন। এঁদের মধ্যে কিচলু সাহেব উর্দুতে এবং তেওয়ারী

পরবর্তী প্রস্তাবে বাংলার তথাকথিত বিপ্লবী ষড়যন্ত্র দমন করতে গভর্ণমেণ্টকে অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান জন্য গত ১০ই ডিসেম্বর যে কমিটি নিযুক্ত হয়েছে তার নিন্দা এবং ভারতরক্ষা আইন ও ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশনের (যার বলে বিনা বিচারে অন্তরীণের ব্যবস্থা আছে) যথেচ্ছ ব্যবহারের প্রতিবাদ করা হয়।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় এই প্রস্তাব উপস্থিত করে যুক্তিপূর্ণ অভিভাষণ দেন। প্রসিদ্ধ সাংবাদিক ও সুবক্তা শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাংলায় ও লক্ষ্ণৌয়ের পণ্ডিত গোকরণ মিশ্র মহাশয় হিন্দীতে প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

এই সময় মাদ্রাজের শ্রীযুক্ত ভি. পি. মোমাচারী মহাশয় দাঁড়িয়ে বললেন যে, দক্ষিণ ভারতের ভীষ্ম স্যর সুব্রহ্মণ্য আইয়ার মহাশয়ের একটি বাণী কংগ্রেসের জন্য পাঠিয়েছেন। এই বাণী আনন্দের বাণী, আশার বাণী এবং অদূর ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ সাফল্যের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের বাণী। সমবেত দর্শক ও প্রতিনিধি মণ্ডলী স্যর সুব্রহ্মণ্য আইয়ারের নামে জয়ধ্বনি দিল।

দ্বিতীয় শ্রীযুক্ত এম. খাজা প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠে বললেন যে, তিনি শাসকগণের ভাষা ব্যবহার না করে আগামী দিনের আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষায় বক্তৃতা দিবেন। এই বলে তিনি উর্দুতে তাঁর মত প্রকাশ করলেন। তারপর বাংলার অনন্যসাধারণ বক্তা কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল ও খ্যাতনামা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠলেন। তিনি জ্বালাময়ী ভাষায় বাংলার অন্তরীণ যুবকদের অবস্থা সম্বন্ধে মর্মন্তুদ বিবরণ শোনালেন। অন্যান্য দৃষ্টান্তের মধ্যে রংপুরের শ্রীশচীন্দ্র-নাথ দাশগুপ্ত সম্বন্ধে ঘটনা তিনি বিবৃত করলেন। শচীন্দ্রনাথ অন্তরীণ হ'তে মুক্তিলাভ করেন সুতরাং ধরে নিতে হবে যে, তিনি নির্দোষ ছিলেন কিন্তু মুক্তির পর পুলিশ তাঁকে এমন ভাবে নির্যাতন সুরু করল এবং সর্বদা তাঁর পিছনে তাড়াহুড়া করতে লাগল যে, শচীন্দ্রনাথকে এই অত্যাচারের হাত থেকে আত্মহত্যা করে নিষ্কৃতিলাভ করতে হ'ল। এই ভাবে একটি বঙ্গবীরের জীবন অবসান হ'ল। এই ঘটনা তখন বাংলা দেশে বিশেষ সাড়া জাগিয়েছিল। জিতেন্দ্রলালের মত এমন অনর্গল চোস্ত ইংরাজি ভাষায় বক্তৃতা দিতে খুব কম লোককেই দেখেছি, শব্দস্রোত যেন জলস্রোতের ন্যায় তাঁর কণ্ঠ হ'তে নির্গত হ'ত।

জিতেন্দ্রলালের পর মধ্যপ্রদেশের ছিন্দওয়াড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত খাড়ে আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের অন্তরীণ-সংক্রান্ত অনেক কথা বলে প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

এর পর বিহারের শ্রীযুক্ত অরিকসন সিং এবং ঢাকার শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় যথাক্রমে হিন্দী ও বাংলায় সমর্থন করার পর প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

অপর একটি প্রস্তাব দ্বারা কংগ্রেসের সংবিধানের কিছু সংশোধন করা হ'ল।

সর্বশেষে সভানেত্রী কর্তৃক কতকগুলি মামুলি প্রস্তাব (omnibus resolution) উত্থাপিত হয়ে গৃহীত হ'ল।

এর পর সেদিনের মত অধিবেশন শেষ হ'ল। সভানেত্রী মহাশয়া জানালেন যে, পরদিন বেলা ১১-৩০ মিঃ সময় কংগ্রেসের শেষ দিনের অধিবেশন হবে।

[চার]

২৯শে ডিসেম্বর বেলা ১১.৩০ মিনিটের সময় কংগ্রেসের তৃতীয় দিনের অধিবেশন আরম্ভ হ'ল।

প্রথমেই সভানেত্রী মহাশয়া কারাগারে আবদ্ধ শ্রীযুক্ত অর্জুনলাল শেঠী নামক জনৈক ভদ্রলোকের অনশন-জনিত মৃত্যুর হাত থেকে তাঁর প্রাণ রক্ষা করার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্টকে হস্তক্ষেপ করতে আবেদন জানালেন। এই প্রস্তাব প্রসঙ্গে সভানেত্রী জানালেন যে, উক্ত ভদ্রলোককে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট পাকড়াও করে জয়পুর ষ্টেটের হস্তে সমর্পণ করে। সেখানে তাঁকে কারাবরণ করতে হ'ল কিন্তু সেখানে তাঁকে তাঁর ঠাকুরের মূর্তিপূজার ব্যবস্থা জয়পুর সরকার করে দেন। তারপর অকস্মাৎ তাঁকে মাদ্রাজে ভেলোর জেলে স্থানান্তরিত করা হয় কিন্তু সেখানে তাঁকে ঠাকুরের পূজা করার অনুমতি দেওয়া হ'ল না। ঐ ধার্মিক জৈন ঠাকুর পূজা না করে জলগ্রহণ করেন না, ফলে ৩৫ দিন তিনি অনাহারে থেকে তিলে তিলে মৃত্যু বরণ করছেন। সরকারের চাপে আবেদন-নিবেদন নিষ্ফল হওয়ায় তাঁর বন্ধুগণ কংগ্রেসের শরণাপন্ন হয়েছেন। প্রস্তাবটি সর্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হ'ল।

তারপর এবারকার কংগ্রেসের সর্বপ্রধান প্রস্তাব—স্বায়ত্ত-শাসন সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হ'ল। প্রস্তাবটি প্রথমে সভানেত্রী মহোদয়া পাঠ করলেন। প্রস্তাবে প্রথমতঃ ভারতে স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠা করা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য বলে ভারত-সচিব যে ঘোষণা করেছেন তজ্জন্য সকৃতজ্ঞ আনন্দ জ্ঞাপন করা

হয়। দ্বিতীয়তঃ, স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠার জন্ত একটি আইন অবিলম্বে পার্লেমেন্টে বিধিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সনির্বন্ধ অনুরোধ করা হয় এবং বলা হয় যেন উক্ত আইনেই অনতিবিলম্বে পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন প্রাপ্তির জন্ত একটি নির্দিষ্ট সময় নির্দ্ধারিত থাকে এবং শেষে বলা হয় যে, প্রথম পদক্ষেপ-স্বরূপ কংগ্রেস-লীগ স্কীম অবিলম্বে প্রবর্তন করা হয়।(৩)

এই প্রস্তাব উপস্থিত করলেন যথারীতি অনারেবল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। তিনি বললেন, কংগ্রেসের স্বায়ত্ত-শাসনের স্বপ্ন আজ সফল হ'তে চলল। তিনি স্বায়ত্ত-শাসন সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে গৃহীত কংগ্রেস লীগ স্কীম সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে বললেন।

শ্রীযুক্ত মহম্মদ আলি জিন্না প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠে অন্যান্য কথার পর বললেন যে, ভারতসচিব মিঃ মণ্টেগু বর্তমানে ভারতে এসেছেন। বিলাতে প্রত্যাবর্তনের অনতিকাল মধ্যে তিনি তাঁর অভিমত প্রকাশ করবেন। খুব সম্ভব আগামী এপ্রিল মাসে তাঁর প্রস্তাব বিলাতে ও ভারতে আলোচনার জন্ত প্রকাশিত হবে। জিন্না সাহেব অভিমত প্রকাশ করলেন যে, প্রস্তাব প্রকাশিত হওয়ার পর অনতিবিলম্বে সেটি বিবেচনার জন্ত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের বিশেষ অধিবেশন হওয়া প্রয়োজন। তখন গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাব আলোচনা ক'রে আমরা যেন আমাদের দাবি সম্বন্ধে চূড়ান্ত মত প্রকাশ করি।

জিন্না সাহেবের পর শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক, শ্রীযুক্ত সি. পি. রামস্বামী আইয়ার, শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্রীযুক্ত হাসান ইমাম, শ্রীযুক্ত আনসারী, শ্রীযুক্ত এস্. আর. বোমানজী ও শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু প্রস্তাব সমর্থন করলেন, এঁদের মধ্যে শ্রীযুক্ত আনসারী উর্দ্দুতে বক্তৃতা দিলেন।

বিখ্যাত নেতাগণের ভাষণের পর সভানেত্রী বললেন যে, খ্রীষ্টান শাস্ত্রমতে সর্বোৎকৃষ্ট মদ ভোজের সর্বশেষে পরিবেশন করতে হয়। বাগ্মিতার এই মহাভোজ সভায় আমাদের এমনি একটি পাত্র পান করতে হবে। এই মন্তব্য ক'রে তিনি পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যকে প্রস্তাব সমর্থন করতে আহ্বান করলেন।

পণ্ডিতজী দাঁড়াতেই কয়েকজন প্রতিনিধি তাঁকে হিন্দীতে ভাষণ দিতে অনুরোধ করল। পণ্ডিতজী বললেন যে, তাঁর মাতৃভাষায় বক্তৃতা দিতে ইচ্ছা প্রতিনিধি উপস্থিত আছেন. তাঁরা কেহই হিন্দী বা উর্দু ভাষা জানেন না। তাঁদের উপেক্ষা করা সমীচীন হবে না। মালব্যজী তাঁর সুদীর্ঘ অভিভাষণে স্বায়ত্ত-শাসন সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করলেন।

মালব্যজী আসন গ্রহণ করলে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দাঁড়িয়ে বললেন যে, তিনি বক্তৃতা দিতে ওঠেন নি। তিনি একজন নমঃশূদ্র প্রতিনিধিকে সভায় পরিচিত করে বললেন যে, এই ভদ্রলোক নমঃশূদ্র সমাজের প্রতিনিধি ও নেতা। যে ভজনখানেক নমঃশূদ্র অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের সাহায্যে জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধাচরণ করছে তাদের সেই কার্যকলাপের প্রতিবাদ জানাতে তিনি কংগ্রেসে উপস্থিত হয়েছেন।

অতঃপর নমঃশূদ্র নেতা শ্রীযুক্ত ভেগাই হালদার বাংলায় বক্তৃতা দিয়ে প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হ'ল।

পরবর্তী প্রস্তাব উপস্থিত করলেন শ্রীযুক্ত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী মহাশয়। (তখন পর্যন্ত গান্ধীজীর "মহাত্মা" উপাধি খুব বেশী প্রসিদ্ধিলাভ করে নি। কেবলমাত্র সভানেত্রী মহোদয়া তাঁর অভিভাষণে গান্ধীজীকে "মহাত্মা গান্ধী" রূপে উল্লেখ করেছেন।) মহাত্মা গান্ধী হিন্দীতে উপনিবেশসমূহে ভারতীয়দের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করে তার প্রতিকার দাবি করলেন।

প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠে শ্রীযুক্ত পলটনওয়ালা পূর্ব আফ্রিকায় ভারতবাসীদের প্রতি অবিচার ও অত্যাচারের বর্ণনা দিয়ে গভর্ণমেণ্টের বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদ করলেন।

প্রস্তাবটি আরও কয়েকজন প্রতিনিধি কর্তৃক সমর্থিত হওয়ার পর গৃহীত হ'ল।

এর পর কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত শশাঙ্কজীবন রায় চুক্তিবদ্ধ মজদুর সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত করলেন।

অনুন্নত শ্রেণীর সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করলেন মাদ্রাজের "ইণ্ডিয়ান রিভিউ" পত্রিকার প্রসিদ্ধ সম্পাদক—শ্রীযুক্ত জি. এ. নটেশন। গুজরাটের শ্রী বি. জে. দেশাই, মালবারের শ্রীযুক্ত রামা আইয়ার এবং দিল্লীর ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত আসফ আলি (পরবর্তী অসহযোগ আন্দোলনে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেন এবং দেশের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর উড়িষ্যায় গভর্ণর নিযুক্ত হন।) প্রস্তাবটি সমর্থন করায় ইহা গৃহীত হ'ল।

পরবর্তী প্রস্তাব দ্বারা যে সকল দমনমূলক আইনগুলি

ও ভারতরক্ষা আইনের বলে জনসাধারণের মতামত প্রকাশ, লেখনী পরিচালনা ও সভা-সমিতি করার স্বাধীনতা সঙ্কোচ করা হয়েছে তার যথেচ্ছ ব্যবহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান জন্য একটি পার্লামেন্টের কমিটি নিযুক্ত করতে ভারতসচিব মারফৎ পার্লামেন্টকে অনুরোধ করা হয় এবং বড়লাটের যোগে এই প্রস্তাব ভারত-সচিবের নিকট পেশ করতে সভানেত্রীকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

এর পরের প্রস্তাবে প্রয়োজন হ'লে ইংলণ্ডে একটি ডেপুটেশন প্রেরণের ক্ষমতা অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটিকে দেওয়া হ'ল।

শেষের প্রস্তাবগুলি সভানেত্রী মহাশয়া উপস্থিত করলেন। একটি প্রস্তাব দ্বারা শ্রীযুক্ত যোসেফ ব্যাপ্টিষ্ট, (বোম্বাই হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার ও লোকমান্য তিলকের অনুগামী কংগ্রেস কর্মী) ও শ্রীযুক্ত এইচ. এস. এল. পোলক (ইংরাজ ইহুদী, মহাত্মা গান্ধীর দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সহকর্মী ও ভারত-বন্ধু) মহাশয়-দ্বয়কে অনুরোধ করা হয় যেন তাঁরা ইংলণ্ডে যে লেবার পার্টি পার্লামেণ্টে ভারতের স্বায়ত্তশাসন আইন গ্রহণে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে—সেই লেবার পার্টির বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত হয়ে উক্ত পার্টিকে ভারতের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

দুইটি প্রস্তাবের দ্বারা কংগ্রেস সংবিধানের কিছু পরিবর্তন করা হ'ল। অন্য একটি প্রস্তাবে কংগ্রেসের ব্রিটিশ কমিটির সভাপতি স্যর উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণকে ধন্যবাদ দেওয়া হয় এবং ব্রিটিশ কমিটি সংরক্ষণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আগামী বৎসরের জন্য শ্রীযুক্ত কেশব পিলাই, শ্রীযুক্ত সি. পি. রামস্বামী আইয়ার ও মাননীয় শ্রীযুক্ত ভুরগুড়িকে সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত করা হ'ল।

এর পর রায়বাহাদুর সুলতান সিং দিল্লীতে, আগামী বৎসরের অধিবেশন জন্য কংগ্রেসকে আমন্ত্রণ করলেন। সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

সভার কার্য সমাপ্ত হওয়ার পর কলিকাতা হাই-কোর্টের সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্তী মহাশয় যথাযোগ্য ভাষায় সভানেত্রীকে ধন্যবাদ দিলেন।

এর পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয় প্রতিনিধিবর্গকে, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে এবং কর্মীবৃন্দকে কংগ্রেসের অধিবেশনের সাফল্যে সহায়তা করার জন্য ধন্যবাদ দিলেন। তিনি বিশেষ করে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ক্যাপ্টেন শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বসু (আলিপুর কোর্টের উকিল) শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন (কলিকাতা হাই-কোর্টের ব্যারিষ্টার), শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস (শিক্ষাব্রতী) ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (শিক্ষাব্রতী) ও শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী (কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার) মহাশয়গণের নাম উল্লেখ করলেন।

বৈকুণ্ঠবাবুর ভাষণের পর সভানেত্রী মহোদয়া তাঁর অনবদ্য ভাষায় প্রতিনিধি ও স্বেচ্ছাসেবকগণকে, ধন্যবাদ দিলেন। রাজা গোপাল সিং নামক জনৈক রাজপুত রাজাকে অন্তরীণ আইন ভঙ্গের অপরাধে জেলে প্রেরণ এবং তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার বিরুদ্ধে শ্রীমতী বেশান্ত তীব্র প্রতিবাদ করে বললেন যে, এই রাজাকে সাধারণ কয়েদীর মত রাখা হয়েছে এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের ফলে তাঁর পুত্র অত্যন্ত দুরবস্থায় পতিত হয়েছে। অতঃপর বাংলার অন্তরীণ অগণিত যুবকদের প্রতি পুলিসের অবর্ণনীয় অত্যাচার ও তাদের দুঃসহ কষ্টের কথা মর্মন্তুদ ভাষায় বর্ণনা করলেন। জিন্না সাহেব 'রিফর্ম বিল' প্রস্তুত হওয়ার পর কংগ্রেস ও লীগের বিশেষ অধিবেশনের যে সুপারিশ করেছেন তা তিনি সমর্থন করলেন এবং আশা করলেন যে, অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি ও মুসলীম লীগের কাউন্সিল এই সুপারিশ অনুসারে কাজ করবে। তার পর তিনি উল্লেখ করেন যে, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও গান্ধীজীর উপদেশানু-সারে একটি কংগ্রেস দিবস পালনের ব্যবস্থা করা হ'ল। অন্তকার এই কংগ্রেস দিবসে শ্রীযুক্ত তিলক মহাশয়ের কথামত সভাপতির বাণী ইংরাজিতে (২০,০০০ কপি) ও ভারতের প্রধান প্রধান ভাষায় তা অনুবাদ করে তিনি হোমরুল লীগের মাধ্যমে বিতরণের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি এই কংগ্রেস দিবস পালনের ব্যবস্থা বজায় রাখতে বললেন (পরবর্তীকালে কংগ্রেস দিবস পালন হয়েছে বলে আমি জানি না)। সর্বশেষে তিনি বললেন যে, একমাত্র ভগবানের নিকট থেকেই স্বাধীনতার দান আসে। কোন জাতি অন্য কোন জাতিকে স্বাধীনতা দিতে পারে না। পরিশেষে তিনি ভারতমাতার প্রতি অপূর্ব ভাষায় ভক্তি অর্ঘ্য প্রদান করে আসন পরিগ্রহণ করলেন।

কংগ্রেসের অধিবেশন সমাপ্ত হ'ল।

পূর্ব বৎসরের ন্যায় এবারেও অল-ইণ্ডিয়া মোসলেম লীগ কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণকে তাঁদের সভায় উপস্থিত হতে নিমন্ত্রণ করে। অন্যান্য প্রতিনিধির সঙ্গে আমিও মুসলীম লীগের অধিবেশনে দর্শকরূপে যোগদান করি।

বিদেশের কথা

শ্রীযোগনাথ মুখোপাধ্যায়

মস্কো-পিকিং কথা

ক্রুশ্চভের বিদায়ের পর কম্যুনিষ্ট দুনিয়ার দুই প্রধান সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীনের মতবৈষম্য ও মনোমালিন্য দূর হওয়ার যে ক্ষীণ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল তা ইতিমধ্যে প্রায় সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে। মীমাংসার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নের দিক থেকে চেষ্টার ত্রুটি হয় নি, কিন্তু চীনের কম্যুনিষ্ট নেতারা এটা প্রায় স্পষ্ট ভাষাতেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, বিরোধের নিষ্পত্তি শুধু তাঁদের সর্তেই হ'তে পারে। তাঁরা যে মারমুখী নীতি অনুসরণ করে চলেছেন তাকে তাঁরা অভ্রান্ত বিপ্লবী নীতি বলে মনে করেন, সে-কারণে ও-ব্যাপারে কোন আপোষ, সংশোধন বা উপদেশ তাঁরা মানতে রাজী নন। যদি কোন কম্যুনিষ্ট দেশ বা দল তাঁদের সঙ্গে একমত হ'তে না পারে, তবে চীনের অতিবিপ্লবী নেতারা তৎক্ষণাৎ সেই দেশ বা দলকে ভীরু, প্রতিক্রিয়াশীল, শোধনবাদী ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে বর্জন করবেন। এই রকম বেপরোয়া মনোভাবের সঙ্গে আপোষ করা বা মানিয়ে চলা কোন আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন দেশের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। এই কারণে সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে চীনের বিরোধ ও ব্যবধান দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। সম্প্রতি মস্কো-পিকিং বিরোধ দল বা আদর্শের গণ্ডি অতিক্রম করে কূটনৈতিক পর্যায়ে পৌঁছেছে।

উত্তর ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে মার্কিন সামরিক তৎপরতার প্রতিবাদ জানাতে কিছুদিন আগে মস্কোয় পাঠরত চীনা ও উত্তর ভিয়েৎনামী ছাত্ররা মস্কোস্থ মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে সাংঘাতিক বিক্ষোভ দেখায়। বিক্ষোভকারীরা এমন মারমুখী হয়ে ওঠে যে, মার্কিন দূতাবাসের সম্মুখে প্রহরারত নিরস্ত্র সোভিয়েট পুলিসের পক্ষে তাদের সহজে সংযত করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে নিরুপায় হয়েই সোভিয়েট পুলিসকে শেষ পর্যন্ত একটু কঠিন হ'তে হয় এবং জোর করেই বিক্ষোভকারীদের অপসারিত করা হয়।

কূটনৈতিক সৌজন্যের তাগিদে সোভিয়েট পুলিসের ঐ আচরণ কম্যুনিষ্ট চীনকে দারুণ উত্তেজিত করেছে। চীনা সরকারের মতে সোভিয়েট সরকার যা করেছেন সেটা সৌজন্যবশত নয়, মার্কিন সরকারের ভয়ে। সেই "ভীরুতার" প্রতিবাদ জানাতে চীনা সরকারের প্ররোচনায় পিকিংস্থ সোভিয়েট দূতাবাসের সম্মুখে চীনা ছাত্ররা প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখায় এবং চীন সরকার সোভিয়েট সরকারের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনার দাবি জানিয়ে এক কড়া নোট পাঠান। কম্যুনিষ্ট দুনিয়ার দলাদলির ফলে ইতিপূর্বে বহু উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু এক কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের দূতাবাসের সম্মুখে আর এক কম্যুনিষ্ট দেশের "গণ-বিক্ষোভ" বা ক্ষমা প্রার্থনার দাবি জানিয়ে কড়া নোট পাঠানো সম্পূর্ণ অভিনব ঘটনা। সোভিয়েট সরকার অবশ্য এবারও সংযম হারান নি এবং অত্যন্ত দৃঢ় ভাষায় চীন সরকারের নোটের উত্তর দিলেও এমন কোন কথা বলেন নি যা কম্যুনিষ্ট দুনিয়ার ভাঙন অনিবার্য করে তোলে। ১লা মার্চ মস্কোয় যে কম্যুনিষ্ট ঐক্য সম্মেলন আহূত হয় এবং পৃথিবীর উনিশটি কম্যুনিষ্ট দেশ ও দলের প্রতিনিধিরা যাতে যোগ দেন তাতেও শেষ পর্যন্ত সব বিরোধের নিষ্পত্তির আশায় এমন কোন প্রস্তাব গৃহীত হয় নি যা কম্যুনিষ্ট চীন বা তার অনুগত কম্যুনিষ্ট দেশ ও দলগুলিকে ক্ষুব্ধ করতে পারে। কিন্তু এ ভাবে জোড়াতালি দিয়ে কতদিন চলতে পারে, এবং চলে কিছু লাভ হচ্ছে কি না—এ প্রশ্ন আজ সব কম্যুনিষ্ট মহলে উঠেছে।

বস্তুতপক্ষে চীন এখন যে নীতি অনুসরণ করে চলেছে তা জঙ্গী জাতীয়তাবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়, তার সঙ্গে কম্যুনিজমের কোন সম্পর্ক নেই। সৈন্যবলে, অস্ত্রবলে পৃথিবীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হওয়ার জন্য চীন মরিয়া হয়ে উঠেছে। কিন্তু পশ্চিমী শক্তিজোটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে খাদ্যে পরনির্ভর ও অস্ত্রশক্তিতে হীন চীনের পক্ষে যে এই উচ্চাভিলাষ পূরণ সম্ভব নয় তা চীনা নেতারা ভাল ভাবেই জানেন। তাই তাঁদের এখন একমাত্র মতলব হ'ল যে-কোন উপায়ে সোভিয়েট ইউনিয়নকে তাদের পক্ষ হয়ে পশ্চিমী শক্তিজোটের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামানো। চীনের জনবল ও সোভিয়েট অস্ত্রবল এক হ'লে সাম্রাজ্যবাদ নিশ্চিহ্ন হবে বিশ্ব থেকে, এই কথাটাই চীনা নেতারা এখন কম্যুনিষ্ট দুনিয়ার মনে গেঁথে দিতে চান। কম্যুনিষ্ট দুনিয়া যদি চীনের এই প্রচারে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয় তা হ'লে কম্যুনিষ্ট শিবিরে নেতৃত্ব হাতছাড়া হওয়ার ভয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন শেষ পর্যন্ত চীনের সঙ্গী হয়ে আমেরিকার বিরুদ্ধে

যুদ্ধে নামতে বাধ্য হবে। আর তাতে যে শেষ পর্যন্ত চীনেরই লাভ হবে সবচেয়ে বেশী, এ বিষয়েও চীনা-নেতারা নিঃসন্দেহ। তাঁরা জানেন, প্রবল প্রতিপক্ষ আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে চীনের কয়েক কোটি লোকের প্রাণহানি ছাড়া আর কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়ন ও আমেরিকা উভয়েই যাবে ধ্বংস হয়ে। তখন চীনের গতিরোধ করার মত কোন শক্তি পৃথিবীতে থাকবে না। চীনের এই সর্বনাশা অভিসন্ধির বিরুদ্ধে বিশ্বের সকল শিবিরের জনমত অবশ্যই সতর্ক ও সচেতন হওয়া দরকার।

মধ্যপ্রাচ্যে সঙ্কট :

পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের কিছুদিন আগে যে মনোমালিন্য ঘটে এখনও পর্যন্ত কোন মীমাংসা হয় নি। বরং অবস্থা আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। পশ্চিম জার্মানী ইস্রায়েলকে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করতে কিছুতেই সম্মত নয়। আবার সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র বা তার অনুগত দেশগুলিও তাদের এক নম্বর শত্রুকে ঐ ভাবে অস্ত্রসমৃদ্ধ হ'তে দিতে চায় না। কারণ ইস্রায়েল-বিরোধী আরবরা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, আরব-ইস্রায়েল যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত হবেই। এ-কারণে সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র ঘোষণা করেছে যে, পূর্ব জার্মানীর কম্যুনিষ্ট সরকারকেও তারা স্বতন্ত্র স্বীকৃতি জানাবে। সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের এই ঘোষণার সঙ্গে সব ক'টি আরব দেশ কিন্তু একমত হয় নি। মরক্কো, তিউনেশিয়া, আলজেরিয়া প্রভৃতি দেশ জানিয়েছে যে, পশ্চিম জার্মানীর ইস্রায়েল নীতি তারা সমর্থন না করলেও তার পাল্টা হিসাবে পূর্ব জার্মানীর কম্যুনিষ্ট সরকারকে তারা স্বতন্ত্র স্বীকৃতি জানাবে না। কারণ তা হ'লে জার্মানীর বিভাগকে মেনে নেওয়া হবে, যেটা তাদের কাম্য নয়। জার্মানীকে তারা ঐক্যবদ্ধই দেখতে চায়। তা ছাড়া এই ভাবে বিরোধ বাড়ানো হ'লে মধ্যপ্রাচ্যে অকারণে নতুন উত্তেজনা সৃষ্টি করা হবে যাতে আরব দেশগুলিরই ক্ষতি হবে সবচেয়ে বেশী। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের সঙ্গে পশ্চিম জার্মানীর মনকষাকষি আরব ঐক্যেও ফাটল ধরিয়েছে। প্রেসিডেন্ট নাসেরের কথা আরব দুনিয়ার শেষ কথা এ অবস্থাটা এখন আর নেই বললেই হয়।

যুদ্ধাপরাধীর বিচার :

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গত বিশ বছরে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে মিত্রপক্ষের আদালতে প্রায় পাঁচ হাজার নাজীর বিচার হয়। এ ছাড়া পশ্চিম জার্মানীর নিজস্ব আদালতে বিচার হয় আরও প্রায় ছয় হাজার জনের। এখনও তের হাজার নাজীর বিচার চলেছে পশ্চিম জার্মানীর বিভিন্ন আদালতে। কিন্তু জার্মানীর রাষ্ট্রীয় আইন অনুসারে (জার্মান কোড—১৮৭১) কোন ব্যক্তির অপরাধের বিচার যদি বিশ বছরের মধ্যে না হয় এবং ঐ সময়ের মধ্যে একই অপরাধ যদি সেই ব্যক্তি আর না করে তবে তার বিরুদ্ধে আর অভিযোগ আনা চলে না। সেই হিসাবে আগামী ৮ই মের মধ্যে যেসব যুদ্ধাপরাধী ধরা পড়বে না তাদের আর বর্তমান আইনানুসারে গ্রেপ্তার বা বিচার করা চলবে না। এ কারণে জার্মানীর ভেতরে ও বাইরে অনেকেই আশঙ্কা করছেন যে, ৮ই মে অতিক্রান্ত হওয়ার পর এতদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকা হিটলারের বহু সঙ্গী বেরিয়ে আসবেন, এমন কি স্বয়ং হিটলারই বেরিয়ে আসতে পারেন কোন এক কল্পনাতীত স্থান থেকে, যদিও এ বিষয়ে কারও মনে কোন সন্দেহ নেই যে, হিটলার বিশ বছর আগেই আত্মঘাতী হয়েছেন। বিভিন্ন মহলে যখন ৮ই মের পরেও নাজী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চালিয়ে যাওয়ার দাবি ওঠে তখন পশ্চিম জার্মানীর আইনমন্ত্রী বলেন, জার্মানীর সংবিধান সংশোধন না করে সেটা করা সম্ভব নয় এবং মন্ত্রিসভাও আইনমন্ত্রীর যুক্তি মেনে নেন। কিন্তু পশ্চিম জার্মানীর মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত নাজী-বিরোধী মহলে সাংঘাতিক বিক্ষোভ জাগিয়ে তোলে এবং পশ্চিম জার্মানীর পার্লামেণ্ট মন্ত্রিসভাকে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে বলেন। শেষ পর্যন্ত মন্ত্রিসভা মত পরিবর্তন করেছেন এবং ঠিক হয়েছে ৮ই মের পরেও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চালিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইন পরিবর্তিত না করে কি ভাবে বিচার চালানো হবে তা এখনও ঠিক হয় নি।

———

হয়েল-নারলিকারের তত্ত্ব

অধ্যাপক ফ্রেড হয়েল এবং ডঃ জয়ন্তবিষ্ণু নারলিকারের প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা আমরা ইতিপূর্বে (প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৭১) পঞ্চশস্যের পাতায় সূত্রপাত করেছিলাম। অধ্যাপক হয়েল গত বছর জুন মাসে তাঁদের নূতন তত্ত্বটির প্রকাশ করেন, বিজ্ঞানের দুনিয়ায় সেই থেকে মস্ত সোরগোল শুরু হ'ল। প্রথম প্রকাশের এক মাসের মধ্যে লেখা সে প্রবন্ধটিতে আমরা হয়েল-নারলিকারের মূল তত্ত্বটির মধ্যে প্রবেশ করতে পারি নি, পরবর্তী আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলাম মাত্র। আসল কথা, তাঁদের যা মূল বক্তব্য সে সম্বন্ধেই আমরা পূর্ণাঙ্গ কোন বিবরণ তখনও জোগাড় করতে পারি নি। সে-কথা স্বীকার করে আমরা মন্তব্য করেছিলাম—"বিজ্ঞানের এই উন্নতির যুগ মানুষের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার কত উন্নতি হয়েছে, মহাসমুদ্রের দু' পাড়ের দেশগুলিতে নিমেষের মধ্যে লক্ষ লক্ষ শব্দ সংবাদ বহন করে চলেছে, অথচ কি আশ্চর্য দেখুন—যে-তত্ত্ব সমস্ত বিশ্ব-সৃষ্টি সম্বন্ধেই নূতন কথা বলতে চায় তার সম্বন্ধে খবর এখনও পর্যন্ত অবিশ্বাস্য রকমে অসম্পূর্ণ।"

এই আট কি ন'মাসের মধ্যে অবস্থার যে খুব কোন পরিবর্তন হয়েছে তা নয়। নারলিকার আমাদেরই মত ভারতীয়। তাঁর সাধনায় ভারতীয় বিজ্ঞানের ঐতিহ্য আরও বেগবান হ'ল। কিন্তু খবর কাগজে তাঁর নানা ভঙ্গির ছবি এবং কলম-জোড়া সাংবাদিক বিবরণের মধ্যে তাঁর বৈজ্ঞানিক বক্তব্যের মূল কথাটুকুই বাদ গেছে। নারলিকার সম্প্রতি ভারতে এলেন, কলকাতাও তিনি ঘুরে গেছেন। এ উপলক্ষে আমরা হয়েল-নারলিকারের যুগ্ম ধারণা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করছি।

হয়েল-নারলিকারের তত্ত্ব মহাবিশ্বের মধ্যে নূতন নূতন বস্তু সৃষ্টির সম্ভাবনাকে স্বীকার করে নিয়েছে। এ কথা আজ নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে, এই বিশ্ব তার সমস্ত জ্যোতিষ্ক নীহারিকা ছায়াপথ নিয়ে এক অনন্তব গতিতে একে অপরের থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। তুলনামূলক ভাবে এক বিস্ফোরণরত তুবড়ির কথা চিন্তা করা যেতে পারে। তুবড়ির স্ফুলিঙ্গগুলি যেমন একে অপর থেকে দূরে ছড়িয়ে পড়ে, এই মহাবিশ্বও সে রকম ভাবে সম্প্রসারণশীল। দু'টি জ্যোতিষ্কের মধ্যে দূরত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মধ্যবর্তী শূন্যতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। হয়েল-নারলিকার বলেন, এই ক্রমবর্ধমান শূন্যতার মধ্যে নূতন নূতন বস্তু সৃষ্টি সম্ভব। তাঁদের এই অভিনব ধারণা বিজ্ঞানের বহুদিনকার গৃহীত তত্ত্বকে অস্বীকার করে গড়ে উঠেছে, যে-তত্ত্ব গ্যালিলিও ও নিউটনের বিজ্ঞান সাধনার মধ্যে জন্ম নিয়েছিল। নিউটন সূর্যকে প্রদক্ষিণ রত গ্রহ-উপগ্রহগুলির [illegible] এই শক্তির ব্যাপারে। শক্তি দূরত্ব ডিঙিয়েও কাজ করতে পারে। সূর্য এত দূরে রয়েছে, তবু তার আকর্ষণ ন'টি গ্রহ এবং তাদের পার্ষদ উপগ্রহগুলির মধ্যে ছড়িয়ে থাকে। শক্তি সম্বন্ধে নিউটনের এই মৌলিক ধারণা বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথকে প্রশস্ত করেছে। কিন্তু কতকগুলি ক্ষেত্রে তা বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নি, আলোক ও তড়িৎ চুম্বকত্ব সম্বন্ধে এ কথা বিশেষ ভাবে খাটে। চুম্বকের চারপাশে লোহার গুঁড়ো বিশেষ ভাবে সাজানো থাকে, অর্থাৎ কি না চুম্বকের প্রভাব আশেপাশের জমিতে সঞ্চারিত হচ্ছে। এ থেকে এলো ফিল্ডের ধারণা। এই ফিল্ডের প্রকৃতিকে স্বীকার করে আইনষ্টাইন তাঁর অভিনব তত্ত্বগুলি ব্যক্ত করলেন। মহাকর্ষকে তিনি শক্তি হিসাবে চিন্তা না করে ফিল্ড হিসাবে কল্পনা করেছেন। তাঁর মতে, মহাকর্ষ দেশ-কালেরই স্বধর্ম, এই দেশ-কাল দেশ অর্থাৎ জমি এবং সময়ের "বুনোনে" গড়া। বস্তুর প্রভাবে দেশ-কাল প্রভাবিত পরিবর্তিত হচ্ছে, দেশ-কাল বেঁকে যাচ্ছে, সূর্যের মত একটা বিরাট আয়তন বস্তুর চাপ বেয়ে গ্রহ-উপগ্রহগুলি ঘুরপাক খাচ্ছে। অন্য ভাবে বলতে গেলে, নিউটনের ধারণায় যেখানে শক্তি দূরত্ব ডিঙিয়েও সরাসরি কার্যকরী, আইনষ্টাইনের মতে সেখানে পারিপার্শ্বিক দেশ-কালে পরিবর্তন এনে ফিল্ডের মাধ্যমে কাজ হচ্ছে।

হয়েল-নারলিকারের বৈজ্ঞানিক ধারণা প্রধানত নিউটনীয় মতাদর্শকে গ্রহণ করে গড়ে উঠেছে। আইনষ্টাইন মহাকর্ষকে দেশ-কালের ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু বস্তুর বস্তুত্ব, জলের সিক্ততা বা আগুনের দাহগুণের মত বস্তুরই স্বধর্ম বলে মেনে নিয়েছেন। হয়েল-নারলিকার কিন্তু সে কথায় সায় দেন নি। নিউটন বা আইনষ্টাইনের ধারণার সঙ্গে এখানে তাঁদের মস্ত তফাৎ। এ বিষয়ে হয়েল এবং নারলিকারের যা মত—অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ভাষায় বলতে গেলে, "যে কোন বস্তুর ভর (অর্থাৎবস্তুর বস্তুত্ব বা পরিমাণ) সারা জগতের বস্তুদের সঙ্গে গ্রথিত—তার অন্য-নিরপেক্ষ নিজস্ব গুণ নয়। জগৎ যদি ভিন্নভাবে গঠিত হ'ত, বস্তুকণার ভরও ভিন্ন সংখ্যা দিয়ে ব্যক্ত করতে হ'ত।

"এঁদের মতে, প্রত্যেক বস্তু বা আমাদের চিন্তজগতে প্রতীয়মান বা আমরা প্রত্যেকেই জগতের সামগ্রিক গঠনের উপর নির্ভর করে আছি। তাই প্রতিপদেই জগৎ ও ব্রহ্মাণ্ডের কথা এসে পড়বে। এই নূতন মত সত্যই বস্তু-স্বরূপ ঠিকভাবে ব্যক্ত করতে পেরেছে বা এটি গণিতজ্ঞের স্বপ্নাবেশ মাত্র। এ-বিষয়ে এত শীঘ্র কিছুই বলা যায় না।"

আসল কথা, এই অভিনব তত্ত্বটি পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করার মত উপযুক্ত কোন উপায় এখনও পর্যন্ত ভেবে পাওয়া যায় নি। প্রবাসীর আগামী সংখ্যায় হয়েল-নারলিকারের তত্ত্ব সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা প্রকাশ পাবে।

চুলের থেকে সরু

ছুঁচের মুখ দিয়ে তার যাবে এতে আশ্চর্য্য কি। আশ্চর্য হ'ত—যীশুখ্রীষ্ট যা বলেছিলেন, ছুঁচের মুখে যদি উট যেত। কিন্তু তার যে কত সরু হ'তে পারে তা সত্যই এক আশ্চর্য কথা। চুলের থেকে সরু। সরু সুতার থেকেও সরু তার আজ তৈরি সম্ভব হচ্ছে। ছবিতে ছুঁচের

চুলের থেকেও সরু তার (ছবিটি বহুগুণ বর্দ্ধিত)

ছিদ্র দিয়ে একটা সরু সুতা আর এক টুকরো তার দেখানো হয়েছে। ছবিটি বড় করে তোলা হয়েছে। সরু সুতো তাই দড়ির মত মোটা দেখাচ্ছে। তারটি তবু চুলের মতই সরু। আসলে তা চুলের থেকে অনেক সরু ছোট ছোট যন্ত্র তৈরিতে এত সরু তারেরও আজ দরকার হয়ে পড়েছে।

আশুতোষ ও বিজ্ঞান সাধনা

বিজ্ঞানের সাধনায় ভারতীয় ধারাটি বেশি পুরাণো না হ'লেও ইতিমধ্যে বেশ বেগবান হয়ে উঠেছে। গত শতাব্দীর মধ্য-ভাগ থেকে আমাদের দেশে আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার শুরু। কার সাধনায় তা প্রথমে রূপ নিয়ে উঠল—এ প্রশ্নটি খুব স্বাভাবিক। অধ্যাপক মহাদেব দত্ত "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" পত্রিকার মার্চ ১৯৬৫ সংখ্যায় এ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন—

"যতদূর জানা যায়, প্রথম ভারতীয় মৌলিক গবেষক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। আশুতোষের বিজ্ঞান গবেষণা অতি স্বল্পস্থায়ী, মাত্র ৩।৪ বছরের মত। অধ্যাপক গণেশপ্রসাদের মতে, আশুতোষের বিজ্ঞানের প্রবন্ধগুলি প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করলেও ইউরোপে এই বিষয়ে কি কি গবেষণা হয়েছে, তা জানা না থাকায় আশুতোষের গবেষণা প্রায়শঃ ইউরোপে কুড়ি বা পঁচিশ বছর পূর্বে যে গবেষণা হয়েছিল, তার পুনরাবৃত্তি। ৩।৪ বছরের মধ্যেই আশুতোষ আইন ব্যবসায়ে তাঁর সব শক্তি ও সময় নিয়োগ করায় বিজ্ঞান গবেষণার প্রথম ধারাটি প্রায় উৎস মুখেই হারিয়ে যায়, কিন্তু এখানেই সারা হয়ে যায় নি। প্রায় কুড়ি বছর পরে গবেষক আশুতোষকে দেখা যায় গবেষণা-সংগঠক হিসাবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা গণিত সমিতি, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে।" (—"ভারতে বিজ্ঞান গবেষণার ধারা" নামক প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত)।

রাত্রির অলংকার

আলো রাত্রিকে সাজিয়ে তোলে। কালোর বুকে তা ছবি আঁকে, আলপনা আঁকে। জোৎস্নাহীন রাতে উপরে আকাশের দিকে তাকালে এ কথাই মনে হয়। বিজলী বাতির যুগে আকাশের সেই আশ্চর্য তারা-

রাত্রির অলংকার

গুলিই যেন আজ মাটিতে নেমে এসেছে। অন্ধকার আজ নানা ভাবে অলঙ্কৃত হচ্ছে। ছবিতে যে অপরূপ কারুকার্যময় জিনিষটি দেখছেন তা কোন ইতিহাস-প্রসিদ্ধা রূপসী নারীর কর্ণাভরণ নয়, তা কালো রাত্রিরই অলংকরণ, তা একটি বিজলী বাতি, ইতালীর আলোক-বিশেষজ্ঞরা এটি রূপায়ণ করেছেন।

এ. কে. ডি.

মণিকণা

দেশস্থ সাধারণের বিজ্ঞতাকাঙ্ক্ষী হইলে প্রচলিত ভাষার অবলম্বন ব্যতিরেকে অভীষ্ট সিদ্ধি হইতে পারে না, এই হেতু এতৎ পাঠশালায় ছাত্রদিগকে গৌড়ীয় ভাষা দ্বারা বিদ্যোপার্জন করা যাইবেক। অর্থাৎ যে ভাষা তাহারা মাতৃক্রোড়াবধি লালন-পালন দ্বারা অভ্যাস করিয়া তদ্দ্বারা জ্ঞাত পদার্থে সংস্কারপ্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। অতএব ইহাতে তাহাদের অভ্রান্ত সংস্কার যে ভাষান্তর বহভ্যাসের শ্রমনিবৃত্তি হওয়াতে অনায়াসে প্রয়োজনোপযোগী বিদ্যা অভ্যাস করিবেন।

(—অধ্যাপক পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ)

সিসের গাছ
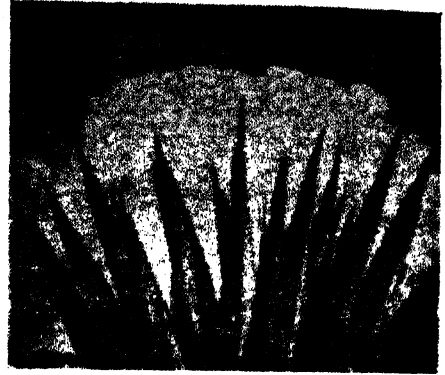
এ গাছ থেকে এক জাতীয় তন্তু তৈরী হয়

মুক্তধারা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকের সংস্কৃত অনুবাদ। অনুবাদক শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী সাহিত্যশাস্ত্রী। শ্রীউমাদেবী চক্রবর্তী, ১৩২।৫ শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড, কলিকাতা-৩১ হইতে প্রকাশিত।

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার। ৩৮।সি, বিধান সরণি। কলিকাতা-৬। পাঁচ টাকা।

রবীন্দ্রনাথের নাটকের সংস্কৃত অনুবাদের প্রয়োজন আছে কি না এ নিয়ে তর্ক উঠতে পারে। ক্লাসিকাল বা প্রাচীন ভাষায় রচিত সাহিত্যের আধুনিক কালের ভাষায় রূপান্তর সর্বদা কাম্য, কিন্তু আধুনিক কালের ভাষায় রচিত সাহিত্যকে সংস্কৃতে অনুবাদ করার সার্থকতা আছে কি? এর উত্তরে বলা যায় সংস্কৃত ভাষা ভারতে 'মৃত ভাষা' বা dead language নয়। ভারতবর্ষে এ ভাষা জীবিত, এ ভাষায় রচিত গ্রন্থ শিক্ষিত সমাজের বিরাট অংশের বোধগম্য। কাজেই সংস্কৃতে আধুনিক ভারতীয় ভাষায় রচিত গ্রন্থের অনুবাদ অপ্রাসঙ্গিক নয়। রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থের অনুবাদ যদি পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় হয়ে থাকে, তা হ'লে বাংলা ভাষার মাতামহী যে সমৃদ্ধ সংস্কৃত ভাষা, সে-ভাষায় রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্মের অনুবাদ হওয়া সঙ্গত। অবশ্য লক্ষ্য রাখতে হবে সে অনুবাদের ভাষা যেন মূলানুগ হয়, যেন দুরূহ বা দুরুচ্চার্য না হয়। শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তীর 'মুক্তধারা' অনুবাদ পড়ে আমি দেখেছি তাঁর রচনা মূলানুগ ও বেশ স্বচ্ছন্দে হয়েছে। কোথাও কোন দুরূহতা নেই যে রসগ্রহণে বাধা পড়বে। রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি রাজা, সেনাপতি, প্রজা, অমাত্য প্রভৃতি ভূমিকা-সমাকীর্ণ হওয়ায় এগুলির মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় সমাজের ছাপ স্পষ্টতঃই ফুটে ওঠে। সেদিক থেকে সংস্কৃত অনুবাদের একটি বিশেষ সুবিধা রয়েছে, কেননা প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত নাটকের কথা ঐ সূত্রে স্মরণ হয়। ধ্যানেশ-বাবুর এই অনুবাদ সর্বজনবোধ্য হওয়ায় সারা ভারতে যাঁরা সংস্কৃত জানেন তাঁদের কাছে 'মুক্তধারা' নাটকের রস পরিবেশন সহজতর হবে। যেমন:

"পথিক:—যন্ত্রেণ কিং প্রয়োজনম্?

নাগরিক: মুক্তধারাখ্যা নিঝরিণী যেনৈব নিরুদ্ধা।

পথিক:— অহো, অসুরস্য মুণ্ডমিব তৎ দৃশ্যতে, নাস্তি মাংসম্,

আবরণভাগ্ন দন্তুরেণ। যুষ্মাকম্ উত্তরকূটস্য শীর্ষোপান্তে ইদং মুখব্যাদানং কৃত্বা দণ্ডায়মানং তিষ্ঠতি। অহর্নিশং তু বিলোক্য যুষ্মাকং প্রাণপুরুষো বিশুষ্কং কাষ্ঠমিব সংকুচিষ্যতে।"

এই অনুবাদ সামান্য সংস্কৃত-জানা শ্রোতা-দর্শকের পক্ষেও কঠিন হয় নি। অনুবাদক সংস্কৃত নাটকের আদর্শে "নান্দী","প্রস্তাবনা" বসিয়েছেন। ফলে নাটকে ক্লাসিকাল রীতি রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু সংস্কৃত নাটকের আদর্শ রাখতে গেলে অন্যদিকে 'সাধারণ' পাত্র-পাত্রীর মুখে, মাগধী প্রাকৃত বসাতে হয়। কিন্তু সেই গোঁড়ামি পরিত্যাগ করে উচিত কাজ করেছেন। তা হ'লে গীতগুলিতে মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত বা শৌরসেনী অপভ্রংশ দিতে হয়। কিন্তু দিলে তার ফলে এই নাটকের রসগ্রহণে বাধা ঘটত। 'শঙ্কর বন্দনা' সংস্কৃত অনুবাদে সুন্দর খাপ খেয়ে গেছে। কিন্তু ধনঞ্জয় বৈরাগীর গানগুলি সম্পর্কে সে-কথা বলা যায় না। বাউলধর্মী গানগুলিকে সংস্কৃত শব্দে ছন্দে অনুবাদ করা অসম্ভব। তবে অনুবাদে রবীন্দ্রনাথের রচিত ঐ গানগুলির বক্তব্য গ্রহণে কোন বাধা হয় নি।

ধ্যানেশবাবু পূর্বে রবীন্দ্রনাথের "ডাকঘর" নাটকের "বার্তাগৃহম্" অনুবাদ করেছেন। সে নাটকের অভিনয় আমি দেখেছি, কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় নি। 'মুক্তধারা'র অনুবাদেও তিনি দক্ষতা দেখিয়েছেন। আমি আশা রাখি এই গ্রন্থ বিদ্বৎসমাজে আদৃত হবে।

শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য্য

বহুমুখী—সাহিত্য সংকলন, জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, মূল্য ১.২৫ পয়সা

সাহিত্য সংকলন হিসাবে একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর বই। অনেক খ্যাতনামা লেখকই ইহাতে লিখিয়াছেন। রচনাগুলি উল্লেখযোগ্য। লেখা নির্বাচনে কৃতিত্ব আছে। মফঃস্বল হইতে এরূপ একখানি রুচিসম্মত সংকলন বাহির করা যে কত কঠিন কাজ তা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। এজন্য সম্পাদক গৌরীপ্রসাদ সেন প্রশংসার দাবি করিতে পারেন। তবে ভয় হয়, এই 'টেম্পো' শেষ পর্যন্ত বজায় রাখিতে পারিবেন কিনা।

সুরভি—এমপ্লইজ্ কালচারাল্ সোসাইটি কর্তৃক আর একটি সাহিত্য সংকলন। ইহাও প্রশংসার দাবি রাখে। রচনাগুলির মধ্যে অধিকাংশই গল্প। গল্পগুলি ভাল। প্রতিষ্ঠানের এরূপ প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৭৭।২।১ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

'প্রবাসী' মাসিক সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকার ও অন্যান্য বিশেষ বিবরণ প্রতি বৎসর ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ তারিখের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিতব্য :—

ফরম্ নং ৪

(রুল নং ৮ দ্রষ্টব্য)

১। প্রকাশিত হওয়ার স্থান— কলিকাতা (পশ্চিমবঙ্গ)

২। কিভাবে প্রকাশিত হয়— প্রতি মাসে একবার

৩। মুদ্রাকরের নাম— শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত

জাতি — ভারতীয়

ঠিকানা — ৭৭।২।১, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

৪। প্রকাশকের নাম — ঐ

জাতি — ঐ

ঠিকানা — ঐ

৫। সম্পাদকের নাম — শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

জাতি — ভারতীয়

ঠিকানা — ৭৭.২.১, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

৬। (ক) পত্রিকার স্বত্বাধিকারীর নাম — প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড

ঠিকানা — ৭৭.২.১, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩

এবং

(খ) সর্বমোট মূলধনের শতকরা এক টাকার অধিক অংশের অধিকারীদের নাম-ঠিকানা—

১। শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
৭৭।২.১, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩

২। শ্রীমতী অরুন্ধতী চট্টোপাধ্যায়
৭৭।২।১, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩

৩। শ্রীমতী রমা চট্টোপাধ্যায়
৭৭.২।১, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩

৪। শ্রীমতী সুনন্দা দাস
৭৭.২।১, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

৫। শ্রীমতী ইশিতা দত্ত
৭৭.২.১, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

৬। শ্রীমতী নন্দিতা সেন
৭৭.২।১, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

৭। শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়
৭৭।২।১, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

৮। শ্রীমতী কমলা চট্টোপাধ্যায়
৭৭ ২ ১, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

৯। শ্রীমতী রত্না চট্টোপাধ্যায়
৭৭।২.১, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

১০। শ্রীমতী অলকানন্দা মিত্র
৭৭.২.১, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

১১। শ্রীমতী লক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায়
৭৭।২।১, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

আমি, প্রবাসী মাসিক সংবাদপত্রের প্রকাশক, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরি-লিখিত সব বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

দাশগুপ্ত